সাপ্তাহিক বসুমতী

জন্মদিনে তাঁর এই জ্যোতির্ময় বিভাসে
মৃত্যুও আজ অমৃতের অধিকারী।

সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ • 19th November, 1964 • Vol. 69, No

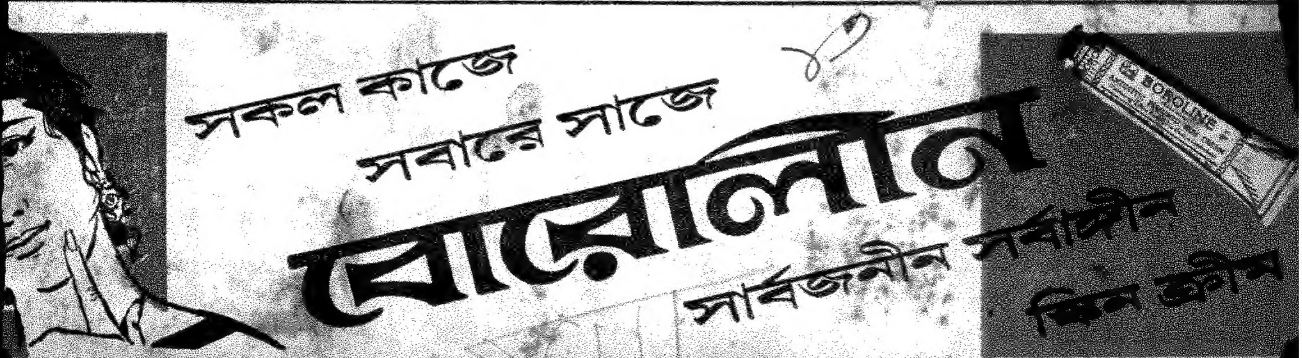

cwk-1405264-8-249704

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	১৫৩৯
আজকের মানুষ	...	১৫৪০
সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর	হরপ্রসাদ মিত্র	১৫৪১
ঘর থেকে ঘর (কবিতা)	পিনাকরঞ্জন সাহা	১৫৪৩
অক্সফোর্ড থেকে লিখছি	অশোক দেব চৌধুরী	১৫৪৪
টোকিওর চিঠি	মিত্রেন	১৫৪৮
ভারতদর্শন	...	১৫৫১
আন্তর্জাতিক	...	১৫৫৭
কৃষ্ণচূড়া (ধারাবাহিক উপন্যাস)	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	১৫৬৩
আঁধারমাণিক (ধারাবাহিক উপন্যাস)	মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	১৫৬৬

শ্রী কৃ ষ্ণ

পরম ভাগবত দেবেন্দ্রনাথ বসু বিরচিত

ভক্তির মন্দাকিনী
প্রেমের অলকনন্দা
জ্ঞানের আকাশগঙ্গা
বঙ্গসাহিত্যে এরূপ মহাগ্রন্থ আর নাই
চিত্রসমৃদ্ধ—সুশোভন—সম্মোহন সংস্করণ
মূল্য পনর টাকা

যে জ্ঞান-সূর্য্যের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার কিরণচ্ছটায় ভারত-মহিমা চিরভাস্বর—সেই সাহিত্যজগজ্জ্যোতি—প্রতিভা ও মনীষার অবতার—সাহিত্য-তপস্যানিষ্ঠ—মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর

হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী

কাঞ্চনমালা, বেণের মেয়ে, মেঘদূত, বাল্মীকির জয়, ভারত-মহিলা, বাঙ্গালা সাহিত্য সমালোচনা, ঐতিহাসিক নিবন্ধমালা, শিক্ষাসন্দর্ভ, সমাজসংস্কার নিবন্ধরাজি, মোহিনী।
এই জাতীয় সাহিত্য-জয়ন্তী মাত্র ১।।০

নীলাচলে
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
শ্রীগৌরাঙ্গ ও প্রফুল্ল
শ্রীপ্রমথনাথ মজুমদার বি-এল প্রণীত
।। দ্বিতীয় সংস্করণ ।।
মূল্য দুই টাকা মাত্র

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ক্যাণ্ডেল সাহেবের ব্যাণ্ডেল যাত্রা (রস-রচনা)	তরুণ মৈত্র	১৫৬৯
ভালোবাসার উদ্দেশে (কবিতা)	পরিমল চক্রবর্তী	১৫৭২
কালো সরকার (গোয়েন্দা-গল্প)	অদ্রীশ বর্ধন	১৫৭৩
বাণিজ্যে সেকাল ও একাল	ধনপতি সওদাগর	১৫৭৮
জৈব (গল্প)	মহাতোষ বিশ্বাস	১৫৮০
বঙ্গদর্শন	...	১৫৮৪
রঙ্গজগৎ	...	১৫৮৬
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	শিলালি	১৫৯০
নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী	দেবনারায়ণ গুপ্ত	১৫৯৬
গ্রন্থমেলা	জয়ন্তী সেন	১৫৯৭
খেলাধুলা	শ্রীঅমিতাভ	১৫৯৮

রক্তযুগের বিপ্লবী গুরু

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

নির্ব্বাসিতের আত্মকথা, উনপঞ্চাশী, সিনফিন, অনন্তানন্দের পত্র, বর্তমান সমস্যা, জাতের বিড়ম্বনা, পথের সন্ধান, স্বাধীন মানুষ, ধর্ম ও কর্ম।

মূল্য—আড়াই টাকা

বাংলার কথাশিল্পী

জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী

৭ খানি বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ উপন্যাস এবং ৩ খানি বড় লেখা—সুবৃহৎ গ্রন্থাবলী।

মূল্য তিন টাকা

আধুনিক কথা-সাহিত্যিক

বিভূতিভূষণ ভট্টের গ্রন্থাবলী

স্বেচ্ছাচারী, আশা, সহজিয়া, সপ্তপদী।

মূল্য—৩ টাকা

রসরাজ

অমৃতলাল বসুর গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—হরিশ্চন্দ্র, আদর্শ বন্ধু, যাদুকরী প্রভৃতি ১১ খানি নাটক।

২য় ভাগে—খাসদখল, চোরের উপর বাটপাড়ি, অবতার প্রভৃতি ১১ খানি নাটক।

৩য় ভাগে—বিবাহ বিভ্রাট, তরুবালা, ব্রজলীলা প্রভৃতি ১১ খানি নাটক

প্রতি ভাগ আড়াই টাকা

কাব্য-সাহিত্যিক

বিহারীলাল চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী

জীবনী ও কাব্য সমালোচনা, বিহারীলালের সারদা, বিহারীলাল ও তাঁহার কাব্য, সারদামঙ্গল, বন্ধুবিয়োগ, প্রেম-প্রবাহিনী, স্বপ্ন-দর্শন, সঙ্গীতশতক, বঙ্গসুন্দরী, নিসর্গ-সন্দর্শন, মায়াদেবী, ধূমকেতু, শরৎকাল, দেবরাণী, বাউল বিংশতি, সাধের আসন, কবিতা ও সঙ্গীত।

মূল্য ৩ টাকা

নয়জন কবির মূল্যবান সংস্কৃত ও বাংলা রচনার সমাবেশ। বঙ্গসাহিত্যে অভিনব আয়োজন।

বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী

মূল্য—পাঁচ টাকা।

প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা

যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর গ্রন্থাবলী

২য় ভাগে—সীতা, বিষ্ণুপ্রিয়া, মহামায়ার চর ও পূর্ণিমামিলন।

মূল্য দুই টাকা

উপন্যাস সাহিত্যের প্রদীপ্ত ভাস্কর

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

তৃতীয় ভাগ—বেলমতিয়া, বঙ্গসংসার, সনাতন গোস্বামী, পূজার মালা ও রাণী ব্রজসুন্দরী।

মূল্য—এক টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

৬১ বর্ষ, ২৫শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পঃ
বৃহস্পতিবার, ৩রা অগ্রহায়ণ ১৩৭১

25 Paise
Thursday, 19th November 1964

ডিগ্রীর অনুসরণে ডিগ্রী

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী এম সি চাগলা শিক্ষার ক্ষেত্রে নবযুগ আনয়নের পক্ষপাতী। আমাদের দেশে শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা দেশের সামগ্রিক লোক-সংখ্যার অনুপাতে যতই কম হোক না কেন—এঁরাই দেশের মাথা। এই মাথায় মস্তিষ্কের পরিমাণ কারো কারো কম-বেশি হলেও এঁরা প্রায় সকলেই ডিগ্রীধারী। সমাজে এঁদের প্রতিপত্তি অসীম। সুতরাং দেশের এই সব মর্যাদাসম্পন্ন ডিগ্রীধারী ব্যক্তিদের অনুসরণে বর্তমান ছাত্র-সমাজের পক্ষে ডিগ্রীর প্রতি মোহ থাকাটা খুব অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এই মোহের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন শ্রীচাগলা স্বয়ং। আমেদাবাদের ছাত্রদের সভায় তিনি বলেছেন:

'Mania for degrees must g' অর্থাৎ 'ডিগ্রীর মোহ অবশ্যই দূর করতে হবে।'

শ্রীচাগলার এই সতর্কবাণীর সারবত্তা আমরা সর্বদাই স্বীকার করি। যদিও একদা পরাধীন ভারতে অন্ততপক্ষে চাকরির ক্ষেত্রে ডিগ্রীর মর্যাদা ছিল অসীম, বর্তমান ভারতের মানসপক্ষে তার মূল শিকড়টা আজো দৃঢ়বদ্ধ হয়ে রয়েছে। তা যদি না হয়, তা হলে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তির দিকে না তাকিয়ে আমরা কেন পাশ করা সার্টিফিকেটকে দেবতার মতো জ্ঞান করি? একালের শাসনযন্ত্র পরিচালনায় সত্যিকারের অভিজ্ঞতালব্ধ এমন মানুষও আছেন, যাঁর কোনো ডিগ্রীই নেই, কিন্তু তিনি মন্ত্রী বা উপমন্ত্রী যাই হোন না কেন, তাঁর চারপাশে চাকরি নিয়ে যাঁরা ভিড় করে থাকেন তাঁদের সকলেই এক একজন কেউকেটা। এঁরাই যখন শাসনযন্ত্রের আসল চালক, তখন সমাজের সব ঠাঁই এঁরা ডিগ্রী দিয়ে ঢেকে রাখতে চান। সেই কারণে ছাত্রদের মধ্যে ডিগ্রী লাভ করাটাও মজ্জাগত হয়ে উঠেছে।

আমাদের মনে রাখা দরকার শ্রীচাগলা যে কথা বলেছেন, তার মধ্যেই রয়েছে যথার্থ সত্যি, জাতির মুক্তি ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ। এর জন্য প্রয়োজন সুদৃঢ় সরকারী প্রচেষ্টা। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম এই ব্যাপারে এদেশে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। তবু ইংরেজ আমলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা তফাৎ মেনে নিতে তিনি বাধ্য হয়ে বলেছিলেন:

'অপেক্ষাকৃত ধনীঘর থেকে যারা আসে তারা সবাই জীবিকা নির্বাহের জন্য পরীক্ষা পাশ করে ডিগ্রী নিতে উৎসুক। তাই তাদের আদর্শ শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। যেমন হাতের কাজ, এমন কি সঙ্গীত আর শিল্পকলায় তারা সময় নষ্ট করতে চায় না। তারা চায় পড়া মুখস্থ করে কোনোরকমে পাশ করে বেরিয়ে যেতে।---আমাদের দেশ অত্যন্ত দরিদ্র, তাই স্বভাবতই ছেলেরা বড় হয়ে জীবিকা অর্জন করে পরিবারের ভরণপোষণ করতে চাইবে। তাদের পরীক্ষা পাশের সুযোগ দিতেই হবে। সেই কারণেই আমি আরেকটি ইস্কুল খুলি।---অনতিকাল পরেই এই গ্রামের ইস্কুলটিই (শ্রীনিকেতন) সত্যিকার আদর্শ বিদ্যালয় হয়ে উঠবে, অন্যটি তখন পাবে অবহেলা।'

রবীন্দ্রনাথের এই কথার পরে মনে হয় আমরা চিন্তার দিক দিয়েও এখনো কতো পেছনে পড়ে রয়েছি। তবু আশার ভরসায় আমরা শ্রীচাগলার দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

আজ-কাল-পরশু নিয়েই প্রত্যেকটি জীবনের পূর্ণাঙ্গ কাহিনী। তবুও সাধারণভাবে আমরা শুধু বর্তমানকেই জানি। জানি না ভবিষ্যৎ। অতীতকেও ভুলে যাই প্রায়শই। কিন্তু এমনও কেউ কেউ আছেন, যাঁরা বর্তমানেই দিতে পারেন ভবিষ্যতের পূর্বাভাষ। যাঁদের অতীতও মুখ্যত ভবিষ্যতেরই মুখবন্ধ। জাপানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ইসাকু সাতোর কথা বলতে গিয়ে ওই কথাগুলোই প্রথমে মনে পড়ল।

১৯৬০ সালে কিসির পর ইকেদো যখন প্রধানমন্ত্রী হলেন, তখন থেকেই ইসাকু সাতোর বর্তমান পরিণতির আভাস নজরে এসেছে। লিবারেল ডেমোক্রেট পার্টির প্রার্থিরূপে তিনি ইকেদোর সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন গত জুলাই-এ। শেষ পর্যন্ত মাত্র কয়েকটি ভোটে পরাজিত হলেও তাঁর পদমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় নি। ইকেদো জানতেন জনতার স্বার্থে তাঁর এই নিকটতম এবং প্রধানতম প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে মৈত্রী বন্ধন রাখতেই হবে। ইকেদোর আমলে তাই বাণিজ্য-বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রিপদে বসেছিলেন সাতো। সেদিনের এই 'বর্তমান'ই আজকের 'বর্তমানে'র (সেদিনের ভবিষ্যতের) কথা যেন বলেছিল। বিশেষত তাঁর 'অতীত' দূরদর্শী রাজকর্মচারী আর যোশিদা ও কিসির মন্ত্রিসভায় সার্থক মন্ত্রীর কর্মদক্ষতায় যখন সমৃদ্ধ, তখন আজ টোকিও অলিম্পিক ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এবং একদা জাপানের বিখ্যাত পররাষ্ট্র-মন্ত্রী (কিসির আমলে) ফুজিয়ামার মত দু-দুজন দুর্ধর্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভূত ক'রে ইসাকু সাতো ইকেদোর অবসর গ্রহণের পর জাপানের একত্রিশতম প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় নতুন বিস্ময় কিছু সৃষ্টি হয় নি। সম্ভ্রান্ত অবস্থাপন্ন ঘরে সাতোর জন্ম। বাবা বিত্তবান, মদ্য-ব্যবসায়ী হলেও রাজনৈতিক আবহাওয়া সাতো পরিবারে আবহমানকাল থেকেই অটুট থেকেছে। যুদ্ধ বেধেছে। চেহারা বদলেছে পৃথিবীর—তরুণ সাতোর মনে রাজনৈতিক উন্মাদনা অনুপ্রবেশ করেছে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই, রাজনীতির নেশা তাঁকে রাজনীতির কর্মযজ্ঞে আহ্বান করেছে। সাতো যোগ দিয়েছেন রক্ষণশীল যোশিদার সঙ্গে। যোশিদার মন্ত্রী-পরিষদে স্বীয় কর্মক্ষমতার পুরস্কার স্বরূপ তিনি পেয়েছেন অন্যতম মন্ত্রীর আসন। তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতিপর্ব এর পর আরও বলিষ্ঠ হয়েছে তাঁরই বড় ভাই কিসির মন্ত্রিসভায় অধিষ্ঠিত হ'য়ে—১৯৫৬ সালে কিসি যখন জাপানের প্রধানমন্ত্রী হলেন যোশিদার পর। সাতো পরিবারের গৌরব এখানেই। এ পরিবার জাপানকে স্বল্পকালের ব্যবধানে দুজন সুযোগ্য প্রধানমন্ত্রী উপহার দিয়েছে। জাপানের রাষ্ট্রচালনায় এ এক নতুন গৌরব। গভীর চিন্তাবিদ ইসাকু সাতো ধৈর্যশীল শান্ত অনুত্তেজিত চরিত্রের মানুষ। কথা বলেন কম। কাজ করেন বেশি। কথা যতটুকু বলেন আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলেন। তাই তাঁর কথা অনেকটা প্রতিজ্ঞার মত। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে তাঁর পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী ইকেদোর সঙ্গে তাঁর মিল অনেক। কেন না তিনিও জাপানের সমৃদ্ধির পথে অনলস কর্মী। তিনি রক্ষণশীল। পশ্চিমী প্রভাব তাঁর মধ্যে যথেষ্ট বিদ্যমান। তাঁর নেতৃত্বে জাপানের রাজনৈতিক বা ব্যবহারিক জীবনের হেরফের কিছু হবে না। ইকেদো যে সুখী জাপানের কর্মসূচীকে ফলপ্রসূ করতে চেয়েছিলেন, জীবনযাত্রার মানকে যে প্রশংসনীয় পর্যায়ে উন্নীত করেছেন—সাতো তাকেই আরও কার্যকরী, আরও ব্যাপক করতে আত্মনিয়োগ করবেন। অন্তত এ বিশ্বাসই দৃঢ় হয় তাঁর কর্মচিন্তার প্রবণতা থেকে। আজ বিশ্বের অগ্রগতির ইতিহাসে জাপানের বিশিষ্ট ভূমিকার কথা উল্লেখ না করে উপায় নেই। মুখ্যত জাপান যুদ্ধোত্তর কালের সুরু থেকে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছে নানা অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে। আজ জাপান তার সাফল্যের পতাকা উত্তুঙ্গে তুলে বিশ্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী ইকেদোর 'লো পসচার' পররাষ্ট্রনীতির বদলে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ইসাকু সাতো প্রয়োগ করবেন 'হাই পসচার'---সক্রিয় পররাষ্ট্রনীতি। ৬৩ বছরের স্থিতধী প্রবীণ রাজনীতিবিদ উজ্জ্বল চোখে ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে জাপানের সমৃদ্ধির জন্য অঙ্গীকার করেছেন। শপথ উচ্চারণ করেছেন গম্ভীর মুখে। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর সাফল্যের খতিয়ান নেবার সময় এখনও আসে নি। তবুও 'গম্ভীর মুখের' প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে আশার সঙ্গে সঙ্গে আশ্বাসও যেন অনেকটাই জেগে ওঠে।

ইসাকু সাতো

সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর

হরপ্রসাদ মিত্র

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের ঘরের ঘড়িটা নাকি এগিয়ে চলতো। সেও একরকম ইশারা। ব্রজেন্দ্রনাথ অনেককে অনেক আইডিয়া দিয়েছেন, কিন্তু নিজে বিশেষ কিছু লিখে যান নি। এই ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে রাখার সঙ্গে তাঁর নিজের রচনামান্দ্যের একটা যোগ ছিল। তিনি নিজেই সে যোগ ব্যাখ্যা করেছিলেন। তাঁর মতে জগতের আইডিয়াগুলি তো সর্বজনীন। যার মন আছে, সে-ই জানতে পারে। অতএব কোনো একজন মানুষ যদি নিজের আইডিয়া বলে কিছু একটা চিহ্নিত করতে যান, তাহলে সেটা কতোদূর সম্ভব, আগে সেই কথাই জানতে হবে। এবং দর্শন সম্বন্ধে সে-রকম কোনো আইডিয়া যদি 'নিজস্ব' বলে কেউ লিখে রাখতে চান, তাহলে তাঁকে অন্তত জগতে তাঁর নিজের সমকাল পর্যন্ত যা-কিছু লেখা হয়েছে, বলা হয়েছে, ভাবা হয়েছে, সবই জানতে হবে। কারণ, যা আগে বেরিয়ে গেছে, সে-কথার চর্বিতচর্বণ নিষ্প্রয়োজন।

তাই ব্রজেন্দ্রনাথ বলেছিলেন—'Time'-এর সঙ্গে যাওয়ার চেয়ে যদি এগিয়ে যেতে পারা যায়, তাহলেই পৃথিবীর জন্যে কিছু বই লেখা সার্থক হয়। কিন্তু আমি এ পর্যন্ত time-এর সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে উঠতে পারছি না। যদি এগিয়ে যেতে পারি, তখন ইচ্ছা আছে যে বই লিখব।'

ব্রজেন্দ্রনাথের এই ঘড়ির গল্পটি অনেকেই জানেন। তেমনি কবি রজনীকান্ত সেনের শেষ শয্যার একটি কাহিনী মনে পড়তে পারে। রজনীকান্ত যখন গলার ক্যান্সারে ভুগছিলেন, সেই সময়ে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দেখতে যান। তখন তাঁর বাক্‌শক্তি ছিল না। কাগজে লিখে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কিছু আলাপ করেন তিনি। তিনি এক টুকরো কাগজে রবীন্দ্রনাথকে এই কথা লিখে জানান যে, দয়াল যদি আমাকে গলা ফিরিয়ে দিতেন, তাহলে আপনার 'রাজা ও রানী'র রাজার ভূমিকা আপনাকে অভিনয় করে দেখাতাম।

এই গভীর অনুরাগের কথা জানিয়ে তিনি সেই বইয়ের দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যের এই লাইনগুলি লিখে দেখান—

> এ রাজ্যেতে যত সৈন্য, যত দুর্গ যত
> কারাগার
> যত লোহার শৃঙ্খল আছে সব দিয়ে
> পারে নাকি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ়বলে
> ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয়।

রবীন্দ্রনাথ ভারি অভিভূত হয়েছিলেন। এ তাঁর নিজের রচনা। কিন্তু মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রুদ্ধবাক্ রজনীকান্তের শেষ শয্যায় 'রাজা ও রানী'র এই ছত্রগুলির গভীর ইশারা তিনি ঠিকই অনুভব করেছিলেন।

হাসপাতাল থেকে ফিরে গিয়ে তিনি এই সাক্ষাৎ স্মরণ করে রজনীকান্তকে একটি চিঠিতে জানান—

'আমার মনে হইতেছিল, সুখ-দুঃখ-বেদনায় পরিপূর্ণ এই সংসারে প্রভূত শক্তির দ্বারাও কি ছোট এই মানুষটির আত্মাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না। শরীর হার মানিয়াছে, কিন্তু চিত্তকে তাহা পরাভূত করিতে পারে নাই। কণ্ঠ বিদীর্ণ হইয়াছে; কিন্তু সংগীতকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। পৃথিবীর সমস্ত আরাম ও আশা ধূলিসাৎ হইয়াছে, কিন্তু ভূমার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসকে ম্লান করিতে পারে নাই। কাঠ যতই পুড়িতেছে, অগ্নি আরও তত বেশি করিয়াই জ্বলিতেছে। আত্মার এই মুক্ত স্বরূপ দেখিবার সুযোগ কি সহজে ঘটে? মানুষের আত্মার সত্য প্রতিষ্ঠা যে কোথায়, তাহা যে অস্থি ও ও মাংস ও ক্ষুধা-তৃষ্ণার মধ্যে নাই, তাহা সেদিন সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি।'

ব্রজেন্দ্রনাথের ঘরে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে রাখার ব্যাপারটি যেমন তাঁর অভিপ্রেত বিশেষ এক সংকেত, রজনীকান্তের এই 'রাজা ও রানী'র ক'টি ছত্র স্মরণও সেই রকম সংকেত।

দুটি কাহিনীই প্রসিদ্ধ। মনোবিজ্ঞানীর চোখে এ-দুটিই সংকেত-প্রয়োগের ধর্তব্য উদাহরণ হিসেবে উল্লেখযোগ্য। সাহিত্যে লেখকরা নিজেদের মনঃস্রোত ব্যক্ত করবার উপায় হিসেবে কখনো প্রেরণার বশে, কখনো বেশ ভেবেচিন্তে এক-একরকম সংকেত ব্যবহার করেই থাকেন। জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক, সে-প্রক্রিয়া নিত্যই ঘটছে। অনেক ছবি ফুটছে, ধ্বনি বাজছে। কিন্তু সার্থকতা সর্বত্র ঘটে না।

চেষ্টা চলবেই। পরীক্ষা ঘটবেই। কিন্তু ফল কী হবে, সেটা সৎ পাঠকের অনুভূতির বিচার্য।

কাফ্‌কার বিচার-কাহিনী বা 'দি ট্রায়াল'-এর রীতি সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে এই সব সংকেতের সঙ্গেই আল্‌বেয়ার কামুর 'দি আউটসাইডার' নামে উপন্যাসটির কথা মনে পড়ে। আমি জানি না, এই দুটি প্রয়াসের মধ্যে

অদৃশ্যের ভাবনা আরো কতো পাঠকের মনে জেগেছে। কাফ্‌কা তাঁর বিচার-কাহিনীতে ব্যক্তিমনের সঙ্গে বহির্জগতের দুর্বোধ্য সংস্পর্শ এবং সংঘাতের ইশারা দিয়েছেন বলে শোনা যায়। 'কে' এই রকম এক ব্যক্তিমন। বাইরে থেকে নানা ঝামেলা এসে তাকে যেন কেবলি জড়িয়ে ফেলতে উদ্যোগী, আর তারই বিরুদ্ধে 'কে'র অশেষ আত্মরক্ষার প্রয়াস। সাদাসিধে ঘটনা-গুলোও সে-জগতে অদ্ভুত এক অসংগতির ফলে কেমন যেন জটিল হয়ে ওঠে এবং অনিশ্চয়তার হাওয়ায় ভাসতে থাকে। ১৯৩০এ এড়ুইন মুইর কাফ্‌কার 'দি কাস্‌ল্‌'-এর প্রথম ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকায় লিখে-ছিলেন যে, জার্মান সমালোচকদের তখনকার শ্রেষ্ঠ কয়েকজনের কাফ্‌কা সম্বন্ধে এই ধারণা ছিল যে, কাফ্‌কাই সে-কালের, অর্থাৎ তাঁর সমসাময়িক-দের মধ্যে সব চেয়ে চিত্তাকর্ষক লেখক। মুইর বলেছিলেন যে, কাফ্‌কা এক অদ্ভুত এবং তাক্‌ লাগানো প্রতিভা—'a strange and disconcerting genius'। আমার এ-অনুবাদ ঠিক হোলো না। disconcerting মানে তো শুধু তাক লাগানো নয়,—শব্দটির স্বাদ ঠিক এইটুকুই নয়, আরো কিছু। আমার মনে হয় মুইর ঠিকই বলেছিলেন—কাফ্‌কা আমাদের অভ্যস্ত ধারণা কেমন যেন ভেঙ্গে দেন—আমাদের সপ্রতিভ ভাবটা তাঁর রীতিতে কেমন যেন ব্যাহত হয়।

'দি কাস্‌ল' বা দুর্গ নামটাই হয়তো তাঁর ব্যক্তিবোধের এবং বহির্বোধের একরকম ইশারা। সে রচনা তিনি বোধ হয়, প্রথমে গল্প হিসেবেই লিখতে আরম্ভ করেন। লিখতে বসে, ক্রমশ তা উপন্যাস হয়ে ওঠে। কিন্তু শেষ হয় নি তবু। উত্তম পুরুষের সর্বনামে লেখা এই কাহিনীর যেখানে যেখানে 'আমি' ছিল সে সব বদলে পরে তিনি 'কে' বসিয়ে দেন। অর্থাৎ যেমন তাঁর বিচার-কাহিনী তেমনি এই দুর্গ-কথাও 'কে'-র কথা। 'কে' সেই ব্যক্তিমন —বহির্জগতের হাজার হাওয়ায় যে কেবলি ভাঙতে-ভাঙতেও আত্মরক্ষা করছে।

দুর্গ-কথার শুরুতেই দেখা যায়—গভীর তুষারে আচ্ছন্ন এক গ্রামে কোনো এক সন্ধ্যায় 'কে' এসে পৌঁছোয়। কুয়াশায়, অন্ধকারে দুর্গটা তখন চোখে পড়ে না,—কোথাও এক ফোঁটা আলোও জ্বলে নি। বড়ো রাস্তা থেকে যেখানে গ্রামের পথ বেঁকে এসেছে, সেইখানে একটা কাঠের সাঁকোয় দাঁড়িয়ে ওপরের মহাশূন্যের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়েছিল 'কে'। তারপর সেই সাঁকো থেকে নেমে এসে, গ্রামে ঢুকে সরাই খুঁজে বের করেছে সে। সরাই-খানার মালিক তাকে আলাদা একটা ঘর দিতে পারে নি বটে, কিন্তু বসবার ঘরে একটা খড়ের বস্তা দিয়েছে শোবার জন্যে। 'কে' নিজেই চিল-কোঠা থেকে সেই বস্তা নামিয়ে এনে সেই কড়া শীতের রাত্রে স্টোভের পাশে নিজের বিছানা ঠিক করে শুয়ে পড়েছে এবং শোবার সঙ্গে-সঙ্গেই গভীর ঘুমে ডুবে গেছে।

কিন্তু একটু পরেই অভিনেতার মতন কে একজন নবযুবক সেই মালিকের সঙ্গে এসে, তার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে তাকে জাগিয়ে দিয়েছে। লোকটার ভুরুর টানটা গভীর, চোখ-জোড়া সংকীর্ণ। সে বলেছে, সারা গ্রামটাই সেই দুর্গের অধীন, আর কাউণ্টের বিনা অনুমতিতে সে-গ্রামে কেউই রাত্রিবাস করতে পারে না। 'কে'র জন্যে তো সে রকম কোনো হুকুম নেই, অনুমতিপত্র নেই,—তাহলে?

তাহলে, হুকুম আনতে হয়। কম্বলটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে এই কথা সোজাসুজি বলে ফেলে উঠতে উদ্যত হয় 'কে'।

কিন্তু এই গভীর রাত্রে কাউণ্টের কাছে যাবে অনুমতিপত্র আনতে? তাও কি হয়? কী অবাক কাণ্ড।

ভারি অবাক হয় নবযুবক। 'কে'র প্রস্তাবে রীতিমতো রাগ করে সে বলে —কোনো আদবকায়দার জ্ঞান নেই, দেখছি। আমি তোমাকে এই খবর-টুকুই জানাবার জন্যে জাগিয়েছি যে, এখুনি এখান থেকে দূর হতে হবে তোমাকে।

'কে' আমল দেয় নি সে-কথার। শুধু নিজের কম্বল বেশ করে গায়ে মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছে আবার, আর বলেছে যে, তুমি জানো না ছোকরা, আমি এসেছি জমি-জরীপের কাজে,—কাউণ্ট জানেন যে, আমি আসবো, —আসতে দেরি হয়েছে বলে এই সরাইয়ে এসে শুয়েছি, তুমি বেয়াদবি করে আমাকে জাগিয়ে দিয়েছ,—আচ্ছা শুভরাত্রি।

কী। জরীপদার? কাউণ্ট নিজে আসতে বলেছিলেন? তাই তো,—তাই তো। আচ্ছা, দেখি টেলিফোন করে- - -

'কে'র মাথার ওপরেই টেলিফোন। টেলিফোনে কথা হয়। 'কে' চুপচাপ শুয়ে শুয়ে শোনে সব। নব-যুবক বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে 'কে'র বিরুদ্ধে ঠেশ দিয়ে কথা বলে। শুয়ে শুয়ে শুনতে শুনতে লোকগুলোর বজ্জাতি-বুদ্ধির নমুনা দেখে অবাক হয় 'কে'। একটু পরেই অন্য প্রান্ত থেকে জবাব আসে। প্রথমে সোজাসুজি অস্বীকার। কই সে রকম কারও তো আসবার কথা ছিল না। সব বাজে কথা। কোথাকার কে একটা রাস্তার বাউণ্ডুলে এসে জুটেছে, মিথ্যেবাদী বদমাশ- - -

কিন্তু তারপর আবার ক্রিং-ক্রিং বেজে ওঠে টেলিফোন—আরে, বড়ো ভুল হয়ে গেছে, সত্যিই জরীপ-দারের আসবার কথা আছে, তিনিই এসেছেন তাহলে- - -

তাহলেও 'কে' রেগে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে নি লোকগুলোর ওপর।

ল্যাণ্ডলেডির দেওয়া তোয়ালে নিয়ে বেসিনে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে গরম এক গ্লাস পানীয় উপহার নিয়েছে। আর কিছুই নয়।

শুয়ে পড়েছে সে। ঘরের লোক-গুলো আলো নিভিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি সাফ হয়ে গেছে ঘর থেকে—দেখো বাবা, জবীপদারমশাই পর দিন সকালে যেন চিনতে না পাবেন!

এই ভাবে পরিস্থিতির টান বজায় রেখে গল্প এগিয়ে চলেছে শুরু থেকেই। যেমন তাঁর বিচারকাহিনীতে তেমনি এই দুর্গ-কথাতেও হঠাৎ উৎপাত ঘটে, ভুল হয়, ভুল ধরা পড়ে,—তবু ভুলের শেষ নেই, উৎপাতের অন্ত নেই। কাফ্কার জীবন-ধারণার যোগ্য বাহন বটে।

কামুর সঙ্গে এ-ধারণার মিল বোধ হওয়াটা মোটেই কষ্টকল্পনা নয়। ফরাসী সাহিত্যের দ্বিতীয় বিশ্বদ্ধযুদ্ধকালীন চাঞ্চল্যের কথা মনে পড়ে। অস্তিত্ববাদ বা existentialism তখন থেকেই দর্শনের ক্ষেত্রে বেশ আসর জমাতে শুরু করে। অস্তিত্ববাদ ব্যাপারটা কী, দর্শনের ক্ষেত্রে তার জায়গা সত্যিই ইতিমধ্যে কতোটা স্বীকৃত, সে সব কথা থাক। জঁা পল্ সার্ত্রে সম্বন্ধে এবারের সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার উপলক্ষে অনেক আলোচনা চলছে। সেই সূত্রেই অস্তিত্ববাদের আলোচনাও হচ্ছে। আমি আজ সে বিষয়ে কিছু লিখছি না। শুধু এই কথাই ভাবছি যে, আমাদের ঘটমান অভিজ্ঞতার ধারার ওপরেই এঁদের মনোযোগ বেশি।

মানুষের মন বিশ্বের ঘটনা দেখে যায়। জগৎসত্য মানেই—আমাদের কাছে, অর্থাৎ মানব-চেতনার পক্ষে, মানব-অভিজ্ঞতার সত্য। একজন লিখেছেন, তার মানে 'the human condition'—অর্থাৎ মানবিক অবস্থা। যতো ক্ষণিকের জন্যেই হোক, মানুষকে তার ক্ষণিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই তার অস্তিত্বের স্বাদ পেতে হচ্ছে। এই জীবনে যা ঘটছে, তাই লিখতে হবে, সত্তার অস্তিত্ববোধের সেই দলিলটুকুই সংরক্ষণীয়। কেন, কেমন করে 'আছি', তা জানি না। আমরা শুধু 'আছি', এবং এই থাকার সত্যটুকুই আমরা লিখতে পারি; সাহিত্যে আমরা নাকি সেইটুকুই লিখে যাচ্ছি। মোটামুটি সাহিত্যে অস্তিত্ববাদ মানে তো এই-ই। অতএব এ-বাদ আধুনিক এবং বাস্তবধর্মী দুইই। বুদ্ধিগত, সমাজগত অথবা রাষ্ট্রনৈতিক যাবতীয় মতবাদের বাইরে ব্যক্তিমনের এ এক রকম মুক্তি। জাতি-ধর্ম-রাষ্ট্র-সমাজ-নিরপেক্ষ এই নিখিল ব্যক্তি-মনের স্বাধীন গতির কথাই সার্ত্রে, কামু, কাফ্কার ইশারা। এঁরা প্রত্যেকেই যে অস্তিত্ববাদী, সে-কথা বলা চলে না। আমি এই সাহিত্যিক ইশারার সমুদ্রতীরে এসে দাঁড়িয়েছি। এ সমুদ্র বিস্তীর্ণ বটে, কিন্তু সত্যিই সাহিত্যের অন্যান্য সময়ের অন্যান্য মহাসমুদ্রের মতন টিকবে কী না জানি না।

এ সব কথা আরো খুলে বলা দরকার। তাই আরো সব কথা মনে আসছে। তাই, কাফ্কার প্রসঙ্গ থেকে কামুর প্রসঙ্গে এসে দাঁড়াতে হোলো।

১৯১৩তে আলজিরিয়ায় তাঁর জন্ম,—ফ্রান্সে এসে পৌঁছোবার আগে তিনি উত্তর-আফ্রিকার অনেক দিন অনেক কাজে কাটিয়েছেন, আল-জিরিয়ার ফুটবল-টিমে গোলকীপারও ছিলেন কিছুদিন। সাংবাদিক জীবন শুরু হয়েছে ইতিমধ্যে। জার্মানরা যখন ফ্রান্স দখল করে, তখন দেশের আন্দোলনে অংশ ছিল তাঁর। দৈনিক পত্রিকা 'কম্ব্যাট'-এর সম্পাদক ছিলেন তখন। জঁা পল সার্ত্রের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ সেই আমলের। সার্ত্রে নিজে কামুর 'দি আউটসাইডার' সম্বন্ধে কথা-প্রসঙ্গে বলেন যে, কামু অস্তিত্ববাদী নন,—তাঁর আসল গুরু সপ্তদশ শতকের ফরাসী নীতিবাদীর দল।

(ক্রমশঃ)

ঘর থেকে ঘর

পিনাকরঞ্জন সাহা

ঘর থেকে ঘর, যেতে অনেক পথ
জানতে না তাই অশ্রু ছলোমলো,
যুদ্ধগামী সপ্তঘোড়ার রথ
বুকের দিকে ফেরাও 'বৃষ্টি এলো।'

সাত সকালে রাজার প্রাসাদ ফেলে
দেখতে গেছ কংসাবতী নদী,
ঢেউয়ের মুখে জন্মদিনের গান
ভেবেছিলে শুনবে নিরবধি।

সন্ধ্যাবেলায় নদীতে হাত ধুঁতে,
দেখলে বুকের গহন বৃন্দাবনে;
অনন্যোপায় নৌকা ছোটে ঝড়ে,
রাজপ্রাসাদের দিগন্ত-সন্ধানে।

ফিরতে পথে দূরে রাজার পথে
দেখলে, হঠাৎ নিজের অন্তঃপুর;
দেখলে বিজন সপ্তঘোড়ার রথে
ঘর থেকে যেতে অনেক দূর।

অক্সফোর্ড থেকে লিখছি

অশোক দেব চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথ অমিত রায়কে লণ্ডনে বা কেম্ব্রিজে পাঠান নি। সাতটি বছর সে অক্সফোর্ডে কাটিয়েছিল। কবি ঠিকই ধরেছিলেন বাংলা দেশের জনচিত্তে অক্সফোর্ডের যে স্থান সেটা আর কেউ পূরণ করতে পারে না। এখানকার সুউচ্চ মিনার (spire), বীচ এবং পপলার গাছের শ্যাওলা ঢাকা গা, হৈমন্তিক সোনালি পাতা ঝরা বিকাল, কলেজ প্রাঙ্গণের বিশালতা, বহু শতাব্দীব্যাপী প্রচলিত এবং সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় প্রথা, Isis নদীতে রাজহাঁস এবং দূরের উপত্যকাভূমির গাম্ভীর্য আছে বইকি। Bodleian Libraryতে কাজ করছেন, বিকেলের পড়ন্ত আলো Radcliffe-এর উঁচু গম্বুজের মাথায় চকচক ক'রছে, ৬টা বেজে গেছে—হঠাৎ ৬-১০-এর সময় গীর্জার ঘণ্টার মৃদু এবং সুন্দর ঘণ্টাধ্বনি অনেকক্ষণ চললো।

এইভাবেই বেশ কয়েক শতাব্দী চ'লে আসছে। St. Aldate স্ট্রীট ধরে Oxford-এর দক্ষিণে যাচ্ছেন আপনি। একটু এগিয়ে বাঁ ফুটপাথে পড়লো টাউন হল। আর একটু এগিয়ে আপনি দেখবেন Christ Church কলেজের উঁচু চুড়ো। রাত্রি ৯-৫ মিনিটের সময় যদি আপনি এখানে দাঁড়ান, তা হলে শুনবেন Tom Tower-এর ১৮০০০ পাউণ্ডের বিরাট ঘণ্টা ১০১ বার বাজছে—১৫২৫ সালে কলেজের প্রথম দলের ১০১ জন ছাত্রকে জানান হতো এইবার কলেজের গেট বন্ধ হবে। এবং তখন থেকে প্রত্যহই এই ৪৫০ বছর ধরে এটি বাজান হচ্ছে। আর একটু এগিয়ে গিয়ে চোখে পড়বে টেমস নদীর ওপর Folly Bridge (বোকামির সাঁকো)—কেন এ নাম দেয়া হয়েছে জানি না। ওপর থেকে নজর পড়বে ছাত্রছাত্রীরা বোটে করে ছোট ছোট নৌকা বাইছে।

উত্তরে যদি যান St. Giles ধরে তা হলে খানিকটা গিয়েই ডান ধারে St. John's college পড়বে। তার একটু আগে বাঁ ধারে Beaumont Street-এ বিখ্যাত Playhouse—যেখানে ইউ-নিভার্সিটির বিভিন্ন নাট্য সংস্থা যথা, Oxford University Dramatic Society, Oxford University Experimental Theatre ইত্যাদি তাঁদের নাটক মঞ্চস্থ করেন। মাঝে মাঝে অভিনয় এখানে অত্যন্ত উঁচু দরের হয় এবং তখন নাট্যরসিকেরা লণ্ডন বা আরো দূর, মফঃস্বল অঞ্চল থেকে আসেন। এখানে কিছুদিন আগে Ibsen-এর Doll's House হয়ে গেল। তারপর আরম্ভ হয়েছে Canterbury Tales-এর কিছু অংশের নাট্যরূপ—Exeter College-এর ৬৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ওই কলেজের John Ford Society এটা মঞ্চস্থ করেছেন। চারধারে প্লাকার্ড পড়েছিল—World premiere---অক্সফোর্ডের লর্ড মেয়রের অনুমতি সহ এই প্রথম চসার মঞ্চস্থ করা হবে।

অক্সফোর্ডের আকাশে-বাতাসে শতাব্দীর সঞ্চিত সাধনা এবং ইতিহাস। এখানে কয়েক শতাব্দী ধরে ইংলণ্ডের বহু শ্রেষ্ঠ সন্তান তাঁদের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। ইংলণ্ডের বহু প্রধানমন্ত্রী এখানেই তাঁদের রাজনৈতিক শিক্ষা-নবিশী সুরু করেন। তবে রাজনীতি বলতে আমাদের দেশে যা বুঝি আমরা, এখানে তার চেহারা সম্পূর্ণ অন্যরকম। মন্ত্রীরা যে কোন মতবাদ প্রচার করুন, ইংলণ্ডের একটি সাধারণ লোক তা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাবে না। কিন্তু যে মুহূর্তে রুটির দাম ই পেনি বাড়লো বা মাখনের আমদানি সামান্য কমলো তখন সেই মন্ত্রিসভার পক্ষে ভোট পাওয়া ভয়ানক কঠিন ব্যাপার। এবার এখান-কার election এতখানি গুরুত্ব-পূর্ণ অথচ সারা ইংলণ্ডে কোথাও হৈ-হৈ নেই। ভোটের দিন পেরিয়ে যাবার পর মনে হল তাই তো আজকে এদের ভোট ছিল না! এই আশ্চর্য যূথবদ্ধতা এদের মজ্জাগত—এবং সেই জন্যে এদের বোঝাও শক্ত। শান্ত জীবন যেমন চলছে তেমনি। Oxford-এর মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে সকালে মাংস এবং রুটির গাড়ি ঠিক আসছে, গৃহকর্ত্রী পেরাম্বুলেটারে ক'রে তাঁর বাচ্চাকে নিয়ে উলওয়ার্থের দোকানে চলেছেন, পেমব্রোক কলেজের পোর্টার টাইটা আঁট ক'রে টেনে গম্ভীর মুখে কাগজ পড়ছে, ছাত্রের দল Radcliffe-এর একতলার সিঁড়িতে বসে সিগারেট টানছে, অধ্যাপক কালো গাউন পরে Bodleian-এর Duke Huphreyতে পুঁথিপত্র ঘাঁটবার জন্যে উঠছেন, Pusey

House Libraryতে theologyর ছাত্র পোর্টফোলিও খুলতে খুলতে ঢুকছেন—কোথাও বোঝার উপায় নেই আজই একটা গভর্নমেণ্টের পতন হবে। বাইরের পৃথিবীতে যা ঘটছে ঘটুক, Oxford তার চিন্তা এবং সাধনা নিয়েই মগ্ন! সামান্য মন্ত্রিসভার উত্থানপতনে Oxford-এর কোন চিন্তার কারণ নেই।

অক্সফোর্ডে বোমা!

তবু Oxford-এও বোমা ফাটলো। এবং সে বোমা ফাটালেন বটানি বিভাগীয় প্রধান প্রখ্যাত geneticist রয়াল সোসাইটির ফেলো অধ্যাপক Cyril Darlington. গত ইস্টারে Lord Franks-এর সভাপতিত্বে একটি কমিশন গঠিত হয়েছিল। উদ্দেশ্য: ইংলণ্ডের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ শিক্ষা-জীবনে Oxford-এর অবদান কতখানি সে সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করা। সেই কমিটির সামনে সাক্ষ্যদানে প্রবীণ অধ্যাপক একটি অগ্নিগর্ভ লেফাফা Lord Franks-এর হাতে দিলেন। টাইপ করা সেই পৃষ্ঠাগুলিতে (অধ্যাপক টাইপ করতে জানেন না—তাঁর ছাত্র-মহলে এ নিয়ে অনেক রসিকতা চালু আছে) লঙ্কার গুঁড়োর মতন এই শব্দগুলি Oxford-এর শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হয়েছে—'corrupt -- spurious -- farce fraud --- failure --- disastrous --- inefficient --- inadequate'. (জোচ্চুরী, জালিয়াতি, প্রহসন, লোক ঠকান, ব্যর্থ, ঘুণধরা, অপদার্থ, অকর্মণ্য ইত্যাদি)। তাঁর প্রধান আক্রমণ হচ্ছে, Oxford-এর যা গর্ব, এর সাতশো বছরের শিক্ষা-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। তাঁর অভিযোগ মোটামুটি এই ধরণের: অনার্স পঠন-পাঠন, এবং তাদের পাঠাগার—অত্যন্ত অপদার্থ ব্যবস্থা। বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলির পরিচালন-ব্যবস্থা জোচ্চুরী এবং জালিয়াতিতে ভরা। ডিগ্রী পরীক্ষার ব্যবস্থা কিছুই নেই। স্নাতকোত্তর গবেষণা—একটি প্রহসন এবং জালিয়াতি। বাড়িঘর তৈরির ব্যাপার----disastrous (বাংলা কি?) যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনা হয়েছিল—বিভিন্ন বয়স এবং বিষয়ের শিক্ষানুরাগীদের মধ্যে পারস্পরিক চিন্তার আদান-প্রদান—সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

প্রবীণ অধ্যাপক আরো বলেছেন যে, টিউটোরিয়াল ব্যবস্থা Oxford-এর গর্ব—সেটি এখন স্কুলসুলভ মাস্টারিতে পর্যবসিত হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, বাইরে থেকে নতুন চিন্তা যারা আনে, Oxford তাদের প্রতি অসহিষ্ণু এবং উদ্ধত। এর অবশ্যম্ভাবী এবং দুঃখজনক পরিণতি হচ্ছে এই যে, অত্যন্ত সন্তুষ্টমনা রক্ষণশীল চিন্তাজর্জর কয়েকটি বুড়ো ঘুঘু এখানে রাজত্ব করছেন। বাঁচার পথ হিসেবে অধ্যাপক কয়েকটি দিক দেখিয়েছেন। অনার্সের পঠন-পাঠন ব্যবস্থা আরো উঁচুদরের করতে হবে এবং তার জন্যে চাই নতুন ধরণের শিক্ষক এবং তাঁদের নিয়োগ করার সময় Oxford-এর বাইরের বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেয়া দরকার। ছাত্র ভর্তি, endowment এবং পরিচালনা ব্যবস্থা প্রতি কলেজের হাত থেকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীভূত করা হোক। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এখানে আসবার সুযোগ দেয়া হোক এবং সর্বশেষ, উপাচার্যের একটি স্বাধীন এবং স্বপ্রতিষ্ঠিত পদ সৃষ্টি করা উচিত, যদিও তাতে ব্যয়বাহুল্য ঘটবে। এই মারাত্মক কথাগুলি অধ্যাপক প্রকাশ করলেন যেদিন এখানে এই term আরম্ভ হচ্ছে সেইদিনই।

কিন্তু তিনি একা নন। St. Catherine কলেজের ফেলো Dr. P. G. Dickson কমিশনের সামনে বললেন—কলেজগুলি এতই স্বপ্রধান যে তাদের মধ্যে কোনই যোগাযোগ নেই। একই বিষয়ের বিভিন্ন

● 'Doll's House' অভিনয়ের একটি দৃশ্য

কলেজের অধ্যাপকেরা একে অন্যের কাজ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং নিরুৎসুক। Spanish Studies-এর প্রধান অধ্যাপক P. E. Russell বললেন---বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং রীডারদের এত কেরানীর কাজ করতে হয় যে, গবেষণার কাজে তা রীতিমত একটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রখ্যাত পণ্ডিত Sir Maurice Bowra বললেন---Oxford এবং Cambridge-এ দেশের সবচেয়ে ভাল ছাত্ররাই আসে। নজর রাখা দরকার—এইসব ছাত্র ভর্তির সময়, তাদের বিশেষ একটা বিষয়ে পারদর্শিতাই যেন বিচারের একমাত্র মাপকাঠি না হয়।

Christ Church কলেজের টিউটর N. W. Blake বললেন---টিউটরদের ক্লাসের সংখ্যা কমান প্রয়োজন। এখনকার অনার্সের ছাত্রমহলে একটা ধারণা আছে যে, তাদের সবই তৈরি করে দেয়া হবে (spoon feeding)।-তিনি সাবধান করে দিয়েছেন যে, টিউটোরিয়াল ব্যবস্থা যেন প্রাইভেট টিউশন এবং নোট লেখায় গিয়ে না পৌঁছয়। যে preliminary examination হয়, তারও কোন দরকার আছে বলে

মহর্ষি কণাদ প্রণীত

বৈশেষিক-দর্শনম

শিষ্যগণ নিকটে উপস্থিত হইলে মহর্ষি কণাদ তাঁহাদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"হে শিষ্যগণ। এই সূত্রে তোমাদের নিকট ধর্ম্মব্যাখ্যা করিব।" মহর্ষির এই বাক্যের নাম প্রতিজ্ঞাবাক্য। ধর্ম্মের বিভিন্ন দিক, কার্য্যকারণ, দ্রব্য ও সত্তার পার্থক্য ও গুণত্বের এবং জাতির পার্থক্য, পৃথিবীর লক্ষণ, জল, বায়ু, দ্রব্য ও আকাশানুমান, পরমাণুতত্ত্ব, মনঃস্থৈর্য্য, মুক্তি, জন্মান্তর, ভ্রম ও প্রমাদ—মহর্ষি কণাদ ধর্ম্মকথার মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের বাণী ব্যক্ত করিয়াছেন।

স্বর্গত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত

মূল্য দুই টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

তিনি মনে করেন না। বছরখানেক বছর দেড়েক বাদে অনার্স পরীক্ষার মতন একটা কিছু ব্যবস্থা করলে চলতে পারে। একজন ছাত্রের বদলে দুজন ছাত্র যদি একটি টিউটরের সঙ্গে থাকে তাতে কোন ক্ষতি হয় বলে তিনি মনে করেন না।

তিনি বলেন, Oxford-এর শিক্ষকমণ্ডলীর অধিকাংশই এখন আর অবিবাহিত নন। তাঁদের সাংসারিক দায় আছে। গৃহকর্মের জন্য লোক পাওয়া এখন দুরূহ। গবেষণা এবং লেখার প্রতি এখন দৃষ্টি অনেক বেশি পড়েছে, কমিটীর সংখ্যা অনেক বেড়েছে এবং স্টাডি লিভ লোকে আরো বেশি নিচ্ছে। বিগত যুগে যে শিক্ষক-ছাত্র অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক ছিল আদর্শ আজ এই যুগে তার পুনর্বিবেচনা করার সময় এসেছে বলে তিনি মনে করেন। তাঁর বিশ্বাস কালের দাবিকে আজ না হয় কাল জানতেই হবে।

Oriel college-এর ফেলো P. A. Brunt বলেন যে, টিউটরদের উচিত দুজনের বেশি ছাত্রকে একসঙ্গে নেয়া। তাঁর মনে হয়, গবেষক ছাত্রেরা কিছু বেশি সংখ্যায় ছাত্র নিতে পারেন, কারণ তাঁদের অনেকেই ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে চান। বৃটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য Sir Philip Morris দৃঢ়স্বরে বলেন, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজেকে কঠিনভাবে বিচার করার সময় এসেছে। Lord Erank-এর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, অক্সফোর্ড সম্বন্ধে আমি কিছু ব'লতে গেলেই সেটা ভুল হবে, কারণ যে-কেউ যা-কিছু বলুক অক্সফোর্ড নিয়ে তা কখনোই ঠিক হবে না। তিনি লিখিত পত্রে জানান যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মপ্রণালী এবং চিন্তাধারা আরো কেন্দ্রীভূত হওয়া প্রয়োজন, এই প্রাচীন বিদ্যাকেন্দ্রের চেষ্টা এবং চর্চা আরো একমুখী করার সবিশেষ অবকাশ আছে. যাতে করে দেশের অন্য সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এর সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের সধর্মী সহযোগিতা ঘটে। Lord Frank জিজ্ঞাসা করলেন, এমন কি কোন ঘটনা ঘটেছে, যখন অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অক্সফোর্ডের সহযোগিতা আশানুরূপ হয় নি? একটুও দ্বিধা না করে Sir Philip Morris উত্তর দিলেন, যদি জিজ্ঞাসা করেন Oxford প্রত্যাশিত সহযোগিতা দান করেছে কি না—আমি নিশ্চয় বলবো—বহু সময় এবং অত্যন্ত অভ্যস্ত রীতিতেই Oxford আমাদের হতাশ ক'রেছে।

এই তো শিক্ষকমহলের কথা। ছাত্রমহলেরও অনেক কিছু বলার আছে। তাদের স্বাধীন মতামত এবং সমালোচনাসূচক তর্ক কর্তৃপক্ষ ভাল চোখে দেখেন না। গত জুন মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার রাজদূত যখন Oxford-এ আসেন, তখন বর্ণবৈষম্যের প্রতিবাদে মিছিল হয় এবং তার জন্যে অক্সফোর্ড ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্টসহ ছয়জন ছাত্রের বিরুদ্ধে কলেজের প্রক্টরেরা বিশেষ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সংস্থা Hebdomadal Council, প্রক্টর এবং উপাচার্যের ক্ষমতা নির্ধারণ করার জন্য একটি কমিটী নিয়োগ করেছেন। উল্লসিত এবং শাস্তিভোগরত ইউনিয়ন প্রেসিডেণ্ট Eric Abrahams বললেন, 'আশা করি কমিটী তাদের কর্মকালের মধ্যে ছাত্র প্রতিনিধিদের বক্তব্য শুনবেন।'

• • •

অধ্যাপকপত্নীকে বললুম, 'Oxford-এর কার্যকলাপ নিয়ে চারধারে তো যথেষ্ট সমালোচনা চলছে। এমন কি এখানকার অধ্যাপকেরাই সব চেয়ে বেশি সমালোচনা করেছেন।'

আমার দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, 'তোমার চায়ে চিনি দেব কটা কিউব—দুটো না তিনটে?' চায়ের পেয়ালাটা এগিয়ে দিয়ে একটা প্লেটে বিস্কুট দিতে দিতে বললেন, 'Oxford is Oxford.' একটু থেমে বললেন, 'এবার তো আবার Socialist-রা জিতলো। তবে হ্যারল্ড তো Oxford-এরই ছাত্র।'

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ
প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর
বেজওয়াড়া - শ্রীনগর - গৌহাটী

টোকিওর চিঠি

মিত্রেন

ইকেবানা আর অলিম্পিক। অলিম্পিক আর ইকেবানা। প্রথমটি ফুল নিয়ে ফুর্তি, দ্বিতীয়টি যৌবন-কদমফুলের মাতামাতি। অথচ আশ্চর্য, জাপানী শিল্পী এ-দুটোকে অনায়াস শিল্পচিন্তায় রীতিমত একটি দার্শনিক ধারণার সম্বন্ধসূত্রে গেঁথে ফেললেন।

টোকিওয় অনুষ্ঠিত অষ্টাদশ অলিম্পিকের সাদর অভ্যর্থনায় জাপানী শিল্পীরাও এবার সক্রিয় অংশ নিতে এগিয়ে এসেছিলেন। মূলধন, এক হাতে কাঁচি, অন্যহাতে পুষ্পস্তবক। যৌবনের সঙ্গে পুষ্পের উপমেয়-উপমান সম্বন্ধ আমরা জানি। কিন্তু খেলাধূলার মাধ্যমে যৌবন-চর্যার সঙ্গে পুষ্পচর্চার আত্মীয়তা গ্রন্থনে আমরা অনভ্যস্ত। এ বিষয়ে, স্বীকার করতেই হয়, জাপানী শিল্পীরা আমাকে অবাক করেছে। শুধু পুষ্প নিয়ে কাব্য নয়। নয় ওমর-খৈয়ামী রুবায়েৎ কিম্বা সম্রাট শাজাহানের অঙ্গুলিধৃত রক্তগোলাপ। জাপানী শিল্পীর সৃষ্টিতে ধরা পড়েছে পেশী সঞ্চালনার পুষ্পরূপক। সৃষ্টির সে এক অভিনব শৈল্পিক পরিকল্পনা এবং পুষ্প-সজ্জিতকরণের (ইকেবানা বা flower arrangement) মাধ্যমে যুবশক্তিকে রূপায়িত করার অনন্য কৌশল। সুতরাং নিছক খেলাধূলাকে শিল্পায়িত করায় এই প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা বিদেশী চোখকে তো বিস্ময়ের শাস্তি দেবেই।

অবশ্য বাংলা দেশে আমরা রবীন্দ্রনাথকে পেয়েছিলাম। যিনি শুধু কাব্যকেলিতে নয়, শারীরচর্চায়ও সমান উৎসুক ছিলেন। সুঠাম সুগঠিত দেহ, প্রশস্ত বক্ষোদেশ, চওড়া কব্জি, উন্নত ললাট, দীর্ঘ দেহরেখা। পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তি ক'রে কবিতার খাতায় অর্জিত প্রাণশক্তিকে প্রকাশ করতেন তিনি। কিন্তু রবীন্দ্র-সমসাময়িক এবং উত্তরসাধকদের মধ্যে যত বেশি দাড়ি ও গ্রীবাচ্ছাদিত কেশর দেখা গেল, যতগুলি 'লালিমা পাল (পুং)' শিল্পীকে অবলা রমণীর সহোদরা ভেবে বিষণ্ণতার জয়গান গাইলেন: রবীন্দ্র-মধুসূদনের পুণ্যভূমিতে কিন্তু ততজন শিল্পী বলবীর্যের মধ্যে, যৌবনোচ্ছলতার মধ্যে স্মিতাননা সরস্বতীকে আবিষ্কার করতে পারলেন না। উচ্ছৃঙ্খলতা এবং মদিরাসক্তির মধ্যে বরং অনেকেই যৌবনের সুধারস পান ক'রে বিষণ্ণ ব্যথায় মুষড়ে পড়লেন। কিন্তু জীবন তো বিচ্ছিন্ন বিষাদ-বিলাস নয়; জীবন বিধৃত হ'য়ে আছে সৃষ্টির অমোঘ শক্তির বাহুতে। প্রকৃতির রূপ রস গন্ধ স্পর্শের আয়োজনে সর্বদা একটি শক্তিমান শিল্পীর প্রচ্ছন্ন পরিশ্রমের স্বাক্ষর বর্তমান। আশ্বাসে পরিপূর্ণ হ'য়ে ফুল-ফোটানোর সেই বৃহৎ কর্মশালা বিনিদ্র ব্যস্ততায় উন্মুখ সাধক। সেখানে হতাশার উল্টোরথে শিল্পীর বিজয়-কেতন ওড়ে না। সৃষ্টির নবীন উন্মেষে চমৎকৃত স্রষ্টাও হন নওজোয়ান। পথের দুই পাশ আনন্দে শোভায় সৌন্দর্যে ভাসিয়ে দিয়েই তাঁর যাত্রা সার্থক।

আমার মনে হয়, জাপানীরা এটুকু মনেপ্রাণে উপলব্ধি করেছেন। আশা-বাদের বলিষ্ঠ শিখায় জ্বালাতে পেরেছেন জীবন-প্রদীপ। তাই গত মহাযুদ্ধে বিধ্বস্ত হ'য়েও আজ তাঁরা অন্যতম প্রাগ্রসর দেশের গর্বিত সন্তান। আর তাই বলছিলাম, জাপ-শিল্পীর মধ্যে এই দুরন্ত প্রাণপ্রবাহ, এই প্রত্যয়দৃঢ় যৌবন-চেতনা এবং এই প্রচণ্ড আশা-বাদকে লক্ষ্য ক'রে বিস্মিত না হয়ে পারি না। জাতটার মানসিকতায় কোথাও এতটুকু অবক্ষয়ের হতাশা কিম্বা হতাশার আড়ম্বর ঘুণ ধরায় নি। পরিপূর্ণ বিশ্বাসে কর্মঠ সৈনিক হেঁটে চলেছে অহমিকাহীন বলদৃপ্ত আত্মতৃপ্তিতে।

এবার অলিম্পিক উপলক্ষে পুষ্প-শোভার মধ্যে তাই এঁরা রূপ দিতে চাইলেন আন্তর্জাতিক যৌবনচর্চাকে। অলিম্পিকের গতিধর্ম, তেজবীর্য এবং কৌশল-কলাকে রূপায়িত করলেন পুষ্পসজ্জার (জাপানী নাম ইকেবানা) বিচিত্র রঙে, বিভিন্ন ঢঙে। টোকিওয় অনুষ্ঠিত অষ্টাদশ অলিম্পিকের অভ্যর্থনায় শিল্পীরা সাজিয়ে ধরলেন মুকুলিত পুষ্পপল্লব, শাখা-প্রশাখা।

অলিম্পিকের পবিত্র শিখাকে শিল্পরূপ দেওয়া হ'ল। জাপানের রাজকীয় হলুদ ক্রিসানথেমাম ফুলে জীবনের সমারোহ এবং লালচে জাফরানি রঙের সাইপ্রেস শিষে পূতাগ্নির শিখা, সেই সঙ্গে সবুজ নরেল শাখায় রূপ পেল যৌবনের জয়যাত্রা এবং শুকনো পাম শাখার ছোবড়ায় ধ'রে রাখা হ'ল গ্রীক পুরাণের প্রতীকী স্মৃতি।

শানস্থ আইক প্রথায় দ্বিতীয় একটি পুষ্পসজ্জার (Flower arrangement বা ইকেবানা) উপাদান করা

● আমি যখন পুষ্পাধারে ফুল সাজাতে বসি

হয়েছিল হলুদ গোলাপ, ম্যাডোনা লিলি এবং এ্যাকাসিয়ার শিষ।

ফুল সাজানোর এই রীতির মাধ্যমে উৎফুল্ল বসন্ত যেন হাতছানি দিয়ে অলিম্পিক উৎসবকে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছে।

এনস্থ রীতির শিল্পী শক্তি ও উদ্দীপনার আর একজাতীয় প্রতীক তৈরি করেছিলেন। শৈল্পিক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছিল,—উইলো-শাখায় মূর্ত হয়েছে শক্তি ও ছন্দ, আর হলুদ টিউলিপ পুষ্প টাটকা বসন্তের প্রতিনিধিত্ব করছে।

টোকিও জুড়ে ও অন্যান্য স্থানে ব্যস্ত শিল্পিগোষ্ঠী এইভাবেই নানা জাতের, নানা বর্ণের পুষ্পপত্র সমারোহের আয়োজন করেছিলেন গত অক্টোবরের অলিম্পিক উৎসব উপলক্ষে। তকোনামা (পুষ্পস্তবক সাজিয়ে রাখার জন্য জাপানী গৃহে বিশেষ এ্যালকভ) যেমনি, কিমোনো (জাপ-কন্যার পিঠ-কোমরে ছড়ানো বিচিত্র নক্সার ঝালর) যেমন, ইকেবানাও তেমনি জাপানের একটি একান্ত নিজস্ব শিল্পধারার প্রকাশ। ফুলকে ভালো না-বাসলে ফুল নিয়ে এমন চুলচেরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা অসম্ভব। য়ুরোপীয়রাও ফুল ভালোবাসেন, ঘরে কিছু ফুল না-রাখলে গৃহসজ্জা অসম্পূর্ণ মনে করেন, দক্ষিণ ভারতীয় মেয়েরাও সন্ধ্যাকালে ফুল দিয়ে কেশবিন্যাসে অভ্যস্ত। কিন্তু এহো বাহ্য। ফুলকে জীবনের প্রতীক ক'রে ফুলসজ্জার বিভিন্ন দার্শনিক শিল্পরুচিসমৃদ্ধ ধ্যান-ধারণা আরোপ ক'রে ফুল নিয়ে দেশব্যাপী এমন গবেষণা বোধহয় জাপান ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো স্থানে হয় না। স্বীকার করি, ভারতীয় কাব্য-সাহিত্যে ফুলের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। অলঙ্কারশাস্ত্রে বিভিন্ন জাতের ফুল বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্বের প্রতীক। কিন্তু ফুল সাজানোর আঙ্গিকে গভীর তত্ত্বারোপের প্রচেষ্টা একমাত্র জাপানেই হ'য়ে আসছে। কেবলমাত্র ফুল সাজানোর রীতিতেই চমকপ্রদ রূপক সৃষ্টির পরিচয় আর কোথায় পাওয়া যায়?

এই পুষ্পসজ্জার প্রথা সুপ্রাচীন। ভগবান তথাগতের ধর্মীয় বাণীকে ফুলের মাধ্যমে রূপদানের প্রচেষ্টায় ফুল সাজানোর মধ্যে সর্বপ্রথম জাপানীরা দার্শনিক উদ্দেশ্য ও চিন্তাকে সন্নিবেশিত করেন। সে আজ সুদীর্ঘ ১৩টি শতাব্দীর পুরনো ইতিহাস। ক্রমে ধর্মের জায়গায় আধুনিক জাপানের শিল্পচিন্তা প্রাধান্য পেতে থাকে। আজকের জাপান পুষ্পসজ্জার আঙ্গিক নিয়ে, উদ্দেশ্য নিয়ে, বিভিন্ন স্কুল, বিভিন্ন দর্শন ও রীতিকে উপস্থাপিত করেছে। তাই অন্যান্য শিল্পের মতো ইকেবানা জাপানী শিল্পীর একটি নির্ভরযোগ্য জীবিকা। ফুল সাজানোর নিয়মবদ্ধ ইতিহাস আছে এদেশে। আছে ঐতিহাসিক বিবর্তন ও ক্রমবিকাশ, আছে প্রতিযোগিতা ও প্রাতিস্বিকতা বা individuality, আছে স্কুল-কলেজ, নিয়মিত পঠন-পাঠনের সুব্যবস্থা।

দশ বছর আগেও কায়টো শহরের প্রসিদ্ধ ইকেনোবো জুনিয়র কলেজই ছিল একমাত্র শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে টোকিওর ইকেনোবো ওচানোমিজু গাকুয়েন স্কুলে জাপানী

● বিশ্বযুব সমাগমে উৎফুল্ল জাপানী পণ্য

ললনার সঙ্গে বহু বিদেশিনীও ফুল-সাজানোর আইন-কানুন, নিয়ম-রীতি অধ্যয়ন করছেন। পড়ুয়ার সংখ্যা দুই সহস্রাধিক। তা ছাড়া আলোচ্য বিষয়ের ওপর একাধিক শিক্ষামূলক পত্র-পত্রিকা তো আছেই।

ফুল সাজাবার জন্য জাপানী শিল্পী বিভিন্ন সাজ-সরঞ্জাম ব্যবহার করেন। ছুরি-কাঁচি থেকে ছোটো কুঠার ও রঙ-তুলি কিছুই বাদ যায় না। প্রয়োজনমত ছাঁটাই বাছাই ও চিত্রিকরণের কাজ হয়। এক এক আঙ্গিকের জন্য এক এক ধরণের সরঞ্জাম ও পুষ্পাধারের ব্যবস্থা। এক এক জাতীয় ফুলের সঙ্গে ভিন্ন জাতের শাখা-প্রশাখা, পত্র-পল্লব, এমন কি ফল-মূলের ব্যবহারও করা হয়। তা ছাড়া শিল্পচিন্তাকে যথাযথ রূপ দেওয়ার জন্য খোদার ওপর খোদকারীর ব্যবস্থা। অর্থাৎ প্রয়োজনবোধে ফুল-পাতা শাখা-কাণ্ডকে এঁরা ভিন্ন আকার ও কৃত্রিম রঙে নবরূপায়িত করেন। সবুজ বাঁশের আঁশ ছুলে সোনালি বর্ণালেপ দিয়ে শিল্পী বলেন—যে সর্বোচ্চ সম্মান

● ফুল সাজানোর স্কুলে বিদেশিনী পড়ুয়া।

লাভের আকাঙ্ক্ষায় অলিম্পিক খেলোয়াড়বৃন্দ তাঁদের যৌবনের অমিততেজকে পরিস্ফুট করছেন, এ বর্ণ, এই রূপবৈচিত্র্য তারই প্রতীক। ফুলের যথার্থ সাঙ্কেতিক ব্যবহারে, পুষ্পাধারের প্রতীকী দ্যোতনায় এবং শিল্প-মানসিকতার আশ্চর্য মৌলিকতায় জাপানী শিল্পী জীবন-শিল্পীরই দোসর।

ফুল সাজানো জাপানী জীবনে যে কতদূর প্রভাব বিস্তার করেছে একটি ছন্দোবদ্ধ গানের কলিতে তা অপূর্বভাবে ধরা পড়ে। ফুল সাজাতে ব'সে জাপ-ললনা গাইছেন :

'আমি যখন পুষ্পাধারে ফুল সাজাতে বসি
পবিত্র হয় হৃদয়খানি শান্তিরসে ভাসি।
আধার ভরে' সাজিয়ে তুলি ঋতুরাণীর মালা,
সুন্দরী সেই চারটি ঋতু সুধাগন্ধ ঢালা।'

বস্তুত, জাপানী পুষ্পচর্চার সম্যক পরিচয় সামান্য একটি চিঠিতে গুছিয়ে তোলা অসম্ভব। এর জন্য ক্রমানুয়ে কয়েকটি পত্রের প্রয়োজন, যেখানে ফুল সাজানোর রীতিনীতি ধীরে সুস্থে বলা যাবে। সুতরাং পারম্পর্য বজায় রেখে পরবর্তী পত্র পাঠ করার অনুরোধ রাখছি, যাতে পূর্বসূত্র বজায় থাকে। এজন্য অবশ্যই পরবর্তী চিঠির ওপর নয়, পূর্ববর্তী 'সাপ্তাহিকের' ওপরই অধিক নির্ভর করতে হবে।

● ভাবী উত্তরাধিকারীর সঙ্গে : জাতীয় সংহতি সম্মেলনে

রাজধানী ঃ

বেদনাঘন চিত্তে রাজধানীর মানুষ সারা ভারতের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পালন করেছে ভারতের প্রাণপুরুষ জওহরলাল নেহরুর ৭৫তম জন্ম-জয়ন্তী। এক বছর আগেও ঋজুদেহ, প্রাণ-চঞ্চল চাচা নেহরুকে দেখেছি নয়াদিল্লীর শিশুমেলায়। শিশুরা ছিল তাঁর প্রাণ। স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি অজ্ঞানতা, কুসংস্কার, অত্যাচার ও নিপীড়নহীন সমৃদ্ধ মহাভারতের। এই মহাভারত রচনাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র সাধনা। তিনি জানতেন এ কর্মযজ্ঞ শেষ করে যাওয়া সম্ভব নয়। তাঁর আরব্ধ কাজের গুরুভার উত্তরসাধকদের হাতে তুলে দিয়ে—পথের নিশানা তাদের দেখিয়ে দিয়ে একদিন বিদায় নিতে হবে। তাই উত্তরসাধক শিশুদের প্রতি তাঁর স্নেহ ছিল অগাধ। সময় পেলেই শিশুদের সঙ্গে তিনি মাতামাতি করতেন। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি তিনি বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি করে সরে পড়বেন, কেউ ভাবতেও পারে নি। সাতাশে মে'র আগে কেউ কল্পনাও করতে পারে নি তাঁর বিদায়ের কথা। আজ তিনি আমাদের কাছে নেই। তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁরই জন্মদিন পালন করতে হয়েছে আমাদের বেদনার্ত হৃদয়ে—নিবেদন করেছি অশ্রুসিক্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি।

তিনি কাছে না থাকলেও দূর থেকেই আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন, মর্তালোকের তাঁর প্রিয়জনদের প্রেরণার উৎস হয়ে আছেন, এ-বিশ্বাস ভারতের প্রতিটি মানুষই করে। মহামানবের প্রেরণা সঞ্চারিত হয় তখনই,

● নেহরুর জন্মদিনে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ 'জওহরলাল নেহরু' ও 'দি এনাক্তিং ওয়ার্ল্ড' দুই খণ্ড বিক্রয়ার্থ প্রচার করছেন।

যখন উত্তরকালের মানুষ তাঁর অসামান্য দানের কথা স্মরণ করে শ্রদ্ধাবনত-চিত্তে। ভারতবর্ষ আবহমানকাল এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী।

এই বিশ্বাসেই 'জওহর জ্যোতি' ধারণ করে সুরু হয়েছে দেশপরিক্রমা। শিশু-সমাবেশে আলোচনা হয়েছে আপোষহীন সংগ্রামী জওহরলালের আত্মকথা। রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ বিজ্ঞানভবনে প্রচার করেছেন স্মারকগ্রন্থ 'জওহরলাল নেহরু' এবং 'দি এমাজিং ওয়ার্ল্ড'। প্রথম গ্রন্থ-খানিতে রয়েছে যুগস্রষ্টার মহান ও বিরাট জীবনের চিত্রলেখা। দ্বিতীয়টিতে রয়েছে বিশ্বের ছাব্বিশজন প্রখ্যাত মনীষী, চিন্তানায়ক ও রাজনীতিবিদের প্রবন্ধ।

হিংসায় উন্মত্ত বিশ্বে, শক্তিগোষ্ঠীর আত্মঘাতী রণোন্মাদনা দেখে মানুষ যখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল, পরমাণু যুদ্ধের সম্ভাবনায় যখন সৃষ্টি হয়েছিল বিশ্বব্যাপী ভয়াবহ বিভীষিকা—নেহরু তখন এনেছিলেন নির্ভয় নির্ভরতা। সাম্রাজ্যবাদের বেড়াজালে নিষ্পিষ্ট এশিয়া ও আফ্রিকার মুক্তিকামী মানুষকে তিনি দিয়েছিলেন মুক্তিপথের সন্ধান। তাঁর এই অসামান্য অবদানের কথা সেদিন মিশরে অনুষ্ঠিত গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রতিনিধি সম্মেলনে রাষ্ট্র-নায়কগণ স্বীকার করেছেন অকুণ্ঠ-চিত্তে। সেখানেও তাঁর অভাবে অনুভূত হয়েছে প্রকাণ্ড শূন্যতা।

ডঃ রাধাকৃষ্ণণ বিশ্বপথিক জওহর-লালের জন্মদিনে অন্তরের গভীরতম শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেছেন, নেহরু ছিলেন মনুষ্যত্বের মূর্ত প্রতীক।

মনুষ্যত্বের প্রতি, মানবাত্মার প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধাই তাঁকে করেছিল অক্লান্ত সংগ্রামী। বুভুক্ষার বিরুদ্ধে, অর্থলোলুপতার বিরুদ্ধে, পরপদানত মোচনের ও অজ্ঞানতা দূরীকরণের জন্যে সংগ্রাম করেছেন তিনি আজীবন। প্রতিবারের সংগ্রামেই তাঁকে আমরা পেয়েছি প্রথম সারিতে। তাঁর জন্ম-দিনে তাই ডাক ও তার বিভাগ যে ছাপের ব্যবহার করেছে তাতে ইংরেজি ভাষায় লেখা হয়েছে—স্বাধীনতার অর্থই হলো অপরের স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা! এই দিনে তাঁর অক্ষয় স্মৃতি-মণ্ডিত এক টাকা ও পঞ্চাশ পয়সার নয়া মুদ্রাও বাজারে ছাড়া হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ নেহরুর একটি

● শ্রীকৃষ্ণমাচারী

মর্মর মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেছেন। তিনমূর্তি ভবনে উদ্বোধন করেছেন তিনি নেহরু সংগ্রহশালা ও প্রদর্শনীর। ভারতের এককালীন সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানের আবাসগৃহটি পরবর্তীকালে রূপান্তরিত হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর বাস-ভবনে। এ ভবন এখন পরিণত হয়েছে ভারতের অন্যতম তীর্থক্ষেত্রে। অগণিত মানুষ আসছে এখানে। পাঠ করছে তাদের প্রিয় নেতার চিঠি। এখানে এসে তারা আরও বেশি করে উপলব্ধি করেছে জওহর সত্যি ছিল মধ্যমণি।

রামলীলা ময়দানের জনসমাবেশে প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী পরলোকগত জননায়কের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে, তাঁর অশেষ গুণাবলীর অনুধাবন করে সকলকে বিপদের মোকাবিলা করতে, নির্ভয়ে জীবন-যুদ্ধে এগিয়ে যেতে অনুরোধ করেছেন।

জওহরলাল আমাদের সামনে সাহস, দৃঢ় সঙ্কল্পের দৃষ্টান্তই রেখে গেছেন। দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত দৈন্য তিনি দূর করে যেতে না পারলেও গণতান্ত্রিক ভারতের ভিত্তি তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছেন, উন্নয়নমূলক রূপরেখাও তাঁরই রচনা। তার সফল, বাস্তব রূপায়ণের দায়িত্ব এখন আমাদের। এই গুরুদায়িত্ব পালন করতে পারলেই আমরা নেহরুর যোগ্যতম উত্তরাধিকারীর গৌরব অর্জন করতে পারবো। তাঁর পবিত্র স্মৃতিচারণ আমাদের সার্থক হবে।

* * *

রাজধানীতে জোর গুজব, অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী অচিরে বিদায় নিচ্ছেন মন্ত্রিসভা থেকে। গুণ্টুরে এ-আই-সি-সি'র অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর যাত্রার আগেই নাকি অর্থমন্ত্রী তাঁর মনের কথা ব্যক্ত করেছেন প্রধান-মন্ত্রীর কাছে।

পদত্যাগপত্র দাখিল না করলেও তিনি এবারে বিদায় নেবার সঙ্কল্পই জানিয়েছেন। কি কারণে তিনি মন্ত্রি-সভা ত্যাগ করছেন তা সঠিক জানা যায় নি। শ্রীকৃষ্ণমাচারীর পদত্যাগ সম্পর্কে আগেও একবার কথা উঠেছিল। সহকর্মীদের সঙ্গে মতবিরোধই তখন প্রধান কারণ বলে রটনা হয়েছিল। সেবারে তিনি নিজেই পদত্যাগের কথাটা অস্বীকার করেছিলেন।

এবারে শোনা যাচ্ছে, দুজন সহকর্মীর সঙ্গে নীতিগত বিরোধ বেধেছে। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের বিগত অধিবেশনে খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মণিয়মের সঙ্গে অর্থমন্ত্রী সুর মেলাতে পারেন নি। খাদ্য-সমস্যা সমাধানের কাজ চালু করতে অর্থাভাবের প্রশ্ন উঠলে খাদ্যমন্ত্রী সন্তুষ্ট হতে পারেন নি।

জাতীয় ইরানীয় তৈল কোম্পানীর সহযোগিতায় মাদ্রাজে তৈল শোধনাগার প্রতিষ্ঠা নিয়েও মতভেদ দেখা দিয়েছে। মন্ত্রিসভায় এ কাজের জন্য টাকা মঞ্জুরীর প্রশ্ন উঠলে শ্রীকৃষ্ণমাচারী তীব্র প্রতিবাদ তুলেছিলেন। প্রকাশ, অর্থমন্ত্রীর প্রতিবাদ সত্ত্বেও পরিকল্পনাটি অনুমোদন লাভ করেছে মন্ত্রিসভায়।

শ্রীসুব্রহ্মণিয়ম

শ্রীকৃষ্ণমাচারী তাঁর স্বাস্থ্যের কথাও তুলেছেন। শরীর তাঁর ভাল যাচ্ছে না। এ অবস্থায় তিনি যে-ভাবে কিছুদিন থেকে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, তা অপরের পক্ষে কষ্টসাধ্য হতো।

মহারাষ্ট্রে ঃ

গোয়ার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শ্রী এস কে পাতিলের হাটে হাঁড়ি ভাঙা বিবৃতির পর যে ঝড়ের সৃষ্টি হয়েছে—তার সমাপ্তি কিভাবে, কোথায় গিয়ে ঘটবে এই মুহূর্তে বলা কঠিন। তবে, এ ঝড়ে গোয়া ও মহারাষ্ট্রের ক্ষমতাসীন দলের সংহতিতে যে প্রচণ্ড ধাক্কা আসবে, তাকে সামলানো সহজসাধ্য হবে না বলেই মনে হচ্ছে।

গেল এপ্রিল থেকে যা সযতনে গোপন রাখা হয়েছিল, তাকে ফাঁস করে দিয়ে শ্রীপাতিল বিপদে ফেলেছেন অনেককেই। প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী বিব্রত বোধ করছেন। কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের অন্য কর্ণধারগণও পড়েছেন মুস্কিলে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী গোয়া সম্পর্কে শ্রীপাতিলের বিবৃতিতে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। বোম্বাইতে সাংবাদিকদের কাছে এ কথা পরিষ্কার ভাষায় তিনি স্বীকার করেছেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন, শ্রীপাতিলই প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন। সম্ভবত তিনি এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল বেশি। প্রধানমন্ত্রী প্রশ্নটি কৌশলে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এ-আই-সি-সি'র একজন মুখপাত্র শ্রীপাতিলের অভিমতকে বাতিল করেন নি। তাঁর মতে 'পাতিল কাঁচা খেলোয়াড়' নন। পাকা খেলোয়াড়ের মতই তিনি ঘুঁটিটি চেলেছেন এবং জয় তাঁর অবশ্যম্ভাবী।

এ ব্যাপার নিয়ে বেশ কিছুটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে গোয়া ও মহারাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের মধ্যে। তারা মনে করে, ভারত সরকার বিশ্বাসভঙ্গ করেছেন। কংগ্রেস-বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো খুবই উৎফুল্ল। তাদের মতে, এ বিবদমান বিবৃতিতে কংগ্রেসের মধ্যেও বিরোধ দেখা দেবে তীব্র আকারে। গোয়ার মহারাষ্ট্রবাদী গোমন্তক দলও এবারে অধিক শক্তি সঞ্চয় করবে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদয়ানন্দ বন্দোদকারকেও শেষ পর্যন্ত তাদের চাপে নতি স্বীকার করতে হতে পারে।

মহারাষ্ট্রের সঙ্গে গোয়াকে জুড়ে দেওয়ার দাবিতে বিল উত্থাপনের কাজটা পিছিয়ে দিতেও নাকি শ্রীবন্দোদকার সম্মত হয়েছিলেন। পরিবর্তিত পরিবেশে তাঁকে সমঝে চলার নীতি পরিহার করে আগামী বিধানসভার অধিবেশনেই বিলটি পেশ করতে হতে পারে। প্রস্তাব বিধানসভায় গৃহীত হলেই তাকে বাস্তবে রূপায়ণের প্রশ্নে কেন্দ্রের সঙ্গে গোয়ার লড়াই যাবে বেধে।

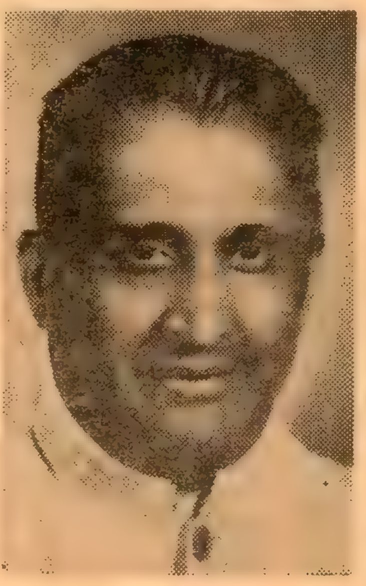

শ্রী এস কে পাতিল

শ্রীচ্যাবন

সব চাইতে ফাঁপরে পড়েছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রী ওয়াই বি চ্যবন। তাঁর বিরোধীরা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন। কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পরিষদের সিদ্ধান্ত তাঁর অগোচরে গৃহীত হয়েছে, এ অজুহাত বিরোধীরা মেনে নিতে নারাজ। এ ঘটনায় তাঁর রাজনৈতিক মর্যাদা হ্রাস পেতে পারে।

রাজনৈতিক মহলের ধারণা, বিলাত থেকে ফিরে এসেই শ্রীপাতিল যে-ক্লেদাক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন তাকে মালিন্যমুক্ত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী একটি বিবৃতি দেবেন। শ্রীবন্দোদকারকে একবার দিল্লী ঘুরে আসবার পরামর্শও তিনি দিয়েছেন। তাড়াহুড়ো করে বিধানসভায় গোয়াকে মহারাষ্ট্রভুক্তির দাবিতে বিল উত্থাপন না করতেও তিনি নির্দেশ দিয়েছেন।

* * *

কোলাপুর জেলা কংগ্রেসের ঘটনাবলী এবং নাগপুর কংগ্রেস কমিটীর পদত্যাগের হুমকীতে রাজ্য কংগ্রেস সংগঠনের পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে পড়েছে।

শ্রী ভি পি নায়েক এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে অসম্মতি জানিয়েছেন। তিনি মনে করেন, উপদলীয় সংঘাত ও ব্যক্তিগত আক্রোশ চরিতার্থ করার ব্যাধি থেকে কংগ্রেসকে মুক্ত করা সহজসাধ্য নয়। কংগ্রেসের নীতি ও কর্মসূচী রূপায়ণের কাজেই তিনি এখন থেকে আত্মনিয়োগ করবেন। তা করতে পারলেই সাধারণের কাছে কংগ্রেস আবার মর্যাদার আসন পাবে। প্রদেশ কংগ্রেস প্রধানও বিপদে পড়েছেন। উপদলীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ায় কংগ্রেসকর্মীদের মধ্যে তাঁর প্রতিপত্তি হ্রাস পাচ্ছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী ডি এস দেশাই হালে পানি পাচ্ছেন না। সরকার-বিরোধী কংগ্রেস গোষ্ঠী কোন যুক্তি-যুক্ত মীমাংসায় আসছে না। মহারাষ্ট্রের কংগ্রেসের নেতারা আজ দ্বিধাবিভক্ত। একদল গঠনমূলক কাজে বিশ্বাসী।

● শ্রী ডি এস দেশাই

অপর দলটি সংগঠনের কর্তৃত্ব নিয়ে ব্যস্ত। দুটি দলের চাপে পড়ে সাধারণ কংগ্রেসকর্মীরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে।

মধ্যপ্রদেশ ঃ

নতুন খারিফ শস্য এবং মোটা দানার খাদ্যশস্যের রপ্তানীর ওপর আরোপিত বাধানিষেধ পরিস্থিতির পরিবর্তন এনে দিয়েছে। গম ভিন্ন অন্য খাদ্যের হাহাকারটা হ্রাস পেয়েছে।

গেল সপ্তাহে রাজধানীর মানুষ একদানা গমও পায় নি। সরকারী ব্যবস্থাই এর জন্য অধিক দায়ী। জেলা-শাসকরা নাকি এক জেলা থেকে আরেক জেলায় গম চালান একবারে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। খাদ্যমন্ত্রী শ্রীগৌতম শর্মা এ অভিযোগের প্রতিবাদ করলেও, জেলা থেকে জেলান্তরে গমের গমনাগমন কারও নজরে পড়ে নি। এতে মানুষের হয়রানি বেড়েছে এবং বেশ মোটা হাতে মুনাফা লুটেছে ব্যবসায়ীরা।

আংশিক রেশন প্রবর্তিত হয়েছে রাজধানীতে। চিনির কার্ড যাদের রয়েছে, দশ কিলো করে দেশী গম দেওয়া হচ্ছে। বণ্টনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থার অভাবে সুযোগ সকলে গ্রহণ করতে পারছেন না। সারা শহরে দোকান খোলা হয়েছে মাত্র চারটি। মানুষ হতাশ হয়ে ফিরে এসে পড়ছে মুনাফা-শিকারীদের হাতে। রেশন দোকানে গম দেওয়া হচ্ছে ৫৫ টাকা কুইণ্টল হারে। ব্যবসায়ীরা দাম নিচ্ছে সেখানে ৮৩ টাকা করে। প্রশাসকরা চোরা-কারবারীদের গুদামের মাল উদ্ধারের জন্য কোন চেষ্টাই করছেন না।

খারিফ শস্য বাজারে আসতে সুরু করেছে। পরিমাণে কম আমদানী হলেও—খারিফের আগমন বাজরা, জোয়ার ও অন্যান্য মোটা দানার শস্যের দাম নামিয়েছে কিছুটা। এবারে ধান খুবই ভাল হয়েছে। চার থেকে পাঁচ লক্ষ টন চাল রপ্তানী করা সম্ভব হবে বলে সরকার আশা করেন। অসময়ে অধিক বৃষ্টির দরুণ জোয়ার কিছুটা নষ্ট হলেও প্রায় দশ লক্ষ টন উৎপন্ন হয়েছে।

জোয়ারের উৎপাদন হ্রাস পাওয়াতেই রাজ্য সরকার মোটা শস্যের রপ্তানীর ওপর বাধানিষেধ আরোপ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। গ্রীষ্মের পর থেকেই খাদ্য-সমস্যার মোকাবিলা করতে গিয়ে সরকারকে তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়েছে। সামনে আসছে সাধারণ নির্বাচন। এই নির্বাচনের মুখে বিপদের পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে, সে জন্য সরকার এখন থেকেই প্রস্তুত হচ্ছেন। ডাল ভিন্ন অন্য কোন খাদ্যশস্য সরকার সাধারণ ব্যবসায়ীদের হাত দিয়ে বাইরে পাঠাবেন না। এ বিষয়ে কেন্দ্রের সম্মতিও নাকি পাওয়া গিয়েছে। গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে উদ্বৃত্ত চালটা পাঠাবার ব্যবস্থা করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে।

• • •

প্রায় তিন কোটি গবাদি পশুর মালিক মধ্যপ্রদেশ। এ দিক দিয়ে ভারতে তার স্থান দ্বিতীয়। এত গরু সত্ত্বেও দুধের অভাব অত্যন্ত বেশি। গরুর সংখ্যা যত বেশি, দুধ হয় সে পরিমাণে খুবই কম। উন্নত ধরণের

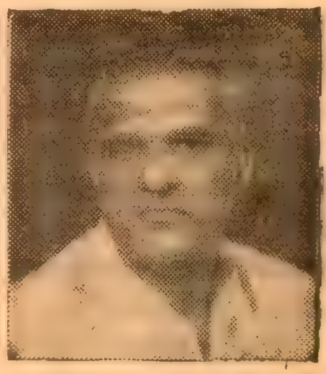

● শ্রীগৌতম শর্মা

প্রজননের দ্বারা গোজাতির উন্নতির পরিকল্পনা নিয়েছেন রাজ্য সরকার। আটতিরিশটি কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র খোলা হয়েছে। ভালো জাতের ষাঁড় আনা হয়েছে অনেকগুলো। গোশালা খুলেছেন আটাশটি এবং গোসদন প্রতিষ্ঠা করেছেন এগারটি।

এত ঢাক-ঢোল পিটিয়ে যে কর্মযজ্ঞ সুরু হয়েছিল তা ভস্মে ঘি ঢালার সামিল হয়ে পড়েছে। বক্তারম্ভের পর

আমাদের হোতাদের উৎসাহে পড়ে ভাটা। তার ফলে টাকা জলের মত হয় খরচ। শেষে গিয়ে দেখা যায় সবটাই একেবারে বানচাল হয়ে গেছে। সরকারের অডিট রিপোর্টে এমনি ধরণের বিরূপ সমালোচনাই হয়েছে। টাকা যা খরচ হয়েছে প্রতিদান তেমন পাওয়া যায় নি।

মাদ্রাজ ঃ

ভারতীয় বংশোদ্ভব সিংহলবাসী-দের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শাস্ত্রী-সিরিমাভো চুক্তি বেশ কিছুটা উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে সাধারণের মনে। কংগ্রেসী মহল চিন্তিত হয়ে পড়েছেন রাজ-নীতির ক্ষেত্রে এর আশু প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে। সিংহলের ভারতীয়দের সমস্যা সমাধানে ভারতের ব্যর্থতাই ছিল এত দিন বিরোধী দলের রাজ-নীতির মোক্ষম হাতিয়ার। সে হাতিয়ারে আবার নতুন করে শাণ্ দেবার সুযোগ পাবে কংগ্রেস বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো।

শ্রীরাজাগোপালাচারী তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ রীতিতে এর মধ্যে শাণিত বাক্যবাণ নিক্ষেপ করেছেন। এ চুক্তিকে 'বিশ্বাসঘাতকতার নজীর' আখ্যা দিয়েছেন। একে তিনি 'অভদ্র ও অমানুষিক' চুক্তি বলে উল্লেখ করেছেন। 'নেহরু নীতি' থেকে সরে যাবার অভিযোগও তিনি এনেছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর বিরুদ্ধে। তাঁর মতে এই চুক্তির ফলে একদিন মালয়েশিয়া ও অন্যান্য রাষ্ট্রের ভারতীয়গণ বিপদে পড়বেন। রাজাজী সিংহলবাসী ভারতীয়দের এ চুক্তি নিয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘের দরবারে এবং আন্তর্জাতিক আদালতে হাজির হতে উপদেশ দিয়েছেন। এ চুক্তি যাদের সম্পর্কে করা হয়েছে তাদের মতামত না নিয়ে, তাদের সঙ্গে আলোচনা না করে সম্পাদন করা হয়েছে বলেই সিংহলের ভারতীয়গণ তা অগ্রাহ্য করতে পারেন বলে রাজাজী মন্তব্য করেছেন।

দ্রাবিড় কাজাগামীরা রাজাজীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রচারকার্যে নেমে পড়েছেন। তাঁরাও চুক্তিকে 'বিরাট বিশ্বাসঘাতকতা' আখ্যা দিয়েছেন। এ অবস্থায় স্থানীয় কংগ্রেস নেতারা পড়েছেন অত্যন্ত বিপাকে। তাঁরা আত্মরক্ষার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই করতে পারছেন না।

সরকারী মহল ভাবছেন চুক্তি-জনিত আর্থিক চাপের দিকটা। ভারত সরকার সিংহল প্রত্যাগত

শ্রীরাজাগোপালাচারী

ভারতীয়দের পুনর্বাসনের সব খরচটাই বহনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এ জাতীয় প্রতিশ্রুতির খারাপ দিকটাই সকলের মনে জাগে সর্বাগ্রে। ব্রহ্মদেশ থেকে যাঁরা এসে এ রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছেন তাঁদের পুনর্বাসনের কাজে কেন্দ্রের ভূমিকায় রাজ্য সরকার খুশি নন। তাঁদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিশ্রুতি কম ছিল না— পরিপূর্ণ সাহায্যের আশ্বাসই রাজ্য সরকার পেয়েছিলেন কেন্দ্রের কাছ থেকে। কিন্তু সুষ্ঠু পুনর্বাসনের আশায় যাঁরা ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করে মাতৃভূমিতে এসেছিলেন তাঁরা হতাশ হয়েছেন।

পূর্ব বাংলার হতভাগ্য উদ্বাস্তুদেরও রাজ্য সরকার বেঁচে থাকবার মত কিছুই দিতে পারেন নি। উপযুক্ত কেন্দ্রীয় সাহায্য তাঁদের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় নি। তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করতে পেরে রাজ্য সরকার হাত গুটিয়ে ফেলেন। উদ্বাস্তুদের ভাগ্যান্বেষণে ভবঘুরের মত ঘুরে ঘুরে জীবিকার সংস্থান করতে হচ্ছে। এই সব অভিজ্ঞতার পর সিংহল-ভারত চুক্তিতে কেউ খুশি হতে পারেন নি

কংগ্রেসী মহল চুক্তিটাকেই আত্মরক্ষার দায়ে আমল দিতে চাইছেন না। তাঁদের মতে নেহরু-কোটলেওয়ালা চুক্তির ন্যায় শাস্ত্রী-সিরিমাভো চুক্তি ফেঁসে যাবে। বিশ হাজার মানুষকে প্রতি বছর নাগরিক অধিকার দিতে সিংহল সরকারই পেরে উঠবেন না। তা' করতে না পারলে ছত্রিশ হাজার ভারতীয়কে ভারতে চালান দেবার প্রশ্নও থাকবে না।

কেরল :

সমুদ্র উপকূলের এই ছোট রাজ্য শান্তিপ্রিয়, নিরীহ নাগরিকরা অনশনে কাতর হয়ে যে গগনবিদারী আর্তনাদ তুলেছিল, তার তীব্রতা অনেকটা হ্রাস পেলেও পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এখনও হয় নি।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রীর হস্তক্ষেপের পর মানুষ কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছে। চাল আসছে প্রতিদিনই স্পেশ্যাল ট্রেনে। সরকারও যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন বন্টন-ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করে অবস্থা আয়ত্তে আনতে। কিন্তু রাতারাতি কোন বিরাট কর্মকাণ্ড সমাধা করা সম্ভব নয়।

কেরলের বুভুক্ষু মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে ক্ষুধার অন্ন আদায়ের জন্য চরম পন্থা অবলম্বন করেছিল। হোস্টেলের ছাত্ররা অনাহার সহ্য করতে না পেরে মহাকরণের কর্মীদের খাদ্যের পাত্র ছিনিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। এ ঘটনাই প্রমাণ করে, কেরলে কি ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল।

আমরা বহুবার এই ভয়াবহ

পরিস্থিতির আভাস দিয়েছি। বলেছি খাদ্যের অভাব উপদেশবাক্যে মেটে না। দুঃখী মানুষ তখনই হাসিমুখে বরণ করে, যখন সে দেখতে পায় তার দুঃখের অবসানের একটি পরিষ্কার ছবি। প্রশাসনের কাছ থেকে সেরূপ কোন কল্যাণের ছবি মানুষ আর পাচ্ছে না। কেরলের এই বিপজ্জনক খাদ্য-পরিস্থিতি সরকারের অজানা নয়। গেল কয়েক মাসে খাদ্য নিয়ে ছোট ছোট হাঙ্গামা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আরও হয়েছে। সে হাঙ্গামার পরই প্রশাসনযন্ত্রের সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। তা হলে এই ক্ষুদ্রতম রাজ্যটির মানুষগুলো এমন ক্ষিপ্ত হতো না—এ ধরণের অরাজকতা আত্মপ্রকাশ করতো না।

কেরলে এ ঘটনা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। বিবেকবান কোন মানুষের কাছেই এ ঘটনা অভিপ্রেত হতে পারে না। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা যাঁদের লক্ষ্য, তাঁরা এ ঘটনাকে সম্যক গুরুত্ব দিয়ে বিচার না করলে ভুল করবেন। খাদ্যের দাবিতে অসন্তোষ, নৈরাশ্য দেখা দিয়েছে ভারতের সর্বত্র। এ কথাও নেতাদের স্মরণ রাখা উচিত হবে।

নাগাভূমি ঃ

ছেদিমার পাহাড়ের আলোচনা বৈঠকে আবার বিভ্রাট সুরু হয়েছে। বৈরী নাগারা নিরাপত্তা বাহিনী তুলে নেবার আব্দার নতুন করে উত্থাপন করেছেন। সীমান্তের নিরাপত্তা বাহিনী তুলে নেওয়া ভারত সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। কোন রাষ্ট্রই এরূপ বিপদের ঝুঁকি নিতে পারে না। তা ছাড়া নাগারা এখনও আত্মসমর্পণ করে অস্ত্র প্রত্যর্পণ করে নি। ২৩শে সেপ্টেম্বর বিদ্রোহী নাগাদের সঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে আলোচনা আরম্ভ হয়। ভারত সরকার চুক্তি অনুযায়ী অস্ত্র সম্বরণ করেছেন। কিন্তু নাগারা সে চুক্তি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে পারে নি। শান্তিপ্রিয় মানুষের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে সশস্ত্র নাগারা লুঠতরাজ করেছে। ডিনামাইট দিয়ে পুল উড়িয়ে দিয়েছে।

গেল সপ্তাহে বিদ্রোহী নাগাদের সশস্ত্র বাহিনীর নয়া গতিবিধির সন্ধান পাওয়া গেছে। সংবাদে বলা হয়েছে, সামরিক পোষাকধারী তের শ' নাগাকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মণিপুরের মাও মহকুমার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের দিকে অগ্রসর হতে দেখা গেছে। গহন অরণ্যের ভেতর দিয়ে তারা এগিয়ে চলেছে পাকিস্তানের অভিমুখে। পাকিস্তানে গিয়ে নয়া ঘাঁটি সৃষ্টি করাই এদের প্রধান উদ্দেশ্য। আগেও নাগারা পাকিস্তান থেকে অস্ত্র সাহায্য পেয়েছে। সামরিক শিক্ষালাভ করেছে সেখানে।

বৈরী নাগাদের নেতারা এখনও আত্মসমর্পণ করে নি। নিজেদের অস্ত্র ফিরিয়ে না দিয়ে দাবি তুলেছে নিরাপত্তা বাহিনী প্রত্যাহারের। এ অযৌক্তিক দাবি তোলবার সাহস তারা পায় কি করে? ভারত সরকার নিরাপত্তা বাহিনী তুলে নিলেও নাগারা অস্ত্র ভারত সরকারের হাতে দিতে নারাজ। আন্তর্জাতিক শান্তি বাহিনী ভিন্ন ভারতের কারো ওপর তাদের বিশ্বাস নেই। সোজা কথায় নাগারা স্বাতন্ত্র্যের দাবিতে এখনও অটল। নাগাভূমির সরকারের অস্তিত্ব এখনও তারা আসলে মেনে নেয় নি। নাগাভূমিকে ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসেবেও স্বীকার করে নিচ্ছে না তারা।

শ্রীবিষ্ণু সহায়

ভারত সরকার নাগাদের ব্যাপারে সীমাহীন ধৈর্যের পরিচয়ই দিয়েছেন। নাগারা আলোচনার প্রথম দিকে বেশ আগ্রহই দেখিয়েছেন। আজ এ পরিবর্তনের কারণ কি? নিশ্চয়ই তারা বাইরের কোন শক্তির কাছ থেকে মদৎ পাচ্ছে। আজ যারা পাকিস্তানে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পাড়ি দিচ্ছে, তাদের সঙ্গে শান্তি আলোচনার অংশীদার নাগাদের কি কোন যোগাযোগই নেই! হয় তারা আলোচনায় অংশগ্রহণকারী নাগাদের নেতৃত্ব মানে না, না হলে বুঝতে হবে বিদ্রোহী নাগারাই সমরনীতির পরিবর্তন করে একাংশ পাকিস্তানে পাঠিয়ে নিরাপদ আশ্রয় থেকে ভবিষ্যৎ সীমান্ত এলাকায় আক্রমণ চালাবার ব্যবস্থাটা পাকাপোক্ত করে রাখছে।

নাগাদের এই গতিবিধি, শান্তি-বৈঠকে নাগা নেতাদের আচরণ আজ সারা ভারতে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। ভারত সরকারের এখন থেকেই সতর্ক হওয়া উচিত হবে। নাগাভূমির বর্তমান শান্তি যাতে অব্যাহত থাকে সেদিকে নজর রেখেই বিদ্রোহী নাগাদের বুঝিয়ে দিতে হবে, অবাস্তব কোন আব্দারই কোনদিন টিকতে পারে না। ভারতের সঙ্গেই তাদের ভাগ্য জড়িত। আকাশ-কুসুম কল্পনার পরিণাম শুভ হতে পারে না। শান্তিপ্রিয় নাগারা একদিন মাথাচাড়া দিয়ে উঠবেই। তার ইঙ্গিত তথাকথিত বিদ্রোহী নাগারা গেল দুটি মাসের মধ্যে না বুঝে থাকলে বুঝতে হবে তারা বিভ্রান্ত—দেশের মানুষের মনের হদিস তারা পায় নি।

বিদ্রোহী নাগাদের আচরণে রাজ্যপাল শ্রীসহায় সেদিন মোককচঙ জেলার সদর শহর ওখায় এক জনসভায় সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি বলেছেন, নাগারা ভারত থেকে আলাদা হওয়ার দাবি যেন না তোলে। সে দাবি নাগারা আঁকড়ে ধরলে যে কোন প্রকারে হোক, ভারত সরকার অখণ্ডতা রক্ষা করবেন। শ্রীসহায়ের বক্তব্য বিদ্রোহী নাগা নেতারা উপলব্ধি করলে নিজেদের কল্যাণের পথ হবে প্রশস্ত এবং নাগাভূমিতে শান্তিও প্রতিষ্ঠিত হবে অতি সহজে।

আন্তর্জাতিক

• অক্টোবর বিপ্লব বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে মস্কোয় রেড স্কোয়ারে কুচকাওয়াজ

সোভিয়েট ইউনিয়ন :

মস্কোতে সোভিয়েট নেতাদের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই গত শনিবার পিকিং রওনা হয়ে গেছেন।

নভেম্বর বিপ্লব-বার্ষিকী দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য এলেও, চৌ-এন-লাই-এর মস্কো আগমনের আসল উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েট নেতাদের সঙ্গে চীন-রুশ মতবিরোধ সম্পর্কে আলোচনা করা।

সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক ও নতুন সোভিয়েট নেতৃমণ্ডলীর প্রধান লিয়নাদ ব্রেজনেভ ও নতুন প্রধানমন্ত্রী অ্যালেক্সি কোসিগিনের সঙ্গে চৌ-এন-লাই-এর কি আলোচনা হয়েছে এবং আলোচনার ফলই বা কি হয়েছে, তার বিবরণ প্রকাশ করা হয় নি। অবশ্য এই আলোচনা সম্পর্কে বিভিন্ন মহলে জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই।

চৌ-এন-লাই-এর মস্কো ত্যাগের পূর্বে যে যুক্ত ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়, তাতে কেবল এই কথা বলা হয়েছে, 'আলোচনা হৃদ্যতাপূর্ণ ও ভ্রাতৃত্বমূলক মনোভাবের মধ্যে হয়েছে।' অনেকেরই ধারণা, চীন-রুশ মত-বিরোধের মূল কোন বিষয়েই মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি। তবে সম্ভবতঃ রুশ নেতৃবৃন্দ ১৫ই ডিসেম্বর আহূত বিশ্বের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সম্মেলনের প্রস্তুতি-বৈঠকটি আপাততঃ স্থগিত রাখতে সম্মত হয়েছেন।

এই সংবাদ সত্য হলে বুঝতে হবে, এবারের বৈঠকে কোন ফল না হলেও রুশ নেতৃবৃন্দ চীনা নেতাদের সঙ্গে আরও আলোচনার পক্ষপাতী। হয়তো জানুয়ারী নাগাদ আর একবার রুশ-চীন বৈঠক বসবে।

ঘটনার গতি দেখে মনে হচ্ছে, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীন উভয়েই মীমাংসার জন্য উৎসুক। উভয়ের এই বিরোধ মিটিয়ে ফেলার জন্য

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চাপ আছে। কারণ, এই বিরোধের ফলে বিভিন্ন দেশে কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষতি হয়েছে। পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট দেশ-গুলিও এই বিরোধ নিষ্পত্তির পক্ষপাতী। মোটামুটিভাবে এদের অধিকাংশ সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষে হলেও, এরা চায় না চীনকে বাদ দিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন কমিউনিস্ট জগতের একচ্ছত্র অধিপতি হোক। কমিউনিস্ট পরিবারের মধ্যে চীন থাকলে সোভিয়েটের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হবে এবং তার ফলে পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলির স্বাতন্ত্র্য বৃদ্ধি পাবে—এই আশায় এই সব দেশ চীনকে বিতাড়নের পক্ষপাতী নয়। পোল্যাণ্ডের গোমুলকা তাই এবারের মস্কো-বৈঠকে উভয়পক্ষের মধ্যে অন্যতম মধ্যস্থরূপে কাজ করেছেন।

তবে বিবাদ নিষ্পত্তির পথে বাধাও অনেক। উভয়ের মধ্যে তত্ত্বগত পার্থক্যের ব্যবধান অনেকখানি। শোনা যাচ্ছে, চৌ-এন-লাই নাকি দাবি করেছিলেন, রুশ নেতৃবৃন্দকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি ও স্ট্যালিন-বিরোধী মনোভাব ত্যাগ করতে হবে। রুশ নেতৃবৃন্দ চৌ-এন-লাই-এর এই প্রস্তাবে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়েছেন। ক্রুশ্চেভের অপসারণ ঘটলেও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতিতে বর্তমান রুশ নেতৃবৃন্দ অটল রয়েছেন। বরং, পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ব্রেজনেভ-কোসিগিন গোষ্ঠী আরও বেশি সম্পর্ক স্থাপনের পক্ষপাতী। এ অবস্থায় চীনের সঙ্গে মীমাংসার আশা কোথায়? পরমাণু বোমায় শক্তিশালী চীনেরই বা আপোষের জন্য গরজ কি?

আপোষ-মীমাংসায় উৎসাহী হলেও কোন পক্ষই বিশেষ আগ্রহ দেখায় নি, বরং একটু যেন অনাগ্রহ ও কুছ-পরোয়া-নেই ভাবেরই পরিচয় মিলেছে। মস্কো বিমান বন্দরে চৌ-এন-লাইকে সম্বর্ধনা জানাতে কেবল-মাত্র কোসিগিন এসেছিলেন, ব্রেজনেভ আসেন নি। এ যেন দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর সৌজন্যমূলক কূটনৈতিক সাক্ষাৎ। ব্রেজনেভ নভেম্বর বিপ্লব-বার্ষিকীর বক্তৃতায় শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির প্রশংসা করেছেন এবং চীনের পক্ষে বিষবৎ আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সম্মেলন আহ্বানের সিদ্ধান্তের কথা পুনর্বার ঘোষণা করেছেন। অপর দিকে চৌ-এন-লাই-ও ব্রেজনেভের এই বক্তৃতায় উল্লাস প্রকাশ না করে একাকী চুপ-চাপ বসে থেকেছেন। রুশ নেতৃবৃন্দের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে চৌ-এন-লাই স্ট্যালিনের সমাধিতে সম্মান প্রদর্শনের জন্য গিয়েছেন।

মীমাংসায় আগ্রহ আছে, কিন্তু নিজের মত ছেড়ে নয়, উভয় পক্ষেরই এই মনোভাব। এ অবস্থায় মীমাংসা হওয়া শক্ত। তবু চেষ্টা চলছে।

বলিভিয়া ঃ

ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে সামরিক অভ্যুত্থান নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। গত তিন বৎসরে এই মহাদেশের ২০টি দেশের মধ্যে ১৩টিতে সামরিক অভ্যুত্থান

● কুচকাওয়াজ পরিদর্শনরত চৌ-এন লাই, মিকোয়ান, গোমুলকা, ব্রেজনেভ, ম্যালিনভস্কী, কোসিগিন, উলব্রিখট ও ঝিকভ্‌।

অনুষ্ঠিত হয়েছে। সর্বশেষ অভ্যুত্থান হয়েছে বলিভিয়ায়।

সৈন্যবাহিনীর চাপে বলিভিয়ার রাষ্ট্রপতি ভিক্টর প্যাজ এসটেনসেরো শাসনক্ষমতা ত্যাগ করে স্বেচ্ছা-নির্বাসনে গিয়েছেন। প্যাজ তাঁর সুন্দরী তরুণী স্ত্রী মারিয়া তেরেসা ও ৪টি সন্তানকে নিয়ে রাজধানী লা প্লাজার এল আল্টো বিমান বন্দর থেকে পেরুর লিমার দিকে যাত্রা করেছেন। প্যাজের জায়গায় উপ-রাষ্ট্রপতি জেনারেল রেনি ব্যারিয়েন-টোস ওরটুনো বলিভিয়ার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

বলিভিয়ার শাসনক্ষমতা থেকে প্যাজের অপসারণে অনেকেই বিস্মিত হয়েছেন। কারণ, ১৯৫২ সালের বলিভিয়া বিপ্লবের নায়ক প্যাজ অত্যন্ত জনপ্রিয় নেতা রূপে পরিচিত। টিন মালিকদের স্বৈরশাসনের অবসান ঘটিয়ে প্যাজ দেশে গণতন্ত্রের পত্তন করেন এবং জনসাধারণকে দাসত্বের হাত থেকে বাঁচান। প্যাজের জাতীয় বিপ্লবী দলের (এম এন আর) নেতৃত্বে বলিভিয়া সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হয়। প্যাজ দেশে কর-সংস্কার করেন, উদ্বৃত্ত ভূমি সংগ্রহ করে ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করেন এবং ব্যাপকভাবে রাস্তাঘাট ও হাসপাতাল নির্মাণ করেন। অনুর্বর উপত্যকা অঞ্চলের ৫০ লক্ষ অধিবাসীকে উর্বর সম্ভাবনাপূর্ণ এলাকায় পুনর্বাসনের এক পরিকল্পনাও সম্প্রতি তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তবু প্যাজকে যেতে হল কেন?

ভিক্টর প্যাজ এসটেনসেরোকে বিদায় নিতে হল, কারণ তিনি নিজে ডিক্টেটর হবার চেষ্টা করেছিলেন। যে প্যাজ ১৯৫২ সালে এক-নায়কতন্ত্রী শাসন অবসানের সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন, সেই প্যাজই ১৯৬৪ সালে নিজে একনায়ক হবার স্বপ্ন দেখেছিলেন।

বলিভিয়ার সংবিধান অনুসারে কোন একজনের পক্ষে তৃতীয়বার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু প্যাজ সংবিধান সংশোধন করে নিজে পুনরায় রাষ্ট্রপতি হবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর প্রভাবে সংবিধান সংশোধিত হয়েছে এবং গত মে মাসের সাধারণ নির্বাচনে তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন। কিন্তু এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁর নিজের দল 'এম এন আর'-এর মধ্যে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। দলের বহু বিশিষ্ট সদস্য নির্বাচনে

• ব্যারিয়েনটোস

ভোট দেন নি। টিন শ্রমিক ও ছাত্ররাও বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হয়েছে। সেনাবাহিনীর অধিনায়করাও প্যাজের পুনর্নির্বাচন পছন্দ করেন নি। তাঁদের চাপেই শেষ পর্যন্ত উপ-রাষ্ট্রপতি পদে প্যাজের নিজস্ব ব্যক্তির বদলে সৈন্যবাহিনীর মনোনীত ব্যারিয়েনটোসকে নিতে হয়েছে।

যে মাসে রাষ্ট্রপতি পদে পুনর্নির্বাচিত হবার পর থেকেই প্যাজ নিজের ক্ষমতাকে সংহত করার জন্য বিরুদ্ধমতাবলম্বী সকলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সুরু করলেন। সংবাদপত্রের ওপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হল এবং বহু রাজনৈতিক নেতাকে দেশ-ত্যাগে বাধ্য করা হল। সর্বশেষে সুরু হল উপরাষ্ট্রপতি ব্যারিয়েন-টোসের সঙ্গে বিরোধ।

এককালের গণতন্ত্রী ও বিপ্লবী প্যাজের এই স্বৈরতন্ত্রী রূপায়ণে ক্ষুব্ধ দেশবাসীর ক্ষোভ শীঘ্রই প্রকাশ পেল। দেশের বিভিন্ন স্থানে শ্রমিক ও ছাত্ররা সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সুরু করে। সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে প্যাজ এই বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সৈন্যবাহিনীরও ব্যাপক অংশ তাঁর বিরুদ্ধে চলে যায়। কোচাবাম্বা শহর থেকে উপরাষ্ট্রপতি ব্যারি-য়েনটোস প্যাজকে অবিলম্বে ক্ষমতা ত্যাগ করার নির্দেশ দেন। উপা-য়ান্তর না দেখে প্যাজ জেনারেল আলফ্রেড ওভেণ্ডো ক্যাণ্ডিয়ার হাতে ক্ষমতা সমর্পণ করে দেশত্যাগ করেন। ওভেণ্ডো নিজেকে ও ব্যারিয়েন-টোসকে বলিভিয়ার যুক্ত-রাষ্ট্রপতি রূপে ঘোষণা করেন। কিন্তু ব্যারি-য়েনটোস কোচাবাম্বা থেকে লা প্লাজায় আসার পরই ঠিক হয়, ব্যারিয়েনটোস একাই রাষ্ট্রপতি থাকবেন।

বলিভিয়ার এই অভ্যুত্থানে এ কথাই প্রমাণ হয়, জনপ্রিয় ও জন-দরদী শাসকও যখন একনায়ক হবার চেষ্টা করেন, জনসাধারণ তাঁর একনায়কত্বকে পছন্দ করে না। বলিভিয়ার বামপন্থী শ্রমিক ও ছাত্র-সমাজ প্যাজের একনায়কত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে এই বিদ্রোহকে সফল করতে হল। দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও পুনর্নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি

দিলেও, শেষ পর্যন্ত ব্যারিয়েনটোসও একনায়ক হবার চেষ্টা করবেন না তো?

বলিভিয়ার অভ্যুত্থানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খুব চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই। বামপন্থী টিন শ্রমিক-নেতা জুয়ান লোচন এই অভ্যুত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করলেও, নতুন রাষ্ট্রপতি ব্যারিয়েনটোস কমিউনিস্ট বিরোধী ও মার্কিন অনুগামী।

দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ঃ

দক্ষিণ ভিয়েৎনাম নিয়ে পশ্চিমীরা, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মহাসমস্যায় পড়েছে। এ-সমস্যার যেন আর শেষ নেই। কমিউনিস্ট ভিয়েৎ কং বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ এবং দেশে উপযুক্ত শাসন প্রতিষ্ঠা, দুই দিকেই ক্রমাগত ব্যর্থতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

বিয়েন হোয়ার ঘটনা মার্কিন-সমর্থিত দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সামরিক শক্তির ওপর এক প্রচণ্ড আঘাত, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। গত ১লা নভেম্বর রাত্রে ভিয়েৎ কং গেরিলা বাহিনী অতর্কিতভাবে বিয়েন হোয়া ঘাঁটির ওপর আক্রমণ চালিয়ে এই শক্তিশালী যুদ্ধ ঘাঁটিটিকে তছনছ করে দিয়ে গেছে। এই আক্রমণের ফলে ৬টি বি-৫৭ বোমারু বিমান সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে এবং আরও ৮টি বিমান গুরুতর-ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মোট এক কোটি ডলার মূল্যের অস্ত্র-শস্ত্র ও অন্যান্য সামরিক যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়েছে। এ ছাড়া ৪ জন মার্কিন সৈন্য নিহত হয়েছে, ১৭জন এখনও হাসপাতালে, এবং ৫৪ জন অল্প-বিস্তর আহত।

ভিয়েৎ কং গেরিলা বাহিনীর এই আক্রমণ ও দক্ষিণ ভিয়েৎ-নামের বিপর্যয় ক্ষতির পরিমাণের দিক থেকে তো বটেই, যুদ্ধ কৌশলের ব্যর্থতার দিক থেকেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে রীতিমত মর্যাদাহানিকর।

রাজধানী সায়গন শহরের মাত্র ১৫ মাইলের মধ্যে এইরূপ একটি ঘাঁটি যদি ভিয়েৎ কং এইভাবে বিপর্যস্ত করতে পারে, তবে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠার আর ক'দিন বাকি? ম্যাক্সওয়েল টেলরের মত ধুরন্ধর সেনানায়ক দক্ষিণ ভিয়েৎনামে মার্কিন রাষ্ট্রদূত থাকা সত্ত্বেও বিয়েন হোয়া ঘাঁটিতে এরূপ বিপর্যয় সম্ভব হল কি করে? ঘটনার বিবরণে জানা যায়, এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি প্রায়-অরক্ষিত

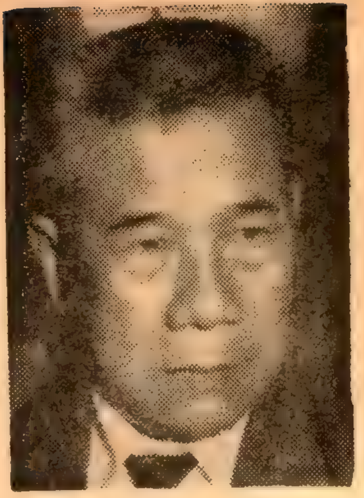

● ত্রান ভান হুয়াং

ছিল। তা ছাড়া, এখানকার অধিকাংশ সৈন্য নগো দিন দিয়েম শাসন অবসানের প্রথম-বার্ষিকী অনুষ্ঠানের প্যারেডে যোগ দেবার জন্য পূর্বদিন সায়গন চলে গিয়েছিল।

দক্ষিণ ভিয়েৎনামে একের পর এক প্রধানমন্ত্রী পরিবর্তন হচ্ছে। এবার প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন প্রাক্তন স্কুল-শিক্ষক ত্রান ভান হুয়াং। ১৫ জনকে নিয়ে তিনি মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করেছেন। এঁদের অধিকাংশই কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নন। হুয়াং ধর্মীয় প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে শাসন পরিচালনার চেষ্টা করায়, বৌদ্ধ ও ক্যাথলিক

● ভিয়েৎ কংদের আক্রমণে দঃ ভিয়েৎনামের বিয়েন হোয়া বিমান ঘাঁটিতে বিধ্বস্ত বিমানগুলির ধ্বংসস্তূপ অপসারণ করতে দেখা যাচ্ছে।

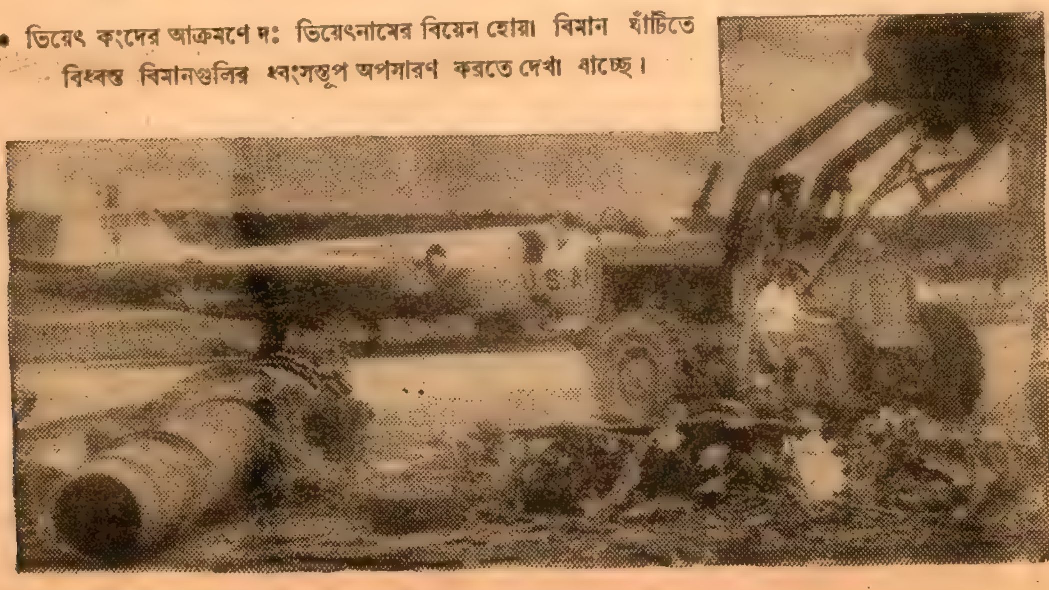

উভয় সম্প্রদায়ের নেতারাই তাঁর ওপর চটে গেছেন। ছাত্ররা হুমকী দিয়েছে, তারা আবার বিক্ষোভের পথ গ্রহণ করবে। এ অবস্থায় হুয়াং-এর একমাত্র ভরসা সৈন্য-বাহিনী ও তাদের প্রধান প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নেগুইন খান।

পশ্চিম জার্মানী ঃ

পশ্চিম জার্মানীতে আবার কনার্ড আদেনুয়ার ও লুডউইগ এরহার্ডের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব সুরু হয়েছে। গত বৎসর ৮৮ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ আদেনুয়ার যখন দলের চাপে পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলার (প্রধানমন্ত্রী) পদ ত্যাগ করতে বাধ্য হন, তখনই তিনি ঘোষণা করেছিলেন, প্রয়োজন হলে আবার তিনি শক্তিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হবেন।

সম্প্রতি তিনি খোলাখুলি বর্তমান চ্যান্সেলার এরহার্ডের বিরুদ্ধে আক্রমণ সুরু করেছেন। বহুল প্রচারিত রবিবাসরীয় পত্রিকা 'বিল্ড আম সোনটাগের' প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে আদেনুয়ার ফ্রান্সের সঙ্গে পশ্চিম জার্মানীর সম্পর্কের অবনতির জন্য এরহার্ড ও পররাষ্ট্র-মন্ত্রী

• ভারতীয় সংসদীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে লুবকে (দক্ষিণে)

গেরহার্ড স্রোয়েডারের তীব্র সমালোচনা করেন।

আদেনুয়ার ও এরহার্ড উভয়েই ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টির নেতা। দলের সভায় এই বিষয়ে আলোচনা হয়, একটা মীমাংসাও হয় এবং আদেনুয়ার এরহার্ড সরকারকে পূর্ণভাবে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেন।

কিন্তু এই প্রতিশ্রুতির মূল্য কতটুকু? আদেনুয়ার এরহার্ডের এই বিবাদ নিছক ব্যক্তিগত নয়। এই বিবাদ—নীতিগত। পশ্চিম জার্মানীর গ্যলপন্থী ও গ্যলবিরোধীদের দ্বন্দ্বেরই বহিঃপ্রকাশ এটা। আদেনুয়ার দ্য গলের সঙ্গে চলতে চান। ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, এবং বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব থেকে মুক্ত স্বতন্ত্র ইউরোপের নীতিতে তিনি বিশ্বাসী। কিন্তু অপরদিকে এরহার্ডরা দ্য গলের প্রভাব বৃদ্ধির বিরোধী। ফ্র্যান্স ও পশ্চিম জার্মানীর ঘনিষ্ঠতার অর্থ এঁদের কাছে পশ্চিম জার্মানীর রাজনীতিতে দ্য গলের কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা।

বর্তমানে আদেনুয়ার প্যারিস সফরে গিয়েছেন। সেখানে তিনি দ্য গলের সঙ্গে পরামর্শ করবেন। ফ্রান্সের 'আক্যাডেমী অব্ এথিক্যাল এ্যাণ্ড পলিটিক্যাল সায়েন্সেস' তাঁকে সম্মানিত সদস্যের পদ প্রদান করবেন।

• আদেনুয়ার

• এরহার্ড

পশ্চিম জার্মানীর পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষের সভাপতি ডঃ ই, গাস্টেন-মাইয়ারের আমন্ত্রণে ভারতীয় লোকসভার সাত জন সদস্যবিশিষ্ট এক সংসদীয় প্রতিনিধি দল পশ্চিম জার্মানী পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। দলের নেতৃত্ব করেন লোকসভার অধ্যক্ষ সর্দার হুকুম সিং।

বারো দিনব্যাপী এই পরিক্রমায় তাঁরা পশ্চিম জার্মানীর বর্তমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের পরিচয় লাভ করেন।

এই উপলক্ষে তাঁরা বন্, ইসেন, ডুসেলডর্ফ, হামবুর্গ, মিউনিক, স্টাটগার্ট, বার্লিন প্রভৃতি বিভিন্ন শহর পরিদর্শন করেন।

প্রতিনিধি দল যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রেসিডেণ্ট ডঃ হাইনারিখ্ লুবকে, চ্যান্সেলর ডঃ লুডউইগ্ এরহার্ড। বিভিন্ন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী এবং পশ্চিম জার্মানীর পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের বহু সদস্য।

প্রতিনিধি দল পঃ জার্মানী পার্লামেণ্টের এবং বিভিন্ন রাজ্যের আইন-সভার কার্যধারা পর্যবেক্ষণ করেন। এছাড়া প্রতিনিধি দল বিভিন্ন শিল্পোদ্যোগ পরিদর্শন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

পূর্ব পাকিস্তান ঃ

পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচনেও সর্বত্র সম্মিলিত বিরোধী ফ্রন্টের জয়ের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। যদিও নির্বাচনের পর আয়ুব-পক্ষ ও বিরোধীদল উভয়েই সাফল্যের দাবি করছে, তবু বোঝা যাচ্ছে, বিরোধী পক্ষের দিকেই পাল্লা ভারী।

১০ই নভেম্বর থেকে পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচন সুরু হয়েছে, ১৯শে তারিখে এই নির্বাচন শেষ হবে। ইতিমধ্যে নির্বাচনের যে সব ফল বেরিয়েছে, তাতে আয়ুবের দল কনভেনশনপন্থী মুসলীম লীগের বাঘা-বাঘা নেতারা পরাজিত হয়েছেন। পাকিস্তান ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলীর বর্তমান সদস্য আমজাদ খাঁ, কনভেনশনপন্থী মুসলীম লীগ দলের প্রাদেশিক কমিটীর কোষাধ্যক্ষ সৈয়দ মহসীন আলি, ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলীর বর্তমান সদস্য ও কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী ওয়াহিদজ্জামানের ভাই ফৈকুজ্জামান এবং প্রাদেশিক যোগাযোগমন্ত্রী খাজা হাসান আসকারির ভাই খাজা মহম্মদ তোফাইন নির্বাচনে বিরোধী পক্ষের প্রার্থীদের কাছে পরাজিত হয়েছেন।

সম্মিলিত বিরোধী ফ্রণ্টের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, এ পর্যন্ত যে সব ফল প্রকাশিত হয়েছে, তার শতকরা ৬৮ ভাগ বিরোধীদের পক্ষে গিয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানেও আয়ুবের পক্ষে নির্বাচনের ফল যায় নি। এর পর পূর্ব পাকিস্তানের ফল এরূপ হলে আয়ুবের গতি কি হবে?

নির্বাচনে পরাজয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে সরকারী মুসলীম লীগ দল সর্বত্র দাঙ্গা-হাঙ্গামার পথ বেছে নিয়েছে। ইতিপূর্বে পশ্চিম পাকিস্তানে নির্বাচনী হাঙ্গামায় ৩০জন নিহত হবার সংবাদ পাওয়া গেছে। পূর্ব পাকিস্তানেও ইতিমধ্যে ৩জন মারা গেছে এবং বহু সংখ্যক ব্যক্তি আহত হয়েছে। কুষ্টিয়া, খুলনা মীরপুর প্রভৃতি স্থান থেকে সংঘর্ষের নানা খবর পাওয়া গেছে। আয়ুব ঘোষণা করেছেন, মিস ফতেমা জিন্না নির্বাচনে জয়লাভ করবে পাকিস্তানে আর একটি বিপ্লব হবে। এই নির্বাচনী দাঙ্গাহাঙ্গামা কি সেই 'বিপ্লবের' পূর্বাভাষ। লাঠি-গুলীর জোরে কি জনমতকে ঠেকিয়ে রাখা যায়?

• আয়ুব খাঁ

• ফতেমা জিন্না

বঙ্গসাহিত্যের সম্রাট—মনস্তত্ব বিশ্লেষণে শারদ-জ্যোৎস্না—চরিত্র-সৃষ্টির ইন্দ্রধনু—অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধ খর

চার্লস ডিকেন্সের

ডিকেন্স গ্রন্থাবলী

অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাশিল্পী—সর্বরসের অনন্ত নির্ঝর—বিশ্বসাহিত্যগৌরব ঔপন্যাসিকের পরিচয় প্রদান অসম্ভব।

২য় ভাগ—নিকোলাস নিকলবি ঃ বারনাবি রজ, চরিত্র-চিত্র। সাহিত্য জগতের এই পুণ্যপ্রভা মাত্র ১।০ টাকা

রোমাঞ্চ উপন্যাসের যাদুকর

৺দীনেন্দ্রকুমার রায়ের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—৫খানি সুবৃহৎ ডিটেকটিভ উপন্যাস। মূল্য ৩।।০ টাকা

২য় ভাগে—৫খানি রহস্য উপন্যাস। মূল্য ৩।০

বসুমতী প্রাইভেট লিঃ

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট

কলিকাতা-১২

কৃষ্ণচূড়া

ধারাবাহিক উপন্যাস

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ একত্রিশ ॥

তিনমাস পরে অরবিন্দের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এল কিরণ। সঙ্গে সঙ্গে এল অরবিন্দ।

ফুটপাথে নেমে অপরাধীর মতো অরবিন্দ বললে, তুমি কি আমায় ভুল বুঝলে সাহিত্যিক ?

কিরণ শীর্ণভাবে হাসল : না, দাদা।

বাস-স্ট্যাণ্ডের পাশে একটা গাছের নীচে এসে দুজনে দাঁড়ালো।

সারাটা দিনের দারুণ গুমোটের পর দক্ষিণের হাওয়া। ক্লান্ত অবসন্ন কলকাতার জ্বলন্ত শরীরে এখন বঙ্গোপসাগরের স্নিগ্ধ দাক্ষিণ্য। গাছের পাতায় পাতায় খুশির কলতরঙ্গ। ছায়া-আলোর ঝিলিমিলি দুলতে লাগল দুজনের ওপর।

অরবিন্দ সিগারেট ধরালো একটা। কাশল্ বারকয়েক।

—তুমি তো দেখতেই পাচ্ছ আমরা ওকে বোঝাতে ত্রুটি করি নি।

—জানি।

—মেয়েদের মন ঠিক—অরবিন্দ একটু থামল : ঠিক বুঝে ওঠা যায় না। র‍্যাদার আন্ফ্যাদমেবল। তা ছাড়া ছেলেবেলা থেকেই আমার এই বোন প্রব্লেম চাইল্ড—ওর মেজাজের কূল-কিনারা কখনো পাওয়া যেত না। একটু বড়ো হলে অনেকটা শুধরে নিয়েছিল, মনে হয়েছিল, ভালো হয়ে গেছে। বাট দেয়ার ওয়াজ দ্য সীড—

—আজ আর এ-সব কথা আলোচনা করার কোনো মানে হয় না, অরবিন্দদা।

—মানে হয়। ইউ হ্যাভ বীন চীটেড। আমরাই তোমাকে সুখী হতে দিই নি।

কিরণ বললে, উল্টো দিক থেকেই দেখা ভালো, অরবিন্দদা। আমার মেসে-মেসেই চিরটা কাল কেটেছে—নিজের মতো করে একা থাকার একটা অভ্যাসও হয়ে গেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য প্রতিমারই। আমিই ওকে সুখী করতে পারলুম না। অপরাধ আমার ভেতরেই ছিল, তাই ও আমাকে সহ্য করতে পারল না।

অরবিন্দ কী বলতে যাচ্ছিল, বাস এসে পড়ল।

—আজ তা হলে চলি দাদা।

—এসো। কিন্তু খবর নিও মাঝে মাঝে, একেবারে ভুলে যেয়ো না।

—না—না।

বাসের দোতলায় উঠে পড়ল কিরণ। একেবারে সামনের দিকেই বসবার জায়গা পাওয়া গেল।

কলকাতার পথঘাট স্রোতের মত বয়ে যাচ্ছে দু'পাশ দিয়ে। একটা রাত্রির স্টিমারের মতো মনে হয়। পাকিস্তান হওয়ার আগে একবার ঢাকায় গিয়েছিল কিরণ—তারই স্মৃতি ভেসে উঠল। দু' ধারে গাছপালা, তীর, গ্রাম, মাঠের ছবি, থেকে থেকে জেগে উঠছে সার্চ-লাইটের আলোয়। দক্ষিণের হাওয়া এসে কিরণের চোখেমুখে আছড়ে পড়তে লাগল। এই কলকাতা যদি আজ রাত্রে পদ্মা হয়ে যেত।

সমুদ্র দূরে। পদ্মা আরো দূরে।

সেই পাহাড়ি নদীটির কাছে কি যাওয়া চলে আর ? বিকেলের সোনা মুছে গিয়ে লালের রঙ পড়ল, লাল নিবে গিয়ে কাকের বুকের পালকের মতো সন্ধ্যা নামল। ওপারের বন ক্রমশ

আবছা হয়ে আসছে। সেই লোকগুলো —যারা হাঁটুজল ভেঙে ওপারে কোন-দিকে চলে গেল, এখনো মাদলের শব্দ শোনা যাচ্ছে তাদের। এপারে একটি মেয়ের কি ক্যাকটাস খোঁজা এখনো শেষ হল না?

—টিকেট?

সেই নির্ভেজাল কণ্ডাক্টার। পয়সা বের করে দিয়ে অভ্যস্ত জবাব: কলেজ স্ট্রীট।

যে ক্যাকটাস খুঁজছে—সে খুঁজুক। কিরণ তাকে সন্ধ্যার আভায় একটুখানি দেখেছিল। চিনতে পারে নি; কৃষ্ণচূড়ার রঙ সকালের রোদে তার ছবি দেখিয়েছিল, তাকে দেখতে দেয়-নি। সেই ছবি তার প্রচ্ছদপট, সে নয়; সেই সন্ধ্যা তার আভাস—সে নয়। তার সম্পূর্ণ পরিচয় নিয়ে যে অন্ধকারে সে মিলিয়ে গেল, সেখান থেকে সে আর কোনোদিন ফিরে আসবে না।

একবার শুধু ভাগ্যের কৃপণ মুঠোটা—ভাগ্য? ওকথা কিরণ স্বীকার করে না। তবুও ভাগ্য ছাড়া কী আর? কৃষ্ণচূড়া থেকে অনেক দূরে সে তার মুঠিটা খুলে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু খুলল না। ভালোই হল। কাছে পেলেও কি শর্মিলাকে সে দেখতে পেত? যা ছবি—যা ছায়া, মন কখনো কখনো তাকে নিজের মতো করে গড়ে নিতে পারে। কিন্তু কাছে থেকেও যে অজানা থেকে যায়, তাকে না বোঝবার দুঃখের শেষ কোথায়?

এই-ই ভালো। সব ভালো।

জীবনটা স্রোতের মতো চলছিল—চলে যাবে। তার একটা বাঁকে কৃষ্ণচূড়া ফুটেছিল, ফুটুক; একটি বাঁধা ঘাটে সমস্ত রাত চাঁপার গন্ধ উঠেছিল, উঠুক। আর স্রোত এগিয়ে যাক সেই সমুদ্রের দিকে—যার কথা এখনো কেউ জানে না।

প্রতিমাও আর আসবে না।

চেতন-অচেতনের গোধূলিতে সে বার বার হাত চেপে রাখতো কিরণের: 'যেতে দেব না,—কিছুতেই তোমায় যেতে দেব না। তুমি আমায় ছেড়ে গেলে আর এক মুহূর্তও বাঁচব না আমি।' তারপরে যখন প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এল, তখন—

তখন প্রতিমার মন আবার সেই বিরূপতার দিকে বয়ে চলল। কিরণকে সে আর সহ্য করতে পারে না।

অনেক বুঝিয়েছেন অরবিন্দের স্ত্রী। অরবিন্দও চেষ্টার ত্রুটি করে নি।

'না—আর আমি ওখানে ফিরে যাব না।'

'কেন?'

'আমার ভয় করে।'

'কিসের ভয়?'

চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থেকেছে প্রতিমা। বলেছে, 'আমি জানি না।'

'কিন্তু কিরণের যে কষ্ট হচ্ছে—'

'তা আমি কী করব?'

'ওর জন্যে তোর কি কোনো—'

'না—ওর জন্যে আমার কিছু মনে হয় না।'

'তুই বাকি জীবনটা এ-ভাবেই কাটাবি?'

'কেন তোমাদের অসুবিধে হচ্ছে?'—প্রতিমার চোখ দুটো জ্বলে উঠেছে একবার: 'আমাকে দুমুঠো খেতে দিতে বুঝি তোমাদের খুব কষ্ট হচ্ছে দাদা? তা হলে আমায় তাড়িয়ে দাও, আমি যেদিকে খুশি চলে যাব, দরকার হলে পথে পথে ভিক্ষে করে খাব।'

এর ওপর কোনো কথা চলে না। স্বাভাবিক হয়েও যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নয়, যার মনের সামনে এখনো সারি সারি ছায়ামূর্তির আনাগোনা, তাকে বেশি বিরক্ত করতে ভয় করে। সেই অচেতন জগতের সীমারেখাটা থেকে প্রতিমা এখনো বেশিদূরে এগিয়ে আসে নি। যে-কোন মুহূর্তে সে সেটা আবার পার হয়ে চলে যেতে পারে, পৌঁছে যেতে পারে তার সেই অন্ধকারের নিঃসঙ্গতায়।

অরবিন্দের স্ত্রী বলেছেন, 'কিরণের সঙ্গে একটু কথা বলবি নে?'

'কোনো দরকার নেই।'

'এসে বসে আছে যে বেচারী।'

'থাকুক।'

'একবারটি বরং ডেকে দিই না তাকে? তারও তো কিছু বলবার থাকতে পারে?'

'আমার শোনবার কিছু নেই।'

'তবু—'

'ও যদি এঘরে আসে তা হলে আমি রাস্তায় বেরিয়ে চলে যাব। নইলে দোতলা থেকে লাফিয়ে পড়ব নীচে।'

নিষ্ঠুরতম ঘৃণা কালো গ্রানিটের মতো স্থির হয়ে আছে। কিরণের জন্যে এতটুকু রন্ধ্র পর্যন্ত কোথাও নেই।

অরবিন্দ বলেছে, 'আমি তো তোমাকে আগেই বলেছিলুম, গেট এ ডিভোর্স। এখন স্বচ্ছন্দে তুমি ওটা করে নিতে পারো। প্রতিমাও হয়তো আপত্তি করবে না। তোমার দিক থেকে সিমপ্যাথির কোনো কারণ নেই—দেখাই যাচ্ছে ম্যাল-আডজাস্টমেণ্ট।'

কিরণ জবাব দেয় নি।

অরবিন্দ আবার বলেছে, এখন ও নর্ম্যাল হয়ে গেছে।—'

নর্ম্যাল? কিরণ হেসেছে একটু-খানি। না—প্রতিমা স্বাভাবিক হয় নি। অথচ ওকে স্বাভাবিক বলে যে মনে হয়, সেইটেই এর সব চাইতে নিষ্ঠুর ট্র্যাজেডি।

কিরণ বলেছে, 'না, ডিভোর্সের এখন দরকার নেই।'

'কী করতে চাও তা হলে?'

'অপেক্ষা করব।'

'তুমি আশা করো, প্রতিমা একদিন তোমার কাছে আবার ফিরে যেতে চাইবে?'

'আশা করতে দোষ কী অরবিন্দদা?'

'না, দোষ নেই, কিন্তু—' এই পর্যন্ত বলেই অরবিন্দও চুপ করে গেছে। 'কিন্তু'র উত্তর সে নিজেও আর খুঁজে পায় নি। এখন সব কিছুর জবাব এক প্রতিমাই দিতে পারে। কিন্তু কবে যে দেবে কেউ জানে না।

বাস বৌবাজারে এসেছে। কিরণ যেন এতক্ষণ মাথা নীচু করে ঝিমিয়ে চলেছিল—এইবার সোজা হয়ে উঠে বসল। চোখে পড়ল, পাশের সীট থেকে এক জোড়া চোখ সকৌতুকে তার দিকে চেয়ে আছে। প্রকাশক ভদ্রলোক একজন।

—ঘুম ভাঙল কিরণবাবু?

—ঘুমোই নি।—কিরণ অপ্রতিভভাবে হাসল: ভাবছিলুম।

—ভাবছিলেন—চোখ বুজে? আমি সেই ভবানীপুর থেকে উঠেছি, দেখতেও পান নি।

কিরণ চুপ করে রইল। ভদ্রলোক বললেন, আপনাকে একটা খবর দিই। ভবেশদার সেই উপন্যাসটার কথা আপনার মনে আছে? 'নিঃসঙ্গ সন্ধ্যা' যেটা আমরা ছেপেছিলুম?

—জানি। পড়েছি আমি। ভবেশদা দিয়েছিলেন আমাকে।

—বইটা খারাপ নয়—তবু একবারে চলে নি। কিন্তু একটা সিনেমা কোম্পানী ওটা কিনেছে। তিন হাজার টাকায়।

কিরণের আচ্ছন্ন আড়ষ্ট মনটা [illegible] হয়ে উঠল।

—এতো খুব ভাল খবর।

—ভালো খবর বইকি। টাকাটা আবার পুরো অ্যাডভান্স করে গেছে বৌদিকে। অথচ ভবেশদার লাকটা দেখুন—প্রকাশক দীর্ঘশ্বাস ফেললেন: বেঁচে থেকে কোনোদিন ভালো করে দুটো পয়সার মুখও দেখতে পেলেন না। ছ' মাস আগেও যদি এ টাকাটা পেতেন হয়তো এ যাত্রা কষ্টে দুঃখে বিনা চিকিৎসায় এমন করে মারা যেতেন না।

তা হলে বিশুদ্ধ সাহিত্যের চর্চা করেও ভবেশদার কিছু আর্থিক স্বীকৃতি শেষ পর্যন্ত এল। কিন্তু বড্ড দেরিতে। তারপরেই কিরণের মনে হল, তাই কি? বেঁচে থাকলে কি গল্পটা বিক্রি হত? ভবেশদা হয়তো গোড়াতেই চটাচটি বাধিয়ে দিতেন, বলে বসতেন, সিনেমার নাম করে আমার গল্প নিয়ে যা খুশি করবেন, তা চলবে না। আমি যে-ভাবে লিখেছি, সেই ভাবেই ছবি করতে হবে, একটা অক্ষরও ও থেকে বদলাতে পারবেন না।

হয়তো ভবেশদা না থেকেই ভালো হয়েছে। এই দুঃসময়ে বৌদির হাতে কিছু টাকা এল। জীবনে কে কতটা অপরিহার্য? মানুষ নিজের কাছেই নিজে মূল্যবান, তার থাকা-না-থাকার লাভ-ক্ষতি বিচার করবার মালিক অন্তত সে নয়। ভবেশদার মৃত্যুতে পরিবারটা পথে বসবে বলে মনে হয়েছিল, অথচ দেখা যাচ্ছে সেই মৃত্যুটাই পরিবারের কাছে আশীর্বাদ হয়ে এল। সিনেমায় যদি বইটা উতরে যায়, তাহলে হয়তো আরো দু-একটা উপন্যাস ভবেশদার বিক্রি হয়ে যাবে। অথচ, ভবেশদা বেঁচে থাকলে তাঁর সিনিক রূঢ়তার সামনে কেউ হয়তো এগোতেই চাইত না।

প্রকাশক বললেন, আমাদেরও লাভ হল। ছবি হলেই বইয়ের কাটতি বাড়ে—কী বলেন?

—বাড়ে বইকি।

কিরণ উঠে দাঁড়ালো: চলি, নামতে হবে এবার। নমস্কার।

—নমস্কার-নমস্কার। সময় পেলে আসবেন আমাদের ওদিকে। একটা-আধটা বই যদি আমাদের—

—দেখব।

ঘরের দরজা খুলে দুখানা খাম পেলো কিরণ।

একখানা হিরণ্ময়ের। সাংসারিক খবরাখবর। 'বৌমা এখন কেমন আছেন? তাঁহাকে বাড়িতে আনা যাইবে না? আমি ও তোমার বৌদি তাহাকে দু-তিনখানা চিঠি দিয়াছি, জবাব পাই নাই।' চিঠির শেষে: 'সস্তায় কিছু ধানীজমি কিনিবার সুযোগ পাইয়াছি। যদি হাজার দুই টাকার ব্যবস্থা করিতে পারো—'

আর একখানা খামে ছোট একটি ফুলের রঙিন স্কেচ। তার নীচে লেখা: 'আজ আমার জন্মদিন। আপনাকে প্রণাম পাঠালুম। কৃষ্ণা।'

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

কিষাণ
লণ্ঠন
সর্বোৎকৃষ্ট
গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
ফোন-২২-৬৫৮০
২৬৩, ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১

আঁধার মানিক

ধারাবাহিক উপন্যাস

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

আনন্দীরামের সুখ-শান্তি অকূল পাথারে ভাসিয়ে নরপতি সভা ছেড়ে গেল। মানী লোকের কাছে মানটুকু সব। মানের চূড়ো খসলে তাদের সব যায়। আনন্দীরামের মাথায় যেন আকাশ ভাঙল।

এ-গ্রামের লোক শান্তির সময় হলে এ-কথা থেকে কত কথা রটাত। চড়কে, এগারো দোলে তারা বাদিয়ার খেলা দেখে। লেংটি পরা বাদিয়া মাথায় ময়লা পগ বাঁধে, 'যা দেখেন তা আশ্চর্য হতে আশ্চর্য, আমার শিক্ষা জিনপরীর কাছে ইত্যাদি বাগবিস্তার করে দর্শকের কাছ থেকে কড়ি চেয়ে নিয়ে জাদু-গুণে সে কড়িকে দশ-কড়ি করে। ক্রমে দশ-কড়ি থেকে একশো কড়ি হয়। তাদের বিদ্যের গুণ, তাদের হাত চালাবার ক্ষমতা।

এ-গ্রামে সবাই বাদিয়ার মন্ত্র জানে। তারা একটি কথাকে দশটি করে, দশটি কথা ক্রমে সহস্র হয়, ঘরে ধান থাকে, স্নান খাওয়া ছাড়া কাজ নেই, পরের কথা বলতে সবাই বড় ভালবাসেন। মুখরোচক কোন খবর পেলে আনন্দীরামের মামা তৎক্ষণাৎ গান বেঁধে ফেলেন। তাঁর গান পাড়ার উড়নচণ্ডে ছেলেছোকরা, গোপ-পাড়ার সুরসিকা পাখি গয়লানী আগ্রহভরে শুনে থাকে।

কিন্তু এ ত' শান্তির সময় নয়। সবে দেশে দস্যু হানা দিয়ে গেছে, তাদের সঙ্গে সমুদ্রের ঢেউ-এর মত অগণিত লোক আছে, আবার যদি আসে!

তাই সকলের হয়ে কাশীর বাবা বাচস্পতি বললেন 'গেছে কি না গেছে, তা গিয়ে দেখ না। মেয়ে থাকেই যদি, তাতে বা কি দোষ। সুরকণ্ঠ ক্ষ্যাপা মহেশ্বর, সবাই জানে।'

'আত্মীয়-ও বটে।'

'এমন আত্মীয়তা না রাখাই ভাল। সুরকণ্ঠ আধামানুষ, আধাসন্ন্যেসী।'

'পিসী দেহ রাখলেন, তা সীমানায় পোড়ালে, ডাকলে না কাউকে।'

'তখন ডাকলে বা যেত কে?'

'আনন্দী।' বাচস্পতি মশায়ের ডাকে আনন্দীরামের চমক ভাঙল। তিনি চারদিকে চান। দৃষ্টি বিভ্রান্ত।

'চল, যাবে?'

'হ্যাঁ, চলুন।' আনন্দীরামের মাথায় কত না চিন্তা ঘুরপাক খায়। সুরকণ্ঠের ঘরে বড়বউ। ঐ ঘরে জগৎপতি আচার্যের মেয়ের সঙ্গে সুরকণ্ঠের বিয়ের ঠিক হয়েছিল, হতে হতে ফেঁচে যায়।

'কাশী, তুই আমার সঙ্গে চল।' আনন্দীরাম ধীরে বলেন। তাঁর বিয়ে জগৎপতি নিজে সেধে দেন, কিন্তু সেই সময় থেকেই বা সুরকণ্ঠ গেরুয়া ধরলেন কেন?

'বৃথা চিন্তা করেন কেন?'

কাশীশ্বরের প্রশ্নে আনন্দীরাম চমকে ওঠেন। তিনি কি চিন্তা করছেন তা কাশীশ্বর কেমন করে জানবে?

'তুই কি জানবি কাশী---'

'শুনুন, মাথা ঠাণ্ডা করুন। এ বড় দুঃসময়। এত বড় বিপদটা মাথার ওপর দিয়ে গেল, তা কেউ চিন্তা করল না বিপদ এখানেই শেষ হল না আবার হবে।'

একথা বলতে আনন্দীরাম সচকিত হন। হ্যাঁ একচক্ষু হরিণের মত একদিকে চেয়ে থাকতে নেই। এমন দুঃসময়, কোন সুদূর দেশ থেকে শত্রু এসে বাংলা ও রাঢ়ের জনপদ ছারখার করে দিচ্ছে। এর মধ্যে ইতিহাসের কোন ইঙ্গিত নিহিত আছে? দেখবার মত চোখ চাই। ভাববার মন দরকার। কিন্তু আনন্দীরামের সে সুকৃতি কোথায়? তাঁর স্থির মন নেই। নিজের স্বার্থ ছাড়া বড় কিছু চিন্তায় আনতে পারেন না, অথচ তিনি শুনেছেন সত্যদ্রষ্টা, দূরদ্রষ্টা মানুষ এখনো, এই কলিযুগেও রাঢ়ে বঙ্গে বিদ্যমান।

'কাশী, আমি বড় সামান্য মানুষ, তুচ্ছাতিতুচ্ছ, আপন আঘাতে কাতর হই।'

'কে না হয়?'

কাশীশ্বর বালক বয়সের তেজস্বিতা নিয়ে কথা বলে, 'কে না হয়? আপনি সংসারী মানুষ, মুনি-ঋষি নন।'

হ্যাঁ কাশীশ্বর, মুনি-ঋষিরা স্থির হয়ে ভাবতে পারেন।'

'তা পারেন। তাঁদের মন গঙ্গাজলে ধোওয়া, ঐ আকাশগঙ্গার মত পরিষ্কার, তাতে সব ঘটনার ছায়া পড়ে।'

'গৃহী মানুষের মন স্বার্থচিন্তায় কালো হয়।'

'কিন্তু, এও সন্ন্যাসীর সমস্যা নয়। এ ত' সমাজে সংসারে ঘোর বিপদ, সন্ন্যাসী এর কি নিদান দেবে?'

'আমি কি করি বল্ ত?'

পথে দাঁড়িয়ে আনন্দীরাম গলার উপবীত মনের যন্ত্রণায় আঙুলে পেঁচান।

'চলুন, ঘরে চলুন, ছোটকর্তামাকে জিগ্যেস করুন।' কাশীর কণ্ঠ ধীর, বিশালাক্ষীর ওপর সে গভীর বিশ্বাস রাখে। বিশালাক্ষীর ধীর স্থির প্রশান্ত দৃঢ়তা দেখে সে মনে মনে কত দুঃখের সময়ে শান্তি পায়। বিশালাক্ষীর যে সন্তান হারিয়ে যায়, ছোটবেলা তাকে কাশীশ্বর বড় ভালবাসত। যে সন্ধ্যায় কানাই হারিয়ে যায়, বালক বয়সের অবিবেচনায় তেমনি আরেক সন্ধ্যায় কাশীশ্বর মুখোটি বাড়ির উঠোনে 'কানাই কানাই, কানাইয়ের সঙ্গে খেলব' বলে কেঁদেছিল।

সে কথা বিশালাক্ষীও ভোলেন নি। তাই কাশীশ্বরের প্রতি তাঁর স্নেহ এখনো। সংযত শান্তভাবে বাস, তার মুখে প্রসাদ দিয়ে তবে তিনি উপবাস ভাঙেন। বিশালাক্ষী স্বভাবে স্নেহ-মমতাময়ী।

'ছোটকর্তামা-কে জিগ্যেস করে তবে যা হয় করুন।' কাশী আবার বলে।

'তাই ভাল।'

আনন্দীরাম যেন আলো দেখতে পান। 'গোপাল!' ছোটর স্নেহভরা ধীর সম্বোধন। সেই বালক বয়স থেকে আনন্দীরামের একমাত্র ভরসাস্থল, 'চল্ কাশী', আনন্দীরাম নতুন উৎসাহে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন।

বিশালাক্ষী সব কথা শুনলেন। আনন্দীরাম বলবার আগেই বাতাসের মুখে খবর এসেছিল। নির্মলার দুঃখ পাতানী পিসীর বুকে শেল হয়ে বিঁধেছিল, কিন্তু এতবড় সংবাদটা মুখোটি বাড়িতে তাঁর আগে আর কেউ বয়ে নিয়ে যাবে এ চিন্তায় তাঁর বুক পুড়ে গেল। দাঁতে মিশি দিয়ে চাদর গায়ে তিনি তৎক্ষণাৎ রওনা হলেন। তাঁদের বাড়িতে সবাই শোকে ও আশঙ্কায় বিষণ্ণ, তিনি বললেন 'বউঠান, আমাদের বিপদ দেখ, এখন সঙ্গের সাথী হয়ে রইল। তা বলে এতবড় খবরটা পেয়ে একবার ওবাড়ি যাব না?'

তাঁর ভাজ সাধারণত ননদের চোপার ভয়ে মুখ খোলেন না, কিন্তু এখন তিনি চিন্তায় চিন্তায় ক্ষিপ্তপ্রায়। মাটিতে পড়ে থাকেন, সর্বদা কাঁদেন। চুল ধুলোয় ধুলোয় জট বেঁধেছে, পরনের কাপড় মলিন। ননদের কথা শুনে তিনি খানিকটা অসংলগ্নভাবে ফিসফিস করে বলতে লাগলেন 'আমাকে শুধোও কেন? আমি কি আর মানুষের মধ্যে আছি? এইজন্যে বলে সতীনপুতকে আপন কর না, বুকে নোড়া ছেঁচে দেবে।'

এ কথা শুনতে বড় খাপছাড়া, পাগলের প্রলাপ। কিন্তু এখন একথা শুনে বাড়ির মেয়েরা ফুকরে কাঁদেন। নির্মলার খুড়ীর মেয়ে ডুকরে কাঁদে ও বলে 'জেঠিমা-গো, এমন করে বলবেন না।'

বড় আচার্যের গিন্নি যেন কারো কথা শুনতে পান না। বলেন 'দিদি

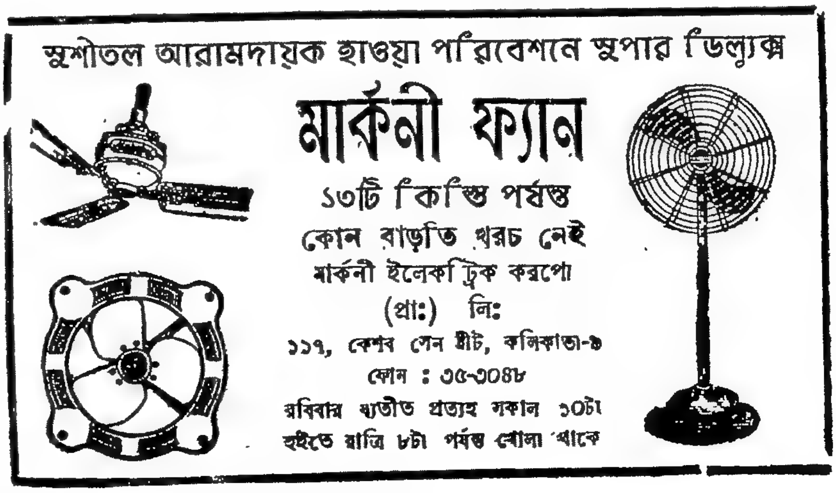

ছজ নিমলিকে রেখে, আমি মাসী হতাম, মা হয়ে এলাম, গৌর হবার আগে ওকে সন্তান বলে জেনেছি, দুরন্ত মেয়ে মা, গৌর হতে হিংসে করে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে দুধ খেত। হা নিমলি, শত্রুতা করবি বলে কি এতদিন ধরে আঁকড়ে ছিলি, আহা দুধের ছেলে যে গো, এখনো মাথায় কাপড় রাখতে শেখে নি, ওকে তোমরা কেমন করে নির্বাসনে পাঠাবে?'

এখন জা, সতীন, ননদঝি, দাসী সবাই কাঁদে। এ রাঢ় দেশে কুলীন-কন্যার চোখে জল শুকোয় না। তাদের দুঃখে বনের পাখি কাঁদে, নদীর জল কাঁদে, বড় আচার্যের গিন্নী হয়ে সেদিন অবধি তাঁর গুমোর ছিলো কত, আজ তাঁর দুঃখে গাছের পাতা শন্‌সন্ করে।

তিনি ফিসফিস করে বলেন 'আজ চারদিন মুখে ভাত নেই, চোখে ঘুম নেই, কর্তা বলেন পাগলের বেটিকে বুঝিয়ে বল আমরা দাঁড়াব কোথা, তাই একবার উপোস ভাঙলাম।'

পাতানী পিসী বলেন 'বউঠান, আমাদের কপালে ত' ছাই ঢেলে দিলেন রাধামাধব, কিন্তু প্রতিবেশীর এমন বিপদে না গেলে কি হয়?'

তাঁর মেজবোন উত্তপ্ত হয়ে বলেন 'দিদি, তোর লজ্জা নেই তাই তুই যেতে চাস, কিন্তু তারা তোকে দেখে যে তোর লজ্জায় মাথা হেঁট করবে।'

পাতানী পিসী অপ্রতিভ হয়ে বলেন 'কাদি তোরও বিপদ, তাদেরও বিপদ। এমন সময়ে মানুষ প্রতিবেশীর ভরসা করেই থাকে।'

তাঁর ছোটভাজ মৃদুস্বরে বলেন 'ওবাড়ির ছোটবউ কারো ভরসা করে না, সে বড় দড় মেয়েছেলে।'

'তোকে সেদিনই অপমান করেছে'। কাদুরাণী এখন সবেগে আঁচল নেড়ে হাওয়া খান ও কোলের নাতিকে দোলা দিয়ে 'কেঁদ না ধন, মণ্ডা খাও, মিঠাই খাও' বলে ভোলাতে থাকেন। দিদির ওপর তাঁর অনেক কারণে রোষ। ছেলে-পুলে নাতি-নাতনী মেয়ে-বউ নিয়ে তিনি বছরে ছ' মাস ভাইয়ের বাড়ি থাকেন ও গোপনে মেয়েকে 'তোর বড় মাসীর হাতে ভাঁড়ার, তাই আমার বাছাদের বাতাসা খাওয়াতে পারি নি, বউঠান কিছু দেখেন না, এ বড় অন্যায়' বলে নানারকম উসকানি দেন। পাতানী পিসী স্বভাবে যেমনই হন না কেন, এদিকে ভাইদের সংসারে প্রাণপাত করে পরিশ্রম করেন ও অপচয় যাতে না হয়, সেদিকে কড়া নজর রাখেন।

এখন তিনি শুকনো হেসে বলেন 'ওলো, ও সেদিনের বউ। আমার মর্ম জানবে কি করে? আনন্দীর নিজের মা আমার পরামর্শ বিনা নতুন উনোন অবধি পাতে না।'

এ-কথা বলেই তিনি হন হন করে বেরিয়ে পড়েন। বেরিয়ে নরপতির কথা মনে করে জোড়হাত কপালে ঠেকিয়ে শ্মশানের দেবীর উদ্দেশ্যে বলেন 'মা বিল্ববাসিনী, অনামুখোকে তাড়াতাড়ি খাটসই কর মা। ঢাকঢোল বাজিয়ে জোড়াপাঁঠা দিয়ে তোমার পূজা দেব। কলিকাল বলে কি তুমিও বাম হলে? আবাগীর কথাটা শোন মা, ঐ অলপ্পেয়েকে চুলোয় চড়াই।'

এতক্ষণে তাঁর মন একটু প্রসন্ন হয়। পথ চলতে চলতে এবার তিনি আঁধার-মাণিক গ্রামের বয়োবৃদ্ধ সমাজপতিদের নানারকম স্বগত সম্ভাষণে আপ্যায়িত করেন। কিছুটা অন্যমনস্ক। কেন না চলতে চলতে পোড়া চাল, কাটা বাঁশ, ঘোড়ার খুরে চষা মাটি কিছু কিছু নজরে পড়ে। কোথায় যেন ভয় পেয়ে গেছেন পাতানী পিসী, অজানিত এই বিপদ তাঁর জীবনের খুঁটি যেন একটু নাড়িয়ে দিয়ে গেছে, অদূরে সুরকণ্ঠের বাড়ির ছাত নজরে পড়ে। এতক্ষণে তাঁর মনে পড়ে মুখোটি বাড়ি ঐ কাছেই। এখনি মুখরোচক সংবাদটা দেওয়া যাবে। আনন্দীর মা-পিসীর মাথা হেঁট হবে এ চিন্তায় তাঁর দুঃখ হয় ঠিকই, কেন না মাথা হেঁট হবার লজ্জা তিনি জানেন।

আবার একটা উত্তেজনাও হয়। বেশ হৈ-চৈ, কান্নাকাটি হবে, তিনি সান্ত্বনা দেবেন, এই ঝগড়া-কলহ, কোঁদল-কুৎসা তাঁর নিশ্বাসের বাতাস, এ বিনা তিনি বাঁচেন কি করে?

মুখোটি বাড়িতে আনন্দীর মা ও পিসী তখন বিশালাক্ষীর তত্ত্বাবধানে ভাঁড়ার গোছাতে ব্যস্ত। পিসীর মেয়েরা বড়ি, আচার, আমসী, আম-সত্ত্বর ভাঁড়-বৈয়ম রোদে দেয়। মামা উঠোনে বসে আছেন, গাছের ছায়ায়। তাঁর এখন রোদে দেওয়া জিনিসের ওপর নজর রাখার কথা। সম্ভবত সেজন্যই তাঁর মুখ বারান্দার দিকে। কিন্তু নজর নিমীলিত প্রায়, ঊর্দ্ধমুখী গালে উৎকৃষ্ট মোদকের বড়ি, মৃদু মৃদু কালীয়দমনের গান। তাঁর বেঁটে বেঁটে পা দুটি সামনে ছড়ানো। মাথায় পটি বাঁধা, সেই নেড়ামাথা বৈরাগী তাঁর মাথা থেকে একটি একটি করে পাকাচুল তুলতে ব্যস্ত।

পাতানী পিসী বুড়ো আঙুলে ভর করে ডিঙি মেরে দেখলেন অদূরে পুকুরঘাটে বিশালাক্ষী কাপড় কেচে কেচে হিজলগাছের ঝুঁকে-পড়া ডাবে টাঙিয়ে রাখছেন। দেখে স্বস্তি পেলেন, যা হোক এখনি বিশালাক্ষী এদিকে আসছেন না। 'বড়বউ, হাতের কাজ রাখ, ইদিকে ফুলি ত' সুরকণ্ঠের বাড়ি এয়েছে আজ দশদিন বুঝি, সমাজে তা নিয়ে হৈ-চৈ কাণ্ড, আমি বলি আগে আগে যাই।'

মেয়েদের দিকে চেয়ে বললেন 'ও মেয়েরা চৌকি আন, পাখা আন, তোদের দাদা ত' পাগল হয়ে ছুটে আসছে, এসেই মূর্ছা যায় বুঝি। দিদি তুমি গুড় আন, জল আন, হঠাৎ নাড়ী তাতলে গুড়েজলে ঠাণ্ডা, কবরেজের বিধান।'

মেয়েরা কিন্তু তাঁর কথা শুনতে না শুনতে পুকুরের দিকে ছুটে গেল।

(ক্রমশঃ)

ক্যাণ্ডেল সাহেবের ব্যাণ্ডেল যাত্রা

তরুণ মৈত্র

(রস-রচনা)

শুরুতেই শেষ। আদিপর্বের গৌরচন্দ্রিকা হ'তে না হ'তেই শেষ অঙ্কের বিসর্জ্জনের বাজনা বেজে উঠতে চায়। ক'মাস হ'ল শিয়ালদহ ডিভিশানের রেলপথে ইলেক্ট্রিফিকেশান চালু হ'তেই যেন প্যালপিটিশান সুরু হয়েছে। আর ক্যাণ্ডেল সাহেবের এমনি ভাগ্য যত কিছু বি-এ্যাকশান ওঁরই ওপর। ক্যাণ্ডেল সাহেব ব্যাণ্ডেল যাবেন বলে শিয়ালদহ স্টেশানে হাজির। কিন্তু প্ল্যাটফর্মে দেখেন ডেলি প্যাসেঞ্জারের দল দলবেঁধে কাজীর বিচারে রেল-কর্তাদের মুণ্ডুপাত ক'রছে। তাদের ঐকতানে তিনি রীতিমত হকচকিয়ে গেছেন। একটুক্ষণের জন্যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় তিনি। সামলে নিলেন পরমুহূর্তে। বোঝবার চেষ্টা করলেন অবস্থা। ভাবলেন—শহরতলীর সবাই জোট বেঁধে এই প্ল্যাটফর্মে কেন একটিমাত্র ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করছে। এতো হবার কথা নয়। একটানা দুর্ভাগ্য দূর করবার জন্যে তিন-চার বছর ধরে আরও দুর্ভোগ ভোগ করেছে, শহরতলীর এইসব দধীচির দল। লাখ লাখ টাকা খরচ করে রেলপথকে বাগ মানাবার জন্যে এ ক'বছর কম পাঁয়তারা কষে নি রেল কর্তৃপক্ষ। তবে এসবের কি দরকার ছিল। যদি এত ক'রেও মন খসাতে না পারলো।

ক্যাণ্ডেল সাহেবের এখন চিন্তার বিস্তার শোনা গেল বহুজনের গুঞ্জনের মধ্যে। অগ্নিতে গব্য ঘৃতাহুতি স্বরূপ মন্তব্য শোনা যায়: ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। কাঠের গাড়ি ছেড়ে টিনের গাড়িতেই চাপি, আর স্টীম ইঞ্জিন বাতিল ক'রে ইলেকট্রিকই ধরি, ডেলি প্যাসেঞ্জারের ভাগ্যে যে দুর্ভোগ তা আর কেউ খণ্ডাতে পারবে না। নইলে দেখছো না, কেমন দু'দিন না চলতেই যন্ত্র বিকল। ধকল সইবার জন্যে যেন আমাদের জন্ম।

এসব কথার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল ক্যাণ্ডেল সাহেবের মনে। কিছুদিন আগের একটা ঘটনার প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে। এ-লাইনের সঙ্গে যেন তাঁর গেরো সম্পর্কটা জট বেঁধে আছে। নইলে তাড়াতাড়ি যাবে বলে আজ ইলেকট্রিফিকেশানের পরেও আগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে কেন। সেবারও ক্যাণ্ডেল সাহেব ব্যাণ্ডেল যাচ্ছেন, তখন এ-লাইনে জ্বরে-ধোঁকা স্টীম ইঞ্জিনের ওপর ভরসা করা ছাড়া উপায় নেই। তাই দুর্ভোগ সম্বন্ধে সচেতন হয়েই যাত্রিকুল যাত্রাপথে পা বাড়াল। এসব একটানা দুর্ভোগের দিন গত হয়ে যান্ত্রিক যুগের স্বচ্ছল উজ্জ্বল দিনের আশায় তাই সবাই দিন কাটিয়েছে। কেমন যাদুমন্ত্রের মতো রেলপথ ইলেকট্রিফিকেশানে দ্রুতগতিসম্পন্ন হ'য়ে উঠছে। সরলমতি জনসাধারণ তিমির শেষে প্রভাতের উদয়ে যেন আনন্দে আটখানা। কয়েকখানা ইলেকট্রিক ইঞ্জিন কয়েকশো স্টীম ইঞ্জিনের শক্তি রাখে। এতদিনে এ-লাইনের ডেলি প্যাসেঞ্জারদের যে

খরচীর সাধনা, তা সার্থক। অনর্থক আর সাড়ে তিন বছর কষ্টভোগ করে নি। সে এক সময় গেছে। বৈদ্যুতিকরণের সময় কাজের এমন ধরণ যে, কোন কোন সময় অনির্দিষ্ট কালের জন্য একেবারে নট-নড়ন-চড়ন। ডেলি প্যাসেঞ্জাররা বুক ভরে বাতাস টেনে ভাবে—আজ সে সব কষ্টের মূল্য হাতের মুঠোয়। এমন আত্মতুষ্টির লিস্টি শুনেই আজ ক্যাণ্ডেল সাহেব আবার এ-পথে পা বাড়িয়েছেন। কিন্তু ও: গড্। ইলেকট্রিক সর্ট। তাই প্ল্যাটফর্ম অপেক্ষমাণ যাত্রিকুলে ঠাসা। ওদের প্রতিটি চলনে বিরক্তি। মুখে নিক্তিমাপা কটূক্তি। অত্যুক্তি ভাবে না কেউই। কেউ বলে, সমুদ্র মন্থন করে শুধু আমাদের ভাগ্যে সেই গরল জুটলো। কণ্ট্রাক্টারদের উঠলো তিনতলা বাড়ি। ইণ্ডিয়া মেড' ইঞ্জিনীয়ারদের জুটলো বড় বড় পোস্ট। এসব কথা শুনতে শুনতে ক্যাণ্ডেল সাহেবের প্রাক্-বৈদ্যুতিকরণের সেদিনের কথা বারবার মনে হতে থাকে।----

ক্যাণ্ডেল সাহেব সেদিন ব্যাণ্ডেল যাচ্ছেন। ট্রেনের হ্যাণ্ডেল- ধরে লোকগুলো ঝুলছে দেখে চোখ দুটো তাঁর ছানাবড়া। হাওড়া-পথ ক্যানসেল করে শিয়ালদহের পথ ধরেছিলেন। কারণটা খুবই গুরুতর। অধিকতর ভোগের দরুণ মাঝে মাঝে ও-লাইনে ইলেকট্রিক কারেণ্টের হার্টফেল হ'ত। তখন উপায়হীনভাবে কয়েক ঘণ্টা পড়ে থাকা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থেকে শুধু ঠোঁট কামড়ানো। অথচ জরুরী কাজ। ক্যাণ্ডেল সাহেবের যে করেই হোক ব্যাণ্ডেল যেতে হবে। তাই সেদিন দ্বিতীয় পথের যাত্রী হলেন। কিন্তু এ-পথের দৈনিক যাত্রীদের বাড়তি সংখ্যার বহর দেখে, তাঁর উৎসাহের ঘাটতি পড়তে আর এতটুকু সময় লাগলো না। কিন্তু উপায় নেই।

নর্থ স্টেশান শিয়ালদহ। ক্যাণ্ডেল সাহেবের হাতে ফিতে ছেল। গাড়ির কামরার হ্যাণ্ডেল ধ'রতেই গুঁতো খেলো দু'চারজন। সমস্বরে বাণী বর্ষণ সুরু হল: রাস্কেল।---আক্কেল কি মশাই।—সাহেব কি ভাবেল ভাঁজছেন। আসলে তিনি তখন খাবি খাচ্ছেন।

এমন মধুর বাণী আর জাঁদরেল মানুষগুলির ঠেলাঠেলিতে কোনমতে ক্যাণ্ডেল সাহেব তবুও একটু স্থান করে নিলেন। ভেতরে প্রবেশ ক'রলেন। যেন ইঞ্জিনের অগ্নিগর্ভে ছিটকে পড়লেন। গরমে গলদঘর্ম। ওপরে চাইলেন পাখার পানে। যে দৃশ্য দেখলেন তার মানে করলে দাঁড়ায়—পাখাগুলি ধর্মঘট করে বসে আছে।—'বন্ধ কর না' পাখা বলে কেউ কেউ হাত বাড়ালো সুইচের দিকে। আসলে ফিউজ হয়ে আছে কলকব্জা। মনে মনে ক্যাণ্ডেল সাহেব ভাবলেন, এখন মানে মানে গাড়িটা ছাড়লে বাঁচি। অথচ হাঁচিটুকু পড়ছে না গাড়ি ছাড়বার। প্রতি সেকেণ্ডে লোক উঠছে আগেপিছে। ডেলি-প্যাসেঞ্জার মহলে সংবাদ পরিবেশিত হ'ল সঙ্গে সঙ্গে। ইঞ্জিন বিকল। অনিবার্য কারণে ধকল সইতে হবে সকলের অনির্দিষ্ট কালের জন্যে। উঠলো সোরগোল। তবলার বোল ছোটার মতো চললো কথাকলি। মেয়েলি কণ্ঠের ঘোষণা শোনা যায় অমায়িক স্বরে মাইকের মাধ্যমে: রিমডেলেশানের জন্যে সেকসনে নিয়মিত ট্রেন চলাচল সম্ভব নয়। ট্রেন ছাড়তে দেরি হবে সেজন্যে। লাউড স্পীকারের ঘোষণা বন্ধ হতে না হতে হন্যে হয়ে পড়লো সবাই রেল-কর্তাদের কাজের সমালোচনায়।

গাড়ি ছাড়বার নামগন্ধ নেই। বন্ধ হ'য়ে গেছে মাইক ঘোষণা। জল্পনা চলছে গাড়ির কামরায়। নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। তবুও যাত্রীরা গাড়ি ভর্তি করে উঠছে অবিরাম। বিরতি নেই এতটুকু। ফিরতি পথে কেউই আর পরের ট্রেনটার জন্যে অপেক্ষা করতে চায় না। রক্ষা থাকবে না অহেতুক বাড়ি যেতে রাত্তির হলে। গিন্নী গোঁসা ক'রবেন মিথ্যা সন্দেহে। বিবাহে যৌতুকলব্ধ জিনিসের মধ্যে এটিই একমাত্র সম্বল। আর সব হরিবোল হয়ে গেছে সংসারের রোজ খরচায়। তা ছাড়া ভরসা কি নেক্সট ট্রেনের। টেস্ট করে হয়তো শেষ বেলায় আবার মিহিগলায় ঘোষিত হবে—ট্রেন ক্যানসেল।

ক্যাণ্ডেল সাহেব এ-পথের এমন স্যাম্পেলের কথা চিন্তাও ক'রতে পারেন নি। ডে লি প্যা সে ঞ্জা র এখন তাঁর কাছে দেখা দিলো যে বোম্বেটেদের ম্যাসেঞ্জার হয়ে। এরই মধ্যে জিন্দার দলের জিন্দাবাদ প্রকাশ পেতে থাকে। দেশপ্রেমে সংগ্রামসুলভ উক্তি সুরু হয়। যুক্তির অবতারণা নাই বা হ'ল। চুক্তি করে সবাই কটূক্তিতে তখন পঞ্চমুখ। পঞ্চবার্ষিকী থেকে পঞ্চশীল কিছুই বাদ যায় না। চিন্তাশীল সবাই। কেরানী হ'লেও পেটে ক' অক্ষর আছে। দক্ষতা কারো চেয়ে কম নয়, পক্ষপাতিত্বের দোষে আজ এরা পক্ষাঘাতগ্রস্ত। অন্য দেশে এদের মধ্যে থেকেই কত ক্রিম-ক্রুশ্চেভের সৃষ্টি হয়েছে। দৃষ্টিকাতর এদেশের নেতাদের কৃষ্টিবোধ প্রতিক্রিয়া-ধর্মী।---এদের সমস্ত বাক্যবাণ শুনতে শুনতে ক্যাণ্ডেল সাহেবের প্রাণ খানখান হবার অবস্থা।

এত বিক্রম প্রকাশের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। গার্ডসাহেবের বাঁশি বাজলো। গাড়ি ছাড়লো। বহুত সুক্রিয়া। ক্যাণ্ডেল সাহেব মেরীমাতাকে স্মরণ করলেন। তিনি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। অসহ্য গরমের মধ্যে কামরার অসংখ্য লোকের প্রাণ ওষ্ঠাগত, আহত সৈনিকের মতো সবাই তখন ধুঁকছে। এদিকে ট্রেনের দু'ধারে প্রতিটি হ্যাণ্ডেলে ঝুলছে বাণ্ডিল বাণ্ডিল লোক। কেউবা জানলা ধরে বাইরের লোহার পাতে একটু পা ছুঁইয়ে রেখেছে মাত্র। তবু যেতে হবে। কচ্ছপগতিতে গাড়ি ছাড়তেই মচ্ছব পড়ে যায় কামরার মধ্যে।

আর একবারের মতো ঠেলাঠেলি পড়ে গেল। দন্ত করে যারা সবতে চাইবে না, তাদের কপালে বর্ষণ সুরু হল জ্ঞানবাণী। জিহ্বা নামক বস্তুটি সচল হয়ে ওঠে। শাণ দেওয়া অস্ত্রের মতো প্রত্যেকের অমন বস্তুটি তখন কর্মরত।

—দাদা কি মৌরসী পাট্টা নিয়ে এসেছেন? এইতো কাঠ দেখা যাচ্ছে। বসতে নাই বা দিলেন, একটু ঠেকাতে দিন।

অন্য কণ্ঠ: বলি হবে না বললেই হল। চিরটা কাল হযে আসছে। আজ আপনার বেলায় নতুন আইন। কোথাকার জয়প্রকাশ নারায়ণ এলো রে।—ব্যঙ্গোক্তিতে সারা কম্পার্টমেণ্ট ভ'রে উঠেছে। এরই মধ্যে একটু নরম কণ্ঠস্বর ভেসে আসে: এই তো হ'ল। দাদা, মিলেমিশে যাবো আসবো—এই হ'ল ডেলি প্যাসেঞ্জারের রীতি।

প্রসঙ্গ ঘুরতে সময় লাগে না। বৃহৎ সঙ্ঘের এইটাই গুণ। বেগুনের দর থেকে সুরু হযে চালের দাম কতগুণ পর্যন্ত চলে।---চাল কেন বাপু। সেনবাবু বলেছেন, আলু খাও, আরাম হারাম হ্যায়—নেহরুর উক্তি। আর আরামবাগ ফেরতা মুখ্যমন্ত্রীর যুক্তি, আলুর দাম চার আনা—চোদ্দ পয়সা। (ক্যাণ্ডেল সাহেব প্লাটফর্মে পুরনো দিনের কথা ভাবতে ভাবতে আজকের আলুর দামটা মনে করতেই আঁতকে উঠলেন—একটাকা চোদ্দ পয়সাতেও তল নেই।

কোন্ আলু? গোলালু, লালালু, শাঁকালু, না দম্মালু? কোনটার দাম চোদ্দ পয়সা? নৈহাটীর বাজারে তো আলুর টিকিটি দেখা যায় না ছ'আনার কমে। (ক্যাণ্ডেল সাহেব জানেন ঘ্যাণ্ডেলে এখন এক টাকা বিশ পয়সা।) কলকাতায় তার চেয়েও বেশি। আরামবাগ থেকে আলু আনতে তো ব্যারাম ধরে যাবে। (হায়, মুখ্যমন্ত্রী যেন আর আলুর প্রসঙ্গ এখন না তোলেন। তাঁকে সুমতি দাও প্রভু।—ক্যাণ্ডেল সাহেব প্রার্থনা জানান।)

চুটকি কথার ফুলকি ছুটতেই ট্রেনের গতি মন্থর হয়ে আসে। তারপর একেবারেই যন্তর বন্ধ। সবাই সমস্বরে জিগ্যেস করতে থাকে—কোন্ প্রান্তর?

কামরার ভেতর তখন কথারা ছানাবড়া গড়াগড়ি খাচ্ছে। অদৃশ্য কণ্ঠের স্বর ভেসে এলো—ছাই গাদা জংসন। এ-পথের প্রথম দংশন।

অফিস-ফেরতা পিঞ্জরাবদ্ধ মানুষগুলো আর যাই হোক, রসকথার রসরাজের মতো থৈ থৈ করে উঠতে এতটুকু দেরি ক'রে না। অভাব নেই বাক্যজালের। সঙ্গে সঙ্গে জবাব।—তবে তো থামতেই হবে। একে ছাইগাদার ট্রাডিশন, তার ওপর চলছে ইলেকট্রিফিকেশান। ডিটেনশান বাঁধা। কিন্তু এমন ধাঁধা আর কতদিন চলবে? শুনলুম সমস্ত কাজ কম্‌প্লিট। তবে কি সব গুবলিট?

উসুকে দিতেই এর-ওর মুখ থেকে কথা ফসকে জলতরঙ্গ বেজে উঠতে দেরি লাগলো না। রঙতামাসার ঢেউ উছলে পড়ে। কেউ আবার অঙ্গভঙ্গি ক'রে রেল-কর্তাদের চোদ্দপুরুষ উদ্ধারে লেগে যায়। এরই মধ্যে আবার বেসুরো সুর। অপেক্ষা আর উদ্বেগের বহিঃপ্রকাশ। ফাঁস করতে এতটুকু দ্বিধা নেই ঘরের কথা।—মশাই, গাড়ির এমন যন্ত্রণাদায়ক মতিগতিতে গিন্নী রেগে খুন। দু'ঘণ্টা আগে গাড়ি ধরবার

সর্বদা সঙ্গে রাখার মত

নবতর প্রযোজন

ইংরেজি-বাঙলা অভিধান

SAMSAD
LITTLE ENGLISH-BENGALI
DICTIONARY

সঙ্কলক: শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস এম. এ.

সংশোধক: ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এম.এ., পি-এইচ.ডি.

~ বৈশিষ্ট্য ~

● সর্বসাধারণের বিশেষ করিয়া ছাত্র ও অফিস কর্মচারীদের প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শব্দচয়ন ও অর্থবিন্যাস ● অধুনা প্রচলিত শব্দসঙ্কলন ● ইংরেজি ও বাঙলায় উচ্চারণ-সঙ্কেত ● ইংরেজিতে প্রয়োগের উদাহরণ ও বাঙলায় শব্দার্থ ● পাতলা অথচ অতিশয় শক্ত বাইবেল কাগজ ● সহজ বহনীয় আকার ৪½ × ৬¾ × ১" ● ৩০,০০০ শব্দসংখ্যা ● ৮২০ + ১২ পৃষ্ঠা।

শক্তবোর্ড ও কাপড়ের মজবুত বাঁধাই। দাম: টা ৭.৫০ মাত্র

আমাদের অন্য দুইটি অভিধান

SAMSAD ENGLISH-BENGALI DICTIONARY [12-50]

সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান [8.50]

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড :: কলিকাতা-৯

জন্যে বাড়ি থেকে বেরুতে হয়। অতএব সহধর্মিণীকেও আরও দু'ঘণ্টা আগে উঠে উনোনে আগুন দিতে হয়। ফলে, ঘুম থেকে না উঠতেই শুনতে হয় মিষ্টিমধুর বাণী। অথচ অফিসে গিয়ে বড়বাবু যথারীতি লালদাগ টেনেছেন হাজিরা খাতায়। যদি বলি গাড়ি দেরির কথা। অমনি তিনি বলবেন, আগের-গাড়িটা ধ'রতে কিসের ব্যথা? তবে যে আর বাড়ি ফেরার দরকারই থাকে না। অফিসচত্বরে রাত কাটাতে হয়। একথা বোঝানো দায়। ফলে সারাটা দিন শুধু ট্রেনেই 'হায় হায়' করেই কেটে যায়।

'বদর - বদর'—করে উঠলো কোন পূর্ববঙ্গীয় যাত্রী। ক্যাণ্ডেল সাহেব নেটিভদের ভাষার কদর দিতে জানেন। বুঝলেন শুভসংবাদ ঘোষিত হচ্ছে। আবার গাড়ি ছাড়ে। কিন্তু হোঁচট খেতে আর বেশি দেরি করে না। কি যে কারণ কেউই সঠিক বলতে পারে না। ক্যাণ্ডেল সাহেব শুধু ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে থাকেন। এমনি করে হোঁচট খেতে খেতে দমদমে এসে দাঁড়ালো। মধ্যে যদিও একটা স্টেশান—উল্টোডাঙা। কিন্তু গাড়ি উল্টোবার আশঙ্কায় তাকে থামতে হয়েছে ছ'বার। তবে ভাঙা ইঞ্জিনে এতটুকু আসতে যে পেরেছে এটা কম বরাত নয়। ডেলিপ্যাসেঞ্জাররা এমনি ক'রে দুর্মূল্য সময়কে গাড়ির পায়ে নিবেদন ক'রছে শুধু জাত খুইয়ে ডেলিপ্যাসেঞ্জার হয়েছে বলে। লোক নামলো না একটিও। বরং দল বেঁধে কলতানে উঠলো ডজন-কয়েক। এর মধ্যে ওজনভারী জেনানা উঠেছেন। মাথায় ঝাঁকাভর্তি শুঁটকি মাছ। মুট্‌কি মেয়েটিকে নিয়ে কামরায় তখন চুট্‌কি চ'লছে। কিন্তু বেশিক্ষণ আর ভদ্রলোকের মতো থাকতে পারে না কেউ। গাড়ি ছাড়তেই মলয়-সমীরণের আলতো ছোঁয়ায় সৌরভ ভেসে বেড়ায় সমস্ত কামরায়। অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসতে চায় পেট থেকে। সুরু হয় ঐক্য বাক্য কুবাক্য। চাকচিক্য, পরিপাটি করা গম্ভীর ভদ্রলোকও মুখ খোলে জেনানার উদ্দেশ্যে।

জেনানাটি কম যান না। সাগরপারের কন্যা বইয়ে দেন তাঁর নিজ ভাষায় গালাগালিতে। কিন্তু সবাই তো আর কচ্ছপের প্রাণ নিয়ে আসে নি ডেলি প্যাসেঞ্জারদের মতো। তাই ক্যাণ্ডেল সাহেব ভিরমি খান। নাসিকারন্ধ্রে শুঁটকির মৎসগন্ধ প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে উদ্‌গার আসে। উৎকট দেহকম্পন সংক্রামিত হয় মস্তিষ্কে। অস্বস্তিতে গলগল করে বমি করে ফেলে। পড়বি তো পড় একেবারে পাশের ভদ্রমহিলার শাড়িতে। অঘটন দেখে সাহেবের তখন আত্মারাম খাঁচাছাড়া। নাড়ীতে প্রাণ পায় না ক্যাণ্ডেল সাহেবের। ডেলি প্যাসেঞ্জাররা তখন এক এক স্টেশানে নামবার জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

নৈহাটী এলো। ক্যাণ্ডেল সাহেব নামলেন ব্যাণ্ডেল যাবার ট্রেন ধরবার জন্যে। যাটের গাড়ি ছেড়ে গেছে। ন'টার পর সেই সাড়ে এগারোটা। রাত্তির বারোটার পর ব্যাণ্ডেলে পৌঁছতে হবে। কাঁচকলা খেয়েছেন ক্যাণ্ডেল সাহেব। আর এ-পথে নয়। (আজ আবার ট্রেন বিরাটে নিজের প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ে।) যাটের গাড়ি স্টেশানে ইন করলো। ক্যাণ্ডেল সাহেব ব্যাণ্ডেল যাবার জন্যে ট্রেনে উঠতে গিয়ে দেখেন তাঁর ক্যাণ্ডেল জোড়া ছেঁড়া। ফ্ল্যাশব্যাকের ঘটনা চিন্তায় চেপে বসেছিল। এতক্ষণ লক্ষ্য করেন নি ক্যাণ্ডেল সাহেব। সবাই ধুলি উড়িয়ে চলেছে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে। কি ব্যাপার। স্টীম ইঞ্জিন ছাড়া উপায় নেই। চল ন'নম্বর প্ল্যাটফর্মে। গ্রাম্য প্যাসেঞ্জার ধরতে হবে। ব্যাণ্ডেল যেতে গয়া মন্দ নয়। ক্যাণ্ডেল সাহেব ইলেকট্রিক ট্রেনের মোহ ত্যাগ করলেন।

ভালোবাসার উদ্দেশে

পরিমল চক্রবর্তী

সহস্র প্রাণের মূল্যে প্রস্ফুটিত অম্লান পুষ্পকে
কে ছিঁড়েছে আমাদের চেতনার বাগানের থেকে
এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যরাতে? অমল আত্মায়
কে ঢেলেছে এতো বিষ, এই তীব্র নীল হলাহল
কার অভিশাপে বলো আমাদের সত্তার গভীরে
ক্রমে মিশে যেতে চায় বিন্দু বিন্দু রক্তের মতন?

অথচ হৃদয়ে ছিলো সেই সুরজীবনের তৃষ্ণা—
যে-জীবন শ্রান্ত নয়, ক্লান্ত নয়, দুঃখের আঘাতে;
ঘৃণার আগুন যাকে পোড়ায় নি, অথবা হিংসার
কুটিল লোলুপ জিহ্বা যে-জীবন স্পর্শ করে নি ক'
সে-জীবন আকাঙ্ক্ষিত ছিলো বড়ো; বুঝি চেয়েছিলো
এই প্রাণ পৃথিবীকে সেই প্রেমে শুদ্ধ দেখে যেতে।

অথচ সমস্ত স্বপ্ন দুই পায়ে দলে দলে দলে
বর্বর যুগের সেই ভয়ঙ্কর কালো অন্ধকার
গ্রাস করে নিতে চায় আমাদের শিল্প ও সভ্যতা।
শুধু হত্যা, শুধু মৃত্যু, দিকে দিকে কেবলি ধ্বংসের
চিহ্ন আর কতো দেখবো। ভালোবাসা, বলো তুমি কবে
সব বাঁধ ভেঙে দেবে অপ্রেমের, বেগান্ধ বন্যায়॥

গোয়েন্দা-গল্প

কমলা সরকার

অদ্রীশ বর্ধন

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

আচম্বিতে জয়ন্তর হাত এসে পড়লো আমার হাতের ওপর।

'দেখেছো ?'

অস্বাভাবিকভাবে মাথা দোলাচ্ছেন সত্যেন মল্লিক। ঘুমের ঘোরে থুৎনি যেমন বুকে এসে ঠেকে, ঠিক তেমনি-ভাবে ওঁর মাথাটা ঝুলে পড়তে চাইছে বার বার, কিন্তু জোর করে মাথা তুলে ধরছেন উনি। বারতিনেক এইভাবে মাথা ঝাঁকানি দিলেন সত্যেনবাবু, তারপরেই দাঁতের ফাঁক থেকে পাইপটা খসে পড়ে গেল গালিচার ওপর—বুকের ওপর ঝুলে পড়ল অবশ মাথাটা। আর নড়লেন না।

এক মিনিট---দু মিনিট---তিন মিনিট---দশ মিনিট কেটে গেল অসহ্য প্রতীক্ষার মধ্যে দিয়ে----

কিন্তু নিস্পন্দ হয়ে রইল সত্যেন মল্লিকের দেহ----

নিথর হয়ে রইল বুকের খাঁচা---

জয়ন্ত আমার দিকে তাকালে—'কি করবে ?'

'ম্যানেজারকে ডাকো।' বললাম আমি।

ম্যানেজার এলেন। ভিড় ঠেলে একজন ডাক্তারও এলেন। পরীক্ষা করে যা বললেন, তা আমরা আগেই অনুমান করেছিলাম। কি এক রহস্যময় কারণে আমাদের চোখের সামনেই নাচ-গানভরা এই পরিবেশে শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন ভারত-বিখ্যাত বিচারপতি সত্যেন মল্লিক।

জয়ন্ত নিজের পরিচয় দিয়ে পুলিশে ফোন করে দিলে তক্ষুণি।

আমি আর কবিতা দাঁড়িয়েছিলাম ভিড়ের মধ্যে। অপলক চোখে বিরাট পুরুষটির ক্ষুদ্র গতায়ু দেহটির দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম, মানুষের জীবন কত সংক্ষিপ্ত, আর মৃত্যু কি আকস্মিক। এক ফুঁয়ে মোমবাতির শিখা নিভে যাওয়ার মতই মিলিয়ে গেল ওঁর জীবনদীপ। কিছুই করতে পারলাম না আমরা। অথচ এই ক্ষণিক জীবনের জন্যেই এত হানাহানি, এত উদ্বেগ, এত—

শ্মশানবৈরাগ্য আচমকা টুকরো টুকরো হয়ে গেল কবিতার ফিসফিসানিতে।

'শুনছো ?'

'কি ?'

'ঘাড়ের কাছটা লক্ষ্য করো।'

করলাম। পরক্ষণেই নিঃসীম কৌতূহলে সূচ্যগ্র হয়ে এল দৃষ্টি।

সত্যেন মল্লিকের ঘাড়ে, পাঞ্জাবীর ঠিক ওপরে অদ্ভুত একটা নীলবৃত্ত। বৃত্তের ঠিক মাঝখানে মশার কামড়ে খানিকটা ফুলে উঠেছে।

মশার কামড়ের চারধারে নীলবৃত্ত। এ কোন্ জাতীয় মশা ?'

মশার কামড়ে মানুষ মরে না

প্রতিদিন ভোরে ঘুমজড়ানো চোখ মুদে চুড়ির বিনিঝিনি রাগিণী শোনার আমেজ ভাঙে অর্ধাঙ্গিনীরই মিঠেকড়া ধমকে—'বেলা হলো, কুঁড়ের বাদশা, উঠবে কখন?'

অতিকষ্টে চোখ খুলে প্রতিদিনই শয্যার পাশে টি-পয়ের ওপর দেখি ধূমায়িত চায়ের কাপের পাশে ভাঁজ করা খবরের কাগজ।

কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটলো সেদিন ভোরে। চায়ের কাপ যথাস্থানেই শোভা পাচ্ছিল, উধাও হয়েছিল খবরের কাগজটা।

পুরো চোখ খুলতেই দেখি, জানলার সামনে পিঠে ভিজে চুলের রাশ এলিয়ে কাগজ মেলে ধরেছে স্বয়ং গৃহিণী।

খুব জোরে কেশে উঠে বলেই ফেললাম—'আহা, খবরের কাগজের আজ কি সৌভাগ্য।'

বলেই বুঝলাম, বেফাঁস কথা বলে ফেলেছি। এই সক্কাল বেলা দাবানল এবার জ্বললো বলে।

কিন্তু আজ হলো কি: বোঁ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে উঠলো কবিতা—'ওগো শুনছো।'

ভড়কে গিয়ে বললাম—'কি হলো?'

'র হ স্য জ ন ক মৃত্যু—সত্যেন মল্লিকের।'

উঠে বসেছিলাম। আবার শুয়ে পড়ে ছোট্ট করে বললাম—'সে তো গতরাতেই দেখেছি।'

'কিন্তু তুমি কি এখনও শুয়ে থাকবে?'

'তা ছাড়া আর করবই বা কি? আমি কি—'

'তুমি যে কিচ্ছু না, তা বিয়ের পর থেকেই হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। ও নিয়ে আর ড্রামবিটিং নাই বা করলে।'

একটা চোখ কুঁচকে বললাম—'বটে বটে, বিবাহ-পুরাণের প্রথম অধ্যায় তা হলে প্রায় হজম করে বসে আছো দেখছি।'

'থাক, যথেষ্ট হয়েছে, গতর তুলে দয়া করে ইন্দ্র-ঠাকুরপোকে ফোন কর।'

'কিন্তু সে এ কেস নিয়ে মাথা ঘামাবে কেন? এ তো জয়ন্তর—'

'ঘটের বুদ্ধিটুকু এ-ব্যাপারে খরচ না করলেও চলবে বুদ্ধির বেস্পতি। আমি শুধু জানতে চাই—মশার কামড়ে মানুষ মরে কি না।'

আর কিছু বলার দরকার হলো না। হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়াল করলাম তক্ষুণি। আমার গলা পেয়েই সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলো ইন্দ্রনাথ—'জয় রাম, কল্কী এসে গেছেন।'

'সেটা কি?' সত্যি সত্যি ঘাবড়ে যাই আমি।

'আজকের কাগজের কার্টুনটা দেখ নি বুঝি? দুই পাখাওলা সাদা ঘোড়ায় চড়ে এসেছেন কল্কী—দশম অবতার। একহাতে আইনের কেতাব, আর একহাতে হাতকড়া নিয়ে ধূমকেতুর মত এসেছেন তিনি। কালোবাজারী-দের নির্মূল করে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে তিনিই দক্ষিণাস্বরূপ সসাগরা পৃথিবী ব্রাহ্মণদের দান করবেন।'

হুংকার দিয়ে উঠলাম—'ইন্দ্রনাথ কার্টুন নিয়ে কচকচি করার জন্যে এত ভোরে তোমাকে ফোন করি নি আমি। রহস্যজনক মৃত্যুর খবরটা দেখা হয়েছে কি?

'কে, সত্যেন মল্লিক? কিন্তু তার চাইতেও চমকপ্রদ এই কার্টুনটা। কল্কীর মুখখানা অবিকল একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মত দেখতে। কি কাণ্ড!'

'ইন্দ্রনাথ, দোহাই তোমার। সত্যেন মল্লিকের মৃত্যু নিশ্চয় স্বাভাবিক নয়।'

'প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুই অস্বা-ভাবিক। তার চাইতেও অস্বাভাবিক হলো এই কার্টুনটা। এটার—'

'মশার কামড়ে কি মানুষ মরে?'

কিছুক্ষণ সব চুপ।

তারপর?

'মশার কামড়ে মানুষ মরে না। 'জাহানারা'তে আজকাল খুনে মশারা বিচরণ করছে জানতাম না। কৃপা-পরবশ হয়ে আরও একটু খোলসা করবে কি?'

সব বললাম। বললাম, মশার কামড়ের চারধারে নীলচে বৃত্তের বৃত্তান্ত।

শুনে ইন্দ্রনাথ শুধু বললে—'আমি আসছি, তোমরা বেরিও না।'

ঘণ্টাখানেক বাদেই এল ইন্দ্রনাথ। একহাতে একটা চ্যাঙাড়ি, আর পেছনে জয়ন্ত।

কবিতা শুধোলে—'এ সব কি?'

ইন্দ্রনাথ বললে—'মোড়ের রামপদ মোদকের দোকানে গরম গরম কচুরি আর জিলিপি ভাজছিল। সকালবেলা একসঙ্গে এই দুটি জিনিস যে কতদিন খাই নি—সকাল বেলা কেই বা আর এনে দেয় বলো। তাই দেখামাত্রই দু'টাকার কিনে ফেললাম। ওরা বললে, হিঙের কচুরি নাকি—'

গালের মধ্যে গোল করে জিবটা ঘুরিয়ে নিয়ে হাসি চেপে কবিতা শুধোলে—'আর কি চাই? চা, না কফি?'

'কফি।'

বলেই, আমার দিকে ফিরে সুরু করে দিলে ইন্দ্রনাথ—'মশা কামড়ালে মানুষ মরে না, কিন্তু সত্যেন মল্লিক কেন মারা গেলেন?'

জয়ন্ত ব্যাজার মুখে বললে—'ধুত্তোর, কান ঝালাপালা হয়ে গেল মশার কেচ্ছা শুনতে শুনতে। মশা, মশা আর মশা। মশার কামড়ে উনি মারা যাবেন কেন? ডাক্তার বলেছে, করোনারী অ্যাটাক। পোস্টমর্টেম না হলে সঠিক কিছু বলা মুস্কিল।'

আমি বললাম—'কিন্তু নীল সার্কেলের মাঝে ফুটোটা—'

হাঙরের মত মুখব্যাদান করে

হাই তুলে জয়ন্ত বললে—'মশা ছাড়াও তো অন্য পোকামাকড়ের কামড়ে অমন দাগ হতে পারে।'

'কি সেই পোকামাকড় ?'

'আমি তা কি করে বলব ? সেজন্য তোমার মত ডিটেকটিভ নভেল লিখিয়েরাই তো রয়েছে ?'

ইন্দ্রনাথ বলে উঠলো—'আহা-হা প্রথম থেকেই তোমরা যদি এভাবে ঝগড়া সুরু করে দাও, তা হলে আসল সমস্যার মীমাংসা তো কোনোদিনই হবে না। তবে, সত্যি কথা বলতে কি জয়ন্ত, ঐ নীল দাগটা নিয়ে আমার মনেও খট্‌কা লেগেছে।'

প্রতিবাদে হয়ত জয়ন্ত এবার কড়িকাঠ কাঁপিয়েই চিৎকার করে উঠতো, কিন্তু সে সুযোগ না দিয়েই ইন্দ্রনাথ বললে—'এয়ার-কণ্ডিশণ্ড ঘরে কখনও পোকামাকড় মাছি-মশার উপদ্রব হতে দেখেছো ?'

সত্যিই তো, শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে তো কখনও এসব উৎপাত দেখি নি। বললাম—'মশা না হলেও, ভীমরুল জাতীয় কোনো বিষাক্ত পোকার কামড়ও তো হতে পারে।'

'তা হলে তো এখন কীটবিজ্ঞান নিয়ে বসতে হয়।' বললে ইন্দ্রনাথ।

'দরকার হলে তা বসতে হবে বৈকি।' খাপ্পা হয়ে বলি আমি।

'নিশ্চয় নিশ্চয়, তা বসবো বৈকি। তার আগে জয়ন্ত যদি আমাকে 'জাহানারা'তে এখন একবার ঘুরিয়ে আনতে পারতো, তা হলে আরো ভালো হতো।'

'জাহানারা কেন ? বিশেষ জাতের ভীমরুলটাকে আবিষ্কার করতে ?' মন্তব্যটি জয়ন্তর।

পিত্তিশুদ্ধ জ্বলে উঠলো আমার। খেঁকিয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু মাঝখান থেকে ইন্দ্রনাথ বলে উঠলো—'রবার্ট ব্রুকের ভাষায় অকুস্থল পরিদর্শন করতে।'

'এখন সেখানে অশ্বডিম্ব ছাড়া আর কিছু নেই।'

চটে উঠে ইন্দ্রনাথ বললে—'জীবনে তুমি শার্লক হোমস হতে পারবে না। আগে থেকেই যারা থিওরিকে অকাট্য বলে মনে করে, তারা কস্মিন-কালেও গোয়েন্দা হওয়ার উপযুক্ত নয়।'

'নাটক-নভেলের অমন ম্যাজিক জানা টিকটিকিও হতে চাই না আমি। বাস্তব নিয়ে আমাদের কারবার। সত্যেন মল্লিক মারা যাওয়ার সময়ে গমগম করছিল অতবড় রেস্তোরাঁটা—আর এখন তা একদম ফাঁকা। তোমার কি মনে হয়, দেওয়ালে আঁকা তসবিরের রক্তচক্ষু দেখে হার্টফেল করেছেন সত্যেন মল্লিক ?'

অসহিষ্ণু স্বরে ইন্দ্রনাথ বললে—'তোমার সঙ্গে বাজে ডিবেট করতে চাই না আমি। মৃগাঙ্কর মুখে যা শুনলাম তাতে মনে হয়, এ মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। সেইজন্যে, আর সত্যেন মল্লিকের মত দেশবরেণ্য ব্যক্তির মৃত্যুরহস্যের সমাধান করার জন্যে বিনা স্বার্থে আমি এ ব্যাপারে নাক গলাতে চাই। তাই, নিরিবিলিতে জাহানারা রেস্তোরাঁয় আমি এখন দেখব কি অবস্থায় মারা গিয়েছেন উনি। ইচ্ছে হলে আসতে পারো, নয়তো আমি একলাই চললাম।' বলে উঠে দাঁড়ালো ইন্দ্রনাথ।

বন্ধুবর ক্ষেপলে আর রক্ষে নেই। কাজেই নরম হয়ে জয়ন্ত বললে—'যো হুকুম, আমি যাব। তবে কফির ফরমাস দিয়ে এখন কেটে পড়লে মৃগাঙ্কর বেটার-হাফ আমাদের আর মুখদর্শন করবে না।'

অগত্যা আবার বসে পড়লো ইন্দ্রনাথ।

সকাল দশটার সময়ে জাহানারা পৌঁছলাম তিনবন্ধু। ম্যানেজার হাজির ছিলেন তদারকির জন্যে। জয়ন্তকে দেখে তক্ষুণি বিনয়ে গলে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে অর্ডার দিলেন এসপ্রেসো কফির।

দর্শক হওয়া ছাড়া আমার কিছু করণীয় ছিল না। জয়ন্তও দেখলাম 'পড়েছি মোগলের হাতে' গোছের ভাব নিয়ে ঘুরঘুর করছে ইন্দ্রনাথের সঙ্গে। যে চেয়ারে বসেছিলেন সত্যেন মল্লিক, সেই চেয়ারেই অনেকক্ষণ বসে রইলো ইন্দ্রনাথ। মৃত্যু কোন্ কোন্ পথে আসতে পারে, সেই চিন্তা নিয়েই সম্ভবত তন্ময় হয়েছিল ও। কিছুক্ষণ বাদে আনমনে তাকালে কড়িকাঠের পানে, শূন্যদৃষ্টি মেলে রইলো চেয়ারগুলোর ওপর। অন্ধকার মুখ দেখে মনে হল, অনেক আশা নিয়ে এসে বেজায় নিরাশ হয়েছে বেচারী।

তারপর, উঠে এসে বসলো সামনের চেয়ারে—যে চেয়ারে বসেছিল পাশি ভদ্রলোকটি। সামনেই মঞ্চের নীচু অংশ—বাজিয়েরা বসে সেখানে। পাশেই মূল মঞ্চ—নর্তকীর হাস্যে লাস্যে কটাক্ষে যা অপরূপ হয়ে ওঠে সন্ধ্যা আসার সঙ্গে সঙ্গে।

অপলক চোখে অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইল ইন্দ্রনাথ।

মনে হলো, যেন ধ্যান করছে—চোখ খুলে। দেওয়াল ফুঁড়ে দৃষ্টি চলে গেছে কোন সুদূরে। ভাবসমাহিত এই দৃষ্টি দেখে কে বলবে, ইন্দ্রনাথ ডিটেকটিভ—গোয়েন্দাগিরিই তার পেশা। বলবে, সে কবি—কবিতাই তার জীবন। সে শিল্পী—শিল্পই তার স্বপ্ন। কিন্তু আমি তো তাকে চিনি। তাই বুঝলাম, ইন্দ্রনাথ স্বপ্নালু চোখে কবিতার ছন্দ খুঁজছে না। মন তার হাতড়ে মরছে এক দুর্বোধ্য হেঁয়ালীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে। অত্যন্ত কঠিন অঙ্কের খেই হারিয়ে ফেললে মানুষ যেমন দিশেহারা হয়ে যায়—উদাস দৃষ্টির অন্তরালে ওর চোখে রয়েছে এখন সেই ছবিই।

পলকহীন চোখে আমিও তাই তাকিয়েছিলাম ওর মুখপানে। এ সময়ে হাস্যময়, কৌতুকপ্রিয় ইন্দ্রনাথ বড় রহস্যময়, বড় অস্পষ্ট হয়ে ওঠে—নাগাল পাওয়া যায় না মনের। তাই অপলক চোখে লক্ষ্য করছিলাম—কোন্ কোন্ ভাবের লেখা পাওয়া যায় ওর মুখে।

সেই কারণেই হঠাৎ ওর চমকে ওঠাটা নজর এড়ালো না আমার। যেন আচমকা ভূত দেখে চমকে উঠলো ও। কিন্তু তা পলকের জন্যে। পরমুহূর্তেই ধীরে ধীরে আলোকিত হয়ে উঠলো ওর মুখ। মৃদু হাসি ফুটে উঠলো ঠোঁটের কোণে। মাথা নেড়ে আপনমনেই সায় দিলে নিজের মনকে।

বললাম—'কি হে রবার্ট ব্রুক, কেল্লা মেরে দিয়েছো মনে হচ্ছে?'

আর একবার ভয়ানক চমকে উঠলো ইন্দ্রনাথ।

পরক্ষণেই আশ্বস্ত হয়ে বললে—'না তা নয়, ভাবছিলাম সামনের ঐ চেয়ারটায় বসে কতরকমভাবে মরতে পারি আমি।'

'ভাবনার রেজাল্ট কি?'

'সবশুদ্ধ তিনরকমভাবে মরা যায়। অবশ্য সবটাই কল্পনা। জয়ন্তর ভাষায়, স্রেফ গাঁজায় দম। কাজেই তা নিয়ে আমি মনগড়া গল্প ফাঁদতে চাই না। তবে, ...এই যে, ম্যানেজার সাহেব যে—'

অত্যন্ত মূল্যবান এক প্যাকেট সিগারেট সামনে ধরে বদনপটে বিগলিত হাসি ফুটিয়ে তুলে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন ইয়া লম্বা পাঠান ম্যানেজার।

কোনোরকম সৌজন্যের ধার দিয়ে না গিয়ে একটা সিগারেট টেনে নিয়ে পাশের চেয়ারে খাতির করে ম্যানেজারকে বসালো ইন্দ্রনাথ। সুরু হলো খোশ-গল্প।

নাচ-গানের প্রতি ইন্দ্রনাথের যে এত অনুরাগ আছে, তা এই প্রথম শুনলাম। লক্ষ্ণৌতে এক নর্তকীর পায়ের বোল দেখে ইন্দ্রনাথ যেরকম মোহিত হয়েছিল, সেরকমটি আর কখনও হতে পারে নি জেনে আমি অবাক হলাম।

পাঠান ম্যানেজার উত্তেজিত হয়ে তক্ষুণি ওকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বসলেন সেদিন সন্ধ্যায়। বেনারসের এক খ্যাতনামা নর্তকীর প্রোগ্রাম আছে সেদিন। আর বাজনদার? তারা রেস্তোরাঁর মাইনে করা বাঁধা বাজনদার হলেও অনেক খানদানী শিল্পীকেও টেক্কা মারতে পারে।

পাথরের মত চ্যাটালো বুক ঠুকে ম্যানেজার জানালেন, এ নাকি ফাঁকা বড়াই নয়। আজ সন্ধ্যায় আমরা এসে পরখ করে যেতে পারি।

বসবার ভালো জায়গা? কুছ পরোয়া নেহি। এই টেবিল-চেয়ারগুলোই রিজার্ভড রইলো আমাদের জন্যে।

সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেল ইন্দ্রনাথ।

বন্ধুদের নাড়ী চিনতে তো আর বাকী নেই আমার। কাজেই ইন্দ্রনাথের আদেখলাপনা দেখে জয়ন্ত যে রেগে টং হয়েছে, তা ওর থমথমে মুখ দেখেই অনুমান করে নিলাম আমি।

বাইরে পা দিয়েই বোমার মত ফেটে পড়লো জয়ন্ত—'তুমি যে এত ফিচেল, জানতাম না। প্রেসটিজ-ফ্রেসটিজ গোল্লায় দিয়ে বিনিপয়সায় খ্যাঁটা আর নাচ-গানের মজা লোটবার মতলবই যদি ছিল, তো আগে বললেই পারতে?'

কাঁচুমাচু মুখে ইন্দ্রনাথ বললে—'সত্যিই ভারি অন্যায় হয়ে গেছে। কিন্তু মশাটাকে যদি এই ফাঁকে দেখতে পাই—তাই লোভ সামলাতে পারলাম না।'

ঠাট্টার ছলে কথাগুলো বললেও গুরুত্বটুকু উপলব্ধি করলাম সেই রাতেই। শত মহফিলের রোশনাই ঝলমল জাহানারার কক্ষে নৃত্যের তালে তালে উন্মোচিত হলো রহস্যকুহেলীর তিমির অবগুণ্ঠন। এখনও সেকথা ভাবলে অবাক হয়ে যাই যে, যা আমাদের চোখের সামনেই ছিল, তা আমরা দেখেও দেখি নি। অথচ—

যেমনটি ঘটেছিল, ঠিক সেইভাবেই বলা যাক কাহিনীটা।...

একটি টিনের বাঁশি

হরদম শুনি, বাঙালীদের মধ্যে নাকি চ্যাটার্জী আছে, ব্যানার্জী আছে, মুখার্জী আছে—কিন্তু এনার্জি নেই। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় জাহানারা আসার জন্যে—ইন্দ্রনাথের তোড়জোড়ের বহর দেখে বাঙালীদের সম্বন্ধে এহেন ধারণার কিছু রদবদল করার দরকার হয়ে পড়ল।

কবিতা আসতে চেয়েছিল। কিন্তু বেঁকে বসলো ইন্দ্রনাথ। আমাকে আর জয়ন্তকে টানকে টানতে যথাসময়ে হাজির হলো রিজার্ভ করা টেবিলে।

বেলোয়ারী ঝাড়ের নীচে ধীরে ধীরে জমজমাট হয়ে উঠছিল আসর। মূল মঞ্চে গজল গাইছিল একটি মেয়ে। জাফরানি রঙের ওড়নায় মুখের একপাশ ঢাকা। মুখ নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝিলমিল ঝিলমিল করে উঠছিল নাকের কমলহীরের নাকছাবিটি। ওদিকে মার্বেল পাথরের জাফরির অন্তরালে চটুল হাস্য-পরিহাসে মত্ত ছিল কয়েকজন তরুণ—কাচের বাসন ভেঙে যাওয়ার মত হাসির চমক ভেসে আসছিল এদিকেও।

গতরাতে যে চেয়ারে বসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন সত্যেন মল্লিক—সেই চেয়ারেই বসেছিল জয়ন্ত। বড় অস্বস্তিবোধ করছিল বেচারী। হয় মশা, না হয় বিষাক্ত পোকা—খুব সম্ভব দুটোর একটার ভয় পেয়ে বসেছিল ওকে। বিপরীত চেয়ার দখল করেছিল ইন্দ্রনাথ—পাশে আমি।

পাঠান ম্যানেজারের খাতিরের ঠেলায় প্রাণ তখন ওষ্ঠাগত হবার সামিল। চক্ষুলজ্জাহীন ইন্দ্রনাথের কোন কিছুতেই অরুচি দেখলাম না। পাশের চেয়ারে ম্যানেজারকে বসিয়ে খোশ-গল্প জুড়ে দিলে ধ্রুপদী সঙ্গীত নিয়ে। কথায় কথায় আবহ সঙ্গীতের প্রসঙ্গও এসে পড়ল। নীচু মঞ্চে বসা বাজনদারদের প্রশস্তি আরম্ভ করে দিলেন ম্যানেজার। ফেজ টুপী মাথায় ঐ যে মুসলমানটি এস্রাজ বাজাচ্ছেন, ওঁর জন্মভূমি আরবে। রাঙা আপেলের মত টুকটুকে রঙ। হাতটিও বড় মিঠে। আর পাশের পাখোয়াজ-বাজিয়ে?

তাকে আনা হয়েছে ইন্দোর থেকে। চেহারাটা কালো আঙুরের মত হলেও ওঁর হাতের বোল নাকি মানুষের মত কথা কয়। তিন-চার রকমের বাঁশি নিয়ে ঐ যে সারসপাখির মত লিকলিকে লোকটি—ওঁকে আনা হয়েছে মহীশূর থেকে। বড় যে সে শিল্পী উনি নন। ওঁর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন কর্ণাটক রাজাদের সভাশিল্পী। কাব্বন পার্কের সাপ্তাহিক জলসায় ওঁর বাঁশি শুনে মুগ্ধ হয়ে গেছিলেন জাহানারার মালিক। শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল আমার।

আরও কিছুক্ষণ পরেই সুরু হলো আজকের অনুষ্ঠানসূচীর সবচাইতে বড় আকর্ষণ—বেনারসী নর্তকীর অনবদ্য নৃত্য।

ইন্দ্রনাথ তখন বাঁশি-বাজিয়ের নাম-ঠিকানা নিচ্ছে ম্যানেজারের কাছ থেকে। ইডেন উদ্যানের আগামী জলসায় শিল্পী সংগ্রহের ভার যে ওর ওপর পড়েছে, তা জানতাম না। বাঁশি-বাজিয়েকে নাকি এই জলসায় একান্তই দরকার।

বিনা মতলবে খুড়ি খুড়ি মিথ্যে বলার পাত্র নয় ইন্দ্রনাথ। তাই চুপ করে শুনে যাচ্ছিলাম সবকিছু। কিন্তু এবার আর চুপ করে থাকা গেল না।

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো ও—'এই যাঃ, একদম ভুলে গেছি।

'কি হে, ফিরপোর পার্টির কথা দেখছি তোমরাও ভুলে মেরে দিয়েছো? একেই বলে নাচের মাহাত্ম্য। ওঠো, উঠে পড়ো, আর দেরি নয়। আচ্ছা ম্যানেজার সাব। বহুৎ সুক্রিয়া। আবার আসা যাবে—আজকে আর নয়।'---

বলে, সবে জমে-ওঠা নাচের আসর থেকে একরকম টানতে টানতে দরজার দিকে এগোলো ইন্দ্রনাথ।

অতবড় কক্ষে তখন নৃত্যের দোল লেগেছে; এক রাঙা হাসি শত শত রাঙা অধরে রাঙা নেশার সৃষ্টি করেছে; দুই কাঁকনের রিনিঝিনির সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেছে নূপুর-নিক্কণ—এক আশ্চর্য ঝংকারে মুখরিত হয়ে উঠেছে গোটা ঘরটা। নাচের তালে তালে সমস্ত ঘরটা যেন দুলছে, স্বপ্নের মত অস্পষ্ট হয়ে গেছে বেলোয়ারী আর তসবির—এতগুলো চোখ মন্ত্রমুগ্ধের মত স্থির হয়ে রয়েছে মঞ্চের নৃত্যপরা রাজেন্দ্রনন্দিনীর মত তনুমূর্তিটির ওপর। এ যেন অলকাপুরী থেকে ছিনিয়ে আনা এক স্বপনরূপিণী অলোকসুন্দরীর জীবন্ত চিত্র।

ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালো ইন্দ্রনাথ।

ফুটপাথে দাঁড়াতে না-দাঁড়াতেই যেন ভিসুভিয়াসের চূড়ো উড়ে গেল—ফেটে পড়লো জয়ন্ত।

'ইয়ার্কি হচ্ছে নাকি? কি পেয়েছো আমাদের?'

গলার স্বর খাদে নামিয়ে এনে রহস্যঘন কণ্ঠে জবাব দিলে ইন্দ্রনাথ—'বাঁশি-বাজিয়ের ওপর নজর রাখতে হবে জয়ন্ত, লোক চাই।'

থমকে গিয়ে জয়ন্ত বললে—'উনি আর যাই করেন, মশার চাষ করেন না।'

অসহিষ্ণু গলায় ইন্দ্রনাথ বললে—'প্লীজ হেল্প মি। এক্ষুণি ফোন করে হেডকোয়ার্টার থেকে কাউকে আনাও। তাকে বসিয়ে চলো আমার সাথে। মৃগাঙ্কও যাবে।'

'কোথায়?'

'বাঁশি-বাজিয়ে বিশ্বনাথ দীক্ষিতের বাড়ি। আর কিছু এখন জিজ্ঞেস করো না। আমার অনুমান যদি সত্যি হয়, তা হলে দেখতেই পাবে, কোন্ ধরণের মশার কামড়ে খুন হয়েছেন সত্যেন মল্লিক।'

'খুন' শব্দটির ওপর জোর দেওয়ায় রোমাঞ্চের শিহরণ বয়ে গেল আমার মেরুদণ্ড বেয়ে।'

কসবা অঞ্চলের ছোট্ট একটা একতলা বাড়ির সামনে যখন পৌঁছোলাম, তখন রাত দশটা।

অ্যাসবেসটসের চালু শেড দেওয়া কটেজ প্যাটার্নের বাড়ি। সামনে একফালি বাগান—পেছনে খানিকটা জঙ্গল। জঙ্গলের পেছনে ঝলমলে অত্যাধুনিক কলোনীটার কিছু কিছু আলোয় চমক দেখা যাচ্ছিল গাছপালার ফাঁক দিয়ে।

ফটক খুলে ঘরের সামনে পৌঁছে দেখি ইয়া বড় তালা ঝুলছে দরজায়। অর্থাৎ, বিশ্বনাথ দীক্ষিত একলা মানুষ, ঘরে না থাকলেই ঘর ফাঁকা।

আগে থেকেই তৈরি হয়ে এসেছিল ইন্দ্রনাথ। দাওয়া থেকে সিধে নেমে এল বাগানে। ফুল আর সব্জির গাছই বেশি দেখলাম। টর্চের আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কিছুই দেখতে বাকি রাখলে না ও। এদিক সেদিক দেখতে দেখতে পৌঁছোলো নিরালা এককোণে।

এদিকটায় ফুলগাছ একটিও নেই। যা আছে, তা আমি কস্মিনকালেও দেখি নি। অচেনা একধরণের গাছ—খুব সম্ভব সব্জির।

এইখানেই থমকে দাঁড়ালো ইন্দ্রনাথ। টর্চের আলোয় দেখলাম এক জায়গার মাটি সদ্য খোঁড়া হয়েছে এবং সারির মধ্যে বেশ খানিকটা ফাঁকা। অর্থাৎ, শেকড় সমেত এই নাম না জানা একটি গাছকে সম্প্রতি এখান থেকে উপড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

স্থির চোখে সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে উবু হয়ে বসে পড়লো ইন্দ্রনাথ। পকেট থেকে একটা ছোট ছুরি বার করে হঠাৎ ঝপাঝপ কোপ মারতে লাগল আর একটা গাছের গোড়ায় মাটির ওপর।

(ক্রমশঃ)

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

উনবিংশ প্রবাহ

"এই জেলায় লবণের ব্যবসা আর সব ব্যবসাকেই ম্লান করে দেয়।"

মেদিনীপুর।

বঙ্গোপসাগরের তটবর্তী অতি প্রাচীনকালের জেলা। একদিন বাঙালীর বাণিজ্যের বজরা সমুদ্রের হাওয়ায় সাদা পাল তুলে গতির আনন্দে উত্তাল ঢেউ পাড়ি দিত এই মেদিনীপুরের সুদূর অতীতের বন্দর তাম্রলিপ্ত থেকে। তাম্রলিপ্তের অতীত গৌরবের কথা লেখা আছে বাংলার বাণিজ্যের প্রাচীন ইতিহাসে; লেখা আছে মেদিনীপুরের পুরাকালের ইতিবৃত্তে। তাম্রলিপ্তের কথা আগেও বলা হয়েছে।

তাম্রলিপ্ত তো আজ প্রাচীন ইতিহাসের গবেষকদের কৌতূহল। বাঙালীর পুরাকীর্তিতে অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিতদের চিন্তার বিষয়। এককালের এই সামুদ্রিক বন্দরের ধ্বংসপুরীর পাশেই গড়ে উঠেছে কত নতুন জনপদ... কত নতুন বাণিজ্যকেন্দ্র।

ঘাটাল। চন্দ্রকোণা। রামজীবনপুর। এই তিনটি স্থানের পিতল-কাঁসার কাজ আর খাবারের থালা ও ঘড়া তৈরি করেই অনেক বাঙালী স্বাধীন ব্যবসাকে পুষ্ট করে তুলেছিল। খুব চমৎকার এক ছবি পাওয়া যায় বাঙালীর শিল্প ও ব্যবসা সংক্রান্ত একটি প্রাচীন পুঁথিতে:

'Out of 9000 population in those three villages 4000 are metal workers. The whole village resounds with the beat of hammer and the ball metal' - - -

গ্রাম গ্রামান্তরে হাতুড়ি আর ছেনির শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে বাতাসে ভেসে ভেসে বহুদূরে চলে যেত। শুধু কি পিতলের থালা-বাসন— চীনামাটির কাপ-প্লেটও তৈরি করতো বাঙালীরা। ১৯০৭–৮ সালের হিসাবে দেখা যায় ৪৩১০৬০ মণ শুধু পিতল-কাঁসার ও খাগড়ার বাসন তৈরি হয়েছিল।

অন্যান্য জেলার মতই মেদিনীপুর জেলাতেও রেশমের ব্যবসা বিপুলভাবে সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। অনেক বাঙালী শুধু রেশমের ব্যবসা করেই জীবিকা নির্বাহ করতে পারতো। মহেশপুর, গড়প্রতাপপুর, রামচন্দ্রপুরে একদিন বাঙালীদের অনেক সম্প্রদায় শুধু সিল্কের সুতো তৈরি করেই দুধেভাতে থাকতো। তমলুক মহকুমার ঘাটাল, দাসপুর, আর গড়বেতায় সিল্কের গুটির চাষ হতো রীতিমত।

গুক্কোই আর নুন্দার বিস্তীর্ণ জঙ্গলের গাছে গাছে রেশমের গুটি হতো। যখন রেশমের গুটিগুলো একটু একটু করে পুষ্ট হয়ে উঠতো তখন জঙ্গলের ভেতরটা অজস্র মানুষের

কোলাহলে মুখর হয়ে উঠতো। গাছ থেকে রেশমগুটি তোলার ধুম পড়ে যেত। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের কর্মমুখর জীবনের প্রবাহ আবর্তিত হতো। তারা ধুতি তৈরি করতো, তৈরি করতো শাড়ি। কখনো কখনো কলকাতায় চালান দিত।

তুলো আর উলের ব্যবসার প্রচলনও ছিল এ-জেলায়। প্রায় সব গ্রামেই দেশী সুতো থেকে কাপড় তৈরি করতো তাঁতে। ঘাটালে এই ব্যবসার খুব সমারোহ ছিল।

পাঁশকুড়ায় আর সবাঙে একদিন হাজার হাজার লোক শুধু মাদুর তৈরি করেই পেটের ভাত জোগাড় করতো। গেজেটিয়ারে লিখছে:

Mat-making is carried extensively in the South of the district especially.

এক সময় শুধু পাঁশকুড়ার আর সবাঙেই প্রায় এক হাজার কর্মী আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে মাদুর বুনতো।

কিন্তু এ-জেলার মাদুর, পিতল-কাঁসার, রেশম-তসর, তুলো-উলের ব্যবসাকে ম্লান করে দেয় লবণের ব্যবসা। সমুদ্রতীরবর্তী জেলা। কাঁথির বহু জায়গার জলই লবণাক্ত। বাতাসে লবণের গন্ধ। হাওয়ায় বালি আসে উড়ে উড়ে। অদূরে সমুদ্রের আভাস।

হিজলীর বিস্তীর্ণ প্রান্তরে লবণ ছড়িয়ে পড়ে থাকতো। যেমন ধানের মাঠ ছোট ছোট পুটে ভাগ করা থাকে, ঠিক তেমনি দীর্ঘ তটভূমি জুড়ে ছোট ছোট এলাকায় বিভক্ত হয়ে থাকতো লবণাক্ত ভূমি। এক একটা ভাগকে বলা হতো খালারি ২৩৩ মণ।

শত শত শতাব্দীপূর্বে হিন্দু ও মুসলমান যুগে লবণের ব্যবসার ওপরে শাসনকর্তাদের তীব্র লক্ষ্য ছিল। মুসলমান-শাসনের সময় এক একজন বণিক এই খালারি ইজারা নিত। এই সওদাগরদের উপাধি ছিল মালিক উল তুজ্জার। তাঁরা শুধু লবণের দামটা সরকারের রাজস্ব বিভাগে জমা দিতেন। তারপর লবণটাকে পরিশোধন করার খরচ, পরিবহনের খরচ ইত্যাদি মালিক উল তুজ্জার দিতেন। এই খরচ ও আসল দামটার ওপরে কিছু ধরে বাজারের দাম ঠিক করে বাজারে খুচরো বিক্রি করতেন। সে আমলে একশো মণ লবণের দাম ছিল ষাট টাকা। মালিক উল তুজ্জারের সঙ্গে এই অঞ্চলের জমিদারদের যোগাযোগ ছিল। জমিদাররাও লবণের জমির জন্য ইজারাটা পেতেন।

যে কোন জমিই লবণ তোলার পক্ষে উপযুক্ত হয় না। সমুদ্রের তীরে যে জমির ওপরে ঢেউ খেলে যায় সমুদ্রের জোয়ারের সেই অংশটুকুর লবণ খুব উৎকৃষ্ট হয়। তারপরে প্রখর সূর্যের আলোয় একটু একটু করে সেই ভেজা জায়গাটা শুকিয়ে ওঠে। শক্ত হয়। তারপরে আসতো জমিদারের পাইক-বরকন্দাজ। তাঁরা নিরীক্ষণ করে যেতেন।

জমিদার দেশের চারিদিকে বিভিন্ন মালিক উল তুজ্জারের কাছে লবণের জমির বিশদ বিবরণ দিয়ে নোটিশ পাঠিয়ে দিতেন। মালিক উল তুজ্জারদের অনুচররা মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে খাবলা দিয়ে মাটি তুলে চোখের কাছে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতেন—কতটুকু লবণ—কি রকম লবণ। তারপর—

তারপর যদি পছন্দ হতো তা হলে ইজারার টাকাটা জমিদারদের হাতে তুলে দিয়ে পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে চলে যেতেন। তারপর আসতো কোদাল, আসতো গাঁইতি—আর আসতো তাদের অজস্র বাঙালী কর্মচারী। তারা কেউ খুঁড়তো লবণ, কেউ ভারে ভারে নিয়ে যেত—আবার কেউ শুধু খাতাপত্রে হিসাব রাখা খাজাঞ্চিও ছিলেন।

এই সব মালিক উল তুজ্জারের ভেতর আবার কেউ কেউ ছিলেন একচেটিয়া শুধু লবণের কারবারী। এঁদের বলা হতো ফকুব উল তুজ্জার।

এই লবণের ব্যবসার অতীত ইতিবৃত্ত বলতে বসে দূরকালের একটা ছবি ফুটে উঠছে চোখের সামনে: শত শত বাঙালী প্রকৃতির অকৃপণ দানের উৎস, এই লবণের ওপরে নির্ভর করে জীবিকা অর্জন করছে।

এল ১৭৮১ সন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল এল। তাঁরা বেনিয়া। তাঁরা অভিজ্ঞ চোখে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলের মাটির দিকে তাকিয়ে দেখল, আছে ব্যবসার অফুরন্ত সম্ভাবনা। কাজেই—

যেই দেওয়ানী হাতে এল, সঙ্গে সঙ্গে জমিদারদের বঞ্চিত করে লবণাক্ত মাটির যাবতীয় কর্তৃত্বভার নিজেদের হাতে তুলে নিল। দেশের লোক তখন তাদের লবণের কারখানায় কুলীর মত খেটেছে। নিজেদের কর্তৃত্ব আর ক্ষমতার কথা বিস্মৃত হয়ে গিয়েছে বহু যুগ আগে।

এই জেলার মহিষাদলে, এগরায়, জারীপুরে, গোপীবল্লভপুরে স্থায়ী বাজার সে আমলে খুব উন্নত ছিল। বহু বাঙালী ব্যবসাদারদের দোকান ছিল—আজ যুগের হাওয়ায় বহু অবাঙালী ব্যবসায়ীকে দেখা যাবে এই মেদিনীপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে, দেখা যাবে অনেক কলকারখানার কালো ধোঁয়া। পরিবর্তনমান এই যুগের পটভূমিতে সেই দূর বিগত দিনের তসর ও রেশমের নিপুণ কারিগর এবং লবণের স্বাধীন ব্যবসায়ী বাঙালী আর দেখা যাবে না— (ক্রমশঃ)

মহাকবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বৃত্র-সংহার কাব্য

দাম—দুই টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট

কলিকাতা-১২

'ক্যাই—'

একটা অস্ফুট আর্তনাদ করেই নেড়ী কুত্তিটা মুখ তুলে তাকালো। মৃত পশুটার তৈলপুষ্ট মাংসল চামড়া ভেদ করে সবেমাত্র দুটো দাঁত সে বসিয়েছে। ক্ষুধার্ত দাঁতগুলোর ফাঁকে গালের কস্ বেয়ে একটা লোভার্ত তরল স্বাদ ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। ঠিক সেই মুহূর্তেই প্রবলবেগে নিক্ষিপ্ত একখণ্ড কর্কশ পাথরের আঘাতে আঁতকে উঠল কুত্তিটা।

আতঙ্কিত চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল। বাজ-পোড়া তালগাছটার পিছনে দাঁড়িয়ে একটা লোক গভীর মনোযোগে আর একখানা পাথরের টুকরো তুলছে। লোকটার শীর্ণ চেহারা, রুক্ষ চুল দাড়ির জঙ্গল আর হিংস্র দু'চোখের দৃষ্টি দেখে ভয় পেয়ে গেল কুত্তিটা। শারীরিক সংগ্রামের সব প্রচেষ্টাই যে এখানে নিষ্ফল হবে, সহজেই সে তা অনুমান করতে পারল। কিন্তু এই সহজলভ্য মৃত পশুটার অজস্র তৈলাক্ত মাংসের লোভও তার কাছে প্রচণ্ড। শূন্য জঠরের মধ্যে প্রতি মুহূর্তেই সে একটা দানবীয় পেষণ অনুভব করছে।

ক্ষুধাশান্তির জান্তব আগ্রহে তাই সে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সমস্ত শক্তি নিয়ে মৃত পশুটার দেহের ওপর। হঠাৎ সেই মুহূর্তেই এই অস্বাভাবিক বাধা প্রাপ্তিতে কুত্তিটা বিরক্ত হ'ল। ক্রুদ্ধ হ'ল। চরম জিঘাংসায় নিমেষে সে লোকটার দিকে তাকাতে চাইল ওকে ভয় দেখাবার জন্য। কিন্তু তার আগেই সে সভয়ে লক্ষ্য করল আর একটা প্রকাণ্ড পাথরের টুকরো অমোঘ নিয়তির মত অব্যর্থ সন্ধানে ওর দিকে ছুটে আসছে। অগত্যা আত্মরক্ষার জন্য পলায়নের পথ বেছে নেওয়া ছাড়া কুত্তিটার পক্ষে আর কোনো গত্যন্তর রইল না। নিমেষে নেড়ী কুত্তিটা ওর ক্ষুধাশীর্ণ লোভার্ত দেহটা নিয়ে অদূরে জঙ্গলের মধ্যে ছুটে পালালো।

লোকটা ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো। সতর্ক চোখ মেলে চারদিকটা একবার দেখে নিল ভাল করে। না, কেউ নেই কোনোদিকে। অপরাহ্ণের উত্তপ্ত সূর্যালোকে যতদূর চোখ যায়, শুধু রুক্ষ পোড়া মাঠ ছাড়া আর কোনো কিছুই নজরে আসে না। গ্রাম ছাড়িয়ে বেশখানিকটা দূরে জঙ্গলের পাশে নিরালা মাঠে এই অবেলায় কারো আসাটাই অস্বাভাবিক। তবু লোকটা সতর্ক হল। মৃত পশুর দেহটিকে তুলে নেবার আগে বারবার দেখল চারদিকে তাকিয়ে। তারপর যখন সে ওর গতিবিধির নিরাপত্তা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারল, তখন সেই মৃত খাসীর সুপুষ্ট দেহটাকে এক হ্যাঁচকা টানে কাঁধের উপর তুলে ফেলল।

খাসীটার ভারে ওর দেহটা সামান্য একটু বেঁকে গেল। অসহ্য উত্তেজনায় লোকটার সমস্ত স্নায়ুগুলো যেন প্রবল বেগে আন্দোলিত হচ্ছে। জঙ্গলের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে এবড়ো খেবড়ো মাঠে কয়েক বার হোঁচট খেল সে। প্যাঁকাটির মত দীর্ঘ শীর্ণ হাতের শক্তি দিয়ে মৃত খাসীর দেহটাকে একবার এ-কাঁধ থেকে

জৈব

মহীতোষ বিশ্বাস

ওকাঁধে বদল করল। একটু এগিয়ে যেতেই সে জঙ্গলের সীমানা পেয়ে গেল। বড় বড় গাছের তলা দিয়ে ছোটো ছোটো ঝোপগুলো কখনো বা পাশে সরিয়ে কখনো বা পায়ে মাড়িয়ে এগিয়ে চলল লোকটা। মৃত খাসীর ভারটা যেন ওর কাঁধে আস্তে আস্তে চেপে বসছে।

কপালের দু'পাশে শিরাওঠা রগ বেয়ে ছোটো ছোটো ঘামের ধারা নেমে আসছে। আরো একটুখানি এগিয়ে সে অপেক্ষাকৃত একটু ফাঁকা জায়গায় খাসীটার দেহটাকে নামাল। জায়গাটা দেখলে সহজেই অনুমান করা যায়, অনেকক্ষণ ধরেই সে এখানে আস্তানা গেড়েছে। একটা ময়লা তেলচিটে জীর্ণ চাদর এলোমেলোভাবে ছড়ানো। চাদরটার একটা পাশ কিছুটা উঁচু। বুনো লতাপাতা ওর তলায় গাদা দেওয়া হয়েছে। বোঝা যায়, এটা ওর শয়নকালীন বালিশের কাজ চালায়। লোকটা এবার জোরে একটা নিশ্বাস ছাড়ল। ঘর্মাক্ত কপালের উপর একবার হাতের চেটোটা ঘষল। হঠাৎ খাসীটার দেহের উপর চোখ পড়তেই সমস্ত শরীরে কেমন যেন একটা আতঙ্কের শিরশিরানি অনুভব করল। রোমশ দেহটা সটান হয়ে পড়ে আছে। ঈষৎ ঘোলাটে দু'চোখের নিথর দৃষ্টি মেলে খাসীটা যেন অপলকে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। লোকটা ওর চোখ দুটো সরিয়ে নিল জন্তুটার দৃষ্টি থেকে। ভয়ের একটা অস্পষ্ট অনুভূতি ওর সমস্ত দেহে-মনে মৃদু কম্পন জাগাল। তবুও লোকটি মোটামুটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে। বস্তুত, এত সহজে যে সে কাজ উদ্ধার করতে পারবে, এটা একান্তভাবেই তার ভাবনার বাইরে ছিল।

ফেলে-আসা সমস্ত ঘটনাগুলো ধীরে ধীরে একবার ওর মনের উপর দিয়ে ঘুরে গেল। বিচ্ছিন্ন দুশ্চিন্তাগুলো আর একবার ওর মস্তিষ্কের সমস্ত স্নায়ুগুলোকে উত্তপ্ত করল। খুনী আসামীর জন্য বরাদ্দ জেলখানার সেই স্বল্পতম কদর্য আহার, অমানুষিক পরিশ্রমের পরেও সামান্য ত্রুটির জন্য জমাদারের অকথ্য প্রহার। তারপর কালকের সেই ঘটনা। সান্ত্রীর সামান্য অনবধানতার সুযোগ নিয়ে ভোর রাত্রির আবছা অন্ধকারে জেলখানার ভাঙা পাঁচিলের উপর দিয়ে নিঃশব্দে দেহটাকে কোনোমতে টপকে দিয়েই জনবিরল রাস্তা দিয়ে প্রাণপণে ছুট। তারপর এক সময় সূর্য উঠেছিল। রাস্তায় লোকজনের চলাচল সুরু হয়েছিল। ওর বেশভূষা আর চেহারার দিকে সকলে এক-একবার সন্দিগ্ধ চোখ মেলে তাকিয়েছিল। তারপর যথাসম্ভব দ্রুতবেগে পাশ কাটিয়ে হন্ হন্ করে চলে গিয়েছিল। এ-অবস্থায় ওর পক্ষে লোকালয়ে থাকা যে মোটেই নিরাপদ নয়, সহজেই সে তা অনুমান করতে পেরেছিল। জেলখানার সেই ভয়াবহ দিনগুলোর কথা ওর স্মৃতিকে নাড়া দিল। একটা বীভৎস আতঙ্কে সমস্ত মাথাটা যেন গুলিয়ে উঠেছিল এবং তার-পরেই যথাসম্ভব লোকের সন্দেহ বাঁচিয়ে লোকালয়ের পর্ব ছেড়ে মেঠোপথ ধরে দ্রুতবেগে চলতে সুরু করেছিল।

বেশ কিছুদূর যাবার পর এই জঙ্গলের কিনারায় এসে সে খানিকটা নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিল। এখানে নিরাপদে লুকিয়ে থাকাটা তার পক্ষে কঠিন হবে না। কিন্তু যতই দিন শেষ হয়ে এলো, ততই সে যেন পেটের মধ্যে একটা অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করল। আস্তে আস্তে দিন শেষ হয়ে এলো। জঙ্গলের মধ্যে নেমে এলো সন্ধ্যার অন্ধকার। এখানে ওখানে শেয়ালের দল একযোগে ডেকে উঠলো। পুঞ্জ পুঞ্জ জোনাকীগুলো লতাপাতার ঝোপে-ঝোপে বাসর রচনা করল। বিশাল দৈত্যের মত প্রকাণ্ড গাছগুলো গাসে-গায়ে জড়িয়ে অন্ধকারকে আরো গাঢ়, রহস্যময় করে তুলেছিল।

জঙ্গলের মধ্যে একটা অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গা, চাদরটা বিছিয়ে সেখানেই শুয়ে পড়েছিল লোকটা। কিন্তু পেটের সেই অসহ্য ক্ষুধার যন্ত্রণাটা এবার যেন আরো জোরে পাক দিয়ে দিয়ে উপরে উঠতে লাগল। যন্ত্রণাটাকে ভুলবার জন্য নানারকমভাবে চেষ্টা করল। কিন্তু কোনো ফল হল না। অবশেষে নিজের অজান্তেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। দুশ্চিন্তা আর ক্ষিধের যন্ত্রণায় আচ্ছন্ন হয়ে তালগোল পাকিয়ে কোনোমতে রাতটা কেটে গেল। পরদিন সকালে জেলখানার অভ্যস্ত পরিবেশে শুয়ে আছে এই ধারণা নিয়েই ওর ঘুম ভাঙে। কিন্তু পারিপার্শ্বিকের নতুনত্ব ওকে বিস্মিত করেছিল। একে একে মনে পড়েছিল সব কথা। দু'হাত দিয়ে চোখটা একবার ভাল করে কচ্লে নিয়েছিল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা ভয়াবহ আতঙ্ক তাকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। তার প্রসারিত পায়ের অদূরেই একটা প্রকাণ্ড গোখরো সাপ ফণা বিস্তার ক'রে তার দিকে অপলকে তাকিয়ে আছে। শীতল মৃত্যুর তীব্র আকর্ষণ যেন ওকে অচেতন জড় পদার্থে রূপান্তরিত করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু সে নিমেষমাত্র। বাঁচবার একান্ত আগ্রহে মুহূর্তেই সে তার সমস্ত সম্বিতকে তীব্রভাবে আঁকড়ে ধরেছিল। লাঠির মত গাছের যে ভাঙা ডালখানা ওর পাশে পড়েছিল, সেখানা তুলে নিয়ে সবেগে ছুঁড়ে মেরেছিল। অব্যর্থ লক্ষ্য। হিংস্র গোখরো সাপের উদ্যত ফণাটা লুটিয়ে পড়েছিল মাটিতে। পুনরায় লাঠিটা তুলে দমাদম আঘাত করতে সুরু করেছিল। তারপর এক সময় সাপটার থেতলানো, বিপর্যস্ত দীর্ঘ শরীরটা একেবারেই এলিয়ে পড়েছিল।

অবশেষে গায়ের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে লোকটা জীবন্ত মৃত্যুর শীতলতাকে সবেগে ছুঁড়ে দিয়েছিল গভীর জঙ্গলের মধ্যে। হাঁফাতে হাঁফাতে নিশ্বাস নিয়েছিল কয়েকবার। সদ্যমৃত্যুকে পাশ কাটিয়ে এবার

তাকে কিছুটা উৎফুল্ল দেখায়। মৃত্যু আর ভয়কে বারবার তুচ্ছ করতে পেরে মনের মধ্যে ও যেন খানিকটে সাহস ফিরে পেয়েছিল।

কিন্তু পরক্ষণেই সুরু হয়েছিল আবার সেই যন্ত্রণাটা। তীব্র, তীক্ষ্ণ, অসহ্য। জেলখানার জমাদারের চাবুকের চেয়েও এ-যন্ত্রণা ভয়ানক। লোকটা যেন তখন তার ভবিষ্যতের চেহারাটাকে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিল। কৌশলে সে জেল থেকে পালাতে পেরেছে, অব্যর্থ লক্ষ্যে মৃত্যুর দূতকে সে ফিরিয়ে দিতে পেরেছে। কিন্তু অনাহারের যে দুশ্ছেদ্য জাল তাকে গ্রাস করছে ধীরে ধীরে, তার হাত থেকে সে মুক্তি পাবে কি করে? ধীরে ধীরে একদিন তার উপবাসক্লিষ্ট শরীরটা পাকিয়ে দড়ি হয়ে পড়ে থাকবে এখানে।

জেলখানায় থাকতে তবুও দু'বেলা দু'মুঠো পেটে পড়েছে। কিন্তু এখানে তার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও নেই। লোকালয়ে ফিরে যাবারও সব পথ বন্ধ। জেলখানার উদ্যত হাতকড়া তাকে সর্বত্র অন্বেষণ করে ফিরছে। জীবন্ত, প্রত্যক্ষ মৃত্যু এবার ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে আসছে। সমস্ত সংগ্রামের ঊর্ধ্বে তার ভয়াবহ আত্মপ্রকাশ। ক্রমেই বেলা বেড়ে উঠেছিল। গাছ-পালার ফাঁকে ফাঁকে তার উত্তপ্ত কিরণজ্বালা বনভূমির নিম্নাংশেও দাহ সঞ্চার করেছিল।

হঠাৎই ওর চোখে পড়ে গিয়েছিল দৃশ্যটা। যেখানে সাপটা প্রথম ফণা তুলে দাঁড়িয়েছিল, ঠিক তার পাশেই একটা পাতার উপরে নির্মল শিশির-বিন্দুর মত কী যেন দু' ফোঁটা টলটল করছে। বিস্মিত হল সে। ওর অভিজ্ঞ চোখ চিনতে ভুল করে নি। ক্রুদ্ধ বিষধর সর্প যখন বিশাল ফণা বিস্তার করে ক্রুদ্ধ আক্রোশে মাটির উপর আছড়ে পড়েছিল, তখন তারই দাঁতের ফাঁক দিয়ে ঝরে পড়েছিল ঐ দু' ফোঁটা তরল মৃত্যু।

নিমেষে ওর মাথার মধ্যে বাঁচবার একটা বীভৎস পরিকল্পনা খেলা করে গিয়েছিল। মৃত্যুকে এবার সে জয় করতে পারবে। মৃত্যু দিয়েই মৃত্যুকে জয় করবে। অন্তত ঠেকিয়ে রাখতে পারবে কয়েকদিন। একটা বুনো কচুর পাতা ছিঁড়ে সযত্নে সে সংগ্রহ করেছিল বিষের ফোঁটা দুটো। হিংস্র আনন্দের উত্তেজনায় ওর পেটের সেই অসহ্য ক্ষুধার যন্ত্রণাটা যেন তখনকার মত একটুখানি নরম হয়ে এসেছিল। সূর্যের প্রখর উত্তাপকে অগ্রাহ্য করে মাঠ ভেঙে সে এগিয়ে গিয়েছিল। দ্রুতপায়ে। একেবারে গ্রামের কাছাকাছি চলে এসেছিল। অনেকগুলো ছাগল এখানে ওখানে নিশ্চিন্তে চ'রে বেড়াচ্ছিল। কাছেই একটা নধর খাসী মাথা নীচু করে ঘাস খাচ্ছিল। পরিপুষ্ট মাংসল দেহ। সযত্নে সে এক চাপড় ঘাস তুলে এনেছিল। কচুরপাতার সেই দু'ফোঁটা তরল মৃত্যুকে ভাল করে মিশিয়ে দিয়েছিল সেই ঘাসগুলিতে। কেউ কোথাও আছে কি না দেখে নিয়েছিল একবার। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে ঘাসগুলো ছড়িয়ে দিয়েছিল খাসীটার মুখের কাছে। খাসীটা আগ্রহে মুখ রেখেছিল ঘাস-গুলোর উপরে। সে তখন আর একটুও সেখানে দাঁড়ায় নি। হন্ হন্ করে চলে এসেছিল জঙ্গলের মধ্যে তার পুরোনো আস্তানায়। সারাটা দিন সে প্রবল উৎকণ্ঠা নিয়ে কাটিয়েছিল। বারবার জঙ্গলের বাইরে এসেছিল। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছিল গ্রামের দিকে। বারবারই সে ব্যর্থ হয়েছিল। পেটের মধ্যে উত্তপ্ত সাঁড়াশির চাপে সমস্ত নাড়ীগুলো যেন পিষে যেতে চাইছিল।

অবশেষে বেলা যখন অনেকখানি গড়িয়ে এসেছিল তখন সে আনন্দিত হতে পেরেছিল। কোটরগত শীর্ণ দু' চোখে চরিতার্থতার আলো নেমে এসেছিল। সাগ্রহে সে লক্ষ্য করেছিল দুটো লোক একটা পশুর মৃতদেহ বয়ে নিয়ে আসছে। নিজেকে সে যথাসম্ভব লুকিয়ে রেখেছিল লক্ষ্য করেছিল ওদের গতিবিধি। লোক দুটি পশুটার দেহটাকে খানিকটে দূরে জঙ্গলের পাশে ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল। মৃত দেহের পচা দুর্গন্ধ থেকে বাঁচবার জন্য ওরা যে খাসীর দেহটাকে গ্রাম থেকে দূরে এই জঙ্গলের পাশেই ফেলে যাবে, সে তা আগেই অনুমান করতে পেরেছিল। খাসীর দেহটার দিকে ভাল করে তাকিয়েছিল সে। সদ্য টাটকা বিষের সঙ্গে বেশিক্ষণ ওকে লড়াই করতে হয় নি। সামান্য সময়ের মধ্যেই ওর প্রাণবায়ু বাতাসে মিশে গিয়েছিল। কচি ঘাসের দুটো পাতা তখনো ওর মুখে লাগানো ছিল। খাসিটার এই আকস্মিক মৃত্যুর কোনো কারণই হয়ত কেউ অনুমান করতে পারে নি। সে তাড়াতাড়ি একবার জঙ্গলের মধ্যে ওর আস্তানায় ফিরে এসেছিল। কী যেন খানিকটে ভেবেছিল। তারপরেই খাসীটার দেহটাকে বয়ে আনবার জন্য দ্রুতপায়ে ছুটে গিয়েছিল। কিন্তু গিয়ে দেখেছিল, ওর মধ্যেই একটা নেড়ী কুত্তি এসে জুটেছে। খাসীর পেটের চামড়া ছিঁড়বার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। পর পর দুটো ঢিল ছুঁড়ে মারতেই কুত্তিটা ভয়ে পালিয়েছিল। আর তারপরেই মৃত পশুটাকে সে এখানে বয়ে নিয়ে এসেছিল।

ওর ভাবনায় ছেদ পড়ল। গাছ-পালার ফাঁক দিয়ে সূর্য এখন অনেকখানি নেমে গেছে। আর একটু পরেই অদৃশ্য হয়ে যাবে। লোকটার পেটের মধ্যে সেই যন্ত্রণাটা এখন আরো তীব্রভাবে মোচড় দিচ্ছে। আর দেরি করা চলে না। দুপুরে খুঁজে খুঁজে সে একখানা টিনের টুকরো সংগ্রহ করেছে। পাথরে ঘসে ঘসে তার মাথাটাকে বেশ সুচোলো করে তুলেছে। আপদে বিপদে অস্ত্রের কাজ চালাবে। টিনের ধারালো ফালিটাকে এবার সে শক্ত করে ধরলো। দেহের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে খাসীটার পেটে বসিয়ে দিল। টান টান কালো চামড়া। জোরে চাপ দিতেই দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। দু'হাতে এবার সে দু'পাশের চামড়া ধরে টান দিল।

অনেকখানি চামড়া সরে গিয়ে মাংস বেরিয়ে এলো। থক্‌থকে সাদা মাংস। মসৃণ, পেলব। একটা লোভার্ত আন্তব চীৎকার বেরিয়ে এলো ওর মুখ থেকে। ভবিষ্যতের অন্ধকার ছায়াটা যেন এবার আস্তে আস্তে সামনে থেকে অল্পে অল্পে সরে যাচ্ছে। বাঁচবে। এবার সে বাঁচতে পারবে। টিনের ফালিটা দিয়ে হিঁচড়ে হিঁচড়ে বেশ কয়েক টুকরো বড়ো বড়ো মাংস কেটে ফেললো খাসিটার পেট থেকে। তারপর খাসিটার দেহটাকে সযত্নে সরিয়ে রাখল একপাশে। পাতার আস্তরণ দিয়ে ঢেকে রাখল। পেটের ঐ দুঃসহ যন্ত্রণার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্য এ তার অব্যর্থ অস্ত্র। বেশ কয়েকদিন চলবে, যে পর্যন্ত না খাসীটার দেহ পঁচে দুর্গন্ধ হয়ে উঠবে, ততক্ষণ ঐ মাংস দিয়েই সে তার পেটের অশান্ত অবুঝ রাক্ষসটাকে সামাল দিয়ে রাখতে পারবে। এবার লোকটা শুকনো পাতায় আগুন জ্বাললো। জেলখানার দেশলাইটা এখনো ট্যাঁকে রয়েছে। পালানোর সময় সঙ্গে আনতে ভোলে নি। দাউ দাউ করে শুকনো পাতায় আগুন জ্বলে উঠলো। কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠল আকাশে। আগুনের তেজ বাড়ল। একটা সরু ডালে একখণ্ড মাংস গেঁথে তুলে ধরল আগুনের উপর। সূর্য কখন ডুবে গেছে। চারিদিক নিস্তব্ধ। সেই প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যায় লোকটা একের পর এক মাংসের খণ্ড আগুনে ঝলসে চলল। আগুনের লালচে আভা ওর মুখে এসে পড়েছে। এই মুহূর্তে মানুষের সভ্যতার ইতিহাস যেন অনেক পিছিয়ে এসে থমকে গেল। সভ্যতার প্রাগৈতিহাসিক অধ্যায় যেন এই মুহূর্তে এখানে জীবন্ত রূপ নিল। আগুনের হল্‌কায় নয়, লোকটা যেন ওর নিজেরই ক্ষুধার প্রচণ্ড উত্তাপে মাংসের টুকরোগুলোকে খাবার আগে ঝলসে নিচ্ছে। এক সময়ে আগুন নিভে গেল। তা যাক। সব কটা খণ্ডই ভাল করে ঝল্‌সে নিয়েছে। এবার আহার। অখণ্ড মনোযোগে দাঁত দিয়ে টেনে ছিঁড়ে চিবিয়ে চিবিয়ে টকুরোগুলোকে উদরস্থ করা।

খাবার আয়োজন করল। কয়েকটা বড় বড় পাতা একত্র করে তার উপর মাংসের খণ্ডগুলো সাজালো। আগুনের তাপে মাংসগুলোর উপরে কালচে ছাপ পড়েছে। নিটোল ডেলার মত দেখাচ্ছে। একটা আদিম মানুষের মত লোকটা এবার একটা মাংসখণ্ড মুখের কাছে তুলে ধরল। জিভের গোড়া দিয়ে অজস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালিকা বেয়ে একটা লোভার্ত নোনতা লালা নেমে আসছে অনুভব করল। হঠাৎ সে চমকে উঠল। কিসের একটা কালো ছায়া অদূরে নড়ছে। ভয় পেয়ে গেল লোকটা। শক্ত হাতে বাগিয়ে ধরল গাছের ডালের লাঠিটা। একটু নজর করতেই কিন্তু চিনতে পারল। সেই নেড়ী কুত্তিটা—ওর শিকারে যে আগে এসে ভাগ বসাতে চেয়েছিল। দুটো ঢিলের ভয়েই সে পালিয়ে গিয়েছিল তখন। আবার এসে জুটেছে।

লাঠিটা তুলে ধরল লোকটা। কুত্তিটাকে ছুঁড়ে মারতে মনস্থ করল। কিন্তু লাঠিটা ছুঁড়তে গিয়েও ছুঁড়তে পারল না। কুত্তিটা তাকিয়ে আছে ওর দিকে। জিভটা বেরিয়ে পড়েছে খানিকটে। লোম ওঠা শীর্ণ চেহারা। পেটের অসহ্য ক্ষিধের যন্ত্রণায় কুত্তিটা এক-পা আধ-পা করে এগোতে চাইছে। কিন্তু লোকটার দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়ে যাচ্ছে। এগোতে পারছে না। দুপুরের কথা সে এখনো ভোলে নি। তাই সুযোগের অপেক্ষা করছে। এক-টুকরো মাংস ওর চাই-ই। যেমন করেই হোক যোগাড় করতেই হবে।

এই মুহূর্তে ঐ নেড়ী কুত্তিটার দিকে তাকিয়ে লোকটার মনে কী যেন হল। আস্তে আস্তে লাঠিটা নামিয়ে নিল। ঐ ক্ষুধার্ত শীর্ণ কুত্তিটার ভাগ্যের সঙ্গে তার নিজের ভাগ্যকে যেন সে একাত্ম করে দেখতে পেল। ওর স্বজনদের মধ্যে কোথাও ও ঠাঁই পায় নি। যেখানেই গিয়েছে সকলে দল বেঁধে ওকে তাড়া করেছে। হিংস্র দাঁতগুলো প্রসারিত করে ওর টুঁটিটা ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছে। তারই মতো ঐ কুত্তিটাও তাই বোধ হয় তাড়া খেয়ে পালিয়ে এসেছে। সমাজ, সংসার, পরিচিত আত্মীয়স্বজনের বাইরে এই নির্জন জঙ্গলে এসে আত্মরক্ষা করতে চেয়েছে। বাঁচতে চেয়েছে। কিন্তু সকলের নিকট থেকে পালাতে পারলেও ক্ষুধার অসহ্য দংশনের হাত থেকে রেহাই পায় নি। তারই মতো হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে একটু খাবার, এক টুক্‌রো মাংসের জন্য। কিন্তু যোগ্যতরের উর্ধ্বতনের সংগ্রামে এখানেও আজ দুপুরে কুত্তিটা নির্মমভাবে হেরে গেছে তার কাছে। কিন্তু ক্ষুধার যন্ত্রণা আবার ওকে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে। যেমন করে হোক একটুকরো মাংস ওর চাই-ই।

লোকটা একখণ্ড মাংস তুলে নিল। উঁচু করে ধরল। কুত্তিটার দিকে বাড়িয়ে ধরে চুক্‌ চুক্‌ শব্দে ওকে ডাকলো কয়েকবার। কুত্তিটার সন্দেহ কাটছে না। চোখ পিট্‌পিট্‌ করে এক একবার তাকাচ্ছে। কিন্তু এক সময়ে কুত্তিটা ওর সমস্ত ভয়কে জয় করতে পারল। আস্তে আস্তে কাছে এসে দাঁড়াল। লোকটা মাংসখানাকে নামিয়ে দিল ওর মুখের কাছে। কুত্তিটা এবার সরাসরি লোকটার দিকে তাকাল। সেখানে নির্ভয়ের আশ্বাস পেল। তালশাঁসের মতো জলো চোখ দুটোতে ওর বন্য কৃতজ্ঞতা নেমে এলো।

তারপর দুজনে মিলে সেই মৃত খাসীটার ঝল্‌সানো মাংস দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে চিবিয়ে চিবিয়ে খেলো অনেকক্ষণ ধরে। খাওয়া শেষ হলে লোকটা এসে শুয়ে পড়লো ওর চাদরের বিছানায়। কুত্তিটা একবার ইতস্তত করল। তারপর সে-ও এসে শুয়ে পড়লো লোকটার পায়ের কাছে। লোকটা ট্যাঁক থেকে জেলখানার শেষতম বিড়িটা বার করল। ফস্‌ করে দেশলাই জ্বেলে বিড়িটা ধরাল। হুস্‌ হুস্‌ করে টান দিল কয়েকটা। আরাম করে ধোঁয়া ছাড়ল। তারপর এক সময় হাঁটুটা তুলে দিল কুত্তিটার গায়ের উপর। কুত্তিটা কিছু বলল না। নড়লও না। সোহাগী মেয়েমানুষের মত শুধু একবার আদুরে গলায় ঘড়ঘড়ে আওয়াজ তুলল। সমাজ-সংসারের নিয়ম আর আইনের বাইরে ওরা যেন একটা নিভৃত নীড় রচনা করল।

জঙ্গলের মধ্যে রাত্রির অন্ধকার ঘন হয়ে নামল।

বঙ্গদর্শন

● সমবায় সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

রাজধানী :

শীতের প্রস্তুতিপর্ব চলেছে রাজধানীর সর্বত্র। ভোর হতে না হতেই পাড়ায় পাড়ায় বেরিয়ে পড়ছে ধুনুরীরা। হাঁকছে—'লেপ, তোষক, বালিশ'। যন্ত্রের ছিলার টঙ্কার দিয়ে ঘোষণা করছে তারা শীতের আগমন-বার্তা। দোকানে দোকানে সুরু হয়েছে শীতবস্ত্র কেনা-কাটার পালা। আফিসের বাবুরা আদ্দির পাঞ্জাবীর তলায় সোয়েটার পরতে সুরু করে দিয়েছেন। স্কুলের দিদিমণিরা, আফিসের মেয়েরা ট্রামে, বাসে ও ট্রেনের কামরায় বসে দু'হাতে সোয়েটার বুনতে সুরু করে দিয়েছেন। দক্ষিণের হাওয়া একদম ঘুরে উত্তর থেকে বইতে সুরু করছে।

হাওয়া ঘুরলেও গরীবের অবস্থার পরিবর্তন হয় নি। তাদের কাছে সব ঋতুই অবশ্য সমান। পোষাক-বিন্যাসের কল্পনাও তারা করে না। শীতের দিনে রোদ, আগুন ও তেল তাদের একমাত্র সম্বল। রোদে পিঠ দিয়ে বসে কুঁচো মাছের চচ্চড়ি সহযোগে এক থালা মোটা চালের বাসি ভাত খাওয়ার অধিক সুখ তারা কল্পনাও করে না। খড়ের বিছানায় শতচ্ছিন্ন কাঁথা মুড়ি দিয়ে নিদ্রাসুখ উপভোগেই তারা দীর্ঘকাল অভ্যস্ত। শীতের আধিক্য হলে আগুনের পাশে বসে শরীরটা একটু গরম করে নেয় মাত্র। আজ তারা এই সামান্য দাবিটাও রক্ষা করতে অক্ষম।

দিনান্তে একবেলা যাদের ভাত জোটে না, তাদের পক্ষে বাসি ভাতের আস্বাদন এখন বিলাসিতায় পরিণত হয়েছে। মাছও তাদের নাগালের বাইরে। দু'টাকা কিলোর কুঁচো মাছ কেনার সামর্থ্য তারা হারিয়েছে অনেক দিন।

কাঠের বাজারে আগেই আগুন লেগে আছে। জ্বালানীর মূল্য হয়েছে প্রায় দ্বিগুণ। শুকনো গাছের ডাল ভেঙে আনাও সম্ভব নয়। বাগানের মালী, গাছের মালিক লাঠি হাতে তেড়ে আসে। শীতকালে দেহে একটু তৈল-মর্দন ছিল গরীবের একমাত্র বিলাসিতা। শীতের কাঁপুনি থেকে রক্ষা পাওয়ার এটি ছিল অন্যতম উপায়। কলকাতার শহরে তেলের অভাব নেই। সোজা পথে অবশ্য তা পাওয়ার উপায় নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়াতে পারলে এবং দোকানে শেষ পর্যন্ত তেল থাকলে তিন টাকা নব্বই পয়সায় তেল জুটতে পারে। লাইনে দাঁড়াতে গেলে সারা দিনের মজুরীটাই হারাতে হয়। খোলা বাজারের তেলের দাম জোগানো দিন-মজুরের সাধ্যাতীত। সাড়ে পাঁচ টাকার কমে শহর কলকাতার খোলা বাজারে তেল মেলে না। শীত এবার মেহনতি দিনমজুরের ঘরে অভিশাপ নিয়েই এসেছে।

বড়লোকের কথাই আলাদা। তারা এর মধ্যেই রঙ-বেরঙয়ের পশমের পোষাকে বেশ পাল্টিয়েছেন। শীত এনে দেয় তাদের ভোগ-বিলাসের সুবর্ণ সুযোগ। পোষাকের রকমারি বিন্যাসের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে কলকাতার বনেদি ঘরের, ধনাঢ্য পরিবারের ধনের গরিমা।

দরিদ্র মধ্যবিত্তের ঘরে শীত এ বছর বিপত্তিই ডেকে এনেছে। হাতে-বোনা উলের সোয়েটার, একটি চাদর, বেশি হলে একটি গরম পাঞ্জাবী দিয়েই তাদের শীত কেটে যায়। চার টাকা কিলোর মাছ, চল্লিশ থেকে তেতাল্লিশ টাকা মণের চাল, এক টাকা বারো পয়সা কিলোর আলু এবং এক পো ওজনের কপি বারো আনায় কিনে সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে গিয়ে এমনিতেই তারা হিমসিম খাচ্ছে। মাসের পর মাস দেনার দায় যাদে

বেড়ে। দেনার পরিমাণ বাড়িয়ে 'উল' কেনা ছাড়া তাদের উপায় নেই। নিজের না হোক ছেলেমেয়েদের ডেঙ্গুর কবল থেকে রক্ষার উপায়টা করতেই হয়। কিন্তু বাজার তার আয়ত্তের বাইরে। ষোল টাকার উল তিরিশ টাকায় উঠেছে। অন্যান্য শীতবস্ত্রের দামও প্রায় সমান হারেই বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই বলছিলাম, শীত এসেছে—সাধারণ মানুষের দুর্দশা আরও বেড়েছে।

বঙ্গ-দর্শনের পাঠক-পাঠিকা আমার কথায় নিশ্চয়ই কিছুটা আতঙ্কিত হচ্ছেন। আমি কিন্তু একটুও অতিরঞ্জিত করি নি। আপনারাও তো ভুক্তভোগী। ছেলের পরীক্ষা সামনে। লাইনে দাঁড়াতে পারছে না। তেল, চাল, আটা, ময়দা, গম ও মাছ পেতে হলে লাইনই তো একমাত্র পথ। খাদ্য আপনার ভাণ্ডারে নিয়মিত উঠছে না। তবু সংসার চলছে। বেঁচেও আছি। সত্যি বেঁচে আছি কি না, এ সন্দেহটাও অনেক সময় হয়। কলকাতা করপোরেশনের তদন্তের একটি রিপোর্ট আপনাদের নজরে নিশ্চয়ই পড়েছে। আমরা প্রতিদিন খাচ্ছি অখাদ্য। শুধু অখাদ্য নয়, ক্ষেত্র বিশেষে বিষও ভক্ষণ করছি। এ্যারারুটের নামে যা' কিনছি তাতে এ্যারারুটের কোন বালাই নেই। সাগুতে ভেজাল চলছে শতকরা সাতাত্তর ভাগ। শিশুর প্রিয় খাদ্য লজেন্সের সবটাই ভেজাল। তেল-ডাল-চিনি-গুড় থেকে মশলাপাতি সব ভেজালে ভর্তি। এই ভেজালের জালে যে-টাকা উঠছে সবই কালো টাকা। ধরা পড়েছে সেদিন আমড়াতলার গোলমরিচের দোকানে বস্তাভর্তি লক্ষ লক্ষ টাকা। তা' নিয়ে ট্রামে-বাসে, চলতি ট্রেনের কামরায় বসে সরকারের, দেশের নেতাদের কঠোর ঠিন ভাষায় সমালোচনাও করেছি। তারপর নীরবে, নিশ্চিন্ত মনে ঘরে ফিরে গেছি। ভেজাল খেয়ে, রসিকতার ঢঙে সরকারের সমালোচনা করে এবং করুণার, ভদ্রতার ভণ্ডামী হজম করেই তো আমরা বেঁচে আছি। কাজেই আতঙ্কের কিছু নেই। শীতটাও কায়ক্লেশে কাটাতে পারবো। মরণ যদি আসেই ভাগ্যের দোহাই দিয়ে তাকে বরণ করতেও কুণ্ঠিত হবো না।

* * *

সেদিন সমবায় সপ্তাহের উদ্বোধন করলেন কলকাতার পৌরপ্রধান শ্রীচিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন শুভেচ্ছা বাণীতে চোরাকারবারী ও মুনাফাখোরদের মুখ বন্ধ করার জন্য সমবায় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেছেন। নেতারা গ্রামীণ অর্থনীতিকে দৃঢ়ভিত্তিতে স্থাপনের জন্য সমবায়ের গুরুত্বের কথা ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের যুক্তি অনস্বীকার্য। বছরের পর বছর সমবায় সপ্তাহ সাড়ম্বরে পালন করার পরও পশ্চিম বাংলায় সমবায়ের ভিত্তিতে শিল্প-বাণিজ্য ও কৃষির কোনটাই আশানুরূপ-ভাবে অগ্রসর হয় নি। ভারতে অনেক রাজ্যই এ ব্যাপারে পশ্চিম বাংলাকে হার মানিয়েছে। অথচ পশ্চিম বাংলায় সমবায়ের ভিত্তিতে ছোট ও মাঝারী ধরণের শিল্প ও বাণিজ্য গড়ে তোলার সম্ভাবনা অন্য রাজ্যের চাইতে অধিক। সমবায় সপ্তাহে বিভাগীয় বড়কর্তারা এ সব কথা একটু গভীর-ভাবে, আন্তরিকতার সঙ্গে চিন্তা করলে সমবায় ব্যবস্থা প্রসারের সহায়ক হবে বলেই আমরা মনে করি।

নদীয়া:

কৃষ্ণনগর পৌরসভার শতবর্ষ-পূর্তি উৎসব হয়ে গেল।

১৮৬৪ সালের পয়লা নভেম্বর কৃষ্ণনগর পৌরসভার প্রতিষ্ঠা হয়। প্রথম চেয়ারম্যান হয়েছিলেন মিঃ গ্রে এবং মিঃ এফ্ টি আববল হয়েছিলেন সে বছর ভাইস-চেয়ারম্যান। বিশ বছর একনাগাড়ে বিদেশী সাহেবরা ছিলেন কৃষ্ণনগর পৌরসভার কর্মকর্তা। তখন নির্বাচনের কোন বালাই ছিল না। রায় প্রসন্ন বসু রায়বাহাদুর প্রথম বাঙালী পৌরসভার ভাইস-চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। কৃষ্ণনগর পৌরসভার প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান রায় জে এন রায়বাহাদুর। বর্তমান চেয়ারম্যান প্রবীণ ব্যক্তি। দীর্ঘ সাঁইত্রিশ বছর ধরে তিনি পৌর-সভার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন।

১৯৬১ সালের লোক-গণনা অনুযায়ী কৃষ্ণনগরের বাসিন্দা সত্তর হাজার চার শ' চল্লিশ। ২৯টি ওয়ার্ডে পৌর এলাকা বিভক্ত। পৌরসভার অধীনে দুটি নৈশ বিদ্যালয়, ছ'টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয় রয়েছে। কৃষ্ণনগরে শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ৫৪ জন।

● কৃষ্ণনগর পৌরসভা ভবন

প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে শীগগিরই পৌরসভার সাধারণ নির্বাচন হবে। ভোটার তালিকা প্রণয়নের কাজ চলেছে। নির্বাচনের তারিখ দু-এক সপ্তাহের মধ্যেই ঘোষণা করা হবে।

• • •

বাঁধগুলোর যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে এবং সুইশ গেটের মেরামতি কাজে সরকারের গাফিলতিতে কি ভাবে গ্রামের পর গ্রামের দরিদ্র চাষীর সর্বনাশ হয় তার সংবাদ আমরা প্রায় প্রতি সপ্তাহে একটা করে দিচ্ছি। এই সর্বনাশের হাত থেকে চাষীদের বাঁচাবার জন্য সেচ দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্যের দৃষ্টিও আকর্ষণ করেছি। সরকারী যন্ত্র এখনও অনড়।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য পশ্চিম বাংলাতেও সদাচার

● শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্য

সমিতি গঠিত হয়েছে। কর্তব্য পালনে যারা গড়িমসি করে তাদের জন্য আচরণবিধি সরকার নতুন করে করেন নি। ন্যায় ও নীতিবর্জিত কাজকে দুর্নীতি আখ্যা দিলে, ন্যায়সঙ্গতভাবে যাঁরা দায়িত্ব পালন করেন না তাঁরাও নিশ্চয়ই দুর্নীতিপরায়ণ। পশ্চিম বাংলা সদাচার সমিতির প্রধান অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি। আইনের চুলচেরা বিচার বাদ দিয়ে ন্যায়-নীতি পরিহার করে, কর্তব্যকার্যে অবহেলা করে যাঁরা চাষীর সর্বনাশ ডেকে আনছেন তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থার কথা আমরা সদাচার সমিতিকে ভাবতে অনুরোধ করছি।

নদীয়ার প্রায় পনের হাজার একর জমির আমন ধানের দুরবস্থার প্রতি আমরা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। হাঁসখালির কাছাকাছি ভৈরব-চন্দ্রপুর খালের সুইশ গেটের বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় এই পনের হাজার একর জমির চাষ নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়েছে।

বহু টাকা—পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় করে চূর্ণী নদীর পশ্চিম পাড়ে ১৯৬১ সালে সুইশ গেটটি নির্মাণ করা হয়। এর ওপরই নির্ভর করে এ এলাকার আমন ধানের চাষ। জল নিকাশ ও প্রয়োজনীয় বর্ষার জল জমিতে ধরে রাখাই এ গেটের কাজ। গেট সমেত তিরিশ ফুটের মত লম্বা বাঁধটি নির্মাণের সময়েই স্থানীয় অধিবাসীরা অনেক ত্রুটিবিচ্যুতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁদের কথা কেউ তখন কানে তোলেন নি।

এবারে তিরিশে সেপ্টেম্বর চাষীরা বাঁধের ক্ষতির আশঙ্কা প্রথম করে। সরকারের মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেরাই তখন যথাসম্ভব বাঁধের প্রাথমিক মেরামতের কাজ করে অঞ্চল পঞ্চায়েতকে বিপদের কথা জানায়। পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে গেট খুলে কিছুটা পরিমাণ জল জমি থেকে ছেড়ে দিতে অনুরোধ জানান হয় সরকারী কর্মকর্তাদের কাছে। তাঁরা এসে জল ছাড়ার আগেই বাঁধ ভেঙে মাঠের জল বেরিয়ে গেছে একুশে অক্টোবর রাত্রিতে। সরকার লোক পাঠিয়েছিলেন পয়লা নভেম্বর জল আটকে রাখার জন্য। তখন মাঠ শুকিয়ে চৌচির হয়ে উঠেছে। শুধু ধান নয়, পাটের ক্ষতি হয়েছে প্রভূত পরিমাণে।

স্থানীয় কংগ্রেসকর্মীরা বিষয়টি সেচমন্ত্রীকে জানিয়েছেন। এ ক্ষতির জন্য যাঁরা দায়ী, তাঁদের নৈতিক চরিত্রের দায়িত্ববোধের প্রশংসা কেউ করবেন না। এঁরাও ভ্রষ্টাচারী। এ বিষয়ে সেচমন্ত্রীর বক্তব্যটা পরিষ্কার ভাষায় মানুষ জানতে চাইবে।

• • •

হাঁসখালিতেই সেদিন মন্ত্রীর হাট বসেছিল। এসেছিলেন সেচমন্ত্রী শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্য, পূর্তমন্ত্রী শ্রীখগেন দাশগুপ্ত, স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায়, নদীয়ার সন্তান শ্রীফজলুর রহমান এবং কৃষিদপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রীসুরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচনী অভিযানে। হাঁসখালি (তপশীল) কেন্দ্রের উপনির্বাচন হচ্ছে ডিসেম্বরের ছ' তারিখে। শ্রী পি আর ঠাকুর পদত্যাগ করায় বিধানসভার এ আসনটি শূন্য হয়। গেল বছরের আত্মঘাতী সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার পর মন্ত্রীদের তোয়াজ করতে গিয়ে পুলিশের যে অমানুষিক অত্যাচার চলেছিল নিরপরাধ, নিরীহ [illegible]দের

● শ্রী পি আর ঠাকুর

ওপর তার প্রতিবাদ করতে গিয়ে শ্রীঠাকুর কংগ্রেসের কোল থেকে খসে পড়েছেন। এবারে কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী শ্রীরমেন মল্লিক।

শ্রীমল্লিককে ভোটযুদ্ধে জয়যুক্ত করার অভিযানেই মন্ত্রীরা এসেছিলেন দলবলে। কংগ্রেসের আদর্শ তাঁরা ব্যাখ্যা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীলাল-বাহাদুর শাস্ত্রীর গুণকীর্তন করতেও কসুর করেন নি। মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, দেশপ্রিয়

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সেবার কথাও উদাত্তকণ্ঠে তাঁরা তুলে ধরেছেন জনগণকে। বলেন নি শুধু নিজেরা কে কতটা দেশের জন্য করেছেন। দেশের মানুষ, বিশেষ করে, ঘাটতি জেলা নদীয়ার গ্রামাঞ্চলের মানুষ কেন আজ তেল মোটেই পাচ্ছে না, সরষের তেলের স্থান কেন বাদাম তেল নিয়েছে এবং তার দামও কেন পাঁচ টাকা হয়েছে তার কোন জবাব তাঁরা দেন নি। সেচমন্ত্রী ও কৃষিদপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ভৈরবচন্দ্রপুরের খালের সুইশ গেট পরিচালনায় সরকারী কর্মচারীদের অপরিণামদর্শিতার অনুসন্ধান করেছিলেন কিনা, কেউ বলতে পারেন না।

শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায় মুনাফাশিকারী ও মজুতদারদের চ্যালেঞ্জের কথাটা বলেছেন এবং উৎপাদন ব্যাহত করার দায়িত্বটা কৌশলে 'ভারত বন্ধ' আন্দোলন টেনে একে চাপিয়ে দিয়েছেন বামপন্থীদের ঘাড়ে। চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার জন্য সরকার কি করেছেন, তার উল্লেখ কিন্তু তিনি করেন নি।

হাঁসখালি কেন্দ্রে কংগ্রেসই হয়তো জয়ী হবে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দলের সমর্থন নিয়ে শ্রীবৃজেন সরকার, কমিউনিস্ট প্রার্থী শ্রীনিতাই সরকার, শ্রীযোগেন মণ্ডল এবং শ্রীঅনিল বিশ্বাস। বিরোধী দলের সমর্থকদের ভোট চারজনের মধ্যে ভাগ হয়ে গেলে কংগ্রেসপ্রার্থীর পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে।

চব্বিশ পরগণা ঃ

সুন্দরবনের সীমান্ত এলাকা এখন পাকিস্তানী চোরাকারবারীদের গোপন ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে। জঙ্গলের গোপন পথে গা ঢাকা দিয়ে এরা এসে প্রবেশ করছে স্থানীয় মোড়লদের গৃহে। মোড়লের দল মজা লুটছে দুদিক থেকেই। এদের কেউ কেউ এর মধ্যে খুলনায় গিয়ে হিন্দুদের পরিত্যক্ত জমি ও ঘরবাড়ি দখল করে বিবিদের রেখে এসেছে। মাঝে মাঝে গিয়ে সেখানে তদারক করে আসছে।

ওদিক থেকে এসে যারা অনুপ্রবেশ করছে পশ্চিম বাংলায়, তারাও এখানে এসে ঘরবাড়ি বাঁধতে সুরু করেছে। সেই সঙ্গে চলেছে ব্যাপক চোরাকারবার। স্থানীয় মোড়লরাই এদের সাহায্য করছে নানাভাবে। এদের দাপটে স্থানীয় হিন্দুরা পর্যন্ত প্রতিবাদ করতে ভয় পাচ্ছে। মোড়লদের কেউ কেউ আবার কংগ্রেসের মুখোস ধারণ করেছে।

এদের অত্যাচারে জেলেরা নির্ভয়ে নদীতে মাছ ধরতে পারছে

● শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায়

না। প্রায়ই এদের সাহায্যে পাকিস্তানী নাগরিকরা দ্রুতগামী ছিপ নিয়ে হামলা চালাচ্ছে জেলেডিঙির ওপর। জাল, বাসন-কোসন, চাল-ডাল প্রভৃতি রান্নার সরঞ্জাম লুণ্ঠন করে গা ঢাকা দিচ্ছে। এই জলদস্যুরা সশস্ত্র। এদের সঙ্গে থাকে আগ্নেয়াস্ত্র।

এই জলদস্যুদের শায়েস্তা করা না হলে সুন্দরবনের নদীনালায় মাছ ধরা বন্ধ হয়ে যাবে।

* * *

একটি হাসপাতালের প্রতি আমরা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এ-হাসপাতালটি হাবড়া অঞ্চলে। এমন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে একটি হাসপাতালে কি করে দিনের পর দিন রোগীর চিকিৎসা হচ্ছে তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। হাসপাতালের চারপাশ ঘিরে যেন যমের পেয়াদারা পাহারা দিয়ে চলেছে। সরকারের জমির ওপর হাসপাতালের আশেপাশে বড় বড় খাটাল রয়েছে। এখান থেকে হাসপাতালের রোগীদের দুধ আসে কি না আমাদের জানা নেই। রোগ সংক্রমণের পক্ষে এই হাসপাতালগুলো যে বড় সহায়ক, তা' নিশ্চয়ই স্বাস্থ্য দপ্তরের হোমরাচোমরারা অস্বীকার করতে পারবেন না।

হাসপাতালে বিদ্যুতের কোন ব্যবস্থা হয় নি। অথচ বিদ্যুতের ব্যবস্থার জন্যই আট হাজার টাকার একটি পরিকল্পনা অনুমোদন করা হয়েছে। জনসাধারণের দেয় অংশ দু' হাজার টাকা ব্যাঙ্কে জমা আছে দীর্ঘকাল ধরে। পরিকল্পনা আজও রূপায়িত হচ্ছে না। স্বাস্থ্য দপ্তরের এ-ধরণের গাফিলতি অমার্জনীয়। তাদের কারবার মানুষের জীবন নিয়ে। আমলাতন্ত্রের লাল ফিতায় আর যাই হোক, রোগীর জীবন নিয়ে খেলা অমার্জনীয় অপরাধ। টাকার অভাব থাকলে, হাসপাতাল না খোলাই বুদ্ধিমানের কাজ। হাসপাতালে এসে রোগীর সেবা-শুশ্রূষা হবে না, রাত্রিতে ডাকাডাকি করে রোগীরা কাউকে পাবে না, এ-শ্রেণীর হাসপাতাল থাকার চেয়ে না-থাকাই শ্রেয়।

বর্ধমান ঃ

ভাতের পরই আলু আমাদের প্রধান খাদ্য। আলু সিদ্ধ, আলু ভাজা প্রতিটি আমিষ ও নিরামিষ ব্যঞ্জন আলুবিহীন বাঙালী কল্পনা করতে পারে না। আলু বাঙালীর কাছে অন্যতম অপরিহার্য খাদ্য। শুধু তাই নয়, পরলোকগত প্রখ্যাত চিকিৎসক মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় থেকে আরম্ভ করে এ রাজ্যের নেতারা সকলেই আলু দিয়ে ভাতের

অভাব মেটাতে আমাদের পরামর্শ দিয়ে আসছেন। আলু কিন্তু এদিকে দামের দিক দিয়ে চালকে পেছনে ফেলে প্রতিটি উল্লম্ফনে হার মানাচ্ছে চালকে। গ্রামাঞ্চলে এক টাকায় এক কে-জি চাল মিললে মিলতেও পারে। আলু কোথাও এক টাকা বারো পয়সার কমে বিকোয় না।

সরকার পরামর্শ দিতে, উপদেশ-বাক্য বর্ষণ করতে কোনদিন কুণ্ঠা করেন নি। বাক্যবর্ষণের পর, নিজেদের দায়িত্বের কথাটা বেমালুম ভুলে যান। আলু খাওয়ার উপদেশ দেবার সঙ্গে সঙ্গে বাজারে উপযুক্ত মূল্যে সরবরাহের দায়িত্বটা সরকারের। সরবরাহ বজায় রাখতে হলে বাইরের আলু আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের মাঠে আলুর উন্নত চাষের ব্যবস্থা করে [illegible] [illegible] দায়িত্বও সরকারের। এ [illegible] দায়িত্ব পালনের জন্য চাই [illegible] পরিকল্পনা অনুযায়ী সরেজমিনে কাজের ব্যবস্থা। এ সব ব্যাপারে আমাদের কৃষি দপ্তর একেবারে উদাসীন।

বিনা সারে আলুর চাষ হতে পারে না. গেল বছর মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের জমিতে নাকি অত্যধিক পরিমাণ আলু হয়েছে। জমিতে তিনি সালফেট, সুপারফসফেট কতটা দিয়েছিলেন তার হিসেবটা ঘোষণায় ছিল না। এই সার চাষীর জমিতে পড়ছে না পর্যাপ্ত পরিমাণে। মুখ্যমন্ত্রীর জমিতে রেকর্ড সৃষ্টি করার মত আলু জন্মালেও সারের অভাবে, পোকার আক্রমণে গেল বছর আগের বছরের তুলনায় দু' লক্ষ সত্তর হাজার টন আলু কম উৎপন্ন হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীদের শ্রীমুখের বাণী শুনে বেশি করে আলু খাওয়ার অভ্যাস যাঁরা করে ফেলেছেন তাঁদের সারাটা বছর ধরেই সরকারের ওপর আস্থা স্থাপনের মাশুল দিতে হচ্ছে।

আসছে বছর আলু আরও আক্রা হতে পারে। আলু জন্মায় বর্ধমান ও হুগলীতে। ধানের পরই আলু এ দুটি জেলার প্রধান কৃষিসম্পদ। আগেই বলেছি, আর যাই হোক, বিনা সারে আলু হয় না। এবারে সারের ঘাঁকতি আরও বেশি। রাসায়নিক সারের পাত্তা নেই। সমবায় সমিতিগুলো রাসায়নিক সারের একচেটিয়া ব্যবসাদার। চাষী তাদের কাছ থেকে ফিরে আসছে নিরাশ হয়ে। সমবায় সমিতি অপর্যাপ্ত সরবরাহের অজুহাতে চাষীর চাহিদার এক দশমাংশ দেয় নি।

এ বছর অক্টোবরের শেষের দিকেও বৃষ্টি হওয়াতে আলুর চাষ পিছিয়ে

● শ্রীফজলুর রহমান

গেছে। রাসায়নিক সার না পেয়ে অধিক মূল্য দিয়ে যারা খৈল কিনে আলুর আবাদ করেছিল পোকায় তাও এর মধ্যেই পয়মাল করে দিচ্ছে। মেরারীর চাষীরা চড়া দামে খৈল ও বীজ কিনে রাতদিন মেহনত করে আলু লাগিয়েছিল দু' হাজার একর জমিতে। অঙ্কুরিত হয়ে কচি পাতা বিস্তার করতে না করতে কুঁকড়ে শুকিয়ে যাচ্ছে। এর কারণ খুঁজে না পেয়ে ব্লকের বিশেষজ্ঞের দুয়ার থেকে সুরু করে টালিগঞ্জের কর্তাদের প্রাসাদ পর্যন্ত দৌড়-ঝাঁপ করে আশু প্রতিকার চাষী পায় নি। দিনদশেক পরে ব্রাইটক্স ও ডি-ডি-টি মিলিয়ে প্রয়োগের বিধান পাওয়া গেছে। দেখা যাচ্ছে, আমাদের কর্তারা কথার চাষ যে-পরিমাণ করেন খাদ্যশস্যের চাষের দিকে ঠিক সেই পরিমাণেই উদাসীন।

মেদিনীপুর :

মৎস্যমন্ত্রী শ্রীফজলুর রহমান হেসে-খেলে হাঁসখালির নির্বাচনকেন্দ্রে কংগ্রেসপ্রার্থীর সমর্থনে জোরালো ভাষায় বক্তৃতা করেছিলেন ঠিক সেই সময়টিতে দীঘার উপকূলে ঝাঁকে ঝাঁকে এসে ধরা দিচ্ছে ইলিশ ও অন্যান্য মাছ। মৎস্যমন্ত্রীর ও তাঁর দপ্তরের বড়বাবুদের গুণপনার কথা অনেকবার বলেছি। পরিকল্পনার বহরে তাঁরা সকলকেই হার মানিয়েছেন। কিন্তু পশ্চিম বাংলার মাছের মতিগতি কোনদিনই তাঁদের মগজে ঢোকে নি।

এ সময়ে মাঠের জল নামতে সুরু করে। নদী-নালা বয়ে গিয়ে পড়ে সমুদ্রে। মাঠের জলের চাপে হ্রাস পায় সমুদ্রোপকূলের নদী-নালার জলের লবণের ভাগটা। মিঠে জলের স্বাদ পেয়ে সমুদ্র থেকে বেরিয়ে উজান পথে ইলিশ ও অন্যান্য মাছ প্রবেশ করে নদী ও খালগুলোতে। এ সব কথা, মৎস্যমন্ত্রীর জানা না থাকলে স্থানীয় জেলের সাহায্য নিতে পারতেন। তা তিনি করেন নি।

দীঘার উপকূল থেকে মাছ পাঠাবার জন্য কয়েকটি নৌকো ও আটটি লরি রয়েছে। মাছের মরশুমে এ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়। মাছ আসে এক সঙ্গে বড় বড় ঝাঁকে। ধরা পড়ে প্রচুর। উপযুক্ত পরিবহনের অভাবে মৎস্যজীবীরা পায় না ন্যায্যমূল্য। মানুষের ভোগে আসে না—পচে যায়।

দীঘায় কদিন ধরে মাছ বিক্রি হলো আট আনা থেকে দেড় টাকা কিলো করে। কলকাতার ইলিশ মাছ পাঁচ টাকার কম মেলে না। [illegible] দপ্তরের বাবুরা একটু তৎপর হলেই দীঘার জেলেরা উপযুক্ত দাম পেতো— কলকাতার মানুষ লাইনে না দাঁড়িয়ে বিনা ক্লেশে কয়েক টু[illegible] মাছের আস্বাদের সুখ উপভোগ করতে পারতো।

রঙ্গজগৎ

আমলাতান্ত্রিক কাঠামো থেকে মুক্ত হোক

গত সংখ্যায় লিখেছিলাম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের প্রস্তুতি এখনো আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে আটকে আছে এবং উৎসবের আদর্শবাণী নেই কেন প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলাম। সেই মন্তব্যের সমর্থনে আমি স্টুডিওকর্মীদের কাছ থেকে কয়েকটি চিঠি পেয়েছি। তাঁরা জানিয়েছেন, আঞ্চলিক বা কেন্দ্রীয় কোন কমিটীতেই সিনে টেকনিশিয়ান এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি স্থান পান নি। পশ্চিমবঙ্গে চলচ্চিত্রকর্মী ইউনিয়নের কোন প্রতিনিধিকেও প্রস্তুতি কমিটীতে স্থান দেওয়া হয় নি।

কমিটী গঠনে কোন আদর্শ অনুসরণ করা হয় নি। যাঁরা কমিটীতে স্থান পেয়েছেন তাঁদের অনেকের চেয়ে টেকনিশিয়ান এবং সিনেমাকর্মীরা চলচ্চিত্র-শিল্পের সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনে যুক্ত এবং তাঁরা এই শিল্পের সম্পর্কে অনেক বেশি ওয়াকিবহাল। আন্তর্জাতিক উৎসবের মত এত বড় উৎসবকে সফল করতে হলে এঁদের সহায়তা নিতেই হবে। শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে উপদেষ্টারা শুধু উপদেশ দিয়েছেন, (তাঁদের কারো কারো সম্পর্কে যোগ্যতার প্রশ্নও উঠতে পারে) কিন্তু হাতে কলমে কাজ করে উৎসবকে সফল করেছেন এই কর্মীরা।

এই উৎসবের প্রচারের দিকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একাধিক আন্তর্জাতিক উৎসবে যোগদানের অভিজ্ঞতা আছে এমন সাংবাদিকও প্রস্তুতি কমিটীতে স্থান পান নি। অথচ আন্তর্জাতিক উৎসবের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এঁরাই দিনের পর দিন পাঠকমন তৈরি করেছেন। উৎসবের আর বেশিদিন দেরি নেই। অথচ এখন পর্যন্ত উৎসবের প্রচার ব্যবস্থা একরকম নেই বললেই চলে। পি-আই-বি মারফৎ যে খবর আসে তা সংবাদপত্রের চলচ্চিত্র সম্পর্কিত বিভাগে এসে পৌঁছয় না, সেভাবে তাঁরা পাঠান না। অন্যান্য বারের অভিজ্ঞতায় আমরা আশঙ্কা করছি প্রচার ও ছবি দেখাবার ব্যাপারে আরো বিশৃঙ্খল অবস্থা হবে। এবং শেষ পর্যন্ত উৎসব মুহূর্তে একটা অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে যা উৎসবের মর্যাদার পক্ষে ক্ষতিকারক হবে।

এই আন্তর্জাতিক উৎসব আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের মর্যাদার পরিচায়ক। তাই এই উৎসবকে জনগণের উৎসবে পরিণত করতে হবে চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা গ্রহণ করে। এই উৎসবের মধ্য দিয়ে ভারতের চলচ্চিত্র-শিল্প জনগণের কল্যাণকর, আন্তর্জাতিক মৈত্রী ও মানবিকতার ভাবধারা প্রসারের সহায়ক শিল্পরূপে বিকাশের প্রেরণা লাভ করুক।

—সুজন।

সত্যজিৎ রায়ের 'কাপুরুষ ও মহাপুরুষ' ছবিতে নায়িকা মাধবী মুখার্জী।

চিত্র আলোচনা

দোস্তী
(রাজশ্রী পিকচার্স)

বাংলা ছবি 'লালুভুলু' দর্শকদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় হয়েছিল। টিকিটঘরের আনুকূল্যলাভের দিক থেকে ছবিটি প্রযোজকদের কাছে উল্লেখযোগ্য ছবিরূপে বিবেচিত হয়েছে। 'লালুভুলু'র কাহিনীর একটা শিক্ষামূলক দিক আছে— যাতে বন্ধুত্ব, সহৃদয়তা ও অধ্যবসায়, সর্বোপরি মানবতার দৃষ্টান্ত প্রেরণা সৃষ্টি করে। এরূপ কাহিনীর আকর্ষণ প্রত্যেক কিশোরের কাছে আশা করা যায়। সম্ভবত এই দিকটি বিবেচনা করে রাজশ্রী পিকচার্স লালুভুলুর হিন্দী চিত্ররূপ 'দোস্তী' নির্মাণে অগ্রসর হয়েছেন। আবেদন সৃষ্টি অথবা কিশোরমনে মানবতা ও অধ্যবসায়ের অনুপ্রেরণা জাগানোর দিক থেকে প্রযোজক ব্যর্থ হন নি। এই হিন্দী ছবিটি পরিচালনা করেছেন সত্যেন বসু। তিনি অবশ্য সর্বভারতীয়

দর্শক ও হিন্দী ছবির মেজাজ ও মনোরঞ্জনী দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখে ছবিটি পরিচালিত করেছেন। তাতে কিছুটা অতিরঞ্জন, সোচ্চারভাব এবং স্থূলতা এসে পড়লেও হিন্দী ছবির জগৎ বিবেচনায় সেটা ছবির পক্ষে ক্ষতিকারক হয় নি। বরঞ্চ হিন্দী ছবির দর্শকদের কাছে ছবিটি সমাদৃত হবে আশা করা যায়।

'দোস্তী'র মূল চরিত্র অন্ধ মোহন ও খঞ্জ রামু। ভাগ্য বিড়ম্বনায় দুজন দুদিক থেকে ছিটকে এসে মিলিত হয়েছিল পথের পরিচয়ে, আর এই পরিচয় তাদের গভীর বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল। রামু বাঁশী বাজায়, মোহন গান করে—এইভাবে তারা ভিক্ষা করে বেঁচে থাকে। এই জীবনের মধ্যে তারা পেল এক স্নেহময়ী বৃদ্ধার স্নেহের পরশ; কিশোরী মঞ্জুলার প্রীতি। রামু স্কুলে ভর্তি হয়ে লেখাপড়া শেখে এবং কৃতিত্বের সাথে পাশ করে। এই লেখাপড়ার খরচ চালায় অজ্ঞাতে থেকে মোহন। সাময়িক-ভাবে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ এলেও শেষ পর্যন্ত সকলেই মিলিত হয়, মোহন তার হারানো দিদিকেও খুঁজে পায় হাসপাতালে।

পরিচালক এই ছবিতে হিন্দী ছবির তারকা-প্রথার প্রতি ঝোঁক কিছুটা সংযত করেছেন। এখানে প্রায় সবাই নবাগত এবং নবাগত শিল্পীদের দিয়ে তিনি সাফল্যলাভ করেছেন। রামু, মোহন, মঞ্জুলা, মীনা প্রভৃতি চরিত্রে অভিনয় করেছেন যথাক্রমে সুশীলকুমার, সুধীরকুমার, বেবী ফরিদা, উমা। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন সঞ্জয়, নানাপালসিকর, অভি ভট্টাচার্য।

অনুষ্টুপ ছন্দ

ভিন্নতর স্বাদ ও রোমাণ্টিক মেজাজের ছবি 'অনুষ্টুপ ছন্দ' চিত্রামোদীদের কাছে তরুণ পরিচালক-চিত্রনাট্যকার পীযূষ বসুর সাম্প্রতিক উপহার। গতানুগতিক প্রেম-বিরহ-মিলন বিধৃত ছবি থেকে এ ছবির চরিত্র স্বতন্ত্র। সরোজকুমার রায়-চৌধুরীর ওই নামেরই উপন্যাস চিত্রনাট্যের অবলম্বন।

সদ্য বিলেত-ফেরত ব্যারিস্টার প্রণব মুখার্জী আর তার পল্লীস্বভাবা স্ত্রীর মধ্যে বোঝাপড়ার ফাঁকটুকুতে তার জীবনে প্রাধান্য পেয়েছে আরেক নারী। স্ত্রী সৌদামিনীর চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের বুদ্ধিদীপ্ত প্রাণোচ্ছল মেয়ে সুচরিতা। স্ত্রীর আকস্মিক মৃত্যুর পর প্রণব আর সুচরিতার বন্ধুত্ব আরও নিবিড় ক'রে দুজনের অদৃষ্টকে বেঁধে দিয়েছে। তার ফলে ছেলের বাড়ি ছেড়ে তীর্থবাসিনী হ'তে হয়েছে প্রণবের মাকে। আজীবন কুমারী থাকতে হয়েছে সুচরিতাকে। আর মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতে তিলে তিলে জীবনের আনন্দটুকু হারিয়ে ফেলেছে নায়ক। পরিশেষে তার পুত্র-কন্যাদের সার্থক বিবাহিত জীবনের মধ্যে মাঝে মাঝে সে নিজের জীবনের ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ভুলে গেছে। ব্যারিস্টার

● কলকাতার বেঙ্গল সিনে আর্ট সোসাইটির উদ্যোগে সম্প্রতি নয়াদিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবনে 'নটীর পূজা' মঞ্চস্থ হয়েছে। কেন্দ্রীয় আইন ও সামাজিক নিরাপত্তা মন্ত্রী শ্রীঅশোক সেনের সঙ্গে শিল্পীদের দেখা যাচ্ছে।

● বিশ্বের জনপ্রিয় অভিনেত্রী এলিজাবেথ টেলরকে দেখা যাচ্ছে তাঁর আদরের বিড়াল নিয়ে এক হাসিখুশির মুহূর্তে।

প্রণব যত প্রতিষ্ঠা আর যশ পেয়েছে প্রেমিক প্রণব তত তার আদর্শ আর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে কর্মজীবন থেকে অবসর নেবার সুযোগ চেয়েছে। নায়কের মুখে চোখে বারবার তাই ফুটে উঠতে দেখেছি বিখ্যাত দুটি কথাই—'ভাল লাগে না, কিছু ভাল লাগে না।' তাও সবকিছুর মধ্যেই তার একমাত্র নির্ভর ওই সুচরিতা। যে তার প্রেমের মূল্য মেটাতে নিজেকে বঞ্চিত করে রেখেছে সারাজীবন। শেষ অবধি নানা বাধা ডিঙিয়েও অতিক্রান্ত যৌবনে নায়ক যখন রিক্তচিত্তে সুচরিতার তনুমন-প্রাণের চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়েছে, সুচরিতা ফেরাতে পারে নি তাকে। তবুও চরিত্রের যে উদারতায় নায়ক ছবির সুরু থেকেই আমাদের সহানুভূতি অর্জন করেছিল—তার মায়ের বিদায়-পর্বের পর সুচরিতাকে বিয়ে করবার উদগ্র ইচ্ছে প্রকাশ করে সে সহানুভূতির যেন অনেকটাই হারিয়েছে। কেন না তার মা চলে গিয়েছেন এই কারণেই। তার এ ইচ্ছেকেই অনুচ্চারিত প্রেমের পবিত্রতর আবরণ দিতে সুচরিতা বস্তুত বেছে নিয়েছে তপশ্চারিণীর পথ। দর্শকের সহানুভূতি তাই শেষ পর্যন্ত থেকেছে সুচরিতার ওপর, অংশত তার মৃতা স্ত্রী 'সদু'র জন্যও।

অবশ্য পরিচালকের অসতর্ক ঘটনা-বিন্যাসের জন্য পরিশেষে সুচরিতাকে প্রায় আকস্মিক অর্থেই আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে নায়কের 'বেহিসাবী' বাসনার কাছে। এরজন্য নায়কের পুত্র-কন্যা প্রমুখের কাছে তাকে সইতে হয়েছে লাঞ্ছনা আর তিরস্কার। কিন্তু এত নাটকীয়তা (!) সত্ত্বেও পরিচালক এ-ছবির বিশিষ্ট ভাবটুকুর শেষরক্ষা করতে পারেন নি। তথাচ নায়ক অসুস্থ অবস্থাতে সকলের অনুরোধ উপেক্ষা করে সুচরিতার স্কুলের

মামলার দায়িত্ব গ্রহণের দৃশ্য যোজনায় সফল হ'য়েছেন পরিচালক। ছবির সুরুতে সখি-পরিবৃতা সৌদামিনীকে আমাদের ভাল লেগেছে। দীর্ঘ প্রবাসের পর বাঞ্ছিত দয়িতের প্রত্যাগমনের পূর্বমুহূর্তে লাজনম্র বধূর অনুরাগ প্রস্তুতিটুকু মনে রাখবার মত। বিশেষত সে অনুরাগ যখন প্রাণ পেয়েছে বিরহের উত্তাপে। এমনি আরও কয়েকটি অনির্বচনীয় লাবণ্যময় নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টি করে পরিচালক শ্রীবসু অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবি রাখেন।

এ-ছবির বিশেষ সম্পদ এর অভিনয়। এ-প্রসঙ্গে প্রথমেই সুচরিতার চরিত্রে সুমিতা সান্যালের নাম করতে হয়। যৌবনের রোমাণ্টিকতা, পরিণত বয়সের বেদনাক্লিষ্ট আত্মসমর্পিত ভাব, উচ্চশিক্ষিতা নারীর রুচিবোধ তাঁর বাস্তবধর্মী অভিনয়ে অনবদ্য হয়ে ফুটেছে। নায়কের চরিত্রে বসন্ত চৌধুরী বহুদিন পর যথার্থ ব্যক্তিত্ব আরোপ করতে সক্ষম হ'য়েছেন। তাঁর সংযত মননধর্মী, মর্মগ্রাহী অভিনয় ও মানসিক দ্বন্দ্বদগ্ধ চরিত্রের সঙ্গে তাঁর কমনীয় চেহারার প্রশংসনীয় সামঞ্জস্য ছিল। এ-চরিত্র সৃষ্টির উপযোগী ঐশ্বর্য তাঁর অনিন্দ্য কণ্ঠমাধুর্য। নায়কের স্ত্রীর চরিত্রে নবাগতা অঞ্জনা ভৌমিকের অভিনয়ে সরলতা, অভিমান, আশংকা ব্যক্ত হয়েছে সুন্দরভাবে। তাঁর অভিনয়ের সাবলীল ভঙ্গি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সূচনা করে। অন্যান্য চরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন মলিনা দেবী, লিলি চক্রবর্তী, এন বিশ্বনাথন, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, নবাগতা উপালী গুপ্ত প্রমুখ।

মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীত পরিচালনা প্রশংসনীয়। দিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায় আলোকচিত্র গ্রহণে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। সম্পাদনা, শব্দগ্রহণ ইত্যাদি অন্যান্য বিভাগের কাজ পরিচ্ছন্ন।

সোভিয়েট চলচ্চিত্রের প্রেরণা কোথায়?

(বিদেশী ছবির পর্যালোচক)

লেনিনগ্রাড ফিল্ম স্টুডিওর ডিরেক্টর ইলিয়া কিসেলভ এক সাক্ষাৎকারে সোভিয়েট চলচ্চিত্র নির্মাতাদের প্রেরণার উৎস সম্পর্কে বলেছেন:

সততা, বাস্তবকে প্রকাশ করার নিষ্ঠা, ব্যক্তিমানসকে আন্তরিকতার সাথে তুলে ধরা এবং সমাজ-জীবনে পরিচালনা পদ্ধতি ও নীতি সম্পর্কে পরিষ্কার জ্ঞান ও মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধ আমাদের প্রেরণার উৎস। আদর্শগত এবং কলাকৌশলগত উৎকর্ষসাধন আজ আমাদের প্রধান কাজ। সোভিয়েট চলচ্চিত্র বলতে আমরা বুঝি বছরে ৪০০ কোটি দর্শক এবং দৈনিক এক কোটির অধিক দর্শক। সুতরাং সোভিয়েট চলচ্চিত্র নির্মাতাদের তাঁদের শিল্প সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়, যাঁরা সোভিয়েট ছবিকে ভালবাসেন, পুরস্কৃত করেন এবং তার জন্য গর্ব অনুভব করেন, সেই দর্শকদের প্রতি কর্তব্যের কথা স্মরণ করেন।

আজ আমাদের শিল্পীদের কাছে সবচেয়ে বড় কথা সৃষ্টির আগ্রহ। নতুন ভাব, নতুন পদ্ধতি, নতুন প্রবর্তনের জন্য তাঁরা উঠে পড়ে লেগেছেন। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা ছবির একটা লক্ষ্য থাকবে। ছবি কেবল ছবির জন্য নয়, অথবা কেবলমাত্র মনোরঞ্জনের জন্য হাল্কা জিনিসের সমাবেশ নয়। সোভিয়েট ছবি বলতে আজ আমরা বুঝি নতুন নতুন সৃষ্টিশীল দিকের বিকাশ। সাহসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। অভিব্যক্তি প্রকাশের নতুনতর পদ্ধতি। এবং কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা বা সর্তের আরোপ থেকে মুক্ত অবস্থা। পরিচালক ও চিত্রনাট্যকারের কাজের পক্ষে এই মুক্ত অবস্থাটা অত্যন্ত প্রয়োজন।

লেনিনগ্রাড স্টুডিওতে নিয়ম হয়েছে, চিত্র গ্রহণের পূর্বে পরিচালক তাঁর পরিকল্পনার খুঁটিনাটি সম্পর্কে আলোচনা করবেন। আমাদের এখন নতুন নতুন পরিচালক তৈরি হয়েছেন, নতুন নতুন চিত্রনাট্যক ও লেখকরা কাজ করতে এগিয়ে আসছেন।

● মুক্তি প্রতীক্ষিত 'মহালগ্ন' ছবির একটি দৃশ্যে অনুপকুমার, কল্যাণী ঘোষ ও সুমিতা সান্যাল।

এতে আমাদের চিত্রনাট্যের অভাব মিটে গেছে।

শিল্পী নিজের কাজকে তখনই সার্থক মনে করবেন, যখন তিনি দর্শকদের সৎ জীবনের প্রতি আকৃষ্ট করবেন। তাদের জীবন গঠনে সহায়ক হবেন। ছবি গভীরভাবে জীবন-অনুসন্ধানী না হলে দর্শকদের প্রেরণা দিতে পারে না। গভীর অনুভূতিহীন ছবি দর্শকরা গ্রহণ করেন না। সমসাময়িকতাকে তুলে ধরা সোভিয়েট ছবির প্রধান গুণ। আমরা যথার্থ প্রামাণিকভাবে এই কাজ করতে চেষ্টা করি।

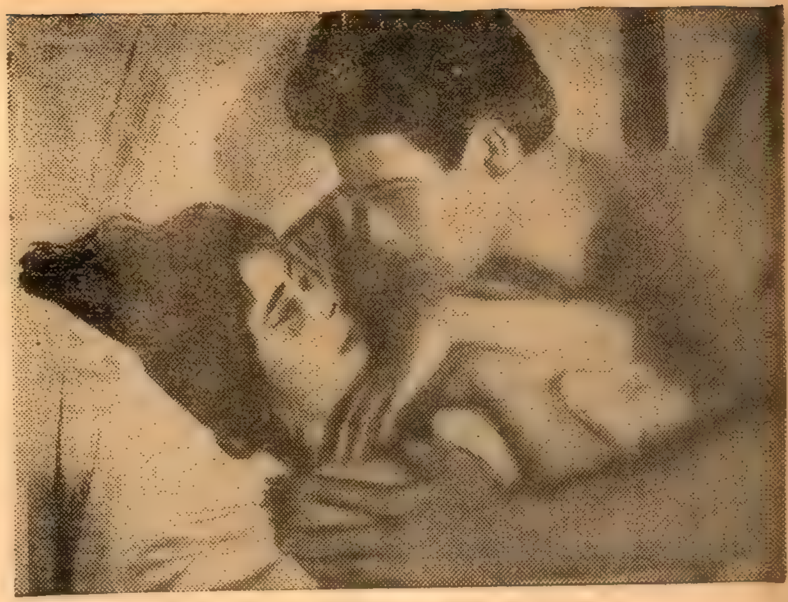

● 'এনাটমি অব ম্যারেজ' একটি চাঞ্চল্যসৃষ্টিকারী ছবিতে নাট ও চ্যারিয়ার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে।

সংবাদবন্ধনা

এনাটমি অব ম্যারেজ

: এক অভিনব ছবি

বিবাহিত জীবন সম্পর্কে কায়াটস্-এর 'এনাটমি অব ম্যারেজ' দুই খণ্ডের চলচ্চিত্র নতুনতর বৈশিষ্ট্যে মুক্তিলাভ করেছে। কোন ছবি ইতিপূর্বে এভাবে মুক্তিলাভ করে নি। মুক্তিলাভের নতুন পদ্ধতি ছবিটির সম্পর্কে ঔৎসুক্য আরো বাড়িয়েছে। ছবিটিকে নিয়ে প্যারিসে রীতিমত উন্মাদনা সৃষ্টি হয়েছে বলা যায়। প্রযোজক-পরিবেশক মুক্তির দিন যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন এখন সেটাই হয়ে গেছে রীতি। রসিকতা করে স্বামী আর স্ত্রী আলাদা আলাদা-ভাবে ছবি দেখে তারপরে আলোচনা করে।

কায়াটস-এর এই ছবির প্রথম খণ্ডের নাম 'মাই ডেজ উইথ জঁা মার্ক'। এক বিবাহিত দম্পতির সাত বছরের অভিজ্ঞতার কাহিনী। এই অংশে দেখান হয়েছে স্ত্রীর দিক থেকে যা বক্তব্য। দ্বিতীয় খণ্ডের নাম 'মাই নাইটস উইথ ফ্রানকোইসা'—একই কাহিনীতে দেখান হয়েছে স্বামীর দিক থেকে বক্তব্য হিসাবে।

ছবির উদ্বোধন অনুষ্ঠানের দিন প্রযোজক-পরিবেশকের পক্ষ থেকে প্যারিসের চারশত সুপরিচিত দম্পতিকে আমন্ত্রণ জানান হয়েছিল (সুপরিচিত বলতে কি বোঝাচ্ছে সেকথা স্পষ্ট নয়)। প্রথমে একটা সিনেমায় স্ত্রীদের দেখান হলো 'ফ্রানকোইসা' এবং স্বামীদের দেখান হলো 'জঁা মার্ক'—অন্য আর একটি সিনেমায়। শো শেষ হলে স্বামী-স্ত্রীদের আবার একসঙ্গে একটা বারে আনা হলো। কিছুক্ষণ পরে আবার ভিন্ন ভিন্নভাবে স্ত্রীদের 'জঁা মার্ক' এবং স্বামীদের 'ফ্রানকোইসা' দেখান হলো। স্বামী-স্ত্রীদের স্বতন্ত্রভাবে ছবি দেখাবার পর আবার তাঁদের একসঙ্গে বসে দুই খণ্ড ছবিই দেখান হলো।

একখণ্ড ছবি দেখার পর স্বামী-স্ত্রীরা নাকি খুব কম কথা বলেছিলেন, কেউ কেউ কোন কথাই বলেন নি। কিন্তু দুই খণ্ড ছবি একসঙ্গে দেখার পর কি হয়েছে, সে খবর আমরা পাই নি।

ছবি দুটি এমনভাবে তৈরি, যাতে একটি খণ্ডের একটা সম্পূর্ণতা পাওয়া যায়। 'জঁা মার্ক'-এ দেখান হয়েছে স্ত্রীর দিক থেকে স্বামীকে। খিটখিট করছে, দোষ ধরছে, ঈর্ষাপরায়ণ, গোঁয়ার ইত্যাদি। 'ফ্রানকোইসা'য় দেখান হয়েছে স্বামীর ধারণার দিক থেকে স্ত্রীকে বিবেচনাহীন, শুধু মনিব্যাগের দিকে নজর, প্রতিবেশীর সুখে ঈর্ষা, অতৃপ্তি, সংকীর্ণমনা ইত্যাদি। কায়াটস্ দুজনের দুইদিক দেখিয়ে—তারপরে সুকৌশলে একটা সিনথিসিস রচনা করেছেন। সেখানে স্বামীর গুণগুলি যা স্ত্রীর চোখে পড়ে না, আর স্ত্রীর গুণগুলি যা স্বামীর চোখে পড়ে না তাকে তুলে ধরেছেন। বিশেষ দুজনের মধ্যে যে পরস্পরের প্রতি গভীর ভালবাসা রয়েছে, নানা ঝগড়া-ঝাঁটির মধ্যেও বাড়ির প্রতি আকর্ষণ, সন্তানের প্রতি দায়িত্ব ও মমতা এবং স্বামী বা স্ত্রীর জন্য মমতা ইত্যাদি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

পরিচালক আজকের ইউরোপের দাম্পত্য জীবন, বিশেষ করে বিবাহ-বিচ্ছেদের অবিশ্বাস্য সংখ্যা বৃদ্ধি এবং তার জন্য সন্তান-সন্ততির

পূর্বভাগের কথা মনে রেখে সম্ভবত ছবিটি করেছেন। স্বামী এবং স্ত্রীর ভূমিকায় ছবিতে অভিনয় করেছেন যথাক্রমে জাকোয়ে চ্যারিয়ার এবং মারি জোসে নাট।

ওয়ার এণ্ড পীস

সোভিয়েট চলচ্চিত্র পরিচালক সের্গেই বন্দরচুক টলস্টয়ের 'ওয়ার এণ্ড পীস'কে চলচ্চিত্রে রূপ দিতে অগ্রসর হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে য়াসনায়া পলিয়ানার টলস্টয় মিউজিয়ামের ডিরেক্টর মিঃ কোসেটেভ বলেছেন: 'সব থেকে বড় সমস্যা হলো নাটাশার চরিত্রে রূপ দিতে পারে এমন অভিনেত্রী জোগাড় করা। যে সুন্দরী নয় কিন্তু চমৎকার, অভিনেত্রী নয় কিন্তু আবেগময়ী, সে কাঁদে যেমন, তেমন হাসেও।' তিন হাজার মেয়ের মধ্য থেকে বাছাই করে এই ভূমিকার জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে—২০ বছর বয়স্কা মিস লুসিয়া সাবেলায়েভাকে। মিস সাবেলায়েভা লেনিনগ্রাডের ব্যালে নাচের স্কুল থেকে সদ্য পাশ করে বেরিয়েছে।

মিঃ কোসেটেভ সম্প্রতি ভারতে এসেছেন। দিল্লীতে তিনি এই ছবির স্থিরচিত্র এক অনুষ্ঠানে দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ছবিতে মস্কোর অগ্নিকাণ্ড দেখাবার জন্য একটা শহর তৈরি করা হয়েছে, যাকে পুড়িয়ে দেওয়া হবে। ছবিটি রুশ ভাষায় তৈরি হবে, সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর আরো বহু ভাষায় 'ডাব' করা হবে।

কোয়ে ভিভা মেক্সিকো

বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্র স্রষ্টা সের্গেই আইজেনস্টাইনের অসমাপ্ত 'কোয়ে ভিভা মেক্সিকো' ছবিটিকে সমাপ্ত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তাঁরই সহকারী গ্রিগরি আলেকজান্ড্রভ। যিনি 'লেনিন ইন সুইজারল্যাণ্ড' নামক প্রামাণিক চিত্র তৈরি করছেন।

স্টুডিও খবর

কে, জি, প্রোডাকসন্স 'কিনু গোয়ালার গলি'র পরে আরো দুটি ছবি করবেন। সে দুটি ছবির জন্য তাঁরা সুবোধ ঘোষের 'কান্তিধারা' এবং 'পাখীর বাসা' গল্প দুটির চিত্রস্বত্ব কিনেছেন।

বন কেটে বসত

ফিল্ম ইউনিট কর্তৃক প্রযোজিত শক্তিপদ রাজগুরুর উপন্যাস 'সন্ধান' ছায়াচিত্রে রূপ পেতে চলেছে। অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় কয়েক দিনের মধ্যেই সুটিং সুরু হচ্ছে। নায়কের ভূমিকায় অনুপকুমার ও নায়িকার ভূমিকায় নবাগত সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায় অংশগ্রহণ করবে। আলোকচিত্র গ্রহণে দিলীপ মুখোপাধ্যায় ও সঙ্গীতে কালোবরণ ঘোষ দায়িত্ব নিয়েছেন। প্রচারে শ্রীগোপাল রায়।

● শুভা ছবিতে শর্মিলা ঠাকুর

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

অর্ধেন্দুশেখরের মৃত্যুর পর গিরিশবাবু মন্তব্য করেছিলেন : অর্ধেন্দু-গুণমুগ্ধ যিনিই থাকুন, যিনিই যত তাহার প্রশংসা করুন, যিনিই যত অন্তর হইতে বলুন, যে অর্ধেন্দু-স্বর্গগত হওয়ায় বঙ্গ-রঙ্গালয়ের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে, তাহাদের অপেক্ষা যদি বেশি না হই, অন্তত আমি তাহাদের সমান অর্ধেন্দুর গুণমুগ্ধ। একথা দম্ভ করিয়া বলিতে পারি।

মোটকথা ম্যাকবেথের অভিনয় হয়েছিল অত্যন্ত উচ্চস্তরের। গিরিশ, অর্ধেন্দু, তিনকড়ির কথা তো সবাই অল্পবিস্তর জানেন, দানীবাবুর ম্যালকম, কুমুদ সরকারের ব্যাঙ্কো, অঘোর পাঠকের ম্যাকডাফ এবং প্রমদার লেডী ম্যাকডাফও সমস্ত দর্শকের প্রশংসা অর্জন করেছিল।

এখানে দানীবাবুর অভিনয় সম্বন্ধে একটা কথা বলা দরকার। এতাবৎ দানীবাবু অভিনয় শিখতেন গিরিশ-শিষ্য অমৃতলাল মিত্রের কাছে। অমৃতলালের কণ্ঠস্বর ছিল অতুলনীয়, সেই জন্যই তার অভিনয় হোত আবৃত্তিপ্রধান। মিনার্ভায় গিরিশ ছেলেকে নিজেই শেখাতে সুরু করলেন। অভিনয়ের সূক্ষ্ম দিকগুলি—যথা চোখের কাজ, অঙ্গভঙ্গী, ভাবাভিব্যক্তি, জেসচার---এসব দানীবাবু আয়ত্ত করতে শিখলেন বাপীর শিক্ষাধীনেই।

লেডী ম্যাকবেথের দুরূহ চরিত্রে অদ্ভুত অভিনয় করে তিনকড়ি শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। আর গিরিশের ম্যাকবেথের তো কথাই নেই---তদানীন্তন কাগজের সব সমালোচনা থেকে দেখা যায়---ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের সঙ্গে তাঁকে তুলনা করা হয়েছে ঐ ভূমিকায়। এমন কি দ্বিতীয় রাত্রির অভিনয়ে বহু ইংরাজ দর্শকও এই ম্যাকবেথ দেখতে এসেছিলেন এবং অভিনয়শেষে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে যান। ভারতবিদ্বেষী 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার সম্পাদক এইভাবে ম্যাকবেথের সমালোচনা করেন :

'The second performance of Macbeth was shown before a large audience including several European gentlemen. Babu Girish Chandra Ghosh, the manager, played the part of Macbeth and the play as a whole was well-rendered. A Bengali Thane of Cawdor is a living suggestion of incongruity but the reality is an 'astonishing' reproduction of the standard convention of the English stage.'

8th February 1893.

কৃষ্টিসম্পন্ন দর্শকের প্রচুর প্রশংসা লাভ করলেও সাধারণ লোকে কিন্তু এ নাটক নেয় নি। দশরাত্রি অভিনয়ের পর ম্যাকবেথের প্রদর্শনী বন্ধ করতে হয়।

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ও হাইকোর্টের বিচারপতি—তিনি ছিলেন স্কুলে গিরিশচন্দ্রের সহপাঠী। এই প্রথম গুরুদাসবাবু থিয়েটার দেখতে এলেন। ম্যাকবেথের সাফল্যমণ্ডিত অভিনয় দেখে স্যার গুরুদাস মোহিত হয়ে যান এবং মন্তব্য করেন :

To translate the inimitable language of Shakespeare is a task of no ordinary difficulty, but Babu Girish Chandra Ghose has performed that task very creditably on the whole, and his translation is in many respects quite worthy of the original.'

প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরাজী ভাষার বিখ্যাত অধ্যাপক শ্রী এন ঘোষও বলেছিলেন যে, গিরিশচন্দ্রের ম্যাকবেথের অনুবাদ ঐ নাটকের ফরাসী অনুবাদের থেকে অনেক বেশি ভাল হয়েছে।

ম্যাকবেথের পর মুকুলমুঞ্জরা, আবুহোসেন, সপ্তমীতে বিসর্জন, জনা, বড়দিনের বখসিস, স্বপ্নের ফুল, সভ্যতার পাণ্ডা, করমেতিবাঈ, ফণীর মণি, পাঁচকনে প্রভৃতির অভিনয়ে মিনার্ভা প্রচুর পয়সা পায়।

মুকুলমুঞ্জরায় দানীবাবুর মুকুল, তিনকড়ির তারা এবং মুস্তাফি সাহেবের অহিফেনসেবী বরুণচাঁদ দর্শকদের বিমুগ্ধ করে দিয়েছিল। আবুহোসেন মঞ্চস্থ হয় ১৮৯৩ সালের ২৫শে মার্চ। এটি একটি হাস্যরসাত্মক তরল নৃত্য-গীতবহুল মেলোড্রামা। হাস্যরসিক অভিনেতা হিসেবে আবুহোসেনের ভূমিকায় অর্ধেন্দুশেখর তাঁর প্রতিভার চরম বিকাশ দেখিয়েছিলেন। রোসেনা হিসাবে হরিমতীর গান সবাইকে মুগ্ধ করেছিল। তিনকড়ির দাইও খুব ভাল হয়েছিল।

গিরিশচন্দ্রের বিখ্যাত নাটক জনায় তিনকড়ি এবং দানীবাবু জনা ও প্রবীরের ভূমিকায় অদ্ভুত অভিনয় কৌশল দেখিয়ে বঙ্গরঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, অভিনেত্রী হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেন। আমাদের রঙ্গমঞ্চে তিনকড়ির মত রূপসী অভিনেত্রী খুব কম দেখা গেছে—টানা টানা চোখ, লম্বা চেহারা, মধুর গাম্ভীর্যপূর্ণ কণ্ঠস্বর, আর ভাবাবেগভরা বাচনভঙ্গী---অভিনয় করতে গেলে যা কিছু দরকার, সব সম্পদই তিনকড়ির ছিল ঈশ্বরদত্ত। পরে আরও অনেক নামকরা অভিনেত্রী, যথা—তারাসুন্দরী, প্রকাশমণি,

দুর্গীলাসুন্দরী প্রভৃতি জনার ভূমিকায় নেমে নাম করেছেন। কিন্তু তিনকড়ির জনার হাইটে আজও পর্যন্ত কেউ উঠতে পারেন নি। আজও অবধি বলতে শিশিরযুগ পর্যন্তই mean করছি। শিশিরোত্তর যুগের নবনাট্যাচার্যেরা তো এসব বইতে হাতই দেন না। এক হিসাবে এই বোধ হয় ভাল, কারণ নবনাট্যসম্রাজ্ঞীরা জনা চরিত্রের রূপায়ণে হয়তো যোকাষ্টা কমপ্লেক্সের সৃষ্টি করতেন অভিনয়ে—আর হিস্টিরিয়া রোগাক্রান্ত আধুনিক জনার তীক্ষ্ণ চিৎকারে দর্শকদের প্রাণান্ত হোত।

প্রবীরের মৃত্যুর পর প্রতিহিংসার যে ভয়াল রূপ তিনকড়ি দেখাতেন, শোনা যায়—ঐ ভূমিকায় অন্য কোন অভিনেত্রী তার ধারে কাছে যেতে পারেন নি।

বিদূষকের ভূমিকায় মুস্তাফি সাহেব নাম করেন—কিন্তু চার রাত্রি পরে তিনি মিনার্ভা ছেড়ে এমারেল্ডে চলে যান। তখন ঐ ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র স্বয়ং নামেন। গিরিশচন্দ্রের অভিনয়েই রোলটিতে depth আসে। এর কারণও আছে—বিদূষকের চরিত্রের ভেতর অন্তর্নিহিতভাবে যে ভক্তিরসের ভাবটা আছে, সেদিকটাকে মুস্তাফি সাহেব অগ্রাহ্য করতেন আর গিরিশবাবুর অভিনয়ে সেটা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে প্রকাশিত হোত।

১৮৯৫ সালের ১৮ই মে গিরিশচন্দ্রের ভক্তিরসমূলক নাটক করমেতিবাঈ মঞ্চস্থ হয়। করমেতির ভূমিকায় তিনকড়ি ভাল অভিনয় করতে না পারায় তার দুর্নাম হয়—আসল কথা করমেতিবাঈর ভক্তির ভাবটা তিনকড়ি ফোটাতে পারেন নি। কয়েক রাত্রি অভিনয়ের পর তিনকড়ি হঠাৎ থিয়েটার ছেড়ে চলে যায়। গিরিশচন্দ্র পড়লেন মহাবিপদে। এ সময়ে তারাসুন্দরী এসে করমেতির ভূমিকা করায় গিরিশবাবুর মানরক্ষা হয়।

নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী

দেবনারায়ণ গুপ্ত

তিপাত্র
দর্শক নাট্যাচার্য

মনোমোহন থিয়েটারে টিকিট কিনে অভিনয় দেখতে এসেছেন নাট্যাচার্য শিশিরকুমার।

সেদিন 'মীরাবাঈ' আর 'সরলা' নাটকের অভিনয় ছিল। মনোমোহন থিয়েটারে। 'সরলা' নাটকে দানীবাবুর গদাধরচন্দ্রের অভিনয় দেখার বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই সেদিনের অভিনয়-আসরে উপস্থিত হয়েছিলেন শিশিরকুমার।

প্রেক্ষাগৃহে দর্শকের আসনে শিশিরকুমারের উপস্থিতির কথা চাপা রইলো না। অচিরেই সে খবর গিয়ে পৌঁছলো সাজঘরে। দানীবাবু ডেকে পাঠালেন শিশিরকুমারকে। দানীবাবুর অনুরোধে শিশিরকুমার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন সাজঘরে। দুই দিকপাল অভিনেতার মধ্যে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা বিনিময় হোল। শেষে দানীবাবু শিশিরকুমারের টিকিটটি চেয়ে নিয়ে বুকিং অফিসে পাঠিয়ে দিয়ে জানালেন—টিকিটের দাম রিফাণ্ড ... তার বদলে ভাল আসনের পাশ লিখে দিতে। শিশিরকুমার আপত্তি জানাতে কসুর করলেন না। কিন্তু কে কার কথা শোনে? বাধ্য হয়ে দানীবাবুর অনুরোধে শেষ পর্যন্ত শিশিরকুমারকে টিকিটের দাম ফেরত নিতে হোল।

তখনকার দিনে অধিক রাত্রি পর্যন্ত থিয়েটার হোত। প্রথম নাটক ছিল 'মীরাবাঈ' পরে 'সরলা'। নাট্যাচার্য 'সরলা' নাটকের অভিনয় দেখলেন। অভিনয় যখন শেষ হোল তখন মধ্যরাত্রি। শিশিরকুমার দানীবাবুর অভিনয়দর্শনে মুগ্ধ। সাজঘরের দিকে পা বাড়ালেন। মনোমোহন থিয়েটারের জনৈক কর্মচারী তাঁকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানিয়ে দানীবাবুর কাছে নিয়ে গেল। দানীবাবু তখন মেকআপ তুলছিলেন। দরজার সামনে শিশিরকুমারকে দেখে স্বাগত জানালেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন লাগল?

—অপূর্ব। আপনার গদাধরচন্দ্রের কথা শুনেই আসছিলাম এতদিন। আজ তা প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য হোল। ভেবেছিলাম, 'সরলা' স্টেজ করবো এবং ইচ্ছে ছিল গদাধরচন্দ্র সাজবো। কিন্তু সে সাধ আপনার এই অভিনয় দেখার পর আর আমার নেই। আপনি অদ্বিতীয় গদাধরচন্দ্র।

নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের প্রশংসায় দানীবাবুকে তখন বারবার এই কথাই বলতে শোনা গেল—না, ঠাকুর না, তুমিও পার। ইচ্ছে করলে তুমি সব পার। কত বড় পণ্ডিত তুমি—এই গদাধরকে তুমি অন্য রূপ দিতে পার।

গ্রন্থ মেলা

পূর্বপারের রূপকথা : ধীরেশ ভট্টাচার্য । প্রকাশক : অভিপ্রকাশ : ৭৬-২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলকাতা-৬, মূল্য : দু' টাকা পঞ্চাশ পয়সা ।

উপন্যাসিক শ্রীধীরেশ ভট্টাচার্য তাঁর আঙ্গিক নৈপুণ্যের অভিনবত্বে পূর্বপার কিংবা পূর্ববঙ্গের সুদূর গ্রামীণ তৃতীয় শ্রেণীর ধীবরবংশী দুর্ধর্ষ প্রকৃতির মানুষের সমাজ-জীবনকে আশ্রয় করে গড়ে তুলেছেন 'পূর্বপারের রূপকথা' উপন্যাসের কাহিনীর দৃশ্যপট।

বর্তমান সমাজ-জীবনে শিল্পি-মানস বহু তীক্ষ্ণ ও বহু নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন বলেই গতানুগতিক ভাবধারার সমন্বয়ের স্রোতে অনেকেই ভাসতে নারাজ। আলোচ্য উপন্যাসের লেখক এই গতানুগতিকতা পরিহার করে পূর্ববাংলার অতি সাধারণ মানুষের সমাজ-জীবনের যে সুস্থ-শোভন সুন্দর কাহিনীকে তুলে ধরেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ।

নায়ক কাঙালী তার ছবিঘরে পিঙ্গলাকে সযত্নে তুলে রেখে দিয়েছিলো, সকল প্রকারের ঝড়ের হাওয়া থেকে তাকে শুচিশুদ্ধ করে রেখে দিয়েছিলো জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। দেহাশ্রয়ী প্রেমকে হাসিমুখে জয় করে নায়ক-নায়িকার চরিত্র মহৎ প্রেমের কাছে উৎসর্গীকৃত। যন্ত্রণাও তাই স্বাভাবিক। ভুল বোঝাবুঝির পালাও সেখানে নিতান্ত কম। সামাজিক নিয়মের টানা-পোড়েনে পিঙ্গলা হৃদয়মনের সমস্ত অনীহা সত্ত্বেও পাতয়ে বরণ করতে হয়েছিলো ছ' কুড়ি টাকার অলঙ্ঘ্য বন্ধনের পঞ্চাশোর্ধ শীতল মণ্ডলকে। বিবাহিত জীবনে পিঙ্গলা কোথাও এতটুকু শান্তি খুঁজে পায় নি। পায় নি তার মনের মানুষকে। কাঙালীও ভেসে চলল অশান্ত হৃদয়-সমুদ্রের প্রতিটি তরঙ্গমালাকে আঁকড়ে ধরে। শ্রীদামের কন্যা পুষ্প কাঙালীর অশান্ত হৃদয়-সমুদ্রে কিছুটা শান্ত সৈকত এনে দিতে চাইলো।

কিন্তু কাঙালীর অন্তরবেদনাও খুঁজে পেলো না কোথাও শান্তির ইসারা। কাঙালী অথৈ সমুদ্রের ঢেউয়ে ভেসে ভেসে একদিন আবার সৈকতভূমিকে খুঁজে পেলো নীড়-রচনার আকুল বাসনায়।

জয়ন্তী সেন

নারী-জীবনের শেষ সম্মানটুকু বজায় রাখতে না-পারার বেদনায়, কাঙালীকে গ্রহণ করার প্রবল ইচ্ছে সত্ত্বেও কাঙালীর বিড়ম্বিত পবিত্র জীবনকে স্পর্শ করার অনধিকার জেনেই পিঙ্গলা অথৈ জলে নিমজ্জিত হোলো। এই ভাবেই একটি করুণ বিয়োগান্ত পরিণতিতে কাহিনীর পরিসমাপ্তি।

তালপাতার বাঁশি : প্রলয় সেন। প্রকাশক : প্রতিমা পুস্তক। ১৩, কলেজ রো, কলকাতা-৯, মূল্য : দু' টাকা।

পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রলয় সেনের অনেক গল্পই ইতিমধ্যে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মোট এগারোটি গল্প স্থান লাভ করেছে আলোচ্য গ্রন্থটিতে। সময়ের হেরফের বশত অনেক গল্পে দৃষ্টি-ভঙ্গির বিভিন্নতা উপস্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও গল্প বলার আশ্চর্য কৌশলটি লেখকের আয়ত্তে থাকায়, প্রতিটি গল্পের নিজস্ব মনোভংগী আশ্চর্যভাবে পাঠক-হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়।

বর্তমান সমাজ-জীবনের অনেক করুণ ঘটনা বিন্যাস ও কাহিনীর চরিত্রে সুন্দরভাবে ধরা দিয়েছে। মধ্যবিত্ত ক্ষয়িষ্ণু মানুষের জীবন-কাহিনী অনেক গল্পেই সুন্দর ও যুক্তিযুক্তভাবে স্থান লাভ করেছে, 'তালপাতার বাঁশি', 'শীতের বেলায়', 'ধ্রুবপদ' প্রভৃতি গল্পের মধ্যে দিয়ে। ভাষা কোথাও আড়ষ্ট নয়। বাঁধাই মনোরম। সর্বাঙ্গসুন্দর বইটিতে ছাপার দিকে যত্ন নেওয়া বিশেষ প্রয়োজন ছিলো।

সমাচার : সম্পাদনায় : অনিল ভট্টাচার্য, কল্যাণব্রত চক্রবর্তী। সমাচার প্রকাশনী, আগরতলা। মূল্য : ১·৫০ পয়সা।

আলোচ্য পত্রিকাটির শারদীয় সংখ্যা অনায়াসে পাঠকমন আকৃষ্ট করবে। প্রবন্ধগুলি মূল্যবান। একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস ছাড়াও গল্প, কবিতা, স্কেচ রয়েছে। নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, চিদানন্দ গোস্বামী, মনুশঙ্কর দাশগুপ্ত, সুশীল রায়, দুর্গাদাস সরকার, শক্তিব্রত ঘোষ প্রমুখের রচনা উল্লেখযোগ্য।

গাবতলা লেন সর্বজনীন দুর্গোৎসবের পুস্তিকাটি শোভন ও সুন্দর। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, দুর্গাদাস সরকার, সুশীল রায়, সুধীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা উল্লেখযোগ্য। সম্পাদনা করেছেন মুকুল সভেঘর পক্ষে তাপস চট্টোপাধ্যায় ও সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়।

৭৫ পল্লী খিদিরপুরের পূজা পুস্তিকাটি আকর্ষণীয়। সম্পাদনা করেছেন দেবব্রত সেন। এতগুলি রচনার সমাবেশ খুব কম পূজা পুস্তিকাতেই দেখা যায়। খ্যাতিমান লেখকদের রচনা এর বৈশিষ্ট্য। প্রেমেন্দ্র মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী, প্রমথনাথ বিশী, নরেন্দ্র দেব, কুমুদরঞ্জন, কালিদাস রায়, হরপ্রসাদ মিত্র এবং দুর্গাদাস সরকার আরো অনেকের রচনা আছে :

বাংলা ও অন্ধ্রপ্রদেশ দলের খেলায় একটি উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্ত

জাতীয় ফুটবল

জাতীয় ফুটবলের আসরে এবার একটি নতুন নিয়ম চালু করা হয়েছে। সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত দলগুলিকে একই দলের সঙ্গে প্রথম পর্ব এবং দ্বিতীয় পর্বের খেলায় দুবার মিলিত হতে হবে। শেষে গোলের গড়পড়তায় বিজয়ী দল উন্নীত হবে ফাইন্যালে।

দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলায় মাদ্রাজ প্রথম দিন রাজস্থানের সঙ্গে ১-১ গোলে খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করে দ্বিতীয় দিন ৩-১ গোলে বিজয়ী হয়। কোয়ার্টার ফাইন্যালে মাদ্রাজ বাংলার সম্মুখীন হয়। গতবার বাংলা ১-০ গোলে পরাজয় স্বীকার করেছিল মাদ্রাজের কাছে। এবার গৌহাটিতে বাংলা মাদ্রাজকে ১-০ গোলে পরাজিত করে পূর্ব পরাজয়ের যোগ্য প্রতিশোধ গ্রহণ করল।

সার্ভিসেস দলকে কোয়ার্টার ফাইন্যালে ৩-১ গোলে পরাজিত করে, অন্ধ্র সেমি-ফাইন্যালে বাংলা দলের কাছে প্রথম পর্বের খেলায় ১-০ গোলে পরাজিত হয়েছে। ভারতীয় রেল দল পাঞ্জাবকে ৩-০ গোলে পরাজিত করে সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হয়। সেমি-ফাইন্যালে রেল দল গতবারের বিজয়ী মহারাষ্ট্রকে প্রথম পর্বের খেলায় ১-০ গোলে পরাজিত করেছে। রেল-দলের সেণ্টার ফরোয়ার্ড অসীম মৌলিক দুটি খেলারই বিজয়সূচক গোলদাতা।

ময়দানী সংবাদ

মোহনবাগানের প্লাটিনাম জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে কলকাতায় দুটি আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। একটি হল অলিম্পিক প্রত্যাগত জার্মান এ্যাথলেটিকস দলের সঙ্গে ভারতীয় দলের একটি এ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা। অন্যটিতে টোকিও

শ্রীঅমিতাভ

অলিম্পিক বিজয়ী ভারতীয় হকি দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন মোহনবাগান দলের সঙ্গে।

এ্যাথলেটিক্স্ প্রতিযোগিতাটিতে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই তেমন ঘটে নি। দু-একটি বিষয়ে ভারতীয় এ্যাথলেটরা জার্মানদের পরাজিত করতে পেরেছে। অন্যান্য বিষয়ে আগন্তুকদের ছিল একচ্ছত্র প্রাধান্য।

মোহনবাগান বনাম ভারতীয় একাদশের খেলাটিতে মোহনবাগা[ন] ৩-০ গোলের ব্যবধানে পরাজিত হয়ে[ছে] সত্য, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা তী[ব্র] প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। মোহনবাগা[নের] তিনজন নির্ভরযোগ্য ফরোয়ার্ড অং[শ] গ্রহণ না করায় মোহনবাগানের দলী[য়] শক্তি অনেকাংশে খর্ব হয়। মা[ঠে] উপস্থিত প্রায় দশহাজার দর্শক সেদি[ন] সত্যই এক আকর্ষণীয় এবং চিত্তাকর্ষ[ক] খেলা দেখার সুযোগ পেয়েছে।

মোহনবাগানের একটুকরো ইতিহাস

ময়দানের পাশ দিয়ে গেলে[ই] আপনার চোখে পড়বে নানা রঙের নানা বর্ণের ক্লাব পতাকা পতপত ক[রে] উড়ছে। একটু নজর করে দেখলে[ই] দেখতে পাবেন---গঙ্গার দিকে ইডেনের সু-উচ্চ দেবদারু আর ঝাউয়ের সারি[র] এক পাশে মেরুন-গ্রীন রঙের এক ক্লা[ব] পতাকা বহন করে চলেছে খেলাধূলার এক সুদীর্ঘ ঐতিহ্যপূর্ণ ইতিহাসের ধারা। এই পতাকার পরিচয় দিতে হয় না, কারণ বাংলার আবাল-বৃ[দ্ধ] বনিতার অন্তরের মণিকোঠায় মোহন[-]বাগানের স্থান।

মোহনবাগান নামের দুর্বার আকর্ষণ টেনে আনে অগণিত ক্রীড়ামোদীকে শ্যামল ঘাসের বুকে। উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ, বয়সের সীমা সমস্ত কিছুই তখন অন্তর্হিত হয়; ধনী-দরিদ্র, বালক-বৃদ্ধ যুবা একই সুরে সুর মিলিয়ে, পরস্পরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দুচোখ ভরে নিঃশেষে পান করে খেলার মাধুর্য। মোহনবাগানের জয়ে এরা উল্লাসে, আনন্দে আত্মহারা হয়; আর ঠিক তেমনি দলের পরাজয়ে দুঃখে এদের মন ভেঙে পড়ে। মোহনবাগানের এই মোহময় আকর্ষণ আজকের নয়, এর সৃষ্টি বা জন্ম হল বিংশ শতাব্দীর চলার গতির সাথে সাথে, ১৯১১র ঐতিহাসিক শীল্ড বিজয়ের প্রায় সমসাময়িক সময়েই।

উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে উত্তর কলকাতার কয়েকজন উৎসাহী বাঙালী যুবা ফুটবলের অনাবিল

আনন্দরসের দ্বারা সম্মোহিত হল, বাস সঙ্গে সঙ্গে তারা খেলার সমস্ত ব্যবস্থাও করে ফেলল। উত্তর কলকাতার মোহনবাগান রোয়ের 'মোহনবাগান ভিলার' সংলগ্ন মাঠেই হল তাদের খেলার আখড়া। এমনি করে ১৮৮৯ সালের এক শুভলগ্নে 'মোহনবাগান ভিলার' ছোট্ট মাঠের বুকেই জন্ম নিল ভবিষ্যতের এক বিরাট ঐতিহ্যশালী ক্লাব, নাম দেওয়া হল তার মোহনবাগান স্পোর্টিং ক্লাব। তৎকালীন প্রেসিডেন্সী কলেজের একজন ইংরেজ অধ্যাপকের কথায় স্পোর্টিং কথার স্থানে সংশোধন করে করা হল এ্যাথলেটিক্স। ভিলার ছোট মাঠে আর আবদ্ধ থাকতে চাইল না মোহনবাগান বেশিদিন। চলার গতিতে পেয়ে বসল তাকে, তাই মোহনবাগান এসে ডেরা বাঁধল শ্যামপুকুরের মাঠে। কিন্তু সেখানেও মন টিকল না, কিছু দিন পর শ্যাম স্কোয়ারে উঠে এসে এরিয়ান্স আর বাগবাজারের ভাগীদার হল। মোহনবাগানের বহুদিনের আশা, বহুদিনের স্বপ্ন পূর্ণ হল, ১৯০০ সালে তার স্থান হল ময়দানের বুকে।

অতঃপর ১৯১১ সালের ঐতিহাসিক শীল্ড বিজয় মোহনবাগানের ভাগ্য দিল ফিরিয়ে। ১৯১৫ সালে প্রথম ডিভিশন লীগে মোহনবাগানের যাত্রা সুরু। শ্বেতাঙ্গদের ছল-বল-কৌশলের দুর্ভেদ্য বেড়াজাল টপকে এসেও বহুবার মোহনবাগানের হাতের মুঠো থেকে লীগ শীল্ড ফস্কে গিয়েছে। ১৯৩৯ সালে মোহনবাগান প্রথম লীগ বিজয় করে। আজ পর্যন্ত মোহনবাগান লীগ বিজয় করেছে বারো বার, শীল্ড ঘরে এনেছে মোট ন-বার। দিল্লীর ডুরাণ্ড এবং বোম্বাইয়ের রোভার্স মোহনবাগান প্রথম জয় করে যথাক্রমে ১৯৫৩ সালে এবং ১৯৫৫ সালে। ডুরাণ্ড জয় করেছে মোহনবাগান চার বার এবং রোভার্স মাত্র একবার। বহু বছর কেটে গিয়েছে, বহু বাধা-বিপত্তির মধ্যে খ্যাতির চূড়ান্ত শিখরে। ১৯৬৩ সালে ইস্টবেঙ্গলের মাঠের গাঁটছড়া খুলে মোহনবাগান ক্যালকাটা মাঠে নতুন আসন পেতেছে। এ বছর ৭৫ বৎসর পূর্তিতে প্লাটিনাম জয়ন্তী উৎসব উদযাপন করছে মোহনবাগান। যুগে যুগে কালে কালে অব্যাহত থাকুক মোহনবাগানের জয়যাত্রা।

মুষ্টিযুদ্ধের রণদামামা

আমেরিকানরা চায় একটা লড়াইয়ের তপ্ত হাওয়ায় মশগুল থাকতে। টোকিও অলিম্পিকে জেতা জাহাজ-বোঝাই সোনার পদক আমেরিকার ঘাটে ভিড়তে না ভিড়তে সুরু হল জনসন ও গোল্ডওয়াটারের ভোটের লড়াই। ভোটযুদ্ধের পর এবার মুষ্টিযুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। আবার ক্যাসিয়াস ক্লে স্বভাবসিদ্ধ ভাঁড়ামির অভিনয় করে নিজের ঢাক নিজেই পিটোচ্ছে। প্রথম সাক্ষাতে সনি লিস্টন ক্লের হাতে ঘায়েল হয়েছিল। এবার সে চায় প্রতিশোধ। তার কাঁধের জখম আরাম হয়েছে। আগামী সোমবার ক্লে-লিস্টন লড়াই বিশ্ব হেভিওয়েটের ভাগ্য নির্ধারণ করবে।

লিস্টন আমেরিকার মুষ্টিযুদ্ধের আকাশে ধূমকেতু। কোন অশুভলগ্নে তার জন্ম হয়েছিল যার ফলে সারা

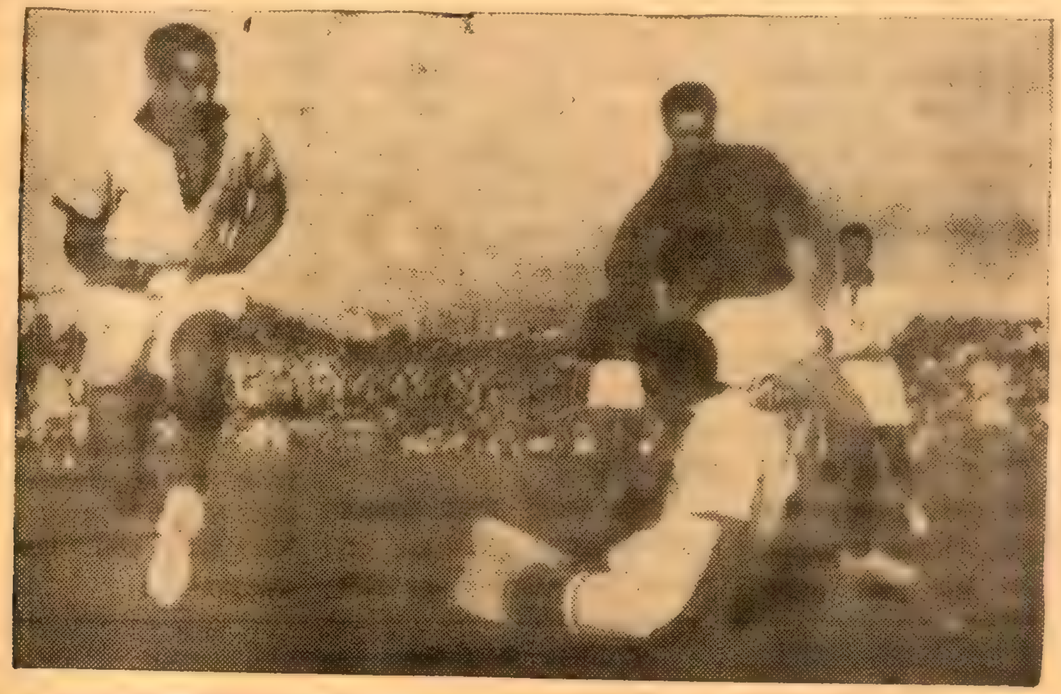

● প্রদর্শনী হকি খেলায় মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের হরিপাল কৌশিক প্রথম গোল করছেন

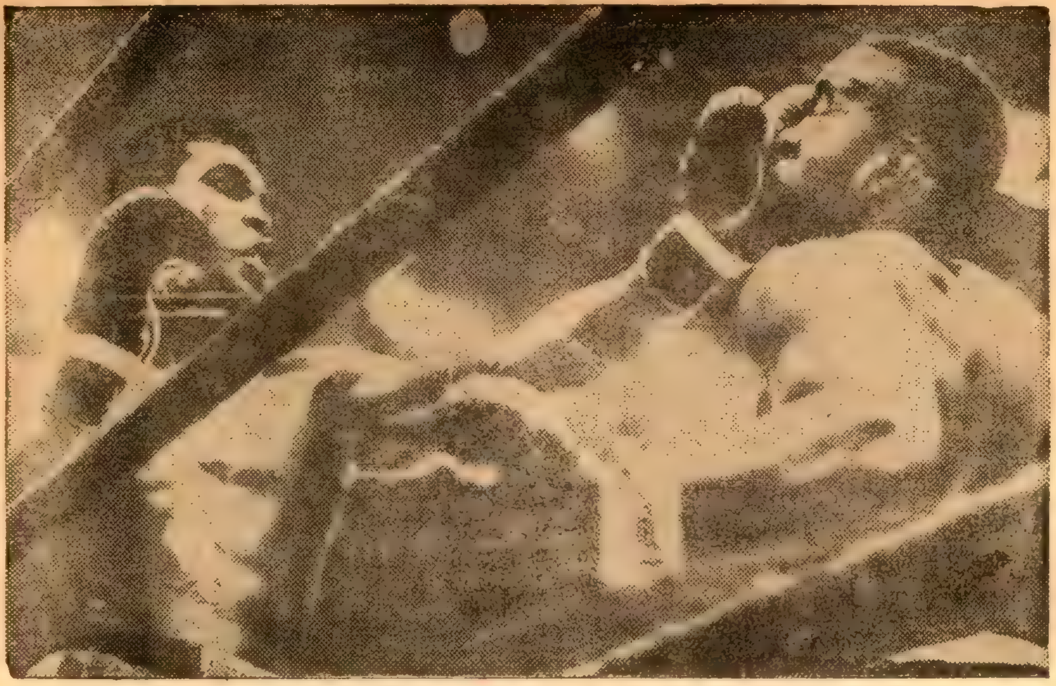

ক্যাসিয়াস ক্লে ও সনি লিস্টন

জীবনটাই একটা অভিশাপের মতন অমঙ্গল সৃষ্টি করছে। শৈশব থেকে স্নেহ, যত্ন, ভালবাসাবঞ্চিত এই বালক যে পরিবেশের মধ্যে মানুষ হয়েছে তাতে তার চরিত্রে মাধুর্যের কোন লেশ নেই।

পিতা দুর্দান্ত মাতাল। দুবার বিয়ে করে বসলেন। ২৫টি ছেলেমেয়ে। তারা কি ভাবে মানুষ হচ্ছে সে দেখার দায়িত্ব তাঁর নেই। শুধু প্রহার এবং প্রহার। এই পৈতৃক শিক্ষাই সনি লিস্টনের জীবনে সব চেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল। ছেলেবেলা থেকেই মারপিট, দাঙ্গা-হাঙ্গামা এই সবের মধ্যেই তার দিন কেটেছে।

সারা জীবনে লিস্টন প্রায় ১৯ বার পুলিশের হাজতে অতিথি হয়েছে, যার দুই জেল খেটেছে। জেলখানাতেই তার মুষ্টিযুদ্ধের হাতেখড়ি। মিসৌরী জেলে পাঁচ বছর সনি প্রখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা মনরো হ্যারিসনের কাছে বক্সিংয়ে তালিম নিয়েছে। বহু লড়াইয়ে লিস্টন অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু পরাজয় ঘটেছে ভাগ্যে মাত্র দুবার। প্রথম পরাজয় মার্শালের হাতে, দ্বিতীয়বার ক্লের কাছে।

কয়েকদিন আগে বোস্টনের রাজপথে মহম্মদ আলি ক্লে এক মজার ব্যাপার করেছে। রাস্তার ট্রাম-বাস থামিয়ে আর লোকজনদের ডেকে মস্করা করে বলতে লাগলো, 'বড় ভালুকটাকে তোমরা কেউ দেখেছ, লিস্টন বলে একটা ভালুক ধরে তোমাদের নাচ দেখাবে। গত লড়াইয়ে ভালুকটার কাঁধটা জখম করেছিলাম, এবার ঠিক করেছি ওর নাকে দড়ি পরিয়ে নাচাব।'

এরপর নিজেই রাস্তার মাঝখানে এমন লাফালাফি শুরু করলো যে, ট্রাম-বাস সব আটকে এক বিশ্রী ব্যাপার। অনেক কষ্টে এক সার্জেণ্ট এসে শেষে ক্লের এই পাগলামি থামালেন। লিস্টনও কম যায় না, ডাক্তারী পরীক্ষার আগে বোস্টনে মুষ্টিযোদ্ধা কমিশনের আপিসের সিঁড়িতে তার সাঙ্গপাঙ্গরা মধু ছড়িয়েছিল, লিস্টন ঢুকলো সেখানে হাতে লাগার আর একটা দড়ি।

এই লড়াইয়ে লিস্টন জিতবে কি ক্লে জিতবে বলা শক্ত। তবে একথা ঠিক খেলা এবার জমবে ভালো।

সমাচার দর্পণ

নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে কলকাতায় বিশ্বক্রিকেটের বাছাই করা খেলোয়াড় সমন্বিত কমনওয়েলথ ক্রিকেট দলকে দুটি খেলায় অবতীর্ণ হতে দেখা যাবে। প্রথম খেলায় কমনওয়েলথ মিলিত হবে মোহনবাগান প্লাটিনাম জয়ন্তী কমিটীর সভাপতির একাদশের সঙ্গে। দ্বিতীয় খেলা হবে মুখ্যমন্ত্রীর একাদশের সঙ্গে।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতী

ভারতের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতিতে বৃটেন

শ্রীচ্যবন ও শ্রীবটমলীর মধ্যে চু

বিস্তৃতি-সম্বলিত পত্র বিনিময়।

২৬৭ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ • 26th November, 1964 • Vol.

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	১৬০৩
আজকের মানুষ	...	১৬০৪
সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর	হরপ্রসাদ মিত্র	১৬০৫
সম্পূর্ণ যাবার আগে (কবিতা)	আশিস সান্যাল	১৬০৭
তখনো ছিল বেলা (কবিতা)	বিশ্বেশ্বর সামন্ত	১৬০৭
ভারতদর্শন	...	১৬০৮
আন্তর্জাতিক	...	১৬১৪
শহর কলকাতা	শ্রীপদাতিক	১৬১৯
বাণিজ্যে সেকাল ও একাল	ধনপতি সওদাগর	১৬২৪
কৃষ্ণচূড়া (ধারাবাহিক উপন্যাস)	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	১৬২৭

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠ্যপুস্তক)

মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার চণ্ডীর কাহিনী বাঙ্গালার বিশিষ্ট জাতীয় জীবনের কাহিনী। তাঁহার কাব্যে পাই মধ্যযুগের বাঙ্গালার নিখুঁত সমাজের সুস্পষ্ট আলেখ্য। শাসক সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্য্যাতিত বাস্তুচ্যুত মুকুন্দরাম দুঃখ ও বেদনাক্লিষ্ট বাঙ্গালার প্রতিনিধি কবি—ব্যক্তির দুঃখ কি করিয়া সর্বজনের দুঃখ হইতে পারে বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা মুকুন্দরামই সর্বপ্রথম দেখাইয়াছেন। এই হিসাবে তিনি আধুনিক বাঙ্গালার রোমান্টিক সাহিত্যসাধনার অগ্রদূত।

—বর্তমান গ্রন্থে আছে—

১। মূল কাব্য, ২। সুবিস্তৃত ভূমিকা, ৩। কবির জীবনী, ৪। কাব্য-পরিচিতি, ৫। কবিকঙ্কণ যুগের বঙ্গভাষা (ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত), ৬। বিস্তৃত কাব্য সমালোচনা এবং ৭। অপ্রচলিত শব্দের অর্থ।

মূল্য সাড়ে চার টাকা

নীহাররঞ্জন গুপ্তের গ্রন্থাবলী

মূল্য সাড়ে তিন টাকা

কালো ভ্রমরের চমকপ্রদ বিস্ময়কর কাহিনীর মধ্য দিয়ে বিদেশী গোয়েন্দা-সাহিত্যের শার্লক হোমসের মত বুদ্ধিদীপ্ত কিরীটি রায়ের আবির্ভাব।

বাংলার মিস্ট্রী সাহিত্যে

ডাঃ নীহাররঞ্জনের দান অপূর্ব

—তেরখানি নির্বাচিত রচনা—

কালো ভ্রমর, মরেছে যা মরেছে, রক্তহীরা রক্তমুখী নীলা, পদ্মদহের পিশাচ, পঞ্চমুখী হীরা, রক্তগেরুয়া, ঘুম, কালচক্র, কবর, পাথরের চোখ, সর্প, অঙ্গুরীয়, প্রণাম জানাই।

প্রতিষ্ঠাবান নাট্যকার ও প্রবীণ সাহিত্যিক

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মণিলাল গ্রন্থাবলী

২য় ভাগে—৬খানি রচনা ৩৩০ পৃঃ—৩

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা -১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আঁধারমাণিক (ধারাবাহিক উপন্যাস)	মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	১৬৩০
ফয়সালা (অনুবাদ-গল্প)	বোম্মানা বিশ্বনাথম্	১৬৩৩
কালো সরকার (গোয়েন্দা-গল্প)	অদ্রীশ বর্ধন	১৬৩৭
আর একটু হাওয়া (গল্প)	ভবেশচন্দ্র চক্রবর্তী	১৬৪৩
গ্রন্থমেলা	জয়ন্তী সেন	১৬৪৭
বঙ্গদর্শন	...	১৬৪৯
রঙ্গজগৎ	...	১৬৫৫
পাঠকমন	...	১৬৫৯
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	শিলাদিত্য	১৬৬০
খেলাধুলা	শ্রীঅমিতাভ	১৬৬২

ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বেকার, চাকুরীপ্রার্থী ও শিক্ষানুরাগীদের
ভাষা শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য্য একমাত্র গ্রন্থ
॥ বিদেশী ভাষায় দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সহায়ক ॥
০০০ স্বল্পশ্রমে পর্য্যাপ্ত ফল অবশ্যম্ভাবী ০০০
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

রা জ ভা ষা

(ইংরাজী ভাষা সহজে শিক্ষার অদ্বিতীয় সাহায্যগ্রন্থ)
এক আধারে : ভাষা - ব্যাকরণ - শব্দার্থ
ইংরাজী হইতে বাঙলা—৩·৫০ ॥ ইংরাজী হইতে উর্দু—১·০০

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের

ম হা ভা র ত

[প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড]
(প্রতি খণ্ড মূল্য আট টাকা)
সদ্য-প্রকাশিত চতুর্থ খণ্ড : মূল্য—ছয় টাকা
(ডাকমাশুল স্বতন্ত্র)

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

মাইকেল গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগে :—মেঘনাদবধ কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, পদ্মাবতী-নাটক, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা ?
মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় ভাগে :—কৃষ্ণকুমারী নাটক, শর্মিষ্ঠা নাটক, তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী, বিবিধ কাব্য, মায়া কানন, হেক্টর বধ।
মূল্য—দুই টাকা

—ঔপন্যাসিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান—
দামোদর মুখোপাধ্যায়ের

দামোদর-গ্রন্থাবলী

১ম খণ্ড ১·৫০   ২য় খণ্ড ২·৫০
৩য় খণ্ড ১·০০   ৪র্থ খণ্ড ২·৫০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

CENTRAL LIBRARY

৪৩ বর্ষ, ২৬শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পঃ 25 Paise
বৃহস্পতিবার, ১০ই অগ্রহায়ণ ১৩৭১ Thursday, 26th November 1964

তণ্ডুল ও তেল

দিল্লীতে মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাঁরা যে খাদ্যনীতি গ্রহণ করেছেন, তা যেন ক্রমশ প্রকাশ্য। পশ্চিমবঙ্গে কোন্ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য জানা যায় নি।

এমন কথাও শোনা গেছে যে, দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের মধ্যে ঐক্যমত স্থাপনের জন্য শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল। তবু আসল যে ব্যাপার, সেই খাদ্যনীতি সম্পর্কে পার্লামেণ্টে শেষ কথা শোনার পর আমাদের নাকে তেল দিয়ে নিদ্রা যাবার কোন কারণ থাকবে না। কেন না তখনো সেই একই কারণ বজায় থাকবে যে, সরকার অনেক গোঁজা-মিলের পর যে সিদ্ধান্তে এসেছেন তা কার্যকরী করতে পারছেন কি না। সরকার প্রতিবার ব্যর্থতার যে পরিচয় দিচ্ছেন, তার প্রধান কারণ খাদ্যনীতি সম্বন্ধে তাঁরা তেমন সচেতন নন। এবারও যে ব্যবস্থা গৃহীত হবে তাও অনেক ঠকে শেখার পরও আংশিক এবং সরকারকে পর্যুদস্ত করার জন্যে যারা তৎপর—সেই অসাধু ব্যবসায়ীমহলকে আজো কঠিন বিধানের দ্বারা শায়েস্তা করা হয় নি।

যাই হোক, নাকে তেল দিয়ে ঘুমোবার দরকার আমাদের হবে না। প্রথম কারণ, আমাদের ধরে নিতে হবে—যত গর্জায়, তত বর্ষায় না। যদিও সরকারীক্ষেত্রে প্রচেষ্টা চলবে, তবু 'না আঁচালে বিশ্বাস নেই'— এই জেনে খাদ্যের ব্যাপারে জন-সাধারণকেও সতর্ক থাকতে হবে। দ্বিতীয়, জনসাধারণ নাকে তেল দিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করলেও পশ্চিমবঙ্গে তেলের দুর্ভিক্ষ সুরু হয়েছে। বিড়ম্বনার মধ্যে তাদের অযথা জাগিয়ে রাখা যদিও শুভবুদ্ধির লক্ষণ নয়, তবু সরকারী ব্যবস্থাকে বানচাল করে দিতে এবং নিরীহ জনসাধারণকেও বুড়ো আঙুল দেখাতে অভ্যস্ত ব্যবসায়ীরা আর কোনো কিছুকেই তোয়াক্কা করে না। তারা নিজেরা 'তৈলনীতি নির্ধারণে' যে কাণ্ড সৃষ্টি করেছে, তা কোনো আইনের রাজত্বে সম্ভব কিনা তা আমরা ভেবে কূল পাই নে।

যতদূর জানা গেছে, তৈলদুর্ভিক্ষ সৃষ্টির জন্য প্রধানত দায়ী হচ্ছে—তেলকল ব্যবসায়ী, পুলিশ ও ব্যবসায়ী সংঘ। পুজোর পূর্বে এই রাজ্যের বাইরে থেকে আনীত সরষের বীজ থেকে উৎপন্ন তেলের বিক্রির জন্য যে বণ্টন-ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল, তা একেবারেই পালিত হয় নি; এমন কি কালোবাজারে পাচার করার ফলে মিল ও খুচরা ব্যবসায়ীদের দ্বারা তেল বিক্রির হিসাব খাদ্য-দপ্তরে পাঠানো হয় নি। এই মনোভাবের দ্বারা তারা সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতি বেপরোয়া মনোভাব প্রকাশ করেছে। এই অবস্থার পরও সরকার কয়েকজন আমদানীকারককে কোন্ ভরসায় ৩২০০০ ব্যাগ সরষে আমদানীর পারমিট দিয়েছেন, তা আমাদের জানা নেই। অবশ্য আমরা ধরে নিতে পারি, তৈল-সঙ্কট সহজে মিটবে না। কেননা ঐ ব্যাপারে সরকারী নীতি বড়ই দুর্বল। সরষের তেলের 'পরিবর্ত' সরবরাহের সকল ব্যবস্থা গ্রহণেও সরকার এখন দিশেহারা। হয়তো তাঁদের মনোভাব এই—যখন তণ্ডুল নেই, তখন তেল নিয়েই বা কি হবে?

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

রং বদলায় প্রকৃতির জগতে—মনের জগতে। রঙ বদলায় রাজনীতির জগতেও। বিশ শতকের গোড়া থেকেই এই রঙ বদলের পালা দ্রুত এগিয়ে চলেছে। আফ্রিকার কালো রঙের পরিবর্তন ঘটেছে—সে জায়গায় এসেছে সূর্যের রঙ—স্বাধীনতার রঙ। রঙের বদল ঘটেছে এশিয়ার বুকেও। এই রঙ বদলের তাৎপর্য সবাই বোঝেন না—বোঝেন কেউ কেউ। যাঁরা বোঝেন তাঁরাই স্বাতন্ত্র্য-বোধে উজ্জ্বল, বহুর মধ্যে বিশিষ্ট এক। সমগ্র জাতির ক্রমোন্নতির সঙ্গে তাঁদের ধ্যান-ধারণা, কর্মপ্রচেষ্টা অবিচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িত। এইরকম দুর্লভ ব্যক্তিত্বের অধিকারী কোয়াইতের যুবরাজ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ সাবা আল সালেম আল সাবা।

মানুষ হিসেবে শেখ আল সাবার একটাই পরিচয়। রাজ-তন্ত্রের মধ্যে থেকেও তাঁর পরিপূর্ণ বিশ্বাস—কল্যাণকর রাষ্ট্রের অর্থই হচ্ছে জনগণের সমৃদ্ধি সাধন। এইখানেই তিনি আধুনিক রাজনীতি-সচেতন, আবার সেই সঙ্গে গণতান্ত্রিক মনোভঙ্গীর অধিকারী। শেখ আল সাবা রাজপরিবারের সন্তান এবং সেই জন্যই উত্তরাধিকার সূত্রে রাজতন্ত্রের চিন্তাভাবনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবার সম্ভাবনাই ছিল অধিক। কিন্তু আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত শেখ আল সাবার ক্ষেত্রে দেখা গেল ব্যতিক্রম। রাজপ্রাসাদের সুউচ্চ অলিন্দে দাঁড়িয়ে ঐতিহ্যানুসারী রাজোচিত ভঙ্গীতে মানুষের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের চিন্তায় কালক্ষেপ না ক'রে তিনি নেমে এসে দাঁড়িয়েছিলেন জনগণের মধ্যে—মাটির মানুষের কাছা-কাছি। সুরু হ'ল রাজনৈতিক সংগ্রাম। নিজ স্কন্ধে তুলে নিলেন দুরূহ গুরুভার।

তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত যৌবনের প্রারম্ভে। কোয়াইতের মন্ত্রিসভায় প্রথমে স্বাস্থ্যমন্ত্রী, তারপর অতি অল্পকালের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত হন। আভ্যন্তরীণ সংস্কারের মধ্য দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সাফল্যের সূত্রপাত। সেক্ষেত্রে জনগণের মানোন্নয়নের প্রতি তাঁর স্থির লক্ষ্য। প্রতিবেশী আরব রাষ্ট্রগুলির মতোই কোয়াইত তৈলসম্পদে সমৃদ্ধ এবং সেই সূত্রে প্রাপ্ত অর্থের অধিকাংশই তিনি সাধারণের জন্য ব্যয় করতে মুক্তহস্ত। বিচক্ষণ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সহৃদয় শেখ আল সাবা বুঝেছিলেন, আজকের দিনে ব্যক্তিত্বের যে ক্রমবিকাশ—তাকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। দীর্ঘকাল রাজতন্ত্রলালিত কোয়াইতকে শেখ আল সাবা কিন্তু পুরাতন রাজতান্ত্রিক অনুশাসনে আবদ্ধ রাখবার চেষ্টা করেন নি। তাই, মধ্যযুগীয় রাজতান্ত্রিক অহমিকাকে বিসর্জন দিয়ে তিনি কোয়াইতের পার্লামেন্টে সর্বপ্রকার শাসনতান্ত্রিক কার্যকলাপ, এমন কি জাতীয় নীতির সমালোচনাকে প্রবেশাধিকার দিয়েছেন।

আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে শেখ আল সাবার যে উদারনৈতিক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গেছে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সেই একই দৃষ্টিভঙ্গী। যে কারণে তিনি চীনকে আক্রমণকারী বলতে দ্বিধাবোধ করেন নি এবং ভারতবর্ষের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাতে কুণ্ঠিত হন নি—ঠিক সেই একই কারণে তিনি বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার যজ্ঞে অন্যতম পুরোহিত। এবং এই একটিমাত্র কারণেই বিশ্বরাজনীতির পর্যায়ে সমানধর্মা শান্তিকামী দুই দেশের ঘনিষ্ঠতা নিবিড় হ'তে পেরেছিল। শুধু তাই নয়, ভারতের পররাষ্ট্রনীতির প্রতি শেখ আল সাবার শ্রদ্ধা যে কত দূর গভীর, তার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন তিনি তাঁর পররাষ্ট্রদপ্তরের বারজন ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে ভারতবর্ষে পাঠিয়েছিলেন, আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিষয়ক শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে। শেখ আল সাবার ভারত-প্রীতির আরও অনেক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে। ভাবলেও খুশিতে বুক ভরে ওঠে, যখন দেখি কোয়াইতে ছাব্বিশ হাজার ভারতীয় নিরুপদ্রবে যথেষ্ট মর্যাদার সঙ্গে বসবাস করতে পারছেন।

ভারতবন্ধু শেখ আল সাবা। তেরো দিনের শুভেচ্ছা সফরে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। আমরা তাঁকে অভিনন্দন জানাই।

শেখ সাবা আল সালেম
আল সাবা

এবং সঙ্গে সঙ্গে আশা করবো, তাঁর যে সুমহান ব্যক্তিত্ব কোয়াইতকে ঘরে-বাইরে মর্যাদা দান করতে সক্ষম হয়েছে—যাঁর সুযোগ্য রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী কোয়াইতকে বিশ্বজনসমক্ষে কৌতূহলী ক'রে তুলেছে এবং যাঁর সার্বিক উদারতা বিশ্বশান্তি প্রচেষ্টাকে অগ্রগামী করতে পেরেছে—তাঁর জয়যাত্রা অব্যাহত থাকুক।

সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর

হরপ্রসাদ মিত্র

ফরাসী সাহিত্যে খ্রীস্টাব্দের সতেরোর শতকে যাঁরা ছিলেন নীতিবাদী, সেই 'মরালিস্ট' দলের সঙ্গে কামুর যোগ হয়তো সত্যিই বিশেষভাবে কর্তব্য, কিন্তু সে-সম্পর্ক যাই থাক্, যতোই থাক্,—সময় যে অতীত থেকে ভবিষ্যতে যাচ্ছে,—ভবিষ্যৎ বা বর্তমান থেকে অতীতের দিকে নয়,—সেটা মোটামুটি আমাদের সকলেরই স্বীকার্য। কামুর 'বাইরের মানুষ' (L'Etranger), যার ইংরেজি নাম 'দি আউটসাইডার' বেরোয় ১৯৪২এ,—'প্লেগ' (La Peste) বেরোয় ১৯৪৭এ। এসব একালেরই রচনা। এসব লেখার মূলে যে সতেরোর শতকের কোনো বিশেষ ধারণার প্রতিধ্বনি একেবারেই না বাজতে পারে, তা নয়,—তবে একালের ভঙ্গি হিসেবেই এসব রচনা প্রধানত কর্তব্য।

একালে কল-কারখানা বেড়েছে, যানবাহন হয়েছে ক্ষিপ্রগতি,—মানুষের জীবন যে যুগ-পরিবেশের মধ্যে ব্যক্ত হয়, একালে আমাদের সেই যুগ-পরিবেশ নিশ্চয় বদলেছে এবং এই রকম বদল ঘটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

যেমন জীবনে, তেমনি সাহিত্যেও পুরোনো অভ্যাসের পাশাপাশি দেখা দেয় নতুন অভ্যাসের সূচনা। আজকের নতুন কালকের চেনা-রীতি হয়ে ওঠে। অভ্যাসের পথ হঠাৎ ভোলবারও হেতু নেই। এইভাবেই অতীতের পল্লীগীতিকা এখনো টিকে আছে, রূপকথা আছে, গাথা আছে,—মহাকাব্যও আছে; হয়তো তাদের সংস্কার হয়েছে কিছু কিছু,— এইসব সাহিত্য-প্রকারে নতুন কালের নতুনত্বও বর্তেছে কিছু কিছু; তারই পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে প্রতীকের নতুন আয়োজন, চিত্রকল্পের নানা খেলা। গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রেও এই যুগোচিত ভঙ্গির বদল মানতেই হবে। কবিতায় যেমন ধীরে ধীরে আমাদের অভিজ্ঞতার নতুন নতুন বিষয় দেখা দিয়েছে, গল্প-উপন্যাসেই বা সে-রকম ঘটবে না কেন?

বাংলায় হেমচন্দ্র যখন রেলগাড়ির কবিতা লেখেন, সেই সুদূর অতীতের সেই লেখাটির সঙ্গে একালের বিদেশী কবি সিগফ্রিড সাসুনের 'এ লোক্যাল ট্রেন অব থট্' মনে পড়ে। তাতে সাসুন লিখেছিলেন—

একলা, নিঃশব্দতার মধ্যে, রাতের
সে এক প্রহরে
আমি আমার লেখা থেকে
চোখ তুলে শুনতে পাচ্ছি
উপত্যকার মধ্য দিয়ে একটা ট্রেন
চলেছে। মনে ভাবি
ঐ যাচ্ছে একটা-পঞ্চাশের গাড়ি;
জানি যে ঐ
নিয়মিত যাওয়ার বোধটা সুখের;
ওতে আমার জগৎ আরো নিরাপদ,
আরো ঘরোয়া, আরো নির্ভরযোগ্য
রকম নিশ্চিত—

অর্থাৎ আজ যেমন, কালও তেমনি—

সামনের বছরেও তাই ঘটবে বলে মনে হয়।

'ও ট্রেন যেন শান্তির সময়।' শোনা যায়
অকারণ বাঁশি বাজাতে-বাজাতে,
আর রেল-লাইনে চাকার ঘটাং-ঘটাং
শব্দ তুলে
ট্রেন চলে যাচ্ছে দৃষ্টির আড়ালে।
মনে হয় ও যেন পুরোনো
পরিচিত বন্ধু।

লুই ম্যাক্‌নিসের 'বার্মিংহাম্' এই ধরনের অন্য এক পরিবেশ-রূপায়ণের নমুনা। তাতে ধোঁয়া, গাড়ি, পুলিশ, দোকানের মনিহারী নানা সরঞ্জামে উল্লেখময় বার্মিংহাম্ আছে। হাওয়াই-জাহাজের অভিজ্ঞতা দেখা দিয়েছে অনেকের অনেক কবিতায়। ডে-লুইসের 'অ্যান ইটালিয়ান ভিজিট' মনে পড়ে,—মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের 'নবজাতক'-এর 'পক্ষী মানব'—

আজি এ কী হোলো, অর্থ কে তার জানে।
স্পর্ধা পতাকা মেলিয়াছে পাখা
শক্তির অভিমানে।
তারে প্রাণদেব করেনি আশীর্বাদ।
তাহারে আপন করেনি তপন
মানেনি তাহারে চাঁদ।

রবীন্দ্রনাথের সে-কবিতাটি লেখা হয় ১৩৩৮-এর ফাল্গুনে। ডে-লুইসের লেখাটি বেরোয় ১৯৫৩তে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্য রচনায় হাওয়াই জাহাজের আনন্দের কথা লিখে গেছেন বটে, কিন্তু 'নবজাতক'-এর 'পক্ষী মানব' আনন্দের নয়,—দুঃখের এবং তিরস্কারের কবিতা। সেটা হাওয়াই-জাহাজের যুদ্ধকালীন বিনাশ-হুঙ্কারের অভিজ্ঞতা

আজি মানুষের কলুষিত ইতিহাসে
উঠি মেঘলোকে স্বর্গ আলোকে
হানিছে অট্টহাসে।
যুগান্ত এল বুঝিলাম অনুমানে
অশান্তি আজ উদ্যত বাজ
কোথাও না বাধা মানে;
ঈর্ষা হিংসা জ্বালি মৃত্যুর শিখা
আকাশে আকাশে বিরাট বিনাশে
জাগাইল বিভীষিকা।

কামুর 'বাইরের মানুষ' ইত্যাদি লেখাগুলিতে,—কাফ্‌কার বিচার-কাহিনী,

স্মৃতিকথা ইত্যাদিতে এবং এইরকম একালের আরো সব নামকরা গল্প-উপন্যাসে এইরকম আরো সব পরিবর্তনের ছায়া পড়ছে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে সনাতন মানবসত্যবোধের কথাটা অস্বীকার করবার নয়। কিন্তু সাহিত্যে তথ্যের নানা ভেদ,—বস্তু বা উপকরণের নানা পরিবর্তন যে যুগে যুগে দেখা দেবেই, তাতে সন্দেহ কিসের? অতীতের পল্লী-জীবনের বদলে দেখা দিয়েছে বর্তমানের নগর-জীবন,—গরুর গাড়ির বদলে দেখা দিয়েছে রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি, হাওয়াই-জাহাজ। একালে টেলিগ্রাফ, রেডিও, টেলিভিশন এলো। তেমনি ভিড় বাড়লো, খাদ্য-সমস্যা প্রচণ্ড হয়ে উঠলো। অতীতের ঈশ্বরনির্ভরতাও বদলে যাচ্ছে; তুক্-তাক্ ঝাড়-ফুঁকে আস্থাও আর কি আগেকার মতন ব্যাপক বলে মনে হয়?

আমাদের সতীত্বের ধারণা, বাৎসল্যের টান, পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, ভ্রাতৃত্ব, পাতিব্রত্য ইত্যাদি পবিত্র এবং সুন্দর ভাবগুলিও যে এই বস্তুপরিবেশ পরিবর্তনের ছোঁয়াচ পুরোপুরি এড়িয়ে অটুট থাকবে,—তাও কী হয়? সেও কি সম্ভব?

পুরোনো মন্দির ভাঙলে খারাপ লাগে বইকি। কিন্তু সময়ের বেগ কি ঠেকিয়ে রাখা যায়?

মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্বন্ধেও বর্তমান কাল নতুন ভাবনায় পড়েছে। এইরকম তীব্র আধুনিক ব্যক্তিচেতনার ফলে নীতি-দুর্নীতি সম্বন্ধে অনেক দিনের অভ্যস্ত ধারণার আশ্রয় ভেঙে পড়ছে। কামু তাঁর 'বাইরের মানুষ' উপন্যাসে যে কেরানি-যুবকের আত্মকথা লিখেছেন, সেই মোর্ স নামে লোকটি বেশ শান্ত, শিষ্ট, স্বাভাবিক ছিল বললে আপত্তি হবে কি? ঘটনাচক্রে সে একজনকে খুন করে ফেলে। এই খুনের পরে যথারীতি সে ধরা পড়েছে,—আদালতে বিচারের সম্মুখীন হয়েছে। মারি নামে যে মেয়েটিকে সে ভালোবাসে, তার সেই ভালোবাসা, নিজের মাকে সে যে আতুর-আশ্রমে পাঠিয়েছিল, সেই বিশেষ আয়োজনটা,—কিংবা তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে সে সেখানে গিয়ে সেখানকার লোকজনের প্রশ্নের উত্তরে মায়ের বয়সটাও যে ঠিক ঠিক বলতে পারে নি,—তার সেই বিশেষ তথ্য-জ্ঞানের অভাব—এ সবই যেন তার ওপর এসে পড়েছে,—মোর্ স-র নিজের যেন কোনো কর্তৃত্ব ছিল না এ সব ব্যাপারে। জীবনের ঘটনাগুলো যেন আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিচেতনায় এইভাবে আসছে, যাচ্ছে। আমরা মোটেই স্বাধীন নই। আমরা প্রতি মুহূর্তেই ঘটনার ভাবনার ইচ্ছা-অনিচ্ছার ঘাত-প্রতিঘাতের সত্তাবোধ।

আমি জানি না, সাহিত্যে এই জীবনবোধের,—এই প্রতি মুহূর্তের সত্তা-মাত্র বোধের পরিণাম কী?

অস্তিত্ববাদী যাঁরা, তাঁরা সেকালের প্লেটো থেকে হাল-আমল পর্যন্ত দর্শনশাস্ত্রের ধারায় সত্য বা Essence-এর সন্ধানের দিকটি উল্লেখ করেন এবং সেই সূত্রেই বোধ হয় বলতে চান যে, ঐরকম সত্য-সন্ধানের ফলে ব্যক্তির ব্যক্তিসত্যটুকু আমাদের ঠিক নজরে পড়ে নি। ঈশ্বরই বলি, আর সত্যস্বরূপই বলি,—যা মূলে বিদ্যমান, প্রতি বস্তুতে, প্রতি ব্যক্তিতে তাকেই প্রতিফলিত বলে ধরে নিলে ব্যক্তির ব্যক্তিসত্য ঠিক অনুভব করা চলে কি? আমাদের বুদ্ধির দোষেই আমরা যেন সুব্যবস্থিত শৃঙখলায় সব কিছুই বাঁধতে চাই; তাই মানুষের বুদ্ধি মানুষকে নিরন্তর 'সিস্টেম' খোঁজাচ্ছে। কিন্তু মানব-মনের যথাযথ রূপটাই দেখা চাই,—'এসেন্স'-চিন্তা ছেড়ে অস্তিত্ব-বোধের দিকে এগুনো দরকার।

শোনা যায়, এই অস্তিত্ববাদের প্রবর্তক কার্কেগার্ড দুঃখ করে বলেছিলেন যে আমার মৃত্যুর পর দার্শনিকরা আমার মতামত সবই প্রণালীবদ্ধ করে দেখবেন, এইটেই আশঙ্কার কথা।

গত বিশ্বযুদ্ধের দুর্যোগের দিনে জার্মান-অধিকারের যন্ত্রণাহত ফ্রান্সে গভীর নৈরাশ্যের ফসল হিসেবেই এরকম মনোভাব দেখা দিয়েছিল। আমি এই ধারণাই শুনতে পাই। আরো নিখুঁৎভাবে, স্পষ্টভাবে বাংলায় এসব কথার আলোচনা হওয়া উচিত। দর্শনে অধিকারী যাঁরা, তাঁরাই এ-কাজের দায়িত্ব নিতে পারেন। আমি একজন সাধারণ পাঠক। কামু যে মোটেই অস্তিত্ববাদী নন, সার্ত্রের এই মন্তব্যটি তাই আরো ভেবে দেখতে হবে। মন্তব্যটি তাই আরো ভেবে দেখতে হবে। সংকল্পের দায় মুছে ফেলে এ কী শুধুই আচরণমাত্রের সাক্ষী হওয়া?

সাহিত্যে নীতিহীন, আদর্শহীন অস্তিত্ববোধ মাত্র যে কী জিনিস সেই কৌতূহলই আমাকে এ সব কথায় তাড়িয়ে এনেছে। আর, কামু খাঁটি অস্তিত্ববাদী হোন আর নাই হোন, তাঁর ঐ 'বাইরের মানুষ' বইখানিতে মোর্ স নামে যুবকটির কোনো কোনো আত্মকথা আমাকে অপরিসীম বিস্ময়-বোধের সঙ্গে গভীর যন্ত্রণাবিদ্ধ করেছে। সে-যন্ত্রণা যথার্থ গভীর সাহিত্যেরই যন্ত্রণা,—যার অন্য নাম হোলো সাহিত্য পাঠের আনন্দ!

যেমন—মারি যখন বিয়ের প্রস্তাব তুলে মোর্ স-র সম্মতি পেয়েও নিজের মনে ঠিক সন্দেহ কাটাতে না পেরে আবার জিগেস করেছে যে, আমাকে তুমি যেমন ভালোবাসো, ঠিক সেই রকমই আর কোনো মেয়েকে যদি ভালোবাসতে,—আর সে যদি বিয়ের প্রস্তাব তুলতো, তাহলে তাকেও কি তুমি 'হ্যাঁ' বলতে? মোর্ স বলেছে—স্বভাবতই তাই বলতুম।

এরকম প্রশ্নের জবাবে অণুমাত্র আবেগের প্রকাশ নেই,—'স্বভাবতই তাই বলতুম'—এ উত্তর সত্যিই আমাদের অভ্যস্ত ধারণার পক্ষে নিরুত্তাপ বলে মনে হয়। মোর্ স সত্যিই ভারি অদ্ভুত। অদ্ভুত, কিন্তু অকৃত্রিম।

বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম দিকেই দেখা যায় আদালতে ম্যাজিস্ট্রেট মোর্‌সকে কিছুতেই ব্যাকুল করতে না পেরে যখন ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছেন, 'আমার কাছে যতো অপরাধী এসেছে, খ্রীস্টের ক্রস চিহ্ন দেখে সবাই কেঁদেছে কিন্তু তোমার মতন এ রকম কঠিন প্রাণ আমি আর দ্বিতীয় দেখি নি,—তখন মোর্‌স' প্রায় বলে ফেলেছিল যে, তারা কেঁদেছে, কারণ তারা ছিল সত্যিই অপরাধী। কিন্তু তখুনি তার মনে পড়েছে যে অপরাধী বলতে যা বোঝায়, সে তো নিজেও সেই অবস্থায় পড়েছে। এবং সেই সঙ্গে তার নিজের এই ভাবনাটিও সেখানে ব্যক্ত হয়েছে যে,—আমি কিছুতেই নিজেকে ঠিক অপরাধী ভাবতে পারি নি।

এ বইয়ে আশ্চর্য অকৃত্রিমতার লক্ষণ আরো অনেক আছে। সত্যিকার গভীর কবিত্বও আছে। আমাদের অভ্যস্ত জীবন-ধারণার সঙ্গে,—অপরাধের সংজ্ঞার সঙ্গে মোর্‌স-র ধারণা মিলুক আর না মিলুক, সে সব ধারণা যে অকৃত্রিম, তাতে সন্দেহ নেই। এই অকৃত্রিম ধারণাবাদ আমার খুবই ভালো লেগেছে।

রিয়ালিজম্ থেকে ইমপ্রেশানিজ্‌ম্-এর দিকে একালের কোনো কোনো গল্প-উপন্যাসে গল্প-উপন্যাসের এই গতিপথ যে বেঁকেছে, তাতে সন্দেহ নেই। উপন্যাসে সামাজিক সত্য রূপায়ণের বা তথ্য বর্ণনার বহুকালের অভ্যস্ত দিক থেকে পাঠকের নজর ফিরিয়ে নিতে হয় ঔপন্যাসিকের মনস্তত্ত্বের দিকে। আগেকার আমলে উপন্যাসের বিশেষ কোনো চরিত্রের সঙ্গে লেখক যেমন নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে উত্তমপুরুষে কাহিনী বর্ণনা করেছেন, তেমনি আবার অনেক ক্ষেত্রেই প্রথম পুরুষেও বলা হয়েছে। আধুনিককালে প্রুস্তের আত্মচিত্রণ, জয়েসের মজির প্রক্ষেপ ইত্যাদি ব্যাপারগুলি ইমপ্রেশনিজম বা ধারণাবাদেরই উদাহরণ বললে অন্যায় হবে কি?

কথাটা এইভাবেই আমার মনে দেখা দিয়ে থাকে। আমি জানি পাঠকদের মধ্যে এ-বিষয়ে আমার মতন সংশয় ভোগ করেন অনেকেই। বাস্তবতা আর ধারণাবাদ,—রিয়ালিজম্ আর ইমপ্রেশানিজ্‌ম্-এর মধ্যে প্রভেদ কী রকম? এ বিষয়ে মনে-মনে সন্দেহ আছেই। অতএব সংশয় কাটিয়ে ফেলা দরকার। সংজ্ঞা নিয়ে অস্পষ্টতা ঘটলে আলোচনার এগিয়ে যাওয়া সম্ভব না।

সাহিত্যে 'রিয়ালিজম' বলে সেই লক্ষণকে যাতে বাস্তব মানবজগতের কার্য-কারণ, আচরণ, ভঙ্গি, বিশ্বাস-অবিশ্বাস ইত্যাদির নিকট-সাদৃশ্য দেখা দেয়। অর্থাৎ বাস্তব-সাহিত্য তাই, যাতে অনেকটা যেন সত্যিকার মানবজগতের যথাযথ ছায়া পড়ে। —যাতে লেখকের নিজের কথার চেয়ে বাস্তব-সংসারের রূপায়ণই প্রধান। সত্যিকার রিয়ালিস্ট সাহিত্যে আত্মকথা-বর্ণনা বা ধারণাপ্রক্ষেপের আয়োজন অবান্তর। তাতে পারিপার্শ্বিক দৃশ্যের বর্ণনা থাকতে পারে,—নানা মানুষ, নানা ঘটনা, বিভিন্ন জায়গার কথা থাকতে পারে,—আঞ্চলিক ভাষার নমুনা বজায় রাখবার চেষ্টাও অসংগত নয়, —মানুষের অশেষ কর্মক্ষেত্রের বিচিত্র বিবরণও থাকতে পারে,—কিছু চিঠিপত্র বা অন্যান্য দলিলেও আপত্তি নেই। (ক্রমশঃ)

সম্পূর্ণ যাবার আগে

শিস সান্যাল

সম্পূর্ণ যাবার আগে বলে যাও হে প্রথম নন্দিত মহিমা,
নিসর্গে তোমার চেয়ে শান্তি কিছু নেই। সাধারণ অন্ধকারে,
অথবা শিশিরভেজা আমলকির মতো কোন প্রবর উদ্যানে
তোমার মুখের চেয়ে প্রস্ফুটিত ফুল নেই আর। প্রতিবার
তাই যতো শূন্য করে দিয়েছো হৃদয় থেকে অমূর্ত করুণা,
করেছো আমারে মূর্ত। হায় স্মৃতি, চিরদিন কেন অভিসার
স্বাভাবিক উচ্চারণে? বলে যাও, হে মোহিনী,
নিসর্গে তোমার
রচিত নির্ভয় থেকে আর কোন শব্দ নেই, ধ্বনি নেই আর।
সম্পূর্ণ যাবার আগে বলে যাও উত্তালিত অন্তরে বাহিরে,
তোমার হৃদয় ছিল শুভতা সমান। সরবতের মতন আঁধারে
তুমি যে আনন্দে মুগ্ধ ছিলে এক সর্বময় দৈবত বিশ্বাসে,
তেমন ছিল না কিছু। তবে হে প্রেমিকবন্ধু, নিভৃত বিজনে,
জগৎ প্লাবিত বৃষ্টি থেমে গেলে, একদিন নির্মেঘ আকাশে,
আবার আসবে ফিরে, বলে যাও, রূপে রসে মুগ্ধ আয়োজনে॥

তখনো ছিল বেলা

বিশ্বেশ্বর সামন্ত

হঠাৎ শুনি বাজলো ঘণ্টা ট্রেনে
অজানা সন্ধানে,
সিথান সিন্দুর যাত্রী বধূ একা,
মরণপ্রিয় সূরের অনামিকা
বেরিয়ে এলে পথে,
হেসে ওঠে প্রভাতসূর্য
আলোর শরাঘাতে।

খানিক বাদে বাজলো ঘণ্টা দূরে
হারিয়ে যাওয়ার সুরে
চোখের কোণে কাটে নি ঘুমঘোর,
যদিও তখন হয়েছে সবে ভোর
ভাসিয়ে দিলে ভেলা,
তখনো ছিল দিনের আলো
তখনো ছিল বেলা।

ভারত দর্শন

● দিল্লীতে লালকেল্লায় এক নাগরিক সম্বর্ধনায় দিল্লীর মেয়র কুবাইতের যুবরাজ ও প্রধানমন্ত্রীকে নাগরিকদের পক্ষ থেকে হস্তীদন্ত নির্মিত স্মারক উপহার দিচ্ছেন।

রাজধানীঃ

নয়াদিল্লী এখন গরম। সংসদ-কক্ষ অগ্নিগর্ভ। সেখানে চলেছে রীতিমত রাজনৈতিক লড়াই। কেরলের খাদ্যসঙ্কট ও উড়িষ্যার ছাত্র-ধর্মঘট থেকে সুরু করে নাগাভূমির সমস্যা সমাধানে রেঃ মাইকেল স্কটের কূটনৈতিক চালবাজী নিয়ে প্রায় প্রতি দিনই বিস্ফোরণ ঘটছে সংসদের অভ্যন্তরে। তার স্ফুলিঙ্গ সভাকক্ষের বাইরে এসে পড়ছে ছিটকে। শীতের বিকেলেও আবহাওয়াটা তাতে গরম হয়ে উঠছে। কফির আড্ডায়, চায়ের মজলিসে, রাস্তা-ঘাটে এবং মহল্লায় মহল্লায় তা নিয়ে উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা চলছে।

সব চাইতে মুখরোচক ও উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা জমে উঠেছে মোরারজীভাই ও শ্রীগুলজারীলাল নন্দকে কেন্দ্র করে। কামরাজ পরিকল্পনা মাথা পেতে মেনে নিয়ে তিনি মন্ত্রিসভার বাইরে এসে পড়েছিলেন। মন্ত্রিত্বের গদীর প্রতি টান সকলেরই থাকে। এ-টান শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের একেবারে ছিল না, এমন কথা হলপ করে বলা যায় না। তিনি নিজে কিছু না বললেও তাঁর অনুগামীরা তাঁকে গদীচ্যুত দেখে বিক্ষুব্ধই হয়েছিলেন। কিন্তু স্বেচ্ছায় একবার যা তিনি পরিত্যাগ করেছেন, তাকে রাতারাতি ফিরে পাওয়াও তখন সম্ভব ছিল না। জনমত ছিল তাঁর বিরুদ্ধে। বাধ্যতামূলক সঞ্চয় চালু করে এবং স্বর্ণনিয়ন্ত্রণ বিধি প্রবর্তন করে তিনি গণমানসে উত্তাল বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণমাচারী জনমতের গতিধারা বুঝে সে-সব বিধানের পরিবর্তন করে অনেক হাততালি পেয়েছিলেন। এতে আরও নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছিলেন মোরারজীভাই।

● শ্রীমোরারজী দেশাই

নেহরুর পরলোকগমনের পর তিনি আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠেন। প্রধানমন্ত্রীর আসন হয় তখন তাঁর লক্ষ্য। পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী পরোক্ষভাবে যাঁকে স্থলাভিষিক্ত করে গেছেন, তাঁকে হঠানো সম্ভবও অবশ্য ছিল না। শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর

দায়িত্বভার গ্রহণকালে শ্রীদেশাইকে মন্ত্রিসভায় যোগদানের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি নাকি তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আসন এবং পদাধিকারে প্রধানমন্ত্রীর দ্বিতীয় স্থান—উপ-প্রধানমন্ত্রীর পদ দাবি করে বসেন। শ্রীনন্দকে নামিয়ে দেওয়া শোভন নয় ভেবেই সে দাবি রক্ষিত হয় নি। শ্রীনন্দ ছিলেন অন্তর্বর্তীকালের প্রধানমন্ত্রী। সে সব যুক্তি উপেক্ষা করার উপায় হয়তো ছিল না।

এখন স্বার্থান্বেষীরা নয়া গুজব তুলেছে। শ্রীনন্দের সঙ্গে নাকি শ্রীশাস্ত্রীর মতের মিল হচ্ছে না—বিরোধই চলেছে দুজনের মধ্যে।

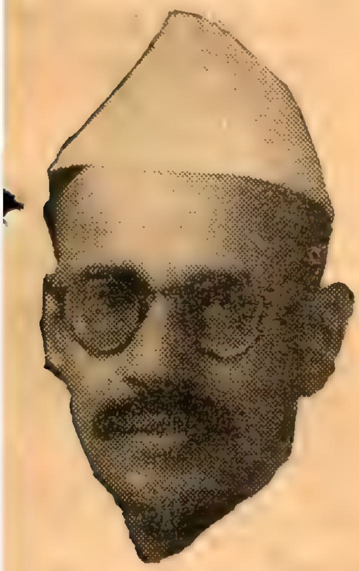

শ্রীগুলজারীলাল নন্দ

কেউ কেউ বলেছেন, মতবিরোধ ঠিক নয়, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশের কল্যাণের কথা চিন্তা করেই পরিকল্পনার কাজে ও অর্থনৈতিক বিষয়ে অভিজ্ঞ শ্রীনন্দকে প্রধানমন্ত্রী শিল্প, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক দপ্তরের ভার দিতে চাইছেন। কায়েমী স্বার্থ প্রথম থেকেই শ্রীনন্দের ওপর বিরূপ। দু' বছরের মধ্যে যিনি দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করে ঢেলে সাজতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, যাঁর চেষ্টায় কোন কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রভাবশালী নেতারা পড়েছেন বিপাকে, তাঁকে সরিয়ে নিশ্চিন্ত হতে অনেকেই ব্যগ্র। কায়েমী স্বার্থ এ কাজ হাসিলের জন্য অর্থব্যয় করে যাচ্ছে বলেও জোর গুজব ছড়িয়ে পড়েছে রাজধানীতে। রাজধানীর জনচিত্ত তাই এত চঞ্চল।

•　•　•

শ্রীমোরারজী দেশাই ও রেঃ মাইকেল স্কট সব চাইতে বেশি গরম করেছেন রাজধানীর আবহাওয়াকে। লোকসভায় বিদেশী ধর্মযাজকের প্রসঙ্গ নিয়ে প্রচণ্ড উত্তাপ সঞ্চারিত হয়েছিল। দলমতনির্বিশেষে সদস্যগণ নাগাদের বিপথগামী নেতা ফিজোর বেনামদার বলে অভিযোগ তুলেছিলেন। সকলেই তাঁর বহিষ্কারের দাবি জানিয়েছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীস্বরণ সিং আলোচনার ধারা দেখে বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। সমালোচনার জবাব তিনি যেরূপ উষ্ণকণ্ঠে দিয়েছেন তাতেই পরিষ্কার বোঝা যায় স্বয়ং মন্ত্রী পর্যন্ত মাইকেল সাহেব-এর বিবৃতিতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। পাদ্রী সাহেবের বিবৃতির সত্যাসত্য যাচাই করার পর সরকার পরবর্তী কর্মসূচী নির্ধারণ করবেন বলে জানিয়েছেন।

রেঃ স্কটও অত্যন্ত চতুর মানুষ। তিনি নাগাভূমি থেকে ছুটে চলে এসেছেন নয়াদিল্লীতে। বোঝাতে চাইছেন তাঁর বক্তব্যটা হুবহু পরিবেশিত হয় নি। সংবাদপত্রে তাঁর বিবৃতিটি বিকৃত আকারে বেরিয়েছে। এর আগেও ভারতের স্বার্থবিরোধী কথা কম বলেন নি। নরহত্যাকারী নাগাদের নৃশংস ও পৈশাচিক কার্যকলাপের নিন্দা তাঁর মুখে আজও বের হয় নি। কিন্তু হত্যালীলার অবসানে নিয়োজিত ভারতীয় পুলিশ ও সৈন্যদের বিরুদ্ধে অযথা দোষ চাপাতে তিনি কসুর করেন নি। এখানে আর মাইকেলের কূটনৈতিক মহিমার কথা টানবো না। তাঁর চালচলনের বিস্তৃত আলোচনা আগে আমরা করেছি। এবারেও নাগাভূমির সংবাদে কিছুটা করা হয়েছে।

•　•　•

প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী রাজ্যসভায় বলেছেন, চীনের পারমাণবিক বোমা বিদারণের কঠোর-কঠিন ভাষায় নিন্দা একবার বিশ্বের দরবারে হওয়া উচিত। এ-প্রশ্নটি রাষ্ট্রসঙ্ঘে উত্থাপনের যৌক্তিকতাও তিনি স্বীকার করেছেন। তার জন্য প্রয়োজন হবে উপযুক্ত প্রস্তুতির। এ প্রস্তুতি সম্পর্কে তিনি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে কিছু বলেন নি।

রেঃ মাইকেল স্কট

রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্থায়ী সদস্য পাঁচটি রাষ্ট্রই এখন পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী বলা যেতে পারে। ফরমোসা চীনের মুখপাত্র কি না তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। চিয়াং-সরকার মার্কিন ছত্রছায়ার আড়ালে নিরাপদ। প্রয়োজনক্ষেত্রে পারমাণবিক অস্ত্র তার হাতে আসতে বাধ্য। নয়াচীন নিজেই অস্ত্রের উদ্ভাবন করেছে। ফ্রান্স পারমাণবিক শক্তি আগেই অর্জন করেছে। হাইড্রোজেন বোমাই

নয়াচীন ও তার পরম সুহৃদ দ্য গল এখনও হাতে পান নি।

নয়াচীন রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য নয়। তার কাজের সমালোচনা রাষ্ট্রসঙ্ঘে করলেও আসল কাজ কিছুই হবে না। রাষ্ট্রসঙ্ঘের কোন সিদ্ধান্ত মেনে চলার বাধ্যবাধকতা তার নেই। চীনের বিরুদ্ধে বিশ্ব-দরবার থেকে সক্রিয় কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হলে আগে প্রয়োজন হবে চীনকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সভ্য করে নেওয়া। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এতে সম্মতি না দেবারই কথা। নয়াচীনকে স্বীকার করলে তাদের পোষ্য চিয়াং কাইশেককে পথে বসাতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নয়াচীনকে স্বীকার করে নিলেও রাষ্ট্রসঙ্ঘের সিদ্ধান্ত চীন মেনে নেবে, এরূপ বিশ্বাস আমাদের নেই। চীন কোনদিনই নিজের যুক্তি ছাড়া অপরের যুক্তির সম্মান দেয় নি। তার নিজের সর্তে মীমাংসা ভিন্ন অন্য কোন কথা চীনের জঙ্গী নেতারা আজ পর্যন্ত মেনে নেয় নি। চীন রাষ্ট্রসঙ্ঘে ঠাঁই পেলে 'ভেটো' দিয়ে সব বানচাল করে দিতে পারবে। কাজেই রাষ্ট্রসঙ্ঘে চীনকে গ্রহণ করলেই চীনা দৌরাত্ম্য হ্রাস পাবে, এমন সম্ভাবনা নেই।

চীনকে জব্দ করতে হলে তার বিরুদ্ধে বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের জনমত গড়ে তোলা দরকার। চীন অস্ত্র প্রয়োগের দ্বারা বিশ্বশান্তি বজায় রাখার অভিনব যুক্তি তুলে আফ্রিকার নবজাগ্রত রাষ্ট্রগুলির চিত্তে যে শ্রদ্ধার আসনলাভের অপপ্রয়াস করছে তার সেই মতলবটা ফাঁস করে দেওয়ার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। সে কাজ করতে হলে চীনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ধিক্কারধ্বনি উত্থাপনের শ্রেষ্ঠ স্থান রাষ্ট্রসঙ্ঘ। সেই সঙ্গে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলোতে চীনের মুখোশটা খুলে ধরার আয়োজন করতে হবে।

কুবাইতের যুবরাজ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ সাবা আল সালেম আল সাবাকে বিপুল ভাবে সম্বর্ধনা জানিয়েছে নয়াদিল্লী। প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর সঙ্গে শেখের আলোচনায় ভারত-কুবাইত সহযোগিতায় উভয় দেশের যৌথ শিল্প গড়ে তোলার উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী কুবাইত সফরের আমন্ত্রণও গ্রহণ করেছেন।

* * *

কেরলের খাদ্যসঙ্কট নিয়ে আলোচনাকালে বিতর্কের ঝড়ের গতিরোধ

শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায়

করতে গিয়ে খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মণিয়ম সরকারী ব্যর্থতার কথা অস্বীকার করতে পারেন নি। তিনি আবার ব্যর্থ হলে রাজনৈতিক মূল্য দেবেন বলে সদর্পে ঘোষণা করেছেন। যে কারণে সমুদ্র-উপকূলের নারকেলকুঞ্জের ছায়াঢাকা শান্ত ছোট রাজ্যটিতে অশান্তির আগুন জলে উঠেছিল, তার বিবরণও তিনি সংসদে পেশ করেছেন। সে কারণগুলো চিরতরে অপসারণের সুষ্ঠু কোন ব্যবস্থার কথা কিন্তু বিবৃতিতে পাওয়া যায় নি।

মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে শেষ পর্যন্ত কলকাতা, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, হায়দ্রাবাদ ও সমগ্র কেরল রাজ্যে বিধিবদ্ধ রেশন প্রথা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সেখানেও পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লদা এবং শ্রীসুব্রহ্মণিয়মই প্রধান বক্তা ছিলেন। রেশন প্রথা চালু করার পক্ষে তাঁরা দুজনেই ক্ষুরধার যুক্তির অবতারণা করেছিলেন।

বিধিবদ্ধ রেশন চালু করার আগে চাহিদা মেটাবার মত পরিমিত খাদ্যশস্য কেন্দ্রের ভাণ্ডারে মজুত রাখতে হবে। কেন্দ্রের ভাণ্ডারে পর্যাপ্ত শস্য মজুত রয়েছে বলে বারবার ঘোষণা খাদ্যমন্ত্রী করা সত্ত্বেও কেরলের মানুষ ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করতে না-পেরে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। খাদ্যশস্য খোলাবাজারে যতদিন থাকবে ততদিন এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি স্বাভাবিক। যে-কোন মুহূর্তে ব্যবসায়ীচক্র বাজারে অরাজকতা সৃষ্টি করতে কসুর করবে না। খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বণ্টনের সুপরিকল্পিত ও দৃঢ় নীতি অবলম্বন না করতে পারলে শ্রীসুব্রহ্মণিয়ম শেষ রক্ষা করতে পারবেন না।

বিহার ঃ

রাঁচীর নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়ের কারণ নিয়ে নানা জোর জল্পনা-কল্পনা চলছে। এ-পরাজয়ে কংগ্রেস ও রাজ্য সরকারের মর্যাদায় বেশ কিছুটা আঘাত হেনেছে। রাঁচীর নির্বাচনে প্রকৃত প্রস্তাবে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসহায়ের পরাজয়—তাঁর গৌরব এতে অনেকটা ম্লান হয়েছে।

শ্রীসহায়ের সাংগঠনিক নীতি কংগ্রেসকে দুর্বল করে দিয়েছে। কংগ্রেস মহল মনে করে শ্রীসহায়ের দূরদৃষ্টির অভাবে কংগ্রেস আজ যে পর্যায়ে নেমেছে, তাতে রাঁচীর নির্বাচনে পরাজয় ছিল অবশ্যম্ভাবী।

কংগ্রেসকে সে-নির্বাচনে লড়াই করতে হয়েছে নাগরিক সুধার সমিতির—বিরোধীদের সম্মিলিত শক্তির সঙ্গে। তাঁদের সঙ্গে আবার যোগ দিয়েছিলেন কংগ্রেসের ক্ষুব্ধ কর্মীরা। দলত্যাগী ও বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসকর্মী এবং ঝাড়খণ্ড পার্টিই ছিল নাগরিক সুধার সমিতির মেরুদণ্ড। বত্রিশটি আসনের মাত্র চোদ্দটি পেয়েছে কংগ্রেস। নাগরিক সুধার সমিতি দখল করেছে পনেরটি আসন।

এ-নির্বাচনকে শ্রীসহায় মর্যাদার লড়াই হিসেবেই ধরে নিয়েছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধপন্থী কংগ্রেস-নেতৃত্বের প্রকাশ্য চালেঞ্জের মোকাবিলার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। আশা ছিল, এই নির্বাচনে জয়লাভের পর বিরুদ্ধপন্থী নেতৃত্বের কোমর যাবে ভেঙে। কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধাচরণ যাঁরা করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনেও তিনি দ্বিধা করেন নি।

শ্রীসহায়ের বিরোধী কংগ্রেস নেতৃত্ব এই নির্বাচনকেই কাজে লাগাতে চাইছেন। তাঁরা মনে করেন হাই-কমাণ্ড এরপর আসল অবস্থাটা উপলব্ধি করবেন। শ্রীসহায়ের হাতে নেতৃত্বের হাল তুলে দেওয়ায় কংগ্রেসের শক্তি কতটা হ্রাস পেয়েছে তা' এবার কেন্দ্রীয় নেতারা সহজেই বুঝতে পারবেন।

রাঁচীতে পূর্বাঞ্চল কংগ্রেস কর্মী-সম্মেলনের প্রাক্কালে ক্ষমতাসীন দলের এই বিপর্যয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপন্ন হয়ে পড়েছেন। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদার আসছেন। ওপর-তলার অন্যান্য নেতারাও সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন। শ্রীসহায়ের বিরুদ্ধ-পক্ষ এ-সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণের আয়োজন করছেন। কংগ্রেস সভাপতিকে অভ্যর্থনার জন্য তাঁরা আলাদাভাবে প্রস্তুত হচ্ছেন।

শ্রীসহায়ের অনুগামীরা কংগ্রেস সভাপতির হাতে দু'লক্ষ টাকা সমর্পণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অপর দিকে বিরোধীদের অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে শ্রীমতী জাহানারা ও শ্রীজয়পাল সিং এম-পি দু'লক্ষ নরনারীর স্বাক্ষর সম্বলিত আবেদনপত্র পেশ করবেন কংগ্রেস সভাপতির কাছে। তাঁরা স্বাক্ষর সংগ্রহের অভিযানে নেমেও পড়েছেন। আশা করেন, ক'দিনের মধ্যেই পাঁচ লক্ষ স্বাক্ষর তাঁরা সংগ্রহ করতে পারবেন।

সংসদ ও বিধানসভার সদস্য সহ প্রায় একশ' প্রতিপত্তিশালী কংগ্রেস-সদস্যের স্বাক্ষর সম্বলিত আবেদনপত্র ইতিমধ্যেই তাঁরা প্রচার করেছেন।

● শ্রীকামরাজ নাদার

পুস্তিকায় রয়েছে—শ্রীকামরাজ এবং ঝাড়খণ্ড পার্টির নেতা ও বিহারের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীজয়পাল সিংয়ের ছবি। গণ-আবেদনে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের এবং মন্ত্রিসভার আশু পরিবর্তন দাবি করা হয়েছে। কংগ্রেস সংগঠন ও মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে দুর্নীতি, আত্মীয় পোষণ ও দলবাজীর অভিযোগ আনা হয়েছে।

* * *

মজুতদারদের সরাসরি বিচারের বিধান জারী হওয়ার পরও খাদ্য পরিস্থিতির কোন পরিবর্তনই হয় নি। রাজ্যময় চরম খাদ্যসঙ্কট চলেছে সরকার এ-বিপদের মুখেও অর্ডিন্যান্সের অস্ত্র প্রয়োগের ব্যাপারে বেপরোয়া হতে চাইছেন না। সমগ্র ব্যাপারটা নাকি এখন সরকারের 'সক্রিয় বিবেচনাধীন।'

খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য রাতারাতি জবরদস্ত পদ্ধতি গ্রহণের কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই। মানুষ দিনের পর দিন আরও হতাশ হয়ে পড়ছে। অর্ডিন্যান্সের প্রয়োগ অথবা জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার ব্যাপারে সরকারের আন্তরিক কোন ইচ্ছা আছে কিনা, এ সংশয় দেখা দিয়েছে সাধারণের মনে। রাজ্য সরকারের কুণ্ঠাজড়িত পদক্ষেপে কংগ্রেসকর্মীরাও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন।

জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খাদ্যশস্যের বাজারে প্রবেশ করতে এবং ফসল কাটার মরশুমে শস্য কিনতে সরকার খুব উৎসাহী নন। স্বেচ্ছামূলক সংগ্রহের নীতি তাঁরা এখনও আঁকড়ে ধরে আছেন। মজুত-দারদের শুভবুদ্ধির এতে উদ্রেক হবে না এবং তারা মজুতদারী নিশ্চয়ই বন্ধ করবে না। ন্যায্যমূল্যের দোকানে খাদ্যশস্য সরবরাহের কোন উন্নতিই এ-ব্যবস্থায় হতে পারে না।

সরকার স্থির করেছেন, মূল্যমান বজায় রাখাই হবে সরকারের খাদ্য-সংগ্রহ-নীতি। সরকার-নির্ধারিত ধানের দাম কমে গেলেই সরকারী লস্কররা যুদ্ধ ঘোষণা করবেন। ব্যবসায়ীদের মাধ্যমেই তারা বাজার থেকে ন্যায্য দাম গুণে দিয়ে ধান কিনে ফেলবেন। এ-নীতি ব্যর্থ হতে বাধ্য। ন্যায্যমূল্যের দোকানে নিয়মিত সরবরাহের অভাবেই ক্রেতারা শূন্য থলি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাধ্য হচ্ছে অত্যধিক মূল্য দিয়ে খোলা বাজার থেকে চাল ও গম কিনতে। চাল এখনও চল্লিশ টাকা প্রতি মণ। গমের মণ ষাট টাকায় ঠেকেছে।

রাজস্থান :

শ্রীকুম্ভরাম আর্যকে মন্ত্রিসভায় গ্রহণের পর তাঁকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক সংগ্রামের তীব্রতা অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। শ্রীআর্য ১৪ই নভেম্বর মন্ত্রিত্বের শপথ গ্রহণ করেছেন।

তিনি হনুমানগড় কেন্দ্র থেকে উপনির্বাচনে জয়ী হয়ে বিধানসভায় এসেছেন। তাঁকে মন্ত্রিসভায় গ্রহণের সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুখাদিয়া ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী দলগুলো একযোগে তারস্বরে সোরগোল আরম্ভ করেছিলেন। স্বতন্ত্র, জনসঙ্ঘ ও সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দলের নেতারা মুখ্যমন্ত্রীকে এ-কাজ থেকে নিবৃত্ত করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছিলেন। তাঁদের প্রতিনিধিরা এর জন্য দিল্লীর দরবার পর্যন্ত গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দকে এ-ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। উত্তরাঞ্চল আঞ্চলিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য শ্রীনন্দের জয়পুর অবস্থানকালে বিরোধী দলের নেতারা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে 'ক্রয়-বিক্রয় সঙ্ঘের' কার্যকলাপ সম্পর্কে তদন্তের অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

বিরোধী দলের মতে, শ্রীকুম্ভরাম আর্যের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। তিনি 'ক্রয়-বিক্রয় সঙ্ঘ'—কেন্দ্রীয় মার্কেটিং ফেডারেশনের সভাপতি। গুড় কেনা-বেচার ব্যাপারে দুর্নাম রটেছে এই সংস্থাটির নামে। এ-বিষয়ে প্রাথমিক তদন্ত করেছেন শ্রীবিঞ্চই। তাঁর তদন্তের রিপোর্টে নাকি শ্রীআর্যকে একেবারে নির্দোষ বলা হয় নি। প্রকাশ, শ্রীনন্দ প্রতিনিধিদলকে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, তদন্তের রিপোর্টে শ্রীআর্যের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রমাণিত হয় নি।

বিরোধী দলগুলো এর পর শ্রীআর্যের কার্যকলাপের নিন্দা করে কালো পতাকা নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল বের করেছিলেন। মিছিল থেকে ধ্বনি উঠেছিল নতুন তদন্তের। এই তদন্ত সাপেক্ষে শ্রীআর্যকে মন্ত্রিসভায় গ্রহণ না-করার দাবি বিক্ষোভকারীরা পেশ করেছিলেন।

● শ্রীসুখাদিয়া

রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার এ-সব প্রতিবাদকে আমল দেন নি। শ্রীআর্যের বিরুদ্ধে যখন বিরোধী দলের নেতারা অসন্তোষ প্রকাশ করছিলেন, সে সময়েই হনুমানগড়ের উপনির্বাচনে কংগ্রেস তাঁকে প্রার্থী নির্বাচন করেন।

গুড়ের লেন-দেনের গুরুত্বপূর্ণ দলিল বিরোধীপক্ষ নাকি কুক্ষিগত করে রেখেছেন। সময়ে তাঁরা সেগুলো মারণাস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবেন। তা' ছাড়া শ্রীবিঞ্চই-এর তদন্তের রিপোর্টে কিছু কিছু ফাঁস হয়ে পড়েছিল। এর পেছনে কংগ্রেসের উপদলীয় কোঁদলও কিছুটা সাহায্য করেছে, সন্দেহ নেই। স্বতন্ত্র ও জনসঙ্ঘের আক্রোশটা কিন্তু ভিন্ন ধরণের। এ-দুটো দলের নেতৃত্বই জাঠদের পরম শত্রু। কুম্ভরামের বড় অপরাধ—তিনি একজন জাঠ। কংগ্রেসের একাংশের সঙ্গে জাঠবিরোধী নেতৃত্বের রাজযোটকের ফলেই আন্দোলন এতটা জোরদার হয়েছিল।

• • •

পাঞ্জাব, কাশ্মীর, রাজস্থান, হিমাচল প্রদেশ ও দিল্লী নিয়ে গঠিত আঞ্চলিক পরিষদের অধিবেশন হয়ে গেল জয়পুরে। খাদ্য সমস্যাই আলোচনায় প্রাধান্য লাভ করেছিল। খাদ্যশস্যের পূর্ণাঙ্গ রেশন প্রথা চালু করার দায়িত্ব কোন রাজ্যই নিতে সম্মত হয় নি।

পাঞ্জাব ভিন্ন এ-অঞ্চলের কোন রাজ্যেই ধান হয় না পর্যাপ্ত পরিমাণে। খাদ্যশস্যের কর্পোরেশনও এপ্রিলের আগে সম্ভব নয়। গম ও চালের সরবরাহ নিশ্চিত না হলে সে কাজে হাত দেওয়া সম্ভব হবে না।

মোটা দানার শস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসা পরিচালনায় রাজস্থান তেমন উৎসাহী নয়। বাজরা ও জোয়ার রাজ্যের বাইরে চালানের ওপর বাধা-নিষেধ আগেই আরোপ করা হয়েছে। মজুত মোটা দানা শস্যের এক চতুর্থাংশের বেশি কোন ব্যবসায়ী তার গুদাম থেকে রাজ্যের বাইরে পাঠাতে পারবে না। যে পরিমাণ শস্য বাইরে চালান দেবে, তার সমপরিমাণ ব্যবসায়ীকে সরকারের কেন্দ্রীয় শস্যভাণ্ডারে তুলে দিতে হবে। এ-নীতি চলতে থাকলে বাইরের চালান যেমন হ্রাস পাবে, তেমনি দামটাও স্থিতিশীল হবে বলে সরকার মনে করেন।

খাদ্যের ভেজাল বন্ধ করার এবং সাধারণ মানুষের কাছে খাদ্যশস্য সহজলভ্য করার সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বনের অনুরোধ মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়ে গেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীনন্দ। বিকল্প বণ্টন ব্যবস্থা হিসেবে ক্রেতা সমবায় ভাণ্ডার তাড়াতাড়ি গড়ে তুলতে বলেছেন।

মধ্যপ্রদেশ :

ভারী কোন প্রকল্পে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে নতুন করে হাত আর লাগানো হবে না। রাজ্য সরকার আর্থিক পরিস্থিতির পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এই সিদ্ধান্তে এসেছেন বলে, বিশ্বস্তসূত্রে খবর পাওয়া গেছে।

গেল তিনটি বছরের ব্যয়াধিক্যে সরকারী কোষাগারের ওপর যে বিরাট চাপ পড়েছে, তা' কিছুটা হ্রাস করাই হবে এখন সরকারের প্রধান লক্ষ্য। বর্তমান সিদ্ধান্ত মেনে চললে আগামী আর্থিক বছরে ছ' কোটি পঁচাত্তর লক্ষ টাকার ব্যয় হ্রাস পাবে।

মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য সরকারের এ-সিদ্ধান্তের কথা প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এবং পরিকল্পনা কমিশনকে নাকি জানিয়েও দিয়েছেন। সেই সঙ্গে শ্রীমিশ্র সাধারণ মানুষের করভারের কথাটা উল্লেখ করেছেন। চতুর্থ পরিকল্পনায় কেন্দ্রকে এ-রাজ্যের প্রতি সদয় হতে এবং দরাজ হাতে সাহায্য দিতেও অনুরোধ জানানো হয়েছে।

নাগাভূমি :

ভারতের ঈশান কোণে জঙ্গলাকীর্ণ এই পার্বত্য রাজ্যটিতে আবার দুর্যোগের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বিদ্রোহী নাগারা বেশ চড়া গলায় নতুন করে পুরোনো কথাগুলো আওড়াতে সুরু করে দিয়েছে। তারা নিজেদের অভারতীয় বলে ঘোষণা করছে। স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নাগারাষ্ট্রের যে দাবিতে মারমুখী হয়ে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে তারা অস্ত্রধারণ করেছিল দু'মাস ধরে আলাপ-আলোচনার পর সেই উদ্ভট দাবিটার ওপরই এখন জোর দিচ্ছে।

শান্তি মিশনের প্রধান মাতব্বর বিলাতের পাদ্রীসাহেবটিও নাগাদের অলীক ও অবাস্তব দাবিটাতে সায় দিয়ে চলেছেন। তিনি কলের বাঁশির মত গলা বাড়িয়ে অস্ত্র সম্বরণের চুক্তিকে সরাসরি আন্তর্জাতিক চুক্তির মর্যাদা দিয়ে ফেলেছেন। নাগাদের ভারতীয় নাগরিক হিসেবেও তিনি আর গণ্য করছেন না। নিজেদের বিদেশী পর্যবেক্ষক বলেই ঘোষণা করতে কুণ্ঠাবোধ করছেন না। তাঁর চালচলন ও কথাবার্তায় নাগারা এতদিন তাঁকে বিদেশী রাষ্ট্রের নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক হিসেবেই ধরে নিয়েছিল। আলোচনার সময় সে-কথাটা নানা কৌশলে সম্ভবত স্কট সাহেব গোপন রেখেছিলেন। প্রকাশ্যে তাই সে-কথাটা কেউ এতদিন উচ্চারণ করেন নি। নাগা প্রতিনিধিদের তরফ থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত প্রচারপত্রে রেঃ মাইকেল স্কটকে বিদেশী পর্যবেক্ষক বলেই বর্ণনা করা হয়েছে।

বিদ্রোহী নাগাদের দমনের জন্য ভারতীয় সৈন্যদল নিয়োগের আইন-সঙ্গত অধিকারও হয়তো একদিন ফিজোর আশ্রয় ও পরামর্শদাতা স্কট সাহেব অস্বীকার ক'রে বসবেন। তাঁর চালচলন ও আচরণ সম্পর্কে অনেক কথাই প্রথম দিকে উঠেছিল। সে-সব কথা এখন সত্যে পরিণত হতে চলেছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য নিয়োজিত ভারতীয় সৈন্যের সঙ্গে বৈরী নাগাদের সংঘর্ষকে তিনি বেনামুর নাগা ও ভারতীয়দের সংগ্রাম আখ্যা দিয়ে বসেছেন।

নাগাদের ওকালতি করতে নেমে তিনি বলেছেন, বিশ্বের কুত্রাপি এমন সততার সাথে শান্তিচুক্তি রক্ষিত হয় নি। তাঁর এ-বাচনভঙ্গীও দুরভিসন্ধিমূলক। তিনি আন্তর্জাতিক শান্তিচুক্তির—দুটি স্বতন্ত্র, স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে সাধিত শান্তিচুক্তির পর্যায়ে নিয়ে ফেলেছেন বিপথগামী একদল ভারতীয় নাগরিকের সঙ্গে আপোষ-আলোচনার সাধারণ ব্যাপারটাকে। তিনি বলেছেন, কোন পক্ষই একটি বন্দুকও চালায় নি। এ নির্জলা মিথ্যাপ্রচারও উদ্দেশ্য-মূলক। ভারতের পক্ষ থেকে অক্ষরে অক্ষরে আলোচনার সর্ত পালিত হলেও নাগারা কথা রক্ষা করতে পারে নি। সেদিনও তাদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে নিরাপত্তাবাহিনীর। ভয় দেখিয়ে নাগারা শান্তিপ্রিয় নাগাদের দলে ভর্তি করছে। জোর করে টাকা আদায় করছে। একদল সশস্ত্র নাগা পাকিস্তানে পাড়ি দিয়েছে। এসব কথা পাদ্রীসাহেবের অজানা নয়। জানি নে, এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য কি? তিনি ধুরন্ধর মানুষ। যারা শান্তি আলোচনার পরিপন্থী কাজ করে চলেছে, তাদের ওপর শান্তি আলোচনার অংশীদার নাগাদের প্রভাব [illegible] থাকলে অবশ্য ভিন্ন কথা।

বৈরী নাগাদের সঙ্গে আরেক চক্কর আলোচনা হবে—এ-মাসের শেষের দিকে। এ-কথা ঘোষণা করে শ্রীস্বরণ সিং বলেছেন, নাগারা হয়তো একটু বেশি করেই দাবিটা উত্থাপন করেছেন। দাবি উত্থাপনকালে নাকি এ-রকম অবাস্তব কথা বলার রেওয়াজ আছে।

শান্তি প্রতিষ্ঠায় নাগাদের আন্তরিকতাতে আমরা সংশয় প্রকাশ কোন দিনই করি নি। তারা রণক্লান্ত হয়েই পড়েছিল। কাইটোর দল ভিন্ন অন্যেরা নরম হয়েই এসেছিল। ঠিক সেই সময়টিতে ফিজো পাঠিয়েছিলেন রেঃ মাইকেল স্কটকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে স্কট সাহেবের মুরুব্বিয়ানার বিচার করে ভারত সরকারের উচিত ছিল—সরাসরি নাগাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ানো। নাগাভূমির সরকারের এক্তিয়ারটাও তাদের পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। এর প্রয়োজন হলে প্রচারের মাধ্যম পাল্টাতে হতে পারে। দায়িত্বশীল, জনপ্রিয় নেতারা এ-কাজে নামলে তার ফল হবে সমধিক। প্রয়োজন হলে শিক্ষিত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগাদের নিয়ে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীও গঠন করতে হবে। সেই সঙ্গে দৃঢ়কণ্ঠে বৈরী নাগাদের বুঝিয়ে দিতে হবে—নাগাভূমি ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ, আগেও ছিল—এখনও রয়েছে। বিদেশী শাসক ক্ষমতা হস্তান্তর করে বিদেয় নেবার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য রাজ্যের মত নাগাভূমির দায়-দায়িত্ব—শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করে শাসন পরিচালনার ভার ন্যস্ত হয়েছে ভারত সরকারের ওপর। কাইটো আর যাই করুন, চীন বা পাকিস্তানের মদত যতই তিনি পান না কেন, কোন রাষ্ট্রই নাগাভূমির সমস্যা নিয়ে বিশ্বের দরবারে হাজির হবে না। ফিজো স্বয়ং সে-চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। কাজেই আলেয়ার পেছনে ঘুরে বৈরী নাগারা নিজেদের ও দেশের অকল্যাণই করবে।

• লণ্ডনে ল্যাঙ্কাস্টার হাউসে কলম্বো পরিকল্পনা গোষ্ঠীর মন্ত্রীপর্যায়ের পরামর্শদাতা কমিটির সম্মেলনের একটি দৃশ্য।

বৃটেন ঃ

ভারতের প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে বৃটিশ সাহায্য লাভের জন্য প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রী ওয়াই বি চ্যাবনের প্রচেষ্টা সাফল্য-মণ্ডিত হয়েছে। বৃটেনের কমনওয়েলথ মন্ত্রী আর্থার বটমলী ও বৃটিশ সরকারের অন্যান্য প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনার পর গত ২০শে নভেম্বর লণ্ডনে যে চূড়ান্ত ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়, তাতে ঘোষণা করা হয়েছে, বৃটেন প্রতিরক্ষার জন্য ভারতকে অবিলম্বে ৪৭ লক্ষ পাউণ্ড অর্থ ঋণ দেবে। এই অর্থের সাহায্যে বোম্বাই-এর মাজগাঁও ডক সংস্কার করা হবে। বৃটেন ভারতকে অবিলম্বে লিণ্ডার শ্রেণীর ৩টি ফ্রিজেট দেবে। ভারতীয় নৌবহরের শক্তি বৃদ্ধির জন্য ১ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকার যে দশসালা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, বৃটেনের বর্তমান ঋণ তার জন্য ব্যয় করা হবে। প্রয়োজন হলে এই কাজের জন্য বৃটেন ভবিষ্যতে আরও অর্থ দেবে। এ ছাড়া সাবমেরিন ধ্বংস-কার্যে ভারতীয়দের ট্রেনিং দেবার জন্য বৃটিশ রাজকীয় নৌবহর থেকে সাব-মেরিন দেয়া হবে।

বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে, ভারতের প্রতিরক্ষার প্রয়োজন সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ অবহিত এবং নিজেদের আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী তারা ভারতকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করবে।

প্রতিরক্ষা মিশনের নেতারূপে শ্রীচ্যাবন নিশ্চয়ই এই বৃটিশ সাহায্যের জন্য আনন্দিত। আলোচনা শেষে লণ্ডনে ইণ্ডিয়ান সোস্যাল ক্লাবের ভোজসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীচ্যাবন বলেছেন, 'আমি যা চেয়েছিলাম, তার সবই পেয়েছি।'

ভারতের জন্য বৃটেনের নতুন শ্রমিক সরকারের এই সাহায্য প্রদান ভারতের প্রতিরক্ষার দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চীনা আক্রমণের পর ভারত বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ব্যাপক অস্ত্র সাহায্য পেয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভারত সোভিয়েট ইউ-নিয়নের সাহায্যও লাভ করেছে।

সোভিয়েট ইউনিয়ন ভারতের ওপর চীনা আক্রমণ সমর্থন না করায় এবং চীন-সোভিয়েট মতবিরোধ তীব্র হওয়ায় ভারত ক্রমবর্ধমান সোভিয়েট সাহায্যের ওপর নির্ভর করেছে। শ্রীচ্যাবন মস্কোয় গিয়ে সোভিয়েট সরকারের সঙ্গে অস্ত্র সাহায্যের বিষয়ে এক চুক্তিও সম্পাদন করেছেন। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নে ক্রুশ্চেভের পতন ও ব্রেজনেভ-কোসিগিন নেতৃত্বের আবির্ভাব, এবং চীন-সোভিয়েট বিরোধ নিষ্পত্তির প্রচেষ্টার ফলে ভারত সোভিয়েট ইউনিয়নের ওপর প্রতিরক্ষার ব্যাপারে কতটা নির্ভর করতে পারবে, সে বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। ভারত সম্পর্কে সোভিয়েট ইউনিয়নের নীতির কোন পরিবর্তন হয় নি, এ কথা বারে বারে ঘোষণা করা সত্ত্বেও (উল্লেখ-যোগ্য, এ কথা ভারতের নেতারা বেশি করে বলছেন,—সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতারা এ ব্যাপারে খুব মুক্তকণ্ঠ নন), সন্দেহ দূর হয় নি। এই কারণে ভারতের পক্ষে বেশি করে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই।

বৃটেন কর্তৃক ভারতকে অস্ত্র-সাহায্য দান, বিশেষ করে নৌবাহিনীর সম্প্রসারণে সাহায্যের বিরুদ্ধে পাকিস্তান তীব্র আপত্তি জানিয়েছে। চ্যবন-বটমলী আলোচনার সময় লণ্ডনে পাকিস্তানের পক্ষে নানাভাবে চাপ সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু বৃটিশ সরকার পাকিস্তানের আপত্তি অগ্রাহ্য করে ভারতকে সামরিক সাহায্য দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ভারত-পাক বিরোধে শ্রমিক দল রক্ষণশীল দলের অপেক্ষা ভারতকে বেশি সমর্থন করবে, এই আশা সঙ্গতভাবেই করা যায়।

• • •

কলম্বো পরিকল্পনা গোষ্ঠীর মন্ত্রীপর্যায়ের পরামর্শদাতা কমিটির চার দিনব্যাপী সম্মেলন গত ২০শে নভেম্বর লণ্ডনে সমাপ্ত হয়েছে।

সম্মেলনের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, কলম্বো পরিকল্পনার মেয়াদ আরও পাঁচ বৎসর, অর্থাৎ ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। ১৫ বৎসর পূর্বে এই সংস্থা গঠন করা হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের সাহায্যে দক্ষিণ ও

● হ্যারল্ড উইলসন

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মসূচী গ্রহণ করার জন্য এই সংস্থা স্থাপন করা হয়েছিল। এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজ এখনও প্রচুর বাকি আছে—অধিকাংশ স্থানেই মানুষ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করছে। সুতরাং কলম্বো পরিকল্পনার কাজের মেয়াদ বৃদ্ধির সিদ্ধান্তে অনগ্রসর দেশগুলি খুশি হবে।

বৃটেনের নতুন শ্রমিক সরকারের প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন এই সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছেন, তাঁর শ্রমিক সরকার কলম্বো পরিকল্পনার কাজে আরও বেশি করে অর্থ ব্যয় করবে।

সম্মেলনে স্থির হয়েছে, কমিটির পরবর্তী বৈঠক আগামী বৎসর করাচীতে হবে এবং জনসংখ্যার সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যা নিয়ে এই বৈঠকে বিস্তৃতভাবে আলোচনা হবে।

ভারতের পক্ষ থেকে লণ্ডন সম্মেলনে বলিরাম ভগৎ ও এন— সি সেনগুপ্ত উপস্থিত ছিলেন।

● ● ●

শ্রমিক সরকারের প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন হাউস অব কমন্সে ঘোষণা করেছেন, বৃটেন থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় আর কোন প্রকার অস্ত্র প্রেরণ করতে দেয়া হবে না।

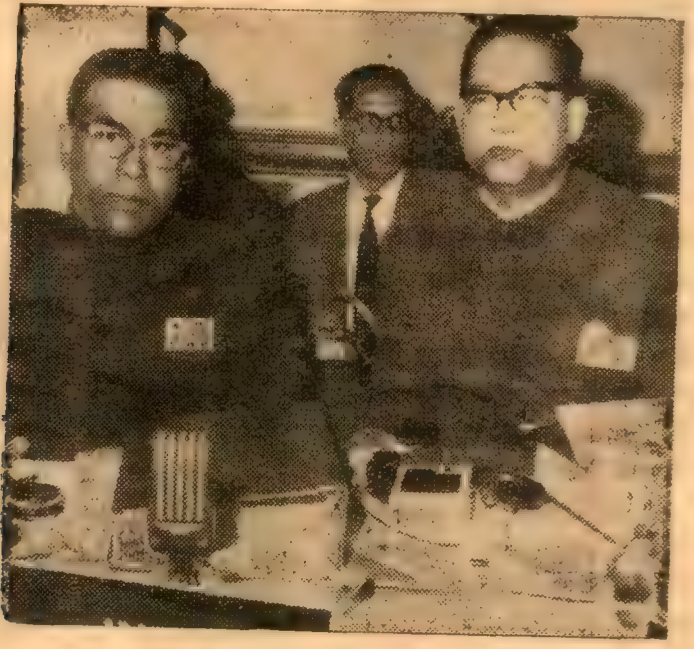

● কলম্বো পরিকল্পনা সম্মেলনে যোগদানকারী ভারতীয় প্রতিনিধি বলিরাম ভগৎ ও এন সি সেনগুপ্ত।

স্যার আলেকজাণ্ডার ডগলাস হিউমের রক্ষণশীল সরকারের পক্ষ থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের নিকট ১৬টি বুকানিয়ার বিমান বিক্রয়ের যে চুক্তি করা হয়েছিল, সেই চুক্তি কার্যকরী করা হবে কিনা, সে বিষয়ে বর্তমানে শ্রমিক সরকার বিবেচনা করে দেখছেন। তবে নতুন করে অস্ত্র রপ্তানী করার জন্য আর কাউকে লাইসেন্স দেয়া হবে না বলে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

নির্বাচনের সময় ও তারও পূর্বে শ্রমিক দল দক্ষিণ আফ্রিকায় বৃটিশ অস্ত্র বিক্রয়ের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। শ্রমিক দল দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের বর্ণবৈষম্য নীতির তীব্র বিরোধী। তাই বর্ণবৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য শ্রমিক দল সর্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণের বিরোধী।

ইতিমধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের প্রধানমন্ত্রী ডঃ হেনড্রিক ভেরউর্ড বৃটিশ সরকারের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেছেন, বৃটিশ সরকার যদি পূর্ব চুক্তিমত বুকানিয়ার বিমান প্রেরণ না করে, তবে দক্ষিণ আফ্রিকা বৃটেনকে সাইমনসটাউন নৌঘাঁটিটি আর ব্যবহার করতে দেবে না।

উইলসন ভেরউর্ডের হুমকীর কাছে মাথা নত করবেন না বলেই মনে হয়।

পশ্চিম জার্মানী :

পশ্চিম জার্মানীর নেতৃবৃন্দ কি শেষ পর্যন্ত দ্য গলের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন? ক্ষমতাসীন 'ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টির' সাম্প্রতিক দল বৈঠকের সিদ্ধান্ত দেখে তাই মনে হয়।

ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টি সিদ্ধান্ত করেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাবিত বহুজাতি পরমাণু নৌবাহিনীতে পশ্চিম জার্মানী যোগ দেবে না।

• দ্য গল

ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি চার্লস দ্য গল কিছুদিন ধরে দুটি বিষয় নিয়ে পশ্চিম জার্মানীর ওপর চাপ দিচ্ছিলেন। প্রথম, পশ্চিম জার্মানীর উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্যের দাম ইউরোপের বাজারে কমাতে হবে---তা না হলে ফ্রান্স কমন মার্কেটে থাকবে না। আর দ্বিতীয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম জার্মানী পারমাণবিক নৌবাহিনীর যে পরিকল্পনা করেছে, তা বন্ধ করতে হবে---নইলে ফ্রান্স 'ন্যাটো' ত্যাগ করবে।

এই দুটি প্রশ্নেই ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টির মধ্যে প্রবল মতবিরোধ রয়েছে। প্রাক্তন চ্যান্সেলার আদেনুয়র দ্য গলের বক্তব্যের সমর্থক, কিন্তু বর্তমান চ্যান্সেলর- এরহার্ড এর সম্পূর্ণ বিরোধী।

আদেনুয়র প্যারিসে গিয়ে দ্য গলের সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এবার দ্য গল আদেনুয়রকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, পশ্চিম জার্মানী তাঁর কথা না শুনলে তিনি ১৯৬৩ সালের ফ্রান্স-জার্মানী চুক্তি বাতিল করে দেবেন। এই ধমকের মুখোমুখি দাঁড়াবার সাধ্য বর্তমান জার্মান নেতৃবৃন্দের নেই। আদেনুয়র প্যারিস থেকে টেলিফোনে এরহার্ডের সঙ্গে কথা বলেছেন। তারপরই দলের সভা ডেকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, পশ্চিম জার্মানী পারমাণবিক নৌবাহিনীতে যোগ দেবে না।

খাদ্যদ্রব্যের দাম নিয়ে এখনও কোন মীমাংসা হয় নি বলেই মনে হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঃ

সম্প্রতি ওয়াশিংটনে মার্কিন জাতীয় বৈদেশিক-বাণিজ্য পরিষদের ৫১তম অধিবেশন উপলক্ষে প্রদত্ত এক বাণীতে রাষ্ট্রপতি লিণ্ডন বি জনসন ঘোষণা করেছেন, বৈদেশিক-বাণিজ্যের

• এরহার্ড

ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের মধ্যে একটা সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চেষ্টা করবে।

বর্তমানে জেনেভায় যে বাণিজ্য আলোচনা চলছে, তার সাফল্য সম্পর্কে আশা প্রকাশ করে জনসন বলেন, 'এই সম্মেলন উন্নত ও অনুন্নত সকল জাতির স্বার্থ' রক্ষা করতে সক্ষম হবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশেষভাবে সহায়ক হবে।

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জন এফ কেনেডি বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য আলোচনা ও বাণিজ্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার যে কাজ সুরু করেন, তা সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য জনসন মার্কিন শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের প্রতি আবেদন জানান।

কিন্তু সমস্যা হল, বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একই সঙ্গে উন্নত ও অনুন্নত দেশের স্বার্থ রক্ষা করা কি সম্ভব হবে? সাধারণ বেসরকারী ব্যবসায়ীরাও কি নিছক উচ্চ মুনাফার সুযোগ ছেড়ে দিয়ে অনুন্নত দেশের স্বার্থের কথা ভাববেন?

কম্বোডিয়া ঃ

কম্বোডিয়ার স্বাধীনতার একাদশ বার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানী নম্ পেনে অত্যন্ত জাঁক-জমকের সঙ্গে এবার সামরিক-বাহিনীর কুচকাওয়াজ ও ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছিল।

কম্বোডিয়ার নিরপেক্ষ রাষ্ট্রপ্রধান প্রিন্স নরোদম সিহানুক এই উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদ্গার করেছেন। সিহানুকের বক্তব্য, কম্বোডিয়া---দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সীমান্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কম্বোডিয়ার সীমান্ত লঙ্ঘন করছে এবং কম্বোডিয়ার স্বাধীনতাকে বিপন্ন

• আদেনুয়র

করে তুলছে। থাইল্যাণ্ডের দিক থেকেও কম্বোডিয়ার আশঙ্কা আছে। কম্বোডিয়ার প্রশ্নে একটি শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় সম্মত হবার জন্য তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানান। তা না হলে তিনি কমিউনিজম গ্রহণ করবেন বলে ভয় দেখিয়েছেন।

'নিরপেক্ষ' হলেও সিহানুক চীনের প্রতি অনেকখানি ঝুঁকে আছেন।

* নরোদম সিহানুক

চীনের সামরিক অস্ত্রশস্ত্রে তাঁর সামরিক বাহিনী পুষ্ট। নিরপেক্ষ রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে সম্ভবত একমাত্র তিনিই চীনের পারমাণবিক বিস্ফোরণকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। নম পেনে স্বাধীনতা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানেও সবচেয়ে সম্মানিত অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন, চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্শাল চেন-ঈ।

প্রিন্স নরোদম সিহানুক অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্যও চেষ্টা করতে প্রস্তুত আছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব অনুযায়ী ঠিক হয়েছে, দিল্লীতে তিনি মার্কিন প্রতিনিধিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে উভয় দেশের মতবিরোধ নিয়ে আলোচনা করবেন। তবে দিল্লী বৈঠকের তারিখ এখনও স্থির হয় নি।

কঙ্গো ঃ

কঙ্গোতে আবার নতুন সংকট দেখা দিয়েছে। স্ট্যানলিভিলে বিদ্রোহীদের হাত থেকে বন্দী শ্বেতাঙ্গদের উদ্ধার করার জন্য মার্কিন ও বেলজিয়ান প্যারা সৈন্য প্রেরণ করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এই সৈন্যরা ইতিমধ্যেই দক্ষিণ আটলান্টিক সাগরে বৃটিশ অধিকৃত অ্যাচেনশন দ্বীপে অবতরণ করেছে বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

কঙ্গোয় সরকারীভাবে টি শোম্বের শাসন অব্যাহত থাকলেও, দেশের অধিকাংশ অঞ্চল বর্তমানে বিদ্রোহীদের কবলে। বিদ্রোহীদের হাতে শ্বেতাঙ্গদের নিগ্রহের নানা খবরও প্রকাশিত হয়েছে। বিদ্রোহীদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, লিওপোল্ডভিল সরকারকে (টি শোম্বে) বিদেশী সাহায্য প্রদান বন্ধ না করা পর্যন্ত বন্দী শ্বেতাঙ্গদের মুক্তি দেয়া হবে না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা বেলজিয়ামের পক্ষে টি শোম্বেকে সাহায্য বন্ধ করার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, তাদের সাহায্য ভিন্ন টি শোম্বে-কাসাভুভু সরকার একদিনও টিকতে পারবে না। সুতরাং বিদ্রোহীদের হাত থেকে শ্বেতাঙ্গদের মুক্ত করার জন্য তারা ব্যাপকভাবে বিদ্রোহী-প্রধান অঞ্চলে সৈন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

কঙ্গোতে আবার বিদেশী সৈন্যরা অবতরণের ফলে কঙ্গো-সংকট আরও জটিল হয়ে উঠবে। কঙ্গোবাসীরা স্ট্যানলিভিলে বিদেশী সৈন্য অবতরণকে কঙ্গোর ওপর 'বৈদেশিক আক্রমণ' রূপে গণ্য করবে।

রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল ইউ থাণ্টও এই ঘটনায় রীতিমত বিচলিত হয়ে পড়েছেন। এই বিদেশী সৈন্য প্রেরণের ফলে যে 'অবাঞ্ছিত পরিণতি' দেখা দেবে সে সম্পর্কে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়াম ও বৃটেনকে সতর্ক করে দিয়েছেন। হয়তো শীঘ্রই তিনি এ বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।

সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ থেকেও এই কার্যের তীব্র নিন্দা করা হয়েছে।

বিদেশী হস্তক্ষেপের ফলেই বারে বারে কঙ্গো পরিস্থিতির জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। টি শোম্বের পেছন থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বেলজিয়াম এবং বিদ্রোহীদের পেছন থেকে চীনের সাহায্য অবিলম্বে প্রত্যাহার করে, কঙ্গোবাসীদের নিজেদের ওপর তাদের সমস্যা মীমাংসার দায়িত্ব ছেড়ে দেয়া উচিত। যদি কঙ্গো-

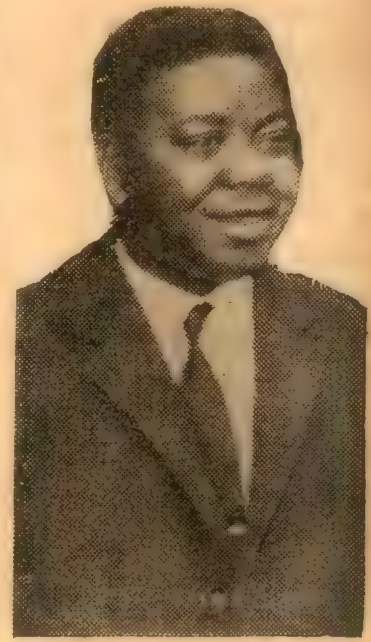

* টি শোম্বে

বাসীরা নিজেদের বিরোধ নিজেরা না মেটাতে পারে, তা হলে আফ্রিকার অন্যান্য রাষ্ট্রের সাহায্য তারা নিতে পারে। কিন্তু কঙ্গোর রাজনীতিতে আফ্রিকা-বহির্ভূত শক্তির হস্তক্ষেপ অবিলম্বে বন্ধ করা প্রয়োজন।

• ফতেমা জিন্না

জ্যামাইকা :

কিংস্টনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ পার্লামেণ্টারী সম্মেলনে পাকিস্তানী প্রতিনিধিরা অপ্রাসঙ্গিকভাবে কাশ্মীর প্রশ্ন উত্থাপনের চেষ্টা করে খুব জব্দ হয়েছেন।

পাকিস্তান প্রতিনিধিদলের নেতা পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের ডেপুটি স্পীকার চৌধুরী চিমা কাশ্মীর বিষয়ে পাকিস্তান সরকারের বক্তব্য উত্থাপন করে ভারতের বিরুদ্ধে খুব একচোট বিষোদ্‌গার করেন। ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা লোকসভার ডেপুটি স্পীকার শ্রীকৃষ্ণমূর্তি রাও পাকিস্তানী প্রতিনিধির বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং কাশ্মীর সম্পর্কে ভারতের বক্তব্য অত্যন্ত জোরের সঙ্গে উত্থাপন করেন।

এর পরেও পাকিস্তানী প্রতিনিধি কাশ্মীরের কথা বলার চেষ্টা করলে সম্মেলনে উপস্থিত অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিরা বিরক্ত হন। শেষ পর্যন্ত সম্মেলনের সভাপতি জ্যামাইকার ডেপুটিমন্ত্রী ডোনাল্ড স্যাংস্টার পাকিস্তানী প্রতিনিধিকে এ বিষয়ে না বলার জন্য নির্দেশ দেন। এ সম্পর্কে পাকিস্তানী প্রতিনিধির বক্তৃতাও সম্মেলনের কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেবার সিদ্ধান্ত করা হয়।

লণ্ডনে বিগত কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনের যুক্ত ইস্তাহারে কাশ্মীর বিরোধের পরোক্ষ উল্লেখে পাকিস্তান খুবই উল্লসিত হয়েছিল। কমনওয়েলথ পার্লামেণ্টারী সমিতির বৈঠকের এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই তারা অত্যন্ত বিমর্ষ বোধ করবে।

পাকিস্তান :

পাকিস্তানের উভয় অংশে নির্বাচনী কলেজের ৮০ হাজার সদস্য নির্বাচনের কাজ শেষ হয়েছে। সম্মিলিত বিরোধী দলের পক্ষ থেকে 'নিয়ামক কমিটী'র সদস্য মামুন উল হক উসমানী ঘোষণা করেছেন, সম্মিলিত বিরোধী পক্ষ পূর্ব পাকিস্তানে মোট আসনের শতকরা ৯০ ভাগ লাভ করেছে। তাঁর হিসাব অনুযায়ী, পূর্ব পাকিস্তানে মোট ৪০ হাজার বেসিক ডেমোক্রাটের মধ্যে সম্মিলিত বিরোধী পক্ষের ৩১,২৬৭ জন সদস্য রয়েছেন। তা ছাড়া আরও ২,৩১৮ জন তাঁদের অনুগামী। ৪,১৭৮টি আসনের ফলাফল ঘোষণা এখনও (২১শে নভেম্বর) বাকি। পশ্চিম পাকিস্তানে মোট ৪০ হাজার বেসিক ডেমোক্রাটের মধ্যে ২৬ হাজার সম্মিলিত বিরোধী পক্ষের। এই যদি নির্বাচনী ফলাফলের চেহারা হয়, তবে মার্চ মাসে এই নির্বাচনী কলেজ কর্তৃক রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফল যে কি হবে, তা সহজেই বোঝা যাচ্ছে। আয়ুব খাঁ নন, মিস ফতেমা জিন্না পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন।

তবে সরকারী মুসলিম লীগ দলের পক্ষ থেকে সম্মিলিত বিরোধী পক্ষের এই সাফল্যকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। মুসলিম লীগ দলও দাবি করেছেন যে, তাঁরাই জয়লাভ করেছেন। তা ছাড়া এই চার মাসে আয়ুব খাঁর পক্ষ থেকে দল ভাঙানোর চেষ্টাও হবে।

ছাত্রদের অপরিহার্য্য গ্রন্থ

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

পালামৌ

—ইহাতে আছে—

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রচিত সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী—সঞ্জীবনী-সুধা, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'পালামৌ সমালোচনা' এবং সমালোচক-শ্রেষ্ঠ চন্দ্রনাথ বসুর সঞ্জীব-সাহিত্য সমালোচনা। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক দ্রুতপঠন গ্রন্থরূপে নির্ব্বাচিত।

মূল্য এক টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা—৮

॥ বিত্ত-বৈভবের পীঠস্থান ডালহৌসী অঞ্চল এবং নেতাজী সুভাষ রোড ॥

(আদিপর্ব)

শ্রীপদাতিক

● লালদীঘির দৃশ্য

যুগের পর যুগ, আরও কতো যুগ পিছিয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে গতকালের আলো, হাওয়া, আকাশ এবং আকাশের মতোই নিরুদ্বিগ্ন অবকাশ। হয়তো সেকালের দিনগুলি ছিল এলোমেলো, প্রকৃতির হয়তো পরিমার্জনের ব্যাপ্তি ছিল না একালের মতো। তবু কী যেন এক ছন্দ ছিল---যার পতন ঘটেছে। কেমন যেন এক সুর ছিল---যা হারিয়ে গেছে। সে-কালেও রাজা ছিল, প্রজা ছিল, প্রজানুরঞ্জনের অঙ্গীকার ছিল। শীত ছিল, গ্রীষ্ম ছিল। বর্ষা-বসন্তের সংরাগ ছিল। আর অনাদি উচ্চারণের মতো স্নিগ্ধতা ছিল ভোরের, দুরন্ত বিভাস ছিল মধ্যাহ্নের এবং দিকে দিকে নিরুত্তাপ কান্তির উৎসর্গ ছিল গোধূলির। সবই ছিল, কিন্তু কিছুই যেন ঠিক একালের মতো নয়। একালের প্রকৃতি দুঃস্থ। আকাশ নিঃস্ব। তাই মেঘের মিনারে কাব্য লেখার অবকাশ নেই বলাকার। নদী জরাগ্রস্তা, তাই তার দীঘল দেহে প্রিয়তমা-যৌবনের প্রতিভাস নেই কোথাও। কিন্তু সেকালের কাল্পনিক নিসর্গ-প্রতিমায় মানস-নেত্রপাতেই বিহ্বলতা লাভ করে একালের কবি। কাব্য মূর্তিলাভ করে ছন্দের সেতুবন্ধে। কারণ কবির চোখে সেকালের নদী নাকি নিত্য-কালের পৌরাণিক শ্লোকের মতো এবং একান্ত দয়িতার মতোই অফুরন্ত আবেগময়ী। কিন্তু একালের নদী কেবল নদীই। সেকালের মেঘ কালিদাসের শ্রোণীভারাক্রান্তা সন্ধ্যার নিটোল তনুর মতোই মদির। কিন্তু একালের মেঘ কেবল বর্ষার প্রয়োজনে। সেকালের পাখি গান গাইতো, একালের পাখি ডাকে। অর্থাৎ অতীতের প্রতিটি কাল ছিল যেন সব মিলিয়ে আপন বৈভবের অভিষেকে রাজা-ধিরাজ। অথচ কী আশ্চর্য, দিনে দিনে পিছিয়ে গেছে সেই কালের পর কাল, আরও কতো কাল।

তিরোহিত কালে স্বৈরথে দিন কাটালেও---রাজায় রাজায় ছিলেন প্রতিবেশে ঘনিষ্ঠ। তাঁদেরই বৃহৎ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত প্রজাকুল। হয়তো ঘরে ঘরে রোগ শোক মারী মৃত্যু এবং দুঃখ-তাপের যাতায়াত ছিল নিয়মিত, কিন্তু তাদের বলিষ্ঠ প্রতিরোধে পরাঙ্মুখ অথবা অক্ষম ছিল না কোনো জীবন। সব কিছুর মধ্যেও শান্তি ছিল প্রতি ঘরের দুলালী দুহিতা; আনন্দ প্রতিদিনের প্রিয়বৃত অতিথি; আর উৎসব ছিল গৃহ-মন্দিরের উপকণ্ঠে লগ্নকালের কবিয়াল। সুতরাং সেকালের রাজা-প্রজার দিনগুলি যদিও দুর্বিপাকের ধূলোয় মলিন হতো মাঝে মাঝে, তবু তা ছিল প্রকৃতই সোনার।

আবার রাজার ওপরেও রাজা ছিলেন---ন্যায়দণ্ড যাঁদের প্রেমভারেই সঞ্চালিত হতো দিকে দিকে। তাঁরা কালজয়ী। সমগ্র কালের অনন্য ধরিত্রীর সঙ্গে প্রেমের রাখীবন্ধনেই আবদ্ধ হতে চেয়েছিলেন অশোক। আর তাঁরই বিরচিত সরণীর নির্ভীক পান্থ ছিলেন হর্ষবর্ধন। তারপর গুপ্ত-পাল-সেন রাজবংশ এবং কোনো এক গৌড়াধিপতির অমর কীর্তি যেমন আজও অম্লান, তেমনই স্মৃতি-তীর্থের অক্ষয় বিগ্রহ আরও পরবর্তীকালের মোগল-ই-আজম আকবর। তিনি ছিলেন সর্বধর্মের সমন্বয়বাদের অদ্বিতীয় নায়ক। দ্বি-ধর্মের মধ্যবর্তী যে-নিষেধের প্রাকার---তা একদিন তিনিই আমাদের ধূলিসাৎ করার সুযোগ দিয়েছিলেন ভারতবর্ষে। কিন্তু হায়! নীতি যেমন তাঁর নির্বাণলাভ করেছে, তেমনই যুগও তাঁর ভাঁটার মুখে ভেসে গেছে অনির্দিষ্ট দূরে---আর সম্ভব নয় যার প্রত্যাবর্তন। তবু না জানি কেন, মানসপটে সে-দিন-কালের চিত্রাঙ্কন প্রেরণার ইন্ধন জোগায় আজও।

মানসিংহ ছিলেন একাধারে পরমাত্মীয় এবং দক্ষিণ হস্ত আকবরের। আকবর-সাম্রাজ্যের সুবিস্তৃতির কৃতিত্ব মূলত তাঁরই। রাজধানী থেকে অনেক দূরের অসংখ্য প্রদেশ বা সুবা

প্রকৃতপক্ষে পরিচালনা করতেন মানসিংহই। তাই প্রায় প্রতি দেশেই প্রয়োজন হতো তাঁর দৈহিক উপস্থিতির। সপারিষদ বাংলা দেশেও তিনি আসতেন এবং সময় বিশেষে অবস্থানও করতেন প্রয়োজনবোধে। আর প্রতিক্ষেত্রেই তাঁর সঙ্গে থাকতেন কুলগুরু কামদেব গঙ্গোপাধ্যায়। এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে সমীহ করতেন স্বয়ং আকবরও। সম্ভবত তিনিই পণ্ডিত-প্রবর কামদেবকে সাম্রাজ্যের কোনো এক উন্নত অঞ্চল জায়গীররূপে দান করার জন্য নির্দেশ দেন মানসিংহকে। তাই শেষবারের মতো মানসিংহ যেবার বাংলায় আসেন, তখন ভাগীরথীর পূর্বতীরবর্তী বিস্তীর্ণ ভূভাগ, অর্থাৎ উত্তরের সুতানুটী থেকে দক্ষিণের একাধিক জনপদ তিনি গুরুদক্ষিণারূপে দান করেন কামদেবকে। সুতরাং কামদেব এই বিস্তৃত ভূভাগের স্বত্বাধিকার লাভ করার পরই সম্রাট আকবর তাঁকে চৌধুরী উপাধি প্রদান ক'রে সম্মানিত করেন আরও। ইতিহাস বলে: এই কামদেব চৌধুরী থেকেই পরে সাবর্ণ চৌধুরীদের উদ্ভব ঘটে কলকাতায়।

বর্তমান ডালহৌসী অঞ্চলের তদানীন্তন ভূমিখণ্ডেই কাছারী এবং প্রথম বসতবাটী নির্মাণ করেন কামদেব চৌধুরী। আর বসতবাটীকে কেন্দ্র করেই তিনি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন একাধিক। তন্মধ্যে সবিশেষ প্রখ্যাত শ্যামরায় বিগ্রহের মন্দির—যা থেকে বসতবাটীর সমীপ-বর্তী মন্দিরসংলগ্ন স্থানের নামকরণ হয় শ্যামরায়তলা। এই শ্যামরায়-তলার অবস্থিতি ছিল বর্তমান কয়লাঘাট স্ট্রীটের তদানীন্তন ভূমি-খণ্ডের উত্তর সীমান্তে। অনেকের মতে একাধিক মন্দিরের মধ্যে শ্যামরায় বিগ্রহের মন্দিরটিই প্রতিষ্ঠা-লাভ করে সর্বশেষে। তার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বিক্ষিপ্তভাবে যে-কাহিনীর প্রচলন রয়েছে সনাতনপন্থীদের মুখে মুখে—হয়তো তা কিংবদন্তীই, অথচ বেশ মাধুর্যাভিষিক্ত বলেই এ-নিবন্ধে তার উদ্ধৃতি খুবই একটা বেমানান হবে না। সম্পূর্ণ আমারই ভাষায় কাহিনীটির সংক্ষিপ্ত কলেবর এই:

একবার ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী হুগলী অঞ্চলে এক-জন মহাতান্ত্রিকের আবির্ভাব ঘটে। তিনি নাকি ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী। তাই সেখানে তাঁর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই খবর ছড়িয়ে পড়ে কাছের এবং দূরের অসংখ্য জনপদে। খবর আসে কামদেব চৌধুরীর কাছেও। খবর পেয়েই তিনি বেশ অস্থির হয়ে ওঠেন সেই তান্ত্রিক-সান্নিধ্যলাভের আকু-লতায়। সুতরাং কালবিলম্ব না করে, তিনি গোপনে একদিন ভাগীরথীর বুকে একখানি নৌকো ভাসিয়ে একাকী রওয়ানা হন হুগলীর উদ্দেশে। কিন্তু যেতে যেতে, হঠাৎ এক প্রবল ঘূর্ণীর আবর্তে পড়ে নৌকো যায় উল্টে এবং সাঁতারে অপটু কামদেব চৌধুরীও তলিয়ে যান সঙ্গে সঙ্গে।

দূরে, পশ্চিম তীরে আপনমনে বাঁশি বাজাতে বাজাতে ভাগীরথীর প্রবল জোয়ারের দিকেই তাকিয়ে ছিল এক বলিষ্ঠ রাখাল। কামদেব চৌধুরীর নৌকো উল্টে যাওয়ায় সে চমকে ওঠে হঠাৎ। এবং তৎক্ষণাৎ বাঁশি ফেলে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রবল জোয়ারী ভাগীরথীর বুকে। তারপর দ্রুত সাঁতরে এসেই সে অতল থেকে শূন্যে তুলে ধরে কামদেব চৌধুরীকে এবং তাঁকে নিয়ে ওভাবেই অতিকষ্টে সে আবার ফিরে আসে তীরে। কিন্তু তীরে এসেই রাখাল বুঝতে পারে; কামদেব চৌধুরী অচৈতন্য। সুতরাং সেখানে আর বিলম্ব না ক'রে, অচৈতন্য কামদেবকে বুকে তুলে নিয়ে, রাখাল আসে তার গৃহে। সেখানে দীর্ঘ শুশ্রূষার পর জ্ঞান ফেরে কাম-দেবের। জ্ঞান ফিরতেই তাঁর মনে পড়ে ভাগীরথীর বুকে নৌকো উল্টে যাওয়ার ঘটনা। তিনি রাখালের মুখের দিকে তুলে ধরেন তাঁর বিস্ফারিত নেত্র। তারপর ধীরে ধীরে প্রশ্ন করেন: মৃত্যুর হাত থেকে কে আমাকে বাঁচালো?

রাখাল সবিনয়ে উত্তর দেয়: আপনাকে বাঁচিয়েছে আমার শ্যামরায়।

আরও বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেন কামদেব: শ্যামরায় কে?

রাখাল আবার বলে: শ্যামরায় আমার গৃহ-দেবতা। তিনি দীন-দয়াল। তাঁরই করুণার ধারা ভাগীরথী এবং তাঁরই অপার কৃপায় এ-যাত্রা রক্ষা পেয়েছেন আপনি।

বিস্ময়ের ঘোর আরও গভীর হয়ে ওঠে কামদেবের চোখে। ওভাবেই খানিকক্ষণ তিনি নীরব থাকেন। তারপর রাখালকে উদ্দেশ ক'রে আবার বলেন: তোমার শ্যামরায়কে দর্শন করবো আমি?

রাখাল তাঁকে নিয়ে আসে উঠোনের উত্তর প্রান্তিক এক কুঁড়ে ঘরের কাছে। ঘরটি ছোটো, খড়ের চাল তার এলোমেলো। তিনদিকে বাঁশের বেড়া, একদিক খোলা। খোলাপথে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করতেই কামদেবের নজর-বন্দনে ধরা দেয় এক উজ্জ্বল বিগ্রহ। মাটির নয়, পাথরেরও নয়, সম্পূর্ণ সোনার। সেদিকে তাকিয়ে থেকেই বিস্ময়াভিভূত কামদেব জিজ্ঞেস করেন রাখালকে: এ-বিগ্রহ তুমি কোথায় পেলে?

রাখাল তেমনই সবিনয়ে বলে: তিনি নিজেই দয়া ক'রে আমাকে ধরা দিয়েছেন। আমি প্রথম তাঁর দর্শন পেয়েছিলাম শিমুল-তলার মাঠে।

আর কোনো কথা বললেন না কামদেব চৌধুরী। শ্যামরায়

● ডালহৌসী অঞ্চলের একদিকের দৃশ্য

বিগ্রহের দিকে বেশ খানিকক্ষণ নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে থাকার পর, রাখালের গৃহ থেকে তিনি নিষ্ক্রান্ত হন। তান্ত্রিক-দর্শনের ইচ্ছা পরিহার ক'রে তিনি সরাসরি সেদিন ফিরে আসেন তাঁর গৃহে। কিন্তু গৃহে ফিরে এসেও তিনি সহজ বা স্বাভাবিক হতে পারেন না। কারণ শ্যামরায়ের চিন্তাই তাঁকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখে সর্বক্ষণ।

তারপর? সেদিন রাত্রেই তিনি আবার স্বপ্নে দর্শন পান শ্যামরায়ের। শ্যামরায়ের জ্যোতির্ময় মূর্তি স্বপ্নে তাঁর সম্মুখবর্তী হয়েই নাকি আদেশ করেন: আমাকে তুই প্রতিষ্ঠা কর।

এই স্বপ্নাদেশ পেয়ে স্বাভাবিক কারণেই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন কামদেব চৌধুরী। পরদিন প্রত্যুষেই তিনি আবার ভাগীরথী পেরিয়ে সপারিষদ উপস্থিত হন রাখালের গৃহে। তারপর রাখালকে উদ্দেশ ক'রে অতি কাতরস্বরে বলেন: শ্যামরায়ের স্বপ্নাদেশ আমি পেয়েছি। সুতরাং তাঁর এই বিগ্রহ তুমি আমাকে অর্পণ কর। আমি তাঁকে প্রতিষ্ঠা করবো এক সুরম্য মন্দিরে।

কামদেবের এই কাতর উক্তি শ্রবণান্তে খানিকক্ষণ ব্যথিত-বিস্ময়ে কী যেন ভাবে রাখাল। তারপর ধীরে ধীরে কামদেবের প্রতি করুণ দৃষ্টি মেলে সে বলে: আমার শ্যামরায় আপনাকে যখন স্বপ্নাদেশ দিয়েছেন, তখন তাঁকে এই দীন-কুটিরে আটক রাখার আর কোনো অধিকার নেই আমার। আপনি তাঁকে পবিত্রচিত্তে গ্রহণ করুন।

রাখাল এত সহজেই বিগ্রহ অর্পণ করতে চাইবে—ভাবতে পারেন নি কামদেব। তিনি রাখালের উদ্দেশে প্রকাশ করেন তাঁর গভীর কৃতজ্ঞতা। তারপর বিগ্রহ গ্রহণ করেই বিনিময়ে রাখালকে প্রদান করতে চাইলেন প্রভূত অর্থ। কিন্তু রাখাল গ্রহণ করলো না একটি কানাকড়িও। সজল নেত্রে সে বিগ্রহসহ বিদায় দিলো সপারিষদ কামদেবকে।

কামদেব চৌধুরী গৃহে ফিরে এসেই অন্যান্য মন্দিরশ্রেণীর পাশে আর একটি সুরম্য মন্দির গ'ড়ে তোলেন সেকালের সুদক্ষ কারিগরদের সাহায্যে। তারপর একদিন মহাসমারোহে শ্যামরায়ের কাঞ্চন-বিগ্রহ তিনি প্রতিষ্ঠা করেন সেখানে। শ্যামরায় প্রতিষ্ঠার পরেই তিনি দোল-উৎসবের প্রচলন করেন নিয়মিত এবং দোল-উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর সাময়িককালের একটি মেলাও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন কাছারীবাড়ির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে,—অর্থাৎ বর্তমান বৃটিশ-ইণ্ডিয়া স্ট্রীটের তদানীন্তন ভূমিখণ্ডে।

তারপর আরও শোনা যায়: কামদেব-প্রতিষ্ঠিত দোল উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর নিয়মিতই আবির্ভাব ঘটতো একজন শ্মশ্রুমণ্ডিত সন্ন্যাসীর। সে এসেই ধ্যানস্থ হয়ে ব'সে থাকতো শ্যামরায় মন্দিরের দ্বারে এবং কখনো উদাসভাবে পায়চারী করতো মেলায়। তারপর মেলা শেষে আবার চ'লে যেতো কোথায়। প্রতি বৎসর এভাবেই নিয়মিত এসে সেই সন্ন্যাসী নাকি অতিক্রম করে চতুর্দশ বর্ষ দোল-উৎসব। চতুর্দশ বর্ষ দোল-উৎসবের পর, সে পঞ্চদশ বর্ষ দোল-উৎসবেও যোগদান করে। কিন্তু সেবার দোল-উৎসবে যোগদান করেই সে দেহত্যাগ করে শ্যামরায় মন্দিরের দ্বারদেশে। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে সন্ন্যাসী নাকি বৃদ্ধ কামদেব চৌধুরীকে ডেকে বলে: সে আর কেউ নয়, সেই রাখাল—শ্যামরায়ের প্রথম অধিষ্ঠান ছিল যার কুটিরে। শ্যামরায়কে হারিয়েই সে সন্ন্যাসীবেশে ঘুরে বেড়াতো দেশ-দেশান্তরে, কিন্তু শান্তি পেতো না কোথাও। তাই প্রতি বৎসর দোল-উৎসব উপলক্ষে সে সান্নিধ্যে আসতো শ্যামরায়ের এবং সেদিন শ্যামরায়ের চরণদেশেই মৃত্যুবরণ করার সুযোগ

পেয়ে সে কেবল ধন্য নয়, সর্বোচ্চ সুখীজনের চাইতেও অশেষ ভাগ্যবান!

উল্লিখিত কাহিনী ভূস্বামী চৌধুরীদের প্রথম যুগের। পরবর্তী যুগে শ্যামরায় বিগ্রহকে কেন্দ্র ক'রে আরও অনেক ঘটনা-উপঘটনার সূত্রপাত হয় এবং লোকের মুখে মুখেই গ'ড়ে ওঠে আরও অনেক বিচিত্র কাহিনী। তবে এ-সমস্ত কাহিনী তেমন প্রাধান্য পায় নি কোনো ঐতিহাসিকের গ্রন্থে। অবশ্য তা সত্ত্বেও কেউ কেউ বিশ্বাস করেন: এ-সমস্ত কাহিনী বা কিংবদন্তীর মধ্যে ইতিহাসের উপকরণ অনুপস্থিত নয়।

যাই হোক, মন্দির-মেলা এবং প্রতি বৎসরের নিয়মিত ধর্মোৎসব ছাড়াও কামদেব চৌধুরীর আরও একটি কীর্তি অবিস্মরণীয়। সে-কীর্তি তাঁর দানসত্র প্রতিষ্ঠা। দরিদ্র-নারায়ণ অর্থে অভাবক্লিষ্ট জনসমাজকে নিয়মিত সাহায্য করার উদ্দেশ্যেই, তিনি দানসত্র প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর অন্তিম জীবনে। এই দানসত্রের মন্দির-প্রতিম বিশাল গৃহের অবস্থিতি ছিল বর্তমান নেতাজী সুভাষ রোড এবং মহাত্মা গান্ধী রোডের সংগম-স্থলের তৎকালীন ভূভাগে। সেকালে দানসত্রের আশেপাশে বসবাস করতো কৃষকসমাজ। এই কৃষকসমাজের মধ্যে যারা অতিবৃদ্ধ, চিররোগী এবং কর্মক্ষমতা-রহিত, দানসত্রের দান গ্রহণ করতো প্রধানত তারাই। দানসত্রে সময়-বিশেষে বাসাহারের সুযোগও পেতো অনিকেত কেউ কেউ। শোনা যায়; কামদেব চৌধুরী যতদিন বেঁচেছিলেন, ততদিন দানসত্রে প্রাত্যহিক দানের উদ্বোধন করতেন তিনি নিজেই এবং যারা সেখানে আহার-পর্ব সমাধা করতো—তাদের অন্তত একজনকে তিনি পরিবেশন করতেন নিজ হস্তে। তা ছাড়া সম্রাট-শ্রেষ্ঠ আকবরের উদারনীতি অনুসরণ ক'রে মাঝে মাঝে সর্বধর্মের মিলনোৎসবের আয়োজন করতেন তিনি—যেখানে সর্ব-ধর্মাবলম্বী সানন্দে গ্রহণ করতো কামদেব-প্রদত্ত পরমান্নের প্রসাদ। আজ বর্তমান শতকের তৃতীয় অঙ্কের তোরণদ্বারে দাঁড়িয়ে, কামদেবের যাবতীয় কীর্তিকথাকে মনে হয় অবাস্তব অথবা রূপকথা। অথচ অসত্য নয় কিছুই।

কামদেব চৌধুরীর তিরোধানের পর ভূস্বামী চৌধুরীদের জৌলুস বৃদ্ধি পায় আরও। তাঁদের প্রভূত ভূ-সম্পত্তি দিনে দিনে আরও পরিমার্জনের প্রসাদ লাভ ক'রে বিকাশ প্রাপ্তি ঘটায় ঐশ্বর্যের, যশের এবং সৌন্দর্যের। প্রতিষ্ঠা পায় একাধিক বাজার, হাট, বাগানবাড়ি এবং অন্যান্য অংশে বসবাসের প্রয়োজনেই গ'ড়ে ওঠে আরও বসতবাটী। কামদেব চৌধুরীর ঠিক পরবর্তী পুরুষেই আত্ম-প্রকাশ করে বড়িশার সুদৃশ্য নিকেতন। তা ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলেও প্রতিষ্ঠা ঘটে আরও অনেক মন্দিরের—যাদের অবস্থিতি অথবা স্মৃতিচিহ্ন বিদ্যমান একালেও।

সম্ভবত পরবর্তী দুই পুরুষেই কাছারীবাড়ির সম্মুখভাগে প্রতিষ্ঠা ঘটে লালদীঘির। তখন স্ফীতকায়া ভাগীরথীর বিস্তার ছিল চৌধুরী-বাড়ি থেকে অনেকদূর পশ্চিমে। তাই সম্ভবত লালদীঘির প্রতিষ্ঠা ঘটে তখন স্নানের প্রয়োজনেই।

মহাযোগী—ত্রিলোকের মহাতান্ত্রিক—সাধকশ্রেষ্ঠ মহেশ্বরের শ্রীমুখনিঃসৃত—কলির মানবের মুক্তির ও অলৌকিক সিদ্ধিলাভের একমাত্র সুগম পন্থা—অসংখ্য তন্ত্রশাস্ত্র-সমুদ্র আলোড়িত করিয়া সারাংসার সঙ্কলনে—প্রত্যক্ষ সত্য—সদ্যফলপ্রদ সাধনার অপূর্ব্ব সমন্বয়

তন্ত্রশাস্ত্র-বিশারদ আগমবাগীশ শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দের

বৃহৎ তন্ত্রসার

—সুবিস্তৃত বঙ্গানুবাদসহ বৃহৎ সংস্করণ—

তন্ত্র-মন্ত্র ও তন্ত্র-রহস্য পঞ্চমকার সাধনা কিরূপ? গুপ্তসাধন কাহার নাম? অষ্টসিদ্ধির সকল প্রকারের সাধনা—তান্ত্রিক সাধনায় শাক্তভক্তগণের সকল সিদ্ধিই তন্ত্রসারে সন্নিবেশিত।

সরল প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ—নূতন নূতন যন্ত্রচিত্রে সুশোভিত—অনুষ্ঠানপদ্ধতি সম্বলিত।

বহু সাধকের আকাঙ্ক্ষায়—বহুব্যয়ে—আনুষ্ঠানিক তান্ত্রিক পণ্ডিতমহাশয়গণের সহায়তায়—কাশী হইতে পুঁথি আনাইয়া বসুমতী সাহিত্য মন্দির পরিশোধিত পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ প্রকাশ করে। পূজা, পুরশ্চরণ, হোম, যাগযজ্ঞ, বলিদান, সাধনা, সিদ্ধি, মন্ত্র, জপ, তপ, তন্ত্রসারে কি নাই? হাইকোর্টের আনরেবল বিচারপতি—অসংখ্য আইনগ্রন্থ-প্রণেতা উডরফ সাহেবের তন্ত্রানুশীলন—মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের অনুবাদ প্রণয়ন ও প্রকাশ কালাবধি তন্ত্রগ্রন্থের প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে; তাঁহারা দেখিবেন কি অলৌকিক সাধনার সিদ্ধি—অতীন্দ্রিয় অনুষ্ঠান সমাবেশ—সর্ব্বতন্ত্রের অপূর্ব্ব সমন্বয় কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসারে যত মন্ত্র আছে সকলেরই চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

মূল্য দশ টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

দোল-উৎসবের প্রাক্কালে, প্রায় সপ্তাহ-খানেক ধরে আবির-রঞ্জিত অজস্র জনের স্নানের ফলেই দীঘির জল হতো গাঢ় লাল। তাই লোকের মুখে মুখেই তা নাম ধারণ করে লালদীঘি—এমন অভিমত পোষণ করেন কোনো কোনো পুরাতাত্ত্বিক।

লালদীঘির উত্তর-পূর্ব কোণে, অর্থাৎ বর্তমানে যেখানে সেন্ট এণ্ড্রুস গীর্জার অবস্থিতি, সেকালে সেখানেই গ'ড়ে ওঠে মল্লযুদ্ধের আখড়া। এই আখড়ায় নগুকালে সমাগম ঘটতো অংসখ্য মল্লবীরের। ভূস্বামী চৌধুরীদের আমন্ত্রণেই তারা দূর-দূরান্তর থেকে এসে অংশ গ্রহণ করতো মল্লযুদ্ধে। তাদের মল্লযুদ্ধ উপভোগের অভীপ্সায় আখড়ার চার-পাশ ঘিরে যে প্রচণ্ড ভিড় জ'মে উঠতো নারী-পুরুষের, সেকালে তা ছিল সত্যই বিস্ময়কর। যে বীর পরপর প্রতি বীরকেই পরাস্ত ক'রে লাভ করতো শীর্ষস্থান—জমিদার নাকি তাকে উপহার দিতেন সোনার প্রদীপ। আজকাল সেই আখড়াকে কেন্দ্র করেও একাধিক কাহিনী বা কিংবদন্তীর প্রচলন জেগে আছে জন-সমাজে—যা ইতিহাসগ্রাহ্য না হলেও, নিঃসন্দেহেই মুখরোচক। একালের কৌতূহলী রসিকজন সেকালের ইতিহাস-অন্বেষার পথে চিত্তবিস্তার ঘটালেই এ-সমস্ত কাহিনী বা কিংব-দন্তীর সাক্ষাৎ পাবেন অবশ্যই।

দেখতে দেখতে অপসরণ ঘটে যুগের পর আরও অনেক যুগের। পুরুষের পর কয়েক পুরুষে এসে বেশ খানিকটা বিলাসপ্রিয় হয়ে ওঠে ভূস্বামী চৌধুরীদের একান্নবর্তী পরিবার। সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পর্ব থেকে প্রায় তার যবনিকাপ্রাপ্তির কাল পর্যন্ত, তাঁদের বিলাস-প্রিয়তা ধাপে ধাপে আরোহণ করে চরম পর্যায়ে। ফলে বিপুলহারে অপচয়প্রাপ্তি ঘটে অর্থের; শুধগতি ধারণ করে তাঁদের শ্রীবৃদ্ধির সমলঙ্কার: দিনে দিনে অধোযাত্রা করে স্বাস্থ্য, বল এবং সামর্থ্য। তাই অষ্টাদশ শতাব্দীর জন্মলগ্নেই বেশ দুঃস্থ এবং দুর্বল হয়ে পড়ে চৌধুরীবংশ। তাঁদের এই অস্বাভাবিক দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে বহিরাগত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। অর্থাৎ ১৭০৯ থেকে ১৭১১ খৃস্টাব্দের মধ্যেই একদিন এই শ্বেত বর্ণাশ্রয়ীর দল সম্রাট ফারুক শায়ারের আনুকূল্য লাভ ক'রে আধিপত্য বিস্তার করে এতদঞ্চলে। সমুদয় সম্পত্তি অধিকার ক'রে তারা এতদঞ্চল থেকে সমূলে উচ্ছেদ ঘটায় সাবর্ণ চৌধুরীদের। তারপর চৌধুরীদের কাছারীবাড়িকেই তারা রূপায়িত করে কোম্পানীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়রূপে।

● নেতাজী সুভাষ রোডের একটি দৃশ্য

তারপর? ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নিজেদের নিরাপত্তার প্রয়োজনেই কাছারীবাড়ির পশ্চিম ভূভাগে, অর্থাৎ যে-অংশে অধিষ্ঠান ছিল মন্দিরশ্রেণীর, সে-অংশেই প্রতিষ্ঠা করে সেনা-নিবাস বা ফোর্ট উইলিয়াম। ফোর্ট উইলিয়াম প্রতিষ্ঠার পরেই সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপার থেকে অসংখ্য হারে আগমন সুরু হয় ভাগ্যান্বেষী ইংরেজদের। তাদেরই প্রয়োজনে লালদীঘির উত্তরে-দক্ষিণে এবং পূর্ব ভাগের বিস্তৃত ভূমিখণ্ডে সমাহার ঘটে উদ্ধত বসতবাটীর, গীর্জার এবং নানাবিধ হোটেল-রেস্তোরাঁর। দেখতে দেখতে এভাবেই আদি রূপ থেকে আরেক রূপের কৃত্রিম পথে যাত্রা সুরু করে সমগ্র অঞ্চল। তার এই বাধ্যতা-মলক পরিবর্তনের করাল গর্ভেই ধীরে ধীরে নিরঞ্জন লাভ করে অকৃত্রিম আদিপর্বের ছন্দসী স্বরূপ।

অতএব এ-নিবন্ধের যবনিকাপাত হোক আজ এখানেই। ইংরেজ অধ্যায় থেকে বর্তমান নবীন অধ্যায়ের ক্রমবিকাশের প্রতি কৌতূহল যাঁদের অপ্রতিরোধ্য—তাঁদের সানুরাগ সন্বিৎসা আমি আকর্ষণ করবো আগামী সংখ্যায়।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ বিংশতি প্রবাহ ॥

"কোন সুদূর অতীতে নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে জব চার্নক গাছের নীচে বসে বিশ্রাম করতে করতে অনুভব করেছিলেন এই কলকাতার বিপুল বাণিজ্য-সম্ভাবনা।

অতীত কলকাতাই বাঙালীর বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র।"

কলিকাতা।

বাঙালীর বাণিজ্যের অন্যতম পীঠস্থান। সুপ্রাচীনকালের নগরী। ইতিহাসের বহু যুদ্ধ আর রক্তপাতের কাহিনী ছড়িয়ে আছে এ শহরের পথেঘাটে। আর—

আর বাণিজ্যের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে এই শহরের জন্মবৃত্তান্ত। সুতানুটি, গোবিন্দপুর আর কলিকাতা এই নিয়ে কলকাতা। এই ইতিহাস আজ সবাই জানেন। কিন্তু—

'সুতানুটি' নামকরণ কেন হয়েছিল? কারণ খুঁজতে হলে যেতে হবে অনেক—অনেক দূর অতীতে। এইস্থানে ছিল তন্তুবায়দের বাস। তারা কাপড় বুনতো। কাপড়ের ব্যবসা করতো। তখন ইংরেজরা এদেশে আসে নি। হয়তো দুঃসাহসী ভাস্কো-ডি-গামা তখনো আকুল হয়ে ভারতবর্ষে আসার পথ খুঁজছেন—সেই—সেই স্মরণাতীতকালে, এখানকার তন্তুবায়রা সুতার নুটি বা নুটি প্রস্তুত করতো। এই সুতার নুটি নিয়ে এসে হাটে বিক্রি করতো। একটা ছোটখাটো হাট নয়। মস্ত বড় হাট। লোকে বলতো সুতানুটির হাট।

হাট বসতো গঙ্গার ঘাটের ওপরে। তাই ঘাটের নাম ছিল সুতানুটির ঘাট। কালের ব্যবধানে সুতানুটি নামের শেষাংশের হাট এবং ঘাট বাদ পড়ে গিয়েছে। সুতানুটিও নেই। সব হারিয়ে শুধু সমস্ত পুরনো ইতিহাস নিয়ে জলজ্বল করছে আধুনিক শহর কলকাতা।

আজও এ শহরের এখানে-সেখানে প্রাচীন বাঙালীর ব্যবসাপ্রীতির চিহ্ন বুকে নিয়ে বেঁচে আছে কতকগুলো অঞ্চল। কুমারটুলীতে কুম্ভকার, শাঁখারী টোলায় শাঁখারীরা বংশ পরম্পরায় বাস করতেন। আরও আছে—এই ধরণের নাম ধোপাপাড়া, কামারপাড়া, আহিরীটোলা, পটুয়াটোলা, মুচিপাড়া, নিকারীপাড়া। কল্পনা করা খুব অস্বাভাবিক নয় যে, একদা এইসব অঞ্চলে ব্যবসাজীবী স্বাধীন বাঙালী বাস করতেন। কামারপাড়ার ঘরে ঘরে বলিষ্ঠ কামারের হাতুড়ীর শব্দ উঠতো ঠক-ঠক-ঠক; আহিরীটোলায় বাস করতো আহিরীরা। আর—

অনেক সুপ্রাচীনকালের গ্রন্থে তো স্পষ্টই লিখছে:

'পূর্বে লবণের ব্যবসার জন্য 'মলঙ্গা' (বর্তমানে জবাকুসুম হাউসের পাশে আজও আছে মলঙ্গা লেন) চুণের ব্যবসার জন্য 'চুণাগলি', হাড়ের কারবারের জন্য (অর্থাৎ চিরুণী, কৌটা, খেলিবার পাশার) 'হাড়কাটা', আর ছাতার ব্যবসার জন্য ছাতাওয়ালার গলির নামকরণ হইয়াছে।'

কলকাতা বন্দরের খ্যাতি আছে সারা ভারতে। গঙ্গানদী বহুদূর পর্যন্ত নৌবহনযোগ্য। সমুদ্রগামী জাহাজ অনায়াসে শহরের কাছাকাছি আসতে পারে। বহুযুগ আগে ওয়েলেসলী কলকাতা বন্দরের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এই কলকাতার বাঙালীর বাণিজ্যের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে শতশত শতাব্দীর বাংলার রাজনীতির বহু জটিল ধূম্রজাল।

ধুরন্ধর রাজনীতিবিদরা মন্ত্রণা করে যুদ্ধের জন্য, রাজ্য বিস্তারের জন্য। যে দেশ বাণিজ্যে যত বেশি সমৃদ্ধ—তত বেশি লক্ষ্য পড়ে সেই দেশের দিকে। জব চার্নক মুর্শিদাবাদ যাওয়ার পথে প্রাচীনকালের কলকাতায় ক্ষণকালের জন্য বিশ্রাম করতে নেমেছিলেন। সময়টা ছিল ঝাঁ ঝাঁ দুপুর। ভাগীরথীর ঢেউয়ের মাথায় মাথায় রোদের চুমকি জ্বলছে। যতদূর চোখ যায় বিশাল-বিস্তীর্ণ গঙ্গার জলরাশি একটা রূপোর পাতের মত ঝকমক করছে। কেমন ধূম্রাচ্ছন্ন ধূসরতায় ঘেরা দিগন্ত। চার্নকের নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে ভাবনার প্রবাহ ওঠানামা করতে লাগল : কেমন হয়—কেমন হয় এইখানে শহর পত্তন করলে। অদূরে সমুদ্র----

তার অনেক—অনেক দিন পরে ওয়াল্টার হ্যামিল্টন বলেছিলেন তাঁর ইস্ট ইণ্ডিয়া গেজেটিয়ারে :

Calcutta possesses the advantage of an excellent inland navigation, foreign imports being transported with great facility on the Ganges and its subsidiary streams, to northern nations of Hindoosthan...

বন্দর হিসেবে অপূর্ব প্রাকৃতিক সুবিধা আছে কলকাতার, এ বিষয়ে কোন ভুল নেই।

আবার Census of India-তে বলা হয়েছে, উড়িষ্যার বালাসোর থেকেই সুরু হয়েছে বাঙালীর সঙ্গে ইংরাজের বাণিজ্যের গোড়াপত্তন। ইউরোপীয়রা প্রথম যে জাহাজে বাংলা দেশে এসেছিলেন তার নাম 'ফ্যালকন'। অতিবড় দুঃসাহস নিয়ে বিনা অনুমতিতে ফ্যালকন ঢুকে পড়েছিল হুগলী নদীতে। প্রায় চল্লিশ হাজার পাউণ্ডের মালপত্র ছিল।

এই ফ্যালকন যেন দেবদূতের মত অদৃশ্য নির্দেশ দিয়ে ইংরেজদের ধন-ধান্যে পুষ্পেভরা এদেশের মাটিতে নিয়ে এসেছিল। হ্যামিল্টনের গেজেটিয়ারে নীচের হিসাব থেকে বুঝতে পারা যাবে বাঙালীর বাণিজ্য তথা ইংরাজের সমৃদ্ধি কত বিপুলভাবে স্ফীত হয়ে উঠছিল।

চুল পাকছে?
চুল পড়ছে??
চুল রুক্ষ হচ্ছে???

বেঙ্গল কেমিক্যালের
ক্যান্থারাইডিন
হেয়ার অয়েল
মেখেই দেখুন না ...

বয়স আপনার যাই হোক না কেন, এর ব্যবহারে মাথা ঠাণ্ডা রাখে-চুল হয়ে উঠে পরিপুষ্ট—চিক্কণতা ও কমনীয়তা বাড়ে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর • দিল্লি

রপ্তানীর পণ্যদ্রব্য (১৮০৫)

নীল—	৩,৩১,৫৮২
চিনি—	৪৫,২৩,১২৪
সিল্ক—	৭,৮৭,১০৬
তুলো—	১,১৮,৯১২
হাতীর দাঁত—	৯,২৭৮

আমদানীর পণ্যদ্রব্য (১৮০৫)

টুপী—	৮০,৬২৯
গহনা—	২৮,৬৩০
স্টেশনারী—	৬১,৪৮৭
প্রসাধন সামগ্রী—	৬৩,৬২৪

তাই দেখতে পাওয়া যায় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব তাঁর গ্রন্থ Early History and Growth of Calcutta-তে লিখেছেন—

If English Commerce made Calcutta what it is, it is also true, that it benefited English Capitalists no less by a rich return.

অর্থাৎ ইংরাজদের বাণিজ্য যদি কলকাতার শ্রীবৃদ্ধি দিয়ে থাকে—তা হলে এও সত্য যে, ইংরাজরাও প্রভূত পরিমাণে লাভবান হয়েছে ভাগীরথী তীরবর্তী এই বন্দর থেকে।

বছরের পর বছর ধরে কলকাতায় বাঙালীর বাণিজ্য বিপুলভাবে স্ফীত হয়ে উঠেছে। এখানকার নদী, রেলপথ, পাকা রাস্তা অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। এই ভাগীরথী তীরেই বাঙালী-পরিচালিত অনেক কলকারখানা গড়ে উঠেছিল। স্থাপিত হলো ধ্রুবেশ্বরী কটন মিলস লিমিটেড। ১৯৩১ সালের মে মাসে এই কোম্পানী কাজ সুরু করল। কোম্পানীর হেড অফিস ছিল ৬৩নং রাধাবাজার স্ট্রীটে আর হুগলী জেলার শ্রীরামপুরে অবস্থিত এই মিলে গড়ে প্রতিদিন ১৭০ জন বাঙালী কর্মী কাজ করতেন। তৈরি হলো বাঙালীর কাপড়ের কল। নাম বঙ্গশ্রী কটন মিলস লিমিটেড। সাহা, চৌধুরী এ্যাণ্ড কোম্পানী লিমিটেড এই কোম্পানীর সেক্রেটারী।

১৯২১ সালে দেখা গেল কলকাতার অদূরে পলতা গ্রামে স্থাপিত হলো বাঙালীর আর একটি কাপড়ের কল—মহালক্ষ্মী কটন মিলস লিমিটেড। মেসার্স এইচ দত্ত এ্যাণ্ড সন্স এই কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্ট। এই কলে গড়ে প্রতিদিন ৩৮৪ জন পুরুষ কাজ করতো। আরও—আরও অনেক কাপড়ের কল, যেমন বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস লিমিটেড, ইস্ট ইণ্ডিয়া কটন মিলস লিমিটেড ইত্যাদি বাঙালীর বাণিজ্যপ্রীতির নিদর্শনস্বরূপ তৈরি হয়েছিল। বাংলায় কাপড়ের কলের ইতিবৃত্ত আরও বিশদ করে পাওয়া যাবে মুকুল গুপ্ত প্রণীত 'Cotton Mill Industry in Bengal' বুলেটিনে।

কাপড়ের কল ছাড়াও বেলঘরিয়া, আগরপাড়া, সোদপুর,, ইছাপুর, কাঁকীনাড়ায় অনেক চটকল আছে—আছে আরও অজস্র কলকারখানা। রেশমী সুতো কাটার কারখানা, চর্ম শোধনের কারখানা, হাড়ের কল, কাঠ চিরিবার কল, চায়ের বাক্সের কারখানা, কলকাতার নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে।

কলকাতার কলকারখানার বিস্তৃত বিবরণ দিতে গিয়ে মনে হল, আজকের বাণিজ্য-বিমুখ বাঙালী কতজন এইসব কলকারখানার মালিক। হয়তো বেশির ভাগই বেতনভুক কর্মচারী। সপ্তাহে, কি মাসে কিছু মাইনে পেয়ে তারা খুশি হয়ে যায়। কারখানার মালিক অবাঙালী। কেন—এককালের ধনপতি, শ্রীমন্ত আর চাঁদ সওদাগরের উত্তরসূরীরা 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী'র পথ ছেড়ে গোলামী করতে লাগল, তার কারণ এই নিবন্ধের বিষয়বস্তু নয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখ স্বদেশপ্রেমিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিজ্ঞানীরা অনেকবার বাঙালীর বাণিজ্যে নিস্পৃহতার কারণ বলেছেন।

বাণিজ্যের 'একাল ও সেকাল' শীর্ষক এই প্রবন্ধমালার এবার আর এক পর্যায় সুরু হবে। তার আগে একটা বিষয়ে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করা দরকার। সম্পাদিকার অনুরোধে বর্তমান পর্যায়ে কোন স্মরণাতীতকালে বাঙালীর বাণিজ্য-পটুতার পুরনো ইতিহাস শুধু একালের বাঙালীকে আত্মসচেতন করার জন্যই বলা হয়েছে। তাই এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলা প্রয়োজন।

অনেক—অনেকদিন আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে বাঙালী যুবকদের চাকুরিপ্রীতি, বাণিজ্যে উদাসীনতা বিষয়ে বিখ্যাত স্যার এডওয়ার্ড বেন্থলের বক্তৃতার আয়োজন হয়েছিল। কি কি গুণ থাকলে বাঙালী যুবকরা ব্যবসায়ে উন্নতি করতে পারবে—তিনি সেই আলোচনা করেছিলেন। তার কয়েকটা গুণের কথা নীচে দেওয়া হলো।

(ক) ব্যবসায়ীদের মানসিক বিচারবুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি। ব্যবসার সাময়িক অবনতিতে ভেঙে না পড়ে সুদিনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। আবার ব্যবসার উন্নতির দিনে ধৈর্য ও সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য তীক্ষ্ণ বিচার-শক্তির প্রয়োজন।---ব্যবসাজগতে যাই ঘটুক না কেন তার কারণ পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

(খ) স্বাবলম্বী ও আত্মবিশ্বাসী হতে হবে। কর্মরত থাকতে হবে অহরহ।

(গ) নিজেকে অপরের বিশ্বাস-ভাজন হতে হবে। নিজের সুনাম ও সততা যাতে ক্ষুণ্ণ হয়, এমন কাজে বিরত থাকতে হবে।

(ঘ) প্রথম কর্তব্য হবে চাকুরির মোহ ত্যাগ করে ব্যবসা-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করা। (ক্রমশ:)

পূর্ব-প্রকাশিতের পর

॥ বত্রিশ ॥

কিরণ লিখছিল।

'এখন রাত একটা। ডাকবাংলোটার সামনে যে তিনটে বড়ো বড়ো আমগাছ রয়েছে, দেখেছিলুম তাতে নতুন মুকুল এসেছে। তখন ভালো করে লক্ষ্য করি নি, এখনো আবছা অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছি না। এক টুকরো চাঁদ উঠেছে; তার আলোয় বাইরের সবটা গগনেন্দ্রনাথের সাদা-কালো ছবির মতো অপরূপ রহস্যময়। আজকে জানলা দিয়ে দেখা বাইরের জগৎটা একালের জটিল মনের মতো একরাশ সরীসৃপ রেখা নয়, বিকৃত অ্যানাটমির আতঙ্ক নয়—এ সব মিলে একখানা ইমপ্রেশ্যনিস্ট ছবি। সেই ছবিটাকে আরো নিবিড়, আরো ঘন করে তুলছে আমের মুকুলের গন্ধ। নস্টালজিয়া। এমনি রাত্রি—এই গন্ধ—এই রাত জেগে জানলা দিয়ে চেয়ে দেখা—ছেলেবেলার ছবি জাগিয়ে আনে—মাকে মনে করিয়ে দেয়।

আমের মুকুলের গন্ধ আসছে। আর একটা রাতের কথা মনে পড়ল। ভবেশদার মৃত্যু। একটা বিফল সন্ধ্যা। নার্ভের ওপর কী বীভৎস উৎপীড়ন। সেদিন যন্ত্রণায় ছিঁড়ে-যেতে যাওয়া স্নায়ুগুলোকে নিয়ে—চাঁপাব উগ্র গন্ধে আমি কৃষ্ণাকে দেখে-ছিলুম। আমাকে সে শ্রদ্ধা করে। সেদিন রাত্রির সেই দুর্বল অবসরে মনে হয়েছিল প্রতিমা রইল সেই দুর্বোধ্য বেদনার আড়ালে, শর্মিলা মিলিয়ে গেল সন্ধ্যার আকাশে—এই কালো রোগা মেয়েটিকে কি আমি বলতে পারি না—তুমি এসো, আমার ঘরে প্রদীপ জ্বালাও? কিন্তু দেখলুম, সে হয় না। মা হতে পারা না-পারা হয়তো বড়ো কথা নয়, কিন্তু বুঝতে পারলুম—শ্রদ্ধা যতই বড়ো হোক, অত ভার তার সইবে না। তা ছাড়া অলকদা—

কৃষ্ণা সুখে থাকুক। ছবি থাকুক, গান থাকুক। অলকদা-ও হয়তো ফিরে আসবে। বুঝবে, সন্তানের মা পাওয়ার চাইতেও কৃষ্ণাকে পাওয়া ঢের বড়ো। কিন্তু ও-সব কথা আমি ভাববার কে? পৃথিবীতে ক'জনের জন্যে আমি ভাবতে পারি?

আজ রাতে চাঁপার গন্ধ আমার হয়তো মনে আসত না; আমের মুকুল রাত্রির বাতাসকে যতই ভরে তুলুক, আমি ঘুমুতে পারতুম। সভা-সমিতি আমার ভালো লাগে না, বক্তৃতা দেবার নামে গায়ে জ্বর আসে, তবু এরা জোর করেই টেনে আনল। সারা দিন সেই ঝঞ্ঝাটেই কেটেছে। ওরা সঙ্গ ছাড়ল রাত সাড়ে দশটায়। থাকার জায়গা দিয়েছে ভালো, বাংলোতে আমি ছাড়া আজ আর কেউ নেই—ক্লান্ত শরীর মন নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে নিতে পারতুম কয়েক ঘণ্টা। আর ঘুমটাও দরকার ছিল, কারণ, কাল বেলা সোয়া সাতটার ট্রেনেই আমি কলকাতায় ফিরে যাব।

তবু আমার ঘুম এল না। আজ আবার আমের মুকুলের সঙ্গে কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী, মহাকাল পাহাড়ের মাথায় সেই অচেনা হলুদ ফুলের রাশ (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বেঁচে থাকলে হয়তো নামটা বলতে পারতেন)—সব মিশে একাকার হয়ে গেল। আবার এই বসন্তের বাতাস

সেই কথায় গন্ধের উচ্ছ্বাস বয়ে আনল।

কতদিন কেটেছে? দু'বছর হতে চলল। আজ এখানে এমন করে শর্মিলার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, কে জানত!

সভা শেষ হয়েছে। মফস্বলের যে-সব ছেলেমেয়ের কাছে লেখক-মাত্রেই সাহিত্যিক, তারা আমাকেও ঘিরে ধরেছিল অটোগ্রাফের জন্যে। এমন সময় খবর এল, একজন ভদ্রমহিলা আমার সঙ্গে দেখা করতে চান।

ভদ্রমহিলা? এখানে কে আসতে পারেন? আশ্চর্য হয়ে বাইরে বেরিয়ে এলুম।

হলের সামনে নিয়নের উজ্জ্বল নীলচে আলোয় শর্মিলা দাঁড়িয়ে। ভুল হওয়ার কারণ নেই, তবু নিজের চোখকে আমি বিশ্বাস করতে পারলুম না। শর্মিলাই আজ কৃষ্ণচূড়া হয়ে দেখা দিয়েছে। পরনে লাল শাড়ি, কপালে সিঁদুরের রক্তবিন্দু। মনে পড়ল, হলের মধ্যে প্রথম সারিতেই যেন এই লালের আগুন আমি দেখেছিলুম। কিন্তু তখন অনেক মানুষের ভিড়ে আমি ভালো করে চেয়ে দেখি নি, ভাবতেই পারি নি।

কয়েক সেকেণ্ড কথা বলতে পারলুম না। দেখলুম, শর্মিলার মুখ মাটির দিকে, সারা শরীরের সেই লালের আভা গালেও পড়েছে। বুঝতে পারলুম, খেয়ালের ঝোঁকে আমায় ডেকে পাঠিয়ে এখন লজ্জায় চোখ তুলে চাইতে পারছে না।

বললুম, নমস্কার মিসেস—

বলেই ইচ্ছে করে থেমে গেলুম। শর্মিলা এবার জোর করে মুখ তুলল, দু'গালে লালের আভা আরো ঘন হল। চাপা গলায় বললে, মিসেস ভৌমিক।

অনেকগুলো কৌতূহলী চোখ চারদিক থেকে চেয়ে আছে জেনেও আমি বললুম, ভারি খুশি হয়েছি। তা হলে এখন এখানেই আছেন?

—হাঁ। এখানেই উনি পোস্টেড।

—চাকরি?

—ছেড়ে দিয়েছি। ওঁর অসুবিধে হয়। তবে একটা থীসিসের কাজ করছিলুম—সেটা প্রায় শেষ করে এনেছি।

—খুব ভালো।—এই পর্যন্ত বলেই আমি থামলুম। আর কী বলা যেতে পারে খুঁজে পাচ্ছি না। আমি কি খুব দুঃখ পেলুম? না—মনের দিক থেকে সেই মুক্তিটা আমার আরো সহজ হল। যন্ত্রণা আমার যে ছিল না তা নয়, কিন্তু যে-সন্ধ্যায় কলকাতায় কথা দিয়েও আমি শর্মিলার সঙ্গে দেখা করতে পারি নি, যন্ত্রণার শেষ পালা সেইদিনই তো আমার সারা হয়ে গেছে। তা ছাড়া নিজেকে আমি শর্মিলার আলোয় আর কৃষ্ণার শ্রদ্ধায় বারে বারে যাচাই করে দেখেছি। প্রতিমা আমার জীবনে এসেও এল না —কোথা থেকে একটা অন্ধকারের দুর্গ এসে তাকে ঘিরে ধরল; কিন্তু তবু প্রতিমার কাছ থেকে আমি দূরে যেতে পারি না। তার একটা অদৃশ্য বন্ধন আছে যাকে অনুভব করা যায় না, অনেকখানি পর্যন্ত তাকে ছাড়িয়ে যাওয়াও চলে, কিন্তু তারপরেই প্রতিমার আকর্ষণ কঠিন হয়ে ওঠে—নাড়ীতে নাড়ীতে টান পড়ে। প্রতিমা পাথরের প্রতিমার মতোই স্তব্ধ নিষ্প্রাণ হয়ে থাকুক, তবু আমাকে ঘুরে-ফিরে তারই কাছে চলে আসতে হবে।

না হলে, অরবিন্দদার ডিভোর্সের প্রস্তাবে আমি রাজী হই নি কেন? কোথায় আমার বাধছিল? এ এক অদ্ভুত কৌতুক, জীবনের কৌতুক। একে ট্র্যাজেডী বলব, না কমেডী বলব জানি না।

এখন আমি কী বলব শর্মিলাকে। কী আলাপ করব তার সঙ্গে? কোনো দিন কি তার সঙ্গে আমি অন্তরঙ্গ হতে পেরেছিলুম? সেই যে মাটিতে প্রকৃতি তার আশ্চর্য ইন্দ্রজাল ছড়িয়ে মানুষকে নিজের নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে যায়, সেখানে দু'দিক থেকে দু' টুকরো রঙিন মেঘ ভেসে উঠেছিল—দুটো স্বপ্ন এসে মিলেছিল মাত্র কয়েকটি মুহূর্তের জন্যে। তারপর মেঘ মিলিয়ে গেল আকাশে—স্বপ্ন নিশ্চিহ্ন হল জীবনের জাগরণে। তা-ই হয়।

আমি আর কী বলতে পারি শর্মিলাকে? কী আমার বলবার আছে?

আবো সহজ হয়ে উঠলুম। মনে পড়ল, ভদ্রতার ব্যাপারটা এখনো সম্পূর্ণ সারা হয় নি।

বললুম, শ্রীযুক্ত ভৌমিক কোথায়? আলাপ করিয়ে দিলেন না তাঁর সঙ্গে?

—উনি এখানে নেই। —শর্মিলার চোখ দুটো যেন একবার আলো হয়ে উঠলো, কিন্তু তার মানে আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না। শর্মিলা বললে, ট্যুরে গেছেন।

—ওঃ!

—আমি জানতুম না—আমার না-বোধা সেই আলোটা চিক চিক করে শর্মিলার দু' চোখে জ্বলতে লাগল: এখানে আপনি সাহিত্য-সভায় আসছেন। ঘর থেকে বিশেষ আমি বেরুই না। হঠাৎ বিকেলে দেখলুম, বাইরের সামনে দেওয়ালে একটা পোস্টার পড়েছে। আপনার নাম। তাই বক্তৃতা শুনতে চলে এলুম।—একটু থেমে বললে, বেশ বলেছেন।

আমি হাসলুম: বেশ বলি নি। বক্তৃতা আমার আসে না। তবু কমপ্লিমেণ্টটা নিলুম।

—কমপ্লিমেণ্ট? —শর্মিলা যেন একবারের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। তারপর বললে, বক্তৃতা শুনতে আমি তো আসি নি। লেখককেই চিনতে এসেছিলুম। তা পেরেছি।

—চিনেছেন?

—আগেই চিনতুম। তবু নতুন কিছু পেলুম। —এতক্ষণে শর্মিলা হাসল: দেখলুম রুক্ষ নিষ্ঠুরতার ওপর একটুখানি মমতার ছায়া নেমেছে।

আমি চমকে উঠলুম।—আবার বুকের মধ্যে ঢেউ উঠল, মন বলতে চাইল, তুমি জানো না—এ তোমারই ছায়া, তুমিই রোদে-পোড়া একরাশ নিষ্ঠুর মাটির ওপর কৃষ্ণচূড়ার ছায়া দুলিয়েছ! হয়তো কিছু বলেও ফেলতুম, এমন সময় অ্যামপ্লিফায়ারের ঘোষণা শোনা গেল: এইবারে আমাদের জলসা আরম্ভ হচ্ছে। প্রথমেই আপনাদের রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে শোনাচ্ছেন কলকাতার বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী শ্রীমতী—

কর্মকর্তাদের দু-একজন এগিয়ে এলেন সামনে।

—ভেতরে যাবেন না কিরণদা? গান আরম্ভ হচ্ছে।

—তোমরা যাও, আমি আসছি।

করিডোর খালি হয়ে গেল। জলসার আকর্ষণে সবাই ভেতরে গিয়ে ঢুকেছে। এখন আমি আর শর্মিলা। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত আগেকার চঞ্চলতা আমার দূর হয়ে গেছে। যে কৃষ্ণচূড়ার রঙ একদিন দুজনকে অনেক কাছে টেনে এনেছিল, আজ শর্মিলার বেশে-বাসে সেই রঙই আমাদের দুটো সমুদ্রের দু'পারে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এখন আমি আর শর্মিলা নির্জনে মুখোমুখি দাঁড়ানোর আর কোনো মানে নেই, কোনো মানে থাকতে নেই।

শর্মিলা বললে, আপনি অনেক রোগা হয়ে গেছেন।

বললুম, বয়েস বাড়ছে।

—শুধু বয়েসের জন্যে?—সেই মেয়েদের চিরকালের কণ্ঠস্বর: নিজের শরীরের দিকে আদৌ লক্ষ্য রাখেন না।

—আমি বেশ আছি।

অ্যামপ্লিফায়ারে হার্মোনিয়ামের অল্প অল্প আওয়াজ আসছে। গানটা চেনা-চেনা ঠেকছে, এখনো সম্পূর্ণ ধরতে পারছি না। শর্মিলা আবার চোখ নামালো: একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

—নিশ্চয়।

—আপনার স্ত্রী কেমন আছেন?

—অনেকটা সেরে উঠেছেন।—এর বেশি কী আর আমি বলতে পারি। আর বলেই বা কী হবে?

—তাই বুঝি?—শর্মিলা আবার আমার দিকে চাইল, সান্ত্বনা আর সহানুভূতিতে ভরে উঠল চোখ দুটো: এতো খুব ভালো কথা। এবার আপনি সুখী হবেন।

—দুঃখ আমার কোনোদিনই নেই।

—নেই? —শর্মিলা চুপ করে রইল। বুঝতে পারলুম আমার কথা ও বিশ্বাস করে নি। কিন্তু তাতে কী আসে যায়। আমি সুখী না দুঃখী, সে খবর তো নিজেও জানি না।

অ্যামপ্লিফায়ারে অনুশীলিত মধুঝরা কণ্ঠের গান উঠল:

'আমার পরান যাহা চায় তুমি তাই,
তুমি তাই গো—'

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে গানটা আমরা শুনতে লাগলুম। শর্মিলা কী ভাবছিল জানি না, কিন্তু এই সহজ সরল রোমান্টিক গানটা আমার বুকের ভেতরে কেঁপে কেঁপে বেড়াতে লাগল।

'আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয়-মাঝে,
আর কিছু নাহি চাই গো—'

শর্মিলা যেন হঠাৎ জেগে উঠল। হাতের ঘড়িটার দিকে চেয়ে বললে, আটটা। একটু দূরে আমাদের বাসা, যেতে রাত হয়ে যাবে। আর একটা কথা বলব?

—নিশ্চয়, বলুন।

—কাল সকালে আমাদের ওখানে চা খেতে আপনার আপত্তি আছে?

—আপত্তি ছিল না। কিন্তু সোয়া সাতটার ট্রেনে আমি কলকাতায় ফিরব।

—চা আমি ছ'টাতেই রেডি করে দেব।

হাসলুম: কী দরকার কষ্ট করে?

—কষ্ট। —শর্মিলা হাসল: ওটা তো ভদ্রতার দোহাই। কিন্তু কয়েকটা কথা বোধ হয় আমার জানাবার ছিল। শর্মিলার স্বর গভীর হয়ে এল: হয়তো খানিকটা ভুল বোঝা—

বললুম, ভুল আমি বুঝি নি। যা জানবার আমার মন আগেই জেনেছে। এই ভালো হল সব চাইতে।

—কে বলতে পারে, কী ভালো হল। আমি যে কেন—

শর্মিলা আবার থেমে গেল। ভেতর থেকে গান আসছে:

'তোমারি বিরহে রহিব বিলীন,
তোমাতে করিব বাস—'

নিজের কথা আর শেষ করল না শর্মিলা। বললে, আমি যাই।—তারপরেই নীচু হয়ে আমাকে প্রণাম করল।

আমি বললুম, একি—একি!

লাল শাড়ি, লাল সিঁদুরের কথা একবারের জন্যে ভুলল শর্মিলা। মাথা তুলে, দু'চোখে সেই আশ্চর্য আলো ছড়িয়ে বললে, তোমায় কিছু দিতে পারি নি—সাহস ছিল না। তুমি আর এক পৃথিবীর মানুষ। তোমাকে আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না।

বললুম, শর্মিলা, আমিও ভুলব না।

শর্মিলা আর দাঁড়ালো না। দেখলুম বড়ো বড়ো পায়ে সে এগিয়ে যাচ্ছে লন পেরিয়ে। অ্যামপ্লিফায়ারে বাজতে লাগল:

'তবে তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও
আমি যত দুখ পাই গো—'

তারপর আমি গানের জলসায় এসে বসলুম।

চাঁদ অস্ত গেছে। রাত ক'টা এখন? চারটে? বাইরে থেকে ভোরের হাওয়ায় আমের মঞ্জরীর গন্ধ স্নিগ্ধ আর কোমল হয়ে এল। দুঃখ? দুঃখ আমি পাই নি। আমার কঠিন রৌদ্র-জ্বলা মাটিতে কৃষ্ণচূড়ার ছায়া কেঁপে তাকে শীতল করে দিয়েছে। নইলে কি কৃষ্ণাকেই আমি চিনতে পারতুম? নইলে কি আমি অপেক্ষা করতে পারতুম প্রতিমার জন্যে—বুঝতে পারতুম তার যন্ত্রণার রূপ?

আমি একখানা উপন্যাস লিখব, 'কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী।' জানি না, এ যুগে তার পাঠক আছে কি না। তবু সে উপন্যাস আমায় লিখতেই হবে।

নিজের মুক্তির জন্যেই আমি লিখব।'

— সমাপ্ত —

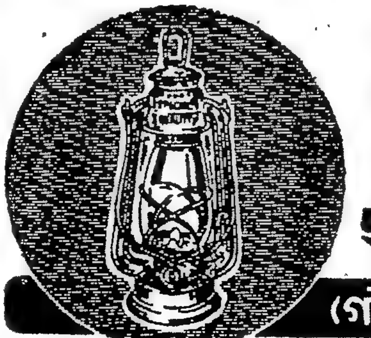

কিষান
লণ্ঠন
সর্বোৎকৃষ্ট
গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
ফোন-২২-৬৫৮০
২৭৩,৩৬ চীনা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১

আঁধার মানিক

ধারাবাহিক উপন্যাস

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

একটু বাদেই বিশালাক্ষী এলেন। 'কি হয়েছে?' তাঁর চোখে মুখে উদ্বেগ। এখন আর মনে নেই পাতানীপিসীকে এ বাড়িতে আসতে বারণ করেছিলেন, এখন গ্রামে বিপর্যয়, বিপদ ঘরে ঘরে হতে পারে, বিশালাক্ষী গামছা গায়ে ভাল করে জড়িয়ে আব্রু হন ও উদ্বেগে প্রশ্ন করেন, 'কি হল? কার কি হল?'

'বিপদ আর কারো নয়, বিপদ তোমার।'

'গোপাল কোথায়?' বিশালাক্ষী অস্থির হন, 'তার কিছু হয়েছে?'

'ওলো তার, আমার, তোর, সকলের বিপদ, কাশিমবাজারের বউ সুরকণ্ঠের বাড়ি, মা গো, যাব কোথা।'

বিশালাক্ষী চমৎকৃত হয়ে বললেন, 'বটে? কবে এল?'

তাঁর কণ্ঠে বিস্ময়। যেন এ-ঘটনায় এমন উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই, যেন এমনটাই স্বাভাবিক।

পাতানীপিসী শুকনো হেসে বললেন, 'তোমার মত বউ, এমন পাষাণে বুক বেঁধে কে এসেছে বল? নইলে এমন ঠাণ্ডা মাথায় দাঁড়িয়ে বল কবে এল?'

'কবে এল তা শুধোব না?'

আনন্দীর পিসী এবার এগিয়ে এসে ডানহাত নেড়ে বললেন, 'এ-বাড়ির বউ যদি সুরকণ্ঠের বাড়ি এসে থাকে, সেটা লোকের চোখে কেমন দেখায় বল না।'

এমন সময়ে আনন্দীরাম ও কাশীশ্বর ঢোকেন। আনন্দীর কানে কথাগুলো যায়। 'ছোট।' তাঁর আকুলতা এই এক সম্বোধনে বেজে ওঠে। এ-সংসারের ভিত বুঝি কলঙ্কের ধাক্কায় ভেঙে যায়, তাই ছোট বিনে আনন্দীরামের বিপদে সাড়া দেবার আর কেউ নেই।

বিশালাক্ষী মৃদুস্বরে বললেন, 'সব শুনেছি, লোকের কথা, সমাজের কথা অস্বীকার করি না। কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখ, তার বড় বোন ঐ সুরকণ্ঠের সৎ-মা। সুর'র পিসী বেঁচে ছিলেন সেদিন অবধি। আর, যারা এতকথা বলে তারা জানে না, সুর ক' রাতভর শ্মশান-তলার মন্দিরে পড়েছিল? দেখ, বড় বউ অরক্ষায় অসহায় ছিল না। তাদের সঙ্গে তার যে-সম্পর্ক, তাতে সে ওখানে উঠতে পারে।'

'ছোট।'

'আমি বলি গোপাল, সে লজ্জায়, ভয়ে, আসতে পারছে না হয়ত, তার কথা শুনে তবে তাকে শাস্তি দাও।'

'সে কালামুখী এ ভিটেয় পা দিলে আমি গলায় দড়ি দেব। হিমি, আমায় দড়ি এনে দে।' আনন্দীর মা তাঁর বহু ব্যবহৃত অস্ত্রটি বের করেন।

বিশালাক্ষী জীবনেও বড় গতীনের মনে ঘা দিয়ে কথা ক'ন না, উপহাসে, করুণায় সব কিছু সহজ ক'রে নেন। আজ আর হাসলেন না। মৃদু বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন, 'তোমার পায়ে গড় করি দিদি, আজ আর ও ছেলেমি কোর না। যেদিন থেকে এ উঠোনে পা দিয়েছি, তোমার গলায় দড়ি দেওয়া আর ডুবে মরার শাসানি শুনছি।'

'তুই কি মনে করিস---?' বড় গিন্নীর গলা স্তিমিত। আসলে গতীনকে তিনি মান্য করেন।

'আমি আর কি মনে করব দিদি, তোমার বয়স না হয় দিন দিন কমছে, বিপদ-আপদ না বুঝে ন্যাকরা করতে বোস, আমার বয়স যে অনেক হল। সে যা হোক, গোপাল, বড় বউকে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করতে হয়। ঠাকুরঝি কি বল?'

পাতানীপিসী বিশালাক্ষীর কথা শুনে অবাক। অপ্রতিভ হয়ে বলেন, 'আমায় আবার জিজ্ঞেসা। তোমাদের বউ তোমরা আনবে, তাতে আমি কি বলব।'

'বলবে বইকি। নিমলির মত সেও যে তোমার স্নেহের সম্পর্ক ঠাকুরঝি। তা ছাড়া তুমি বয়সে বড়, নিজের ঘরের বিপদ রেখে এখানে এসেছ---'

বিশালাক্ষী আন্তরিকতার সঙ্গেই বলেন। আজ, বড় সামান্যে অভিভূত হন পাতানীপিসী। বলেন, 'তা বউ, তুমি যা বলেছ তা একেবারে মিথ্যে নয়। আর স্মরো যদি রাতটা শ্মশানতলায় থাকে---'

'তাই ত' শুনলাম। আমাদের মাহিন্দারের মেয়ের দেওর এসেছিল। এমন প্রলয় হবে তা ত' জানে না। আজ চারদিন যত সাধুসন্ন্যেসী গেঁজেল ফকির শ্মশানতলায় জড়াজড়ি হয়ে পড়ে আছে, সেও ছিল। স্মরকণ্ঠের কথা সেই বললে। ও না কি আগেই জানত এমনটা হবে। তাই ওকে নিয়ে সন্ন্যেসীরা খুব মাতামাতি করছে। আমি বলি, কাশী আমার সঙ্গে চলুক, আমি নিজে তাকে নিয়ে আসি। ঠাকুরঝি, আমি নিমলির মা'র কাছে যাব। আগেই যাওয়া উচিত ছিল, যা বিপর্যয়।'

'তুমি এমন কাজ করলে বড় বউ, আমাদের ধন নেই, মান নিয়ে বাঁচি, উঁচু মাথা হেঁট করে দিলে', আনন্দীরামের এ ব্যাকুল প্রশ্নে হাহাকার ছিল। ফুলেশ্বরীর মুখে এ-কথার উত্তর জোগায় নি। তিনি মাথা হেঁট করে থাকেন। এখন উদ্বেগে উদ্বেগে তিনিও নিজের মধ্যে নেই, মাথার মোহনখোঁপা বিপর্যস্ত।

'আজ তোমায় নিয়ে সমাজে কথা ওঠে এও আমায় শুনতে হল!' দেশাচার মনে থাকে নি আনন্দীরামের। বিশালাক্ষীর সামনেই, দিনমানে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বললেন। যেমন সময়, তেমনি তার রীতিনীতি।

এমন সময়ে উঠোনে ঢুকলেন স্মরকণ্ঠ। প্রৌঢ়ত্বের প্রথম অবস্থা। উন্নত গৌরকান্তি দেহ। সদাই প্রসন্ন, চঞ্চল চোখ দুটি এখন ঘোর লাল, বিস্ফারিত, মুখের ভাব কঠোর।

'কাকে নিয়ে সমাজে কথা ওঠে?' তাঁর কণ্ঠ গম্ভীর, রাত জেগে জেগে শ্লেষ্মায় ভারী, কাঁধে একটি বৃহৎ শেকড়ের জটা। বিশালাক্ষী ঘোমটা ও চাদর টেনে সাব্যস্ত হয়ে দাঁড়ান।

'পাগলা বসতে আসন দে এঁদের, আপনি এসেছেন, ফুলিকে নিয়ে যান', স্মরকণ্ঠ বিশালাক্ষীর উদ্দেশ্যে মাটিতে লম্বা হয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করেন, এমন প্রণাম শিবায়েতী সন্ন্যেসীরা ক'রে থাকে, বক্রেশ্বরে, শিবরাত্রি ও চড়কের সময়ে। স্মরকণ্ঠকে এ প্রণামকালে অতি সম্ভ্রান্ত দেখায়, শিবভক্ত কোন রাজপুরুষ যেন, তাঁর পরনের অতি মূল্যবান পট্টধুতি এখন অবহেলে কাদায় লোটে। এমন দামী কাপড় স্মরকণ্ঠ প্রায় পরেন, ভক্তজনে উপহার দেয়, এ-গ্রামে এমন মানুষ আছে যারা স্মরকণ্ঠের সকল ব্যয়

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেজওয়াডা - শ্রীনগর - গৌহাটী

নির্বাহ করতে পাবলে ধন্য বোধ করে।

'বড় বউ এস।' বিশালাক্ষীর মৃদু কণ্ঠস্বর যেন শোনেন নি, সুরকণ্ঠ উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, 'পিসীমা নেই, আজ আমি মাতৃহারা, কে আপনাকে মান্য দেয়, অশৌচের বাড়িতে কেউ বসে না।'

'গোপাল, ওঁকে বল আমরা পবে আসব। পিসীমার কাজে কোন ত্রুটি হবে না।'

'কাজ আমি এখানে করব না, ঠাকুরথানে যাব।'

সুরকণ্ঠের কথা শুনে এখন পাগল ভীত, চকিত, অসহায়, 'হা ভগবান, যে ভিটেতে তিনি দেহ রাখলে সেখায় কাজ করবে না কি গো?'

'কার কাজ করবি বেটা; এ-গ্রামের আকাশে শিব, পিসী স্বর্গ পেয়েছেন।'

সুরকণ্ঠের কণ্ঠ একটু অসংযত। শ্মশানতলায় বহু সন্ন্যেসী, ফকির, সাধু চড়কে বাধা পেয়ে মনে কষ্ট পায়।

বর্গীরা চলে যাবার পর নমো-নমো করে চড়কগাছ ও শিবপাটা পুকুরে ডোবান হল। কিন্তু চড়কের সময়ে যারা আসে সে-সব সাধুসন্ন্যেসী অনেক আমোদ-প্রমোদ, উন্মত্ত গাজননৃত্য, রাতের পর রাত গাঁজা-মহোৎসব, ভগবানের নামে সমুদ্রমন্থনের মত হই চই, উদ্দাম মাতোয়ারা নামগান, এ সবের জন্যে তৈরি হয়ে আসে।

এরা নানা ধরণের সন্ন্যেসী, অনেকে অন্ত্যজজাতের, মড়া জাগাবে, মৃতদেহের মুণ্ড নিয়ে গেণ্ডুয়া খেলবে, গলায় সাপ পেঁচিয়ে সাপের সঙ্গে এক বাটি থেকে দুধ খাবে, এ রকম আনন্দ খোঁজে।

বর্গীর আক্রমণে যখন চড়কের মহোৎসবে বাধা পড়ল, তখন তাদের সে উত্তেজিত, স্ফীত আনন্দোচ্ছ্বাস কোথায় রাখে? তাই ক'দিন শ্মশান-তলায় হই রই, গাঁজা ও ভাঙের নেশা, ঘনঘন বিপদশোধন তুকতাক চলেছে। সন্ন্যেসীদের এ আচরণে রাঢ়-বঙ্গের মানুষ দোষ দেখে না। মানুষের সংসার ছেড়ে যারা ভগবানের সংসারে যায়, তারাও আনন্দ করবে বইকি!

সুরকণ্ঠ তাদের কাছেই ছিলেন। নেশাভাঙ, রাতজাগা, এখনো তিনি ধাতস্থ হন নি।

তাঁর 'এ গ্রামের আকাশে শিব' কথাটি শুনে বিশালাক্ষী হাত জোড় ক'রে মাথায় ঠেকান।

'তুমি ফুলিকে নিয়ে যাও আনন্দী, ওর কোন দোষ নেই। বাপ ধনগর্বে মেতে থাকে, মেয়ের মন দেখে না। ও তোমাব সঙ্গে দেখা করবে বলে এখানে এসেছিল।'

'তুমি বল নি কেন?' আনন্দী বিভ্রান্ত। এমন অবস্থায় সংসারী লোক কি করে? এমন পরিস্থিতিতে তাঁব মুখে বাক্য সরতে চায় না, কে বলে দেবে এখন তাঁর কি বলা কর্তব্য।

'ফুলির কথা যেদিন তোমায় বলব স্থির করলাম, সেদিনই ও এসে পড়ল সব। ফুলি এখানে আসবার আগে কি আমার সঙ্গে পরামর্শ করে এয়েছিল? নিজে থেকে আমি তোমায় খবর দেই কি করে?'

'উচিত ছিল।' আনন্দীর গলা স্তিমিত।

'উচিত-অনুচিতের আমি জানি কি? আমার বাস সংসারের বাইরে, ভাত খেতে না এলে পিসী কাঁদত, তাই একবার আসা, তোমার ইয়ে সংসারের নিয়ম কাকে বলে তা আমি জানি? তবু ত' আমি বললাম কাল, আপনা হতে যাও, গিয়ে পা ধর, মিষ্টি কথায় সবাই তুষ্ট, আমার এখানে থাকাটাও ঠিক নয়, আমি গেঁজেল পাগল মানুষ। তবোও ফুলিকে, কি, আমি বলি নি?'

তিনি বন্ধুভাবে আনন্দীর বাহুতে হাত চাপড় মারেন। বলেন 'এখন নিজের সামগ্রী নিজে নিয়ে যাও। সামগ্রীই বটে।'

সুরকণ্ঠ গলা ভুলে অশালীন-ভাবে হাসেন। পাগল বলে, 'সে কথা ঠিক। তা ছাড়া ইনির কি আর মাথার ঠিক আছে? ইদিকে এই ধোঁয়ার দম, উদিকে খড়ি দাগিয়ে আঁক কষা আর গণা। তোমরাই জান না, আর সবে জানে, উনি গণে দেবে তবে যুদ্ধে মাতবে সব, এ নবাব-বাদশার কাণ্ড, সোজা কথা নয়।'

সুরকণ্ঠ তৎক্ষণাৎ ঘাড় নেড়ে বলেন, 'সে কথাও সত্যি। তোমরা বড়মানুষ, বড় কাজে থাক, গোঁফ-জোড়া সবচে' কাছে থাকে বলে চোখে পড়ে না। কিন্তু ফুলি সব জানে। যাও ফুলি, নিজের ঘরে যাও।'

ফুলেশ্বরী ও বিশালাক্ষী যখন রাস্তায় তখন ছুটতে ছুটতে পাগল এসে ফুলেশ্বরীর যাবতীয় কাপড়-চোপড় পোঁটলা বেঁধে দিয়ে গেল।

সেই রাতেই সুরকণ্ঠ গ্রাম ছেড়ে গেলেন। (ক্রমশঃ)

বিশ্বসাহিত্যের সম্রাট—মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে শারদ-জ্যোৎস্না—চরিত্র-সৃষ্টির ইন্দ্রধনু—অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধীশ্বর

চার্লস ডিকেন্সের

ডিকেন্স গ্রন্থাবলী

অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাশিল্পী—সর্বরসের অনন্ত নির্ঝর—বিশ্বসাহিত্যগৌরব ঔপ-ন্যাসিকের পরিচয় প্রদান অসম্ভব।

২য় ভাগ—নিকোলাস নিকলবি: ঘারনাবি রজ, চরিত্র-চিত্র। সাহিত্য জগতের এই পুণ্যপ্রভা মাত্র ১১।০ টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিঃ
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মালয়ালম গল্প

হয়সালা

টি শিবশঙ্কর পিল্লাই

হিসেবমতো কোরনের কাছ থেকে ইটইয়ানির পঁচিশ টাকা পাওনা হয়। কোরনের হাতে টাকা থাকলে ইটইয়ানী চাইলে পেতো; আবার কোরনের প্রয়োজনে ইটইয়ানিও তাকে ধার দিত। ওদের মধ্যকার এই লেনদেন আজকের নয়, বহুদিন থেকে চলে আসছে। লেনদেনের খতিয়ান শেষ পর্যন্ত পঁচিশ টাকায় এসে ঠেকেছে।

দেনা-পাওনার হিসেবটা যে দুই বন্ধুতে মিলে কোন এক জায়গায় বসে খতিয়ে দেখেছে, তা নয়। আসলে ওদের কাছে এর জন্য কোন নোটবই পর্যন্ত ছিল না। একদিন দুজনেরই কোন কাজ-ধান্দা ছিল না। মাণিক-তুম্নালের আমগাছের ছায়ায় বসে ওরা গল্প করছিল। কথায় কথায় দেনা-পাওনার প্রসঙ্গ উঠল এবং তারই ফলে হিসেব সম্বন্ধে এই রফা।—ঝগড়া-ঝাঁটির কোন প্রশ্নই ওঠে নি—ভাল মনে, হাসিতে-খুশিতে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশেই কথাবার্তা এবং সিদ্ধান্তে আসার কাজটা সাঙ্গ হলো।

পঁচিশ টাকা। কোরনের মনে খটকা লাগল। মন বলছে, অত টাকা হতেই পারে না। হিসেবে কোনরকম ভুলচুক হয় নি তো? হয় ফেরৎ টাকার হিসেব মনে নেই, আর নয়ত, যা নেওয়া হয়েছে তার চেয়ে বেশি ধরা হয়েছে। ব্যাপারটা কোরনের ঠিক মনে মনে হলো না, কিন্তু তার জন্য ইটইয়ানিকে সে দোষী সাব্যস্ত করবে না। এদিকে এতগুলো টাকা কী করে শোধ দেবে সে? এই ভাবনা থেকেই বোধ হয় তার মনে সন্দেহের উৎপত্তি।

বাড়ি ফেরার সময় ইটইয়ানি বলল—'তোমার কাছে ভাই, আমার পঁচিশটি টাকা রইল তা হলে—মনে থাকে যেন।'

এমনটি ইতিপূর্বে কখনো হয় নি। বহু বছরের পুরোনো বন্ধুত্ব এবং লেনদেনও অনেকদিন থেকেই চলে আসছে। কিন্তু এই 'মনে থাকে যেন' কথাটা তো কারো মুখ থেকে কখনো বেরোয় নি। আজ ইটইয়ানির এ-হেন কথা বলার মানেটা কী? এই পঁচিশটা টাকা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন যাতে আর না ওঠে তারই পাকাপাকি বন্দোবস্ত করার জন্যই বোধ হয়। তাই কোরনের মনে হলো, একটা গরমিল এর মধ্যে নিশ্চয় কোথাও রয়ে গেছে। তবু এই নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত সে করতে পারে না।

'তুইও যেমন, আমি যেন সব মনে করে বসে আছি। এ হলো গিয়ে আমাদের নিজেদের মধ্যকার লেনদেনের ব্যাপার।'

'এ কেমন কথা? হিসেব-নিকেশ করেই তো পঁচিশ টাকা ঠিক হলো।'

কথাটার কোন জবাব না দিয়েই কোরন চলে গেল। তখন থেকেই অষ্টপ্রহর উঠতে বসতে তার এই একই চিন্তা। শেষ পর্যন্ত সে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে, তার তরফ থেকে অত টাকা বাকি নেই।

তিনদিন আর দুজনের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হয় নি। চতুর্থ দিন হঠাৎ দেখা হতেই ইটইয়ানি কোরনকে বলল—'আরে ভাই, কিছু টাকা থাকলে দাও না। হাত একদম খালি।'

ইতিপূর্বে দেখা হলে ওদের মধ্যে কথাবার্তার সূত্রপাত কখনো এভাবে হয় নি, কিন্তু আজ এ কী হচ্ছে? তাকে দেখেই ইটইয়ানি কিনা টাকা চেয়ে বসলো। শুধু তাই নয়, চাওয়ার ধরণটাও অভিনব। আসলে টাকাটা উসুল করাই ইটইয়ানির উদ্দেশ্য।

'আমার কাছে এখন একটা কাণাকড়িও নেই।'

কোরন তার অক্ষমতা প্রকাশ করে। চলে যাবার জন্য সে পা বাড়িয়েছে এমন সময় ইটইয়ানি রাগতভাবে বলে ওঠে—'এ কেমন কথা। এটা কি ভাল হচ্ছে?'

কোরন কোন জবাব দেয় না।

'দরকার বলেই চাইছি, আর নিজেরই পাওনাগণ্ডা। আমার টাকা আমায় ফেরৎ দেবে বলে দিলাম। তা না হলে খুব খারাপ হয়ে যাবে কিন্তু।'

'ক্ষমতা থাকে যদি আদায় করে নিও।'

এর পর দুজনে যে যার পথে চলে যায়।

চার-পাঁচদিন পরে একটা বিশেষ ধরণের ঘটনা ঘটল। পথে দেখা হতেই ওদের মধ্যে মারপিট হয়ে গেল। এই প্রথমবার ওরা পরস্পরের গায়ে হাত তুলল। কোরনের বুকের ওপর

'ক্ষমতা থাকে যদি আদায় করে নিও'

বসে ইটইয়ানি একখানা ঘুঁষি জমাতে যাবে এমন সময় কোরনের কাকা ঘটনাস্থলে এসে হাজির হলেন। ফলে ইটইয়ানিকে তাঁর হাতে ঘা কতক খেতে হলো। ইতিমধ্যে ইটইয়ানির কাকা এসে আবার কোরনের কাকাকে বেশ করে উত্তম-মধ্যম দিলেন। চার কাকা-ভাইপোয় বেশ একটা খণ্ড-যুদ্ধ বেধে গেল। দুপক্ষে আত্মীয়-বন্ধুরাও এসে জুটল। তামাসা দেখার জন্য গাঁয়ের লোকেদের ভিড় জমে উঠল। শেষ পর্যন্ত গাঁয়ের কিছু লোক মাঝে পড়ে খুনোখুনিটা আর হতে দিল না। কিন্তু এই ঘটনার ফলে গ্রামের মধ্যে দুটি দলের সৃষ্টি হলো।

ব্যাপারটা কিন্তু এখানেই মিটল না। দুপক্ষই থানায় গিয়ে এজাহার দিয়ে এলো। কোরনের পক্ষে দাঁড়ালেন একজন উকিল আর একটি রাজনৈতিক দলভুক্ত জনৈক গ্রাম্যনেতা। ইটইয়ানির সমর্থনে এগিয়ে এলেন। থানার দারোগাবাবুর মধ্যস্থতায় শেষ পর্যন্ত লিখিতভাবে একটা রফা হলো। আগামী মরশুমে ফসল উঠলে পর কোরন ইটইয়ানিকে পঁচিশ টাকা দেবে। মামলা-মোকর্দমার খরচ যার যাব তার তার। বারোয়ারী জায়গায় ঝগড়াঝাঁটি করা ঠিক হয় নি সুতরাং তার ফলভোগ দুজনকেই সমানভাবে করতে হবে। মীমাংসা এইভাবেই হলো এবং তারপব উকিলমশাই, পার্টিনেতা আর থানার দারোগাবাবু এই তিনজন নিভৃতে বসে কী যেন সব কথাবার্তা বললেন।

ঘটনাটির ওপর এইভাবে যবনিকাপাত ঘটলো। তবু কোরন খুঁত খুঁত করে। অত টাকা তার বাকি নেই। কিন্তু ইটইয়ানিও নাছোড়বান্দা। সে বলল—'ধান কাটা হয়ে যাক না। তারপর পঞ্চায়েত তো আছেই।'

কোরনের কাকা তাকে বোঝালেন—'শোন বাবা, পাঁচজনের কথা মানতেই হবে। তোর হিসেবে হয়ত অত টাকা পাওনা হয় না। তবু কথা যখন দেওয়া হয়েছে তখন তা রাখা দরকার। যাই হোক না কেন, টাকাটা আমাদের দিতেই হবে।'

কোরনও সম্মতি জানিয়ে বলে—'ঠিক আছে। টাকা আমি নিশ্চয়ই দিয়ে দেবো। ও টাকা আমার কাছে হারাম।'

কোরনের বাড়ির লোকেরা ঠিক করল এবার ধান কেটে কোরন যে ধানটা পাবে, তা থেকে খরচ বাবদ কিছু নেওয়া হবে না। ওই ধান বেচে সে তার ধার শোধ করবে।

সে বছর ফলনও হয়েছিল খুব জোর। পাহাড়ের পশ্চিম দিকের ক্ষেতে অমন ফসল বহুকাল হয় নি; কোরনপুরমের কিষাণদের বুকে বল এলো। সারা কুট্টনাদ অঞ্চলের দিকে মা লক্ষ্মী এবার মুখ তুলে চেয়েছেন।

এই মরশুমে কাটাইয়ের সময় কী কী করবে সে সম্বন্ধে কোরন এখনই মনে মনে একটা পরিকল্পনা ছকে রেখেছে। কেবল ধার শোধ নয়, দু পয়সা জমাবার কথাও সে ভেবেছে। তাতে একটা বাধা আছে। দুদ্দাড় করে কাটা-ঝাড়া শেষ হয়ে যাবে—পুরো দিনের মজুরী মিলবে না। তাই শুধু এ-গাঁয়ের ভরসায় থাকলে চলবে না। এখানে প্রায় কিছুই পাওয়ার আশা নেই। কোরনের কেন, সবারই মনে এই ধরণের পরিকল্পনা রয়েছে। প্রত্যেকেরই নিজস্ব কিছু কিছু সমস্যা আছে। এখন তো সার্বজনীন উপবাসের মরশুম। তবু অনাগত সেই সুদিনের আশায় আশায় সবাই দিন গুণছে। —সেদিনের কল্পনায় সবার মন উল্লসিত হয়ে উঠছে।

মাঠের সবচেয়ে ভাল জমিটাতেই কাটাইয়ের কাজ আগে সুরু হবে। কাটাইয়ের নির্দিষ্ট দিনটির কথাও শোনা যায়। খবরটা দাবানলের মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে ওই দিন হাজার হাজার কিষাণকে

জমির চতুর্দিকে আলের ওপর বসে থাকতে দেখা গেল। ওদের প্রত্যেকের হাতে একখানি করে কাস্তে। কিন্তু কাটাইয়ের কাজে সবাইকে লাগানোও এক সমস্যা। কাজের তুলনায় কাজীর সংখ্যা বহুগুণ বেশি। সবাই মাঠে নামলে ধানের কিছু আর অবশিষ্ট থাকবে না। জমির মালিককে সেদিন অবস্থা দেখে ঘাবড়ে গিয়ে ফিরে যেতে হলো।

পরের দিনও জমির মালিক চাষীটির কাছে খবর গেল যে, আগের দিনের মতোই বিপুল সংখ্যক কিষাণের সমাবেশ তার জমির আলে আজও হয়েছে। ফলে সকালবেলায় সে আর জমিমুখো হলো না। দুপুর নাগাদ বহু কিষাণ হতাশ হয়ে ফিরে গেলে পর, সে গিয়ে কাটাইয়ের কাজ সুরু করালো। অত বড় জমিটার ধান কাটা হতে চারঘণ্টা মাত্র সময় লাগল।

এই জমিতে কাজ করে কোরন সের চারেকের মতো ধান পেল। এক সপ্তাহ পার হতে চলল। এখানে ওখানে আরও পাঁচটা জমিতে ধান কাটার কাজ সুরু হয়ে গেছে। বাইরে থেকেও দলে দলে কিষাণ এসে জুটেছে। উদয়াস্ত খেটেও পাঁচ সেরের বেশি ধান পাওয়া দুষ্কর। আর ওই পাঁচ সের তো দৈনন্দিন খরচের পিছনেই চলে যায়।

পনেরো দিন কাজ করে কোরন দেড় মণের মতো ধান পেল। পূর্ব ব্যবস্থামতো বাড়ির খরচের জন্য কিছুই তাকে দিতে হলো না। তবু সব ধান কটাই খরচ হয়ে গেল। তার কাস্তে ছিল না। তাই একটা কাস্তে তৈরি করাতে হয়েছে। সারা বছর খেটে খেতে হবে তো। একটা লুঙ্গিও কিনেছে। চায়ের দোকানের ধারটাও মিটিয়ে দিয়েছে। গাঁ ছেড়ে বাইরে গেলে টিপে টিপে খরচ করে রোজগারের পয়সাগুলো জমানো যাবে। এই ভেবে একদিন কোথায় যাচ্ছে এমন সময় পথে হঠাৎ ইটইয়ানির সঙ্গে দেখা। কোরনের মনে হলো ইটইয়ানি বোধহয় কিছু বলবে। দুজনেই কাছাকাছি মুখোমুখি হতেই থেমে যায়। সত্যি সত্যিই ইটইয়ানির তরফ থেকে একটা কথা বলার ছিল। সে বলল—'ভাই কোরন, আমাদের হিসেবে কিছুটা ভুল আছে।'

কোরনও প্রশ্ন করে—'কী ভুল। আরও ঠকাবার ইচ্ছে আছে নাকি?'

'চটছো কেন? আমি বলছিলাম কি, পঁচিশ টাকার মধ্যে চার টাকা তুমি দিয়ে দিয়েছিলে, পরশু হঠাৎ মনে পড়ে গেল। তখন থেকেই বলব বলব ভাবছিলাম।'

কোরন চটবে না-ই বা কেন? —তার তো কোন ভুল হয় নি। ঝগড়া ঝামেলার জন্যও সে যে দায়ী নয় তা-ও প্রমাণ হয়ে গেল। সে বলল—'সত্যিকে কখনো মিথ্যা দিয়ে ঢাকা যায় না।'

'তুমি আমায় একুশ টাকাই দেবে।'

'কেন?—আমি পঁচিশ টাকাই দেবো। পাঁচজনে মিলে তা-ই তো ঠিক করেছে।'

এই কথা বলে কোরন হনহন করে চলে যায়। ইটইয়ানি দাঁড়িয়েই থাকে। যেন আরও কিছু তার বলার ছিল। কোরন কিছুদূর এগিয়ে গেলে পর ইটইয়ানি আপনমনেই বলে—'আচ্ছা জেদী রে বাবা। সত্যি কথা বলতে গেলেও দোষ। বেশ পঁচিশ টাকাই যদি দেয় তো আমার নিতে কী দোষ?'

গাঁয়ে কাটাইয়ের কাজ শেষ হলে কোরন চম্পককুলম চলে যায়। চম্পক-কুলমের অসংখ্য কুটিরে শত শত কুমোর পরিবার ধানকাটার অথবা অন্য ধরণের দিনমজুরী করে জীবন যাপন করে। কোরন গিয়ে একটি চেনা বাড়িতে আশ্রয় নেয়। এ-গাঁয়ে দিন পনেরোর মতো কাজ পাওয়া যেতে পারে। সে যাই হোক, অন্তত সাত-আট মণ ধান সে জমাবেই; অবশ্য একটু মুস্কিল আছে বটে। দুপুরে কোন হোটেলে খেয়ে নিতে হবে আর বাড়িরেও খেতে খেতে সে অর্ধেক রাত। পারিশ্রমিক হিসেবে যে ধান পাবে তা থেকে চাল করে ফুটিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা করাও সহজ নয়। বিকেলে এক কাপ চা-ও তো চাই। আর যাই হোক, না খেয়ে থাকা যায় কী করে? কাটাইয়ের কিষাণদের জন্য পাড়ার ওপর ছোট ছোট যে হোটেলগুলো খুলেছে তাদেরই একটিতে সে ব্যবস্থা করে নেয়। ওদিকে চেট্টিওলার তিন-চার ঘর

সেক্সপীয়রের নাটক সাগরবৎ
কালিদাসের নাটক নন্দনকাননতুল্য।
—বঙ্কিমচন্দ্র

গল্পাংশের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ নহে
মহাকবির নাট্য-মাধুর্য্যের প্রতি
দৃষ্টি রাখিয়া অনুবাদ

সেক্সপীয়র গ্রন্থাবলী

(প্রথম ভাগ)

—এই ভাগে আছে—

১। ম্যাকবেথ—অনুবাদক মুণীন্দ্রনাথ ঘোষ
২। মনের মতন (As You Like It)—অনুবাদক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
৩। আণ্টনী ক্লিওপেট্রা—অনুবাদক দেবেন্দ্রনাথ বসু
৪। রোমিও জুলিয়েট—অনুবাদক হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৫। ভেরোনার ভদ্রযুগল—অনুবাদক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
৬। জুলিয়াস সীজার—অনুবাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

একত্রে মূল্য আড়াই টাকা।

(দ্বিতীয় ভাগ)

—এই ভাগে আছে—

১। ওথেলো—অনুবাদক দেবেন্দ্রনাথ বং
(নটকবিচূড়ামণি গিরিশচন্দ্র ঘোষ সংশোধিত)
২। মার্চেণ্ট অব ভেনিস—অনুবাদক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
৩। মেজার ফর মেজার—অনুবাদক ঐ
৪। সিম্বেলিন—অনুবাদক ঐ
৫। কিং লিয়র—অনুবাদক যতীন্দ্রমোহন ঘোষ
৬। টুয়েলফথ নাইট—অনুবাদক পশুপতি ভট্টাচার্য্য

একত্রে মূল্য আড়াই টাকা।

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

[illegible] এখানে এসেছে। ওদেরই মধ্যে একটি যুবক এসেই একটা নতুন জামা করিয়েছে। নতুন একখানা চাল-ধুতিও কিনেছে সে। এ-পাড়ায় কোরনের সমবয়সী দশ-পনেরোটি যুবক রয়েছে। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই ওদের মধ্যে বেশ একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। নতুন ছেলেটির জামাটা ওদের সবারই ভারি পছন্দ হয়েছে।

'আচ্ছা ভাই, আমরা সবাই এই রকম এক একটা জামা কিনলে কেমন হয়?—আর ধুতিও। একই রকম জামা-কাপড় পরে আমরা সবাই কাজে যাবো।'

'লাখ কথার, এক কথা বলেছ কিন্তু।' অন্য একজন মন্তব্য করে।

'আমরা সবাই কিনবো।'—তৃতীয়জনও সম্মতি জানায়।

প্রস্তাবটি পাশ হয়ে যায়। কোরনও আপত্তি করে নি। আসলে ওই রকম একটা জামা পরার তারও খুবই ইচ্ছে হয়েছিল। পরের দিন ধান বেচে সবাই মিলে আলযুগায় যাবে, সিনেমা দেখবে। সারা দিনকার খাটুনির পারিশ্রমিক হিসাবে পাওয়া ধান কটা কোরনকেও বেচে দিতে হলো।

ওদের একটি স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। পনেরোটি জোয়ান কিষাণ পরদিন একই ধরণের পোযাক পরে ধান কাটতে গেল। সে একটা দেখবার মতো দৃশ্য ঘটে।

চম্পককুলমের কাজও বেশিদিন স্থায়ী হলো না। দশম দিনেই কাটা-ঝাড়া সব শেষ। হোটেলের বকেয়া চুকাতেই তিন মণের মধ্যে আড়াই মণই নিঃশেষ হয়ে গেল। বাকি আধ মণ বেচে দিয়ে পয়সা কটা ট্যাঁকে গুঁজে কাওয়ালার পথে কোরন পা বাড়ান।

ইটইয়ানির পাওনার কথাটা যে সে ভুলে গেছে, তা নয়। তবু ও ব্যাপারে দায়িত্ববোধ যেন তার মধ্যে অনুপস্থিত। সালিশীর পর ইটইয়ানির সঙ্গে তার দেখা হয়েছে এবং সে যে আদৌ দোষী নয় তা-ও প্রমাণ হয়ে গেছে। তবু পঁচিশ টাকাই সে দেবে।

ক্রইনিঞ্চদায় এগেছে আজ চার-পাঁচ দিন হয়ে গেছে। তালবটাতে ওর এক কাকা থাকেন, তিনি এসেছিলেন। তাঁর কন্যাদায়। কিছু না দিলেই নয়। কোরনের কাছে প্রায় চার মণের মতো ধান জমেছিল। তার মধ্যে আড়াই মণ দিয়ে দিতে হলো।

গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে ধান কাটাইয়ের কাজ সেরে খালি হাতে কোরন ফিরে এলো। ধার শোধের সময় পার হয়ে গেছে। সে এবার ইটইয়ানির নজর বাঁচিয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়।

ইটইয়ানি অবশ্য কোরনকে খুঁজে বেড়াচ্ছে না। পুরনো ঘটনার কথা সবাই যেন ভুলে গেছে। সে সব কথা কেউ জিজ্ঞেস পর্যন্ত করল না। কোরনের বাপই শুধু একবার জিজ্ঞেস করলেন—'সেই ধারটা কবে শোধ করছ, বাবা?'

সে-ও বিনা দ্বিধায় উত্তর দিল—'টাকাটা আমার কাছেই আছে।'

'তবে দিয়ে দিচ্ছ না কেন?'

'এসে নিয়ে গেলে তবে তো?'

সে মাসটা কেটে গেল। ইটইয়ানির সঙ্গে কোরনের দেখা-সাক্ষাৎ হলো না। কোরনের মনে ভয় ঢুকে গেছে। কখন বুঝি ইটইয়ানির সঙ্গে দেখা হয়ে যায়,—এই তার ভয়। দেখা হলে কী বলবে সে? ভারি ভুল হয়ে গেছে।

জামাটা না কিনলেই হতো। দামের কথা চিন্তা না করে খাবারের দোকান থেকে খাবার আনিয়ে খাওয়াটাও ঠিক হয় নি। খুড়তুতো বোনের বিয়েয় অতটা বড়মানুষী না দেখালেও তো কোন ক্ষতি ছিল না। আসছে বছর সে আর এমন আহাম্মুকী করবে না।

আষাঢ় মাস এসে গেল। বর্ষার ঝড়-জল সুরু হয়েছে। ঘরে ঘরে অনাহার। হাতে কাজকর্ম, পয়সা-কড়ি কিছুই নেই। এইবার একদিন না একদিন ইটইয়ানি নির্ঘাৎ টাকা চাইতে আসবে। আর হলোও তাই। ইটইয়ানির সঙ্গে কোরনের হঠাৎ একদিন মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। কোরনদের পাড়া দিয়ে ইটইয়ানি যাচ্ছিল। কোরনও কী যেন একটা কাজে ঠিক সেই সময় বাইরে বেরিয়েছিল।

দেখা হতেই ইটইয়ানি বলে—'হাতে কিছু নেই। কিছু থাকে যদি তো দাও না। আমার ঘরে আজ উনুন জ্বলে নি। তোমার কাছে কিছু পাওয়া যায় কি না দেখতে আসছিলাম।'

কোরনের মুখ থেকে হঠাৎ কোন জবাব বেরুলো না। বলারই বা তার আছে কী? আছে না নেই। মুখ দিয়ে আপনিই বেরিয়ে যায়—'পয়সা হাতে ছিল। তোমায় দেবার জন্যে রেখে-ছিলাম। ভেবেছিলাম তুমি আসবে। কিন্তু এলে না। এদিক-ওদিক করে সব খরচ হয়ে গেল।'

'আমার হাতে পয়সা ছিল বলে তখন আসি নি। ভাবলাম, পাবই যখন, তখন আর ভাবনার কী আছে? দরকার হলে চেয়ে নেবো'খন।'

বিব্রতভাবে কোরন বলে—'পয়সা হাতে থাকে কখনো?'

ইটইয়ানি তাকে সমর্থন করে বলে—'তুমি ঠিকই বলেছ।'

সহানুভূতির সঙ্গে কোরন প্রশ্ন করে—'আজ তোমার ওখানে উনুন জ্বলে নি বুঝি?'

'তাই তো বেরুলাম, ভাই। তোমার কাছে একেবারেই কিচ্ছু নেই?'

কোরন জবাব দেয়—'একটা টাকা আছে।'

আশ্বস্ত হয়ে ইটইয়ানি বলে—'ওই একটা টাকাই তা হলে আমায় দাও। আজকের দিনটা কোনমতে চলে যাক। কালকে আবার কোথাও দেখা যাবে।'

মাণিকতুয়ালের আমগাছের তলায় আজও আপনি ওদের দু-বন্ধুকে গল্প করতে দেখতে পারেন। আজও ওদের মধ্যে লেনদেন চালু আছে। একুশ টাকা ধারের কথা ওরা দুজনেই যেন ভুলে গেছে।

অনুবাদক : বোম্মানা বিশ্বনাথম্

গোয়েন্দা-গল্প

কমলা সরকার

অদ্রীশ বর্ধন

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

হলো কি ইন্দ্রনাথের? পাগল হয়ে গেল নাকি? কোথায় জাহানারায় রহস্যজনক মৃত্যু ঘটলো সত্যেন মল্লিকের। আর, ও কিনা ছুটে এলো শহরের উপকণ্ঠে কসবায়—বসে গেল একটা অদ্ভুত গাছের মাটি খুঁড়তে। প্রাইভেট ডিটেকটিভদের কাজকর্ম সব সময়েই একটু উদ্ভট হয় বটে, কিন্তু এ যে দেখছি সৃষ্টিছাড়া। ইন্দ্রনাথ অবশ্য বলেছে, সত্যেন মল্লিক নিহত হয়েছেন। তাই যদি হয়, আমার মশার থিওরিটাকে অমন হেসে উড়িয়ে দেওয়া কি ঠিক হয়েছে? বিশেষ করে এই সেদিন একটা সায়ান্সফিকশান গল্পে পড়ছিলাম, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মশার একটা লালাকে কেউটের বিষের চাইতেও শতগুণ তীব্র গরলে পরিণত করা যায়। তখন, এই নিরীহ মশার এক এক কামড়েই চক্ষের নিমেষে অক্কা পেতে হবে মানবকুলকে। সেক্ষেত্রে, মশা-থিওরিকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে এই আধা পাড়া-গাঁয়ে এসে গাছ উপড়োনো আর নির্দোষ বাঁশি-বাজিয়ের ওপর নজর রাখার মধ্যে কি এমন বাহাদুরী আছে?

আমার মনের বিদ্রোহ হয়তো মুখেই প্রকাশ হয়ে পড়তো। যদি না—যদি না ঠিক সেই সময়ে মাটির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতো সুতোর মত একটা শেকড়।

ঠিক সুতোর মতই তলার দিকটা সরু হয়ে এসেছিল লম্বাটে শিকড়টার। টর্চের আলোয় অত্যন্ত নিবিষ্ট মনে উল্টেপাল্টে দেখতে লাগলো ইন্দ্রনাথ।

এ যে দেখছি পর্বতের মূষিক প্রসব। এতো লম্ফঝম্প করে কিনা শেষকালে সুতো আবিষ্কার।

বিদ্রূপতরল কণ্ঠে তাই বললাম—'কি হে টিকটিকি, হত্যাকারীর হাতিয়ারটাকেই আবিষ্কার করে ফেললে দেখছি।'

ব্যঙ্গটুকু গায়েই মাখলো না ইন্দ্রনাথ। মুখ তুলল আমার দিকে। অন্ধকারে মুখটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম না। তবে নিশ্চয় তখন বিজয়োল্লাস ওর দুই চোখে নৃত্য করছিল। কেন না, উত্তেজিত চাপা গলার সঙ্গে সঙ্গে ও বলে উঠলো—'তা পেয়েছি, মৃগাঙ্ক। অকল্পনীয় এই হাতিয়ার।'

ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলাম কণ্ঠস্বর শুনে। নিরাশার লক্ষণ তো দূরের কথা, এযে আবিষ্কারের তূর্যনিনাদ!

সুতোর মত শেকড়টাকে পকেটে পুরে উঠে দাঁড়িয়েছিল ইন্দ্রনাথ। বাগান সম্বন্ধে আর কোনো আগ্রহ দেখলাম না ওর মধ্যে।

ফটক বন্ধ করে বেরিয়ে এলাম বাইরে। কিছুদূরে রূপসি বটগাছের

গাছে রাখা জীপে এসে বসলাম তিন বন্ধু। জয়ন্ত এতক্ষণ মুখ বুজে সাক্ষীগোপালের মত দেখছিল বন্ধুবরের উন্মাদ কার্যকলাপ। এবার কি বলতে গেল। কিন্তু মুখের ওপর কাঁচির একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে মুখ বন্ধ করে দিলে ইন্দ্রনাথ।

প্রায় ঘণ্টাখানেক এইভাবে বসে বসে মশার কামড় খেলাম। তারপরেই দূরে দেখা গেল একটা ছায়ামূর্তি।

বিশ্বনাথ দীক্ষিত। সারসপাখির মত লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে ফটকের সামনে এসে দাঁড়ালো তার অত্যন্ত হালকামূর্তি। বাঁ হাতে ঝুলছিল একটা লম্বাটে বাক্স—বাঁশির বাক্স।

ডানহাতে ফটক খুলে দরজার সামনে পৌঁছোলো সে। তারপর কড়াৎ করে তালা খুলে অন্তর্হিত হলো ভেতরে।

ঘরের মধ্যে আলো জ্বলে উঠতেই গাড়ি থেকে নেমে এলাম আমরা। কড়া নাড়তেই দরজা খুলে গেল। তার আগেই আড়ালে দাঁড়িয়েছিল জয়ন্ত। দরজার সামনে রইলাম শুধু আমি আর ইন্দ্রনাথ।

বিরক্ত চোখে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল বিশ্বনাথ দীক্ষিত। কিন্তু আমাদের দেখেই সামান্য চমকে উঠলো।

তবে কি আমাদের চিনতে পেরেছে ও?

কিন্তু এ চমক ক্ষণেকের জন্যে। পরক্ষণেই রুক্ষস্বরে শুধোলে—'কি চাই আপনাদের?'

ইন্দ্রনাথ বললে—'আপনার সঙ্গে বিশেষ দরকার আছে আমাদের। কিন্তু তা তো এখানে দাঁড়িয়ে বলা যাবে না।'

একটু ইতস্তত করলো বিশ্বনাথ। তারপর দরজার সামনে থেকে সরে দাঁড়িয়ে বললে—'ভেতরে আসুন।'

টিমটিমে আলো জ্বলছিল দেওয়ালের ব্র্যাকেটে। ধুলো জমে এমন অবস্থা হয়েছে যে, বিদ্যুৎ-বাতি বলে চেনাই যায় না। এককোণে একটা তক্তপোষ। অপর দিকে একটা কাঠের আলমারী। তক্তপোষের ওপর সতরঞ্চি পাতা। এলোমেলোভাবে ছড়ানো কয়েকটা বাদ্যযন্ত্র— বাঁশিই বেশি।

রসকষহীন গলায় বিশ্বনাথ বললে—'বসুন। আমি বড় ক্লান্ত—যা বলবার সংক্ষেপে বলুন।'

তক্তপোষের ওপর গিয়ে বসলাম আমরা। ইন্দ্রনাথ বললে—'জাহানারাতে আপনার বাঁশি শুনলাম আজ। বড় ভালো লেগেছে আমাদের। আমার ইচ্ছে, ইডনে গার্ডেনের আগামী ফাংশনে আপনি আসুন।'

'আপনি কে?'

'আমার নাম ইন্দ্রনাথ রুদ্র। এই জলসার আর্টিস্ট সংগ্রহের ভার পড়েছে আমার ওপর।' অম্লানবদনে কাঁচা মিথ্যে কথা বলে গেল ইন্দ্রনাথ।

কিন্তু তাতে বিশ্বনাথের গলার রুক্ষতা একটু কমলো বলে মনে হলো না। শুধোলো—'জলসা কবে?'

'তারিখটা এখনো ঠিক হয় নি—তবে নভেম্বরের শেষাশেষি।'

'আমাকে একটু ভাবতে দিন।'

'বেশ তো, ভেবেচিন্তেই বলুন।' পকেট থেকে কাঁচির প্যাকেট বার করতে করতে বললে ইন্দ্রনাথ। 'এত রাতে আসাটা সত্যিই অন্যায় হয়েছে। কিন্তু—' ঠোঁটের গোড়ায় একটা কাঁচি ঝুলিয়ে পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে—'ম্যানেজারের কাছে শুনলাম আপনি মাইশোরিয়ান, কিন্তু বাংলাটা বেশ রপ্ত করেছেন তো? ধুত্তোর দেশলাইটা বোধ হয় জাহানারাতেই রেখে এলাম। আছে নাকি মিঃ দীক্ষিত?'

নিরুত্তরে চৌকাঠের ওদিকে পা দিলে বিশ্বনাথ। তৎক্ষণাৎ বিদ্যুৎবেগে তক্তপোষ ছেড়ে আলমারীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো ইন্দ্রনাথ। কাঠের পাল্লার একদম কাছে চোখ নিয়ে গিয়ে কি দেখে চকিতে ফিরে এসে বসে পড়লো তক্তপোষের ওপর।

ফিস্‌ফিস করে বললে—'এখন আমি যাই বলি না কেন, তোমরা মুখে চাবি এঁটে বসে থাকবে।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকলো বিশ্বনাথ। হাতে দেশলাই।

সিগারেটটা ধরিয়ে নিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ইন্দ্রনাথ বললে—'ইডেন গার্ডেনে শুধু বাঁশি বাজানো নয়, আরও একটা কাজের ভার আপনাকে দিতে চাই। অন্যের কাছে কাজটা কঠিন হলেও, আপনার কাছে নয়। কেন না, একাজে আপনি হাত পাকাচ্ছেন অনেকদিন ধরেই।'

কি বলতে চায় ইন্দ্রনাথ? ওর ওপর মাঝে মাঝে আমার প্রচণ্ড রাগ হয় যখন-তখন সাসপেন্স সৃষ্টির জন্যে। কিন্তু এ-ধরণের প্রস্তাবনা তো ওর কাছে আশা করি নি। এ কোন কাজের কথা বলছে ও? অত্যন্ত ধীর, অত্যন্ত সিরিয়াস ভঙ্গীতে কথা বলছিল ইন্দ্রনাথ। লক্ষ্য করলাম, বিশ্বনাথের মুখেও পড়েছে কৌতুহলের ছায়া।

প্রত্যেকটি অক্ষরের ওপর জোর দিয়ে থেমে থেমে বলে চললো বন্ধুবর—'ইডেন গার্ডেনে মঞ্চের একদম সামনের সারিতে কয়েকজন হোমরা-চোমরা ব্যক্তি বসে থাকবেন। তাঁদের মধ্যে থাকবেন একজন বিখ্যাত জননেতা—নামটা পরে বলবো। নানা কারণে তাঁর এখন রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ থেকে সরে যাওয়ারই দরকার হয়েছে।

শক্তিমান অভিনেতার মতই মাত্র এই কটি কথায় ঘরের পরিবেশকে যেন আমূল পাল্টে দিলে ইন্দ্রনাথ। উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় থমথমে হয়ে উঠল ঘরের আবহাওয়া। আর ধীরে ধীরে তীব্র হয়ে এল বিশ্বনাথের চোখের দৃষ্টি, শক্ত হয়ে এল চোয়ালের রেখা।

চুপ করেছিল ইন্দ্রনাথ। এখন বন্দুকের গুলীর মত বলে উঠল—'আপনি অভিজ্ঞ। তাই এ দায়িত্ব আপনার ওপরেই দিতে চাই। পারিশ্রমিকের পরিমাণ দশ হাজার টাকা।'

এতক্ষণ বাদে তীব্র চাপা গলায় গর্জে উঠলো বিশ্বনাথ—কালনাগিনী যেন ফণা তুলে হিসহিসিয়ে উঠলো ওর কণ্ঠে—'কে আপনি?'

'বললাম যে, ইডেন গার্ডেনের জলসায় আর্টিস্ট সংগ্রহের—'

'রাতদুপুরে এসব কথা কি বলতে এসেছেন? কি মতলব আপনার?'

ধীরে-সুস্থে আধ-পোড়া সিগারেটটা তক্তপোষের গায়ে রগড়ে রগড়ে নিভিয়ে দিল ইন্দ্রনাথ। থমথমে নৈঃশব্দ্য যেন ফেটে পড়তে চাইল অতীব্র উদ্বেগে। নিভোনো সিগারেটটা জানলা দিয়ে আঙুলের টোকায় উড়িয়ে দিয়ে শান্ত গলায় বললে ও—'আপনি ভয় পেয়েছেন, ভাবছেন আমি পুলিশের লোক। পুলিশ হলে কি এসব ভণিতা করতাম? সত্যেন মল্লিকের মৃত্যুর কারণ পুলিশ জীবনেও জানতে পারবে না। কিন্তু আমি জানি। জানি বলেই এত রাতে—'

'জানেন যে-তার প্রমাণ কি?'

চমকে উঠলাম বিশ্বনাথের স্বর শুনে। এ যে দেখছি স্পষ্ট চ্যালেঞ্জ।

টুপ করে মেঝেতে নেমে পড়লো ইন্দ্রনাথ। লম্বা লম্বা পা ফেলে কাঠের আলমারীর সামনে গিয়ে বললে—'প্রমাণ এই আলমারীটা।'

বিশ্বনাথের কেউটের মত বিষময় চোখ আর সারা দেহের টানটান ভঙ্গি দেখে মনে হলো এই বুঝি লিকলিকে নেকড়ের মতই লাফিয়ে উঠবে সে।

'আপনি পুলিশের লোক?'

'না। আচ্ছা, এই জিনিসটা চিনতে পারেন?' বাগান থেকে খুঁড়ে আনা শেকড়টা বার করে তুলে ধরলো ইন্দ্রনাথ।

'মুলো বলেই তো মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, সেই রকমই দেখতে। ভুল করে মুলো অথবা গাজর জাতীয় সব্জি মনে করায় অতীতে অনেক শোচনীয় পরিণতিরও কারণ হয়েছে নিরীহ চেহারার এই শেকড়টি।'

একটু থামল ইন্দ্রনাথ। অসহ্য উৎকণ্ঠায় ভারি হয়ে উঠেছিল ঘরের বাতাস। সূচ্যগ্র চোখে তাকিয়েছিল বিশ্বনাথ। মোচড়ের পর মোচড় দিয়ে ক্লাইম্যাক্সের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কায়দায় আবার সুরু করলো ইন্দ্রনাথ।

'মুলো নয়, এ শেকড়ের নাম অ্যাকোনাইট। জানেন কি, এ থেকে একটা মারাত্মক বিষ ডিস্টিল করে বার করে নেওয়া খুব কঠিন নয়?'

'না, জানি না, জেনেই বা করবো কি?'

'এ শেকড় আপনার বাগানে এন্তার রয়েছে কি না।'

'আগাছার জন্যে নিশ্চয় দায়ী নই আমি।'

'সবুর। সবুর। দায়িত্বের কথা পরে কইবো। সত্যেন মল্লিককে আপনি এর আগে চিনতেন?'

'না।'

'তা সত্ত্বেও গত রাতে অত লোকের চোখের ওপরেই ওঁকে খুন করলেন আপনি। আপনার ধড়িবাজির তারিফ করছি। কিন্তু ওঁর মত মানুষকে কেন খুন করতে গেলেন বলুন তো?'

ঠিক যেন মেশিনগান থেকে আচমকা একঝাঁক গুলীবর্ষণ ঘটলো, এমনি উপর্যুপরি প্রশ্ন করে গেল ইন্দ্রনাথ। কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠছিল ওর কণ্ঠ আর চোয়ালের রেখা। আর, শক্ত হয়ে আসছিল বিশ্বনাথের দৃষ্টি।

কয়েক মুহূর্তের শ্বাসরোধী নীরবতা ভঙ্গ করে চিবিয়ে চিবিয়ে জবাব দিল বিশ্বনাথ, 'আপনি উন্মাদ। দয়া করে এত রাতে আর জ্বালাবেন না, বিদেয় হোন।'

'না, আমি উন্মাদ নই। আমি জানি কি করে সত্যেন মল্লিককে খুন করেছেন আপনি। আপনি জানতেন, গতকাল রাতে উনি হাজির থাকবেন 'জাহানারা'তে। তাই বেশ কিছুদিন ধরে সাধনা করেছেন এই ঘরে বসে।'

'কিসের সাধনা? কি বলতে চান আপনি?'

'বাঁশির নয়। আলমারীর ঐ পাল্লার ওপর একটা পুঁচকে তীর ছোঁড়ার সাধনা।'

'আপনি কি দৈবজ্ঞ, না—সবজান্তা, না, পাগল? রাতদুপুরে একি উৎপাত?'

'আমি কোনোটাই নই। পাল্লার আগাগোড়া ছোট ছোট ছুঁচ ফোটার মত চিহ্ন দেখলেই বোঝা যায় ওগুলো কিসের চিহ্ন।'

'কিসের?'

'বললাম তো, তীর বেঁধার চিহ্ন।'

আচমকা অট্টহাস্য করে উঠলো বিশ্বনাথ। সারসপাখির কণ্ঠে যেন হায়নার হিমেল হাসি—হাসির ধমকে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল পাতলা লম্বা দেহটা। এ-হাসি যার কণ্ঠে জাগে, কে বলবে সময় বিশেষে তারই ফুসফুস থেকে বেরোতে পারে সুরের যাদু।

আমরা তো হতবাক। ইন্দ্রনাথ নির্বিকার।

হাসি থামাতে গিয়ে খক্‌খক্ করে কাশতে লাগল বিশ্বনাথ। কাশি আর হাসির মধ্যে মধ্যে বললে ও—'জাহানারার মধ্যে আমি তীর ছুঁড়েছি—এই কথাই বলতে চান তো আপনি? মিঃ ডিকেটটিভ, পুলিশের চাকরি ছেড়ে দিয়ে গোয়েন্দা-গল্প লিখুন, দুটো পয়সার মুখ দেখবেন—এ-কাজ আপনার নয়।'

সর্বনাশ। ইন্দ্রনাথের প্রশ্নবাণ আর আক্রমণের ধারার মধ্যে যে অসঙ্গতিটা একটু একটু করে প্রকট হয়ে উঠছিল আমার মনের মধ্যে, ঠিক সেইখানেই ঘা দিয়েছে বিশ্বনাথ। এও কি সম্ভব? অত লোকের সামনে

তীর ছুঁড়ে হত্যা? দারুণ রাগ হয়ে গেল ইন্দ্রনাথের ওপর। আগে থেকে আমাদের সঙ্গে শলাপরামর্শ না করার ফলেই তো এই দুর্গতি। এখন ল্যাজে-গোবরে এক হয়ে ঘরমুখো হওয়া ছাড়া আর কোন পথ নেই। ইন্দ্রনাথের নিষেধ অমান্য করে জয়ন্ত হয়তো কথাই বলে ফেলতো, কিন্তু বন্ধুবরের এক ঝলক ঠাণ্ডা দৃষ্টিতেই চুপ মেরে গেল ও।

অস্বাভাবিক শান্ত গলায় ইন্দ্রনাথ বললে—'আমি পুলিশ নই, আমি গল্প-লিখিয়েও হতে চাই না। কিন্তু আমি প্রমাণ করে দিতে পারি তীর ছুঁড়েই সত্যেন মল্লিককে ওপারে পাঠিয়েছেন আপনি।'

হাসির চোটে চোখ-মুখ লাল করে বিশ্বনাথ শুধোলে—'কেমন করে শুনতে পারি কি?'

ইন্দ্রনাথের মার্বেল পাথরের মত শক্ত মুখে ধ্বক ধ্বক করে জ্বলছিল যেন আগ্নেয়শিলায় তৈরি চোখ দুটি।

'হ্যাঁ, পারি। আপনার বাহাদুরী তো সেইখানেই, মিঃ দীক্ষিত। এ-খুনের আসল ধাঁধাই তো সেইখানে। মাঝে মাঝে আপনি একটা সাদাসিধে টিনের বাঁশি বাজান। ঐ বাঁশিটা।'

তক্তপোষের ওপর থেকে টিনের বাঁশিটা নিয়ে এল ইন্দ্রনাথ। বাতাসের গর্তগুলোর ওপর আঙুল রেখে বললে—'সব ক'টা ছেঁদা এইভাবে বন্ধ করে খুব জোরে ফুঁ দিলে দমকা বাতাসের স্রোত বয়ে যায় বাঁশির মধ্যে দিয়ে। অ্যাকোনাইটের শেকড় থেকে পাওয়া মৃত্যু-বিষে ভেজানো একটা ক্ষুদে তীর যদি এই বাঁশির মধ্যে থাকে, আর দীর্ঘদিন ধরে কেউ যদি হাত পাকিয়ে থাকে ছুঁচের মত সূক্ষ্ম এই তীর ছোঁড়ার বিদ্যায়, তা হলে ফুঁ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা কারও ঘাড়ে গিয়ে বিঁধে যাওয়া এমন কিছু বিচিত্র ব্যাপার নয়। যার কাঁধে লাগবে, সে ভাববে বুঝি মশা বা পোকা-মাকড়ের কামড়। ঘাড়ের চামড়ায় বিষ ঢুকিয়ে মেঝেয় খসে পড়ে যাবে ছুঁচরূপী তীরটা। তারপর অন্যান্য ময়লার সঙ্গে ঝাড়ুদারই তা ঝেঁটিয়ে ফেলে দেবে জঞ্জালের গাদায়। যদি না----যদি না তীরন্দাজই তা পরে কুড়িয়ে নেয়।

'মিঃ দীক্ষিত, এইভাবেই সত্যেন মল্লিককে খুন করেছেন আপনি। পুলিশ যখন হট্টগোলের মধ্যে তাদের রুটিনওয়ার্ক নিয়ে ব্যস্ত, তখনি বিশেষ ধরণের এই ছুঁচটা আপনিই সরিয়ে ফেলেছেন। ইডেন গার্ডেনে এই জিনিসকেই আবার কাজে লাগাতে হবে আপনাকে। ছুঁচটা একবার দেখাবেন?'

বিশ্বনাথের মুখখানা তখন পর্যবেক্ষণ করার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁচেছে। নিঃসীম বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে দু' চোখ—কৌতুকের বাষ্পকণাও নেই সে চোখে। অদম্য উত্তেজনা, অপরিসীম উদ্বেগ আর ভয়ানক শঙ্কায় মৃগীরুগীর মত কেঁপে কেঁপে উঠছিল মুখের আর ঠোঁটের মাংসপেশী।

ঠিক এই সময়ে নাটকীয়ভাবে গটগট করে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলো জয়ন্ত।

চকিতে ইন্দ্রনাথের কণ্ঠ থেকে অন্তর্হিত হলো অশিব ঝনঝনানি। সহানুভূতির স্বরে সে বললে—'থাক, থাক, আমরাই খুঁজে নেবো তীরটা। ও জিনিস ছাড়া তো এ মামলায় আপনার বিপক্ষে খাড়া করার মত সত্যিকারের কোন প্রমাণই নেই। আসুন, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই আমার এই বন্ধুটির। জয়ন্ত চৌধুরী—ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর।

কালো টাকা

'রেজালা'র ঝোলে তন্দুরি ডুবিয়ে ইন্দ্রনাথ বললে—'জয়ন্তর রিপোর্ট কি?'

স্থানাভাবে ইন্দ্রনাথের জীর্ণ টেবিলটার ওপরেই বসেছিল জয়ন্ত। বললে—'বিশ্বনাথ দীক্ষিতই খুন করেছে সত্যেনবাবুকে।'

কবিতা ফোঁস করে বললে—'হায় কপাল, এক লক্ষবার তা শুনেছি আমার কর্তার কাছে। কিন্তু কেন?'

'কারণ সেই একই—কালো সরকার।'

'সেটা আবার কি হে?' তন্দুরি চিবুতেও ভুলে গেল ইন্দ্রনাথ।

'কালো সরকার কি বলতে গেলে গৌরচন্দ্রিকা হিসেবে যে টাকার হিসেব নেই, তা সম্বন্ধে কিছু বলতে হয়। দয়া করে ধৈর্য ধরে শোনো।

'কাগজে পড়েছো তো সম্প্রতি অর্থমন্ত্রী রাজ্যসভায় দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, হিসেবের বাইরে টাকা উদ্ধার করতে সরকার চেষ্টার ত্রুটি করবেন না। এই টাকাই কালো টাকা। গত যুদ্ধের সময়ে সরকারী নিয়ন্ত্রণের বাইরে যে কালো-বাজার সৃষ্টি হয়, কালো টাকার উদ্ভব ঘটে সেখানেই। কালোবাজারে কোটি কোটি টাকা মুনাফার জন্যে কোনো আয়কর দেওয়া হয় না। এই টাকাই আবার কালোবাজারে খাটানো হয়। এইভাবেই কালো টাকার অঙ্ক ফেঁপে উঠে এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, সরকার শুদ্ধ দিশেহারা হয়ে উঠেছে।

'বর্তমানে কালো টাকা রোজগারের আর খাটাবার একটা প্রধান পথ হচ্ছে: বিধি-নিষেধের বেড়া ডিঙিয়ে বিদেশ থেকে 'স্মাগলিং' অর্থাৎ শুল্ক ফাঁকি দিয়ে পণ্য আমদানী করা—আর সুড়ঙ্গ-পথে দেশের বাইরে মাল পাঠানো। পুলিশ এ খবরও রাখে যে, কলকাতারই কোন একটা বাজারে প্রতিদিন এক কোটি টাকা-দামের বে-আইনী-ভাবে আমদানী করা মাল কেনাবেচা হয়। কেউ কেউ মনে করেন, আমাদের দেশে কালো টাকার পরিমাণ তিন হাজার কোটি টাকার মত। অবশ্য সঠিক অঙ্ক নিধারণ করা সত্যিই খুব কঠিন।

'বর্তমানে অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে সমাজবিরোধীদের হাতে কালো টাকা একটা বিরাট শক্তিতে পরিণত হয়েছে। এরা কালো টাকার জোরে সরকারের সবরকম নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা আর বিধি-নিষেধকে ভেঙে তছনছ করে দিচ্ছে। সরকার-নিয়ন্ত্রিত প্রকাশ্য বাজারের নাকের ডগাতে কালোবাজার চলছে। কালোবাজার চালু রাখার জন্যে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী বাজারে essential commodity অর্থাৎ অত্যাবশ্যক পণ্যদ্রব্যের কৃত্রিম ঘাটতি সৃষ্টি করছে। সেই সাথে জিনিসপত্রের দাম বাড়ানোর জন্যে সরকারের ওপর চাপ দিচ্ছে। এই চাপ যে কত প্রবল, জিনিসপত্রের দামের ঊর্ধ্বগতির দিকে তাকালেই তা বোঝা যায়। সমাজবিরোধীরা কালো টাকার জোরে দেশে প্রায় অরাজক অবস্থা সৃষ্টি করেছে। সরকার এই দুঃসহ অবস্থার কোনো প্রতিকার করতে পারছেন না। সরকারের সবরকম আইন-কানুন ডিঙিয়ে কালোবাজারীরা অবাধে তাদের কারবার চালিয়ে যাচ্ছে। কালো টাকার মালিকরা বলতে গেলে, আজ প্রায় একটা পাল্টা সরকার চালাচ্ছে। আমি এই সরকারের নাম দিয়েছি কালো সরকার।'

একটানা বলতে বলতে দারুণ উত্তেজনায় টকটকে লাল হয়ে উঠেছিল জয়ন্তর মুখ। উত্তেজনা অত্যন্ত ছোঁয়াচে জিনিস। কাজেই আমাদের রক্তও যেন ধীরে ধীরে টগবগিয়ে উঠেছিল কালো সরকারের খপ্পরে পড়ে, নিজেদের অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করে।

কবিতাই শুধু চোখ গোল-গোল করে বলে উঠলো—'বাবা, এ যে রেগুলার ইকনমিক্সের লেকচার সুরু করে দিলে। কিন্তু কালো টাকার সঙ্গে সত্যেন মল্লিকের মৃত্যুর—'

'সম্বন্ধ আছে।' মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে জয়ন্ত। 'কালো টাকার দাপট নষ্ট করতে হলে কালোবাজার ধ্বংস করতে হবে, যে কোনোভাবে স্মাগলিং বন্ধ করতে হবে। স্মাগলিং বন্ধ হলেই কালো টাকা খাটাবার আর কালো টাকা উপায়ের একটা প্রধান পথ বন্ধ হয়ে যাবে। বেশ কিছু দিন ধরে লালবাজারের প্রত্যেকেই হিমসিম খাচ্ছিলেন এই গুরুদায়িত্ব নিয়ে। ঠিক এই সময়ে মারা গেলেন সত্যেন মল্লিক।

'কেন?' কবিতা নাছোড়বান্দা।

'কারণ, কালোবাজারীদের নির্মূল করার জন্যে একটা পরিকল্পনা রচনা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল যে কমিটির ওপর, তারই চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন সত্যেন মল্লিক। সমস্ত ব্যাপারটা এত গোপনে চলছিল যে, জনসাধারণ তো দূরের কথা, আমরা শুদ্ধ কিছু জানতে পারি নি। কিন্তু কালো সরকার জানতে পেরেছিল।'

'অর্থাৎ, তুমি বলতে চাও কালো সরকার আমাদের সরকারের এই স্কীমও বানচাল করে দিলে সত্যেন মল্লিককে খুন করে?' শুধোলে ইন্দ্রনাথ।

'হ্যাঁ, তাই বলতে চাই। বিশ্বনাথ দীক্ষিতের জবানবন্দীতে যেটুকু তথ্য পাওয়া গেছে, তা থেকে অনায়াসেই এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি আমরা। বিশ হাজার কালো টাকার লোভে এ কাজ করেছে বিশ্বনাথ।'

'কিন্তু সুরের সাধক খুনের ব্যাপারে হাত পাকাতে গেল কেন, তাই তো বুঝলাম না।' অবুঝের মত লেগে থাকি আমি।

কবিতা মুখ টিপে বললে—'এও যায়, ব্যাঙ যায়, খলসে বলে আমি এক লাফ দিই। সবই যদি তুমি বুঝবে তা হলে আর আমার কপালে জুটবে কেন?'

ইন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি বলে উঠলো—'আ রে, আ রে, সভামধ্যে দাম্পত্য-কলহ নৈব নৈব চ। শোনো বৌদি, শুধু স্ত্রীলোকের চরিত্র কেন, মানব-চরিত্রও বড় দুর্জ্ঞেয়, বড় জটিল। টাকার লোভে ছেলে যদি বাপকে খুন করতে পারে, তা হলে সঙ্গীত-সাধকই বা অ্যাকোনাইটের চাষ করবে না কেন?

'বেশ, কিন্তু ঐ নিরীহ মানুষটাকে তুমি সন্দেহ করতে গেলে কেন? নিশ্চয় হাত গোনো নি?'

'তবে শোনো, প্রথমটা সত্যিই আমি দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, এ যাত্রা বুঝি মুখ কালো করেই ঘরে ফিরতে হবে। বাস্তবিকই, নীলবৃত্ত না থাকলে সত্যেন মল্লিকের মৃত্যুকে অস্বাভাবিক কখনই বলতে পারতাম না—খুনতো নয়ই। শেষ পর্যন্ত করোনারি অ্যাটাক বলেই সুড়সুড় করে সরে পড়তাম। কিন্তু গোল বাধালে মৃগাঙ্ক আর একটা সায়েন্স ফিকশ্যন গল্প।'

'আমি?'

'হ্যাঁ, তুমি। আমি একটু কল্পনা-বিলাসী বলে তোমরা টিটকিরি দাও। গোয়েন্দাদের নাকি প্র্যাকটিক্যাল হতে হয়। কিন্তু এ কেস সমাধানের জন্যে ফিফটি পার্সেণ্ট ক্রেডিট দিতে হবে আমার কল্পনা, আর আমার কপালকে। মনে আছে, ব্লু সার্কেল দেখে তুমি বলেছিলে, এ মশার কামড়ের দাগ?'

'বলেছিলাম তো।'

'মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড, সঙ্গে সঙ্গে প্রেমেনবাবুর একটা গল্প মনে পড়ে

শ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন সম্পাদিত
নাড়ীজ্ঞান-প্রদীপিকা
(নাড়ী স্পর্শ দ্বারা রোগ নির্ণয় ও পরমায়ু নিরূপণ)
মূল্য এক টাকা
জাতীয়-কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের
রঙ্গলাল-গ্রন্থাবলী
পদ্মিনী, সুরসুন্দরী, কর্মদেবী, কুমারসম্ভব, নীতিকুসুমাঞ্জলি, কাঞ্চী-কাবেরী, কবির জীবনী। ৭খানি একত্রে ২·০০।
বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

গেল। বইটা তুমিই পড়তে দিয়েছিলে আমাকে। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মশার একটি বিশেষ লালাকে বিষাক্ত করে তুলতে পারলেই সেই মশার কামড় খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অক্কা পেতে হবে প্রতিটি প্রাণীকে। তবে কি এই ধরণেরই কোনো মশার জন্ম হয়েছে কারও ল্যাবরেটরীতে? পরক্ষণেই ভাবলাম, রাবিশ। তাই যদি হয়, মশার রাগ তা হলে কেবল সত্যেন মল্লিকের ওপর কেন? আরও অনেককে সেদিন পরলোকের টিকিট কাটতে হতো।

'মশার সম্ভাবনাকে তক্ষুণি নাকচ করেছিলাম। কিন্তু তুমিই সর্বপ্রথম আমার মাথায় একটা জব্বর পয়েণ্ট এনে দিলে—বিষের সম্ভাবনা। সে বিষ মশার হুল মারফৎ না এলেও নিশ্চয় বায়ুপথেই এসেছে সবার চোখের ওপর দিয়ে। পাঠিয়েছে, মানুষ। কেন না বুদ্ধি খাটিয়ে একমাত্র মানুষই মানুষকে হত্যা করে।

'কল্পনার রাশ ছেড়ে দিলাম। নিজেকে হত্যাকারীর পদে অধিষ্ঠিত করলাম। যে কোনো কারণেই হোক, খুন করতে হবে সত্যেন মল্লিককে। কিন্তু কি করে?

'দূর থেকে ব্যক্তিবিশেষের প্রাণ হরণ করার একটিমাত্র পদ্ধতিই আধুনিক মানুষ আবিষ্কার করেছে এবং তা হলো আগ্নেয়াস্ত্র। কিন্তু নাচ-গান-ভরা কক্ষে সাইলেন্সর লাগানো রিভলবারও বিপজ্জনক।

'আহা রে এমন কোনো একটা হাতিয়ার যদি পাওয়া যেত যাকে দিয়ে নিঃশব্দে সবার চোখে ধুলো দিয়ে আগুন নয়, তপ্ত সীসের বুলেট নয়, এককণা বিষ পাঠিয়ে দিতে পারতাম।

সঙ্গে সঙ্গে যেন এক লক্ষ ওয়াটের ফ্লাশ-বাল্ব জ্বলে উঠলো মাথার কোষে কোষে। অভিভূতের মত 'ইউরেকা' 'ইউরেকা' বলে চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে হয়েছিল। মনে পড়ে গিয়েছিল ব্লো-পাইপের কথা।

'দক্ষিণ আমেরিকার কোনো কোনো আদিবাসীরা আজও এই মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহার করে শত্রুনিধনের জন্যে। সামান্য একটা নল। তার মধ্যে থাকে বিষ মাখানো তীর। ফুঁ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা অব্যর্থ লক্ষ্যে বিঁধে যায় টার্গেটে।

'ব্লো-পাইপ। একমাত্র ব্লো-পাইপে ফুঁ দিয়েই নিঃশব্দে মারতে পারি সত্যেন মল্লিককে। তীরটা এত ছোট হওয়া চাই যা গরলটুকু ঢেলে দিয়েই খসে পড়ে যাবে মাটিতে।

'নিঃশব্দে না হয় হলো। কিন্তু অত লোকের চোখের ওপর ব্লো-পাইপে ফুঁ দেওয়া কি সম্ভব?'

'কিন্তু ব্লো-পাইপের মত দেখতে প্রত্যেকের চেনা অত্যন্ত নিরীহ চেহারার কোনো পাইপে যদি ফুঁ দেওয়া যায়? যা দেখে কেউ কোনো সন্দেহই করবে না, অথচ যা দিয়ে—

'বাঁশির সম্ভাবনা মাথায় এল তখুনি। বাজনদারদের মধ্যে বসে যদি বাঁশি বাজাতে থাকি আমি, তারপর একফাঁকে আসল বাঁশিটা তুলে তীরটা ছুঁড়েই আবার বাঁশি পাল্টে নিই—তা হলেই তো কেল্লা ফতে।

'কিন্তু বিষ? কোন্ বিষ লাগাবো তীরের ডগায়? দক্ষিণ আমেরিকার ব্লো-পাইপের আবিষ্কর্তারা যে বিষ-বৃক্ষের নির্যাস ব্যবহার করে, তা তো এদেশে পাওয়া যাবে না, এ জন্যে চাই এদেশের বিষ।

'কীট-বিজ্ঞান নয়, 'জাহানারা' থেকে ফিরে এসেই বসলাম বিষ-বিজ্ঞানের বই নিয়ে। সন্ধান পেলাম অ্যাকোনাইটের। সম্পূর্ণ হলো আমার কল্পনা-সিদ্ধান্ত।

'ম্যানেজারের কাছে বিশ্বনাথ দীক্ষিতের ঠিকানা নিয়ে সেই রাতেই হানা দেওয়ার ঠিক করলাম। ম্যানেজারকে ভয় খাইয়ে দিলাম, আমাদের পরিচয় 'জাহানারা'র কোনো কর্মচারী জানতে পারলে তিনিই বিপদে পড়বেন। বাগানে অ্যাকোনাইটের গেকড় আবিষ্কারের পরেই আর কোনো সন্দেহই রইলো না। বাকিটুকু তো তোমরা জানোই। স্রেফ কথার মারপ্যাঁচে কুপোকাৎ করতে হয়েছে ওকে।'

কবিতা বললে—'কিন্তু এক নজরেই তুমি কি করে জানলে যে, টিনের বাঁশিটাই ব্লো-পাইপ?'

'স্রেফ আন্দাজে। এ রকম ঝুঁকি আরও কয়েক বার নিয়েছি ওর পেট থেকে কথা আদায়ের জন্যে। অনুমান মিথ্যা হলেও অপ্রস্তুত যাতে না হই, তার জন্যে পাল্টা আক্রমণের পন্থাও মনে মনে তৈরি রেখেছিলাম। আচ্ছা জয়ন্ত, তীরটা পাওয়া গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'এটাই এ কেসের একমাত্র প্রমাণ। এ ব্যাপারে সব চাইতে আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, সত্যেন মল্লিকের মত মানুষের 'জাহানারা' আগমন এবং ওদেরই পাতা ফাঁদে পা দেওয়া। এ রহস্যের মীমাংসা জয়ন্তই করবে। তবে আমার ধারণা, কালোবাজারীরাই নিজেদের মৃত্যুবাণ ওঁর হাতে তুলে দেওয়ার লোভ দেখিয়েছিল। এমনই লোভনীয় সেই টোপ যে উনি আর সামলাতে পারেন নি।'

'শয়তানগুলোকে গ্রেপ্তার করার ব্যবস্থা হয়েছে?' কবিতা শুধোয়।

'তা সম্ভব নয়, বৌদি।' ম্লান হেসে বললে জয়ন্ত। 'বিশ্বনাথ তাদের মুখ চিনলেও ঠিকানা জানে না। একজনকে তো আমরা দেখেইছি সত্যেন মল্লিকের সামনের চেয়ারে জাহানারা রেস্তোরাঁয়। কিন্তু এরা তো এজেণ্টও হতে পারে—গভীর জলের রাঘব বোয়ালদের নাগাল পাওয়া কি এতই সহজ। তদন্ত চলছে, একদিন না একদিন—'

'তদন্ত নয়, বলো যুদ্ধ।' সংশোধন করে দিলে ইন্দ্রনাথ—'কালো সরকার বনাম ভারত সরকার।'

(—সমাপ্ত—)

মৌসুমী বায়ু তখনো কলকাতার বুকে তার শীতল পাখনা নিয়ে উড়ে আসে নি। সারা আকাশটা জুড়ে গন্‌গনে আগুন। পৃথিবীর গা পুড়ে যাচ্ছে। জ্বলছে সর্বাঙ্গ। অলস দুপুরটা ছট্‌ফট্ করে কেটে গেল। একখানা তালপাতার পাখায় আর কতটা বেশি শান্তি দিতে পারবে?

পশ্চিমের জানলায় চুপটি করে বসে আছি। ছুটির দিনে শুধু এমনি করে বসে বসে সন্ধ্যাটা কাটিয়ে দিতে মন্দ লাগে না।

শনিবারটা—সপ্তাহে এই একটা দিন মাত্র ছুটি। তাও আবার কোন ফাংশান থাকলে এ দিনটাকেও উপভোগ করা যায় না। সোম বুধ শুক্র বীথিকে আর মঙ্গল বৃহস্পতি রবি কুমকুমকে গান শেখাতে যেতে হয়। চল্লিশ আর পঞ্চাশ—মোট এই নব্বুই টাকা মাত্র। স্থায়ী আয়। মা-বোনকে নিয়ে তিনজনের সংসার। নয়তো একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড টেবিলফ্যান কিনে নিতে পারতাম।

নাঃ, অসহ্য, অসহ্য। সন্ধ্যা হয়ে এল। তবু জ্বালাটা আজ যোচেছ" কমছে না যেন।

আ—আঃ আঃ-----

ঐতো আকাশের বিশাল ময়দানে ছোট ছোট মেয়েরা ছুটোছুটি করছে। এই আসছে আবার অমনি কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছে। দুষ্টু ছেলেদের মত লুকোচুরি খেলছে যেন। হঠাৎ ছেলেধরার মত কোথা থেকে এসে একটা ঝড়ো হাওয়া ওদের তাড়িয়ে নিয়ে গেল। ইস্ কি ধুলো, কি ধুলো। জানলা-কপাট আর কিছু খোলা রাখার জো নেই।

একটু বাদেই অবশ্য এ তাণ্ডব থেমে যাবে। আবার যে-কে সেই। সারাটা রাত্তির ঘুমোতে পারব না। অসম্ভব দাপাদাপি। মা অবশ্য মাঝে মাঝে হাতপাখাখানা চালাবেন। চলতে চলতে অলস হাত কখনো কখনো থেমে যাবে। ওপাশে কণাটা কিন্তু বেশ নিশ্চিন্তে ঘুমোয়। স্কুল থেকে আসে সেই বিকেলে। তারপর পাড়ার আর কটা সমবয়সী মেয়ের সঙ্গে লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি। সন্ধ্যায় বই নিয়ে বসা। খাওয়া-শোওয়া। তারপর টানা ঘুম।

জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে বসে বসে—ভাবছিলাম। কণা এসে ডাকল—দিদি, অমলদা এসেছেন।

পেছনেই অমলবাবু। মাথায় এক বাজ্যের চুল এলো মেলো। রুমালে নাকমুখ মুছে বসল অমল। পকেট থেকে একটা ভাঙা চিরুণী বের করে অবাধ্য চুলটাকে পাট করে নেবার চেষ্টা করল।

বললে—কণা, একটু চা খাব।

—বসুন। আমাদেরও এখনো হয় নি।

চলে গেল কণা।

জিজ্ঞেস করলাম—অমলদা, নতুন কোন গান লিখেছেন নাকি?

—রোজই লিখি। ও আর একটা নতুন কথা কি?

—আপনাকে কিন্তু আজ খুব টায়ার্ড বলে মনে হচ্ছে।

—হতে পারে। অনেক ঘুরেছি। একখানা ছবিতে ক'খানা গান নেবার কথা হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত আর হল না। নির্বিকার একটা সিগারেট (খুব সম্ভবত কম দামী) ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল অমল।

বললে—আচ্ছা বীণা, গত সোমবার রেডিওতে তোমার একটা প্রোগ্রাম ছিল, তাই না?

হেসে প্রশ্ন করলাম—খুব খারাপ গেয়েছি তো?

—নিশ্চয়ই। আমার মোটেই ভাল লাগে নি। বিজ্ঞের মত সিগারেট টানতে থাকে।

—এরপরে আর কবে সিটিং পাচ্ছ?

—দেখি।

—শোন, তুমি তো বোধহয় জান

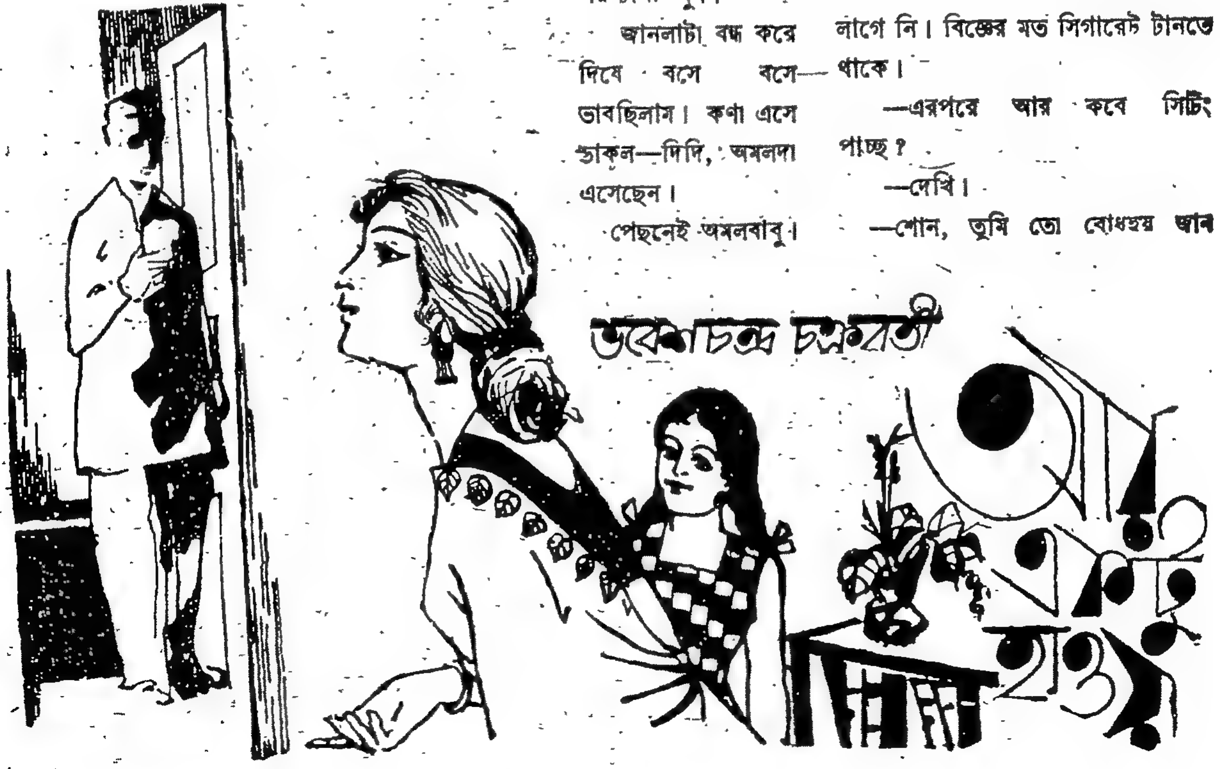

আমি রেডিওর এনলিস্টেড গীতিকার। আমার গান তুমি গাইতে পার, অবশ্য তোমার যদি কোন আপত্তি না থাকে।

—না, না। আপনার কথাগুলো তো বেশ ভালই।

একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল অমল।

—কে আর বুঝল বল। তোমাদের ঐ ইলেকট্রিসিয়ান ভ্রমর কি বলে জান? বলে—আমার মত গীতিকারের নাকি কোন দাম নেই, কোন ক্রেডিট নেই।

দু'কাপ চা নিয়ে এল কণা।

একবার চুমুক দিয়েই অমল প্রশ্ন করলে—চাটা কে তৈরি করেছে?

কণা চোখ পাকিয়ে উঠল—কেন, ভাল হয় নি বুঝি? দাঁড়ান আগে আমি খেয়ে দেখে নি।

বেরিয়ে গিয়ে হাতলভাঙা কাপটায় করে নিজের চা নিয়ে আবার এল কণা।

বললে—আজকের চা কিন্তু খুব ভাল হয়েছে অমলদা। তাই না ছোড়দি?

একটু মৃদু হাসলাম আমি।

—ভাল না ছাই। দুস্ অখাদ্য।

আমরা দু'বোনে হেসে উঠলাম।

গম্ভীর মুখে অমল তেড়ে উঠল—এতে হাসির কি আছে? আজ-কালকার মেয়েরা আবার চা করতে জানে নাকি? অসম্ভব।

প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে বললাম—আজ বড় গরম পড়েছে, তাই না অমলদা।

—হুম্। ভাল কথা, তুমি তো একদিন বলেছিলে—দরকার হয়তো কিনতে পারো—আমার টেবিলফ্যানটা আমি বিক্রি করে দোব।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম।

—ক'টা টাকার বড় দরকার হয়ে পড়েছে। হোটেলের ম্যানেজারবাবুকে গত মাসের টাকাটা মিটিয়ে না দিলে সে আর আমাকে ভাত দেবে না বলেছে।

নির্বিকার কণ্ঠ অমলদা'র। আমার কিন্তু মনটা খারাপ হয়ে গেল। যদি সম্ভব হত---কিন্তু কোথায় টাকা? জানতে চাইলাম দাম কত?

—বর্তমান দাম হয়তো বেশিই হবে। তবে আমি চল্লিশটা টাকা হলেই ছেড়ে দিতে পারি।

বললাম—আমাকে দুটো দিন সময় দিন।

—বেশ। উঠে গেল অমলদা।

এত সস্তায় পাখা—এমন সুযোগ আর নাও পেতে পারি---কিন্তু টাকা?

দোকানে গিয়ে ভ্রমরের সংগে একবার দেখা করতে পারি। প্রায় মাসখানেক হয়ে গেল বর্ধমানে একটা ফাংশনে আমায় নিয়ে গেছল। তিরিশ টাকা দেওয়ার কথা। ক'জন বেশি নামকরা শিল্পীকেও নিয়ে গিয়েছিল। তাদের পাওনা-গণ্ডা মিটিয়েও দিয়েছে। যত গাফিলতি কেবল আমার বেলায়। কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তো চুক্তি অনুযায়ী সব টাকাটা আদায় করে নিয়েছে। তবু এতদিন টাকার তাগাদায় যাই নি, কারণ কিছুদিন ধরেই লক্ষ্য করা যাচ্ছিল, ভ্রমরটা যেন সুযোগ পেলেই কি ধরণের কথাবার্তা বলতে চায়।

তবে এখন একটা কাজ করা যেতে পারে। কণাটাকে পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়। হয়তো ফিরিয়ে দেবে। আচ্ছা, টাকাটা চেয়ে যদি একটা চিঠি দিয়ে দিই। চিঠি? না থাক, ওসব ঝামেলায় দরকার কি? তার চেয়ে নিজেই যাই। সোজা যাওয়া, আর কাজের কথা বলে চলে আসা। খুব ব্যস্ত আছি, আগে থেকেই এরকম একটা ভাব দেখাতে হবে।

কিন্তু হল উল্টোটা।

এসে দেখি ভ্রমর এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে বেশ কিছু টাকা নিয়ে রসিদ লিখে দিচ্ছে। যেন আমাকে দেখতেই পায় নি। ভদ্রলোকের সংগে কথায় ব্যস্ত। বিয়েবাড়ি, তার প্যাণ্ডেল গেট, ক'টা লাইট হবে, কি লাইট, ক'টা ফ্যান ইত্যাদি। ভদ্রলোক চলে গেলেন।

—আরে বীণা যে, কি খবর?

যেন এই দেখল আমাকে।

—ক'টা কথা আছে।

ঘরে আরো তিনজন লোক। একজন কর্মচারী, আর বাকি দুজন দিনে পয়সায় পাখার হাওয়া খেতে এসেছে। তাদের দিকে একবার আড়চোখে তাকাল ভ্রমর। বললে—দাঁড়াও, এক মিনিট।

কি একটু কাজকর্ম সেরে চাবি দিয়ে টেবিলের ড্রয়ারটা বন্ধ করে দিল। কর্মচারীটিকে কাজের কি সব নির্দেশ দিয়ে আমাকে বললে—চল।

তাকে অনুসরণ করে রাস্তায় নেমে পড়লাম। একটা চায়ের দোকানে এসে বসলাম।

—কি খাবে? জিজ্ঞাসা করে ভ্রমর।

—কিছু না।

—মানে? কিছু না খেলে শুধু শুধু এখানে এলাম কেন?

দু' কাপ চা আর কেকের অর্ডার দিল ভ্রমর।

ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবীর পকেটে অনেকগুলো দশ টাকার নোট জ্বলজ্বল করছে। তার মধ্য থেকে মাত্র তিনখানা যদি পাই—আর একখানার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। লুব্ধ-দৃষ্টিতে ওদিকে একবার তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিলাম। মুখে হাসি টানবার চেষ্টা ক'রে বললাম---বৌদি কেমন আছে? আর বাচ্চু?

অপলক চোখে আমার মুখের দিকে একবার স্পষ্ট তাকালো, তারপর বলল—ভাল।

ওর বেচারা-বেচারা ভাবটা লক্ষ্য ক'রে আমি ফিক্ করে হেসে ফেললাম।

মুখে বললাম—আমার কি মুস্কিল

বলতো। ছেলেবেলা থেকে এক পাড়ায় থেকে এসেছি, খেলাধুলো করেছি। তোমাকে তাই নাম ধরে ডাকি। আর তোমার বৌকে কিন্তু বৌদি বলতে হয়।

—হুম্, এবার কাজের কথা বলো। রীতিমত গাম্ভীর্য প্রকাশ করল ভ্রমর।

চা খেতে খেতে আমার আসল কথাটা বলে ফেল্‌লাম, এমন কি আমি যে পাখা কিন্‌বো, সস্তায় পেয়েছি তা বলতেও কসুর করলাম না।

সব শুনে ভ্রমর বললে—টেবিল-ফ্যান মাত্র চল্লিশ টাকায়। কার কাছ থেকে কিন্‌ছো, আমি তাকে চিনি?

—হ্যাঁ, চিন্‌বে বই কি। আমাদের অমলদা।

—অ। বিজ্ঞের মত একবার হাস্‌লো ভ্রমর। পকেট থেকে বের করে তিনখানা দশ টাকার নোট আমায় দিল। আমি হাতে আকাশ পেলাম। কোনরকমে আর দশটা টাকা ধারধোর করে নিতে পারলে পাখাটা আমার। তখন আমাদের মাটির ওপরকার অদৃশ্য কিন্তু চলমান বাতাসটাকে হাতের মুঠোর মধ্যে পাব। আর এই নিদারুণ গরম থেকে বেঁচে যাব।

বেশ খুশিমনে চায়ের দোকান থেকে উঠে এলাম। রাস্তায় পা দিয়ে ভ্রমর বললে—হ্যাঁ, শোন বীণা, আমার কানে যখন একবার এসেছে, তখন তোমাকে আমার পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া ভাল। নয়তো পরে আবার তুমি আমায় দোষ দেবে।

—কি বল তো? জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম।

ভ্রমর বললে—অমল পাখাটার কথা আমাকেও বলেছিল। আমি খুলেও দেখেছি। আর্মেচার ঠিক নেই। বলেছিলাম, যা পাও, তাতেই বিক্রি করে দাও। ওর কিছু নেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তোমাকেই যে বর্ধ করবে ভাবি নি।

মনটা আবার খারাপ হয়ে গেল। এবার যেন আরো বেশি। গরমে পুড়ে মরতে হচ্ছে, সে তো আছেই। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা অমলদার মত লোককে অবিশ্বাস করতে হবে।

কিন্তু তাই বা কেমন করে করব? আজ কতদিন ধরে আমরা অমলদাকে চিনি। কলকাতার বুকের ওপর বাড়ি-ঘর, সুখ-শান্তি না ছিল কি। কিন্তু আধ-পাগলা ঐ অমলদাটা এক কথায় কেমন সবকিছুর মায়া ত্যাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল।

কারণটা অবশ্য সেকেলে। যে মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিল অমলদা, বাবা-মা তাকে পুত্রবধূ বলে গ্রহণ করতে নারাজ। ঐ বউকে নিয়ে বাড়িতে তার ঠাঁই হবে না।

হাতে যা যা ছিল তাই দিয়ে সংসারের জিনিসপত্র, একটা খাট, এই ফ্যানটা কিনেছিল অমলদা।

কিন্তু ভাবী বধূকে কিছুতেই এ-বাড়িতে আসতে রাজী করানো গেল না।

মুখের ওপর সে পরিষ্কার বলে দিয়েছে—উঃ, আমি ভাবতেই পারি না, তুমি নিজের বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছ। এখন আর কি দাম আছে তোমার?

হাসতে হাসতে এসে সব ঘটনাটা আমাদের বলেছিল অমলদা।

সর্বদা সঙ্গে রাখার মত
নবতর প্রয়োজন
ইংরেজি-বাঙলা অভিধান
SAMSAD
LITTLE ENGLISH-BENGALI
DICTIONARY
সঙ্কলক : শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস এম. এ.
সংশোধক : ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এম.এ., পি-এইচ.ডি.
~ বৈশিষ্ট্য ~
● সর্বসাধারণের বিশেষ করিয়া ছাত্র ও অফিস কর্মচারীদের প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শব্দচয়ন ও অর্থবিন্যাস ● অধুনা প্রচলিত শব্দসঙ্কলন ● ইংরেজি ও বাঙলায় উচ্চারণ-সঙ্কেত ● ইংরেজিতে প্রয়োগের উদাহরণ ও বাঙলায় শব্দার্থ ● পাতলা অথচ অতিশয় শক্ত বাইবেল কাগজ ● সহজ বহনীয় আকার ৪¼ × ৬¼ × ১ ● ৩০,০০০ শব্দসংখ্যা ● ৮২০ + ১২ পৃষ্ঠা।
শক্তবোর্ড ও কাপড়ের মজবুত বাঁধাই। দাম : টা ৭.৫০ মাত্র
আমাদের অন্য দুইটি অভিধান
SAMSAD ENGLISH-BENGALI DICTIONARY [12-50]
সংসদ বাঙ্গালা অভিধান [8.50]
সাহিত্য সংসদ
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড : : কলিকাতা-৯

আমি প্রশ্ন করেছিলাম—আর আপনি তাকে কিছুই শুনিয়ে এলেন না?

—পাগল। সে যদি তার মতটা আবার পাল্টে ফেলে, তা হলে আমি বিপদে পড়ে যাব। আমার মনটা তো আর কম দুর্বল নয়।

তারপর দিন এসে অমলদা আর একটা নতুন কথা শুনিয়েছিল আমাদের।

—জান বীণা, চাকরিটা ইস্তফা দিয়ে এলাম। বলে এলাম, চাকরি করার আমার আর কোন প্রয়োজন নেই।

—এখন কি করবেন?

—কেন, আমার জীবনটা তো সুরে ভরা, গান লিখব।

সেই থেকে গান লিখছে অমলদা।

হোটেলের মাসকাবারি টাকা মেটাতে পারলে খাওয়া জোটে, নয়তো আর তাও জুটবে না। এমন একজন মানুষ অমলদা তাকে অবিশ্বাস করব? তার চেয়ে ভাল নিজের চোখেই দেখে আসা যাক্ না, পাখাটা চালু আছে কি না।

টাকাটা সংগে নিয়ে পরদিনই দুপুরবেলা এসে হাজির হলাম। খাটের ওপর হেলান দিয়ে বসে ঠোঙায় করে মুড়ি খাচ্ছিল অমলদা।

প্রশ্ন করলাম—এত বেলায় মুড়ি খাচ্ছেন যে?

—আজ আর অন্য কিছু জুটল না।

আমাকে বসতে বলে কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেল। ভেজা গামছায় গায়ের ঘাম মুছল অমলদা।

বললাম—এত গরম, পাখাটা চালাচ্ছেন না কেন?

বললে—মায়া বাড়িয়ে লাভ কি? পাখার হাওয়া খাওয়া আমার বরাতে নেই। বাড়িওয়ালা কানেকশন কেটে দিয়েছে।

—কেন?

—তার দোষ দিই না। তিন-চার মাসের ভাড়া বাকি, আবার ইলেকট্রিক। একটু হাসল অমলদা।

আমি ভাবছি তখন অন্য কথা। তাহলে কি----?

ধরে নিলাম ভ্রমরের কথাই ঠিক। অমলদা সত্য গোপন করছে। বড় টাকার দরকার অমলদার, আমার অপেক্ষায় বসে আছে, ভাতের বদলে মুড়ি খেয়ে দিন গুজরান করতে হচ্ছে—এসব কিছু ভুলে গেলাম। শুধু ভাবলাম, আমার এমন কষ্টের টাকায় এ-পাখা কিনে আমি ঠকতে পারি না। ঠকব না।

গরমে জ্বলে পুড়ে মরছি। এই টাকার মধ্যে যদি আর একখানা পাখা আমি কোথাও পেতাম।

আবার ভাবি, যদি এমন হয় যে, সত্যি কানেকশন নেই অমলদার ঘরে। তা হলে?

আমাদের ঘরে এনেও তো পাখাটা পরীক্ষা করে দেখা যেত। এমন অনেক কিছু ভাবছিলাম। এক ঠোঙা আম হাতে করে কণার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে এল অমলদা।

কণা বললে—মনে হচ্ছে আমগুলো ভাল হবে না।

—মানে?

—মনে হচ্ছে খুব টক্ হবে। ঠোঁট, নাক বাঁকিয়ে বলল কণা।

অমলদা রেগে উঠল—শুনলে, শুনলে বীণা, আমগুলো নাকি টক হবে। বাজারের সেরা আম নিয়ে এলাম, টাকার চারটে করে।

আমি প্রশ্ন করি—এত কেন অমলদা?

—একসঙ্গে বসে খাব বলে আনলাম। কিছু রোজগার হল।

—রোজগার?

—হ্যাঁ, আজ সকালবেলা গিয়ে একজন আমার পাখাটার দাম দিয়ে এসেছিল পঞ্চাশ টাকা। তখন তাকে দিতে পারি নি। তোমাকে কথা দেওয়া ছিল। তারপর যখন বুঝলাম তোমার নেওয়া হল না, আর আমারও টাকাটার খুব প্রয়োজন, তখন তাকে ডেকেই দিয়ে দিলাম।

আমি অবাক-বিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি।

অমলদা আবার বললে—মজা কি জান বীণা, খদ্দের ঠিক করাই ছিল, আমার সামনেই সে পঁচাত্তর টাকায় বিক্রি করে দিল পাখাটা।

—কে, কে সে অমলদা? কৌতূহল আর সংবরণ করতে পারলাম না।

মুচকি হেসে জবাব দিল অমলদা—কেন, ফুলে ফুলে মধু খাওয়া যার স্বভাব, তোমাদের সেই ইলেক্ট্রিসিয়ান বন্ধু ভ্রমর।

উঃ কি অসহ্য গরম। ঘেমে উঠেছি আমি। এবারে আরো অনেক বেশি।

মহর্ষি কণাদ প্রণীত

বৈশেষিক-দর্শনম

শিষ্যগণ নিকটে উপস্থিত হইলে মহর্ষি কণাদ তাঁহাদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"হে শিষ্যগণ। এই সূত্রে তোমাদের নিকট ধর্ম্মব্যাখ্যা করিব।" মহর্ষির এই বাক্যের নাম প্রতিজ্ঞাবাক্য। ধর্ম্মের বিভিন্ন দিক, কার্য্যকারণ দ্রব্য ও সত্তার পার্থক্য ও গুণত্বের এবং জাতির পার্থক্য, পৃথিবীর লক্ষণ, জল, বায়ু, দ্রব্য ও আকাশানুমান, পরমাণুতত্ত্ব, মনঃস্থৈর্য্য, মুক্তি, জন্মান্তর, ভ্রম ও প্রমাদ—মহর্ষি কণাদ ধর্ম্মকথার মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের বাণী ব্যক্ত করিয়াছেন।

স্বর্গত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত

মূল্য দুই টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

গ্রন্থ মেলা

সবিতা ঃ সম্পাদিকা : সাধনা সোম। সবিতা কার্যালয়, ৮৬-এ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-১৪। মূল্য : এক টাকা।

'বিদগ্ধ বাংলা মাসিক পত্র' 'সবিতা'র প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা শারদীয় ও গান্ধীজয়ন্তী সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। অন্যান্য মাসিক পত্রিকার তুলনায় এর বৈশিষ্ট্য পৃথক জাতীয়—তাই বাংলা পত্রিকা-জগতে 'সবিতা' নতুন অনুসন্ধান ও আবিষ্কারের প্রেরণায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বর্তমান দিশাহারা সাহিত্য, সমাজ, বিজ্ঞান, শিল্প ও রাজনীতির বিচার-পরম্পরায় প্রবন্ধকারগণ যে যুক্তিপূর্ণ ও বৈজ্ঞানিক অভিমত দান করেছেন তা পাঠকদের কাছে রমণীয় বলে মনে না হলেও চমকপ্রদ ও প্রয়োজনীয় মূল্যবান বক্তব্য হিসেবে অবশ্যই স্বীকৃত হবে। প্রবন্ধকারগণের মধ্যে উল্লেখ্য হচ্ছেন—রমা চৌধুরী, সত্যেন বোস, রণজিৎকুমার সেন, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, আচার্য জে বি কৃপালনী ও শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের জীবনস্মৃতি যেমন হৃদয়গ্রাহী তেমনি তথ্যবহুল। তিনি স্বদেশী-আন্দোলন সম্বন্ধে এমন অনেক কথা বলেছেন, যা আজো আমাদের অজানা। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সহজ স্পর্শ পেয়ে আমরা বড়ই খুশি হয়েছি। 'সবিতা'য় কবিতা লিখেছেন মনীশ ঘটক, প্রভাত বসু প্রমুখ। মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য ও গজেন্দ্রকুমার মিত্র গল্প লিখেছেন। সমালোচনায় প্রমথনাথ বিশী সমাদৃত হবেন। সংকলন বিভাগটিও বেশ ভাল।

আনন্দম্ ঃ সম্পাদক : তারাপদ সাঁতরা। (নবাসন) পোঃ বাগনান, জেলা হাওড়া। মূল্য : এক টাকা।

শারদীয় আনন্দম্ প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক পত্রিকা। সুতরাং এই পত্রিকাকে হার্দ্য অভিনন্দন জানিয়ে গৌরব অনুভব করা যায়। এই সব পত্রিকার সমাদর সাধারণ পাঠকেরা আরো বেশি উপলব্ধি করলে আমাদের

জয়ন্তী সেন

নিজেদেরই সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটবে—এ কথা অনস্বীকার্য। 'আনন্দম্'-এ শুভেচ্ছা দান করেছেন নির্মলকুমার বসু ও দেবপ্রসাদ ঘোষ। অমলকুমার গাঙ্গুলীর 'নিবেদন' সার্থক। চিন্তাগর্ভ ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেছেন সর্বশ্রী কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সরকার, পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, কালিদাস দত্ত, স্বামী শঙ্করানন্দ, চিত্তরঞ্জন চৌধুরী, দুর্গাদাস মজুমদার, সত্যেন রায়, হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়, তারাপদ সাঁতরা ও সন্তোষ বসু। পত্রিকাটি প্রতিটি বিদ্যালয়, কলেজের পক্ষে অপরিহার্য।

আনন্দম্ ঃ সম্পাদক : বিপুলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। ২৩-বি, বিজয় বোস রোড, কলকাতা ২৫। মূল্য : দেড় টাকা।

অন্যান্য সাধারণ শারদীয় সংখ্যার মতো এটিও একটি। এতে লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিমলচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ।

ঝংকার ঃ সম্পাদক : নুরুল ইসলাম। কামখুলি, পোঃ গার্ডেনরীচ, কলকাতা-২৪। মূল্য : এক টাকা।

এই পূজা সংখ্যাটিতে আছে গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ। অধিকাংশ লেখকই নতুন। এইসব লেখক ঝংকার-এর মাধ্যমে একদা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবেন বলে আমরা আশা করি।

ধূমকেতু ঃ সম্পাদক : অনিলকুমার দেবনাথ। সাহিত্য পরিষদ, রাণীর বাজার, ত্রিপুরা।

কয়েকজন ছাত্র একটি 'সাহিত্য পরিষদ' গঠন করে—তারই মুখপত্র হিসেবে বের করেছেন ত্রৈমাসিক 'ধূমকেতু'। নিজেদের জলখাবারের পয়সা বাঁচিয়ে যাঁরা সততাকে প্রতিষ্ঠা করতে চান, তাঁদের প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। ১ম বর্ষের ৩য় সংখ্যায় ধূমকেতুর কিছু কিছু গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ করে খুশি হওয়া যায়।

বাণীপীঠ ঃ সম্পাদক : অমূল্যকুমার সেনগুপ্ত। বর্ধমান বাণীপীঠ সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়।

যাঁরা পড়ান এবং যারা পড়ে তাদের উভয়ের সম্মিলিত রচনায় সমৃদ্ধ বাণীপীঠে এমন কতকগুলি প্রবন্ধ আছে যা ছেলেদের উপকারে লাগবে। ইংরেজী ও বাংলা—দুই জাতীয় রচনাই এতে রয়েছে। তা ছাড়া কতকগুলি ছবি পত্রিকাটির শ্রীবৃদ্ধি করেছে। বর্ধমান বাণীপীঠের আয়োজন খুব ভারি না হলেও—তুচ্ছ করাও যায় না।

ঋতুপত্র ঃ সম্পাদক : সুবোধ ঘোষ। ১৫৷এ, অবিনাশচন্দ্র ব্যানার্জি লেন, কলকাতা-১০। মূল্য : ৫০ পয়সা।

আকর্ষণীয় প্রচ্ছদপট এবং গল্প-কবিতা-প্রবন্ধের সমন্বয়ে শারদীয় সংখ্যাটি বিশিষ্ট। দিলীপ মিত্র, দীপংকর ঘোষ, কবিতা সিংহ প্রমুখের রচনা রয়েছে।

বঙ্গদীপ : সম্পাদক : গিরিধারী কুণ্ডু। ২৩২৷বি৷১১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৪। মূল্য : এক টাকা।

বঙ্গদীপের শারদ সংকলনের অধিকাংশ রচনাই নবীনদের দ্বারা রচিত। তাদের রচনার মধ্যে আন্তরিকতা থাকলেও সমাজ ও জীবন সম্পর্কে তাদের বোধ আরো স্বচ্ছ হওয়া দরকার। কিশোর-কিশোরীদের বিভাগটি ছোটদের রচনায় সমৃদ্ধ। সেখানে খেয়ালীপনা থাকলেও আনন্দ রয়েছে।

শ্রীমতী ঃ সম্পাদিকা : বাণী ঘোষ। ১২৭ এ, রাসবিহারী এভিন্যু, কলকাতা-২৯। মূল্য : ৩'০০ টাকা।

সুদৃশ্য অভিজাত শারদ সংকলনটিতে একাধিক ভাল লেখা আছে। তিনটি উপন্যাস, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, কার্টুনে অলঙ্কৃত পত্রিকাটি বিশিষ্ট। হরপ্রসাদ মিত্র, বাণী রায়, সুশীল রায়, আশাপূর্ণা দেবী প্রমুখের রচনা উল্লেখযোগ্য। বড় গল্পকে উপন্যাস বলে না চালালে পত্রিকাটির মর্যাদা বৃদ্ধি পেত।

বর্ণালী ঃ সম্পাদক : তাপসরঞ্জন পাল। ১০৬, রায়বাহাদুর রোড, কলকাতা-৩৪, মূল্য : ১'০০ টাকা।

খেয়া সাংস্কৃতিক পরিষদের মুখপত্র বর্ণালীর শারদীয় সংখ্যায় প্রবীণ ও নবীন লেখকদের সমন্বয় ঘটেছে। আশুতোষ ভট্টাচার্য, নচিকেতা ভরদ্বাজ, দুর্গাদাস সরকারের রচনা উল্লেখযোগ্য।

বর্ণালী ঃ সম্পাদক : মদনমোহন বিশ্বাস। চুঁচুড়া স্টেশন রোড, হুগলী। মূল্য : ১'০০ টাকা।

গল্প-উপন্যাস-কবিতা-প্রবন্ধ সমন্বিত সংখ্যাটি সত্যিই সুন্দর হয়েছে। সুরুচিসম্মত প্রচ্ছদ এবং সুমুদ্রিত এই সংখ্যাটি পাঠক আকর্ষণে সমর্থ হবে। শক্তিব্রত ঘোষের কবিতাটি উল্লেখযোগ্য।

আমাদের গ্রাম ঃ সম্পাদক : শতদল গোস্বামী, মঞ্জু আচার্য। ৬১২, কালীচরণ ঘোষ রোড, কলকাতা-৫০। মূল্য : ১'৫০ পয়সা।

অজস্র পত্রিকার ভিড়ে আলোচ্য পত্রিকার আন্তর্জাতিক গ্রাম সংখ্যা সহজেই চোখে পড়ে। পত্রিকাটির উদ্দেশ্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গ্রামের সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। বর্তমানে আমরা শহরমুখী, কিন্তু পৃথিবীর নানাস্থানে গ্রামোন্নয়ন কিভাবে হচ্ছে আমাদের জানা নেই। পত্রিকাটি নিঃসন্দেহে সমাদৃত হবে, কারণ এর প্রতিটি রচনাই মূল্যবান।

তন্দ্রা ঃ সম্পাদক : মধুসূদন চৌধুরী, সুধাংশু ঘোষ। ২৮, মাইকেল দত্ত স্ট্রীট, কলকাতা-২৩। মূল্য : ১'৫০ পয়সা।

একটি পরিচ্ছন্ন শারদ সংকলন। বনফুল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নরেন্দ্র মিত্র, মনীশ ঘটকের পাশাপাশি তরুণ লেখকদের রচনায় সমৃদ্ধ।

সেতু ঃ বৃন্দাবন গোস্বামী কর্তৃক কৃষ্ণনগর হতে প্রকাশিত সেতু সাহিত্য-সংস্থার এই শারদীয় মুখপত্রটি নবীন লেখকদের রচনায় বিশিষ্ট।

সাগ্নিক ঃ সম্পাদক : করুণাশঙ্কর বিশ্বাস। চাকদহ, নদীয়া হইতে প্রকাশিত। মূল্য : ১'২৫ পয়সা।

মফস্বলের পত্রিকার কাছে আমরা আশা করি যথেষ্ট। আঞ্চলিক সংস্কৃতিকে প্রচার করার দায়িত্ব তাদের আছে। তেমন কোন প্রতিশ্রুতি পেলাম না, তবু তরুণ লেখকদের উৎসাহ দেবার প্রচেষ্টা প্রশংসার্হ।

কারবারের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ঃ সন্তোষকুমার মিত্র, অনিলকুমার বসাক। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিঃ। ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। মূল্য : দশ টাকা।

বর্তমানে বাণিজ্যবিদ্যা নিঃসন্দেহে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বাণিজ্য শিক্ষার প্রয়োজনে 'কারবারের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা'র সাহায্য কতখানি প্রয়োজন এ বলে বোঝান কঠিন। ইংরেজী ভাষায় এই শ্রেণীর কিছু বই আছে, কিন্তু বাংলা ভাষায় আলোচ্য গ্রন্থটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী—একথা দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার করি। অল্প সময়ে গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশও এই সত্যকে স্বীকৃতি দেবে। নানা চিত্র বাণিজ্যিক শব্দকোষ গ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। মুদ্রণ পারিপাট্য, বাঁধাই উত্তম। গ্রন্থটি অধ্যাপক-ছাত্রমহলে সমাদৃত হবে।

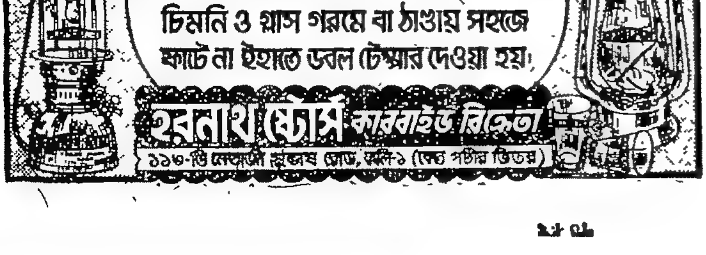

রাজধানী :

সারা ভারতে যখন পালিত হচ্ছিল শিশুদিবস, ভিন দেশ থেকে আসছিল শিশুদের জন্য রকমারী উপঢৌকন—ঠিক সেই সময়টিতে চোরাবাজারে হানা দিয়ে কলকাতার গোয়েন্দা পুলিশ দেড় লক্ষ টাকার শিশুখাদ্য বের করেছে। সময়ের গৌরবটা এখন পুলিশও বুঝতে শিখেছে—ঝোপ বুঝে কোপ মেরে বাহাদুরী নেবার কায়দাটাও আয়ত্ত করে ফেলেছে। লাভও হয়েছে তাতে অনেকখানি। কাগজে কাগজে ফলাও করে প্রকাশিত হয়েছে পুলিশের কেরামতির কথা।

মাছ, তেল, চাল ও ডালের মূল্য নির্ধারণের সমস্যা নিয়ে সুরুতে যে-সময়ে সৃষ্টি হয়েছিল ডামাডোলের—তখনই আমরা বলেছিলাম শিশুখাদ্যের কথাটা। দেশী-বিদেশী সব রকমের শিশুখাদ্যেরই মূল্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীগুলো। তা' সত্ত্বেও কেন শিশুখাদ্য বাজারে নির্দিষ্ট মূল্যে পাওয়া যাবে না? এই ছিল আমাদের প্রশ্ন। মুনাফা-নিরোধ আইনের অভাব আমাদের নেই। সেগুলো প্রয়োগ পুলিশ যথাসময়ে করলে শিশুদের মুখের খাদ্য নিয়ে মুনাফাশিকারী শয়তানের দল এমন পৈশাচিক নৃত্য করতে পারতো না। কাজেই মূল্য নির্ধারণ করে কোন ফয়দাই হবে না। সেদিন যা' বলেছিলাম তা' আজ বাস্তবে দেখতে পাচ্ছি। বাজারে চলেছে সম্পূর্ণ অরাজকতা। পুলিশ অত্যন্ত নিষ্ক্রিয়। দু-চারটে চুনোপুঁটিকে তাড়া করেই তারা হয়ে পড়ে অবসন্ন। পুলিশ তার নিজের ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকলে বেবী-ফুড ক্যানিং স্ট্রীট, বাগরী মার্কেট, রাজাকাটারা ও বড়বাজারে এমন কোণঠাসা হয়ে অন্ধকারে পড়ে থাকতো না। প্রকাশ্য বাজারে ন্যায্যমূল্যে মানুষের ঘরে উঠে শিশুদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতো। পুলিশ তার দায়িত্ব পালন করে নি।

বেবী-ফুডের চোরাকারবারের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান দেরিতে হলেও

● বাগরী মার্কেটে পুলিশের রাশি রাশি 'বেবী ফুডের' পেটি আবিষ্কার

এবার নাকি তারা নাছোড়বান্দা। একটা ফয়সালা না করে ছাড়বেন না। শতকরা পঞ্চান্ন ভাগ বেবী-ফুড কলকাতার ক্রেতা সমবায় বিপণির মাধ্যমে বিক্রির কথা হচ্ছে। স্বয়ং পুলিশ কমিশনার বেবী-ফুডের মালিকপক্ষকে ডেকে এ নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছেন। বেবী-ফুডের বিক্রেতাদের প্রতি মাসে হিসেব দাখিলের নির্দেশও গেছে। শ্রী পি কে সেন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁর প্রচেষ্টা সফল হবে বলেই আশা করবো।

শ্রীসেনের চেষ্টা সফল হলে ন্যায্যমূল্যেই হয়তো শিশুর খাদ্যটা পাওয়া যাবে। কিন্তু নয়া ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত গোদের ওপর বিষফোড়া হয়ে দেখা দিলেই শিশুর মুখে আর খাদ্য উঠবে না। শুনছি, বেবী-ফুড পেতে হলে চিকিৎসকের কাছ থেকে একখানা করে সার্টিফিকেট আনতে হবে। এমন উদ্ভট ব্যবস্থা কি করে প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের মগজে ঢুকলো, আমরা বুঝে উঠতে পারছি নে। এক টিন গ্ল্যাক্সো বা নেলশন কিনতে ডাক্তারকে তা' হলে কম হলেও দু' টাকা দক্ষিণা দিতে হবে। চিকিৎসকগণ রাতারাতি বদান্য হয়ে উঠবেন, এমন আশা না করাই ভাল। চিকিৎসকের সার্টিফিকেটের প্রয়োজনের কথা আসবে কেন? ন্যায্যমূল্যে শিশুখাদ্য পেয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত নেলশনের টিন কেউ কিনবে না। শিশুর খাদ্য তার মা, বাবা এবং আত্মীয়েরা নিশ্চয়ই খেতে সুরু করবেন না। ডাক্তারের সার্টিফিকেটের অজুহাতে শিশুকে বিমুখ করা অন্যায়।

* * *

পশ্চিম বাংলা সকল মুস্কিলের আসান করে সারা ভারতের সামনে নয়া আদর্শ স্থাপন না করে বোধ হয়

এবার ক্ষান্ত হবে না। আসন্ন কংগ্রেস অধিবেশনের জোর প্রস্তুতি-পর্ব চলেছে দুর্গাপুরে। ব্যবস্থাপনার যাতে কোন ত্রুটি না থাকে, ভুবনেশ্বরের অধিবেশনের চেয়ে দুর্গাপুরের অধিবেশনে এসে যাতে সর্বভারতীয় নেতৃত্ব পঞ্চমুখে পশ্চিম বাংলার নেতৃত্বের তারিফ করেন, তার জন্য কংগ্রেসের খোদ কর্তারা ঘন ঘন দুর্গাপুর পরিদর্শন করছেন। নির্মীয়মাণ বিধান স্টেশনের কাজও প্রায় শেষ। শিল্প-শ্রমিকদের গৃহনির্মাণ পরিকল্পনার ছকে ঢেলে দুর্গাপুরে নতুন গৃহ হচ্ছে। এখানে থাকবেন বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রেরিত প্রতিনিধিগণ।

• • •

চাষীর কাছ থেকে অর্থের পরিবর্তে শস্য নিয়ে খাজনা আদায়ের পরিকল্পনা থেকে সুরু করে কলকাতার ও শিল্পাঞ্চলের মানুষের অন্নের ভাবনা দূর করার জন্যে সরকার যে হারে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেছেন তা' বাস্তবে রূপ গ্রহণ করলে পশ্চিম বাংলা নয়া রেকর্ডই সৃষ্টি করবে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী সম্প্রতি খাজনা আদায়ের এই নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনের অনুরোধ জানিয়েছেন। তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী খাদ্য-শস্যে খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা হলে চাষীদের বোঝা অনেকটা লাঘব হবে। শস্য দিয়ে মহাজনের দেনা শোধে তারা অভ্যস্ত খাজনার পরিবর্তে যেটুকু শস্য সে সরকারকে দেবে তার ন্যায্যমূল্য যেমন চাষী পাবে, তেমনি সরকারের খাদ্য-ভাণ্ডারেও সহজ পথে শস্য কিছুটা পরিমাণ আসবে। কিন্তু এর জন্য চাই উপযুক্ত সংগঠন। আমরা যতদূর জানি, পশ্চিম বাংলার তেমন কোন সংগঠন নেই। আগে ভাগে সংগঠন গড়ে না তুলে অনেক কাজে হাত দিয়ে রাজ্য সরকার ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। এবারে রাজস্বমন্ত্রী শ্রীভট্টাচার্য নাকি অভয় দিয়েছেন। তিনি সংগঠন গড়ে তোলার পরিকল্পনা আগে দাখিল করে পরে কাজে হাত দেবেন। কাজটাও চালু হবে কয়েকটি নির্বাচিত অঞ্চলে পরীক্ষামূলকভাবে।

• • •

একশ' টাকা বেতন এবং পঁয়তিরিশ টাকা মহার্ঘভাতার দাবিতে ৬৫ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রতীক অনশন পালন করলেন। গেল জুলাই মাসে শিক্ষকগণ তাঁদের দাবি পেশ করে চরমপত্র পাঠিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। সে চিঠির কোন সন্তোষজনক উত্তর তাঁরা পান নি।

বর্তমান দ্রব্যমূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষকদের দাবি যে কত ন্যায়সঙ্গত তা' বলিষ্ঠ যুক্তির অবতারণা করে কাউকে বোঝানো প্রয়োজন হবে না। দাবি তাঁদের সামান্য। দুঃখের বিষয়, শিক্ষা দপ্তরের আমলাদের দৌলতে এই সামান্য দাবি আদায়ের জন্য শিক্ষকদের সাধারণ শ্রমিকের মত পথে নেমে আন্দোলন করতে হচ্ছে।

নদীয়া :

সীমান্ত এলাকার পুলিশবাহিনীর বিরুদ্ধে গ্রামবাসীদের অভিযোগ দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। তাদের অত্যাচারে নিরীহ মানুষ নাস্তানাবুদ হয়ে ওপরওয়ালাদের কাছে নালিশও করছে। কিন্তু ওপরওয়ালাদের সুখ-নিদ্রা তাতে ব্যাহত হয় নি। সীমান্ত পুলিশের সহযোগিতায় পাকিস্তানে গরু পাচার হওয়ার সংবাদের প্রতি আমরা পুলিশ মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। শ্রীঅর্ধেন্দু নস্কর মশায়কে এ বিষয়ে তদন্তের অনুরোধও জানিয়েছিলাম। তিনি কিছু করেছেন বলে সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নি। পাকিস্তানী দবৃত্তদের

● অনশনকারী প্রাথমিক শিক্ষকগণ 'অরেঞ্জ' পান করে অনশন ভঙ্গ করছেন

নজে পুলিশের গোপন আঁতাতের কথাটাও সরকারী মহল সরাসরি অস্বীকার করছেন না। সত্যি বিচিত্র আমাদের প্রশাসন ব্যবস্থা। আইন ও শৃঙ্খলা, বিশেষ করে, সীমান্ত অঞ্চল রক্ষার গুরুদায়িত্বের অবহেলার অভিযোগ সম্পর্কেও সরকার একেবারে নির্বিকার?

বিনা পয়সায় দুধ দিতে পারে নি ফরিদপুর সীমান্তের দরিদ্র গৃহস্থ। ছোটবেলায় শুনেছি, বাঘে একবার স্পর্শ করলে হয় আঠারো ঘা, আর পুলিশের হাতখানা কারো ঘাড়ে পড়লে তাকে নাকানি-চুবানি খেতে হয় বত্রিশবার। করিমপুর-বাসীদের এই প্রবাদবাক্য বোধ হয় জানা ছিল না। জানা থাকলে, সীমান্ত পুলিশকে সেলাম ঠুকে বিনা পয়সায় দুধ দিতে কসুর করতো না। দুধ না দেওয়াতে নাকি তারা পুলিশের বিরাগভাজন হয়েছে। গরুর দুধ যাতে আর বাজারে যেতে না পারে তার ফন্দী আবিষ্কার করে ফেলেছে রাতারাতি। পুলিশ-ফাঁড়ির পাঁচশ' গজের মধ্যে গরু পেলেই নিয়ে ঢোকাচ্ছে খোঁয়াড়ে। চাষীরা বাধা দিতে গেলেই সহ্য করতে হয়েছে অযথা নিপীড়ন। খোঁয়াড়ের পয়সার বখরাও নাকি পুলিশের পকেটে যাচ্ছে।

খোঁয়াড়ের সঠিক মালিক কে—কেউ জানে না। পঞ্চায়েত-প্রধান শ্রীআব্দুল জলিল খাঁকেই মানুষ তদারক করতে দেখে। গেল বছর নিজের বাপের নামে ছিল খোঁয়াড়টি। এবারে নাকি পাক-নাগরিক লুফের রহমানের নামে একশ' বাহান্ন টাকায় নেওয়া হয়েছে।

এ অভিযোগও অত্যন্ত গুরুতর। কে খোঁয়াড়ের মালিক? পঞ্চায়েতের অধ্যক্ষ? লুফের রহমানই বা কে? এ প্রশ্নের উত্তর, যাদের কাছ থেকে আসবে তাদের একাংশ দুর্নীতি-পরায়ণ হলে সদুত্তর পাওয়া যাবে না—সীমান্তরক্ষাও হবে না।

* * *

বৃজনাথপুরের মাঠে সেদিন পাকিস্তানীরা হানা দিয়েছিল। ধান কেটে নিয়ে যাচ্ছে তারা গরুকে খাওয়াবার জন্যে। এখন ধানের ফুল ধরে নি। ধানগাছ দিয়ে তারা কাজ চালাবে ঘাসের। কম পক্ষে তিরিশজন ছিল দলটিতে। গ্রামের মানুষের তৎপরতায় পুলিশ গিয়ে তাদের ছ' জনকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশের বক্তব্য এ মাঠে যাওয়ার ভাল পথ নেই—রাস্তা দুর্গম। জল ভেঙে যেতে হয়।

সীমান্তরক্ষার ভার যাদের ওপর তাদের মুখে এ অজুহাত শোভা পায়

● শ্রীঅর্ধেন্দু নস্কর

না। সীমান্তের পথ সুগম করার দায়িত্ব গ্রামবাসীর নয়। সে দায়িত্ব সরকারের। সীমান্ত পুলিশের বড়-কর্তাদের এ বিষয়ে অগ্রণী হওয়া উচিত ছিল।

বর্ধমান:

জামালপুর থানার কয়েকটি গ্রামে পাম্পের সাহায্যে নদী থেকে জল সেচের পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। এ গ্রামগুলো নদীর খুব কাছে বলে জমি উঁচু হওয়ায় নদীর জল মাঠে প্রবেশ করতে পারে না।

পরিকল্পনা খুবই ভাল। একে কার্যকর করা হলে বেরুগ্রাম, মাঠশিয়ালী, কানাড়া, বলরামপুর, শ্রীকৃষ্ণপুর, শম্ভুপুর, রেশনাৎপুর প্রভৃতি গ্রামের বিরাট অঞ্চলের কয়েক হাজার জমিতে সেচের জল পড়বে।

তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনাকালের মধ্যেই নাকি এ সব এলাকায় সেচের কাজ আরম্ভ হবে। পাম্প কোথায় কোথায় বসবে তাও শুনছি স্থির হয়ে গেছে।

পরিকল্পনাটি নাকি একেবারে নতুন নয়। নদী থেকে জমিতে জল সেচের পরিকল্পনার কথা শুনে আসছি দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার সময় থেকে। কাজ এখনও কিছুই হয় নি। কথা ছেড়ে দিয়ে সরকার কাজে নামলে, চাষীরা দু'হাত তুলে সরকারের যেমন গুণগান করবে, তেমনি খাদ্য সমস্যার সমাধানেরও অনেকটা সাহায্য হবে।

উপযুক্ত সেচের অভাবে, জমির বদ্ধ জল নিকাশের বন্দোবস্ত না থাকায় এবং নদী ও নালার মুখে সর্বত্র বাঁধ না থাকায় পশ্চিম বাংলার বহু জমি থেকেই আশানুরূপ ফসল পাওয়া যাচ্ছে না।

বর্ধমানেরই একটি শাখানদী কুনুর কানায় কানায় যখন ভরে ওঠে তখন গুসকরা অঞ্চল ভাসিয়ে দেয়। প্রচুর শস্যহানি হয়। এ বছরও হাজার পাঁচেক একর জমির ধান নষ্ট হয়েছে। কুনুরের ওপর বাঁধ নির্মাণ খুব যে একটা ব্যয়-সাধ্য ব্যাপার হবে, তাও নয়। বর্ধমানেই চালু হয়েছে প্যাকেজ প্রোগ্রাম। এখানকার আবাদের ব্যবস্থা হবে অপর জেলার কাছে আদর্শ। কাজেই এ জেলার কোন সম্ভাবনাই যাতে হেলায় আমরা না হারাই সেদিকে লক্ষ্য রাখা কৃষি দপ্তরের প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত। আশা করি, সরকার কুনুরের তীরে গ্রামগুলোর দিকে একবার মুখ তুলে তাকাবেন।

মেমারীতে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে আধুনিক ধরণের চালকলটি। সারা ভারতে সরকারী পরিকল্পনায় যে ছ'টি বৃহদাকারের চালকল স্থাপনের পরিকল্পনা ভারত সরকার নিয়েছেন, মেমারীর কলটি হবে তার অন্যতম।

ছ' লক্ষ টাকা ব্যয় হবে এ চালকলটি স্থাপন করতে। সাধারণ চালকলের চাইতে এ কলটিতে চাল উৎপন্ন হবে তিরিশ গুণ বেশি। তা' ছাড়া, অপচয় হ্রাস পাবে অনেকখানি।

সরকার রুটি, বিস্কুট নির্মাণের জন্য একটি বেকারী খোলারও পরিকল্পনা নিয়েছেন। সরকারী উদ্যোগের বেকারীটিও মেমারীতে স্থাপিত হবে।

এ সব সংবাদ খুবই সুখের। ধানকল বর্ধমানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সংবাদ প্রথম যখন পাওয়া যায় তখনই আমরা বলেছি, দেশে যে সব কল চালু রয়েছে তাকে একটু নেড়ে-চেড়ে দেখার প্রয়োজন আছে। বিদেশ থেকে টাকা খরচ করে কল এনে বসাবার সঙ্গে সঙ্গে দেশে যা চালু রয়েছে সেগুলোর সমস্যাও বিচার করে দেখতে হবে। এ কলগুলো পাততাড়ি গুটোলে একদল কর্মী যাবে বেকার হয়ে। এ কলের মেরামত করে আধুনিক যন্ত্রপাতি যোজনার পর কি পরিমাণ উৎপাদন বাড়তে পারে, তাও একবার ভেবে দেখা উচিত ছিল। নতুনের মোহে পুরোনোকে একেবারে বাতিল করে দেওয়া সমীচীন নয়।

সরকার বেকারী প্রতিষ্ঠার আগে একবার খোঁজ করলে দেখতে পেতেন ময়দার অভাবে তিন মাসের মধ্যে বহু বেকারীর কর্মী বেকার হয়ে পড়েছে। স্বল্প পুঁজি নিয়ে রুটি ব্যবসা করতো যারা, তাদের রুজি-রোজগার বন্ধ হয়ে গেছে। পরিকল্পনার উদ্দেশ্য বেকার সমস্যা বৃদ্ধি নয়—মানুষের জীবিকার নতুন নতুন পথ খুলে দেওয়াই তার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। সেদিকটাকে উপেক্ষা করে চটকদার পরিকল্পনার প্রচারে কোন সমস্যারই সমাধান হতে পারে না।

পশ্চিম দিনাজপুর :

বালুরঘাটের পৌরনির্বাচন হয়ে গেল সেদিন। বালুরঘাট পৌরসভার মোট পনেরটি আসনের সাতটিতে মাত্র জয়ী হয়েছেন কংগ্রেস প্রার্থী। বাকী আটটিতে জয়লাভ করেছেন কংগ্রেস-বিরোধী রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা। তাঁরা কেউ অবশ্য দলের টিকিট নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসরে নামেন নি। দলগত ভিত্তিতে—জেলা কংগ্রেস নির্বাচনী কমিটির মনোনয়নপত্র হাতে নিয়ে লড়াই শুধু কংগ্রেস প্রার্থীরাই করেছেন। বিরোধীরা নানা কারণে আত্মপরিচয় গোপন করে নির্দলীয় মুখোশ পরেছিলেন। দলের ছাপ নেওয়ার বিপদ ছিল অনেক।

এ সব দিক চিন্তা করে, অনেকেই ভেবেছিলেন, পৌরসভার নির্বাচনের খেলায় কংগ্রেস খালি মাঠেই গোল দিয়ে জয়মাল্য পরে পৌরসভায় জাঁকিয়ে বসবে। সে আশা কংগ্রেস পূরণ করতে পারে নি। পারবার কথাও নয়—ঐক্যবদ্ধ শক্তি না থাকলে 'সেম সাইড' গোল খালি মাঠে হয়ে যায়। বালুরঘাটে ঠিক তাই হয়েছে।

● শ্রীসুশীলরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

স্বয়ং জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীমহারাজ বসু পৌরসভার নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন। দীর্ঘকাল তিনি পৌরসভায় রয়েছেন। দাঁড়িয়েছিলেন এক নম্বর ওয়ার্ড থেকে।

জেলা কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ শ্রীকালীপদ বসুর নামডাক আছে। জেলা কংগ্রেসের তিনি অন্যতম খুঁটি। বালুরঘাট পৌরসভার তিনি প্রাক্তন সহকারী সভাপতি। সাত নম্বর ওয়ার্ডের তিনি ছিলেন প্রার্থী। অঞ্চলের প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতা, পশ্চিম বাংলার প্রাক্তন রাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ সুশীলরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। তিনি শ্রীবসুর সমর্থনে নিজের নামে প্রচারপত্র প্রকাশ করে 'সবিনয় নিবেদন' পেশ করেছিলেন ভোটারদের কাছে। তাঁর নিবেদনে কোন কাজ হয় নি। শ্রীকালীপদ বসুকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছে।

কংগ্রেসপ্রার্থীদের পরাজয়ের মুখ্য কারণই নাকি 'সেম সাইডের' মারামারি। কংগ্রেসের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের পরাজয়ে এবং পরোক্ষভাবে বিরোধীদের হয়ে কাজ করেছেন নেপথ্য থেকে কংগ্রেসেরই অপর একটি সমান প্রভাবশালী অংশ। জেলা কংগ্রেসের নেতৃত্বের লড়াইটা এতদিন সাধারণ মানুষের কাছে এত প্রকট হয় নি। পৌরসভার নির্বাচনে এবার তার বহিঃপ্রকাশ হল।

পশ্চিম বাংলার প্রায় প্রতিটি জেলা কংগ্রেসেই নেতৃত্বের খেয়োখেয়ি চলেছে। নেতৃত্ব ব্যক্তি-স্বার্থের উর্দ্ধে যতদিন না উঠবে ততদিন কংগ্রেসকে স্বখাত সলিল থেকে উদ্ধার করা যাবে না। প্রদেশ কংগ্রেসের দায়িত্ব সংগঠনের কাজে দক্ষ, সর্বজনশ্রদ্ধেয় শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় গ্রহণের পর অবস্থার উন্নতির আশা আমরা করেছিলাম। তিনি শক্ত হাতে হাল ধরতে পারলে নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব হ্রাস পাবে বলেই আমরা বিশ্বাস করি।

রঙ্গজগৎ

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের আদর্শবাণী

সপ্তাহ তিনেক আগে আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম—ভারতে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের আদর্শবাণী নেই কেন? সম্প্রতি আমরা এক খবরে জানতে পারলাম, ভারতের তৃতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য একটা আদর্শবাণী গ্রহণ করা হয়েছে; এবং সেই আদর্শবাণী—'বসুধৈব কুটুম্বকম্।' পঞ্চতন্ত্র হতে গৃহীত এই শ্লোক—সমগ্র বিশ্ব একটি পরিবার; বর্তমান কাল ও যুগচিন্তার উপযোগী। বিশ্বের জনমত আজ দেশে দেশে ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠার পক্ষে। মানুষ আজ আর যুদ্ধ এবং হানাহানি চায় না, চায় না সাম্রাজ্যবাদের দাসত্ব। বর্তমান কালে নাটক, চলচ্চিত্র, সঙ্গীত প্রভৃতি শিল্পকলা মানবতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের এই বাণীকে প্রকাশ করছে। এই বাণীতেই শিল্পকলা আজ মহৎ হয়ে উঠেছে।

কিন্তু উৎসব পরিচালকমণ্ডলী যদি এই বাণীকেও তাঁদের চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী ফাইলবন্দী করে রাখেন, তবে এই আদর্শবাণী গ্রহণের সার্থকতা কোথায়? পরিচালকমণ্ডলী এই বাণী এখনো জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন নি। যে সব পত্র-পত্রিকা চলচ্চিত্র উৎসবের প্রচারে আগ্রহী এবং সহযোগিতা করতে উৎসুক, সেই সব পত্র-পত্রিকার নিকটও এই আদর্শবাণী অথবা উৎসব সম্পর্কিত কোন খবরাখবর পৌঁছয় না। এমন কি আজ পর্যন্ত উৎসব কমিটী একটি সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করে উৎসবের তাৎপর্য ও লক্ষ্য আলোচনা করার সার্থকতা অনুভব করেন নি। যাঁরা পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত চলচ্চিত্র পর্যালোচনা করেন, তাঁদের সহযোগিতা গ্রহণের প্রয়োজন বোধ করেন নি। উৎসব কমিটী হয়তো মনে করছেন রাতারাতি তাঁরা যাদু দেখাবেন, অথবা এই প্রতিযোগিতামূলক উৎসবের তাৎপর্য তাঁরা নিজেরাই বুঝতে পারেন নি। আমলাতন্ত্র এমনই ব্যাপার, যার খোলস ভেঙে বেরিয়ে আসা বাস্তবিকই কঠিন। আমরা কামনা করি, উৎসব কমিটী জনমুখীন হয়ে উঠুক।

—সুজন

তৃপ্তি মিত্র
কাঞ্চনরঙ্গ ছবিতে বিশিষ্ট ভূমিকায়

চিত্র আলোচনা

আঁদ্রে মুনকের শেষ ছবি
● প্যাসেঞ্জার ●

পোল্যাণ্ডের বিখ্যাত চিত্র-পরিচালক আঁদ্রে মুনক-এর শেষ ছবির নাম 'প্যাসেঞ্জার'। ছবিটি তিনি শেষ করে যেতে পারেন নি। এই ছবির সঙ্গে পরিচালকের জীবন-দীপ নিভে যাওয়ার ঘটনা যুদ্ধ পরবর্তী-কালে চলচ্চিত্র-জগতে এক বিরাট ট্র্যাজেডি। লজ থেকে ওয়ারশর পথে গাড়ির দুর্ঘটনায় তিনি নিহত হন।

মৃত্যুর সময় এই তরুণ পরিচালক এই অসমাপ্ত ছবির মাধ্যমে বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে একটা আবেদন রেখে গেছেন। তাঁর চিন্তা ও জিজ্ঞাসা এই ছবিতে প্রতিফলিত। ছবিটি তাঁর নৈপুণ্যপূর্ণ শিল্পকর্মের একটি নিদর্শন, তার চেয়েও বড় কথা—এমন একটা কালের প্রামাণিক তথ্যচিত্র—যে কাল সভ্যতার ইতিহাসে সর্বাধিক জটিল ও নিষ্ঠুর। যে নিষ্ঠুরতার ও মানবিক বুদ্ধির শূন্যতার মুহূর্তের সঙ্গে তরুণ পরিচালক নিজেই পরিচিত হয়েছেন। নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি বিশ্ববাসীর কাছে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, আবার কি আমরা তেমন এক বর্বর যুগের পুনরাবির্ভাব সহ্য করবো?

'প্যাসেঞ্জার' ছবির মধ্য দিয়ে আবার দর্শকরা চলে যাবেন সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের কালে, যেখানে বিদ্যুৎ-সংযোজিত কাঁটাতারের বেড়ার বেষ্টনী সৃষ্টি করে একদল মানুষ আর একদল মানুষকে নরকযন্ত্রণায় ভোগাচ্ছিল। একটা নাৎসী

● আঁদ্রে মুনক---
যুদ্ধোত্তর চলচ্চিত্র-জগতের ট্র্যাজেডি।

কনসেনট্রেশন ক্যাম্প, সেখানে ধীরে ধীরে যন্ত্রণা দিয়ে মারার জন্য একদল মানুষকে আটক করা হয়েছে। এই বন্দী-শিবিরের দর্পণে চলচ্চিত্রস্রষ্টা মানুষের ভাল-মন্দ, দোষ-গুণ প্রতিফলিত করেছেন। এক পোলিশ তরুণীর মৃত্যু হয়েছিল এই শিবিরে। এই তরুণী দেশের আরো দশজনের মত এক নারী। সেও জীবনে অনেক আশা নিয়ে বেঁচেছিল, অনেক কল্পনার রামধনু এঁকেছিল। হয়তো সে ইহুদী ছিল, অথবা সে কমিউনিস্ট সমর্থক বা পার্টির সদস্যা ছিল, অথবা কিছুই ছিল না। কেবলমাত্র নাৎসীদের খেয়ালে সে এই নরকে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। এখনো তো তার মরার বয়স হয় নি। এই বন্দীশিবিরে নিক্ষিপ্ত না-হলে সে কি মরতো! এই তরুণীর মৃত্যুকে অবলম্বন করে মুনক জীবনের নামে এক চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন ‘প্যাসেঞ্জার’ ছবিতে। তিনি বিশ্বমানবের কাছে আবেদন

● পোলিশ অভিনেত্রী আলেকসান্ড্রা স্লাসকা ‘প্যাসেঞ্জার’ ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

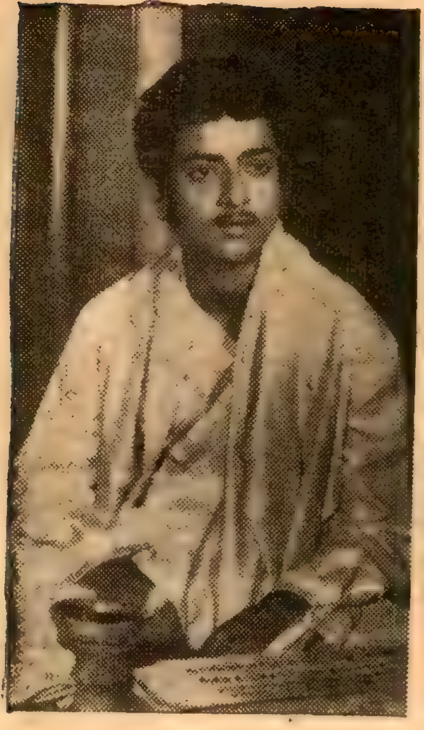

● 'রাজা রামমোহন' ছবিতে মাঃ তিলক। ছোটকালের ভূমিকায়।

করেছেন, যা ঘটেছে তার প্রতি দর্শকের মনোভাব নিয়ে থাকবেন না। পৃথিবীতে কেউ দর্শক নয়, সকলেরই কিছু করণীয় আছে; জীবনের রঙ্গমঞ্চে সকলেরই একটা ভূমিকা আছে। আমাদের মধ্যে যা মানবিক গুণ ও সত্য, তাকে বাঁচিয়ে রাখা ভবিষ্যৎকে নিরাপদ করার উপায়।

আঁদ্রে মুনক ছবিটি শেষ করে যেতে পারেন নি, তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু লেসিউজ বাকি কাজ সমাধা করেছেন। তিনি মুনককে জানেন, সুতরাং তাঁর চিন্তা ও মেজাজ অনুযায়ী কাজ করেছেন। চলচ্চিত্রে রূপায়ণ-রীতির দিক থেকে লেসিউজ খুব একটা জটিল পথে অগ্রসর হয়েছেন। তিনি বন্দীশিবিরের কাহিনীকে অক্ষুণ্ণ রেখে, বন্দীশিবিরের পটভূমিকায় কেবলমাত্র প্রামাণিক চিত্রের সাহায্যে কাহিনী বিবৃত করেছেন।

ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন সোফিয়া পসমিজ ও আঁদ্রে মুনক। অভিনয়ে আছেন—আলেকসান্দ্রা সুলসকা (লিজা), আনা কাইপিলেস্কা (মার্তা) জান ক্রাকমার, লিও পিয়েট্রাসকি-উইজ প্রমুখ।

• কার্ল মার্ক্সের জীবনীচিত্র • সোভিয়েট চলচ্চিত্রের প্রশংসনীয় উদ্যোগ

কার্ল মার্ক্সের জীবনী অবলম্বনে মসফিল্ম স্টুডিওতে ৭০ মিলিমিটার রঙিন ছবি নির্মিত হচ্ছে। ছবিটির পরিচালকমণ্ডলীর পুরোভাগে আছেন বিখ্যাত পরিচালক গ্রিগরি রোশাল। সোভিয়েট লেখিকা শ্রীমতী গালিনা সেরেব্রায়াকোভা লিখিত 'অগ্নিহরণ' উপন্যাস অবলম্বনে চিত্রনাট্য তৈরি হয়েছে।

সম্প্রতি গ্রিগরি রোশাল ক্যামেরাম্যান লিওনিড কসমাটভ ও শিল্পী শ্পিনেলকে নিয়ে গণতান্ত্রিক জার্মানীর বিভিন্ন স্থান দেখে ফিরে এসেছেন।

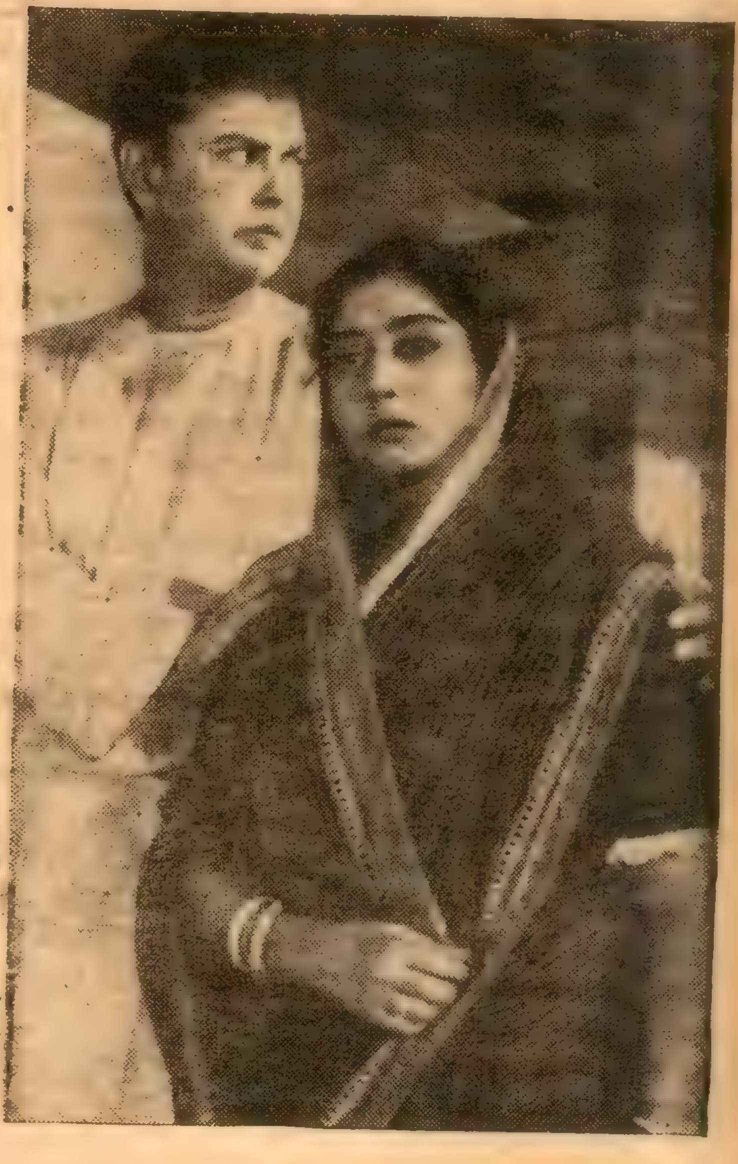

● 'জয়া' ছবির নায়ক-নায়িকা অনিল চট্টোপাধ্যায় ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। ছবির কাজ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে।

সত্যজিৎ রায়ের 'কাপুরুষ ও মহাপুরুষ' ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণকালে অজয় কর ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, দূরে দাঁড়িয়ে আছেন মাধবী মুখার্জি।

অধিকাংশ বহির্দৃশ্য জার্মানীতে গ্রহণ করা হবে। কার্ল মার্ক্স, ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, তাঁদের সহকর্মীদের যথাযথ পরিচয় প্রকাশ এবং পরিবেশ ফুটিয়ে তুলতে বহির্দৃশ্যে চিত্রগ্রহণ সহায়ক হবে। ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশেও চিত্রগ্রহণ করা হবে। ইয়াল্টাতে নকল বাড়ি-ঘর-রাস্তা তৈরি করা হবে ১৮৪৮ সালের ব্রাসেলসকে দেখাবার জন্য।

পরিচালক গ্রিগরি রোশাল বলেছেন, এই ছবি করা একরূপ অসাধ্য-সাধন। মার্ক্সের ব্যক্তিগত ও বহুমুখী জীবনকে ফুটিয়ে তোলা সহজ কাজ নয়। শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল ব্যক্তি, অসাধারণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিশ্লেষক, মহান দার্শনিক, আশ্চর্য পরিমাণ জ্ঞানসম্পন্ন বিপ্লবী ও সংগঠক এবং স্নেহ-মমতাময় হৃদয়-সম্পন্ন একজন মানুষের জীবনকে পর্দায় ফুটিয়ে তুলতে হবে। ছবিতে ইতিহাসের সর্বাধিক জটিল পর্যায় ১৮৪৮—৪৯ সাল—যে দু'বছর ইউরোপ এক প্রচণ্ড ঝড়ে আলোড়িত হয়েছিল এবং যে ঝড়ের সঙ্কেত ঠিকভাবে বুঝতে পেরে মার্ক্স ও এঙ্গেলস 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' রচনা করেছিলেন, শ্রমিক শ্রেণীকে শ্রেণী-সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েছিলেন; এই কালটাকে ছবিতে দেখান হবে। এই ছবি হবে চলচ্চিত্র-শিল্পের পক্ষে বিশেষ মর্যাদাদায়ক।

তরুণ মার্ক্সের চরিত্রে রূপ দেবেন মস্কোর সোভ্রেমেনিক থিয়েটারের অভিনেতা ইগোর কাসা, এঙ্গেলসের চরিত্রে অভিনয় করবেন মস্কোর স্যাটায়ার থিয়েটারের অভিনেতা আঁদ্রে মিরোনভ, মার্ক্সের স্ত্রীর চরিত্রে রূপ দেবেন খ্যাতা অভিনেত্রী রুফিনা নিফোগতোভা, লেভ ঝলোটুখিন সাজবেন বাকুনিন, বিপ্লবী কবি ওয়ের্থ-এর ভূমিকায় আছেন ভাসিলি নিভানভ। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন ডিমিট্রি সোস্টাকোভিচ।

স্টুডিও খবর

অশোককুমারকে এ-যাবৎকাল আমরা অভিনেতারূপে দেখেছি। এবার তিনি চিত্র পরিচালনায় অগ্রসর হচ্ছেন। সারা জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দিয়ে তিনি যে ছবি পরিচালনা করবেন সে ছবি নিশ্চয় সর্বতোভাবে সার্থক হবে। তাঁর ছবির নাম

'কাঞ্চনরঙ্গ' ছবিতে সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়

'মীর'। বিখ্যাত উর্দু কবি মীর তাকির জীবনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য তৈরি হয়েছে। প্রধান নারী চরিত্রে অভিনয় করার জন্য তিনি সায়রা বানুকে মনোনীত করেছেন বলে জানা গেছে।

* বিমল মিত্রের লেখা 'গুল-মোহর' ছবির চিত্রগ্রহণ কার্তিক চ্যাটার্জির পরিচালনায় খুব শীঘ্র আরম্ভ হবে। ছবিতে দুটি প্রধান চরিত্রে থাকবেন বিশ্বজিৎ এবং মালা সিন্হা।

* পরিচালক সুবীর মুখার্জি এবার একটি হিন্দী ছবি পরিচালনা করছেন। পদ্মশ্রী প্রোডাকসন্সের 'ঝঙ্কার' ছবির চিত্রগ্রহণ করবেন তিনি বোম্বাইতে। ছবিটির নায়ক-নায়িকা উত্তমকুমার ও আশা পারেখ।

* পরিচালক মৃণাল সেন প্রায় এক বছরকাল ভারত সরকারের এক প্রামাণিক চিত্র নির্মাণের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। 'ভারতের প্রজাতান্ত্রিক দিবসকে' কেন্দ্র করে এই ছবিটি নির্মিত হয়েছে। ছবিটির কাজে মৃণাল সেন অসাধারণ পরিশ্রম করেছেন, অধ্যবসায় সহকারে কলকাতা ও দিল্লীর গ্রন্থাগার থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস অধ্যয়ন করেছেন এবং বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ও রাজনীতি-বিদদের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন। ছবিটিতে সারা ভারতের ঐতিহাসিক নিদর্শন এবং রামায়ণের যুগ থেকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম পর্যন্ত ভারতীয় জনগণের চিন্তাগত ঐতিহ্যকে তুলে ধরা হয়েছে। ছবিটি বিদেশে প্রদর্শনের জন্য বিশেষভাবে তৈরি হয়েছে। এই ছবির কাজ শেষ করে মৃণাল সেন পূর্বাচল ফিল্মসের প্রযোজনায় 'আকাশ-কুসুম' ছবির কাজে হাত দিয়েছেন। কাহিনী রচনা করেছেন আশিস বর্মণ, যিনি 'পুনশ্চ' ছবির কাহিনী লিখেছিলেন। 'আকাশ-কুসুম'-এর নায়িকা অপর্ণা দাশগুপ্তা, নায়ক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

* প্রবোধ সান্যালের 'কাঁচ কাটা হীরে'কে চিত্ররূপ দিচ্ছেন অজয় কর। ছবির জন্য চিত্রনাট্য রচনা করেছেন মৃণাল সেন। এখানে মুখ্য চরিত্রে থাকবেন মাধবী মুখার্জি, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং বিকাশ রায়।

● উচ্ছল যৌবনের একটি দিনে এলিজাবেথ টেলর—এডি ফিসারের সঙ্গে

সংবাদ রমনা

আরবের লোকসংস্কৃতি দল

সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র হতে এক সাংস্কৃতিক দল ভারত সফরে এসেছেন। ৫৫ জন সদস্য বিশিষ্ট এই দলের বৈশিষ্ট্য লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্য প্রদর্শন। সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রের জন জীবনকে কেন্দ্র করে এই সঙ্গীত রচিত এবং লোক-জীবন থেকে নৃত্য গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৫৯ সালে একশ' জন নৃত্যশিল্পী ও চল্লিশ জন ঐকতান বাদক নিয়ে এই দল গঠিত হয়। দলের প্রধান পরিচালক মহম্মদ রেডা। তাঁরই নামে দলটি রেডা দল নামে পরিচিত। মহম্মদ রেডা নিজে একজন বিশিষ্ট নৃত্য-শিল্পী। দলে নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে তাঁর স্ত্রী নাদিদা ও নাদিদার বোন ফরিদা ফাহমি আছেন।

সংগীত কথা

কানাই মাঝি

লোকসঙ্গীত পল্লীর সাধারণ মানুষের গান। তাঁদের দৈনন্দিন কাজের নিত্যসঙ্গী এ গান তাঁরা নিজেরাই বাঁধেন—নিজেরাই গান।

এ গানের কথা ও সুরের মধ্যে কোন কৃত্রিমতা নেই—শিল্পীর নিজেকে জাহির করার প্রয়াসও নেই এ গানের মধ্যে। শুধু আছে কথা ও সুরে একটা শান্ত গ্রাম্য গন্ধ এবং সেই কারণেই এ গান চিরদিনই আমাদের মনকে নাড়া দিয়ে এসেছে।

এই লোকসঙ্গীতগুলির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এগুলি সকল জাতির ইতিহাসকে বহন করে এসেছে আবহমান কাল থেকে। ইতিহাসের পাতা থেকে অনেক কাহিনী ও ঘটনা লুপ্ত হয়ে যায় অথবা খুঁজে পাওয়া যায় না—সে সব ঘটনা বা কাহিনীর অস্তিত্ব ছড়িয়ে রয়েছে বহু প্রাচীন লোকগাঁথা ও লোকসঙ্গীতগুলির মধ্যে। সেখানে আমরা আমাদেরই পুরনো সামাজিক ব্যবস্থা, সামাজিক বিধিনিষেধ, সামাজিক দুর্নীতি ইত্যাদির কথা খুঁজে পাবো।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, যাঁরা এই সব গান ও গাঁথা রচনা করে মনের আনন্দে গেয়ে থাকেন তাঁদের কথা আমরা একবারও ভেবে দেখি না। এ ধরণের বহু লোকশিল্পী আমাদের দেশে রয়েছেন—তাঁদেরকে সকলের সামনে তুলে ধরা কর্তব্য। আজকে মৈমনসিংহ অঞ্চলের কানাই মাঝির কথা বলব।

আমরা তখন কিশোর। ব্রহ্মপুত্র নদের পাড়ে খেলতে খেলতে কানাই মাঝির গান শুনতাম—কখনো বা নদীবক্ষে, আবার কখনো পাড়ে ভিড়ান নৌকো থেকে।

তার গান আমাদের খুবই ভাল লাগত। তখন অবশ্য গানের বাণীর দিকে খুব নজর দিতাম না—কেন না সব কথার অর্থও বুঝতাম না। কিন্তু তার উদাত্ত-কণ্ঠে উদাস করা সুর আমাদের পাগল করে দিত।

বড় হয়েও কানাই মাঝির সাথে আমাদের খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ক্রমে ক্রমে যখন তার গানের অর্থ বুঝতে পারলাম তখন যেন সেই কানাই মাঝি আমাদের আত্মীয় হয়ে উঠল। তার গান কিছু সংগ্রহ করেছি।

নিরক্ষর সেই কানাই মাঝি কত বড় যে শিক্ষিত, কত বড় দার্শনিক তা ধরা পড়ে তার বাঁধা গানগুলি থেকে। তার গানগুলিতে অধ্যাত্মবাদের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন:

● কানাই মাঝি

ওরে ভবনদীর মাঝি,
আমি জনম ভইরা বাইয়া গেলাম
অকূল দরিয়ায়
আমার নায়ে পাড়ি দিছি
নিত্য নতুন সোয়ারীরে
শক্ত হাতে বাইছিরে দাঁড়
রোদে জলে পুইড়ারে,
তখন অথৈ জলে আমি ভাসি,
চারিদিকে ফেনার রাশি,
কেমন কইর‍্যা দিব পাড়ি
অকূল দরিয়ায়,
(ও মাঝি) তুমি আইস্যা ধররে হাল
ভবনদী পার কর আমায় ॥

এরপর কানাই মাঝির আর একটি গানে গুরুবাদের প্রাধান্য লক্ষণীয়। গুরু অর্থাৎ জগদ্‌গুরুর কৃপায় সব বিপদ-আপদ কেটে যায়। এই বিশ্বাস ঐ নিরক্ষর কানাই-এর মনেও বদ্ধমূল হয়েছিল। যেমন:

ওরে মনমাঝি মাইয়া
ভবনদী কেমনে যাবি বাইয়া।
ঝড় তুফানে ওঠে রে নাও
হেলিয়া দুলিয়া
ওরে, সামাল সামাল, ধর রে পাড়ি,
গুরুর নামটি লইয়া।

আরও একটি গানে কানাই-এর বিশ্বাসের একটি সুন্দর ছবি পাওয়া যাবে। যার যা পেশা তাতে অনুরক্ত ও নিষ্ঠাবান থাকলে জগৎকাণ্ডারী অর্থাৎ শ্রীভগবানের করুণা সে পেয়ে থাকে। ফুটা পচা নৌকোতেও তার আর ভয় নেই। যেমন:

সুজন কাণ্ডারী ধারে, চিন্যাল মন
ডাইন কি বাও।
মনমাঝি তুই ক্যামনে যাবি
এ পচা নাও।
যে জন জাতে পাটুনি হয়,
তার তুফানে কি ভয়,
সতে সতে ঢেউ কাটিয়ে
টের গলুইতে হয়।

কানাই মাঝির আরও অনেক গান আছে যার মধ্যে এই ধরণের অধ্যাত্মবাদের প্রকাশ আছে।

আমাদের দেশের বহু জ্ঞানী-গুণীরা, দার্শনিকেরা অনেক বড় বড় কথার মধ্যে দিয়ে—পাণ্ডিত্যের মধ্যে দিয়ে এই অধ্যাত্মবাদের কথা প্রকাশ করেছেন, কিন্তু কানাই নিরক্ষর—তবু তার গানের মাধ্যমে যেভাবে অধ্যাত্মবাদের কথা বলেছে তার উপলব্ধি থেকে তা সত্যিই আমাদের চমক লাগিয়ে দেয়।

শুধু কি তাই। কানাইয়ের কণ্ঠস্বরও উদাত্ত ও মধুর ছিল—। তার কণ্ঠের গান যাঁরা শুনেছেন তাঁরা মুগ্ধ না হয়ে পারেন নি।

দেশবিভাগ হবার পর প্রায় ১৪ বছর বাদে একদিন কলকাতার রাস্তায় কানাইকে ভিক্ষা করতে দেখলাম। তার দিকে চেয়ে চোখে জল এল। না খেতে পেয়ে তার সেই বলিষ্ঠ চেহারার শুধু কঙ্কালটাই রয়েছে। যে হাতে সারা জীবন বৈঠা টেনে এল, সেই বলিষ্ঠ হাত দুটো কানাইয়ের শীর্ণকায় হয়েছে। কানাইয়ের সাথে দেখা হতেই তাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি এখানে চলে এলে কেন? জাতব্যবসা ছেড়ে কি কেউ ভিক্ষে করে?'

সে তখন আমার হাত দুটো ধরে বললে, 'বাবু ভগবানও আমাদের প্রতি বিরূপ—তাই পেটের দায়ে ভিক্ষে করতে হচ্ছে।' কানাইয়ের মত অনেক মাঝিই আছে যারা আজ খেতে পায় না।

—বুদ্ধদেব রায়

পাঠক মন

গত কয়েক মাস যাবৎ অন্যান্য সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকাগুলির সঙ্গে 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র প্রতিটি সংখ্যার প্রতিটি বিষয় অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পড়ে চলেছি—আর লক্ষ্য করছি—পত্রিকাটি অন্যান্য পত্র-পত্রিকা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। যৎসামান্য মূল্যে (বর্তমান দুর্মূল্যের বাজারেও) পত্রিকাটির বৃহত্তর অবদান যেমন প্রশংসনীয় তেমন চমকপ্রদ।

পত্রিকাটির কয়েকটি বিভাগ—বিশেষত 'আজকের মানুষ', 'আন্তর্জাতিক', 'বঙ্গদর্শন', 'ভারতদর্শন' ইত্যাদি রাজনৈতিক সংবাদ পর্যালোচনা এবং 'পাঠকমন'—সময়োপযোগী ও অতুলনীয়।

'পাঠকমন' বিভাগটির সংযোজন—এটির মাধ্যমে বিভিন্ন পাঠক-পাঠিকাগণের বিচিত্র অনুভূতি এবং স্ব-স্ব চিন্তাধারার প্রকাশ—অর্থাৎ পাঠক-মনের চিন্তাধারার মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি-দান—পত্রিকা কর্তৃপক্ষকে উচ্চ-মনের অধিকারী করেছে।

পাঠকসমাজের নিজ নিজ বক্তব্য পেশের অধিকার আছে বৈকি। কিন্তু তাই বলে—এই সুযোগের অপব্যবহার বা যথেচ্ছাচারিতা মোটেই সমীচীন নয়। 'পাঠকমনে' পাঠক-সমাজের রুচিশীল চিন্তাধারার প্রকাশই বাঞ্ছনীয়।

'পাঠকমন' বিভাগের মাধ্যমে—পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর পাঠক-পাঠিকাগণের সুচিন্তিত আলোচনা, বোধ করি, বিভাগটিকে মূল্যবান করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকাটির মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

পত্রিকায় প্রকাশিত গল্প-প্রবন্ধ-উপন্যাসগুলির মধ্যে শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র মহাশয়ের 'সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর' নামক মননশীল নিবন্ধটি—বিশ্বের বিভিন্ন সাহিত্যের স্রষ্টা এবং তাঁদের অমর কীর্তির তুলনামূলক সমালোচনা সাহিত্য-রসিকদের নিকট যে অত্যন্ত মূল্যবান তা বলা বাহুল্য।

শ্রীপদাতিকের 'শহর-কলকাতা' বিভাগটি আমার অত্যন্ত প্রিয়। আধুনিক বিচিত্ররূপী কলকাতার প্রাচীনতম জঙ্গলাকীর্ণ রহস্যঘন মূর্তি দর্শনের এ এক সহজলভ্য উপায়। ইতিহাসের দিক থেকে লেখাটির মূল্যায়ন করা কঠিন। লেখকের রচনা-কৌশল এবং শব্দবিন্যাস অভিনবত্বের দাবি রাখে। লেখকের লেখনীর যাদুস্পর্শে ইতিহাসের কঠিন বাস্তবও প্রাণবন্ত ছন্দোময় মূর্তিময়ী হয়ে পাঠক-সমক্ষে প্রতীয়মান হয়। এক কথায় বলা চলে, কলকাতার ইতিহাস রচনায় লেখকের এ এক অতুলনীয় অনবদ্য সার্থক প্রয়াস।

অন্যান্য গল্প, কবিতাগুলির মধ্যে শ্রীশ্যাম রায়ের রহস্য-গল্প 'কে?', শ্রীকৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পানীয় জলের কাহিনী', শ্রীঅশোকরঞ্জন সেনগুপ্তের 'ফুলের পরমায়ু', শ্রীসামসুল হকের কবিতা 'আহত পাখীর নামে', শিপ্রা ঘোষের কবিতা 'কোন জীবন্মৃতের প্রতি' মন্দ লাগল না।

এতদ্ব্যতীত শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কৃষ্ণচূড়া' এবং শ্রীমতী মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের 'আঁধার-মাণিক' ধারাবাহিক উপন্যাস দুটি ভালই লাগছে।

শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুচিন্তিত প্রবন্ধ 'চল্লিশোত্তর বাংলার নাট্যধারা'—নাট্যরস-পিপাসুদের বিশেষ উপাদেয়।

শ্রীঅমিতাভের 'খেলাধুলা' বিভাগটির আরো একটু সম্প্রসারণ করলে ভাল হয়।

বেশ কয়েক সংখ্যা আগে অর্থাৎ ১৭শ সংখ্যায় এবং আরও আগে ৪৫শ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীসৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'নন্দন-কানন' ও 'লাল জল নীল জল' গল্প দুটিতে লেখকের কৃতিত্ব এবং নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। লেখকের কাছ থেকে ভবিষ্যতে আরো ভালো জিনিস পাওয়ার আশা রাখি।

সর্বশেষে—একথাও না স্বীকার করে উপায় নেই—অস্বীকার করার ইচ্ছাও নেই যে, গত কয়েক সপ্তাহ থেকে 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র কিছু কিছু উন্নতি দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। এর ফলে আনন্দের সঙ্গেই অনুভব করছি যে, পত্রিকা কর্তৃপক্ষ সত্যই অকৃপণ—পাঠককুলকে প্রবঞ্চিত করার নিচুর মনোবৃত্তি তাঁদের নেই। এর জন্য কর্তৃপক্ষকে—বিশেষ করে সম্পাদিকা মহাশয়াকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

আশা করি দিনে দিনে 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র আরো উন্নতি হবে। আমি অবশ্য কাগজের Quality-র কথা বলব না—কারণ বর্তমানে বাজারের যা পরিস্থিতি তাতে কাগজের মান উন্নয়ন করলে—পত্রিকাটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য-স্বল্পমূল্যতা হয়ত বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়বে। ফলে পাঠক-পাঠিকাগণের অধিকাংশই অসুবিধা বোধ করবেন।

সুতরাং আপাততঃ কাগজের মান উন্নয়ন না করে—মুদ্রণ, আলোকচিত্র ইত্যাদি কয়েকটি বিষয়ের দিকে নজর রাখলেই চলবে।

দোলন
৯১, নূরালি লেন
কলকাতা-১৪

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

[illegible]

ইবসেনের নাটকের ভূমিকা

ফরাসী নাটক এবং নাট্যকারদেরই তখন ইউরোপীয় মঞ্চের ওপর অবিসংবাদিত প্রাধান্য। এমন সময় প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিল নরওয়ে থেকে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, ১৮৯০ সাল অবধি বিওরর্নসন ও ইবসেনের কালোপযোগী নাটকগুলিকে ফরাসী সমালোচকেরা বেশ অবজ্ঞার দৃষ্টিতেই দেখতেন। এঁরা মনে করতেন—এই সব নাটক তৎকালীন ফরাসী নাটকেরই অনুকরণ এবং জায়গায় জায়গায় অত্যন্ত দুর্বোধ্য। এই দুর্বোধ্যতার অভিযোগ অবশ্য আজকের দিনের পাঠকের কাছে কোনো সমর্থন পাবে বলে মনে হয় না। ক্রমশ নরওয়েজিয়ান ড্রামা ইউরোপের সর্বত্র এবং বিশেষত জার্মানীর রঙ্গমঞ্চে প্রভাব বিস্তার করতে লাগল। এমন কি ইংলণ্ডেও ইবসেনিজমের ঢেউ রোধ করা গেল না। রাশিয়ায় এই প্রভাবের অভ্যাগম সুরু হল, সেই সময়টায় যখন জারিস্ট শাসনতন্ত্র প্রায় বিলুপ্তির পথে। এর পর নরওয়েজিয়ান নাট্যের প্রভাব বিস্তারিত হল সুদূর আমেরিকাতে। মার্কিন মুলুক তখন মঞ্চনাট্যের সাহিত্যিক মূল্যের দিকটা ভাবতে সুরু করছে। এর পরের ইতিহাস সকলেরই জানা। প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের সময় অবধি একটানা পৃথিবীর সব দেশের নাট্যকারদের রচনার ওপরই ইবসেনের প্রভাব অত্যন্ত পরিস্ফুট। ইবসেন এবং বিওরর্নসনের আগের সময়টায় নরওয়ে তার কৃষ্টি ও স্থিতির জন্য অনেকটাই নির্ভর করতো ডেনমার্ক এবং সুইডেনের ওপর। ইবসেন বিওরর্নসন নরওয়ের কৃষ্টি ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করলেন।

নরওয়ের বিখ্যাত বার্জেন ও ক্রিস্টিয়ানিয়া থিয়েটারে এতাবৎকাল ডেনিশ নাট্যের মঞ্চরূপ দেখানোই যেন একটা প্রথার মত দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ইবসেন এবং বিওরর্নসন প্রথম থেকেই চেষ্টা করতে লাগলেন বিদেশী নাটককে হটিয়ে দিয়ে নিজেদের রচিত দেশীয় নাটকের প্রদর্শনী করতে।

জাতীয় জীবনের পুরোনো গল্প-গাথা, কাহিনী-ইতিহাস থেকেই তাঁরা নাটকের মাল-মশলা আহরণ করতে লাগলেন। তৎকালীন সমাজ থেকেও বিষয়বস্তু নিয়ে তাঁরা নাট্যরচনা করলেন এবং সেগুলিও নরওয়েজিয়ান সেটিং-এ পরিবেশিত হল। নাট্যরচনার বিষয়বস্তুতে দেশকে প্রাধান্য দিলেও এঁরা যে বাইরের পৃথিবী সম্বন্ধে অচেতন ছিলেন এমন কথা কিন্তু কেউ মনে করবেন না। এঁরা কিন্তু দুজনেই জীবনের বেশ কিছুটা অংশ দেশ-পর্যটনে কাটিয়েছেন। ইবসেন তো ১৮৬৪ সালের পর নরওয়ের বাইরে থাকতেই ভালবাসতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা সত্যি বিওরর্নসন বিদেশী বিষয়বস্তু নিয়ে একটিমাত্র নাটক লিখেছেন—'Maria Stuart'। ইবসেন তাঁর প্রথম নাটক Catalina-র পর, আর একবার মাত্র চেষ্টা করেছিলেন বিদেশী কাহিনী নিয়ে ভাব ঐতিহাসিক নাটক লিখতে—নাটকটির নাম Emperor And Galilean। তা ছাড়া বিদেশে যখনই তিনি থেকেছেন—ইতালী, জার্মানী বা অস্ট্রিয়ার কোন হোটেলে—নাট্যরচনার বেলায় কিন্তু সেটিং ঠিক করেছেন নরওয়েতে।

এঁদের দুজনের নাটকগুলি একই সঙ্গে পড়া দরকার। দুজনের লেখাই পরস্পরের ওপর এতোটা নির্ভরশীল যে, একথা বোঝা মুস্কিল কার দ্বারা কোন্ রচনায় কে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান ফেমিনিস্ট নাটকগুলির অন্যতম প্রধান এবং প্রথম দিকের নাটক হল বিওরর্নসনের Leonarda। ১৮৭৯ সালের এপ্রিল মাসে এই নাটকটি ক্রিস্টিয়ানিয়াতে মঞ্চস্থ হয় এবং বই আকারে প্রকাশিত হয় সেই বছরই সেপ্টেম্বর মাসে। অর্থাৎ ইবসেনের A Doll's House প্রকাশিত হওয়ার তিনমাস আগে। কিন্তু আবার A Doll's House-এর প্রথম পাণ্ডুলিপির তারিখ হল ১৮৭৮ সালের অক্টোবর মাস। পূর্ণাঙ্গ নাটকটি লেখা হয় Amalfi-তে ১৮৭৯ সালের বসন্তকালে।

সমালোচক Martin Lamm এই প্রসঙ্গে লিখেছেন :

Ibsen may have read in the Norwegian press about the great success of Leonarda and the tremendous controversy to which it gave rise, but the idea of A Doll's House had been conceived long before—it was present, in embryo in the Selma episode, from the League of Youth of 1869. It is however true as Bull points out, that he did acknowledge his debt to Bjornson. In 1878 he congratulated him, through an intermediary, on his story Magnhild, in which by an even more violent paradox than in A Doll's House, the moral is driven home that a woman whose marraige is not a real one should abandon it, rather than continue to countenance a false situation.

বহিবিশ্বে বিওর্নসনের নাট্য-প্রতিভার স্বীকৃতি হয় ইবসেনের আগে। কিন্তু বহুবিধ গুণ থাকা সত্ত্বেও তাঁর নাটকগুলি আজ আর নরওয়ের বাইরে অন্য কোন দেশে অভিনীত হতে দেখা যায় না। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, বর্তমানে পৃথিবীর সর্বদেশে ইবসেনের নাটক যেভাবে সমাদৃত বিওর্নসনের রচনা সে তুলনায় প্রায় অপরিচিত বললেই চলে।

Martin Lamm-এর মতে—'Ibsen's work is the Rome of modern drama; all roads lead to it or from it.'

১৮২৮ সালের মার্চ মাসে নরওয়ের স্কিন শহরে হেনরিক ইবসেনের জন্ম হয়। চার ভাই এবং এক বোনের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবার বড়। ১৮৩৬ সালে ইবসেনের বাবা দেউলিয়া হন এবং এজন্য তাঁদের বহু সামাজিক তাড়না ভোগ করতে হয়। এমন কি স্কিন থেকে বাসা তুলে তাঁদের ভেনস্টপে উঠে যেতে হয় এবং এখানে ইবসেনকে একটি নির্জন চিলেকোঠায় আশ্রয় নিতে হয়। এই চিলেকোঠাকে পরে তিনি তাঁর বিখ্যাত নাটক The Wild Duck-এ অমর করে রেখে গেছেন। ১৮৪৩ সালে ইবসেনকে গ্রীমস্ট্যাডের এক রাসায়নিকের সাগরেদিতে লাগিয়ে দেওয়া হয় এবং এই সময় থেকেই নিজেকে চালিয়ে নেবার সমস্ত দায়িত্ব তাঁর নিজের ঘাড়ে এসে পড়ে।

১৬ বছর বয়স থেকে ১৯ বছর অবধি ইবসেনকে ভয়ানক নির্জন জীবন কাটাতে হয়—বন্ধু বলার মত একটি সঙ্গীও তাঁর ছিল না। ১৮৪৩ সালে রাসায়নিকের একজন পরিচারিকার গর্ভে ইবসেনের একটি অবৈধ সন্তান হয়। এই অবিবেচনার জের টানতে হয় ইবসেনকে ১৪ বছর ধরে ঐ শিশুটির ভরণপোষণের খরচ দিয়ে। এরই

● 'Doll's House' অভিনয়ের একটি দৃশ্য—হেলমার, র‍্যাঙ্ক, নোরা

প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় Peer Gynt-এ, দি গ্রীন উম্যান এণ্ড হার চাইল্ড-এ।

১৮৪৭ সালে তাঁর প্রথম কবিতা Resignation লেখেন। এবার পরীক্ষায় পাশ করেন, আয়ও বেড়ে যায় এবং একটা ভাল বাড়িতে আশ্রয় নেন। এরপর ইবসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য তৈরি হতে থাকেন। এই সময় তিনি ভালভাবে Kierkegaard অধ্যয়ন করেন, ইউরোপীয় রাজনীতির ব্যাপারে আগ্রহশীল হয়ে ওঠেন এবং Due ও Schulerud-র সঙ্গে গভীর বন্ধুত্বের সম্বন্ধ স্থাপন করেন।

বছর দুই বাদে গ্রীমস্ট্যাডের যৌবনোচ্ছল সামাজিক জীবনে এবং নাচের আসরে তাঁকে ঘন ঘন দেখা যেতে লাগল। এর মধ্যেই সমাজে রসিক এবং দেশপ্রেমের কবিতা রচয়িতা হিসাবে তিনি নাম করে ফেলেছেন। তাঁর প্রথম নাটক Catalina, Brynj ılf Bjarme—এই ছদ্মনামে এই সময়েই লেখা হয়। লেখার ধারাটা ছিল গুরুগম্ভীর ও অসরল—অলঙ্কার-বাহুল্যে ফেঁপে ওঠা। নাটকের নায়ক অবসেশড হয়ে পড়েছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও বড় হবার বাসনায়। অথচ কোন পথে গেলে যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে, সে সম্বন্ধে তার কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। এরপর আর এক সমস্যা দেখা দিয়েছিল—দুজন নারী এল তার জীবনে এবং তাদের মধ্য থেকে একজনকে বেছে নিতে গিয়ে সে ভুলভাবে বাছলে—ক্রমশ নিজের অতীতের কৃতকর্মের জালে সে জড়িয়ে পড়তে লাগল এবং এইভাবেই তার চরম সর্বনাশ হয়ে গেল।

এই সময় ইবসেন ক্লারা এবেল নামে একটি মেয়ের প্রেমে পড়েন। লেখাও চলতে থাকে অবিরত ধারায়। ক্লারা এবেল ছিলেন খামখেয়ালী ধরণের—তার ঔদাসীন্যে বিরক্ত হয়ে ইবসেন অন্য একটি মেয়ের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। ১৮৫০ সালে Schulerud-এর সঙ্গে তিনি Oslo রওনা হয়ে যান এখানকার University-তে পড়বার জন্য। তাঁর একাঙ্ক নাটক The Warrior's Barrow এই সময় মঞ্চস্থ হয়—এইটিই ইবসেনের প্রথম মঞ্চস্থ নাটক—কারণ Catalina বহুবারই অমনোনীত হয়ে ফেরৎ আসে এবং মঞ্চস্থ হয় ১৮৮০ সালে স্টকহলমে। (ক্রমশঃ)

● হাঙ্গেরীর তাতাবানিয়া দলের সেণ্টার ফরোয়ার্ড মোহনবাগানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় গোলটি করছেন।

ফুটবলে হাঙ্গেরী

বসন্তের কোকিল যদি শীতের মরশুমে কুহু কুহু করে ডেকে ওঠে তা হলে স্বতঃই শ্রোতার মনে বসন্তের ছোঁয়াচ লাগে ক্ষণিকের জন্যে। অসময়ের অতিথি হাঙ্গেরীর তাতাবানিয়া দলও কলকাতার ময়দানে ফিরিয়ে এনেছে ফুটবলের প্রাণ-মাতানো সুর। টৌকিও অলিম্পিকের স্বর্ণপদক বিজয় হাঙ্গেরীর ফুটবল প্রতিভাকে ক্রীড়ামোদীদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। বিশ্বের একটি সেরা ফুটবল দলকে কলকাতার মাঠে আমন্ত্রণ করার জন্যে মোহনবাগান দল ধন্যবাদের পাত্র। কারণ, মোহনবাগানের প্লাটিনাম জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষেই হাঙ্গেরীয় দলের কলকাতায় আগমন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরই হাঙ্গেরীর ফুটবল প্রাধান্য আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৫২ সালের হেলসিংকি অলিম্পিকে স্বর্ণপদক লাভে তার পরিপূর্ণ বিকাশ। এ বছর টৌকিও অলিম্পিকে হাঙ্গেরীর চেকোশ্লোভাকিয়াকে ২-১ গোলের ব্যবধানে পরাস্ত করে পুনরায় স্বর্ণ-পদক লাভ করার গৌরব অর্জন উল্লেখযোগ্য। আগন্তুক দলের মধ্যে এমন দুজন খেলোয়াড় আছেন যাঁরা হাঙ্গেরীর অলিম্পিক দলের পক্ষে টৌকিওতে প্রতিনিধিত্ব করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তবে হাঙ্গেরী দলের পক্ষে এ বছর যিনি টৌকিওর আসরে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় বলে বিবেচিত হয়েছেন—সেণ্টার ফরোয়ার্ড বেনে, তিনি এই দলে নেই। টৌকিও অলিম্পিকে ফাইন্যালে জয়লাভের পশ্চাতে তাঁরই কৃতিত্ব সব চেয়ে বেশি। তাঁর ক্ষিপ্রগতির সঙ্গে তুলনা করা চলে এক্সপ্রেস ট্রেনের। টৌকিওতে

শ্রীঅমিতাভ

বেনের দেওয়া বিজয়সূচক গোলটি নাকি স্বপ্নের মত। বিপক্ষ দলের সমস্ত খেলোয়াড়কে একা কাটিয়ে বল ঠেলে দিলেন গোলের মধ্যে। চেকোশ্লোভাকিয়ার খেলোয়াড়রা শত চেষ্টা করেও তাঁর সামনে কোন বাধার সৃষ্টি করতে পারল না। সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ফুটবল যাদুকর ফেরেন পুসকাস এই হাঙ্গেরীরই ছেলে।

১৮ই নভেম্বর মোহনবাগানের সঙ্গে খেলায় তাতাবানিয়া দল ৩ গোলে জিতেছে। গোলের সংখ্যা দিয়ে এ সব খেলার মান নির্ণয় করা চলে না। কারণ আরও বেশি গোলের ব্যবধানে জয়লাভ করা তাতাবানিয়া দলের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। কলকাতায় আরও দুটি খেলায় অংশ গ্রহণ করার পর তাতাবানিয়া দিল্লীতেও একটি প্রদর্শনী খেলায় অংশ গ্রহণ করবে বলে আশা করা যাচ্ছে। শেষে এই কথাই বলব যে, হাঙ্গেরীর দলের ক্রীড়াপদ্ধতির নতুন ধাঁচ এবং আদান-প্রদানের নিখুঁত ছন্দ ভারতীয় খেলোয়াড়দের নিশ্চয়ই নতুন পথের সন্ধান দেবে, যাতে ভারতীয় ফুটবলের ক্রীড়ামান উন্নত হয়।

বাংলার ফুটবল প্রসঙ্গে

গৌহাটির জাতীয় ফুটবলের আসর শেষ হল। ফাইন্যালে ভারতীয় রেল দলের কাছে বাংলার পরাজয় আমাদের মনে জাগায় কয়েকটি প্রশ্ন। একথা সত্য যে, সেদিন খেলার মানদণ্ডে যোগ্য দল হিসাবেই রেল দল বিজয়লক্ষ্মীর আশীষ লাভ করে সন্তোষ ট্রফি বিজয়ী হয়েছে। বাংলা দলের রক্ষণভাগে জার্নাল সিং এবং আক্রমণভাগে চুনী গোস্বামী উপস্থিত থাকলে হয়ত বাংলা দলকে

● পিটার স্নেল

পরাজয়ের তিক্ত আস্বাদ গ্রহণ করতে হত না। এবং দুই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন খেলোয়াড়ের অনুপস্থিতিতে বিভিন্ন মহলে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল। এই দুজন খেলোয়াড় অবশ্য তাঁদের যোগদানের অক্ষমতা পূর্বেই জ্ঞাপন করেন। অনুপস্থিতির কারণ হিসাবে যে যুক্তির অবতারণা তাঁরা করেছেন, সেগুলি অনেকের মতে খুবই দুর্বল যুক্তি। বাংলা দলের পক্ষে গৌহাটিতে গেলে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হত বলে মনে হয় না। তাতাবানিয়ার সঙ্গে খেলতে জার্নাল পাতিয়ালা থেকে ছুটে এলেন। চুনী গোস্বামীকে এখনও ফুটবল মাঠে অবতীর্ণ হতে দেখা যাচ্ছে এবং তাতাবানিয়া বনাম ভারতীয় একাদশের খেলায় স্বেচ্ছায় অংশ গ্রহণ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন এ-আই-এফ-এফ'র কাছে। দেশের এবং রাজ্যের মানসম্মান ক্লাবের এবং ব্যক্তিগত মানসম্মানের অনেক উর্ধ্বে একথা প্রত্যেক খেলোয়াড়েরই স্মরণ রাখা উচিত। এবারের ফাইন্যাল খেলা থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, ফুটবলে এখনও বাংলার ছেলেরা অগ্রভাগে। ফাইন্যালে উন্নীত দু'দলের বাইশ জনের মধ্যে কুড়ি জন কলকাতার মাঠের এবং তার মধ্যে পনের জন বাংলার ছেলে।

● হনুমন্ত সিং

১৯৬৪র জাতীয় ফুটবলের ফাইন্যালে বাংলার পরাজয় কিছুটা অপ্রত্যাশিত হলেও আশ্চর্যের কিছুই নয়। বাংলা দলের ক্রীড়াধারায় ছিল ব্যর্থতার ছাপ, আক্রমণধারায় ছিল না ক্ষুরধার, গতিটা ছিল কিছুটা এলোমেলো, দলীয় সংহতি এবং খেলোয়াড়দের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাবটা প্রকট হয়ে উঠেছিল। অন্য দিকে রেল দলের সম্মিলিত উচ্চাঙ্গের ক্রীড়াধারা, অটুট মনোবল এবং দলগত ঐক্য তাদের ললাটে এঁকে দিয়েছে বিজয় তিলক। দু'দলই প্রায় সমানভাবে আক্রমণধারা রচনা করেছে, দু দলই পেয়েছে গোল করার সুযোগ। বাংলা দল বহু সুবর্ণ সুযোগ অপচয় করেছে, রেল দল প্রাপ্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করে বাজিমাৎ করে দিয়েছে। প্রথমার্ধেই জানকীরামের দেওয়া গোলে রেল দল অগ্রগামী থাকে। দ্বিতীয়ার্ধে অরুময় বাংলা দলের পক্ষে গোল পরিশোধ করেন। এরপর রেল দল একটি পেনাল্টির সুযোগ পায়। অরুণ ঘোষ পেনাল্টি থেকে গোল দিয়ে নিজ দলের জয়ের পথ সুগম করেন। রেল দল ইতিপূর্বে ১৯৬১ সালে প্রথম জাতীয় ফুটবল বিজয়ী হয়। মোট ২০ বার প্রতিযোগিতার মধ্যে বাংলা দল ফাইন্যালে উন্নীত হয়েছে পনের বার এবং সন্তোষ ট্রফি বিজয়ী হয়েছে মোট একাদশ বার।

● তাতাবানিয়া এবং মোহনবাগানের অধিনায়কদ্বয় পতাকা বিনিময় করছেন

রেকর্ড ভাঙা কীর্তি

রেকর্ড ভাঙার নেশায় যেন পেয়ে বসেছে নিউজিল্যাণ্ডের দূর পাল্লার দৌড়বীর পিটার স্নেলকে। পিটার স্নেল ১৯৬৪র টোকিওর অলিম্পিকে ৮০০ এবং ১৫০০ মিটারে স্বর্ণপদক লাভ করেছেন। ১৯৬০ সালের রোম অলিম্পিকেও তিনি ৮০০ মিটারে স্বর্ণপদক লাভ করেন।

ওয়েস্টার্ন স্প্রিং স্টেডিয়ামের সিণ্ডার ট্র্যাকে তিনি ১ মাইলের দূরত্ব ৩ মিনিট ৫৪'১ সেকেণ্ডে অতিক্রম করে নতুন বিশ্ব রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত করলেন। এর ঠিক কয়েকদিন পূর্বেই তিনি ২ মিনিট ১৬'৬ সেকেণ্ডে ১০০০ মিটার অতিক্রম করে এক নতুন বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেন। ৮০০ মিটারের বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী হলেন এই স্নেলই।

ইতিপূর্বে ১ মাইলের বিশ্ব রেকর্ড স্নেলেরই ছিল। ওয়েলিংটনের ঘাসের ট্র্যাকে তিনি ৩ মিনিট ৫৪'৪ সেকেণ্ডে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেন। দৌড়ের পর স্নেল বলেন যে, ৩ মিনিট ৫৪'১ সেকেণ্ডে ১ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করতে তাঁকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছে। প্রথম অর্ধ মাইল তিনি মাত্র ১ মিনিট ৫৪ সেকেণ্ডে অতিক্রম করেন। স্নেলের বর্তমান এই সাফল্যের পশ্চাতে যে বিরাট অধ্যবসায় এবং নিরলস কঠোর পরিশ্রম আছে, তা কল্পনা করা যায় না। নিউজিল্যাণ্ডের পাহাড়ে রাস্তার চড়াই-উতরাই ভেঙে প্রতিদিন প্রায় তিরিশ মাইল দৌড়ান। এ ছাড়া আছে অন্য ধরণের ব্যায়াম। স্নেল বলেন ভাল প্রতিযোগী পেলে তিনি তাঁর সময় আরও ভাল করতে পারবেন। স্নেলের লক্ষ্য এখন থেকেই ১৯৬৮ সালের মেক্সিকো অলিম্পিকের দিকে।

● সন্তোষ ট্রফিসহ বিজয়ী রেল দলের অধিনায়ক প্রদীপ ব্যানার্জি

সমাচার দর্পণ

ক্লে বনাম লিস্টন বিশ্ব হেভী ওয়েট মুষ্টিযুদ্ধ বর্তমানে স্থগিত রইল। ক্যাসিয়াস ক্লে লড়াইয়ের ঠিক একদিন পূর্বে অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে যেতে বাধ্য হন। সেখানে হার্নিয়া অস্ত্রোপচারের পর তিনি বর্তমানে সুস্থই আছেন।

* * *

দেরাদুনের গুর্খা মিলিটারী স্কুল বোম্বাইয়ের আঞ্জুমান-ই-ইসলাম স্কুলকে ফাইন্যালে ৪—২ গোলে পরাজিত করে সর্বভারতীয় স্কুল ফুটবলের সুব্রত মুখার্জি কাপ লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছে। এই প্রথম সুব্রত কাপ বাংলার বাইরের স্কুল জয় করল।

* * *

গতবারের দলীপ ট্রফির যুগ্ম-বিজয়ী দক্ষিণাঞ্চলকে প্রথম ইনিংসের ফলাফলে পরাজিত করে মধ্যাঞ্চল ফাইন্যালে উন্নীত হয়েছে। ফাইন্যালে পশ্চিমাঞ্চল এবং পূর্বাঞ্চলের বিজয়ীর সঙ্গে তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। মধ্যাঞ্চলের হনুমন্ত সিং ব্যক্তিগত ২১০ রান সংগ্রহ করে এক নতুন নজীর স্থাপন করেন।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২ বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাপ্তাহিক বসুমতী

মহাভারতে ক্যাথলিক ধর্মগুরু
মহামান্য পোপ ষষ্ঠ পল।

২৭শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ ∘ 3rd December, 1964 • Vol. 69,

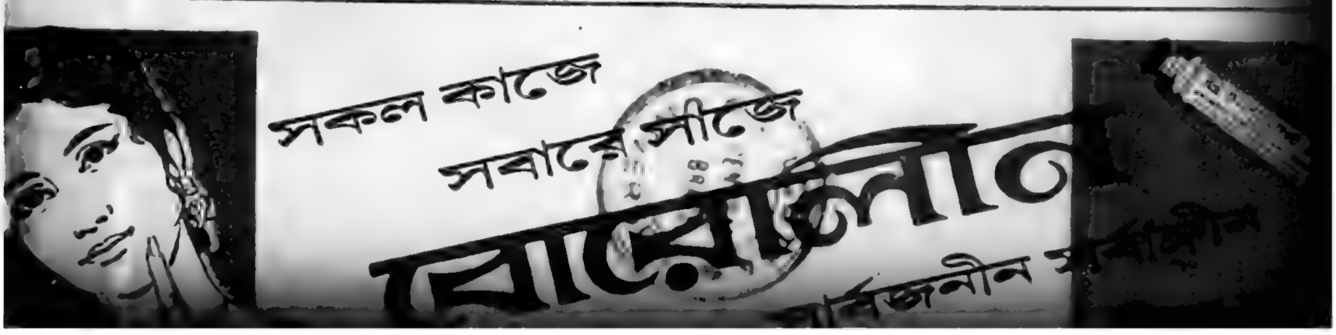

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	১৬৬৭
আজকের মানুষ	...	১৬৬৮
সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর	হরপ্রসাদ মিত্র	১৬৬৯
বিকেলবেলায় (কবিতা)	রবীন্দ্র গুহ	১৬৭১
তীব্র হ্যারিকেন (কবিতা)	শান্তনু দাস	১৬৭১
ভারতদর্শন	..	১৬৭২
আন্তর্জাতিক	...	১৬৭৯
অদ্বিতীয়া (ধারাবাহিক উপন্যাস)	সুশীল রায়	১৬৮৪
হলধর (কবিতা)	অসিত চৌধুরী	১৬৮৬
সঙ্গীত (কবিতা)	মকসুদা খাতুন	১৬৮৬
ডিটেকটিভ সবাই হতে পারে (গোয়েন্দা-গল্প)	পরিমল গোস্বামী	১৬৮৭

শ্রী কৃ ষ্ণ

পরম ভাগবত দেবেন্দ্রনাথ বসু বিরচিত

ভক্তির মন্দাকিনী
প্রেমের অলকনন্দা
জ্ঞানের আকাশগঙ্গা
বঙ্গসাহিত্যে এরূপ মহাগ্রন্থ আর নাই
চিত্রসমৃদ্ধ—সুশোভন—সম্মোহন সংস্করণ
মূল্য পনর টাকা

যে জ্ঞান-সূর্য্যের সর্বতোমুখী প্রতিভার কিরণচ্ছটায় ভারত-মহিমা চির-ভাস্বর—সেই সাহিত্যজগজ্জ্যোতি—প্রতিভা ও মনীষার অবতার—সাহিত্য-তপস্যানিষ্ঠ—মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর

হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী

কাঞ্চনমালা, বেণের মেয়ে, মেঘদূত, বাল্মীকির জয়, ভারত-মহিলা, বাঙ্গালা সাহিত্য সমালোচনা, ঐতিহাসিক নিবন্ধমালা, শিক্ষাসন্দর্ভ, সমাজসংস্কার নিবন্ধরাজি, মোহিনী।

এই জাতীয় সাহিত্য-জয়ন্তী মাত্র ৭।।০

নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

শ্রীগৌরাঙ্গ ও প্রফুল্ল
শ্রীপ্রমথনাথ মজুমদার বি-এল প্রণীত
।। দ্বিতীয় সংস্করণ ।।
মূল্য দুই টাকা মাত্র

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
শহর কলকাতা	শ্রীপদাতিক	১৬৯১
পাখী ও ফুল (গল্প)	রতনকুমার ঘোষ	১৬৯৭
আঁধারমাণিক (ধারাবাহিক উপন্যাস)	মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	১৭০১
বাণিজ্যে সেকাল ও একাল	ধনপতি সওদাগর	১৭০৪
টোকিওর চিঠি	মিত্রেন	১৭০৬
বঙ্গদর্শন	...	১৭০৯
গ্রন্থমেলা	জয়ন্তী সেন	১৭১৪
রঙ্গজগৎ	...	১৭১৫
পাঠকমন		১৭২১
নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী	দেবনারায়ণ গুপ্ত	১৭২২
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	শিলালি	১৭২৩
খেলাধুলা	শ্রীঅমিতাভ	১৭২৬

বঙ্গযুগের বিপ্লবী গুরু

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

নির্বাসিতের আত্মকথা, উনপঞ্চাশী, দিনকিন, অনন্তানন্দের পত্র, বর্তমান সমস্যা, জাতের বিড়ম্বনা, পথের সন্ধান, স্বাধীন মানুষ, ধর্ম ও কর্ম।

মূল্য—আড়াই টাকা

বলিষ্ঠ কথাশিল্পী

জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী

৭ খানি বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ উপন্যাস এবং ৩ খানি বড় লেখা—সুবৃহৎ গ্রন্থাবলী।

মূল্য তিন টাকা

আধুনিক কথা-সাহিত্যিক

বিভূতিভূষণ ভট্টের গ্রন্থাবলী

স্বেচ্ছাচারী, আশা, সহজিয়া, সপ্তপদী।

মূল্য—৩ টাকা

রসরাজ

অমৃতলাল বসুর গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—হরিশ্চন্দ্র, আদর্শ বন্ধু, যাদুকরী প্রভৃতি ১১ খানি নাটক।

২য় ভাগে—খাসদখল, চোরের উপর বাটপাড়ি, অবতার প্রভৃতি ১১ খানি নাটক।

৩য় ভাগে—বিবাহ বিভ্রাট, তরুবালা, ব্রজলীলা প্রভৃতি ১১ খানি নাটক

প্রতি ভাগ আড়াই টাকা

কাব্য-সাহিত্যিক

বিহারীলাল চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী

জীবনী ও কাব্য সমালোচনা, বিহারীলালের সারদা, বিহারীলাল ও তাঁহার কাব্য, সারদামঙ্গল, বন্ধুবিয়োগ, প্রেম-প্রবাহিনী, স্বপ্ন-দর্শন, সঙ্গীতশতক, বঙ্গসুন্দরী, নিসর্গ-সন্দর্শন, মায়াদেবী, ধূমকেতু, শরৎকাল, দেবরাণী, বাউল বিংশতি, সাধের আসন, কবিতা ও সঙ্গীত। মূল্য ৩ টাকা

নয়জন কবির মূল্যবান সংস্কৃত ও বাংলা রচনার সমাবেশ। বঙ্গসাহিত্যে অভিনব আয়োজন।

বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী

মূল্য—পাঁচ টাকা।

প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা

যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর গ্রন্থাবলী

২য় ভাগে—সীতা, বিষ্ণুপ্রিয়া, মহামায়ার চর ও পূর্ণিমামিলন

মূল্য দুই টাকা

উপন্যাস সাহিত্যের প্রদীপ্ত ভাস্কর

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

তৃতীয় ভাগ—বেলমতিয়া, বঙ্গসংসার, সনাতন গোস্বামী, পূজার মালা ও রাণী বঙ্গসুন্দরী। মূল্য—এক টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

UNIVERSITY

৩১ বর্ষ, ২৭শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পঃ | 25 Paise
বৃহস্পতিবার, ১৭ই অগ্রহায়ণ ১৩৭১ | Thursday, 3rd December 1964

সরকারী কাজে হিন্দী

খবরে প্রকাশ যে, আগামী ২৬শে জানুয়ারী থেকে হিন্দীকে সরকারী ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে—ঠিক তার পরদিনই হিন্দীতে রচিত অন্তত একটি চিঠি ভারত সরকারের সমস্ত এবং প্রত্যেক আপিস থেকে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ছাড়া হবে। এই সার্কুলার নাকি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রদপ্তর জারী করেছেন। সম্পূর্ণ বয়ানে হিন্দীকে এখনই আসমুদ্রহিমাচলে চালু করার নির্দেশ দেওয়া হয় নি। তথাপি আমাদের আশঙ্কা যে থেকেই যাচ্ছে, এ কথা কিভাবে অস্বীকার করি। কেন না, হিন্দীভাষাভাষীদের হিন্দী-ভাষা প্রচারের উগ্র উৎসাহ দেখে আমাদের উক্ত আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে।

আরেক কথা, যে-দিনটিতে হিন্দী-ভাষাকে সরকারী ভাষারূপে ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সে-দিনটি হচ্ছে পবিত্র প্রজাতন্ত্রদিবস। প্রজাতন্ত্র-দিবস সকলেরই আনন্দের দিন, শুধু ভাষাগত কারণে এই দিনটিতে যেন মনোমালিন্যের সৃষ্টি না হয়।

আসল আশঙ্কার কারণ হচ্ছে এই যে, যে-কাজের সুরু হতে চলেছে তার শেষ কোথায়? আমরা অনেকবার লক্ষ্য করেছি, উগ্র হিন্দী-প্রেমিকগণ কখনো স্বল্পে তুষ্ট হন নি। তাই অহিন্দীভাষীদের পক্ষে 'ভবিষ্যৎ' অনুকূল নয়, এই ধারণা জাগা স্বাভাবিক। তাদের অপ্রতিরোধ্য জেদ বজায় রাখতে গিয়ে ভাষার ব্যাপারে অহিন্দীভাষাভাষীদের কোণঠাসা হতে হবে। সংবিধান-স্বীকৃত আঞ্চলিক ভাষাগুলির ওপর বিমাতৃসুলভ চাপ সৃষ্টি হলেই সেগুলির ভাবীহাল সম্পর্কেও সন্দেহ জাগা অহেতুক নয়। সেই কারণে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রদপ্তরের নির্দেশ সীমাবদ্ধ হলেও অহিন্দীভাষীদের ভয় দূর হয় না।

অবশ্য হিন্দীভাষাভাষীদের মনের সাধ যাই হোক না কেন, শিক্ষামন্ত্রী শ্রীচাগলা যে কথা বলেছেন, তা হচ্ছে শেষ কথার এককথা। তাঁর অভিমতে, পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলের সম্মতি ব্যতীত হিন্দীকে চালু করার অসুবিধা আছে। আমাদের মতে, এই সম্মতিটাই বড় কথা,—কেন না, 'সম্মতি নিয়েই শাসন' এ কথাটা অসত্য নয়। শ্রীচাগলার পক্ষে আরও যা রয়েছে, তা হচ্ছে—কুঞ্জরু কমিটির রিপোর্ট, মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনের এবং জাতীয় সংহতি বৈঠকের প্রস্তাব। তা ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরীতে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা ভিন্নভাষাভাষী অঞ্চল থেকে এসেছেন এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দ্বারা আগামীকালে আসবেন। এই ব্যাপারে অহিন্দীভাষীদের দুর্যোগটাও বিবেচ্য। আমাদের মতে হিন্দী চালু করার সময় এখনো আসে নি। প্রথম কারণ, আজো ঐ ভাষা অপুষ্ট এবং সরকারী স্বীকৃত হিন্দী সর্বজনীন নয়। দ্বিতীয়ত, পুষ্ট ইংরেজীকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে রাখতে বাধ্য হয়ে হিন্দী চালু করার ব্যবস্থা অবৈজ্ঞানিক। তৃতীয়ত, দেশের জরুরী অবস্থায় হিন্দী চালিয়ে পাহাড়প্রমাণ খরচ করা অবাঞ্ছনীয়। চতুর্থত, এমন কিছু করা উচিত নয়, যা জাতীয় সংহতির প্রতিবন্ধক। তথাপি হিন্দী চালু করার যাঁরা স্বপক্ষে, তাঁরা হাজার গণ্ডা যুক্তি দিলেও কর্ণপাত করবেন না।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

বইটির নাম দেওয়া যাক ক্রমিক সাফল্যের ইতিহাস। বইটি স্পর্শ করেই বুঝেছিলাম, এ-বই সে বই নয়—যা হাজার বইয়ের ভিড়ে হারিয়ে যেতে পারে অনায়াসে। কেন না, এই বইয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি জীবনের বহু সোনালি প্রভাত, অগণিত দীপ্ত মধ্যাহ্ন আর কখনো লাবণ্যের রাত্রি। এই বইয়ের আগাগোড়া দেখেছি নির্ভুল ছন্দ, অনমনীয় ভঙ্গিমা আর দ্রুত-গতির তরঙ্গ। এই মূলত একটি জীবনের বিজয়-বৈজয়ন্তীর ইতিহাস। এই ইতিহাস লেখা সুরু হয়েছে চৌষট্টি বছর আগে থেকে কালের পাতায় সাফল্যের স্বর্ণরেণু দিয়ে। এ-ইতিহাস তাই মহত্বের, ব্যক্তিত্বের, কমনীয়তার প্রোজ্জ্বল জীবনায়ন। জীবনীকার স্বয়ং বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত।

জীবনের জয়যাত্রা—যে জীবনের পরিচয়ে আজ আমরা গর্বিত, উদ্বেলিত—সুরু হয়েছিল মাত্র পনের বছর বয়সে।

১৯০০ সালে বিজয়লক্ষ্মীর জন্ম আনন্দভবনে। মুক্তি-যোদ্ধাদের মিলনতীর্থ এই আনন্দভবন। তাই ১৯১৫ সালের ঘটনা সুস্থ, স্বাভাবিক ও সুন্দর। ঘরের বাইরের রাজনীতির অঙ্গনে পা বাড়ালেন বিজয়লক্ষ্মী। বোম্বাই কংগ্রেসে প্রথম দীক্ষা আর তারপর থেকেই পরম নিষ্ঠায়, আন্তরিকতায় তিলে-তিলে নিজেকে গড়ে তুললেন মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সৈনিক হিসেবে। একের পর এক সেই ঐতিহাসিক দিনগুলো পেরিয়ে এলেন দৃঢ়-পদবিক্ষেপে। স্বাধীনতার বিজয়রথ দ্রুত ধাবমান—অন্য অনেকের মতই বিজয়লক্ষ্মীও বজ্রমুষ্টিতে ধরেছিলেন সেই রথের রশি।

অতএব ১৯৩২ সালেই ইংরেজ সরকারের আতিথ্য স্বীকার করতে হলো। একবার নয়, দু'বার নয়—বারবার। অনেক বেদনা, অনেক আনন্দের ছোট ছোট মুহূর্তগুলি জড়িয়ে, মিশিয়ে ১৯৪৭ পর্যন্ত সংগ্রামী-জীবনের অধ্যায়টি দীর্ঘায়ত হয়ে উঠেছে। এরই মধ্যে একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের নাতিদীর্ঘ একটি কাহিনীও রয়েছে। সে কাহিনী সংক্ষিপ্ত কিন্তু মধুর, স্নিগ্ধ আর উজ্জ্বল। ১৯২১ সালে বিজয়লক্ষ্মী একাধারে দেশের অক্লান্ত কর্মী আবার বিদ্বান, গুণবান, স্বামীর ঘরের গর্বিতা ঘরণী। স্বাধীনতা-যুদ্ধের অনেক কণ্টকাকীর্ণ পথ তাঁরা দু'জনে পার হয়ে এসেছেন। কিন্তু এই দ্বৈতজীবন-যাত্রার পথে অকস্মাৎ এলো অবাঞ্ছিত সমাপ্তির সুর। বিজয়লক্ষ্মী স্বামীকে হারালেন ১৯৪৪ সালে। সে ঘটনাও খুব সংক্ষিপ্ত কিন্তু আবেগহীন এক উজ্জ্বল মর্যাদায় অভিষিক্ত।

তবু চলার বিরাম নেই। আজ ফুলপুরের নির্বাচনে বিজয়িনী যে বিজয়লক্ষ্মীকে নিয়ে এই প্রসঙ্গের অবতারণা, তার প্রথম সাফল্য ১৯৩৭-এ। তারও আগে এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির শিক্ষা পরিষদে এবং তারপরেই উত্তর-প্রদেশের বিধানসভায়। নির্বাচিত হলেন কানপুরের বিলহাউ কেন্দ্র থেকে। ১৯৪৫ সালে এই কেন্দ্র থেকেই বিনা-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুনর্নির্বাচিত হয়ে মন্ত্রিসভায় যোগদান করলেন—স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমন্ত্রী হিসেবে। ভারতের ইতিহাসে আর এক নতুন অধ্যায় সংযোজিত হলো—প্রথম মহিলা-মন্ত্রী।

তারপর? তারপর ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে সদ্য স্বাধীন ভারতবর্ষের সঙ্গে বহিবিশ্বের মৈত্রী রচনার দায়িত্ব পড়লো তাঁরই হাতে। বহু পূর্ব থেকেই বহিবিশ্বের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ। মাদাম চিয়াং কাইশেককে তিনিই ভারতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তিনিই ১৯৩৮ সালে বিশ্বের কাছে তুলে ধরেছিলেন জহরলালের মিউনিক ভ্রমণের তাৎপর্য। এই ভারতীয় নারীই আমেরিকায় ইংরেজ অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন—দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেছিলেন ভারতে ইংরেজের নির্মমতার শোক-করুণ কাহিনী। তাই স্বাধীন ভারতের বিশ্বজয়ের কাহিনীও তাঁরই হাতের রচনা। ১৯৪৭—৪৯ রাশিয়ায়, ১৯৪৯—৫২ আমেরিকায়, ১৯৫৫—৬১ ইংল্যাণ্ডে তাঁর সার্থক কর্মপ্রচেষ্টা। আর সেইসঙ্গে আর একটি অসাধারণ ঘটনা—১৯৫৩—৫৪ সালে জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের সভানেত্রীত্ব। তাঁর এই দুর্লভ সম্মান শুধু ভারতের গৌরব নয়, বিশ্বের সমগ্র নারী-সমাজের গর্বের বস্তু।

ক্রমিক সাফল্যের ইতিহাস এখনও শেষ হয় নি। বহুতর সাধনার ক্ষেত্রে বিজয়লক্ষ্মী জয়লাভ করেছেন বহুবার। আর

শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত

একবার তিনি জয়লাভ করলেন। মহারাষ্ট্রের রাজভবনের এলাকা ছেড়ে নেমে এলেন তাঁর অনেক কালের চেনা এক জগতে। এবারে যাত্রা সুরু করলেন আর এক নতুন অধ্যায় রচনার জন্য। এবার আর স্বাধীনতার জন্য লড়াই নয়—বহিবিশ্বের সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা নয়—এবার লড়াই নিজের জন্য, জনতার জন্য, আরও ব্যাপক সমৃদ্ধতর ভারত গঠনের জন্য।

সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর

হরপ্রসাদ মিত্র

সাহিত্যে বস্তুতন্ত্র বা বাস্তবতার ঝোঁক তাহলে চিরায়ত এক প্রয়াস হিসেবে দেখা যেতে পারে। জীবনের পারিপার্শ্বিক আয়োজন বদলের সঙ্গে-সঙ্গে এ কেবল সাহিত্যের ভঙ্গিবদল। আগেকার দৃষ্টিতে আর পরের আমলের দৃষ্টিতে যে ভেদ, এককালের বাস্তবতার লক্ষণের সঙ্গে অন্যকালের বাস্তবতার লক্ষণে সে-ভেদ ঘটবেই।

ইংরেজিতে 'রিয়ালিজম' আর 'ন্যাচারালিজম' দুটি শব্দেরই প্রয়োগ সুপরিচিত। এ দুটি সমার্থবোধক নয়। উনিশ শতকে এক ধরনের রিয়ালিজম-চর্চার রেওয়াজ থেকেই 'ন্যাচারালিজম' শব্দটি চলতে থাকে। প্রকৃতির আইনে জগতে যেমনটি ঘটছে, সাহিত্যে কি ঠিক সেই ধারাই যথাযথভাবে দেখাতে হবে? মানুষের জগৎ আর বৃহৎ বিশ্বজগৎ—দুটির মধ্যে সম্পূর্ণ মিল খুঁজে পাওয়া সম্ভব কি? সাহিত্যে মানুষের জীবন কি শুধুই জগতের আর পাঁচটা বাইরের ঘটনার মতো নীতি-বিবেক-লক্ষ্যবোধ-নিরপেক্ষ ঘটনামাত্র?

না, না, তাও নয়। 'ন্যাচারালিজম' শব্দটি সাহিত্যের ক্ষেত্রে নিখুঁৎভাবে এবং সর্বপ্রকারে লেখকের নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনার দিকে আগ্রহ বোঝাবার ইঙ্গিত হয়ে ওঠে। অবশ্য, 'সাহিত্য' মানেই কোন-না-কোনোরকম মান, মাত্রা, সামঞ্জস্য-বোধের রূপ। সেই অনিবার্যতাটুকু উপেক্ষা করলে বলা যায় যে, এ যেন বিশেষ লেখকের তথাকথিত সংস্কারমুক্ত যাথাযথ্য রক্ষার মেজাজ। উনিশ শতকে এই মেজাজ দেখা দিয়েছিল ফ্রান্সে। বালজাকের লেখায়, জোলার মেজাজে এই ঝোঁক ছিল। শোনা যায়, জোলার কাছে শিল্পের সংজ্ঞা এই ছিল যে, তা কেবল বিশেষ মেজাজে দেখা জীবনের খণ্ড-রূপ।

'ন্যাচারালিজম'কে এই যথাযথ-রূপায়ণভঙ্গির চরমপন্থা বলতে আপত্তি হবে কি? বিপুল তালিকা, নিখুঁৎ বিবরণ, সর্ব-বস্তুর উল্লেখ—এ-রকম চরমপন্থা কি সাহিত্যের পথ? জোলার পাঠকরাও আপত্তি করেছিলেন বলে শোনা যায়। এ যেন ক্যামেরা দিয়ে হুবহু দৃশ্য ফুটিয়ে তোলবার ঝোঁক। মোপাসাঁ সে-নজরের মানুষ ছিলেন না। তিনিও বাস্তবতা মেনেছেন, কিন্তু তাঁর খেয়াল নিখুঁৎ বিবরণের খেয়াল নয়।

মোপাসাঁও জীবনের খণ্ডচিত্রের চিত্রকর। কিন্তু তিনি নির্বাচনবাদী শিল্পী। আর, শিল্পীর নিজস্ব অভিজ্ঞতা বলতে যা বোঝানো উচিত, সে কেবল ঘটনামাত্রের প্রতিলিপি হবে কেন? আসুক তাঁর ধারণা। প্রতিলিপির চেয়ে ধারণার দাম বেশি। মোপাসাঁ বাস্তবতা মেনেছেন, কিন্তু ঘটনার অনুলিপি বা প্রতিলিপিমাত্র রেখে যান নি। তিনি নিজের অভিজ্ঞতাই রেখে গেছেন।

হাজার বছর আগে শ্রীমতী মুরাসাকির লেখা জাপানী রচনা 'গেঞ্জির কাহিনী'—যার ইংরেজি অনুবাদের নাম 'The Tale of Genji' মনে পড়ে। রাজকুমার গেঞ্জিকে দিয়ে শ্রীমতী মুরাসাকি বলিয়েছিলেন—সম্প্রতি একদিন আমি শুনলুম আমাদের নবীনদেরই একজন নিজে পড়ে শোনাচ্ছেন, আর সঙ্গীরা শুনছেন। ডায়ারি আর রোমান্স ধরনের এইসব লেখার ভঙ্গি সত্যিই ভারি চমৎকার। জাপানের ইতিহাসে কি জাপানের সব পরিচয় পুরোপুরি দেওয়া যেতে পারে? কতো মানুষের কতো কথা আছে। সে-সব কথা না জানলে পুরোপুরি জাপানকে জানা যাবে না। তাই বলছিলুম—এ-ভঙ্গির দরকার আছে।

শ্রীমতী মুরাসাকি সেই সুদূরকালের জাপানে বসে যা ভেবেছিলেন, উনিশ শতকে ফ্রান্সের ন্যাচারালিস্ট জোলা বা বালজাক বা অন্যান্য লেখকরাও হয়তো সেই ভাবনাই ভেবেছিলেন। ফ্লবেয়ারের 'মাদাম বোভারি' সেই একই নজরের রচনা বললে খুব একটা অন্যায় কিছু বলা হয় না। লুই নেপোলিয়ঁর ফ্রান্স সে বইয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। কিন্তু বিচারে ফ্লবেয়ার মুক্তি পান। সাহিত্যে বাস্তবতার চর্চা অব্যাহত আছে। বালজাক, জোলা, ফ্লবেয়ার মোপাসাঁ—এঁদের প্রত্যেকের আদর্শ যে একই, তা নয়,—কিন্তু প্রত্যেকের মধ্য দিয়েই সাহিত্যের বস্তুদৃষ্টি বা বস্তুতন্ত্র অনুশীলনের ধারা বয়ে এসেছে।

একযোগে এসব মতামতের ধারা দেখতে পেলে ভালো লাগে। এ দেখা 'প্রাদেশিক' নয়, 'বিশ্বজাগতিক'। একালের কাফ্‌কা, কামু, সার্ত্রে ইত্যাদির সঙ্গে হাজার-বছর আগেকার জাপানী রাজকুমার গেঞ্জির কাহিনী এখানে সেই কারণেই উল্লেখ করা গেল। ফ্লবেয়ার, মোপাসাঁ,—বা গোঁকুর (Goncourts)-ভ্রাতৃবৃন্দের কথা একই সূত্রে মনে পড়ে। টুর্গেনিভও সেই সূত্রেই মনে আসেন।

ফ্রান্স থেকেই সাহিত্যের অনেক রুচি, অনেক মতবাদ বিশ্বে ছড়িয়েছে। শোনা যায়, ইমপ্রেশনিজম বা ধারণা-বাদেরও জন্মভূমি সেই ফ্রান্স। ইংলণ্ডে ১৮৯৫এ কনরাড তাঁর

'...মেয়ার্স ফলি' (Almayer's Folly) নামে প্রথম যে উপন্যাস প্রকাশ করেন, ফ্লবেয়ারের 'মাদাম বোভারির' শেষ দিকের কয়েকটি শাদা কাগজেই সেটি তিনি নাকি প্রথম লিখতে আরম্ভ করেন। শুধু তাই নয়, কনরাড তখন রুয়েঁ বন্দরে জাহাজে বসে জাহাজের জানলা দিয়ে সেই বাড়িটি দেখছিলেন, ফ্লবেয়ার তাঁর উপন্যাসে যেটিকে রোদোলফ আর এমা বোভারির সাক্ষাতের জায়গা বলে দেখিয়েছেন। ইংরেজি সাহিত্যে আর্নেস্ট ডসন, জর্জ মুর সেই একই কালের লেখক। উনিশ শতকের সেই শেষ দশকে ইংরেজি সাহিত্যে ফ্রান্স থেকে 'ধারণাবাদ' এসে পৌঁছোয়।

জগতের সাহিত্যলোকে 'রিয়ালিজম' থেকে 'ন্যাচারালিজম'-এ—'ন্যাচারালিজম' থেকে 'ইমপ্রেশনিজম'-এর দিকে লেখকদের মনঃস্রোতের এই গতি দেখতে-দেখতে সাহিত্যের একরকম বিশ্বরূপের কথায় এসে পৌঁছোন গেল। তাই সন্দেহ হয়, পাঠকরা আমাকে ভুল বুঝবেন না তো? আমার বক্তব্য কতোটুকু? আমি তর্ক জানি না,—সাহিত্যের এই বিশ্বরূপে আমি বিশ্বাস করি, এই মাত্র। যেন একই সূর্য-চন্দ্রের আলোয় জ্বলছে দেশ-দেশান্তর। অতীতও অতীতে ফুরিয়ে যায় নি, বর্তমানও বর্তমানেই ফুরোবে না।

আমার বলতে কুণ্ঠাও হয়, ভয়ও হয়,—কী জানি কার মনে আঘাত দেবো—কিন্তু কথাটা ঠিকই, অতএব নিজের কাছে নিজের মানতে ইচ্ছে করে যে, আমরা বাংলা-সাহিত্যে কেমন যেন হয় অতি-প্রাদেশিক, নয়তো নোঙর-ছেঁড়া বিশ্ব-পরিব্রাজক হয়ে আছি। আমাদের মঙ্গলকাব্যের গর্ব যেন আমাদের বড্ডো বেশি পেয়ে বসেছে। না, না, উপেক্ষা নয়,—রবীন্দ্রনাথ তো মধ্যযুগের এই সব কাব্য উপেক্ষা করেন নি,—তিনি শুধু বাড়াবাড়ির নিন্দে করে গেছেন। তিনি সাহিত্যের বৃহৎ মানচিত্রের দিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরাবার চেষ্টা করে গেছেন। বাংলা-সাহিত্যকে প্রাদেশিকতার গণ্ডির বাইরে নিয়ে যেতে হলে পাঠকেরও দাবি চাই, লেখকেরও সাধনা চাই। প্রচুর অনুবাদ চাই। অশেষ প্রযত্ন চাই। এখানে প্রসঙ্গত সেইসব প্রয়োজনের কথা মনে এলো। তাই লিখে রাখলুম। পাঠকরা এজন্যে কিছু মনে করবেন না।

গসের 'লিটারেচারস অব দি ওয়ার্লড', অধ্যাপক সেণ্টস্‌বেরির 'পিরিয়ড্‌স্ অব ওয়েস্টার্ন লিটারেচার' প্রভৃতি বইগুলি জগতের বিভিন্ন সাহিত্য-প্রবাহের তুলনামূলক আলোচনা হিসেবে খুবই কাজে লাগে।

সাহিত্যের মধ্য দিয়ে মানুষের যে বিশাল আত্মকথা ব্যক্ত হচ্ছে, সে-বিষয়ে কৌতূহল বোধ করা স্বাভাবিক। কালে কালে এক-একটি ভাষা সেদিক থেকে গুরুত্ব অর্জন করেছে। মিশর, আসিরিয়া, ব্যাবিলন অঞ্চলে জীবনের যে মনন, সংবেদন ইত্যাদির সমৃদ্ধি দেখা দিয়েছিল প্রাচীন হিব্রু-সাহিত্যে তারই ছায়া পড়ে,—জগৎ-সাহিত্যে হিব্রুই সেই ঢেউ পৌঁছে দেয়। আরবী সাহিত্যে মধ্যযুগের অনেকটা বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র,—সূর্যালোকিত বিস্তীর্ণ প্রাচ্য ভূখণ্ডের অনেকটাই নিজের চিহ্ন রেখে গেছে। পবিত্র কোরান আর প্রসিদ্ধ আরব-রজনীর কাহিনীর কথা মনে পড়ে। অধ্যাপক মোল্টন আরব-রজনীর কাহিনী সম্বন্ধে বলেছেন—ইংলণ্ড বা ইউরোপ থেকে সে যেন মধ্যযুগেরই ছবি দেখা,—শুধু নিকট প্রান্ত থেকে নয়, দূর প্রান্তের দৃশ্য সে-সব। বলেছেন—একাল থেকে সে যেন দূর কালে যাবার ছুটি,—লণ্ডন, প্যারি, রোম নয়,—তার বদলে বাগদাদ, ডামাস্কাস, বসোরা, কাইরো, ত্রিপলির নামাবলী মনে আসে।

যাক্ যাক্ সে-কথা যাক। আমি ধারণাবাদের কথা বলতে বসেছিলুম। সেই কথাতেই ফেরা যাক।

মোরস যখন বিচারাধীন আসামী, তখন মারি তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। সেই হাসি-হাসি মুখ,—রেলিঙের ওপার থেকে মারির চুম্বনের ভঙ্গি চোখে পড়েছিল,—তারপর সময় শেষ হতেই সরে গিয়েছিল সে-দৃশ্য। তার অল্প ক'দিন পরেই চিঠি এসেছিল মারির কাছ থেকে।

বন্দী অবস্থার সেই প্রথম পর্বে,—মনে তখনো স্বাধীনতার স্বাদ,—সে-অবস্থাটা বড়োই কষ্টে কেটেছে মোর্‌স-র। হঠাৎ তীব্র ইচ্ছে হোতো সমুদ্রে স্নান করবার, জলের ঢেউয়ের শব্দ মনে পড়তো,—সারা গায়ে জলের স্পর্শ মনে পড়তো,—মনে পড়তো স্নানের সেই আশ্চর্য আরাম,—আর সংকীর্ণ সেলের কষ্ট সেই সময়ে খুবই দুঃসহ মনে হোতো। তারপর অবস্থার পরিবর্তন না হলেও মন নতুন অবস্থায় ক্রমশ নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। সয়ে গেছে। কয়েক মাসের মধ্যেই কয়েদীর অনুভূতি আয়ত্ত হয়ে গেছে। প্রতিদিন উঠোনের হাতার মধ্যেই একটু ঘোরবার জন্যে প্রতীক্ষা,—উকিল আসবেন বলে তাঁরই অপেক্ষায় থাকা,—এইসব অভিজ্ঞতার কথাই কামু জানিয়েছেন। সেই কয়েদী-জীবন সম্বন্ধে মোর্‌স-র এই অভিজ্ঞতা রূপায়ণই তো একরকম ধারণাবাদ।

আরো একটি দৃষ্টান্ত মনে আসছে। অবনীন্দ্রনাথের 'ভূত-পত্রীর দেশ' থেকে অবুর কথা তুলে দেওয়া যায়। সবাই জানেন অবুর পিসির বাড়ির উল্টো নিয়ম। গুরু-মশায়ের ঘরে অবুকে যখন কিচ্‌কিন্দে ধরে ফিরিয়ে নিয়ে এনেছে, তখন বেতের খোঁচা মেরে গুরু জিগেস করেছিলেন, 'লেখাপড়া করলে কি হয়? সুখে থাকে? না দুঃখে থাকে?'

অবুর মনে পড়েছিল পিসির বাড়িতে সব উল্টো। তাই বসু করে বলেছে—'দুঃখে থাকে সবাই, দুঃখে থাকে।'

তখন গুরু বলেছেন—'ভাল রে ভাল। আচ্ছা তোর নাম তো অবু। লেখ দেখি—

'অবু তবু পিরি সুতা
মায়ে বলে পড় পুতা ॥
পড়লে শুনলে দুধি ভাতি
না পড়লে ঠেঙার গুঁতি ॥'

অবু মাটিতে খড়ি দিয়ে একটা চৌকা ঘর কেটে লিখতে আরম্ভ করেছে—'প্যাঁচা পেঁচি দুই ভুতা' তারপর—

'কিন্তু কেমন লিখছি—মায়ে বলে পড় পুতা—অমনি আমার মাকে মনে পড়ে গেছে, আমি খড়ি ফেলে দিয়ে একেবারে পাঠশালা থেকে দৌড়। এক দৌড়ে ষষ্ঠী-তলায় হাজির। সেখান থেকে দেখছি—গঙ্গার ওপারে তুলসীগাছের পাতা ঝুরঝুর করছে, তারি তলায় মা আমার দুপগো পিদিম জ্বালছেন। ওদিকে দেখছি গুরুমশায় ঠেঙার গুঁতি হাতে, সঙ্গে হারুদে কিচকিন্দে আর সেই মনসা-বুড়ো আর যাংলা বাংলা বাংলা যত ভূত-পেরেত। কেমন গুরুকে দেখা আর—মা! —বলে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়েছি, অমনি দেখি আমাদের বাড়িতে হাজির। সেখানে দেখি ঝড় হচ্ছে, শিল পড়ছে আর আমবাগানে আমার ছোট ছোট দাদাদিদিরা আম কুড়োতে লেগেছে।'

(ক্রমশঃ)

বিকেলবেলায়

রবীন্দ্র গুহ

সারাদিন বৃষ্টি হ'ল,
বিকেলেও অন্ধকার করেছে আকাশ
ওই দূর দক্ষিণের কোণে।
কেমন বিনম্র পথ, প্রান্তর-পাড়ার
সীমান্তরেখাও সবুজ মাটিতে মিলেছে।
শহরের রিক্ত অনুচ্ছাস
অমিত দেয়াল ছুঁয়ে ফুটবল খেলার মাঠে সমান অংশীদার।
ধুলো উড়িয়ে ফিটনগাড়ির পিছে—'ঐটাই কাকুর গাড়ি
এলো, আমরা একত্রে সবাই বসবো।'
কেমন সাহসী ছেলে।
এক ছুটে পাড়ার খেলার মাঠ, স্কুলবাড়ি
সবকিছু পিছনে রেখে আমরা ছুটলাম। তুলে নেবো
কোটের পকেট থেকে লাল ফুল,
ওই দ্যাখো কত বড় গাড়ি
দরজার সুমুখে বসা ছোটকাকু। বস্তু গলির মুখে
দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ—'আমিও বড় হলে
এমনি শহরে যাবো।

চিলেকুন ছাদের উপর একা-একা কাকিমা ভাবছেন—
রিণ্টুটা এখনো এলো না কেন? এই বৃষ্টির দিনে
শান্ত হয়ে কত সুন্দর ঘরের ভালোবাসা!'

বড় রাস্তায় অনেক মলিন মুখ। অনচ্ছ আকাশ
বৃষ্টিতে ঢাকা রিক্ত জানালা। বুকে নিয়ে
নিরুদ্বেগ আশা
ঝিকিঝিকি ট্রামের চাকায় জীবনের অন্তিম নিক্কণ।

তীব্র হারিকেন

শান্তনু দাস

হাঁটুমোড়া বিকেলটাকে
দুমড়িয়ে এই জানলায়
শাসিয়ে গেল সন্ধ্যাবেলার ট্রেন
স্তব্ধ ঘরে একলা আমি
নিঝুম মনের আলনা
দালানে রাখি তীব্র হারিকেন।

এত আলোয় মুখ চেনা দায়
ধূসর মনের আয়না,
অশরীরি আলোছায়ায় ঘেরা।
ঘনিষ্ঠতাপ আঁকড়ে ধরি
গুমরে ওঠে হায়না,
সময় জল ছেঁড়ায় ফেরার বেলা।

● জাতীয় গ্রন্থ প্রদর্শনীতে ডঃ রাধাকৃষ্ণণ ও শ্রীচাগলা

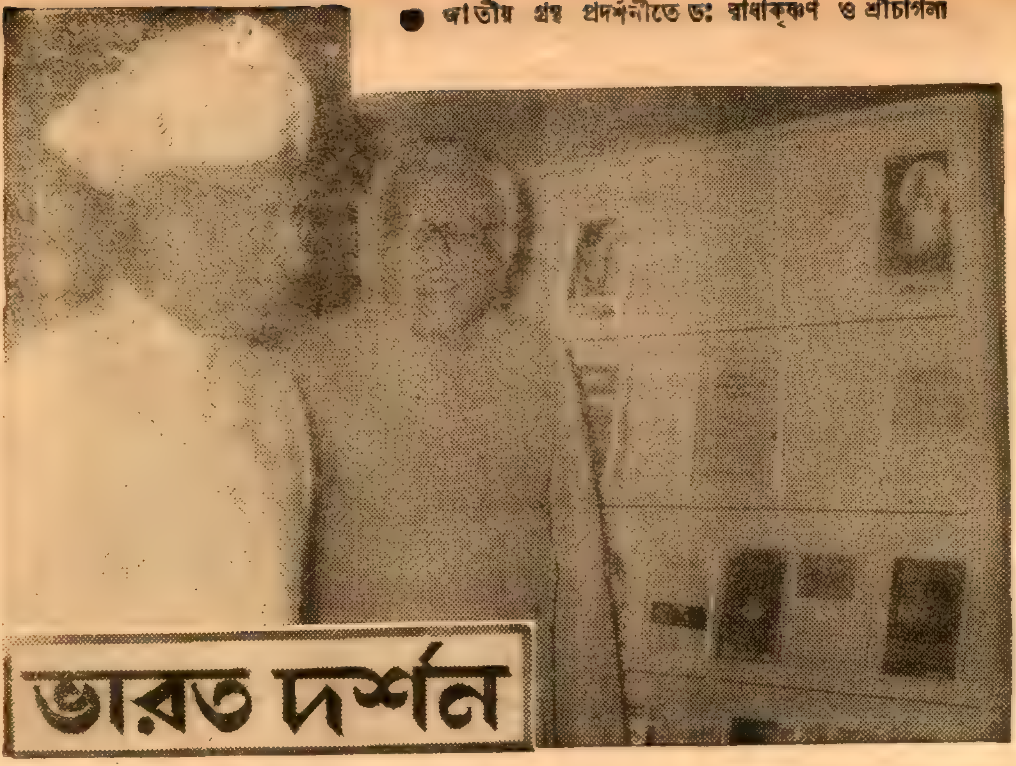

ভারত দর্শন

রাজধানী ঃ

পারমাণবিক বোমার মোকাবিলার বিষয় নিয়ে লোকসভায় তিনদিন বিতর্কের পর কেরলের খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে সভাকক্ষে যে পরিমাণ উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছিল---তাতে এটাই প্রমাণ হয়েছে, পারমাণবিক বোমার চাইতে এ বিষয়টিকে বিরোধী সদস্যগণ কম বিস্ফোরক মনে করতে পারেন নি।

পারমাণবিক বোমা নিয়েও হৈ-হল্লোড় কম হয় নি। চীন ফাটিয়েছে আমাদের শিয়রের কাছে বোমা। আমরা ফাটিয়েছি গলা। তাতে আসল সমস্যার কোন সুরাহাই হয় নি। প্রচুর ধূমজালের সৃষ্টি হয়েছে মাত্র---তাতে আসল কথাটাই ঢাকা পড়ে গেছে। পরমাণু বোমা তৈরি ভারত করবে কি না, এই মুহূর্তের চীনাজুজুর ভয়ে ভীত হয়ে উন্নয়নমূলক কাজ বাতিল করে বাতুলের মতো আত্মহত্যার প্রস্তুতি চালাবো কি না, এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া খুব কঠিন। এর সঠিক জবাব দেবার —দেশের ভবিষ্যৎ পথ নির্ধারণের একমাত্র অধিকারী লোকসভা। কিন্তু সেখানেও তিনদিন আলোচনার পর সুস্পষ্ট কোন নীতি নির্ধারিত হয় নি।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী অবশ্য তাঁর সহজাত শান্ত কণ্ঠে জানিয়ে দিয়েছেন, ভারতের মত অনগ্রসর দেশের পক্ষে চীনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারমাণবিক অস্ত্রলাভের প্রচেষ্টা শুধু পাগলামিই নয়, সে কাজ আত্মহত্যার সামিল। কাজেই বর্তমান অবস্থায় পারমাণবিক অস্ত্র প্রস্তুতির চেষ্টা না করাই শ্রেয়ঃ। প্রধানমন্ত্রী এ কথাও স্বীকার করেছেন, ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে এ সিদ্ধান্তও পাল্টাতে হতে পারে। শ্রীশাস্ত্রী ঠিকই বলেছেন, পরিবর্তনশীল বিশ্বপরিস্থিতিতে কোন সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত, অপরিবর্তনীয় হতে পারে না। ফ্রান্স ও বৃটেনের মত বিত্তবান ও বিজ্ঞানে উন্নত দেশ এখন পর্যন্ত পরমাণু অস্ত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে নি। চীনের পক্ষে সে কাজ কতটা সম্ভব হবে, বিচার্য বিষয়। তা' ছাড়া, পরমাণু বোমা হাতে পেলেই চীনের পররাজ্য গ্রাসের উগ্র লিপ্সাকে প্রতিরোধ করা যাবে, এমন কথা বলা যায় না। তাই বলছিলাম, আসল কথাটার দিকে আমাদের নেতাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নি—তাঁরা চীনের পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ নিয়ে কেবল কণ্ঠ বিদারণই করেছেন।

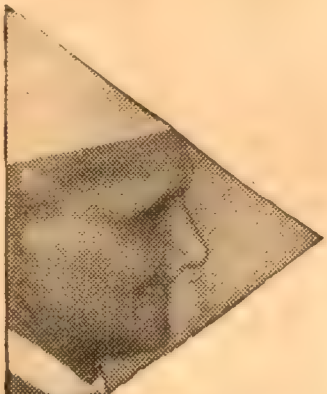

● শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী

বিষয়টি নিয়ে আমরা আগেও বিস্তৃত আলোচনা করেছি। বিশ্ববাসীর মিলিত আবেদন উপেক্ষা করে চীন

যে, গর্হিত কাজ করেছে, তার বিরুদ্ধে চারদিক থেকে যতটা ধিক্কার ধ্বনিত হওয়া উচিত ছিল তা' হয় নি। এশিয়া ও আফ্রিকার বহু রাষ্ট্র এ বিষয়ে নীরব। এই অনুন্নত দেশের সাধারণ মানুষের কাছে চীনা বোমার বিপদের কথা পৌঁছে দেবার প্রধান দায়িত্ব ভারতের। ভারতের মাথার কাছে চীনের বোমা বিদীর্ণ হয়েছে। কূটনৈতিক পর্যায়ে চীনের আসল রূপটা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরতে পারলেই চীনের বোমার আসল মোকাবিলা করা সম্ভব হবে। লোকসভার সদস্যগণ পাল্টা বোমা নির্মাণের পরিকল্পনা বাদ দিয়ে সেইদিকে নজর দিলেই ভাল করতেন। সে প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হতো।

• • •

কেরলের খাদ্যসঙ্কটের ওপর আলোচনাকালে খাদ্যদপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রী ডি আর চ্যবনকে উদ্ধারের জন্য সেদিন প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী শ্রী টি টি কৃষ্ণমাচারীকে এগিয়ে যেতে হয়েছিল। বিরোধী

● শ্রীকৃষ্ণমাচারী

সদস্যগণের সংশয়— তাঁরা নিরসন করতে পারেন নি।

তিনজনেই পরিসংখ্যান উদ্ধার করে দেখিয়েছেন, বিভিন্ন রাজ্য থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যশস্য চলে গিয়েছে কেরলে। সেখানে এখন আর তীব্র খাদ্যসঙ্কট নেই। শ্রীশাস্ত্রী হিসেব উদ্ধার করে বলেছেন, আংশিক রেশন ব্যবস্থা বজায় রাখার মতো খাদ্যশস্য কেরলে প্রেরিত হয়েছে। তিনি এবং শ্রীকৃষ্ণমাচারী আরও জানিয়েছেন, গ্রামাঞ্চলে এবং শহরে রেশনের বরাদ্দও শীগগিরই বাড়িয়ে দেওয়া হবে।

শ্রী এ কে গোপালনকে লোকসভা ভবনের লবীতে অনশন করতে দেওয়া হবে না বলে স্পীকার মন্তব্য প্রকাশ করতেই সভাকক্ষে প্রচণ্ড উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। স্পীকার ঘোষণা করেন, লবী 'এ জাতীয় বিক্ষোভ প্রদর্শনের' উপযুক্ত স্থান নয়। শ্রীগোপালন পড়লেন বিপদে। তিনি কেরল নিয়ে বেশ কিছুদিন থেকে কলরব সুরু করেছিলেন। তাঁর সব পরিকল্পনা পণ্ড হতে দেখে একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। বীরদর্পে উঠে দাঁড়িয়ে কণ্ঠ সপ্তমে তুলে জানিয়ে দিলেন সমরে পিছু হঠবার পাত্র তিনি নন। পরিণতি যাই হোক না কেন, প্রতিজ্ঞা মাফিক ব্রত পালন তিনি করবেনই। শেষ অবধি তিনি উভয় কূলই রক্ষা করেছেন। অনশন সুরু করার কয়েক ঘণ্টা পরই শ্রীমহাবীর ত্যাগীর কাছ থেকে প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাসবাণী শুনে তা' ভঙ্গ করেছেন।

অনশনের সমর্থন কেউ না করলেও কেরলের পরিস্থিতির সরেজমিনে সমীক্ষার জন্য পার্লামেণ্টারী পার্টি প্রেরণের তিনি যে প্রস্তাব তুলেছিলেন, তার সমর্থন করেছেন অধ্যাপক এন জি রঙ্গ, শ্রীহীরেন মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীনাথ পাই। এ প্রস্তাবটি লোকসভার সদস্যগণ প্রধানমন্ত্রীর কাছে পরে পেশও করেছিলেন। তিনি নাকচ করে দিয়ে বলেছেন, সরকার কেরলের জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থাই করেছেন। এই সময়ে পার্লামেণ্টারী পার্টি প্রেরণ সমীচীন হবে না। তাতে বরং অযথা আতঙ্কেরই সৃষ্টি হবে।

লোকসভার অধ্যক্ষের মন্তব্যে শ্রীগোপালন কেন এতটা চটে গেলেন আমরা বুঝতে পারছি নে। গণতন্ত্রে অনশন সত্যাগ্রহ তো আখেরের হাতিয়ার। লোকসভার লবীতে বসে শেষ

● শ্রীগোপালন

অস্ত্র প্রয়োগের আগে কেরলের ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহের জন্য তিনি কি করেছেন? এ প্রশ্নের জবাব কেরলের অনশনক্লিষ্ট মানুষকে একদিন তাঁকে দিতেই হবে। কেরল তো তাঁর দলেরই প্রধান ঘাঁটি। ক' বছর আগে সেখানে তাঁরা কিছুদিন রাজত্বও করেছেন। এ রাজ্যের সমস্যা তাঁদের নখদর্পণে থাকবারই কথা।

খাদ্যসঙ্কট, দেশে দুর্ভিক্ষ আগেও দেখা দিত। সেকালের প্রাকৃতিক দুর্যোগেই মানুষকে চরম দুর্ভোগে ভুগতে হতো। এখন দুর্ভিক্ষ বেশিরভাগই সৃষ্টি করে অতিলোভী একদল মানুষ। কিভাবে, কারা, কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি করে কেরলকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে, সে কথা গোপালনের মত বিশুদ্ধ প্রোলেটারিয়েটের অজানা নয়। সেই কৃত্রিম অভাব সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রধান দায়িত্ব— একচেটিয়া অধিকার তাঁরাই তো গ্রহণ করেছিলেন। সে দায়িত্ব শ্রীগোপালন

ও তাঁর অনুগামীরা পালন করেছেন কি ? পালন করেন নি বলেই, আজ কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি গণমন অত্যন্ত

● রেঃ মাইকেল স্কট

বিরূপ। গণমানসে আসন ফিরে পাওয়ার জন্য যে কৌশল তিনি অবলম্বন করেছেন, তাতে আর কোন ফল হওয়ার আশা নেই। কেরলের আসন্ন নির্বাচনের মুখে তাঁর এ ভেল্কিকেও মানুষ মুখরক্ষার সামিল বলেই গণ্য করবে।

•　　•　　•

নাগাভূমি নিয়ে রেঃ মাইকেল স্কট রাজধানীতে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিলেন, শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের বিবৃতি তাকে আরও তীব্র করে তুলেছে। স্কট সাহেব সুচতুর কূটনীতিকের মত বলে ফেলেছেন, তাঁর কথাগুলো বিকৃত করে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর এ কথায় কাজ অবশ্য খুব বেশি হয় নি। তিনি এতদিন নাগাদের সুহৃদ হিসেবেই অন্দর ও বাহির মহলের তথ্যাদি সংগ্রহ করে এখন নাগাভূমিকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার কাজে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছেন। এ বিশ্বাস মানুষের মনে শিকড় গাড়তে সুরু করেছে। এমন কি, প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সহকর্মীরা পাদ্রী সাহেবের আচরণে ক্ষুণ্ণ হয়েছেন।

জয়প্রকাশজী তো নাগাদের পক্ষে ওকালতি করতে গিয়ে গোটা পার্লামেণ্ট ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়েছেন। তাঁর মতে, পার্লামেণ্টের সদস্যদের নাগা সমস্যার ব্যাপকতা ও প্রকৃতি সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই। পার্লামেণ্টের মেজাজ ও স্বর তাঁকে নাকি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলছে।

এই নারায়ণী বাণীতে লোকসভায় আবার ঝড় উঠেছিল। কয়েক-জন সদস্য শ্রীনারায়ণের গ্রেপ্তারের দাবিও উত্থাপন করেছিলেন। কল্পনা রচনা বিশারদ ভূদান নেতাটি নাগা সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন ব্যবস্থার কথা তুলেছেন। তিনি শত্রুভাবাপন্ন নাগাদের ভারতীয় ইউনিয়নে বাঁধার চাইতে সাংবিধানিক পথে নাগাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চান।

এ যুক্তি অবাস্তব ও উদ্ভট। সংবিধানের অনড় ধারাগুলোকে নড়বড়ে করে তুলে বিদ্রোহী নাগাদের তিনি স্ব-মর্যাদা দিতে চান, তার একটি মাত্র অর্থ দাঁড়ায়, বিদ্রোহী নাগাদের সমগ্র নাগাভূমির একমাত্র মুখপাত্র বলে গণ্য করতে হয়। নাগাভূমি ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য এবং সেখানে সংবিধানসিদ্ধ পদ্ধতিতে গঠিত রাজ্য সরকারের অস্তিত্বটাই বেমালুম অস্বীকার করতে হয়। কোন কোন মহলের ধারণা, শ্রীনারায়ণ নাগাভূমিকে সিকিম ও ভূটানের মর্যাদা দিয়ে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের ইঙ্গিত দিচ্ছেন।

● শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ

রেঃ স্কটের মতলবটা সহজেই বোঝা যায়। তিনি ফিজোর আশ্রয়দাতা। তাঁর গৃহে বসে, তারই পরামর্শে ফিজো নাগা-সমস্যাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যেতে চেষ্টার কসুর করেন নি। সে চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হওয়ার পরই রেঃ স্কট ভারতের বন্ধু সেজে নাগাভূমিতে প্রবেশ করে-ছেন। কিন্তু ভূদান নেতার এইসব অভাবনীয় পরিকল্পনা ভারতের দিক থেকে অত্যন্ত বিপদের। কারণ তিনি একজন ভারতীয় নাগরিক। তাঁর উক্তির ব্যাখ্যা বিদেশে বিভ্রান্তিরই সৃষ্টি করবে। তিনি মোহান্তের ভূমিকা অবলম্বন করে বিগত ক'বছর জোরে চালাও বাণী ঘাটে-বেঘাটে প্রচার করেছেন, তারপর তাঁকে নাগাভূমির জটিল সমস্যার নাক গলাতে দেওয়া কোন দিক থেকেই সমীচীন হয় নি। প্রথম থেকেই ভারত সরকারের সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

নাগাভূমি সম্পর্কে তাঁর ইঙ্গিতের প্রতিক্রিয়া হবে সুদূরপ্রসারী। নাগা নেতা কাইটো চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। সতৃষ্ণ নয়নে চীন তাকিয়ে আছে নাগাভূমির দিকে। ভূটানও তার অন্যতম লক্ষ্য। ভূটানের পরলোকগত রাজার মৃত্যুর পর ভারত সরকারের অস্তিত্ব অস্বীকার করে চীন শোক-সংবাদ সরাসরি পাঠিয়েছিল ভূটানে।

এক বছরের মধ্যে ভূটানের অবস্থা আয়ত্তে আনতে ভূটানাধিপতিকে দু'বার হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। ভূটানের প্রধানমন্ত্রী দোরজীকে হত্যার পিছনে বিরাট ষড়যন্ত্র ছিল। মহারাজার তৎপরতাতেই সেবারের ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে পড়ে। ভূটানের সৈন্যাধ্যক্ষ পর্যন্ত ষড়যন্ত্রের মামলায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

এবারে ভগবানকে বাদ দিয়ে মহারাজা, প্রধানমন্ত্রী ও দেশের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ নিয়েই নাকি প্রধান গোলযোগ বেঁধে ছিল। সৈন্যবাহিনীকে ভগবান, দেশ ও মহারাজার নামে আনুগত্যের শপথ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন মহারাজা স্বয়ং। প্রধানমন্ত্রী লেণ্ডুপ দোরজী সে নির্দেশ পালন করেন নি। এতেই গোলমালের সূত্রপাত হয়।

* * *

সুখের কথা ভূটানের পরিস্থিতি মহারাজার দ্রুত হস্তক্ষেপের পর বেশি দূর গড়াতে পারে নি। মহারাজা নিজে প্রশাসনের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং সৈন্যবাহিনীর ভার অর্পণ করেছেন রাজভ্রাতা দাসো ওয়াংচুকের ওপর। সৈন্যবাহিনীর সহকারী অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার উগিয়েন থাংবির সঙ্গে যে পাঁচজন অফিসার কর্তব্যচ্যুতির ভয়ে দেশত্যাগ করেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কোন কারণ নাকি ঘটে নি।

ভূটানের মহারাজা বিচক্ষণ ব্যক্তি। প্রজারা সকলেই মহারাজগত প্রাণ। কাজেই ভূটানের কুচক্রীরা সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক কোন বিদ্রোহ চালাতে পারে নি। জিগমে দোরজীর হত্যার পর ভূটানে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল, মহারাজা দেশে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তা' শান্ত হয়। মহারাজা এবারে এখানেও ভূটানের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন।

মহারাজার অনুপস্থিতিতে দু'বার ভূটানে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, ভারতের দিক থেকে তার গুরুত্ব কম নয়। দেখা যাচ্ছে, সীমান্তে যখনই চীনা চমূদের বিপুল সমাবেশ ঘটে, ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই ভূটানে একটা গোলযোগের সৃষ্টি হয়।

পাল্টা প্রজাতন্ত্রী 'ভূটান সরকারের' গুঞ্জনও উঠেছে। এ সব সম্প্রসারণশীল মনোভাবাপন্ন সাম্যবাদীদের মুক্তিফৌজের মারফতে পররাজ্যে প্রবেশের অধিকার ঘোষণার একটি মোক্ষম কৌশল। চীনের চক্রান্তের

● শ্রীলেণ্ডুপ দোরজী

বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হলে ভূটান ও ভারতের মিলিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন হবে। এই সীমান্ত-রাজ্যের স্বাধীনতা বিঘ্নিত হলে ভারতের স্বাধীনতাও বিপর্যস্ত হবে।

* * *

রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ দিল্লীতে রবীন্দ্রভবনে গত ২৬শে নভেম্বর জাতীয় পুস্তক সংস্থা (ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট) কর্তৃক আয়োজিত প্রথম জাতীয় গ্রন্থ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। সমস্ত ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত বইয়ের এমন চমৎকার প্রদর্শনীর আয়োজন করায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীচাগলা উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন জানান।

মহারাষ্ট্র ঃ

বোম্বাই ময়দানে আন্তর্জাতিক ইউকারিস্টিক কংগ্রেসের ঐতিহাসিক অধিবেশন হচ্ছে। ২রা ডিসেম্বর দেশ-বিদেশের ধর্মপ্রাণ দু' লক্ষ নর-নারী এখানে শ্রদ্ধাবনতচিত্তে অভিনন্দন জানাবেন পোপ ষষ্ঠ পলকে। তিনি এয়ার ইণ্ডিয়ার বিশেষ বিমানে ভ্যাটিক্যান থেকে আসছেন। সেখান থেকে তাঁর গাড়িও পাঠানো হবে বিমানযোগে। জেরুজালেমের পুণ্যভূমি পরিদর্শনে পোপ পল এই প্রথম বিদেশে আসছেন।

ধর্ম সম্মেলনের প্রতিনিধিদের জন্য বিভিন্ন হোটেলে দু' হাজার কক্ষ নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তা' ছাড়া, ক্যাথলিক সংস্থাগুলোর ষাটটি গৃহকে অতিথিদের আপ্যায়নের উপযোগী করে সজ্জিত করা হয়েছে। চার হাজারের মত প্রতিনিধি এর মধ্যেই এসে পৌঁচেছেন। আরও দু' হাজার দু' দিনের মধ্যে আসবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। অনেকে বন্ধু-বান্ধবের গৃহেও উঠেছেন।

বোম্বাই শহরের চেহারাই প্রায় ফিরে গিয়েছে। প্রধান রাস্তাগুলোকে আলোকমালায় সজ্জিত করা হচ্ছে। অনুষ্ঠানে কোন প্রকার জাঁকজমক ও আড়ম্বর পোপের বাঞ্ছনীয় নয়। যথাসম্ভব আড়ম্বর এড়িয়ে চলার চেষ্টাও করা হচ্ছে। তা' সত্ত্বেও এ অধিবেশনে খরচ হবে ছেচল্লিশ লক্ষ টাকা। ভারতের ক্যাথলিক-সমাজ বহন করবে খরচের সতের লক্ষ টাকা।

ময়দান থেকে হেলিকপ্টারযোগে টেলিভিশনের ফিল্ম যাবে শান্তাক্রুজ বিমান বন্দরে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় জেট বিমান সেগুলো নিয়ে উড়ে চলে যাবে ভারতের বাইরে।

আগত অভ্যাগতদের ভারতের পরিচয় দেবার জন্য বিরাট প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছে। ২১শে নভেম্বর

প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছেন শিক্ষামন্ত্রী শ্রী এম সি চাগলা । দর্শকের ভিড় বাড়ছে প্রতিদিনই। প্রদর্শনীর নাম দেওয়া হয়েছে---আমাদের উত্তরাধিকার। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সংস্থা ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলোর সুসজ্জিত মণ্ডপগুলো দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেছে।

ইউকারিস্টিক কংগ্রেসের প্রাক্কালে কয়েকটি ঘটনা বোম্বাই শহরের মর্যাদা কিছু ম্লান করে দিয়েছে। পোপ পলকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দনের এই প্রস্তুতিতে হিন্দুমহাসভা ও জনসঙ্ঘ বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করে ভারতের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কলঙ্কের কালিমা লেপন করেছে। বোম্বাই ও নয়াদিল্লীতে পোপকে ফিরে যাবার দাবিসম্বলিত প্রচার পত্র বিলি করা হয়েছে। অবশ্যি প্রাচীর-গাত্রে এই প্রচার-পত্রের পাশেই পোপকে স্বাগত জানিয়ে প্রচারিত প্রাচীরপত্রও দেখতে পাওয়া গেছে। জনসঙ্ঘ ও হিন্দুমহাসভার এই সাম্প্রদায়িক মনোভাব সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন প্রভাবই বিস্তার করতে পারে নি। কিন্তু বিদেশী নিরপেক্ষ দর্শক ও অভ্যাগতদের কাছে ভারতের মর্যাদা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। ভারতীয় ঐতিহ্য, ভারতের উদার আদর্শ এবং ভারতের অন্তরাত্মার সুমহান বাণীর সন্ধান যারা রাখেন না, তাঁরা ভিন্ন মন নিয়েই ভারত থেকে ফিরবেন।

এই ধর্মসম্মেলনের বিরুদ্ধে একটা শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য 'কালো পতাকা' নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শনের চেষ্টাও চলেছে। ধর্মকে যাঁরা রাজনীতির যূপকাষ্ঠে জুলুম করে ঠেলে দিতে চাইছেন, তাঁরা ভারতের কত বড় সর্বনাশ ডেকে আনছেন, আজ হয়তো বুঝতে পারছেন না।

মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী দেশাই জনসঙ্ঘ ও হিন্দুমহাসভার প্রতিনিধিদের সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, পোপ পলের অবস্থান কালে

● শ্রী দেশাই

মহানগরীতে কোন অশোভন ঘটনা ঘটলে সরকার সহ্য করবেন না। জনসঙ্ঘের নেতার শুভবুদ্ধির উদ্রেক হয়েছে বলেও শোনা যাচ্ছে। তাঁদের কথাবার্তায় সে মনের প্রকাশ্য কোন পরিচয় এখনো পাওয়া যায় নি।

* * *

জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর হত্যার প্রধান আসামী নাথুরাম গডসের ভাই গোপাল গডসে ও বিষ্ণু করকারের মুক্তির পর তাদের অভিনন্দনের আয়োজন এবং সেই সভাতে 'তরুণ ভারত' পত্রিকার সম্পাদকের উক্তি নিঃসন্দেহে মারাঠা জাতির একাংশের উগ্র মনের পরিচয় দিয়েছে। জনমত এতে বিক্ষুব্ধ ও উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল। 'তরুণ ভারতের' সম্পাদক শ্রী জি ভি কেটকার মাদ্রাজে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণের পর বলেছেন, প্রাণের ভয়ে তিনি মাদ্রাজে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন । গোপাল গডসে ও বিষ্ণু করকারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়েছে।

মধ্যপ্রদেশ :

মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ডি পি মিশ্র আবার নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন। বিন্ধ্যপ্রদেশ অঞ্চলের প্রতিমন্ত্রী আরেকটি উপদলের সৃষ্টি করে বসেছেন। এ দলটি গিয়ে মিশতে চেষ্টা করছে শ্রীদেশলেহরার সঙ্গে। এঁদের চেষ্টা হবে মিলিতভাবে হাই কমাণ্ডের ওপর চাপ দিয়ে ডঃ কৈলাসনাথ কাটজুকে ফিরিয়ে আনা।

দেশলেহরা ও মিশ্রের মধ্যে বিরোধ চলতে থাকায় কংগ্রেসের মর্যাদাহানির প্রশ্নটাই এখন বড় করে তোলার চেষ্টা চলেছে। কংগ্রেসকে বাঁচাবার খাতিরেই সর্বসম্মত নেতাকে মুখ্যমন্ত্রীর পদে ফিরিয়ে আনবার দাবি হাই কমাণ্ডের কাছে পেশ করা হবে।

দেশলেহরার অনুগামীরা এবং নতুন উপদলের প্রতিনিধিরা ইতিমধ্যে ডঃ কাটজুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়েছেন। ডঃ কাটজু এখনও মনস্থির করতে পারেন নি। ডঃ কাটজুকে রাজী করাতে পারলেই প্রভাবশালী একটি প্রতিনিধিদল নয়াদিল্লীতে গিয়ে হাই কমাণ্ডের কাছে হাজির হবেন।

শ্রীমিশ্রের 'প্রধান শিক্ষকসুলভ মনোভাব' নাকি মন্ত্রীরা অনেকেই সহ্য করতে পারছেন না। প্রায় এক বছর আগে এ-ঘটনার সূত্রপাত হয়। মুখ্যমন্ত্রী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের না জানিয়ে সেক্রেটারীদের কাছে ফাইল তলব করেছিলেন।

● শ্রী ডি পি ।

বাসের ভাড়া বৃদ্ধির ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, তাতে তাঁর অত্যন্ত অনুগত মন্ত্রীরাও বিরক্তিবোধ করেছেন।

গেল বছরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শ্রীমিশ্রের সাফল্যের প্রধান সহায়ক স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী শ্রীগোবিন্দনারায়ণ সিংকে সম্ভবত শীগ্‌গিরই মন্ত্রিসভা থেকে বিদায় নিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রীর

ডঃ কৈলাসনাথ কাটজু

বিরোধীদের তিনিই এখন নেতা। মুখ্যমন্ত্রীকে হটিয়ে ডঃ কাটজুকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করার অনভিপ্রায় জ্ঞাপক বিবৃতিতে শ্রীসিং স্বাক্ষর করতে অসম্মতি জানিয়েছেন। তাঁকে না জানিয়ে তাঁর দপ্তরের ফাইল মুখ্যমন্ত্রী তলব করার পর থেকেই তিনি বিরূপ হয়ে ওঠেন। প্রকাশ, শ্রীসিংকে দলে রাখতে না পেরে শ্রীসিং তাঁকে মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে দিতে চাইছেন। প্রয়োজন-বোধে তিনি গোটা মন্ত্রিসভাকে ঢেলে সাজাতেও নাকি দ্বিধা বোধ করবেন না।

গোয়া ঃ

রাজধানী পাঞ্জিম থেকে আট মাইল দূরে—সমুদ্র উপকূলের 'ভেল্লা গোয়ার' (পুরোনো গোয়ার) বম জেসাস গীর্জার অঙ্গনে ২৪শে নভেম্বর থেকে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী নরনারী সমবেত হয়েছিলেন সেণ্ট জেভিয়ারের পবিত্র শবাধারের পাশে। পুণ্যশ্লোক খৃস্টান সাধক সেণ্ট জেভিয়ারের পবিত্র শবাধার উন্মুক্ত করা হয়েছে সেদিন। বেয়াল্লিশ দিন ধরে চলবে তীর্থযাত্রীর বিরামহীন স্রোত ভেল্লা গোয়ার গীর্জায়। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর মাত্র তিনবার এ সুযোগ এসেছিল—১৯৫২, ১৯৬০ ও ১৯৬১ সালে। পরশাসনমুক্ত গোয়াবাসী-দের কাছে কারুকার্যখচিত শবাধারটি এই প্রথম উন্মুক্ত হল। সেণ্ট জেভিয়ারের পবিত্র দেহ দর্শনের সুযোগ লাভকে খৃস্টানগণ জীবনের পরম সৌভাগ্য এবং পুণ্যকর্ম বলে মনে করেন।

১৫০৬ সালে ৭াতই এপ্রিল স্পেনের নাভারাতে সেণ্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ারের জন্ম। পোপ ও পর্তুগাল রাজের প্রতিনিধি হিসেবে ১৫৪২ সালে তিনি গোয়ায় অবতরণ করেন। ভারতে অবতরণের দশ বছর পরে তিনি চীনের উপকূলে দেহরক্ষা করেন। সঙ্গে ছিলেন অনুগামী ও শিষ্য এ্যাণ্টনিও। তিনি কোনরকমে গুরুর শেষকৃত্য সমাপন করেন। সাধকের পবিত্র দেহাবশেষ যাতে হিংস্র শ্বাপদের নখরাঘাতে শতছিন্ন না হয়, সেই উদ্দেশ্যে এ্যাণ্টনিও সেণ্ট জেভিয়ার দেহটি প্রচুর পরিমাণে চূণ দিয়ে ঢেকে দিয়ে ছিলেন। খবর পেয়ে মালাক্কা থেকে পর্তুগীজরা এসে তাঁদের ধর্মযাজকের মরদেহ তুলে নিয়ে যান ক্যাণ্টনে। পরে নিয়ে আসা হয় গোয়াতে। তার পর থেকেই গোয়া খৃস্টান-সমাজের অন্যতম তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

চল্লিশ বছর আগেও সেণ্ট জেভিয়ারের দেহটি স্পর্শ করে ভক্তি-পুত চিত্তে দর্শকগণ প্রণাম করতে পারতেন। ১৯৫২ সালেও কেউ কেউ সাধকের পায়ে চুমু খেয়ে পুণ্য অর্জনের বাসনা তৃপ্তি করেছেন। এর পরই সব নিষিদ্ধ হয়েছে—একটি কাচের আধারে দেহটি বন্ধ করে রাখা হচ্ছে। তাই এখন আর কেউ দেহ স্পর্শ করতে পারেন না।

মাদ্রাজ ঃ

রাজ্য সরকারের নয়া ব্যবস্থা মানুষকে অর্ধাশনে দিন কাটাতে হচ্ছে শহরের বিশ লক্ষ মানুষকে চোরা বাজারের গলিপথে খাদ্যের সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরতে হচ্ছে। সরকার মাথাপিছু এক লিটার চাল ও এক লিটার গম ব্যবস্থা করেছেন। বারো বছরের কম যাদের বয়স তাদের কেলা হয়েছে শিশুর পর্যায়ে।

এ ব্যবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করছে অসাধু ব্যবসায়ী-সমাজ। আংশিক রেশন প্রবর্তনের পরই তারা নখদন্ত বিস্তার করে চারদিক থেকে আক্রমণ চালিয়েছে। খোলাবাজার থেকে খাদ্যশস্য রাতারাতি সরিয়ে নিয়ে কালো-বাজার জমজমাট করে তুলেছে। খোলা-বাজারে এখন আর একদানা খাদ্যশস্যও পাওয়া যাচ্ছে না। বাজারের অবস্থা দেখে চাল ও গম কেনার হিড়িক পড়ে গেছে। সুযোগ তার পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করছে চোরাকারবারী ব্যবসায়ীর দল। মানুষ প্রাণ বাঁচাবার দায়ে চোরাকারবারী-দের কাছে আত্মসমর্পণ করছে। টাকা যাদের ট্যাঁকে আছে, তারা চালের জন্য যে-কোন মূল্য দিতে একটু দ্বিধা করছে

শ্রীভক্তবৎসলম

না। সরকারী কর্মচারীরা পর্যন্ত কালো-বাজার থেকে চাল কিনতে বাধ্য হচ্ছে।

রেশনের পরিমাণ অবিলম্বে বৃদ্ধি করতে না পারলে বাজারে অরাজকতা যাবে আরও বেড়ে। আংশিক রেশন চালু রাখাও সরকারের পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে উঠবে। এর মধ্যেই অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠেছে। সকলের মুখেই এক কথা শোনা যাচ্ছে—সরকার পূর্বপ্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নি। মাস-খানেক আগেও, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীভক্তবৎসলম বলেছিলেন, মাথাপিছু দৈনিক আট আউন্স চাল ও আট আউন্স গমের বরাদ্দ করতে না পারলে রাজ্য সরকার কোন রকমের রেশনই চালু করবেন না। এতে এই ধারণাই হয়েছিল, উপযুক্ত খাদ্যভাণ্ডার গড়ে তোলার জন্য সরকার সময় নিচ্ছেন মাত্র। এদিকে অবস্থা সামলাতে না পেরে সরকার তাড়াতাড়ি রেশন প্রথা চালু করে দিতে বাধ্য হয়েছেন।

আটঘাট না বেঁধে—উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করে হঠাৎ আংশিক রেশন প্রবর্তনের ফলেই আজ মাদ্রাজে চরম দুর্গতি দেখা দিয়েছে। এখন বলা হচ্ছে অন্ধ্র থেকে যথাসময়ে খাদ্যশস্য এসে না পড়াতেই অবস্থার এতটা অবনতি হয়েছে।

কেন্দ্রের সাহায্য ভিন্ন এ সঙ্কট থেকে মাদ্রাজ ত্রাণ পেতে পারে না। রেশনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রের সাহায্য নাকি চেয়ে পাঠিয়েছেন। কেরলের ঘটনার পুনরাবৃত্তি মাদ্রাজে যাতে না ঘটতে পারে, তার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত হবে।

রাজস্থান ঃ

রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা দপ্তর চতুর্থ পরিকল্পনার একটা কাঠামো তৈরি করে ফেলেছেন। ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহেই রাজ্য পরিকল্পনা পরিষদের বৈঠকে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। পরিষদ পর্যালোচনার পর কিছুটা কাটছাঁট করবেন নিশ্চয়ই।

চতুর্থ পরিকল্পনার নক্সায় ব্যয়-বরাদ্দ ধরা হয়েছে দু'শ' সত্তর কোটি টাকার। তৃতীয় পরিকল্পনায় ব্যয় ধরা হয়েছিল দু'শ' বত্রিশ কোটি টাকা। এ পরিকল্পনা রচনাকালে সরকার অবশ্য খুবই সতর্কতা অবলম্বন করেছেন।

তৃতীয় পরিকল্পনায় রাজস্থান খাল ও পঙদাম অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ দু'টি প্রকল্পের জন্য ব্যয়-বরাদ্দ ছিল পঁয়ষট্টি কোটি টাকার। রাজস্থান খালের সমগ্র ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় সরকার বহন করতে সম্মত হয়েছেন। সম্ভবত বিধিবদ্ধ একটি সংস্থা গঠন করে প্রাথমিক পর্যায়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণ নিয়ে কাজ আরম্ভ হবে। এই দুটি প্রকল্প বাদ দিলে, তৃতীয় পরিকল্পনা ছিল ১৬৭ কোটি টাকার। চতুর্থ পরিকল্পনায় কার্যত একশ' কোটি টাকার বেশি ব্যয়েরই প্রস্তাব করা হচ্ছে।

রাজ্য পরিকল্পনা দপ্তরের হিসেবে তৃতীয় পরিকল্পনাকালের প্রকল্প-গুলোর পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে আরও চল্লিশ কোটি টাকা লেগে যাবে। তা' ছাড়া, বর্তমান সঙ্গতির কথাও নয়া রূপরেখা রচনাকালে পুঙখানুপুঙখরূপে বিচার করে দেখা হয়েছে। অধিক অর্থ জোগানো সম্ভব নয় বলেই বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় নি। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে বাৎসরিক আট শতাংশ আয় বৃদ্ধি পাবে, আশা করা গিয়েছিল। সে আশা পূরণ হয় নি।

কর্ম-সংস্থানের দিক দিয়েও তৃতীয় পরিকল্পনা রাজ্যের দাবি পূরণ করতে পারে নি। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে কম হলেও ছ' লক্ষ লোক বেকার থেকে যাবে। বে-সরকারী মহলের মতে, বেকারের সংখ্যাটা খুবই কম করে দেখাবার চেষ্টা হয়েছে। সরকারী হিসেব মেনে নিলেও চতুর্থ পরিকল্পনায় চোদ্দ লক্ষ লোকের জীবিকার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হবে; কারণ চতুর্থ পরিকল্পনাকালের মধ্যে শ্রমজীবীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে আট লক্ষের মত। সরকারী পরিকল্পনা-কারগণ দশ লক্ষের বেশি মানুষের জীবিকার ব্যবস্থা চতুর্থ পরিকল্পনায় করতে পারেন নি।

চতুর্থ পরিকল্পনার নক্সা দেখে রাজনৈতিক মহল অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছেন। তাঁদের মতে, এ পরিকল্পনায় আগামী দিনের আশার কথা কিছুই নেই। রাজস্থান ভারতের একটি অনগ্রসর রাজ্য। অন্য রাজ্যের পাশাপাশি টেনে তোলার প্রয়োজন সমধিক। সরকারের পরিকল্পনায় তেমন কোন ব্যবস্থাই নেই। একটি অনগ্রসর রাজ্যের প্রয়োজন মিটিয়ে তার দ্রুত উন্নয়নের জন্য আরও বলিষ্ঠ পদক্ষেপেরই প্রয়োজন ছিল।

* * *

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী সম্প্রতি এখানে এসে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যে আলাপ-আলোচনা করে গেছেন, রাজস্থানের আর্থিক কাঠামোতে প্রভাব বিস্তার করবে প্রভূত পরিমাণেই। কোন কোন ক্ষেত্রে সে লক্ষণটা এর মধ্যে বেশ প্রকট হয়ে উঠেছে।

রাজস্থান খালের জন্য একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা গঠনের প্রস্তাব এবং এই খালের চারদিকে বসতি স্থাপনের বিষয় সম্পর্কে এখনও কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নি। তবে, এটা ঠিক, প্রস্তাবিত সংস্থার অর্থের ব্যবস্থাটা কেন্দ্রীয় সরকারই করবেন। জমি বিক্রির টাকা, বাজার ও মণ্ডীতে ছোট ছোট পুটে জমি বিক্রির টাকা এবং মূলধনী খাতে যে-আয়টা হবে, সবই চলে যাবে এই সংস্থার হাতে। পৌনঃপুনিক আয়টাই কেবল রাজ্য সরকার পাবেন।

এ ব্যবস্থা নাকি আগামী আর্থিক বছরেই চালু হবে। ডিসেম্বর মাসেই খালের একটা পাকাপাকি ব্যবস্থাপনার জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটী বসবে নয়াদিল্লীতে। রাজ্য সরকার কমিটীর সামনে পেশ করবেন প্রস্তাবিত সংস্থার একটি খসড়া।

আন্তর্জাতিক

• কোলে শিশুসহ স্ট্যানলিভিলের একজন বিমূঢ় বাস্তুহারা মাতা

কঙ্গো ঃ

স্ট্যানলিভিলে বেলজিয়ান প্যারা সৈন্য প্রেরণের ফলে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে আফ্রিকা ও এশিয়ায় তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিমী প্রভাবমুক্ত দুনিয়া এই ঘটনাকে কঙ্গোর স্বাধীনতা বিপন্ন করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত বলে অভিহিত করেছে।

কঙ্গোর বিদ্রোহীদের কবল থেকে সহস্রাধিক শ্বেতাঙ্গ নর-নারী ও শিশুদের রক্ষা করার জন্য বেলজিয়াম ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মিলিতভাবে এই অভিযান পরিচালনা করেছে। আর বৃটেন এই কার্যে তাদের সহায়তা করেছে। আটলাণ্টিক মহাসাগরে বৃটিশ অধিকৃত দ্বীপ অ্যাচেনশন থেকে ১২টি মার্কিন বিমানে করে ৫৬৫ জন বেলজিয়ান প্যারা সৈন্য ২৪শে নভেম্বর অতর্কিতে স্ট্যানলিভিলে অবতরণ করে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ময়সে টি শোম্বের সরকারের কঙ্গোলী ব্রিগেডের তিন হাজার সৈন্যও স্ট্যানলিভিল শহরে প্রবেশ করে। এই যুক্ত আক্রমণের মুখে স্বাভাবিকভাবেই বিদ্রোহীরা সুবিধা করে উঠতে পারে নি। শহর ছেড়ে বিদ্রোহীরা আশেপাশে ঝোপঝাড়ে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তারপর মার্কিন বিমানে করে উদ্ধারপ্রাপ্ত শ্বেতাঙ্গদের স্ট্যানলিভিল থেকে টি শোম্বের রাজধানী লিওপোল্ডভিলে এবং অনেককে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

বিদ্রোহীদের হাতে স্ট্যানলিভিল শহর আসার পর থেকেই বিদেশী শ্বেতাঙ্গরা বন্দী রয়েছে। তাদের অন্যত্র যেতে দেয়া হয় নি। বিদ্রোহীদের পক্ষ থেকে এদের যুদ্ধের 'প্রতিভূ' বা 'Hostage' হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। বিদ্রোহী রাষ্ট্রপতি ক্রিস্তপ্ গিনেই বারেবারে বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বেলজিয়াম কর্তৃক টি শোম্বেকে সাহায্য প্রদান বন্ধ না করলে এদের ছাড়া হবে না। অবিলম্বে সাহায্যদান বন্ধ না করলে এদের মেরে ফেলা হবে বলেও ভয় দেখানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই অনেককে মেরে ফেলা হয়েছে বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। মার্কিন ধর্মযাজক ডাঃ পল কার্লসনকে বিদ্রোহীরা হত্যা করেছে, এই সংবাদে মার্কিন মহল খুবই উদ্বিগ্ন হয়েছে। ডাঃ কার্লসন কঙ্গোবাসীদের সেবাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু বিদ্রোহীদের মতে তিনি মার্কিনীদের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করছিলেন। তাই তাঁকে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কেনিয়ার রাষ্ট্রপতি জোমো কেনিয়াট্টার অনুরোধে ডাঃ কার্লসনের ফাঁসি দু'বার বন্ধ রাখা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কার্লসনকে গুলী করে মারা হয়। এই সংবাদে এবং অন্যান্যদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বেলজিয়াম স্ট্যানলিভিলে সৈন্য প্রেরণ করেছে।

বেলজিয়ামের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পল হেনরী স্পাক ব্রাসেলসে ঘোষণা করেছেন, এক হাজার বিদেশী নর-নারী ও শিশুকে রক্ষা করার জন্যই সৈন্য প্রেরণ করা হয়েছে। এই সৈন্যদল কঙ্গোর আভ্যন্তরীণ

ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না—বিদ্রোহ দমন করার জন্য বেলজিয়ান সৈন্য প্রেরিত হয় নি। মার্কিন সরকারের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির কাছে আদলাই স্টিভেনসনও একই কথা বলেছেন। বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকেও বলা হয়েছে, নিছক মানবিকতার জন্যই তারা এই অভিযানে সহায়তা করেছে।

কিন্তু প্রশ্ন হল: বিদ্রোহীদের হাত থেকে এই শ্বেতাঙ্গ প্রতিভূদের রক্ষার জন্য বিদেশী সৈন্য প্রেরণ ছাড়া কি আর কোন পথ ছিল না? একথা ঠিক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বেলজিয়াম টি শোম্বেকে সাহায্যদান বন্ধ করবে না। কারণ, এদের সাহায্য ভিন্ন টি শোম্বের পক্ষে এক মুহূর্তও টিকে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু এ ছাড়াও তো পথ ছিল। আন্তর্জাতিক রেডক্রশ প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে প্রতিভূদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করা যেত। জোমো কেনিয়াটার চেষ্টায় একটা মীমাংসার চেষ্টাও চলছিল। কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে স্ট্যানলিভিলের বিদ্রোহী কঙ্গোলীদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী টমাস কানজার সঙ্গে কেনিয়ার মার্কিন রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম এ্যাটউডের আলোচনা সুরু হয়েছিল। কেনিয়াটার অনুরোধে বিদ্রোহীরা কার্লসনের মৃত্যুদণ্ড স্থগিত রাখতে

• পল হেনরী স্পাক

সম্মত হয়েছিল। এই অবস্থায় সতর্কতার সঙ্গে ধীর-স্থিরভাবে চেষ্টা করলে প্রতিভূ উদ্ধারের একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হত। কিন্তু হঠাৎ এইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বেলজিয়ামের সৈন্য প্রেরণে অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করেছে।

মার্কিন ও বেলজিয়ানদের সৈন্য প্রেরণের ফলে বিদ্রোহীরা পিছু হঠেছে, এবং অনেক শ্বেতাঙ্গকে উদ্ধার করাও সম্ভব হয়েছে। সাময়িকভাবে স্ট্যানলিভিলে টি শোম্বের কর্তৃত্বও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু বরাবর তো এ রকম থাকবে না। বিদ্রোহীরা আবার শক্তি সঞ্চয় করবে এবং স্ট্যানলিভিলও তারা পুনরুদ্ধার করবে। কঙ্গোর জটিলতা এতে না কমে আরও বাড়বে।

বিশ্বের সর্বত্র, বিশেষ করে আফ্রিকায় মার্কিন ও বেলজিয়ান সৈন্য প্রেরণের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। কায়রো ও খার্তুমে মার্কিন দূতাবাস আক্রান্ত হয়েছে। কায়রোয় বিক্ষুব্ধ আরবীয়রা মার্কিন দূতাবাস পুড়িয়ে দিয়েছে। মস্কোয় কয়েক হাজার আফ্রিকীয় ছাত্র মার্কিন ও বেলজিয়ান দূতাবাস আক্রমণ করে ইট-পাটকেল ছুঁড়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন, যুগোশ্লাভিয়া, চীন এবং প্রায় সকল আফ্রিকীয় রাষ্ট্র এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে অবিলম্বে মার্কিন ও বেলজিয়ান সৈন্য প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে। ভারত এইসব রাষ্ট্রের মত তীব্র ভাষায় মার্কিন ও বেলজিয়ান সরকারের সমালোচনা না করলেও, এই ব্যাপারে গভীর 'উদ্বেগ' প্রকাশ করেছে এবং কঙ্গোয় বিদেশী হস্তক্ষেপ অবসানের দাবি জানিয়েছে। কঙ্গোর সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব কঙ্গোবাসীদের হাতেই ছেড়ে দেয়া উচিত, এই হল ভারতের বক্তব্য।

প্রতিভূ উদ্ধারটা একটা উপলক্ষ মাত্র, মার্কিন ও বেলজিয়ান সৈন্য প্রেরণের আসল উদ্দেশ্য বিদ্রোহীদের দমন করে স্ট্যানলিভিল অঞ্চলে টি শোম্বের কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা—এই হল সমাজবাদী শিবির ও নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগোষ্ঠীর অভিমত।

আফ্রিকা ঐক্য সংস্থার পক্ষ থেকে কঙ্গো-সমস্যা আলোচনার জন্য আফ্রিকার রাষ্ট্রপ্রধানদের এক সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদেও বিষয়টি তোলার চেষ্টা হচ্ছে। সুদান ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে, কঙ্গোর স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এবং মার্কিন ও বেলজিয়ান সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকে ব্যর্থ করার জন্য সুদানের পক্ষ থেকে কঙ্গোর বিদ্রোহীদের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে ও অন্যান্য প্রকারে সাহায্য করা হবে।

একদিকে মার্কিন ও বেলজিয়ান সাহায্যপুষ্ট টি শোম্বে-কাসাভুভু-মোবুটু চক্র এবং অপরদিকে আফ্রিকার অন্যান্য দেশের সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্রোহী দল, এদের মধ্যে চূড়ান্ত সংঘর্ষের ব্যাপক মহড়া চলেছে সারা কঙ্গো জুড়ে।

বৃটেন:

হ্যারল্ড ম্যাকমিলান ও আলেকজাণ্ডার ডগলাস-হিউমের নেতৃত্বে রক্ষণশীল দল বৃটেনকে প্রায়

• জোমো কেনিয়াটা

দেউলিয়া বানিয়ে ছেড়েছে। শ্রমিক দল শাসন ক্ষমতা হাতে নিয়েই দেখে, বৃটেনের অর্থনৈতিক অবস্থা অন্তিম-দশায় উপস্থিত।

অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর জেম্‌স্ ক্যালাঘান প্রথমেই যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তা হল বৃটেনের সর্ব-

• জেমস ক্যালাঘান

প্রকার আমদানীর ওপর শতকরা ১৫ ভাগ সারচার্জ বৃদ্ধি। এর ফলে বৃটেনের বৈদেশিক বাণিজ্যের লেনদেন ব্যালান্সের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হবে।

সম্প্রতি আবার ক্যালাঘান বৃটেনে ব্যাঙ্কের সুদের হার শতকরা ৫ ভাগ থেকে ৭ ভাগ বৃদ্ধি করেছেন। যুদ্ধের পর বৃটেনে ব্যাঙ্কের সুদের হার কখনও এতটা বৃদ্ধি পায় নি।

বৃটেনের অর্থনৈতিক অবস্থা এতদূর খারাপ হয়ে পড়েছে যে, সর্বত্র রটে গিয়েছিল—এবার স্টার্লিং পাউণ্ডের মূল্য হ্রাস বা 'devaluation' করা হবে। এর ফলে সাময়িকভাবে আর্থিক বিপর্যয় রোধ করা সম্ভব হলেও, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্টার্লিং-এর প্রভাব কমে যাবে। শেষ পর্যন্ত বোধ হয় আর এবার মূল্যহ্রাসের প্রয়োজন হল না। ওয়াশিংটন থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, ১১টি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বৃটেনকে ৩০০ কোটি ডলার ঋণ দেবে। এই ঋণের সাহায্যে আপাতত স্টার্লিং-এর মূল্যমান বজায় রাখা হবে এবং বৃটেন নিশ্চিত-অর্থনৈতিক সঙ্কটকে অতিক্রম করতে সক্ষম হবে। অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, ক্যানাডা, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, ইতালী, জাপান, হল্যাণ্ড, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৃটেনকে এই ঋণ দিতে সম্মত হয়েছে।

আমদানীর ওপর সারচার্জ বসানোর ফলে ভারত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভারতের চা ও পাটজাত দ্রব্যের বিক্রয় বৃটেনে কমে যাবে। আবার এবারের ব্যাঙ্ক রেট বৃদ্ধির ফলেও ভারতের অসুবিধা হবে। বৃটেন থেকে ভারত যে সব জিনিস আমদানী করবে, তার দাম বেড়ে যাবে।

ভারতকে বিপদে ফেলা নিশ্চয়ই শ্রমিক সরকারের উদ্দেশ্য নয়, তবু ভারত অসুবিধা ভোগ করছে, একথা সত্য। রক্ষণশীল সরকার যেন শ্রমিক সরকারকে জব্দ করার জন্য ইচ্ছে করেই এ অবস্থা সৃষ্টি করে গেছে।

সোভিয়েট ইউনিয়ন ঃ

রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগদানের পথে ভারতের পররাষ্ট্র-মন্ত্রী সর্দার স্বরণ সিং মস্কো গিয়েছেন। সোভিয়েট ইউনিয়নে নেতৃত্ব বদলের পর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মস্কো গিয়েছিলেন, তবু পররাষ্ট্রমন্ত্রীরূপে সর্দার স্বরণ সিং-এর এই সফর বেশি তাৎপর্যপূর্ণ।

সর্দার স্বরণ সিং মস্কোয় প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রে গ্রোমিকো ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ভারত-সোভিয়েট সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন।

সর্দার স্বরণ সিং-এর সম্মানার্থে আয়োজিত ভোজসভায় সোভিয়েট পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রে গ্রোমিকো যে বক্তৃতা করেন, তা ভারতের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ক্রুশ্চেভের

• স্বরণ সিং

পতনের পর ভারত সম্পর্কে সোভিয়েট মনোভাবের কোন পরিবর্তন হয় নি, একথা আভাসে-ইঙ্গিতে নানাভাবে বলা হলেও, সোভিয়েট নেতৃত্বের প্রথম সারির ব্যক্তিদের মধ্যে গ্রোমিকোই বোধ হয় প্রথম সে কথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন।

গ্রোমিকো ভোজসভায় বলেন, (১) সোভিয়েট ইউনিয়ন ভারতের সঙ্গে পূর্ণ বন্ধুত্ব রক্ষা করে চলবে, (২) সোভিয়েট ইউনিয়ন ভারতের পররাষ্ট্রনীতির প্রশংসা করে এবং ভারতের জোট-নিরপেক্ষতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মনোভাবের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, (৩) ভারতকে সাধ্যমত অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য দেবার নীতি সোভিয়েট ইউনিয়ন অনুসরণ করবে এবং ইতিমধ্যে যে সব সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা পালন

করা হবে এবং (৪) কাশ্মীর সম্পর্কে সোভিয়েট ইউনিয়নের নীতি অপরিবর্তিত রয়েছে,—অর্থাৎ কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ, সোভিয়েট ইউনিয়ন একথা স্বীকার করে।

কাশ্মীর সম্পর্কে সোভিয়েট ইউনিয়নের এই নীতির কথা সোভিয়েট ইউনিয়নের সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী লাপিনও তাঁর সাম্প্রতিক পাকিস্তান সফরের সময় পাকিস্তানী কর্তাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন।

ক্রুশ্চেভের পতনের ফলে ভারত সম্পর্কে সোভিয়েট নেতাদের মনোভাবের যে কোন পরিবর্তন হয় নি, গ্রোমিকোর এই স্পষ্ট ঘোষণার পর সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রইল না।

• আন্দ্রে গ্রোমিকো

সর্দার স্বরণ সিং এবার নিশ্চিন্ত হয়ে রাষ্ট্রসংঘে যেতে পারবেন। দিল্লীতেও সরকারী কর্তারা স্বস্তিবোধ করবেন।

ইতালী ঃ

রোমের ফিউমিসিনো বিমান বন্দরের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে কূটনৈতিক জগতে রীতিমত আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে।

কায়রো অভিমুখে প্রেরিতব্য একটি ট্রাঙ্ক থেকে মরদেহাই বেন

• লুক

মাসুদ লুক নামে একজন ইহুদীকে পাওয়া গেছে। সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের দূতাবাস থেকে প্রেরিত কূটনৈতিক ছাপ মারা এই ট্রাঙ্কটি বিমান বন্দরে একটি আরব বিমানের জন্য রাখা হয়েছিল। যে কুলি এই ট্রাঙ্কটি নিয়ে যাচ্ছিল সে হঠাৎ ট্রাঙ্ক থেকে ইতালীয় ভাষায় 'আমাকে বাঁচাও! আমাকে সাহায্য করো!! এরা সব খুনী!!!' এই কথা শুনে বিস্মিত হয়। তারপর সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের দূতাবাসের কর্মচারীদের আপত্তি সত্ত্বেও ট্রাঙ্কটি খোলা হয় এবং দেখা যায়, তার মধ্যে বেশ কায়দা করে একজন মানুষকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। যাতে শ্বাসরোধ হয়ে লোকটি মারা না যায়, তার জন্য ট্রাঙ্কের গায়ে অতি ক্ষুদ্র কয়েকটি ফুটো রাখা হয়েছে।

ট্রাঙ্ক থেকে উদ্ধার করা ব্যক্তিটি জাতিতে ইহুদী। তিন বৎসর পূর্বে সে ইজরায়েল থেকে কায়রো পালিয়ে যায় এবং সেখানে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তির কাজ গ্রহণ করে। কায়রো বেতার থেকে লুক দীর্ঘদিন নিয়মিতভাবে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করে। কিছুদিন হল তাকে নেপলসে ন্যাটো ঘাঁটিতে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের পক্ষে গুপ্তচরের কাজ করতে পাঠানো হয়।

লুকের কথা থেকে জানা যায়, সে তার মাইনে বৃদ্ধির জন্য দাবি জানাতে রোমের সংযুক্ত আরব দূতাবাসে এসেছিল। দুজন আরবীয় তাকে একটি রেস্টুরেন্ট থেকে জোর করে ধরে

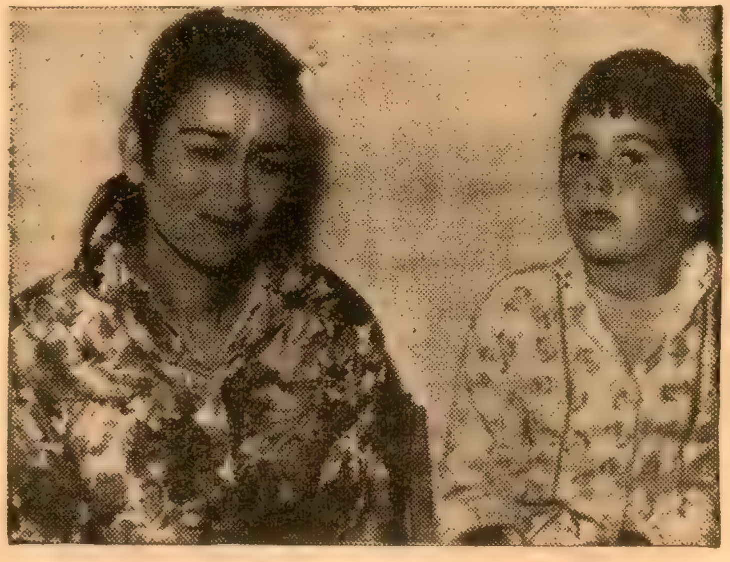

• চার বছরের একটি সন্তানসহ মিসেস লুক

নিয়ে যায় এবং কিছু খাইয়ে অচেতন করে তাকে এইভাবে কায়রো পাঠাবার চেষ্টা করে।

যে দুজন আরবীয় লুককে গোপনে কায়রো পাঠাবার চেষ্টা করে—ইতালী সরকার তাদের রোম থেকে বহিষ্কারের আদেশ দিয়েছে। এই দুজন আল সঈদ ও আল নেকলাই এবং আর একজন আদেল ইসমাইল সালেম রোম থেকে কায়রো চলে গিয়েছে। লুককেও তার ইচ্ছানুসারে ইজরায়েল পাঠানো হয়েছে। সেখানে তাকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার জন্য বিচারের সম্মুখীন হতে হবে।

এখন কথা হল, লুককে হঠাৎ এভাবে গোপনে কায়রো পাচার করা হচ্ছিল কেন? অনেকেরই ধারণা, লুক আসলে ইজরায়েলের গুপ্তচর। সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের পক্ষে কাজ করার নাম করে প্রকৃতপক্ষে সে ইজরায়েলের পক্ষেই গুপ্তচরবৃত্তি করছিল। এই সত্য জানতে পেরেই সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের রোম দূতাবাসের পক্ষ থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য লুককে কায়রো পাঠানো হচ্ছিল। কিন্তু মাঝ থেকে বিমান বন্দরে বিমান আসতে ঘণ্টাখানেক বিলম্ব হওয়াতেই সব ফন্দী ভেস্তে গেল। লুক যেভাবে তাকে ইজরায়েলে পাঠাবার জন্য ইতালী সরকারের কাছে কাতর প্রার্থনা জানিয়েছে, তাতেও এই সন্দেহই হয়।

যে ট্রাঙ্কে করে লুককে পাঠানো হচ্ছিল, তা দেখে ইতালীয় কাস্টমস কর্মচারীদের ধারণা হয়েছে, এ ট্রাঙ্ক পূর্বেও এভাবে লোক পাচারের জন্য ব্যবহার হয়েছে। কোন বাক্স বা প্যাকেটে দূতাবাসের ছাপ থাকলে কাস্টমস তা খোলে না। তা হলে এ রকম ব্যাপার কি অনেকেই করে নাকি?

পাকস্তান ঃ

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে 'বেসিক ডেমোক্রাটদের' নির্বাচনে সম্মিলিত বিরোধী দলগুলির বিরাট সাফল্য লাভের উল্লাস বোধ হয় আর বেশি দিন স্থায়ী হচ্ছে না। ইতিমধ্যেই বিরোধী দলগুলি ভাবতে সুরু করেছে, 'নির্বাচনী কলেজের' অধিকাংশ আসনে তারা জয়লাভ করা সত্ত্বেও, শেষ পর্যন্ত আয়ুব খাঁই রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের এখনও তিন মাস বাকি। এই তিন মাসে আয়ুব খাঁ দল ভাঙানোর সর্বপ্রকার চেষ্টা করবেন। এই চেষ্টা এখনই সুরু হয়ে গেছে। নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল বের হবার পূর্বেই আয়ুব খাঁ সকল 'বেসিক ডেমোক্রাট'র কাছে অভিনন্দনপত্র পাঠিয়েছেন। এই অভিনন্দনপত্রে তিনি স্পষ্টই বলেছেন, তাঁকে ভোট না দিলে অসুবিধার সৃষ্টি হবে। বিরোধী দল নির্বাচিত হলে পাকিস্তানে বিপর্যয় দেখা দেবে। বেসিক ডেমোক্রাটরূপে শাসক-পক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করলে তারা অনেক 'সুযোগ-সুবিধা' পাবে, এমন ইঙ্গিতও এই পত্রে করা হয়েছে। বিরোধী পক্ষের কাউন্সিলপন্থী মুসলিম লীগ দলের সভাপতি জেড এইচ লারি আয়ুব খাঁর এই অভিনন্দনপত্রের তীব্র সমালোচনা করে একে স্বাধীন নির্বাচনের বিরোধী কাজ বলে অভিহিত করেছেন।

• আয়ুব খাঁ

আয়ুব খাঁ আরও ঘোষণা করেছেন, বেসিক ডেমোক্রাটদের কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করার জন্য শীঘ্রই একটি স্বল্প সময়ের শিক্ষা-শিবির খোলা হবে।

• ফতেমা জিন্না

সরকারের উর্ধ্বতন অফিসারদের কাছে বেসিক ডেমোক্রাটরা তাঁদের কাজ শিখবেন। এ ব্যবস্থা আর কিছুই নয়, আয়ুব খাঁর বাছাই করা লোক দিয়ে বেসিক ডেমোক্রাটদের অধিক সংখ্যায় নিজের দলে টানার চেষ্টা।

আয়ুব খাঁ বেশ বিচক্ষণ লোক দেখা যাচ্ছে। নির্বাচনী কলেজ গঠনের পর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মাঝে তিন মাস সময় রেখেছেন। প্রয়োজন হলে এই সময়ের মধ্যে প্রলোভন, ধমক ইত্যাদি বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্য নেয়া যাবে।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফল যাই হোক, পাকিস্তানের রাজনীতি এখন আর এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আবদ্ধ থাকবে না। এই নির্বাচনকে উপলক্ষ করে দেশের উভয় অংশে যে ব্যাপক গণজাগরণ হয়েছে, তার ফলে পাকিস্তানের রাজনীতির গতি অবশ্যই পরিবর্তিত হবে। মিস্ ফতেমা জিন্নাও ঘোষণা করেছেন, নির্বাচনের ফল যাই হোক, তিনি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে যাবেন।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে দেশের সর্বত্র আরও শক্তিশালী গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সম্মিলিত বিরোধী শক্তি প্রস্তুত হচ্ছে। ব্যালটপত্রে নয়, আন্দোলনের ক্ষেত্রে আয়ুবশাহীর সঙ্গে গণশক্তির চূড়ান্ত শক্তি-পরীক্ষার দিন বেশি দূরে নয়।

অদ্বিতীয়

সুশীল রায়

অনেক দূর পথ পার হয়ে এসেছে ওরা। অনেক ঘুর-পথ ঘুরে এসেছে।

জীবনে এমন প্লাবন হয়তো মাঝে মাঝে আসে সকলেরই। এবং এমন প্লাবন যে আসে সেইটেই জীবনের যেমন যন্ত্রণা, সেইটেই জীবনের সান্ত্বনাও তেমনই। জীবনের চারপাশ বাঁধিয়ে জীবনকে নিশ্চল জলাশয় করে তুলতে চাই আমরা ক'জন? জীবনকে নদীর স্রোতের মতন অবারিত করে দিতেই বুঝি আমাদের মধ্যের অনেকেরই ইচ্ছে।

হঠাৎ এই রকম ইচ্ছে যখন এসে না দেয়, তখনই আমাদের জানা হয়ে যায় যে, আমাদের জীবনে একটা প্লাবন এল। আমরা তখন সে-প্লাবনে গা ভাসিয়ে দিতে ভালোবাসি। ভালোবাসি, কেন না প্লাবনের সুফলও একটা আছে। বিপর্যয় যেমন ঘটায় এ, ফসলও তেমনি ফলায়। জীবনকে উর্বর করে দেয়। যদি কেবল বিপর্যয় করাই পেশা হত এই প্লাবনের, তাহলে প্লাবনকে প্লাবন হয়তো আমরা বলতাম না, এর আর একটা নাম দিতাম; হয়তো বলতাম—সর্বনাশ।

মনের মধ্যে খুশি ও ইচ্ছেরা ধীরে ধীরে জমে উঠে ক্রমে ক্রমে দানা বাঁধতে থাকে, এবং সেই দানা এক সময়ে এমন বড় হয়ে যায় যে, মুঠির মধ্যে তাকে ধরে রাখা দায় হয়ে ওঠে। তখন তাই আমরা তাকে আর ধরে রাখতে চাই নে, তখন আমরাই তার কাছে নিজেদের ধরা দিই।

এই রকমই ধরা দিতে হল ওদেরও। চলন্ত ট্রেন থেকে কতবার দেখেছে ওরা মাঠের মধ্যে দিয়ে সরু রাস্তা সটান সোজা কোথায় যেন চলে গিয়েছে। মাঠের পাশে দেখেছে ওরা বিরাট বিশাল বিপুল আকারের পুরাতন অট্টালিকা।

কোথায় গিয়ে শেষ ওই রাস্তার, কোথায় ওর আরম্ভ। কি আছে ঐ অট্টালিকায়, কে বাস করত একদা ওখানে, কে বাস করে এখন ওখানে? এই প্রশ্নগুলো জমতে জমতে মস্ত একটা জিজ্ঞাসাচিহ্ন হয়ে উঠল ওদের কাছে, সেই সঙ্গে ওসব জানার ইচ্ছাও বড় হয়ে উঠতে লাগল ক্রমশ।

প্রাণের যাবতীয় প্লাবন একত্র ক'রে ওরা ছ'জন জোগাড় করল একটা গাড়ি। এই বাহনে চেপে অভিযানে যাবে তারা।

মনের বিপুল ইচ্ছা জমা করে নিল তারা। পৌষ মাসের শীতের সকালে ছ'জন যাত্রী একত্র হয়ে রওনা হল বেহালার রায়বাহাদুর রোড থেকে।

মসৃণ দ্রুততায় পীচের রাস্তা ধরে অনেকক্ষণ হল ছুটে চলেছে গাড়িটা। অনেকগুলো পথ পার হয়েছে, অনেক বাঁক নিয়েছে। তবু তেজ কমে নি গাড়িটার।

গাড়িটা চলেছে গান গাইতে গাইতে; আশপাশের গাড়ি ও বাড়ি অতিক্রম করতে করতে, এবং সেই সঙ্গে উচ্চকিত করতে করতেও। যাদের পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে গাড়িটা, তাদের কানে একখণ্ড গানের কলি বাজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে হঠাৎ। কিসের শব্দ এটা, সে-কথা ভালো করে বোঝবার আগেই গাড়িটা সামনের বাঁক ঘুরে চলে গেল চোখের আড়ালে।

চোখের আড়ালে চলে গেল বটে, কিন্তু মনের মধ্যে একটা ঝাঁকি রেখে গেল যেন। অতটুকু একটা গাড়িতে অমন ঠাসাঠাসি করে বসে কোথায় চলেছে ঐ একঝাঁক মানুষ?

অনেকগুলো বাঁক পার হয়ে এসেছে গাড়িটা। অনেকগুলি মানুষের

মনেই এ রকমের প্রশ্ন জাগিয়ে দিয়ে এসেছে ইতিমধ্যে। কিন্তু এসব প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে একবারও গাড়িটা তো থামলই না, এমন কি তার বেগও কমাল না এতটুকু।

অট্টহাস্যের শব্দ ছড়াতে ছড়াতে আর গানের কলি বিলি করতে করতে ছুটে চলে গেল পুরনো মডেলের একটা বেবি অস্টিন।

রাস্তার লোকে ব্যঙ্গ করেছে, বলেছে; যেমন গাড়ি, তেমনি তার সওয়ার। গাড়ির চাকা আবার খুলে না যায়!

চলন্ত গাড়িতে বসে তারা চাকার কথা হয়তো এখন ভাবছে না। কিন্তু চাকা নিয়ে গবেষণা তারা করেছে আগে। যখন এই অভিযান নিয়ে আলাপ-আলোচনা আর গবেষণা হয়েছে তখন অনেক কথার সঙ্গে চাকার কথাও তারা ভেবেছিল।

তাদের এই অভিযানের প্ল্যানটা হয়ে উঠল হঠাৎ।—কেউই এর জন্যে তেমন তৈরি ছিল না। কিন্তু কথাটা যখন উঠল তখন দেখা গেল যে, প্রত্যেকের মনের মধ্যেই আলাদা আলাদাভাবে এ ধরণের একটা আকাঙ্ক্ষা জমা ছিলই।

ওদের দলের মধ্যে স্নেহাংশু একটু কবি-ভাবাপন্ন। কিন্তু কবিতা সে বেশি লেখে না, কবিতা নিয়ে আলোচনা অবশ্য করে। কবিতা লেখে না বটে, কিন্তু নাটক লেখে, এবং নাটকের পাত্র-পাত্রীদের যেসব গান গাওয়ার কথা, সেসব গানও লেখে স্নেহাংশুই। স্নেহাংশুর লেখা তিন-চারটি একাঙ্ক নাটক তারা দল বেঁধে অভিনয় করেছে, এবং অভিনয় করতে করতে তাদের দলটাও বেশ মজবুত হয়ে উঠেছে।

বেহালার রায়বাহাদুর রোডে গড়ে উঠেছে তাদের নাট্য-আসর। সেখানে অভিনয়ের রিহার্সেল লেগেই আছে। পাড়ার লোককে বিরক্ত বা বিব্রত না করে দরজা-জানলা এঁটে দিয়ে তারা চালায় তাদের মহড়া। তারপর যখন খোলা মাঠে স্টেজ বেঁধে অভিনয় করে তখন পাড়ার লোকও আসে দল বেঁধে সেই অভিনয় দেখতে।

নাটকগুলো ভালই লিখেছে স্নেহাংশু। আইডিয়াও যেমন তার নতুন, আবেদনও তেমনি নতুন। স্নেহাংশুর তাই বেশ আদর হয়েছে পাড়ায়, এবং আদরের সঙ্গে একটু দরও হয়েছে।

অমিয় তরফদারদের বাড়িটা বেশ বড়। তাদের বৈঠকখানা ঘরের পাশের ঘরটা হয়েছে এদের নাটকের আসর। এখানে জমা হয় সকলে—রেবতী মল্লিক, মনোজ সান্যাল, বিকাশ নন্দী, হরেশ, দীপক, নীহার, বীরেন ইত্যাদি পাড়ার অনেকেই। এদের মধ্যে প্রথম তিনজন অভিনয়ে পাকা, বড় বড় ভূমিকায় এরাই অভিনয় করে। কিন্তু ভূমিকা কতবড় আর হতে পারে? যে নাটকের মেয়াদ মাত্র একটা অঙ্ক, তার ভূমিকা আর কতবড় হবে?

কারও ভূমিকাই যে বিশেষ বড় হচ্ছে না—এ আক্ষেপ অভিনেতাদের যেমন আছে, নাট্যকারেরও আছে তেমনি।

সুতরাং সুতরাং সুতরাং—

স্নেহাংশু কিছুদিন থেকেই এই বিষয়টা নিয়ে বেশ ভালোভাবেই যেন ভাবছে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা সে এসে অমিয়কে ডাকল।

'কি রে স্নেহাংশু?'

স্নেহাংশু বলল, 'কথা আছে।'

বৈঠকখানা ঘরেই বসল দুজন। স্নেহাংশু বলল, 'আর কারও আক্ষেপ রাখতে চাই নে।'

'কিসের আক্ষেপের কথা বলছ হে?'

স্নেহাংশু একটু হাসল, বলল, 'ছোট ছোট পার্ট পায় ওরা। রেবতী, মনোজ আর বিকাশ—এ নিয়ে প্রায়ই দুঃখ করে। তাই বড় পার্ট লিখেছি ওদের জন্যে?'

একটু ঝুঁকে অমিয় জিজ্ঞাসা করল, 'কি রকম?'

চাদরের নীচে থেকে বিরাট একটা বাণ্ডিল বের করে টেবিলের ওপর রাখল স্নেহাংশু, বলল, 'এই।'

—'কি এটা?'

'নাটক। একাঙ্ক নয়, পঞ্চাঙ্ক। পাঁচ অঙ্কে শেষ।'

'বলো কি হে?' আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল অমিয়, বলল, 'তুমি তো বড্ড চাপা হে স্নেহাংশু। এতবড় একটা কাণ্ড করে বসলে, কিন্তু কাক-কোকিলে টের পেল না?'

স্নেহাংশু কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বলল, 'কেবল পঞ্চাঙ্কই নয়, এতে নারী-ভূমিকাও আছে। এখন, ভাবনা এই—নারী সাজবে কে?'

অমিয় কিছু মন্তব্য করল না। সে ভাবতে লাগল স্নেহাংশুর কথা।

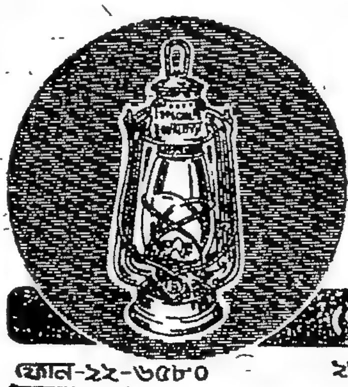

কিষান
লণ্ঠন
সর্বোৎকৃষ্ট
গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
ফোন-২২-৬৫৮০
২৩৩, ওল্ড চীনাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১

অবশেষে সত্যিসত্যিই স্নেহাংশু একজন নাট্যকারই হয়ে উঠবে নাকি? একজন নামজাদা নাট্যকার হয়ে উঠবে নাকি বেহালার স্নেহাংশু বিশ্বাস? একথা বিশ্বাস করতে ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছে অমিয়র, কিন্তু ঠিক যেন বিশ্বাস করতে সে পারছে না।

অমিয় একটু চাপা গলায় বলল, 'আমরা আমাদের জীবন যদি নারী-বর্জিত করতে না পারি, তাহলে আমাদের নাটকই বা নারী-বর্জিত হবে কেন। আসলে, আমাদের প্রত্যেকের জীবনই তো এক একটা নাটক, কি বলো হে নাট্যকার?'

স্নেহাংশু বলল, 'বটেই তো।'

এরা কথা বলছে, এমন সময়ে বিকাশ আর মনোজ এসে উপস্থিত হল। ওরা ঘরে ঢুকে দেখল দুটি প্রাণী চুপচাপ বসে আছে স্তব্ধ হয়ে।

মনোজ ওদের মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠল, 'কি ব্যাপার হে? কোনো শোক-সংবাদ আছে না কি? দুজনে মুখোমুখি গভীর দুখে দুখী হয়ে বসে আছ যে!'

অমিয় বলল, 'বসো ভাই। ব্যাপারটা গুরুতর।'

বিকাশ আর মনোজের মুখের ভাব বদলে গেল, তারা যেন একটু চিন্তিতই হয়ে উঠল, যাতে শব্দ না হয় এই রকম ভাবে আস্তে চেয়ার একটু এগিয়ে নিয়ে বসতে বসতে বলল, 'কি?'

অমিয় বলল, 'সাংঘাতিক ব্যাপার। স্নেহাংশু যে এমন ডুবে ডুবে জল খায়, কে জানত বলো।'

স্নেহাংশুর মুখের দিকে ওরা একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। ওদের তাকানোর ভঙ্গি দেখে হাসি পেল স্নেহাংশুর, তার ঠোঁটের ওপর বেশ খুশির রেখা ফুটে উঠছে দেখে বিকাশ বলল, 'বুঝেছি। ব্যাপার সাংঘাতিক হওয়াই সম্ভব।'

মনোজ তৎক্ষণাৎ বলল, 'বুঝেছি—প্রেম।'

অভিনয়ের ভঙ্গিতে বিকাশ বলল, 'বলো বৎস, কে সেই হতভাগিনী।'

অমিয় ওদের চাপা ধমক দিয়ে বলল, 'আস্তে। ভেতরের বারান্দায় বাবা-মা বসে।'

জিভ কাটল বিকাশ।

মনোজ তার ভুরু দুটি নাচিয়ে জিজ্ঞাসা করল ফিসফিস করে, 'কে, কে?'

স্নেহাংশু বলল, 'সব বলব। স্থির হও।'

(ক্রমশঃ)

হলধর

অসিত চৌধুরী

আমি সেই শতাব্দীর হলধর
অবজ্ঞায় নির্বোধ চাষী
—আমারই অন্য এক অভিধা
দার আনি পৃথিবীতে
পানীয় এবং আহার
অতএব অবজ্ঞার পাত্রদের নির্ঘাত পুরোধা।

অথচ হলাগ্রে সীতারে তুলেছি আমিই
দানব রাবণ বধের ব্রহ্মাস্ত্র সেই।
রাম-সীতা কৃষ্টি ও সভ্যতার জনক
তস্য পুত্র ভুলে গেছে আমাদের সুখ,
তাই আমাদের সুখ অপহৃত,
হৃদয়ে অসীম বিষাদ, জীবন শতধা।
আমি সেই শতাব্দীর হলধর,
অবজ্ঞায় নির্বোধ চাষী
—আমারই অন্য এক অভিধা।

সঙ্গীত

শ্রীফাল্গুনী খাতুন

ভগ্ন পাত্র, ভগ্ন সময় পার।
ঘুটঘুটে নীল আঁধারে চারটে কুকুরের চীৎকার।
সময় ফেরে না। শুধু শূন্যতা মনের আকাশে ভাসে।
সোনালি তারেতে ঝুলতে ঝুলতে ধবধবে তারা হাসে।

ধিকৃত প্রাণই সঙ্গীত খুঁজে ফেরে।
ক্লান্ত রিক্ত পথের নমস্কারে
হঠাৎ দাঁড়ায় কে রে?
দূরে আরো দূরে অন্ধকারের হাসি,
অট্টহাস্যে বলছে কি—'ভালবাসি'
শুষ্ক কণ্ঠসঙ্গীত ঝংকার,
আজ রাতে আছে সবাই ঘুমিয়ে
কেউ তা শোনে না আর।
তুমি দিলে গান থেমে যায় সব পেঁচাদের কেংকার।

[আর রীড কলকাতা ডিটেকটিভ বিভাগের সুপারিন্‌টেনডেণ্ট ছিলেন। তিনি ১৮৬৪-৭০ খৃস্টাব্দে পার্ক স্ট্রীট ইত্যাদি থানার অফিসার ছিলেন। ১৮৭৫-৭৬ খৃস্টাব্দে যখন সপ্তম এডোয়ার্ড যুবরাজরূপে কলকাতা বাস করেন, সেই সময় তিনি তাঁর দেহরক্ষীর কাজ করেন। তিনি তাঁর গোয়েন্দাগিরির অভিজ্ঞতা বিষয়ে কয়েকখানি বই লিখে গেছেন, তার মধ্যে 'এভরিম্যান হিজ ওন ডিটেকটিভ' নামক বই (১৮৮৭) খানা অনুবাদকের হাতে এসেছে। এই ইতেব তিনি একই সঙ্গে জাগ্রত দৃষ্টিতে ঘটনার দিকে লক্ষ্য রাখার কৌশল ও সেই প্রায় একশ' বছর আগেকার কয়েকটি বিশেষ অপরাধের ঘটনা বিবৃত করেছেন। এই বইতে সে যুগের কলকাতার সমাজের নিচুস্তরের বেশ একটা বাস্তব ছবি পাওয়া যায়। ছোটখাটো রহস্য থেকে জটিলতর রহস্য-কাহিনীগুলি সরল বর্ণনাভঙ্গিতে আরও চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। সমাজচিত্র যা ফুটেছে তার উত্তরাধিকার থেকে অবশ্য এখনও শহর বঞ্চিত হয় নি, কিন্তু তবু সে যুগের পটে সে যুগের বুদ্ধির খেলার স্বাদ আজকের যুগেও ভালই লাগবে।

—অনুবাদক]

মুখের ভাবে চরিত্র পাঠ

মুখের ভাবের সাহায্যে লোক-চরিত্র পাঠের বিদ্যা যে নির্ভুল, এটি এখন স্বীকৃত সত্য। মানুষের মনে কি আছে চোখেমুখে তার অনেকখানিই প্রকাশ হয়ে পড়ে। এটি একটি প্রয়োজনীয় বিদ্যা। এ বিদ্যাকে যিনি মানেন না, তিনি এর ব্যবহার বিষয়ে অজ্ঞ। উল্লাস, ক্রোধ, ভয়, লজ্জা, অপরাধবোধ, অথবা সরলতা—যে-কোনো বুদ্ধিমান মানুষই মুখের ভাব থেকে ধরে ফেলতে পারেন। আর গোয়েন্দাদের শিক্ষিত দৃষ্টি তো নির্ভুলভাবেই এসব বুঝতে পারে। কোন্‌ ভাবটা অপরাধবোধ প্রকাশ করছে, কোন্‌ ভাবটা সরলতা প্রকাশ করছে, তা তাঁদের চোখে ঠিক ধরা পড়ে যায়।

এ কথা সত্য যে এই বিদ্যা, অর্থাৎ ফিজিওগনমি বিদ্যা, বিজ্ঞানের বিচারে জাতিচ্যুত হয়েছে, কিন্তু সে শুধু মুখের গঠন বিচারের দিক দিয়ে। মুখে ভাবের প্রকাশকে বাদ দিয়ে শুধু মুখাবয়ব থেকে নির্ভুল তথ্য

পাওয়া কঠিন। আমি নিজে অনেক মানুষকে দেখেছি যাদের মুখ অত্যন্ত কুৎসিত, কিন্তু তারা সদাশয় এবং মধুর স্বভাববিশিষ্ট। কিন্তু এমন একটি লোককেও দেখি নি যে প্রফুল্ল-চিত্ত, মনখোলা, সৎ, অথচ ভিতরে ভিতরে অসৎ—তা সে চেহারা যাই হোক।

দরকার শুধু ভাল করে দেখার শিক্ষা। মনের ভিতরে কি চলছে, তা বাইরের ভাবভঙ্গিতে বুঝতে পারা বিশেষ শিক্ষাসাপেক্ষ। শিশুরা এ বিদ্যা জানে, কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা এই ক্ষমতাটি হারাতে থাকে।

প্রথম প্রথম পরিচিত পাপাসক্তদের মুখের ভাব অনুশীলন করলে ভাল হয়। এক এক জাতীয় পাপাচার এক এক জাতীয় মুখের ভাব গঠন করে। জেলখানায় এটি চর্চা করার একটি ভাল জায়গা। কলকাতার জুয়াড়িদের আড্ডা, কিংবা আফিং-খোরদের আড্ডা, এর পক্ষে উপযুক্ত স্থান। অনেকেরই মুখে হীন ধূর্ততা, লোভ আর নিষ্ঠুরতার মিশ্রণ। অতি বীভৎস সে-সব মুখ। সব জাতীয় অপরাধ-প্রকাশক মুখেরই দেখা মিলবে এইসব জায়গায়। আমি নিজে যেভাবে মুখের ভঙ্গি দেখে অপরাধীদের ধরেছি, তার গোটাকতক গল্প বলছি।

একটি সভ্যভব্য ঠগের কাহিনী

কয়েক বছর আগে চার্লস নেভ্যু অ্যাণ্ড কম্পানীর প্রতিষ্ঠান পর পর কয়েকটি অতি চাতুর্যপূর্ণ প্রতারণায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের শো-কেসে রক্ষিত মূল্যবান রত্নখচিত সব আংটি একের পর এক রহস্যজনক-ভাবে উধাও হচ্ছিল, আর তার জায়গায় পাওয়া যাচ্ছিল নকল রত্নের সব সস্তা আংটি। কেসটি তদন্তের ভার আমার হাতে আসে। আমি দু-তিন দিন নানাভাবে সন্ধান চালিয়ে বুঝতে পারলাম এ-কাজ বাইরের কোনো প্রতারকের, ভিতরের কারো নয়। প্রতিষ্ঠানের মালিক এবং আমার উর্ধ্বতন অফিসিয়ালগণ এতে অবশ্য বড়ই হতাশ হলেন। কারণ তাঁরা সবাই ভেবেছিলেন এ-কাজ ভিতরের লোক ভিন্ন অন্য কারো দ্বারা সম্ভব নয়। যাই হোক, আমি আমার নিজের বিশ্বাস মতো একটা অনুমান খাড়া করে সেই মতো চোর ধরার কাজে লেগে গেলাম।

নকল আংটিগুলি তদন্তের সময় আমার নির্দেশ মতো কেস থেকে বার করে আনা হয়েছিল, আমার নির্দেশ মতোই আবার সেগুলিকে কেসের মধ্যেই রাখা হল, ট্রে'র উপর যেমন সাজানো ছিল তেমনি। কারণ আমার ধারণা, চোর যদি বাইরে থেকে এসে থাকে, তবে সে আবার ফিরে আসবে, এবং এসে যদি দেখে তার রাখা নকল আংটিগুলি সেখানে নেই, তাহলে বুঝতে পারবে চুরি ধরা পড়েছে। তাহলে দ্বিতীয়বার আর সে চুরি করতে সাহস পাবে না। পক্ষান্তরে যদি সে দেখে তার রাখা ঐ আংটিগুলি যথাস্থানেই আছে, তাহলে সে মনে করবে চুরি ধরা পড়ে নি, অতএব সে আবার চুরি করতে আসবে।

এবারে আমি শাদা পোষাকে দোকানের এমনভাবে একটি ডেস্কের পিছনে এসে বসলাম যেখান থেকে ক্রেতাদের আসা-যাওয়া বেশ ভালভাবে লক্ষ্য করা যায়। প্রথম দিন কাটল, কিন্তু তেমন সন্দেহজনক কিছু ঘটল না। সন্ধ্যায় দোকান বন্ধের পরে আংটিগুলি পরীক্ষা করে দেখলাম কোথাও হস্তক্ষেপের কোনো চিহ্ন নেই, যেমন ছিল সব তেমনি আছে। কিন্তু দ্বিতীয় দিন দোকান খোলার ঘণ্টাখানেক পরেই, ক্রেতাদের বেশ ভিড় জমে গেল, আর আমি লক্ষ্য করলাম, হাইকোর্টের উকিলের পোষাক পরা চশমা শোভিত এক শ্রদ্ধেয় চেহারার বাবু এসে প্রবেশ করলেন অন্যান্য ক্রেতার সঙ্গে। তাঁর বুকে সোনার মোটা অ্যালবার্ট চেন। তিনি প্রথমেই এগিয়ে এলেন সেই নকল আংটি রাখা শো-কেসটির দিকে, এবং সেদিকে কয়েক মুহূর্ত বেশ মনোযোগের সঙ্গে চেয়ে রইলেন, তারপর মাথা তুলে চারদিকে একবার তাকালেন। কিন্তু তাকালেন চশমার ভিতর দিয়ে নয়, ফ্রেমের উপর দিয়ে। আমি মনে মনে বললাম, 'বাছাধন, তোমার ঐ চশমা আর-কোনো মতলবে পরা, ভাল দেখার মতলবে নয়। তোমার চালচলন ভাল মনে হচ্ছে না।'

আমি এবারে তাঁকে ভাল করে লক্ষ্য করতে লাগলাম। চশমাধারী ভদ্রলোক শো-কেস দেখে খুশি হলেন, ভাবলেন, তিনি এখন নির্ভাবনায় পরবর্তী চাল চালতে পারবেন। এবারে তিনি চশমার আড়ালে চোখ দুটি ফিরিয়ে নিয়ে অন্য আর একটা শো-কেসের কাছে গিয়ে হাজির হলেন। সেখানে কিছুক্ষণ শো-কেসের ভেতরের জিনিসগুলোর দিকে তাকিয়ে দোকানের একটি লোককে ডেকে ভিতরের আংটির ট্রেটি বার করতে বললেন। বার করার পর সেটির দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন, যেন কোন্‌টা নেবেন পছন্দ করছেন। ইতিমধ্যে বিক্রেতা অন্য কাউণ্টারে অন্য এক ক্রেতার কাছে সরে যেতেই ট্রে থেকে একটা আংটি তুলে নিয়ে একটু দূরে সরে আলোয় ভাল করে পরীক্ষা করতে লাগলেন। আমি তাঁকে লক্ষ্য করতে লাগলাম। দেখলাম, আংটিটি পরীক্ষা করা একটা ছুতো মাত্র। তিনি আসলে চোখ দুটি চশমার উপর দিয়ে বিক্রেতার দিকে নজর রাখছেন। কয়েক সেকেণ্ড এভাবে কাটার পর একটা শুভ সুযোগ (ঐ বাবুর মতে) আসতেই হাতের আংটি ট্রেতে রেখে দিলেন। আমি দেখছিলাম, উক্ত কার্যটি করার সময় বাবুর চোখ দুটি বড়ই চঞ্চল হয়ে

উঠল, গোঁফের কোণাটা একটু কেঁপে উঠল। মনের ভয়টা বাইরে ক্ষণস্থায়ী হয়েই মিলিয়ে গেল, বাবুটি আর কালবিলম্ব না করে ট্রে থেকে কম দামের সাধারণ একটি সোনার আংটি চট করে তুলে নিয়ে তার দাম দিয়ে সেটিকে পকেটে পুরলেন। ভাল করে দেখলেনও না আংটিটি কি রকম।

তিনি দাম দিলেন কারেন্সি নোটে। তারপর হিসাব মতো ভাঙানি পেয়ে তাড়াতাড়ি দোকান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁকে ইচ্ছে করেই দেরি করিয়ে দেবার জন্য বলা হল, আপনি যে নোটগুলি দিয়েছেন সেগুলির উপর আপনার নামসই দরকার। ইতিমধ্যে আমি দোকানের পিছনে অবস্থিত অফিসে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে দোকানের ভিতরে ডেকে এনে যে ট্রে থেকে বাবুটি আংটিটি কিনেছেন সেই ট্রেটি পরীক্ষা করে দেখতে বললাম। দেখা গেল ৫০০ টাকা দামের একটি হীরের আংটি তুলে নিয়ে তিনি সেখানে একটি নকল হীরের আংটি রেখে দিয়েছেন।

দোকানের মধ্যে একটা হট্টগোলের সৃষ্টি না করে বাবুটিকে ম্যানেজারের অফিসে নিয়ে যাওয়া হল। প্রথমে তো তিনি চুরির অপবাদের ঘোর প্রতিবাদ জানালেন, রেগে গরম হলেন এবং বললেন, আমি এ কাজ করি নি। কিন্তু তাঁকে সার্চ করা হবে বলাতে শেষ পর্যন্ত চুরি স্বীকার করলেন এবং চোরাই আংটিটি পকেট থেকে বার করে দিলেন।

এই জাতীয় হীরক বিষয়ক প্রতারণার বহু ফন্দি আছে। নকল হীরে তৈরি একটা উচ্চস্তরের শিল্প। অথচ সাধারণের ধারণা হীরকজাতীয় রত্নাদিতে নকলকারীর বিদ্যা খাটবে না। ঝলমল করা হীরে, এর কি কখনও নকল হয়? কারণ হীরে চেনার নানা উপায় আছে। সে সব সহজ পরীক্ষা। তারপর অণুবীক্ষণ আছে। শিক্ষিত চোখে চট করে ফাঁকি ধরা পড়ে। অণুবীক্ষণের সাহায্যে আরও সহজে ধরা পড়ে। কিন্তু তবু এতে এমন একটা ফাঁক আছে যা জহুরীকেও বিভ্রান্ত

[illegible] পারে। দুটি খাঁটি হীরে ওজনে বা আকারে এক হলেও দুয়ের দামে অনেক তফাৎ হয়ে থাকে। হলুদ রঙের আফ্রিকার হীরককে যদি অল্প সময়ের জন্যও তার সমান ওজনের ইস্পাত-নীল হীরকের মতো চেহারা দেওয়া যায় তাহলে তার দাম অনেক গুণ বেড়ে যাবে। এই চেহারা বদলের বৈজ্ঞানিক কৌশল আছে। হলুদের পরিপূরক রং হচ্ছে বেগুনি। এবং দৃষ্টিবিজ্ঞানের এক পরিচিত নিয়মে দুটি পরিপূরক রঙের মিশ্রণে শাদার উৎপত্তি হয়। এখন যদি কোনো প্রতারক তার কম দামের হলুদ পাথর অ্যানিলাইন ভায়োলেট নামক রাসায়নিকে কয়েক মিনিট ডুবিয়ে রাখে, তাহলে সেই সস্তা পাথর সঙ্গে সঙ্গে 'মূল্যবান' পাথরে পরিণত হবে। অবশ্য সাবান জলে এ-প্রতারণা ধুয়ে ফেলা যায় সহজেই।)

ব্যাঙ্ক প্রতারকের কথা

একটি জালিয়াতি কেসের তদন্ত উপলক্ষে কয়েক বছর আগে আমাকে একবার ওরিয়েণ্টাল ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করার দরকার হয়। ব্যাঙ্কের লেনদেনের সময়ের মধ্যেই ম্যানেজারের ঘরে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে। আমাদের আলাপ চলছে, এমন সময় একটি পিওন কতকগুলি দরকারী কাগজপত্র এনে ম্যানেজারের টেবিলে রাখল, এবং জানাল, যে-ভদ্রলোকের কাছ থেকে সে এগুলো এনেছে, তিনি বাইরে অপেক্ষা করছেন। ম্যানেজার কাগজগুলির উপর চোখ বুলিয়ে তাকে বললেন, ভদ্রলোককে গিয়ে বল আমি এখন একটু ব্যস্ত আছি, অতএব তিনি যেন আরও একটুক্ষণ অপেক্ষা করেন।

আমার কাজ শেষ হওয়ামাত্র আমি উঠে পড়লাম, এবং অফিসের দরজা ঠেলে বাইরে আসতেই সেই অপেক্ষমাণ ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। ভদ্রলোকটি কিন্তু আমাকে দেখামাত্র হঠাৎ চমকে উঠলেন, এবং মুখ ঘুরিয়ে চাদরের প্রান্ত ঠিকভাবে গায়ে জড়ানোর কাজে ব্যস্ত হলেন। আমি স্পষ্ট দেখলাম, তিনি একটুখানি নার্ভাস হয়ে পড়েছেন, কেন না চাদরের প্রান্ত ধরবার সময় তাঁর হাতের মুঠোটি অস্বাভাবিক রকমের শক্ত হয়ে উঠেছিল। চাদর ঠিক করা যে একটা ছুতামাত্র, তাতে আমার সন্দেহ ছিল না। তাই আমি তাঁর অপরাধ-চেতনার আরও কিছু লক্ষণ প্রকাশের অপেক্ষা না করে ম্যানেজারের ঘরেই আবার ফিরে এলাম। আমাকে এভাবে ফিরে আসতে দেখে ম্যানেজার আমার দিকে স্বভাবতই জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম, 'যে বাবুটি দেখা করতে চান, তিনি কে?'

ম্যানেজার বললেন, 'তিনি একটি ঋণ সম্পর্কে কথা বলতে এসেছেন, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় নেই।'

তখন আমি তাঁকে, ঐ ভদ্রলোক আমাকে দেখে কিভাবে চমকে উঠেছিলেন, সে কথা জানিয়ে বললাম, 'আমার মনে হয়, তাঁর সঙ্গে কারবার করার আগে তাঁর সম্পর্কে ভালভাবে সন্ধান নেওয়া কর্তব্য।'

ম্যানেজার আমার কথায় একটুখানি হেসে আমার হাতে একখানা দলিল তুলে দিয়ে বললেন, 'দেখুন।'

দেখলাম। সেখানা একখানা রসিদ। শুল্ক বিভাগের গুদামঘরে ১৪০টি মলমল ও মসলিন জাতীয় কাপড়ের কেস্ জমা আছে। টাকা দিয়ে সেগুলো ছাড়িয়ে নিতে হবে। 'ব্যবসায়ীর পক্ষে এর চেয়ে নিরাপদ পাকা দলিল আর কি হতে পারে?'—বললেন ম্যানেজার।

আমার আর বলবার কিছু ছিল না। ভাবলাম সেই ভদ্রলোকটি যে আমাকে দেখে একটু বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন তার অন্য কারণ থাকতে পারে। হয়তো তা অপরাধ চেতনার লক্ষণ নাও হতে পারে। ম্যানেজার অবশ্য আমার সতর্কতার জন্য অনেক ধন্যবাদ দিলেন, আমিও বিদায় নিলাম। দরজা খুলে বাইরে এসে কিন্তু বাবুটিকে আর দেখতে পেলাম না। উপর নিচে সর্বত্র সন্ধান করা হল, কিন্তু বাবুর চিহ্ন নেই। বোঝা গেল, আমি যখন ফিরে গিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলছিলাম, সেই ফাঁকে বাবু ভেগেছেন।

আমি ম্যানেজারকে বললাম, 'আমার বিশ্বাস, ঐ দলিলখানা জাল। এবং ঐ বাবুটি আমাকে আপনার কাছে ফিরে আসতে দেখে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছেন। ম্যানেজার আমার অনুমান সত্য বলে মেনে নিলেন। আমি তখন ঐ দলিলের সত্যতা যাচাই করার জন্য তৎক্ষণাৎ গুদামঘরে একজন সহকারীকে পাঠিয়ে দিলাম। সহকারী আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে এসে জানাল, 'রসিদ খাঁটি, ওতে কোনো গোলমাল নেই। ঐ দলিলের বিনিময়ে ঋণ দেওয়া সম্পূর্ণ নিরাপদ।'

তখন ম্যানেজার বললেন, 'আমাদের আর এ নিয়ে ভাববার কিছু নেই। বাবুটি হয়তো অন্য কোনো জরুরী কাজে আটকা পড়েছেন। সুযোগ পেলেই তিনি এসে পড়বেন।'

কিন্তু তিনি সমস্ত দিনের মধ্যে আর দেখা দিলেন না। সমস্ত সপ্তাহের মধ্যেও না। তখন ঠিক করলাম গুদামঘরের ঐ মলমলের কেস্গুলো পরীক্ষা করে দেখতে হবে, ওর মধ্যে কিছু জোচ্চুরি আছে কি না।

যথাসময়ে সেখানে কেস্গুলো খোলার ব্যবস্থা করা হল। পর পর চারটি কেস্ খুলে দেখা গেল তাতে মলমল চাকা চটের বস্তার মধ্যে ভাঙা ইটের গুঁড়ো ভিন্ন আর কিছুই নেই। অন্য কেস্গুলোর মধ্যেও তাই। শুধু ভাঙা ইট, পাটের ফেঁসো দিয়ে ঢাকা। ব্যাঙ্ক খুব বাঁচাটা বেঁচে গেল।

(ক্রমশঃ)

শহর কলকাতা

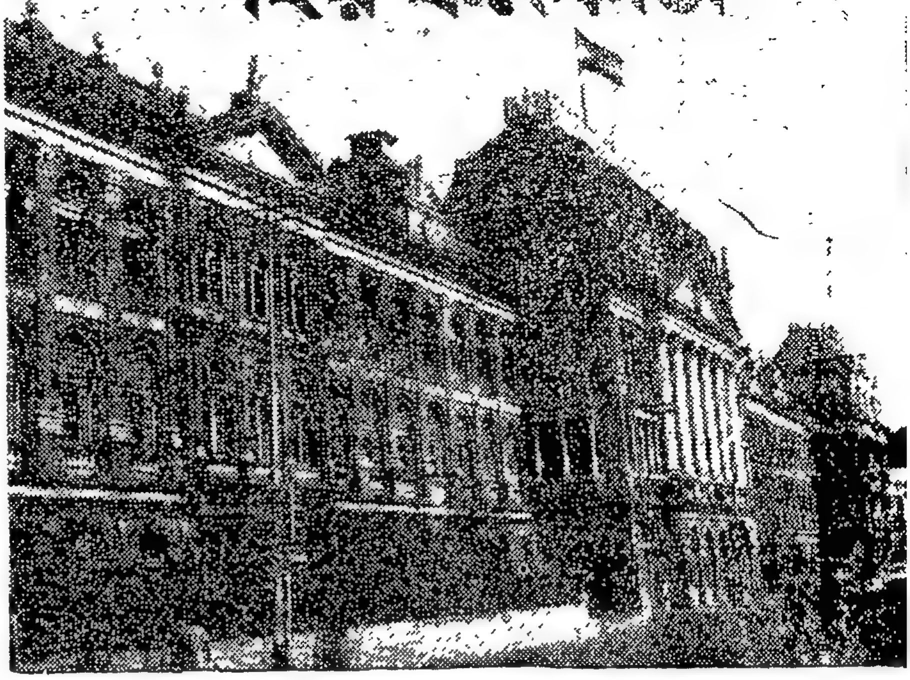

● একালের রাইটার্স বিল্ডিং

।। বিত্ত-বৈভবের পীঠস্থান ডালহৌসী অঞ্চল এবং নেতাজী সুভাষ রোড ।।

(ইংরেজ আমল থেকে স্বরাজোত্তর পর্ব)

চৌধুরীদের ত্রিশতাধিক কালের দিনগুলির রূপায়ণ ঘটলো রূপকথায়। যেন এক-একটি কলকণ্ঠ পাখি, অতীতের নিঃসীম দিগন্তের মেঘ-লোকে উধাও হলো একে একে। যারা বণিকবেশী সাগর-দ্বীপের নিষাদ—তাদের দুরিষ্ট শরাঘাতেই মহাপ্রস্থান ঘটলো এমন একটি কলালাপী অধ্যায়ের। হায় মূঢ় ফারুক শায়ার! তোমার অপরিণামদর্শিতার পথেই জাতীয় দুর্লক্ষণের প্রথম পদযাত্রার সূচনা। যে-কাল ব্যাধির মর্মান্ত প্রহারে নির্বিরতির শয্যা নিয়েছিলে তুমি--চিরনিদ্রার প্রয়োজন ছিল তোমার সেখানেই। তা যদি হতো, তাহলে ইংরেজ আধিপত্যের আদি সোপান রচনার সুযোগ পেতো না হ্যামিল্টন। হ্যামিল্টনই তার অভিজ্ঞতার সার্থক প্রয়োগে সম্পূর্ণ নিরাময় ক'রে তোলে তোমাকে। প্রতিদানে তুমি তাকে উপঢৌকন দিতে চাইলে সাজিপূর্ণ পান্না, জহরত এবং সেইসঙ্গে স্বর্ণখচিত এক দুর্লভ তরবারী। কিন্তু গ্রহণ করলো না চতুর হ্যামিল্টন। সে কামনা করলো: ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক সুতানুটী, গোবিন্দপুর, কালীক্ষেত্র এবং তৎসংলগ্ন আরও কয়েকটি বর্ধিষ্ণু জনপদে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সনদ। হায় মতিভ্রষ্ট সম্রাট! তোমার কৃতজ্ঞতার অবিমৃষ্যকারী হস্ত সেই সনদই তাকে অর্পণ করলো সেদিন। ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক নামমাত্র মূল্যে ক্রীত হলো দীনমিত্র চৌধুরীদের সম্পত্তি। বিনাশের নৈবেদ্য হলো ত্রিশতাধিক বর্ষের বিরল-মাহাত্ম্যের মন্দিরশ্রেণী। বিনিময়ে সেখানে মাথা তুলে দাঁড়ালো পশু-প্রতাপের উদ্ধত প্রতীক ফোর্ট উইলিয়াম। আর তারই শিখরদেশে বাংলার নির্মল হাওয়ায় দেহ ভাসালো প্রথম স্বৈরাচারের পতাকা শ্বেতাঙ্গদের।—তারপর? তারপর কেবল কলকাতায় নয়, সারা বাংলায় এবং দিনে দিনে সারা বাংলা থেকে সারা ভারতের পবিত্র সত্তায় অপঘাত এসে পড়লো শ্বেতাঙ্গদেরই দুঃশাসন-দণ্ডের। অপ্রাজ্ঞ ফারুক শায়ার! যদি

শ্রীপদাতিক

পরপারের জাহান্নাম আত্মার অস্তিত্ব বজায় রাখে তোমার, তাহলে সেখান থেকে অবশ্যই তুমি অনুধাবন করেছো শ্বেত-স্বৈরাচারের কলঙ্কিত ইতিহাস দু'শ' বছরের। তুমি জানো, তার প্রধান উদ্গাতা তুমিই। অতএব অনুতপ্ত বলেই হয়তো, স্বেচ্ছায় তুমি আজও মুক্তি-পরাঙমুখ জাহান্নাম থেকে। তোমাকে ধন্যবাদ!

ফোর্ট উইলিয়াম প্রতিষ্ঠার পরেই ইংরেজ-নিয়তির মঙ্গলঘট স্থাপিত হয় লালদীঘি অঞ্চলে। লালদীঘিও সংস্কার সাধিত কলেবরে অচিরেই উদ্ভাস ঘটায় এক কৃত্রিম রমণীয়তার। আরও সুবিন্যস্ত হয়ে, উত্তরে-দক্ষিণে পরিধি বিস্তার করে পশ্চিমের প্রাচীনতম ঘাট। আর ত্রি-উপান্তের সুপ্রশস্ত জমি আগের তুলনায় অনেক বেশি সমতল হয়ে পরিমার্জনের প্রসাদ পায় প্রভূত। শ্যাম দূর্বাদলের সমাহার ঘটে তার সর্বাঙ্গেই। আর স্বল্পকালের মধ্যেই মরশুমী ফুলের বিচিত্র চারা-গাছের পাশাপাশি মাথা তুলে দাঁড়ায় দেওদার, ঝাউ এবং পুষ্পিত বকুলবীথি। সকাল-বিকেলের অভিজাত পদসঞ্চার, এমন কি সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারেও প্রমত্ত বিহারের প্রাণকেন্দ্ররূপে রূপায়ণ লাভ করে লালদীঘি। তরুতলে সংস্থাপন ঘটে কারুকার্যখচিত যে-আসনশ্রেণীর—তাতে কৃষ্ণপক্ষের সন্ধ্যালগ্নে, মাঝে মাঝে উভয় লিঙ্গগত যুগ্মকায়া পরিদৃশ্যমান হতে থাকে তাদেরও—যারা ইংরেজ-অনুগ্রহের সারমেয়-প্রতিম বিত্তবান এ-দেশের।

এবার থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর

[illegible] অনেক, দায়িত্ব প্রচুর। নানাসূত্রে কার্যক্রম তাদের প্রসারলাভ করে দিকে দিকে। তাই সাত সাগরের ওপার থেকে আরও ইংরেজ-কর্মচারীর আমদানী সুরু হয় প্রতুল হারে। তা ছাড়া ফোর্ট উইলিয়ামের প্রয়োজনে, অথবা ইংরেজকুলের তথাকথিত নিরাপত্তার তাগিদে যেমন সৈন্যদলের আগমন সুরু হয়, তেমনই এ-দেশীয় অজ্ঞজনের পূর্বপুরুষের ধর্ম—যা স্মরণাতীত কাল থেকেই নির্বিরোধ, তাকে খৃস্টীয় ধর্মের যূপকাষ্ঠে অর্পণ করার জন্য আবির্ভাব ঘটে ধর্ম-যাজকদলের। ফলে বিপুল সৈন্যভারে অনন্য গাম্ভীর্যের আত্মপ্রতিষ্ঠা ঘটে ফোর্ট উইলিয়ামে এবং একদিকে যেমন ধর্ম-যাজকদের তাগিদেই পত্তন ঘটে গীর্জার, অন্যদিকে তেমন কর্মচারী-দের প্রয়োজনেই উদ্ধত বিকাশ ঘটে বসতবাটীর। তা ছাড়া অভিজাত হোটেল, রাজকীয় রেস্তোরাঁ, এবং নেত্রাকর্ষক অসংখ্য বিপণির সঙ্গে ইংরেজ নরনারীদের চিত্তবিনোদনের জন্য একটি রঙ্গমঞ্চেরও প্রতিষ্ঠা ঘটে লালদীঘির উত্তরে। দেখতে দেখতে এভাবেই রূপ বদলায় লালদীঘি অঞ্চল। কৃত্রিম হলেও, তার সার্বিক জৌলুষের প্রচণ্ড উপকরণসমূহ উপেক্ষার নয়। সেগুলি গভীর মাদকতা সৃষ্টির পক্ষে অনেকের কাছেই অপরিহার্য নিঃসন্দেহে।

সময় যতো এগিয়ে চলে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ততোই আরও দৃঢ়তার সঙ্গে নিজ কর্ম-তৎপরতার প্রসার ঘটায় দিকে দিকে। বাণিজ্যের নামেই তারা শোষণ, পীড়ন, আর অব্যাহত লুণ্ঠনের করাল থাবা নিক্ষেপ করে গঞ্জে, গ্রামে, ক্ষেতে-খামারে এবং নিরীহ কৃষককুলের নিলিপ্ত পর্ণকুটিরে। এই একই উদ্দেশ্যে কুঠি নির্মাণ করে তারা কাশিমবাজারেও। তা ছাড়া এ-দেশীয় জনকয়েক শ্বেতাঙ্গ-সেবায়েত ধনকুবের শেঠ এবং কিছু রাজা খেতাবধারী ভূস্বামীর দ্বারাই তারা ম[illegible] জাল বিস্তার করে এ-দেশীয় নবাবের বিরুদ্ধে। তাই সুবে বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদকেও খানিকটা দোলা দিয়ে যায় অরাজকতার ঢেউ।

সিরাজদ্দৌলা তখন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার তরুণ অধিপতি। তিনি ইংরেজদের এই বেপরোয়া গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য ক'রে স্থির থাকতে পারলেন না বেশিদিন। প্রথমত তাদের উদ্দেশে তিনি উচ্চারণ করেন চরম সাবধানবাণী। কিন্তু তারা তা কর্ণপাত না করায়, ক্রুদ্ধ সিরাজ এবার বাংলা-বিহার এবং উড়িষ্যার স্বার্থ-রক্ষার স্বপক্ষেই অধিকার করেন কাশিমবাজার কুঠি। এবং পরদিন প্রাতেই পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের এক বিপুল বাহিনীসহ রওয়ানা হন কলকাতার উদ্দেশে।

ইংরেজ-দমনোদ্দেশে নবাবের এই যুদ্ধযাত্রার আশুবার্তা আসে কলকাতায়। সুতরাং খবর পেয়েই সাজ সাজ রবে মুখর হয়ে ওঠে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম। সমর-বিদ্যায় সুপটু ইংরেজ-বাহিনী প্রতিরোধ গ'ড়ে তোলে উত্তরে-দক্ষিণে এবং পূর্বদিকে চিৎপুর থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত। সিরাজ-বাহিনী কাছাকাছি আসতেই একসঙ্গে গর্জে ওঠে ইংরেজ-বাহিনীর অজস্র কামান। কিন্তু নবাব-বাহিনীর প্রত্যুত্তর আরও ভয়ঙ্কর। পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের মিলিত পদধ্বনি এবং সেই সঙ্গে হাজার হাজার তোপের মুহুর্মুহু আঘাতে মুহূর্তেই ধ্বসে পড়ে সমস্ত প্রতিরোধ ইংরেজের। সুতরাং অস্ত্রহীন ইংরেজ-সৈন্য এবার সভয়ে চারদিক থেকে ছুটে এসে আত্মগোপন করে ফোর্ট উইলিয়ামে। কিন্তু সেখানেও রেহাই নেই। নবাব-বাহিনী ফোর্ট উইলিয়ামের দিকেও এগিয়ে আসে চক্রাকারে। তাদের সঘন তোপধ্বনিতে যেন ভাগীরথীও ধারণ করে করাল মূর্তি। কারণ তার জোয়ার-লগ্নের লক্ষ লক্ষ ঢেউ এসে তখন অবিরাম আঘাত হানছিল ফোর্ট উইলিয়ামের পশ্চিম দেয়ালে।

ভাগ্যক্রমে তখন ভাগীরথীর জোয়ারী বুকে ভাসছিল কোম্পানীর একখানি জাহাজ। সেই জাহাজে করেই ফোর্ট উইলিয়ামের কিছু সৈন্য এবং অধিকাংশ সেনানায়ক পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচাবার সুযোগ পায়। যারা বাকি থাকে, তারা যৎপরোনাস্তি পর্যুদস্ত হয়ে আত্মসমর্পণ করে নবাবের কাছে। আর তাদের সঙ্গেই নবাব-বাহিনী কর্তৃক শৃঙ্খলিত হন ইংরেজ-বাহিনীর অন্যতম সেনাপতি হলওয়েল।

ইংরেজমুক্ত কলকাতা। বিধ্বস্ত ফোর্ট উইলিয়াম জনশূন্য। শান্ত ভাগীরথী। এ-দেশীয় প্রজাপুঞ্জের হর্ষধ্বনিতে তরুণ নবাবের বিজয়-বার্তাই মূর্তিমান হয়ে ওঠে বারবার। নবাব সারা কলকাতার শাসনভার তাঁর বিশ্বস্ত সহচর মাণিকচাঁদকে অর্পণ ক'রে ফিরে যান মুর্শিদাবাদে।

কিন্তু হায়। সিরাজ কর্তৃক কলকাতা-বিজয়ের পর একে একে যে-নতুন দিনগুলির আবির্ভাব সুরু হয়, তাদের সুসম্মেলনে একটি বছর পূর্তির পূর্বাহ্নেই আবার বাংলার আকাশে ঘনিয়ে আসে ঝড়ের সঙ্কেত। এবং ঝড়ও ওঠে যথাসময়ে। অর্থাৎ একাধিক জাহাজে আরও বিপুল সৈন্যভার নিয়ে মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় ভেসে আসেন লর্ড রবার্ট ক্লাইভ। তাঁর সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে এসে মিলিত হয় ফলতায় আত্মগোপনকারী সৈন্যরাও। সুতরাং এই বিরাট বাহিনীর সাহায্যে ক্লাইভ বেশ অনায়াসেই পুনর্জয় করেন কলকাতা। তারপর আবার সিরাজের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধযাত্রা করেন পলাশীতে।

তারুণ্যের প্রচণ্ড বিভাসে উজ্জীবিত সিরাজ। তাঁর যোগ্য নেতৃত্বে অকুতোভয় সৈন্যবাহিনী প্রবল প্রতাপে এগিয়ে আসে পলাশী প্রান্তরে। আম্রবাগের তিনদিকে তারা রচনা করে দুর্ভেদ্য ব্যূহ। যুদ্ধ সুরু হয়। অবিরাম তোপধ্বনিসহ সম্মুখপানে দুর্জয় পদক্ষেপে এগিয়ে চলে অভিজ্ঞ নবাব-বাহিনী। সংখ্যা-প্রাচুর্যের অধিকারী হয়েও, ইংরেজ-বাহিনী

বাধ্য হয় পিছু হটতে। হয়তো চিরতরেই পিছু হটে যেতো তারা, হয়তো বা ইংরেজ-আধিপত্যের সমাধি রচনা হতো পলাশী প্রান্তরেই। কিন্তু সিরাজ তথা বাংলার দুর্ভাগ্য। নিশ্চিত জয়ের মুহূর্তে হঠাৎ বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে বসেন ক্লাইভের সেই বিখ্যাত গর্দভ মীরজাফর—যিনি নিবলস সিরাজ-বাহিনীর প্রধান সেনাপতি। তাঁরই ধূর্ত-অনুনয়ে যুদ্ধ-বিরতির আদেশ প্রদান করেন নবাব। সুতরাং ক্লান্ত সৈন্যবাহিনী ফিরে আসে শিবিরে। আর সেই সুযোগে রাত্রির অন্ধকারে অতর্কিত আক্রমণ চালায় ইংরেজ-বাহিনী। এই হঠাৎ আক্রমণে ছত্রভঙ্গ নবাব-বাহিনীর বিপর্যয় ঘটে চূড়ান্ত। ফলে সে-রাত্রেই যবনিকা নেমে আসে যুদ্ধের। আর হতভাগ্য সিরাজের সঙ্গেই স্বাধীনতা-সূর্যের নিরঞ্জন ঘটে পলাশীর রক্ত-গঙ্গায়।

অতএব, এবার শহর-কলকাতায় সুপ্রতিষ্ঠা ঘটে ইংরেজের। এবার তারা কেবল সওদাগর, শোষক এবং লুণ্ঠনকারী নয়, একই সঙ্গে তারা শাসক অথবা দুঃশাসক। রাজধানী তাদের কলকাতা। সুতরাং যুদ্ধ-বিধ্বস্ত কলকাতাকে এবার অভিনবত্ব দান করার কাজে আত্মনিয়োগ করে তারা। সংস্কারসাধিত হয়ে ওঠে ফোর্ট উইলিয়াম, একাধিক গীর্জা, কোম্পানীর কার্যালয় এবং বিধ্বস্ত অসংখ্য বসতবাটী। আর সিরাজ-বাহিনীর তোপের আঘাতে সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হয়েছিল যে-রঙ্গালয়-গৃহ—লালদীঘি অঞ্চল বা ট্যাঙ্ক স্কোয়ারের উত্তরে আবার তা মাথা তুলে দাঁড়ায় নবীন কলেবরে। তা ছাড়া দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে অতিশয় পরিমার্জিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে একাধিক রাজপথ। ডালহৌসী অঞ্চলের যে-সর্বোৎকৃষ্ট রাজপথ আজ নেতাজী সুভাষ রোড নামে পরিচিত—তা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক সেকালেই নির্মিত হয়ে নাম ধারণ করে ক্লাইভ স্ট্রীট।

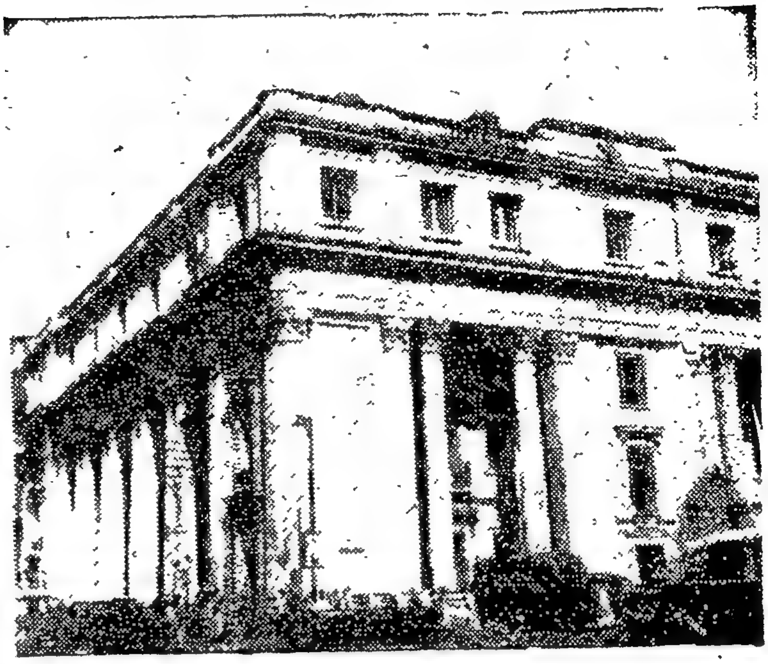

রয়্যাল এক্সচেঞ্জ

এবার ক্লাইভও দক্ষিণ ভারতের বসতবাটী ত্যাগ ক'রে কলকাতাকেই তাঁর অধিবাসক্ষেত্ররূপে নির্বাচন করেন। লালদীঘি অঞ্চল—বা ট্যাঙ্ক স্কোয়ারের উত্তরে বিশেষ বৈচিত্র্যে বিরচিত যে-ভবনশ্রেণী, তন্মধ্যে যে-ভবন বেশ উদ্ধত এবং দৃশ্যগত দিক থেকেও নয়নাভিরাম—তার মধ্যেই অসংখ্য দাসদাসীর সঙ্গে সপত্নীক বসবাস সুরু করেন ক্লাইভ।---ক্লাইভের এই বাসভবনের অবস্থিতি ছিল বর্তমান রয়্যাল এক্সচেঞ্জ-ভবনের তদানীন্তন অংশে। অনেকের দৃঢ় প্রত্যয় এই: ক্লাইভের তদানীন্তন বাসভবনই পরে বৃহদায়তনে সংস্কৃত হয়ে রূপান্তর লাভ করে রয়্যাল এক্সচেঞ্জে। তবে এই প্রত্যয় বা অভিমতের স্বপক্ষে তেমন তীক্ষ্ণধার নয় তাদের যুক্তি।

যাই হোক, অসমসাহসী এবং উচ্চাভিলাষী ক্লাইভ—যাঁর কোনো অন্ত ছিল না বিত্তের ও বিলাসের, সম্ভবত ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন সব চাইতে অসুখী। তাই লণ্ডনে প্রত্যাবর্তনের পর আত্মহননে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। তার আগে কলকাতার বাসভবনেও তিনি একবার আত্মনিধনে উদ্যোগী হন। এখানে আত্মনিধনে উদ্যোগী হওয়ার কারণ সম্পর্কে শোনা যায়: ক্লাইভ-পত্নী বা লেডি ক্লাইভ রমণী হলেও নাকি চরিত্র ছিল তাঁর পুরুষের মতোই কমনীয়তা-বর্জিত। তাঁর সান্নিধ্যলাভে চাহিদার ভাণ্ড তৃপ্তিরসে পূর্ণ হতো না ক্লাইভের। তাই মাঝে মাঝেই তাঁর সংসক্ত হওয়ার প্রয়োজন হতো অন্য নারীর সঙ্গে। কলকাতায় তাঁর প্রথম প্রণয়িনী নির্বাচিত হন তদানীন্তন পুলিশকর্তা মট সাহেবের পত্নী। তাঁকে নিয়ে তিনি অজস্র মধুনিশির মদনোৎসব উদ্‌যাপন করেন দমদমের বাগানবাড়িতে। কিন্তু তারপর, না জানি কী কারণে মট-পত্নী তাঁকে ত্যাগ করেন স্থায়িভাবে। মট-পত্নী ত্যাগ করায় ক্লাইভ এবার বাধ্য হয়েই শরণাপন্ন হন বেগম জনসনের—যিনি প্রথমদিকে ছিলেন ওয়াটস সাহেবের পত্নী এবং পরে আবও অজস্রজনের সহধর্মিণী। ক্লাইভ তখন কলকাতার এবং প্রায় বাংলা-বিহার-

উড়িষ্যার সর্বময় কর্তা। তাই সাদরেই তাঁকে গ্রহণ করেন বেগম জনসন এবং গভীব সান্নিধ্য দান ক'রে অতিবাহিত করেন পঁচিশটি রজনী। কিন্তু তারপর হঠাৎ একদিন, এক সুদর্শন তরুণের সঙ্গলাভ ক'রে রুচির পরিবর্তন আসে বেগম জনসনের। তাই প্রৌঢ় ক্লাইভকে আর প্রিয়-রজনীর প্রসাদ পরিবেশন করতে রাজী হলো না তাঁর মন। তিনি একদিন সরাসরি এবং বেশ সবিনয়েই প্রত্যাখ্যান করেন তাঁকে। যেদিন প্রত্যাখ্যান করেন, ঠিক সেদিনই ক্লাইভ তাঁর বাসভবনে এসে আত্ম-নিধনে উদ্যত হন পিস্তলের সাহায্যে। কিন্তু পরপর দু'বার ট্রিগার টেপা সত্ত্বেও সেদিন ফায়ার হলো না তাঁর পিস্তল। পিস্তল ফায়ার না হওয়ায়, বিস্মিত ক্লাইভ যখন পিস্তলের দিকেই তুলে ধরেন তাঁর বিস্ফারিত চোখ, ঠিক তখনই তাঁর সাক্ষাতে আসেন তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ক্লাইভ তখন বন্ধুর হাতেই পিস্তলটি দিয়ে তাঁকে ফায়ার করতে বলেন দেয়াল লক্ষ্য ক'রে। অতঃপর তাঁর সেই বন্ধু একবার মাত্র ট্রিগার টিপতেই পিস্তল থেকে বুলেট ছুটে যায় সশব্দে। ফলে বিশেষভাবেই বিধ্বস্ত হয় কারুকার্যখচিত দেয়ালের একাংশ। ---বিস্মিত ক্লাইভ, পিস্তলের এই কার্যকারিতা লক্ষ্য ক'রে তিনি বিস্মিত হয়ে ওঠেন আরও এবং গভীর-ভাবে কী যেন চিন্তা করেন খানিকক্ষণ। তারপর একসময় হঠাৎ বন্ধুর উদ্দেশে সহাস্যে তিনি বলেন:

'Well, I am reserved for something; That pistol, I have twice snapped at my own head'

অর্থাৎ, তাঁর নিয়তি তাঁকে দিয়ে কোনো বিশেষ কাজ সমাধা করার জন্যেই সেদিন মৃত্যুকে ফিরিয়ে দিলেন। কিন্তু সেই বিশেষ কাজটি কী? সেকি সমগ্র ভারতকে ইংরেজের পদানত করার কাজ? সম্ভবত তা-ই। কারণ পরে তিনি প্রায় সমগ্র ভারতকেই ইংরেজের শাসনাধীনে আনার সুযোগ সৃষ্টি ক'রে প্রত্যাবর্তন করেন ইংলণ্ডে। তারপর সেখানেই একদিন তাঁর অতৃপ্ত আত্মাকে তিনি হনন করেন—না জানি কী কারণে।

বেগম জনসন সেকালের একজন বিখ্যাত কামিনী নিঃসন্দেহেই। তিনি ছিলেন আর্ল অব লিভারপুলের পিতামহী অথবা মাতামহী। প্রথম দিকে কাশিম-বাজারের ওয়াটস সাহেবকে তিনি স্বামীরূপে বরণ করলেও, পরে অজস্র-জনের দয়িতারূপে উৎসর্গ করেন নিজেকে। একের পর আরেক পুরুষকে সান্নিধ্য দেওয়ায় তিনি সত্যই ছিলেন অদ্বিতীয়া সেকালের। সেজন্য তিনি গর্বিতাও ছিলেন যথেষ্ট। যৌবনকাল থেকে অন্তিমকাল পর্যন্ত তিনি বসবাস করেন ক্লাইভ স্ট্রীটেই। সন্ধ্যা নামলেই ভবন তাঁর উদ্ভাসিত হতো বিচিত্র রঙের আলোয় এবং সুরু হতো বিচিত্র জনের আগমন। তাদের নিয়েই তিনি অধিক রাত্রি পর্যন্ত মজলিশ জমাতেন কখনো সরবে, কখনো নীরবে, এবং কখনো বা নেশাতুর নৃত্যের তালে তালে। তাঁর সম্পর্কে পুরাতত্ত্ববিদ হেনরী কটন বলেছেন:

'Begum Johnson, the grand-mother of the Earl of Liverpool, who died in Calcutta in 1812, at the age of 87 and who had been the wife of a member of Council in the days of Colonel Clive and Black Hole, prided herself on keeping up these old usages to the last. She would dine in the afternoon at three O' clock, take her siesta after dinner, and then her airing in her carriage. On her return home, her house in Clive Street would be litup and thrown open for the reception of visitors until ten O' clock at night.'

কর্নেল ক্লাইভের ইংলণ্ড প্রত্যা-বর্তনের পরেই যাঁদের আবির্ভাব ঘটে কলকাতায়, তাঁদের মধ্যে হেস্টিংস, ক্লেভারিং এবং ফিলিপ ফ্রান্সিসের নাম ইতিহাস-খ্যাত। তাঁদের আমলেই লালদীঘি অঞ্চল বা ট্যাঙ্ক স্কোয়ারের চতুপার্শ্ববর্তী এলাকা সুশোভন রূপ ধারণ করে আরও। সম্ভবত তখন থেকেই এতদঞ্চলে বিত্তবান বাণিজ্য-জীবীদের বৃহদায়তন কার্যালয়সমূহের নির্মাণকার্য সুরু হয় এবং ফোর্ট উইলিয়ামেরও স্থানান্তর ঘটে দক্ষিণের গোবিন্দপুরে। তবে ট্যাঙ্ক স্কোয়ারের চতুপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বোচ্চ সমৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত হয় লর্ড ওয়েলেসলির আমলে। বিখ্যাত রাইটার্স বিল্ডিং আত্মপ্রকাশ করে তখনই।

লর্ড ওয়েলেসলির আমলে যে-সমস্ত সিভিলিয়ান যুবক লণ্ডন থেকে কলকাতায় আসে, সরকারী দপ্তরের কেরানীর কাজে নিযুক্ত হয় তারাই। সম্ভবত তখন কেরানী বা clerk শব্দের কোনো প্রচলন ছিল না বলেই সিভিলিয়ান যুবকদের বলা হতো রাইটার্স। এই রাইটারদের বসবাসের জন্যেই রাইটার্স বিল্ডিং-এর পত্তন ঘটে প্রথম। বেশ কয়েক বছর অতি-ক্রান্তির পর এ-সমস্ত রাইটার যখন তাদের অধিবাসক্ষেত্র নির্বাচন করে অন্যত্র, রাইটার্স বিল্ডিং তখন বাণিজ্য-জীবীদের গুদামরূপে ব্যবহৃত হয় শোনা যায়। তারপর সেখানেই আবার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজেরও সংস্থাপন ঘটে কিছুকালের জন্য। সম্ভবত উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই রাইটার্স বিল্ডিং থেকে উচ্ছেদ ঘটে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের। তারপর সমগ্র গৃহ বিশাল আকারে সুসংস্কৃত হয়ে রূপান্তর লাভ করে সরকারী কার্যালয়ে। ট্যাঙ্ক স্কোয়ারের উত্তর সীমান্তের এই সুশোভন গৃহ এতদঞ্চলের গৌরব বৃদ্ধি করেছিল যেমন সেকালে, তেমনই একালেও তার রাজসিক প্রভাব অক্ষুণ্ণ ডালহৌসী অঞ্চলে।

ক্লাইভ বিল্ডিং-ও এতদঞ্চলের এক অনুপমেয় অট্টালিকা। তার নির্মাণকার্যের সমাপ্তি ঘটে ইস্ট

ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলেই। বিলেতের Royal Institute of British Architects-এর আদি সভাপতি Mr. Goodhart Rendal তার নকশা প্রণয়ন করেন। তাঁরই নকশা অনুসারে মাথা তুলে দাঁড়ায় এই বিপুলায়তন ক্লাইভ বিল্ডিং—যা একালেও এক বিস্ময়কর কীর্তি বললে অতিশয়োক্তি হয় না। এই একই বিল্ডিং-এ বাণিজ্যজীবীদের অজস্র কার্যালয় বর্তমান। হঠাৎ কোনো অনভ্যস্ত ব্যক্তি যদি ক্লাইভ বিল্ডিং-এর গোলক-ধাঁধায় প্রবেশ করেন—তাহলে অন্তত খানিকক্ষণের জন্যেও তিনি দিশেহারা হতে বাধ্য। কাউকে জিজ্ঞেস না ক'রে, হয়তো বেরিয়ে আসার সোজা পথ তিনি খুঁজে পাবেন না সহজে।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আদি কাউন্সিল হাউসের অবস্থিতির জন্য এবং একে একে পরে দেশী-বিদেশী অজস্র ব্যবসায়ীর উদ্ধত কার্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ঘটায়, সমগ্র লালদীঘি অঞ্চলকে লর্ড ওয়েলেসলির আমলেই বলা হতো Theatre of Business, অর্থাৎ ব্যবসায়ীমহলের রঙ্গভূমি। এ-সম্পর্কে পরবর্তীকালের হেনরী কটন সেকালের যে-বর্ণনা করেছেন তাঁর গ্রন্থে—তার কিয়দংশ এই :

'In early days we find it described as 'the grand theatre of business, and there stood the Council House and every public mart in it', the reference being to the first Council House, which was discarded in 1764.'

ক্লাইভ স্ট্রীট থেকেই বিভিন্নমুখে গতি-বিন্যাস ঘটেছে আরও অনেক পথের। তন্মধ্যে ফেয়ারলি প্লেস, রয়্যাল এক্সচেঞ্জ প্লেস, বনফিল্ডস লেন, হামাম লেন, ক্যানিং স্ট্রীট প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ফেয়ারলি প্লেস বহন করছে ফেয়ারলি সাহেবের স্মৃতি। তিনি ছিলেন লর্ড ওয়েলেসলির আমলে একজন উল্লেখযোগ্য দালাল এবং একজন বিচক্ষণ ব্যবসায়ী। বাংলা দেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যে-সমস্ত হস্তী, উষ্ট্র এবং অশ্ব ছিল—তাদের আহার সংগ্রহের দায়িত্ব ছিল তাঁরই। তিনি এ-সমস্ত পশুর আহার সরবরাহ করেই তদানীন্তন কালে অর্জন করেন লক্ষ লক্ষ টাকা। তা ছাড়া তিনি ছিলেন গিলমোর এণ্ড কোম্পানীর অন্যতম অংশীদার। সম্ভবত সেজন্যেই গিলমোর কোম্পানীর পরবর্তী কোনো স্বত্বাধিকারীর প্রচেষ্টায় এ-অঞ্চলের একটি নাতিদীর্ঘ সরু পথের নামকরণ হয় ফেয়ারলি প্লেস।

বনফিল্ডস লেন বনফিল্ড সাহেবের নামে। তিনি ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংসের একজন বিশ্বস্ত পার্শ্বচর এবং একজন নীলামের কারবারী। রিষড়ার যে-সুদৃশ্য বাগানবাড়ি ছিল হেস্টিংসের, এককালে তা বনফিল্ড সাহেবই নীলামে বিক্রি ক'রে হেস্টিংসের হাতে অর্পণ করেন আশাতীত অর্থ। এই নীলাম সম্পর্কে ১৭৭৪ খৃস্টাব্দে ক্যালকাটা গেজেটে যে-বিজ্ঞাপন প্রকাশ-লাভ করে—তা এই :

'On Thursday, the 2nd September next, will be sold by

public outcry by Mr. Bonfield at his auction room, if not before sold by private sale, that extensive piece of ground belonging to Waren Hastings, Esq, called Risherah situated on the western bank of the river, two miles below Serampore consisting of 136 bighas, 18 of which are lakherago land or land paying no rent.'

সম্ভবত হেস্টিংসেরই অভিলাষ অনুসারে এতদঞ্চলের এই সরু পথ সেকালেই নামধারণ করে বনফিল্ডস লেন।

রয়্যাল এক্সচেঞ্জ বিল্ডিং অবস্থিতির ফলেই তার পার্শ্ববর্তী রাস্তার নামকরণ হয় রয়্যাল এক্সচেঞ্জ প্লেস। আর হামাম লেনের উদ্ভব ঘটে অনেককাল আগের একটি হামাম হাউস বা স্নানাগারের অস্তিত্ব থেকেই—যার উষ্ণ জলের ঝর্ণাধারায় শীতের প্রাত্যহিক স্নান সমাধা করতেন তদানীন্তন অভিজাত ইংরেজ নরনারী। বর্তমানে সেই হামাম হাউস আর নেই। কিন্তু নাম আছে—যা আজও উচ্চারণ ক'রে চলেছে এ-অঞ্চলের এক সংস্কারবর্জিত রাস্তা।

ভারতের প্রথম ভাইসরয় লর্ড ক্যানিং-এর নামেই নামাঙ্কিত ক্যানিং স্ট্রীট। এ-পথেই অবস্থিত হোলসেল মার্কেট। বিশৃঙ্খল বিপণিভারে বিপর্যস্ত রাস্তার পূর্ব থেকে পশ্চিম সীমান্ত। প্রয়োজনের তাগিদেই পরিবেশ বিপদচারীদের পদশব্দে অবিরাম মুখর।

ক্লাইভ স্ট্রীট এবং লালদীঘি অঞ্চলে যে-অভিনব সমৃদ্ধির চাহিদা প্রকাশ প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে—উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে তা পূর্ণতা লাভ করে সগৌরবে। আর বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সেই পূর্ণতার মধ্যেই প্রকটরূপে ফোটে বৈচিত্র্যের অলংকরণ। শহর-কলকাতার পাষাণ-মহিমা যে কতো উদ্ধত, প্রচণ্ড এবং দুর্ধর্ষ—তা ডালহৌসী অঞ্চলের সংখ্যাতীত অট্টালিকার শিখরে দৃষ্টিবিস্তার না করলে অনুভব করা কঠিন।

দীর্ঘদিনের দুর্দমনীয় বিপ্লবের চাপে বিংশ শতাব্দীর প্রাক-মধ্যাহ্নেই সাগরপারে ফিরে গিয়েছে ইংরেজ। সুতরাং সমগ্র ভারতে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত স্বরাজ। স্বরাজোত্তর যুগে লালদীঘি অঞ্চল লর্ড ডালহৌসীকে স্মরণ করলেও, স্থায়িভাবে সমাধিলাভ করেছে কুখ্যাত ক্লাইভের স্মৃতি। কারণ সমগ্র ক্লাইভ স্ট্রীটের আজ সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে নেতাজী সুভাষ রোডে।

একদা ক্লাইভ স্ট্রীটেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল হলওয়েল মনুমেণ্ট—যা ইংরেজ-কল্পিত অন্ধকূপহত্যার ঘৃণ্য প্রতীক। তাই বিংশ শতাব্দীর প্রাক-মধ্যাহ্নে সুভাষচন্দ্রের উদাত্ত কণ্ঠ আওয়াজ তোলে: হলওয়েল মনুমেণ্ট ভাঙো। এই ভাঙার গানেই সেদিন উজ্জীবন লাভ করে হিন্দু-মুসলমানের এক দুর্নিবার শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রা সেদিন শ্বেতাঙ্গ পুলিশের প্রহার-বর্ষণে জর্জরিত, সুভাষচন্দ্র সেদিন সঙ্গীনের নির্মম আঘাতে রক্তাক্ত কলেবর, তবু রুদ্রকণ্ঠে তাঁর সেই একই আওয়াজ: অন্ধকূপহত্যা সত্য নয়, হলওয়েল মনুমেণ্ট ভাঙো।---শেষ পর্যন্ত ভেঙেই গেল সেই মিথ্যা প্রতীক হলওয়েল মনুমেণ্ট। সুভাষচন্দ্রের দুর্জয় শৌর্যে পরাস্ত ইংরেজ সরকার মনুমেণ্টের অপসারণ ঘটাতে বাধ্য হয়। সেদিন সেই মনুমেণ্ট তারা ক্লাইভ স্ট্রীট থেকে তুলে নিক্ষেপ করে সেণ্ট জন গীর্জার সমাধিক্ষেত্রে—আজও যা সেখানেই প'ড়ে আছে হলওয়েলের বিকৃত শবদেহের মতো।

হলওয়েল মনুমেণ্ট সংক্রান্ত সেই আন্দোলন—সুভাষচন্দ্রের নির্ভীক নেতৃত্বকে স্মরণ করেই, স্বরাজোত্তর যুগে ক্লাইভ স্ট্রীটের নামকরণ হয় নেতাজী সুভাষ রোড। অতএব আজ প্রতি বাঙালী তথা ভারতীয়ের কাছে তীর্থতুল্য এই রাজপথের সংস্পর্শে ধন্য হোক অগণিতের নিত্যকালের জীবনযাত্রা, পুণ্য হোক প্রাণের অঙ্গীকার, এবং আরও সুন্দর হোক সুন্দরের আরাধনা।

স্বরাজোত্তর যুগে, ডালহৌসী অঞ্চল এবং নেতাজী সুভাষ রোডের হর্ম্যরাজির অরণ্যে বিন্যাস ঘটেছে আরও কয়েকটি উদ্ধত অট্টালিকার। ফলে তার পাষাণ-মহিমা আরও খানিকটা উদ্ধত হয়েছে স্থানবিশেষে। কিন্তু শ্রীহীন হয়েছে লালদীঘি। তার দক্ষিণের সমগ্র জমিতে কঠিন পাথরের পা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গগনভেদী টেলিফোন ভবন এবং উত্তর তীরের অধিকাংশ মৃত্তিকা অধিকার করেছে ভি আই পি সমাজের গাড়ি রাখার গ্যারেজ। তা ছাড়া লালদীঘির পাঁজর ঘেঁষেই আজকাল চলাচল করছে ট্রাম—যার অবিরাম ঘর্ষণ শব্দেই যেন সভয়ে শিউরে উঠছে লালদীঘির তরল হৃদয়।

তা সত্ত্বেও, আজ নিঃসন্দেহেই বিত্ত-বৈভবের পীঠস্থান ডালহৌসী অঞ্চল এবং নেতাজী সুভাষ রোড—মহানগরের প্রাণকেন্দ্ররূপে প্রতি নাগরিকের সঙ্গেই সম্বন্ধ যার অবিচ্ছেদ্য চিরকাল। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের অধিকাংশ কার্যালয় স্থাপিত এখানেই। এবং এখানেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে ভাগ্যবান বাণিজ্য-জীবীদের অসংখ্য দপ্তর। তা ছাড়া দেশী-বিদেশী অজস্র ব্যাঙ্ক, অগণিত বিপণি এবং একাধিক দূতাবাসের সন্নিবেশ যেমন ঘটেছে, তেমনই এদিকে-ওদিকে আজও দাঁড়িয়ে আছে সেই প্রাচীন গীর্জাগুলি। সবই আছে। তাই যে-কোনো তাগিদ, যে-কোনো চাহিদা এবং যে-কোনো মনোবাঞ্ছা পূরণের উপকরণ সংগ্রহ করতে হ'লে আসতে হবে এখানেই। পাথরের পথ, পাথরের ফুটপাথ, পাথরের অজস্র অট্টালিকা। উর্ধ্বে-নিম্নে, সামনে পেছনে এবং ডাইনে-বাঁয়ে শুধু পাথর আর পাথর। অথচ কী আশ্চর্য। এখানে পাথরেও প্রেম আছে হয়তো, হয়তো রসও আছে অফুরন্ত। তাই লক্ষ প্রেমিকের পদসঞ্চার এখানে অব্যাহত এবং হাজার হাজার রসিকেরও রস-লিপ্সার এখানে বিরাম নেই।

পাখী ও ফুল

সারাদিন মাথার ওপর যেন আগুন জ্বলছে। আজ রোদের তেজ বেশি। সামনের ভাঙা দেওয়ালের ইট কালো হয়ে গেছে। পিচে তাড়ির গন্ধ। আজ গন্ধ জোরাল মনে হল। সকালে যখন বসির বসিয়ে দিয়ে গিয়েছিল তখন কুয়াসা ছিল। ময়লা কুয়াসা। পাগলা লালুর ছেঁড়া কাঁথার মত কুয়াসা। তারপর বেলা বাড়তেই কুয়াসা কেটে খাঁ-খাঁ রোদ।

জলতেষ্টা পেয়েছে। সাধারণত এ সময় জলতেষ্টা পায় না। পায় সন্ধ্যা ঘন হবার পর। যখন তাকে প্যাকিং বাক্সে বসিয়ে টেনে নিয়ে ডেরায় ফেলে। মাখুন দৌড়ে একঘটি জল বাড়িয়ে দেয়। ও চকচক করে শেষ করে। কুকুরের মত হাঁপায়। সারাদিনে বুকে-জমানো ধুলো-ময়লা ঝেড়ে ফেলতে চায়। চোখ বোজে। তারপর ওকে পাঁজাকোলে ঘরে রেখে দেয়। ও চোখ বুজেই পড়ে থাকে বিচালির গাদায়। যতক্ষণ খানদশেক সেঁকা রুটি আর ডাল না পায় ঈশ্বর।

জিভ দিয়ে গালের টাক্‌রা ঘসল। থুতু নেই। রোদে খেয়ে নিয়েছে। সারাদিন ঘাম ঝরে ঝরে রক্ত শেষ। এখন ঘাম নেই। থুতু নেই। ঠিক আগুনে পোড়া ইটের মত।

ঈশ্বর পয়সা ক'টি গুণল আবার। সারাদিনের ভিক্ষের পাওয়া পয়সা। গুণে ঠোঁট ওল্টাল। বাহাত্তর নয়া। কম। খুবই কম। শুধু আজ নয়। পর পর কয়েকদিন এমনি কম হচ্ছে। মনিব বসির মিঞা লাটার মত চোখ করে বলে—কি রে বুড্ডা। এত কম কেন?—গর্ত করেছিস নাকি?

না সাহাব।—সঙ্গে সঙ্গে জিভে কামড় দেয় ঈশ্বর। গর্ত করব কেন?

তবে? বসির যেন বিশ্বাস করতে চায় না।

পাবনি নেই কি না? মনিবকে সঠিক তথ্য বোঝাতে চেষ্টা করে সে।

পাবন-ফাবন বুঝি না। কাল এক টাকার কম কামালে পাঁচখানা রুটি।—হো হো শব্দে হেসে ওঠে বসির। হাঁড়ির তাড়িতে চুমুক দেয়। আর রুটিতে কামড় দিতে গিয়ে কাঁকর পড়ে ঈশ্বরের দাঁতে।

গলা জ্বালা করে ঈশ্বরের। পেটের খিদে হিংস্র হয়ে ওঠে। আজ নিয়ে চারদিন। মাত্র পাঁচখানা সেঁকা রুটি তার বরাদ্দ। সারাদিনের খিদের গত তার ভরে না। রুক্ষ আর বুভুক্ষু চোখ ঘুরিয়ে, ঘুরিয়ে অন্যের খাওয়া দেখে ঈশ্বর। হাত-ভাঙা ডেমো, কানা লাটাই, কুষ্ঠরোগী ছেমুয়া, মুখের একপাশ পোড়া লখাইয়ের মা। ওরা সারাদিন পরে যে যার বরাদ্দমত ডাল-রুটি পায়। গোগ্রাসে গেলে। ঈশ্বরের ইচ্ছে করে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের খাবার কেড়ে খায়।

হাই তুলল ঈশ্বর; টিনের মগটা চটে মুড়ল। তেলচিটচিটে শিবলিঙ্গের ছবিখানা ভাঁজ করে রাখল একপাশে। ভিক্ষে করার ঝোলাঝুলি কম। যা আছে তাই গুছিয়ে নিয়েছে অনেকক্ষণ। বারবার রাস্তার দিকে চেয়ে চেয়ে চোখ এখন ক্লান্ত। মনিবের দেখা নেই।

ক্রমশ অন্ধকার হয়ে এল। রাস্তায় আজ ভিড় কম। গলির মোড়ে

[illegible] ছেলেরা ড্যাংগুলি খেলে, তারাও অনুপস্থিত। ট্রামের শব্দ আসছে দেরিতে দেরিতে। ঘোড়াগাড়ির কোচোওয়ান ফকির মিঞাও আজ এদিকে আসে নি। শুধু লোমওঠা নেড়ি কুকুরটা বারবার ওর কাছে এসে বসছিল। ঈশ্বর ঢিল মেরে তাড়িয়েছে কয়েকবার। এখন হাতের কাছে ঢিল নেই। কুকুরটা শুয়ে রইল নিশ্চিন্ত মনে।

অন্ধকার ক্রমশ গাঢ় হল। এদিকে আলো নেই। বকুলগাছের নীচেটা আরও অন্ধকার। ঈশ্বর তারই মধ্যে ডুবে রইল। বিড়বিড় করে কথা বলল। ভগবানের নামগান অথবা অভিসম্পাত দুই হতে পারে। হাতে মশা কামড় দিল বোধহয়। আন্দাজে চড় বসালো। চুলে উকুন হয়েছে। ট্যাকের পয়সায় হাত বুলালো একবার। কুকুরটা কিসের হাড় চিবোচ্ছে বোধহয়। ঈশ্বরের জিভ লালাসিক্ত হল।

গুড়ুম—। বন্দুকের শব্দ হতেই হল্লা উঠল বস্তীতে। অনেকগুলো আর্ত চীৎকার, কান্না, হৈ-হৈ একসঙ্গে জড়াজড়ি করে দলা পাকিয়ে আকাশে উঠল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই আরও অনেকগুলো গোলাগুলীর শব্দ কানে এল তার।

ভয় পেল ঈশ্বর। একটা অজানা অমঙ্গল আশংকায় তার বুক কাঁপল। আন্দাজ করেছিল আগে থেকেই। গত তিনদিন ও মালিক বসির মিঞাকে দেখছে। কিঞ্চিৎ গম্ভীর, থমথমে, অস্থির। পয়সা গুণে নেয়। ভাল-মন্দ কথা বলে না। তাড়ির নেশায় অশ্লীল গালি দেয় না কাউকেই; দ্রুত বরাদ্দমত ডাল-রুটি দিয়ে ঘর তালা বন্ধ করে। তারপর জনকয়েক ষণ্ডা-গোছের লোকের সঙ্গে ঘোড়ার গাড়িতে চেপে বেরিয়ে যায়।

কুছ্ সমঝা ?—কুষ্ঠরোগের ঘকল গা-জোড়া বিচালির মধ্যে গুঁজে ফিস-ফিস করে জিজ্ঞেস করে ছেমুয়া। ডেমো, লাটাই, লখাইয়ের মা নিঃশব্দ থাকে। মালিকের ভবিষ্যৎ খারাপ হোক আর নাই হোক, তাতে মাথা ঘামাতে ওরা নারাজ। বরং ঘামালে বিপদ হতে পারে; সাবুকে তো চোখের সামনে মেরেই ফেলল বসির। দোষের মধ্যে সে মালিক সম্পর্কে অপর একজন লোকের কাছে কিছু জিজ্ঞেস করেছিল।

সাবধানে কাম করবি বুড্ডা। আজ সকালে বসির ঈশ্বরকে ছেঁড়া চটে শুইয়ে দেবার সময় বলেছিল।

কেন সাহাব?

দিনকাল ভাল না। বসির একটা বিড়ি বের করে। এককালি কুয়াশা দপ করে জ্বলেই নিভে যায়।

শিবমন্দিরে পুজো দিতে আস-ছিলেন কয়েকজন মহিলা। দ্রুত চলে গিয়েছিল বসির। আর কোন কথা বলার অবসর পায় নি।

হল্লা-চীৎকার বেড়ে চলল। কয়েকজন লোক দৌড়ে গলি থেকে বেরিয়ে এল রাস্তায়। আগুন জ্বলে উঠল দূরের বস্তীতে। বন্দুকের আওয়াজ। হাতবোমার শব্দ। আর আল্লাহো আকবর, বন্দেমাতরম-এর সম্মিলিত কণ্ঠস্বর। কুকুরটা এতক্ষণ ঘেউ ঘেউ শব্দে ডাকছিল। এবার সেও ভয় পেল। ভয় পেয়ে পায়ে পায়ে ঈশ্বরের গায়ের কাছে গিয়ে বসল। রাস্তার ধারের বাড়িগুলোর দরজা-জানলা বন্ধ হয়ে গেছে। গলির আলো নিভে গেল। এতক্ষণ যে আবছা আলো দূর থেকে ঈশ্বরকে অভয় দিচ্ছিল সেটাও অবশিষ্ট রইল না আর।

জলের তলায় অন্ধকার। বুকটা ভার মনে হল ঈশ্বরের। মাথা ঘুরতে থাকল। মনে পড়ল ঠিক এমনি আর একটি রাতের কথা। মধুমতী নদীতে তখন ভাটির টান। সরমাটিতে চাঁদের আলো ঝকমকে। খেয়াঘাটে মহাভারত বাঁশি বাজাচ্ছে। সারা গ্রাম নিশুতি। ঈশ্বরের বৌ এইমাত্র বাচ্চাটাকে দুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়েছে। গত হাটের বেচা-কেনার লাভের হিসেব কষছিল ঈশ্বর।

আল্লা-হ্-হ্—হঠাৎ চীৎকার উঠল পুবদিকে। বাদখালির চরের দিক থেকে। কেঁপে উঠল গ্রাম। কুকুরগুলো একসঙ্গে ঘেউ ঘেউ করে উঠল। ঘুম ভেঙে গেল সারা গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো-মেয়ে-মদ্দর।

লড়াই বাধছে—হো-হো-হো—। মহাভারতের বাঁশির সুর ছাপিয়ে ত্রাসকম্পিত চীৎকার উঠল সারা গাঁয়ে। পুবদিককার ঘর-বাড়িতে আগুনের খাণ্ডব-দাহন।

ভয় নাই—একলাফে সড়কি হাতে বেরিয়ে পড়ল ঈশ্বর। বন্দুকের গুলীর আওয়াজ পাওয়া গেল। মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সে।

জ্ঞান ফেরার পর ঈশ্বর তার লক্ষ্মীকে ফিরে পায় নি। লক্ষ্মীর কোলের সাত মাসের বাচ্চাকেও না। সারা গাঁ পুড়ে ছাই। গুলীতে জখম পা কেটে বাদ দিতে হল ঈশ্বরের।

বস্তীর আগুন লেলিহান। বাঁশ ফাটা আর টিন ছোটার শব্দ ক্রমশ জোরাল হল। হল্লা-চীৎকার বন্দুকের গুলী আর পটকার আওয়াজ সব মিলে একাকার। কান্না আর অট্টহাসি পৃথক করা দায়। এবার খুব ভয় পেল ঈশ্বর। শীত বোধ হল। খাড়া হল গায়ের লোম। ফাঁকা রাস্তার পাশে একলা বসে। সে বুঝল দাঙ্গা বেধেছে। হিন্দু-মুসলমানের কাজিয়া। বসির মালিকের গত কয়েকদিনকার কঠিন নীরবতা আর অন্যমনস্কতার সঠিক কারণ খুঁজে পেল এবার। ঈশ্বরের পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হল। কিন্তু কাটা পায়ে তাগদ নেই। পারবে না হাঁটতে। পারবে না ছুটতে। প্যাকিং বাক্সে বসিয়ে টেনে নিয়ে না গেলে ওর যাবার উপায় নেই। মৃত্যুর মুখোমুখি হলেও না।

ঈশ্বরের পঞ্চান্ন বছরের কুদে চোখ-জোড়ায় জল নেমে এল। হাতের মুঠিতে টিনের মগ, যা দিয়ে ভিক্ষে করে। পায়ের কাছে চটের বালিশ, যার ওপর মাথা রাখে। কাপড়ের গিঁটে বাহাত্তর নয়া। ওর সারাদিনের ভিক্ষের সঞ্চয়।

দেওয়ালের শেষপ্রান্তে কি যেন নড়ে উঠল। ভ্রূ কুঁচকে তাকাল ঈশ্বর। একটা মানুষ; দেওয়ালের গা ঘেঁষে অন্ধকারে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে। হ্যাঁ—তারই দিকে। ঠিক শিকারী কুকুর যেমন আসে। ওর হাতে একটা লাঠি। ও যদি মুসলমান হয়? যদি লাঠি বসিয়ে দেয় মাথায়। ঈশ্বর আর ভাবতে পারছে না। গলা শুকিয়ে কাঠ। চীৎকার করে উঠবে এমন শক্তিও যেন তার নেই। ঈশ্বরের মনে হল সে শ্মশানে চিতার কাছাকাছি। বাঁশের মাচায় দড়াদড়ি দিয়ে বাঁধা। মৃত্যু তার আসন্ন।

ঠিক হাত চারেক দূর। সরীসৃপের মত দেওয়ালের গা ঘেঁষে হামাগুড়ি দিয়ে ভয়ংকর মানুষটি হাত-চারেকের মধ্যে আসতেই আর্তকণ্ঠে প্রাণপণ শক্তিতে ঈশ্বর বলল—আমি ভিখারী বাবা—

আমিও ভিখারী। সঙ্গে সঙ্গে সরীসৃপের মুখ থেকে ঠিক ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর যেন প্রতিধ্বনিত হল। এবং ধপ করে দেওয়ালের গা ঘেঁষে বসে পড়ল সে। হাতের লাঠি গড়িয়ে গেল। কুকুরের মত সে তখন দম নিচ্ছে।

এত সময় পরে বুকের দম বাইরের বাতাসে ঠেলে হাল্কা হল রসুল। বস্তীর বাঁকে জলের কলের ধারে বসে রোজ সে ভিক্ষা করে। সেখানে আজ আগুনের শিখাটা দাউদাউ করে জলে উঠেছে প্রথম। অন্ধ সে। প্রথম বুঝতে পারে নি। লোকজনের হল্লা কানে যেতে আর আগুনের তেজ গায়ে লাগতেই উঠে দাঁড়িয়েছিল। উঠে দাঁড়িয়েই হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। এখন সে কি করে পালাবে? মালিক পৌঁছে দেয়। আবার রাতের অন্ধকারে মালিক ডেরায় নিয়ে যায়। তবু সেই মুহূর্তে আপন দৃষ্টিহীনতার কথা মনে রইল না রসুলের। দৃক্‌পাতহীন হয়ে সে ছুট দিল। ধাক্কা খেল বস্তীর চালায়। হোঁচট লাগল রাস্তার ইটে। পড়ে গেল কাদাভর্তি ড্রেনে। তবু ছুটল রসুল। প্রাণের আশায় ছুটে এসে বাধা পেল বড় রাস্তার দেওয়ালে।

কার ঘর পোড়ে? ঈশ্বর রসুলকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন করল।

জানি না। জবাব দিল অন্ধ রসুল।

কে বন্দুক চালায়?

জানি না।

ওরা দুজন চুপ করল। চুপ করে থেকে ভয়ংকর বিষয়টি ভুলতে চাইল বোধহয়। কিন্তু পারল না। বস্তীর আগুন ক্রমশ রাস্তার দিকে প্রসারিত হচ্ছে। উর্ধ্বশ্বাসে লোক ছুটছে বড় রাস্তায়। বন্দুক আর পটকার আওয়াজ আরও কাছাকাছি। ওরা দুজন এবার একসঙ্গে ভয় পেল। ভয় পেয়ে দুজনে দুজনের নিকটবর্তী হল। গরু-বাছুর, মানুষ একরাশ জীব একসঙ্গে ছুটে গেল প্রাণভয়ে। যার যেদিকে চোখ যায়।

এখন কি করবে? ঈশ্বরের গলায় জোর নেই আর।

তুমি বল। রসুলের অন্ধ চোখের কোণে অক্ষমতার ফোঁটা ফোঁটা জল।

চল, পালিয়ে যাই।

আমি অন্ধ।

আমি খোঁড়া।

এবার দুজনে আরও কাছাকাছি হল ওরা। অন্ধ রসুল হাতের লাঠি নামাল। খোঁড়া ঈশ্বর ইটের খোয়া ফেলে দিল। আত্মরক্ষার ভঙ্গুর ও দুর্বল আয়ুধে এই মুহূর্তে আর তাদের প্রয়োজন নেই।

উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যাচ্ছিল দুটি লোক। হঠাৎ তারা থমকে দাঁড়াল। লক্ষ্য করল বকুলগাছের তলায়; যেখানে অন্ধকারের মধ্যে পাশাপাশি ঈশ্বর আর রসুল আত্মগোপন করে রয়েছে। অস্ফুটে নিজেদের মধ্যে কি যেন পরামর্শ করল তারা। ঈশ্বর স্নায়ু

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ
প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর
বেজওয়াডা - শ্রীনগর - গৌহাটী

তেজ রেখে কান খাড়া করল। ওরা কয়েক পা এগিয়ে এল। থমকে দাঁড়াল। আবার অস্ফুট কথা বিনিময় হল ওদের। এবং দ্রুত আগুনলাগা বস্তীর দিকে ছুটে গেল লোক দুটি।

কিসের শব্দ। খোঁড়া ঈশ্বরের হাত চেপে ধরল অন্ধ রসুল।

বিপদ। গলা শুকিয়ে গেছে ঈশ্বরের।

উপায়?

পালাতে হবে।

ওরা আর কথা বলল না। খোঁড়া অন্ধর কাঁধে উঠল।

দেওয়াল শেষ হতেই একফালি মাঠ। শেষদিকে খাটাল। এখন গরু নেই। এককোণে টিনের চালা কাত হয়ে রয়েছে। বিচালি কাঠ আর বাঁশ ভর্তি। ওরা দুজনে আদিম মানুষের মত আশ্রয়ের আশায় সেখানে ঢুকল। দৌড়ে গেল কয়েকটা ইঁদুর। পথের সেই কুকুর মুখ উঁচু করে দেখল। একটা বুড়ো গরু জাবর কাটছে আরাম করে।

রসুলের জিলজিলে বুকে হাঁপ ধরেছে। ঈশ্বরের পেটে শূলবেদনা। কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। একটা নিরাপদ আশ্রয় সাময়িক কষ্ট ভুলিয়ে দিল। পরস্পরের বন্ধনমুক্ত হয়ে কাছাকাছি বসে রইল ওরা।

তোমার ডেরা কোথায়? ঈশ্বর কথা বলে সাহস আনে। চুপচাপ বসে থাকতে ভয় হয়।

কালাবস্তী। করুণ স্বরে জবাব দিল রসুল। তোমার?

রেলগেট। থুতু ফেলে ঈশ্বর।

মালিককে কত দিতে হয়? রসুল শুধাল।

দৈনিক এক টাকা।

আমারও।

ওরা পরস্পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। সেটা একসঙ্গে মিশে গেল বাতাসে। মুহূর্তের জন্য মৃত্যুর চেয়েও সত্য আপন আপন বৃত্তির বিষণ্ণতা ম্রিয়মাণ করল ওদের। ঈশ্বরের ইচ্ছে হল সঙ্গীর পরিচয় জেনে নিতে। রসুলও চাইল সাথীর নাম জেনে আরও ঘনিষ্ঠ হতে। কিন্তু সাহস করে মুখ দিয়ে কথাটা কেউ উচ্চারণ করল না। এই দাঙ্গা-বিধ্বস্ত ভয়ংকর রাতের অন্ধকারে ওরা হিন্দু বা মুসলমান হতে চাইল না নতুন করে। দুজনে ভিখারী, এই পরিচয়েই ওরা নিশ্চিন্ত থাকতে চাইল।

হঠাৎ হাতবোমা ফাটল রাস্তায়। ঝমঝম করে বেজে উঠল টিনের চালা। একটি নারীকণ্ঠ একবার মাত্র আর্ত চীৎকার করতে পারল। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল ওদের। গুমোট কান্না হাতবোমার ধোঁয়ায় আকাশে মিশে একাকার।

এখানে কারা? অন্ধকার পুড়িয়ে টর্চের আলো জ্বলে উঠল হঠাৎ। হিংস্র চেহারার কয়েকটি লোক; হাতে লকলকে ছুরি আর লোহার ডাণ্ডা। ঈশ্বরের গায়ে ধাক্কা মারল একজন। চুলের মুঠি ধরল রসুলের। মুখে মদের গন্ধ। চোখ জ্বলছে তাদের। ঈশ্বর বুঝল মৃত্যু আসন্ন। রসুল অনুভব করল আল্লার পৃথিবীতে আজ শেষদিন। শেষনিশ্বাস ফেলবার জন্য প্রস্তুত হল ওরা।

তোর নাম কি? রসুলের পেটে খোঁচা মারল একজন।

পাখী। পেটের নাড়ী ছিঁড়ে শব্দটি মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল রসুলের হঠাৎ।

তোর? ঈশ্বরের মুখে সজোর চড় পড়ল একটা।

ফুল। ভিরমি খেয়ে শব্দটি উচ্চারণ করল ঈশ্বর। না বুঝেই।

হো হো শব্দে হেসে উঠল ওরা। হায়েনার হাসি হাসল। নেশাগ্রস্তের হাসি হাসল। হাসতে হাসতে ধাক্কা মারল ওদের দুজনকে। ওরা পড়ে গেল। হা রাম আর ইয়া আল্লা শব্দ দুটি ঈশ্বর আর রসুলের বুক পর্যন্ত এসেও উচ্চারিত হতে পারল না। ফুল আর আর পাখীর পাঁজরে আটকে রইল।

চল। পুলিশ আসার আগেই—

দ্রুত পদক্ষেপে ছায়ামূর্তির মত বেরিয়ে গেল তারা। যাবার আগে টিনের চালায় পেট্রল ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল। ফুল আর পাখীর পাঁজরে ছুরি বসাবার জায়গা পেল না বোধ হয়।

যখন পুলিশের গাড়ি আর ফায়ার ব্রিগেড এল তখন রাত শেষ হয়ে গেছে। সূর্যওঠা ভোর হয় নি। টিনের চালা পুড়ে ছাই। ইঁদুরগুলো আর দড়িতে বাঁধা গরু পুড়ে মরেছে। দূরের বস্তীর লেলিহান শিখা প্রায় নির্বাপিত। দলা পাকানো ধোঁয়া উঠছে তখনও।

উন্মুক্ত মাঠের শেষপ্রান্তে ওরা দুজন গুটি-শুটি হয়ে বসা। মৃত্যুর মুখোমুখি একরাত বাস করে ওরা বোবা হয়ে গেছে। পুলিশ এসে ওদের পরিচয় জানতে চাইল। দুটি ক্যাম্পের কোন্‌টিতে তারা যেতে চায়। ওরা কিন্তু এতকালের সুখে দুঃখে বহন করা পরিচয়টা দিতে পারল না। ঈশ্বর আর রসুল তাদের বহু ব্যবহৃত নামের পরিচয় এক রাতেই ভুলে গেছে। এখন ওরা পাখী আর ফুল। মানুষের কোন সম্প্রদায়ে ওরা আর পরিচিত হতে চায় না।

পুলিশের গাড়ি বস্তীতে ঢুকতেই পাখী আর ফুল আপন মনে কুয়াশার মধ্যেই চলা সুরু করল। একটু পরেই সূর্য উঠবে।

মহাকবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বৃত্র-সংহার কাব্য

দাম—দুই টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

আঁধার মানিক

ধারাবাহিক উপন্যাস

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ কুড়ি ॥

'জীবনে আমার ইষ্ট ছাড়া অনিষ্ট ভাব নি, যা বলতে তোমায় জানি, কিন্তু কি দেখে বউ এনেছিলে ছোট, আমার মনের শান্তি ছারেখারে দিল।'

আনন্দীর কথা শুনে বিশালাক্ষীর বুক ফেটে যায়। তিনি মৃদুস্বরে বলেন, 'গোপাল, সবই ভাগ্য। জগৎ আচার্য দাদাকে দিয়ে কথা কওয়ান, তুমি জান, দাদা তোমায় কি চোখে দেখেন, বললেন বড় বংশের মেয়ে, এ বংশের মেয়েরা সুখী হয়, ওর বড় সতাতো বোন টুনি হতে রায়বংশে শ্রী এসেছিল।'

নিশ্বাস ফেলে বলেন, 'বাপ-মা বলত বুনো মেয়ে, তাই নাম দিয়েছিল বুনি। বুনি বুনোই রইল, জ্ঞান-বুদ্ধি আর হল না!'

'এখন আমি কি করি?'

আনন্দীরামের বুক দু'ভাগ হয়। দুই বউ নিয়ে ঘর করবেন? কুন্দর সঙ্গে বিয়ে ত' বাবা জোর করে দিলেন। কুন্দর বাপ তাঁর পা জড়িয়ে ধরেছিলেন। বাবা বললেন, 'গোপাল, ব্রাহ্মণের ধর্ম রাখ।'

বাবার সঙ্গে আনন্দীরামের পদে পদে বিরোধ হত, মতের মিল ছিল না, তবু 'পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম', শৈশবে ঠাকুমার কোলের কাছে বসে শেখা। শৈশবের সে সুন্দর প্রভাতে, ঠাকুমার ঠাকুরঘরে জবা, দোপাটি ও শিউলি ফুলের গন্ধ ঘন হয়ে থাকত। পিতামহী বাবার জ্ঞাতি খুড়ীমা, শীর্ণা, শিরওঠা, জরাগ্রস্তা হাতে এ-সংসারের হাল ধরে থাকতেন। তাঁর কোল-আঁচলের কাছে বসে বালক আনন্দীরাম শেখেন, 'পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম,' সে শিক্ষা রক্ত থেকে যায় না, শৈশবে মানুষ কি অসহায়, যে শিক্ষা রক্তে নেয় তা কখনো ভোলে না, ফলে কুন্দকে বিয়ে করতে হল।

'এ তোমার ছোটবোনের মতন', ফুলেশ্বরী এ-কথা শুনে ঈষৎ হেসে মেঝেতে বসে বড় মোহনখোঁপা বাঁধেন। উত্তম বালুচরী-কলিমটর পরেন, একটি একটি করে সর্বাঙ্গে গহনা, কার্তিকী শুক্লাতিথির সচল জগদ্ধাত্রী প্রতিমা যেন, এমনই সগর্বে সোনার সিঁদুর-কৌটো হাতে সপত্নীর কপালে সিঁদুর পরাতে গিয়েছিলেন। কুন্দর হাতে রাঙা কড়, রাঙা চেলী, গরীবের ঘরের ভীরু বালিকা। মা'র শেখানো কথা ধীরে ধীরে বলেছিল সতীনকে গড় ক'রে, 'তোমার ছোটবোন, পায়ের নীচে ঠাঁই দিও।'

এখন আনন্দীরাম কি করেন? 'ছোট, কুন্দ এখন চোখের জলে ভাসে। তাকে না তাড়ালে বড়বউ থাকবে কি? আমি অধর্ম করতে পারব না।'

এ-সংসার ফুলেশ্বরীকে বড় উঁচুতে

ঠাই দিয়েছিল। তার চুল বাঁধতে পিসীর মেয়েরা সকলে ছুটে যেত। তার ছেলে সবায়ের কোলে-কোলে ফিরত। ফুলির কাকা মহীপতি বলতেন, 'হর-পার্বতীর সংসার। কৈলাসে দুর্গা যেমন, বুনিকে ওরা বুকে ধরে রেখেছে।' এ-কথা বলতে তাঁকে নিশ্বাস চাপতে হত। কেন না ঐ ছেলে তিনি নিদুলীর জন্যে স্থির করেন, তাই শুনে জগৎপতির টনক নড়ে ওঠে, তিনি বোনের আগে মেয়েকে পাত্রস্থ করলেন।

'নিদুলীর বিয়ে কি ওখানে হতে পারে না?' মহীপতির কথায় যুক্তি ছিল। দেশাচারে বাধা নেই, শাস্ত্রে আটকায় না; নৈকষ্য কুলীন দশটা বিয়ে করতে পারে, কিন্তু নিদুলী বললে, 'ছি।'

তার কথায় তীব্র তিরস্কার ছিল। মনোভঙ্গে সে তখন পাথর প্রতিমা, নিদুলীর মুখ দেখলে আজও মহীপতির বুক ফাটে। বিয়ের কথা হতে সে রাত জেগে, লুকিয়ে, নিজ হাতে কাপড়ে ফুল তুলত, সে-কথা মহীপতি জানেন। সৈদাবাদে মুসলমান মেয়েরা কাপড়ে নক্সা তোলে ও রঙীন সুতোয় মনোহারী খোঁপা-ঢাকা জাল বোনে। তাদের দেখে নিদুলী শিখেছিল।

সে নকশা-কাটা জাল, ফুল-তোলা কাপড় দিয়ে নিদুলী ফুলেশ্বরীর ডালি সাজিয়ে দিয়েছিল। বেতের রঙীন সুন্দর ডালি বঙ্গদেশে বেদেরা বোনে, মাঝিরা সৈদাবাদে বেচতে আনত, নিদুলী ডালির ওপর থরে থরে তার সকল সুখের জিনিস সাজিয়ে দেয়, মহীপতিকে বলে, সে বরকনেকে বিষ্ণুপুর কালীধামে পাঠিয়ে পুজো দিইয়েছিল, ফুলিকে 'সতীলক্ষ্মী ব্রত'র নিয়ম শিখিয়ে দেয়। এ-ব্রত আরেকজনকে শিখিয়ে দিলে নিজে আর কাজে লাগাতে পারে না। বড় জাগ্রত ব্রত।

'নিদুলী।' মহীপতি দুঃখে কাতর হন, কিন্তু নিদুলী তার কথা শোনে নি। 'এ ব্রত তুই নে বুনি, চিরদিন সুখে-সোহাগে থাকবি', তাঁর কণ্ঠে কান্না ছিল।

সুখে-সোহাগে ছিল ফুলেশ্বরী, কেউ তাকে অনাদর করে নি, সতীন থাকত পায়ের নীচে, তবু তার মন উঠল না। বড়মানুষের মেয়ে গরীব ঘরে সাজে না। সে এ-সংসারের উঠোনে হাঁটতে পায়ে ব্যথা পেত, ছেলেকে নাওয়াতে হলে কেঁদে অধীর হত। তার বাবা বলেছিলেন, 'আমরা জামাই আনি, মেয়ে দিই না, আমার এক সন্তান, ওকে না দেখলে আমার বুক পোড়ে।'

কিন্তু আনন্দীরামের ধীর শান্ত স্বভাবে সমানবোধ বড় সম্ভ্রান্ত ছিল। তাঁর সম্মানবোধ ছিল এক খেলাতী দোশালা, মহামূল্যবান আভরণ, তিনি সে আভরণ ত্যাগ করেন নি।

'তোমার সংসার আমাকে নিয়ে, এ-সংসারে তোমার কাজ কি। তুমি আমার সঙ্গে বাবার কাছে চল। তিনি তোমায় দেওয়ান কাছারীতে কাজ করে দেবেন। মুর্শিদাবাদে বাবার নামে সবাই কাঁপে, তুমি অবুঝ হয়ো না।'

ফুলেশ্বরীর সে-কথায় আনন্দীরাম ব্যথা পান। বলেন, 'তুমি আমার স্ত্রী। আমার সাধ্যমত তোমায় সব দেব, গহনা, আদর, সম্মান। কিন্তু পুরুষের আত্মসম্মান জেয়াদা দামী, সে-বস্তু আমি দিই কেমন করে বড়বউ?'

এ-কথা বলে বোঝাতে হল, এ-দুঃখে আনন্দীরাম কতই দুঃখ পান, কিন্তু ফুলেশ্বরী কি তাঁর কথা শুনলেন?

কারো কথা শোনেন নি। সতীনকে কথার ঘায়ে হেঁটকাঁটা-ওপরকাঁটার যন্ত্রণা দিতেন। বিশালাক্ষী বলতেন, 'বউ থির হও, তুমি এ-বাড়ির লক্ষ্মী, তুমি ছেলের মা, তোমার আসন কে কাড়ে?' কিন্তু ফুলেশ্বরী তখন নতুন জেদ ধরলেন, 'দাঁইহাটের মেয়েকে বাপের বাড়ি পাঠাও, নয়ত আমি চললাম।'

অথচ ফুলেশ্বরী কুলীনকন্যা, সতীন নিয়ে ঘর করা জন্ম হতে দেখেন, তাঁর সৎ মা'র কোলেপিঠে তিনি বড় হয়েছেন, তবু অবুঝ অভিমানে সুন্দর ঘাড় বাঁকালেন। ক্রমে বেণী আর খোঁপায় জড়ান না, হাত গায়ের গহনা বাক্সে উঠল, অভিমানে মাটিতে গড়াগড়ি দেন, স্বামীকে ফুলেশ্বরী বড় ভালবাসেন, নিজের স্বভাব মত, হায়, স্বামী এমন বস্তু নয় যে আঁচলে গেরো দিয়ে রাখবেন।

তারপর একদিন কেঁদে-কেটে চলে গেলেন কাশিমবাজার, সে আজ পাঁচ বছর হল। এখন এতদিন বাদে এই বিপদ।

'ছোট, আমি কি করি?'

আনন্দীরাম এখন ব্যাকুল প্রশ্ন করেন, 'তুমি সব জান, বল আমি কি করি? বড়বউ আমায় অধর্মের দিকে ঠেলে দেয়।'

বিশালাক্ষী উনোনে কাঠ ঠেলে দেন। কড়াই-এর তরকারীতে তিল-পোস্ত বাটা গুলে দিয়ে বলেন, 'গোপাল, কর্তা বলতেন, বড় গাছে বড় ঝড় বাধে। পুরুষ মানুষকে অনেক কাজ করতে হয়, একটা বিয়ে যেমন তেমন হবে কাতর হয়ে কি হবে।'

'তাঁরা সেকালের মানুষ, তাই বুঝতেন, আমি এ-কালের মানুষ, অমন চোখ বুজে থাকতে পারি কই।' ব'লে আনন্দীরাম বাইরে গেলেন।

'কুন্দ। হেঁসেলে এস মা।' বিশালাক্ষী ধীরে ডাকেন।

কুন্দর চোখ কান্নায় লাল, মুখ থমথমে। সে বালিকা, এখন মাত্র ষোল বছর বয়স, 'মা, আমি তোমাদের ছাড়া অন্য ঘর জানি না, আমার বাপ-ভাই বড় দুঃখী, তুমি কি আমায় তাড়িয়ে দেবে?'

অন্য সময়ে কুন্দ এত কথা কয় না, কিন্তু এখন সে মনোদুঃখে অধীর। তা ছাড়া বিশালাক্ষী তাকে আঁচলের ছায়ায় রাখেন। এ-সংসারে আনন্দীর মা, পিসীমা সবাই অবুঝ, বউকে মিষ্ট গলায় ডাকেন না, বিশালাক্ষী কুন্দকে হাতে ধরে সংসারের কাজ

শিক্ষা দেন। শাস্ত্রের গল্প বলেন, ব্রতপালন করান। বলেন, 'ওটি আমার অন্ধের লাঠি, ও বিনে আমি বাঁচি না।'

এখন তিনি বউকে কাছে ডাকেন। বলেন, 'সে কি কথা মা! তোমাকে আমি নিজে কোলে করে ঘরে তুলেছি,' এ-কথা বলতে তাঁর অনেক কথা মনে পড়ে। সেদিন তাঁর মাথার ওপর স্বামী, হলেন বা বৃদ্ধ, সংসারে নিরাসক্ত, রাধামাধবের চরণ সম্বল; তবু সংসারের শোভা, মাথার মুকুট।

'পর বউ, গয়না পর,' এ-কথা বলে ননদ তাঁর গহনার ঝাঁপি বের করেছিলেন। কিন্তু বিশালাক্ষী বলেন, 'সে কি কথা?' কড় হাতে কুঁড়েঘর থেকে বউ এনে, তার সামনে কি শাশুড়ী সাজে? এই আমার বেশ সাজ,' বলে তিনি ত্বরিতে এগিয়ে গিয়েছিলেন। 'এস আমার মা এস', আদরে সাপটে কুন্দকে কোলে নিয়েছিলেন।

'তুমি কেঁদ না মা, গোপাল আমার ধার্মিক ছেলে, সে অন্যায় জানে না।' এ-কথা বলতে তাঁর বুক স্ফীত হয়। আনন্দীরামকে তিনি বড় শুভক্ষণে চোখে দেখেছিলেন, ছেলে বলতে তিনি প্রাণ দেন. 'তুমি ঘরের শ্রী মা।'

কুন্দর চোখের জল মুছে দিয়ে বিশালাক্ষী বলেন, 'স্নক্ত নামিয়ে তুমি আঁশঘরে যাও মা, আজ হাবির পঞ্চামৃত, পাঁচখানা রাঁধতে হয়। কাজ কারো জন্যে বসে থাকে না। ঠাকুরঝির ঐ হাবা মেয়ে; ওকে তুমি ছাড়া কে দেখবে বল?'

'আঁশঘরে আমি গেলে ঠাকুরাণী বকবেন না?' কুন্দর মন থেকে দুঃখ নিমেষের জন্য যায়।

বিশালাক্ষী হাসেন। বলেন, 'তোমার ঠাকুরাণীর বকুনি মা, ও মানতে গেলে সংসার চলে না। আমি কম কথা শুনেছি? ও চিরকালের অবুঝ মা, নিজের ছেলের সঙ্গে রিষ করতে ছাড়ত না।'

'মামী, আঁশঘরে কি আমি যাব?' হাবির বোন এসে দাঁড়ায়। তার রান্নায় সুনাম, কাজ কিছু অজানা নেই। কিন্তু কুলীন স্বামী দশ বছরে দেখা দেন না, রাধির এত গুণ সব বিফলে গেল।

'কুন্দ রাঁধবে রাধি, তুই জোগাড় দি'গে যা। তারি কইমাছ এনেছে? জেলেপাড়ায় যেতে আসতে কত সময় যায়?'

'মা, আমি পারব ত'?' কুন্দ ভয় পায়, 'শেষে নিন্দে হবে।'

'খুব পারবে। রাধি, বড়মামীকে বলগে যা, এ-ঘরে এসে পায়েস রাঁধুক। তোর মাকে সন্দেশের ছাঁচ আর ক্ষীরের থালা দি'গে যা। হাবিকে বল্, পান ক'টা সেজে রাখুক। এমন শুয়ে বসে থাকা ভাল নয় মা।'

একে-ওকে-তাকে এক কাজে দিয়ে বিশালাক্ষী পুকুরপাড়ে গেলেন। এ-পুকুরে তাঁরা ভিন্ন কেউ জল সরে না।

নিরিবিলি, নিশ্চুপ। জিবলগাছের গায়ে হেলান দিয়ে ফুলেশ্বরী আপন মনে মাটিতে বুড়োআঙুল দিয়ে দাগ কাটছেন। বিশালাক্ষী তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। আড়ালে তাঁকে 'ফুলি' বলেন, কেন না অনেক দিনের চেনা। ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, 'ফুলি, আমায় তুই ফাঁকি দিতে পারবি না। বল্, কেন এমন কাজ করলি? হতভাগী, এমন করে নিজের সর্বনাশ কে করে?'

'বলব। সব কথাই বলব।' ফুলেশ্বরী কাঁদতে থাকেন।

'বল্।'

(ক্রমশঃ)

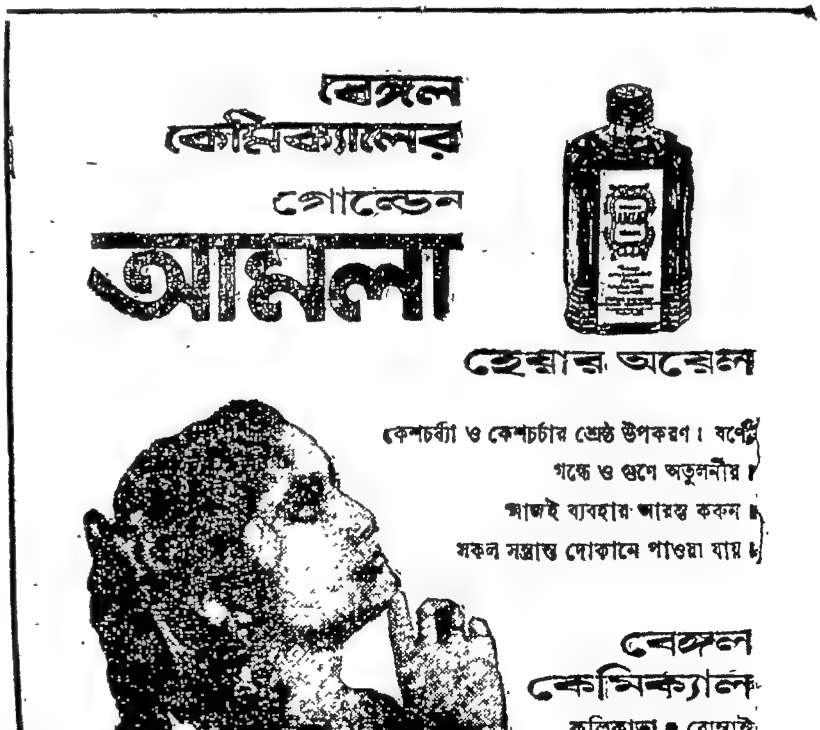

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ একবিংশ প্রবাহ ॥

একেবারে যে বাঙালী কিছুই করে নি, তা নয়। সাধনা ঔষধালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্দ্র মহাশয় তাঁর 'বাণিজ্যে বাঙালী' প্রবন্ধে বলেছেন :

'স্বদেশীযুগের ভাবসাগরের উদ্বেল বন্যায় যে জাতীয়তার আত্মপ্রকাশ সংঘটিত হইয়াছিল, তার ফলে বাংলার বিভিন্ন প্রকার কলকারখানা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ দেখা দেয়। ১৯০৫ থেকে ১৯৩৯ খৃস্টাব্দ মধ্যে বহু জননীর অনেক কৃতী সন্তান ব্যবসায়ক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়া কাপড়ের কল, চটকল, চামড়ার কল, চাউল ও ময়দার কল, কাচের কারখানা, চিরুণীর কারখানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া বাংলার বণিক-সমাজকে পরিপুষ্ট করিয়াছেন'—

পরে অন্যত্র ঘোষমশাই আরও বলেছেন :

'বজবজ থেকে ত্রিবেণীর গঙ্গাতীর পর্যন্ত ৬০।৭০টি পাটকলের ভেতরে ৪।৫টি পাটকল বাঙালীর। ---'

প্রিমিয়ার সল্ট কোম্পানী ও বেঙ্গল সল্ট কোম্পানী লবণ উৎপাদনে ব্রতী হয়েছিল। বেঙ্গল সল্ট কোম্পানীর ডাইরেক্টর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেছিলেন :

সংগঠন শক্তি, সহানুভূতি এবং অর্থ সাহায্যের মূলে বাংলার লবণ-শিল্পের ভবিষ্যৎ একান্তই সমুজ্জ্বল।

শুধু কি লবণ। ওষুধের ব্যবসায় আজও বাঙালীর নৈপুণ্য বিস্ময়কর। এই কলকাতা শহরেই প্রায় ৫২।৫৩টি ওষুধের কারখানা বাঙালীর পরিচালনাধীনে চলছে। বৃটিশ ফার্মাকোপিয়ার কতক কতক ওষুধ ও ভেকসিন ও সিরাম প্রস্তুত করে বাংলা দেশ খুবই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। বেঙ্গল কেমিক্যাল এ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিকাল ওয়ার্কস, ইউনিয়ন ড্রাগ কোম্পানী, বেঙ্গল ইমিউনিটি, ডাঃ কার্তিক বসুর ল্যাবরেটোরীর নাম উল্লেখযোগ্য। ক্যালকাটা কেমিক্যাল ল্যাবরেটোরীও বহুবিধ ওষুধ প্রস্তুত করে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছে।

আয়ুর্বেদীয় ওষুধের ব্যবসায় সুবিস্তারে বঙ্গীয় কয়েকটি ফার্ম যে ভারতব্যাপী যশ অর্জন করেছে, এটাও কম গৌরবের কথা নয়। কলুটোলার সেন কবিরাজগণ এই ব্যবসায় প্রথম পথিকৃৎ। কলকাতার সি কে সেন এ্যাণ্ড কোম্পানী, এন এন সেন এ্যাণ্ড কোম্পানী, কল্পতরু আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয় এবং ঢাকার সাধনা ঔষধালয়, শক্তি ঔষধালয় ও আয়ুর্বেদীয় ফার্মেসী লিমিটেড আয়ুর্বেদের জনপ্রিয়তা ও প্রসারতাকে অত্যন্ত বিস্তীর্ণ করে দিয়েছে।

এই ওষুধ তৈরিতে ও এর ব্যবসায় বাঙালীর গৌরব করার আছে।

ওষুধের ব্যবসা ছাড়া চর্ম-শিল্পের ব্যবসাতেও বাঙালী কৃতিত্ব দেখিয়েছে। এই বাংলা দেশেও স্যুটকেস, এটাচী-কেস, হোল্ডঅল, ডাক্তারী ব্যাগ, বেড-বাইণ্ডার আর মনিব্যাগ ইত্যাদি তৈরি হচ্ছে। বাংলার নীরব কর্মী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত বাংলার লুপ্তপ্রায় চর্ম-শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন।

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ কোম্পানী খাঁটি বাঙালী পরিচালিত একটা প্রতিষ্ঠান—রবারের জিনিস নির্মাণে খুব কৃতিত্ব দেখিয়েছে। বর্ষাতি ইত্যাদি বিস্ময়কর নিপুণতার সঙ্গে তৈরি করেছে।

অস্ত্রচিকিৎসার যন্ত্রপাতি—ল্যান্সেট, ফরসেপস, কাঁচি ও সেফটি রেজারও এখন বাংলা দেশে তৈরি হচ্ছে।

ক্যালকাটা, ন্যাশনাল, হিমানী, শিশির সোপ ওয়ার্কস, ক্যালকাটা কেমিক্যাল এবং বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রভৃতি বাংলার সাবান-শিল্পকে গঠন করেছে। শুধু তাই নয়, কাপড়-কাচা সাবান ও ওষুধ জাতীয় (কার্বলিক, চাল-মুগরা) সাবান, টয়লেট তৈরির কাজেও এইসব কোম্পানী খুবই খ্যাতি অর্জন করেছে।

একথা ভাবতে সত্যই আনন্দ হয়, এইসব বাঙালী-পরিচালিত কোম্পানীতে বহুবিধ জিনিস তৈরি হয়।

সুগন্ধি তেল। পথে চলতে চলতে পাশ কাটিয়ে যাওয়া লোকের মাথা থেকে গন্ধ ভেসে আসে। কী তেল মেখেছে। ক্যালিফোর্নিয়ান পপি? না আর কোন বিদেশী তেল?

না। বেঙ্গল কেমিক্যালের ক্যান্থারাইডিন। কিম্বা সি কে সেনের জবাকুসুম। এসব তেল বাঙালীর সম্পূর্ণ নিজস্ব অবদান। দেশ-বিদেশে সুখ্যাতি অর্জন করেছে জবাকুসুম আর ক্যান্থারাইডিন। নাম করেছে কুন্তলীন। লক্ষ্মীবিলাসের খ্যাতিও কম নয়।

একদিন বাঙালী শিল্পীর নতুন আবিষ্কার পূর্ণিমা ব্যাটারী সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল।

আরও কত ছোটখাট জিনিস আছে, সব উল্লেখ করলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হবে, তথ্য ভারাক্রান্ত হবে।

জুয়েলারী অর্থাৎ স্বর্ণশিল্পের ক্ষেত্রে বি সরকারের ব্যবসায়িক বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিভা অবিস্মরণীয়। স্বর্ণশিল্পে বাঙালীর একদিন প্রভুত্ব ছিল। একটুকরো সোনার ওপরে ছোট হাতুড়ি দিয়ে নিপুণ ছন্দে যতিতে আশ্চর্য অলঙ্কার তৈরি করেছে এখানকার স্বর্ণশিল্পীরা।

আরও একটা জিনিসে বাঙালীর ব্যবসায়িক ক্ষমতা ও শিল্প-প্রতিভার নিদর্শন পাওয়া যায়। পথেঘাটে দেখা যায় স্টেশনারী দোকানের মাথায় নিওনের আলোয় ঝলমল করে একটা সাইনবোর্ড—লিলি বিস্কুট—বৃটানিয়া। এই বৃটানিয়া আজ শিশু আর রোগীদের নিত্যপ্রয়োজনীয় আর অপরিহার্য এক বস্তু।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, পাঁউরুটির কারখানা, সেটা বাঙালীর দ্বারাই পরিচালিত এবং বাঙালীর পরিকল্পিত। বেকারীর জগতে 'আর্য বেকারী' একটি অবিস্মরণীয় নাম।

এইসব কুটিরশিল্প জাতীয় জিনিসে বাঙালীর উদ্যম দেখা যায়। কিন্তু বৃহৎ কোন ব্যবসায়ের ব্যাপারে বাঙালীর উপস্থিতি নেই। তার কারণ নির্মম দারিদ্র্য। শতকরা ৮০ জন বাঙালীকে উদয়াস্ত কঠোর পরিশ্রম করতে হয় একমুঠো অন্নের জন্য। যাকে বলে 'হ্যাণ্ড টু মাউথ' অর্থাৎ দিন আনে দিন খায়। এরা নিজেদের পেটের ধান্দায় অস্থির। নতুন কোন বিজনেস 'এণ্টার প্রাইজের' কথা ভাবতেও পারে না।

তাই দেখা যায়, কলাকাতার ধন-সমাগমের যেসব বিখ্যাত স্থান, রয়্যাল এক্সচেঞ্জ শেয়ার মার্কেট, ইনসিওরেন্স অফিসের এলাকা, বড়বাজারের কোন অঞ্চলে বাঙালী ব্যবসাদার নেই। এখানে "বিগ বিজনেস ম্যাগনেট" সবই অবাঙালী।

বর্তমান শতাব্দীতে কলকাতার বুকের ওপরে যত বিদেশী মূলধন আছে, যত বিদেশী কোম্পানী আছে, তারা ব্যবসায়কে বিপুলভাবে স্ফীত করেছে। এখানে বাঙালীর কোন স্থান নেই।

কলকাতায় একসময় বিখ্যাত বিদেশী ব্যবসায়ী রেলী, টার্নার মরিসন, গিলাণ্ডার্স, হোয়াইট, বার্ড ইত্যাদির ধনসমৃদ্ধি ছিল বিস্ময়কর।

বাঙালী অনেকে স্বাধীনভাবে ব্যবসায় নেমেছে সত্যি, কিন্তু রেলী, টার্নার মরিসন ইত্যাদির মত তারা প্রভূত উন্নতি করতে পারে নি কেউ। তবুও—

তবুও আমাদের ভেতরই আছেন আলামোহন দাস, আছেন বীরেন শাসমল, আছেন বি সরকার, আছেন স্যার বীরেন। বারান্তরে এঁদের কয়েকজন ব্যবসায়ে কৃতী বাঙালীর কথা বলবো।

(ক্রমশঃ)

রোমাঞ্চ উপন্যাসের যাদুকর
৺দীনেন্দ্রকুমার রায়ের
গ্রন্থাবলী
১ম ভাগে—৫খানি সুবৃহৎ ডিটেকটিভ উপন্যাস। মূল্য ৩৷৷০ টাকা
২য় ভাগে—৫খানি রহস্য উপন্যাস। মূল্য ৩৷৷০

জাতীয়-কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের
রঙ্গলাল-গ্রন্থাবলী
পদ্মিনী, সুরসুন্দরী, কর্মদেবী, কুমার-সম্ভব, নীতিকুসুমাঞ্জলি, কাঞ্চী-কাবেরী, কবির জীবনী। ৭খানি একত্রে ২·০০।

শ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন সম্পাদিত
নাড়ীজ্ঞান-প্রদীপিকা
(নাড়ী স্পর্শ দ্বারা রোগ নির্ণয় ও পরমায়ু নিরূপণ)
মূল্য এক টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

টোকিওর চিঠি | মিত্রেন

কিমোনো, তকোনামা আর ইকে-বানা,—পৃথিবীর শিল্পেতিহাসে অন্যত্র দুর্লভ এই ত্রয়ী বিদেশীর চোখে জাপানের অনন্যসাধারণ শিল্পপ্রীতির তিনটি বিস্ময়কর নিদর্শন। তকোনামা ও কিমোনোর কথা 'টোকিওর চিঠির' পাঠক-পাঠিকা মাত্রেই জানেন। গত ১৯শে নভেম্বরের চিঠিতে ইকেবানা বা জাপানী রীতির Flower arangement-এর আলোচনাও প্রকাশিত হয়েছে। জাপানী রীতিতে ফুল সাজানো বা 'ইকেবানা'র আলোচনায় জানিয়েছিলাম, যুগে যুগে সাহিত্য ও শিল্পকলার মতোই ইকেবানাশিল্পও জাপানের প্রগতিশীল দার্শনিক ধ্যান-ধারণা প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম হ'য়ে ওঠার মর্যাদা লাভ করেছে। ফুল নিয়ে একদল শিল্পী এবং শিল্প-নির্দেশক, একাধিক শিক্ষালয় এবং অনেকগুলি পত্র-পত্রিকা রাত-দিন মশগুল হ'য়ে আছেন। ইকেবানাকে মূলধন ক'রে এখানে বড় বড় শিল্পীর উল্লেখযোগ্য কর্মশালা নিত্য-নতুন রীতি-নীতির আবিষ্কার গবেষণায় ব্যস্ত।

একটি মাত্র ইকেবানার পেছনে থাকে শিল্পীর একান্ত সাধনা, ধৈর্য, পরিশ্রম ও গভীর চিন্তাশীলতা। বাগান থেকে ফুল তুলে পুষ্পাধারে সাজিয়ে রাখলেই তো ইকেবানা হয় না, জাপানে তেমন পুষ্পসজ্জার কোনো মূল্যও নেই। বরং তেমন ক'রে ফুল রাখলে জাপানে আপনি আনকালচার্ড আখ্যা পেতে পারেন। এঁদের শিল্প-চেতনা জাতীয় সংস্কৃতির ধারায় প্রবহমান। তাই ফুল নিয়ে এঁরা বিভিন্ন 'স্কুল' গড়েন, রীতিমত শৈল্পিক গবেষণা চালান। একটি সুষ্ঠু ইকেবানা রচনা করতে শিল্পীকে হরেক রকমের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হয়। আর এক এক রীতির পুষ্পসজ্জার জন্য এক এক রকমের পুষ্পাধারেরও যোগাড় রাখতে হয়। ইকেবানার জন্য রীতিমত আয়োজন চাই, চাই প্রকৃষ্ট শিক্ষা।

ইতিমধ্যেই 'ইকেবানা' সম্পর্কে পশ্চিমী দেশগুলি যথেষ্ট অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠেছে। ভারতে জাপানী পুষ্পচর্চার বড় রকমের কোনো ঢেউ জাগে নি, যদিও ড্রইংরুমে ফুল সাজানোর রেওয়াজ প্রচলিত আছে। জাপানী পুষ্পাধারের বৈচিত্র্যে অনেকে আকৃষ্ট হয়েছেন হয়ত, কিন্তু যথার্থ 'ইকেবানা' সৃষ্টির আগ্রহ অনুভূত হয় নি। অর্থাৎ কোন একটি বিশিষ্ট শিল্পীরীতিকে অনুসরণ ক'রে পুষ্পাধার সাজিয়ে তোলার রেওয়াজ সুরু হয় নি। অথচ জাপানী 'ইকেবানা'র সঙ্গে সামান্য পরিচয় হ'লে ভারতীয় পরিবেশের অনুকূলে খাঁটি ভারতীয় 'ইকেবানা' অনায়াসেই রচিত হ'তে পারে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যাঁরা মনে করেন এ্যাকুয়ারিয়ামে মাছ পোষার মতো ফুলদানে নিয়মিত ফুল সাজানোও একটি ধনিক-সাধ্য বিলাসিতা, তাঁরা কিন্তু গোছানো জিনিস সাজিয়ে রাখার কথাই ভাবেন; নিজের হাতে ছড়ানো জিনিস গুছিয়ে নেওয়ার আনন্দ-কল্পনায় শিহরিত হ'ন না। নচেৎ বনরানো পুষ্পে ভরা ভারতের মাটিতে অভাব কী? বিশেষ ক'রে বাংলা দেশে ফুল তো অনায়াসলভ্য (অবশ্য শহরে দুর্লভতার কথা স্বতন্ত্র)। তবু বলব, 'ইকেবানা'র সঙ্গে যাঁর সম্যক পরিচয় আছে, তিনি শহরে বাস ক'রেও এবং পুষ্পপত্র-পল্লবের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্যতার বিষয়ে পুরোপুরি সচেতন থেকেও বুক ঠুকে নিজের ঘরে একটি 'ইকেবানা' সাজিয়ে রাখার সঙ্কল্পে পিছপা হওয়ার কোনো সঙ্গত কারণই খুঁজে পাবেন না। সাজাতে জানলে আগাছা আর ঘাস জড়ো ক'রেও একটি চমৎকার 'ইকেবানা' রচনা করা সম্ভব।

শুধু বিশেষ বিশেষ ফুলপাতার নিজস্ব চারিত্র্য ধর্মটি শিল্পীর চোখ দিয়ে আবিষ্কার করতে হবে। প্রয়োজনীয় শাখাটি খুঁজে এনে প্রোথিত করতে হবে স্বস্থানে। সর্বোপরি জাপানী সুলভ একটি আগ্রহ ও শৈল্পিক আনন্দ-অনুসন্ধিৎসার অধিকারী হ'তে হবে। আর তা হলেই ঘর গুছানোর

● শিল্পী তামেজি নাকাজমা

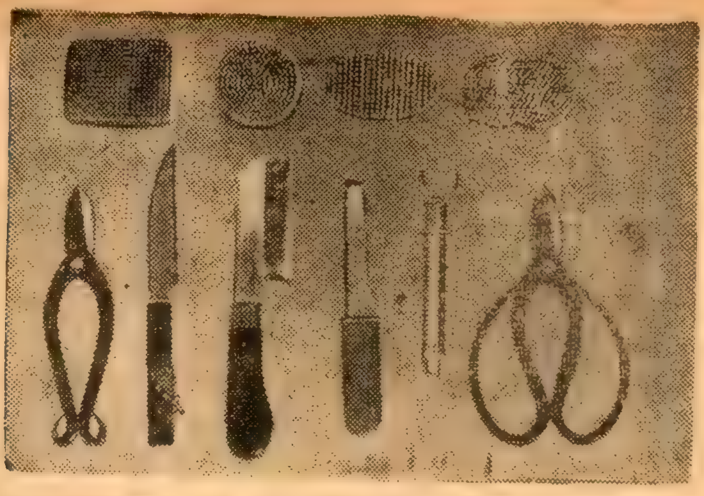

● ইকেবানার যন্ত্রপাতি

মতো 'ইকেবানা' রচনাও সহজ অভ্যাসে পরিণত হতে সময় লাগবে না।

জাপানে ইকেবানা বা ফুল সাজানোর রেওয়াজ আজ থেকে তেরশ' বছর আগে চালু হয়েছিল। এক এক জাতীয় পুষ্পসজ্জার পেছনে ছিল এক-একটি শৈল্পিক ও দার্শনিক চিন্তা। ভগবান তথাগতের ধর্মদর্শনকে রূপায়িত করার জন্য জাপানী ভক্ত-শিল্পী সর্বপ্রথম পুষ্পসজ্জার মাধ্যমে গ্রহণ করেন। সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে ক্রমশ ধর্মীয়-প্রভাবমুক্ত হ'য়ে জাপানী ইকেবানায় প্রকৃতির রূপ-বৈচিত্র্য সাঙ্কেতিক রীতিতে ধরা পড়তে থাকে। আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে পুষ্প-সুন্দরীকে নতুনতর অবস্থান-বৈচিত্র্যের মধ্যে নতুনভাবে সাজিয়ে তুললেন জাপানীশিল্পী। ফুলদানে কখনো সমজাতীয় পুষ্পপত্রের সমাহার কখনো বা বৈপরীত্য সৃষ্টি ক'রে বিভিন্ন শিল্প-চেতনাকে রূপায়িত করলেন তাঁরা। যেমন-তেমন ক'রে ফুল সাজানোর আনাড়িপনায় এরপর লজ্জা পেলেন শিল্পপ্রাণ জাপানী নাগরিকরা। সুরু হল ফুল নিয়ে চর্চা, ফুল সাজোনোর শিল্পসাধনা। আর তারই নাম ইকেবানা।

ইকেবানায় অন্ততপক্ষে বিশেষ ঋতু, বর্তমান ভূত ও ভবিষ্যৎ (অর্থাৎ কালগত বৈশিষ্ট্য) এবং উদ্ভিদ-জীবনের প্রাণস্পন্দনটুকু ফুটিয়ে তুলতেই হবে। না হলে সেটি ইকেবানার মর্যাদা দাবি করার অধিকার হারাবে। ইকেবানার দরবারে অন্ত্যজ ব'লেও অনুকম্পা লাভের আশা নেই। জাপান এক কঠোর নিয়মানুবর্তিতার দেশ। এখানে পান থেকে চূণ খসানোর কলঙ্ক অনপনেয়। সাজে-পোষাকে, চলন-বলনে এঁরা কঠোর নিয়মতান্ত্রিকতার ভক্ত।

ইকেবানায় তাই নিয়মের রাজত্বের কয়েকটি অনুশাসন মানতেই হয়। উদ্ভিদ-জীবনের একটি সামগ্রিক রূপ তুলে ধরার জন্য শিল্পী নিম্নলিখিত রীতি মেনে চলেন:

১। অতীতের রূপারোপে পূর্ণস্ফুট ফুল ও পূর্ণস্ফুট বীজের বীজশূন্য খোসা এবং শুকনো শাখাপল্লবের ব্যবহার।

● স্বর্ণমুখী ক্রিসানথেমামের মুখে ধরা দিয়েছে নববর্ষের নবীন আশার উজ্জ্বলো

২। বর্তমানের রূপায়ণে অর্ধোন্মুক্ত ফুল এবং সতেজ সবুজ পাতা; আর—

৩। ভবিষ্যতের সংকেত রচনায় কুঁড়ি, চিকন শাখাশীষ ও লালচে শিশুপল্লবের সহায়তা গ্রহণ।

এইভাবে জাপানীশিল্পী উদ্ভিদ-জীবনের জন্ম-মৃত্যু কর্মের ইতিহাস রচনা করেন ইকেবানার মাধ্যমে

ঋতু সম্পর্কেও ইকেবানার বিভিন্ন রীতি-নিয়ম আছে:

(ক) বসন্তের যৌবন বলদৃপ্ত রূপ প্রকাশনে এদেশের শিল্পী ব্যবহার করেন,—দৃপ্ত সন্নত পুষ্পসজ্জা। যেখানে শাখায় লতায় বক্রভাব বজায় থাকে সেখানেও তেজোদৃপ্ত চেহারাটি পরিস্ফুট করার দিকে শিল্পীর সচেতন দৃষ্টির অভাব হয় না।

(খ) গ্রীষ্ম এখানে ভারতীয় পচা ভাদ্র নয়। তাই গ্রীষ্মের রূপক রচনায় পুষ্পশোভার একটি বিস্তৃত আয়তক্ষেত্র সৃষ্টি করা হয়, যার দ্বারা গ্রীষ্মকালীন অজস্রতার রূপ ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস থাকে।

(গ) আবার শরৎ বা অটামের প্রতীকী রূপসৃষ্টিতে ইকেবানাকে শীর্ণকায়া করা হবে। ফলে সমৃদ্ধির অপ্রতুলতা একনজরে সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠবে।

(ঘ) আর শীত। ইকেবানার বিমর্ষ বিশুষ্কতাই তুলে ধরবে অজন্মার সাময়িক পরিচয়।

তত্রাচ এ সমস্তই ইকেবানা শিল্পের প্রথম পাঠ। অবশ্যকরণীয়। কিন্তু এর পরও আছে শিল্পীর স্বাধীনতা। শিল্পী এই আবশ্যিককে বজায় রেখেই আনবেন বৈচিত্র্যের বাহার। বস্তুত পক্ষে ইকেবানার শিল্পীকে হতে হবে প্রাজ্ঞ স্রষ্টা। জাপানী ইকেবানা শিল্পী ফুলের অঙ্গে যে ভাষা দেন, তার পাঠোদ্ধার করতে হ'লে অনুরাগীকে জানতে হবে জাপানের কাব্য-সাহিত্য, ধর্মদর্শন, আচার-আচরণ এমন কি এক-একটি উৎসবের বিশিষ্ট অর্থ। ইকেবানার ইতিহাস ও ঐতিহ্যের জ্ঞানও শিল্পীর মতো দ্রষ্টাকেও সযত্নে আহরণ করতে হবে।

নববর্ষের দিনটিকে রূপ দিতে হলে শিল্পিমনে যে উজ্জ্বল চিত্রকল্পের সৃষ্টি হয়, ফুলের মধ্যে তার রূপক খুঁজে ইকেবানা রচনায় মন দেন জাপানীশিল্পীর কবিমানস। উজ্জ্বল শাদা পুষ্পাধারে পাইন ও শুভ্র ক্রিসানথেমাম ফুল এইরূপ সৃষ্টি করতে পারে। অথবা সূর্যমুখী ফুলের সতেজ পূর্ণস্ফুট সন্নত চেহারা নতুন বছরের আশা আনন্দ ও উদ্দীপনার ভাবটি সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারে। অতএব

● জাপানী নয়, বিদেশিনী রচিত শুকনো মেক্সিকান গোলাপের ইকেবানা রাজমুকুটের আকৃতি লক্ষণীয়।

নববর্ষের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রির অবসান ঘোষণার প্রাণবন্ত সূর্যমুখী ফুলের ব্যবহার খুবই যুক্তিসঙ্গত। অবশ্য ঊর্ধ্বমুখী সন্নত ভাব জাপানী শিল্প-দর্শনে আরও একটি সূক্ষ্ম অর্থের দ্যোতনা করে, এই ঊর্ধ্বমুখীনতার মাধ্যমে তাঁরা স্বর্গাভিসারের ব্যঞ্জনাও রাখতে চান। স্বর্গ রাজ্যের দিকে পূর্ণস্ফুট ফুল যেন তার সতেজ খাড়াই শাখায় মুখ তুলে তাকিয়ে আছে।

বাংলা দেশে এ জাতীয় ইকেবানা অনায়াসেই রচিত হতে পারে। ঊর্ধ্বমুখী গগনাভিসারী ফুলের মধ্যে বোধহয় আরও সহজলভ্য একটি ফুল আছে, যাকে আমরা সহজ বাংলায় বলি, কলাফুল। কলাফুল সুলভ অথচ বর্ণ-বৈচিত্র্যে ক্রিসানথেমামের জুড়িদার। ইকেবানার বিশিষ্ট রীতি অনুসরণ করে এই অজস্র সস্তা কলাফুল সাজিয়ে দিলেই সৌন্দর্যের সঙ্গে দর্শন একত্র মূর্ত হ'য়ে উঠবে। এই জাতীয় স্বর্গাভিসারী (Heavenly Style) পুষ্পসজ্জা ইকেবানার দুটি বিভিন্ন রীতি মেনে চলে (১) মরিবানা (২) হায়েকা। তফাতের মধ্যে এই যে, মরিবানা যখন নীচু (চেপ্টা) ধরণের পুষ্পাধার ব্যবহার করে, হায়েকা রীতিতে তখন লম্বাটে ফুলদানী গ্রহণ করা হয়।

মরিবানা এবং হায়েকার বিভিন্ন রীতি সম্পর্কে বারান্তরে আলোচনা করা যাবে।

প্রখ্যাত কথাশিল্পী
শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়ের
রামপদ গ্রন্থাবলী
৩৯২ পৃষ্ঠা—মূল্য ৩৲ টাকা
গিরীন্দ্রমোহিনী দেবীর
গ্রন্থাবলী
মূল্য—বার আনা
বিগতকালের বরেণ্য সাহিত্যস্রষ্টা
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের
গ্রন্থাবলী
১ম ভাগে—
ফোকলা দিগম্বর, পাপের পরিণাম, ডমরুচরিত।
মূল্য এক টাকা
২য় ভাগে—
ভূত না মানুষ, কঙ্কাবতী, মজার গল্প, মুক্তামালা।
মূল্য: দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা
দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

● লবণ হ্রদে নবনির্মিত একটি বাড়ি

রাজধানী ঃ

একমাত্র মাছের বাজারের সামান্য উন্নতির লক্ষণ ভিন্ন বঙ্গ-দর্শনের পাঠক-পাঠিকাদের প্রতিদিনের সকালের ভাবনা লাঘবের মত—উৎফুল্ল হয়ে খুশিমনে পাঠের যোগ্য নতুন কোন সঠিক সংবাদ এ-সপ্তাহেও পরিবেশন করতে পারছি নে। আগামী দিনের যে-সব উন্নয়নমূলক রূপরেখার কথা সরকার এর্ মধ্যে ঘোষণা করেছেন, তা' একদিক থেকে আশাব্যঞ্জক, সন্দেহ নেই। তবে, তা' অভিনব নয়—পুরোনো পরিকল্পনাকে নয়া পাত্রে পরিবেশন করা হয়েছে বললে, অন্যায় হবে না। মাছ, ডিম, মাংস ও দুধের চাহিদা মেটাবার পরিকল্পনা দীর্ঘদিনের। এ নিয়ে অতীতে অনেক পরিকল্পনাই রচিত হয়েছে। কাজ একেবারে হয় নি, তাও নয়। হরিণঘাটায় হাঁস-মুরগীর আমদানী হয়েছে, হরিয়াণার ষাঁড় এনে শোভাবর্ধন করা হয়েছে, টালিগঞ্জেও পোলট্রি খোলা হয়েছে এবং গভীর জলের মাছ শিকার থেকে লালদীঘিতে মাছের চাষ হয়েছে।

লালদীঘির মাছের চাষের টাকাটার সবই জলে গিয়েছে। জালে একটা মাত্র শোল ও কয়েকটা কোলা-ব্যাঙ ছাড়া আর কিছুই সেদিনে পাওয়া যায় নি। বিদেশের বিশেষজ্ঞ দিয়ে সমুদ্রে ট্রলার চালিয়ে কোন ফয়দাই হয় নি। সে টাকাটাও লোকসান গিয়েছে। গভীর জলের মাছ ধরতে পারলে, পশ্চিম বাংলার মাছের অভাব কিছুটা মিটবে, এ-আশাই সেদিন সরকার করেছিলেন। কাজটাও পরীক্ষামূলকভাবেই নব বাংলার রূপকার পরলোকগত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সুরু করেছিলেন। সে কথাটা তিনি বারবার পরিষ্কারভাবে বলেও গেছেন।

খুবই দুঃখের কথা, বিধানচন্দ্র রায় যেগুলোতে সাফল্য অর্জন করে-ছিলেন বর্তমান সরকারের হাতে পড়ে সেগুলো আজ অলাভজনক সংস্থায় পরিণত হতে চলেছে। হরিণঘাটার দুধের ও হাঁস-মুরগী উৎপাদন কেন্দ্র সাধারণের মনে আশা ও ভরসার সৃষ্টি করেছিল। যাঁরা মুরগী পোষার নামে আঁতকে উঠতেন, মুরগী উঠানে ঢুকলে নাসিকা কুঞ্চিত করতেন—তাঁদের ঘরে হরিণঘাটার মুরগী স্থান পেয়েছে। হরিণঘাটার দুধ কলকাতায় এসে অতিলোভী গয়লাদের অত্যাচার থেকে আমাদের কিছুটা বাঁচিয়েছিল।

শ্রীফজলুর রহমানের হাতে পড়ে মুরগীগুলো নাকি ফজরে উঠে আগের মত ডাক ছেড়ে হরিণঘাটার জয়ধ্বনি করতে পারছে না। গরুর দুধও শুকিয়ে যাচ্ছে—কলকাতার নাগরিকদের শূন্য বোতল হাতে নিয়ে সকালে ফিরতে হচ্ছে সরকারের

● শ্রীফজলুর রহমান

দুগ্ধ সরবরাহ কেন্দ্র থেকে। রহমান সাহেবের স্পর্শে যে-বিপত্তি ঘটেছে, তার প্রতিকারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ন'কোটি টাকা খরচ করার পরিকল্পনা নিচ্ছেন। এবারে আর পশ্চিম-ভারতের ষাঁড় নয়, খাস বিলাত ও আমেরিকার ঘাটি থেকে ষাঁড় আসবে ভারতীয় গরুর মানোন্নয়নের জন্য। হরিণঘাটায় শূকর পালন কেন্দ্র খোলা হবে। ডানকুনিতে হবে কসাইখানা। দক্ষিণ কলকাতার লবণাক্ত জলাভূমিতে—লবণ হ্রদে হবে মাছের চাষ। পোর্ট ক্যানিং ও নামখানাতে প্রতিষ্ঠিত হবে ঠাণ্ডাঘর।

খুবই মুখরোচক খবর। কিন্তু উৎসাহ পাচ্ছি নে, কোটি কোটি টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ দেখেও। ষাঁড় আমদানীর জন্য যাদের আমেরিকা পর্যন্ত পাড়ি জমাতে হচ্ছে, তাদের বুদ্ধির তারিফ কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই করবেন না। ভারতবর্ষে দশ সের থেকে আধ মণ পর্যন্ত দুধ দেয় এমন গরু ও মহিষের অভাব নেই। বাংলার গোজাতির উন্নতির জন্য আমেরিকা সফরের পরিকল্পনা না করে পাঞ্জাবের ষাঁড় আমদানী করলে বিদেশী মুদ্রাও বাঁচতো এবং গ্রামের চাষীরাও অযথা ব্যয়-বাহুল্যের হাত থেকে রক্ষা পেতো।

প্রতি মাসে পাঞ্জাবের গরু

কলকাতায় ক'টা আসে এবং গয়লাদের অযত্নে দুধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো অকালে কিভাবে কসাইখানায় চলে যায়—তার হিসেব হয়তো আমাদের সরকার রাখেন না। দুধ ছাড়ার পর এই গরুগুলো রক্ষার ব্যবস্থা করতে পারলে, দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাবার চেষ্টার মত ব্যবস্থাপনা করে, বিদেশ থেকে ষাঁড় আমদানীর পরিকল্পনাটা সরকারের আমলাদের মাথায় আসতো না। এত গলদ নজরে পড়াতেই ভবিষ্যতের এ রূপরেখায় উৎফুল্ল হওয়ার মত কিছু খুঁজে পাচ্ছি নে।

• • •

দুধের অভাব মেটাবার জন্য, দুগ্ধপোষ্য শিশুদের ভাবনায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী ছানা তৈরি বন্ধ করতে চাইছেন। মুখ্যমন্ত্রীর যুক্তি অকাট্য সন্দেহ নেই। শিশু যেখানে দুধ পাচ্ছে না, সেখানে ছানা তৈরি করে রসগোল্লা বানিয়ে রসনার তৃপ্তি সাধন বিলাসিতা বৈকি! কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীকে এই হুমকী দেওয়ার আগে একটু সমঝে চলতে হবে। তিনি হঠাৎ দুম করে অনেক কথা বলে ফেলে বিপদ ডেকে আনেন। তার দুর্ভোগটা পোহাতে হয় সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে।

মিঠাই-মণ্ডার শিল্পটা বাংলার একচেটিয়া ছিল। এখনও বাংলার বাইরে বাঙালীর মিঠাই সমাদরের সঙ্গেই বিকায়। বাংলায় হালুইকরের সংখ্যা কম নয়। এবার সবাই বেকার হলে আবার সুরু হবে হাহাকার। প্রফুল্লদা এদের জীবিকা সংস্থানের কোন ব্যবস্থা করেছেন কি না, জানান নি।

গ্রামাঞ্চলের ও মফস্বলের মিঠাই-ব্যবসায়ীদের এর মধ্যেই নাভিশ্বাস সুরু হয়েছে। একমাত্র চিনিতে স্বাধীন ভারত স্বয়ংসম্পূর্ণ। সেই চিনি নিয়ে পশ্চিম বাংলার ব্যবসায়ী-চক্র যেরূপ ছিনিমিনি সুরু করে দিয়েছে, তাতে ছোট ছোট মিঠাইওয়ালার দোকানের ঝাঁপ বন্ধের উপক্রম হয়েছে। ময়দার অভাবে সামান্য মূলধনের মালিক রুটি-ব্যবসায়ীরা বেকার হয়ে পড়ছে। চিনির পর ছানা হাতছাড়া হলে সোনায় সোহাগা হবে—আরেক দল পরিবারে বেকার জীবনের অভিশাপ নেমে আসবে।

রুটির চাহিদা মেটাতে প্রফুল্লদার কুপনের ব্যবস্থায় মানুষ কুপিতই হয়েছে। রুটির দাম বেড়েছে—গেল কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পাঁচ পয়সা। বর্ধিত মূল্যটা সরকার কমাতে পারেন নি। এই বেশি পাঁচটা গাঁটের পয়সা খরচ করে যাঁরা চায়ের সঙ্গে দু' স্লাইজ মচমচে টোস্ট খেতেন, তাঁদের নয়া

● শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন

ব্যবস্থায় প্রলোভন সম্বরণ করতে হতে পারে। রুটি খেতে হলে তাকে সপ্তাহের বরাদ্দ খাদ্যশস্যের একটা অংশ ছেড়ে দিতে হবে—মাথাপিছু বরাদ্দ এক কে-জি গমের কিছুটা হারাতে হবে রুটির জন্য। সোজা কথা, সপ্তাহের বরাদ্দ খাদ্যের বেশি যেটা খোলাবাজারে পাওয়া যেতো, সেটা বন্ধ হলো। এরপর হয়তো একদিন বঙ্গ-দর্শনের পাঠক-পাঠিকারা শুনতে পাবেন, সিঙাড়া, নিমকি, চিঁড়ে ও মুড়ি কিনতে হলে কুপন লাগবে এবং কুপন পেতে হলে চাল বা গমের কিছুটা ছেড়ে দিতে হবে। হাসবেন না। হাসবার কথাও নয়। সরকারের ভাবভঙ্গী দেখে কোন ভরসাই মানুষ পাচ্ছে না।

• • •

যাঁরা কলকাতায় বাড়ি করতে চান, তাঁদের জন্য নতুন খবর একটি পেয়েছি। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সাধের পরিকল্পনা—লবণ হ্রদ ভরাট করে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তের গৃহের সংস্থানের পরিকল্পনার কাজ সমাপ্ত প্রায়। আড়াই লক্ষ মানুষের বাসোপযোগী ভিটে প্রায় তৈরি হয়ে এসেছে। এ কাজে বাঙালী ইঞ্জিনীয়ারগণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। শ্রী কে ডি গঙ্গোপাধ্যায়ের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার পরিচয় পেয়ে বোম্বাই ও উড়িষ্যার বিশেষজ্ঞগণ ছুটে আসছেন কলকাতায়।

লবণ হ্রদের জমি বিলি করা হবে তিন থেকে পাঁচ কাঠা করে। মূল পরিকল্পনায় জমির মূল্য ধরা হয়েছিল কাঠা প্রতি দু' হাজার টাকা। এবারে শোনা যাচ্ছে দাম হবে কমপক্ষে কাঠা প্রতি চার হাজার টাকা। জমির ওপর আটতলা পর্যন্ত বাড়ি নির্মিত হতে পারবে। জমির মূল্য দ্বিগুণ করেও সরকারের লাভ নাকি হচ্ছে না। তবে, লোকসানও সরকারকে দিতে হবে না।

সরকার জমি ভরাটের খরচের ফিরিস্তি এখনও দেন নি। খরচটা মূল পরিকল্পনার নক্সা-মাফিক না হয়ে এত বেশি বেড়ে কেন গেল, তারও কোন জবাবদিহি সরকার করেন নি। এই চড়া দাম দিয়ে ক'জন নিম্নমধ্যবিত্ত গৃহ নির্মাণ করতে সমর্থ হবেন, তা আমাদের পূর্তমন্ত্রী শ্রীখগেন দাশগুপ্ত ভেবে দেখেছেন কি? তিন কাঠা জমির মূল্য বারো হাজার টাকা জোগাড় করা নিম্ন আয়ের মানুষের সাধ্যাতীত। তাদের সামর্থ্যের কথা ভেবেই মূল পরিকল্পনায় জমির মূল্য যাতে দু' হাজার টাকার বেশি যা'তে প্রতি কাঠায় পড়ে, সেরূপ ব্যবস্থা ছিল। ডাঃ রায়ের মুখে এই আশ্বাসবাণীই আমরা

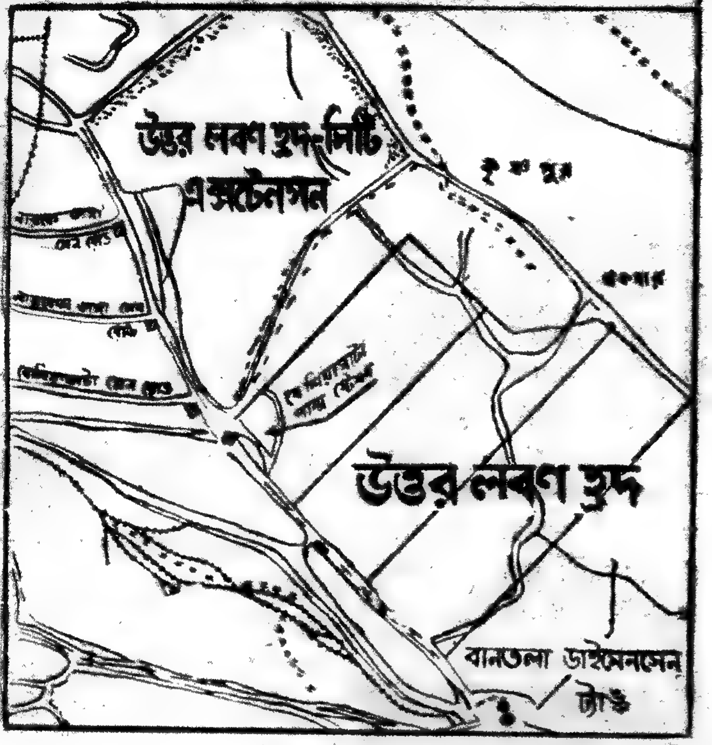

শুনেছিলাম। এখন দেখা যাচ্ছে, জমির মূল্য বাড়িয়ে সরকার বিত্তবানদের দয়া সুযোগ করে দিচ্ছেন। আর গৃহ নির্মাণের ঘোষণাতেও সেই কথাটাই আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

*   *   *

মাছের বাজারের সত্যি একটু উন্নতি হয়েছে। বাজারে টাটকা, তাজা মাছ আসতে সুরু করেছে। এটা মাছেরই মরশুম। এখন থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত অঢেল মাছ বাজারে আসবার কথা। সঙ্গে সঙ্গে দামও কমে এই সময়টাতেই। মাছ বাজারে এলেও দাম কিন্তু কমে নি। কমেছে চোরা-বাজারের অধিক মূল্যটা। মাছের ব্যবসায়ীরা সরকারের নির্ধারিত মূল্যের তালিকাটা ঝুলিয়ে বাজারের মন্দা প্রতিরোধের ফন্দী করেছে। মেছুনি জোরগলায় জানিয়ে দিচ্ছে, সরকারের বাঁধা দামের বেশি সে চায় নি। অতএব দামের আপত্তি তুলে কেউ যেন ঝামেলা না বাড়ায়। এ দামটা মাছের সর্বোচ্চ মূল্য, তা' ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই যেন ভুলে গেছে। বাঁধা দামে মাছ কেনার জন্য লাইনে দাঁড়াবার রীতিটাও ক্রেতারা প্রায় রপ্ত করে ফেলেছেন। ভোরে উঠে চা পানের পর্ব শেষ না করেই মেছোর বঁটিকে দণ্ডবৎ করে নীরবে অন্তত ঘণ্টাখানেক লাইনে না দাঁড়াতে পারলে এখনও মাছ জুটছে না।

বর্ধমান:

বর্ধমান পৌর প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন ১৯৬৫ সালেও হচ্ছে না। ১৯৬৩ সালের বিশে জুন থেকে পৌরসভার কাজ চালাচ্ছেন সরকার নিযুক্ত এ্যাডমিনিস্ট্রেটর। পশ্চিম বাংলার সর্বত্র প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হচ্ছে নতুন পৌরসভা। বর্ধমানের মানুষ স্বাভাবিক-ভাবেই পৌরসভাকে নতুন কাঠামোতে ঢেলে সাজাতে চায়। এ দাবি অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গতও। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে গড়া গণতন্ত্রের মহিমা বোঝা সব সময় সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। সরকারী দপ্তরের মাথায় যিনি বসেন, গণতন্ত্রও তাঁর খাকিবতিতে গোল্লায় যায়। শ্রীফজলুর রহমানের দৌলতে বর্ধমানের পৌরসভার সরকারী কর্তৃত্বের মেয়াদটা ১৯৬৫ সালের শেষ অবধি বৃদ্ধি পেয়েছে।

*   *   *

দুর্গাপুরের খাল কাটতে যে অর্থ ব্যয় হয়েছে, সে পরিমাণ জল খালে প্রবাহিত হচ্ছে কি না, এ বিতর্কের অবসান না হলেও দেশী নৌকো চলাচলের মত পর্যাপ্ত জল খালে আছে বলেই স্থানীয় অধিবাসীরা মনে করেন। এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়েই নৌকায় মাল পরিবহনের অনুমতি প্রার্থনা করে অনেকে আবেদন পেশ করেছেন সরকারের কাছে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, পশ্চিম বাংলা সরকারের দপ্তর থেকে কোন উত্তরই কেউ পান নি।

এদিকে আমলাচক্রের অপার মহিমার মৃদু গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। এদেশের ব্যবসায়ীদের কোন নৌকো নাকি দুর্গাপুরের খালে ভাসতে পারবে না; দুর্গাপুরের খালে নৌকো চালাবার একচেটিয়া অধিকার কোন একটি বিদেশী কোম্পানীকে দেবার তোড়জোড় চলছে। বিনা শুল্কে দুর্গাপুর খালের জলপথে মাল পরিবহনের অধিকার এই বিদেশী কোম্পানীকে দেওয়ার ব্যাপারে জনৈক অবসরপ্রাপ্ত আই-সি-এস নাকি নেপথ্যে থেকে কলকাঠি নাড়াচ্ছেন।

২৪ পরগণা:

গোবরডাঙ্গা, মেদিয়া কলোনী, চারঘাট, দাসহাটি, খাঁটুরা প্রভৃতি বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দাদের কঙ্কনা পারাপারের একমাত্র অবলম্বন খেয়া নৌকো। একবার খেয়া নৌকো-ডুবিতে দুজন যাত্রীর সলিল সমাধিও ঘটেছে। খেয়া পারাপারের দুর্ভোগ থেকে স্থানীয় অধিবাসীদের অব্যাহতি দেবার জন্যই কঙ্কনা বাঁধের পরিকল্পনা।

পাঁচ হাজারের অধিক উদ্বাস্তু পুনর্বাসন পেয়েছে মেদিয়া কলোনীতে। উদ্বাস্তু সমাগমের পরই কঙ্কনা বাঁধের

গুরুত্ব সরকার উপলব্ধি করেন। উদ্বাস্তুরাই স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় বাঁধের দাবিতে আন্দোলন সুরু করে। সরকার দাবি মেনে নেন এবং বাঁধের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার মঞ্জুর করেন দু' লক্ষ টাকা। সে প্রায় তিন বছরের কথা। কাজও আরম্ভ হয় ১৯৬২ সালেই। কিন্তু দু' বছরে কাজ একটুও এগোয় নি। এখন কাজ একেবারে বন্ধ। কণ্ট্রাক্টার নাকি কাজ বন্ধ করে সরে পড়েছে। নতুন কণ্ট্রাক্টার আবার নিয়োগ না করা পর্যন্ত কাজ বন্ধ থাকবে।

এ-অঞ্চলের মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহের পথ সুগম করার জন্যই বাঁধটির গুরুত্ব সমধিক। দু'পারের মানুষই নানাদিক থেকে কঙ্কনার উভয় তীরের ওপর নির্ভরশীল। একদিনও এপার ওপারকে ছেড়ে থাকতে পারে না। ফলে, বাঁধটি নির্মাণের কাজ অযথা বারবার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে উভয় তীরেই। বাঁধের কাজে অধিক বিলম্ব হলে বিক্ষোভ তীব্ররূপে দেখা দেবে। কর্তাব্যক্তিরা আশা করি, আর কালহরণ করে মানুষকে আন্দোলনের মুখে ঠেলে দেবেন না।

• • •

পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পরিষদের তত্ত্বাবধানে শীগ্‌গিরই সুন্দরবনে একটি প্যাকিং কাগজ তৈরির কেন্দ্র খোলা হবে। এ-প্রস্তাব দীর্ঘদিনের। মূল পরিকল্পনাটি ছিল চোদ্দ লক্ষ বিরাশি হাজার টাকার। বোম্বাইতে কেন্দ্রীয় খাদি ও গ্রামীণ শিল্প কমিশন তাকে কলমের এক খোঁচায় কেটে দিয়ে এক লক্ষ বাইশ হাজার টাকা মাত্র মঞ্জুর করেছেন। তবে, কাজ চালু হলে ভবিষ্যতে আরও টাকা মঞ্জুরীর প্রতিশ্রুতি কমিশনের কাছ থেকে পাওয়া গেছে। মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী তখন ধাপে ধাপে টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে কেন্দ্রটির কলেবর বৃদ্ধি করা হবে।

আপাতত ষাটজন স্থানীয় বাসিন্দাকে কাজে নিয়োগ করা হবে। প্যাকিং কাগজ তৈরি হবে খড় থেকে। সুন্দরবনে গ্রামীণ শিল্পের প্রবর্তন এই প্রথম।

সুন্দরবন অঞ্চলে ক্ষুদ্রশিল্প গড়ে তোলার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। পশ্চিম বাংলার শিল্পমন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ উদ্যোগী মানুষ। তিনি একটু চেষ্টা করলেই সুন্দরবনের দারিদ্র্য ঘুচতে পারে।

• • •

কার্তিকের শেষে দিনতিনেক প্রায় একনাগাড়ে বর্ষণের ফলে সুন্দরবনের দক্ষিণাঞ্চলে প্রচুর শস্যহানি হয়েছে। মথুরাপুর, পাথরপ্রতিমা, সাগর,

● শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ

নামখানা ও কাকদ্বীপ থানার হাজার হাজার বিঘা জমির আলুবীজ, কলাইবীজ, সরষেবীজ বৃষ্টিতে পচে গেছে। এসব এলাকার প্রধান শস্য ধান ও খেসারী। খেসারীর শেষ দানাটুকু পর্যন্ত চাষী ভবিষ্যতের আশায় মাঠে ফেলেছিল। বৃষ্টির ফলে তা তলিয়ে আছে জলের নীচে।

ধানও কম নষ্ট হয় নি। পাকা ধানকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৃষ্টি মাটিতে লুটিয়ে দিয়েছে।

নদীয়া:

জলঙ্গী কৃষ্ণনগরের পুরোনো জলকলের এলাকা গ্রাস করতে চলেছে। এই জলকল থেকে এখনও আড়াই লক্ষ গ্যালন জল সরবরাহ হয় প্রতিদিন। পাম্পিং স্টেশনের জেটিটি নদীর ভাঙন সামলাতে পারে নি। পাইপ লাইনও বেশিদিন টিকে থাকতে পারবে না বলেই বিশেষজ্ঞদের ধারণা। পাইপ লাইন জলঙ্গী ভেঙে দিলে ভয়াবহ জলকষ্ট দেখা দেবে এক নম্বর ও পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে। অর্থের ক্ষতিও হবে প্রচুর।

কৃষ্ণনগর পৌরসভার পক্ষ থেকে যথাসময়ে এর প্রতিকারের দাবি জানান হয়েছে স্বায়ত্তশাসনমন্ত্রী শ্রীফজলুর রহমান এবং সেচমন্ত্রী শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্যের দপ্তরে। কোন সাড়া মেলে নি কোন দপ্তরের কাছ থেকেই। অথচ সরকারী সাহায্য ভিন্ন জলঙ্গীর আক্রোশ থেকে কৃষ্ণনগরকে বাঁচাবার মত সামর্থ্য পৌরসভার নেই।

জলঙ্গীর ভাঙন রোধ করতে না পারলে কুমোরপাড়া, বক্সীপাড়া, মুচিপাড়া, পেয়াদাপাড়া প্রভৃতি বিরাট অঞ্চলের মানুষকে ভিটেমাটি ছাড়া হতে হবে। এদের অধিকাংশই পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তু। নদী এদের দুয়ারে এসে প্রায় হানা দিয়েছে। কারো কারো বাড়ির সীমানা থেকে নদীর দূরত্ব এখন পাঁচ হাতের বেশি হবে না। এরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে নদীর ভয়ালমূর্তি দেখে। সরকারের ঘুম ভাঙতে দেরি হলে, শুধু উদ্বাস্তুরাই আবার উদ্বাস্তু হবে না, সীমান্তের সঙ্গে যোগাযোগ যাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে। করিমপুর, শিকারপুর যাওয়ার সীমান্ত-পথের দিকে নদী এগিয়ে আসছে দ্রুতগতিতে—পঞ্চাশ গজ এগুতে পারলেই সে সীমান্ত-পথটিকেও গ্রাস করে ফেলবে।

জলপাইগুড়ি:

জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালের চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আবার

দানা বাঁধতে সুরু করেছে। হাসপাতালের রোগীর প্রতি যত্ন নেওয়ার চাইতে বাইরের রোগী দেখে পয়সা জমানোই নাকি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। তাঁদের নজরানা অন্তত একটিবার দেখিয়ে দিতে না পারলে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া সকলের ভাগ্যে হয়ে ওঠে না। এ অভিযোগ হামেশাই শোনা যাচ্ছে। বিনা দর্শনীতে শহর কলকাতার হাসপাতালেও স্থান পাওয়ার সম্ভাবনা অবশ্য খুবই কম। নামজাদা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের যথাসময়ে হাসপাতালে হাজির হওয়ার সুনাম কলকাতায়ও কমই শুনতে পাওয়া যায়। মফস্বলে এ রীতি চালু হওয়ার বিপদ অনেক। রোগীরা আসে সুদূর গ্রামাঞ্চল থেকে। চিকিৎসকরা এগারোটার আগে হাসপাতালে হাজির না হলে অনেক রোগীকে ফিরে যেতে হয়। জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালের কোন কোন চিকিৎসকের বিরুদ্ধে দেরিতে হাসপাতালে প্রবেশ এবং 'হাসপাতালে কি এত হয়' মন্তব্য প্রকাশের অভিযোগ উঠেছে। চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে এ ধরণের ঘৃণ্য কাজের অভিযোগের তদন্তের উপযুক্ত ব্যবস্থা না হলে হাসপাতালগুলো অচিরে দরিদ্রের অর্থ শোষণের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হবে।

* * *

সরকারের খয়রাতি সাহায্য তারাই পায় যাদের শারীরিক ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। আর পায় যারা সম্পূর্ণ অনাথ—সাহায্য পাওয়া ভিন্ন কোন পথই যাদের নেই। গ্রামাঞ্চলের নিঃস্ব ও অসহায় পরিবারগুলো দীর্ঘকাল সরকারী সাহায্য না পেয়ে চরম দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। পূজার আগে পরিবার পিছু দু' থেকে তিন টাকা করে সাহায্য একবার বিতরণ করা হয়েছিল। তারপর কোন মহল থেকে আর কোন সাড়াই পাওয়া যাচ্ছে না।

পঞ্চায়েতীরাজ গ্রামের মানুষের দুঃখ ঘোচাবে, ন্যায়বিচার পাবে তারা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে এবং পঞ্চায়েতের মাধ্যমে আসবে গ্রামের সুখ ও সমৃদ্ধি। গ্রামগুলো ধীরে ধীরে হয়ে উঠবে স্বাবলম্বী। এই আশার বাণীই প্রচারিত হয়েছিল ওপরের মহল থেকে। এখন দেখা যাচ্ছে, পঞ্চায়েতের প্রধানদের জন্য, পঞ্চায়েতের সদস্যদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থের যূপকাষ্ঠে বলি হচ্ছে মূক, দরিদ্র গ্রামবাসীরা। জলপাইগুড়ির বিভিন্ন অঞ্চল-প্রধান খয়রাতি সাহায্য কাদের দেবেন তার তালিকাই নাকি পেশ করতে পারেন নি। অঞ্চল-প্রধানদের এই অহেতুক বিলম্বে গরীবের ঘরে ঘরে উঠেছে হাহাকার ধ্বনি।

বীরভূম :

সাঁইথিয়ার প্রখ্যাত অবাঙালী ব্যবসায়ী ও মিলমালিক শ্রীওঙ্কারনাথ সারদাকে গ্রেপ্তারের পর চারদিকে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জাঁদরেল ব্যবসায়ীদের অনেকেই গা ঢাকা দিয়েছেন। তেলকলের মালিকরা রাতারাতি ভাল মানুষের মত দোকানে দোকানে ট্রাকে করে সরষের তেল পৌঁছে দিতে সুরু করেছিলেন। বীরভূমের মানুষ ক'দিন অঢেল তেল পেয়েছে। দামও কম ছিল।

শ্রীসারদা এ অঞ্চলের প্রভাবশালী ব্যবসায়ী। শ্রীসারদার সাঁইথিয়ায় চালকল, সরষের তেলের কল, কোল্ড স্টোরেজ প্রভৃতি হরেক রকমের ব্যবসা। গ্রেপ্তারের আগের দিন অভেদানন্দ কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত কর্নিকটি তিনি কিনেছেন তিন হাজার দু'শ টাকায়। কলেজ নির্মাণের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা সাহায্যেরও প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছেন।

* * *

তিলপাড়ার সরকারী পুকুর থেকে গুলীবিদ্ধ পাখী আনতে গিয়ে বীরভূম ফরেস্ট অফিসের পিয়ন (অর্ডারলী) শোচনীয়ভাবে মৃত্যুবরণ করেছে। পঁচিশ বছরের যুবক বলদেও মাহাতোর বাড়ি দুমকা জেলায়। মা বাবা, স্ত্রী ও চার মাসের একটি শিশু কন্যা রেখে গেছে।

জেলা ফরেস্ট অফিসার ও রেঞ্জ অফিসারকে শিকারে সাহায্য করতে সেদিন তাকে যেতে হয়েছিল। তাদেরই একজনের গুলীতে নিহত পাখী গিয়ে পড়ে পুকুরটিতে। এবং তাঁদেরই আদেশে নাকি বলদেওকে পাঁক, পানা ও দামে ভর্তি পুকুরে নামতে হয়েছিল। পাখী নিয়ে সে আর পুকুর থেকে উঠতে পারে নি। পরে তার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

এ ঘটনায় চতুর্থ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। কর্মচারীরা শোকসভা করেছে। সভায় জেলা-সমাহর্তার কাছে 'এই অকারণ' দুর্ঘটনার তদন্তের দাবি পেশ করেছে। বলদেও মাহাতোর স্ত্রী, কন্যা ও বৃদ্ধা মাতার ভরণ-পোষণের উপযুক্ত ব্যবস্থার আবেদনও তারা জানিয়েছে।

জেলা-সমাহর্তার কর্মচারীদের আবেদনে সাড়া দিয়ে তদন্তের ব্যবস্থা করা উচিত হবে। সরকারী কর্মচারী কারো ব্যক্তিগত ভৃত্য নয়। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বড় সাহেবরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজেদের ব্যক্তিগত কাজে নিয়োগ করে থাকেন। বলদেও স্বেচ্ছায় শিকারের সাহায্য করতে গিয়ে থাকলেও এবং মনিবকে সন্তুষ্ট করার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিহত পাখী উদ্ধারের জন্য পুকুরে নেমে থাকলেও অফিসার দুজনের বিবেক-বুদ্ধির তারিফ কেউ করবেন না। মাহাতো ভাল সাঁতার জানত না। তা ছাড়া যে পুকুরে মানুষ নেমে মাহাতোকে উদ্ধার করতে সাহস পায় নি, তেমন বিপদের মুখে ঠেলে না দিয়ে অফিসারদের উচিত ছিল মাহাতোকে প্রতিনিবৃত্ত করা। মনিবের সেরূপ সহৃদয় আদেশ মাহাতো অমান্য করতে সাহস পেতো না এবং তার এই শোচনীয় মৃত্যু ঘটতো না।

গ্রন্থ মেলা

জয়ন্তী সেন

সন্দেশ ঃ সম্পাদক : লীলা মজুমদার, সত্যজিৎ রায়। সন্দেশ কার্যালয় ; ১৭২।৩, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯, মূল্য : কাগজের মলাট তিন টাকা। বোর্ড মলাট চার টাকা।

'সন্দেশে'র শারদীয় সংখ্যার প্রথমেই সুকুমার রায়ের 'আনন্দ' কবিতা। এ কিন্তু সুকুমার রায়ের সেই সব প্রিয় হাসির কবিতা নয়, এ কবিতা একেবারেই নতুন—জীবনকে অগাধ ভালোবাসার কবিতা। যে ভালোবাসায় থাকে অঢেল আনন্দ। ছেলেদের জন্য গল্প তো অনেকেই লেখেন, কিন্তু 'প্রফেসর শঙ্কু ও কাণ্ড'-এর মত এমন অবাক করা গল্প কে কবে লিখেছেন? হ্যাঁ লিখেছেন—তাঁকে ছেলেরাও চেনে। তাঁর নাম সত্যজিৎ রায়, কলমে তাঁর যাদু আছে বৈকি—একথা স্বীকার করতেই হবে। ছেলেদের জন্যে নাকি বাংলা দেশে ভালো উপন্যাসের সংখ্যা হাতে গোণা যায়। তবু 'সন্দেশ' পড়েই বোঝা যায়, আরো তিনটি ভালো উপন্যাস শিশু-সাহিত্যে যুক্ত হোল। লিখেছেন তিনজন : পুণ্যলতা চক্রবর্তী, নলিনী দাশ ও লীলা মজুমদার। একটি উৎকৃষ্ট পত্রিকায় তিনটি ভালো উপন্যাস থাকা সহজ কথা নয়।

এই সঙ্গে আবার রুশ দেশের রূপকথাও আছে। লিখেছেন কে? আমাদের হাসিখুশির সুখলতা রাও। গল্প তো অঢেল। উপেন্দ্রকিশোর রায়, নরেন্দ্র দেব, স্বপনবুড়ো, শিবরাম চক্রবর্তী, আশাপূর্ণা দেবী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী। দুটো নাটিকাও দুই ধরণের ; লিখেছেন—বাণী রায় ও বীরেন্দ্রলাল ধর। ছড়া এবং কবিতাও অনেক। সন্দেশের ছড়া ও কবিতাই যেন সবার সেরা সন্দেশ। লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, গিরিবালা দেবী, আশা দেবী, উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক ও অনেকেই। এ ছাড়া আছে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, ক্রীড়া জগৎ, হাত পাকাবার আসর, আরো কত কী! 'ব' প্রতিযোগিতা কি? এতে যোগ দিতে না পারলেই তো মনস্তাপ। তাই চাই সন্দেশ—যে সন্দেশ হাসিতে খুশিতে, ভালোবাসায় আর পাতায় পাতায় ছবিতে ভরা। দামও খুব সস্তা।

॥ প্রকাশকদের প্রতি নিবেদন ॥

পুস্তক প্রকাশকগণের প্রতি আমাদের সবিনয় নিবেদন এই যে, সাপ্তাহিক বসুমতীতে সমালোচনার জন্যে যাঁরা পুস্তক প্রেরণ করতে ইচ্ছুক, তাঁরা অনুগ্রহপূর্বক অতঃপর নিম্নলিখিত ঠিকানায় দু'খানি করে পুস্তক প্রেরণ করবেন।

সম্পাদিকা, সাপ্তাহিক বসুমতী,
১, শরৎ বসু রোড, কলিকাতা—২০।

রবীন্দ্রসঙ্গীত ও আনুষঙ্গিক ঃ শৈলেশ ভড়। অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির, ৬, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-১২, মূল্য : আড়াই টাকা।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরধারার সঙ্গে মহাসাগরের স্রোত-সঙ্গীতের তুলনা করলেই হয়তো মনের ভাব প্রকাশ করা যায়। সমুদ্র বিরাট, তবু একক নয়, বহু স্রোতস্বিনীর সুরে পুষ্ট, গভীর ও গম্ভীর, তেমনি রবীন্দ্রনাথ স্বীয় সঙ্গীতে সম্পূর্ণ মৌলিকতা রক্ষা করেও সঙ্গীতের বিশ্বসভায় আমাদের এক মুহূর্তে হাজির করে দেন। এই কারণে রবীন্দ্রসঙ্গীত তুলনা-রহিত এক স্বর্গীয় বস্তু। তথাপি এই গানের সমাদরে আকৃষ্ট হয়ে অনেক পথিক এই পথে ভুলক্রমে যথেচ্ছা-বিহার করেন। উক্ত কারণে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সর্বাঙ্গীণ আলোচনায় একটি ইতিহাস রচিত হওয়া উচিত। উপরোক্ত লেখক অবশ্য অতদূর ভাবেন নি এবং সে প্রচেষ্টাও করেন নি। তবু তিনি যা করেছেন, তাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তিনি বলেছেন :

'রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সঙ্গীত রচনার সঙ্গে যাতে পরিচয় ঘটে এবং গায়কী রক্ষা করে সুষ্ঠু পরিবেশন প্রণালীও যাতে আয়ত্ত হয় সেইদিকে লক্ষ্য রেখে নবীন শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে বইখানি রচনা করেছি।'

রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্রমবিকাশের একেকটি পর্যায়, বাণী ও উচ্চারণ, তথ্য সঙ্গীত, সুর ও স্বরলিপি, ছন্দ ও লয়, ভাব ও রূপ প্রভৃতি অধ্যায় পড়ে মনে হয় তিনি নবীন শিক্ষার্থীদের জন্য যেমন অগ্রসর হয়েছেন—তেমনি একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনার জন্যও তাঁর প্রস্তুত হওয়া উচিত।

সোনার আনারস

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

মূল্য ঃ এক টাকা

কিশোর-কিশোরীদের উপযুক্ত রোমাঞ্চকর উপন্যাস। ছাপা, বাঁধাই চমৎকার

উপহার দিবার মত বই

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

রঙ্গজগৎ

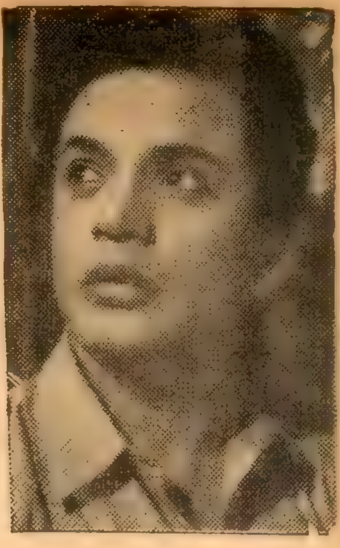

উত্তমকুমার
'গৃহদাহ' ছবির কাজ সুরু হয়েছে।

চলচ্চিত্রের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত

এক খবরে প্রকাশ, কাঁচা ফিল্ম সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটীর সুপারিশ অনুযায়ী ভারত সরকার স্থির করেছেন যে, কাহিনী চলচ্চিত্রের দৈর্ঘ্য সম্পর্কিত কোন বাধানিষেধ আর আরোপ করা হবে না। ভারতীয় চলচ্চিত্রের দৈর্ঘ্যের ওপর এই বাধানিষেধ তুলে নেওয়ায় নিঃসন্দেহে মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের এক শ্রেণীর বৃহৎ ফিল্ম ব্যবসায়ী খুশি হবেন। হয়তো তাঁদেরই তদ্বিরে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্তে বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা অথবা যাঁরা উচ্চতর মানসম্পন্ন ছবি করতে চান, তাঁরা খুশি হবেন না। বরঞ্চ তাঁদের কিছুটা শঙ্কিত হবার কারণ আছে।

স্মরণ করা দরকার যে, একসময় কাঁচা ফিল্মের যথেচ্ছা ব্যবহার বন্ধ করা এবং বৃহৎ প্রযোজকদের মনোভাবের দরুণ কাঁচা ফিল্মের অভাব রোধ করার জন্য এই নিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। কয়েক বছর আগে এমন অবস্থা হয়েছিল যে, ছোট ছোট প্রযোজকরা কাঁচা ফিল্মের অভাবে ছবি তুলতে পারছিলেন না। ছোট প্রযোজকদের পক্ষ থেকে তখন আন্দোলন করা হয়েছিল। সেই আন্দোলনের ফলে সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য ১২ হাজার ফুট সুপারিশ করা হয়েছিল; পরবর্তী দৈর্ঘ্যের জন্য লেভী বসানো হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল ১২-১৩ হাজার ফুটের মধ্যে ছবি সীমাবদ্ধকরণ। এই ব্যবস্থায় সকল প্রযোজকের পক্ষে ফিল্ম পাওয়া সম্ভব ছিল। মনে রাখা দরকার যে, আমাদের দেশে কাঁচা ফিল্ম তৈরি হয় না, বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। সেই সময় মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের আপত্তির দরুণ এই দুই স্থানের জন্য সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য নির্ধারিত ছিল যথাক্রমে ১৬ হাজার ও ১৪ হাজার ফুট। কিন্তু এতেও তাঁরা খুশি নন, কারণ সীমাবদ্ধতার মধ্যে তাঁরা সর্বরসে ছবিকে প্রসারিত করতে পারেন না।

বেতার ও তথ্য দপ্তরের এই সিদ্ধান্ত ভারতের চলচ্চিত্র-শিল্পে প্রগতিশীল চিন্তার সহায়ক নয়। এতে একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের সুযোগ দেওয়া হয়েছে।
—সুজন।

চিত্র আলোচনা

কাঞ্চনরঙ্গ
(চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থা)

'কাঞ্চনরঙ্গ' নাটক হিসাবে মঞ্চে সাফল্য লাভ করেছিল। শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র লিখিত এই নাটকের চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেছেন অমর গাঙ্গুলী। চিত্র পরিচালনায় শ্রীগাঙ্গুলীর এই প্রথম প্রয়াস। কিন্তু কাহিনীগুণে ছবিটি উপভোগ্য হয়েছে। প্রচুর হাসির মধ্যে বর্তমান সমাজের কাঞ্চন-কৌলীন্যের একটা নগ্ন দিক এই ছবিতে দেখান হয়েছে। যেখানে ভাল-মন্দর বিচার হয় অর্থের পরিমাপে, হৃদয় যেখানে অর্থের দ্বারা বিক্রিত। এই নির্মম সত্যের আঘাতে কাহিনী ও চিত্রনাট্যকার অবশ্য সিনিক হয়ে যান নি, তাই পাশাপাশি সমাজের নীচের স্তরের মানুষ খেটে খাওয়া এক নারীর হৃদয়ের মহত্ত্ব, এবং এক উদারহৃদয় যুবকের পরিচয়ও পাওয়া গেছে। অর্থ-কৌলীন্য যাদের জীবনে একমাত্র বিচারের মাপকাঠি—তাদের প্রতি শ্লেষে কাহিনীর রস ঘনীভূত হয়েছে।

পাঁচু গ্রাম থেকে এসে পাতানো সম্পর্কে মেসোমশায় যদুবাবুর বাড়িতে আশ্রয় নেয়। যদুবাবু মুখে আত্মীয়তার ভাণ করলেও তাকে বিনা মাইনের চাকর হিসাবেই স্থান দেয়। কয়েক দিন যেতে না-যেতে সকলের ফরমায়েস খাটতে খাটতে তার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে; তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও অপমানে সে মানুষ বলেই গণ্য হয় না। শুধুমাত্র একজনের কাছ থেকেই সে পেয়েছে মানুষের মর্যাদা, সে বাড়ির পাচিকা তরলা। একদিন সব উল্টে-পাল্টে গেল, যখন পাঁচুর নামে লটারীতে দু-লাখ টাকা পাওয়ার খবর এলো। সেই মুহূর্ত থেকে যদুবাবুদের কাছে

'দিনান্তের আলো' ছবিতে কালী ব্যানার্জি ও অনুপকুমার

অবহেলিত পাঁচু হয়ে উঠলো পাঁচুবাবু, তাঁদের নিকটআত্মীয়, তার গায়ে জামা, পায়ে জুতো হলো। তার খাতির-আপ্যায়নের শেষ নেই। এমন কি নিজেদের মেয়েকে বিয়ে দিয়ে তাকে জামাই করতেও যদু-গিন্নীর মনে সাধ।

চাকা আবার ঘুরে গেল। যখন লটারী কর্তৃপক্ষ জানালো পাঁচুর নাম ভুলে ছাপা হয়েছে। মুহূর্তে সে আত্মীয় থেকে আবার চাকরে পরিণত হলো। আবার তাচ্ছিল্য; শুধু তরলার কাছে সে একই মানুষ। সেখানে দামের কোন উঠতি-পড়তি নেই। কয়েক দিন পরে লটারী কর্তৃপক্ষ ভুল স্বীকার করে যখন জানালো যে, সত্যিই পাঁচু লটারীর টাকা পেয়েছে; তখন সে যদুবাবুদের আওতা থেকে বেরিয়ে পড়লো তরলাকে নিয়ে। সে তখন যদুবাবুদের সমাজকে চিনে ফেলেছে। যদুবাবুদের দেখা গেল একখণ্ড মাংসের জন্য যেমন কুকুর ছোটে, সেভাবে সপরিবারে তার পেছনে ছুটেছে।

পরিচালক চড়া কৌতুকরসে ছবিটির মেজাজ সৃষ্টি করেছেন। এই চড়া কৌতুকরসে ডুবে যাওয়ায় অনেক স্থানে তিনি বাস্তবতার ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেন নি। চিত্র রূপায়ণ-রীতির দিক থেকেও ছবিটি ত্রুটিমুক্ত নয়। বিশেষ করে পাঁচুকে বড় বেশি ইডিয়ট করে তোলার জন্য মূল বক্তব্য কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে। হাসির সঙ্গে সঙ্গে পাঁচুর প্রতি মনে সহানুভূতি জাগে না। মঞ্চরীতির প্রভাবেও ছবির গতি কিছুটা ব্যাহত।

কিন্তু পরিচালক শিল্পীদের কাছ থেকে যে অভিনয় সহযোগিতা পেয়েছেন, তাতে ছবিটি সাফল্যলাভ করেছে। তরলার ভূমিকায় তৃপ্তি মিত্রকে তরুণ মুখার্জির সঙ্গে বেমানান মনে হলেও অভিনয় তাঁর হৃদয়গ্রাহী। অল্প কথায় তিনি একটা মানবিক দিক, সাধারণ মানুষের মর্যাদাবোধ ও স্বপ্ন ফুটিয়ে তুলেছেন। অনবদ্য অভিনয়ে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পাঁচুর চরিত্রে তরুণ মুখার্জি পরিচালকের নির্দেশ সার্থকভাবে রূপায়িত করেছেন। যদুর ভূমিকায় গঙ্গাপদ বসু উল্লেখযোগ্য। তরুণকুমার, সুব্রতা চ্যাটার্জি, বিপিন গুপ্ত, শোভেন মজুমদার, লতিকা বসু প্রমুখ বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

ভূমিকালিপি উপস্থাপনা এবং সঙ্গীত পরিচালনায় ছবির মেজাজ জানিয়ে দিয়েছে।

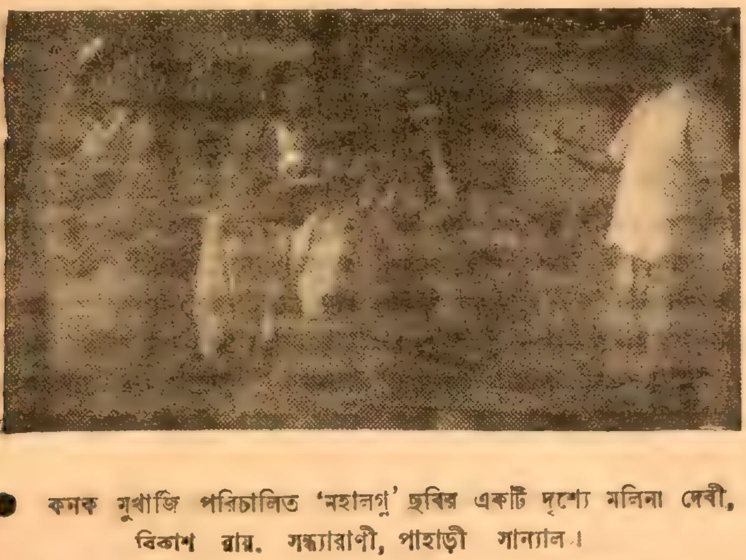

কনক মুখার্জি পরিচালিত 'মহালগ্ন' ছবির একটি দৃশ্যে মলিনা দেবী, বিকাশ রায়, সন্ধ্যারাণী, পাহাড়ী সান্যাল।

নাটকের কথা

ঠগ

(চলাচল)

'চলাচল' একটি নবগঠিত নাট্য-সম্প্রদায়। লিটল থিয়েটার গ্রুপ থেকে বেরিয়ে আসা একদল উৎসাহী এই নাটকের দল গঠন করেছেন। ইতোপূর্বে তাঁরা দুটি নাটক অভিনয় করেছেন, তাঁদের তৃতীয় নাটক 'ঠগ'-এর প্রথম অভিনয় দেখলাম ২৩শে নভেম্বর রঙমহল থিয়েটারে। নাটকটি রচনা করেছেন উমানাথ ভট্টাচার্য। প্রয়োগ পরিকল্পনা করেছেন রবি ঘোষ।

স্মারক পুস্তিকায় উদ্যোক্তারা

বলেছেন, জাঁ পল সার্ত্রের নাটকের দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও এই নাটক মৌলিক। আমরা দেখলাম, এই নাটকে বর্তমান কালের একেবারে সাম্প্রতিক অনেক ঘটনা প্রতিফলিত। এই নাটকের দর্পণে আমরা বাংলা দেশে গত দু-বছরে যা ঘটেছে এবং যা ঘটতে যাচ্ছে, তাকে যেন পুনর্বার দেখলাম। যাঁরা বাস্তব ঘটনাকে দেখতে পান না, এই নাটক তাঁদের সেই ঘটনা দেখাতে সাহায্য করবে। এদিক থেকে নাট্যকার ও 'চলাচল' সম্প্রদায় অভিনন্দনীয়।

দৈনিক সত্যবাণী অফিস এবং এই পত্রিকার সহ-সম্পাদকের গৃহ—এই দুটি স্থানে তিনটি দৃশ্যে নাটকে সংবাদপত্র মালিকদের চেহারা, সাংবাদিক তথা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানসিক গঠন ও চরিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তারই সঙ্গে এক প্রগতিশীলা নারীর দুর্বলতার মাধ্যমে রাজনৈতিক ও সমাজজীবনে অশুভশক্তির অনুপ্রবেশের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন করে ইউরোপে ফ্যাসিজম এসেছিল। নাটকটি দেখতে দেখতে আমরা বহু চেনা মানুষের নক্সা দেখতে পাই। দু-বছর আগের ঘটনার এক বামা সাংবাদিক ও সংবাদ-পত্রের মালিকের নগ্নমূর্তি এখানে দেখা যায়। এই স্বরূপ উদ্ঘাটনমূলক চরিত্র-চিত্রণ ও সংলাপ নিঃসন্দেহে জনশিক্ষা-মূলক প্রয়াস।

শিল্পে জীবন প্রতিফলিত, তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে জীবনের সংগ্রাম, জয়-পরাজয় এবং প্রেরণা। মানুষের জীবনের এমন রূপ যা মানুষকে জীবন-সংগ্রামে বিভ্রান্ত করে না। কিন্তু এখানে আমরা ব্যর্থতা ও হতাশা দেখেছি, সংগ্রাম দেখি নি। বাংলার প্রগতিশীল শক্তির দুর্বলতা অনস্বীকার্য, কিন্তু পাশাপাশি তাদের সংগ্রাম ও প্রতিবাদ এখানে দেখা যায় নি। শিল্প উদ্দেশ্যবিহীন নয়; কিন্তু তার নিজস্ব এক রীতিনীতি আছে। সেদিক থেকে এই নাটকে কিছুটা সূক্ষ্মরসবোধের অভাব আছে। তথাপি এই নাট্যচিন্তাকে আমরা সমর্থন না করে পারি না।

অভিনয়ে সম্পাদকের ভূমিকায় রবি ঘোষের তিক্ত-মধুর অভিনয়ে দর্শকমাত্রই অভিভূত হবেন। সহ-সম্পাদক সিনিক রাখাল ঘোষের ভূমিকায় ভোলা দত্ত প্রশংসনীয়। সত্যবাণীর মালিকরূপে উমানাথ ভট্টাচার্য অত্যন্ত সংযমের সাথে একটা চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। একটি মাত্র নারী চরিত্র চিত্রা মণ্ডল যথাযথভাবে চরিত্রের তাৎপর্য প্রকাশ করতে পারেন নি। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন তপন রায়চৌধুরী, হৃষি চক্রবর্তী, বাণীকুমার, প্রণব চক্রবর্তী, তপেশ চট্টোপাধ্যায় ও গোরা চট্টোপাধ্যায়। দলগত অভিনয় প্রশংসনীয়।

● মৃণাল সেন পরিচালিত 'আকাশকুসুম' ছবির একটি দৃশ্যে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও পুরোনো দিনের অভিনেত্রী প্রফুল্লবালা।

● তরুণ মজুমদার পরিচালিত 'আলোর পিপাসা' চিত্রের একটি দৃশ্যে সন্ধ্যা রায়

সঙ্গীত কথা

লণ্ডন সিম্ফনী অর্কেষ্ট্রার শিল্পীদল আপ্যায়িত

ভারতে সফররত লণ্ডন সিম্ফনী অর্কেষ্ট্রা দলকে ভারতীয় সঙ্গীত শোনাবার আগ্রহে জলপাইগুড়ির নবাবজাদী বেগম সাইদা জব্বার তাঁর পাম এ্যাভেনিউস্থ বাসভবনে এক সঙ্গীত-অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। গত ২৩শে নভেম্বর উক্ত অনুষ্ঠানে বেগমসাহেবা সুরবাহার ও সেতারে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সঙ্গত করেন ওস্তাদ কেরামত-উল্লা খান। সরোদে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন করেন ওস্তাদ ওমর খান (লক্ষ্ণৌ)। তারপরে ওস্তাদ কেরামতউল্লা খান তবলা লহরা বাজান। বিদেশী বিদগ্ধ শ্রোতারা এই সঙ্গীতে মুগ্ধ হয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

জার্মান গীটারবাদক ও গায়িকা

পশ্চিম বার্লিনের গীটারবাদক সিগফ্রীড বেরেণ্ড (৩০) ডিসেম্বর মাসে ভারত সফরে আসছেন। তাঁর সঙ্গে থাকবেন গায়িকা বেলিনা। মিঃ বেরেণ্ড পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোকসঙ্গীতের সুর বাজাতে পারেন এবং বিশ্বব্যাপী তাঁর গুণমুগ্ধ শ্রোতা রয়েছে। শ্রীমতী বেলিনা ৬টি ভাষা জানেন এবং ১৭টি ভাষায় গান গাইতে পারেন।

উত্তর দরবারীর কুশীলব

নাটুকে দল, নাটুকে মানুষ আর নাট্য-আন্দোলনের পটভূমিকায় উত্তর দরবারীর কুশীলব নাটকটির কয়েকটি নিয়মিত অভিনয় হবে মুক্ত অঙ্গন রঙ্গমঞ্চে।

প্রথম অভিনয় ১১ই ডিসেম্বর।

নাটক ও নির্দেশনা ভবেন্দু ভট্টাচার্য।

রেডা নৃত্য সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান

সংযুক্ত আরব প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র থেকে আগত রেডা নৃত্য সম্প্রদায় গত ২৪শে, ২৫শে ও ২৬শে নভেম্বর নিউ এম্পায়ার মঞ্চে নৃত্য প্রদর্শন করেছে। এই সম্প্রদায়ের তরুণ পরিচালক মাহমুদ রেডা ১৯৫৯ সালে এই নৃত্য সম্প্রদায় গঠন করেন, এবং প্রেসিডেণ্ট গামেল আবদেল নাসের তার

● নির্মীয়মাণ 'মায়াবিনী লেন' ছবির একটি দৃশ্যে নির্মলকুমার ও অন্যান্য শিল্পিগণ।

● পশ্চিম জার্মানীর গীটারবাদক মিঃ সিগফ্রীড ও গায়িকা বেলিনা

উৎসাহদাতা। ছোট একটি দল থেকে ক্রমে এক বড় সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছে এবং সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রের বাইরে রাশিয়া, চীন, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে এই সম্প্রদায় নৃত্য প্রদর্শন করেছে। ভারতে অনুষ্ঠানের শেষে এঁরা বার্মা ও হংকং-এ নৃত্য প্রদর্শন করে দেশে ফিরবেন। এই দলের মধ্যমণি বলতে রয়েছেন মাহমুদ রেডা, শ্রীমতী খাদিজা যিনি রূপসজ্জা দেন, তাঁরই বোন শ্রীমতী ফরিদা—দলের ব্যালেরিনা, এবং সঙ্গীত পরিচালক আলি ইসমাইল। দলের অনেকেই কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী।

মাহমুদ রেডা নিজেই বলেছেন, মিশরের লোকনৃত্য অবলম্বনে তিনি নাচগুলিকে সাজিয়েছেন, কালোপযোগী করেছেন। সুতরাং নাচগুলি অনেকাংশে সংশোধিত লোকনৃত্য। কোন কোন নাচের ওপর আজের বাইজান, জর্জিয়া ও চীনের নাচের প্রভাব পড়েছে। তবে আরবের মেজাজ নাচগুলিতে পাওয়া যায়।

যে এগারটি নাচ আমাদের দেখান হলো, তার মধ্যে বাস্তবিকই প্রশংসনীয় মিশরের প্রাচীন গাঁথা অবলম্বনে চিনির পুতুলের নাচ, একটি বালিকার হৃদয় জয় করা নিয়ে দু-দলের লাঠালাঠি রমজানের রাত্রিতে একটি গরীব বালিকা, কয়েকটি হাস্যরসাত্মক নাচও দেখান হয়েছে, তার মধ্যে এক গ্রাম্য বালিকাকে নিয়ে তিন যুবকের প্রেমাভিনয়, যাদু-বাঁশী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

নাচে এঁরা আমাদের মত মুদ্রা ও পায়ের রকমারী তাল ব্যবহার করেন না। নির্দিষ্ট কয়েকটি হাতের ভঙ্গি, এক পা বাড়িয়ে পদসঞ্চালন এবং কোমর দোলানো এদের নানানৃত্যের বৈশিষ্ট্য। ছেলেদের নাচ পৌরুষদীপ্ত এবং তাতে শারীরিক শক্তি ও সৌন্দর্য প্রকাশের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। একক নাচ অপেক্ষা দলগত নাচই তাঁরা পছন্দ করেন। সুগঠিত দেহের যুবকের ছন্দোময় গতি ও সুন্দরী মিশরী যুবতীদের সাবলীল দেহের এই সমবেত

● লণ্ডন সিম্ফনী অর্কেষ্ট্রা শিল্পীদের সঙ্গে নবাবজাদী সাইদা জব্বার, মিঃ জব্বার, ওস্তাদ ওমর খাঁ, কেরামতউল্লা খাঁ।

নাচ বৈচিত্র্যময় পরিচ্ছদে মনোরঞ্জক। পোষাকের দিক থেকে এরা উদার, প্রাচ্যের রক্ষণশীলতা ত্যাগ করেছেন। নাচের দিক থেকে খুব উচ্চাঙ্গের না হলেও এই নৃত্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা বর্তমান মিশরকে কিছুটা অনুভব করতে পারলাম। মোল্লা-মসজিদের আবেষ্টনী থেকে, কুসংস্কারের বেড়া ভেঙে, বোরখার আবরণ ছেড়ে যে নতুন মিশর জন্ম নিয়েছে, এই যুবক-যুবতীদের প্রাণময় নাচে আমরা যেন সেই মিশরের আভাস পেলাম।

আলি ইসমাইলের সঙ্গীত মূলত লোকসঙ্গীত অবলম্বনে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সুরমিশ্রণ। এই সঙ্গীত কিছুটা মধুর রসের এবং শ্রুতিসুখকর।

● [সং]যুক্ত আরব রাষ্ট্র থেকে আগত রেডা শিল্পীদলের দুজন নর্তকী

সংবাদ বর্ণনা

● রাজশ্রী প্রোডাকসন্সের 'দোস্তী' হিন্দী ছবিকে মধ্যপ্রদেশ ও পণ্ডিচেরী সরকার প্রমোদকর থেকে রেহাই দিয়েছেন।

● নবগঠিত স্ক্রীন এ্যাক্টরস গিল্ড অব ইণ্ডিয়ার প্রতিনিধি হিসাবে হিন্দী চিত্রজগতের কয়েকজন খ্যাতনামা অভিনেতা ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শিল্পীদের সমস্যার কথা আলোচনা করেছেন।

● আর ডি বনসাল প্রযোজিত সত্যজিৎ রায়ের 'কাপুরুষ ও মহাপুরুষ' চিত্রের 'কাপুরুষ' অংশের চিত্রগ্রহণ শেষ হয়েছে। এবার 'মহাপুরুষের' চিত্রগ্রহণ সুরু হয়েছে।

● 'হাম্বর' নাটকের দুজন বিশিষ্ট শিল্পী কৃষ্ণেন্দু গুপ্ত ও সুজাতা ব্যানার্জি

প্রবীণ রসোপন্যাসিক
শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের
অসমঞ্জ গ্রন্থাবলী
৩খানি বড় উপন্যাস ও ৭খানি নির্বাচিত গল্প। মূল্য তিন টাকা।
বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

পাঠক মন

'সাপ্তাহিক বসুমতী'র প্রত্যেকটি বিভাগই আমার কাছে ভাল লাগে। কেন ভাল লাগে ? বলতে হলে অনেক বলতে হয় তাই, সকল বিভাগের কথা না বলে শুধু একটি বিভাগের কথা বলব, কেন ভাল লাগে ? সে বিভাগ হলো 'পাঠকমন'। পাঠক-পাঠিকার মতামতের এতো স্বাধীনতা কোনো পত্রিকা (সাপ্তাহিক বসুমতী ভিন্ন) দিয়েছে বলে আমার মনে হয় না।

২৪শ সংখ্যায় (বৃহস্পতিবার, ২৬শে কার্তিক), এম, রায়হানউদ্দিন ২য় কলমের মাঝামাঝি লিখেছেন, 'পাঠ করা একেবারে অসম্ভব' একথা বলা যায় না।

তাঁর কথা কতটুকু সত্য আমি বুঝতে পারি নি। কেন এ কথার সমালোচনা করলেন তাও বুঝতে পারি নি। 'পাঠ করা একেবারে অসম্ভব' এ কথা সত্য। আপনার 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র ২৪শ সংখ্যা হতে উত্তর দিচ্ছি। ১৪৮৯ পৃঃ ৩য় কলমের শেষে কয়েকটি শব্দই ওঠে নি এবং ১৫১৩ পৃঃ ৩য় কলমের শেষের লাইনখানা উঠে নি। তারপরেও কি বলা যায় যা 'পাঠ করা একেবারে অসম্ভব'।

জনৈক পাঠক (জহর বোস) প্রশ্নোত্তর বিভাগের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, 'প্রশ্নোত্তর বিভাগ করলেই—উত্তমকুমার কোন - - - চুল কাটেন কিনা, সুচিত্রা রবারের - - - পরেন কিনা।' এসব প্রশ্ন আসবেই। আসবে তা সত্য। যদি সম্পাদিকার নির্দেশ থাকে, অবান্তর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় না—তাহলে এসব প্রশ্ন আসবে না সুনিশ্চিত।

সর্বশেষে আমার মতামত ও বিশ্বাস এই যে, সাপ্তাহিক বসুমতীতে যদি ধারাবাহিক লেখাগুলির মধ্যে যে, কোন একটি কমিয়ে বা গল্প-কবিতার একটি কমিয়ে যদি প্রশ্নোত্তর বিভাগ, ব্যঙ্গচিত্র কার্টুন বিভাগ করা হয়, তাহলে এই পত্রিকাখানি আরো সুন্দর হবে।

রণজিৎকুমার দে, অফিস লেন, আগরতলা

* * *

ভেজালের যুগে 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র মত নির্ভেজাল সাহিত্য-পত্রিকা যেদিন প্রকাশ হোল, সেদিন মনে মনে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলাম—তোমার যাত্রাপথ শুভ হোক। মনে সন্দেহ ছিল পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারবে তো ? কিন্তু যেদিন 'পাঠক-মন' প্রকাশ হল, সেদিন আমার মনের সব সন্দেহ দূর হয়ে গেছে। সেদিনই বুঝেছি এর দেওয়ার অনেক কিছু আছে। তখন থেকেই পাঠক-মনে আমার ক্ষুদ্র অভিনন্দনটুকু জানাব ভাবছিলাম।

সবচেয়ে ভাল লাগছে দেখে 'পাঠকমন' বিভাগে পাঠক যা বলছে তা পালন করতে আপনার চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই। আমাদের কথামত মলাটের কাগজ যথেষ্ট ভাল হয়েছে, (অবশ্য কাগজ থেকে ওপরের ছবিটা অনেক বেশি লোভনীয় ও আকর্ষণীয়) ছাপাও অনেক পরিষ্কার হয়েছে।

'সাপ্তাহিক বসুমতী'র 'আন্তর্জাতিক', 'ভারতদর্শন' ও 'বঙ্গদর্শন' যে-কোন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী-দের কাছে খুব বেশি আদরণীয় হওয়া উচিত, কেন না এতে ভারতের ভেতরে বা বাইরে কি ঘটছে বা ঘটার সম্ভাবনা আছে, তা সংক্ষেপে অথচ সম্পূর্ণভাবে জানা যায়—তাই এ বিভাগগুলোকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য বলছি—যে ছবিগুলো এইসব বিভাগে ব্যবহার করা হয় তা বহু ব্যবহৃত, ওগুলো মাঝে মাঝে পাল্টাবার অনুরোধ রইল।

'সাপ্তাহিক বসুমতী'র জন্মলগ্নে বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'দিল্লী থেকে' যেমন বেরোচ্ছিল ওইরকম ধরণের আর কিছু প্রকাশ করা যায় কি না, যেমন ধরুন বাংলার গ্রামাঞ্চলের এক একটি গ্রাম নিয়ে আলোচনা যদি করা যায়, তবে কেমন হয়—এতে বাংলার নিজস্ব রূপটা ফুটে উঠবে, সেইসঙ্গে অনেক অতীত ইতিহাসও জানা হবে। এটা গ্রামাঞ্চলের পাঠক-পাঠিকারাই করতে পারেন বলে আমার মনে হয়।

আর যে সব বিভাগগুলো যেমন আছে তেমনই চলুক—কোনটাকেই যেন বাদ না দেওয়া হয়। 'রঙ্গজগৎ'-এর পৃষ্ঠা সংখ্যা বাড়ানোর দরকার নেই—ওর জন্য অসংখ্য পত্র-পত্রিকা রয়েছে। শুধু 'সুজনে'র মন্তব্য ও নতুন বাংলা ও হিন্দী বইগুলোর নির্ভীক সমালোচনা থাকলেই যথেষ্ট। বরং বাংলা সিনেমার কলাকুশলীদের দুর্দশা কিভাবে দূর করা যায় অথবা বিদেশে পরিচালক ও জনসাধারণ চলচ্চিত্র সম্বন্ধে কি চিন্তা করেন—সে সম্বন্ধে দু-একটা প্রবন্ধ মাঝে মাঝে দিতে পারলে মন্দ হয় না। এর জন্যে দু-চারটে পৃষ্ঠাও দেওয়া যেতে পারে। 'খেলাধূলা' সম্বন্ধে ওই একই মত। তবে দেশের ছেলে-মেয়েদের খেলাধুলার মান কিভাবে আরও উন্নত করা যায়, সে সম্বন্ধে আলোচনা বা বড় বড় খেলোয়াড়দের মতামত প্রকাশ হলে ভাল।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রোমান্টিক উপন্যাস 'কৃষ্ণচূড়া' শেষ হলো। অনেকদিন এরকম মিষ্টি-মধুর উপন্যাস পড়ি নি। 'আঁধারমাণিক' শেষ না হওয়া পর্যন্ত নতুন কোন উপন্যাস না দেওয়াই ভাল—কেন না অত্যন্ত বেশি ক্রমশর আধিক্য হওয়ায় নতুন পাঠক-পাঠিকাদের ভালো নাও লাগতে পারে, আবার অনেক পাঠক-পাঠিকার ধৈর্যচ্যুতিও ঘটতে পারে। তার চেয়ে ঐ জায়গায় নতুন লেখকদের একটা করে ছোট গল্প দিতে পারলে ভালই হবে—নতুন লেখক ও বাংলা ছোট গল্পের একটা ধারা গড়ে ওঠবার সুযোগ পাবে। অথবা দেশ-বিদেশের ভাল ছোট গল্পের অনুবাদ দেওয়া যেতে পারে। পরিশেষে হাওড়ার এম রায়হানউদ্দিনকে সমর্থন করে বলি—'সাপ্তাহিক বসুমতী'তে প্রকাশিত লেখাগুলো নিয়ে একটা আলোচনা কি 'পাঠক-মনে' করা যায় না—এতে 'পাঠকমন' আরও সার্থক হবে।

কান্তি সরকার, ঝাড়গ্রাম।

নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী

দেবনারায়ণ গুপ্ত

॥ ছয় ॥

মর্যাদার মূল্য

সেযুগের নাম করা ইংরাজী কাগজওয়ালারা মঞ্চাভিনেত্রী বিনোদিনীকে কেউ কেউ 'ফ্লাওয়ার অব দি নেটিভ স্টেজ' বলতেন। কেউ বা বলতেন 'সাইনোরা'। সত্যিই তাই। সেযুগে বিনোদিনী ছিলেন অভিনেত্রী-কুলশিরোমণি।

অভিনয়-জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে সারা জীবন তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়েছে। পাঁচ বছর বয়সে বিনোদিনীকে গৌরীদান করেছিলেন তাঁর দিদিমা। কিন্তু গৌরীদানের কোন পুণ্যই তিনি অর্জন করতে পারেন নি। গৌরীকে ফেলে রেখে মহাদেব স্বামীটি পালিয়ে গিয়েছিলেন। আর শেষ পর্যন্ত ঘর বেঁধেছিলেন আর এক গৌরীকে নিয়ে। যার ফলে বিনোদিনীকে জীবনধারণের জন্যে অভিনেত্রীর বৃত্তি গ্রহণ করতে হয়েছিল।

অভিনেত্রী জীবনে তিনি খ্যাতি, প্রতিপত্তি সবই পেয়েছিলেন। কিন্তু শান্তি পান নি কোনদিন। সারাজীবন তাঁর ওপর দিয়ে অশান্তির ঝড় বয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এরই মধ্যে তাঁর অভিনেত্রী জীবনের সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা ছিল এই যে, তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আশীর্বাদ লাভে ধন্য হয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ দেব তাঁর মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন—'মা তোর চৈতন্য হোক।' ভোগবিলাসের তমসাচ্ছন্ন তমির অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত ঠাকুরের আশীর্বাদে তাঁর চৈতন্য হয়েছিল। ভোগবিলাস ত্যাগ করে শেষ জীবনে তিনি গৈরিক ধারণ করেছিলেন। নিত্য গঙ্গাস্নান করে, তিনি হবিষ্যান্ন গ্রহণ করতেন। চরম ভোগের পরে, ঠাকুরের আশীর্বাদই হয়েছিল তাঁর শেষ জীবনের পরম পাথেয়।

● বিনোদিনী

অভিনেত্রীরূপে যখন তিনি 'সাইনোরা', সেই সময়ে এক জমিদার পুত্রের আবির্ভাব ঘটলো তাঁর জীবনে। এই জমিদার পুত্রের ভালবাসায় মুগ্ধ হলেন বিনোদিনী। অতবড় অভিনেত্রী হয়েও জমিদার পুত্রের ভালবাসার অভিনয়কে তিনি অভিনয় বলে ধরতে পারেন নি। কিন্তু বিনোদিনী তাঁকে সত্যিই ভালবেসেছিলেন। তাঁর ভালবাসার মধ্যে এতটুকু কপটতা ছিল না।

কিন্তু বিনোদিনী মানুষের চেয়ে ভালবাসতেন মঞ্চকে। তাই জমিদার পুত্র যখন তাঁকে অভিনেত্রীর কাজ ত্যাগ করতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, তখন বহু অর্থের বিনিময়েও তা তিনি ত্যাগ করতে পারেন নি। প্রচুর অর্থের বিনিময়ে এমনতর সর্ত শুধু জমিদার পুত্রটিই আরোপ করেন নি—বিনোদিনীর জীবনে বিত্তশালী এমন অনেক ব্যক্তিই তাঁকে মঞ্চের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে অনুরোধ করেছিলেন।

বিনোদিনী জানতেন, মঞ্চ তাঁকে যে যশ ও প্রতিষ্ঠা দিয়েছে, সে যশ ও সে প্রতিষ্ঠার কাছে অর্থ অতি তুচ্ছ বস্তু। যাই হোক, জমিদার পুত্রটি শেষ পর্যন্ত সহধর্মিণীর মর্যাদা দেবেন বলেও জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাতেও বিনোদিনীকে রাজী করান সম্ভব হয় নি। বিনোদিনী বেশ জানতেন, থিয়েটার ছাড়ানোর জন্যে জমিদার পুত্রের এ আর একটি কৌশল মাত্র। বিনোদিনী কোনমতেই থিয়েটার ছাড়তে রাজী না হলেও জমিদার পুত্রের কিন্তু বিনোদিনীর ঘরে আসা-যাওয়া বন্ধ হয় নি। কিন্তু হঠাৎ বেশ কিছুদিন তিনি ডুব মারলেন। কোন খবর নেই। মাসখানেক পরে, সহসা এক সন্ধ্যায় বিনোদিনীর ঘরে পুনরাবির্ভাব হোল জমিদার পুত্রের। বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করলেন—

—এতদিন আস নি যে? কোথায় ছিলে?

—জমিদারীর কাজকর্ম দেখার জন্যে দেশে যেতে হয়েছিল

বিনোদিনী মুচকে হাসলেন মাত্র। কোন জবাব দিলেন না। কেন না, জমিদার পুত্রের প্রবঞ্চনা বিনোদিনীর কাছে আগেই ধরা পড়ে গিয়েছিল। বিনোদিনী জানতে পেরেছিলেন, জমিদার পুত্র দেশে গিয়েছিলেন —বিয়ে করতে।

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

শিলাদিত্য

Oslo বিশ্ববিদ্যালয়ে ইবসেন পরীক্ষায় পাশ করতে পারেন নি—গ্রীক ও গণিতে তিনি ফেল করেন। ডাক্তার হবার আশা ত্যাগ করে সাহিত্য, রাজনীতি প্রভৃতির দিকেই তিন ঝুঁকে পড়লেন।

১৮৫১ সালে Ole Bull-এর সঙ্গে ইবসেনের এক কণ্ট্রাক্ট হোল ছ'মাসের জন্য---বার্জেন জাতীয় রঙ্গমঞ্চের মাইনে করা নাট্য-উপদেষ্টা হলেন ইবসেন---১৮৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বার্জেন থিয়েটার তাঁকে বৃত্তি দিয়ে পাঠালেন ডেনমার্ক ও জর্মনীর রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে স্টাডি করে আসতে। ইবসেন কোপেনহেগেন ও ড্রেসডেনে গেলেন এবং শরৎ-কালে আবার বার্জেন থিয়েটারে ফিরে এলেন। বিদেশ-ভ্রমণকালে Midsummer Eve নামে যে নাটকটি তিনি লিখেছিলেন, সেটি মঞ্চস্থ হল ১৮৫৩ সালের ২রা জানুয়ারী। নাটকটি কিন্তু মোটেই জমল না। বার্জেনে ইবসনের বন্ধু-বান্ধব বিশেষ কেউ ছিল না। তাঁর ভদ্র ব্যবহার আর সুরুচিপূর্ণ পোষাক-পরিচ্ছদের দিকটাই লোকের নজরে পড়তো। নাটকের অসাফল্যের আঘাত সামলে নেবার আগেই আরেক দিক থেকে এল ব্যর্থতা। রিবেক হোলসট নামে একটি পনের বছরের মেয়ের সঙ্গে তখন ইবসেনের একটা প্রেমের ব্যাপার চলছে---মেয়েটির বাবা বিরক্ত হয়ে মেয়ের সঙ্গে ইবসেনের দেখাশোনা সব বন্ধ করে দিলেন।

১৮৫৪ সালে The Warrior's Barrow আবার মঞ্চস্থ হল এবং তারপরেই Lady Inger of Gstrat—দুটি নাটকই জমল না। কিন্তু এরপর বিরাট সাফল্য এল ১৮৫৬ সালের The Feast at Soulhaug মঞ্চস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে। Catalina-র পর এই নাটকটিই প্রথম বই আকারে প্রকাশিত হয়। এই বছরেই ১৯ বছরের মেয়ে সুজানা থোরোসেনের সঙ্গে ইবসেনের আলাপ হয়। দু'বছর বাদে এঁকেই ইবসেন বিয়ে করেন। ১৮৫৭ সালে ইবসেন ক্রিস্টিয়ানা-নরওয়েজিয়ান থিয়েটারের আর্টিস্টিক ম্যানেজার নিযুক্ত হন। The Warrior's of Helgeland নামে একটি নাটকও এর মধ্যে লিখে ফেলেন। নাটকটি ড্যানিশ রয়েল থিয়েটার ও ক্রিস্টিয়ানা থিয়েটার থেকে অমনোনীত হয়ে ফিরে আসবার পর ইবসেন নিজের থিয়েটারেই এটিকে মঞ্চস্থ করেন।

Lady Inger নাটকটি স্ক্রাইবের স্টাইলের অনুকরণে লেখা। নরওয়ের ঐতিহাসিক কাহিনী থেকেই কাহিনীটি নেওয়া। স্ক্রাইবের নাটকের যা সব থেকে বড় গুণ অর্থাৎ 'স্পষ্টত্ব' তারই সম্পূর্ণ অভাব ছিল এই নাটকে। তা ছাড়া 'এককভাষণ' 'স্বগতোক্তি' ইত্যাদির বাহুল্য

● পিয়ার গিণ্ট---কম্পোজিসন দেখবার মত

● 'ব্র্যাণ্ড'-এর মঞ্চসজ্জা ও কম্পোজিসন

নাট্যচরিত্রের অস্বাভাবিকতা', 'বক্তব্যের অস্পষ্টতা' ইত্যাদি দোষে নাটকটি অপাংক্তেয় হয়ে রইল। এ নাটকটি সম্পর্কে Martin Lamm বলেছেন:

'We also see for the first time in Ibsen mists descending on the stage, and, rising up through the gloom, the striking figure Lady Inger. Long after all else is forgotten can be heard her mournful lament for one called to play a great part in life but lacking the strength to sustain it.'

The Feast at Soulhaug এবং The Vikings at Helgeland নামক দুটি বিবাহ এবং জীবনের কর্মধারার সমস্যা নিয়ে লেখা। প্রথমটি লোকনাট্য—হার্টস-জের স্টাইলে লেখা। নারী তার বাল্যবন্ধুকে উপেক্ষা দেখিয়ে বিত্তশালী অপদার্থ একটি লোককে বিয়ে করল। এই লোকটির ভেতরে হেলমার চরিত্রের অঙ্কুর দেখা যায়। Vikings-এর শেষটা ট্র্যাজিক—Sigurt বন্ধু Geunnar-এর কাছে নিজের প্রেমিকা Hjordis-কে উৎসর্গ করার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করল নিজের জীবন দিয়ে। নায়িকার সম্বন্ধে বর্ণনা প্রসঙ্গে Lamm লিখেছেন:

Her words, only slightly adapted, would serve as a motto for a whole series of Ibsen's plays, 'including John Gabriel Borkmann: All good gifts a man may give to faithful friend, all—but never the woman he loves; for if he does that he breaks the secret thread spun by the Norns, and two lives will be lost.'

১৮৬১ সাল অবধি ইবসেনের লেখা নাটকগুলোর কোনটিই খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে নি। নিজেরই লেখা পুরোনো একটি নাটক Svanhild-কে কাব্য-নাটকে রূপান্তরিত করে Love's comedy নাম দেন। এ নাটকের নায়িকা Svanhild-কে ইবসেন নিজের স্ত্রী সুজানা থোরেসেনের আদর্শে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেন। এই নাটকের কবি Falk-এর ওপরেও ইবসেনের চরিত্রের ছাপ সুস্পষ্ট। এরপর ১৮৬৪ সালে ইবসেন তাঁর The Pretenders নাটকটি লেখেন। এটি Vikings-এর থেকে ভাল নাটক। তবে সমগ্র রচনাটি ঠিক এক স্টাইলে লেখা নয়—খানিকটা Shakespeare-এর ঐতিহাসিক নাট্যের ধারায় লেখা; Scribe-এর স্টাইল প্রতিফলিত হয়েছে Bishop Nicholas চরিত্রে এ নাটকটি মঞ্চসাফল্য লাভ করে।

এই সময় স্টাডিটুর-এর জন্য তিনি একটি বৃত্তি পান ও কপেনহেগেন যাত্রা করেন ১৮৬৪ সালের ৫ই এপ্রিলে। সেখান থেকে বার্লিন যান ৪ঠা মে। বার্লিন থেকে ভিয়েনা, সেখান থেকে রোম, তারপর গেনজানো এবং আবার রোম। রোমে তাঁর স্ত্রী ও ছেলে এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হন।

এইবার ইবসেন The Emperor and Galilean নিয়ে কাজ সুরু করেন। কিন্তু এ নাটকটি ১৮৭৩ সালের আগে শেষ হয় নি। এ নাটকটি ইবসেনের একটি ব্যর্থ রচনা। ১৮৬৫ সালের বসন্তকালে তিনি নিজের মূল এপিক Brand-কে নাট্যরূপ দিয়ে এ বছরের শেষে নাটকটি শেষ করেন। ১৮৬৬ সালে এটি প্রকাশিত হয় এবং ইবসেনকে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য এনে দেয়।

ইবসেন ১৮৬৭ সালে Peer Gynt ও ১৮৬৮ সালে The League of Youth নাটক রচনা করেন। এরপর দেশীয় সরকার আবার সুইডেনে গিয়ে নাটক সম্বন্ধে অধ্যয়ন করবার জন্য তাঁকে একটি বৃত্তি দেন।

ইবসেনের প্রথম আধুনিক সামাজিক নাটক Pillars of Society সম্পূর্ণ হয় ১৮৭৭ সালে।

Brand প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ সালে এবং বছর শেষ হবার আগেই চারবার নাটকটি পুনর্মুদ্রণ করতে হয়। এ নাটকটি সম্বন্ধে Martin Lamm লিখেছেন :

'In Brand, which was written in Rome, this thought of a vocation returns in tragic form. The hero wants to force his dying mother to give away here property. He refuses to allow his wife to take his child away to a milder climate in order to save its life. When the child dies and his wife clings to its clothes as her only remaining link with life, he compels her to give them away to a gipsy. 'Brand is myself in my finest moments', Ibsen declared in a letter.

Brand attracts by its mixture of inhumanity and weakness. It has the beauty of ice and hoar-frost.

Peer Gynt-এ এমন একটা উচ্ছলতা এবং কাব্যময়তা আছে—যা ইবসেনের অন্যান্য নাটকে সহসা দেখা যায় না। স্টেজ-প্লে হিসেবে এ নাটকটিই তাঁর অন্যান্য সব নাটকের থেকে বেশি দীর্ঘস্থায়ী হবে বলে মনে হয়। Brand-এর পরেই এ নাটকটি ইবসেন কি করে লিখলেন এ কথা ভেবে কেউ কেউ আশ্চর্য হন। কারণ Peer Gynt, Brand-এর একেবারে বিপরীতধর্মী নাটক। সমালোচক Bull-এর মত হচ্ছে :

Ibsen liked to work with such contrasts. Haning created that seeker after truth, Dr. Stockman, Ibsen then concived the embodiment of the life-lie, Hjalmar EKDAL.

ইবসেন বলেছেন Peer Gynt-এ এমন অনেক কিছুই আছে—যা তাঁর যৌবনের অভিজ্ঞতা থেকে নেওয়া। Ase চরিত্রের মূল হচ্ছেন তাঁর নিজের মা। এ নাটকের শেষ দৃশ্যের সঙ্গে Foust-এর অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা যায়। ১৮৭১ সালে Bjornson লেখেন :

'Not till Peer Gynt did Ibsen become himself; for Peer Gynt was himself'.

Synge-এর The Playboy of the Western World নাটকের ওপর Peer Gynt-এর প্রভাব সুপরিস্ফুট। আমেরিকান নাট্যকার O'neill-ও Peer Gynt-এর theme-কেই অদল-বদল করে কয়েকবারই ব্যবহার করেছেন তাঁর কয়েকটি নাটকে।

The League of Youth নাটকটি যেন কিছুটা দ্বিধার সঙ্গে ইবসেন ছাপতে দেন। কারণ এই নাটকেই প্রথম তিনি তৎকালীন নরওয়েকে বিষয়বস্তু করে লেখেন। তা ছাড়া এর আগে লিখছিলেন কাব্যধর্মী ভাবপ্রধান নাটক। এবার সুরু করলেন ডোমেস্টিক ড্রামা। এর আগেই অবশ্য ডোমেস্টিক ড্রামা সাহিত্য-কৌলীন্যের দাবি আদায় করে নিয়েছিল। কিন্তু তখনও পর্যন্ত স্ক্যাণ্ডিনেভিয়াতে এ-ধরণের নাটক ঠিক সাহিত্য-মর্যাদা পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হত না। Lamm লিখেছেন :

'It is actually difficult to understand why The League of Youth did not succeed in opening the way for modern Scandinavian drama. The dialogue is sparkling and the characters remarkably life like, with the result that the play has held its own on the stage longer than many of Ibsen's later social dramas, but the plot and the psychological motination are conventional, and in the final acts far too many concessions are made to the technique of Scribe.'

(ক্রমশঃ)

বিশ্বসাহিত্যের সম্রাট—মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে শারদ-জ্যোৎস্না—চরিত্র-সৃষ্টির ইন্দ্রধনু—অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধীশ্বর

চার্লস ডিকেন্সের

ডিকেন্স গ্রন্থাবলী

অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাশিল্পী—সর্ব্বরসের অনন্ত নির্ঝর—বিশ্বসাহিত্যগৌরব ঔপন্যাসিকের পরিচয় প্রদান অসম্ভব।

২য় ভাগ—নিকোলাস নিকলবি। বারনাবি রজ, চরিত্র-চিত্র। সাহিত্য জগতের এই পুণ্যপ্রভা মাত্র ১।০ টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিঃ

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট

কলিকাতা-১২

● তাতাবানিয়া এবং ভারতীয় একাদশের খেলোয়াড়দের চন্দনের ফোঁটা এবং পুষ্পস্তবক দেওয়া হচ্ছে।

ইডেনের আগামী আকর্ষণ

মোহনবাগানের প্লাটিনাম জুবিলির সৌজন্যে আমরা টোকিও-প্রত্যাগত জার্মান অলিম্পিক এ্যাথলেট দলের খেলা দেখার সুযোগ পেয়েছি। এরপর আমাদের সৌভাগ্য হয়েছে হাঙ্গেরীর তাতাবানিয়া দলের ফুটবল খেলা দেখার। তাতাবানিয়া দলের অনবদ্য ক্রীড়ানৈপুণ্য ফুটবল খেলার নতুন টেকনিকের ওপর আলোকসম্পাত করবে এবং তরুণ সম্প্রদায়কে নতুন ক্রীড়াধারা অনুসরণ করতে উদ্বুদ্ধ করবে।

এবার ক্রীড়ামোদীদের সামনে হাজির করা হচ্ছে কমনওয়েলথ ক্রিকেট দলকে। হকি, ফুটবল, ক্রিকেট, প্রতিটি অনুষ্ঠানে আজকাল দর্শক সমাগম হয় প্রচুর। বহু ক্রীড়ামোদীর খেলা দেখার ইচ্ছা থাকলেও টিকিট সংগ্রহের ঝামেলা বা কষ্ট এড়ানোর জন্যে মাঠে আসেন না। তাই যখনই কোন ভাল খেলার আয়োজন হয়, বিশেষ করে ফুটবল, তখনই জনসাধারণ স্টেডিয়ামের জন্যে হা-হুতাশ করে। স্টেডিয়াম করে জ্বলে উঠে আশার সঞ্চার করে, পরক্ষণেই নিভে গিয়ে আবার নৈরাশ্যের সৃষ্টি করে। জানি না, এই আলেয়া কবে বাস্তবের কঠিন মুষ্টিতে ধরা পড়ে ইট কাঠ লোহা সিমেন্টের বাস্তব রূপ নেবে।

এখন কমনওয়েলথ ক্রিকেট দলের কথায় আসা যাক। ইংলণ্ড, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও পাকিস্তানের বাছাই

শ্রীঅমিতাভ

খেলোয়াড় নিয়ে এই শক্তিশালী দল গঠিত। এই দলে নামকরা ইংরাজ খেলোয়াড়রা ত' আছেনই, তবে বিশ্বের সেরা চৌকস খেলোয়াড় গ্যারফিল্ড সোবার্স হলেন বিশেষ আকর্ষণ। সাদায় কালোয় মিশ্রিত এই দল সোচ্চারে ঘোষণা করছে, খেলাধূলায় বর্ণবিদ্বেষের স্থান নেই। তাই ইডেন উদ্যানে ২৮শে নভেম্বর থেকে আবার ক্রিকেট কার্নিভাল সুরু হয়েছে।

অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়া দলের খেলা কলকাতার ক্রীড়ারসিকদের চোখের সামনে এখনও ভাসছে। সেই পট-ভূমিকায় ইংলণ্ড ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের

উঠছে। তবে অস্ট্রেলিয়া যে খেলা খেলেছিল তার পেছনে ছিল অফিসিয়াল টেস্টের ছাপ, খেলায় হারজিৎ রেকর্ডে পাকা খাতায় উঠবে। তাই তাদের খেলায় ছিল আত্মরক্ষা ও আক্রমণাত্মক কৌশলের সমন্বয়। কিন্তু কমনওয়েলথের খেলায় হারজিতের মূল্য বিশেষ নেই। এখানে খেলোয়াড়রা নিজেদের স্বাভাবিক প্রতিভার পরিচয় দেবার পরিপূর্ণ সুযোগ পাবে। তবে আকাশ দেবতার মর্জির ওপর অনেক কিছুই নির্ভর করছে। গত অস্ট্রেলিয়ার খেলা শেষ দু'দিন বৃষ্টির জন্যে অনুষ্ঠিত হতে পারে নি। কমনওয়েলথ দলের খেলার আগেও আকাশের অবস্থা আশঙ্কাজনক মনে হচ্ছে। তবে বরুণদেবের কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন মোহনবাগান ক্লাবের এই অর্থব্যয় ও আয়োজন ব্যর্থ না করেন।

তাতাবানিয়া কাহিনী

কলকাতা ময়দানে ফুটবলের রেশ যেন এখনও লেগে আছে: হাঙ্গেরীর তাতাবানিয়া আকাশপথে রেঙ্গুনের দিকে যাত্রা করেছে। ফেরার পথে রাজধানী দিল্লীতে মোহনবাগানের সঙ্গে একটা প্রদর্শনী খেলায় অংশ গ্রহণ করে তারা দেশের পথে পাড়ি দেবে। কলকাতার হাটে-বাটে মাঠে-ঘাটে তাতাবানিয়ার মনমাতানো ফুটবলের আসর জমানো আলোচনা

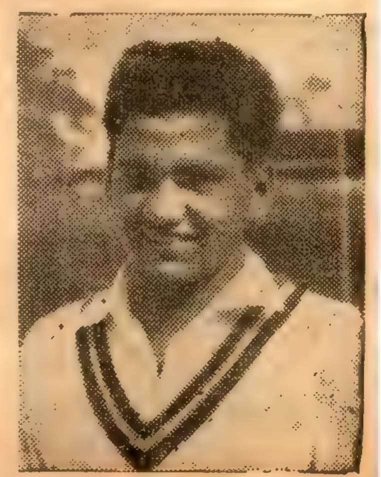

এখনও চলছে। চাচাদের এই ফুটবলের যে ছোঁয়াচ গারনাই, লোলেক নেগী, মেনজেল, সেকেরেস আর বীরোরা রেখে গেল ক্যালকাটা মাঠের শ্যামল ঘাসের বুকে, তা কলকাতার অগণিত ক্রীড়ামোদীর স্মৃতির মণিকোঠায় অক্ষয় হয়ে থাকবে।

তাতাবানিয়া দলের তিনটি প্রদর্শনী খেলা সত্যিই ফুটবলের কলা-কৌশলের এক অপূর্ব প্রদর্শনী। তিনটি প্রদর্শনী খেলার মধ্যে ভারতীয় একাদশ বনাম তাতাবানিয়ার খেলাটিই শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করা চলে। তাতাবানিয়ার ক্রীড়াধারার আছে স্বাতন্ত্র্য, আছে অভিনবত্ব, আছে আপন বৈশিষ্ট্য। তাদের প্রতিটি আক্রমণধারা যেন পূর্ব-পরিকল্পিত। বল আদান-প্রদান প্রায় নিখুঁত; স্থান জ্ঞান অদ্ভুত এবং সটগুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বিপথগামী কদাচিৎ হয়। তাতাবানিয়ার আক্রমণধারা ঝটিকা বাহিনীর মত নয়, গতি ধীর-স্থির বটে, কিন্তু অভ্রান্ত। সুগঠিত দেহ, কিন্তু খেলার মধ্যে দৈহিকশক্তি প্রয়োগের অথবা অযথা ফাউল করার কোন ছাপই নেই।

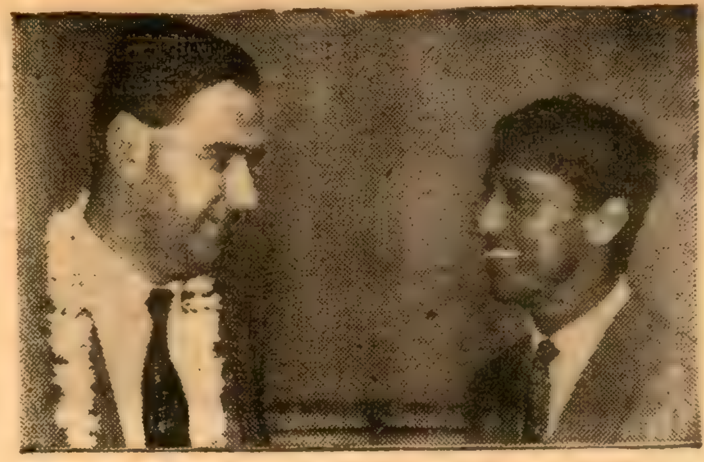

কলিন কাউড্রের সঙ্গে চুণী গোস্বামী

ভারতীয় একাদশ সেদিন হাঙ্গেরীয় দলের বিপক্ষে ভাল খেলে পরাজিত হয়েছে বলা চলে। ভারতীয় দলের তীব্র গতিবেগের কাছে তাতাবানিয়া রক্ষণভাগ বেশ কয়েকবার পরাস্ত হয় বটে, কিন্তু কোন ফল হয় নি। কারণ ভারতীয় আক্রমণভাগ সমস্ত কিছুই করেছে—একমাত্র গোল করা ছাড়া। ঝটিকা বাহিনীর মত তাদের আক্রমণের গতি, কিন্তু গোলের সম্মুখেই সব শেষ। গোলের সম্মুখে বহু সুবর্ণ সুযোগ অপব্যবহার করার ফলে, জয়ের সম্ভাবনা ভারতীয় দলের হাতের মুঠো থেকে ফস্কে গিয়েছে। ভারতীয় দল ৩—১ গোলে পরাজিত হয়েছে বটে, কিন্তু তাদের ক্রীড়াধারা এবং উদ্যম প্রশংসার দাবি রাখে।

শেষে মোহনবাগানের ক্লাব কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই সুব্যবস্থার জন্য। এতবড় একটা প্রদর্শনী খেলা এত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হল, দর্শকরাও কোন হয়রানির মধ্যে না পড়ে খেলা দেখল—আই-এফ-এ পরিচালিত চ্যারিটির স্মৃতি মনে পড়লেই আশ্চর্য লাগে, মনে হয়—কবে আমরা চ্যারিটি ম্যাচগুলি এইভাবে নির্বিঘ্নে দেখার সুযোগ পাব।

মোহনবাগানের প্লাটিনাম জয়ন্তী উৎসবে যাদুকর এ সি সরকার যাদু প্রদর্শন করছেন।

একটি শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত

ইংলণ্ড ফুটবল দলের ভূতপূর্ব অধিনায়ক জনি হেন্সের খেলার মাঠে অখেলোয়াড়ী আচরণের জন্য ইংলণ্ড ফুটবল এসোসিয়েশন তাঁর বিরুদ্ধে চোদ্দ দিনের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। ফুলহ্যাম দলের বর্তমান অধিনায়ক হেন্স সাণ্ডারল্যাণ্ডর সঙ্গে

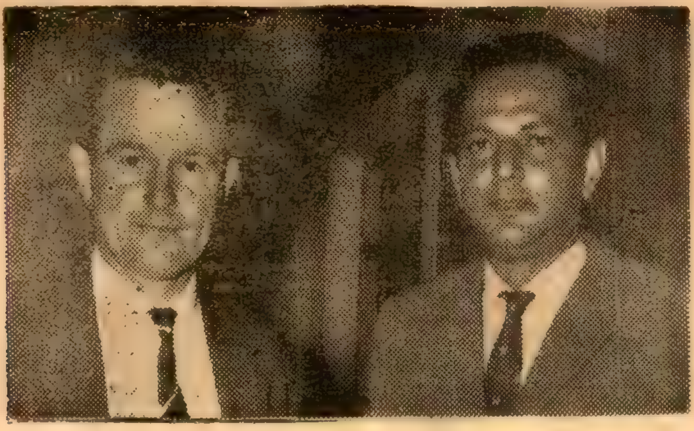

কমনওয়েলথ দলের অধিনায়ক রিচার্ডসন এবং চেয়ারম্যান দলের অধিনায়ক পি বি দত্ত।

খেলার মাঠ থেকে রেফারীর দ্বারা বহিষ্কৃত হন। ইংলণ্ড ফুটবল এসোসিয়েশন বর্তমানে খেলার মাঠে শৃঙ্খলা রক্ষা এবং খেলোয়াড়ী-মনোবৃত্তি বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। নামী দলের দামী খেলোয়াড়রা রেহাই পাবেন না—যদি মাঠে তাঁদের আচরণে বিন্দুমাত্র অভদ্রতা এবং অখেলোয়াড়ী-মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

আমাদের কলকাতা ময়দান কেন, সর্বভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা একেবারে একটি সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ দেখব এই বিষয়ে। আমাদের দেশের মাঠে খেলোয়াড়েরা লাঠালাঠি করে মাথা ফাটাচ্ছেন। একটি ক্রীড়াসংস্থা তাঁদের বিরুদ্ধে গ্রহণ করলেন শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা, অন্য একটি ক্রীড়াসংস্থা সেই সমস্ত দোষী খেলোয়াড়দের খেলার সুযোগ দিলেন আইন উপেক্ষা করে। আমাদের প্রশ্ন—ইনামুর রহমান কিভাবে সর্বভারতীয় হকি দলের পক্ষে ভারতীয় হকি দলের সঙ্গে খেলায় অংশ গ্রহণ করলেন। আমাদের দেশে ফুটবল খেলোয়াড়েরা মাঠে লাঠালাঠি, মারা-মারি করেন। তাঁদের শুধুমাত্র সতর্ক করেই অব্যাহতি দেওয়া হয়। খেলার মাঠে পরিচ্ছন্ন আবহাওয়া ফিরিয়ে আনতে গেলে ক্রীড়াসংস্থাগুলিকে শক্ত হতে হবে, কঠোর মনোভাব গ্রহণ করতে হবে। নিজেদের বিকিয়ে না দিয়ে কর্তৃপক্ষ যদি দৃঢ় মনোবলের পরিচয় দেন, তবেই দেশের খেলাধূলার মঙ্গল হবে।

সমাচার দর্পণ

অশোক যোশী নামে বরোদার এক তরুণ ক্রিকেট-উৎসাহী স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যানের 'দি আর্ট অব ক্রিকেট' বইয়ের একটি কঠিন প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম হয়েছেন। সঠিক উত্তরদাতা হিসেবে তিনিই প্রথম ভারতীয় এবং সমগ্র বিশ্বে তিনি প্রথম। অন্যান্য দেশ থেকে আরও পাঁচজন এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পেরেছেন। ব্র্যাডম্যান বলেছেন যে, গণিত শাস্ত্রের ওপর দখল এবং সত্যিকারের ক্রিকেটের অনুরাগ আছে এমন একজনের পক্ষে এই অঙ্কের প্রশ্নটির সঠিক উত্তর দেওয়া অসম্ভব নয়।

উত্তরাঞ্চলের রঞ্জি ট্রফির সাভি বনাম দিল্লীর খেলায় দিল্লীর অধি এবং ভারতের অধিনায়ক পতে নবাব দুই ইনিংসেই সেঞ্চুরী কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

আগামী ৩রা ডিসেম্বর সিংহল ক্রিকেট দল ভারত সফর করবে। বাঙ্গালোর, সেকেন্দ্র এবং আমেদাবাদে তিনটি বেসর টেস্ট অনুষ্ঠিত হবে ভারত সিংহলের মধ্যে।

* *

এবারের পূর্বাঞ্চল বিশ্ববিদ ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হবে কলকাত ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে প্রতিযোগিতা সুরু হবে। কল বিশ্ববিদ্যালয় দলের প্রাথমিক নি পর্ব সাঙ্গ হয়েছে। কয়ে অনুশীলনের পর কুড়িজনের থেকে চূড়ান্ত দল মনোনীত হবে

* *

দিল্লীতে ডুরাণ্ড কাপের সুরু হয়েছে। এখন চলছে বাছ

পতৌদির নবাব

পালা। কোন বড় দলই আসরে অবতীর্ণ হয় নি পর্যন্ত।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২ বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতী

দুই প্রধানমন্ত্রীর
সফল সাক্ষাৎকার।

সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ • 10th December, 1964 • Vol. 6

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	১৭৩১
আজকের মানুষ	...	১৭৩২
সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর	হরপ্রসাদ মিত্র	১৭৩৩
ভারতদর্শন	...	১৭৩৫
আন্তর্জাতিক	..	১৭৪২
ডিটেকটিভ সবাই হতে পারে (গোয়েন্দা-গল্প)	পরিমল গোস্বামী	১৭৪৭
'তিনি যে হলাডেন' (প্রবন্ধ)	কল্পতরু সেনগুপ্ত	১৭৫২
অন্ধকার (কবিতা)	অর্চনা ঘোষ	১৭৫৪
বাণিজ্যে সেকাল ও একাল	ধনপতি সওদাগর	১৭৫৫
শহর কলকাতা	শ্রীপদাতিক	১৭৫৭

W. H. Harton & Co. Ltd.

Rope Manufacturers

Since 1780

Head Office **: 8, Dalhousie Sq. East, CALCUTTA.**

Telegrams : "HARTONCO." CALCUTTA. Telephone : Office : 22-2878 ; Works : 66-2011

We specialize in 'Ropes' and 'lines' of all descriptions, viz :—

Manila Ropes	Loglines	Heald Cords
Sisal Ropes	Pilot Lead Lines	Whip Cords
Hemp Ropes	Marlines	Temperband Cords
Coir Ropes	Seizing Lines	Dobby Twines
Jute Ropes	Spun Yarn	Coir Fenders
Cotton Ropes	Oakums	Bore Springs

Cordage Hawsers of any size up to 48" circumference.

Registered contractors and regular suppliers to Government, Port Trusts, Railways, Mills, Mercantile Firms, Shipping and Engineering Workshops, Harbour and Dock Yards, etc.

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অন্ধ মৃত্যু (গল্প)	অমলেন্দ্রনাথ ঘটক	১৭৬১
বৃষ্টিতে এবার (কবিতা)	অমিতাভ চক্রবর্তী	১৭৬৪
জতুগৃহে (কবিতা)	বাসুদেব দেব	১৭৬৪
অদ্বিতীয়া (ধারাবাহিক উপন্যাস)	সুশীল রায়	১৭৬৫
জরুরী (ব্যঙ্গ-গল্প)	অমিতা রায়	১৭৬৮
গ্রন্থমেলা	জয়ন্তী সেন	১৭৭১
আঁধারমাণিক (ধারাবাহিক উপন্যাস)	মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	১৭৭২
আমাদের দেশ (কবিতা)	বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৭৭৪
সমুদ্র (কবিতা)	অজিত দে	১৭৭৪
বঙ্গদর্শন	...	১৭৭৫
পাঠকমন	..	১৭৮০
রঙ্গজগৎ	...	১৭৮১
নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী	দেবনারায়ণ গুপ্ত	১৭৮৭
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	শিলাদিত্য	১৭৮৮
খেলাধুলা	শ্রীঅমিতাভ	১৭৯০

ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বেকার, চাকুরীপ্রার্থী ও শিক্ষানুরাগীদের
ভাষা শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য একমাত্র গ্রন্থ
॥ বিদেশী ভাষায় দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সহায়ক ॥
০ ০ ০ স্বল্পশ্রমে পর্য্যাপ্ত ফল অবশ্যম্ভাবী ০ ০ ০
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

রা জ ভা ষা

(ইংরাজী ভাষা সহজে শিক্ষার অদ্বিতীয় সাহায্যকারী)
এক আধারে : ভাষা - ব্যাকরণ শব্দার্থ
ইংরাজী হইতে বাঙলা—৩·৫০ ॥ ইংরাজী হইতে উর্দ্দু—১·০০

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের

ম হা ভা র ত

[প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড]
(প্রতি খণ্ড মূল্য আট টাকা)
সদ্য-প্রকাশিত চতুর্থ খণ্ড : মূল্য—ছয় টাকা
(ডাকমাশুল স্বতন্ত্র)

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

মাইকেল গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগে :—মেঘনাদবধ কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, পদ্মাবতী-নাটক, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা ?
মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় ভাগে :—কৃষ্ণকুমারী নাটক, শর্মিষ্ঠা নাটক, তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী, বিবিধ কাব্য, মায়া কানন, হেক্টর বধ ।
মূল্য—দুই টাকা

—ঔপন্যাসিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান—
দামোদর মুখোপাধ্যায়ের

দামোদর-গ্রন্থাবলী

১ম খণ্ড ১·৫০ ২য় খণ্ড ২·৫০
৩য় খণ্ড ১·০০ ৪র্থ খণ্ড ২·৫০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

৩৯ বর্ষ, ২৮শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পঃ 25 Paise

বৃহস্পতিবার, ২৪শে অগ্রহায়ণ ১৩৭১ Thursday, 10th December 1964

বিষকুম্ভ পয়োমুখম্

সম্পাদকীয়

শীত পড়েছে। কিন্তু হাড় কাঁপানো শীতের জন্য বাংলা দেশের এই সমতল ভুমিতে আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। অসহ্য শীত অধিকাংশ মধ্যবিত্ত বাঙালীর কাছে খুব উপাদেয় না হলেও, শীতকাল বাংলা দেশের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ। মারাত্মক ছোঁয়াচে ব্যাধির প্রকোপ এ সময় কম। খাদ্যাভাব ঘরছাড়া না হলেও গ্রামাঞ্চলে এই শীতের মরশুমেই শস্য সংগ্রহের আনন্দধ্বনি মাঠ থেকে কৃষকের মনেও সঞ্চারিত হয়। 'দেবাদিদেব মহাজন' ত কদাকার মূর্তিতে দণ্ডায়মান। তবু এই সময়েই সকালের এক মুঠো রোদের মতো হাসতে চায় গ্রামের সেই সরল মানুষগুলি—যারা 'সুজলাং সুফলাং শস্য শ্যামলাং' এই আর্ষবাক্যের মর্যাদা আজো রক্ষা করে শস্যের সম্ভারে।

শীতকালে শহর কলকাতার চিত্র আলাদা। এ বছর লক্ষ্মী রয়েছেন রেশনের দোকানে। তবু স্থানীয় বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্যকে নিজেদের প্রবল প্রচেষ্টার দ্বারা যেন এ সময়েই একটু জিইয়ে রাখেন। তদ্দ্বারা কি আমরা লাভ করি সঞ্জীবনী কোনো নতুন মন্ত্র? সমস্ত বাঙালী জাতি কি তার ফলে কিছুমাত্রায় উদ্বুদ্ধ হন? আগে নিজেদের মধ্যে প্রাণসঞ্চার না হলে অপরকে আদর্শবাদের উদাহরণ দেখিয়ে বা শুনিয়ে কি লাভ হতে পারে, তা বুঝে ওঠা দুঃসাধ্য। বরুন, এই বাংলা দেশেই যে সব সভা-সম্মেলন হয়—কত সংখ্যক সাধারণ বাঙালী তার স্বাদ গ্রহণ করেন বা তাৎপর্য উপলব্ধি করেন। কিম্বা যাঁরা বাঙালী নন, তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রীতি আমরা কতটুকুই বা আদায় করতে পেরেছি। বাঙালী হিসেবে আমরা নিজেরাই যে দ্বিধাবিভক্ত। সম্মেলন শহরকেন্দ্রিক কিংবা বহির্বাংলায় হোক, আমরা কি সম্মিলিত হয়েছি—এ প্রশ্ন সব সময়েই আত্মজিজ্ঞাসার জন্য করা যেতে পারে। ভাবের আদান-প্রদানেও এখনো অনেকে বিমুখ, কেউ কেউ আবার 'বিষকুম্ভ পয়োমুখম্'। আমরা কি আজো আশা করতে পারি না বাঙালীর সমাজকল্যাণ চিন্তা, সঙ্গীত-শিল্প অনুষ্ঠান, এবং সাহিত্য সম্মেলনের ক্ষেত্র আরো উদার হোক; সেখানে কর্মী, শিল্পী, সাহিত্যিকের স্বাধীনতা যেন কোনো বিশেষ শক্তির চাপে নিষ্পিষ্ট না হয়; সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনায় তাঁরা যেন এক মন এক প্রাণের প্রেরণা দান করতে পারেন। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, বাস্তব ক্ষেত্রে তা হচ্ছে না। আদর্শকে কেবল মুখের বুলি করে উপদলীয় কোন্দল সৃষ্টিতে কেউ কেউ আজো অদ্বিতীয়। এভাবেই চলছে বাংলা দেশের সম্মেলন ও সাহিত্য। এই কারণে আবির্ভাব প্রয়োজন সেই সদ্ বুদ্ধিজীবীদের—যাঁরা কলমের অগ্রভাগে বাংলা দেশের ভাগ্যাকাশকে মসিলিপ্ত হতে না দেবার সংকল্প নিয়ে এগিয়ে আসবেন।

আজকের মানুষ

পুরাণের কথা অথচ পুরোনো নয়।

যন্ত্রণাদগ্ধ বন্দী প্রমিথিউস মুক্ত হলেন। জয়যাত্রার পথে মানুষকে তিনি দিয়েছিলেন অমৃত-পাথেয়। আর সেইজন্যই তাঁর দীর্ঘকাল এই যন্ত্রণার প্রহর গোনা। কিন্তু সেও তো বেশিদিনের কথা নয়। তাঁরই বরপুত্র—সর্বকালের সর্বসুন্দর শক্তিধর হারকিউলিস তাঁর বন্দিত্বের অবসান ঘটালেন।

অতঃপর প্রমিথিউস আনবাউণ্ড। বর্তমান কালের কবির কণ্ঠেও এই মুক্তিরই বন্দনা। আজও চলেছে এই মুক্তির লড়াই। অন্ধকারের বুক চিরে মুক্তির আলো এসে পড়ছে দিকে দিকে।

মুক্তি---মুক্তি। প্রমিথিউস মুক্ত। আফ্রিকাও আজ ক্রম মুক্তির পথে। প্রমিথিউস আনবাউণ্ড। আফ্রিকা আনবাউণ্ড।

হ্যাঁ, এই আফ্রিকা আনবাউণ্ডের কথাই শুনিয়েছেন আফ্রিকারই সন্তান। আফ্রিকা জাগছে—নবজাগ্রত আফ্রিকার স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষার কথাই রয়েছে আলেক্স কোয়াইসন স্যাকের 'আফ্রিকা আনবাউণ্ড'-এ। মুক্ত আফ্রিকার উজ্জ্বল বিদগ্ধ চরিত্রকে তিনি দাঁড় করালেন বিশ্বসভায়। কল্পনায় অনুমানে নয়—কর্মে ও সত্যে তাঁকে পরিচিত করলেন পৃথিবীর সমগ্র মানবতার দ্বারে। মনুষ্যত্বের দরবারে ঘোষণা করলেন মানুষের সম্পূর্ণ পরিচয়।

আলেক্স কোয়াইসন স্যাকে এই মুক্ত আফ্রিকার সন্তান আর লক্ষ লক্ষ হারকিউলিস জনতার মধ্যে তিনি বিশিষ্ট একজন। জন্মভূমি ঘানা। স্বাধীন ঘানা—জাগ্রত আফ্রিকার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হিসেবেই শুধু নয়—এমন কি জাতিপুঞ্জে ঘানার প্রতিনিধিত্ব করাই বড় কথা নয়—তার চেয়েও বড় কথা সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশের পক্ষ থেকে বজ্রনির্ঘোষ কণ্ঠে তিনি দাবি করেছেন ঘৃণ্য সাম্রাজ্যবাদের ত্বরিৎ অবসান আর সেই সঙ্গে প্রতিটি আফ্রিকানের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। সমগ্র আফ্রিকার বক্তব্য প্রকাশের দায়িত্ব এসে পড়েছে তাঁর ওপর একাধিকবার। বার বার আফ্রিকার জনচিত্তের চিন্তা-ভাবনার সার্থক মুদ্রণ তাঁরই হাতে। এক কথায় একটা গোটা মহাদেশের প্রতিনিধিত্ব করবার দুর্লভ সুযোগ তিনি পেয়েছেন আর আমরা সবিস্ময়ে দেখেছি তিনি সেই সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পেরেছেন।

মাত্র চল্লিশ বছর বয়সেই আলেক্স কোয়াইসন স্যাকে জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে এই বছর সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। এই প্রথম একজন আফ্রিকাবাসী এই সম্মান পেলেন। এবং বলা বাহুল্য, একমাত্র এই কারণেই শ্রীস্যাকে আমাদের স্মরণীয় নন। মানুষ হিসেবে তিনি সর্বকালের—সর্বশ্রেণীর। কেন না তিনি মুক্তির সন্ধানে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এসে আজ এমন সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ থেকে মুক্ত তেমনি বর্তমান পৃথিবীর বিবাষ্প থেকে প্রতিটি মানুষের মুক্তির উপায় অনুসন্ধানে আজও তিনি নিরলস পরিশ্রমী।

তাই বিশ্বরাজনীতিতে তাঁর ভূমিকা শান্তিবাদীর। তাই স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে প্রথম থেকেই তাঁর কর্মক্ষেত্র নির্ধারিত হয়েছিল বিশ্বের রাষ্ট্রমেলায়—এই জাতিপুঞ্জে।

১৯৫৯ সাল থেকে জাতিপুঞ্জে ঘানার প্রতিনিধিত্ব করছেন। অকৃত্রিম দক্ষতা গুণে ক্রমে ১৯৬১-৬২ সালে সাধারণ পরিষদে সহ-সভাপতি এবং ১৯৬২-৬৩ সালে নিরাপত্তা পরিষদে সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। ১৯৬১ সালে কিছুকাল রাষ্ট্রদূত হিসেবে ছিলেন কিউবায় এবং পরের বছর মেক্সিকোয়। কঙ্গোয় প্রেরিত আন্তর্জাতিক কমিশনের সদস্য হিসেবে তিনি কঙ্গোয় যান এবং ফিরে এসে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি কঙ্গোয় বেলজিয়ান সাম্রাজ্যবাদের দমননীতির তীব্র নিন্দা করেন। শুধু তাই নয়, তিনি খোলাখুলিভাবেই লুমুম্বাকে সমর্থন করেন।

উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের অধিকারী আলেক্স কোয়াইসন স্যাকে। বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত করেন মাগান্তসিবিম বিদ্যালয়ে। তারপর এক্সিটার কলেজ এবং পরে লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স-এ।

আজ জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের সভাপতি হিসেবে শ্রীস্যাকের ভূমিকা আরও ব্যাপক—আরও গুরুত্বপূর্ণ। সমস্যা-সঙ্কুল এই বিরাট পৃথিবীর দিকে তাকালেই তিনি দেখতে পাবেন চারদিকে অনেক বারুদের স্তূপ ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। অতএব বিশ্বশান্তি প্রচেষ্টায় জাতিপুঞ্জের কার্যাবলীর সার্থক

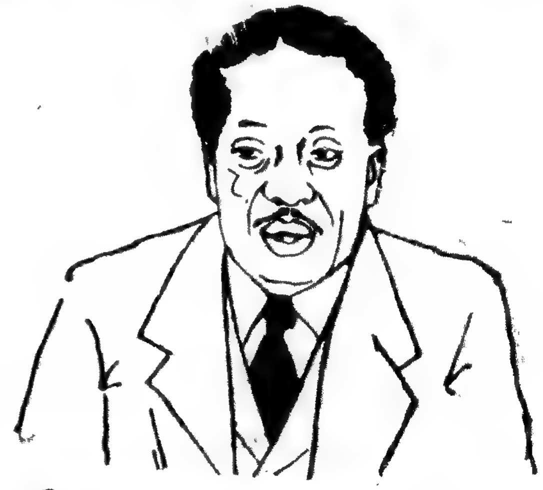

শ্রীআলেক্স কোয়াইসন স্যাকে,

রূপায়ণে তাঁর দান যে অপরিসীম হবে—এ আমরা আশা করতে পারি। কেন না, শ্রীস্যাকের নিজের বিশ্বাস, জাতিপুঞ্জ বিশ্বের বহু সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে সক্ষম হবে। সেই সঙ্গে এই স্থির প্রত্যয়ও তাঁর আছে, বহুকাল নির্যাতিত আফ্রিকা জাতিপুঞ্জে তার যোগ্য সম্মান ও অধিকার লাভ করবে।

সামনে অগ্নিপরীক্ষা। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস প্রত্যয়নিষ্ঠ, আদর্শবাদী, মানবতাবোধ দীপ্ত আলেক্স কোয়াইসন স্যাকে সহজেই এবং সম্মানের সঙ্গেই এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবেন।

সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর

হরপ্রসাদ মিত্র

অবুর মনে তার মায়ের স্মৃতি জেগে উঠতেই এই যে ছবি দেখা দিয়েছে, এ তো ঠিক বাইরের ছবি নয়; এ অবুরই আত্মচিন্তার রূপ,—তার জননী-অনুষঙ্গের ধারণা। একেও লেখক-মনের ধারণা-অভিব্যক্তির উদাহরণ বলতে ইচ্ছে করে।

এক হিসেবে সাহিত্যের উদাহরণ মানেই লেখকদের এক-একরকম ধারণা। বাইরের উপকরণের তালিকা নয়,—সাহিত্যিকের মনের মধ্য দিয়ে পরিস্রুত হয়ে আসছে যে জগৎনির্যাস, সেই নির্যাসই আমরা গল্পে, কবিতায়, উপন্যাসে উপভোগ করছি।

অতএব রিয়ালিজম্, ন্যাচারালিজম্, ইম্‌প্রেশনিজ্‌ম্—এ সবই আপেক্ষিক অভিধা। বাংলায় আমাদের একালের গল্প-লেখকদের মধ্যেও কিছু ন্যাচারালিজম্, কিছু ইম্‌প্রেশনিজ্‌মের মেলামেশা দেখা যাচ্ছে। যেন কেবল-মাত্র ঘটনার পারম্পর্যের দিকে নজর রেখে কাহিনীর গতিরেখা ফুটিয়ে তোলাই নয়,—যেন আরো একদিক আছে,—যেন এসব ক্ষেত্রে গল্পের মধ্যেই কবিতার মেজাজ দেখা দিচ্ছে।

গল্পের মধ্যে কবিতা ঘনিয়ে ওঠার নাম 'ইমপ্রেশনিজম্',—এ-সূত্র নিখুঁত হোলো না বটে, কিন্তু এ-লক্ষণ ঠিক তোলবারও নয়, ফেলবারও নয়। সর্বত্র এ-মেজাজের নাম ইম্‌প্রেশনিজ্‌ম্ নয়। যেমন, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেজাজ মনে পড়ে; তেমনি মনে পড়ে একালের বিমল করের কিংবা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর রীতি।

এসব কথা ভেবে দেখা দরকার। তাড়াতাড়ি একটা সূত্র তৈরির তাগিদে নয়, এঁদের লেখার মধ্য দিয়ে এঁদের যে বিচিত্র মেজাজ ধরা দিচ্ছে, সেই মেজাজের বিশেষত্ব দেখবার জন্যেই এই প্রস্তাব।

দেওয়ালীতে রাজ-ময়দানে সুন্দর সুন্দর বাজি পোড়ানো হচ্ছে। এই দৃশ্য দিয়ে বিমলবাবুর 'খড়কুটো' শুরু হয়েছে। তাঁর এই সূচনাটি বস্তুবর্ণনাহীন ধারণা-মাত্র নয়,—বাস্তবতা রক্ষা করেই এ-সূচনা সূচিত। কিন্তু সেকি শুধু ছবি,—শুধুই বহির্জগতের পটে লিখা চিত্র? বিমলবাবু লিখেছেন—

> 'অন্ধকার আকাশের তলায় দেখতে দেখতে একটি আলোর ময়ূর ফুটে উঠল। অবিকল সেই রকম কণ্ঠ, সেই পুচ্ছ। আলোর ফুলকিগুলো যেন ভাসছিল। তারপর ওই আকৃতি তরল হয়ে ভাসমান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতন কাঠিন্য হারাতে শুরু করল। ময়ূরটির আকার যত বাড়ছিল, তার প্রত্যঙ্গগুলি ততই গলে যাচ্ছিল। কিছু সোনালী তারা, কিছু রূপালী স্ফুলিঙ্গ আরও ওপরে উঠে আকাশের তারাদল প্রায় যেন স্পর্শ করল; কণ্ঠ এবং পুচ্ছ থেকে খচিত কণাগুলি নক্ষত্রচূর্ণের মতন বিক্ষিপ্ত হয়ে মাটিতে নেমে আসতে আসতে নিবে যাচ্ছিল। শেষে, যখন আলোর ময়ূরটি অন্ধকারেই হারিয়ে গেল, তখন কয়েকটি মাত্র রূপালী ফুল বৃষ্টির ফোঁটার মতন গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ল, মাঠের ঘাস স্পর্শ করার আগেই ছাই হয়ে গেল।'

অমল, ভ্রমর,—মোহনচাঁদরা বাড়ি-শুদ্ধ সবাই—এবং আরো অনেকেই দেখছিল সেই রাজ-ময়দানের বাজির খেলা। পুষ্পা হিন্দীতে ভ্রমরকে খবর দিয়েছিল—এবারে মাঠে জোনাকি জ্বলবে। তারপর—মাঠের মাঝখানে হঠাৎ দপ্ করে উঠেছে একটা আলো। ফোয়ারার মতন আলোর ধারা উঠেছে। রজনশালের তারার মতন, তুবড়ীর ফুলের মতন আলো। সেই ফোয়ারা নিস্তেজ হয়ে আসতে না আসতেই—মাঠের কোণে কোণে, গাছে গাছে থোকা থোকা আলোর জোনাকি জ্বলে উঠেছে।

'খড়কুটো'র এই বাজি-পোড়ানোর দৃশ্যটি চমৎকার। বলা বাহুল্য, এটি মনোরম ছবি। এর নাম ইম্‌প্রেশনিজ্‌ম্ নয়। কিন্তু এই রাজ-ময়দানের দৃশ্যের ওপর লেখকের বেশ আগ্রহ ছিল যে, তাতে সন্দেহ নেই। বাইরের জগতের শোভা দেখতে দেখতে এই বিভোর হয়ে যাবার ভাবটা বিভূতিভূষণেরও ছিল, বিমলবাবুরও আছে, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর মধ্যেও বিদ্যমান। আরো অনেকের নাম মনে আসে। কিন্তু নামের তালিকা দেবার দরকার নেই। আমি তো তালিকা তৈরি করতে বসি নি।

গল্প-লেখক হতে গেলে মনের এ ভাব যে অন্য কোথাও রেখে আসতে হবে, তা নয়। তবে এ ভাবের আতিশয্য ঘটলে কোনো কোনো পাঠকের তরফে সহিষ্ণুতার অভাব ঘটতে পারে বৈকি। বিমলবাবুর ক্ষেত্রে তা হয়নি। তিনি চমৎকার মাত্রাজ্ঞানী লেখক। কিন্তু এই সূত্রে একথাও মনে আসে যে, যাঁদের বিভোর হওয়া স্বভাব, তাঁরা কাহিনীর ধারা-রক্ষার দাবি ভুলে গিয়ে খণ্ডদৃশ্যেই বিভোর হতে পারেন। সেটা আশঙ্কার কথা। কিন্তু সে-কথা এখানে

তোলবার দরকার নেই। ইম্‌প্রেশনিজম্‌ও কতকটা এই রকম খেয়াল। গল্প যদি গল্পের অভ্যস্ত শর্ত রক্ষা না করে আনুষঙ্গিক কোনো একটা খেয়ালের খেলা হয়ে ওঠে, তাহলে?

তাহলে মোপাসাঁও নয়, রবীন্দ্রনাথও নয়,—কী যে ঘটবে,—কোন্‌ বিশ্ব-পরিচিত লেখকের লেখায় সে রকম নমুনা আছে, তাই খুঁজতে খুঁজতে একেবারে আমাদের ঘরের মানুষ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'রূপালী মাছ' নামে একটি গল্পের দিকে চোখ পড়লো। পড়লুম তাঁর আরো গল্প—'শ্বাপদ' নামে আর একটি—'গন্ধ' নামে আরো একটি।

এসব গল্পের বিষয়বস্তুর কথা তুলবো না এখানে। 'রূপালী মাছ' বা 'শ্বাপদ' বা 'গন্ধ' ইত্যাদি শব্দের মধ্য দিয়ে আমাদের মনে যে-যে ধারণা দেখা দেয়, এক-একটি পরিবেশ এবং ঘটনাচক্রের মধ্য দিয়ে সেই সব ধারণা ফুটিয়ে তুলে জীবন এবং জগতের ছবি সাজিয়েছেন তিনি। সেই দিকেই জ্যোতিরিন্দ্র-বাবুর নজর। গল্পের ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে তাঁর নিজের অদ্ভুত মেজাজ মিশে গিয়ে,—অদ্ভুত সব ছবি জেগেছে,—এইসব শব্দের 'ধ্বনি' বেজেছে যেন।

আমি জানি না আরো স্পষ্ট করে আমার মনের কথাটা লিখতে পারবো কী না। জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর এই 'শ্বাপদ শয়তান ও রূপালী মাছেরা' বইখানি আমার এইজন্যে মনে আসছে যে, এর মধ্যে একজন 'আধুনিক' অথচ প্রবীণ বাঙালী গল্প-লেখকের জীবন-ধারণার অভিব্যক্তি দেখতে পাচ্ছি। সে-ধারণা ভালো না মন্দ, প্রশংসার যোগ্য না নিন্দার বস্তু,—সে সব লিখতে বসিনি আমি। আমার মনে হয়েছে যে, এটি একখানি আধুনিক বাংলা গল্পের বই,—যাতে ন্যাচারালিজম্‌ ইম্‌প্রেশনিজম্‌ এবং মনঃস্রোত উদ্‌ঘাটনের সজ্ঞান আয়োজন, তিনই আছে।

বিমলবাবুর মতন জ্যোতিরিন্দ্র-বাবুও গল্পের মধ্যে সুন্দর সুন্দর ছবি ফুটিয়ে তুলতে ভালোবাসেন। এই ছবির মেজাজ,—মানুষের উগ্র তীব্র লোকচক্ষুর আড়ালে লুকিয়ে থাকা বিশেষ বিশেষ প্রবৃত্তি ফুটিয়ে তোলবার মেজাজ,—এবং লেখবার ভঙ্গিতে স্পষ্ট বা সুবোধ্য ধারা-রক্ষার বদলে কেমন একরকম বিপরীত মেজাজ,—একসঙ্গে এই তিনটিই বিদ্যমান।

'রূপালী মাছ'-এর শুরুতেই দেখা গেল—

'কাগজের মতন শুকনো খসখসে মুড়মুড়ে দিন। গরম মুড়ির মতন চমৎকার দুপুর। কে বলল শীতের দুপুর? রোদের দুপুর। শীত তখন যখন হাওয়া বইবে। এখন না। কনকনে হাওয়া রোদের কাছে কানমলা খেয়েছে। এমন তাজা টাটকা মাঘের দুপুরে মুখ দেখাতে না পেরে ভীরু রাতকে আশ্রয় করেছে; তখন তার ফিসফিসানি ছুরির ফলার ধার ঠোঁটে নিয়ে ছুটোছুটি ও মানুষের হাড় কাঁপিয়ে দিতে যত রকমের চেষ্টা চলে চলুক। দিনের বেলায় তার মুখ দেখাবার পথ মেরে দিয়েছে মাঘের এই উজ্জ্বল ঝক্‌ঝকে দিন, কাগজের মতন খসখসে রোদে মাজা উষ্ণ মধুর মধ্যাহ্ন। আর নীল নির্জন অফুরন্ত আকাশ।'

এই মেজাজ যে একান্তভাবে কবিদেরই, তা নয়। কিন্তু বিমল-বাবুর এবং জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর,—এঁদের দুজনেরই এদিক থেকে মিল অনুভব করা যায়। এঁদের এই কবিত্বের লক্ষণেই দুজনের সমীপতা।

কিন্তু দুজনের আলাদা মন, আলাদা মানুষ এঁরা। জ্যোতিরিন্দ্রের 'রূপালী মাছের' এই ছবিও মনে আসে—

'সোনার রঙের স্তন নিতম্ব কাঁধ গলা কোমর হাত পা নিয়ে ফুলে ভেসে ওঠা শরীরের কোথাও গাত্রাবাসের চিহ্নটি নেই বলে মনের কাছের কোন স্বপ্ন মনের ছবি মনে পড়ে শেওলার গন্ধ মনে পড়ে; অকৃত্রিম এক শব, শব ঘিরে অপরিসীম বেদনা আর নিঃসঙ্গ মধ্যাদিনের বিহ্বলতা।

এই বিহ্বলতা, এই বেদনার সুখে বুক ভরে তুলে ও নিজেকে দেখছিল। তকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল হাত পা উরু কোমর বা পদ্মকোরকের মতন অনিন্দ্য সুন্দর এক নাভি। একটা নীল মাছি বসে আছে। এইমাত্র উড়ে এসে বসেছে, তাই ও বাধা দেয়নি, তাড়িয়েও দিচ্ছে না।'---

আমি অদ্ভুত এই শবের ছবি দেখতে দেখতে আজ ভালো-মন্দ-ন্যায়-অন্যায় কিছুই ভাবছি না। শুধু একালের এই খেয়ালের কথাই মনে জেগে আছে। আর সেই সঙ্গে হঠাৎ মনে আসছে রবীন্দ্রনাথের শেষ দিকের একটি কবিতার কয়েক ছত্র—

কার লাগি এই গয়না গড়াও
যতন ভরে
স্যাকরা বলে, একা আমার
প্রিয়ার তরে।
শুধাই তারে, প্রিয়া তোমার
কোথায় আছে।
স্যাকরা বলে, মনের ভিতর
বুকের কাছে।

এই কয়েক ছত্রের পরেই মন থেমে দাঁড়ায়। স্যাকরার বুকে যাঁর অধিষ্ঠান, তাঁকে নমস্কার। কিন্তু আমরা পাঠকরা বাইরের জীব। আমাদেরও আকাঙ্ক্ষা আছে, প্রার্থনা আছে, প্রত্যাশা আছে। আমরা গল্পের আসরে গল্পই চাই। তাতে ধারণাও থাক, বস্তবর্ণনাও থাক, কবিতাও থাক। কিন্তু গল্প থাকবে তো?

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর শিল্পি-মনটিকে নমস্কার জানাই। তাঁর এইসব গল্প পড়তে-পড়তে প্রবৃত্তির বিকার দেখতে পাই,—সেই সঙ্গে বহির্জগৎ এবং মনোজগৎ মিলে গিয়ে—মনে হয় যেন এক ধারণাজগৎ রূপ নিয়েছে। (ক্রমশঃ)

জধানী ঃ

ভূস্বর্গ কাশ্মীর কিছুদিন থেকে াদিল্লীর চিত্ত দখল করে বসেছিল। শ্মীরে সশস্ত্র পাকিস্তানী গুপ্তচরের ্প্রবেশ, পাকিস্তানী নেতাদের ানীতে কাশ্মীরের পাক-দরদী ষ্ঠীর আত্মঘাতী কার্যকলাপ এবং -বিরতি সীমারেখার ওপার থেকে াকর ও মুজাহিদদের রণ-হুঙ্কারের বাদ রাজধানীর মানুষের মধ্যে দ্বেগের সৃষ্টি করেছিল।

সংবিধানের ৩৫৬ ও ৩৫৭ অনুচ্ছেদ ি জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে প্রয়োগের দ্ধান্ত লোকসভায় ঘোষিত হওয়ার পর দ্বেগ কেটেছে অনেকটা। এই দুটি নুচ্ছেদে রয়েছে রাষ্ট্রপতির শাসন বস্থা প্রবর্তনের বিধান। রাজ্যপাল রাজপ্রমুখের কাছ থেকে অথবা পর কোন সূত্রে সংবাদ পেয়ে রাষ্ট্রপতি দি মনে করেন কাশ্মীরে সংবিধান নুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করা ম্ভব নয়, তখন সরাসরি রাষ্ট্রপতি াসনভার গ্রহণ করতে পারবেন।

সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ তিল করার প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য করে রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ াকসভায় বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে াষণা করেছেন, জম্মু ও কাশ্মীরকে র্ণাঙ্গরূপে ভারতের অঙ্গীভূত করার ক্ষে অনুচ্ছেদটি মোটেই বাধা স্বরূপ া। ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের লটির বিরোধিতা করে তিনি ৃকণ্ঠে জানিয়েছেন, বাইরের কোন প অথবা হুমকীতে ভারত প্রভাবিত ানদিন হয় নি। তা ছাড়া ংবিধানের এই অনুচ্ছেদটি জম্মু ও াশ্মীরের প্রগতির পক্ষে কোন ন্তরায়ই সৃষ্টি করে নি। এই অনুচ্ছেদকে তিনি প্রগতির সুড়ঙ্গ পথ আখ্যা য়েছেন। এই পথেই সম্ভব হবে ীরে ধীরে কাশ্মীর রাজ্যে প্রগতি-লক কেন্দ্রীয় আইনের এক্তিয়ার স্তার করা।

নির্দলীয় সদস্য শ্রীপ্রকাশবীর শাস্ত্রী ংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের প্রস্তাব সম্বলিত বেসরকারী বিলটি উত্থাপন করেছিলেন। বিলটি বিপুল ভোটাধিক্যে অগ্রাহ্য হয়েছে। শ্রীনন্দ স্বীকার করেছেন, কাশ্মীরের ব্যাপারে গণমনের উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ এই বিলের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

ভারত দর্শন

● রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ ও পোপের শুভেচ্ছা বিনিময়

উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা ভারত সরকারের এবং কাশ্মীর সরকারেরও কম নয়। হজরতবাল মসজিদের পবিত্র কেশ অপহরণের পর থেকে নানাভাবে একদল কুচক্রী কাশ্মীরের আবহাওয়াকে বিষিয়ে তোলার জন্য বারবার চেষ্টা করছে। শেখ আবদুল্লা আন্তর্জাতিক নেতা সাজবার অভিপ্রায়ে অনেক ঘাটের জল ঘোলা করে তাঁর ছোট গণ্ডীর মধ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। নেতৃত্বের খোয়াব, ভূস্বর্গের ভাগ্যবিধাতার আসনের জন্য তিনি এখনও লালায়িত। তাই কাশ্মীরের ভারতভুক্তি তিনি মেনে নিতে পারছেন না।

বক্সী গোলাম মহম্মদের অনুচরগণ এখনও সক্রিয়। কাশ্মীরের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীসামসুদ্দিন বক্সীর দলত্যাগ করায় নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার ফলে বক্সীর একান্ত পার্শ্ব-চরগণ গিয়ে মিলিত হচ্ছে সাম্প্রদায়িক দলগুলোর সঙ্গে। কাশ্মীর বিধান-সভায় বক্সীপন্থী সদস্য সংখ্যা এখন বিশজন মাত্র।

এই পটভূমিকায় এই মুহূর্তে সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল

সাংবিধানিক থেকেই যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। এই বিধান কাশ্মীরকে বিশেষ অধিকার দিয়েছে। অবাঞ্ছিত কোন ব্যক্তিকে যে-কোন মুহূর্তে জম্মু ও কাশ্মীর সরকার বহিষ্কার করতে পারেন।

আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোক সেন রাজ্যসভায় শ্রীগুরুপদ স্বামীর প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, সুপ্রীম কোর্ট মৌলিক অধিকারকে আইনসভার অধিকারের সঙ্গে সমান করে দেখান নি। সুপ্রীম কোর্টের রায়ে বলা হয়েছে, আইনসভার অবমাননার দায়ে বাইরের কাউকে অভিযুক্ত করা হলে সে-ক্ষেত্রে আইনসভা কিংবা পার্লামেন্টের ক্ষমতা সংবিধানের একুশ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মৌলিক অধিকারের সাপেক্ষ হবে।

সুপ্রীম কোর্টের রায়ের পর আইনসভা ও বিচার বিভাগের এক্তিয়ারের প্রশ্নে অনেকের মনে যে-সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছিল আইনমন্ত্রীর মন্তব্য তা' নিরসনে সাহায্য করবে। বিচার বিভাগ ও আইনসভার মধ্যে ক্ষমতার লড়াই বেধেছে বলেই অনেকের মনে বদ্ধমূল ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। শ্রীসেন জানিয়েছেন, সুপ্রীম কোর্ট 'আইনসভার অবিসম্বাদী অধিকার' সুপ্রীম কোর্টও চ্যালেঞ্জ করেন নি।

শ্রীঅশোক সেন

• • •

আমাদের খাদ্যনীতি কত ত্রুটিপূর্ণ, খাদ্যসমস্যা সমাধানের জন্য নেতাদের চিন্তাধারা কত দুর্বল—তার কিছুটা চিত্র ফুটে বেরিয়েছে রাষ্ট্রপুঞ্জের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ডিরেক্টর জেনারেল ডঃ বি আর সেনের সাংবাদিক বৈঠকে। ডঃ সেন ভারতের খাদ্যদপ্তরের উচ্চপদে আসীন ছিলেন। দেশের খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি অনেকের চাইতেই অধিক ওয়াকিবহাল। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি ব্যাপক অভিজ্ঞতাই অর্জন করেছেন। কাজেই তাঁর মন্তব্যের গুরুত্ব সমধিক।

আমাদের নেতাদের সঙ্গে আলোচনার পর তাঁর মনে হয়েছে, 'নেতাদের ধারণা, ভারতের খাদ্যসমস্যা একটা অস্থায়ী ব্যাপার। একবার ফসল ভাল হলেই সকল দুর্দশার অবসান হবে—এ-ধারণা বড় বেশি আশাবাদী, এমন কি, অপরাধ না নিলে বলতে পারি—আত্মপ্রসাদ পূর্ণ।'

তিনি আরও বলেছেন, কৃষি অগ্রগতি সম্পর্কে সরকারী পরিসংখ্যান সন্দেহের উর্ধ্বে নয়। মনে হয়, সাধারণভাবে লোকে কম খেয়ে থাকা সত্ত্বেও গেল দু' বছরে অগ্রগতির চেষ্টায় যেন ঢিলে পড়েছে।

ডঃ সেনের এই সাবধানবাণী আমাদের কর্তাব্যক্তিরা উপেক্ষা করলে মারাত্মক ভুলই করবেন। তিনি বাহুল্য কোন কথাই বলেন নি এবং অতিরঞ্জিতও কিছু করেন নি। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন দশ কোটি টন বৃদ্ধিরই কথা ছিল। এখন পর্যন্ত সাত কোটি দশ লক্ষ টনের বেশি খাদ্যশস্য উৎপাদন সম্ভব হয় নি। উৎপাদনের পরিসংখ্যান যে-ভাবে গৃহীত হয় তাও অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কথা বিবেচনা করে দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা

শ্রীকৃষ্ণমাচারী

অবলম্বন না করলে এবং উৎপন্ন ফস সুষ্ঠু বণ্টনের নীতি নির্ধারিত না ভারতের খাদ্যসমস্যার সমাধান পারে না।

• • •

আমাদের নেতাদের মুখে মাঝেই গণমনের অভিব্যক্তি শু পাই। জনপ্রিয়তা অর্জনের এ-ধরণের খাঁটি কথা উচ্চারণ সহায়ক সন্দেহ নেই। শ্রী টি কৃষ্ণমাচারী বলেছেন, 'দেশের অ অত্যন্ত গুরুতর। এ-অবস্থা চ থাকলে অরাজকতা অনিবার্য উঠবে। কারণ পেট খালি থা কেউ আইন ও শৃঙ্খলা মেনে চ পারে না। দেশে জঙ্গলের নিয়ম আর কোন অর্থনৈতিক নিয়মই করছে না।'

কেন এই জঙ্গলের নিয়ম স সমাজে চলছে, তার জন্য দায়ী কিছুই তিনি বলেন নি। তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি আর্থিক জগতের অ কর্ণধারের মুখে সে কারণটা পা যায় নি। তিনি অর্থ দপ্তরের দা ভার আগের বার স্বেচ্ছায় পরিত্যা পূর্বে ব্যবসায়ী মহলকে যে-সব সু সুবিধা করে দিয়ে গিয়েছিলেন— কালো টাকার প্রসার সম্ভব হয়ে কি না, তার জবাব মন্ত্রী মহোদয় অনেক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটবে।

উত্তর প্রদেশ ঃ

উত্তর প্রদেশের রাজধানী লক্ষ্ণৌ হরে প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর স্ত্রীর সাম্প্রতিক সফর অনেকটা

● শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠি

ফল প্রসব করেছে। উত্তর প্রদেশের াজনীতির প্রাণকেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শাস্ত্রীর এই প্রথম পদার্পণ।

কংগ্রেসের দুটি শিবিরের মধ্যে াপোষ-রফা করে যেতে না পারলেও র এই সফরে উভয় পক্ষের মনের কটা পরিষ্কার চিত্র তিনি দেখে ছেন। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা অনুসরণের ত্রও নাকি তিনি প্রস্তুত করে ছেন।

উত্তর প্রদেশের বিবদমান দুটি লের মধ্যে মীমাংসার চেষ্টা তিনি গেও করেছেন। উত্তর প্রদেশ গ্রেসের নির্বাচনের সময় তিনি দুটি কে কাছাকাছি টেনে আনতে চেষ্টা রেছিলেন। সে চেষ্টা ব্যর্থ হলেও তিনি ল ছেড়ে দেন নি।

রবীন্দ্রালয়ের অনুষ্ঠানে যোগদানের মন্ত্রণ প্রধানমন্ত্রী গ্রহণ করেছেন নেই শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠির দল রূপ হয়ে ওঠেন। তাঁরা এ ঘটনাকে সি বি গুপ্তের অনুগামীদের নিছক সাজি বলে ধরে নিয়েছিলেন। শাস্ত্রীজীর কোন অনুষ্ঠানেই শ্রীত্রিপাঠির দলের কেউ যোগ দেন নি। শ্রীত্রিপাঠি লক্ষ্ণৌ শহরেই ছিলেন না। যাতে এই সময়টায় তাঁকে শহরে থাকতে না হয় সেইভাবেই তিনি দু'দিনের কর্মসূচী রচনা করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁকে সাক্ষাৎ করতে অনুরোধও জানিয়েছিলেন। কৌশলে সে অনুরোধ তিনি এড়িয়ে গিয়েছিলেন। নয়াদিল্লী যাত্রার প্রাক্কালে বিমানঘাঁটিতে অবশ্য শাস্ত্রী তাঁর সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

উত্তর প্রদেশের এই রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য শাস্ত্রী-ফরমূলা নিয়েও উভয় দলের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী আলোচনা করেছেন। কংগ্রেসকর্মী সম্মেলনে তিনি নিজেই, এ বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। রাজনৈতিক মহলের মতে, শাস্ত্রীজী শ্রী সি বি গুপ্ত ও মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী কৃপালনীকে রাজ্যের বাইরে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করতে চাইছেন। শ্রীগুপ্ত নাকি প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন; কিন্তু শ্রীকমলাপতি

● শ্রী সি বি গুপ্ত

ত্রিপাঠিকে মুখ্যমন্ত্রীর আসন ছেড়ে দিতে তিনি সম্মত হতে পারেন নি।

• • •

ফুলপুর ও অপর দুটি কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনে কংগ্রেসের সাফল্যে বিরোধী দলগুলো অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়েছে। গ্রামাঞ্চলে তাঁরা কত দুর্বল তার প্রমাণ এবারে কিছুটা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। পরলোকগত

● শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী

প্রধানমন্ত্রী নেহরুর প্রতিকৃতিতে কলঙ্ক-কালিমা লেপনের অভিযান চালিয়ে ডঃ রামমনোহর লোহিয়া গণমনে বিরক্তিরই উদ্রেক করেছেন। সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দলের এতে যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে।

• • •

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী খাদ্যনীতির পরিবর্তনের বিরোধী। ন্যায্যমূল্যের দোকানের মাধ্যমে খাদ্য বণ্টনের নীতি বজায় রাখার প্রস্তাবই তিনি নয়াদিল্লীতে মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে উত্থাপন করেছিলেন। গেল এক বছরে আট হাজারের অধিক ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলা হয়েছে। রেশনের পরিমাণও বৃদ্ধি করে প্রতি মাসে প্রতি ইউনিটে আট কিলোগ্রাম করা হয়েছে। বণ্টন ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য সকলে পূর্ণ রেশন পাচ্ছে না।

খাদ্যশস্যের দাম বেঁধে দেওয়ার পর থেকে খোলাবাজারে চাল ও গম পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠেছে। ধানের

ফলন ভাল হওয়া সত্ত্বেও খোলা-বাজারে ধান পাওয়া যাচ্ছে না। কালোবাজারের চাপে পড়ে খাদ্যমন্ত্রী শ্রীনেগীকে দু' ওয়াগন চাল লক্ষ্ণৌতে এনে খোলাবাজারে সরবরাহের ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল।

খাদ্যমন্ত্রী নিজে খাদ্যশস্য রাষ্ট্রায়ত্ত করার পক্ষপাতী। তিনি মনে করেন পূর্ণাঙ্গ রেশন ব্যবস্থা ভিন্ন রাজ্যের খাদ্যসঙ্কটের কোন সুরাহা হতে পারে না। কিন্তু এই বিরাট কর্মকাণ্ডের উপযুক্ত ব্যবস্থাপনাও রাতারাতি সম্ভব নয়। এসব দিক বিবেচনা করেই সরকার আপাতত মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন।

সরকারের হিসেব অনুসারে সারা বছরে খাদ্যশস্যের প্রয়োজন ১৫৬ লক্ষ ৫১ হাজার টন। গেল বছর খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়েছে মোট ১১৬ লক্ষ ১৯ হাজার টন। ৪০ লক্ষ ৩১ হাজার টনের ঘাটতি মেটাতে পারলে দেশের এ দুরবস্থা হতো না।

মধ্যপ্রদেশ ঃ

ডঃ কৈলাসনাথ কাটজুকে পুনরায় মুখ্যমন্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত করার

● শ্রীপটাশকর

প্রচেষ্টায় যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তাতে রাজ্যপাল শ্রীপটাশকর নাকি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। রাজ্যপাল সম্মেলনে যোগদানের জন্য দিল্লীতে অবস্থানকালে প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীকে আনুপূর্বিক সব ঘটনাই নাকি তিনি জানিয়ে এসেছেন।

অর্থমন্ত্রী শ্রীশুক্লাও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকরে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ডি পি মিশ্র

● শ্রী ডি পি মিশ্র

ও তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের শক্তির পরিচয়টা দিয়ে এসেছেন।

শ্রীদেশলেহরা এর মধ্যেই রচনাত্মক কার্য সমিতির দায়িত্ব নিয়ে বসেছেন। এতে রেষারেষিটা আরও বেড়েছে। তিনিই আগে এ সমিতির কর্ণধার ছিলেন। তাঁকে সরিয়ে দিয়ে শ্রী কে এল খাদিওয়ালাকে সমিতির কার্যভার দেওয়া হয়েছিল। 'চন্দ্রওয়ালার মামলা'র পর তাঁকে সরে দাঁড়াতে হয়। তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হয় শ্রীমিশ্রের দক্ষিণহস্ত শ্রীলক্ষ্মীশঙ্করকে। এ-আই-সি-সির নির্দেশেই শ্রীদেশলেহরা সমিতির আসন দখল করেছেন। সমিতির কার্যালয়টি প্রদেশ কংগ্রেস ভবনেই অবস্থিত। একই ভবনে সহাবস্থানের মনোভাব নিয়ে শান্তিতে উভয় পক্ষ কতদিন কাটাতে পারবেন, সে সন্দেহও জেগেছে অনেকের মনে।

• • •

চলতি আর্থিক বছরে ছ' কোটি সাতাত্তর টাকা ব্যয় হ্রাসের পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া সরকারের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। সরকার ঠিক করেছেন, পাঁচসালা পরিকল্পনার বাইরের খরচ থেকে বাঁচাবেন সাড়ে তিন কোটি টাকা, পরিকল্পনার বরাদ্দ থেকে খরচ হ্রাস পাবে দু' কোটি সত্তর লক্ষ টাকা এবং বিবিধ খাতের খরচ কমানো হবে পঞ্চান্ন লক্ষ টাকা।

অতীতের অভিজ্ঞতায় সরকারের ব্যয়-বরাদ্দের বিপরীত সাক্ষ্যই পাওয়া যাচ্ছে। সেদিক থেকে বিচার করলে তিন কোটি টাকা ব্যয় হ্রাস করাই অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হবে। বাজেট রচনাকালে অতিরিক্ত অর্থ-বরাদ্দ সত্ত্বেও বরাবর দেখা গেছে আসল ব্যয় হয়েছে অনেক বেশি।

১৯৬১-৬২ সালে পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে বাজেট বরাদ্দের চাইতে বেশি ব্যয় হয়েছিল দু' কোটি সতের লক্ষ টাকা। ১৯৬২-৬৩ সালে অনেক মুসাবিদার পর সাত শতাংশ ব্যয় হ্রাসের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরে সংশোধিত বরাদ্দে বৃদ্ধি পেল পাঁচ কোটি টাকার ওপর। শেষ পর্যন্ত বাজেটের অঙ্ক ছাপিয়ে ব্যয় হয়েছিল অতিরিক্ত ছ' কোটি পাঁচ লক্ষ টাকা।

মাদ্রাজ ঃ

রোটারিয়ানদের সমবেত চেষ্টাতে সেদিনের বাণিজ্য সংক্রান্ত সম্মেলনে শ্রীগোরওয়ালাকে নিবৃত্ত করা সম্ভব হয় নি। তিনি সবলে মাইক আঁকড়ে ধরে বীরের ভঙ্গীতে প্রাণ খুলে সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছেন। প্রশাসন যন্ত্রের হাল যাঁদের হাতে তাঁদের কাউকেই তিনি রেহাই দেন নি। তাঁর আক্রমণে সৌজন্যবোধের বালাই পর্যন্ত ছিল না। তিনি একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অসত্য ভাষণের মত গুরুতর অভিযোগ উত্থাপনেও কোন কুণ্ঠাবোধ করেন নি।

শ্রীগোরওয়ালার ভাষণে রোটারিয়ানরা যেমন অস্বস্তি বোধ করছিলেন, তেমনি তাঁদের অনেকে রেলমন্ত্রী শ্রী এস কে পাতিলের উৎসাহ, উদ্যম দেখে অনেকে বিস্মিত

করেছেন। তিনি ব্যবসায়ী মহলকে সন্তুষ্ট করার প্রয়াসে সরকারের শিল্প-সংক্রান্ত নীতির প্রকারান্তরে সমালোচনাই করেছেন। তিনি ব্যক্তিগত মালিকানার জন্য শিল্প সংরক্ষণের পক্ষে উমেদারীও করেছেন এবং উদাহরণ স্বরূপ তাঁর নিজের বিভাগের কথা তুলে বলেছেন, শিল্পগুলো থেকে 'কোন কোন মাল' রেল বিভাগে সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তাঁর মতে কর ফাঁকির কথাটা কম তোলাই মঙ্গলজনক। শিল্পপতিরা যাতে লাভজনক প্রয়াসে টাকা খাটাতে পারেন সেদিকে লক্ষ্য রাখাই উচিত।

রাজাজীও এ-সম্মেলনে তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন। তিনি কর ফাঁকির কথাটা একেবারে এড়িয়ে গেছেন। তিনি ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দানের দাবি তুলেছেন। প্রস্তাব করেছেন, আইন-সভার 'সেকেণ্ড চেম্বারটি' বাতিল করে সেখানে 'আর্থিক পরিষদের' প্রতিষ্ঠা করা হোক। সে পরিষদে থাকবে ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প, কৃষির প্রতিনিধিমণ্ডলী।

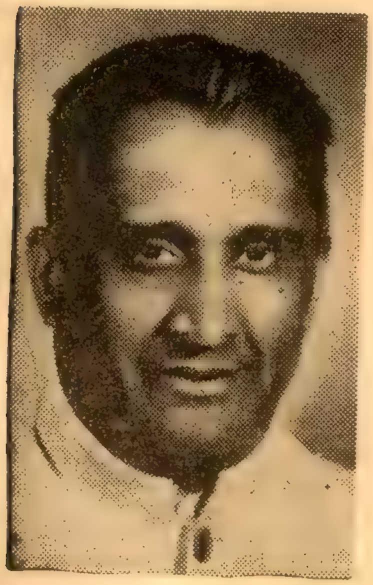

● শ্রীপাতিল

এই ডামাডোলের মধ্যে শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে আওয়াজ তুলেছিলেন প্রাক্তন এটর্নি জেনারেল শ্রী এম সি শীতলবাদ। 'ব্যাপক হারে কর ফাঁকি' দেওয়ার অভিযোগ তুলেছিলেন সেদিন। কর ফাঁকি দেওয়ার যে-কৌশল ব্যবসায়ীরা অবলম্বন করেছেন তার বিরুদ্ধে অভিযান খুবই ন্যায়সঙ্গত। তাঁদের জন্য সাংবিধানিক রক্ষাকবচের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

শ্রীমোরারজী দেশাই শিল্পপতিদের মূল্যবান কথাই বলেছেন। যে-দেশে শতকরা নব্বই জন মানুষ কায়ক্লেশে জীবনযাপন করে সে-দেশের মুষ্টিমেয় মানুষের সম্পদ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা শোভা পায় না বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে, মুনাফা অর্জনের সঙ্কীর্ণ প্রবৃত্তি ব্যবসায়ী মহলকে লোকচক্ষে হেয় করেছে।

মহারাষ্ট্র ঃ

মহামান্য পোপ ষষ্ঠ পল আন্তর্জাতিক ইউকরিস্টিক কংগ্রেসে যোগদানের জন্য ২রা ডিসেম্বর বোম্বাইয়ে উপস্থিত হলে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন। ভ্যাটিকানের বাইরে এটাই তাঁর দীর্ঘতম পাল্লার সফর। সান্তাক্রুজ বিমানবন্দরে উপরাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী তাঁকে স্বাগত জানান।

আন্তর্জাতিক ইউকরিস্টিক কংগ্রেসে যোগদান করাই মহামান্য পোপের যদিও প্রধানতম উদ্দেশ্য, তথাপি তাঁর বাণীতে এমন স্বচ্ছন্দ সুর ফুটে উঠেছে যা শুনলে মনে হয় তিনি ভারতের অন্তরে প্রবেশ করেছেন। ভারতের যে সহজ সরল ব্যবহারের জন্য তিনি পূর্ব থেকেই মুগ্ধ, সেই ব্যবহার তিনি নিজেও দেখিয়েছেন এখানে। 'আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখায়' এই ধর্ম-বাণীকে তিনি জীবনদর্শনরূপে গ্রহণ করে সাধারণের সম্মুখে প্রতিফলিত করেছেন। মহামান্য পোপ ক্যাথলিক ধর্মগুরু হলেও একটি রাষ্ট্রের প্রধান। তথাপি অনাথ আশ্রমে গিয়ে অনাথদের সঙ্গে আহার করেছেন। সংবাদপত্রের ফটোগ্রাফারের মর্মান্তিক মৃত্যুতে তাঁর পরিবারবর্গকে সাহায্যদান ও বেদনাময় সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন।

● রাজাজী

মহামান্য পোপ ভারতের ধর্ম-বাণীকে কোনো বিশেষ ধর্মের চোখে বিচার করেন নি, তাই ভারতে এসে পারমাণবিক ভীতির কথা শুনিয়েছেন, সর্বমানবের শান্তির জন্যে আকুল আবেদন জানিয়েছেন।

ভারত যেমন তাদের মাননীয় অতিথিকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে আনন্দিত হয়েছে তেমনি স্বয়ং পোপ ভারতের ঐতিহ্যকে চিনে নিতে এক মুহূর্ত বিলম্ব করেন নি। তাই দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রপতি যখন পোপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তখন স্বয়ং পোপ তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মান দিয়ে ভূষিত করেন।

মহামান্য পোপের প্রতিটি মুহূর্ত এখানে কর্মব্যস্ত। তথাপি যে বাণী তাঁর কাছে শুনেছি তাতো ভারতেরই। খৃস্ট-জন্মের বহু শত বছর পূর্বে রচিত হিন্দুশাস্ত্রের—'অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়'—এই প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ

করে পোপ বলেন যে, এই প্রার্থনা আমাদেরও যুগের। শান্তি ও মানব-মৈত্রীর নিমিত্ত অবিরাম কাজ করার যে প্রতিশ্রুতি পোপ জানিয়েছেন তা ভারতবাসীরা চিরকাল স্মরণে রাখবে।

কাশ্মীর ঃ

যুদ্ধ-বিরতি এলাকায় পাকিস্তান আবার নাশকতাকাজের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের প্রাক্কালে একটা বড়রকমের গোলমাল কাশ্মীর সীমান্তে সৃষ্টি করাই পাকিস্তানের নেতাদের এখন লক্ষ্য। যুদ্ধ-বিরতি রেখার ওপারে এর মধ্যেই তার মহড়া সুরু হয়ে গেছে।

এ কাজের জন্য তিনটি বাহিনী গঠিত হচ্ছে। জাপানী 'সুইসাইড স্কোয়ার্ডে'র মত একদল আত্মঘাতী স্বেচ্ছাসেবক গড়ে তোলা হচ্ছে। দুটি শিক্ষণ শিবির খোলা হয়েছে—

● শ্রীসাদিক

একটি মুরীতে এবং অপরটি হয়েছে কোটলীতে। রাজাকর ও মুজাহিদদের মধ্য থেকে গঠন করা হচ্ছে আত্মঘাতী স্বেচ্ছাসেবক দল। এ ছাড়া পাকিস্তানের সৈন্যবাহিনী থেকেও কিছুসংখ্যক নিযুক্ত হবে। এদের এখন দস্তরমত তালিম দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষানবীশরা মাসে তিরিশ টাকা করে পাচ্ছে। এ ছাড়া প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকের মাথার জন্য আলাদা অর্থের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এই মাথা-শিকারীর দল পুঞ্চ এলাকায় বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে। তাদের ভয়ে অনেকেই নিরাপদ অঞ্চলে

● বক্সী গোলাম মহম্মদ

সরে আসতে সুরু করেছে। রাজ্য সরকারের সামনে নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সাদিক এ বিষয়টি নয়াদিল্লীর গোচরেও নাকি এনেছেন। সীমান্তের নিরাপত্তার প্রশ্ন এবং সশস্ত্র পাকিস্তানী নাগরিকদের যুদ্ধ-বিরতি অঞ্চলে অনুপ্রবেশের বিষয় নিয়ে তিনি দিল্লীতে অবস্থানকালে প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীচ্যবনের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনাও করেছেন।

এসব দিক বিবেচনা করেই শ্রী জি এম সাদিক আপাতত সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলে সম্মতি দিতে পারছেন না। এই অনুচ্ছেদে কাশ্মীরকে বিশেষ অধিকার দেওয়া হয়েছে। এ বিধানে অবাঞ্ছিত কোন ব্যক্তি কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না। কাশ্মীরের বর্তমান পরিস্থিতিতে অবাঞ্ছিত ব্যক্তির প্রবেশ প্রতিরোধ অত্যন্ত প্রয়োজন। কাজেই শ্রীসাদিক এই মুহূর্তেই এ বিধানটি বাতিল করতে পারেন না।

সংবিধানের অন্যান্য প্রগতিমূলক বিধান, সংবিধানের ৩৫৬ ও ৩৫৭ অনুচ্ছেদের এক্তিয়ার কাশ্মীর রাজ্যে বিস্তারের ব্যাপারে তিনি নাকি অত্যন্ত আগ্রহশীল। এ দুটি অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতির শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের পরের ব্যবস্থা অবলম্বনের বিধান রয়েছে। পাকিস্তানী নেতাদের উস্কানীতে কাশ্মীরে সাম্প্রদায়িক জিগির তুলে কোন অচলাবস্থা সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিলে এ বিধান দুটিরও প্রয়োজন হতে পারে।

শেখ আবদুল্লা ও বক্সী গোলাম মহম্মদের অনুগামীরা যাতে নয়া কোন রাজনৈতিক চাল চালতে না পারেন, সেদিকে লক্ষ্য রেখে শ্রীসাদিক কাশ্মীর জাতীয় পরিষদের অস্তিত্ব বিলোপেও সম্মতি দিতে পারছেন না। এ সম্পর্কে তিনি কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদারের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তিনি মনে করেন, জাতীয় সম্মেলনের বিলুপ্তি ঘটলে অনেকেই আঘাত পাবেন। এবং তার সুযোগটা গ্রহণ করবে বিরুদ্ধ জোটগুলো পুরোমাত্রায়। জাতীয় সম্মেলনের অস্তিত্ব রক্ষা করে, তাকে কংগ্রেসের একটি শাখা সংস্থা হিসেবে নিতে হলে কংগ্রেসের সংবিধান সংশোধন আবশ্যক হবে। এ বিষয়টি দুর্গাপুরের অধিবেশনে উঠতেও পারে। সেখানে এ নিয়ে চুলচেরা বিচারের পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে পারে।

ছাত্রদের অপরিহার্য্য গ্রন্থ
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

পালামৌ

—ইহাতে আছে—

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রচিত সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী—সঞ্জীবনী-সুধা, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'পালামৌ সমালোচনা' এবং সমালোচক-শ্রেষ্ঠ চন্দ্রনাথ বসুর সঞ্জীব-সাহিত্য সমালোচনা। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ কর্ত্তৃক দ্রুতপঠন গ্রন্থরূপে নির্ব্বাচিত।

মূল্য এক টাকা।

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মার্ক্সবাদী চিরায়ত সাহিত্যের নব সংস্করণ

মার্কস্‌বাদী চিরায়ত সাহিত্য পাঠ করুন

১। কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার
—মার্কস্ ও এঙ্গেল্‌স্ ০-১৯

২। জনগণের প্রতি ॥ গণতন্ত্র ॥ ও একনায়কত্ব সম্বন্ধে সোভিয়েত শাসন কী
—ভি. আই. লেনিন ০-১৯

৩। ঔপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে
—মার্কস্ ও এঙ্গেল্‌স্ ১-৫০

৪। মজুরী, শ্রম ও পুঁজি
—কার্ল মার্কস্ ০-১২

৫। সোভিয়েত শাসন ও কৃষক
—ভি. আই. লেনিন ০-২৫

৬। পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি
—এফ. এঙ্গেল্‌স্ ৩-০০

৭। ভারতীয় ইতিহাসের কালপঞ্জী
—কার্ল মার্কস্ ০-৮৭

৮। এক পা আগে দুই পা পিছে
—ভি. আই. লেনিন ২-২৫

৯। কি করিতে হইবে
—ভি. আই. লেনিন ২-০০

১০। গ্রামের গরীবদের প্রতি
—ভি. আই. লেনিন ০-১২

১১। গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোস্যাল ডেমোক্রেসির দুই কৌশল
—ভি. আই. লেনিন ১-৫০

১২। প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ ১৮৫৭—১৮৫৯
—মার্কস্ ও এঙ্গেল্‌স্ ১-১২

১৩। জাতীয় সমস্যায় সমালোচনামূলক মন্তব্য
—ভি. আই. লেনিন ০-৩৬

১৪। মজুরী, দাম, মুনাফা
—কার্ল মার্কস্ ০-১২

১৫। মার্কস্‌বাদের ঐতিহাসিক বিকাশের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য
—ভি. আই. লেনিন ০-১২

১৬। পার্টি কংগ্রেসের কাছে লেনিনের চিঠি
—ভি. আই. লেনিন ১-৫০

১৭। সোভিয়েত শাসন ও মেয়েদের অবস্থা
—ভি. আই. লেনিন ০-০৩

১৮। কল্প স্বর্গ ও বৈজ্ঞানিক সমাজ
—এফ. এঙ্গেল্‌স্ ০-১৯

১৯। ভারতে ব্রিটিশ শাসন
—কার্ল মার্কস্ ০০-৬

প্রাপ্তিস্থান

মনীষা
৪।৩-বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা ১২

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রাঃ) লিমিটেড
১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা ১২

INTERAD

● ডাউনিং স্ট্রীটে মধ্যাহ্নভোজের পর হ্যারল্ড উইলসন ও লালবাহাদুর শাস্ত্রী করমর্দন করছেন। কমন-ওয়েলথ সচিব বটমলি ও ভারতের হাইকমিশনার জীবরাজ মেটাকে পেছনে দেখা যাচ্ছে।

বৃটেন ঃ

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর প্রথম বৃটেন সফর সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। তিনদিনব্যাপী সফরের পর শ্রীশাস্ত্রী ভারতে ফিরে এসেছেন।

নেহরুর মৃত্যুর পর বিগত কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনের সময় শ্রীশাস্ত্রী অসুস্থতার জন্য লণ্ডন যেতে পারেন নি। ইতিমধ্যে বৃটেনে রাজনীতির পটপরিবর্তন হয়েছে। রক্ষণশীল দলের পরিবর্তে শ্রমিক দল শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। দুই দেশের নতুন প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। বিভিন্ন বিষয়ে ভারত-বৃটেন পারস্পরিক স্বার্থ ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিষয়ে উভয়ের মতবিনিময় আবশ্যক।

শ্রীশাস্ত্রী তাঁর প্রথম সফরেই বৃটেনে সরকারী ও বেসরকারী সকল মহলে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছেন। সবাই তাঁর সরল অনাড়ম্বর আচরণে মুগ্ধ।

রাজনৈতিক দিক দিয়ে এই সফরের ফলে ভারত-বৃটেন সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হবে। শ্রীশাস্ত্রী এই ধারণা নিয়ে ভারতে ফিরে এসেছেন, হ্যারল্ড উইলসনের শ্রমিক সরকার ভারতকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে সর্বপ্রকারে সাহায্য করবে। বৃটিশ সরকার ভারতের চতুর্থ পরিকল্পনায় সাধ্যমত সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কাশ্মীর প্রশ্নেও শ্রমিক সরকার ভারতের প্রতি অধিকতর সহানুভূতি দেখাবে বলে মনে হচ্ছে।

কাশ্মীরসহ সমগ্র ভারত-পাক সমস্যা শাস্ত্রী-উইলসন আলোচনায় প্রাধান্য লাভ করেছে। প্রসঙ্গত লক্ষণীয়, শ্রীশাস্ত্রী যখন মার্লবরো হাউসে সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দিচ্ছিলেন, তখন একদল পাকিস্তানী কাশ্মীরের ব্যাপারে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। কিন্তু বৃটিশ কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোন গুরুত্ব আরোপ করে নি।

চীনের পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ প্রসঙ্গ নিয়ে শ্রীশাস্ত্রী উইলসন ও অন্যান্য বৃটিশ নেতার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। ভারত যে পারমাণবিক বোমা তৈরি না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, বৃটিশ নেতৃবৃন্দ তার জন্য ভারতের প্রশংসা করেন।

শ্রীশাস্ত্রী লণ্ডন অবস্থানকালে বৃটিশ

শিল্পপতিদের এক বৈঠকে তাদের বেশি করে ভারতে মূলধন নিয়োগের জন্য আহ্বান জানান।

হ্যারল্ড উইলসন, অর্থনৈতিক দপ্তরের মন্ত্রী জর্জ ব্রাউন, অর্থমন্ত্রী জেমস ক্যালাঘান, বাণিজ্যমন্ত্রী ডগলাস জে, কমনওয়েলথ মন্ত্রী আর্থার বটমলি প্রমুখের সঙ্গে আলোচনার সময় শ্রীশাস্ত্রী ভারতের রপ্তানীজাত দ্রব্যের ওপর বৃটেনের সারচার্জ তুলে নেবার বিষয়েও অনুরোধ করেন।

দক্ষিণ ভিয়েৎনাম :

ম্যাক্সওয়েল ডি টেলার আবার দৌড়েছেন ওয়াশিংটনে। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সমস্যার সমাধানের পরিবর্তে ক্রমেই তা জটিল আকার ধারণ করছে।

কমিউনিস্টপন্থী ভিয়েৎ কং বাহিনী দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রায় অর্ধেক দখল করে নিয়েছে। প্রতিদিন তাদের অগ্রগমনের খবর আসছে। এদিকে পাঁচ সপ্তাহের মধ্যেই ত্রান ভান হুয়াং-এর মন্ত্রিসভার অবস্থা টলমল। এক বৎসরের মধ্যে চারবার মন্ত্রি বদল হয়েছে, এবং যে-কোন মুহূর্তে বর্তমান মন্ত্রিসভারও পতন ঘটতে পারে।

* সায়গনে সম্প্রতি সরকার বিরোধী বিক্ষোভকালে নিহত বালকের শবাধার নিয়ে যাবার সময় এই শোকবিহ্বল দৃশ্যের অবতারণা হয়।

* থ্রিচ তাম চাউ

সায়গন শহরের পথে বৌদ্ধ ধর্মনেতাদের নেতৃত্বে জনসাধারণ, বিশেষ করে ছাত্ররা প্রতিদিন মিছিল বের করছে, এবং পুলিশের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হচ্ছে। ১৫ বৎসরের বালক নে ভান নগোক পুলিশের গুলীতে নিহত হওয়ার পর থেকে ছাত্র-বিক্ষোভ আরও ব্যাপক আকার ধারণ করেছে।

সায়গনের ভিয়েন হোয়া দাও ইনস্টিটিউট হুয়াং বিরোধী আন্দোলনের কেন্দ্র। হুয়াং ধর্মনেতাদের প্রভাবমুক্ত হয়ে শাসন পরিচালনা করতে চান, কিন্তু ধর্মনেতাদের তা পছন্দ নয়। তাঁরা মন্ত্রিসভায় উত্তর ও কেন্দ্রীয় অঞ্চলের আরও প্রতিনিধি চান। হুয়াং বিরক্ত হয়ে বলেছেন, এঁদের দাবি মানলে

১০০ জনকে মন্ত্রী করতে হবে। হুয়াং দৃঢ়তার সঙ্গে সকল প্রকার বিভেদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু কতটা তিনি সফল হবেন, বলা শক্ত। বৌদ্ধ ধর্মযাজকদের নেতা থিচ তাম চাউ ঘোষণা করেছেন, হুয়াং সরকারের বিরুদ্ধে 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন' সুরু করা হবে।

একদিকে ভিয়েৎ কং অগ্রগতি ও অপরদিকে সায়গনের বিক্ষোভে বিব্রত ম্যাক্সওয়েল টেলার ভিয়েৎনাম সমস্যার সমাধানের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি জনসনের কাছে আরও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাচ্ছেন। তাঁর পরিকল্পনা, উত্তর ভিয়েৎনাম ও লাওসে ভিয়েৎ কং ঘাঁটিগুলির ওপর বোমা ফেলতে হবে। তবে এদের জব্দ করা যাবে, এবং সায়গনেও হুয়াং সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

কিন্তু ভিয়েৎনামের যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকতর অংশ গ্রহণের এই পরিকল্পনা মার্কিন কর্তাদের অনেকেই পছন্দ করছেন না। ভিয়েৎ কং বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যাপক আক্রমণের পরিবর্তে বিদ্রোহীদের সঙ্গে একটা মীমাংসায় উপনীত হবার জন্য চেষ্টা করা উচিত, রাষ্ট্রপতির পরামর্শদাতা ম্যাক জর্জ বাণ্ডি, সহকারী পররাষ্ট্র-সচিব জর্জ বল, এমন কি শোনা যাচ্ছে পররাষ্ট্র-সচিব ডিন রাস্কও এই মত পোষণ করেন। অপরদিকে টেলারের যুদ্ধ জোরদার করার নীতির পক্ষে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রবার্ট ম্যাকনামরা, ম্যাক জর্জের ভাই দূরপ্রাচ্য বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্র-সচিব উইলিয়াম বাণ্ডি প্রমুখ। এখন রাষ্ট্রপতি লিণ্ডন বি জনসন কোন নীতি সমর্থন করেন, তার ওপরই সব কিছু নির্ভর করছে।

• ইউ থাণ্ট

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র:

রাষ্ট্রসংঘ: রাষ্ট্রসংঘের জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নের বকেয়া চাঁদার প্রশ্নে রুশ-মার্কিন বিরোধ রীতিমত তীব্র হয়ে উঠেছে। অনেকেই আশংকা করেছিলেন, ১লা ডিসেম্বর যখন রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন সুরু হবে, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাবে।

কিন্তু রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী-জেনারেল ইউ থাণ্টের আপ্রাণ চেষ্টার ফলে আপাতত বিরোধটি চাপা আছে। ইউ থাণ্ট অনেকদিন ধরে এ বিষয়ে একটা মীমাংসার চেষ্টা করছেন। কিছুদিন পূর্বে তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নও গিয়েছিলেন টাকা আদায়ের জন্য। কিন্তু কোন ফল হয় নি। এবার সাধারণ পরিষদের অধিবেশন সুরু হবার পূর্বে তিনি বিভিন্ন রাষ্ট্র ও গোষ্ঠীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে একটি মীমাংসা সূত্র উদ্ভাবন করেছেন। মীমাংসার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত না হলেও মনে হচ্ছে, এ বিষয়ে আরও আলোচনা চালানো হবে, এবং ইতিমধ্যে সাধারণ পরিষদে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে কোন প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে না।

সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছে রাষ্ট্রসংঘের মোট পাওনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫ কোটি ২৬ লক্ষ ডলার। এর অধিকাংশই কঙ্গোতে রাষ্ট্রসংঘ অভিযান পরিচালনার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নের দেয়। সোভিয়েট ইউনিয়ন নীতিগত কারণে এই অর্থ দিতে অস্বীকার করেছে। সোভিয়েটের বক্তব্য, কোথাও রাষ্ট্রসংঘের পক্ষ থেকে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হলে, তার সিদ্ধান্ত করবে নিরাপত্তা পরিষদ। কিন্তু কঙ্গোর বিষয় নিরাপত্তা পরিষদের পরিবর্তে সাধারণ পরিষদে স্থির করা হয়েছে। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত বেআইনী ও এই অভিযানের জন্য যে ব্যয় হয়েছে, সেই বেআইনী ব্যয়ের অংশ সোভিয়েট ইউনিয়ন বহন করবে না। কঙ্গোয় রাষ্ট্রসংঘ সৈন্য প্রেরণ সোভিয়েট ইউনিয়নের অনভিপ্রেত ছিল। নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েট ভেটো থাকার দরুণ সেখানে এই প্রস্তাব পাশ হবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সাধারণ পরিষদে ভেটো নেই, সুতরাং সেখানে ভোটাধিক্যে প্রস্তাব পাশ করে, সোভিয়েটের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সৈন্য প্রেরণ ও রাষ্ট্রসংঘের অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। কেবল সোভিয়েট ইউনিয়ন নয়, কঙ্গো অভিযানের জন্য ফ্রান্সও কোনে অর্থ দেয় নি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়নের এই যুক্তি গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। প্রথমত, কঙ্গো অভিযান যখন রাষ্ট্রসংঘের পক্ষ থেকে পরিচালিত হয়েছে, তখন তার ব্যয় সকল সদস্যকেই বহন করতে হবে। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রসংঘের আর্থিক অবস্থা বর্তমানে খুব খারাপ। কেবলমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সকল ব্যয় বহন করবে কেন?

রাষ্ট্রসংঘ সনদের ১৯ ধারায় বলা হয়েছে, কোন সদস্য-রাষ্ট্র দু'বৎসর তার দেয় অর্থ প্রদান বাকি রাখলে, সাধারণ পরিষদে তার ভোটাধিকার থাকবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দাবি, হয় সোভিয়েট ইউনিয়ন তার বাকি অর্থ দিয়ে দিক, নয়তো তার ভোটের অধিকার কেড়ে নেয়া হোক।

এশিয়া-আফ্রিকা গোষ্ঠী সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্পর্কে এরূপ চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিরোধী। কঙ্গো অভিযানের আইনগত ন্যায্যতা ও এর জন্য অর্থ দানের প্রশ্নে ১৯৬২ সালে আন্তর্জাতিক আদালতের পরামর্শ চাওয়া হয়। আন্তর্জাতিক আদালতের অভিমত, কঙ্গো

অভিযান রাষ্ট্রসংঘের সনদ অনুসারেই হয়েছে, সুতরাং সকল সদস্য-রাষ্ট্রকেই এর ব্যয় বহন করতে হবে। কিন্তু আন্তর্জাতিক আদালতের এই অভিমত সত্ত্বেও এশিয়া-আফ্রিকা গোষ্ঠী এ সম্পর্কে সোভিয়েট ইউনিয়নের মনোভাবের সঙ্গে আপোষ করার পক্ষপাতী। এ বিষয়ে ভারতের মনোভাব ব্যক্ত করে রাজ্যসভায় পররাষ্ট্র বিষয়ক রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন বলেন, ভারত যে-কোন মীমাংসা চেষ্টা সমর্থন করবে। তবে কোন সদস্য কোন নীতি সমর্থন না করলে তার জন্য তার কাছ থেকে জোর করে অর্থ আদায় করা উচিত নয়।

রাষ্ট্রসংঘ বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বেচ্ছা-মূলক প্রতিষ্ঠান। কোন রাষ্ট্র অধিকাংশের পছন্দমত কোন কাজ করতে রাজী না হলেও, তাকে সেই কাজে বাধ্য করার চেষ্টা আন্তর্জাতিক সংগঠনের মূল নীতির বিরোধী। আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভোটের জোরে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু দু'দিন পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও তো এরূপ প্রস্তাব পাশ হতে পারে? যেভাবে আফ্রিকার নতুন সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, রাষ্ট্রসংঘে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আর ক'দিন?

তা ছাড়া সোভিয়েট ইউনিয়নের ভোটাধিকার কেড়ে নেবার আর একটি বিপদ আছে। ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হলে সোভিয়েট ইউনিয়ন নিশ্চয়ই সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেবে না। হয়তো নিরাপত্তা পরিষদ ও সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রসংঘ ছেড়ে চলে যাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন। সোভিয়েট ইউনিয়নকে বাদ দিয়ে আজকের দিনে কোন আন্তর্জাতিক সংগঠনের কল্পনা করা যায়? সোভিয়েট ইউনিয়ন রাষ্ট্রসংঘ ত্যাগ করলে বিশ্বশান্তির পক্ষে তা হবে এক মহা দুঃসংবাদ।

সুতরাং কোনরূপ উত্তেজনা নয়, ধীর স্থিরভাবে একটা মীমাংসার জন্য সকল পক্ষের চেষ্টা করা উচিত।

* * *

রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদের নতুন সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন ঘানার আলেক্স কোয়াইসন স্যাকে। রাষ্ট্রসংঘে ঘানার স্থায়ী প্রতিনিধি কোয়াইসন স্যাকের সভাপতি নির্বাচন একাধিক কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই প্রথম সাধারণ পরিষদের সভাপতি পদে একজন আফ্রিকীয় নিগ্রো নির্বাচিত হলেন। এর পূর্বে আফ্রিকার

• মঙ্গ স্লিম

আর মাত্র একজন সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন—তিনি হচ্ছেন তিউনিসিয়ার মঙ্গি স্লিম। কিন্তু তিউনিসিয়া আরব রাষ্ট্র, এবং মঙ্গি স্লিমের পূর্বপুরুষ গ্রীস থেকে এসেছিলেন। কৃষ্ণ আফ্রিকার প্রতিনিধিরূপে কোয়াইসন স্যাকেই প্রথম বিশ্ব প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হলেন। অবশ্যই এ ঘটনা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আফ্রিকার ক্রমবর্ধমান প্রভাবের স্বীকৃতি। তা ছাড়া কোয়াইসন স্যাকে সাধারণ পরিষদের বয়ঃকনিষ্ঠ সভাপতি। তাঁর বয়স মাত্র ৪০। এত কম বয়সে আর কেউ পূর্বে সভাপতি হন নি। এর পূর্বে যিনি বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন, তিনি হলেন বেলজিয়ামের পল হেনরী স্পাক। যখন তিনি সভাপতি হন, তখন তাঁর বয়স ছিল ৪৬।

সিংহল ঃ

গত ৩রা ডিসেম্বর অকস্মাৎ সিংহল পার্লামেন্টের প্রতিনিধিসভায় (House of Representative) বন্দরনায়ক সরকারের পরাজয় ঘটে। শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়কের নেতৃত্বে গঠিত সরকারকে ৫২ মাস শাসন চালাবার পর এইবার বিদায় গ্রহণ করতে হচ্ছে।

পার্লামেন্টের অধিবেশন উদ্বোধন উপলক্ষে গভর্নর-জেনারেল স্যার অলিভার গুণতিলকের ভাষণের ওপর বিরোধী পক্ষ থেকে যে সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, তা ৭৪-৭৩ ভোটে গৃহীত হয়। সুতরাং ১ ভোটে বন্দরনায়ক সরকারের পতন ঘটে। সরকার পক্ষের কয়েকজন প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন নি। অর্থমন্ত্রী ডাঃ এন এম প্যারেরা বর্তমানে লণ্ডনে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভোট গ্রহণের মাত্র দু' ঘণ্টা পূর্বে মন্ত্রিসভার প্রবীণতম সদস্য ও প্রতিনিধিসভার সভানেতা শ্রী সি পি ডি'সিলভা আরও ১২ জন সদস্যসহ সরকার পক্ষ ত্যাগ করে বিরোধী দলে গিয়ে যোগ দেন। এর ফলেই বন্দরনায়ক মন্ত্রিসভার পরাজয় নিশ্চিত হয়ে যায়। মনোনীত সদস্যরা বরাবর সরকার পক্ষে ভোট দেন। কিন্তু এবার তাঁদের মধ্যেও কয়েকজন বিরোধী পক্ষে ভোট দিয়েছেন।

সিংহলের রাজনীতিতে শাসকদলের মধ্যে বিরোধ অনেকদিন ধরেই চলছিল। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সলোমন বন্দরনায়ক প্রতিষ্ঠিত শ্রীলঙ্কা ফ্রিডম পার্টির চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে সমাজতন্ত্রের পথ নিয়ে মত-বিরোধ সুরু হয়। শ্রীমতী বন্দরনায়ক সিংহলের অন্যান্য বামপন্থী দলের

* সিরিমাভো বন্দরনায়ক

সহযোগিতায় দ্রুত সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হতে চান। কিন্তু নরমপন্থীরা ধীরে-সুস্থে চলার পক্ষপাতী। কিছুদিন পূর্বে যখন শ্রীমতী বন্দরনায়ক ট্রটস্কীপন্থী লঙ্কা সমসমাজ পার্টির সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন, তখন দলের নরমপন্থীরা তা সমর্থন করে নি—কিন্তু তাদের বাধা সত্ত্বেও শ্রীমতী বন্দরনায়ক মার্ক্সবাদীদের সঙ্গে একত্র চলার নীতি গ্রহণ করেন। যারা সমাজতন্ত্রের বিরোধী তারা বন্দরনায়ক সরকারের বিরুদ্ধে নানাভাবে শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করে। সিংহলের বিদেশী শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী, বিশেষ করে ইংরেজ এবং বৌদ্ধ ধর্মনেতারা শ্রীমতী বন্দরনায়কের বিরোধিতা করতে থাকে। সরকার কর্তৃক সংবাদপত্র জাতীয়করণের প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে দেশের মধ্যে সর্বত্র বিক্ষোভ সুরু হয়। কেবলমাত্র সমাজতন্ত্র-বিরোধীরাই নয়, অনেক প্রগতিশীল ও উদারনৈতিক ব্যক্তিও সংবাদপত্র জাতীয়করণের প্রস্তাব সমর্থন করে নি। তার ফলে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এবং যারা প্রতিক্রিয়াশীল নয়, কিন্তু গণতান্ত্রিক নীতিতে বিশ্বাসী তাদের ব্যাপক অংশ বন্দরনায়ক সরকারের বিরুদ্ধে চলে যায়। প্রতিনিধিসভায় বন্দরনায়ক সরকারের পরাজয়ের মূল কারণ হল এই।

পদত্যাগী মন্ত্রী শ্রী সি পি ডি'সিলভা বলেছেন, শ্রীলঙ্কা ফ্রিডম পার্টি ও লঙ্কা সমসমাজ পার্টি দেশকে একনায়কত্বের পথে নিয়ে যাচ্ছে। এর বিরোধিতা করতে হবে। শ্রী ডি' সিলভা সিংহলের রাজনীতিতে বিশেষ প্রভাবশালী ও সম্মানিত ব্যক্তি। শ্রীমতী বন্দরনায়কের অনুপস্থিতিতে তিনিই অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। শ্রীমতী বন্দরনায়কের স্বামী সলোমন বন্দরনায়ক যখন শ্রীলঙ্কা ফ্রিডম পার্টি গঠন করেন, তখন তাঁর দক্ষিণহস্ত ছিলেন শ্রী ডি' সিলভা। সুতরাং দলবল নিয়ে শ্রী ডি' সিলভার বিরোধী দলে যোগদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তী সংবাদে প্রকাশ, শ্রী ডি'সিলভা নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করবেন।

শ্রীমতী বন্দরনায়ক ঘোষণা করেছেন, তিনি পার্লামেণ্ট ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা করার জন্য গভর্নর-জেনারেলকে পরামর্শ দেবেন। শ্রীমতী বন্দরনায়ক কোনরূপ আপোষের পরিবর্তে সরাসরি জনসাধারণের সম্মুখে তাঁর সমাজতন্ত্রের কর্মসূচী নিয়ে উপস্থিত হতে চান।

আগামী নির্বাচন সিংহলের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে। বামপন্থীদের সহযোগিতায় শ্রীমতী বন্দরনায়ক নির্বাচনে জয়লাভ করলে, সব বাধা অগ্রাহ্য করে, সংবাদপত্র জাতীয়করণ করে, এমন কি প্রয়োজন হলে বার্মার মত সকল রাজনৈতিক দল বাতিল করে দ্রুত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা শ্রীমতী বন্দরনায়ক করবেন। আর যদি শ্রী সি পি ডি'সিলভা ও ইউনাইটেড ন্যাশন্যাল পার্টির শ্রীডাডলি সেনানায়কদের বিরুদ্ধ পক্ষ জয়লাভ করে, তাহলে সিংহলে সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি ব্যাহত হবে—আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্র রক্ষিত হলেও।

থাইল্যাণ্ড :

মাত্র এক বৎসর হল মার্শাল থানম কিট্টিকাচরণ থাইল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই তাঁর শাসন উচ্ছেদের জন্য চক্রান্ত সুরু হয়েছে। সম্প্রতি থাই সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, এদের মধ্যে একজন ফরাসী দূতাবাসের কর্মচারী এবং আর দুজন থাই সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রীর দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত কর্মচারী।

থাই পুলিশের প্রধান কর্মকর্তা জেনারেল প্রসারিত রুচিরাওয়ঙ্গ বলেছেন, যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তারা সরকারের নীতি ও সীমান্তের খবরাখবর সম্পর্কে গোপন তথ্য বিদেশে পাচার করছিল। আরও প্রকাশ পেয়েছে, কয়েকজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারীকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, থাইল্যাণ্ডের রাজা ভূমিবল আদুলিয়াদেজের জন্মদিবস উপলক্ষে আয়োজিত কুচকাওয়াজের সময় এরা জোর করে প্রাসাদ দখল করে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটাবার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু পূর্বেই এই চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যায়।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শক্ত ঘাঁটি থাইল্যাণ্ড। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র লাওস, ভিয়েৎনাম ও কম্বোডিয়ার রাজনীতির পটভূমিকায় থাই শাসন উচ্ছেদের চক্রান্ত রীতিমত চাঞ্চল্যকর। এর পেছনে কমিউনিস্ট উস্কানি ছাড়াও, ফ্রান্সের হস্তক্ষেপের আশংকা রয়েছে। ফ্রান্স দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘোরতর বিরোধী।

* থানম কিট্টিকাচরণ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ঘরোয়া চুরি

একদিন সকালে ভারত সরকারের ভূতপূর্ব মিলিটারি সেক্রেটারী কর্নেল বার্ন আমার থানায় এসে উপস্থিত। তিনি বললেন তাঁর ১৩ নম্বর লাউডন স্ট্রীটের বাড়িতে রাত্রে চোর প্রবেশ করে তাঁর স্ত্রীর পোষাকঘরের আলমারি থেকে অনেক টাকা চুরি করে নিয়ে গেছে। তিনি আরও জানালেন, টাকাটা ইউরোপীয়ান অরফ্যানেজ অ্যাসাইলাম স্কুলের, এবং তাঁর স্ত্রী এই স্কুলের অবৈতনিক সেক্রেটারী। এই টাকাটা আগের দিনই ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলে গচ্ছিত রাখবার কথা ছিল, কিন্তু হয় নি। কিন্তু এখন সে ভুল সংশোধনের আর তো উপায় নেই।

আমি কর্নেলের সঙ্গে তাঁর ১৩নং লাউডন স্ট্রীটের বাড়িতে গিয়ে যে ঘরে চোর ঢুকেছে সন্দেহ করা হচ্ছিল, সেই ঘরটা পরীক্ষা করলাম। দেখলাম, ঘরের প্রত্যেকটি বাক্স এবং আলমারি খোলা পড়ে আছে, আর মেঝের ওপর ছড়িয়ে পড়ে আছে ভিতরের সব জিনিসপত্র। যে আলমারি থেকে টাকা চুরি গেছে; তার ড্রয়ার দেখে মনে হল, তা বড় একটা টোস্ট করবার চিমটের সাহায্যে বলপ্রয়োগে খোলা হয়েছে। কাঠে চিমটের দাগ আঁকা পড়েছে। যন্ত্রটিও ঘরেই পাওয়া গেল এবং সেটি এই বাড়িরই জিনিস।

আমি ভেবে দেখলাম জাতচোরেরা আলমারির ড্রয়ার ভাঙতে এ ধরণের যন্ত্র কখনও ব্যবহার করে না। অতএব আমি অনুমান করলাম এ কাজটি ঘরের কোনো চাকর ভিন্ন আর কারও নয়। ঐ বাড়িতে দুটি পরিবার বাস করতেন, কর্নেল বার্ন ও তাঁর স্ত্রী, এবং মিস্টার ও মিসেস ফারগুসন। আমি সবার যথাযথ নাম উল্লেখ করছি, কারণ এতে আমার বিবরণ বোঝার পক্ষে সুবিধা হবে। আরও কারণ, মুখের ভাবে লোকচরিত্র পাঠের বিদ্যা যাদের জানা নেই, তারা এর নাম শুনলেই এই বিদ্যাকে বিদ্রূপ করে। এ জন্য এই কেসটি কিভাবে তদন্ত করা হল, তা এই জাতীয় বিদ্রূপকারীদের জানা উচিত। আর এই উদ্দেশ্যেই আমি এর বিস্তারিত বর্ণনা দিচ্ছি।

আমি উপরোক্ত দুটি পরিবারের সকল ভৃত্যকেই ডাকিয়ে একত্র এনে জোটালাম। তারা সবাই উঠোনে

এসে দাঁড়াল। সংখ্যায় হবে প্রায় ত্রিশজন।

তাদের সবাইকে একসারিতে দাঁড় করিয়ে দিয়ে প্রত্যেকের মুখের ভঙ্গি লক্ষ্য করার উদ্দেশ্যে আমি তাদের সামনে দিয়ে ধীরে ধীরে একের পর একে অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে লাগলাম। এইভাবে কর্নেল বার্নের সর্দার-বেয়ারার সামনে এসে পড়লাম। কিন্তু দেখি সে আমার মুখের দিকে সোজা চাইতে পারছে না। তার দৃষ্টি ক্রমাগত-একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে চঞ্চল হয়ে ছুটছে, কিন্তু একবারও সে আমার চোখের দিকে তাকাচ্ছে না। অথচ লোকটি আমার ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে। আমি একটু বাঁয়ে সরে দাঁড়াই, কিন্তু তবু সে আমার দিকে তাকায় না। তারপর ডাইনে সরে দাঁড়াই, তবু না। যাই হোক আমি শেষ লোকটি পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম এবং সেখান থেকে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখি, ঐ সর্দার-বেয়ারা আমার গতি-বিধি লক্ষ্য করছে, অথচ অন্যেরা সবাই যেমন সোজা তাকিয়ে ছিল, তেমনি রয়েছে। আমি সেটি দেখামাত্র তাড়াতাড়ি আবার তার সামনে এসে দাঁড়ালাম, কিন্তু এবারেও সে আমার দিকে চাইতে পারল না, চোখ অন্য দিকে ফিরিয়ে রাখল। শেষ পর্যন্ত তাকে বলতে বাধ্য হলাম যে, সোজা আমার দিকে তাকাও। কিন্তু সে স্থির-ভাবে এক মুহূর্তও সোজা চাইতে পারল না। আরও একটা জিনিস এই সময় আমি লক্ষ্য করলাম—সে বারবার জিভ দিয়ে তার শুকনো ঠোঁট দুটি ভিজিয়ে নিচ্ছে। কাজটা কিন্তু সে তার অজ্ঞাতসারেই করছিল। আরও দেখলাম, তার গলার মধ্যে কি যেন একটা ঠেলে ঠেলে উঠছে, আর সে ঢোঁক গিলে ক্রমাগত সেটাকে নামিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। যতক্ষণ আমি তার সামনে দাঁড়িয়ে, ততক্ষণই এই ব্যাপারটা ঘটতে দেখলাম। আমার দেখা শেষ হলে আমি তার ঘাড়ে হাত দিয়ে তাকে সারি থেকে বার করে এনে কর্নেলকে বললাম, 'কর্নেল, এই লোকটিই আপনার চোর।'

আমার কথা শেষ হবামাত্র বেয়ারা কোনো ভূমিকা না করে তৎক্ষণাৎ তার মনিবের পায়ে লুটিয়ে পড়ে অপরাধ স্বীকার করল। বলল, 'আমি আপনার অনেক দিনের বিশ্বাসী চাকর, আমাকে মাপ করুন।'

দয়াভিক্ষার সে কি করুণ আবেদন! কিন্তু এমন অপরাধ তো ব্যক্তি-গতভাবে ক্ষমা করা চলে না, তাই তাকে পুলিশের হাতে দিতেই হল। লোকটি যখন নতজানু হয়ে ক্ষমাভিক্ষা করছিল, সেই সময়েই সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কর্নেলকে সে সব টাকা ফিরিয়ে দেবে। টাকা কোথায় রেখেছে তাও বলল, অবশ্য ক্ষমা পাবার প্রত্যাশা করেই। বলল, দু'মাইল দূরের একটি জায়গায় এক ঘরের মধ্যে টাকা আছে।

অতঃপর একজন দেশী অফিসার-সহ তাকে সেইখানে পাঠানো হল টাকা উদ্ধারের উদ্দেশ্যে। কিন্তু মাঝপথে সে বেঁকে দাঁড়াল। সে ইতিমধ্যেই ভেবে দেখেছে, ঝোঁকের মাথায় অপরাধ স্বীকার করা তার বড়ই অন্যায় হয়ে গেছে। সে তাই সঙ্গের অফিসারকে বলল, সে কর্নেল বার্ন এবং কারগুসনের কাছে যে স্বীকারোক্তি করেছে তা ডাহা মিথ্যা। সে সময়ে সে আফিঙের নেশায় বুঁদ হয়েছিল, তাই সে নেশার ভরে কি বলেছে তা তার খেয়াল নেই। অতএব এখন তাদের টাকা উদ্ধারের জন্য যাওয়ার কোনো মানেই হয় না। টাকা তো সে চুরি করে নি, অতএব কোথাও রাখেও নি—মিছিমিছি মরীচিকার পিছনে ধাওয়া করা হচ্ছে। সে টাকার বিষয়ে কিছুই জানে না। একথা শোনার পর অফিসার আর না এগিয়ে তাকে থানায় নিয়ে এসে আমাকে সব বললেন। আমি কিন্তু তার কথা মোটেই বিশ্বাস করলাম না। আমি লোকটিকে সঙ্গে নিয়ে আগে যেখানে টাকা আছে বলেছিল, সেইখানে রওনা হয়ে গেলাম। আমার সঙ্গে দেশী অফিসারটিও ছিলেন। আমরা যখন সেই বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছেছি তখন অফিসারটিকে বললাম, 'একে একটু দূরেই রাখুন, আমি একা যাচ্ছি ঐ বাড়িতে।'

আমি গিয়ে বাড়ির লোকদের সঙ্গে দেখা করলাম। বেয়ারার ভাই বেরিয়ে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করতে লাগল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কর্নেল বার্নের বেয়ারা কাল রাত্রে কখন তোমার কাছে এসেছিল?'

লোকটি একটুখানি ইতস্তত করে দূরে দাঁড়ানো তার ভাইয়ের দিকে এমন-ভাবে চাইল যেন তার কি করা উচিত সে বিষয়ে যদি কোনো ইসারা বা ইঙ্গিত তার কাছ থেকে পাওয়া যায়।

আমি বললাম, 'নাও নাও, আর দেরি করো না, এখন যা জান সব সত্যি করে বল। তোমার ভাই যা বলেছে, তা থেকে যদি তোমার জবানবন্দি কোনোরকম তফাৎ হয় তা হলে তোমাকেও ধরে নিয়ে যাওয়া হবে।'

একথা শোনার পর সে বলল, 'রাত প্রায় এগারোটায় এসেছিল।'

'যে বাণ্ডিলটা তোমাকে রাখতে দিয়েছিল, সেটা কোথায়?'

'সেটা আমার বাক্সে আছে।'

এই জবাবটি দিতে সে আর দেরি করল না, কারণ সে এতক্ষণে অনুমান করে নিয়েছে যে আমি সবই জানি, আমার কাছে লুকিয়ে তার আর কোনো লাভ হবে না। তাই আমি সেই বাণ্ডিলটা চাওয়ামাত্র সে সেটি নিয়ে এসে আমার হাতে তুলে দিল। এর মধ্যে প্রায় এক হাজার টাকা ছিল এবং আরও মজার কথা এই যে, কর্নেল বার্নের সিল্কের রুমাল দিয়েই বাঁধা ছিল টাকাগুলো।

ফিরে যেতে যেতে আমাদের বন্দীকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার কোন্ জবানবন্দিটা সত্যি—আগেরটা না পরেরটা?'

সে এর উত্তরে বলল, 'হায় সায়েব! আপনি আমার মুখ দেখে প্রথমেই আমাকে চোর বলে সন্দেহ করেছিলেন, আর আমার গলার আওয়াজ শুনে আমি যে মিথ্যা বলছি তা বুঝতে পেরেছিলেন, আপনাকে আর কি বলি? এই আমার কিসমৎ, এর বিরুদ্ধে লড়াই করে আর কি করব এখন?'

এই কেসটির বিচার হয় হাইকোর্টে এবং লোকটির তিন বছরের জেল হয়।

প্রশ্রয়দাতা মনিব আর অসাধু ভৃত্য

১৮৭০ সালের ১৭ই এপ্রিল তারিখে চীফ জাস্টিস স্যার বার্নেস পীকক হঠাৎ আবিষ্কার করেন, তাঁর পাঠাগার থেকে বিদেশী প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রার সংগ্রহ উধাও হয়েছে। অনেক বছর ধরে তিনি এই মুদ্রাগুলি সংগ্রহ করেছিলেন। অতএব এর ওজন-দরের চেয়েও এর অন্য দাম অনেক বেশি ছিল। এবং ওজনদরও খুব কম ছিল না।

এই সময় তিনি ইংল্যাণ্ডে যাবার জন্য সব গোছগাছ করছিলেন, আর এজন্য কয়েকজন চীনা মিস্ত্রী এবং বাইরের আরও কয়েকজন সাহায্যকারী লোক নিযুক্ত হয়েছিল। সবাই তাঁর বাড়িতেই কাজ করছিল। বাড়ির মধ্যে এত বাইরের লোক কাজ করছিল, অতএব তাঁর মূল্যবান মুদ্রাগুলি যে আর উদ্ধারের আশা নেই, একথা তিনি প্রায় ধরেই নিয়েছিলেন। তবু যে তিনি থানায় আমার কাছে ঘটনাটি রিপোর্ট করতে এসেছিলেন সে কেবল থানায় জানানো কর্তব্য মনে করে।

আমি তখন পার্কস্ট্রীট থানায়, আর স্যার বার্নেস থাকেন গ্রেট রাসেল স্ট্রীটে, সুতরাং আমার এলাকার মধ্যেই। আমি তাঁর মুখ থেকে সব শোনার পরেই কালবিলম্ব না করে তাঁর সঙ্গে আমি তাঁর বাড়ির দিকে রওনা হলাম। সেখানে পৌঁছে তাঁর পড়ার ঘরে বসে চুরি সম্পর্কে আলোচনা করতে করতে তাঁর সর্দার-বেয়ারাকে ডাকিয়ে আনালাম। তাকে বললাম আমাকে সমস্ত বাড়িটা দেখাও, কোথায় কোন্ ঘর আছে তাও দেখতে চাই। বেয়ারাকে যে আমি সন্দেহ করছি সে বিষয়ে তার সন্দেহ ছিল না, কেন না তাকেই আমি প্রথম ডাকিয়ে এনেছি। তাই তার মুখে চোখে অপরাধের ভাবটা পুরোপুরি ফুটে উঠতে দেখলাম। তখন আমি ইচ্ছে করেই স্যার বার্নেসের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলাম, যাতে সেই অবসরে বেয়ারার মুখের ভাব আরও ভালভাবে লক্ষ্য করতে পারি। ফল পেলাম আশাতীত। একটু দূর থেকেও দেখতে পাচ্ছিলাম তার ঘাড়ের দু-পাশের শিরা ফুলে উঠেছে, আর হাতের আঙুলের মধ্যেও মনের ভিতরের অস্থিরতা প্রকাশ হয়ে পড়ছে। কারণ সে তার অজ্ঞানতেই হাতের ডাস্টারখানা থেকে সুতো টেনে টেনে ছিঁড়ছিল।

আমাদের আলোচনা শেষে স্যার বার্নেস তাঁর বেয়ারাকে আমার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সব দেখাতে ও যা জিজ্ঞাসা করি তার জবাবে সব খুলে বলতে আদেশ দিলেন। আমি হেসে বললাম, 'স্যার বার্নেস, আপনি তো খোদ চোরকেই এসব আদেশ দিচ্ছেন।'

স্যার বার্নেস চমকে উঠে বললেন, 'বলেন কি! আপনি নিশ্চয় আমার বেয়ারাকে সন্দেহ করছেন না? এ লোকটি বহুদিনের বিশ্বাসী চাকর, ১৬ বছর আমার কাজ করছে, মানে, যখন থেকে আমি ভারতবর্ষে এসেছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত তার সততায় আমি কখনও সন্দেহ করার অবসর পাই নি।'

আমি বললাম, 'স্যার বার্নেস, হতে পারে আপনার কথা সত্যি, কিন্তু

রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা

(রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রৈমাসিক মুখপত্র)

সম্পাদক ঃ ধীরেন দেবনাথ

২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা প্রকাশিত হল।

এই সংখ্যার লেখকসূচী ঃ

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	ডঃ শীতাংশু মৈত্র
ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য	ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার
ডঃ অজিতকুমার ঘোষ	ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য প্রভৃতি।

প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা

বার্ষিক সদস্য চাঁদা চার টাকা (সডাক)

গ্রাহক চাঁদা পাঠাবার ও অন্যান্য যাবতীয় অনুসন্ধানের ঠিকানা ঃ

পত্রিকা-সম্পাদক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়,

৬/৪, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭

ফোন ঃ ৩৪-২৭৪৯ ; ৩৪-৫৩১৬

একমাত্র পরিবেশক ঃ

পত্রিকা সিণ্ডিকেট (প্রাঃ) লিমিটেড

১২/১, লিণ্ডসে স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

তবু আমার এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, যে-লোকটি এখন আমাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার কাছেই আপনার চুরি যাওয়া মুদ্রাগুলো পাবেন। শুধু তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করানোর অপেক্ষামাত্র।'

স্যার বার্নেস বললেন, 'মিস্টার রীড, আপনার যদি এ রকম ধারণা হয়ে থাকে, তা হলে আমার মুদ্রাগুলো উদ্ধারের জন্য আপনার যা ভাল মনে হয় করুন।'

প্রধান বিচারপতির অনুমতি পেয়ে যথাকর্তব্য সুরু করলাম। বেয়ারাকে জানালাম, 'চোরাই মুদ্রাগুলোর জন্য তোমাকে আমি পয়লা নম্বর আসামী খাড়া করছি।'

একথায় লোকটি তার মনিবের দিকে কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে রইল, কিন্তু আমি তাকে কোনো কথা বলার সুযোগ দিলাম না। কারণ, আমি দেখলাম, স্যার বার্নেস তার কাতর মুখ দেখে বিগলিত হয়েছেন এবং মনে হচ্ছে, যেন তিনি তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এনেছি তা তুলে নেওয়ার জন্য প্রায় প্রস্তুত হয়েছেন। তাঁর প্রিয় ভৃত্যকে এভাবে সন্দেহ করা হোক এটা তাঁর যেন অভিপ্রেত নয়। তাই আমি এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে লোকটির দেহ তল্লাসী করতে আরম্ভ করে দিলাম। দেখলাম তার কোমরে একটি চাবি বাঁধা রয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ চাবির উদ্দেশ্য কি?'

'এটা আমার বাক্সের চাবি, স্যার।'

'তোমার বাক্স কোথায়?'

'আছে এই বাড়িতেই একটি গুদামের মধ্যে।'—উত্তরটা দিল কিছু দ্বিধার সঙ্গে।

'আমি ঐ বাক্সে কি আছে দেখতে চাই।'

এরপর আর কিছু বলতে হল না। বেয়ারা বুঝতে পারল আর চালাকি চলবে না, তাই সে ফস করে তার মনিবের পায়ে লুটিয়ে পড়ল। স্যার বার্নেস সবই দেখছিলেন সেখানে উপস্থিত থেকে।

বেয়ারা চুরি স্বীকার করল এবং অপহৃত মুদ্রাগুলিও ফিরিয়ে দিল। সেগুলো তার বাক্সেই ছিল।

(এই কেসটির বিস্তারিত খবরের জন্য ১৮ই এপ্রিল ১৮৭০-এর 'ইংলিশম্যান' ও 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ' দ্রষ্টব্য। স্যার বার্নেস হাইকোর্টে সে সময়ে ফৌজদারি সেশন আরম্ভ হওয়ার আগেই ইংল্যাণ্ড অভিমুখে রওনা হবেন, এজন্য পুলিশকোর্টে দুজন ম্যাজিস্ট্রেট এ কেসটির বিচার করেন।)

একটি উল্লেখযোগ্য জেল পালানোর কাহিনী

কয়েক বছর আগে কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে এক কুখ্যাত সিঁদেল চোর দীর্ঘমেয়াদি জেল খাটছিল। একদিন তাকে জেল-গভর্নর ডাক্তার লিঙ্কের বাসস্থান মেরামতের কাজে লাগানো হয়। জেলের প্রধান ফটকের ঠিক ওপরে ছিল তাঁর বাসা। অন্যান্য কয়েদীও তার সঙ্গে কাজ করছিল।

এই কয়েদী চোরের নাম বৈকুণ্ঠ। কাজ শেষ হলে সবাইকে একত্র ডেকে তাদের সংখ্যা গোনার সময় দেখা গেল একজন কম পড়েছে। অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ নেই।

খোঁজ! খোঁজ! কোথায় গেল বৈকুণ্ঠ? কিন্তু কোথাও তাকে পাওয়া গেল না। সমস্ত জেলখানা তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল, কিন্তু সব বৃথা।

আসলে সে যা করেছিল তা এই। সবাই মিলে কাজ করতে করতে সে কোনো এক ফাঁকে ডাক্তার লিঙ্কের বাথরুমে ঢুকে সেখানে বড় একটা টব উল্টো করে তার নিচে লুকিয়ে ছিল। রাত্রে ডাক্তার লিঙ্ক ডিনার খেতে বেরিয়ে যান এবং ফেরেন রাত প্রায় বারোটায়। ততক্ষণ সে ঐ টবের নিচে বসে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে শুভক্ষণের প্রতীক্ষা করছিল।

ডাক্তার লিঙ্ক ফিরে এসে পোষাক ছেড়েই বিছানায় শুয়ে পড়েন এবং তখনই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হন। বৈকুণ্ঠ এবারে টব থেকে বেরিয়ে এসে খুব সাবধানে সাহেবের ছাড়া পোষাক নিজে পরল, হ্যাট, পেটেণ্ট চামড়ার বুট, কোনোটাই বাদ গেল না। মোট কথা সে নকল জেল-গভর্নর সাজল। এর পরের ধাপগুলি অত্যন্ত সহজ। অর্থাৎ নিচে নেমে যাওয়া এবং প্রহরীদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যাওয়া। নিচে নামার আগে সে সাহেবের ড্রেসিং টেবল থেকে কিছু অলঙ্কারপত্রও পকেটস্থ করেছিল।

এমন চালের সঙ্গে সে বেরিয়ে গিয়েছিল যে, প্রহরীরা তাকে দেখে সন্দেহমাত্র করে নি যে, সে অন্য কোনো লোক হতে পারে। বরং তাকে দেখে প্রহরী যথারীতি কুর্নিশ করেছিল।

পরদিন প্রেসিডেন্সি জেলে মহা হৈ-চৈ। কারণ বৈকুণ্ঠ নেই। জেল-গভর্নরের জুয়েলারি নেই। পোষাক নেই। ডাক্তারের বাথরুমে আবিষ্কার হল কয়েদীর পোষাক আর নম্বর পাওয়া গেল। তারপর প্রহরীর সাক্ষ্যে যা জানা গেল, তাতে আর সন্দেহ রইল না যে, বৈকুণ্ঠই এই চাতুরি খাটিয়ে পালিয়ে গেছে। শহর ও শহরতলীর সর্বত্র হুলিয়া প্রচার করা হল এবং পলাতক কয়েদীকে ধরার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হল। বৈকুণ্ঠ কিন্তু তার বিরুদ্ধে জেল-পালানো এবং জেল-গভর্নরের পোষাক চুরির অভিযোগ বহন করে গা ঢাকা দিয়েই রইল। কেউ তাকে ধরতে পারল না।

এরপর দশ মাস কেটে গেছে। এতদিন পরে শহরের উত্তর এলাকায় এক বাড়িতে চুরি করতে গিয়ে সে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেল। বৈকুণ্ঠ এবারে কিন্তু আর বৈকুণ্ঠ নয়। সে এখন অন্য আর এক নামে ফিরে এলো জেল খাটতে। সে এখন রামচরণ।

এই বৈকুণ্ঠের এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। সে ইচ্ছে করলে মুখের চেহারা এমন বদলে ফেলতে পারত যে, তার খুব অন্তরঙ্গ লোকও অনেক সময়

তাকে চিনতে পারত না। আর এই ক্ষমতার বলে সে নিজেকে চীনা, ধর্মীজ, অসমীয়া, বাঙালী অথবা হিন্দুস্থানীরূপে অনায়াসে পরিচয় দিতে পারত। বিলেতের ডেভিড গ্যারিক নামক বিখ্যাত অভিনেতার এই ক্ষমতা ছিল। তিনি দুইবারে সম্পূর্ণ দুই বিপরীত চেহারা করতে পারতেন, এমন কি, মুখের ভাব বদলের সাহায্যে তিনি জাতীয়ত্বেরও ভ্রান্তি ঘটাতে পারতেন। আর এইজন্যই অভিনেতারূপে তিনি এত সফল হতে পেরেছিলেন।

এই বৈকুণ্ঠের বেলাতেও ঠিক এই ভ্রান্তি। নতুন নামে সে যখন আর এক চুরির দায়ে জেলে ফিরে এলো, তখন জেলের কর্তৃপক্ষের কেউ তাকে বৈকুণ্ঠ বলে চিনতে পারেন নি। এই লোকটাই তাঁদের সকলের চোখে ধুলো দিয়ে দশ মাস আগে জেল থেকে জেল-গভর্নরের পোষাকে প্রহরীর কুর্নিশ নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল তা বুঝতে না পাবায় অবাক হবার কিছু নেই। লোকটি বৈকুণ্ঠ কি না। তার পক্ষে যে সবই সম্ভব।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে তার এক পুরনো জেলসঙ্গীর কাছে ধরা পড়ে গেল। তাকে মজুর খাটার বিভাগে পাঠানো হয়েছিল, এইখানে তার সঙ্গে দেখা হল তার সেই পুরনো মেটের সঙ্গে। বৈকুণ্ঠ তার কক্ষে ঘুমিয়ে ছিল, সেইখানে তাকে চিনতে পেরে সে চমকে ওঠে। এই সুযোগে জেলকর্তাদের কাছে ভাল মানুষ সাজার ইচ্ছাটা তার প্রবল হয়ে উঠল, সে সব ফাঁস করে দিল তাঁদের কাছে। কিন্তু বৈকুণ্ঠও সহজ পাত্র নয়। সে তো এখন আর বৈকুণ্ঠ নয়, এখন সে রামচরণ। অতএব তার ভয়টা কিসের? সে বলল ঐ কয়েদী একটি ব্যক্তিগত কারণে তাকে জব্দ করার জন্য মিথ্যা করে তার বিরুদ্ধে এইসব লাগিয়েছে। ব্যক্তিগত কারণটা আর কিছুই নয়, একখণ্ড আফিমের ভাগ নিয়ে মনান্তর। এই আফিম সে নিজের কোশলে আইনকে ফাঁকি দিয়ে জেলের মধ্যে এনেছে, অথচ সে এর বড় একটা অংশ দাবি করছে। এবং তার কথা যে কত সত্য, তা প্রমাণের জন্য সে সেই আফিম এনে জেলারের হাতে তুলে দিল।

রামচরণকে বৈকুণ্ঠ বলে চিনিয়ে দিতে পারে এমন কেউ তখন আর জেলে ছিল না, তাই তার কথা যে মিথ্যা, তার প্রমাণ হল না। অতএব বৈকুণ্ঠ প্রায় জিতেই যাচ্ছিল, এমন সময় তখনকার জেলার মিস্টার উইলসনের মাথায় এক বুদ্ধির উদয় হল। তিনি যে-এলাকায় বৈকুণ্ঠ স্বনামে প্রথম চুরির দায়ে ধরা পড়েছিল, সেইখানকার থানার অফিসারকে এইখানে আনিয়ে তাঁকে দিয়ে রামচরণকে পরীক্ষা করাতে মনস্থ করলেন। থানার এই অফিসারটি কাউকে একবার দেখলে তার মুখ মনে রাখতে পারেন এই রকম একটা খ্যাতি ছিল তাঁর। তাঁকে এনে বৈকুণ্ঠসহ এগারোজন কয়েদীকে প্রধান ফটকের সামনে এনে দাঁড় করানো হল। একের পিছনে এক এইভাবে, অর্থাৎ সিংগ্‌ল ফাইলে, তাদের দাঁড় করানো হল। মিস্টার উইলসনের নিমন্ত্রণে আমিও সেখানে হাজির ছিলাম।

আমাকে বলা হল অপরাধী বাছাই করতে। আমি পর পর সবাইকে দেখতে দেখতে এগিয়ে যেতে লাগলাম। সারির মাঝামাঝি এসে দেখি একটি লোকের মুখ বেঁকে আছে। ঠোঁট মুখের ডান দিকে টানা। দেখলেই বোঝা যায় সে এক অদ্ভুত বিকৃতি। মুখের একটি পেশীও নড়ছিল না, মনে হচ্ছিল চোখ দুটিও যেন নিষ্পলক। সন্দেহ রইল না যে মুখখানি লোকটির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে আছে। একটিমাত্র অপরাধ-প্রকাশক চিহ্ন বাইরে ফুটে উঠেছিল তার চোখের তারায়। অপরাধেরও ঠিক বলা যায় না। বরং সেটি ভয়ের চিহ্ন বলাই যুক্তিসঙ্গত। দেখা গেল মুখকে কৃত্রিম উপায়ে বেঁকিয়ে রাখার জন্য তার যে শক্তি ব্যয় হচ্ছিল, তাতে তার চোখের তারার সঙ্কোচ আর বিস্ফার ঘটছিল অবিরাম। সারির বাকি লোকদের পরীক্ষার জন্য আর না এগিয়ে বৈকুণ্ঠের ঘাড়ে হাত দিয়ে বললাম, 'সারি থেকে বেরিয়ে এসো।' মিস্টার উইলসনকেও সেই সঙ্গে বললাম, 'এই আপনার লোক।'

বৈকুণ্ঠ জেলারের পায়ে লুটিয়ে পড়ে সব স্বীকার করল। তারপর যখন সে উঠে দাঁড়াল, তখন তার মুখ স্বাভাবিক হয়েছে এবং তখন সে মুখ দেখে তাকে বৈকুণ্ঠ বলে সবাই চিনতে পারলেন। (ক্রমশঃ)

মহর্ষি কণাদ প্রণীত

বৈশেষিক-দর্শনম্

শিষ্যগণ নিকটে উপস্থিত হইলে মহর্ষি কণাদ তাঁহাদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"হে শিষ্যগণ। এই সূত্রে তোমাদের নিকট ধর্ম্মব্যাখ্যা করিব।" মহর্ষির এই বাক্যের নাম প্রতিজ্ঞাবাক্য। ধর্ম্মের বিভিন্ন দিক, কার্য্যকারণ, দ্রব্য ও সত্তার পার্থক্য ও গুণত্বের এবং জাতির পার্থক্য, পৃথিবীর লক্ষণ, জল, বায়ু, দ্রব্য ও আকাশানুমান, পরমাণুতত্ত্ব, মনঃস্থৈর্য্য, মুক্তি, জন্মান্তর, ভ্রম ও প্রমাদ—মহর্ষি কণাদ ধর্ম্মকথার মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের বাণী ব্যক্ত করিয়াছেন।

স্বর্গত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত

মূল্য দুই টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

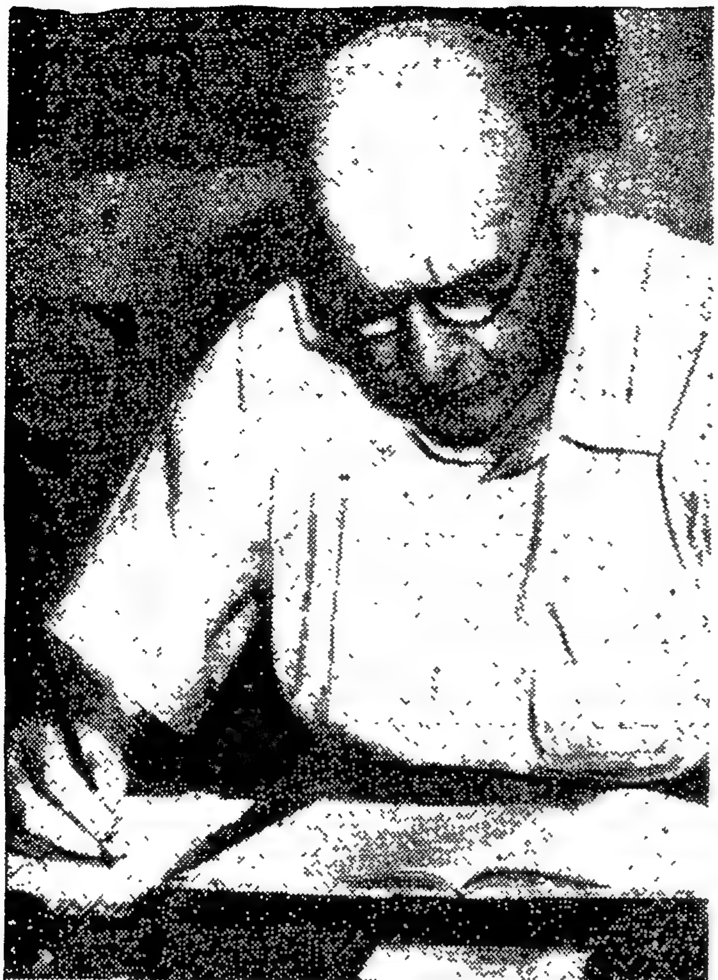

'তিনি যে হলডেন'

কল্পতরু সেনগুপ্ত

প্রফেসব হলডেন নামের সঙ্গে আমাদের এক নির্ভীক যোদ্ধাব কথা মনে হয়। যিনি বিজ্ঞানকে মানব কল্যাণে সর্বতোভাবে কাজে লাগাবার জন্য সংগ্রাম করেছেন, যিনি বিজ্ঞান সম্পর্কিত জ্ঞান বিশেষ একটা শ্রেণী অথবা উচ্চশিক্ষিত মহলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার পরিবর্তে সর্বসাধারণের আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসার জন্য লেখনী ধরেছিলেন। যিনি শোষক ও শোষিতের সংগ্রামে শোষিতের পক্ষে বৈজ্ঞানিক তথ্য ব্যবহার করতে গৌরব বোধ করেছেন, যিনি বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী হয়েও শ্রমিকশ্রেণীর আদর্শকে জয়যুক্ত করার জন্য নির্ভীকভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রচারকের ভূমিকা গ্রহণ করেন, যিনি ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে কেবল লেখনী ধারণ অথবা বক্তৃতা করেন নি, নিজে প্রত্যক্ষভাবে স্পেনে গণতন্ত্র বক্ষার সংগ্রামে অংশ-গ্রহণ কবেছিলেন। পৃথিবীকে সর্ব-প্রকার কলুষ, শোষণ ও বর্ণবিদ্বেষ থেকে মুক্ত করার এবং বিশ্বশান্তির সংগ্রামে জে বি এস হলডেন ছিলেন একজন প্রথম সারির যোদ্ধা।

প্রফেসর হলডেনের নামের সঙ্গে আমরা বহুদিন থেকে পরিচিত। তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এদেশের জ্ঞানান্বেষীদের মনে প্রেরণা জাগিয়ে আসছিল। ইংল্যাণ্ডের 'ডেইলী ওয়ার্কার' দৈনিক পত্রিকায় কিশোরদের জন্য বৈজ্ঞানিক তথ্যসম্পন্ন তাঁর লেখা বিজ্ঞানের সহজ ভাষ্যের বা পপুলার সায়েন্সের এক চমৎকার দৃষ্টান্ত। তাঁর গবেষণালব্ধ জ্ঞান মানব জাতির বিকাশের পথে এক পরম সম্পদ। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ও তাঁব স্ত্রী শ্রীমতী এইচ স্পাবওয়ে এদেশকে বৈজ্ঞানিক উন্নতিতে যা করেছেন, তার জন্য বিজ্ঞানের ছাত্রদেব কাছে প্রফেসর হলডেন বিশ্ব-মানবতাব ও পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের এক অনুকবণীয় আদর্শ পুরুষ। জেনেটিক্স বিশেষজ্ঞ হিসাবে তিনি বিশ্ববিশ্রুত। কিন্তু তাঁর মধ্যে বিজ্ঞান ও মানব প্রেমের এমন সমন্বয় ঘটেছিল, যা সাধারণত বিজ্ঞানীদের মধ্যে আমরা দেখি না। বিজ্ঞানীরা সাধারণভাবে সমাজ ও রাজনীতি-নিরাসক্ত থাকেন। প্রফেসর হলডেন সমাজের গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করা এবং সেই অনুসারে কাজ করা বৈজ্ঞানিকেব কর্তব্য মনে করতেন। বিজ্ঞানের অর্থে তিনি বুঝতেন মানুষের কল্যাণ। এই দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি কার্ল মার্ক্স-এর মতবাদের সমর্থক ছিলেন। সমাজ-বিশ্লেষণে মার্ক্সবাদ এক শক্তিশালী হাতিয়ার। এই হাতিয়ার তাঁব বৈজ্ঞানিক প্রতিভাকে আবো উজ্জ্বল, আরো বিকশিত করেছিল। তিনি এমনই সমাজ-সচেতন ছিলেন যে, ১৯৩০ সালে জার্মানীতে নাৎসীবাদের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বৈজ্ঞানিক মন পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল। ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের সংগ্রামে তিনি নেতৃত্ব দিলেন। ফ্যাসিস্ট বিরোধিতা ও মার্ক্সবাদী চিন্তাধারার জন্য নাৎসী গোয়েন্দা গেস্টাপোর তালিকায় অবাঞ্ছিত ব্যক্তি হিসাবে তাঁর নাম উঠেছিল। সে সময় জার্মানী থেকে বিতাড়িত ইহুদীদের আশ্রয়দানের ও সহায়তা করার জন্য এবং

জাতি-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন করেছিলেন। এ সময় তিনি গ্রেট বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েছিলেন, এবং কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'ডেইলি ওয়ার্কার' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন প্রায় দশ বছর।

যৌবনকাল থেকে লেখা ও বিজ্ঞানচর্চা তাঁর পেশা হলেও লেখনীর সঙ্গে বন্দুক ধরতে তিনি সমান সাহসী ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি বৃটিশ সৈনিকরূপে গিয়েছিলেন ফ্রান্স ও ইরাকে। যুদ্ধক্ষেত্রে দুবার আহত হয়েছিলেন। যুদ্ধের বীভৎসতা প্রত্যক্ষ করেছেন। এখান থেকে তাঁর মন যুদ্ধ-বিরোধী হয়ে ওঠে। যুদ্ধ কাদের স্বার্থে বাধে; আর অজস্র প্রাণের বিনিময়ে কিভাবে কায়েমী স্বার্থ রক্ষা করা হয়, ধনতান্ত্রিক স্বার্থের যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাঁর মন বিদ্রোহ করে। পরবর্তীকালে এই অভিজ্ঞতায় তিনি যুদ্ধ-গ্যাস প্রয়োগ সম্পর্কে গবেষণা করেন, এবং মূল্যবান থিসিস রচনা করেন। জীবনে তিনি আর একবার যুদ্ধে গিয়েছিলেন; তবে এবার প্রথম মহাযুদ্ধের মত বৃটিশ সৈনিক হিসাবে নয়; এবার গিয়েছিলেন শান্তির সৈনিক হিসাবে। ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে মানবতার পক্ষে; স্পেনে গ্যাস মুখোসের উপদেষ্টা হিসাবে। আন্তর্জাতিক বাহিনীর সঙ্গে তিনি স্পেনের ফ্রণ্টে গিয়ে কিছুদিন ছিলেন। সেখানে তাঁর ১৭ বছরের ছেলে ট্রাক চালক হিসাবে সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিল।

জন বার্ডন স্যাণ্ডার্সন হলডেন ইংল্যাণ্ডে ১৮৯২ সালের ৫ই নভেম্বর তারিখে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হলডেন পরিবার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সুপরিচিত। তাঁর পিতা ও পিতামহ উভয়েই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী। ১৯১১ সালে তিনি ইটন থেকে বৃত্তি নিয়ে অক্সফোর্ডের নিউ কলেজে পড়তে আসেন। এখানে তিনি অঙ্কশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর অনার্স এবং জুলজি অধ্যয়ন করেন। ১৯১২ সালে তিনি সাহিত্য অধ্যয়ন করেন এবং প্রথম শ্রেণীর অনার্স নিয়ে পাশ করেন। এ সময় সাহিত্যের দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধে যোগ না দিলে হয়তো সাহিত্যের পথেই তাঁর জীবন বিকশিত হত। চিরায়ত সাহিত্যে তাঁর পাণ্ডিত্য অসাধারণ। সাহিত্য আলোচনা এবং তাঁর কণ্ঠে গ্রীক ভাষায় হোমারের আবৃত্তি শুনে শ্রোতারা মুগ্ধ হতেন। ১৯১৯ সালে তাঁকে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্যার উইলিয়ম ডান অধ্যাপক পদে নিয়োগ করা হয়। এ পদে তিনি দশ বছরকাল ছিলেন। ১৯৩০ সালে তিনি রয়্যাল ইনস্টিটিউটে ফিজিওলজির রীডার, ১৯৩৩ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রজনন বিজ্ঞানের অধ্যাপক, পরে ১৯৩৭ সালে বায়োমেট্রির অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি ২০ বছর কাল কাজ করেছেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রজনন বিজ্ঞানের পদটি তাঁরই জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল। এই অধ্যাপনাকালের মধ্যে তিনি একদিকে যেমন চাঞ্চল্যকর তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশ করে বিজ্ঞান-জগতের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করেছিলেন, অন্যদিকে তাঁর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রেট বৃটেন ও ইউরোপে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বিজ্ঞানী হিসাবে তাঁর স্থান সকল মহলে অতি উচ্চে, অথচ তাঁর মত ও সামাজিক ব্যবহার নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। এই বিতর্ক এমন সুরে উঠেছিল যে, একবার স্যার উইনস্টন চার্চিলকেও বলতে হয়েছে—'তিনি ভয়ঙ্কর 'লাল' হতে পারেন, কিন্তু আমি তাঁকে ছাড়তে পারি না। তিনি যে হলডেন।'

১৯৩২ সালে হলডেন রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। তিনি সোসাইটির ডারউইন পদক, এবং ১৯৫৮ সালে ডারউইন-ওয়েলস স্মারক পদক লাভ করেন। আমেরিকার জাতীয় বিজ্ঞান একাডেমি প্রজনন বিজ্ঞানে তাঁর কাজের স্বীকৃতিতে তাঁকে কিম্বার পদক (১৯৬১) দেন। একই বছরে পণ্টিফিক্যাল একাডেমি থেকে বায়োলজিতে তাঁর গবেষণার সাফল্যের জন্য ১১ হাজার ৫ শত পাউণ্ড পুরস্কার লাভ করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি এস-সি দিয়ে সম্মান জানান। এ সময়ে তিনি গ্রেট বৃটেন এবং বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট লাভ করেন।

অন্য বিজ্ঞানীদের সাথে প্রফেসর হলডেনের চরিত্রের তফাৎ কোথায় তা যেমন স্পেনের যুদ্ধের সময় বোঝা গেছে, তেমন দৈনন্দিন জীবনেও জানা গেছে। তাই অনেকের চোখে তিনি বড় অদ্ভুত মানুষ। ১৯৩৯ সালে বৃটেনের সাবমেরিন দুর্ঘটনার পরে ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে তাঁকে তদন্তের জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। তিনি একটা বায়ুপূর্ণ স্টিলের চেম্বারের মধ্যে সাড়ে চোদ্দ ঘণ্টা থেকে দুর্ঘটনার কারণ প্রমাণ করেছিলেন। আদালতে প্রফেসর হলডেনের সাক্ষ্য খুবই সহায়ক হয়েছিল। এই অনুসন্ধান কাজ চালাতে গিয়ে তাঁর শরীরের ওপর ভয়ানক চাপ পড়েছিল। তার জন্য তাঁকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ভুগতে হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বৃটেনের নৌ-বাহিনীর কর্তৃপক্ষ তাঁকে সাবমেরিন সম্পর্কে গবেষণার জন্য অনুরোধ করেন। এ সময়ে তিনি যা আবিষ্কার করেন তাতে পূর্ববর্তী অনেক ধারণা পাল্টে যায়, এবং সাবমেরিনের উন্নতির দিক থেকে এক নতুন পথনির্দেশ করে।

বাহাত্তর বছরকাল জীবনের মধ্যে গবেষণা, অধ্যাপনা, সাধারণ ট্রেড ইউনিয়ন থেকে বিশ্বশান্তির কাজ এবং পত্রিকা সম্পাদনার মধ্যে তিনি অমূল্য প্রবন্ধ এবং পুস্তক রচনা করেছেন। অসংখ্য প্রবন্ধ ছাড়াও তাঁর পুস্তকগুলির মধ্যে বিখ্যাত—পসিবল ওয়ার্লড; এ্যানিমল বায়োলজি (জুলিয়ান

হারাদিন বন্ধু) ; সায়েন্স এণ্ড এথিক্স ; এনজাইমস ; দি ইন-ইকোয়ালিটি অব ম্যান ; ফ্যাক্ট এণ্ড ফেইথ ; মাই ফ্রেণ্ড মিঃ লিকি ; হেরেডিটি এণ্ড পলিটিক্স ; এ আর পি ; দি মার্ক্সিস্ট ফিলজফি এণ্ড দি সায়েন্স ; সায়েন্স এণ্ড এভরি ডে লাইফ ; কিপিং কুল ; সায়েন্স এণ্ড পীস এণ্ড ওয়ার ; নিউ পাথস ইন জেনেটিক্স ; এ ব্যানড ব্রডকাস্ট ; সায়েন্স এডভান্সেস ; এভরিথিং হ্যাজ এ হিস্টরী ; দি বায়োকেমিস্ট্রি অব জেনেটিক্স ; কজেস অব ইভল্যুশন ইত্যাদি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে প্রফেসর হলডেন বিশ্বশান্তির কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বিশ্বশান্তি সংসদ গড়ে তোলার কাজে তাঁর অবদান যথেষ্ট। ১৯৫৬ সালে বৃটিশ সরকার সুয়েজের ওপর আক্রমণ করে সাম্রাজ্যবাদী দস্যুতার এক ঘৃণ্য পরিচয় প্রকাশ করে। এই ঘটনায় প্রফেসর হলডেন এত বিচলিত হন যে, তিনি প্রকাশ্যে একে 'বৃটিশের গণহত্যা' বলে নিন্দা করেন। সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপের প্রতিবাদে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী এইচ স্পারওয়ে ইংল্যাণ্ডের নাগরিকত্ব ত্যাগ করেন। এবং বলেন যে, তাঁরা অপেক্ষাকৃত সভ্যদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করবেন। ১৯৫৭ সালে হলডেন দম্পতি ভারতে আসেন। এখানে এসে প্রফেসর হলডেন বরাহনগরে অবস্থিত ইণ্ডিয়ান স্টাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট-এ রিসার্চ প্রফেসরের কাজ গ্রহণ করেন। তাঁর স্ত্রীও একই সঙ্গে গবেষণায় যোগ দেন। পশ্চিমবঙ্গে থাকাকালে তিনি ও শ্রীমতী স্পারওয়ে ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু চার বছর পরে তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে এখানকার কাজে ইস্তফা দিতে হয়। ১৯৬২ সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ-এর জেনেটিক্স এবং বায়োমেট্রি গবেষণার প্রধান নিযুক্ত হন। কিন্তু এখানেও তিনি বেশিদিন কাজ করতে পারেন নি। তারপরে তিনি উড়িষ্যা সরকারের জেনেটিক্স এণ্ড বায়োমেট্রি গবেষণাগারের প্রধান হিসাবে ভুবনেশ্বরে কাজ করেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সেখানে কাজ করেছেন। তাঁর মত স্পষ্টভাষী ও নির্ভীক মানুষ বড় কম দেখা যায়। নিজের বিবেক ও স্বাধীন চিন্তাধারার বিরুদ্ধে কোন বাধার সাথে তিনি আপোষ করতেন না। এই কারণে স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের কাজ ত্যাগ করার পূর্বে তিনি অনশন ধর্মঘট করেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছেও উপযুক্ত সহায়তা না পাবার জন্য অভিযোগ করেছিলেন। এ নিয়ে রাজ্য সভায়ও আলোচনা হয়েছিল। আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন এক ভয়ঙ্কর প্রতিবাদ। এ কারণে তাঁকে ভয় করার লোকও কম ছিল না।

জীবনের এক সন্ধিক্ষণে আমি প্রফেসর হলডেনের লেখার সাথে পরিচিত হয়েছি। ইংরেজ সরকারের জেলে হলডেনের প্রবন্ধগুলি ভারতের বহু মুক্তিসংগ্রামীকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণে সাহায্য করেছে। দূর থেকে নাম শোনা প্রফেসর হলডেনকে প্রথম যেদিন কলকাতায় দেখেছিলাম সেদিন বিস্ময়ের সীমা ছিল না। শ্রী ও শ্রীমতী হলডেন এক জনসভায় শ্রোতাদের মধ্যে আমারই পাশে দাঁড়িয়ে। দীর্ঘদেহ, সৌম্যমূর্তি, ভাব বিভোর চোখ দুটি ; পরনে গেরুয়া পাঞ্জাবী-পায়জামা ; সকলের দৃষ্টি এই দম্পতির দিকে। তারপরেও আমি প্রফেসর হলডেন দম্পতিকে দেখেছি। যত দেখেছি, মনে মনে গর্ববোধ করেছি। তাঁর শেষ দান নিজের দেহ, যা তিনি ডাক্তারী ছাত্রদের গবেষণার কাজে দিয়ে গেছেন। এমন সংস্কারমুক্ত, ব্যক্তিপূজার মোহমুক্ত এমন মহান বিজ্ঞানীর উদ্দেশ্যে বারবার শ্রদ্ধা জানাই।

অন্ধকার

অর্চনা ঘোষ

যে রয়েছে বুকের গভীরে আলো তার মুখেরা

মাগো, স্বৈরথে উদাসী সেই দুলাল রাজার
ফিরে গেলে অন্য অঙ্গীকারে, অন্তরংগ হার-
ছেঁড়া-মণি পরশ কাতর ; চিত্রাপিত চোখে,
বিকেলের সমস্ত প্রবাল ভেসে গেল জলে ;
সেনালা স্মৃতি দূরে থাকে করুণ আঙুলে ॥

দূরতর বাদর দোলে, অকারণ গানে
মনে রবে কিনা রবে ভাবি নম্র অন্ধকারে,
যে রয়েছে আলো হয়ে আজো বুকের গভীরে।
মন্দিরের কপাট কঠিন, অস্ফুট আঘ্রাণে.

কস্তুরী হরিণ ধাওয়া, কয়েকাট ফুলে
প্রতিশ্রুতি, জেগে আজ থাকো, বিনিদ্র রজনী।
উদাসীন রাজার দুলাল ফিরে গেলে চিনি
তার মুখ, অন্ধকারে সোনা, তার নাম ভুলে ॥

পূর্ব-প্রকাশিতের পর

॥ দ্বাবিংশ প্রবাহ ॥

বাণিজ্য।

বাণিজ্যের ইতিহাস বিশদ করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলতে গেলে অনেক অনেক কথা বলতে হয়। বাণিজ্যের সঙ্গে মানুষের আর সমাজের যোগাযোগ এত নিবিড় যে, বাণিজ্যের ইতিবৃত্ত বলতে গেলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে হাজারো ছবি—শত শত শতাব্দীর বিস্মৃতির কুয়াশায় অস্পষ্ট, আর আবছায়া সে-সব ছবি। কিন্তু—

ইতিহাসের পাতায় সোনার লেখার মত জ্বলজ্বল করছে যুগ-যুগান্তরের সওদাগরের ব্যবসা-বাণিজ্যের বিচিত্র ইতিকথা। শুধু কি সওদাগর—সেখানে আছে বন্দরের কথা, আছে বিভিন্ন পণ্যসম্ভারের কথা আর আছে সেই কোন্ পুরাকালের জনকোলাহলমুখর বন্দরের ছবি।

স্মরণের বায়ুতরঙ্গকে আশ্রয় করে বহু—বহুদূরের বিগতকালের সেই কুয়াশাময় অতীতের ভেতরে যাওয়ার আগে বলে রাখা উচিত—বাঙালীর বাণিজ্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে বসে কখনও কখনও (প্রত্যেক জেলার কথা বলতে গিয়ে) অনেক পরের যুগে চলে গিয়েছিলাম। পাঠকরা আমাকে নিজগুণে মার্জনা করবেন। এবারে আমি মোগলযুগের ব্যবসা-বাণিজ্যের কথাই আলোচনা করবো।

মোগলযুগ।

ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ। বিশাল এই দেশের কোন নগরে, জনপদে কি পল্লীতে এতটুকু দারিদ্র্যের চিহ্নও ছিল না; ছিল না কারো চোখে-মুখে বিষাদের কোন ছায়া। রাজপথের দু'ধারে বিপণিতে বিপণিতে বিপুল পণ্যসম্ভার থরে থরে সাজানো থাকতো; সুবেশ আর সুখী নরনারীর আনন্দ উচ্ছলিত কোলাহল বহু দূরাগত নটীর নূপুর নিক্কণের মত শোনা যেত।

কত সুখের দেশ ছিল তার প্রমাণ পেতে হলে যেতে হবে এক বিদেশীর কাছে। বিচিত্র সেই মানুষটির ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ইতিহাসের অন্ধকারে ফেলবে ম্লান মশালের আলো। উত্তাল সাগর পাড়ি দিয়ে এক পর্তুগীজ ভ্রমণকারী এসেছিলেন ভারতবর্ষে সেই পুরাকালে। নাম—

ম্যাণ্ডেল সো। ম্যাণ্ডেল সো ভারতবর্ষের পশ্চিমপ্রান্তে প্রথম পদার্পণ করেছিলেন। সুরাট থেকে এসেছিলেন আগ্রায়। তিনি আগ্রা আর লাহোরে এদেশের বাণিজ্যের সমৃদ্ধি দেখে মুগ্ধ আর বিস্মিত হয়েছিলেন। ইতিহাসকার লিখেছেন,

He was impressed with business prosperity of Surat. Every merchant have their lodges, their storehouses, their employees,---their secretaries---and they indeed have made it eminent cities.---

ম্যাণ্ডেল সো আগ্রা শহরের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির যে বিবরণ দিয়েছেন, তা পড়লে মনে হবে, সেই সুদূর অতীত-কাল যেন মূর্তি ধরে উঠে এসেছে চোখের সামনে।

'প্রত্যেক সওদাগরের বাণিজ্যের একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল। যে যে জিনিসের ব্যবসা করে সেই জিনিসের সঙ্গে সওদাগরের নাম জড়িয়ে থাকতো।

যারা স্বর্ণশ্রেষ্ঠী তারা থাকে যে অন্সাটে তার নাম, 'সোনা মহল'—রৌপ্য, লোহা, তামা ইত্যাদি প্রত্যেকটি জিনিসের জন্য সওদাগরদের আলাদা আলাদা রাস্তা—পৃথক-পৃথক মহল। এই আগ্রাতেই আশীটা সরাইখানা ছিল বিদেশী ব্যবসায়ীব জন্য। এক একটা সরাইখানা যেন এক-একটা রাজপ্রাসাদের মত। ঘরে ঘরে আলোব রোশনাই জ্বলছে, লোকে গমগম করছে সরাইখানার উঠোন। বাইরে হাতীশালে হাতী, আস্তাবলে ঘোড়া। যে-কোন সরাইখানার সামনে এলে মনে হবে, শ্রেষ্ঠীরাই বুঝি সমাজের সর্বাপেক্ষা বিত্তশালী ব্যক্তি----'

ম্যাণ্ডেল সো'ই কিন্তু প্রথম অগ্রগামী নন। ভয়ঙ্কর উত্তাল ঢেউ পাড়ি দিয়ে অজানা সমুদ্রে শুধু একমাত্র সাহসকে পাথেয় করে এসেছিলেন আরও অনেক দুঃসাহসী অভিযানকারী।

এসেছিলেন নাবিক হকিন্স। এসেছিলেন ইংরাজদের প্রথম দূত হার্বণ্ট স্যার থমাস রো। এসেছিলেন বিশপ টেরি আর অভিংটন। এসেছিলেন আর মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁদেব চোখে-মুখে অভিভূত একটা আচ্ছন্নতা থমথম করছিল। এত স্থখী—

এত ঐশ্বর্য এই দেশে। এই ভারতবর্ষে। এই শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের আদিম দেশে। অভিভূত বিহ্বলতা চোখ থেকে নিশ্চিহ্ন হযে মুছে গেল। চোখে জেগে উঠল লোভের আভা। ঠিক—

ঠিক এই সময় সাত সমুদ্র তের নদী পারের ছোট্ট দেশেব কয়েকটি সওদাগরের মাথায় দূরের সেই ঐশ্বর্যের দেশে ব্যবসা করার কুটিল চক্রান্ত ধূমায়িত হতে স্থরু কবেছিল। ইংল্যাণ্ডে তখন রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকাল চলছিল। কতিপয় ব্যবসায়ী দ্বারা পরিচালিত 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' এলিজাবেথের কাছে প্রস্তাব করেছিল, তারা ভারতবর্ষে বাণিজ্য করতে যেতে ইচ্ছুক। রাণী সম্মতি দিয়েছিল, আর সেই অনুমতির ভেতরে দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীর ইতিহাসের অনুরণন বেজে উঠেছিল। এই বণিক সমিতি,—ভারত ইতিহাসের পতন-অভ্যুদয় পন্থার সারথী সেই 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী'র সর্বপ্রথম স্বীকৃত প্রতিনিধি উইলিয়ম হকিন্স।—

'Story of Nations' নামে গ্রন্থের 'মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাসে' লিখেছে, Arrival of William Hawkins to the Court of Great Mogul at Agra was a memorable event in the history of British intercourse with India. সেইখানেই শেষ নয়। আবও—

আরও বলেছে, হকিন্সই হচ্ছেন ইংল্যাণ্ডের রাজার প্রথম প্রতিনিধি। তাঁর স্বীকৃতির ভেতরেই ভারতবর্ষে বৃটিশের ব্যবসার ইতিহাসের—সেই বিস্ময়কর ইতিহাসের স্থরু হয়েছিল।

উইলিয়ম হকিন্স মোগলযুগের ব্যবসার ইতিহাসে একটি স্মবণীয় নাম। শুধু যে আগ্রায় এসেই আরামে রাজঅতিথি হয়ে বসেছিলেন তা নয়। গিয়েছেন উত্তর আর্যাবর্তে, গিয়েছেন দক্ষিণে ভারত মহাসাগরের কূল ধরে ধরে ভিজাগাপট্টমে, গিয়েছেন মাদ্রাজে, কালিকটে আরও অনেক জায়গায়। সমুদ্রযাত্রায় সহযাত্রী ছিলেন আর এক দুর্ধর্ষ অভিযানকারী।

ড্রেক। ফ্র্যান্সিস ড্রেক। যেমন ড্রেক তেমনি হকিন্স। ওঁদের রক্তের ভেতরে বিষের মত ক্রিয়া করতো একটি—একটিমাত্র নেশা, যেমন কবে হোক নতুন দেশ আবিষ্কাব কবতে হবে, বাণিজ্য বিস্তার করতে হবে সেই নতুন দেশে। এই নেশায় উন্মত্ত একটা ঝড়ের মত ছুটে ছুটে বেড়াতেন হকিন্স এই ভারতবর্ষেব বন্দরে বন্দরে। সুদীর্ঘ ত্রিশ—ত্রিশ বছর পব ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁকে তাদের সুযোগ্য নেতা বলে স্বীকার করেছিল। উপাধি দিয়েছিল 'হেক্টর'।

হকিন্সেব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভেতরে সেই সাবেক ভারতবর্ষের ব্যবসা-জগতের জীবন্ত চিত্র পাওয়া যায়। যেন এই দুর্নীতি, এই মাৎস্যন্যায়, স্বজন-পোষণ আরও সহস্র রকম অবিচারের দুঃস্বপ্নে ভরা এই বর্তমানের ছবিটাই দীর্ঘ শত শত শতাব্দী পূর্বের ভারতবর্ষের ব্যবসার ইতিহাসেব সত্য হযে উঠেছিল।

সুরাটে এক জাহাজ মাল বোঝাই করে নিয়ে চললেন হকিন্স সাহেব। ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে জাহাজ চলেছে। হকিন্সের বুক অজানা আশঙ্কায় দুরু দুরু কাঁপছে। কাঁপছে মাঝি-মাল্লাদের বুক। সাগরপাবেব আর এক বিদেশীর জাহাজও রাত্রির অন্ধকারে সমুদ্রে নিঃশব্দে আততায়ীর মত ঢেউ কেটে কেটে চলে। তারাও ব্যবসা করে। কিন্তু সে ব্যবসা—

তারা 'দিনকা মোহিনী, রাতকা বাঘিনী।' দিনের ছদ্মবেশ খুলে ফেলে দস্যুর মূর্তি ধরে বেবিয়ে আসে তাবা।

ভয়ঙ্কর হিংস্র পর্তুগীজ জলদস্যু। সেই চারশো বছর আগে পর্তুগীজরা নিজেদের এই ভারত মহাসাগর, আরব সাগর, বঙ্গোপসাগরের সম্রাট মনে করতো। কিন্তু সে যাই হোক—

হকিন্সের কপাল ভাল ছিল। সমুদ্রের সেই মালিকরা তাঁকে ধরতে পারল না। তিনি সুরাটে পৌছোলেন।

—কার জাহাজ?

—উইলিয়ম হকিন্সের।

—ইংরাজ?

—হ্যাঁ।

—সনদ দেখাও—

বন্দরের মালিককে কিন্তু সনদ দেখাতে পারলেন না। কোথায় পাবেন সে-সব। দিল্লীশ্বর শুধু যে মৌখিক অনুমতি দিয়েছেন।

স্থানীয় শাসকরা বললেন,—ও-সব মুখের কথাটথা মানি না। যদি কিছু টাকাকড়ি খবচ করতে পারো তা হলে ভেবে দেখতে পারি—

অসম্ভব। চিবকালেব নিয়মনিষ্ঠ ইংরাজ সন্তান মনটাকে শক্ত করল। ওদের ওপরওয়ালা যখন স্বীকৃতি দিয়েছে, তখন ওদের কাছে নতিস্বীকার করবো কেন? জাহাজেব নোঙর ফেললেন না। মুখ ঘুরিয়ে রওনা হলেন ব্যাণ্টনের দিকে। আবার—

আবার অকূল সমুদ্রে যাত্রা। দূরে, কুয়াশাময় বিশাল জলরাশির দিকে তাকিয়ে হকিন্সের মনে একটা—একটা ভাবনাই আবর্তিত হতে লাগল, Nothing can be done by bribe.---

(ক্রমশঃ)

॥ এজরা স্ট্রীটের নানাকালের কথাচিত্র ॥

উত্তরের ক্যানিং স্ট্রীট থেকে দক্ষিণের রাধাবাজারে এসেই পঞ্চত্ব লাভ করেছে এজরা স্ট্রীট। অতএব যেমন তা নাতিদীর্ঘ, তেমন প্রস্থেও তার দীনতার প্রাধান্যই লাভ করেছে অমরত্ব। এমন কোনো শ্রীও তার নেই—যা নিদর্শনের স্বপক্ষে পরিহার্য নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও, কিছু ক্ষুদে, অ-ক্ষুদে শিল্পপতি এবং কিছু বাণিজ্য-জীবীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কাছে সে বাঁধা। এ-সমস্ত বাণিজ্যজীবী এবং শিল্পপতির দ্বারা অতি-ব্যবহৃত বলেই যেন আজ তার যৌবনে নেমেছে ধূসর গোধূলি এবং তার অস্তিত্বেও প্রতিবিম্বিত পরিক্লান্তির ছায়া। তাই তার কোনো অংশে আজ সেই সুঠাম স্বাস্থ্যের সংকেতমাত্রও নেই—যা তার নাতিদীর্ঘ অঙ্গেও হয়তো এককালে ছিল। কিন্তু কী আশ্চর্য, অদম্য জরার কাছেই সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পিতা সত্ত্বেও, অসংখ্য বাণিজ্যজীবী কর্তৃক অতি-ব্যবহৃত হওয়া থেকে সে নিস্তার পায় নি কিছুমাত্র। বরং মাত্রা আরও বেড়েছে। তাই সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বিপুল হারে বিচিত্র পদসঞ্চারের যে-উৎপীড়ন সুরু হয় তার ক্ষীণ অঙ্গে—তা রাত্রির তৃতীয় অঙ্কেও যতিলাভ করে কদাচিৎ। কেবল ভিড় আর ভিড়। তার জরাতুরা ক্ষীণাঙ্গের প্রতিও লক্ষজনের ঘনীভূত লিপ্সা আজ ভয়ঙ্কর বললেও চলে।

আজ থেকে কয়েক শতক আগে, যখন চৌধুরীদের বিত্ত-বিকাশ চরম-স্তরে উপনীত, তখন সমগ্র এজরা স্ট্রীট এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলের অন্তর্ভুক্তি ছিল এক তৃণাঞ্চলের সঙ্গে। এই তৃণাঞ্চলেরই দক্ষিণ উপকণ্ঠে, অর্থাৎ বর্তমান এজরা স্ট্রীট এবং রাধাবাজারের সংগমস্থলেই সেকালে অবস্থিতি ছিল এক মহাবটের। আর সেই মহাবটেরই সমীপবর্তী ভূমিখণ্ডে বিশাল এক

● এজরা স্ট্রীটের অবিরাম ভিড়ের একটি দৃশ্য

পাকুড় বৃক্ষেরও সরব অবস্থিতি ছিল অনেককাল। চৌধুরীবাড়ির নারী-সমাজ একদিন এই পাকুড় বৃক্ষের সঙ্গেই মহাবটের বিয়ে দেন। বিয়ের দিন উৎসবের সমারোহে অপ্রাতুল্য ছিল না কিছুই। সেদিন ঢাক-ঢোলের সঙ্গে সানাই বেজেছিল আসন্ধ্যা-সকাল। চৌধুরীবাড়ি থেকে উল্লেখিত বৃক্ষ-দ্বয়ের সীমানা পর্যন্ত রাস্তার উভয় দিকেই ব্যবস্থা হয়েছিল আলোকসজ্জার।

শ্রীপদাতিক

গঙ্গা থেকে একশ' এক ঘড়া জল এনে সেদিন উভয় বৃক্ষকেই স্নান করানো হয় সযত্নে। তারপর লগ্নানুসারে, মহাবটের সঙ্গে পাকুড় বৃক্ষকে হলুদ-ছোপানো এক দীর্ঘ সুতোয় বেঁধে, তাদের পরস্পরকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করানোর কাজ সম্পন্ন করেন নারী-সমাজই। এই উপলক্ষে যে-ভোজন-সামগ্রীর আয়োজন হয়—তা তৃপ্তি সহকারে গ্রহণ করে একাধিক জনপদবাসী।

শোনা যায়: উক্ত বৃক্ষদ্বয়ের বিবাহ উপলক্ষে খরচ হয় প্রভূত অর্থ। এই বিরাট খরচ লক্ষ্য ক'রে হুগলীর কোনো এক ভূস্বামী তৎকালীন চৌধুরী-প্রধানকে প্রশ্ন করেন: এক বৃক্ষের সঙ্গে আরেক বৃক্ষের বিয়ের তামাসা ক'রে এত প্রচুর অর্থ অপচয় করার নাম উচ্ছৃঙ্খলতা নয় কি?

চৌধুরী-প্রধান নাকি এ-প্রশ্নের উত্তর সঙ্গে সঙ্গেই দেন। তিনি বলেন: অর্থ তো ব্যয় করার জন্যেই। এক বৃক্ষের সঙ্গে আরেক বৃক্ষের পরিণয়সূত্র উদ্ভট হলেও, তাকে কেন্দ্র ক'রে যে-নির্মল উৎসবের বিকাশ ঘটে—তা উপেক্ষার নয়। এমন উৎসবের মাধ্যমেই আমরা একাধিক জনপদবাসী, অর্থাৎ অজস্র নরনারায়ণের সান্নিধ্য-লাভে ধন্য হয়ে থাকি। তাদের স্বতঃস্ফূর্ত দুর্লভ আনন্দের দর্শন-লাভটাই উৎসবের মূল উদ্দেশ্য। বৃক্ষের সঙ্গে বৃক্ষের বিয়েটা উপলক্ষ মাত্র এবং এই উপলক্ষে যা খরচ হয়ে থাকে—তাকে আমরা মনে করি সদ্ব্যয়, অপচয় নয়।

দিনের পর দিন মিলিয়ে যায়, মাসের পর মাস পিছিয়ে এসে অতীত হয় এবং বৎসরের পর বৎসর অতিক্রান্তির ফলে যুগান্তরের প্রচণ্ড উদয় ঘটে চৌধুরী-বংশের ভাগ্যাকাশে। কুচক্রী ইংরেজদের প্রাদুর্ভাবের পরেই হঠাৎ একদিন এই সদাশয় চৌধুরী-বংশের উচ্ছেদ ঘটে লালদীঘি অঞ্চল থেকে। ফলে দিকে দিকে বিস্তার লাভ করে

ইংরেজদেরই আধিপত্য। সম্ভবত কলকাতার মতো শহর প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা জব চার্নকের হলেও, প্রধান উদ্‌গাতা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীই।

যাই হোক, ইংরেজ আমলের উন্মেষ-সগ্নেও বর্তমান এজরা স্ট্রীট এবং তৎ-সমীপবর্তী অঞ্চলের তদানীন্তন তৃণভূমির খানিকটা অস্তিত্ব বজায় ছিল কিছুদিন। তবে উল্লেখিত বৃক্ষ-দ্বয়ের কোনো স্থিতি তখন ছিল না। সেখানে তখন বসতি স্থাপন করেছিল কয়েক ঘর ডোম। তাই সে-অঞ্চলের নাম তখন ডোমতলা। ইংরেজরাও তখন নিজেদের প্রয়োজনেই এদিকে-ওদিকে গ'ড়ে তুলেছে অসংখ্য বসতবাটী, গীর্জা, রেস্তোরাঁ এবং নানাবিধ কার্যালয়। তা ছাড়া তাদেরই চিত্তবিনোদনের দাবি পূরণের পক্ষে লালদীঘির উত্তরে প্রতিষ্ঠা ঘটে একটি নাট্যশালার। এই নাট্যশালাতেই একদিন বেহালা-বাদকরূপে নিজেকে নিয়োগ করেছিলেন গেরাসীম স্তেপানভিচ লেবেদেভ। তিনি একজন রাশিয়ান। ইংরেজ-প্রতিষ্ঠিত সেই নাট্যশালায় তিনি শিল্পীরূপে নিযুক্ত থাকার কালেই ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হন গভীর-ভাবে। সম্ভবত সেদিক থেকে উদ্বুদ্ধ হয়েই তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির উন্নয়ন কামনা করেন আরও এবং একই উদ্দেশ্যে প্রথম বাংলা নাট্যশালার প্রবর্তন করেন বর্তমান এজরা স্ট্রীটের তদানীন্তন ডোমতলায়। কিন্তু এই নাট্যশালাকে সেদিন টিকে থাকতে দেয় নি পরশ্রীকাতর ইংরেজ-সমাজ। অজস্র দিনের নির্যতি নিষ্ঠা এবং অপরিমেয় অধ্যবসায়ের বিনিময়ে ডোমতলায় সর্বপ্রথম যে-বাংলা নাট্য-শালার প্রতিষ্ঠা করেন লেবেদেভ—তা কেবল ঈর্ষাবশতই সেদিন অগ্নি-সংযোগে ধ্বংস করেন ইংরেজ-সমাজ। তারা শুধু সেখানেই ক্ষান্ত হয় নি, কিছুদিন পর তারা লেবেদেভকেও গণ্য করে একজন বিদেশীয়রূপে এবং সেই অজুহাতেই তাঁকে ভারতবর্ষ থেকে বহিষ্কার করে নিঃস্ব অবস্থায়। ইংরেজ তখন একাধারে এ-দেশের শোষক এবং দুঃশাসক। তাই পশুশক্তি প্রবল প্রতাপেই তখন তারা বিদেশী হয়েও এ-দেশের প্রধান পুরুষ। আর লেবেদেভ এ-দেশীয়দের অন্তরঙ্গ সুহৃদ এবং এ-দেশের সনাতন সংস্কৃতির প্রতি গভীর আস্থাশীল হয়েও সেদিন ইংরেজের কাছে তিনি বিদেশীরূপে প্রতিপন্ন। কারণ তিনি ইংরেজ নন, রাশিয়ান।

১৭৮৫ খৃস্টাব্দে লেবেদেভ প্রথমে আসেন দক্ষিণ ভারতে এবং সেখানেই একজন কৃতী বেহালাবাদকরূপে সুপরিচয়ের অধিকারী হন ইংরেজ-মহলে। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁর যে-গভীর অনুরাগ—তারও সূত্রপাত সম্ভবত দক্ষিণেই। একজন দক্ষিণ ভারতীয় পণ্ডিতের সংস্পর্শে এসেই তিনি বৈদিক এবং সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন সুরু করেন। কিন্তু সেখানে বেশিদিন তার চর্চা করা সম্ভব হয় নি। কারণ কিছুদিন পরেই তিনি দক্ষিণ ভারত ছেড়ে কলকাতায় আসেন এবং একজন যন্ত্র-শিল্পীরূপে যোগদান করেন ইংরেজ-প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালায়।

সম্ভবত ইংরেজ-নাট্যশালাতেই তাঁর অনবদ্য বেহালা শুনে বিমোহিতা হন একজন ইংরেজ মহিলা—যিনি বৈধব্য বরণ করতে বাধ্য হন যৌবন-কালেই। তিনি লেবেদেভের সঙ্গে স্বেচ্ছায় এসে আলাপ করেন এবং সম্পূর্ণ অবারিত করেই লেবেদেভের সামনে তুলে ধরেন তাঁর প্রণয়-প্রয়াসী অন্তর। ফলে উভয়ের মধ্যে চিত্ত-বিনিময়ের বিধি-নিষেধ অপসারিত হয় দেখতে দেখতে। লেবেদেভ এই মহিলার হৃদয়-বেদীতে বরণীয় হয়েই যেন অনিকেত জীবনে পেলেন অমৃতের স্বাদ। সুতরাং তিনি ভাড়াটে বাসার পাট চুকিয়ে এবার তাঁর প্রেমিকার গৃহেই উঠে এলেন স্থায়িভাবে। প্রেমিকা তাঁকে বরণ করলেন সত্যই। তিনি তাঁর জীবন-যৌবন নিঃশেষে উৎসর্গ করার পরেও লেবেদেভের হাতে তুলে দেন কিছু অর্থ। পরে সেই অর্থের উপর নির্ভর করেই, লেবেদেভ ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের অনুশীলন মানসে যাতায়াত সুরু করেন কলকাতা থেকে লাক্ষ্ণৌ। এভাবেই কিছুকাল যাতায়াত করার পর

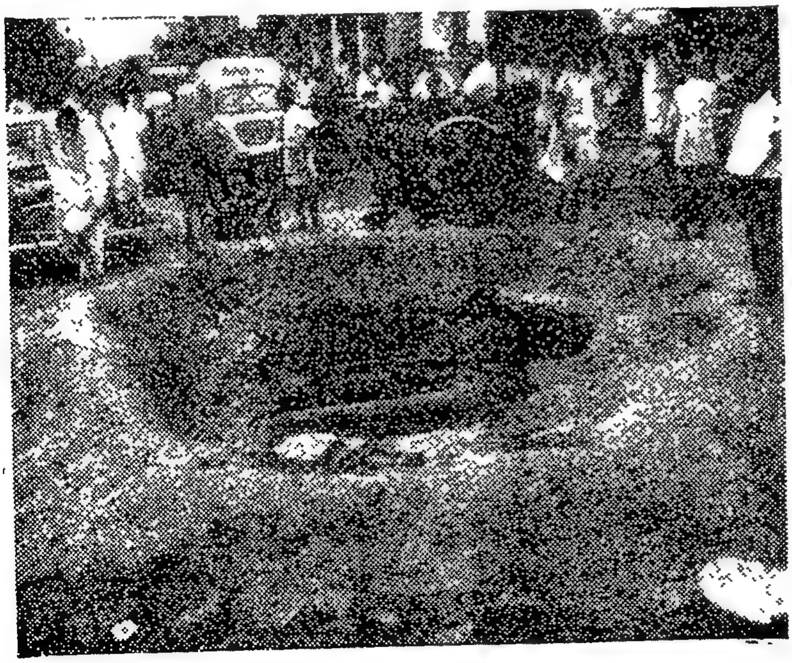

● এজরা স্ট্রীট ও ক্যানিং স্ট্রীটের সংগম স্থলের বিপর্যস্ত দৃশ্য।

তিনি ভারতীয় মার্গসংগীতের ধারা আয়ত্ত করেন যথাসম্ভব। তারপর তদানীন্তন কলকাতাব পণ্ডিত গোলকনাথ দাশ এবং আরও জন-কয়েক প্রবীণ পণ্ডিতের সংস্পর্শে এসে আবার অনুশীলন সুরু কবেন সংস্কৃত ভাষার। দেখতে দেখতে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষাও তিনি আয়ত্ত ক'রে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যে-গভীর সংযোগ তিনি স্থাপন কবেন—তা তখন নিঃসন্দেহেই অভাবনীয়।

তারপর ইংরেজ-নাট্যশালাব চাকুরী থেকেও তিনি সবে আসেন এবং ভারতীয় সংস্কৃতিব প্রতি ভারতীয়দেবই আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে একটি বাংলা রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠাব পবিকল্পনা গ্রহণ করেন তিনি। তদানীন্তন বাঙালী যুবক-যুবতীদের মধ্য থেকেই তিনি আহরণ করেন উপযুক্ত নাট্য-শিল্পী। তন্মধ্যে লেবেদেভের সুশিক্ষায় নায়িকারূপে নির্বাচিতা হয় চন্দ্রমুখী নামে সেকালের একটি অভিজাত যুবতী এবং নায়করূপে মহড়া-লগ্নেই অভূতপূর্ব যোগ্যতার পরিচয় দান করে দেবকীনন্দন ভট্টাচার্য নামে একটি যুবক। এভাবেই একটি নাট্য-সংস্থা গঠন করার পর তিনি পণ্ডিত গোলকনাথ দাশের সাহায্যেই In Disguise নামে একটি ইংরেজী নাটক অনুবাদ করেন বাংলায়। তারপর জন-কয়েক বাঙালী বিত্তশালীর কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ ক'রে অচিরেই একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন বর্তমান এজরা স্ট্রীটের তৎকালীন ডোমতলায়। এই নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার পরেই তিনি বাঙালী শিল্পীদের দ্বারাই In Disguise-এর বাংলা সংস্করণ মঞ্চস্থ করেন মহাসমারোহে। যেদিন মঞ্চস্থ করেন, সেদিন সারা কলকাতার অভিজাত বাঙালী-সমাজের সানুরাগ সমাগম ঘটে নাট্যশালায়। নাচ-গান প্রধান নাটকটি অতি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হওয়ায়, সেদিন সহস্রাধিক দর্শকের অন্তরে যে-উত্তেজনার সঞ্চার হয়—অনেকের মতে তা নাকি বিরল-দৃষ্টান্ত একালেও।

● এজরা স্ট্রীট সংলগ্ন রাবাবাজারের দৃশ্য

কিন্তু লেবেদেভের এই সাফল্যকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারলো না ইংরেজ-সমাজ। হয়তো ভারতীয় সংস্কৃতির নবজাগরণ ঘটলে, এ-দেশে ইউরোপীয় সংস্কৃতির অপমৃত্যু ঘটতে পারে ভেবেই সমগ্র ইংরেজ-সমাজ সেদিন বিরাগভাজন হয়ে ওঠে লেবেদেভের। লেবেদেভ যাতে প্রথম রজনীর পর আর দ্বিতীয় রজনীতে কোনো নাটক মঞ্চস্থ করার সুযোগ না পায়—ইংরেজ-সমাজ তার ব্যবস্থা করে যথাযথ। অর্থাৎ অনতিবিলম্বেই তাবা নানা প্রলোভনের মাধ্যমে নিজেদের দলভুক্ত ক'রে নেয় লেবেদেভের সেই পাওনাদারদের—যাদের কাছ থেকে নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনেই ঋণ গ্রহণ করেছিলেন লেবেদেভ। কুচক্রী ইংরেজ-সমাজ এই নির্বোধ পাওনাদারদের দিয়েই রাতারাতি তাঁকে অভিযুক্ত করে দেনার দায়ে। সুতরাং যতদিন তিনি ঋণ পরিশোধের পাকাপাকি ব্যবস্থা না করবেন, ততদিন বাংলা নাট্যশালায় আর কোনো নাটক মঞ্চস্থ করার অধিকার তাঁর থাকবে না—ইংরেজদের প্ররোচনায় এমন স্বীকৃতিই সেদিন লেবেদেভের কাছ থেকে আদায় করে পাওনাদারের দল।

লেবেদেভ কিন্তু অত সহজেই দমবার পাত্র নন। তিনি পুরোনো ঋণ পরিশোধের দৃঢ় অভিপ্রায়ে অন্য জন-কয়েক বিত্তবানের কাছ থেকে গ্রহণ করেন নতুন ঋণ এবং এই উপলক্ষে তাঁর প্রণয়িনীও দান করেন আরও কিছু অর্থ। তারপর এভাবেই তিনি ইংরেজ-দলভুক্ত পাওনাদারদের ঋণ পরিশোধ ক'রে পণ্ডিত গোলকনাথ দাশকে দিয়েই আবার বাংলার অনুবাদ করান Love is the Best Medicine—নামে অন্য একখানি ইংরেজী নাটক। এই নাটকও তিনি বাঙালী শিল্পীদের দ্বারাই বর্তমান এজরা স্ট্রীটের তৎকালীন রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ করেন আরও অনেক সাফল্যের সঙ্গে। বাঙালী-সমাজে অসাধারণ সাড়া জাগে এবারেও। এবাব অধিকাংশ বাঙালী বিত্তবান ডোমতলাব এই বাংলা নাট্যশালাটির আরও উন্নতির উদ্দেশ্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবেন ব'লে প্রতিশ্রুতিও দেন এবং

...দের এই প্রতিশ্রুতির পরিচ্ছন্ন মুকুরেই যেন অন্য এক উজ্জ্বল দিগন্তের প্রতিফলন লক্ষ্য করেন লেবেদেভ।

কিন্তু সবই বৃথা। Love is the Best Medicine-এর বাংলা সংস্করণ মঞ্চস্থ হবার পরেই ঈর্ষান্বিত ইংরেজ-সমাজ হঠাৎ অগ্নি-সংযোগে ধ্বংস করে লেবেদেভের বহু সাধনার বাংলা নাট্যশালা। তারপর তাঁর প্রণয়িনীকেও তারা নানা প্ররোচনায় নিজেদের গোষ্ঠীভুক্ত করে এবং তাঁকে দিয়েই লেবেদেভের বিরুদ্ধে তারা প্রচার করায় বহুবিধ মিথ্যা অপবাদ। প্রণয়িনী তাঁকে গৃহ থেকেও বিতাড়িত করেন অতি নির্মম তাচ্ছিল্যে। যে-প্রণয়িনী এতকাল ছিল তাঁর অশেষ প্রেরণার উৎস, হঠাৎ তাঁর সঙ্গেই এমন নিষ্ঠুর বিরহের স্বাক্ষিত রচিত হওয়ায় লেবেদেভের অফুরন্ত উদ্যমে খানিকটা ভাঁটার টান পড়ে সাময়িকভাবে।

অতএব, তারপর কিছুকাল তিনি কোনো এক বাঙালী পরিবারের নিভৃত পর্ণকুটিরে বসেই অধ্যয়ন করেন রামায়ণ, মহাভারত এবং আরও অনেক সংস্কৃতিমূলক ভারতীয় গ্রন্থ। তা ছাড়া দু-একটি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন করেন তিনি নিজেও। সম্ভবত এভাবেই মনের ভারসাম্য কিছুকাল রক্ষা করার পর তিনি কর্মোদ্দেশে উজ্জীবন লাভ করেন আবার। আবার তিনি অভিজাত বাঙালী-সমাজের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হয়ে বাংলা নাট্যশালা পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা পেশ করেন। এ-পরিকল্পনা সাদরে গ্রহণ ক'রে এগিয়ে আসেন অনেকে এবং বর্তমান এজরা স্ট্রীটের তদানীন্তন ডোমতলাতেই তার বাস্তব রূপায়ণের প্রাথমিক কার্যক্রমও সুরু হয় কিছু কিছু। কিন্তু ইংরেজ-সমাজ এবারও বাদ সাধে। তারা এবার লেবেদেভকে একজন বহিরাগত শত্রুরূপে চিহ্নিত করে এবং এ-দেশ থেকে তাঁকে বিতাড়িত করার পক্ষে আইনবলে গ্রহণ করে এক অচল সিদ্ধান্ত। অতএব এই সিদ্ধান্ত অনুসারে দু-একদিন পরে ইংরেজদের এক ইংলণ্ডগামী জাহাজে উঠে বাধ্য হয়েই সমুদ্রে পাড়ি জমান নিঃস্ব লেবেদেভ।

লণ্ডন হয়ে লেবেদেভ ফিরে যান তাঁর স্বদেশ রাশিয়ায়। তারপর রাশিয়াতে বসেই তিনি ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে বৃদ্ধ বয়সে রচনা করেন একাধিক গ্রন্থ—যা আজও বিশ্ববাসীর কাছে অমূল্য সম্পদ বলেই গৃহীত।

ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি লেবেদেভের অনুরক্তির গভীরতা ছিল অন্তহীন। তাই সেদিন তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল সর্বপ্রথম বাংলা নাট্যশালার প্রবর্তন করা কলকাতায়। তিনি ইউরোপীয় ভাষায় এ-দেশীয় সনাতন-সংস্কৃতিমূলক এক গ্রন্থের অনুবাদক যেমন প্রথম, তেমনই এ-দেশীয় ভাষায় ধর্ম-নিরপেক্ষ এবং হাস্যরসাত্মক ইউরোপীয় সাহিত্যেরও প্রথম অনুবাদক তিনিই। গভীর গবেষণার মাধ্যমেই তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে আপন আত্মার সংযোগ স্থাপন করেন নিবিড়ভাবে। সেকালে ইংলণ্ডের সম্রাট কর্তৃক প্রেরিত যে-সমস্ত ইংরেজ বা ফরাসী রাজনীতিবিদ এবং সংস্কৃতিবিদ ভারতীয় সংস্কৃতিচর্চায় আত্মনিবেশ করেছিলেন কিছুকাল, তাঁদের সঙ্গে লেবেদেভের প্রকৃতিগত পার্থক্য অনেক। লেবেদেভ ভারতীয় দৃষ্টিতেই দর্শন করেছেন ভারতকে এবং ভারতীয় মন দিয়েই গবেষণা করেছেন ভারতীয় সংস্কৃতি। তাই সে-যুগের সমগ্র ভারতের বিশ্বরূপ দর্শন বিদেশীদের মধ্যে একমাত্র সম্ভব হয়েছিল তাঁর পক্ষেই। লেবেদেভ সম্পর্কে P. M. Kemp তাঁর Bharat-Rus গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন:

'Lebedev founded the first Bengali Theatre and, at the same time the first European theatre using European techniques for an Indian audience. He was also the first translator of secular not to say humorous European literature and first European translator of Bengali classic. Through these activities he participated in indigenous cultural life in manner quite different from partly assimilated foreigners engaged in commercial, political and military affairs or those attached to courts, like a number of contemporary Frenchmen in Mysore and those employed by the king. Moreover he had entered into the cultural life of a Hindu circle and saw India very much from their point of view.'

লেবেদেভ প্রতিষ্ঠিত প্রথম বাংলা নাট্যশালাটি ভস্মীভূত হওয়ার কিছুকাল পরেই ইংরেজ বসতির বিস্তার লাভ ঘটে বর্তমান এজরা স্ট্রীটের তদানীন্তন ডোমতলা পর্যন্ত। সম্ভবত ইংরেজ বাসিন্দাদের প্রয়োজনেই এজরা স্ট্রীটের পত্তন ঘটে তখন। তারপর উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকেই ক্ষুদে, অ-ক্ষুদে শিল্পপতি এবং বাণিজ্য-জীবীদের সদম্ভ পদার্পণ সুরু হয় এই নাতিদীর্ঘ সরণীর উভয় বাহুতে। কালে কালে তাদেরই সুপ্রতিষ্ঠা ঘটায় একদিকে যেমন পত্তন ঘটে রাধাবাজারের, অন্যদিকে তেমনই অসংখ্য গগনচুম্বী অট্টালিকার বিপুল ভারে দুর্বহতা লাভ করে ক্ষীণাঙ্গী এজরা স্ট্রীট। আজ বিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নকাল অতিক্রান্তির পর এজরা স্ট্রীটের সাবিক স্বরূপের খর্বতা আরও প্রকট। আজ সে সম্পূর্ণই হতশ্রী। তার জরা-জর্জর অঙ্গে হাজার প্রসাধনেও কোনো রঙ ফেরে না আর। তবু তার উপরেই আজও মত্ত বাণিজ্য-জীবীদের পীড়ন চলছে দিবারাত্রি। কে জানে, আগামী আরও এক শতকেও তাদের এই চিরক্ষুধার অত্যাচার থেকে সে মুক্তি পাবে কি না।

নিজের ছবিটা ভাল করে দেখল বিজন। অনেকক্ষণ ধরে। অনেকবার আইডেনটিটি কার্ডের ছবিটা উল্টে-পাল্টে দেখল। বাঁ হাতের আঙুল-গুলো দিয়ে মাথার চুল স্পর্শ করল, ঘাড়ের পাশটাও রগড়াল কয়েকবার। অনেক ছোট মনে হল যেন মাথার চুলগুলো। একটা গভীর নিশ্বাস বেরিয়ে এল।

—এই যে, তুই এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছিস। আমি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তোকে খুঁজে মরছি।

বিজনের মনে আনন্দের জোয়ার এল। পাথর সরে গেলে উঁচু পাহাড় থেকে ঝর্ণার জল যেমন বেরিয়ে আসে। দাদাকে জড়িয়ে ধরতে গিয়েও পাবল না।

(অনেক দিন অদেখার পর দাদার সঙ্গে প্রথম দেখা হলে বিজন প্রণাম করত, না জড়িয়ে ধরত—মনে করতে পারল না।)

শুধু বলল—দাদা। তুমি এসেছ!

—এসেছি অনেকক্ষণ বুঝলি। সারা সকালটায় তোদের অফিসের কাজকর্মগুলো চুকিয়ে দিতে হল। সুপারিনটেণ্ডেণ্ট একগাদা ওষুধ আর উপদেশ দিলেন। বেশ লোক রে বিজন, নতুন এসেছে, না?

বিজন দেখল দাদা যেন অনেক বুড়ো হয়ে গেছে। কানের ওপরে মাথার বেশ কয়েকটা চুল পেকেছে। মাফলারটা অর্ধেক কোটের মধ্যে, বাকি অংশ বেরিয়ে আছে। দাদার হাতে একটা মিহিদানার ঝুড়ি। শালপাতাগুলো এলো-মেলো হয়ে পড়েছে। অনেকক্ষণ ধরে ঝুলিয়ে এনেছে বোধ হয়। সুতোগুলো আলগা হয়ে পড়েছে।

—অনুপমা আসে নি কেন দাদা?

—আমিই ইচ্ছে করে আনি নি। এতটা রাস্তা, বল? আমরা পুরুষ মানুষই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি। এতটা আনি কি ওরা করতে পারে?

—মা কেমন আছে?

—ভাল আছে। তবে চোখটা বোধ হয় অপারেশন করাতে হবে। এমন কিছু নয়। ডাক্তার বলেছে মাইনর অপারেশন। ডাক্তারটি কে, চিনলি ত'?

বিজন দেখছিল দাদার ধুতিটা বেজায় নোংরা হয়ে গেছে। কিছুতেই যেন দাদার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে পারছে না। মুখটা উঁচু করে দাদার দিকে তাকাল একবার।

—আরে আমাদের রণজিৎ—ছোটমামার বন্ধু।

বিজন রণজিৎকে চিনতে পারল না।

—ভাল কথা। একদম ভুলে গেছি। মা তোর জন্যে মিহিদানা দিয়েছে, ঐ কলটায় হাত ধুয়ে খেয়ে নে।

অন্যমৃত্যু

অমলেন্দ্র নাথ ঘটক

—কেন?

—বা (! তুই কত ভালবাসিস মনে নেই। লিলির বিয়েতে ছোটমামার সঙ্গে বাজী ধরে কত খেয়েছিলি একাই মনে নেই। পরে অবিশ্যি ছোটমামাকে ডাক্তার ডাকতে হয়েছিল। দাদা আপন মনে হেসে উঠল—নিজেই সামলে নিল আবার। একটা রিক্সা ধরে নি কি বলিস?

—না।

—তবে ট্যাক্সিতে যাবি, তাই চল।

—বাসে যাব।

—বাসে যে বেজায় ভিড় হবে। তোর কষ্ট হবে না ত'। বেশ তাই চল।

সমস্ত পৃথিবীকে বিজনের নতুন মনে হল। যেন একটা বিরাট ভূমিকম্পে ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়ে আবার নতুন করে জন্মেছে এই পৃথিবীটা। বিজনের মনে হল সমস্ত পৃথিবীর লোককে একসঙ্গে জড়িয়ে ধরে। প্রাণপণে। এত আলো, এত রোদ, এত বড় আকাশ বিজন যেন কখনও দেখে নি। আকাশ পরিচ্ছন্ন। অনেকটা আকাশ দেখে নিল বিজন একসঙ্গে। সূর্যের আলো চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছিল; যেন কোন অন্ধকার গুহা থেকে এইমাত্র বেরিয়ে এল বিজন। আলোর দিকে ভাল করে তাকাতে পারছিল না—তবু সৃষ্টির প্রথম মানবের মত সমস্ত আলো প্রাণে-মনে উপভোগ করল।

(কিন্তু দাদাকে তা জানাতে পারল না।)

আশে-পাশে কেয়ারী করা মরশুমী ফুল। গাছগুলোর ওপর শীতের রোদ এসে পড়েছে। বিজনের এ-সব দেখতে খুব ভাল লাগছিল। বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে হাঁটতে লাগল বিজন।

—এখন স্টেশনে যাবে ত'?

—ভাবছি একটা হোটেলে গিয়ে উঠলে হোত না? পাড়ি ত' সেই রাত্তিরে। ভাল কথা, মা বলেছিল—লিলির এক ননদের বিয়ে হয়েছে ওখানে। লিলিও বলেছিল। ভদ্রলোক নাকি যাবার জন্যে বিশেষ করে বলেছিলেন।

—এই অসময়ে।

—তুই ক্ষেপেছিস নাকি? এখন এই দুপুরে গিয়ে একটা লোককে মিছিমিছি বিরক্ত করার কোন মানে হয়? লিলি অবিশ্যি বলেছিল ছোড়দা যদি যেতে চায়, তবে নিয়ে যেও।

বিজন কোন কথা বলল না। একমনে পথ হেঁটে চলল। বিজন কিছুতেই দাদার সঙ্গে সমতা রক্ষা করে হাঁটতে পারছিল না। দাদা বার-বারই বিজনকে পিছে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছিল। দাদা নিজে থেকেই গতিটা কমিয়ে দিয়ে বিজনের সঙ্গে সমতা রক্ষা করছিল।

—তা হলে স্টেশনেই চল, না হয় ওখানেই খেয়ে নেব।

—তাই চল।

দাদা বুঝল আবদ্ধ জায়গা বিজনের ভাল লাগছে না, লোকজনই ওর ভাল লাগছে।

চারদিকটা ভাল করে দেখছিল বিজন। বেশ মন দিয়ে। আকাশের সমস্ত রোদ যেন অন্ধকারে চাপা পড়ে ছিল। পাথর চাপা। পাথরটা যেন আলগা হয়ে গেছে। বিজন স্ট্যাণ্ডের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

—বাসের ত' দেরি আছে, মিহিদানা একটু খেলি না বিজন?

বিজন একমনে হাঁটতে লাগল, নিঃশব্দে।

—খুশি কত বড় হয়েছে দাদা?

—ক্লাশ সেভেনে পড়ে। দিন দিন যা ধিঙ্গি হয়ে উঠছে; সামনের বছর শাড়ি কিনে দিতে হবে।

(বিজন মনে মনে হিসেব করল তিন বছর অতীতের কথা। খুশি তখন ক্লাশ ফাইভে পড়ত।)

—আমার কথা জিজ্ঞেস করে?

—করে মানে? ওর বড়মাকে ত' মাঝে মাঝে অস্থির করে তোলে। আমার কাছেও মাঝে মাঝে বায়না ধরে।

—মানে, আমি কোথায় আছি?

—তুই বাইরে চাকরি করছিস এই জানে। তুই বরং একটু মিহিদানা খেয়েই নে বিজন, স্টেশনে পৌঁছুতে অনেক বেলা হয়ে যাবে।

বিজন ঘুরে ঘুরে সমস্ত গাছপালা, লোকজন দেখছিল। অবিরাম জনস্রোত। প্রয়োজনে-নিষ্প্রয়োজনে হেঁটে চলেছে। সূর্য মাথার ওপর অনেকটা উঠে এসেছে। গাছের ডালে সবুজ পাতার ফাঁকে কতকগুলো পাখি কিচির-মিচির করছিল। বেশ আনন্দ লাগল ওদের দেখে। মুক্তির স্বাদ পেল বিজন।

স্টেশনে দাদা বলল—বেশ ভালই হল। অনেক আগে আসা গেছে। মনে-করে যদি রিজার্ভেসনটা করে নেয়া যায়।

—কোন ক্লাশে যাবে?

—কেন, সেকেণ্ড ক্লাশে—বাবা ত' তাই বলে দিয়েছেন।

—থার্ড ক্লাশে চল, রিজার্ভ করতে হবে না।

—কিন্তু বুঝতে পারছিস না, বেজায় ভিড় হবে। একটা রাত ঠায় দাঁড়িয়ে যেতে হবে। বসবার জায়গা পাবি না। দেখছিস না এখন থেকেই লোকজন আসতে সুরু করে দিয়েছে।

—লোকজন বেশ ভাল লাগছে।

—এত লোকজন যায় কোথায় বলতে পারিস? একটা গাড়ি ফাঁকা যায় না। কাজে-অকাজে গাড়ি চেপে বসলেই হল। অথচ যাদের, মানে—আমাদের সত্যিকার গাড়ি চাপা দরকার, তারা একটু বসবার জায়গা পর্যন্ত পায় না।

মাল ওজন করাবার যন্ত্রটার লোহার পাটাতনের ওপর বসল বিজন। দাদা কাছে একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসল।

—আজকাল রেলওয়ে ক্যাটারিং-গুলোতে খাওয়া-দাওয়া বেজায় খারাপ হয়ে গেছে। শুধু মাংসের ঝোল-ভাত, তাই পাঁচসিকে চায়।

দাদাকে অবসন্ন দেখাচ্ছিল। কাল সারারাত জেগে এসেছে। আজও

বোধ হয় জাগতে হবে। বিজনের মনে হল দাদার যেন ঘুম পাচ্ছে।

—একটু ঘুমিয়ে নিবি না বিজন, সারারাত জাগতে হবে। আয় আমার পাশে এসে বস। অনেক জায়গা আছে।

—যাই —বলল বটে, কিন্তু উঠে গেল না বিজন।

—দেখছিস বিজন, স্টেশনটা কত বড় হয়ে গেছে। এখন এটা একটা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল শহর হয়ে গেল। স্বাস্থ্যটা নষ্ট হয়ে যাবে। 'হেলথ-রেসোর্ট' আর রইল না।

(বিজন অনেক ভেবেও তিন বছর আগের কথা মনে করতে পারল না।)

আস্তে আস্তে সূর্যের তেজটা কমে আসছিল। বিজন দেখল, দিনটার ওপর একটা বিষণ্ণ ছায়া নেমে আসছে। দাদার মত ক্লান্তি নিয়ে দিনটার চোখ যেন ছোট হয়ে আসছে। দূরে রেলের 'হলিডে হোম'-এ কয়েকটা ছেলেমেয়ে খেলা করছিল। বিজনের দেখতে বেশ ভাল লাগছিল। ওদের মধ্যে দশ-বারো বছরের একটা মেয়ে ছিল। বিজন অনেক চেষ্টা করেও খুশির সঙ্গে মেয়েটার কোন মিলই খুঁজে পেল না।

একটা মালগাড়ির কামরা লাইনের ওপর একাকী দাঁড়িয়ে ছিল। কামরার দরজাটা খোলা—বিজন দূর থেকে গাড়িটার ভেতরের জমাট কাল অন্ধকার দেখতে পেল। কামরাটাকে দেখে কষ্ট হল বিজনের। সমস্ত সঙ্গী নিয়ে ইঞ্জিনটা চলে গেছে—সেই কামরাটাই শুধু দাঁড়িয়ে আছে। সাথীহারা।

অফিসের কথা মনে হল বিজনের। পাশের টেবিলে কাজ করত মিত্তির। এতদিনে বোধ হয় একটা লিফ্ট হয়ে গেছে। মুখার্জীদারও হয়ত প্রমোশন হয়েছে। মুখার্জীদাকে বারবার মনে পড়ে বিজনের। বেলেঘাটা থেকে আসত। সুন্দর হাস্যময় মুখ। চাকরির প্রথমদিন থেকেই লোকটা বিজনের মনে অদ্ভুত দাগ কেটেছিল। বিজনের চাইতে বয়স অনেক বেশিই ছিল মুখার্জীদার। প্রথমদিন আলাপের পর বিজনকে একটা সিগারেট দিয়েছিল খেতে। বিজন সিগারেট খেত, অভ্যেস ছিল না। ইতস্তত করছিল, সংকোচও লাগছিল। মুখার্জীদা সিগারেট বাড়িয়ে বলেছিল—নিন মশাই, আপনারা হলেন সরকারের কোষাধ্যক্ষ। টাকা-পয়সা নিয়ে নাড়াচাড়া করবেন সবসময়। একটু-আধটু সিগারেট, বিড়ি না টানলে হিসেব রাখবেন কি করে?

বিজন সিগারেটটা পকেটে রেখে দিল।

—আবার পকেটে ঢোকালেন কেন—নিন টানুন, লজ্জা কি, সার্ভিস ইজ এ মাইটি লেভেলার।

মাথাটা কেমন যেন টনটন করে উঠল। অফিসের কথা মনোমত করে মনে করতে ভাল লাগল না। একটা অস্বস্তি লাগল।

'হলিডে হোমে'র ছেলেমেয়েগুলো খেলতে খেলতে রেললাইনের ওপর চলে এসেছে। এখুনি হয়ত একটা গাড়ি এসে পড়বে। ভয়ানক শিরশির করে উঠল শরীরটা। একবার মনে হল নিজে গিয়ে ছেলেমেয়েগুলোকে সরিয়ে দিয়ে আসে। ছেলেমেয়েগুলো নিজে থেকেই সরে পড়ল। বিজন দেখল কোথা থেকে একটা ইঞ্জিন শব্দ করতে করতে এসে মালগাড়ির কামরাটাকে ধাক্কা মারল, অন্ধকার-বোঝাই কামরাটাকে জুড়ে নিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চলে গেল। বিজন শক্তি পেল।

অবসন্ন দুপুরটার চোখ অনেক ছোট হয়ে গেছে। এখন বিকেল। অনেক দিন পর বিকেল দেখল বিজন। এমনি সময় তাদের বিকেলের টিফিনের ঘণ্টা পড়ত। সূর্য ক্রমে নীচে নেমে যাচ্ছে। ডিমের খোলার মত নীলাভ আকাশটা শেষবারের মত দিনটাকে দেখে নিচ্ছে।

অনুপমার কথা ভাবতে লাগল বিজন। শিকদার বাগান লেনের বাড়িটার কালকে এ-সময়ে অন্য রকম চেহারা হবে। এ-সময়ে হয়ত সে খাটে শুয়ে থাকবে। অনুপমা হয়ত প্রথমে

ভারতের শ্রেষ্ঠ
বেঙ্গল কেমিক্যালের
স্বচ্ছ
গ্লিসারিন সাবান
এই সাবান আপনার কোমল গাত্রত্বককে শীত ও গ্রীষ্মের রুক্ষতা থেকে রক্ষা করে। সর্ব্ব ঋতুতে ব্যবহারোপযোগী সাবান।

টিনের বাক্সে পাওয়া যায়
কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

কাছে আসতে সংকোচ বোধ করবে। দীর্ঘ অদেখার লজ্জা-জড়ানো সংকোচ। চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে আড়চোখে একবার সব দেখে নেবে। হয়ত অনুপমা ভয় পাবে তার কাছে আসতে। বাঁ হাতের আঙুলগুলো দিয়ে চুলগুলো হাতড়ে দেখল বিজন। অনেক ছোট, সকালের চেয়েও অমসৃণ মনে হল। অনুপমা হয়ত ভয়ই পাবে। খুশিকে হয়ত শিখিয়ে দেবে—বাবার কাছে যাস নে, বাবার অসুখ করেছিল।

নিজের শুকনো, কাল হাত-পা দেখে বিজনের কেমন যেন লজ্জা লাগল। হাত-পায়ের শিরাগুলো, যেন কেমন অস্বাভাবিকভাবে বেরিয়ে আছে। অনেক চেষ্টা করেও অনুপমার মুখটাকে ভাল করে মনে করতে পারল না বিজন। খুশিকেও না। ভয়ানক অস্বস্তি লাগল বিজনের। নিজেকে দোষী মনে হল।

বাবার বন্ধু মতিলালবাবু এ-সময়ে এসে হাজির হবেন। বিজনের ঘরে এসে সোজা ঢুকবেন—তুমি ভাল হয়ে ফিরে এসেছ বাবা, এ ভগবানের আশীর্বাদ। সংসারটা রক্ষা পেল। এ ক'দিন বিশ্রাম নাও। মাথার খাটুনি একদম করবে না।

বিজন যেন শুনতে পেল—পাশের ঘরে বৌদি দাদাকে বলছে—বাড়িরও ত' একটা বদনাম। তোমারও ত' নমুকে বিয়ে দিতে হবে। ঠাকুরপো না হয় খুশি আর অনুকে নিয়ে বাড়ি ভাড়া করে থাকুক। নমুর ত' কোন বুদ্ধি-সুদ্ধি নেই, খুশির সংগে গিয়ে হয়ত ঠাকুরপোর বিছানায় বসবে। বেদানার কুঁচিও দুটো মুখে দেবে। তুমি না হয় আমাকে শালিমারে ছোড়দার কাছে পাঠিয়ে দাও।

বিজন চমকে উঠল। বৌদির মুখটা পরিষ্কার দেখতে পেল চোখের সামনে। পাড়ার লোকগুলোও বিজনকে দেখে ফিসফাস করবে। ওরা কি বলাবলি করবে বিজন তা জানে।

পানের দোকানের লোকটাও বলবে—এখন কেমন আছেন দাদাবাবু। এই দোকান থেকে বিজন অফিস যাবার আগে পান কিনে খেত। বিজনের সামনে আসতে সবাই সংকোচ বোধ করবে।

বিজনের মনে হল শিকদার বাগান লেনের বাড়িটায় একটা চাপা থমথমে ভাব সর্বক্ষণ বিরাজ করবে। সকলেই যেন একটা লোকের জন্য ইসারায় কাজ সারতে চাইছে।

—এ কি রে। তুই দেখি এখনও চুপচাপ বসে আছিস। নে শীগ্‌গির রেডি হয়ে নে। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—খেয়ালই হয় নি সন্ধ্যে হয়ে গেছে। গরম জামা-কাপড়গুলো ভাল করে পরে নে। চাদরটা কানের পাশ দিয়ে জড়িয়ে নে। ঠাণ্ডা লাগাস নে। গাড়িতে কিন্তু বেজায় ঠাণ্ডা লাগবে।

প্ল্যাটফরমে লোকের আনাগোনা সুরু হয়েছে। দূরে 'হলিডে হোমে'র দস্যি ছেলেমেয়েগুলো এতক্ষণ হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে। ট্রেন আসবার ঘণ্টা দিল।

ঘণ্টার শব্দে যেন চমকে উঠল বিজন। আশ্চর্য মিল রয়েছে যেন পৃথিবীর সবগুলো সংকেতধ্বনির মধ্যে। অচিরাগত অতীতের কথা মনে পড়ল বিজনের। বিজন যেন স্পষ্ট শুনতে পেল আগ্নেয়গিরির ভেতর কুণ্ডলী পাকানো ফুটন্ত লাভার মত একদল অসামাজিক লোক; অন্ধকার মৃত্যুগুহার আবরণ ভেদ করে আলোর দিকে ছুটে আসবার জন্যে প্রাণপণে চীৎকার করছে। বীভৎস সে আর্তনাদ।

বিজন উঠে পড়ল। প্ল্যাটফরমের একেবারে শেষপ্রান্তে লোহার রেলিঙের কাছে দাঁড়িয়ে আকাশটা দেখে নিল। বিজনের মনে হল, এখানে অনেক বেশি আকাশ। উন্মুক্ত। উদার। সারি সারি নক্ষত্রের দীপালিকা। গ্রহ-নক্ষত্র, ছায়াপথ। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল সেই উদার আকাশের দিকে। বিজনের এখন আর অতটা একাকী, নিঃসঙ্গ মনে হল না।

বৃষ্টিতে এবার

অমিতাভ চক্রবর্তী

এবার বৃষ্টিতে ভিজে জল হয়ে যাবো
এবার তোমাকে দেবো ভালোবেসে
পরম সুস্বাদু জল।
গতেরই বৈশাখ তোমার জন্মদিনে
জলরঙ বৃষ্টিতে ভিজে
আমার আকণ্ঠ পিপাসা মেটাবো।

চৈত্রের বিকালে সজল দু'চোখে
কত জল ছিল, —আজ তা বুঝেছি
বুঝেছি ভালোবাসা চিরকাল জলছবি
নানারঙ, নানা যন্ত্রণায়।

বৃষ্টি হতে চাই—বৃষ্টিকে আজ চিনেছি।

জতুগৃহে

বাসুদেব দেব

জতুগৃহে বসিয়ে রেখে কোথায় গেলে সখ—
দেয়াল-ভরা ঈশ্বরের ও নিসর্গেরই মুখ।
প্রাচীন সম্রাটের ছবি, শিল্প কারুকলা।
কেউ জানে-না কোথায় গেলে মিলতে পারে সুখ।

প্রতিদ্বন্দ্বী অন্ধকারে বিনষ্ট দর্পণ---
বনের শেষে আদ্যিকালের স্থবির পর্বত।
সেখান থেকে ঝর্ণা ঝরে, 'সুরের সুরধুনী—'
কেউ জানে না আসবে কখন আলোর জয়রথ।

অম্ল দ্রাক্ষা ক্লান্ত আমার এপিটাফ কে লেখে।
অলীক অপ্রাপনীয় শিখর থাক দূরে।
বিসর্জনের হোমশিখাতে সকল লজ্জা ফেলে।
পালিয়ে আমায় যেতেই হবে ঐ নিরাপদ পুরে।

ধারাবাহিক উপন্যাস

অদ্বিতীয়

সুশীল রায়

আশিস

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

স্নেহাংশু অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। একটা আশ্বাস দিয়ে এভাবে চুপ করে থাকার মধ্যে কোনো নাটকীয় টেকনিক আছে কিনা ভাবতে লাগল অমিয়। হয়তো আছে। হয়তো সাসপেন্স সৃষ্টি করা হয় এইভাবেই। অমিয় নাট্যকার নয়, তাই ও-সব কায়দাকানুন সে জানে না। কিন্তু এতগুলো কথার মাঝখানে হঠাৎ এ-ভাবে তার চুপ করে থাকাটার মধ্যে সে যেন কোনো যুক্তি খুঁজে পেল না।

অমিয় কোনো যুক্তি খুঁজে পেল না বটে, কিন্তু মনোজ আর বিকাশ সবটা যুক্তিই যেন খুঁজে পেয়েছে। তারা বুঝতে পেরেছে যে, এবার ক্ষেপেছে তাদের নাট্যকার—তাদের এই একাঙ্ককার, এবার নির্ঘাৎ ঘটাবে একটা কেলেঙ্কারি।

কিন্তু একাঙ্ককার যে ইতিমধ্যে পঞ্চাঙ্ককার হয়ে গিয়েছে—সেই কথাটাই এখন পর্যন্ত তাদের জানা হল না।

আসল কথাটা তাদের জানা হল না বটে, কিন্তু আন্দাজের কথাটা তাদের কাছে যেন একেবারে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। সেইজন্যে বিকাশ পুনরায় সেই প্রশ্ন করল—'কে সেই হতভাগিনী?'

গলাটা এবার একটু সাফ করে নিল স্নেহাংশু বিশ্বাস। একটু হেসে সে বলল, 'একটা হতভাগিনীতে হবে না ভাই, এবার চাই একের অধিক।'

'কেন, কেন, কেন?' একটু ঝুঁকল, একটু জমাট হয়ে বসল বিকাশ।

স্নেহাংশু বলল, 'কেন আবার কি! তোমাদের জন্যেও চাই এক-একটি পার্টনার।'

অমিয় মজাটা বুঝি উপভোগ করছে। তাই কোনো কথা বলছে না। বারান্দায় বাবা-মা বসে আছেন বলে একটু অস্বস্তি বোধ করছে সে। উঠে গিয়ে তাই ভিতরে যাবার দরজাটা ভেজিয়ে দিল।

ফিরে এসে বসেই অমিয় বলল, 'থাক্। অনেক বাজে কথা হল, এবার কাজের কথায় আসা যাক। ব্যাপারটা হচ্ছে এই—'

অমিয় কথাটা বলতে যাবে, এমন সময় একটু বাধা পড়ল, বাইরের দিকে চেয়ে অমিয়ই বলল, 'এই যে, এস রেবতী, এস।'

রেবতী আসায় আসরটা যেন একটু ভারি হল। নাট্যকার স্নেহাংশু বিশ্বাসের নাটকের পাকা অভিনেতাদের মধ্যে রেবতী একজন।

রেবতী বসতে বসতে সবার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ব্যাপার কি? পরিস্থিতিটা একটু যেন নাটকীয় বলে ঠেকছে? নতুন নাটক-ফাটক আবার করছ নাকি তোমরা? কি হে, খুলে বলো।'

'খুলেই বলা যাক তবে?' অমিয়র এই প্রস্তাবে সকলে রাজী হল।

ব্যাপারটা খোলসা করে বলা হল এই আসরে।

সব শুনে রেবতী বলে উঠল, 'একাঙ্ক থেকে একেবারে এক লাফে পঞ্চাঙ্ক? তুমি সব পার হে স্নেহাংশু, তুমি নমস্য, তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করি—এমন সাধ্য কি আছে আমাদের?'

মনোজ আর বিকাশ দু'জন দু'জনের মুখের দিকে একটু তাকাল,

অতঃপর মনোজ বলল, 'আর কথা নয়। কথা আর দ্রৌপদীর শাড়ি—একই ব্যাপার, টানলেই বেড়ে যায়, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয় না, যে উদ্দেশ্যে টানা, তা—'

সকলে অট্টহাস্য করে উঠতে গিয়েই হঠাৎ থেমে গেল, তাদের মনে পড়ে গেল যে, এটা তাদের রিহার্সেলের ঘর নয়, এটা অমিয়দের বৈঠকখানা-ঘর।

রেবতী দম নিয়ে বলল, 'বেড়ে চলেছ। টানাটাই অযথা হয়ে যায়। সুতরাং আর কথা নিয়ে টানাটানি করা না হল, এবার কাজ হোক।'

কিন্তু তাদের এখানকার যা কাজ তাও তো কথা দিয়েই সারতে হবে, সুতরাং আরম্ভ হল আবার কথাই।

কথা হওয়া উচিত ছিল প্রথমেই নাটকের বিষয়বস্তু নিয়ে, কিন্তু তার বদলে আলোচনা আরম্ভ হল নাটকের চরিত্র নিয়ে।

সুহাংশু হাসল, বলল, 'নাটকটা খুবই সচ্চরিত্র। কিন্তু এতে স্ত্রী-ভূমিকা আছে, সুতরাং তোমাদের জন্যে পার্টনার দরকার। লিখে ফেলেছি বটে, কিন্তু এটা অভিনয় করা যদি সাব্যস্ত হয়, তা হলে আমরা চাইব—'

'নিশ্চয় চাইব'—মন্তব্য করে উঠল মনোজ, বলল, 'নিশ্চয় চাইব মনের মত কো-অ্যাকট্রেস।'

'তাই তো বলছিলাম,' সুহাংশু বলল, 'আমার নাটক সচ্চরিত্র, কিন্তু তোমরা শেষ পর্যন্ত সচ্চরিত্র থাকতে পারবে তো? এই নাটকে অভিনয় করার পরেও?'

মনোজ বলল, 'সেটা নির্ভর করছে ইয়ের ওপর, মানে, ইয়ে আর কি। কেমন ধরণের নায়িকা আসেন, তাঁর চেহারা কেমন, চরিত্র কেমন—এই সবের ওপর আর কি। আমাদের নিজেদের ওপর একটুও নয়।'

'ইস্, মনোজটা বলে কি।' যেন শিউরে উঠল রেবতী, বিকাশ আর অমিয়। সুহাংশু তো নাট্যকার, সে তো অভিনেতা নয়, তাই নিজেকে এদের দল থেকে সে একটু বুঝি আলাদা করে রাখল এবং সেইজন্যে নির্লিপ্তভাবে বসে থাকতেও পারল সে।

পঞ্চাঙ্ক নাটক লিখে সুহাংশু এমন একটা আলোড়ন তুলেছে যে, সকলেরই মনে হতে লাগল—এ একটা ভীষণ ব্যাপার। কোনো-এক কালে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ লেখা হয়েছিল, তখন সেই লেখককে নিয়েও বুঝি এতটা হৈ-চৈ সে-আমলের মানুষেরা করে নি। খুব হৈ-চৈ হতে লাগল বেহালার এই পল্লীতে। বেশ সাড়াই পড়ে গেল। এতদিন হয়ে এসেছে একটা জলসার পরে ছোট এক-চিলতে নাটকের অভিনয়। তখন কে সেই নাটকের লেখক, সে কথা নিয়ে মাথা কেউ ঘামায় নি; নাট্যকারকেও বিশেষ আমল দেয় নি। কিন্তু এখন তো ব্যাপার একেবারে আলাদা, নাটক বলতে যা বোঝায়, তেমনি একটা ব্যাপার নিয়ে সর্বজনসমক্ষে উপস্থিত হয়েছে বেহালার সুহাংশু বিশ্বাস।

বেহালার চৌহদ্দি পার হয়ে সুহাংশুর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল অনেকটা বড় এলাকা জুড়ে। হরেশ কাজ করে মিন্টে—সে তাদের টাঁকশালের সহকর্মীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিল এই কীর্তিকাহিনী। দীপক হল পোর্ট ট্রাস্টের কর্মী—তার মারফৎ খ্যাতি ছড়ালো তাদের আপিসে। এবং যাকে সবাই ডাকে 'ফায়ার' ব'লে সেই নীহার তাদের পল্লীর সুহাংশুর কথা বলতে লাগল ফায়ার ব্রিগেডের তার সহকর্মীদের কাছে। নিরীহ আর নম্রস্বভাবের

মহাযোগী—ত্রিলোকের মহাতান্ত্রিক—সাধকশ্রেষ্ঠ মহেশ্বরের শ্রীমুখনিঃসৃত—কলির মানবের মুক্তির ও অলৌকিক সিদ্ধিলাভের একমাত্র সুগম পন্থা—অসংখ্য তন্ত্রশাস্ত্র-সমুদ্র আলোড়িত করিয়া সারাৎসার সঙ্কলনে—প্রত্যক্ষ সত্য—সদ্যফলপ্রদ সাধনার অপূর্ব্ব সমন্বয়

তন্ত্রশাস্ত্র-বিশারদ আগমবাগীশ শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দের

বৃহৎ তন্ত্রসার

—সুবিস্তৃত বঙ্গানুবাদসহ বৃহৎ সংস্করণ—

তন্ত্র-মন্ত্র ও তন্ত্র-রহস্য পঞ্চমকার সাধনা কিরূপ? গুপ্তসাধন কাহার নাম? অষ্টসিদ্ধির সকল প্রকারের সাধনা—তান্ত্রিক সাধনায় শাক্তভক্তগণের সকল সিদ্ধিই তন্ত্রসারে সন্নিবেশিত।

সরল প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ—নূতন নূতন যন্ত্রচিত্রে সুশোভিত—অনুষ্ঠানপদ্ধতি সম্বলিত।

বহু সাধকের আকাঙ্ক্ষায়—বহুব্যয়ে—আনুষ্ঠানিক তান্ত্রিক পণ্ডিতমহাশয়গণের সহায়তায়—কাশী হইতে পুঁথি আনাইয়া বসুমতী সাহিত্য মন্দির পরিশোধিত পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ প্রকাশ করে। পূজা, পুরশ্চরণ, হোম, যাগযজ্ঞ, বলিদান, সাধনা, সিদ্ধি, মন্ত্র, জপ, তপ, তন্ত্রসারে কি নাই? হাইকোর্টের জ্ঞানবৃদ্ধ বিচারপতি—অসংখ্য আইনগ্রন্থ-প্রণেতা উডরফ সাহেবের তন্ত্রানুশীলন—মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের অনুবাদ প্রণয়ন ও প্রকাশ কালাবধি তন্ত্রগ্রন্থের প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে; তাঁহারা দেখিবেন কি অলৌকিক সাধনার সিদ্ধি—অতীন্দ্রিয় অনুষ্ঠান সমাবেশ—সর্ব্বতন্ত্রের অপূর্ব্ব সমন্বয় কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসারে যত যন্ত্র আছে সকলেরই চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

মূল্য দশ টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মানুষ হচ্ছে বীরেন, বছর-দুই হল যোগ দিয়েছে অধ্যাপনার কাজে, তাও অধ্যাপক-মহলে বলে বেড়াতে লাগল—অমিয় হন্তদন্ত হয়ে তাদের রিহার্সেল-রুমে ঢুকেই বলে উঠল সেদিন, "অখ্যাত-অজ্ঞাত রহি দীর্ঘকাল হে রাজ-বৈরাগী, অকস্মাৎ হয়ে উঠলে খ্যাতিমান দ্যুতিমান স্নেহাংশু বিশ্বাস ?'

সকলে ঝুঁকে পড়ে নাটকটির পাণ্ডুলিপি পড়ছিল। অমিয়র গলার স্বর শুনেই তারা মাথা তুলে তাকাল, বলল, 'কি ব্যাপার ?'

অমিয় বসে পড়ল মাদুরের কোণায়, বলল, 'বুকের মধ্যে চাপা একটা ব্যথা বোধ করছি। ব্যথাটা গর্বের উত্তেজনার জন্যেই কিংবা হিংসার সংকীর্ণতার জন্যে—ঠিক ধরতে পারছি নে। আমরা পড়ে রইলাম যে-তিমিরে সেই তিমিরেই ; আর, আমাদের অখ্যাত-অজ্ঞাত রেখে আমাদেরই বন্ধু শ্রী স্নেহাংশু একা গিয়ে দাঁড়াল ভীষণ-উজ্জ্বল আলোর মধ্যে। এতে, খুলেই বলি, গর্ব হচ্ছে একটু-একটু, গর্ব হবারই কথা—আমাদের বন্ধু হয়ে উঠছে ধনামধন্য। গর্ব তাই হবেই। কিন্তু হিংসেও কি একটুও হবে না ?'

হিংস্রক দৃষ্টিতে তাকাল রেবতী, মুখটা একটু বিকৃত করে হাসার চেষ্টা ক'রে বলল, 'ছি। এতে গর্বই হবে, হিংসে হবে কেন ?'

স্নেহাংশু কোনো কথা বলল না। যা নিয়ে তাদের আলোচনা হচ্ছিল, সেই বিষয় নিয়েই আবার আলোচনা আরম্ভ করল। আলোচনা হচ্ছিল চরিত্রলিপি নিয়ে। মোট তিনটি মেয়ে-চরিত্র রেখেছে স্নেহাংশু এই বিরাট নাটকে, বেশি মেয়ে-চরিত্র সে রাখে নি ইচ্ছে করেই এবং চেষ্টা করেই। কিন্তু এই চরিত্র তিনটিতে নামতে রাজী আছে কে কে, এই নিয়েই কথাবার্তা হচ্ছে। রেবতী মনোজ আর বিকাশ—এরা তিনজন ভারি ভূমিকার জন্য একেবারে বাঁধা। কেন না, অভিনয়ে এরা তিনজনই বেশ পোক্ত। নীহার, দীপক আর হরেশ মেয়ে সাজতে রাজী আছে কি না, এই নিয়ে কথা চলছে, তাদের রাজী করাবার চেষ্টা চলেছে। বীরেন একজন অধ্যাপক এবং তার কলেজটাও কাছেই, সে যদি মেয়ে সাজে তাহলে তার তিষ্ঠানো দায় হবে।

বিকাশ হেসে বলল, 'তাহলে ছাত্রেরা নিশ্চয় তোমাকে দিদিমণি বলে ডাকতে আরম্ভ করবে ?'

নীহার নিরীহ ভঙ্গিতেই হেসে বলল, 'এটুকু সুযোগও যদি তারা কাজে না লাগায়, তবে তারা ছাত্র কিসের বলো।'

'তা বটেই।' সুতরাং মিল্ট-কর্মী, ফায়ার-ব্রিগেডকর্মী আর পোর্টকর্মীদের ওপরই মেয়ে সাজবার দায় গিয়ে পড়ল।

এতে পৌরুষে হয়তো তাদের একটু লাগল। তারা নিশ্চল হয়েই কেবল না, নির্বাক হয়েও বসে রইল। এই নাটক নিয়ে এবং এই নাট্যকার নিয়ে তারা যেমন উৎসাহের সঙ্গে কথা বলেছে তাদের সহকর্মীদের কাছে, সে উৎসাহ যেন একটু কমে আসতে লাগল তাদের। তাদের মনে হল, তাদের ওপর যেন অবিচার করা হচ্ছে। অভিনয়ে তারা তেমন পোক্ত নয় বলেই তাদের মেয়ে সাজতে হবে ? মেয়ে-ভূমিকায় অভিনয় করা বুঝি বেশ সোজা কাজ ? তার ওপর, কলেজের ছাত্রদের দৌরাত্ম্যের কথা ভেবে যদি বীরেনকে রেহাই দেওয়া হয়, তাহলে পাড়ার ছেলেদের উপদ্রবের কথা ভেবে কি তাদেরও ছেড়ে দিতে হয় না ? মেয়ে সেজে একবার নামলেই পাড়ার ছেলেরা দীপককে নিশ্চয় দীপিকা বলে ডাকতে আরম্ভ করবে, নীহারকে বলবে নীহারিকা এবং হরেশকে ডাকার তেমন নাম না পেয়ে হয়তো বলবে হৃদয়েশ্বরী। এবং, এবং, এবং, পাড়ার মেয়েরা ? পাড়ার মেয়েরাই বা কি বলবে ? সুতরাং ওসবের মধ্যে ওরা নেই।

দীপকই প্রস্তাব করল, বলল, 'আমার একটা সাজেসশন আছে। আপিসে আপিসে যখন অভিনয় হয় তখন আপিসের কর্মিণীরাই নামে মেয়ে-ভূমিকায়। এ তো অনবরত দেখছি।'

'নামেই তো।' বিকাশ বলল, 'আমাদের ব্যাঙ্কের সব অভিনয়েই তো মেয়েরা কো-অপারেট করে। তাই কি ?'

'তাই বলছিলাম।' দীপক বলল, 'এটা পাড়ার কাজ। পাড়ার কাজ মানে পাড়ার প্রত্যেকের কাজ। আমাদের এই নাটকের অভিনয়ে তবে যোগ দিক পাড়ার মেয়েরা—তারা স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসুক লেডি-ভলান্টিয়ারের মত।'

সকলে হেসে উঠল একসঙ্গে। কিন্তু দীপক হাসল না। তার প্রস্তাবের দাম আছে তার কাছে। ছেলেমানুষী ক'রে সে এ প্রস্তাব করে নি।

নীহার মিন-মিন করে বলল, 'কিন্তু তেমন মেয়ে কি পাড়ায় আছে হে ?'

'এন্তার। এন্তার।' (ক্রমশঃ)

কিষাণ
লণ্ঠন
সর্বোৎকৃষ্ট
গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
ফোন-২২-৬৩৮০
২৬৬,ওল্ড চীনাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১

[ইয়ন লুকা কারাজিয়ালে (১৮৫২-১৯১২) রুমানিয়ার শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ-সাহিত্যিক। বিদেশী প্রভাবান্বিত রাজতান্ত্রিক শাসনের সময়ে রুমানিয়াতে যে বিশৃঙ্খলা, দুর্নীতি ও জনসাধারণের যে দুর্গতি দেখা দিয়েছিল, কারাজিয়ালের সব রচনাই হাসির আড়ালে সেই বেদনাদায়ক অধ্যায়ের পরিচয় বহন করছে। সমাজজীবনের উপলব্ধিকে বিভিন্ন নাটকীয় চরিত্রের মাধ্যমে রূপায়িত করে, আজ পর্যন্ত তিনি রুমানিয়ার শ্রেষ্ঠ নাট্যকাররূপে পরিগণিত। তাঁর স্বল্পায়তন গল্প ও নক্সাগুলি বিদ্রূপ-হাস্যের মতনই হৃদ্য ও তার আবেদন তেমনই দীর্ঘস্থায়ী। কেন না, এ হাসির উৎস সমস্ত দেশের অন্তরের রুদ্ধ বেদনা। সেই সময়কার আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতার এমনি একটি হাস্যকরুণ চিত্র বর্তমান গল্পটি।

—অনুবাদিকা]

জরুরী

ইয়ন লুকা কারাজিয়ালে

বালিকা-বিদ্যালয় নং ১ পত্রসংখ্যা-৬৫৪

ক----নগর জরুরী ১৫ই নভেম্বর

ক---নগরের মাননীয় পৌরপতি

সমীপেষু—

মাননীয় পৌরপতি,

এই বিদ্যালয়ের কাঠের প্রয়োজন সম্বন্ধে আমাদের গত মাসের ৫৯৭নং চিঠির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এই সম্বন্ধে আপনাকে অনুরোধ করিতেছি যে, যথাশীঘ্র সম্ভব পূর্ববর্ণিত পরিমাণ কাঠ পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। কেন না, উত্তরোত্তর শীত বাড়িতেছে এবং জ্বালানী কাঠ না পাইলে ঘর গরম রাখার অসুবিধার জন্য আর বিদ্যালয় খোলা রাখিতে পারিব না এইরূপ ভয় হইতেছে।

যথাবিহিত সম্মানদানান্তে—

পরিচালিকা

আগলায়ে পোপেস্কু

বালিকা-বিদ্যালয় নং ১ পত্রসংখ্যা-৬৮৩

ক---নগর জরুরী ১লা ডিসেম্বর

ক---নগরের মাননীয় পৌরপতি
সমীপেষু—

মাননীয় পৌরপতি,

আমাদের গত ১৫ই নভেম্বরের ৬৫৪ নং চিঠির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এই শহরের ১নং বালিকা-বিদ্যালয়ের ঘর গরম করিবার জ্বালানী কাষ্ঠ সম্বন্ধে পূর্বের অনুরোধ যথাবিহিত সম্মানের সহিত পুনরায় জানাইতেছি। শীতকালে পাঠের সময়ে ঘরে যথেষ্ট পরিমাণ উত্তাপ না থাকায় অত্যন্ত অসুবিধা বোধ করিতেছি। বিশেষত, এই বৎসরে শীত অত্যন্ত প্রবল হওয়ার জন্য ঘরের ভিতরে বসিয়া শীতে ছাত্রীদের হাত অসাড় হইয়া যাইতেছে; তাহারা লিখিতে পারিতেছে না। শিক্ষয়িত্রীরাও ঘরের ভিতর ওভারকোট ইত্যাদি শীতবস্ত্রাদি খুলিয়া রাখিতে না পারার জন্য বাহির হইলেই শীতের প্রকোপে কষ্ট পাইতেছেন। এইজন্য ভয় পাইতেছি যে, শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীরা সকলেই অসুস্থ হইয়া পড়িবেন।

অতএব, এই পত্রদ্বারা অনুরোধ জানাইতেছি যে, এইরূপ অস্বাভাবিক অবস্থার প্রতিকার যথাশীঘ্র সম্ভব করিবেন। অন্যথায়, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের নিকট পত্র দিয়া এই বিদ্যালয় সম্পর্কে আর দায়িত্বগ্রহণে অক্ষমতা জানাইতে বাধ্য হইব।

যথাবিহিত সম্মানদানান্তে—
পরিচালিকা
আগলায়ে পোপেস্কো

*

বিদ্যালয়-পরিদর্শক পত্রসংখ্যা-৪৫৯৯

খ---জেলা জরুরী ১৫ই ডিসেম্বর

ক---নগরের মাননীয় পৌরপতি
সমীপেষু—

মাননীয় পৌরপতি,

আজ ১৫ই ডিসেম্বর ক---নগরের ১নং বালিকা-বিদ্যালয়ে কার্যসূচী অনুযায়ী পরিদর্শনকালে আমার সহিত উক্ত বিদ্যালয়ের পরিচালিকা শ্রীমতী আগলায়ে পোপেস্কো ও তিনজন শিক্ষয়িত্রী সর্বশ্রী আরেতি ইয়োনেস্কো, সেবাস্তি ইয়োনেস্কো এবং আরিস্তি পোপেস্কোর সাক্ষাৎ হইয়াছে। জ্বালানী কাষ্ঠের অভাবে ঐ বিদ্যালয় বর্তমানে যে দুর্দশা ভোগ করিতেছে, সে-সম্বন্ধে তাঁহারা সকলেই অভিযোগ করিয়াছেন। বিদ্যালয়ের চিঠিপত্রাদির ফাইল দেখিয়া অবগত হইলাম যে, এ সম্পর্কে স্থানীয় পৌরসভাকে অসংখ্যবার পত্রদ্বারা অনুরোধ করা সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত কোনরূপ ফল পাওয়া যায় নাই।

তাহার পর বিদ্যালয়ের কক্ষগুলি পরিদর্শন করিয়া দেখিয়াছি যে, ঐ কক্ষগুলি অসহ্য ঠাণ্ডা। রাত্রিরাদের পক্ষে ইহা অধিকতর অসহনীয় এবং ঐ কারণেই তাহারা কোন সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িতে পারে। তখন সেই ব্যাধির প্রকোপ সম্পূর্ণরূপে দূর না হওয়া পর্যন্ত নিয়মিত পাঠক্রম বন্ধ রাখিতে হইবে। তাহার দ্বারা বার্ষিক পরীক্ষার আগে এই বৎসরের সিলেবাস অনুযায়ী পাঠ্যবস্তু শেষ হইবে না।

এই অসুবিধার জন্য আপনাকে অনুরোধ করিতেছি যে, বিদ্যালয়ের প্রয়োজন যথাসম্ভব মিটাইবার ব্যবস্থা করিয়া বাধিত করিবেন।

যথাবিহিত সম্মানদানান্তে—
বিদ্যালয়-পরিদর্শক
লাজ্যার ইয়োনেস্কু—লিওন

*

বালিকা-বিদ্যালয় নং ১ পত্রসংখ্যা-১৩

ক---নগর জরুরী ৮ই জানুয়ারী

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী সমীপেষু—

মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়,

স্থানীয় পৌরসভার নিকট বর্তমান ঋতুর নিদারুণ শৈত্যের জন্য বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় জ্বালানী কাষ্ঠ পাঠাইবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিয়া কোন ফল পাই নাই।—বর্তমানে এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, আমাদের ও ছাত্রীদের জীবন সঙ্কট দেখা দিয়াছে। ছাত্রীরা তো ছুটির পূর্ব হইতেই বিদ্যালয়ে আসা বন্ধ করিয়াছে। কেন না, তাহাদের অভিভাবকেরা এইরূপ অবস্থার কথা জানিতে পারিয়াছেন এবং যতদিন পর্যন্ত বিদ্যালয়-কক্ষগুলিতে আগুন জ্বালাইবার ব্যবস্থা না হয়, ততদিন পর্যন্ত তাঁহারা মেয়েদের আসিতে অনুমতি দিবেন না বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

বিদ্যালয়-পরিদর্শক শ্রীলাজ্যার ইয়োনেস্কু—লিওন মহাশয় স্বয়ং জ্বালানী কাষ্ঠের অভাবে বিদ্যালয়ের দুরবস্থা দর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গত বৎসরের ১৫ই ডিসেম্বরের ৪৫৯৯নং চিঠিতে তিনিও স্থানীয় পৌরপতিকে এ সম্বন্ধে অনুরোধ জানাইয়াছেন। কিন্তু সে চিঠিও কেহ গ্রাহ্য করেন নাই। এই বিদ্যালয় বর্তমানে যেরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে—যে, বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, ছাত্রীদের এইরূপ কষ্টভোগ করানো অমানুষিকতার পর্যায়ে পড়ে।

সেইজন্য গভীরতম শ্রদ্ধার সহিত আপনাকে অনুরোধ করিতেছি যে, এই অত্যাচার প্রশমন করিবার জন্য আপনার বিচারানুযায়ী যথাবিহিত উপায় অবলম্বন করিবেন।

বিনীত নমস্কারান্তে—
পরিচালিকা
আগলায়ে পোপেস্কো

*

শিক্ষা ও সংস্কৃতি দপ্তর পত্রসংখ্যা-১০০০১,
১৫ই জানুয়ারী

জরুরী

খ---জেলার বিদ্যালয়-পরিদর্শক সমীপেষু—

মাননীয় পরিদর্শক,

ক---নগরের ১নং বালিকা-বিদ্যালয়ের পরিচালিকা শ্রীমতী আগলায়ে পোপেস্কো আমাদের নিকট অভিযোগ জানাইয়াছেন যে, স্থানীয় পৌরসভা

বিদ্যালয়-কক্ষগুলি গরম রাখিবার জন্য তাঁহাদের প্রয়োজনীয় জ্বালানী কাষ্ঠ দিতেছেন না।

এতদ্দ্বারা আপনাকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, ঐ বিদ্যালয়ে অবিলম্বে তদন্ত করিয়া আপনার বিবরণী পেশ করিবেন। এইসঙ্গে পরিচালিকা মহাশয়ার বিবরণী সংলগ্ন করিয়া দিলাম।

পক্ষে মন্ত্রী পক্ষে পরিচালক
স্বাক্ষর অস্পষ্ট স্বাক্ষর অস্পষ্ট

*

বিদ্যালয়-পরিদর্শক পত্রসংখ্যা-১০৩
খ---জেলা জরুরী ১লা ফেব্রুয়ারী

মাননীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতিমন্ত্রী সমীপেষু—

মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়,

আপনার ১৫ই জানুয়ারী তারিখের ১০,০০১ নং পত্রপাঠমাত্র আমি ক---নগরের ১ নং বালিকা-বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়াছি ও পরিচালিকা মহাশয়ার এই সম্বন্ধীয় বিবরণী সর্বাংশে সত্য এ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হইয়াছি।

প্রকৃতপক্ষে শীতের জন্য বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা অর্ধেক কমিয়া গিয়াছে। বাকী অর্ধেকের সকলেই কাশি ও গলাব্যথায় ভুগিতেছে। এ কারণে ক---নগরের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসককে ডাকা হইয়াছিল। তিনি জানাইয়াছেন যে, ইহাদের অধিকাংশেই টনসিল-সংক্রান্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। যে-সব বালিকারা রক্তশূন্যতা প্রভৃতি রোগে ভুগিতেছে, তাহাদের পক্ষে ইহার পরিণাম বড় ভীষণ হইতে পারে এবং বহু সংক্রামক জটিল ব্যাধির সৃষ্টি হইতে পারে।

সে কারণে, চিকিৎসক মহাশয়ের মতে সঙ্কট বেশি দূর গড়াইবার পূর্বেই বিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত।

গভীরতম শ্রদ্ধার সহিত আপনাকে অনুরোধ জানাইতেছি যে, জনস্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনে এ সম্পর্কে অতি সত্বর আমাকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করিতে আজ্ঞা দিবেন অথবা আপনি স্বয়ং স্থানীয় পৌরসভার কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া ঐ বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় জ্বালানী কাষ্ঠ দানের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

বিনীত নমস্কারান্তে—

বিদ্যালয়-পরিদর্শক

আজার ইয়োনেস্কু—লিওন

*

শিক্ষা ও সংস্কৃতিদপ্তর
পত্রসংখ্যা-২০,০০২

জরুরী ১৫ই ফেব্রুয়ারী

ক---নগরের মাননীয় পৌরপতি
সমীপেষু—

ঐ শহরের ১নং বালিকা-বিদ্যালয়ের পরিচালিকা শ্রীমতী আগলায়ে পোপেস্কো অভিযোগ জানাইয়াছেন যে, বারংবার আবেদন সত্ত্বেও পৌরসভা হইতে তাঁহাদের প্রয়োজনীয় জ্বালানী কাষ্ঠ দেওয়া হয় নাই এবং সেই কারণে পাঠক্রম বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে।

সেইজন্য আপনাকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, পরিচালিকা মহাশয়ার এই সংগত চাহিদা আপনি অতি সত্বর রীতি অনুযায়ী মিটাইবেন।

পক্ষে মন্ত্রী পক্ষে পরিচালক
স্বাক্ষর অস্পষ্ট স্বাক্ষর অস্পষ্ট

*

লোকসভা—প্রলম্বিত অধিবেশন—১লা ম...
শ্রী আ, লিংগপলু—

মাননীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতিমন্ত্রী মহোদয়কে একটি প্রশ্ন করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছি। স্থানীয় পৌরসভা জ্বালানী কাষ্ঠ না দেওয়ার জন্য ক---নগরের ১নং বালিকা-বিদ্যালয়টি কিরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে ও ছাত্রীরা ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়ার জন্য যে স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী বিদ্যালয় বন্ধ রাখা হইয়াছে—একথা মাননীয় মন্ত্রী অবগত আছেন কি?

সংস্কৃতিমন্ত্রী—

মাননীয় সদস্যকে জানানো যাইতেছে যে, স্থানীয় বিদ্যালয় পরিদর্শকের বিবরণী পাইবার পর পৌরসভা যাহাতে ঐ বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় জ্বালানী দেয় সেইরূপ যথাবিহিত ব্যবস্থা এই দপ্তর অবলম্বন করিয়াছে।

*

পৌরসভা পত্রসংখ্যা-৩৭১
ক---নগর জরুরী ১৫ই মা...

মাননীয়া বিদ্যালয়-পরিচালিকা
বালিকা-বিদ্যালয় নং ১
ক---নগর

মহাশয়া,

কাল ৫ (পাঁচ) গাড়ি পরিষ্কার শ্রেষ্ঠস্তরের জ্বালানী কাষ্ঠের একটি চালান আপনার বিদ্যালয়ে সসম্মানে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে। জ্বালানী কাষ্ঠের প্রাপ্তিসংবাদ যথাশীঘ্র সত্বর জানাইয়া বাধিত করিবেন।

পক্ষে পৌরপতি একান্ত সচিব
নিৎসা নেকুলেস্কু আথানাসিউ
সহকারী এলেউথেরেস্কু

অনুবাদিকা—অমিতা র...

মূল রুমানিয়ান থেকে অনুবাদ

বিশ্বসাহিত্যের সম্রাট—মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে শারদ-জ্যোৎস্না—চরিত্র-সৃষ্টির ইন্দ্রধনু—অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধীশ্বর চার্লস ডিকেন্সের

ডিকেন্স গ্রন্থাবলী

অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাশিল্পী—সর্বরসের অনন্ত নির্ঝর—বিশ্বসাহিত্যগৌরব ঔপন্যাসিকের পরিচয় প্রদান অসম্ভব।

২য় ভাগ—নিকোলাস নিকলবি: বারনাবি রজ, চরিত্র-চিত্র। সাহিত্য জগতের এই পুণ্যপ্রভা মাত্র ১॥০ টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিঃ
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

গ্রন্থ মেলা

সোভিয়েতে বঙ্গসংস্কৃতি : ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য। প্রতিমা পুস্তক, ১৩ কলেজ রো, কলকাতা-৯। মূল্য: আট টাকা পঞ্চাশ পয়সা। রেক্সিনে বাঁধাই : দশ টাকা।

ভারতের খ্যাতনামা লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতিবিদ আচার্য ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য গত ডিসেম্বর মাসে সোভিয়েট সরকারের আমন্ত্রণে লেনিনগ্রাদ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বাংলার লোকসংস্কৃতি' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার জন্য সেখানে গিয়েছিলেন। প্রথমেই বলা দরকার, এ আমন্ত্রণ যথোপযুক্ত ব্যক্তিকেই তাঁরা করেছিলেন। কেন না অধ্যাপক ভট্টাচার্য ক্লাশঘরে বাঁধা বুলির বক্তৃতা দিয়ে এবং গ্রন্থের সাহায্যে গ্রন্থ রচনা করে খ্যাতি অর্জনের জন্য কখনোই উন্মুখ হন নি। তিনি যে পথের পথিক—সে পথ বড়ই কঠিন। সেই কারণে স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ডক্টর ভট্টাচার্যের 'অসামান্য পারদর্শিতা'র জন্য এক স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দনবাণী পাঠিয়েছিলেন। এ ত' কম কথা নয়। এ হচ্ছে পরম গৌরবের কথা। আনন্দের ব্যাপার এই যে, ডঃ ভট্টাচার্য সোভিয়েট দেশে গিয়ে যে নতুন আলোকপাত করেছেন তার জন্যে তাঁর নিজের যেমন—সেইসংগে সারা ভারতেরও বিপুল গৌরব ঘোষিত হয়েছে। তাঁর এই সাফল্যের মূলে রয়েছে—অভিজ্ঞতাবলব্ধ জ্ঞানকে চরম উপলব্ধির দ্বারা সহজভাবে জানানো। ডঃ ভট্টাচার্য একদা নৃতত্ত্ববিশারদ ডঃ ভেরিয়ার এলউইনের সহযোগী ছিলেন। সেই কারণে চোখে দেখে এবং তার সাহায্যে সব কিছু জেনে সত্যকে প্রকাশ করার জন্যে তিনি উদ্গ্রীব। ভারতীয় লোকসংস্কৃতির অন্যতম প্রধান আবিষ্কারক ও বোদ্ধা হিসেবে ডঃ ভট্টাচার্যকে আহ্বান করা ছাড়াও তাই অন্য উপায় নেই। সোভিয়েট দেশে গিয়ে বিদ্বৎমণ্ডলীর সম্মুখে সত্যিকারের মুখরক্ষা করেছেন তিনি। 'বাংলার লোকশ্রুতি পরিক্রমা', 'বাংলার সর্পশ্রুতি', 'লৌকিক দেবদেবী', 'মঙ্গলকাব্য', 'যাত্রা', 'বাংলা নাটকের উদ্ভব,' 'সাম্প্রতিক বাংলা নাটক' প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ, বিজ্ঞানসম্মত ও অকাট্য। অবশ্য বক্তৃতা দেবার সময় একটি বাদে প্রায় সবই ইংরেজির মাধ্যমে দেওয়া হয়েছিল। বলা বাহুল্য মূলে তিনি সেগুলিকে বাংলাতেই রচনা করেছিলেন। স্বদেশে উপস্থাপিত করার সময় তিনি প্রয়োজনানুযায়ী প্রবন্ধগুলি পরিবর্ধিতও করেছেন।

উপরিউক্ত গ্রন্থটি লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতামালার মধ্যেই সীমিত নয়, তা যদি হোত, তাহলে সোভিয়েটে বঙ্গসংস্কৃতির আরেকটি রূপ আমাদের অগোচরেই থেকে যেত। ডক্টর ভট্টাচার্য সোভিয়েট দেশে ভারত-সম্পর্কিত লোকসাহিত্য গবেষণা ও সংরক্ষণ দেখে বিস্মিত হয়েছেন। কলকাতা : দিল্লী : তাসখন্দ : মস্কো—মনোরম ও সুন্দর ভঙ্গিমায় বর্ণিত ভ্রমণকাহিনী চুম্বকের মত আমাদের আকর্ষণ করে রাখে। সোভিয়েট দেশ কাল-ও মানুষের পরিচয় পেয়েও আমরা মুগ্ধ হই। এমন কি প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে ভারতীয়-র মধুর মিলন-মুহূর্তও তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। সেইসঙ্গে অবশ্য বাংলা চলচ্চিত্রের আলোচনাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আবার ভারতীয় এমবেসির কর্মবিমুখতাও উল্লেখ্য। এরপর লেনিনগ্রাদ। সেখানে পুস্কিন ভবন, প্রাচ্যবিদ্যা-ভবন, জাতিতত্ত্ব সংগ্রহশালা, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, প্রাচ্যবিদ্যাবিভাগের যে তথ্য ডঃ ভট্টাচার্য স্বচক্ষে দেখে তুলে ধরেছেন—বাংলা তথা ভারতের মানুষ ইতিপূর্বে তার কোনো পরিচয় পায় নি। সবচেয়ে বড় কথা আমরা যা তুচ্ছ করে হারিয়েছি, তা কিভাবে অতি সযত্নে সোভিয়েটে রক্ষিত রয়েছে, তা দেখলে বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই। এই রক্ষিত দ্রব্যরাজি ভারতের অতীত ও বর্তমান সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে নতুনভাবে লিখতে সাহায্য করতে পারে। সোভিয়েট নিজের দেশ সম্বন্ধেও সদা সজাগ। হয়তো সামান্য একজন কবি—তবু তার চুল পর্যন্ত সংরক্ষণ করা হয়েছে, পাণ্ডুলিপি ত' আছেই। এমন কি আমাদের দেশে যা নেই—বঙ্কিমের স্বহস্তলিখিত সেই মূল স্বাক্ষরও রয়েছে সেখানে। এ-সব বিবরণ থেকে আমাদের দেশ অনেক জানতে পাবে, শিখতেও পারে। ডক্টর ভট্টাচার্যের গ্রন্থ শুধু আমাদেরই নয়, এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহ-বিভাগকেও বেশ কিছুটা নাড়া দেবে বলে আমাদের ধারণা। কেন না, এ-বই আমাদের সকলের চোখ খুলে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। তাঁর বক্তৃতাগুলির নতুন মর্মও হয়তো আমরা উপলব্ধি করতে পারবো। রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি' যখন লিখিত হয়েছিল তখন রাশিয়া সবে গড়ে উঠেছিল,—'সোভিয়েতে বঙ্গসংস্কৃতি' পড়ে মনে হয় ডক্টর ভট্টাচার্য রাশিয়ার সংস্কৃতির মহামিলনের এক পবিত্র ও পূর্ণ মূর্তি দর্শন করে এসেছেন এবং আমাদেরও তা দেখিয়েছেন। গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য স্বভাবতই উদ্গ্রীব হতে হয়।

জয়ন্তী সেন

আঁধার মানিক

ধারাবাহিক উপন্যাস

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ একুশ ॥

ফুলেশ্বরীকে বিশালাক্ষী একটি কথাই বারবার জিগ্যেস করলেন, 'এমন করে চলে আসবার কথা বাড়িতে কে জানে?'

'কেউ জানে না।'

'ছেলে কোথায়?'

'মা'র কাছে।'

'এমন করে এলি কেন?'

'এমন করে না এলে কি বাবা উদ্যোগ করে আসতে দিতেন?'

ফুলেশ্বরীর গলায় বিপন্ন অসহায়তা। বিশালাক্ষীর হাসি পেল। মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'চলে গিয়েছিলে, কারো কথা ভাব নি। আসতে চাও জানালে ব্যবস্থা হত।'

ফুলেশ্বরী নতমুখী, মুখে কথা নেই।

'মেয়েমানুষকে এত অবুঝ হতে নেই বুনি। এমন কাজ রাজার রাণীও করে না। রাণী ভবানীরও শুনতে পাই একটি কাজ করতে গেলে পাঁচজনের পরামর্শ নিতে হয়। তুমি কোন আক্কেলে এমন একা একা এলে? আর এলে যদি, এত কি মান তোমার, এসে শাশুড়ীর পায়ে ধরলে না কেন? সুরকণ্ঠ তোমার এমন কুটুম্ব নন বুনি, তোমায় আমি আর কি বলব, মেয়েমানুষের সামান্যে কলঙ্ক হয়, কিছুই বোঝ না?'

'ভয় পেয়েছিলাম।'

'এত বড় সাহসের কাজটা করতে ভয় হল না? পরের ঘরে গিয়ে উঠলে, শ্বশুরবাড়ি এলে না, তাতে ভয় হল না? তা ছাড়া----'

বিশালাক্ষী চুপ করলেন। সুরকণ্ঠের সঙ্গে ওর বিয়ের কথা ছিল, অন্তত সুরকণ্ঠের সে-ইচ্ছে ছিল, বুনির সতাতো দিদি টুনি সুরকণ্ঠের সংসা হয়ে না এলে বিয়ে হত, এ-সব পুরনো কথা। সুরকণ্ঠের বাবা ভাইপোকে জগৎপতির বাড়ি রেখেছিলেন বিদ্যাশিক্ষার্থে। সেই সূত্রে ওরা ছোটবেলার খেলুড়ি। সুরকণ্ঠের পিসী বলতেন ঐ বিয়ে হল না বলেই ছেলেটা আধা-ক্ষ্যাপাটে হয়ে রইল।'

বুনি সে-সব জানে বলে তাঁর মনে হয় না। এখন তাঁর রাগ হতে লাগল।

'সেই আট বছর বয়সে বউ করে এনেছিলাম, আজ বারো বছর হল। এখানে ঘরও করেছ বছর-তিনচার। গ্রামের সমাজ কেমন জান না? এ কি তোমাদের শহর-বাজার?'

ফুলেশ্বরী কাঁদতে লাগলেন। চোখ ভরা জল, অভিযোগের সুরে বলতে লাগলেন, 'বাবা বলেন সায়েবকুঠির কাজে জেয়াদা মান। কুঠির কাজ বাবা নিমেষে করে দিতে পারেন, জামানতের টাকা তিনি নিজে দেবেন।'

'এ আজকের কথা নয় বুনি।

এ নিয়ে অনেক কথা আগেও হয়েছে। আমরা ছেলে বেচি না, আমরা বউ আনি। আমাদের ছেলে শ্বশুরের অন্নদাস হয় না।'

এ-কথার মধ্যে কি আশ্চর্য মন্ত্র ছিল, কথাটি যেন নিমেষে বিশালাক্ষীকে কত কত আভরণে সাজিয়ে গর্বিতা মহারাণী ক'রে দেয়। বিশালাক্ষীর মনে হয় স্বামীর শেষ আদেশ, 'ছোটবউ, গোপাল যেন জগৎ আচাজ্জির অন্নদাস না হয়। এ বংশে ছেলেরা শ্বশুরঘোরো হয় না, পরভাতা, পরঘোরো হওয়া বড় অপমান ছোট-বউ।'

কপালে স্বামীর শীর্ণ হাতের শীতল স্পর্শ পান। বড় কঠিন দায়িত্ব দিয়ে গেছলেন স্বামী। যেন কানাইকে হারাবার বেদনায় বিশালাক্ষী দিনে দিনে ভেঙে পড়বেন বলেই এমন সব গুরু কর্তব্যের ভার দিয়ে গেছলেন। কর্তব্যে বুক বাঁধতে হয়, শোক-দুঃখ নিয়ে ভেঙে পড়লে হয় না।

এখন মনে হল, স্বামী কত জ্ঞানী ছিলেন। সহসা মনে বিদ্যুৎ-চমকের মত ভেসে উঠল এ-নতুন উপলব্ধি। সংসারের মাথা যিনি, তাঁকে নিষ্ঠুর হতে হয়। স্বামীকে সেদিন বড় নিষ্ঠুর মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন মনে হতে লাগল তিনি ঠিকই করেছিলেন। যে-দায়িত্ব মেয়েমানুষের নেবার কথা নয়, সেই দায়িত্বই চাপিয়ে গেছলেন বিশালাক্ষীর ঘাড়ে। বুঝেছিলেন অমনি একটি ধ্রুবতারা চিনিয়ে না দিলে বিশালাক্ষী চলতে পারবেন না। তোমার চেয়ে তোমার কর্তব্য অনেক বড়। সেদিকে চেয়ে সব সয়ে যাও, এইটি ছিল স্বামীর শিক্ষা। যেন গঙ্গাসাগর সঙ্গমের পথে, মাঘ মাসের শীতে, দুরূহ নৌ-যাত্রার পথে বৃদ্ধ মাঝি তরুণ মাঝিকে এমনি করেই ধ্রুবতারাটি চিনিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে মরে যায়। ঐদিকে চোখ রাখতে হবে, নৌকো নিয়ে যেতে হবে, এই কর্তব্য-জ্ঞান তরুণ মাঝিকে সাহস দেয়, নইলে কুয়াশাচ্ছন্ন জলধিবিস্তার দেখে সে নিমেষে সাহস হারাত।

তিনি আবার বললেন, 'তোমার শ্বশুরের আদেশ, বড়বউ। এ-কথা তোমার অজানা নয়।'

ফুলেশ্বরীর ওষ্ঠাধর অভিমানে ফুলে ওঠে। তিনি সভয়ে বলেন, 'বাবা মানী লোক।'

'তবে তুই মানের ঘর ছেড়ে এখানে এলি কেন? ভেবেছিলি গোপাল তোর কথা মেনে নেবে?'

ফুলেশ্বরী কাঁদতে লাগলেন, 'আমার মন কেউ বোঝে না। বাবা বংশধর চেয়েছিলেন, নাতি পেয়েছেন, তিনি বলেন, এই আমার যথেষ্ট।'

'তোমার মন মানে না বড়বউ।' বিশালাক্ষী সস্নেহে জিগ্যেস করেন।

ফুলেশ্বরী মাথা নাড়লেন। বললেন, 'বাবা মা কেউ জানেন না আমি এখানে এসেছি।'

'তাই যদি হবে, তবে তুমি এখানে থাক না কেন? ছোট বউকে বিষ কর কেন? তার আর কে আছে বল?'

ফুলেশ্বরী এ-কথায় আশ্চর্য হন। তিনি জগৎপতির মেয়ে, একবার চাইতে বাবা পারলে চাঁদ এনে দেন। তিনি জানেন সংসার তাঁর জন্যে। স্বামীর ভাগ কেমন করে অন্যকে দেবেন?

'তোমার যতটুকু দাবি, ওরও ততটুকুই। ওকে বঞ্চিত করে কেমন করে গোপাল। সে কর্তব্যহীন ছেলে নয়।'

এখন বিশালাক্ষীর মনে পড়ে ওর পিসী নিদুলীকে আনতে চেয়েছিলেন গোপালের বাবা। তাঁর কথায় পিসী ছেড়ে ভাইঝিকে আনা হয়। তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কুলীনের মেয়ে, কুলীনের বউ, শত সতীনের সঙ্গে বাস করবার কথা, তোমার মা তোমায় কোন শিক্ষা দেয় নি? কেন, সে সতীন নিয়ে ঘর করে নি? আমি করি না? গোপাল আমার শান্ত ছেলে। নইলে এত-দিনে সে অনেক বিয়ে করত। এমন স্বামী লাখে হয় না, তাকে কষ্ট দাও তুমি? এত গুমোর থাকে না বুনি, একদিন এই গুমোর তোমার উঁচু মাথা ধুলোয় নামাবে। সেদিন কেঁদে কূল পাবে না।'

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ
প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর
বেজওয়াড়া - শ্রীনগর - গৌহাটী

বিশালাক্ষী ঘরের দিকে পা বাড়ালেন। বললেন, 'দাদা খবর দেবেন। তোমার বাবা যা হয় করুন। জেদ করে এলে, পরঘরে রইলে, ঠেকো হবার কথা, তা তোমার কেলেঙ্কারের ভয় মোটে নেই? ছোট না গেলে তুমি থাকবে না? এই জেদের বশে বংশের একটা ছেলে, তাকে নিয়ে ফরফরিয়ে চলে গেছলে। মেয়েমানুষের অত জেদ ভাল নয়।'

'বাবা বলেন, আচাজ্জিবাড়ির মেয়ে ঘর করতে যায় না।'

ফুলেশ্বরীর এ ধৃষ্ট, স্পর্ধিত উক্তি শুনে বিশালাক্ষী আশ্চর্য। তাঁর মুখ লাল হয়ে যায়। বলেন, 'কত বড় লোক তোমার বাবা? তাঁকে জিগ্যেস কোর শিবকালী গাঙ্গুলীর বোন ঘর করে কেমন করে? তাঁর বংশ-গৌরব আমার দাদার চেয়ে বেশি নয়। বংশগৌরব বল, ধনগৌরব বল, এখনো আমার দাদা প্রত্যহ একশোটি মানুষকে অন্ন দেন। তাঁর সবকিছু আমার গোপাল পাবে। অমন মামা, তাঁর বাড়িতে সে তে'রাত্তির বাস করে না, সে যাবে শ্বশুরবাড়ি? বড়বউ, আদরে আদরে তোমার বাপ-কাকা তোমার মাথাটি খেয়েছেন।'

বিশালাক্ষী আরো কত কি বলতেন বলা যায় না, এমন সময়ে তাঁদের বা'রবাড়ির দরজায় সোরগোল ওঠে। কার কণ্ঠে আর্ত চীৎকার। পাকশাল থেকে কুন্দ ছুটে আসে, মাথায় কাপড় নেই, ভয়ে দিশাহারা।

'কি হল?'

বিশালাক্ষী এ-কথা জিগ্যেস করতে না করতে সে আশ্রিত নেড়ামাথা বৈরাগী কি যেন বলে চেঁচিয়ে বাইরে চলে যায়।

বিশালাক্ষী দেখেন উঠোনে ধুলো-কাদায় বসে এক বৃদ্ধ। তাঁর মাথায় ফেটা, রক্ত মাখা। তিনি কুন্দর বাপের বাড়ির জ্ঞাতি।

সর্বনাশ হয়ে গেছে। এখান থেকে বর্গীরা দাঁহাপাড়া গেছল। পথে আর কোন গ্রাম বাকি রাখে নি। সকল গ্রামের লোক এখন আঁধারমাণিকের দিকে আসে। এ-পথ ধরে তারা পালাবে। সব গ্রামে আগুন জ্বলছে, ব্রাহ্মণের পুঁথিপাটা থেকে সুরু করে জেলের জালদড়ি অবধি সবই এখন পথের ধুলোয় লুটোপুটি যায়। সন্ন্যেসীরা অবধি 'শিব শিব' বলে কপনি সম্বল ক'রে দূরে দূরে পালায়।

কুন্দর বাপের বাড়ির জ্ঞাতগুষ্টি সকলেই মরেছে। 'জামাই, এখন কুন্দর মহাশৌচ।'

এ-কথা বলে বৃদ্ধ মূর্ছা গেলেন।

এক আঘাতে আঁধারমাণিক গ্রামের ভূগোলের চৌহদ্দি ভেঙে গেল। রাঢ়বঙ্গের সব গ্রামের সঙ্গে এক হয়ে গেল। একদিনে আঁধারমাণিক গ্রামটা বড় হতে হতে যেন আলীবর্দীর সুবেবাংলার সঙ্গে এক সমান হয়ে গেল। বাংলায় বর্গী।

(ক্রমশঃ)

আমাদের দেশ

বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

চারিদিকে হাহাকার ছিঁড়ে দেয় কল্পনা আমার
আবর্তিত কঠিন চিন্তায়; উর্ধ্বে 'ও কোন্ ফানুস?'
আলেয়ার রাত্রিশেষে ফিরে আসে কেন বা প্রভাত।
দ্যাখো রাজপথে নামে দিকশূন্য যান্ত্রিক মানুষ।

পুনরায় রাত্রি এলে কুকুরের অশুভ চীৎকারে
ভাঙে ঘুম। অন্ধকারে বেসামাল নিজেই প্রহরী।
লেবেল-ক্রশিং-এ কার যৌবন হারায় কাঁটাতারে।
শহরের চৌমাথায় বাজে জোরে চতুষ্টয় ঘড়ি।

পথে পথে শবদেহ। কেউ মৃত্যুলোকের পথিক—
জলের পিপাসা নিয়ে আপনার রক্ত পান করে,
বুলেটের ক্ষতচিহ্নে পদাঘাত করে যে বণিক—
ক্ষুধিতের অন্ন কেড়ে দানছত্র খোলে আড়ম্বরে।

আমরা কি মৌন রবো, অভ্যস্ত চিন্তায় মুঠি মুঠি
পবিত্র ক্রোধের জন্য চিরকাল চালাবো কোদাল।
ফসল যা ফলে মাঠে তাই খেয়ে তারা ধরে টুঁটি,
চাই অন্য পথ তাই। অপেক্ষায় আছে মহাকাল।

সমুদ্র

অজিত দে

নদীকে করেছি বন্দী স্পর্ধা তার স্তিমিত এখন।
আমার অমিতবীর্যে হিমালয় নত করে শির
প্রণত চরণতলে। পৃথিবীতে অসাধ্য সাধন
কিছু যেন নেই আর। ডুব দিয়ে গহন গভীর
আগ্নেয়গিরির গর্ভে পাতালের সঠিক খবর
তুলে আনি অনায়াসে। আমি মহাস্বপ্ন পৃথিবীর
অঞ্চলের ঘুম নেই, শুক্রলোক কাঁপে থরথর,
স্বপ্নভূমি চন্দ্রলোকে আমাদের দৃষ্টি হলো স্থির।

হে সমুদ্র। জানি আমি, শক্তিমান তুমি, মহাবীর।
তোমার প্রচণ্ড ক্রোধে পৃথিবীতে সম্ভব প্রলয়।
আমি তবু ভীত নই, পদযুগে পরাবো জিঞ্জির;
আমি মহাকাশজয়ী—চন্দ্রলোক করেছি বিজয়।

সংকুচিত করো ফণা, স্পর্ধা দ্রুত করো সংবরণ।
মনে রেখো, আমি বিংশ শতাব্দীর দুরন্ত যৌবন।।

রাজধানী .

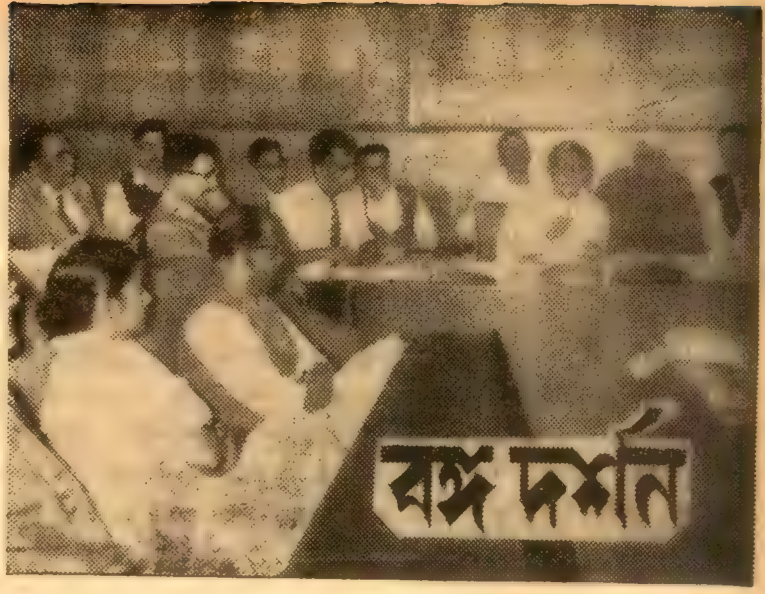

● রাইটার্স বিল্ডিংসে সরকারী কর্ম্মচারীদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন ধানকল থেকে চাল আদায়ের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছেন।

পশ্চিম বাংলার সর্বত্র এবার ধান ভাল হয়েছে। বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিদিন চাষের উজ্জ্বল চালচিত্র পাওয়া যাচ্ছে। লক্ষ্মীকান্তপুরের একজন চালের ফেরিওয়ালার মুখে সেদিন বিরাট আশার কথা শুনেছি। ওর ধারণা, এবারে মা-লক্ষ্মীর কৃপায় আমাদের ক্ষুধার যাতনা ঘুচে যাবে। নতুন চাল বেশি করে বাজারে আমদানী হলেই আমাদের আর ন্যায্যমূল্যের দোকানে ধর্ণা দিতে হবে না। ও মাথায় করে বয়ে এনে 'কণ্ট্রোলের চাইতে অনেক কম দামে' চাল আমার ঘরে পৌঁছে দিয়ে যাবে।

আকুল আগ্রহে সরল বিশ্বাসী ফেরিওয়ালার কথা শুনেছি সেদিন; আর মনে মনে বলেছি তুমি ভ্রান্ত। এ-বিভ্রান্তি শুধু তোমাকে নয়, আমাদের যাঁরা নায়ক তাঁদেরও মোহাবিষ্ট করে রেখেছে। ফসল হলেই আমাদের ফাঁড়া কাটবে না। মুনাফাশিকারীদের গ্রাস থেকে সে-ফসল রক্ষার ব্যবস্থা না করতে পারলে আমাদের ভোগে আসবে না। তারা এর মধ্যেই জাল বিস্তার করে বসে আছে।

এই চক্রান্তজালকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেবার, মুনাফাবাজদের করালগ্রাস থেকে আমাদের ক্ষুধার অন্ন ছিনিয়ে আনার কোন সক্রিয় ব্যবস্থাই আমাদের সদাশয় সরকার বাহাদুর এখনও করে উঠতে পারেন নি। সরকার পক্ষের তোড়জোড়ের পালাটাই এখনও সাঙ্গ হয় নি। ধান সংগ্রহের ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট নির্দেশই মহাকরণের মহাজনদের কাছ থেকে জেলাশাসকদের কাছে যায় নি। সুস্পষ্ট আদেশ না থাকাতে জেলাশাসকগণ নিজেদের খেয়ালখুশিমত পদ্ধতি গ্রহণ করছেন। কেউ শরণাপন্ন হয়েছেন সমবায়সমিতি ও গ্রাম-পঞ্চায়েতের। যাঁরা গ্রাম-পঞ্চায়েতের পাঁচমিশালী নেতৃত্বের ওপর দায়িত্বভার ন্যস্ত করতে সাহস পাচ্ছেন না, তাঁরা সমবায়সমিতির মাধ্যমে ধান সংগ্রহের ব্যবস্থা নিয়ে এখন ব্যস্ত। একটি জেলায় নাকি এর মধ্যে সমবায়সমিতির মাধ্যমে ছ'হাজার মণ ধান সংগ্রহও করেছেন। কোন কোন জেলাশাসক আবার ধান সংগ্রহের দায়িত্বটা পুরোপুরি ব্যবসায়ী-দের হাতে ছেড়ে দেবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন।

গেল সপ্তাহে রাইটার্স বিল্ডিংসে ধানকলগুলো থেকে চাল আদায়ের ব্যাপার নিয়ে জোর সম্মেলন হয়েছে। সে সম্মেলনে জেলাশাসক, বিভাগীয় কমিশনার, পুলিশ, এমন কি হোম-গার্ডের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। কোন কোন জেলাশাসক ধানকলের গোটা চালই লেভী করার প্রস্তাব করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের বাইরে যেতে পারেন নি। তিনি জানিয়েছেন, ধান-কলের উৎপন্ন চালের পঞ্চাশ ভাগ লেভী প্রথায় আসবে সরকারের হাতে। বাকীটাও যাতে একেবারে হাতছাড়া হয়ে গোপন গর্তে চলে না যায়, তার জন্যে জেলা-শাসকের কাছে হিসেব দাখিল করতে হবে সংশ্লিষ্ট মিলমালিককে।

উত্তম এ-ব্যবস্থা। তবে, এ-ব্যবস্থা নতুন নয়—আগেও ছিল। এবারে লেভীর পরিমাণটা বৃদ্ধি করা হয়েছে মাত্র। এই উত্তম ব্যবস্থা সত্ত্বেও ব্যবসায়ীদের কাছে আমাদের বারবার নাজেহাল হতে হয়েছে। তারা পদে পদে সরকারকে ফাঁকি দিয়ে বাজারে সৃষ্টি করেছে অরাজকতা। সেই ফাঁকির রাস্তাটা বন্ধের কি ব্যবস্থা সরকার করবেন, তারই ওপর নির্ভর করবে ভবিষ্যতের সাফল্য।

সরকার ধান আটকের অভিযান করেছিলেন। তা' নিয়ে হাল-ফ্যাসানের হৈ-হল্লাই কেবল সার হয়েছে—সমস্যার তেমন কোন ফয়সালাই হয় নি। দেখা গেছে, বড় বড় জোতদারের ঘরে অভিযানের দিন তারিখ ও সময় পর্যন্ত গোপন ছিল না। এ-গ্রামে যখন অভিযাত্রীদের আনাগোনা চলেছে, তখন ও-গ্রামের মানুষকে সজাগ হতে বলা হয়েছে। জোতদাররা, মজুত-দাররা সুযোগ পেয়েছে গুদাম শূন্য করে ধান লুকিয়ে ফেলার। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ধান চলাচল করেছে সারা-রাত। সামান্য পরিমাণ যে ধান আটক করা হয়েছে, তা তুলে আনতে গিয়ে বেশি দাম দিয়ে ব্যবসায়ীরা লুকোনো ধানটাও কিনে এনেছেন।

শাসনযন্ত্র ও ব্যবসায়ীমহলের এই লুকোচুরির খেলাটা যতদিন বজায় থাকবে, ততদিন মা-লক্ষ্মী ঝাঁপি উজাড় করে দিলেও সমস্যার সমাধান হবে না। শস্য ভাল হলেই ভারতের ভাবনা দূর হতে পারে না।

• • •

চতুর্থ পরিকল্পনায় ছ' কোটি টাকা ব্যয়ের একটি রূপরেখা পশ্চিম বাংলা সরকার রচনা করেছেন। পরিকল্পনা কমিশন প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনার পর রাজ্য সরকারকে পাঁচ শ' আশী কোটি টাকার মধ্যে পরিকল্পনাকে সীমিত করার অনুরোধ জানিয়েছেন। সরকার চতুর্থ পরিকল্পনায় কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে বেশি যত্ন নেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপের নির্দেশটা পরিকল্পনা কমিশনের কাছ থেকে এসেছে। সারা ভারতেই এই নীতি অনুসারে কাজ হবে চতুর্থ পরিকল্পনাকালে।

ক্ষেতের উৎপাদিকাশক্তি বাড়াতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন মাটির তৃষ্ণা নিবারণের ব্যবস্থা করা। তারপর তার গুণাগুণ বিচার করে সার ও ভাল বীজ চাষীর ঘরে পেঁ।ছে দিতে হবে। সেচের জন্য নয়া নক্সায় যে-পরিমাণ অর্থের বরাদ্দ করা হয়েছে, তাতে নতুন করে কোন সেচ-প্রকল্পে নামা রাজ্য সরকারের পক্ষে সম্ভব হতে পারে না। কংসাবতী পরিকল্পনা ও ময়ূরাক্ষীর বাকী দাবিটা মিটিয়ে নতুন কোন সেচের কাজে হাত দেবার মত উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারের হাতে থাকবে না।

• • •

সাম্রাজ্যবাদী শাসকের চক্রান্তে বাঙালী প্রায় সর্বস্ব হারাতে বসেছিল। বাঙালীর হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়েছিলেন সেকালের শাসকগোষ্ঠী। একটি একটি করে শিল্প তাকে ছাড়তে হয়েছিল বিদেশী বণিকের অত্যাচারে। বাণিজ্যের ক্ষেত্র থেকেও তাকে সরে দাঁড়াতে হয়েছিল একই কারণে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের চাকার নিষ্পেষণ বাঙালীর জ্ঞানভাণ্ডারকে ভেঙে খানখান করতে পারে নি। জ্ঞানের সাধনা নিয়ে জাতি হিসেবে বাঙালী বেঁচে ছিল। শিক্ষামন্ত্রী শ্রী এম সি চাগলা এই কথাটাই নাকি পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বাংলা এক সময়ে শিক্ষাক্ষেত্রে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। তার স্থান ক্রমাগত নেমে যাচ্ছে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিম বাংলা অনেক পিছনে পড়ে আছে। এর কারণও তিনি উল্লেখ করেছেন। শিক্ষার প্রসারে রাজ্য

শ্রীচাগলা

সরকারের চূড়ান্ত শ্লথ গতিই এর প্রধান কারণ। কলকাতা মহানগরী এবং শহরাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য রাজ্য সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন, তাও নাকি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী জানতে চেয়েছেন।

শিক্ষাদপ্তরের বড়কর্তা-ব্যক্তি যেদিন দিল্লী থেকে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের অনুগ্রহে পশ্চিম বাংলার বুকে চেপে বসেছেন, তারপর থেকেই মা-সরস্বতীর আসন টলেছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে ধীরে ধীরে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তরের প্রস্তাব এলে কর্তারা নাসিকা কুঞ্চিত করে তার না-গ্রহণ, না-বর্জনের নীতি অনুসরণ করে চললেন। শিক্ষার একমাত্র উপকরণ একটি বেত ভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে আর কিছু বরাদ্দ করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হল না। অন্যান্য রাজ্য বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রসারের অর্থটা হাতে পেয়ে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দিল শিক্ষার আলোকবর্তিকা।

মাধ্যমিক স্তরের পুনর্বিন্যাসের ব্যাপার নিয়েও একই পদ্ধতি অনুসরণ করলেন আমাদের শিক্ষাদপ্তরের পরিকল্পনাকারগণ। তাতে শিক্ষাক্ষেত্রে সৃষ্টি হ'ল অরাজকতার। একাদশ শ্রেণী খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েও আন্তরিকতার সঙ্গে তাকে রূপ দিতে অগ্রসর হলেন না। পাঠ্যতালিকা প্রণয়নের কাজেও গাফিলতির অভাব ছিল না। শিক্ষার প্রসারের দিকে নজরটা না দিয়ে—ছাত্র ও শিক্ষকের প্রয়োজনটা উপেক্ষা করে, লাখ লাখ টাকা ব্যয় করলেন বিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণের কাজে। তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স প্রবর্তনের প্রশ্ন নিয়ে রঙ্গ তামাসাও কম হয় নি।

এর পরিণতি ভাল হতে পারে না। বিদ্যামন্দির থেকে বিদ্যাদেবী নিলেন সসম্মানে বিদায়। শিক্ষার পরিবর্তে অশিক্ষা অনেক মন্দিরে বাসা বাঁধতে সুরু করলো। বিদ্যালয়ের পবিত্র প্রাঙ্গণ হল কলুষিত—রাজনীতি সেখানে উঠলো দানা বেঁধে। শিক্ষার মানের কোন বালাই আর রইল না। আজ তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষা গ্রহণের দিনে বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রশ্নপত্রের পরিবর্তন করে ছাত্রদের মনোরঞ্জন করতে দেখা যাচ্ছে। এর চাইতে দুঃখের আর কিছু হতে পারে না। যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধি নিয়ে দু'দিন পরে বেরিয়ে এসে জাতি গঠনের কাজে করবে আত্ম-নিয়োগ, তাদের কাছ থেকে অভিযোগ উঠেছে প্রশ্নপত্র সম্পর্কে। সে অভিযোগ মেনে নিয়ে সহজ প্রশ্ন সন্নিবেশিত করতে হয়েছে। এর

চাইতে লজ্জার আর কিছু হতে পারে না। শিক্ষার মান কতটা হ্রাস পেয়েছে এর চাইতে বড় নজীর দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

কেবল শিক্ষার মান নয়, শিক্ষার ক্ষেত্রে উচ্চ আসন অধিকার করে যাঁরা বসে আছেন, পরীক্ষা ব্যবস্থা যাদের হাতে, তাঁদের দায়িত্ববোধের কথাটাও সেইসঙ্গে এসে পড়ে। প্রশ্নপত্র পরীক্ষাককে কেন পাল্টাতে হবে ? এ অধিকার সত্যি কারও আছে কি ? প্রশ্নগুলো ছাপাতে পাঠাবার আগের কর্তব্যগুলো ঠিক ঠিক পালিত হলে পরীক্ষার হলে এমন কেলেঙ্কারী হতে পারে না।

শ্রীচাগলাকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তিনি চোখে আঙুল দিয়ে যা দেখিয়েছেন, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। পশ্চিম বাংলার শিক্ষাদপ্তরের গাফিলতি, নীতিনির্ধারণে অস্থির মনোভাবেই বাংলার শিক্ষার সঠিক কাঠামো এখনও গড়ে উঠতে পারে নি। বিজ্ঞানের যুগে শিক্ষার প্রসার পর্যাপ্ত অর্থ ছাড়া হওয়া সম্ভব নয়। পশ্চিম বাংলার হৃত গৌরব উদ্ধারে কেন্দ্রের অর্থানুকূল্য প্রয়োজন। শ্রীচাগলা সেদিকে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন। চতুর্থ পরিকল্পনায় রাজ্য সরকার শিক্ষার জন্য একশ' তিরিশ কোটি টাকা ব্যয় করা ঠিক করেছিলেন। পরিকল্পনা কমিশনের কলমের খোঁচায় তা' দাঁড়িয়েছে উনপঞ্চাশ কোটিতে। শোনা যাচ্ছে, রাজ্য সরকার তাকে টেনে আবার সত্তর কোটিতে তোলার চেষ্টায় আছেন। পরিকল্পনা কমিশন সদয় হলে পশ্চিম বাংলা চতুর্থ পরিকল্পনায় কিছুটা এগিয়ে যেতে সমর্থ হবে।

মেদিনীপুর :

মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেসের দুই শিবিরের মল্লরা মালকোঁচা এঁটে সম্মুখসমরে নেমে পড়েছিলেন। কয়েক চক্কর পায়তারা কষে, ঘন ঘন উরুদেশে প্রহার করে পরস্পর পরস্পরকে লড়াইয়ের আহ্বান জ্ঞাপনের পর্বটাও শেষ হয়েছিল। স্বয়ং প্রফুল্লদা এঁদেরকে বিরত করতে পর্যন্ত পারেন নি। অবস্থা খারাপ দেখে পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের আসল মুরুব্বিকে আসরে নামতে হয়েছিল। অবস্থা খারাপ দেখে অতুল্যদা অনুগামীদেরই রাশ ধরে টেনে দিতে বাধ্য হয়েছেন। শ্রীমতী আভা মাইতি, শ্রীপ্রবীর জানা, শ্রীসুবোধ জানা প্রমুখ অতুল্যদার অত্যন্ত স্নেহভাজন। দুষ্ট লোকে বলে অতুল্যদাই এ শিবিরের আসল শক্তি। দুর্জনের কথা বাদ দিলেও খোঁটার জোরে প্রবাদবাক্য উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সেই জোরেই এ শিবিরের পক্ষ থেকে মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাপতি পদের জন্য শ্রীচারুচন্দ্র মোহান্তিকে মনোনীত করা হয়েছিল।

জেলা পরিষদই এখন হয়েছে রাজনীতির প্রধান ক্ষেত্র। অনেক টাকা-পয়সা লেন-দেনের ব্যাপার যেখানে দল রক্ষার পক্ষে, সে সংস্থা হাতছাড়া করা বুদ্ধিমানের কাজ নিশ্চয়ই নয়।

● শ্রীপ্রবীর জানা

এই জেলা পরিষদ দখলের সংগ্রামটা মেদিনীপুরেই সীমাবদ্ধ নয়। এ নিয়ে আরেকটি জেলার জেলা কংগ্রেসের গোটা সংগঠনেই ফাটল ধরে আছে। তবে, সেখানে মেদিনীপুরের মত বে-সামাল অবস্থা হয়ে ওঠে নি।

শ্রীচারু মোহান্তি ও শ্রীপ্রবীর জানার উত্তরোত্তর শক্তি বৃদ্ধিতে

● শ্রীচারু মোহান্তি

যাঁরা নাস্তানাবুদ হয়ে উঠেছিলেন, জেলা পরিষদ ভাল মানুষের মত ছেড়ে দেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এ সংস্থাটি বিপক্ষের হাতে চলে গেলে এঁদের পড়তে হয় গিয়ে একেবারে সর্বহারার দলে। অতুল্যদার অনুগতদের লম্ফ-ঝম্প দেখে এঁরা বাধ্য হয়ে প্রয়োগ করলেন মোক্ষম অস্ত্র। তাঁরা জেলা পরিষদের সভাপতি পদের জন্য মনোনীত করে বসলেন মেদিনীপুরের অবিসম্বাদী নেতা খোদ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়কে। শ্রীসুনীল ধাড়া, শ্রীমৃত্যুঞ্জয় জানা, শ্রীসতীশ সামন্ত প্রমুখ নেতাদের অনুরোধ এত সহজে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রক্ষা করবেন অপর শিবিরের কর্মকর্তারা ভাবতেও নাকি পারেন নি। অঘটন যখন ঘটে গেল, তখন পিছিয়ে যাওয়াও সহজ নয়। কাজেই উভয় পক্ষে পড়ে গেল সাজ সাজ রব।

অতুল্যদা বিচক্ষণ ব্যক্তি। নিষ্ঠাবান, আদর্শ চরিত্রের মানুষ শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সম্মুখ-সমরে জয়লাভ আশাতীত। চতুর সংগ্রামী

মাত্রেই পরাজয় বরণের চাইতে সুকৌশলে পিছু হঠে যাওয়ার নীতিতে বিশ্বাসী। এ নীতি অনুসরণ করে অতুল্যদা সর্বভারতীয় রাজনীতিতে সুনাম অর্জন করেছেন। শ্রীকামরাজ নাদারকে কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনের প্রস্তাবটাও তাঁকেই করতে হয়েছিল। মেদিনীপুরের প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরের সমঝোতার আর কোন উপায় না দেখে তিনি শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়কেই জেলা পরিষদের সভাপতি ঘোষণা করেছেন। উভয় পক্ষই অবশ্যি তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নিতে সম্মতও হয়েছিলেন। এ পক্ষকেও একেবারে নিরাশ করেন নি। সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন, এ-পক্ষের নেতা শ্রীরাসবিহারী পাল। এতে প্রবীর জানার দল নাকি মোটেই সন্তুষ্ট হন নি। অসন্তোষ প্রকাশ করতে তাঁরা কুণ্ঠাও করেন নি। অতুল্যদার সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর এ-পক্ষ বেঁকে বসেছিলেন।

এ-দিকে দুর্গাপুরের কংগ্রেস অধিবেশন আসন্ন। পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসের বিভিন্ন জেলার বিবদমান শিবিরে সংঘর্ষের কাহিনী বাইরে এখনও ছড়িয়ে পড়ে নি। উড়িষ্যা, বিহার, উত্তর প্রদেশ, কেরল, মধ্যপ্রদেশের, মত পশ্চিম বাংলার বিবদমান শিবিরের কর্মী ও নেতারা উগ্র নন। সর্বভারতীয় কংগ্রেসমহলে সেজন্য অতুল্যদার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বেড়েছে অনেক। কাজেই দুর্গাপুরের অধিবেশনের প্রাক্কালে পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের কেলেঙ্কারী প্রকাশের বিরূপ প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। শ্রীমতী আভা মাইতি ও শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্য কলকাতা যাত্রা রদ করলেন। মুখ্যমন্ত্রীকে জানালেন, মন্ত্রিসভার বৈঠকে যোগ দিতে পারছেন না। চললো গোপন বৈঠকের পালা। উত্তেজিত কর্মীদের চেতনা উদ্রেকের শুভপ্রচেষ্টা। শেষে ঠিক হলো অতুল্যদার সিদ্ধান্ত অলঙ্ঘনীয়।

এ-জোড়াতালি কতদিন টিকে থাকবে বলা শক্ত। প্রভাবশালী সদস্যরা উপরোধে ঢেঁকি গেলার মত যা' আজ গ্রহণ করলেন, তা' মেনে চলবেন কি না, এ-সংশয় এখনও সাধারণ কর্মীদের মন থেকে দূর হয় নি।

নদীয়া :

আট মাস আগে কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপকদের জন্য পাঁচটি গৃহনির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এই গৃহনির্মাণের কাজে। এগুলোর তদারকের জন্য মাসে মাসে আড়াই শ' টাকা করে সরকারের কোষাগার থেকে গচ্চাও যাচ্ছে। অধ্যাপকদের কেউ নতুন বাড়িতে উঠতে পারেন নি। পাঁচটি গৃহের বিশটি ফ্ল্যাটের ভাড়া বাসে হাজার টাকার কম নিশ্চয়ই হতো না।

● শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়

আমাদের পূর্তদপ্তর অথবা শিক্ষা-দপ্তরের এর জন্য কোন উদ্বেগই নেই। গৃহগুলোতে এখনও বিদ্যুতের ব্যবস্থা হয় নি। সর্বোপরি গৃহের প্রতি ফ্ল্যাটের ভাড়া কত হবে তাও সরকার ঠিক করে উঠতে পারেন নি।

একই কারণে নবনির্মিত ছাত্রাবাস খালি পড়ে রয়েছে। ৬৬ জন ছাত্রের বাসের উপযোগী গৃহটিতে এখনও বিদ্যুতের আলো যায় নি।

মুর্শিদাবাদ :

মুর্শিদাবাদ জেলায় রুটি ও বিস্কুট তৈরির কারখানার সংখ্যা প্রায় একশ'। একমাত্র বহরমপুর শহরের কয়েক শ' পরিবারের জীবিকা নির্ভরশীল এই ব্যবসার ওপর। বহরমপুরে বর্তমানে 'বেকারী' রয়েছে বাইশটি। ময়দার অভাবে এগুলোর ইতিমধ্যেই নাভিশ্বাস উঠেছে। পুজোর প্রায় দেড় মাস আগে এ-সব এলাকায় ময়দার অনটন সুরু হয়। তার পর থেকেই তদ্বির-তদারক কম হয় নি।

আমাদের সরকার বাহাদুরের আমলারা প্রথম দিকে অনেক আশ্বাস-বাণীও শুনিয়েছেন। তাতে কাজ তেমন কিছু এগোয় নি—ঝঞ্ঝাটই বেড়েছে বেশি করে। খাতা-পত্র, হিসেব-নিকেশ দাখিলের ঝামেলাটা চুকিয়ে কেউ কেউ সমিতির মাধ্যমে সরবরাহ দপ্তরের কর্তাদের সন্তুষ্ট করে যে-পরিমাণ ময়দা পেয়েছেন—প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই সামান্য। সপ্তাহে যেখানে দরকার আটশ' মণের, সেখানে ময়দা সরবরাহের ব্যবস্থা হয়েছে মাত্র এক-শ' মণ। এ-ব্যবস্থাও নিয়মমাফিক চালু নেই। গেল তিন মাসে দু'বারের বেশি ময়দা নাকি কোন বেকারীর ভাগ্যেই জোটে নি।

স্থানীয় হিন্দু, মুসলমান এবং বহু উদ্বাস্তু পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের আর কোন ভিন্ন পথ নেই। তারা অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়েছে। এই বিপদের মুখে আরেকটি সংবাদ ছড়িয়ে পড়ায় সকলেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। কলকাতার একটি বড় বেকারীর মালিক নাকি সারা মুর্শিদাবাদের একচেটিয়া ব্যবসা পরিচালনার পরিকল্পনা রচনা করেছেন। এ-সংবাদ ভিত্তিহীন না হলে, খুবই ভাবনার কথা। পরিকল্পনাটি বাস্তবে রূপায়িত হলে বেশ কয়েক হাজার পরিবারের রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

• • •

মাসের অতিবৃষ্টি ও অকালবর্ষণে ধানের যেরূপ ক্ষতির আশঙ্কা করা গিয়েছিল তা হয় নি। বরং এবারের ধান আশার সঞ্চারই করেছে। পর পর তিনটি বছর অজন্মা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ জেলার অর্থনীতিকে পর্যুদস্ত করে তুলেছিল। চাষীদের হতাশ জীবনে আশার আলো দেখা দিয়েছে—ক্ষেতের সোনালি ফসল চাষীর মুখে হাসি ফুটিয়েছে। এমন ভাল ফলন নাকি অনেকদিন হয় নি। কৃষিজীবীমহলের ধারণা, গেল বছরের তুলনায় এবারে ধান উৎপন্ন হবে দ্বিগুণ। ধান কাটা সুরুও হয়েছে। নতুন চাল বাজারের আমদানী বাড়িয়েছে। নতুন চাল বিক্রি হচ্ছে প্রতি মণ আটাশ টাকা।

* * *

কান্দী, বরোয়াঁ, বহরমপুর ও বেলডাঙ্গায় ধানের পরই হয়ে থাকে আলুর চাষ। গেল বছরেও এ-জেলায় আলুর চাষ হয়েছিল প্রায় সাড়ে ছ' হাজার একর জমিতে। অসময়ের বৃষ্টির জন্য আলুর চাষ সুরু হয়েছে দেরিতে। আলুর চড়া দাম দেখে এ-বছর চাষীরা একটু উৎসাহী হয়ে উঠেছিল। আশা ছিল বিরাট। এখন কিন্তু কেউ আর ভরসা পাচ্ছে না। আলুবীজের দাম উঠেছিল বিয়াল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকায়। শেওড়াফুলির বীজের ওপরই এ-জেলা নির্ভরশীল। এই বেশি দামটা গুণে দিয়ে যারা অতি উৎসাহে বেশি আলু জমিতে ফেলেছিল তারা এখন প্রমাদ গুণছে। ব্যাপক আকারে আলুতে রোগ ধরেছে। এ-রোগের প্রতিষেধক চাষীর জানা নেই। একমাত্র ভরসা সরকারের কৃষি-দপ্তর। তাদের কাছ থেকে আশানুরূপ সাহায্য ও সহায়তা যথাসময়ে পাওয়া যায় নি। কাজেই আলুর চাষে চাষীর সর্বনাশ হওয়ার সম্ভাবনাটাই বেশি।

* * *

সাঁইথিয়ার নামজাদা ব্যবসায়ী শ্রীওঙ্কারনাথ সারদাকে গ্রেপ্তারের ফলটা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছেন মুর্শিদাবাদের মা-বোনেরা। ওঙ্কারনাথের গ্রেপ্তারের পরই লরী করে বীরভূমের বাজারে বাজারে তেল পেঁাছে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুর্শিদাবাদে সুরু হয়েছে তেলের হাহাকার। এ-জেলায় তেল আসতো সাঁইথিয়া, মল্লারপুর প্রভৃতি এলাকা থেকে। ওঙ্কারনাথের গ্রেপ্তারে নাকি সব ওলট-পালট হয়ে গেছে। এই ধুয়া তুলে এখানকার ব্যবসায়ীরা বাজার গরম করে ফেলেছে। তেলের দাম হাঁকছে সাত টাকা কে-জি। তাও সহজপথে পাওয়ার উপায় নেই। খোলাবাজারের তেলের ভাঁড় একেবারে শূন্য। গোপনপথে কমপক্ষে সাড়ে ছ'টি টাকা দিতে পারলে এক কে-জি তেল নামধেয় তরল পদার্থটি মিলছে। এ-তেল কতটা খাঁটি, ব্যবসায়ীদের

● শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্য

মতে সে প্রসঙ্গ উত্থাপন একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। তাদের মতে নির্ভেজাল খাঁটি কথা হল, যাও পাওয়া যাচ্ছে তাও ক'দিন পর আর জুটবে না। খুব কৌশলে এবারে মুর্শিদাবাদের ব্যবসায়ীরা ফাঁদটি পেতেছে। দিশেহারা মানুষ বাধ্য হচ্ছে সে ফাঁদে পা দিতে।

বর্ধমান ঃ

পশ্চিম বাংলা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের যোগাযোগটা আরও নিবিড় করে উন্নয়নমূলক কাজগুলো ত্বরান্বিত করার প্রসঙ্গ কিছুদিন আগে তুলেছিলেন কেন্দ্রীয় কর্তা-ব্যক্তিরা। বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে নিবিড় যোগসূত্রের অভাবেই পশ্চিম বাংলা কৃষি উৎপাদনে পিছিয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল। কেন্দ্রীয় কর্তাদের বোধ হয় গৌরী সেনের টাকার মহিমাটা জানা নেই। সে কাহিনী যাঁরা অবগত আছেন তাঁরা একটু সতর্ক হয়ে তাকালেই দেখতে পাবেন—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের আমলেও গৌরী সেনের ধারাটা অবিকল বহাল রয়েছে। টাকার মায়াটা আমাদের আঁকড়ে ধরতে পারে নি। প্রতিদানের কথাটা বেমালুম ভুলে গিয়ে সরকার টাকা খরচ করে চলেছেন।

কালনা মহকুমার পূর্বস্থলী থানার জলকষ্ট নিবারণের জন্য জলের মত টাকা খরচ হয়েছে। সতেরটি গভীর নলকূপ খনন করা হয়েছে পঁচাত্তর হাজার থেকে আটাত্তর হাজার টাকা ব্যয় করে। সব অকেজো হয়ে পড়ে আছে। সেচদপ্তর তার কাজ করেছেন। কাজেই সেচমন্ত্রী শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্য মুক্ত। বিদ্যুৎ না হলে জল নল বেয়ে মাঠে এসে পড়তে পারে না। বিদ্যুৎ কবে আসবে, কেউ সঠিক বলছেন না। এখন শোনা যাচ্ছে, চতুর্থ পরিকল্পনার শেষের দিকে এ-এলাকা আলোকিত হতে পারে।

পূর্বাপর চিন্তা না করে পূর্বস্থলীতে সরকার পৌনে এক লাখ টাকা ব্যয় করার আগে বিদ্যুতের সংস্থান আগে করলে টাকাগুলো মাঠে মারা যেতো না। গভীর নলকূপগুলো চতুর্থ পরিকল্পনার শেষের দিক পর্যন্ত অকেজো থাকলে তা' যে আর কোনদিন কাজের উপযোগী হবে না, একথা সেচদপ্তরের ইঞ্জিনীয়ারগণ ভাল করেই জানেন। যতদিন বিদ্যুতের ব্যবস্থা না হয় ততদিন বড় বড় গভীর কূয়ো খনন করে মাঠে জলসেচের ব্যবস্থা করলে সে টাকার প্রতিদান পাওয়া যেতো। পশ্চিম বাংলার অন্নকষ্টের সামান্য সুরাহাও তাতে হতো।

পাঠক মন

'সাপ্তাহিক বসুমতী'কে ধন্যবাদ যে 'সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর'-এর মতো জ্ঞানগর্ভ আনন্দদায়ক একটি রচনা নিয়মিত উপহার দিয়ে চলেছে এর পাঠকদের। রচয়িতাকে ধন্যবাদ দেওয়া ধৃষ্টতামাত্র।

'সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর' নামটা দেখে এবং দু-এক কিস্তির রচনা প'ড়ে প্রথমটা ভেবেছিলাম সব দেশেরই সাহিত্যসেবী লেখকদের ভাব-ভাবনার আভ্যন্তরীণ সাদৃশ্য দেখানোই বুঝি লেখাটির উদ্দেশ্য। মানুষের দেহমন সাধারণত একই উপাদানে গঠিত, একই মাটির ছেলে, মানুষ আমরা। আমাদের সবার দেহে যেমন একই রঙের রক্ত প্রবাহিত, মনের ধমনীতেও তেমনি—সবার শোণিতে, রয়েছে ধ্বনিতে একই বিচিত্র সুর। ভেবেছিলাম, সেই অখণ্ড বিচিত্র সুরটাকেই বুঝি কান পেতে শুনতে চান লেখক, শোনাতে চান আমাদের। নিজের মনকে তাই প্রতিপক্ষ খাড়া ক'রে তিনি শুনিয়েছিলেন—'মিল তো সকলের সংগেই সকলের। যে দেখতে চায় তারই চোখে পড়ে।' উদাহরণ-স্বরূপ তিনি মিলিয়ে দিয়েছিলেন বাংলার ১৪০০ সালের সংগে ইংরেজী ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দের কাব্যানুভূতি। রবীন্দ্রনাথ আর টমাস হার্ডি, দুজনেই তো স্বকালের সকাল ছেড়ে পরকালের বি-কালে উপস্থিত। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মশায়ের ঘড়ির কাঁটার মত দুই কবিরই মনের ও চেতনার ঘড়ি একশো বছর অগ্রগামী। অতএব মিল। Great men think alike.

কিন্তু যতই এগিয়ে যাই, ততই ভুল ভাঙে। আরও দু-এক কিস্তির রচনা পড়ে ভাবতে থাকি, কার সংগে কার কোথায় কতটুকু মিল আছে সেটা খুঁজে বের করা রচনাটির মূল কথা নয়। মিলটা তো মূল, স্বীকৃত থিওরি। বরং বৈচিত্র্যময় স্বকীয়তাই আমাদের জীবনের ফুল-পাতায় সাজানো বহুমুখী ডালপালা। তাই স্বকীয়তার কে কোথা ভাস্বর সেইটা বুঝিয়ে দেওয়াই বুঝি শ্রদ্ধেয় লেখকের উদ্দেশ্য। তাই বুঝি বৃটেন থেকে বাংলা, জাপান থেকে জার্মানী জুড়ে সংখ্যায় সংখ্যায় এই ডালপালা বিস্তার। তাই বুঝি বাক্কার এত কপচানী। কিন্তু তাও না। যতই এগিয়ে যাই, ততই ভুল ভাঙে, ভুল বাড়ে। পেছনের ভুলের সীমানা পেরিয়ে নতুন ভুলের এলাকায় পড়ি। এই বিস্ময়কর ভ্রান্তি-বোধ যে কত আনন্দের, তা এর নিষ্ঠাবান পাঠকমাত্রই অনুভব ক'রে থাকবেন। অবশ্য আমি আমার মতো অদগ্ধ পাঠকের কথাই বলছি। বিদগ্ধ-বিদ্বান পণ্ডিত পাঠকের অনুভূতি স্বভাবতই স্বতন্ত্র।

লেখকের নিজের উদ্দেশ্যটা এই সেদিন মাত্র উচ্চারিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন—'সাহিত্যের কোনও কোনও প্রয়াস, কোনও কোনও কৃতিত্বের নমুনা ধ'রে ধ'রে শুধু আমার নিজের প্রতিক্রিয়া লিখে যাওয়াই আমার উদ্দেশ্য।' অর্থাৎ—ভুরি-ভোজনের পর সতৃপ্ত উদ্গারণ। সাহিত্যের ভোজবাড়িতে আকণ্ঠ খেয়ে এসে ঘরে বসে আরামের ঢেকুর তোলা। তাই সই,—আমরা ইতর-পাঠকজনেরা ঘ্রাণেই ভোজনের অর্ধেকটা সেরে নেওয়ার লোভে পড়তে থাকি 'সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর।' কিন্তু হায়, অর্ধ ভোজন কেন, সিকি ভোজনের সুখও পাওয়া গেল না। ঘ্রাণে ঘ্রাণে শুধু বেড়ে যায় অতৃপ্ত ভোজন-লালসা। এতদিন ধরে যা পড়লাম তাতে শুধু সূর্যের দিকে পিঠ রেখে রোদ পোহানই হ'ল, ভরসা ক'রে সাহিত্যের সূর্যের দিকে যখনই তাকাতে গেছি, চোখ ধাঁধিয়ে গেছে।

ওটা দুঃখের কথা নয়, আনন্দের কথা। কিন্তু একটা দুঃখের কথাও বলি। সাহিত্যের দেশ-দেশান্তরে দেশান্তরের সাহিত্যই বেশি দেখা দিচ্ছে, সে অনুপাতে স্বদেশের সাহিত্য কম আসছে না কি? দেশের সাহিত্যে কি এমন কৃতিত্ব অপ্রতুল, যা নিয়ে বিস্ময় বোধ করতে পারি? হয়ত তাই, এবং হয়ত এও সত্য যে, বাংলা সাহিত্যে সেই বিস্ময়কর কৃতিত্বের অভাবের মূলে রয়েছে রবীন্দ্র-শরতের উত্তরসাধকদের 'একটানা ভেরী বাজানোর' অর্বাচীন উল্লাস। আমাদের দেশে খাদ্যের বাজারে উৎপাদনে ঘাটতির ওপরও আছে ব্যবসায়ীর কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি, কিন্তু সাহিত্যের বাজারে রীতিমত 'সাহিত্য-স্ফীতি' দেখা দিয়েছে বৈকি। বাইরে থেকে আনা রাসায়নিক সার প্রয়োগে আমাদের সাহিত্যের ফসলগুলি হয়েছে আকারেও বড়, ওজনে ভারী, দেখতেও সুদৃশ্য; কিন্তু হয়ত তাতে বাঞ্ছিত পরিমাণ 'সাহিত্যপ্রাণ' বস্তুটা নেই। নেই থাক, তবুও মাননীয় লেখকের স্বচ্ছন্দ আলোচনায় এই নতুন বঙ্গজ ফসলের কিছুটা ঘ্রাণ পেলে সুখী হতাম। আমার অধীরতা অবশ্যই মার্জনীয়।

এম রায়হানউদ্দিন। আমতা (হাওড়া)

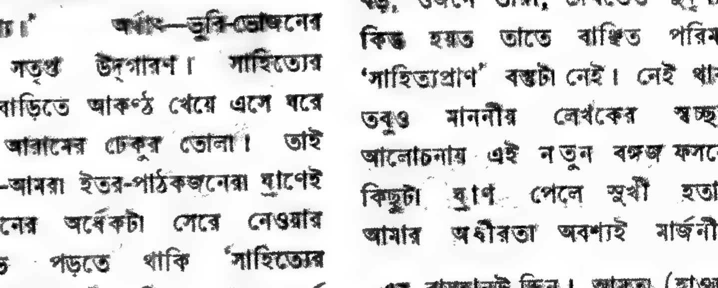

রঙ্গজগৎ

● শার্লি ম্যাকলিন—হলিউড থেকে ভুটা'

হিন্দী ছবিতে সাঁতারপব

ওরা সংকল্প করেছে সিনেমা দর্শকদের সাঁতার শেখাবে! বাস্তব জীবনে যদি না পারেন, তবে ছবিঘরে বসে মনে মনে সাঁতার কাটিতে দোষ কি? সেই সুযোগটুকুই তো হিন্দী ছবির মাথামোটা পরিচালকরা আপনাদের দিতে চায়। হলিউডের প্রযোজকরা 'বেদিং বিউটি'র মত ছবি করেছিল, কোন কোন ছবিতে সাঁতারের দৃশ্যও আছে। দেখেই হিন্দী ছবির পরিচালকদের মাথা খুলে গেল। সুরু হলো সাঁতারপর্ব। এখন দর্শকরা হিন্দী ছবি দেখে দেখে সাঁতার শিখতে পারেন। 'দিল্লীকা ঠগ' ছবিতে শ্রীমতী নতুনকে সুইমিং কস্টুম পরিয়ে দেখান হয়েছিল, তাতে যত না সাঁতার ছিল তার চেয়ে বেশি ছিল শ্রীমতীর দেহসৌষ্ঠব দেখাবার চেষ্টা। সে ছবি হিট হয়েছিল। আর যায় কোথা! এবার শুধু সাঁতার কাটো, সাঁতার কাটাতে না পার সুইমিং কস্টুম পরিয়ে তরুণীদের দেখাও। আর জনপ্রিয় কোন অভিনেত্রীকে সেভাবে দেখাতে পারলে তো কথাই নেই। তা হলেই ছবি হিট!

গত একটা বছরেই জংলী, সঙ্গম, জিদ্দি, সানাই থেকে এপ্রিলফুল পর্যন্ত সব রঙিন ছবিগুলিতেই মনে ধরাবার জন্য সাঁতারের দৃশ্য আছে। বৈজয়ন্তী থেকে সায়রা বানু সাঁতারের পোষাক পরে পর্দায় হাজির হয়েছেন। আজ আর শুধু সাদা কালোয় নয়, রঙিন ছবিতে মনে রঙ ধরাবার চেষ্টা চলছে! এই রঙের মেলায় আমাদের আশুতোষ দর্শকরা হাজির আছেনই। যাঁরা গাঁটের পয়সা দিয়ে আড়াই ঘণ্টার আরাম খরিদ করেন। ওঁরা বাস্তব-অবাস্তব, শালীন-অশালীন, অতশত বুঝতে চান না। আরাম খরিদ লিয়া! এই হলো ওঁদের কথা। এরকম দর্শকদের উপর হিন্দী ছবির নির্ভর।

হিন্দী ছবির জগতে বোম্বাই-মাদ্রাজে ভীষণ প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতার মুখে মাদ্রাজ চলেছে বাংলা-গল্পকে অবলম্বন করে; বোম্বাই চলেছে সাঁতারের পথে। দেখা যাক, আশুতোষ দর্শকদের পৃষ্ঠপোষকতায় কারা জেতে! ---সুজন।

● 'হাতারী' ছবিতে একটি চরিত্রে জিরাডন

প্রাক্তন রাণী সুরাইয়ার অভিনেত্রী জীবন

কয়েক বছর আগে ছিলেন ইরাণের রাণী। রাণী সুরাইয়াকে নিয়ে খবরের কাগজে অনেক লেখা হয়েছে। সে খবর অনেকের কাছে রসালো মনে হয়েছে; বিশেষ করে যাঁরা রাজা-রাণীর বা অভিজাতদের ব্যক্তিগত কাহিনী নিয়ে রস উপভোগ করতে চান। আজ সেই রাণী সত্যিই একজন অভিনেত্রী। মোরো বলোগনিনির একটি ছবিতে। রাণী সুরাইয়াকে নিয়ে প্রথম ছবিতেই পরিচালককে একটু মুস্কিলে পড়তে হয়েছে। কারণ অভিনেত্রী হলেও এখনো অবচেতন মনে কোথায় যেন বাধা পান।

বলোগনিনির ছবির একটি দৃশ্যে তিনি নীল রঙের পাতলা একটা পরিচ্ছদ পরেছেন। কিছুটা শিথিলভাবে চুল বাঁধা, যে-কোন মুহূর্তে খোঁপা খসে পড়তে পারে। প্রেমিকা নায়ককে বলছে—'এভাবে যে বিদায় নেব, সে কথা ভাবতেই পারি নি।' সঙ্গে সঙ্গে নায়িকা চুম্বন করলো। আর ক্যামেরাম্যান ছবি তুললো—পর পর দু'বার। সুরাইয়া কিছুটা হতচকিত হয়ে পড়লেন। না, চুম্বনের দৃশ্য ছবিতে রাখা চলবে না। সে রকম তো চুক্তি ছিল না। চুক্তিতে ছিল চুম্বনের দৃশ্য তোলা হবে না, উগ্র যৌনতামূলক দৃশ্য থাকবে না, এমন কিছু থাকবে না যা নিয়ে সিনেমার কাগজগুলি প্রচ্ছদ ছাপাতে পারে।

কিন্তু পরিচালক বলোগনিনি দৃশ্যটি রাখতে চান, এমন একটা রোমাঞ্চকর দৃশ্য না রাখলে যে ছবির ব্যবসায়িক মূল্য কমে যাবে। পরিচালক এবার কূটনৈতিক চাল চাললো। নায়কের মুড তৈরির জন্য দৃশ্যটা যে দরকার। নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করছিল হ্যারিস। সুরাইয়ার বন্ধু। যে তাকে অভিনয়ে নামিয়েছে। হ্যারিস পাশে থেকে বললো—সে

এখন সেটে অভিনয় করছে, ছবির জন্য যেমন খুশি আমরা অভিনয় করাবো।

এই ছবিটি হবে তিনখণ্ডে। প্রথম খণ্ড পরিচালনা করছে মোরো বলোগনিনি। বাকি দু'খণ্ড পরিচালনা করবে ফ্রাঙ্কো ইণ্ডোভিনা এবং মাইকেল এঙ্গালো এণ্টোনিওনি।

এই দৃশ্যের সাময়িক বিরতির সময় পরিচালক হ্যারিসকে অনুরোধ করলো—সুরাইয়াকে বুঝিয়ে ঠিক রাখার জন্য। হ্যারিস জানালো গোড়া থেকে সে সুরাইয়ার সেণ্টিমেণ্টের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। প্রথমেই সে বলেছে—দেখ, সুদর্শনা, তোমাকে আর রাজকন্যা বলবো না, কারণ তুমি এখন অভিনেত্রী। আমরা দু'জনে মিলে ছবিটি করছি—তোমার যদি পুরনো সেণ্টিমেণ্ট থাকে, তবে আর অগ্রসর না হওয়া ভাল। সুরাইয়া হ্যারিসের কথায় রাজী হয়েছে।

সুরাইয়ার বয়স এখন ৩৪। গভীর নীল চোখ, নাকের ডগা সামান্য উঁচু—যাকে রোমানরা বলতো অভিজাতের লক্ষণ। সুরাইয়া সাংবাদিকদের বলেছেন, এই নতুন জীবন তাঁর ভালই লাগছে। এতে যথেষ্ট মানসিক শক্তির প্রয়োজন। রাণীরূপে আমার অতীত জীবনের অভিজ্ঞতা অভিনয়ে বেশ কাজে লাগছে।

● সুরাইয়া ও হ্যারিস। —তুমি এখন আর রাণী নও, অভিনেত্রী।

শার্লি ম্যাকলিন কেন এসেছিলেন?

হলিউডের চিত্তবিনোদিনী অভিনেত্রী শার্লি ম্যাকলিন ভূটানে পরিভ্রমণ করে ফেরবার পথে কলকাতা এসেছিলেন। ভূটানের প্রধানমন্ত্রী লেণ্ডুপ দোরজী তাঁকে ভূটান পরিদর্শনের অনুমতি দিয়েছিলেন। মিস ম্যাকলিন ভূটানের সীমান্তসহ নানাস্থানে পরিভ্রমণ করে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। যে অভিজ্ঞতার কথা তিনি বর্ণনা করেছেন—হয়তো একদিন দেখা যাবে তা নিয়ে চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে এবং দলে দলে আমেরিকানরা কলকাতা হয়ে ভূটানে যাচ্ছে চলচ্চিত্র তোলার জন্য। শার্লি ম্যাকলিন বোম্বাইতে অভিনেতা দেব আনন্দের সঙ্গে অনেক আলোচনা করেছেন। তাঁদের আলোচনার বিষয় নাকি গান্ধীজীর দর্শন। উল্লেখযোগ্য যে, দেব আনন্দ আমেরিকার সঙ্গে যুক্তভাবে একটা ছবি তুলছেন। মিস ম্যাকলিন ভারতীয় শাড়ি পরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রকাশ যে, শার্লি ম্যাকলিনকে ভূটান পরিদর্শনের সুযোগ দেওয়ার জন্য লেণ্ডুপ দোরজীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে।

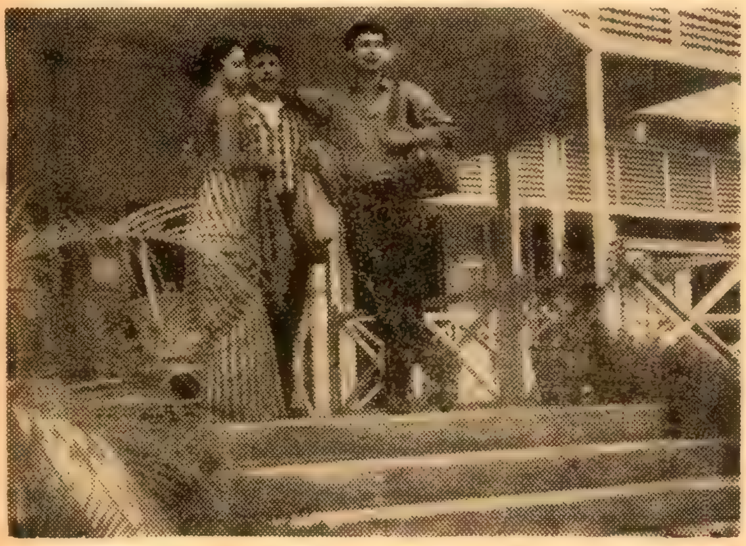

● সত্যজিৎ রায়ের কাপুরুষ ছবির একটি দৃশ্য

নাটকের কথা

বঙ্গ নাট্যমঞ্চের প্রতিষ্ঠাদিবস

শৌভনিক নাট্যসংস্থা গত ২৭শে নভেম্বর মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে বাংলা নাট্যমঞ্চের প্রতিষ্ঠা-দিবস পালন করেছে। এই উপলক্ষে কলকাতার মেয়রের একটি লিখিত ভাষণ পাঠ করা হয় এবং সভা শেষে নাটক অভিনীত হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ২৭শে নভেম্বর রুশ দেশীয় সঙ্গীতজ্ঞ ও পণ্ডিত গেরেসিম লেবেদভ্ কলকাতার ডোমপাড়ায় (বর্তমান এজরা স্ট্রীট) সর্বপ্রথম বেঙ্গলী থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। এই মঞ্চে বাঙালী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দ্বারা দুই রজনী নাটক অভিনয়ের পর ইংরেজদের প্রতিবন্ধকতায় নাট্যশালা বন্ধ হয়ে যায়। বেঙ্গলী থিয়েটার বাংলার প্রথম নাট্যমঞ্চ।

প্রতি বছর কলকাতার বিভিন্ন নাট্যসংস্থা এই দিনকে 'লেবেদভ্ দিবস' নামে পালন করেন। কিন্তু এ বছর একমাত্র শৌভনিক ছাড়া অন্য কোন নাট্যসংস্থা ঐ দিবস উদ্‌যাপনে আগ্রহ দেখায় নি।

● 'এপ্রিল ফুল' হিন্দী ছবিতে নায়িকা সায়রা বানু

● 'এতটুকু ছোঁয়া লাগে' বাংলা ছবিতে বোম্বাইয়ের আজরা ও মণি চ্যাটার্জি।

স্টুডিও খবর

রাজা রামমোহন

অরোরার 'রাজা রামমোহন রায়' ছবির জন্য সম্প্রতি ত্রিবেণী, রাজা রামমোহনের বসতবাড়ি এবং বারাণসীতে বহির্দৃশ্য গ্রহণ করা হয়েছে। লণ্ডনেও দৃশ্য গ্রহণ করা হবে। ছবিটি বিজয় বসুর পরিচালনায় দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। বিজয় বসুর 'ভগিনী নিবেদিতা' সর্বসাধারণ কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছিল। আশা করা যায়, 'রাজা রামমোহন' সকল দিক থেকে একটি সার্থক ছবি হবে। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে 'রাজা রামমোহন রায়ের' জীবনীচিত্র নির্মাণ জরুরী কর্তব্য। রাজা রামমোহন এদেশে প্রথম জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে

তুলেছিলেন, তিনিই প্রথম সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ থেকে আন্তর্জাতিক চেতনায় দেশকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন! তিনিই এদেশে বিশ্ব-মৈত্রীর পথপ্রদর্শক। দেশের বর্তমান সংকট মুহূর্তে রাজা রামমোহনের জীবনীচিত্র নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য অরোরা কর্তৃপক্ষ সকলের ধন্যবাদভাজন। আমরা আশা করবো ছবিটিতে রামমোহনের জীবনাদর্শ যত্নসহকারে ফুটিয়ে তোলা হবে।

ভৌমিক। চিত্রালী ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটরস ছবিটির পরিবেশন দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।

সংবাদবর্ণনা

শহরে নতুন সার্কাস

এবার বড়দিনের মরশুমে কলকাতায় দু'টি সার্কাস এসেছে। দক্ষিণ ভারতের জেমিনী সার্কাস তাঁবু ফেলেছে মহাজাতি সদনের পেছনে মার্কাস স্কোয়ারে। জেমিনী সার্কাসের খেলা ইতিপূর্বে কলকাতাবাসী দেখেছেন। তবে এবার তাঁরা অনেক নতুন খেলা দেখাচ্ছেন। তার মধ্যে জলহস্তীর খেলাটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ ছাড়া রাশিয়া সফর করে এবং রাশিয়ার ট্রেনারদের কাছে তাঁরা আরো অনেক নতুন খেলা শিখেছেন। শুক্রবার ৪ঠা ডিসেম্বর এই সার্কাসের অনুষ্ঠান উদ্বোধন হয়েছে।

আর একটি সার্কাস এসেছে হাওড়া স্টেশনের উত্তরে—বোম্বাইয়ের জি এ সার্কাস। এই সার্কাসটি এই প্রথম কলকাতাতে খেলা দেখাতে এলো।

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

তৃতীয় আন্তর্জাতিক উৎসবে অংশ গ্রহণকারী ছবিগুলি পরীক্ষার জন্য ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত স্ক্রিণিং কমিটীর বৈঠকে স্থির হয়েছে যে, শুধু শিল্প ও সৌন্দর্যবোধের বিচারেই উৎসবে প্রদর্শনের জন্য ছবি বাছাই করা হবে। কমিটী প্রতিদিন দুটি করে ছবি পরীক্ষা করবে। এ যাবৎ ৩৫টি কাহিনীচিত্র ও সমসংখ্যক তথ্যচিত্র প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে বলে তালিকাভুক্ত হয়েছে।

● মঙ্গল চক্রবর্তী পরিচালিত 'দিনান্তের আলো' ছবির একটি দৃশ্যে দেবজিৎ ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

মহরৎ

বি কে প্রোডাকসন্সের পরবর্তী ছবি 'রাজদ্রোহী'র শুভ মহরৎ অনুষ্ঠান গত শুক্রবার ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে সম্পন্ন হয়েছে। মহরৎ অনুষ্ঠানে ওস্তাদ আলি আকবর খান সঙ্গীত পরিবেশন করেন এবং প্রথম দৃশ্য গ্রহণের জন্য ক্যামেরার সামনে উপস্থিত হন উত্তমকুমার ও অঞ্জনা

সিনে ক্লাবের 'চিত্রকল্প'

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটার বাংলা মুখপত্র 'চিত্রকল্প'-এর তৃতীয় বা ১৯৬৪ সালের শরৎকালীন সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এই সংখ্যার প্রচ্ছদপট, দেশী-বিদেশী চলচ্চিত্রের আকর্ষণীয় ছবি এবং কয়েকটি প্রবন্ধ প্রশংসনীয়। চিত্র সমালোচনার মান এখনো সন্তোষজনক নয়।

জেমিনী সার্কাসের যুগান্তকারী ক্রীড়া প্রদর্শন

(স্থান : মার্কাস স্কোয়ার)

শুক্রবার। ৪ঠা ডিসেম্বর। সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় জেমিনী সার্কাসের প্রথম অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করলেন পৌরপ্রধান শ্রীচিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। পেছনের গ্যালারী থেকে সুরু করে অনুষ্ঠানমঞ্চের পার্শ্ববর্তী সারি পর্যন্ত অগণিত দর্শকের কৌতূহলের মধ্যে বেজে উঠলো অর্কেস্ট্রা। পার্টির জয়ধ্বনি আমরা এসেছি, এসেছি, এসেছি। মস্কো এবং সোভিয়েট দেশের বিভিন্ন শহরে প্রদর্শনীর পর কলকাতায় জেমিনী সার্কাসের এই প্রথম আগমন। জানা গেল, সার্কাসের খেলার আধুনিকতম আঙ্গিক প্রয়োগের ক্ষেত্রেও তাঁরা আবার সোভিয়েট দেশে শিক্ষা নিয়েছেন। সে শিক্ষা যে সার্থক, তা আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করা যায়। গত বছর সোভিয়েট দেশ থেকে আগত সার্কাস দলের সুখ্যাতি যাঁরা একবাক্যে করেছেন, খেলার বিস্ময়কর প্রগতি দেখে হতবাক হয়েছেন, জেমিনী সার্কাসের প্রতিটি খেলাও তেমনি তাঁদের বিস্ময়ে হতবাক করবে। এই সব খেলা দেখে আমাদের মনে হয়েছে, জেমিনী সার্কাস তাঁদের ক্রীড়া-নৈপুণ্যে বর্তমানে অদ্বিতীয়, কেন না বিগত বিশ বছর ধরে যে ধরণের খেলা দেখায় আমরা অভ্যস্ত হয়েছি—সেই সব খেলার পুনরাবৃত্তি জেমিনীতে নেই। প্রতিপদে পুরাতন ভিত্তির ওপর, আমরা লক্ষ্য করেছি, অভিনব উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে নবতম প্রয়োগ।

বলা বাহুল্য, এসব খেলার ঐশ্বর্য, বিস্ময়, মাধুর্য, বীভৎস রূপ ও অদৃষ্টপূর্ব চমৎকারিত্ব লিখে বর্ণনা করা যায় না। সুতরাং জেমিনী সার্কাসের খেলার শ্রেষ্ঠত্ব চোখে দেখার পরই বিচার করা ভালো। অন্যান্যদের মতো বিজ্ঞাপনে তাদের ঘনঘটা নেই। তথাপি পর পর চব্বিশটির অধিক যে সব খেলা আমরা দেখেছি তাতে মনে হয়েছে—দৈহিক শক্তি, অমেয় পরিমিতি জ্ঞান না থাকলে প্রতিপদে বিপদ এবং মৃত্যু। তবু শিল্পীরা সেই বিপদ ও মৃত্যুকে জয় করেই আমাদের মুগ্ধ করেছেন। খেলাগুলির দু-একটি বর্ণনা করাও প্রয়োজন। শূন্যে এক দাঁড় থেকে কঠিন কসরতের দ্বারা ঝুলতে কিংবা ডিগবাজি খেতে অথবা পর পর হাতে হাতে ঝুলন্ত দু-তিনজনকে ধরে রাখতে আমরা আগেও দেখেছি; কিন্তু জেমিনীর নতুনত্ব এই যে, অন্ধকারের মধ্যে শূন্যে

● রবীন্দ্রনাথের 'সুভা ও দেবতার গ্রাস' ছবির 'সুভা' খণ্ডে গীতা দে, লিলি চক্রবর্তী, শর্মিলা ঠাকুর, অনুভা গুপ্তা

শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত নেপালী আদিবাসীদের একটি নৃত্য

একপ্রান্তের দাঁড় ধরে ঝুলে অপরপ্রান্তে ঝুলন্ত মানুষের হাত ধরে নিজেকে রক্ষা করা। আলো-আঁধারির টেকনিক এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে। এই আলোয় শিল্পীকে দর্শকরা দেখতে পাবেন, কিন্তু শিল্পীর পক্ষে চোখে দেখে ধরার উপায় নেই। সুনিপুণ পরিমিতি জ্ঞানই এখানের একমাত্র বিপদবারণ সম্পদ।

আরো আছে, একজন সুদর্শনা মহিলাকে আপাদমস্তক লম্বা করে শুইয়ে একটা চাকার এঁটে বনবন করে (যতো জোরে সম্ভব) ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে—তারপর তার দিকে অন্ধকারে ছুঁড়ে মারা হয়েছে পর পর অতি তীক্ষ্ণ ছ'খানি বর্শা। এই বিপজ্জনক খেলা বড়ই ভয়ঙ্কর, কিন্তু অতীব বিস্ময়কর ও গৌরবময়। পায়ের সাহায্যে ভারসাম্য (leg balance) রক্ষার খেলাতেও অনেক নতুনত্ব আমরা লক্ষ্য করেছি। দু'জন মহিলা-শিল্পীর যোগব্যায়ামের খেলা অদ্ভুত। একজন ত' একেবারেই অষ্টবক্র। এ খেলা চোখে না দেখলে বর্ণনা ও বিশ্বাস করা যায় না। খেলার মধ্যে যাতে একঘেয়েমি না থাকে তার জন্যে ক্রীড়ার পার্থক্যগত সতর্কতাও লক্ষ্য করেছি। অতি উর্ধ্বে কোন কিছু হাতে না ধরে দাঁড়ের ওপর হাঁটু রেখে মরণপণ করে এর আগে কে সেই একই দাঁড়ের রুমাল মুখে থেকে তুলতে পেরেছেন? খেলাটিতে কী আশ্চর্য ব্যালান্স-নৈপুণ্যই. ফু‌টে উঠেছে। দেখতে দেখতে আমরাও রোমাঞ্চিত হয়েছি। হয়তো মানুষ মহৎ শিল্পী বলেই এমন অসাধ্য সাধন করতে পারে। এরোপ্লেনের আকৃতির কাঠামোর ওপর না ধরে শূন্যে ঘোরার ব্যাপারটি যে কিভাবে সম্ভব করে তুলেছেন—তা ভাবতে অবাক লাগে। অবশ্য জানা গেল এই খেলাটি বিশ্বে আর কোথাও নেই। এ সময় আবহ সঙ্গীতও হৃদয়স্পর্শী। কঠিন মৃত্যুর হাত থেকে পরমাশ্চর্য নৈপুণ্যে মানুষের মুক্তির বিষাদ আনন্দ ফুটে উঠেছে সেই সঙ্গীতে। দড়ি বা তারের ওপর চলা বা নৃত্য করা কিংবা শূন্যে রাখা চেঁকির এক আছাড়ে উঠে গিয়ে তারের ওপর দণ্ডায়মান একের ওপরে আর এক মেয়ের ঘাড়ে চড়া সহজ ব্যাপার নয়। এসব খেলার প্রত্যেকটিতেই নতুন উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পেয়ে আমরা গভীর তৃপ্তি পেয়েছি।

সিগারেট ধরানো, প্লেট, তলোয়ার বা বাতিদানের খেলা নতুন ও আশ্চর্য রকমের। জেমিনী সার্কাস যেন আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ এনে এই সব খেলা দেখিয়েছে, নতুবা এমনও কি সম্ভব—একথা প্রতি মিনিটে প্রতি সেকেণ্ডে মনে হয়েছে কেন? কামানের গর্জন হবার সঙ্গে সঙ্গে এক সেকেণ্ডের মধ্যে বিরাট কামানের ভেতর থেকে বের হয়ে দুশ' হাত দূরে গিয়ে পড়ল একটা জীবন্ত মানুষ। সিকি পলক দেরি হলেই হয়তো বারুদের আগুনে ছাই হয়ে যেত লোকটা। এ খেলা না দেখলে মনে আপশোষ থাকা স্বাভাবিক। অন্যান্য দিকে টুপি, বল, ছোরা, পায়ের কসরতের খেলা হাজার রকম। অজস্র তাদের শাখা, সহস্র তাদের প্রশাখা। সাইকেল খেলাতেও এদের নতুনত্ব, বর্তুলাকৃতি লোহার প্লেটের জালের মধ্যেকার খেলাতেও নতুনত্ব। ছোট্ট সেই বর্তুল। একাধিক পুরুষ ও নারী তার মধ্যে বিদ্যুদ্‌গতিতে চালাচ্ছে একাধিক মোটর সাইকেল। অকল্পনীয় এই ব্যাপারে চোখে ধাঁধা লাগে। পালোয়ানের ভারোত্তোলন অপরিসীম দৈহিক শক্তির প্রমাণ করে। পায়ের সাহায্যে ৫০০ পাউণ্ড, হাতের ওপরও কমপক্ষে ২০০ পাউণ্ড, তার ওপর আবার চারজন লোক। তিনি যে কেন পিষ্ট হলেন না, তা তাঁর দেহ দেখলেই বোঝা যাবে। লোহার রডে ধরা অবিশ্বাস্য ভারী লোহার দু'টো বল যখন ঘাড়ে পড়ল তখন ঘাড়টা ভাঙল না, সেই মোটা লোহদণ্ডটাই বেঁকে গেল।

ম্যাজিক, মোটরগাড়ি, ফায়ার ব্রিগেড কঠিন খেলার মধ্যে মধুর হাসির খোরাক যুগিয়েছে। প্রত্যেকটি জোকারও ওস্তাদ শিল্পী, বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে ভয়ঙ্করকে তুচ্ছ করার প্রেরণায় অফুরন্ত হাসি যুগিয়েছে দর্শকদের ওষ্ঠে। জলহস্তীর খেলা, এক সঙ্গে আটটি বৃহৎ হস্তীর খেলা, দশটি সিংহ-সিংহীর খেলা মনে ভয় জাগায়, কিন্তু দেখতে ভালো লাগে। বানরের রিক্সা চালনা উপভোগ্য। যাত্রী হচ্ছেন, সম্ভবত বানরী। একসঙ্গে হাতী, উট, ঘোড়া, বানর হনুমান ও জেব্রার খেলাটিতেও পারদর্শিতা অনস্বীকার্য। অবশ্য একথা বলা বাহুল্য যে, প্রতিটি বিভিন্ন আঙ্গিক, পদ্ধতি ও উপস্থাপনা রীতি বিশেষ লক্ষণীয়। সেই কারণে বলা যায়, আমরা যেন হাজারটা খেলা দেখেছি। এতৎসত্ত্বেও যে ত্রুটি আমরা লক্ষ্য করেছি তা হচ্ছে এই যে, দর্শকদের বসানোর ব্যাপারে অব্যবস্থা। প্রেসের জন্য নির্দিষ্ট আসন না থাকায় বেশ মুস্কিলে পড়তে হয়েছে। এ ছাড়া মাইক থেকে যা ঘোষণা করা হয় তা সর্বত্র সমান শোনা যায় না, বাজনার মধ্যে তা বিরক্তিরও সৃষ্টি করে। জেমিনী সার্কাসের লক্ষ্যবস্তু চমৎকার, সুতরাং উপলক্ষ সম্পর্কে সামান্য ত্রুটি দূর করলে খুশিই হবো।

নট-নটীদের বি[illegible] কাহিনী

দেবনারায়ণ গুপ্ত

॥ পঞ্চাশ ॥

একটি অবিশ্বাসী মনে আঘাত

গিরিশচন্দ্রের বাগবাজার বোসপাড়া লেনের বাড়ি থেকে, স্টার থিয়েটারের ঘোড়ার গাড়িতে করে গিরিশচন্দ্র ও ভূনীবাবু (অমৃতলাল বসু) আসছেন থিয়েটারে। গিরিশচন্দ্রের নির্দেশে গাড়ি বাগবাজারের গঙ্গার ধার দিয়ে আসছে। গিরিশচন্দ্র সিদ্ধেশ্বরীতলায় এসে গাড়ি থামাতে বললেন।

ভূনীবাবু মাঝপথে গাড়ি থামাতে বলার জিজ্ঞেস করেন : এখানে কেন?

—সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে যাব। মাকে প্রণাম করবো।

গাড়ি থামলো। গিরিশচন্দ্র গাড়ি থেকে নেমে মন্দিরে গেলেন। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে ফিরে এলেন। গাড়ি ছাড়লো।

মদনমোহনতলার পাশ দিয়ে গাড়ি রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীটে ঢুকতে যাবে, গিরিশচন্দ্র আবার গাড়ি থামাতে বললেন।

ভূনীবাবু একটু বিরক্তভাবেই বলেন : এখানে আবার কি?

—মাকে দর্শন করবো।

—এই তো করলে।

—এখানেও মায়ের মন্দির। দেখছো না?

—দেখেছি। দেখেছি। আমিও এই পাড়ার ছেলে। তুমি আর নতুন কি দেখাবে আমায়।

গিরিশচন্দ্র কোন উত্তর করলেন না। গাড়ি থেকে নেমে মন্দিরদ্বারে মাথা ঠেকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করলেন। গাড়িতে ফিরে এলেন। গাড়ি ছাড়লো। গাড়িতে এসে, ভূনীবাবুর বিরক্তি-মাখানো মুখের দিকে লক্ষ্য করলেন গিরিশচন্দ্র। বললেন : ব্যস্ত কেন হে। থিয়েটার আরম্ভ হতে ত' এখনো দেরি আছে।

—তা আছে। তবে তোমার ব্যাপার-স্যাপার দেখে তাজ্জব বনে গেছি।

—কেন?

—এক কালীকে প্রণাম করে হোল না—আর এক কালী। বলি, দুটিতে তফাৎ কি শুনি?

—তফাৎ কিছুই নেই। শুধু মনের তফাৎ। তুমি নামলে না কোন জায়গায়

—আমার মন টানলো, আমি নামলাম।

—আরো গোটাকতক পথের মাঝে থাকলেও, নামতে বোধ হয়?

—বললাম ত' মন টানলে নিশ্চয় নামতাম।

—বলিহারী তোমার মনের টান। এইরকম টান হলে, আর দিনকতক বাদে কাজকর্ম সব শিকেয় উঠবে।

—তা আর হচ্ছে কৈ? সে টান হলে ত' এমন করে আর থিয়েটারে ছুটতাম না। টান কি বে-টান বুঝি না ভূনী। শুধু বুঝি, ঠাকুর যা করাচ্ছেন, তাই করছি—

গিরিশচন্দ্র গম্ভীর। মুখে কোন কথা নেই। থমথম করছে সে মুখ। গাড়ি এসে থামলো থিয়েটারে। গ্রীনরুমে ঢুকতে ঢুকতে বললেন : মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কি তুমি সন্দিহান?

ভূনীবাবু এ কথার কোন জবাব দেন না। তিনি ভালভাবেই চেনেন গিরিশচন্দ্রকে। মুখের ভাব দেখে বুঝতে তাঁর কষ্ট হয় না যে, গিরিশচন্দ্র আহত হয়েছেন তাঁর কথায়। তাই পাশ কাটিয়ে গ্রীনরুমে নিজের আসনে গিয়ে মেক-আপ করতে আরম্ভ করেন।

অভিনয় আরম্ভ হয়েছে। গিরিশচন্দ্রের আজকের অবস্থা দেখে সকলেই বেশ একটু ভয়ে ভয়ে আছেন। রাশভারী মানুষ। যাও বা দু'-একটা কথা বলেন, তাও আজ আর বলছেন না। শুধু এক-একটা দৃশ্য অভিনয় করে আসেন, আর স্টেজের পেছনে 'মা-মা' বলে চিৎকার করে পায়চারী করতে থাকেন।

মধ্যরাত্রি। থিয়েটার ভাঙতে আর সামান্যই দেরি আছে। গিরিশচন্দ্র ডেকে পাঠালেন ভূনীবাবুকে। তারপর নিজে আসন করে বসলেন। ভূনীবাবু ত' গিরিশচন্দ্রের ভাবান্তর দেখে অবাক।

—আমার সামনে তুমি বসো ভূনী।

ভূনীবাবু বসলেন।

গিরিশচন্দ্র বলেন : মায়ের মন্দিরে নেমে প্রণাম করাতে তুমি বিরক্ত হয়েছ। তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণা নেই। থাকলে—অমন তাচ্ছিল্য করে কথাগুলো তখন বলতে পারতে না। যাই হোক, আমি আসন করে বসেছি। তুমি আমাকে স্পর্শ করো।

স্পর্শ করলে কি হবে?

—কি হবে সেইটাই তোমাকে দেখাতে চাই।

ভূনীবাবু গিরিশচন্দ্রের দুটো হাঁটুর ওপর হাত রাখলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছিটকে পড়ে গেলেন। যেন ইলেকট্রিকের শক্ খেলেন তিনি।

এই ঘটনার পর থেকে ভূনীবাবুর মানসিক পরিবর্তন দেখা দেয়। গিরিশচন্দ্রের তিনি অন্তরঙ্গ সুহৃদ-সচিব হলেও, গিরিশচন্দ্রকে তিনি এতকাল গুরু বলেই ডাকতেন। এই ঘটনার পর থেকে, তাঁর জীবনের গুরুত্ব যেন বেশি করেই এনে দিলেন গিরিশচন্দ্র।

মহাকবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বৃত্র-সংহার কাব্য

দাম—দুই টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

—শিলাদিত্য—

১৮৭৫ সালে ইবসেন তাঁর প্রথম সত্যিকার সামাজিক নাটক Pillars of Society নিয়ে কাজ সুরু করেন। আট বছর আগে যখন তিনি The League of Youth লেখেন, তার থেকে এখন সামাজিক পরিস্থিতি অনেক বদলে গেছে। এই সময়টার সাধারণ লোকে বুঝতে শিখেছে যে, যুগোপযোগী ইউরোপীয় নাটকগুলি—যেমন Alexandre Dumas-এর The Natural Son বা Augier-এর Giboyer's Son ও The Impertinents পড়লে অনেক রকম সামাজিক সমস্যা ও প্রথা সম্বন্ধে জানা যায়, যা প্রত্যেক দেশের সমাজেই বর্তমান। অথচ স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান সাহিত্যে এতাবৎ সে-সব সম্বন্ধে কোনই আলোচনা করা হয় নি। সামাজিক সমস্যা, সমাজের ভাল-মন্দ প্রথা নিয়ে আলোচনা ইত্যাদি ব্যাপারে পথিকৃতের কাজ করেছিল সেই সময়কার লেখা ফরাসী নাটকগুলি। ১৮৭৫ সালের প্রথম ভাগে সাহিত্যের মোড় এইদিকে প্রথম ফেরালেন Bjornson, তাঁর লেখা দুটি নাটক A Bankruptcy ও The Editor দিয়ে। সেই বছরেই গ্রীষ্মকালে ইবসেন তাঁর প্রথম সমস্যামূলক নাটক Pillars of Society লিখতে সুরু করলেন।

Younger Dumas ও Augier-ই প্রথম সামাজিক সমস্যামূলক বাস্তবধর্মী আধুনিক নাটক লিখতে সুরু করেন। সমাজনীতি এবং ব্যক্তি-বিশেষের নীতিবোধ-এর সংঘর্ষে যে সমস্যার উদ্ভব হয়—তারই ওপর ভিত্তি করে ইবসেনের অনেক নাটকই রচিত হয়েছে—এ বিষয়ে কিন্তু তাঁর পথপ্রদর্শক Dumas। ড্রামাটিক ফর্মের দিকটাতেও তিনি Dumas ও Augier-এর কাছে বহুভবে ঋণী। Pillars of Society-তে অবশ্য ফরাসী গুরুদের থেকে অনেকটাই পেছিয়ে আছেন। তখনও ডেমোক্রেটিক ড্রামা লেখবার প্রচলিত ধারা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পারেন নি। A Doll's House-এ ইবসেন আরও অনেকটা এগিয়ে এসেছেন। এ নাটকের টেকনিক বারবার Dumas-এর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ফরাসী নাট্যকারদের সঙ্গে তুলনা করলে বলা চলে, তিনি এই সময় ওদের সমপর্যায়ে উঠেছেন। Ghost-এ ইবসেন ওদের অনেকটাই পেছনে ফেলে এগিয়ে

● ব্র্যাণ্ড নাটকের অদ্ভুত মঞ্চসজ্জা এবং কম্পোজিশন

বললেন। ক্রমশ জার্মানিক দেশগুলি ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার সমস্ত রঙ্গমঞ্চ থেকে ইবসেনের নাটকগুলির জন্য জায়গা খালি করে দিয়ে ফরাসী নাটকগুলি হটে যেতে লাগল।

A Doll's House নাটকটি লেখা হয় ১৮৭৯ সালে। বাস্তবধর্মী নাটক লিখতে গিয়ে এই প্রথম ইবসেন নিজেকে উচ্চশ্রেণীর শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলেন। নাটকের বুনানি, চরিত্রের বিশ্লেষণ এবং সংলাপের স্বাভাবিকতা ও সূক্ষ্ম কারুকার্য একটা সার্থক পরিপূর্ণতা পেল এই নাটকে। এ নাটকটি সম্বন্ধে Allardyce Nicoll বলেছেন :

'First there is skill in the use of words. Ibsen has conquered what after all, is the basic problem of the realistic playwright, the problem of combining language which shall at once seem natural and be dramatically appropriate. His curtains looked at objectively are of the same kind as those employed in the earlier dramas, but the fact that they are built out of character and imaginatively intregrated with the basic situation makes us forget the deliberate craftsmanship determening their being. The third element might be described as Ibsen's thought. In France the play-wrights could not get beyond themes of marraige and money conceived in conventional terms; to the question of marraige and money Ibsen gives a startlingly new interpretation. Ibsen look a loving husband as his hero and as his heroine a childish creature adoring her husband and yet, when her eyes are opened to his character, determening that she must leave his house. This is the old theme of marraige and money certainly, but presented with such a difference as to make it seem absolutely new. A Doll's House, because of this novelty of concept, served as a clarion-call to the younger generation of dramatic realists.'

১৮৯৮ সালে নরওয়েজিয়ান ফেমিনিস্ট এসোসিয়েশন ইবসেনের সম্মানে একটি নৈশ-ভোজের অনুষ্ঠান করেন। এখানে তাঁর বক্তৃতায় সবাইকে চমকিত করে দিয়ে ইবসেন বলেন যে, তিনি সচেতনভাবে women's cause-এর জন্য কোনো লেখা লেখেন নি। তা ছাড়া women's cause বলতে কি বোঝায়, তাও ঠিক তাঁর জানা ছিল না। ১৮৮১ সালে ইবসেন Ghost লিখে একটা প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করলেন—যে বিষয়বস্তু এ-নাটকে প্রাধান্য পেল, এতাবৎকাল সে ধরণের ব্যাপারকে সাহিত্যে ব্যবহারের অযোগ্য বলেই লোকে মনে করতো।

(ক্রমশঃ)

হেডা গ্যাবলারের একটি দৃশ্য

খেলাধূলা

● বামে : জয়ন্তী দলের পি সি পোদ্দার ও নিমাই ঘোষ ব্যাট করতে যাচ্ছেন। ডাইনে : কমনওয়েলথ দল ফিল্ডিং করতে যাচ্ছেন।

ইডেনে ক্রিকেট কার্নিভাল

ইডেনে চলল ক্রিকেটের কার্নিভাল। মোহনবাগানের প্লাটিনাম জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত কমনওয়েলথের খেলাটি ইডেনের প্রাঙ্গণকে দিয়েছিল এক অপূর্ব রূপ। ইডেনের পাশে মোহনবাগান মাঠ আলোকমালায় সজ্জিত হয়ে নিয়েছে এক নবরূপ; ইডেন উদ্যানের চারদিকে মোহনবাগানের পতাকা, সকাল-সন্ধ্যা সানাইয়ের সুর। সবকিছুর সংমিশ্রণে ক্রিকেটকে নিছক খেলাতেই পরিণত করেছে।

কমনওয়েলথ একাদশ আর মোহনবাগানের প্লাটিনাম জুবিলি একাদশের খেলার পূবে খেলোয়াড়দের মালাচন্দন দিয়ে সম্বর্ধনা জানান হল। কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোক সেনের সঙ্গে খেলোয়াড়দের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। নিরুত্তাপ পরিবেশে খেলা সুরু হল এবং শেষ পর্যন্ত খেলাটিকে টেনে এনে ড্র করান হল। ক্রিকেটকে নিয়ে ছেলেখেলা করা হল, খেলা যত না হল তার থেকে বেশি হল তামাসা।

কমনওয়েলথ এবং মুখ্যমন্ত্রী একাদশের খেলাতে ভারতীয় টেস্ট খেলোয়াড়দের আগমন ক্রীড়ামোদীদের তবু কিছুটা আকর্ষণ করল, সঙ্গে আর একটা লোভ ছিল—বিশ্ববিখ্যাত খেলোয়াড় সোবার্সের ব্যাটে বলের ভেল্কী দেখার। এই খেলায় আলো আছে নেই উত্তাপ, উৎসাহ আছে নেই উত্তাপ। টেস্ট খেলা আর প্রদর্শনী খেলার এই তফাৎ।

কমনওয়েলথ টসে জয়ী হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর একাদশকে ব্যাট করতে পাঠাল। সুরুটা মোটামুটি ভালই হয়েছিল; কিন্তু হঠাৎ ছন্দপতন হল—মাত্র ১০৭ রানে ৬টা উইকেট পড়ে গেল। সরদেশাই ৪৬ রান করে তবু কিছুটা

শ্রীঅমিতাভ

মুখরক্ষা করলেন, কিন্তু জয়সীমা, পতৌদি, হনুমন্তের মত ব্যাটসম্যান অল্প রানের বিনিময়েই প্যাভেলিয়ানে ফিরে গেলেন। বোরদে এবং দুরাণীর জুটির অনবদ্য ব্যাটিং দলের নিশ্চিত পতন রোধ করল। বোরদের সেঞ্চুরী হল; ব্যক্তিগত ১২৪ রানে তিনি এবং ৯২ রানে দুরাণী আউট হলেন। দুরাণীর ছয়ের বাড়ি আর বাউণ্ডারীর ঝলক দর্শকদের যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছে, বোরদেও অবশ্য একই ভূমিকা গ্রহণ করেন। ৩৩৯ রানে মুখ্যমন্ত্রী দলের ইনিংস শেষ হল।

কমনওয়েলথ দল ব্যাট করতে মাঠে নামল। সকলেই সাগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগল সোবার্স আর কাউড্রের জন্যে। দুজনেই এলেন, রানের ফুলঝুরি ছুটতে লাগল। কাউড্রে শান্ত, অচঞ্চল এবং সহজভাবে ব্যাট করতে লাগলেন। সোবার্স কিছুটা চঞ্চল আর অস্থির। দুজনেই দিলেন একটি করে ছয়ের বাড়ি আর করলেন বাউণ্ডারীর ছড়াছড়ি। কাউড্রে বিদায় নিলেন ৬৬ রানে আর সোবার্স ৮৩ রানে। মুস্তাক ঝড়ের গতিতে ৫৯ রান তুলে বিদায় নিলেন। ৩৫৫ রানে কমনওয়েলথ দলের ইনিংস শেষ হল। মুখ্যমন্ত্রীর দল দিনের শেষে কোন উইকেট না হারিয়ে ২১ রান সংগ্রহ করেছে। লেখা যখন শেষ করছি তখন দু'দিন খেলা হয়েছে বাকী আরও তিনদিন। খেলার গতি দেখে মনে হচ্ছে এ খেলার মীমাংসা হবে।

ডুরাণ্ড কাপ পর্ব

রাজধানী দিল্লীতে তাপমানযন্ত্রে পারদের গতি হচ্ছে নিম্নগামী, কিন্তু অসময়েও ফুটবলের আকর্ষণ উর্ধ্বগতি প্রাপ্ত হচ্ছে। শীতের আমেজের মাঝে ফুটবলের তপ্ত আবহাওয়া এক অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি করেছে দিল্লীর মাঠে ময়দানে। ফুটবলের সেই উত্তাপ সঞ্চারিত হয়েছে রাজধানীর অগণিত ক্রীড়ামোদীর প্রাণে; ডুরাণ্ডের প্রাণচঞ্চল পরিবেশেই তাই তাদের সমস্ত আকর্ষণ বর্তমানে কেন্দ্রীভূত।

তিনটি ফুটবল প্রতিযোগিতাকে বর্তমানে সর্বভারতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা বলে আখ্যাত করে প্রথম সারিতে স্থান দেওয়া যায়। মান-সম্মানের দিক থেকে তাই কলকাতার আই-এফ-এ, দিল্লীর ডুরাণ্ড এবং বোম্বাইয়ের রোভার্সের সমকক্ষ কেউই নয়। এবার আই-এফ-এ শীল্ডে বহির্বাংলার দলগুলির আশানুরূপ সমাগম হয় নি। অন্ধ্র পুলিশের খেলা কলকাতার দর্শকদের হতাশ করেছে। ফাইন্যালে মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গলের খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হবার পর পুনরনুষ্ঠান সম্ভব হয় নি। গতবারের ডুরাণ্ড বিজয়ী মোহনবাগানের ৭৫ বৎসর পূর্তিতে চলছে প্লাটিনাম জয়ন্তী উৎসব। এই স্মরণীয় বৎসরে তারা ডুরাণ্ড জয় করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে,

কলকাতা ফুটবল লীগ ইতিমধ্যেই ঘরে তোলা হয়ে গিয়েছে। ইস্টবেঙ্গলও শেষ শক্তি নিঃশেষ করে লড়াই করবে বলে মনে হচ্ছে, তাদের ক্রীড়াধারারও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। গোলরক্ষকের স্থানে কমল সরকারকে খেলালেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। ক্লাব কর্তৃপক্ষের দোষে এবং কয়েকটি অবিচারের ফলে ইস্টবেঙ্গলের দলীয় মনোবল অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং দলগত ঐক্যও কিছুটা নষ্ট হয়েছে। বোম্বাইয়ের টাটা স্পোর্টসের অগ্রগতি একথাই প্রমাণিত করছে যে, তারাও এবার ডুরাণ্ডের অন্যতম দাবিদার। কলকাতার বি এন রেল এবং হায়দ্রাবাদের অন্ধ্র পুলিশও সম্ভাব্য বিজয়ীর তালিকায় আছে।

কলকাতার ইস্টার্ন রেল শেষরক্ষা করতে পারল না ; মাদ্রাজ ইঞ্জিনীয়ারিং গ্রুপকে ৩-০ গোলে পরাজিত করে শেষে টাটা স্পোর্টসের কাছে ৪-০ গোলে পরাজিত হয়ে ডুরাণ্ড থেকে বিদায় নিল। এই টাটা স্পোর্টস দ্বিতীয় রাউণ্ডে পাঞ্জাব পুলিশকে ২-০ গোলে পরাজিত করে। বি এন রেল প্রথম খেলায় দিল্লীর রাইসিনাকে ৪-০ গোলে পরাজিত করেছে বটে, কিন্তু তাদের এই জয় বেশ কষ্টার্জিত। বি এন রেলের আপ্পালারাজু হ্যাট্ ট্রিক লাভ করেন। ইণ্ডিয়ান নেভীকে ৩-০ গোলে পরাজিত করে বি এন রেল এখন কোয়ার্টার ফাইন্যালে উঠে অপেক্ষা করছে। ইস্টবেঙ্গল এখনও পর্যন্ত দুটি খেলায় অংশগ্রহণ করেছে। প্রথম রাউণ্ডে তারা পরাজিত করেছে সিমলার ইয়ংসকে ২-০ গোলে এবং দ্বিতীয় খেলায় গুর্খা ব্রিগেডকে ৪-০ গোলে। মোহনবাগান ২-০ গোলে শিখ রেজিমেণ্টকে পরাজিত করে কোয়ার্টার ফাইন্যালে উন্নীত হয়েছে।

নেহরু স্মৃতিরক্ষা ভাণ্ডারের জন্য গত ২রা ডিসেম্বর মোহনবাগান হাঙ্গেরীর তাতাবানিয়া দলের সঙ্গে দিল্লীতে একটি প্রদর্শনী খেলায় অংশ গ্রহণ করে। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে খেলাটি শেষ হয় ; অবশ্য মোহনবাগান ২-০ গোলে পরাজয় বরণ করেছে। তাতাবানিয়ার আক্রমণভাগের মধ্যমণি সারনাই একাই দুটি গোল দেন।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট

কলকাতা ময়দানের আগামী আকর্ষণ হল পূর্বাঞ্চল আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। পূর্বাঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয়-গুলি এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। গতবার এই আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা বেনারসে অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বাঞ্চলে বিজয়ী হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সেমি-

● ডুরাণ্ড কাপ কোয়ার্টার ফাইন্যাল খেলার একটি মুহূর্ত।

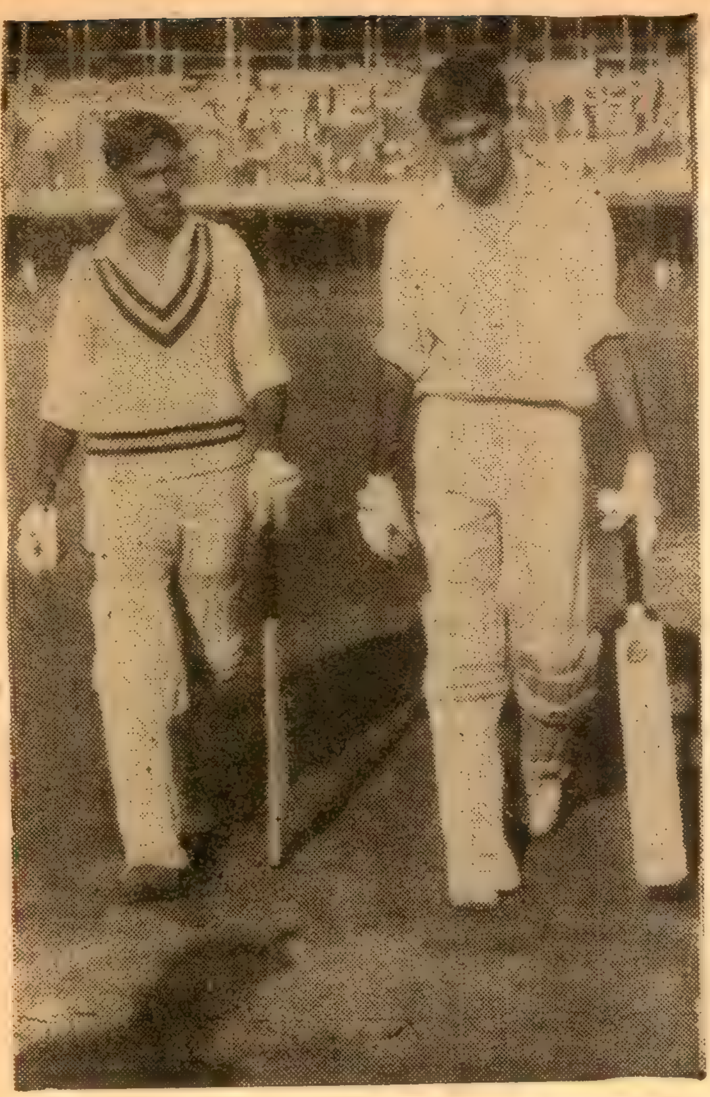

● সেলিম দুরাণী এবং বোরদে ব্যাট করতে যাচ্ছেন

ফাইন্যাল খেলায় বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে পরাজিত হয়।

পূর্বাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বরাবরই শীর্ষে। কিন্তু এই সামানা পার হয়ে বোম্বাই বা দিল্লীর কাছে কলকাতা দল বারবার পরাস্ত হয়েছে।

গতবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দল নির্বাচনে যথেষ্ট গলদ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিকেট কোচ এবং নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্য শ্রীকার্তিক বোস সম্বন্ধে বিভিন্ন মহলে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল। এবার আর কার্তিক বোস বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত নন, তাঁর স্থানে এসেছেন শান্তি ঘোষাল। আশা করি তাঁর কাছে যোগ্য খেলোয়াড়েরা স্বীকৃতি পাবেন।

এখনও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দল চূড়ান্তভাবে মনোনীত হয় নি। প্রাথমিকভাবে কুড়িজন নির্বাচিত হয়েছে। ক্রিকেটে অধিনায়কের অসীম গুরুদায়িত্ব যে, কোন খেলোয়াড়কে অধিনায়কের পদে বরণ করলে চলে না। অধিনায়কোচিত মনোভাব, দৃঢ়তা এবং দল পরিচালনার প্রয়োজনীয় গুণগুলি যার মধ্যে আছে, বয়সে নীবন হলেও তাকে অধিনায়কত্বের গুরুদায়িত্ব দিলে দলেরই মঙ্গল।

গতবার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনায়কের পদ থেকে শিবাজী রায়কে অন্যায়ভাবে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমার দৃঢ় ধারণা, অধিনায়ক হিসাবে শিবাজী রায়ের সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দলের অন্য কোন খেলোয়াড়ের তুলনাই হয় না। শিবাজী বয়সে নীবন হলেও ক্রিকেটের অভিজ্ঞতায় তিনি যথেষ্ট প্রবীণ। শিবাজীর পর অধিনায়কত্বের যোগ্য দাবিদার হলেন ন্যাটা স্পিন বোলার ভাস্কর গুপ্ত। বর্তমানে অলরাউণ্ডার হিসাবে ভাস্কর যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। এবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বভারতীয় স্কুল ক্রিকেটের অম্বর রায়, রবীন মুখার্জী এবং রণবীর সেনের মত যশস্বী খেলোয়াড়কে দলে পেয়েছে। পূর্বাঞ্চলে বিজয়ী হলে কলকাতা বরোদায় সেমিফাইন্যালে মিলিত হবে উত্তরাঞ্চলের বিজয়ীর সঙ্গে।

সমাচার দর্পণ

বাঙ্গালোরে ১১ই নভেম্বর ভারত এবং সিংহলের বেসরকারী টেস্ট সুরু হচ্ছে। ভারতীয় দলে একমাত্র নবাগত খেলোয়াড় হলেন মহীশূরের লেগ স্পিন বোলার সুব্রহ্মণিয়ম্। অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন পতৌদির নবাব।

• •

হাঙ্গেরীর তাতাবানিয়া ফুটবল দল রেঙ্গুনের এ্যামেচার ফুটবল এ্যাসোসিয়েশনের কাছে ২-১ গোলে পরাজিত হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কলকাতায় তিনটি এবং দিল্লীর একটি খেলায় তারা জয়ী হয়েছে।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট্স কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতী

বিদ্রোহী নেতা শ্রীগ্যাস্টন সুমালি
স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথে শ্রদ্ধা
জানাচ্ছেন শ্রীমতী লুমুম্বাকে।

২৯শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২রা পৌষ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ • 17th December, 1964 • Vol. 69,

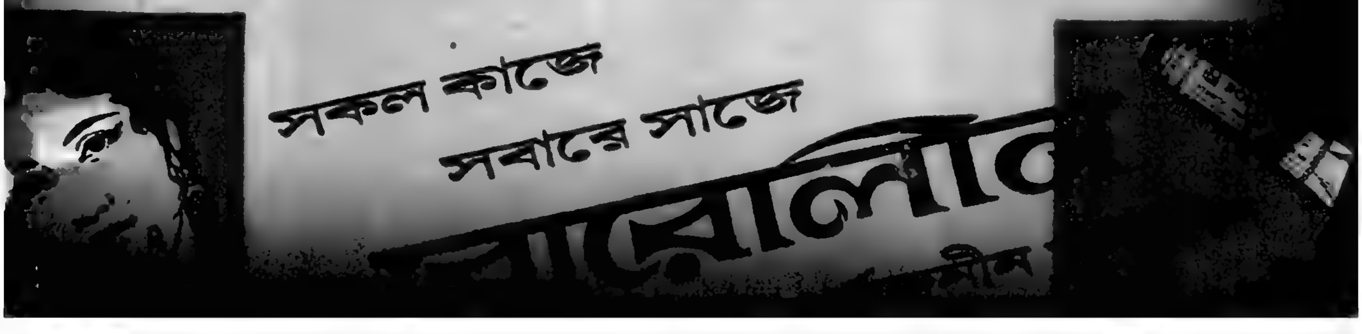

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	১৭৯৫
আজকের মানুষ	...	১৭৯৬
সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর	হরপ্রসাদ মিত্র	১৭৯৭
দৃষ্টি (কবিতা)	বিজয়কুমার দত্ত	১৭৯৮
স্বর্গ, মর্ত্য (কবিতা)	সুখেশ্বর গরাই	১৭৯৯
টোকিওর চিঠি	মিত্রেন	১৮০০
ভারতদর্শন	...	১৮০৩
আন্তর্জাতিক	...	১৮০৯
বাণিজ্যে সেকাল ও একাল	ধনপতি সওদাগর	১৮ ৫
এবং বৃষ্টির পর (কবিতা)	দীপক গোস্বামী	১৮১১
পরম উত্তাপ (কবিতা)	অতুলরঞ্জন দেব	১৮১৩
গ্রন্থমেলা	জয়ন্তী সেন	১৮১৭

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠ্যপুস্তক)

মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার চণ্ডীর কাহিনী বাঙ্গালার বিশিষ্ট জাতীয় জীবনের কাহিনী। তাঁহার কাব্যে পাই মধ্যযুগের বাঙ্গালার নিখুঁত সমাজের সুস্পষ্ট আলেখ্য। শাসক সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্য্যাতিত বাস্তুচ্যুত মুকুন্দরাম দুঃখ ও বেদনাক্লিষ্ট বাঙ্গালার প্রতিনিধি কবি—ব্যক্তির দুঃখ কি করিয়া সর্ব্বজনের দুঃখ হইতে পারে বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা মুকুন্দরামই সর্ব্বপ্রথম দেখাইয়াছেন। এই হিসাবে তিনি আধুনিক বাঙ্গালার রোমান্টিক সাহিত্যসাধনার অগ্রদূত।

—বর্ত্তমান গ্রন্থে আছে—

১। মূল কাব্য, ২। সুবিস্তৃত ভূমিকা, ৩। কবির জীবনী, ৪। কাব্য-পরিচিতি, ৫। কবিকঙ্কণ যুগের বঙ্গভাষা (ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত), ৬। বিস্তৃত কাব্য সমালোচনা এবং ৭। অপ্রচলিত শব্দের অর্থ।

মূল্য সাড়ে চার টাকা

নীহাররঞ্জন গুপ্তের গ্রন্থাবলী

মূল্য সাড়ে তিন টাকা

কালো ভ্রমরের চমকপ্রদ বিস্ময়কর কাহিনীর মধ্য দিয়ে বিদেশী গোয়েন্দা-সাহিত্যের শার্লক হোমসের মত বুদ্ধিদীপ্ত কিরীটি রায়ের আবির্ভাব।

বাংলার মিষ্ট্রী সাহিত্যে

ডাঃ নীহাররঞ্জনের দান অপূর্ব্ব

—তেরখানি নির্ব্বাচিত রচনা—

কালো ভ্রমর, কয়েকে য্যা মরেছে, রক্তহীরা রক্তমুখী নীলা, পদ্মদহের পিশাচ, পঞ্চমুখী হীরা, রক্তগেরুয়া, ঘুম, কালচক্র, কবর, পাথরের চোখ, সর্প, অঙ্গুরীয়, প্রণাম জানাই

প্রতিষ্ঠাবান নাট্যকার ও প্রবীণ সাহিত্যিক

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মণিলাল গ্রন্থাবলী

২য় ভাগে—৬খানি রচনা ৩৩০ পৃঃ—৩

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ডিটেকটিভ সবাই হতে পারে (গোয়েন্দা-গল্প)	পরিমল গোস্বামী	১৮১৯
আঁধারমাণিক (ধারাবাহিক উপন্যাস)	মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	১৮২২
ক্যাম্বুরিনা (গল্প)	বিকাশ বসু	১৮২৫
শহর কলকাতা	শ্রীপদাতিক	১৮৩১
অদ্বিতীয়া (ধারাবাহিক উপন্যাস)	সুশীল রায়	১৮৩৫
অকৃত্রিম এই প্রশ্ন থাক (কবিতা)	প্রফুল্ল মণ্ডল	১৮৩৭
পাঠকমন	...	১৮৩৮
বঙ্গদর্শন	...	১৮৩৯
রঙ্গজগৎ	...	১৮৪৪
নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী	দেবনারায়ণ গুপ্ত	১৮৫০
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	শিলালি	১৮৫১
খেলাধুলা	শ্রীঅমিতাভ	১৮৫৪

বৈষ্ণব-সাহিত্যের অমূল্য অবদান

ভক্তিজগতের কৌস্তভরত্ন, ভগবদ্ভক্তগণের সাধনার ধন, ভক্তের তুলসী-মালা সদৃশ মহাপবিত্র ভক্তিশাস্ত্র সমন্বয়।

বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রলাপ ও শিক্ষাষ্টক

শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীকৃষ্ণলাভের জন্য যে উৎকণ্ঠা, এই 'প্রলাপে' তাহার অভিব্যক্ত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত 'শিক্ষাষ্টক শ্লোকই' তাঁহার একমাত্র রচনা। শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামীর সুললিত পদ্যানুবাদে এই অমিয় মাধুরী লীলায়িত।

নরোত্তম বিলাস

বৈষ্ণবগণের পরম উপভোগ্য উপজীব্য ভক্তিচরিতামৃত।

দুর্লভসার

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-রচয়িতা শ্রীল লোচনদাস বিরচিত, বৈষ্ণবগণের সংপূজিত।

আত্মতত্ত্ব

বৈষ্ণব দর্শনের সূক্ষ্মতম অনুসরণ।

মনঃশিক্ষা

শ্রীপ্রেমানন্দ দাস ঠাকুর বিরচিত। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত সাধন-ভজনের নিগূঢ় মর্ম্মসমাহিত।

শ্রীচমৎকার চন্দ্রিকা

পরম পণ্ডিত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য পরম বৈষ্ণব শ্রীল কৃষ্ণদাসের সুললিত পদ্যানুবাদ।

পাষণ্ড-দলন

মূর্ত্তিমান বৈরাগ্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বিরচিত প্রেমভক্তির লহর-লীলা।

ভক্তিতত্ত্বসার

হাটপত্তন, শ্রীশ্রীগুরু-বন্দনা, নামসংকীর্ত্তন চৌত্রিশ পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম, নরোত্তম দাসের প্রার্থনা, প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা। সুলভে নামমাত্র মূল্যে বিতরিত।

মূল্য : ৩৲ টাকা

প্রখ্যাত কথাশিল্পী

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়ের

রামপদ গ্রন্থাবলী

৩৯২ পৃষ্ঠা—মূল্য ৩৲ টাকা

গিরীন্দ্রমোহিনী দেবীর গ্রন্থাবলী

মূল্য—বার আনা

বিগতকালের বরেণ্য সাহিত্যস্রষ্টা

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—

ফোকলা দিগম্বর, পাপের পরিণাম, ডমরুচরিত।

মূল্য এক টাকা

২য় ভাগে—

ভূত না মানুষ, কঙ্কাবতী, মজার গল্প, মুক্তামালা।

মূল্য : দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

৬১ বর্ষ, ২১শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পঃ 25 Paise
বৃহস্পতিবার, ২রা পৌষ ১৩৭১ Thursday, 17th December 1964

নিউইয়র্ক বিদ্যালয়ে ভারত-সংস্কৃতি

আমেরিকার নিউইয়র্ক রাজ্যের সরকার পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যক্রমে ভারত সম্পর্কীয় বিভিন্ন বিষয় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবে বলে একটি সুখবর পাওয়া গেছে। একালে রাজনীতির সম্পর্ককেই সকলের চেয়ে বড় করে দেখা হয়। রাজনীতির বাইরে যে বিরাট সংস্কৃতি রয়েছে—তার আদান-প্রদানটা অনেক সময় অবহেলিত হয়ে থাকে। কিংবা ঐ সংস্কৃতির আদান-প্রদান যতোটা হয়ে থাকে তার অনেকাংশ রাজনীতির রজ্জুতে আবদ্ধ থাকে। সুতরাং তদ্দ্বারা দেশ-দেশান্তরের সংস্কৃতির সমন্বয় সাধনে বেশ কিছুটা বাধা উপস্থিত হয়। আমরা চাই বিশুদ্ধ সংস্কৃতি, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরস্পরকে জানার মোহমুক্ত দৃষ্টি। সেদিক দিয়ে বিচার করলে নিউ-ইয়র্ক রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে অভিনন্দিত হবার যোগ্য। কারণ তাঁরা বিদ্যালয়ের পঠনকাল থেকেই ছাত্রদের মধ্যে প্রাচ্য দেশের ইতিহাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে চান। বিগত বছরে নিউইয়র্ক রাজ্যে শিক্ষা পর্ষদের অন্তর্ভুক্ত বৈদেশিক অঞ্চল সংক্রান্ত বিষয়ের অনুশীলন সম্পর্কে পরামর্শদাতা ডাঃ মোর-হাউসের রিপোর্টটিও প্রণিধান-যোগ্য। তিনি তাতে বলেছেন, 'ভবিষ্যতে মার্কিন আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখতে ও বিকশিত করতে হলে যে দুনিয়ায় আমরা রয়েছি সেই দুনিয়া, বিশেষ করে প্রতীচ্য জগতের বাইরের দুনিয়ার জনগণ ও তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের তরুণদের আরও জানতে হবে—এ-সকল বিষয়ে তাদের জ্ঞানের সীমা আরও প্রসারিত করতে হবে।'

প্রতীচ্য জগতের বাইরের দুনিয়ার জনগণের সংস্কৃতির যথার্থ কল্যাণ-স্বরূপটিকে প্রতীচ্যের অনেক জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি দেখে গেছেন। তাঁরা বিভিন্ন গ্রন্থও প্রণয়ন করেছেন। তা সত্ত্বেও প্রাচ্যের বিরাট ভূখণ্ড দীর্ঘকাল ধরে সাম্রাজ্যবাদের আওতায় থাকায় প্রচারের মাহাত্ম্যে তার সত্যকেও অস্বীকার করা হয়েছে এবং প্রাচ্যের অন্তর্গত এই ভারতের বিরাট ঐতিহ্যকে স্বচক্ষে দেখেও দেখা হয় নি। সেই কারণে এদেশের ধ্যানধারণা, জনপদ, ইতিহাস ও সভ্যতা সম্পর্কে বিকৃত রূপই প্রতীচ্যের সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে। এমন কি ভারতের ইতিহাস যা রচিত হয়েছিল, তা খণ্ডিত ও কল্পিত তথ্যে পরিপূর্ণ।

এই কারণে নিউইয়র্কের বিদ্যালয়গুলির পাঠ্যক্রমে ভারত সম্পর্কিত গ্রন্থ নির্বাচনে একান্ত সতর্কতা প্রয়োজন। ঐ পাঠ্যক্রম নির্ধারণে শুধু দুজনের প্রতিনিধিত্বই কি যথেষ্ট? এ ব্যাপারে ভারতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহও যথোপযুক্ত ব্যক্তিদের পরামর্শ গ্রহণ করলে ত্রুটিহীন গ্রন্থ নির্বাচন করা সহজ হবে। আমেরিকার বিখ্যাত পাঠাগারগুলিতে ভারতের আঞ্চলিক ভাষাসমূহের গ্রন্থ নির্বাচনে ত্রুটি ঘটেছে বলে এর আগে শোনা গেছে। পাঠ্যক্রম নির্ধারণে জটিলতা বেশি, সেই কারণে সতর্কতা সর্বাপেক্ষা বেশি প্রয়োজন। নিউইয়র্ক সরকারের সদিচ্ছা অবশ্যই সম্পূর্ণতা লাভ করবে, যদি এই ব্যাপারে আমাদের দেশের উচ্চতম শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিও কিছুটা খোঁজখবর রাখবার চেষ্টা করেন।

সম্পাদকীয়

আজকের —— মানুষ

আমরা প্রত্যেকে, আমাদের নিজস্ব পথে, অসাধ্যসাধন করতে পারি।'

এই নিজস্ব পথেই মানুষের ক্রমমুক্তি। এই পথেই এসেছে ইতিহাসের রূপান্তর। ইতিহাসের অনন্তযাত্রার পথে একটি দেশ, একটা জাতি ইতিহাসেরই অমোঘ নির্দেশে এমনি করেই একদিন নিজেদের ইতিহাস গড়ে তুলেছে। এই নিজস্ব ধারায় আলেকজাণ্ডার মধ্যযুগের রাশিয়াকে হাত ধরে নিয়ে এলেন আধুনিক সভ্যতার আলোক-মেলায়। তারপর আধুনিক রাশিয়ায় উড়লো সমাজতন্ত্রের বিজয় পতাকা। সেটা ১৯১৭ সালের বিপ্লবের ঘটনা।

ইতিহাসের উজ্জ্বল আলোকে তাই উদ্ভাসিত নায়কের মুখচ্ছবিরও রূপান্তর ঘটে—রূপান্তর ঘটে দৃশ্যপট পরিবর্তনের সাথে সাথে। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া রাশিয়ার বুকেও এমনি করেই লেনিন, স্ট্যালিন, ম্যালেনকভ, বুলগানিন, ক্রুশ্চেভ---

তারপর কোসিগিন। আলেকসি নিকোলায়েভিচ কোসিগিন। রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত নতুন মুখ, নতুন ব্যক্তিত্ব। মনে রাখতে হবে, রাশিয়ার নেতৃত্ব বদলের রীতি খুবই চমকপ্রদ। চকিত আবির্ভাব, চকিত তিরোধান। অনেকটাই চকিত বিদ্যুতের মত প্রথম দর্শনে চোখ ঝলসে যায়, কিন্তু স্থায়িত্বকাল অনেক সময় দীর্ঘ নয়। কারণটা বোধ হয় এই যে, দীর্ঘকাল ক্ষমতা হাতে রাখলে জনকল্যাণের সদিচ্ছা ক্রমশ ধূসর হয়ে আসতে পারে। এহ বাহ্য। আজ সমগ্র দুনিয়ার অন্যতম শক্তিশালী দেশ—সমাজতান্ত্রিক দেশ রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন—আজকের দুনিয়ায় আলোচ্য মানুষ সন্দেহ নেই।

জন্ম ১৯০৪ খৃস্টাব্দে। রাশিয়ার বিপ্লবের দিনে তিনি বালক মাত্র। সুতরাং কোসিগিন সম্পূর্ণ ভাবে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার মানুষ। এই নতুন মূল্যবোধে দীক্ষিত চিন্তা ও ভাবনায় কোসিগিন স্বভাবতই শক্ত ধাঁচের মানুষ আর সঙ্গে সঙ্গে অসাধারণ যুক্তিনিষ্ঠ। ক্রেমলিনের এই প্রাসাদে তিনি সহসা প্রবেশের ছাড়পত্র পান নি। ধাপে ধাপে তাঁকে ক্রমশ উপরে উঠতে হয়েছে। তাঁকে পেরিয়ে আসতে হয়েছে অনেক—অনেক পথ। আসতে হয়েছে বস্ত্রশিল্পের কারখানা থেকে মস্কোর ক্রেমলিন প্রাসাদে।

জীবননাট্যে কোথাও ভয়ঙ্কর উত্থান-পতন নেই। স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রবাহিত হয়েছে জীবন-স্রোত। সাফল্যের ফসল একের পর এক জমা পড়েছে তার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে। জীবন সুরু হয়েছিল একটি বস্ত্রশিল্পের শ্রমিক হিসেবে। আর সেখানেই তিনি ফোরম্যান পদ লাভ করেন। কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন ১৯২৭-এ। তখন স্ট্যালিন-ট্রটস্কি বিরোধ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁচেছে। সেদিন তাঁর মুক্তমনা মন স্ট্যালিনের পক্ষ সমর্থন করতে কুণ্ঠাবোধ করে নি। ১৯৩৯ খৃস্টাব্দে কেন্দ্রীয় কমিটিতে যোগদান করেন। নিজের ক্ষমতাবলেই তিনি স্ট্যালিন মন্ত্রিসভার বস্ত্র, বিদ্যুৎ ও অর্থ দপ্তরের দায়িত্ব পান। পার্টি প্রেসিডিয়ামে প্রবেশাধিকার পান ১৯৪৮ খৃস্টাব্দে। উল্লেখযোগ্য, এই সময় পার্টি প্রেসিডিয়ামে তিনি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ সদস্য, কিন্তু নেতৃত্বের চুচকাওয়াজে কোথাও তাঁর পদবিক্ষেপ এতটুকু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে নি। এই সময়ই তাঁকে মাঝে মাঝে সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের প্রধান হিসেবেও কাজ চালাতে হয়েছে।

তারপর ক্রুশ্চেভের একান্ত ঘনিষ্ঠ সহকর্মী হিসেবেও অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। অবশেষে প্রধান-মন্ত্রীর দায়িত্ব।

ক্রুশ্চেভের অকস্মাৎ পদচ্যুতি যেমন উল্লেখযোগ্য ঘটনা, তেমনি কোসিগিনের প্রধানমন্ত্রিত্ব লাভও যথাযোগ্য। কেন না তিনি দীর্ঘকাল ধরে প্রামাণ করে এসেছেন এতবড় দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্যতা তাঁর আছে। আমরা এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ। সাম্প্রতিক রদবদলের পর কেউ কেউ ভেবেছিল সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতির অদল-বদল হওয়া সম্ভব। অন্তত ভারতের ক্ষেত্রে। কিন্তু কোসিগিন স্পষ্টভাষায় জানিয়েছেন,

শ্রী আলেক্সি কোসিগিন

ভারতের প্রতি সোভিয়েটের মনোভাব অপরিবর্তিত থাকবে। কোসিগিনের বাস্তবদৃষ্টি, যুক্তিশীল মনোভঙ্গি, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা সম্ভবত তাঁকে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণেরই সুযোগ দেবে—যা মূলত শান্তি ও প্রগতির সহায়ক। কেন না, বিশ্বে রাশিয়ার ভূমিকা শান্তিবাদীর। কোসিগিন, ইতিমধ্যেই অনুরূপ সদিচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। সামরিক বাজেটের বরাদ্দ অর্থ কমিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তিনি যথার্থ শান্তির পথে দৃঢ়তার সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছেন, সন্দেহ নেই।

সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর

হরপ্রসাদ মিত্র

শব্দ নিয়ে অতৃপ্তি ঘনিয়ে উঠছে তবু। 'ধারণা' কথাটা নিয়েই অশান্তি। সাহিত্যের খেলায় 'বস্তুনিষ্ঠা' থেকে এই 'ধারণা'-সঞ্চারের খেয়ালে গিয়ে পৌঁছোনো,—এই গতির কথাই ভাবছিলুম। শেষরাত্রে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে শীতের সকাল অনুভব করলুম।

আস্তে আস্তে পূবদিক ফরসা হোলো। আমার লেখার টেবিলের সামনাসামনি এদিকের আমগাছটা শুধু ছায়া-ছায়া স্থির এক উপস্থিতি।

ত্রিপলের পর্দা তোলা ছিল তারই মুখোমুখি বারাণ্ডায়। পর্দার ওপর দিয়ে পূবদিকের আকাশ দেখা যাচ্ছিল। রাঙা হচ্ছে আকাশ।

এই আমগাছে পাখি থাকে। সেই পাখিরা ডাকছিল। চড়ুই, বাবুই, একটানা কুক্ কুক্ শব্দ করে যারা, সেই পাখিরাও। আকাশে চিলের ডাক শোনা গেল। শেয়ালদায় ট্রেন আসা-যাওয়া করছে, সেইসব এঞ্জিনের বাঁশি শোনা গেল। জাহাজেরও। গঙ্গা এখান থেকে কতোই বা দূর?

ঈষৎ ঠাণ্ডা হাওয়া এলো জানলা দিয়ে। ভোরের প্রথম হাওয়া।

সকালের সেই অনুভূতির স্বাদে শান্ত হয়েছিল মন। শহরের ঘুম ভাঙার স্বাদ,—সকালের শান্ত কলকাতার স্বাদ। প্রথম যানবাহন চালু হবার শব্দ শুনতে শুনতে বিমলবাবুর 'খড়কুটো' মনে পড়লো আবার। এক ঝলকে যেন দুটি নরম দৃশ্য পাশাপাশি এসে দাঁড়াল।

মধ্য-ভারতের আটসাঁট ঈষৎ কালচে মাটি আর পাথরের দেশ। আনন্দমোহন সেখানকার কলেজে কেমিস্ট্রি পড়ান। তাঁর বয়স পঞ্চাশ। প্রথম স্ত্রী সুখতারার মৃত্যুর পরে কৃষ্ণার-মা হিমানীকে বিয়ে করেছিলেন তিনি। আনন্দমোহনের প্রথম বিবাহের সন্তান ভ্রমর। ভ্রমরের প্রায়ই অসুখ করে। তার নিজের মা নেই বলেই বোধ হয় তার অসুখ নিয়ে কেউই বিশেষ মাথা ঘামায় না। অমল তাতে কষ্ট পায়। দেওয়ালীতে বাজীর উৎসব দেখতে গিয়ে যে-রাত্রে ভ্রমরের জ্বর হয়, তারই পরের সন্ধ্যায় পরিপাটি এই খ্রীস্টান-পরিবারে তরুণ অতিথি অমল সেখানকার জল-চাঁদমারির গল্প শুনেছে।

আনন্দমোহনের দেশ বাঁকড়োয়। তিনি পোস্ত খেতে ভালোবাসেন। রিটায়ার করে বাঁকড়োতেই গিয়ে বাস করবেন,—এই তাঁর ইচ্ছে। এইসব কথা হচ্ছিল। ঘরে ঠাণ্ডা আলো। ভ্রমর তখনো ঠিক সুস্থ হয় নি। কিন্তু কেউ তার অসুখ নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না বলেই নিজের অসুখের বিষয়ে সংকুচিত হয়ে থাকে সে। সে বাপের কথা শুনছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। অমল আচমকা অধীর হয়ে বলে—'ভ্রমর তুমি বসো।'

আনন্দমোহন ঘাড় ফিরিয়ে তাকে দেখে বলেন—'কিরে তুই দাঁড়িয়ে আছিস কেন?- - -আচ্ছা শোন, আমার ঘর থেকে সিগারেটের টিনটা নিয়ে আয়।'

এই পরিস্থিতির শুধু দৃশ্যরূপই নয়,—এ-দৃশ্যের অনুভূতির স্বাদ দিয়েছেন বিমলবাবু। সেদিন কলকাতায় শীতের সকাল অনুভব করতে-করতে আমার সেই অনুভূতি মনে এলো—

'সিগারেট ধরিয়ে নিয়েছেন আনন্দমোহন। এক মুখ ধোঁয়া নিয়ে আস্তে আস্তে ঢোঁক গিলছিলেন। ঘরের আলো ধবধবে নয়; এ-বাড়িতে ইলেকট্রিক নেই। বড় মতন একটা জাপানী বাতি জ্বলছিল, কাঁচের প্লেটের ওপর রাখা পেতলের পালিশ করা টেবল-ল্যাম্প, বড় ফুলদানির মতন দেখতে অনেকটা, কাঁচের সরু চিমনি গলা তুলে আছে, গায়ে গোল ধবধবে সাদা ডোম। মোলায়েম আলোয় ঘর অর্ধেকটা আলোকিত, বাকিটুকু ছায়া-ছায়া ধূসর। আনন্দমোহনের ছায়া হিমানীর কাছাকাছি গিয়ে আকারহীন হয়ে পড়ে আছে। হিমানীর ছায়া অন্ধকারে মিশেছে। ভ্রমর ও কৃষ্ণার পায়ের তলায় অমলের মাথার ছায়াটুকু দেখা যাচ্ছিল।'

'খড়কুটো'র এই ছায়া-বিন্যাস যেন গভীর এক প্রতীক। উপন্যাসের মধ্যে এইভাবেই অনুভূতির প্রতীক ফুটিয়ে তোলা বিমলবাবুর স্বভাব।

'খড়কুটো'তেই এরপর ভ্রমরের একটি গানের দৃশ্য আছে।

ঘরটা চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল। হিমানী তাঁর বোনার কাঁটা কোলে রেখে বলেছিলেন—'ভ্রমর, তুমি ক'দিন কোনো উপাসনা গাওনি।'

উপাসনার প্রস্তাব শুনে কৃষ্ণাকেও শান্ত হয়ে বসে থাকতে হয়েছিল। ভ্রমর নীরবে অর্গানের কাছে গিয়ে বসেছে। আনন্দমোহন হাতের

সিগারেট নিভিয়ে বসেছেন। হিমানী শাড়ের চাদর গুছিয়ে শক্ত ভঙ্গিতে সোজা হয়ে বসেছেন। অমলও মুখ ঘুরিয়ে বসেছে অর্গানের দিকে।

ভ্রমরের গান শুরু হয়েছে সেই অবস্থাতেই—'তিনি মহিমাতে সজ্জিত - - -সদাপ্রভু সজ্জিত - - -'

এই গানের বর্ণনায় বিমলবাবু লিখেছেন—

'অর্গানের ঘন গম্ভীর শব্দের সঙ্গে ভ্রমরের মিষ্টি চিকন গলার সুর মধুর হয়ে মিশে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, ভ্রমর তার সর্বান্তঃকরণ দিয়ে এই উপাসনাটুকু গাইছে, তার সমস্ত হৃদয় সদাপ্রভুর মহিমার কাছে নিবেদিত।

হিমানী শান্ত নিশ্চল হয়ে বসে, আনন্দমোহন শূন্যের দিকে তাকিয়ে আছেন। কৃষ্ণা অভ্যস্ত ভঙ্গিতে বসে, তার চোখ চঞ্চল। এই ঘরের আবহাওয়া আস্তে আস্তে কেমন পাল্টে গেল। এখন আর অন্য কিছু মনে পড়ছে না, ভ্রমরের মুখ আরও যেন করুণ, সুন্দর হয়ে উঠছে। অমলের ইচ্ছে হল ভ্রমরের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ওই গান একটু গায়, 'মহিমায় সজ্জিত' শব্দটা তার বড় ভাল লাগছিল। দরজার মাথায় মেহগনি কাঠের যীশু মূর্তির দিকে তাকিয়ে অমল সেখানে ঘরের ছায়া দেখল।'

যীশুর মূর্তিতে ঘরের ছায়া দেখবার এই ইঙ্গিতটিও কবিতা। এ যে [illegible] আমাদের একালের সাহিত্যেরই [illegible], সে-কথা বলা ঠিক হবে না। প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক সাহিত্যেই স্রষ্টা-মনের এইরকম নানা অনুভূতি দেখা দিয়ে থাকে। একালে বাংলা গল্প-উপন্যাসে বাস্তবতা চর্চার মধ্যেই এইরকম উপলব্ধি ফুটিয়ে তোলবার আয়োজন দেখা যাচ্ছে—এইটুকুই একটু আলাদা করে অনুভব করা যায়।

পশ্চিমের সাহিত্যে উনিশ-শতকের সব চেয়ে বড়ো বা সব চেয়ে লক্ষণীয় উপাদান কী, এ-প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে কেউ কেউ উপন্যাস-চর্চা আর বাস্তবতা রক্ষার কথা বলেন। বিজ্ঞানে বিশ্বাস আর উদার-দৃষ্টির অভ্যাস,—সামাজিক ক্ষেত্রে এই ছিল এ-মনোভাবের প্রকাশ্য দিক। সাহিত্যের বিষয়বস্তুর দিক থেকে বলা যায় যে, মধ্যবিত্ত আর নিম্নবিত্ত শ্রেণীর জীবন-রূপায়ণের দিকে আগ্রহই এ-মনোভাবের প্রত্যক্ষ ফল। আগেকার মতন বীরত্ব আর প্রেমের বর্ণনাই শুধু নয়, এ-আমলে মানব-জীবনে টাকা-কড়ির সম্পর্ক,—সমাজের খুঁটিনাটি আরো নানাদিক সাহিত্যে আরো বেশি পরিমাণে প্রবেশ করেছে।

পশ্চিমের সাহিত্যের নানা ধারা মনে রেখেই একজন বলেছেন যে, বস্তুতন্ত্রের সূচনা স্বভাবতই আদিকালের হোমারের মধ্যেও পাওয়া যায়। তবে, একালে এ-দৃষ্টির ধর্তব্য তারিখ বোধ হয় স্তাঁদালের (Stendhal : ১৭৮৩-১৮৪২) সময় থেকে। ফরাসী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে স্মরণীয়দের অন্যতম তিনি। খুব রোমান্টিক কাহিনীর দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিল বটে, কিন্তু তাঁর বলবার ভঙ্গিটা বিস্ময়কর। সে-ভঙ্গিতে তন্ময়তা ছিল, বিদ্রূপের মেজাজও ছিল।

বালজাক (Honore De Balzac : ১৭৯৯-১৮৫০) এসে স্তাঁদালের বস্তুমুখিতার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেন। বিষয়বস্তু এবং বলবার ভঙ্গি—দু' দিক থেকেই আরো যেন বস্তুনিষ্ঠ হলেন তিনি। ফরাসী সমাজের অনেক ছবি ফুটেছে তাঁর চব্বিশখানা উপন্যাসে আর অসংখ্য গল্পে।

ফ্লবেয়ার (Gustave Flaubert ১৮২১-৮০) যেন আরো বস্তুনিষ্ঠা দেখিয়ে গেছেন। লেখার রীতিতে আরো যথাযথ হবার চেষ্টা করেছেন তিনি। তাঁর উপন্যাস 'মাদাম বোভারী' আর তাঁর ছোট একটি গল্প,—ইংরেজি অনুবাদে যার শিরোনাম—'এ সিম্প্‌ল্‌ হার্ট'—ফরাসী সাহিত্যে বস্তুনিষ্ঠার জোয়ারের চিহ্ন না কি এই দুটিতেই।

আজ যাঁর মতামত মনে পড়ছে এখানে, সেই অধ্যাপক-মশাই লিখেছেন যে, ইংরেজিতে ডিফো, ফীল্ডিং, রিচার্ডসনের মধ্যে বাস্তব দৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল বটে, তবে চার্লস ডিকেন্স (১৮১২-৭০) থেকেই এদিকের রীতিমত অভিব্যক্তি দেখা দেয়। বালজাকের মতন 'হিউম্যান কমেডি' না লিখলেও উনিশ-শতকের প্রথম দিকের ব্রিটেনের সমাজ-জীবন তাঁর রচনায় ছায়া রেখে গেছে। এই সঙ্গেই উইলিয়ম মেক্‌পীস্‌ থ্যাকারের (১৮১১-৬৩) এবং অ্যান্টনি ট্রলপের (১৮১৫-৮২) নাম করেছেন তিনি। বলেছেন—ইংলণ্ডের বাস্তব-সাহিত্য-আন্দোলনের সাধকদের মধ্যে তাঁরাও গণ্য।

কিন্তু ফ্রান্সে, ইংলণ্ডে সাহিত্যের আসরে এই বস্তুবাদ যতোই তীব্র হয়ে থাক, পুরোপুরি ইউরোপের সাহিত্যের কথা ধরলে অনেকেই বলবেন রাশিয়ার কথা। ফীয়ডর ডস্টয়ভেস্কি (১৮২১-৮১) ছিলেন, —আইভ্যান টুর্গেনিভ (১৮১৮-৮৩) ছিলেন,—লিও টলস্টয় (১৮২৮-১৯১০) ছিলেন। এঁরা এঁদের নিজেদের সমকালের জীবনে সম্যক মনোযোগী থেকেই জীবনের গভীর স্বাদ রেখে গেছেন।

সেই উনিশ-শতকেই নরওয়েতে নাট্যকার ইবসেন (১৮২৮-১৯০৬) এসেছিলেন। তাঁর প্রভাব ছড়িয়েছে নানা দেশে—বিশেষভাবে জার্মানীতে এবং ইংলণ্ডেও—বার্নার্ড শ'র মননে।

বিমল কর আর জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কথা ভাবতে গিয়ে আজ আমার এসব ইতিহাস মনে পড়ছে কেন? এঁরা ইউরোপেরও নন, উনিশ-

শতকেরও নন। এঁদের দুজনের মন একও নয়। দুজনের মধ্যে বিশেষ মিল এইটুকুই যে, আমাদের হাল-আমলের বাংলা গল্প-উপন্যাসে যথার্থ শিল্পীর পরীক্ষা বলতে যা বুঝিয়ে থাকে, এঁদের অনুভূতি-রূপায়ণের আয়োজনটা সেদিক থেকে কর্তব্য,—এবং তাতে দুজনের মধ্যে বেশ একটু সাদৃশ্যের ধারণা জাগে। উপমার ভক্ত দুজনেই, চিত্র-রচনার ঝোঁক আছে দুজনেরই। দুজনেই বাস্তব—অর্থাৎ কাছের জগৎ নিয়ে গল্প-উপন্যাস লিখতে উদ্যোগী; এবং দুজনেই কবিপ্রাণ।

আর, বিমলবাবুর নজর ন্যাচারালিজ্‌মের দিকে নয়, কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্র-বাবুর মধ্যে থেকে থেকে যেন সে-ঝোঁকও দেখা দেয়।

সাহিত্যে 'ন্যাচারালিজ্‌ম্' সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্ট করে বলতে যাওয়া শক্ত কাজ। শক্ত কাজ,—কারণ, এই আন্দোলনের মধ্যেই একটু নিচু-নজরের বাস্তবতার ঝোঁক ছিল বোধ হয়। আমি তাই কদিন আগে এই কথার ইশারা দিতে গিয়ে 'চরম-পন্থা' কথাটা লিখেছিলুম। আজ আর একটু খুলে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে। সেজন্যে দ্বিধাও হচ্ছে। কিন্তু তবু বলে ফেলাই ভালো। যদি নিজে ভুল করে থাকি, ভুল ভাঙবে তো।

[illegible] অধ্যাপক লিখেছেন—গত শতকের শেষদিকে সাহিত্যে বস্তু-নিষ্ঠার আন্দোলন ক্রমে ন্যাচারালিজমে রূপান্তরিত হতে থাকে। গত শতকের মাঝামাঝি সময়ের বাস্তবতার সঙ্গে তুলনা করে দেখলে বলতে হয় যে, এই বদলের ফল ফলেছিল একরকম কৃত্রিম-বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে,—সে কতকটা যেন যুদ্ধের মেজাজ,—যেন আক্রমণাত্মক ভঙ্গি,—এবং মানবিক অস্তিত্বের ক্লেদাক্ত স্তর নিয়েই সে দৃষ্টির অভিনিবেশ। মূল ইংরেজিতে এই অধ্যাপক লিখেছেন—'Compared with mid-century realism, naturalism tended to be more militantly pseudo-scientific in its approach and even more concerned with degraded, often sordid levels of human existence.'

ইংরেজিতে এই 'sordid levels' দেখেই বাংলায় নিচু-নজরের উল্লেখ করতে ভরসা পেলুম। জ্যোতিরিন্দ্র-বাবু আমার বন্ধু। তাঁর নজর স্রষ্টার নজর। আমি তাঁর বা অন্য কোনো সৎ লেখকের বিরুদ্ধে কোনো মন্তব্য করছি না। তাঁরা আমার প্রিয়জন। প্রত্যেক সৎ লেখকই তো প্রত্যেক সৎ পাঠকের প্রিয়।

আমি কথাশিল্পীর বিশেষ একটি পরীক্ষার কথা ভাবতে-ভাবতেই একালের এই নিচু-নজরের বা কৃত্রিম-বৈজ্ঞানিক নজরের প্রসঙ্গে এসে পৌঁছেছি। বাংলার কবিতায়, কথা-সাহিত্যে আরো নবীন পরীক্ষাব্রতী যাঁরা, সেইসব আগামীকালের লেখকদের উদ্দেশ্যে এই সূত্রে আমার পাঠককৃত্য সারা হোলো। 'নিচু-নজর' কথাটা এখানে গ্লানিহীন। শোনা যায়, ইংরেজিতে টমাস হার্ডির (১৮৪০-১৯২৪) মধ্যেও এই ন্যাচা-রালিজ্‌ম্ ব্যক্ত হয়,—সে তো কদর্যতা নয়,—হার্ডির হাতে ন্যাচারালিজ্‌ম্ হয়ে ওঠে গভীর বিষাদময় অদৃষ্টবাদের ভঙ্গি। আবার, জোলার কলমে সেই ন্যাচারালিজ্‌মই বংশানুক্রমিক প্রভাবের গুরুত্বে বিশ্বাস হয়ে দাঁড়ায়। শোনা যায়, জার্মানীতে থিয়োডর ফন্টেন (Theodor Fontane : ১৮১৯-৯৮) এবং আরো কেউ কেউ এ-আন্দোলনের সাধক ছিলেন। ইউরোপে উনিশ-শতকের বেড়া ডিঙিয়ে এ-মেজাজ আমাদের এই বিশ শতকেও বয়ে এসেছে। বাংলায় একালের সাহিত্যপ্রয়াসে আরো নানা হাওয়ার সঙ্গে এই পুরোন হাওয়াও মিশে গেছে বোধ হয়।

(ক্রমশঃ)

দৃষ্টি

বিজয়কুমার দত্ত

পাহাড়ে দাঁড়িয়ে উঠলে, চোখের সামনে ভাসে জনপদ নগর গ্রামের
ভিন্নতর দৃশ্যপট : কি যেন অদ্ভুত লাগে মনে।
যেমন শিশুরা হাসে অকারণে পরিচিত কোলে।

বিস্ময় লাগানো চাই চোখের মণিতে—
নইলে উজ্জ্বল আলো মাঝে মাঝে ফিকে হয়ে ওঠে,
চেতনা শাণিত হলে তবেই প্রখর প্রেম রক্তিম নির্বাধে
নিজেকে নিঃশেষ করে ছাই হতে পারে।

তবে কি পাহাড়ে উঠে প্রাকৃতিক পটভূমিকায়
মানুষ নিজেকে দ্যাখে রক্ত-মাংস-গ্রন্থির সত্তায়?

স্বর্গ, মর্ত্য

সুবেশ্বর গরাই

গ্রহে গ্রহে যাত্রা সুরু। অসীমের পথে দিল পাড়ি
ভুলে গিয়ে পৃথিবীর পথ যারা তারাও মানুষ
এই মহাপৃথিবীর। মহাব্যোমযানে কারো হুঁশ
নেই, তবু বক্ষে ভালবাসা। যেন জীবনের গাড়ি
সদাই চঞ্চল। মর্ত্যে তাদের কথার প্রতিধ্বনি
বেতার তরঙ্গে কাঁপে। সবাই কী আগ্রহে উৎসুক।
মাটির মানুষ দেখে টেলিভিশনে সে চেনা মুখ।
স্বর্গ আর মর্ত্য যেন মিলে হয় মধুর তখনি॥

● মরিবানা পুষ্পসজ্জায় বিষম রীতির একটি অপূর্ব রচনা

প্রতীচ্যের সঙ্গে দূর পাল্লার দৌড়ে প্রাচ্য জাপান পিছিয়ে পড়তে নারাজ ছিল সম্রাট মেইজির আমল থেকেই। জীবনে এবং জীবনযাত্রায়, শিল্পে (Industry) এবং শিল্পকলায় (Art), চিন্তায় এবং চেতনায়, এমন কি ঘরে ও গৃহস্থালীতে পাশ্চাত্যের কাছে যেটুকু যথার্থ শিক্ষণীয়, জাপান তা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছে। প্রকৃষ্ট গতির বা প্রগতির অনুধাবনে এই প্রাচ্য দ্বীপ-মালার দেশ ঐতিহ্যের কাটছাঁট রদবদলেও চির নির্ভীক। পাশ্চাত্য প্রভাব তাই এদেশে সমস্ত সম্ভাব্য রন্ধ্রপথেই আতিথ্য পেয়েছিল এবং আজও পাচ্ছে। এখানের যা একান্ত নিজস্ব সম্পদ সেই ইকেবানা শিল্পেও (Flower arrangement) পাশ্চাত্যের সংক্ষিপ্তকরণ ও দ্রুততার হাওয়া নতুন ঝড় এনেছিল আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে, আরও প্রত্যক্ষভাবে গত মহাযুদ্ধের পর। আর তারই ফসল জাপানী ইকেবানায় মরিবানা রীতির প্রবর্তন। পুষ্পাধারে পত্রপুষ্পপল্লবের সমাহার রচনাকেই যদিও একার্থে 'মরিবানা' বলা হয়; তবু প্রকৃতপক্ষে মরিবানা মানে পুষ্পাধারে লতাপাতা ফুলফলের স্তূপ রচনা নয়, আরও কিছু। প্রধানত পাশ্চাত্যের ছিমছাম নতুন রীতির গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্যই জাপানীরা 'শোকা' এবং 'রিক্কা' রীতির ওপর প্রয়োজনীয় আধুনিকীকরণ ক'রে আরও একটু বাস্তবধর্মী মনোভঙ্গির পরিচয় রেখেছিলেন মরিবানা রীতিতে।

মরিবানার জন্য শিল্পী নিচু বা চেপ্টা ধরণের আয়ত পুষ্পাধার নির্বাচন করলেন। তা ছাড়া আধুনিক পাশ্চাত্য ঢঙের গৃহসজ্জার উপযোগী পরিবেশ রচনার জন্য 'মরিবানা'য় পরিকল্পনার যথেষ্ট স্বাধীনতাও গ্রহণ করা হ'ল। মরিবানা আসলে বিন্দুতে সিন্ধু ধারণের কর্তব্য সাধন করতে চাইল। ছোট পুষ্পাধারটির মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে চাইল উদ্ভিদজীবনের সমস্ত বৈশিষ্ট্য সমন্বিত একটি সুষ্ঠু বাগানের দৃশ্যকে। অবশ্য জাপানী পুষ্পসজ্জার প্রচলিত ভাবাদর্শকেও বাদ দেওয়া হ'ল না। পুষ্পসজ্জায় স্বর্গ-মর্ত্য ও মানবকে রূপায়িত করার অবশ্যপাল্য প্রথাকে বজায় রাখা হ'ল তিনটি সুস্পষ্ট স্তর বিভাগের মাধ্যমে।

মরিবানায় জাপানী ইকেবানা বহুল পরিমাণে সরলীকৃত হ'য়েছে। — ড্রইং রুমই হোক বা ছোট বৈঠক-খানাই হোক, স্বচ্ছন্দে নিজেকে পরিবেশ অনুসারে গুছিয়ে তোলার অদ্ভুত ক্ষমতা রাখে এই মরিবানা রীতি। আর তা সম্ভবও। কেন না মরিবানায় শিল্পীর স্বাধীনতা অপেক্ষাকৃত বেশি।

তবুও জাপানী ইকেবানার সাধারণ ধর্মটি মরিবানাকেও নির্বিবাদে মানতে হয়। আর তা হল, বিশেষ ঋতু ও কালগত বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তোলা (৩রা ডিসেম্বর, ২৭ সংখ্যক সাপ্তাহিক দ্রষ্টব্য)। এবং ইকেবানার আকৃতিতে জাপানী দার্শনিক প্রতীতির ইঙ্গিতবহ যথাযথ রূপারোপ করা।

এক একটি মরিবানায় প্রধানত তিনটি অনিবার্য স্তর বিভাগ থাকবেই।

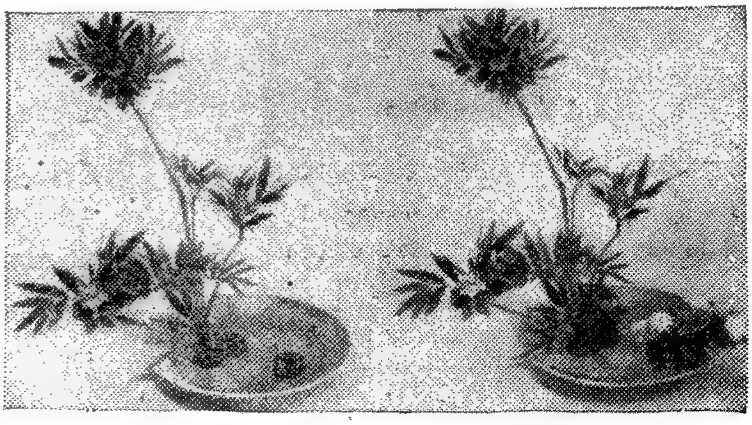

● মরিবানা—খাড়া রীতি। শিপ্পোর ব্যবহার লক্ষণীয়

এই স্তরত্রয়ীর লক্ষ্য—স্বর্গ, মানুষ ও মর্ত্যের পুষ্পিত রূপক রচনা করা। পুষ্পাধারের সবচেয়ে দীর্ঘস্তর স্বর্গের, মধ্যস্তর মানুষের এবং নিম্নস্তর মর্ত্যের প্রতীক।

দৈর্ঘ্যে সর্বোচ্চ স্তরের (শিন) পরিমাপ পুষ্পাধারের দেড়গুণ; মধ্যস্তর (শোই) দীর্ঘ (শিন) স্তরের এবং নিম্ন-স্তর হিক্যা) মধ্যম স্তর থেকে তিন চতুর্থাংশ পরিমাণ ছোট। স্বর্গের রূপক (শিন) বা দীর্ঘতম শাখাটি মরিবানার প্রধান অঙ্গ ও সে কারণে বলিষ্ঠতম। মধ্যম স্তর অর্থাৎ মনুষ্য-রূপকটি পুষ্পাধারের কেন্দ্রবিন্দু থেকে দুই প্রান্তে ও সম্মুখভাগে প্রশাখা বিস্তার ক'রে রচনার বৈচিত্র্যসাধন করে। আবার এই প্রশাখাত্রয়ীর প্রত্যেকটিকে স্বর্গাভিসারী বা প্রধান শাখার প্রতি আকৃষ্ট রাখা হয়। মর্ত্যের সংকেত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শিল্পী যে তৃতীয় শাখাটি গ্রহণ করেন তা পুষ্পাধারের উচ্চতা স্পর্শ ক'রে কখনো শায়িত অবস্থায় কখনো বা প্রধান শাখাদ্বয়ের বিপরীত দিকে হেলে থাকে। এরই সঙ্গে একটি সম্পূর্ণ বাগানের দৃশ্য বা উদ্ভিদ পরিবেশ ফুটিয়ে তোলার অভিপ্রায়ে শিল্পী অতিরিক্ত কিছু পুষ্পপল্লবের আয়োজনও রাখতে পারেন, যদিচ সে আয়োজন কোনো ক্ষেত্রেই প্রধান তিনটি স্তরকে আবৃত করবে না।

• হেলানো রীতির মরিবানা

শৈল্পিক কৌশলের গুণে সমগ্র ইকেবানাটি একই মূল কাণ্ড থেকে উত্থিত হয়েছে, এ জাতীয় বিভ্রম সৃষ্টি করা যায়। ফলত পুষ্পসজ্জার এই আপাতবিভ্রম সমগ্র পারিপাট্যকে একক সৌন্দর্যে মনোরম ক'রে ইকেবানার সৌষ্ঠব রচনায় সহায়তা করে। শিল্পীকে এজন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতির সাহায্য নিতে হয়। কাঁচি ও কুঠার শাখাগুলির প্রয়োজনীয় আকৃতি সাধন করে। কেনজান ও শিপ্পো (চিত্র দ্রষ্টব্য) কচি বাঁশ কিম্বা নরম শাখার ঠেকনো দিয়ে শাখাশিষগুলিকে যথাযথ ধরে রাখে এবং স্প্রে ও পাম্পের সাহায্যে শিল্পী তাঁর ইকেবানা জলের ছিটেয় স্নান করিয়ে সতেজ ক'রে তোলেন।

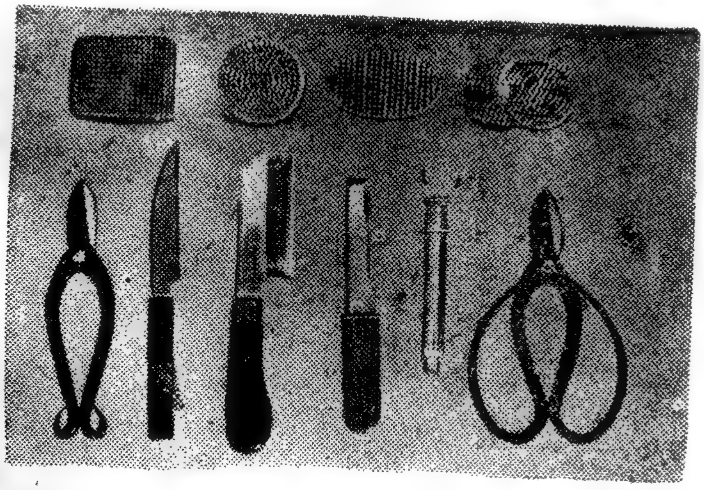

● 'ইকেবানার যন্ত্রপাতি'

একটি সুষ্ঠু মরিবানা রচনায় ইচ্ছুক হ'লে আপনাকে মনে রাখতে হবে, মরিবানার আয়োজনে শিপ্পো এবং

কেনজানের ব্যবহার প্রায় অনিবার্য। আয়ত আধারে শাখাশিষ ধ'রে রাখার অন্যতর কোনো সুন্দর ব্যবস্থা নেই। কেনজান এবং শিপ্পোর উচ্চতা ঢেকে পুষ্পাধারে জল রাখবেন। লক্ষ্য রাখবেন, শাখার কর্তিত অংশ যেন বাইরের হাওয়ার স্পর্শ না পায় অর্থাৎ জলের মধ্যেই অনুস্যূত থাকে। এখানে এই ব্যবস্থার নাম 'মিজুকিরি'। মিজুকিরির দ্বারা ইকেবানা সতেজ রাখা যায়। দীর্ঘতর সময় ইকেবানাকে সতেজ রাখার জন্য জাপানীরা স্বল্প পরিমাণ হাইড্রোক্লোরিক অথবা সালফিউরিক এ্যাসিড ব্যবহার করেন। ভারতে অত ঝক্কি কেউ পোয়াবেন না জানা কথা। সুতরাং দ্বিতীয় একটি সুলভ পন্থার উল্লেখ করি: শাখাগুলিকে শিপ্পো অথবা কেনজানে প্রোথিত করার আগে নস্যির টিপের মতো এক টিপ মিহি লবণ কর্তিত শাখামূলে বেশ ক'রে ড'লে দিতে পারেন, যা আবশ্যকীয় রাসায়নিক এ্যাসিড সৃষ্টি ক'রে ইকেবানাকে সতেজ ও সুন্দর রাখবে।

আগের চিঠিতেই জানিয়েছিলাম, মরিবানা যেমন চেপ্টা ধরণের পুষ্পাধার অবলম্বন করে, লম্বাটে ফুলদানী গ্রহণ করা হয় তেমনি হাইকা রীতিতে। বাকি রীতিনীতি প্রায় একই প্রকার। তবে অনাড়ম্বর ঘরের পক্ষে মরিবানাই উপযুক্ত।

মরিবানা ও হাইকার মধ্যেও শিল্পী কয়েকটি রীতিবৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন:

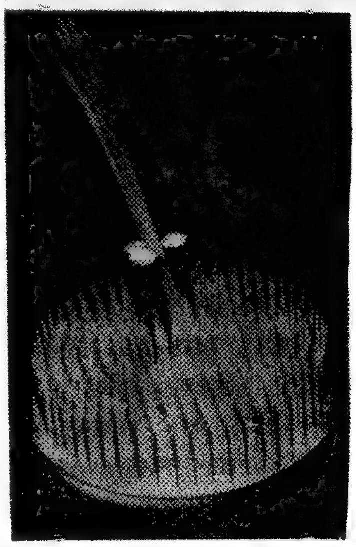

● কেনজান ব্যবহারের নিয়ম

(ক) খাড়া বা Upright রীতি, (খ) হেলানো অথবা Standing রীতি, (গ) Cascade কিম্বা ঝর্ণা রীতি, (ঘ) স্বর্গাভিসারী অথবা Heavenly রীতি, (৩রা ডিসেম্বরের সাপ্তাহিক দ্রঃ) (ঙ) Contrasting বা বিষম রীতি। আবার স্বাধীনচেতা শিল্পী এই পঞ্চরীতির বাইরেও ব্যবহার করেন নিজস্ব অবাধ রীতি বা ব্যতিক্রম।

বর্তমান পত্রের সঙ্গে যে কয়েকটি চিত্রনিদর্শন সংযুক্ত হ'ল, অনুসন্ধিৎসু পাঠক সেগুলি লক্ষ্য ক'রে মরিবানা ও হাইকা সম্পর্কে উপযুক্ত পাঠ গ্রহণ করতে পারবেন ব'লেই আশা রাখি।

● ঝর্ণা রীতির 'হাইকা' পুষ্পসজ্জা

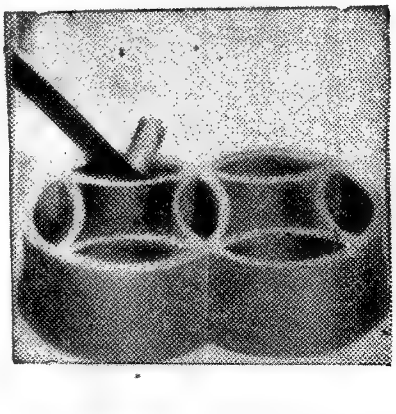

● শিপ্পোর ব্যবহারে পুষ্পসজ্জায় অনেক সমস্যা মেটে।

রাজধানী ঃ

ভারতবর্ষের জাতীয় ভাষা সম্পর্কে দফায় দফায় বহু আলোচনা হয়ে গেছে। তখন হিন্দীপ্রেমীরা প্রাণপণ চিৎকারে অচিরে সমগ্র ভারতবাসীদের ওপর এই হিন্দীর বোঝা চাপিয়ে দিতে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু চিৎকার যত জোরে হয়েছিল, আবেগ যত গভীর হয়েছিল—কার্যক্ষেত্রে ততটা হয় নি। কেন না অহিন্দীভাষীরা বিশেষত দক্ষিণ ভারতীয়রা এই হিন্দীর জোর-জবরদস্তি সহজে মেনে নিতে রাজী ছিলেন না। ফলে জাতীয় ভাষার ব্যাপারটি একপ্রকার গড়িমসি করেই এতকাল চলছিল। কিন্তু সম্প্রতি এই ব্যাপারটি আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে—জোর বিতর্কের সূচনা করেছে। এর সুরু হয় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীচাগলার বক্তৃতা থেকে—যেখানে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে হিন্দীপ্রেমীদের অত্যুৎসাহিতার নিন্দা করেছেন এবং দক্ষিণ ভারত ও বাংলার অনিচ্ছুক গলা দিয়ে হিন্দী নামানোর চেষ্টার পক্ষে সঙ্গত কারণেই সায় দিতে পারেন নি।

শুধু তাই নয়, হিন্দীপ্রেমিকদের উদ্দেশ্য করে দ্বিধাহীন কণ্ঠে জানিয়েছেন, হিন্দী প্রবর্তনের ব্যাপারে এই জোর-জবরদস্তি চলতে থাকলে তিনি মন্ত্রিত্ব পদে ইস্তফা দিতে কুণ্ঠিত হবেন না। সুতরাং শিক্ষামন্ত্রীর সাহসের দৃঢ়তা দেখে তাজ্জব বনতে হয়। কারণ, একথা বাস্তবিক সত্য যে, আজকের দিনে রাষ্ট্রশাসনের ব্যাপারে যাদের হাত অত্যধিক কার্যকরী, তারা নিঃসন্দেহে পয়লা নম্বরী হিন্দীপ্রেমিক। এই অবস্থায় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীচাগলার এই স্পষ্ট ভাষণ অনেক ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু একথাও মানতে হবে যে, শ্রীচাগলার বক্তব্য বাস্তবসম্মত, যুক্তিনিষ্ঠ এবং জাতীয় সংহতির সহায়ক। শ্রীচাগলা পরিষ্কার জানিয়েছেন, ত্রিভাষিক নীতিতে আস্থাহীন হিন্দী-

● মার্কিন-কাম্বোডিয়া বিরোধ মীমাংসাকল্পে শ্রীসন সান ও শ্রীফিলিপ বনসাল নিজ নিজ প্রতিনিধিদল নিয়ে আলোচনা-বৈঠকে যোগ দিতে যাচ্ছেন।

ওয়ালাদের জন্য জাতীয় সংহতি বিনষ্ট হতে দেওয়া যায় না। প্রশ্নটা উঠলো এই জন্য যে, হিন্দীকে গ্রহণ করবার মত উপযুক্ত না হয়েই যদি অহিন্দীভাষী অঞ্চলগুলি হিন্দী গ্রহণ করতে বাধ্য হয়—তাহলে রাজ্যগুলির মধ্যে পরস্পরের সম্পর্ক মধুর হয় কি করে?

দ্বিতীয় কথা এই যে, সংযোগ রক্ষাকারী ভাষা হিসেবে যতদিন না হিন্দীর উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অন্য রাজ্যগুলি যোগ্য হয়ে উঠছে, ততদিন পর্যন্ত ইংরেজীই বহাল থাকবে। বস্তুত সিদ্ধান্তও খুবই যুক্তিপূর্ণ।

● শ্রীচাগলা

তৃতীয় প্রসঙ্গ হলো, বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে জাতীয় ভাষা হিন্দীর প্রবর্তনের প্রতি সরকার আস্থাশীল, কিন্তু তা রাতারাতি সম্ভব নয়। কেন না, এর পূর্বে হিন্দীকে যথেষ্ট উচ্চমানের পর্যায়ে উঠতেই হবে নইলে বিজ্ঞান, কারিগরী-শিক্ষা, চিকিৎসাবিদ্যা, তুলনামূলক সাহিত্য ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে উপযুক্ত শিক্ষাদান কখনোই সম্ভব হবে না।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, এতকাল হিন্দীর ত্বরিত প্রবর্তনের বিরুদ্ধে যে-সকল বক্তব্য অহিন্দীভাষীদের তরফ থেকে করা হয়েছে, মূলত তাই শিক্ষামন্ত্রীর বক্তৃতায় প্রতিধ্বনিত হয়েছে। এতকাল পরে আশা করা যায়, হিন্দী সম্পর্কে যে জোড়াতালি বা গোঁজামিল চলছে, সে সম্পর্কে একটা স্থায়ী সমাধান পাওয়া গেলেও পাওয়া যেতে পারে। শ্রীচাগলা একদিকে যেমন অহিন্দীভাষীদের নিকট আনন্দের কারণ হয়েছেন—অন্যদিকে হিন্দীওয়ালাদের বিরক্তির কারণ হয়েছেন। তাঁরা ইতিমধ্যেই অভিযোগ করেছেন যে, শ্রীচাগলা নাকি ইচ্ছা করেই হিন্দী প্রতিষ্ঠার প্রতি

ষড়গহস্ত। ব্যাপারটা যাই হোক, এতকালের হিন্দীঘটিত বিতর্কের ওপর শ্রীচাগলার স্পষ্টবাদিতা যে অনেকখানি নতুন আলোকপাত করতে সক্ষম হয়েছে তা মানতেই হবে।

* * *

শেখ আবদুল্লাসহ তাঁর অনুচরবর্গ কাশ্মীরে অশান্তি ও বিভেদ সৃষ্টির জন্য যে হীনচক্রান্ত সুরু করেছেন, তাকে উপলক্ষ করে লোকসভার সদস্যবৃন্দের বিরক্তি ও উষ্মাপ্রকাশ উচিতই হয়েছে।

কিছুকাল ধরে আবদুল্লার তল্পীবাহকগণ কাশ্মীরে অশান্তি সৃষ্টির জন্যে একটা উপলক্ষ খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। এই কথার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাঁদের গতিবিধি ও কোনো কোনো বক্তৃতা থেকে। কিন্তু একটা মনোমত দিন ত' চাই! সুতরাং আবদুল্লার জন্মদিন ৫ই ডিসেম্বরকে নষ্টামির শুভদিন বলে বেছে নিলেন। তাঁদের ধারণা ছিল, ঐ দিনটিতে তাঁরা গোলাম মহম্মদ সাদিকের কাশ্মীরকে অবশিষ্ট ভারতের সঙ্গে, ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টাকে ছিন্নভিন্ন করে দেবেন।

তারপর যেদিন ৫ই ডিসেম্বর এসে উপস্থিত হোল, সেদিন আবদুল্লার অনুচর শেখ আফজল বেগের গণভোট ফ্রণ্ট ওড়ালো পাকিস্তানী পতাকাসদৃশ গণভোট ফ্রণ্টের পতাকা। এই ধরণের পতাকা ওড়ানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে পাকিস্তানী প্রীতি লাভের আশা।

● শেখ আবদুল্লা

ভারত-বিরোধী হীনতর এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে লোকসভার সদস্যবৃন্দের পবিত্র ক্রোধ জাগা স্বাভাবিক। প্রত্যুত্তরে স্বরাষ্ট্র বিভাগের প্রতিমন্ত্রী শ্রীজয়সুখলাল হাতী বলেছেন যে, পতাকাটি গণভোট ফ্রণ্টের নিজস্ব। তার সঙ্গে পাকিস্তানী পতাকার সাদৃশ্য নেই। শ্রীহাতীর মন্তব্য সদস্যদের তুষ্ট করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। কেন না, গণভোট ফ্রণ্টের উদ্দেশ্য-অভিসন্ধি যখন চক্রান্তমূলক, তখন তাদের কার্যাবলীও যে ভারতের ঐক্যের পক্ষে ক্ষতিকারক তা বলাই বাহুল্য। কাশ্মীরকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার যে কূটকৌশল ও ষড়যন্ত্র দীর্ঘকাল ধরে কাশ্মীরে চলছে, তার সমূলে বিনাশসাধন এই মুহূর্তেই প্রয়োজন। মনে রাখা দরকার, শেখ-সুহৃদদের ঐ পতাকা উত্তোলন করা একটা উপলক্ষ মাত্র। আবদুল্লার জন্মদিনে গণভোটপন্থীরা কাশ্মীরে পুনরায় বিচ্ছিন্নতার দাবি তুলেছে। দুঃখের ব্যাপার এমন একটি গুরুতর প্রশ্ন সম্পর্কে আমাদের সরকার কোনো কথাও বলেন নি। এমন কি, ঐ দাবির মূলোৎপাটন করার জন্যে নতুন পন্থাও গ্রহণ করেন নি। কাশ্মীরকে অবশিষ্ট ভারতের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য আমাদের সরকারের দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করা—আশু কর্তব্য। একমাত্র ভারতবিদ্বেষী ও ঘৃণ্যতম শত্রু ছাড়া আর কেউ ভারতের অনৈক্যের কথা ভাবতেই পারে না। শেখ আবদুল্লার ধ্বজাধারী অনুচরবৃন্দ অনৈক্য সৃষ্টির জন্য যে চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে—তার মূলোৎপাটনে আমাদের সরকার কতটাই বা এগিয়েছেন? ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের যে ৩৭০ ধারার ছিদ্রপথে সুযোগসন্ধানীরা অনৈক্যের সৃষ্টি করছেন, সেই ধারাটির অবলুপ্তির কথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আগেই ঘোষণা করেছেন। কিন্তু সেই ব্যবস্থা গ্রহণে আর বিলম্ব করা চলে না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কাম্বোডিয়ার মধ্যে যেসব বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে, তার মীমাংসাকল্পে রাজধানী নয়াদিল্লীতে উভয় দেশের প্রতিনিধিদের বৈঠক হয়ে গেল। কাম্বোডিয়ার সীমান্তই প্রধান মতানৈক্যের বিষয়। এই সীমান্ত প্রশ্ন নিয়েই কাম্বোডিয়া ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে এবং দক্ষিণ ভিয়েৎনামে যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য দানের ফলে এই মতানৈক্যের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র জড়িত হয়ে পড়েছে। ভারত সরকারের উদ্যোগে উভয় দেশের মধ্যে এই আলোচনা বৈঠকের ব্যবস্থা হয়। কাম্বোডিয়া প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে আসেন প্রিন্স নরোদম সিহানুকের প্রধান পরামর্শদাতা শ্রীসন সান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি দলের নেতা শ্রীফিলিপ বনসাল।

* * *

ভূটানের আভ্যন্তরীণ গোলযোগের ব্যাপারে ভারতের হাত আছে বলে যে ভারত-বিরোধী অপপ্রচার করবার চেষ্টা হয়েছিল—স্বয়ং ভূটানের রাজা মুখের ওপর তার জবাব দিয়েছেন। ভূটানের তথ্যদপ্তর থেকে ভূটানরাজের নামে যে বিবৃতি প্রচারিত হয়েছে, তাতে পরিষ্কার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে যে, ভূটানের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে ভারতের বা অন্য কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের হাত নেই। এটা নিতান্তই ভূটানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং বিদেশী সরকারের হাত থাকার অভিযোগগুলি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ৬ই ডিসেম্বর যখন কাটমুণ্ডু থেকে পলাতক ভূটানী অফিসারেরা এক বিবৃতি মারফত ভূটানের আভ্যন্তরীণ গোলযোগের ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে ভারত সরকারকে দায়ী করেছিলেন, তখন লোকসভায় ও ভারতের সংবাদপত্র সমূহে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল।

ভারত সরকারকে ভুটানের ওপর থেকে হাত গুটোবার উপদেশ দিতেও পলাতক ভুটানী অফিসারেরা ভোলেন নি। অর্থাৎ ভারত রাষ্ট্র ভুটানকে প্রায় গ্রাস করে ফেলেছে, ভারতের সর্বনাশা নীতির যাঁতাকলে পড়ে ভুটানের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব সবই রসাতলে গেছে, বলে দেশত্যাগী ভুটানী অফিসারেরা অভিযোগ তুলেছিলেন। বলাই বাহুল্য, ভারত সরকারের পক্ষ থেকে এ অভিযোগ ভিত্তিহীন ও অসত্য বলে বলা হয়েছে। এক্ষণে ভুটানরাজের প্রচারিত বিবৃতিতে ভারতীয় চিন্তাধারারই সমর্থন পাওয়া গেল।

আসলে সীমান্তের এ রাজ্যটির ওপর লুব্ধদৃষ্টি অনেক প্রতিবেশী ও দূর রাষ্ট্রেরই পড়েছে। প্রধানমন্ত্রী জিগ্‌মি দোরজী হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে এও প্রকাশ হয়ে পড়েছিল যে, এখানে একটা ক্যুপ (coup) ঘটাবার ষড়যন্ত্র চলছে এবং সে ষড়যন্ত্রে চীনাদেরও ভূমিকা রয়েছে। পাকিস্তানও ভারত-বিরোধী প্রচারে উৎসাহী হয়ে উঠে ষড়যন্ত্রকারীদের নানাভাবে মদৎ দিয়েছিল। এমন কি এখানে যে পশ্চিমী দুনিয়া থেকে গুচ্ছ গুচ্ছ সুন্দরী তরুণীদের (চিত্র তারকা-সহ) আবির্ভাব ঘটে থাকে তার পিছনেও কার্যকারণ রয়েছে বলে পর্যবেক্ষকেরা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। ভুটানের সঙ্গে ভারতের যে ১৯৪৯ সালে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যার ফলে পররাষ্ট্রীয় বিষয়ে ভুটান ভারতের নির্দেশ মেনে চলতে স্বীকৃত হয়, এতে অনেকেরই গাত্রদাহ হচ্ছিল। অথচ পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং জিগ্‌মি দোরজী তখন বলেছিলেন, 'ভারতের মধ্যে আমরা এক মিত্র প্রতিবেশীকে লাভ করেছি এবং এ মৈত্রীবন্ধন দৃঢ়তর করতে আমাদের বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই।' ১৯৬১ সালে ভুটানের রাজাও একথা বলেছিলেন যে, ১৯৪৯ সালের চুক্তির ফলে তাঁর দেশের স্বার্থ সুরক্ষিত হবে এবং এ চুক্তির শর্ত পরিবর্তনের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু ভুটান সরকার না চাইলেও বিদেশী রাষ্ট্রদের যেন দুশ্চিন্তার সীমা নেই। ভারতের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে তারা 'স্বাধীন' ভুটান প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য যেন উঠেপড়ে লেগেছিল। অথচ গোড়া থেকে ভারত যে সাহায্য ও সহযোগিতা ভুটানকে দিয়া আসছে, তা কেবল মিত্র রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব। জিগ্‌মি দোরজী হত্যাকাণ্ডের ফলে ভুটানে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হলে যেমন ভারত কালবিলম্ব না করে ভুটানের

● ডঃ কাটজু

প্রতি সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করেছিল, তেমনি রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কথাও পূর্বাহ্নে জানিয়ে দিয়ে ভারত ভুটানের প্রতি বন্ধুত্বের কাজই করেছে। তা ছাড়া এযাবৎ ভুটানকে যে পরিমাণ আর্থিক সাহায্য ভারত দিয়েছে, তাও ভুটানের প্রতি মিত্রতার জন্যই। ভারতের এ প্রশংসনীয় ভূমিকা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু দুর্জনের যুক্তি মানার বালাই নেই। সত্য স্বীকার করার সাহস নেই। ভুটানের রাজা স্বয়ং বিবৃতি দিয়ে ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতাই শুধু প্রকাশ করলেন না, অনৃতভাষীদের খোঁতা মুখও ভোঁতা করে দিয়েছেন।

মধ্যপ্রদেশ :

মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ডি পি মিশ্র তাঁর মন্ত্রিসভায় যে সাম্প্রতিক রদবদল করেছেন তাতে তাঁকে শুধু কাটজু-সমর্থক গোষ্ঠীরই নয়, নিজের অনুগামী-বর্গেরও কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হ'তে হয়েছে। কাটজু-সমর্থকরা শ্রীমিশ্রের নেতৃত্বে অনাস্থা প্রকাশ করেছেন সরাসরি, আর রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকগণ মনে করছেন, মন্ত্রিসভায় রদবদলের আসল উদ্দেশ্য হ'ল কাটজু-সমর্থকদের দাবিয়ে রাখা। এবং কার্যত কাটজু-সমর্থকরা একটু যে বেকায়দায় পড়েছেন তাও বেশ লক্ষণীয় হ'য়ে উঠেছে।

শ্রীমিশ্র কিন্তু সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, রদবদলের উদ্দেশ্য হ'ল প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে আরও সক্রিয়ভাবে অব্যাহত রাখা। এর মধ্যে রাজনৈতিক চাতুরী কিছুই নেই। দপ্তরগুলিতে নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করাই তাঁর আসল লক্ষ্য। কিন্তু খুব অল্পসংখ্যকই প্রভাবিত হয়েছেন তাঁর বক্তব্যে। অনেকেরই ধারণা, মন্ত্রীদের মধ্যে যাঁরা শ্রীমিশ্রের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন বা করছেন ব'লে সন্দেহভাজন নামের তালিকাভুক্ত ছিলেন, বর্তমান রদবদলে তাঁরাই ছাঁটাই হয়েছেন বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

শ্রীগোবিন্দনারায়ণ সিংকে স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগ থেকে সরিয়ে একেবারে সমাজোন্নয়নের মতো একটি এলেবেলে দপ্তরের ভার দেওয়া হয়েছে। সিংজী নাকি শ্রীমিশ্রের মন্ত্রিসভার পয়লা নম্বর বিরোধী সদস্য। আসলে সিংজীকে সরাসরি পদচ্যুত করাই ছিল মুখ্যমন্ত্রীর অভিপ্রায়। কিন্তু কংগ্রেস হাই কমাণ্ড এমন একটা কঠোর ব্যবস্থা

● শ্রীগোবিন্দনারায়ণ সিং

গ্রহণে সায় দেন নি। কিন্তু এতেও সঙ্কল্পচ্যুত করা যায় নি শ্রীমিশ্রকে। সিংজীর বিরুদ্ধে অভিযোগের ফাইল তৈরি হ'য়ে গেছে এবং শোনা যাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী নাকি ইতিমধ্যেই নন্দজীর কাছে নালিশ পেশ ক'রে অভিযোগের প্রতিকার করার জন্য তাঁকে আহ্বান জানিয়েছেন।

গোয়ালিয়র ও মোরোনায় কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজের উপস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী-সমর্থক ও বিরুদ্ধবাদীরা পারস্পরিক শক্তির একটা মহড়া দেখিয়েছিলেন এবং নিজের নিজের বক্তব্যও উপস্থিত করেছিলেন। শ্রীমিশ্র ও শ্রীকাটজু, যিনি বিরুদ্ধবাদীদের নির্বাচিত নেতার আসনে বর্তমানে মনোনীত আছেন, উভয়েই এই দলীয় সঙ্কটের প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা ছিলেন। সুতরাং এই ঘটনার পরই শ্রীমিশ্র মন্ত্রিসভায় একটি আশু পরিবর্তনের প্রয়োজন ভীষণভাবে অনুভব করেন ও সঙ্গে সঙ্গে কাজও সুরু ক'রে দেন। ডাঃ কাটজুও সুযোগের অপব্যবহার করেন নি। শ্রীকামরাজের সঙ্গে তাঁরও বেশ কিছুক্ষণের একান্ত আলাপ হয়ে গেছে. অবশ্য এ সম্পর্কে কোনো সংবাদ জানা যায় নি। কারণ তাঁরা দুজনে একই ট্রেনে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন এবং সহচর বলতে তাঁদের সঙ্গে কোনো তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন না।

শ্রীমিশ্রের অনুগামীরা ডঃ কাটজুকে চেপে ধরেছিলেন একটি স্বীকারোক্তি করিয়ে নেওয়ার অভিপ্রায়ে। ডঃ কাটজু যে মুখ্যমন্ত্রিত্বের জন্য লালায়িত নন এবং শ্রীমিশ্রের বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে তাঁর কোনো রাজনৈতিক যোগাযোগ নেই, এই মর্মে একটি স্বীকৃতি চাওয়া হয়। কিন্তু ডঃ কাটজু আবেদনটি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন।

শ্রীমিশ্র নিজের দুর্বলতা নিজেই প্রকাশ ক'রে বসেছেন। অনুগামীদের মনে বল-ভরসা যোগাতে গিয়ে তিনি মন্ত্রিসভায় তাঁর একাধিপত্যের উল্লেখ করেছেন এবং সাংবাদিক সম্মেলনে প্রশ্নের উত্তরে নিজেকে প্রবোধ দেওয়ার জন্যই যেন বলে ফেলেছেন, যেহেতু ডঃ কাটজু নেতৃত্বের পরিবর্তন সম্পর্কে কোনোরকম স্পষ্টোক্তি করছেন না, অতএব তিনি (শ্রীমিশ্র) ব্যাপারটার অস্তিত্ব নিয়ে একেবারেই চিন্তিত নন।

কিন্তু শ্রীমিশ্রের এ-জাতীয় উক্তি বিশেষজ্ঞ মহলের সন্দেহের কারণ হয়েছে। তাঁরা মনে করেন, মধ্যপ্রদেশ প্রশাসনিক ক্ষমতাকে কেন্দ্র ক'রে বেশ বড়রকমের একটা দলাদলি দানা বেঁধে উঠেছে।

• • •

প্রশাসনিক রদবদলে বিভিন্ন দপ্তরই অসন্তুষ্ট। রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার সম্প্রসারণে ডঃ শঙ্করদয়াল শর্মার অবদান অনেকেই স্বীকার করেন। শিক্ষা-বিভাগ নিয়েই ব্যস্ত থাকার ইচ্ছা ছিল ডঃ শর্মার নিজেরও। কিন্তু তাঁর ওপর শিল্প ও বাণিজ্যদপ্তরের ভার চাপিয়ে দেওয়া হ'ল, শিক্ষাদপ্তর কেড়ে নিয়ে। স্বভাবতই ডঃ শর্মা এ-ব্যাপারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছেন। ওদিকে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার গঠনমূলক সময়ে শ্রী এন আর দীক্ষিতকে হারাতে হয়েছে শিল্প-বাণিজ্যদপ্তর। শ্রীদীক্ষিতও দপ্তর বদলের প্রহসনে রীতিমত আহত হয়েছেন। রাণী পদ্মাবতী দেবীর স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগেও শ্রীমিশ্র হাত বাড়িয়েছেন। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগ থেকে গ্রামাঞ্চলীয় অংশটুকু শ্রীমিশ্র নিজে গ্রহণ করেছেন পঞ্চায়েতরাজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ইচ্ছেমত হস্তক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে। শুধু নাগরিকদের নিয়েই রাণীকে এখন পরিতুষ্ট থাকতে হবে।

• • •

দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করার অপরাধে মধ্যপ্রদেশের জেলমন্ত্রী শ্রীবেদরাম মন্ত্রিত্ব হারাতে বসেছেন। সংবাদে প্রকাশ, অবশেষে মন্ত্রিসভা থেকে শ্রীবেদরামের অপসারণে রাজ্যপাল শ্রীপটাশকরের নাকি অনুমোদন পাওয়া গেছে। এক স্ত্রী বর্তমানে একটি অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করায় এই বিপত্তির সূত্রপাত। আইনসভার কংগ্রেসী মহিলা সদস্যাগণ ইতিপূর্বেই মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ডি পি মিশ্রকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, শ্রীবেদরামের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গৃহীত না হলে তাঁরা কংগ্রেস হাইকমাণ্ড পর্যন্ত ব্যাপারটা নিয়ে টানাপোড়েন করবেন। বিরোধী সদস্যরাও একই কারণে শ্রীবেদরামের অপসারণ দাবি করেন। শ্রীবেদরাম অভিযোগ খণ্ডন ক'রে বলেছেন, মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করার আগেই তিনি এ বিষয়ে রাজ্যপালের নিকট তাঁর বক্তব্য পেশ করেছিলেন। রাজ্যপালও নাকি শ্রীবেদরামের বক্তব্যে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু নববধূর বরাতেও শ্রীবেদরামের গদি টিকল না।

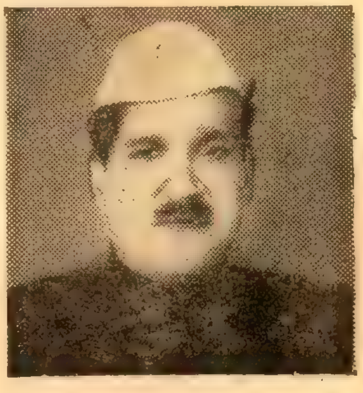

● ডঃ শঙ্করদয়াল শর্মা

পাঞ্জাব :

পাঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্দার প্রতাপ সিং কায়রোঁ পরাজয়ের ও লোকনিন্দার গ্লানি মুছে ফেলে আবার রাজনীতির প্রকাশ্য রাজপথে বিচরণের চেষ্টায় নতুন কৌশল অবলম্বন করেছেন। দাশ কমিশনের রায়ের পর জনমতের চাপে নতশিরে আসন ত্যাগ করলেও প্রদেশ কংগ্রেসের ঘাঁটি তিনি ত্যাগ করেন নি। তাঁর অনুগামীরাই সে ঘাঁটি আগলে বসে আছে। তাঁদের দিয়ে রামকিষেণ মন্ত্রিসভাকে কোণঠাসা করাই ছিল সর্দার কায়রোঁর প্রধান লক্ষ্য। সুদক্ষ বাজিকরের মত নেপথ্যে থেকে এঁদের নাচিয়ে তুলেছিলেন এবং ক্রমাগত এঁদের দিয়েই প্রবল চাপ সৃষ্টি করছিলেন নয়াদিল্লীতে। তাতেও প্রত্যাশিত ফলের আশু কোন সম্ভাবনা না দেখতে পেয়ে তিনি ক্ষেপে গিয়ে এবারে রণহুঙ্কার দিয়ে বসেছেন।

'সিয়াসী দুনিয়া'য় সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধে এই সমরসজ্জার কথাটাই ব্যক্ত করা হয়েছে। এই সাপ্তাহিক পত্রিকার পরিচালকরা সর্দার কায়রোঁর দলের নিষ্ঠাবান সদস্য। প্রবন্ধটিতে তিনি এক রাউণ্ড গোলাবর্ষণ করেছেন কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের বিরুদ্ধে। অভিনব যুক্তির অবতারণা করেছেন তিনি। তাঁর মতে 'রামরাজের পরিবর্তে কামরাজ' কায়েমের চেষ্টা চলেছে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে। দেশের 'জরুরী সমস্যা' সমাধানের দিকে নাকি 'আজকের দিনের বড়লোকদের' নজর দেবার ফুরসত নেই। 'তোষা-মোদকারী' মোসাহেবদের ও 'নিন্দুক-দের' কথা কান পেতে শুনতে শুনতেই নাকি তাঁদের সময় ফুরিয়ে যায়। বেসামাল হয়ে সর্দারজী একেবারে শক্তিশেল বাণ নিক্ষেপের চেষ্টা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দকে লক্ষ্য করে। দেশবরেণ্য এই দুই নেতার বিরুদ্ধে আক্রোশটাই যেন তাঁর সব চাইতে বেশি। তাঁদের উচ্চ মর্যাদা-লাভ সম্পর্কে কুৎসিত ইঙ্গিত করতেও তিনি তাই কসুর করেন নি।

সর্দারজী এ আক্রমণটি খুব সন্তর্পণে সুযোগ বুঝেই চালিয়েছেন। বিভিন্ন প্রদেশ কংগ্রেসের পুনর্বিন্যাসের প্রশ্নে নেতাদের মতবিরোধই তাঁকে প্রলুব্ধ করেছে। হাইকমাণ্ডের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে তিনি তাঁর অনুগামীদের নৈতিক শক্তি ফিরিয়ে আনতে পারলেই তাঁরাও গর্জন সুরু করে দেবেন। তখন বর্তমান মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে জোট পাকানো হবে সহজ।

সর্দার কায়রোঁ সম্পর্কে দিল্লীর চিত্ত এখনও দ্বিধাজড়িত। দাশ কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে বিধানসভা থেকে সর্দার কায়রোঁকে বহিষ্কারের অনুরোধ এখনও বিবেচনাধীন। কৃষ্ণস্বামীর সুপারিশ মেনে নিয়ে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবি উঠেছে মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে। দিল্লী এখনও মনস্থির করতে পারেন নি।

● সর্দার প্রতাপ সিং কায়রোঁ

সর্দার কায়রোঁ চতুর ও দক্ষ যোদ্ধা। সম্মুখ-সমরে বিপদের সময় তাঁর দলবলকে দিয়ে শান্তির সাদা পতাকা তুলে ইসারায় জানিয়েছিলেন, তাঁরা পাঞ্জাবে কোন গোলযোগ আর সৃষ্টি করবেন না। হাইকমাণ্ড তাই সর্দারজীর ব্যাপারটা নিয়ে তাড়াহুড়া পছন্দ করেন নি।

সামনে আসছে সাধারণ নির্বাচন। সর্দারজীর দাপাদাপি সুরুতেই বন্ধ করতে না পারলে আগামী দিনে পাঞ্জাবে তিনি দক্ষযজ্ঞ সুরু করে দেবেন। পাঞ্জাবের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রতিটি নাগরিকই এ মতের সমর্থক।

পাঞ্জাবে দুটি উপনির্বাচন আসন্ন। এই নির্বাচনপর্বে কায়রোঁপন্থীদের পথের সঠিক নিশানা পাওয়ার আশা নাকি নেতৃবর্গ করছেন। সে সন্ধান পেলেই কায়রোঁর বিষয়টির ফয়সালা করা সহজ হবে। দুর্গাপুরের অধিবেশন পর্যন্ত হাইকমাণ্ডের সিদ্ধান্ত ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা চলছে কায়রোঁপন্থীদের মধ্যে।

কেরালা :

খাদ্যসমস্যার ঘনঘটা সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার হতে না হতেই কেরালার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আবার মেঘের আনাগোনা সুরু হয়েছে। গত দু' মাস যাবৎ খাদ্যসমস্যা রাজ্যের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে প্রায় তমসাচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল। বর্তমানে তারই জের চলেছে বা সেই জের টেনেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের নির্বাচনী উদ্দেশ্যসিদ্ধির দিকে নজর দিয়েছেন। অবশ্য বছরের শেষে খাদ্য নিয়ে কেরালাকে প্রতিবারই কিছু না কিছু দুর্যোগের সম্মুখীন হ'তে হয়। এ বছর সঙ্কট চূড়ান্ত রূপ নিয়েছিল। কারণ ফসলের ঘাট্‌তি এবার অপ্রত্যাশিত। ফলত মজুতদার এবং কালোবাজারীর পৌষমাস হ'লেও সাধারণ মানুষের সর্বনাশ রোখা যায় নি। আর তারই সুযোগ নিয়েছেন বিরোধী দলগুলি।

খাদ্যকে হাতিয়ার ক'রে বিরোধী দলগুলি একসঙ্গে নির্বাচনী যুদ্ধে নেমেছিলেন। বামপন্থী কমিউনিস্টদের খাদ্য-আন্দোলনকেও নির্বাচনী চাল ব'লে মনে করা হচ্ছে। এস-এস-পি অবশ্য শেষমুহূর্তে তাঁদের ৩০শে নভেম্বরের ঘোষণাকে প্রত্যাহার করে-ছিলেন। কমিউনিস্টদের সঙ্গে একত্রে

খাদ্যসমস্যা নিয়ে রাজ্যজোড়া পিকেটিং করতে নামেন নি তাঁরা।

রাজ্যের অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচনকে কেন্দ্র ক'রে যে সমস্যা ধুঁইয়ে উঠছে, কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রী এস কে পাতিলের উক্তি তাতে আবার নতুন ইন্ধনের যোগান দিল। গত ৫ই ডিসেম্বর কোচিনে এক ভাষণদান প্রসঙ্গে শ্রীপাতিল অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচন আয়োজনকে সরাসরি খতম করার স্বপক্ষে বক্তৃতা করলেন। অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচনের বিরুদ্ধে স্বয়ং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমহোদয়ের ওকালতি জনচিত্তে নতুন সন্দেহের সঞ্চার করেছে। অন্যতর একটি সংবাদে প্রকাশ যে, কেন্দ্রীয় সরকারও নাকি কেরালায় অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচনকে স্থগিত রাখতে চান। সুতরাং নির্বাচনের ব্যাপারে সরকারী দুর্বলতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষ সঙ্গত কারণেই সন্দিহান হ'য়ে উঠতে পারেন। এবং সেক্ষেত্রে বিরোধী দলগুলি ঘটনাটির পুরোপুরি সদ্ব্যবহার তো করবেনই। শ্রীপাতিলের উক্তি সরকারী নীতিরই পূর্বাভাষ, এমন ধারণা অযৌক্তিক নয়।

যা হোক, নির্বাচনের দিন যতই এগিয়ে আসছে, রাজনৈতিক দলগুলিও ততই বিভিন্ন বিরোধী নেতাদের মধ্যে আঁতাত সৃষ্টির চেষ্টায় উদ্দীপিত হয়ে উঠছেন। নির্বাচনের মুখোমুখী হওয়ার জন্য কৌশলও গৃহীত হচ্ছে নব নব ভাবে।

মুসলিম লীগের সঙ্গে ইতিমধ্যেই হাত মিলিয়েছেন বিসংবাদী কংগ্রেসী সদস্যগণ। কমিউনিস্ট এবং আর-এস-পি প্রমুখ তথাকথিত প্রগতিশীল দলগুলি কুইলনে একটি প্রতিনিধি সম্মেলনে মিলিত হয়েছিলেন—যদিও কোনো যুক্ত ফ্রণ্ট এযাবৎ তৈরি হয় নি। মুসলিম লীগ ও কমিউনিস্ট আঁতাত হওয়ার সম্ভাবনার একটি গোপন সংবাদই নাকি কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ব্যাপারে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

একদিকে আর-এস-পি নেতা

● শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ

শ্রীকান্তন নায়ার সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনাকালে মুসলিম লীগের বা অন্য কোন সাম্প্রদায়িক দলের সঙ্গে আঁতাত করার সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে দিয়েছেন। অন্যদিকে কমিউনিস্ট নেতা শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ ও শ্রী সি এইচ কানারান লীগের সঙ্গে আঁতাত স্থাপনে বিশেষ আগ্রহী। শ্রীকানারান তো এ ব্যাপারে এতদূর অগ্রসর হয়েছেন যে, মুসলিম লীগকে গণতান্ত্রিক এবং প্রগতিশীল বলতেও তাঁর বাধে নি। এস-এস-পি'ও একই আওয়াজ তুলে বোকা বনে গেছেন, কেন না মুসলিম লীগ এ দলের সঙ্গে আঁতাতের প্রস্তাবকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে।

এস-এস-পি'র বর্তমান নির্বাচনী আওয়াজ হ'ল, যেন তেন প্রকারেণ কংগ্রেসীরাজ খতম কর আর তার জন্য যে কোনো মতবাদের সঙ্গে গলা মেলাতে তাঁরা প্রস্তুত।

উত্তর প্রদেশ:

প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে উত্তর প্রদেশ মন্ত্রিসভা সমর্থকদের পক্ষে কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের কাছে অভিযোগ পেশ করতে গিয়ে পুরোপুরি ব্যর্থ হ'য়ে ফিরে এসেছেন শ্রীবানারসী দাস। তাঁর দৌত্যকার্য সফল হ'ল না; কারণ উত্তর প্রদেশের কংগ্রেসী দলাদলির ব্যাপারে এখন হস্তক্ষেপ করেছেন স্বয়ং কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদার। ইতিপূর্বে প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী বিবদমান কংগ্রেসী সদস্যদের একটা ভদ্রগোছের আপোষ মীমাংসায় উপনীত করার চেষ্টায় অসমর্থ হন। ক্রমে এমন ঘোঁট পাকিয়ে উঠেছে যে, স্বয়ং কংগ্রেস সভাপতির হস্তক্ষেপ অনিবার্য হয়ে পড়েছে। এমন অবস্থায় মন্ত্রিসভা-সমর্থকদের পক্ষে রাজ্য কংগ্রেসের ক্ষমাতাসীন নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন ক'রে সুবিধা ক'রে উঠতে না পারাই স্বাভাবিক। তা ছাড়া তাঁদের অভিযোগ পরোক্ষে শ্রীকামরাজের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত। কেন না রাজ্যের আঠারটি জেলা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনে রাজ্য কংগ্রেস যে বে-আইনী পন্থা অবলম্বন করেছেন ব'লে মন্ত্রী-সমর্থকরা দাবি করছেন, সেই আঠার-জন সভাপতির নাম স্বয়ং কংগ্রেস সভাপতি ইতিমধ্যেই অনুমোদন করেছেন। শ্রীকামরাজ অনেক বিচার-বিবেচনার পর সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। এ্যাড হক কমিটির সভাপতিরূপে প্রদেশ কংগ্রেস কর্তারা যাঁদের নাম প্রস্তাব করেন, কংগ্রেস সভাপতি অনুমোদনের আগে প্রস্তাবিত সেই সমস্ত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে বিস্তারিত সংবাদ সংগ্রহ করেন। উক্ত আঠারটি জেলায় সক্রিয় কংগ্রেসসেবিগণের পরামর্শও গ্রহণ করা হয়। অবশেষে সেরা ব্যক্তিবর্গকেই বাছাই ক'রে নেওয়া হয়েছে।

বর্তমান ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীবানারসী দাসের দৌত্যকার্য বরং বিপরীত ফসল তুলে আনল। শ্রীকামরাজ মন্ত্রী-সমর্থকদের সতর্ক ক'রে বলেছেন, তাঁরা যেন প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যকলাপে নাক গলাতে চেষ্টা না করেন। প্রদেশ কংগ্রেসকেও মন্ত্রিসভার সঙ্গে অখণ্ড সহযোগিতা করার জন্য কড়া নির্দেশ দিতেও ভুল করেন নি তিনি।

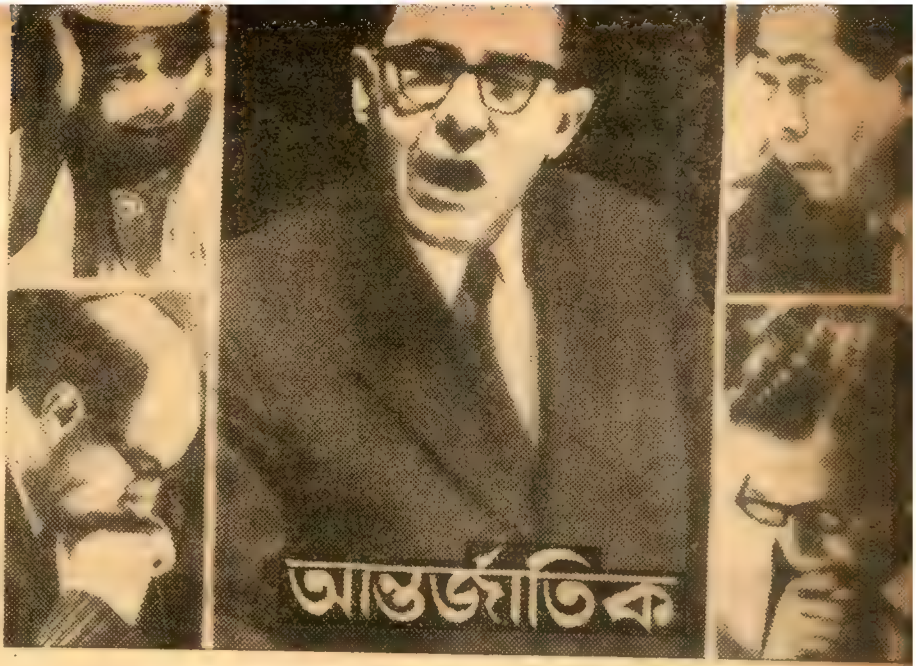

* রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধিবেশনের একটি দৃশ্য। গ্রোমিকো (মাঝখানে) মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমীদের কঙ্গো নীতিকে আক্রমণ করে বক্তৃতা করছেন। শ্রোতাদের মধ্যে নাইজিরিয়া, কাম্বোডিয়া, ফ্রান্স ও মাকিনী প্রতিনিধিদের দেখা যাচ্ছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে :

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন দু'দিন ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি লিণ্ডন বি জনসনের স ঙ্গে আলোচনা করে স্বদেশে ফিরে গিয়েছেন। নানাদিক দিয়েই এই আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠীর দুই প্রধান সরিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন। বৃটেনে শ্রমিক সরকার গঠিত হবার পর, নতুন সরকারের পক্ষে মার্কিন সরকারের সঙ্গে পারস্পরিক স্বার্থ-সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন ছিল। এই আলোচনার গুরুত্ব বোঝা যাবে, উইলসনের সঙ্গে তাঁর এই যাত্রায় আর যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁদের তালিকা থেকে। উইলসনের সঙ্গে ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্যাট্রিক গর্ডন ওয়াকার, প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী ডেনিস হিলে ও কমনওয়েলথ সচিব আর্থার বটমলী এবং আরও ৩০ জন উচ্চপদস্থ কর্মচারী।

হ্যারল্ড উইলসন ও লিণ্ডন বি জনসন আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিভিন্ন বিষয় ও দুই রাষ্ট্রের পারস্পরিক স্বার্থ নিয়ে আলোচনা করেন। বৃটেনের বর্তমান অর্থনৈতিক সংকট ও এই ব্যাপারে সম্ভাব্য মার্কিন সাহায্যের বিষয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। সফর শেষে প্রকাশিত যুক্ত ইস্তাহারে দেখা যায়, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ও মালয়েশিয়া নিয়ে দুজনে আলোচনা করেছেন। জনসন দক্ষিণ ভিয়েৎ-

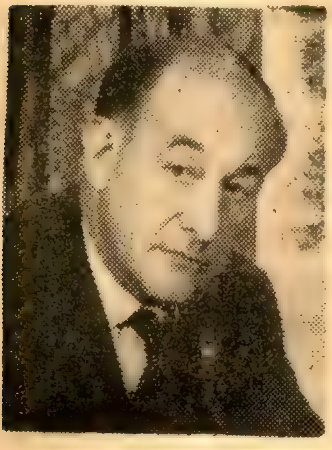

* গর্ডন ওয়াকার

নামের ব্যাপারে বৃটিশ সহযোগিতা চেয়েছেন। অপর দিকে বৃটেনও মালয়েশিয়ার জন্য মার্কিন সাহায্যের প্রত্যাশী।

তবে উভয়ের মধ্যে প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল 'ন্যাটো' ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাবিত বহুজাতিক পরমাণু বাহিনী। ন্যাটোর অন্তর্ভুক্ত সকল রাষ্ট্রের অংশ গ্রহণের দ্বারা একটি পরমাণু বাহিনী গঠনের যে পরিকল্পনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উপস্থিত করেছে, ফ্রান্স তার ঘোরতর বিরোধী। পশ্চিম জার্মানী অবশ্য এই মার্কিন পরিকল্পনার প্রতি বিশেষ উৎসাহ দেখিয়েছে। দুটি কারণে ফ্রান্স এই পরমাণু বাহিনীর বিরোধী। ইউরোপের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খবরদারী ফ্রান্স আর বরদাস্ত করতে রাজী নয়। তা ছাড়া মার্কিন পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রস্তাবিত পরমাণু বাহিনীর জন্য অর্থব্যয় যে যেমন করবে, বাহিনীর ওপর কর্তৃত্বও তার তেমন থাকবে। এই ব্যবস্থায় সবচেয়ে বেশি কর্তৃত্ব থাকবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এবং তার পর পশ্চিম জার্মানীর। ফ্রান্স কোনমতেই এ ব্যবস্থা মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রও এই কারণেই পরমাণু বাহিনী গঠনে বিশেষ উৎসাহ দেখাচ্ছে না।

পশ্চিম ইউরোপ তথা ন্যাটো অঞ্চলের নিরাপত্তার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাবিত পরমাণু বাহিনীর ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করছে। কিন্তু ফ্রান্সের তীব্র বিরোধিতা ও অন্যান্য রাষ্ট্রের অনাগ্রহের ফলে এ-বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা যাচ্ছে না।

শোনা যাচ্ছে, উইলসন এই পরমাণু বাহিনী গঠন সম্পর্কে একটি মাঝামাঝি পরিকল্পনা নিয়ে জনসনের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। এই পরিকল্পনার কোন বিবরণ প্রকাশিত হয় নি, তবে পরমাণু বাহিনীর পরিচালন-ব্যবস্থায় ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির অধিকতর কর্তৃত্ব স্থাপনের কথা উইলসন বলেছেন বলে মনে হয়। এই সম্পর্কে দুদিনের আলোচনাতেই কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছনো শক্ত। তবে পরস্পর মত বিনিময়ের

ফলে এই বিষয়ে আরও আলোচনার পথ প্রশস্ত হল। উইলসন তাঁর পরিকল্পনা সম্পর্কে ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রনায়কদের মত জেনে নিয়ে হয়তো আবার জনগনের সঙ্গে আলোচনা করবেন।

উভয়ের আলোচনা শেষে প্রকাশিত যুক্ত ইস্তাহারে বলা হয়েছে, নিরস্ত্রীকরণের নীতি সমর্থন করা সত্ত্বেও পারমাণবিক নীতিতে ন্যাটো সদস্যদের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করা হবে বলে উভয় রাষ্ট্রনেতা একমত হয়েছেন।

• • •

'আমেরিকান ব্যুরো অব্ পপুলেশন স্টাডিজ'-এর পক্ষ থেকে যে হিসাব প্রকাশ করা হয়েছে—তাতে বলা হয়েছে, আগামী পনের বৎসরের মধ্যে বিশ্বের জনসংখ্যা আরও ১০০ কোটি বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে বিশ্বের জনসংখ্যা ৩৩০ কোটি। ১৯৮০ সালে এই সংখ্যা হবে ৪৩০ কোটি। লোকসংখ্যা সবচেয়ে বেশি বাড়বে ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে। এখানে বর্তমানে লোকসংখ্যা ২০ কোটি, ১৯৮০ সালে তা বেড়ে হবে ৩৭·৪ কোটি। বিশ্বের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার বৎসরে সাড়ে ৬ কোটি—বৃটেনের মোট লোকসংখ্যার চেয়েও বেশি। ভারত, চীন প্রভৃতি এশিয়ার দেশগুলিতেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অত্যন্ত বেশি।

নিউইয়র্ক স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক রেমণ্ড ইউয়েন মার্কিন কেমিক্যাল সোসাইটির কাছে প্রদত্ত এক প্রবন্ধে আলোচনা করে দেখিয়েছেন, আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার অনুন্নত দেশগুলিতে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হবে। এমন দুর্ভিক্ষ বিশ্বে এ-পর্যন্ত কখনও হয় নি। ভারত, পাকিস্তান, চীন প্রভৃতি দেশে ১৯৭০ সালের কাছাকাছি সময়ে এবং অন্যান্য দেশে ১৯৮০ সালের মত সময়ে এই দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে।

ইউয়েন বলেছেন, জনসংখ্যা এইসব দেশে অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এশিয়ায় বৎসরে ২·৩./° জনসংখ্যা, আফ্রিকায় ২·৪% ও ল্যাটিন আমেরিকায় ৩% জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। অথচ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির হার গত কয়েক বৎসরে একেবারেই বাড়ে নি। এর ফলে দুর্ভিক্ষ অনিবার্য।

দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করার জন্য খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। আর তার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সারের। তা ছাড়া জলসেচ, ভাল বীজ, পোকামাকড় নষ্ট করা ও উন্নত চাষের ব্যবস্থার ওপরও ইউয়েন জোর দিয়েছেন। তবে এর জন্য সবচেয়ে বেশি দরকার হবে জন্মনিয়ন্ত্রণ।

অনুন্নত দেশগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতিতে সকলেই চিন্তিত। কিন্তু অবস্থা যে এতটা ভয়াবহ তা হয়তো অনেকেরই জানা নেই। বিপর্যয় রোধ করার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষিসংস্থা (F. A. O) এবং উন্নত দেশগুলির সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

• • •

৭ই ডিসেম্বর, রাষ্ট্রসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদে ভাষণদান কালে সোভিয়েট ইউনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রে গ্রোমিকো বিশ্বে উত্তেজনা হ্রাস ও নিরস্ত্রীকরণের কাজকে ত্বরান্বিত করার জন্য প্রধান রাষ্ট্রগুলির কাছে আবেদন জানিয়েছেন। এই উপলক্ষে তিনি একটি ১১ দফা পরিকল্পনা পেশ করেছেন। এই পরিকল্পনায় তিনি সামরিক ব্যয় হ্রাস, অন্য দেশ থেকে বিদেশী সৈন্যের অপসারণ,

• হ্যারল্ড উইলসনের সঙ্গে প্রেসিডেণ্ট জনসন ও মিসেস জনসন।

বিদেশী যুদ্ধ ঘাঁটি লোপ, পরমাণু বিস্ফোরণ বিস্তার প্রতিরোধ, পরমাণু বোমার ব্যবহার বন্ধ, পরমাণু বোমা বিহীন এলাকা গঠন, বোমারু বিমান থেকে বোমা নিক্ষেপ বন্ধ, ভূগর্ভে পরমাণু বিস্ফোরণ বন্ধ, ন্যাটো ও ওয়ারশ গোষ্ঠীর মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি, অকস্মাৎ আক্রমণ বন্ধ এবং সৈন্য-সংখ্যা হ্রাসের প্রস্তাব করেছেন।

গ্রোমিকোর পরিকল্পনা মত বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি কাজ করতে স্বীকৃত হলে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনে অনেকখানি সাহায্য হবে। এখনও এই পরিকল্পনা সম্পর্কে অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া জানা যায় নি।

গ্রোমিকো অবশ্য তাঁর বক্তৃতায় কঙ্গোয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়াম ও বৃটেনের আচরণের তীব্র নিন্দা করেন। স্ট্যানলিভিলে বেলজিয়ান প্যারা সৈন্য অবতরণকে তিনি কঙ্গোর স্বাধীনতার ওপর বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের হস্তক্ষেপ বলে বর্ণনা করেন। এই বিষয়ে তাঁর বক্তৃতা অন্যান্য আফ্রিকীয় প্রতিনিধির বক্তৃতার অনুরূপ হয়েছে। গ্রোমিকো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহুজাতিক পরমাণু বাহিনী গঠনের পরিকল্পনাকেও আক্রমণাত্মক বলে অভিহিত করেন।

সোভিয়েট ইউনিয়ন ঃ

সামরিক ব্যয় হ্রাস করে জনকল্যাণের জন্য সে অর্থ ব্যবহার করার কথা সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে। গত ৯ই ডিসেম্বর সুপ্রীম সোভিয়েটের উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে ১৯৬৫ সালের বাজেট উত্থাপন করতে গিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী আলেকসি কোসিগিন বলেছেন, ১৯৬৪ সালের তুলনায় ১৯৬৫ সালের বাজেটে সামরিক ব্যয় ৫০ কোটি রুবল কম ধরা হয়েছে। সামরিক ব্যয় কমিয়ে যে অর্থ বাঁচবে, তা শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির জন্য ব্যয় করা হবে। কোসিগিন আরও ঘোষণা করেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও অনুরূপ হারে সামরিক ব্যয় হ্রাস করতে সম্মত হয়েছে।

কোসিগিনের এই ঘোষণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি বিশ্বে উত্তেজনা বৃদ্ধি করে, যুদ্ধের আশংকাকে বাড়িয়ে দেয় এবং দেশে অন্যান্য, কল্যাণমূলক কাজকে ব্যাহত করে। সোভিয়েট ইউনিয়ন সামরিক ব্যয় হ্রাসের ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করে বিশ্বশান্তির সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করেছে সন্দেহ নেই। সোভিয়েট ইউনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রে গ্রোমিকো রাষ্ট্রসঙ্ঘে অন্যান্য রাষ্ট্রের কাছে শতকরা

* ডীন রাস্ক

১০।১৫ ভাগ সামরিক ব্যয় হ্রাস করার জন্য আবেদন করেছেন। সকল রাষ্ট্রই যদি সোভিয়েট ইউনিয়নের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে, তবে নিরস্ত্রীকরণ ও বিশ্বশান্তির পথ প্রশস্ত হবে। যুদ্ধের জন্য অহেতুক ব্যয় বন্ধ করলে, কেবল নিজেদের দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্যই বেশি অর্থ পাওয়া যাবে না, অনুন্নত দেশগুলির উন্নয়ন কার্যের জন্যও অধিক পরিমাণে অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হবে।

কোসিগিন বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও আগামী বৎসরের বাজেটে সামরিক ব্যয় কমাতে রাজী হয়েছে। ওয়াশিংটনে হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র জর্জ রিডি অবশ্য এর প্রতিবাদ করে বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়নকে এমন কোন প্রতিশ্রুতি দেয় নি এবং ১৯৬৫-৬৬ সালের বাজেট প্রস্তুতির ক্ষেত্রে কোসিগিনের ঘোষণার কোন প্রভাব পড়বে না। তবে রিডি স্বীকার করেছেন, আন্দ্রে গ্রোমিকোর সঙ্গে মার্কিন পররাষ্ট্র-সচিব ডীন রাস্কের এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

ডীন রাস্ক আন্দ্রে গ্রোমিকোর কাছে স্পষ্টভাবে সামরিক ব্যয় হ্রাসের কথা বলুন আর নাই বলুন, সোভিয়েট ইউনিয়নের ব্যয় হ্রাসের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ব্যয় হ্রাসের কথা ভাবতেই হবে। না হলে বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মর্যাদা হ্রাস পাবে।

সিংহল ঃ

বন্দরনায়ক সরকারের পতনের ফলে সিংহলের ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সমস্যা নিয়ে নতুন করে চিন্তা সুরু হয়েছে। দিল্লীতে এদের সম্পর্কে যে ভারত-সিংহল চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে তার ভবিষ্যৎ কি? শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়কের উৎসাহে এই চুক্তি হয়েছে, কিন্তু তাঁর সরকারের পতন ঘটেছে। সিংহলে এখন সাধারণ নির্বাচন হবে এবং নির্বাচনের পর নতুন সরকার গঠিত হবে। নির্বাচনের সময় কে এই চুক্তি কার্যকরী করার দায়িত্ব গ্রহণ করবে? নির্বাচনের পর যে মন্ত্রিসভা গঠিত হবে, তারাও কি এর দায়িত্ব নেবে? সিংহল পার্লামেন্টের প্রতিনিধি সভায় ১ ভোটে বন্দরনায়ক মন্ত্রিসভার পতনের পর প্রথম বেতার ভাষণে শ্রীমতী বন্দরনায়কও এই চুক্তির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন।

অবশ্য অনেকের ধারণা, আন্তর্জাতিক চুক্তি সকল সরকারই মানতে

বাধ্য। সুতরাং নির্বাচন বা নতুন মন্ত্রিসভার গঠনের দ্বারা এই চুক্তি কার্যকরী করার বিষয়ে কোন প্রশ্নের উদ্ভব হবে না। কিন্তু কোন কোন মহলে বিপরীত সুরও শোনা যাচ্ছে। কেউ কেউ এমন কথাও বলছেন, শ্রীমতী বন্দরনায়ক যে চুক্তি করেছেন, তা পরিবর্তন করার প্রয়োজন হবে।

ভারত-সিংহল চুক্তি ভারতের পক্ষে খুব একটা অনুকূল হয় নি। ভারতের সংবাদপত্রে ও সংসদে এই চুক্তির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা হয়েছে। সিংহলের ভারতীয় বংশোদ্ভূতরাও এই চুক্তিকে পছন্দ করে নি। চুক্তির ফলে

* সিরিমাভো বন্দরনায়ক

সিংহলের অধিকাংশ ভারতীয় বংশোদ্ভূতকে ভারতে চলে আসতে হবে। তবু ভারত সরকার এই চুক্তিটিকে দ্রুত কার্যকরী করতে চান। দীর্ঘদিনের এই সমস্যাটির সমাধানের ওপর ভারত-সিংহল মৈত্রী নির্ভর করছে। এই কারণেই সিংহলের রাজনৈতিক পরিবর্তন সত্ত্বেও ভারত থেকে কমনওয়েলথ সচিব শ্রী সি এস ঝা'র নেতৃত্বে ভারত সরকারের এক প্রতিনিধিদল সিংহল সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে চুক্তি কার্যকরী করার বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করার জন্য ১৪ই ডিসেম্বর কলম্বো যাচ্ছেন।

সিংহলে পুরোদস্তুর নির্বাচনী অভিযান সুরু হয়ে গেছে। শ্রীমতী বন্দরনায়ক ঘোষণা করেছেন, আগামী ২৪শে মার্চ সিংহলে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং ৭ই এপ্রিল নতুন পার্লামেণ্টের প্রথম অধিবেশন বসবে। ১৭ই ডিসেম্বর বর্তমান পার্লামেণ্ট ভেঙে দেয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

৩রা ডিসেম্বর প্রতিনিধি সভায় বন্দরনায়ক মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব গৃহীত হয়। ৯ই ডিসেম্বর কলম্বোর ৮টি শ্রমিক সংস্থার যুক্ত আহ্বানে এক বিরাট শ্রমিক সমাবেশে শ্রীমতী বন্দরনায়কের নীতির প্রতি সমর্থন জানানো হয়। কলম্বোর ইতিহাসে এতবড় শ্রমিক সমাবেশ আর হয় নি। শ্রীলঙ্কা ফ্রিডম পার্টি, ট্রটস্কিপন্থী লঙ্কা সমসমাজ পার্টি ও সোভিয়েটপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক সংগঠনগুলি এই সমাবেশের আয়োজন করেছিল। আগামী নির্বাচনে এই তিনটি দল একত্রে কাজ করবে বলে মনে হচ্ছে।

অপ্রত্যাশিতভাবে এই সমাবেশে উপস্থিত হয়ে শ্রীমতী বন্দরনায়ক শ্রমিকদের কাছে বক্তৃতা করেন। শ্রীমতী বন্দরনায়ক আগামী নির্বাচনে জয়লাভ করবেন বলে দৃঢ় আশা প্রকাশ করেন।

বিপরীত দিকে, শ্রী সি পি ডি' সিলভা ও শ্রীডাডলি সেনানায়কের নেতৃত্বে সিংহলের আর প্রায় সব ক'টা দল সম্মিলিত হচ্ছে বন্দরনায়ক ট্রটস্কিপন্থী কমিউনিস্ট জোটের বিরুদ্ধে একত্রে নির্বাচন পরিচালনার জন্য। বৌদ্ধ ধর্মনায়করা এদের সমর্থন করবেন বলে মনে হচ্ছে। বন্দরনায়ক মন্ত্রিসভার পতনের পর থেকে বিভিন্ন স্থানে মহাসঙ্ঘের সদস্যদের (বৌদ্ধ সন্ন্যাসী) সঙ্গে বন্দরনায়ক-সমর্থকদের ইতস্তত সংঘর্ষের খবর পাওয়া যাচ্ছে।

বৃটিশ গায়না:

বৃটিশ গায়নায় নতুন শাসনতান্ত্রিক সংকট দেখা দিয়েছে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ডঃ ছেদী জগান ও তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী জেনেট জগানের নেতৃত্বাধীনে পিপলস প্রোগ্রেসিভ পার্টি সাধারণ নির্বাচনে সর্বাধিক আসন লাভ করলেও—মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে নি। এ অবস্থায় সরকার গঠন করার জন্য অন্য কোন দলের সঙ্গে কোয়ালিশন করা প্রয়োজন। ফরবেস বার্নহামের পিপলস ন্যাশনাল কংগ্রেসের সঙ্গে ছেদী জগান একত্র কাজ করার

* ছেদী জগান

পক্ষপাতী ছিলেন। বিগত দাঙ্গার সময় থেকেই ছেদী জগান এর জন্য চেষ্টা করে আসছেন। ভারতীয়-প্রধান পিপলস প্রোগ্রেসিভ পার্টি ও নিগ্রো-প্রধান পিপলস ন্যাশনাল কংগ্রেসের সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠনের দ্বারা একত্র শাসন পরিচালনার ফলে ইংরেজদের দেশত্যাগে বাধ্য করা যাবে। এই বিশ্বাসে ছেদী জগান বার্নহামের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিলেন। দুই পক্ষের মধ্যে একটা আপোষ মীমাংসা হয়েও যেত। কিন্তু বিভেদপন্থী ইংরেজ সরকার মীমাংসার পথে বাধা সৃষ্টি করেছে।

গভর্নর-জেনারেল স্যার রিচার্ড লুইটের কারসাজিতে দুই পক্ষের মধ্যে মীমাংসার পরিবর্তে শত্রুতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

নির্বাচন পরবর্তী অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে কোন দলের পক্ষেই সরকার গঠন করা সম্ভব নয়। বার্নহামের পিপলস ন্যাশনাল কংগ্রেস ও পিটার দওয়ারের নেতৃত্বাধীন পর্তুগীজ-প্রধান ইউনাইটেড ফোর্স দলের মধ্যে কোয়ালিশন গঠনের চেষ্টা চলছে। কিন্তু এই দুই দলের সদস্যরাও একত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারবে না।

ডঃ ছেদী জগান ঘোষণা করেছেন, তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করবেন না। ১৯৬১ সালে প্রবর্তিত বৃটিশ গায়নার বর্তমান সংবিধানে নির্দেশ আছে, বিদায়ী প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ মত গভর্নর-জেনারেল নতুন পার্লামেণ্টের অধিবেশন না ডাকা পর্যন্ত পুরোন মন্ত্রিসভাই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকবে। ডঃ জগান ঘোষণা করেছেন, তিনি গভর্নর-জেনারেলকে পার্লামেণ্ট ডাকার পরামর্শ দেবেন না। এ অবস্থায় সংবিধান অনুযায়ী গভর্নর-জেনারেলের আর কিছু করার নেই। তবে গভর্নর-জেনারেল ঘোষণা করেছেন, সময় হলেই জগান-মন্ত্রিসভাকে অপসারিত করা হবে। গভর্নর-জেনারেল স্যার রিচার্ড লুইট এ বিষয়ে লণ্ডনে বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে পরামর্শ চেয়ে পাঠিয়েছেন।

ইতিমধ্যে গভর্নর-জেনারেল বৃটিশ গায়নায় উপস্থিত ১৩০০ বৃটিশ সৈন্য, ৩০০০ স্থানীয় সৈন্য ও পুলিশ বাহিনীকে সতর্ক থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। বার্নহামও নিগ্রো অধিবাসীদের ধৈর্যসহকারে প্রস্তুত থাকার জন্য বলেছেন। জগানও নিশ্চয়ই যে-কোন অবস্থার মুখোমুখি হবার জন্য প্রস্তুত হয়েই পদত্যাগ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ অবস্থায় জোর করে জগান-মন্ত্রিসভাকে সরাবার চেষ্টা করলে সমগ্র উপনিবেশে নতুন করে সংঘর্ষ সৃষ্টি হবে, এমন আশংকা আছে।

সুইডেন ঃ

১৯৬৪ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রাপ্ত মার্কিন নিগ্রো নেতা ডঃ মার্টিন লুথার কিংকে ৯ই ডিসেম্বর সুইডেনে নোবেল প্রাইজ কমিটির সভায় সম্বর্ধনা জানানো হয়। সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে ডঃ কিংকে 'অকুতোভয় শান্তি সংগ্রামী' বলে অভিহিত করা হয়েছে। ডঃ কিং সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে অহিংসা নীতি গ্রহণ করার জন্য বিশ্ববাসীর নিকট আহ্বান জানান। অত্যাচার ও হিংসার পরিবর্তে অহিংসার পথ গ্রহণ করলে জাতিতে জাতিতে মৈত্রী ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

চীনের পারমাণবিক বিস্ফোরণের তীব্র নিন্দা করে ডঃ কিং এই ঘটনাকে বিশ্বশান্তির পক্ষে এক অত্যন্ত অশুভকর বলে বর্ণনা করেন।

ডঃ কিংকে নিয়ে এ পর্যন্ত ৩ জন নিগ্রো নোবেল পুরস্কার পেলেন—তাঁদের মধ্যে ডঃ কিং বয়সে সবচেয়ে ছোট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোদের স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রাম সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা এবং প্রচুর উত্তেজনা সত্ত্বেও আন্দোলনে শান্তি বজায় রাখার জন্য মার্কিন নিগ্রোদের জনপ্রিয় নেতা

• ১৯৬৪ সালের নোবেল পুরস্কার দ্বারা যাঁরা সম্মানিত হয়েছেন, তাদের কয়েকজন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'গান্ধী' ডঃ মার্টিন লুথার কিং আজ বিশ্বের সর্বত্র সম্মানিত।

কঙ্গো ঃ

মার্কিন বিমান ও বেলজিয়ান প্যারা সৈন্য স্ট্যানলিভিল থেকে ফিরে এসেছে। খবরটি মন্দের ভাল। কঙ্গোর রাজনীতিতে অতর্কিত মার্কিন ও বেলজিয়ান হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বিশ্বের প্রতিক্রিয়া তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু প্রতিভূদের উদ্ধারের জন্য প্রেরিত বেলজিয়ান সৈন্য ফিরে এলেও, টি শোম্বের সৈন্যদল বিদ্রোহীদের নৃশংসভাবে হত্যা করছে বলে সংবাদ আসছে। যে মানবিকতার কথা তুলে স্ট্যানলিভিলে বেলজিয়ান সৈন্য গিয়েছিল, সেই মানবিকতার কারণেই বিদ্রোহীদের ওপর অত্যাচার বন্ধ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বেলজিয়াম নীরব কেন? টি শোম্বের একার পক্ষে স্ট্যানলিভিলে প্রবেশ করা অসাধ্য ছিল—মার্কিন ও বেলজিয়ানদের সাহায্যেই বিদ্রোহীদের বিতাড়িত করে টি শোম্বের বাহিনী স্ট্যানলিভিল দখল করেছে। সুতরাং এখন সেখানকার বিদ্রোহীদের রক্ষার দায়িত্ব মানবিকতাবাদীরা অস্বীকার করতে পারে না।

কঙ্গো সম্পর্কে মীমাংসার জন্য আফ্রিকা ঐক্যসংস্থার যে বিশেষ কমিটি গঠিত হয়েছিল, সম্প্রতি নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত এই কমিটির এক বৈঠকে ইথিওপিয়ার সদস্য গ্যাটেস্মু ম্যাকেসা তীব্রতম ভাষায় মার্কিন ও বেলজিয়ান প্যারা সৈন্য প্রেরণের নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আন্তর্জাতিক ডাকাত দলের আক্রমণের হাত থেকে কঙ্গোর স্বাধীনতাকামীদের রক্ষার দায়িত্ব আমাদের গ্রহণ করতে হবে।' ম্যাকেসার মন্তব্যের মধ্য দিয়ে ক্ষুব্ধ আফ্রিকার মর্মবাণী ব্যক্ত হয়েছে।

* * *

এদিকে বিদ্রোহী কঙ্গোলীজদের নেতা গ্যাস্টন সুমালিয়ত দেশ স্বাধীন করার জন্য আরেকবার শপথ নিচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে। স্ট্যানলিভিলে যখন অতর্কিতে বেলজিয়ান প্যারা সৈন্যরা অবতরণ করে, তখন মিঃ সুমালিয়ত সুদান পালিয়ে এসেছিলেন। কায়রোতে এসে তিনি কঙ্গোর প্রথম প্রধানমন্ত্রী নিহত প্যাট্রিস লুমুম্বার বিধবা পত্নী শ্রীমতী পলিন লুমুম্বার সঙ্গে দেখা করেন। পলিনের কাছে গ্যাস্টন এ প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাঁর স্বামীর অসমাপ্ত কার্যকে তিনি চালিয়ে নিয়ে যাবেন। সুমালিয়ত কঙ্গো ফিরে গিয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে প্যাট্রিস ও পলিন লুমুম্বার আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করতে সচেষ্ট হবেন।

* মার্টিন লুথার কিং

পাকিস্তান ঃ

এতদিন পূর্ব পাকিস্তানেই ছাত্র আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল, এবার সারা পশ্চিম পাকিস্তান জুড়ে ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন সুরু হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ কেবলমাত্র শিক্ষা-সমস্যা ও নিজেদের দাবি নিয়েই আন্দোলন করে নি, দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রধান স্তম্ভ আজ সেখানকার ছাত্রসমাজ। পশ্চিম পাকিস্তানেও ছাত্র-আন্দোলন বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করেছে। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মত পাকিস্তানেও শেষ পর্যন্ত ছাত্র-আন্দোলনের চাপেই আয়ুবশাহীর পতন ঘটবে কি না তা সাগ্রহে লক্ষ্য করতে হবে।

করাচীর সর্বদলীয় ছাত্র সংস্থার পক্ষ থেকে কয়েকদফা দাবির ভিত্তিতে ছাত্ররা কায়েদে আজম জিন্নার সমাধি-ক্ষেত্রের কাছে মিছিল করে সভা করার চেষ্টা করে। কিন্তু পুলিশ ছাত্রদের ওপর লাঠিচার্জ করে ও কাঁদুনে গ্যাস ছোঁড়ে। পুলিশী অত্যাচারের প্রতিবাদে করাচী তথা সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানে ছাত্ররা স্কুল-কলেজে ধর্মঘট করে এবং সরকারী আদেশ অমান্য করে মিছিল বের করে। বিভিন্ন স্থানে ছাত্র-পুলিশে সংঘর্ষ সুরু হয়। ৮ই ডিসেম্বর করাচীতে ছাত্রদের ওপর গুলী চলে এবং নাসিম নামে একজন ছাত্র পুলিশের গুলীতে নিহত হন। আহতের সংখ্যা ২০। এই ঘটনার পর লাহোর, রাওয়ালপিণ্ডি, নবাবশাহ, সুক্কুর, হায়দ্রাবাদ (সিন্ধু) প্রভৃতি স্থানে ছাত্র-আন্দোলন তীব্রতর হয়েছে। সরকার বেগতিক দেখে সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল-কলেজ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু ছাত্র আন্দোলনের গতি ক্রমেই তীব্র হচ্ছে। ১০ই ডিসেম্বর করাচীতে ছাত্ররা সরকারী দল কনভেনশনপন্থী মুসলিম লীগের অফিস পুড়িয়ে দিয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তানেও আবার নতুন করে ছাত্র বিক্ষোভ সুরু হয়েছে। বাগেরহাটে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় যোগাযোগমন্ত্রী সবুর খাঁর বিরুদ্ধে ছাত্রদের বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় পুলিশ গুলী ছোঁড়ে এবং এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ ক্ষিপ্ত হয়ে আছে। যে-কোন সময় আগুন জ্বলে উঠতে পারে।

ধনপতি সওদাগর

বাণিজ্যে সেকাল ও একাল

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ ত্রয়োবিংশতি প্রবাহ ॥

তবুও হকিন্স ব্যবসায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

বহু বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে তাঁর কোম্পানীকে এদেশের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কিন্তু—

বাধা শুধু এদেশেই নয়। বাধা ছিল ওদেশেও। পূর্ব ইউরোপে, পশ্চিম ইউরোপে ভারতীয় জিনিসের কোন চাহিদা ছিল না। তারা জানতোই না, ভারতবর্ষে কি কি বস্তু পাওয়া যায়----

একমাত্র মালাবার অঞ্চলের আদার খুব বাজার ছিল ইউরোপে। বহু পুরনো নথিপত্রে দেখা যায়, লণ্ডনে এক পাউণ্ড আদা এক শিলিং দুই পেন্স দরে বিক্রি হয়েছে। কিন্তু এদেশেরই আর এক প্রান্তের নগরে আদার ব্যবসা খুব জমে উঠেছিল। সুমাত্রা আর জাভা থেকে পর্তুগালে আদা রপ্তানী নিয়মিত এবং একচেটিয়া হয়ে গিয়েছিল। আদার ব্যবসায়ীদের গোলায় আড়ত থাকতো। সুমাত্রা থেকে, জাভা থেকে আদা এনে আড়ত বোঝাই করে রাখতো—তারপর একদিন জাহাজে বোঝাই করে সুরু হতো সমুদ্রযাত্রা।

নীল। যাকে বলে ইণ্ডিগো। এই ইণ্ডিগো শুধু একমাত্র ভূমধ্য-সাগরীয় অঞ্চলের অধিবাসীদেরই চাহিদা ছিল। ভারত থেকে সেইসব দেশে নীল যেত। কিন্তু ইউরোপীয়রা বুঝতে পেরেছিল, এই নীল, আদা এবং আর কিছু দিয়েই ব্যবসা সুরু করতে হবে যদি—'If Profitable Commerce to be made in Eastern Waters.' আরও আছে—

আর ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা বুঝতে পেরেছিল, ভারতবর্ষে আছে প্রচুর খনিজ পদার্থ। পুরাকালে অনেক দেশ—অনেক জাতি এখানে ব্যবসা করতে এসে যে মুদ্রা বিনিময় করেছে, সেইসব মুদ্রাও এদেশেরই মাটির নীচে রয়ে গিয়েছে। এক বিদেশী ঐতিহাসিক ভারতবর্ষের মধ্যযুগের কথা লিখতে গিয়ে বলেছেন—General tendency is to bury the coin underground. থাক সেকথা।

ইউরোপে সেই দীর্ঘ চারশো বছর আগে আর কিসের চাহিদা ছিল তা হলে। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরাই বলেছেন, ভারতের তেজস্বীয়ান অশ্ব, হস্তী, হাতীর দাঁত, রং (বিভিন্ন রং), সীসা, দস্তা, টিন, সিল্ক, উল ইত্যাদি—

কিন্তু এদের আদর থাকলে কি হবে? কেনা হবে কি করে? যদি তাদের মাল এদেশে কিছু না কাটে তা হলে ঘরের টাকা দিয়ে তো আর কিনতে পারে না। এলিজাবেথের দেশের ব্যবসায়ীরা ভাবনায় পড়লেন। একমাত্র পর্তুগীজরা দীর্ঘদিনের চেষ্টার ফলে এদেশে কিছু মদ, স্পিরিট ও কিছু কাঁচের জিনিসপত্র আর আয়না চালাতে পেরেছে। এমন স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশে ব্যবসা করা খুব অসুবিধা '...intial difficulty in proving remunerative business---

আমদানী না হয়, নাই হলো। রপ্তানী কি হয়? সে এক বিচিত্র ব্যাপার। উইলিয়ম হকিন্সের সহকর্মীরা বিস্মিত হলেন। শুধু নীল নয়, আদা নয়—প্রচুর বস্ত্রসম্ভার দূর দূর দেশে রপ্তানী হয়। এক বাংলা দেশের বিখ্যাত বন্দর সপ্তগ্রাম থেকেই রপ্তানী হতো তণ্ডুল, চিনি, তুলো, সিল্কের পোষাক আর—দাস। জীবন্ত এই কমোডিটির প্রচুর আদর ছিল বিদেশীদের কাছে।

বাংলা দেশ থেকে চিনি যেত মালাবারে। যেত গঙ্গা পাড়ি দিয়ে আগ্রায়। কিন্তু শুধু গঙ্গায় নয়, সমুদ্রে নয়—এদেশের সীমান্তেও ব্যবসার লেন-দেন ছিল প্রচুর। নেপাল, কুমায়ুন, ভুটান আর ব্রহ্মদেশের সঙ্গে বাঙালী ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করতো। নেপালের সঙ্গে আমাদের এই বাঙালা দেশের বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল পাটনা। নেপাল রপ্তানী করতো গরু-মহিষ, গোরুর শিং, মৃগনাভি, চিরতার পাতা, লাল রং, ভেড়ার লোম, ঘাস থেকে উৎপন্ন গন্ধদ্রব্য (সুগন্ধি তেলে-মেশানো হতো) আর এই বাঙলা থেকে আমদানী হতো বস্ত্রসম্ভার, লবণ, চিনি ইত্যাদি।

ভুটান থেকে বাঙলার সমতলে আসতো মৃগসুরভি, তিব্বতীয় ষাঁড় (ইয়াকের) চামড়া। সেই উত্তুঙ্গ পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে ভুটানের সওদাগররা কেমন করে আসতো এই বাংলার সমতলভূমিতে। সে এক বিচিত্র ব্যাপার। পাহাড়ী টাট্টু-খচ্চর আর গাধার পিঠের দুইদিকে মাল বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হতো।

তারপর—

তারপর সুরু হতো চড়াই-উতরাই পেরিয়ে দীর্ঘ বাণিজ্যযাত্রা। ভুটানের ব্যবসায়ীরা এসে নিয়ে যেত বাংলা দেশের চিনি আর অপূর্ব বস্ত্রসম্ভার। কিন্তু—

মোগলযুগে বাঙলার কোন বন্দর থেকে সপ্তডিঙা ভাসিয়ে বাঙালী সওদাগর দূরদেশে বাণিজ্য করতে যেত; কোন বন্দরে সবচেয়ে বেশি আমদানী-রপ্তানী হতো, এই বাংলার সমুদ্রতীরের কোন জনপদ জনসমাগমে মুখরিত ছিল, ষোড়শ শতাব্দীর সেই বাংলার বাণিজ্যের ইতিবৃত্ত বলবো।

(ক্রমশঃ)

এবং বৃষ্টির পর

দীপক গোস্বামী

বৃষ্টির শরশয্যায় বুক পেতে দিয়ে
নিমগাছে ক'টা দাঁড়কাক।
ও বাড়ির মেয়েটা উনুনের রসদ তুলেছে।
কাজ শেষ তাই
রোদলাগা অলকে
খা'র ঘুমলাগা দুপুর দিয়ে ভাগ করে
'অকাজ'কে আনমনে খোঁজে।
সে এখন কলেজের ক্লাসে---
অন্য এক মুখ নিয়ে শেষ অশ্বারোহণের পথে।
মেয়েটার বয়সটা বোকা।
কিছুতেই বোঝেনাক'
এ জলের জীবনযন্ত্রণায়
পোড়খাওয়া শতাব্দীটা ঘোরে।
তাই রোজ নিজেই রসদ হয়
সংসার নামে এক উনুনের আঁচে।

পরম উত্তাপ

অতুলরঞ্জন দেব

এ বাঁকে নদীটি শান্ত, পিছিয়ে পড়ারও নেই ভয়।
এখানে তরীটি বাঁধি, চতুর্দিক বড় নিরাপদ।
বিচিত্র বৃক্ষের সারি, সুবিস্তীর্ণ তীরের সম্পদ,
অকৃপণ ছায়া ফেলে; আন্তরিক ছায়ার চুম্বনে
জলের সোহাগ টানে, বেড়ে ওঠে পরিতৃপ্ত মনে।
এবং বিশুস্ত বড় দিবারাত্রি সকল সময়।
দূরের যাত্রিণী তুমি। ওদিকে সূর্যও ডুবে যায়।
আমি তো চালকমাত্র, থামা-চলা তোমার কথায়।

থামা-ই সাব্যস্ত হলো। রাত্রিবাসে প্রথম আস্বাদে
অভিনব দৃষ্টি খোলে, আঁধারের পরম উত্তাপে
সুদূর নিকটে আসে। পিপাসাও বাড়ে ধাপে ধাপে
কালের মদিরা-ঘ্রাণে। ধনাঢ্য, সুন্দর পরিবেশে
পরস্পর নিঃশ্বাসের স্বাভাবিক শব্দ ভালোবেসে
রাত্রিটা কাটাবো ভালো: হৃদয়ে হৃদয় ঠিক বাঁধে।

গ্রন্থ মেলা

মেঘের উপর প্রাসাদ : শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। এম-সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রা: লি:। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম : সাত টাকা।

বর্তমান সাহিত্যের যুগ নাকি আয়তনে বিশাল উপন্যাসের যুগ। অধিকন্তু সেই সব উপন্যাসের বিষয়বস্তু এমন হওয়া চাই—যার নাকি সাধারণ জীবনের সংগে যোগ নেই, কিন্তু যোগ না থাকলেও সাধারণ পাঠকেরাই একটা অহেতুক কৌতূহলে তা গিলে খেতে চায়। অবশ্য এর কারণ নির্ধারণ করতে গেলে বর্তমান যুগ, যুদ্ধোত্তর সামাজিক অবস্থা ও অস্থিরচিত্ততার কথাই ওঠে। এখানে সে প্রসংগ অবান্তর। তবু স্বীকার করতে হবে, যে সাহিত্য সাময়িক মনের খোরাক হিসেবে মনোরঞ্জন করে তা চিরন্তন সাহিত্য আখ্যা পাবার উপযুক্ত নয়, কেন না সেখানে কালজয়ী মানব-জীবন বিধৃত থাকে না।

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিমিত চাযায় ছন্দে গ্রথিত উপন্যাসের প্রধান গুণ—সেখানে মহাজীবনের স্পর্শ লাভ করা যায়। তা সাধারণ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, তবু তা কালজয়ী। সেই কারণে তাঁর উপন্যাসও ধ্রুপদী সাহিত্যের পর্যায়ে পড়েছে। তা ছাড়া ইতিহাস, সময়, সমাজ ও শ্রেণীবিন্যস্ত মানব-জীবন সম্পর্কে এমন সচেতন লেখক বাংলা সাহিত্যে সত্যিকারের দুর্লভ বলে মনে হয়। তাঁর যাবতীয় প্রাক্তন উপন্যাস-গুলির গৌরব আজো অদ্বিতীয় ও অক্ষুণ্ন থাকলেও এখনো তিনি নতুন ভাবনার দিশারী। 'মেঘের উপর প্রাসাদ' উপন্যাসটি এই কথার সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। উৎকর্ষ তাঁর চিন্তায়, উৎকর্ষ তাঁর ভাষায়, উৎকর্ষ তাঁর পরিবেশ নির্ধারণে, চরমোৎকর্ষ তাঁর পাঠকমনের আবেগের সঙ্গে উপন্যাসের আবেগের সাযুজ্য ঘটনায়।

'মেঘের উপর প্রাসাদ' নামকরণেই আমাদের সেই বিস্ময়—একদা 'টোপ' গল্প 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী' উপন্যাস লিখে সে বিস্ময় তিনি হাজির করেছিলেন পাঠকের মনে। মনে হয়, কতো-যেন রোমান্সধর্মী নাম। কিন্তু কাহিনীর বর্ণনায় বাস্তবের দিক থেকে তিনি বিনা প্রয়োজনে এক পা বেশি এগোন নি। তাই দেখা যায় 'মেঘের উপর প্রাসাদে'র করুণ কাহিনী হচ্ছে উদ্বাস্তু জীবন—যে জীবনের গভীরে এতোদিনে একমাত্র নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ই প্রবেশ করতে পেরেছেন। গৌরাঙ্গবাবু, তার মেয়ে, ছেলে—সবাই আমাদের চিরকালের চেনা মানুষ। কিন্তু কিভাবে পরিবর্তন এলো সেই সব চেনা মানুষের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা সমন্বিত সমাজ-জীবনে। তারা শুধু বাসভূমিশূন্যই ত নয়। মনের মধ্যে বাসা বাঁধে যে ভালবাসা তা থেকেও তারা কি একে একে উদ্বাস্তু। যে আশা থাকে মনে তা কি কেবল আকাশ-কুসুমই রচনা করে? 'মেঘের উপর প্রাসাদ' তা দিয়েই হয় কি সজ্জিত? কিন্তু জীবনের একমাত্র শূন্যময়তার ছবি আঁকার কবি নন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—তিনি ভাবীকালেরও চিরস্মরণীয় শিল্পী। তাই যেন কলমের আঁচড়ে আঁচড়ে ঝরে পড়েছে মুক্তোরাশি। বাস্তবই সেখানে সব নয়। কল্পনার, সিদ্ধির যোগ ঘটেছে প্রতিপদে। রাণী ও দীপ্তি ভালবাসার দ্বন্দ্বে সেখানে মুখর এবং সুন্দর। তৃপ্তি ও প্রভাত যেন আরো সুন্দর।

উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রে প্রগাঢ় সহানুভূতির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এই উপন্যাসের পাতায় পাতায় লেখক মানুষ থেকে মানবতার ছবি এঁকেছেন। সেই কারণে এই উপন্যাসের স্রষ্টাকে জানাই আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন।

জয়ন্তী সেন

মায়া মুকুর : শ্রীমতী বিনতা রায়। সিগমা পাবলিকেশনস্, ৪এ, গোঁসাই লেন, কলকাতা—৩। দাম : তিন টাকা।

মঞ্চে ও ছায়াচিত্রে নানা ভূমিকায় অবতীর্ণা হয়ে যিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন—সেই বিনতা রায়কে সাহিত্য-জগতের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হতে দেখে সমঝদার পাঠকেরা নিঃসন্দেহে আনন্দিত হবেন। অবশ্য 'মায়া মুকুর' পুস্তকাকারে তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ হলেও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ভিন্ন রসের ও বিভিন্ন স্বাদের জীবনধর্মী গল্প লিখে ইতিমধ্যে তিনি আমাদের রস-দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

'মায়া মুকুরে' সংকলিত গল্পের সংখ্যা বারো। নব-রসের ভিন্ন ভিন্ন ভিয়ানে বারোটি গল্পেরই মাধুর্য আমাদের মনের জগতে আনন্দিত ধারায় উপচে পড়েছে। গল্পগুলির পৃথক পৃথক বিষয় ও পটভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 'মায়া মুকুরে' নীল রক্তের দুই দিগন্তে অধিষ্ঠিত সুজাতা ও লাবণ্য। একই জগতে মনের এত পার্থক্য, জীবনের এতো বিস্ময় দেখলে মানুষ

মুহূর্তে আমাদের চেতনা স্পষ্টতর হয়। 'ফাঁকি' গল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের পরিহাস যেন তির্যক ব্যঙ্গের দ্বারা পরিস্ফুট। অবিনাশ ছেলেকে ফাঁকি দিতে গিয়ে কিভাবে নিজেকেও ফাঁকি দিয়েছে তা আমাদের ব্যথাতুর করে তোলে। 'বাড়তি এক পাতা' গল্পের স্বল্প পরিসরের মধ্যে আমরা পৌঁছই গিয়ে জীবনের অতলান্ত গভীরে। দেশের দিকপালের মুখোশ বাড়তি এক পাতায় চমৎকারভাবে খসে পড়েছে। 'জাত-বিচারে' যে আমেজ ও কৌতুক ছড়িয়ে পড়েছে তা অভিনব। 'চটির বদলে' গল্পে সাধারণ একজন বেকার যুবকের করুণ প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'বাবলুর অসুখ' গল্পটি শিশুর চিত্তকে মনস্তাত্ত্বিকতার আলোকে লেখিকা নিপুণভাবে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন। এটি ছোটদের যেমন, তেমনি বড়দেরও পাঠ্য। 'আঁধার দেউলে'র বক্তব্য অসাধারণ—'আজ সে বুঝেছে, জীবনে বৈচিত্র্য, ট্র্যাজিডি সর্বত্র ছড়ানো রয়েছে বটে, কিন্তু সব ঘটনা নিয়ে গল্প লেখা চলে না।'

'নায়িকার ব্যথা', 'এ-পিঠ ও-পিঠ', 'মনের কোঠায়', 'চাল' ও 'মন ও মুহূর্ত' গল্পে লেখিকার কৃতিত্ব এই যে, সাধারণ জীবনের ঘটনা থেকে উদ্ঘাটিত এই সব গল্পে অনন্যসাধারণের আস্বাদ আমাদের মুগ্ধ করে দেয়। বিনতা রায় সাহিত্যক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠিত হলেন—একথা অনায়াসে বলা যায়।

শিশুতীর্থের পথ : শ্রীউৎপল হোমরায়। সাহিত্যায়ন; ৮-এ, কলেজ রো, কলকাতা-৯। মূল্য : তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

বর্তমান পৃথিবীর কতকগুলি দেশের অধিকতর উন্নতির কারণের মূলে দেখা যায় যে, জাতির ভবিষ্যৎ শিশুদের বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে লালিত ও পালিত করার মধ্যেই অন্তর্নিহিত রয়েছে সেই উন্নতি। আমাদের দেশের শিশুরা অবহেলিত, গ্রাম-শহরের হাজার হাজার প্রভৃতি ক্লিষ্ট ও দুর্ভাগ্যলাঞ্ছিত। এর কারণ আর্থিক ও সামাজিক অভাব, অশিক্ষা, প্রাচীন সংস্কার। তবু যা হোক 'শিশুদিবস' প্রথম এই ভারতেই পালিত হয়েছে। অধুনা শিশু সম্পর্কিত মূল্যবান গ্রন্থ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে। কিছুকাল পূর্বে ঐ ধরণের একটি গ্রন্থকে আমরা তুলে ধরেছিলাম। আলোচ্য গ্রন্থটিকে পেয়ে আমরা তদনুরূপ আনন্দিত হয়েছি, তা বলা বাহুল্য। শ্রীযুক্ত উৎপল হোমরায় শিশুতীর্থের পথ সৃষ্টির একজন ন্যায়নিষ্ঠ, বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক পথিক—এই কথা উপরিউক্ত গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠা প্রমাণ করার পক্ষে যথেষ্ট। গ্রন্থটিতে রয়েছে অন্যূন চব্বিশটি অধ্যায়। শিশুর আবির্ভাব কালটিকে আমাদের সম্মুখে বৈজ্ঞানিকপন্থায় তুলে ধরে লেখক একে একে ছক কেটে, অঙ্ক কষে, ছবি দিয়ে বলেছেন শিশু পালনের কথা, তাদের খাদ্য-ব্যবস্থা, খেলাধুলা, বাল্য-কৈশোরের প্রতিটি বছরের কাহিনী, তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, আবেগানুভূতি, পরিবেশ, সহজাত প্রবৃত্তি, স্মৃতিশক্তি, কু-অভ্যাস, মা-বাবা ও শিশুর কথা। এইভাবে নানা খুঁটিনাটি দিকের আলোচনায় শিশু-মনোবিজ্ঞানের যে জটিলতম রহস্য-গুলিকে তুলে ধরা হয়েছে তা অভিভাবক, শিক্ষক ও কিশোর সংগঠকদের কাজে লাগবে।

শ্রীনিখিলরঞ্জন রায় লিখিত ভূমিকাটি গ্রন্থটির সারবত্তা অতি অল্প কথায় সুন্দরভাবে আমাদের জ্ঞাপন করে।

NEW INDIA: Raiharan Chakrabarti. শ্রীমতী আশালতা দেবী কর্তৃক ১২৪।১, বি এল সাহা রোড, কেঃ অব পি এন মিত্র ব্রিক ফিল্ড লেন, পোঃ নিউ আলিপুর, কলকাতা-৫৩ থেকে প্রকাশিত। মূল্য : দুই টাকা।

এই গ্রন্থটি ইংরেজিতে লিখিত। তৃতীয় পরিকল্পনার আধুনিক ভাষা-সমূহের উন্নতির উদ্দেশ্যে 'নিউ ইণ্ডিয়া' সরকারের পৃষ্ঠপোষণা লাভ করেছে, অধিকন্তু এটি একটি প্রতি-যোগিতার ক্ষেত্রে সম্মানদক্ষিণা লাভের গৌরব অর্জন করেছে। নিছক লেখার খাতিরে 'নিউ ইণ্ডিয়া' রচিত হয় নি। ভারতীয় ঐতিহ্য ও আদর্শকে পরিস্ফুট করার জন্যই এই গ্রন্থ-প্রণয়ন। শ্রীচক্রবর্তী বলেছেন,

'To others 'New India' may be a tale told again and again, but it is an abiding inspiration of love and truth to me.'

অবশ্য ঐ ইন্সপিরেশন-এর জন্য আবেগ যে নেই তা বলা যায় না। ভাব ও ভাষাতে আবেগ,—সততার আবেগ তাদেরই মধ্যে সঞ্চারিত। তা ছাড়া একথা ঠিক যে, জড়বাদ যতোই আধিপত্য স্থাপন করুক না কেন, রবীন্দ্রচিন্তা ও গান্ধীবাদের সমকক্ষ অ কখনোই হতে পারবে না। সেই কারণে বিদেশীদের কাছে এই গ্রন্থ প্রচারিত হওয়া উচিত এবং একালের এদেশের যে-সব গণ্যমান্য ব্যক্তি জড়বাদের প্রতি আকৃষ্ট, তাঁরা এই বই থেকে এই শিক্ষা পাবেন যে, জড়বাদকে অস্বীকার না করেও সর্বমানবের 'মিলন মন্দির' এই ভারতের আপন পন্থায় জগতের মুক্তি, পৃথিবীর শান্তি; ভারতেরও ভাবী উন্নতি। 'জাতীয় দক্ষতা ও শ্রমের মর্যাদা' 'নবভারতের গ্রাম সমস্যা' প্রভৃতি প্রবন্ধও চিন্তামূলক।

॥ প্রকাশকদের প্রতি নিবেদন ॥

পুস্তক প্রকাশকগণের প্রতি আমাদের সবিনয় নিবেদন এই যে, সাপ্তাহিক বসুমতীতে সমালোচনার জন্যে যাঁরা পুস্তক প্রেরণ করতে ইচ্ছুক, তাঁরা অনুগ্রহপূর্বক অতঃপর নিম্নলিখিত ঠিকানায় দু'খানি করে পুস্তক প্রেরণ করবেন।

সম্পাদিকা, সাপ্তাহিক বসুমতী,
১, শরৎ বসু রোড, কলিকাতা—২০।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

পর্যবেক্ষণ

('বন্ধুগণ, যদি কোনো স্ফূর্তিবাজ, ছলনাপটু, ধূর্ত, সাহসী, নিঃস্বার্থ এবং কেতাদুরস্ত মানুষের দেখা পান, তবে জানবেন সে আপনাকে ঠকাবে। যে মশলা থেকে তৃতীয় রিচার্ডের মতন চরিত্র জন্মায়, এর চরিত্রও তা থেকেই সৃষ্টি, আর এই চরিত্রই ওস্তাদ প্রতারকরূপে দেখা দেয়।'

* * *

'এমন লোকের সঙ্গে চালাকি খাটাতে যাবেন না, কারণ সে সহজেই তা ধরে ফেলবে। তাকে বুঝতে দিন যে আপনিও একজন প্রতারক। এবং এটি প্রথম দেখা হতেই বুঝতে দিন। এবং এই সঙ্গে তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করুন যাতে তার ধারণা হয় তার কাজে আপনি সাহায্য করতে পারবেন। খুব নিষ্ঠার সঙ্গে তার আদেশ পালন করুন, এবং তা করলে যে তাতে আপনারও স্বার্থসিদ্ধি ঘটবে এমন ধারণা জন্মিয়ে দিন তার মনে। এ-জাতীয় লোক বেশ একটু উদার হয়, তাই সে আপনার ব্যবহার যে খুব যুক্তিসঙ্গত হচ্ছে তা বুঝে আপনাকে তার সাকরেদ ভেবে অনেক কিছুরই অংশ আপনাকে দেবে। যদি এদিক দিয়ে আপনি কিছু হতাশও হন, তবু এমন ভাব দেখান যে, আপনি তার ব্যবহারে খুবই সন্তুষ্ট। তারপর তার কোনো ব্যবহারিক ত্রুটিতে তাকে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা না করে, ধরিয়ে দেবার শুভ সুযোগ খুঁজুন। তার চরিত্রের উপর নজরদারি না করে, আপনি আপনার উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় থাকুন।')

ডিকেন্স যে যুগে বাস করতেন, সে-যুগের মানুষ এবং তাদের আচরণ যেভাবে তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এমন আর কেউ করেন নি। ধনী হোক, দরিদ্র হোক, প্রত্যেকের পারিপার্শ্বিক অবস্থা আর চরিত্র তিনি চিরকালের ক্যানভাসে উজ্জ্বল রঙে এঁকে গেছেন। ডিকেন্স যে নৈপুণ্যের সঙ্গে এসব পর্যবেক্ষণ করেছেন, ডিটেকটিভ হতে হলেও পর্যবেক্ষণে সেই নৈপুণ্য দরকার। এটি একটি শিল্প—এবং বড় শিল্প। অথচ দেখা যায় খুব কম লোকই এই শিল্পচর্চা করেছেন। অনেক ডিটেকটিভেরও এই পর্যবেক্ষণ শক্তির অভাব আছে। যে-কোনো লোক, যার একটু বুদ্ধি আছে, সে একটু

অনুশীলন করলে বিখ্যাত উদ্ভিদতত্ত্ববিদ হতে পারে, অথচ দেখা যায় উদ্ভিদ-বিদ্যা কম লোকই জানে। ন'শ' নিরানব্বুই জন লোক ময়দানের ভিতর দিয়ে চলে যাবে, কিন্তু সেখানকার গাছগুলির কোনো বৈশিষ্ট্য দেখবে না, বা তাদের কোনো পরিচয় জানবার চেষ্টা করবে না। কিন্তু হাজারের সেই বাকি একজন প্রতিপদে গাছপালায় আকৃষ্ট হবে এবং তাদের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করবে। ঠিক এইভাবে ন'শ' নিরানব্বুই জন লোক জনতার ভিতর দিয়ে চলে যাবে, কিন্তু যেসব মানুষকে সে দু'পাশে অতিক্রম করে চলেছে, তাদের চেহারা তাদের আচরণ তাদের চলার ভঙ্গির মধ্যে কোনো বৈশিষ্ট্যই দেখবে না। অথচ প্রতি পাঁচজনের অন্তত একজন মানুষই লক্ষ করবার মতো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই দৃষ্টি যাদের আছে তারাই ডিটেকটিভ হবার উপযুক্ত। অতএব আমি মনে করি, সামান্য অনুশীলনের সাহায্যে প্রত্যেকটি লোকই ডিটেকটিভ হতে পারে। হয় না যে কেন তার কোনো কারণ আমি দেখতে পাই না।

বছর দুই আগে রেল-পুলিশ সমিতি একটি সন্ধানের কাজ পরিচালনা করেছিলেন। তাঁদের বিভিন্ন শাখায় যে-সব পুলিশ আছে তাদের বিদ্যাবুদ্ধি এবং সংগঠন কেমন, তা জানাই ছিল এইসব সন্ধানীদের কাজ। সব জায়গায় নানা-রকম অনুসন্ধান এবং বিবরণ সংগ্রহ করে জানা গেল ৮০০০ মাইল রেলপথের নানাস্থানে সন্ধানী কাজে নিযুক্ত করা যায় এমন নিপুণ ডিটেকটিভের বড়ই অভাব। মোট কথা কোনো ডিটেকটিভ পদ্ধতিই কোথাও নেই। এই সমিতি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, ভারতীয়দের মধ্যে গোয়েন্দা বুদ্ধির অভাবের জন্যই প্রধানত এটি ঘটেছে। এটি একটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। ভারতীয়দের মধ্যে গোয়েন্দাগিরির ক্ষমতার অভাব থাকার দরুণ যে এটি হয়েছে মোটেই তা নয়। হয়েছে উচ্চপদস্থ অফিসারদের বাছাই করার ক্ষমতার অভাবের দরুণ। ভারতীয় পুলিশদের মধ্যে কারো যে এ ক্ষমতা থাকতে পারে এ-বিশ্বাস তাঁদের নেই বলেই তাঁরা উপযুক্ত লোককে দেখেও দেখেন না। আমি দু-একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে আমার কথার সত্যতা প্রমাণ করি।

রাত্রির ঘটনা। একজন মুসলমান ভৃত্য ঘাড়ে একটি চটের মস্তবড় থলে নিয়ে পার্ক স্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছিল। প্রহরারত কনস্টেবল তাকে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করল থলের মধ্যে কি আছে। লোকটি একটু ভেবে বলল, 'খোদা জানতা, মহারাজ।' এই উত্তরটা দিতে যে সামান্য একটুখানি দেরি হল, এতেই কনস্টেবল-এর মনে সন্দেহ হয়।

লোকটি বলল, 'খোদা জানতা, মহারাজ। আমি এটি পথে কুড়িয়ে পেয়েছি—তাই কাছাকাছি কোনো থানায় জমা দিতে চলেছি। এর দাবিদার কেউ নেই। কিন্তু আপনি যখন সরকারী লোক, তখন আপনাকেই এটা দিয়ে যাই। আপনি কি নেবেন এটা? আমার বড্ড তাড়া আছে কি না, তাই। আমি চলছিলাম একটা মরণাপন্ন রুগীর ওষুধ কিনতে—স্কট টমসন্ অ্যাণ্ড কোং-এর ওষুধের দোকানে। চলতিপথে এই থলে কুড়িয়ে পেয়ে এক ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসে আছি।'

এই চাতুরিপূর্ণ কৈফিয়ৎ শুনে বেশির ভাগ লোকই তা বিশ্বাস করত, এবং ঐ লোকটাকে স্বাধীনভাবে যেতে দিত। কিন্তু পার্ক স্ট্রীটের ঐ ভবী এ-কথায় ভুলল না। সে বলল, 'উঁহু, ঐ থলে নিয়ে একবার থানায় চল তো।' থানায় নিয়ে ব্যাগ খুলে দেখা গেল তার মধ্যে অনেকগুলি পোষাক রয়েছে, বেশ দামী পোষাক, এবং সেগুলি বেঙ্গল ক্লাবের। আরও প্রমাণ হল, যে লোকটা ওটা ঘাড়ে করে নিয়ে যাচ্ছিল, সেই স্বয়ং চোর।

থানার ইন্সপেক্টর এই কনস্টেবলের নাম 'গুড কনডাক্ট'-এর বইতে তুললেন এবং সুপারিশ করলেন, ভবিষ্যতে প্রোমোশনের সময় এর কথাটা যেন ভুল না হয়। কিন্তু ডেপুটি কমিশনার দেখেলন এ লোকটি এমন আর কি করেছে যার জন্য একে প্রোমোশন দিতে হবে। দেখুন, এইভাবে যে কনস্টেবলটি আপনা থেকেই গোয়েন্দা-গিরির বুদ্ধির পরিচয় দিল এবং এমন উল্লেখযোগ্যভাবে দিল, তাকে উৎসাহ দেওয়ার বদলে তার এই সহজাত বুদ্ধির আলোটা আরও কি না ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দেওয়া হল।

আর একটা দৃষ্টান্ত দিই। ১৭নং ক্যামাক স্ট্রীটে এক দেশী দর্জি ঐ বাড়িতে একটি বারান্দায় বসে কাজ করত। সেখানে মহিলাদের ড্রেসিং রুম থেকে পেগে ঝোলানো দামী সিল্কের পোষাকের দিকে তার দৃষ্টি পড়ে এবং জিনিসটির জন্য তার লোভ হয়। সে ঐটে দেখার পর থেকে কেবলই ভাবতে থাকে ওটা অন্যের অলক্ষ্যে কিভাবে হাত করা যায়। সে জানত, ও বাড়ি থেকে যে-কোনো পুঁটুলি বাইরে যাবে, সেটাকেই আগে খুলে দেখতে হবে তার মধ্যে কি আছে, কাজেই পুঁটুলি বানিয়ে ওটাকে বাইরে নেওয়া যাবে না। অতএব সে যা করল, তা এই: বাড়ির সবাই সন্ধ্যায় গাড়িতে করে বেড়াতে যাবার সময় পর্যন্ত সে অপেক্ষা করল। তারপর তার নিজের চিলে পাজামার শেলাই কেটে ফেলে পাজামাটাকে লুঙ্গিতে পরিণত করল, ঠিক লুঙ্গি নয়, আমাদের কাপড়ের মতো দেখতে হল। এরপর সে মহিলার সিল্কের পোষাকটি পরে ফেলল, অন্তর্বাস যেমন পরে তেমনি করে, তারপর সেই কাটা পাজামাটি তার উপর দিয়ে পেঁচিয়ে দিল। তখন আর ভিতরের সিল্কের পোষাকটি দেখা যাচ্ছিল না, ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। তারপর যখন সে গায়ে একটি শাল জড়িয়ে নিল, তখন আর তাকে কে ধরে? সে তখন

আয়া। এবং আয়া বেশেই বেরিয়ে গেল, দরোয়ান কিছুই বুঝতে পারল না।

কিন্তু ক্যামাক স্ট্রীট থেকে বেরিয়ে পার্ক স্ট্রীটে পড়তেই সে সেখানকার প্রহরারত এক কনস্টেবলের প্রায় মুখোমুখি এসে পড়ল। তখন সে হঠাৎ থেমে গিয়ে ভাবতে লাগল, যাব কি যাব না। পুলিশের লোকটি তাকে ঐ অবস্থায় দেখে ভদ্রভাবে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি পথ হারিয়েছ, আয়া?' সে আয়ার বেশেই ছিল, তাই পুলিশম্যানের দোষ নেই। কিন্তু 'আয়া' তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সে হঠাৎ নিজেকে ভুলে গিয়ে পুরুষ দর্জির গলায় বলে উঠল, 'হাঁ, পথ হারিয়েছি।' সেই কর্কশ গলা শুনে তাকে কোনোমতেই স্ত্রীলোক মনে হল না, ঐ গলাতেই সে ধরা পড়ে গেল। তারপর যখন তাকে থানায় নিয়ে যাওয়া হল, তখন সে যে স্ত্রীলোক নয় সে কথা তো তাকে স্বীকার করতেই হল, কাজেই বাকিটাও আর বাকি রইল না, সবই স্বীকার করতে হল। তারপর সেই সিল্কের পোষাকের যিনি মালিক, সেই মহিলাকে তা পরিধান করে কয়েকদিন পরেই টাউনহলে অনুষ্ঠিত বল-নাচে দেখা গিয়েছিল, এবং তার জৌলুষের আকর্ষণে কেউ কেউ তাঁকে ফ্লার্ট করারও সুযোগ দিয়েছিলেন। যাই হোক, সেসব আমার বক্তব্যের পক্ষে প্রাসঙ্গিক নয়। আমি, এই কনস্টেবল যে ইনস্পেক্টরের অধীনে কাজ করছিল, তাঁকে এর কিছু পুরস্কার দেওয়ার জন্য সুপারিশ করেছিলাম। কিন্তু পূর্বের ঐ কেসটার মতো এটাতেও ডেপুটি কমিশনার কনস্টেবলের কাজে প্রশংসাযোগ্য কিছু দেখতে পেলেন না। অতএব তাকে পুরস্কার দেওয়া হল না।

আরও একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি: আড়াই বছরের একটি শিশুকে পথে কুড়িয়ে পাওয়া গেল, কোনোমতেই তার পরিচয় বা ঠিকানা তার কাছ থেকে পাওয়া সম্ভব ছিল না। তার কোনো একটা ব্যবস্থার জন্য তাকে আমার অফিসে আনা হয়েছিল। হাতের মুঠোয় চানাভাজা জাতীয় কিছু ছিল, কোনো মুদি দয়াপরবশ হয়ে তাকে দিয়েছে। নতুন পরিবেশে খুব ভয় পেয়ে গেলেও ছেলেটি হাতের ভাজা দানা দু-একটা মুখে পুরছিল। এই রকম খেতে দেখে আমি তার জন্য কিছু মিষ্টি আনিয়ে দিলাম। মিষ্টিগুলো খাওয়ার ভঙ্গি দেখেই বোঝা গেল অনেকক্ষণ কিছু খায় নি। খাওয়া শেষ হলে শিশুটিকে একটি কনস্টেবলের জিম্মায় দিয়ে দিলাম। শিশুটি বারান্দায় বসে হাতের মুঠো থেকে দানাগুলো নিয়ে প্রেসের টাইপ সাজানোর ভঙ্গিতে সাজাতে লাগলে, খুব এলোমেলোভাবে অবশ্য। সবগুলো দানা যখন সাজানো শেষ হল তখন সে আবার সেগুলো ভাঙতে লাগল এবং এবারেও প্রেসে ছাপার পর যেমনভাবে টাইপ ডিস্ট্রিবিউট করে তেমনি ভঙ্গিতে সেগুলো এক-একটা খোপে রাখার ভঙ্গিতে রাখতে লাগল।

কনস্টেবল তার এই কাণ্ড দেখে আমার কাছে এসে বলল, 'সাহেব, আমার রোঁদের এলাকায় একটা ছাপাখানা আছে, আমি বাইরে থেকে জানালার ভিতর দিয়ে মাঝে মাঝে তাদের কাজ দেখেছি। এই ছেলেটি ঠিক তাদের মতো টাইপ সাজানো আর ভাঙার কায়দায় হাতের চানাগুলো সাজাচ্ছে আর ভাঙছে। তাই আমার মনে হয় এর বাবা প্রেসের কম্পোজিটর।' অনুসন্ধান করে দেখা গেল ঠিক তাই।

আমি কর্তৃপক্ষকে বললাম, এই কনস্টেবলকে গোয়েন্দা বিভাগে নেওয়া উচিত। তার বয়স কম, এবং পুলিশের কাজে অল্প দিনমাত্র ঢুকেছে। কিন্তু আমার সুপারিশকে তাঁরা উড়িয়ে দিলেন। সম্ভবত তাঁরা ভাবলেন যে-কোনো নির্বোধ ব্যক্তিও এটা ধরতে পারত। আমার ধারণা কিন্তু অন্য রকম। আমি মনে করি চানা সাজানো দেখে সে যে প্রেসের কম্পোজিটরের কাজ নকল করছে তা অনুমান দশ হাজারের মধ্যে একজনও করতে পারত কি না সন্দেহ।

এইভাবেই এক-একটি লোকের গোয়েন্দাগিরির সহজাত শক্তিকে গোড়াতেই নষ্ট করে দেওয়া হয়। এবং খবরের কাগজের কলমে আর জনসাধারণের মুখে সবসময় প্রচার হচ্ছে যে, ভারতীয়দের মধ্যে গোয়েন্দাগিরির ক্ষমতার বড়ই অভাব। উচ্চপদে যাঁরা আছেন, তাঁদের নিজেদেরই যদি ডিটেকশন বিদ্যার মূল নীতিগুলি অজানা থাকে, তা হলে তাঁরা নিম্নপদস্থদের ভিতর যে গোয়েন্দাগিরির সহজ চেতনা আছে, তাকে উৎসাহ দিয়ে বাড়াবেন কি করে?

বুদ্ধিচাতুর্য, দ্রুতবীক্ষণ ক্ষমতা, এবং ধূর্তামি, এইসব গুণের জন্য বাঙালীরা বিশেষভাবে খ্যাত। ডিটেকটিভ বিভাগের প্রধানদের হাতে এরা বিশেষ প্রশংসনীয় হাতিয়ার, অবশ্য যেখানে মনের বিরুদ্ধে মনের লড়াই, অর্থাৎ যেখানে রহস্য ভেদের জন্য বিশ্লেষণী ক্ষমতার দরকার হয় সেই উচ্চ ক্ষমতার ক্ষেত্রে এরা উঠতে পারে না, তথাপি এদের কাছ থেকে গোয়েন্দাগিরির কাজে যেটুকু সাহায্য পাওয়া যেতে পারে তা তুচ্ছ নয়।

কতকগুলো নিয়মমাফিক সন্ধানরীতির উপরে ওঠার ক্ষমতা থাকাই ডিটেকটিভের পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাঁকে একান্তে বহুরকম পর্যবেক্ষণ ও তা থেকে বহু অনুমান গড়ে তুলতে হয়। তাঁর প্রতিপক্ষও হয়তো ঐ রকমই করে। কিন্তু অনুমানের যাথার্থ্য থেকে পর্যবেক্ষণের বৈশিষ্ট্যই আসল সত্যকে চেনবার পক্ষে বেশি উপযোগী।

এখন আমি নির্ভুল পর্যবেক্ষণ ডিটেকশনের কাজে কত মূল্যবান তার বর্ণনা দিচ্ছি।

(ক্রমশঃ)

আঁধার মানিক

ধারাবাহিক উপন্যাস

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ বাইশ ॥

রাজা আসে রাজা যায়, বাংলার গ্রামের ঘুম ভাঙে না। রাজার মত রাজা থাকেন, গ্রামের মানুষ থাকে নিজের ধান্দায়। সেই আদ্যিকাল থেকে আজ পর্যন্ত সে দিনান্তে দুটি গরম ভাত পেলেই হাতে স্বর্গ পায়। চিরকাল তাদের কোমরে খাট ধুতি, সম্বল হাল-লাঙল, আলবাঁধা জমির টুকরো দেখে মনে হয় কোন্ কালনেমি এই স্বর্ণলঙ্কা ভাগ করেছিল যেন।

জমির মত তাদের জীবনও আল বাঁধা। এইটুকুর মধ্যে চলাফেরা, কেউ কারো খবর রাখে না। এমন কি, দশ ক্রোশ হেঁটে ভিন গাঁও দেখতে যায় না, নেহাৎ দায়ে না ঠেকলে।

এগারো শ' উনপঞ্চাশে যেন সব লণ্ডভণ্ড একাকার হয়ে গেল। আল ভেঙে বেনো জল ঢুকে পড়ে সব একাকার। নবাবী রাস্তা দিয়ে, পথ-বিপথ দিয়ে শুধু ভয়ার্ত মানুষ ছুটতে লাগল। কে জেমোকান্দীর বামুন আর কে দাঁইহাটের চাঁড়াল, কোথায় ছিল ক্ষীরপাই গ্রামের শাঁখারীরা আর কোথায় মাঙনপাড়ার তাঁতি-বসাক, সবাই একসঙ্গে নেমে পড়ল পথে। অকর্ষিত ধান ক্ষেত। চাষী সব পথে। চাষীর ধানে নবাবের ধন। আলীবর্দী প্রমাদ গুণলেন।

ওয়াকিবহাল মহল কানাকানি করলে সিংহাসনে বসার আগে দিনক্ষণ দেখে-শুনে নেওয়া দরকার। সরফরাজের ভূত সিংহাসন থেকে নামতে না নামতে শাহীমসনদে বসাটা ঠিক হয় নি। অন্যে পরে কা কথা। স্বয়ং জানকীরাম গোপনে এ-ধারণা পোষণ করেন। বলতে লজ্জা পান। কেন না, আলীবর্দী ভাগ্যবাদী লোক নন, পুরুষকারে বিশ্বাসী। তা ছাড়া, আগে যা হত তা হত। এই উনপঞ্চাশে কে এ-সব কথা মানতে চায়?

বলতে গেলে নবাব মোটে আমল দেন না। এমন কি এই মেদিনীপুর থেকে মুর্শিদাবাদের দিকে আসতে আসতেও জানকীরাম বলতে চেষ্টা করেছেন। এ-সব কথা বললেই নবাব ঠাণ্ডা হাসি হাসেন। অথচ, ঝড়ের মত চলতে চলতে নবাব নিজেও ভাগ্যকে গালি দিয়েছেন। বুড়ো বয়সের নবাবী। উড়িষ্যার হাঙ্গামা মিটতে না মিটতে কোথা থেকে এল বর্গী।

প্রথমটা সবাই ভাবলে ওরা স্রেফ দস্যুবৃত্তি করতে এসেছে। স্বয়ং আলীবর্দীও তার চেয়ে বেশি কিছু ভাবেন নি। কিন্তু ভাস্কররাম চোখ পাকিয়ে জানালে সে চায় চৌথাই। এ-কাজে ভগবানের অনুমোদন বিলক্ষণ আছে। কেন না, শুভ কাজে বেরুবার

দাপটে রঘুজী ভোঁসলে দেবদেবীদের তুষ্ট করতে বাকি রাখেন নি।

কিন্তু ঈশ্বর ত' দুটি। এক দিল্লীশ্বর, আর জগদীশ্বর। একজন না হয় অলক্ষ্যে অনুমতি দিলেন। আর একজন কি করছিলেন?

আলীবর্দী এ-প্রশ্নের যে জবাব পেলেন তাতে তাজ্জব হতে হল তাঁকে।

স্বরকণ্ঠ তখন বর্ধমানের পথে। এক ভয়ঙ্কর অস্থিরতা তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সবার অজ্ঞাতে গ্রাম ছেড়েছেন, গত ক'দিন ধরে তাঁর অন্তরে এতরকম সংগ্রাম চলেছে যে, বাইরের এতবড় ঘটনা সম্পর্কেও তিনি কিছুটা উদাসীন ছিলেন।

সন্ন্যেসীরা তাঁকে কাঁধে তুলে নাচে, সবাই জানে তিনি দেবভক্ত মানুষ, স্বরকণ্ঠ নিজেও বিশ্বাস করেন তাঁর অনেক অলৌকিক ক্ষমতা আছে, কিন্তু, এখন মনে হয় মন থেকে দ্বেষ, বিদ্বেষ, আরো কত প্রবৃত্তিই ত্যাগ করতে পারেন নি।

পিসীমাকে পুড়িয়ে-ঝুড়িয়ে সেই-জন্যে স্বরকণ্ঠ শ্মশানতলার মন্দিরে গিয়ে বসেন। বাড়িতে থাকলে মাথা খারাপ হয়ে যেত।

এখন, পথ চলতে চলতে যতই ভাবেন, ততই নতুন করে রাগ হতে থাকে।

'পাপ। মহাপাপ!' ঘেন্নায় ফুলেশ্বরীর প্রতি কটূক্তি করেন। দিব্যি ছিলেন স্বরকণ্ঠ, ঘরে-বাইরে সমান, সংসার বৈরাগী আধা অবধূতের মত। নিজের মনে দিব্যি ছিলেন। তাঁর ভক্তরা দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে থাকে। এমন কি দেওয়ান দুর্লভরাম, রাজা জনকীরাম সবাই তাঁর খবর রাখেন। সর্বদা তাঁর বিধানপত্র নেন, স্বরকণ্ঠের দুঃখ করবার কিছু ছিল না।

এমন সময়ে ফুলেশ্বরী এল। স্বরকণ্ঠের মনের শান্তিতে ছাই পড়ল। এতদিনের চেষ্টা, এত সাধনা কিছুই কিছু নয়? এইজন্যেই কি বক্রেশ্বরের সন্ন্যেসী তাঁকে গেরুয়া দিতে চায় নি? মুচকি হেসে বলেছিল, 'ভেতর কাঁচা তাই এত ছটফট করছ ঠাকুর। মনে আগে রঙ ধরুক, শুধু শুধু শরীরটাকে গেরুয়ার শাসনে রেখে কি হবে?'

সেদিন স্বরকণ্ঠ সন্ন্যাসীর অজ্ঞতা দেখে কষ্ট পেয়েছিলেন।

এখন মনে হয়, লোকটা মানব-চরিত্র বোঝে। কোনটা বৈরাগ্য, কোনটা ভাণ, বুঝতে তার ভুল হয় নি। ভাণ! কে বলে ভাণ! স্বরকণ্ঠ বুকে হাত রেখে বলতে পারেন তাঁর আচরণে কোথাও কৃত্রিমতা নেই, ছলনা তিনি জানেন না।

অথচ, অথচ ফুলেশ্বরী তাঁকে পুরুষমানুষ বলে স্বীকার করে নি, কাঠ পাথর মনে করে। তাই কি এমন অবহেলে তাঁর কাছে এসে দাঁড়াতে পারল? মনে এতটুকু 'কিন্তু' হল না? সবাই প্রতিপত্তি, বাইরের দাপট, গরগরম মেজাজকে মান্য দেয়। স্বরকণ্ঠের ইচ্ছে হতে লাগল হঠাৎ তিনি অন্য পাঁচজনের পথে চলে বিরাট প্রতিপত্তি বাড়িয়ে ফেলেন, যা দেখে সবাই সমীহ করে।

এমন দুঃসময়েও স্বরকণ্ঠ একলা নন, সঙ্গে সঙ্গী পাগল আছে। 'দেখ্ পাগল, মানুষ বড় এঁটো জাত, কড়ি বিনে অন্য কথা বোঝে না।'

'যা বল।' পাগল ভয়ে সন্ত্রস্ত পিসীমার কাজ না হতেই তাকে কোথায় নিয়ে চললেন স্বরকণ্ঠ, সন্ধ্যে হতেই ছায়াছায়া সবগুলো জিনিস দেখে গা ছমছম করে, ইচ্ছে করে পরলোকের বিষনজর ডেকে আনা এর নাম। ইহলোকেরই বা কি সুবিধে হচ্ছে কে জানে।

'কোন চুলোয় যাচ্ছি আমরা কে জানে। শুনছ বেটারা নবাবকে পর্যন্ত খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।'

স্বরকণ্ঠ নিজের ভাবে আছেন। আরক্ত চোখে ঈষৎ হেসে বললেন, 'দেখ পাগল, টাকা কত্তে পারলে সবাই বশে থাকে। আমিও করব।'

'কি করবে?'

'টাকা।' স্বরকণ্ঠ চিন্তাশক্তিহীন বালকের মত জেদভরে বলেন।

'হাঃ।' পাগল অবিশ্বাসে চায়, 'মানুষ ঘটি বাটি ধরে রাখতে পারছে না দেখছ। কাতারে কাতারে লোক পালাচ্ছে দেখছ না? এ-সময়ে বুঝলে, এ-সময়ে মানুষ অবস্থা গুছোতে পারে না।'

'তুই কুয়োর ব্যাঙ, তুই কি বুঝবি?'

'তুমি বোঝ?'

'বুঝি না? খুব বুঝি। এখন কতদিন ধরে দেশে হইতাণ্ডব হবে, আকাশ কাক চিলে কালো হয়ে থাকবে। তবু, বুঝলি পাগল, এর মধ্যেও যে জানে সে ঠিক গুছিয়ে নেয়।' স্বরকণ্ঠ একটু আস্ফালনের হাসি হাসলেন।

'এ-কথাটা একটু খোলসা করে বলতে হবে ঠাকুর, অধমকে বুঝিয়ে

দিতে হবে।' করজোড়ে বিগলিত বিনয়ে এক গেরুয়াধারী বলে। এ-জাতে ছোট, ধর্মঠাকুরের পূজোরী, এখন তারা ক'জন সুরকণ্ঠের সঙ্গে যায়।

সুরকণ্ঠ ঠাওর করে দেখলেন ঐ দূরে নেগোর খাল দেখা যায়। ঐ খাল পেরোতে হবে রাতে রাতে। সামনের দিকে চোখ রেখে তিনি জবাব দিলেন, 'বুঝে দেখ না, সব অবস্থাতেই কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ। এই যে এতবড় কুরুক্ষেত্রটা হয়ে যায়, তা শ্মশান হয়ে গেল সব, অতঅত রাজা-গজাকে পোড়ালে, ঘরে ঘরে হাহাকার--- ।'

'ঘরে ঘরে হাহাকার।' গেরুয়াধারী পুনরুক্তি করে।

'তবু লাভবান কি কম লোক হল?'

সুরকণ্ঠ আঙুলের কর গুণে গুণে বলতে থাকেন, 'শ্যাল শকুনের পোয়াবারো, তারা মড়া ছিঁড়ে খেল। লাভ হল তস্করের আর শ্মশানের ডোমের, তারা সোনাদানা পেল কত। আর দেখ পরামাণিক আর পুরুত, এদের ভাত মারে কে। আর যারা কাঠ জোগালে, চুলী ঢোলবাদ্যি বাজালে, যারা ফুল, ঘি, কড়ি জোগান দিলে তাদের কি লাভ হয় নি বলতে চাও?'

এখন সুরকণ্ঠ গলা তুলে জোরে জোরে হাসেন। আড়চোখে দেখে নিয়েছেন বেশ ক'টি যুগী সন্ন্যেসী তাঁর সঙ্গী হয়েছে। মানুষের ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখতে পেলে সুরকণ্ঠের বুক দশ হাত হয়। মানুষের জয়ধ্বনি তাঁর মাথায় নেশা ধরায়, তিনি বলেন, 'এখন মস্ত ব্যাপার হবে, দেশের বুকে শিব নাচবে, সবে ত' কলির সন্ধ্যে। এতবড় ব্যাপার হবে, যে গোছাবার, সে গোছাবে না? তুই দেখিস পাগল, আমি ঠিক সন্ধান করে নেব।'

সুরকণ্ঠ প্রফুল্লচিত্তে যান। তাঁর কাঁধ থেকে একটি বৃহৎ শেকড়ের জটা মাটিতে লোটে।

'বাবা গো! অধমতারণ। শিব যেন সর্প কাঁধে যাচ্ছে।'

সহসা গেরুয়াধারী মাটিতে লুটিয়ে প্রণাম করে।

'এ কি, এমন অশৌচে ছোঁয় না।' সুরকণ্ঠের এ-কথা মুখে থাকে। ভক্তি বড় সংক্রামক জিনিস। তাঁর সেখোরা এতক্ষণ ভয়ে সিঁটিয়ে পথ হাঁটছিল। এখন তারা সবাই মাটিতে লুটোয়, সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে। সুরকণ্ঠের পায়ের ধুলো নেবার জন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে। এ-দৃশ্য দেখে সহসা পাগলও কাঁধের পোঁটলা নামায়, মাটিতে মাথা রাখে।

সুরকণ্ঠ অভিভূত। পাগল এখন ফিঁচফিঁচ করে কাঁদে, 'এরা তোমায় দু'দণ্ড দেখে চিনে নিল। আমি এমন অন্ধ গো, কাছে থাকি তবু চিনতে পারি না।'

সুরকণ্ঠকে প্রণাম করে, ভক্তিতে গড়াগড়ি দিয়ে এতক্ষণে দলের মধ্যে নতুন উৎসাহ সঞ্চারিত হয়।

'চল হে, বাবার সঙ্গে চল, ভয় নেই কোন, বাবার সঙ্গে যাই।' গেরুয়াধারী উচ্চকণ্ঠে বলে। এখন, মহানন্দে সুরকণ্ঠ গান ধরেন—

'জটার বাঁধনে বেঁধেছ জাহ্নবী হে চন্দ্রচূড়।'

সন্ধ্যার প্রান্তরে সুরকণ্ঠের গান দূরে দূরে যায়। নেগোর খাল কাছে আসে। বাঁশের মাচা, এ-মাচায় পাটনী বা করে। ডিঙি নৌকো ঘাটে বাঁধা, এখন মাঝি নেই, শূন্য নৌকো জলের ওপর দোলে। ঘাটে মানুষের ভিড়। জটলা, 'আধক্রোশ পুবে যেয়ে হেঁটে পারাও গো।' কে ডেকে বলে।

এখন সবাই পুবদিকে যায়। ভীত, সন্ত্রস্ত মানুষের জটলায় নানারকম বাক-বিতণ্ডা। কয়েকটি মেয়ে উঁচু গলায় কথা বলে।

'ও গো, আমরা বেগুন বেচব, বেগুন সাজাবার নিয়ম আছে, একচাল নরেশ বেগুন, একচাল পোক বেগুন দেবে, ঠাকুররা বেগুন কেনে, তারা কি আমাদের রীতি জানবে?'

'ও লো, আমার মেয়ে জেয়াদা হাবা, বলে কড়ি নেব মা, পোক বেগুন দেব কেমন করে?'

'ও লো ওইটি আমাদের ধর্ম, ঐ ধর্মে বেসাত করি, পোক বেগুন বেচতে দোষ নেই।'

'ঠাকুরকর্তা বলেন, এ-হাঙ্গামায় তো বেটিদের পোয়াবারো। তোদের অন্ন কেও মারবে না। অন্ন বিনে মানুষ হাহাকার করবে, তখন তো বেটিদের সস্তাপাতি সোনার দরে বিকোবে।'

'ও লো, ঠাকুরকর্তার কথা অমনি। সোনার দরে বেগুন বিকোবে যেদিন সেদিন আমরা, বাউরী মেয়েরা পালঙ্কে শুয়ে গড়াগড়ি দেব।'

'পালঙ্কে শুয়ে গড়াগড়ি দেব! আ রে মাগী, এখন বাঘের ভয়ে পালাস, তখন যোগ এসে ধরবে।' একজন খিঁচিয়ে ওঠে।

এ-কথা শুনে সুরকণ্ঠ উচ্চস্বরে হাসেন। বলেন, 'কি হে গেরুয়াধারী, বলি নি তোমায়? ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে। দেশজুড়ে লঙ্কাকাণ্ড, ইদিকে বেগুন বেচে কারা হাল-বলদ কেনে দেখ। সব অবস্থায় বুঝলে, যার চোখ আছে, সে গুছিয়ে নিতে পারে।'

তাঁর হাসিটা কেমন যেন, ফেনিল এবং গাঁজিয়ে ওঠা।

'প্রভু অন্তর্যামী।' গেরুয়াধারী সকাতরে বলে। এখন সে সুরকণ্ঠের বলে বলীয়ান হয়ে কাঁধের গামছা শূন্যে ঘোরায়। আস্ফালন করে বলে, 'তোমরা নির্ভয়ে চল গো, শিব আমাদের সঙ্গে যান।'

উৎসাহে সবাই জয়ধ্বনি দেয়। নালাতে পা দেবার আগেই সুরকণ্ঠকে সবাই কাঁধে তুলে নেয়। হৈ-হৈ করে সবাই বর্ধমানের দিকে যায়। 'যেখানে নবাব, সেখানে আশ্রয়। তা ছাড়া, এ-সব লোকের ধারণা, গ্রামে যেমন বিপদ, শহরে তেমন বিপদ নেই। সেখানে মাথাওয়ালা মানুষের বাস, তারা বুদ্ধি রাখে।

বর্গী যখন বর্ধমান শহর বেড়াজালে ঘিরেছে, তখন তারা [illegible]নের দিকে যায়। (ক্রমশ:)

ক্যাসুরিনা

বিকাশ বসু

চলে এসো ক্যাসুরিনা।

চিত্র এখানে এসে শর্বরীর নতুন নাম দিয়েছে ক্যাসুরিনা। একবার সে শর্বরীদের পরিবারের সঙ্গে রাঁচী গিয়েছিল। সেবার ওর নাম দিয়েছিল মুংরি। সেবারের নামটা ওর পছন্দ হয় নি। ও-নামে ডাকলেই রেগে যেত। এবারের নামটা বোধ হয় ওর পছন্দ হয়েছে। এবারে দীঘায় ওরা দুজনে একলা এসেছে।

ঢেউয়ের দোলায় শর্বরী দুলতে ভয় পাচ্ছে দেখে চিত্র হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, চলে এসো ক্যাসুরিনা।

শর্বরী তখনো শাড়ি ভেজায় নি। দু'হাত দিয়ে আলতো করে তুলে ধরে রেখেছিল। শুধু ভেঙে-পড়া ঢেউয়ের প্রবল আবেগের ভগ্নাবশেষটুকু তার পা ছুঁয়ে যাচ্ছিল। মনকে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। কেন না, সমুদ্র দেখেই তার এক ধরণের আনন্দ হয়েছিল। তবু সে বলল, না যাবো না। এখানে নুলিয়া নেই।

—আই এ্যাম্ দি নুলিয়া। চলে এসো ক্যাসুরিনা। চিত্র শর্বরীর দিকে আহ্বানের মত দু'হাত বাড়িয়ে দিল।

সমুদ্র যেমন করে বসুন্ধরার ঠিক হৃদয়ের মাঝখানটাতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, তেমনিভাবে তারও চিত্রর বুকের ওপর ভেঙে-পড়া উচিত ছিল বোধ হয়, অন্তত হাত ধরে একই ঢেউয়ের দোলায় দোলা, তাও সে পারল না।

চিত্র বলল, ওদের দেখে শেখো।

—ওদের দেখে শিখবে রেড-ইণ্ডিয়ানরা, ইণ্ডিয়ানরা নয়। শর্বরী হাঁটু-পর্যন্ত তোলা কাপড়টা ফেলে দিল। নিজেও একহাঁটু জলে বসে পড়ে পা ডোবালো।

—কেন, ওদের উড়োজাহাজ নিতে পারো, আর ওদের একসঙ্গে সমুদ্র-স্নান নিতে পারো না? চিত্র একাই আরো গভীর সমুদ্রের দিকে এগোল।

চিত্র মনের মধ্যে কাকের ডাক শুনতে পেল। সে যে ডানা ঝাপ্ টাতে ঝাপ্টাতে বলে চলে গেল, একা এসেছে, একা এসেছে। চিত্র ফিকে হাসল। আনন্দের চূড়োয় সব মানুষই বোধ হয় সঙ্গীহীন। শর্বরী তো তার হাত ধরে অনেক দূরে এসেছে, আর পারল না। ওকি ভয় পেল? ঠিক ভয় নয় বোধ হয়, অনভ্যাস। হাজার বছরের অনভ্যাস। নইলে ওই বিদেশিনীকে দেখ। কেমন ভেঙে-পড়া ঢেউয়ে ও নিজেই আনন্দে ভেঙে পড়ছে। ওর স্ফটিকস্তম্ভের মত উরু অনাবৃত। উল্লাসের মুহূর্তে ওর ধাহমূলের খয়েরী চুল পর্যন্ত দেখা যায়। ওদের দেখলেই বোঝা যায়, ওরা আদিম মানব-মানবীর কেউ। স্বর্গচ্যুত হয়ে এখানেই স্বর্গ বানিয়ে নিয়েছে। যেখানে যায় সেখানেই বানায়। বিদেশিনী মেয়েটা এগিয়ে গিয়ে ওর পুরুষ-সঙ্গীর হাত ধরল।

ওরা চিত্রদের পাশের বাংলোটাতে উঠেছে। একটাতে নয়, দুটোতে। প্রথমে ব্যাপারটা জেনে ওরা খুবই অবাক হয়েছিল। চৌকিদার আকবর আলি জানাল, একটাতে শোয় সাহেব, আরেকটাতে মেম। দিনের বেলায় সাহেব আসে মেমের বাংলোয়।

চিত্ররা আকবর আলিকে অনেক জপিয়ে-তাপিয়ে যে বাংলোটা আদায় করেছে, তাতে দুটো ঘর। প্রত্যেকটা ঘরে দুটো করে বিছানা পাতা। রাত্রে শোবার সময় চিত্র বলল, এ-ঘরে এসো।

শর্বরী বলল, না। ওদের দেখে শেখো। চিত্র জানলার পর্দা সরিয়ে দেখল, সাহেবদের দুটো বাংলোতেই আলো জ্বলছে।

তবু শর্বরীর মুখে কথাটা বড় অদ্ভুত শোনাল। কেন না, তার মাথায় সিঁদুর। ঠিক সিঁদুর নয়, লিপস্টিকটাই আজ সকালে খুব করে মাথায় ঘষেছে।

কাল রাত্রে খড়গপুর থেকে বাসে করে যখন আসছিল (অনেক সময়ই শর্বরী চিত্রর বুকে মাথা রেখে ঢুলেছে) তখন অনেক জোড়া সকৌতূহল দৃষ্টি ওদের ওপর পড়েছে। একদল অল্পবয়সী ছেলে তো দৃষ্টির জিভ বাড়িয়ে ওদের রীতিমত চেটেছে। ওরা সবাই আশে-পাশের বাড়িতে উঠেছে। কেউ কাফেটেরিয়ায়, কেউ ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের বাংলোয়, কেউ বা সারদা বোর্ডিং-হাউসে। এই একফোঁটা জায়গায় ওদের সঙ্গে চলতে-ফিরতে দেখা হবে। ওদের কৌতূহল আর বাড়তে দেওয়া ঠিক নয়।

সকালে উঠে শর্বরী তার বাঁকা সিঁথিতে লিপস্টিক ঘষতে যাচ্ছিল। চিত্র বলল, ও কি, ও কি।

শর্বরী চিত্রর দিকে পিছন ফিরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। আয়নার মধ্যে দিয়ে অবশ্য চিত্রর দেহের গোটাটাই দেখা যাচ্ছিল। ওর মুখের ভ্যাবাচাকা দৃষ্টি উপভোগ্য। শর্বরী আয়নার ভেতরকার চিত্রকে হাসি-হাসি মুখ করে বলল, আত্মরক্ষার উপায়।

—দাও, আমি পরিয়ে দিচ্ছি। চিত্র বিছানায় লাফিয়ে উঠে বসল। আজ না হোক, একদিন তো সে-ই পরাবে।

শর্বরী বলল, ধীরে, বন্ধু ধীরে।

চিত্রর ভোরের রোদ-লাগা সরোবরের মত উজ্জ্বল মুখে গ্রীষ্মের মেঘ এক-টুকরো ছায়া ফেলেই মিলিয়ে গেল। ওর মনের আকাশে মেঘ জমে না, সব সময় সেখানে শারদীয় হাল্কা হাসির মেলা।

কিন্তু শর্বরীকে বোধ হয় দোষ দেওয়া যায় না। কথাটা ও নিজেই বেশি করে শুনিয়ে থাকবে। কেন না, হাওড়া স্টেশনেই এক সময় দীঘার ঝাউ-বনের একরাশ স্বপ্নের ফাঁকে উঁকি দিয়ে গিয়েছিল একচিলতে আশংকা। আজ এই মুহূর্তে বোধ হয় শর্বরীর বুকে সেই আশংকার ঢেউ প্রবল হয়ে লাগল। সে একবার তার মামারবাড়ি বেড়াতে গিয়ে চাঁপায় পুকুরে এককোমর জলে গা ডুবিয়ে ভয়ে ভয়ে যেভাবে স্নান করেছিল, সেইভাবে সমুদ্রস্নান সেরে উঠে পড়ল।

শর্বরীর কাণ্ড দেখে চিত্র ঢেউ ভেঙে কাছে এল, বলল, এরই মধ্যে উঠে পড়লে যে বড়? হোয়াট ইজ দি বিকজ অফ ইট?

শর্বরী বলল, আজ থাক। কাল।

চিত্র বলল, ও-ক্-এ। কাল কিন্তু ওদের ধরে ফেলতে হবে। সাহেবরা আমাদের থেকে এগিয়ে থাকবে, এ আমার কিছুতেই বরদাস্ত হয় না।

সাহেবরা অনেক এগিয়ে। একবারে আবেগের চূড়োয়। ঢেউ যেখানে সবচেয়ে উঁচু, সবচেয়ে উদ্দাম, বেছে বেছে ওরা সেদিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি ডুবছে, উঠছে। জীবনের দোলায় ওরা এইভাবে দোলে। দূর থেকে দেখলেও ওদের চেনা যায়। মসৃণ সিল্কের মত গায়ের রঙ। সাহেবের পরনে লাল জাঙিয়া, মেমের গায়ে ঘন নীল রঙের সাঁতারের পোষাক, দেহের সঙ্গে একেবারে লেপ্টে লেগে আছে।

শর্বরী জলে-ভেজা শাড়িটা লট্‌পট্ করতে করতে চালাও মাঠের মত বীচটা কোনরকমে পার হল। ঝাউবনের ভেতর দিয়ে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে বাসায় গেল। ওদের বাসাটা ঝাউবনের ঠিক পেছনে।

কলের জলে দ্বিতীয়বার স্নান করবার সময় শর্বরীর মনে হল, আনন্দযজ্ঞে আমন্ত্রণলিপির মত দুটি হাত আজ বাড়িয়ে দিয়েছিল চিত্র, কিন্তু সে নিজে মনের হাত গুটিয়ে বসে রইল। মন যে সায় দিচ্ছে না। ওই হাত কি বিশ্বাসযোগ্য? আজ সকালেই কি শর্বরী একটা বড় রকমের ধাক্কা খায় নি।

চিত্র-চরিত্রে যে মোটা দাগের অ

সে জানত। সেই জানার বোধ হয় অনেক স্তরভেদ আছে। চিত্র তাদের বাড়িতে কতবার এসেছে। তার ধুলোমাখা খালি পা, তার প্যান্টের ওপর ঝুলিয়ে শার্ট পরা, তার গ্রাম্যতা শর্বরীকে পীড়িত করে নি, আনন্দ দিয়েছে। তারা যখন জানলার পর্দা একরঙা অথবা রঙীন কি হওয়া উচিৎ, এই নিয়ে তর্কে মেতেছে, তখন চিত্র দুম করে বলেছে, জানলায় পর্দা দেওয়া সে একদম পছন্দ করে না। সকলে বলেছে, কেন কেন? সে বলেছে, আলো-হাওয়া আসার জন্যেই তো জানলা, দরজা।

শর্বরীর ভীষণ ভালো লাগত, এই গ্রাম্যতার ভেতর কোথায় যেন একটা জোর আছে। কিন্তু সে বোধ হয় এতদিন চাঁদের একপিঠই দেখে এসেছে। কয়েক বছরের মেলামেশায় যা জেনেছে, তার অনেক বেশি জানা হয়ে গেল এই কয়েক ঘণ্টায়। আশ্চর্য। মুখোমুখি না বসলে মানুষ মানুষকে বোধ হয় ঠিকমত জানতে পারে না।

ট্রেনের কামরায় মুখোমুখি বসে চিত্র সিগারেটের প্যাকেট থেকে বিড়ি বের করে ধরিয়েছিল। একটু লজ্জা করল না ওর।

ঘৃণা, বিস্ময় ও বিরক্তির একটা দলা তাল পাকিয়ে উঠেছিল শর্বরীর বুকের মধ্যে। চিত্র তার বিস্ময়কে অনুসরণ করে হেসে বলেছিল, এটা মাসের কোন উইক চলছে।

—কেন, লাস্ট উইক।

—লাস্ট উইকে আমি বিড়ি খাই। ফার্স্ট উইকে ক্যাপস্ট্যান দিয়ে শুরু করি, তারপর নামতে নামতে—

শর্বরী অনেক নামতে পারে, তাই বলে বিড়িতে। নিম্নবিত্তের দুঃখ-বিলাসী রোমান্স একটুও ভালো লাগে না তার। সে বিড়ির ধোঁয়া হাত দিয়ে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করল। তাতে অবশ্য চিত্রর কিছুই যায় আসে নি। তার দাড়ি থেকে বের হয়ে আসা গজদাঁতটা তখনো হাসছিল।

তারপর তনুমাসীর ব্যাপারটা। ভুলতে চায়, ভুলতে চায় শর্বরী। তবু সমুদ্রের ঢেউয়ের মতই ঘটনার ঢেউ-গুলো অনিবার্যভাবে ধাক্কা দেয়। শাওয়ারের তলায় মাথা পেতে দিয়ে শর্বরী ভাবল, আর ভাববে না এসব কথা। তথাপি চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে আবার মনে এল তনুমাসীর ব্যাপারটা।

আসবার সময় চিত্র শর্বরীকে বুঝিয়েছিল, 'তিলাঞ্জলি' নামের বাড়িটা ওর তনুমাসীর। তনুমাসীরা ওখানে থাকেন না, বাড়িটা খালি পড়ে থাকে এবং সে সব বন্দোবস্ত করে এসেছে। অতএব থাকবার কোন অসুবিধাই হবে না।

হোস্টেল থেকে বেরোবার সময় মনটাকে একটা হাল্কা খুশিতে সিফন শাড়ির মত জড়িয়ে নিয়েছিল। নিজেকে কেমন যেন উপন্যাসের নায়িকা-নায়িকা মনে হচ্ছিল শর্বরীর। হুইলারের স্টল থেকে সাপ্তাহিক কেনা। বাড়ি ফেরার পথে এই একই স্টলে দাঁড়িয়ে এর আগেও তো কত পত্র-পত্রিকা কিনেছে, কিন্তু ঠিক এইভাবে জাগে নি। চিত্র অবশ্য মতটা নষ্ট করে দিয়ে বলেছিল, বই-ই যদি পড়বে, তা হলে বেড়াতে বেরোনো কেন।

কিন্তু খুশির জোর ছিল, খুশির হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে চলে এসেছে এতখানি পথ। হাওড়া থেকে খড়্গপুর, খড়্গপুর থেকে দীঘা, কেমন যেন একটা নেশা-নেশা ভাব। সে তো চিত্রর বুকের ওপর মাথা রেখে ঢুলেছে। ওরা যেন বিদেশী আগন্তুক, এমনি করে দেখেছে ওদের লোকে। শর্বরীর ওপরে যখন নেমে আসতে চেয়েছে চিত্রর মাথা, তখন শর্বরী কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে বলেছে, এ্যাই।

চিত্রর হাতে চামড়ার স্যুটকেশটা, শর্বরীর হাতে প্ল্যাস্টিকের বালতি ব্যাগ। ওরা বে-কাফে থেকে সারদা বোর্ডিং হাউস, আবার সারদা বোর্ডিং থেকে বে-কাফে এই করছিল। 'তিলাঞ্জলি' নামের বাড়িটা তখন ঝাউগাছের আড়ালে চুপটি করে বসেছিল। সবাই নতুন, কেউ কোন খবর দিতে পারে না। শর্বরীর কিন্তু বেশ মজা-মজা লাগছিল। রবীন্দ্রনাথের—

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ
প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর
বেজওয়াডা - শ্রীনগর - গৌহাটী

শপথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি।
আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী।

ইত্যাদি লাইনগুলো মনের মধ্যে বাজছিল। চিত্রর মনেও কি বাজছিল? ও কি পড়েছে রবীন্দ্রনাথের কবিতা? না পড়লেও কিছু আসে যায় না। শর্বরী দেখেছিল চিত্রর চোখে-মুখে ভাবের ঘোর। শর্বরী নিজের মুখ দেখতে পাচ্ছিল না, ওর নিজের মুখেও ছিল সেই একই ভাবের ঘোর।

অঘোর-কামিনী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ও-দিকটায় বালিয়াড়ির ওপর ঝাউবনে ঘেরা বাড়িটা আবিষ্কার করা গিয়েছিল। তবে চিত্রর তনুমাসীর সঙ্গে সে বাড়ির কোন সম্পর্ক নেই। অন্তত সে বাড়ির পাহারাদার ও-নামের কাউকে চেনে না। বাড়িটা খালিও নয়, একটা গোটা পরিবার ভাড়া নিয়ে বাস করছে সেখানে।

শর্বরী অবাক হয়ে চিত্রর মুখের দিকে তাকাল। চিত্রা তার গজদাঁতটা বের করে বলল, হোয়াট্ ইজ্ দি বিকজ অফ্ ইট? তনুমাসী আমাকে বললেন, বাড়িটা খালি পড়ে আছে।

শর্বরী রাগ চেপে রসিকতা করেছিল, তোমার তনুমাসী আছেন তো?

চিত্র বলল, ভেবে দেখি নি তো। তার গজদাঁতটা বের হয়ে হাসতে লাগল।

চিত্রর কথা, তার হাসি, গজদাঁতটা সকলে মিলে একসঙ্গে আলপিন হয়ে শর্বরীর খুশির ফানুসটাকে ফুটো করে একেবারে চুপসে দিল। এই মানুষের সঙ্গে সে হোস্টেল থেকে বাড়ি যাবার নাম করে চলে এসেছে। বাড়িতে জানে হোস্টেলে আছে, হোস্টেল-সুপার জানেন বাড়িতে গিয়েছে। বাড়ির নিরাপদ বন্দরটা ফেলে সে এ কোথায় ভেসে বেড়াচ্ছে।

তবু ভাগ্য ভালো যে আকবর আলি ছিল। অনেক তোষামোদ করে পেয়েছে এই ডেভেলপ্‌মেন্ট বুকের বাংলোখানা। নইলে কাফেটেরিয়ায় ঘর খালি ছিল না। একখানা ঘর পেলেই বা কি সুবিধেটা হত। সে তো আরো মুস্কিল। সারারাত জেগে কাটানো। ভগবানই বাঁচিয়ে দিয়েছেন বলতে হবে। টু-রুম বাংলো, বাথরুম, রান্নাঘর। আজকে অবশ্য রান্নাবান্নার পাট নেই। কাফেটেরিয়ায় খাবার বন্দোবস্ত হয়েছে।

কোন তাড়া নেই। ওরা ভোরের হাওয়া একবার গায়ে মেখে এসেছে। সমুদ্রটা যেন একটা শাড়ি, বিস্কুট রঙের বীচটা একটা সুদীর্ঘ পাড়ের মত পড়ে আছে। নীল শাড়ি। না, ঠিক নীল নয়, সে পুরীর সমুদ্র। এখানে সমুদ্র ঘোলা, প্রথম যৌবনে লেখা রচনার মত, ঘোলা কিন্তু উদার। সমুদ্রটা বাংলো থেকে এতো কাছে। বাংলো পেরোলেই ক্যাসুরিনা ফরেস্ট, ঝাউবন পেরোলেই সমুদ্র। অথচ কোন শব্দ আসছে না। ঝাউবনটা সমস্ত শব্দ যেন ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিচ্ছে। বাংলোটা অদ্ভুত নির্জন লাগছে। হাতে কোন কাজ নেই। সংসারের সব ভার কাফেটেরিয়ার হাতে। বাংলোটা অদ্ভুত নির্জন। এ সময় কত রোমান্স জাগে, অথচ কিছুই জাগছে না।

শর্বরী বিছানায় পড়ে থাকল কিছুক্ষণ, দেওয়ালের গায়ে চোখ বোলাল. না, কোন ছবি নেই। থাকা সম্ভব নয়, ওর মনে পড়ে গেল, এটা বাসা নয়, বাংলো। পর্দা সরিয়ে রোদ ভেতরে আসতে চাইছে, সঙ্কোচে পারছে না। হাওড়া স্টেশন থেকে কেনা বাংলা সাপ্তাহিকটা টেনে নিল শর্বরী, বানানো গল্পের জগতে যদি ডুব দেওয়া যায়।

পুঁথি পড়া চিত্রর ধাতে সয় না। সে সাপ্তাহিকটা ছোঁ মেরে কেড়ে নিল।

—এই কি হচ্ছে কি? বলল শর্বরী।

—ওঠ, ওঠ, খাওয়া-দাওয়া মিলবে সেই সাড়ে এগারোটায়। আপাতত তোমাকে কিছু হাওয়া খাইয়ে নিয়ে আসি। চিত্র সস্তা রসিকতা করল। শর্বরীর হাত ধরে টেনে তুলল।

শর্বরী বলল, আঃ হাত ছাড় না।

ওরা সারদা বোর্ডিংহাউস ফেলে ক্যাসুরিনা ফরেস্টের গা বেয়ে বালিয়াড়ির দিকে এগোল। আলস্য-মন্থর পদক্ষেপ, চেহারায় চলায় আভিজাত্য শর্বরীর। কেমন যেন একটা ব্যবধান তৈরি করে চলেছে। চিত্রর ভালো লাগে না। সে ওর মধ্যে সেই 'ছড়ে' মেয়েটাকে দেখতে চায়। কিন্তু সেই প্রমোদপ্রিয় মেয়েটা যেন একটু একটু করে ঘুমিয়ে পড়ছে। চিত্র ওকে জাগাতে চায়, পথের ধার থেকে বনফুল ছিঁড়ে ওর খোঁপায় পরিয়ে দেয়, কিন্তু শর্বরীর কি হয়েছে।

চিত্র বলল, এসো তোমার বোটানির বিদ্যের পরীক্ষা নিই। ওগুলো কী গাছ বলতো?

—ক্যাকটাস। শর্বরী এতক্ষণ পরে একটা কথা বলল।

—রাইট্। চিত্র বলল। ওর 'রাইট্' বলার ধরণ দেখে শর্বরী হাসল।

—আর কোথায় দেখেছ বলতো। চিত্র আবার প্রশ্ন করল।

—ডায়মণ্ডহারবারে। শর্বরী বলল।

—গুড্। চিত্র বলল।

শর্বরী আবার হাসল। ওর মনের বিষণ্ণতাটাও বুঝি একটু একটু করে ফিকে হয়ে আসছিল। চিত্রর আর কিছু না থাক চোখ আছে। ওর চোখে না দেখতে পারলে কিছুই দেখা হয় না।

চিত্র বলল, দেখ দেখ, এইদিকে দেখ।

পাহাড়ের চেয়ে বালিয়াড়িগুলো আরো ভালো লাগে। এরা মৃদু-কোমল, সমুদ্রের ঢেউয়ের মত উঠেছে পড়েছে। চিত্র বলল, জানো এইখানে থেকে 'ইতিকথা'র ছবি তুলেছে।

শর্বরী বলল, আচ্ছা, এই পথটাই চলে গেছে উড়িষ্যার চন্দনেশ্বর অবধি?

চিত্র বলল, রামায়ণ-মহাভারতের দেশেও যেতে পারে।

শর্বরী বলল, চমৎকার, না?

চিত্র বলল, হ্যাঁ, এইখানে জমি কিনব। কেমন?

শর্বরী বলল, এই নিয়ে কত জায়গায় জমি কেনা হল?

চিত্র বলল, আহা ভাবতে ক্ষতি কি।

শর্বরী আর একবার ভাবল, কোন মানুষের হাত ধরে সে চলে এসেছে এতদূরে।

ওরা অনেক দূরে এসে পড়েছে। কাল একা একা ঘুরতে ঘুরতে যে আশ্চর্য জায়গাটা আবিষ্কার করেছে চিত্র, সেইখানে টেনে এনেছে শর্বরীকে।

ঝাউবনের ভেতরে কালো কালো জেলে নৌকো তোলা রয়েছে। কবে থেকে তোলা রয়েছে কে জানে। কত হাজার বছর ধরে। আগে বোধ হয় এখানে জল আসত। আঁকা-বাঁকা খাঁড়ির মত জায়গা। একদিন এখানে সমুদ্রের জল খেলা করত। এপাশ থেকে দেখলে সমুদ্রের মুখ দেখা যায়, ওপাশ থেকে দেখা যায় না। ঝাউবন মৃদু-কোমল ছায়া ফেলেছে। ঘরে ঢুকে কে যেন দরজা বন্ধ করে দিল। জায়গাটা অশ্লীল।

কাঠকয়লার মত কালো নৌকোর পিঠে ঠেস দিয়ে বসেছিল শর্বরী। এখান থেকে সমুদ্র দেখা যায় না। শুধু শব্দ শোনা যায়। তাও কানে লাগে না, দু'দিনেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

চিত্র এসে ওর পাশে বসল। একটা মৃদু-কোমল ভিজে ছায়া ওদের ঘিরে ধরেছে। চিত্র শর্বরীর কোলে মাথা দিল। শর্বরী বাধা দিল না। আলস্য ওকে পেয়ে বসেছে। ও এখন এখানে বছরের পর বছর বসে থাকতে পারে। মোহময় নীল নির্জন প্রাণী-খেকো গাছের মত ওকে আস্তে আস্তে গিলছিল। চিত্র ওর কোলে মাথা রেখেই দুই হাত দিয়ে ওর গলা জড়িয়ে ধরল। আস্তে আস্তে আল্‌গা হয়ে আসছিল শর্বরীর চেতনার মুঠি। এরোপ্লেনটা উড়ে গেল, একেবারে ঝাউবনের মাথা ঘেঁষে। শর্বরী নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। চিত্র ধড়মড় করে উঠে বসেছে। প্লেনটা ওদের পরিচিত বীচের ওপর থাকে, ওরা দেখেছে।

শর্বরীও উঠে পড়ল, চলো ফেরা যাক।

নিজের ঘরে এসে বিছানায় ঝিম্ হয়ে শুয়েছিল। ও যেন হোস্টেলের খাটে শুয়ে আছে। রুমমেট চন্দনা নিজের খাট ছেড়ে উঠে এল। ওর পাশে শুয়ে ওর উরুতে মৃদু মোলায়েম চিমটি কাটল। ও যেন বলল, সব সময় ইয়ার্কি ভালো লাগে না চন্দনা।

চন্দনা এখন কি করছে। আজ কি বার? রোববার। তা হলে ও বাক্স-তোরঙ গুছোচ্ছে। ছুটির দিনে বাক্স-তোরঙ গুছোনো ওর স্বভাব, প্রত্যেক রোববারে ও বাক্স গুছোয়।

আজকে এমনি সময় ও তো সারেঙ্গাবাদের বাড়িতেও থাকতে পারত। সারেঙ্গাবাদের বাড়িতে থাকলে এমনি সময় ছোট ভাই পিকলু বলত, ও দিদি, বুকুট দিবি না, বুড়বুড়ু এসেছে। বুকুট হল বিস্কুট, বুড়বুড়ু ডাক্তারবাবুর বাইক, এই সময় উনি রোগী দেখে বাড়ি ফেরেন।

চিত্র এ ঘরে এল, বলল, আকাশ-পাতাল কিসব ভাবছ। ওঠ সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। এর পরে গেলে আর কিছু মিলবে না। হোস্টেলের মেয়েকে হোস্টেলে ফিরিয়ে দিলেই তো হল। বাব্বাঃ।

শর্বরী হেসে ফেলল, চলো।

—ওঠো।

—হাত ধরো।

খাওয়া-দাওয়ার পর চিত্র বিছানায় গড়িয়ে নিচ্ছিল। শর্বরী স্যুটকেশ খুলেছিল। চন্দনার মত প্রতি রোববার স্যুটকেশ গুছোনো ওর আসে না। ও শুধু কিছু জিনিস বের করবে। বাংলোটাকে বাসার মত করে সাজাবে। আলনা, ড্রেসিং টেবিল সবই তো রয়েছে। আজ বিকেলে কোন শাড়িটা পরবে এই চিন্তাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করল খানিক। লাল ভেলভেটের তক্‌লীটা নজরে পড়ল। তক্‌লীটা যতদূর মনে পড়ে, ছিল ও কোণে। এ-পাশে এল কি করে। সে কি নিজেই কোন সময় সরিয়ে থাকবে। উঁহুঁ। হতেই পারে না। তক্‌লী খুলে ও অবাক হয়ে গেল।

ও ঘরে চিত্র শুয়ে ছিল। শর্বরী এ-ঘর থেকেই চেঁচিয়ে বলল, আমার তক্‌লী খুলেছিলে?

চিত্র ঘুমোয় নি। তথাপি কোন জবাব দিল না।

—আমার তক্‌লী খুলেছিলে? শর্বরী আরো চেঁচিয়ে মেজাজী গলায় বলল।

—বদ্ এতদ্ তক্‌লীং তব তদ্ এতদ্ তক্‌লীং মম। জড়ানো এলানো সুরে বলল চিত্র। বেশ বোঝা গেল ও ও-পাশ ফিরে শুল।

শর্বরী ঘরে এসে বলল, ন্যাকামো রাখো। খুলেছিলে কি না বলো।

—নইলে কাফেটেরিয়ার বিল পে করলুম কি করে। চিত্র পেছন-ফেরা অবস্থায় ঘুম-ঘুম গলায় বলল।

—বাকিটা?

—বাকি দিনগুলো চলবে।

শর্বরী নিজের ঘরে চলে এল। আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল। মিথ্যে হলেও আর সহ্য হচ্ছে না। আঁচলের খুঁট দিয়ে ঘষে ঘষে সিঁথি থেকে লিপস্টিকের সমস্ত রঙ তুলে ফেলল। ওর হাতটা থর থর করে কাঁপছিল।

আবার নতুন করে বাক্স গুছোলো শর্বরী। নিজের টুকিটাকি যা জিনিস বের করেছিল সব বাক্সে পুরল। চিত্রর সব সম্পত্তি বের করে দিল। তারপর কোলের কাছে হাত দুটো জড়ো করে বিছানার ওপর চুপ করে বসে রইল।

ও ঘরে চিত্র ঘুমুচ্ছে। বিকেলের বাস ছাড়তে অনেক দেরি। সে কি একটা চিঠি লিখে রেখে যাবে।

প্রথমে লিখল :

চিত্র,

আমার এ পথ তোমার পথের থেকে অনেক দূরে গেছে বেঁকে। অতএব। চললুম।

শর্বরী।

না, কারো নয়। কাগজটা ছিঁড়ে দলা পাকিয়ে ফেলে দিল। সাদা কথার একটি চড় মেরে যাবে ওকে।

আবার লিখল :

চিত্র,

চললুম। পিছু নিও না। ফল অত্যন্ত খারাপ হবে।

শর্বরী।

চিঠিটা টেবিলের ওপর রেখে চিত্রর হাতঘড়িটা তার ওপর চাপা দিল। ওর ঘুম না ভাঙিয়ে আস্তে আস্তে দরজা টেনে দিল শর্বরী। শুধু স্যুটকেশটা হাতে করে বের হয়ে এল। স্যুটকেশ এখন হাল্কা, মনটাও হাল্কা, গুরুভার নেমে গেছে। সব সম্পর্ক ছিন্ন।

ঝাউবনের সঙ্গে একটা আবেগের সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেছে। ঝাউবনটা তাকে সমুদ্রের চেয়েও টানে। শর্বরী ঝাউবনে এসে বসল।

সাহেব মেমদের তখনো স্নান সারা হয় নি। ওরা চারটে ঝাউ-গাছকে খুঁটি করে কাপড় টাঙিয়ে কার্পেট বিছিয়েছে। ওরা একবার করে সমুদ্রে যাচ্ছে, সমুদ্রের সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটিয়ে আবার তাঁবুতে ফিরে আসছে। ওদের সমুদ্রের স্বাদ নেওয়া কি ফুরোবে না।

এ-পাশে একটা পিকনিক পার্টি এসেছে। ট্রানজিস্টার সেটটা বেজেই চলেছে। কেউ শুনছে বলে বোধ হয় না। বাচ্চাটা বীচে নেমে লাল কাঁকড়ার পেছনে ছুটছে। বাচ্চার দিদি ঝিনুক খুঁটছে। বাচ্চার মা এইমাত্র স্নান সেরে এল। এবার টিফিন-কেরিয়ারে আনা খাবার বাঁটবে।

ওদিকে একদল গ্রাম্যলোক এসেছে সমুদ্রস্নান করতে। ওরা প্রথমে সমুদ্রের জল মাথায় ঠেকাল, এখান থেকেই দেখতে পেল শর্বরী। ওরা স্নান না করেই ফিরে যাবে নাকি?

ওদের কাছ বরাবর চড়ুই পাখি-গুলো তির্ তির্ করে উড়ছে। এখান থেকে খুবই ছোট দেখাচ্ছে ওদের। সমুদ্রের ঢেউ একবার করে বীচটা ধুয়ে মুছে নিকিয়ে দিয়ে যাচ্ছে, আর ওরা নতুন করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। ওরা কি খুঁটে খাচ্ছে কে জানে।

সাহেব-মেম আবার জলে নেমে গেল। এই নিয়ে কতবার হল কে জানে।

শর্বরী এবার ঝাউবনের ভেতরের দিকে তাকাল। কেমন ভিজে ভিজে নরম, কিছুটা রহস্যময়। এই ঝাউ-বনকে সে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবে না। চিত্র তার নাম দিয়েছে ক্যাসুরিনা। তার সঙ্গে কি এই ঝাউবনের কিছু মিল আছে? কিছু না। দুম করে যাকে তাকে যা-তা একটা নাম দিয়ে দেওয়া ওর খেয়াল। ভেবে কাজ করা, ভেবে কথা বলা ওর চরিত্রে লেখে না।

শর্বরী আবার সামনের দিকে তাকাল। ঝাউবনের মধ্যে দিয়ে দূরের সমুদ্রকে সবুজ পাহাড়ের মত লাগে। সামনের অংশটা অবশ্য মাটি রঙের, ফেনায় ফেনায় কখনো সাদা, কখনো ঘোলাটে। সমুদ্র কি কোন কথা বলছে? সে কান পেতে শোনবার চেষ্টা করল। কিছু শোনা যায় না। সে তো কবি নয়। কবি হলে হয়তো সমুদ্র তার সঙ্গে কথা কইত। তবে বড় আনন্দ। এই আনন্দই বোধ হয় সমুদ্রের বাণী। সমুদ্রকে দেখলেই কেন আনন্দ হয়। ঝাউবনকে দেখলেও আনন্দ হয়।

—ক্যাসুরিনা, তুমি এখানে একা একা বসে? হোয়াট্ ইজ্ দি বিকজ অফ্ ইট? চিত্র শর্বরীর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

শর্বরী কোন জবাব দিল না, সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইল।

—একি! স্যুটকেশটাও এনেছ!

শর্বরী চিত্রর দিকে তাকাল। সে খুব ঘুমিয়েছে, তার চোখ-মুখ ফোলা ফোলা। শর্বরী ঝাউবনের দিকে তাকাল। কেমন নরম ভিজে ভিজে, ঠাণ্ডা, একটু যেন রহস্যময়। তার চোখ সজল হল। ঝাউতলাটা বড় অপরিষ্কার, হাজার বছরের পচা পাতা জমেছে। ডাবের মালা, ফেলে-দেওয়া খবরের কাগজ, শালপাতার ঠোঙা, সিগারেটের খালি প্যাকেট এখানে-ওখানে ছড়ানো। কত ময়লা, কুটিকাটি। কিন্তু কি সুন্দর।

শর্বরী আবার চিত্রর মুখের দিকে তাকাল।

চিত্র বলল, এ্যাই, কথা বলছ না যে বড়। হোয়াট্ ইজ্ দি বিকজ অফ্ ইট?

শর্বরী এবারেও কোন জবাব দিল না। প্রকৃতির গায়ে বোধ হয় ধুলো লাগে না। সে কুটিকাটি ভরা অপরিচ্ছন্ন ঝাউবনে গড়াগড়ি দিল, বারবার গড়াগড়ি দিল।

রোমাঞ্চ উপন্যাসের যাদুকর
দীনেন্দ্রকুমার রায়ের
গ্রন্থাবলী
১ম ভাগে—৫খানি সুবৃহৎ ডিটেকটিভ উপন্যাস মূল্য ৩॥০ টাকা
২য় ভাগে—৫খানি রহস্য উপন্যাস। মূল্য ৩॥০
জাতীয়-কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের
রঙ্গলাল-গ্রন্থাবলী
পদ্মিনী, সুরসুন্দরী, কর্মদেবী, কুমার-সম্ভব, নীতিকুসুমাঞ্জলি, কাঞ্চী-কাবেরী, কবির জীবনী। ৭খানি একত্রে ২'০০।
শ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন সম্পাদিত
নাড়ীজ্ঞান-প্রদীপিকা
(নাড়ী স্পর্শ দ্বারা রোগ নির্ণয় ও পরমায়ু নিরূপণ)
মূল্য এক টাকা
বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

● স্বর্গীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বাসভবন

॥ আদি-অধুনাকালের ভবানীপুর ॥

একদিকে নিবিড় অরণ্যের দুর্বিনয়, আরেকদিকে নম্রস্বভাবা নদী। তারই উপকণ্ঠে হলুদ রোদে চমকে ওঠা গ্রাম—সামনে যার লাঙলের সঙ্গে সংগমসুখী মাঠ কখনো সবুজ, কখনো সোনালি ওড়না হাওয়ায় ছড়িয়ে হাসে। গ্রামের কেউ চাষী, কেউ তাঁতী, এবং কেউ কুমোর। জাত-বেজাতের বালাই নেই তাদের। পেশা ভিন্ন হলেও, আশা তাদের সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে অভিন্ন। নেশা কেবল কাজের। কাজের গভীরে ডুব-সাঁতারের বিচিত্র ক্রীড়ার মধ্যেই তারা খুঁজে পায় শান্তি এবং আনন্দ, প্রেম এবং সম্প্রীতি—প্রভাব যাদের অদম্য; আবেদন যাদের সর্বজনীন। জীবনের প্রতি জীবনের সংযোগ এখানে অমাৎসর্যে অনিন্দ্য, সংসারের প্রতি সংসারের আত্মীয়তায় কোনো সন্দেহ নেই এখানে। এখানে আপদে-বিপদে এবং লগ্নকালের নির্মল উৎসবেও কোনো কৃত্রিমতা নেই একাত্মবোধের।

এ-গ্রামেই বসবাস করে হরিমোহন ডোম। জাতে ডোম হলেও, সে সর্বজাতের প্রিয়। কারণ সে একজন গুণীন। উত্তরের কোন্ দেশ থেকে সে শিখে এসেছে তন্ত্র-মন্ত্র। তাই দায়ে পড়লেই তার দ্বারস্থ হয় গাঁয়ের লোক। তারা ওষুধ নেয় অসুখের, মাদুলি নেয় বিপদের। বিশ্বাসের জোরেই হোক, অথবা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক, মাঝে মাঝে তারা ফলও পায় যথেষ্ট। একদিন সর্বসমক্ষে একজন মৃত ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে তোলার পর, হরিমোহনের অলৌকিক শক্তির প্রতি গ্রামবাসীদের সবিস্ময় বিশ্বাসের গভীরতা বৃদ্ধি পায় আরও। সম্ভবত সেদিন থেকেই জাতে ডোম হওয়া সত্ত্বেও, হরিমোহনকে গুরুজ্ঞানে শ্রদ্ধা করতে সুরু করে সমস্ত গ্রামবাসী।

হরিমোহনের দেবতা বাঁশের বিগ্রহ। অধিষ্ঠান তার চালাঘরের মৃৎ-মঞ্চে। সারাদিনে তিনবার, অর্থাৎ সকালে, দুপুরে এবং সন্ধ্যায় তাঁর পূজা করে হরিমোহন। তার প্রত্যহের পূজার ফুল জোগায় গাঁয়েরই একজন দ্বিজ-দুহিতা—নাম যার কমলা। কমলা প্রথমত শিষ্যারূপেই সান্নিধ্যে আসে হরিমোহনের। কিন্তু কিছুকাল অতিক্রান্তির পর তারা উভয়েই বুঝতে

শ্রীপদাতিক

পারে : গুরু-শিষ্যার সম্বন্ধের সেতুবন্ধে গুপ্তসঞ্চারে আবির্ভাব ঘটেছে বসন্তের। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই এবার উভয়ের মধ্যে সংকেত আসে ফুলধনুর। ফলে পরস্পরের দান-প্রতিদানের পালাও সুরু হয় নিঃসঙ্কোচে।

গ্রামের লোক সহজেই বুঝতে পারে গুরু-শিষ্যার সম্বন্ধের এই রূপান্তর। তবু তারা নীরব থাকে। কারণ হরিমোহনকে যেমন তারা ভক্তি করে গভীরভাবে, তেমনই ভয়ও করে। হরিমোহন গুণীন। তার মৃদু সংকেতেই ঘটে যেতে পারে অভাবনীয় কিছু। সুতরাং সে যাই করুক—সে-সম্বন্ধে মাথা না ঘামিয়ে নীরব থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে করে সমস্ত গ্রামবাসী। কেবল কুল-কলঙ্কের আশঙ্কায় বিচলিত হয়ে ওঠে কমলার পিতা। হরিমোহনের বিপক্ষে প্রকাশ্যে কোনো অভিযোগ আনার সৎসাহস নেই তার। অথচ দ্বিজরূপে কুলরক্ষা না করলে পরকালে তার অধিবাসক্ষেত্র হবে সপ্ত নরক। এই ভয়ে সে কমলাকে গৃহে আটক রাখে দিন-কয়েক। তারপর হঠাৎ একদিন একজন অতি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সঙ্গে গোপনে কমলার বিয়ে দিয়ে, সে দ্বিজত্বের ঐতিহ্য রক্ষা করে কোনোমতে।

যথাসময়ে খবর আসে হরিমোহনের কাছে। কিন্তু খবর পেয়েও সে অবিচল থাকে প্রকাশ্যে। তবে তার অন্তরদেশে বিশেষভাবেই যে নাড়া দিয়েছে দুঃসহ বিষাদ—তা বোঝা যায় বাঁশ-বিগ্রহের সামনে দিনমান তার দুঃস্থ ধ্যানস্থ মূর্তি লক্ষ্য করে।

অন্যদিকে পিতার নির্দেশে অতি

বৃদ্ধ দরিদ্রের সংসারেই প্রবেশ করে কমলা এবং বাহ্যিক আচারে নিষ্ঠাও সে প্রদর্শন করে যথাসম্ভব। কিন্তু সারা অন্তরে তার আসন পাতা কেবল একজনের জন্যেই—সে হরিমোহন। সুতরাং গভীর মনে সে তারই চিন্তা করে দিবারাত্রি। স্বামীর গৃহে অভি কর্মের জটিল অরণ্যেও সে-চিন্তা তার হারিয়ে যাবার সুযোগ পায় না কোনোদিন।

দেখতে দেখতে এভাবেই কেটে যায় দেড়টি বছর। হঠাৎ এই দেড় বছরের পুতি-লগ্নেই ইহলীলার পাট চুকিয়ে লোকান্তরে যাত্রা করে বৃদ্ধ স্বামী কমলার। সুতরাং সেকালের সামাজিক বিধি অনুসারেই সহমরণের নির্মম নির্দেশ আসে কমলার প্রতি।

খবর পেয়েই চমকে ওঠে হরিমোহন। স্বামীর সঙ্গে কমলার সহমরণের প্রস্তুতির কথা শুনেই এতদিনের সমাহিত অন্তর তার উত্তেজিত হয়ে ওঠে মাত্রাতিরিক্ত। একবার সে একজন মৃত ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে তার অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়েছে গ্রামবাসীকে। সুতরাং এবারও সে কমলার মৃত স্বামীকে বাঁচিয়ে, কমলাকে সহমরণের নিষ্ঠুর প্রথার হাত থেকে রক্ষা করার সংকল্প গ্রহণ ক'রে ছুটে আসে শ্মশানে। শ্মশানে তখন চিতা প্রস্তুত। চিতার পাশেই শবাধারে শায়িত কমলার স্বামী এবং সেখানেই সহমরণের উদ্দেশে নববধূর সাজে দাঁড়িয়ে আছে নির্বাক নতমুখী কমলা। হরিমোহনের আবির্ভাবে সারা শ্মশানেই চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে হঠাৎ এবং কমলাও যেন কী এক আশার উল্লাসে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তখন।

হরিমোহন সরাসরি কমলার পিতার সামনে এসেই সদম্ভে ঘোষণা করে : কমলার স্বামীকে আমি বাঁচিয়ে তুলবো।

সঙ্গে সঙ্গে কমলার শোক-সন্তপ্ত পিতাও আলিঙ্গন করে হরিমোহনকে এবং ওভাবেই অতি ভগ্নকণ্ঠে বলে : বাবা, তুমি এই মৃতকে বাঁচিয়ে তুলতে পারলে, কমলা মা আমার রক্ষা পাবে। আজ তুমিই আমার একমাত্র ভরসা। মৃতকে বাঁচিয়ে, আমার কমলাকে তুমি অকাল-সহমরণের হাত থেকে অব্যাহতি দাও। তারপর চিরকালের তরে আমি গ্রহণ করবো তোমার দাসত্ব।

হরিমোহন অবতরণ করে গঙ্গায়। স্নান সমাধা ক'রে সে উঠে আসে মৃতের পাশে। তারপব সিক্ত বসনেই সে সুরু করে মন্ত্র পড়া।----প্রহরের পর প্রহর কেটে যায়। সূর্য ঢলে পড়ে পশ্চিমে। সারা শ্মশানে আঁচল পাতে ম্লানমুখী সন্ধ্যা। হরিমোহন মন্ত্র পড়ে চলে তখনো। কিন্তু মৃতের দেহে কোনো সাড়া নেই। সুতরাং আরও জোরে, আরও গভীর নিষ্ঠা সহকারে মন্ত্র পড়া সুরু করে হরিমোহন। তার মন্ত্রের সুরে সুরেই গঙ্গার জোয়ারে ভেসে আসে বিষণ্ণ রাত্রি। তারপর আবার ভাঁটার টানেই তা ভেসে যায় নিরুদ্দেশে। রাত্রিশেষে সূর্য ওঠে আবার। তবু কোনো সাড়া নেই মৃতের দেহে। বরং সে-দেহের দুর্গন্ধে এবার ভারি হয়ে ওঠে বাতাস।

সুতরাং গ্রামের জনসাধারণ এবার একজোট হয়ে নিরস্ত হতে বলে হরিমোহনকে। হরিমোহনও বুঝতে পারে প্রচেষ্টা তার বৃথা, মন্ত্র তার দৈবশক্তি-বর্হিত। তাই সে শ্মশান ছেড়ে ছুটে আসে গৃহে এবং চালা-ঘরের বেদী থেকে সে ছোঁ মেরে তুলে নেয় তাব দেবতার বিগ্রহ। তারপর দেবতার বিগ্রহসহ আবার যখন সে ফিরে আসে শ্মশানে, চিতার লেলিহান শিখা তখন আকাশমুখী। তার দুরন্ত গর্ভে মৃতের পাশে কমলাও তখন সর্বাংশে দগ্ধ হয়ে ধারণ করেছে বিকৃত মূর্তি।

কম্পিত পদে চিতার নিবিড় সান্নিধ্যে এগিয়ে আসে হরিমোহন। আগুনের প্রচণ্ড হল্কায় বারবার ঝলসে যায় তার মুখমণ্ডল। তবু সেখানেই সে পাষাণমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে বেশ খানিকক্ষণ। তারপর এক সময় হঠাৎ সে তার দেবতার বিগ্রহ চিতায় নিক্ষেপ করে পালিয়ে যায় শ্মশান ছেড়ে।

অবশ্য কেবল শ্মশান ছেড়েই নয়, পরদিন গ্রাম ছেড়েও নিরুদ্দিষ্ট হয় হরিমোহন। সেই থেকে গ্রামবাসীদের কেউ কোনোদিন তাকে আর গ্রামে ফিরে আসতে দেখে নি।

উপরের এই কাহিনী আজ বিংশ শতাব্দীর অপরাহ্নে আমাদের কাছে কিংবদন্তী মনে হলেও, অনেকের কাছে তা ঘটনা বলেই গৃহীত। যদি তা ঘটনাই হয়ে থাকে—তা হলে তা ঘটেছিল ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পর্বে। তারপর উক্ত শতাব্দীরই দ্বিতীয় পর্বে কালীঘাটের আদি সেবায়েত ভুবনেশ্বর চক্রবর্তী—যিনি শুদ্ধ ব্রহ্মচারী রূপেই খ্যাত ছিলেন সাধারণ্যে, তাঁরই বিত্তবান জামাতা ভবানীদাস ভট্টাচার্য এসে বসতি স্থাপন করেন হরিমোহন ডোমের গ্রামে। শোনা যায় : ভবানী-দাসের প্রযত্নেই সমস্ত গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে অনন্যস্বরূপে এবং কলেবরগত দিক থেকেও তা স্ফীতি লাভ করে প্রভূত। তাই ভবানীদাস ভট্টাচার্যের মৃত্যুর পর সমগ্র গ্রাম নামধারণ করে ভবানীপুর। তারপর যে-কোনো কারণেই হোক, ভবানীদাস ভট্টাচার্যের পরবর্তী বংশধরেরা হালদার উপাধি গ্রহণ করেন এবং তাঁরাই স্থায়ী সেবায়েত নিযুক্ত হন কালীঘাট মন্দিরের। সুতরাং বর্তমানকালেও যাঁরা কালী-মন্দিরেব সেবায়েত—তাঁরা সেকালের সেই হালদার বংশেরই উত্তরপুরুষ। এ-কথার স্বপক্ষে হরিহর শেঠের গ্রন্থ থেকে কয়েক ছত্রের উদ্ধৃতিই যথেষ্ট। হরিহর শেঠ বলেছেন :

'কালীর সেবায়েতগণের মধ্যে ভুবনেশ্বর চক্রবর্তীর নাম প্রথমেই পাওয়া যায়। ইহা ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের কথা।----ভুবনেশ্বরের জামাতা ভবানীদাসের নাম হইতেই

ভবানীপুর নাম হইয়াছে। ইঁহার বংশই কালীর বর্তমান সেবায়েত হালদার বংশ বলিয়া পরিচিত।'

তারপর শতাব্দীর পর শতাব্দীকে পেছনে ঠেলে, বহু উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে কখনো দ্রুত এবং কখনো শিথিল সঞ্চারে এগিয়ে আসে ভবানীপুর। প্রবল মোগল আমলের সূর্যাস্তের পরেই ভারতের উদয়-শৈল-শিরে আত্মপ্রকাশ করে ইংরেজ-ভাগ্যরবি। সম্ভবত তখন থেকেই গ্রামের নীলিম পরিবেশকে বিনাশের নৈবেদ্য ক'রে শহরের অভিজাত প্রভাব অঙ্গে ধারণ করতে সুরু করে ভবানীপুর। দূর থেকে আরও দূরে অপসরণ ঘটে কৃষাণকুলের। তাঁতী-সমাজ কোথায় যেন কীভাবে হারিয়ে যায়। আর কুমোরের চাকা ঘুরতে ঘুরতেই স'রে যায় প্রথমত দক্ষিণে, তারপর দক্ষিণ থেকেও পূর্বদিকের কোন্ এক অজানা জনপদে। সুতরাং এবার আচারগত দিক থেকেও প্রাচীন প্রকৃতির মহাপ্রস্থান ঘটে ভবানীপুর থেকে। ধ্বসে পড়ে মাটির ঘর এবং মাটির নিচেই চাপা পড়ে পর্ণকুটির। বিনিময়ে মাথা তুলে দাঁড়ায় কোঠাবাড়ি এবং আবির্ভাব সুরু হয় বুদ্ধিজীবী বিত্তবানদের, বাণিজ্যজীবী ভাগ্যবানদের এবং লক্ষ্মীর বরপুত্র জমিদার-শ্রেণীর। তাঁদের প্রয়োজনেই মধ্যবর্তী Road to Kalighat সুপ্রশস্ত হয়ে আপন অঙ্গে রূপায়ণ আনে রাজপথের। এদিকে-ওদিকে প্রতিষ্ঠা ঘটে পুকুরের, পার্কের এবং কাননবীথির। কোনো এক অভিজাত কাননে বকুল বৃক্ষের প্রাধান্য ঘটায়—কানন-সমীপবর্তী অঞ্চল নামধারণ করে বকুলতলা—বকুলতলা রোড যার সাক্ষ্য বহন ক'রে চলেছে একালেও।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার যুগে ভবানীপুরের বকুলতলাতেই এসে-ছিলেন প্রিন্স অব ওয়েলস অ্যালবার্ট এডওয়ার্ড, অর্থাৎ মহারাণীর জ্যেষ্ঠ তনয়—যিনি বৃটিশ-সিংহাসনে অভিষিক্ত

প্রকাশিত হয়েছে—

রবীন্দ্র-সুভাষিত

শ্রীবিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ সংকলিত

মূল্য—১২.০০

রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে উল্লেখযোগ্য উদ্ধৃতির সংকলন-গ্রন্থ।
রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠকের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় পুস্তক।

THE HOUSE OF THE TAGORES

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

মূল্য—১.৫০

বাংলা দেশের নবজাগরণের পটভূমিতে লেখা
ঠাকুরবাড়ীর ইতিহাস।

চৈতন্যোদয়

মূল্য—২.৫০

জ্ঞানদর্পণ

মূল্য—৩.০০

৺হরিশ্চন্দ্র সান্যাল লিখিত

উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মচেতনার পরিচয় গ্রন্থদ্বয় পাঠে জানা যাবে।

প্রকাশক ঃ

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

৬/৪, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭

পরিবেশক ঃ

জিজ্ঞাসা

৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

১৩৩এ রাসবিহারী এ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯

● ভবানীপুর অঞ্চলের বর্তমান রাস্তার দৃশ্য

হয়েছিলেন মহারাণীর পরেই। বড়ো বিচিত্র খেয়াল ছিল যুবরাজ এডওয়ার্ডের। তিনি ১৮৭৬ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বকুলতলায় এসেছিলেন তদানীন্তন আইনজীবী জগদানন্দ মুখার্জীর গৃহে। সেদিন মান্য নেটিভ জগদানন্দের অন্তঃপুরবাসিনীদের দর্শন করাই ছিল তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য। সেদিক থেকে অভ্যর্থনার কোনো ত্রুটি রাখেন নি জগদানন্দ মুখার্জী। তাঁর পরিবারের যে-নারীসমাজ এতকাল ছিল পর্দানশীন এবং পর-পুরুষ দর্শন করা মহাপাপ বলেই যাদের গণ্য করতে শেখানো হয়েছিল, সেদিন ইংরেজভক্ত জগদানন্দ তাদেরই পর্দা মোচন ক'রে প্রত্যেককে টেনে আনেন বাইরে। তারপর প্রত্যেকের ঘোমটা অপসারিত ক'রে তিনি তাদের দাঁড় করান গৃহ-প্রাঙ্গণের উভয় দিকে। যুবরাজ অ্যালবার্ট এডওয়ার্ডের পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই তারা তাঁকে বরণ করে উলুধ্বনি এবং শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে। তারপর কেউ মালা পরায় যুবরাজের গলায় এবং কেউ চন্দনের তিলক আঁকে তাঁর কৌতুক-কুঞ্চিত ললাটে। সেদিন নাকি কুখ্যাত জগদানন্দের এই অন্তঃপুরবাসিনীদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করে অতিমাত্রায় উল্লসিত হয়েছিলেন যুবরাজ। পরে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই যে ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করেন হেমচন্দ্র আজ তার কয়েক ছত্র উদ্ধার করলেই সেদিনের ছবি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে আশা করি :

'সাবাস ভবানীপুর সাবাস তোমায়।
দেখালে অদ্ভুত কীর্তি বকুলতলায়॥
পুণ্যদিনে বিশে পৌষ বাঙ্গালার মাঝে।
পর্দা খুলে কুলবালা সম্ভাষে ইংরাজে॥'

হেমচন্দ্র আরও লিখেছেন :

'ও যতীন্দ্র কৃষ্ণদাস! একবার দেখ চেয়ে—
বকুলতলার পথের ধারে কত শত মেয়ে—
কালো, ফিকে, গৌর, সোনা, হাতে গুয়াপান,
রূপের ডালি খুলে বসি পেতেছে দোকান।'

সেদিন জগদানন্দ-পরিবারের নারী-সমাজ কর্তৃক যুবরাজ অ্যালবার্ট এডওয়ার্ড-বরণ উৎসবে যুবরাজকে যে-উপহারের ডালা প্রদান করেন জগদানন্দ—তাতে ছিল একগাছি মণির মালা, এক জোড়া সোনার বালা, এবং একগাছি স্বর্ণহার। তা ছাড়া ছিল ১৬০০ টাকা মূল্যের এক জোড়া এবং ২৫০ টাকা মূল্যের আরেক জোড়া বিচিত্র নক্সা আঁকা ঢাকাই মসলিন, ৩০০ টাকা মূল্যের বেনারসী থান, বোতল প্রতি ৩০ টাকা মূল্যের চার বোতল গোলাপজল—ইত্যাদি।

বকুলতলার এই অনুষ্ঠান লক্ষ্য করে সেদিন যুবরাজেরই এক সঙ্গী যা লিখেছিলেন, বর্তমান নিবন্ধকারের ভাষায় তা এক কথায় এই :

'এমন কীর্তি বা অপকীর্তির জন্যে জগদানন্দ মুখার্জীকে তাঁর দেশবাসী সহধর্মিগণ সুদূর ভবিষ্যতেও কোনো-দিন ক্ষমা করতে পারবে কি না সন্দেহ।'

অবশ্য জগদানন্দ মুখার্জীরা আজ আর নেই। তাদের মহান প্রভু ইংরেজদেরও উচ্ছেদ ঘটেছে এ-দেশ থেকে। সারা ভারত আজ স্বাধীন এবং স্বাধীন ভারতের শহর-কলকাতাও আজ তার স্বরূপ বদলেছে অনেকাংশে। তারই অঙ্গীভূত ভবানীপুর আর কোনোদিনও স্মরণ করবে না জগদানন্দদের। কেবল স্বদেশের তরে আত্মবলিদানের তুলনা নেই যাঁদের—ভবানীপুরে তাঁদেরই অক্ষয় স্বাক্ষর মহাকালকে জয় করার স্পর্ধা অর্জন করবে চিরকাল। যেমন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের নাম-সংকীর্তন থেকে কোনোদিন বিরত হবে না ভবানীপুরের জনসমাজ। দেশবন্ধুকে মুখর স্মরণের উজ্জ্বল তীর্থে আরতি করছে চিত্তরঞ্জন সেবাসদন। আর স্যার আশুতোষের নাম-মাহাত্ম্যে আজও শ্রদ্ধার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে আশুতোষ ভবন, আশুতোষ কলেজ এবং সেই নামই বারবার আবৃত্তি করছে আশুতোষ মুখার্জী রোড। সুতরাং এমন মহাপুরুষদের অক্ষয় অভিজ্ঞান যেখানে উজ্জ্বল—আজ সে-অঞ্চলের অবস্থান-গত পরিবেশ খানিকটা জটিল এবং তার অসংখ্য প্রেক্ষাগৃহে প্রত্যহের শোভাযাত্রা কিছুটা অস্বাভাবিক বা অশালীন হলেও, বাঙালীর গৌরবে সে-অঞ্চল দান করবে চিরন্তনের পরমায়ু।

ধারাবাহিক উপন্যাস

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

যথা—

'মুখে রঙ মেখে তারা ইস্কুল-কলেজে, সিনেমা-থিয়েটারে যেতে পারে, আর মুখে রঙ মেখে একটু স্টেজে উঠে দাঁড়াতে পারবে না? তাদের একবার বলেই দেখা যাক-না।' দীপক বলল।

দীপকের কথাটা বড় মজার—বলে দেখা যাক-না। কিন্তু কে গিয়ে কাকে বলবে? দেয়ালে-দেয়ালে পোস্টার? বাড়িতে-বাড়িতে উড়ো-চিঠি? কিভাবে কি হবে?

দীপক কাজ করে পোর্টট্রাস্টে। সে বলল, 'যত কঠিন মনে করছ, কাজটা তত কঠিন নাও হতে পারে। বড় বড় জাহাজ বাঁধা পড়ছে বন্দরে-বন্দরে, আর ক্ষুদে ক্ষুদে পল্লীবাসিনীকে রাজী করানো যাবে না—'

স্নেহাংশু বলে উঠল, 'মন্তরে মন্তরে? এই বুঝি তোমার বলার ইচ্ছে? কিন্তু সে মন্ত্র জানা নেই ভাই আমাদের। সুতরাং বিনা-মন্ত্রে যা হয় তাই হোক।'

দীপক বলল, 'তা হলে বধ করো ঐ মেয়ে তিনটি। নাটক থেকে বাদ দিয়ে দাও স্ত্রী-ভূমিকা।'

মেয়ে-ভূমিকার হাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে দীপকের এই প্রস্তাব শুনে সকলে চমকেই উঠল এবং সবচেয়ে বড় আঘাত পেল নাট্যকার। এত মায়া দিয়ে মমতা দিয়ে স্নেহ দিয়ে প্রীতি দিয়ে এবং সেইসঙ্গে কলমের কালি দিয়ে যে নারীচরিত্রকে গড়ে তুলেছে সে, তাকেই বলা হচ্ছে তার সৃষ্ট সেই চরিত্রকে বধ করতে?

স্তব্ধ হয়ে বসে রইল স্নেহাংশু, দুই হাত তার পাণ্ডুলিপির ওপর রেখে সে স্তম্ভিত হয়ে রইল। যারা তাকে খ্যাত ক'রে তুলেছে তারাই যেন চক্রান্ত করে তার সর্বাঙ্গ থেকে তার খ্যাতির সমস্ত আবরণ কেড়ে নিয়ে তাকে রিক্ত, নিঃস্ব ও দেউলিয়া করে দেবার জন্যে উদ্যত হয়েছে, এমনই মনে হল অকস্মাৎ স্নেহাংশু বিশ্বাসের।

'পাণ্ডুলিপির পাতাগুলো গুছোতে-গুছোতে অস্ফুটে সে বলল, 'থাক্।'

আর অভিনয়ে দরকার নেই, তার যেন শিক্ষা হয়ে গিয়েছে খুবই, এমনই মনের অবস্থা হয়ে গেল স্নেহাংশুর।

অমিয় একটু এগিয়ে বসে একটু বুঝি সান্ত্বনার সুরেই বলল, 'কি হল হে? হঠাৎ অমন ইয়ে হয়ে গেলে কেন?'

স্নেহাংশুর যেন আর উৎসাহ নেই, সে আবার বলল, 'থাক্।'

'নিশ্চয়।' অমিয় বলল, 'থাকবে বই-কি। তুমি যা লিখেছ তার সব থাকবে। পুরুষ-চরিত্রগুলোও যেমন থাকবে, তেমনি থাকবে মেয়ে-চরিত্রও। দীপকের কথায় কিছু মনে কোরো না।'

দীপক বুঝি একটু লজ্জিত হয়েছে। তাই একেবারে চুপ করে বসে আছে।

রেবতী, বিকাশ আর মনোজ কেবল এই পাড়াতেই অভিনয় করে না, তারা ব্যাঙ্কের কর্মী। তাদের আপিসের অভিনয়েও শক্ত ভূমিকাগুলি তাদের জন্যে বাঁধা। মেয়ে-ভূমিকায় সে অভিনয়ে নামে মেয়েরাই। মেয়েদে-

সঙ্গে অভিনয়ের অভ্যাস তাদের আছে। এটা কেবল পাড়ার ব্যাপার বলে তারা এর মধ্যে সত্যিকারের মেয়ে আনতে একটু দ্বিধা করছিল। কিন্তু দীপকরা যদি অত ছেলেমানুষ হয়, মেয়ে-সাজার নাম করলেই তাদের ইজ্জতে যদি লাগে, তবে থাক্ তারা তাদের ইজ্জৎ নিয়ে। সুেহাংশুর নাটকের জন্য অন্য ব্যবস্থা তা হলে করতেই হবে।

গম্ভীর হয়ে বসেছিল বিকাশ। এতক্ষণে সে বলল, 'ভেবো না। ব্যবস্থা একটা হবেই।'

আশ্বাসের কথাই বলল বিকাশ, কিন্তু তার কথা শুনে সুেহাংশুর মনে হল সে যেন কত ছোট হয়ে গিয়েছে। এই রিহার্সেল-রুমে যখন সে এসে আজ বসেছিল, তখন তার মনে কত জোর, তখন তার সর্বাঙ্গে খ্যাতির একটা শিহরণ লেগে আছে, তখন তার মনে হয়েছিল, সত্যিই তার মনে হয়েছিল, এদের সকলের থেকে সে কত আলাদা এবং কত বড়। কিন্তু হঠাৎ তার সেই গোপন অহমিকা চূর্ণ হয়ে গিয়েছে, সে যেন এদের কৃপার কণার ওপর নির্ভর করছে এখন।

সুেহাংশু বড় সেন্টিমেন্টাল জীব এবং খুব সেন্সিটিভ, সে চুপ করে বসে-বসে ভাবছে, ভাবতে-ভাবতে আবার সে বলল, 'থাক্।'

অমিয় বলল, 'সেই ভালো। থাক্। এসব নিয়ে আজ আর কথা না। আজ এই পর্যন্তই।'

দীপকও বেশ একটু মর্মাহত। নাটকটার সর্বনাশ করার ইচ্ছে তার এতটুকুও নয়। একটু তামাসা করার ইচ্ছে তার ছিল এবং সেইসঙ্গে নিজেদের নির্ভেজাল পুরুষ বলে জাহির করার ইচ্ছেও। কিন্তু কথায়-কথায় আবহাওয়াটা বড় জটিল হয়ে যাওয়ায় সে লজ্জিত ও আহত হল মর্মে-মর্মে।

ঘরের এই মেঘলা আবহাওয়াটা সাফ করে দেবার জন্যে হঠাৎ হেসে উঠল দীপক, বলল, 'এতক্ষণ একটা নাটক করলাম। আসলে, আমি রাজী—মেয়ে হোক পুরুষ হোক, যে-ভূমিকা আমাকে মানাবে, আমি তাই নিতে রাজী আছি।'

নতমাথাটা একটু তুলে সুেহাংশু তাকাল দীপকের দিকে।

দীপক বলল, 'আমি একা না, হরেশ রাজী, নীহার রাজী—তাদের হয়েই আমি ঘোষণা করলাম। যা থাকে বরাতে—পাড়ায় যদি এজন্যে দীপিকা হয়ে যাই, হলাম।'

নীহার বলল, 'এই বেশ। সবে মিলে করি কাজ, হারি-জিতি নাহি লাজ। সুতরাং লজ্জার আছে কি? না হয় বললই লোকে নীহারিকা।'

খুশি-খুশি হয়ে উঠল আবহাওয়া। মনোজ চারদিকে চেয়ে নিয়ে হরেশের দিকে চেয়ে বলল, 'আর তুমি? তুমি কোনো কথা বলছ না কেন হে, হরেশ।'

হরেশ হাসল, বলল, 'হৃদয়েশ্বরী হতে কেমন-যেন সংকোচ হচ্ছে। আজ পর্যন্ত কাউকে করতে পারলাম না ঐ জিনিসটা, অবশেষে নিজেকেই করে তুলব—'

'নইলে নাটক জমবে কেন।' অমিয় বলল, 'অবশ্য যদিও ইতিমধ্যেই বেশ জমাট হয়ে জমে উঠেছে আমাদের নাটক—কি যেন নামটা আমাদের নাটকের?'

মনোজ বলল, 'অচিনপুরী।'

সুেহাংশুর মনের গুমোট একেবারে কেটে গিয়েছে। তার মুখে একটু হাসিই যেন ফুটে উঠেছে। সে বলল, 'নামটা তোমাদের সকলের পছন্দ তো ভাই?'

দীপক বলল, 'অভিনয় করতে নেমে আমাদের যদি নাম বদল হয়ে যায়, তোমার নাটকেরও নাম দরকার হলে বদল কেন হবে না ভাই?'

অমিয় চোখ রাঙিয়ে বলল, 'এই! আবার?'

দীপক কোনো কথা বলল না। কিন্তু মনে-মনে হাসতে লাগল।

আজকের আসরটা একেবারে মাঠে মারা গেলই বলতে হবে। কোনো কাজের কাজই আজ হল না। কথা ছিল—মোটামুটিভাবে আজ নাটকের ভূমিকাগুলি সকলের মধ্যে বেঁটে দেওয়া হবে। সে কাজটা করবে সুেহাংশু, কেন না, চরিত্রগুলি সবই তার চেনা। তারপর নাটকটা আজ পড়া হবে, প্রত্যেকেই যাতে নিজের নিজের চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু স্ত্রী-ভূমিকা নিয়ে প্রত্যেকের এত ভূমিকা শুনতে-শুনতে সময়ই কেটে গেল অনেক।

আজকের এই অভিজ্ঞতাটা সকলের কাছেই তেতো ঠেকল। উদ্বোধনের দিনেই এ-রকম অশোভন আচরণ বিশেষ করে তিক্ত লেগেছে সুেহাংশুর। সে তাই যেন কারও কোনো কথার ওপরেই ভরসা রাখতে পারছে না।

তার তাই ইচ্ছে হচ্ছে, নাটকটার কেবল নাম-বদলই না, সে এর আগাগোড়া সব বদলে দিয়ে যা রয়-সয় এমন-একটা নাটকই নতুন করে লিখে ফেলবে।

অমিয় সুেহাংশুর কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, 'কি ভাবছ হে নাট্যকার? নতুন কোনো নাটকের প্লট বুঝি?'

অমিয়র কথা শুনে একটু যেন চমকেই উঠল সুেহাংশু। অমিয় কি তা হলে তার মনের কথাটা ধরে ফেলতে পেরেছে?

সুেহাংশু এবার একটু স্পষ্ট করেই বলল তার ইচ্ছের কথাটা। বলল, 'তাই-ই ভাবছিলাম। ভাবছিলাম, অনেকগুলি নাটকই তো লিখলাম, সেগুলোর অভিনয়ও হল। কিন্তু সে-সব নিয়ে এত কথা হয় নি। কিন্তু এটা নিয়ে মনে হচ্ছে, এর অভিনয় বুঝি করা যাবে না। সূচনাতেই যখন এত আপত্তি, তখন থাক্ এটা। আমি মেয়ে-চরিত্রগুলি বাদ দিয়ে নতুন ক'রে—'

বাধা দিয়ে উঠল প্রথমেই দীপক, বলল, 'উঁহুঁ। তা হয় না। এই নাটকই হবে। হতেই হবে। এবং আমাদের

ওপর যে আদেশ হবে আমরা তা পালন করব। কি বলো হে হরেশ। কি বলো নীহার?'

ওরা দুজনে সম্মতি জানাল।

তবু যেন সব রফা হয়ে গেল না। বিকাশের দিকে চেয়ে বিজ্ঞের মত মাথা নাড়তে লাগল মনোজ।

মনোজ ইতিমধ্যে মনস্থির করে ফেলেছে। ওসব সাতে-পাঁচে সে নেই। কারও ওপরে নির্ভর করা আর না। কারও করুণার ওপর আর আস্থা রাখতে রাজী না সে।

মনোজ বলল, 'আমি ঠিক করব।'

অমিয় জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল।

মনোজ বলল, 'আমাদের পার্টিনাব। সত্যিকার মেয়ে-অভিনেত্রী অনেক আছে এই কলকাতা শহরে। কোনো পুরুষকেও মেয়ে সাজতে হবে না, পাড়া থেকেও লেডি-ভলান্টিয়ার্র খুঁজতে হবে না।'

একটু উল্লসিতই হল স্নেহাংশু। তার চোখে জেগে উঠল স্বপ্ন। ট্রেনে যেতে-যেতে সে দেখেছিল—রেল লাইনের থেকে কিছু তফাতে একটা মাঠের মধ্যে বিরাট একটা পুরনো বাড়ি, জীর্ণ হয়ে গিয়েছে সেই বাড়িটা, তার দেয়ালে আর ছাদে গজিয়েছে আগাছা, একেবারে পরিত্যক্ত বলে মনে হয়েছিল তার সেই বাড়িটাকে, হঠাৎ তার চোখ পড়ল বাড়িটার দোতলার একটা জানলায়। দেখল, একটি মেয়ে সেই জানলায় দাঁড়িয়ে আছে একা। বেশিক্ষণ সে দেখতে পায় নি এ-দৃশ্য—তীব্রবেগে ছুটে চলে গেল ট্রেন। উহ্য হয়ে গেল সেই অচিনপুরীটা।

বাড়িটা সম্বন্ধে অনেকদিন অনেক কথা ভেবেছে সে একা-একা। অনেক কথা সে ভেবেছে ঐ এক-লহমার দেখা মেয়েটি সম্বন্ধে। এবং ভাবতে-ভাবতে নিজের মন-গড়া একটা কাহিনী খাড়া করে গড়ে তুলেছে এই নাটক।

মনোজ যদি খুঁজে নিয়ে আসে অন্তত একজন অচেনা মহিলাকে, তা হলে তারই মধ্যে স্নেহাংশু বুঝি পেয়ে যাবে তার স্বপ্নের নায়িকাকে। স্নেহাংশুর শরীরে একটু যেন শিহরণ দেখা দিল। মনোজের দিকে ঝুঁকে সে আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, 'কে, কে সেই মেয়ে?'

'আছে। আছে।'

'কি নাম তার?'

মনোজ বলল, 'যার কথা ভাবছি, যদি তাকে পাই তবে তো?'

'তা তো বটেই। তার নাম কি?'

মনোজ বলল, 'দিবা।'

বিকাশ আর রেবতী একটু নড়ে বসল। তারাও চেনে এই মেয়েকে। তাদের ব্যাঙ্কের কর্মীরা অভিনয় করেছিল মাইকেল মধুসূদন, ঐ মেয়েটা তাতে অভিনয় করে হেনরিয়েটা—আঁরিয়াতা।

বিকাশ মন্তব্য করল, 'বড় দর। বড় ডাঁট।'

দিবার নাম ঘোষণা করামাত্র এই রাত্রিবেলাও যেন এই ঘরের মধ্যে বিদ্যুতের আলো উহ্য করে দিয়ে হঠাৎ প্রবেশ করল দিবালোক।

সেই আলোর তেজে যেন নিভে গেল দীপকদের দীপ্তি, সেই আলোয় ডবল উদ্ভাসিত হয়ে উঠল স্নেহাংশুর উৎসাহ।

আরও দুটি মেয়ের দরকার। কিন্তু সেকথা নিয়ে এখন আর কথা হল না। নায়িকা-নির্বাচনই যদি হয়ে গেল, তখন কাজ তো হয়ে গেল অর্ধেকের ওপর। ওসব ছোটখাট ভূমিকার জন্যে এখন ভেবে লাভ নেই।

অমিয় কেবল বলল, 'রিহার্সেলের জন্যে তা হলে একটা ভালো জায়গা দেখতে হয়। মেয়েদের নিয়ে এখানে হৈ-হল্লা করবে- বাবা-মা রাগ করবেন।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' আশ্বাস দিল মনোজ।

(ক্রমশঃ)

অকৃত্রিম এই প্রশ্ন থাক

প্রফুল্ল মণ্ডল

অকৃত্রিম আলোচনা যদি হয় মৌলিকতা নিয়ে
নিরম্বু পৃথিবী শুষ্ক বিশ্লেষণে শুধু ধূম্রজাল
মানুষের মজ্জা মেদে শোণিতেও রক্তের মিশ্রণ
তা হলে চার্বাকই সত্য বাঁচাটাই কেবল মৌলিক।

তুমি আমি জোড়াতালি এক [illegible]
আমাদের জন্ম হয় এবং কখনও আমরা প্রজাপতি হই
পৌরাণিক গল্প ফাঁদি অখণ্ডতা অভিন্নতা বাক্যের বেড়ায়
তৃতীয় পাণ্ডব হই শুধুমাত্র [illegible]ভাগী।

অতএব আমরা আজ প্রত্যেকেই এক একটি নারদ
চীৎকারকে গান ভাবছি বাস্তবতা যতই কাঁদুক
কবে আমরা চোখ খুলব বিকলাঙ্গ সুর মূর্তিগুলো
জীবন্ত সজীব হবে—অকৃত্রিম এই প্রশ্ন থাক।

পাঠক মন

আমরা 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র নিয়মিত অনুরাগী পাঠক। পত্রিকার বিভিন্ন বিভাগ বিশেষ সুখপাঠ্য। পত্রিকাটির বহুল প্রচার আমাদের কাম্য।

পত্রিকাটিতে সিনেমা বিভাগটি যদি কিছুটা সঙ্কুচিত করে শহর কলকাতা তথা পশ্চিম বাংলার সমাজ-চিত্র বা অন্য কোন রসসমৃদ্ধ সাধারণ বিভাগ সংযোজিত হয়, তা হ'লে আমাদের মনে হয় পাঠক সাধারণ বিশেষ বাধিত হ'বেন। সিনেমা সংক্রান্ত বহু পত্রিকা প্রকাশিত হয়, ঐতিহ্য-মণ্ডিত এই সাপ্তাহিকটিতে সিনেমা সংবাদের আধিক্য বাহুল্যমাত্র বলে আমাদের মতে বিবেচিত হয়।

আমরা এ-কথাও মনে করি, পত্রিকার ব্যবসায়িক কল্যাণার্থে চপলমতি তরুণ-তরুণীর অবাঞ্ছিত চিন্তার চাহিদা মেটাতে অন্যান্য পত্রিকা সিনেমা সংবাদ পরিবেশনের জন্য যে সহজ পথ গ্রহণ করেছে, সাপ্তাহিক বসুমতী, তার ব্যতিক্রম হবে।

শ্রীসুকুমার ঘোষ, এডভোকেট
৪২৬, যোধপুর পার্ক, কলকাতা-৩১

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্র চক্রবর্তী
ক্রিস্টোফার রোড, বি/৭ সি আই টি বিল্ডিংস, কলকাতা-১৪

অধ্যাপক শ্রীরাধাশ্যাম দত্ত, রামকৃষ্ণ কলোনী, ধরমপুর, ২৪ পরগণা

অধ্যাপক শ্রীবিজয়কুমার মিত্র
মলতা ২৪ পরগণা, কলকাতা-২৮

• • •

আমি 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র গ্রাহক। আমার চোখে এই 'সাপ্তাহিক বসুমতী'টি কতখানি আদর্শমণ্ডিত হয়ে উঠেছে তারই দু-একটি কথা এখানে বলবো।

প্রথম পৃষ্ঠার 'সম্পাদকীয়'টি পাঠ করলেই মনের মধ্যে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি এবং আভ্যন্তরীণ চিত্রের একাংশ বেশ স্পষ্টাকারে ফুটে ওঠে। দ্বিতীয়ত, 'ভারতদর্শনে'র মধ্যে প্রয়োজনীয় খবরাখবর চমৎকারভাবে পাই। এটা নাতিদীর্ঘ এবং বাহুল্যবর্জিত।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে হরপ্রসাদ মিত্রের 'সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর' এবং মধ্যে মধ্যে প্রদত্ত বেশ মননশীল প্রবন্ধাদি সাহিত্য-পিপাসাকে সার্থকভাবে মিটিয়ে থাকে।

আমি মফস্বলবাসী। কলকাতার সম্বন্ধে ধারাবাহিক ইতিহাস জানিয়ে শ্রীপদাতিক যে কি আনন্দ দান করছেন এবং অজানা রহস্যের সমাধান করে পরিতৃপ্ত করছেন—তা অবর্ণনীয়।

এ ছাড়া নিয়মিত বিভাগগুলিও আমার মতে একরকম সার্থকনামা। তবে এগুলোর আর একটু বিস্তৃততর পরিধি হওয়া আবশ্যক।

এক্ষেত্রে এবং বিশেষ ক'রে প্রচ্ছদপটের ওপর একটু নজর দিলে পঁচিশ পয়সার মূল্য-পরিধিতে এই পত্রিকাটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠবে।

পরিশেষে আমিও বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, উদীয়মান তরুণ লেখকদের আর একটু সুযোগ প্রদানের ব্যবস্থা করুন।

শ্রীকালীশঙ্কর রায়
গ্রাম-।-পো: আলিগ্রাম
জেলা বীরভূম

• • •

'সাপ্তাহিক বসুমতী'র ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত ইতিমধ্যে পাঠকমন বিভাগের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, সে সম্বন্ধে আর দ্বিরুক্তি করব না। তবে এর আশু উন্নয়নকল্পে আমারও কিছু বক্তব্য আছে। যথা :

প্রচ্ছদপট : 'দেশ' বা 'অমৃতে'র প্রচ্ছদপট যেমন প্রতি সপ্তাহে বিভিন্ন-রূপে প্রকাশিত হয়, 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র ক্ষেত্রেও সে পন্থা অবলম্বন করলে—আশা করি প্রচ্ছদপট আরো আকর্ষণীয় হবে। অবশ্য এর জন্য বর্তমান মূল্য পঁচিশ পয়সার বদলে ত্রিশ পয়সা করলেও পাঠকদের পক্ষে খুব একটা ক্ষতি হয়তো হবে না। এ-বিষয়ে আপনাকে ভাবতে বলছি।

কবিতা : কবিতা সম্বন্ধে শ্রী এম রায় (দাশগুপ্ত), ৫৫, সেণ্ট্রাল রোড, কলকাতা, যা বলেছেন—সেটা খুবই সত্য। উদীয়মান কবিদের সুযোগ দেবেন তাতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু তার পাশে পাশে প্রতি সপ্তাহেই যদি প্রতিষ্ঠিত দু-একজন কবির কবিতা স্থান পায়, তা হলে পত্রিকার মর্যাদাও ক্ষুণ্ণ হয় না, আর দ্বিতীয়ত উদীয়মান কবিরাও তাঁদের কবিতার মাধ্যমে নিজেদের লেখনীতে আরও গভীরতা আনতে পারেন। আজকাল অনেকেরই ধারণা, কবিতা কেউ পড়ে না। এটা সম্পূর্ণ ভুল। অন্তত আমার ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়। বিগত এক বছরে প্রকাশিত—শঙ্কর দে, করুণাসিন্ধু দে, ত্রিদিব মালাকার, মৃণাল বসুচৌধুরী, শান্তনু দাস, পিনাকরঞ্জন সাহা, নিখিলেশ মোহান্ত, দীপঙ্কর চক্রবর্তী, মিলন দত্ত, কমলেশ চট্টোপাধ্যায়, দুর্গাদাস সরকার, বিষ্ণু দে, দিনেশ দাস, জয়ন্তী সেন, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, বটকৃষ্ণ দাস, অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, সুনন্দা দাশগুপ্ত, আবুল কাসেম রহিমউদ্দীন প্রমুখের কবিতাগুলোই আমার ভাল লেগেছে। তার কারণ, সংযত ভাষার মাধ্যমে এমন সুন্দর সাবলীল ভঙ্গী এবং গভীরতা, মনে রাখবারই মত। কিন্তু এ ছাড়া যে-সমস্ত কবিতা প্রকাশিত হয়েছে, সে-সমস্ত কবিতার কবিদের আমি দোষ দিচ্ছি না। তাঁদের বলব আরও অনুশীলন করতে। ভাল ভাল কবিতা পড়তে যেন আপনাদের দেওয়া সুযোগের অপব্যবহার না করেন।

মণিলাল চক্রবর্তী
গাঙ্গুলী বাগান
ব্লক নং—১১, কলকাতা-৪৭

রাজধানী ঃ

তিন সপ্তাহ ধরে আলাপ-আলোচনা, জল্পনা-কল্পনা ও অনেক ছাঁটকাটের পর পশ্চিম বাংলা সরকারের উন্নয়ন ও পরিকল্পনা পরিষদ চতুর্থ পরিকল্পনার একটা চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করেছেন। স্থির হয়েছে চতুর্থ যোজনা রূপায়ণে ব্যয় হবে ছ'শ' সতের কোটি আটতিরিশ লক্ষ টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনায় ব্যয়বরাদ্দ নির্ধারিত ছিল, দু'শ' তিরানব্বই কোটি টাকা।

তৃতীয় পরিকল্পনার তুলনায় চতুর্থ পরিকল্পনার কলেবর বৃদ্ধি পাবে দ্বিগুণেরও বেশি। দুটি পরিকল্পনাকে পাশাপাশি রেখে বিচার করে অনেকেরই পশ্চিম বাংলার আগামী দিনের রূপরেখাকে অত্যন্ত আশাবাদী আখ্যা দিতে পারেন। সমস্যাসঙ্কুল পশ্চিম বাংলার প্রয়োজন মেটাতে বিভিন্ন দপ্তর যে-দাবি পেশ করেছিলেন, সেদিক থেকে বিচার-বিবেচনা করলে দেখা যাবে, খসড়া পরিকল্পনার আয়তন পরিকল্পনাকারদের কলমের নিষ্ঠুর আঘাতে অর্ধেকটাই হ্রাস পেয়েছে। এই ক্ষীণ কলেবরের ওপরেও আবার আঘাত কতটা পড়বে বলা শক্ত। আর তিন হাত পাড় না হলে আসলে কতটা টিকে থাকবে বলা যায় না। পশ্চিম বাংলার মন্ত্রিসভার অনুমোদন পেলে পরিকল্পনা কমিশনের দরবারে তার চুলচেরা বিচার হবে আরেক দফা। তারপর জাতীয় উন্নয়ন পরিষদে ঠিক হবে পরিকল্পনার খাঁটি রূপটি।

কৃষির উন্নতির ওপরই চতুর্থ পরিকল্পনার গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে অধিক। এই পরিকল্পনাকালের শেষে রাজ্যে যাতে সতের লক্ষ টন অধিক খাদ্যশস্য উৎপন্ন হতে পারে সে ব্যবস্থাই করা হবে। ব্যয় হবে উননব্বই কোটি বিরাশি লক্ষ টাকা। কৃষির পরই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে শিক্ষার ওপর।

● শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায় লাইসেনসিয়েট চিকিৎসক সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণ দিচ্ছেন।

পরিকল্পনার এই প্রয়োজনীয় অর্থের দু' শ' কোটি টাকার অধিক রাজ্য সরকারের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। কেন্দ্রের কাছ থেকে এ-পর্যন্ত তিন শ' বিশ কোটি টাকার আশ্বাস পাওয়া গিয়েছে। বাকী টাকাটা কোথা থেকে, কিভাবে আসবে তা' এখনও স্থির হয় নি।

পশ্চিম বাংলার সমস্যা সম্পূর্ণ আলাদা। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে এর মিল কোনদিক থেকেই খুঁজে পাওয়া যাবে না। শহর কলকাতার মত বিরাট সমস্যা অন্য কোন রাজ্যেই নেই। অথচ এই শহরের ভবিষ্যতের ওপর সারা উত্তর ভারতের আর্থিক কাঠামো অনেকাংশেই নির্ভরশীল। উদ্বাস্তু সমাগম পশ্চিম বাংলার আর্থিক ও সামাজিক বিপর্যয় এনে দিয়েছে। কাতারে কাতারে এখনও পূর্ব-পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তুরা এসে আশ্রয় নিচ্ছে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলা-শহরে ও শহর কলকাতায়। ক্রমবর্ধমান বেকারসমস্যা মেটাতে না পারলে এ-রাজ্যের সমাজের গোটা কাঠামোই ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। ছোট ও মাঝারি ধরণের শিল্পের প্রসার ভিন্ন বেকারসমস্যার সমাধানের আর কোন পথই খোলা নেই। শিল্পায়নের জন্য অত্যাবশ্যক বিদ্যুৎ। বিদ্যুতের ঘাটতি পূরণের জন্য পরিকল্পনায় দু' শ' কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রতিটি খাতে ব্যয়ের যে-প্রস্তাব পশ্চিম বাংলার খসড়া পরিকল্পনায় করা হয়েছে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করলে দেখা যাবে, প্রয়োজনের দিক দিয়ে

তা অত্যাবশ্যক। তাকে কেটে-ছেঁটে কমালে অবিচারই করা হবে। আশা করি, কেন্দ্রীয়দপ্তর বাকী সাতানব্বই কোটি টাকা মঞ্জুর করতে কার্পণ্য করবেন না।

কেন্দ্রীয় সরকার প্রসন্ন হলে এবং আমাদের কর্তারা মোট বরাদ্দের টাকাটা ব্যয় করতে পারলে, আগামী দিনে পশ্চিম বাংলার রূপ অনেকাংশেই পাল্টাবে—সমস্যার জটও খুলে যাবে কিছুটা। টাকা পেলেও তার উপযুক্ত ব্যবহারের ব্যর্থতার নজীরের অভাব নেই। গৃহসমস্যা পশ্চিম বাংলার একটা বড় সমস্যা। মানুষ মাথা গোঁজবার ঠাঁই খুঁজে পাচ্ছে না। আমাদের সংশ্লিষ্ট দপ্তর টাকা হাতে পেয়েও দুর্দশা নিবারণের ব্যবস্থা করতে পারেন নি। মেথর ও বাঙড়দের গৃহনির্মাণের টাকা খরচের ব্যাপারে পশ্চিম বাংলা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক পেছনে পড়ে আছে।

কৃষির উন্নতিই চতুর্থ পরিকল্পনায় সারা ভারতের লক্ষ্য। সারা ভারতের নির্ধারিত নীতির বাইরে এ-রাজ্য যেতে পারে না। কাজেই এবারের পরিকল্পনায় পশ্চিম বাংলাকেও কৃষির উন্নতির কথাটা পেশ করতে হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষির জন্য নির্ধারিত ব্যয়বরাদ্দ ছিল সাঁইতিরিশ কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা। এ টাকার যথাযথ ব্যয় হলে উৎপাদন বৃদ্ধি পেতো। সারা ভারতে পশ্চিম বাংলার মত তীব্র খাদ্যসঙ্কট আর কোথাও নেই। কিন্তু আমাদের কৃষিদপ্তর যে-হারে কাজ চালাচ্ছেন, তাতে পঁচিশ কোটি টাকার অতিরিক্ত তাঁরা ব্যয় করতে পারবেন, এমন আশা নেই। তাই বলছিলাম, টাকার সদ্ব্যয় না হলে আমাদের দুর্গতির অবসান হবে না।

• • •

পশ্চিম বাংলার বিধানসভার তিনটি নির্বাচন কেন্দ্রের উপনির্বাচন-পর্ব শেষ হয়েছে। ফরাক্কা ও হাঁসখালিতে কংগ্রেস আসন রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে। ক্যানিং-এ কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থীকে হারিয়ে জিতেছেন একজন প্রবীণ ও প্রাক্তন কংগ্রেসসেবী। বিগত সাধারণ নির্বাচনে এ তিনটি আসনেই জয়ী হয়েছিলেন কংগ্রেসপ্রার্থী। গিয়াসুদ্দিন বিশ্বাস ও খগেন্দ্রনাথ নস্করের মৃত্যুতে ফরাক্কা ও ক্যানিং-এর আসন দুটি শূন্য হয়। কংগ্রেসের সঙ্গে মত-বিরোধের পর শ্রী পি আর ঠাকুর পদত্যাগ করায় হাঁসখালিতেও প্রয়োজন হয়ে পড়ে উপনির্বাচনের।

উপনির্বাচনের ফলাফল দেখে কংগ্রেসীমহলে উল্লাসের সৃষ্টি হলেও সাধারণ মানুষ এতে মোটেই বিস্মিত হয় নি। এ তিনটি এলাকাই কংগ্রেসের ঘাঁটি।

ফরাক্কার নব-নির্বাচিত সদস্য সৈয়দ আবু হোসেন পরলোকগত গিয়াসুদ্দিন সাহেবের জামাতা। গিয়াসুদ্দিন সাহেব দীর্ঘকাল এ আসনটি দখল করে ছিলেন। তাঁর প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল স্থানীয় মুসলমান সমাজের ওপর। তা ছাড়া, ধান কাটার মরশুমে গ্রামের ভোটদাতারা কেউ ভোট দিতে আসতে পারেন নি। ফরাক্কায় ভোট গৃহীত হয়েছে শতকরা মাত্র পঁয়তিরিশ ভাগ। মূল্যবৃদ্ধির চাপে যাদের জীবন

● হাঁসখালি উপনির্বাচনের একটি কেন্দ্রে ভোটারগণ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন।

দু বিষহ. তাদের গোটা অংশটাই ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের দরজায় আসে নি। তাদের আনবার ব্যবস্থাও ছিল না। যাঁরা সে ব্যবস্থা করবেন, তাঁরা নিজেদের দলের অস্তিত্ব রক্ষার সমস্যার বেড়াজালে আটকা পড়ে আছেন।

হাঁসখালিতে তাঁরা একজনকে সামনে ঠেলে দিয়েছিলেন। সেখানেও তাঁদের পদক্ষেপ ছিল অত্যন্ত দ্বিধাজড়িত। ফলে তাঁদের মনের মানুষটি ভোট পেয়েছেন মাত্র সাড়ে ছ' হাজার। ভোটদাতাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পেরেছিলেন নির্দলীয় প্রার্থী শ্রীযোগেন মণ্ডল। তিনি দশ

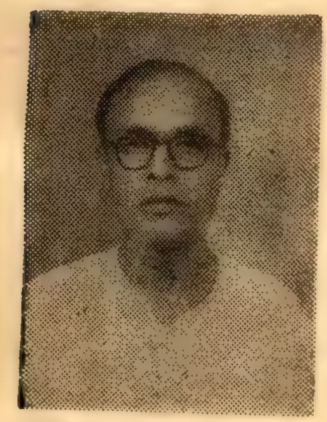

● শ্রীঅধরচন্দ্র হালদার

হাজারের সামান্য অধিক ভোট পেয়েছেন। কিন্তু অতীত দিনের কাহিনী তাঁর বিরুদ্ধে প্রচারের অনেকটা সাহায্য করেছে। কাজেই এখানে কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীরামেন্দ্রকিশোর মল্লিকের বিজয়ে কেউ বিস্মিত হন নি।

ক্যানিং নির্বাচনকেন্দ্রে পরাজয়ের কলঙ্ক-কালিমা মোচনের জন্য কংগ্রেসী-মহল জোর গলায় যে-কথা প্রচার করছেন, তাতে সত্যেরই প্রকারান্তরে অপলাপ করা হচ্ছে। তাঁদের মতে কংগ্রেসপ্রার্থী যাঁর কাছে পরাজিত হয়েছেন, তিনিও এককালে কংগ্রেসের একজন ছিলেন। অতএব কংগ্রেসেরই জয় ঘোষিত হয়েছে। হেরে গিয়েও যারা হার মানে না, তাদের পক্ষে এমনি ধরণের উদ্ভট যুক্তির অবতারণা খুবই স্বাভাবিক। শ্রীঅধরচন্দ্র হালদার জনপ্রিয় কংগ্রেসসেবী। শিক্ষক ও কর্মী হিসেবে তিনি সুনাম অর্জন করেছেন। তাঁকে ঘায়েল করার জন্য পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের একচ্ছত্র অধিনায়ক শ্রীঅতুল্য ঘোষের অন্যতম প্রধান চেলা শ্রীহংসধ্বজ ধাড়া সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছিলেন। শ্রীধাড়ার বিরুদ্ধে ধারাবাহিক অভিযোগ যাঁরা উত্থাপন করেছিলেন, শ্রীহালদার তাঁদের অন্যতম নেতা। কংগ্রেসের তরফ থেকে এইটাই নাকি তাঁর বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ। ক্যানিং অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি মণ্ডল কংগ্রেস শ্রীধাড়াকেই কংগ্রেসপ্রার্থী করার সুপারিশ করেছিলেন। মণ্ডল কংগ্রেসগুলোর পক্ষ থেকে এ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পর্যন্ত এসে হাজির হয়েছিলেন। কিন্তু প্রবল প্রতাপান্বিত শ্রীধাড়ার খুঁটির জোর বড়। সে-খুঁটির জোরেই সমবেত আবেদন উপেক্ষা করে শ্রীপুলিন মণ্ডলকে প্রার্থী মনোনীত করা হয়। উপদলীয় সংঘাতই সেখানে বড় হয়ে উঠেছিল। সে সংঘাতে কংগ্রেসের আসনই শুধু হাতছাড়া হয় নি—কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্রটাও উদ্ঘাটিত হয়ে পড়েছে। এ-কথা অস্বীকার করবার কোন উপায়ই নেই।

মালদহ ঃ

সমস্যার সামগ্রিক রূপ, তার পূর্বাঙ্গ চিত্র সামনে না রেখে কাজ করলে হিতে বিপরীতই হয়। হয়েছেও তাই। রাজ্য সরকার এ জেলার মানুষকে বন্যার ভয়াবহ আক্রমণ থেকে রক্ষা ও জমিতে সেচের ব্যবস্থার জন্য মালিওর ও সম্বলপুরে দুটি বাঁধ নির্মাণ করছেন। কাজ অনেকটা এগিয়েও গেছে। তাতে ফলও হয়েছে আশাতীত। বন্যার জল থেকে শস্য রক্ষা পেয়েছে। সত্তর লক্ষ টাকার ধানও নাকি উৎপন্ন হয়েছে। মাঠ ভর্তি এখন রবিশস্য।

এ-বাঁধে একদল নিঃসন্দেহে লাভবান হয়েছে। আরেক দল হয়েছে সর্বহারা। বাঁধের পরিকল্পনাকারগণ বন্যার জল প্রতিরোধের অধিক কোন সমস্যা চিন্তাই করেন নি। জল নিকাশের সম্যক ব্যবস্থা না রেখে বাঁধের যে-ভাবে বিন্যাস তাঁরা করেছেন, তাতে জল আটকে গেছে তুলসীহাটা, রশিদাবাদ, ভিঙ্গোল, সাদলিচক, পারো, ইসলামপুর, সুলতাননগর প্রভৃতি গ্রামের বিরাট অঞ্চলে। বাস্তভিটা হারিয়েছে অনেকেই। পনের লক্ষ টাকার ভাদুই

● শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্য

ও আমন ধানের সর্বনাশ হয়েছে। গ্রামের মানুষ পড়েছে চরম খাদ্য-সঙ্কটের সম্মুখে। পশুর মুখের খাদ্যও বন্যার জলে ভেসে গেছে। অনাহারে এর মধ্যেই নাকি পনেরশ' গরু ও মহিষ মারা গেছে।

সেচমন্ত্রী শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্য এসেছিলেন। তিনি দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করে গেছেন। শোনা যাচ্ছে, প্রতিকারের জন্য দুটি মজা নদী—বারঘাসিয়া ও জালালকে চাঙ্গা করে তোলা হবে। এই নদী সংস্কারের কাজে হাত দেওয়া হবে আগামী বছর। বাঁধ নির্মাণের

ত্রুটিতে যাদের এত বড় সর্বনাশ হয়ে গেল, তাদের কিভাবে কতটা সাহায্য করা হবে, এখনও সরকার জানান নি। অবিলম্বে উপযুক্ত ক্ষতি-পূরণ না পেলে অধিকাংশ পরিবারই একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়বে। মজা নদীর সংস্কারের কাজে বিলম্ব হলে বাঁধে লাভ যেটুকু হয়েছে, ক্ষতির দিকটা ভারী হবে তার চাইতে ঢের বেশি।

• • •

গঙ্গার প্রলয় নাচনে মালদহের নাভিশ্বাস উঠেছে। নাচতে নাচতে উন্মত্তা গঙ্গার যেন তালভঙ্গ হয়ে পড়েছিল। তাল সামলাতে গিয়েই হয়তো সে পরিবর্তন করেছে —তার গতিধারা—সেইসঙ্গে উন্মাদনাও গেছে তার বেড়ে।

তার এই উন্মত্ত আক্রোশে কালিয়াচক ও মাণিকচক থানা বিপন্ন হয়ে পড়েছে। এ-দুটি থানার বহু জনপদ, হাট, বাজার, বিদ্যালয় এবং হাজার হাজার একর চাষের জমি গঙ্গা গ্রাস করে ফেলেছে। খাস মহলের জুনিয়ার হাইস্কুল, পরাণ-পুরের ৫২৭টি গৃহ, পঞ্চানন্দপুরের ১৩২টি গৃহ ও হামিদপুরের ২৮২টি গৃহ বিলীন হয়েছে গঙ্গাগর্ভে। বহু গ্রাম নিশ্চিহ্ন করে কলনাদিনী গঙ্গা এগিয়ে যাচ্ছে আরও ভেতরের দিকে।

নদী তার খেলার চিরন্তন নীতি অনুসরণ করে ভরাট করে তুলছে পরপার। ওপারেই প্রতিবেশি বিহার রাজ্য। এপারের সম্পদ ওপারে জুড়ে দিয়ে বাড়িয়ে তুলছে বিহারের কলেবর।

বিজ্ঞানের যুগে উন্মাদিনী নদীকে শৃঙ্খলিত করা, গতিপথ পাল্টে দিয়ে তাকে প্রতিনিবৃত্ত করা অসাধ্য ব্যাপার নয়। কিন্তু সে কাজ যেমন সময়-সাপেক্ষ, তেমনই তার জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত অর্থ। রাজ্য সরকারের সেচদপ্তর এই পরিকল্পনায় আদৌ হাত দেবেন কি না এবং এ-ব্যাপারে কেন্দ্রীয় দপ্তরের সাহায্য চাওয়া হয়েছে কি না, জানা যায় নি। নদীর ভাঙনের ফলে যারা জমি হারিয়েছে, তাদের জমি ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থাটা সরকার করতে পারেন না।

গঙ্গা এপারের জমি ওপারে তুলে দিয়েছে। সে চড়ায় অধিকার তাদেরই, যারা জমি হারিয়েছে। বিহার সরকার বেমালুম সে অধিকার অগ্রাহ্য করে বসেছেন। মালদহের মানুষ ভারতের নাগরিক। ভারতের যে-কোন অংশে তার সম্পত্তি বিস্তারে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। তবু কেন হারানো জমি তারা ফিরে পাবে না, আমরা বুঝে উঠতে পারছি নে। বিহার সরকারের এ-বেয়াড়াপনা সত্যি অস্বাভাবিক।

গঙ্গার ভাঙনে সর্বস্বান্ত মানুষের দল। তাদের অপরিসীম দুঃখের কাহিনী সবিনয়ে পেশ করা হয়েছে রাজ্য সেচ ও ভূমিরাজস্বমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রীর দরবারে। ডঃ কে এল রাও বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি সহানুভূতির সঙ্গে বিষয়টি বিচার করে বিহার সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করতে পারেন। পশ্চিম বাংলার মানুষের ন্যায্য এই দাবি বিহার সরকারের কাছে উত্থাপনের প্রাথমিক দায়িত্ব শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্যের। তিনি কতদূর এগিয়েছেন, আমরা জানি নে। পশ্চিম বাংলার আমলাদের ঢিমে তালে চলার নীতি সর্বজনবিদিত। শ্রীভট্টাচার্য নিজে আগ্রহী হয়ে বিষয়টি ত্বরান্বিত না করলে একেবারে তলিয়ে যাবে। গঙ্গা এপারে মাটি ভেঙে নিয়ে ওপারে চরের সৃষ্টি করেছে। আমলাদের ফাইলে সে মাটির কাহিনী একবার আবদ্ধ হলে আর কোনদিনই মুক্তি পাবে না।

বর্ধমান ঃ

আসানসোল কেবল বর্ধমানেরই অন্যতম প্রাণকেন্দ্র নয়—পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলার সঙ্গেও এই শিল্পাঞ্চলটির নাড়ীর যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। কিন্তু এই দুটি জেলায় আসানসোল থেকে যাতায়াতের সরাসরি কোন ব্যবস্থা নেই। আসানসোল থেকে পুরুলিয়ায় যেতে হলে পাঞ্চেৎ বাঁধ ঘুরে যেতে হয়। বিশ মাইল পথশ্রম লাঘবের জন্য বার্ণপুরের কাছে

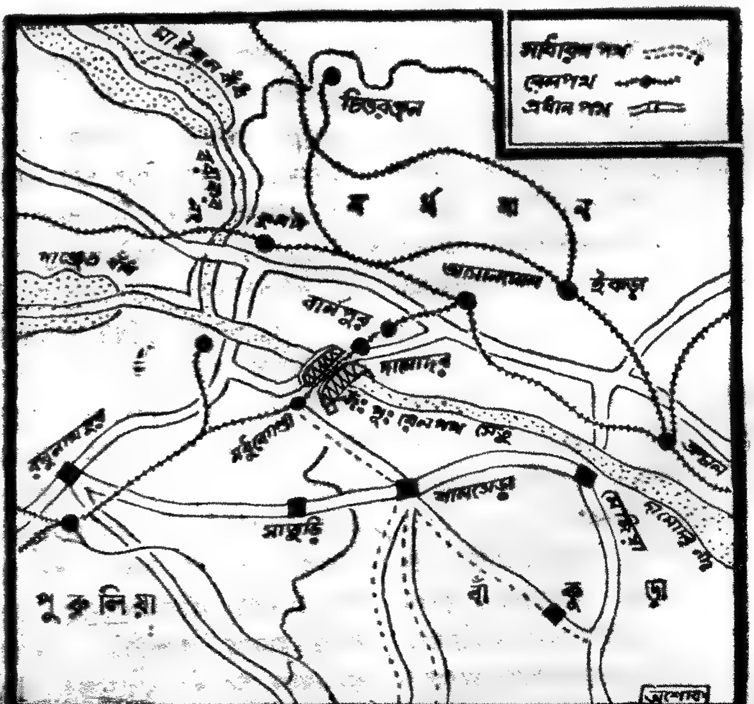

দামোদরের ওপর সেতুপথ নির্মাণের প্রস্তাব উঠেছে। এখানে রেল-কর্তৃপক্ষকে পরিবহনের সুবিধার জন্য একটি সেতু শীগ্‌গিরই নির্মাণ করতে হবে। এই রেলের সেতুর সঙ্গে একটি সড়ক জুড়ে দিলেই ঝামেলা চুকে যেতে পারে। এ-দাবি অত্যন্ত সমীচীন। এতে হ্রাস পাবে ব্যয়বাহুল্য। কাজটাও আমলাদের লালফিতা ডিঙিয়ে সমাধা হবে দ্রুতগতিতে। পশ্চিম বাংলা সরকারের করুণা হলেই—কৃপাপরবশ হয়ে তাঁরা রেলের কর্তামহলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিলেই প্রস্তাবিত রেলের সেতুর পাশ দিয়ে সেতুপথ হতে পারে।

এই সহজ, সরল যুক্তি, পূর্তমন্ত্রী শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত গ্রহণ করেন নি। সরকার রেলের সেতুর সঙ্গে সেতুপথ যুক্ত করতে নারাজ। পূর্তদপ্তর ঠিক করেছেন, চতুর্থ পরিকল্পনায় নিজেরাই আলাদা করে এখানে একটি সেতু-সড়ক এবং রাণীগঞ্জের মেজিয়ার কাছে দামোদরের ওপর আরেকটি সেতু নির্মাণের কথা বিবেচনা করছেন। সরকারের আশ্বাসবাণীতে আস্থা স্থাপনের তিক্ত অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে, তাঁরা এ-সংবাদে আশ্বস্ত হতে পারছেন না। চতুর্থ পরিকল্পনা এখনও চূড়ান্ত রূপ নেয় নি। যা' এখনও নেতাদের কল্পলোকে বিরাজ করছে তা পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করার আগেই কাজটা রেলের সঙ্গে মিলে-মিশে সুরু করতে কোনই বাধা ছিল না। দামোদরের বুকে সেতু নির্মাণের প্রয়োজন একবার স্বীকৃত হলে তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেরে ফেলাই ভাল। অযথা গড়িমসিকে সাধারণ মানুষ ভাঁওতার সামিল বলেই গণ্য করে।

* * *

নতুন ধান চাষী ঘরে তুলতে সুরু করেছে। ধান হয়েছেও ভাল। চাষীদের ধারণা, এবারে বিঘে প্রতি বার থেকে চৌদ্দ মণ ধান আসবে তাদের ঘরে। দুঃখও ঘুচবে কিছুটা।

চাষীর সে সুখের স্বপ্ন এর মধ্যেই অনেক ক্ষেত্রে মিলিয়ে গেছে। ধান তাকে বিক্রি করতে হচ্ছে জলের দরে। মেমারী বাজারে নতুন ধান কেনা-বেচা চলছে চোদ্দ টাকা করে। এক মণ ধানের চলতা ও ঈশ্বরবৃত্তি ছাড়াও মণ প্রতি দু' সের অধিক দিতে হচ্ছে। পাইকার ও মিলের এজেণ্টরা নতুন ধান ওজনে কম হওয়ার খেসারত আদায় করে নিচ্ছে। মেমারীর মত বড় বাজারে এখনও নির্দিষ্ট মূল্যে ধান কেনার কোন ব্যবস্থাই সরকার করেন নি।

* * *

বর্ধমান এখন অত্যন্ত উত্তপ্ত চঞ্চল। পুলিশ সেদিন ভারতরক্ষা আইনের

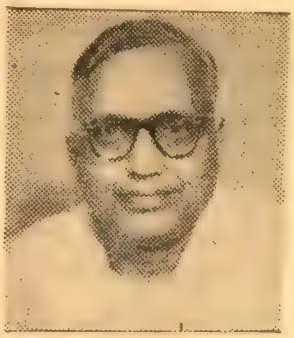

● শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

অধিকার কাজে লাগিয়ে শহরের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করে। এঁরা সকলেই বর্ধমানের নামজাদা মানুষ। শ্রীধনপতি দত্ত ছিলেন বর্ধমানের একজন পৌরপিতা। তিনি চালকল ও তেলকলের মালিক—বৈদ্যনাথ কাটরার প্রতিষ্ঠাতা। এ-হেন ধনপতি দত্তের গ্রেপ্তারে চাঞ্চল্য সৃষ্টি স্বাভাবিক।

একই রাত্রিতে মহাবীর রাইস মিলের শ্রীবাহাদুর সিং ভুতোরিয়া সহ পাঁচজন, বিজয় রাইস মিলের শ্রীরামদাস বাজাজ ও শ্রীললিত বাজাজ এবং মানকরের শংকর রাইস মিলের শ্রীশঙ্করমল সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

স্বাধীন ভারতে ভারতরক্ষা আইনের সৃষ্টি হয়েছিল বর্ণচোরা অসাধু ব্যবসায়ী, জবরদস্ত প্রকৃতির গুণ্ডা ও রাষ্ট্র-বিরোধীদের শায়েস্তা করার মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই। দেরিতে হলেও আইনের গতি সঠিকপথে চালিত হতে দেখে সাধারণ মানুষ খুশিই হয়েছে। আমরা আগেও বলেছি, মুনাফাবাজদের ফাটকাবাজি বন্ধ করার ক্ষমতা সরকারের হাতে রয়েছে। সরকার একটু শক্ত হলেই 'সাবাস! সাবাস!' রব তুলে সাধারণ মানুষও এগিয়ে আসবে। সাধারণের মনে তাতে যেমন সরকারের প্রতি আস্থা ফিরে আসবে, তেমনি সরকারের প্রশাসনযন্ত্রও ফিরে পাবে অপরিমেয় শক্তি।

নদীয়াঃ

পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায় গত ১১ই ডিসেম্বর রাণাঘাট শ্রীনাথপুরে নিখিল ভারত লাইসেনসিয়েট চিকিৎসক সমিতির বঙ্গীয় প্রাদেশিক শাখার উনবিংশ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী ভাষণ প্রসঙ্গে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারী সিদ্ধান্তের কথা জানান সম্মেলনে সমাগত চিকিৎসগণকে।

পল্লী অঞ্চলে চিকিৎসকের অভাব মেটাবার জন্য লাইসেনসিয়েট মেডিক্যাল কোর্স ও কনডেনসড এম-বি-বি-এস কোর্স পুনঃপ্রবর্তন এবং চিকিৎসকগণকে গ্রামাঞ্চলে যেতে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে 'গ্রাম ভাতা' প্রচলনের পরিকল্পনা—এ দুটো সরকারী সিদ্ধান্তই বাস্তব-বুদ্ধিসম্মত ও সুচিন্তিত সন্দেহ নেই। স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে কার্যভার গ্রহণের পর শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় রাজ্যের চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য প্রশংসনীয় কয়েকটি কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। উল্লিখিত দুটি সিদ্ধান্তও তাঁর কৃতিত্বের যথার্থ পরিচায়ক। আশা করা যায়, অবিলম্বে সরকারী সিদ্ধান্ত দুটি কার্যকরী করা হবে।

রঙ্গজগৎ

ভারতে আন্তর্জাতিক উৎসবে ছবি বিচারের মাপকাঠি

ভারতে তৃতীয় আন্তর্জাতিক উৎসবের ছবি বাছাইয়ের জন্য গঠিত স্ক্রিনিং কমিটীর সভাপতি শ্রী জি ডি খোসলা বলেছেন, শুধু শিল্প ও সৌন্দর্য-বোধের বিচারেই উৎসবে প্রদর্শনের জন্য ছবি বাছাই করা হবে। এই সিদ্ধান্তে উৎসবের চরিত্র সম্পর্কে এতদিনে কিছুটা অনুমান করা সম্ভব হবে। আমরা পূর্বেই বলেছি, প্রত্যেক আন্তর্জাতিক উৎসবের একটা লক্ষ্য ও আদর্শ থাকে। আমাদের উৎসব যে আমলাতন্ত্র পরিচালিত আদর্শহীন মেলাতে পরিণত হবে সেরূপ আশঙ্কা আমরা পূর্বেই করেছিলাম। তাই আমরা উৎসবের আদর্শবাণীর প্রশ্ন তুলেছিলাম। উৎসব কর্তৃপক্ষ হয়তো এরূপ প্রশ্নের জন্যই ঘোষণা করেছিলেন উৎসবের আদর্শ-বাণী 'বসুধৈব কুটুম্বকম'। সত্যিই যদি সারা বিশ্বকে আপন করার আদর্শে আমাদের উৎসব পরিচালিত হয়, তবে ছবি বাছাই সেই আদর্শবাণীর কষ্টিপাথরে হয় না কেন? ছবির বিষয়বস্তুকে বাদ দিয়ে সৌন্দর্য ও শিল্পকে একমাত্র মাপকাঠি করলে কি পরিস্থিতি হবে স্ক্রিনিং কমিটী হয়তো ভাবতে পারেন নি। সৌন্দর্য ও শিল্পের দিক থেকে 'হিরোসিমা মন আমোর' 'মাদার জোয়ান' বা 'সাইলেন্স'-এর মত ছবি যে প্রথম শ্রেণীর এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। অথচ একমাত্র বিষয়বস্তুর জন্য প্রথমোক্ত দুটি ছবি ভারত সরকারের বিচারে ভারতে প্রদর্শন নিষিদ্ধ, আর তৃতীয়টির তো কথাই তোলা যাবে না। কারণ সে ছবিতে কয়েকটি যৌন-সঙ্গমের দৃশ্য আছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এ ছবিগুলি নিয়ে বিতর্ক আছে। তবে ভারতের মত কোন দেশে প্রদর্শন নিষিদ্ধ হয় নি।

বিষয়বস্তুকে বাদ দিয়ে একমাত্র শিল্প ও সৌন্দর্য যদি বিচারের মাপকাঠি হয়, তা হলে 'বসুধৈব কুটুম্বকম'কে আদর্শবাণী করার কি প্রয়োজন ছিল। সৌন্দর্যের আদর্শ প্রকাশক কোন বাণীকে গ্রহণ করলেই চলতো। এশিয়া মহাদেশে গোষ্ঠি-নিরপেক্ষ দেশে চলচ্চিত্র উৎসবের তাৎপর্যই বা কি থাকলো। —সুজন

● উৎপল দত্ত—নট ও নাট্যকার

চিত্র আলোচনা

সুভা: দেবতার গ্রাস
(সাজ ও আওয়াজ)

ছোট গল্পের যেমন আলাদা রূপ, রস ও মেজাজ আছে, ছোট ছবিরও স্বতন্ত্র একটা মেজাজ আছে। কিছুটা হালকা গতিতে ছোট পরিসরে সে অনেক কথা জানিয়ে যায়। ঘরের জানলা খুললে যেমন হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে চোখে-মনে একটা নতুন কিছু অনুভব করা যায়; ক্ষণেক দাঁড়িয়ে বাইরের অনেক কিছু দেখা যায়, তেমনি খণ্ডচিত্রের একটা স্বতন্ত্র আনন্দ আছে, স্বতন্ত্র রসোপলব্ধি আছে। বিদেশে অনেক চিত্রস্রষ্টা খণ্ডচিত্র নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। এদেশে প্রথম সত্যজিৎ রায় পথ দেখিয়েছেন 'তিন কন্যায়'। তরুণ পরিচালক পার্থপ্রতিম চৌধুরী এই নতুনত্বের পথে অগ্রসর হয়েছেন। ছবিটির নির্মাণপর্ব থেকে আমার মত অনেকে বিশেষ ঔৎসুক্য নিয়ে প্রতীক্ষা করেছে। এরূপ নতুনত্বের পথে অগ্রসর হবার জন্য প্রযোজক ও পরিচালক অভিনন্দনীয়।

একটি গল্প 'সুভা', আর একটি বহুপরিচিত কবিতা 'দেবতার গ্রাস'। দুটিই রবীন্দ্রনাথের রচিত। সুভা ও দেবতার গ্রাস-এর দৃষ্টিকোণ স্বতন্ত্র হলেও মানবিক আবেদনে, প্রাকৃতিক পটভূমিকায় এবং করুণ রসে ঐকতানের মত একই সুরে বাঁধা। সুভার করুণ সুর প্রকৃতির কোলে লালিতা এক মূক কন্যার জন্য বেদনাবোধে অনুভূতির একটা দিক খুলে দেয়, দেবতার গ্রাসের রাখাল মনে এক প্রচণ্ড আঘাত দিয়ে ধর্মান্ধতা ও সংস্কারের বন্ধন মুক্তির আবেদন জানায়।

সুভাষিণী পাড়ার সবার কাছে সুভা। নামের অর্থ যাই হোক, মেয়েটি কালা-বোবা; একমাত্র বাবা ছাড়া কারো সহানুভূতি সে পায় নি। আর পেয়েছে পাড়ার এক ছেলে প্রতাপের কাছে। নদীর ধারে প্রতাপের মাছ ধরার

সাক্ষী সে, প্রকৃতির সঙ্গে তার মিতালি। পাড়ার লোকের কথার জ্বালায় বাবা তার বিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ফুলশয্যার রাতেই স্বামী তাকে পরিত্যাগ করে। তার নীরব আকৃতি স্বামীর মনে রেখাপাত করে নি। আবার সে ফিরে আসে প্রকৃতির কোলে।

এখানে রূপায়ণ-রীতির দিক থেকে পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের রীতি অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন। সময় সময় তিনি সার্থকও হয়েছেন। দুইখণ্ড ছবির মধ্যে তুলনায় 'সুভা' যথার্থ সার্থক। এখানে ব্যঞ্জনায় ও অভিনয়ে ছবিটি রসোত্তীর্ণ বলা যায়। কিন্তু প্রতীক ব্যবহার কিছুটা আতিশয্যপূর্ণ। শব্দের প্রয়োগেও অপরিমিতি দেখা যায়। শব্দ ও বিন্যাসের দিক থেকে সংযত হলে ছবিটি আরো বেশি সার্থক হতে পারতো। তথাপি 'সুভা'র নিঃসঙ্গতা ফুটিয়ে তুলে ছবিটি আপন বৈশিষ্ট্যে মনে রেখাপাত করে।

সুভার ভূমিকায় শমিলা ঠাকুর অভিব্যক্তির দিক থেকে সার্থক; সাজসজ্জায় গেঁয়োভাবটি আরো ফুটিয়ে তুলতে পারলে চরিত্রটি বেশি আবেদন সৃষ্টি করতে পারতো। সুভার বাবার চরিত্রে কালী ব্যানার্জী যথাযথ। অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন লিলি চক্রবর্তী, অনুভা গুপ্তা, গীতা দে, যতীন্দ্র ভট্টাচার্য, বঙ্কিম ঘোষ, নিভাননী দেবী প্রমুখ।

'দেবতার গ্রাস'-এর কাহিনী কারো অজানা নয়। এখানে পরিচালক ভূমিকা প্রকাশের সময় ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর কাহিনী বিন্যাসের লক্ষ্য প্রায় প্রকাশ করেছেন। সেভাবে তিনি বিভিন্ন মানসিক গঠনের প্রকাশক চরিত্র হাজির করেছেন। ত্রিশূল-ধারীকে বিভিন্নভাবে দেখানো, নৌকোর আরোহীদের নির্বোধ চেহারাগুলি, মৈত্র মহাশয়ের একঘেয়ে সুরে সেই সুদূর অতীতের লঙ্কাকাণ্ড পাঠ, তার সঙ্গে রাখালের নামতা মুখস্থ বলা ইত্যাদি অত্যন্ত সুন্দর কল্পনা। কিন্তু মেলার যথাযথ পরিবেশ ফুটিয়ে তুলতে এবং রাখালকে জলে ফেলে দেবার দৃশ্যটি তিনি যথার্থভাবে প্রকাশ করতে পারেন নি।

এই খণ্ডে সুচিন্তিতভাবে তিনি শিল্পী নির্বাচন করতে পারেন নি মৈত্র মহাশয় যা হোক, মোক্ষদারূপে রুমা গুহঠাকুরতাকে স্থবির ও গেঁয়ো লোকগুলির পাশে তাদের একজন বলে গ্রহণ করা যায় নি। তিনি বলনে-চলনে যতটা মার্জিত ততটা মোক্ষদা হতে পারেন নি। তাই রাখালের জন্য তার মমতা ও চরম মুহূর্তে হাহাকার কৃত্রিম মনে হয়েছে। এই খণ্ডে সর্বাধিক প্রশংসা প্রাপ্য শ্রীমান সৌমিত্রের।

দুই খণ্ডে, বিশেষ করে 'দেবতার গ্রাস' খণ্ডে সম্পাদনার ত্রুটি রয়েছে। সম্পাদনার ত্রুটির জন্য দ্বিতীয় খণ্ড যথাযথ আবেগ ও করুণ রস সৃষ্টি করতে পারে নি।

ছবির চিত্রধারক দীনেন গুপ্তের ক্যামেরার কাজ অত্যন্ত উচ্চমানের। বিশেষ করে সুভা খণ্ডে তিনি যে

● 'দুজ কা চাঁদ' ছবির একটি নাচের দৃশ্যে সরোজা দেবী সহ অন্যান্য নৃত্যশিল্পিগণ

কাজ করেছেন তাতে ছবির একটা কোমল মেজাজ ও নিঃসঙ্গতা ফুটে উঠেছে। গ্রাম্যতা ফুটিয়ে তোলার কাজে তাঁর দক্ষতা বিশেষ প্রশংসনীয়। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডে মুখরেখা চিত্রণে তিনি যতটা সার্থক, প্রকৃতির ভাবান্তর প্রকাশে তিনি ততটা সার্থক হতে পারেন নি।

দু-খণ্ড ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন ভি বালসারা। কয়েক বছর আগে তাঁর রচিত 'দেবতার গ্রাস'-এর সিম্ফনী সঙ্গীতে ঐকতান শুনে আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম। হয়তো সেই সঙ্গীত তাঁকে এই চিত্র রূপায়ণে অনুপ্রাণিত করেছে।

'সুভা ও দেবতার গ্রাস'-এর পরিচয়লিপি বর্ণনা সুন্দর রুচি-বোধের পরিচায়ক। বাংলা চলচ্চিত্রে সৎপ্রচেষ্টা হিসাবে এদুটি ছবি সকলের সমর্থন লাভ করা উচিত।

একটি বিদেশী ছবি

'দি ফেবুলাস ওয়ার্ল্ড অব জুলেভেন'

ছবিটি ইতিপূর্বে একবার কলকাতায় প্রদর্শিত হয়েছে। পুনর্মুক্তি লাভ করেছে নিউ এম্পায়ারে। ছবিটি ছেলে থেকে বড়ো সকলের কাছে আকর্ষণীয়। বৈজ্ঞানিক রোমাঞ্চ গল্পে, গল্পের শিকার, জলের নীচের অদ্ভুত জলচর প্রাণী এবং জাহাজের ওপর বিস্ময়কর অভিজ্ঞতায় এই কাহিনী দর্শকদের মুগ্ধ করে রাখে। জুলেভের্ন-এর রচনাকাল শতবর্ষ পূর্বে, অথচ তাঁর রচনায় বেলুন থেকে সাবমেরিন এবং এমন সব বৈজ্ঞানিক বিষয় স্থান পেয়েছে যা আজকের দিনে বাস্তব। এই বিস্ময়কর রচনার কাহিনী গঠিত হয়েছে দুজন বৈজ্ঞানিক ও কয়েকজন দস্যুকে নিয়ে। দস্যুরা বৈজ্ঞানিকদের হ... করে এনেছিল তাদের স্বার্থে কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিভাবে তাদের সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছিল সেটা ছবিতে দেখানো হয়েছে। ছবির মর্মবাণী—মানবতার সেবায় বিজ্ঞান আশীর্বাদ, মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষীদের স্বার্থে হয়ে ওঠে অভিশাপ। বিজ্ঞানকে স্বার্থান্বেষীরা যতই অপব্যবহার করুক, একদিন তাদের বিনাশ হবে, বিজ্ঞান হবে জনগণের কল্যাণকর।

ছবির চিত্রগ্রহণ ও টেকনিক্যাল কাজ অত্যন্ত নৈপুণ্যপূর্ণ। এই ছবিটি সকলের দেখা উচিত।

● জিড্রা রিটেনবার্জস
সোভিয়েট ইউনিয়নের খ্যাতা চলচ্চিত্র অভিনেত্রী।

নাটকের কথা

সীমান্তিক এর বার্ষিক সভা

গত ৬ই ডিসেম্বর গণনাট্য সঙ্ঘের 'সীমান্তিক' শাখার বার্ষিক সভা বাগুইআটিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত বছরের রিপোর্ট ও হিসাব পেশ করা হয়। রিপোর্টে বাংলার নাট্য আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি এবং প্রতিবন্ধকতার কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে যে সকল সংগঠন সৎ নাট্যপ্রচেষ্টা চালিয়েছেন এবং প্রগতিমূলক নাটক মঞ্চস্থ করেছেন তাঁদের অভিনন্দন জানান হয়। বার্ষিক সভা শেষে 'নাটকের ধারা' বিষয়ে এক আলোচনা হয়। রবীন্দ্রসঙ্গীত ও গণনাট্য সঙ্গীতে সভার কাজ শেষ হয়।

দিল্লীতে সেক্সপীয়র সেমিনার

সাহিত্য একাডেমি এবং সঙ্গীত-নাটক একাডেমির যুক্ত উদ্যোগে দিল্লীতে সেক্সপীয়র সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পর চারদিন সেক্সপীয়রের নাটক সম্পর্কে আলোচনা হয়। আলোচ্য বিষয় ছিল (১) ভারতীয় মনে সেক্সপীয়রের ছায়া, (২) সেক্সপীয়রের শিক্ষা, (৩) সেক্সপীয়র নাটকের প্রযোজনা, (৪) সেক্সপীয়র নাটকের অনুবাদ।

আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন মুলক্‌রাজ আনন্দ, আর কে নারায়ণ, অধ্যাপক আর কে দাশগুপ্ত, এ বোস, কে স্বামীনাথন, উৎপল দত্ত, এব্রাহিম এলকাজী, মৃণালিনী সরাভাই, শ্যামলাল, হুমায়ুন কবীর, অধ্যাপক মদনমোহন ভাল্লা।

স্টুডিও খবর

* ভারতের হিন্দী ভাষাভাষী দর্শকদের উপভোগের জন্য সত্যজিৎ রায়ের 'কাপুরুষ মহাপুরুষ' ছবিটিকে হিন্দী সংলাপযুক্ত করার ব্যবস্থা হচ্ছে। এই ব্যবস্থা এবং সর্বভারতে ও বিদেশে প্রদর্শনের স্বত্ব ক্রয় করেছেন তারাচাঁদ বরজাতিয়ার রাজশ্রী পিকচার্স। দুই খণ্ডে এই ছবিটির দৈর্ঘ্য হবে ২৪ হাজার ফুট।

* মহেন্দ্র গুপ্ত প্রযোজিত ও অসিত সেন পরিচালিত 'তৃষ্ণা' ছবিটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ছবিটি মুক্তি প্রতীক্ষায় রয়েছে। এমিলি ব্রন্টির 'উইদারিং হাইটস' উপন্যাস অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন বিজন ভট্টাচার্য। সুর দিয়েছেন শ্যামল মিত্র। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন জ্যোৎস্না বিশ্বাস, শেখর চ্যাটার্জী, বিজন ভট্টাচার্য, শ্যামল ঘোষাল, রুমা গুহঠাকুরতা, সুমিতা সান্যাল।

সঙ্গীত কথা

সুরের সান্ধ্য-আসর

গত ৬ই ডিসেম্বর—রবিবার পার্ক এভিনিউস্থ জনাব গোলাম জব্বারের বাসভবনে বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং রসজ্ঞ শিল্পিবৃন্দের একটি সান্ধ্য-আসর আহূত হয়। আসর ঘরোয়া হলেও, সে-আসরে অভ্যাগতদের সমাহারে অপ্রাতুলতার

● পণ্ডিত নেহরুর জন্মদিনে মস্কোয় ফ্রেণ্ডশিপ হাউসে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এক সংস্কৃতি অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করছে।

● সুরবাহারে আলাপরতা নবাবজাদী বেগম সাইদা জব্বার

কোনো লক্ষণ ছিল না। সব মিলিয়ে সেদিনের পরিবেশ ছিল শান্ত এবং সমাহিত। সেখানে গুরুভার সুরবাহারে প্রথমত শ্যামকল্যাণ এবং পরে বেহাগ রাগে আলাপ করেন নবাবজাদী বেগম সাইদা জব্বার। তারপর আবার সেতারের মাধ্যমেও তিনি যথাক্রমে ছায়ানট এবং পিলু রাগে বিলম্বিত ও দ্রুত লয়ের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন ক'রে প্রাণ স্পর্শ করেন প্রতিজনের। অত্যন্ত রেওয়াজী হাত বেগম জব্বারের। একাধারে সেতার এবং সুরবাহারে তিনি যে অশেষ নৈপুণ্যের অধিকারী —তা সেদিনের সান্ধ্য-আসরে তিনি প্রমাণ করেছেন। পর্দার অন্তরালে থেকে প্রায় ২৫ বৎসর নীরবে সাধনা করেছেন তিনি।

বেগম জব্বারের পর সরোদে অংশ গ্রহণ গ্রহণ করেন লক্ষ্ণৌ-এর কীতিমান ওস্তাদ ওমর খাঁ। তিনি প্রথমে পুরিয়া এবং পরে খাম্বাজ রাগে বিলম্বিত ও দ্রুত লয়ের সুরজাল বিস্তার করেন নিজস্ব ঘরোয়ানার শুদ্ধ ভঙ্গীতে। অতি অনবদ্য তাঁর লয়, তান এবং বিস্তার—যা শ্রবণান্তেও শ্রোতার মনে অনুরণন দীর্ঘকাল জেগে থাকতে বাধ্য। পরিশেষে বেগম জব্বার এবং ওস্তাদ ওমর খাঁ সেতারে-সরোদে দ্বৈতভাবে তিলক কামোদ রাগ পরিবেশন ক'রে শ্রোতৃবৃন্দকে চমৎকৃত করেন আরও। উভয়ের সঙ্গেই তবলায় সংগত করেন শ্রুতকীতি ওস্তাদ কেরামতউল্লা খান। তাঁর অনবদ্য শুদ্ধ সংগত কোনো প্রশংসার অপেক্ষা রাখে না।

গিরীন চক্রবর্তী প্রসঙ্গে

সংগীতজগতে গিরীন চক্রবর্তীর নাম কার-ই বা অজানা। শহরে আর শহর ছাড়িয়ে গ্রামের কোণ পর্যন্ত তাঁর গানের গতি। তাঁর এই জনপ্রিয়তা তাকে অভিমানী করে নি।

ঢাকায় জন্ম গিরীন চক্রবর্তীর—আযৌবন কাটিয়েছেন সেখানেই। ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর স্নেহাস্পদা ছিলেন তাঁর মা—মায়ের কাছেই শিশুকাল থেকে তাঁর সংগীতের শিক্ষা সুরু। তারপর একটু বড়ো হতে সুরেন ঠাকুরের কাছে তাঁর সঙ্গীত বিদ্যাচর্চার গোড়াপত্তন হলো।

ঢাকায় কলেজে যখন পড়ছেন—তখন থেকেই তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ছিল ছোটোখাটো অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। দার্জিলিঙ ভ্রমণে গিয়ে দার্জিলিঙ টাউনহলে কাজী নজরুল ইসলামের গান শুনে উদ্দীপ্ত হলেন, পরিচয় হলো স্বনামখ্যাত কণ্ঠশিল্পী আব্বাস উদ্দীন আহম্মদের সঙ্গে। আব্বাসের পরিচিতি নিয়ে দার্জিলিঙের কয়েকটি আসরে সংগীত পরিবেশন করলেন তিনি। ঢাকা আর ত্রিপুরার চেয়ে অনেক বেশি খ্যাতি ও প্রশংসা দার্জিলিঙ তাঁর ওপর বর্ষণ করলো। আর সম্ভবত এই সূত্রেই তাঁর জীবনে প্রথম রেকর্ডিং-এর সুযোগ এলো।

সুবিখ্যাত গ্রামোফোন কোম্পানী এইচ-এম-ভি সে সময় বাংলার অঞ্চলে অঞ্চলে সম্ভাবনাপূর্ণ নতুন কণ্ঠের অনুসন্ধান করছিলো—গিরীনবাবু মনোনীত ও আমন্ত্রিত হলেন—কথা হলো ছ'টি গান একসঙ্গে রেকর্ড করার।

কিন্তু যথারীতি রিহার্সাল-এর পর গ্রামোফোন কোম্পানীর প্রতিনিধি শ্রীহেমচন্দ্র গুহ মন্তব্য করলেন, তাঁর কণ্ঠে কৃষ্ণচন্দ্র দে-র (কানা কেষ্ট) অনুকৃতি স্পষ্ট, সুতরাং মৌলিকত্ব অর্জনের জন্য অনুশীলন আবশ্যক। ছ'মাস পর,—যদিও ইতিমধ্যে গিরীনবাবুর কণ্ঠ বিন্দুমাত্র পরিবর্তিত হয় নি—তিনি সন্তুষ্ট হলেন এবং গান রেকর্ডিং হ'লো। অল্পদিনের মধ্যেই অকুণ্ঠ স্বীকৃতি ও প্রশংসা শ্রোতৃসমাজে উচ্ছ্সিত হলো। 'বাজিয়ে সর্বনাশী বাঁশের বাঁশি'—এই গানটি তো মুখে মুখে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিলো।

গোটা বারো গান রেকর্ড করা হয়—তার মধ্যে ছিলো পল্লীসংগীত, গজল, কীর্তন আর আধুনিক গীত।

প্রসিদ্ধা কীর্তন-গায়িকা হরিমতী দেবী ও তাঁর সম্প্রদায়ের সঙ্গে গিরীনবাবুর এই সময়ে ঘনিষ্ঠতা হয়।

১৯৩৪-৩৫ পর্যন্ত এই গেল তাঁর জীবনের প্রথম অধ্যায়।

পিতৃ-প্রতিশ্রুতি ছিলো সংগীত সাধনার পক্ষে সর্বপ্রকার সাহায্যের—কিন্তু গিরীনবাবু ক্রমশই সেদিক দিয়ে আশাহত বোধ করছিলেন। তার ওপর বন্ধুমহলে বিশ্রী মনান্তর ঘটলো। তাই গিরীনবাবু বিক্ষুব্ধ চিত্তে ঢাকা বর্জনের সংকল্প নিয়ে কলকাতায় এসে পৌঁছলেন—নিঃসম্বল, পথবাসী হ'য়ে। আশ্রয় পেলেন বরদা গুহ প্রমুখ তৎকালীন খ্যাতনামা শিল্পীদের আড্ডায়।

খুচরো উপার্জনও হতে লাগলো কিছু কিছু—মেগাফোন, হিন্দুস্থান প্রভৃতি গ্রামোফোন কোম্পানীগুলিতে ট্রেনার হিসাবে কাজ ক'রে।

ইতিমধ্যে শচীন দেববর্মণ খ্যাতির শিখরে উঠছিলেন—গিরীনবাবুর সঙ্গে স্বভাবতই তাঁর প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হলো।

কলকাতায় থাকার সময় রীতিমতো সংগীতের শিক্ষানবীশী গ্রহণ করলেন গিরীনবাবু ওস্তাদ জামিরুদ্দীন খাঁয়ের কাছে—যিনি 'ঠুংরী কা বাদশা' নামে পরিচিত ছিলেন।

এইচ-এম-ভি-তে স্বনামে এবং টুইন কোম্পানীতে 'সুজন মাঝি' নাম নিয়ে নিয়মিত তখন রেকর্ডিং চলছে তাঁর গানের। আর 'সুজনের গান' নামে তাঁর স্বরচিত ও সযত্ন-সংগৃহীত পল্লীগীতিকার সংকলনও প্রকাশিত হয় তখন। সে বইয়ের ভূমিকা লিখতে গিয়ে স্বভাবসিদ্ধ আবেগে নজরুল বলেছেন—'শ্রীমান গিরীন চক্রবর্তী সংগীতশিল্পিরূপেই বিশেষ ভাবে পরিচিত। এই পরিচিতির ঊর্ধ্বে তাঁর যে নিবিশেষ রূপ, সেখানে তিনি কবি। পল্লীসংগীতের প্রতি তাঁর প্রীতি —তিনি নিজে পল্লী-কবি ব'লে। ভুঁই-চাঁপার মালা-পরা ভুঁইমালির মেয়ের মত তাঁর কবিতায় নিরাভরণ রূপ--- পল্লীমেয়ের মত এর ছন্দ ও গতি স্বচ্ছন্দ।'

স্নেহভাজনের প্রতি প্রীতির অনুরঞ্জন মাত্র নয়, এ প্রশংসা যে অকপট—গানগুলি পড়লে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। গিরীনবাবুর কবিকল্পনার মাধুর্য যেন সহজভাবে উপচে পড়ছে কয়েকটি ছত্রের মধ্যে:

'শালি-ধানের শ্যামলা-বনে
  হৈলদা-পঙখী ডাকে,
চিকমিকাইয়া হাসে রে চান্
  সর্ষা-খেতের ফাঁকে।
আরে, সোনালি রূপালি রঙ্গে
  রাঙ্গা হৈল নদী,
  মিতালি পাতাইতাম মুই মনের
  মিতা পাইতাম যদি রে,
আরে, ঝিলমিলাইয়া ঝালর-পানি
  নাচে থৈয়া থিয়া।'---

কাজী নজরুলের সঙ্গে পরিচিতির পটভূমি ছিলো 'সংগীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা' নামের পত্রিকাখানি—এতে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের বহু গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হ'য়েছিল। এই পত্রিকায় গিরীনবাবুর রচনাও প্রকাশিত হয়েছে। সেই সূত্রেই আলাপ—পরে ঘনিষ্ঠতা; গিরীনবাবু তাঁর একদা-স্বপ্নের-আকাঙ্ক্ষার লোকটির অকৃত্রিম স্নেহ লাভ ক'রে ধন্য হয়েছেন। তাঁর প্রতি নজরুলের প্রীতি ও আস্থা কতো গভীর ছিলো, তার একটি নমুনা:

'নদী, এই মিনতি তোমার কাছে' গানটি নজরুল রচনা করার পর গিরীনবাবু গানটির ভাষা সম্বন্ধে আপত্তি করেন। নজরুল নির্দ্বিধ হ'য়ে তাঁর উপরে ভার দিয়ে দেন ইচ্ছামতো 'বাঙাল' ভাষায় গানটির কথা ও প্রয়োজন মতো ছন্দ পরিবর্তন ক'রে নিতে।

নজরুলের বিশ্বাসের অমর্যাদা হয় নি কখনো—গিরীনবাবুর প্রাণঢালা নজরুল-গীতি যিনি শুনেছেন, তিনিই জানেন। 'নারী', 'বিদ্রোহী', 'শিকল পরা ছল', 'কারার ঐ লৌহকপাট', 'তোরা সব জয়ধ্বনি কর' প্রভৃতি বিখ্যাত নজরুল-গীতি তার প্রমাণ।

চলচ্চিত্র-জগতে তাঁকে টেনে আনেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব গিরীনবাবু প্রথম নিলেন শৈলজানন্দের সফল ছবি 'বন্দী'তে। সাত-আটটি ছবিতে তিনি কাজ করেন—বিশেষ উল্লেখযোগ্য তার মধ্যে 'অভিনয় নয়' এবং 'বন্দী'র সুপারহিট গানগুলি।

এই সময়েই নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের আগ্রহে বেতারে তিনি নিয়মিত সংগীত পরিবেশন করেছিলেন।

● গিরীন চক্রবর্তী

১৯৪২ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন কর্মপ্রবাহে কাটলো। তারপর একদিন চরম অসুস্থতার দুঃসহ ছোবল এসে পড়লো প্রিয়জন নজরুলের উপর। অ ছাড়া 'টুইনে'র প্রতিনিধিত্বও সামান্য কারণে ত্যাগ করতে হলো তাঁকে।

দেহমনে পরিশ্রান্ত গিরীনবাবু কলকাতা ছেড়ে ১৯৪৪-এ চলে গেলেন ঢাকায় নতুন কর্ম নিয়ে। কিন্তু সেখানেও বেশিদিন নয়। দেশভাগ—বাস্তত্যাগ—গিরীনবাবু কলকাতায় পুনর্বার ফিরে এলেন।

স্থায়ী আবাস এখন টালিগঞ্জে এম-এন-সেন লেনে—মনোমত তপোবনোপম এক পরিবেশ গ'ড়ে নিয়েছেন চারপাশে। কর্মপরিচয়—'বেঙ্গল মিউজিক কলেজ ফর উইমেন'-এ অধ্যাপনা। বর্তমান বৎসরে বিশ্ববিদ্যালায়িক সংগীত-পরীক্ষক এবং পেপার সেটার পদে বৃত হয়েছেন।

পল্লীগীতি সম্বন্ধে ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের সৃজ্যমান গবেষণায় তিনি সক্রিয় অংশ নিচ্ছেন।

কবিপ্রাণ এই কণ্ঠশিল্পী তাঁর জীবনে, নজরুলের ভাষায় 'নিজেকে ফাঁকি দেন নি, যা নন তা হতে চান নি'—আর এতেই তিনি সার্থক হয়ে আছেন: এই কথাই মনে হ'লো তাঁর সুন্দর সঙ্গ লাভ ক'রে কৃতার্থ হ'য়ে ফেরার সময়। —বীথিকা ঘোষ

নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী

দেবনারায়ণ গুপ্ত

॥ ছাপ্পান্ন ॥

সত্য বই মিথ্যা বলিব না

আশু বোস। কৌতুক-অভিনেতা হিসেবে এই নামটি চিহ্নিত হয়ে আছে রঙ্গজগতে।

কর্পোরেশন-এ ওয়াটার ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টে কাজ করতেন। শেষ জীবনে সামান্য কিছুদিন থিয়েটারকে পেশারূপে গ্রহণ করলেও, জীবনের বেশির ভাগ সময় অবৈতনিক (অ্যামেচার) অভিনেতারূপে কাজ করে গেছেন। অভিনয়ের ব্যাপারে অদম্য উৎসাহ আর নিষ্ঠা ছিল আশুবাবুর।

দর্শকেরা তাঁকে যেমন কৌতুক-অভিনেতারূপে জানতেন, তেমনি ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি ছিলেন সুরসিক, কৌতুকপ্রিয়।

সবসময়ে ফিট্‌ফাট্‌। আদ্ধির গিলে করা পাঞ্জাবী। একটু চওড়া কালাপাড় দেশী কোঁচান ধুতি, পায়ে বার্নিশ করা পাম্পস্যু। হাতের আঙুলে নানারকমের পাথর বসানো আংটি। একটি-আধটি নয়—দশ আঙুলে অন্তত আটটি। তা ছাড়া সোনার চেন দেওয়া বোতাম। এ ছাড়া সবসময়ে মুখে থাকতো সুগন্ধি জর্দাপান।

কর্পোরেশনের ওয়াটার ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের উড়িষ্যাবাসী কর্মীদের সঙ্গে কাজ করে, আশুবাবু উড়িয়া ভাষাটি বেশ ভালভাবেই রপ্ত করেছিলেন। উড়িয়া ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতেন। কয়েকটি নাটকে উড়িষ্যাবাসীর ভূমিকায় তিনি যে অভিনয় করে গেছেন, তা আজও নাট্যামোদীদের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে।

থিয়েটারের ভেতরে সকলেই তাঁকে পরিহাস করে রায়বাহাদুর বলে ডাকতেন। ইদানীং আর আশুদা বা আশুবাবু বলে ডাকলে উত্তর দিতেন না। রায়বাহাদুর বলে ডাকলে তবে সাড়া মিলতো।

একদিন সন্ধ্যায় রঙমহলের বুকিং অফিসে বসে আমরা গল্প করছি, এমন সময় হেলেদুলে আশুবাবু এসে ঢুকলেন। তারপর আমার সামনে এসে ডান হাতটা কপালে ঠেকিয়ে বললেন: Good evening Madam!

—ভুল হোল রায়বাহাদুর।

—Yes, slip of tongue. Excuse me.

কথা ক'টি বলেই সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে পানজর্দার কৌটটা আমার দিকে এগিয়ে ধরলেন। স্বর্গত অভিনেতা প্রফুল্ল দাস (হাজুবাবু) ছিলেন আমার পাশে। তিনি বললেন: ওটা তোমার slip of tongue নয় রায়বাহাদুর। ওটা তোমার অভ্যাস। মিস্টারদের চেয়ে ম্যাডামদেরই তুমি বেশির ভাগ সময়ে Good evening করে থাকো কিনা, তাই—

হাজুবাবুর কথার উত্তরে একটু এ্যাক্টিং-এর ভঙ্গিতেই আশুবাবু বললেন: সত্য বই মিথ্যা বলিব না। ম্যাডামদের একটু বেশি সমীহ করেই চলি। কারণ নাটক ত' ওঁদের নিয়েই।

আশুবাবুর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আমি বললাম: কেন আপনিই বা কম কিসে?

—অনেক কম। আমরা কমা, অথবা সেমিকোলন। ওঁরা আজ 'পোষ্যপুত্র' নাটকে থরথরে 'শিবানী'র মা সাজলেন—আর তারপরের দিন 'কর্ণার্জ্জুন' নাটকে দ্রৌপদী সাজলেন তরতর করে চলে গেল। কিন্তু আমি পোষ্যপুত্রে গাঁটকাটা সাজার পর কর্ণার্জ্জুনে কেষ্ট সাজলেও যে পান্নালাল সেই পান্নালাল। ওঁদের উত্থান আছে অথচ পতন নেই। কিন্তু—

—অর্থাৎ?

—তা হলে বলি শুনুন, ঢাকায় গিয়েছি প্লে করতে। প্রথম দিন 'পোষ্যপুত্র' নাটকে গাঁটকাটা সেজেছি। আমার অভিনয় দেখে অডিয়ান্স ভারি খুশি। পরের দিন সকালে শহর দেখতে বেরিয়েছি—এই গাঁটকাটার পেছনে অন্তত পঞ্চাশটা ফেউ লেগে গেল। কি খাতির তাদের!—এ বলে পান খান, ও বলে চা খান। কেউ বলে ঢাকায় এসেছেন পাতক্ষীর খাবেন না? অথচ সেইদিন রাত্রে 'কর্ণার্জ্জুন' নাটকে কেষ্ট সেজে যেই বেরিয়েছি—অমনি তারস্বরে তারাই কিনা চিৎকার করে উঠলো—'গাঁটকাটাটা টাকে পরচুলো পইরা কেষ্ট সাজছে।'—বলবো কি এমন চিৎকার করলে যে, আমাকে এ্যাক্টিংই করতে দিলে না। অথচ আগের রাত্রের শিবানীর মা পরের দিন দিব্যি কুন্তী করে গেলেন। কেউ টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করলে না। তা মিস্টারদের চেয়ে ম্যাডামদের যদি একটু বেশি খাতির করি সেটা কি অন্যায়?—আপনিই বলুন?

আশুবাবু কথার শেষে আমাকে সালিশী মেনে বললেন। কাজেই বলতে হোল: না না, অন্যায় কি।

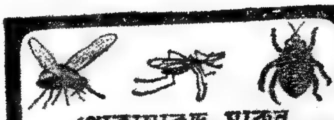
পোকামাকড় মারুন
এরা অনেক রকম রোগ ছড়ায়
মারকিট
আরসোলা, ছারপোকা, মশা প্রভৃতির
নির্ঘাত প্রাণ-ঘাতক
বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

নাটকটি গ্রীক ট্র্যাজেডির প্যাটার্নে লেখা—Attic Tragedy-তে বর্ণিত হোত যে, বিশেষ বিশেষ পরিবারের ওপর তিন পুরুষ বা চার পুরুষ আগে থেকে ঝুলছে এক 'মারাত্মক অভিশাপ'—এই 'মারাত্মক অভিশাপের' জায়গায় ইবসেন আনলেন 'মারাত্মক যৌনব্যাধি' তাঁর মডার্ন ট্র্যাজেডি Ghosts-এ। এ-নাটকটির চরিত্র-চিত্রণে ইবসেন যে শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়েছেন, সেই দিকটাই আজও নাটকটিকে বর্তমানের কাছে অপাংক্তেয় হওয়া থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। Mrs. Alving-এর ভূমিকাটি মঞ্চাভিনয়ের পক্ষে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ও প্রাণবন্ত চরিত্র। ছেলে Oswald বাপের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিল দুরারোগ্য যৌনব্যাধি। নাটকের শেষের দিকে দেখা যায় যে, এই ব্যাধির আক্রমণে সে দ্রুতগতিতে উন্মাদ হয়ে উঠছে। তার মা তাকে এই নারকীয় যন্ত্রণা ভোগ করতে দেবেন, না বিষ দিয়ে তার সকল দু:খের অবসান ঘটাবেন, এই প্রশ্নটাই সবার মনে দেখা দেয়। নাট্যকারের কাছ থেকে এ-বিষয়ে কোনো উত্তর পাওয়া যায় নি। এই প্রসঙ্গে Allardyce Nicoll লিখেছেন :

'The very fact that Ibsen himself has left us to guess, is in its own way indicative of the gulf between him and his French predecessors; whereas they were inclined to tie all their knots tightly and to leave no untidy ends. Ibsen's dramas, like all great works of the theatre, permit at least a little room for our imaginative fancies to play in. Once when William Archer asked Ibsen whether he intended Mrs. Alving to give her son poison or not, the author swited and said thoughtfully: 'I don't know. Each one must find that out for himself. I should never dream of deciding so delicate a question. But what is your opinion ?'

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

১৮৮২ সালে লেখা An Enemy of the People অভিনয়োপযোগী একটি সুন্দর নাটক। তবে Dr. Stockman-এর Contaminated Swimming Baths নিয়ে একটা দার্শনিক সমস্যার সৃষ্টি করাটা ঠিক মনের গভীরে কোনো রেখা কাটতে পারে না। এ-নাটকটিতে যেন আমরা আবার অপরিণত নাট্যকার হিসাবেই ইবসেনকে দেখতে পাই। নাট্যকার নিজেই ভবিষ্যৎ-জীবনে এই নাটকের নায়ক সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন: 'an extravagant immature fellow and a hot-head.'

১৮৮৪ সালে The Wild Duck প্রকাশিত হয়। সমসাময়িক সামাজিক সমস্যার চিন্তা ছেড়ে ইবসেন এবার মনস্তত্ত্বমূলক নাটক লিখতে সুরু করলেন। Old Ekdal জীবনের সুরুতে ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে গোলমালে জড়িয়ে পড়ে ধনী সওদাগর Werle-এর চক্রান্তে জেলে যেতে বাধ্য হন। জেল থেকে ফেরার পর Ekdal একেবারে ভেঙে পড়েন। তাঁর সাধারণ বুদ্ধি একেবারে লোপ পায় এবং মানুষের সমাজের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে তিনি এক অদ্ভুত ধরণের জীবনযাপন করতে থাকেন। একসময় তিনি ছিলেন বিখ্যাত শিকারী—এখন garret-এর ভেতর নকল বন তৈরি করে সেখানেই খরগোস শিকার করে একটা শিশুসুলভ আনন্দ পেয়ে থাকেন। এই নকল বনে Ekdal পরিবারের সবচেয়ে গর্বের বিষয় একটি Wild Duck। এই পাখিটিকে শিকার করতে গিয়ে Werle একে আহত করেন—এই আহত হাঁসটিকে সংগ্রহ করে Ekdal নিজেদের garret-এ এনে রাখেন। পাখিটিও এখানে থাকতে থাকতে আগের মুক্তজীবন ভুলে গিয়ে এই বদ্ধ পারিপার্শ্বিকের ভেতর নি:সঙ্গ জীবন-যাপনেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

এই Wild Duck-এর ভেতর দিয়ে নাট্যকার যেন Old Ekdal-এরই করুণ জীবনের কাহিনীটিকে ইঙ্গিতের দ্বারা ফুটিয়ে তুলেছেন। Old Ekdal-ও পাখিটির মতই Werle এর দ্বারা আহত হয়ে স্বাভাবিক পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই নি:সঙ্গ অস্বাভাবিক জীবন বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন। আবার Ekdal-এর ছেলেও অন্যভাবে Werle-এর দ্বারা আহত হয়েছে। তার স্ত্রী Gina-র কুমারী অবস্থায়, তার সঙ্গে Werle অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং পরে নিজের বিপদ এড়াবার জন্যে কৌশল করে মেয়েটিকে Hialmar-এর ঘাড়ে চাপিয়ে দেন। অবশ্য এদের জীবিকা অর্জনের একটা ব্যবস্থাও তিনি করে দেন।

কিন্তু Hialmar Ekdal আগে এসব কথার কিছুই জানতে পারে নি। পরে Werle-এর ছেলে Gregers-ই সব কথা তাকে জানিয়ে দেয়—সেই হিসাবে Hialmar-এর জীবনেরও প্রতীক যেন এই একই Wild Duckটি।

চতুর্থ অঙ্কে Gregers যখন বললেন : 'You have much of the Wild Duck in you Hialmar'—তখন Hialmar উত্তর দিলেন—Yes Mr. Werle's wing broken victim.' এই

● হেড্‌ডা গ্যাব্‌লারের ভূমিকায় ওয়েন্ধ ফস

ধরণের সঙ্কেত Chekov-ও ব্যবহার করেছেন তাঁর The Seagull নাটকে।

Rosmersholm প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ সালে। আপাতদৃষ্টিতে বাস্তবধর্মী মনে হলেও, নাটকটি আসলে সাঙ্কেতিক। ইবসেনের এই নাটকের নায়িকা হচ্ছেন Modern emancipated woman, A Doll's House-এর নোরা এসেছে মুক্তির দ্বারদেশে। Rebecca west-এর কোনো বন্ধন নেই—'no soil into which she may cast down roots'—A. Nicoll. এ-নাটকে Foot Bridgeটি অদৃশ্য হলেও এদের জীবনের অপরিহার্য নিয়তির মতই ভয়াবহ। মৃত্যুকে যেমন বিভীষিকার মত লোকে এড়িয়ে চলতে চায়—Pastor Rosmer প্রথম থেকেই Mill-race-এর উপরিস্থিত এই Foot Bridgeটি থেকে দূরে দূরে থাকতে চেয়েছেন। আবার এই Foot Bridge-এর ওপর থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়ে তিনি ও Rebecca জীবনের সব সমস্যার সমাধান করতেও চেয়েছেন। ঠিক এই এক পথেই Rosmer-এর স্ত্রী Beata-ও মৃত্যুর ভেতর দিয়েই জীবনের সব ব্যর্থতা ও অশান্তির অবসান ঘটিয়েছিলেন। নাটকটি দেখবার বা পড়বার সময় এই Foot Bridge-এর অস্তিত্ব বারবার করে মনে আসে।

The Lady from the Sea লেখা হয় ১৮৮৮ সালে। নায়িকা Ellida-র সাগরের প্রতি একটা অদ্ভুত আন্তরিক আকর্ষণ—যৌবনে একটি পরদেশী নাবিকের সঙ্গে তার ছিল ঘনিষ্ঠতা—দু'জনের ভেতর তখন একটা আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এর মূলে ছিল এদের দুজনের সমুদ্রপ্রীতি। নাবিকটি অনেকদিন বাদে বহু দেশ ঘুরে এসে দাবি করে বসল যে, Ellida তার স্বামী Dr. Wangel-কে ছেড়ে তার সঙ্গে চলে আসুক। এ-নাটকটি সম্বন্ধে Nicoll বলেছেন:

'Intellectually considered the conclusion is logical: it remains to be wondered, however, whether it has emotional justification.'

এরপর ১৮৯০ সালে ইবসেনের Hedda Gaabler প্রকাশিত হয়। নায়িকা Hedda বারবার মানসপটে Eilert-lovberg-এর যে মূর্তিটি দেখতে পেয়েছে তার শিরোভূষণ কতকগুলি ভাইন্ লিভস্। এ-ব্যাপারটা প্রতীকধর্মী। এরসঙ্গে জড়িত হয়ে আছে একটা বন্যতার ভাব এবং সুরার দেবতা Bacchus-এর উৎসবাদির ইতিহাস। তা ছাড়া শঙ্কাহীনতার দুর্জয়তা এবং সবকিছু নিয়ম, প্রথা ইত্যাদিকে আঘাত হানার ইঙ্গিতও রয়েছে এই ভাইন্‌লিভসের ব্যবহারে। ইবসেন, Hedda, Lovberg এবং Thea চরিত্রগুলির ভেতর দিয়ে নরনারীর সম্বন্ধের বিভিন্ন দিকের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

The Master Builder নাটকটি

১৮৯২ সালে, অর্থাৎ ইবসেনের বেশ পরিণত বয়সেই লেখা। এ-নাটকটির প্রকৃত বক্তব্য কি, এ নিয়ে সমালোচকরা বহু মাথা ঘামিয়েছেন। নাটকটির প্রথমদিকে অবশ্য কোনো জটিলতা নেই। নতুন যুগের আবির্ভাবের ভীতি Master Builder Soleness-এর বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি প্রভৃতিকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। এই নতুন যুগ নিয়ে আসবে অনেক কিছুর পরিবর্তন ও বিবর্তন। এরই বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে Soleness। এই কারণেই সে Ragner-এর উন্নতির পথে নানা বাধা-বিঘ্নের সৃষ্টি করতে লাগল। কিন্তু এদিকে আবার নবযুগের প্রতিভূ Hilda-কে সে বেশ সহজভাবেই গ্রহণ করল। এই পর্যন্ত নাটকটি বোঝবার কিছু অসুবিধা নেই। মতদ্বৈধ সুরু হল পরের অংশ নিয়ে। দশ বছর আগে Soleness Hilda-কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, দশ বছর পর সে তাকে এক রাজ্যের রাজকুমারী বানিয়ে দেবে। এই ব্যাপারটি নিয়েই যত জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। কারো কারোর মতে Hilda হচ্ছে Soleness-এর যৌবনের উচ্চাশার প্রতীক। আবার আর একদল মনে করেন Hilda, Soleness-এর উন্মত্ত যৌবনাবেগের সিম্বল। তৃতীয় একদলের মতে এ-নাটকটিতে নাট্যকার ইবসেন শিল্পী ইবসেনের জীবনের, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আদর্শের কথাই বলতে চেয়েছেন।

১৮৯৪ সালে এর পরের নাটক Little Eylof প্রকাশিত হয়। অতিরিক্ত প্রতীকের ব্যবহারে নাটকটি ঠিক রসঘন হয়ে জমে উঠতে পারে নি। এ-নাটকটি সম্বন্ধে Nicoll বলেছেন:

'Once more the symbol fails to integrate itself into the organic whole, and the failure is one, not to Ibsen's weakness, but to the intractability of the form in which he is working.'

১৮৯৬ সালে লেখা John Gabrial Borkman নাটকটি অনেক দিক দিয়েই আগের নাটকটির থেকে শ্রেষ্ঠ। দু-একটি ঘটনা ছাড়া বেশির ভাগ জায়গাতেই নাটকটি প্রতীকমুক্ত বলে চরিত্রগুলি অনেক বেশি বাস্তব এবং প্রাণবন্ত মনে হয়। Borkman-এর জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, দেশের, দশের উপকারের জন্য তাঁর সব আকাশ-কুসুম সদৃশ পরিকল্পনা—ষড়যন্ত্রের ফলে তার অসাফল্য, এই সমস্ত ঘটনাবলীই তার চরিত্রকে tragic height-এ উঠিয়েছে। আবার Borkman-কে নিয়ে Gunhild ও Ella-র প্রতিদ্বন্দ্বিতাও নাটকটিকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

ইবসেনের শেষ নাটক When We Dead Awaken ১৮৯৯ সালে লেখা। এ-নাটকের নায়ক একজন ভাস্কর—নাম Rubek। তার স্ত্রী Maia হাল্কা ধরণের মেয়ে এবং এইজন্যে শিল্পী এবং তার স্ত্রীর মধ্যে সদ্ভাব নেই। শিল্পীর জীবনে মডেল হিসাবে Irene নামে আর একটি মেয়ে এল। কিন্তু Rubek তাকে দেখলে, 'no more than an instrument towards the achieving of an artistic result.' মর্মাহত হয়ে Irene চলে গেল। Rubek-এর নিরাসক্তি তার ভেতরকার প্রাণশক্তিকে যেন নিঃশেষ করে ফেলেছিল।

নাটকের শেষে দেখা যায় আবার তারা দুজনে মিলিত হয়েছে এক পাহাড়ের ওপরে। ভয়ানক ঝড় উঠেছে, কিন্তু নিজেদের নিরাপত্তার জন্য নীচে নামবার চেষ্টা না করে, নিশ্চিত মৃত্যুর দিকেই তারা এগিয়ে চলল ওপরের দিকে।

নাটকের সঠিক মর্মার্থ বোঝা মুস্কিল। কিন্তু শেষের দিকে ইবসেন বোধ হয় একথা উপলব্ধি করছিলেন যে, মানুষের জীবনটা শুধু শিল্প বা কাজকর্মকে কেন্দ্র করেই পরিপূর্ণতা পেতে পারে না। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে ধরনের সম্বন্ধ, সেটাই হচ্ছে আমাদের জীবনের সব থেকে বড় কথা।

১৮৮০ সাল থেকে ১৯২০ সাল অবধি ইউরোপীয় মঞ্চে ইবসেনেরই নাটকের একাধিপত্য চলছিল। তাঁর নাট্য-প্রতিভা যে কতো বিরাট এবং বিস্তৃত ছিল—সে সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা করা যেতে পারে বার্নার্ড শ'য়ের Quintessence of Ibsenism থেকে। শুধু শিল্পী হিসাবেই যে তিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন তা নয়—রচনার কারিগরী দিকটার প্রতিও তিনি যথেষ্ট নজর দিতেন। পুরনো প্রথায় কাহিনীকে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা না করে, সম্পূর্ণ নিজস্ব রীতিতে চরিত্রগুলিকে ধীরে ধীরে তাদের কার্যক্রমের ভেতর দিয়ে রূপায়িত করবার নতুন পথ আবিষ্কার করেন ইবসেন। আজও অবধি এই পদ্ধতি অনুসারেই তাঁর পরবর্তীরা নাটক লিখে আসছেন। চিরাচরিত পাঁচ অঙ্কে নাটক লেখবার রীতিকেও তিনি ভেঙে দিলেন। নাটক জমে ওঠবার পক্ষে unity of place বজায় রাখাটা যে কত কার্যকরী—এ সত্যটাও ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন নিজের লেখা নাটকের ভেতর দিয়ে। soliloquy, aside প্রভৃতি বর্জন করে লিখলেই যে নাটক অনেক বেশি স্বাভাবিক হয়, এ-শিক্ষাও পাওয়া গেল ইবসেনেরই কাছ থেকে।

● রাধাকৃষ্ণাণের সঙ্গে মোহনবাগানের খেলোয়াড়বৃন্দ

একটি স্মরণীয় ক্রিকেট কাহিনী

শ্রীঅমিতাভ

শেষ দৃশ্যে নাটকটি ভালই জমে উঠেছিল, ক্রিকেটের নন্দনকানন ইডেনের রঙ্গমঞ্চে অভিনেতার ভূমিকায় বিশ্ব ক্রিকেটের সেরা কয়েকজন খেলোয়াড় আর ভারতীয় ক্রিকেট তারকাবৃন্দ। ৬ই ডিসেম্বর চা-পানের বিরতির পর ল্যান্স গিবস উইকেটটা ছুঁড়ে ফেলে চলে গেলেন। তারপর এলেন উইকেটরক্ষক এ্যানড্রু, কিন্তু নিজের উইকেট তিনি বেশিক্ষণ রক্ষা করতে পারলেন না—বলতে গেলে জোর করে তাঁকে আউট করে প্যাভেলিয়ানে ফেরৎ পাঠান হল। ঠিক সেইসময় বৈদ্যুতিক স্কোরবোর্ডে কমনওয়েলথ দলের রানসংখ্যা ৯ উইকেটে ৪২৪, দুই ইনিংসের ফলাফলে দুই দলের অবস্থা সমান সমান। কমনওয়েলথ দলের হাতে আহত অবস্থায় অবস্থিত বেসিল বুচারের উইকেটটি। দর্শকরা সব আসন ত্যাগ করে বাইরে আসতে ব্যস্ত, প্যাভেলিয়ানের দিকে তাকিয়েই সকলে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন, নাটকের চরম মুহূর্ত উপস্থিত প্রায়। দর্শকদের কৌতূহলী দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখা গেল, বেসিল বুচার, রিচার্ডসন আর নাইটের কাঁধে ভর দিয়ে কোনক্রমে উইকেটের দিকে আসছেন, বুচারের ব্যাটটি গিবসের হাতে। অনেক কসরৎ করে বুচার স্টান্স নিয়ে দাঁড়ালেন ক্রিজে। জয়সীমা এসে বল করলেন, বুচার এমনভাবে ব্যাটটি চালালেন, যেন তিনি বলটিকে স্বাগত জানাচ্ছেন উইকেট স্পর্শের জন্য। কিন্তু হায়! কোথা থেকে কি যে ঘটে গেল, বলটি তামানের হাত ফসকে সোজা বাউণ্ডারী লাইন অতিক্রম করল। আনাড়ী অভিনেতার মুহূর্তের ভুলে বানচাল হয়ে গেল পূর্ব-পরিকল্পিত নাটকীয় পরিসমাপ্তির একটি নিখুঁত পরিকল্পনা।

মোহনবাগানের প্লাটিনাম জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত এই প্রদর্শনী খেলাটিতে সমবেত দর্শকরা বহু অভিনব ঘটনার আস্বাদ গ্রহণ

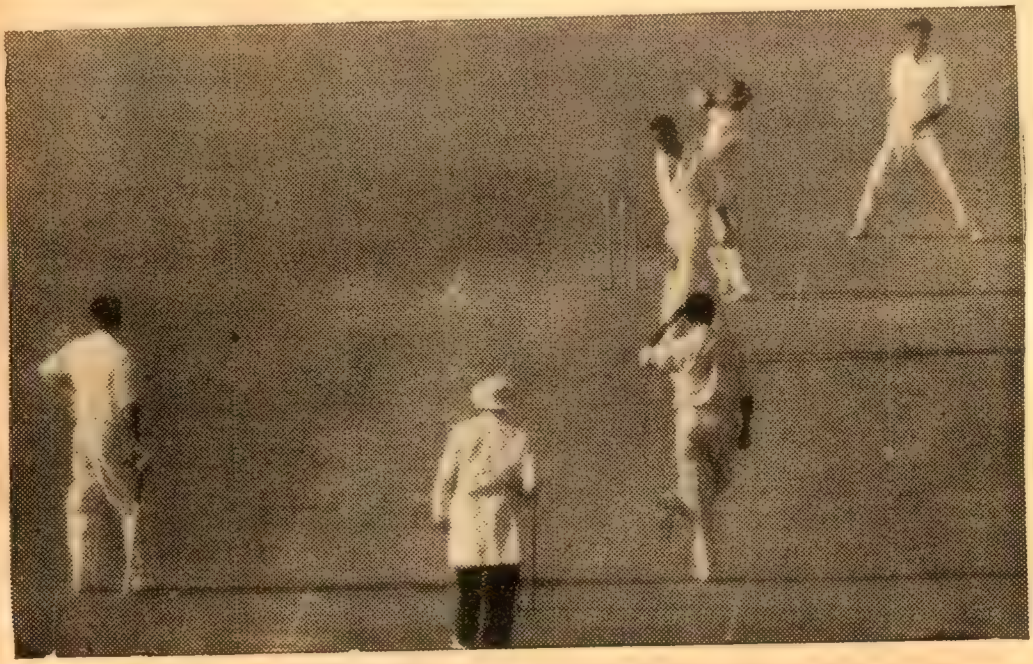

● চান্দু বোরদের বলে সোবার্সের স্টাম্প আউট হবার দৃশ্য

করেছে, খেলা ছিল এখানে উপলক্ষ মাত্র। কলিন কাউড্রে পরিণত হয়েছিলেন ক্লাউন কাউড্রেয়। তাঁর ব্যাট থেকে বেরুনো নিখুঁত পরিচ্ছন্ন কেতাবী মারগুলি এবং তার ভাঁড়ামী দর্শকদের প্রাণে এনেছে আনন্দের হিল্লোল, গ্যারফিল্ড সোবার্সের কাছ থেকেও দর্শকরা অনেক কিছুই পেয়েছেন।

খেলাটিতে হয়েছে তিনটি সেঞ্চুরী। দুটি মুখ্যমন্ত্রী একাদশের পক্ষ থেকে, আর একটি কমনওয়েলথ দলের পক্ষে। প্রথম শত রান চান্দু বোরদের, দ্বিতীয়টি হনুমন্ত সিংয়ের এবং তৃতীয়টি গ্যারফিল্ড সোবার্সের। যদিও খেলাটি ছিল প্রদর্শনী এবং মেজাজও ছিল হাল্কা, তবু এখানে কয়েকজন খেলোয়াড়ের ব্যক্তিগত প্রদর্শনী সম্বন্ধে আলোচনা করব।

ভারতীয় ক্রিকেট অধিনায়ক পতৌদির নবাব ব্যাটে এবং ফিল্ডিংয়ে সকলকেই নিরাশ করেছেন। তরুণ ক্রিকেটার সুব্রহ্মণিয়মের মধ্যে সম্ভাবনা আছে, তবে ফিল্ডিংয়ের আরও কিছুটা উন্নতি প্রয়োজন। গিবসের বলের কুটিল স্পিন এবং বক্রগতি তাকে নিঃসন্দেহে বর্তমানে শ্রেষ্ঠ অফ স্পিনারের মর্যাদা দেবে। শেষে একজনের কথা উল্লেখ না করলে খুবই অন্যায় হবে। তিনি হলেন কমনওয়েলথ দলের ম্যানেজার এবং বিখ্যাত ক্রিকেট শিক্ষক অ্যালফ্ গোভার। গোভারের আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্যে মোহনবাগানের এই কঠিন প্রয়াস সার্থক রূপ পেয়েছে।

মোহনবাগানের ডুরাণ্ড বিজয়

স্মরণীয় বৎসরের আরও একটি স্মরণীয় বিজয় মোহনবাগানের হল ডুরাণ্ড লাভ করে। দিল্লীর কর্পোরেশন স্টেডিয়ামে দুই পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বীর সাক্ষাৎ হল ডুরাণ্ড কাপের ফাইন্যালে। দু' বছর আগে এই ডুরাণ্ড কাপের ফাইন্যালে মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল যুগ্ম বিজয়ী হয়। মোহনবাগান মোট পাঁচবার ডুরাণ্ড বিজয় করেছে আর ইস্টবেঙ্গল করেছে মোট চারবার।

মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গলের অগ্রগতির বিবরণ প্রথমে পেশ করছি। ইস্টবেঙ্গল কোয়ার্টার ফাইন্যালের খেলায় সেকেন্দ্রাবাদের ই-এম-ই সেণ্টারকে ১-০ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে উন্নীত হয় সেমি-ফাইন্যালে। অন্যদিকে কলকাতার শক্তিশালী বি-এন-রেল দল কোয়ার্টার ফাইন্যালের খেলায় হায়দ্রাবাদ পুলিশের মত দুর্ধর্ষ দলকে ৩-২ গোলে পরাজিত করে সেমি-ফাইন্যালে উপস্থিত হয়। সেমি-ফাইন্যালে ইস্টবেঙ্গল বি-এন-রেলের ফুটবল যুদ্ধের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ছিল চরম উত্তেজনা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার ছোঁয়াচ। ২-১ গোলের ব্যবধানে শেষ পর্যন্ত বি-এন-রেলকে নতি স্বীকার করতে হয়েছে ইস্টবেঙ্গলের কাছে।

মোহনবাগানের বিজয়ের পথে দুটি বাধা ছিল, কোয়ার্টার ফাইন্যালে মাদ্রাজ রেজিমেণ্টাল সেণ্টার এবং সেমি-ফাইন্যালে বোম্বাইয়ের টাটা স্পোর্টস্। মাদ্রাজ রেজিমেন্টাল ৩-০ গোলে পরাজিত হয়ে বিদায় গ্রহণ করে এবং টাটা স্পোর্টসের সঙ্গে খেলায় দলের একমাত্র বিজয়সূচক গোলটি দেন অধিনায়ক চুনী গোস্বামী।

● ডুরাণ্ড কাপ ফাইন্যালে ইস্টবেঙ্গলের পরিমল দে'র গোল করার চেষ্টা

ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের ফাইন্যাল খেলায় মোহনবাগান সরাসরি ২-০ গোলের ব্যবধানে জয়ী হয়েছে, কিন্তু খেলা একতরফা হয় নি। ইস্টবেঙ্গলের পুরোভাগের বহু আক্রমণের ঢেউ মোহনবাগানের গোলে গিয়েছিল। কিন্তু মোহনবাগানের রক্ষণভাগের ক্রীড়াচাতুর্যের কাছে খুব বেশি সুবিধা করতে পারেন নি, ইস্টবেঙ্গলের পুরোভাগের খেলোয়াড়েরা। এইদিন কিছুটা সংহতির অভাব ছিল বলা চলে। যাই হোক, এবারের ডুরাণ্ডের ফলাফল ফুটবলে কলকাতার প্রাধান্যের কথাই প্রমাণিত করল। খেলার পর উভয় দলকে পুরস্কার বিতরণ করেন ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রীরাধাকৃষ্ণাণ।

● অশোক চ্যাটার্জী ● অরুময়।

জয়লক্ষ্মীও বোধ হয় ইস্টবেঙ্গলের প্রতি বিরূপ ছিলেন, নইলে বিদ্যুৎ মজুমদারের হ্যাণ্ডবলের ফলে যে পেনাল্টি ইস্টবেঙ্গল লাভ করল অসীম মৌলিক করলেন তা অপচয়। প্রথমার্ধের পঞ্চম মিনিটে অরুময় নৈগমের সুন্দর সট ইস্টবেঙ্গলের গোলরক্ষক কমলকে পরাস্ত করে। দ্বিতীয়ার্ধের তৃতীয় মিনিটে মোহন-বাগানের পক্ষে দ্বিতীয় গোলটি করে দলের জয়ের পথ সুগম করেন অশোক চ্যাটার্জী। ইস্টবেঙ্গলও কয়েকটি গোলের সুযোগ পায়, কিন্তু তা নষ্ট হয়। ইস্টবেঙ্গলের খেলার মধ্যে

স্প্রিং বক আর ক্যাঙারুর দেশে

দিকে দিকে বেজে উঠেছে ক্রিকেটের রণদামামা, বেধেছে দেশে দেশে উইলোদণ্ড আর বল নিয়ে ক্রিকেটের মহাযুদ্ধ। অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে পাকিস্তান এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট শেষ হল। অন্যদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে দক্ষিণ আফ্রিকা-ইংলণ্ড প্রথম টেস্ট পর্ব শেষ হল। এদিকে ভারতের ব্যাঙ্গালোরে শক্তি পরীক্ষা চলছে ভারত এবং সিংহলের প্রথম টেস্টে। ইতিপূর্বে একসঙ্গে ক্রিকেটের এতগুলি উচ্চ-পর্যায়ের খেলা দেশে দেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে মনে হয় না।

প্রথমে দিচ্ছি মেলবোর্নের সংবাদ। পাকিস্তান প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে প্রথম ইনিংসে সংগ্রহ করে ২৮৭ রান। পাকিস্তানের অধিনায়ক হানিফ মহম্মদ শতরান করার কৃতিত্ব অর্জন করেন। হানিফের ব্যক্তিগত ১০৪ রানের পরই উল্লেখযোগ্য হল ৮০ রান সইদ আমেদের। বোলিংয়ে সাফল্য লাভ করেন ম্যাকেঞ্জি, হক এবং সিনকক ৩টি করে উইকেট গ্রহণ করে।

অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের রান-সংখ্যা হয় ৪৪৮। কাউপারের ৮৩ এবং ভিভার্সের ৮৮ রান উল্লেখযোগ্য। পাকিস্তানের আরিফ বাট ৮৯ রানে ৬টি উইকেট লাভ করেন। পাকিস্তান দ্বিতীয় ইনিংসে সংগ্রহ করে ৩২৬ রান। হানিফ এই ইনিংসেও মাত্র ৭ রানের জন্য শতরান করার গৌরব থেকে বঞ্চিত হন। প্রথম ইনিংসে তিনি শতরান লাভ করেন এবং দ্বিতীয় ইনিংসেও এই কৃতিত্ব অর্জন করতে পারলে তাঁর এই সাফল্য ক্রিকেট ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকত। বরুণ দেবের আকস্মিক আবির্ভাবে পাকিস্তান এবং অস্ট্রেলিয়ার টেস্টটি 'ড্র' হল।

ডারবানে অনুষ্ঠিত প্রথম টেস্টে ইংলণ্ড দক্ষিণ আফ্রিকাকে এক ইনিংস এবং ১০৪ রানে পরাজিত করেছে। ব্যারিংটন ১৪৮ এবং জিম পার্কস অপরাজিত ১০৮ রান করে উভয়েই শতরান লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেন।

সমাচার দর্পণ

বর্তমান বিশ্ব অপেশাদার টেনিসের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় অস্ট্রেলিয়ার রয় এমার্সন পেশাদার বৃত্তি গ্রহণ করবেন না বলে জানিয়েছেন। গেজম্যানের তিরিশ হাজার পাউণ্ডের লোভনীয় চুক্তি এমার্সন প্রত্যাখ্যান করেছেন।

* * *

দিল্লীতে ডুরাণ্ড একাদশ বনাম তাতাবানিয়ার প্রদর্শনী ফুটবল খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রা:) লি:-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাপ্তাহিক
বসুমতী

কলকাতার নাট্যমঞ্চে দি নিউ সেক্সপীয়ার কোম্পানী অভিনীত 'দি টেম্পেস্ট' নাটকের একটি অবিস্মরণীয় মুহূর্ত।

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY

বর্ষ, ৩০শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৯ই পৌষ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ • 24th December, 1964 • Vol. 69, No. 3

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	১৮৫৯
আজকের মানুষ	...	১৮৬০
সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর	হরপ্রসাদ মিত্র	১৮৬১
ভারতদর্শন	..	১৮৬৩
আন্তর্জাতিক	...	১৮৬৭
পঁচিশে ডিসেম্বরে	রজত রায়চৌধুরী	১৮৭৩
বাণিজ্যে সেকাল ও একাল	ধনপতি সওদাগর	১৮৭৫
পশ্চিম জার্মানী থেকে	শান্তিশেখর	১৮৭৭
অদ্বিতীয়া (ধারাবাহিক উপন্যাস)	সুশীল রায়	১৮৮০
জুয়ারী (গল্প)	বিমল সেনগুপ্ত	১৮৮৩

ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বেকার, চাকুরীপ্রার্থী ও শিক্ষানুরাগীদের
ভাষা শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য্য একমাত্র গ্রন্থ
॥ বিদেশী ভাষায় দক্ষতা অর্জ্জনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সহায়ক ॥
০০০ স্বল্পশ্রমে পর্য্যাপ্ত ফল অবশ্যম্ভাবী ০০০
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

রা জ ভা ষা

(ইংরাজী ভাষা সহজে শিক্ষার অদ্বিতীয় সাহায্যগ্রন্থ)
এক আধারে : ভাষা - ব্যাকরণ - শব্দার্থ
ইংরাজী হইতে বাঙলা—৩·৫০ ॥ ইংরাজী হইতে উর্দ্দু—১·০০

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের

ম হা ভা র ত

[প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড]
(প্রতি খণ্ড মূল্য আট টাকা)
সদ্য-প্রকাশিত চতুর্থ খণ্ড : মূল্য—ছয় টাকা
(ডাকমাশুল স্বতন্ত্র)

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

মাইকেল গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগে :—মেঘনাদবধ কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, পদ্মাবতী-নাটক, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা ?
মূল্য—তিন টাকা
দ্বিতীয় ভাগে :—কৃষ্ণকুমারী নাটক, শর্মিষ্ঠা নাটক, তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী, বিবিধ কাব্য, মায়া কানন, হেক্টর বধ।
মূল্য—দুই টাকা

—ঔপন্যাসিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান—
দামোদর মুখোপাধ্যায়ের

দামোদর-গ্রন্থাবলী

১ম খণ্ড ১·৫০ ২য় খণ্ড ২·৫০
৩য় খণ্ড ১·০০ ৪র্থ খণ্ড ২·৫০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
শহর কলকাতা	শ্রীপদাতিক	১৮৮৯
ডিটেকটিভ সবাই হতে পারে (গোয়েন্দা-গল্প)	পরিমল গোস্বামী	১৮৯৩
আঁধারমাণিক (ধারাবাহিক উপন্যাস)	মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	১৯৯৮
বঙ্গদর্শন	...	১৯০১
গ্রন্থমেলা	জয়ন্তী সেন	১৯০৬
রঙ্গজগৎ	...	১৯০৭
কলকাতায় নিউ সেক্সপীয়ার কোম্পানী	অশোক সেন	১৯১৩
নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী	দেবনারায়ণ গুপ্ত	১৯১৫
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	শিলালি	১৯১৬
খেলাধূলা	শ্রীঅমিতাভ	১৯১৮

প্রচ্ছদ পরিচয় : 'দি টেম্পেস্ট' নাটকের একটি দৃশ্যে প্রস্পারোর (জন ওয়াইজ) নিকট অজ্ঞাত দ্বীপে ভয়ঙ্কর নির্বাসনের কাহিনী শ্রবণরতা কন্যা মিরাণ্ডা (আমাণ্ডা রেইস)।

বঙ্গযুগের বিপ্লবী গুরু

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

নির্বাসিতের আত্মকথা, ঊনপঞ্চাশী, সিরাজিন, অনন্তানন্দের পত্র, বর্তমান সমস্যা, জাতের বিড়ম্বনা, পথের সন্ধান, স্বাধীন মানুষ, ধর্ম ও কর্ম।

মূল্য—আড়াই টাকা

বাংলার কথাশিল্পী

জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী

৭ খানি বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ উপন্যাস এবং ৩ খানি বড় লেখা—সুবৃহৎ গ্রন্থাবলী।

মূল্য তিন টাকা

আধুনিক কথা-সাহিত্যিক

বিভূতিভূষণ গুপ্তের গ্রন্থাবলী

স্বেচ্ছাচারী, আশা, সহজিয়া, সপ্তপদী।

মূল্য—৩৲ টাকা

রসরাজ

অমৃতলাল বসুর গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—হরিশ্চন্দ্র, আদর্শ বন্ধু, যাদুকরী প্রভৃতি ১১ খানি নাটক।

২য় ভাগে—খাসদখল, চোরের উপর বাটপাড়ি, অবতার প্রভৃতি ১১ খানি নাটক।

৩য় ভাগে—বিবাহ বিভ্রাট, তরুবালা, ব্রজলীলা প্রভৃতি ১১ খানি নাটক

প্রতি ভাগ আড়াই টাকা

কাব্য-সাহিত্যিক

বিহারীলাল চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী

জীবনী ও কাব্য সমালোচনা, বিহারীলালের সারদা, বিহারীলাল ও তাঁহার কাব্য, সারদামঙ্গল, বন্ধুবিয়োগ, প্রেম-প্রবাহিনী, স্বপ্ন-দর্শন, সঙ্গীতশতক, বঙ্গসুন্দরী, নিসর্গ-সন্দর্শন, মায়াদেবী, ধূমকেতু, শরৎকাল, দেবরাণী, বাউল বিংশতি, সাধের আসন, কবিতা ও সঙ্গীত। মূল্য ৩৲ টাকা

সয়দন কবির মূল্যবান সংস্কৃত ও বাংলা রচনার সমাবেশ। বঙ্গসাহিত্যে অভিনব আয়োজন।

বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী

মূল্য—পাঁচ টাকা।

প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা

যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর গ্রন্থাবলী

২য় ভাগে—সীতা, বিষ্ণুপ্রিয়া, মহামায়ার চর ও পূর্ণিমামিলন

মূল্য দুই টাকা

উপন্যাস সাহিত্যের প্রদীপ্ত ভাস্কর

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

তৃতীয় ভাগ—বেলমতিয়া, বঙ্গসংসার, সনাতন গোস্বামী, পূজার মালা ও রাণী ব্রজসুন্দরী। মূল্য—এক টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

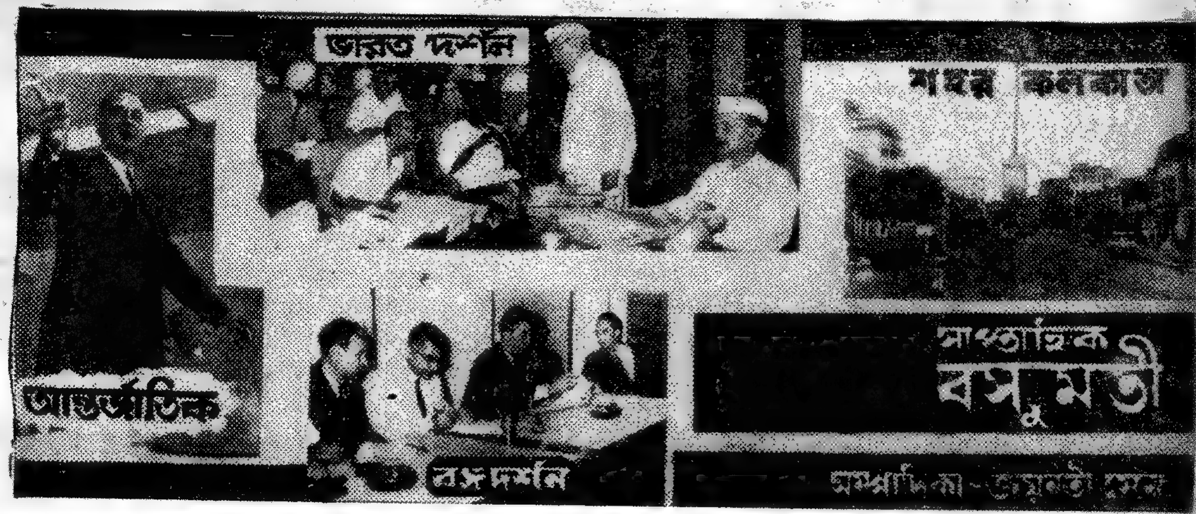

৬১ বর্ষ, ৩০শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পঃ 25 Paise
বৃহস্পতিবার, ৯ই পৌষ ১৩৭১ Thursday, 24th December 1964

তেঁতুলের ঝোলও যখন দুর্মূল্য

পঁচানব্বইটি বে-সরকারী কলেজের প্রায় আড়াই হাজার অধ্যাপক-অধ্যাপিকা পরীক্ষা বর্জনের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন—সেই সিদ্ধান্তের প্রতি সরকারী আমলাদের কোনোরকম সমর্থন, এমন কি অধ্যাপকদের সঙ্গত দাবি-দাওয়ার প্রতি নৈতিক সমর্থনও, হয়তো আশা করা সম্ভব নয় ; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-দপ্তরের মুখপাত্র যখন হুমকি দিয়ে কথা বলেন, তখন সেই হুমকির বিরুদ্ধে প্রত্যুত্তরদানের ইচ্ছা জাগাই স্বাভাবিক। উক্ত মুখপাত্র যে কথা বলেছেন, তদ্দ্বারা জটিল অবস্থা জটিলতর হবেই হবে। কেন না, সরকারী আমলাদের সাহায্যে পরীক্ষা গ্রহণ করার নীতি শিক্ষাদপ্তর যদি গ্রহণ করেন, তাহলে ধরে নিতে হবে—পরীক্ষা বর্জন আন্দোলনের বিরুদ্ধে সরকার 'কুচ পরোয়া নেই' ধরণের দমননীতিমূলক মনোভাব গ্রহণ করেছেন এবং প্রতি বছর একই অবস্থায় পরীক্ষক-রূপে সরকারী আমলাগণ নিযুক্ত হবেন। এই অস্বাভাবিক অবস্থা থেকে অধ্যাপক-গণ কর্তৃক আরো কোনো জটিল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অসম্ভব নয়। ফলে, এর দ্বারা সমস্যার কোনো মীমাংসাই হবে না। বরং বেপরোয়া আমলাদের তথাকথিত যান্ত্রিক হস্তে এই বাংলা দেশে সমূলে শিশুপাল বধের সূচনা হবে।

অধ্যাপকদের ন্যায়সঙ্গত দাবি একবারের মধ্যেই যে পুরোপুরি মেটানো সম্ভব—এ কথা আমরাও বলছি না। কিন্তু তাঁদের দুরবস্থা সম্বন্ধে আমরা কতটা সচেতন, তার সমীক্ষা আমরা নিজেরা কি করেছি। এই দুঃসময়ে তেঁতুলের ঝোলও দুর্মূল্য হয়ে উঠেছে অথচ কলেজ শিক্ষকরা তাঁদের আর্থিক অনটনের মধ্যে যে তিমিরে ছিলেন, আজো সেই তিমিরে রয়েছেন। জাগতিক পরিবর্তন সম্পর্কে কলেজ-ছাত্রদের তাঁরা আলো দান করলেও এবং পরবর্তীকালে সেই ছাত্রদের কেউ কেউ সরকারী উচ্চপদে বহাল হলেও তারা শিক্ষকদের অবস্থা কি ভাবে যে ভুলে যায়—তা ভাবতেও অবাক লাগে। হয়তো এর মূলে সামাজিক ত্রুটি থাকাই সম্ভব এবং বর্তমান বিশ্বে দেশকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে সেই ত্রুটি দূর করা জাতীয় কর্তব্য। অথচ সরকারী মুখপাত্রের ভাষা শুনলে মনে হয়, তিনি সুযোগ পেলে শিক্ষকদের এক হাত নেবেন। যা হোক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটসভা অধ্যাপকদের ন্যায়সঙ্গত দাবির প্রতি যে সমর্থন জানিয়েছেন, তদ্দ্বারা মনে হয়—এ কথা ঐ মর্যাদাসম্পন্ন সভা অনুভব করেছেন যে, শিক্ষকদের সম্পর্কে যে-কোনো অবহেলা নিজেদের শিক্ষারত সন্তান-সন্ততিদের প্রতি অবহেলারই নামান্তর। এই কারণে তাঁদের সঙ্গত দাবি সম্পর্কে স্বয়ং উপাচার্য শ্রীমালিক পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে সুফল আশা করা যায়। তথাপি একটি পরিকল্পনা আরম্ভ হলে আগামী আর-একটি পরিকল্পনার অর্থের কথা শুনিয়ে শিক্ষকদের ঝুলিয়ে রাখা কখনোই উচিত নয়। বরং বৃহৎ আমলাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা একটু কম ভেবে সরকার জাতির মেরুদণ্ড শিক্ষকদের দুরবস্থা মোচনে এগিয়ে আসুন।

সম্পাদকীয়

আজকের —— মানুষ

ওঁরা দুজন বিশ্বপর্যটনে বেরিয়েছিলেন।

নিছক ভ্রমণ-বিলাস নয়—গভীরতর এক উদ্দেশ্য নিয়ে। ওঁরা যেখানেই গিয়েছিলেন, আন্তরিকতার অভাব ছিল না কোথাও। সহানুভূতি, সহৃদয়তা ও অকৃত্রিম বন্ধুত্ব তাঁরা পেয়েছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কোটি কোটি জনতা—বহু দেশ-বিদেশ তাঁদের সমর্থন জানিয়েছে—সমর্থন জানিয়েছে ভারতবর্ষও। কেন না, ওঁরা জগৎকে শুনিয়েছিলেন পরাধীন জাতির মুক্তিযুদ্ধের কথা—বলেছিলেন সাম্রাজ্যবাদের লোলুপতার কথা।

ওঁরা আবেদন করেছিলেন বৃটিশ গায়নার মানুষদের লড়াইয়ের প্রতি বিশ্ব-জনতার সমর্থন—প্রার্থনা করেছিলেন বৃটিশ সরকারের সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ সাধনে বিশ্ববাসীর নিবিড় আত্মীয়তা। ওঁরা দুজন সেদিন বিশ্বসভার ঘাটে-ঘাটে আত্মজয়ের গান গেয়ে বেড়িয়েছিলেন।

ওঁরা বিপ্লবী। ওঁরা মুক্তিযোদ্ধা। ওঁদের একজন ভারতীয় দন্ত চিকিৎসক, অন্যজন নিগ্রো আইনবিদ। একজন শ্রীছেদী জগন, অন্যজন শ্রী এল এফ এস বার্নহাম।

এসব ১৯৫২ সালের ঘটনা।

আজকের ঘটনার সঙ্গে তার পার্থক্য অনেক। আজ একজনের সারা, অন্যজনের সুরু। গত নির্বাচনে পরাজিত শ্রীজগনের জায়গায় এসেছেন বিজয়ী প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীবার্নহাম।

শ্রীফরবেজ বার্নহাম—বৃটিশ গায়নার প্রধানমন্ত্রী—সংযুক্ত জাতীয় কংগ্রেসের নেতা—আজকের আলোচ্য মানুষ—খুব নিশ্চিন্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর আসনে উপবিষ্ট হন নি। কেন না, তিনি জানেন, নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি—আর এও জানেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিভেদ-শাসননীতির ক্রিয়াশীলতা এখনও সজীব। তাই প্রধানমন্ত্রী শ্রীবার্নহামের কাছে আগামীকালের দুশ্চিন্তাই মুখ্য।

জনতার নিকটতম মানুষ শ্রীবার্নহাম। জন্ম নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে। প্রাথমিক শিক্ষাদীক্ষা জর্জ টাউনের কুইন্স কলেজে। অতঃপর আইন পড়তে যান লণ্ডনে মিডল টেম্পলে। আইনশিক্ষা সমাপ্ত করে চতুর্থ দশকের শেষাশেষি ফিরে এসে ওকালতি সুরু করলেন জর্জ টাউন শহরের আদালতে। আর সমান্তরালভাবে চললো ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা।

যোগ দিলেন শ্রীজগনের পিপলস্ প্রোগ্রেসিভ পার্টিতে। একদিকে তিনি সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠ, অন্যদিকে জনতার মধ্যে ব্যাপক সংগঠনকার্যে ব্যস্ত-নিযুক্ত। স্বভাবতই ১৯৫২ সালে দীর্ঘকালের জন্য তাঁকে কারা-যন্ত্রণা ভোগ করতে হলো। সেদিন তিনি শ্রীজগনের বিশ্বস্ত সহকর্মী। তারপর মুক্তি এবং তারপর সেই ঐতিহাসিক বিশ্বপর্যটন।

কিন্তু বিশ্বপর্যটন-পর্বের শেষে দেখা গেল উভয়ের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে অনেকখানি। পার্থক্যের পরিমাণও সুবিপুল। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে অতঃপর শ্রীবার্নহাম হলেন শ্রীজগনের তীব্র বিরোধী। প্রবল প্রতিপক্ষ।

১৯৬২ সালের নির্বাচনে শ্রীজগন জয়লাভ করলেন সত্য, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিচারে শ্রীবার্নহামের সঙ্গে বিশেষ কোন পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারেন নি। এইজন্য শ্রীজগনের পক্ষে মন্ত্রিসভার আয়ুষ্কাল সুদীর্ঘ করার ব্যাপারে অনেক অনিশ্চয়তা ছিল। আর সেই সুযোগেই ঐতিহ্যবাহী বিভেদ-শাসননীতি অনুসারে বৃটিশ সরকারের পূর্ণ সমর্থন রইল শ্রীবার্নহামের প্রতি। এবং পরোক্ষভাবে উভয়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বকে জিইয়ে রাখতে চাইল নিজেদের শাসনকার্যের সুবিধার্থে। ফলে শ্রীজগনের মন্ত্রিসভাকে অস্বীকার করে শ্রীবার্নহাম দাবি করলেন : প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের সমানুপাতিকহারে প্রতিনিধি গ্রহণের ভিত্তিতে অচিরেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক। শ্রীজগন এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত না করে পারেন নি।

অতঃপর গত নির্বাচনের ফলাফলের বিচারেই শ্রীবার্নহামের এই প্রধানমন্ত্রিত্ব লাভ। সুতরাং শ্রীবার্নহাম এক অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার মধ্যে এই গুরুদায়িত্ব পেয়েছেন। আজ শ্রীবার্নহামের সামনে দুটি সমস্যা—একটি শ্রীজগনের চ্যালেঞ্জ, অন্যটি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিকতা। আশা করি, শ্রীবার্নহাম এই উভয়-সঙ্কট থেকে উত্তীর্ণ হয়ে বৃটিশ গায়নার প্রতিটি অধিবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তব রূপদানে সমর্থ হবেন।

শ্রীবার্নহাম

সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর

হরপ্রসাদ মিত্র

বিমলবাবু এবং জ্যোতিরিন্দ্রবাবু একদিকে তীক্ষ্ণ অনুভূতির দিকে মনোযোগী,—অন্যদিকে বোধ হয় কতকটা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সমভাবী। এই শেষ দিকটিতে জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর নৈকট্যই বেশি বোধ হয়।

কিন্তু সে-দিকটি পরে দেখা যাবে। আজ ঐ অনুভূতি-মনোযোগের দিকটিই বেশি মনে পড়ছে। সেই সূত্রে দিলীপ-কুমার রায়ের একখানি বইয়ের কথাও। তাঁর 'মনের পরশ' প্রথম বেরিয়েছিল উনিশ শ' ছাব্বিশে। তিনি এই বই-খানির প্রথম ভাগের ইংরেজি অনুবাদ পাঠিয়েছিলেন গল্সওয়ার্দির কাছে। উনিশ শ' সাতাশে গল্সওয়ার্দি সে-রচনার প্রশংসা করে তাঁকে চিঠি লেখেন। ইতিমধ্যে সংসার ছেড়ে পণ্ডিচেরিতে যান দিলীপকুমার। 'মনের পরশ'-এর কথা তাই তাঁর আবার মনে পড়ে অনেকদিন পরে,—১৯৫৬তে। তখন পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার এই পুরোনো লেখা নতুনভাবে সাজাতে আরম্ভ করেন তিনি। ১৯৬৩তে সেই 'মনের পরশ'-এর নবরূপ বেরিয়েছে 'ভাবি এক হয় আর' নামে।

আমি এখানে 'মনের পরশ'-এর বিষয়বস্তুর কথা তুলছি না। তবু তাঁর ঐ 'ভাবি এক হয় আর'-এর ভূমিকার কয়েকটি কথা মনে পড়ছে। তিনি তাঁর ঐ ভূমিকায় লিখেছেন—'মতামত নিয়ে তর্ক অফুরন্ত হলেও আমাদের আনন্দ-তৃষিত মন সাড়া দেয়ই দেয় যখন কোনো চিত্রে রস প্রত্যক্ষ হয়ে ফুটে ওঠে।'

সাহিত্যসৃষ্টির কাজে এই প্রত্যক্ষ-তার দিকে নজর রাখা চিরকালের স্রষ্টা-মনের স্বভাব। আমাদের একালের বাংলা সাহিত্যের নানামুখী পরীক্ষা-নিরীক্ষার চাঞ্চল্যের দিকটি ভাবতে বসলেই দিলীপকুমারের ঐ স্রষ্টার স্বীকৃতিটুকু মনে পড়ে।

তবু, একথাও ঠিক যে, আজকালকার সংসারের চেহারাটাই কেমন যেন ভাঙা ভাঙা। সাহিত্যের আসরেও টুকরো কথা, খণ্ডদৃশ্য, তাক-লাগানো ক্ষণিকের কতাস্তই যেন আমরা বেশি দেখছি, বেশি শুনছি। জানি না, এসব খেয়ালের সঙ্গে শিল্পীর যথার্থ মন দুলে-ওঠার যোগ ঘটছে কি ঘটছে না।

এই মন দুলে-ওঠার কষ্টিতেই সাহিত্যের দাম যাচাই করে নেবার সম্ভাবনা। তাই 'ভাবি এক হয় আর'-এর ভূমিকার সেই কথাগুলি মনে আসছে। তিনি লিখেছেন—'শিল্পী যখন কোনো সত্যকে আবিষ্কার করেন, তখন তাকে রূপ দিতে মেতে ওঠেন সে-আবিষ্কারে তাঁর হৃদয় দুলে উঠছে বলেই,—সে-সত্যকে বৈজ্ঞানিক তথ্য-রূপে পেশ করার কোনো নৈতিক কর্তব্যবোধে নয়।'

একথা শিল্পের ক্ষেত্রে সর্ববাদি-সম্মত। এ যে কেবল দিলীপ রায় একলাই বলেছেন, তা নয়। তিনি এই দিকটির উল্লেখ করে ফিলিপাইনদের সভায় কথিত নোবেল-লরিয়েট উইলিয়ম ফক্‌নারের এক বক্তৃতার এই একই ধরনের ক'টি কথা তুলে দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, আরো অনেকের এইরকম অনেক কথা তুলে দেখানো যায়। কিন্তু তা নিষ্প্রয়োজন। ন্যাচারালিজম্ প্রভৃতি সাহিত্যিক মতবাদগুলি আমরা এদেশে যেভাবে ব্যবহৃত হতে দেখছি, সেই ভাবটার সম্বন্ধেই আমরা পাঠকরা বোধ হয় মাঝে মাঝে সংশয় ভোগ করছি—এবং সেইটুকুই আমাদের শক্তিমান লেখকদের কাছে আমাদের জানাবার কথা।

হয়তো, জীবন সম্বন্ধে গভীর আবেগের দৈন্যই একালের বিধিলিপি। আজ পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই একই নিস্তরঙ্গতার খেলা দেখা যাচ্ছে। হয়তো, দেশে দেশে মানুষ সেই প্রত্যয় খুঁজছে—যা এখনো পাওয়া যায় নি। বিজ্ঞান এবং রাজনীতি,—বিজ্ঞানের দ্বারা সুসজ্জিত রাজনীতি,—রাজনীতির দ্বারা পরিচালিত বিজ্ঞান—এই অদ্ভুত এবং ভয়াবহ দৃশ্যই হয়তো আজকের প্রধান দৃশ্য। লেখকদের মন এরই মধ্যে বিদ্যমান। তাই, আধ্যাত্মিকতার অভাবে আমাদের মনের যতোই শূন্যতা ঘটছে, বাইরের হাজারবিধ ভঙ্গি বা মতবাদের ততোই প্রাচুর্য দেখা দিচ্ছে।

আধ্যাত্মিক অর্থে এইরকম নোঙরহীন ভাবটা নবীন বয়সের পক্ষে উত্তেজনাকর বটে, কিন্তু যাঁদের বয়স হয়েছে, তাঁদের কাছে অবস্থা শোচনীয় বলে মনে হয়।

কিন্তু আজ হাহুতাশের কথা থাক। যে-কালের যা পাওনা, সে-কালকে তা পেতেই হয়। তবু, তারই মধ্যে অন্য শক্তিও কাজ করতে থাকে। অন্য কামনাও জেগে থাকে। একালের সেই অন্য কামনার দিকটাও বিবেচ্য। আমরা পাঠকরা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে জীবনের সুস্থতর, পূর্ণতর সম্ভাবনার দিকটাই দেখতে চাই। ক্ষণিকের খেয়ালে আমাদের অরুচি নেই, কিন্তু সর্বগ্রাসী অন্ধকারে আমরা ডুবতে নারাজ। এইসব কথা বলবার জন্যেই আমাদের পাঠকপক্ষের একটা আসর থাকা চাই।

সেদিন এই চাহিদার কথা ভাবতে ভাবতে মনে হোলো, মধ্যযুগে আমাদের এরকম আসর ছিল না বলেই লেখকরা শুধু লিখে গেছেন, আর তাঁদের পৃষ্ঠ-পোষক রাজ-রাজড়ারাই তা লিখিয়েছেন—সে-যুগে 'জনসাধারণ' বলে আমাদের বাংলা কাব্যের কোনো সজাগ শ্রোতৃপক্ষ ছিলেন কি না, সন্দেহের বিষয়। যদি সজাগ 'জনসাধারণ' থাকতেন, তাহলে একই ধরনের মঙ্গলকাব্য শুনে শুনে কানের অরুচি হবার কথা। কিন্তু তা যে হয় নি, ইতিহাসই তার প্রধান সাক্ষী।

আমরা বৈচিত্র্য চাই এবং বিশ্বাস চাই। আমরা অবিশ্বাসও চাই। সন্দেহ চাই, বিতর্ক চাই, ভাঙনও চাই। কিন্তু প্রাণের স্রোত বহতা। আমরা অবসাদের দুর্গতি চাই না। জীবনবোধ সমুদ্র-বোধের মতন। জীবন বিশাল, বিস্তীর্ণ, দুর্বোধ্য,—জীবনের সীমা দুনিরীক্ষ্য। ধ্বক্ করে রবীন্দ্রনাথের কথা মনে আসে—তিনি তাঁর 'শান্তিনিকেতন'-প্রবন্ধমালায় মানুষের ধর্ম-সাধনার কথা-প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—

'এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে আমি এসে দাঁড়িয়েছি এটি একটি মহাশ্চর্য ব্যাপার। এর চেয়ে বড়ো ব্যাপার আর কিছু নেই। আশ্চর্য এই আমি এসেছি—আশ্চর্য এই চারিদিক।

এই যে আমি এসে দাঁড়িয়েছি, কেবল খেয়ে ঘুমিয়ে গল্প করে কি এই আশ্চর্যটাকে ব্যাখ্যা করা যায়? প্রবৃত্তির চরিতার্থতাই কি একে প্রতি মুহূর্তে অপমানিত করবে এবং শেষ মুহূর্তে মৃত্যু এসে একে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিয়ে চলে যাবে?

এই ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের মাঝখানটিতে দাঁড়িয়ে নিজের অন্তরাকাশের চৈতন্যলোকের মধ্যে নিস্তব্ধ হয়ে নিজেকে প্রশ্ন করো—কেন? এ সমস্ত কী জন্যে? এ প্রশ্নের উত্তর জল-স্থল-আকাশের কোথাও নেই।—এ প্রশ্নের উত্তর নিজের অন্তরের মধ্যে নিহিত হয়ে রয়েছে।'

হেণ্ডরিক ভ্যান লুনের 'দি স্টোরি অব ম্যানকাইণ্ড' মনে পড়ে। পৃথিবীর আদিপর্ব থেকে শুরু করে আমাদের এই শতকের প্রথমার্ধ সমাপ্তি পর্যন্ত ইতিহাসের বড়ো বড়ো ধারাগুলি দেখিয়ে, বই শেষ করবার প্রহরে, ১৯৫১ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসে ন্যু-ইয়র্কে বসে তিনি লিখেছিলেন—আমি জানি না—আরো কী লিখতে হবে,—আরো কী যে বাকি রইলো। আমি যেখানে বসে আছি,—ম্যানহাটান দ্বীপের এই একাংশ হয়ে উঠেছে সংযুক্ত রাষ্ট্রসংঘের এলাকা। এই সংঘের বাড়ি তৈরি হচ্ছে। পৃথিবীর শেষ এবং চরম সংঘাতের দুর্যোগ যদি এই রাষ্ট্রসংঘ নিবারণ করতে সমর্থ হয়, তাহলে এ-ইতিহাসের পরের অধ্যায় স্মরণীয় অধ্যায় হবে।

একথা ঠিকই যে,—মানুষের মনে মনে আজ নতুন দায়িত্ববোধে গভীর এবং জাগ্রত অন্তর্লোকের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। তাই, রবীন্দ্রনাথের ঐসব কথা কিছুতেই ভোলা যায় না।

একথা ঠিকই যে সাহিত্য যে লোকজগতের সংবাদ, সেই লোক-জগতে এরকম উপলব্ধি সত্যিই বিরল। কিন্তু বিরল বলেই কি সেদিকে বিমুখ হতে হবে? সাহিত্যের সামাজিক মূল্য আছে বৈকি। 'আর্ট ফর আর্টস সেক' সত্যিই কি মানা যায়?

'শান্তিনিকেতন'-প্রবন্ধমালার মধ্যেই 'বিমুখতা' নামে একটি প্রবন্ধ দেখেছিলুম। আজ সেই প্রবন্ধের কথাও মনে পড়ছে। তিনি লিখেছিলেন—

'তিনি আমার জীবনের একটি সূর্যকরোজ্জ্বল দিনকে চন্দ্রতারাখচিত রাত্রির সঙ্গে গাঁথছেন, আবার সেই জ্যোতিষ্কপুঞ্জখচিত রাত্রিকে জ্যোতির্ময় আর একটি দিনের সঙ্গে গেঁথে চলেছেন। আমার এই জীবনের মণিহার রচনায় তাঁর বড়ো আনন্দ। আমি যদি তাঁর সঙ্গে যোগ দিতুম তবে সেই আনন্দ আমারও হত। এই আশ্চর্য শিল্প-রচনায় কত ছিদ্র করতে হচ্ছে, কত বিদ্ধ করতে হচ্ছে, কত দগ্ধ করতে হচ্ছে, কত আঘাত করতে হচ্ছে—সেই সমস্ত আঘাতের মধ্যেই বিশ্বকর্মার সৃজনের আনন্দে আমার অধিকার জন্মাত।'

আজ শীতের সন্ধ্যায় কলকাতায় 'ধোঁয়াশা'র আস্তরণ। আকাশ সেই আস্তরণে ঢাকা পড়েছে। রবীন্দ্রনাথের দিন-রাত্রির মণিহার এখান থেকে দেখা যায় না।

কিন্তু জীবনকে মণিহার হিসেবেই দেখতে চাই। আশা করি একথার মর্মার্থ ব্যাখ্যার দরকার নেই। 'মণিহার' না বলে 'মহাসমুদ্র' বলতেও আপত্তি নেই। কিন্তু কোনো স্থাপত্য নেই, গঠন নেই, সঙ্কল্প নেই, পরিকল্পনা নেই,—জীবন নিরবচ্ছিন্ন এক বিস্তার বা কিছু কিছু ঘটনাজাল,—কিছু কিছু প্রবৃত্তির বিকার,—খানিকটা ধোঁয়াশা,—বা অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন চেতনাস্রোত মাত্র ভাবতে ভালো লাগে না। জীবনের সঙ্গে সমুদ্রের বিস্তারের ভাবটাও মিলিয়ে নিয়ে ভাবা যায়, কিন্তু তখনো রবীন্দ্রনাথের কথাই শিরোধার্য,—বলতে ইচ্ছে করে যে, এ সমুদ্রের পার আছে, পার আছে, পার আছে।

পশ্চিমের সাহিত্যে একালে রিয়ালিজ্‌মের ধারায় ন্যাচারালিজ্‌ম্ দেখা দিয়েছে, আবার রিয়ালিজ্‌মের প্রতিক্রিয়া হিসেবে এসেছে মনো-বিকলনাশ্রয়ী ভঙ্গি,—এসেছে নিও-রোমাণ্টিক সাহিত্য-আন্দোলন,—ইমপ্রে-শনিজ্‌ম্ বা ধারণাবাদ,—চৈতন্য-স্রোতের অভিব্যক্তি,—এসেছে এক্স্‌-প্রেশনিজ্‌ম্। সাহিত্যের তত্ত্বদর্শী সমালোচক যাঁরা, তাঁরা এইসব নানা নামে লেখকদের নামাবলী সাজিয়ে যাচ্ছেন। এসব আন্দোলনের চুলচেরা প্রকৃতি-বিচার শক্ত কাজ। পাঠকরা এসব শ্রেণী-বিভাগ সম্বন্ধে উদাসীন নন। কিন্তু আঁদ্রে জিদ আর জাঁ পল সার্ত্রের বা আলবেয়ার কামুর মধ্যে আদর্শগত সংযোগ ঠিক কতোটুকু কিংবা স্ট্রিণ্ডবার্গের সঙ্গে কাফ্‌কার আত্মিক যোগ ঠিক কোন্ ক্ষেত্রে, সে সব কথা যতোই প্রাসঙ্গিক হোক, পাঠকের প্রত্যক্ষ অনুভূতির চাহিদা হিসেব করে দেখলে সে সব তথ্য ঠিক অনিবার্যও নয়, অত্যাবশ্যক ব্যাপারও নয়।

আইডিয়ার দাম আছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু কোনো সাহিত্যে কোনো-এক 'আইডিয়া'র সাবলীল প্রকাশ ঘটেছে বললেই কি সবটা বলা হয়? যা আমরা বরেণ্য আশ্রয় বলে অনুভব করতে পারি, সে কি শুধু 'আইডিয়া'র খেলা?

কথায় কথায় অনেক কথা এসে পড়েছে। সব কথা গুছিয়ে বলতে হলে একটু জিরিয়ে নেওয়া দরকার। আজ তাই আর কথা বাড়িয়ে কাজ নেই।

(ক্রমশঃ)

● দিল্লীতে মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনের একটি দৃশ্য

রাজধানী ঃ

পাকিস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক চাতুরীর খেলায় ভারতীয় নীতি আরও একবার তার দুর্বলতাকে বিশ্বের দরবারে উপহাসের বস্তু ক'রে তুলল। ভারতের এই নরম নীতির, যা অন্যতর ব্যাখ্যায় পাকিস্তান তোষণ নীতি, সমালোচনায় রাজধানী আজ বিক্ষোভে সরগরম। লোকসভা রাজ্য সভার কংগ্রেসী বিরোধী সদস্য নির্বিশেষে পাকিস্তানী গুপ্তচরবৃত্তির ব্যাপারে ভারতের পঙ্গু নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁদের মতে, পাকিস্তান হাই কমিশন অফিসের দোসরা নম্বর সচিব শ্রীগোলাম মহম্মদকে ভারত ত্যাগের নির্দেশদান ক'রেও সংবাদটি পাকিস্তান হাই কমিশনের অনুরোধে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য গোপন রাখায় পাকিস্তানকে ভারত বিরোধী প্রচার ও প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ ক'রে দিয়েছেন ভারত সরকার নিজেই। তাঁরা বলেন যে, অতীত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার উপযুক্ত শিক্ষাগ্রহণে পরাঙ্মুখ। মাত্র কয়েক মাস আগে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে পাক হাই কমিশনের বিমান অফিসারকে বহিষ্কারের ব্যাপারেও পাকিস্তানী অনুরোধ রক্ষার খাতিরে ভারত সরকার অনুরূপ কূটনৈতিক প্রমাদের নজীর সৃষ্টি করে ছিলেন। উভয় ক্ষেত্রেই পাকিস্তান ভারতের তরফে ভদ্রতার সুযোগ নিয়ে তৈরি করা অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় হাই কমিশনের বিমান অফিসার ও সম্প্রতি করাচীস্থ ভারতীয় হাই কমিশনের দু নম্বর সচিব শ্রী আর এন যোশীকে পাকিস্তান ত্যাগের আদেশ দিয়েছেন। প্রসঙ্গত জনসঙ্ঘ সদস্য শ্রীবাজপেয়ী পাকিস্তান কর্তৃক কর্নেল ভট্টাচার্যের নিগ্রহের কথাও উল্লেখ করেন। গুপ্তচর অপবাদে কর্নেল ভট্টাচার্যকে পাক সরকার কয়েদ ক'রে রেখেছিলেন। বলা বাহুল্য, ভদ্র ভারত পাকিস্তানী রীতিতে তার কোনোও জবাব দিতে সমর্থ হয় নি। আজও দিতে পারল না, যদিও শ্রীগোলাম মহম্মদ একজন পাকিস্তানী গুপ্তচর চক্রের উচ্চপদস্থ পরিচালক।

সাফ জবাব

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ কিন্তু এই সমস্ত তীব্র সমালোচনার একটি সহজ সরল রাজকীয় জবাব দিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, পাকিস্তানী গুপ্তচরবৃত্তির সংবাদ চেপে রেখে ভারত সরকার যথাকর্তব্য করেছেন। আর তাতে এমন কিছু কূটনৈতিক ক্ষতিবৃদ্ধিও হয় নি। কারণ শ্রীগোলাম মহম্মদ যেদিন ভারতভূমি থেকে বহিষ্কৃত হন, করাচীস্থ ভারতীয় হাই কমিশনের দ্বিতীয় সচিব পাকিস্তান ত্যাগ করেন তার পরের দিন।

সময়ের ব্যবধানই পাকিস্তানী অপপ্রচারের বাধা হয়ে দাঁড়াবে বলে হয়ত শ্রীনন্দের ধারণা। কিন্তু এ-প্রসঙ্গে অন্তত একটি কথা মনে রাখা উচিত যে, বিদেশে সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে এই এক দিনের চুলচেরা হিসেবটিও যে তুলে ধরা হবে এমন কোনও কারণ নেই।

আমরা অজ্ঞ

রাজ্যসভায় প্রশ্নোত্তরকালে স্বরাষ্ট্র

■ণালয়ের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী জে এল হাতা স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অজ্ঞতা স্বীকার করে জানিয়েছেন যে, পাকিস্তান প্রত্যাবর্তনের সময় পাক গুপ্তচর পরিচালক শ্রীগোলাম মহম্মদ কোনো নথিপত্র সঙ্গে নিয়ে গেছেন কি না অথবা তাঁকে বিমানঘাঁটিতে আদৌ তল্লাসী করা হয়েছে কি না—এ সম্পর্কে তাঁর কোনো সংবাদ জানা নেই। এমন কি গুপ্তচর-চক্রের মধ্যমণি মহিন্দর সিং লাম্বা তার পাকিস্তানী মনিব শ্রীগোলাম মহম্মদকে ইতিপূর্বে কোনো গোপন তথ্যের যোগান দিয়েছিল কিনা শ্রীহাতী তারও কোনো সংবাদ রাখেন না। অবস্থার গুরুত্বে চোখ রেখে অনেকেই কিন্তু মনে করেন যে, এই প্রয়োজনীয় সংবাদগুলি সংগৃহীত হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল।

মীরজাফরের দণ্ড

পাক ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত কু-চক্রীদের প্রাণদণ্ড দাবি ক'রে সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টির সদস্যগণ লোকসভায় সোরগোল তুললে শ্রীনন্দ উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের আশ্বাস দেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোপন তথ্য পাচারের এই ঘৃণিত চক্রান্তকে 'গুরুতর এবং সূক্ষ্ম' নামে অভিহিত করেছেন। কিন্তু প্রাণদণ্ডই কি মীরজাফরের শাস্তি! ভারতের প্রধান প্রধান শহরের চিড়িয়াখানায় যাবজ্জীবন নির্বাসিত ও দর্শনীয় হ'য়ে এই ঘৃণিত জীবগুলি বরং অনুতাপ করার সুযোগ পেতে পারে।

হিন্দী রাজ

এখানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দের আহ্বানে ও সভাপতিত্বে দুই দিনব্যাপী মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলন সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে উত্তর প্রদেশ, উড়িষ্যা ও মহারাষ্ট্র ব্যতীত সকল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রিগণ উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের মধ্যে যাঁরা যোগদান করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শিক্ষামন্ত্রী শ্রী এম সি চাগলা, আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোক সেন, খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মমণিয়ম এবং স্বরাষ্ট্র বিষয়ক প্রতি মন্ত্রী শ্রী জে এল হাতী। সম্মেলনে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, মজুত ও মুনাফা বিরোধী অর্ডিন্যান্সের প্রয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে কয়েকটি সিদ্ধান্ত যথাযথ গৃহীত হয়েছে।

কিন্তু সম্মেলনের যে সিদ্ধান্তে রাজধানী তথা তামাম ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণ বিশেষ বিচলিত বোধ করছেন, তা হ'ল আগামী ২৬শে জানুয়ারী থেকে হিন্দী ভাষাকে পুরোপুরি ভাবে সরকারী ভাষারূপে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত।

হিন্দীভাষী রাজ্যগুলি নিজেদের মধ্যে হিন্দী ভাষায় সরকারী পত্র বিনিময় করবেন বলে স্থির হয়। সৌভাগ্যবশত সরকারী শুভবুদ্ধির করুণায় এখনো পর্যন্ত অহিন্দী ভাষী রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে পত্র-বিনিময়ের সময় হিন্দীর ইংরাজি অনুবাদ অবশ্য প্রদেয় ব'লে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

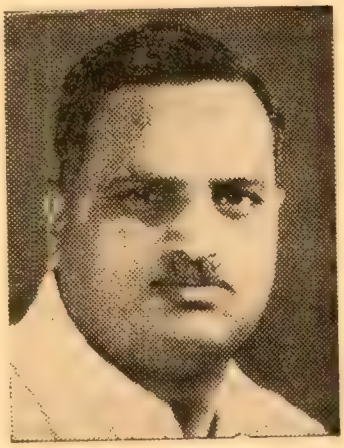

● শ্রীহাতী

বলা বাহুল্য এ সিদ্ধান্ত হিন্দী সাম্রাজ্যবাদীদের বিশেষ প্রীতির কারণ হতে পারে নি। রাতারাতি তাঁরা হিন্দী ভাষাকে সারা ভারতবর্ষের ওপর জোর ক'রে চাপিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী ও সেই সুবাদে সরকারী দপ্তরগুলিতে হিন্দী ভাষীর একাধিপত্য কায়েম করায় অত্যুৎসাহী। আগামী সেপ্টেম্বর মাস থেকে সর্বভারতীয় ও কেন্দ্রীয় সরকারী চাকুরির নির্বাচনী পরীক্ষায় বিকল্প ভাষা হিসেবে হিন্দী ভাষার ব্যবহার চালু করার ব্যাপারে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ মুখ্যমন্ত্রীদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী শ্রীচাগলা ঘোষণা করেছেন, অহিন্দী ভাষী রাজ্যগুলিতে সর্বতোপায়ে হিন্দী শিক্ষা প্রচলনের জন্য কেন্দ্রীয় দরাজ তহবিল অকৃপণ ভাবে খরচ খরচা করতে প্রস্তুত। তত্রাচ উগ্র হিন্দী-রাজ সমর্থকদের ব্যগ্র-লোলুপ নখরাক্রমণ প্রতিহত করার জন্য শিক্ষামন্ত্রী শ্রীচাগলাই আবার লোকসভায় জোরালো ভাষায় হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ প্রসারের উগ্র পরিকল্পনার পরিণাম সম্পর্কে হুঁশিয়ারী দিয়েছেন।

বলা বাহুল্য, শ্রীচাগলার দূরদর্শিতা প্রশংসনীয়। বাস্তবিক ক্ষেত্রে অদূর ভবিষ্যতে হিন্দীভাষীরা যদি ভারতবর্ষে ভাষাগত প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষায় হিতাহিত জ্ঞান বিবর্জিত হ'য়ে পড়েন, ভারতবর্ষ স্পষ্টত হিন্দী-অহিন্দী বলয়ে দ্বিধাবিভক্ত হ'য়ে পড়বে। কিন্তু হিন্দীর একাধিপত্যে যাঁরা ক্ষুদ্র প্রাদেশিক স্বার্থসিদ্ধির সুবর্ণ সুযোগের অপেক্ষায় অধৈর্যভাবে দিন গুণছেন, শ্রীচাগলার সতর্কবাণী তাঁদের কানের ভিতর প্রবেশ করলেও মরম স্পর্শ করবে ব'লে আশা করা অসঙ্গত। সুতরাং এ বিষয়ে সরকারী শুভবুদ্ধির শৈথিল্য ঘটলে সৎ নাগরিক মাত্রই ভারতীয় সংহতির বিপর্যয়ের আশঙ্কা করবেন।

হরফ সংহতি

সংহতি রক্ষার মহান দায়িত্বে উদ্বুদ্ধ উগ্র হিন্দীবাদীরা শ্রীচাগলার উল্টো পথে নয়া সড়ক আবিষ্কারের জন্য উর্বর মস্তিষ্কের নির্যাসে বড় বড় মাথা ঘর্মাক্ত ক'রে তুলেছেন। তাঁদের নয়া জিগির, এক ভারত, এক লিপি। অর্থাৎ বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া, মারাঠী, গুজরাটি, তামিল, তেলেগু ও হিন্দীর লিপিগত বৈচিত্র্যের বিলোপ সাধন ক'রে একই লিপির প্রচলন না-করা

পর্যন্ত নাকি ভারতীয় সংহতি দৃঢ় বাঁধনে আবদ্ধ হবে না। বলা বাহুল্য, বহুভাষী ভারতবর্ষে এই একমেবদ্বিতীয়ম্ লিপিটির চেহারাও বলা হয়েছে, তা রাজভাষার লিপি গৌরবের অধিকারী দেবনাগরী লিপি। এঁরা বহুতর সুবিধার অধিকারী রোমান হরফের কথা বললেও না-হয় এঁদের বক্তব্য বিশেষ যুক্তিকেন্দ্রিক ব'লে মনে করা যেত। কিন্তু সুবিধা-অসুবিধা বা অন্যতর কোনোও কারণের জন্য এঁরা যে মোটেও চিন্তিত নন, বরং দেবনাগরী লিপি যে আঞ্চলিক ভাষার সঙ্কেত সৃষ্টি করে সেই হিন্দীর প্রচারই এঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য, তা এঁদের দুশ্চিন্তার বহর দেখে সহজেই অনুমান করা যায়। সংহতির নামে হিন্দীর ধ্বজাধারীরা যে দেশব্যাপী বিভেদের উস্কানি দিচ্ছেন দেশপ্রেমী মাত্রেই তার সত্যাসত্য সুবিধা-অসুবিধা চূড়ান্তভাবে যাচাই ক'রে নেবেন।

দয়া নয়, অধিকার

অনুন্নত শ্রেণীর বৈষয়িক মানোন্নয়নে সর্বতোমুখী প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে লোকসভায় সামাজিক নিরাপত্তা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীঅশোক সেন ঘোষণা করেন যে, সমাজের অনুন্নত ও দুর্বল শ্রেণীর জীবন ধারণের মানোন্নয়নে তাঁর দপ্তর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করবেন। এতৎ সম্পর্কে সরকারী তৎপরতাকে সরকারী কর্তব্য ব'লেই উল্লেখ করেন তিনি। এ বিষয়ে অনুন্নত শ্রেণীর প্রতি কোনরূপ দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করা হচ্ছে—এ জাতীয় বিভ্রান্তি নাগরিকদের মন থেকে মুছে দেওয়ার জন্যও শ্রীসেন তাঁর দৃঢ় সঙ্কল্প প্রকাশ করেন।

শ্রীসেনের প্রস্তাব একটি স্থায়ী সমস্যার ওপর নতুন চিন্তাধারার আলোকপাত করেছে।

সংবিধান-রচয়িতাগণ অনুন্নত-শ্রেণীর মানোন্নয়নের জন্য পনেরো বছর শ্রেণীগত বিশেষ সুবিধা-সুযোগের ব্যবস্থা রেখেছিলেন। কিন্তু এই সময়ের ব্যবধানেও আশানুরূপ ফল হয় নি। শ্রীসেন অনগ্রসর তপশীলী সম্প্রদায় ও খণ্ডজাতির কল্যাণ সাধনে তাঁর সুস্পষ্ট নীতি ঘোষণা ক'রে বিষয়টিকে নতুন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

তপশীলী সম্প্রদায়ের কৃষকদের জন্য একটি ঋণদান সংস্থা গঠন সম্পর্কে বিবেচনার্থ শীঘ্রই একটি রাজ্য প্রতিনিধি সম্মেলন আহ্বান করা হবে। সম্মেলনে তপশীলী কল্যাণসাধন সম্পর্কিত অন্যান্য প্রশ্নও আলোচিত হবে।

● শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন

অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে কারিগরী শিক্ষার সম্পূর্ণ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থাও সরকার গ্রহণ করবেন বলে শ্রীসেন ঘোষণা করেন।

আমরা কি দুর্বল

পাকিস্তানে হিন্দু নির্যাতন, ব্যাপক ধর্মান্তরিতকরণ ও নারীহরণ প্রসঙ্গে এক প্রশ্নোত্তরকালে বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মী মেননের কয়েকটি হিমশীতল উক্তিতে সভাগৃহে উত্তেজনা ও বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। বহু কংগ্রেসী সদস্য সমেত স্বয়ং অধ্যক্ষও অবিচলিত থাকতে পারেন নি। শ্রীমতী মেননের বক্তব্যে পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ভারতের দুর্বল নীতির আর এক দফা পরিচয় মিলল। শ্রীমতী মেনন বলেছেন, পাকিস্তানী নাগরিককে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হয় নি, পাকিস্তানের এই কৈফিয়ৎ ভারতীয়রা মেনে না নিলেও বহির্বিশ্বে পাকিস্তানী কৈফিয়ৎ-ই বিশ্বাসযোগ্য ব'লে গণ্য হবে। শ্রীমতী মেননের উক্তি পাকিস্তানের পক্ষে ওকালতি ব'লে অনেকে মন্তব্য করেন। স্বয়ং অধ্যক্ষ এই উক্তির তাৎপর্য বিশ্লেষণ ক'রে বলেছেন—শ্রীমতী মেননের উক্তির অর্থ, ভারতের বক্তব্য এতই দুর্বল যে, বহির্বিশ্বে পাকিস্তানী কৈফিয়ৎই একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য। শ্রীমতী মেনন আরও বলেছেন যে, ধর্মান্তরিতকরণ পাকিস্তানে অবশ্যই হয়েছে, কিন্তু যাঁদের ধর্মান্তরিত করা হয়েছে, তাঁরা পাকিস্তানেরই নাগরিক।

শ্রীমতী মেননের বক্তব্যে ভারত সরকারের নিরুপায় দুর্বল অবস্থাই চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু সত্যিই কি আমরা পাকিস্তানের ক্ষেত্রে চরম দুর্বলতাকে জপমালা ক'রে চিরটা কাল মুখ বুজে পড়ে থাকব?

আসামঃ

আসামের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীবিষ্ণুরাম মেধির আবির্ভাব বর্তমান মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে একটি জোরদার সঙ্কট ঘনিয়ে তুলেছে। শ্রীমেধি বর্তমানে আসাম কংগ্রেসের বিসংবাদী দলের নেতৃত্বে আসীন। শ্রীমেধি বর্তমান মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধাচরণের জন্যই একদিন আসামের রাজনীতিক্ষেত্র থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হ'ন। আজ তিনিই চালিহা-সরকারের বিরুদ্ধবাদীদের নেতৃত্ব গ্রহণ ক'রে পুনরায় রাজ্যের রাজনৈতিক তরণীর কর্ণধার হওয়ার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছেন। এককালে শ্রীমেধি আসামের রক্ষণশীল দলের

নেতারূপে বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। সম্প্রতি হাওয়া ঘুরেছে।

আসামে চিরাচরিতভাবে উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের বিরোধ চলে আসছিল। কিন্তু মেধি-চালিহা প্রশ্নে সেই আবহমানকালের বিরোধও কোনো কার্যকরী ক্রিয়া সম্পাদন করছে না। শ্রীমেধি দক্ষিণাঞ্চলবাসী হওয়া সত্ত্বেও উত্তরাঞ্চলের সমর্থন লাভে এখন সমর্থ হয়েছেন। মন্ত্রিসভা বিরোধী দল এবং কংগ্রেসী বিসংবাদী সদস্যরা যেন শ্রীচালিহার পতনের জন্য শ্রীমেধিকে আঁকড়ে ধরে আছেন।

আসামে 'হিন্দু আধিপত্যের' শ্লোগান নিয়ে মন্ত্রিসভা বিরোধীরা শ্রীমেধির নেতৃত্বে অভিযান সুরু করবার জন্য রীতিমত প্রস্তুত। শ্রীমেধিও উল্লিখিত বিষয়টিকে তাঁর রাজনৈতিক সাফল্যের হাতিয়ার হিসেবে সযত্নে তুলে নিয়েছেন। চালিহা-সমর্থক বাঙালী নেতৃবৃন্দকেও ক্রমশ দলে টানতে শ্রীমেধি সুযোগের অপব্যবহার করেন নি। বাঙালী নাগরিকগণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের রক্ষক শ্রীচালিহার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল হওয়া সত্ত্বেও 'হিন্দু ঐক্যের' প্রশ্নে শ্রীমেধির প্রতি ঝুঁকেছেন। শ্রীমেধি সুযোগ সদ্ব্যবহারের অভিপ্রায়ে সম্প্রতি 'হিন্দু ঐক্যের' জিগির নিয়ে বাঙালী-প্রধান কাছাড় জেলা সফর করেন ও সমস্ত রকম সভা-সমিতিতে যোগ দিয়ে পাকিস্তানী অনুপ্রবেশের সমস্যা সমাধানে চালিহা-মন্ত্রিসভার ব্যর্থতার প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে আঞ্চলিক সমর্থন আদায়ে সফল হন।

অবশ্য আসামের ভাগ্যে দলাদলির ভিত্তিতে ক্ষমতার লড়াই-এর ভবিষ্যৎ পরিণাম কি হবে, এখনই সে বিষয়ে কোনো সঠিক মন্তব্য করা অনুচিত। তবে এখানে যে একটা বড় রকমের দলীয় সঙ্কট ঘনীভূত হয়ে উঠছে, আসামের রাজনৈতিক আকাশের মেঘাচ্ছন্নভাব লক্ষ্য ক'রে তা অনায়াসেই উপলব্ধি করা যায়।

উড়িষ্যা ঃ

দলীয় ভিত্তিতে সর্বপ্রথম দেশের সমস্ত মন্ত্রীমহোদয়ের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ পরীক্ষা ক'রে দেখা হোক ব'লে উড়িষ্যার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিজু পট্টনায়ক কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজের দরবারে আবেদন পেশ করেছেন। এ সম্পর্কে অভিযোগের ওপর তদন্ত চালাবার জন্য বিশেষ প্রক্রিয়া স্থিরীকরণের জন্যও তিনি কংগ্রেস সভাপতিকে অনুরোধ জানান। তাঁর মতে উল্লিখিত প্রথা অবলম্বিত না হওয়ায় অনেকের ধারণা হয়েছে, কোনো কোনো রাজ্যে যখন দুর্নীতি দেখা দিয়েছে, অন্যান্য রাজ্যগুলিতে তখন ঐ বস্তুর অস্তিত্বই নেই। শ্রীপট্টনায়ক তাই দাবি করেছেন যে, যদি এক রাজ্যে দুর্নীতির তদন্ত চালানো হয়, তা হলে অপরাপর রাজ্যেও অনুরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হবে না কেন। পরন্তু তদন্তকালীন সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী কি নির্দোষ এ সম্পর্কে আগে থেকে কোনো মনোভাব পোষণ করা অনুচিত। হয় সব ক্ষেত্রেই তদন্ত চালানো হোক, না হলে তদন্তের ঝামেলা চুকিয়ে দাও। অবশ্য দলগত-ভাবে তদন্ত করায় শ্রীপট্টনায়কের আপত্তি নেই।

উড়িষ্যাই যে দুর্নীতির পীঠস্থান এ জাতীয় ধারণা সৃষ্টি অনুচিত। শ্রীপট্টনায়ক দাবি করেন যে, অন্যান্য রাজ্যের মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উড়িষ্যা থেকে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে এবং এই জাতীয় পক্ষপাতিত্বের অবসান হওয়া দরকার।

ইতিমধ্যে জানা গিয়েছে যে, উড়িষ্যার নেতৃবর্গের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত অভিযোগগুলি বিবেচনায় ক্যাবিনেট সাব কমিটী আরও দীর্ঘ সময় গ্রহণ করতে পারেন। শ্রীপট্টনায়কের বিরুদ্ধে এ যাবৎ ৩১ দফা অভিযোগ আনীত হয়েছে, যার মধ্যে বর্তমান আলোচনাকালে কয়েকটি মাত্র অভিযোগ বিবেচনা করা হয়।

● শ্রীবিজু পট্টনায়ক

শ্রীপট্টনায়কের বক্তব্যে বিশেষজ্ঞ মহলে কিন্তু আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরা মনে করছেন, শ্রীপট্টনায়কের ব্যাপারে কোনোরকম পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ করা হ'লে তিনি প্রতিহিংসামূলক পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারেন।

গুজরাট ঃ

অবশেষে ক্ষুধা নিরোধক একটি উদ্ভিদমূল গুজরাটের বন্য প্রদেশে আবিষ্কৃত হয়েছে। গুজরাটী আদিবাসীদের ধন্যবাদ, এই যাদু-মূলের আবিষ্কারে সহায়তা ক'রে তাঁরাই হয়ত অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের খাদ্য সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধান রচনা ক'রে দেবেন। মহা মহা খাদ্যমন্ত্রীদের আর মাথা ঘামাতে হবে না। এই বহু আলোচিত বৃক্ষমূলের নাম কালিয়াকান্দ। আদিবাসীদের কাছে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেছে যে, একবার কালিয়াকান্দ ভক্ষণে নাকি পাঁচদিনের জন্য কোনোও ক্ষুধার অনুভূতি থাকে না।

সুতরাং আধা মণ কালিয়াকান্দ ইতিমধ্যেই দিল্লীর সেণ্ট্রাল রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার্থে রপ্তানী করা হয়ে গেছে।

বিষয়টির ওপর এ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরই সর্বাপেক্ষা আগ্রহাতিশয্য দেখা গেছে। পশ্চিমবঙ্গ বিধান-পরিষদেও এ সম্পর্কে বিতর্কের চূড়ান্ত হয়েছে। স্বয়ং স্বাস্থ্যমন্ত্রী গুজরাটের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে পত্রযোগে এই আশ্চর্য কালিয়াকান্দের গুণাগুণ জানতে চেয়েছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঃ

গত ১১ই ডিসেম্বর যখন রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে কিউবার শিল্পমন্ত্রী ডঃ এর্নেস্টো গুয়েভেরা বক্তৃতা করছিলেন, তখন ক্যাস্ট্রোবিরোধী একদল কিউবান রাষ্ট্রসংঘ ভবনকে লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করে। বোমাটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে রাষ্ট্রসংঘ ভবনের প্রায় ১৫০ গজ দূরে নদীর মধ্যে পড়ে। লক্ষ্যভ্রষ্ট না হলে, ৩৮ তলা বিশিষ্ট রাষ্ট্রসংঘ ভবনটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হত এবং বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দকে প্রাণ হারাতে হত।

রাষ্ট্রসংঘ ভবনের ওপর আক্রমণ অবশ্য এই প্রথম নয়। পূর্বেও একাধিকবার এরূপ ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু এবারের ঘটনা যেন সব কিছুকে ছাপিয়ে গেছে। মার্কিন পুলিশ বিভাগের বিবরণে জানা যায়, রাষ্ট্রসংঘ ভবনের পূর্বদিকের নদীর অপর পার থেকে স্বয়ংক্রিয় কামানে মর্টার ধরণের বোমা ছোঁড়া হয়েছে। এখানে নদীটি প্রায় ৯০০ গজ চওড়া। বোমাটি নদীগর্ভে পড়ে। বোমা বিস্ফোরণে বিরাট শব্দ হয় এবং সমগ্র রাষ্ট্রসংঘ ভবনটি কেঁপে ওঠে। বোমা বিস্ফোরণের ফলে নদীর জলও প্রায় ২০ ফুট উঁচু হয়ে কেঁপে ওঠে। কেবল এই বোমা বিস্ফোরণই নয়, বিস্ফোরণের ঠিক পূর্বে একজন কিউবান মেয়ে একটি ৯ ইঞ্চি ছোরা নিয়ে রাষ্ট্রসংঘ ভবনে ঢোকার চেষ্টা করে। মেয়েটি স্বীকার করেছে, গুয়েভেরাকে হত্যা করাই তার উদ্দেশ্য ছিল। এ-ছাড়া ক্যাস্ট্রো-

• এর্নেস্টো গুয়েভেরা

• করাচীতে পাকিস্তানী সরকারের নীতি ও ব্যবস্থার প্রতিবাদে বিরাট ছাত্র-জনতা হাত তুলে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। ছাত্রদল প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের প্রতীক হিসেবে একটি কুকুরকে তুলে ধরেছেন।

বিরোধী কিউবানরা রাষ্ট্রসংঘ ভবনের সোভিয়েট ইউনিয়নের পতাকাকে ছিঁড়ে ফেলে এবং কিউবার প্রতীকচিহ্নটি নষ্ট করে ফেলে।

ক্যাস্ট্রোবিরোধী কিউবানদের প্রতিষ্ঠান 'ব্ল্যাক ফ্রণ্টের' একজন মুখপাত্র বলেছে, রাষ্ট্রসংঘ ভবনের ওপর এই আক্রমণ তাদের কর্মসূচীর প্রাথমিক পর্বমাত্র। —ভবিষ্যতে এইরূপ আরও আক্রমণ পরিচালনা করা হবে। রাষ্ট্রসংঘের তীব্র সমালোচনা করে 'ব্ল্যাক ফ্রণ্টের' লোকেরা বলছে, রাষ্ট্রসংঘের কার্যকারিতা ফুরিয়েছে এবং বর্তমানে রাষ্ট্রসংঘ কমিউনিজম প্রসারের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। 'ব্ল্যাক ফ্রণ্টের' সদস্যরা তাই কেবল ক্যাস্ট্রোর বিরোধীই নয়, তারা রাষ্ট্রসংঘেরও বিরুদ্ধে।

ক্যাস্ট্রোবিরোধীদের দ্বারা রাষ্ট্রসংঘ ভবন আক্রমণের ঘটনায় রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছেন। তাঁদের প্রশ্ন: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পছন্দ নয়, এমন কোন বক্তৃতা কেউ রাষ্ট্রসংঘে করলে তাঁর জীবনের কোন নিরাপত্তা থাকবে না? কিউবার শিল্পমন্ত্রী ও ফাইডেল ক্যাস্ট্রোর ব্যক্তিগত প্রতিনিধি এর্নেস্টো গুয়েভেরা যখন সাধারণ পরিষদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় বক্তৃতা করছিলেন, তখনই এই আক্রমণ পরিচালিত হয়। একথা ঠিক, মার্কিন পুলিশ বিভাগ এই ঘটনায় অত্যন্ত বিব্রত বোধ করছেন এবং অপরাধীদের খুঁজে বের করার জন্য তাঁরা বিশেষভাবে চেষ্টা করছেন। কিন্তু 'ব্ল্যাক ফ্রণ্ট' প্রতিষ্ঠানটি কি মার্কিন কর্তাদের নাকের ডগাতেই গড়ে ওঠে নি? ফ্যাসিস্ট ধরণের এই প্রতিষ্ঠান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুকূল্যেই বিকাশ লাভ করেছে। ক্যাস্ট্রোবিরোধী কিউবানরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয়লাভ করুক, এতে কারও আপত্তি নেই, কিন্তু তারা যখন রাষ্ট্রসংঘে ঢুকে ক্যাস্ট্রো বা তাঁর অনুগামীদের হত্যার চেষ্টা করে, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সে দায়িত্ব অস্বীকার করে কিভাবে?

আজ তাই দাবি উঠেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি রাষ্ট্রসংঘ এলাকা ও রাষ্ট্রসংঘ প্রতিনিধিদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা

করতে না পারে, তবে রাষ্ট্রসংঘকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূখণ্ড থেকে সরিয়ে কোন একটি নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে নিয়ে যাওয়া উচিত।

কঙ্গো ঃ

ময়সে টি শোম্বে রোম, প্যারিস, মিউনিক, বন সফরে বেরিয়েছেন। তাঁর এই সফর নানাদিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি চার্ল দ্য গলের সঙ্গে টি শোম্বের সাক্ষাৎকার বিশ্বের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

টি শোম্বের ধারণা হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বেলজিয়াম হয়তো শেষ পর্যন্ত তাঁকে সমর্থন করবে না। পূর্বের অভিজ্ঞতা তিনি ভুলতে পারেন নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বেলজিয়াম প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সিরিল আডুলাকে তাঁর জায়গায় প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসাবে, এ-রকম ভয় টি শোম্বের আছে। বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য বিদেশী সাহায্য না নিয়ে উপায় নেই, তাই টি শোম্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বেলজিয়ামের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু তাই বলে তিনি তাদের হাতের পুতুল হবেন না—নিজের ইচ্ছামত তিনি চলতে চান। এই অবস্থায় কেবলমাত্র এদের সাহায্যের ভরসায় না থেকে টি শোম্বে নতুন বন্ধু খুঁজতে বেরিয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মনে হয়েছে দ্য গলের কথা।

দ্য গলের সমর্থন টি শোম্বের অন্য কারণেও প্রয়োজন। আফ্রিকার প্রাক্তন ফরাসী অধিকৃত রাষ্ট্রগুলিতে এখনও দ্য গলের যথেষ্ট প্রভাব আছে। কোন মতে নিজের দিকে দ্য গলকে টানতে পারলে, আফ্রিকায় বন্ধু সংগ্রহ করা টি শোম্বের পক্ষে সহজ হবে। আফ্রিকার রাজনীতিতে টি শোম্বে বর্তমানে প্রায় একঘরে—এ-অবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, কঙ্গোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য টি শোম্বে ফ্রান্সের সাহায্য চান। ইতিমধ্যেই ফ্রান্সের শিল্পপতিরা কঙ্গোয় অনেক অর্থ-বিনিয়োগ করেছে এবং বহু দক্ষ কারিগর ও অন্যান্য কর্মী ফ্রান্স থেকে কঙ্গোয় এসে কাজ করছে। এই সহযোগিতা আরও বৃদ্ধি পেলে টি শোম্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বেলজিয়ামের ওপর কম নির্ভর করবেন।

দ্য গল অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে টি শোম্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। এখন পর্যন্ত কঙ্গোর রাজনীতিতে তিনি মাথা গলান নি। ফ্রান্সের জনমত স্ট্যানলিভিলে মার্কিন বিমান ও বেলজিয়ামের প্যারা সৈন্য অবতরণের তীব্র নিন্দা করেছে। দ্য গল স্বাভাবিকভাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতির বিরোধী হবেন। কিন্তু তা হলেও ফরাসীভাষী কঙ্গোয় প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ তিনি ছাড়তে চান না।

সম্ভাবনাপূর্ণ কঙ্গোয় অর্থ-বিনিয়োগের লাভের কথাও তিনিই ভালই বোঝেন। টি শোম্বে যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বেলজিয়ামের পরিবর্তে ফ্রান্সের দিকে ঝোঁকেন, তবে দ্য গলের পক্ষে তা নিশ্চয়ই ভাল খবর।

কিন্তু ঝানু রাজনীতিক দ্য গল একথাও জানেন, টি শোম্বের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব আফ্রিকা-এশিয়ার দেশগুলি মোটেই ভাল চোখে দেখবে না। তাই দ্য গল মধ্যপন্থা অনুসরণের চেষ্টা করেছেন। তিনিই টি শোম্বের সঙ্গে দেখা করেছেন। তাঁর কথাও সব শুনেছেন—কিন্তু প্রকাশ্যে কোন মন্তব্য করেন নি।

তবে মনে হয়, দ্য গল টি শোম্বেকে কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। কঙ্গোর

রাষ্ট্রসংঘ ভবন লক্ষ্য করে ক্যাস্ত্রোবিরোধীদের কামানের গোলাবর্ষণ। গোলাবর্ষণের স্থান ও গোলার পতন স্থান ছবিতে চিহ্নিত হচ্ছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বেলজিয়ামের প্রভাব হ্রাসের ব্যবস্থা করার জন্য তিনি টি শোম্বেকে বলেছেন। লক্ষ্য করার বিষয়, কঙ্গোর খনির ওপর প্রভাবশালী বেলজিয়ান কোম্পানী 'ইউনিয়ন মিনিয়েরে' ও আরও দুটি বেলজিয়ান কোম্পানীর রয়্যালটির অধিকার খাতিল করে টি শোম্বে ইতিমধ্যেই আদেশ জারী করেছেন। দ্য গলের ভরসা না পেয়েই কি টি শোম্বে মুরুব্বি বেলজিয়ামকে চটাতে সাহস করেছেন?

শেষ পর্যন্ত যদি দ্য গল টি শোম্বের পেছনে এসে দাঁড়ান, তবে কঙ্গোর রাজনীতিতে বড়রকমের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে।

কেনিয়া ঃ

স্বাধীনতা প্রাপ্তির ঠিক এক বৎসর পরে কেনিয়া নিজেকে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র রূপে ঘোষণা করেছে। গত সপ্তাহে নাইরোবিতে বিরাট জাঁক-জমকের মধ্যে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উৎসব পালিত হয়। এই বৎসর শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত মার্কিন নিগ্রো নেতা ডঃ মার্টিন লুথার কিং বিশেষভাবে এই উৎসবে যোগ দেবার জন্য নাইরোবি এসেছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী জোমো কেনিয়াট্টা কেনিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ওগিঙ্গা ওডিঙ্গা হয়েছেন উপরাষ্ট্রপতি।

কেবলমাত্র 'উহুরু' বা স্বাধীনতা থেকে 'জামহুরি' বা প্রজাতন্ত্রের রূপান্তরই নয়, কেনিয়ার বহুদল ব্যবস্থা থেকে একদল ব্যবস্থাও একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হল। বিরোধী 'কাডু' দল শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত 'কানু' দলের সঙ্গে মিশে গেছে। কেনিয়াট্টা ঘোষণা করেছেন, দেশ গঠনের জন্য একটিমাত্র দলই যথেষ্ট। এ ব্যাপারে তিনি ঘানার কোয়ামে নক্রুমার নীতি অনুসরণ করেছেন। অবশ্য, নক্রুমার মত তিনি আজীবন রাষ্ট্রপতি হবার চেষ্টা করবেন, এমন কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। কেনিয়াট্টার বয়স এখন ৭৪। খুব বেশিদিন নিশ্চয়ই তিনি শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকবেন না।

● শপথগ্রহণরত জোমো কেনিয়াট্টা

কেনিয়াট্টার পর কেনিয়ার শাসনক্ষমতায় কে বসবেন, এই নিয়ে এখন থেকেই আলোচনা চলছে। উপরাষ্ট্রপতি ওগিঙ্গা ওডিঙ্গাই সম্ভবত কেনিয়াট্টার উত্তরাধিকারী। কিন্তু পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নমন্ত্রী টম ময়ার নামও এই প্রসঙ্গে শোনা যাচ্ছে। "ডবল ও" বা ওগিঙ্গা ওডিঙ্গা বড্ড বেশী কমিউনিস্ট ঘেঁষা বলে মধ্যপন্থীরা টম ময়াকে সমর্থন করতে চান।

যাই হোক, আপাতত সবাই 'হারাম্বি' বা "এক সঙ্গে কাজ করার" নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার চেষ্টা করবেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রজাতন্ত্র হলেও, কেনিয়া কমনওয়েলথের সদস্য থাকবে।

ইন্দোনেশিয়া ঃ

কিছুদিন পূর্বে রাষ্ট্রপতি সোয়েকার্নোর বিদেশ সফরের সময় জোর গুজব রটেছিল, সোয়েকার্নোর পতন আসন্ন। কিন্তু তেমন কোন ঘটনা ঘটে নি। সোয়েকার্নো নিরাপদে দেশে ফিরেছেন এবং শাসন পরিচালনা করেছেন।

● সোয়েকার্নো

কিন্তু সোয়েকার্নোর বিরুদ্ধে একটা চক্রান্তের চেষ্টা যে সত্য-সত্যই হয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে ক'দিন আগের একটি সংবাদ থেকে। জাকার্তা থেকে প্রচার করা হয়েছে, ইন্দোনেশিয়ার সব ক'টি দল, অর্থাৎ মোট ১০টি রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ রাষ্ট্রপতি প্রাসাদে সোয়েকার্নোর সঙ্গে আলোচনা করে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাঁরা সবাই সোয়েকার্নোকে আজীবন রাষ্ট্রপতিরূপে মেনে চলবেন। নতুন করে এই প্রতিশ্রুতি দেবার প্রয়োজন হল কেন? তা হলে সোয়েকার্নো নিশ্চয়ই নিজেকে বিপন্ন বলে বোধ করেছিলেন। এই দলগুলির মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল কমিউনিস্ট পার্টিও ছিল।

রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা সোয়েকার্নোর 'মালয়েশিয়া ধ্বংসের' প্রচেষ্টাকেও সর্বতোভাবে শক্তিশালী করার প্রতিশ্রুতি দেন এবং ঘোষণা করেন, তাঁরা সবাই ইন্দোনেশিয়া অনুগামী উত্তর বোর্নিওর আজহারিকে সমর্থন করবেন। আজহারি এখন বোর্নিও থেকে পালিয়ে ইন্দোনেশিয়ায় এসে আছেন এবং তিনি নিজেকে উত্তর বোর্নিও, সাবা ও সারওয়াকের প্রধানমন্ত্রী বলে ঘোষণা করেছেন। তাঁর কল্পিত রাষ্ট্রের নাম 'ইউনিটারি স্টেট অব কালিমান্তান উতারা'।

সোয়েকার্নো অবশ্য মালয়েশিয়া ধ্বংসের কাজে খুব একটা সুবিধা করে উঠতে পারছেন না।

সোভিয়েট ইউনিয়ন ঃ

সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, বিশ্ব কমিউনিস্ট পার্টি সম্মেলনের প্রস্তুতিস্বরূপ আগামী ১৫ই মার্চ মস্কোয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদের এক বৈঠক বসবে। এই বৈঠকে খসড়া প্রণয়ন কমিশন গঠন করা হবে এবং এই কমিশন আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক বিরোধ সম্পর্কে প্রস্তাব রচনা করবে।

তবে কি চীনের সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের আপোষ প্রচেষ্টা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে? নিকিতা ক্রুশ্চেভ যখন প্রথম এরূপ বিশ্ব কমিউনিস্ট সম্মেলনের প্রস্তাব করেন, তখন চীন তার তীব্র বিরোধিতা করেছিল। এরূপ সম্মেলনে অধিকাংশ দেশের কমিউনিস্ট পার্টি চীন-সোভিয়েট তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বে সোভিয়েট ইউনিয়নকে সমর্থন করবে, এই কারণেই চীন এই প্রস্তাবে সম্মত হয় নি। ক্রুশ্চেভের পতনের পর চীনা নেতাদের সঙ্গে সোভিয়েটের নতুন নেতাদের বিবাদ নিষ্পত্তির একটা চেষ্টা সুরু হয়। মস্কোয় নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উৎসবে যোগ দিতে এসে চৌ-এন-লাই স্বয়ং আপোষ আলোচনার সূত্রপাত করেন। আলোচনার ফলে বিরোধের নিষ্পত্তি না হলেও, আরও আলোচনা হবে বলে মনে হয়েছিল। বিশ্ব কমিউনিস্ট সম্মেলনের যে প্রস্তুতি-বৈঠক ১৫ই ডিসেম্বর হবার কথা ছিল, সোভিয়েট নেতারা তা বন্ধ রেখেছিলেন। কিন্তু এখন যখন আবার সম্মেলন আহ্বানের কথা বলা হয়েছে, তখন মনে হয় আপোষ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

• চৌ-এন-লাই

• মাও-সে-তুং

চীনা নেতারাও সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছে দেখা যাচ্ছে। 'পিপলস ডেইলী' পত্রিকায় 'ক্রুশ্চেভীয় কমিউনিজম'-এর নাম করে প্রকারান্তরে ব্রেজনেভ-কোসিগিন নেতৃত্বকেই গালাগাল করা হয়েছে। চীনে সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত সেরভোলেনকো চীনা কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান মাও-সে-তুং-এর সঙ্গে দেখা করে বিশ্ব কমিউনিস্ট সম্মেলনের আমন্ত্রণপত্র দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মাও-সে-তুং, লি-শাও-চি, চৌ-এন-লাই কেউ সেরভোলেনকোর সঙ্গে দেখা করতে রাজী হন নি। অনেক চেষ্টা করে সেরভোলেনকো একজন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে পেরেছেন। মন্ত্রীপ্রবর সোভিয়েট রাষ্ট্রদূতকে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, চীন প্রস্তাবিত সম্মেলনে যোগ দেবে না।

'প্রাভদা' পত্রিকাতেও চীনের নাম উল্লেখ না করে চীনা নেতাদের তীব্র সমালোচনা করে প্রবন্ধ বেরিয়েছে।

বৃটিশ গায়না ঃ

অবশেষে ডঃ ছেদী জগানকে বৃটিশ গায়নার প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। পিপলস ন্যাশন্যাল কংগ্রেস দলের নেতা ফরবেস বার্নহাম নতুন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন।

৩ঃ জগানকে বিতাড়নের জন্য বৃটিশ গায়নার সংবিধান সংশোধন করতে হয়েছে। বৃটিশ সরকার একটি অডিন্যান্স জারী করে সংবিধানের সংশোধন করেন এবং গভর্নর-জেনারেল স্যার রিচার্ড লুইট বার্নহামকে প্রধানমন্ত্রী হবার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

বামপন্থী মতাবলম্বী জগানকে সরাবার জন্য বৃটিশ সরকারের চেষ্টা এই প্রথম নয়। ১৯৫৩ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ছেদী জগান জয়লাভ করেন। কিন্তু জগানের বামপন্থী মনোভাব ও স্বাধীনতার দাবিতে বিরক্ত হয়ে গভর্নর-জেনারেল পাঁচ মাসের মধ্যে জগানকে বিতাড়ন করতে সক্ষম হন। তিন বৎসর পরে আবার জগান নির্বাচনে জয়লাভ করেন। এবার বৃটিশ সরকার জগানকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য সংবিধান সংশোধনের ব্যবস্থা করেন। এমন ভাবে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়, যাতে ২,৯৫,০০০ ভারতীয়দের নেতা জগানের পরিবর্তে ১,৯০,০০০ নিগ্রোর নেতা বার্নহাম বেশি আসন লাভ করেন।

গত বৎসর সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক-ভাবে বৃটিশ গায়নার সংবিধান সংশোধন করার জন্য বৃটেনের রক্ষণশীল সরকারের আচরণের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন তৎকালীন বিরোধী দলনেতা হ্যারল্ড উইলসন। আর অদৃষ্টের এমনই পরিহাস, আজ হ্যারল্ড উইলসনকেই প্রধানমন্ত্রীরূপে কেবল অগণতান্ত্রিক সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনের ব্যবস্থাই করতে হ'ল না, আরও অগণতান্ত্রিক উপায়ে আবার সংবিধান সংশোধন করে ছেদী জগানকে বিতাড়িত করতে হল। বৃটেনে শ্রমিক দলও কি রক্ষণশীল দলের মত একইরূপ ঔপনিবেশিক নীতি অনুসরণ করবে?

পাকিস্তান ঃ

পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র-আন্দোলন ক্রমেই তীব্র আকার ধারণ করছে। ১৪ই ডিসেম্বর খুলনায় একটি ছাত্র মিছিলের ওপর গুণ্ডারা ইট-পাটকেল ছোঁড়ে এবং ছোরা দিয়ে ছাত্রদের আক্রমণ করে। গুণ্ডাদের মধ্যে কনভেনশনপন্থী মুসলিম লীগ দলের অনেক পরিচিত ব্যক্তি ছিল। আরও উল্লেখযোগ্য, ডেপুটি কমিশনার ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের সম্মুখেই গুণ্ডারা ছাত্রদের ওপর এই হামলা চালায়।

এই আক্রমণের ফলে একজন বেসিক ডেমোক্রাট ও প্রায় ১৫ জন ছাত্র গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। রংপুর শহর থেকেও ছাত্রদের ওপর গুণ্ডামীর খবর পাওয়া গেছে।

কিন্তু পুলিশী নির্যাতন ও গুণ্ডামীর দ্বারা ছাত্রদের আন্দোলন দমন করা যাবে না। ঢাকায় ছাত্ররা ১৫ই ডিসেম্বর 'মিস ফতেমা জিন্না প্রচার সপ্তাহ' উদ্বোধন উপলক্ষে এক বিরাট মিছিল বের করে এবং শহীদ মিনারের কাছে সমবেত হয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বস্বদানের শপথ গ্রহণ করেছে।

আয়ুব খাঁর বিরুদ্ধে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বত্র ছাত্ররা বিক্ষোভ-মিছিল বের করছে। করাচীতে ছাত্ররা একটি কুকুরকে আয়ুবের প্রতীক হিসেবে শোভাযাত্রায় বের করেছিল। ঢাকায় ছাত্ররা আয়ুবের ছবি ছিঁড়ে ফেলে। হায় ডিক্টেটর!

* * *

পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বত্র মিস ফতেমা জিন্না বেসিক ডেমোক্রাটদের নির্বাচনী সভায় বিপুল সমর্থন লাভ করছেন। নির্বাচন কমিশন আয়োজিত এইসব সভায় আয়ুব খাঁ রীতিমত নাস্তানাবুদ হচ্ছেন।

শেষ পর্যন্ত আয়ুবের সমর্থনে চীন নেমে পড়েছে। পিকিং রেডিওতে আয়ুবের সমর্থনে জোর প্রচার চালানো হচ্ছে। আয়ুবশাসনের প্রশংসা করে

এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান স্তম্ভরূপে আয়ুব খাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী চেন-ই স্বয়ং আয়ুবের প্রশংসা করেছেন। পিকিং রেডিও থেকে মিস ফতেমা জিন্নাকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দালাল বলা হয়েছে।

যুগোশ্লাভিয়া ঃ

যোশেফ ব্রোজ টিটো পুনরায় যুগোশ্লাভ কমিউনিস্ট দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। ১৯৩৭ সাল থেকে তিনি একটানা এই পদে অধিষ্ঠিত আছেন। গত ১৩ই ডিসেম্বর যুগোশ্লাভিয়ার কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ অধিবেশনে টিটো সর্বসম্মতিক্রমে দলের সেক্রেটারি-জেনারেল পদে নির্বাচিত হন।

কমিউনিস্ট লীগের সম্মেলনের পূর্বে জোর গুজব রটেছিল, ৭৩ বৎসর বয়স্ক টিটো এবার অবসর গ্রহণ করবেন। ভালকো ভ্লাহোভিক টিটোর পরিবর্তে দলের সাধারণ সম্পাদক হবেন, এবং আলেকজাণ্ডার র‍্যানকোভিক হবেন যুগোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্রপতি। কিন্তু সব গুজবের অবসান ঘটিয়ে টিটো তাঁর পদে অধিষ্ঠিত রইলেন।

যুগোশ্লাভ কমিউনিস্ট লীগের এই বার্ষিক সম্মেলনে টিটো ৫৫ পৃষ্ঠাব্যাপী যে দীর্ঘ রিপোর্ট পেশ করেন, তাতে তিনি চীনের তীব্র সমালোচনা করেছেন। চীনা কমিউনিস্ট পার্টিকে তিনি ‘অ-মার্কসীয়, অ-লেনিনীয় ও ধ্বংসাত্মক’ বলে অভিহিত করেন। চীনকে তিনি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন তথা বিশ্বশান্তির পক্ষে মহা বিপদ বলে মনে করেন।

টিটো তাঁর রিপোর্টে নিকিতা ক্রুশ্চেভের বিশেষ প্রশংসা করেন। ক্রুশ্চেভের চেষ্টাতেই স্ট্যালিনীয় অনাচারের হাত থেকে সোভিয়েট ইউনিয়নকে উদ্ধার করা হয়। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ক্রুশ্চেভের অবদানের তিনি সপ্রশংস উল্লেখ করেন।

• চেন-ই

• সস্ত্রীক টিটো

সমাজতন্ত্র ও আন্তর্জাতিকতার আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে হবে, টিটো অত্যন্ত জোরের সঙ্গে এই কথা বলেন।

আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে টিটোর প্রভাব খুবই বেশি। স্বাধীনচেতা ব্যক্তি হিসাবেও তিনি পরিচিত। তাই একাধারে চীনের সমালোচনা ও ক্রুশ্চেভের প্রশংসা তিনি করতে পেরেছেন। টিটো সোভিয়েট ইউনিয়নের বর্তমান নেতাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রেখে চলতে চান।

• আয়ুব খাঁ

পঁচিশে ডিসেম্বরে

রজত রায়চৌধুরী

নভেম্বরের দ্বিতীয়ার্ধে একদিন জি পি ও-র সামনে মুখুজ্জেবাবুর সঙ্গে দেখা। সেই ডবলকাফ ছিটের সার্ট, মালকোঁচা দেওয়া ধুতি পরনে, পাতলা ঠোঁট দুটি পানের ছোপে লাল।

হন্তদন্ত হয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছিলেন। চিনতে ভুল হবার কথা নয়। মাথার চুলগুলো সব সাদা, ভ্রু-দুটোও।

আমার ডাকে থামলেন। এক গাল হেসে বললেন, এই যে রায়চৌধুরী, কেমন আছেন?

কুশলবার্তা বিনিময়ের পর তাঁর উদ্দেশ্য ব্যক্ত হল। পকেট থেকে বার করলেন একটি লেফাফা। ঠিকানাটা সমুদ্রপারের। নামটাও আমার পরিচিত। কলকাতার কোন কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষের নাম। বললাম, হঠাৎ সেখানে চিঠি?

বুকের সামনে হাতটা একটা পবিত্র পরিচিত চিহ্ন অঙ্কন করল। বললেন, আজই লাস্ট ডে। আজ সী-মেলের ডাক না ধরতে পারলে ক্রিসমাস কার্ড টাইমলি পৌঁছবে না।

ক্রিসমাস। বড়দিন। তার উৎসব। শহর কলকাতায় আজও শেষ ডিসেম্বরে ক'দিনের জন্যে নেমে আসে শীতের বাতাস, কিন্তু তেমন করে আর জমে ওঠে না খৃস্টোৎসব।

সাহেবপাড়ায়, নিউ মার্কেটে দোকানে দোকানে সাজ সাজ রব। আলোর মেলা। ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে করে সাজানো দ্রব্য-সামগ্রী। ক্রিসমাস ট্রি, চুমকি বসানো চকচকে পাখি, রূপোলী মালা, বিচিত্র কারুকার্যমণ্ডিত ক্রিসমাস কার্ড, বড় বড় রঙ-বেরঙের কেক প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সযত্ন সমাবেশের নিখুঁত আয়োজন; আর থাকে ছোট্ট করে তৈরি ফাদার ক্রিসমাস। কোন কোন বিপণিতে কাগজের শিকলের আর নানা ফুলের সমারোহ।

দোকানগুলোর এই সাজসজ্জা দেখলে স্বভাবতই আমাদের মনে পড়ে দুর্গোৎসবের কথা। তেমনি উৎসব খৃস্টানদের বড়দিন। সমগ্র পরিবারের, ছোট-বড় সবার মিলিত উৎসব। মানবপুত্র যীশুর পবিত্র জন্মদিবস ধন্য পঁচিশে ডিসেম্বর।

ইংরেজরা গেছে। কিন্তু খৃস্টানরা রয়েছেন। তাঁরা ভারতবাসী। ভারতবর্ষ তাঁদের দেশ। আমাদের মুখুজ্জেবাবু তাঁদের একজন। কলকাতার কোন মিশনারী কলেজের তিনি কেরানিবাবু। তাঁকে চিনি। তাঁকে জানি। জানি পনেরো নয়া পয়সার সী-মেলটা ধরতে না পারলে তাঁর চাকুরিদাতা বড়সাহেবকে তিনি ক্রিসমাস কার্ড হয়তো পাঠাতে পারবেন না। এও জানি, তিনি বা তাঁর পুত্ররা দেবদারু কিংবা ঝাউপাতা দিয়ে তৈরি করবেন ক্রিসমাস ট্রি। অপটু হাতের প্রচেষ্টায় তার পাতাগুলো বিবর্ণ হয়ে যাবে। সস্তা দরে কিনে আনবেন একখানা বড় কেক। আর ক্রিসমাসে পাওয়া কিছু অতিরিক্ত টাকায় কিনবেন সম্বৎসরের নতুন জামাকাপড়। এবং বড়দিনের রাত্রে একটু ভালো খাবার চেষ্টা করবেন।

এ মুখুজ্জেবাবুদের আপনারাও চেনেন। পার্ক সার্কাসের, ওয়েলেসলীর আনাচে-কানাচে, অলিতে-গলিতে এঁদের দেখেছেন। এই দরিদ্র, এই হতাশা-পীড়িত, এই জীবন-যুদ্ধে ক্লান্ত মানুষদেরই দেবতা যীশু।

এর অপরদিকটার বিজ্ঞাপন বেশি। সেটাই চোখের সামনে। বড় বড় হোটেলের আসরে নাচগান আর অর্কেস্ট্রার আসর। সেখানে টাকাওলা লোকেরা টাকা ওড়ায়। রোস্ট টার্কী আর পানীয়, বালিকা-বন্ধুর কটিদেশ বেষ্টন সহকারে নৃত্য এবং গ্যালা ক্রিসমাস ও হ্যাপি নিউ ইয়ার তাদের উদ্বেল করে তোলে।

আর যাঁরা খৃস্টান নন, ক্রিসমাসে তাঁদের জন্যে ময়দানে কি পার্কে তাঁবু পড়ে সার্কাস পার্টির—আর কিছু নয়। বড়জোর কোন কোন পাড়া থেকে তরুণ-তরুণীরা পিকনিকে বেরিয়ে পড়েন বটানিকস্ কি ডায়মণ্ড-হারবার। কেউ কেউ ফ্রেজারগঞ্জ।

আজও শীতের হাওয়ায় পাতায় পাতায় নাচন লাগে, কিন্তু ক্রিসমাস উৎসবে লাগে কি? কোথায় গেল সেই আলোকোজ্জ্বল আনন্দোচ্ছল সাহেবপাড়া? সেই ডগ রেস? সেই মনোরম বড়দিনের ভেটের সওদা? সেই উচ্ছ্বসিত প্রাণমাতানো আবেগ-কম্পিত সঙ্গীত—যা নিশীথ রাত্রির শহর কলকাতার সাহেবপাড়ায় একদা সমস্বরে বেজে উঠত।।

উপরওলা আজও আছে। কিন্তু বড়দিনের সেই ভেট আর নেই।

মধ্যযুগে ভাঁড়ুদত্ত বিচিত্র ভেট নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল রাজদরবারে। সে যুগের পরিবেশে তার সুসামঞ্জস্য ছিল। তার বিবরণ বড় বিচিত্র। আর বড়দিনের ভেট—যা প্রেরিত হত অধস্তন কর্মচারী কর্তৃক উপর-ওলার কাছে, তাও তেমন চিত্তবিমোহন করত। বড় বড় বাঁধাকপি, লাল টুকটুকে বিলিতি বেগুন, প্রকাণ্ড আকারের ফুলকপি, কড়াইশুঁটি, কমলা লেবু, মর্তমান কলার কাঁদি প্রভৃতি শীতের যাবতীয় ফলমূল, এবং সেই সঙ্গে গলদা চিংড়ি ও ভেটকি মাছ। আর তা ছাড়া থাকত নামকরা কোম্পানীর নামকরা ব্র্যাণ্ডের দুটি পানীয়ের বোতল এবং একটি টার্কী।

সে ভেট আর নেই। গলদা চিংড়ি আর ভেটকি আজ আকাশের স্বপ্ন। নামকরা কোম্পানীর নামকরা ব্র্যাণ্ডের পানীয় যোগাড় করতেও অনেক বুদ্ধির মারপ্যাঁচ দরকার। আর সবচেয়ে বড় কথা, হৃদয়ের সেই প্রসারতা কোথায়?

আজও ভেট প্রেরিত হয়। আজও সওদা হয়, সাহেবপাড়ার বাজারে বাজারে। কিন্তু অফুরন্ত আনন্দের নির্মল সূত্রটি যেন কোথায় ছিন্ন।

যীশুকে বলা হয়েছে দুঃখের মানুষ। দুঃখ স্বীকারকে তিনি মহৎ করে দেখিয়েছেন। কোন যোদ্ধৃবেশে তিনি আসেন নি, বাহুবলের পরিচয় দেন নি, 'ছিন্ন চীর পরে পথে পথে ঘুরেছিলেন তিনি।'

তাই তিনি দরিদ্রের ভগবান। তিনি তো শিশুদেরও। তাই তো দেখি পার্ক সার্কাসে কি ওয়েলেসলীতে কি সঙ্গতিপূর্ণ সাহেবপাড়ার শিশুদের মনের আকাশে ফাদার ক্রিসমাসের অত্যাশ্চর্যময় আবির্ভাবের কথা।

ফাদার ক্রিসমাসের গল্প নানা। তবে প্রায় সকলেই বিশ্বাস করেন, তিনি সেণ্ট নিকোলাস। তিনি ছিলেন এশিয়া মাইনরের 'মাইরা'র বিশপ। তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্যের অজস্র নিদর্শন উপকথার মতন প্রচলিত। একটি প্রচলিত গল্প, যা প্রায় সকলেই জানেন তারই উল্লেখ করছি।

একবার একজন ভালো মানুষ পড়লেন বড় বিপদে। বিপদটা তাঁর মেয়েদের নিয়ে। তাঁর তিনটি মেয়ে। কিন্তু তিনি নিতান্ত গরীব। পণের টাকা যোগাড় করতে না পেরে তিনি বড় অসহায় বোধ করছিলেন। একথা জানতে পারলেন সেণ্ট নিকোলাস। তিনি রাতের অন্ধকারে জানলা দিয়ে সেই ভালো মানুষের ঘরে রেখে গেলেন তিনটি বস্তা। তিনটি বস্তার ছিল অনেকগুলি সোনার বল। বলা বাহুল্য, তাতেই ভালো মানুষ বিপদ থেকে উদ্ধার পেলেন। আসলে এই সোনার বলগুলো তখন সাধুদের চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হত।

ভগবান তো এই শিশুদের। তারা যে একদিন অকালে ঘুম থেকে উঠে আনন্দের কলরবে ভরে তুলতে চায় তাদের গৃহ। তারা আশা করে একদিন ফাদার ক্রিসমাসের করুণার দানে তাদের আকাঙ্ক্ষিত প্রত্যাশার পূরণ হবে। তিনি মেটাবেন তাদের কামনাকে, এনে দেবেন স্বর্গ থেকে অমরাবতীর আনন্দ-নির্ঝরকে।

খৃস্টোৎসব বহু পুরানো। আদিম মানুষ উপাসক ছিল সূর্যের। পৃথিবীর সর্বদেশে এই একই ধারা। রোমানরাও। তারা উৎসব করত ডিসেম্বরের সতেরো থেকে বাইশ। সূর্য-পরিমণ্ডলের দক্ষিণায়নে তখন উত্তর গোলার্ধে নিস্তেজ সূর্যকিরণ। তাকে প্রদীপ্ত করবার জন্য উপাসনার প্রয়োজন দেখা দিল। আর তাতেই ধীরে ধীরে পূর্বতেজ ফিরে পেত সূর্য। এ বিশ্বাস ছিল তাদের। এই সূর্যোৎসব উত্তর ইউরোপে গিয়ে নাম নিল ইউল উৎসব। মূলগত পার্থক্য না থাকলেও স্বভাবতই প্রয়োগগত পার্থক্য কিছু এল। অনেকে মনে করেন খৃস্টীয় চতুর্থ শতকে ইউল উৎসবের পরিণতি হল খৃস্টোৎসবে।

অবশ্য কাল বিপুল। এবং পরি-বর্তনের ধারায় ক্রিসমাস উৎসব আজ অন্য রূপ নিয়েছে।

পঁচিশে ডিসেম্বর মানবপুত্র জন্মে-ছিলেন পৃথিবীতে। তিনি যে দরিদ্রের ভগবান। তাই তো তিনি কোন এক অখ্যাত গ্রামের কোন এক পশুরক্ষণ-শালায় জন্ম নিলেন। যে মানবপুত্র সমস্ত কলুষ-গ্লানির অবসান করতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন মানুষের পরিপূর্ণ সম্পূর্ণতা, তাঁর আবির্ভাব এখানে না হবে তো তাঁর আসনখানি পাতা হবে কোথায়? তাই তো তাঁর জন্ম রাজপ্রাসাদে নয়, ধনীর অট্টা-লিকায় নয়, সকল ঐশ্বর্য ও বিলাসের অতীত অনাবৃত আকাশের নীচে অতি সাধারণ মানুষের ও পশুর গৃহাঙ্গনের পার্শ্বেই তাঁর নিঃশব্দ আগমন।

সেই মানুষদের সংখ্যাই আজ শহর কলকাতায় সবচেয়ে বেশি। বড়দিনের উৎসবে এই বিষণ্ণ, রুগ্ণ, শ্রান্ত, ক্লান্ত, পীড়িত ও জর্জরিত মানুষের অন্তরলোকে পঁচিশে ডিসেম্বর প্রতি বছরের মতন এবারও ফিরে এসেছে; কিন্তু বড়দিনের উৎসব ফিরে এসেছে কি?

সোনার আনারস

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

মূল্য: এক টাকা

কিশোর-কিশোরীদের উপযুক্ত রোমাঞ্চকর উপন্যাস। ছাপা, বাঁধাই চমৎকার।

উপহার দিবার মত বই

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ধনপতি সওদাগর

বানিজ্যে সেকাল ও একাল

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

চতুর্বিংশতি প্রবাহ

মোগলযুগ স্বর্ণযুগ।

মোগল আমলে বিশাল এই ভারতবর্ষ নানাপ্রদেশে বিভক্ত ছিল। গুজরাট, বঙ্গদেশ, লাহোর, মুলতান ইত্যাদি বিখ্যাত প্রদেশ ছিল। বাণিজ্যে, ব্যবসায় বিপুল সমৃদ্ধি লাভ করেছিল।

বিদেশী ঐতিহাসিক লিখেছেন, এই বাংলার সুপ্রাচীন কালের বন্দর সপ্তগ্রামে একদিন সারা পৃথিবীর বাণিজ্যতরী এসে নোঙর করতো। ইতিহাসের পাতায় সোনার লেখার মতন জলজল করছে গৌরবোজ্জ্বল ইতিবৃত্ত।

'SATGAON was an Important Port in the East. The various agricultural Products of Bengal and its textile Products were sent out from Satgaon.'

এই সপ্তগ্রামের মহিমা লেখা আছে প্রাচীন 'কবিকঙ্কন চণ্ডীতে', আছে চৈতন্য ভাগবতে, আছে মনসার গীতে।

কবিকঙ্কন বলে :

সপ্তগ্রামের বেনে সব কোথা নাহি যায়
ঘরে বসে সুখমোক্ষ নানা ধন পায়,
তীর্থমধ্যে—পুণ্যতীর্থ অতি অনুপম
সপ্তঋষি শাসনে বলয়ে সপ্তগ্রাম।

শত শত বছর আগে কবি দ্বিজদাস বিপ্রদাস লিখেছিলেন মনসার গীত। বাংলার গ্রামে-গ্রামে আজও কৃষকবধূর কণ্ঠে এই মনসার গীত শোনা যায়। কত যুগ আগের কত দূর দেশের এই সপ্তগ্রাম, তার অবলুপ্ত কীর্তি তাদের চোখের পাতায় ঘন হয়ে নামে। তাদের স্মরণের বায়ুতরঙ্গকে আশ্রয় করে মন ভেসে চলে যায় যুগ-যুগান্তরের সেই কুয়াশাচ্ছন্ন অতীতে। তারা ভাবে কোথায় :

বহিত্রে চাপায় কূলে
চাঁদ অধিকারী বলে।
দেখিব কেমন সপ্তগ্রাম।
তথা সপ্তঋষি স্থান
সর্বদেব অধিষ্ঠান
শোকদুঃখে সর্ব গুণধাম।

আজও গ্রাম বাংলার পথে-প্রান্তরে, চণ্ডীমণ্ডপে, কথকঠাকুরের মৃদু উচ্চারিত কণ্ঠস্বর শোনা যায়। চৈতন্য ভাগবত পাঠ হয়। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতে সপ্তগ্রামের মহিমা বলতে বলতে কথকঠাকুরের কণ্ঠস্বর আবেগে গভীর হয়ে আসে। তার চোখ দুটো আবেশে মন্থর হয়ে ওঠে। শ্রোতারা ভাবে কোথায় এই সপ্তগ্রাম, তা-না হলে কথকঠাকুর যে বললেন :

কথোদিন নিত্যানন্দ যায় কি খড়দহে
সপ্তগ্রামে আইলেন সর্বগণ সহে।
সেই সপ্তগ্রামে আছে সপ্তঋষি স্থান,
জগতে চিহ্নিত সে ত্রিবেণীঘাট নাম।

এই বাংলাদেশে একদিন তিনটি বিভাগ ছিল। লক্ষণাবতী, সুবর্ণগ্রাম আর সপ্তগ্রাম। সেই বিদ্যায় আর সংস্কৃতিতে, বাণিজ্যে আর বিদেশী ব্যবসায় সমৃদ্ধশালী বাংলার সপ্তগ্রাম ছিল আকাশের তারার মত উজ্জ্বল। বহুদূর-দূর দেশ থেকে পালতোলা জাহাজ এই বঙ্গদেশের সপ্তগ্রাম লক্ষ্য করে পণ্যসম্ভার নিয়ে আসতো—আবার এই সপ্তগ্রাম থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তাল জলরাশি পার হয়ে বাংলার পণ্য, বাংলার বিখ্যাত মসলিন, বাংলার বস্ত্র, বাংলার ইক্ষু চলে যেতো জাভা, সুমাত্রা আরো বহু দূর-দূরান্তরে।

শুধু যে বাংলার মসলিন যেতো, বাংলার ইক্ষু যেতো তা নয়, বিদেশী ঐতিহাসিক বলেছেন, পশু-পাখি অর্থাৎ ভেড়া, গরু, মোষ আর সুদৃশ্য কার্পেট বিদেশে রপ্তানী হতো। এই কার্পেটে প্রাচীন বাংলার বস্ত্রশিল্পীদের শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যেতো। বাংলার গ্রামে গ্রামে অপর্যাপ্ত কার্পাস হতো। পুরনো ইতিহাসে লেখা আছে cotton was plentiful and exporting as a raw material to the Ports of the East & Far East.

রেশম। কত বিচিত্র বর্ণের আর বিচিত্র রকমের রেশম তৈরি হতো এই বঙ্গদেশে। গাছে-গাছে রেশম-কীটের চাষ করা হতো। একসময় গ্রাম-গ্রামান্তরের মেয়ে-পুরুষ মহাসমারোহে এই রেশমকীট তুলতো। এই রেশমকীট থেকে লাটাইতে করে সুতো পেঁচিয়ে ঘরে তোলা—তারপর এই সুতো থেকে বস্ত্রবয়ন একটা উৎসবের ভিতর দিয়ে হয়ে যেতো।

ডাক্তার পন্থের The Commercial Policy of Moguls গ্রন্থে বলেছেন, Herb অর্থাৎ তৃণ থেকে উৎপাদিত রেশমের প্রচুর খ্যাতি ছিল বিদেশে। আজকে বস্ত্রের রাজ্যে যেমন লিনেন অস্বাভাবিক জনপ্রিয়, তেমনি একদিন এই Herb-ও ঘরে ঘরে খুব আদর পেতো। এদের বলা হতো Bengalian Herb। রঙ ছিল হাল্কা হলুদ। মেলে ধরলে মনে হতো শীতের সকালের রোদ বুঝি ঝলমল করছে প্রান্তরে। এদের বয়নে অতি সূক্ষ্ম নৈপুণ্যের প্রয়োজন হতো। তাঁতীরা নিপুণ অঙ্গুলি-বিন্যাসে আর বিচিত্র ছন্দে ও যতিতে বয়ন করতো এই অপূর্ব বস্ত্র। সেই সুপ্রাচীন কালের বাংলায় ধনীদের ঘরে ঘরে মর্যাদা বৃদ্ধি করতো এই তৃণ-উৎপাদিত সিল্কের বালিসের ওয়াড়, কার্পেট, আরও রকমারি বিলাসিতার জিনিস।

এই বিশেষ ধরণের সিল্ক তৈরি করতো থানে থানে। সাধারণ সিল্কের মত শুধু কাপড় বা শাড়ি করলে মজুরী পোষাতো না। বাংলায় এই কাপড়ের একটা অদ্ভুত জনপ্রিয় নাম ছিল। বলতো সারিজিন। ইতিহাসকার লিখেছেন :

This Sarrigin was much used in Bengal, yellow in colour and brighter than Silk and exported them to the all Ports of the World.

শুধু রেশম নয়। সুদৃশ্য আসবাবপত্র, বিচিত্র গঠনের পিতলের কলসী, মেঘডম্বুর ও পরীলিলা শাড়ি, আরও সুগন্ধি মসলাদ্রব্য একদিন এই সপ্তগ্রামের বন্দর থেকে পৃথিবীর দূর-দূর দেশে রপ্তানী হয়ে চলে যেতো।

East India Companyর সুযোগ্য প্রতিনিধি আর ভারত ও ইংরাজ সংস্কৃতির প্রথম অগ্রদূত স্যার টমাস রো সুরাটে বসে বিলেতে তার কম্পানীকে চিঠি দিয়েছিলেন :

Bengal feeds the whole India with wheat, rice and Sugar.

টমাস রো আরও বলেছেন—যে গয়না তৈরির জন্য Amber অর্থাৎ হলুদ বর্ণের এক ধরণের সুগন্ধি মোমের মতন আঠা, মৃগনাভি ইত্যাদিও একদিন সপ্তগ্রামের বন্দর থেকে পৃথিবীর দেশে-দেশে রপ্তানী হতো।

সপ্তগ্রাম। বিশ্বকোষ বলে—ইউরোপীয় আগমনের বহু পূর্বে বিদেশী বণিকরা সপ্তগ্রামের বিপুল সম্পদ ও বাণিজ্য-বৈভবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আজ সপ্তগ্রাম পুণ্যতোয়া সরস্বতী তীরের একটা জীর্ণ গ্রাম মাত্র। সেখানে আজ দরিদ্র গ্রামবাসীদের জীর্ণ কুটির আর শ্বাপদ-সঙ্কুল বিস্তীর্ণ অরণ্য। কিন্তু—

কিন্তু আজ কে মনে করতে পারবে শত শতাব্দী পূর্বে এই মজে-যাওয়া সরস্বতী নদী আদমজুড়, আমতা আর তমলুক দিয়ে দক্ষিণ মুখে তার বিপুল প্রবাহ নিয়ে ভাগীরথীতে পড়ত। আজ কে ভাবতে পারবে একদিন এই সরস্বতী নদীর বুকে দেশ-বিদেশের বাণিজ্যতরী ভিড় করে নোঙর করতো। আর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের কলরবে মুখরিত হয়ে উঠতো সপ্তগ্রামের আকাশ।

(ক্রমশঃ)

ছাত্রদের অপরিহার্য্য গ্রন্থ
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
পালামৌ
—ইহাতে আছে—
ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রচিত সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী—সঞ্জীবনী-সুধা, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'পালামৌ সমালোচনা' এবং সমালোচক-শ্রেষ্ঠ চন্দ্রনাথ বসুর সঞ্জীব-সাহিত্য সমালোচনা। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ কর্ত্তৃক দ্রুতপঠন গ্রন্থরূপে নির্ব্বাচিত।
মূল্য এক টাকা।
দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

পশ্চিম জার্মানী থেকে

● পশ্চিম জার্মানীর প্রথম মনোরেল, এসেনে চালু হবে

এদেশকে যত দেখি তত অবাক হয়ে ভাবি; কি করে সম্ভব হলো। পনের বছর আগে যেখানে ছিল ধ্বংসস্তূপ আজ তার চিহ্নমাত্র নেই। যেন আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের মত যাদুমন্ত্রে দেখতে দেখতে ধ্বংসের ভিতর থেকে উঠে এসেছে সৃষ্টির কল্যাণমূর্তি। অকল্যাণের চামুণ্ডারূপে হিটলারের নাৎসীবাদ যে দেশ ও জাতির জীবনে কলঙ্কের কালিমা লেপন করেছিল, সেই দেশ ও জাতি নবযৌবনের জয়গানে আজ মুখর হয়ে উঠেছে।

নাৎসী দলের সর্বনাশা নীতিতে যে জার্মানীর মাটিতে ঘাস পর্যন্ত গজাতে পারে নি, যুবক-যুবতীরা ফুলের নাম ভুলে গেছিল। মাত্র পনেরটা বছর পরে পাল্লা দিয়ে এদেশ আজ জীবনকে বিকশিত করছে। শুধু পশ্চিম আর পূর্ব জার্মানীর মধ্যে প্রতিযোগিতা নয়, পশ্চিম জার্মানী যেন সৃষ্টিযন্ত্রের উন্মাদনায় সারা বিশ্বের সাথে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। পূর্ব জার্মানী চলেছে এক ধরণে, এখানে এরা দেখাতে চায় ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতেও কতদূর উন্নতি সম্ভব। এক কথায় বলা যায় ধনতন্ত্র আর সমাজতন্ত্র একটা প্রাচীরের এপার-ওপার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে।

কলকাতার ১৪ তলা বাড়ি আমরা দেখেছি, আমেরিকার টেলিভিশন টাওয়ার আর ১,১০০ ফুট উঁচু ১০২ তলা এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ের কথা শুনেছি। পশ্চিম জার্মানী এবার সেই বিস্ময়কে ছাড়িয়ে নতুন করে বিস্ময়ের রেকর্ড তৈরি করতে যাচ্ছে। স্থপতি রবার্ট গ্যাব্রিয়েল যে বাড়ির পরিকল্পনা করেছেন সেটা উঁচু হবে ৩,৭৫০ ফুট, ব্যাস হবে ১৯০ ফুট। জমির ওপরে থাকবে ৩৫৩ তলা, মাটির নীচে থাকবে ১৬ তলা। তৈরি হলে এই বাড়ি এম্পায়ার বিল্ডিংয়ের তিনগুণ ছাড়িয়ে যাবে। এ বাড়ির ৮ হাজার ফ্ল্যাটে লোক থাকবে ২৫ হাজার। প্রতি ২০ থেকে ৪০ তলায় জিনিসপত্র কেনাকাটার ও মেরামতের দোকান থাকবে। মাটির তলায় থাকবে ৪ হাজার গাড়ি রাখার ব্যবস্থা এবং পারমাণবিক বোমা থেকে বাঁচবার আশ্রয়। এ বাড়িতে কয়েকটি সিনেমা ছাড়াও একটি থিয়েটার থাকবে। ওঠা-নামার জন্য ১৮ খপরিওয়ালা ছ'টি লিফট থাকবে, যাতে এক সঙ্গে ৪০ জন লোক যেতে পারে। এই লিফটগুলি প্রতি ২০ তলায় গিয়ে থামবে।

শান্তিশেখর

এ ছাড়া আরো ১৮৬টি খপরির লিফট থাকবে যেগুলি প্রতি তলায় থামবে।

বাড়িটির কাঠামো ক্রোমনিকেল স্টিল দিয়ে তৈরি করা হবে, যাতে সহজে আগুন না লাগে। এ বাড়ির অর্ধেক লোক বাস করবে মেঘলোকে। সেখানে গোলমাল নেই, ধুলো-ধোঁয়া নেই। মেঘলোকে বাস করার জন্য ইতিমধ্যে কয়েকজন ভাড়াটে আবেদন করেছে। এদের অনেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানী, রোমাণ্টিক প্রেমিক-প্রেমিকাও দু-চারজন থাকতে পারে।

স্থপতি গ্যাব্রিয়েল জানিয়েছেন এ বাড়ি দুলবে না, কারণ বাড়ির কাঠামোয় যেমন পাঁচ লক্ষ ইস্পাত ব্যবহার করা হবে, তেমনি বাড়িটি একটু একটু সরু হতে থাকবে। বাড়িটির জন্য জায়গা ধরা হয়েছে কলোন থেকে ৩০ মাইল দূরে মুইন্স-টেরেফিয়েলের কাছে। বর্তমানে এই পরিকল্পনা কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ হলেও বিশ হাজার মার্ক খরচে একটা মডেল তৈরি করা হচ্ছে। আসল বাড়ি তৈরি হতে খরচ হবে দুই বিলিয়ন মার্ক, সময় লাগবে দশ বছর। কয়েকটি মার্কিন ব্যাঙ্ক নাকি এর জন্য দাদন দিতে প্রস্তুত আছে জানিয়েছে। বাড়ি যখনই হোক, এখানে এই খবর আলোচনার এক মুখরোচক খবর হয়ে উঠেছে।

আর একটি খবর আমাদের কলকাতার লোকের কাছে মুখরোচক হবে। কারণ কলকাতার লোক অনেকদিন থেকে মনোরেলের কথা শুনছে। পশ্চিম জার্মানী কিন্তু ব্যবসায়িক ভিত্তিতে মনোরেল চালু করছে। মনোরেলের আসল নাম আলভেক রেল। আলভেক হচ্ছে মনোরেলের প্রবর্তক সুইডেনের ব্যবসায়ী অ্যাক্সেল এল ভেনের সংক্ষিপ্ত নাম। বেশ উঁচু দিয়ে এক লাইনের ওপরে মনোরেল

চলে। পরিবহন সমস্যার সমাধানে পশ্চিম জার্মানীর এসেন শহরে মনো-রেল চালু করার ব্যবস্থা হচ্ছে। এসেন শহরের একটি জনাকীর্ণ রাজপথের ১২ ফুট উঁচু দিয়ে এই রেলগাড়ি ঘণ্টায় ৫০ মাইল বেগে চলাচল করবে। এই রেলগাড়ির প্রত্যেক কামরায় ১০০ জন যাত্রী যেতে পারবে এবং ৮০০ গজ অন্তর ওঠানামা করার প্ল্যাটফরম থাকবে।

পৃথিবীতে মনোরেল চলে লস এঞ্জেলস-এর কাছে ডিজনে ল্যাণ্ডে, সিটলের বিশ্বমেলায়, ইটালীর টিউরিনে এবং জাপানের দুটি আমোদ-প্রমোদের পার্কে। সম্প্রতি জাপানের টোকিওতে পৃথিবীর সব চেয়ে বড় মনোরেল চালু করা হয়েছে। এর দৈর্ঘ্য ১০ মাইল।

পশ্চিম জার্মানীর আর একটি উল্লেখযোগ্য নির্মাণ-প্রচেষ্টা উল্লেখ করছি, যা বেশ কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। বন শহরের রাইন নদীর ওপর এখন

নব পরিকল্পিত ৩৬৯ তলা বাড়ির নক্সা

এক নতুন পুল তৈরি হচ্ছে—তা পার হবার সময় শহরের মানুষ সঙ্গীতের মূর্ছনায় তৃপ্ত হবে। দেড় হাজার ফুট লম্বা পুল, মাঝখানটায় ১৩৫ ফুট উঁচু স্তম্ভের সঙ্গে বীণাযন্ত্রের মত আশিটি মোটা-মোটা তার দিয়ে বাঁধা থাকবে। সেই তারের মধ্য দিয়ে যখন হাওয়া বইবে, তখন মধুর ঝঙ্কার নিঃসৃত হবে। এই অভিনব পুল তৈরির কাজ সুরু হয়েছে, আড়াই বছরের মধ্যে শেষ হবে। এই পুলের খরচ পড়বে ২.১৩ মিলিয়ন জার্মান মার্ক। কলোন স্টেট মিউজিয়মে এই নতুন পুলের মডেল রাখা হয়েছে।

কোলোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এক নতুন ধরণের গ্রন্থালয় তৈরি করা হচ্ছে। স্থাপত্যের দিক থেকে যেমন এই গ্রন্থা-লয়ের কেরামতি থাকবে, বাস্তব উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও তার প্রয়োজন অশেষ। স্থপতির পরিকল্পনা হচ্ছে একটার ওপর একটা ভারি সিমেণ্টের পাত লাগিয়ে যতদূর সম্ভব রোদ ঠেকানো। পাতগুলি এমনভাবে বেঁকিয়ে বসানো

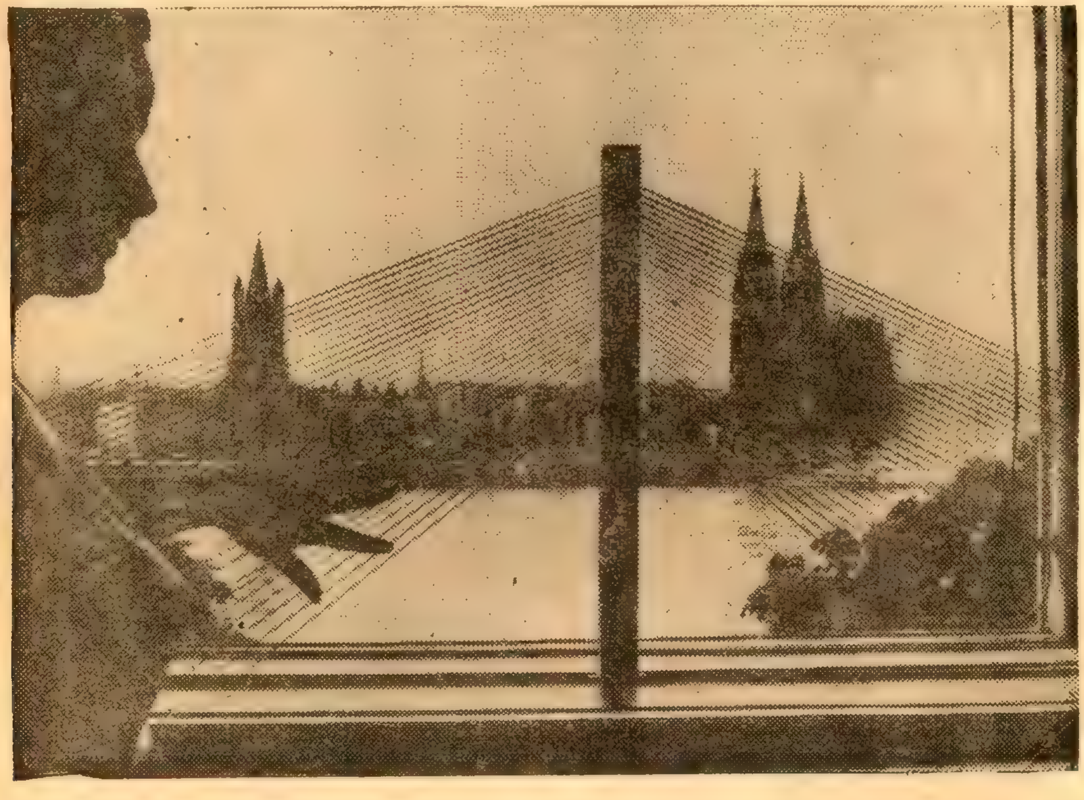

'বন-এর বীণা' নামে পরিচিত হবে রাইনের ওপর নির্মীয়মাণ সেতু

হবে যাতে কোন সময়ে ঘরের মধ্যে সরাসরি রোদ ঢুকতে না পারে। গ্রন্থালয়টি হবে ৮ তলার। স্থপতি অধ্যাপক গুটবড এমনভাবে তৈরি করেছেন যাতে মেঝের প্রতি বর্গগজ জায়গায় ২ হাজার পাউণ্ড জিনিসপত্র রাখা যায়। ১৯৬৫ সালে এই গ্রন্থালয়ের কাজ শেষ হবে। সারা বিশ্বের সু-পরিচিত অর্থনীতি ও সমাজ-বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকগুলি এখানে এনে রাখা হবে।

আর একটি উল্লেখযোগ্য খবর হামবুর্গের ফিনকেনাউ হাসপাতালের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উৎসব পালন। এই হাসপাতালটি কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য ১৯১৪ সালে হাসপাতালটি স্থাপিত হয়েছিল। এ যাবৎ এই হাসপাতালে ১,৫৯,০০০ শিশু জন্মগ্রহণ করেছে; এবং অসংখ্য গর্ভবতী ও ক্যান্সার আক্রান্ত মহিলা এখানে চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করেছে।

সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কথা—গত ১৫ বছর যাবৎ বিদেশী মেয়েরা এই হাসপাতালে ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা গ্রহণ করতে আসছেন। ইরান, তুর্কী ও আফ্রিকার সদ্য স্বাধীন দেশগুলি থেকে মেয়েরা এখানে শিক্ষালাভ করেন। এই বিদেশী মেয়েদের দু' বছরের কোর্স সুরু হবার আগে তাদের জার্মান ভাষা ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে তিন মাস তালিম দিয়ে নেওয়া হয়। যাতে ওরা ক্লাশের পড়া ও রোগীদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে পারে। বিদেশী মেয়েদের এখানে শিক্ষা নিতে আসার কারণ, অনুন্নত দেশগুলির বাস্তব অবস্থার উপযোগী করে হাতে-কলমে এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়।

এবার পশ্চিম জার্মানীর রাজনৈতিক খবর কিছুটা জানাই। ১৯৬৫ সালের হেমন্তকালে এখানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচনের গুরুত্ব রয়েছে এ কারণে যে, যুদ্ধোত্তরকালে এই প্রথম নির্বাচনপ্রার্থী হিসাবে সৈনিকরা অংশগ্রহণ করতে পারবে।

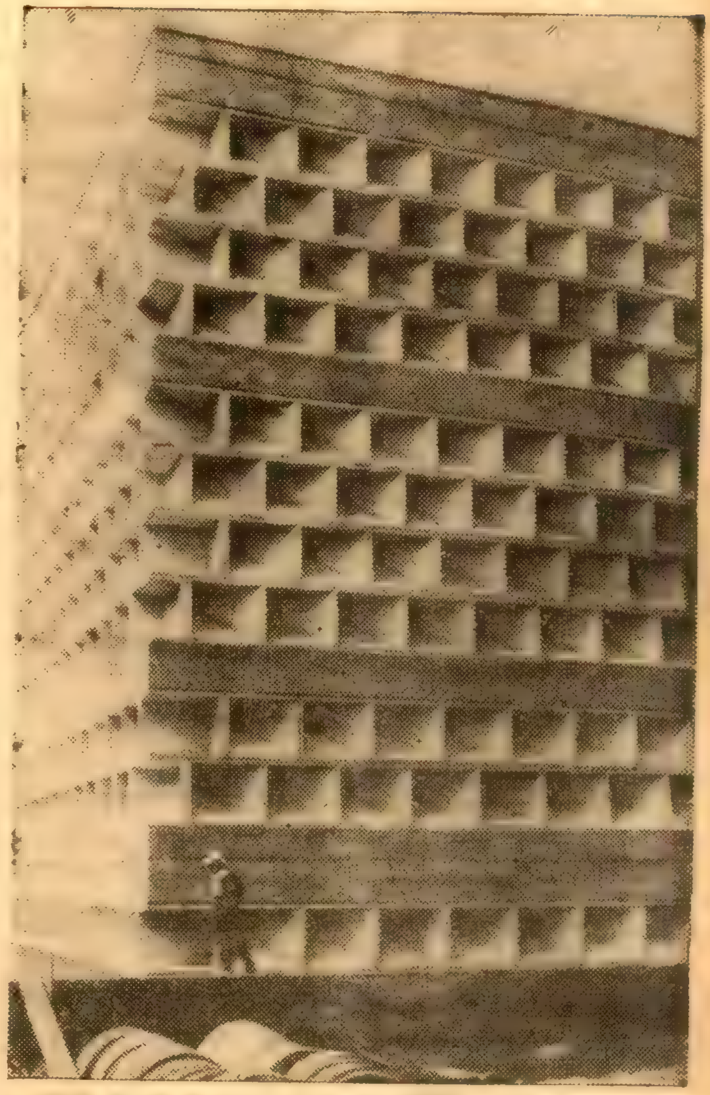

● কোলোন বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মীয়মাণ অভিনব গ্রন্থাগার

সৈনিকদের পক্ষে বক্তব্য হচ্ছে 'ওরা তো উর্দি পরা নাগরিক।' যে সকল সৈনিক নির্বাচিত হবেন তাঁদের কিন্তু তখন আর উর্দি পরা চলব না। তখন তাঁদের প্রতিনিধি হিসাবেই কাজ করতে হবে, সৈনিক হিসাবে নয়। এই সুবিধাদানকে অনেকে সমর্থন করলেও বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন এমন লোকও কম নেই। যাঁরা বিরুদ্ধে, তাঁদের বক্তব্য হলো, এতে রাজনৈতিক দলগুলিতে সৈনিকদের টেনে নেবার সুবিধা হবে, অথবা একটি জার্মান সামরিক পার্টি গঠন করার ঝোঁক দেখা দিতে পারে।

মহাকবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের
বৃত্র-সংহার কাব্য
দাম—দুই টাকা
বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

ধারাবাহিক উপন্যাস

অদ্বিতীয়া

সুশীল রায়

আশিস

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ দুই ॥

অচিনপুরীর রিহার্সেল আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। অমিয়দের বাড়িতে রিহার্সেল হচ্ছে না। এর জন্যে নতুন জায়গা জোগাড় করা হয়েছে। বেহালা থেকে জায়গাটা কিছুটা দূরে—মোমিনপুরে।

বড় রাস্তা থেকে কিছুটা ভিতরে বেশ নিরিবিলি জায়গা, ঘরটাও বেশ বড়। নাটকের রিহার্সেলের পক্ষে যেমন উপযুক্ত, পরিবেশটাও যেন তেমনি নাটকীয়। এখানে এসে বসলেই যেন ঠিক স্বাভাবিক থাকতে ইচ্ছে করে না, একটু নাটুকে ভঙ্গিতে চলতে ও বলতে ইচ্ছে করে। কিন্তু, মনে হয়, কেবল পরিবেশটার জন্যেই সকলের মনের ভাবটা এরকম হয় নি, এরকম হবার অন্য কারণও অবশ্যই আছে।

কারণটা আর-কিছু না। এখানে তারা সত্যিকার অভিনেত্রীর সঙ্গে অভিনয় করতে পারবে, এই সম্ভাবনাটাই অসম্ভব রকম ভাবে তাদের উত্তেজিত করে রেখেছে। এতদিন তারা অভিনয় করেছে নিজেদের বন্ধুর সঙ্গে। তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু এবার তাদের জীবনে আসছে বুঝি নতুন অভিজ্ঞতা।

যে নায়িকার জন্যে তারা এমন উৎকণ্ঠিত, তার আবির্ভাব ঘটবে কবে—এই জিজ্ঞাসা সকলেরই মনের মধ্যে চাপা আছে, কিন্তু কেউই তা প্রকাশ করছে না। সকলেরই ভাবটা এমন, যেন তারা স্নেহাংশুর এই নতুন নাটকে অভিনয় করার জন্যেই ব্যাকুল।

মনোজ, রেবতী বা বিকাশ ততটা চঞ্চল না, যতটা চঞ্চল আর-সকলে। কেন না, ওরা তিনজনেই চেনে সেই নায়িকাকে—দিবা দেবীকে। কিন্তু ওরা কয়েকজন? হরেশ, দীপক, নীহার আর অধ্যাপক বীরেন? ওরা কখনো দেখে নি সেই নায়িকাকে। মনে মনে তাই তাদের অনেক জল্পনা ও অনেক কল্পনা। চোখে তাই তাদের লেগে আছে—

কিন্তু সে কথা থাক। ওরা রিহার্সেল দিয়ে চলেছে। বড় বই, ভূমিকাও অনেকগুলি। পার্ট বেঁটে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকেই নিজের যথাসাধ্য চেষ্টা দিয়ে নিজেকে জাহির করার জন্যে ব্যস্ত।

এদের এই উৎসাহ দেখে সব-চেয়ে বেশি খুশি হচ্ছে যে, সে স্নেহাংশু। গর্বে তার বুক যেন ফুলে উঠছে। তার ভাবতেই বড় ভালো লাগছে যে, এতগুলো চরিত্র সে সত্যি এত সুন্দরভাবে গুছিয়ে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে। ওরা যখন সংলাপগুলি বলছে, তখন স্নেহাংশুর শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে। তার মনে হচ্ছে—এত সুন্দর ও লাগসই কথা তার কলম দিয়ে বেরলো কি ক'রে। তার চোখ-দুটো উদাস হয়ে উঠল, মন ভরে উঠতে লাগল প্রসন্নতায়। তার মুখের চেহারাটা বেশ মনোরম হয়ে উঠল এতে, বেশ ভাবুক আর বেশ কবি-কবি দেখাতে লাগল স্নেহাংশুকে।

স্নেহাংশুর মুখের দিকে চেয়ে অমিয় বলল, 'বা, সুন্দর দেখাচ্ছে বটে আমাদের নাট্যকারকে। চোখ দুটিতে যেন যাদু লেগে আছে।'

দীপক বলল, 'হুঁ। যাদুই বটে। স্বপ্নও বলা যায়—দিবাস্বপ্ন।'

'কী বললে, দীপক?' প্রায় হুংকার দিয়ে উঠল যেন মনোজ।

অধ্যাপক বীরেন নিরীহ গলায় বলল, 'দিবাস্বপ্ন।'

সকলে হেসে উঠতে গিয়েই থেমে গেল। অভিনেত্রীটিকে এখানে আনার ব্যবস্থা করছে মনোজ। অতএব সে-ই তার অভিভাবক-বিশেষ। সুতরাং সেই অভিনেত্রীর নাম নিয়ে কোনোরকম তামাসা মনোজ পছন্দ নাও করতে পারে—এই কথা ভেবে সকলে চুপ করে যাবার চেষ্টা করল।

কিন্তু মৌচাকে ঢিল পড়লে মৌমাছিদের ঠাণ্ডা করতে একটু সময় লাগে, তাদের গুঞ্জন চট করে থামতে চায় না।

কথাটা তো মন্দ বলে নি দীপক। পোর্টট্রাস্টে কেরানিগিরি করেও তার মনে রস তবে কিছু আছে। জাহাজের কারবার করা সত্ত্বেও আদার খবরও কিছু রাখে তা হলে।

গলাটা সাফ করে নেবার চেষ্টা করল নীহার, একটু কাশল, সকলেই আশা করল নিরীহ নীহার এবার কিছু বিরহ অথবা বিহার প্রসঙ্গ তুলল বুঝি। কিন্তু সকলকে হতাশ করে দিয়ে নীহার সংক্ষেপে বলল, 'ছি।'

নীহারের এই মন্তব্যটা শুনে হরেশ সকলের মুখের দিকে তাকাল, সকলের মনোভাবটা যাচাই করার লোভ হল তার। তার ইচ্ছে হল একটু ঘুন দিয়ে দেখা যাক নীহারটা মেকি, না, সাচ্চা।

হরেশ বলল, 'ঠিক। একজন অপরিচিতা মহিলাকে নিয়ে কোনো মন্তব্য করা উচিত না। বিশেষ করে যিনি এখানে আসছেন অতিথিরূপে, আমাদের গেস্ট হয়ে। আর, আর, আর—যাঁকে এখানে আনা আমাদের সাধ্যে কুলোতো না, যদি না আমাদের মধ্যে থাকত মনোজ। কোনোরকম হাসি-ঠাট্টা করার আগে—এ-কথাটা আমাদের ভাবা দরকার।'

মনোজ যেন ডুবে ছিল নাটকের পাণ্ডুলিপির মধ্যে, বসে-বসে পাতা ওল্টাচ্ছিল। এবার সে সেই পাতা থেকে মাথা তুলে একটু যেন চোখ উল্টেই বলল, 'ঘটে বুদ্ধি তবে আছে দেখছি।'

'আছে।' হরেশই জবাব দিল, 'কিন্তু পাঁচজন বন্ধু এক জায়গায় বসে একটু প্রাণ খুলে কথা বললেই যেন কেউ অপরাধ না নেয়, এইটুকুই আমাদের আবেদন। কেন না, এতে মহাভারত অশুদ্ধ তো হয়ই না, কোনো মহামহিমান্বিতা—'

'চুপ, চুপ, চুপ। হরেশ, চুপ করো। জানো না—কথা আর দ্রৌপদীর শাড়ি একই ব্যাপার, টানলেই বেড়ে যায়?' বাধা দিয়ে উঠল দীপক।

মিন-মিন গলায় নীহার বলল, 'এইভাবেই দল ভেঙে যায়, এইভাবেই বন্ধুত্ব চটে যায়।'

'ঘটে বুদ্ধি থাকা চাই সকলের সমান।' হরেশ বলল মনোজের দিকে আলগোছে একটু দৃষ্টিপাত করে।

প্রমাদ গনছিল বসে-বসে স্নেহাংশু। রিহার্সেল চলছিল, বেশ লাগছিল তার। তার লেখা কথাগুলোর ওপর প্রাণের উত্তাপ ঢেলে দিয়ে-দিয়ে এরা বলে চলেছিল তাদের পার্ট, সেইটেই তো বেশ জমাট করে তুলেছিল এই ঘরটির আবহাওয়া, তার মধ্যে এক-টুকরো দিবাস্বপ্ন ঢুকিয়ে দিয়ে এরা আবহাওয়াটা এমন গরম করে তুলতে উদ্যত হয়েছে কেন।

কিন্তু এটাও ঠিক—যে মেয়ে পয়সা নিয়ে প্রকাশ্য মঞ্চে অভিনয় ক'রে-ক'রে বেড়ায়, সে মেয়ে যতই মহীয়সী মহিলা হোক, তাকে নিয়ে বন্ধুবান্ধবরা মিলে একটু হাল্কা চালে কথা বললেই তার মানহানি হয়ে যাবে, এটা আবার কেমন কথা? অমিয়রা মনে-মনে এইরকম চিন্তা করছে বটে, কিন্তু বিশেষ কথা বলতে চাচ্ছে না। দ্রৌপদীর শাড়ির সঙ্গে মুখের কথার খানিকটা মিল নাকি আছে, কথার টানা-পোড়েনে তাই তাদের মন নেই।

হরেশের শেষ মন্তব্যে মনোজ বেশ-একটু ক্ষুণ্ন হয়েছে। তার মুখের ভাব দেখেই সেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু মনোজও এসব নিয়ে আর আলোচনা করতে যেন বিশেষ রাজী নয়।

আবহাওয়াটাও কেমন বিশ্রী হয়ে গিয়েছে, মেজাজও বুঝি সকলের ঠিক নেই।

বিরাট আর বিশাল এবং পুরনো—যে-রকম একটা বাড়ির স্বপ্ন নিয়ে গড়ে উঠেছে স্নেহাংশুর নাটকটি, তাদের রিহার্সেলের জন্যে জোগাড় হয়েছে এই-যে বাড়িটা, তাও ঠিক তেমনি বিরাট ও বিশাল এবং হয়তো তেমনিই পুরনো। কিন্তু এ-বাড়িটা পরিত্যক্ত নয়, বহুবিধ মানুষের জনতা দিয়ে বাড়িটি ঠাসা। কোনো-কোনো ঘর হচ্ছে মালগুদাম, কোনোটায় থাকে রিক্সাওয়ালারা এক-সঙ্গে গাদাগাদি করে, নোনাধরা ইটের থামের আড়ালে বারান্দায় লাইন দিয়ে

কিষাণ
লণ্ঠন
সর্বোৎকৃষ্ট
গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
ফোন-২২-৬৫৮০
৯৩,ওল্ড চীনা বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

বসে বিড়ি বাঁধে একদল লোক। বিভিন্ন ঘরে বিভিন্ন জীবিকার মানুষ বসবাস করছে—জাতিধর্ম-নির্বিশেষে।

এই বাড়িরই একটা হলঘর ছিল খালি, সেটা জোগাড় করেছে এরা অনেক তদ্বির করে। হলঘরটার দেয়ালের গায়ে কয়েকটা ময়লা-ধরা আলমারি দাঁড় করানো, ওপরে শিলিং থেকে ঝুলছে প্রকাণ্ড-একটা ঝাড়—ধুলোয় কাচের রঙ আর দেখা যায় না।

এমনি নিভৃত এই নিকেতনে তারা এসেছে নাটক করতে। তারা প্রত্যেকেই মনে করছে তাদের প্রত্যেকেরই জীবন বুঝি নাটকীয় ঘটনায় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠবে, তখন আসবে তাদের সেই প্রতীক্ষিত নায়িকা। যখন বা যেদিন আসবে সেই শ্রীমতী দিবা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কিন্তু যার জন্যে সকলের এত প্রতীক্ষা এবং এত প্রেরণা তার কথা আবার তুলল দীপক, কিন্তু তার প্রস্তাবটা সকলের কাছেই আকস্মিক এবং অনেকের কাছেই মর্মান্তিক বলে মনে হল।

দীপক বলল, 'থাক। দরকার নেই ওসবের। আমরা নিজেরাই যা পারি তাই করব। দরকার-মত আমরাই সাজব মেয়ে। বাইরে থেকে সত্যকারের মেয়ে এনে কাজ নেই।'

সকলকে চমকে দিল দীপক। কিন্তু হঠাৎ তার এ-ধরণের প্রস্তাব করার হেতু কি। হঠাৎ এমন-কি ঘটল যার জন্যে সব প্ল্যান এমন বানচাল করে দিতে হবে।

সূচনাতেই যদি মনোমালিন্যের লক্ষণ দেখা দেয়, তা হলে প্রথম থেকেই সাবধান হওয়া ভালো। যখন সমস্ত ব্যাপারটাই একটু বাঁকা রাস্তা নিতে আরম্ভ করেছে, তখন যাত্রা একেবারে বন্ধ করে দেওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

কেবল এই বন্ধুদের দলটাই এ-প্রস্তাবে স্তম্ভিত হয়ে যায় নি, মাথার ওপরে স্তব্ধ হয়ে ঝুলছে ঝাড়, দেয়ালে-দেয়ালে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আলমারি।

অনেকক্ষণ কাটল এইভাবে। কতটা সময় কেটে গেল তাও বলা শক্ত। কেন না, ওদের সকলেরই বুঝি মনে হল যে, সময়ও এই আকস্মিক পরিবর্তনের দরুণ হয়তো স্তব্ধ হয়ে গিয়ে থাকবে।

অনেক বাদে কথা বলল মনোজ। তাকেই কথা বলতে হল, কেন না সে'ই কথা দিয়ে এসেছে ঐ নায়িকাকে। কথা হয়েছে—এরা কয়েকদিন রিহার্সেল দিয়ে নিজেদের একটু রপ্ত করে নিয়ে কিছুটা এগিয়ে যাক, তারপর আসবে সে। নানা জায়গায় নানারকমের ভূমিকায় অভিনয় করে-করে বেড়াতে হয় তাকে, রিহার্সেলে সময় বেশি খরচ করা যেমন তার অসুবিধে, তেমনি অল্প সময়ের মধ্যেই নিজেকে তৈরি করে নেবার যোগ্যতাও অর্জন করে নিতে পেরেছে সে। মনোজকে তাই সে বলেছে, 'আপনারা এগিয়ে যান, আমি ঠিক সময়ে গিয়ে আপনাদের ধরে নেব।'

সুতরাং এর পরে আর পিছিয়ে আসা যায় না। তার ওপর এই অচিন-পুরীর নায়িকা হবে দিবা এবং এর নায়কের ভূমিকায় নামছে মনোজ।

এ-সব কারণে কথা বলতে হল মনোজকেই। মনোজ একটু হেসে, হাওয়াটা হাল্কা করে দেওয়ার চেষ্টা ক'রে, বলল, 'দীপকটা বড্ড ছেলে-মানুষ। নিজেরা একটু রসিকতা করব না? আলবৎ করব। তাতে যদি কারও গায়ে ফোস্কা ওঠে, উঠুক। আমাদের দিবা দেবী হবেন আমাদের নায়িকা।'

বা, বা, বা। সুন্দর কথা বলেছে তো মনোজ। এমন পরিষ্কারভাবে কথা বলে সব একাকার করে দিল সে। এ ক'দিন মনোজের আচরণ দেখে সকলেরই কেমন মনে হয়েছিল যে, মনোজ একেবারে যেন করতলগত করে রাখতে চাচ্ছে ঐ নায়িকাকে, যেন ঐ নায়িকা একমাত্র মনোজেরই করতল-গত, তার ওপরে আর যেন কারোই কোনো অধিকার নেই। তার ওপর মনোজের হাব-ভাব দেখে ও কথা বলার ভঙ্গি দেখে বন্ধুরা সকলেই মনে করছিল যে, মনোজ যেন অমন-একটা নায়িকা সংগ্রহ করে এনে দিয়ে তাদের সকলকে ধন্য করে দিচ্ছে।

হ্যাঁ, এ নায়িকা উত্তম নায়িকা, এ নায়িকা উৎকৃষ্ট নায়িকা—এ কথা তারা স্বীকার করে। সকলেই তাকে চাক্ষুষ দেখেছে, কিম্বা সকলেই তার অভিনয় দেখেছে—এমন নয়। যারা দেখেছে তারা তো দেখেছেই, যারা দেখে নি তারা এর অভিনয়ের ও অন্যান্য বিষয়ের তারিফ শুনেছে অনেক। সেই নায়িকা এসে তাদের সঙ্গে অভিনয় করবে—এটা আনন্দের কথা, কিন্তু ভাগ্যের কথা এটা কখনোই নয়। কেন না, তিনি অসূর্যম্পশ্যাও নন, অস্পৃশ্যাও নন।—অস্পৃশ্যা কথাটার মধ্যে অবশ্য রস ও একটু রসিকতা আছে।

যাই হোক, মনোজ যে একটু রাশ আলগা দিয়েছে এবং ঐ নায়িকাকে সকলের নায়িকা বলে ঘোষণা করেছে—এইটেই আশ্বাসের কথা, ভরসার কথাও।

সকলে একটু শক্ত হয়ে ব'সে ছিল, সকলে এবার গা একটু আলগা দিয়ে বসল।

দীপক বলল, 'এইরকম কথাই শুনতে চেয়েছিলাম। দিবা দেবী হবেন আমাদের নায়িকা—ঠিক বলেছ্ দাদার মনোজ। তিনি আমাদের সকলের নায়িকা, অর্থাৎ আমাদের নাটকের তিনি নায়িকা।'

একটু নড়ে বসল স্নেহাংশু, তার নাটকের উল্লেখ শুনে একটু বুঝি খুশিই হল সে, বলল, 'রিহার্সেলটা এবার একটু চেপে দিতে হবে। কেউ যেন গা লাগিয়ে—'

হরেশ হেসে উঠল, বলল, 'সব যখন রফা হয়ে গেল, তখন আর কথা নেই। গা লাগাবে এবার সবাই, কত গা চাই?' ব'লেই সে সুর ধরল, 'সা-রে-গা, মা-রে-গা, পা-রে-গা—' (ক্রমশঃ)

জুয়ারী

বিমল সেনগুপ্ত

পার্ক সার্কাসের পাঁচমিশেলী পাড়ায় যেখানে নিউ চার্চ লেন এসে মিশেছে ট্রাম রাস্তায়—সেখানে আমাদের বন্ধু জহরুল হক্ একখানা বইয়ের দোকান খুলে বসেছিল। নিজেদের বাড়িতে জুৎ করে আড্ডা মারবার সুবিধে না থাকায়, হক্ সায়েবের দোকানের পেছনে আমরা আড্ডাখানা খুলেছিলাম। মণ্টু চক্রবর্তীর উৎসাহে সে আড্ডার একটা গালভরা নামও দেওয়া হয়েছিল—'ইয়ং বেঙ্গল ট্রাভলার্স এ্যাসোসিয়েশন'—অর্থাৎ পুজো, পরবে, ছুটির দিনে ইয়ার-বন্ধুরা মিলে হৈ-হৈ করতে করতে কোথায় বেড়াতে যাওয়া হবে তা ঐ ঘরে বসেই ঠিক করতাম আমরা। এ-ব্যাপারে আরও একটু সুবিধে হয়েছিল। আড্ডায় যারা আসতো তাদের নিজের পয়সায় চা-শিঙাড়া না খাওয়ালে হক্ সায়েবের কোথায় যেন বাধ বাধ ঠেকতো—সুতরাং আমাদের আড্ডা সরগরম থাকতো নিয়মিত। আড্ডায় নিয়মিত তাস-পাশা খেলা হতো, পাঁচটা ভালো-মন্দ আলোচনা হতো, কখনো-সখনো পয়সা দিয়ে তিন তাসের জুয়োও যে খেলা না হতো এমন নয়। শেষ পর্যন্ত ক্লাবটা মহামানবের মিলন তীর্থও হয়ে দাঁড়ালো। অর্থাৎ পাড়ার বারোয়ারী সরস্বতী পূজোর মিটিং, মিলাত শরীফ উৎসব বা বড়দিনের খৃস্টজন্মের সময়টিতে পাড়ার বাঙালী খৃস্টানরা যে ক্যারোল গানের পার্টি বের করবে তার মহড়াও ঐ ঘরেই হতে সুরু করল। এখানেই আমাদের প্রথম পরিচয় হয়েছিল ভাস্কো-ডা-গামার সাথে।

ভাস্কো-ডা-গামা নামটা অবশ্য আমরা দিয়েছিলাম, ওর আসল নাম ছিল ম্যালকম। প্রায়ই দোকানে আসতো ছ'পেনী সিরিজের ইংরিজী নভেল কিনতে। সপ্তাহে অন্তত দু'খানা করে বই কিনতো ও। জহরুলের ভাই নাসিম তখন নিয়মিত সাহিত্য-সাধনা করছে। অর্থাৎ এন্তার গল্প-কবিতা লিখে সম্পাদকদের দরজায় দরজায় ঘুরছে। কেউ নিয়মিত বইপত্তর পড়ে এমন দেখলে তাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি না করে ও পারতো না। সুতরাং ও বলল একদিন, 'সায়েব, তুমি তো দেখছি অনেক বই কেন, খুব পড়তে ভালোবাসো বুঝি?'

উত্তর এলো, 'ও! ডেফিনিটলি, এসব বই আমি আমার মিসেসকে পড়ে শোনাই'।

নাসিম বললে, 'কন্‌গ্রাচুলেশন সায়েব, তোমরা তো খুব হ্যাপি কাপল্‌, দুজনেরই লিটারারি টেস্ট।'

সায়েব বললে, 'থ্যাঙ্ক্‌ ইউ, উই আর ভেরি হ্যাপি। আর লিটারেচর তো আমরা গিলে খাই, রাদার উই গবল আপ দিজ্‌ বুকস্‌।' তারপরই সায়েব প্রশ্ন করলে, 'তোমাদের পেছনের ঘরে এত হল্লা-গাল্লা হচ্ছে, কি ব্যাপার, কোনো সাহিত্যসভা হচ্ছে নাকি ?'

নাসিম একটু বুক ফুলিয়ে জবাব দিলে, 'না, আমাদের ইয়ং বেঙ্গল ট্রাভলার্স এ্যাসোসিয়েশনের মেম্বাররা ডিস্‌কাসান করছেন।'

সায়েব বললে, 'হোয়াট এ গুড আইডিয়া, মি অলসো এ জেনুইন ট্রাভলার। তোমাদের সেক্রেটারী কে, একবার আলাপ করতে পাই না ?'

সুতরাং নাসিমও বয়োজ্যেষ্ঠ কেদারদাকে সসম্মানে এগিয়ে দিয়ে পরিচয় দিলে, 'ইনিই আমাদের অনারেব্‌ল সেক্রেটারী।'

ম্যালকম কাজ করতো রেলের ড্রাইভারের—সেই সুবাদে ও তো ট্রাভলার বলে দাবি করতেই পারে। আর ও নাকি বহুদিন ধরেই এমনি একটা ক্লাব খুঁজছিল। আমাদের চরণ মিত্তির আর নতিক প্রথমে আপত্তি তুলেছিল—'বেশ আছি হে আমরা, এ বাঙালীর আড্ডায় ওসব টেঁস্‌ ফিরিঙ্গী ঢোকানোর কি দরকার ?'

কিন্তু কেদারদা ফিসফিস করে বললেন, 'তোমরা এক-একটি গাড়োল, সামনে পুজো আসছে না। সায়েবের সুবাদে রেলগাড়িতে ফ্রি পাশ না পাও অন্তত কিছু কম পয়সায় পেতে পারলেও তো কত সুবিধা। রেলে কাজ করে, দুদিন আসবে তো সাতদিন আসবে না। ও-ও খুশি হোক, আমাদেরও কাজ গুছনো হোক।'

সুতরাং নতিক আর চরণ মিত্তির চটপট তাদের আপত্তি তুলে নিলে।

শেষ পর্যন্ত ম্যালকমকে পেয়ে আমরা ভারি খুশি হয়ে গেলাম। আমাদের সাথে চা-ডালমুট খায়—কোনো আপত্তি নেই। দুবার অনুরোধ করলেই হেঁড়ে গলায় ইংরাজী গান শোনায়। ঘরের চেয়ার-বেঞ্চি ভর্তি থাকলে ট্রপিকালের প্যান্ট গুটিয়ে হাঁটু মুড়ে চৌকীতে বসেই ব্রীজ খেলে। এমন কি কেদারদার অনুরোধে একদিন তার বাড়িতে যেয়ে কলাপাতায় সত্যনারায়ণের সিন্নীও খেয়ে এলো। মন্টু চক্রবর্তী তো একদিন পরিষ্কারই জিজ্ঞেস করলে, 'তা হলে, মিঃ ম্যালকম, তুমি আমাদের এই আড্ডাটাকে আবিষ্কার করে খুব খুশিই হয়েছ কি বল ?'

খুব শরীফ মেজাজে ম্যালকম বললে, 'ইয়েস, ইয়েস, ইণ্ডিয়া আবিষ্কারের পর ভাস্কো-ডা-গামা যতটা খুশি হয়েছিলেন তার চেয়ে কম নয়। এমনি একটা নরক গুলজার প্যাণ্ডেমোনিয়ামই তো খুঁজছিলাম এতদিন।' সেই থেকেই ম্যালকমের নাম হয়ে গেল ভাস্কো-ডা-গামা।

সামনে তিনতাস বিছিয়ে বসে সেই ম্যালকমকে একদিন ডাকলেন কেদারদা, 'এই যে ভাস্কো-ডা-গামা, ব্রীজ তো ভালোই খেল, ফ্লাস-ট্যাস চলে নাকি ?'

যেন পেটের নাড়ী ছিঁড়ে যাবে এইভাবে হাসতে হাসতে ভাস্কো-ডা-গামা বলল, 'হাউ ফানি, খুব হাসির কথা বলেছে কেডারডাডা। রেসের মাঠের ক্রনিক গ্যাম্বলারকে তিনতাস দেখাচ্ছে।'

কেদারদা একটু অবাক হয়ে বললেন, 'তা হলে মিস্টার, ওদিকে মানে রেস কোর্সে যাওয়াও অভ্যাস আছে ?'

একটু কাঁচুমাচু হয়ে জবাব দিলো ভাস্কো-ডা-গামা, 'আর বলেন কেন, সিজনে কোনো শনিবার বাদ যায় না।' তারপর একটু থেমে আবার বললো, 'আর আমার জীবনটাই তো একটা জুয়াখেলা—এ গ্যাম্বলিং ইনফ্যাক্ট।'

সেদিন তিনতাস খেলার ফ্লাস, রান, রানিং ফ্ল্যাস, ট্রায়ো আর সর্বোপরি ব্লাফ দিয়ে বাজের যে বহরটা দেখালে ভাস্কো-ডা-গামা তাতে কেদারদার মত ঝানু খেলোয়াড়েরও চোখ কপালে উঠে গেল। আমাদের আড্ডায় নিছক আনন্দের জন্য খেলা হতো বলে 'বোর্ডমানি' কখনো দুপয়সার বেশি করা হতো না। তবু ঘণ্টা-খানেক বাদে ভাস্কো-ডা-গামার দিকে এককাঁড়ি পয়সা জমে উঠলো।

কেদারদা ভয়ে ভয়ে বললেন, 'তা হলে বল, রেসের মাঠেও তুমি অনেক বড় বড় দাঁও মেরেছ ?'

তাসটা হাওয়ায় সাফ্‌ল করতে করতে ভাস্কো-ডা-গামা অবহেলায় উত্তর দিলো, 'তা মন্দ কি ? কখনো খারাপ রেকর্ড করেছি বলে তো মনে পড়ছে না।'

গৌরী গাঙ্গুলী ফস্‌ করে ফোড়ন কাটলে, 'তা হলে ব্যাঙ্কে বেশ জমিয়েছ বল। আমার এক খুড়শ্বশুর তো রেস খেলেই সি-আই-টি রোডে ছ'তলা বাড়ি হাঁকড়েছে।'

বাঁ চোখটা একটু টিপে সায়েব বলল, 'গড সেভ ইয়োর খুড়াশ্বশুর। বাট টেক ইট ফ্রম মি, গৌর, রিয়াল গ্যাম্বলার আনসারটেনিটির ওপর জুয়ো খেলতেই আনন্দ পায়। বারগেন কি হলো না হলো তা নিয়ে মাথা বড় একটা ঘামায় না।'

আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি দেখে বললে, 'ওয়েল লেট মি এক্সপ্লেন, আমার গল্পটাই বলি তোমাদের।'

তারপর সামনের পয়সাগুলো সবার জন্য চা আর কাটলেট আনতে দোকানের চাকরটার হাতে তুলে দিয়ে বেশ জুৎ করে একটা সিগারেট ধরিয়ে সুরু করলো ও—

'জুয়ো খেলার নেশা আমায় প্রথম ধরিয়েছিলো গোমেশ। গোমেশ কারকরমা পড়তো আমাদের ক্লাশে। তবে এক-একটা স্ট্যাণ্ডার্ডে বেশ কয়েকবার ফেল মেরে মেরে পাশ করতো বলে ওর বয়সটা আমাদের

চেয়ে বছর-ছয়েক এগিয়ে গিয়েছিল। সেবার সেণ্ট পিটার স্কুল থেকে জুনিয়ার কেম্ব্রিজ দেবার কথা আমাদের। ফি জমা দেবার দিন টাকা পকেটে নিয়ে গুটিগুটি স্কুলে পৌঁচেছি। স্বয়ং সেণ্ট পিটারও যে আমাকে পাশ করাতে পারবেন না, সে-বিষয়ে মনে কোনো সন্দেহ নেই। এমন সময় গোমেশ এসে বললে, 'আবি ম্যালকম।'

আমি বললাম, 'কোথায়?'

ও বলল, 'রেসকোর্সে। ফাইভ রুপিজে ক্লিন মেরে দিবি ফিফটি, ধা টিপস যোগাড় করেছি না।'

আমি বললাম, 'পাঁচ টাকা কোথায় পাবো?'

ও বলল, 'এই বুদ্ধি তোর, নইলে আর চাইনীজ পামকিন বলে ডাকি তোকে, কেন ফিয়ের টাকা আনিস নি?'

আমি বললাম, 'কেন, ফি দেবো না?'

গোমেশ বললে, 'আরে ব্রাউন নকটার ফি তো সোমবার দিলেও চলবে, এইফাঁকে যদি কিছু আর্ন করে নিস তাতে ক্ষতি কি? আর রেসে গেলেই যদি অন্যায় হোতো তবে স্বয়ং বেঙ্গল গভর্নর রেস খেলতে যেতো না।'

'—অকাট্য যুক্তি। সুতরাং আমি আর গোমেশ রওনা হলাম। মাঠে পৌঁছে এখানে-ওখানে পিটপাট কথাবার্তা বলে এসে ও ঝপাঝপ টিকিট কিনলো, আর পর পর তিনটে রেসে আমরা একেবারে ফ্ল্যাট হেরে গেলাম। রাগে-দুঃখে কান্না পেয়ে গেলো, ইচ্ছে হল গোমেশকে ধরে ঠেঙাই। কিন্তু তা হল না, কারণ গোমেশ ছিল আমার থেকে হাত-খানেক লম্বা আর গায়েও অনেক জোর। তখন ভাবলাম—যা গেছে, গেছে, এ কয়টা টাকাই বা থাকে কেন? পাপা এমনিতেও পিঠের চামড়া তুলবে অমনিতেও তুলবে, সুতরাং আমি ঘোড়ার এ্যাকসেপ্টান্স লিস্টটা বের করে সামনে যে নামটা পেলাম তার ওপরই টিকিট কিনে ফেললাম। গোমেশ হা হা করে উঠলো, 'হেরে যাবি হেরে যাবি, হাতে যা আছে তাও যাবে।'

আমিও বললাম, 'সাট্ আপ্ মিস্টার বুলডগ, আমার টাকা দিয়ে আমি ডাংকি মার্কা ঘোড়া ধরবো—হোয়াট্স্ দ্যাট টু ইউ?' তারপর বললে বিশ্বাস করবে না। সেই গাধা-মার্কা ঘোড়াটাই জিতে গেল। আর আমি একেবারে ওয়ান টু টেন-এ কড়কড়ে পঞ্চাশটা টাকা পেয়ে গেলাম। তারপর যা ধরি তাই জেতে, যেন ম্যাজিক দেখছি। খেলা শেষ হলে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পাশে এসে বসেছি, দুজনের পকেটেই একগাদা নোট গজগজ করছে। গোমেশের ওপর রাগ কোথায় উবে গেছে।

'আলুকাবলী খেতে খেতে গোমেশ যা বললে, তার অর্থ হচ্ছে—'তোর এমন ইনটিউশন ম্যালকম, এ-লাইনে তো তুই দুদিনে মিলিয়নেয়ার হয়ে যাবি। তা পড়াশুনো করবার আর দরকার কি? কারণ পড়াশুনো তো লোকে প্রফেশন নেবার জন্যই করে।'

গোমেশের কথাগুলো এমন মনে লেগে গেল কি আর বলবো। রাতে ডিনারের পর পাপাকে কথাটা বলতেই, পাপা নাকের সামনে এমন একখানা ব্রো তুললে যা খেলে আমাকে একেবারে বেরিয়াল গ্রাউণ্ডে মাটি নিতে হোতো।

আমিও লাফিয়ে চার হাত পেছনে সরে গিয়ে বললাম, 'পাশ-টাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তাই টাকা আর নষ্ট করবো না, আমি স্বাধীনভাবে রোজগার করবো আর এই হলো আমার সিঙ্গল ডের রোজগার।

বাবা একটু নরম হয়ে বললে, 'কোন চুলো থেকে রোজগার হলো শুনি? পিকপকেট না বার্গলারি?'

ঠিক যেমনভাবে গোমেশ আমাকে বলেছিল, তেমনভাবে আমিও বললাম বাবাকে, 'রেস খেলে, যা বেঙ্গল গভর্নর প্রতি শনিবারে খেলে থাকেন।'

সেদিন বাবা চুপ করে গেলেন, কিন্তু পরদিন এক কড়া মিশনারী হোস্টেলে থাকার বন্দোবস্ত করে এলেন। মুখে বললেন, 'তোমার রোজগারে আমার দরকার নেই, কাল স্কুলে ফি দিয়ে আসবে, আর পরশু থেকে হোস্টেলে থেকে পড়াশুনোয় মন দেবে।'

'শুনে পিত্তি জ্বলে গেলো আমার। মনে হলো পাপা যেন একটা কুকুর বাঁধবার শেকল আমার পায়ে আটকে দিতে চাইছে। সুতরাং সেই রাত্তিরেই আমি আমার লাইফ নিয়ে গ্যাম্বলিং-এর প্রথম চাল চেলে দিলাম। অর্থাৎ বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলাম। তারপর রেলওয়ে ইঞ্জিনে কয়লামারা খালাসীর এ্যাপ্রেণ্টিসশিপ নিয়ে ভেগে গেলাম। কলকাতা থেকে কাঁচরাপাড়া।'

জহরুল বললে, 'আর কাঁচরাপাড়া থেকে বুঝি শনিবার শনিবার রেস এ্যাটেণ্ড করতে?'

একগাল হেসে ডাকো-ডা-গামা বললে, 'সারটেনলি ইয়েস, সিজনের শনিবার রেলকোম্পানী আমাকে লাখ টাকা দিতে চাইলেও কাজ করি নি কোনদিন। পর পর দুদিন-দুরাত্তির ডিউটি করেছি, তবু শনিবারে অফ নিয়েছি। খেলতে খেলতে কেমন আলাদা একটা নেশা ধরে গেলো। যে ঘোড়া আপসেট হবার সম্ভাবনা, সেইটাই ধরতে লাগলাম। এ যেনো জেনে-শুনে স্লিপার সরানো লাইনের ওপর দিয়ে ফুলস্পীডে ইঞ্জিন চালানো। কিন্তু কপাল খুলে গিয়েছিল, কিছু না কিছু পেতামই সবসময়।'

পোর্টকমিশনার্সে কাজ করতেন ইন্দ্রদা—ইতিহাসে আছে দু-চারবার রেসের মাঠে অনেক গচ্চা দিয়ে যাওয়া বন্ধ করেছিলেন—তিনি এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন, 'ফেভারিট নামের টিপস্গুলো কোথা থেকে বাগাতে হে, ডাকো-গা-ডামা?'

তেমনি হেসে সায়েব বললে, 'টিপস্, ফিপস্ নিয়ে ব্রেন র‍্যাকিং করি

পি কোনদিন, আমি একেবারে বুাইও খেলতাম। শেষে এমন হয়ে গেলো, বড় একঘেয়ে লাগতো। হারবার ভয় চলে গিয়েছিল, খুব বিরাট কিছু না জিতলেও জানতাম খেলা শেষে বিশ-পঞ্চাশ টাকা হাতে আসবেই। তাই ধীরে ধীরে সব উত্তেজনা ফাটা বেলুনের মতই চুপসে যেতে থাকলো কিছুদিন পর। সব ইণ্টারেস্ট চলে যাবার মত হলো। কিন্তু জুয়োর নেশা একবার ধরলে কি আর ছাড়া যায়? তাই রেলওয়ে ইয়ার্ডের ভেতর আড্ডাতেও জমে গেলাম। কখনো কখনো হাওড়া ময়দানে বা বোটানিকাল গার্ডেনের আড্ডায় এসে 'আলু-সুপুরি' খেলতাম, বউবাজারে চায়নাটাউনে খেলতে যেতাম মাজাং।'

কেদারদা প্রশ্ন করলেন, 'আলু-সুপুরি কি সায়েব?'

ভাস্কো-ডা-গামা বললে, 'পুলিশের চোখে ধূলো দেবার জন্য ওপনলি আলু আর সুপুরি লেনদেন হতো। সুপুরি মানে ওয়ান রুপি, আলু মানে ফাইভ রুপিজ্। খেলার শেষে একবারে হিসেব হোতো টাকা-পয়সার।'

নাসিম তার সাহিত্যিক-সাহিত্যিক ভাব নিয়ে এতক্ষণ হাঁ করে গল্প গিলছিল, প্রশ্ন করলে, 'তা হলে রেসে যাওয়া একেবারে ছেড়ে দিলে?'

সায়েব বললে, 'নট এক্সাক্টলি অবকোর্স, তবে খুব বেশি আর যেতাম না। মাড়োয়ারী পটিতে গিয়ে আই-এফ-এ আর ডুরাণ্ড খেলার ওপর স্পেকুলেশন করে বাজী ধরতাম। এইভাবেই এদিক-সেদিক করে চললো কয়েক বছর। শেষে রেসেও গেলাম একদিন আর সেইদিনই আমার লাইফ নিয়ে সেকেণ্ড গ্যাম্বলিং খেললাম।'

কেদারদা বললেন, 'সে আবার কি?'

ভাস্কো-ডা-গামা হেসে বললে, 'ভেরি রোমাণ্টিক এণ্ড ভেরি ইণ্টারেস্টিং স্টোরি অব এ রিয়াল গ্যাম্বলার্স লাইফ। কিন্তু কাট্লেট্ এসে গেছে। জাস্ট হেল্প ইয়োর-সেল্ফ কেডারডা।' সায়েব বলে চললো—

'বড়দিনের আগে এসপ্লানেডে এসেছিলাম এক ফ্রেণ্ড-এর সাথে দেখা করতে। দেখা হোলো না, খুব মন খারাপ। মন খারাপের আরও একটা কারণ ছিল। ক্যালকাটা ফায়ার ব্রিগেডের ড্রাইভার হেনরীর মেয়ে স্টেলার সাথে কিছুদিন হলো আলাপ হয়েছে আমার। প্রায়ই দেখা হয় দুজনের। আমিও এদিকে সাবার্বান লাইনে এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ড্রাইভার হয়েছি তখন। কোয়ার্টার পেয়েছি। পাপাও পুরনো রাগ ভুলে মা'র সাথে এসে ২।৪ দিন থেকে গেছেন আমার সাথে। কিন্তু এদিকে মিসেস হেনরী, মানে স্টেলার মা হোলো একটি গুঁফো মহিলা। এটা-সেটা করে সবসময় ২।৪ টাকা হাতাবার তালে থাকে। আগের দিন রেড রোড দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি স্টেলার সাথে—বললাম, স্টেলা, আর নয়, এবার একদিন গীর্জেয় গিয়ে সম্পর্কটাকে পাকা করে ফেলা যাক।'

'স্টেলা এতক্ষণ আমার হাতটা জড়িয়ে ধরে হাঁটছিল, ওর হাতের বাঁধনটা কেমন আলগা হয়ে গেল।

ও বললে, 'এখন তা হয় কি করে ম্যালকম? পাপা মদ খেয়ে হাজার চারেক টাকা ধার করে ফেলেছে, সেটা শোধ না করতে পারলে আমি ফ্রি হব কি করে? সেইজন্যই তো টেলিফোন এক্সচেঞ্জে ইণ্টারভিউ দিয়ে এলাম।' একটু থেমে আবার বলল, 'জানো, ফায়ার ব্রিগেডের সেকেণ্ড অফিসার রঞ্জন বোসকে যদি কথাটা বলি ও এখনি চার-দুগুণে আট হাজার টাকা ফেলে দেবে।'

আমি বললাম, 'পরিচয় আছে বুঝি?'

ও বলল, 'এই ক'দিন মাত্র হয়েছে, হি ইজ ম্যাড আফটার মি। জানো, হি ইজ এ জমিন্দার এণ্ড লিভস্ লাইক এ প্রিন্স।'

'অন্ধকারে স্টেলার মুখ দেখা যাচ্ছিল না। তবু মনে হল আমার পাশে যেন একটা ইভনিং ড্রেস পরা বনবিড়াল ফ্যাঁচফ্যাঁচ করে হাসতে হাসতে চলেছে। বুঝলাম ও আমার জেলাসিতে ঘা দিতে চায়, গ্যাম্বলিং করতে চায় পুরুষের ভালোবাসার সাথে। কিছু বললাম না, ওকে গাড়িতে তুলে দিয়ে ফিরে এলাম।

'একটু সুখ-দুঃখের কথা বলতে তাই এসেছিলাম এসপ্লানেডে। আমার বন্ধু কোহেনের কাছে। দেখা হল না। মন খারাপ নিয়ে ফিরে যাচ্ছি। হঠাৎ কানে এল বড়দিনের রেসের এ্যাক-সেপ্টান্স লিস্ট নিয়ে ভেণ্ডাররা চিৎকার করছে। ভাবলাম আচ্ছা আমিও জন্মজুয়ারী। এ গ্যাম্বলার টু মাই ম্যারো। পরদিন সোজা গেলাম রেস কোর্সে। যে নামটা চোখে ঠেকল, প্রথম পকেটের যথাসর্বস্ব চাললাম তার পেছনে। তারপর দুআনার চিনেবাদাম পকেটে পুরে সিটে গিয়ে বসলাম, যেন কিছুই হয় নি। খেলাটা ছিল ট্রিবল টোটের। তারপর কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল, ভাল করে মনে নেই। স্টেলাদের বাড়ির দরজায় যখন আমার ট্যাক্সীটা থামলো। পকেটে তখন গাণ্ডার দশেক টাকা গজগজ করছে।

খবর শুনে ধাড়ি মেয়েটা লোভে আর আনন্দে এমন লাফিয়ে উঠল, যেন চার বছরের খুকু। বললে, 'মামির সাথে দেখা করবে না?'

আমি বললাম, 'আজ নয় কাল। তারপর ওর হাতে চার হাজারের একটা বাণ্ডিল গুঁজে দিয়ে বললাম, 'চলি'।

স্টেলা বললে, 'চল না একটু গঙ্গার ধার দিয়ে বেড়িয়ে আসি ট্যাক্সী করে, নয়তো চলো হোটেল-ডি-ভেনাসে—স্ক্যাণ্ডি-নেভিয়ান ড্যান্স আর মিউজিক আছে আজ। রঞ্জন বোস কতবার সাধাসাধি করে গেল।'

'মেরীর নামে বলছি কেডারডা, সেই মুহূর্তে মেয়েটার ওপর থেকে যেন সব ফ্যাসিনেশন চলে গেল আমার। খানিকটা পিটি আর ঘৃণা ছাড়া কিছুই রইল না! সারারাত ভাবলাম। আর পরদিন একেবারে স্টেলার নাকে ঝামা ঘসে দিয়ে চলে এলাম।'

'পাশের ফ্ল্যাটে থাকতো লুসি। ভারি সুন্দর দেখতে, ভারি মিষ্টি ব্যবহার, কিন্তু ছোটবেলায় স্টোভ বার্স্ট করে চোখ দুটো অন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। পরদিন সোজা তার কাছে প্রোপোজ করলাম। তারপর ওর বাবা মার কনসেণ্ট পাবার পর বিয়ের দিন ঠিক করে নিমন্ত্রণ করলাম স্টেলা আর তার মাকে।

ওঁকো মহিলা ব্যাপারটা বুঝেই একচালে ক্লাং করতে চাইল আমাকে। বললে, 'ভেরি হ্যাপী নিউজ, ভেরি হ্যাপী নিউজ! তা আমার স্টেলারও বিয়ে ঠিক হয়েছে রঞ্জন বোসের সাথে। হি ইজ এ বিগ অফিসার, এণ্ড এ প্রিন্স।'

'শুনে আমি সামনের দেওয়ালে ক্রাউনের ছবির নিচে সোনার জলে লেখা—'গড সেভ দি কিং'—কথাটাই একবার আবৃত্তি করে ফেললাম। কারণ রঞ্জন বোসকে আমি চিনতাম, ম্যারেজ প্রোপোজ করতে তার বয়ে গেছে। স্টেলার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, চোটটা ঠিক লেগেছে। যেন চড় খেয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে মুখ। কাছে গিয়ে বললাম, 'লজ্জা কি, টাকাটা তোমায় প্রেজেণ্ট করলাম। আমি জমিদার নই, প্রিন্সও নই। তবে, অমন দশ-পনর হাজার টাকা আমার পকেটে আজকাল ক্যাশ মজুত থাকে। উইস ইউ লাক।'

'চলে এলাম। তবে জীবনের গ্যাম্বলিং-এ লুসিকে পেয়ে আমি সত্যিই খুব খুশি হয়েছি। সি লাভস মি মোর দ্যান এনি ওয়ান ইন দিস ওয়ার্লড।'

চং করে আটটা বাজলো ঘড়িতে। সায়েব বললে, 'এবার তবে উঠি হে ফেণ্ডস, লুসি এতক্ষণ ঘরবার করছে।' নাসিমের দিকে ফিরে বললে, 'একটা ডিপথং-এর বই কিছু দাও তো, হট্ স্টাফ শুনে শুনে লুসির ঘেন্না ধরে গেছে।'

সায়েব টুপীটা মাথায় দিতে যাচ্ছিল, পোর্টকমিশনার্সের ইন্দ্রদা বললেন, 'কিন্তু ভাস্কো-ডা-গামা তুমি এখনো তা হলে রেস কোর্সে যাও কেন?'

হেসে সায়েব বললে, 'আজন্ম জুয়ারী যে, রেস কোর্সে বসে আনসারটেনিটির ওপর জুয়ো খেলার নেশাকে শান্ত না রাখলে শেষে ফ্যামিলি-লাইফ নিয়ে হয়ত গ্যাম্বলিং করে বসবো। নাসিমকে এক্সপ্লেন করতে বল, ও সাহিত্যিক মানুষ সাইকোলজী বোঝে।'

ধীরে-সুস্থে গুড নাইট জানিয়ে বেরিয়ে গেল সাহেব।

এরপর আমাদের 'ইয়ং বেঙ্গল ট্রাভলার্স এ্যাসোসিয়েশনের' আরও তিন বছর কেটে গেল। তিন বছরে আমরা ভাস্কো-ডা-গামার খাতিরে বেড়িয়ে এসেছি পুরী, বেনারস, ডায়মণ্ড-হারবার, বোলপুর আর রাঁচী। কখনও বিনা ভাড়ায়, কখনও সিঙ্গল ফেয়ার ডাবল জার্নিতে। পুরীতে তো লুসি আর বাচ্চা পলও আমাদের এক্সকারসন পার্টিতে জয়েন করলে, কেদার বৌদি আর জহরুলের বিবিও সঙ্গ নিয়েছিল। ভাস্কো-ডা-গামা এখন নাগপুর প্যাসেঞ্জারের ড্রাইভার।

ফেব্রুয়ারীর প্রথম দিকে ভাস্কো-ডা-গামাকে একটু ব্যস্ত-সমস্ত দেখা গেল। কেদারদা জিজ্ঞেস করলে, 'কি সায়েব, তোমাকে একটু আপসেট দেখাচ্ছে যেন।'

তড়বড় করে ভাস্কো-ডা-গামা যা বললে তার অর্থ হচ্ছে, বোম্বে মেলে এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ড্রাইভারের একটা পোস্ট খালি হয়েছে। ন্যায়ত সেটা তারই পাবার কথা। কিন্তু বোম্বে মেলে পোস্টিং হওয়া খুব ইজ্জতের কথা বলে, অনেক রাইভ্যাল দাঁড়িয়ে গেছে। খুব ঘুষ আর ক্যাচ চলছে।

দাঁতে দাঁত চেপে বলে গেল ভাস্কো-ডা-গামা, 'আচ্ছা আমিও জন্ম গ্যাম্বলার, দেখে নেবো।'

দিন দশেক পরে আবার দেখা হলো রাত্রিবেলা। কোথা থেকে

দহন করে ফিরছে।- থেমে বললে, হ্যালো সেনগুপ্তা, আই হ্যাভ এ প্রেজেণ্ট সারপ্রাইজ ফর ইউ, জাস্ট গেস ইট।'

বললাম, 'পোস্টটা পেয়েছ নিশ্চয়ই---'

বলল, 'হ্যাঁ সব ক'টা রাইভ্যালকে গ্যাং মারবার ব্যবস্থা করে এলাম।---তবে কড়কড়ে কয়েক হাজার টাকা পান খেতে দিতে হবে। ব্যাঙ্কে যা আছে সব ওঠাতে হবে। লুসি আর পলের নামে পাশ বই করে কিছু টাকা রেখেছিলাম---তাতেও হাত দিতে হবে।'

একটু ঘুরে আবার বলল, 'নেভার মাইণ্ড, নেক্সট ঘোড়ার সিজনে ও টাকা আমি তুলে আনবো সুদ সুদ্ধ---আচ্ছা, গুড নাইট।'

ও চলে যাচ্ছিল, পেছনে চেঁচিয়ে বললাম, 'উইস ইউ লাক, ভাস্কো-ডা-গামা।'

যেতে যেতেই ভাস্কো-ডা-গামা বললে, 'থ্যাঙ্ক ইউ সেনগুপ্তা।'

দিন পনের পরে কেদার-বৌদি ডেকে বললেন, 'শুনেছ, ভাস্কো-ডা-গামা আজকে এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আনতে যাবে সন্ধ্যেয়, ফিরে এসে ক্লাবে আসবে। এই উপলক্ষে সবাইকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে একটু হৈ-হুল্লোড় করবে। লুসি ডেকে পাঠিয়েছিল---বললে, অনেক বাঙালী জেণ্টলম্যান আসবে আজ, তুমি আমায় একটু হেল্প করো।'

তাড়াতাড়ি ক্লাবে এসে খবরটা ছড়িয়ে দেওয়া হলো। আধ ঘণ্টার ভেতর সেণ্ট পারসেণ্ট এ্যাটেণ্ড্যান্স হয়ে গেল। কেদারদা আর ইন্দ্রদা তখনই কিছু চাঁদা তুলে ট্যাক্সী করে চলে গেলেন নিউ মার্কেটে। কিছু ফুল আর সায়েব-মেম আর বাচ্চাটার জন্য কিছু প্রেজেণ্টেশন আনতে। নাসিম আর কবিবন্ধু পার্থসারথি দুজনে মিলে---'প্রিয় বন্ধু মিঃ ম্যালকমের পদোন্নতি উপলক্ষে, ইয়ং বেঙ্গল ট্রাভলার্স এ্যাসোসিয়েশনের আনন্দোচ্ছ্বাস' নামে একখানা কবিতা-অভিনন্দন লিখতে বসে গেল।

ঠিক আটটায় ঢুকলো ভাস্কো-ডা-গামা। আমরা ফুল আর মালা হাতে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'হ্যালো, কনগ্রাচুলেশন. থ্রি চিয়ার্স ফর মিঃ ম্যালকম, হিপ হিপ হুররে, ভাস্কো-ডা-গামা কি জয়, ইয়ং বেঙ্গল ট্রাভলার্স এ্যাসোসিয়েশন, জিন্দাবাদ।'

কিন্তু সায়েব একটু ক্লান্তি জড়ানো পায়ে গিয়ে চেয়ারে বসে পড়লো।

কেদারদা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন, 'কি খবর সায়েব এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট পেয়েছো? শরীর ভালো তো?'

ভাস্কো-ডা-গামা তাড়াতাড়ি বললে, 'আরে না না কেডারডা, শরীর খুব ফিট আছে। এ্যাপয়েণ্টমেণ্টও পেয়েছি। জীবনে কোনো রেসে আমি হারি নি, আর হারবো একটা পোস্ট নিয়ে। গ্যাম্বলিং-এ ঐ পাতি ঘোড়াগুলোর কাছে।' তারপর একটু থেমে বললে, 'আসলে কি জানো কেডারডা, এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট অর্ডারটা হাতে পেতেই পোস্টটার ওপর সব মোহ কেটে গেলো---ফেক্ট নো মোর ইণ্টারেস্ট ফর ইট। হাজার আটেক টাকা খরচ করে ফেলেছি তবু এ ভিক্টরিতে আর আনন্দ হলো না তেমন। কি করি ভাবতে ভাবতে চৌরঙ্গীতে একটা রেস্তোরাঁয় বসে কফি খাচ্ছি। হঠাৎ দেখা আমার এক বন্ধু স্যাণ্ডার্সনের সাথে। স্যাণ্ডার্সন কাজ করে বে-অব-বেঙ্গলের ভেতর একটা দ্বীপের লাইট-হাউসে।'

বললে, 'সেকেণ্ড অফিসারের পোস্টটা খালি পড়ে আছে। কেউ যেতে চায় না, ভারি লোনলি লাগে।'

বললাম, 'আমাকে দিতে পারো চাকরিটা?

ও বললে, 'হ্যাঁ, রাইট নাউ এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দিতে পারি।'

'গেলাম ওদের অফিসে। কথা বললাম বড়কর্তার সাথে। এক ঘণ্টা বাদে চাকরি হয়ে গেল। মাইনেটা নট ব্যাড। তবে ছ'মাস পরে একমাস ছুটি। ওখান থেকে বেরিয়ে রেল অফিসে একেবারে লাস্ট আওয়ারে রেজিগ-নেশন সাবমিট করে চলে এলাম। ইয়োর ভাস্কো-ডা-গামা উইল বি কোয়াটার্ড ইন ওপন সি নাউ।'

সবার দিকে চাইলো ও একবার, তারপর বলল, 'আমার নতুন চাকরির জায়গায় এ্যাসোসিয়েশনের সব মেম্বারদের নেমন্তন্ন থাকলো। উইথ দেয়ার ফ্যামিলি। যাওয়া-আসার খরচ-খরচা সব আমার।'

আমরা কেমন বোকা হয়ে গিয়েছিলাম। মুখ দিয়ে কোন কথা বের হচ্ছিল না। ভাস্কো-ডা-গামাই বললে আবার, 'ইট উইল বি সামথিং আনএক্সপিরিয়েন্সড এণ্ড এ নিউ গ্যাম্বলিং উইথ লাইফ, ফর মি, লুসি এণ্ড পল, তাই না কেডারডা।'

কেদারদা এতক্ষণ ঘাবড়ে গিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসেছিলেন। অনেক কষ্টে, অনেক চেষ্টা করে, সেই নিস্তব্ধ ঘরের ভেতর প্রায় অস্ফুট স্বরেই উত্তর দিলেন, 'আরে মানে সে তো বটেই, সে তো বটেই---মানে. তা আর বলতে।'

রোমাঞ্চ উপন্যাসের যাদুকর
দীনেন্দ্রকুমার রায়ের
গ্রন্থাবলী
১ম ভাগে—৫খানি সুবৃহৎ ডিটেকটিভ উপন্যাস। মূল্য ৩॥০ টাকা
২য় ভাগে—৫খানি রহস্য উপন্যাস মূল্য ৩॥০

জাতীয়-কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের
রঙ্গলাল-গ্রন্থাবলী
পদ্মিনী, সুরসুন্দরী, কর্মদেবী, কুমার-সম্ভব, নীতিকুসুমাঞ্জলি, কাঞ্চী-কাবেরী, কবির জীবনী। ৭খানি একত্রে ২'০০।

শ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন সম্পাদিত
নাড়ীজ্ঞান-প্রদীপিকা
(নাড়ী স্পর্শ দ্বারা রোগ নির্ণয় ও পরমায়ু নিরূপণ)
মূল্য এক টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

॥ শিমুলিয়া থেকে সিমলা এবং সুকেশ থেকে সুকিয়া ॥

আদিপর্বে অবিচ্ছেদ্যই ছিল শিমুলিয়া, সুকেশ এবং ঠনঠনে। অর্থাৎ চোরবাগানের অরণ্য-যুগে ঠনঠনে বা সুকেশ নামের কোনো উচ্চারণ ছিল না কোথাও। সম্ভবত তখন সবই ছিল শিমুলিয়ার অন্তর্গত।

উত্তরে-দক্ষিণে বিস্তারিত অরণ্য চোরবাগানের। তারই পূর্বোপান্তে তৃণ-লাঞ্ছিত ময়দান। সারা ময়দানে ফুলভারে প্রক্ষিপ্ত যে-তরুশ্রেণী—নাম তাদের শিমুল। হাজার হাজার শিমুলের অগ্নিবর্ণ বিভাসে রঙিন হয়ে থাকে আপ্রান্তিক পরিবেশ। তাই দূর-লোকালয়ের কাছে 'শিমুল-তলার মাঠ' নামেই তার পরিচিতি। পাশের অরণ্য গভীর। তার জটিল অন্তর্দেশে হিংস্র শ্বাপদের নিত্য পদসঞ্চার। তবু শিমুলতলার মাঠে জনপদবাসীদের আনাগোনায় বিরাম নেই। এখানে রাখাল আসে গরু চরাতে, কাঠুরিয়া আসে কাঠ কাটতে, এবং চৈত্র-বৈশাখের সংগমযোগে শিকারে আসে শিকারীর দল। এভাবেই ধাপে ধাপে, অনেক কালের পাশ কাটিয়ে আসে শিমুলতলার মাঠ। তারপর দেখতে দেখতে, একদিন একটি-দুটি-তিনটি ক'রে কয়েকটি কুটিরের বিন্যাস ঘটে তার বুকে। এ-সমস্ত কুটিরে বসবাস সুরু করে যারা—তারা সেই বলরামেরই অনুচর বা চেলা। অর্থাৎ বনোপান্তের জমি চাষ করাই তাদের পেশা। দিনের পর দিন আবার তাদের পাশেই ঘর বাঁধতে আসে কয়েক ঘর জেলে। ফলে কুটিরের পাশে কুটির ওঠে আরও, এবং এভাবেই সারা শিমুল-তলার মাঠে আত্মপ্রকাশ করে যে-নিবিরোধ পল্লী—পরে তা শিমুলতলা সূত্রেই নামধারণ করে শিমুলিয়া। এই শিমুলিয়াতে প্রথম পত্তন ঘটে যে-মন্দিরের—প্রতিষ্ঠাতা তার জেলে-সমাজ। তাই একালের কিছু পুরা-

● কৈলাস বসু স্ট্রীটের সেই ঐতিহাসিক বাড়ি—যেখানে বিধবা বিবাহের প্রথম বাসর বসেছিল বিদ্যাসাগরের যুগে।

তাত্ত্বিকের বিশ্বাস: সে-মন্দির ছিল ধর্মঠাকুরের। কারণ কূর্মপ্রতিম ধর্মঠাকুরই ছিলেন চিরোপাস্য বিগ্রহ তদানীন্তন জেলেদের।

তারপর তিরোধান ঘটে অনেক কালের। শিমুলিয়া পল্লীতে সেই কৃষক এবং ধর্মপূজারীদের সরব সংসারযাত্রার স্থায়িত্ব ছিল কতকাল—

শ্রীপদাতিক

আজ তা নির্ণয় করা গবেষণা-সাপেক্ষ। তবে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রান্তিক পরিচ্ছেদে—যখন চোরবাগানের অরণ্য-যুগ বিবর্তিত প্রায়—তখন শিমুলিয়া পল্লীতে ঘর-কয়েক জেলে পরিবারের সাক্ষাৎলাভ ঘটলেও, কৃষক-সমাজের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। কারণ শিমুলিয়া তখন বসতিগত দিক থেকে বর্ধিষ্ণু বলেই রূপান্তর ঘটেছে তার আবাদী জমির। সম্ভবত সে-কারণেই কৃষকসমাজ শিমুলিয়া থেকে সরে যায় অনেক দূর-পূর্ব-দিকের কোনো উর্বর অঞ্চলে। তাদের বিনিময়ে শিমুলিয়াতে এসে বসতি স্থাপন করে কিছু শ্রমজীবী পরিবার এবং সেই সঙ্গে সপ্তগ্রাম থেকে আগত ঘর-কয়েক সুবর্ণবণিক। তার পর ইংরেজ আমলের যাত্রারম্ভে—যখন নবীনতর ফোর্ট উইলিয়াম প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অধিকার করে দু'শ' বছরের শহর-প্রতিম গ্রাম গোবিন্দপুর—তখন সে-অঞ্চলের কিছু বিত্তশালীও এসে সুরম্য বসতবাটী নির্মাণ করেন শিমুলিয়াতে। এ-সমস্ত বিত্তশালীর মধ্যে মনীষী রাজনারায়ণ বসুর পূর্ব-পুরুষও ছিলেন। সম্ভবত গোবিন্দ-পুর থেকে আগত এই বিত্তশালীদের উন্নত রুচির স্বপক্ষেই দিনে দিনে গ্রামীণ পরিবেশের নির্বাসন ঘটে শিমুলিয়া থেকে। তার কুটিরাদির স্থলে বিচিত্র কোঠাবাড়ির উদ্ধত অধিষ্ঠান ঘটায় এবার শহরের সঙ্গেই তার সম্পর্ক স্থাপিত হয় ঘনিষ্ঠতর।

দিন যায়। দিনে দিনে শিমু-লিয়ার শহর-প্রতিম পরিবেশে আভি-জাত্যের প্রতিষ্ঠা ঘটে স্থায়িভাবে। এ-দিকে ও-দিকে পত্তন ঘটে সুদৃশ্য

[illegible]। তন্মধ্যে সুকেশ স্ট্রীটই সুখ্যাত শিমুলিয়ার মধ্যবর্তী প্রধান রাস্তা বলে গণ্য হয় এবং তারই উভয় বাহুতে এসে বসতি স্থাপন করেন তদানীন্তন পণ্ডিত সমাজের কয়েকজন। আভিজাত্যের অব্যাহত প্রভাবেই সেকেলে নাম শিমুলিয়ারও বিবর্তন ঘটে খানিকটা। অর্থাৎ সারা শিমুলিয়া অঞ্চল এবার কারো কারো উদ্দেশে সিমলা পল্লীরূপেই আপন আত্মপ্রচারের ইস্তাহার জারি করে কলকাতায়।

তারপর? শিমুলিয়া অঞ্চল সেই অরণ্যের কাল থেকে রূপান্তরের পথে চলতে চলতে অতিক্রম করে অষ্টাদশ শতাব্দী এবং সেই অভিন্ন গতিতেই সে আবার পেরিয়ে আসে উনবিংশ শতাব্দীরও প্রথম পরিচ্ছেদ। প্রথম পরিচ্ছেদের অতিক্রান্তির শেষেই সমগ্র সিমলা পল্লীতে সূচনা ঘটে অবিস্মরণীয় এক অনন্য যুগের—স্রষ্টা যার যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর।

সিমলা পল্লীর দক্ষিণ-পূর্বে বাদুড়বাগান। সেখানেই এক অনাড়ম্বর গৃহে বসবাস করেন একাধারে প্রজ্ঞা-পৌরুষ এবং দয়া-দাক্ষিণ্যের বারিধি ঈশ্বরচন্দ্র। বসবাস তাঁর বাদুড়বাগানে হলেও প্রধান কর্মক্ষেত্র কিন্তু সুকেশ স্ট্রীটে। সুকেশ স্ট্রীটের দ্বাদশ সংখ্যক ভবনে বসবাস করেন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। তিনিও সমাজ-বিপ্লবের একজন অন্যতম বিপ্লবী এবং ঘনিষ্ঠ সহযোগী বা অনুগামী বিদ্যাসাগরের। প্রেসিডেন্সী কলেজে বাংলার অধ্যাপক তিনি। তাঁর গৃহেই বিদ্যাসাগরের বৈঠক বসে নিয়মিত। যাবতীয় জনহিতকর কার্যের পরামর্শ সভা যেমন বসে, তেমনই সে উদ্দেশে কিছু-কিছু ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তও সেখানে গৃহীত হতে থাকে দিনের পর দিন। তা ছাড়া বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে সেই যুগান্তকারী আন্দোলনেরও প্রধান কেন্দ্ররূপে ব্যবহৃত হতে থাকে সেই দ্বাদশ সংখ্যক ভবন।

বালিকা বয়সেই যারা বিধবা হওয়ার দুর্নিয়তিকে বরণ করতে বাধ্য হয়—তাদের উদ্দেশে পূর্ব-সূরী শাস্ত্রীদের শাস্ত্রে কোনো সম-বেদনার বাণী কি সত্যই অনুপস্থিত? মহাপ্রাজ্ঞ বিদ্যাসাগর তা বিশ্বাস করেন না। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়: এই অসহায়াদের অন্তর্বেদনার প্রতি সহানুভূতির স্বাক্ষর অবশ্যই আছে আদি-শাস্ত্রের কোথাও-না-কোথাও। তাই পাঠাগারে বসে সংস্কৃত শাস্ত্রের পাহাড় ঘাঁটতে সুরু করেন তিনি। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ঘাঁটতে ঘাঁটতে একদিন সত্যই তিনি সেই পাহাড় থেকে আহরণ করতে সক্ষম হন বিধবাদের মনোবেদনার স্বপক্ষে জন-কয়েক আদিশাস্ত্রীর সম-বেদনার বাণী। সুতরাং উত্তেজিত বিদ্যাসাগর সেদিন পাঠাগার ছেড়ে সরাসরি ছুটে আসেন সুকেশ বা সুকিয়া স্ট্রীটে। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সাহচর্যে তিনি সেখানেই প্রথম আহ্বান করেন প্রাজ্ঞজনের যে-সভা তা বিধবা বিবাহ সম্পর্কিত। উক্ত সভার এক সিদ্ধান্ত অনুসারে তিনি সেদিন সেখানে বসেই রচনা করেন বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে ঐতিহাসিক প্রস্তাব সমন্বিত পুস্তিকা যা পরদিন সূর্যোদয়ের মুহূর্তকাল থেকে ছাপার অক্ষরে সপ্রচারে ছড়িয়ে পড়তে সুরু করে বাংলার গঞ্জে-গ্রামে, হাটে-মাঠে এবং পথে-প্রান্তরে।

কিন্তু হায়! সনাতন কুসংস্কারের বাংলা দেশে সর্বজন-স্বীকৃত হলো না বিদ্যাসাগরের প্রস্তাব। তাঁর বিরুদ্ধে দানা বেঁধে উঠলো বিদ্রোহ। বিদ্রোহের প্রবল নায়ক রাজা রাধাকান্ত দেব। তিনি বিধবা বিবাহের বিপক্ষে স্বগৃহে এক সভা আহ্বান ক'রে বিদ্যাসাগরকেও আমন্ত্রণ জানালেন যথারীতি;

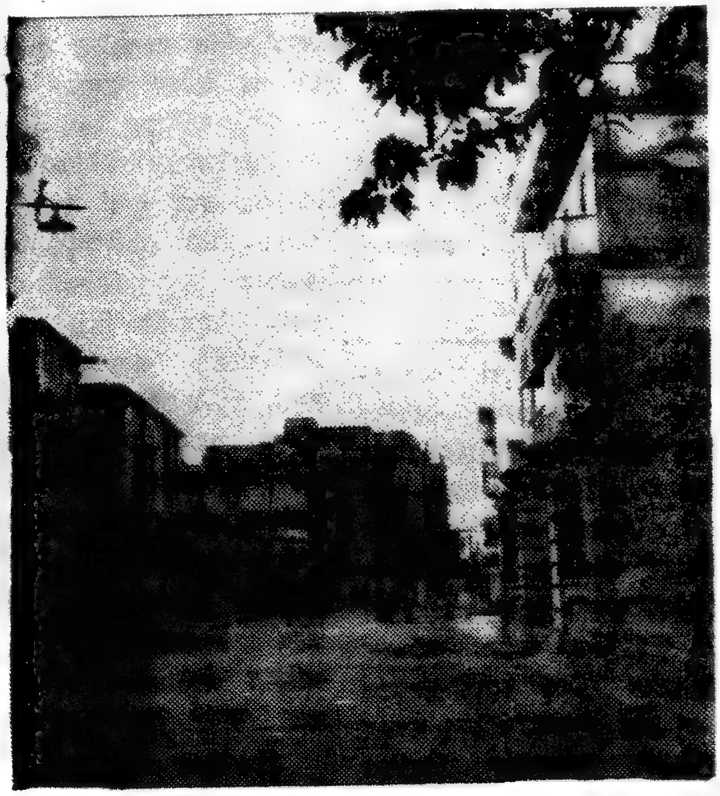

● বর্তমান সিমলা স্ট্রীটের দৃশ্য

অকুতোভয় বিদ্যাসাগর রাধাকান্তের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করলেন না। তিনি তাঁর সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে যথাসময়ে উপস্থিত হলেন রাধাকান্তের সভায়। সেখানে তিনি তীক্ষ্ণধার যুক্তি সহযোগে বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে বক্তৃতা দিলেন দীর্ঘ সময়। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাধাকান্তের পশুপ্রবল সংখ্যাগরিষ্ঠতার কাছে জয়ী হতে পারলেন না তিনি। অবশ্য হতাশও হলেন না। পরাজয়ের গ্লানি নয়, বরং সংগ্রামের আরও প্রচণ্ড শক্তি চয়ন ক'রে ফিরে এলেন স্বগৃহে। নিবিষ্ট মনে চিন্তা করলেন সমস্ত নিশি। তারপর নিশান্তেই আবার সভা আহ্বান করলেন সুকেশ বা সুকিয়া স্ট্রীটে। এবং সভান্তে রচনা করলেন বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে দ্বিতীয় পুস্তিকা।

তাঁর দ্বিতীয় পুস্তিকা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই সারা দেশে আরও ভয়ঙ্কর-রূপে জ'লে ওঠে বিদ্রোহের বহ্নি। বিদ্যাসাগর ভাবলেন: এ-বহ্নির উদ্গাতা যারা—তার প্রচণ্ড শিখায় জ'লে-পুড়ে একদিন খাঁটি হয়ে উঠবে তারাই। তারপর নতুন সমাজ, নতুন দিন, নতুন যুগে বরণীয় হবে তার প্রস্তাব। অকাল বৈধব্যের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে, আবার সবুজ সংসারের অজস্র শাখায় ফুল ফোটাবে নারী। সুতরাং তিনি করণীয় কর্মে যতি টানতে রাজী হলেন না, শপথের জটিল সরণী বেয়ে আগের মতোই এগিয়ে চললেন দৃঢ় পদক্ষেপে।

বিপক্ষ দল ভাবলো: সনাতন হিন্দুধর্মের চিরাচরিত আকাশে নিঃসন্দেহেই কুগ্রহ বিদ্যাসাগর। অতএব এই কুগ্রহের অপসারণকল্পেই তারা আততায়ী নিযুক্ত করে গোপনে।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা, কলেজের কাজ সেরে ঠনঠনে হয়ে সুকেশ বা সুকিয়া স্ট্রীটেই আসছিলেন বিদ্যাসাগর। কিন্তু আসার পথেই হঠাৎ তিনি সম্মুখীন হন বিপক্ষ দল কর্তৃক নিযুক্ত একদল আততায়ীর। তারা সশস্ত্র। বিদ্যাসাগর বুঝতে পারেন: তাঁরা তাঁকে নিধন ক'রেই রক্ষা করতে চায় হিন্দুধর্মের কৌলীন্য। সুতরাং ঘৃণায় মোচড় দিয়ে ওঠে তাঁর সর্বাঙ্গ। কাপুরুষ আততায়ীদের ভয়ে স'রে দাঁড়াবার পাত্র নন তিনি। এমন যে ঘটতে পারে—তা তিনি জানতেন এবং তার জন্যে তিনি প্রস্তুতও ছিলেন। সুতরাং আততায়ীর দল অস্ত্র বাগিয়ে এগিয়ে আসা সত্ত্বেও তিনি বিচলিত হলেন না। কেবল গলা ছেড়ে একবার ডাকলেন: 'কোথায় রে ছিরে, সঙ্গে আছিস তো?'

অন্ধকার পথে ছায়ার মতো পেছনে পেছনে আসছে ছিরে ওরফে শ্রীমন্ত। ওস্তাদ লাঠিয়ালরূপে তার নাম-ডাক আছে সারা কলকাতায়। বিদ্যাসাগরের ডাক শুনেই সে জবাব দেয়: 'তুমি এগিয়ে চলো না বাপু! কারা আসছে, আর কারা যাচ্ছে—তা আমি দেখছি। কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে—তার ভার আমার ওপর ছেড়ে দিয়েই তুমি নিশ্চিন্তে এগিয়ে যাও।'

বজ্র-গম্ভীর কণ্ঠ শ্রীমন্তের। তার অস্তিত্ব অনুভব করেই সভয়ে পিছিয়ে যায় আততায়ীর দল। মুহূর্তেই পরিষ্কার হয়ে যায় সমস্ত পথ কালীতলার। হাসতে হাসতেই সুকেশ বা সুকিয়া স্ট্রীটে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে এসে উঠলেন বিদ্যাসাগর। বেশ খানিকক্ষণ হাসলেন। তারপর পরক্ষণেই আবার গম্ভীর হয়ে বসলেন পরামর্শ সভায়। সভাশেষে, সম্ভবত সে-রাত্রেই তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক বিধবা বিবাহকে আইন-সিদ্ধ করার উদ্দেশে রচনা করেন এক দীর্ঘ দরখাস্ত। পরদিন সে-দরখাস্তে স্বাক্ষর দান করেন: মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা কালী-প্রসন্ন সিংহ, দ্বারকানাথ মিত্র, অক্ষয় কুমার দত্ত, ঈশ্বর গুপ্ত, রামগোপাল ঘোষ, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—প্রভৃতি প্রায় এক হাজার জন বিশিষ্ট ব্যক্তি বাংলার।

তারপর, ১৮৫৫ খৃস্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর, পঁচিশ হাজার নাগরিকের সানুরাগ উপস্থিতিতে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সেই যুগান্তকারী আবেদনপত্র দাখিল করলেন বিদ্যাসাগর।

বিধবা বিবাহ আইন-সিদ্ধ না করার পক্ষে আবেদনপত্র নিয়ে বিরোধীপক্ষও উপস্থিত হয় যথাসময়ে। তাদের দরখাস্তে স্বাক্ষরদানকারী ছত্রিশ হাজার সাত শ' তেষট্টি জন। এই বিপুল-সংখ্যক স্বাক্ষরদানকারীর সেই আবেদন-পত্র সেদিন তারাও সাড়ম্বরে পেশ করে ব্যবস্থাপক সভায়।

কিন্তু তা সত্ত্বেও শেষে জয়ের বরমাল্য লাভ করলেন বিদ্যাসাগরই। ১৮৫৬ খৃস্টাব্দের ২৬শে জুলাই বিধবা বিবাহ আইন পাশ হলো ব্যবস্থাপক সভায়। সঙ্গে সঙ্গে খবর ছড়িয়ে পড়লো বাংলা দেশ থেকে সারা হিন্দুস্থানের নগরে-বন্দরে এবং প্রতি জনপদে। দিকে দিকে জয়ধ্বনি উঠলো অপরাজেয় বিদ্যাসাগরের এবং তাঁকেই শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে বিধবা বিবাহের পক্ষে নাটক লিখলেন উমেশচন্দ্র মিত্র এবং পাঁচালী লিখে আসর জমাতে সুরু করলেন দাশরথি। বিধবাদের ম্রিয়মাণ ওষ্ঠপুটে হাসির মুকুল ফুটলো নির্মল আনন্দে।

আর দেখতে দেখতে, বিধবা বিবাহ আইন পাশ হওয়ার মাস-কয়েক পরেই একদিন একটি বিধবা মেয়ের বিয়ের লগ্নও ভেসে এলো সুকিয়া স্ট্রীটে, অর্থাৎ অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাসভবনেই। সেখান থেকেই নিমন্ত্রণ-পত্র বিলি হলো সংস্কৃত কবিতায় এবং বাংলা গদ্যে। যাঁরা পণ্ডিত এবং ব্রাহ্মণ—তাঁরা নিমন্ত্রণ পেলেন সংস্কৃত কবিতায় এবং বাংলা দেশের আরও প্রায় আটশত বিশিষ্ট ব্যক্তি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন বাংলা গদ্যে। বাংলা গদ্যে যে-নিমন্ত্রণপত্র ছাপা হয়—তা এই:

'শ্রীশ্রীলক্ষ্মীমণিদেব্যাঃ বিনয়ং নিবেদনম্। ২৩শে অগ্রহায়ণ রবিবার বিধবা কন্যার শুভ বিবাহ হইবেক; মহাশয়েরা অনুগ্রহপূর্বক কলিকাতার অন্তঃপাতী শিমুলিয়ার সুকেশ ষ্ট্রীটের ১২ সংখ্যক ভবনে শুভাগমন করিয়া শুভকর্ম করিবেন।—ইতি তারিখ ২১শে অগ্রহায়ণ, শকাব্দাঃ ১৭৭৮।'

যে-বিধবা বালিকার বিয়ে—নিবাস তার বর্ধমানের পলাশডাঙা গ্রাম। নাম কালীমতী দেবী। সে পিতৃহীনা। তদানীন্তন নিয়মে চার বছর বয়সেই তার বিয়ে হয়েছিল প্রথম। কিন্তু

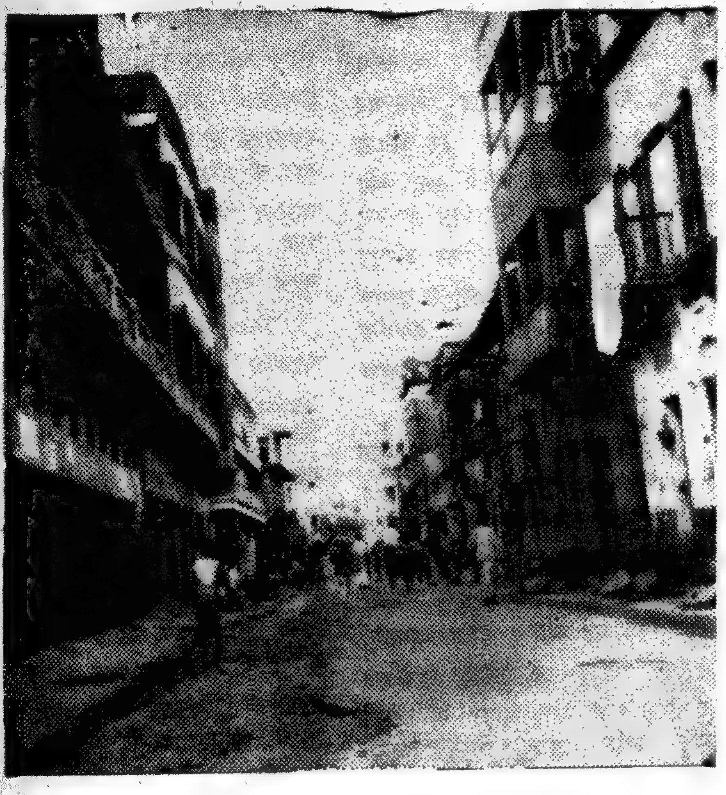

● বর্তমান কেলাস বসু স্ট্রীটের দৃশ্য

দুর্ভাগ্যক্রমে সে বৈধব্য বরণ করতে বাধ্য হয় মাত্র ছ' বছর বয়সেই। সুতরাং সে ফিরে আসে পিতৃগৃহে। মাতা লক্ষ্মমণি দেবীর কাছে থেকেই সে যখন ছ' বছরের কোঠা অতিক্রম ক'রে পদার্পণ করে দশ বছরে, তখন বিদ্যাসাগরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সেই দশ বছর বয়সের বিধবাটিকেই বিয়ে করবে ব'লে সম্মতি দান করেন যশোরের রামধন তর্কবাগীশের পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। সুতরাং বিদ্যাসাগরের নির্দেশে পাত্র-পাত্রী আসে কলকাতায়। পাত্রী এসে ওঠে সুকেশ বা সুকিয়া স্ট্রীটের দ্বাদশ সংখ্যক গৃহে, অর্থাৎ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাসভবনে এবং সেখান থেকেই মাতা লক্ষ্মমণি দেবী বিতরণ করেন উল্লিখিত নিমন্ত্রণপত্র।

আর পাত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন এসে ওঠেন বৌবাজারে, রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের বাসভবনে। ২৩শে অগ্রহায়ণ গোধূলি লগ্নে বিয়ে। সুতরাং সেখান থেকেই যথাসময়ে পালকিতে উঠলেন বিদ্যারত্ন। পালকির পুরোভাগে পদ-ব্রজে চললেন বিদ্যাসাগর স্বয়ং এবং পালকির এ-পাশে ও-পাশে বরানুগমনের শোভাযাত্রায় যোগ দিলেন রামগোপাল ঘোষ, দ্বারকানাথ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি বাছাই করা বাঙালি নায়কেরা। ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়ের মতো এগিয়ে চললো পালকি। পথের উভয় বাহুতে কৌতূহলী জনতা—তাদের কারো কণ্ঠে জয়ধ্বনি, কারো কণ্ঠে ধিক্কার। তবে সংখ্যা-প্রাচুর্যের অধি-কারী জয়ধ্বনির কণ্ঠেই। রাস্তার কোনো কোনো অংশে বিপক্ষ দল সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও, সেদিন সরকারী পুলিশ কর্তৃক নিরাপত্তার ব্যবস্থা বেশ দৃঢ় হওয়ায়, তারা তেমন সুযোগ পেলো না কলহ বাধানোর। সুতরাং প্রায় নির্বিঘ্নেই পালকি এসে পৌঁছলো সুকিয়া স্ট্রীটের মোড়ে। সারা সুকিয়া স্ট্রীট তখন সমর্থনকারী জনতার বিপুল ভিড়ে উদ্দীপিত। স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাস-ধ্বনির মধ্য দিয়ে পালকি ধীর পদক্ষেপে যখন এগিয়ে আসে দ্বাদশ সংখ্যক ভবনের দ্বার প্রান্তে, তখন বরকে সাদরে বরণ করে নারীসমাজের সমস্বর উলুধ্বনি এবং উদাত্ত মঙ্গল-শঙ্খ। তারপর লগ্নানুসারে গৃহের অন্দরে এসে অগ্নিকুণ্ডের মুখোমুখি বসেন বর; বহু মূল্য আভরণে বরের পাশে এসে আসন গ্রহণ করে সলজ্জিতা কালীমতী দেবী। হিন্দুর চিরাচরিত শাস্ত্রের বিবিধ মন্ত্র পাঠের মাধ্যমে সেদিন জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রভৃতি স্বনাম-খ্যাত অধ্যাপক এবং শাস্ত্রজ্ঞবৃন্দের সঙ্গে বাঙালি নায়কমণ্ডলীর উপস্থিতিতে সাড়ম্বরেই সম্পন্ন হলো বিধবা বিবাহের প্রথম অনুষ্ঠান। ১২৬৩ সালের ২৩শে অগ্রহায়ণের সেই বিজয়ী রবিবার ইতিহাসে এক অভিনব অধ্যায়ের সংযোজন ঘটালো সুকিয়া স্ট্রীটের দ্বাদশ সংখ্যক ভবনে।

আজ বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় অঙ্কে সারা সিমলা পল্লীই ঘনবসতির দুর্বহ চাপে বিপর্যস্ত। আজ তার বিভিন্ন অঙ্গে প্রচলন ঘটেছে বিভিন্ন নামের। এমন কি, সুকিয়া স্ট্রীটের সেই ঐতি-হাসিক অংশও আজ নাম ধারণ করেছে কৈলাস বসু স্ট্রীট। সুতরাং সে-অংশের সেই দ্বাদশ সংখ্যক বাড়িটিও আজ আর সংখ্যাগত দিক থেকে দ্বাদশ নয়। রূপান্তরের পর বহু রূপান্তরের দীর্ঘ পথ অতিক্রম ক'রে যুগের পর বহু যুগান্তরের সান্নিধ্য পেয়েছে সুকিয়া স্ট্রীট। তাই আজ সর্বাঙ্গেই তার বিবর্তন এসেছে চরম। বাড়ির পাশে বাড়ির ঘন সন্নিবেশ ঘটায় প্রকৃতিও তার বদলে গেছে সম্পূর্ণ। সম্ভবত সে-কারণেই সেকালের সেই দ্বাদশ সংখ্যক বাড়িটির অবস্থান ঘটেছে কৈলাস বসু স্ট্রীটে এবং আজ তা নবপর্যায়ে সংখ্যা গ্রহণ করেছে ৪৮এ এবং ৪৮বি এর সঙ্গে। বাড়িটি আজ জরাজীর্ণ। আজ তার কোনো অংশেই তেমন কোনো জৌলুষ নেই—যা নেত্রাকর্ষক। তবু বিধবা বিবাহের সেই ঐতিহাসিক বাসর সগর্বে সে-ই প্রথম ধারণ করেছিল ব'লে আজও তা ঐতিহ্যে গম্ভীর, মর্যাদায় মহান এবং স্মৃতি-বিন্যাসে মনোহর। যুগান্তকারী ইতিহাসের অবিস্মরণীয় প্রতীক এই ভবন। তার দিকে তাকিয়েই অমিতবীর্য ঈশ্বর-চন্দ্রের অন্তহীন সাগর দর্শন হয়তো একালেও সম্ভব হতে পারে বাঙালি-সমাজের পক্ষে।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় অধ্যায়

পর্যবেক্ষণের রীতি

প্রিন্স অভ ওয়েলস [পরে ৭ম এডোয়ার্ড] যখন ভারত পরিদর্শনে আসেন [১৮৭৫-৭৬], তখন স্যার স্টুয়ার্ট হগ আমাকেই যুবরাজের রক্ষীরূপে নিযুক্ত করেন। যুবরাজ যতদিন কলকাতায় ছিলেন, আমিও ততদিন তাঁর রক্ষীর কাজ করেছি। তৎকালীন [পুলিস কমিশনার এবং কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান] স্টুয়ার্ট হগ যুবরাজের ভারত আগমনের ঠিক পূর্বেই নাইট উপাধিতে ভূষিত হন। এঁর নামেই কলকাতার মিউনিসিপ্যাল মার্কেটটি স্যার স্টুয়ার্ট হগ মার্কেট [এবং কলকাতার সাধারণ লোকদের কাছে হগসাহেবের বাজার] নামে পরিচিত হয়েছে।

প্রত্যেকটি সাধারণ অনুষ্ঠানে আমাকে যুবরাজের সঙ্গে থাকতে হত। এবং এই সময়ে কোথাও কোনো সন্দেহজনক চরিত্র কাছাকাছি আছে কিনা সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা আমার কাজের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। আমার মনে আছে, একদিন যুবরাজ গার্ডেন রীচে কয়েকজন দেশী সামন্ত রাজের কাছে প্রতিনিমন্ত্রণ রক্ষার্থে গভর্মেণ্ট হাউস থেকে বেরিয়ে আসবার সময় তাঁকে দেখবার জন্য রেড রোডের শোভাযাত্রার দুধারে দারুণ ভিড় জমে যায়। এ পথে সে-সময়ের জন্য অন্য গাড়ি চলা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। পথটিকে ভিড় মুক্ত রাখার জন্য দুধারে ডবল লাইনে পুলিস কনস্টেবল নিযুক্ত হয়েছিল। যুবরাজের গাড়ি থেকে পঞ্চাশ ষাট গজ সামনে ঘোড়ায় চেপে এগিয়ে চলছিলাম আমি। দুদিকে জনসমুদ্র। সবার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে করে চলেছি। চলতে চলতে যখন লর্ড হারডিঞ্জ-এর মূর্তির কাছাকাছি এসেছি, তখন একটি বিশেষ লোকের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। তার মাথা অন্যান্য সবার মাথা থেকে অনেক উপরে। দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতোই লম্বা চেহারা লোকটার। জনতার প্রথম সারিতে ছিল সে। কিন্তু আমি তার খুব কাছে এগিয়ে আসতে দেখি সে একটুখানি ঝুঁকে পড়ে আর সবার সমান হবার চেষ্টা করছে। দেখে আমার কেমন

যেন সন্দেহ হল। আমি তখনই একজন অশ্বারোহী কনস্টেবলকে ডেকে তার হাতে তাকে সমর্পণ করে বলে দিলাম, থানায় নিয়ে তাকে যেন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। লোকটি পশ্চিমা, প্রথমে সে নিজের কোনো পরিচয় প্রকাশ করতে অস্বীকার করল। তার দেহ অনুসন্ধান করা হল। পাওয়া গেল একখানা দরখাস্ত—প্রিন্স অভ ওয়েলস-এর নামে। লালবাজারের স্মল কজ কোর্টের আশে-পাশে বহু ব্যবসাদার দরখাস্ত-লিখিয়ে থাকে, এখানাও তাদের একজনকে দিয়ে লেখানো। দেশের একখণ্ড জমি নিয়ে কার সঙ্গে গোলমাল বেধেছে, তারই একটা মীমাংসার জন্য প্রিন্স অভ ওয়েলস-এর নামে দরখাস্ত-খানা লিখিয়ে এনেছে। তার ইচ্ছা ছিল প্রিন্সকে সে নিজহাতে সেখানা পেশ করবে। এর জন্য সে যে-কোনো ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিল। তাকে আগে থাকতে গ্রেপ্তার না করলে অবশ্যই সে এ কাজটি করত। কিন্তু তার আসল মতলব কি ছিল তা আর জানা গেল না। একখানা বাজে দরখাস্ত যুবরাজকে দেবার জন্য এতটা ঝুঁকি কেউ কি সহজে নেয়?

বিস্ময়ের ব্যাপার—ফেরবার পথেও এমনি এক কাণ্ড ঘটল। গভর্নেণ্ট হাউসের বেসরকারী প্রবেশদ্বারের কাছে এগিয়ে আসতে আমি লক্ষ করলাম একটি লোক ভিড় ঠেলেঠুলে কনস্টে-বলদের সারিতে আসবার চেষ্টা করছে। কনস্টেবলরা এক গজ দূরে দূরে অবস্থিত ছিল। দেখা গেল এগিয়ে ঠিক এসেছে, যদিও কনস্টেবলদের সমসারিতে নয়, দুজনের মাঝামাঝি, কিন্তু একটু পিছনে। আমার ঘোড়া তার কাছাকাছি আসতেই সে একটু পিছনে সরে গিয়ে একটু অন্যদিকে মাথা ফিরিয়ে দাঁড়াল। আমি ঘোড়া থামিয়ে সাদা পোষাকপরা আমার একজন ডিটেকটিভকে ঐ লোকটাকে ধরে আনতে নির্দেশ দেব, এই উদ্দেশ্যে তাকে কাছে ডাকলাম, এবং সেও দ্রুত গতিতে আমার কাছে চলে এলো। কিন্তু কোন্ লোকটাকে ধরতে হবে নির্দেশ দিতে গিয়ে দেখি ভিড়ের মধ্যে সে কোথায় মিশে গেছে। তাকে আর কোনো মতেই বেছে বার করা গেল না। তার মনে যে, একটা-কোনো অপরাধ বোধ ছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ করবার কারণ নেই। নইলে হাজার হাজার লোকের মধ্যে তাকে ধরা হবে এ ধারণা তার এলো কি করে?

অনেক সময়েই আমি রাস্তার মোড় ঘুরে হঠাৎ কোনো এক পলাতক আসামীর মুখোমুখি এসে পড়েছি—অথচ আমি তাকে চিনি না; কোনো দিন দেখিও নি। আমার ইউনিফর্ম পরা থাকলে এ রকম লোক হঠাৎ থেমে গিয়েছে, চমকে উঠেছে, হাত-খানা মাথার উপর তুলে অকারণ টুপিটা হয় তো একটু এদিকে বা ওদিকে বেঁকিয়ে নিয়ে মাথা চুলকোতে আরম্ভ করেছে, অথবা মাটির পাইপ মুখে থাকলে তা এমন জোরে কামড়িয়েছে যে, তা ভেঙে যাচ্ছে আর নিচের তামাকসুদ্ধ বাটিটা মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। এ সবই তার মানসিক অস্থিরতার চিহ্ন, হঠাৎ পুলিস দেখে ফুটে ওঠা। পলাতক আসামীর আরও একটা অভ্যাস আমি লক্ষ করেছি। পুলিসের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে সে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে নাকের পাশ ঘষতে থাকে। ডান হাতে কোনো জিনিস থাকলে বাঁ হাত ব্যবহার করে, অথবা দুহাত মুক্ত থাকলে ডান হাত ব্যবহার করে এই কাজে। অথবা পায়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে জুতোর ফিতে বাঁধতে থাকে। এমনকি দুপাশে রবার লাগানো জুতো, যার ফিতে নেই, এমন জুতোতেও ফিতে ঠিক করে নেওয়ার অভিনয় করতে দেখেছি। আরও একটা কৌশল খুব সাধারণ। হাতে লাঠি থাকলে সেখানা মাটিতে 'পড়ে যায়'—এবং সেখানা মাথা নুইয়ে তুলতে থাকতে। এতে তাদের সাময়িক অস্বস্তিটা ঢাকা পড়ে বটে, কিন্তু তারা যে মনে মনে বেশ ভয় পেয়ে গেছে সে কথাটা আর চাপা থাকে না।

এ রকম ক্ষেত্রে আমি সাধারণত এইভাবে তাদের কাছে নিজের পরিচয় দিই—'ও হে, তোমাকেই আমি খুঁজছিলাম।' লোকটি চমকে উঠে বলে, 'আমাকে, স্যর?'—বলতে বলতে সোজা দাঁড়িয়ে ওঠে, এবং বলে, 'নিশ্চয় আপনি ভুল করেছেন।' আমি বলি, 'না, ভুল করি নি. এসব ব্যাপারে আমার কখনও ভুল হয় না, আর আমার হেপাজতে তোমার সম্বন্ধে যে সব বিবরণ আছে তাতে ভুল হবার কথাই নয়। ঐ যে তোমার নাকে একটা খাঁজ চিহ্ন, উপরের ঠোঁটে একটা কাটা চিহ্ন, বাঁ গালে আঁচড়ের দাগ, তা ছাড়া গায়ের রং, বয়স, দেহের উচ্চতা—সব যে মিলে যাচ্ছে গো। যদি তোমার নিজের কোনো সন্দেহ থাকে তবে তা মিটিয়ে দেব—আমার সঙ্গে একটিবার থানায় চল।' এই-চাল চেলে দেখেছি, দশটা কেসের মধ্যে নটা কেসেই আমি সাফল্য লাভ করি। অথচ তাদের কোনো বিবরণই থানায় নেই, সবটাই ছলনা। তাদের গ্রেফতার করার অন্য কোনো অতিরিক্ত ক্ষমতাও নেই, অথচ তাদের কৈফিয়ৎ রচনার সময় ও সুযোগ না দিয়ে এই সব কৌশলের সাহায্যে আমি তাদের মুখ থেকে সত্যকথাটা বার করে নিই।

অপরাধের চেতনা কোনো কোনো মানুষের বেলায় কিভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে তার একটি মনোহর দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

একদিন বিকাল বেলা ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীটের মোড়ে আসতেই আমি সুন্দর চেহারার একটি যুবকের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালাম। পোষাকটা তার নাবিকের, শুধু চুলগুলি সামরিক রুচির পক্ষে বেমানান রকমের বড়। কিন্তু অন্যান্য দিক থেকে দেখলে তাকে সেনাবিভাগের লোক বলে চিনতে দেরি হয় না। আমার সঙ্গে চোখোচোখি হতেই তার মুখ থেকে পাইপটি খসে পড়ল পেভমেণ্টে

উপর। পাইপটি ভেঙে গেল পড়ে। সে তখন সেই ভাঙা পাইপের দিকে করুণভাবে চেয়ে রইল। পুরনো বন্ধু ছেড়ে গেলে মনে যে দুঃখ জাগে তারও তখন সেই অবস্থা। তার এই সাময়িক দুশ্চিন্তার সুযোগ নিয়ে তাকে বললাম, 'কিচ্ছু ভেবো না হে, কিছুকালের জন্য এ পাইপ তোমার আর দরকার হবে না।'

লোকটি হঠাৎ চমকে উঠে আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। আমি বলতে লাগলাম, 'তোমার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা আপাতত আমিই করে দিচ্ছি, তবে তামাক খেতে দিতে পারব কি না সে প্রতিশ্রুতি তোমাকে দিতে পারছি না। হয়তো তোমার নিজের খরচেও তামাক যোগানো সম্ভব হবে না।'

'আমাকে, সার, আপনি নিশ্চয় হাজতে পাঠাচ্ছেন না?' —লোকটি অত্যন্ত ভীতভাবে বলল। ভয় তার সমস্ত চোখেমুখে।

'আমি বড়ই দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আপাতত আমার উদ্দেশ্য ঠিক সেটাই। তোমার কাছে এটি যতই অপ্রীতিকর, অথবা আমার কাছে বেদনাদায়ক হোক, আমাকে এ কাজ করতেই হবে।'

'কিন্তু সার, আপনি কি নিশ্চয় করে জানেন যে আমাকেই আপনি ধরতে চান? আপনার কি ভুল হচ্ছে না?'

আমি বললাম, 'না, আমার ভুল হচ্ছে না। আমি যাকে খুঁজছি, তোমার চেহারা তোমার আচরণ সব তার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। তোমার উচ্চতা, তোমার বয়স, তোমার গায়ের রং, মুখের বাঁ-পাশে কাটা দাগ, এবং লম্বা হাল্কা বাদামী রঙের চুল—ভুল হবার তো কোনো কারণ নেই।'

'সার, আপনি আমার লম্বা চুলের কথা বলছেন, আর তার রঙের কথা?' —লোকটির প্রশ্নের মধ্যে যেন একটা [illegible] আলো।

'হাঁ। সেই কথাই তো বলছি।'

'তা হলে আপনি যাকে খুঁজছেন, সে আমি নই।'—লোকটি বেশ জোরের সঙ্গে বলল। যেন সেই জিতে গেল। বলবার সময় তার আগের সেই ভয়ে ভীত চেহারাটা আর দেখা গেল না। 'এই দেখুন, সার'—বলে সে চট করে মাথার টুপিটা খুলে মাথাটি আমার সামনে উন্মুক্ত করে ধরল। আমি সবিস্ময়ে চেয়ে দেখি, তার মোটেই লম্বা চুল নয়, সবচুল অত্যন্ত খাটো করে ছাঁটা, এবং এত ছোট যে দেখে মনে হল সে কোনো সামরিক কয়েদখানা থেকে পালিয়ে এসেছে। যে চুল টুপিসুদ্ধ দেখা গিয়েছিল তা টুপির সঙ্গে সেলাই করা, এবং তা তার ছদ্মবেশের একটা অঙ্গ। কিছুক্ষণের জন্য আমার মুখে কোনো কথা সরল না। কিন্তু তা নিতান্তই সাময়িক। আমি বললাম, 'হতে পারে তোমাকে প্রথম যে লোক বলে ভেবেছিলাম তুমি সে লোক নও, কিন্তু তোমার এই ছদ্মবেশ ধারণের জন্যই তোমাকে ধরা হচ্ছে।'

তাকে থানায় নিয়ে যাওয়া হল, এবং জিজ্ঞাসাবাদ করার পর জানা গেল তাকে সত্যিই পুলিসে খুঁজছে। সে একটি সামরিক জেলখানা থেকে পালিয়ে এসেছে কলকাতায়, এবং এখান থেকে নাবিক বেশে জাহাজে পালাবে এই তার উদ্দেশ্য।

• • •

আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আমি হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ডাউন মেল ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

গাড়ি এসে থামবার সঙ্গে সঙ্গে বেশ মোটাসোটা এক বাবু একটি কামরা থেকে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটতে আমার সঙ্গে তার প্রায় ধাক্কা লেগে গেল। কিন্তু আমাকে দেখে সে অত্যন্ত ভড়কে গিয়ে তার এই অনিচ্ছাকৃত ধাক্কা লাগার জন্য মাফ চাইতে গেল, কিন্তু দেখলাম কথা তার মুখে বেধে যাচ্ছে। এতে আমার সন্দেহ হওয়াতে আমি বাবুটিকে থানায় নিয়ে গেলাম। তার হাতে একটিমাত্র কার্পেট ব্যাগ ছিল, সেটা খুলে দেখা গেল তাতে প্রায় একশ' খানা জাল নোট রয়েছে এবং সে নোটের প্রত্যেকখানার মূল্য একশ টাকা। তারপর যথাযোগ্য সন্ধানের পর জানা গেল এই লোকটার চেয়েও কোনো বড় প্রতারকের হাতে সে ঠকেছে। হীরে দিয়ে হীরে কাটার ব্যাপার আর কি। লোকটি বৃত্তিতে স্বর্ণকার, কাশীতে তার দোকান আছে। জানা গেল, একজন কুখ্যাত মাদ্রাজী জালিয়াত তার সঙ্গে দেখা করে এবং তার কাছ থেকে দশ হাজার টাকার অলঙ্কার কেনে। এই জাল নোট দিয়েই সে অলঙ্কারের দাম পরিশোধ করেছে, এবং তার পরেই সে কাশী থেকে সরে পড়েছে।

এই ক্রয়ের ব্যাপারটা ঘটেছে এক রবিবারে। পরদিন একখানি নোট যখন সে ব্যাঙ্কে পাঠায় তখনই ধরা পড়ে যে সেখানা জাল নোট, এবং ব্যাঙ্ক সেখানা বাজেয়াপ্ত করে। তাই সে বাকি নোটগুলো নিয়ে পরের ট্রেনেই কলকাতা আসছিল কোনোমতে সে-গুলো ভাঙানো যায় কিনা দেখতে। কিন্তু তাকে সময়মতো গ্রেফতার করাতে তার এই উদ্দেশ্য আর সফল হতে পারল না। সে, নোটগুলো নকল জেনেও তা ভাঙাতে চেয়েছিল, তাই তাকে শাস্তি পেতে হল।

কিছুদিন পরে নোটজালকারী নিজেও ধরা পড়েছিল, কিন্তু কৌশল করে পুলিসের খপ্পর থেকে পালিয়ে গিয়ে একটি পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে।

তৃতীয় অধ্যায়

একটি গোপন দুষ্কার্যকে বাইরের আলোয় আনা

ডিটেকটিভের শিক্ষিত দৃষ্টি বহু উপায়ে অপরাধ-চেতনাকে আবিষ্কার করতে পারে। সে জন্য কোনো কোনো বিশেষ অবস্থায়, কোনো কোনো

মানুষের অত্যন্ত তুচ্ছ চালচলন বা আচরণের দিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। 'এ সব তুচ্ছ ঘটনা—অতএব যেটুকু লক্ষ করছি তাই যথেষ্ট।'—এ রকম মনোভাব ডিটেকটিভের যোগ্য নয়। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় অত্যন্ত তুচ্ছ কারণ থেকেই সাংঘাতিক সব কাণ্ড ঘটে থাকে।

কলকাতা শহরের জোড়াবাগান এলাকায় এমনি এক ঘটনা ঘটেছিল। সে কয়েক বছর আগের কথা। টাঁক-শালের [চার্চ লেন] কাছাকাছি ধর্মতলা স্ট্রীটে এক কাপড়ের ব্যবসায়ী কারবার চালাত। তার বাসস্থানও ছিল সেটি। তার এই ব্যবসায়ের এক অংশীদার ছিল। একদিন লভ্যাংশের ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে তার সঙ্গে বচসা হওয়াতে সে তাকে খুন করে। তারপর সে তার মৃতদেহটিকে তার উঠোনে অবস্থিত রান্নাঘরের মেঝের নিচে পুঁতে রাখে। পরদিন হত্যাকারী সোজা থানায় গিয়ে জানায়, তার কারবারের অংশীদার অনেক টাকা নিয়ে রাতারাতি কোথায় সরে পড়েছে। টাকাটা তার নিজের নয়, কারবারের টাকা। তা ছাড়া অলঙ্কারপত্রও অনেক চুরি করেছে সে। তার একটিও তার নিজের সম্পত্তি নয়।

থানায় এজাহার লিখিয়ে তাতে সই করে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে গ্রেফতার পরোয়ানার ব্যবস্থা করিয়ে সে মোটা রকমের একটি পুরস্কার ঘোষণা করল। যিনিই সেই পলাতক অংশীদারকে ধরে দেবেন, তাঁকে ঐ পুরস্কার দেওয়া হবে। মিস্টার গ্রেভস নামক এক ইনসপেকটরের উপর ভার ছিল এই কেসটা তদন্ত করার। আমি তখন ছিলাম রিভার পুলিসের ইনসপেকটর। জোড়াবাগান সেকশনের উত্তর বিভাগ ছিল আমার এলাকা। কাজেই রোঁদে বেরুলে আমাদের প্রায়ই দেখা হত। মাঝে মাঝে তাঁর থানাতে গিয়ে সন্ধ্যা কাটানোও ছিল আমার অভ্যাস। কাজেই স্বভাবতই এরকম ক্ষেত্রে তাঁর অনেক কথা আমি জানতে পারতাম। একদিন জোড়াবাগান থানা থেকে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে দেখি সেই কাপড়ের ব্যবসায়ীটি আমার বাড়িতে এসে বসে আছে। আমি তখন নদীর উপরে বাস করতাম। সে আমাকে কিছু বলতে চায়। অর্থাৎ আমার সঙ্গে সে তার কেস নিয়ে আলাপ করতে চায়। 'সার, আপনি গ্রেভস সাহেবের বন্ধু, তাই আপনার কাছে জানতে এলাম আমার সেই জোচ্চোর অংশীদারের কোনো পাত্তা মিলল কি না। তা ছাড়া এ বিষয়ে গ্রেভস সাহেবের মত কি? তিনি কি তাকে খোঁজার কাজে কিছুদূর এগিয়েছেন?'

তখন এসব কথা শুনে আমি কল্পনাও করি নি যে এই লোকটি আমার কাছ থেকে কৌশলে খবর সংগ্রহ করতে এসেছে। কিন্তু এটি আবিষ্কার করতে আমার খুব বেশিক্ষণ লাগে নি। যখন মনে মনে সবটা অনুমান করলাম, তখন বিষয়টা আমার কাছে অনেকখানি পরিষ্কার হয়ে গেল। তাই আমি তার কথার জবাবে বললাম, 'মিস্টার গ্রেভ্স তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন অভিজ্ঞ অফিসার, অতএব তোমার কোনো চিন্তা নেই, তিনি তাকে জীবিত হোক মৃত হোক, ঠিক আবিষ্কার করবেন। আর তা করতে খুব বেশিদিন লাগবে না।'

মনে হল যেন আমার একথায় লোকটা একটুখানি চমকে উঠল। 'জীবিত বা মৃত', এই কথারই ফলে তার মনে ঐ প্রতিক্রিয়া ঘটল। কথাটা মনে রাখলাম। এর পর আরও দু-চারটে বাজে কথার পর লোকটা বিদায় নিল।

পরদিন সন্ধ্যায় জোড়াবাগান থানায় গিয়ে শুনলাম ঐ বস্ত্রবণিক সকাল বেলা মিস্টার গ্রেভ্স-এর কাছে এসেছিল, এবং স্পষ্টই বোঝা গেল তার উদ্দেশ্য মিস্টার গ্রেভ্স-এর উপর একটা উপর-চাল মেরে তাঁর কাছ থেকে আরও কিছু খবর সংগ্রহ করা। শুনলাম সে তার সঙ্গে এক থলে-ভরতি টাকা এনেছিল, এবং সে টাকা মিস্টার গ্রেভস-এর হাতে দিয়ে বলেছিল, 'আমার সেই অংশীদারকে ধরতে পারলে এটাকা পুলিসকে দেবেন।' কিন্তু মিস্টার গ্রেভস তা ফিরিয়ে দিয়ে বলেছেন, 'পুরস্কার দেওয়ার সময় যথেষ্ট পাওয়া যাবে; এখনও তোমার লোককে গ্রেফতার করা হয় নি।' বস্ত্রবণিক বলল, 'কিন্তু আমি শুনলাম তাকে কাশীধামে গ্রেফতার করা হয়েছে, এবং কলকাতায় নিয়ে আসা হচ্ছে, তাই শুনেই তো আমি এই পুরস্কারের টাকাটা নিয়ে এলাম।'

মিস্টার গ্রেভস বললেন, 'ও গুজব সত্যি নয়, অতএব টাকা তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও।'

আমি যখন এই ঘটনা শুনলাম, তখনই ঐ লোকটার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ঘটনার কথা মনে পড়ল। দুটিকে একত্র মিলিয়ে দেখে আমার খুব সন্দেহ জাগল। মনে যে ছবিটা ফুটে উঠল তাতে বেশ বোঝা গেল কেসটি মোটেই সোজা নয়। ইনসপেকটর গ্রেভসকে আমার সন্দেহের কথা বললাম। তারপর তাঁর দিকের কথার সঙ্গে আমার দিকের কথা সব তুলনা করে বিশ্লেষণ করে দেখলাম। ইনসপেকটর গ্রেভস আমার সঙ্গে একমত হলেন।

আমাদের প্রথম কাজ হল ঐ বস্ত্রবণিককে ডাকিয়ে এনে তাকে জিজ্ঞাসা করা সে কাশীতে তার লোককে গ্রেফতার করা হয়েছে এখবর কোথায় শুনেছে। তাকে হাজির করা হল থানায়। সে এ প্রশ্ন শুনে তার উত্তরে বলল, সকালবেলা অক্ষয়বাবু নামে এক ভদ্রলোক তার দোকানে এসে বলেছেন কাশীতে পলাতক আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে একথা সত্যি কি না। তিনি একথা শুনেছেন প্রেমচাঁদবাবুর কাছ থেকে।

তখন প্রেমচাঁদকে হাজির করিয়ে জিজ্ঞাসা করা হল। সে বলল সে কথাটা অভয়চরণের কাছ থেকে শুনেছে। এবং অভয়চরণকে জেরা করে জানা গেল সে শুনেছে এই বস্ত্রবণিকের

কাছ থেকেই। তা হলে দেখা যাচ্ছে এই গুজবটি রটানোর মূলে এই লোকটিই —যে লোকটি তার অংশীদারকে ধরার জন্য বড়ই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। তার উদ্দেশ্য সবাইকে ধোঁকা দেওয়া, এবং থানায় আসবার আগেই সে নিজে এই গুজব রটিয়ে এসেছে। এবং থানায় এসেছে জানতে যে এ খবরটা থানায় পৌঁছেছে কি না। পৌঁছলে—এবং সে গুজব সত্য হোক মিথ্যা হোক, সে নিজে যে খবরের জন্য কত ব্যস্ত হয়ে উঠেছে ইনসপেকটরের মনে এ ধারণা জন্মিয়ে দেওয়া।

নিরুদ্দিষ্ট লোকটিকে তার কর্মস্থলের আশেপাশের লোক শেষ কখন দেখেছে, এই সূত্র ধরে তদন্ত আরম্ভ করা হল। জানা গেল দুই অংশীদার পূর্বদিন সন্ধ্যায় খুব ঝগড়া করেছে। নিরুদ্দিষ্ট লোকটিও ঐ বাড়িতেই থাকত। এ সব শুনে, এবং বস্ত্রবণিকের অস্বাভাবিক ব্যবহারের কথা ভাবতে গিয়ে আমার মনে দারুণ এক সন্দেহের ছায়াপাত হয়। এবং মিস্টার গ্রেভ্‌স-এরও মনে ঐ একই সন্দেহ জাগে। সে হচ্ছে এই যে ঐ লোকটি সত্য এজাহার দেয় নি, তার অংশীদার পালিয়েও যায় নি, তার ভাগ্যে অন্য কিছু জুটেছে। অতএব এর পরের কাজ হল ঐ বণিকের বাড়ি সার্চ করা। কিন্তু এ ব্যাপারে একটু অসুবিধা দেখা দিল। গুরুতর অভিযোগ উপস্থাপিত করে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে সার্চ ওয়ারাণ্ট বার করতে হলে আইনসঙ্গত প্রমাণ কিছু দেখাতে হয়। কিন্তু এই লোকটি সম্পর্কে সে প্রমাণ কোথায়?

আমরা এই অসুবিধার কথা আলোচনা করছিলাম, এমন সময় মিস্টার গ্রেভ্‌স-এর একটা কথা মনে পড়ল। এর কয়েক সপ্তাহ আগে এই লোকটার বিরুদ্ধে একটি লোক এই মর্মে থানায় অভিযোগ উপস্থাপিত করেছিল যে, এরা দুই অংশীদারে মিলে বেআইনিভাবে আফিঙের ব্যবসা চালায়। কিন্তু এই ব্যাপারে তাদের বাড়ি সার্চ করার জন্য যে দিনটি ধার্য করা হয়েছিল, সে দিন ঐ অভিযোগকারী লোকটি আর আসে নি, তাই কাজটি স্থগিত আছে। কাজেই আমাদের এখনকার কাজ হল ঐ অভিযোগকারীকে খুঁজে বার করা, যাতে আমরা এক ঢিলে দুটি পাখী মারতে পারি। গ্রেভ্‌স তো খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, এবং ঘণ্টাদুই পরে সেই ইনফরমারকে যখন একজন ভারতীয় অফিসার খুঁজে বার করে আনলেন, আমরা ঐ বণিকের বাড়িতে গিয়ে বললাম, আমরা এখানে চোরাই আফিঙ-এর সন্ধানে এসেছি। আমরা ভিতরে গেলাম এবং যেতে যেতে মিস্টার গ্রেভ্‌স তাঁর হাতের একটি ধারালো লোহার ডাণ্ডা দিয়ে ঠুকে ঠুকে মেঝে পরীক্ষা করতে লাগলেন। তারপর উঠোনের উপরেও তেমনি ঠুকতে লাগলেন। তিনি সবসময়েই বাড়ির মালিককে এই কথা বোঝাচ্ছিলেন যে আমরা শুধু লুকিয়ে রাখা আফিঙের সন্ধান করছি। এর পর রান্নাঘরে ঢোকা হল। সেখানে ঐ ধারালো ডাণ্ডা দিয়ে মেঝেতে চাপ দিতেই অনায়াসে সেটি প্রায় পাঁচ ফুট পর্যন্ত ভিতরে ঢুকে গেল। গ্রেভ্‌স উল্লসিত হয়ে বলে উঠলেন, 'আ! এখানে যে আফিঙ ছাড়া অন্য আর একটা কিছুর গন্ধ পাচ্ছি!'—

ঠাণ্ডাটি তোলামাত্র সেখানথেকে গলিত শবদেহের দুর্গন্ধে ঘর ভরে উঠল। সবাই সেখান থেকে সরে গেল সেই দুর্গন্ধে।

সবাই তখন একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনার উত্তেজনায় চঞ্চল, আর এই ফাঁকে বস্ত্রবণিক হঠাৎ সরে পড়বার চেষ্টা করতেই একটি কনস্টেবল তাকে ধরে ফেলল। তারপর এক কাণ্ড। লোকটি নিচে সটান শুয়ে পড়ে উঠোনের উপর ক্রমাগত মাথা ঠুকতে লাগল। তাকে এ অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে দুজন লোকের দরকার হল। তারপর একটি কোদাল জোগাড় করে হতভাগ্য লোকটির মৃতদেহ বাইরে টেনে তোলা হল। আর এই মৃতব্যক্তির বিরুদ্ধেই কিনা মিথ্যা ওয়ারাণ্ট বার করা হয়েছিল।

দেহটির তখন পচন আরম্ভ হয়ে গেছে। দেখে চেনা যায় না। চেনবার একমাত্র চিহ্ন তার কাপড়চোপড়, হাতের আংটি ও রুপার কোমরচেন। দেহটিকে মাটিতে পোঁতার আগে এসব আর খুলে নেবার অবসর ঘটে নি হত্যাকারীর।

সে এর পর আর হত্যা অস্বীকার করতে পারল না। হাই কোর্টে তার বিচার হয়েছিল, হত্যার অপরাধ প্রমাণিত হয়েছিল, এবং এর জন্য যথাযোগ্য যে শাস্তি, অর্থাৎ চরম দণ্ড, তা সে পেয়েছিল।

(ক্রমশঃ)

মহর্ষি কণাদ প্রণীত

বৈশেষিক-দর্শনম

শিষ্যগণ নিকটে উপস্থিত হইলে মহর্ষি কণাদ তাঁহাদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"হে শিষ্যগণ এই সূত্রে তোমাদের নিকট ধর্মব্যাখ্যা করিব।" মহর্ষির এই বাক্যের নাম প্রতিজ্ঞাবাক্য। ধর্মের বিভিন্ন দিক, কার্য্যকারণ, দ্রব্য ও সত্তার পার্থক্য ও গুণত্বের এবং জাতির পার্থক্য, পৃথিবীর লক্ষণ, জল, বায়ু, দ্রব্য ও আকাশানুমান, পরমাণুতত্ত্ব, মনঃস্থৈর্য্য, মুক্তি, জন্মান্তর, ভ্রম ও প্রমাদ—মহর্ষি কণাদ ধর্মকথার মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের বাণী ব্যক্ত করিয়াছেন

স্বর্গত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত

মূল্য দুই টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

আঁধার মানিক

ধারাবাহিক উপন্যাস

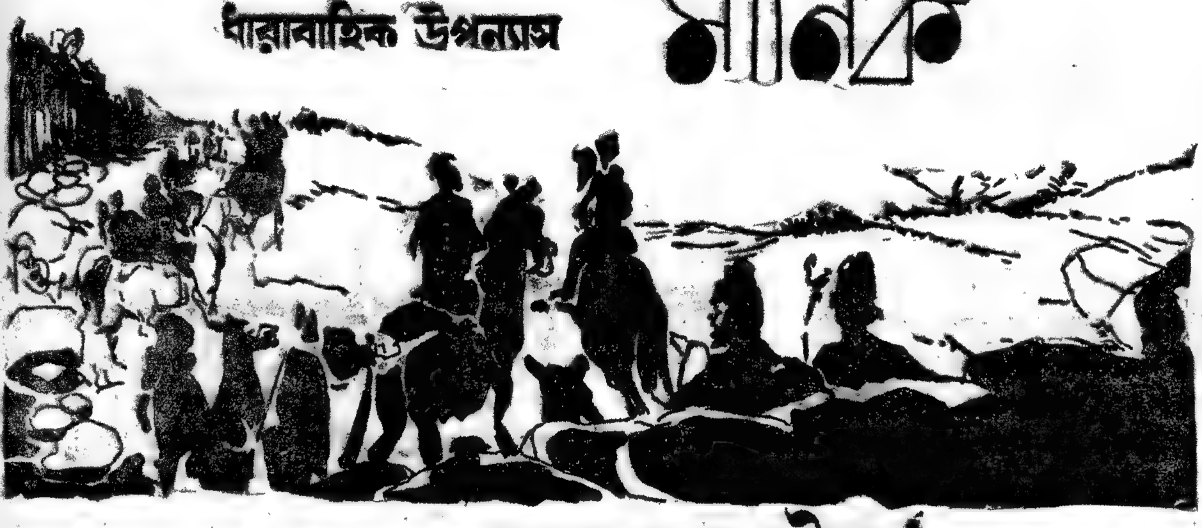

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ তেইশ ॥

'বরগির তরাসে কেহ বাহির না হএ।
চতুর্দিকে বরগির ডরে রসদ না মিলএ ॥'

ক্রোশচারেক পথ চলবার পর কাঁদন গ্রামের কাছে এসে দরগা-বটতলায় সুরকণ্ঠ ফুলেশ্বরীর কাকা মহীপতি আচার্যের সাক্ষাৎ পেলেন।

বৈশাখের প্রভাতী সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীদলের উৎসাহ কমে আসে। পথ ঘোড়ার খুরের ঘায়ে ছিন্নভিন্ন। অন্যসময়ে এ-পথে কুচিৎ অপরিচিত, অচেনা মানুষ পা দেয়। এ-পথ দিয়ে সন্ধ্যায় গরু গোহাল-পানে ধায়। শোনা যায়, একসময়ে আঁধারমাণিক গ্রামের আনন্দীরাম মুখোটির স্বর্গত বৃদ্ধ প্রপিতামহ এই কাঁদন গ্রামের কাছাকাছি বেগোর হাটি থেকে আদায়তশীল সেরে স্ব-গ্রামে ফিরছিলেন।

বড় ভক্ত মানুষ ছিলেন, 'কৃষ্ণ' নাম শুনলে তাঁর দু'চোখে ধারা বয়ে যেত, অথচ সংসারী-বিষয়ী পুরুষ, বলতেন, 'আমি কৃষ্ণসেবা করছি এই জ্ঞানে সংসার করি হে, কৃষ্ণ নাম নিলে সব পাপক্ষয় হয়, নতুবা বিষয় মানে আসলে বিষ।'

সন্ধ্যা সমাগত। দরগা-বটতলার অদূরের পুকুরপাড়ে জপআহ্নিক সেরে বৃদ্ধ কাচাকাপড় ঘাসে মেলতে যাবেন, হাতের কাপড় হাতেই রইল, এমন সময় সঙ্গী ভাইপো দেখে তিনি মোহাবিষ্টের মত সামনের দিকে ধেয়ে যান। 'খুড়োমশায়! কোথা যান!' এ-কথা বৃদ্ধের কানে ঢোকে নি।

কিছুদূর গিয়েই তিনি পথের পাশে পড়ে গেলেন। সিক্ত উপবীত, সোনার গঙ্গোপবীত ধুলোয় মাখামাখি হল, বৃদ্ধ অজ্ঞান।

জ্ঞান হতে ক্ষীণস্বরে বললেন, 'আমার চাদর দাও।' কুচিৎ তাঁর মুখে 'তুই' সম্বোধন বেরুত।

চাদরে পথের ধুলো তুলে বাঁধলেন, মাথায় ঠেকালেন। বললেন, 'কাঁদন গ্রামের এ গোচারণের পথ দিয়ে স্বয়ং কৃষ্ণ একা গেলেন, দূরে গরুর হাম্বা ডাক, তাঁর হাতে বাঁশি।'

মাথায় হাত ঠেকালেন। বললেন, 'তিনি দক্ষিণে গেলেন, সেথা হতে পশ্চিমে যাবেন, নীলাচলের গৌর দেহ রাখবেন।'

এই বটগাছের গায়ে লোহার শলা দিয়ে সন, মাস, তারিখ লিখে রাখলেন। বললেন, 'আমি আর ঘরে যাব না। এ-পথ দিয়ে তিনি ফিরবেন। এখন এ-পথ মন্দির।'

ঐখানে, ঐ বটগাছের কাছে ফুলন্ত হিজল গাছের নিচে নাম গাইতে দল এল। তখনো সংকীর্তনের এমন পেশাদারী দল মিলে না, সবে সংকীর্তন-মাহাত্ম্যের ঢেউ এসে রাঢ় গৌড়ের মাটি ভিজিয়েছে। তখনো মহাপ্রভু স্ব-দেহে আছেন, শুধু ভক্তজন নামগান

গায়, কীর্তন তখনো পেশা হয়ে ওঠে নি।

বৃদ্ধ মুখোটিমশায়ের দিব্যদর্শন হয়েছে, ওদিকে সমুদ্রতীরে গৌড়চন্দ্র অস্ত গেছেন, এ-কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। দলে দলে লোক এল। দিবারাত্রি নামগান। মুখোটিমশায় তিনদিন নামগানে মত্ত রইলেন, চারদিনের দিন প্রত্যুষে সহসা জপাসনেই বললেন, 'হাত ধর, চল যাই।'

দেহত্যাগ করলেন। এ-আশ্চর্য ঘটনার কথা এ-অঞ্চলে সবাই জানে। এ-পথ এখনো পুণ্যপথ ব'লে গণ্য। এ-পথে কোন রাখাল গরুকে বাড়ি মারে না। এখানে মাঠে-জঙ্গলে গরু হারিয়ে গেলেও গৃহস্থ ভাবে না, বাঘ খাবে ব'লে চিন্তা করে না। যাঁর জিনিস তিনি নাকি বাঁশি বাজিয়ে সন্ধ্যেবেলা ঘর-হারানো গরু, পথভোলা ছেলে, রাতকানা হাটুরেকে ঠিক গ্রামে পৌঁছে দিয়ে যান। যারা এ-কথা বিশ্বাস করে না, বলে, 'কলিতে এ-সব ঘটে না কি?' তাদের কথা আলাদা। নইলে এখনো নাকি প্রথম ঘুমভাঙা-জ্যোৎস্নারাতে এ-পথে অপার্থিব বাঁশি বাজে, অদেহী লীলা হয়, রাঢ়ের এ-অখ্যাত গ্রামের গাম্য বনপথ প্রতিরাতে দেবতার পদস্পর্শে ধন্য হয় এ যে-জানে, সে-জানে।

সুরকণ্ঠ এ-কথা শৈশব থেকে শুনে আসছেন। আনন্দীরামের বাড়িতে এখনো দোলে-মচ্ছবে নিমাই-পাটবাড়ি থেকে নেমন্তন্ন আসে। মুখোটিবাড়ির ঠাকুরঘরে সুরক্ষিত সেই পূর্ব-পুরুষের খড়ম, নামাবলী ও উপবীত মানুষ দেখতে আসে, এতে সুরকণ্ঠের মনে গোপন ঈর্ষা আছে। ভগবানের বিচার কে বুঝবে? বিষয়-সম্পত্তি, প্রভাব-প্রতিপত্তি সব দিয়েও হয় নি, আনন্দীরামের পূর্বপুরুষকে অতবড় ভক্ত ক'রে পাঠাবার কি দরকার ছিল?

অবশ্য এ-ঈর্ষার ভাব নিমেষে আসে, নিমেষে যায়। সুরকণ্ঠকে নিয়ে কৌতুক করে যেন। সুরকণ্ঠ নিজের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা রাখেন। সবাই তাঁকে আধা-সাধক মনে করে, পুণ্যাত্মা বলে ভক্তি করে। অথচ মাঝে মাঝে এমন সব ঈর্ষা, লোভ, দুর্বলতা তাঁকে পেয়ে বসে।

তাঁকে আড়ালে নরপতি মিশ্র বলে, 'আনন্দী তোমার জ্ঞেয়াতি। ঈশ্বরভাব-টাব ও পায় নি, ও পেয়েছে জমিজেরাত, হালবলদ, আর আসল ধনসম্পত্তি ভগবান তোমায় দিয়েছে।'

এ-কথাটি মনে করলেই সুরকণ্ঠ বুকের নিচে স্বস্তি পান। আশ্চর্য, আনন্দীরাম ত' তাঁর শত্রু নন, তবে তাঁর কথা সুরকণ্ঠ সময়ে-অসময়ে এতবার ভাবেন কেন?

এখন, বৈশাখের প্রভাতে কাঁদন গ্রামের সেই পথে চলতে চলতে

ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীর সচিত্র পাক্ষিক পত্রিকা

সোভিয়েত দেশ

গ্রাহক হোন ও পড়ুন। গ্রাহকরা বিনামূল্যে পাবেন বহুবর্ণে ছাপা সুদৃশ্য রঙিন ক্যালেণ্ডার ও ডায়েরী

• বিশেষ সুবিধাজনক চাঁদার হার •

১৫-১১-৬৪ হইতে ৩০-৪-৬৫

ইংরাজী সংস্করণ			অন্যান্য ভাষার সংস্করণ		
	হ্রাসকৃত	স্বাভাবিক		হ্রাসকৃত	স্বাভাবিক
বাৎসরিক	৫·০০	৬·০০	বাৎসরিক	৪·০০	৫·০০
দ্বি-বাৎসরিক	৯·০০	১১·০০	দ্বি-বাৎসরিক	৭·০০	৯·০০
ত্রৈ-বাৎসরিক	১২·০০	১৬·০০	ত্রৈ-বাৎসরিক	৯·০০	১৩·০০

আপনার এজেন্টের নিকট চাঁদা জমা দিন অথবা নিম্নঠিকানায় পাঠান:
সোভিয়েত দেশ ১/১ উড স্ট্রীট, কলিকাতা -১৬

প্রকাশিত হয়: ইংরাজী, বারটি ভারতীয় ভাষা ও নেপালী ভাষায়

সুরকণ্ঠ আশ্চর্য হলেন। ঘোড়ার খুরে খুরে সে নিশ্চিন্ত, নির্জন, শান্ত পথ ক্ষতবিক্ষত। দেখে বুকের নিচে গেরুয়াধারী, পাগল ও অন্যদের যেন ধ্বক করে ঘা লাগে। যেন এমন অশুভ দৃশ্য তারা জীবনে দেখে নি। বড় নদী যেন ছোট নদীকে খলখল বন্যায় নিমেষে গ্রাস করেছে, গৃহস্থের আঙিনায় লজ্জাকুলশীল ভেঙে যেন কে হাট বসিয়ে দিয়েছে, এমনই ভয়ঙ্কর এক সর্বনাশের ইঙ্গিত পায় তারা।

বর্ধমান নগরীর অঞ্চল-প্রান্তের গ্রাম, এ-সব গ্রামে চাষীদের সমৃদ্ধি কত। এ-গ্রাম থেকে বাউরী-বাগ্‌দী মেয়েরা সব্জী, দুধ, কাছিমের ডিম, ফল নিয়ত বর্ধমানে জোগান দেয়। যত বড় শহর, তত তার চাহিদা। মুর্শিদাবাদের পরে নাম করতে বর্ধমান। গোয়াড়ী, কাটোয়ার অমন বাড়বাড়ন্ত নেই। এ-সব গ্রামের চাষীরা পূর্ব দেশের বেদেনীদের কাছ থেকে ঝালি কেনে, তাদের মাচায় ঝালিভরা কড়ি থাকে। এ-সব অঞ্চলে চাষীঘরের মেয়েরা শহরের ধনী-গৃহিণীদের অনুকরণে খোঁপা বাঁধে ও তিনপেড়ে শাড়ি পরে। এমনসময়ে এ-সব গ্রামের গৃহস্থদের উঠোনে টুকটুকে লাল লঙ্কা চুড়ো করা থাকে। ঢেঁকিতে ঘন ঘন পাড় পড়ে, বারান্দায় ধানের 'নোট' ঝোলে। চাষীর ঘরে ধানের 'নোট' বড় আদরের অলঙ্কার। বাজুবন্ধে যেমন ঝুমকো, বিয়ের মুকুটে যেমন শোলার কদম, কয়েক গোছা ধানের শীষ দিয়ে সেই ছাঁদেই 'নোট' বাঁধা হয়। এটি চাষীঘরের লক্ষ্মীচিহ্ন। এই 'নোট' থেকে ধান নিয়ে গৃহস্থ সম্বৎসর বারব্রত করেন।

এখন দেখা যায় ঢেঁকিশালে শেয়াল, ঘরের চালে গো-শকুন, কামারশালে হাপর ফোঁসফোঁস করে না, তাঁতিপাড়ায় তাঁতের ওপর ইঁদুর খটর-খটর করে, বৈরাগীর একতারা মাটিতে গড়াগড়ি যায়। 'হা দেখ গো, বৈরেগীর একতারা হল ভিক্ষের সম্বল, বৈরেগী যখন একতারা ফেলে পালায় তখন দেশের অবস্থা বেপর্যয় মন্দ।'

পাগলা এ-কথা শুনে সভয়ে সুরকণ্ঠের দিকে চায়। সুরকণ্ঠ এখন উল্লাসে গম্ভীর, মদমত্ত, চাপা গলায় বলেন, 'দেখ পাগল, এইসব আমি সাদাচক্ষে দেখেছিলাম। দেশে এমন বিপর্যয় হবে।'

'দেখেছিলে যদি, তবে দেশের রাজাকে খবর দিলে না কেন গো ছেলে, রাজা লেঠেল-বর্শেল মোতায়েন রাখত?'

একটি বৃদ্ধা সকাতরে বলে। পথ চলতে চলতে দেশের অবস্থা দেখে সে বড় ভয় পায়। মৃদুস্বরে বলে, 'কে জানে আমাদের গাঁয়ে এতক্ষণে কি হতে লেগেছে।'

কেউ তার কথার জবাব দেয় না। সবাই সন্ত্রস্ত, ভীত। একা সুরকণ্ঠ মাথা উঁচু করে চলেন। বিড়বিড়িয়ে বলেন, 'মহাপাপে এমন হয়। মহাপাপে এমন হল।'

পাগল বিনবিনিয়ে কাঁদে। এখন পেছনে ফেলে-আসা জীর্ণ গ্রাম-কুটিরটির জন্য তার মন ব্যস্ত হয় কত। ঐ ঘর, ঐ আঙিনা, ঐ ছায়াঢাকা উঠোন ছাড়া সে আর কিছু জানে না। কোথায় তাকে নিয়ে যাচ্ছে ভগবান? পিসীমা গতিগঙ্গা না পেয়ে কোথায় গেল? সুরকণ্ঠ তাকে কোন্ নিয়তির দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন! কে পাগলকে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেবে?

'হা দেখ, সামনে বেস্তর বেপদ, সামনে যেঞে আমরা মরি কেন?'

একজন সংসারী এ-প্রশ্ন তোলে। তখন নানারকম কথা ওঠে।

'ঠাকুর বললে বলে ওঁর সাথে যাই।'

'কিন্তু সামনেও দেখি ঘোড়-সেপাই গেছে।' 'সামনে যেঞে তবে কাঁচা প্রাণ দিই কেন?'

কেন? না না, দেব না প্রাণ। তারচেয়ে পেছনে যাই চল, নানামুনি নানামত জাহির করে।

এমন সময়ে সহসা দরগা-বটতলা থেকে চড়াগলায় প্রশ্ন, 'কে যায়?'

শোনবার সঙ্গে সঙ্গে গরুর পালে বাঘ পড়ল। 'ও মা, আমরা আর নেই গো।' আর্ত চীৎকার করে যাত্রীরা যে-যার মত পালাল।

সুরকণ্ঠ পাগলকে বললেন, 'দেখ, ওদের বুদ্ধি দেখ। যেন পেছনে ফিরে দাঁড়ালেই ওরা বাঁচবে। কে বলবে ওদিকে বর্গী নেই?'

তিনি পাগলের হাত ধরে দরগা-বটতলার দিকে চললেন। বেশ কিছু জনসমাগম। গরুরগাড়ি, ঘোড়া ইত্যাদি দেখে অনুমানে বুঝলেন সম্পন্ন গৃহস্থরা বোধ হয় পালাচ্ছে।

কাছে এসে দেখেন পাল্কীর বাইরে বসে এক প্রৌঢ়, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, খর্বকায়।

'আমি ব্রাহ্মণ', এ-কথা বলে পৈতে দেখিয়ে তিনি অভয় প্রার্থনা করতে চাইছিলেন। মুখের কথা মুখে রইল, বললেন, 'আপনি।'

প্রৌঢ় নির্বাক। সুরকণ্ঠ আবার বললেন, 'আমি সুরকণ্ঠ। আপনাকে চিনেছি। আপনি মহীপতি আচার্য। ফুলির কাকা।'

(ক্রমশঃ)

বিশ্বসাহিত্যের সম্রাট—মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে শারদ-জ্যোৎস্না—চরিত্র-সৃষ্টির ইন্দ্রধনু—অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধীশ্বর

চার্লস ডিকেন্সের

ডিকেন্স গ্রন্থাবলী

অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাশিল্পী—সর্বযুগের অনন্ত নির্ঝর—বিশ্বসাহিত্যগৌরব ঔপন্যাসিকের পরিচয় প্রদান অসম্ভব।

২য় ভাগ—নিকোলাস নিকলবি : বারনাবি রুজ, চরিত্র-চিত্র। সাহিত্য জগতের এই পুণ্যপ্রভা মাত্র ১।০ টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিঃ

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

● মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন খড়্গপুরে বি সি রায় হাসপাতালের দ্বারোদ্ঘাটন করছেন

রাজধানী :

দশ বছর পর আবার কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চলে বিধিবদ্ধ রেশনিং চালু হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন অনেকদিন থেকেই বৃহত্তর কলকাতায় রেশনিং-এর কথা বললেও, এ বিষয়ে অনেকের মনেই সন্দেহ ছিল। শোনা যাচ্ছিল, মন্ত্রীদের মধ্যে কয়েকজন রেশনিং চাইছেন না—দু-একজন তো প্রায় প্রকাশ্যেই এর বিরোধিতা করছিলেন। তা ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় সাহায্য দেবেন কি না, সে সম্পর্কেও যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী বরাবর বলে এসেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য না পেলেও তিনি কলকাতা অঞ্চলে রেশনিং প্রবর্তন করবেন। তাঁর মতে, কলকাতা অঞ্চলের সরবরাহ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে সমগ্র রাজ্যের সমস্যা সহজে সমাধান করা যাবে।

বর্তমানে কেবল রাজ্য মন্ত্রিসভাই মুখ্যমন্ত্রীর পরিকল্পনা পুরোপুরি সমর্থন করেন নি, কেন্দ্রীয় সরকারও বৃহত্তর কলকাতার বিধিবদ্ধ রেশনিং-এর জন্য রাজ্য সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে কেন শেষ পর্যন্ত রেশনিং-এর পথ বেছে নিতে হলো মুখ্যমন্ত্রী এক বেতার ভাষণে বিশ্লেষণ করে বলেছেন, গত দশ বছরে যে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় খাদ্যদ্রব্যে অবাধ ব্যবসা করার সুযোগ পেয়েছে, তাদের অনেকেই সুযোগের চরম অপব্যবহার করেছে। অতিরিক্ত মুনাফার লোভে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে এরা জনসাধারণকে বঞ্চিত করেছে। এই ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের আচরণ রাজ্য সরকারকে রেশনিং ব্যবস্থায় ফিরে যেতে বাধ্য করেছে। মুখ্যমন্ত্রী রেশনিং-এর সাফল্যের জন্য জনসহযোগিতার আবেদনও জানিয়েছেন। জনসাধারণ সব সময়ই সহযোগিতা করতে উন্মুখ। তবে ব্যবসায়ীশ্রেণী যেরূপ বেপরোয়া হয়ে পড়েছে, তাদের অতি মুনাফার ঝোঁক যেরূপ দুর্ধর্ষ হয়ে উঠেছে; তাতে প্রশাসনিক কার্যধারা বজ্রের মতো কঠোর না হ'লে জনসহযোগিতা প্রহসনে পরিণত হয়ে পড়বে সন্দেহ নেই।

রেশনিং-ব্যবস্থাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সমগ্র কলকাতা অঞ্চলকে কর্ডন করা হচ্ছে। পূর্বে এইরূপ কর্ডনের দায়িত্ব ছিল খাদ্য-দপ্তরের কর্মীদের ওপর। এবার এই দায়িত্ব পুলিশের ওপর দেয়া হবে। এই কাজের জন্য প্রায় দেড় হাজার পুলিশ প্রয়োজন হবে। শোনা যাচ্ছে, রাজ্যের অতিরিক্ত ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ শ্রীশচীন্দ্রমোহন ঘোষের ওপর এই পুলিশবাহিনীর কাজ পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হবে।

* * *

পশ্চিমবঙ্গের প্রায় পাঁচ হাজার বেসরকারী কলেজের অধ্যাপকদের সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সমিতি ঘোষণা করেছেন, অবিলম্বে রাজ্য সরকার কলেজ অধ্যাপকদের বেতন বৃদ্ধির দাবি মেনে না নিলে ১৯৬৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলির সঙ্গে তাঁরা অসহযোগিতা করবেন। অর্থাৎ কোন অধ্যাপক পরীক্ষার হলে 'ইনভিজিলেশন' দেবেন না, খাতা দেখবেন না, স্ক্রুটিনি— ট্যাবুলেশন— কোন কিছুই করবেন না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে অবস্থাটা খুবই অস্বস্তিকর। অধ্যাপকরা সহযোগিতা না করলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষে পরীক্ষা গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। তাই সেনেটের প্রবীণ সদস্য শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের একটি প্রস্তাব আলোচনার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ বিধুভূষণ মালিক সেনেটের একটি বিশেষ অধিবেশন ডেকেছিলেন। রমাপ্রসাদবাবুর প্রস্তাবে অধ্যাপকদের বেতন বৃদ্ধির দাবি সমর্থন করে অবিলম্বে রাজ্য সরকারকে এ বিষয় ব্যবস্থা

করার জন্য অনুরোধ করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে এই প্রস্তাবে ছাত্রদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে অধ্যাপকদের কাছেও পরীক্ষা বয়কটের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

কিন্তু প্রশ্ন হল: অধ্যাপকসমাজ কি সেনেটের প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে পরীক্ষা বর্জনের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করবেন? অধ্যাপক সমিতির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তাঁরা দীর্ঘকাল ধরে এই আন্দোলন চালিয়ে আসছেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন পার্লামেন্টের নিকট প্রদত্ত তাঁদের তৃতীয় রিপোর্টে (১৯৬০-৬১) কলেজ অধ্যাপকদের জন্য ৩৫০-৯৫০ টাকা মাসিক বেতন হারের সুপারিশ করেন। এই সুপারিশকে কার্যকরী করার জন্য তাঁরা সভা, সমাবেশ, মিছিল, প্রতীক কর্মবিরতি, এই সব কার্যক্রম গ্রহণ করে এসেছেন গত কয়েক বৎসর ধরে। কিন্তু রাজ্য সরকার তাঁদের কথায় কর্ণপাত করেন নি। পরলোকগত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ও শিক্ষামন্ত্রী শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহ অধ্যাপকদের দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করলেও অর্থের অভাবের অজুহাত দেখিয়ে তাঁদের অক্ষমতা জানিয়ে আসছেন। কিন্তু রাজ্যের ৬০০ কোটি টাকার পরিকল্পনায় কলেজী শিক্ষার জন্য দু-তিন কোটি টাকার অতিরিক্ত সংস্থান করা কি এতই কঠিন?

অধ্যাপক সমিতি বারে বারে বলেছেন, তাঁদের এই আন্দোলন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে নয়, ছাত্র বা অভিভাবকদের বিরুদ্ধে তো নয়ই। সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করার অন্য কোন উপায় না দেখে তাঁরা এই পথ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। অভুক্ত শিক্ষকদের পক্ষে ছাত্রদের উপযুক্ত শিক্ষাদান করা সম্ভব নয়। তাই শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বেতন বৃদ্ধির এই দাবি। গত অক্টোবর মাসের গোড়ায় অধ্যাপকদের সম্মেলনে পরীক্ষা-বর্জনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এতদিনেও যদি রাজ্য সরকার এ সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন, তবে পরীক্ষায় কোনো বিপর্যয় দেখা দিলে তার দায়িত্ব কি রাজ্য সরকারের নয়?

রাজ্য শিক্ষাদপ্তরের একজন মুখপাত্র বলেছেন, অধ্যাপকদের বেতন বৃদ্ধির দাবি তাঁদের পক্ষে বর্তমানে মানা সম্ভব নয়। তবে চতুর্থ পরিকল্পনায় এ সম্পর্কে একটা ব্যবস্থা হবে বলে তিনি আশা করেন। অধ্যাপকদের পরীক্ষাবর্জনের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে তিনি চ্যালেঞ্জের সুরে বলেছেন, সরকার এ বিষয়ে নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকবেন না। প্রয়োজন হলে সরকারের উচ্চ শিক্ষিত কর্মচারীদের দিয়ে খাতা দেখানো হবে। ছাত্রদের ক্ষতি তাঁরা কিছুতেই সহ্য করবেন না।

রাইটার্স বিল্ডিংস-এর কর্মচারী বা পুলিশ অফিসারদের দিয়ে খাতা দেখিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ, বি-এস-সি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হচ্ছে, এ কথা কল্পনা করাও যায় না। এখনও সময় আছে, রাজ্য সরকার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও অধ্যাপক সমিতির মধ্যে আলোচনার দ্বারা সমস্যার একটা আশু মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন।

*   *   *

কলকাতা কর্পোরেশন চরম অর্থ-সঙ্কটে পড়েছে। কোটি কোটি টাকা অনাদায়ী পড়ে আছে, অথচ জরুরী খাতে খরচ করার মত অর্থ নেই। সর্বত্র 'খরচ কাটো', 'খরচ কাটো' রব উঠেছে। এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছ'মাসের আদায়ের যে হিসাব পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যায় এই সময়ে মোট ৩ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা আদায় হওয়া উচিত ছিল—কিন্তু আদায় হয়েছে মাত্র ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। কর্পোরেশনের এ্যাসেসমেন্ট ও কলেকশন বিভাগের অক্ষমতাই নিশ্চয় এই অনাদায়ের জন্য দায়ী। এক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছেই নাকি পাওনা আছে ১৬ লক্ষ টাকা।

জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা দক্ষতার সঙ্গে কাজ পরিচালনা করতে পারেন না বলে, মেয়র ও কাউন্সিলার অল্ডারম্যানদের প্রভাবমুক্ত প্রচুর ক্ষমতাসম্পন্ন একজন কমিশনার রাখা হয়েছে। সরকার নিয়ন্ত্রিত কমিশনারের পক্ষেও যখন কর্পোরেশনের কাজ ঠিকমত পরিচালনা করা যাচ্ছে না, তখন এই ব্যবস্থার জন্য দায়ী কে?

*   *   *

কলকাতার লোকের মুখে এখন সবচেয়ে বড় খবর, শীত পড়েছে। কয়েকদিন হল বেশ শীত পড়েছে। উত্তর ও পশ্চিম ভারতের মত শীত-প্রভাব সুরু না হলেও কলকাতাবাসী হাড়-কাঁপানো শীত অনুভব করছে।

শীতের প্রকোপে দরিদ্র মানুষ খুবই অসুবিধায় পড়েছে। চড়া দামে খাদ্যদ্রব্য কিনতেই প্রাণান্ত, এরপর শীতের জামা-কাপড় কেনার পয়সা কোথায়? কোথাও কোথাও আগুন জেলে গরম হবার চেষ্টা দেখা যাচ্ছে বটে, তবে আগুন জ্বালাবার জিনিসও কি সর্বত্র পাওয়া যায়? ইতিমধ্যেই শীতে একজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। গত সোমবার কলাবাগান বস্তীর ফুটপাথে ৪০ বৎসর বয়স্ক এক ব্যক্তি শীতে মারা গেছে।

হুগলী:

হরিপাল থানার কয়েক শ' একর জমিতে জল দাঁড়িয়েছে প্রায় তিন ফুট। এ জল অতি বৃষ্টি, বাঁধের ভাঙন অথবা নিষ্কাশনের পথহারা আবদ্ধ জল নয়। এ জল দামোদর উপত্যকা কর্তৃপক্ষের অযাচিত দান। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস যাঁদের আকুল আগ্রহে আবেদন-নিবেদন করে উপযুক্ত সময়ে সেচের জল পাওয়া যায় না, তাঁরাই প্রচুর

● মহানগরীর হাড় কাঁপানো শীতের রাতে রাজপথের ফুটপাতের দৃশ্য

পরিমাণে জল ছেড়েছেন সেচের খালে। জল ছেড়ে দেবার আগে মাঠে জল প্রবেশের পাইপগুলো পরীক্ষা করে দেখাও কর্তারা প্রয়োজন বোধ করেন নি। ফলে পাইপের উন্মুক্ত মুখ বেয়ে জল প্রবেশ করে জোতরাধা ও অনন্তপুরের মাঠ ভাসিয়ে দিয়েছে। মাঠ ভর্তি এখন পাকা ধান। দু'দিন পরই সুরু হবে ধান-কাটা। কয়েকদিনের মধ্যেই মাঠের জল না নামলে মাঠের সব ধানই নষ্ট হয়ে যাবে। পাকা ধানের ভারে ধানগাছের মাথা এমনিতেই নুয়ে আছে। মাঠের জল সরতে আরম্ভ করলেই স্রোতের টানে অধিকাংশ ধান হবে ধরাশায়ী। খড়ের ক্ষতি তাতে অবশ্যম্ভাবী। ধানও কিছুটা পরিমাণ নষ্ট হতে বাধ্য।

চাষীর এই সর্বনাশ, তার সারা বছরের শ্রমের উৎপন্ন ফসলের ক্ষতি-পূরণ করবে কে? বহু যত্নে ক'টা মাস ধরে এ ধানকে সে লালন করেছে—পালন করেছে নিজের সন্তানের মতই। মাঠের ফসলই ছিল তার একমাত্র ভরসা। ধান কেটে সে ছাড়িয়ে আনবে হালের বন্ধকী গরুটি। ঋণ শোধ করবে মহাজনের। বউকে নতুন গয়না গড়িয়ে দেবার স্বপ্নও হয়তো দেখেছে তরুণ চাষী। যাদের অবহেলায় চাষীর আশার স্বপ্ন ভেঙে যাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে ধিক্কার ধ্বনি তুললেই হবে না। সরকারের উচিত হবে, এদের এমন শাস্তির ব্যবস্থা করা—যাতে এ-ধরণের গাফিলতিজনিত সর্বনাশের সম্ভাবনা ভবিষ্যতে আর না দেখা দেয়।

• • •

পশ্চিম বাংলার কর্ষণযোগ্য জমি নাকি আর নেই—সব জমিতেই লাঙল পড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী থেকে সুরু করে সরকারপক্ষের সকলের মুখেই একথা উচ্চারিত হচ্ছে বারবার। জমির যেখানে এত অভাব, সেখানে সরকারের কর্মচারীদের ঔদাসীন্য ও খাম-খেয়ালীর জন্য কি পরিমাণ আবাদী-জমি নিষ্ফলা জমিতে পরিবর্তিত হয়, তার উল্লেখ আমরা আগেও করেছি।

হুগলী জেলার নির্বাহী বাস্তুকার নির্বিঘ্নে তাঁর কাজটি সহজে নির্বাহের জন্য আবাদীজমির ওপর দিয়েই নতুন পথ নির্মাণের ব্যবস্থা করছেন। ইলিপুর গ্রামের বাসিন্দারা সমবেত-ভাবে গ্রামের ভেতরের রাস্তাটিকে ভাল করে নির্মাণের দাবি পেশ করেছেন লিখিতভাবে। স্থানীয় পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকেও গ্রামের রাস্তাটিকেই চালু রাখার দাবি জানানো হয়েছে। কোন সুফল তাতে হয় নি। নির্বাহী বাস্তুকার এখনও নির্বিকার। তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অনড়। গ্রামের মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দাবি তাঁর মন গলাতে পারে নি। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং এ-ঘটনার অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করলে গ্রামের মানুষের কল্যাণের জন্য নয়া পথ নির্মাণ করতে গিয়ে অকল্যাণ ডেকে আনার সম্ভাবনা থাকবে না বলেই আমরা আশা করি।

বর্ধমান ঃ

হঠাৎ দেখা যাচ্ছে, বর্ধমানে সরকারী কর্মচারীরা খুব তৎপর হয়ে উঠেছেন। ভারতরক্ষা আইনে বেশ কয়েকজন বড় বড় চালকল মালিককে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু কয়েকদিন পরেই শহরবাসী চমৎকৃত হয়ে দেখেন—এদের মোটা জামিনে ছেড়ে দেয়া হল।

চালকল মালিকদের ধরা হল, ছাড়াও হল, কিন্তু বর্ধমানের চাল গেল কোথায়? অঘ্রাণে নতুন চাল উঠেছে। অথচ শহরে কোথাও চাল নেই। রেশনের দোকানে চাল নেই, খোলা-বাজারে তো নেই-ই। গোপনে অবশ্য পাওয়া যায়, কিন্তু তার দাম প্রতি মণ পাইকারী ৩২ টাকা, ও খুচরা ৩৫ টাকা। সরকার-নির্দিষ্ট দর হল, খুচরা প্রতি মণ ২৭ টাকা ৯৪ পয়সা, অথচ তা প্রায় প্রকাশ্যেই পুলিশের নাকের ডগায় ৩৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

চাষীরা এখন ধান বিক্রি করছে ১৪ টাকা মণ দরে। সব খরচা ধরেও ২৫ টাকার বেশি চালের দাম হয় না, অথচ তা ৩৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বর্ধমান জেলাতেই আজ এই অবস্থা।

বর্ধমানের চাল কোথায় গেল, আর দামই বা এভাবে বাড়ল কেন? এ বিষয়ে সরকার কি বলেন?

•   •   •

বর্ধমানের একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। শোনা যাচ্ছে, মাসখানেক পূর্বে তিনি নাকি কোন এক কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটিকে সরকার নির্দিষ্ট দরের অতিরিক্ত দামে সরিষার তেল বিক্রির জন্য মৌখিক নির্দেশ দেন।

সরকার নির্দিষ্ট দামের অতিরিক্ত দরে বাজারে সরিষার তেল বিক্রি হচ্ছে, একথা সবাই জানে। যারা বেশি দামে বিক্রি করছে, তাদের ধরাই উপরোক্ত কর্তাব্যক্তি ও তাঁর কর্মচারীদের কাজ। অথচ তার পরিবর্তে তিনি নিজে দাম বাড়াবার নির্দেশ দিয়েছেন। লিখিত আকারে কোন নির্দেশ না দিলেও, মৌখিকভাবে তিনি এই নির্দেশ দিয়েছেন, প্রকাশ্যে আজ এই অভিযোগ উঠেছে। অবিলম্বে এ সম্পর্কে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

অনেকেই প্রশ্ন করছেন, বেশি দামে জিনিস বিক্রির জন্য ব্যবসায়ীদের ভারতরক্ষা আইনে ধরা যাচ্ছে। তা হলে যদি দাম বৃদ্ধিতে সরকারী কর্মচারীটি সহায়তা করেন, তবে তাঁকেও কি ভারতরক্ষা আইনে ধরা হবে?

•   •   •

বর্ধমান জেলায় শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্যাকেজ স্কীম কি ভাবে সরকারী কর্মচারীদের গাফিলতিতে ব্যর্থ হচ্ছে, তার একটি ঘটনা জানা গেছে।

আলুর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকারী 'পট্যাটো মালটিপ্লিকেশন ব্লকের' উদ্যোগে চাষীদের ভাল বীজ ও সার দেবার কথা। এই জন্য জামালপুর এলাকায় গ্রামসেবকরা চাষীদের কাছ থেকে বণ্ড স্বাক্ষর করিয়ে নিয়েছেন। গত ১লা ডিসেম্বর জৌগ্রামে আলুর বীজ দেয়া হবে, এবং ৮ই ডিসেম্বর সার দেয়া হবে বলে চাষীদের জানানো হয়। চাষীরা যথাসময়ে গরুর গাড়ি নিয়ে জৌগ্রামে এসে হাজির। কিন্তু আলু অফিসারদের কারও পাত্তা খুঁজে পাওয়া যায় নি, অন্য কোন সরকারী কর্মচারীও ছিলেন না। চাষীরা হতাশ হয়ে, গরুর গাড়ির ভাড়া গুণে দিয়ে বাড়ি ফিরে যায়।

এই হল আমাদের সরকারের নিবিড় শস্যোৎপাদন প্রচেষ্টা।

মেদিনীপুর:

গত ১২ই ডিসেম্বর শনিবার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন খড়্গপুরে 'ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব্ টেকনোলজির' ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় হাসপাতালের উদ্বোধন করেন। শ্রীসেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক সংস্থার সভাপতি।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নামে আই-আই-টি'র হাসপাতালটির নামকরণ সার্থক হয়েছে। ডাঃ রায় কেবল বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসক বা পশ্চিমবঙ্গের সংগঠকই নন, আই-আই-টি প্রতিষ্ঠানটিকে বর্তমান বিরাট আকারে দাঁড় করানোর মূলেও তাঁর অবদান অনেকখানি।

৬৮টি শয্যাবিশিষ্ট এই হাসপাতাল ভবনটি আধুনিক স্থপতিবিদ্যার এক সুন্দর নিদর্শন। চিকিৎসার আয়োজনের দিক থেকেও হাসপাতালটি অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনায় সমৃদ্ধ। বর্তমানে ইনস্টিটিউটের ছাত্র এবং অধ্যাপক ও তাঁদের পরিবার-বর্গের চিকিৎসার জন্য হলেও, ভবিষ্যতে ইন্‌স্টিটিউটের সঙ্গে যুক্ত ১০ হাজার ব্যক্তির চিকিৎসার ব্যবস্থা এখানে করা হবে।

নদীয়া:

নবদ্বীপ বাংলা দেশের অন্যতম প্রধান তীর্থস্থান। বহিরাগত ব্যক্তিরা এখানে এসে পোড়ামাতলা ও মন্দিরে আসেন, কিন্তু এই অঞ্চল নানাপ্রকার দোকানে পুরোপুরি একটি বাজারে পরিণত হয়েছে।

তীর্থযাত্রীদের সুবিধা এবং মন্দির অঞ্চলের সৌন্দর্য রক্ষার জন্য স্থানীয় পৌরসভা অনেকদিন হল পোড়া-মাতলায় রাস্তার দোকানঘরগুলি তোলার চেষ্টা করে আসছেন। এজন্য বহু হাজার টাকা খরচ করে পৌর-সভাকে হাইকোর্টে মামলা করতে হয়েছে। হাইকোর্ট এইসব দোকান অবিলম্বে তুলে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন।

অথচ আশ্চর্যের বিষয় হাইকোর্টের রায় সত্ত্বেও পৌরসভা দোকানগুলি তুলছেন না। শহরবাসী বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবছে, দোকান যদি নাই তোলা হবে, তবে করদাতাদের এত অর্থ ব্যয় করে মামলা করা হল কেন? শোনা যাচ্ছে এইসব দোকান না তোলার পেছনে অদৃশ্য হস্তের প্রভাব আছে। কোন কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি দোকানগুলির মালিকদের কাছ থেকে এই বাবদ বেশ কিছু অর্থ পাচ্ছেন, এসব কথা প্রকাশ্যেই শোনা যায়।

বীরভূম:

শেষ পর্যন্ত ক[illegible] সদস্যরা এক মত হয়ে বীরভূ[illegible] পরি-ষদের সভাপতি ও সহকারী সভাপতি

নির্বাচন সম্পন্ন করতে পেরেছেন। গত ১৪ই ডিসেম্বর জেলা পরিষদের সভায় শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅমর সরকার যথাক্রমে সভাপতি ও সহকারী সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন।

জেলা পরিষদ নির্বাচন নিয়ে জেলার কংগ্রেসীদের দুই দলের মধ্যে কলহ চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত রাজ্য কংগ্রেস নেতৃত্বকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। জেলা পরিষদের কংগ্রেসী সদস্যরা সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত করেছিলেন, শ্রীঅমর সরকারকে সভাপতি ও শ্রীদুর্গাপদ দাসকে সহঃ সভাপতি করা হোক কিন্তু রাজ্য কংগ্রেস নেতৃত্ব এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে বৈদ্যনাথবাবুকে সভাপতি ও অমরবাবুকে সহঃ সভাপতি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

উর্ধ্বতন কংগ্রেস নেতৃত্বের নির্দেশে দুই উপদলের দুই প্রধানকে সভাপতি ও সহঃ সভাপতি করা হল ঠিকই, কিন্তু দুজনে কতদিন এক সঙ্গে কাজ করতে পারবেন এ সম্পর্কে জেলাবাসীর মনে বেশ সন্দেহ আছে। জেলার নির্বাচন ও কংগ্রেসের সংগঠন নিয়ে দুই দলের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ চলছে।

শ্রীঅমর সরকারের নির্বাচন নিয়ে সাধারণ মানুষ ছাড়াও অনেক কংগ্রেস-কর্মীও প্রশ্ন তুলেছেন। শ্রীসরকার গত সাধারণ নির্বাচনে বোলপুর বিধানসভা কেন্দ্রে পরাজিত হন এবং এ বৎসর বীরভূম থেকে বিধান পরিষদের স্থানীয় কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আবার পরাজিত হন। যিনি জনসাধারণের ভোটে প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন, তাঁকে জেলা পরিষদে এনে সহঃ সভাপতি পদে নির্বাচিত করে বিপুল অর্থ ব্যয়ের দায়িত্ব দেওয়া কি গণতন্ত্রসম্মত? পঞ্চায়েতীরাজ শেষ পর্যন্ত গণতন্ত্র প্রসারের পরিবর্তে গণতন্ত্র সঙ্কোচনের ব্যাপার না হয়ে দাঁড়ায়।

*   *   *

বাংলা-বিহার সীমান্তে পাহাড়পুর গ্রামে দুর্বৃত্তদের দ্বারা ধান কাটার একটি ঘটনা নিয়ে রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এই ব্যাপারে খয়রাশোল থানার জনৈক কর্মচারীর বিরুদ্ধেও গুরুতর অভিযোগ উঠেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, পাহাড়পুর গ্রামের শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্তীর জমির পাকা ধান পারগুণ্ডি গ্রামের জনৈক প্রভাবশালী ব্যক্তি ভাড়াটে লাঠিয়ালদের দিয়ে কাটিয়ে নেয়। যখন ভাড়াটে গুণ্ডারা ধান নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল, তখন নিকটবর্তী বিহার পুলিশ ক্যাম্পের দারোগা গুণ্ডাদের বাধা দেয়। তখন গুণ্ডারা দারোগা ও অন্যান্য পুলিশকে লাঠি, টাঙি ও বল্লম দিয়ে আক্রমণ করে, এবং ক্যাম্পের জিনিসপত্র নিয়ে বড়কোলা গ্রামের দিকে পালিয়ে যায়। এই সময় পুলিশের গুলীতে গুণ্ডাদলের একজন মারা যায়।

বিস্ময়ের বিষয়, এই ঘটনা জানা সত্ত্বেও খয়রাশোল থানার উক্ত কর্মচারী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন নি। তিনি নাকি তখন বড়ড়া গ্রামে তাঁর এক বিশেষ বন্ধুর বাড়িতে বসে বিহার পুলিশের বিরুদ্ধে খুনের মামলা সাজাবার চেষ্টা করছিলেন। আর যে গুণ্ডারা অন্যের ধানক্ষেতে ঢুকে ধান কেটে পালিয়ে গেল, তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই তিনি করছেন না।

এই অঞ্চলে একদল প্রভাবশালী ব্যক্তির আস্কারায় সমাজবিরোধী দুর্বৃত্ত দল প্রবল হয়ে উঠেছে। পুলিশের সঙ্গে এদের ভালরকম যোগসাজস আছে বলে স্থানীয় অধিবাসীদের ধারণা।

● মিছিল নগরী কলকাতা গত ১৮ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। বাঁধভাঙা স্রোতের মত মিছিলের পর মিছিল সমগ্র মহানগরীকে যেন প্লাবিত করে ফেলে। মিছিলের যাত্রী শুধু সরকারী কর্মচারী কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের। সারা রাজপথে ধ্বনি ওঠে 'মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি কর', 'মূল্যবৃদ্ধির পূর্ণ ক্ষতিপূরণ চাই', 'সরকারী কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার দিতে হবে'।

গ্রন্থমেলা

জয়ন্তী সেন

চতুষ্কোণ ঃ সম্পাদক : শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী। ১২৩, এস পি মুখার্জী রোড, কলকাতা-২৬। মূল্য : এক টাকা।

'চতুষ্কোণ' ত্রৈমাসিক থেকে মাসিকে রূপান্তরিত হলেও এর কলেবর পূর্বের মতোই রয়েছে। প্রবন্ধগুলি শুধু সুলিখিতই নয়, এদের প্রকৃতিও আকর্ষণীয়। যেমন, গৌতম সান্যালের 'এবার ফিরাও মোরে' সাহিত্য-শিল্প সংক্রান্ত প্রবন্ধ। শ্রীসান্যালের বক্তব্যের সঙ্গে অনেকে একমত না হলেও তাঁর যুক্তিগুলি বাস্তবধর্মী। সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পশ্চিমবঙ্গে নগরীকরণ প্রসঙ্গে', মিহির ভট্টাচার্যের 'ওড়িয়া সাহিত্যের আদিপর্ব', রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের 'পাশ্চাত্যের কয়েকটি অধুনা চলচ্চিত্র ও মানুষ' তথ্যপূর্ণ মননশীল রচনা। ৺অদ্বৈত মল্লবর্মণের ধারাবাহিক উপন্যাসটির জীবনানুভূতি অতলস্পর্শী। বৃজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসটি সুখপাঠ্য। মৃণাল চৌধুরীর 'শামুক' গল্পে ফুটে উঠেছে নবজীবনের আশ্বাস। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আবুল কাশেম রহিমউদ্দীন, সুশীলকুমার গুপ্ত, সুধাংশু দে, বীথিকা ঘোষ প্রমুখের কবিতা যেমন সুবোধ্য তেমনি বলিষ্ঠ।

রূপান্তর : সম্পাদনা : বিকাশ ভট্টাচার্য। মেডিকেল কলেজ ছাত্র-সংসদের পক্ষে (৮৮, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-১২) প্রকাশিত।

'রূপান্তর' প্রকাশের দায়িত্ব তাঁদেরই হাতে, যাঁরা মুমূর্ষু জীবনে আনবেন রূপান্তর। মনে পড়ে সেই ঘটনা, যখন নির্জন দ্বীপে যুদ্ধক্ষত লোকগুলি ওষুধপত্র পেয়েও দিনের পর দিন মনমরা হয়ে যাচ্ছিল, তখন তাদের নবজীবন দান করেছিল হঠাৎ এসে পড়া একজাহাজ গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও প্রবন্ধ। সুতরাং সাহিত্যের আবেদনের সঙ্গে কোনো বস্তুরই তুলনা হয় না। 'রূপান্তর'-এও সেই আবেদনই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে উঠেছে। বনফুলের কবিতাটি উপদেশমূলক হলেও সুন্দর। সমীর বসু, দেবদাস পাল, প্রবাল ঘোষ, আলোককুমার দেবদাস, সঞ্জিত গঙ্গোপাধ্যায়, অমলেশ গৌতম, মুকুল ছোদা মণ্ডল, সুন্দরম, ডাঃ সরোজ দত্ত, কল্যাণ দাশগুপ্তের কবিতা আমাদের ভালো লেগেছে। এনিটা মিটার ও এষা বোসের অনুবাদ-গল্প বেশ প্রাঞ্জল। ডঃ অমিতাভ মিত্র, সুচারুরঞ্জন হালদার, দিলীপ দত্তের প্রবন্ধ অনেক নতুন উপাদানে সমৃদ্ধ। 'রূপান্তর'-এর ইংরেজি বিভাগেও রয়েছে কবিতা ও কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ। ডঃ এরিন মেহতার প্রবন্ধটি সংকলন হিসেবে দেওয়ায় অনেকেই উপকৃত হবেন। 'রূপান্তর'-এর প্রচ্ছদ-চিত্রণে বিকাশ ভট্টাচার্যের নাম অবশ্যই উল্লেখ্য।

মায়ামঞ্চ ঃ সম্পাদিকা : গীতা মুখোপাধ্যায়। ২১-বি, গঙ্গাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলকাতা-২৫। মূল্য : এক টাকা।

নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে 'মায়ামঞ্চ' দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করেছে। ম্যাজিকবিদ্যা সম্বন্ধে যাঁরা কৌতূহলী, তাঁরা এ-পত্রিকা পড়ে ম্যাজিকের প্রকৃতি, মূল রহস্য ও পদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক কিছুই জ্ঞাত হবেন। যাদুবিদ্যার প্রয়োগপদ্ধতি স্বভাবতই মনকে আকৃষ্ট করে, 'মায়ামঞ্চে'র রচনাগুলিতে সেই গুণের সঙ্গে সংমিশ্রিত রয়েছে লৈখিক নৈপুণ্য। বিমলাকান্ত রায়চৌধুরীর 'ম্যাজিকে বিজ্ঞান ও শিল্প', অজিতকৃষ্ণ বসুর 'হুডিনি' মনোজ্ঞ রচনা। প্রচ্ছদপটেও অভিনবত্ব লক্ষণীয়।

অরণি ঃ সম্পাদক : নীরেন রায়। পাবলিসিটি রিপাবলিক, ৪।২এ নকর কুণ্ড রোড, কলকাতা-২৬ মূল্য : দুই টাকা।

'অরণি' প্রতি বছরে শরতের মতোই একবার আবির্ভূত হয়। স্বভাবতই পত্রিকা প্রকাশের পূর্বে সম্পাদক মহাশয় এর আয়োজন সম্পর্কে সতর্ক ও সচেতন। 'অরণি'র প্রবন্ধগুলি বিশেষ সুলিখিত। কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, গোপাল হালদার প্রমুখের রচনা যে-কোনো পাঠকের নিকট আকর্ষণীয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন 'কবি কাজি নজরুল ইসলাম'। এই প্রবন্ধটিতে কবির কাব্যের ঐশ্বর্যকে ঐতিহাসিক পটভূমিতে চমৎকারভাবে তিনি তুলে ধরেছেন। 'অরণি'র গল্প ও কবিতা রচয়িতার অধিকাংশই খ্যাতিমান। উনিশটি কবিতা ও চোদ্দটি গল্প এর শ্রীবৃদ্ধি করেছে।

আভাতি ঃ সম্পাদক : নিত্যগোপাল সামন্ত। বিষ্ণুপুর, ভায়া কলকাতা-২৭, ২৪-পরগণা। মূল্য : ৫০ পয়সা।

মফস্বল থেকে প্রকাশিত 'আভাতি'র তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যায় লিখেছেন কুমুদরঞ্জন মল্লিক, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নরেন্দ্র দেব, হরপ্রসাদ মিত্র, অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, আশা দেবী, হরেন ঘোষ ও আরো অনেকেই। গল্প-কবিতা-ধারাবাহিক উপন্যাস ছাড়া এতে আছে শহরতলীর সংবাদ, সাহিত্য-জিজ্ঞাসা প্রভৃতি বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়। পত্রিকাটির সম্পাদকগোষ্ঠী তাঁদের এই উচ্চ মান বজায় রেখেও ২৪-পরগণার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে তুলে ধরতে পারলে, সেখানের ইতিহাস, কিম্বদন্তী ও জনপদ সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে, সেইসঙ্গে পত্রিকাটি আরো চিত্তাকর্ষক হবে বলে আমরা মনে করি।

রঙ্গজগৎ

ভারতে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন

ভারতে প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের পরে কলকাতায় প্রথম ফিল্ম সোসাইটি গঠিত হয়েছিল। ফিল্ম সোসাইটি গঠনে বিশ্বের খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্র স্রষ্টাদের তৈরি ছবি এবং বিবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক ছবির সাথে সোসাইটির সদস্যরা পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছেন। সদস্যদের মধ্যে ছবির বিষয়বস্তু থেকে আঙ্গিক, নানা দৃষ্টিকোণসম্পন্ন টেকনিক ইত্যাদি নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। ফিল্ম সোসাইটি কেবলমাত্র দুর্লভ ছবি দেখার জন্য সংগঠিত নয়; এরূপ সমিতি দেশের চলচ্চিত্র-শিল্পের বিকাশের সহায়ক। বাস্তবিকপক্ষে ফিল্ম সোসাইটিগুলি যোগ্য দর্শক ও চিত্রস্রষ্টা তৈরির সংস্থা।

কলকাতায় আজ দুটি চলচ্চিত্র সমিতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে এরূপ ইউনিট গঠিত হয়েছে। সর্বভারতীয়ভাবে এই সমিতিগুলিকে নিয়ে কেন্দ্রীয় সংগঠন ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ অব ইণ্ডিয়া গঠিত হয়েছে। এই সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়েছে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ২৫টি চলচ্চিত্র সমিতি। ১৯৬০ সালে ফেডারেশন গঠিত হবার পরে এই ৩।৪ বছরের মধ্যে কয়েকটি দেশের ক্লাসিক চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও শিক্ষামূলক কাজ করেছে। ফেডারেশনের উদ্যোগে বৃটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউটের সদস্যা মিস মারী সিটন ভারতের বড় বড় শহরে ফিল্ম সেমিনারে বক্তৃতা দিয়েছেন। ভারত সরকার বর্তমানে ফিল্ম সোসাইটির ফেডারেশনের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করছেন। ফেডারেশন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম কাউন্সিলকে আমদানী শুল্ক ছাড় দিয়ে বছরে ৮টি ছবি আমদানীর সুবিধা দেওয়া হয়েছে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব অডিও-ভিসুয়াল এডুকেশনের সেণ্ট্রাল ফিল্ম লাইব্রেরী ৫ বছরের জন্য ফিল্ম সোসাইটিগুলিকে সদস্যভুক্ত করতে স্বীকৃত হয়েছে। এবং ফিল্ম সোসাইটিগুলি কেন্দ্রীয় ফিল্ম লাইব্রেরী থেকে একসঙ্গে একাধিক ছবি আনতে পারবে। ফেডারেশনের প্রস্তাবে ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে মিস মারী সিটনকে পাঁচজন পরিচালকের কাজের পরিচয়মূলক পুস্তক রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক দপ্তরের প্রাক্তন মন্ত্রী ফেডারেশনের মুখপত্র প্রকাশের জন্য ৫ হাজার টাকা সাহায্য করেছেন। অফিসের কাজের জন্য সঙ্গীত-নাটক একাডেমির কাছ থেকেও ৫ হাজার টাকা পাওয়া গেছে। ভারতের ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ আন্তর্জাতিক ফিল্ম সোসাইটির ফেডারেশনের সদস্যভুক্ত হয়েছে।

ফিল্ম সোসাইটিগুলির ফেডারেশনের মুখপত্র 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ম কালচার' একটি আকর্ষণীয় পত্রিকা। সত্যজিৎ রায় থেকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরিচিত লেখকদের চিন্তাশীল রচনায় এই পত্রিকা সমৃদ্ধ।

—সুজন।

ফ্রানকইসে ট্রাফোঁ

চিত্র আলোচনা

দুজ কা চাঁদ

(ফিল্ম এশিয়া)

'দুজ কা চাঁদ' বা দ্বিতীয়ার চাঁদ ছবিতে রয়েছে ভাই-ফোঁটার মঙ্গল অনুষ্ঠান, ভায়ে ভায়ে প্রীতির সম্পর্ক এবং বোনের সুখী জীবনের আকাঙক্ষায় ভাইয়ের বিপদ বরণের কয়েকটি কল্যাণকর দৃশ্য। এ ছাড়া আছে বড়লোকের কন্যার (আজরা) সাথে নায়কের (ভারতভূষণ) প্রেম এবং প্রেমিকার বিশ্বাসঘাতকতার পরিণামে নায়কের পথবিচ্যুতি, অন্যদিকে আর এক বড়লোক-দুহিতার সততার চিত্র। বন্ধুর জন্য বন্ধুর নিঃস্বার্থ প্রীতির এক উজ্জ্বল চিত্র এখানে দেখা যাবে। নায়ক যেমন আইনশিক্ষার্থী (অশোককুমার) বন্ধুকে নিজের অর্থ দিয়ে সাহায্য

করেছে, তেমনি সেই বন্ধুও বিচারকের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে আদালতে বন্ধুর সমর্থনে দাঁড়িয়েছে। এইসঙ্গে রয়েছে এক সাধারণ তরুণীর (সরোজা দেবী) নায়কের সাথে প্রেমের কথা। হিন্দী ছবির দর্শকদের জন্য রকমারী আনন্দের ব্যবস্থা ছবিতে রাখা হয়েছে। কৌতুক-রসের জন্য আগা রয়েছেন এবং প্লে-ব্যাক গানের এক কৌতুককর দৃশ্য তিনি সৃষ্টি করেছেন। নাচ-গানে এবং প্রণয়দৃশ্যে পাঁচমিশালী রসের এই ছবি।

নায়কের ফাঁসীর মঞ্চে যাবার সময় জীবনের প্রিয়মুহূর্ত স্মরণের যে খণ্ডদৃশ্যগুলি উপস্থিত করা হয়েছে, তার জন্য পরিচালকের কল্পনা প্রশংসনীয়।

ছবিটিতে যেমন বহু রকমের ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে, তেমনি বহু শিল্পী-সমাবেশ ঘটেছে। আনন্দ পরিবেশনে মনোরঞ্জন করাই যে ছবিটির একমাত্র উদ্দেশ্য, তাই মনে হয়েছে।

ছবিটি পরিচালনা করেছেন নীতিন বসু। চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনার কাজ করেছেন যথাক্রমে রামচন্দ্র ও শিবাজী অবধূত। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন রোশান।

● ট্রাফোঁর জুলেস এণ্ড জিম ছবিতে জেনী মোরু

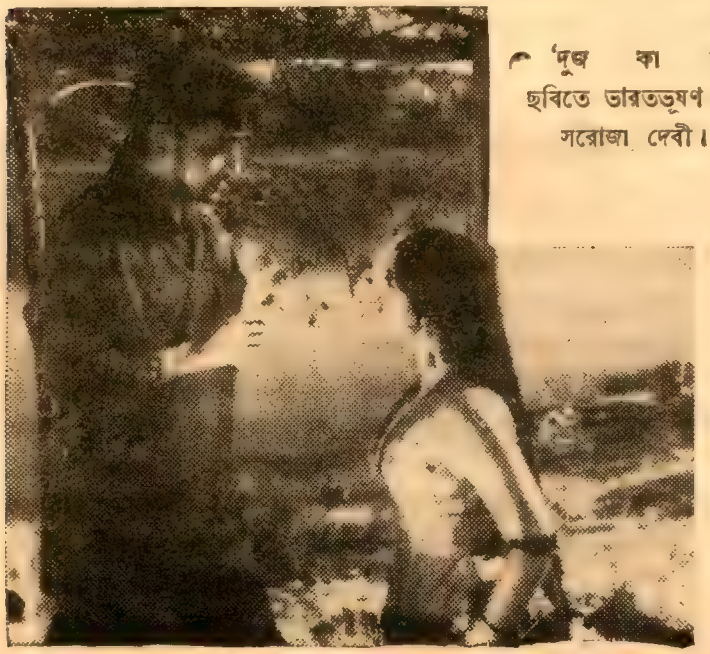

← 'দুজ কা চাঁদ' ছবিতে ভারতভূষণ ও সরোজা দেবী।

ফরাসী নবতরঙ্গ চিত্র

কলকাতা ফিল্ম সোসাইটি ফরাসী দূতাবাসের যুক্ত উদ্যোগে ফরাসী নবতরঙ্গ বা নিউওয়েভ ছবি প্রদর্শনের এক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। গত ১৫ ডিসেম্বর ফিল্ম সোসাইটির কার্যালয়ে এক সাংবাদিক-সম্মেলনে শ্রীচিদানন্দ দাশগুপ্ত এই কর্মসূচীর কথা ঘোষণা করেছেন।

চলচ্চিত্রে নবতরঙ্গ সারা বিশ্বে তুমুল আলোচনার বিষয়। ফরাসী দেশে এই নতুন রীতির সূচনা। ফ্রানকই ট্রাফোঁ এই নতুন রীতির একজন স্রষ্টা। তার পরে আলাঁ রেনের ছবিতে এ রীতির আরো এক বিকাশ দেখা যায়

স্বদেশের নবতরঙ্গ ছবির পরেই আলোচনা দারুণ সোরগোলের পর্যায়ে পৌঁছে। এই রীতির যেমন সমর্থক আছে, তেমন বিরুদ্ধতাও প্রচণ্ড। টেকনিক্যাল দিক থেকে যেমন নবতরঙ্গ চলচ্চিত্রে এক বিপ্লব এনেছে, বিষয়বস্তুর দিক থেকে কিন্তু বর্জোয়া চিন্তার পশ্চাৎপদ বলে কোন কোন পক্ষ থেকে নিন্দিত। বিশেষ করে 'হিরোসিমা মন আমোর' ছবিটি সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে এবং খোদ ফরাসী দেশে তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে। এত বিরোধিতা সত্ত্বেও সকল দেশের নবীনদের মধ্যে নবতরঙ্গের প্রভাব পৌঁচেছে। এমন কি সোভিয়েট ইউনিয়নের মত সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের রীতিসমৃদ্ধ দেশেও পরিচালক চখরাইর বিরুদ্ধে সমালোচনা সুরু হয়েছে। তাঁকে নবতরঙ্গের সোভিয়েট ভাষ্যকার বলে নিন্দা করা হয়েছে।

ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি ২০শে ডিসেম্বর থেকে ২০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছ'টি ফরাসী নবতরঙ্গ ছবি দেখাবার ব্যবস্থা করেছে। প্রত্যেকটি ছবি ইংরেজি সাব টাইটেল যুক্ত। ছবিগুলি যথাক্রমে—ফ্রানকইসে ট্রাফোব 'দি ফোর হাণ্ড্রেড ব্লোজ', 'জুলেস এণ্ড জিম'; জ্যাকুই জিম পরিচালিত 'লোলা'; আলেকজান্দার এস্ট্রাক পরিচালিত 'দি ক্রিমসন কার্টেন' এবং কয়েকটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি; জ্যাকুই রিবেটে পরিচালিত 'প্যারিস বিলংস টু আস'; আলাঁ রেসনে পরিচালিত 'হিরোসিমা মন আমোর।'

ছবিগুলি ২০শে ডিসেম্বর থেকে ক্যাথেড্রাল রোডের ললিতকলা একাডেমি হলে প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টায় ও রাত্রি ৮টায় দুবার প্রদর্শন করা হবে। কেবলমাত্র সদস্যদের এই ছবিগুলি দেখান হবে।

● ডেভিড কনভিল—ম্যানেজিং ডিরেক্টর

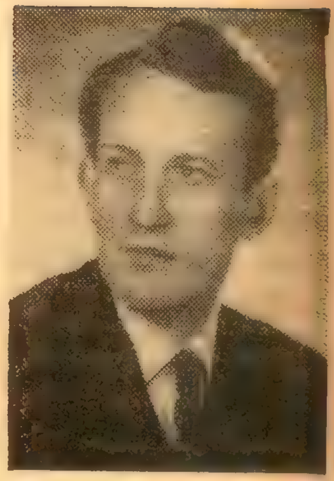

● ডেভিড উইলিয়ম—পরিচালক

● শীলা ব্যালো'টনে

● ডিন্‌ডেন লাঙেন

সিনেক্লাব অব ক্যালকাটা

সিনেক্লাব অব ক্যালকাটার সদস্যদের গত ৭ই ডিসেম্বর 'এ ভেরী প্রাইভেট এফেয়ার' এবং গত ১৫ই ডিসেম্বর 'মিডনাইট মাস' ছবি দুটি প্রদর্শিত হয়েছে।

নাটকের কথা

নিউ সেক্সপীয়র কোম্পানীর শিল্পিগণ

বৃটেনের নিউ সেক্সপীয়র কোম্পানীর শিল্পীরা কলকাতা এসেছেন। কলকাতায় আসবার আগে পাটনায় তাঁরা দুদিন নাটক অভিনয় করেছেন। ভারতে এই সংস্থার এই প্রথম আগমন। এঁদের অভিনয় প্রদর্শনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ভারতস্থ বৃটিশ কাউন্সিল।

দলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডেভিড কনভিল। পরিচালক ডেভিড উইলিয়ম। মঞ্চাধ্যক্ষ— গ্রিফিথ জেমস। প্রধান টেকনিশিয়ান জ্যাক বোমন্ট। এই দলের ৩৫ জন সদস্যের মধ্যে শিল্পীদের অনেকে ওল্ড ভিক থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত

ছিলেন। শিল্পীরা সেক্সপীয়র নাটক ছাড়াও ইংরেজি নাট্যমঞ্চে বিভিন্ন ধরণের নাটক অভিনয় করে সুনাম অর্জন করেছেন। দলের অধিনায়ক ডেভিড কনভিলের জন্ম কাশ্মীরের শ্রীনগরে (১৯২৯)। মার্লবরো ও অক্সফোর্ডে লেখাপড়া শিখে তিনি রয়াল একাডেমি অব ড্রামাটিক আর্টস-এ শিক্ষালাভ করেন। তিনি অভিনয়ক্ষেত্রে যেমন সুনাম অর্জন করেছেন, তেমনি লরেন্স অলিভার প্রমুখের দলে থিয়েট্রিক্যাল ম্যানেজার রূপে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন।

পরিচালক ডেভিড উইলিয়ম বৃত্তি-পাওয়া ছাত্র। ওল্ড ভিক থিয়েটারে তিনি সেক্সপীয়র নাটকে প্রথমে নাম করেন। বর্তমানে তিনি নিউ সেক্সপীয়র থিয়েটারের পরিচালক, মারমেড থিয়েটারের সহযোগী পরিচালক। মঞ্চে, টেলিভিশনে এবং বি, বি, সি'তে তিনি অভিনয় করে থাকেন।

অভিনেতা ডিন্সডেল লাণ্ডেন ফ্লোরেন্স মুর থিয়েটার স্কুলে শিক্ষালাভ করেছেন। ১৯৫৫ সালে তিনি ওল্ড ভিকের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ায় অভিনয়-সফরে যান। লণ্ডনে বিভিন্ন নাটকে তিনি প্রশংসিত হন। 'দি ভ্যালিয়াণ্ট, 'উই জয়েণ্ড

● আমন্দা রেইস

দি নেভী' প্রভৃতি ফিল্মে তিনি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। মুক্ত অঙ্গন থিয়েটার ও টেলিভিশন অভিনয়ে তিনি অংশ গ্রহণ করেন।

জন ওয়াইজ লণ্ডনের নামকরা ক্লাসিক্যাল নাটকের অভিনেতা। তিনি ওল্ড ভিক এবং স্ট্র্যাটফোর্ড-এ প্রধান ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেছেন এবং ১৯৩৫ সালে ওল্ড রয়ালটি থিয়েটারে বহু নাটক পরিচালনা করেছেন। ১৯৪৭ সালে তিনি বল্টন থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি ১৯৫১ সালে ভারতে সেক্সপীয়র নাটক অভিনয় করে গেছেন এবং দীর্ঘ সময় আমেরিকায় ছিলেন। তিনি মারমেড থিয়েটার, ওপেনএয়ার থিয়েটার এবং নিউ সেক্সপীয়র থিয়েটারে অভিনয় করা ছাড়াও টেলিভিশন এবং রেডিওতে অভিনয় করেন।

শীলা ব্যালেন্টিনে ওল্ড ভিক থিয়েটারে শিক্ষালাভ করেছেন। ওল্ড ভিকের অভিনেত্রীরূপে তিনি নাম করেছেন। 'ওথেলো'তে ডেসডিমোনা এবং বিবিধ নাটকে তিনি নায়িকার চরিত্রে রূপ দিয়েছেন।

আমন্দা রেইস লণ্ডনের মেয়ে। লেখাপড়া করেছেন সাসেক্স-এ। তিনি প্রথম সহকারী ম্যানেজার হিসাবে রয়াল উইণ্ডসর থিয়েটারে যোগ দেন। তারপরে রয়াল একাডেমি অব ড্রামাটিক আর্টস-এ শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং পুরস্কার লাভ করেন। লণ্ডনের মঞ্চে কয়েকটি নাটকে অভিনয় করে তাঁর সুখ্যাতি হয়। নিউ সেক্সপীয়রে যোগ দেবার পূর্বে তিনি 'পঞ্চম হেনরি' নাটকে রাজকুমারীর ভূমিকায় অভিনয় করতেন। তিনি টেলিভিশনে অভিনয় করে থাকেন।

জো হিকস্ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার অভিনেত্রী। প্রথমে ছিলেন ব্যালে নর্তকী, যুদ্ধের সময় মেয়েদের অক্সিলিয়ারী বিমানবাহিনীতে যোগ দিলেন, ফিরে এসে ১৯৪৫ সালে মঞ্চে

● ভ্লাডেক শেবল

অভিনয় সুরু করলেন। পাঁচ বছর পরে থিয়েটার ছেড়ে ওয়েলস্ পাহাড়ে খামার পরিচালনা করলেন; এলেন স্পেনে ইংরেজি-শিক্ষিকার কাজ নিয়ে, তারপরে পিতার জমিদারীতে গেলেন দেখাশোনা করতে। আবার ফিরে এলেন মঞ্চে। এরপর থেকে মঞ্চে ও টেলিভিশনে অভিনয় করে যাচ্ছেন। সম্প্রতি অক্সফোর্ড প্লে-হাউসে 'দি রেপ অব দি বেল্ট' নাটকে তাঁর খুব নাম হয়েছে।

ভ্লাডেক শেবল জাতিতে পোলিশ। সাত বছর আগে লণ্ডনে আসার আগে পোলিশ ন্যাশনাল থিয়েটারের অন্যতম কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি টেলিভিশন নাটক পরিচালনা করেন, তিনি ব্রোমলের লিটল থিয়েটারের শিল্পী, পরিচালক ছিলেন। চলচ্চিত্র অভিনেতা হিসাবেও তিনি পরিচিত। দলে আরো যাঁরা আছেন, তাঁদের মধ্যে এডওয়ার্ড আটিয়েঞ্জা ওল্ড ভিক এবং স্ট্র্যাটফোর্ডের অভিনেতা ছিলেন। আর্থার হাওয়ার্ড ত্রিশ সাল থেকে মঞ্চ, ফিল্ম এবং টেলিভিশনে অভিনয় করছেন। উল্ফ মরিস অভিনয়ের জন্য বহু পুরস্কার লাভ করেছেন। তিনি ওল্ড ভিকের সঙ্গে ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে অভিনয়

করেছেন। 'সেভেন ইয়ার্স ইন টিবেট', 'নাইন আওয়ার্স টু রাম' প্রভৃতি ছবিতেও তিনি অভিনয় করেছেন।

ডেভিড কিং কেম্ব্রিজে পড়ার সময় মার্লো সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। তিনি ওল্ড ভিকের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। তিনি এই দলের সঙ্গীত রচয়িতা এবং সঙ্গীত উপদেষ্টা।

ক্রিস্টোফার বার্জেস ওল্ড ভিকে শিক্ষালাভের পূর্বে তিনি ছিলেন কয়লা-খনি-শ্রমিক। তিনি ব্রিস্টল ওল্ড ভিক এবং অক্সফোর্ড প্লে-হাউসে অভিনয় করেছেন। ১৯৬৩ সালে তিনি ব্রিস্টল ওল্ড ভিকের সঙ্গে পাকিস্তান, ভারত ও সিংহলে পরিভ্রমণ করেছেন। তিনি কয়েকটি নাটকও লিখেছেন।

রোনাল্ড হার্ডম্যান—ছিলেন নাচিয়ে, যোগ দিয়েছিলেন বিমানবাহিনীতে, ভ্রাম্যমাণ নাটকের দলে। সেখান থেকে চিলড্রেন্স থিয়েটার, মারমেড থিয়েটার হয়ে নিউ সেক্সপীয়র থিয়েটারে আসেন। লাণ্ডটন জোন্স সঙ্গীত ও নাটক সম্পর্কে শিক্ষালাভ করে বিভিন্ন নাট্য-সংস্থায় অভিনয় করেছেন।

নিউ সেক্সপীয়র কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেছেন ডেভিড কনডেল পরিচালক ডেভিড উইলিয়মের সহযোগিতায়, ১৯৬২ সালে। রিজেণ্ট পার্ক মুক্ত অঙ্গন থিয়েটার থেকে প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট এ্যাটকিন্স অবসর গ্রহণ করলে এঁরা তা গ্রহণ করেন। সেখানে দু-বছর অভিনয় করার পরে বর্তমান দল গঠন করেন।

নিউ সেক্সপীয়র কোম্পানী ১৯শে থেকে ২৭শে ডিসেম্বর পর্যন্ত নিউ এম্পায়ার মঞ্চে নাটক অভিনয় করছেন।

শিশুদের মুখোস নাটিকা

পার্ক সার্কাসস্থিত চিলড্রেন্স লবেল থিয়েটারের চতুর্থ বার্ষিক উৎসব আগামী ২৫শে থেকে ২৭শে ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় রবীন্দ্র সরোবর প্যাভিলিয়ন হলে অনুষ্ঠিত হবে। এই উপলক্ষে প্রতিদিন দুটি করে মুখোস নাটিকা মঞ্চস্থ করা হবে। নাটকগুলি যথাক্রমে 'কেমন জব্দ' ও 'ভারতকে জান', 'রূপকথা' ও 'সোনার পেয়ালা', 'নকল রাজা' ও 'বোকা মোরগ'। শ্রীমতী রেণুকা রায় এম-পি উৎসব উদ্বোধন করবেন।

নাটকগুলির লেখক ও পরিচালক শ্রীসুশীল দাস।

● 'নিশাচর' ছবিতে একটি দৃশ্যে সুস্মিতা সান্যাল ও স্মিতা মজুমদার

'রূপচক্র' নাট্যসংস্থা

গত ১৭ই ডিসেম্বর 'রূপচক্র' নামক নাট্যসংস্থার সদস্যরা স্পেন্সার হোটেলে সাংবাদিকদের সাথে মিলিত হয়েছিলেন। সংস্থার পক্ষে শ্রীরণজিৎ দত্ত জানান যে, তাঁরা 'অন্ধকার থেকে আলোয়' নামে একটা নাটক শীঘ্রই মিনার্ভা থিয়েটারে মঞ্চস্থ করবেন। এই নাটকে চলচ্চিত্র অভিনেত্রী শ্রীমতী কল্যাণী ঘোষ নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করবেন। শ্রীদত্ত নাটকটি রচনা করেছেন। এই সান্ধ্য-আসরে শ্রীমতী কল্যাণী ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। 'রূপচক্র' ইতিপূর্বে কয়েকটি নাটক মঞ্চস্থ করেছে এবং নাট্য-প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছে।

এ্যামেচার ইউনিটের তিনটি নাটক

গত ১৪ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় মিনার্ভা মঞ্চে এ্যামেচার ইউনিট তিনটি নাটক মঞ্চস্থ করেন। নাটক তিনটি জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শিলালিপি' 'সাগর সঙ্গমে' এবং রঞ্জিত রায় চৌধুরীর 'এই শতকের কান্না'।

প্রথম নাটক 'শিলালিপি' দেশ-বিভাগজনিত পরিস্থিতিতে এক বাস্তুচ্যুত পরিবারের নির্যাতিতা কুমারী-কন্যা 'কুন্দর' বাঁচবার আকুল প্রচেষ্টার কাহিনী। দ্বিতীয় নাটক 'এই শতকের কান্না' সার্থক নয়। তৃতীয় নাটক 'সাগর সঙ্গমে'। এক আধুনিকা নারীর অন্তর্দ্বন্দ্ব এই নাটকের বিষয়বস্তু।

অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছেন হিমাংশু দাস, পুতুল চক্রবর্তী, অরুঃ ভট্টাচার্য, সতীকান্ত ঘোষ, চিত্রা মুখোপাধ্যায়, দিলীপ দত্ত, রবি বোস, অরুণ মোদক, যূথিকা ভট্টাচার্য, সুনীল সাহা, ভানু পাল প্রমুখ।

সংগীত কথা

হেমাঙ্গিনী দাসী (হেমমাসী)

আমাদের দেশের নিজস্ব সংস্কৃতি লুকিয়ে রয়েছে আমাদেরই পল্লী-অঞ্চলের মেয়েলী ছড়াগান ও ছেলে-ভুলোনো ছড়াগানের মধ্যে। এইসব ছড়াগানে বাঙালীর চিন্তা, চেষ্টা ও মনের ছাপ পাওয়া যায়। কিন্তু এসব ছড়াগান আবহমান কাল থেকে মুখে মুখে চলে আসছে। কে বা কারা যে এসব ছড়াগানের রচয়িত্রী, তা সঠিক করে বলা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভব নয়। তার কারণ, এ নিয়ে কোনো-দিনই কেউ মাথা ঘামান নি।

আজ যাঁর কথা বলতে বসেছি—তিনি হলেন আমাদের হেমাঙ্গিনী দাসী (হেমমাসী)।

হেমমাসী বরিশালের সিদ্ধকাটি গাঁয়ের মেয়ে। তবে তিনি ছেলেবেলা থেকেই ঢাকা-বিক্রমপুর অঞ্চলের পাইকপাড়া গাঁয়ে জীবনের প্রায় সবটুকুই কাটিয়ে দেন। হেমমাসীর কোন কূলে কেউই ছিল না—শুধু ছিল তাঁর একমাত্র পালিতা কন্যা টেঁপী। ওকে নিয়েই তিনি দিন কাটাতেন। গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের দেখলে বাসায় এনে মুখে মুখে অনেক ছড়া কেটে শোনাতেন। হেমমাসী মুখে মুখে কত যে ছড়া বেঁধেছেন তার হিসেব নেই। আমরাও ছেলেবেলায় তাঁর কোলে বসে অনেক ছড়াগানই শুনেছি। ছেলেবেলায় ঐ ছড়াগানগুলিকে নিতান্ত ছড়া বলেই কোন গুরুত্ব দিই নি, কিন্তু বড় হয়ে এ ছড়াগানগুলির সাংস্কৃতিক ও কাব্যিক মূল্য বুঝতে পেরে ঐ ছড়াগানের কিছু কিছু সংগ্রহ করেছি।

হেমমাসীর কাছ থেকে সংগৃহীত ছড়াগুলি আশা করি বাংলা সাহিত্য-ভাণ্ডারের কলেবর কিছু বৃদ্ধি করবে।

ছড়াগানে সাধারণত ভাবের ঐক্য ও পারম্পর্য থাকে না—এগুলি কতক-গুলো অসংলগ্ন ছবির মিছিল, কাঁচা-পাকা পাঁচমিশেলী কথা-সুর ও ছন্দের সমষ্টি ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু হেমমাসীর রচিত ছড়াগুলিতে ভাবের ঐক্য ও পারম্পর্য বিদ্যমান।

প্রাচীন প্রচলিত ঘুমপাড়ানী যে ছড়াটি হেমমাসীর মুখে সব সময় শুনতাম তা হল—

আয় চাঁদ নড়িয়া ভাত দিমু বাড়িয়া
চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা।

● হেমাঙ্গিনী দাসী।

ধান কুটলে কুঁড়া দিমু,
গাই বিয়াইলে দুধ দিমু,
রাঙা সুতার কাপড় দিমু
মাইনকার কপালে টিপ দিয়ে যা॥

হেমমাসী গাঁয়ের সকলের মাসী। তাই পূজা-উৎসব ছাড়াও জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি সামাজিক অনুষ্ঠানে মাসীর উপস্থিতি প্রত্যেকেরই বাঞ্ছনীয় ছিল। তা ছাড়া হেমমাসী গাঁয়ের এ-বাড়ি, ও-বাড়ি গিয়ে এর-ওর ছেলে-মেয়েকে নিয়ে ছড়া কেটে ঘুম পাড়াতেন—

খোকা ঘুমাইলো পাড়া জুড়াইলো,
বর্গী আইলো দ্যাশে,
বুলবুলিতে ধান খাইচে,
খাজনা দিমু কিসে।
খোকা আমার বড় হইয়া
মায়ের আশীষ মাথায় নিয়া
প্রতাপ রাজার সাহস দিয়া
খেদাইব বর্গী গো॥

হেমমাসী লেখাপড়া জানতেন না। কিন্তু উপরোক্ত ছড়াগানে তাঁর শিক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। একজন নিরক্ষরা মহিলার পক্ষে এ-ধরণের ছড়াগান রচনা করা সত্যিই আমাদের বিস্ময় জাগায়। শুধু তাই নয়, মাসী নিরক্ষরা হলেও ভারতের রাজা-বাদশার ইতিহাস তাঁর কাছে অজানা নয়—একথা তাঁর রচিত উপরোক্ত ছড়াগান থেকে স্পষ্ট ধরা পড়ে।

হেমমাসীর আরো একটি ছড়া তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে, যেমন—

খুকু আমাগো রাণী হইব,
সবাই তারে বড় কইব,
'কোঁয়র' রাণীর মত হইব
মস্ত সে এক বীর।
খুকু আমাগো রাখব মান,
দ্যাশের তরে দিব পরাণ,
'কোঁয়র' রাণীর মতন হইব
মস্ত সে এক বীর॥

আমাদের দেশের রাজা-রাণীদের বীরত্ব-কাহিনী আমাদের মত শিক্ষিত-দেরও অজানা। মাসীর উপরোক্ত ছড়াগানে সেইসব কাহিনীর উল্লেখ রয়েছে। 'কোঁয়র' রাণী ছিলেন একজন শিখ রাণী। দেশের জন্য শত্রুর সঙ্গে খুবই বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। এই শিখ রাণীর মত আমাদের দেশের প্রতিটি ঘরের খুকু বীর হয়ে উঠুক, এই ছিল তাঁর বাসনা।

হেমমাসীর এ-ধরণের অনেক ছড়াগান আছে যার এক-একটি বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। হেমাঙ্গিনী মাসীর মতো আরও অনেকেই আছেন যাঁদের নাম আমাদের অজানা। তাঁদের এ-ধরণের ছড়াগানগুলি মুখে মুখে চলে এসেছে—একসময় সবগুলিই হয়ত লুপ্ত হয়ে যাবে। তাই এ-ধরণের ছড়াগানগুলি সংগ্রহ করে ছড়া-রচয়িত্রীদের সকলের সামনে তুলে ধরা কর্তব্য। —বুদ্ধদেব রায়

● 'দি টেম্পেস্ট' নাটকের মিরাণ্ডা ও ফার্ডিনাণ্ডের চরিত্র রূপায়ণে আমান্দা রেইস ও জন ক্যাসল।

অশোক সেন

ব্রিটিশ কাউন্সিলের ব্যবস্থাপনায় লণ্ডনের রিজেণ্ট পার্ক মুক্ত অঙ্গন থিয়েটারের দি নিউ সেক্সপীয়ার কোম্পানী মহাকবির চতুর্থ জন্মশতবার্ষিকী উৎসব পালনের জন্য ভারত সফরে বেরিয়েছেন। কলকাতা, বম্বে, পাটনা প্রভৃতি শহরের নাট্য-রসিকদের সুযোগ এসেছে একটি খাস বিলাতী কোম্পানীর দ্বারা অভিনীত সেক্সপীয়ারের কয়েকটি নাটক, যথা—দি টেম্পেস্ট, কিং রিচার্ড দি সেকেণ্ড ও দি টেমিং অভ্ দি শ্রুর মঞ্চরূপ দেখবার। অভিনেতা এবং অভিনেত্রী মিলিয়ে প্রায় তেত্রিশজন শিল্পী এসেছেন দলের সঙ্গে। বিলেতের প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা, অভিনেত্রী এঁদের বলব না—তবে যতদূর জানি এই দলের অভিনয়ের একটা স্ট্যাণ্ডার্ড আছে।

১৯৩২ সালের গ্রীষ্মকালে রবার্ট এ্যাটকিন্স, সিড্নে ক্যারল বলে এক ভদ্রলোককে সহযোগী হিসাবে নিয়ে রিজেণ্ট পার্কে প্রথম এই মুক্ত অঙ্গন থিয়েটারের পত্তন করেন। পর পর ২৯টি সিজনে এ্যাটকিন্স এই মুক্ত অঙ্গনে সেক্সপীয়ারের বিভিন্ন নাটকের মঞ্চরূপ দেখিয়ে এসেছেন। সেক্সপীয়ার ছাড়া, বেন্ জনসন, জেমস্ বাড়ি, গ্যয়টে, মিল্টন প্রভৃতির নাটকও এখানে অভিনীত হয়েছে। ইংলণ্ডের বহু নামজাদা অভিনেতা, অভিনেত্রীও রিজেণ্ট পার্কের মুক্ত অঙ্গন রঙ্গমঞ্চে কোন না কোন সময়ে অভিনয় করেছেন—এঁদের কারো কারো অভিনয়ের সঙ্গে আপনাদেরও হয়তো পরিচয় আছে—যথা, ফিলিস নিল্সন টেরী, জঁ্যা ফর্বস্ রবার্টসন, জর্জ গ্রোস স্মিথ, ফ্লেয়ার লুস, আইরিন ভ্যানব্রা, জন ড্রিঙ্কওয়াটার, ভিভিয়ান লে, ডেবরা কার এবং কে কম্পটন। বিখ্যাত গ্ল্যাডিস্ কুপারও লাইসিস্ট্রাটা নাটকে নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করেছেন এ্যাটকিন্স মুক্ত অঙ্গন থিয়েটার থেকে অবসর নেন ১৯৬০ সালে—এই বছরই রিজেণ্ট পার্কে। ৭৪ বছর বয়সে

রোমাঞ্চ-রহস্য গ্রন্থ

রক্তনদীর ধারা

ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল

রক্তনদীর ধারা মাসিক বসুমতীর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। রোমান্স ও রোমাঞ্চের সত্য ঘটনায় বইটির আদ্যোপান্ত পরিপূর্ণ। রক্তনদীর ধারা জীবনের অভিজ্ঞতা নয়; জীবনপথের দিক-নির্দেশ। তাই প্রবঞ্চনা; ছলনা ও প্রেমের লীলায় চাঞ্চল্যকর বইটি চাঞ্চল্য তুলেছে সকল সমাজেই। লোমহর্ষক সামাজিক কাহিনী।

দাম চার টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

তিনি এখানে টেম্পেস্টে ক্যালিব্যানের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।

এরপর এখানকার থিয়েটার পরিচালনা করবার দায়িত্ব নেন নিউ সেক্সপীয়ার কোম্পানীর তরফে ডেভিড কন্‌ভিল। কয়েক বছরের ভেতরেই সুদক্ষ পরিচালক ডেভিড উইলিয়মের প্রযোজনায় 'এ মিড্ সামার নাইট্‌স ড্রিম', 'লাভ্‌স লেবারস্ লস্ট', 'মাচ্ এ্যাডো এবাউট নাথিং' প্রভৃতি নাটক এখানে প্রডিউস করা হয় এবং সর্বত্র ভাল নাট্যগোষ্ঠী হিসাবে দলটির নাম ছড়িয়ে পড়ে।

নিউ সেক্সপীয়ার কোম্পানী কলকাতার যে সব নাট্যানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করলেন বা করবেন, তার একটা তালিকা নিচে দিলাম—

(১) 'দি টেম্পেস্ট' : পরিচালনা—ডেভিড উইলিয়ম। ডিসেম্বর—১৯, ২০ ও ২১—সাড়ে ছটায়—ছাত্রদের জন্য ম্যাটিনি ২০শে আড়াইটায়।

(২) 'কিং রিচার্ড দি সেকেণ্ড': পরিচালনা—ডেভিড উইলিয়ম। ডিসেম্বর ২২, ২৩, ২৪ সাড়ে ছটায়—ছাত্রদের জন্য ম্যাটিনি ২৩শে আড়াইটায়।

(৩) 'দি টেমিং অভ্ দি স্রু' : পরিচালনায় ভ্লাডেক শেবল্। ডিসেম্বর ২৬, ২৭ সাড়ে ছটায়—ছাত্রদের জন্য ম্যাটিনি ২৭শে আড়াইটায়।

যে-কোন নাটকের অভিনয় দেখে যা শেখা যায়, তার থেকে ভালভাবে পড়ে ও-সম্বন্ধে অনেক বেশি জানা যায়—এ ধরণের একটা ভুল ধারণা কারো কারো আছে। আচ্ছা, নাট্যকারদেরই প্রশ্ন করে দেখুন না, তাঁরা কি চান? Playgoing Public-এর বদলে reading Public পেলেই কি নাট্যকার বেশি খুশি হবেন? কোন দেশের কোন নাট্যকারই কোনো সময়েই একথা স্বীকার করবেন না। এই প্রসঙ্গে George Eliot বলেছেন: 'In opposition to most people who love to read Shakespeare, I like to see his plays acted better than any others; his great tragedies thrill me, let them be acted how they may'.

স্যার হেনরি আরভিং-এর একটি উক্তি এ বিষয়ে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক—তিনি বলেছেন: 'তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন ছাত্রকে প্রশ্ন করি—হ্যামলেট্ কর্তৃক ওফেলিয়ার প্রত্যাখ্যানের দৃশ্যটির সম্বন্ধে একবার ভালভাবে মনে মনে চিন্তা করে দেখুন। সমস্ত নাট্যসাহিত্যে এ ধরণের জটিল দৃশ্য আর বিশেষ দেখা যায় না। বলুন, এ দৃশ্যটি পড়ে বা এ সম্বন্ধে চিন্তা করে যা ধারণায় আনতে পারবেন, তার থেকে ঢের বেশি সুস্পষ্ট এবং গভীরতর অর্থ কি ও-দৃশ্য থেকে পান না, যখন কোন ভাল অভিনেতা দৃশ্যটি অভিনয় করেন?'

সেক্সপীয়ারের নাটকের অভিনয় দেখবার সুযোগ সচরাচর আমাদের দেশের নাট্যরসিকদের হয় না। একমাত্র লিট্‌ল থিয়েটারের শ্রীযুক্ত উৎপল দত্ত মাঝে মাঝে সেক্সপীয়ারের নাটক (মূল ইংরাজীতে এবং বাংলা অনুবাদে) মঞ্চস্থ করে সে অভাব খানিকটা পূরণ করেন। শ্রীদত্তের প্রযোজনা এবং ব্যক্তিগত ও দলীয় অভিনয় খুবই উচ্চশ্রেণীর—তাঁর ওথেলোর ইংরাজী মঞ্চরূপ দেখে সত্যিই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু নানা অসুবিধার দরুণ তিনিও নিয়মিতভাবে মহাকবির নাটক মঞ্চস্থ করতে পারেন না।

বহুদিন বাদে লণ্ডনের একটি পার্টির সেক্সপীয়ারের নাটকের অভিনয় দেখবার সুযোগ আমাদের হয়েছে—এর ব্যবস্থাপনার জন্য দায়ী বৃটিশ কাউন্সিলকে এদেশের সেক্সপীয়ার-অনুরাগীদের তরফ থেকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

নাটক তিনটি দেখবার পর যথাসময়ে আমার মতামত আপনাদের কাছে পেশ করবো।

১৮ই ডিসেম্বর শুভমুক্তি !

দুটি মেয়ে আর একটি ছেলেকে নিয়ে যে ঝড় উঠেছিল তারই ঘাত-প্রতিঘাতের ঘটনাপ্রবাহ।

হিন্দ (তাপনিয়ন্ত্রিত বিলাসবহুল চিত্রগৃহ) মেনকা : কালিকা : ইন্দ্রাণী : নাজ
লিবার্টি : অজন্তা : জ্যোতি : রূপালী : রাজকৃষ্ণ : রুক্মিণী : বাটা
এবং ৮টি চিত্রগৃহে

নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী

দেবনারায়ণ গুপ্ত

॥ সাতান্ন ॥

নোলা বিভ্রাট

নাটকে পল্লীরমণীদের মুখে একটি গান আছে। গানের লাইন এরূপ :

'ঘরে যাবো না যাবো না,
যাবো না লো!'

ব্যালে মেয়েদের দিয়ে গানটি রপ্ত করাতে হিমসিম্ খেয়ে যাচ্ছেন অপেরা মাস্টার। সকাল-সন্ধ্যায় রিহার্সাল দেওয়াচ্ছেন। রিহার্সালে চা আর জল-খাবারের খরচ বেড়ে গেছে। তা ছাড়া দু'বেলা গাড়ি করে নিয়ে আসা আবার পৌঁছে দেওয়া। ক'টা মেয়ের মুখে একটা গান তুলতে শুধু অপেরা মাস্টারই নন, সেইসঙ্গে মিউজিক স্টাফের দশজন লোককেও কম ভোগান্তি ভুগতে হচ্ছে না। তা ছাড়া গানের সঙ্গে নাচের মাস্টারও আছেন।

গানটা ঘষে-মেজে কোনরকমে যদিও বা খানিকটা রপ্ত হয়ে ওঠে, নাচের পা ফেলতে বা ফিগার করতে গিয়ে গানটা আবার ভুল করে বসে মেয়েরা।

শেষ পর্যন্ত মেয়েদের ভুলের ব্যাপারটা, নাচ আর গানের মাস্টারের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝিতে দাঁড়ায়।

গানের মাস্টার বলেন : দুটো একসঙ্গে হবে না। আমি মিউজিকের সঙ্গে গানটা তৈরি করে দিই, তারপর তুমি নাচ কম্পোজ করো।

উত্তরে নাচের মাস্টার বলেন : আমি মিউজিকের সঙ্গে নাচটা ঠিক করেছি—তারপর তোমার গান ঠিক কি বেঠিক তুমি দেখে নাও গে।

—তুমি কি বলতে চাও, শুধু নাচটা হলেই হবে? গানের দরকার নেই—

—আমিও তো তোমায় ঐ কথাই বলতে পারি। গানটা হলেই হোল? নাচের দরকার নেই?

এমনিভাবেই তর্কাতর্কিটা দুই মাস্টারের মধ্যে শেষ পর্যন্ত চরমে পৌঁছলো। প্রায় হাতাহাতি হয় আর কি!

যাই হোক, মিউজিসিয়ানরা তখনকার মত দুই মাস্টারকে শান্ত করে। দোষ মাস্টারদের নয়, দোষ মেয়েগুলোর। একটা করতে যায় তো আর একটা ভুল করে বসে। আর মাস্টার দুটি এদের সঙ্গে দিবারাত্র তালিম দিতে দিতে তিতিবিরক্ত। ফলে, এই বিরক্তিই শেষ পর্যন্ত বিরাগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

কথাটা মালিকের কানে উঠলো। মালিক প্রথমে গানের মাস্টারকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন : ব্যাপার কি?

উত্তরে গানের মাস্টার বল্‌লেন : চা আর জলপানির পয়সা পেয়ে পেয়ে ওদের নোলা বেড়েছে। আজকের দিনটা দেখবো, তারপর দেবো সবক'টাকে বিদেয় করে। ফ্রেস্ ব্যাচ্ নিয়ে আসবো।

মালিক বললেন : আজকের রিহার্সালে আমি থাকবো। দেখবো।

—বেশ তো। তা হলে তো ভালই হয়।

গানের মাস্টার চলে গেলেন।

মালিক এবার নাচের মাস্টারকে ডেকে পাঠালেন। নাচের মাস্টার বললেন : মিউজিকের নোটেশান্ ধরে নাচটা আমি শেখাতে পারি, কিন্তু গানের গণ্ডগোলের জন্যে নাচটা ঠিক করে দিতে পারছি না।

যাই হোক, দুই মাস্টারের কাছে দু'রকম কথা শুনে নিয়ে, থিয়েটারের মালিক সন্ধ্যায় রিহার্সালে এসে বসলেন।

গান সুরু হোল, সেই সঙ্গে নাচও। কয়েক কলি গান আর নাচ চলার পর, গানের মাস্টার থামিয়ে দিলেন। বললেন : আবার ভুল হোল।

সঙ্গে সঙ্গে নাচের মাস্টার বলে বসলেন : আমার ঠিক আছে।

একজন বেঠিক ও অপরজন ঠিক বলায় মালিক গানের মাস্টারকে বললেন : কি ভুল হোল?

—ওদের নোলায় স্যার! এই একটা কথা আমি ক'দিন ধরে ওদের আর ঠিক করাতে পারছি না। গানের লাইনটা হচ্ছে—

ঘরে যাবো না, যাবো না—
যাবো না লো!

আর ওরা বলছে—

ঘরে যাবো না, যাবো না,
যাবো নোলা—

তাইত বলছি স্যার ক'দিনে ওদের নোলাটাকে ঠিক করাতে পারলাম না। এখন আপনি যদি চা আর জলপানিটা বন্ধ করে ওদের নোলাটাকে সংযত করতে পারেন।

গানের মাস্টারের কথায় মালিক হেসে ওঠেন। মেয়েরা লজ্জিত হয় এবং সেই সঙ্গে 'নোলা' সংযমেও সচেষ্ট হয়।

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ
প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর
বেজওয়াডা - শ্রীনগর - গৌহাটী

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

শিলাদিত্য

আন্দ্রেয়েভ

পিরানদেল্লোর নাটক থেকে একটা কথা বারবার মনে হয়—নাটকীয় সত্যকে ভালভাবে পরিস্ফুট করতে হলে প্রাণবন্ত চরিত্রের থেকে অনেক বেশি কার্যকরী হয়ে ওঠে ঠিকমত সঙ্কেতের ব্যবহার। এসব নাটক দেখলে একথাও মনে আসে—থিয়েটারের জগৎ থেকে বাস্তব জগৎকে দূরে সরিয়ে রাখলেই বা ক্ষতি কি? থিয়েটারে থিয়াট্রিক্যালিজমই থাকুক না!

কথাগুলো মনে হয় সত্য—কিন্তু কি জানি কিসের অভাবে হৃদয়ে খুব গভীরভাবে দাগ কেটে বসতে পারে না। পিরানদেল্লোর নাটকে যা আভাসে পাওয়া যায়, তারই পরিপূর্ণ রূপ দেখতে পাই দুজন রুশদেশীয় নাট্যকারের রচনায়—লিওনিড নিকোলায়ভিচ, আন্দ্রেয়েভ এবং নিকোলায় নিকলেভিচ্ এভ্রিনভ-এ।

গোর্কি এবং মেটারলিঙ্কের মাঝামাঝি একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন আন্দ্রেয়েভ। গোর্কির সঙ্গে একটা যোগসূত্র আছে বই-কি! কারণ আন্দ্রেয়েভও বাস্তবধর্মী নাটক নিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, এদিকে আবার মেটারলিঙ্কের মত তিনি অনেক সাঙ্কেতিক নাটকও লিখেছেন। এ্যাসলে ডিউক্স বলেন—আন্দ্রেয়েভের 'থিয়েটার অফ দি সোল' এক্সপ্রেসেনিস্ট ড্রামার মতই অতি আধুনিক আবার মধ্যযুগীয় মিস্ট্রি প্লেগুলোর মত প্রাচীন ধাঁচেরও। এমন এমন নাট্যকার আছেন, যাঁদের রচনায় বেশি পাত্র-পাত্রীর দরকার হয় না। কারোর কারোর তিনটি চরিত্র হলেই (যথা, স্বামী, স্ত্রী ও প্রেমিক) নাটক লিখতে অসুবিধা হয় না। কেউ কেউ আবার দুজন চরিত্র নিয়েই কাজ সারেন—বলিষ্ঠ সংলাপের আকর্ষণে পাঠককে বা দর্শককে এঁরা মুগ্ধ করে রাখেন। এ-বিষয়ে আন্দ্রেয়েভ কিন্তু আরও অনেকটা এগিয়ে এসেছেন। পৃথিবীতে যদি একটিমাত্র মানুষ বেঁচে থাকতো, তাঁকে নিয়েও আন্দ্রেয়েভের নাটক রচনা করতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হোত না।

'In effect all his plays concern the mind of a single man. The other personages are not even minor or neutral characters. They are themselves offshoots of the single tree of personality. They are themselves embodiments of the doubts and fears that issue from the house of Man, and halt, and flee for refuge to their native corridors.'—From 'The Youngest Drama' by Ashley Dukes.

১৮৭১ সালের ৯ই অগাস্ট মস্কো থেকে ২০০ মাইল দক্ষিণে ওরেল শহরে লিওনিড নিকোলায়ভিচ আন্দ্রেয়েভের জন্ম হয়। তাঁর বাবার রোজগার কোনদিনই বেশি ছিল না। আন্দ্রেয়েভ যখন হাইস্কুলের ছাত্র, সে-সময় তাঁর বাবা মারা যান। তারপর একটানা দারিদ্র্যের ইতিহাস—বহু দুঃখদৈন্যের ভেতর দিয়ে কাটিয়ে ২৬ বছর বয়সে আন্দ্রেয়েভ মস্কো ইউনিভার্সিটির আইন-বিভাগ থেকে গ্রাজুয়েট হন। শোনা যায়, হতাশা এবং অর্থাভাবে এর মাঝে তিনবার তিনি আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করেছিলেন।

শৈশবে এবং যৌবনে আন্দ্রেয়েভের ভেতর ছবি আঁকবার ক্ষমতা দেখা গিয়েছিল। এমন কি ছাত্র-জীবনে পোর্ট্রেট এঁকে তিনি কিছুদিন নিজের থাকা-খাওয়ার খরচও চালাতেন। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে এদিকটা ঠিকভাবে পরিস্ফুট হতে পারে নি।

ছেলেবয়েস থেকেই আন্দ্রেয়েভ পড়াশুনা করতে খুব ভালবাসতেন। সমস্ত রাশিয়ান ক্লাসিক্স্ এবং নামকরা বিদেশী লেখকদের বইয়ের রাশিয়ান অনুবাদ অতি অল্প বয়সেই তিনি পড়ে ফেলেন।

১৮৯৭ সালে তিনি আইন-ব্যবসা সুরু করেন—কিন্তু প্র্যাকটিশ একদম জমে না—ফলে এ ছেড়ে তিনি কাগজের রিপোর্টার হিসাবে কাজ নেন। পরে মস্কো কোরিয়ার কাগজে একপাতার-হাল্কা-সাহিত্য লেখবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই সময়কার অনেক স্কেচ পরে বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৯৮ থেকে আন্দ্রেয়েভ সম্পূর্ণভাবে নিজেকে সাহিত্যচর্চায় নিযুক্ত করেন। এ-সময় প্রথমটায় মস্কোতে এবং পরে পেট্রোগ্রাড্-এ থাকতেন—১৯০৬ সালে ফিনল্যাণ্ডের টেরিয়োকীতে নিজের কান্ট্রিহোমে চলে যান। কারণ আন্দ্রেয়েভ বুঝতে পারছিলেন যে, বড় শহরের নানারকম হৈ-হৈ-এর ভেতর নিশ্চিন্তমনে সাহিত্যচর্চা করা সম্ভব হয় না।

আন্দ্রেয়েভ কখনও সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগ দেন নি। কোন দলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার মানেই হল নিজের আর্টিস্ট-সত্তার বিসর্জন দেওয়া—এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। সাহিত্যের জীবনের প্রায় সুরুতে তাঁর লেখা একটি গল্প গোর্কির দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গোর্কি তখন গৌরবের চরম শিখরে—তিনি নানাভাবে আন্দ্রেয়েভকে উৎসাহ ও সাহায্য করতে সুরু করলেন।

১৯০১ সালে আন্দ্রেয়েভের একটি গল্প-সঙ্কলন প্রকাশিত হয়—রাশিয়ান সামাজিক-জীবনের কয়েকটি গূঢ় সমস্যার ওপর ভিত্তি করেই গল্পগুলি লেখা হয়েছিল। এই বইটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই আন্দ্রেয়েভের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তারপর থেকে তাঁর জনপ্রিয়তা ক্রমাগতই বিস্তৃতি পেয়েছে দেশে এবং বিদেশে।

তাঁর নাটকগুলো রাশিয়ার সর্বত্র জনপ্রিয়তা লাভ করল এবং দীর্ঘদিন ধরে মঞ্চস্থ হতে লাগল। তাঁর সমস্ত লেখার চাহিদাও ক্রমশ খুব বেড়ে যেতে লাগল। কিং হাঙ্গারের আঠারো হাজার কপির একটি সংস্করণ একদিনেই বিক্রি হয়ে যায়। এ সত্ত্বেও এক শ্রেণীর লোক কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। এঁরা ক্রমাগত তীব্র ভাষায় আন্দ্রেয়েভের বিরূপ সমালোচনা করতেন। এ-বিষয়ে তাঁর ভাগ্যটা টলস্টয় প্রমুখ অন্যান্য বড় রাশিয়ান সাহিত্যিকদের থেকে বিশেষ তফাৎ ছিল না। এঁরা কেউই সর্বশ্রেণীর পাঠক এবং সমালোচকের কাছ থেকে প্রশংসা অর্জন করতে পারেন নি। কিন্তু এ-ধরণের নিন্দায় এঁদের প্রতিভাকে এতটুকু ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি।

আন্দ্রেয়েভের লেখা পড়লেই বোঝা যায়, জীবনের বাহ্যিক ঘটনাবলীর মূল্য তাঁর কাছে বেশি নয়—চরিত্রের অন্তর্লীন রহস্যের দিকটাই পরিস্ফুট করে তোলবার প্রচেষ্টা করেছেন তিনি নিজের রচনায়।

'Thoughts of progress are foreign to him, but he advances step by step into the recesses of human personality.'

১৯১৩ সালে Maski নামে মঞ্চ-পত্রিকায় আন্দ্রেয়েভ থিয়েটার সম্বন্ধীয় একটি চিঠি প্রকাশ করেন। অতীত এবং ভবিষ্যতের থিয়েটার সম্বন্ধে তাঁর বিস্তারিত মতামত তিনি এই চিঠিতে আলোচনা করেছিলেন। আগামী কালের থিয়েটারের তিনি নতুন নামকরণ করেন **'Pansyche' (literarally 'all soul', or 'all thought.')**

এতাবৎ মঞ্চে এ্যাকশন বলতে দৈহিক গতি, চোখের ওপর ঘটছে যেসব ঘটনাবলী এবং দৃশ্যমান অঙ্গ-সঞ্চালনকেই বোঝা যেত। আন্দ্রেয়েভ প্রশ্ন তুললেন, আজকের যুগেও কি এ্যাকশন বলতে এই Physical movements on the stage-কে নিয়েই নাট্যকারেরা তুষ্ট থাকবেন? আন্দ্রেয়েভের মতে, আধুনিক জগতে মানুষ তার বিষাদঘন এবং করুণতম মুহূর্তে নিজেকে বাইরের পারিপার্শ্বিক এবং বস্তুজগৎ থেকে ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে আত্মকেন্দ্রিক এবং আত্মমগ্ন হয়ে থাকতে ভলাবাসে। তার মানসিক সত্তা ক্রমানুয়ে অন্তরের অন্তস্থলে এমন একটা আশ্রয় খুঁজে বেড়ায়, যেখানে খানিকটা শান্তি এবং বিশ্রাম মিলবে।

● কিং হাঙ্গার

আজকের দিনের ট্র্যাজিক হিরোকে বাইরে থেকে শান্তি, সমাহিত বলেই মনে হবে। অতীতের নাটকের নায়কের মানসিক উত্তেজনা ছিল বহির্মুখী—বর্তমানে এই উত্তেজনাকে হতে হবে অন্তর্মুখী। কারণ বাস্তব-জীবনেও মানুষের ভেতর এই ধরণের একটা পরিবর্তন দেখা দিয়েছে।

আন্দ্রেয়েভ অবশ্য একথা কখনও বলেন নি যে, বর্তমান জগতে অন্য ঘটনাবলী সব অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে,—আর মানুষ সব কাজকর্ম বিসর্জন দিয়ে শুধু চিন্ময় স্বরূপকে নিয়েই আত্মমগ্ন হয়ে কাল কাটাচ্ছে। বর্তমান জগতেও আত্মহত্যা, কলহ-বিদ্রোহ, যুদ্ধ প্রভৃতি সবকিছুই আগেকার মতই ঘটছে—বরং আগের থেকে বেশি করেই ঘটছে। কিন্তু আজকের বিচার্য বিষয় হল, আজকের দিনে এইসব ঘটনার নাটকীয় মূল্য ঠিক আগের মতই আছে কি না।

আন্দ্রেয়েভের মতে—**'The chronicle of current events is still replete with suicides, strife and war, but all these events in their outward aspects have fallen in dramatic value. Life has become more psychological.'**

(ক্রমশঃ)

● আন্তঃকলেজ স্পোর্টসে ৮০০ মিটার দৌড়ের একটি দৃশ্য।

প্রশংসনীয় উদ্যম

ডুরাণ্ডের আকর্ষণীয় সমাপ্তির পর বর্তমানে রাজধানী দিল্লীর মাঠে-ময়দানের প্রধান আকর্ষণ হল নেহরু মেমোরিয়াল হকি প্রতিযোগিতা। এবারই প্রথম এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। খেলাধূলার দিকেও আমাদের স্বর্গত প্রিয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুর এই সুন্দর এবং অপূর্ব প্রয়াস সত্যাই প্রশংসনীয়। শ্রীনেহরু ক্রীড়াবিদ হয়ত ছিলেন না, কিন্তু ছিলেন একজন সত্যকারের ক্রীড়ামোদী। অলক্ষ্যে থেকে তিনি সর্বদাই সাহায্য এবং উৎসাহ দান করেছেন ভারতের বিভিন্ন ক্রীড়া-সংস্থাকে। ১৯৫১ সালে দিল্লীর প্রথম এশিয়ান গেমসের অনুষ্ঠানের পশ্চাতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর বিরাট দানের কথা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। শ্রীনেহরুর অমূল্য বাণী 'Play the game in the spirit of the game' আমাদের ক্রীড়াজগতের আদর্শ হওয়া উচিত।

কলকাতা ইস্টবেঙ্গল ক্লাব দিল্লীর ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ক্লাবকে মাত্র ১—০ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে প্রথম কোয়ার্টার ফাইন্যালে উন্নীত হয়। বোম্বাই একাদশ ১—০ গোলে সাদার্ন কম্যাণ্ডকে পরাজিত করে কোয়ার্টার ফাইন্যালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। ইণ্ডিয়ান নেভী এক তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলায় মধ্যপ্রদেশকে ৫—২ গোলে পরাজিত করেছে। নেভী দল খেলার প্রথমে ২—০ গোলে পরাজয় স্বীকার করছিল. কিন্তু শেষ পর্যন্ত নেভী দল বিরাট ব্যবধানে জয়লাভ করে।

শ্রীঅমিতাভ

দ্বিতীয় রাউণ্ডে নেভী দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে কলকাতার মোহনবাগানের সঙ্গে। দিল্লীর নিউ স্টার দল কোয়ার্টার ফাইন্যালে উন্নীত হয়েছে শক্তিশালী আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়কে ৩—২ গোলে পরাজিত করে। সর্ব-ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রের খ্যাতনামা বাছাই করা দলগুলি অংশগ্রহণ করায় এই প্রতিযোগিতা সত্যই এক আকর্ষণীয় পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

ব্যাঙ্গালোর টেস্ট

ব্যাঙ্গালোরের প্রথম বে-সরকারী ভারত-সিংহল টেস্ট যুদ্ধে শক্তি পরীক্ষায় ভারত ১ ইনিংস ৪৬ রানের ব্যবধানে ধরাশায়ী করেছে আগন্তুক সিংহ দলকে। ভারতীয় ব্যাটসম্যানদে কঠিন আঘাতে চুরমার হয়েছে সিংহলে দুর্বল বোলিং শক্তি। অপরদি ভারতের বোলিং আক্রমণের বিরু মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে নি সিংহলে ব্যাটসম্যানেরা।

শক্তির দিক থেকে সফরকার সিংহল দল অতি সাধারণ স্তরের এবারের সফরের উদ্বোধনী খেলা সিংহল দল, তরুণ খেলোয়াড় সমন্বি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দলের হাতে কোনক্রমে পরাজয় এড়িয়েছে।

ভারত প্রথমে ব্যাট করার সুযো লাভ করে, ৪ উইকেটে ৫০৮ রানে বিরাট রানসংখ্যা সংগ্রহ করে ইনিংসে সমাপ্তি ঘোষণা করেন অধিনায় পতৌদি। দিলীপ সরদেশাই এব হনুমন্ত সিং শতরান করার কৃতি অর্জন করেন। সরদেশাই ১২৬ রানে আউট হন এবং হনুমন্ত ১৪৯ রানে অপরাজিত থাকেন।

সিংহল প্রথম ইনিংসের খেল শেষ করে মাত্র ২০৫ রানে এডোয়ার্ডের ব্যক্তিগত ৩৮ রান এব পনিয়ার ৪৮ রান দলকে অনেকাংশে সাহায্য করে। চন্দ্রশেখর মাত্র ৫৬ রানে ৫টি উইকেট সংগ্রহ করেন সিংহল ফলো অনের সম্মুখীন হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা সুরু করে। জয়সিংহী ৬৩ রান এবং টিসেরা ৪৪ রান সংগ্রহ করে দলের পতন রোধ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন কিন্তু ২৫৭ রানে সিংহলের দ্বিতী ইনিংস শেষ হয়। সুতি ৮১ রানে ৫টি এবং চন্দ্রশেখর ৯২ রানে ৫টি উইকেট দখল করেন। প্রথম টেস্টে সিংহলের ভাগ্যে জুটল ১ ইনিংস এব ৪৬ রানের ব্যবধানে পরাজয়।

হায়দ্রাবাদের দ্বিতীয় টেস্টে তিনজন নতুন খেলোয়াড় দলভুক্ত হয়েছেন দুজন নতুন মুখ হলেন বাংলার প্রকাশ পোদ্দার, মাদ্রাজের ভেঙ্কটরাঘবন এব ফারুক ইঞ্জিনীয়ার। দ্বাদশ খেলোয় নির্বাচিত হয়েছেন বাংলার তরু

খেলোয়াড় অমর রায়। দল থেকে বাদ পড়েছেন সরদেশাই, ইন্দ্রজিৎ সিংজী এবং সেলিম দুরানী।

● দিল্লীতে নেহরু-স্মৃতি হকি প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী দিনে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পাণ্ডিত ও শ্রীঅশোক সেন খেলা দেখছেন।

গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জি

পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার ছেলে 'গারর্থ' নিজেও কোনদিন হয়ত ভাবতে পারেন নি, যে তাঁকেই একদিন রে লিণ্ডওয়াল আর ডেভিডসনের ফেলে যাওয়া বিরাট দায়িত্বের বোঝা মাথায় নিতে হবে। একসঙ্গে ক্রিকেটের মাঠ থেকে রিচি বেনো, ডেভিডসন, নীল হার্ভে আর ম্যাকের মত ক্রিকেট তারকাদের বিদায়ের লগ্নেই 'গারর্থের' আবির্ভাব। ব্যাটে বলে এই ক'টি অমূল্য রত্ন হারাবার পর যে ক'জন নতুন প্রতিভার আবির্ভাব ঘটেছে অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটের অঙ্গনে—তার মধ্যে ফাস্ট বোলার গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জিই হলেন মধ্যমণি। 'গারর্থ' ম্যাকেঞ্জির সহ ক্রিকেট খেলোয়াড়দের দেওয়া আদরের ছোট্ট ডাক নাম।

৬ ফুট ২ ইঞ্চি দীর্ঘ এবং ১৫ স্টোন ওজনের সুগঠিত বিশাল দেহী ম্যাকেঞ্জির হাত থেকে যখন দুর্দান্ত গতিতে ক্রিকেট বলটি পিচের ওপর দিয়ে ব্যাটসম্যানের দিকে ছুটে আসে, দেখে মনে হয় একটা স্প্রিং থেকে সুনিপুণভাবে বলটি ছোঁড়া হল। এই বলের সম্মুখে খেলতে অতি বড় ব্যাটসম্যানও কিছুটা ইতস্তত করেন।

● ম্যাকেঞ্জি

ম্যাকেঞ্জির প্রথম বড় খেলার সুযোগ ঘটে যখন তাঁর বয়স মাত্র ১৮ বছর; এই সময় তিনি শেফিল্ড শীল্ডে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে নির্বাচিত হন। তখন দলে তাঁর ভূমিকা ছিল বোলার হিসাবে নয়, ব্যাট্সম্যান হিসাবে।

বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় ফ্রাঙ্ক ওরেলের প্রশংসা এবং ভবিষ্যদ্‌বাণীই ম্যাকেঞ্জির খেলোয়াড়ী জীবনে সৌভাগ্যের দ্বার খুলে দেয়। ১৯৬০-৬১ সালে পার্থে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আর পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার খেলায় তিনি বিরাট কোন একটা নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে পারেন নি। কিন্তু ওরেলের সন্ধানী চোখ ম্যাকেঞ্জির মধ্যে দেখেছিল ভবিষ্যতের সম্ভাবনার ইঙ্গিত।

আশ্চর্য, ১৯৬১ সালে ইংলণ্ড সফরে বেনোর দলবল যখন যাত্রা করল, দেখা গেল ম্যাকেঞ্জিও হয়েছেন সেই দলের সদস্য। দ্বিতীয় টেস্টে কোন এক খেলোয়াড়ের অসুস্থতার জন্য গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জিও প্রথম টেস্টে খেলার সুযোগ পেলেন। ৩৭ রানে ৫টি উইকেট দখল করলেন আর ব্যাটেও তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে তাঁর ভাগ্য আরও খুলে গেল। অস্ট্রেলিয়ার পরাজয় প্রায় নিশ্চিত—হাতে ম্যাকেঞ্জির শেষ উইকেট। ডেভিডসনের সঙ্গে জুটিতে ৯৮ রান এবং ব্যক্তিগত ৩২ রান সংগ্রহ করে দলকে বিপন্মুক্ত করলেন; এই খেলাই অস্ট্রেলিয়ার অনুকূলে এ্যাসেজের ভাগ্য নির্ধারিত করল।

দ্বিতীয়বার ইংলণ্ড সফরের পর, ভারত এবং পাকিস্তান সফরের শেষে বোঝা যাচ্ছে ম্যাকেঞ্জি অস্ট্রেলিয়ার বোলিং আক্রমণের মেরুদণ্ড। এই সফরে তাঁর টেস্ট উইকেটের পুঁজি ৯৭-এ পৌঁছেছিল। আর কিছুদিন

পূর্বে **মেলবোর্নে** পাকিস্তানের সঙ্গে খেলায় **তাঁর** একশত উইকেট পূর্ণ হয়েছে। মাত্র ২৩ বছর বয়স্ক ম্যাকেঞ্জির সামনে পড়ে আছে বিরাট বিস্তৃত খেলোয়াড়ী জীবন, পড়ে আছে আরও মান-সম্মানের ডালি তাঁর ভবিষ্যতের পথের ধারে।

খেলার মেলা

ময়দানে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের মাঠে শেষ ১৯৬৪ সালের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃ কলেজ এ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা। প্রতিবারই এই ক'টি দিনের জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়াঙ্গন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নানা বর্ণের পতাকা একসঙ্গে শোভা পায় মাঠের এক পাশে, শামিয়ানার নিচে নানা রঙের মেলা, আর মাঠের মাঝে প্রতিযোগীদের সমাবেশ প্রাণসঞ্চার করে ময়দানের শ্যামল ঘাসের বুকে।

এবারের প্রতিযোগিতায় ছাত্রদের বিভাগে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর বিদ্যাসাগর সান্ধ্য বিভাগ ৬০ পয়েণ্ট সংগ্রহ করে বিজয়ী হয়, ছাত্রীদের বিভাগে বিজয়ীর সম্মান লাভ করে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ ২৪ পয়েণ্ট সংগ্রহ করে।

ছাত্রদের বিভাগে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ব্যক্তিগত বিজয়ীর সম্মান লাভ করেন গতবারের বিজয়ী বিদ্যাসাগর সান্ধ্য কলেজের শিশুতোষ মুখার্জী ১৯ পয়েণ্টে সংগ্রহ করে। ছাত্রীদের বিভাগে একাই ২৪ পয়েণ্ট সংগ্রহ করে বিজয়িনীর সম্মান লাভ করেন সুরেন্দ্রনাথ কলেজের চিত্রা গাঙ্গুলী।

● শিশুতোষ মুখার্জী

● ছাত্রীদের বিভাগে বিজয়িনী

এবারের আসরে কয়েকটি বিষয়ে নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বটে, তবে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নি। অবশ্য সুরেন্দ্রনাথ কলেজের উচ্চাঙ্গের ক্রীড়ানৈপুণ্য সকলের সাফল্যকে অতিক্রম করেছে। চিত্রার সংগৃহীত ব্যক্তিগত পয়েণ্টের সাহায্যেই সুরেন্দ্রনাথ কলেজ ছাত্রীদের বিভাগে বিজয়ী হয়েছে।

শেষে একটি কথা বলব, যদিও অনেকের কাছে সেটা অপ্রিয় লাগবে। এমন কয়েকজন প্রতিযোগীকে বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টসে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায় তাঁদের আমরা ছাত্র হিসাবে কোন্ কাল থেকে দেখে আসছি তা মনে নেই। এদের ছাত্রজীবন যে কবে শেষ হবে তা জানি না। এদের জন্য প্রকৃত ছাত্ররা তেমন সুযোগ পায় না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যতে এই দিকে দৃষ্টি দিলে ভাল হবে মনে হয়।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কালকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতী

শান্তিনিকেতনে, অভিজ্ঞানপত্র গ্রহণের
আচার্য এবং উপাচার্যের স্নেহ-শরণ
সম্মুখে বিশ্বভারতীর ধন্য-সমাহিত
স্নাতকোত্তর ছাত্রী।

বর্ষ, ৩১শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৬ই পৌষ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ • 31st December, 1964 • Vol.

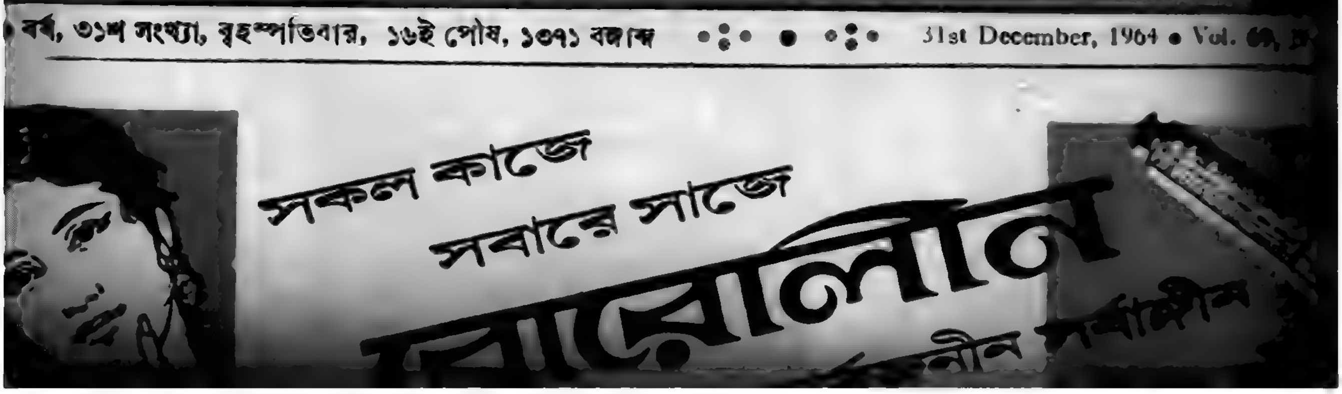

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	১৯২৩
আজকের মানুষ	...	১৯২৪
সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর	হরপ্রসাদ মিত্র	১৯২৫
আত্মদর্শন (কবিতা)	বেণু দত্তরায়	১৯২৭
ভারতদর্শন	..	১৯২৮
আন্তর্জাতিক		১৯৩৩
গ্রন্থমেলা	জয়ন্তী সেন	১৯৩৭
অদ্বিতীয়া (ধারাবাহিক উপন্যাস)	সুশীল রায়	১৯৩৮
শিলঙ: একটি শতবার্ষিকী আলেখ্য	সন্দীপ দাস	১৯৪১
শহর কলকাতা	শ্রীপদাতিক	১৯৪৫
নিঃসঙ্গ (কবিতা)	অনসূয়া দেবী	১৯৪৮
জীবন রংগ (গল্প)	নির্মলেন্দু রায়চৌধুরী	১৯৫১
বাণিজ্যে সেকাল ও একাল	ধনপতি সওদাগর	১৯৫৩

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠ্যপুস্তক)

মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার চণ্ডীর কাহিনী বাঙ্গালার বিশিষ্ট জাতীয় জীবনের কাহিনী। তাঁহার কাব্যে পাই মধ্যযুগের বাঙ্গালার নিখুঁত সমাজের সুস্পষ্ট আলেখ্য। শাসক সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্য্যাতিত বাস্তুচ্যুত মুকুন্দরাম দুঃখ ও বেদনাক্লিষ্ট বাঙ্গালার প্রতিনিধি কবি—ব্যক্তির দুঃখ কি করিয়া সর্ব্বজনের দুঃখ হইতে পারে বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা মুকুন্দরামই সর্ব্বপ্রথম দেখাইয়াছেন। এই হিসাবে তিনি আধুনিক বাঙ্গালার রোমান্টিক সাহিত্যসাধনার অগ্রদূত।

—বর্ত্তমান গ্রন্থে আছে—

১। মূল কাব্য, ২। সুবিস্তৃত ভূমিকা, ৩। কবির জীবনী, ৪। কাব্য-পরিচিতি, ৫। কবিকঙ্কণ যুগের বঙ্গভাষা (ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত), ৬। বিস্তৃত কাব্য সমালোচনা এবং ৭। অপ্রচলিত শব্দের অর্থ।

মূল্য সাড়ে চার টাকা

নীহাররঞ্জন গুপ্তের গ্রন্থাবলী

মূল্য সাড়ে তিন টাকা

কালো ভ্রমরের চমকপ্রদ বিস্ময়কর কাহিনীর মধ্য দিয়ে বিদেশী গোয়েন্দা-সাহিত্যের শার্লক হোমসের মত বুদ্ধিদীপ্ত কিরীটি রায়ের আবির্ভাব।

বাংলার মিস্ট্রী সাহিত্যে

ডাঃ নীহাররঞ্জনের দান অপূর্ব্ব

—তেরখানি নির্ব্বাচিত রচনা—

কালো ভ্রমর, করেঙ্কে য়্যা মরেঙ্গে, রক্তহীরা রক্তমুখী নীলা, পদ্মদহের পিশাচ, পঞ্চমুখী হীরা, রক্তগেরুয়া, ঘুম, কালচক্র, কবর, পাথরের চোখ, সর্প, অঙ্গুরীয়, প্রণাম জানাই

প্রতিষ্ঠাবান নাট্যকার ও প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মণিলাল গ্রন্থাবলী

২য় ভাগে—৬খানি রচনা ৩৩০ পৃঃ—৩

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা -১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আঁধারমাণিক (ধারাবাহিক উপন্যাস)	মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	১৯৫৫
ডিটেকটিভ সবাই হতে পারে (গোয়েন্দা-গল্প)	পরিমল গোস্বামী	১৯৫৮
আকাশে-বাতাসে (কবিতা)	শক্তি চট্টোপাধ্যায়	১৯৬৩
সখাসূয (কবিতা)	গৌতম গুহ	১৯৬৩
বঙ্গদর্শন	...	১৯৬৪
কলকাতায় নিউ সেক্সপীয়ার কোম্পানী	অশোক সেন	১৯৬৯
স্মৃতি বিষয়ক কবিতা (কবিতা)	শান্তিব্রত ঘোষ	১৯৭২
দময়ন্তী (কবিতা)	মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	১৯৭২
রঙ্গজগৎ	...	১৯৭৩
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	শিলাদিত্য	১৯৭৮
পাঠকমন	...	১৯৮১
খেলাধূলা	শ্রীঅমিতাভ	১৯৮২

বৈষ্ণব-সাহিত্যের অমূল্য অবদান

ভক্তিজগতের কৌস্তভরত্ন, ভগবদ্ভক্তগণের সাধনার ধন, ভক্তের তুলসী-মালা সদৃশ মহাপবিত্র ভক্তিশাস্ত্র সমন্বয়।

বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রলাপ ও শিক্ষাষ্টক

শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীকৃষ্ণলাভের জন্য যে উৎকণ্ঠা, এই 'প্রলাপে' তাহার অভিব্যক্ত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত 'শিক্ষাষ্টক শ্লোকই' তাঁহার একমাত্র রচনা। শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামীর সুললিত পদ্যানুবাদে এই অমিয় মাধুরী লীলায়িত।

নরোত্তম বিলাস

বৈষ্ণবগণের পরম উপভোগ্য উপজীব্য ভক্তিচরিতামৃত।

দুর্লভসার

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-রচয়িতা শ্রীল লোচনদাস বিরচিত, বৈষ্ণবগণের সংপূজিত।

আত্মতত্ত্ব

বৈষ্ণব দর্শনের সূক্ষ্মতম অনুসরণ।

মনঃশিক্ষা

শ্রীপ্রেমানন্দ দাস ঠাকুর বিরচিত। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত সাধন-ভজনের নিগূঢ় মর্মসমাহিত।

শ্রীচমৎকার চন্দ্রিকা

পরম পণ্ডিত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য পরম বৈষ্ণব শ্রীল কৃষ্ণদাসের সুললিত পদ্যানুবাদ।

পাষণ্ড-দলন

মূর্ত্তিমান বৈরাগ্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বিরচিত প্রেমভক্তির লহর-লীলা।

ভক্তিতত্ত্বসার

হাটপত্তন, শ্রীশ্রীগুরু-বন্দনা, নামসংকীর্ত্তন চৌত্রিশ পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম, নরোত্তম দাসের প্রার্থনা, প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা। সুলভে নামমাত্র মূল্যে বিতরিত।

মূল্য: ৩৭ টাকা।

প্রখ্যাত কথাশিল্পী

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়ের

রামপদ গ্রন্থাবলী

৩৯২ পৃষ্ঠা—মূল্য ৭ টাকা

গিরীন্দ্রমোহিনী দেবীর গ্রন্থাবলী

মূল্য—বার আনা

বিগতকালের বরেণ্য সাহিত্যস্রষ্টা

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—

ফোকলা দিগম্বর, পাপের পরিণাম, ডমরুচরিত।

মূল্য এক টাকা

২য় ভাগে—

ভূত না মানুষ, কঙ্কাবতী, মজার গল্প, মুক্তামালা।

মূল্য: দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

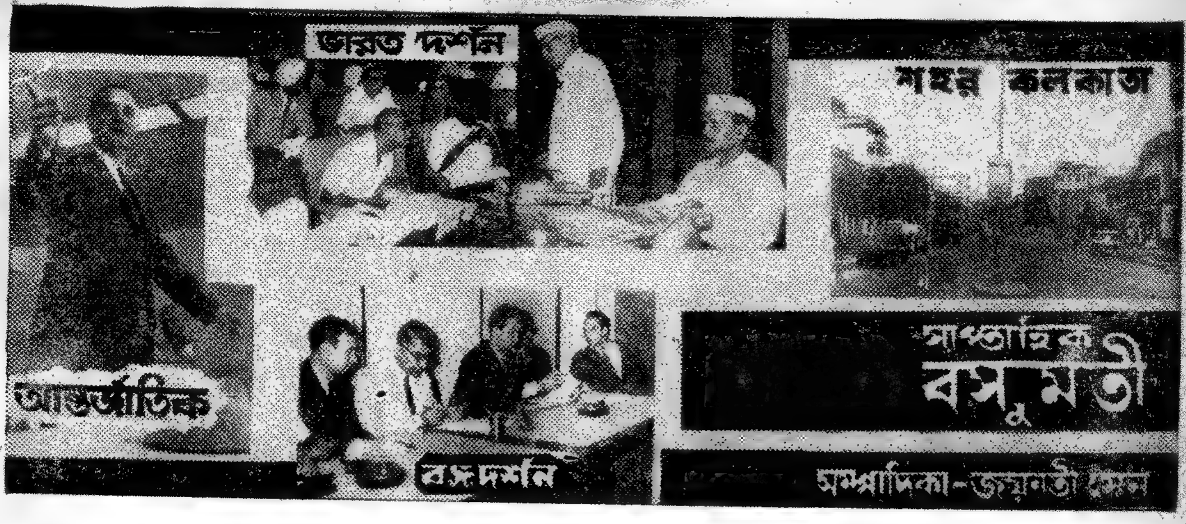

৬১ বর্ষ, ৩১শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পঃ
বৃহস্পতিবার, ১৬ই পৌষ ১৩৭১

25 Paise
Thursday, 31st December 1964

আগামী বছরের ভবিষ্যৎ

আজ ইংরেজি বছরের শেষদিন। এই ইংরেজি দিন তারিখ সালের সঙ্গে ভারতীয় মন কতটুকু মিল খুঁজে পায় জানি না, তবু এই সাল তারিখ আমাদের ব্যবহারিক জীবনের আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা রয়েছে।

বছরের শেষদিনটিতে ব্যাঙ্ক হিসেবের সঙ্গে আমরা যে আমাদেরও ভাঁড়ারের কথা চিন্তা করবো, একথা বলাই বাহুল্য। আগামী বছরের প্রারম্ভে নতুন করে চলাটা যেমন সত্য, তেমনি যে বছর শেষ হতে চলেছে—সেই বছরের কর্মকাণ্ড থেকে আগামী বছরের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করা অসম্ভব ব্যাপার নয়।

আমাদের সুবৃহৎ রাষ্ট্রের বৃহৎ শাসনযন্ত্র পরিচালনায় সরকারী কর্মচারীরা প্রধান স্থান অধিকার করে রয়েছে। সেই কোম্পানী আমল থেকে এই সব ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদের প্রয়োজনীয়তা ও দক্ষতা স্বীকৃত হয়ে আসছে। আবার সংখ্যায় বিপুল নিম্নবেতনের সাধারণ কর্মচারীদের বশম্বদ ভাবটির জন্য সরকারী হাল-চালনায় নানা তুফানের মধ্যেও কোনোদিন তেমন অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয় নি। এই সেদিন, যেদিন স্বাধীন ভারতবর্ষে জরুরী আইন বিধিবদ্ধ হোল, সেদিন দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যখন সরকারী কর্মচারীদের আপিসের সময় আধ ঘণ্টা বাড়িয়ে দেওয়া হোল, তখন একমাত্র দেশেরই স্বার্থে তারা সরকারী আদেশ শিরোধার্য করে নিল। অথচ সময় বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে জাতীয় আয় কতটা বৃদ্ধি পেল—সেই সম্পর্কে সরকার তেমন সচেতন নন। বরং ঐ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সময়ের জন্য অপব্যয় ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে কর্মে অবসাদ সৃষ্টি হয়েছে।

মধ্যবিত্ত সংসারের সমস্যা এখন সহস্রশীর্ষ। কিন্তু তাদের কথা সরকার কতটুকু ভেবেছেন? জিনিসপত্রের দাম এক এক বছরে যে অনুপাতে বৃদ্ধি পেয়েছে সেই তুলনায় তাদের বাঁধা বেতনের ওপর মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি পায় নি। দুঃখের ব্যাপার, সরকার মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির ব্যাপারে বেতন কমিশনের সুপারিশ মেনে নিলেও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেন নি।

অথচ জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্য, যানবাহনের ভাড়াবৃদ্ধিজনিত অতিরিক্ত ব্যয়, পুত্র-কন্যাদের স্কুল-কলেজের বেতন বৃদ্ধি ও বাড়ি ভাড়ার জন্য অতিরিক্ত অর্থ কোথা থেকেই বা আসবে? এই অবস্থায় চোখ বুজে থাকলে সাধারণ কর্মচারীদের পক্ষে আর্থিক সঙ্কটে রসাতলে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। এদের রক্ষার একমাত্র উপায়, সর্বস্তরে মূল্য কমিয়ে আনা অথবা ক্ষতিপূরণসহ সমানুপাতিক হারে মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি করা। দ্বিতীয়টি গ্রহণ করলে সরকার নিজেও মুদ্রাস্ফীতিজনিত অর্থনীতির সঙ্কটময় কাতরোক্তিতে পীড়িত হয়ে উঠবেন। বিচারপতি এস কে দাসের রায়ের জন্য অপেক্ষা না করে কলকাতার রাজপথে সওয়া চার লক্ষ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কর্মচারীর আকস্মিক নির্ভীক কণ্ঠে যে দাবি উচ্চারিত হয়েছে, তা যেমন একটি সাধারণ ঘটনা নয়, তেমনি আগামী বছরের ঘটনাকে এরা কোন পথে নিয়ে যাবে তা লক্ষণীয়। তবু চারদিকে মূল্যবৃদ্ধির বিক্ষোভের মধ্যে সরকারী কাঠামোয় এরা অপরিত্যাজ্য, সুতরাং সরকার এখনই এদের সম্বন্ধে সুবিচার না করলে ভবিষ্যৎ বড়ই শঙ্কাময়।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

যেন নজীর সৃষ্টি করতেই আসা। যেন এক একটি নাটকীয় দৃশ্য। দীর্ঘ তিরিশ বছরের রাজনীতির জীবনে তিনি অসংখ্য নজীর সৃষ্টি করেছেন। অবাক করেছেন বহুতর কর্মে ও চিন্তায়। অনেক অনেক ঘটনার তিনি বিরল-দৃষ্টান্ত আশ্চর্য নায়ক।

পাকা সমাজতন্ত্রী ডঃ রামমনোহর লোহিয়া। সম্পূর্ণত না হলেও তাঁর রাজনৈতিক জীবনের বর্ণ পরিচয় সুরু হয়েছিল মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে ১৯২৪ সনের গয়া কংগ্রেসে। পিতৃদেব হীরালাল লোহিয়া ছিলেন গান্ধীজীর শিষ্য এবং সেই সূত্রে বাল্যকাল থেকেই স্বাদেশিকতার আবহাওয়ায় লালিত। জন্ম ১৯১০ সালে। বোম্বাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বি-এ পাশ করেন কলকাতায়। তারপর কাশীতে কিছুদিন উচ্চতর শিক্ষালাভ করে ইউরোপ যাত্রা করেন। ইউরোপ থেকে ফিরে আসেন ১৯৩৩ সালে। তখন তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির ডক্টরেট। ডঃ লোহিয়া সেদিন স্বাভাবিক কারণেই যোগদান করলেন কংগ্রেসে। নেহরুর আহ্বানে একেবারে সদর দপ্তরে হাজির হলেন, তারপর দায়িত্ব পড়লো বৈদেশিক দপ্তরের। কাজের মানুষ ডঃ লোহিয়া সেদিন দেশের তাবৎ প্রগতিবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চললেন আর সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের তরুণ সমাজতন্ত্রীদের অন্যতম পুরোধা হয়ে বসলেন এবং সেই সঙ্গে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পত্রিকা সম্পাদনাও। সব মিলিয়ে এই সময় তিনি কংগ্রেসের অক্লান্ত কর্মী আর স্বাধীনতা যুদ্ধের অপরিহার্য একজন সেনানী।

রাজদ্রোহের অপরাধে বন্দী হন ১৯৩৮ সনে। তারপর সেই দু'বছরের কাহিনী। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৪ সালের মধ্যে ডঃ লোহিয়া এমন সব কাজ করেছিলেন, যার ফলে ইংরেজ সরকার কেবলমাত্র এই একটি মস্তিষ্ককে নিয়েই সেদিন দিবারাত্র দুঃস্বপ্ন দেখেছিল। ১৯৪৪ সালে লাহোর কোর্টে দীর্ঘ কারাবাসের পূর্ব পর্যন্ত সেদিন তাঁর অসামান্য কর্মসূচীর মধ্যে গোপন রেডিও স্টেশন পরিচালনা এক দুর্বর্ষ মনোভঙ্গীর পরিচয় সন্দেহ নেই।

স্বাধীনোত্তর যুগেও ডঃ লোহিয়া অপরিবর্তিত রয়ে গেলেন। সমাজতন্ত্রীরা কংগ্রেস ত্যাগ করে গড়ে তুললেন প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল। তাঁদের সঙ্গে ডঃ লোহিয়াও। সংগ্রামী, বিদ্রোহী ডঃ লোহিয়া কিন্তু বেশিদিন থাকতে পারলেন না। কোনো আপোষ হলো না। কোনো রফা হলো না। ১৯৫৬ সালে নিজেই একটি দল গড়লেন---ভারতের সোস্যালিস্ট পার্টি। অতি সাম্প্রতিককালে পি-এস-পি'র সঙ্গে যুক্ত হয়ে—সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টিতে পরিণতি লাভ।

১৯৬৩ সালের মে মাসে উপনির্বাচনে জয়লাভ করে ডঃ লোহিয়া লোকসভায় প্রবেশ করেন এবং সেখানেও তিনি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। হাল আমলের বহিষ্কারের ঘটনাটি নিঃসন্দেহে তাঁর চরিত্রের সঙ্গে সুসমঞ্জস।

মানবতাবাদী ডঃ লোহিয়া 'ম্যানকাইণ্ড' পত্রিকার সম্পাদক। ইংরেজি হটাও আন্দোলনের পুরোহিত ডঃ লোহিয়া ইংরেজিতেই কয়েকটি উৎকৃষ্ট বই লিখেছেন : 'হিমালয়ান পলিসি ফর ইণ্ডিয়া', 'ফ্র্যাগমেণ্টস অব এ ওয়ার্ল্ড মাইণ্ড', 'হুইল অব হিস্ট্রি' ইত্যাদি।

সমাজতন্ত্রের বক্তৃতা, ইংরেজি হটাও আন্দোলন, আমেরিকার বর্ণ-বিভেদের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ, আবার অন্যপক্ষে নেহরুর বিরুদ্ধে বিরামবিহীন আক্রমণ অথবা এমন সব তুচ্ছ ঘটনা যা চোখেই পড়ে না তাই নিয়েই ঝড়ের সৃষ্টি কিম্বা অতি সম্প্রতিকালের বহিষ্কারের ঘটনা—সর্বত্রই তিনি এমন এক ভূমিকায় অবতীর্ণ হন যার পরিণতি পরম বিচিত্রতার মধ্যে। সতেরো বছরে আঠারো বার কারাবরণ এও এক বিস্ময়কর ব্যাপার। মল কথা, খাপছাড়া খামখেয়ালীপনা অথচ প্রজ্ঞার গভীরতা, স্বধর্মে একনিষ্ঠতা সব মিলিয়ে কাঠিন্যের মাঝখানে কোথায় যেন একটু তারল্য। ঘন রঙের মাঝে একটু যেন ফিকে রঙের আমদানী।

ডঃ রামমনোহর লোহিয়া

সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর

হরপ্রসাদ মিত্র

ভাবনার শেষ নেই। জিরোবার সময় কোথায়?

পৃথিবীতে লোকচলাচল অন্তহীন। মনের ঘড়িতে দিনরাত,—প্রতি মুহূর্তে জন্ম-মৃত্যুর অশেষ টিক্ টিক্ বাজছেই। এই টিক্ টিক্ যখন কাছ থেকে কানে আসে, তখন সে যেন প্রচণ্ড দামামার আওয়াজ,—কী বিপুল তার সংখ্যা-পরিমাণ,—কী যে অমেয়, অগণন মনে হয় সব কিছু।

আমরা যে-কালে বিদ্যমান আছি, সেইটুকুই আমাদের বর্তমান। বর্তমান কালটুকুই আমাদের এই কাছের এলাকা। এই বর্তমান জুড়ে কত্তো মনের কতো রকম খেয়াল, কতো যে অভিব্যক্তি ঘটছেই। সাহিত্যে,—শিল্পের ক্ষেত্রে এইসব মতামত আর খেয়াল-খুশির বাদ-প্রতিবাদ থেকে একটু দূরে সরে না দাঁড়ালে শান্ত হবার পথ মেলে না।

অথচ, একথাও মানতে হবে যে, এইসব আন্দোলনের সঙ্গে একেবারে সম্পর্কচ্যুত হয়ে থাকাটাও সজীবতার লক্ষণ নয়। সবই দেখতে হবে, শুনতে হবে। পারিবেশ মানতেই হবে। কিন্তু বোধ হয়, কাছে কাছে থেকেও মনে মনে দূর রচনা চাই।

সেদিন ভারতীয় চারুকলার বার্ষিক শিল্প-প্রদর্শনী দেখতে গিয়েছিলুম। অনেক ছবি দেখলুম, কিছু ভাস্কর্যও দেখলুম। রূপকারের অনেক অনুভূতি সেসব। গাড়িবোঝাই মাটির কলসী একটি ছবিতে,—মেয়েরা দেখছে, বাছাই করে নিচ্ছে,—মাটিতে সাজিয়ে রাখা হয়েছে অনেক কলসী,—একজন পুরুষ উবু হয়ে বসে আছে সেই পসরার মধ্যে—আর-একজন ও ...—বোধ হয় বিক্রেতা তারাই। ভারি প্রত্যক্ষ এবং স্বাভাবিক একটি দৃশ্য। তাতে শিল্পী দেববর্মণ মশাই দর্শককে সোজাসুজি একটি দৃশ্যই উপহার দিয়েছেন; তাঁর রঙের উজ্জ্বলতা এবং ভঙ্গির সজীবতা আমার চোখে লাগলো। হুবলীর টি. কে. রাওয়ের 'ঝরণা' আর গোপাল ঘোষের নদীর দৃশ্য দেখলুম। ভারি খুশি হোলো মন।

সেখান থেকে অন্য ছবির দিকে এগিয়ে গেলম। দৃশ্য নয়,—যেন ইশারা। সেই ইশারার দিকে এগিয়ে গেলম। দেখলম মধুসূদন রাওয়ের 'ভিক্ষুক',—অজিত কেশরী রায়ের 'বীণাবাদক'। অশ্বিনীকুমার মোদির 'ক্লিওপেট্রা' দেখলম,—সুনীল মাধব সেনের 'নর্তক-নর্তকী'। অনীতা রায়চৌধুরীর 'কণ্ঠস্বর' আর পরিতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ধরিত্রী'র মানে বোঝবার চেষ্টা করলম। নিজেকে জিগেস করলম—অন্নদা মুন্সীর 'আফটার দি ক্রুসিফিকেশন'-এর তাৎপর্য কী?

পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর 'স্টেশন' কিন্তু এইসব ইঙ্গিতপ্রধান ছবির মতন নয়। সেও সাক্ষাৎ একটি দৃশ্য। সে রকম দৃশ্য আজকাল পথে-ঘাটে সকলেই দেখেছেন,—ছবিতে দেখতে পেয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে ছবির মিল অনুভব করতে অসুবিধা হবার কথা নয়। পুরুলিয়ার রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গ্রাম-লোক' চন্দ্রালোকিত আর-এক রাত্রির দৃশ্য। মানবেন্দ্রনাথ বড়ুয়ার 'চুনার দুর্গ',—যোশীর 'বোম্বাইয়ের রাস্তা',—ইন্দোরের জি. কে. পণ্ডিতের 'শ্রীনগর সেতু', মনোরঞ্জন সাহার 'হিমালয়ের পথ' আর 'হিমাচল প্রদেশের পথে' এবং এই রকম আরো কয়েকটি চমৎকার দৃশ্য দেখা গেল।

অঞ্জু চৌধুরীর 'কম্পোজিশন' কিন্তু অন্য ব্যাপার। আরো কয়েকটি 'কম্পোজিশন' দেখলুম। সে-সব আমাদের মতন সাধারণ দর্শকেরও চর্মচক্ষুর গোচর বটে, কিন্তু শিল্পীর মনের ব্যাপার,—তাঁর রঙ-রেখায় ছন্দের অনুভূতি। 'অবজেক্ট' নেই,—বাইরের বিবরণ নয়,—ভেতরের ব্যাপার।

সুধীর খাস্তগীরের 'বসন্ত-সমারোহ',—গণেশ হালোইয়ের 'সাঁওতাল মেয়ে', কস্তুরী দত্তের 'কাঠচাঁপা'—এবং এই রকম আরো অনেক ছবিই ভালো লাগলো এবং সেগুলিকে বাইরের বিবরণ বলে চিনতে অসুবিধা হয় না। সুকুমার দাসের 'হাবড়া-পুলের' ছবি দেখলুম। সতীশ সিংহ মশাইয়ের আঁকা আত্মচিত্র দেখলুম। সেখান থেকে আবার ফিরে এসে দেখলুম হায়দ্রাবাদের সূর্যপ্রকাশের আঁকা বর্ণোজ্জ্বল ছবি—'সূর্য আসে আমার দেশে'। গোপাল সান্যালের 'ঘোড়া' দেখলুম,—রাজকোটের কিশোর বানার 'টিলা-দৌড়' দেখলুম। এসব ছবিও অবজেক্ট-অবলম্বী বটে, কিন্তু এসব ক্ষেত্রে ইশারার দিকে শিল্পীর ঝোঁক বোঝা যায়। শ্যামল রায়ের 'মিনিক' এসবের তুলনায় আরো অন্তর্জাগতিক, অর্থাৎ ভেতরের ব্যাপার। রাজকোটের জম্বু রাওয়ারের 'এক বর্ষার রাত' এবং 'মিনারপুঞ্জ', ঠিক বিবরণ নয়—, দৃশ্যপটের উপর থেকে নিচে নেমে আসা কালোতে ধূসরে মেশামিশি রেখাগুলি দেখলুম; 'এক বর্ষার রাত' একটি অদ্ভুত এবং অখণ্ড অনুভূতি জাগিয়ে গেল মনে। 'স্টেটস্ম্যান' কাগজের পৃষ্ঠায় জলরঙের দক্ষ তুলির টান দেখলুম কুলদান করের 'রাত্রি-সমাগম'-এ।

প্রদর্শনীর সব ছবি দেখা হোলো না। বোম্বাইয়ের জ্যোতিরিন্দ্র রায়ের 'সম্মতি'

দেখেছিলুম। মাদ্রাজের সূর্যমূর্তির 'পরিবার'ও দেখেছিলুম। ভালো লেগেছিল, খুবই ভালো লেগেছিল। প্রদর্শনী থেকে বেরুবার আগে আমাকে আর একবার যে-দৃশ্যে ফিরে দাঁড়াতে হোলো, সে দুটিই জিয়াগঞ্জের নদীর দৃশ্য—ইন্দ্র দুগারের আঁকা। একটিতে রাত্রির নদী,—চারদিক অন্ধকার,—মাঝে মাঝে ক্ষীণ চন্দ্রালোক বুঝি,—তটে অন্ধকার নৌকোর সারি,—বালির বিস্তার, জলের ধারা। তার পাশেই দিবালোকে উজ্জ্বল আর এক নদী আর নদীতীর, কতো লোক স্নান করছে,—তাতে কী যে বিস্তারের সুখ।

সেই পরমাশ্চর্য বিস্তারের স্বাদ, আর রাত্রির সেই নিথর নদীর স্বাদ রইলো বোধে। 'অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস'-এর বাড়ির বাইরে এসে মাঠের ঘাস মাড়াতে মাড়াতে শিল্পলোকের নানা খেলার বিচিত্রতার কথা মনে এলো।

আমি ছবির সমজদার নই। ছবির ব্যাকরণ বুঝি না, অভিপ্রায়টা ধরবার চেষ্টা করি। একজন শিল্পীকে পেয়েছিলুম। ইশারা-প্রধান দু-একটি ছবির সামনে দাঁড়িয়েছিলুম তাঁকে পাশে রেখে। আমার ব্যাখ্যা শুনে তিনি হেসে বলেছিলেন,—আপনারা যা যা দেখছেন, হয়তো চিত্রকর নিজে ঠিক সেই সেই দিকই দেখাতে চান নি। হয়তো, আপনারা মূল অভিপ্রায়ের চেয়ে বেশি দেখছেন, হয়তো বা কমও। কিন্তু তাতে কী আসে যায়।

আমি জানি না, এ-মেজাজ অবজেক্ট থেকে সরে দাঁড়াবার ভিন্নমুখিতার ফল কী না। হয়তো তাই। হয়তো পরিচ্ছন্ন সর্বজনীনতার পক্ষে অবজেক্টের অবলম্বন থাকা দরকার। পুরো নির্বস্তুকতা একটা দায়হীন এলাকা। 'তুমি যেমন বোঝো, তেমনি দেখো',—কথাটা সাধারণ সত্য বটে, কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে ওটা চালাও অনুজ্ঞাবাচক হলে রূপের ব্যাকরণ ভেঙে গিয়ে স্বেচ্ছাচারিতা ঢুকবে না কি?

হঠাৎ মনে হোলো, মন আমাদের ঘাসের মতন। ময়দানে যতো ঘাস,—সতেজ, সবুজ, জীবন্ত,—মানুষের মনও সেই রকম। এতো মনের এতো অজস্র দৃষ্টিবিন্দু,—কখনো সূর্যের আলোয় ঝলমল করে ওঠে, কোথাও বা ইন্দ্র দুগারের জিয়াগঞ্জের রাত্রির নদীর দৃশ্যের মতন নিথর, নিস্তব্ধ,—এতো ভাবনার, অবস্থার, আদর্শের বিচিত্রতা থাকবে কোথায়? কিছুই চিরস্থায়ী নয়,—সাহিত্যও নয়, কোনো বিশেষ আর্টই নয়।

শুধু প্রতি মুহূর্তের জন্ম-মৃত্যুর অফুরন্ত এই টিক্ টিক্ শুনে যাওয়াটাই জীবিত মনের মননের অঙ্গ। সাহিত্যের নানা হাওয়াও এই ধারাগতি। স্বেচ্ছাচারিতা আর স্বাধীনতা এক ব্যাপার নয়, ঠিকই। দুটো এলাকা যদিও স্পষ্ট আলাদা করে অনুভব করা যায়, তবু ঠিক দুয়ের মাঝামাঝি সীমারেখাটা সুচিহ্নিত নয়। কৃতিত্ব আর ব্যর্থতা ছড়িয়ে আছে পাশাপাশি,—জড়িয়ে আছে পরস্পরকে। কে বলবে—'এইখানে, ঠিক এইখানেই ব্যর্থতার অবসান, সার্থকতার সূচনা?' নদীর তট যেটা, সেটা জল-স্থলের ওতপ্রোত সংযোগ।

'বীথিকা'য় রবীন্দ্রনাথের 'অতীতের ছায়া' পড়েছিলুম কবে। মনে পড়লো সেই কবিতার দুটি কথা—'রূপময় বিশ্বধারা'। তাতে রবীন্দ্রনাথের শেষ প্রহরের অন্তর্লোকের গুহাচিত্রের ইশারা ছিল। বলেছিলেন—

মহা-অতীতের সাথে আজ আমি
করেছি মিতালি—
দিবালোক-অবসানে তারালোক জ্বালি
ধ্যানে যেথা বসেছে সে
রূপহীন দেশে;

তিনি সেই অতীতের কণ্ঠহারে দুলতে দেখেছিলেন—'প্রাচীন শতাব্দীগুলি শান্ত-চিত্তদহন বেদনা—মাণিক্যের কণা।' নিজের দিনাবসানের বেদনার মধ্যে তিনি অনুভব করেছিলেন—'অতীতের শূন্য তার সৃষ্টি মেলিতেছে মোর মনে।'

শিল্পের সজীবতা এবং নশ্বরতা দুই-ই সত্য বলে অনুভব করলুম। বোধ হয়, শিল্পসৃষ্টির কাজই তাই। মাঝে মাঝে মানুষকে এই জীবন-সত্যের বোধটুকু নতুন করে পেতে হয়। ছবি, সাহিত্য, গান আমাদের এই বোধ জাগিয়ে দিয়ে যায়। মহাভারতের স্ত্রী-পর্বে শোকগ্রস্ত ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনা দিয়ে বিদুর বলেছিলেন—সমস্ত সঞ্চয়ই একদিন ক্ষয় হয়, উন্নতির পরে পতন হয়, সংযোগের পরে বিচ্ছেদ ঘটে, জীবিত প্রাণীর মৃত্যু হয়।

সেদিন ময়দানের ঘাস মাড়াতে মাড়াতে দুপুরের রোদের আরামও পেলুম,—আর এই মহাবিরতির চিরায়ত তর্জনীচিহ্নও দেখলুম। মনে হোলো জন্ম-মৃত্যুর ঘড়ির বাজনাটা আমার খুব কাছাকাছি নেই আর। যেন দূর থেকে শুনতে পাচ্ছি। যেন বর্তমানের নানান সাহিত্যিক বাদ-প্রতিবাদের গা-ঘেঁষাঘেঁষি অবস্থান থেকে কিঞ্চিৎ সরে দাঁড়াতে পেরেছে মন। সেই আমার অদ্ভুত মন এই মহাকোলাহলময় কলকাতার নেহরু-রোডের জনযান চলাচলের দৃশ্যের মধ্যে বাস করেও রবীন্দ্রনাথের 'বীথিকা'র কবিতা আবৃত্তি করলো—

হে অতীত,
শান্ত তুমি নির্বাণ-বাতির
অন্ধকারে,
সুখ-দুঃখনিষ্কৃতির পারে।

কিন্তু সে কি শুধু অতীতকে সম্বোধন? সে কি বর্তমানকে এড়িয়ে যাওয়া? সমস্ত অতীত এবং বর্তমান এবং ভবিতব্যের একাকার সম্পূর্ণতার উদ্দেশ্যে মন বললে—

শিল্পী তুমি, আঁধারের ভূমিকায়
নিভৃতে রচিছ সৃষ্টি নিরাসক্ত নির্মম কলায়,

মরণে ও বিস্মরণে বিগলিত বর্ণ দিয়া লিখা
বর্ণিতেছ আখ্যায়িকা।
পুরাতন ছায়াপথে নূতন তারার মতো
উজ্জ্বলি উঠিছে কত,
কত তার নিভাইছ একেবারে
যুগান্তের অশান্ত ফুৎকারে।

তবু, আমার মতন একজন অতি সাধারণ মানুষের পক্ষে সেও কয়েক মিনিটের মেজাজ। নিরাসক্তি সহজ কথা নয়। জীবনে কখনো কখনো তার শুভ আলোক-রেখাটুকু দেখা যায়। তারপর, আবার কাছের টিক্ টিক্ দামামার মতন হঠাৎ প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। মনে বিঁধতে থাকে নগদ যন্ত্রণাগুলো। সাহিত্যের শিল্পলীলার রূপটা হঠাৎ আবার যেন চোখের সামনে থেকে সরে যায়। তখন এক-একটা ভঙ্গিকে এতোই দুর্বোধ্য অথবা অবান্তর মনে হয় যে, পাঠকের পক্ষ থেকে সে-সব প্রতারণা বলে বোধ হয়। আমি জানি, লেখকরা এই উক্তির অপরাধ মার্জনা করবেন। নিরবধি কালের আঙিনায় দাঁড়িয়ে তাঁরা যদি অনুগ্রহ করে এই 'প্রতারণা' শব্দটি লক্ষ্য করেন, তাহলে তাঁরাও এ শব্দের রূঢ়তা বিস্মৃত হবেন।

প্রতারণার চেষ্টা যে মূঢ়তা, তাতে সন্দেহ নেই। মানুষ মাত্রেই মূঢ় হতে পারে। লেখকরাও মানুষ। অতএব তাঁরাও নিজেদের ক্ষেত্রে মূঢ় আচরণের সম্ভাবনা পুরোপুরি বাতিল করবেন কেন? অকৃত্রিম ব্যর্থতার নাম 'প্রতারণা' নয়। প্রতারণা কতকটা উদ্দেশ্য-সচেতন ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছিলেন—'শুধু ভঙ্গি দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ'।

সেদিন বাড়ি ফিরে, আমি রাজশেখর বসুর মহাভারতের সারানুবাদ খুলে স্ত্রী-পর্বের সেই সান্ত্বনার কথাগুলি আবার দেখলুম। দেখতে দেখতে আলবেয়ার কামুর গভীর ব্যঙ্গ-বেদনাময় একটি গল্প মনে পড়লো—ইংরেজি অনুবাদে যার শিরোনাম 'দি আর্টিস্ট অ্যাট ওয়ার্ক'। সমকালীন মতামতের প্রতারণা যে কী সর্বনাশা ব্যাপার, কামু সে-গল্পে তাই-ই ফুটিয়েছেন। কামুর সে-কাহিনীর সঙ্গে আমি ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের এই সান্ত্বনার কথাগুলি মনে মনে মিলিয়ে নিলুম—

'কুরুশ্রেষ্ঠ, কালের কেউ প্রিয় বা অপ্রিয় নেই, কাল কারও প্রতি উদাসীনও নয়, কাল সকলকেই আকর্ষণ করে নিয়ে যায়।—গর্ভাধানের কিছু পরে জীব জরায়ুতে প্রবেশ করে, পঞ্চম মাস অতীত হলে তার দেহ গঠিত হয়। অনন্তর সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ হয়ে ভ্রূণরূপে সে মাংস-শোণিতযুক্ত অপবিত্র স্থানে বাস করে। তারপর বায়ুর বেগে সেই ভ্রূণ ঊর্ধ্বপাদ অধঃশিরা হয়ে বহু কষ্ট ভোগ করে যোনিদ্বার দিয়ে নির্গত হয়। সেই সময়ে গ্রহগণ তার কাছে আসে। ক্রমশ সে স্বকর্মে বদ্ধ হয় এবং বিবিধ ব্যাধি ও বিপদ তাকে আশ্রয় করে, তখন হিতৈষী সুহৃদগণ তাকে রক্ষা করেন। কালক্রমে যমদূতেরা তাকে আকর্ষণ করে, তখন সে মরে। হা, লোকে লোভের বশে এবং ক্রোধ ও ভয়ে উন্মত্ত হয়ে নিজেকে বুঝতে পারে না। সৎকুলে জন্মালে নীচকুল-জাতের এবং ধনী হলে দরিদ্রের নিন্দা করে, অন্যকে মূর্খ বলে, নিজেকে সংযত করতে চায় না। প্রাজ্ঞ ও মূর্খ, ধনবান ও নির্ধন, কুলীন ও অকুলীন, মানী ও অমানী সকলেই যখন পরিশেষে শ্মশানে গিয়ে শয়ন করে তখন দুষ্টবুদ্ধি লোকে কেন পরস্পরকে প্রতারিত করে

(ক্রমশঃ)

আত্মদর্শন

বেণু দত্তরায়

কী চাও তুমি, আমার আশ্চর্য আত্মদর্শন
যারা লণ্ঠনের মতো আলো ছুঁড়লো, রোববারের বিকেলে
যখন হাউইটা উড়ল শূন্যে
যাবে কি না-যাবে, বল্গাবিহীন এ-প্রত্যাশা।

আবেদ অস্থির স্তব্ধতা নামলে, রৌদ্রের পর বৃষ্টি,
রাত্রির আকাশে তারা উঠলে, তরঙ্গ
যখন তোমাকে কেন যে মনে আসল
কেন যে যৌবন আলেয়াকে ভালবাসল?

যৌবন, তুমি কী চাও কী চাও
আকাশ, অপার নীলিমা, মধ্যরাত্রি,
অন্ধকার রাত্রে কেন ছায়া-ছায়া অরণ্যে ফেরো
মধ্যরাত্রি, অস্থির গান বাজাও কেন স্নায়ুতে
নীলামের ঘণ্টা বাজাও প্রহরে-প্রহরে
হাউইয়ের মতো শূন্য ছুঁড়ে দাও
নিষ্ঠুর আত্মদর্শনে।

ভারত দর্শন

● মার্চেণ্টস্ চেম্বার অফ কমার্স আয়োজিত আলোচনা-চক্রে শ্রীঅশোককুমার সেন ভাষণ দিচ্ছেন।

রাজধানী ঃ

হিম-প্রবাহ প্রশমিত হয়েছে। রাজনৈতিক ঝড়ো হাওয়া চলেছে এখন রাজধানীতে। তার দাপাদাপিতে তুষার-শীতল পরিবেশ কেটে গিয়ে কিছুটা উত্তাপেরও সঞ্চার হয়েছে। রাজধানীর হিমেল হাওয়ার ঘোর কাটিয়ে উঠতে সব চাইতে বেশি সাহায্য করেছেন ডঃ রামমনোহর লোহিয়া। তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রীতিতে এমন জেদ করতে থাকেন যাতে স্পীকার বাধ্য হন বর্তমান অধিবেশনের অবশিষ্ট কালের জন্য তাঁকে সাসপেণ্ড করতে।

ডঃ লোহিয়া চিরকালই অসহিষ্ণু বিদ্রোহী। ঠোঁটকাটার মত কড়া কড়া ভাষণ দানেরও সুনাম তাঁর রয়েছে। অনেক দল গড়েছেন, দুদিন পরই মতের গরমিল দেখা দিয়েছে সঙ্গীদের সঙ্গে। অক্লেশে বেরিয়ে এসেছেন সকলকে ত্যাগ করে।

প্রধানমন্ত্রীর কাজের সমালোচনার জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপনের নোটিশ দিয়েছিলেন ডঃ লোহিয়া। তাঁর অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী কোন প্রতিশ্রুতি কার্যকরী করছেন না। কাজেই তাঁর প্রস্তাবটি উত্থাপিত না হলে তিনি স্পীকারকে কাজ চালাতে দিতে পারেন না।

গণতন্ত্রে বিরোধিতারও একটা সীমা আছে। স্পীকার সেই কথাটির উল্লেখ করে বলেছেন, কোন সদস্য খুশিমত প্রস্তাব উত্থাপনের মনোভাব দেখালে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাজ চলতে পারে না। ডঃ লোহিয়া নাছোড়বান্দা। স্পীকার এর পর বাধ্য হন সংসদের বিধি অনুযায়ী 'কঠোর' ব্যবস্থা অবলম্বন করতে। স্পীকার তাঁর আদেশ জারীর আগে পরিষ্কার ভাষায় তাঁর বক্তব্য ব্যাখ্যা করে বলেছেন, ধৈর্য ও সহনশীলতার যথেষ্ট পরিচয় তিনি দিয়েছেন। তাঁর মর্যাদার ওপর আঘাত হানা হচ্ছে। অতএব তাঁকে সংসদের বিধি অনুযায়ী কাজ করতেই হবে।

• • • •

ডঃ লোহিয়ার পরই দিল্লীর রাজনৈতিক হাওয়া বদলের বড় অবদান তাঁর এক সময়ের পরম বন্ধু শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ। নাগাভূমিকে সিকিমের পর্যায়ে টেনে তোলার একটি বিবৃতি দিয়ে বসেছেন। ভূদান নেতার এই আচরণে মানুষ এখন ধৈর্য হারাতে বসেছে। শান্তি মিশনের এ জাতীয় প্রচারের জন্য তাঁকে মিশন থেকে বহিষ্কারের দাবি উঠেছে আজ সর্বত্র। পরলোকগত প্রধানমন্ত্রীর জীবিতকালেই তাঁর প্রথম জীবনের সহচর জয়প্রকাশজী সম্পর্কে সাবধান হতে আমরা ভারত সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছিলাম। রাজনীতিতে পাত্তা না পেয়েই তিনি ভূদান যজ্ঞে যোগদান করেছেন। সক্রিয় রাজনীতি যাঁর জীবনের ধর্ম নয়, তাঁকে রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে দূরে রাখলেই ভাল।

জয়প্রকাশজী পাকিস্তানের পরম দোস্ত। তিনি আশঙ্কা করেন, পাকিস্তান অশান্ত হলে ভারতের চরম দিন ঘনিয়ে আসবে। কাজেই যেন-তেন প্রকারে পাকিস্তানের সন্তুষ্টি বিধান তাঁর কাম্য। কাশ্মীর ছাড়তেও তিনি কুণ্ঠিত নন। পাকিস্তানের পর ভারতের বিরাট ভূখণ্ড উপঢৌকন দিয়ে চীনের সঙ্গে সীমানা বিরোধ মেটাতেও তিনি উমেদারী কম করেন নি। এবারে নাগাভূমিকে সিকিমের সমপর্যায়ে তুলে দিয়ে কাশ্মীরের মতই আরেকটি ক্ষত উত্তর-পূর্ব ভারতে করার সুপারিশ তিনি করে বসেছেন। জয়প্রকাশজী যত বড় নেতাই নিজেকে মনে করুন না কেন, দেশের মানুষ তাঁর বাড়াবাড়ি আর সহ্য করতে পারছে না।

লোকসভায় তাঁর অভিনব সুপারিশ নিয়ে বেশ তোলপাড়ের সৃষ্টিই হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, নাগাভূমির শান্তি মিশন অনুরূপ কোন প্রস্তাব পেশ করলে মিশনকেই বাতিল করে দেওয়া হবে। এই মিশন বাতিলের আগে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের আচরণ সম্পর্কে ভারত

● শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ

সরকারের বিধানসম্মত ব্যবস্থা অবলম্বন করলে ভবিষ্যতে বিপদ কম ঘটবে। দুম করে তিনি মাঝে মাঝে যেসব বাণী দিয়েছেন, তাতে ভারতের মর্যাদা বিশ্ববাসীর চোখে কতটা হানি হয়েছে, ভারতের শত্রুরা ভারতের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে কতটা সুবিধা পেয়েছে তাও বিবেচনা করা সরকারের উচিত হবে।

• • •

দেশের প্রশাসনিক সুবিচারের দিক থেকে রাজস্ব বিষয়ক ও প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের ভূমিকা নিয়ে কলকাতায় অনুষ্ঠিত একটি আলোচনা-চক্রে কেন্দ্রীয় আইন ও সামাজিক নিরাপত্তা মন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন আইনের নিতান্ত প্রাঞ্জল ভাষায় বিশ্লেষণ করে বলেছেন, ট্রাইব্যুনাল ন্যায় বিচারের প্রকৃত বাহন। আয়কর আপীল ট্রাইব্যুনাল উঠিয়ে দিয়ে সকল বিরোধ মীমাংসার জন্য হাইকোর্টের দুয়ারে ধর্ণা দিলে জটিলতা ও সমস্যা আরও বাড়বে। আপীল ট্রাইব্যুনাল দক্ষতা ও যোগ্যতার পরিচয়ই দিয়েছে। বিশেষ করে, হিসাব-নিকাশ প্রভৃতির ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা বিচার করার পদ্ধতি অধিক ফলপ্রদ। তা' ছাড়া, মামলার নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার প্রয়োজন সর্বাধিক। ট্রাইব্যুনালেই সে কাজ সম্ভব।

• • •

এসোসিয়েটেড চেম্বার অফ কমার্সে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার গুরুত্ব ব্যবসায়ী মহলের কাছে সমধিক। এই বক্তৃতাতেই ঘোষিত হয় ভারতের পরবর্তী বছরের অর্থনীতি। কলকাতায় এসোসিয়েটেড চেম্বার্সের বার্ষিক অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী এবার কোন চটকদার কথা বা বিতণ্ডামূলক তর্কের অবতারণা করেন নি। বোঝাপড়া ও সহযোগিতার ভিত্তিতে আগামী দিনের রচনাত্মক কাজে অগ্রসর হতে অনুরোধ জানিয়ে বলেছেন, দুর্নীতি দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আমাদের অবলম্বন করতেই হবে। এ প্রচেষ্টায় আমি সকলের সাহায্য কামনা করি। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে লগ্নীর পরিমাণ ও ভাগাভাগি নিয়ে ব্যবসায়ী মহলে যে-সংশয় দেখা দিয়েছিল তা' নিরসন করে শ্রীশাস্ত্রী জানিয়েছেন, সরকারী ও বেসরকারী সকল স্তরেই দেশের কল্যাণে অর্থ নিয়োগের সুবিধা থাকবে। সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধনই হবে পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। শিল্পে বৈদেশিক সহযোগিতার ব্যাপারেও উদারতর নীতি প্রবর্তনের আশ্বাসই দিয়েছেন।

কৃষির উৎপাদন চক্রবৃদ্ধি হারে বৃদ্ধি হলেই মূল্যস্থিতি আসবে এবং ঘাটতির প্রতিকার হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন।

সহযোগিতার কথাটাও নতুন নয়। প্রধানমন্ত্রী ব্যবসায়ীদের প্রতি আগেও সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর উদারতায় কোন ফললাভই হয় নি। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিও শেষ কথা নয় বলেই আমরা মনে করি। কৃত্রিম অভাব সৃষ্টির সুযোগ যতদিন ব্যবসায়ীদের হাতে থাকবে ততদিন মূল্যস্থিতি আসতে পারে না। অসম বণ্টন ও কৃত্রিম অভাব সৃষ্টির ফলেই আজ খাদ্যে এত অধিক ঘাটতি দেখা দিয়েছে। ব্যবসায়ী মহলের অসহযোগিতার জনাই আজ বাজারে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছে। কংগ্রেস সংসদ দলের কার্যকরী সমিতির সভায় এ নিয়ে সকলেই উদ্বেগও প্রকাশ করেছেন। কাজেই ব্যবসায়ীরা যাতে সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসতে বাধ্য হয় সেরূপ পন্থা অবলম্বন করাই হবে সরকারের প্রধান কাজ।

পাঞ্জাব ঃ

গুরুদ্বারের নির্বাচন আসন্ন। আকালীদের মধ্যে সাজ সাজ রব উঠেছে। মাস্টার তারা সিং ও সন্ত ফতে সিং-এর অনুগামীরা পরস্পরকে ঘায়েল করার জন্য নতুন করে বিভিন্ন রাজনৈতিক

● মাস্টার তারা সিং

দলের সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন।

একশ' বিশটি আসনের জন্য লড়াইয়ে নেমে পড়েছেন প্রায় সাড়ে তিনশ' প্রার্থী। বিশ লক্ষ ভোটদাতা আগামী ১৭ই জানুয়ারী নির্বাচন করবেন একশ' চল্লিশ জন প্রতিনিধিকে। এর মধ্যে বিশটি আসন অবশিষ্ট সংরক্ষিত। এঁদের নিয়ে গঠিত হবে শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটী। এক কোটি টাকার বার্ষিক বাজেট নির্ভর করে এই কমিটীর হাতে। এমন একটি কমিটীকে হাতছাড়া বিচক্ষণ রাজনীতিক করতে পারেন না।

পাঞ্জাবের বর্তমান শাসকগোষ্ঠী মাস্টার তারা সিংকে এড়িয়ে চলছেন। তাঁর পরাজয়ই এ পক্ষের কাম্য। মাস্টারের অনুগামীরা সকলেই সর্দার কায়রোঁর সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ। এ অবস্থার

● সন্ত ফতে সিং

প্রকাশ্যে কিছু না বললেও সন্ত ফতে সিং-এর দলের সমর্থন গোপনে তাঁদের করতেই হবে।

সর্দার কায়রোঁ কিন্তু একেবারে নির্বাক। কোন কথা না বলে, নীরবে বসে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর ইঙ্গিতেই দলের লোকজন কাজ করছে মাস্টারের সমর্থনে। এই নির্বাচনের গুরুত্ব তাঁর কাছে অধিক। সন্তের দলবলকে হঠাতে পারলে ভবিষ্যতের পথ তাঁর পরিষ্কার হবে অনেকখানি। এই শক্তিশালী সংস্থা হবে রাজনৈতিক রণে তাঁর প্রধান সহায়।

প্রজাতন্ত্রী প্রাক্তন দুজন মন্ত্রী সর্দার গিয়ান সিং রারেওয়ালা এবং গিয়ানী কর্তার সিং পর্দার আড়াল থেকে মাস্টার তারা সিংকেই সমর্থন করছেন।

● সর্দার কায়রোঁ

মাস্টারের সঙ্গে যাতে কোন গোলযোগ না বাঁধে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই তাঁরা আসন বন্টন করেছেন। গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটির মধ্য দিয়ে তাঁরাও রাজনীতিতে ফিরে আসার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন।

সব চাইতে ফ্যাসাদে পড়েছেন কমিউনিস্ট নেতারা। গ্রামাঞ্চলের শিখ-সমাজে তাঁদের সমর্থক নেহাৎ কম নয়। এদিকে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দেওয়াও বিপ্লবের পরিপন্থী। ঢাক-ঢোল পিটিয়ে তাই তাঁরা প্রচার করতে চাইছেন গুরুদ্বারের ব্যাপারে তাঁরা নেই। তাঁরা সরাসরি কোন প্রার্থীও নিয়োগ করেন নি, তা সত্ত্বেও সন্তের দলের সমর্থন তাঁদের করতেই হচ্ছে। প্রগতির পবিত্র গঙ্গাজল ছিটিয়ে কমিউনিস্ট ভাইয়েরা বলে বেড়াচ্ছেন সন্ত ফতে সিং উগ্র সাম্প্রদায়িক মোটেই নন—তাঁর দলের লোকেরা প্রগতিপন্থী। এ ছাড়া, নির্দলীয় মার্কা দিয়ে নিজেদের মনের মানুষদেরও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামানো হয়েছে। নির্দলীয় মার্কা কমিউনিস্ট প্রার্থীরা গুরুদ্বারের গুরুত্ব না দিয়ে ভোটদাতাদের কছে আর্থিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি তুলে ধরছেন।

কমিউনিস্ট ভাইদের বাম অংশ তাঁদের পুরোনো বন্ধু মাস্টারের মোহ ত্যাগ করতে না-পেরে একেবারে চরমবাক্য প্রয়োগ করেছেন। আকালীদের দু'দলকেই সমান সাম্প্রদায়িক ঘোষণা করে তলে তলে তারা সিং-এর সাহায্য করে চলেছেন।

কাশ্মীর ঃ

কাশ্মীরের শের নাকি অনেকটা প্রকৃতিস্থ হয়েছেন। মাঝে মাঝে হুঙ্কার দিলেও আগের মত আর আস্ফালন করেন না। আন্তর্জাতিক খ্যাতির মোহও তাঁর প্রায় কেটে এসেছে। শেষ চেষ্টা হিসেবেই তিনি হজ সেরে বিদেশ পর্যটনে বেরিয়ে পড়তে চেয়েছিলেন। ইরাক ও আরব দেশ হয়ে বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে মোলাকাত করাই ছিল তাঁর বাসনা।

আরব দেশে গিয়ে কোন ফয়দাই হতো না। কাশ্মীরের ব্যাপারে অবশ্য তাঁরা নাক গলাবেন না—ভারতকে কোন রকমে বিব্রত করা তাঁদের অভিলাষ হতে পারে না। ইরাকও ভারতের বিরুদ্ধে কুৎসা সহ্য করতে পারে না। কাজেই শেখ আবদুল্লাকে ছেড়ে দিলে ভালই হতো। তাঁর দৌড় কতদূর পরিষ্কার হয়ে যেতো।

● শেখ আবদুল্লা

কাশ্মীর সরকার তাও দিতে পারেন নি। প্রকাশ, শেখ আবদুল্লা ও তাঁর সহচর মির্জা আফজল বেগকে তীর্থযাত্রা ভিন্ন অন্য কোন দেশে যাওয়ার পাশপোর্ট দিতে রাজ্য সরকার সম্মত হতে পারেন নি। বৃটেনে যাওয়ার বাসনার কথাটা সরকার আরেকবার বিবেচনা করে দেখতে পারেন।

গুজরাট ঃ

সোনার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে যখন পার্লামেণ্টে তোলপাড় চলছে তখন কচ্ছ ও সৌরাষ্ট্রে এক কোটি টাকার চোরাই আমদানী সোনার খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল শুল্ক ও আবগারী কর্মচারীরা। তাদের তল্লাসীর অভিযান এখনও চলেছে অব্যাহত গতিতেই—চোরের কোন হদিস এখনও হয় নি।

গোপন খবর অনুযায়ী ২৫ লক্ষ টাকার সোনা এসেছে কচ্ছের পথে। সৌরাষ্ট্রে এসেছে বাকি পঁচাত্তর লক্ষ টাকার মাল। এসব সোনা আগে সাধারণত কুবাইত, মাস্কাট, বাহেরিন থেকে পাকিস্তান হয়ে। গোপন খবরটার তল্লাসীর কাজ গোপনে হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল। তা' না করে দীর্ঘদিনের অভ্যাসমত হৈ-হল্লা করে আমাদের অফিসার পুঙ্গবেরা সোনার বাজার গরম করে দিয়েছেন, ক'দিনের মধ্যে সোনার দাম বেড়েছে প্রতি তোলা দশ থেকে পনের টাকা।

কেরল ঃ

আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেনের সাম্প্রতিক বিবৃতি রাজ্য আইনসভার সাধারণ নির্বাচন স্থগিত রাখার সম্ভাবনা সম্পর্কে জনমনের বিভ্রান্তি নিরসনে সাহায্য করেছে অনেকখানি।

ভোট গ্রহণের প্রাথমিক পর্যায়ের কাজও নাকি এর মধ্যে শেষ হয়েছে। এখন বাকী কেবল নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ। কংগ্রেসের সাংগঠনিক দুর্বলতা লক্ষ্য করেই সাধারণ মানুষের মধ্যে নানা ধরণের জল্পনা-কল্পনা দানা বেঁধে উঠেছিল। প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব সে-সমালোচনার প্রতিবাদই করেছেন। নির্বাচন স্থগিত রাখার তাঁরা সম্পূর্ণ বিরোধী। নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবেই বেরিয়ে এসে নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের আশা তাঁরা রাখেন। নিজেদের শক্তি সম্পর্কে সুনিশ্চিত না হয়ে কেরলের শিক্ষা-সংস্কারের প্রচেষ্টায় কেউ নামতে পারেন না। কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচারপত্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাকে ব্যক্তিগত মালিকানার কলুষমুক্তির প্রতিশ্রুতি থাকবে। এ নিয়ে এক দফা আলোচনাও প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীতে হয়ে গেছে। সদস্যদের মধ্যে সামান্য মতভেদের কথাও অবশ্য শোনা যাচ্ছে।

শিক্ষা এ-রাজ্যের জটিলতম সমস্যা। এর জট ছাড়াতে গিয়ে প্রায় সকলেই বিপদে পড়েছেন। শিক্ষা-ব্যবস্থায় হাত পাকাতে গিয়েই কংগ্রেস মন্ত্রিসভা থেকে সুরু করে কমিউনিস্ট মন্ত্রিসভা বিপাকে পড়েছিল।

শ্রীরাজাগোপালাচারী

কেরলের প্রাইভেট স্কুলগুলোতে চলেছে ব্যক্তিগত মালিকানার ব্যবসা। মূলধন এতে কিছুই খাটাতে হয় না। অথচ লাভ প্রচুর। শতকরা পঁচাত্তরটির পরিচালক বেসরকারী সংস্থা। এসব বিদ্যালয়ে চাকরি পেতে হলে মোটা অঙ্কের নজরানা দিতে হয়। শিক্ষিত বেকার কেরলে অসংখ্য। কাজেই তিন হাজার টাকা পর্যন্ত বিদ্যালয়ে চাঁদা দিয়ে শিক্ষকতার পদপ্রাপ্তির প্রার্থীরও খুব একটা অভাব এখানে হয় না। কংগ্রেস সরকার তাঁদের অনুগামীদের আগে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুযোগ-সুবিধে দিয়েছেন। সে নীতির পরিবর্তন তাই দলের কিছুসংখ্যকের কাম্য নয়। তাঁরা মনে করেন, নীতি পরিবর্তনে সর্থকদের মতের পরিবর্তন হতে পারে। প্রদেশ কংগ্রেস প্রধানেরা এ মতে বিশ্বাসী নন। তাঁরা বলিষ্ঠ নীতি নিয়েই এগিয়ে যেতে চাইছেন। তা' ছাড়া, কংগ্রেসে মুষ্টিমেয় যে-ক'জন ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থে ব্যর্থ হয়ে ক্ষুণ্নমনে বামে হেলে পড়েছেন বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্তও নাকি তাঁরাই বেশি সংখ্যায়। তথাপি বিষয়টি কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পূর্বে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, শ্রীসাদিক আলি এলেই নির্বাচনী প্রচারপত্রের চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যাবে।

* * *

স্বতন্ত্র নেতা শ্রীরাজাগোপালাচারী এক চক্কর নির্বাচনী কসরত শেষ করে গেছেন। তূণ প্রায় শূন্য করে কংগ্রেস ও কমিউনিস্টের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছেন বাছাই করা বাক্যবাণ। কংগ্রেস নাকি খানায় পড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। ভারতের নাগরিকদের স্বাধীন চিন্তাশক্তি সম্পর্কে কংগ্রেস তাই সন্দিহান। কমিউনিস্টরা

শুভ আবির্ভাব শুক্রবার ১লা জানুয়ারী

ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদ রূপ ও সনাতন গোস্বামীর পূত জীবন-কাহিনীর অনবদ্য চিত্ররূপ।

শুভকল্প চিত্রমের

রূপ সনাতন

পরিচালনা: সুনীলবরণ ০ সুর: রথীন ঘোষ

শ্রে: গুরুদাস ০ রবীন ০ নীতীশ ০ বিপিন ০ প্রবীর ০ জহর ০ জহর রায় ০ পশুপতি ০ নবকুমার ০ শিপ্রা ০ সবিতা ০ রেখা ০ মিতা ০ জয়শ্রী ০ মলিনা দেবী

: একযোগে :

শ্রী - ইন্দিরা - রূপম - আলেয়া

আলোছায়া ০ সুরশ্রী ০ অজন্তা ০ পারিজাত ০ নবরূপম ০ মায়াপুরী ০ রূপায়ণ ও অন্যত্র

— ইন্দু পিকচার্স রিলিজ —

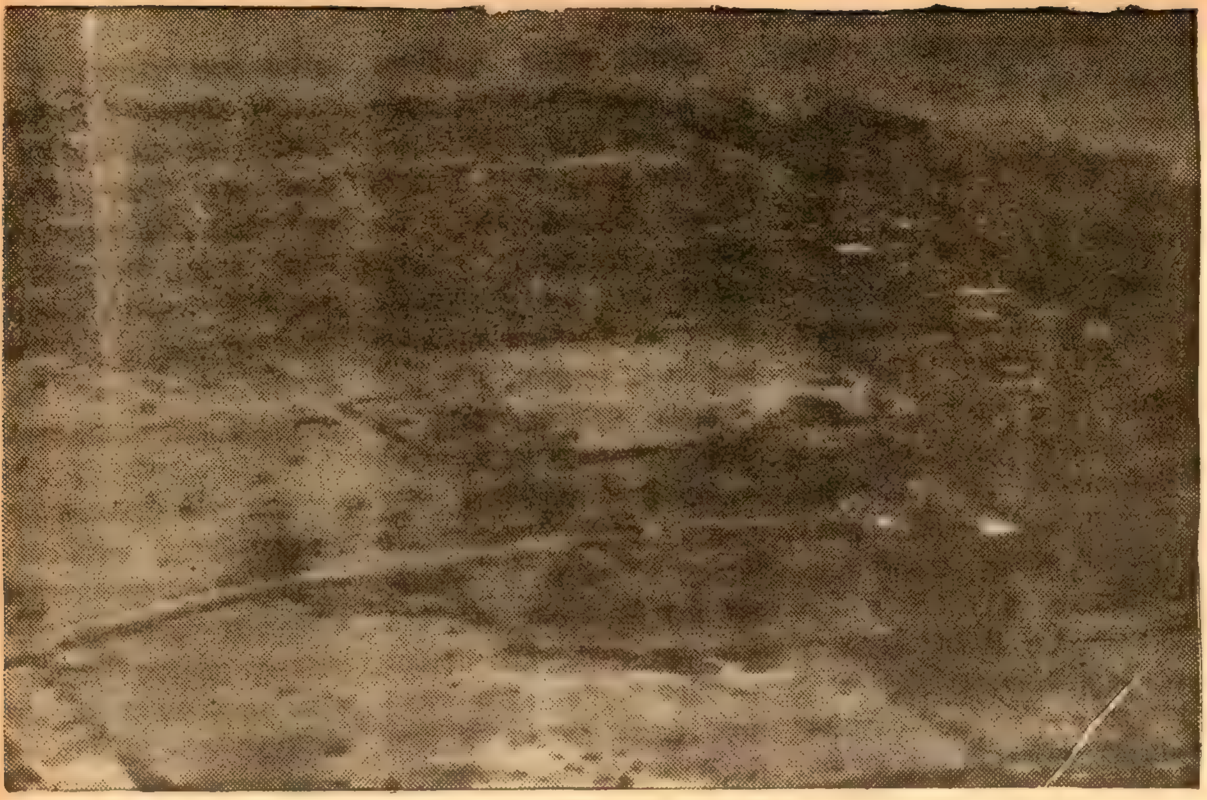

● বিমান থেকে গৃহীত বিধ্বস্ত রামেশ্বরম দ্বীপের একটি দৃশ্য

দেশদ্রোহী। আর কংগ্রেস হ'ল গণতন্ত্র-বিরোধী দল। কংগ্রেসের সমাজতন্ত্রবাদকে 'ঠাকুরদার ক্ষুর' নিয়ে 'ছোট্ট নাতীটির খেলার' সমতুল্য বলে তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

রাজাজীর কটাক্ষপাত ও বিদ্রূপাত্মক চাষা জনমনে কিন্তু কোন রেখাপাতই করতে পারে নি। কেরলে প্রাক্তন রাজা-উজীর বা বিরাট মুনাফার মালিক ব্যবসায়ী নেই। তা' ছাড়া, স্বতন্ত্র দল রাজাদের দল বলেই এ-রাজ্যের সাধারণ মানুষ জানে। এ-অবস্থায় রাজাজীর মন্তব্য খিস্তি-খেউড় হিসেবেই গণ্য হয়েছে।

মাদ্রাজ ঃ

রুষ্ট প্রকৃতির তাণ্ডবে রামেশ্বরম দ্বীপ বহির্বিশ্ব থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ধনুস্কোটির নিকটে প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণি-ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের প্রবল জলোচ্ছ্বাসে দ্বীপটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। মান্দাপাম ও রামেশ্বরম দ্বীপের মধ্যে যোগাযোগকারী বিখ্যাত পামবান সেতু প্রবল ঢেউয়ের দাপটে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। ঘূর্ণিবাত্যায় ধনুস্কোটিতেই দু'শ' জনের জীবনান্ত ঘটেছে। প্লাবনের ফলে সমগ্র দ্বীপে পাঁচ শতাধিক লোক নিহত হয়েছে। ঝড়ো হাওয়ার মধ্যে পামবান থেকে ধনুস্কোটিগামী একখানি যাত্রীবাহী ট্রেন একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। রেল দপ্তরের প্রেসনোট অনুযায়ী ট্রেনটি একশ' দশজন যাত্রী ও পাঁচজন রেল-কর্মীর কেউ বেঁচে নেই।

রামেশ্বরমের এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় সারা ভারতই আজ সমবেদনা অনুভব করছে। প্রকৃতির এই নিষ্করুণ আঘাতে রামেশ্বরমের সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার কোন চিহ্নই নাকি খুঁজে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। সেতুটি ভেঙে যাওয়ায় স্বাভাবিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। যাঁরা এ অবস্থায় আছেন তাঁরাও এখন জীবন্মৃত। মাথা গুঁজবার ঠাঁই নেই। খাদ্য, তৈজসপত্র সমুদ্রের জলে ভেসে গেছে।

ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার ওপর দিয়ে হেলিকপ্টারে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদার ও মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীভক্তবৎসলম ঘুরে এসেছেন। মাদ্রাজ সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার দুর্গতদের সাহায্যের ব্যবস্থা করেছেন। বিমান ও হেলিকপ্টার থেকে খাদ্য ও বস্ত্র সরবরাহ করা হচ্ছে। প্লাস্টিকের থলে-ভর্তি পানীয় জলও দুর্গত এলাকাগুলোতে ওপর থেকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এও যথেষ্ট নয়। সেবাব্রতী সংস্থাগুলো এবং সরকারের পক্ষ থেকে নৌকো ও জাহাজযোগে পর্যাপ্ত সাহায্যের ব্যবস্থা না-করা হলে, যাঁরা বেঁচে আছেন, তাঁদের মধ্যে মহামারী আকারে দেখা দেবে সংক্রামক ব্যাধি। সারা ভারত রামেশ্বরমের মানুষের বিপদের দিনে দরদীর মন নিয়ে এগিয়ে যাবে এই আশাই আমরা করি।

পাকিস্তান ঃ

শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হবে তো? পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বত্র 'পরিচিতি সভায়' গোলমাল হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানেও ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে, এবং প্রত্যেকটি স্থানে ছাত্রদের মিছিলের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের ফলে অবস্থা রীতিমত গুরুতর আকার ধারণ করেছে। নির্বাচন মানে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, পাকিস্তান যেন এই কথা প্রমাণ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

চট্টগ্রামে পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দু'পক্ষের মধ্যে বাদানুবাদের ফলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে; উভয় পক্ষের মধ্যে টেবল ছোঁড়াছুঁড়ি, হাতাহাতি সবই হয়েছে। বাইরে মিস্ ফতেমা জিন্নার সমর্থক ছাত্র-মিছিলের ওপরও পুলিশ লাঠিচার্জ করে।

রাজশাহীতে মিস্ জিন্নার সমর্থনে যে ছাত্র-মিছিল বের হয় তার ওপর পুলিশ লাঠিচার্জ করার ফলে বেসিক ডেমোক্রাট সহ ৫০ জন আহত হয়েছে, ২৭ জন গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে রয়েছে। খুলনায় ছাত্র-মিছিলের ওপর পুলিশের লাঠি-চার্জে ৬ জন আহত হয়েছে। খুলনার ছাত্ররা আয়ুবের পোস্টারগুলি সব ছিঁড়ে ফেলে।

যেখানেই পরিচিতি সভা হচ্ছে, সেখানেই ছাত্ররা বিরাট মিছিল বের করে মিস্ ফতেমা জিন্নাকে সমর্থন করছে। পরিচিতি সভাতেও বেসিক ডেমোক্রাটরা অধিকাংশ মিস্ জিন্নাকে সমর্থন করছেন।

আয়ুব খাঁ যথারীতি সর্বত্র বলছেন, মিস্ জিন্না শাসন পরিচালনায় অক্ষম। কিন্তু এই অভিযোগ বেসিক ডেমোক্রাটরা খুব একটা গ্রহণ করছে বলে মনে হয় না।

সংখ্যালঘু সদস্যদের ভোট পাবার জন্য আয়ুব খাঁ সংখ্যালঘুদের সমান অধিকারের কথা খুব ফলাও করে বলছেন। আবার পূর্ব পাকিস্তানের বাহবা আদায়ের জন্য বেরুবাড়ীর কথাও তিনি বলছেন। কোনরূপ জরিপ ছাড়াই বেরুবাড়ীতে পিলার বসাবার জন্য তিনি বর্তমানে ভারত সরকারের ওপর চাপ দিচ্ছেন। যদি কোনরূপে পিলার বসাতে পারেন, তবে তিনি বলতে পারবেন, তিনি জোর করে বেরুবাড়ী পাকিস্তানে এনে দিলেন। কিন্তু এখনও যে বেরুবাড়ীর মামলা চলছে? পিলার বসাবে কে?

আয়ুব খাঁর বক্তৃতা ভারত-বিরোধী হবে, এ তো জানা কথা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, মিস্ জিন্নাও ভারত-বিরোধী কথাবার্তা সুরু করেছেন। খুলনার পরিচিতি সভায় মিস্ জিন্না বলেছেন, কাশ্মীরের ব্যাপারে তিনি 'অন্য পন্থা' গ্রহণ করার কথা ভাববেন। এই 'অন্য পন্থা' কি যুদ্ধ? পূর্ব পাকিস্তানের বিগত দাঙ্গার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভারতের ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় পূর্ব পাকিস্তানে দাঙ্গা হয়েছে।

একথা ঠিক, ভোট আদায়ের জন্য অনেক উল্টো-পাল্টা কথা বলতে হয়। কিন্তু গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চাপ থাকা সত্ত্বেও, দ্বিজাতি তত্ত্বের গোঁড়া সমর্থক ও কায়েদে আজম জিন্নার ভগ্নী ফতেমা জিন্না যে আসলে কতটা প্রগতিশীলা, এবং তিনি নির্বাচিত হলে ভারতের সঙ্গে কতটা বন্ধুত্বপূর্ণ হবেন, সে বিষয়ে চিন্তিত হবার সঙ্গত কারণ আছে। তবু গণতন্ত্রের স্বার্থে আয়ুব খাঁর পরিবর্তে মিস্ ফতেমা জিন্না পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবে ভারতবাসী মাত্রেই সন্তুষ্ট হবে।

* * *

পাকিস্তানে আসন্ন প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনে সুবিধা লাভের মতলবে

• মিস্ ফতেমা জিন্না দলবল নিয়ে পরিচিতি সভায় বক্তৃতা করতে যাচ্ছেন।

ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ দল 'ভারত জুজুর' যে ধুয়া তুলেছে, পূর্ব পাকিস্তানের জনপ্রিয় বাংলা দৈনিক পত্রিকা 'সংবাদ' তার তীব্র সমালোচনা করে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করেছে। 'সংবাদ' লিখেছে, যখনই পাকিস্তানে কোনো গণ-আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, তখনই পাকিস্তানের শাসক সম্প্রদায় তার পেছনে ভারতের অদৃশ্য হাত আবিষ্কার করেছে। সরকার-বিরোধী প্রত্যেক জনপ্রিয় নেতাকে তারা সর্বদাই ভারত অথবা বিদেশী রাষ্ট্রের ক্রীড়নক বলে চিহ্নিত করেছে।

কনভেনশনপন্থী মুসলিম লীগ দলের সেক্রেটারী জেনারেল আবদুল ওয়াহিদ খান প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের বিরোধিতার জন্য ভারতের শ্রাদ্ধ করেছেন। তিনি ভারতের বিরুদ্ধে বিরোধী প্রার্থীকে সমর্থনের নানা অভিযোগ করেছেন। 'সংবাদ' এ সম্পর্কে সম্পাদকীয় কলমে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছে: মৌল গণতন্ত্রীদের নির্বাচনে জনসাধারণের হাতে ভাল রকম শিক্ষা পেয়ে ক্ষমতাসীন দল এখন ভারতের দিক থেকে বিপদের মিথ্যা ধুয়া তুলে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। এই বিপজ্জনক খেলার গুরুতর পরিণাম সম্পর্কে ঐ দৈনিকটি ক্ষমতাসীন দলকে সতর্ক করে দিয়েছে।

ফ্রান্স ঃ

গত সপ্তাহে প্যারিসে 'উত্তর অতলান্তিক চুক্তি সংস্থা' বা 'ন্যাটো'র মন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। এবারের মন্ত্রী সম্মেলন উপলক্ষে প্যারিসে যে রকম কূটনৈতিক তৎপরতা দেখা যায়, পূর্বে কখনও এমনটা দেখা যায় নি। 'ন্যাটো'র ১৫টি সদস্য-রাষ্ট্রের মধ্যে বহুজাতিক পরমাণু বোমা নিয়ে মতভেদ এতটা চরমে উঠেছে যে, 'ন্যাটো' থাকবে, না উঠে যাবে—এই প্রশ্ন আজ দেখা দিয়েছে।

মন্ত্রী সম্মেলনে ১৫টি রাষ্ট্রের ৪৫ জন মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। বহুজাতিক পরমাণু বাহিনী বা 'এম এল এফ' (Multi Lateral Force) প্রসঙ্গে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে তীব্র মতভেদ থাকার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মেলনে বিষয়টি নিয়ে কোন আলোচনা হয় নি। কারণ, আনুষ্ঠানিকভাবে এই বিষয় আলোচনার চেষ্টা হলে সম্মেলনই হয়তো ভেঙে যেত। কিন্তু ঘরোয়াভাবে সকলেই এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন। আসলে এবারের সম্মেলনকালে সদস্যদের কাছে প্রধান আলোচ্য বিষয়ই ছিল এই।

'ন্যাটো'র প্রধান চার সদস্য বা 'বিগ ফোর' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানীর প্রতিনিধিরা একবার পৃথকভাবে নিজেরা বসেছিলেন, কিন্তু তাঁরা কোনরূপ ঐক্যমতে পৌঁছুতে পারেন নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই পরমাণু বাহিনী গঠনে বদ্ধপরিকর, আবার অপরদিকে ফ্রান্স তার ঘোরতর বিরোধী।

পরমাণু বাহিনীর প্রশ্নটি 'ন্যাটো'র সম্মুখে উভয় সংকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'ন্যাটো'র ভেতরে এই বাহিনী

• দ্য গল

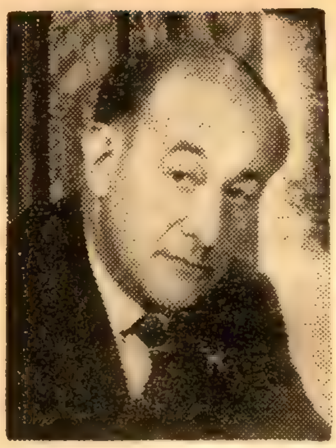

• প্যাট্রিক গর্ডন ওয়াকার

গঠনের চেষ্টা হলে 'ন্যাটো' ভেঙে যাবে। সকল সদস্য-রাষ্ট্রের সম্মতি ছাড়া ন্যাটোতে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে কোন সিদ্ধান্ত নেবার চেষ্টা হলে 'ন্যাটো' ভেঙে যাবে। আর যদি 'ন্যাটো'র বাইরে এরূপ কোন বাহিনী গঠন করা হয়, তবে ইউরোপের প্রতিরক্ষা-সংস্থা রূপে 'ন্যাটো'র অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রয়োজন কি?

যাই হোক, নিজেদের মধ্যে যত মতভেদই থাকুক, পরমাণু বাহিনীর মত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির মীমাংসা 'ন্যাটো' গোষ্ঠীকে শীগগিরই করতে হবে।

'ন্যাটো' সম্মেলনে অন্যান্য প্রশ্নের মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়নে ক্রুশ্চেভের পতন, চীনের পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হয়।

সম্মেলন উপলক্ষে প্যারিসে এসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-সচিব ডীন রাস্ক ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি চার্লস দ্য গলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন, এবং বিভিন্ন বিষয়ে উভয়ের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। দ্য গল যেভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ক্ষেপে আছেন, তাতে উভয়ের মধ্যে এই সাক্ষাৎকারে কূটনৈতিক সৌজন্য

বিনিময় ছাড়া আর বিশেষ কিছু লাভ হয়েছে বলে মনে হয় না।

তবে এবার ইঙ্গ-ফরাসী সম্পর্ক কিছুটা ভালর দিকে বলে মনে হয়। বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব প্যাট্রিক গর্ডন ওয়াকার দ্য গল ও ফ্রান্সের পররাষ্ট্র-সচিব কুভে দ্য মারভিলের সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। বৃটেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাবিত বহুজাতিক পরমাণু বাহিনীর পরিবর্তে অতলান্তিক পরমাণু বাহিনী গঠনের যে সংশোধিত প্রস্তাব করেছে, শোনা যাচ্ছে ফ্রান্স তা সমর্থন করবে। সম্ভবত শীঘ্রই বৃটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে একটি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

দক্ষিণ ভিয়েৎনাম :

আবার দক্ষিণ ভিয়েৎনামে শাসন ক্ষমতার পরিবর্তন হয়েছে।

* ত্রান ভান হুয়াং

এবারের 'রক্তপাতহীন বিপ্লবের' নায়ক চারজন সামরিক অফিসার।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ২০শে ডিসেম্বর সায়গনে সামরিক বাহিনীর একাংশ ক্ষমতা দখল করে, এবং উচ্চতর জাতীয় পরিষদকে ভেঙে দেয়। 'দালাত গ্রুপ'

* নেগুইন খান

বলে পরিচিত একদল সামরিক অফিসার ও জাতীয় পরিষদের বিভিন্ন সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে জাতীয় পরিষদের সেক্রেটারী-জেনারেল ত্রান ভান ভানও আছেন।

ক্ষমতা দখল করার পর বিদ্রোহীরা ঘোষণা করে, জাতীয় পরিষদ প্রতিবিপ্লবীদের খপ্পরে পড়ে গেছে, এবং তারা দেশের শাসন পরিচালনায় চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। বিদ্রোহীরা সামরিক পরিষদের প্রধান জেনারেল নেগুইন খান ও প্রধানমন্ত্রী ত্রান ভান হুয়াং-এর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেছে। বিদ্রোহীদের চারজন নায়ক হলেন : এয়ার ফোর্স কম্যাণ্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নেগুইন কাও কোই, ম্যারিন কোর কম্যাণ্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল লা নেগুইন খাং, ফার্স্ট কোর কম্যাণ্ডার জেনারেল গুয়েন সান থি এবং জেনারেল নেগুইন ভান থিউ।

এবারের বিদ্রোহ স্পষ্টতই বৌদ্ধ-ধর্মনেতা ও ছাত্র বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে। যেভাবে বৌদ্ধ নেতারা দেশের শাসনে হস্তক্ষেপ করছিলেন তাতেই ক্ষুব্ধ হয়ে সামরিক অফিসাররা জাতীয় পরিষদের উচ্ছেদ সাধনের কাজে এগিয়ে আসেন। বহুসংখ্যক বৌদ্ধ ধর্মনেতা ও ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বৌদ্ধনেতারা এই বিদ্রোহের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, এবারের বিদ্রোহ মার্কিন নীতির বিরুদ্ধেও। সামরিক অফিসাররা মার্কিন কর্তাদের সঙ্গে কোনরূপ পরামর্শ না করেই বিদ্রোহ করেছেন, এবং তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে মার্কিন নীতির সমালোচনা করেছেন। জেনারেল নেগুইন খান স্বয়ং সায়গন বেতার থেকে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সম্পর্কে মার্কিন নীতির তীব্র সমালোচনা করেছেন। অপরদিকে, মার্কিন সরকারও সায়গনের ঘটনায় বিক্ষোভ প্রকাশ করেছে। দক্ষিণ ভিয়েৎনামে মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেনারেল ম্যাক্সওয়েল টেলারের সঙ্গে বিদ্রোহীদের দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। কিন্তু তার পরেও তিনি বলেছেন, এই বিদ্রোহ 'ন্যায়-

* ম্যাক্সওয়েল টেলার

সঙ্গতভাবে গঠিত সরকারের বিরুদ্ধে।' ওয়াশিংটন থেকেও পররাষ্ট্র বিভাগের একজন মুখপাত্র বলেছেন, সায়গনের অবস্থা গুরুতর—জাতীয় পরিষদ ভাঙার বিষয় পূর্ব থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কোন সংবাদ দেওয়া হয় নি।

দক্ষিণ ভিয়েৎনামে মার্কিন নীতির ব্যর্থতার ফলে যারা কমিউনিস্ট

নয়, তারাও আজ ক্ষুব্ধ। এবারের সায়গন বিদ্রোহ তারই অভিব্যক্তি। কিন্তু একদিকে ভিয়েৎ কং বাহিনীর দ্রুত অগ্রগতি, এবং অপরদিকে ভিয়েৎনামবাসীর তীব্র মার্কিন বিদ্বেষ, এর মধ্যে নেগুইন খান-ত্রান ভান হুয়াং গোষ্ঠী ও বিদ্রোহীরা কিভাবে শাসন বজায় রাখবেন, তাই হল প্রশ্ন।

বৃটিশ গায়না ঃ

ফরবেস বার্নহাম বৃটিশ গায়নার প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন বটে, কিন্তু কতদিন তিনি শাসন ক্ষমতায় থাকতে পারবেন সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। দেশের দুই-তৃতীয়াংশ জনগণ তাঁর বিরুদ্ধে, এ-অবস্থায় কেবলমাত্র বৃটিশ সৈন্য-বাহিনী আর মার্কিন সাহায্যের ওপর ভরসা করে তিনি কতদিন থাকতে পারবেন?

জর্জ টাউনে গত ২০শে ডিসেম্বর পিপলস্ প্রোগ্রেসিভ পার্টির উদ্যোগে আহূত এক বিরাট সমাবেশে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডাঃ ছেদী জগান বার্নহাম সরকারকে 'উপনিবেশবাদের অকালে ভূমিষ্ঠ জারজ সন্তান' বলে অভিহিত করেছেন। ডাঃ জগান বলেছেন, বার্নহাম সরকারকে কোনমতেই সহ্য করা হবে না—এই সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করা হবে।

• ছেদী জগান

ডাঃ ছেদী জগান ও তাঁর দল বার্নহাম সরকারের বিরুদ্ধে সমগ্র বৃটিশ গায়নায় ব্যাপক গণ-আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন। বৃটিশ গায়নার সংঘবদ্ধ শ্রমিক শ্রেণী ও ইক্ষু কৃষক এই আন্দোলনে যোগ দেবে।

ছেদী জগানের অপসারণ ও ফরবেস বার্নহামের ক্ষমতা গ্রহণের পশ্চাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাত আছে, এরূপ সন্দেহ করার কারণ আছে। পর পর দু'বার সাধারণ নির্বাচনে সমাজতন্ত্রী ছেদী জগানের জয়লাভে মার্কিন কর্তারা রীতিমত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। বৃটিশ গায়না

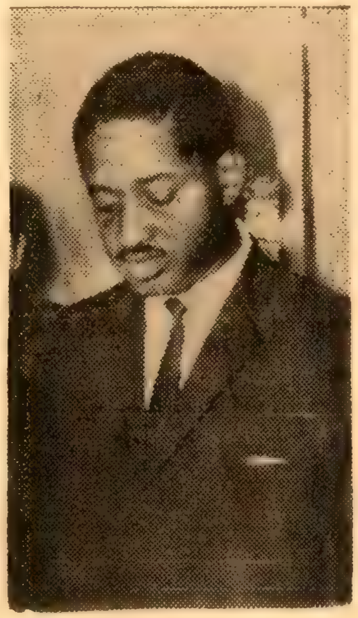

• বার্নহাম

আর একটি কিউবায় পরিণত হোক, এ তাঁরা চান না। তাঁদেরই চাপে প্রাক্তন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড ম্যাকমিলান ও আলেকজাণ্ডার ডগলাস-হিউম জগানকে সরাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। শ্রমিক দলের প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপের কাছে মাথা নত করলেন।

ইতালী ঃ

পোপ পল ক'দিন পূর্বে ভ্যাটি-কানে ২০০ জন ভারতীয় ছাত্রের

• পোপ পল

সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাতের সময় পোপ ভারতের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ভারতীয় জাতিকে তিনি ধর্মপ্রাণ জাতি বলে অভিহিত করেন। ভারতের দীর্ঘকালে উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শ ও মূল্যবোধের উল্লেখ করে পোপ বলেন, ভারত এই আদর্শের জন্যই বিশ্বের সকলের নিকট তীর্থস্বরূপ।

বর্তমানে বিশ্বশান্তি রক্ষার ক্ষেত্রে ভারতের অবদানের কথা উল্লেখ করে পোপ ভারতীয় নেতৃত্বের প্রশংসা করেন।

ভারত ভ্রমণের ফলে পোপ যে ভারত সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা নিয়ে ফিরে গেছেন, এ সংবাদে ভারতীয় মাত্রেই গর্ববোধ করবেন। পর্তুগাল সরকার, এবং ভারতের একদল ধর্মান্ধ সাম্প্র-দায়িকতাবাদী পোপের ভারত সফর নষ্ট করার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের এই অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

গ্রন্থমেলা

কাহিয়ে সময় বিচারি ঃ শ্রীলক্ষ্মীনিবাস বিড়লা। অনুবাদ ও সম্পাদনা : ডঃ অচিন্ত্যকুমার মুখোপাধ্যায়। নিউ বুক স্টল, ১ ময়রা স্ট্রীট, কলকাতা ১৬। মূল্য : ১·৫০ পয়সা।

শ্রীলক্ষ্মীনিবাস বিড়লা হিন্দী সাহিত্যে একজন চিন্তাশীল অগ্রণী সাহিত্যিক। 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধগুলি একদা সুধী পাঠকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছিল। বর্তমান গ্রন্থটিতে ষোলটি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে। বাংলা গ্রন্থটির নামকরণ থেকেই বোঝা যায় যে, ঐ গ্রন্থ ইতোপূর্বে হিন্দীভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল। যা হোক, শ্রীযুক্ত বিড়লার প্রধানতম যে নৈপুণ্য—তা হচ্ছে তাঁর অকাট্য যুক্তি, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-শক্তি ও মননগ্রাহ্য সত্যের প্রতি প্রবলতম বিশ্বাস। ঐ সব গুণ থেকেই যুক্তির সারবত্তা সাহিত্যাস্বাদনের চমৎকারিত্বে পর্যবসিত হয়েছে। শ্রীযুক্ত বিড়লা ধর্ম, বিজ্ঞান, ধন-সম্পদ, সাহিত্য, মানবিক স্পৃহা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের কথা উত্থাপন করে দেখিয়েছেন ঐ সব বিষয়ের মৌল ধর্ম কি। তিনি এক একটি প্রশ্ন উত্থাপন করে গল্পের ভঙ্গীতে সেই প্রশ্নের সঙ্গে আধ্যাত্মিক ও জাগতিক সম্পর্ক নির্ণয় করে সত্যানুসন্ধানের পথে গিয়েছেন। তিনি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন কিভাবে বিবেচনা-শক্তি আর অনুভূতি থেকে কথায় কোন উপায়ে শক্তি লাভ করা যায়। শিল্পকলার বাহ্যিক বদল ঘটলেও ভেতরে তার সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্। অর্থ যেমন কল্যাণময় তেমনি তা অকল্যাণকর—'চতুর্থ শক্তি দাম' প্রবন্ধের সার সত্য ফুটে উঠেছে সুরদাসজীর কথায়। এইভাবে লেখক প্রতিটি প্রবন্ধে মানুষের কল্যাণের কথাই ব্যক্ত করেছেন। ভারতের অবদান' প্রবন্ধটিতে ভারতের আধ্যাত্মিক স্বরূপ নির্ণয় করে নিঃসন্দেহে তিনি পাঠকদের প্রশংসাভাজন হয়েছেন। যা হোক, গ্রন্থটির নামকরণ বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করা উচিত ছিল। তাছাড়া গ্রন্থটির মূল্য : দেড় টাকা না দেড় পয়সা (?) তা বোঝা গেল না।

চাচা নেহরু ঃ শিবানী চট্টোপাধ্যায়। ৯।৪, খানপুর রোড, কলকাতা-৪৭, মূল্য দেড় টাকা।

জওহরলাল কা'র নয়? তবু তিনি সবচেয়ে বেশি যেন শিশুদের। একবার শিশুদের ডাক দিয়ে তিনি বলেছিলেন যে, তাঁর হাতের মশাল পড়ে গেলে শিশুরাই তা তুলে ধরবে। কিন্তু কে না জানে সেই তুলে ধরা কাজটি কতো কঠিন। সেই ভার গ্রহণ করা মানে—অসম্ভব ব্যাপারকে শ্রদ্ধানত মস্তকে তুলে নেওয়া। আজ আমাদের সবার প্রিয় নেহরুজী নেই, কিন্তু রয়েছে তাঁর প্রাণের প্রিয় শিশুরা—যে শিশুদের নিয়ে যুগে যুগে তাঁর জন্মদিন পালিত হবে, যে শিশুরা বড় হয়ে দেখবে—এই দেশকে তাদের নেহরু চাচা কতো বড়ো করে গেছেন। আর তিনি নিজেও কতো বড়ো অর্থাৎ মহৎ। সেই মহৎ ব্যক্তির কথা শুনবে সকল কালের ছেলেরা মা-দিদিদের কোলে চড়ে। মনে হবে সেই আগামী কালে যেন সব কথাই কিম্বদন্তী, তা নইলে একজন মানুষের পক্ষে কি এমন হওয়া সম্ভব! একালের আর সেকালের শিশুদের জন্য চাচা নেহরুর সব কথা সরল আর সহজ করে বলেছেন শ্রীযুক্তা শিবানী চট্টোপাধ্যায়। লেখিকা সুরু করেছেন সেই তখন থেকে—যখন জওহরলালের পূর্বপুরুষরা কাশ্মীর থেকে এসে অবশেষে বসবাস সুরু করলেন এলাহাবাদে। তারপর মাতা, পিতা ও কন্যাসহ জওহরের অনেক খবর লিখেছেন লেখিকা। তা ছাড়া দেশ বিদেশের যাঁরা নেহরুর জীবনকে প্রভাবিত করেছেন—তাঁদের কথাও বাদ যায় নি একটুও। এমন কি, কিভাবে বাংলা দেশে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বাংলা দেশের জেলের মধ্যে শ্রীনেহরু বাংলা দেশকে ভালোবেসে ফেললেন—সে কাহিনীও চমৎকার। শিশুদের কী ভালোই না তিনি বাসতেন। বিশ্বভারতীর উপাচার্য শ্রীসুধীরঞ্জন দাসের চেষ্টায় বাপে শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েদের জন্য পুরানো ডাক টিকিট দেখে নেহরু হাজার হাজার ডাক টিকিট পাঠাতেন তাঁর কাছে। ছোট্ট ঘটনা, কিন্তু কম উল্লেখযোগ্য নয়। তবে সাহিত্যিক নেহরুর কথা লেখিকা কম বলেছেন। ঐ দিকের আলোচনা একটু থাকলে ভালই হোত।

জয়ন্তী সেন

॥ প্রকাশকদের প্রতি নিবেদন ॥

পুস্তক প্রকাশকগণের প্রতি আমাদের সবিনয় নিবেদন এই যে, সাপ্তাহিক বসুমতীতে সমালোচনার জন্যে যাঁরা পুস্তক প্রেরণ করতে ইচ্ছুক, তাঁরা অনুগ্রহপূর্বক অতঃপর নিম্নলিখিত ঠিকানায় দু'খানি করে পুস্তক প্রেরণ করবেন।

সম্পাদিকা, সাপ্তাহিক বসুমতী,
১, শরৎ বসু রোড, কলিকাতা—২০।

ধারাবাহিক উপন্যাস

অদ্বিতীয়

সুশীল রায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সকলে বাধা দেওয়ায় থেমে গেল হরেশ। কিন্তু বেশিক্ষণ থেমে থাকল না, আবার বলল, 'বিষাদে হরিশ। এই তো চাই। ইউনাইটেড উই স্ট্যাণ্ড, ডিভাইডেড উই ফল্। মনোমালিন্যে কোনো সুফল ফলে না, ঐক্যেই বল। বলো, দিবা দেবী কি—'

নীহার বলে উঠল, 'জয় বলব না। যদি বলি, তবে সেটা বাংলা জয় নয়, ইংরেজি জয়। আমরা আনন্দিত, আমরা পুলকিত, আমরা রোমাঞ্চিত, আমরা—'

প্রাণ খুলে হেসে উঠল সকলে একসঙ্গে। নীহারের উক্তিটা হচ্ছে সুেহাংশুর একটি একাঙ্কিকার একটি ডায়ালগ।

সকলের মন খোলসা হয়ে গিয়েছে। এইবার নাটক বুঝি তবে জমবে।

নাটক তো জমবে। এদিকে সকলের অজানিতে রাতও তো বেশ জমে উঠেছে। ঠাণ্ডাও তো পড়েছে বেশ। ঘরের মধ্যেই অবশ্য বসে আছে সকলে. কিন্তু বাইরের হিম-হাওয়া ঘরে ঢোকার মত ছোট-বড় রাস্তা আছে অনেকই। জানলা-দরজাও অনেক। কিন্তু সেগুলো বন্ধ করে দিলেও বন্ধ হয় না, পুরনো কাঠের ফাঁক দিয়ে প্রচুর হাওয়া খেলে। অনেকগুলো জানলার খড়খড়ি আবার ভাঙা। সুতরাং বাইরে ঠাণ্ডা যতটা পড়েছে, ভিতরের ঠাণ্ডা তার চেয়ে খুব কম নয়। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত বোঝা যায় নি, কেন না তখন ঘরের আবহাওয়াটা অনেকের মেজাজের তাপেই উষ্ণ হয়ে ছিল। কিন্তু মেজাজ যখন এখন সকলের ঠাণ্ডা, তখন, হ্যাঁ, ঠাণ্ডাটা এখন যেন গায়েও লাগছে একটু।

এখান থেকে বেরিয়ে আবার ধরতে হবে বাস্ কিংবা ট্রাম। তারপর এই মোমিনপুর থেকে যেতে হবে সেই বেহালায়, সেই রায়বাহাদুর রোডে।

অমিয় উঠে দাঁড়াল। আলোয়ানটা গায়ে জড়াতে-জড়াতে হাত-ঘড়িটা দেখে নিল একটু ঝুঁকে, বলল, 'উঃ, এতরাত হয়ে গেল নাকি?'

'ক-টা এখন?'

'পৌনে এগারো।'

ওরা বারান্দায় বেরিয়ে এল। দরজায় তালা লাগাতে লাগল অমিয়।

এই বারান্দায় বসে যারা বিড়ি বানায়, তারা এখন কেউ নেই। কিন্তু রাস্তার কয়েকজন ভিখিরি এখানে এসে জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে অকাতরে ঘুম জুড়ে দিয়েছে।

রিহার্সেল দেওয়ার আস্তানাটা তাদের ভালোই হয়েছে। নাটকটার যা পরিবেশ, এই বাড়িটার পরিবেশের সঙ্গে তার অনেক মিল আছে। নাটকের যে নায়িকা সে হচ্ছে এক পুরনো বাড়ির বাসিন্দা. এই নাটকে অভিনয় করতে আসবেন যে নায়িকা, তিনি পরিবেশটা পাবেন ভালোই।

বেহালার যাত্রীরা গায়ে আলোয়ান জড়িয়ে কুয়াশাচ্ছন্ন ডায়মণ্ডহারবার রোডে এসে দাঁড়াল। একচাপ অন্ধকারের মত দেখতে লাগল তাদের। তাদের বুকে এবার যেন বল এসে গিয়েছে, তাদের মনে উৎসাহও দেখা দিয়েছে যেন চতুর্গুণ। একটা চাপা দ্বিধা এবং

একটা ক্ষুদ্র দ্বন্দ্ব তাদের মনের মধ্যেই জমে উঠেছিল। আজকের আলোচনার পর সেসব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর হয়ে গিয়েছে একেবারেই। তাদের মনের অন্ধকারও আর নেই। সেইসব অন্ধকার তাদের মন থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের এই শীতার্ত কুয়াশায় মিশে গিয়ে ডায়মণ্ডহারবার রোডের ধারের আলোর সঙ্গে যেন দ্বন্দ্ব জুড়ে দিয়েছে।

আলোয়ান দিয়ে শরীর জড়িয়ে নিয়েছে তারা, কিন্তু তাদের মুখ চলছে, কথা চলছে। কথা চলেছে নাটক নিয়ে, কথা চলেছে নাটকের ভূমিকা-লিপি নিয়ে। তাদের মন অনেক পরিষ্কার হয়েছে, তাদের কথায় আর ক্ষোভ নেই, শ্লেষ নেই, উত্তাপ নেই। নাটকটির অভিনয়, যাকে বলে সাফল্যমণ্ডিত করা, তাই করার দিকেই তাদের প্রত্যেকের সমান ঝোঁক দেখা যাচ্ছে যেন তাদের কথায়-বার্তায়।

এদের এইসব কথা শুনে কৃতার্থ হয়ে যাচ্ছে সুেহাংশু। মন ভরে যাচ্ছে আনন্দে।

ওরা হাঁটিতে-হাঁটিতে কথা বলতে-বলতে এগিয়ে চলেছে। ট্রাম বা বাস্ নেবার গরজও তাদের নেই। এর-মধ্যে কোনো ট্রাম-বাস্ তাদের পাশ দিয়ে চলে গিয়েছে কি না, সেদিকে বুঝি লক্ষ্যও তারা দেয় নি।

তারা উঠে এল মাঝেরহাট ব্রীজের ওপর। ব্রীজের নিচ দিয়ে প্রবল শব্দ করতে-করতে চলে গেল একটা মালগাড়ি।

সুেহাংশুর মনের কবিতা অমনি ধুঝি গর্জে উঠল, থমকে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'ঐ গার্ডসায়েবকে নিয়েও লিখতে হবে একটা নাটক। কিরকম নিঃসঙ্গ, কিরকম অসহায়, কিরকম নির্জীব ঐ মানুষটা। জনপ্রাণী-হীন লম্বা একটা গাড়ির পালের পিছনে একা একটি মানুষ বসে আছে। করা যায় না এই সাবজেক্ট নিয়ে একটা নাটক?'

'তা যাবে না কেন?' 'অমিয় বলল, 'কিন্তু ওই একক-জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া না-হয় দেখাবে বক্তৃতা দিয়ে। কিন্তু—'

'কিন্তু কি?'

'বলছিলাম নায়িকার কথা। মালগাড়ির গার্ডের নায়িকা পাবে কোথায়?'

হেসে উঠল সকলেই, সুেহাংশুও হাসল। বলল, 'নাটকটা কি কেবল ঐ গার্ডের কামরার মধ্যেই আটক থাকবে? কামরা থেকে একবারও কি সে নামবে না, একবারও কি সে বেরিয়ে আসবে না। দৃশ্য-বদল করে নিলেই সব ইচ্ছা পূরণ করে নেওয়া যাবে।'

ব্রীজের ঢালু পথ দিয়ে দ্রুত নামতে-নামতে অমিয় বলল, 'তা হলে সকলকে নিয়েই নাটক হয়। ঐ গার্ড বেচারা তা হলে একা কি দোষ করল। আমাদের জীবন নিয়েও নাটক হয়, নানারকম অবস্থার মধ্যে আমাদের ফেলে-ফেলে নাট্যকার তাঁর কার্য-সিদ্ধি করতে পারেন।'

'তা পারা যায় বটে।' সুেহাংশু বলল,'কিন্তু কথাটা তা নয়। কথা হচ্ছে, ঐ নিঃসঙ্গ প্রাণীটির জীবনের ট্র্যাজিডি নিয়ে। যাই বলো, আমার একটু সিম্প্যাথি আছে ওদের ওপর।'

হরেশের কর্মক্ষেত্র ঐ মিন্ট। ডাইনে টাঁকশালের প্রকাণ্ড বাড়িটা রেখে ওরা হেঁটে চলেছে।

হরেশ হাসতে-হাসতে বলল, 'অ্যালোপাথি আর হোমিওপ্যাথি এই দু-রকম দাওয়াইয়ের কথাই তো বেশি শুনি। কবিরাজির কথাও অবশ্য শোনা যায়। কিন্তু আমাদের কবির দাওয়াই বুঝি সিম্প্যাথি?'

একটু বিরক্তই হল যেন সুেহাংশু। থমকে থেমে গেল সে, বলল, 'আর হাঁটা যায় না। এবার রাস্তা পার হয়ে ওপারে চলো। ট্রাম নিশ্চয় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। একটা বাস্ ধরতে হবে।'

প্রস্তাবটা শোনার অপেক্ষাতেই যেন ছিল সকলে। প্রস্তাবটা করা মাত্র সকলে রাজী হয়ে গেল। কিন্তু তাদের চাহিদা-মত তখনই একটা বাস্ এসে হাজির হবে, এতটা আশা করা যায় না। ওরা রাস্তা পার হয়ে ওপার ধরে হেঁটে চলল, বাস্ এলেই সকলে দল বেঁধে হাত তুলে বাস্ দাঁড়করাবে—এই তাদের ইচ্ছে।

হরেশের মন্তব্যের জবাব দেওয়া হয় নি। ও-কথার খেই ধরে কথা বলতে উৎসাহ বোধ করল না সুেহাংশু। কিন্তু অমিয় বলল কথা। বলল, 'সিম্প্যাথি ইজ দি থিং। ওটি না থাকলে কিছুই থাকল না। পোড়ো-বাড়ি আমরা কি দেখি নি কখনো? ওরকম কোনো বাড়িতে কি দেখি নি কখনো নিঃসঙ্গ কোনো প্রাণী? মেয়ে হোক, পুরুষ হোক—দেখি নি কি

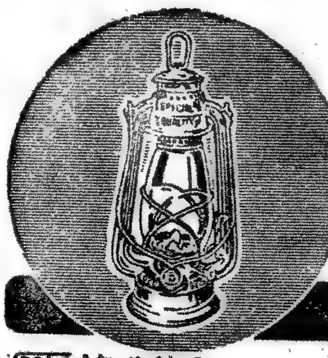
কিষান
লন্ঠন
সর্বোৎকৃষ্ট
গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
ফোন-২২-৬৫৮০
২৭৩,ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১

কোনো মানুষ? নিশ্চয় দেখেছি। কিন্তু দেখেই আমরা খালাশ। কিন্তু সুেহাংশু? সুেহাংশু কি না সেই মুহূর্তের দেখার ওপর ভর করে খাড়া করে তুলল একটা নাটক। যাকে দেখেছে সুেহাংশু তার ওপর নিশ্চয় তার একটা ইয়ে হয়েইছে—কি বলো সুেহাংশু।'

সুেহাংশু কিছু বলল না। কিন্তু অমিয়র কথা শুনে তার চোখের সামনে নতুন করে জেগে উঠল সেই বাড়িটা, চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই ছবিটা, একটা ছোট শাখানদী বয়ে যাচ্ছে বাড়িটার প্রাচীরের পাশ দিয়ে, পুরো বাড়ির ছায়া এসে যেন ঝাঁপিয়ে পড়েছে ঐ নদীর জলের উপর। সুেহাংশু যদি ছবি আঁকতে জানত তাহলে এই দৃশ্যের একটা ছবিই সে আঁকত, এতটা মেহনত ক'রে এতবড় একটা নাটক সে লিখতই না।

বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে ট্রেনে চেপেছিল সুেহাংশু, সে যাচ্ছিল ডায়মণ্ডহারবারে। কোনো কাজে যাচ্ছিল না, যাচ্ছিল একটু বেড়িয়ে আসার জন্যে। মন তাই ছিল খালি ও খোলা। জানলায় বসে সে দেখতে-দেখতে চলেছিল দু-পাশের ঘরবাড়ি, দু-পাশের মাঠ-ঘাট, ও দু-পাশের প্রান্তর। যাদবপুর গড়িয়া সোনারপুর ছাড়ার পরেই রেল লাইনের কাছাকাছি লোকালয়ের সংখ্যা কমে আসতে লাগল, ক্রমশ বেড়ে উঠতে লাগল, উন্মুক্ত মাঠ ও প্রান্তর। বড় মজা লাগছিল সুেহাংশুর। শহরের বাইরে বড়-একটা যাওয়া হয় না; কিন্তু শহরের এত কাছেই যে এমন মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছড়ানো আছে—একথা তার বুঝি জানা ছিল না। মনটা প্রফুল্ল হয়ে উঠল সুেহাংশুর, তার মনের মধ্যে অনেক ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠতে লাগল, জেগে উঠতে লাগল অনেক স্বপ্ন ও অনেক কল্পনা।

মহাকবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বৃত্র-সংহার কাব্য

দাম—দুই টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

দু-পাশে প্রশস্ত প্রান্তর ছড়াতে-ছড়াতে যেন এগিয়ে চলেছে তার ট্রেন। তার কামরায় যাত্রী বেশি ছিল না ব'লে আরও বেশি মজা লাগতে লাগল তার। চোখ-দুটোকে যেমন ইচ্ছে-মত খেলাতে পারছে, মনও তেমনি ইচ্ছে-মত নড়ে-চড়ে বেড়াতে পারছে। হঠাৎ কখনো-কখনো সাঁকোতে উঠে পড়ছে ট্রেন, সুর বদল করে আবার ছুটে চলেছে ভাঙা-পথ ধরে। মাঝে মাঝে সেই প্রান্তর ভেদ করে জেগে উঠছে গ্রাম, দেখা দিচ্ছে স্টেশন। একটু দম নিয়ে আবার ছুটতে আরম্ভ করছে ট্রেন।

একা-একা এ রকম বেড়ানোর মধ্যে বেশ মজা আছে তো! খুব ফুর্তি বোধ হচ্ছে সুেহাংশুর। মনে-মনে সে গান করছে, হয়তো সে গান তার নিজেরই বাঁধা, হয় তো সে গান আছে তার কোনো একাঙ্ক নাটকে। হাঁটু-দুটো কোলের মধ্যে নিয়ে দৃষ্টিটা বাইরে ছড়িয়ে দিয়ে পরম-আনন্দে ভ্রমণে চলেছে সুেহাংশু বিশ্বাস।

ডায়মণ্ডহারবারে গিয়ে সে দেখবে জল—জলের অরণ্য। সারাদিন সে নদীর কিনার-বরাবর ঘুরে বেড়াবে উদ্দেশ্যহীনভাবে। লেখায় যখন হাত সে দিয়েছে তখন লেখার মসলা তাকে জোগাড় করতে তো হবেই; কোনো উপকরণ খুঁজে না মিলে—

হঠাৎ যেন চমকে উঠল সুেহাংশু। দু-পাশে লোকালয় হীন এই প্রান্তর। তার মাঝে ঐ প্রকাণ্ড বাড়িটা কাদের? রেল-লাইন থেকে খুব বেশি দূরে না, ট্রেন আরও এগিয়ে এলে সে তাকাল বাড়িটার দিকে। এবার আরও চমক লাগল সুেহাংশুর। বিরাট প্রান্তরের এক পাশে নিঃসঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঐ যে বাড়িটা, তার দোতলার জানলায় মূর্তিটি কার? পরিচ্ছন্ন একটি মেয়ে নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে আছে ঐ জানলায় এই ট্রেনের দিকে মুখ ক'রে। সুর বদল করে একটা ছোট সাঁকোয় উঠে পড়ল গাড়ি। সুেহাংশুর মনের সুরও যেন বদলে গেল। সে ঝুঁকে তাকাতে লাগল বাড়িটার দিকে। কিন্তু ট্রেনের গতি কমল না। সুেহাংশুর ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তার নিজের গতিতেই ছুটে চলল সেই গাড়ি।

বড়ই জীর্ণ ঐ বাড়িটা। অজস্র গাছ ঘিরে ধরে আছে বাড়িটাকে। তার চারদিকে প্রাচীর। কিন্তু নোনা ধরে অনেক জায়গায় ভেঙে গিয়েছে প্রাচীরটা। বাড়ির গা দিয়ে চলে গিয়েছে একটা ছোট জলের ধারা। যে সাঁকোটা এইমাত্র পেরিয়ে এল সুেহাংশু, সেটা বোধ হয় ঐ জলের ধারাটা পার হবার জন্যেই তৈরি।

এই লোকালয় হীন নির্জন-নির্জীব-নিঃসঙ্গ এলাকায় কার ঐ বাড়ি? কে থাকে ওখানে? কাকে সে দেখে এল ঐ জানলায় ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে?

কিছু ভেবে পেল না সুেহাংশু। কিন্তু সে ভাবতে লাগল। হঠাৎ তার ভাবনায় বাধা দিয়ে ব্রেক কষল ট্রেন। ডায়মণ্ডহারবার।

সুেহাংশুর সব পরিকল্পনা বুঝি মাঠে মারা গেল। ঐ মাঠেই বুঝি মারা গেল তার পরিকল্পনা, যেখানে একা-একা দাঁড়িয়ে আছে প্রাসাদতুল্য ঐ জীর্ণ অট্টালিকা।

কিছুটা সময় অবশ্য সুেহাংশু কাটাল নদীর ধারে। কিন্তু দিন থাকতে-থাকতে সে ফিরে আসবে বলে ঠিক করল। আবার তার দেখতে ইচ্ছে করল বাড়িটা। আবার ঐ ছবিটা দেখে নিতে ইচ্ছে হল তার।

জল আর জলের অরণ্য সে দেখবে সারাটা দিন ঘুরে-ঘুরে—তার সে ইচ্ছা পূরণ সে করতে পারল না। ফিরতি ট্রেনে সে উঠে বসল। (ক্রমশঃ)

আসামের রাজধানী শিলঙ শহর প্রতিষ্ঠার একশ' বছর পূর্ণ হয়েছে। শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে এই পাহাড়ি রাজধানীর অতীত ও বর্তমানকে নিয়ে এই আলোচনার অবতারণা করা হল।

ভারতে বৃটিশ আধিপত্য বিস্তারের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁরা একটু পরিচিত—তাঁরা অবহিত আছেন যে, আসামে বৃটিশ অধিকার উনবিংশ শতকের ঘটনা। অবশ্য শ্রীহট্ট জেলায় (যা পরবর্তীকালে আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল) ইংরেজ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৬৫ সালে। অর্থাৎ, বাংলায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের সঙ্গে সঙ্গে। তারপর দীর্ঘদিন কেটে গেল। ইংরেজরা নানা সমস্যাক্লিষ্ট হয়ে বাংলা দেশের চৌহদ্দি ছেড়ে আর পূর্বদিকে এগুতে পারে নি। তাই ১৮২৬ সালের আগে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ইংরেজ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারল না। তখন দুটি সমতল জেলা শ্রীহট্ট ও কামরূপের মধ্যবর্তী খাসিয়া পাহাড়ের ওপর স্বভাবতই ইংরেজদের চোখ পড়ল।

উনিশ শতকের প্রথমদিকে পার্বত্য-অঞ্চলের অধিবাসী খাসিয়া সমতল-বাসী শ্রীহট্টের গ্রামাঞ্চলে হানা দিয়ে লুটপাট চালাত। এতে সীমান্তবর্তী শ্রীহট্টের গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়েছিল। এইসব ঘটনা সাম্রাজ্যবিস্তারে আগ্রহী ইংরেজদের খাসিয়া পাহাড়ে প্রবেশের সুবিধে করে দিয়েছিল। খাসিয়া পাহাড়ের চূণাপাথর প্রভৃতি দ্রব্যসামগ্রীর আকর্ষণও কম ছিল না। তা ছাড়া খাসিয়া পাহাড়ের মধ্য দিয়ে শ্রীহট্টের সঙ্গে কামরূপের যোগাযোগ সৃষ্টির প্রয়োজনও ছিল।

শ্রীহট্টের লুটপাট দমন ও খাসিয়া পাহাড়ে অনুপ্রবেশ, এই দুই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ডেভিড স্কটের পরিচালনাধীন ইংরেজরা খাসিয়া গোষ্ঠী-প্রধানদের নানা উপকরণে বশীভূত করল। কামরূপ থেকে খাসিয়া পাহাড়ের মধ্যে রাস্তা নির্মাণের কাজ আরম্ভ হল। কাজ কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর খাসিয়াদের মধ্যে নানারকম সন্দেহ আরম্ভ হল। খাসিয়া উপজাতি সামগ্রিকভাবে ইংরেজদের এই রাস্তা নির্মাণের প্রচেষ্টাকে সুনজরে দেখতে পারে নি। তাই তারা নানা-রকম বাধা সৃষ্টি করতে থাকে। ক্রমশ পাহাড়িয়া অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে খাসিয়ারা ইংরেজদের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের সম্মুখীন হতে থাকে। খাসিয়ারা বুঝতে পেরেছিল—তাদের ওপর ইংরেজ আধিপত্য কায়েম হচ্ছে। ননক্ল (Nonghklaw)-তে খাসিয়ারা অতর্কিতে ডেভিড স্কটকে আক্রমণ করে। ডেভিড স্কট কোনরকমে রক্ষা পান, কিন্তু অপর দুজন ইংরেজ পদস্থ কর্মচারী নিহত হলেন।

১৮২৯ সালে ইংরেজ-খাসিয়া প্রকাশ্য যুদ্ধ হয়। খাসিয়া উপজাতিদের প্রধান নেতা ছিলেন টীরাট সিং (Teerut Singh)। তাঁর নেতৃত্বে খাসিয়ারা দীর্ঘ ছ' বছর উপজাতীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়েই ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত ইংরেজ আক্রমণ প্রতিহত করে তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে হয়। তাঁকে বন্দী করে ঢাকা জেলে পাঠানো হল।

১৮৩৪ সালে সেখানে বন্দী অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। টীরাট সিং আজও খাসিয়াদের মধ্যে বীরের মর্যাদায় পূজিত। ১৮৩৩ সালেই খাসিয়া পাহাড়ে ইংরেজ অধিকারের সূচনা হল। ১৮৩৫ সালের মধ্যে খাসিয়া পাহাড়ে মোটামুটিভাবে ইংরেজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

খাসিয়াদের সঙ্গে যুদ্ধে ইংরেজ-পক্ষের নেতৃত্ব করেছিলেন ক্যাপ্টেন লিস্টার। তাঁকেই প্রথম খাসিয়া পাহাড় ও জৈন্তা পাহাড়ের রাজনৈতিক-অধিকর্তা নিয়োগ করা হল। প্রথমে রাজনৈতিক অধিকর্তার কার্যালয় ছিল ননক্লুতে (Nonghklaw)। অচিরেই তা অদূরবর্তী চেরাপুঞ্জিতে স্থানান্তরিত হয়। শহর হিসেবে চেরাপুঞ্জি যত ছোটই হোক, তার মর্যাদা কম নয়।

পৃথিবীর সর্বাধিক বৃষ্টিপাতের স্থান হিসেবে তার নাম সুপরিজ্ঞাত। অত্যধিক বৃষ্টিপাতের জন্য চেরাপুঞ্জি স্থায়ী বসবাসের উপযোগী না হলেও, পর্যটক আকর্ষণ করার মত প্রাকৃতিক শোভা তার যথেষ্টই আছে।

যা হোক, ইংরেজদের তখন খাসিয়াদের চিরাচরিত জীবনযাত্রায় কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ বা শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করার কোন প্রচেষ্টা ছিল না। দীর্ঘ ষোল-সতেরো বছর খাসিয়া পাহাড়ে ইংরেজ অধিকার নামে মাত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। খাসিয়া সমাজজীবনের গোষ্ঠীপ্রধানদের হাতেই রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ন্যস্ত ছিল।

এদিকে জৈন্তা পাহাড়ের অবস্থা ছিল রীতিমত অশান্ত। ক্রমাগত জৈন্তা-উৎপাত দমন করা চেরাপুঞ্জির রাজনৈতিক অধিকর্তার আয়ত্তের বাইরে ছিল। ১৮৫০ সালে জৈন্তা পাহাড়ের জন্য একটি থানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫১-৫২ সাল থেকেই ইংরেজরা কার্যত খাসিয়া-জৈন্তা পাহাড়ে শাসন করতে পদক্ষেপ করে। ইতোমধ্যে ১৮৪২ সালে ওয়েলস মিশন খাসিয়া পাহাড়ে তাদের কাজ আরম্ভ করল। খাসিয়ারা স্বভাবতই প্রথম-দিকে মিশনের সঙ্গে মোটেই সহযোগিতা করে নি। মিশনকে খাসিয়াদের ওপর প্রভাব বিস্তারের জন্য দীর্ঘদিন অতিবাহিত করতে হয়। কিন্তু ওয়েলস মিশন ইংরেজদের সাম্রাজ্যবিস্তারের কাজ অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছিল।

ইতোমধ্যে চেরাপুঞ্জিকে খাসিয়া পাহাড় জেলার সদর কার্যালয়ের মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। এদিকে ১৮৬১-৬২ সালে গৃহকর আদায় নিয়ে পুনরায় জৈন্তা-বিদ্রোহ হয়ে গিয়েছে। সেজন্য জৈন্তার জন্য পৃথক রাজনৈতিক উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। তবু খাসিয়া পাহাড়ের একপ্রান্তে অবস্থিত চেরাপুঞ্জি থেকে জৈন্তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা প্রায় অসম্ভব ছিল। তা ছাড়া চেরাপুঞ্জির প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতও ইংরেজেদের বসবাসের উপযোগী ছিল না। তাই জেলা সদরের জন্য একটি মধ্যবর্তী স্থানের তাগিদ অনুভূত হল। এর বেশ কিছুদিন আগে থেকেই ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর জন্য একটি সামরিক-নিবাস ও স্বাস্থ্যনিবাস প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন কর্তৃপক্ষ উপলব্ধি করছিলেন। এই সকল প্রয়োজন মেটানোর জন্য উপযুক্ত স্থান হিসেবে তাঁরা নির্বাচিত করলেন ইয়োডো অঞ্চলকে (Yeodo)। খাসিয়া পাহাড়ের মধ্যে এর অবস্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চারদিকে উঁচু পাহাড়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ঢালু এই অঞ্চল (Concave)। এ-জায়গার প্রাকৃতিক শোভা নিঃসন্দেহে মনোরম। প্রধানত ক্যান্টনমেণ্ট ও স্যানিটোরিয়াম নিয়েই নতুন শহর ইয়োডোর পরিকল্পনা প্রস্তুত হল। ১৮৬৪ সালের ক্যালকাটা গেজেটে পাওয়া যায় যে, এই সময়েই সরকারী পূর্তবিভাগ কামরূপ ও খাসিয়া পাহাড়ের জন্য একজন এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার নিয়োগ করেন। শহর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে-সঙ্গেই খাসিয়া-জৈন্তা পাহাড়ের সদর কার্যালয় চলে এল চেরাপুঞ্জি থেকে এখানে। অপেক্ষাকৃত শুকনো ও ঠাণ্ডা আবহাওয়া পেয়ে জেলার ইংরেজ কর্মচারীরা অনেকটা দেশী আবহাওয়া পেল।

কিন্তু শহরটির সমস্যা দেখা গেল নামকরণ নিয়ে। ইয়োডো উঠতি জায়গা। তার কোন ঐতিহ্য বা বনিয়াদ গড়ে ওঠে নি। অথচ ঠিক এই নামেই জাপানে একটি সুপরিচিত শহর আছে। ইয়োডো শহরের জনকরা দু' জায়গার এক নাম রাখা বাঞ্ছনীয় মনে করলেন না। নতুন নামের জন্য বেশিদূর যেতে হল না। ইয়োডোর অদূরেই আছে খাসিয়া পাহাড়ের ২৫টি শৃঙ্গের মধ্যে সর্বোচ্চ শিলঙ চূড়া (৬, ৪৫৬)। ঐ চূড়ার নামই জনকদের পছন্দসই হল।

১৮৬৪ সাল। মানুষের নগর সৃষ্টির ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন ঘটল। জন্ম হল শিলঙ শহরের। সূচনা নিতান্তই আটপৌরে। ১৮৬৪ সালের বেঙ্গল হরকরাতে শিলঙ বা খাসিয়া পাহাড়েরই কোন উল্লেখ নেই।

আদিপর্বে দেখি মুষ্টিমেয় কয়েক হাজার লোক নিয়ে গঠিত হল একটি পাহাড়ি জেলার জেলা-শহর। কিন্তু শিলঙ শহর জন্মলগ্নেই

● শিলঙ-এর আর্ল স্যানিটোরিয়াম

বিধাতার আশীর্বাদ নিয়ে জন্মেছে। আটপৌরে থাকা ওকে কি করে মানায়। ১৮৭৪ সালে উত্তর-পূর্বের জেলাগুলো নিয়ে সৃষ্টি হল নতুন প্রদেশ আসাম। রাজধানীর সম্মানে অভিষিক্ত হল নতুন গড়া শহর শিলঙ। দশ বছর বয়স থেকেই শিলঙ তাই রাজাসনে অধিষ্ঠিত।

প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী শোভিত ও স্বাস্থ্যকর স্থান হিসেবে শিলঙ দেশী-বিদেশী বহু পর্যটককে প্রতিনিয়ত আকর্ষণ করে আসছে। প্রতি বছর মার্চ থেকে অক্টোবর পর্যন্ত শিলঙ শহর বহিরাগতের ভারে কিছুটা স্ফীত থাকে। ডিসেম্বর হলেই আবার শিলঙের লোকেরাই আশ্রয় খুঁজতে যায় উত্তাপের আশায় সমতলের দিকে। শীতের প্রকোপে একমাত্র খাসিয়া ছাড়া অন্যান্য ভাষাভাষীরা এ-সময়ে খুব সহজ বোধ করে না। বলা বাহুল্য, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবীদের অধিকাংশকেই দুঃসহ শীতের মধ্যে বসন্তের পদধ্বনির অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় থাকে না। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে শীতের প্রকোপ অবশ্য অনেক কমে এসেছে।

বিগত শতকের শেষদিকে আসামে যে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়—তাতে শিলঙ প্রচণ্ডভাবে বিধ্বস্ত হয়েছিল। অবশ্য প্রতিনিয়ত ছোটখাট ভূমিকম্প শিলঙে লেগেই আছে। তাই এসব ছোটখাট ভূমিকম্পে এখানকার লোকেরা বিচলিত বোধ করে না। কিন্তু এখানে কোন অট্টালিকা নির্মাণে কেউ সাহস পেত না। অধিকাংশ বাড়িঘরই কাঠের ফ্রেমে তৈরি। আজকের স্থপতিরা সেই ভীতিকে উপেক্ষা করে নির্মাণ করে চলেছেন বহু সুরম্য অট্টালিকা।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে স্বভাবতই প্রাকৃতিক শোভা কিছুটা কমে এসেছে। তাহলেও অনেক পাইনবন, সুন্দর গাছপালা, রঙবেরঙের ফুল, অগণিত ছোট ছোট জলপ্রপাত, সুন্দর লেক—এরকম সৌন্দর্যের অনেক উপকরণই ছড়িয়ে আছে এই পাহাড়ঘেরা শহরে। শহর ছাড়িয়ে খানিকদূর গেলেই পাওয়া যাবে বিডন, বিশপ, এলিফেণ্ট প্রভৃতি সুপরিজ্ঞাত জলপ্রপাত। শহরের অদূরবর্তী জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলোতে মানুষের প্রচেষ্টা ও প্রাকৃতিক পরিবেশের অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ্য করবার মত। বাংলা উপন্যাসে বিশিষ্টতায় অনন্য, যুগান্তকারী উপন্যাস 'শেষের কবিতা' শিলঙেরই পটভূমিতে রচনা করে গিয়েছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ।

রাজধানী শিলঙেরও নব্বই বছর বয়স পূর্ণ হল। মহাকালের অমোঘ নিয়মে জাগতিক বহু প্রগতির হাওয়া শিলঙের গায়ে লেগেছে। মুষ্টিমেয় কয়েক হাজার লোক নিয়ে যে ক্ষুদ্র শহরের পত্তন হয়েছিল, আজ তা লক্ষ মানুষের কল্লোলে মুখরিত নগরী।

আজকের শিলঙের এক লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে সংখ্যাগতভাবে মূল অধিবাসী খাসিয়ারা একক সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়। আজকের শিলঙের চাকচিক্যের মধ্যে খাসিয়া-সংস্কৃতি অনেকাংশেই স্তিমিত। শিলঙের প্রাণকেন্দ্রে খাসিয়াদের সংখ্যা খুব কমই। বড় বড় ব্যবসা, চাকুরি, সর্বস্তরেই আজ অখাসিয়াদের প্রভাব। খাসিয়ার পরই সংখ্যাধিক্যের দিক থেকে বাঙালীর স্থান। বাঙালীর মধ্যে অধিকাংশই নিকটতম শ্রীহট্ট জেলার লোক।

দেশবিভাগ অনিবার্যভাবেই সেই সংখ্যাকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে। অফিস-কেন্দ্রিক শিলঙ শহরের কেরানিকুল বাঙালীর ভারেই স্ফীত। শিলঙের ব্যবসায়-ক্ষেত্রে বহুদিন থেকেই বাঙালী উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছিল। আজ অন্যান্য প্রদেশের মতই মাড়োয়ারী, সিন্ধি, পাঞ্জাবী প্রভৃতিকে প্রথম সারিতে স্থান দিয়ে পেছনে চলে আসতে হচ্ছে বাঙালীকে। সংখ্যাধিক্যের ক্ষেত্রে বাঙালীর পরই অসমীয়া। সীমান্তবর্তী জেলা কামরূপকে শিলঙ প্রথম থেকেই আকর্ষণ করে আসছে। তা ছাড়া রাজ্যের রাজধানীতে সংখ্যাগরিষ্ঠ (এককভাবে নয়) ভাষাভাষীরা যে নানা আকর্ষণেই ভিড় করবে, সেটা খুবই স্বাভাবিক। এ ছাড়া বহু নেপালী, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি অর্থনৈতিক আকর্ষণে, বিশেষত ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য শিলঙে আস্তানা করেছে।

এসব সত্ত্বেও 'কানু ছাড়া গীত নেই'-এর মত খাসিয়াদের বাদ দিয়ে শিলঙের পরিচয় দেওয়া যায় না। হাটে-বাজারে

● শিলঙ্-এর ওয়ার্ড লেকের একটি দৃশ্য

যাসে, কোর্ট-কাছারিতে যাদের ভিড়ে দেখবেন শহর মুখর হয়ে উঠেছে, তাদের অধিকাংশই নিঃসন্দেহে খাসিয়া, শিলঙের শহরতলীতে আজও এরা অপ্রতিরোধ্য।

রাজনৈতিক পরাভব স্বীকার করার দীর্ঘদিন পরও খাসিয়ারা বৃটিশের আনুগত্য স্বীকার করে নি। রাজধানী শিলঙের জন্মের দু-তিন বছর পরেও ইংলণ্ডের হাউস অব কমন্সে ভারতের পার্থিব ও নৈতিক প্রগতির যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তাতে খাসিয়াদের সম্পর্কে অত্যন্ত নৈরাশ্য প্রকাশ করা হয়েছে। বিশ শতকের প্রথম দিকেও (District Gazetter অনুসারে) খাসিয়ারা ইংরেজীশিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ দেখায় নি। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে অবস্থার অস্বাভাবিক পরিবর্তন হল। খাসিয়ারা যে মুহূর্তে ইংরেজী-শিক্ষা গ্রহণ করে, তখন থেকেই দ্রুত হারে শিক্ষা-বিস্তার তাদের মধ্যে আরম্ভ হল। ওয়েলস মিশনের দীর্ঘকালের নিরলস প্রচেষ্টা অবশ্য এর পেছনে অনেকখানি কাজ করে গিয়েছে। আজ খাসিয়াদের মধ্যে, বিশেষ শিলঙ শহরাঞ্চলের খাসিয়াদের মধ্যে অশিক্ষিতের সংখ্যা খুব কম।

শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ মিশনারীরা ধর্মীয় প্রভাব বিস্তারের কাজও পাশাপাশি চালিয়ে যান। আজও সে প্রচেষ্টা অব্যাহত চলেছে। সামগ্রিকভাবে খাসিয়ারা ইংরেজদের শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করেছে। কথ্য খাসিয়া ভাষার লিখিত রূপ দেওয়া সম্ভব হয় রোমীয় বর্ণমালার সাহায্যে। কিন্তু ধর্মের দিক থেকে অধিকাংশ খাসিয়া খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে নি। তারা এখনও তাদের পাহাড়িয়াদের দেব-দেবীর পূজো করে থাকে।

সাধারণভাবে খাসিয়ারা অত্যন্ত কর্মঠ। সমাজব্যবস্থা মাতৃতান্ত্রিক। সেজন্য স্ত্রী-পুরুষ যেভাবে জীবিকা অর্জনের সরিক হয়েছে, তেমনি শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রেও সমভাবে চলেছে। খাসিয়া ছেলেমেয়েরা যেমন দিনের বেলা অফিস করে—রাত্রে কলেজ করতে দ্বিধাবোধ করে না, তেমনি-ভাবেই তারা দিনের বেলা কলেজ করে সন্ধ্যাবেলা হাটে বসে মাছ বা তরকারী বিক্রি করতে লজ্জা বোধ করে না। পাশ্চাত্য প্রভাবেই হোক, আর যে কারণেই হোক—তাদের এই প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা সমতলবাসী-দের, বিশেষত আমাদের ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্তের দৃষ্টিতে বিস্ময় উদ্রেক না করে পারে না।

প্রকৃতিগতভাবে খাসিয়ারা অল্পে সন্তুষ্ট। কিন্তু সমতলের তথাকথিত সভ্যতার প্রভাবে তাদের মধ্যে সভ্যজীবনের নানা প্রলোভন এসেছে। তা থেকে নৈতিক অধঃপতন এসেছে বেশ কিছু। সেই অধঃপতন আমাদের কাছে এত প্রকট হওয়ার কারণ অবশ্য সভ্যজীবনের সঙ্গে পরিচিত হলেও তার মুখোস ব্যবহারে ততটা রপ্ত হয় নি এরা।

অধিকাংশ খাসিয়ারা যথেষ্টভাবে রাজনৈতিক সচেতন নয়। তা সত্ত্বেও অন্যান্য পাহাড়ি জেলার মত এখানেও আছে স্বতন্ত্র খাসিয়া রাজ্যের দাবি। স্বতন্ত্র নাগা রাজ্যের সৃষ্টি, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সী গঠন প্রভৃতি কারণে ভারতের অন্যান্য পার্বত্য অধিবাসীদের মত এদের মধ্যেও স্বাতন্ত্র্যবোধ তীব্র হয়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক কারণ এ-ব্যাপারে ইন্ধন যোগাচ্ছে। শিক্ষিত ও উন্নত শ্রেণীর কিছুসংখ্যক খাসিয়ার মধ্যে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব লাভের আগ্রহও নগণ্য নয়। সাধারণভাবে খাসিয়ারা উগ্র স্বভাবের নয়। তাই এদের আন্দোলনের উগ্রতা অন্যান্য পাহাড়িদের চেয়ে কম। এরা কখনও ভারত থেকে আলাদা হওয়ার কথা ভাবে নি। কিন্তু বৃটিশ সরকারের বিভেদমূলক নীতির জন্য কখনও পার্বত্য অঞ্চলবাসীরা সমতলবাসীদের সঙ্গে একাত্মভূত হতে পারে নি।

দুঃখের বিষয় স্বাধীনতার পরও অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হল না। ভারতের ও আসামের কংগ্রেসী সরকার আগাগোড়া রাস্ত্রনীতি অনুসরণ করে সেই বিভেদ আরও বাড়িয়ে তুলেছেন। অধিকাংশ খাসিয়ার ধারণা, কংগ্রেস সরকার, বিশেষত আসামের কংগ্রেসী শাসকগোষ্ঠী তাদের প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ করে চলেছেন। তাই গত কয়েক বছরে অপ্রীতিকর অনেক ঘটনা ঘটেছে। যখনই খাসিয়াদের কোন আন্দোলন একটু তীব্র হয়, তখনই অনেকে শিলঙ থেকে রাজধানী পরিবর্তনের কথা ভাবেন।

এদিকে অসমীয়াদের মধ্যে গৌহাটিতে রাজধানী পরিবর্তনের দাবি দীর্ঘদিন থেকেই চলে আসছে। আসামের বৃহত্তম শহর গৌহাটি নিঃসন্দেহে ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প, যোগাযোগ, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে স্বাভাবিক রাজধানী, কিন্তু রাজধানী পরিবর্তন, আসাম তথা ভারতের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ঘোরতর পরিবর্তনের সূচনা করতে পারে। অশান্তির দাবানল জ্বলে উঠলে পার্বত্য অঞ্চলবাসীদের সমতলের অধিবাসীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা আছে। শিলঙ শহরের সামগ্রিক উন্নতির জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছে। আরও বহু কোটি টাকা ব্যয়িত হওয়ার পরিকল্পনা আছে। এই মুহূর্তে রাজধানী পরিবর্তন হলে এই দেশের বহু কোটি টাকার ক্ষতি হবে। গৌহাটিতে প্রয়োজনীয় অফিসের জন্য বাড়ি-ঘর নির্মাণের জন্যও বহু কোটি টাকার দরকার, যা আমাদের দেউলিয়া অর্থনৈতিক অবস্থায় দুঃসাধ্য। তা ছাড়া চীনা আক্রমণ প্রভৃতি সাম্প্রতিক ঘটনাতে শিলঙ অসাধারণ সামরিক গুরুত্বও পেয়েছে—এসব কথা রাজধানী পরিবর্তন প্রসঙ্গে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

---

* এই প্রবন্ধ রচনায় আসাম সরকারের তথ্য ও প্রচারঅধিকর্তা শ্রী ঈশ্বর-প্রসাদ চৌধুরী এবং জেলাপঞ্জীর মুখ্য সম্পাদক শ্রীকেশবনারায়ণ দত্তের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

॥ বাহির-শিমুলিয়ার কাল থেকে একালের ঝামাপুকুর ॥

পূর্বে রাজাবাজার অরাজকতায় দোসরহীন; পশ্চিমে ঠনঠনে দেবী-মাহাত্ম্যের পসারী; উত্তরে সিমলা নষ্ট-ঐতিহ্যের শৈবালে আচ্ছন্ন; এবং দক্ষিণে নববিধানের প্রাজ্ঞ-পুরোধার স্মৃতি-পথ বিধানহীন। মধ্যে ঝামাপুকুরের পুকুরবিহীন অস্তিত্বে জরার উপদ্রব, খরশব্দের উৎপীড়ন এবং বিত্তাহরণের দপ্রতাপ লাঞ্ছনা। এখানে নানাপথ নানা গলির জটিল বন্ধনে বাড়ির পাশে বাড়ি, দেয়ালের পাশে দেয়াল। আর কোনো ঠাঁই নেই তার সারাবুকে। বুকে তার বিচিত্র শব্দের শরনিক্ষেপের শিহরণ। কারণ প্রায় ঘরেই তার সংস্থাপিত বিশ্বকর্মার যন্ত্রণা বা যন্ত্র—যা প্রাপ্তিযোগের অনিবার্য স্বার্থেই সচল থাকে দিবারাত্রি।

ঝামাপুকুর আজ শহর বা শহরের বিশেষ ভাগ। যদিও সে চৌরঙ্গীর মতো নয় রমণীয়, ডালহৌসীর মতো নয় দুর্ধর্ষ, বালিগঞ্জের মতো নয় প্রচণ্ড এবং হেস্টিংস বা আলিপুরের মতো নয় সৌখীন, তবু সে শহর, অর্থাৎ শহরেরই আত্মলগ্ন পরিবেশে লালিত। হয়তো সুকুমার নয় বৃত্তিগত দিক থেকে, তবু আভিজাত্যের আদিমঞ্চে সে অসাড় হয়ে পড়ে নি একালেও। হয়তো সুচারু নয় বহিঃপ্রকাশে, তবু অস্তিত্বকে তার পাশ কাটিয়ে যায় নি ইতিহাস। তাই শহর-কলকাতা পর্যায়ের আলোচনা-সংঘে আজ সভ্যপদ লাভের অধিকারী সে-ও।

অরণ্যের কাল পেছনে ফেলে, যখন আত্মপ্রকাশের পথে যাত্রা সুরু করে জেলে এবং কৃষাণকুলের শিমুলিয়া পল্লী, ঝামাপুকুর অসংস্কৃত তখনো। তখনো তার সর্বাঙ্গে কাঁটাকুঞ্জের গহন বিস্তৃতি। সুতরাং শ্বাপদাদির স্বাধীন বিহারক্ষেত্ররূপে তা পরিত্যাজ্য ছিল কৃষাণকুলের কাছেও। অবস্থিতি তার শিমুলিয়ার বহির্ভাগে—তাই তখন বাহির-শিমুলিয়া নামেই সে পরিচিত। ----

● রাজা দিগম্বর মিত্রের প্রাচীন প্রাসাদের দৃশ্য

নির্জন বনপ্রান্তর বাহির-শিমুলিয়া। শেয়ালের ডাকে সন্ধ্যা ঘনায়, মাঝে মাঝে বাঘের ডাকেও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে গভীর রাত্রি। অবশ্য পাখিও ডাকে। পাখির ডাকেই ভোর এসে ঘুম ভাঙায় বনফুলের। হাসতে হাসতে চোখ মেলে তাকায় সূর্য। হাওয়া এসে হাত বুলায় কাঁটাকুঞ্জের অলকে। সুতরাং যদিও জনপদের বহির্ভাগে তার সংস্কার-বর্জিত স্থিতি এবং রাতের রূপ তার

শ্রীপদাতিক

স্বভাবতই ভয়ঙ্কর, তবু প্রত্যহের প্রাতঃপর্বে সে ধারণ করে এমনই এক মূর্তি—যা কবির চোখে কাব্যের অনুকূল নিঃসন্দেহেই। কিন্তু জেলে বা কৃষকসমাজের মধ্যে কবি হয়তো ছিল না কেউ, তাই সেদিন ছন্দের বন্ধনীতে আসন লাভের কোনো সুযোগ পায় নি বাহির-শিমুলিয়া।

তবে বাহির-শিমুলিয়া পরে একদিন মন মজালো একজনের—তিনি কোম্পানী-আমলের 'বেঙ্গল ব্যাঙ্কের' দেওয়ান গোপীনাথ ঘোষের পিতৃদেব। হঠাৎ তিনিই একদিন এসে জরীপ করলেন বাহির-শিমুলিয়ার আংশিক ভূ-ভাগ। তারপর দিনে দিনে কাঁটাগাছ নিড়িয়ে, শ্বাপদাদি তাড়িয়ে এবং অনেককালের অসমতল ভাগে কোদাল চালিয়ে তিনি পত্তন ঘটালেন যে-নতুন পরিবেশের—দূর থেকে তা দর্শন ক'রে আশ্চর্য হলো শিমুলিয়া পল্লীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। দেখতে দেখতেই সেখানে আত্মপ্রকাশ ঘটলো বাগানবাড়ির, প্রতিষ্ঠা ঘটলো সুদৃশ্য একটি পুকুরের। পুকুরের উঁচু পাড় ঝামা নামক পাথরকুচি দিয়ে বেঁধে দিলেন ঘোষমশায়। ফলে সাধারণের কাছে সেদিন থেকেই পুকুরটির নাম হলো 'ঘোষেদের ঝামা-পুকুর'। শোনা যায়: পরবর্তীকালে সেই পুকুরের সূত্রে বাহির-শিমুলিয়াও 'ঝামাপুকুর' নামেই নিজ-পরিচিতির বিস্তার ঘটায় অঞ্চলগত দিক থেকে। বলা বাহুল্য, সে-নামের স্পষ্ট উচ্চা-রণ জেগে আছে একালেও—যদিও

পুকুর আজ নেই এবং পুকুরের স্থলাভিষিক্ত গৃহরাজিও আজ প্রাচীনত্বের অঞ্চলতলে অবস্থিত প্রায়।

ঘোষবংশের বাগানবাড়ি প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পর থেকেই বসু-মিত্র-দত্ত-পাল এবং চট্টোপাধ্যায় বংশের আবির্ভাব সুরু হয় ঝামাপুকুরে, বসু-দত্ত-পাল এবং চট্টোপাধ্যায়দের আদিনিবাস গোবিন্দপুর। ফোর্ট উইলিয়ামের প্রয়োজনে সে-অঞ্চল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক অধিকৃত হওয়ায়, তাঁরা বাধ্য হয়েই ঝামাপুকুরে এসে স্থাপন করেন নতুন বসতি। আর মিত্রবংশ আসেন কোন্নগর থেকে। কোন্নগরের প্রতাপশালী জমিদার দিগম্বর মিত্র। ইংরেজের পরম ভক্তরূপে তিনি তদানীন্তন নেটিভদের মধ্যে ছিলেন সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া নীলকর সাহেবদেরও নাকি প্রধান সহায়ক ছিলেন তিনি। প্রভু ইংরেজ তাঁকে উপঢৌকনস্বরূপ প্রদান করে রাজা উপাধি। রাজা হয়েই তিনি ঝামাপুকুরে এসে নির্মাণ করেন উদ্যানশোভিত নিকেতন। তারপর সপরিবারে সেখানেই বসবাস সুরু করেন স্থায়িভাবে। আজও ১ নং ঝামাপুকুর লেনের ঠিকানায়, রাজবংশের ক্ষয়িষ্ণু যশের মতোই দাঁড়িয়ে আছে সেই আদিকালের রাজবাটী—যা তদানীন্তন যুগের এক ম্রিয়মাণ চিত্ররূপে কৌতুক-কুঞ্চিত করে পথিকজনের ললাট।

রাজা দিগম্বর মিত্রের একমাত্র পুত্র গিরিশ মিত্র কিন্তু ইংরেজ-মিত্র ছিলেন না কোনোদিন। শোনা যায়: বাহ্যিক আচারে ইংরেজের আনুগত্য স্বীকার করলেও, অন্তরে ইংরেজ-প্রভুত্বের প্রতি প্রচণ্ড বীতরাগ ছিল গিরিশ মিত্রের। তিনি ইংরেজের বিপক্ষে কোনো এক বিদ্রোহীদলের সদস্যপদও নাকি গ্রহণ করেছিলেন গোপনে। একালের অতি প্রবীণের দল ব'লে থাকেন: একদিন শহর থেকে দূরে, বিদ্রোহীদলের কোনো এক গোপন সভায় যোগদান করার পর, সন্ধ্যালগ্নে যখন অশ্বারোহণে গৃহে ফিরছিলেন গিরিশচন্দ্র, তখন তাঁর পিছু-ধাওয়া করে দু'জন শ্বেতাঙ্গ পুলিশ। এই পুলিশদের দিগভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যেই ভিন্নপথে অশ্ব ছুটিয়ে দেন তিনি। উঁচু-নিচু পথে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলে অশ্ব। এভাবে ছুটতে ছুটতেই একসময় সর্পিল পথের এক গভীর গর্ত যখন ডিঙিয়ে যায় অশ্বটি জোরকদমে, তখন একদিকের রেকাবে হঠাৎ পা গলে যায় গিরিশ মিত্রের। ফলে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অশ্বের পৃষ্ঠচ্যুত হয়ে আছড়ে পড়েন নিচে। অশ্ব ছুটে চলে আগের মতোই। তার রেকাবে আটকে আছে গিরিশ মিত্রের পা। সুতরাং ছুটন্ত অশ্বের সঙ্গে সারাপথ আছাড় খেতে খেতেই গড়িয়ে চলে তাঁর ঝুলন্ত দেহ। এভাবেই দীর্ঘ পথ অতিক্রমের পর, দুরন্ত অশ্ব যখন এসে পৌঁছয় প্রাসাদের তোরণ-দ্বারে, কুমার গিরিশ মিত্রের রক্তাক্ত কলেবরে আর কোনো বিধূনন নেই তখন প্রাণবায়ুর।

অন্দরমহল থেকে ছুটে আসেন স্নেহময়ী মাতা। তিনি প্রিয় পুত্রের এমন মর্মন্তুদ দশা দর্শন করেই অচৈতন্য হয়ে পড়েন তখনই। তিনি জানতেন পুত্র তাঁর ইংরেজ-বিরোধী বিদ্রোহী-দলের সদস্য এবং এ ব্যাপারে পুত্রের প্রতি অকৃত্রিম সমর্থন ছিল তাঁরও। সুতরাং জ্ঞান ফিরতেই তিনি স্থির-বিশ্বাসে ঘোষণা করেন: পুত্রকে তাঁর হত্যা করেছে ইংরেজরাই এবং তারাই মৃত পুত্রের পা রেকাবে আটকে দিয়ে অশ্ব ছুটিয়ে দিয়েছে গৃহাভিমুখে।

যাই হোক, পুত্রশোকে দিন-কয়েকের মধ্যেই মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটে মায়ের। মত্ত অবস্থায় যতদিন তিনি

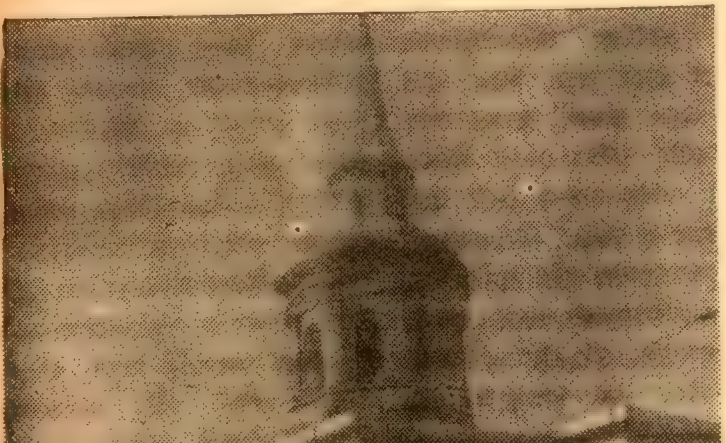

● কেশব সেন প্রতিষ্ঠিত নববিধান ব্রাহ্মসমাজ গৃহ

বেঁচে ছিলেন, ততদিন নাকি প্রলাপের সুরে কেবল অভিশাপ দিয়েছিলেন ইংরেজদের। ইংরেজ আজ এ-দেশ থেকে বিতাড়িত। কিন্তু উন্মাদিনী মায়ের অভিসম্পাতের সেই প্রতিধ্বনি হয়তো জীর্ণ প্রাসাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জেগে আছে আজও। এ-ধ্বনি শ্রুতিগোচর হবে না সাধারণ মানুষের। এমন কি, রাজবংশের উত্তরপুরুষদের কানেও তার মৃদু অনুরণন জাগবে না কোনোদিন। স্পষ্ট ভাষা তার বিস্ময় ফোটাবে কেবল তাঁরই কানে—সন্ধিৎসা যাঁর পুরাতত্ত্বের নদীতে স্নানার্থী এবং যার অনুভূতি ছুঁয়েই ধন্য হয় সর্বকালের ইতিহাস।

ঝামাপুকুরের আরেক বনেদী বংশ চট্টোপাধ্যায়েরা। তাঁদের সঙ্গেই জড়িত এ-অঞ্চলের ইতিহাস, সমাজ এবং সনাতন অধ্যাত্ম-চেতনা। তেমন লিখিত আকারে ঝামাপুকুরের ইতিহাস নেই কোথাও। কিন্তু চট্টোপাধ্যায় বংশের একালের পরিবার-প্রধান যিনি—এ-অঞ্চলের আদিযুগের বাঙ্ময় মানচিত্র তিনি স্বয়ং। পিতামহ-প্রপিতামহদের কাছ থেকেই তিনি আহরণ করেছেন যে-সমস্ত তথ্য—আজও তা সযত্নেই গচ্ছিত আছে তাঁর স্মৃতির দেউলে। লেখার দিকে কোনো ঝোঁক নেই তাঁর। সুতরাং তা লিখিত আকারে হয়তো আত্মপ্রকাশ করবে না কোনোদিনও। তবে পুরাতত্ত্বের প্রতি আকর্ষণ যাঁর গভীর—তিনি যদি ঝামাপুকুরের কোনো ইতিবৃত্ত লেখার আগ্রহে সমীপবর্তী হন চাটুজ্যেমশায়ের, তা হলে অবশ্যই তিনি শুনতে পাবেন আদি-মানচিত্রের গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

চট্টোপাধ্যায় বংশের প্রাচীন বসতবাটী আজ গোপাল বোস লেনের ঘনবসতির অন্তরালে আড়ম্বর-বর্জিত। বাড়ির মধ্যে অপরিসর উঠোন। উঠোনের উত্তরভাগে উঁচু মণ্ডপ। ঝামাপুকুরের আদিকাল থেকে এখানেই অধিষ্ঠিত লক্ষ্মী-জনার্দন। তাঁর উপাসনার জাঁকজমক আগের তুলনায় খানিকটা স্তিমিত হলেও, আদ-গাম্ভীর্যের অভাববোধ নেই কোনো অংশে। আজও উদাত্ত কণ্ঠে সকাল-সন্ধ্যায় উচ্চারিত তাঁর অনাদিকালের ধ্যান:

'ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী
নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ মকরকুণ্ডলবান্ কিরীটী
হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ॥'

এই লক্ষ্মী-জনার্দন একটি শালগ্রাম শিলা। তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদন্তী এই: এককালে একখণ্ড শিলারূপেই তিনি ঔষধ পেষার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছিলেন কোনো এক কবিরাজের গৃহে। তাই একদিন চট্টোপাধ্যায় বংশের অন্যতম আদি-পুরুষ লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়বাগীশকে স্বপ্নে দর্শন দান করেন তিনি। তারপর বলেন: অমুক কবিরাজ আমাকে ব্যবহার করছে ঔষধ পেষার কাজে। তার হাত থেকে তুই আমাকে উদ্ধার কর এবং প্রতিষ্ঠা কর তোর গৃহে।

স্বপ্নাদেশ পেয়েই কবিরাজের গৃহে উপস্থিত হন ন্যায়বাগীশ। সেখানে তাঁর স্বপ্ন-বৃত্তান্ত তিনি বিশদ-ভাবে বর্ণনা করতেই সশঙ্কচিত্তে চমকে ওঠেন কবিরাজ। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই শিলাখণ্ড এনে অর্পণ করেন ন্যায়বাগীশের হাতে। প্রতিদানে কবিরাজকে কিছু অর্থদান করতে চাইলেন ন্যায়বাগীশ। কিন্তু কবিরাজ এক কপর্দকও গ্রহণ না করে কেবল বললেন: আমি পাপী, তাই দেবতাকে চিনতে পারি নি। দেবতা আপনাকে দর্শন দান করেছেন স্বপ্নে এবং প্রতিষ্ঠা চেয়েছেন আপনারই গৃহে। অতএব আপনিই ধন্য। দয়া করে প্রার্থনা করবেন—যেন আমার ক্ষমাহীন পাপও ক্ষমা করেন লক্ষ্মী-জনার্দন।

সেই থেকে ন্যায়বাগীশের গৃহেই অধিষ্ঠান ঘটে লক্ষ্মী-জনার্দনের। চট্টোপাধ্যায়রাই ন্যায়বাগীশের উত্তর-পুরুষ। পুরুষানুক্রমে লক্ষ্মী-জনার্দনের সেবায়েত আজ তাঁরাই।

চট্টোপাধ্যায় বংশের আরেক ঐতিহ্যশালী বিগ্রহ শ্যামসুন্দর। শ্যামসুন্দরের স্বতন্ত্র মন্দির ছিল গোবিন্দপুরে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ

দেশ সেবায় নিয়োজিত,
এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড
কলিকাতা—৫০
নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ
প্রস্তুতকরণের অগ্রণী
—ব্রাঞ্চ সমূহ—
বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর
বেজওয়াডা - শ্রীনগর - গৌহাটী

ভাগে যখন গোবিন্দপুর গ্রামের উচ্ছেদ ঘটে, তখন স্বাভাবিক কারণেই চট্টোপাধ্যায় বংশের সঙ্গে শ্যামসুন্দর আসেন ঝামাপুকুরে এবং আসন গ্রহণ করেন লক্ষ্মী-জনার্দনের পাশেই। তারপর এভাবেই কেটে যায় অষ্টাদশের পর, উনবিংশ শতাব্দীর সুদীর্ঘ সময়। বিংশ শতাব্দীর উন্মেষপর্বে অর্থাৎ বাংলা ১৩৩০ সালে চট্টোপাধ্যায় বংশই আবার বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীটে প্রতিষ্ঠা করেন শ্যামসুন্দরের স্বতন্ত্র মন্দির। বর্তমানে শ্যামসুন্দরের এই মন্দির-সূত্রেই মন্দির-সমীপবর্তী অঞ্চল নামধারণ করেছে শ্যামসুন্দরতলা। এখন অবশ্য শ্যামসুন্দরের সেবায়েত আর চট্টোপাধ্যায় বংশ নন। তাঁর বর্তমান সেবায়েতের নাম রামগোপাল মুখোপাধ্যায়।

কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীটের পশ্চিমভাগ ঝামাপুকুরেরই অন্তর্গত। এখানেই অবস্থিত নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের চূড়াবিশিষ্ট উপাসনালয়। তার প্রতিষ্ঠাতা কেশবচন্দ্র সেন স্বয়ং। পূর্বে কেশবচন্দ্র ছিলেন একই সমাজভুক্ত। পরে তাঁর কন্যাকে তিনি ভিন্ন গোত্রের রাজবংশে সম্প্রদান করায় আদি সমাজের সঙ্গে তাঁর মতান্তর ঘটে প্রচণ্ড। সুতরাং সে-কারণেই আদি সমাজের সঙ্গে আর সংযুক্ত থাকাও সম্ভব হল না তাঁর পক্ষে। তিনি স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠা করেন নববিধান সংঘ। এই নববিধান সংঘেরই প্রথম উপাসনালয় তিনি নির্মাণ করেন ঝামাপুকুরের দক্ষিণভাগে—যা আজও এক ভাব-গম্ভীর পরিবেশ বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে ৯৫ নং কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীটে। অটল উর্ধ্ববাহু এই গৃহ। কোনো আড়ম্বর নেই তার অঙ্গে, কোনো ঔদ্ধত্য নেই তার অধিষ্ঠানে, এবং বিশেষ কোনো বিধি-নিষেধ নেই তার প্রবেশপথে। সব মিলিয়ে সহজ সাবলীল এবং স্বাভাবিক। হয়তো সেজন্যেই তার সার্বিক পরিবেশে ফুটে উঠেছে সমাহিত এক সৌন্দর্য—যা স্মরণ করে সেকালকে, বরণ করে একালকে এবং আমন্ত্রণের এক মৌন বার্তা পাঠায় ভবিষ্যতের উদ্দেশে।

ঝামাপুকুরে আরও মন্দির আছে, আরও ঐতিহ্যসম্পন্ন গৃহ আছে এবং বংশগত দিক থেকেও স্মরণীয় পরিবার আছে আরও একাধিক। কিন্তু প্রচণ্ড ভিড়ের জটাজাল থেকে আজ এক এক করে তাঁদের আহরণ করা সহজসাধ্য নয় বলে সংযত থাকাই হয়তো সমীচীন। যদিও অঞ্চলগত দিক থেকে তেমন সুপরিসর নয় ঝামাপুকুর, তবু তার স্বল্প পরিসরে ঘনবসতির যে-গভীর অরণ্য বাহু বিস্তার করেছে দিনে দিনে—আজ তারই অন্তরালে হারিয়ে গেছে অনেক কালের অনেক ইতিহাস। এ-অঞ্চলের শহুরে পরিবেশও আজ যেমন স্বাভাবিক কারণেই প্রাচীন, তেমনই তার জীবন জুড়েই আজ আসন্ধ্যা-সকাল দোলা দিয়ে যায় উদ্বাস্তুতার প্রবল বন্যা। সুতরাং এখানে প্রাণের কাছাকাছি এলেও অন্তরের বাসরগৃহে ঠাঁই পাওয়া কঠিন; রসিকের সান্নিধ্য পেলেও রসের নাগাল পাওয়া দুরূহ, এবং গানের কলিতে কান পাতলেও তার সুরকে আয়ত্ত করা খুব সহজ-সাধ্য নয়। অবশ্য আছে সবই এবং তা দিনের পর দিন সাবধানে চয়ন করে সাধারণ্যে পরিবেশন করার যোগ্যতাও হয়তো অর্জন করা সম্ভব। কিন্তু তার জন্য অধ্যবসায়ের যে-প্রতুলতা অপরিহার্য—তার পক্ষে বর্তমান নিবন্ধকার অকিঞ্চিৎকর নিঃসন্দেহেই।

নিঃসঙ্গ

অনসূয়া দেবী

দুর্ভেদ্য বাদামী বিষণ্ণতা
আদি অন্তহীন।
জনাকীর্ণ এই পৃথিবীতে
নিঃসঙ্গ আত্মকেন্দ্র এই চলাফেরা
এর চেয়ে আশ্চর্য আর কিছু নেই।
সারাদিন ট্রামে বাসে
অবিরাম জনস্রোত ওঠে আর নামে;
তখন এ প্রাণহীন চলমান যন্ত্রগুলো যেন
মানুষের কত আপনার!
তারপর রাতে সেই জল আর তেলমাখা
নোংরা ডিপোতে
ওরা পড়ে থাকে একা
এখন তো কেউ আসে নাকো
ওদের একাকীত্বের ভাগ নিতে।

একটু আগেই খুব ঘনমেঘ করে
প্রচণ্ড বৃষ্টি এলো,
তারপর বৃষ্টিকণা সূর্যের ব্যাঙ্গকে উপেক্ষা করে
রামধনু এঁকে দিল ঘন কালো আকাশের 'পরে।
মেঘ আর বহুবর্ণ ইন্দ্রধনু
পাশাপাশি বন্ধুর মত শোভা পেল।
কিন্তু তা কতক্ষণ? রামধনু কতক্ষণ বিষণ্ণ মেঘে
দৃশ্যমান থাকে, তার বিষণ্ণতা কে হাল্কা করে?
রামধনু চলে যায় মেঘ পড়ে থাকে
আরো কালো, আরো একা, আরো বৈচিত্র্যহীন,
আমারই মতন এই অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যে ঠাসা
বর্ণহীন প্রাণহীন শব্দময় শহরের বুকে।

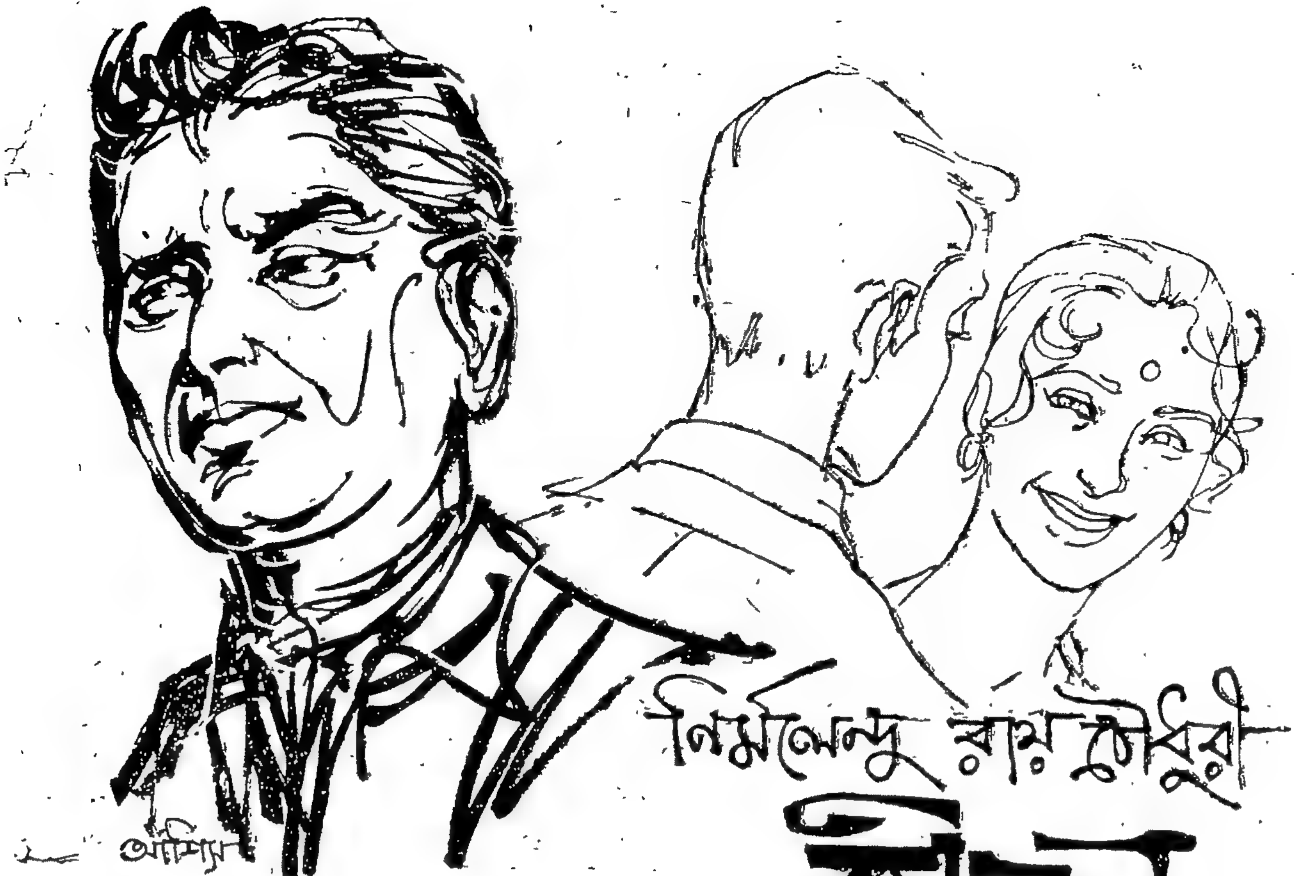

নির্মলেন্দু রায়চৌধুরী

জীবন রং

যেহেতু দীর্ঘদিন পাশাপাশি বাস করেছেন এবং আপনি আপনার স্ত্রীর স্বামী—স্ত্রী থাকার অর্থ, আপনি জানেন, অন্যের হাঁড়ির খবর নিতান্ত অনায়াসে আপনার জ্ঞানের গোচরে আসা—সেহেতু ননীগোপাল-কাকলির দাম্পত্য-চর্চার খুঁটিনাটি সমস্ত সংবাদই আপনি জানেন। প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যে পর্দা উঠল যেদিন, সেদিন, সেই শুভদৃষ্টির লগ্ন থেকেই আপনি ওদের দাম্পত্য-নাট্যের একজন বিবেচকদর্শক।

হ্যাঁ, আজ থেকে সাত বছর আগে ওদের শুভদৃষ্টির অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আপনি।

সেদিনের সেই শ্যামলী সন্ধ্যা মধুর ছিল, কাকলির হাজারবাতি রূপের আলোর চারপাশে ননীগোপালবাবুর মন ঘুরছিল। ঘুরছিল পতংগের মত। অসহ্য উল্লাসে। এমন সময় কী যে হল, ননীগোপালবাবুর চোখের সামনে সমস্ত আলো হঠাৎ একসঙ্গে দপ করে নিভে গেল। বেশ বুঝলেন ননীগোপালবাবু যে, তাঁর দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল কাকলি। কী একটা অকথ্য যন্ত্রণায় কাকলির চোখের মণিদুটো ছটফট করে উঠল। মুখ ফিরিয়ে নিল ও। ননীগোপালবাবু ঘাবড়ে গেলেন। প্রবল-প্রতাপ অফিসারের সামনে গরীব কেরানি যেমন ভড়কে যায়, ঠিক তেমনি।

ব্যাপারটা চরমে উঠল বাসরঘরে। বাসরে কিছুতেই যেতে চাইছিল না কাকলি। বাড়ির লোকে একরকম টেনেই নিয়ে গেল তাকে সেখানে। কিন্তু আমোদ-আহ্লাদ, ঠাট্টা-তামাসা কিছুই জমল না। কাকলির বিরস মুখ আর রুক্ষ দৃষ্টির কঠিন শাসনে সবকিছু স্তব্ধ হয়ে গেল। সে নিঃশব্দ রাত্রে অজানা একটা আশংকায় ননীগোপালবাবুর বুকের ভেতরটা শুধু কেঁপে কেঁপে উঠল নীরবে।

মাঝরাতে ভয়ার্ত একটা চীৎকার করে জেগে উঠল কাকলি।

কী হল? নতুন বিয়েব কনে! হল কী? ছুটে এল সকলে।

জানা গেল যে, স্বপ্নে ভয় পেয়েছে কাকলি। স্বপ্নে ও দেখেছে ওর জীবনের প্রথম পুরুষ, কুমারীর অনুরাগে রাঙানো ওর কল্পনার নায়ক রূপ ধরে এসেছে ননীগোপালবাবুর—যার নাক থ্যাবড়া, চোখ কোটরগত, রঙ ঘন কালো, ঠোঁট পুরু, শরীর বেটপ্ আর রোমশ। এবং সেই ননীগোপালবাবু, মুখে যার হলদেটে দাঁতের স্থূল হাসি, চোখে যার লালসা, এসে হাত ধরলেন কাকলির, গ্রাম্য চাষীর মত প্রণয় নিবেদন করলেন। বুকটা দুরুদুরু করে উঠল কাকলির, সে ছুটে পালাতে চাইলে। কিন্তু

ননীগোপালবাবুর কর্কশ দুটি বাহুর বজ্র বন্ধন,—উঃ কী কঠিন। কী ভয়ংকর। চীৎকার করে উঠল কাকলি।

হ্যাঁ, বিচিত্র সেই বাসররাত্রি থেকে আজ সাত বৎসর পর্যন্ত আপনি ননীগোপালবাবুর দাম্পত্য-জীবন দেখে আসছেন। কত খুঁটিনাটি আপনার চোখে ধরা পড়ল, কত ছোটখাট ব্যাপার।

আপনি জানেন যে, কাকলি সারারাত ধরে গল্পের বই পড়ে, গল্পের কন্দর্পকান্তি নায়কের হাত ধরে সারারাত সে এক মোহময় স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করে। স্বাভাবিকভাবে ননীগোপালবাবু এ-সমস্ত ব্যাপার পছন্দ করতে পারেন না, পারার কথাও নয়। কারণ রাত্রিজাগরণের ফলে কাকলি বেলা ন'টা পর্যন্ত ঘুমোয়। ননীগোপালবাবু এর মধ্যে ঘর-দোরের কাজ সারেন, বাজার করেন, রান্না করেন,—এমন কি ওরই একফাঁকে এককাপ চা ঘুমন্ত কাকলির বিছানার পাশে রেখে আসেন। ঘুমজড়িত চোখে চা খেয়েই আবার কাকলি শুয়ে পড়ে। কিন্তু আশ্চর্য মানুষ ননীগোপালবাবু। এ-হেন স্ত্রীর বিরুদ্ধেও তাঁর কোন অভিযোগ নেই। অভিযোগ তো নেই-ই, কল্পিত এবং মনোরম এক মিথ্যার আড়ালে স্ত্রীর সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি ঢেকে রাখার একটা বিচিত্র চেষ্টাই আজ পর্যন্ত আপনি দেখে আসছেন ননীগোপালবাবুর মধ্যে।

কিন্তু লোকের মুখে হাত চাপা দেবে কে? এ রেল-কলোনীর নিথর জীবনে রোমাঞ্চ জাগিয়েছে কাকলি-ননীগোপাল সংবাদ। সকলের জিভের আগায় আগায় ঘুরছে ওদের কথা।

এই তো সেদিন আপনি শুনলেন হাবুলের মা'র কথা।

সেদিন আপনি ঘরে বসে বই পড়ছিলেন। হঠাৎ অনুচ্চ নারীকণ্ঠের এক শ্রবণাভিরাম সংলাপ শুনে বই বন্ধ করলেন আপনি। কান খাড়া করলেন। পাশের কোয়ার্টারের হাবুলের মা এসেছে ভোম্বলের মা অর্থাৎ আপনার স্ত্রীর কাছে।—

হাবুলের মা বললে, শুনেছ ভোম্বলের মা। শুনেছ কাণ্ড। ননীগোপালবাবু কাকলির জন্য একখানা শাড়ি কিনে এনেছিলেন। এমন কিছু মন্দ নয়, বেশ ভাল শাড়ি-ই। তা আমাদের কাকলি-সুন্দরী ঝি'কে সে শাড়ি দিয়ে দিয়েছে। বলেছে নাকি,—যাকে যা মানায়। যার যা সাজে।

ভোম্বলের মা বললে, একটু সুন্দরী কিনা, তাই এত দেমাক। কিন্তু দিদি, মেয়েমানুষের এত দেমাক ভাল নয়।

একটু উত্তেজিত হয়ে হাবুলের মা বললে, সুন্দরী। অমন সুন্দরী ঢের দেখেছি। আজই না হয় যেদিকে জল পড়ে সেদিকে ছাতা ধরতে ধরতে আর খাটতে খাটতে হাড় হিম হয়ে গেছে। আজই না হয় সাত-সাতটা সন্তান পেটে ধরেছি, বুড়ি হয়েছি। কিন্তু আমিও তো এমন চিরকাল ছিলাম না ভোম্বলের মা।

ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটু থেমে হাবুলের মা আবার সুরু করলে, মেয়েমানুষ একটু-আধটু বেচাল হতে পারে। কিন্তু বাপু, তোমার তো উচিত স্ত্রীকে একটু শাসনে রাখা, তা শাসন-টাসন তো দূরের কথা, নিজেই ওই চণ্ডী ধিংগী বৌ-এর ভয়ে মরছে। এমন স্ত্রৈণ পুরুষ তো আমি জন্মে দেখি নি বাবা। বুঝলে ভোম্বলের মা, বুড়ি হয়ে মরতে চললাম, ছেলেমেয়ের মা হয়েছি কিন্তু এখনও যদি পান থেকে চুণ খসে, তাহলে হাবুলের বাবার ভয়ে আমি থরথরিয়ে কাঁপি।

তা সে কথা যাক, ওনার কাছে সেদিন আমি কাকলি-সুন্দরীর শাড়ি কেনার গল্প করেছিলাম। হাবুলের বাবা আবার পুরুষমহলে ওই কথাটা তুলেছিলেন। ননীগোপালবাবুও ছিলেন সেখানে। জানই তো হাবুলের বাবার আবার ঢাক ঢাক গুড় গুড় নেই। সোজাসুজিই তিনি ননীগোপালবাবুকে বলেছিলেন, আপনি তো আমাদেরই মত কেরানি। গরীব মানুষ। সাধ্যের অতিরিক্ত ব্যয় ক'রে স্ত্রীর পছন্দমত শাড়ি কিনলেন আর সেই শাড়ি কিনা আপনার স্ত্রী ঝি'কে বিলিয়ে দিল।

ননীগোপালবাবু তার উত্তরে কি বললে জান ভোম্বলের মা? কথা শুনে ঘেন্নায় মরে যাই।

ননীগোপালবাবু হেসে গড়িয়ে পড়ে বললেন, না, না, আমার স্ত্রীর কোন দোষ নেই। বড়ঘরের মেয়ে কিনা, ওদের নজরই আলাদা। ঝি'কে শাড়ি দেবার আগে ও আমাকে বললে, দেখ আমার তো দু-চারখানা শাড়ি আছে, কিন্তু আহা, দেখ তো কি শতছিন্ন শাড়িখানা ওর পরনে! ঝি ব'লে ও কি মানুষ নয়। স্ত্রীর কথা শুনে আমার কষ্ট হল। আমিই ওকে শাড়িখানা দিতে বললাম।

হাবুলের মা'র কথা আপনি শুনলেন। শুনলেন আরও কতজনের কথা।

কেউ বলে, সে এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখলাম মশাই। সেদিন ননীগোপালবাবুর বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। ভাবলাম একবার দেখা করেই আসি ভদ্রলোকের সংগে। তা বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখি যে, ভদ্রলোক ঘরের মধ্যে বসে বসে একগাদা শাড়ি, সায়া, ব্লাউজ নিয়ে ইস্ত্রী করছেন। অবশ্য এসব ব্যাপার আমি এবং আমাদের এ রেল-কলোনির সকলেই জানি। জানি যে ননীগোপালবাবু সকালে সাবান দিয়ে কাপড়-জামাগুলি কেচেছেন, দুপুরে যত্ন করে শুকিয়েছেন এবং বিকেলে ইস্ত্রী করতে বসেছেন।

তা আমার গলার আওয়াজ পেতেই চমকে ওঠেন এবং শাড়ি, সায়া, ব্লাউজগুলি সরিয়ে ফেলে আমায় দরজা খুলে দিলেন ভদ্রলোক।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কী করছিলেন ননীগোপালবাবু?

ননীগোপালবাবু সংগে সংগে হাসিমুখে জবাব দিলেন, এই একটু বিশ্রাম করছিলাম। রোজই তো স্ত্রী একা একা খেটে খেটে মরে। ছুটির দিন, তাই ভাবলাম আমিও একটু কাজে লেগে যাই আজ। কিন্তু স্ত্রী একেবারে বেঁকে বসলেন। তিনি বললেন,- না, বিশ্রাম কর। পুরুষমানুষ সংসারের কাজ করবে আর মেয়েছেলে শুয়ে-বসে থাকবে, এ আমি কখনই সইতে পারি না। সুতরাং কী আর করি মশাই? বাধ্য হয়ে বিশ্রাম করছি বসে বসে।

কেউ বলে, এক তাজ্জব ব্যাপার দেখলাম মশাই। ননীগোপালবাবুর গিন্নী সিনেমায় গেছে। রাত দশটার আগে ফিরবে না। তার ওপর সেদিন আবার ভদ্রলোকের শরীর অসুস্থ। রীতিমত জ্বর। তা বাড়ি গিয়ে দেখি ননীগোপালবাবু ওই জ্বর গায়েই রান্না করছেন। সিনেমা দেখে ফিরে ক্লান্ত স্ত্রী যাতে খাবার-দাবার একেবারে 'রেডি' পান, কোন অসুবিধায় না পড়েন, তারই ব্যবস্থা করছেন। আমি গিয়ে পড়তেই ননীগোপালবাবু একটু হকচকিয়ে গেলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কী হচ্ছে ননীগোপালবাবু? রান্না করছেন বুঝি? কেন গিন্নী গেলেন কোথায়?

তা আশ্চর্য মিথ্যা বলবার ক্ষমতা মশাই ভদ্রলোকের। সংগে সংগে এক গল্প কেঁদে বসলেন।

বললেন কী জানেন? বললেন, গিন্নী একটু 'সিনেমা' গেছেন। অবিশ্যি রান্নাবান্না সমস্ত করেই গেছেন। রান্নার দিকে যাতে না যাই তার জন্য মাথার দিব্যিও দিয়ে গেছেন। কিন্তু ব্যাপারটা কী জানেন? ওটা আমাদের পুরুষানুক্রমিক সখ। সখ আমার বাবারও ছিল। মা যতই রাঁধুন, রান্নার শেষে আমার বাবা একটা তরকারি রাঁধবেনই রাঁধবেন। ওটা নিছক একটা সখের ব্যাপার, তা আমিও বাবার ওই স্বভাবটা পেয়েছি বুঝলেন?

কথা শেষে সকলেই বলে, ঘেন্না ধরে গেল।

হ্যাঁ, এ রেল-কলোনির সকলেই ঘেন্না করে ননীগোপালবাবুকে। কিন্তু আপনার কথা স্বতন্ত্র। কোন মানুষের 'পরেই আপনার বিরূপ ভাব নেই। কারণ আপনি দরদী। আপনার উপলব্ধি গভীর। তা ছাড়া আরও পাঁচজনের মত পরচর্চার প্রবণতা নেই আপনার মধ্যে। শুধু মানুষ সম্বন্ধে একটা অনাসক্ত আগ্রহের বশেই আপনি ননীগোপালবাবু সম্বন্ধে আলোচনা করেন। আপনার ডায়েরির পাতায় লেখেন যে যুবতীর রূপ অনেকটা খামখেয়ালী, মদ্যপ আর দাম্ভিক জমিদারের নিষ্ঠুর শক্তির মত। সে শক্তি নিজের চরিতার্থতা খোঁজে মানুষের বেদনা, যন্ত্রণা ও দহনের মধ্যে।

কাকলির রূপের মমতাহীন রাজ্যে ননীগোপালবাবু যেন এক প্রজা, দীন, হীন, ভীরু প্রজা।

কিন্তু আপনার মত এমন নরম হৃদয়ের মানুষও একদিন বিগড়ে গেল। ননীগোপালবাবুকে আপনি ধিক্কার দিলেন মনে মনে। সেদিন কী একটা কাজে আপনি ননীগোপালবাবুর বাড়ি গেছেন। তাঁর সংগে গল্প করছেন বসে বসে।

এমনসময় পাশের ঘর থেকে এক কলি গানের সুর ভেসে এল। জানলা দিয়ে আপনি দেখলেন যে, ছিমছাম ফিটফাট একটি ছেলে বসে আছে কাকলির সামনে। পাতলা চেহারা। ফর্সা রঙ। ভোঁতা ভোঁতা কিন্তু সুদর্শন।

ছেলেটির সামনে একটি হারমোনিয়াম। হঠাৎ ও-ঘরে যাওয়ার প্রবল ইচ্ছা হল আপনার। কিন্তু ভব্যতাবিরোধী বলে যেতে পারলেন না। জানলা দিয়েই দেখতে লাগলেন।

—ভাললাগা ভালবাসা নয় জানি জানি।

অতি ভাবালু একটা ভংগীতে ছেলেটি চোখ বুজে গাইতে সুরু করলে।

গান শেষ হলে কাকলি জিজ্ঞাসা করলে ছেলেটিকে, এ গান কার লেখা?

নাটকীয় ভংগীতে বুকের ওপর হাত রেখে ছেলেটি জবাব দিলে, এ অধমের।

কাকলি বললে, কী গভীর বাণী!

বিচিত্র একটা মুগ্ধ দৃষ্টি কাকলি ফুটিয়ে তুলল তার সুর্মা-টানা চোখে। বিবশ একটা ভাবালুতায় চোখ দুটো রসাল আঙুরের মত টসটসে করে বললে, এমন অপূর্ব সব ভাব তোমার মাথায় আসে কি করে সুব্রত?

বাবরিচুল-মাথা ঝাঁকিয়ে নিয়ে ছেলেটি বললে, কল্পনার শক্তি চাই, অনুভূতির জোর চাই।

মুহূর্তের মধ্যে মুখের ভাব পাল্টে ফেলল কাকলি।

খিলখিলিয়ে হেসে উঠল। হাসিটা মিছরির দানার মত চারিদিকে টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিয়ে বললে, কল্পনার যার এত জোর, শরীর তার এত দুর্বল হয় কি করে?

ছেলেটি বললে, কে বললে আমার শরীর দুর্বল? এসো না দেখি পাঞ্জা লড়বে?

একটা হাত বাড়িয়ে দিল ছেলেটি। একটি হাত, রক্ত যার মধ্যে উত্তাল।

মুহূর্তের মধ্যে কাকলির পাঁচটি আঙুল ছেলেটি তার পাঁচটি আঙুলের পাকে পাকে জড়িয়ে ধরলে।

কয়েক মুহূর্তের বিরতি।

'উঃ'—চাপা, মিষ্টি আর মৃদু একটা শব্দ করলে কাকলি।

আপনি দেখলেন যে, একটানে কাকলির আশ্চর্য যৌবন একেবারে ছেলেটির বুকের ওপর এসে পড়ল।

এবার আপনি ননীগোপালবাবুর দিকে তাকালেন। দেখলেন পাশের ঘরের ঘটনা সম্বন্ধে একটা অবোধ নির্লিপ্ততা তাঁর চোখেমুখে। খবরের কাগজের 'পরে ঝুঁকে পড়ে গভীর মনোনিবেশে কি একটা সংবাদ যেন তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন তখন।

আপনি জিজ্ঞাসা করলেন, ননীগোপালবাবু, ছেলেটি কে?

ননীগোপালবাবু একটু থেমে, একটু ভেবে তারপর সমস্ত ভাবনা লম্বা একটা হাসির মধ্যে মিলিয়ে দিয়ে বললেন,—কোন ছেলেটি? ওহো! ওই গাইয়ে ছেলেটির কথা বলছেন আপনি। ভারি ভাল ছেলে, বুঝলেন? আমার স্ত্রীকে ও দিদি বলে ডাকে। এখানে মাঝে মাঝে আসে। গানটান গায়। আমার স্ত্রী এক-একদিন রেগে যায়। বলে,—কী রোজ রোজ আসে, আর প্যান প্যান গান গায়,—আমার ভাল লাগে না। তা আমি বলি,—আহা, ও তোমার ছোট ভাইয়ের মত! দিদি বলে যথেষ্ট ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। তা ছাড়া এই বিদেশে-বিভুঁয়ে ওরকম একটি ভাই পাওয়া কি মুখের কথা।

আপনি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছিলেন, বিরক্ত হচ্ছিলেন,—একটা রাগ আপনার জিভের আগায় রাঙময় হয়ে উঠতে চাইছিল,—ভাবছিলেন ননীগোপালবাবুর মন-গড়া সমস্ত কাপুরুষ মিথ্যাগুলোকে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়ার কথা। কিন্তু সৌজন্য বোধে বাধল,—নীরবে বেরিয়ে এলেন আপনি।

এ ঘটনার কিছুদিন পরেই আপনাদের সকলকে চমক লাগিয়ে, সমস্ত জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে কাঁচা গল্প-লিখিয়ের নায়িকার মত দাম্পত্য-নাট্যের মাঝদৃশ্যেই কাকলি প্রস্থান করল। কাকলি মারা গেল।

হঠাৎ কী যে হ'ল। জ্বর এল কাকলির, দেখতে দেখতে হু-হু করে বেড়ে গেল,—বাড়তে বাড়তে এক সর্বনাশা অবস্থায় এসে দাঁড়াল। বদ্যি এল, ডাক্তার এল, আপনারা দেখলেন, ননীগোপালবাবু সেবা-যত্নের কোন ত্রুটিই করলেন না,—তবুও এ রেল-কলোনির সকলকে চমকে দিয়ে কাকলি চিরতরে চলে গেল।

যাকে পান তাকে ডেকেই ননীগোপালবাবু কান্নাভাঙা কণ্ঠে বলেন,—আমার বুক ভেঙে দিয়ে গেল। দয়া করে ঈশ্বর যদি আমায় ওই অমূল্য রত্ন দিলেন, তা হলে তা আবার কেড়ে নিলেন কেন?

আরও একবার সকলে হাসলে মনে মনে। মুখ টিপে, নীরবে। মৃত্যুর মত এমন একটা সার্বজনিক শোকাবহ ঘটনাকেও আপনি পানসে হয়ে যেতে দেখলেন পাঁচজনের বাঁকা হাসির মধ্যে। আপনার জীবনে এ একটা রীতিমত অভিজ্ঞতা।

হ্যাঁ, রীতিমত অভিজ্ঞতা এবং দস্তুরমত নাটক। এ আশ্চর্য নাটকে নায়িকা আচমকা মারা গেল, নায়ক কেঁদে বুক ভাসাল আর দর্শকেরা শুধু হাসল। হাসলেন আপনিও। কিন্তু আপনিও আরও পাঁচটা মানুষের মত ভুল করলেন, কেন না এ নাটকের নেপথ্য ঘটনাগুলো আপনি দেখেন নি। অবিশ্যি তা দেখার কথাও নয় আপনার। কারণ ঘটনাটা ঘটেছিল গভীর রাত্রে এবং রুদ্ধদ্বার কক্ষে।

সে রাত্রে ননীগোপালবাবুর ঘরে ঢুকলে আপনি এক স্নায়ুবিদারী দৃশ্য প্রত্যক্ষ করতেন। দেখতেন যে ননীগোপালবাবু কখনও অস্থিরভাবে পায়চারী করছেন, কখনও হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে কি যেন ভাবছেন গভীর-ভাবে। কপাল তাঁর রেখা-সংকুল। লালচে চোখ দুটোয় কিসের একটা দুর্বোধ্য জ্বালা।

কাকলি শুয়ে আছে ওই ঘরেই। মনে হচ্ছে ঝড়-বিধ্বস্ত একটা রূপ, মার-খাওয়া একটা দম্ভ অসহায় হৃত-সর্বস্বের মত পড়ে আছে।

কাকলির অহংকারী চোখ এখন আতুর। ঠোঁটের ঐশ্বর্য উধাও। আগুন-ছড়ানো বুক নিরুত্তাপ। সারা শরীরে জ্বরের প্রবল আক্রমণ। বুকে শ্লেষ্মার ঘর্ঘর আওয়াজ।

একবার তাকালেন ননীগোপালবাবু কাকলির দিকে। তারপর ভাবনার অতলে তলিয়ে গেলেন।

শেষবারের মত ডাক্তার এসেছিলেন রাত দশটায়। খুব সতর্ক থাকতে বলেছিলেন ননীগোপালবাবুকে। ওষুধে কোন কাজ হচ্ছে না বলে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন।

ডাক্তারের কথা শুনতে শুনতে ননীগোপালবাবুর মুখে চোখে তীব্র উদ্বেগ ফুটে উঠেছিল।

প্রায় কেঁদে ফেলেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কী হয়েছে ডাক্তারবাবু?

—ডবল নিউমোনিয়া।

—তা হলে কী হবে ডাক্তারবাবু?

—এখন ঘাবড়ালে তো চলবে না। প্রতিটি মুহূর্ত সজাগ থেকে যা কিছু করণীয় করে যেতে হবে।

সেই রাত্রেই, রাত বারোটায়, ননীগোপালবাবু ঘরের জানলা খুললেন। তাকালেন বাইরের দিকে। আকাশে মেঘের হানা। গুরু গুরু গর্জন। বিদ্যুৎ-ঝলকে কিসের একটা কুটিল সংকেত। আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত শুধু নীরন্ধ্র অন্ধকার। থম থম করছে চারিদিক। বেশ বোঝা যায় কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই পৃথিবী জলে ডুববে, ঝড়ে বিধ্বস্ত হবে।

ডাক্তারবাবুও সেই কথা বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন ননীগোপালবাবুকে, বলেছিলেন, খুব সাবধানে রাখবেন। আকাশের ভাবগতিক ভাল নয়। ঝড় জল এল বলে। সমস্ত দরজা-জানলা বন্ধ রাখবেন। এতটুকু ঠাণ্ডা যেন ওঁর না লাগে। এর ওপর অনিয়ম হলে আর বাঁচাতে পারব না মশাই।

'আর বাঁচাতে পারব না মশাই'—কথা ক'টি ননীগোপালবাবু বার-কয়েক মনে মনে নাড়াচাড়া করলেন। কাকলির বিছানার পাশে একবার গেলেন। খুব ধীরে ধীরে শ্বাস নিচ্ছে ও। একটা ঘর্ঘর আওয়াজ আসছে বুক থেকে। চোখ দুটো বুজে গেছে। ননীগোপাল-বাবু ভাবলেন, একেই বোধ হয় শ্বাস কষ্ট বলে।

এমনসময় বৃষ্টি এল, ঝড় উঠল। গোঁয়ার মাতালের মত ঝড়ের একটা ক্রুদ্ধ গোঁ-গোঁ আওয়াজ শোনা গেল। দরজা-জানলা কেঁপে কেঁপে উঠল ঠকঠকিয়ে।

ননীগোপালবাবু জানলা খুলে দিলেন। দেখলেন, বাইরে অন্ধকার, শুধু অন্ধকার, অথৈ অন্ধকার। তীব্র একটা রোষে এ অন্ধকারের সমুদ্র ফুঁসে ফুঁসে উঠছে,—গর্জে গর্জে উঠছে।

ননীগোপালবাবু রাত বারোটার এ-তাণ্ডবের মাঝে, খুব পরিষ্কারভাবে একথা চিন্তা করতে পারলেন যে, এ-অন্ধকারের কালো পর্দা সরিয়ে কারুর চোখ এখন নিশ্চয়ই তাঁর এই ঘরে উঁকিঝুঁকি মারবে না।

ইতিমধ্যে জানলা খোলা পেয়ে ঝড় তাণ্ডবলীলায় মেতেছে ননীগোপাল-বাবুর ঘরে। জিনিসপত্র তছনছ হয়ে যাচ্ছে,—পড়ছে, ভাঙছে। জলের ছাট আসছে ঝড়ের সংগে।

গত সাতদিন ধরে রাতের অন্ধকারে যেমন করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে আজও এই ঝড়ের রাতে ননীগোপালবাবু জানলার বাইরে ওষুধের শিশিগুলি উবুড় করে দিলেন।

কাকলির বুকের চাদর উড়ে গেল কাপড় সরে গেল।

কুঁকড়ে উঠল। কেঁপে উঠল কাকলি।

কাকলির দিকে বিষাক্ত দৃষ্টির বাণ ছুঁড়ে দিয়ে বিকট একটা অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন ননীগোপালবাবু।

ঝড়ের গর্জন ছিল,—তা না হলে সে রাত্রে হাসির আওয়াজে পাশের কোয়াটারে আপনার ঘুম নিশ্চয়ই বিঘ্নিত হত।

ধনপতি সওদাগর

বানিজ্যে সেকাল ও একাল

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ পঞ্চবিংশতি প্রবাহ ॥

সরস্বতী-নদী।

মোগলযুগে সরস্বতী নদীর উত্তাল ঢেউ পাড়ি দিয়ে শত শত পণ্যতরী একদিন সপ্তগ্রামে যে নোঙর করতো, তার প্রমাণ আছে আজকের মজে-যাওয়া সরস্বতীর কূলে কূলে। আজও সরস্বতীর অববাহিকায় কোদালের ঘা দিলে বেরিয়ে আসে মাস্তুলের একটা টুকরো, সূর্যের আলোয় চিক্‌চিক করে ওঠে প্রাচীনকালের তলোয়ারের ফলক, ভাঙা নৌকোর জীর্ণ পাটাতন। এই সুপ্রাচীনকালের সমুদ্রযানের ধ্বংস-চূর্ণ ইতিহাসের অন্ধকারে ফেলে ম্লান মশালের আলো। কোন সুদূরকালে কত বিচিত্র পণ্যে তরী বোঝাই করে সাদা পাল তুলে হয়তো গতির আনন্দে তারা তরতর করে সপ্তগ্রামের অভিমুখে আসছিল। ঠিক সেই সময়—

সেই সময় আকাশের দিকে দিকে কালো মেঘের চক্রান্ত ঘনঘোর হয়ে উঠেছিল। সরস্বতীর জলে আর আকাশের মেঘে মেঘে হয়তো প্রলয় জেগেছিল। দিক্‌দিগন্তে যেন হাজার হাজার ডাইনী মাথার চুল ছিঁড়ে কাকে মর্মান্তিক অভিশম্পাত দিচ্ছিল। ফুলে উঠেছিল, ফুঁসে উঠেছিল সরস্বতী নদীর বিশাল জলরাশি। তার ঢেউয়ে ঢেউয়ে লোলুপ উল্লাস জেগেছিল। কত পাল-তোলা অর্ণবযানকে মুহূর্তে অগাধ জলের নিচে গ্রাস করে নিয়েছে। সেইসব ডুবে-যাওয়া নৌকোর খোলে খোলে কত জলচর প্রাণী, কত পাঙাস মাছ, কত হাঙর বাসা বেঁধেছে। কত মৃত নাবিকের করোটি-কঙ্কালে ছোট ছোট জলকীট পুরুষানুক্রমে বংশ বিস্তার করেছে। তারপর ক্ষমাহীন সূর্যের আলোয় বছরের পর বছর সরস্বতী নদী শুকিয়ে এসেছে। আরও কত প্রাকৃতিক নিয়মে এই নদী মরা নদীতে পরিণত হয়েছে। আর—

আর এই নদীর বালুকাময় মৃত্তিকায় শত শত শতাব্দী পূর্বে বাণিজ্যতরীর ধ্বংসাবশেষ ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ে আছে। তাই প্রাচীন গ্রন্থে লিখেছে: 'সরস্বতী নদীর গর্ভ খনন করিয়া নৌকা ভাঙার জীর্ণ তক্তা, শৃঙ্খল এমন কি মৃত্তিকার বহু নিম্নস্তর হইতে বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবযানের মাস্তুলের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে।'

প্রাচীন ইতিহাস একথাও বলে যে, বিশ্ববিখ্যাত ভ্রমণকারী প্লিনির সময় থেকে পর্তুগীজদের আগমনের কাল পর্যন্ত সপ্তগ্রামের বন্দরে বন্দরে রাজকীয় সমারোহ ছিল।

সপ্তগ্রামকে Ganges Region বলেছেন ঐতিহাসিক উইলসন সাহেব। De Barros সপ্তগ্রামের সেই বিপুল সমৃদ্ধির দিনে ভ্রমণের

উদ্দেশ্যে বাংলা দেশের মাটিতে পা দিয়েছিলেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি এক মুগ্ধ তন্ময়তায় আবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল সপ্তগ্রাম বন্দরের বিপুল সমৃদ্ধির দৃশ্য দেখে। তিনি লিখেছেন:

It was difficult in inlet and outleting of the ship at the Port of Chitagong. So S tgaon was developed day by day as an ideal Port.

ভ্রমণকারী Frederick-এর বিবরণের ভিতরে বাঙালীর সর্ববৃহৎ বাণিজ্যকেন্দ্র সপ্তগ্রামের চারশো বছর আগের দৃশ্য ফুটে ওঠে। তিনি লিখেছেন: 'বহু দূর দেশ থেকে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বণিকরা এই সপ্তগ্রামে এসে সমবেত হতেন। সপ্তগ্রামের দক্ষিণে ছিল বেতোড় গ্রাম। জোয়ারের সময় এই বেতোড় থেকে নৌকাপথে এলে অতি অল্প সময়ে সপ্তগ্রামে পৌঁছানো যায়। প্রত্যেক বছর সপ্তগ্রাম থেকে ত্রিশ থেকে চৌত্রিশটি নৌকা চাউল, কার্পাস, লাক্ষা প্রচুর পরিমাণে চিনি, কাগজ, তেল দেশে বিদেশে রপ্তানী হতো।'

আজ বাঙালী মধ্যবিত্তঘরের জীর্ণ মেয়ের মত ক্ষীণকায়া সরস্বতীর কোথাও সেই সুদূরকালের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না। আজ কেউ কল্পনাও করতে পারবে না এইখানে একদিন এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকার বাণিজ্যতরী এক-একটি স্বতন্ত্র পল্লীর মত বিরাজ করতো।

আজকের ভাগীরথীর কূলে যেমন কলকাতা মহানগর। ঠিক তেমনি দূর-সমুদ্রবাহী সরস্বতীর তীরে ছিল মহানগর সপ্তগ্রাম। জগতের বিভিন্ন দেশের অধিবাসী তাদের নিজেদের জাহাজে জাহাজে বাস করতো। পৃথিবীর দেশ-দেশান্তরের মানুষের বিচিত্র ভাষার টুকরো টুকরো কথায় আর হাসিতে মুখরিত হয়ে থাকতো এই মহানগরের আকাশ-বাতাস।

প্রশস্ত রাজপথের দুপাশে বিচিত্র পণ্যে সুসজ্জিত অসংখ্য বিপণিশ্রেণী ছিল। ছিল বাঙালী শ্রেষ্ঠীদের বিশাল বিশাল প্রাসাদ, ছিল আকাশস্পর্শী মন্দিরশ্রেণী। রাজপথে জলের স্রোতের মতন অবিরাম জনপ্রবাহ বয়ে যেত। পৃথিবীর দেশে দেশের বিভিন্ন জাতির এই বিচিত্র মিছিল ছিল বাঙালীর এই শ্রেষ্ঠ বন্দর সপ্তগ্রামের শোভা।

'আইন-ই-আকবরী'র পাতায় ছোট্ট একটা হিসাব আছে। এই সপ্তগ্রামের সুবেদার বণিকদের কাছে বাণিজ্যের শুল্ক বাবদ বারো লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় করতেন। এই বারো লক্ষ টাকার অধিকাংশ সুবেদারকে দিতেন বাঙালী বণিকরা।

বাঙালীর অতীত-গৌরব এই সপ্তগ্রাম। আজও দূরপল্লীর ঘরে ঘরে কৃষ্ণরামের ষষ্ঠীমঙ্গল গ্রন্থ কথকঠাকুররা পাঠ করেন। বাঙালীর বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির অতীত-মহিমা ফুটে ওঠে তার একটি শ্লোকে—

সপ্তগ্রাম ধরণীতে নাহি তুল।
চালে চালে বৈসে লোক
ভাগীরথীর কূল॥

চৈতন্যচরিতামৃত পড়লে, আরও জানা যায় রঘুনাথ গোস্বামীর পিতা গোবর্ধন দাস কোন একসময় এই সপ্তগ্রামের দণ্ডমুণ্ডের মালিক ছিলেন। এইখানে—বাংলা দেশের এই প্রাচীনতম মৃত্তিকায় হিন্দুর জ্ঞান, হিন্দুর মনীষা, হিন্দুর সংস্কৃতি সহস্র শিখায় জ্বলে উঠেছিল।

আগেই বলা হয়েছে বহু ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠী এইখানে বাস করতেন। তাঁরা যে শুধু সুদূর সিংহল, সুমাত্রা, যবদ্বীপে বাণিজ্য বিস্তার করেছিলেন তা নয়। হিন্দুর সংস্কৃতি, হিন্দুর মনীষাকে দেশ-দেশান্তরে ব্যাপ্ত করে দিয়েছিলেন। তাই—

তাই প্রায় দুই শতাব্দী আগে পর্তুগীজ ভ্রমণকারী ডি মনিকার এইখানে এসে জাফর গাজী খাঁর দরগায় হিন্দু-স্থপতির নিদর্শন দেখতে পেয়েছিলেন।

বাঙালী শ্রেষ্ঠীরা যে শুধু বিপুল বাণিজ্যিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তা নয়, রামায়ণ-মহাভারতের ঘটনাবলী অংকিত করে বহু মন্দির এখানে নির্মাণ করেছিলেন।

এইখানে এই সপ্তগ্রামে যুগের পর যুগ বহু যুদ্ধ হয়েছে, বহু সিংহাসন বদল হয়েছে। এখানে এসেছে ইকরার খাঁ, এসেছে তরবিয়ৎ খাঁ, এসেছে উলা মজলিস খাঁ, এসেছে উলাঘ মসনদ খাঁ—বহু শাসনকর্তা এসেছে, কিন্তু বাঙালী বণিকদের বাণিজ্য অব্যাহতভাবে চলেছে, তার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস এতটুকু ম্লান হয় নি।

এইখানে আজও আছে বৈষ্ণব মহাত্মা, উদ্ধরণের সমাধির ধ্বংসস্তূপ। আজকের এই জঙ্গলাকীর্ণ স্তূপ একদিন হাজার হাজার বণিকের পদশব্দে মুখরিত হয়ে উঠত। এইখানে বাঙালী সুবর্ণবণিকরা প্রত্যেক বৎসর একটি উৎসব করতেন।

সেই সুদূরকালে বাঙালীর বাণিজ্যের অন্যতম পীঠস্থান এই সপ্তগ্রাম আজ অভিশপ্ত শূন্যতায় খাঁ-খাঁ করছে। হু-হু হাওয়ায় সেই কুয়াশাময় অতীতের বণিকদের দীর্ঘশ্বাস শোনা যায়। আলাদ-গোক্ষুরের ফোকরে ভরা পুরনো ঘাটের সোপানে কান পাতলে শোনা যায় সেই বনজনে সমৃদ্ধ জনপদ সপ্তগ্রামের বিচিত্র কলস্বর। (ক্রমশঃ)

ছাত্রদের অপরিহার্য গ্রন্থ
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

পালামৌ

—ইহাতে আছে—

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রচিত সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী—সঞ্জীবনী-সুধা, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'পালামৌ সমালোচনা' এবং সমালোচক-শ্রেষ্ঠ চন্দ্রনাথ বসুর সঞ্জীব-সাহিত্য সমালোচনা। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক দ্রুতপঠন গ্রন্থরূপে নির্বাচিত।

মূল্য এক টাকা।

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

আঁধার মানিক

ধারাবাহিক উপন্যাস

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ চব্বিশ ॥

'বহুদিন পর দেখা।'

সুরকণ্ঠ এ-কথা বলে আসনে বসলেন। দরগা-বটতলায় বটগাছের ছায়া অতি শীতল। ঝুরিতে ঝুরিতে ঘন সবুজ পাতা, মাটিতে বটফল গড়াগড়ি যায়, অদূরে শান্ত, গভীর, কালো দহের জল টলটল করে, সুরকণ্ঠের মনে হল দিব্যদর্শনের পক্ষে জায়গাটি বড় সুন্দর। সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের গভীরে যেন মন্দিরের বাতাস বয়, এমন কাকচক্ষু জল দীঘি, এমন পবিত্র দেবস্থান সুরকণ্ঠ কতই দেখেছেন, জাহ্নবীর তীর ধরে এক সময়ে গুরু-সন্ধানে তিনি দিনরাত হাঁটতেন। কত শত দেবদেউলের ছবি এখন তাঁর মনে এল। বক্রেশ্বরে আচারীবাবা তাঁকে বার বার সঙ্গী হতে বলেছিলেন, এখন এ ঘোর অরাজকতার দিনে তিনি কেন এমন ক'রে এ প্রলয়ের পেছনে পেছনে চলেছেন? রাজপুরুষরা তাঁকে কি দিতে পারেন যাতে সুরকণ্ঠের মনে শান্তি হয়?

'বহুদিন পরে দেখা', তিনি আবার বললেন, 'আপনাকে আমি প্রণাম করলাম না, আমি প্রণামে অনধিকারী, পিসীমা আমায় অনাথ করে রেখে গেছেন।' সুরকণ্ঠ আবার গম্ভীর হলেন।

মহীপতি অবাক হয়ে কিছুটা বিস্ময়ে, কিছুটা শ্রদ্ধায় সুরকণ্ঠকে দেখছিলেন। সুরকণ্ঠের উন্নত গৌর-দেহ, রুক্ষ চুল, পরনে পট্টবস্ত্র, সবশুদ্ধ যেন যোগীশ্বর বলে বোধ হয়। চোখে মুখে প্রতিভার লক্ষণ, প্রশস্ত ললাট, এই সুরকণ্ঠকেই তিনি ফুলেশ্বরীর স্বামী বলে মনে মনে নির্বাচন করে রেখেছিলেন। শেষে সবই ওলটপালট হয়ে গেল। বিয়েটা একান্তই বিধির নির্বন্ধ, মহীপতির মনে সর্বদা বোনের মুখ জেগে থাকে, সুরকণ্ঠ সেদিন মহীপতির সানুনয় অনুরোধ উপেক্ষা করেন, নিদুলী এমন স্বামী পেলে ধন্য হত।

'আপনি কি রাজকার্যে?' সুরকণ্ঠের প্রশ্নে মহীপতি ঈষৎ হাসেন।

'বর্ধমানে নবাব অসহায়। বর্গীরা চতুর্দিক ঘিরে আছে। আমি মুর্শিদাবাদ থেকে সাহায্য এনেছিলাম।'

'যেতে পারলেন না?'

'না। বর্গীরা যুদ্ধে বড় দড়।'

'নবাব শুনি যুদ্ধে মহাবীর, তাঁর সৈন্য অগণন?'

'সৈন্যকটক উড়িষ্যা থেকে মুর্শিদাবাদে আগেই পাঠিয়েছিলেন। বর্ধমানে তাঁর সঙ্গে সৈন্য বেশি নেই। প্রধান ভরসা আফগান সেনা, তা তারা এখন নবাবের শত্রুতা করে।'

'শুনি আফগানরা নিমকহারাম হয় না।'

মহীপতি নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'যখন সময় ছিল নবাব তাদের মুখের দিকে চান নি। তা ছাড়া নবাব জাতি

ধর্মের দোষ দেখেন না। ছোট জামাই আজিমাবাদে বিশ্বাসী আফগান রৌশন খাঁকে মারলে, তার প্রতিবিধান করলেন না। উড়িষ্যায় যুদ্ধকালে যত কথা দিলেন তা রাখলেন না। এমন কি মুস্তাক খাঁ ময়ূরভঞ্জের রাজা রঘুনাথ ভঞ্জের জন্যে নিজে আরজি করলে, সে কথা উপেক্ষা করে রাজাকে মারলেন। মুস্তাক খাঁ সম্মানী লোক, তাঁর রক্ত গরম, জেয়াদা অপমান হল। এখন সময় বুঝে বেঁকে বসবে তাতে আর আশ্চর্য কি।'

'বিপদকালে একতাবদ্ধ থাকলে পারত।'

'বর্গীরা ভাল বুদ্ধি রাখে। শুনে এলাম তারা কানাতের দোর খুলে রেখেছে। যার মন হয় সে-ই তাদের দলে যাবে। তা যে ভীমকাণ্ড প্রলয় দেখলাম, নবাবের কানাতের কাছে যায় মানুষের সাধ্য কি। বর্গীরা চারপাশে বেড়াজালে ঘিরে রেখেছে। মুদি বেনে রসদ নিতে পারে না, অন্ন বিনা নবাবের ফৌজদলে হাহাকার। নবাব বর্গীদের মন বুঝবার জন্যে এত চেষ্টা করলে, তা ভাস্কর পণ্ডিত বলে এক কোটি টাকা আগে ফেল, তবে কথা কইব।'

'এখন টাকা দিয়ে বিপদ সারলে পারত।'

'নবাব বলেন যে টাকা ওদের দেব, সে টাকা আমার ফৌজকে বিলিয়ে দাও। হাজার হলেও তারা আমার জন্যে প্রাণ দিতে এসেছে। শত্রুকে টাকা দেব কেন?'

'এ-কথা তেজের কথা।'

'শুনে এলাম নবাব নাতির হাত ধরে রাতে একলা গিয়ে মুস্তাক খাঁকে বলেছে এই নাতি আমার প্রাণের অধিক। তা তোমরা বেঁকে বসলে শত্রুতে আমার মাথা কাটবে, তার চেয়ে এখন তুমিই আমাদের মাথা নাও।'

'এ-কথায় কোন ফল হল না?'

'কি হয় এখন বলা যায় না। এদিকে বর্গীদের সঙ্গে লড়াই করতে নবাব একবার এগোলেন. বলে দিলেন আমার সঙ্গে বেশি সৈন্য দরকার নেই তোমরা সাহস করে থাক। তা সাহসে কুলোল না কারো, নবাবের পেছু-পেছু তারাও এসে পড়লে। বর্গীদের দুশো মজা, তারা যথা ইচ্ছে মারলে কাটলে, হাতীগুলো অমনি নিলে, একটা কামান দখল করে এখন গাছের ওপর চড়িয়েছে। গোলা ছুঁড়ে নয়ছয় কাণ্ড করছে।'

'তবে নবাবের অবস্থা এখন ভাল নয়?'

'না।' মহীপতি মাথা নাড়লেন। বললেন, 'বর্ধমান শহরের মধ্যে রাজা, সেখানে মেলে না হেন দ্রব্য নেই। সেই বর্ধমানে নবাব এখন অন্ন বিনা, অর্থ বিনা মহাবিপদে পড়ে আছেন। সাহায্য করতে এসেও কিছু করতে পারলাম না। তবে মনে বুঝে দেখলাম, নবাবের কাছে যদি পেঁৗছে দিতে না পারলাম, তবে এ রসদ বর্গী বেটাদের খাওয়াই কেন? এগোতে চেষ্টা বিশেষ করি নি। ফাঁক বুঝে সরে এসেছি।'

'বর্গীরা কি ওখানেই থাকবে এখন। কি মনে হয়?'

'কেমন করে বলি? তারা জাতে ধর্মে একেবারে আলাদা। সামনে দাঁড়িয়ে নবাবের সঙ্গে যুদ্ধ করে এমন সাহস তাদের নেই। তারা দূরে দূরে থাকে, হঠাৎ হঠাৎ এসে পড়ে। আর তাদের যত দৌরাত্ম্য দূরে দূরে, গ্রামে গ্রামে হাহাকার, ঘোড়া তুলে দেয় ধানের গোলায়। না, আমি লক্ষণ কিছু ভাল বুঝি না।'

'তারা এল কেন?'

'তাদের আর দোষ কি বল। এ কলিকালে যার জোর যত, তার দাপট তত। ওদের ভয়ে দিল্লীর বাদশা কাঁপেন, এক কথায় ওদের বলে দিলেন যাও, বাংলায় গিয়ে চৌথ নাও গে যাও। এটা বিবেচনা করলেন না বাংলার কি অবস্থা। সবে নবাব একরাশ টাকা দিয়ে নবাবী নিয়েছেন। তাতে এই অরাজক অত্যাচার।'

'রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট হয়।'

'পাপ বললে বলতে পার। তবে নবাবের রাজ্য দখল করা যদি পাপ বল, এমন পাপ হয়েই থাকে। অন্যথায় এ শাসক ভাল, প্রজাদের সুখ-দুঃখ দেখে। আর এই যে হাঙ্গামা, এতে রাজার গায়ে আর কতটুকু আঁচ লাগল বল, দেশের মানুষের কষ্টের শেষ রইল না। গ্রামে গ্রামে হাহাকার তুমি স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছ।'

'শুধু ত' রাজার পাপ নয়, চতুর্দিকে পাপের ভরা পূর্ণ হয়েছে। এখন সত্বর এ বিপদ যাবে না, রাঢ়ে বঙ্গে হাহাকার উঠবে, দৈবনির্দেশ।'

'দৈব নির্দেশ।'

'হ্যাঁ, দৈব নির্দেশ। আমার গণনা মিথ্যে হবার নয়। এখন থেকে সর্বনাশ সুরু হল, দেশের মানুষের দুঃখে শেয়াল-কুকুর কাঁদবে।'

মহীপতি এ-কথা শুনে যেন ভয় পান। ধীরে বলেন, 'সুরকণ্ঠ, তুমি কি ভাগ্যগণনা কর?'

'আমি ঈশ্বরের নির্দেশ দেখি। ভগবান এমন সর্বনাশ দিয়ে যুগ বদলান, তাঁর ইচ্ছেয় সব হয় আচার্যকাকা, মানুষ অন্ধ, দেখেও দেখে না।'

'কিন্তু সুরকণ্ঠ, এ বিপদ মানুষের তৈরি। এতে দৈবের হাত কোথায়?'

'তাঁর হাত সর্বত্র থাকে।' বলতে বলতে সুরকণ্ঠের চোখ জ্বলজ্বল করে, মুখ লালচে হয়, 'মানুষের মনে লোভ তিনি দেন, লোভে মানুষ জ্ঞান হারায়, পররাজ্য ছারেখারে দেয়। কোথায় তিনি নেই? সর্বত্র তাঁর প্রকাশ, যে দেখে সে দেখে।'

'আমি জানি না সুরকণ্ঠ, আমার মনে বিশ্বাস নেই।' মহীপতি বালকের মত নিঃসঙ্কোচে বলেন।

'এমন পরিবর্তন আগেও হয়েছে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কত রাজ্য ধুলোয় গেল, নতুন রাজ্য উঠল, সব ঘটনাই বারবার ঘটে, নতুন কিছু নয়।'

'সে পুরাণের কথা।'

'সত্য কথা।'

এ-কথা বলে সুরকণ্ঠ নিজের মধ্যে

স্থির হন। যেন দিব্য চোখে দেখতে পান 'ইতিহাস মানে পুনরাবৃত্তি। লোভে, জেদে, স্বার্থে, অহংকারে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, গ্রাম জনপদ ছারেখারে যায়, 'মানুষের দুঃখ ঘুচবার নয়' তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন।

মহীপতির মনে পড়ে গত ক'দিনের অভিজ্ঞতা। গ্রামে গ্রামে হাহাকার, বর্গীদের ভয়ে সবাই ঘর ছেড়ে পালায়। পুরাণে কোথায় এমন ঘটনার প্রমাণ আছে সে কথা তাঁর মনে থাকে না। বর্তমান দেখে তাঁর চোখ আচ্ছন্ন, মন বিষণ্ণ, অতীতের কথা তাঁর মনে হয় না।

'দেখলাম মানুষের দুর্দশার বর্ণনা হয় না, গ্রাম ছেড়ে সবাই পালায়, কাঙাল ফকির অবধি ভয়ে সারা, মানুষের কি হবে?'

'যেখানে আশ্রয় পাবে সেখানে যাবে।'

'কে আশ্রয় দেবে? নবাব বড় একা সুরকণ্ঠ।'

'ভগবান এখন বাংলার ওপর বড় বিরূপ আচার্যকাকা, এ-দেশের দুঃখ কেমন করে যাবে? এখনি এই, এর পরে আরো কত সর্বনাশ হবে, কলিযুগে এই হবে।'

'সুরকণ্ঠ, তুমি কোথায় যাও?'

'আমার কাজ আছে, আমি নবাব ছাউনীতে যাব।'

'কেমন করে?'

'আমি ভগবানের ওপর বিশ্বাস রেখে যাই, আমার পথ কেউ আটকাতে পারে না।'

মহীপতি নিশ্বাস ফেলে বলতে লাগলেন 'এখন, এই কাঁচা টাকা, মসদ নিয়ে আমি কোথা যাই বল দেখি? মুর্শিদাবাদের পথ সুগম কিনা জানি না। এ বর্গী জাত বাতাসের আগে যায়, অতর্কিতে আসে।'

'আঁধারমাণিক যান।'

'আঁধারমাণিক যাব?'

'সেখানে আপনার জ্ঞাতিকুটুম্ব আছে, তাদের কাছে রাখুন।'

'গ্রামে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব সুরকণ্ঠ।'

'কেন? আপনার পূর্বপুরুষ গ্রাম ছাড়া হয়েছিলেন সেই কথা এখন মনে রাখা উচিত নয়, এখন আপনি বিপন্ন।'

'সেজন্যে নয় সুরকণ্ঠ। সেখানে গেলে জামাইয়ের সঙ্গে দেখা হবে। তুমি জান না, বুনি আজ কতদিন নিরুদ্দেশ।'

এ-কথা শুনে সুরকণ্ঠ উচ্চহাস্য করলেন। বললেন, 'আপনাদের বাড়ির মেয়েরা স্বামীর ঘর করে না, আপনারা মেয়ে দেন না, জামাই আনেন, এ-কথা শুনেছি বটে। তবুও, মেয়ে স্বামীর ঘরে যাওয়া কি নিরুদ্দেশ হওয়া? আপনারা শহরে থেকে থেকে কি একেবারে সমাজ ছাড়া হয়েছেন?'

'কি বললে?'

'ঠিকই বললাম। ফুলি তার স্বামীর ঘরে আছে। গেলেই দেখা পাবেন।'

'তাই না কি? এদিকে দাদা-বউঠান চিন্তায় সারা, আমি ভেবে বাঁচি না, ও মেয়ে আদরে আদরে নষ্ট হয়েছে, তাই চিন্তার অন্ত ছিল না।'

'ফুলির দোষ কি আচার্যকাকা। আপনারা জেদে অন্ধ, জামাই আনব-মেয়েকে ঘর করতে দেব না। আনন্দী সম্মান হারাবে না। সে নিজের মানে নিজের মনে আছে। ফুলি সামান্য স্ত্রীলোক, সে কোথায় যায় বলুন?'

'না সুরকণ্ঠ, বুনি স্বামীর ঘর করুক তাতে আমি কিছুমাত্র মন্দ দেখি না।'

'বুনির বাবা মন্দ দেখেন। তাঁর কথায় বুনি চলে।'

'এ একপক্ষে ভাল। আমি তবে আঁধারমাণিক যাই, কি বল?'

'তাই যান। ফুলি আগে আমার আশ্রয়ে এসেছিল, তখন পিসীমা ছিলেন। এ বর্গীর উৎপাতে গ্রামে সেদিন সর্বনাশ, পিসীমা দেহত্যাগ করলেন। ফুলিকে কোথা রাখি, আমার সংসার বলতে এক পিসীমা ছিলেন বই ত' নয়। এমন দুদিনে সংবাদ পেয়ে আনন্দীর ছোট মা এসে বউকে নিয়ে গেলেন।'

'ভাল কাজ করেছেন।'

'তিনি ও-বাড়ির লক্ষ্মী। ফুলি যদি তাঁর পা ধরে পড়ে থাকে তবে ওর ভাবনা কি! তা ফুলির জেদ কম নয়, সে তা বুঝবে বলে মনে হল না। সে যা বোঝে করুক গে। আমি সংসারের নিয়ম বুঝি না, পাগল ক্ষ্যাপা মানুষ, ও চলে যেতে তবে পথে বেরিয়েছি।'

'ওর দোষ নেই সুরকণ্ঠ, দোষ আমাদের। আমরা মেয়েকে শিক্ষা দিতে পারি নি।'

'ফুলির মন শিশুর মত আচার্যকাকা, ভাল-মন্দ বোঝে না।'

'না বুঝলে চলে কই সুরকণ্ঠ!'

এখন আর সুরকণ্ঠ কথা কন না। তাঁর মনে ঐ একটি ব্যথার জায়গা আছে। ফুলেশ্বরীর কথা স্মরণমাত্রে এখনো তাঁর মন চঞ্চল হয়। শৈশবের সময় থেকে প্রথম যৌবন অবধি যাকে আপনতম বলে জানতে শিখেছিলেন, তার কথা মনে হলে মন চঞ্চল হয়, এ সুরকণ্ঠের একটা মস্ত বন্ধন। এ বন্ধন কাটবেন বলেই পথে বেরিয়েছেন, এখনো মনেপ্রাণে নিরাসক্ত সন্ন্যাসী হতে পারেন নি বলে নিজে দুঃখ পান।

অথচ এ-কথা প্রকাশ করবার অধিকার নেই তাঁর। সংসারী মানুষ সব কথাতেই কাদা মাখায়। কে বিশ্বাস করবে সুরকণ্ঠের চিন্তায় কোন পাপ নেই। তিনি ফুলেশ্বরীকে সুখী দেখলে আনন্দিত হন। ফুলেশ্বরীর দুঃখ দেখলে কষ্ট পান। এখন ফুলেশ্বরী স্বামীর ঘরে সসম্মানে আছেন, এতে তাঁর আনন্দের অবধি নেই। তিনি বললেন, 'আপনি পাগলকে নিয়ে যান। ওর মন বড় চঞ্চল হয়েছে, আমিও একলা হতে চাই। এ বন্ধন নিয়ে পথ হাঁটতে পারি না।'

সেদিন বেলা তিনপ্রহরে মহীপতি আঁধারমাণিকের পথে গেলেন।

(ক্রমশঃ)

[পাঁচ]

চতুর্থ অধ্যায়

মাশুল এড়িয়ে নুনের কারবার

কলকাতা বন্দরের মধ্যবিভাগের ভার সবে পেয়েছি, এমনি সময়ের কোনো এক দিন রোঁদে বেরিয়ে কয়েকটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করলাম। দেখলাম, একখানা নুন বোঝাই দেশী বড় নৌকা আরমেনিয়ান ঘাট ও টাঁকশালের মধ্যবর্তী স্থানের একটি নির্জন খালে প্রবেশ করল। সেইখানে একখানা খালি নৌকা মনে হল এই নৌকাখানার জন্যই অপেক্ষা করছিল। তারপর দেখলাম, দুখানা নৌকা কাছাকাছি আসতেই নৌকাদুখানার মাঝিমাল্লাদের পরস্পর বদল ঘটল। এ নৌকার লোকেরা ও নৌকায় গেল, এবং ও নৌকার লোকেরা এ নৌকায় এলো। তারপর নুন বোঝাই নৌকাখানা ঘাট থেকে ছেড়ে চলে গেল উত্তর দিকে, আর খালি নৌকাখানা খাল থেকে বেরিয়ে নদী পার হয়ে হাওড়ার দিকে চলল।

আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম, 'ব্যাপারটা কি? নিশ্চয় এর মধ্যে কিছু রহস্য আছে।'

আমি নৌকাগুলির গতিবিধি লক্ষ করতে লাগলাম। আমি আমার 'ভাউলে' (বাসের উপযোগী নৌকা) খানা ছেড়ে দিয়ে একখানা ছোট নৌকা নিয়ে ঐ খালি নৌকাখানা অনুসরণ করলাম, আর আমার জমাদারকে আর একখানা ছোট ডিঙ্গি-নৌকায় নুনের নৌকাখানার পিছু ধাওয়া করতে নির্দেশ দিলাম।

দেখলাম, খালি নৌকাখানা নদীর ওপারে গিয়ে ভিড়ল এবং নৌকার লোকেরা ভিতর থেকে কিছু বাসনপত্র আর কাপড়চোপড় বার করে ডাঙায় এনে তুলল। এ কাজ শেষ হলে, একটি লোক একখানা লম্বা বাঁশের সাহায্যে জলের গভীরতা মেপে দেখল, এবং বুঝলাম, দেখে খুশি হয়েছে। তারপর সে ভিতরে গিয়ে নৌকার তলায় যে ফুটোটি বন্ধ করা ছিল, সেটি খুলে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। তারপর দেখা গেল নৌকাখানা আস্তে আস্তে জলের নিচে তলিয়ে যাচ্ছে। তার আগে অবশ্য মাঝিমাল্লারা ডাঙায় উঠে পড়েছিল। জলের উপরে নৌকার মাস্তুল ভিন্ন তখন আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। তখন জোয়ারের সময়। নৌকা থেকে যে কটা জিনিস বাইরের লোককে ধাপ্পা দেবার জন্য ডাঙায় আনা হয়েছিল, মাঝিমাল্লারা তার পাশে বসে রইল। তারপর এক চাপরাশী (আসলে চারণদার, যার ঐ নুনের নৌকার

পারমিট নিয়ে যাবার কথা। একখানি নৌকা ভাড়া করে চাঁদপাল ঘাটের দিকে রওনা হল। আধ ঘণ্টা পরে লোকটি নুনের চৌকি দারোগাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলো সেখানে, এবং দারোগা ডুবে-যাওয়া নৌকার বিষয়ে ওদের কাছ থেকে ওদের জবানবন্দি লিখে নিতে লাগল। আমি ভাবলাম, এইবার ওদের কাছে গিয়ে সব ব্যাপারটা দেখবার সময় এসে গেছে আমার, আর বিলম্ব নয়। গিয়ে দেখি, নৌকার মাঝিরা দারোগার কাছে সজল চোখে বিলাপ করতে করতে তাদের দুর্ভাগ্যের কথা বলে যাচ্ছে। তাদের কতবড় সর্বনাশ হয়ে গেল, তা যেন বলবার ভাষা নেই তাদের। একজনের অনেক টাকা দামের গয়নাসুদ্ধ একটা বাক্স ছিল নৌকায়। আর একজনের কাপড়জামা আর টাকা ছিল, কিন্তু কিছুই উদ্ধার করতে পারে নি। সব নৌকার সঙ্গে অতলে তলিয়ে গেছে। কেউ কেউ এই দুর্ঘটনায় একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে পথে বসেছে।

আমি দারোগাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'দুর্ঘটনাটা ঘটল কি ভাবে?'

দারোগা বলল, 'চারণদার বলছে, ঐ নৌকায় ২০০০ মোন লিভারপুলের নুন ছিল। এই নুন ইংরেজদের 'এবলানা' নামক জাহাজ থেকে নামানো হয়েছে। জাহাজখানা ফোর্ট উইলিয়ামের কাছাকাছি নোঙর করা হয়েছে। তারপর নুন বোঝাই করে নৌকাখানা উজান পথে আসতে, আজ দুপুরের জোয়ারের জলোচ্ছ্বাস এলো গর্জে, সে কি ভীষণ জলোচ্ছ্বাস, সহজে এমন দেখা যায় না। আর তার ফলে নৌকাখানা সঙ্গে সঙ্গে ডুবে গেল। নুন ছিল হাটখোলার এক বড় মহাজনের, এ ক্ষতি তাঁর হয় তো সহ্য হবে, তাছাড়া তিনি এর দরুন যে মাশুল দেওয়া হয়েছে তাও ফেরৎ পাবেন। তাই তাঁর লোকসান এমন কিই বা। আবার জোয়ার চলে গেলে নৌকাখানাও উদ্ধার করা যাবে, কিন্তু এই গরিব লোকগুলোর যে সবই গেল।'

আমি দারোগার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বললাম, 'সত্যিই তো, লোকগুলোর বড়ই ক্ষতি হল।' কিন্তু আমার মনের কথা আর প্রকাশ করলাম না, এর পর কি ঘটে দেখবার জন্য অপেক্ষা করে রইলাম। দারোগার জবানবন্দি লেখা হল। ঐ তথাকথিত দুর্ঘটনার জায়গাতে বসেই তার তদন্তের কাজ শেষ হয়ে গেল। সে ঐ চারণদার আর মাঝিদের নিয়ে 'এবলানা' জাহাজের দিকে এবারে রওনা হয়ে যাবে। তার উদ্দেশ্য, শুল্কবিভাগের অফিসারদের দিয়ে এদের সনাক্তকরণ। তা ছাড়া ওরা যা যা বলছে তা সত্য কিনা যাচাই করা। ওদের জবানবন্দিতে আছে, বেলা ১১টার সময় ওরা ঐ জাহাজ থেকে ২০০০ মোন নুন নৌকায় তুলেছে। আর এর জন্য তাদের পারমিট আছে।'

আমি প্রস্তাব করলাম, সবাই আমার সঙ্গে চলুক। দারোগা এ প্রস্তাবে খুশিই হল, কারণ আমার নৌকাখানা বড় ছিল, বন্দোবস্তও ছিল ভাল। যাবার পথে দারোগা আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আমার নাম এ ঘটনার সাক্ষী হিসাবে খাতায় লেখা হলে কি আমার আপত্তি হবে? আমি বললাম 'কেন হবে? আমি যা দেখেছি তা নিশ্চয় বলব।' দারোগা বলল, 'এইটুকুই আমার প্রার্থনা ছিল।'—কথাটা সে সরলভাবেই বলল, কারণ তার মনে, এই দুর্ঘটনার পিছনে যে চাতুরি আছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহেরই উদয় হয় নি। তাই দারোগা বলতে লাগল, 'যখন কোনো ইউরোপীয় ভদ্রলোক এ রকম দুর্ঘটনার ব্যাপারে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সাক্ষী হতে চান, তখন নুনের মালিকের পক্ষে লোকসানের পরিমাণ হিসাবে শুল্ক ফেরৎ পেতে আর কোনো বেগ পেতে হয় না। তবে একটা কথা—বোর্ড অভ রেভনিউ কিন্তু নুনের নৌকা যে আজকাল প্রায়ই ডুবে যাচ্ছে—এ ব্যাপারটাকে এখন একটু সন্দেহের চোখে দেখতে আরম্ভ করেছেন।'

আমি মন্তব্য করলাম, 'সত্যিই যদি নৌকাডুবিতে মহাজনের ক্ষতি হয় তা হলে তাঁর শুল্ক নিশ্চয়ই ফেরৎ পাওয়া উচিত। বোর্ড অভ রেভনিউএর এ রকম স্থলে শুল্ক ফেরৎ দেওয়ায় কোনো দ্বিধা করাই উচিত নয়। নুনের মহাজনের প্রতি অবশ্যই এটি সুবিচার। কোনো চাতুরি বা প্রতারণা বিষয়ে সতর্ক থাকলে, সত্যদুর্ঘটনার দরুন মাশুল ফেরৎ দিলেও এ থেকে কোনো ক্ষতির কারণ ঘটে না।'

দারোগা বলল, 'এই দুর্ঘটনার কেসটিতে যে কোনো প্রতারণা ঘটে নি, এ কথা আপনিও স্বীকার করবেন, তাই না? আর যদি 'এবলানা'র শুল্কবিভাগের অফিসাররা চারণদার আর মাঝিদের সনাক্ত করেন, তা হলে মহাজনের দাবী অবশ্যই পূরণ করা হবে। কারণ তখন আর তো সন্দেহের অবকাশ রইল না।

দারোগার সঙ্গে এ বিষয়ে আমি একমত হলাম। তার কথার যাথার্থ্য আমি স্বীকার করলাম। 'এবলানা' জাহাজে পৌঁছনোর আগে পর্যন্ত আর আমাদের এ বিষয়ে কোনো আলোচনা হল না। সেখানে পৌঁছনোর পর যখন নিমজ্জিত নৌকার চারণদার ও মাঝিমাল্লাদের 'এবলানা'র ডেকের উপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল, তখন জাহাজের প্রত্যেকটি অফিসার তাদের সনাক্ত করলেন। জাহাজের খালাসিরাও সনাক্ত করল। সবাই এ বিষয়ে একমত যে, যে নৌকা 'এবলানা' থেকে বেলা ১১টার সময় ২০০০ মোন নুন নিয়ে জাহাজের পাশ থেকে রওনা হয়েছে, এরা সেই নৌকারই লোক।

তদন্ত এইখানেই শেষ হয়ে গেল। দারোগা আর অন্যান্য লোকেরা ঘরে ফিরে গেল। কিছুক্ষণ পরে আমি যখন আমার থানায় ফিরলাম তখন দেখি—

সেই যে লোকটিকে নুনবোঝাই নৌকার পিছনে পাঠিয়েছিলাম, সে ফিরে এসেছে। সে যা বলল তা এই—সে ঐ নৌকাটাকে অনুসরণ করে হাটখোলা পর্যন্ত যায়। সেইখানে নুনের গোলার বিপরীত দিকে গিয়ে ভেড়ে। এই নুনের গোলার মালিকের নামও সে আমাকে জানাল। নৌকাখানা তীরে লাগানোমাত্র নৌকা থেকে নুনের বস্তা ঐ মহাজনের গুদামে তোলা হতে লাগল। বহু কুলি নিযুক্ত হল এ কাজে।

এই সংবাদটার অপেক্ষাতেই ছিলাম আমি। আমি মনে মনে যেভাবে কেস্‌টি সাজিয়েছি, এই সংবাদে তার অতিরিক্ত সমর্থন পাওয়া গেল। আমি তৎক্ষণাৎ আমার রিপোর্ট তৈরি করে ফেললাম, এবং সেখানা আমার উপরের অফিসারকে দিলাম।

যথাসময়ে এই রিপোর্ট বোর্ড অভ রেভনিউএর হাতে গেল, এবং এই ঘটনার এক মাসের কম সময়ের মধ্যেই সল্ট চৌকি প্রথা রহিত হয়ে গেল, এবং তার বদলে বর্তমানের রিভার পুলিস প্রথার প্রচলন হল।

ডিটেকটিভের বিদ্যা যারা শিখতে চায় তারা এই কেসটা থেকে অনেকগুলি নির্দেশ পেতে পারে। পর্যবেক্ষণ, সন্দেহভাজন ব্যক্তি কি করে তার যথাযথ হিসাব রাখা, তাদের সমস্ত আচরণ, এবং চালচলন লক্ষ করা দরকার। আরও একটা জিনিস লক্ষ করবার এই যে, কত সহজে ভুল অনুমান খাড়া করা যায়। তখন মনে হয় এটাই একমাত্র সত্য অনুমান। এই ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে যতই তদন্তে এগিয়ে যাওয়া যায় ততই সেই মিথ্যা অনুমান সমর্থিত হতে থাকে। এই কেস্‌টিতে দারোগা ঠিক এই ভাবেই আরম্ভ থেকেই ভুল অনুমান করেছিল।

পঞ্চম অধ্যায়

ডাকঘর সংক্রান্ত প্রতারণা

হাওড়াবাসী এক ইহুদীর সঙ্গে আমার একদিন দেখা করার দরকার হয়। এই লোকটি ট্রাঙ্ক তৈরি করত। আমার এক বান্ধবী বিলেতে ফিরে যাবে, তার জন্যই একটি পোর্টম্যাণ্টো দরকার ছিল, এবং সেই উদ্দেশ্যেই সেখানে গিয়েছিলাম।

দোকানে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম বৃদ্ধ ইহুদী তার গায়ের কোটটি খুলে খুব নিবিষ্টমনে একটি টিনের লাইনিং দেওয়া প্যাকিং বাক্স খুলছে। এমনি সময়ে আমার সাড়া পেয়ে সে হঠাৎ ভীষণভাবে চমকে উঠল, এবং কেমন যেন সঙ্কুচিতভাবে চেয়ারের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা কোটটি আধখোলা কেসটির উপর ফেলে দিল। বুঝলাম সে আমাকে ঐ বাক্সে কি আছে তা দেখাতে চায় না। আমিও এমন ভান করলাম যেন ব্যাপারটি আমার নজরেই আসে নি। অতএব আমি তাড়াতাড়ি পোর্টম্যাণ্টো বাছাইয়ের দিকে মন দিলাম। এতে ইহুদীটিও নিজেকে কিছুপরিমাণ সামলে নিতে সময় পেল। আমি একটি বাক্স বাছাই করে তার দাম জিজ্ঞাসা করলাম। বৃদ্ধ মৃদু হেসে অতি বিনীত সুরে বলল, 'মিস্টার রীড—হেঁ হেঁ—আপনি নেবেন যখন, তখন আর বেশি কি চাইব, আমাকে আপনি ষোল টাকা দেবেন।' এ কথা শুনে এবারে আমি মনে মনে হাসলাম। দেখলাম বাজার দর থেকে অনেক কমিয়ে বলেছে দাম। আমি ষোল টাকা দিয়ে বাক্সটি কিনলাম, কোনো মন্তব্যই করলাম না।

অতঃপর একটি লোক ডেকে বাক্সটি আমার গাড়ির উপর চাপিয়ে চলে এলাম সেখান থেকে। আসতে আসতে সমস্ত ব্যাপারটা ভাবতে লাগলাম, এবং গাড়িতে বসেই আমার নোটবুকে যা যা ঘটেছে সব লিখে রাখলাম। এর পর আর এ সম্পর্কে কিছু চিন্তা করি নি। এরপর মাস দুই কেটে গেছে এমন সময় আমার হাতে এক অদ্ভুত রহস্যময় কেস্ তদন্তের ভার এলো। আমাকে সব তদন্ত করে এ সম্পর্কে একটি রিপোর্ট দাখিল করতে হবে।

ব্যাপারটা হচ্ছে এই: ডাকবিভাগের হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে বর্তমান ত্রৈমাসিক স্ট্যাম্প বিক্রি আগের বছরের ত্রৈমাসিক বিক্রির তুলনায় খুব বেশিপরিমাণে কমে গেছে। অথচ দেখা যায় চিঠিপত্র পার্সেল ইত্যাদির সংখ্যা আগের তুলনায় কিছুই কমে নি। এর কারণ অনুসন্ধানের ভার দেওয়া হয়েছে আমার উপর।

আমার তখন প্রথম কাজ হল কলেকটর ম্যাকেনজির সঙ্গে অফিশিয়ালভাবে সাক্ষাৎ করা এবং তাঁর কাছ থেকে প্রধান প্রধান স্ট্যাম্প ভেণ্ডরদের তালিকা নেওয়া। আমার এ তালিকা কলকাতা ও শহরতলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলাম। এইভাবে কাজে হাত দিয়ে আমি আবিষ্কার করলাম বিশেষ করে দুজন স্ট্যাম্প ভেণ্ডর প্রতি বছর দৈনিক তিন শত টাকার স্ট্যাম্প বিক্রি করত, তারা হঠাৎ স্ট্যাম্প কেনা খুব কমিয়ে দিয়েছে। তারা দুজনেই দৈনিক এখন মাত্র পঞ্চাশ টাকা পরিমাণ কিনছে। আমি অতঃপর এদের দুজনের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার ব্যবস্থা করলাম। এই সময়ে আমার অধীন একজন বেশ চটপটে ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি ইউরোপীয় কনস্টেবল ছিল। তাদের ভার ছিল গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল পাহারা দেওয়া। সৌভাগ্যবশত ঐ দুজন স্ট্যাম্পভেণ্ডরের একজনের দোকান ছিল আবার ঠিক ঐ হোটেলের উল্টো দিকেই, কাজেই তার চলাফেরার উপর নজর রাখার কাজটা সহজ হল। সে সন্দেহও করবে না যে তাকে কেউ নজর রাখছে।

অতএব ঐ কনস্টেবলকে কি কি করতে হবে সে বিষয়ে যথাযোগ্য নির্দেশাদি দিয়ে আমি কাজে বেরিয়ে গেলাম। সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা উক্ত ইউরোপীয় কনস্টেবলটি আমার কাছে এসে হাজির। সে সেদিনের নজরদারির রিপোর্ট আমার কাছে পেশ করল। জানা গেল সকাল ১০টায় ঐ স্ট্যাম্পভেণ্ডার দোকান খোলে, এবং ৫-৩০ এর সময় দোকান বন্ধ করে।

কিন্তু বন্ধ করবার আগে সে খুচরো সমস্ত পয়সা একটি ব্যাগে বন্ধ করে সোজা লালবাজারে অবস্থিত এক পোদ্দারের কাছে নিয়ে সেগুলো ভাঙিয়ে কারেন্সি নোটে পরিণত করেছে। তারপর একখানা ঠিকাগাড়িতে করে হাওড়ার দিকে যায়। কনস্টেবল তাকে অনুসরণ করে আর-একখানা ঠিকা গাড়িতে। স্ট্যাম্প ভেণ্ডরের গাড়ি আমার সেই পরিচিত ইহুদীর দোকানের সামনে গিয়ে থামে, ইহুদি বেরিয়ে এসে তাকে দুচারটি কথা বলে, এবং দুজনেই দোকানে প্রবেশ করে। কিছু-ক্ষণ পরে ভেণ্ডরটি বেরিয়ে এসে পুনরায় সেই গাড়িটিতে উঠে চলে আসে তার চিৎপুর রোডের বাড়িতে। কনস্টেবল এবারেও তাকে অনুসরণ করে। তারপর যখন সে বুঝতে পারে ভেণ্ডরটি এবারে সকল কাজের শেষে এখন বাড়িতেই বিশ্রাম নেবে, তখন সেও নিশ্চিন্ত মনে ফিরে এসেছে।

এই সব খবর শুনে আমি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে সব বিষয়টা চিন্তা করতে লাগলাম। একটার সঙ্গে আর একটা জুড়ে কোনো একটা কিছু খাড়া করা যায় কি না সেটাই এখন হল আমার উদ্দেশ্য। তখন হঠাৎ মনে পড়ল ঐ একই ইহুদীর কাছেই তো আমিও গিয়েছিলাম। মনে পড়তেই আমার নোটবইখানা খুলে দেখতে লাগলাম। কোনো সূত্র পাওয়া যায় কি না। একবার দুবার তিনবার—এইভাবে অন্তত ছ বার পড়লাম আমার সেদিনের নোটকরা কথাগুলো। ভাবতে লাগলাম এও কি সম্ভব ঐ বুড়ো ইহুদী এই স্ট্যাম্প ভেণ্ডরকে প্রলুব্ধ করে নিয়ে গিয়ে নিজেই তার কাছে স্ট্যাম্প বিক্রি করছে? ঠিক ঠিক মনে পড়ছে, আমি তার দোকানে যেতে যে আধখোলা বাক্সটি সে কোট দিয়ে ঢেকে দিয়েছিল, সেই বাক্সের সঙ্গে স্ট্যাম্প রহস্যের নিশ্চয় যোগাযোগ আছে। আমার অনুমান সব ঘটনাটার সঙ্গেই অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে। কোথাও ফাঁক নেই। ঐ রকম বাক্সেই বিলেত থেকে স্ট্যাম্প ও স্ট্যাম্পের কাগজ আসে। তবে ইহুদীর কাছে যে বাক্সটি দেখেছি তাতে জলে ভেজার দাগ ছিল। সেইটুকুই শুধু ব্যতিক্রম। আর সব ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে। কিন্তু ঐ বাক্সে যদি স্ট্যাম্পই থাকবে, তবে তা ঐ লোকটার হাতে এলো কি করে? তা ছাড়া স্ট্যাম্প ও স্টেশনারি বিভাগের সুপা-রিনটেনডেন্ট-এর কাছ থেকে সম্প্রতি-কালে বা অতীতে স্ট্যাম্প হারিয়ে যাওয়া অথবা চুরি যাওয়ার কোনো রিপোর্টই তো আমি পাই নি। আর সুপারিনটেনডেন্ট জে. বি. রবার্টস এমন মানুষই নন যিনি এমন কোনো ঘটনা ঘটে থাকলে তা চেপে যাবেন।

আমি বসে বসে এই সব সমস্যার সমাধান খুঁজছি এমন সময় আমাকে অবাক করে আমার কাছে স্বয়ং স্ট্যাম্প-ভেণ্ডর এসে হাজির। সে তখন বেশ একটু উত্তেজিত অবস্থায় ছিল। সেই স্ট্যাম্প ভেণ্ডর—যাকে আমি পুলিসের প্রায় নজরবন্দী অবস্থায় রেখেছিলাম।

ওকে দেখে প্রথমেই আমার মনে হল, লোকটা সব টের পেয়ে আমার কাছে তার ব্যক্তিস্বাধীনতায় পলিস বাধা সৃষ্টি করছে এই মর্মে অভিযোগ জানাতে এসেছে। কিন্তু না। সে যা বলতে এসেছে তা শুনে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম। অর্থাৎ সে যে পুলিসের সন্দেহভাজন তা সে টের পায় নি। সে এখন এসেছে অন্য অভিযোগ নিয়ে। এক ঠিকাগাড়ির চালক তার হিসাবের খাতা আর অনেকগুলি ডাকঘরের স্ট্যাম্প আর দলিলের স্ট্যাম্প নিয়ে পালিয়ে গেছে।

সে ঐ ঠিকাগাড়িতে হাওড়া থেকে তার চিৎপুরের বাড়িতে এসে নেমে বাড়ির ভিতরে গেছে হিসাবের খাতাপত্র আর ঐ সব স্ট্যাম্প গাড়িতে রেখে। বলা হয়েছিল চাকর ভাড়া নিয়ে আসছে, সে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে গাড়ির ভিতর থেকে তার জিনিস-পত্র তুলে নিয়ে যাবে। কিন্তু সে এসে দেখল দুটি বাবু কোথেকে ছুটে এসে গাড়ির ভিতর উঠে বসল এবং কোচ-ম্যানকে বলল ছুটে চল হাওড়া স্টেশনে ডবল ভাড়া পাবে। গাড়িও তৎক্ষণাৎ ছুটে চলে গেল। চাকর ভাড়াও দিতে পারল না, গাড়ির ভিতরের জিনিসপত্রও নিতে পারল না। এ কথা শোনামাত্র সে ছুটে গেল থানায়।

আমি নানারকম কৌশল খাটিয়ে স্ট্যাম্প ভেণ্ডরের কাছ থেকে, কি করে সে স্ট্যাম্প সংগ্রহ করেছে তা জেনে নিয়ে, ঐ পলাতক কোচম্যানের সন্ধানে লাগব মনস্থ করলাম। কারণ এখন ঐ স্ট্যাম্পের বিষয় তথ্য সংগ্রহে আমার নিজের আগ্রহ ঐ ভেণ্ডরের চেয়েও বেশি দাঁড়িয়ে গেছে। আমি তাই ভেণ্ডরকে সঙ্গে নিয়ে তার চিৎপুর

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায়ণ

মূল্য দুই টাকা

"অমূল্য গ্রন্থ হয়েছে"—স্বামী অপূর্বানন্দ।
"বইখানি নতুন ধরণেরই হয়েছে।"
—স্বামী সদানন্দ।
"বইখানি দেখিতে সুন্দর, বিষয়বস্তু অমূল্য ও অতুলনীয়। একখানি গ্রন্থে এত মহা-মূল্য রত্নের সন্নিবেশ পূর্বে আর হয় নাই।" —স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজী।

নূতন উপন্যাস—নূতন সৃষ্টি
বর্তমান সময়ের সমস্যা ও তাহার সমাধান

শ্যাম-সোহাগিনী

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত

মানুষ ভুল করে কিন্তু মানুষের মন যদি পবিত্র থাকে, তবে ভুল ভাঙ্গিতে বিলম্ব হয় না। মূল্য ১॥০ টাকা

স্বনামধন্য কথাশিল্পী

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

স্বর্গাদপি গরীয়সী (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড), দৈনন্দিন ও বসন্তে। মূল্য—৩.৫০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট.
কলিকাতা—১২

রোডের বাড়িতে গেলাম, এবং সেখানে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে দেখি কোচ-ম্যানটি সেখানেই ফিরে এসেছে। কিন্তু গাড়ির ভিতর অনুসন্ধান করে শুধু হিসাবের খাতাপত্র পাওয়া গেল, স্ট্যাম্প একটিও নেই।

কোচম্যানকে জেরা করে জানা গেল, সে দুটি বাবুকে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছে, বাবু দুটি স্টেশনে পৌঁছে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে স্টেশন প্ল্যাটফর্মের দিকে গেছে এইটুকু সে জানে। সে তখুনি গাড়ি নিয়ে ছুটে এসেছে চিৎপুর রোডে ভেণ্ডরবাবুর কাছ থেকে ভাড়া নিতে। স্ট্যাম্প ভেণ্ডর ও আমি তৎক্ষণাৎ ঐ গাড়িতে উঠে হাওড়া স্টেশনের দিকে ছুটে চললাম। কিন্তু সেখানে কোনো বাবুর দেখা পাওয়া গেল না, অতএব স্ট্যাম্পেরও সন্ধান মিলল না। স্টেশন প্ল্যাটফর্মে তদন্ত চলছিল, এমন সময় কে যেন হাওড়ার সেই ইহুদীকে খবর দিয়েছে স্ট্যাম্প ভেণ্ডরকে মিস্টার রীড গ্রেফতার করেছেন, এবং স্ট্যাম্প নিয়ে ভীষণ গোলমাল আরম্ভ হয়ে গেছে।

এ কথা শুনে ঐ ইহুদী ভীষণ ভয় পেয়ে তার কাছে যত স্ট্যাম্প ছিল সব পুড়িয়ে ফেলল, এবং পরদিন সকালে উকিলের বাড়ি গেল জানতে যে, যদি স্ট্যাম্প ভেণ্ডর যে স্ট্যাম্প বিক্রি করেছে তা তার কাছ থেকে পাওয়া এটা ধরা পড়ে, তা হলে এ বিষয়ে তার দায়িত্ব কতখানি। সে এখন গা ঢাকা দেবে, না আত্মপক্ষ সমর্থন করবে।

উকিল আগাগোড়া সব কাহিনী শুনে বললেন, তোমার কোনো ভয় নেই। ঐ স্ট্যাম্প বিষয়ে তোমার বিরুদ্ধে আইন কিছুই করতে পারবে না। স্ট্যাম্প সংগ্রহ তোমার পক্ষে মোটেই বেআইনি হয় নি। অতএব তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

এই কথা যেমনি শোনা, তেমনি ইহুদীটি 'হা ভগবান! হা ভগবান!' বলে চেঁচিয়ে উঠল। 'আমি ভয় পেয়ে সব স্ট্যাম্প যে পুড়িয়ে ফেললাম। আমি যত ডাকঘরের স্ট্যাম্প আর দলিলের স্ট্যাম্প এডেন বন্দরে বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে কিনেছি সব পুড়িয়েছি, এখন আমি কি করব? আমি যে গরিব হয়ে গেলাম। হায় হায়! কেন আমি পোড়ানোর আগে আপনার পরামর্শ নিতে আসি নি।'

বৃদ্ধ ইহুদী উন্মাদের মতো বিলাপ করতে করতে চলে গেল। এর পর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমি পুলিস অফিসাররূপে গিয়ে হাজির হলাম তার দোকানে। গিয়ে তার চোখমুখের যে ভাব দেখলাম তা বর্ণনা করবার ভাষা নেই। সে যখন দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এলো আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে তখন তার মুখে যে বেদনার ছাপ দেখেছিলাম, তা আমি কোনোদিন ভুলব না। আমাকে দেখে সে কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারল না। তারপর কোনো রকমে জিজ্ঞাসা করল আমি কি পোর্টম্যাণ্টো কিনতে এসেছি? আমি উত্তরে বললাম, 'না, আজ আমি অন্য উদ্দেশ্যে এসেছি।'

'মিস্টার রীড, আপনি চতুর লোক। আমি বুঝতে পেরেছি আপনি কেন এসেছেন।'

'শুনে খুশি হলাম মিস্টার সি—, কারণ, ব্যাপারটা বেদনাদায়ক হলে কি করে যে কথাটা পাড়া যাবে সেও এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এ ক্ষেত্রে তুমি যে আগেই সব বুঝতে পেরেছ এতে আরাম বোধ করছি।'

'ঠিক কথা, মিস্টার রীড—খুব খাঁটি কথা, আপনি স্ট্যাম্প সম্পর্কে তদন্তে এসেছেন, তাই না?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, সেই উদ্দেশ্যেই এসেছি। স্ট্যাম্পের রহস্য কি তা জানতেই আমার আগমন।'

'তা হলে বসুন, মিস্টার রীড'—বলতে বলতে বৃদ্ধ আমাকে একখানা চেয়ার এগিয়ে দিল। 'আমি সবই আপনাকে—বলব। স্ট্যাম্প আমার হাতে কি করে এলো তা সবই খুলে বলছি।'

আমি চেয়ারে বসলাম। বৃদ্ধ আমার সম্মুখে আর একখানা চেয়ারে বসল এবং পরক্ষণেই তার কাহিনী বলতে শুরু করল।

'আপনার নিশ্চয় মনে আছে মিস্টার রীড, কয়েক বছর আগে 'দেওলালি' নামক জাহাজখানা লোহিত সমুদ্রে ডুবে গিয়েছিল?'

আমি বললাম, 'মনে আছে।'

বৃদ্ধ বলতে লাগল, 'ডোববার সময় সে জাহাজে সাধারণ মালপত্র ছাড়াও অনেক ধনসম্পত্তি আর ডাকঘরের স্ট্যাম্প ও দলিলের স্ট্যাম্প-কাগজ ছিল প্রচুর। এ সবই ভারতবর্ষের জন্য আসছিল ইংল্যাণ্ড থেকে। বছরখানেক হল সেখান থেকে বহুসংখ্যক ডুবুরি পাঠানো হয় জাহাজডুবির জায়গায়—যাতে তারা জাহাজের ভিতর থেকে ঐ সব সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারে। তারা জাহাজের খোল থেকে ধনসম্পত্তি উদ্ধার করবার সময় সেখান থেকে অনেক কিছুই উদ্ধার করে সেগুলো নৌকায় করে তীরে পাঠিয়ে দিয়েছিল। সমুদ্রের তীরেই সে সব পড়ে ছিল কয়েক মাস ধরে, তারপর সেগুলোকে প্রকাশ্যে নিলাম করা হয়। আমিই তখন সে সব কিনেছিলাম। যে সব মাল সমুদ্রের নিচে তিন বছর পড়ে ছিল, সেই সব মাল বিনা পরীক্ষায় নিলামে কেনার জন্য সে সময় আমার নির্বুদ্ধিতায় অনেকে ঠাট্টা করেছিল। কিন্তু আমি ইচ্ছে করেই ঝুঁকিটা নিলাম। কেনবার কিছুদিন পরে আমি আবিষ্কার করলাম দামী জিনিসই পেয়েছি—অর্থাৎ এই স্ট্যাম্পগুলো। মাশুল বাঁচাবার উদ্দেশ্যেই সম্ভবত স্ট্যাম্পের কেস্‌-গুলো বিলেত থেকে 'স্টেশনারি' নামে চালান দেওয়া হয়েছিল। সব-গুলো কেসের ভিতরেই টিনের আস্তর দেওয়া ছিল, এবং অধিকাংশ কেস্‌ই অক্ষত অবস্থায় পেয়েছিলাম। মাত্র কয়েকটির টিনের আস্তর খারাপ হয়ে গিয়ে তাতে নোনা জল ঢুকে স্ট্যাম্পগুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আমি সেগুলো নিয়ে এডেনের বৃটিশ

রেসিডেণ্টকে দেখাই, এবং তার জন্য ক্ষতিপূরণ পাই। যে কেসগুলো ভাল ছিল সে সবই আমি কলকাতায় নিয়ে আসি তাড়াতাড়ি বিক্রি করতে পারব আশায়। আমি প্রায় সফল হয়ে এসে-ছিলাম, এমন সময় কাল সন্ধ্যায় আমি খবর পেলাম আমার এক খদ্দের ভেণ্ডরকে আপনি গ্রেফতার করেছেন। ভয় হল, এর পরই হয় তো আমার পালা আসবে, তাই আমি কাল সমস্ত স্ট্যাম্প নষ্ট করে ফেলেছি। আজ সকালে আমি এক আইনজীবীর কাছে গিয়েছিলাম। তিনি বললেন, আমি কোনো বেআইনি কাজ করি নি। আমি প্রকাশ্য নিলামে কিনেছি, অতএব তা আমার সম্পত্তি, আমি তা নিয়ে স্বাধীনভাবে যা ইচ্ছে তা করতে পারি।'

ইহুদীর কাহিনী শেষ হলে আমি তাকে বললাম, 'তোমার খদ্দের ভেণ্ডরকে আমি গ্রেফতার করেছি এ খবর একে-বারে মিথ্যা। আমি বরং তার স্ট্যাম্প যে চুরি করেছে তাকে ধরবার চেষ্টা করেছিলাম। আমি ঐ ভেণ্ডরকেই সাহায্য করতে চেয়েছিলাম।'

ইহুদী আমার তরফের কথা শুনে উন্মাদের মতো চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে 'হায় ভগবান! হায় ভগবান! আমি একটি গাধা' বলে চিৎকার করে বিলাপ করতে লাগল। তার চোখ দুটি যেন গর্ত থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসবে এমনি অবস্থা হল তার।

আমি তাকে উত্তেজিত হতে নিষেধ করে বললাম, 'তুমি নির্বোধের কাজ কর নি। কারণ স্ট্যাম্প উদ্ধার করতে পারলে তোমাকে বিনা লাইসেন্সে স্ট্যাম্প বিক্রির দায়ে ধরতাম।

ইহুদী এ কথা শুনে অনেকখানি সংযত হল, এবং পুনরায় আসনে গিয়ে বসল। তারপর একটুক্ষণ চিন্তা করে আমাকে বলল, 'যে নিলামদার ওগুলো এডেনে নিলাম করেছিল, তার কোনো লাইসেন্স ছিল না।'

'ঠিক কথা মিস্টার সি—কিন্তু সে যে স্ট্যাম্প বিক্রি করছে এটা তার জানা ছিল না। কিন্তু তোমার জানা ছিল। আইনের চোখে ঐখানেই যে অনেকখানি তফাৎ হয়ে গেল দুজনের কাজে। আর এক কথা, আমি হয় তো তোমার ঐ স্ট্যাম্প বাজেয়াপ্ত করতে পারতাম না, কারণ তোমার হাতে যে ঐ সব এসেছে, তার মধ্যে অনেক কিছু বিবেচনা করবার আছে। কিন্তু বিনা লাইসেন্সে বিক্রির কাজে আমি হয় তো—আর হয় তো কেন, অবশ্যই তোমাকে বাধা দিতাম। এখন সব দিক ভেবে দেখ; তুমি যতটা ভাবছ, ততটা ক্ষতি তোমার হয় নি।'

এর পর কি হল তা অনুক্ত রইল। কারণ এর সঙ্গে এত সব আনুষঙ্গিক আইনগত প্রশ্ন জড়িত আছে যে, তা সাধারণ্যে প্রকাশ করার আমার ইচ্ছা নেই। কিন্তু গোয়েন্দাগিরির আর্ট যারা শিখতে চায়, তাদের কাছে অবশ্যই 'পর্যবেক্ষণ'-এর মূল্য এতক্ষণ যথেষ্ট উদঘাটিত হয়েছে। আর ঠিক এই কারণেই এ ঘটনাটা এ বইয়ের অন্তর্ভুক্ত করলাম।

(ক্রমশঃ)

আকাশে-বাতাসে

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আকাশে-বাতাসে ছড়ায় অন্ধকার
নিভে যায় ঘরদুয়ারে সোনার আলো
যা কিছু পেয়েছি—তাহাতে হয় নি ভার
এবার—প্রিয় হে, মরি যদি সে-ও ভালো।

এমনও দেখেছি—আকাশের উজ্জ্বলা
শামিয়ানা ছুঁতে উদ্ধত কিংশুকে
এমনও দেখেছি—শেষ হতে কথা বলা
শ্রাবণের মেঘ উঠানে পড়েছে ঝুঁকে।

রাজবাড়ি থেকে ভেসে আসে কতো গান
জোছনা নিশীথে অপ্সরা কথা বলে :
প্রিয় হে, তোমায় তখন কি দেবো দান—
—ক্ষণিক সুখে কি প্রলুব্ধ হলে চলে?

সখাসূর্য

গৌতম গুহ

অন্তরঙ্গ নগরের কিছু যেন রঙ বদলেছে
ও-সূর্যের চিমনিতে স্ফটিকের সে স্বচ্ছতা নেই;
বর্ণ-বৈষম্যের ধোঁয়া অশালীন কপিশ স্পর্শেই
বাদল দিনের মতো মনে বুঝি কান্না জমিয়েছে।

রৌদ্রের উত্তাপটুকু স্বাস্থ্যহীন পৃথিবীর দেহ
উষ্ণ রাখে অনুভবে; চোখে নামে নক্ষত্র-আকাশ
নদীকণ্ঠে বেগবান কূলভাঙা গানের বিন্যাস
একদিন থেমে যায়, পর্বতজঙ্ঘায় তবু কেহ

যিশুর মতন হেসে ফোটায় না ক্ষমার কোরকে,
উৎসবও শূন্য হয়, প্রতিবেশী ভায়েদের মুখ
ভুলে যাই অকপটে, রক্তে ডাকে অশান্ত উল্লুক
অন্ধকার হানা দেয় তবু ভুলি প্রাণের সূর্যকে

বাঁচতেও জানি না কো মাথা কুটে মরি এই শোকে।

● শান্তিনিকেতনে সমাবর্তন উৎসবে আচার্য বরণ

রাজপথে জনতার সমাবেশ ও বিক্ষোভ-মিছিল হয়ে আসছে। সে মিছিলের আদর ছিল সারা ভারতের স্বদেশ-প্রেমিক মানুষের কাছে। সে মিছিল থেকে তাঁরা লাভ করেছেন নব নব প্রেরণা।

স্বাধীন ভারতের অঙ্গরাজ্য অঙ্গহীন পশ্চিম বাংলার রাজধানীর জনতার মিছিল চেহারার বদল হয়েছে অনেকখানি। চেহারার এই পরিবর্তন দেখেই কেন্দ্রের কর্তারা মিছিলে আর তেমন উৎসাহ ও উদ্যম দেখতে পাচ্ছেন না। গেল সপ্তাহেও শহর কলকাতায় আরেক দফা মিছিল হয়ে গেছে। এ মিছিলে যাঁরা সামিল হয়েছিলেন তাঁরা সকলেই সরকারী কর্মচারী। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী থেকে সুরু করে লোয়ার ডিভিশন ও আপার ডিভিশনের সকল কর্মচারীর বিরামহীন মিছিল চলেছিল সেদিন কলকাতার বিভিন্ন রাজপথে। দাবি তাঁদের অতি সামান্য। শুধু সরকারী কর্মচারী কেন, পশ্চিম বাংলার প্রতিটি মেহনতী মানুষেরও একই দাবি। চাই ভোগ্যপণ্যের নিয়মিত সরবরাহ। মূল্যটাও তার হতে হবে ক্রয়ক্ষমতা মাফিক। এই সর্বসাধারণের দাবির কথাটার সঙ্গে সরকারী কর্মচারীরা ক্ষতি-পূরণের প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। ভোগ্যপণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে আজ তাঁদের সংসারযাত্রা নির্বাহ করা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়েছে। জীবন তাঁদের অভিশপ্ত মনে হচ্ছে। জীবনযাত্রা বর্ধিত ব্যয়সূচীর সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে তাঁরা দাবি জানিয়েছেন মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির। তার চূড়ান্ত ফয়সালা সাপেক্ষে অন্তর্বর্তীকালীন ভাতা-ব্যবস্থার অনুরোধ জানিয়েছেন।

খাদ্যের দাবিতে জনতার বিক্ষোভ শুধু কলকাতা শহরেই নয়, সারা ভারতেই চলেছে। ভোগ্যপণ্য আজ মানুষের নাগালের বাইরে। কালোবাজারের দৌরাত্ম্য দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। মুনাফাবাজদের

রাজধানী :

শহর কলকাতা এখন সরগরম। বড়দিনের উৎসবে মুখর কলকাতার বর্ণাঢ্য এলাকা। ইংরেজ রাজত্বের পতনের পর থেকেই ঈশ্বরপুত্র—প্রেরিত পুরুষ যীশুর জন্মদিন পালিত হচ্ছে এখানে। বড়দিনে—খৃস্টমাস ডে-তে সুরু হয় আনন্দ-উৎসব এবং তার ঢেউ চলে ইংরেজি নববর্ষ পর্যন্ত। ইংরেজ আমলের এই দিনের জৌলুষ অবশ্যি এখন আর নেই। বন্ধু-বান্ধবদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন, সারা বছরের বেদনা ও ক্লান্তি কাটিয়ে আগামী দিনের শুভ-কামনা জানাবার রীতি এখনও আমরা বজায় রেখেছি।

এখানেই আমাদের বৈশিষ্ট্য। আমরা যা পাই তাকে সহজে ত্যাগ করি নে। তাঁকে আপন করে নিতে পারি সহজেই। উনিশ শো চৌষট্টি বছর আগে বেথলহেম গ্রামে যে মানুষটি জন্মগ্রহণ করে বিশ্বাসের বাণী, প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের ভাবধারা প্রচার করেছিলেন—তাঁকেও আমরা অত্যন্ত আপনজন হিসেবেই গ্রহণ করেছি।

বর্জনের নীতি বাঙালীর জীবনে কোনদিনই স্থান পায় নি। সবাইকেই সে হাতছানি দিয়ে কাছে টেনে নিয়েছে—গ্রহণ করেছে প্রিয়জনরূপে। তার ভালবাসা ও প্রীতির মধ্য দিয়েই জগতের সঙ্গে সে স্থাপন করেছে আত্মিক মৈত্রী। যুগে-যুগে এই মহামিলনের মহোৎ-সবের আয়োজন হয়েছে বাঙালী মনীষীদের উদ্যোগে। জাতি হিসেবে বাঙালী তাই এত উৎসবপ্রিয়। বাঙলার রাজধানী কলকাতায় বারো মাস সেইজন্যেই একটা-না-একটা উৎসব লেগে থাকে।

স্বাধীন ভারতের অঙ্গচ্ছেদের পর বাঙালী জাতি নানাদিক থেকে পঙ্গু হয়ে পড়েছে। তাই তার আনন্দে কিছুটা ভাটা পড়েছে। উচ্ছলতা, তীব্রতা না থাকলেও তার জীবনধারা গতিহারা হয় নি। অঙ্গচ্ছেদের অসহ্য যন্ত্রণার ছটফটানী দেখে যাঁরা শহর কলকাতাকে মিছিল-নগরী আখ্যা দিয়ে আসল সমস্যা এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন, তাঁরা প্রকৃত পরিচয় সম্ভবত পান নি। তা পেলে কলকাতাকে মিছিল-নগরী না বলে বলতে বাধ্য হতেন উৎসবমুখর নগরী।

মিছিলও কলকাতার ইতিহাসে আকস্মিক কিছু নয়। স্বাধীনতা-সংগ্রামের দিন থেকেই কলকাতার

অঙ্গুলিহেলনে দ্রব্যমূল্য বেড়ে চলেছে রকেটের গতিতে। সরকার দৃঢ়হস্তে এদের দমনের কোন ব্যবস্থাই করে উঠতে পারেন নি। মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের, মুনাফাশিকারীদের হিংস্র আক্রমণ থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষার প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব সরকারের। সরকার মাঝে মাঝে বচনামৃত বর্ষণ করছেন---দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সাধারণ মানুষকে এগিয়ে এসে সরকারকে সাহায্যের আহ্বানবাণীও শুনিয়েছেন; কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় নি। বচনামৃত পানে জঠর-যন্ত্রণা আর নিবারিত হচ্ছে না দেখেই, আজ মানুষ বাধ্য হচ্ছে পথে নেমে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সোচ্চারে দাবি জানাতে। কালোবাজারের করালগ্রাস থেকে আজ তারা মুক্তি চায়।

সরকারের পর কালোটাকার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলে সংগ্রামের দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবেই এসে যায় বিরোধী দলের নেতাদের ওপর। বিরোধী দলগুলোও সে কাজে সরকারের মতই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরাও বিবৃতি ও বক্তৃতার গণ্ডী পেরিয়ে অন্য কোন পথের নিশানা মানুষকে দিতে পারেন নি। এ বিষয়ে পূর্বে আমরা বিস্তারিত আলোচনাও করেছি। সোজা কথা, বচনসর্বস্ব বিরোধী দল নামধেয় দলগুলো তাঁদের দায়িত্ব পালনের সুযোগ হেলায় হারিয়েছেন।

বড়দিনের বাজারে পৌষ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে শহর কলকাতার বুকে বসে শুনতে পাচ্ছি---মানুষের জীবন ছাড়া আর কিছুই সস্তা হয় নি। অথচ এই পৌষ মাসকে আগলে রাখার উৎসব হত চিরকাল পৌষ-সংক্রান্তিতে। শীত আসতো ভোগের সম্ভার নিয়ে। গ্রামে গ্রামে নতুন ধানে হত নবান্নের উৎসব।

উৎসব এখনো চলেছে। আগেই বলেছি আনন্দের স্রোতধারা ক্ষীণ হলেও মরা নদীর বালুচরে আটকে

● সরকারী কর্মচারীদের অভূতপূর্ব মিছিলের একাংশ

যাওয়ার অবস্থায় আসে নি। বড়দিনের উৎসব, ইংরেজি নববর্ষের উৎসবের আয়োজন চলেছে বড়দের ঘরে ঘরে। সেখানে সাধারণ মানুষের—নিম্নমধ্য-বিত্তের, দরিদ্র চাষী ও মজুরের স্থান নেই। গ্রামে গ্রামে নবান্ন হচ্ছে ঠিকই। তার উৎসবের আনন্দও এখন বড় জোতদারের গৃহের গণ্ডী পেরিয়ে উপচে পড়ছে না সাধারণ মানুষের দুয়ার পর্যন্ত।

মানুষ তাই মুক্তির জন্য আকুলি-বিকুলি করছে। ইংরেজি বছর শেষ। ছেলে-মেয়েদের বার্ষিক পরীক্ষা হয়ে গেল। আমাদের রাষ্ট্রনায়ক ও জন-নেতারা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে একটু কান পেতে শুনতে চেষ্টা করলেই শুনতে পাবেন দু'শ' টাকা পর্যন্ত মাসিক আয়ের অধিকাংশ পরিবারের গিন্নিদের করুণ কণ্ঠের আর্তনাদ। ছেলে-মেয়েদের বিদ্যালয়ের বেতন তাঁর স্বামী মিটিয়ে দিতে পারেন নি। পরীক্ষার ভাল সংবাদ পেয়ে খুশি মনে ছেলে-মেয়েদের আদর করার সৌভাগ্য থেকে তিনি আজ সরকারের কেরামতিতে ও কালোবাজারীদের কারসাজিতে বঞ্চিতা। কানের দুল বিক্রি করে, হাতের চুড়ি দু' গাছা বাঁধা দিয়ে যে জননী পরীক্ষার সংবাদ এনেছেন, তিনিও নতুন বই কেনার টাকা সংগ্রহের আর কোন পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ছেলে-মেয়েদের বেতনের টাকাটা সরকার দেবেন আর ক'টা দিন পরে। সে টাকা দিয়ে হাতের সোনার চুড়ি মুক্ত না করতে হলে, দু-চারখানা করে নতুন বই কিনে দেওয়া সম্ভব হবে। সে সৌভাগ্যবতী মায়ের সংখ্যাও খুবই নগণ্য।

খণ্ডিত বাংলার সমাজ-জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আজ এই করুণ দৃশ্য। বেকারের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। পূর্ব বাংলা থেকে আসছে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে আত্মীয়-পরিজন। কালোটাকার দৌলতে ফেঁপে উঠছে ভোগ্যপণ্যের মূল্যস্তর।

মানুষ এই যাঁতাকলের নিষ্পেষণ সহ্য করতে না পেরেই একদিন অশান্ত হয়ে উঠবে। সে অশান্তির উত্তাল তরঙ্গাঘাতের ভয়াবহ পরি-স্থিতির নজীর ইতিহাসে রয়েছে। ইতিহাসের সে শিক্ষাকে উপেক্ষা করা যে মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়, তা বিবেকবান মানুষমাত্রেই স্বীকার করবেন।

সরকার হবেন আদর্শ 'এমপ্লয়ার'। কর্মচারীদের অভুক্ত রেখে, তাদের

সংসারকে সমস্যাভারে ভারাক্রান্ত করে রেখে কোন 'এমপ্লয়ারই' ভাল কাজের আশা কর্মীদের কাছে করতে পারেন না। সেদিক থেকে বিবেচনা করে মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা—মূল্যমান মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে ধরে রাখার ব্যবস্থা সরকারের আগেই করা উচিত ছিল। তা' হলে, কর্মচারীদের কাতারে কাতারে রাস্তায় নেমে মিছিল করতে হতো না।

এ মিছিল উপেক্ষার নয়। বাঙালী যুগে যুগে আগামী দিনের পথই নির্দেশ করে আসছে। সেদিক থেকে এ মিছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বিরাট মিছিলে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অবাঙালী ভাইবোনেরাও ছিলেন—বিহারী, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী, মারাঠী, ওড়িয়া সকলেই বাঙালী তরুণ, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে সাহস, সংহতি ও অপূর্ব শৃঙ্খলার পরিচয় দিয়েছেন। কোন নেতা, কোন রাজনৈতিক দলের কর্মী মিছিলের পুরোভাগে থেকে মিছিলের শোভাবর্ধন করেন নি।

* * *

আসছে সপ্তাহ থেকে কলকাতায় বিধিবদ্ধ রেশন প্রথা চালু হচ্ছে। সাউথ সুবারবান মিউনিসিপ্যালিটি থেকে সুরু করে নৈহাটি, কাঁচরাপাড়া, হালিশহর, পূর্বদিকে দমদম ও পশ্চিমে চন্দননগর পর্যন্ত বিরাট শিল্পাঞ্চলের মানুষকে মাথাপিছু এক কে-জি বিশ গ্রাম চাল ও সমপরিমাণ গম দেওয়া হবে। পাঁউরুটির জন্য গম কাটা যাবে। দৈহিক শ্রম যাঁরা করেন বেশি, অর্থাৎ যাঁরা মজুরের খাতায় নাম লিখিয়েছেন, তাঁরা ষাট গ্রাম অতিরিক্ত গম পাবেন।

প্রফুল্লদাকে ধন্যবাদ জানাবার সুযোগ খুঁজছিলাম অনেকদিন থেকে। তিনি নয়া যে-ব্যবস্থা করেছেন, তা' চালু করতে পারেন কাজের মত একটা কাজ নিশ্চয়ই হবে। অন্যান্য রাজ্যের মন্ত্রীরা যেখানে ভয়ে পিছিয়ে যাচ্ছেন, সেখানে সাহসের সঙ্গে তিনি যেরূপ ব্যবস্থাপনা করেছেন, তার জন্য তাঁকে আমরা আগেভাগেই একবার ধন্যবাদ জানিয়ে রাখি। সেই সঙ্গে এ-কথাটাও জানিয়ে রাখি, কলকাতার মানুষ বিধিবদ্ধ রেশনের বরাদ্দের চাল ও গম নিয়মিত পাবেন কি না, এখনও নিঃসন্দেহ হতে পারেন নি। তাই কলকাতায় চাল কিনে মজুত করার হিড়িক পড়ে গেছে। মফস্বল থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার বস্তা চাল আসছে কলকাতায়। মফস্বলে দাম কমলেও কলকাতায় তা বিক্রি হচ্ছে চল্লিশ থেকে তেতাল্লিশ টাকা মণ দরে। আখেরে বিপদের আশঙ্কা করেই মানুষ কিছুটা আতঙ্কিত হয়েছে এবং আতঙ্কের মাশুলও দিতে হচ্ছে তাকে। অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা না থাকলে এত আতঙ্কগ্রস্ত কেউ হতো না।

এবারে অতীতের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়তো হবে না। কেন্দ্রীয় সরকার উদার হয়েছেন। শোনা যাচ্ছে, অর্থ ও খাদ্যশস্য দিয়ে পশ্চিম বাংলার শিল্পাঞ্চলের রেশন প্রথাকে চালু রাখতে কেন্দ্রীয় দপ্তর যথাশক্তি চেষ্টার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

● ডঃ শ্রীমালী সমাবর্তন ভাষণ দিচ্ছেন

বীরভূম:

বীরভূমের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র বোলপুর—শান্তিনিকেতন। পৌষ-মেলার দিন থেকে এখানে সুরু হয় পুণ্যার্থীদের ভিড়। জ্ঞানার্থীদের, জ্ঞানবৃদ্ধ সাধকদের পুণ্য পরশে শান্তিনিকেতনের রূপ বদলায় এই সময়টিতে। অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে একটা সুন্দর শুচিতা। সে শুচিতা স্পর্শ করে জ্ঞানপিপাসু ও ধর্মপিপাসুদের চিত্তকে। ছাতিমতলায় ব্রহ্মোপাসনার পর সাতই পৌষ থেকে সুরু হয় শান্তিনিকেতনের পৌষ-মেলা। এই দিনটি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুণ্য স্মৃতিবিজড়িত। আজ থেকে একশ একুশ বছর আগে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সাতই পৌষ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। পরে এই দিনেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শান্তিনিকেতনে ব্রহ্ম মন্দির এবং ব্রহ্মচর্যাশ্রম। সেই আশ্রমই আজ বিশ্বভারতীতে পরিণত হয়েছে। পুরোনো ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় যেদিন বিশ্বভারতীতে উন্নীত হল, সেদিন থেকে শান্তিনিকেতন হয়ে পড়ল সারা বিশ্বের মহামানবের মিলনক্ষেত্র। বাংলার কবি উদাত্তকণ্ঠে বিশ্ববাসীকে সেদিন থেকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সেখানে। বিশ্বভারতীর আঙিনায় তারপর থেকেই সুরু হয়েছে সারা বিশ্বের আনাগোনা—বিশ্ব এসে এক নীড়ে পরিণত হয়েছে।

এবারেও উদাত্তকণ্ঠে বেদ ও উপনিষদের মন্ত্র উচ্চারণ করে ছাতিমতলায় ব্রহ্মোপাসনার পর সুরু হয়েছে পৌষ-মেলা। উপাসনা করেছেন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কৃতী প্রাক্তন ছাত্র, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য, বিশ্বভারতীর বর্তমান উপাচার্য শ্রীসুধীরঞ্জন দাস।

শ্রীদাস সমবেত উপাসকদের মহর্ষির সাধনার মূল মন্ত্রটিকে হৃদয়ঙ্গম করতে অনুরোধ জানান। মহর্ষি ত্যাগের বাণী প্রচার করে গেছেন। 'মা গৃধঃ' ছিল তাঁর জীবনের মূল মন্ত্র। সাতই পৌষের উৎসব ত্যাগের ব্রতে দীক্ষা গ্রহণের উৎসব।

বিশ্বভারতীর আচার্য শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী ও কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোক সেন উপাসনায় উপস্থিত ছিলেন। বিশ্বভারতীর আচার্য এই প্রথম সাতই পৌষের উদ্বোধনী উপাসনায় যোগ দিলেন। পরলোকগত আচার্য জওহরলাল নেহরু এ উপাসনায় কোনদিন যোগ দেন নি। তিনি আসতেন সাধারণত বিশ্বভারতীর সমাবর্তনের দিনটিতে।

বিশ্বভারতীর সমাবর্তন উৎসবে শান্তিনিকেতনের মহান ঐতিহ্যের উল্লেখ করে শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী বলেছেন, শান্তি, প্রীতি ও ঐক্যের মহাতীর্থ এবং ভারতীয় জীবনাদর্শের প্রতীক শান্তিনিকেতন, হিংসায় উন্মত্ত বিশ্বের কাছে বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে আছে।

সমাবর্তন ভাষণে ভারতের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী, মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ কে এল শ্রীমালী বলেছেন, ভারত যদি পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা ও অস্ত্রসজ্জার বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে চিরতরে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ বিশ্বের নিরাপত্তা ও মানুষের কল্যাণ সাধনের পথ উন্মুক্ত করে দিতে পারে, তবেই হবে বিশ্বমানবের প্রতি ভারতের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য সাধন। পারমাণবিক বিস্ফোরণ মানবসমাজের কাছে প্রকৃত সমস্যা নয়, যুদ্ধের বিভীষিকা দূর করাই বড় কথা।

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস বলেছেন, গুরুদেবের আদর্শ পরলোকগত প্রধানমন্ত্রীর জীবনে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছিল। সে আদর্শেই শান্তিনিকেতনবাসী উদ্বুদ্ধ।

বর্ধমান:

সারা ভারতের দৃষ্টি আজ নিবদ্ধ বর্ধমান জেলার গড়ে-ওঠা শিল্প নগরী দুর্গাপুরের দিকে। স্টেশন থেকে এক মাইল উত্তর-পূর্বে কাজ চলেছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। সগরভাঙা গ্রামে ছ'শ' একর জমির ওপর গড়ে উঠেছে কংগ্রেস নগর। রেলস্টেশন থেকে সুরু করে পথ-ঘাটের চেহারা গেছে পাল্টে। সমগ্র শিল্পনগরী আজ কর্মচঞ্চল। আর মাত্র ছ'দিন বাকী। ছ'দিন পরই সুরু হবে জাতীয় কংগ্রেসের ৬৯তম ঐতিহাসিক অধিবেশন। এ অধিবেশনের গুরুত্বও সমধিক। এখানেই স্থির হবে আমাদের ভবিষ্যৎ—আগামী দিনের চাল-চিত্র। তাই আজ সারা ভারতের মানুষ আকুল আগ্রহে তাকিয়ে আছে দুর্গাপুরের দিকে।

কংগ্রেস নগরের পাশেই ব্যবস্থা হয়েছে বিরাট একটি প্রদর্শনীর। এই প্রদর্শনীতে থাকবে পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী নেহরুর জীবন অবলম্বনে একটি মূর্তিমণ্ডপ। নেহরুর মূর্তির সঙ্গে থাকবে দেশ-বিদেশের মনীষীদের মূর্তি। এ মূর্তিগুলো পরে এলাহাবাদের আনন্দভবনে নিয়ে যাওয়া হবে। এই মূর্তি নির্মাণে ব্যয় হবে প্রায় লক্ষ টাকা।

প্রদর্শনীতে ভারতের প্রায় প্রতিটি রাজ্যের একটা পরিপূর্ণ চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

* * *

স্বাধীনতার ষোল বছর পরেও যে সব গ্রাম আজও অনুন্নত, অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছে, শক্তিগড় ব্লক এলাকার বণ্ডুল ইউনিয়নের সর্ববৃহৎ গ্রাম সামন্তী তাদের অন্যতম। রাস্তাঘাট, হাসপাতাল, উচ্চ বিদ্যালয় প্রভৃতি আধুনিক জীবনযাত্রার অত্যন্ত সাধারণ সুযোগ-সুবিধা থেকে এই গ্রামের মানুষ বঞ্চিত।

মান্না নদীর ওপর সেতু ও রাস্তা নির্মাণের দাবি এ অঞ্চলের জনসাধারণের বহুদিনের। সেতুটি যাতে সত্বর নির্মিত হয়, তজ্জন্য জনসাধারণের চেষ্টারও কোনো অন্ত নেই। এ বছরের (১৯৬৪) প্রথমদিকে সেতু নির্মাণের পরিকল্পনাটি যাতে সি. ডি. আর, স্কীমের অন্তর্ভুক্ত হয়, তজ্জন্য সরকারের নিকট তাঁরা আবেদন জানান। এর বিধিব্যবস্থামত গ্রামবাসীদের যেমন প্রয়োজনীয় অর্থও তাঁরা সংগ্রহ করেন এবং সরকারী তহবিলে জমা দেন।

কিন্তু হলে কি হবে! সরকারী দপ্তরে যে আঠারো মাসে বছর। তাই এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে পূর্তদপ্তরের কর্তাব্যক্তিদের পরিকল্পনাটির মঞ্জুরি

● দুর্গাপুর কংগ্রেসে নেহরুর জীবনী অবলম্বনে প্রদর্শনীর একটি অংশ

সম্পর্কে বিবেচনা করে দেখার সময় হলো না। লাল ফিতার এমনি অপার মহিমা! অনেক তদ্বির-তদারকের পর গ্রামবাসীদের জানান হয়েছে যে, আগামী আর্থিক বৎসরে (অর্থাৎ ১৯৬৫-৬৬ সালে) বিষয়টি বিবেচনা করে দেখা হবে।

দার্জিলিং:

গৌহাটি-শিলিগুড়ি পাইপ লাইনের উদ্বোধন হলো সেদিন শিলিগুড়িতে। কেন্দ্রীয় তৈল ও রসায়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী ও ভি আলাগেসন দু' শ' আট মাইল লম্বা পাইপলাইনের উদ্বোধন করে বলেছেন, এই পাইপ লাইন চালু হওয়ায় ভারতে তৈল-শিল্পের একটি নতুন যুগের সূচনা হল।

তৈলশিল্পের উন্নয়নে এটি নতুন পদক্ষেপ সন্দেহ নেই। গৌহাটির তৈল-শোধনাগার থেকে শিলিগুড়িতে এসে যে তৈল সংরক্ষিত হবে, তা' যাবে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে। নতুন পাইপ লাইন গড়ে-ওঠা শহর শিলিগুড়িরও গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে অনেকখানি। রামমোহন নগরে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, বাগডোগরায় বিমান-ক্ষেত্র এবং পরিকল্পিত মেডিক্যাল কলেজ, শিলিগুড়িকে পৌঁছে দিচ্ছে বিশেষ একটি পর্যায়ে।

হিমালয় এখনও অশান্ত। চীনা দস্যুদের বুটের আওয়াজ সেখান থেকে ভেসে আসছে প্রতিনিয়ত। পাশেই রয়েছে চীনের নয়া দোস্ত পূর্ব পাকিস্তান। আশে-পাশের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিবেশ শিলিগুড়ির মর্যাদা আরও বাড়িয়েছে। সিকিম ও ভুটানের যাত্রীরাও চলে শিলিগুড়ির পথেই।

শিলিগুড়ি আর অখ্যাত গণ্ডগ্রাম নেই। দেশবিভাগের পরই সুরু হয় শিলিগুড়ির কলেবর বৃদ্ধি। দলে দলে গৃহহারা উদ্বাস্তু এসে নতুন করে ঘর বেঁধেছে শিলিগুড়িতে। দার্জিলিং, সিকিম, নেপাল ও ভুটানের বাণিজ্যের প্রধান পথ হিসেবে শিলিগুড়ি ডেকে এনেছে নতুন নতুন পথিককে। সারা ভারতের লোকের বিচিত্র সমাবেশ হয়েছে ছোট্ট শহর শিলিগুড়িকে কেন্দ্র করে। অতি আধুনিক কায়দার দোকানপাট থেকে সুরু করে প্রাসাদোপম

শ্রীআলাগেসন

অট্টালিকার পাশেই এলোমেলো গড়ে উঠেছে দরিদ্রের কুটির। শিলিগুড়ির পরিপূর্ণ চিত্র তুলে ধরে পূর্বে বারবার আমরা এর উন্নয়ন-ব্যবস্থার প্রয়োজনের উল্লেখ করেছি। দেশবিভাগের পর শিলিগুড়ির লোকসংখ্যা বেড়েছে দেড় লক্ষেরও অধিক।

খুবই আনন্দের কথা শিলিগুড়ি পরিকল্পনা-সংস্থা ১৯৬৫ সালের জুলাই মাসের মধ্যে শিলিগুড়িকে ঢেলে সাজাবার একটা অন্তর্বর্তী-কালীন পরিকল্পনা নিচ্ছেন। নতুন জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে বাগডোগরা অবধি অবিচ্ছিন্ন একটি শহর গড়ে উঠবে। পরিকল্পনার কাজ ত্বরান্বিত না হলে শিলিগুড়ি অচিরে একটি জঙ্গলে পরিণত হবে। উত্তর বাংলার এই প্রাণকেন্দ্র একেবারে অচল হয়ে পড়বে।

মুর্শিদাবাদ:

এটা প্রগতির যুগ। প্রগতির প্রধান কথাই গতিশীলতা। পশ্চিম বাংলা সরকারের আমলাদের হাতে পড়ে গতির রথের চাকা যেন শত আঘাতেও আর খানা থেকে উঠে আসছে না। জিয়াগঞ্জে হাসপাতালে চিকিৎসক মাত্র দুজন। তাঁদের একজনকে বদলি করে দেওয়া হয়েছে শহর কলকাতার হাসপাতালে। সে তিন মাস আগের কথা। স্বাস্থ্যদপ্তর এই তিন মাসের মধ্যে কোন চিকিৎসক পাঠাতে পারেন নি।

হাসপাতালটিতে রোগীর ভিড় কম হয় না। হাসপাতালের আউট-ডোরেই প্রতিদিন রোগী আসে গড়ে প্রায় তিনশ'। আউটডোর ও ইনডোরের রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা একজন চিকিৎসকের পক্ষে নিশ্চয়ই সম্ভব নয়। গ্রামের হাসপাতালের চিকিৎসকদের আবার পরিবার পরিকল্পনা, গ্রামীণ স্বাস্থ্য বিধানের খবরদারীও করার কথা।

সম্প্রতি জিয়াগঞ্জের আশে-পাশে কলেরা দেখা দিয়েছিল ব্যাপকহারে। একজন চিকিৎসক, একজন কম্পাউণ্ডার ও চারজন নার্স দিয়ে পরিচালিত হাসপাতালে এসে কত কলেরা রোগীকে ফিরে যেতে হয়েছে তা' সহজেই অনুমেয়। হাসপাতালের মেটারনিটি বিভাগেই রোগীর সংখ্যা অধিক। বিজ্ঞানের যুগে প্রগতিশীল রাজ্যের গ্রামের হাসপাতালে কাজ চলে এখনও হ্যারিকেনের আলোতে। এ বিষয়ের প্রতি আমরা বারবার স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টিও আকর্ষণ করেছি। যেখানে বিজলী আলোর ব্যবস্থা নেই সেখানে অবশ্যি ভিন্ন কথা। মফস্বলে এমন অনেক হাসপাতাল রয়েছে, যেখানে সরকার ইচ্ছা করলেই বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করতে পারেন। জিয়াগঞ্জের হাসপাতালের তিনদিকেই রয়েছে বিদ্যুতের ব্যবস্থা। বিদ্যুতের এ সুবিধা থেকে কেন যে হাসপাতাল বঞ্চিত, কেন মান্ধাতার আমলের লণ্ঠন হাসপাতালের সম্বল হয়ে আছে, তা' সাধারণ মানুষ ভেবেই পাচ্ছে না।

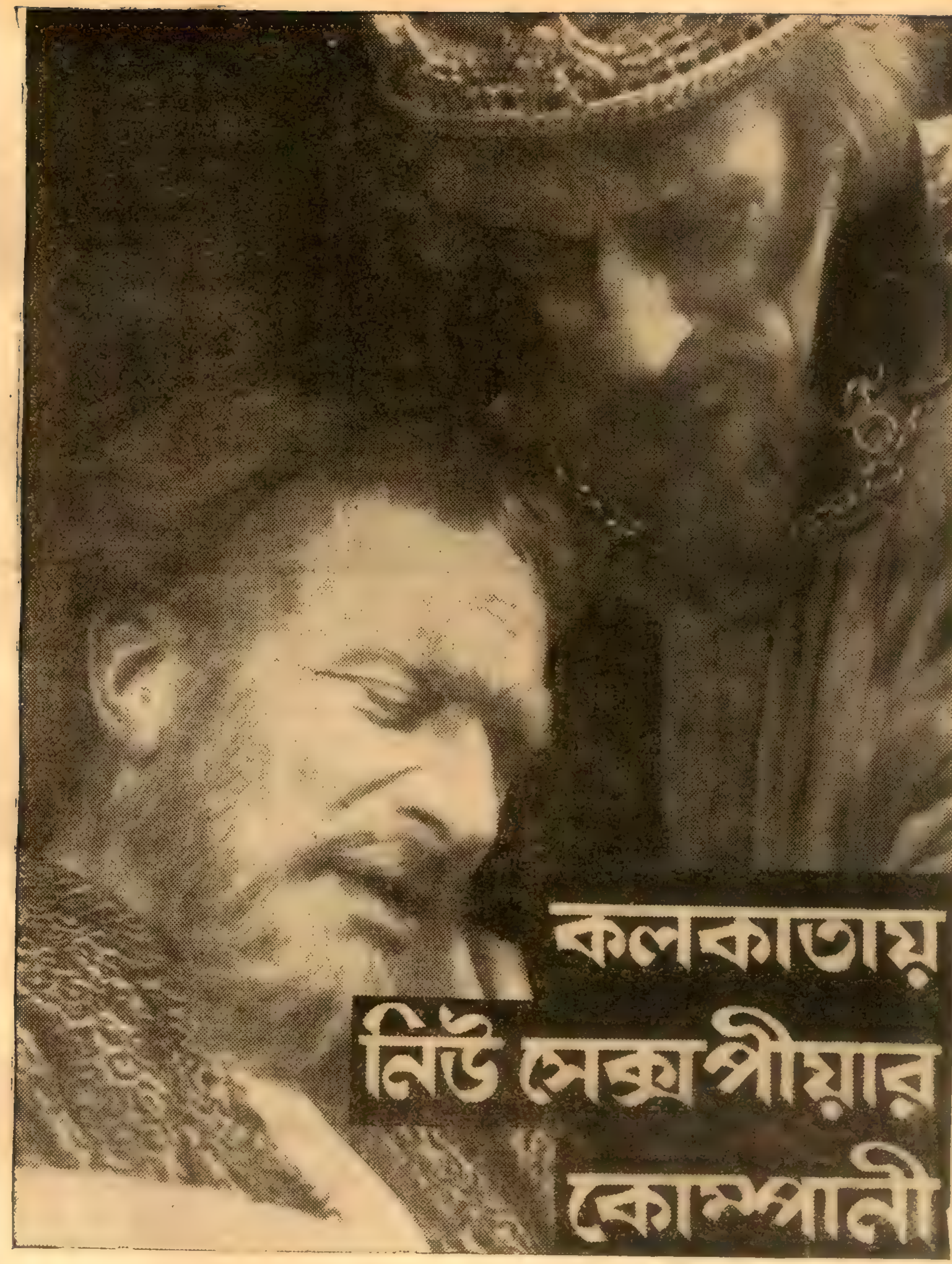

● 'রিচার্ড দি সেকেণ্ড' নাটকে জন অব গন্ট (জন ওয়াইজ)
ও ডিউক অব ইয়র্ক (আর্থার হাওয়ার্ড)।

১৯শে ডিসেম্বর নিউ এম্পায়ারে মহাকবির টেম্পেস্ট নাটক দিয়ে এঁদের অভিনয়ের উদ্বোধন হোল। বিশেষজ্ঞ-দের ধারণা যে, টেম্পেস্ট রচিত হয় ১৬১০ কি ১৬১১ সালে। অনেকের মতে এই নাটকটিই সেক্সপীয়ারের শেষ নাটক। সমালোচক ক্যাম্পবেল শুধু এই মতের সমর্থন করেই থেমে যান নি—প্রস্পেরো চরিত্রে

ভেতর দিয়ে নাট্যকার নিজের কথাই বলতে চেয়েছেন এ কথাও প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন। ক্যাম্পবেল বলেন—সেক্সপীয়ারের শেষ নাটক হিসাবে টেম্পেস্টের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে একটি বিশেষ পবিত্রতার ভাব। কবি সম্পূর্ণ সচেতনভাবে শিল্পী হিসাবে নিজের মাহাত্ম্যের পরিচয় দিয়েছেন তাঁর শেষ রচনায়—উদার, সরল, মহৎ, পরোপকারী যাদুকর চরিত্র প্রস্পেরোর মাধ্যমে। সেক্সপীয়ার অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী—তাঁরই চরিত্রের প্রতীক প্রস্পেরো :

'Who could conjure up spirits from the vasty deep, and command supernatural agency by the most seemingly natural and simple means.'

কিন্তু যাদুকরও বুঝতে পারছেন এবার সময় হয়েছে যাদুদণ্ড ভেঙে ফেলে ভূগর্ভের গভীরে তাকে পুঁতে ফেলবার—শেষ নাটক লেখবার সঙ্গে সঙ্গেই মহাকবির যাদু-লেখনীও প্রোথিত হোল মাটির তলায়।

'The staff has never been and never will be recovered.'

রোমাঞ্চ-রহস্য গ্রন্থ

রক্তনদীর ধারা

ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল

রক্তনদীর ধারা মাসিক বসুমতীর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। রোমাঞ্চ ও রোমান্সের সত্য ঘটনায় বইটির আদ্যোপান্ত পরিপূর্ণ। রক্তনদীর ধারা জীবনের অভিজ্ঞতা নয়; জীবনপথের দিক-নির্দেশ। তাই প্রবঞ্চনা; ছলনা ও প্রেমের লীলার চাঞ্চল্যকর বইটি চাঞ্চল্য তুলেছে সকল সমাজেই। লোমহর্ষক সামাজিক কাহিনী।

দাম চার টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

টেম্পেস্ট নাটকে দু-জায়গায় বিস্তৃতভাবে মাস্কের ব্যবহার করা হয়েছে—তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে এবং চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে।

চতুর্থ অঙ্কে মাস্কের সব রকম বিশেষত্ব অতি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। যথা—

(১) বিয়ের উৎসবের সমর্থনে এর অবতারণা।

(২) ক্ল্যাসিকাল মাইথলজি থেকে নেওয়া হয়েছে মাস্কের চরিত্রদের—তারা কথাবার্তা বলে মিত্রাক্ষর ছন্দযুক্ত কবিতায়।

(৩) সবগুলো মিলিয়ে একটা সঙ্গীত-মাখানো মহৎ দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছে।

(৪) সুন্দর পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে Nymphs ও Reaper-রা নৃত্যরত।

এবার অভিনয়ের কথায় আসা যাক। প্রথমেই এঁদের সহজ এবং পরিচ্ছন্ন মঞ্চসজ্জার দিকটা দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। বার্নার্ড শ লণ্ডনের এলিজাবিথান স্টেজ সোসাইটির টেম্পেস্ট প্রডাকসন (৫ই নভেম্বর ১৮৯৭) সম্বন্ধে সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন—

The poetry of the Tempest is so magical that it would make the scenery of a modern theatre ridiculous. The methods of the Elizabethan stage society leave to the poet the work of conjuring up the isle 'full of noises, sounds and sweet airs.' And I do not see how this plan can be beaten.

নিউ সেক্সপীয়ার কোম্পানীর টেম্পেস্টের পরিচালক ডেভিড উইলিয়ামও জবরজং মঞ্চসজ্জা না করে অভিনয়ের ভেতর দিয়ে নাটকটির কাব্যময়তার দিকটাই যে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করে তুলবার চেষ্টা করেছিলেন—এবং অনেকাংশে সফল হয়েছিলেন—এ জন্য তাঁকে ধন্যবাদ। বাত্যাক্ষুব্ধ সমুদ্রের জাহাজের ডেকের দৃশ্য সামান্য আলোর খেলা এবং শব্দসৃষ্টির সাহায্যে এবং দু-একটি সঙ্কেতের—যেমন ওপর থেকে ঝুলে-থাকা একটি দড়ি ধরে একজন নাবিকের দাঁড়িয়ে থাকা বা প্রচণ্ড বাতাসের গতিবেগের বিরুদ্ধে কোনোরকমে খোলা ডেকে ডিউক প্রভৃতির এগিয়ে আসা এবং বেরিয়ে যাবার ভঙ্গীদ্বারা সত্যিকার মঞ্চমায়ার সৃষ্টি করেছিল।

তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের এবং চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের মাস্কের সুন্দর পরিকল্পনা করেছিলেন প্রডিউসার।

মিরান্দার ভূমিকায় আমান্দা রাইস চোখ-মুখের ভাবব্যঞ্জনা এবং বাচন-ভঙ্গীতে অদ্ভুত একটা প্রিস্টাইন-পিওরিটির ভাব ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

প্রস্পেরো সুরু করছিলেন ভাল—মাঝে এ ভূমিকায় অভিনেতা জন ওয়াইজকে একটু প্রাণহীন মনে হচ্ছিল, তবে শেষের দিকে তাঁর অভিনয় আবার প্রাণবন্ত হয়ে উঠছিল।

ফার্দিনান্দ (জন ক্যাসন) আগাগোড়াই একটা স্ট্যাণ্ডার্ড বজায় রেখে অভিনয় করেছেন।

এরিয়েল এককথায় চমৎকার—গ্লাইড করে তাঁর চলবার ভঙ্গিমায় স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে, তিনি airy spirit. তবে এরিয়েলের রূপসজ্জাটা একটু জবরজং হয়েছিল। এডওয়ার্ড এটিয়েন্নার এরিয়েল আমাকে মুগ্ধ করেছে।

ক্যালিব্যান (উন্ক বরিস)—এঁর রূপসজ্জা বা অভিনয় মোটেই ভাল লাগে নি। ট্রিঙ্কুলোরূপী আর্থার হাওয়ার্ড (বিখ্যাত চিত্রাভিনেতা লেসলী হাওয়ার্ডের ছোট ভাই) জাত অভিনেতা—সমবেত দর্শকদের তিনি মাতিয়ে রেখেছিলেন।

স্টিফেনোর ভূমিকায় সাইমন কাটারও ভাল অভিনয় করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় রূপায়ণও কিছু খারাপ লাগে নি।

Incidental music এরিয়েলের গান এবং আবহসঙ্গীত মনোমুগ্ধকর।

রিচার্ড দি সেকেণ্ড

একুশে ডিসেম্বর রিচার্ড দি সেকেণ্ড দেখলাম। নাটকটি রচিত হয় ১৫৯৫-৯৬ সালে। মারলোর এডওয়ার্ড দি সেকেণ্ডের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সেক্সপীয়ার এ নাটক লেখেন—অনেকের এই ধারণা। দুটি কারণে রিচার্ড দি সেকেণ্ড ইংরাজ দর্শকদের খুব প্রিয়—

(১) এর কাব্যিক সৌন্দর্য।

(২) অন্তর্নিহিত দেশাত্মবোধের দিকটা।

অভ্ গণ্টের বিখ্যাত স্পিচটি

● 'দি টেম্পেস্ট' নাটকের একটি দৃশ্যে প্রস্পেরো (জন ওয়াইজ) ও এরিয়েল (এডওয়ার্ড এটিয়েন্না)

ইংরাজী সাহিত্যের ছাত্রদের প্রত্যেকেরই বোধ হয় মুখস্থ আছে। যতদূর স্মরণ হয়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় প্রধান-মন্ত্রিত্ব নেবার পর—ইংলণ্ডের তখন ঘোর দুর্দিন চলেছে—উইনস্টোন চার্চিল তাঁর একটি বেতার-বক্তৃতায় গণ্টের স্পিচটি আবৃত্তি করেছিলেন—

This royal throne of kings,
this scepter'd isle,
This earth of majesty,
this seat of Mars,
This other Eden, demiparadise,
This fortress built by Nature
for herself
Against infection and the
hand of war,
This happy breed of men,
this little world,
This precious stone set
in the silver sea,
Which serves it in the office
of a wall
Or as a most defensive
to a house,
Against the envy of
less happier lands,
This blessed plot, this earth,
this realm, this England.

পরিচালক ডেভিড উইলিয়াম মঞ্চ-সজ্জা বা পোষাক-পরিচ্ছদে ব্যারোক স্টাইল বর্জন করে অভিনয়ের মাধ্যমে নাটকটির কাব্যিক সৌন্দর্যকেই তুলে ধরতে চেষ্টা করেছিলেন দর্শকদের কাছে—এ-বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সফলও হয়েছেন।

তিনটি স্পিচই—যথা গণ্টের 'This England' ও রিচার্ডের 'Death of Kings' ও 'What must a King do?' সুন্দরভাবে বলেছিলেন জন ওয়াইজ ও ডেভিড উইলিয়াম—আবৃত্তি করলেই ব্যাপারটা খারাপ হয়ে যেত, অর্থাৎ স্পিচগুলো নাটক থেকে আলগা হয়ে পড়তো।

নাটকটির লাইটিং, স্টেজ কম্পোজিশন, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মুভমেন্টস, জেসচার্স, টিমওয়ার্ক সবই দেখবার মত।

Richard's very capriciousness of mood which all the scholars have noted—his easily-wrung sensitivity and 'flower-like imagination', as chambers calls it, his boomerang flights from hope to despair and back again, his self-dramatisation and poet's response to images, forms a character so complex, and at the same time so intense in its deviations, that it is in itself a drama of infinite fascination.

পরিচালক ডেভিড উইলিয়াম রিচার্ড চরিত্রের উপরি-উক্ত সুক্ষ্মাতি-সুক্ষ্ম দিকগুলি অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন অভিনয়-কৌশলে।

রাণীর ভূমিকায় আমান্দা রাইসের অভিনয় খুবই মর্মস্পর্শী হয়েছিল।

বোলিংব্রোক চরিত্রের দৃঢ়তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হচ্ছিল ডিন্সডেল-ল্যাণ্ডেনের চলনে, বলনে এবং চোখ-মুখের ভাবভঙ্গীতে। অন্যান্য সমস্ত চরিত্রও সুঅভিনীত।

—অশোক সেন

স্মৃতি বিষয়ক কবিতা

শান্তব্রত ঘোষ

যখন মধ্যযামিনী, তারা জেগে ওঠে।
কেউ শয্যা ত্যাগ করে আসে, ইজিচেয়ারের
হাতলে স্মৃতির স্নেহে হাত রাখে, অনেকের
বুকে ব্যাধি, শহরের হৃৎপিণ্ড, জ্বলে।
যখন মধ্যযামিনী, সেই সব দীপ্ত মর্মতলে
হাতে দীপ ধরে কারা একে একে নেমে আসে ঘাটে।

নাতিরা ঘুমোয়, পুত্রবধূ পাশের ঘরের দরোজায়
শব্দ তুলে কোথাও বেরলো; জাগ্রত ছেলের কণ্ঠস্বর
এত চাপা যে এ-ঘরে অস্পষ্ট শোনায়:
শহর! শহর!
বয়সের আলোময় ঝড়
কোথা যেন বয়ে যায়,
অস্পষ্ট শোনায়।

যখন মধ্যযামিনী, এই বনবাসে
ঝড় ওঠে;
বেশি বয়সে কে বলে ঘুম কমে আসে?
ঘাটের হাজার দীপে অগ্নিকাণ্ডে এক
আসলে ভীষণ ঝড় ওঠে।

দময়ন্তী

মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

আলোটা অনেক আগে নিভে গেছে
যন্ত্রণার কিছু ক্ষত ছায়া ছায়া প্রদীপের ঘন অন্ধকারে
ইচ্ছেটুকু গণ্ডুষে পান করে
পেরিয়ে এলাম রাঙামাটি, পেরিয়ে নদীর সিঁড়ি
দুটি চোখের স্বপ্নগুলি বিনি সুতোর গেঁথে
করুণ কি যেন সুরে
এক-দুই-তিন করে পাতালের কোনো স্বর্গে
ডেকোছো অনেক,

অথচ:

আমার এই হাতে রক্ত, মুখে গন্ধ, দাঁতে পুঁজ
দময়ন্তী কি করে তোমাকে ছুঁই বলো।
বরং দুজনে ঐ আলোর সিঁড়ির কাছে গিয়ে
নাক-চোখ-মুখ বুজে ফিরবো. আবার;
বার বার
অসহিষ্ণু বালিশটা ধরে
দময়ন্তী আমাকে ডেকোনা তুমি আজ॥

রঙ্গজগৎ

বিদেশী অভিনেতাদের সঙ্গে বাংলা মঞ্চের পরিচয়

নিউ সেক্সপীয়র কোম্পানীর নাটক অভিনয় কলকাতার নাট্যামোদীরা দেখেছেন। তাঁরাও বাংলার নাট্যমঞ্চের সঙ্গে পরিচিত হতে চেয়েছেন। জানা গেল, তাঁদের বিশ্বরূপা থিয়েটারের 'লগ্ন' নাটকের নির্বাচিত দৃশ্য দেখান হয়েছে। হয়তো বিশ্বরূপা কর্তৃপক্ষ নিজেদের উদ্যোগে এই নাটক দেখাবার ব্যবস্থা করেছেন অথবা বৃটিশ কাউন্সিল করেছেন আমরা জানি না। যাঁরাই করে থাকুন, এই ব্যাপারে আমাদের দুর্বলতার একটা দিক প্রকাশ পেয়েছে। বিদেশীদের যদি বাংলা নাটকের সাথে পরিচিত করাতে হয়, তবে তার একমাত্র উপযুক্ত স্থান বিশ্বরূপা মঞ্চ বা 'লগ্ন' নাটক নয়। এদিক থেকে মিনার্ভার 'তিতাস', 'অঙ্গার' অনেক বেশি উপযুক্ত নাটক ছিল। 'লগ্ন' দেখলেও অন্য দু-একটি মঞ্চের এবং অপেশাদার সম্প্রদায়ের কোন নাটক যদি বৃটিশ অভিনেতারা দেখতেন, তা হলে বাংলা মঞ্চ সম্পর্কে তাঁরা যথার্থ ধারণা নিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু এ-ব্যাপারে নাট্যকার সংঘ, রাজ্য সরকারের প্রচার অথবা লোকরঞ্জন বিভাগের হয়তো কোনো ভূমিকা ছিল না। সুতরাং স্বতঃস্ফূর্ততার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সম্ভবত 'লগ্ন' দেখেই তাঁরা বাংলা নাট্যমঞ্চের মান নির্ণয় করবেন।

বাংলার নাটক ও সংস্কৃতি বিষয়ে বিদেশীদের পরিচিত করাবার ব্যাপারে রাজ্য সরকারের একটা ভূমিকা থাকা দরকার। এমন ব্যবস্থা থাকা উচিত, যাতে বিদেশী অভিনেতারা বাংলার নাট্যকার ও মঞ্চশিল্পীদের সাথে পরিচিত হতে পারেন, এবং নাট্যকার ও নাট্য সম্প্রদায়সমূহের সংগঠিত সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত কয়েকটি নাটক দেখতে পারেন। বিদেশীদের নাটক দেখাবার বিষয় এরূপ সংস্থার সাথে আলোচনা করে হওয়া উচিত। এরূপ ব্যবস্থা থাকলে বিদেশীরা যেমন উপকৃত হবেন, আমাদের মঞ্চের মান সম্পর্কেও ভুল ধারণা সৃষ্টি হবে না। ---সুজন

আলাঁ রেসনে

চিত্র আলোচনা

ফরাসী নবতরঙ্গ রীতির কয়েকটি ছবি

চলচ্চিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে নিউ-ওয়েভ বা 'নবতরঙ্গ' আজ এক পরিচিত কথা। যুদ্ধোত্তরকালে ইতালীর 'নিউ-রিয়ালিজম্' যেমন চলচ্চিত্র-শিল্পে, বিশেষ করে ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের চলচ্চিত্রে নতুন প্রাণশক্তি এনেছিল, তেমনি 'নিউওয়েভ' এনেছে ফরাসী চলচ্চিত্রে। যুদ্ধোত্তরকালে ফরাসী চলচ্চিত্রে বড় দুঃসময় এসেছিল। দর্শকরা একঘেয়েমির অভিযোগে ফরাসী চলচ্চিত্রের দিক-পালদের ছবিতে উৎসাহ হারিয়েছিল। কলোনীগুলি একে একে হাতছাড়া হবার জন্য দেশের বাইরেও তার তেমন বাজার ছিল না, যাতে হলিউডের মত অনেক পচা ছবি বিদেশে দেখিয়ে উৎপাদন ব্যয় পোষানো যেতো। অথচ দিকপালদের ছবির ব্যয় ছিল বিশেষ মোটা অঙ্কের। এ ছাড়া যুদ্ধের পরে মানসিক গঠনেও কিছু পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল। ফ্রান্সে বছরে যে ৩৭ কোটি দর্শক সিনেমা দেখে তাদের মধ্যে ৮৮ ভাগের বয়স ১৫ থেকে ২১ বছর। সুতরাং কি ধরনের ছবি পছন্দ করবে সেদিকটাও লক্ষণীয়। 'নবতরঙ্গ' ছবির পরিচালক আলাঁ রেসনে বলেছেন, 'আমি নতুন চিত্র-স্রষ্টাদের অপেক্ষা নব পর্যায়ের দর্শকদের উপর বেশি বিশ্বাসী।'

এই পরিস্থিতিতে ফরাসী দেশে একদল তরুণ পরিচালকের উদ্ভব হলো। এঁরা এতদিন সহকারী পরিচালক হিসাবে, কেউ বা ফিল্ম ক্লাবের আলোচনা-চক্রে বাস্তব ও তত্ত্বগত অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। গতানুগতিক ছবির বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহের সুর এদের মধ্যে দেখা গেছে। এ সময় ১৯৫৮ সালে রজার ভাদিমের 'এ্যাণ্ড গড ক্রিয়েটেড উম্যান' অর্থকরী দিক থেকে যেমন বিপুল সাফল্য লাভ করে তেমনি তরুণ দর্শকদেরও মাতিয়ে তোলে। কেবল ফরাসী দেশে

● ট্রাফোঁর 'ফোর হাণ্ড্রেড ব্লোজ' ছবির কিশোর নায়ক

নিউওয়েভ প্রবর্তকদের মধ্যে ফ্রাসো ট্রাফোঁ, জাঁ লাক গডার্ড, ক্লুডে চাব্রোল প্রমুখ নেতৃস্থানীয়। পরে এঁদের সঙ্গে এসে যোগ দেন আলাঁ রেসনে, ভার্দা প্রমুখ।

'নবতরঙ্গ'-এর সমর্থক যেমন আছে প্রচুর, তেমনি বিরোধীর সংখ্যাও কম নয়। বিরোধিতা তীব্রতর হয়ে ওঠে আলাঁ রেসনের 'হিরোসিমা মন আমোর'কে নিয়ে। এই ছবির বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে, স্বাধীনতার জন্য প্রতিরোধ-যুদ্ধ আর ফ্যাসিস্ট যুদ্ধকে একাকার করে ফেলা হয়েছে। আর এক অভিযোগ যৌনতার ব্যাপারে বিদ্রোহী চিন্তাধারায়। নবতরঙ্গ রীতির প্রভাব আজ আর ফরাসী দেশে সীমাবদ্ধ নেই, পূর্ব ইউরোপে, এমন কি সোভিয়েট ইউনিয়নেও সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সঙ্গে গিয়েও মিশেছে। বিশেষ করে পোল্যাণ্ডের নতুন পরিচালকদের একাংশের মধ্যে এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের চুখরাইর ছবিতে বিশ্বশান্তি ও যুদ্ধের প্রশ্নে এক নতুন চিন্তাধারা ও রীতি উপস্থিত হয়েছে।

নয়, আমেরিকা থেকে ভারত পর্যন্ত এই ছবি স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে ক্লাশ পালিয়ে দেখার আকর্ষণ হয়ে দাঁড়ায়। তরুণ দর্শকদের মনের অবস্থা এই ছবির সাফল্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এ সময় ফরাসী ছবির দুর্দিনে শূন্যতার মুহূর্তে একদল তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাণে প্রয়াসী হলেন। এঁদের উদ্দেশ্য হলো অল্প ব্যয়ে, অল্প চরিত্র নিয়ে কম থিয়েট্রিক্যাল সেট ব্যবহার করে চিত্র নির্মাণ করা। এঁদের ছবিতে সমসাময়িক কাল ও যুবমানস প্রতিফলিত, এককথায় যুবচিত্র বললে অত্যুক্তি হয় না। যৌনতার ব্যাপারে এঁরা রেখে-ঢেকে চলার পক্ষপাতী নন। তরুণ মনে এই উগ্রতার আকর্ষণ যথেষ্ট। আদর্শগত দিক থেকে এঁরা বিশ্বশান্তির সমর্থক।

● ফরাসী নবতরঙ্গ 'লোলা'র একটি দৃশ্য

ধনতান্ত্রিক জগতের চিত্র-সমালোচকরা যাকে আয়রন কার্টেন উন্মোচন বা স্ট্যালিনোত্তর যুদ্ধের শুভ-সংকেত বলে অভিনন্দন জানিয়েছেন। পশ্চিমী সমালোচকদের এই উল্লাসের আসল কারণ—এসব ছবিতে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ আর মুক্তির যুদ্ধকে একই চোখে দেখা হয়েছে।

ফরাসী নতুন রীতির এই ছবিগুলির তিনটি মার্সেল কামুর 'অরফিউ নিগ্রো', ট্রাফোঁর 'ফোর হাণ্ড্রেড ব্লোজ' এবং রেসনের 'হিরোসিমা মন আমোর' ১৯৫৯ সালে কাঁন-এ পুরস্কার লাভ করে। এই স্বীকৃতিতে অনেকদিন পরে ফরাসী চলচ্চিত্র এক নতুন তরঙ্গের শক্তি অনুভব করে। চিত্র-সমালোচকদের ভাষায় এই নতুন রীতি নবতরঙ্গ বা নিউওয়েভ নামে চিহ্নিত হয়েছে।

নবতরঙ্গ প্রবর্তকদের মধ্যে ফ্রাসো ট্রাফোঁ ১৯৫৪ সালে প্রথম ১৬ মিঃ মিঃ স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি করেন, তিন বছর পরে আর একটি। কিছুদিন তিনি ইতালীয় বিখ্যাত রবার্টো রোসেলিনির সহকারী হিসাবে কাজ করেন। তারপরে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রথম পূর্ণাঙ্গ ছবি 'ফোর হাণ্ড্রেড ব্লোজ' নির্মাণ করেন। চিত্র-সমালোচক আঁদ্রে বাজিন প্রথমে ট্রাফোঁকে জনসমক্ষে পরিচিত করেন। ১৯৬১ সালে নির্মাণ করেন 'জুলেস এণ্ড জিম'।

আলাঁ রেসনের জন্ম হয়েছে ১৯২২ সালে। 'ভন গগ', 'গুয়েরনিকা', 'গগ', 'নাইট এ্যাণ্ড ফগ', 'স্ট্যাচু অলসো ডাই' স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি নির্মাতা হিসাবে প্রথম তাঁর পরিচিতি। তারপরে 'হিরোসিমা মন আমোর' (১৯৫৯), 'লাস্ট ইয়ার এ্যাট মারিয়েনবাদ' (১৯৬১), 'মুরিয়েল' ... র তিনি ফরাসী ... স্থান

আলাঁ রেসনের 'হিরোসিমা মন আমোর'এ একটি মুহূর্ত

ছবির পরে তিনি নির্মাণ করেন 'ক্রিমসন কার্টেন'। এই ছবিটি কাঁনে এবং অন্যান্য উৎসবে পুরস্কার লাভ করেছে। নিজস্ব ক্যামেরা রীতির জন্য তিনি আরো খ্যাতিলাভ করেছেন।

নবতরঙ্গের আর একজন জ্যাকুই ডেমি। তাঁর বয়স বর্তমানে ৩৩ বছর। সহকারী হিসাবে কাজ আরম্ভ করে ১৯৫৫ সালে প্রথম ছবি করেন। তাঁর তৈরি 'লোলা', 'লা বায়ে দ্য আর্গে' এবং 'লা পারাপুলেস চেরবার্গ' একই সুরে বাঁধা। শেষোক্ত ছবির জন্য তিনি কাঁন-এ পুরস্কার লাভ করেন।

নবতরঙ্গ রীতির নায়ক এই চারজনের পাঁচটি ছবি ললিতকলা ভবনে ২০শে ডিসেম্বর থেকে প্রদর্শিত হয়েছে। এই পাঁচটি ছবি যথাক্রমে 'ফোর হাণ্ড্রেড ব্লোজ' (ট্রাফোঁ) 'জুলেস এণ্ড জিম' (ট্রাফোঁ) 'লোলা' (ডেমি) 'ক্রিমসন কার্টেন' (এসট্রুক) 'হিরোসিমা মন আমোর' (রেসনে)। এই সঙ্গে কয়েকটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি দেখার সুযোগ হয়েছে।

ফোর হাণ্ড্রেড ব্লোজ: এক কিশোরের জীবন-কাহিনী। এই কিশোর বাড়িতে মা-বাবার কাছে, স্কুলে শিক্ষকদের ... এবং বাইরের জগতে যেভাবে ... য়েছে, তাতে মনে হয়েছে তার প্রতি সকলে সহানুভূতিহীন। এই সহানুভূতিহীন অনুভূতি তাকেও বাড়ির প্রতি আকর্ষণহীন করে তোলে। সে একটা টাইপ-রাইটার চুরির জন্য সংশোধনাগারে আসতে বাধ্য হয়। সেখান থেকে পালিয়ে ছুটতে ছুটতে আসে সমুদ্রের পারে। সমুদ্রের তরঙ্গমালার সামনে দাঁড়িয়ে তার অসহায় চোখেমুখে ফুটে ওঠে একটা জিজ্ঞাসা। এতবড় জগতে আমার স্থান কোথায়? এই প্রশ্ন সিনেমার দর্শকের উদ্দেশ্যে।

চিত্রনাট্য ট্রাফোঁর নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও নগর-জীবনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত। এই অভিজ্ঞতার সাথে কমবেশি আমরা সকলেই পরিচিত। দৈনন্দিন জীবনে মা-বাবার সম্পর্ক এবং তাঁদের দাম্পত্যজীবনের কোন ফাঁকি যদি সন্তানের চোখে ধরা পড়ে, তার প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে? সন্তানের প্রতি ব্যবহার, তাদের অসতর্ক আলাপ-আলোচনা সন্তানের চরিত্রগঠনে কত অন্তরায় হতে পারে। উপযুক্ত স্নেহের অভাবে সন্তানের মন কি ভাবে শিথিল হয়ে ক্রমশ আয়ত্তের বাইরে চলে যায়, তার এক বাস্তবনির্ভর ছবি 'ফোর হাণ্ড্রেড ব্লোজ'।

এতে শিল্পপ্রধান নগর-জীবনের এক নির্মম চিত্র দেখা গেল। সেখানে

জীবিকার সংগ্রামে গৃহ ও গৃহস্থালী বিপর্যস্ত। সন্তান যখন আয়ত্তের বাইরে চলে যায় তখন সমস্ত দোষ সন্তানের উপর চাপানো হয়, অথবা তার সঙ্গী-সাথীদের উপর। কিন্তু ট্রুফোঁ সমস্ত দোষ দিয়েছেন মা-বাবা আর শিক্ষকদের হৃদয়হীন রুটিন-বাঁধা শিক্ষা-পদ্ধতির উপর।

কিশোর এন্টোয়াইনের চোখে আমরা সমস্ত ঘটনা দেখলাম। কেবল একটি দৃশ্য পরিচালক দর্শকদের তৃপ্ত করার জন্য বাড়তি উপহার দিয়েছেন। যেখানে এন্টোয়াইন উপস্থিত ছিল না। যে দৃশ্যে তার বাবা মাকে আদর করছিল। চিত্রগ্রহণের দিক থেকে সহজ-সরল রীতি এবং সংশোধনশিবির থেকে পালিয়ে সমুদ্রপাড় দাঁড়িয়ে পড়ার দৃশ্যটি উল্লেখযোগ্য। এখানে জিজ্ঞাসার ভঙ্গীটা স্থিরচিত্রে পথের দিশা না-পাওয়াটাকে স্পষ্ট করে তুলেছে। এই জিজ্ঞাসা দর্শকদের মনে প্রতিধ্বনিত হয়।

এ, এস্ট্রুকের দি ক্রিমসন কার্টেন: এক নতুন স্বাদের ছবি। Barbey, D'Aurevilly-র গোমিক রোমান্টিক উপন্যাস অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচিত। সবেমাত্র বিশ বছরে পড়েছে এমন এক শিক্ষার্থী সৈনিক অফিসার ফ্রান্সের কোন এক প্রদেশের শহরে কাজ করছিল। শহরের এক ধনী পরিবারে সে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। সে পরিবারের কন্যা ছুটিতে বাড়ি এসেছে। তরুণ অফিসার মেয়েটির রূপে মুগ্ধ, কিন্তু মেয়েটি নিরুত্তাপ, অফিসারের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করে না। একদিন দেখা গেল, মুখে কথা না বললেও তার হাত এসে পড়লো তরুণ অফিসারের হাতের উপর। অফিসার মেয়েটির প্রেমে পড়লো। কিন্তু অগ্রসর হবার সাহস তার নেই। মেয়েটি একদিন রাতে নিজেই এসে ধরা দিল। সমস্ত আবেগ দিয়ে তরুণ অফিসার তাকে আলিঙ্গন করলো। তারপর থেকে প্রতি রাত্রে তরুণ উন্মুখ হয়ে থাকে, তরুণীও নিশাগ্রস্তের মত এসে উপস্থিত হয়। এক রাত্রে তারা গভীর আবেগে প্রতিদিনের মত মিলিত হলো এবং তরুণের আলিঙ্গনের মধ্যেই হঠাৎ প্রাণত্যাগ করলো তরুণীটি।

এই ছবিতে পরিচালক বিমূঢ় তরুণের মানসিক প্রতিক্রিয়া এবং শেষ পর্যন্ত কাপুরুষের মত নিজেকে বাঁচাবার জন্য পলায়নে ছবি শেষ করেন। সমস্ত ছবিতে চরিত্রগুলির মুখে কোন কথা নেই, তরুণের জবানীতে নেপথ্যভাষ্যে মনের কথা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে ক্যামেরার কাজ এত সুন্দর যে, প্রতিটি মুহূর্ত চিন্তাকে ক্যামেরায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তাতে ছবিটিতে সাহিত্যের এক বিস্ময়কর স্বাদ অনুভব করা যায়। উপযুক্তভাবেই ছবিটি পুরস্কারপ্রাপ্ত।

কার্লো রিম পরিচালিত মোঁপাসার 'নেকলেস' গল্পের চিত্ররূপ দেখানো হয়েছে। স্বল্পদৈর্ঘ্যের এই ছবিটি মনের উপর যথেষ্ট রেখাপাত করে। ছোট গল্পের মেজাজ ও রস এখানে অক্ষুণ্ণ।

আলাঁ রেসনের হিরোসিমা মন আমোর: নায়িকা এক ফরাসী অভিনেত্রী।

● তরুণ মজুমদারের 'আলোর পিপাসা'য় সন্ধ্যা রায়।

হিরোসিমার উপর একটা ছবিতে অভিনয় করতে জাপানে এসেছিল। তার বিদায় গ্রহণের দু-দিন পূর্বে এক জাপানী ভাস্করের প্রেমে পড়ে। এক-দিন পরেই অভিনেত্রীকে জাপান ছেড়ে চলে যেতে হবে। তারা দুজনেই যুদ্ধের ভয়ঙ্কর স্মৃতি নিয়ে বেঁচে আছে। একজন দেখেছে হিরোসিমাকে; আর একজনের জীবনের উপর দিয়ে গেছে চরম অপমান। অভিনেত্রী নাৎসী অধিকৃত ফ্রান্সের এক গ্রামে এক নাৎসী সৈন্যকে ভালবেসেছিল। সেই সৈন্য পার্টিজানদের হাতে নিহত হয়। গ্রামবাসী চরম অপমান করে মেয়েটিকে তাড়িয়ে দেয়। সে প্যারিসে এসে নতুন করে জীবন গঠন করে। দুজনেই বিবাহিত, দুজনেরই সন্তান রয়েছে। যুদ্ধের স্মৃতি এক রাত্রির মিলনের পর দুজনকেই আবার দূরে সরিয়ে নেয়। এই ভয়ঙ্কর স্মৃতিকে তারা ভুলতে চায়।

এই ছবিতে ফরাসী অভিনেত্রীর চরিত্রে এম্যানুয়েল রিভা এবং জাপানী ভাস্করের চরিত্রে ইজি ওকাদা অভিনয় করেছে। ছবিটির দৃশ্য গ্রহণ ও কয়েকটি আবেগপূর্ণ মুহূর্ত সৃষ্টি চমকপ্রদ। যৌনতার মুহূর্তগুলি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। ছবিটির বিরুদ্ধে ... মহিলা ...

● 'তৃষ্ণা' ছবিতে রুমা গুহঠাকুরতা ও জ্যোৎস্না বিশ্‌স...

পাঁয়ে চালবার জন্য?' নাংগীর সঙ্গে প্রেম করে যে নারী হিরোসিমার স্মৃতিতে তার ক্ষতি যাচাই করে, ঘরে স্বামী ও সন্তান রেখে জাপান থেকে বিদায়ের মুহূর্তে যে আর একজনের সাথে রাত্রিবাস করে তাকে গণিকা ছাড়া আর কি বলা যাবে! এবং এরূপ গণিকাকে নায়িকা দাঁড় করিয়ে ফ্রান্সের মুক্তিযুদ্ধ ও হিরোসিমার ধ্বংসকে একাকার করে দেওয়া হয়েছে।

এই বিরোধিতা সত্ত্বেও নবতরঙ্গ সমর্থকদের কাছে 'হিরোসিমা মন আমোর' বা হিরোসিমা আমার ভালবাসা একটা আকর্ষণীয় ছবি। কারণ তাঁরা আদর্শ নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না।

সংবাদবর্ণনা

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের প্রস্তুতি

ভারতে তৃতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রতিযোগিতার জন্য ছবি বাছাইয়ের ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে: কয়েকটি বিদেশী ছবি নিম্নমানের জন্য বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। বিচারকমণ্ডলীতে ভারতীয় অপেক্ষা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রস্রষ্টা ও সমালোচকদের সংখ্যাধিক্য রাখা হয়েছে। ফ্রান্সের জর্জ সাদুলের মত সমালোচক ও পোল্যাণ্ডের আঁদ্রে ওয়াইজদার মত পরিচালক বিচারকমণ্ডলীতে থাকছেন। ভারতের সত্যজিৎ রায় ও খাজা আহম্মদ আব্বাস আছেন। সোফিয়া লোরেন সহ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অনেক চিত্রতারকা উপস্থিত থাকবেন। উৎসব উপলক্ষে আলোচনা ও স্মারক-পুস্তক প্রকাশের ব্যবস্থা হয়েছে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ছবিগুলি বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলকাতায় প্রদর্শনের ব্যবস্থা হয়েছে। অতিথিবৃন্দও উপরোক্ত শহরে আসবেন।

গত ১৯শে ডিসেম্বর উৎসবের অধ্যক্ষ শ্রী পি সি ন্যাগৎ উপরোক্ত তথ্য ঘোষণা করেন।

সংগীত কথা

নিতাই অধিকারী

● নিতাই অধিকারী

পেশার তাগিদে আমাকে মাঝে মাঝে বাংলার বিভিন্ন পল্লীতে ভ্রমণে বের হতে হ'ত। এক এক গাঁয়ে থাকাকালীন সেখানকার লোকশিল্পীদের গান শোনা ও সংগ্রহ করা আমার নেশা ছিল। সেই সব লোকশিল্পীদের মধ্যে যে প্রতিভা দেখেছি, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

এমনি একজন হলেন উত্তর বাংলার রাজশাহী জেলার তাহেরপুর গাঁয়ের লোকশিল্পী নিতাই অধিকারী। ঐ গাঁয়ে ২০ বছর আগে নিতাইয়ের সাথে আমার পরিচয় হয় ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের সাহায্যে। প্রথম সাক্ষাতে আমি তাঁকে অবাঙালী বলে মনে করেছিলাম—কিন্তু তারপর ক্রমে তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাওয়ায় আমার সে ভুল ভেঙে যায়। গাঁয়ের অন্যান্য সকলের কাছে নিতাইয়ের খোঁজ-খবর নিলাম। খোঁজ-খবরে জানলাম নিতাই গাঁয়ের সবাইয়ের নমস্য—সকলেই তাঁকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে এবং ভয়ও করে। নিতাই সকলেরই বন্ধু। গ্রামবাসীর বিপদে-আপদে তিনি সকলেরই সহায়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে নিতাই কোনদিনই পিছু হটেন নি।

নিতাই অধিকারীর সবচেয়ে বড় পরিচয় হল—তিনি একজন সুকণ্ঠ লোকশিল্পী। সন্ধ্যের পর নিতাইয়ের বাসায় সকলে মিলিত হতেন তাঁর গান শোনবার জন্য। আমিও সবাইয়ের সাথে নিতাইয়ের গান শুনতে যেতাম।

নিতাইয়ের গানগুলি তাঁর নিজেরই রচনা। নিতাইয়ের গানগুলির একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, যা সাধারণত নিরক্ষর গ্রাম্য শিল্পীদের মধ্যে চোখে পড়ে না। অধিকাংশ গানই তাঁর দেশাত্ম-মূলক এবং বিদেশী শাসকের প্রতি কটাক্ষ করে রচনা।

তাঁর সবচেয়ে প্রিয় গানটি হল:

গাঁওর শিল্প হয় যে মাটি
দ্যাশের মাটি আছে খাঁটি,
'নানা' কৃষিশিল্প মোকে শিখাও,
দ্যাশকে বড় করি।

নিতাইয়ের আরো একটি গানে বিদেশী শাসক ইংরেজদের কুশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষভাবে ধরা পড়ে। যেমন:

ইংরাজ বানিয়া হ'ল দ্যাশপতি,
কি বলব ভাই দ্যাশের গতি,
অনুক্ষণা সাগরপারের ইংরাজ কাঙ্গাল,
মোদের দ্যাশে বাধাইছে জঞ্জাল,
মোদের কপাল মন্দ অতি॥

পরাধীনতার অপমান অসহ্য—ও অপমান থেকে মুক্তি পাবার বলিষ্ঠ শপথের সুর পাওয়া যায় নিতাইয়ের আরো একটি গানে:

ঠাকুর স্বরাজ প্যালে মণ্ডা দেব,
ঘন দুধের বাটি দেব,
নইলে কাঁচকলা॥ - - -

নিতাইয়ের এই ধরনের অনেক গানই আছে, যা থেকে স্পষ্টই ধরা পড়ে যে, নিতাই সত্যিকারের একজন দেশপ্রেমিক। নিতাইয়ের মত অনেক লোকশিল্পীই এখনও অবহেলিত অবস্থায় বেঁচে আছেন—কেউ তাঁদের জানে না—কেউ তাঁদের জানবার চেষ্টাও ক'রেন না।

—বুদ্ধদেব রায়

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

আন্দ্রেয়েভের কয়েকটি বিখ্যাত নাটকের নাম এবং প্রকাশের বছর ও তার মধ্যে যেগুলি ইংরেজীতে অনুবাদ করা হয়েছে তার ইংরেজী নাম এইসঙ্গে দিয়ে দিলাম :

K. Zvezdam (To the Stars 1905), Savva (1906), Zhizn Cheloveka (The Life of Man 1906), Tsar-Golod (King Hunger 1907), Cherniya maski (The Black maskers 1908), Dni nashei zhizni (The Days of Our Life 1908), Anfisa (1909), Anathema (1909), Gaudeamus (1910), Prekrasnie Sabiniaki (The Sabine Women 1912), Professor Storitsyn (1912), To, Kto poluchact poshchetschini (He who gets slapped 1915), The Waltz of the Dogs (written 1914, printed 1922) প্রভৃতি।

আন্দ্রেয়েভের নাটকের ইংরাজী অনুবাদ এদেশে কখনও আমার চোখে পড়ে নি। বৃটিশ ড্রামা লীগ লাইব্রেরীতেই এইসব অনুবাদের বইগুলো আমার হাতে পড়েছিল এবং সেগুলো পড়ে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম। যে ধরণের abstract subjects নিয়ে আন্দ্রেয়েভ নাট্যরচনা করছেন, তা যে নাটকের মাধ্যমে মঞ্চস্থ করা যায়---এ আমার ধারণার অতীত ছিল। বহু বছর আগে একবার একটি International Plays-এর collection পড়বার আমার সুযোগ হয়েছিল, তাতে Theatre of the soul নামে একটি নাটিকা পড়েছিলাম—নাটিকাটি split personality সম্বন্ধে লেখা---একই ব্যক্তির তিনটি সত্তাকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখানো হয়েছে---লেখকের নাম এখন মনে নেই।—তবে বোধহয় এ নাটিকাটি আন্দ্রেয়েভেরই লেখা।

আর একটি কথা শুনে অনেকে আশ্চর্য হবেন ---মস্কো আর্ট থিয়েটার, যাঁরা রিয়ালিস্টিক নাটক মঞ্চস্থ করে বিখ্যাত হন, চেখভের বাস্তববাদী নাটকগুলি একমাত্র যাঁরাই সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন—এঁরাই The Life of Man প্রডিয়ুস করেন। এ বিষয়ে Stanislavsky তাঁর My Life in Art-এ লিখেছেন :

"There was an opinion prevailing at that time, an opinion which it was impossible to overthrow, that ours was a realistic theatre, that we were interested only in everyday life, and that we regarded all that was abstract and unreal uninteresting and unstageable.

It was not so in reality. At the time of which I am writing (The Life of aMn was staged by Moscow Art Theatre on December 12, 1907), I was almost exclusively interested in works of an abstract nature and was seeking for ways and means of interpreting them on

● হি ন গেট্স গ্যাপহ্-এর ক্লাউনের রূপসজ্জা

the stage. Andreyev's play was timely for it answered all of our demands.'

আন্দ্রেয়েভের এই নাটকটি পছন্দ করার কারণ হিসাবে আর একটি মজার ব্যাপার আছে। এই সময়েই স্ট্যানিসলাভস্কি তাঁর বিখ্যাত Black Velvet Trick আবিষ্কার করেন। Black Velvet যে মঞ্চমায়া সৃষ্টি করেছিল, সেই পরিবেশে আন্দ্রেয়েভের এই mystic নাটকটিতে প্রাণসঞ্চার করে তুলতে একটা বিশেষ আনন্দ পেয়েছিলেন স্ট্যানিসলাভস্কি। মস্কো আর্ট থিয়েটার আন্দ্রেয়েভের Anathema নাটকটিও সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন 2nd October, 1909-এ।

আন্দ্রেয়েভ সম্বন্ধে পরে অবশ্য স্ট্যানিসলাভস্কি মত বদলে ফেলেছিলেন।

Already in 1910 Stanislavsky said: 'It is better to close the theatre altogether than to stage Sollogub or Andreyev. Just try to see or read The Life of Man again and you will be horrified by its hypocrisy, falseness and utter distortion of things'

আন্দ্রেয়েভের সম্বন্ধে কিছুকাল রাশিয়াতে এই ধরনের একটা মতবাদ প্রচলিত হয়। আবার অবশ্য তা বদলেছে এবং আন্দ্রেয়েভ পূর্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

To the Stars নাটকটিতে বাস্তবতা এবং সাংকেতিকতার অদ্ভুত সংমিশ্রণ দেখা যায়। Savva-তে বাস্তবতার দিকটাই বেশি—অর্থোডক্স চার্চের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সবাইকে সচেতন করবার প্রচেষ্টা রয়েছে নাটকটিতে। King Hunger সাংকেতিক নাটক। The Days of Our Life, Anfisa এবং Gaudeamus—এই তিনটি নাটকই রিয়ালিস্টিক পরিবেশে গড়ে উঠেছে—কিন্তু মানবাত্মা সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করার ব্যাপারটা বাদ পড়ে নি। Anfisa-তে বৃদ্ধ নার্সের চরিত্রটি সাংকেতিক। এবার আন্দ্রেয়েভের বিখ্যাত কয়েকটি নাটকের বিশদ আলোচনা করব।

The Life of Man-এর নায়ক Man এবং The Black Maskers-এর প্রধান চরিত্র Lorenzo উভয়েই অতিরিক্ত মননশীলতার ফলে নিজেদের জীবনকে করে তুলেছেন বিষাদময় এবং করুণ। The Being in Grey (held in his hands the candle, the emblem of life) যেন নায়কের জীবনের ভাগ্যদেবতা—নিজের রহস্যজালের আবরণের অন্তরাল থেকে ইঙ্গিতে তিনিই যেন Man-এর চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করছেন। এইখানেই Man এবং Lorenzo-র জীবনের ট্র্যাজেডি। দারিদ্র্য এবং দুঃখের সঙ্গে সংগ্রাম করে Man সম্পদ এবং পার্থিব সুখকে নিজের আয়ত্তে এনে ফেলেন—এদিকে আবার স্বভাবতই তিনি প্রখর ধীশক্তি-সম্পন্ন, চিন্তাশীল এবং আত্মসচেতন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, জীবনযুদ্ধে তিনিই হবেন অপরাজেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিয়তির খেলায় Being in Grey-ই জয়ী প্রতিপন্ন হন। Man তাঁর সমস্ত সম্পদ, শক্তি, বুদ্ধির প্রখরতা, আত্মবোধ—সবকিছু থাকা সত্ত্বেও হেরে যান।

Herein lies the drama of Man whose, life has become an 'inner' life, while the outward events become non-essential, mere unavoidable details.

The Black Maskers-এর প্রধান চরিত্র Duke Lorenzo-কে বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে—সব বিষয়েই তিনি শক্তিশালী—সম্পদ, ক্ষমতা কোনো কিছুরই কোনো অভাব তাঁর নেই। কিন্তু বীভৎস চিন্তার নারকীয় তাড়নে তাঁর মানস-সত্তা সব সময়েই বিক্ষুব্ধ। বিশেষত একটি ধারণা তাঁর মনের শান্তি একেবারে নষ্ট করে দিয়েছে। তিনি কিছুতেই স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেন না যে, সত্যি সত্যিই তিনি Duke Lorenzo, না, তাঁর মা ও আস্তাবল-রক্ষকের জারজ সন্তান। এই চিন্তাই তাঁর আত্মিক শান্তিকে সবসময় বিব্রত করে। এই সমস্যাই Duke Lorenzo-র অন্তরের মানুষটিকে Obsessed করে রেখেছে। এই অভিভূত অবস্থাতেই Lorenzo তাঁর double-কে হত্যা করলেন। কিন্তু কোনোরকমেই তিনি Being in Greyকে পরাজিত করতে পারলেন না। সব থাকা সত্ত্বেও কিছুতেই Lorenzo নিজের জীবনকে সব কিছুর ঊর্ধ্বে টেনে নিতে সমর্থ হলেন না; মানসদৃষ্টিতে সব মানুষকেই তাঁর মুখোসধারী বলে মনে হোত—আসল পরিচয়কে গোপন করে সবাই যে ছদ্মরূপেই নিজের পরিচয় দিতে ব্যস্ত। পৃথিবীর সব কিছুই যেন ছদ্ম আবরণ দিয়ে ঢাকা—বাইরের এই মিথ্যা রূপটা আসল পরিচয়কে গোপন করবারই যেন Mask। এমন কি Lorenzo-র নিজের মনের চিন্তা-ভাবনা পর্যন্ত অসত্যের আবরণে মণ্ডিত হয়ে became disguised in masks.

The whole world was merely the delusion of Duke Lorenzo, who moved about the earth in an eternal mask. Both man and Lorenzo are the victims not of outward conditions, but of their own inner experiences.

দুটি নাটকই আগাগোড়া সাংকেতিকতা মণ্ডিত। রাশিয়ান সাহিত্যে প্রথম সাংকেতিক নাটক এই The Life of Man (১৯০৬ সালে প্রকাশিত)।

Professor Storitsyn (১৯১২ সাল)—আন্দ্রেয়েভের লেখা আর একটি শ্রেষ্ঠ নাটক। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে যে, এ নাটকটি রাশিয়ান বুদ্ধিজীবীদের জীবনবিষয়ক রিয়ালিস্টিক ট্র্যাজেডি। বৃদ্ধ অধ্যাপক স্টোরিটসিন শিক্ষক হিসাবে বহু ছাত্র-ছাত্রীর মনে উদ্দীপনা এবং অনুপ্রেরণা যুগিয়ে এসেছেন। সাহিত্য এবং সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর সমস্ত লেখা রাশিয়ান সাহিত্যে বিশেষ খ্যাতি পেয়েছে। শিক্ষিতসমাজের

● হি হু গেট্স স্ল্যাপড্-এ রবার্ট হেল্পমান ও অড্রে ফিল্ডেস

সবাই তাঁকে অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করে। অথচ ব্যক্তিগত জীবনে সবদিক থেকে তিনি পরাভূত। তাঁকে বঞ্চিত করে তাঁর স্ত্রী ভালবাসে এক অশিক্ষিত স্থূলচিত্ত বর্বরকে। নিজের সন্তানেরা পর্যন্ত তাঁকে অশ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে।

He himself lacks even the stoicism to submit with dignity to the ruin about him, but pursues a futile gleam of youth and beauty. নাটকটির সহজ বাস্তবতার দিকটা হোল এই। কিন্তু এর ভেতর একটা সাংকেতিক ইঙ্গিত রয়ে গেছে। পৃথিবীতে চিরকালই স্থূলতা এবং পাশবিকতার একটা বিশেষ আধিপত্য দেখা যায়। যতই আমরা কৃষ্টি এবং সভ্যতার গর্ব করি, কিন্তু আজ পর্যন্ত এ-সত্যকে অস্বীকার করবার মত পরিবর্তন পৃথিবীতে দেখা দেয় নি। Storitsyn represents the bankruptcy of the intellectual and aesthetic life in a world that always has been, and will remain course and brutal.

আন্দ্রেয়েভের শেষ নাটক—He the One who gets Slapped. এই নাটকটিকে কিছুটা পরিবর্তন করে নির্বাকযুগে একটি বিখ্যাত ছবি হয়েছিল Laugh Clown Laugh নামে—এতে অনবদ্য অভিনয় করেছিলেন সিনিয়ার লন চ্যানি—সঙ্গে ছিলেন নর্ম শিয়ারার। ইংলণ্ডেও অদ্ভুত সাফল্যের সঙ্গে এই নাটকটি কয়েকবার মঞ্চস্থ হয়। রবার্ট হেল্পমান ক্লাউনের ভূমিকায় অপূর্ব শিল্পকৌশল প্রদর্শন করেছিলেন।

নাটকের নায়ক উচ্চশিক্ষিত—শুধু তাই নয়, তাঁর লেখার পাণ্ডিত্যে, Great Intellectual হিসাবে তিনি সর্বজনবিদিত। হঠাৎ দেখা গেল জীবন থেকে অবসর নিয়ে তিনি কোথায় উধাও হয়ে গেছেন। লোকে মনে করল তিনি বুঝি স্বেচ্ছায় এ-ধরনের একটা খামখেয়ালী কাজ করলেন। কিন্তু সাধারণে জানল না যে, একরকম বাধ্য হয়েই তাঁকে আত্মগোপনের পথ বেছে নিতে হোল। আন্দ্রেয়েভ এ নাটকে বোধ হয় বলতে চেয়েছেন—মানুষ পারস্পরিক সম্বন্ধ, নিজেদের জীবন, এমন কি নিজেদের চিন্তার মধ্যেও কোন আদর্শ খুঁজে পায় না।

এই নাটকের নায়ক জীবন সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ছদ্ম পরিচয়ে Clown-এর চাকরি নিলেন অন্য এক শহরে গিয়ে। নানারকমের ভেল্কী দেখানো এবং স্টেজের ওপর অন্যের হাতে চড় খাওয়া এই হোল তাঁর নতুন কাজের ধারা। দর্শকেরা তাঁকে দেখে আনন্দ পায়, চড় মারা দেখে হেসে লুটিয়ে পড়ে। অথচ এ-কথা তারা বোঝে না যে, এই হাসির দ্বারা তারা নিজেদেরই শিক্ষা-সংস্কৃতি, চিন্তাধারা, বিবেচনা-শক্তি প্রভৃতিকে বিদ্রূপ করছে।

He becomes a clown. He performs stunts, he gets slaps; the public laughs, being unaware that this laughter is a mockery at itself, at its culture, at its thought, at its achievement.

(ক্রমশঃ)

পাঠক মন

বস্তুত, 'সাপ্তাহিক বসুমতী' একটি যথার্থ সংবাদ সাপ্তাহিক। জাতীয়-আন্তর্জাতিক এবং বিভিন্ন রাজ্যের সংবাদ ছাড়াও অন্যান্য চমকপ্রদ বিষয়ের ওপর আলোচনা এতে দেখলাম।

তবে এ বিষয়ে আমার বক্তব্য যদি গ্রাহ্য হয়, তবে আমি বলব, সাপ্তাহিকের সম্পাদকীয় স্তম্ভটি নিতান্তই সংক্ষিপ্ত। সম্পাদকীয় মন্তব্যের জন্য আরও একটু স্থান সঙ্কুলান করা উচিত ; কেন না সংবাদ সাপ্তাহিক মানেই তো সংবাদ সমীক্ষার সাপ্তাহিক পত্রিকা। পর পর দুটি সংখ্যায় চোখ রেখেই বোঝা যায়, সম্পাদকীয় মন্তব্যের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র প্রথম পৃষ্ঠাটি নির্দিষ্ট আছে। তার মধ্যেও আবার শিরোনামার জন্য বেশ একটি মোটা অংশ ব্যয় করা হচ্ছে। এ ছাড়া সম্পাদকীয় মন্তব্যের জন্য মাত্র একটি বিষয় নির্বাচিত থাকে। আমার মতে, অধিকতর বিষয়ের ওপর সম্পাদকীয় স্তম্ভে আলোকপাত করা হ'লে পাঠকবর্গ খুশি হ'তেন। মন্তব্য ছোট হ'তে পারে, কিন্তু মন্তব্য রাখা উচিত।

দ্বিতীয়ত, দুটি ধারাবাহিক উপন্যাসের জন্য দুই থেকে তিন পৃষ্ঠা নির্দিষ্ট করেছেন। সুতরাং উপন্যাসদ্বয় বেশ কয়েক মাস ধারাবাহিক প্রকাশিত হবে। ফলত উপন্যাসের শেষাংশে পৌঁছাতে বহুকাল ধৈর্য ধারণ করতে হবে পাঠকবর্গকে। বরং যদি একটিমাত্র উপন্যাসে আরও একটু জায়গা দেওয়া হয়, তা হলে অল্প সময়ে সেটি শেষ করার আনন্দ ভোগ করতে পারেন তাঁরা। প্রতি সংখ্যায় উপন্যাসের একটি গোটা পরিচ্ছেদ ও আরও কয়েকটি গল্প-কাহিনীর প্রকাশ বাঞ্ছনীয়।

তৃতীয়ত, যখন এতসব বিষয়ের ওপরই আলোচনা রাখা হয়েছে, তখন, স্থান সঙ্কুলান করা সম্ভব হলে মহিলাদের জন্য রন্ধনশিল্প বিষয়ক এবং শিশুদের জন্য স্বতন্ত্র বিভাগের ব্যবস্থা করলে পাঠকরা পরিকল্পনাটিকে স্বাগত জানাবেন।

শ্রীমৌলিচন্দ্র শর্মা
সদস্য, রাজভাষা-বিধায়ী-আয়োগ
১১।৫৬, দেশবন্ধু গুপ্তা মার্গ
করোলবাগ, নয়াদিল্লী-৫

• • •

'পাঠকমন' শীর্ষকটির জন্য সম্পাদনা বিভাগ ধন্যবাদার্হ। একথা নিঃসন্দেহে অনস্বীকার্য। কারণ পাঠকের বক্তব্য থেকে অনেককিছুই পুস্তকটির উন্নতির শীর্ষে আরোহণে সহায়ক হ'বে, এ-সম্বন্ধে আমি দৃঢ়-নিশ্চয়। শ্রীপদাতিকের নিবন্ধ পড়লে মনে হয় যেন তিনি শহর-কলকাতার বিস্তীর্ণ অলিগলির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। হরপ্রসাদ মিত্রের ক্রমাগত প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি 'সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর' নামাংকিত দর্শকের মনোরঞ্জনে বলিষ্ঠতার পরিচয় দেবে সন্দেহ নেই। আর 'আজকের মানুষ' তো নিঃসন্দেহে অভিবাদনের পাত্র। কারণ সে চার আনা পয়সার পরিবর্তে মাত্র কয়েক পয়সায় পৃথিবীর প্রখ্যাত মনীষীদের সাধারণ্যে উপস্থাপিত করছে। মানুষ যেমন তার প্রগতির পথে কোন বাধা মানে নি, ঠিক তেমনটি 'বসুমতী'ও তার প্রগতির পথে সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে তৃণখণ্ডের মত তার সবল ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছে। সে তার জয়ধ্বজা প্রতিটি জনসাধারণের দোরগোড়ায় স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছে। এই দৃঢ়-প্রতীতি 'বসুমতী'র 'সুবর্ণ-জয়ন্তী-স্মারক'গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিতে বিশেষভাবে বিধৃত হয়েছে। সারা পৃথিবীর বিস্তৃত সংবাদ এই ক্ষুদ্র পুস্তকটির মধ্যে ধরে রাখার সামর্থ্যকে অকুণ্ঠ প্রশংসা করি। অন্তরের মণিকোঠায় এই সংবাদগুলি গেঁথে রাখতে যে-কোন পাঠকই সমর্থ হ'বেন, বিশ্বাস করি। গত ২১শ সংখ্যায় শ্রীবিজনকুমার ঘোষের 'সবুজ মাঠ' গল্পটি শ্রুতি-মধুর হয়েছে। এবং ২২শ সংখ্যায় শ্রীনারায়ণ ঘোষ তাঁর 'সিদ্ধি' গল্পের মাধ্যমে ভারতের দরিদ্র-সাধারণের সাংসারিক জীবনযাত্রার যে বাস্তবালেখ্য আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন, তার জন্য তিনি অভিনন্দন-যোগ্য। কি কষ্টের মধ্যে এইসব মানুষেরা বেঁচে আছে।

সব শেষে কয়েকটি অনুরোধ করবো। আচ্ছা প্রতিটি বিভাগের নীচে একটি করে মহামানবের বাণী দিলে ভাল হয় না? খেলাধূলার বিভাগটিই আরেকটু বাড়ালে ভাল হয়। শিলালি ও দেবনারায়ণ গুপ্তের নিবন্ধদ্বয় আরেকটু বাড়ালে ভালো হয়। উপন্যাসগুলি একটু বেশি করে তাড়াতাড়ি শেষ করে দিলে ভালো হয় না? 'প্রাচীন ভারত ও বর্তমান ভারত' এই শিরোনামায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশের ব্যবস্থা করলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

শ্রীঅনীমরঞ্জন দাস, গ্রন্থাগারিক,
প্রগতি সংঘ, ডিব্রুগড়, (আসাম)

বিশ্বসাহিত্যের সম্রাট—মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে শরদ-জ্যোৎস্না—চরিত্র-সৃষ্টির ইন্দ্রধনু—অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধীশ্বর
চার্লস ডিকেন্সের
ডিকেন্স গ্রন্থাবলী
অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাশিল্পী—সর্বরসের অনন্ত নির্ঝর—বিশ্বসাহিত্যগৌরব ঔপন্যাসিকের পরিচয় প্রদান অসম্ভব।
২য় ভাগ—নিকোলাস নিকলবি : বারন্যাব রজ, চরিত্র-চিত্র। সাহিত্য জগতের এই পুণ্যপ্রভা মাত্র ১।০ টাকা
বসুমতী প্রাইভেট লিঃ
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

● নর্থবেঙ্গল দলের দুজন ব্যাটসম্যান ইনিংস সুরু করতে যাচ্ছেন

ভারত-সিংহল টেস্টযুদ্ধ

শ্রীঅমিতাভ

সিংহলের ভাগ্যই নিতান্ত খারাপ। ব্যাঙ্গালোরের প্রথম টেস্টে শোচনীয় পরাজয়ের পর হায়দ্রাবাদের দ্বিতীয় টেস্টে তারা খেলাটাকে ড্রয়ের দিকে আনতে আনতেও শেষরক্ষা করতে পারল না, আবার ভাগ্যে জুটল সাত উইকেটের পরাজয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় টেস্টের কাহিনী প্রায় একই। প্রথম টেস্টে সিংহলের পরাজয় একটু দ্রুত লয়ে, দ্বিতীয়টি কিছুটা বিলম্বিত লয়ে। হায়দ্রাবাদের দ্বিতীয় টেস্টে সিংহল শেষ পর্যন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করেছে পরাজয় রোধের জন্য। অধিনায়ক টিসেরা এবং সহ-অধিনায়ক জয়সিংহের উচ্চাঙ্গের ব্যাটিং উচ্ছ্বসিত প্রশংসার দাবি রাখে।

ভারত প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেটে ৫০৫ রান সংগ্রহ করে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। জয়সীমা এবং বোরদে শতরান লাভ করার কৃতিত্ব অর্জন করেন এবং হনুমন্ত মাত্র ২ রানের জন্য শতরান লাভের কৃতিত্ব থেকে বঞ্চিত হন। জয়সীমার ব্যক্তিগত রান হয় ১৩১, বোরদের ১৩৮ এবং হনুমন্তের ৯৮ রান।

সিংহল দল প্রথম ইনিংসে সংগ্রহ করে মাত্র ২৮০ রান। এডওয়ার্ডের ৫৩ রান এবং জয়সিংহের ৭৮ রান দলের উল্লেখযোগ্য রান। সুতি ১১৩ রানে সংগ্রহ করেন ৫টি উইকেট। সিংহল দল ফলো অনের সম্মুখীন হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা সুরু করে। দ্বিতীয় ইনিংসে সিংহল দলের ব্যাটিংয়ের যথেষ্ট উন্নতি হয়। অধিনায়ক টিসেরা এবং সহ-অধিনায়ক জয়সিংহ অধিনায়কোচিত দৃঢ়তা প্রদর্শন করে শতরান লাভ করার কৃতিত্ব অর্জন করেন। টিসেরা করেন ১২২ রান এবং জয়সিংহ ১৩৫ রান। সুতি এবং চন্দ্রশেখর তিনটি করে উইকেট দখল করেন। সিংহল দল দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করে ৩৭৮ রানে।

ভারত যখন দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে, জয়ের জন্য তখন প্রয়োজন মাত্র ১৫৪ রান। তিনটি উইকেট হারিয়ে ভারত প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে। উইকেট-রক্ষক ফারুক ইঞ্জিনীয়ার ১০২ রান সংগ্রহ করে শতরান লাভ করেন। আমেদাবাদের তৃতীয় টেস্টে ভারতীয় দলে পাঁচজন তরুণ খেলোয়াড়কে দলভুক্ত করা হয়েছে। বাংলা থেকে নির্বাচিত হয়েছেন অম্বর রায়। তরুণ খেলোয়াড়দের সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে স্বীকৃতি লাভের এই সুবর্ণ সুযোগ।

তরুণ প্রতিভা সন্ধানে

বাংলা দেশে ক্রিকেট প্রতিভা উন্মেষের পথে বাধা কোথায়? ফুটবলে বাংলার স্থান শীর্ষে, কিন্তু ক্রিকেটে এই দৈন্যদশা কেন? বহু প্রশ্ন মনে জাগে। দলাদলি আর পৃষ্ঠকুণ্ডয়নের পঙ্কিল আবর্ত দিন দিন বাংলা ক্রিকেটকে টেনে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নিচের দিকে। বাংলা ক্রিকেটে এমন কয়েকজন কর্মকর্তা বা নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্য আছেন, যাঁরা দলীয় বা স্বীয় স্বার্থের জন্যে রাজ্যের স্বার্থ বা মান-সম্ভ্রমকে বিসর্জন দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন না। বাংলা ক্রিকেটে বর্তমানে খেলোয়াড়ের নামাবলী গায়ে এমন কয়েকজন প্রবীণ খেলোয়াড় এখনও ভ্রান্ত মোহের আকর্ষণে বাংলা দলের আসন আঁকড়ে আছেন, যাঁদের বেশ কিছুদিন আগে সসম্মানে অবসর গ্রহণ করা উচিত ছিল। এঁরা অতীতে হয়ত বাংলার ক্রিকেট তারকা ছিলেন, কিন্তু বর্তমানে তাঁরা বাংলা ক্রিকেটের গ্রহ

বিশেষ। এঁদেরই জন্য বহু তরুণ সম্ভাবনাময় খেলোয়াড় সুযোগ না-পেয়ে অকালে ঝরে যাচ্ছে। বাংলার বহু তরুণ প্রতিভা উপযুক্ত শিক্ষা এবং সুযোগ পেলে সর্বভারতীয় ক্রিকেটে স্বীকৃতি পেতে পারেন বলে আমার দৃঢ় ধারণা। কিন্তু বাংলায় না-আছে ভাল ক্রীড়াশিক্ষক না-আছে উপযুক্ত সুযোগ।

বর্তমান বাংলা ক্রিকেটে উদীয়মান তরুণ প্রতিভা, যাঁদের মধ্যে সম্ভাবনার বীজ অঙ্কুরিত আছে, তাঁদের কয়েক-জনের কথা পাঠকদের কাছে আমি তুলে ধরব।

১৯৬২ সালের কথা, পূর্বাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেটে কলকাতা দলে নবাগত একজন তরুণ ন্যাটা স্পিন বোলার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। জনপ্রিয় ক্রিকেট-সমালোচক বেরী সর্বাধিকারীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসার দ্বারা রাতারাতি এই তরুণ বোলারের সৌভাগ্যের দ্বার খুলে দিল। সেবার প্রতিযোগিতায় খেলোয়াড়টি মোট ২১টি উইকেট লাভ করলেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা যে, এই ন্যাটা তরুণ বোলার ভাস্কর গুপ্ত সেই বছরই প্রথম মিলন সমিতির পক্ষে প্রথম ডিভিশনে আত্মপ্রকাশ করেন।

ভাস্করের স্কুল-জীবন কাটে কলকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্সে। এখানে খেলাধুলার ক্ষেত্রে তিনি কোনদিন তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকাই গ্রহণ করেন নি। কলেজ-জীবন ভাস্কর সুরু করেন বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনে, এই সময় খেলাধূলা সুরু করলেন অল্প অল্প। কলেজ দলের পক্ষে ক্রিকেট, হকি, ফুটবল সব কিছুতেই অংশ গ্রহণ করলেন এবং পরে অধি-নায়কত্বের দায়িত্বও গ্রহণ করলেন।

এরপর সেণ্ট জেভিয়ার্সের বি, কম বিভাগে যোগ দিলেন। এই সময় ক্রিকেট ভাস্করকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করল। ক্রিকেটের সাধনায় মগ্ন হলেন, পরিশ্রমের ফলও পেলেন, কলেজ দলে স্থান মিলল, প্রথম ডিভি-শনে নিয়মিত খেলার সুযোগ পেলেন মিলন সমিতির পক্ষে। ১৯৬২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দলে স্থান পেলেন, আর তারপর থেকে তিনি এখনও বিশ্ববিদ্যালয় দলের একজন নির্ভরযোগ্য এবং নিয়মিত সদস্য।

ভারতের প্রাক্তন টেস্ট খেলোয়াড় লালা অমরনাথ ভাস্করের যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন এবং তিনি নিজে ভাস্করকে আর্মার বল করার কৌশল শিখিয়ে-ছেন। ভাস্কর বর্তমানে বি, কম পাশ করে ল' কলেজে অধ্যয়ন করছেন এবং তিনি এখন চার্টার্ড এ্যাকাউণ্টেন্সিরও ছাত্র। বয়স মাত্র ২১ বছর। বাংলা দলের এবং পূর্বাঞ্চল দলে নেটে তিনি গিয়েছেন, যদিও দলের পক্ষে অংশ গ্রহণের সুযোগ তাঁর এখনও হয় নি। মিলন সমিতি ত্যাগ করে স্পোর্টিং ইউনিয়ন দলে এসে ভাস্কর যোগ দিয়েছেন ১৯৬৩ সালে। স্পোর্টিং দলের পক্ষে নিয়মিত প্রথম ডিভিশনে অংশ গ্রহণ করছেন। এই ক্লাবে বহু প্রবীণ এবং খ্যাতনামা খেলোয়াড়ের সংস্পর্শে এসে ভাস্কর অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে রঞ্জী ট্রফি এবং দলীপ ট্রফির আসরে ভাস্করকে আমরা দেখতে পাব।

কলকাতার মাঠে-ময়দানে

কলকাতা ময়দানের আসর এখন জমজমাট। বাংলা-বিহার রঞ্জী ট্রফির খেলা শেষ হল ইডেন উদ্যানে। সুরু হয়েছে পূর্বাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা আর পূর্বাঞ্চল স্কুল ক্রিকেট।

ইডেনে অনুষ্ঠিত বাংলা-বিহার রঞ্জী ট্রফির খেলায় প্রথম ইনিংসের ফলাফলে বাংলা দল জয়ী হয়ে সংগ্রহ করেছে পাঁচ পয়েণ্ট। বিহার দল প্রথম ব্যাট করার সুযোগ পায়। পিতার অসুস্থতার জন্য বিহারের অধিনায়ক সুধীর দাসকে কলকাতায় উপস্থিত হয়েও আবার ফিরে যেতে হয়। বিহারের অধিনায়কত্বের দায়িত্ব অর্পিত হয় রাজেন সান্যালের ওপর। রাজেন সান্যালের ৮১ রান, সুরেশ ভগতের অপরাজিত ৫৭ রান এবং পি নাগরওয়ালার ৪৮ রান বিহার দলের রান সংখ্যাকে ২৫৭-র কোঠায় পৌঁছে দেয়। শান্তি ঘোষাল বোলিংয়ে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেন, তিনি দখল করেন ৪টি উইকেট এবং ডি এস মুখার্জী ৩টি উইকেট।

বাংলা দল প্রথম ইনিংসের

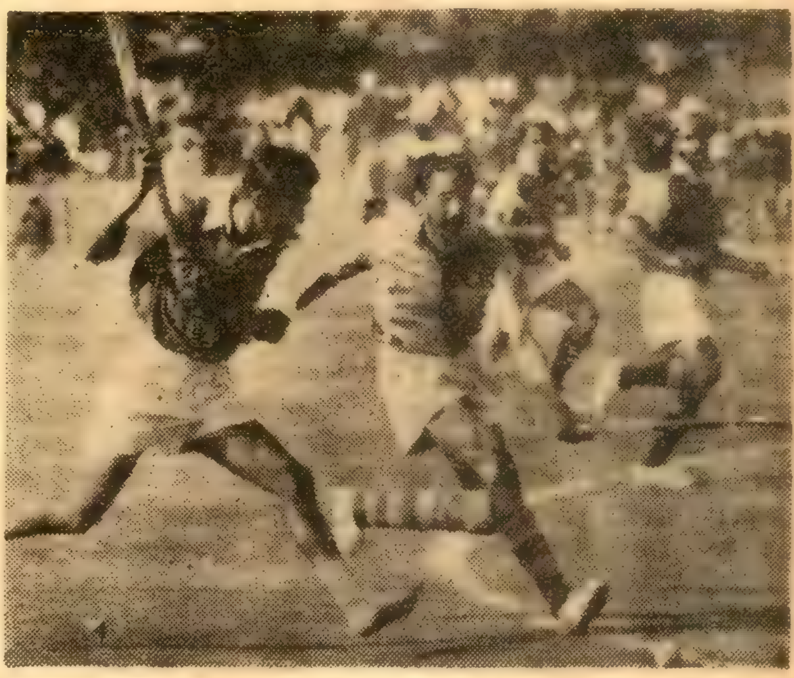

নেহরু-স্মৃতি হকিতে ইস্টবেঙ্গল এবং দক্ষিণ-পূব রেল দলের খেলার একটি দৃশ্য

খেলা স্থরু করে। দ্বিতীয়দিনের শেষে বাংলা দল ৮ উইকেট হারিয়ে সংগ্রহ করে ২৫০ রান। স্বরূপ গুহঠাকুরতা সংগ্রহ করেন ৮১ রান, তবে সমস্ত প্রশংসা প্রাপ্য চুনি গোস্বামীর। প্রয়োজনীয় সময়ে তিনি এবং জলি সরকার দলের জয়ের পথ সুগম করেন। চুনির ব্যক্তিগত রান হয় ৫৯ এবং বাংলা দলের ইনিংস শেষ হয় ২৭০ রানে। অবশিষ্ট সময়ে বিহার দলের দ্বিতীয় ইনিংস শে: হয় মাত্র ১৭৯ রানে; কিন্তু সরাসরি খেলার নিষ্পত্তি না হবার ফলে প্রথম ইনিংসের ফলাফলে বাংলা বিজয়ী হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় পূর্বাঞ্চল ক্রিকেটে পাটনা মগধকে ৪৫ রানে পরাজিত করেছে। এই খেলায় ব্যাটসম্যান অপেক্ষা বোলাররাই বেশি প্রাধান্য বিস্তার করে। পাটনা দলের এস রায়চৌধুরী মাত্র ৮০ রানের বিনিময়ে ১১টি উইকেট সংগ্রহ করেন। নর্থ বেঙ্গলকে ৬ উইকেটে পরাজিত করে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় এখন মিলিত হবে পাটনা দলের সঙ্গে।

গতবারের পূর্বাঞ্চল-বিজয়ী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-বেনারস দলের খেলায় কলকাতা দলই প্রাধান্য বিস্তার করেছে। কলকাতা দলের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে প্রথম ইনিংসে প্রবীন মুখার্জীর ৬৫, এ বি রায়ের ৪৬ এবং শিবাজী রায়ের ২৩ রান উল্লেখযোগ্য। কলকাতার প্রথম ইনিংসের মোট রান সংখ্যা হয় ২১২। প্রত্যুত্তরে বেনারস দল মাত্র ৯৮ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করে। কলকাতার বোলারদের মধ্যে ভাস্কর গুপ্ত ২৪ রানে ৩টি, দীপঙ্কর ঘোষ ৩০ রানে ৩টি এবং সুব্রত গুহ ও সঞ্জীব শীল ২টি করে উইকেট লাভ করেন। কলকাতা দলের দ্বিতীয় ইনিংসে দেব মুখার্জী, শিবাজী রায় এবং ভাস্কর গুপ্ত ব্যাটে নৈপুণ্য দেখান। দেব মুখার্জীর ব্যক্তিগত ৬৭ রান এবং শিবাজীর ৫১ রান

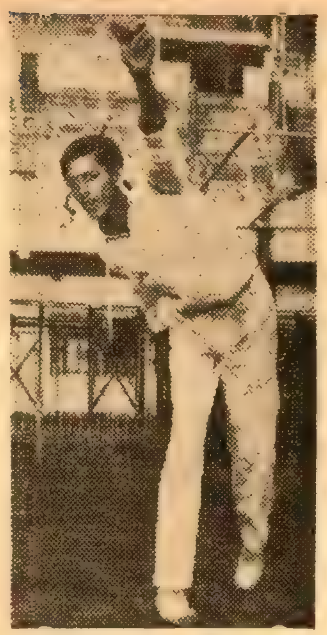

● ভাস্কর গুপ্ত

খুবই প্রশংসনীয়। বোলিংয়ে যথেষ্ট সাফল্য লাভের পর ব্যাটেও নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন ভাস্কর গুপ্ত। এই লেখা যখন শেষ করা হচ্ছে তখন হাতে আরও একদিন সময়। কিন্তু কলকাতার জয় নিশ্চিত।

বাংলা স্কুল উড়িষ্যাকে এবং বিহার আসামকে পরাজিত করে পূর্বাঞ্চলের ফাইন্যালে মিলিত হয়েছে। বাংলা দলের পি চক্রবর্তীর অপরাজিত ১৮০ রানই স্কুল-ক্রিকেটের উল্লেখযোগ্য সংবাদ।

নেহরু-স্মৃতি হকি

প্রথম অনুষ্ঠিত দিল্লীর নেহরু-স্মৃতি হকি প্রতিযোগিতা বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মূলক পরিবেশের মধ্যে শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে। সর্বভারতীয় হকির বাছাইকরা খ্যাতনামা দলগুলির অংশগ্রহণের ফলে খেলার মান খুবই উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

এখন পর্যন্ত সেমিফাইন্যালে উন্নীত তিনটি দল হল বোম্বাই একাদশ, উত্তর রেল দল এবং দক্ষিণ-পূর্ব রেল-দল। সেমিফাইন্যালে অপর একটি স্থানের জন্য শক্তিপরীক্ষা হচ্ছে পাঞ্জাব পুলিশ এবং সেণ্ট্রাল কম্যাণ্ডের মধ্যে, এই দুই দলের প্রথম দিনের কোয়া-র্টার ফাইন্যালের খেলা অমীমাংসিত-ভাবে শেষ হয়। কলকাতার দুটি জনপ্রিয় দল মোহনবাগান ২-১ গোলে ভারতীয় নেভীর কাছে পরাজিত হয়ে এবং ইস্টবেঙ্গল দল ১-০ গোলে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের কাছে পরাজিত হয়ে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিয়েছে।

ইস্টবেঙ্গল দল রেল দলের সঙ্গে প্রথমদিনের খেলার পর রেল দলের কুশলকুমারের খেলার যোগ্যতা সম্বন্ধে প্রতিবাদ জানায়, কিন্তু প্রতি-যোগিতা কমিটী তাদের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কুশলকুমার গতবার কলকাতার মাঠে অপ্রীতিকর একটি ঘটনা ঘটার পর আরও কয়েকজন খেলোয়াড়ের সঙ্গে বি এইচ এ কতৃক সাসপেণ্ড হন। যে খেলোয়াড় শাস্তিমূলক ব্যবস্থার আওতায়---তাঁকে খেলায় অংশ-গ্রহণ করতে না-দেওয়াই উচিত ছিল।

সমাচার দর্পণ

ফরাসী হকি দল বর্তমানে ভারত সফর করছে। বোম্বাইয়ের প্রথম টেস্টে ৫-১ গোলে, জলন্ধরের দ্বিতীয় টেস্টে ৩-১ গোলে এবং সাঙ্গুরের তৃতীয় টেস্টে ৪-১ গোলে ভারত ফ্রান্সকে পরাজিত করেছে।

* * *

অকল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্ব বিলিয়ার্ড প্রতিযোগিতায় ভারতের উইলসন জোন্স প্রথম স্থান লাভ করেছেন এবং ভারতের অপর এক প্রতিযোগী ফেরেরা পেয়েছেন তৃতীয় স্থান।

* * *

হংকংয়ে আগামী ১০ই জানুয়ারী প্রথম এশীয় মহিলা হকি প্রতি-যোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ভারত, সিংহল, জাপান, হংকং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে।

* * *

ভারতের অলিম্পিক বিজয়ী হকি দলের গোলরক্ষক শঙ্কর লক্ষ্মণ বছরের শ্রেষ্ঠ সার্ভিসেসের খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রা:) লি:-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২।
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীস্বকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতী

কংগ্রেস অধিবেশনের
প্রতিটি মুহূর্তের আকর্ষণ
শিল্পনগরী দুর্গাপুর

, ৩২শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৩শে পৌষ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ • 7th January, 1965 • Vol. 69,

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	১৯৮৭
আজকের মানুষ	...	১৯৮৮
সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর	হরপ্রসাদ মিত্র	১৯৮৯
কংগ্রেস ঃ একটি প্রবীণ বনস্পতি (প্রবন্ধ)	মৃত্যুঞ্জয় মাইতি	১৯৯১
টোকিওর চিঠি	মিত্রেন	১৯৯৪
গ্রন্থমেলা	জয়ন্তী সেন	১৯৯৬
ভারতদর্শন	...	১৯৯৭
আন্তর্জাতিক	...	২০০২
আঁধারমাণিক (ধারাবাহিক উপন্যাস)	মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	২০০৬
শহর কলকাতা	শ্রীপদাতিক	২০০৯

ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বেকার, চাকুরীপ্রার্থী ও শিক্ষানুরাগীদের
ভাষা শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য্য একমাত্র গ্রন্থ
॥ বিদেশী ভাষায় দক্ষতা অর্জ্জনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সহায়ক ॥
০০০ অনুক্রমে পর্য্যাপ্ত ফল অবশ্যম্ভাবী ০০০
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

রা জ ভা ষা

(ইংরাজী ভাষা সহজে শিক্ষার অদ্বিতীয় সাহায্যগ্রন্থ)
ত্রয় আধারে : ভাষা - ব্যাকরণ - পদার্থ
ইংরাজী হইতে বাঙলা—৩.৫০ ॥ ইংরাজী হইতে উর্দ্দু—১.০০

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের

মহাভারত

[প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড]
(প্রতি খণ্ড মূল্য আট টাকা)
সদ্য-প্রকাশিত চতুর্থ খণ্ড ঃ মূল্য—ছয় টাকা
(ডাকমাশুল স্বতন্ত্র)

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

মাইকেল গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগে :—মেঘনাদবধ কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, পদ্মাবতী-নাটক, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা ?
মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় ভাগে :—কৃষ্ণকুমারী নাটক, শর্মিষ্ঠা নাটক, তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী, বিবিধ কাব্য, মায়া কানন, হেক্টর বধ।
মূল্য—দুই টাকা

—ঔপন্যাসিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান—
দামোদর মুখোপাধ্যায়ের

দামোদর-গ্রন্থাবলী

১ম খণ্ড ১.৫০ ২য় খণ্ড ২.৫০
৩য় খণ্ড ১.০০ ৪র্থ খণ্ড ২.৫০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অদ্বিতীয়া (ধারাবাহিক উপন্যাস)	সুশীল রায়	২০১৩
একটি শীতের সকাল (কবিতা)	শান্তশীল দাস	২০১৬
যুথভ্রষ্ট (গল্প)	রণজিৎকুমার সেন	২০১৭
বাণিজ্যে সেকাল ও একাল	ধনপতি সওদাগর	২০২৩
বঙ্গদর্শন	...	২০২৫
ডিটেকটিভ সবাই হতে পারে (গোয়েন্দা-গল্প)	পরিমল গোস্বামী	২০৩১
কলকাতায় নিউ সেক্সপীয়ার কোম্পানী	অশোক সেন.	২০৩৬
পাঠকমন	..	২০৩৭
রঙ্গজগৎ	...	২০৩৮
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	শিলালি	২০৪৪
খেলাধুলা	শ্রীঅমিতাভ	২০৪৬

বঙ্গযুগের বিপ্লবী গুরু

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

নির্বাসিতের আত্মকথা, উনপঞ্চাশী, ধর্ম ও কর্ম, পথের সন্ধান, অনন্তানন্দের পত্র, বর্তমান সমস্যা, জাতের বিড়ম্বনা, স্বাধীন মানুষ, ধর্ম ও কর্ম।

মূল্য—আড়াই টাকা

বঙ্কিম কথাশিল্পী

জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী

৭ খানি বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ উপন্যাস এবং ৩ খানি বড় লেখা—সুবৃহৎ গ্রন্থাবলী।

মূল্য তিন টাকা

আধুনিক কথা-সাহিত্যিক

বিভূতিভূষণ গুপ্তের গ্রন্থাবলী

স্বেচ্ছাচারী, আশা, সহজিয়া, সপ্তপদী।

মূল্য—৩ টাকা

রসরাজ

অমৃতলাল বসুর গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—হরিশ্চন্দ্র, আদর্শ বন্ধু, যাদুকরী প্রভৃতি ১১ খানি নাটক।

২য় ভাগে—খাসদখল, চোরের উপর বাটপাড়ি, অবতার প্রভৃতি ১১ খানি নাটক।

৩য় ভাগে—বিবাহ বিভ্রাট, তরুবালা, ব্রজলীলা প্রভৃতি ১১ খানি নাটক

প্রতি ভাগ আড়াই টাকা

কাব্য-সাহিত্যিক

বিহারীলাল চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী

জীবনী ও কাব্য সমালোচনা, বিহারী-লালের সারদা, বিহারীলাল ও তাঁহার কাব্য, সারদামঙ্গল, বন্ধুবিয়োগ, প্রেম-প্রবাহিনী, স্বপ্ন-দর্শন, সঙ্গীতশতক, বঙ্গসুন্দরী, নিসর্গ-সন্দর্শন, মায়াদেবী, ধূমকেতু, শরৎকাল, দেবরাণী, বাউল বিংশতি, সাধের আসন, কবিতা ও সঙ্গীত। মূল্য ৩ টাকা

নয়জন কবির মূল্যবান সংস্কৃত ও বাংলা রচনার সমাবেশ। বঙ্গসাহিত্যে অভিনব আয়োজন।

বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী

মূল্য—পাঁচ টাকা

প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা

যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর গ্রন্থাবলী

২য় ভাগে—সীতা, বিষ্ণুপ্রিয়া, মহামায়ার চর ও পূর্ণিমামিলন

মূল্য দুই টাকা

উপন্যাস সাহিত্যের প্রদীপ্ত ভাস্কর

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

তৃতীয় ভাগ—বেলমতিয়া, বঙ্গসংসার, সনাতন গোস্বামী, পূজার মালা ও রাণী ব্রজসুন্দরী। মূল্য—এক টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

৬১ বর্ষ, ৩২শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পঃ | 25 Paise
বৃহস্পতিবার, ২৩শে পৌষ ১৩৭১ | Thursday, 7th January 1965

জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি

স্বাধীন ভারতে বাংলা দেশে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল কল্যাণীতে। স্বাধীন ভারত তখন গঠনোন্মুখ। নির্মীয়মাণ কল্যাণীও ছিল তখন এক পরিকল্পিত শহর। আজো আছে সেই কল্যাণীর ভগ্নস্বপ্ন আর জনসাধারণের মনে দ্বিধা-চঞ্চল ভাব থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেসের প্রতি নিষ্ঠা। অবশ্য আমাদের সমস্যা হচ্ছে সংখ্যাতীত। সেই সব সমস্যা থেকে উত্তীর্ণ হবার দুর্বার আশায় জাতীয় কংগ্রেস নানা কার্যকর পরিকল্পনার সঙ্গে প্রগতিশীল ভাবধারা গ্রহণ করেছেন। আবাদী কংগ্রেসে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গঠনের যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়—সেই প্রস্তাবের চরম সাফল্য প্রদর্শনের প্রতীক্ষায় ভুবনেশ্বরের অধিবেশনে শ্রীনেহরুর উচ্চাদর্শমণ্ডিত গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা ব্যক্ত করা হয়। কিন্তু যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে—তা বাস্তবক্ষেত্রে কতোখানি রূপায়িত হয়েছে, তা হয়তো দুর্গাপুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন থেকেই জানা যাবে। বর্তমান অধিবেশনের জন্য যে স্থান গৃহীত হয়েছে—সেই স্থানটিও ভারতের 'রূঢ়' অভিধায় নিঃসন্দেহে কংগ্রেস সরকারের কৃতিত্বের পরিচায়ক। সেই কর্মচঞ্চল শিল্পনগরী দুর্গাপুরেই মুখর জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন থেকে ভারতের অগণিত জনতার মর্মবাণী কতোটা প্রকাশিত হবে—তা জানতে চাওয়া অস্বাভাবিক নয়। বিশেষত মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই অধিবেশনের বিরাট ব্যয়ভার বহন সাধারণ মানুষের দান থেকেই সম্ভব হয়েছে। জাতীয় কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ স্বয়ং এই অভিমত জানিয়েছেন।

সেই কারণে, এই অধিবেশন থেকে কোন্ নতুন বলিষ্ঠ তত্ত্ব ও তথ্য তুলে ধরা হবে তা জনসাধারণ জানতে চায়। যদি নতুন কোনো বক্তব্য উপস্থাপিত করা কিংবা নতুন আদর্শ তুলে ধরা সম্ভব না হয়, তাতেও আক্ষেপ নেই। আমরা চাই যে, কংগ্রেসের অধিবেশনগুলিতে এযাবৎকাল যে সব আদর্শের কথা ফলাও করে প্রচার করা হয়েছে—সে সব বিষয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হোক। একটি প্রতিশ্রুতির কথা দুর্গাপুর অধিবেশনে আগত নেতৃবৃন্দকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারি। সেই প্রতিশ্রুতি হচ্ছে বেকারত্ব দূরীকরণের প্রতিশ্রুতি। এই অধিবেশনের সময় বেকার বাঙালী যুবককের দল কোন্ প্রত্যাশায় দুর্গাপুরের দিকে তাকিয়ে আছে—তার কারণ নতুন করে বলা কি দরকার? আজ বাংলা দেশের যুবক যেন দুর্ভাগ্যবশত বাঙালী হওয়ার জন্যেই দুর্গাপুর শিল্পনগরীতে সতীনপুত্রের মতো ব্যবহার লাভ করছেন। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা অন্নহীন এবং বেকার। দেশের সামগ্রিক স্বার্থে এঁদের উপেক্ষা করা হলে কি কংগ্রেসের উচ্চাদর্শ প্রতিষ্ঠা লাভ করবে এবং এরই নাম কি গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র। অধিবেশনের দিনগুলিতে বাংলা দেশের যুবকণ্ঠ কংগ্রেসের কাছে প্রার্থনা করে বাঁচবার আশায় প্রাথমিক প্রতিশ্রুতি রক্ষার। কিন্তু তাঁদের কণ্ঠের প্রতি কে-ই বা কর্ণপাত করবেন? তাই মনে হয়, দুর্গাপুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অমূল্যবাণী জনতার কাছে পৌঁছলেও বাইরের জনতার করুণ আকুতি দুর্গাপুরের শিল্পনগরীর লৌহপ্রাচীর ভেদ করে কংগ্রেসের কানে পৌঁছবে না।

সম্পাদকীয়

আজকের — মানুষ

বাংলার কবি গেয়েছেন, 'বাঙালী অতিশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ঙ্কর।' কঠিন তুষার ভেদ করে একদা অতিশ (দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান) যখন তিব্বতে গিয়ে পৌছান, তখন তিনি সাদরে সম্বর্ধিত হয়েছিলেন সেখানে। তাঁর কাছ থেকে বৌদ্ধ-ধর্মের মর্মবাণী গ্রহণ করেছিল তিব্বতবাসীরা সানন্দে। অতিশ সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন মৈত্রেয় মূর্তি আর বিনিময়ে অতিশের পরমপ্রিয় শিষ্য ডোম রিণ্‌পোছে তাঁর গুরুকে সম্মানিত করেছিলেন গুরুদেবের স্মরণে মঠ প্রতিষ্ঠার দ্বারা। খৃস্টিয় ৭ম শতাব্দীতে ভারতের নাগরসদৃশ লিপি গ্রহণের পর তিব্বতের সঙ্গে যেন সেদিন থেকে হৃদয়ের যোগ আরও ঘনীভূত হয়েছিল এই ভারতের।

সেদিক দিয়ে ১৬৪৫ খৃস্টাব্দটিও নিঃসন্দেহে স্মরণীয়। ১৬৪৫-এই মোগলবীর গুশ্‌রি খাঁ তিব্বতকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করে পঞ্চম দলাই লামাকে তিব্বতের রাজত্ব প্রদান করেন। তদবধি কাল থেকে তিব্বত ছিল দলাই লামারই অধীনে। তিনি যেমন ধর্মগুরু, তেমনি রাষ্ট্রগুরু। তারপর ১৯৫৯ সালে দলাই লামার ভারতে পালিয়ে আসার পর যিনি তাঁর স্থলে ধর্মগুরু ও রাষ্ট্রগুরু পদে আসীন হন সেই পাঞ্চেন লামাও আজ রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হচ্ছেন। এরপর হয়তো সুরু হবে তিব্বতের রাষ্ট্রজীবনে আর-এক খেলা।

অথচ এই পাঞ্চেন লামার প্রতি চীনের দরদ ১৯৫৯ সালের পর থেকে যেন অধিকতরভাবে উপচে পড়েছিল। বাহ্যিক আচরণে তিব্বতীয়দের সরলতার প্রতি এইভাবেই যেন বিশ্বাস-ঘাতকতা করা হয়েছিল। তিব্বতীয় জনতার শ্রদ্ধামণ্ডিত চিত্তে দলাই লামার পরই পাঞ্চেন লামা অধিষ্ঠিত। সে ঘটনাও এ-কালের নয়, বহুকাল আগেকার। তিব্বতের তশি-লুহুন্‌পো সংঘারাম সর্বজন পরিচিত। এটিকে স্থাপন করেছিল বেশ কয়েক যুগ আগে গ্যা-ব গেদুন্দুব। এখানেই অ.মতাভ বুদ্ধ মনুষ্যাকারে পাঞ্চেন খস্‌ চে খন্‌পা নামে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি যে মাত্র একবারই জন্মেছিলেন, তা নয়। ঐ এক নামে পর পর কয়েক জন্ম যে আবির্ভূত হয়েছিলেন তার প্রমাণ আছে তশি-লুহুন্‌পো আশ্রমে।

সেই বিচারে বর্তমান পাঞ্চেন লামা হচ্ছেন দশম অবতার-স্বরূপ। আর দলাই লামা হচ্ছেন চোদ্দ। তিব্বতীয় ধর্মপ্রথায় পাঞ্চেন লামাই দ্বিতীয় স্বলাভিষিক্ত। দলাই লামার মতো তিনিও মহাযানপন্থী। আসল নাম তাঁর খি হ্‌সুন্‌ৎসা। আর একটি নাম তাঁর আছে, তা হচ্ছে, পাঞ্চেন-এরদেনি চুজি-গেল্টসেন। বয়স তাঁর খুব বেশি নয়। ১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাসে চীন দেশের চাংহাইতে তাঁর জন্ম, আর ১৯৪৩-এ তিনি চিংহাই-এ পাঞ্চেন লামারূপে অধিষ্ঠিত। এরপর রাষ্ট্রজীবনে দলাই লামার সঙ্গে সুরু হয় তাঁর বিবাদ। সে বিবাদের মিটমাট হয়ে যায় ১৯৫১ সালে। তারপর বুদ্ধের আড়াই হাজার জন্মশতবার্ষিকীতে দলাই লামার সঙ্গে তিনি আসেন ভারতে। তবু ১৯৫২ সালে কমিউনিস্ট চীন কর্তৃক তিব্বত আক্রমণের পর থেকে তাঁর দহরম-মহরম চীনের সঙ্গে বেড়েই চলেছিল। ঐ সূত্রে সেই সময় লাসায় পৌছে তিনি লাভবানও কম হন নি। শেষ পর্যন্ত ১৯৫৯ সালে দলাই লামার বিদায়ের পর তাঁর সৌভাগ্য যেন আরো বেড়ে গেল। কত পদ, কতো না পদবী, ইয়ত্তা নেই তার। রুটিনে বাঁধা হাজার রকম কাজ, হাতে তাই সোনার ঘড়ি, আর বিশ্রাম-কক্ষেও অবিরত হাতে তাঁর টেলিফোন রিসিভার। তিনিই হলেন চীনাধিপত্যে তিব্বতীয় স্বয়ংশাসিত অঞ্চলের প্রস্তুত কমিটীর ভাইস চেয়ারম্যান ও কমিটীর অস্থায়ী চেয়ারম্যান। (অবশ্য স্থায়ী চেয়ারম্যান কাগজে-কলমে দলাই লামাকেই রাখা হয়েছিল।) প্রস্তুত কমিটীর সেই ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীপাঞ্চেন লামা এখন নিপাত ধরণীতলে। তিনি এখন চীনের চক্ষুশূল। বিদায় তাঁর অবধারিত, হয়তো বা শূলেও তাঁর পরমাগতি।

পাঞ্চেন লামা

একমাত্র যে সুযোগ তিনি মিঃ চৌ-এর শাসনে লাভ করতে পারেন বলে জানা যাচ্ছে, তা হচ্ছে 'সংশোধনের সুযোগ'। তাঁর এই দশা ঘটবার কারণ, তিনি নাকি তিব্বতের দায়াবদ্ধ কৃষক সম্প্রদায়কে 'স্বদেশবাসীদের ও সমাজতন্ত্রের বিরোধী কাজ' করতে উস্কানী দিয়েছেন।

গুরুর ওপর চরম শাস্তি দেখে তিব্বতবাসীরা এবার নতুন শিক্ষা লাভ করবেন। সেই শিক্ষার পরিণতি দেখার জন্য আজ কে-ই বা উদগ্রীব নয়।

সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর

হরপ্রসাদ মিত্র

কামুর সেই গল্পের নায়কের নাম গিলবার্ট জোনাস। চিত্রকর হিসেবে তাঁর বেশ খ্যাতি হয়েছিল। নিজের ভাগ্যের ওপর জোনাসের বিশ্বাস ছিল। নিজের উন্নতির জন্যে কোনো অবস্থাতেই তিনি যে খুব সক্রিয় ছিলেন, তা নয়। সবই যেন সহজে ঘটে গেছে। অনুকূল যোগাযোগ সে-সব।

তাঁর বয়স যখন পঁয়ত্রিশ বছর, সেই সময়ে হঠাৎ প্রায় ডজনখানেক সমালোচকের মধ্যে বাদ-প্রতিবাদ শুরু হয়ে যায়---কে তাঁর শক্তি সম্বন্ধে প্রথম সচেতন হয়েছেন, কে-ই বা তাঁকে প্রথম আবিষ্কার করেছেন।

জোনাস নিজে জানতেন---এ সবই তাঁর অদৃষ্টের খেলা, ভাগ্যের সংঘটন। তাঁর বাল্যবন্ধু র‍্যাটো ছিল তাঁর সত্যিকার শুভার্থী। জোনাসের ছেলেবেলায় তাঁর বাপ-মার মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে যায়; কিন্তু দুজনেই ছেলেকে অতিরিক্ত আদর দিতেন। নিজেদের দাম্পত্য সম্পর্কে ভাঙন ঘটার ফলে,---পাছে ছেলে সেই অশান্তির দরুণ ভয়ঙ্কর কিছু একটা করে বসে, এই ভয়ে বাপ-মা দুজনেই জোনাসকে এটা ওটা সেটা জুগিয়ে যেতেন। আর, র‍্যাটোর বাপ-মাও এই অসহায় ছেলেটিকে ভারি ভালোবাসতেন। লেখাপড়া মোটামুটি শেষ করে জোনাস তাঁর বাবার প্রকাশ-ভবনে চাকরি পান। তারপর যখন ছবি থেকে তাঁর মোটামুটি একটা আয়ের ব্যবস্থা হোলো, তখন সে-চাকরিটা ছেড়ে দেন।

র‍্যাটোর সঙ্গে মোটর-সাইকেলে বেড়াতে বেরিয়ে একটা দুর্ঘটনায় পড়তে হয় জোনাসকে। লুই পুলিন নামে মেয়েটির দিকে সেই সুযোগেই গভীরভাবে নিবিষ্ট হবার সময় পাওয়া যায়। র‍্যাটো অবিশ্যি বন্ধুকে বলতো---তুমি কী যে দেখেছ ঐ ক্ষুদে পতঙ্গটির মধ্যে! র‍্যাটো নিজে বেঁটে ছিল বলেই বোধ হয় তার আগ্রহ ছিল লম্বা চেহারার দিকে। আর, জোনাসের নিজের স্বভাবে আলস্যের পরিমাণ বেশি ছিল বলেই ঐ মেয়েটির কর্মব্যস্ততা দেখে ভারি ভালো লাগতো।

লুই যতোদিন এটুকু বুঝেছিল যে, জোনাসের মন গ্রন্থ-প্রকাশের রাজ্যে, ততোদিন প্রকাশ-প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের দিকেই মনপ্রাণ সমর্পণ করে রইলো সে। দিনরাত নানা ধরনের লেখা পড়ে পড়ে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সে পাঁচরকম বিষয়ে কথা চালিয়ে যাবার মতন বিদুষী হয়ে উঠলো। তারপর যে-মুহূর্তে জোনাসকে সে প্রকাশালয়ের কাজ থেকে ছবি আঁকার আগ্রহে সরে যেতে দেখলো, সেই মুহূর্তেই সাহিত্যের খবরে তার আগ্রহ ফুরোলো। তখন থেকে নানা মিউজিয়ামে আর শিল্প-প্রদর্শনীতে ঘুরে বেড়ানো শুরু হোলো। জোনাসকে টেনে টেনে সব দেখিয়ে বেড়ানোই তার প্রধান কাজ হয়ে উঠলো।

কিন্তু জোনাসের মন অন্য ধরনের। তাঁর স্মৃতি দুর্বল। আজ যে ছবি দেখলেন, কাল সেটা ঠিক ঠিক মনে থাকে না। লুই তখন মনে করিয়ে দেয়। জোনাসের জামা-জুতো-টাই কেনবার সময় হয় না,---লুই ঠিক জিনিসটি ঠিক সময়ে জুগিয়ে চলে। র‍্যাটো বলে---ভায়া তোমার সব প্রয়োজনই তো লুই মিটিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু মনে রেখো, তোমার দাঁতে ব্যথা হলে দন্তচিকিৎসকের কাছে তোমার বদলে লুই গিয়ে বসতে পারবে না!

অপরিসীম এই মমতার বন্ধন অনিবার্য। বিয়ে হোলো দুজনের। দুটি সন্তান হোলো পর পর, তারপর তৃতীয় আর একটি।

র‍্যাটো এই পরিবারের অকৃত্রিম বন্ধু থেকে গেল। জোনাস হয়ে রইলো উদাস, আত্মভোলা, অদৃষ্টবিশ্বাসী শিল্পী। লুই সুগৃহিণী মধুমতী।

এমন সংসারে দিনগুলি সব সোনার খাঁচায় বাঁধা থাকবার কথা। কিন্তু বাঁধা থাকা সম্ভব কি? কিছু কি বাঁধা থাকে? জীবনে সকলের কণ্ঠে বোধ হয় একই গান---দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইলো না!

বিয়ের পরে একে একে সন্তান-গুলির জন্মের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি লুইকে তার স্বামীর দিক থেকে ছেলেমেয়েদের দিকে সরিয়ে দিলেন ধীরে ধীরে। সে কোনো উদাসীনতা নয়, বিমুখতা নয়,---শুধু মাতৃত্বের সহজ টান। জননী সরে এলেন জোনাসের শিল্পরাজ্য থেকে,---তাঁর নৈসর্গিক শুভ দায়িত্ববোধে।

এদিকে, শিল্পীদের মহল্লায় আঠারো শতকের পুরোনো বাড়িটার যে-অংশে এই শিল্পী-পরিবারের বাস, তার ঘরগুলো এঁদের সংখ্যাবৃদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট প্রশস্ত ছিল না। অল্প পরিসরের মধ্যেই সকলের শ্বাস-প্রশ্বাসের জায়গা করে নেওয়া দরকার। লুই আর র‍্যাটো, দুজনে মিলে যথাযোগ্য ব্যবস্থাপনায় উদ্যত হয়। পর্দা, পার্টিশন, শেলফ, ভাঁজ-করা-টেবিল আসে। আসবাবের প্রয়োজন মেটে। জোনাসের ছবির পট, আঁকবার সাজ-সরঞ্জাম, বসবার ব্যবস্থা---সবই হোলো। শিল্পীর সংসারে লক্ষ্মী রইলেন নিরন্তর প্রযত্নে বাঁধা।

স্টুডিওর এক কোণে, নবজাতকের শয্যা রইলো পর্দার আড়ালে। টেলিফোন সেই ঘরেই। টেলিফোন বাজলেই বাচ্চাটার ঘুম ভেঙে যায়। লুই পা টিপে টিপে ঘণ্টায় সতেরো-বার তার ঘুমন্ত শিশুটিকে দেখে যায়। তাতে শিল্পীর ধ্যান বাধা পায় বটে, কিন্তু মাতৃত্বের দরদ দেখে দেখে প্রাকৃতিক শক্তির লীলায় কৌতুক বোধ করেন জোনাস।

এই আঁটসাঁট ঘরকন্নার মধ্যেই অনেক শিল্পীর আসা-বসা চলতে থাকে। সমালোচক আসেন, চিত্রকর আসেন। জোনাসের কাজ হয় না। সারা বিকেল শিল্পীদের খেদোক্তি চলতে থাক,---আহা কী কঠিন আজ-কালকার জীবন,---একটু ভাববার সময় নেই, একটু মগ্ন হবার সুযোগ মেলে না! তাঁরা জোনাসের খাবার সময়টাও জুড়ে থাকেন। রাত পর্যন্ত কথা চলতে থাকে। স্ত্রীর সঙ্গে, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ হবারও ফুরসৎ মেলে না। তরুণরা আসে তাঁর সামনে বসে নিজের নিজের তুলি চালাতে। জোনাসের সমালোচকরা নানা কথা বলতে থাকে। বাইরে জানলায় এসে দাঁড়ায় বাইরের লোকরা।

একেই বলে খ্যাতির বিড়ম্বনা। মান, যশ, ভক্তের ভক্তি, সমালোচকের মতামত এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য আয়োজন,—অদৃষ্ট একে একে সবই জুটিয়ে দিলেন। কিন্তু ভেতরে ভেতরে জোনাসের মনের আবহাওয়া বদলে যায়। ভিড় ভালো লাগে না। দু-একজন তাতে ক্ষুব্ধ হয়, বলে লোকটা অহঙ্কারী হয়েছে এবার।

লোকজনের সঙ্গে আর দেখা করতে ভালো লাগে না জোনাসের। তাঁর ছবির একটু-আধটু নিন্দে শুরু হয়েছে ইতিমধ্যে। দু-একজন সোজা-সুজি বলতেও আরম্ভ করেছেন। সেই সময়ে একদিন র‍্যাটো জিগেস করে—কী বন্ধু তুমি সুখী হয়েছ তো?

জোনাস জবাব দেন—সকলেই আমার প্রতি সদয়।

র‍্যাটো বলে, তোমার বন্ধুরা কিন্তু ভালো নয়।

জোনাস বলেন, আমি জানি, তারা অনেকেই নিজেদের অস্তিত্বে সন্দিহান। নিজেদের নাম থাকবে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ ঘোচে না, তাই নিন্দে করে, সমালোচনা করে। কিন্তু ওদের ভালোবাসতে হবে, সমালোচনার দিকে ওদের এই ঝোঁকটাই ওদের অস্তিত্বের সূত্রপাত।

র‍্যাটো বলে, কিন্তু তোমার নিজের সম্বন্ধে কি মনে হয়,—তুমি নিজে বেঁচে থাকবে তো? তোমার নিজের অস্তিত্বের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ আছে না কি?

জোনাস গম্ভীর হয়ে যান। বলেন, না, আমার সেরকম নিশ্চিত বিশ্বাস নেই এখনো, তবে আমি বিশ্বাস করি যে, বেঁচে থাকবার মতন কিছু কাজ আমার দ্বারা হবেই।

ফুরসৎ মেলে না কিছুতেই। হয় তো, একজন স্বাক্ষর-সন্ধানী এসেছেন, —ডাকঅলা রেজেস্টারি চিঠি এনেছে, —বিদেশের একজন নাট্যকার এসেছেন দেখা করতে। দুটি কুকুর উপহার দিয়ে গেলেন এক মহিলা। জোনাস তাঁর ছবি আঁকছেন। আবার, জোনাসের ছবি আঁকছেন আর এক শিল্পী। লুই বলে, সে-ভদ্রলোক নাকি গভর্নমেন্টের চিত্রকর,—সরকারী অনুরোধে এসেছেন সাধনারত শিল্পীর ছবি আঁকতে।

সেই শনিবারের বিকেলেই র‍্যাটোর সঙ্গে ঐ সব কথা হয়েছিল।

লুই বললে—জোনাসের কথাই ঠিক। ঐ সব বন্ধুদের কথায় কিছুই এসে যায় না। জোনাসকে স্থায়ী কিছু ছবি আঁকতেই হবে।

জোনাসের চোখের দৃষ্টি তখন জানলার বাইরে। আর কথা চলে না। সেদিন এই পর্যন্তই।

এই ভাবে দিনের পর দিন কেটে যায়। জোনাসের খ্যাতিতে ভাঁটা ধরে। ভেতরে ভেতরে কী যেন একটা প্রাণান্তকর টিকে থাকবার ইচ্ছেও কাজ করতে থাকে।

একটু বেসামাল হতেই বা বাধা কিসের? একদিন পেটে একটু বেশি মদ পড়ে, মনে হয় নিজের ফুরিয়ে যাওয়া ক্ষমতা যেন আবার ফিরে আসছে, কিন্তু ছবির পটে সুন্দরের অভ্যুদয় কোথায়? সব তুলে রেখে বাইরে বেরিয়ে পড়তে হয়। চেনা মেয়েটির সঙ্গে রাত কেটে যায় বাইরেই।

পরদিন সকালে ফিরে এসে মনে হয়, লুইয়ের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে যেন! যেন জলে ডুবে যাচ্ছে লুই। জোনাস বলেন, ক্ষমা করো, আমাকে ক্ষমা করো।

লুই ভেঙে পড়ে। আবার প্রকৃতস্থ হয়। সংসারে সব ভাঙা জিনিসই জুড়ে নিতে হয়। সংসারের ছন্দ বজায় রেখে দিনের পর দিন কাটাতে হয়। লুই ক্ষমা করে। জোনাস নির্জনতা খোঁজেন। এক পর্বান্তের পরে নতুন পর্ব শুরু হয় বুঝি!

একটা তেলের আলো, একটা চেয়ার, একটা টুল আর ফ্রেম নিয়ে ছাদের ঠিক নিচেই উঁচু একটা মাচায় উঠে বসেন শিল্পী। কিছু একটা আঁকতে চান তিনি। নির্জনে মগ্ন হতে হবে তাঁকে।

সংসারের সমস্ত কলরব থেকে একটু সরে দাঁড়ানো দরকার।

র‍্যাটো যথারীতি আসে, যায়। লুই যথারীতি কাজ করে, ভালোবাসে, লক্ষ্য করে। কিন্তু ছেলেমেয়ে, স্ত্রী, বন্ধু, সংসার, সব কিছুই দূরে সরিয়ে রেখেছেন জোনাস, কী যে আঁকছেন, ভগবান জানেন।

সেই মাচার ওপর একদিন সারা রাত আলো জ্বললো—পরদিন সারা সকাল জুড়ে। ছেলেদের কলরব শোনা যাচ্ছিল সেখান থেকে। সংসারের সব শব্দ, সব কথা, রাস্তার একটা চলন্ত ট্রাকের আওয়াজ, জানলার খড়খড় সমস্ত শব্দের মাধুর্যে, রূপের আনন্দে জীবন কী যে পরিপূর্ণ মনে হচ্ছিল জোনাসের। ক্যানভাসটা দেওয়ালের দিকে সরিয়ে দিয়ে চুপচাপ বসে ছিলেন তিনি। আর, ঠিক সেই অবস্থাতেই, গভীর শ্রান্তির ফলে তিনি সেইখানেই পড়ে যান।

ডাক্তার এলেন। এসে বললেন—ও কিছু নয়, শ্রান্তির ফল, এক সপ্তাহের মধ্যেই আবার সুস্থ হয়ে যাবেন।

লুই ব্যাকুল হয়ে জিগেস করে—ঠিক তো, ভালো হবেন তো?

তখন পাশের ঘরে র‍্যাটো দেখছিল জোনাসের সেই ফাঁকা ক্যান-ভাস। তার কোথাও কোনো আঁচড় নেই,—সবটাই ফাঁকা, উদাস—কেবল ঠিক মাঝখানে—জোনাস তাতে কী যেন লিখেছে—'নির্জনতা' নাকি 'নির্জমতা'? শব্দটা ঠিক পড়া যায় না।

কামুর এ গল্পে ব্যঙ্গের চেয়ে বেদনাই বেশি। তবে, ব্যঙ্গ যে একে-বারে নেই, তা নয়। জোনাস নিজে যা এঁকেছেন, জীবনের যে রস তিনি তাঁর শিল্পে পরিবেষণ করতে চেয়েছেন বা পেরেছেন বা পারেন নি, যথার্থ শিল্পীর মন নিয়ে তাঁর সমসাময়িক শিল্পীর দল সে-সব কথা কিছুই কি ভেবেছেন, কিছুই কি পেয়েছেন?

খ্যাতি শুধুই হুজুক। ভক্তের দলও লোভী। শিল্পের গভীর বোধ বিরল। কামু তাঁর ব্যঙ্গ-বেদনাময় এই কাহিনীর মধ্য দিয়ে এইসব ইশারা দিয়ে গেছেন।

এবং বোধ হয় বলতে চেয়েছেন যে, মহাকাল সব কিছুই হরণ করে। আমরা নির্জনতা থেকে নির্জনতায় ফিরে যাই।

এই কথা ভেবেই সেদিন বিদুরের সান্ত্বনার কথাগুলি মনে পড়েছিল। (ক্রমশঃ)

কংগ্রেস: একটি প্রবীণ বনস্পতি

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসের কথা নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করলে প্রবীণ বনস্পতির কথা মনে পড়ে। যার দৈর্ঘ্য, বিস্তৃতি---শাখা এবং প্রশাখা অরণ্যের বিরাট প্রাঙ্গণ জুড়ে থাকে। বনস্পতির বাইরের শরীর তার সব নয়। মাটির গভীরে তার যে দৃঢ় শেকড় লুকিয়ে থাকে, জীবনের রস সংগ্রহ ও সঞ্চয় করে সে বনস্পতিকে আকাশে মাথা তোলার শক্তি ও সাহস জোগায়; ঝড়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সে তাকে বিজয়ীর মত বাঁচিয়ে রাখে।

ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেস যেন তেমনি একটি প্রবীণ বনস্পতি, যে কেবল অসুস্থ শরীর নিয়ে বেঁচে থাকার দীনতা থেকে মুক্ত নয়, যে নানা বিপর্যয় ও সংগ্রামের মধ্যে আজও উন্নত শির, আজও দৃঢ়, আজও নবীন। কংগ্রেসের এই জরা ও স্থবিরতাহীন সুদীর্ঘ জীবনের কথা চিন্তা করলে একথা স্বীকার্য যে, এর পশ্চাতে কোথাও এমন কিছু উপাদান আছে যে উপাদান এই প্রতিষ্ঠানকে মৃত্যুর হাত থেকে সগৌরবে আজো রক্ষা করে চলেছে।

কংগ্রেসের ইতিহাস, নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ইতিহাস। প্রাক্ স্বাধীনতা-কালে মূলত যে সংগ্রাম ছিল ইংরেজের বিরুদ্ধে, স্বাধীনোত্তর-কালে সে সংগ্রাম বিভিন্নমুখী রূপ নিয়েছে। কংগ্রেস দুটি সাধারণ নির্বাচনী যুদ্ধে অতি মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রম ছাড়া, বিপুলভাবে জয়লাভ করেছে। আজ যে কোন চিন্তাশীল রাজনীতি-সচেতন মানুষের একথা কল্পনা করার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে যে, কংগ্রেস আরও বহুদিন এমনি শক্তিশালী অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকবে। ঠিক আজকের দিনের কথা, অর্থাৎ যখন জীবন যাপনের অপরিহার্য পণ্যগুলি দুর্লভ বা অদৃশ্য, দুঃখকষ্ট ব্যাপক ও গভীর তখনও পশ্চিমবঙ্গে তিন-তিনটি নির্বাচনে কংগ্রেস জয়লাভ করেছে। (যে নির্দলীয় প্রার্থীটি কংগ্রেস প্রার্থীকে পরাজয় করে জয়লাভ করেছেন তিনি মূলত বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মী। নির্বাচনের পূর্বে, উপদলীয় কোন্দলের জন্য মনোনয়ন না পেয়েই তিনি নির্দলীয় প্রার্থীরূপে নির্বাচনে দাঁড়ান)। এই সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলি দেশের ভবিষ্যৎ নির্বাচন যুদ্ধের একটি চিত্র বহন করছে।

অনেক বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কঠিন যুক্তি দেখাতে পারেন। তাঁরা বলতে পারেন, কংগ্রেসের অঢেল টাকা আছে; তাঁরা বলবেন, দেশে কোন শক্তিশালী রাজনৈতিক দল নেই, তাই কংগ্রেস কিছুটা ফাঁকা মাঠে গোল দেবার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু এ যুক্তি বিচারে টেকে না। অনেক দিক থেকে কমিউনিস্ট পার্টি শক্তিশালী (বাম ও দক্ষিণ হওয়ার পূর্বের কথা); এমন অভিযোগও আছে যে, বৈদেশিক রাষ্ট্র তাদের প্রচুর টাকা দেয়। সংগঠনের দিক থেকেও কমিউনিস্ট পার্টি শক্তিশালী, কংগ্রেসের মত চার আনা পয়সা দিলে এ দলের সদস্য হওয়া যায় না। ট্রেনিং দিয়ে সদস্য তৈরি করা হয়, এমন কোন বিজ্ঞানসম্মত রাজনৈতিক দল, কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া ভারতে আর নেই। এবং প্রতিটি সদস্য যে শিক্ষিত সৈনিক—এ দাবিও কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া আর কেউ করতে পারে না। কিন্তু তবু, ভারতবর্ষের মাটিতে কমিউনিস্ট পার্টি আজো কেবল

বিপ্লবের গর্জন ছাড়া আর কিছু শোনাতে পারল না। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের স্থান কমিউনিস্ট পার্টি আজো গ্রহণ করে নি এবং সম্ভবত কোনকালেই গ্রহণ করবে না। তাই কংগ্রেস নিজের জগতে আজো অপরাজেয় এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী। শ্রীরাজাগোপালাচারী, আচার্য কৃপালনী এবং বাংলা দেশে ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মত বিখ্যাত এবং অতি বিশিষ্ট নেতাও কংগ্রেস ছেড়ে চলে গেছেন। তবু কংগ্রেসের মৃত্যু হয় নি। আজো সে অক্ষত বনস্পতির মত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

॥ ২ ॥

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের মধ্যে, কংগ্রেসের আদর্শের মধ্যে এবং যে মানুষগুলির তপস্যা দিয়ে কংগ্রেসের শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের ভিত গড়ে উঠেছিল, তাঁদের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন উপাদান ও এমন সত্য ছিল, যার ফলে নানান ঝড়েও কংগ্রেসের মৃত্যু হয় নি। এই উপাদানগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে।

(১) কংগ্রেসের সর্বজনীনতা—কংগ্রেস ভারতবর্ষের মধ্যে প্রাচীনতম জাতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। ১৮৮৫ সালে এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছিল এবং এরূপ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রথম চিন্তা এসেছিল এ্যালন অক্টাভিয়াস হিউম নামে একজন ইংরেজের মনে। কংগ্রেসের প্রথম অবস্থা স্যার ফিরোজ শা মেটা এবং দাদাভাই নৌরজী—এই দুজন পার্শীর সাহায্যে পুষ্ট হয়ে ওঠে। কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী ১৮৮৫ সালের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। এইভাবে প্রথম অবস্থা থেকেই কংগ্রেসে মুসলমান, খৃস্টান, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান অর্থাৎ সমস্ত ধর্মের ও সম্প্রদায়ের মানুষের মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। মুসলমান নেতা, পার্শী নেতা এবং মহিলা নেত্রীগণ, (ডঃ অ্যানি বেশান্ট, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী) কংগ্রেসের সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছেন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ এবং নরনারী নির্বিশেষে কংগ্রেস একটি সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেস কোন বিশেষ শ্রেণী, সম্প্রদায় বা বিশেষ কোন স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে না। সমগ্র জাতির এবং সমস্ত শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করাই তার চরিত্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

(২) অবিরাম গতিশীলতা—একটু চিন্তা করলে আশ্চর্য মনে হবে, যে কংগ্রেস ৭০।৮০ বছর পূর্বে মাত্র কয়েকজন বুদ্ধিজীবী মানুষকে নিয়ে গড়ে উঠেছিল, আজ সেই কংগ্রেস পৃথিবীর বৃহৎ রাজনৈতিক সংস্থাগুলির মধ্যে অন্যতম, হয়তো বা শ্রেষ্ঠও হতে পারে। কেবল প্রতিষ্ঠানের সদস্য-সংখ্যা দিয়ে এই বৃহত্ত্বের বিচার করা হচ্ছে না। এই বৃহত্ত্বের বিচারের মানদণ্ড হল, সংগ্রাম তার সাফল্য, তার বিরাটত্ব। একথা বললে অন্যায় হবে না যে, প্রাক্-স্বাধীনতাকালে কংগ্রেস মানেই সারা ভারতবর্ষ বোঝাত। একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান একটি বিরাট দেশের সমগ্রতার প্রতিনিধিত্ব করছে—এই চিত্র কল্পনা করা অবশ্যই কঠিন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

উৎসভূমির সঙ্কীর্ণতা থেকে যাত্রা করে নদী একদিন সমুদ্রের মত বিস্তৃতি লাভ করে। বস্তুত তার এই পরিণতি, গতির মধ্য দিয়েই সম্ভব হয়। যে নদীর স্রোত স্তব্ধ, সে নদীর সমুদ্র-ব্যাপ্তি সম্ভব নয়। তেমনি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ব্যাপ্তি গতির মধ্য দিয়েই সূচিত হয়। এই গতিকে বাধাহীন হতে হবে, এমন কোন কথা নেই। বরং বাধা গতির বেগকে তীব্রতর করে।

কংগ্রেসের এই গতিশীলতাও তেমনি। বাধা বারবার এসেছে। শাসক-শ্রেণী কংগ্রেসকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করেছে। কংগ্রেসের নিজের মধ্যে বিভিন্ন আদর্শবাহী মানুষের সংমিশ্রণ ঘটেছে। তার মধ্যে সহিংস বিপ্লবী এসেছেন, সমাজতন্ত্রী এসেছেন, আবার চলে গেছেন। নেতাজীর মত বিরাট ব্যক্তিত্ব, তাঁর বৈপ্লবিক অস্থিরতা নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে যেমন বিদ্রোহী যৌবনের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, তেমনি বীর সভারকার, মানবেন্দ্র রায় তাঁরাও এসেছেন নতুন আদর্শ, নতুন চিন্তার ঐশ্বর্য নিয়ে। একদিন তাঁরাও চলে গেছেন। এমনি করে কংগ্রেস বিভিন্ন আদর্শবাহী মানুষের একটি মহৎ মিছিল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এই বিচিত্র সমাবেশ চূড়ান্তভাবে কংগ্রেসকে একটি আশ্চর্য গতিশীলতা দান করেছে। যার ফলে কংগ্রেস একটি সমগ্র দেশের ব্যাপ্তি নিয়ে আজও সমুন্নত।

এই গতিশীলতা কেবল ব্যক্তিত্ব-কেন্দ্রিক নয়, এই গতিশীলতা আদর্শ-ভিত্তিকও বটে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শের বাস্তব রূপায়ণের অভিজ্ঞতাকে ভারতের মাটি ও মানুষের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে কংগ্রেস তার নিজের আদর্শ রচনা করেছে। আজ কংগ্রেস ভারতে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ কার্যকরী করে তুলতে চলেছে। এই চিন্তাধারা ও আদর্শ গ্রহণের পেছনে কংগ্রেসের গতিশীলতার প্রমাণ বর্তমান। কংগ্রেস বলছে, গণতন্ত্রও চাই, সমাজতন্ত্রও চাই। একটি অপরটির পরিপূরক—একটি লক্ষ্য, একটি পথ। গণতন্ত্র ছাড়াও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হতে পারে। কিন্তু কংগ্রেসের মতে, সে সমাজতন্ত্র নতুন-ভাবে রাজতন্ত্রের দুঃখবহ পুনরাবর্তনের নামান্তর হয়ে উঠবে।

আপাত ব্যর্থতার পথ বেয়ে আসা কংগ্রেসের এই গতিশীলতার কথা বলতে গিয়ে গান্ধীজী সুন্দরভাবে বলেছেন—

'The Worst critic will have to recognize, as it has been recognized, that the Indian National Congress is a

daily growing organization, that its message penetrates the remotest village of India, that on given occasions the Congress has been able to demonstrate its influence over among the masses who inhabits its 700,000 villages.' (young India 24, 12 1931)

অর্থাৎ, কংগ্রেসের সবচেয়ে কড়া সমালোচককেও একথা বলতে হবে যে, কংগ্রেস একটি ক্রমবর্ধমান সংস্থা যার বাণী ভারতবর্ষের ৭ লক্ষ গ্রামে প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে।

(৩) নিঃস্বার্থ ও শ্রেষ্ঠ কর্মীদের সমাবেশ—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, প্রাক্-স্বাধীনতাকালের ভারতবর্ষের বিশিষ্ট মানুষদের আশ্চর্য সমাবেশ কংগ্রেসের মধ্যে ঘটেছিল। এঁরা কেউ স্বার্থসিদ্ধির জন্য আসেন নি বা দেশ স্বাধীন হলে মন্ত্রী হবেন—এ সুদূর আশা নিয়েও কংগ্রেসের মঞ্চে এসে জড় হন নি। একটি অবিচল আদর্শ এবং প্রয়োজন হলে সে আদর্শের জন্য মৃত্যু বরণও শ্রেয়—এই শপথ নিয়ে তাঁরা কংগ্রেসের পতাকাতলে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। এই সব মানুষ সমাজজীবনে কোন না কোনভাবেই নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের সকল উজ্জল সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করে দেশের স্বাধীনতা, দেশের দরিদ্র মানুষের মুক্তির জন্য কংগ্রেসে তাঁরা ভিড় করেছিলেন। গান্ধীজী ব্যারিস্টার হয়েও জীবন কাটাতে পারতেন—নেতাজী, শ্রীঅরবিন্দ ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের দুর্লভ রাজকীয় পদমর্যাদায় সমাসীন থাকতে পারতেন—শ্রীনেহরু ব্যারিস্টারী এবং সাহিত্যচর্চায় সময় অতিবাহিত করতে পারতেন। এমনি অসংখ্য মানুষ এসেছেন কংগ্রেসে; নিঃস্বার্থভাবে, নিরলসভাবে, কংগ্রেসকে গড়ে তুলেছেন। এই সাধনা একদিন কংগ্রেসের মধ্যে ছিল বলেই, কংগ্রেস এক অক্ষয় শক্তির উৎস হয়ে আছে।

এই সেদিনও দেশে-বিদেশে কংগ্রেসের অস্তিত্ব নিয়ে কত জল্পনা। শ্রীনেহরুর মৃত্যুর পর কংগ্রেস লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে—এই দিবাস্বপ্নে কোন কোন রাজনৈতিক দল নিঃশব্দে প্রতীক্ষিত প্রহর গুণেছে। কিন্তু আশ্চর্য, শ্রীনেহরুর মৃত্যুর মত শূন্যতা সত্ত্বেও কংগ্রেসের পাথরের দেয়ালে কোন উল্লেখযোগ্য ফাটল দেখা দেয় নি। যে মতবিরোধ, যে ব্যক্তিভিত্তিক বিরোধ আজ আছে, তা সেদিনও ছিল এবং তা ভবিষ্যতেও থাকবে। যে কোন বিরাট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এই বিরোধ অবশ্যম্ভাবী এবং জীবনের লক্ষণ। সমস্ত মানুষ একই রকম ভাববে, একই রকম আশা পোষণ করবে—এ হয় না; এমন কি কঠিন সামরিকীকরণের মধ্যেও তা সম্ভব নয়।

কংগ্রেসের একদল নিঃস্বার্থ মানুষ নিজেদের জীবনের মধ্য দিয়ে সত্য এবং আদর্শকে একদিন রূপায়িত করেছিলেন। সেই বীজের সঞ্চয় থেকে আজও কংগ্রেসের মধ্যে নতুন বলিষ্ঠ বৃক্ষের ছায়া আমরা পাচ্ছি। শ্রীধেবর বা শ্রীকামরাজের মত এমনি সংবাদপত্র জগতের অনালোকিত মানুষ, একদিন কংগ্রেসের হাল ধরবেন। কংগ্রেসের ভিত্তি, তার শৈশব, কৈশোর ও যৌবন—সমস্ত স্তর এমনি নিঃস্বার্থ মানুষদের সেবার মধ্যে গড়ে উঠেছিল বলেই বহু ঝড়ের মধ্যেও, এই প্রতিষ্ঠান আজও অক্ষত আছে।

(৪) কংগ্রেসের আদর্শ ও পথ—সর্বশেষ যে কারণে কংগ্রেসের এই সুদীর্ঘ স্থায়িত্ব ও সাফল্য সম্ভব হয়েছে, তার মূল কথা হল প্রতিষ্ঠানের আদর্শ ও পথ। এই আদর্শ ও পথের মধ্যে রোমাঞ্চ চাই, এমন কি চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বলতাও নেই। বুদ্ধিজীবী তরুণেরা ভিড় করে আসবে এমন জুৎসই শ্লোগান পর্যন্ত নেই। তবু কংগ্রেসের মৃত্যু হয় নি। তার কারণ, কংগ্রেসের মধ্যে এমন মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল, যিনি সর্বহারার দুঃখে বিগলিত হয়ে মাঠে-ময়দানের জনসভায় বক্তৃতার বন্যা না বইয়ে নিজে দরিদ্রের মত থাকতেন বিপুল সংখ্যক দরিদ্র মানুষের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য। তিনি (গান্ধীজী) রাজবেশ ধারণ করেন নি। কংগ্রেসকে তিনি সেই শিক্ষাই দিয়েছিলেন, তাদেরই প্রতিষ্ঠান করে গড়ে তুলেছিলেন যারা মূক, যারা আধপেটা খায়, যাদের পরনের কাপড় জোটে না। দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে সেই অর্ধনগ্ন শীর্ণ মানুষটি অতি মৃদু গলায়, বলেছিলেন :

'Above all, the Congress represents, in its essence, the dumb, semi starved millions scattered over the length and breadth of the land in its seven hundred thousand villages.'

কংগ্রেস এদেরই প্রতিষ্ঠান, এদেরই বাঁচবার জন্য ভারতবর্ষের স্বাধীনতা চাই।

এই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য, (যে স্বাধীনতা সাধারণ মানষের জীবনধারণের মান উন্নত করবে, সকলের সমান সুযোগ ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে এবং শোষণ দূর করবে বলে শপথবদ্ধ) তিনি একটি নতুন পথ বেছে নিলেন। ৭ লক্ষ গ্রামের অধিবাসীদের জন্য যদি স্বাধীনতা আনতে হয়, তবে ৭ লক্ষ গ্রামের অধিবাসীদের চেষ্টা করতে হবে। স্বাধীনতা কেউ দেয় না, ভিক্ষা করে স্বাধীনতা পাওয়া যায় না, গেলেও তা রক্ষা করা যায় না। স্বাধীনতা অর্জন করতে হয় এবং অর্জন করার দায়ভাগে আমরা সকলেই অংশীদার। তিনি ৭ লক্ষ গ্রামের মানুষের হাতে দুটি অস্ত্র তুলে দিলেন—একটি অহিংসা, দ্বিতীয়, অসহযোগ।

কংগ্রেস দেখতে দেখতে জনতার প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়ে গেল। চীৎকার নয়, আদর্শের এবং থিওরীর চুলচেরা বিচার নয়, শুধু ব্যক্তিগত জীবন, একটি বিরাটতম প্রতিষ্ঠানের অন্তরের বাণী হয়ে উঠল। কংগ্রেসকে গান্ধীজী বললেন, চরম বিপ্লবের জন্য অপেক্ষা করতে হয় এবং সেই সময়ের মধ্যে নিজেদের প্রস্তুত করতে হয়। কাজেই ব্যস্ত হয়ো না। আমি শুধু এক পা এগুতে চাই,—'**One step is sufficient for me.**'

শেষ কর্ণধার যাত্রীবাহী তরীতে উপকূলে পৌঁছে দিয়ে গেছেন। আজ স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি। সংগ্রামের দ্বিতীয় অধ্যায় এখন সুরু হয়েছে। নানা ঘাত-প্রতিঘাত, এবং বহু আপাত ব্যর্থতা সত্ত্বেও, কংগ্রেসকে আমরা এখনও ভারতবর্ষের সেই একমাত্র বৃহত্তম, মহত্তম এবং শ্রেষ্ঠতম প্রতিষ্ঠান বলে মনে করি, যার নেতৃত্বে দেশে নতুন দিনের অভ্যুদয় ঘটতে পারে এবং ঘটবেও।

টোকিওর চিঠি

"মিত্রেন"

---আ রে ছোঃ। কাজকর্ম আমার ধাতে সয় না। তা ছাড়া খেটে-খেটেই মরব নাকি?

এই উত্তর, এই বেপরোয়া হাব-ভাব। কি ছেলে, কি মেয়ে—সব সমান। দেখেশুনে আপনি আশ্চর্য হবেন। আমরা হই। কিন্তু টোকিওর বিনিদ্র অল-নাইট টি-রুমগুলি এইসব সাংঘাতিক দামাল ছেলেমেয়ের জন্যই ব্যবসা ফাঁপিয়ে তুলছে দিনের পর দিন। সারারাত জমজমাট রেস্তোরাঁ। গান-বাজনা হৈ-চৈ। টোকিওর রাজপথে এদেরই হুল্লোড়। অথচ বয়স কুড়ি পার হয় নি কারও। গার্জেন-ফার্জেন মানে না। অভি-ভাবককে থোড়াই কেয়ার। মধ্যরাত্রে দল থেকে কুড়ি বছরের ছেলেমেয়ে দশ বেঁধে দৌড়ঝাঁপ করলে বোবা দর্শক শুধু দু'দণ্ড জাপানের ভবিষ্যৎ নাগরিকের দুর্বিনীত চেহারা কল্পনায় আঁকতে পারেন। তার বেশি এগোবার সাহস নেই। ঘাড় পেতে সে দায়িত্ব কেউ গ্রহণও করেন না।

তবু উত্তেজিত বয়োজ্যেষ্ঠ কেউ সাহসে ভর করে প্রশ্ন করলে উল্লিখিত সাফ জবাবে তাঁর নাগরিক দায়িত্বজ্ঞান ওলট-পালট করে দেবে ওরা। এদের অনেকেই ফ্যাক্টরী শ্রমিক। লেখাপড়ার বালাই নেই। পরের দিনের কাজের কথা ভেবে আগের রাত্রে উভ-লিঙ্গে আমোদ-প্রমোদে বিরত থাকা এদের কাছে বোকামি। এক-একটি যৌবন কোরক, কদর্থে ওমর খৈয়াম। নাও, হেসে-খেলে নাও, সামনে তোমার যে কটা দিন পাও। এদেরই বিশিষ্ট দর্শন। উচ্চাশা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা—বাদ দাও ওসব ফাজলামি। অনেক হাঙ্গামা ওতে। টাটকা যৌবন শুকিয়ে খড় হ'লে হয়ত কিছু হবে, নয়ত কিছুই হবে না। অত ঝুট-ঝামেলা কেন? সময় নদীর জলের মতো তরতর ক'রে বয়ে যাচ্ছে। তার প্রতিটি বিন্দু গায়ে মেখে শরীর-মনে তারল্য আনো।

এমনটা আগে ছিল না। এই মাতলামি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফসল। জাপানের নয়া সমস্যা। একটা বড় রকমের জাতীয় সমস্যা। বড়রা একসময় এদের নাম দিয়েছিলেন রকবাজ ছোকরার পাল। ভদ্র ভাষায়, যুদ্ধোত্তর দল।

এদের সমস্যা অফুরন্ত। সমস্যা নিশীথ সরাইগুলিকে কেন্দ্র ক'রেও। জাপানের উঠতি নায়ক-নায়িকা রাত্রিকালীন নর্মভূমি সৃষ্টি করেছে এখানে। সেই সৃষ্টিছাড়া লীলা-নিকেতনগুলি আজ জাপ-জননায়কদের দুশ্চিন্তার উৎসস্থল। অল-নাইট টি-রুমে যুব-জাপানের স্থায়ী আড্ডা গড়ে উঠেছে। আধো-আঁধারে এক-এক যুগল তরুণ-তরুণী মন আশ্লেষে রাতভোর মন দেওয়া-নেওয়ার খেলা খেলে। এই দুরন্ত তারুণ্য আজ অবাধ্য, বিশৃঙ্খল।

টি-রুমগুলির জন্ম কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে। রাস্তাঘাট তৈরির কাজে নিযুক্ত শ্রমিক-শ্রেণীর জন্য রাত্রের আহার ও বিশ্রামের স্থান ছিল টি-রুমগুলি। সেইসব শ্রান্তিহর পান্থপাদপ, এখন জাপানের প্রশান্তি হরণে উদ্যত। অপরাধ অনুষ্ঠানের বৈঠকখানা।

এইসব নিয়ে রীতিমত চিন্তা করতে হচ্ছে গবেষকদের। বাউণ্ডুলে তরুণ-তরুণীর স্বপক্ষে তাঁদের যুক্তি, প্রথাবদ্ধ মনোবিজ্ঞানীর যুক্তি। অর্থাৎ মনের মতো কাজ পাচ্ছে না এরা। তরুণ-মনের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে।

স্ব স্ব পছন্দ অনুসারে বিকালের

● উত্তেজনা আর গতিই এদের একমাত্র কাম্য।

সন্ধ্যা নামলে তরুণ-তরুণীর দল নাচে-গানে মুখর হয়।

যথার্থ পথ পাচ্ছে না ইত্যাদি। ফলত খ্য´ দিবস-রজনীর গ্লানি ভুলতেই না কি নারী-পুরুষ পরস্পরের বুকে আবিষ্ট আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছে। তা ছাড়া অভিভাবকরাও নির্দোষ নন। জোট বেঁধে এই সামাজিক অকল্যাণ রুখতে এগিয়ে আসেন নি তাঁরা। বড়রা তরুণ-তরুণী নির্বিশেষে একই ধরণের দুষ্কর্ম দাবি করেন, যা অনুচিত। আর তাই গোড়ায় গলদ না কি এইখানেই।

কিন্তু সমস্যা শুধু তরুণ-তরুণীর ঘনিষ্ঠতার মধ্যে সীমিত থাকলেও না হয় অবিচলিত থাকতে পারত আজকের মডার্ন জাপান। সমস্যা দূরপ্রসারী হয়েছে।

জাপানে উঠতি গুণ্ডার সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। ১৯৬২ সালের রিপোর্টে ১,৬২,৯৪১টি ক্ষুদে গুণ্ডার সংবাদ আছে। এদেশে অপরাধ-প্রবণতার ইতিহাসে এই সংখ্যা নতুন রেকর্ড। অপরাধের মাত্রাই শুধু নয়, দুষ্কৃতর অপরাধের সংখ্যাও ভয়াবহ। এমন কি সদ্বংশজাত কিশোর অপরাধীর সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান। অবশ্য কিশোর অপরাধের সমস্যা বর্তমানে যুগের হাওয়া। য়ুরোপ-আমেরিকায় এ সমস্যা আরও কঠিনভাবে দানা বাঁধছে।

জাপ সরকার সুতরাং একটি 'চরিত্র' গঠনের পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছেন। 'ওসব সরকারী কর্ম নয়'—অন্যদিকে ধুয়ো তুলেছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁরা বলেন, চরিত্র গঠনের মতো শক্ত কাজে সহায়ক হতে পারেন একমাত্র শিক্ষক এবং অভিভাবকগণ। এমনি সব বিষয় নিয়ে জাপান এখন ব্যস্ত।

কিন্তু অন্ধকারের চিত্রটাই সব নয়, এবং গুণ্ডামিও জাপানী তারুণ্যের চরিত্র নয়। আলোর দিকও আছে। আছে পরিশ্রমী উচ্চাভিলাষী জ্ঞান-পিপাসু দায়িত্ববোধসম্পন্ন তরুণ জাপান। এরা জ্ঞানার্জন, খেলাধূলো, শরীরচর্চা, কলা-সংস্কৃতি নিয়ে দৈনন্দিন সাধনায় একান্ত পরিতৃপ্ত। যুদ্ধের ক্ষত, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শয়তানী উন্মত্ততার প্রভাব এদের ওপর অপেক্ষাকৃত কম। কারণ এরা বয়সে আরও তরুণ, যুদ্ধের ব্যাধি ও ব্যভিচারের অগ্নিদাহন এদের চেতনাকে বিষাক্ত করার সুযোগ পায় নি। এরা নয়া জাপানের সবুজ ফসল। পরিশ্রম অধ্যবসায় উচ্চাভিলাষ এদের পাথেয়। এরাই ভবিষ্যৎ জাপানের সম্ভাব্য জননায়ক বা নায়িকা।

এই সম্ভাবনাময় তরুণ জাপানের সম্মানে দেশব্যাপী উৎসবের আয়োজন হয় প্রতি বছর জানুয়ারী মাসের পনেরো তারিখে। আগামী পনেরোই জানুয়ারী রাজধানী টোকিও সেই উৎসবের উদ্দীপনায় স্ফূরিত হবে। যৌবন নতুন ফসলের বীজ বপন করবে; আগামী সূর্যের আগমনী গাইবে জাপানের শহর, নগর, গ্রাম।

পনেরই জানুয়ারীর শ্লোগান হবে 'ওয়াকাই নেক্কো' (সজীব শেকড় বা Young roots) জিন্দাবাদ। বার বছর আগে 'ওয়াকাই নেক্কো'র একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছিল, যার শাখা-প্রশাখায় গোটা জাপান সমাকীর্ণ। সেই প্রতিষ্ঠানের (ওয়াকাই নেক্কো নো কাই) টোকিও শাখার সদস্য সংখ্যাই ত্রিশ হাজারের ওপর। সুতরাং টোকিওর উৎসব জমজমাট হবে। আমাদের বনমহোৎসব, জাপানে তারুণ্যের মহোৎসব। পনেরোই জানয়ারীর প্রতীক্ষায় আছি।

সৃষ্টিমূলক চিন্তায়, নৃত্যে, শরীরচর্চায় জাপানী তরুণী সমান উৎসুক।

গ্রন্থমেলা

জাতীয় কর্মনীতির প্রশ্নাবলী ও প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদ : ভি আই লেনিন, ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-১২। মূল্য—৩.৭৫ পয়সা।

পৃথিবীতে জাতি-সমস্যার সমাধান সম্পর্কে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা আজো এমন সহজ পথের সন্ধান পান নি—যে পথে আন্তর্জাতিকতার পরিপূর্ণ রূপ অনায়াসে দর্শন করা সম্ভব হতে পারে। অথচ কবি, বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও মানবপ্রেমিক রাষ্ট্রবিদগণ আন্তর্জাতিক চিন্তা-ভাবনায় সর্বদাই নিরত। জাতি-সমস্যার সমাধান প্রসঙ্গে লেনিনের চিন্তা-ভাবনাগুলি অনেকেই বাস্তবক্ষেত্রে রূপায়িত করে তুলতে চেয়েছেন। কিন্তু তিনি যে পথের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের কথা বলেছেন, সে পথে এগিয়ে যেতে কেউই সাহসী হন নি, কেউ বা এগিয়ে যাবার মতো ভরসাও পান নি। তথাপি একথা স্বীকার করতেই হবে, জাতি-সমস্যার সমাধান না হলে কোনো দেশেই সুখ নেই এবং সেই অবস্থায় আন্তর্জাতিকতার আদর্শ তুলে ধরা নিরর্থক। জাতি-সমস্যার সমাধান না-হবার ত্রুটি ও মামুলি আদর্শের মূলীভূত কারণ সম্পর্কে লেনিন যে সব কথা যুক্তিসহকারে তুলে ধরেছেন, সেগুলি সব সময় শ্রুতিসুখকর না-হলেও মানব-কল্যাণের সহায়ক। সেই কারণে উপরি-উক্ত গ্রন্থের 'জাতি-সমস্যা সম্পর্কে সমালোচনাপূর্ণ মন্তব্য, 'জাতি সমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার'; 'বৃহৎ রাশিয়ানদের জাত্যাভিমান' শীর্ষক প্রবন্ধগুলি সকলের পাঠ করা উচিত। প্রয়োজন হলে সমালোচনার সমালোচনা-সাহায্যে মূল সত্যে পৌছানো যে কোনো সৎ ব্যক্তির একান্ত কর্তব্য। জাতিসমূহের সমানাধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও ভাষার সমানাধিকারের যে তাৎপর্য লেনিন ফুটিয়ে তুলেছেন, বর্তমান যুগের পরিস্থিতিতে নিঃসন্দেহে তার সত্যতা বিচার্য।

আম্রপালী : শ্রীরামচন্দ্র ঠাকুর। অনুবাদ : বোম্মানা বিশ্বনাথম। প্রকাশক : পি দত্ত, ১৫৩।১, নেতাজী সুভাষ রোড, হাওড়া। দাম : পাঁচ টাকা।

'আম্রপালী' উপন্যাসের মূল রচয়িতা শ্রীরামচন্দ্র ঠাকুর একজন খ্যাতিমান গুজরাতী সাহিত্যিক। বহু

জয়ন্তী সেন

গুজরাতী সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যের অনেক গল্প-উপন্যাস অনুবাদ করেছেন। সেদিক দিয়ে বিচার করলে, গুজরাতী সাহিত্যিকদের গল্প-উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ খুবই কমই বলা যায়। অথচ সারা ভারতের জাতীয় সংহতির কথা ভাবতে গেলে পরস্পরের সাহিত্যকে জানা একান্ত দরকার। সেই কারণে 'আম্রপালী' উপন্যাসটি সাদরে গৃহীত হবে এবং অনুবাদক শ্রীবিশ্বনাথম ভাষান্তরিত করার কৃতিত্বে প্রশংসা লাভ করবেন। 'আম্রপালী' উপন্যাসটির মাধ্যমে আমরা যে ইতিবৃত্ত, ঘটনা ও চরিত্রসমূহের সম্মুখীন হই, তা ভারতের যে-কোনো ভাষাভাষীর কাছে অজ্ঞাত নয়, বলা যেতে পারে। আম্রবৃক্ষই আশ্রয় দান করে যে আম্রপালীকে পার্থিব কারাগারে পাঠিয়েছিল, তার সকরুণ কাহিনী নিয়ে বাংলা সাহিত্যের ভাবজগৎ মুখর। সেই চরিত্রের পারিপার্শ্বিকতায় 'আম্রপালী' উপন্যাসে যেন প্রাচীন ভারত আধুনিক ভারতের মুখোমুখি সমুদ্ঘাটিত। বিম্বিসার, অজাতশত্রু, ধর্মযশ কোনোটাই যেমন মিথ্যা নয়, তেমনি সর্বশেষে এও সত্য যে, 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি', 'ধর্মং শরণং গচ্ছামি'। উপন্যাসটির কাহিনী উপস্থাপনার রীতিটিকে গতিদান করেছে সুধীর ও চিরঞ্জীব নামক দুটি চরিত্র। তবু উপন্যাসটির একটি ত্রুটি এই যে, কাহিনী অনেক সময় দীর্ঘ সূত্রাকারে অতিকথিত।

এই মন : তৃষ্ণার্ত হৃদয়—পরেশ দত্ত। শালতোড়া, শাবড়াকোন, বাঁকুড়া। দাম : দু' টাকা।

প্রখ্যাত কবি শ্রীদিনেশ দাস শ্রীপরেশ দত্তের কাব্যচেতনা দুটি কথায় প্রোজ্জলরূপে তুলে ধরেছেন। তিনি শ্রীদত্তের কবিপ্রাণ ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিঃসংশয়িত। 'এই মন : তৃষ্ণার্ত হৃদয়' আলোচ্য কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ। সুতরাং এই গ্রন্থে প্রাথমিক গুণাগুণ ও সম্ভাবনাসম্ভূত আদর্শের সঙ্গে চিন্তানুসৃত মোহ থাকা অসম্ভব নয়। সুতরাং প্রেম, প্রকৃতি, জগৎ ও মানবজীবন সম্বন্ধে লেখকের আন্তরিকতা অনস্বীকার্য হলেও বিভিন্ন ছন্দের দিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা তাঁর পক্ষে প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। তা ছাড়া স্বকীয়তাই হচ্ছে কবিজীবনের পরমাশ্চর্য সম্পদ—সেই সম্পদের অধিকারীও তিনি পরবর্তী গ্রন্থে হতে পারবেন। কেন না, চিন্তার ক্ষেত্রে 'এই মন : তৃষ্ণার্ত হৃদয়'-এ সতর্ক স্বাতন্ত্র্য কিছুটা লক্ষ্য করে খুশি হয়েছি। কবি নিজেই বলেছেন, 'সহসা কখন কবে পাবো আমি আমার ঠিকানা, উষ্ণ বুকে জাগে মহাসমুদ্রের তৃষা।' কবি সচেতন থাকলে তাঁর আবেগধর্মী আশা পূর্ণতা লাভ করবে, এ আমরা বিশ্বাস করি। মণীন্দ্র মিত্রের মনোরম প্রচ্ছদপট গ্রন্থটির অন্যতম আকর্ষণ।

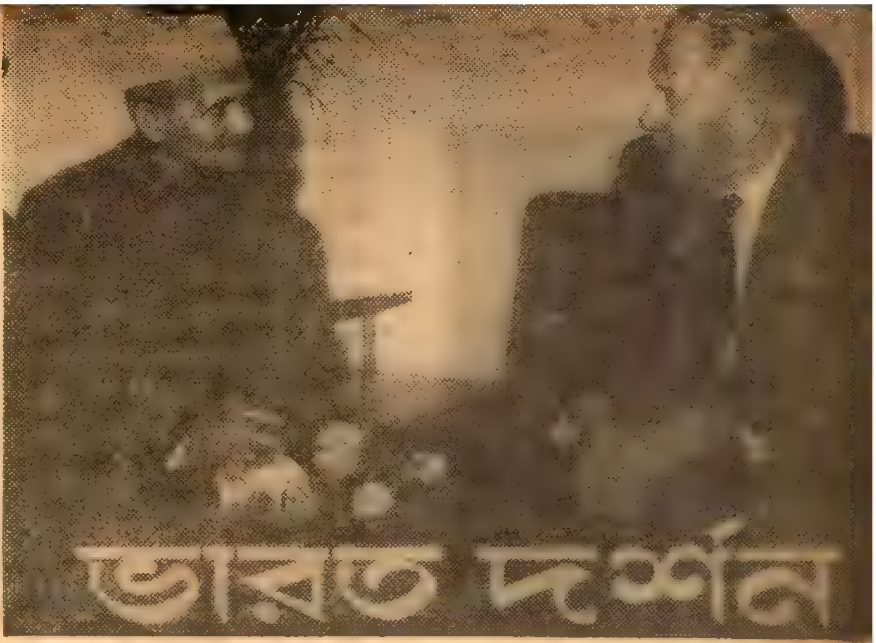

প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীজী সকাশে লর্ড রবিন্স

রাজধানী ঃ

নয়াদিল্লী এখন একেবারে ফাঁকা। সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শেষ হয়েছে দিন-কয়েক আগে। সদস্যরা সকলেই ফিরে গেছেন নিজেদের এলাকায়। প্রধানমন্ত্রী, কংগ্রেস সভাপতি এবং অপরাপর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা চলে গেছেন দুর্গাপুরে কংগ্রেসের অধিবেশনে। এ অবস্থায় রাজনৈতিক জল্পনা-কল্পনার অবকাশ কম থাকে। স্বাভাবিক নিয়মেই সকলের দৃষ্টি থাকে কংগ্রেসের অধিবেশনের দিকে।

এই অধিবেশনের প্রাক্কালে কমিউনিস্ট পার্টির ছোট তরফের নেতাদের গ্রেপ্তারের পর নয়াদিল্লী উঠেছে অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে। সেই সঙ্গে ভারতের উত্তর প্রান্তে চীনা-বাহিনীর তৎপরতা, বড়দিনের সময় সিকিমে চীনা সৈন্যের অনুপ্রবেশ ও চীনের প্রধানমন্ত্রীর ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তি গণমনে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। অবস্থাটা অত্যন্ত ঘোরালো এবং ভবিষ্যৎ কতকটা অনিশ্চিত, এরূপ আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে।

কমিউনিস্ট নেতাদের গ্রেপ্তারে প্রথম দিকে কিছুটা বিস্ময়ের সৃষ্টিও হয়েছিল কারো কারো মনে। পার্টির পক্ষ থেকে তাকে কাজে লাগাবার চেষ্টাও করা হয়েছিল। তাঁদের মতে কেরলের নির্বাচনে বামপন্থীদের কোণঠাসা করাই সরকারের উদ্দেশ্য। তা' ছাড়া, দেশের ক্রমবর্ধমান সমস্যার কোন সুরাহা করতে না পেরে সরকার জনমনের মোড় ফিরিয়ে দেওয়ার কৌশল হিসেবেই কমিউনিস্টদের ওপর এমন অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়েছেন।

কমিউনিস্টদের এই পাঁতি সাধারণ মানুষ গ্রহণ করে নি। চীন-ঘেঁষা বামপন্থী কমিউনিস্টদের ১৯৫৯ সাল থেকেই সন্দেহের চোখেই সকলে দেখে আসছে। চীনের ভারত আক্রমণের পর এ দলের কার্যকলাপকে দেশবাসী দেশদ্রোহিতার সামিল বলেই গণ্য করেছিল। সে সময়ে এঁদের বিরুদ্ধে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন না করায় গণমন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। তাদের সে সংশয় যে একেবারে অমূলক নয়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দের বেতার ভাষণই সে সাক্ষ্য আজ দিচ্ছে।

শ্রী এ কে গোপালন, শ্রী পি সুন্দরায়া, শ্রী পি রামমূর্তি, শ্রীবাসবপুন্নিয়া, শ্রীমোহিত মৈত্রে, শ্রী বি টি

শ্রীগুলজারীলাল নন্দ

রণদিভে প্রমুখ প্রায় সাত শ' জনকে এ পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তারের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে এবং পরে বেতার ভাষণে শ্রীগুলজারীলাল নন্দ জানিয়েছেন, বামপন্থী কমিউনিস্ট দলের নেতৃবৃন্দ দেশের মধ্যে সশস্ত্র সংগ্রাম ও গেরিলা যুদ্ধ চালাবার জন্য দলের সাধারণ সদস্যদের ও অনুগামীদের তৈরি করছিলেন। বামপন্থী কমিউনিস্টদের লক্ষ্য হচ্ছে, ভারতে আবার চীনা আক্রমণ আরম্ভ হলেই দেশের অভ্যন্তরে একটা বিদ্রোহ সৃষ্টি করে এক ধরণের সাঁড়াশী অভিযানের সাহায্যে ভারতের গণতান্ত্রিক সরকারের উচ্ছেদ সাধন।

১৯৬২ সালে এরূপ একটা মতলব করা হয়েছিল। শ্রীনন্দ বলেছেন, ১৯৬২ সালের ২৪শে অক্টোবর চীনা আক্রমণ যখন চলছে, তখন বামপন্থী কমিউনিস্ট নেতারা পশ্চিম বাংলায় এক সভায় সমবেত হয়ে এ অভিমত প্রকাশ করেন যে, সমাজতন্ত্রী দেশ চীনের পক্ষে অন্য রাষ্ট্রের এক ইঞ্চি জমি দখল করাও সম্ভব নয়। চীনকে আক্রমণকারী বলা উচিত না। তারা ভারতকেই

শ্রীগোপালন

আক্রমণকারী বলে অভিহিত করেন। এরূপ মনে করার কারণ রয়েছে যে, চীন সরকার ভেবেছিলেন ভারত আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ আরম্ভ হয়ে যাবে; তখন সাঁড়াশী অভিযান চালিয়ে ভারত সরকারকে নাস্তানাবুদ করা সম্ভব হবে।

শ্রীনন্দের বক্তব্য থেকে একথাই প্রমাণ হচ্ছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার চীন-ভারত সম্পর্কের বর্তমান অবস্থাকে অত্যন্ত গুরুতর বলে মনে করেন। সরকার চীনের অনমনীয় মনোভাব ও ভারতের চীনাপন্থী কমিউনিস্টদের গতিবিধি পর্যালোচনার পর চীন ভারত আক্রমণের তোড়জোড় চালাচ্ছে এ সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হয়েছেন। চীনের প্রধানমন্ত্রী শ্রীচৌ-এন-লাই সুর পাল্টেছেন। কলম্বো প্রস্তাবের দাম এখন কাণাকড়িও নয়। দম্ভভরে তিনি পিকিং-এ জাতীয় গণ-কংগ্রেসে বলেছেন, চীন ভারতের পশ্চিম সীমান্তের জবরদখল জায়গা ছেড়ে নড়বে না। ম্যাকমেহন লাইনের দক্ষিণে নব্বই হাজার বর্গ কিলোমিটার ভারতের জমির ওপর দাবিটাও আবার সকলকে জানিয়ে দিয়েছেন।

এরপর কোন সরকারই রাষ্ট্রের নিরাপত্তার ব্যাপারে উদাসীন থাকতে পারে না। যারা রাষ্ট্রদ্রোহী কার্যকলাপে লিপ্ত, দেশের শত্রুর প্রশংসায় যারা পঞ্চমুখ এবং শত্রুর সাহায্যে যারা পুষ্ট তাদের সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন না করে পারেন না। এ কাজ আরও আগে করা উচিত ছিল। কেন করা হয় নি তার জবাবও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, গণতন্ত্রে কিছুদূর পর্যন্ত প্রশ্রয় দেওয়া হয়; কিন্তু যখন গণতন্ত্রই বিপন্ন হয়ে পড়ে তখন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়।

• • •

নেপালের রাজা মহেন্দ্র আসছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের অধিবেশনে যোগ দিতে। প্রতিষ্ঠানটির কাঠামো

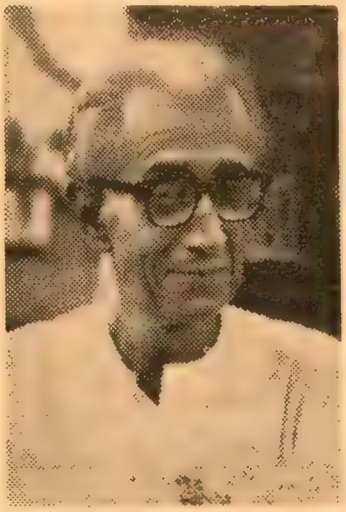

শ্রীমোহিত মৈত্র

সাংস্কৃতিক হলেও, এর লক্ষ্য রাজনৈতিক। এরূপ বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। রাজনীতিতে এ সংস্থার প্রভাবের কথা আজ আর অজানা নেই। সাধারণ মানুষের কমিউনিস্টদের মতই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রতি ঘোর বিতৃষ্ণা রয়েছে। সেই প্রতিষ্ঠানের অধিবেশনে নেপালের রাজার উপস্থিতির সংবাদে নয়াদিল্লীর উদ্বেগও স্বাভাবিক।

• • •

জানুয়ারী মাসের আট তারিখে কাঠমুণ্ডুতে ভারতীয় শিল্প-সম্ভার ও চারুকলার একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন হচ্ছে। বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীমানুভাই শাহ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন। সে সময়ে নেপালের রাজধানীতে ভারতের গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরও সমাবেশ হবে।

রাজা মহেন্দ্র এই সময়ে আচার্য বিনোবা ভাবেকেও পেতে চান। তিনি নাকি ভারত সরকারকে একথা জানিয়েছেন। ভূদান নেতার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে নেপালের সর্বত্র।

নেপালের সুদূর পল্লী অঞ্চলের মানুষের চিত্ত পর্যন্ত তিনি জয় করেছেন। নেপালের সংস্কারমূলক কাজে তাঁর নেপাল পরিদর্শন সহায়ক হবে বলেই অনেকের ধারণা।

• • •

শ্রীনন্দ হায়দ্রাবাদে আরেকটি সত্য উদ্‌ঘাটন করেছেন। তিনি যা' বলেছেন দেশবাসীর কাছে তা অজানা ছিল না। সরকারের তরফের স্বীকৃতির আগে দেশের মানুষ যত সত্য কথাই বলুক না কেন, সরকারী দপ্তরে তা' গ্রাহ্য হয় না। সত্যের উদ্‌ঘাটন বলাই শ্রেয়।

তিনি বলেছেন, আমরা যা' খাচ্ছি তা' আসলে কি জানি নে। বিশ্বাস করে যা' খাচ্ছি আদপেই সে জিনিস আমাদের পেটে যাচ্ছে না। আজ ভেজাল শিল্পই দেশে প্রাধান্য লাভ করেছে।

রাজা মহেন্দ্র

এই ভেজালের রাজত্বে নির্ভেজাল কিছুই যে আমরা পাচ্ছি নে, এ বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ। ভেজালের মাত্রা কতটা এবং কোনটা আদপেই ভেজাল না' সঠিকভাবে কেউ বলতে পারবেন না। শ্রীনন্দ এ ভেজাল প্রতিরোধের কি ব্যবস্থা করছেন সে প্রশ্ন আর তুলবো না। একথা আজ নিঃসংশয়ে বলতে পারি, রাজনীতিকে নির্ভেজাল করতে না পারলে খাঁটি মাল বাজারে আসবে না।

* * *

গ্রেট বৃটেনের উচ্চশিক্ষা বিষয়ক কমিটীর চেয়ারম্যান, প্রখ্যাত বৃটিশ অর্থনীতিবিদ লর্ড রবিন্স নয়াদিল্লীতে এসেছিলেন। রাজধানীতে অবস্থানকালে তিনি স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে বহু সরকারী ও বে-সরকারী ব্যক্তি ও সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর সঙ্গেও তিনি সাক্ষাৎ করেন।

উড়িষ্যা ঃ

বেশ সমারোহের সঙ্গে সর্বপ্রকার ঠাট বজায় রেখেই কটকের ইউনিয়ান ক্লাব প্রাঙ্গণে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের চল্লিশতম অধিবেশন হয়ে গেল। ভারতের বিভিন্ন এলাকা থেকে শ' চারেক প্রতিনিধি এসেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে উড়িষ্যার প্রভাব থেকে সুরু করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক চুলচেরা বিচারও সমবেত সাহিত্যিকদের ভাষণে প্রকাশ পেয়েছে। বাংলা সাহিত্য শাখার সভানেত্রী শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী নবীন সাহিত্যিকদের জীবনধর্মী হতে আহ্বান জানিয়েছেন।

আমার উপজীব্য মানবজীবনের শাশ্বত অমৃতকথা হলেও সাহিত্যের কালাতীত সত্য বিচারে আমি একান্ত অক্ষম। কাজেই সাংবাদিক হিসেবে আমার সামনে সাময়িক যে চিত্র ধরা পড়েছে, তাই আমি তুলে ধরছি।

সম্মেলনের মূল সভাপতি ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষা-

● শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী

বিদ্বেষের সর্বনাশা রূপটি উদ্ঘাটিত করে তাঁর ভাষণে হিন্দী নবীশদের ভাষাগত অসহিষ্ণুতার দিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, শত শত সমস্যা ও অসঙ্গতির মধ্যে ধর্মগত বিদ্বেষের প্রতিস্পর্ধী এক নতুন ধরণের মনোভাবের এবং কর্মপদ্ধতির আবির্ভাব, প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব বিগত দশ বৎসরের মধ্যে ভারতের বহু স্থলে নতুন উৎপাতের মত দেখা দিয়েছে—যেটির ইংরেজী নামকরণ হয়েছে 'লিঙ্গুইজম'; এর বাংলা করতে পারা যায় 'ভাষা-বিদ্বেষ' অথবা 'ভাষাবিষয়ক অসহিষ্ণুতা'। এর ফলে, বিহারে ও উত্তর প্রদেশে বাংলাভাষী ছাত্র ও অন্য ব্যক্তির নতুন নতন নানা অসুবিধা বিদ্যালয়ের শিক্ষা থেকে আরম্ভ করে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে ও দিচ্ছে; এর ফলে ব্যাপকভাবে আসামে 'বঙ্গাল-খেদা' আন্দোলন ও তার পরিণতি—আসামে নির্লজ্জ নিষ্ঠুর এবং জাতীয়তা বিধ্বংসী নারকী কাণ্ড, বাঙালীমেধ যজ্ঞ স্বাধীন ভারতের অন্যতম কলঙ্ক।

ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের এই ভাষণ একটি মূল্যবান দলিল হিসেবেই বিবেচিত হবে। ডঃ চট্টোপাধ্যায় উক্ত ভাষা-বিদ্বেষের পরিণতির কথা প্রসঙ্গে ধর্মগত বিদ্বেষের উল্লেখ করেছেন। সেই সঙ্গে সাহিত্যিক-সমাজের গোষ্ঠীগত রেষারেষি কথাটা সমবেত সাহিত্যিকদের শুনিয়ে দিলে ভাল করতেন। কটকের নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে নাকি গোষ্ঠীগত কোঁদলটাই প্রকট হয়ে উঠেছিল। যাঁরা বিশেষ কোন সংবাদপত্র গোষ্ঠীর সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছেন না, তাঁরা এ সমাজের কেউ নন। সাহিত্যিকদের আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণের ব্যাপারেও অভিযোগ যে না শোনা যায়, তা নয়। অনেক সময় দেখা যায়, প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকরাও সম্মেলনের কাছ থেকে তেমন কোনো সাড়া পান না। একথা কে অস্বীকার করবে যে, নিখিল ভারত

● ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, বাংলা দেশের সাহিত্যিক সমাজের সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্যিকদের ভাবের

আদান-প্রদান। এ মহৎ কার্যের দ্বারা সাহিত্য-সংস্কৃতির মাধ্যমে জাতীয় সংহতিও সাধিত হবে।

তবু বলা দরকার, এবারের সম্মেলন থেকে যে সুর ভারতের দিগদিগন্তে প্রতিধ্বনিত হয়েছে, তা ভারতের প্রতিটি চিন্তাশীল ব্যক্তিকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছে। ভারতের বর্তমান সর্বপ্রধান সমস্যার বিষয় হচ্ছে ভাষা। এই ভাষার দ্বন্দ্ব ও কোনো বিশেষ ভাষার প্রাধান্যে অপরাপর ভাষার অবনতি কিংবা বিনাশ অসম্ভব নয়। সেই সঙ্গে জাতীয় সংহতির বিনষ্টির কথা চিন্তা করলে আশঙ্কায় যে-কোনো ভারতপ্রাণ ব্যক্তির গা শিউরে উঠবে। এই সব কথা বিচার করলে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও বরেণ্য সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়ের (যাঁর প্রথম রচনা ওড়িয়া ভাষাতেই প্রকাশিত হয়েছিল) ভাষণ উদগ্র হিন্দী-সেবীদের কিছুটা জ্ঞান দান করবে। একমাত্র সম্মেলনের মাধ্যমে এই সুর সারা ভারতের জনমানসকে নাড়া দেওয়ায় এবারের সম্মেলনের গুরুত্ব সুচিরকাল স্বীকৃত হবে।

মহারাষ্ট্র ঃ

মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী-মহলের বিরোধীরা

● শ্রীচ্যবন

আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছেন। মহারাষ্ট্র প্রদেশ কংগ্রেসের নাগপুরের সাম্প্রতিক অধিবেশনে উভয় পক্ষ প্রকাশ্যেই মাথা ঠোকাঠুকি একদফা করে নিয়েছেন।

এখন দেখা যাচ্ছে 'বসন্তরাও নায়েক বিরোধী' নাটক সযত্নেই রচিত হয়েছে। এ অভিনয়ের প্রধান চরিত্র মনে হচ্ছে শ্রীওয়াই বি চ্যবন। এর প্রধান উদ্দেশ্যই হল মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনায়েককে জব্দ করে গদীচ্যুত করা এবং সুকৌশলে এ রাজ্যের রাজনীতিতে শ্রীচ্যবনকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা।

গত ১৩ই ডিসেম্বর পাটনার অধিবেশনে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে যে ধরণের বাক্যবাণ নিক্ষেপ করেছেন তাতে বিরোধের ক্ষেত্রটা আরও বেশি করে প্রশস্ত হয়েছে। মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সমালোচকদের শাস্তি দানের সুপারিশ একসময় যাঁরা করেছেন আজ তাঁরাই হচ্ছেন সমালোচকদের উৎসাহ-দাতা। এর তাগিদটাও এসেছে শ্রীচ্যবনের কাছ থেকেই। মহারাষ্ট্র কংগ্রেসের সমালোচনা করে তিনি বলেছেন, আজ কংগ্রেস যে পরিস্থিতিতে এসে পৌঁছেছে তাতে দলে নেতৃত্বের অভাব, এ কথা অনুভব করতে মানুষ বাধ্য। এ মন্তব্য সমালোচকদের নতুন করে উৎসাহিতই করেছে।

খাদ্যনীতির ওপর আলোচনা-কালে একদল সদস্য শ্রীতালেয়ার খানের খাদ্যনীতির তীব্র সমালোচনা করেছেন। শ্রীতালেয়ার খানের নীতি কোনদিনই মুখ্যমন্ত্রী সমর্থন করতে পারেন নি। দলীয় কোঁদলের ভয়ে তিনি সে নীতিকে নাকচও করতে পারেন নি। সেদিনের আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী পরোক্ষভাবে সমালোচকদের সমর্থনই করেছেন। তিনি বলেছেন, খাদ্যনীতি সফল হয় নি আশানুরূপভাবে। কাজেই এ বিষয়ে পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন হবে। শ্রীচ্যবন, প্রদেশ কংগ্রেস প্রধান

● শ্রীনায়েক

শ্রীবিনায়ক রাও প্যাটেল ও তাঁদের অনুগামীরা শ্রীতালেয়ার খানকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য তক্ষুণি এগিয়ে এসে-ছিলেন।

এ পক্ষের যুক্তিতে অবশ্যি কোন ফাঁক নেই। কোন নীতির ব্যর্থতার জন্য কেবল বিভাগীয় মন্ত্রীই দায়ী হতে পারেন না—দায়ী সমগ্র মন্ত্রিসভা। শ্রীচ্যবনের এ যুক্তি কেউ অস্বীকার করবেন না। মন্ত্রিসভাকেও তা শেষ পর্যন্ত মাথা পেতে নিতে হয়েছে। খাদ্যনীতি নিয়ে তালেয়ার খানের জেদের কথাটা তুললে এবং দলীয় কোঁদলের জন্য এ ব্যাপারে মন্ত্রিসভার অসহায় অবস্থাটা সেই সঙ্গে উদ্‌ঘাটিত হওয়া উচিত ছিল।

মুখ্যমন্ত্রীর প্রগতিশীল মতবাদ, তাঁর প্রশাসনিক পদ্ধতি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে তিনি শাসনকার্যে সুনাম অর্জন করেছেন। এ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেও দল গঠনে তিনি তাঁর বিরোধী-দের মত দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন নি। কাজের মানুষ দল রক্ষার—সমর্থক-দের নিয়ে সুসংবদ্ধ রক্ষীদল গঠনের চিন্তায় সর্বদা মশগুল থাকতে পারেন না। কিন্তু এ কাজটি করতে না পারলে —নিরপেক্ষতা বিসর্জন দিয়ে, সততার

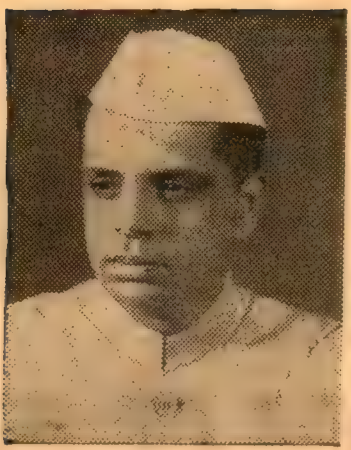

● শ্রীতালেয়ার খান

পথ থেকে সরে দাঁড়িয়ে উপদলীয় রাজনীতির বিতৃষ্ণা বিসর্জন না দিতে পারলে শেষরক্ষা করা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত কষ্টসাধ্যই হয়ে উঠবে।

মধ্যপ্রদেশ ঃ

চতুর্থ পরিকল্পনাকালে বড় ও মাঝারী সেচের দিকে অধিক নজর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রাজ্য সরকার। পঁচিশ কোটি টাকা ব্যয় করে চল্লিশটি মাঝারী পরিকল্পনা রূপায়ণের প্রস্তাব সরকারের আছে। সাত কোটি পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য।

হাসদেও, তাওয়া, হালালী, সিন্ধ, পরভাতী, দেন্যা, ভোলাপতনম, সুতিয়ায় অঞ্চলের পঞ্চাশ লক্ষ একর জমিতে সেচের আয়োজন হবে। এ সব পরিকল্পনা রূপায়ণে ব্যয় হবে দেড় শ' কোটি টাকা।

আসাম ঃ

পার্বত্য জেলা সম্পর্কে প্রস্তাবিত নেহরু পরিকল্পনা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা আবার দানা বাঁধতে সুরু করছে। মিজো জেলার সাম্প্রতিক উপনির্বাচনই তার প্রধান বিবেচ্য বিষয়। মিজো জেলার আইজল কেন্দ্র থেকে যিনি নির্বাচিত হয়েছেন তিনি নির্দলীয় প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও, আসলে তিনি ছিলেন মিজো ইউনিয়নের মনোনীত প্রার্থী। তাঁর নিকট-প্রতিদ্বন্দ্বীও ঠিক তেমনি পূর্ণ সমর্থন পেয়েছিলেন মিজো জাতীয় ফ্রন্টের।

আইজলের আসনটি আগে মিজো ইউনিয়নের দখলেই ছিল। তখন ইউনিয়ন ছিল সর্বদলীয় পার্বত্য নেতৃসম্মেলনের একটি অংশ। পার্বত্য রাজ্য গঠনের দাবিতে সর্বদলীয় নেতৃসম্মেলন পরে বিধানসভা পরিত্যাগের আহ্বান জানালে আইজলের সদস্য পদত্যাগ করতে অসম্মত হন। তিনি বহাল তবিয়তে ছিলেন বেশ কিছুদিন। রাজ্য সরকার তাঁকে পাবলিক সার্ভিস কমিশনে নিযুক্ত করার পর নতুন করে উপনির্বাচন প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

মিজো ইউনিয়নও ইতিমধ্যে সর্বদলীয় পার্বত্য নেতৃসম্মেলন থেকে সরে গিয়ে মিজো রাজ্য গঠনের দাবি তোলে। ১৯৬৩ সালের উপনির্বাচনে মিজো জাতীয় ফ্রন্ট বিধানসভার দুটি আসন দখল করে। সাধারণ নির্বাচনে তারা একটি আসন না পেলেও 'স্বতন্ত্র মিজো রাজ্যের' ধ্বনি তুলে উপনির্বাচনে দু-দুটি আসন লাভ করতে দেখেই মিজো ইউনিয়ন সম্ভবত তাদের মত পাল্টাতে বাধ্য হয়। মিজো জাতীয় ফ্রন্টের দাবি অত্যন্ত ব্যাপক। তাদের মতে মিজোরা বাস করে মণিপুর, উত্তর কাছাড়, ব্রহ্মদেশ ও পূর্ব-পাকিস্তানে। মিজো ইউনিয়ন পররাষ্ট্রের দিকে নজর না দিয়ে মিজো জেলা, মণিপুর ও উত্তর কাছাড়ে বসবাসকারী মিজোদের অঞ্চল নিয়ে ভারতীয় ইউনিয়নে একটি মিজো রাজ্য গঠনের দাবি তুলেছে। এ দাবি নেহরু পরিকল্পনা থেকে স্বতন্ত্র।

নেহরু পরিকল্পনার সমর্থক সর্বদলীয় পার্বত্য নেতৃসম্মেলনের সঙ্গে মিজো জেলার যাঁরা যুক্ত তাঁরা এককালে ছিলেন আধা-সামন্ত। জেলার সব জমি-জমার মালিক ছিলেন তাঁরাই। মিজো সমাজের তাঁরাই ছিলেন নায়ক। গণ-আন্দোলন তাঁদের সামাজিক অধিকার কেড়ে নিয়েছে। জমি-জমার একচেটিয়া মালিকানাও তাঁরা হারিয়েছেন। সাধারণ মিজোরা এখনও এঁদের আচার-আচরণ সম্পর্কে সন্দিগ্ধ। সর্বদলীয় পার্বত্য নেতৃসম্মেলনের মনোনীত প্রার্থীর এরপর উপনির্বাচনে জয়ের কোন সম্ভাবনাই থাকতে পারে না।

উপনির্বাচনের ফলাফল থেকে এই প্রমাণ হচ্ছে, মিজো জেলার মানুষ নেহরু পরিকল্পনার সমর্থক মোটেই নয়। বিধানসভার তিনজন সদস্যই নেহরু পরিকল্পনার বিরোধী।

গারো, মিকির ও উত্তর কাছাড়ীদের মধ্যে গরমিলই বেশি। জয়ন্তিয়া নেতারা নেহরু পরিকল্পনা তেমন পছন্দ করেন না। খাসিয়ারা সর্বদলীয় পার্বত্য নেতৃসম্মেলনের আদর্শে বিশ্বাসী। অবিলম্বে নেহরু পরিকল্পনার রূপায়ণই তাঁদের কাম্য। নেহরু পরিকল্পনা কার্যকরী না হলে তাঁদের অস্তিত্ব নিয়ে টানাটানি সুরু হবে বলে খাসিয়া নেতাদের ধারণা।

মণিপুর, ত্রিপুরা, মিজো জেলা, উত্তর কাছাড় এবং কাছাড় জেলার কুকীর শীগগিরই মণিপুরে মিলিত হচ্ছে। এ সম্মেলনের উদ্যোক্তারা সকলেই তরুণ। ছাত্রসমাজও রয়েছে তাঁদের সঙ্গে। মিজো জেলা, কাছাড়ের পশ্চিমাঞ্চল, উত্তর কাছাড়ের পার্বত্য এলাকা, মিকির পাহাড়ের একটা অংশ, নাগাভূমির দক্ষিণাঞ্চল, মণিপুরের পার্বত্য এলাকা এবং ত্রিপুরার পূর্বাঞ্চল নিয়ে সুসংহত কুকী রাজ্য গঠনের দাবিতে এঁরা নতুন সংগঠন গড়ে তুলবেন।

ভারত সরকার নেহরু পরিকল্পনাকে রূপ দেবার জন্য কমিশন গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাড়াতাড়ি কমিশন নিয়োগ করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। বেশি দেরি হলে পার্বত্য অঞ্চল আরও চঞ্চল হয়েই উঠবে। তাতে সঙ্কট আরও বাড়বে।

• মাথা হেঁট করে ইতালীর প্রধানমন্ত্রী আলডো মোরো (বাঁয়ে) রোমের চিগি প্রাসাদে নবনির্বাচিত প্রেসিডেণ্ট সারাগাতের সঙ্গে করমর্দন করছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঃ

পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে চীন যে এশিয়ার বুকে কী সর্বনাশ ডেকে এনেছে এখন ক্রমশ তা টের পাওয়া যাচ্ছে। মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, গুয়াম থেকে একটা প্রচণ্ড শক্তিশালী পোলারিস সাবমেরিন রওনা হয়ে গেছে যা চীনের কাছাকাছি টহল দেবে। ডুবো জাহাজটির নাম হল 'ড্যানিয়েল বুন'। এতে ১৬টি এ-২ পোলারিস ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে এবং এর পাল্লা হল ১৮০০ মাইল। অর্থাৎ চীনের মূল ভূখণ্ডের প্রায় অর্ধেক দূর পর্যন্ত ওই ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা যাবে। শুধু তাই নয় এর শক্তি এত বেশি যে, সবারই অলক্ষ্যে জলের তলায় যে-কোন জায়গা থেকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এটা পারমাণবিক আঘাত হানতে পারবে। মার্কিন গভর্নমেণ্টের পক্ষ থেকে একথাও বলা হয়েছে যে, দূর পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে টহল দেবার জন্যে যে ৭টি সাবমেরিন তৈরি করার কথা ছিল, 'ড্যানিয়েল বুন' হল তাদেরই পুরোধা। আগামী দু' মাসের মধ্যে আরো একটা পোলারিস সাবমেরিন তৈরি হবে---তখন তার পাল্লা হবে ২৮০০ মাইল।

পারমাণবিক অস্ত্রবাহী সাবমেরিন তৈরির সিদ্ধান্ত অবশ্যি মার্কিন সরকার বহু আগেই নিয়েছে এবং গত সেপ্টেম্বর মাসেই প্রতিরক্ষা সচিব রবার্ট ম্যাকনামারা এ-ধরণের ঘোষণা করেছিলেন। অর্থাৎ মার্কিন সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে, চীনের পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের সঙ্গে আমেরিকার পারমাণবিক সাবমেরিন গঠনের কোন যোগাযোগ নেই। তা হয়তো না থাকতে পারে, কারণ চীনের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার সঙ্কল্প মার্কিন সরকারের বহুদিন আগে থেকেই ছিল। মার্কিন প্রতিরক্ষা প্রকল্পে চীনের স্থান গোড়া থেকেই ছিল। কিন্তু একথা তো সত্যি যে, চীন পারমাণবিক বোমা না ফাটালে এত তাড়াতাড়ি মার্কিন সরকার পারমাণবিক অস্ত্রবাহী সাবমেরিন বাহিনী গঠনে হাত দিতেন না। এশিয়ার সমুদ্রে এই ভয়ঙ্কর সাবমেরিনগুলো বিচরণ করার মানে হল সমগ্র মহাদেশই বিপন্ন হওয়া। ভারত সহ শান্তিকামী ও পারমাণবিক অস্ত্রহীন সমস্ত দেশ যখন পরমাণুমুক্ত অঞ্চল গঠনে উদ্যোগী, তখন চীন পারমাণবিক অস্ত্রের কসরৎ দেখাতে গিয়ে কার্যত নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাই ভঙ্গ করেছে। পারমাণবিক অস্ত্রের যাতে বিস্তৃতি না ঘটে সকলেই যখন সেদিকে সচেষ্ট, তখন নতুন করে পারমাণবিক এলাকা প্রসারে সহায়তা করে চীন কি এশিয়া ভূখণ্ডে নতুন উৎপাত ডেকে আনলো না?

ইন্দোনেশিয়া ঃ

ইন্দোনেশিয়া একটা ইতিহাস রচনা করল, যদিও তাকে গৌরবজনক না বলে কলঙ্কময় বলাই ভালো। সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদে সে ইস্তফা দেবে। রাষ্ট্রসংঘের স্বস্তি পরিষদে মালয়েশিয়াকে আসন দেওয়ার প্রতিবাদেই ইন্দোনেশিয়া এ-ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তটি নিয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের ২০ বছরের ইতিহাসে এ-ঘটনা অভূতপূর্ব। ইতিপূর্বে এই বিশ্বসংস্থার কোন সদস্য রাষ্ট্রই তার সদস্যপদ ত্যাগ করে নি, যদিও এ-ধরণের হুমকী একাধিকবার বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে উচ্চারিত হয়েছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতিনিধি স্বস্তি পরিষদের সদস্যপদ থেকে অবসর গ্রহণ করলে যখন সেই শূন্য পদটি মালয়েশিয়াকে দেবার প্রস্তাব উত্থাপিত হয় তখনি প্রেসিডেণ্ট সোয়েকার্নো হুমকী দিয়েছিলেন যে, প্রস্তাবটি কার্যকরী হলে ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্রসংঘের সদস্য-পদ ত্যাগ করবে। ১লা জানুয়ারী যখন সত্যি মালয়েশিয়া স্বস্তি পরিষদের সদস্য পদ লাভ করল ইন্দোনেশিয়া সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্কল্প বাক্য রক্ষা করেছে। ফলে রাষ্ট্রসংঘে এখন বেশ সংকটাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

মালয়েশিয়ার প্রশ্নে ইন্দোনেশিয়ার বিরোধিতা গোড়া থেকেই। তার নাকের ডগায় সাম্রাজ্যবাদীদের ঘাঁটি তৈরি হোক ইন্দোনেশিয়া এ অবস্থাকে কোনদিনই মেনে নিতে রাজী ছিল না।

তাই সে বার বার মালয়েশিয়া সৃষ্টির বিরোধিতা করে এসেছে। রাষ্ট্র সৃষ্টি হবার পরও প্রেসিডেণ্ট সোয়েকার্নো 'crush Malayasia' শ্লোগান তুলে আকাশ-বাতাস গরম করে রেখেছিলেন। এমন কি মালয়েশিয়ার সীমান্তে প্যারাসুট বাহিনীকে নামিয়ে দিয়েও ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়াকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে কসুর করে নি। ইন্দোনেশিয়া মনে করে যে, বৃটেন-আমেরিকা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কমিউনিজমের প্রসার রোধ করার নামে একটা শক্ত ঘাঁটি রচনা করছে যার আসল লক্ষ্য সমৃদ্ধশালী ইন্দোনেশিয়া। তাই সে প্রাণপণ চেষ্টা করছে মালয়েশিয়া ফেডারেশনের উচ্ছেদ করতে। কিন্তু কিছুতেই যখন প্রেসিডেণ্ট সোয়েকার্নো সফল হতে পারেন নি, তখন এই কূটনৈতিক অস্ত্রটি প্রয়োগ করলেন। মালয়েশিয়াকে ইন্দোনেশিয়া এখনো স্বীকৃতি দেয় নি। কিন্তু অতেও মালয়েশিয়ার উন্নতি ব্যাহত হয় নি, বরং বৃটেন-আমেরিকার অ_ুগ্রহে তার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে বলে শোনা যাচ্ছে। আর এখানেই হল ইন্দোনেশিয়ার ক্ষোভের কারণ।

ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্রসংঘ ছাড়ল কেন? দুটো কারণ হতে পারে: প্রথমত সে দেখেছে যে, রাষ্ট্রসংঘে থেকে তার সুবিধে হচ্ছে না 'মালয়েশিয়া ধ্বংস কর' কর্মসূচী কার্যকরী করতে। বরং রাষ্ট্রসংঘের সদস্যেরা তাকে কঠোর সমালোচনা করছে। অন্যতম সদস্য হিসেবে সংস্থার প্রতি ইন্দোনেশিয়ার কয়েকটি নৈতিক দায়িত্বও রয়েছে। কাজেই সদস্যপদে ইস্তফা দিলে তার নীতির কোনো বালাই রইলো না—এ-ধার ।ার বশবর্তী হতে পারেন প্রেসিডেন্ট সোয়েকার্নো। দ্বিতীয়ত চীনের পরামর্শেই ইন্দোনেশিয়া তার এ-সিদ্ধান্তটি নিতে পারে। চীন রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদ এখানো লাভ করতে পারে নি। রাষ্ট্রসংঘের

• সোয়েকার্নো

প্রতি তার কোনো দায়িত্বও নেই। গত কিছুকাল ধরে ইন্দোনেশিয়াকে চীনের ক্রীড়নকে পরিণত হতে দেখা গেছে---কায়রো সম্মেলন তার একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চীনের প্রতিভূ হিসেবে ইন্দোনেশিয়াকে খাড়া করার একটা বাসনা চীনের থাকতে পারে। তাই ইন্দোনেশিয়াকে এ-অঞ্চলের নেতৃত্বের লোভ দেখিয়ে তাকে দাবার বোড়ের মতো পরিচালনা করছে চীন। ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি অ-কমিউনিস্ট দেশগুলির মধ্যে বৃহত্তম। এ পার্টিটি চীনাপন্থীই শুধু নয়, ইন্দোনেশিয়া ও প্রেসিডেন্ট সোয়েকার্নোর ওপর তার প্রভাব যথেষ্ট। এমন কি তাঁর পররাষ্ট্রনীতিও কমিউনিস্ট পার্টির অনুমোদনসাপেক্ষ বলে অনুমান করার কারণ রয়েছে। কাজেই চীনের এশিয়াতে যেমন নেতৃত্ব করার মোহ রয়েছে, তেমনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইন্দোনেশিয়াকে তার ভাইস ক্যাপ্টেন করার লোভ দেখিয়ে চীন রাষ্ট্রসংঘ থেকে ইন্দোনেশিয়াকে সরিয়ে এনেছে বলে মনে হয়।

সে যাই হোক, ইন্দোনেশীয় সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য। টুঙ্কু আবদুল রহমান অবশ্যি বলেছেন যে, ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রসংঘ

ত্যাগ করার ফল ভালই হবে। কিন্তু সত্যিই কি তাই? ইতিমধ্যেই বৃটেন উচ্চতম সামরিক পুরুষদের এ অঞ্চলে পাঠিয়ে দিয়েছে। আর পাঠিয়েছে এক ব্যাটালিয়ন সেনানী। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যে সংকট ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেজন্যেই সেক্রেটারী জেনারেল ইউ থাণ্ট ইন্দোনেশিয়ার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন শুভবুদ্ধি দেখাতে, তার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে। মনে রাখতে হবে যে, সংঘর্ষ যদি হয়, তা কেবল মালয়েশিয়া-ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে আর সীমিত থাকবে না, তা ছড়িয়ে পড়বে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে চীন যেমন খাল কেটে কুমীর এনেছে, এশিয়ার জলে পোলারিস সাবমেরিনের বিচরণের মাধ্যমে তেমনি ইন্দোনেশিয়া ও বৃটেনকে নাক গলাতে সহায়তা করেছে এশীয় ব্যাপারে।

ইন্দোনেশিয়া যদি মনে করে যে সদস্য পদ ত্যাগ করে সে খুব লাভবান হবে তাহলে ভুল করবে। নৈতিক দায়িত্ব অস্বীকার করলেও বিশ্ব-জনমত তাকে মেনে নিতেই হবে। যেমন মানতে হয়েছিল বৃটেন-ফ্রান্সকে ১৯৫৬ সালে সুয়েজ সংকটের প্রশ্নে।

আরো দুঃখের হল, ইন্দোনেশিয়ার এ কাজের ফলে আফ্রো-এশীয় সংহতি বিপন্ন হবার আশঙ্কা রয়েছে। তা যদি হয় তবে তার সমগ্র দায়িত্ব ইন্দোনেশিয়ারই।

ইতালী ঃ

প্রধানমন্ত্রী আলডো মোরোর নাম দিয়ে জর ছাড়ল, শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেণ্ট একজন পাওয়া গেছে। গত ডিসেম্বরের গোড়ায় আন্তোনিয়ো সেনি প্রেসিডেণ্টের পদ ত্যাগ করলে এখানে নতুন প্রেসিডেণ্টের সন্ধান সুরু হয়। নিয়ম হচ্ছে ব্যালটের মাধ্যমে প্রার্থীদের ভাগ্য পরীক্ষা করা। কিন্তু এক্ষেত্রে ইতালী পৃথিবীতে নতুন একটা রেকর্ড করেছে। দু-দশবার নয়, একুশবার ব্যালট নিয়ে তবে সাফল্য অর্জিত হয়েছে। রেকর্ড এজন্যে যে, ইতিপূর্বে ১৯৬২ সালে প্রাক্তন প্রেসিডেণ্ট নবম ব্যালটে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। আর ১৯৫৩ সালে ফরাসী প্রেসিডেণ্ট রেনে কোটি ১৩ বারের ব্যালট যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছিলেন। এবার ইতালীর গিসেপ সারাগাত ২১ বারের ব্যালটে বিজয়-তিলক পরলেন কপালে। এ অবস্থার সম্মুখীন ইতালীকে হতে হতো না, যদি এখানে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে

* আয়ুব খাঁ।

খেয়ো-খেয়ি এত তীক্ষ্ণ না হতো। একে ৯৬৩ জন সেনেটর, ডেপুটী এবং আঞ্চলিক প্রতিনিধির মধ্যে অধিকাংশ বা ৪৮২টি ভোট যিনি পাবেন তাঁরই প্রেসিডেণ্ট পদ লাভের বিধি, তার ওপর বহুসংখ্যক রাজনৈতিক দল এবং তাদের মতের অস্থিরতা—এগুলিই প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনকে বিলম্বিত করেছে।

প্রেসিডেণ্ট সারাগাত ডেমোক্রাটিক সোস্যালিস্ট দলের একজন বিশিষ্ট নেতা। ইতিপূর্বে তিনি এখানকার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মতবাদের দিক থেকে তাঁকে বাম-ঘেঁষা মধ্যপন্থী বলা যায়। প্রেসিডেণ্টের শপথ নেবার পর সারাগাত দেশের সামনে তিনটি কর্তব্যের কথা বলেছেন। কর্তব্যগুলো হল (১) শান্তির জন্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (২) স্বাধীন সংস্থাগুলির সংহতি এবং (৩) সামাজিক ন্যায়বিচার। এ ছাড়া তিনি নিয়ন্ত্রিত নিরস্ত্রীকরণ, আন্তর্জাতিক সমঝোতা ও সহিষ্ণুতার ওপর জোর দেন। প্রেসিডেণ্ট সারাগাত একথাও বলেছেন যে, শান্তিরক্ষার জন্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংহতির প্রয়োজন।

পাকিস্তান ঃ

ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খাঁ প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হয়েছেন, বিরোধী দলের প্রার্থী মিস ফতেমা জিন্না ২১ হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হয়েছেন। যদিও এ-ফলাফল অপ্রত্যাশিত ছিল না, তবুও পাকিস্তানের প্রগতিশীল অংশ ফলাফল শুনে হতাশ হয়েছে। হতাশ হয়েছে এজন্যে যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতাটা দুজন ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে ছিল না, ছিল দুটো মতবাদের মধ্যে। সংগ্রাম ছিল স্বৈরতন্ত্র ও একনায়কত্বের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র ও গণমুক্তির। স্বৈরাচারী শাসনের প্রতীক আয়ুবের জয়লাভে তাই পাকিস্তানের প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক মানুষেরা হতবাক হয়ে গেছে।

নির্বাচনের যেটুকু ফলাফল জানা গেছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, আয়ুব খাঁ পেয়েছেন মোট ৪৯ হাজার ৬ শ' ৪৭টি ভোট আর মিস জিন্না পেয়েছেন ২৮ হাজার ৩ শ' ৪৩টি ভোট। পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানে আয়ুব খাঁ যেখানে পেয়েছেন যথাক্রমে ২৮,৯২৭ এবং ২০,৭২০টি ভোট, সেখানে ফতিমা পেয়েছেন ওই দুটি অংশে যথাক্রমে ১০,২৬৩ ও ১৮,০৮০টি ভোট। অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের সংগ্রামী জনতা আয়ুবের বিরুদ্ধে ফতেমাকে বিশ্বাসঘাতকতা করে নি, যদিও এখানে আরো বহু ভোট ফতেমা আশা করেছিলেন।

তবে নির্বাচনের এ-ফলাফল আগে থেকেই আঁচ করা গিয়েছিল, যদিও ব্যবধান সম্পর্কে কেউ স্থির-নিশ্চয় ছিলেন না। কারণ ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসের সেই অশুভ দিনটি থেকেই, যেদিন তদানীন্তন প্রেসিডেণ্ট ইস্কান্দার মির্জা শাসন-ব্যবস্থা বাতিল করে দিয়ে সামরিক পুরুষদের হাতে দেশের শাসনভার তুলে দিয়েছিলেন, সেদিন থেকেই গণতন্ত্রের সামনে চরম সঙ্কট ঘনিয়ে আসতে থাকে। ইস্কান্দারকে অবশ্যি কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে বেশিদিন না যেতেই, ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খাঁ প্রেসিডেণ্টের গদী লাভ করে অচিরেই ইস্কান্দার মির্জাকে গদীচ্যুত করলেন। বিলাতের এক হোটেলের ম্যানেজারি করে ইস্কান্দারকে এখন পাপের বেতন গুণতে হচ্ছে।

ইস্কান্দারকে সরিয়েই আয়ুব নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি, দেশের রাজনৈতিক নেতাদের টিট করতে না পারলে তাঁর সোয়াস্তি নেই। তাই কুখ্যাত 'এবডো' আইন চালু করে রাজনৈতিক নেতাদের ৬ বছরের জন্যে রাজনৈতিক জীবন থেকে নির্বাসিত করলেন। অর্থাৎ শাসনক্ষমতা হাতে নিয়েই সামরিক পুরুষ আয়ুব পুরো সামরিক কায়দায় শাসন চালিয়ে যেতে লাগলেন। গ্রেপ্তারী লাঞ্ছনা অত্যাচার আর কিছুই বাদ রাখলেন না আয়ুব। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করতেও তিনি ছাড়েন নি। তারপর জনগণকে উপহার দিলেন এক তথাকথিত শাসনতন্ত্র—মৌলিক গণতন্ত্র ইত্যাদি। প্রেসিডেণ্টের শাসনের নামে আয়ুব দেশে প্রকৃতপক্ষে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন। কাজেই এ-হেন সরকারের কাছে পাক জনগণ বেশি কিছু আশাই করতে পারে না। আয়ুব খাঁ যখন গদগদ কণ্ঠে নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেছিলেন তখন অনেকেই আশান্বিত হয়েছিলেন—পাকিস্তানে প্রথম নির্বাচন। উৎপীড়িত জনগণ হয়তো একটা সুযোগ পাবে তাদের নিজেদের সরকার কায়েম করতে। কিন্তু সে আশায় ছাই পড়েছিল যখন শোনা গেল যে, নির্বাচন প্রত্যক্ষ হবে না। প্রথমে বেসিক ডেমোক্রাট নির্বাচিত হবেন, তাঁরাই প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন। এ হিসাবে পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যা যেখানে প্রায় ১০ কোটি, সেখানে মোট ৮০ হাজার বেসিক ডেমোক্রাটের ভোটেই প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হবেন। তবুও প্রগতিশীল পাক জনগণ হতোদ্যম না হয়ে ৯ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে সম্মিলিত বিরোধী দল গঠন করলেন আয়ুবের বিরুদ্ধে নির্বাচন লড়ার জন্যে। মিস ফতিমা জিন্না হলেন তাঁদের প্রার্থী।

নির্বাচনী প্রচার করতে গিয়ে পাকিস্তানে দু' দলের মধ্যে যে-ধরণের দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়েছে এ-রকমটি পৃথিবীর আর কোথাও কখনো হয়েছে বলে এ সংবাদদাতার জানা নেই। এবং আয়ুবের পক্ষে যেভাবে সরকারী প্রশাসনযন্ত্র ও বেতার ব্যবহৃত হয়েছে তারও তুলনা নেই। কাজেই এ অবস্থায় মিস ফতেমা জিন্নার পক্ষে জয়লাভ করাটা প্রায় অসম্ভব ছিল।

যা হবার তা হয়েছে। মুক্তিকামী পাক জনগণের সামনে এখন আরো কঠোর পরীক্ষা। তাঁদের আরো পাঁচ বছর ধৈর্য ধরতে হবে দ্বিতীয় ও চরম আঘাত হানার জন্যে। তার জন্যে এবারে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি তাঁদের ছিল তারও সংশোধন করতে হবে, প্রগতিশীলদের মৈত্রীবন্ধন দৃঢ়তর করতে হবে। ওদিকে নির্বাচনের ফলাফল আয়ুব খাঁর যদি চক্ষু উন্মীলন করে তবেই মঙ্গল। তিনি যদি সুযোগ পেয়ে বিরোধীদের শাস্তি দিতে বা হামলা করতে চেষ্টা করেন তবে প্রচণ্ড ভুল করবেন। বরং যে কারণে পাকিস্তানের এতবড় অংশ তাঁর বিপক্ষে ভোট দিয়েছে তা অনুসন্ধানে সচেষ্ট হন এবং জনগণের অভাব-অভিযোগ মেটাতে অগ্রসর হন, তবেই তাঁর পাঁচ বছরের মেয়াদ শান্তিপূর্ণ হতে পারে।

শুভমুক্তি শুক্রবার ৮ই জানুয়ারী
দুটি তৃষিত হৃদয়ের আর্তকান্নার এক
আবেগমথিত চিত্রকাব্য !!
অসিত সেনের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি
মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রযোজিত
গিল্ড ফিল্মস্-এর

ভূমিকায় : বিশ্বজিৎ - জ্যোৎস্না
সুমিতা - শেখর - শ্যামল
রুমা গুহঠাকুরতা
পরিচালনা : অসিত সেন
সঙ্গীত : শ্যামল মিত্র
শ্রী - প্রাচী - ইন্দিরা
পার্বতী ॥ অলকা ॥ অশোকা
(হাওড়া) (শিবপুর) (বেহালা)
নিউ তরুণ ॥ বাটা সিনেমা ॥ শ্রীমা
(বরাহনগর) (বাটানগর) (খড়দহ)
নিউ লাইট ॥ নৈহাটি সিনেমা
(ইছাপুর) (নৈহাটি)
আর, ডি, বি এণ্ড কোং রিলিজ

আঁধার মানিক

ধারাবাহিক উপন্যাস

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ পঁচিশ ॥

"হাজারে হাজারে ঘোড়া উঠাএ একি বারে।
মারা হারা কইরা আইসে কাছাইতে নারে ॥"

'এ এক বেয়াড়া জাত। মুখে 'হর হর' ধ্বনি, কিন্তু কাছে এসে যুদ্ধ করে কই? এমন যুদ্ধ দেখি নি কখনো। আমরা যাই, ওরা দূর দিয়ে গ্রাম পোড়াতে পোড়াতে যায়, এক ঘোড়া মাত্র বাহন, একখানা নাঙ্গা তলোয়ার, কোমরে থলেবাঁধা বেসনের লাড্ডু, ছাতুর মিঠাই।'

বলতে বলতে মাথা নাড়লে লোকটি, বললে 'রাজা জানকীরামের কাছে নিশ্চয় নিয়ে যাব ঠাকুর, কিন্তু বলে যাও ত', কবে দেশের অবস্থা আবার আগের মত হবে?'

'দেশের অবস্থা কবে আগের মত হবে?' এ-প্রশ্ন জানকীরামও স্বয়ং করেন।

স্বরকণ্ঠের উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস। প্রশ্নটি করলেন সন্ধ্যের মুখে, ঘোড়ার পিঠে বসে সূর্যপ্রণাম সেরে নিতে নিতে। সামনে, অনতিদূরে নবাবের ফৌজ যায়। উদ্দেশ্য কাটোয়া যাওয়া, অবস্থা বড়ই সঙ্গীন, অন্যে পরে কা কথা, বর্গীদের উৎপাতে গ্রামের পর গ্রাম উৎখাত। তাই স্বয়ং নবাবও নাকি উপবাসী।

'পয়সা দিলে জিনিস মেলে না, চাল, ডাল, তেল, লবণ, আনাজপাতি সবই সোনারদরে বিকোচ্ছে, তবু পাওয়া দুষ্কর। মুখোমুখি যুদ্ধ করে না, গ্রামগুলো পোড়ায়, না, এমন যুদ্ধরীতি আমি আর দেখি নি।'

স্বরকণ্ঠ একটু হাসলেন। বললেন, 'যা হোক, এরা বুদ্ধি রাখে। হাতী-ঘোড়া তাঁবু-কটক সাজতে সাজতে আপনাদের দেরি হয়, ওরা ততক্ষণে এগিয়ে যায়।'

'বড়ই বর্বর।'

'আসলে ওরা জিততে চায়, যেন তেন প্রকারে জয়লাভ করাই উদ্দেশ্য। গ্রাম পোড়াবার কথা কি বলছেন, আমি ত' দেখলাম ওরা হতে সব ধ্বংস হবে।'

'সব ধ্বংস হবে।'

'সব ধ্বংস হবে, আমি দেখলাম গৃহস্থের উঠোন ভেঙে সৈন্য যাবার পথ হয়েছে, ছেঁচতলায় শেয়াল হাড় নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে। এ কলিতে আর কি হবে, এই সেদিন শুনলাম আশ্চর্য ঘটনা, মন্দিরে পুজো হচ্ছে এমন সময়ে কুকুর ঢুকে শিবলিঙ্গ অপবিত্র করলে। এর মানে কি বুঝতে পারেন?'

নবাবের বক্সী আড়চোখে তাকান। এখন স্বরকণ্ঠকে বড়ই প্রয়োজন তাঁর। কিছুদিন আগে যখন উড়িষ্যায় যুদ্ধ হল, তখন তাঁর সৌভাগ্যরবি যেন চড়চড় করে উঠছিল, মনেও হয় নি কোনদিন অবস্থার পরিবর্তন হবে।

প্রৌঢ় বক্সী চারদিকে তাকিয়ে

জনশূন্য গ্রামপথ, দগ্ধ ধানের গোলা, পরিত্যক্ত দেবালয় দেখেন। চারদিকে কি নিরানন্দ, সন্ত্রাসের চেহারা। অথচ কিছুদিন আগেও ভাবেন নি তাঁর সামনে কোন দুঃখের দিন আছে। তিনি ধীরে বলতে লাগলেন, 'সেদিন আপনাকে গণে দেখবার জন্য কোষ্টিপত্র দিয়েছিলাম তার কারণ, ভেবেছিলাম সামনে এখন সৌভাগ্যের দিন।'

'কেন, আমার গণনা মিথ্যা হয় নি, সেদিনের বক্সী, আজ সংকটকালে দেওয়ান হয়েছেন। চারপাশের সর্বনাশের দিকে চাইবেন না, কেন না অনেকের পক্ষে সময়টি অশুভ, আপনার পক্ষে শুভ, মিছে মন ভারী করে লাভ নেই।'

'কিন্তু বর্তমানে এ দেওয়ানী আমার পক্ষে কণ্টকশয্যার সামিল হয়েছে। নবাবকে মিনতি করে বললাম, এক কোটি টাকা চায়, তাই দিই, হাতে হাতে চল্লিশ লক্ষ, পরে ষাট লক্ষ দেওয়া যাবে, কিন্তু দেশকে রাহুমুক্ত করুন।'

'তিনি তাঁর উপযুক্ত কাজ করেছেন। মাথা একবার নোয়ালে আবার তোলা যায় না।'

'এমন অবস্থায় পড়ব কে ভেবেছিল। পুজোপার্বণে উপবাস করি সে-এক কথা, আর এমন করে ওদের কৌশলে শুকিয়ে মরতে হবে কে ভেবেছিল।'

সুরকণ্ঠ জবাব দিলেন না। এমনভাবে যেতে তাঁর মন্দ লাগছে না। সেদিন ছিলেন স্ব-গ্রামে, ছোট সুখদুঃখে জড়িয়ে। আজ ঘটনার তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে চলেছেন কাটোয়া অভিমুখে। ছোট নদী যেন বড় নদীতে পড়লে আর ইচ্ছেমত যেতে পাবে না, নদীর স্রোতে স্রোত মিলিয়ে ভাসতে ভাসতে সাগরপানে ধায়, সুরকণ্ঠ আজ পিসীমার মৃত্যুর পর অশৌচের পোষাকে, খালি পায়ে, মাথা উঁচু করে কোথায় চলেছেন? এ রাজায় রাজায় যুদ্ধ, সন্ন্যাসীর সেখানে ঠাঁই কোথায়? এ যুদ্ধের পরিণতি কি? নিয়তির বিধানে তিনি কোন্ বৃহৎ পরিণতির দিকে চলেছেন?

'আপনি জ্ঞানী, দ্রষ্টা, পণ্ডিত। বলুন, দেশের এ দুর্দিন কবে কাটবে? কবে আবার আগেকার অবস্থা ফিরে পাব?'

প্রশ্নটি সুরকণ্ঠের কাছে পরম কৌতুকের ঠেকল। তিনি উচ্চকণ্ঠে হেসে তখনি গম্ভীর হন। বলেন, 'কোনদিন না।'

'কোনদিন না। বর্গীরা কি তবে, মনে করেন এ দেশে বসত করতে এসেছে?'

'তা কেমন করে বলব? তবে এ দেশের মাটিতে সোনা ফলে, এ পর্যন্ত যারাই ব্যবসা করতে এসেছে তারাই রয়ে গেছে। ফিরে কেউই যায় নি।'

'এরা যদি থেকে যায়, তাহলে অবশ্য----'

'তা আমি কি করে জানব?' সুরকণ্ঠ ঈষৎ ভুরু কুঁচকোলেন। বললেন, 'সেজন্যে আমি কথাটা বলি নি। আপনি বললেন কবে আবার আগেকার অবস্থা ফিরে পাব? আমি বললাম কোনদিনও না।'

'কেন, যুদ্ধ মিটে গেলেও সব আগেকার মত হবে না?'

'কেমন করে হবে বলুন?' সুরকণ্ঠ আরো গম্ভীর হন। 'তাঁর রাজত্বে পুরোন বলে কিছুই নেই। তাঁর সৃষ্টিতে সব সমুখপানে চলেছে। নতুন পাতা, নতুন ফুল, নতুন ফল, সব তিনি নতুন করে সৃষ্টি করেন। এমন ক্ষেত্রে, আমি কেমন করে বলব বলুন, যে আবার আগেকার অবস্থা ফিরে আসবে? শিব, শিব।'

সুরকণ্ঠের সঙ্গে কথা বলা এখন আর উচিত নয় জেনেও নবাবের বক্সী সাগ্রহে বলেন, 'কাটোয়া পৌঁছেই আপনার সঙ্গে ধীরে সুস্থিরে বসব। আপনার গণনার ফলাফল জানতে আমার বড়ই আগ্রহ। আপনার খ্যাতি জানি, আপনি যখন যা বলেছেন, কখনো ভুল হয় নি।'

'সবই তাঁর ইচ্ছা।'

'মীর হবিব বন্দী হল, সঙ্গে সঙ্গে বর্গীর দলে জোর বাড়ল। এখন সে কি খবরাখবর দিয়ে সাহায্য করে কে বলবে। সেদিন অবধি সে এ-পক্ষের লোক ছিল, সুলুক-সন্ধান, সবই তার জানা।'

'এখন অনেক অসম্ভব কাণ্ড হবে। আসলে ঘোর কলি। চারদিকে দুর্লক্ষণ, কাল যে বন্ধু ছিল, আজ সে শত্রু হবে, বাপ-ছেলেতে মারামারি হবে, মানুষ যেখানে হাত রাখে সেটিই ময়লা করে।' সুরকণ্ঠ নিঃশ্বাস ফেললেন, 'কলি কবে ছিল না, এতবড় মহাভারতের যুদ্ধ হয় তার মূলেও ছিল লোভ, জেদ, হিংসে।'

সুরকণ্ঠের কথা নবাবের বক্সীর কানে বড়ই অপ্রাসঙ্গিক ঠেকে। কেন না তিনি বিষয়ী সংসারী লোক, বক্সী থেকে দেওয়ান হয়েছেন, এক রাজার পতন, অন্য রাজার উত্থান, এক রাজ্যের লয়, অন্য রাজ্যের অভ্যুদয় তাঁর মত মানুষদের কাছে কমলালয় গড়বার আহ্বান পৌঁছে দেয়। বহু মানুষের সর্বনাশ, বহু মানুষের অবস্থান্তর, দেশব্যাপী ভাঙাগড়ার ভেতর থেকে তাঁরা সে-কমলালয় গড়বার মালমশলা আহরণ করেন। তিনি উচ্চ সম্মানে থাকেন, এ-রাজ্যের একজন শ্রেষ্ঠ রাজপুরুষ, অন্যসময়ে সুরকণ্ঠের মত সামান্য ব্রাহ্মণ তাঁর কাছে আসবেন ও এমন সহজে আলাপ করবেন এমন কখনো হয় না।

কিন্তু তিনি প্রৌঢ়, ধর্মনিষ্ঠ হিন্দু। যেদিন থেকে ভাগ্য তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়েছে, সেদিন থেকে তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন গ্রহনক্ষত্রের কোন শুভ যোগাযোগের ফলেই এমনটি হয়েছে। হয়েছে যখন তখন গ্রহনক্ষত্রকে আরো প্রসন্ন করা প্রয়োজন। দেবদেবী, গ্রহনক্ষত্র, মকর-কেতু, তাঁদের রাজ্য মানুষের নাগালের বাইরে, সেখানে রাজা-বাদশার হুকুম চলে না। অতএব সুরকণ্ঠকে দরকার। সুরকণ্ঠকে দেখলে মনে আপনি বিশ্বাস আসে। নইলে মুর্শিদাবাদে গণক-জ্যোতিষীর অভাব নেই। গণক, জ্যোতিষী, পীর, ফকির, কারো দিনে রাতে সময় নেই। ব্যস্ততা

রাজপুরুষের চেয়েও তাঁরা ব্যস্ত। নবাব সরকারের রাজপুরুষরা তাঁদের ভক্ত, রাজপরিবারের বহু আত্মীয়স্বজন তাঁদের কথায় সম্পত্তি ক্রয়, সোরার গুদামে টাকা লগ্নী, পথের পাল্কী খরিদ, ইত্যাদি গুরুতর কাজে হাত দেন। তা ছাড়া বর্তমানে মুর্শিদাবাদ নগরী ছোটখাট আর একটি পৃথিবী বললেও হয়।

কেন না বাংলা কোন বিচ্ছিন্ন ভূ-খণ্ড নয়, আদিযুগ থেকে সমুদ্র পেরিয়ে, নদীপথে, হিমালয়ের দুর্গম বাধা উপেক্ষা করে হাটে-বন্দরে, মঠে ও সংঘারামে এসে বাইরের বৃহৎ-বিশ্ব বাংলার সুখদুঃখের খবর নেয়।

এখনো প্রতিবছর বাংলার অতি-সুলভ কাপড়, খাদ্যশস্য ও মশলা কেনবার জন্যে ভাগীরথীর বুকে সারিসারি নৌকো ভাসে ও মুর্শিদাবাদ, সৈদাবাদ, খাগড়া, কুঞ্জঘাটার ঘাটে এসে নবাবকে ঘাটমাশুল দেয়। সে নৌকোয়, বাণিজ্যতরণীতে আসে অগ্নি-উপাসক পারসীক, কৃষ্ণবর্ণ বিশালকায় আবিসীনীয়, ইসলামের পিতৃভূমি হতে আরব ব্যবসায়ী। চৈনিক, তুর্ক, মুর ও ইহুদী, আফগানিস্তানের উত্তর হতে কৃষ্ণ-সাগরের তীরবাসী জর্জীয়, রঙীন পোষাকপরা আর্মেনীয়, সকলে সন্ধ্যায় সমবেত হয় নগরের চকে। তারা ইংরেজ, জর্মান, ওলন্দাজ ও ফরাসীদের মত কুঠি ক'রে বাস করে না। আসে এবং চলে যায়। এখন পৃথিবীর সর্বত্র বৈশ্যযুগ। বাণিজ্য যেখানে, লক্ষ্মী সেখানে। তাই ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে কাশ্মীরী, মুলতানী, পাঠান, গুর্জরী, সিন্ধী, এমন কি তিব্বতী, নেপালী ও ভোট-ব্যবসায়ীরা সারা বছর-ধরে মুর্শিদাবাদের হাটে-বাজারে কেনাবেচা করে।

সকলেই দৈবে বিশ্বাসী, বাণিজ্য-ব্যবসা কিছুই দৈবের সাহায্য ছাড়া চলে না। সায়েব কুঠিয়ালরা অবধি জ্যোতিষী-গণকের সাহায্য ছাড়া চলাফেরা করেন না। মাঝে মাঝে এমন কাণ্ডও হয়, পেয়াদা পাঠিয়ে গণকের খোঁজ করতে হয়। গঙ্গার ঘাটে নিরিবিলি বসে কোন গেরুয়াধারী লোক বিশ্রাম করবে সে উপায় নেই।

সুরকণ্ঠ সে-জাতের নয়। বক্সী দেওয়ানের সঙ্গে যখন তাঁর প্রথম পরিচয়, তখন সুরকণ্ঠকে দিয়ে যাগ-যজ্ঞ করাবার ব্যবস্থা হচ্ছিল। বক্সী দেওয়ান, ফতেচাঁদ বা কুঞ্জঘাটার বাড়িতে যাগযজ্ঞ করতে জ্যোতিষীরা খুব আনন্দ পান, কেন না এ বৈশ্যযুগে লক্ষ্মী বলবতী, প্রতাপশালীর আশ্রয়ে থাকতে ভালবাসেন। এ-সব বাড়িতে সোনারূপো কথায় কথায় গড়াগড়ি যায়।

কিন্তু ভাবগতিক দেখেই সুরকণ্ঠ বেঁকে বসেন। সোজাসুজি বলে দাসেন, 'বিষ্ণুপুরে যাব, মায়ের গানে প্রসাদ পাব। গঙ্গাপারে যাব, কিরীটেশ্বরীর চরণ দর্শন করব, ও-সব যাগযজ্ঞে আমি নেই।'

সেখান থেকেই পালালেন সুরকণ্ঠ। শোনা গেল গঙ্গার ওপর দিয়ে লবণের নৌকো যাচ্ছিল, তাতে চেপে তিনি উজিয়ে নৈহাটীর দিকে গেছেন।

সুরকণ্ঠকে নির্লোভ জেনে সেই থেকে বক্সী দেওয়ানের তাঁর ওপর অচলা বিশ্বাস। তিনি নিজে অর্থ, প্রতিপত্তি বড় ভালবাসেন। ইচ্ছে হয় বাংলা দেশে তিনি এমন নাম করেন, যে মানুষ একডাকে চেনে। যে লোক এই সম্মান, প্রতিপত্তি, যশ, অর্থ, সবকিছু তুচ্ছজ্ঞানে ফেলে যায়, তাকে তিনি ভক্তি করেন।

সেই থেকে কোষ্ঠিপত্র করতে দিয়েছিলেন, আবো গুপ্তগণনার ভার দিয়েছিলেন, সুরকণ্ঠ বড় দেরি করে ফেললেন। দেখা হল যখন, তখন সময় বড় অশুভ। বর্গীর তাড়া খেয়ে তাঁরা কাটোয়া পালাচ্ছেন।

'অন্ন বিনা প্রাণ বাঁচে কই, বর্ধমানে, শেষে এমন অবস্থা হল যে, কলাগাছের শেকড়বাকল অবধি সেদ্ধ ক'রে খেয়েছে সবাই। এখন কতদিনে এ-বিপদ উদ্ধার হয়।'

সুরকণ্ঠের তখন হঠাৎ মনে পড়ল মহীপতি আচার্য সাহায্য আনছিলেন, কাছে আসতে পারেন নি।

সে-কথা শুনে বক্সী দেওয়ান হতাশায় হাতের তালু চিৎ করলেন। দু'দিকের দগ্ধ শস্যক্ষেত, পরিত্যক্ত গ্রাম তাঁর বুকে পাষাণের মত বিষণ্ণতা চাপিয়ে দিচ্ছে। অথচ যুদ্ধ মানেই সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, যুদ্ধ তাঁর চোখে নতুন নয়।

তাঁর চিন্তা কেমন ক'রে যেন সুরকণ্ঠের কাছে ধরা পড়ে যায়। সুরকণ্ঠ গম্ভীর গলায় বলেন, 'এতদিন যুদ্ধ দেখেছেন বিজয়ীর চোখে। এ দুঃখ-দুর্দশা চোখে দেখেছেন, মনকে স্পর্শ করে নি। এখন অবস্থা পাল্‌টে গেছে তাই মনে হচ্ছে কি দেখছেন চোখে।'

'রাইয়তের যদি এ অবস্থা হয়---'

'তবে?'

'আমাদেরই ক্ষতি। রাজাকে ধন কে দেবে চাষী ছাড়া।'

সুরকণ্ঠ এ-কথার জবাব চট ক'রে দেন না। চারিদিকে চেয়ে একটু হেসে বলেন, 'আপনি ভাবেন আপনি রাজ্য চালান, নবাব ভাবেন তিনি, কিন্তু রাজ্য আসলে চালায় ঐ হেলো-চাষা, তার লাঙল আর বলদ।'

এ-কথা শুনে বক্সী দেওয়ানের এত-দুঃখেও হাসি পায়।

'সন্ন্যাসী মানুষ, আপনি ত' এ-কথা বলবেনই। রাজ্য কিসে চলে তার আপনি কি বোঝেন?'

কষ্টসাধ্য যাত্রা, আহার নেই, চারদিকে শত্রু। তবু সুরকণ্ঠের এ-কথাটি তাঁকে আনন্দ দেয়। তিনি আবার হাসেন।

হঠাৎ পথের বাঁকে কাটোয়া নারী দেখা গেল।

(ক্রমশঃ)

● মানিকতলা মেন রোডের বর্তমান দৃশ্য।

॥ মানিকতলার নানাকালের উপকথা ॥

খাল-বিল-পোল এবং বাজার-পথ-বাসাবাড়ির যে-বেসামাল অস্তিত্বে প্রায় বিধ্বস্ত বর্তমান পরিবেশ—আদিপর্বে তার বৈপরীত্যই মূর্তিমান ছিল মানিকতলায়। তখন বাঁশবনের পাশে পাশে, কাঁটাবনের কাছে কাছে, এবং জলাভূমির ধারে ধারে ছিল কুঁড়েঘরের বসতি। যারা বাসিন্দা—দেহ তাদের পাহাড়ের মতো কঠিন, মন তাদের পাহাড়ি ঝর্ণার মতোই যেন উচ্ছল। তারা আলপথে হাঁটে কাল-কেউটের ফণা দ'লে, ঝোপে-ঝাড়ে বাঘের চোখে ধুলো দেয় যখন-তখন, এবং সুযোগ পেলেই লুঠেরাদের সঙ্গে লাঠি খেলে রাতের অন্ধকারে। বিপদ তাদের হাতের পুতুল, মরণ তাদের খেলার দোসর। তারা দীন নয়, তাই দুঃখের সঙ্গে ঘর করে নির্বিঘ্নে। দয়ার ঘাটে হাত পাতা তাদের স্বভাব নয়। তারা মাঠে মাঠে লাঙল চালায়, ঘরে ঘরে তাঁত বোনে, গাছে গাছে ফল ফলায়। তাদের সংসারের উঠোন বেয়েই দিন যায়, রাত আসে। রাত যায়, দিন আসে। গড়িয়ে যায় বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ। সুতরাং নানা যুগের পদসঞ্চারের পথকে প্রশস্ত করার প্রয়োজনেই যেন নিজেকে সংক্ষেপ করে জলাভূমি; পিছিয়ে যায় বাঁশের ঝাড়, কাঁটার ঝোপ। তাই এবার মাঠের পাশে ভেসে ওঠে আরও মাঠ, দিকে দিকে সবুজের স্বরগ্রামে চমকে ওঠে আরও সোনা। বসতির পাশে বসতি জাগে হাসতে হাসতে। এক ধর্মের সঙ্গে আরেক ধর্মের সমন্বয় ঘটে কোথাও আচারে, কোথাও বিচারে। সংঘবদ্ধ সমাজের ডালে ডালে সকুজনে নীড় বাঁধে শ্রী, শান্তি এবং আনন্দ। অবশ্য দুঃখও বাসা বাঁধে পাশাপাশি। কিন্তু এ-দুঃখ বহিঃশত্রুর মতো মারমুখী নয়, একান্ত প্রতিবেশীর মতোই সৌহার্দ্য-প্রয়াসী। তাই সুখ-দুঃখের প্রভেদ এখানে পরিমাপযোগ্য কিনা—বিচার করে না কেউ।

ঠিক এমনই দিনে, সেই-যে বিদেশী বণিক—যে কারো মতে ওলন্দাজ, কারো মতে পর্তুগীজ, সে হঠাৎ একদিন বাসা বাঁধতে আসে এখানেই। সারা বসতির দক্ষিণ-পশ্চিমে তখনো অবশিষ্ট ছিল যে-বনাঞ্চল, বণিক তা সংস্কার করে স্বল্পকালের মধ্যেই। তারপর বসবাসের প্রয়োজনে সেখানেই গ'ড়ে তোলে একটি কোঠাবাড়ি। বাড়ির সামনে পুকুর বসায়, বাগান সাজায়।

শ্রীপদাতিক

বণিক সাহেবের এই স্বরচিত পরিবেশ দিনে দিনে আকর্ষণ করে সারা লোকালয়ের বিস্মিত দৃষ্টি। আমোদে-উৎসবে সাহেব আমন্ত্রণ জানায় লোকালয়ের প্রত্যেককে। কেউ আসে, কেউ তফাৎ থাকে। তবু এভাবে প্রায় প্রতি বাসিন্দার সঙ্গেই সখ্য স্থাপন করার প্রয়াস পায় সাহেব।

বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর, সাহেব একদিন জমি ক্রয় করার অভিপ্রায় ঘোষণা করে সকলের সামনে। মজুর রেখে চাষাবাদ করবে বলেই সে বাসা বেঁধেছে এখানে। সুতরাং বিক্রি করার মতো জমি যাদের আছে, সাহেব তাদের মোটা টাকার লোভ দেখায়। কিন্তু এ-লোভের প্রতি তেমন উৎসাহ প্রকাশ পেলো না কোথাও। বরং সাহেবের এই প্রস্তাবের বিপক্ষে একজোট হলো প্রতিটি বাসিন্দা। তাদের ধারণা : সাহেব তাদের জমি কেড়ে নিয়ে, এখানে রাজত্ব করতে চায় তাদেরই ঘাড়ে ব'সে। সুতরাং এবার সাহেবের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখাতো দূরের কথা, বরং সাহেব যাতে এই লোকালয় ছেড়ে অন্যত্র চ'লে যেতে বাধ্য হয়—ভেতরে ভেতরে ঠিক তেমনই এক ব্যবস্থা অবলম্বন করার কথা চিন্তা করতে থাকে সবাই।

সাহেব ভাবলো : এ-পথে তার অভিপ্রায়ের সাফল্য সহজসাধ্য নয়। তাই এবার সে অবলম্বন করে ভিন্ন পথ। প্রকাশ্যে সে ঘোষণা করে : আর সে জমি কিনবে না। চাষাবাদের কোনো ইচ্ছাও আর তার নেই। কেবল সকলের বন্ধু হয়েই এখানে সে বসবাস করতে চায় শান্তিতে।

এই ঘোষণার পর, আবার প্রত্যেকের ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করে সাহেব।

দিন-কয়েকের মধ্যে প্রচেষ্টা তার কার্যকরীও হয়ে ওঠে বেশ। সরল [illegible] সবাই আবার সান্নিধ্যে আসে [illegible] তাকে তারা গ্রহণ করে আগের মতোই আবার আপন জন ব'লে।

এই সুযোগেরই প্রত্যাশায় ছিল ধূর্ত সাহেব। এবার কৌশলে সে প্রত্যেকের ক্ষুদ্র স্তর থেকে প্রায় পরমাত্মীয়ের পর্যায়ে এসে দখল করে নিজের আসন। তারপর ধর্মের ভিত্তিতেই সে প্রত্যেকের কানে কানে বিদ্বেষ প্রচার সুরু করে গোপনে। অর্থের বিনিময়ে জন-কয়েক দালালও সে সংগ্রহ করে বেছে বেছে। এ-সমস্ত দালালের মাধ্যমেই সে এক ধর্মাবলম্বীর ধর্মের ঘরে আগুন দিয়ে, দোষ চাপায় ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর ওপর। উদ্দেশ্য: বাসিন্দাদের মধ্যে যদি এভাবেই একটা চরম কলহের সূত্রপাত ঘটে, তাহলে তখন কিছু অর্থ ব্যয় করলে সে অনায়াসেই তাদের জমি দখল করার সুযোগ পাবে।

হলোও তা-ই। ধর্মভীরু সমাজের কাছে ধর্মটাই বড়ো। সুতরাং ধর্মের ঘরে আগুন জ্বলতেই আগুন জ্ব'লে ওঠে প্রত্যেকের মনে। মাঠে মাঠে থেমে যায় লাঙল, ঘরে ঘরে সুতো ছেঁড়ে তাঁতের। কেবল কে কার সর্বনাশ করবে কীভাবে—তারই ষড়যন্ত্রে সময় বয়ে যায় প্রত্যেকের। অতএব এই সুযোগে সাবধানে জাল ফেলে সাহেব। সে পরস্পরবিরোধী প্রতি-ধর্মাবলম্বীকেই অর্থ সাহায্য করে গোপনে। বিনিময়ে অজস্র জনের জমি বাঁধা পড়ে তার কাছেই। এই ধুরন্ধরের অভিসন্ধি কেউ বুঝলো না। ভুল বুঝে নিজেদের মধ্যে যে-চরম বিপর্যয়ের বান ডেকে আনলো প্রতিটি বাসিন্দা—দিনের পর দিন তারই প্রবল ঢেউ আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো সমগ্র অঞ্চলে।

ঠিক এমনই দিনে আরেকজন দূর-দেশীর আবির্ভাব ঘটে এ-অঞ্চলে। গৌরবর্ণ দীর্ঘ দেহ; আবক্ষ শ্মশ্রু, সারা মাথায় দুরন্ত কেশভার; উন্নত নাসা, প্রশস্ত ললাট; ধ্যান-গম্ভীর দীঘল চোখ। গায়ে তাঁর শুভ্র আলখাল্লা, হাতে জপের মালা। তিনি এ-অঞ্চলে এসেই তাঁর নিবাসক্ষেত্ররূপে নির্বাচন করেন এক বনস্পতির ছায়াতল। সেখানে বসেই তিনি নিমীলিত চোখে ধ্যান করেন কখনো, কখনো বা উন্মীলিত চোখ আদিগন্তে বিস্তার ক'রে আপন খেয়ালে বিভোর থাকেন একা। পাশ দিয়ে তাঁর হেঁটে যায় নানাজন, কিন্তু দেখেও দেখে না তাঁকে কেউ। তাঁরও খেয়াল নেই কোনোদিকে, নজর নেই কারো প্রতি। দিনে দিনে এভাবেই দিন কেটে যায় তাঁর জপের মালায়।

কিন্তু বেশিদিন নয়। একদিন তাঁর এই ঔদাসীন্যের অবসান ঘটে হঠাৎ—যেদিন তিনি তরুতল থেকেই সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেন দুটি পরস্পরবিরোধী দলের প্রচণ্ড সংঘাত। এ-দলের লাঠি ও-দলের মাথায় এবং ও-দলের লাঠি এ-দলের মাথায় ঝরছে অবিরাম। তাদের চিৎকার এবং আর্ত-চিৎকারে যেন সন্ত্রাসের ঢেউ কাঁপছে চারদিকে।----কয়েক মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে রইলেন সেই দূর-দেশী। তারপর একসময় হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন তিনি, দীর্ঘ পদক্ষেপে এগিয়ে চললেন নীরবে। কাছাকাছি আসতেই মেঘের মতো গর্জন ক'রে উঠলো তাঁর কণ্ঠ। সে-গর্জনে একসঙ্গে চমকে উঠলো সংঘর্ষে বৃত উভয় দল। হাতের লাঠি তাদের খ'সে পড়লো সঙ্গে সঙ্গেই এবং পরক্ষণেই যেন নিস্তব্ধতার তীরে এসে হঠাৎ সমাধিস্থ হলো বিপন্ন পরিবেশ।

উভয় দলের মধ্যস্থলে এসে দাঁড়ালেন সেই দূর-দেশী। তাঁর জ্যোতির্ময় মুখের দিকেই নিবদ্ধ উভয় দলের অজস্র অবাক চোখ। এক দলের কে একজন হঠাৎ সভয়ে তাঁকে প্রশ্ন করলো: আপনি কে বটে?

সঙ্গে সঙ্গেই প্রতি উত্তরে তিনি বললেন: আমি ফকির, কিন্তু ইনসান (মানুষ)। তোমরাও ইনসান। ইনসানিয়তের এক্তিয়ার আমাদের সকলের। সুতরাং আমরা সবাই সমান। আমাদের মধ্যে কোনো ভেদ নেই।

তাঁর এই কথা শুনেই একদলের জন-কয়েক চিৎকার করে ওঠে: তাহলে ওরা আমাদের ধর্মের ঘরে আগুন দিলো কেন?

সঙ্গে সঙ্গে অপর দলেরও দু-একজন পাল্টা অভিযোগের সুরে বলে: ওরাই বা আমাদের বিগ্রহ চুরি করলো কেন?

ফকির তাঁর উদার দৃষ্টির স্নেহের ছায়া মেলে দেন প্রতিজনের চোখে চোখে। তারপর ধীর-স্থির কণ্ঠে আবার বলেন: কেউ কারো ঘরে আগুন দেয় নি, কেউ কারো বিগ্রহ চুরি করে নি। তোমরা সবাই নির্বোধ, অতএব নেক্‌বন্দ্ (নিষ্পাপ)। গুনাহগার (পাপী) কেবল একজনই আছে তোমাদের গাঁয়ে—যার সব খবরই আমি পেয়েছি। কীভাবে পেলাম জিজ্ঞেস করো না। তোমরা এসো, আজ সেই শত্রুকে তোমাদের চিনিয়ে দেবো আমি।

ফকির এগিয়ে চললেন। পেছনে পেছনে তাঁকে অনুসরণ ক'রে চললো উৎসুক জনতা। ফকির এসে থামলেন বণিক সাহেবের সেই কোঠাবাড়ির সামনে। খবর পেয়েই অন্দর থেকে বাইরে ছুটে এলো সাহেব। কিন্তু ফকিরের চোখের দিকে তাকাতেই সে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। ফকির তার সারা গায়ে বার-কয়েক হাত বুলোতেই আবার তার জ্ঞান ফিরে এলো তখনই। জ্ঞান ফিরতেই কী-এক দৈবানুভূতির বিষম আঘাতে কাতর হয়ে উঠলো সাহেব। সুতরাং আর্তস্বরেই সে সকলের সামনে স্বীকার করলো তার সমস্ত অপরাধ এবং সে-মুহূর্তেই সে গ্রাম ছেড়ে চ'লে যাবে বলে প্রতিশ্রুতি দিলো ফকিরকে।

তারপর? সেদিন সে-লোকালয় ছেড়ে সত্যিই চ'লে যেতে হলো সাহেবকে। তার কোঠাবাড়িটাকেও একটা অশুভের প্রতীক ভেবে ধূলিসাৎ করলো উত্তেজিত জনতা। তারপর সবাই তারা দল বেঁধে এগিয়ে এলো সেই তরুতলে—যেখানে ইতিমধ্যেই ফিরে এসেছেন ফকির। ফকিরের সামনে

নতজানু হয়ে বসলো সবাই। তাদের মঙ্গল কামনায় উদাত্তকণ্ঠে একবার মনাজাৎ (প্রার্থনা) করলেন ফকির। তারপর সবার উদ্দেশেই তিনি প্রসারিত করলেন তাঁর হাত। হাত নয়, যেন নির্ভয় শরণ—যেখানে অশান্তির কোনো বসতি স্থাপন অলীক।

এই ফকিরেরই নাম সৈয়দ হোসেন-উদ্দীন শাহ্। দিনে দিনে হিন্দু-মুসলমানের অতি প্রিয়জন হয়ে ওঠেন তিনি। তিনি কারো পীর এবং কারো দেবতাই শুধু নন, প্রতিজনের তিনি বুকের মাণিক—আলোয় যার অন্ধকার স'রে যায় অজ্ঞানের, ভয়ের এবং দুর্ভাবনার। সুতরাং মাণিক নামেই তাঁকে অভিহিত করে গুণমুগ্ধ ভক্তের দল। তিনি মাণিক অথবা মাণিকপীর। সাধারণের মনে এ-নামেই তিনি স্থায়ী আসন লাভ করেন ব'লে শেষে সমগ্র অঞ্চলেরও নামকরণ হয় মাণিকতলা।

হিন্দু-মুসলমানের শ্রদ্ধার নৈবেদ্য গ্রহণ ক'রে অনেককাল বেঁচে ছিলেন মাণিকপীর। যেদিন তাঁর দেহান্তর ঘটে, শোনা যায় সেদিন থেকে পর পর সাতদিন নাকি উনোন জ্বলে নি কোনো গৃহে।

যাই হোক, হিন্দু-মুসলমানের মিলিত অর্থেই দরগা গ'ড়ে ওঠে তাঁর সমাধির ওপর। তারপর দরগাকে কেন্দ্র ক'রেই বসতি এগিয়ে আসে আরও কাছে। পীর নেই, তাঁর দরগা আছে। তাই পীরের উদ্দেশে দরগার দ্বারে এসেই এবার বাড়ি দান করতে সুরু করে সাধারণ মানুষ। তাদের বিশ্বাস: পীরের অপার মাহাত্ম্যের কোনো অভাব নেই দরগায়। সুতরাং পরিশুদ্ধ মনের নিবেদন যদি গভীর হয়, তবে আবেদন পূরণ করবে দরগাই।

তারপর সময় এগিয়ে চলে। দেখতে দেখতে অতিক্রান্তি লাভ করে আরও কয়েকটি যুগ। যুগে যুগে দরগার খাদেম বা সেবায়েতরূপে যাঁরা নিযুক্ত হন, আজ তাঁদের অনেকেরই কোনো ইতিহাস বা হদিস নেই কোথাও, তবে

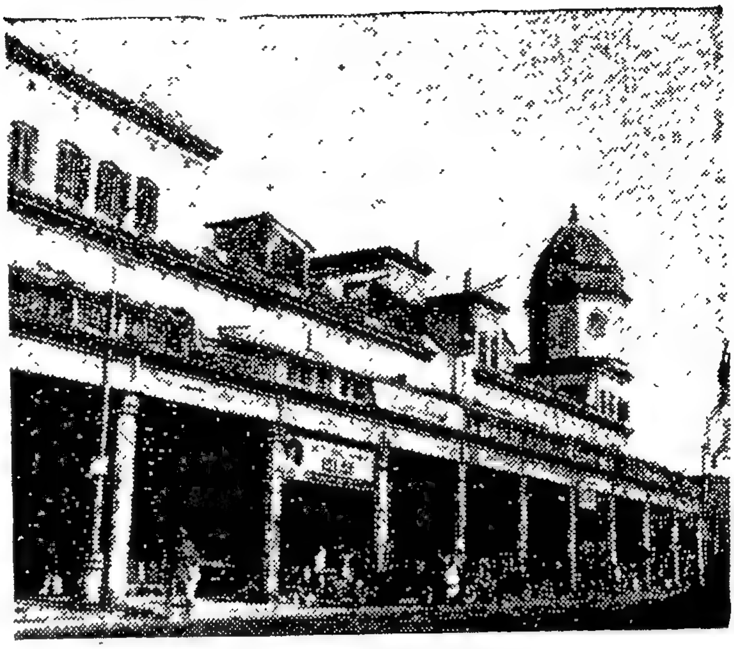

মাণিকতলা বাজারের বহির্দৃশ্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের একজন খাদেমের ইতিহাস আজও দুষ্প্রাপ্য নয়। এই খাদেমের নাম দীন-দারা। সম্ভবত তিনি ভারতীয় নন, মালয়দেশীয়। কিশোর বয়সে তাঁকে মালয় দেশ থেকেই দাসরূপে ক্রয় করে একজন ইংরেজ ব্যবসায়ী। কালক্রমে সেই ইংরেজ ব্যবসায়ী আসে কলকাতায় এবং দীন-দারাও আসেন তার সঙ্গে। পায়ে তাঁর লোহার বেড়ি, দেহে তাঁর অজস্র ক্ষত। তিনি গোলাম। অতএব কাজে কোনো ত্রুটি ঘটলেই গোলামের ওপর মনিবের যে-অত্যাচার সুরু হতো—তা এককথায় আদিম বর্বরতা বললেও সম্পূর্ণ বলা হয় না। সম্ভবত দিনের পর দিন এমন অত্যাচার আর সইতে না-পেরেই সেই ইংরেজ ব্যবসায়ীর কলকাতার বাসা থেকে একদিন পালিয়ে আসেন দীন-দারা। তখন তাঁর বয়স মাত্র পনেরো বছর। পালিয়ে এসেই তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন মাণিকপীরের দরগায়। ওদিকে তিনি নিখোঁজ হওয়ায় তাঁর মনিব তাঁকে চোর সাব্যস্ত ক'রে বিজ্ঞাপন দেয় তদানীন্তন ক্যালকাটা গেজেটে। উক্ত বিজ্ঞাপনেই তাঁর বয়স, আকৃতি এবং সারা দেহের ক্ষত চিহ্নের বর্ণনা করা হয় বিশদভাবে। ঘোষণা করা হয়: যে তাঁর সন্ধান দিতে পারবে, তাকে পুরস্কৃত করা হবে পঞ্চাশ টাকা। সেকালের ক্যালকাটা গেজেটের উক্ত ইংরেজী ভাষার বিজ্ঞাপনটি এই:

'Missing, since the night of 2nd instant, a slave boy, named Din Darah, of about fifteen ... is marked on the back and arms with the scars of a number of small burns, had an iron ring on one leg, which, though he may have taken off, the chaffing must be discernible; his gait is slow; if confused, has an impediment in his speech. He is a stranger in this part of the country, and from his having no money, must soon offer for service. Any person who will deliver him at No. 1, Larkins Lane, shall receive a reward of fifty Sicca Rupees. Should he offer for employ, any gentleman who will send him as above directed will confer a particular obligation on his Master, who will, if he returns voluntarily forgive this offence.

Any information that can be given respecting him will thankfully received.'

এই বিজ্ঞাপন পাঠ ক'রে অনেকেই সেদিন পঞ্চাশ টাকার লোভে দীন-দারার অনুসন্ধানে বের হয়। কেউ কেউ তাঁর দর্শনও পায় পীরের দরগায় এসে। কিন্তু দরগা বলেই সেখান থেকে তারা বলপূর্বক তাঁকে আকর্ষণ করতে সাহসী হয় নি। তবে তারা খবর পাঠায় তাঁর মনিবের কাছে। মনিব এসেই সনাক্ত করে গোলাম দীন-দারাকে। তারপর সে-ই তাঁকে দরগা থেকে বাইরে টেনে আনার চেষ্টা করলে সদলবলে বাধা দেয় স্থানীয় বাসিন্দারা। সম্ভবত এই বাধাপ্রাপ্তির ফলেই হোক, অথবা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক, গোলাম দীন-দারার দাবি পরিহার ক'রে সেদিন স্থায়িভাবেই ফিরে যায় শ্বেতাঙ্গ মনিব।

সেই থেকে দরগার পাশেই একটি কুঁড়েঘর তুলে বসবাস করতে থাকেন দীন-দারা। তারপর পরিণত বয়সে দরগার একজন খাদেমরূপেই নিযুক্ত হন তিনি। যতদিন বেঁচে ছিলেন, একজন একনিষ্ঠ খাদেমরূপে দরগার পাশেই ছিলেন তিনি নিরলস। তিনি মৃত্যুও বরণ করেন সেখানেই। তবে মৃত্যুর পর তাঁর মরদেহের সমাধি ঘটে কোথায়—আজ তা গবেষণা করার দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নয় কারো পক্ষেই।

অষ্টাদশ শতাব্দীতেই অবস্থানগত দিক থেকে যে-গতিবিবর্তন সুরু হয় মাণিকতলার—উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তা প্রায় আংশিক পূর্ণতা লাভ করে বলা যায়। কারণ ১৮১৫ খৃস্টাব্দেই সারা মাণিকতলার অধিষ্ঠান ঘটে রামমোহনের যুগে। এই মহান পুরুষ রামমোহনের পদস্পর্শেই ধন্য হয়ে ওঠে মাণিকতলার মাটি, চিরকালের সংস্কার থেকে মুক্তি-লাভ ক'রে নবযুগের যাত্রী হয় তার পরিবেশ। সুতরাং মাণিকতলা সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই রামমোহনের নাম উচ্চারণ করা কেবল কর্তব্য নয়, পরম পুণ্যের দিক থেকেও তা বিধেয়।

১৭৭৪ খৃস্টাব্দে হুগলীর রাধানগরে জন্মগ্রহণ করেন রামমোহন রায়। পিতা রামকান্ত রায়ের তত্ত্বাবধানে আট থেকে নয় বছর বয়সেই তিনি প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন বাংলা এবং আরবী ভাষায়। বারো বছর বয়সে তিনি যাত্রা করেন কাশী এবং সেখানেই আয়ত্ত করেন সংস্কৃত ভাষা ও গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন বেদান্ত দর্শন। ষোল বছর বয়সে তিনি মানস সরোবর হয়ে উপনীত হন তিব্বতের রাজধানীতে। সেখানে থেকেই তিনি গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে অনুধাবন করেন সে-দেশের সংস্কৃতি। তারপর দেশে ফিরে এসে আরও একাধিক ভাষা চর্চায় আত্মনিবেশ করেন একা। এভাবেই প্রায় দশটি ভাষাকে মাতৃভাষার স্বরূপে আপন ধী-শক্তিতে ধারণ করেন রামমোহন। তারপর ১৮১৫ খৃস্টাব্দে কলকাতার মাণিকতলাতে এসেই তিনি প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর স্থায়ী নিবাস। সে-নিবাস তাঁর আজও দাঁড়িয়ে আছে মাণিকতলার দক্ষিণাংশে। আজ তা উত্তর বিভাগীয় ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের প্রধান কার্যালয়রূপে নিষিদ্ধ করেছে সাধারণের প্রবেশাধিকার।

মাণিকতলার বাড়িতে অবস্থানকালেই সমাজ-বিপ্লবের একজন বিপ্লবীরূপে নিজেকে নিজেই দীক্ষিত করেন রামমোহন। সতীদাহপ্রথা এবং হিন্দুধর্মের আরও অনেক অভাবনীয় কলঙ্ক মোচনের উদ্দেশ্যে একদিকে তিনি যেমন অক্লান্ত পদাতিক, অন্যদিকে তিনি তেমনই যুগান্তকারী লেখনীর প্রচণ্ড ধারক। রচনা তাঁর বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ লাভ সুরু করে 'ব্রাহ্মিণীক্যাল ম্যাগাজীন বা ব্রাহ্মণ সেবধি', 'বেঙ্গল হেরাল্ড', এবং 'মিরাৎ-উল-আকবরে'। এভাবেই তাঁর আহ্বান পৌঁছয় সারা দেশের আপ্রান্তিক অংশে। সাড়াও জাগে দিকে দিকে। তাঁর আদর্শের দিকে মুখ রেখেই ছুটে আসেন প্রাজ্ঞজন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও একজন দীক্ষার্থী-রূপে রামমোহনের দ্বারদেশেই এসে নিবেদন করেন তাঁর শুচিশুভ্র সত্তা।

সম্ভবত ১৮৩০ খৃস্টাব্দে রামমোহন দিল্লীর বাদশাহের প্রতিনিধিরূপে বিলেত যাত্রা করেন এবং সেখানে এক স্মরণীয় বক্তৃতা দেন পার্লামেণ্টে। তারপর ফিরে এসে দিল্লীর দরবার থেকেই তিনি গ্রহণ করেন রাজা উপাধি। ১৮৩২ খৃস্টাব্দে তিনি একবার ফ্রান্সে যান। তারপর ফিরে এসে আবার পূর্ণোদ্যমেই অংশগ্রহণ করেন এ-দেশের সমাজ-বিপ্লবে। সম্ভবত সতীদাহপ্রথা নিরোধকল্পেই কোনো এক আর্জি নিয়ে আবার তিনি বিলেত যাত্রা করেন ১৮৩৩ খৃস্টাব্দে। কিন্তু স্বদেশে ফিরে আসা আর সম্ভব হয় নি তাঁর। সেই খৃস্টাব্দেরই ২৭শে সেপ্টেম্বর হঠাৎ ব্রিস্টলে দেহরক্ষা করেন ভারতের মৃত্যুঞ্জয় বীর সেই মহান পুরুষ।

রামমোহনের আমল থেকেই শহুরে পরিবেশের পদযাত্রা সুরু হয় মাণিকতলায়। তবে সেই পদযাত্রার দ্রুত তাল লক্ষ্য করা যায় বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। প্রকৃতপক্ষে তখন থেকেই কোঠাবাড়ির বিচিত্র প্রাচুর্যে রাজকীয় পরিবেশ ধারণ করে মাণিকতলা। উল্লেখযোগ্য রাস্তা-ঘাট এবং বাজারাদিরও আত্মপ্রকাশ ঘটে তখন। তা ছাড়া বাঙালীর আধুনিক সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায়—তারও উদ্বোধন সেখানে ঘটে রামমোহনেরই ঠিক পরবর্তী যুগে, অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর প্রথম অংকেই। অতএব সহজেই অনুমেয়: তখন মাণিকতলার পরিবেশে তেমন বিকৃতি ছিল না কোথাও। হয়তো কাব্যের অনুকূল না হলেও, স্বাস্থ্যের অনুপন্থী ছিল তার সার্বিক নিসর্গ।

কিন্তু আজ? আজ আর সে-পরিবেশ নেই। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগের জনারণ্যে জটিল রূপ ধারণ করেছে রাস্তা-ঘাট, বাজার ইত্যাদি। ঘনবসতির দুর্বহ চাপে আজ বিপর্যস্ত তার প্রাক-মধ্যাহ্নের রমণীয় চিত্র। যেন শান্তি নেই কোথাও। উদ্বাস্তু জনতার উর্ধ্বশ্বাস গতি এখানে দৃশ্যগত দিক থেকে সত্যই শোচনীয়। অবিরাম বাসের খরশব্দ, নির্যাতিত ট্রামের আর্তনাদ এবং একসঙ্গে নানাজনের অট্টালাপের কোনো বিরাম নেই এখানে। আজ তার প্রতি ক্ষেত্রেই বিকৃতির প্রকট স্বাক্ষর। কে জানে, এমন দুঃসহ পরিবেশ থেকে ভবিষ্যতে কোনোদিন মুক্তির আশা পোষণ করে কিনা মাণিকতলা।

ধারাবাহিক উপন্যাস

অদ্বিতীয়

সুশীল রায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

জায়গা-মত একটা পছন্দ-সই বোঞ্চিতে সে বসল। যথাসময়ে ছাড়ল ট্রেন। ট্রেন ছাড়া মাত্র স্নেহাংশুর শরীরে কেমন শিহরণ খেলে গেল। একটা সামান্য ব্যাপারকে সে এতই অসামান্য বলে ভেবে নিয়েছে যে, অল্পেই তার মনের সব ভাবনা কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু এবার সে দেখল কেবল ঐ বাড়িটাই। তার বেশি কিছু নয়। বাড়িটার কোনো বাসিন্দাকে এবার আর সে দেখতে পেল না। জানলাটা ফাঁকা।

জানলাটা ফাঁকা বটে, কিন্তু স্নেহাংশুর মন কেমন যেন ভরে উঠেছে, একেবারে ভরাট হয়ে উঠেছে।

কিছুক্ষণ আগে যে জিনিস সে দেখেছে চাক্ষুষ, এখন তার কাছে সেটি স্বপন বলে মনে হচ্ছে। তার মনে হচ্ছে—সে যদি কাউকে এই গল্পটা করে তবে কেউ তা বিশ্বাস করবে না। সকলেই নিশ্চয় বলবে—বানানো। কিন্তু অন্যের কথা আলাদা, তার নিজেরই কেমন অদ্ভুত আর অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে এখনই।

কিন্তু কে ঐ প্রাণীটি? অমন নিশ্চল নিশ্চুপ ও নিঃসঙ্গ? স্নেহাংশু যা দেখল তাই সে ভাবছে। অথচ সত্যিই কি সে নিশ্চল নিশ্চুপ আর নিঃসঙ্গ।

পায়ের ওপরে পা তুলে একটু আঁট হয়ে বসল স্নেহাংশু বিশ্বাস। না, হতে পারে না। অমন প্রাসাদ-পুরীতে অমন সঙ্গীহীন হয়ে থাকতে পারে না কোনো মানুষ। নিশ্চয়ই বাড়িটা, লোকে লোকারণ্য না হোক, নিশ্চয়ই বাড়িটায় লোকজন আছে অনেক। এবং—

পা দুলিয়ে-দুলিয়ে ট্রেনের তালে-তালে নিজেকে সে দোল দিতে লাগল, ভাবতে লাগল—এবং ঐ মেয়েটি ও-বাড়ির মক্ষিরাণী। লোকচক্ষুর অন্তরালে নিত্যনতুন নাটকের অভিনয় হচ্ছে ওখানে। কেউ দেখার নেই, কেউ শোনার নেই, কেউ বাধা দেবার নেই, কেউ প্রতিবাদ করার নেই। পুরাতন ঐ ভিতের আড়ালে নতুন নাটক অভিনয় করছে কারা, নুনে-ধরা ইট আর ঘুণে-ধরা জানলা-দরজা তাদের প্রাচীন ও পঙ্গু চোখ দিয়ে প্রত্যহ দেখে চলেছে সেই ট্র্যাজেডি ও কমেডি।

বেশ আনন্দ হল নাট্যকার স্নেহাংশু বিশ্বাসের। তার নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না যে, এত চট করে একটা নাটকের প্লট সে খাড়া করে তুলতে পারল।

কিন্তু সে পেরেছে। সে পেরে গেল। তার মনে হল, সার্থক তার এই যাত্রা। বটেই তো, কেবল ঘরের মধ্যে বসে থাকলে আর বেহালার রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়ালে কি কোন কাজ হয়? উপকরণ চাই, উপাদান চাই, তবেই-না আসবে উৎসাহ।

বিপুল উৎসাহ এসে গিয়েছে স্নেহাংশুর। কিন্তু, সে নিজের কাছেই শপথ করল যে, এসব কথা কারও কাছে সে ফাঁস করবে না। নিজের মনের মধ্যে সমস্ত কিছু পুঁজি করে রাখবে; এবং ধীরে ধীরে লিখে

ফেলবে এমন-একটা জিনিস, যাকে আমি বলে পূর্ণাঙ্গ নাটক।

কয়েকদিন গত হয়েছে। স্নেহাংশু একটু যেন আলগা-আলগা থাকছে, সে তার বন্ধুদের সঙ্গে তেমন যেন মিশছে না। ভাবুক লোক সে, কিসের ভাবনায় যেন বিভোর হয়েছে, ও একা-একা যা-খুশি ভাববার ভাবুক—এই রকম ভাবতে থাকে তার বন্ধুরাও। তারা থাকে নিজের-নিজের ধান্দায়, স্নেহাংশুকেও থাকতে দিয়েছে তার নিজের মর্জি অনুসারে।

সুহাংশু ভাবে, যতই ভাবতে থাকে সে ততই তার কানের মধ্যে বেজে ওঠে যেন পাখোয়াজ—চাকায় এবং রেল্রে ঠোকাঠুকিতে বাজে যে-গান সেই-গান কেবলই শুনতে পায় সুহাংশু। রেলগাড়ির সেই সংগীতে সুহাংশু বিভোর। সেই নিঃসঙ্গ ও নীরব মেয়েটি বিপুলভাবে আকর্ষণ করছে সুহাংশুকে। মনে-মনে নিত্যই রেল-ভ্রমণ করে চলেছে সুহাংশু বিশ্বাস। স্টেশনগুলোর নাম পর্যন্ত তার মুখস্থ, ডায়মণ্ডহারবারের কাছাকাছি স্টেশনগুলোর।—ধামুয়া, মগরাহাট, সংগ্রামপুর, দেউলা, নেত্রা, হাশুলডাঙা। কিন্তু ঐ কয়টি নামের মধ্যের একটা নাম তার মনে পড়ছে সবচেয়ে বেশি, সে নাম সংগ্রামপুর—ডায়মণ্ডহারবার থেকে মাত্র তিন-চারটি স্টেশন আগে এই জায়গাটি এবং এই সংগ্রামপুরই সুহাংশুর জীবনে এনেছে নতুন এই সংগ্রাম।

প্লট তার প্রায় প্রস্তুত, এবার কলম ধরলেই হয়। কিন্তু তার আগে নিজেকে আরও একটু তৈরি করে নেওয়া দরকার বলে মনে হয়েছে। এই জন্যে সে কয়েক দিন ধরে খুঁজে বেড়িয়েছে ঐ জায়গাটার ইতিহাস। কার বাড়ি ওটা হতে পারে, কোন্ আমলের বাড়ি ঐটি, নির্জন প্রান্তরের মধ্যে হঠাৎ গজিয়ে উঠতে পারে না অমন একটি প্রাসাদ, অবশ্যই ঐ জায়গাটা এককালে ছিল মস্ত একটি লোকালয়। চব্বিশপরগণা জেলার পুরনো দলিল ঘেঁটেছে সুহাংশু, ঐ জেলার ইতিহাসের পাতা উল্টে-উল্টে দেখেছে, কিন্তু হায়, সুহাংশু বিশ্বাস তার মনের মত কোনো রসদ খুঁজে পেল না। রসদ যখন সে পেলই না, তখন আর কথা কি—তখন তো তার কলম মুক্ত, তার কল্পনাও বাধাবন্ধহীন, তখন সে মুক্ত, তখন সে স্বাধীন। সুতরাং, আর কোনো দিকে না তাকিয়ে বেপরোয়াভাবে সে বেছে নিল সংগ্রাম।

ছক কেটে নিল সুহাংশু তার নাটকের। পাঁচটি অঙ্কে সে ভাগ করল এই নাটক। যতই প্ল্যান করে সে, ততই তার শরীর যেন শিউরে উঠতে থাকে। তার কেবলই মনে হয় অদ্ভুত হবে, অপূর্ব হবে তার নাটক। তার চোখে স্বপ্ন হয়ে যা লেগে আছে, তাকেই সে রূপ দেবে বাস্তবিক চেহারায়।

সংগ্রামপুর জায়গাটার নাম তার নাটকে হল বিক্রমপুর। এই বিক্রমপুরের একটা বিরাট ইতিহাস বানিয়ে নিল সে। এমন নিখুঁতভাবে সে তা বানাল যে, সত্যিই তা ইতিহাসের মতই তার নিজেরই মনে হল। সুতরাং তার এ বিষয়ে সন্দেহ রইল না যে, এই ঘটনাকে সকলেই ইতিহাস বলেই মানবে। সে বেছে নিল সম্রাট সাজাহানকে; এঁকে বেছে নেবার কারণ হল এই যে, ইনি একটু প্রেমিক ব'লে খ্যাত আছেন এবং এঁর নামের সঙ্গে মমতাজমহলের নাম যুক্ত আছে। এই সম্রাট সাজাহানের রাজত্বকালে পূর্বভারতের সমুদ্রকিনারের একজন সামান্য ব্যক্তি তার অদ্ভুত নৌবিদ্যার জন্যে সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—সেই কৌশলী নাবিকের নাম কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোড়ই। সম্রাটের কৃপাদৃষ্টি লাভ করে কৃষ্ণপ্রসাদ ভারতের নৌ-বাহিনীর নৌ-অধ্যক্ষপদে অভিষিক্ত হয়। এবং সেইসময়ে একবার পারস্য দেশে সে যায় এবং সেই দেশের অপূর্ব রূপবতী এক নারীকে পত্নীরূপে বরণ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে। এই সংবাদ শুনে সম্রাট সাজাহান কৃষ্ণপ্রসাদের প্রতি আরও প্রসন্ন হয়ে ওঠেন, প্রসন্ন হবার কারণ এই যে, সম্রাট যাকে কেবলমাত্র নাবিক বলে মনে করেছিলেন, সে যে শুধুই নাবিক নয়, সে যে প্রেমিকও—তার প্রমাণ তিনি পেয়ে গেলেন। প্রেমিক সম্রাট তাঁর প্রসন্নতার নিদর্শনস্বরূপ সমস্ত চব্বিশ-পরগণা জিলাটাই তাকে উপঢৌকন দিলেন। কৃষ্ণপ্রসাদ তখন সমুদ্রের অনতিদূরে তাঁর আদিনিবাসের কাছাকাছি একটি অপ্রশস্ত শাখানদীর বাঁকের মুখে নির্মাণ করে তুললেন একটি প্রাসাদ। সে-কালের লোকের চোখে বিস্ময় সঞ্চার করে আকাশকে আড়াল করে দাঁড়াল এই প্রাসাদচূড়া। কিন্তু মানুষ যা চায়, মানুষ তা পায় না। একটি কন্যা ও একটি পুত্র কৃষ্ণপ্রসাদকে দান করে অকালে পরলোকগমন করলেন সেই পারস্য-ললনা। মাতার রূপলাবণ্যের অধিকারী এই পুত্র ও কন্যা ধীরে ধীরে বড় হতে লাগল। কিছুকাল পরে লোকান্তরিত হলেন কৃষ্ণপ্রসাদ। এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। সেই কন্যার কাহিনী জানার কথা নয়, কেন না, সে বিবাহ করে অন্য কোথাও চলে গিয়ে থাকবে। কিন্তু পুত্রটি হল ঐ প্রাসাদের অধিকারী এবং বিপুল ঐশ্বর্যের মালিক। বিনা-ক্লেশে অর্জিত ধনৈশ্বর্যের অধিকার পেয়ে সে হয়ে উঠল উচ্ছৃঙ্খল, নানারূপ উপসর্গ এসে উপস্থিত হল। প্রাসাদের প্রাচীরে-প্রাচীরে বেজে উঠতে লাগল আর্তনাদ।

প্রাসাদের আর্তনাদ সংক্রান্ত সংলাপ যখন পরিবেশন করতে আরম্ভ করল স্নেহাংশু, তখন তার নিশ্চয় খেয়াল হল না যে, রবীন্দ্রনাথের ক্ষুধিত পাষাণ গল্পটির প্রতিধ্বনি এসব সংলাপে শোনা যাচ্ছে। যাই হোক, এই পর্যন্ত লিখে সে শেষ করল প্রথম অঙ্ক, এই অঙ্কে দৃশ্যের সংখ্যা দাঁড়াল তিন। প্রথম অঙ্কের এই তিনটি দৃশ্যে সে নাটকের ভূমিকা করে নিল।

অন্যভাবে বলা চলে যে, সে ভিত্তি স্থাপন করল।

দ্বিতীয় অঙ্ক থেকেই সে চলে এল একেবারে বর্তমান কালে। যে অট্টালিকায় বিলাসের বিপুল সমারোহ চলেছে প্রথম আমল থেকে—তার চার-দেয়ালের মধ্য থেকে নির্বাসিত হতে পারে না সেই বিলাস। বংশপরম্পরা চলে আসছে সেই স্রোত। এককালে এই প্রাসাদে চলেছিল ঐশ্বর্যের বিতরণ, এখন ঐশ্বর্য নেই, তার পরিবর্তে আছে অভাব ও অনটন। কিন্তু অভাব ও অনটন আছে বলেই বাসনা কামনা আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি থাকবে না কেন। এককালে এক পারস্য-ললনা এই বঙ্গদেশে সৌন্দর্যের ও সুষমার যে বীজ উপ্ত করে গিয়েছেন, তার থেকে যুগে-যুগে বিভিন্ন প্রফুল্ল ফুল প্রস্ফুটিত হয়ে আসছে। বর্তমানে এক আশ্চর্য ফুল সেই আদি সৌন্দর্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে বিক্রমপুরের এই ভগ্ন প্রাসাদে।

সেই ফুলটির নাম ফুল্লরা।

এইখানেই নায়িকার প্রথম নাটকে প্রবেশ ও মঞ্চে আবির্ভাব। এবং এইখানেই দ্বিতীয় অঙ্ক শেষ।

কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোড়ইয়ের নাম অনুসারে এই জায়গাটির নাম হওয়া উচিত ছিল কৃষ্ণপুর বা প্রসাদপুর; কিন্তু তাঁর নাম অনুসারে নয়, তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা স্মরণীয় করে রাখার জন্যে জায়গাটির নাম হয়েছে বিক্রমপুর। গ্রামের লোক কৃষ্ণপ্রসাদকে ভুলে গেলেও তার বিক্রমকে ভোলে নি। এই প্রাসাদের সংলগ্ন ঐ ছোট শাখা-নদীতে ছোট-ছোট যে ঢেউ ওঠে এবং সেই ঢেউয়ে হাওয়া লেগে যে জলতরঙ্গ বাজে, তা বুঝি কৃষ্ণপ্রসাদের বিক্রমের কথা স্মরণ করেই। দুঃসাহসিক নাবিক ছিলেন কৃষ্ণপ্রসাদ, বড়-বড় নৌবহর নিয়ে তিনি বড়-বড় সমুদ্র পাড়ি দিয়েছেন, সেই বড়-বড় কীর্তির কথা ছোট গলায় ছোট ছোট শব্দে গেয়ে চলেছে এই ছোট শাখা-নদীটি।

মাঝেমাঝেই পাত্র-পাত্রীর মুখে এইরকম সংলাপ দিয়ে নাটকটিকে জমাট করে তোলার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে স্নেহাংশু। এবং, আমরা অকপটেই স্বীকার করব যে, স্নেহাংশুর সে চেষ্টা মাঠে-মারা যায় নি। নাটকটা বেশ নাটকীয়ই হয়ে উঠেছে। এমন কি, তৃতীয় অঙ্কের গোড়ার দিকে নায়িকা ফুল্লরা যখন প্রাসাদের অলিন্দে দাঁড়িয়ে তার জীবনের কথা ভাবছে এবং জীবনকে এক-একবার ভীষণ ঘৃণিত মনে হওয়ায় নাসিকা কুঞ্চন করছে তখন তার মুখেও স্বগত সংলাপ দেওয়া হয়েছে; সেই সংলাপে সে মন্থন করছে তার অতীত, বলছে, কোন ঘরের কন্যা সে, কোন মহা-মহিমান্বিত পুরুষটি হচ্ছে তার পূর্বপুরুষ, আর আজ?—আজ সে নিত্য-নতুন পরপুরুষ নিয়ে—

ছি ছি ছি! ফুল্লরা নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছে, এমন সময়ে তার পাশে এসে দাঁড়াল এক সুদর্শন পুরুষ, বলিষ্ঠ চেহারা তার, চোখে প্রখর দৃষ্টি, ঠোঁটে মৃদু হাসি, বলল, কার কথা ভাবা হচ্ছে? কার জন্যে অপেক্ষা করা হচ্ছে এখানে দাঁড়িয়ে?

এই সুদর্শন পুরুষটি হচ্ছে নাটকটির নায়ক। এর নাম মধুসূদন।

ব্যাপারটা হয়েছে এই যে, নায়ক মধুসূদন এ গৃহে এর আগেও এসেছে তার বন্ধুদের সঙ্গে নেহাতই খেলার ছলে এবং হয়তো-বা একটু ফূর্তির আকর্ষণে। শহর থেকে দূরে এই জায়গাটি। এখানে এসে মনের ইচ্ছায় সময় কাটালে কারও কিছু জানবারও সুযোগ নেই, কারও কিছু বুঝবারও উপায় নেই। একটা রাত্রি মনের আনন্দে কাটিয়ে উধাও হয়ে চলে যাও, সমস্ত ভাবনা-চিন্তা বিসর্জন দিয়ে আবার নিজের মত ভেসে বেড়াও শহরের জনস্রোতে। এমনি হাল্কা মন নিয়েই এসেছিল সে। কিন্তু ফুল্লরার কাছে এক রাত্রির নায়ক হবার ইচ্ছায় সে এসেছিল, সেই মধুসূদন নিজের অজানিতেই ফুল্লরার জীবনের অধিনায়ক হয়ে উঠল এবং ফুল্লরাকে করে নিল তার অধিনায়িকা। এবং স্নেহাংশুর নাটকের তারাই হয়ে উঠল নায়ক-নায়িকা।

অবস্থাটা এতে একটু জটিল হয়ে উঠল। যারা নিঃশব্দ পদক্ষেপে নিত্যনিয়ত এই নিভৃত নিকেতনে গোপন অভিসারে আসে, তাদের অনেকের মনেই জেগে উঠতে লাগল অভিমান। হিংসা দ্বেষ ইত্যাদি মনের নানাবিধ বিকারে বিকৃত হয়ে উঠতে লাগল সকলের মন। কিন্তু ফুল্লরা অটলা। এক নাবিক-বংশের তনয়া সে, সে জানে ঝড় জল তুফান ভেদ করে চলতে একসময়ে কূল পায় জাহাজ, ভরাডুবির হাত থেকে সে যদি নিজেকে বাঁচিয়ে আনতে পারে তবেই তার

বাহাদুরি, তবেই সে জাহাজ সার্থক। কিনারে এসে এখন সে চায় নোঙর ফেলতে। তটের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে সে চায় নিরাপদ হতে।

কোন দিকে কোন কিনারা না দেখে ফুল্লরা ভেবেছিল তার জীবন এখন ভেসে চলেছে বটে যৌবন-জলতরঙ্গে, কিন্তু কত দিন আর চলতে পারে একটা জীবন এমন যৌবন-সমারোহ নিয়ে। প্রত্যহের নানারূপ অনুকূল বাতাসের সঙ্গে অনেক ঝড় জল তুফানও আসছে নিয়মিত। সে জানত তার জীবনের কোন কিনার নেই। অপার-অকূল সমুদ্রের মধ্যে এই-যে তার ভেসে বেড়ানো, এর পরিণাম কি সে তা জানত। এই প্রাসাদপুরীব অধিকারিণী সে। কিন্তু প্রাসাদের নুনে-ধরা ইটের স্তূপ ও দেয়ালের এই বেড়া তাকে বেষ্টন করে ধরে আছে বটে, কিন্তু তাকে প্রতিপালন করার শক্তি নেই এই প্রাসাদের। কৃষ্ণপ্রসাদের সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি একে একে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে, থাকার মধ্যে আছে কেবল মাত্র এই একটি আশ্রয়। নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে কি লাভ তা চিন্তা করে দেখে নি ফুল্লরা, কিন্তু নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রবল বাসনা তার মনের মধ্যে। বাঁচার সেই প্রেরণায় সে নিজেকে সহসা উৎসর্গ করেছিল একবার, সেই উৎসর্গটিই উপসর্গ হয়ে দেখা দিল পরে এবং তারই প্ররিণামে এখন সে এখানে এই অকূল সমুদ্রের মাঝখানে। এখান থেকে কূল দেখা যায় না, কিনারা দেখা যায় না।

কিন্তু হঠাৎ তার জীবনে এসে গেল একটি তট, একটি তটের সংকেত। এসে গেল তার জীবনে মধুসূদন।

স্নেহাংশুর নাটকের চতুর্থ অঙ্ক এইখানে শেষ।

জীবনের সব গ্লানি এবং সমস্ত আবর্জনা দূর করে দিয়ে নতুন গার্হস্থ্য জীবনযাপনের জন্যে প্রস্তুত হল নায়িকা ফুল্লরা। পূর্ববর্তী অঙ্কে যে ছিল রঙ্গিনীরূপে, এই পঞ্চম অঙ্কের আরম্ভ থেকেই তার রূপ গেল বদলে। সে দেখা দিল এক মহীয়সী রমণী রূপে। অচিনপুরীকে আর যেন চেনা যায় না, তারও রূপের বদল হয়ে গেল। ফুল্লরা আর মধুসূদন যাপন করতে আরম্ভ করল নতুন জীবন।

ফুল্লরার দাসী ছিল দু'জন, তার মধ্যে একজনের নাম ললনা, অন্য-জনের নাম মাধুরী। মাধুরীর চেয়ে ললনার চেহারায় মাধুর্য অনেক বেশি। এখানে ফুল্লরার এই নতুন জীবনের সঙ্গে তারা দু'জনেও নিজেদের বেশ মানিয়ে নিল। কিছুকাল বেশ মধুরভাবে চলল এখানকার জীবন। কিন্তু তার পরেই একটু যেন জটিলতার সৃষ্টি হতে লাগল, একটু যেন নাটকীয় হয়ে উঠতে লাগল পরিবেশটা।

স্নেহাংশু এই জায়গায় কয়েকটা ছোট-ছোট দৃশ্যের অবতারণা করেছে। এই ছোট-ছোট দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে সে দেখিয়ে দিয়েছে মধুসূদনের আসল চেহারা। বেশ স্পষ্ট করেই দেখিয়ে দিয়েছে। সে দেখিয়েছে—মধুসূদনের মন পরি-বর্তনের ঘটনা। মধুসূদন নতুনভাবে আকৃষ্ট হয়েছে অন্যের দ্বারা। যে তাকে আকর্ষণ করেছে সে হচ্ছে ললনা। অদ্ভুত কৌশলে স্নেহাংশু এইভাবে নাটকের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে এবং দেখিয়েছে ফুল্লরার নতুন অবস্থা। মধুসূদনের সঙ্গে তার একটু বচসা হল কিন্তু মধুসূদন অটল। মধুসূদন ফুল্লরাকে জানিয়ে দিল যে, মধুসূদন যদি একজন অবিশ্বাসী, ফুল্লরাই বা কি? ফুল্লরাও তো একজন ইয়ে—

মৃত্যুই শ্রেয় বলে মনে করল ফুল্লরা। এ জীবন রেখে লাভ নেই। সে নীরব হয়ে গিয়েছে, সে নির্বাক হয়ে গিয়েছে। কি করবে সে ভেবে পায় না। অচিনপুরীর জানালায় দাঁড়িয়ে সে বহু দূরের দিগন্তে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাবে তার জীবনের কথা।

বলা বাহুল্য, এইরকম এক সময়েই স্নেহাংশু ট্রেন থেকে তাকে দেখেছে।

নাটকেও স্নেহাংশু এই দৃশ্যটাকে দিল। ফুল্লরা দূরে দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তার সঙ্গে সে যোগ করে দিল একটা নেপথ্য কণ্ঠস্বর—ললনা ও মধুসূদন খলখল করে হাসছে। এর পরেই যবনিকা পতন। (ক্রমশঃ)

একটি শীতের সকাল

শান্তশীল দাস

সূর্যের সোনালী রঙ—আজ নয়, কাল নয়, কতদিন ধরে
একই মতো নেমে আসে : তবু আজ এ-শীতের ভোরে,
সেই পুরাতন রঙ, অনাদি কালের সেই সোনা
কেন যে নতুন লাগে। ঝিলমিল দেয় আলপনা
মনের পুরনো পটে, আঁকে ছবি নতুন নতুন;
চারিদিকে কত খুশি, গেয়ে ওঠে গুন্ গুন্ গুন্।

বেশ লাগে, বেশ লাগে এই সোনা-রঙ রোদ্দুর;
হাতে পায়ে সারা গায়ে মেখে নিয়ে মন ভরপুর।
পুরনো পৃথিবী কোথা। নতুন আলোর ছোঁয়া লেগে,
ভোরে সোনালী রঙে ডুব দিয়ে স্নান করে জেগে
উঠেছে আবার ছেড়ে পুরনো দিনের বেশবাস;
অনেক নতুন আলো, সোনা-রঙ আজকে আকাশ।

কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার কেবল ফিকে হয়ে আসছে মধুমতীর কালো জলে। কাছে দূরে দু'-একখানি জেলে-ডিঙি, একমাল্লাই আর পান্‌সী বাঁধা। দিন-মজুরীতে খেয়া-পারাপার করছে দু'-একজন খেয়ারী। এখানে ওখানে

বিক্ষিপ্ত কচুরীপানার মধ্য থেকে উদ্ধত ভঙ্গিতে মাথা তুলে উঠেছে ফুলের মঞ্জরী। হঠাৎ চারপাশের নিস্তব্ধ প্রায়ান্ধকারকে সচকিত করে দক্ষিণ পারের ঘাটে 'টিকারা' বেজে উঠলো 'গয়না'-নৌকোখানিতে : টিক্-টিক্ টিকির-টিকির।

মচ্ মচ্ শব্দ করে উঠলো একবার দাঁড়গুলি। সেই সাথে ছ' জন মাঝির সম্মিলিত একটা ঐকতান : 'বদর বদর-হেঁইও—।'

ঘাট ছেড়ে একসময় মাঝগাঙে এসে প'ড়লো নৌকোখানি। পূব বাংলার এদিকটায় বলে 'গয়না'। ফ্যাক্টরীর কলে সিটি দেবার মতো সন্ধ্যায় ঘাট ছেড়ে যাবার আগে 'গয়না'য় বাজে 'টিকারা', অমনি মালপত্র-নিয়ে এসে নৌকোর পাটাতনে শয্যা পেতে বসে পড়ে যাত্রীরা। কেউ হুঁকো টানে, কেউ তাস আর দাবা খেলে, কেউ বা পড়ে পড়ে ঘুমোয়।

কিন্তু এদের কোনো দলেরই মানুষ নন গগন চৌধুরী। তাস আর দাবা খেলে একসময় তিনি রাতের পর রাত কাটিয়েছেন, ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন তার চাইতেও বেশি ; গোলাপজলভরা আলবোলায় কল্কি সাজিয়ে যতবার এসে কাছে এগিয়ে ধরেছে বাবুরাম, নির্বিবাদে রুপোর জরি দেওয়া নলটাকে হাতের মুঠোয় টেনে নিয়েছেন গগন চৌধুরী। একগাল হেসে মাথা নিচু ক'রে আবার অন্য কাজে সরে পড়েছে বাবুরাম। বিশ্বস্ত পুরনো চাকর. বছর পঁয়তাল্লিশেক বয়স হবে, অনেকটা 'যত পায় বেত না পায় বেতন তবু-না চেতন মানে' গোছের। মধুমতীর এই নিস্তরঙ্গ কালো জলের বুকে গগন চৌধুরীর সাথে আজও আছে সেই বাবুরাম। মাঝে মাঝে কল্কি সাজিয়ে কর্তার দিকে এগিয়ে দিচ্ছে আলবোলাটা।

কিন্তু আজ আর তাতে মন নেই গগন চৌধুরীর। ঘুমোতে চেষ্টা করেছেন প্রথম থেকে, কিন্তু চোখের পাতা দুটোকে কিছুতেই এক করতে পারেন নি। পোড়া ঘুমটাও আজ শত্রু হয়ে পীড়া দিচ্ছে তাঁকে। এমন নির্বেদ অবসন্ন মুহূর্ত যে কখনও আসবে, কল্পনাও ক'রতে পারেন নি তিনি।

জীবনে মাত্র তিনটি রাত্রির কথা মনে পড়ে—শীতের কুয়াশা-জড়িত বিনিদ্র তিনটি রাত্রি। বিয়ের পর প্রথম সেই তিনটি রাত্রি জাগ্রত স্বপ্নের মধ্য দিয়ে কেটেছিল পুষ্পলতার সাথে। সারা গহরপুর জমিদার স্টেটে সবাই সেদিন ঘুমিয়ে ছিল, শুধু বিনিদ্র রাত্রির প্রতিটি প্রহরকে যক্ষের মতো একান্ত গোপনে স্বপ্নময় করে তুলেছিলেন তিনি পুষ্পলতার পাশে শুয়ে।

যূথভ্রষ্ট

রণজিৎ কুমার সেন

সেদিন এমন অস্থিবর্তা ছিল না, অবসাদ ছিল না, সমস্ত সত্তাকে জড়িয়ে ছিল কেমন একটা আবেগমুখর ধ্যানা। আজ ঠিক তার উল্টো। হয়তো সেই তিনটি রাত্রিরই একটা প্রায়শ্চিত্ত মুহূর্ত। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে কপালে, চোখের নিচে আর গলায়, কণ্ঠনালীতে বিষ ঢেলে দেবার মতো একটা উত্তপ্ত ঝাঁজ। নিজেকে আজ আর কিছুতেই স্থির রাখতে পারছেন না গগন চৌধুরী।

—'বদর বদর হেঁইও—'

অবিশ্রান্তভাবে দাঁড় টেনে চলেছে মাঝিরা। মধুমতীর জল কেটে কেটে চলেছে 'গয়না' নৌকো। আকাশে ঝিকমিক করে জ্বলছে তারাগুলি। সামনে পিছনে যতদূর দৃষ্টি যায়, শুধু দিকে দিকে অন্ধকার। বহুদূরের বিক্ষিপ্ত গাছগুলিকে মনে হয় ধ্যানী, বুদ্ধের মতো তপস্যায় রত।

—'বদর বদর হেঁইও—'

পায়ের গোড়ালীতে একবার দাঁড়টাকে চেপে ধরে ইয়াকুব হাঁক দিলে: 'অদে সমছের বাই, এট্টা বিড়ি দ্যাওছেন, হাতে টান ধইরা গেল, দুই টান টাইন্যা লই।'

ট্যাঁকে বিড়ি আর দেশলাই গোঁজা ছিল সামসের আলীর। হাত বাড়িয়ে এগিয়ে দিল ইয়াকুবের দিকে। রোজার মাস। সন্ধ্যায় টিকারা দিয়ে নৌকো ছাড়বার আগে ইফ্‌তার শেষ করে মুখে যা-হোক কিছু দিয়ে নিয়েছে। আবার শেষ রাত্রে উনুনে হাঁড়ি চড়াবার ব্যবস্থা। এইভাবেই চলেছে ধর্ম আর জীবিকা। একটাকে ছেড়ে অন্যটাকে আঁকড়ে ধরবার উপায় নেই, সাতপুরুষের সংস্কারে বাধে, বাধে জীবনধর্মে।

গলুইয়ের কাছাকাছি জনচারেক স্বতন্ত্র যাত্রী চক্রাকারে বসে লণ্ঠনের আলোয় তাসের তুরুপ আর নোট্রামে বাজার মিলিয়ে নিয়েছে। বাঁজ থেকে বিড়ি—যখন যা ভালো লাগছে পিটিয়ে নিচ্ছে। দুনিয়ার সমস্ত চিন্তা এসে ঠাঁই নিয়েছে তাদের আপাতত এই তাসে। খাস-বিক্রমপুরের লোক। হঠাৎ যেন অতর্কিতে কখন এসে ছিটকে পড়েছিল ঐ গহরপুরের ঘাটে, তারপর এই মধুমতী। উচ্ছল প্রাণ-তী চারটি: হেনু দাস আর প্রেম-হরি, শীতেশ্বর আর প্রাণেশ ভদ্র।

—'শালা একেবারে মাটি ক'রে দিলি খেলাটা।'

হঠাৎ প্রেমহরিকে কনুইয়ের শক্ত একটা গোঁত্তা দিয়ে তিড়িক করে লাফিয়ে উঠলো হেনু দাস। জয়েণ্ট পার্টনার। হার হয়েছে শীতেশ্বরের কাছে। কিন্তু তাই বলে দোষ নিতে রাজী নয় প্রেমহরি। কৃত্রিম ক্রোধে সেও জামার আস্তিন-টাকে বেশ করে গুটিয়ে নিল: 'মুখ সামলে কথা বলবি শালা। গোলাম-টাকে মাটি করে দিয়ে নিজে এখন বাদশা সাজাব কিকির।'

ততক্ষণে হেসে খুন শীতেশ্বর আর প্রাণেশ ভদ্র। —'নে, নে, খুব হয়েছে; তুরূপ দিয়ে আর তিরিক্ষি হতে হবে না, মুরদ বোঝা গেছে।'

'গয়না' এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। কলকল বেগে ছুটে চলেছে মধুমতী।

এ পক্ষের আওয়াজটা বড় বেশি সুখকর বলে বোধ হচ্ছিল না এতক্ষণ গগন চৌধুরীর কাছে। বাবুরামকে একবার কাছে ডেকে বললেন: 'আমাকে এ তুই কিসের মধ্যে নিয়ে এলি রাম? জীবন যে ওষ্ঠাগত।'

সোজা সরল মানুষ বাবুরাম, কর্তাবাবুর কানের কাছে মুখ এনে চাপাগলায় বললো: 'চারপাশে যেমন অনবরত দাঙ্গা-কাইজার ভয়, তাতে তো বড় বেশি ভরসা নেই। ঘুটঘুটে রাত, কোনোরকমে ভোর হলে হয়। করুন ওনারা রাতভর হৈ-চৈ, পাশ দিয়ে কোনো গুণ্ডা-ডাকাতের নৌকো গেলে ভাববে—জোয়ান মর্দ ব্যাটাছেলেরা আছে গয়নায়, সুতরাং খবরদারীতে আর দরকার নেই।'

—'বুদ্ধির বলিহারী যাই তোর! বলি, তেমন বুঝলে এই ইয়াকুবের দলকেই বা বিশ্বাস করে ভাড়া নিলি কি ভাবে?'

—'ছিঃ ছিঃ, কি যে বলেন বাবু।' গলার স্বরটাকে আরও অনেকখানি খাদে নামিয়ে আনলো, এবারে বাবুরাম, বললো: 'আমাদের ঐ দক্ষিণ-পারের ঘাটে বসে কতদিন গল্প করেছি, আর গান শুনেছি ইয়াকুবদের। নদীতে জল এলো ওরা সব ভুলে যায়। ইয়াকুব আর ওদের নাকি আবার সন্দ করবো?'

কথা তুললেন না আর গগন চৌধুরী। অলক্ষ্যেই আবার কখন নিজের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে গেলেন।

একছিলিম টেনে নেবার জন্যে এতক্ষণ বাবুরামও কম চেষ্টা করছিল না। কিন্তু স্থানাভাব। নৌকোর মধ্যে এমন আড়াল-আবডাল নেই যে, কর্তাবাবুকে লুকিয়ে দু'-এক টান টেনে নেবে। স্থান আছে এক উপরের ফাঁকা ছইয়ে, কিন্তু বাইরের অন্ধকারে ছইটাও নিরাপদ নয়; উঠতে গিয়ে টাল সামলাতে না পেরে শেষটায় যদি মধুমতীর বুকেই আশ্রয় নিতে হয়, তবে আর রক্ষা নেই। কিছুক্ষণ ধরে চিন্তা করলো বাবুরাম। দেখলো একবার কাৎ হয়ে শোবার চেষ্টা করছেন কর্তাবাবু। কাছে এসে সঙ্গে আনা তাকিয়াটিকে গগন চৌধুরীর ঘাড়ের দিকে এগিয়ে দিল বাবুরাম। বললো: "একটু ঘুমোতে চেষ্টা করুন বাবু। রাত সম্ভবত একেবারে কম হলো না।"

—'ভোর বোধ হয় ঘুম পেয়েছে!' বাবুরামের মুখের দিকে একবার চোখ দুটোকে তুলে ধরলেন গগন চৌধুরী।

বাবুরাম দেখলো—চোখ দুটো রীতিমত লাল হয়ে উঠেছে কর্তা-বাবুর। দীর্ঘকালের পুরনো বিশ্বস্ত চাকর হলেও গহরপুর জমিদার স্টেটের

কেউ তাকে চাকরের মতো দেখতো না, গগন চৌধুরীও না। জমিদার-গৃহিণী পুষ্পলতা সংসার থেকে চক্ষু বুজে গিয়েছেন আজ সাত বছর। এই সাত বছরের একটি বেলাও বাবুরামকে ছেড়ে চলে নি গগন চৌধুরীর। তাঁর জমিদারীর রাজকীয় দম্ভ ছিল বাইরে প্রজাদের কাছে আর কাছারী-ঘরে; কিন্তু বাবুরামের কাছে এসে একেবারে শিশুর মতো অসহায়তা প্রকাশ করে বসতেন, বলতেন: তুই আমাকে না দেখলে আমার আর বেঁচে থাকা সম্ভব হবে না রাম।' করুণ আবেদনে কণ্ঠ আর্দ্র হয়ে উঠতো গগন চৌধুরীর।

কর্তাবাবুর চোখ দুটোর দিকে লক্ষ্য করে এসব কথা মনে আসে বৈকি বাবুরামের। সেই সঙ্গে একটা তরল মায়াতেও সমস্ত মনটা ভরে গেল তার। বললো: 'না। ঘুম পেলে আমি একসময় শুয়ে পড়বোখন। আমার জন্যে ভাববেন না।' তারপর ঈষৎ চোক চিপে বললো: 'আপনার শরীর তো খারাপ লাগছে না বাবু?'

ম্লান একটুকরো হাসতে চেষ্টা করলেন এবারে গগন চৌধুরী; বললেন: 'শরীর? না, খারাপ আর লাগবে কি, বেশ ভালোই তো আছি।'

তাকিয়াটাকে বগলদাবা ক'রে খানিকটা কাৎ হয়ে নিলেন গগন চৌধুরী।

ওপক্ষ ততক্ষণে পার্টনার বদল করে আবার গরম হয়ে বসেছে। রাত যত বেশি হচ্ছে, হেনু দাস আর শীতেশ্বরদের খেলাটাও ততই রকমফের হচ্ছে। ব্রীজ ছেড়ে বে, বে ছেড়ে বিন্তি। মাঝে মাঝে জিহ্বার অদ্ভুত শব্দে অশ্লীলতা বেরিয়ে আসে, মাঝে মাঝে উদ্ভটসাগরদের কবিতা আবৃত্তির ছন্দে তাস পড়ে পাটাতনের ওপর।

—'মার শালা টেক্কা।'

—'নে শালা, রং এবারে আমাদের হাতে।'

—'কোথায় যাবে যাদুমণি?' সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকে প্রেম-হরির থুতনিটা নেড়ে দেয় প্রাণেশ ভদ্র।

ধৈর্যচ্যুতি ঘটে এবারে বাবুরামের। নৌকোয় যাত্রী বেশি নয়। কম জেনেই ঘাট থেকে ভাড়া করেছিল বাবুরাম। কিন্তু মাঝগাঙে এসে দেখলো—ঐ চারজনেই চারশো। কর্তাবাবুকে কোনোভাবে বুঝিয়েছে বটে, কিন্তু অশ্লীলতা ক্রমেই যেমন উদগ্র হয়ে উঠছে, তাতে লজ্জায় এবারে বাবু-রামেরই মাথা কাটা যেতে লাগলো। খানিকটা ইতস্তত করে খানিকটা কেশে নিয়ে একসময় মৃদু কণ্ঠে বললো: 'বাবুরা যদি একটু আস্তে শব্দ করেন তো ভালো হয়।'

কিন্তু কারুর ভালো করবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে সত্যিই এই চতুর্বর্গের কেউ নৌকোয় উঠেছিল কি না, সে কথাটা তলিয়ে বুঝতে যায় নি বাবুরাম।

তাস থামিয়ে খানিকটা আভি-জাত্যের চোখে তাকালো শীতেশ্বর। —'ভালো হয়? কি ভালো হয়? বলি, আস্তে শব্দ করবো মানে কি? নৌকো কি কারুর একচেটিয়া জমিদারী নাকি?'

সঙ্গে সঙ্গে মাঝির উদ্দেশে গলা তুললো হেনু দাস: 'বলি, ও মাঝি, তোমার এখানেও কি আইন মেনে চলতে হবে নাকি?'

চতুর্বর্গের হাবভাব দেখে মনে মনে ভয় ছিল ইয়াকুবের। পাকিস্তানের গয়নার মাঝি হলে কি হবে, এমন মধ্যরাত্রির মধুমতীতে যদি হালে পানি না পায় সে, তবে বিপদের কথা। ভয়ে ভয়েই তাই উচ্চারণ করলো সে: 'আইজ্ঞা আইন আর কি, খেলেন না রাইত ভইরা তাস।'

এবারে রীতিমত অপ্রস্তুত হয়েই পড়লো বাবুরাম। এখানকার এই সংখ্যাগুরুদের কাছে তার লঘুকণ্ঠের আবেদনটা যে এমন করে বানচাল হয়ে যাবে, একথা জানলে মুখ বুজেই থাকতো সে। বিপদে পড়ে এবারে চুপ করে যেতেই বাধ্য হলো বাবুরাম।---

রাত ক'টা হবে কি জানি। জলের বুকে ছপ্ ছপ্ শব্দ ভিন্ন আর কিছু একটাও শোনা যায় না। মধুমতীর বুকের ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে 'গয়না'।

ক্রমে বাইরের অন্ধকার ফিকে হয়ে এলো। সম্ভবত ভোর হবার আর বেশি দেরি নেই। মিঠে বাতাসে শরীরে কেমন কাঁপন অনুভব হলো। ছইয়ের ওপর দিয়ে বোধ করি কী একঝাঁক জলচর পাখি অলক্ষ্যে আর্তনাদ করতে করতে উড়ে গেল।

—'বিছমিল্লা রহিমতুল্লা—।

একবার হাই তুললো ইয়াকুব। —'অ সমছের বাই, উইঠ্যা এবার উনাবে হাত লাগাও। রাইত যে কাবার হইয়া আইলো।'

রোজার মাস; ভোর হবার আগে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিতে হবে সবাইকে। এ ব্যাপারে সমসের আলীর কাজটাই অধিক। প্রাণপণে বসে দাঁড় টানতে হয়, আর বাটনা বেটে উনুন ধরিয়ে রাঁধতেও হয় তাকেই। নৌকো মধুমতীর বুকেই চলুক আর বঙ্গোপসাগরেই চলুক, অসুবিধে নেই কোনো ক্ষেত্রেই। কলকল বেগে স্রোত বয়ে যায় নিচে দিয়ে, ওপরে হাঁড়িতে টগবগ করে ফুটতে থাকে ভাত। নদীর মানুষের অভ্যস্ত জীবনযাত্রা।

উঠে একসময় তোলা-উনুনে আঁচ দিল সমসের আলী, তারপর গুন্‌গুন্ করে কী একটা সারিগানের সুর ভাঁজতে লাগলো আপন মনে।

চতুর্বর্গের জীবনে ততক্ষণে সম্ভবত নিবৃত্তি এসে থাকবে। প্যাকেটের মধ্যে তাসগুলোকে গুঁজে রেখে যাত্রার দলের মৃত সৈনিকের মতো পাশাপাশি টান টান হয়ে শুয়ে পড়লো সকলে: হেনু দাস আর প্রেমহরি, শীতেশ্বর আর

প্রদীপ ভঙ্গ। বোঝা গেল—রাত জাগবার অভ্যাস এদের কারুরই নেই। শুধু কিছুক্ষণের একটা উত্তেজনা আর আস্ফালন।

—'বদর বদর হেঁইও—।'

আরও খানিকটা জোরে দাঁড় টানতে সুরু করে দিল ইয়াকুব আর তার সঙ্গীদল। সূর্য ওঠার আগে আগেই যদি টেপাখোলার সদর ঘাটে গিয়ে নৌকো না ভিড়ানো যায়, তবে আর কষ্টের শেষ থাকবে না। সমসের আলীর হাতের গুণ আছে। রান্না হতে দেরি লাগে না। আর রান্নাই বা তেমন একটা কি? দুটো আলুভাতে ভাত, সঙ্গে চিংড়ির একটা ঝাল-পাতুড়ি, ব্যস। এই যথেষ্ট, এই পরমায় ইয়াকুবদের জীবনে। খেয়ে-দেয়ে আর দাঁড় টানা সম্ভব হবে না, আলস্যে দু'চোখ জড়িয়ে আসবে।

—'বদর বদর হেঁইও—।'

ছপ্ ছপ্ শব্দে মুহুর্মুহুঃ দাঁড় পড়তে লাগলো মধুমতীর কালো জলে। মধুমতীও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সামনেই একটা বাঁক ঘুরে কুমারনদীর মরা শাখায় পড়বে নৌকো। লোকে বলে—পদ্মা মরে গিয়ে এখানে ঐ রূপ পরিগ্রহ করেছে নদীটা। আগে নাকি চোল-সমুদ্রের সঙ্গে ওর একটা সূক্ষ্ম যোগ ছিল, এখন সেটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।---

এতক্ষণে বেশ একটা নাক ডাকাবার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে এদিক থেকে। নোট্রাম আর তুরুপের বেশ একটা মারপ্যাচ ঘুরছে ঘুমন্ত হেনু দাসদের মাথায়। শেষরাত্রির মিঠে বাতাসের আমেজ। ঘোরে ঘুমমান হয়ে পড়েছে চতুর্বর্গের জনবায় জীবন।

কিন্তু গগন চৌধুরী? এতটুকুও ঘুম নেই তাঁর পোড়া দুই চোখে। রাশিকৃত চিন্তার চাপে ব্রহ্মতালুটা ক্রমশই বিষিয়ে উঠছে তাঁর। অনেকক্ষণ কেটে গেলে একসময় কাছে ডাকলেন তিনি বাবুরামকে।

—'কিছু কষ্ট হচ্ছে বাবু?'

—'না।' অদ্ভুত একটা পরাজিতের স্বর গগন চৌধুরীর কণ্ঠে।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো একবার বাবুরাম।

চোখের কোণে মনে হলো যেন একবার জল জমে উঠলো গগন চৌধুরীর। নীরবে কাপড়ের খুঁটে সেটুকু মুছে নিলেন তিনি।

—'বাবুরাম?'

—'আজ্ঞে?'

—'তোর মাঠাক্‌রুণের মৃত্যুর দিনটা মনে করতে পারিস?'

একবার যেন কি চিন্তা করে নিল বাবুরাম, তারপর বললো: 'আজ্ঞে চুয়ান্ন সালের দশই বৈশাখ, খুব বাদলা ছিল সেদিন।'

অলক্ষ্যে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন গগন চৌধুরী। —'ঠিক মনে আছে দেখছি তোর।'

—'আকাশে খুব ঝড় উঠেছিল সেদিন। বাংলার আকাশেও তখন ঝড়ের সংকেত।'

বাবুরামের মুখের দিকে একবার তাকাতে চেষ্টা করলেন গগন চৌধুরী—'আজকের তারিখটা কত বলতে পারিস বাবুরাম?'

—'আজ্ঞে দশই বৈশাখ। এই দিনেই মাঠাক্‌রুণ দেহ রেখেছিলেন।'

—'সম্ভবত ভালোই করেছিলেন, না কি বলিস? খানিকটা কেশে গলাটাকে ঈষৎ পরিষ্কার করে নিলেন গগন চৌধুরী, তারপর পুনরায় বললেন: 'পাপ আর নির্যাতন সয়ে সয়ে আমার মতো এমন তিলে তিলে মরতে হয় নি তাঁকে।'

কথা বলতে পারলো না বাবুরাম। বুকের ভিতরটা কেমন যেন একবার জ্বালা করে উঠলো তার।

অন্ধকার ক্রমে ফিকে হয়ে আসছে বাইরে। ওদিকে মাটির মালসাগুলিকে মেজে-ঘষে পরিষ্কার করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে সমসের আলী। দাঁড় ছেড়ে একসঙ্গে বসে খাবার উপায় নেই কারুর। দুজন-একজন পালা করে খাবার ব্যবস্থা। নৌকোখানি চলেছে বেশ জোর কদমে।

—'বাবুরাম।'

—'আজ্ঞে?'

—'কিছু বললি না যে বড়।'

এবারও তেমনি নীরব বাবুরাম।

ম্লানকণ্ঠে গগন চৌধুরী বললেন: 'তোর বকুল দিদিমণির কথা মনে আছে?'

কথাটা ভালো লাগলো না বাবুরামের। নানারকমের যত বিশ্রী কথার উল্লেখ করতে সুরু করেছেন গগন চৌধুরী। সোনার পুতুলের মতো একমাত্র মেয়ে ছিল তাঁর বকুল। বয়সটাও নেহাৎ কম হয়েছিল কি। ভরা ভরা প্রায় সোমত্ত। হঠাৎ একদিন রাত্রি থেকে তাকে আর পাওয়া গেল না। জানা গেল—গহরপুর জমিদার স্টেটের প্রজা আফজল মুন্সী তাকে অপহরণ করে পালিয়েছে। থানা-আদালতে দৌড়াদৌড়ি কম হলো না, কিন্তু মিথ্যে, খোঁজ মিললো না কারুর, না বকুলের, না আফজল মুন্সীর। রাজকার্য ফেলে পুলিশের এমন সময় হলো না যে, বকুলমণিকে খুঁজে বার করে। ফেরারী আফজল মুন্সীর হাতের থাবায় পড়ে জীবনান্ত হয়ে মরছে বকুল। কে জানে সে বেঁচে আছে কি না।

ঘটনাটা পরিষ্কার মনে আছে বৈকি বাবুরামের। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে সে বললো: 'এসব কথা ছাড়া কি আর কথা নেই বাবু?'

—আছে বৈকি, তোর রঞ্জন দাদাবাবুর কথাটাই ধর না কেন!”

বলে হঠাৎ নিজের মধ্যেই কেমন যেন একবার শিউরে উঠলেন গগন চৌধুরী। অপঘাতে মরেছে রঞ্জন। তাঁর সারা জীবনের একমাত্র ভরসা ছিল সে। সারা ইউনিয়নের লোকে ডাকতো তাকে কুমারসাহেব বলে। কিন্তু সেও তার সমস্ত কৌমার্য রক্ষা করেই একদিন চলে গেল। বেশি-দিনের ঘটনা নয়। সংসার থেকে পুষ্পলতা চক্ষু বুজে যাবার পর খুব বেশিদিন কাটে নি। খুলনা-নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকার হাঙ্গামার কতকটা হাওয়া কেমন করে যেন একদিন উড়ে এলো তাঁদের গহরপুর ইউনিয়নে। চৌকিদার-বরকন্দাজেরা অনবরত ক'দিন ধরে টহল দিয়ে বেড়াতে লাগলো। কিন্তু তাদের চোখই চোখ নয়। যখন শত চোখ সহস্রাক্ষি হয়ে মুষল আর মশাল হাতে এলো, তখন প্রাণ নিয়ে পালাবার পালা আসে তাদেরও। এমন একটা বিপর্যয় মুহূর্তেই দেহ থেকে মাথাটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল রঞ্জনের। সারাজীবন একটি বারও যিনি ভগবানকে ডাকেন নি, সেই গগন চৌধুরী সেদিন অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে একবার কাতর স্বর তুলেছিলেন কণ্ঠে: ‘এ তোমার কি অদ্ভুত পরীক্ষা, এ তুমি কি করলে ভগবান? আমার বংশের প্রদীপটিকে পর্যন্ত তুমি এমনি করে নিভিয়ে দিলে?’

রীতিমত বোবা হয়ে গেল এবারে বাবুরাম। উপায় থাকলে কিছুক্ষণের জন্যে অন্তত কর্তাবাবুর সামনে থেকে পালিয়ে বাঁচতো সে, কিন্তু তারও কোনো পথ নেই। বকুল আর রঞ্জনের স্মৃতিটা এখনও কাঁটার মতো খচখচ করে বেঁধে তার বুকে। কোলে করে মানুষ করেছিল সে বকুল আর রঞ্জনকে। গগন চৌধুরীর চাইতে কম ব্যথা বাজে নি সেদিন বাবুরামের। রক্তের সম্বন্ধ না থাকলেও স্নেহের ভালোবাসার মানদণ্ডে একেবারে অকিঞ্চিৎকর নয় সেও। বুকের মধ্যে তারও এমন একটা হৃদয় লুকিয়ে আছে, যেখানে করুণার স্রোত বয়ে চলেছে বিগলিত ধারায়। কিন্তু তা খুলে দেখাতে পারে নি সে কোনোদিন। এ পৃথিবীতে ভৃত্যের আসন সবার নিচে।

বাধা দিতে চেষ্টা করলো একবার বাবুরাম।—‘সেসব কথা এখন আর মনে আনবেন না বাবু। মন থেকে ওসব মুছে ফেলতে চেষ্টা করুন।’

—‘চেষ্টা কি কম করছি রাম, কিন্তু কই, পারলুম না তো!’ একটা ভারী নিশ্বাস ফেললেন গগন চৌধুরী।

সামনের বাঁক ঘুরে এতক্ষণে সরু খালের মুখে এসে পড়েছে নৌকো। কুমারনদীর মরা শাখা। ক্রমে দিনের জ্যোতি ফুটে উঠছে অন্ধকার রাত্রির বুকে। এখান থেকে তীর বেশি দূরে নয়। সদরে পৌঁছে ট্রেন ধরতে হবে গগন চৌধুরীকে। গহরপুরের মায়ায় পাকিস্তানের মাটির আকর্ষণ আজ আর এতটুকুও নেই, পাকিস্তানের মাটি ছাড়িয়ে যেখানে ভারতভূমির দূর-প্রসারী রেলপথ, সেই পথেই আজ তাঁর শেষ যাত্রা; শেষ লক্ষ্য তাঁর কাশীধাম। বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে। আরতির ধূপের ধোঁয়ায় মন্দির আচ্ছন্ন, নানা লোক আসছে নানা প্রার্থনা নিয়ে। গগন চৌধুরীও বাবা বিশ্বনাথের পায়ে প্রণাম নিবেদন করে পুষ্পলতা, রঞ্জন আর বকুলের আত্মার জন্যে কল্যাণ প্রার্থনা করে নেবেন।

—ভাবতে গিয়ে আত্মনিমগ্ন হয়ে গেলেন গগন চৌধুরী।

ইয়াকুবেরা পর্যায়ক্রমে একসময় নামাজ সেরে রাত্রিশেষের আহার শেষ করে নিল।

সরু খালের পাশে পাশে বিক্ষিপ্ত চাষীর কুটির। সেখান থেকেও আজানের ধ্বনি আসছে কানে। মাঝে মাঝে গাছের ডালে ডালে কিচমিচ করে উঠছে নানা পাখি।

অনেকক্ষণ বাদে আর একবার ডাকলেন গগন চৌধুরী: ‘বাবুরাম!’

—‘আজ্ঞে?’

—‘এমন করে এত তাড়াতাড়ি যে

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ
প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে – মাদ্রাজ – দিল্লী – কানপুর
বেজওয়াড়া – শ্রীনগর – গৌহাটী

গহরপুর ছেড়ে চলে আসতে হবে, তুই কি কল্পনা করতে পেরেছিলি ?'

মাথা নিচু করে নিল বাবুরাম।

—'আমিও পারি নি।' ভাঙা গলায় গগন চৌধুরী বললেন: 'এমন করে যে জমিদারীটা তচনচ হয়ে যাবে, এমন করে যে বিদ্রোহী প্রজারা ছিনিয়ে নেবে আমার সব কিছু, এ আমি কল্পনাও করতে পারি নি রাম। চোরের মতো আজ নিজের জমিদারী ফেলে পালিয়ে আসতে হলো। তুই পাশে না থাকলে এভাবেও বোধ হয় আসতে পারতুম না।' নিজের অলক্ষ্যেই আর একবার কাপড়ের খুঁটে চোখ দুটোকে রগড়ে নিলেন গগন চৌধুরী।

কথা ফুটলো না বাবুরামের মুখে। শুধু দু' চোখের ওপর দিয়ে শেষবারের মতো একবার গহরপুর জমিদারী স্টেটটা ভেসে গেল তাঁর: সেই বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, সেই সুসজ্জিত দীপাধার, চকমিলানো বৃহত্তর বাড়ির চত্বর, কাছারীঘরের দলিল-দস্তাবেজ, সেই উদার বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র আর কাছে-দূরে স্তরে স্তরে প্রজাদের আবাস।

রোমাঞ্চ-রহস্য গ্রন্থ

রক্তনদীর ধারা

ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল

রক্তনদীর ধারা মাসিক বসুমতীর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। রোমান্স ও রোমাঞ্চের সত্য ঘটনায় বইটির আদ্যোপান্ত পরিপূর্ণ। রক্তনদীর ধারা জীবনের অভিজ্ঞতা নয়; জীবনপথের দিক-নির্দেশ। তাই প্রবঞ্চনা; ছলনা ও প্রেমের লীলার চাঞ্চল্যকর বইটি চাঞ্চল্য তুলেছে সকল সমাজেই। লোমহর্ষক সামাজিক কাহিনী।

দাম চার টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

সবকিছু যেন বিদ্যুতের মতো কেমন একবার চোখের সামনে দিয়ে চমকে গেল বাবুরামের। আর সেইসঙ্গে একবার কেঁপে উঠলো ধমনীর রক্ত-কণাগুলি। চিরকালের নিরীহ শান্ত প্রজারা একসময় উন্মত্ত জলতরঙ্গের মতো নেচে উঠলো। খাজনা বন্ধ করেছিল অনেক আগেই, শেষ আশা মেটালো তারা চৌধুরী-জমিদারী দখল করে। যে জমিদারী চলতো এতদিন গগন চৌধুরীর একা হাতে, এখন থেকে তা পড়লো গিয়ে না জানি কোন শক্তিযুথের হাতে। এতদিনে হয়তো প্রজাদের তৃষিত আত্মা কিছুটা তৃপ্ত হলো।

সহসা কী একটা স্বপ্ন দেখে যেন ওদিক থেকে চমকে উঠলো শীতেশ্বর, ঠেলে ওঠালো হেনু দাস, প্রেমহরি আর প্রাণেশ ভদ্রকে।

—'শকুনি।'

—'সে কি, শকুনি আবার কোথায় রে?' ত্রস্তে ঝুঁকে বললো সকলে শীতেশ্বরকে কেন্দ্র করে।

—'হ্যাঁ, শকুনি।' জড়িতকণ্ঠে শীতেশ্বর বললো: 'মনে হচ্ছিল বিরাট একটা শকুনি যেন রাক্ষসীর মূর্তি ধরে আমাকে আক্রমণ করতে এসেছে।'

ঘুমের জড়তা তখনও ভালো করে কাটে নি কারুর। তৎসত্ত্বেও কথা শুনে এবারে হো-হো করে হেসে উঠলো সকলে।

—'তোর কি মাথা খারাপ, না আর কিছু?'

—'শকুনি এলো রাক্ষসী হয়ে তোকে আক্রমণ করতে? আমরা তবে ছিলাম কোথায়?'

—'আমরা ছিলাম ছইয়ের ওপরে। উনি পাটাতনে পড়ে পড়ে গোঙাচ্ছিলেন।' থেমে হেনু দাস বললো: 'এবারে নতুন ভিসা আর পাসপোর্ট করে তুই রাঁচী যা শীতু, অথবা মাই-গ্রেশন সার্টিফিকেট নিয়ে এ তল্লাটের মাটি ছেড়ে বেরিয়ে পড়। মাথাটা তবু শান্ত হবে। শালা, বাঁধে দু' রোল হেরে গিয়ে রাক্ষসীর পেটে যাচ্ছিল, আর দু' রোল হারলে তো মধুমতীতে ডুবে মরতিস; ইয়াকুবদের সাধ্যও ছিল না যে তোকে বাঁচায়।'

আবার সেই হো-হো শব্দে হাসি।

পারলে একবার ইয়াকুবও হেসে নিতো প্রাণভরে। কিন্তু ততক্ষণে সে এসে সদরঘাটে নোঙর করেছে নৌকো।

পাড়ে তখন কয়েকটি নিম্ন-মধ্যবিত্ত হিন্দুনারী গায়ে হলুদ মাখিয়ে বিয়ের কনেকে ঘাটে এনেছে স্ত্রী-আচার রক্ষা করে স্নান করিয়ে নিতে। মাঝে মাঝে উলুধ্বনি জাগছে তাদের কণ্ঠে।

এত শ্লেষবাণ নিক্ষেপের পরেও শীতেশ্বর কিছু একটাও আর না না বলতে পেরে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল। এবারে সদরঘাট থেকে নারীকণ্ঠের উলুধ্বনি কানে ভেসে আসতেই সেদিকে সকলে দৃষ্টি ফেরালো।

গগন চৌধুরীও নিশ্চেষ্টভাবে বসে থাকতে পারলেন না। বাবুরামের হাত ধরে নৌকোর পাটাতনের উপর উঠে দাঁড়াতে গিয়ে তাঁর মনের মধ্যেও একটা দারুণ প্রশ্ন আলোড়িত হয়ে উঠলো:— গহরপুর জমিদার স্টেটেও কি এমনি করেই আজ পুরনারীরা উলুধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠেছে? বৃহত্তর চৌধুরী স্টেটের ভস্মস্তূপে এতটুকুও কি আজ আর প্রাণের প্রাচুর্য আছে কোথাও? আছে কি পাল-পার্বণ, যাগ-যজ্ঞ আর বিবাহ-উৎসব?—অলক্ষ্যে টস টস করে দু' ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো গগন চৌধুরীর চোখ বেয়ে।

প্রভাতসূর্যের রক্তিম আলোয় তখন পথ-প্রান্তর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তীরের বুকে আছাড় খেয়ে জলের ঢেউয়ে মৃদু মৃদু দোল খাচ্ছে কেবল গয়না নৌকোখানি।

শ্রীনপতি সওদাগর

বানিজ্যে সেকাল ও একাল

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ ষড়্‌বিংশতি প্রবাহ ॥

মোগল ইতিহাস।

বিপুল তার বিস্তার। ভারতবর্ষের সুদূরতম প্রান্তেও তাঁদের প্রভাব ছিল। এই বাংলা দেশের একেবারে প্রান্ততম নিভৃত দেশেও একদিন ছিল মোগলশাসনের রাজকীয় সমারোহ।

জাহাঙ্গীর। যেমন বিলাসী ছিলেন, তেমনি ছিল তাঁর নিপুণ শাসনক্ষমতা। তিনি সুবা উড়িষ্যা নতুন করে গঠন করে ফেললেন। একদা ধনেজনে পূর্ণ, আর সমুদ্র উপকূলের এই জনপদ মেদিনীপুরকে উড়িষ্যার সঙ্গে জুড়ে দিলেন। পাঠিয়ে দিলেন নতুন এক সুবেদার। এই সুবেদার মেদিনীপুরে বাণিজ্যের অনেক উন্নতি করেছিলেন।

জাহাঙ্গীরের পর সাজাহান। সাজাহান তাঁর দ্বিতীয় পুত্রকে (শাহ সুজাকে) পাঠালেন প্রাদেশিক শাসনকর্তা করে। এই সময়ের ইতিহাসে আছে মেদিনীপুরের বাণিজ্যের খবর।

সন ১৮০৬। এই সময় এক ইংরাজ ঐতিহাসিক রাফেল ফিচ্ এসেছিলেন বাংলা দেশে। তিনি বলেছেন, হিজলীতে বহু দূর দূর দেশ থেকে আসে পণ্যবাহী জাহাজ; আসে শত শত সওদাগর। তারা আসে নাগাপট্টম থেকে, আসে সুমাত্রা থেকে, আসে মালাক্কা থেকে—আরও পৃথিবীর নানা দেশ থেকে। তারপরে আরও বলেছেন, "They took from here rice, cotton, wool and sugar and long pepper, great store of butter etc.

হিজলী। সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলায় একটি বিখ্যাত নাম। সওদাগররা এখানে আসতো। আবার চলেও যেত। কিন্তু পৃথিবীর দেশে দেশে নিজেদের পণ্যের বাজার খুঁজতে গিয়েই উপনিবেশ স্থাপন করেছে—ধীরে ধীরে দেশের মাটির সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে মিশে গিয়েছে, এমন বহু দৃষ্টান্ত আছে।

ইতিহাস বলে। আধুনিক হিজলীর কিছু দূরে গ্রামপ্রান্তে পর্তুগীজদের কুঠিবাড়ির ধ্বংসচূর্ণ আজও রেণু রেণু হয়ে পড়ে আছে। এই বিদেশী বণিকরাও একদিন এখানে উপনিবেশ গড়েছিল। কিন্তু—

কিন্তু অত সহজে তারা এমন শান্তশিষ্ট ব্যবসায়ী হয় নি। অত অনায়াসে এই অর্থলোলুপ বিদেশীরা তাদের কুঠিবাড়ির গদীতে বসে দাঁড়ি-পাল্লা নিয়ে কেনা-বেচা সুরু করে নি। প্রাদেশিক শাসক শাহ সুজার তীক্ষ্ণ নজরের প্রহরাকে এড়িয়েও ওরা হিংস্র জন্তুর মত নিঃশব্দ পায়ে শিকার খুঁজে খুঁজে বেড়াতো। শিকার। নারী। সোনা। টাকা। লুঠতরাজ, রাহাজানি, ছিল নিত্যদিনের ঘটনা সমুদ্রতীরের সব জনপদে। আধুনিক বালেশ্বরের রেমুনা, বাস্তা আর জলেশ্বরে ওদের অত্যাচার একেবারে সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

পর্তুগীজ আর আরাকান জলদস্যুরা রাত্রির অন্ধকারে প্রেতচ্ছায়ার মত পানসিতে করে উপকূলে আসতো। হাতে উন্মুক্ত তরোয়াল, হিংস্রতায় ধারালো দুটো চোখ, লোলুপ উল্লাসে তারা ঝাঁপিয়ে পড়তো রেসুনা, বাস্তারের শান্ত-নিভৃত পল্লীতে। নির্বিচারে হত্যা করতো শিশু, বৃদ্ধ আর যুবাদের। আর পানসি বোঝাই করে নিয়ে যেত যুবতী মেয়েদের। শাহ সুজা বালেশ্বরের এই অঞ্চলকে বাংলার সঙ্গে জুড়ে দিলেন শুধু বিদেশী দস্যুদের হাত থেকে এই অঞ্চলকে রক্ষা করার জন্য। বাংলায় আসার এই উপকূলে ব্যবসা-বাণিজ্য সমৃদ্ধিলাভ করেছিল।

হিজলীর পটভূমিতে আবার নতুন পরিবর্তন হলো। বাংলার মসলিন, বাংলার ইক্ষু, বাংলার ধানের লোভে আবার সমুদ্রপারের নতুন একদল বিদেশীর আনাগোনা সুরু হলো।

এল ওলন্দাজরা। মেদিনীপুরের গেজেটিয়ার বলে: 'In the 2nd quarter of XVII century Dutch began to trade here.'

এল ইংরেজ। আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টনের লেখার ভেতরে হিজলীতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ইতিবৃত্ত জলজল করে: English appeared at the later half of the century. At this time, Chandrakona became famous for sugar and Radhanagar was the centre of trade in regard to cotton cloth and Silkroomals.

চন্দ্রকোণায় গৃহস্থদের বাড়িতে বাড়িতে আখ মাড়াই চলতো। বড় বড় কড়াইতে করে আখের রস জ্বাল দেওয়া হতো। শত শত কর্মী অহরহ ব্যস্ত হয়ে থাকতো গুড় আর চিনি তৈরিতে। আধুনিককালের চন্দ্রকোণার কোথাও এই চিনি-ব্যবসায়ীদের খুঁজে পাওয়া যাবে না—কোথাও নেই এই ব্যবসার সমারোহ। কিন্তু একদিন ওলন্দাজরা ভিড় করে এসে দাঁড়াতো এই বিখ্যাত মিহি চিনির পণ্য কিনতে। আসতো ইংরেজ, ফরাসী ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিরা চিনি ক্রয় করতে। রাধানগরের ঘরে ঘরে সেই সুদূরকালে তাঁতের ঠকাঠক শব্দ উঠতো। আজ যে কুটিরশিল্প নিয়ে প্রচুর আন্দোলন করা হচ্ছে, কিন্তু বিনা চেষ্টায়, বিনা আন্দোলনে একদিন স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাধানগরে কুটিরশিল্প গড়ে উঠেছিল। হ্যামিল্টনের চোখে বিস্ময় নেমেছিল: এত সুন্দর আর সুদৃশ্য ও মিহি কাপড় বুনতে পারে গ্রামীণ শিল্পীরা।

রাধানগরের সিল্কের রুমাল একদিন বিলাসী মেয়ে-পুরুষদের তীব্র আকর্ষণ ছিল। এখানকার, এই বাংলা দেশের দূরতম নিভৃত পল্লীর বস্ত্রবয়নকারীর হাতের চিহ্ন চলে যেত সাগর পাড়ি দিয়ে বহু দূরের দেশ-দেশান্তরে। আজ—

রাধানগরের লোকেরা হয়তো জানে না তাদের অতীত-পুরুষদের গৌরবোজ্জ্বল এই কৃতিত্বের কথা: জানে না এখানেই একদিন সুখী, সম্পন্ন আর স্বাধীন বাঙালী ব্যবসায়ীরা দৃপ্ত গর্বিত পদক্ষেপে চলাফেরা করতো।

শুধু হ্যামিল্টন নয়, সুবিখ্যাত ওলন্দাজ পরিব্রাজক ভ্যালেণ্টাইনের প্রত্যক্ষ বিবরণের ভেতরেও বাংলার সমুদ্র উপকূলের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির ইতিহাস জীবন্ত হয়ে ফুটে ওঠে: Higli was one of our (Dutch) chief settlements. Rice and other articles were chiefly sold here.

শুধু পর্তুগীজ নয়, ইংরেজ নয়, ওলন্দাজদের কুঠিবাড়িও ছিল এখানে। বিদেশী পণ্যবাহী জাহাজ দাঁড়িয়ে থাকতো। আর শত শত মজুর পিঠে ভারী ভারী বস্তা নিয়ে কুঁজড়ে দ্রুত-পায়ে জাহাজের খোলে ফেলে কপালের ঘাম মুছতো। সারাদিন ধরে চলতো এই জাহাজ বোঝাই করার কাজ। তারপরে এক সময় নোঙর তোলার শব্দ হতো। জাহাজের ভোঁর শব্দ হিজলীর বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে বহু—বহু দূরে মিলিয়ে যেত। জল কেটে কেটে বাংলার ধান, অতীত বাংলার ঐশ্বর্য-লক্ষ্মী চলে যেতেন দেশ-দেশান্তরে।

হ্যামিল্টন, ভ্যালেণ্টাইনের লেখার ভেতরে যেন আমাদের প্রস্তরায়িত অতীত আত্মীয়েরা কথা বলে ওঠে, বহু দূরাগত সঙ্গীতের সুমধুর সুরের মত তাদের কণ্ঠস্বর আমাদের কানে ভেসে আসে। আর—

আর আধুনিককালের বাংলার বিখ্যাত জনপদ হিজলী, তমলুক, রাধানগর যেন নতুন এক সাজে সেজে আমাদের চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলে: বাঙালী তোমরা এক বিচিত্র আত্মবিস্মৃত জাতি, তোমরা জানো না, কত হাজার হাজার বণিকের কলকণ্ঠে একদিন মুখরিত থাকতো আকাশ-বাতাস, তোমরা জানো না কোথায় তাম্বলী আর হিঙ্গেলী।

ভ্যালেণ্টাইনের লেখার ভেতরেই আছে: Tamboli and Benzia were two Villages where the Portugeese have their church and their Southern trade, There is much dealing in wax here.

তাম্বলী অর্থাৎ তাম্রলিপ্ত। আর বেঞ্জিয়া একটি গ্রাম। তাম্রলিপ্ত বাঙালীর সমুদ্র-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল। এই তাম্রলিপ্তে বিদেশী ব্যবসায়ী পর্তুগীজদের চার্চ ছিল, ছিল তাদের দক্ষিণ বাংলার বাণিজ্যের প্রসারতা। বেঞ্জিয়াতে ছিল ঘন অরণ্যের বিপুল বিস্তার। শত শতাব্দীর বনস্পতিরা বেঞ্জিয়ার মাটিতে নিবিড় নীলাভ ছায়া ফেলে পুরনো কালের প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে থাকতো। এইসব সুপ্রাচীনকালের গাছের ডালে ডালে মৌমাছিরা চাক বেঁধে বাসা করতো। তারপরে একদিন মধু-ব্যবসায়ীরা আসতো। আসতো অরণ্য সংহার করতে, আসতো মৌমাছিদের শান্ত-নিভৃত নীড়ে হাহাকার তুলে দিতে।

চাক ভাঙা হয়ে গেলে মোম সংগ্রহ করতো মোম-ব্যবসায়ীরা। সেই মোম রপ্তানি হয়ে যেত দূর বিদেশে। আমাদের পূর্বসূরীরা একদিন আদিম অরণ্য, দুস্তর সমুদ্র সবকিছুকে অগ্রাহ্য করে ব্যবসার বিস্তার করেছিল—এই কথা উত্তরসূরীদের মনে প্রেরণা দেবে, দেবে নতুন একটা শক্তিকে তরঙ্গায়িত করে।

ভ্যালেণ্টাইনের পরে এসেছিলেন Gameli Carerier, আর এক পরিব্রাজক। বিচিত্র তাঁর বিবরণ —

(ক্রমশঃ)

রাজধানী :

নতুন বছরে বঙ্গদর্শনের পাঠক-পাঠিকাদের আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। ইংরেজী বছর হলেও এর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা কত ঘনিষ্ঠ, কত নিবিড় সে কথা গেল সপ্তাহেই উল্লেখ করেছি। সেকালে—ইংরেজের আমলে পহেলা জানুয়ারীর রূপ ও লাবণ্য ছিল আলাদা। রাতারাতি শহর-কলকাতার রূপ তখন যেতো পাল্টে। চৌরঙ্গী পরিণত হতো ইন্দ্রপুরীতে। গীর্জায় গীর্জায় মধ্যরাত্রিতে বর্ষ-বোধনের ঘণ্টা বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের ঢল নামতো চৌরঙ্গী এলাকার, সাহেব পাড়ার পথে পথে। তার ঢেউ গিয়ে পড়তো কলকাতার অভিজাত পরিবারগুলোতে। হোটেল, রেস্তোরাঁ ও সাহেব পাড়ার ক্লাবগুলো জম-জমাট হয়ে উঠতো। শীতের শহর রীতিমত গরম হয়ে উঠতো।

সে উৎসবের রূপবদল ভিন্ন আর সব ঠাট এখনও বজায় রয়েছে। খাস বিলেতী সাহেবের স্থানটা দেশোয়ালী সাহেবরা নিয়েছেন। আগের উন্মাদনাটা কমেছে কিছুটা। 'হ্যাপি নিউ ইয়ার' কামনা করে বন্ধু-বান্ধবদের এখনও আমরা রঙীন কার্ড পাঠাই। তবে, সেকালের উন্মত্ত ভোগবিলাসের মধ্যে অতীতকে একেবারে মুছে ফেলার প্রয়াসটা নেই। পুরোনো দিনের ভয়, সংশয় ও গ্লানি থেকে মুক্তির কামনা নিয়ে আমরা আহ্বান করি নতুনকে। সকল নৈরাশ্য দূর করে, সকল সংশয় কাটিয়ে উঠে নতুন আলোকে জীবন উজ্জ্বল হয়ে উঠুক—এই কামনা করে বঙ্গ-দর্শনের পাঠক-পাঠিকাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

১৯৬৪ সাল ভয়াল মূর্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল। তার মর্মান্তিক আঘাতের যন্ত্রণায় এখনও আমরা ছটফট করছি। এই সালে আমরা হারিয়েছি বিশ্ববরেণ্য নেতা, আমাদের আদরের দুলাল প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে। তাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠ কালের কপোলতলে রুদ্ধ হয়ে গেছে।

● নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির সমাবর্তন উৎসবে ভাষণরতা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

এই সালেই কালোবাজারের দাপটে বাজারে সৃষ্টি হয়েছিল অস্বাভাবিক অরাজকতা। চরম খাদ্য-সঙ্কট দেখা দিয়েছিল ভারতের সর্বত্র। চাল, আটা, ময়দা, গম ও তেল থেকে সুরু করে শিশুর খাদ্য পর্যন্ত নিয়ে মনাফাশিকারী দল বাজারে কৃত্রিম ঘাটতি সৃষ্টি করে দিনের পর দিন মানষের পকেট কেটে মোটা অঙ্কের মনাফা লুঠেছে। তার জের এখনও চলেছে। অসাধু ব্যবসায়ীদের কুটিল চক্রান্তজাল ছিন্ন করে আশানরূপ শক্তিশালী বিধান আমাদের রাষ্ট্রনায়কগণ করতে পারেন নি।

নতুন বছরের অরুণোদয়ের সাথে সাথে নতুন আশার বাণী শুনতে পাচ্ছি নেতাদের কণ্ঠে। নতুন বছরে পশ্চিম বাংলার কাছে ৫ই জানুয়ারীর গুরুত্ব সমধিক। এই দিনটিতে কলকাতা ও শহরতলীর শিল্পাঞ্চলে বিধিবদ্ধ রেশন প্রথা চালু হল। এই দিনেই সমস্যার যাঁতাকলে নিষ্পেষিত পশ্চিম বাংলায় অধিবেশন সুরু হচ্ছে নিখিল ভারত কংগ্রেসের।

পূর্ণাঙ্গ রেশন প্রথা প্রবর্তনের প্রাক্কালে পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ঘোষণা করেছেন, চাল, গম, আটা ও চিনি নিয়ে ব্যবসায়ীদের আর ছিনিমিনি খেলতে দেওয়া হবে না। খাদ্যশস্যের ব্যবসাতে অবাধ অধিকার পেয়ে অসাধু ব্যবসায়ীরা সাধারণ মানুষকে আর যাতে বিপন্ন করে তুলতে না পারে, সেটাই হবে সরকারের লক্ষ্য। এই আদর্শ সামনে রেখেই কলকাতা ও বৃহত্তর শিল্প এলাকায় বিধিবদ্ধ রেশন প্রথা প্রবর্তিত হয়েছে। মফস্বল এলাকাতেও কৃত্রিম খাদ্যসঙ্কট ব্যবসায়ীরা যাতে সৃষ্টি না করতে পারে, সরকার সে সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বনে দৃঢ়সঙ্কল্প।

সঙ্কল্প খুবই সাধু। পশ্চিম বাংলার ষাট লক্ষ নরনারীর চাল, গমজাত দ্রব্য ও চিনি সরবরাহের দায়িত্ব সরাসরি সরকার গ্রহণ করেছেন। পশ্চিম বাংলার বাসিন্দা তিন কোটির কাছাকাছি। ষাট লক্ষের মুখের অন্ন সংগ্রহের ভার সরকার নিলেন। বাকি যারা রইল তাদের ভবিষ্যতের কথা সরকার পরিষ্কার করে কিছুই বলেন নি। কলকাতার

রেশন ব্যবস্থা সফল হলে আশে-পাশের দুর্ভোগ কিছুটা নিশ্চয়ই কমবে। কলকাতার মত প্রতিটি মফস্বল-শহরের দায়িত্ব সরাসরি সরকার নিলে গ্রামের মানুষের অনশন ও অর্ধাশনের দিন আরও অনেকটা হ্রাস পেতো।

এই বিশাল কর্মযজ্ঞের জন্য প্রয়োজন বিরাট প্রস্তুতি। যাঁরা জেগে থেকে ঘুমোবার ভাণ করেন তাঁদের যেমন জাগানো সম্ভব নয়, তেমনি সেয়ানা মানুষকে জ্ঞানদানের চেষ্টাও বৃথা। আমরা বারবার এই সাংগঠনিক প্রস্তুতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। বাস্তবক্ষেত্রে আজ দেখা যাচ্ছে, সম্যক ব্যবস্থা অবলম্বন না করেই সরকার কর্মযজ্ঞ আরম্ভ করে দিয়েছেন।

শহর-কলকাতার রেশনাঞ্চলে সরকার অনুমোদিত দোকান ভিন্ন কোথাও এককণা চাল, গম ও চিনি পাওয়ার কোন উপায়ই নেই। অথচ ষাট লক্ষ লোকের একটা বিরাট অংশকে সরকার এখনও পারিবারিক রেশন কার্ড হাতে তুলে দিতে পারেন নি। জানুয়ারী মাসের মধ্যে তারা রেশন কার্ড পাবে কিনা, তার কোনই নিশ্চয়তা নেই। রেশন কার্ডের জন্য সারাদিন লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে পুলিশের লাঠির আঘাত খেয়ে রিক্তহস্তে ঘরে ফিরতে হচ্ছে। পুলিশের লাঠি খেলে পেট ভরবে না। পেটের জন্য যেন-তেন প্রকারে তণ্ডুল সংগ্রহ না করলে চলবে না। মানুষ বাধ্য হবে কালোবাজারের আশ্রয় নিতে।

মানুষ আজ বুঝতে পেরেছে, মুনাফাবাজদের শায়েস্তা করতে হলে রেশন ব্যবস্থা চালু করতেই হবে। তার জন্য যথাসম্ভব ত্যাগ স্বীকার করতেও তারা প্রস্তুত। শূন্য হাতে রেশনের দোকান থেকে কেউ তাই বলে নীরবে ফিরে আসবে না।

এখনও রেশনের দোকানে সবসময়ে খাওয়ার উপযোগী, পছন্দসই চাল মিলছে না। আতপান্নভোজীকে জোর করে সিদ্ধ চাল চাপালে যেমন সে সন্তুষ্ট হতে পারে না, ঠিক তেমনি সিদ্ধ চাল যার প্রধান খাদ্য তাকে আতপ চাল দিলে তার চলে না। পেট সরকারের শাসন মানে না—আতপ চাল সকলের পেটে সহ্য হয় না। কলকাতার অনেক রেশনের দোকানে বাহান্ন ও ছাপ্পান্ন

● শহর কলকাতার একটি রেশনিং অফিসে রেশন কার্ড করার জন্য ভিড়।

পয়সার চাল নেই। অনেক দোকানে আতপ ছাড়া আর কোন চালই পাওয়া যাচ্ছে না। আটা, গম ও ময়দার সরবরাহও নিয়মিত নয়। এ অবস্থা পূর্ণাঙ্গ রেশনের ক্ষেত্রে অচল।

কলকাতায় রেশন প্রথা প্রবর্তনের আগে তার আনুষঙ্গিক সকল সমস্যার কথাটাই চিন্তা করা উচিত ছিল। তেল, চাল, ডাল ও চিনিই ছিল মুদিখানার প্রধান পণ্য। তেল তাদের হাতছাড়া হয়েছে। চাল ও চিনি সরকার নিলেন। ডাল এখন বাজারে দুর্লভ। বাকি রইল সামান্য মশলাপাতি ও লবণটা। মশলাপাতির দাম বেড়েছে দ্বিগুণ। বড়বাজার তার চাবিকাঠি নিয়ে বসে আছে। অভাবের সংসারে মানুষ বাধ্য হয়েছে মশলার খরচ কমাতে। এ অবস্থায় ছোট ছোট মুদির দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হতে বাধ্য। মুদির দোকানের মালিকদের চোখে ঘুম নেই—বেকার জীবনের বিভীষিকায় তারা ভীত হয়ে পড়েছে।

সরকারের সদিচ্ছা থাকলে, একটু দূরদৃষ্টি নিয়ে কাজ করলে এ সমস্যা এমন প্রকট হয়ে উঠতো না। এ দোকানগুলোকে সহজেই রেশনের দোকানে পরিণত করা যেতো। দোকানদারদের জীবিকার পথ রুদ্ধ হতো না, সাধারণ মানুষকেও রেশনের দোকানে তীর্থের কাকের মত হা-পিত্যেশ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে হতো না।

স্বর্ণশিল্পীদের বেকার জীবনের যন্ত্রণা চোখের সামনেই সকলে দেখতে পেয়েছে। পাইকারী ব্যবসায়ী ও মজুতদারদের কাছে ছোট-বড় সকল শ্রেণীর মুদিরাই চোরাকারবারের শিক্ষা অল্পবিস্তর লাভ করেছে। কাজেই দুঃসহ বেকার জীবন থেকে মুক্তির পথ হিসেবে চোরাকারবারকেই এরা জীবনের অবলম্বন করবে না, একথা আজ আর হলপ করে বলা যায় না।

সরকার যেখানেই হাত দিয়েছেন, সেখানেই চোরাকারবার কেঁপে উঠেছে। সাধারণ মানুষের সব চাইতে সস্তার জলখাবার রুটিতে সরকারী হাত পড়ায় কতটুকু লাভ হয়েছে। সরকার আমাদের বরাদ্দ খাদ্যের একাংশ কেড়ে নিয়েছেন কুপনের ব্যবস্থা চালু করে। বিনা কুপনেও কিন্তু প্রচুর পরিমাণে রুটি পাওয়া যাচ্ছে। সরকার দাম কমাতে পারেন নি। বরং অধিক মুনাফার সুযোগটা ব্যবসায়ীদের করে দিয়েছেন। চব্বিশ পয়সার রুটি ছাব্বিশ থেকে তিরিশ পয়সা দিতে পারলেই বিনা কুপনে পাওয়া যাচ্ছে।

এ নীতির পরিবর্তন আবশ্যক। চোরকে চুরির পূর্ণ সুযোগ দিয়ে গেরস্থকে সজাগ করলে লাভ হবে না—চুরি তাতে বন্ধ হয় না, গেরস্থদের দুর্ভোগটাই বাড়ে মাত্র। পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা আবার সবিনয়ে অনুরোধ জানাচ্ছি, সমস্যার সামগ্রিক রূপটা সামনে রেখে তার সমাধানের ব্যবস্থা করুন। চোরের হাত থেকে সিঁদ কাটার যন্ত্রটা কেড়ে নিন এবং সেইসঙ্গে গেরস্থের ভাণ্ডারের সরবরাহটা চালু রাখার ব্যবস্থা করুন। সে কাজ করতে পারলেই তিনি যে বলিষ্ঠ কর্মপন্থার কথা বলছেন তা' সফল হবে—মানুষ দু' হাত তুলে তাঁর জয়গান করবে।

* * *

কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বাংলা দেশে মাত্র কয়েক দিন অবস্থানের মধ্যে যে কর্মচাঞ্চল্য দেখিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে মনে রাখার মতো। প্রেস ক্লাবের সদস্যদের তিনি এই কথা বলেছেন যে, ভারতের পত্রিকাগুলির মান উচ্চ কিন্তু সেগুলি আরো অধিক জন-জীবন সম্পর্কিত হওয়া উচিত। তিনি এমন কথাও বলেছেন যে, অন্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে সংবাদপত্রগুলির ক্ষেত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণই কাম্য। আকাশবাণীর কর্মী সমাবেশেও শ্রীযুক্তা গান্ধী বেতারকেন্দ্রের উত্তরোত্তর উন্নয়নের একটা আভাষ দিয়েছেন। রবীন্দ্র সরোবরে জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘ আয়োজিত ব্যায়াম-শিক্ষা-শিক্ষণ-শিবিরও তিনি পরিদর্শন করেন।

বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির সমাবর্তন অনুষ্ঠানেও শ্রীযুক্তা গান্ধী যোগদান করেছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক কর্মসূচীতে কৃতী শিক্ষার্থীদের ডিপ্লোমা, ডিগ্রি ও পদক দান করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী আর এম হাজারনবীশ। এরপর কেন্দ্রীয় তৈলমন্ত্রী শ্রীহুমায়ুন কবীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঐ সভায় শ্রীযুক্তা গান্ধীর সমাবর্তন ভাষণ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দানের মাধ্যমে তিনি এই ভাষাকে সঙ্গীতময় ভাষা বলে সানন্দে উল্লেখ করেন। তারপর তিনি উল্লেখ করেন রাজনীতি, শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাংলা দেশের গৌরবময় অবদানের কথা। রবীন্দ্র-বঙ্কিম-শরৎ সাহিত্য পাঠ করাকে তিনি একান্ত সুখকর বলে আনন্দ প্রকাশ করেন। অবশ্য এ কথাও তিনি বলেন যে, ভারতের প্রতিটি নাগরিকের উচিত হচ্ছে—দু-তিনটি ভাষা শিক্ষা করা। এতৎসত্ত্বেও দুঃখের ব্যাপার এই যে, শ্রীযুক্তা গান্ধী বর্তমানে বিশেষভাবে আলোচ্য 'ভাষা-বিবাদ' সম্পর্কে মৌন থেকেছেন। সারা ভারতে রাষ্ট্রীয় ভাষা নিয়ে যখন বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে, তখন তাঁর যুক্তিপূর্ণ মতামত জানতে পারবো বলে আমরা আশা করেছিলাম। তবু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্বের কথা তিনি যেভাবে বলেছেন, তদ্দ্বারা যে-কোনো ব্যক্তি অনুপ্রাণিত হবেন। তিনি হিন্দী নাট্যোৎসবের একটি সভায় বলেছেন যে, 'গুরুদেবের নাটকের রসোপলব্ধির জন্য প্রায় বিশ বছর আগে বাংলা শিখতে সুরু করি।' তিনি আরো বলেন যে, হিন্দীর নাট্যশাখা বাংলার তুলনায় অনুন্নত।

বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় হিন্দী সাহিত্যের ঐ দশা হলেও সরকারী প্রসাদপুষ্ট হিন্দী ভাষার বিরুদ্ধে কথা বলার শক্তি আছে কার?

দুর্গাপুর এখন গমগম করছে। সারা ভারতের মানুষের আজ সেখানে আনাগোনা চলছে। সুদৃশ্য মঞ্চ, বিরাট প্যাণ্ডেল, রকমারী দোকানপাটের জৌলুষে কংগ্রেস নগরের সর্বত্র জলজল করছে।

কত লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, কেউ সঠিক হিসেব দিতে পারবে না। কেউ বলছেন পনের লক্ষ, কারো মুখে শোনা যাচ্ছে ষাট লক্ষ আবার একদলের আন্দাজে সরকারী ও বে-সরকারী মিলে কোটি টাকার অধিক ব্যয় হয়েছে। পনের লক্ষই হোক আর কোটি টাকাই হোক, দরিদ্র নিরন্ন পশ্চিম বাংলার পক্ষে এ রাজসূয় যজ্ঞ সত্যিই ব্যয়সাধ্য। পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসের নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষের ঘোষণা অনুযায়ী টাকাটা এসেছে সাধারণ মানুষের ঘর থেকে। সেই টাকা দিয়েই নির্মিত হয়েছে দুর্গাপুরের বিলাস-সজ্জা। দুর্গাপুরের রাস্তার দু' পাশে যে সারিবদ্ধ ফুলগাছ দেখতে পাচ্ছেন, সেগুলো এসেছে বহু অর্থ ব্যয়ে কলকাতা থেকে। টবসমেত গাছগুলো পুঁতে দেওয়া হচ্ছে।

ভুবনেশ্বরকে না কি দুর্গাপুর হার মানিয়েছে। পশ্চিম বাংলার তারিফ করেছেন বিদেশীরা। পশ্চিম বাংলার পক্ষে গৌরবের কথা, সন্দেহ নেই। দুর্গাপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন ডঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর কাম্য ছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্যমণ্ডিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন পশ্চিম বাংলায় হচ্ছে, খুবই আনন্দের কথা। কংগ্রেসের আদর্শে এখনও বাংলার মানুষ অত্যন্ত আস্থাবান। পশ্চিম বাংলার মাটিতে অনুষ্ঠিত অধিবেশন থেকে কংগ্রেসের সেই উজ্জ্বল আদর্শ রূপায়ণের কর্মসূচী হোক, এই আমরা কামনা করি।

মেদিনীপুর ঃ

দীঘার ডাকে সাড়া পড়েছে ভারতের সর্বত্র। দলে দলে দেশ-বিদেশের ভ্রমণকারীরা আজ ছুটে আসছে দীঘার সমুদ্রসৈকতে। পর্যটকের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দীঘায় যাতায়াতের সমস্যাটাও হয়ে উঠেছে অত্যন্ত জটিল। এ ছাড়া রয়েছে পানীয় জল ও পর্যটকদের আবাসিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সমস্যা। দীঘার উন্নয়ন পরিষদ কোনটারই সম্যক সুরাহা করে উঠতে পারে নি।

দুর্গাপুরে বিধানচন্দ্র স্টেশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাপতির পদ নিয়ে প্রায় ছ' মাস কংগ্রেসের নেতারা লড়াই চালালেন। এই দীর্ঘ ছ' মাসে উন্নয়ন পরিষদের কোন বৈঠকই হয় নি। দীঘার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য পরিষদের অনুরোধেই সি-এম-পি-ও একটি পরিকল্পনা রচনা করেছেন। সে পরিকল্পনা পরিষদের সামনে পেশ করা সম্ভব হয় নি। অথচ এই দীঘা উন্নয়ন পরিষদের কর্ণধার পশ্চিম বাংলার প্রচ্ছন্ন সর্বাধিনায়ক শ্রীঅতুল্য ঘোষ। দীঘা সমবায় সমিতিও তাঁরই কুক্ষিগত। এই সমবায় সমিতির সঙ্গে জমি দখলের ব্যাপারে দীঘা প্রশাসন কর্তৃপক্ষের মামলার মীমাংসার সম্ভাবনটাও প্রভাবশালী মহলের প্রভাবেই লোপ পেতে বসেছে। দেখা যাচ্ছে দীঘার আকর্ষণ যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে, ততই তার উন্নতি বিধানের ক্ষেত্রে সৃষ্টি হচ্ছে অচল অবস্থা।

খড়গপুর স্টেশন থেকে দীঘা পাক্কা ছিয়াত্তর মাইল। বাস এ পথের একমাত্র সম্বল। আগেভাগে ব্যবস্থা করে রাধার বরের মত আরামে 'রাধাবর' বাসে 'রিক্লাইনিং' আসনের ব্যবস্থা করতে না পারলে দুর্ভোগের আর সীমা থাকে না। বাকী ছ'টি বাসের আশায় হা-পিত্যেশ নয়নে বসে থাকতে হয়। বাস চলে দিবা-রাত্রি। দীঘার বাসে সব সময়েই প্রচণ্ড ভিড়।

ঝাড়া ছিয়াত্তর মাইল রাস্তা পাড়ি দেবার পথে নেই কোনো শৌচাগার। বাসের স্টপেজে নেমে যত্রতত্র যাত্রীকে প্রস্রাবের জন্য ধাবিত হতে হয়। তাও আবার নিরাপদ নয়। পাঁচ আইনের ঝঞ্ঝাট আছে। 'রাধাবর' বাসে কিন্তু রয়েছে আধুনিক কায়দার সুদৃশ্য 'ল্যাভেটরী'। তা' ছাড়া এ-বাসের যাত্রীরা কাঁথিতে নেমে সুপরিসর বিশ্রামাগারে বসে একটু জিরিয়ে নিতেও পারছেন। দুর্ভাগা যাত্রীদের। এই 'রাধাবর' বাসেরও সারিয়ের

নিশ্চয়তা নেই। কোনো অজ্ঞাত কারণে 'আরামদায়ক' বাসটি এ রুটে স্থায়িভাবে চালু রাখার অনুমতি দেওয়া হয় নি। আর-টি-এর নির্দেশও কিন্তু এই একটি বাস ভিন্ন আর কেউ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলছে না।

মেদিনীপুরের তিনটি ব্যবসা—ধান, পান ও বাস সব চাইতে নাকি লাভজনক। এখানেও কংগ্রেসের ওপর-মহলের প্রভাবটাই বেশি। নিন্দুকের মুখ আটকানো সহজ নয়। তারা রটনা করছে আর-টি-এর মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থের কিছুটা অতুল্যদার দক্ষিণহস্ত শ্রীপ্রবীর জানা জেলা কংগ্রেস ভবনের রূপসজ্জায় ব্যয় করেছেন। যা' রটেছে তার কতটা এ-ক্ষেত্রে সত্য তার সঠিক তথ্য কেউ কোনদিন দেবেন না। চোখের সামনে যা' দেখতে পাচ্ছি; তাতে একথা স্বীকার করতেই হবে, আর-টি-এর অনুজ্ঞা অমান্য করে দীঘার বাসের মালিকরা বেশ দু' পয়সা কামিয়ে নিচ্ছে—যাত্রীর স্বাচ্ছন্দ্য, দেশের সুনামের চাইতে মুনাফার অঙ্ক বৃদ্ধিই তাদের মুখ্য লক্ষ্য।

রাজ্য সরকার নয়া আদেশ জারী করে আরেক ফ্যাসাদের সৃষ্টি করেছেন। নয়া আদেশ অনুযায়ী আর-টি-এতে থাকবেন জেলা পরিষদের সভাপতি। ব্যবসায়ীমহল আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন আর-টি-এতে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের আবির্ভাবের ফলে। চেষ্টা চলছে শ্রী মুখোপাধ্যায়কে জেলা পরিষদ থেকে সরিয়ে দেবার। শুধু তাই নয়, দীঘা উন্নয়ন পরিষদ থেকে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের সমর্থকদের অপসারণের ব্যবস্থাও চলেছে গোপন হাতের ইঙ্গিতে।

অতুল্যদার স্নেহধন্যা পশ্চিম বাংলার ত্রাণমন্ত্রী শ্রীমতী আভা মাইতি অজয়দার বিরোধীদের ত্রাণ-কার্যে নেমে পড়েছেন। তাঁর বশংবদ জেলা পরিষদের সহ-সভাপতি শ্রীরাস-বিহারী পালের হাতে জেলা পরিষদের রাশটি তুলে দেওয়া হয়েছে। শ্রীপালের বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত নেই। জেলা স্কুল পরিচালনায় তাঁর পক্ষপাতমূলক আচরণ ও দুর্নীতির প্রশ্রয়দানই ছিল তাঁর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ। জনসাধারণের রায় গিয়েছিল তাঁর বিরুদ্ধে—নির্বাচনে হেরে খিড়কির পথে বিধান পরিষদে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের মত নিষ্ঠাবান, আদর্শ নিষ্ঠ নেতাকে কোণঠাসা করার চেষ্টায় জেলার সাধারণ কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বেঁধে

● শ্রীমতী আভা মাইতি

উঠেছে। শ্রীমুখোপাধ্যায় স্বেচ্ছায় সরে না দাঁড়ালে দুর্গাপুরের অধিবেশনের পর মেদিনীপুরের ক্ষমতার লড়াই অবশ্যম্ভাবী। দুর্গাপুরের অধিবেশনে পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্বের কথাটা ধামা চাপা দিয়ে রাখার জন্য মেদিনীপুরের আগুনকে কৌশলে ছাই চাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল মাত্র।

অতুল্যদা বিচক্ষণ ব্যক্তি, চতুর রাজনীতিক। মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেসের ঘরোয়া কোঁদলের চাপে দীঘার উন্নয়নকার্যে অচলাবস্থা চলতে থাকলে বাইরের ভ্রমণকারীদের চোখে পশ্চিম বাংলার বদনামই ছড়াবে আরও বেশি করে। দীঘাকে তিনি রাজনীতির ক্লেদাক্ত পরিবেশমুক্ত করুন—এই আবেদনই আমরা দেশবাসীর পক্ষ থেকে তাঁর কাছে সবিনয়ে পেশ করছি।

মুর্শিদাবাদ ঃ

কান্দীর পাঠাগারে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কান্দী মহকুমা কিষাণ কংগ্রেসকর্মীদের সভায় কৃষি-সংস্কারে সরকারের শ্লথ গতির জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। সরকারী ঔদাসীন্যের উল্লেখ করে সভার প্রধান অতিথি শ্রীনরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস বলেছেন, কান্দীর মত মহকুমায় দুটি ফসল ফলানোর কোন আয়োজন হচ্ছে না। সরকারের কাজ এত শ্লথগতিতে চলেছে যে, কতকাল দেশের কৃষি উৎপাদন জনসংখ্যার সঙ্গে মিল রাখতে পারবে বলা শক্ত।

মুর্শিদাবাদের জমি অত্যন্ত উর্বরা। একটু উদ্যম ও উৎসাহ নিয়ে সরকার চাষীদের সাহায্য করলে সেখানে সোনা ফলতে পারে। শ্রীবিশ্বাস কৃষি-সংস্কারের কথা বলেছেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষের ব্যবস্থা দূরের কথা, সরকারী আমলারা মুর্শিদাবাদ জেলার জলাভূমির সংস্কার করলেই এ জেলাটির দুর্নাম ঘুচতে পারে। খাদ্যের ব্যাপারে মুর্শিদাবাদ অনেকাংশে পরমুখাপেক্ষী। গঙ্গা ও ভাগীরথীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন অংশে বিস্তীর্ণ এলাকা অনাবাদী জমিতে পরিণত হয়েছে। বর্ষায় এসব অঞ্চল একেবারে ডুবে যায়। এ বিলগুলোকে পুনরুদ্ধারের কোন পরিকল্পনাই রাজ্য সরকার গ্রহণ করেন নি। দেশে যখন চলেছে চরম খাদ্যসঙ্কট, তখনও কাগজে-কলমে ভিন্ন বাস্তবে খাদ্য উৎপাদনের ব্যাপারে দেশের কৃষিদপ্তর কত উদাসীন, মুর্শিদাবাদের অবস্থাই তার একটি নজীর।

মুর্শিদাবাদে কৃষিজীবীর সংখ্যা অধিক। দেশ বিভাগের পর রাজশাহী ও পাবনা ছেড়ে এসে যাঁরা আশ্রয় নিয়েছেন মুর্শিদাবাদে, তাঁদের মধ্যেও চাষী পরিবারই বেশি। উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য কোটি কোটি টাকা আমরা খরচ করেছি। সে টাকায় অনেক সুদৃশ্য অট্টালিকা নির্মিত হয়েছে। উদ্বাস্তু সমাগমে জেলায় যে পরিমাণ লোকসংখ্যা বেড়েছে, সেদিকে নজর রেখে এই জমি উদ্ধার করলে খাদ্যের ঘাটতি যেমন পূরণ হতো, তেমনি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ভাবনাটাও হ্রাস পেতো অনেকাংশে।

মুর্শিদাবাদের বাসিন্দারা মনে করে, তারা সরকারের চোখে অবহেলিত। মুর্শিদাবাদ বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসের পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। পলাশীর প্রান্তরে সূচনা হয়েছিল এই পরিবর্তনের পালা। দেশ-বিদেশের ভ্রমণকারীদের কাছে তাই এর গুরুত্ব অধিক। প্রতি বছর পর্যটকের সমাগমও কম হয় না। তাদের বাসস্থানের কোন ব্যবস্থাই সরকার করে উঠতে পারেন নি। বাসস্থানের ব্যবস্থা হলে পর্যটকের সংখ্যা আরও বাড়বে।

মুর্শিদাবাদ ভারতের সীমান্ত এলাকা। পাকিস্তানের সঙ্গে এ জেলার সীমান্তের অনেকেরই দহরম-মহরম অত্যন্ত বেশি। এদের অনেকেই আবার পূর্ব পাকিস্তানে গিয়ে বহাল তবিয়তে সরকারী চাকরি করছে। মাঝে মাঝে এখানে এসে নির্বিবাদে টাকা-পয়সা নিয়ে আবার পাকিস্তানে চলে যাচ্ছে। এরা সকলেই মীরজাফরের বংশধর বললে অন্যায় হবে না। মুর্শিদাবাদের দিকেই সরকারের সতর্ক দৃষ্টি আগে পড়া উচিত ছিল।

বীরভূম ঃ

জেলার নামজাদা ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তারের ফলে চাল ও তেলের বাজার একটু স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে-ছিল। শহরাঞ্চলে তেলের দামটা ঠিকই আছে। আগমার্কের টিনের তেল থেকে খোলা তেল ন্যায্যমূল্যেই পাওয়া যাচ্ছে। বাদাম তেল সরষের তেলকে হটিয়ে জেঁকে বসে নি।

শহর থেকে দু' পা বাড়ালেই আর সরষের তেলের নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না। গ্রামাঞ্চলে কখন-সখনও তেল পাওয়া যায়। দাম তার অত্যন্ত চড়া—ছ' থেকে সাত টাকা।

মানুষ ভেবে পাচ্ছে না, সত্যি কোন্ রাজত্বে তারা বাস করছে। গ্রামের মানুষের বেলায় কেন একই ব্যবস্থা হচ্ছে না? এ প্রশ্ন আজ সকলের মুখে মুখে। প্রশাসনযন্ত্র কি শুধু শহরের আইন ও শৃঙ্খলা বিধানের জন্য? যে ব্যবস্থার ফলে শহরের দোকানে সরষের তেল আসছে, সে ব্যবস্থা গ্রামে প্রবর্তনের বাধা কোথায়?

• • •

সিউড়ি মিউনিসিপ্যালিটীর নির্বাচনের ভোটার তালিকা প্রণয়ন হচ্ছে। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারে মিউনিসিপ্যালিটীর নির্বাচন এই প্রথম। পশ্চিম বাংলার আইনসভার নির্বাচনী তালিকায় যাদের নাম নেই, তাদের নতুন করে ভোটার হওয়ার যথারীতি সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নিরুদ্দেশের তালিকা করতে গিয়ে কর্তারা একেবারে বেসামাল হয়ে পড়েছেন।

শহরের প্রায় দু' হাজার ভোট-দাতার নাকি কোন পাত্তাই নেই। যাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তাদের কথা স্বতন্ত্র। তাদের নাম খারিজ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এতে কারো কোন আপত্তিই হবে না। যারা বীরভূমের দীর্ঘদিনের বাসিন্দা, তাদের নাম নিখোঁজের তালিকাভুক্ত হওয়ায় বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। একটু যত্ন নিয়ে সতর্ক হয়ে কাজ করলে ভোটারদের অযথা হয়রানি ভোগ করতে হতো না।

২৪ পরগণা ঃ

সুন্দরবনের নদী-নালায় আবার ইলিশ মাছের ঝাঁক এসে পড়েছে। এর আগেও দু-তিনবার ইলিশ মাছের প্রচুর আমদানী হয়েছিল ক্যানিং বাজারে। সে-মাছ পচে-গলে নষ্ট হয়েছে—ব্যবসায়ীদের কারসাজিতে তা' মানুষের ভোগে আসে নি।

এখন শীতকাল। বরফের চাহিদার অভাবের সাথে সাথে তার দামটাও কমেছে। কাজেই জলের ইলিশ ডাঙায় পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই পচে উঠবে না। মৎস্যদপ্তর পরিবহনের ব্যবস্থা করলেই ক্যানিংয়ের বাজারের ইলিশ কলকাতার বাজারে আসতে পারবে।

• • •

লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে চাষের সুবিধার জন্য বসানো হয়েছিল গভীর নলকূপ। গভীর নলকূপের জলে জমিতে তিন-তিনটে ফসল উৎপাদনের গালভরা বাণীও চাষীরা শুনেছে এর আগে। ২৪ পরগণার কয়েকটি অঞ্চলের এই নলকূপ অকেজো হয়ে পড়ে আছে। আবার কোনটা থেকে জল সরবরাহ ঠিক কাজের সময়টিতে পাওয়া যাচ্ছে না। সরকারী প্রচারপত্রে এই অকেজো নলকূপ ও জল সরবরাহের অব্যবস্থার কথাটা কিন্তু কোনদিনই থাকে না। চাষীদের পক্ষ থেকে আজ তাই নয়া দাবি উঠছে। তারা চাইছে এর তদন্ত।

চাষীদের এ দাবিতে সাড়া দিয়ে তদন্তের ব্যবস্থা করলে দেখা যাবে, দরিদ্র চাষী সরকারের প্রচারে প্রলুব্ধ হয়ে সর্বস্বান্ত হতে চলেছে। ঋণ করে সে আলুর চাষ, গমের চাষ সুরু করেছিল। জলের অভাবে তার অর্থ নষ্ট হবে, পরিশ্রম পণ্ড হবে—বাড়বে শুধু ঋণের বোঝাটা।

মহাকবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বৃত্র-সংহার কাব্য

দাম—দুই টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

[ছয়]

ষষ্ঠ অধ্যায়

সিপাহী-বিদ্রোহের পটে একটি ছোট্ট কাহিনী

জেনারাল পোস্ট অফিসে গিয়েছিলাম একটি কাজে। রেজিস্ট্রেশন বিভাগের হেডক্লার্কের সঙ্গে আলাপ করছিলাম সেখানে, এমন সময় সেখানে এক মহিলা এলেন একখানা চিঠি রেজিস্ট্রির উদ্দেশ্যে। এলেন বটে, কিন্তু হঠাৎ বিব্রত হয়ে পড়লেন আমাকে দেখে। তাঁর মুখচোখের ভাব দেখে স্পষ্টই বোঝা গেল আমার উপস্থিতিটা তাঁর পক্ষে খুব প্রীতিকর হয় নি। চিঠিখানা তিনি আমার সামনে বার করবেন কিনা সে বিষয়ে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত। অতএব আমি তাঁকে এই অস্বস্তি থেকে মুক্তি দিলাম। অর্থাৎ আমি কিছুক্ষণের জন্য সেখান থেকে সরে গেলাম, এবং তাঁর কাজ শেষ হলেই ফিরে এলাম। তাঁর উদ্বেগ আমাকে কৌতূহলী করে তুলেছিল বলা বাহুল্য। আমি হেডক্লার্কের কাছ থেকে চিঠিখানা চেয়ে নিয়ে প্রাপকের ঠিকানাটা নোট করে নিলাম আমার নোট বইতে।

যে সময়ের কথা বলছি সে সময়ে এলাহাবাদের আদালতে এক বন্দীর বিচার হচ্ছিল। আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল রাষ্ট্রদ্রোহিতা এবং হত্যালুণ্ঠনাদি নানা অপরাধের। এ সবই বিদ্রোহ উপলক্ষে। বিচারের সময় আসামীপক্ষের উকিল প্রকাশ্য আদালতে এমন কথা বলেছেন যে, তিনি আদালতের কাঠগড়ায় সাক্ষী হিসাবে একজন ইউরোপীয় মহিলাকে হাজির করাবেন, এবং ঐ মহিলা এই মর্মে সাক্ষ্য দেবেন যে, কানপুরে ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের সময় তাঁর ক্লায়েন্ট ঐ মহিলাকে একজন বিদ্রোহীর হাত থেকে উদ্ধার করে তাঁকে নিরাপদ আশ্রয়ে রাখেন এবং সুযোগ উপস্থিত হওয়ামাত্র তাঁকে ইংরেজদের ক্যাম্পে রেখে আসেন। তিনি একখানা চিঠি দেখিয়ে আরও বলেছেন যে, 'এই যে আমার হাতে কলকাতা ডাকঘরের ছাপমারা রেজিস্টার্ড চিঠিখানা দেখছেন, এই চিঠি ঐ মহিলার লেখা। তিনি এই চিঠিতে আসামীর পক্ষে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সাক্ষ্য দেবেন বলে এখানে আসবেন জানিয়েছেন। চিঠিখানা আমি আজ সকালের ডাকে পেয়েছি।'

ঐ মহিলার নাম তিনি প্রকাশ করলেন না, কিন্তু তাঁর এই ঘোষণাতে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হল। এবং একথা সত্য হলে সরকারী পক্ষের কেস্ যে খুবই দুর্বল হয়ে পড়বে এ বিষয়ে কারো সন্দেহ রইল না।

সরকারী উকিল কালবিলম্ব না করে তৎকালীন পুলিস কমিশনার মিস্টার উয়াউচোপের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন এবং জানতে চাইলেন ঐ মহিলাটি কে, এবং তিনি আসামীর পক্ষে কি ধরনের সাক্ষ্য দেবেন।

মিস্টার উয়াউচোপ বিষয়টির তদন্তের ভার আমার উপরে দিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি ঐ মহিলাকে খুঁজে বার করে তাঁর সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করতে পারব?

আমি একটুখানি চিন্তা করে বললাম, 'মহিলাটিকে খুঁজে বার করা খুব কঠিন হবে না, কারণ আমি তাঁকে চিনি, এবং আরও কথা হচ্ছে এই যে, তিনি যে আসামীকে ফাঁসির হাত থেকে বাঁচাবার জন্য কিছু সত্য চেপে যাবেন, তাও জানি। যেমন ধরুন, তিনি যদি বলেন আসামী তাঁকে বিদ্রোহীদের ব্যাপক ইউরোপীয়-হত্যার হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন, তা হলে তিনি সত্য কথাই বলবেন। কিন্তু এর সঙ্গে তাঁর আরও বলা উচিত যে, কানপুরে তখন অন্যান্য ইউরোপীয়দের উপর যে নৃশংস অত্যাচার করা হয়েছিল, একজন ইউরোপীয় মহিলার পক্ষে তার চেয়েও জঘন্য ব্যাপারে রাজি হওয়াতেই তাঁকে হত্যা করা হয় নি, তাঁর জীবন রক্ষা করা হয়েছিল। এমন অবস্থায়, ঐ আসামী কানপুরে ও অন্যান্য স্থানে নিরস্ত্র অসহায় নর-নারী এবং শিশুদের বেপরোয়া হত্যার কাজে যে ভূমিকা নিয়েছিল, তা সত্ত্বেও তাকে বাঁচাবার জন্য ঐ মহিলা যদি তার সপক্ষে সাক্ষ্য দেন, তা হলে বুঝতে হবে তাঁর অন্য মতলব আছে, জীবনরক্ষকের প্রতি এ শুধুই কৃতজ্ঞতা নয়।'

মিস্টার উয়াউচোপ আমাকে আমার কথার মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'তাহলে আপনি বলতে চান ঐ মহিলার সাক্ষ্য যদি আসামীর সপক্ষে যায় তা হলে তিনি তার জন্য যথেষ্ট টাকা পাবেন?'

আমি বললাম, 'না, মহিলাটি বর্তমানে বিবাহিতা এবং ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করছেন। লজ্জা এবং শালীনতার খাতিরে তিনি সম্পূর্ণ সত্য এখন প্রকাশ করতে বাধা অনুভব করবেন। অর্থাৎ যেটুকু প্রকাশ করলে আসামীর প্রাণদণ্ড হতে পারে সেটুকু চেপে যাবেন। কারণ, আসামী যে চরিত্রের লোক, তার অধীন, বিদ্রোহীদের ক্যাম্পে কোনো মহিলা যদি দীর্ঘ দুটি মাস কাটিয়ে থাকেন, তবে তিনি কোন্ মুখে তা প্রকাশ্য আদালতে এসে স্বীকার করবেন? কোনো মহিলার পক্ষেই তা করা সম্ভব নয়। আসামী পক্ষের উকিলের এটি নিশ্চিত জানা উচিত, এবং উক্ত মহিলা যেন একথা জানেন যে, তাঁকেও যে এই লোকটি হস্তক্ষেপ না করলে কানপুরের অন্যান্য ইউরোপীয়দের ভাগ্য বরণ করে নিতে হত, শুধু এই ঘটনা বিষয়েই সোজাসুজি জেরা করা হবে।'

পুলিস কমিশনার চেয়ারে অর্ধশায়িতের মতো হেলান দিয়ে বসে ভাবতে লাগলেন, এবং কয়েক সেকেণ্ড কেটে যাবার পর বললেন, 'সমস্ত ব্যাপারটাই আমি এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছি। কিন্তু মিস্টার রীড, আপনি কি উপায়ে এই মহিলার বর্তমান চালচলন এবং আগের ইতিহাস এমন করে জানতে পারলেন?'

আমি বললাম, 'এই মহিলাকে আমি দুদিন আগে জেনারাল পোস্ট অফিসে দেখেছি। তাঁর ভাবভঙ্গি আমার কাছে কিছু অস্বাভাবিক মনে হওয়াতে আমার কৌতূহল জাগে, আর তার ফলে তাঁর অভিপ্রায় কি তা জেনে নেওয়ার সুবিধা হয়। অর্থাৎ তিনি একখানা চিঠি রেজিস্ট্রি করতে এসেছিলেন, এবং তিনি চলে গেলে চিঠিখানা কার নামে লেখা তা জেনে নিই। আমাকে ওখানে দেখে তিনি খুব বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন, এটি লক্ষ করেই আমি এ কাজে ব্রতী হই। কিন্তু তবু আমি তখন ভাবতে পারি নি যে সে চিঠি এলাহাবাদের আদালতে বিচারাধীন আসামীর সম্পর্কিত। তারপর যখন সরকারী উকিলের টেলিগ্রামখানা পড়ি, তখনই আমার মনে হয়, তাই তো এই তো সেই মহিলা। আমি, সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই মহিলার জীবনে যেটুকু ঘটেছিল, মাত্র সেই টুকুই জানি, তার বেশি কিছুই জানি না। এই তথ্যটা আমি কিভাবে জানতে পেরেছি, তা বলি। ইংল্যাণ্ডের এক ভদ্রলোক ভারতের সিপাহীবিদ্রোহের ইতিহাস লিখছেন। তিনি আমাকে এই মহিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কয়েকটি ছাপা প্রশ্নের উত্তর তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে ইংল্যাণ্ডে তাঁর কাছে পাঠাতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। মহিলাটি তখন যে সব জবাব দিয়েছিলেন তা থেকেই আমি তাঁর সম্পর্কে যেটুকু খবর জানতে পেরেছি। এখন আমি জি-পি-ওতে তাঁর যে অস্বস্তি দেখেছিলাম, তার কারণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশ্লেষণ করতে পারি। সেই সময়ে সিপাহী-বিদ্রোহের সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলিতে তাঁর জীবনে যে ছোট্ট একটি কলঙ্কময় ইতিহাস রচিত হয়েছিল, তার কথাই সেজন্য সেদিন জি-পি-ওতে তাঁর মনে প্রধান স্থান অধিকার করেছিল। অর্থাৎ আমি তাঁর জীবনের এই ইতিহাসটুকু জানি বলেই তিনি আমাকে জি-পি-ওতে দেখে এতটা বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন, এবং সে ভাব তিনি তখন গোপন করতে পারেন নি।

তাঁর মুখেচোখে তা প্রকাশ হয়ে পড়েছিল।

আমার কথা শেষ হতে দেখি পুলিস কমিশনার তাঁর কলমটি মুখে পুরে চিবোচ্ছেন। তাঁর তখন গভীর মনোযোগ। কিছুক্ষণ পরে তিনি তাঁর ড্রয়ার থেকে একখানি টেলিগ্রাফ ফর্ম বার করে বললেন, 'আমি কতদূর এগিয়েছি তা এলাহাবাদে জানিয়ে দিই এবং বলি যে চিঠিতে বিস্তারিত লিখছি। ইতিমধ্যে ঐ মহিলার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া জরুরি দরকার।'

এই দেখা হওয়ার পর আর ঐ মহিলাকে এলাহাবাদে সাক্ষ্য দিতে যেতে হয় নি।

আমি প্রয়োজন বোধে এই কাহিনীর অনেকখানি অংশ বাদ দিয়ে বললাম। কিন্তু আমি নিশ্চয় আমার পাঠকদের কাছে পর্যবেক্ষণের মূল্য কত তা জানবার পক্ষে যথেষ্ট বলেছি। আর ঠিক এই জন্যই এ কাহিনীটি উপস্থিত করলাম।

সপ্তম অধ্যায়

একটি অপরাধ অনুষ্ঠানে বাধা পড়ল

কয়েক বছর আগে কলকাতার দক্ষিণ শহরতলীতে এক খেয়ালী বৃদ্ধ ভদ্রলোক বাস করতেন। নাম তাঁর পেরেরা। সম্পত্তিশালী ব্যক্তি। বয়স পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে, একটু স্থূলকায়, স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল, কিন্তু মাঝে মাঝে বাতে ভুগতেন। এর কারণ সম্ভবত তাঁর আহারের প্রতি লোভ, এবং মাত্রা ঠিক না রাখা। বিয়ে করেন নি, এবং বিয়ের বিরুদ্ধে তাঁর মত অতি স্পষ্ট, এককথায় তিনি ছিলেন বিবাহবিরোধী। নিজের সম্পর্কে তো বটেই, তাঁর কোনো আত্মীয় বিয়ে করুক এটাও তিনি পছন্দ করতেন না। তাঁর অগ্রজ, মিস এইচ—নাম্নী একটি মেয়েকে বিয়ে করেন এবং দুটি সন্তান ও বিধবা পত্নীকে রেখে মারা যান। এই বিধবা স্ত্রীর বয়স তখন ছাব্বিশ বছর। সন্তান দুটিই মেয়ে। পেরেরা অবিবাহিত থাকায় মেয়ে দুটি তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে জেনে তাদের মা পাগলা বুড়োকে যথাসাধ্য খুশি রাখার চেষ্টা করত। এই সময় ঐ বিধবার প্রতি একজন বাঞ্ছিত যুবক বিশেষ আকৃষ্ট হয়, কিন্তু বিধবাটি বলে, এখন তাদের বিয়ে না হওয়াই ভাল। বৃদ্ধ মারা গেলে তারপর বিয়ে হোক, এই তার ইচ্ছা। কারণ আগেই বিয়ে হলে তার মেয়েরা তাদের জেঠার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হতে পারে।

এ রকম আশঙ্কা হওয়া স্বাভাবিক। কারণ পেরেরা ভীষণ বিবাহবিরোধী, তাই বিধবাটি যদি এখন আবার বিয়ে করে, তাহলে তিনি ভীষণ চটে গিয়ে উইল পাল্‌টে ফেলবেন. এবং তাঁর সম্পত্তি অন্য কোনো দূর সম্পর্কের আত্মীয়কে দিয়ে দেবেন। অতএব মেয়েদের ভবিষ্যৎ নষ্ট না করে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির এক নতুন পথ সে অবলম্বন করল। অর্থাৎ পেরেরা যাতে একটু তাড়াতাড়ি পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়, তার ব্যবস্থা করল। কারণ বিদায় নিয়ে যে জগতে যাবেন, সেখান থেকে আর তিনি হাত বাড়িয়ে অন্য কারো সুখের পথে কাঁটা দিতে পারবেন না।

এর পরে যখন পেরেরার বাতের আক্রমণ আরম্ভ হল, তখন ঐ যুবতী তার দুই মেয়ে ও চাকর নিয়ে রোগীর বাড়িতে গিয়ে উঠল। অসুস্থ দেবরকে তার সেবা করা দরকার। কিন্তু এই সময় থেকে বৃদ্ধের অবস্থা কিন্তু আরও খারাপের দিকেই যেতে লাগল, এবং কেন যে এ রকম হল তা বোঝা গেল না। এমন সব লক্ষণ প্রকাশ পেতে লাগল ডাক্তারও যার কারণ খুঁজে পেলেন না। অবশেষে ডাক্তারের মনে সন্দেহ জাগল রোগী কোনো বিষজাত অসুখে ভুগছে। এ সন্দেহ অল্প-দিনের মধ্যেই আর সন্দেহ রইল না. একেবারে দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হল, কারণ বিষের ক্রিয়া কি না পরীক্ষার জন্য রোগীর দেহনিঃসৃত বস্তু সংগ্রহের চেষ্টায় তিনি ক্রমাগত বাধা পেতে লাগলেন। পেরেরার ডাক্তার পুলিসকে এসব জানাতে প্রথমত নিতান্তই অনিচ্ছুক ছিলেন, অথচ দেরি করলেও বিপদ। অতএব তিনি একদিন রোগীর বাড়ি যাবার পথে আমার কাছে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে সাধারণ বেশে রোগীর কাছে যেতে অনুরোধ জানালেন। 'তাহলে আর তাঁর ভ্রাতৃবধূ সন্দেহ করবে না যে পুলিস এসেছে, কারণ সে জানে আমি আরও একজন ডাক্তারের পরামর্শ নিতে চাই, অতএব সে আপনাকে একজন ডাক্তারই মনে করবে।'

আমি তৎক্ষণাৎ তাঁর সঙ্গে যেতে রাজি হলাম। আমি ডাক্তারের সঙ্গে তাঁর ব্রুহ্যামে চলতে চলতে তাঁর কাছ থেকে সবটা ইতিহাস জেনে নিলাম। আমাদের গাড়ি এসে থামল পেরেরার দরজায়। একজন চাকর আমাদের ভিতরে নিয়ে পৌঁছে দিল। পেরেরার ভ্রাতৃবধূকে, অর্থাৎ আপাতত যে রোগীর নার্সের ভূমিকা অভিনয় করছে তাকে, দেখতে পেলাম না। সম্ভবত ডাক্তার এখন আসবেন তা তার জানা ছিল না।

ভিতরে পৌঁছে ডাক্তার রোগীর ঘরে প্রবেশ করলেন, আর আমি বসলাম গিয়ে বৈঠকখানায়। সেখানে কথা বলবার কেউ ছিল না, আমি একা ছিলাম, তাই হাতের কাছে একখানা বই পেয়ে তারই পাতা ওল্‌টাতে লাগলাম। বইখানা বিষ, ও মানুষের দেহে বিষক্রিয়া সম্পর্কিত। বইখানা সদ্য কেনা, অর্ধেকের বেশি পৃষ্ঠা তখনও কাটা হয় নি। একটি পরিচ্ছেদের নাম দেখলাম 'লেড পয়জনিং' বা সিসের বিষক্রিয়া। আরও দেখলাম, এই অধ্যায়ের একটি অনুচ্ছেদের কয়েকটি লাইন পেন্সিলে চিহ্নিত

করা হয়েছে এবং এই পৃষ্ঠা যাতে সহজে ওলটানো যায়, সেজন্য এখানে দুটি পাতার মধ্যবর্তী স্থানে একখণ্ড কাগজ বুকমার্ক হিসাবে রাখা আছে। এই অনুচ্ছেদটি পড়া শেষ হলে আমি বই বন্ধ করে যথাস্থানে রেখে রোগীর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলাম। ডাক্তার তখন সেখানে বসে প্রেসক্রিপশন লিখছিলেন। আমি তাঁকে একান্তে ডেকে নিয়ে আমি যা আবিষ্কার করেছি তা তাঁকে বললাম। ডাক্তার আপন মনে খুব খাটো গলায় বার বার আবৃত্তি করতে লাগলেন, 'লেড পয়জনিং, লেড পয়জনিং। ঠিক, ঠিক। এইবারে তা হলে বোঝা গেল সব, যদিও এই বিষের ক্রিয়া মুখে ও দাঁতের মাড়িতে এখনও সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় নি। বইখানা নিয়ে আসুন তো।'

আমি বই আনতে গিয়ে দেখি—ইতিমধ্যে বইখানা কে সেখান থেকে সরিয়ে ফেলেছে। নিশ্চয় ঐ বিধবাটি অন্য ঘর থেকে লুকিয়ে আমার ঐ বই পড়া লক্ষ করেছে।

এই সংবাদ শুনে ডাক্তার কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন, তারপর বললেন, 'এখন কি করা উচিত?'

আমি বললাম, 'আমাদের প্রথম কর্তব্য অপরাধটি অনুষ্ঠিত হতে না দেওয়া। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করে বসে না থাকা। অপরাধ অনুষ্ঠিত হল, তারপর অপরাধীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম, এমন না হওয়াই ভাল।'

ডাক্তার বললেন, 'আমারও ঠিক সেই মত। কিন্তু রোগীর জীবন রক্ষা করতে হলে তাঁর ভ্রাতৃবধূ এবং এ বাড়ির চাকরদের অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া দরকার। কিন্তু এদের মনে যাতে সন্দেহ না জাগে যে আমরা টের পেয়েছি, সেইভাবে চলতে হবে। কি করে তা করা যাবে সে হল এক সমস্যা। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে রোগীর জীবন রক্ষা, আর যদি সম্ভব হয় তা হলে কেলেঙ্কারিটা চারদিকে না রটে সে বিষয়ে সাবধান হওয়া।'

আমরা এই বিষয়ে কিছুক্ষণ আলোচনার পর স্থির হল—ডাক্তার বিধবাটিকে বলবেন, 'মিস্টার পেরেরার লক্ষণ দেখে মনে হয় এটি সিসের বিষক্রিয়া। নিশ্চয় চাকরদের কেউ ভুল করে এ কাজ করেছে। হয় তো খাবারের সঙ্গে দৈবাৎ সিসে মিশে গেছে, বুঝতে পারে নি, সিসেকে অন্য কিছু মনে করেছে।'—এই কথা বলে পেরেরার ভ্রাতৃবধূর উপর তার কি প্রতিক্রিয়া হয় তা তাঁরা লক্ষ করবেন।

এইটে স্থির হওয়ার পর আমরা রোগীর ঘর থেকে বেরিয়ে ড্রইং-রুমে বিধবাটির সঙ্গে মিলিত হলাম। সেখানে টেবিলে আমাদের জন্য শেরি ও বিস্কিট রাখা হয়েছিল। ডাক্তার এক গ্লাস শেরি মাত্র পান করলেন এবং পরক্ষণেই কথাটা পাড়লেন।

'মিসেস পেরেরা, আমার বন্ধু ও আমি আজ আপনার দেবরের কেস্ নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা করেছি, এবং শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে তাঁর বাত যে সহজে সারছে না, তার কারণ তাঁর দেহে সিসে প্রবেশ করেছে, সম্ভবত তাঁর খাবারের সঙ্গে প্রবেশ করেছে।'

এ কথা শোনামাত্র বিধবাটি এমন কাসতে আরম্ভ করল যে মনে হল, সে যেন মাটিতে পড়ে যাবে। সে বোঝাতে চেষ্টা করল যে, বিস্কিটের গুঁড়ো গলায় আটকে বিষম লেগেছে। আমরা দুজনে অবশ্য অন্য রকম বুঝলাম। এ বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ রইল না যে, মিস্টার পেরেরার অসুখ বিষয়ে ডাক্তারের আবিষ্কারের কথা হঠাৎ শুনেই এ রকম হয়েছে। তাই মুখে যে অপরাধের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল তা ঢাকবার জন্যই এই কাশির ছুতো। ডাক্তার অপেক্ষা করতে লাগলেন, কাসি থামলে বাকিটা বলবেন। কিন্তু মিসেস পেরেরা তা বুঝতে পেরে আরও বেশি বেশি কাসতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সে ওখান থেকে উঠে নিজের ঘরে চলে যেতে বাধ্য হল, ডাক্তারের কথা আর তার শোনা হল না। সে যেটুকু শুনেছে সেটুকুই অবশ্য তার একদিনের পক্ষে যথেষ্ট, অতএব ডাক্তার ও আমি ওখান থেকে বেরিয়ে এলাম।

বেরিয়ে আসবার পর আমি অন্য পথ ধরলাম, সেদিকে আমার কাজ ছিল, অতএব এরপর আর আমাদের এ বিষয়ে অতিরিক্ত আলোচনা করা হল না।

আমাদের চলে আসার অল্পক্ষণের মধ্যেই বিধবাটি ঐ বাড়ির এক চাকরের কাছ থেকে জানতে পারল যে আমি ডাক্তার নই, আমি ডিটেকটিভ বিভাগের সুপারিনটেনডেণ্ট। সে আমাকে চিনতে পেরেছিল।

যেমনি একথা শোনা, সে তো তখুনি গাড়ি ডাকিয়ে তার বাপের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়ল। বলল, 'বাবা আমাকে মিথ্যা অভিযোগের হাত থেকে বাঁচাও।' তার পিতা ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে তোমার বিরুদ্ধে কি করেছে, আমাকে সব খুলে বল।'

সে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল 'বাবা, বাবা, আমি নাকি পিটারকে বিষ খাইয়েছি, এই আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ।'

সোনার আনারস

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

মূল্য : এক টাকা

কিশোর-কিশোরীদের উপযুক্ত রোমাঞ্চকর উপন্যাস। ছাপা, বাঁধাই চমৎকার।

উপহার দিবার মত বই

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

পিটার পেরেরার খ্রীস্টিয়ান নাম।

'অভিযোগ এনেছে কে ?'—তার পিতা প্রশ্ন করলেন।

'পিটারের ডাক্তার, আর ডিটেকটিভ সুপারিনটেনডেন্ট।'

বেদনাহত পিতা আর কোনো কথা না শুনে ডাক্তারের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি জানতে চান ব্যাপারটা কি। যখন তিনি সেখানে পৌঁছলেন তখন ডাক্তার বাড়িতে ছিলেন না। তখন তিনি সোজা আমার অফিসে এসে হাজির হলেন। তিনি তাঁর মেয়ের কাছ থেকে যেটুকু শুনেছেন তা আমাকে বললেন, আমি বললাম, 'ডাক্তার মিস্টার পেরেরার খাদ্যে বিষ মেশানোর জন্য আপনার মেয়ের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগই আনেন নি। আপনার মেয়ে নিজেই নিজেকে দোষী প্রমাণ করেছেন।'

আমি তখন আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা তাঁকে বললাম। আমার কথা শুনে বৃদ্ধ কপাল থেকে ঘাম মুছে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

তারপর বললেন, 'মিস্টার রীড, এই বেদনাদায়ক ঘটনাটি আমাদের জীবনে সর্বনাশ ঘটাবে, আমাদের সুনামকে কলঙ্কিত করবে। আমি এ আঘাত সহ্য করতে পারব না।'

'মিস্টার এইচ'—আমি বললাম, 'আপনার মেয়ে নিজেই নিজেকে অভিযুক্ত করেছেন। আর কেউ করে নি। অতএব বাড়ি গিয়ে তাঁকে ঠাণ্ডা রাখুন, এবং তাঁকে মিস্টার পেরেরার বাড়িতেও যেতে দেবেন না। তা হলে আর এ ঘটনা বেশিদূর গড়াবে না, এইখানেই এর শেষ হয়ে যাবে।'

বৃদ্ধ কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। তিনি বিদায় নিয়ে চলে যাবার সময় তাঁকে বললাম, 'মিস্টার এইচ—আপনি সোজা বাড়ি চলে যান। ডাক্তারের সঙ্গে আমি নিজে দেখা করে তাঁকে সব বুঝিয়ে বলব।'—আমি আমার কথা রেখেছিলাম।

এরপর থেকে মিস্টার পেরেরা তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন। তবে প্রথম দিকে কিছু প্যারালিসিসের লক্ষণ দেখা গিয়েছিল, কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই সেটা দূর হয়। তিনি সুস্থ মানুষের মতোই চলাফেরা করতে সক্ষম হলেন।

(ক্রমশঃ)

টেমিং অভ্ দি শ্রু

শনিবার ছাবিবশে ডিসেম্বর নিউ সেক্সপীয়ার কোম্পানী তাঁদের তৃতীয় প্রডাকসন 'দি টেমিং অভ্ দি শ্রু' মঞ্চস্থ করলেন। নাটকটির পরিচালক ভ্লাডেক শেবল—জাতিতে পোলিশ—অক্সফোর্ডের মার্টন কলেজে ইংরাজী সাহিত্য অধ্যয়ন করেছেন।

হাল্কা হাস্যরসের কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে নাটকটি লেখা—প্রত্যেকটি নট-নটী যেন অন্তরের উচ্ছলতা ফুটিয়ে তুলেছেন অভিনয়ের মাধ্যমে। দর্শকেরা প্রাণভরে উপভোগ করেছেন নাটকটি—একটি পত্রিকার সমালোচক তাঁর কাগজে এমন পর্যন্ত লিখেছেন যে, তিনটি নাটকের মধ্যে এটির পরিচালনা এবং অভিনয়কেই শ্রেষ্ঠ বলতে হয়। কিন্তু তাই কি? রিচার্ড দি সেকেণ্ডের মত জটিল নাটককে যেমন পরিচ্ছন্ন ও সুষ্ঠুভাবে ডেভিড উইলিয়াম সেদিন মঞ্চস্থ করেছিলেন তাকে পরিচালনার মাপকাঠিতে নামিয়ে দেওয়াটা বোধ হয় ঠিক হবে না।

আর পরিচালনার কথাই যখন উঠল, তখন টেম্পেস্টকেই বা নিকৃষ্ট স্থান দিই কি হিসাবে। অভিনয়ের দিক দিয়ে যদি বিচার করতে যাই, তবে টেম্পস্ট-এর অভিনয়ের কথা কি এতই সহজে অগ্রাহ্য করা চলে—প্রস্পেরো, মিরান্দা, এরিয়েল, ফার্দিনান্দের রূপায়ণে যাঁরা অভিনয় করেছেন, তাঁদের অভিনয়কে টেমিং অভ্ দি শ্রু'র অভিনয়ের তুলনায় নিকৃষ্ট বলতে আমি রাজী নই। তা ছাড়া টেম্পেস্টে ছোট ছোট রোলে যে সূক্ষ্ম অভিনয়-প্রতিভার ছাপ দেখেছি তা সত্যিই প্রশংসনীয়। রিচার্ড দি সেকেণ্ডের মত জটিল চরিত্রকে ডেভিড উইলিয়াম যেভাবে রূপায়িত করেছেন, তাতে পরিষ্কার বোঝা যায়, ভবিষ্যতে তিনি ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের অন্যতম বলে গণ্য হবেন। এ নাটকে অন্যান্য প্রত্যেক চরিত্রেই

● পেট্রুকিও—'টেমিং অভ্ দি শ্রু'।

নট-নটীরা সত্যিকার ভাল অভিনয় করেছেন।

টেমিং অভ্ দি শ্রু'র অভিনয় বা পরিচালনাকে আমি কোনোভাবে খাটো করতে চাইছি না—It is the best directed and acted of the three plays মন্তব্যটিতে আমার আপত্তি আছে এই কথাই বলতে চাই।

'টেমিং অভ্ দি শ্রু' সেক্সপীয়ারের অন্যতম নিকৃষ্ট নাটক—এই হচ্ছে সমালোচকদের অভিমত। নাটকটিতে হৃদয়হীনতা, কাব্যময়তার অভাব এবং অ-রোমাণ্টিক মনোভাবের এত আধিক্য যে, এ নাটক মঞ্চস্থ হলেই কেন এত জনপ্রিয় হয়—ক্রিটিকরা তার কারণ খুঁজে পান না।

সেক্সপীয়ার অনেক সময়ই অন্যের নাটকের কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে নতুনভাবে নাটক সৃষ্টি করতেন—টেমিং অভ্ দি শ্রু'ও এই ধরণেরই রচনা। ১৫৯৪ সালে টেমিং অভ্ এ শ্রু বলে একটি নাটক ছাপা হয়—আর টেমিং অভ্ দি শ্রু ছাপা হয় ১৬২৩-এ। অবশ্য সেক্সপীয়ারের নাটকটি আগের নাটকটি থেকে সবদিক দিয়েই শ্রেষ্ঠ। মূল নাটকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে বিয়াঙ্কা কাহিনীর ওপর—সে প্রাধান্যকে অনেক কমিয়ে দিয়ে ক্যাথারিন-পেট্রুকিও কাহিনীর ওপরই সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন সেক্সপীয়ার।

—ার একটি কারণে এ দুটি নাটকের ভেতর যথেষ্ট পার্থক্য দেখা

পাঠক মন

গত ১৭।১২।৬৪ তারিখের সাপ্তাহিক বসুমতীর 'পাঠকমন' বিভাগে শ্রীমণিলাল চক্রবর্তী মহাশয়ের পত্রই আমার আলোচ্য-বিষয়। তিনি লিখেছেন "----'দেশ' বা 'অমৃতের' প্রচ্ছদপট যেমন প্রতি সপ্তাহে বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়, সাপ্তাহিক বসুমতীর ক্ষেত্রেও সে পন্থা অবলম্বন করলে—আশা করি প্রচ্ছদপট আরো আকর্ষণীয় হবে, অবশ্য এর জন্যে বর্তমান মূল্য পঁচিশ পয়সার বদলে ত্রিশ পয়সা করলেও পাঠকদের পক্ষে খুব একটা ক্ষতি হয়তো হবে না।'

শ্রীচক্রবর্তীর এটা নিজস্ব মতামত হতে পারে। অন্য কোন গ্রাহক এটা সমর্থন করবেন না। বৈচিত্র্যময় এই সাপ্তাহিক বসুমতী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় বলেই এত সমাদর। মূল্য বৃদ্ধি করলে এর বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়ে পড়বে। এই অতুলনীয় বস্তুটির অপর পত্রিকার সঙ্গে তুলনা করা চলে না, 'অমৃত' বা 'দেশ' হচ্ছে সাপ্তাহিক সাহিত্যপত্র, কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন 'সাপ্তাহিক বসুমতী' বিশিষ্ট সংবাদ সাপ্তাহিক অবশ্য উপরি হিসাবে সাহিত্যের প্রয়োজনও মেটায়। আর এ কথা তো ঠিক প্রতি সংখ্যার প্রচ্ছদপট একইভাবে প্রকাশিত হয় না। এর বিশেষত্ব যে সপ্তাহের বিশেষ সংবাদের শিরোনামারূপে প্রচ্ছদপট পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমাদের ভেবে দেখা উচিত আমরা বিভিন্ন ঢঙের প্রচ্ছদ চাইব—না উন্নত শ্রেণীর সাহিত্য ও নিরপেক্ষ সংবাদ চাইব। ছবির বই যাঁদের ভাল লাগে তাঁরা 'শুকতারা', 'বেতার জগৎ' বা তেমন একটা কিছু নিতে পারেন। আমার অনুরোধ, তাঁরা যেন এই বৈচিত্র্যময় সুলভ সাপ্তাহিক বসুমতীর মূল্যবৃদ্ধির কথা কোনদিন চিন্তা না করেন।

'আজকের মানুষ', 'ভারতদর্শন', 'আন্তর্জাতিক', 'বঙ্গদর্শন', 'নট-নটাদের বিচিত্র কাহিনী' ও 'শহর কলকাতা' বিভাগগুলির মাধ্যমে যা লাভ করি, আমার জীবনে তা অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে।

শ্রীগোবর্দ্ধন দাস
অডিটার,
সমবায় সমিতিসমূহ, সাটাব,
(কোন্নগর) মেদিনীপুর।

যায়—টেমিং অভ্ দি শ্রু যদিও play—within-a-play তবুও সেক্সপীয়ার তাঁর নাটকটিতে কোন epilogue যুক্ত করেন নি—ফলে নাটকটিতে অসম্পূর্ণতার দোষ থেকে গেছে। প্রচলিত রীতি অনুসারে এ ধরণের নাটকে একটা উপসংহার থাকা উচিত—টেমিং অভ্ দি শ্রু'তে 'উপসংহার' তো আছেই, তা ছাড়া—

Sly takes a continuous interest in the entertainment that is offered him, over & above the epilogue to round off the whole play.

নিউ সেক্সপীয়ার কোম্পানীর পরিচালক ভ্লাডেক শেবল তাঁর টেমিং অভ্ দি শ্রু'র প্রডাকসনে 'উপসংহার' দিয়েছিলেন---(বোধ হয় টেমিং অভ্ এ শ্রু'র epilogue-টি ব্যবহার করেছিলেন) এবং প্লে'র মাঝে একবার Slyকে ঢুকিয়ে প্লেকে disturb করিয়েছিলেন। এই ব্যাপারটা অত্যন্ত স্বাভাবিক হয়েছিল এবং নাটকটিকে সুন্দরতর করে তুলেছিল। উপসংহার দেওয়াতে নাটকটির অসম্পূর্ণতা দোষ কেটে গিয়েছিল। টেমিং অভ্ দি শ্রু'র প্রডাকসন আমি বিলেতে দেখি নি—জানি না এইভাবেই নাটকটির প্রডাকসন করাটা একটা Convention-এ দাঁড়িয়ে গেছে কি না---তবে তা যদি না হয়ে থাকে এবং এই রীতিটি যদি ভ্লাডেক শেবলের নিজস্ব এবং original idea হয়, তবে তাঁর এই মৌলিক চিন্তাধারার জন্য তাঁর production skill-এর অকুণ্ঠ প্রশংসা করবো।

নিউ সেক্সপীয়ার কোম্পানীর তিনটি প্রডাকসনের ব্যক্তিগত এবং দলগত অভিনয় উল্লেখযোগ্য। অবশ্য একথা আগেও বলেছি, এ পার্টিকে লণ্ডনের প্রথম শ্রেণীর নাট্যগোষ্ঠী বলব না—তবে এ দলটি যে ভাল দল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এ নাটকে অভিনয়গুণে সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বিয়নডেলোরূপী এডওয়ার্ড এটিয়েঞ্জা। অথচ টেম্পেস্ট-এ সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের ভূমিকা এ্যারিয়েল চরিত্রের রূপায়ণেও এটিয়েঞ্জা অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। ডিন্সডেল নিওনেও পেট্রুকিওকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন। কেটের ভূমিকায় শীলা ব্যালেনটিন অনবদ্য অভিনয় করেছেন। আর্থার হাওয়ার্ড প্রত্যেকটি নাটকেই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন অভিনয় বৈশিষ্ট্যে। ডেভিড কিং যে পাকা অভিনেতা একথা দর্শকরা তাঁর প্রথম দিনের অভিনয় দেখেই বুঝেছেন। আমান্দা রেইস কিন্তু এ নাটকটিতে একটু নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছিলেন। মনে হচ্ছিল যেন মিরান্দাকেই দেখতে পাচ্ছি বিয়াঙ্কার ভেতর। অন্যান্য চরিত্রের অভিনয়ও বেশ ভালই হয়েছে একথা আগেই বলেছি।

—অশোক সেন

রঙ্গজগৎ

নাটক ও নাটকের ব্যবসা

বিশ্বরূপা থিয়েটারের আলোকশিল্পী শ্রীনারায়ণ দাস থিয়েটারের সম্মুখে অনশন ধর্মঘট করছেন। থিয়েটার কর্মীদের দাবি লিখিত পোস্টারে থিয়েটারের সম্মুখস্থ রাস্তার পাশে একটি শিবির নির্মিত হয়েছে। এই শিবিরের সামনে সবসময় শত শত পথচারী, বিভিন্ন থিয়েটারের কর্মী এবং পেশাদার ও অপেশাদার শিল্পীরা সমবেত হয়ে অনশনব্রতীকে সমর্থন জানাচ্ছেন।

থিয়েটার কর্মীদের সংস্থার পক্ষ থেকে প্রচারিত ইস্তাহারে বলা হয়েছে, 'মঞ্চ ও আলোকসজ্জা-কুশলীরা এবার পূজার প্রাক্কালে এক মাসের বেতন বোনাস চেয়েছিলেন। মালিকপক্ষ অস্বীকার করায় সরকারী শ্রমদপ্তর হস্তক্ষেপ করেন এবং ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে হিসাব দাখিলের জন্য নির্দেশ দেন। কিন্তু মালিকপক্ষ হিসাব পেশ করা তো দূরের কথা, উপরন্তু প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কর্মীদের ওপর ছাঁটাই নোটিশ দিয়েছেন।'

ইস্তাহারে নাটক দর্শক ও জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে,—'যখন এদেশের খেটে-খাওয়া মানুষেরা প্রচণ্ড দুর্মূল্যের দিনে জীবনধারণের প্রাণান্তকর যন্ত্রণা ভোগ করছে, সে সময় নিজেদের যোগ্যতা ও নিষ্ঠায় 'সেতু' ও 'নগ্ন'-এর মত নাটকের সাফল্য আনার জন্য যাঁরা প্রদীপের পিলসুজের মত নিজেদের শ্রমে মালিকের হাতে লক্ষ লক্ষ টাকা তুলে দিয়েছেন—সেই অর্ধশতাধিক আলোকসজ্জা ও মঞ্চসজ্জাশিল্পী কেন রাস্তায় দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছেন—আপনারা কি প্রগতির দাবিদার (!) এই মঞ্চ মালিকদের জিজ্ঞাসা করবেন না?'

বিশ্বরূপা থিয়েটার কর্তৃপক্ষের এই অন্যায় ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে এবং ছাঁটাই নোটিশ প্রত্যাহারের অনুরোধে বাংলার খ্যাত শিল্পী, পরিচালক ও রাজনৈতিক নেতারা এক আবেদন প্রকাশ করেছেন। তাতে স্বাক্ষর করেছেন—সত্যজিৎ রায়, অজয় কর, মন্মথ রায়, উৎপল দত্ত, কানন দেবী, সরযূ দেবী, মঞ্জু দে, আঙুরবালা দেবী, নীলিমা দাস, শোভা সেন, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, অসিতবরণ, সবিতাব্রত দত্ত, অনুপকুমার, অজিত চট্টোপাধ্যায়, তাপস সেন, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সলিল সেন প্রমুখ বহু শিল্পী এবং অমর বসু, হেমন্ত বসু প্রমুখ নেতা।

বাংলার মঞ্চশিল্পী, কলাকুশলী এবং কর্মীদের সঙ্গে আমরা থিয়েটার কর্তৃপক্ষকে বিরোধ মীমাংসার অনুরোধ জানাচ্ছি। যে নাট্যমঞ্চে শিল্পের চর্চা হয়ে থাকে, যেখানে মানবতা ও ন্যায় নীতির কথা ঘোষিত হয়ে থাকে, যেখানে জাতির চিন্তা ও চরিত্র প্রতিফলিত হয়, সেই মঞ্চকে নিয়ে নিছক মুনাফাবৃত্তি জাতি ও শিল্পের পক্ষে বিপজ্জনক।

—সুজন।

● সত্যজিৎ রায়

বার্লিনে শ্রেষ্ঠ পরিচালক, ভারতের উৎসবে সভাপতি।

বাংলা চলচ্চিত্রের এক বছর

১৯৬৫ সালকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। নতুন বছরের প্রারম্ভে গত বছরকে আমরা স্মরণ করছি। এগিয়ে চলা জীবনের ধর্ম। এগিয়ে চলার আনন্দ ও গৌরবের মধ্যে পেছনে ফেলা আসা দিনের অনেক মধুর স্মৃতি ভেসে ওঠে। অতীত দিনগুলির ভুল-ত্রুটি, দুর্বলতা কাটিয়ে নতুন বছরকে আরো সুন্দর ও সফল করে তোলার আকাঙ্ক্ষায় আমরা গত বছরের সালতামামি করছি।

গত বছরের সবচেয়ে গর্ব করে বলার কথা বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে সত্যজিৎ রায়ের শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান লাভ। 'মহানগর' ছবির জন্য বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের বিচারকবৃন্দ তাঁকে এই সম্মান দিয়েছেন। এই উৎসবে 'মহানগর'-এর নায়ক অনিল চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীরায় উপস্থিত ছিলেন। ভারতীয় ছবি গত বছরে কার্লোবিভ্যারি, কাঁন, মেক্সিকো, ভেনিস ইত্যাদি উৎসবে ও প্রতিযোগিতায় প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হয়েছিল।

গত বছর বাংলা চলচ্চিত্রে কয়েক জন নতুন পরিচালকের কাজের সাথে আমরা পরিচিত হয়েছি। তাঁদের মধ্যে

● মাধবী মুখার্জী

রয়েছেন উমাপ্রসাদ মৈত্র (সপ্তর্ষি), মঞ্জু দে (স্বর্গ হতে বিদায়), ও সি গাঙ্গুলী (কিনু গোয়ালার গলি), সন্ধানী (অয়নান্ত), অমর গাঙ্গুলী (কাঞ্চনরঙ্গ), ধীরেশ্বর মুখোপাধ্যায় (কাঁটা তার), সুরেশ রায় (মরুতৃষা)। এঁদের মধ্যে চারজনের কাছে বাংলা চলচ্চিত্র কিছু আশা করতে পারে। নতুন শিল্পীদের মধ্যে যাঁদের কথা আমাদের মনে আছে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জ্যোৎস্না বিশ্বাস, অজয় গাঙ্গুলী, সুবীর সেন, দোলনচাঁপা দাশগুপ্ত, শ্রাবণী বসু, অপর্ণা ভৌমিক, দেবজিৎ, নন্দিতা দে, লতিকা দাশগুপ্ত

চলচ্চিত্রে সঙ্গীত-পরিচালকরূপে আশিস খান এবং প্রবীর মজুমদারকে পাওয়া গেল। এঁদের কাজে কিছুটা নতুনত্বের স্বাদ দর্শকরা পেয়েছেন।

১৯৬৪ সালে ৩৫টি বাংলা ছবি মুক্তি লাভ করেছে। ১৯৬৩ সালে মুক্তি পেয়েছিল ৩১টি। তুলনায় যদিও চারটি ছবি বেশি; কিন্তু এই চারটির মধ্যে .টি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি। এই ৩৫টি ছবির মধ্যে ব্যবসায়িক দিক থেকে সাফল্য লাভ করেছে 'মহাতীর্থ কালীঘাট' (৫০ সপ্তাহ)। তারপরে যথাক্রমে 'চারুলতা' (৪১ সপ্তাহ), 'আরোহী' (৩০ সপ্তাহ), 'জীবন কাহিনী' (৩০ সপ্তাহ), 'জতুগৃহ' (৩০ সপ্তাহ)। ব্যবসায়িক অথবা জনপ্রিয়তার দিক লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আজ পর্যন্ত

● উত্তমকুমার

ভক্তিধর্মী ছবির দর্শক বেশি। এখনো পর্যন্ত অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত এবং মহিলাদের একাংশের ওপর ছবির ব্যবসায়িক সাফল্য নির্ভর করছে।

● সন্ধ্যা রায়

'চারুলতা' যদিও ৪১ সপ্তাহ চলেছে কিন্তু তা দিয়ে বাঙালী দর্শকদের রুচির বিচার চলে না। এখানে রবীন্দ্রনাথ এবং সত্যজিৎ রায়ের নামের ওপর আস্থা নিয়ে যাঁরা বাংলা ছবি সাধারণত দেখেন না, তাঁরাও দেখতে এসেছিলেন।

১৯৬৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ৩৫টি ছবির মধ্যে আমাদের বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ ছবি 'চারুলতা' (সত্যজিৎ রায়), দ্বিতীয় ছবি 'জতুগৃহ' (তপন সিংহ), তৃতীয়

● সত্যজিৎ রায়ের 'কাপুরুষ ও মহাপুরুষ' চিত্রের একটি দৃশ্যে চারুপ্রকাশ ঘোষ ও রবি ঘোষ।

'বিদ্যাপতি' হিন্দী ছবিতে সিম্মি ও কমলজিৎ

'প্রতিনিধি' (মৃণাল সেন)। তার পরের ছবিগুলি যথাক্রমে অয়নান্ত, আরোহী, অভা, অনুষ্টুপ ছন্দ, কিনু গোয়ালার গলি, জীবনকাহিনী, দেবতার গ্রাস, প্রভাতের রং, নতুন তীর্থ, বিংশতি জননী, স্বর্গ হতে বিদায়, মোমের আলো, বীরেশ্বর বিবেকানন্দ, কাঞ্চনরঙ্গ, লালপাথর, অশান্ত ঘূর্ণী, বিভাস, কষ্টি পাথর, সপ্তর্ষি, সন্ধ্যাদীপের শিখা, সিঁদূরে মেঘ, অগ্নিবন্যা, দুইপর্ব, এরা কারা, তা হলে, গোধূলি বেলায়, কাঁটাতার, কে তুমি, দীপ নেভে নাই, মরুতৃষা, মহাতীর্থ কালীঘাট, রাধাকৃষ্ণ।

'রূপসনাতন' ছবিতে গুরুদাস ও প্রবীরকুমার

পরিচালকদের মধ্যে তপন সিংহ, সুশীল মজুমদার এবং বিনু বর্ধনের দুটি করে ছবি মুক্তিলাভ করেছে। পুরাতন পরিচালকদের মধ্যে কয়েকজনের কোন ছবি গত বছর মুক্তিলাভ করে নি।

জনপ্রিয় শিল্পীদের মধ্যে উত্তমকুমার (পাঁচটি) সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (চারটি), দিলীপ মুখার্জী (চারটি), অনিল চট্টোপাধ্যায়, বসন্ত চৌধুরী, মাধবী মুখার্জী, সুপ্রিয়া চৌধুরী, সন্ধ্যা রায়, শর্মিলা ঠাকুর, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়কে কয়েকটি ছবিতে দেখা গেছে। অরুন্ধতী দেবী ও সুচিত্রা সেন একটি করে

ছবিতে অভিনয় করেও জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ন রেখেছেন।

গত বছর যে ৩৫টি ছবি মুক্তিলাভ করেছে, প্রায় সব ক'টি ছবির অবলম্বন উপন্যাস বা ছোট গল্প। বাংলা দেশের খ্যাত ও স্বল্পখ্যাত অনেক লেখকের রচনা প্রযোজকদের চিত্র নির্মাণে উৎসাহিত করেছে। রবীন্দ্রনাথের দুটি ছোট গল্প এবং একটি কবিতা চলচ্চিত্রের অবলম্বন হয়েছে। লক্ষণীয় যে, অধিকাংশ প্রযোজক উপন্যাসের ওপর যতটা নির্ভরশীল, স্বাধীন চিত্রনাট্যের ওপর ততটা নির্ভরশীল নন। ছবি এখনো গল্পনির্ভর দৃষ্টিগ্রাহ্য গল্পমাত্র। স্টাইল বা আঙ্গিক, সৌন্দর্য পরিস্ফুটন এবং জীবনের বিভিন্ন দিক ও চিন্তাকে ফুটিয়ে তোলার অবকাশ এখন পর্যন্ত বাংলা ছবিতে তেমন নেই। বাংলা চলচ্চিত্র এখনো গতানুগতিক প্রেমকাহিনী এবং শর্মাগৃহের চৌহদ্দী থেকে মুক্ত হতে পারে নি। জীবনের ক্ষেত্রে যতই অভিজ্ঞতা ঘটুক, যতই সমস্যায় জীবন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে উঠুক, ছবিতে তার প্রতিফলন কোথায়? কলকাতার মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত সমাজের বাইরে বেশি দূরে কোথায় আমরা যেতে পেরেছি।

১৯৬৪ সালে কলকাতা ফিল্ম সোসাইটি ও সিনেক্লাবের উদ্যোগে বিদেশী দূতাবাসগুলির সহায়তায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছবি প্রদর্শিত হয়েছে। পোলিশ চলচ্চিত্র উৎসব, সোভিয়েট চলচ্চিত্র উৎসব, ক্লাসিক চলচ্চিত্র উৎসব, সুইডিশ চলচ্চিত্র উৎসব, সেক্সপীয়র চলচ্চিত্র উৎসব এবং ফরাসী নবতরঙ্গ চলচ্চিত্র উৎসব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ছবিগুলির মাধ্যমে বাংলার চলচ্চিত্র-উৎসাহীরা পাঁচটি দেশের চলচ্চিত্র নির্মাণরীতি ও আধুনিক চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হয়েছেন। এইসঙ্গে চলচ্চিত্রের অতীত দিনের গৌরবের সাক্ষী ক্লাসিক ছবিগুলি দেখে বিশ্বের বিশিষ্ট স্রষ্টাদের কাজের সাথে পরিচিত হয়েছেন। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের এই অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা বাংলা ছবির উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে আশা করি। অবশ্য এই ভাববিনিময় ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবার পথে বাধা কোথায়, সে সম্পর্কে আমরা সচেতন।

● 'আকাশ-কুসুম' চিত্রের একটি দৃশ্যে অপর্ণা দাশগুপ্ত ও অনিল চ্যাটার্জি।

ঋত্বিক ঘটকের প্রথম ছবি 'নাগরিক' এবং ১৯৬২-৬৩ সালে নির্মিত 'সুবর্ণরেখা', বারীন সাহার 'তের নদীর পারে' ও উৎপল দত্তের 'ঘুম ভাঙার গান' আজো মুক্তিলাভ করতে পারে নি। কেন পারে নি, সে কথা সম্ভবত আজ আর কারো অজানা নয়।

সিনেমাগুলির মালিক এখনো এমন একদল লোক—যাদের ব্যবসায়ী বুদ্ধি ও লোভের জন্য বাংলা ছবি স্বাভাবিকভাবে বিকাশলাভ করতে পারছে না। এখনো বাংলা দেশে বাংলা ছবি মুক্তিলাভ করতে পারে না; অথচ বছরে একশতের মত হিন্দী ছবি মুক্তিলাভ করে। চলচ্চিত্র কর্মীমহল থেকে তাই দাবি উঠেছিল—প্রত্যেক সিনেমায় বাংলা ছবি প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করা হোক। আন্দোলনের ফলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক তদন্ত কমিশন গঠন করেছিলেন। যথাসময়ে সেন কমিশনের রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে। প্রকাশ যে, তিনি বাংলা ছবির সঙ্কট ও প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য কয়েকটি সুপারিশ করেছেন। তিনি নাকি বাংলার বাইরে থেকে আগত প্রত্যেকটি ছবির ওপর লেভী ধার্য এবং লেভী থেকে অর্জিত টাকা বাংলা চলচ্চিত্র উন্নয়নে ব্যয় করতে সুপারিশ করেছেন। কিন্তু এই রিপোর্ট লালফিতায় বাঁধা অবস্থায় চাপা পড়েছে। জনসাধারণ এবং চলচ্চিত্র শিল্প সংশ্লিষ্টদের কাছে রিপোর্টটি প্রকাশ করা হয় নি।

আমরা কামনা করি, ১৯৬৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই রিপোর্টের ভিত্তিতে বাংলা চলচ্চিত্রের সহায়ক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। নির্দিষ্ট কাল প্রত্যেক প্রেক্ষাগৃহে বাংলা ছবি প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করা হবে।

চিলড্রেন্স নবেল থিয়েটারের উৎসব

চিলড্রেন্স নবেল থিয়েটারের চতুর্থ বার্ষিক উৎসব রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে গত ২৫শে থেকে ২৭শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছে। উৎসবে সভাপতিত্ব

মঞ্জু দে

করেন শ্রীপ্রমথনাথ বিশী এবং উৎসব উদ্বোধন করেন শ্রীমতী রেণুকা রায় এম-পি।

চার বছর আগে চিত্রালিকা নামে এই সংস্থা গঠিত হয়েছিল। এ-বছর চিলড্রেন্স নবেল থিয়েটার নামে সংস্থা রেজিস্ট্রিকৃত হয়েছে। এই সংস্থার 'কেমন জব্দ', 'নকল রাজা', 'রূপকথা' ইত্যাদি রূপক নাটিকা শিশুদের মনোরঞ্জন করেছে। এ-বছর আগের তিনটি নাটক ছাড়াও, চিলড্রেন্স নবেল থিয়েটারের শিশু সদস্যরা 'সোনার পেয়ালা' ও 'বোকা মোরগ' নামে আরো দুটি নতুন রূপক নাটিকা মঞ্চস্থ করেছে। শত শত শিশু ও তাদের অভিভাবক এই নাটিকাগুলি উপভোগ করেছে।

শ্রীসুশীল দাসের পরিচালনায় রূপক নাটকগুলি সার্থক হয়েছে।

ছন্দগীতিকার সমাবর্তন উৎসব

বিগত ২৫শে ডিসেম্বর, কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে প্রখ্যাত সঙ্গীত ও নৃত্য শিক্ষায়তন ছন্দগীতিকার চতুর্দশ বার্ষিকী সমাবর্তন ও পুরস্কার বিতরণী উৎসবে শিক্ষাদপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র, ইনস্পেক্টার জেনারেল অব পুলিশ শ্রীউপানন্দ মুখার্জী ও জিলা স্কুল পরিদর্শিকা শ্রী অমিয়া দাশগুপ্তা যথাক্রমে প্রধান অতিথি, উদ্বোধক ও সভানেত্রী হিসাবে আসন অলঙ্কৃত করেন। শ্রীননীগোপাল মিত্র, হিমাংশু রায়চৌধুরীর যুগ্ম পরিচালনায় ছাত্রীরা কবিগুরুর নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' সাফল্যের সহিত মঞ্চস্থ করেন, অভিনয়ে অর্জুন, চিত্রাঙ্গদা ও মদনের ভূমিকায় যথাক্রমে দীপ্তি দত্ত, ছন্দশ্রী শর্মিষ্ঠা দাশগুপ্ত, নন্দিতা দেব ও ছন্দা ভট্টাচার্য এবং অন্যান্য ভূমিকায় রীতা মিত্র, রত্না, সুতপা, উমা, অনিতা, তমিস্রা এবং সঙ্গীতাংশে রবিদীপ্তি, গীতালি হোড় ও রুণা মতিলাল, কুমারী উৎপলা ব্যানার্জী, মুকুলিকা গায়েন, শুক্তি রায় প্রশংসনীয়। শ্রীযুক্তা দাশগুপ্তা ছাত্রীদের 'সঙ্গীতশ্রী', 'রবিদীপ্তি', 'ছন্দশ্রী' ডিপ্লোমা প্রদান করেন এবং শ্রীযুক্তা বিভা মুখার্জী কৃতী ছাত্রীদের সুশীলা স্মৃতি পদক ও পুরস্কার বিতরণ করেন।

স্টুডিও খবর

তুষার মানব

হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রযোজনায় বিজয় প্রোডাকসন্স 'তুষার মানব' ছবি তৈরি করছেন। কাহিনী রচনা করেছেন কানুরঞ্জন ঘোষ। পরিচালনা করবেন দিলীপরঞ্জন মুখার্জী।

মহালগ্ন

কনক মুখার্জী পরিচালিত দীপ্তি পিকচার্সের 'মহালগ্ন' ছবির মুক্তি আসন্ন। এক মা-হারা ছেলে ও ছেলে-হারা মা'র কান্না-হাসির কাহিনী। অভিনয়ে আছেন বিকাশ রায়, সন্ধ্যারাণী, সুমিতা সান্যাল, জহর রায়, ভানু ব্যানার্জী প্রমুখ।

● চিলড্রেন্স নবেল থিয়েটার উৎসব উদ্বোধন করছেন শ্রীমতী রেণুকা রায় এম-পি। ওপরে 'সোনার পেয়ালা'র একটি দৃশ্য।

সংগীত কথা

উত্তর বাংলার রাজসাহী জেলার আত্রাই পল্লীর কৃষক-শিল্পী ফতে আলী।

ফতে আলী রোজ সকালে লাঙল কাঁধে নিয়ে মাঠে কাজ করতে যেতেন। সারা দিন মাঠে কাজ করে ঘরে ফিরতেন সন্ধ্যের সময়। মাঠের কাজে যাবার সময় ছেলেকে ডেকে গান গেয়ে বলতেন—

আরে ও আফতাব,
ও বাপের বেটা,
চল যাই চল মাঠে লাঙল মারতি,
গরুর কাঁধে লাঙল দিয়ে
ঠেলতি ঠেলতি ঠেলতি॥

ফতে আলীর সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা ক্রমে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণই হল তাঁর অমূল্য লোকগীতি রচনার ক্ষমতা। একজন সাধারণ কৃষকের মুখে যে এত সুন্দর গান কোনকালে শুনব, তা আমি কল্পনাও করি নি। তাঁর কণ্ঠস্বর যেমন উদাত্ত ছিল, তেমনিই ছিল তাঁর লোকগীতি রচনার ক্ষমতা।

গ্রীষ্মে যখন জমি ফেটে চৌচির হয়ে গেছে, খাল-বিল সব শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, তখন এই অসহনীয় ও করুণ অবস্থা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য ভগবানের কাছে আকুল প্রার্থনা জানিয়ে গান বেঁধে ফতে আলীকে গাইতে শুনেছি—

ও আল্লা এবার বুঝি
জান বাঁচে না,
এমন অনাবৃষ্টি কইর‍্যা সৃষ্টি,
কইরল্যা কেন ছলনা।
আসমান হইল আগুনতাতা
জমিন হইল ফাটা ফাটা,
কেমন কইর‍্যা দিব যে হাল
উপায় বল না।
আমরা সবাই চাইয়্যা আছি,
তোমার মুখ পানে,
তুমি না চাইলে আল্লা,
মরব সবাই জানে॥

অপূর্ব আবেগ, অভিব্যক্তি সহজ ও সরলভাবে ব্যক্ত হয়েছে ফতে আলীর উপরোক্ত গানে।

আবার গ্রীষ্মের শেষে, বর্ষার

● ফতে আলী

আগমনে যে উচ্ছল আনন্দ ফতে আলীর মনকে দোলা দিয়েছিল, তা' ধরা পড়ে তাঁরই একটি পল্লীগীতি রচনা থেকে।—

ম্যাঘারাণীর কত দয়া দেখ রে চেয়ে,
শুকনো জমি পেইল পরাণ,
তারি জলে নেইয়ে,
দিল দেখা তেষ্টার পানি
দু হাত ভইর‍্যা,
এই পানিতে জমিন মোদের
জানে বাঁচবে রে॥

এ ধরণের কৃষির সুবিধে-অসুবিধে নিয়ে ফতে আলীর বহু লোকগীতি মুখে মুখে রচিত আছে, যা সত্যিকারের লোক-সংস্কৃতির অঙ্গ। ফতে আলীর মত অনেক লোকশিল্পীই এখনও গাঁয়ে গাঁয়ে আমাদের দৃষ্টির বাইরে বেঁচে আছেন—কিন্তু তাঁদের কোনই স্বীকৃতি নেই। এত অমূল্য সম্পদের অধিকারী যে-সব শিল্পী, আজ তাঁরা প্রায় না-খেয়ে মরতে বসেছেন, তাঁদেরকে সকলের সামনে তুলে ধরে তাঁদের বাঁচবার পথটিকে খুলে দিতে হবে আমাদেরই।

—বুদ্ধদেব রায়।

● সাথী গুপ্তা

ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের শিল্পী

গত ২৫শে ডিসেম্বর ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের নৃত্যশিল্পী সাথী গুপ্তা (২১) ইউরিমিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে কিছুদিন রোগভোগের পর মারা যান। শ্রীমতী বিভিন্ন নৃত্যনাট্যে সর্বদাই দর্শকবৃন্দের প্রশংসা অর্জন করেন। ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের পক্ষ থেকে শবাধারে মাল্যদান করা হয়। শ্রীমতী সাথী গুপ্তার অকাল মৃত্যুতে সকলেই ব্যথিত।

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

—শিলাদিত্য—

জার্মান নাট্যকার গেরহার্ট হাউপ্টমান

(১৮৬২—১৯৪৬)

প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে জার্মান জনসাধারণ এবং শিক্ষিতসমাজের ওপর হাউপ্টমান যে প্রভাব বিস্তার করে এসেছেন তার তুলনা হয় না।

Like Lessing and Goethe before him, Gerhart Hauptmann became a symbol to the German people. Yet unlike these classical poets Hauptmann reached the heart of everyone—even the simple farmers, miners and weavers—for it was their joy and their suffering that offered him his richest material.

রবীন্দ্রনাথের মতই নানাধরণের নাটক হাউপ্টমান লিখেছেন—তাঁর কাব্যনাট্য, সাংকেতিক নাটক ও বাস্তববাদী গদ্যনাটকগুলি ইউরোপের প্রায় সব দেশেই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর আর হাউপ্টমানের হানেল নাটকে যথেষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

দুটি নাটকেরই প্রধান চরিত্র এক, একটি শিশু। এর কারণ বোধ হয় এই যে, শিশুচিত্তই সবচেয়ে নিষ্পাপ—ঐশ্বরিক মহিমা শিশুর কাছেই সহজে প্রতিভাত হয়।

ডাকঘরে সাংকেতিকতার মাধ্যমে যে শাশ্বতভাবকে রূপায়িত করা হয়েছে তা হচ্ছে এই—

পার্থিব জীবনে মানবাত্মা নানা বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে—এর ফলে সে অস্থির হয়ে ওঠে এবং ক্রমাগত মুক্তির জন্য ব্যাকুল হয়। অবশেষে ঈশ্বরের কৃপায় মৃত্যুরূপে এই মুক্তির আবির্ভাব হয়। মৃত্যুর বাহ্যিক রূপটা ভয়াবহ—আসলে মৃত্যু হচ্ছে মুক্তির দূত—মৃত্যুই যেন ঈশ্বরের বার্তা বহন করে নিয়ে আসে—সীমার ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভেতর থেকে মানুষকে নিয়ে যায় অসীমের ব্যাপ্তির মাঝে।

হানেল নাটকেও হাউপ্টমান দেখাতে চেয়েছিলেন যে, পার্থিব জীবন দুঃখময়। এই দুঃখময় জীবন থেকে মুক্তিলাভের জন্য মানবজীবনের যে ব্যাকুলতা, তাকেই রূপায়িত করেছেন হাউপ্টমান তাঁর নাটকে।

হানেল ম্যাটার্ন চোদ্দ বছরের মেয়ে—তার মা নেই, বাবা মদ্যপ এবং অত্যাচারী। হানেলকে একলাই বাড়ির সব কাজকর্ম করতে হয়—তার ওপর বাপের মদের পয়সা যোগাড় না করতে পারলে তার বাপ তার পিঠের ছাল আস্ত রাখে না। হানেলের দেহ জলে ভাসতে দেখে কাঠুরিয়া জাইডেল তাকে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করে। সে এবং স্কুলমাস্টার গট্‌ওয়াল্ড গ্রামের আতুরালয়ে মরণাপন্ন হানেলকে নিয়ে আসে। এখানে তার সেবা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। ক্লান্তি ও পরিশ্রমে অল্পক্ষণ বাদেই হানেল ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে। নিদারুণ দুঃখকষ্টের পর সে যেন মুক্তির আলো দেখতে পায়। নিজের কাছে নিয়ে যাবার জন্য ভগবান যেন মৃত্যুদূতকে তার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এরপর ভারি সুন্দর একটা ইঙ্গিত আছে। মৃত্যুভয় আমাদের একটা সংস্কারের বশে। হানেল বুঝতে পারছে যে, মৃত্যুর ভেতর দিয়েই সে চরম শান্তিলাভ করবে। তবুও যেন তার অল্প অল্প ভয় হচ্ছে। মূল নাটকটির ইংরাজী অনুবাদ কিছুটা তুলে দিচ্ছি—

Hannele

Mother! Mother! There's some one in the room?

বিশ্ব-সাহিত্যে বসুমতীর অমর অবদান

শ্রীঅরবিন্দের

ANANDAMATH

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অমর আনন্দমঠের অমর ইংরাজী অনুবাদ

- আনন্দমঠে—স্বাধীনতার সক্রিয় সংগ্রামের পূর্বাভাস।
- আনন্দমঠে—'বন্দেমাতরম' মন্ত্রের পূত-প্রকাশ
- আনন্দমঠে—ঋষি বঙ্কিম ও ঋষি অরবিন্দের আদর্শ সমন্বয়।

আনন্দমঠের এই মহামন্ত্রের অর্দ্ধশতাব্দীর সাধনে ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত

ভারতের প্রতি গৃহে এই পবিত্র গ্রন্থ শোভা পাউক

দাম—তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

● হাউপ্টমানের একটি সাঙ্কেতিক নাটকের মঞ্চসজ্জা

Deaconess

Fear not, my child. He is your friend.

Hannele

Who is it, mother ?

Deaconess

He is Death !

Hannele

Death (She stares fearfully at the angel for a moment) Must it—must it be ?

Deaconess

Death is the gate, Hannele !

Hannele

Is there, no other, mother dear ?

Deaconess

There is no other.

Hannele

Will you be cruel to me, Death ? He won't answer ! Why won't he answer any of my questions, mother ?

Deaconess

The Voice of God has answered you already.

Hannele

Oh, dear Lord God, I have so often longed for this. But now—now I am afraid !

হাউপ্টমানের আরও দুটি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী সাঙ্কেতিক নাটক আছে—The Sunken Bell এবং Henry of Aue.

The Sunken Bell-এর মর্মার্থ এই—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, দৃশ্য এবং অদৃশ্য জগতের সবকিছুই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট। তাঁর সৃষ্টিতে কোনো খুঁত নেই, অভাব নেই, অসম্পূর্ণতা নেই। কিন্তু মানুষ তো দেবতা নয়। মানুষের সৃষ্টি মৌলিক হতে পারে না—সে সৃষ্টি দেবশিল্পেরই অনুকরণ—আর অনুকরণে অসম্পূর্ণতা থাকবেই। সৃষ্টির এই অসার্থকতার ফলেই মানুষের মনে বেদনার অনুভব হয়। এই বেদনার অনুভূতি চিরকাল মানুষের জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকবে। এ থেকে তার অব্যাহতি নেই।

Henry of Aue নাটকে সাঙ্কেতিক ইঙ্গিতে বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে যে, মানুষ যতদিন না প্রেমের প্রভাবে চৈতন্য লাভ করে, ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করতে শিখবে, ততদিন তার অবস্থা কুষ্ঠরোগাক্রান্ত সর্বসুখবঞ্চিত হতভাগ্যদের মতই শোচনীয়। অহঙ্কারমুক্ত হয়ে ঈশ্বরের অপার প্রেম অনুভব করতে না শেখা পর্যন্ত তার মুক্তি নেই—যেদিন সেই অনুভূতি আসবে, সেদিনই সে ঈশ্বরের কৃপায় রোগমুক্ত হবে।

ভবিষ্যতে সুযোগমত হাউপ্টমানের অন্য জাতীয় নাটকগুলির আলোচনা করবো। (ক্রমশঃ)

খেলা ধুলা

এশীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী ভাষণ দিচ্ছেন শ্রীঅশোক সেন

উডবান পার্কের টেনিস লনে

এবার শীতের মরশুমে আকর্ষণীয় ক্রিকেটের আয়োজন না থাকায় ক্রীড়ামোদীদের দৃষ্টি টেনিসের দিকে বেশি আকৃষ্ট হয়েছে। এশিয়ান টেনিসের অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিশ্বের কয়েকজন অপেশাদার খেলোয়াড়ের সমাগমে এই প্রতিযোগিতাটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। বহিরাগত খেলোয়াড়দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, অস্ট্রেলিয়ার মার্টিন মুলিগ্যান ও বব হিউইট এবং ইংলণ্ডের পয়লা নম্বর টেনিস খেলোয়াড় মাইক স্যাংস্টার। এ পর্যন্ত যা খেলা হয়েছে তাতে অস্ট্রেলিয়ার দুজন খেলোয়াড় টিকে আছেন। ভারতের তরুণ খেলোয়াড় জয়দীপ মুখার্জীর হাতে স্যাংস্টারের পরাজয় উল্লেখযোগ্য। এই কোয়ার্টার ফাইন্যালটি ৩০শে ডিসম্বরে অনুষ্ঠিত হয় এবং দীর্ঘ পাঁচ সেটের খেলায় বিমুগ্ধ দর্শকরা উন্নত ক্রীড়া-নৈপুণ্যের আনন্দরস উপভোগ করেন। জয়দীপের এই বিজয় লাভ ভারতীয় টেনিসের উন্নতিসূচক। জয়দীপকে এবার সেমি-ফাইন্যালে বব হিউইটের সম্মুখীন হতে হবে। এইবার উইম্বলডেনের আসরে বব হিউইটের কাছে জয়দীপকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। জয়দীপ

শ্রীঅমিতাভ

যদি সাউথ ক্লাবের লনে এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পারেন, তাহলে ভারতীয় টেনিসের ক্ষীণ দীপশিখা কিছুটা উজ্জ্বল হবে। ভারতের একটি সম্ভাবনা তরুণ প্রেমজিৎ লাল বিদায় নিলেন হিউইটের কাছে পরাজিত হয়ে। প্রেমজিৎ তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন বটে, কিন্তু হিউইটের সর্ব বিষয়ে প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।

বব হিউইট মেজাজী খেলোয়াড়। তাঁর যদি মেজাজ ভাল থাকে আর খেলা খুলে যায়, তাহলে জয়দীপকে হারাতে হিউইটের বিশেষ বেগ পেতে হবে না। অন্যদিকে মুলিগ্যান অস্ট্রেলিয়ার উদীয়মান খেলোয়াড়। কৃষ্ণাণের সঙ্গে তাঁর লড়াই তীব্র প্রতিযোগিতামূলক হবে আশা করি। শেষ পর্যন্ত আশ্চর্য হবার কিছুই থাকবে না, যদি সিংগলস প্রতিযোগিতার দুদিক থেকে দুজন অস্ট্রেলিয়ানই ফাইন্যালে ওঠেন। ডাবলস খেলাতেও অস্ট্রেলিয়া জুটিই বিজয়ী হবে বলেই সকলের ধারণা। শেষ কথা, এই উন্নত টেনিস প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ভারতীয় তরুণ প্রতিভাসম্পন্ন টেনিস খেলোয়াড়েরা লাভবান হবেন বলে মনে হয়। মোহনবাগানের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী

জয়দীপ মুখার্জী

উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত এক প্রদর্শনী টেনিস খেলায় এশিয়ান টেনিসে আগত কয়েকজন সেরা খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেন। হাল্কা মেজাজের মধ্যে মোহনবাগানের টেনিস লনে অনুষ্ঠিত খেলায় অংশগ্রহণ করেন মার্টিন মুলিগ্যান, বব হিউইট, মাইক স্যাংস্টার, কৃষ্ণণ, জয়দীপ এবং প্রেমজিৎ।

হকি প্রসঙ্গে

নেহরু স্মৃতি হকি প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে শেষ পর্যন্ত দুই রেল দলের সাক্ষাৎ হল। উত্তর রেল ফাইন্যালে পৌঁছায় বোম্বাই দলকে ২-১ গোলে পরাজিত করে এবং দক্ষিণ-পূর্ব রেল সেন্ট্রাল রেল দলকে ১-০ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে।

ফাইন্যালে দুদলের মধ্যে কোনদলই তেমন উচ্চাঙ্গের ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করতে পারে নি। খেলার মধ্যে দুদলের রক্ষণভাগই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। আক্রমণভাগের খেলোয়াড়রা ব্যর্থতার পরিচয় দেওয়ার ফলেই, খেলার মান আশানুরূপ পর্যায়ে উন্নীত হয় নি। উত্তর রেল দলের প্রতি জয়লক্ষ্মী প্রসন্ন ছিলেন, তাই শেষ পর্যন্ত তারা প্রথম নেহরু স্মৃতি হকি প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হবার গৌরব অর্জন করল। ভারতের অলিম্পিক খেলোয়াড় এবং পেনাল্টি কর্নার বিশারদ পৃথ্বীপাল সিং পেনাল্টি কর্নার থেকে উত্তর রেল দলের পক্ষে দুটি গোল দিয়ে দলের জয়ের পথ সুগম করেন।

এই প্রতিযোগিতায় সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নি; বজায় ছিল খেলোয়াড়ী মনোভাব এবং পরিচ্ছন্ন আবহাওয়া। প্রতিযোগিতাকে সাফল্যমণ্ডিত করার পেছনে প্রতিযোগিতা কমিটির সভাপতি আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোক সেন এবং উদ্যোক্তাগণের আছে যথেষ্ট অবদান। ফাইন্যাল খেলার দিন মাঠে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী এবং তিনিই খেলার শেষে পারিতোষিক বিতরণ করেন।

● মাইক স্যাংস্টার

● রমানাথ কৃষ্ণাণ

ভারত সফরকারী ফরাসী হকি-দলের খেলায় যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। ভারত সফরের ফলে যে অমূল্য অভিজ্ঞতা তাঁরা সঞ্চয় করছেন, ভবিষ্যতে তা নিঃসন্দেহে তাঁদের প্রভূত সাহায্য করবে। ভারতের কাছে তাঁরা চতুর্থ টেস্ট পর্যন্ত পরাজিত হয়েছেন বটে, কিন্তু গোলের ব্যবধান কমে আসছে। দিল্লীর চতুর্থ টেস্টে ভারতীয় দল কোনক্রমে ২-১ গোলে ফরাসী দলকে পরাজিত করেছে।

ময়দান ক্রিকেট

রঞ্জী ট্রফির দ্বিতীয় খেলায় বাংলা সংগ্রহ করেছে পাঁচ পয়েণ্ট। উড়িষ্যার বিপক্ষে বাংলা দল প্রথম

ইনিংসের ফলাফলের ব্যবধানে বিজয়ী সাব্যস্ত হল। উড়িষ্যা দলকে সরাসরি পরাজিত করে বাংলা দল অনায়াসে পুরো পয়েণ্ট সংগ্রহ করতে পারত। বাংলা দলের নিম্নমানের ফিল্ডিং সমস্ত সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দেয়। বাংলা দলের ফিল্ডিং দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে উড়িষ্যা দল প্রথম ইনিংসে ২৩১ রান সংগ্রহ করে। প্রত্যুত্তরে বাংলা দল প্রথম ইনিংসে ৩৩৫ রান সংগ্রহ করে। খেলার শেষ দিন খেলা শেষ হবার মাত্র ৩৫ মিনিট পূর্বে উড়িষ্যা দল ২০৭ রানে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শেষ করে। বাংলা দলের জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল তখন ১০৪ রান এবং সময় ছিল মাত্র ২৫ মিনিট। কিন্তু এই ২৫ মিনিটেও বাংলা দল সংগ্রহ করে ৭৫ রান ৩ উইকেটের বিনিময়ে।

বাংলা স্কুল দল পূর্বাঞ্চল ক্রিকেট ফাইন্যালে বিহার স্কুল দলকে পরাজিত করে রাণী হেমন্তকুমারী ট্রফি জয় করল। বিহার দল ২৬৭ রানের ব্যবধানে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়। বাংলা স্কুল দল পূর্বাঞ্চল ক্রিকেটে বহুদিন একচ্ছত্র প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

পূর্বাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেটের খেলা এখন সেমিফাইন্যাল পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। কলকাতা এবং যাদবপুরকে মনে হয় আমরা ফাইন্যালে দেখতে পাব।

তরুণ প্রতিভা সন্ধানে

একজন ভাল ফিল্ডার ক্রিকেটে যে কোন দলেরই একটা সম্পদ; আর যদি কোন ফিল্ডার সব্যসাচী হয়, মানে দুহাতেই সমানভাবে ফিল্ডিং করার ক্ষমতা থাকে, তবে সে যে-কোন দলেরই অমূল্য রত্ন। কথায় বলে catches win matches. সময়মত ভাল ক্যাচ লুফে এবং প্রয়োজনীয় মুহূর্তে রান আটকে একজন ফিল্ডার দলের জয়ের পথ সুগম করতে পারেন।

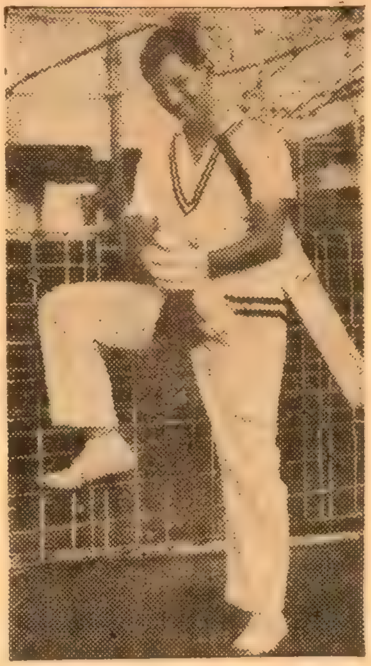

● কল্যাণ সেন

আমি যে তরুণ ক্রিকেট খেলোয়াড়টির কথা বলতে যাচ্ছি, তাঁকে বর্তমানে বাংলা ক্রিকেটের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফিল্ডার বলে অনায়াসে অভিহিত করা যায়। সবচেয়ে মজার কথা যে, ইনি ডান হাত এবং বাঁ হাতে সমানভাবে ব্যাট করতে পারেন, বল করতে পারেন এবং ফিল্ডিং করতে পারেন। খেলোয়াড়টি হলেন কালীঘাট ক্লাবের কল্যাণ সেন।

কল্যাণ ১৯৪৫ সালে কলকাতাতে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি ক্রিকেটের প্রতি একটা বিরাট আকর্ষণ অনুভব করে এসেছেন। পাড়ার রাস্তায় ব্যাট-বল পিটিয়েই তাঁর ক্রিকেট খেলা সুরু। ১৯৬০ সালে প্রথম ডিভিশন ক্লাব মিলনসমিতির নেটে অনুশীলনের সুযোগ পান। ঠিক এই সময়ই তিনি আবার প্রবীণ খেলোয়াড় কার্তিক বোসের সংস্পর্শে আসেন। কার্তিক বোসের কাছে তিনি ক্রিকেটের অনেককিছু শিক্ষা লাভ করেন। কল্যাণের সত্যিকারের ক্রিকেটের হাতেখড়ি বলতে গেলে এই কার্তিক বোসের কাছেই। ১৯৬১-৬২ সালে পূর্বাঞ্চল স্কুল ক্রিকেটে আসামে বাংলা স্কুল-দলের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পান। কিন্তু আশ্চর্য, স্কুল-জীবনে তীর্থপতি স্কুলের পক্ষে খেলার সুযোগ তাঁর হয় নি।

১৯৬২ সালে তীর্থপতি স্কুল থেকে স্কুলফাইন্যাল পাশ করে এলেন আশুতোষ কলেজে। ১৯৬২-৬৩ সালে কলকাতায় এবং ১৯৬৩-৬৪ সালে বেনারস এবং দিল্লীতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দলে স্থান পান। মিলনসমিতিতে ১৯৬০ সাল থেকে এ-বছর পর্যন্ত থাকার পর এবার কালীঘাটে এসে যোগ দিয়েছেন। যে খেলোয়াড়ী-জীবনে তিনি পিতা শ্রীনারায়ণচন্দ্র সেন এবং মিলনসমিতির শ্রীরবীন্দ্রলাল সাহা এবং শ্রীরঞ্জিত চ্যাটার্জীর কাছ থেকে উৎসাহ এবং সাহায্য পেয়েছেন। এবার দলীপ ট্রফির পূর্বাঞ্চল দলের নেটে স্থান পেয়েছিলেন। রঞ্জী ট্রফিতে বিহারের বিপক্ষে দ্বাদশ খেলোয়াড় মনোনীত হয়েছিলেন এবং এবার রঞ্জী ট্রফিতে বাংলা দলের পক্ষে গৌহাটিতে গিয়েছেন। আশা করি কল্যাণ সেনের মত তরুণ খেলোয়াড়রা বাংলার গৌরব বৃদ্ধি করতে পারবেন ভবিষ্যতে।

সমাচার দর্পণ

এবার আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস অনুষ্ঠিত হয়েছে রাজস্থানের জয়পুরে। সিংহল বিশ্ববিদ্যালয় সহ ভারতের ৪২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৬০০ প্রতিযোগী এবার স্পোর্টস-এ অংশগ্রহণ করেছে।

• • •

বোম্বাইয়ের রোভার্স কাপের খেলা সুরু হয়েছে। এ মাসের মাঝামাঝি সময়ের পর থেকে কলকাতার দলগুলিকে রোভার্সের আসরে অবতীর্ণ হতে দেখা যাবে।

• • •

জোহান্সবার্গে অনুষ্ঠিত ইংলণ্ড-দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় টেস্ট অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতী

দুর্গাপুরে কংগ্রেসের বিষয় নির্বাচনী সমিতির বৈঠকে আলোচনারত শ্রীকামরাজ নাদার, শ্রীসাদিক ও শ্রীশাস্ত্রী।

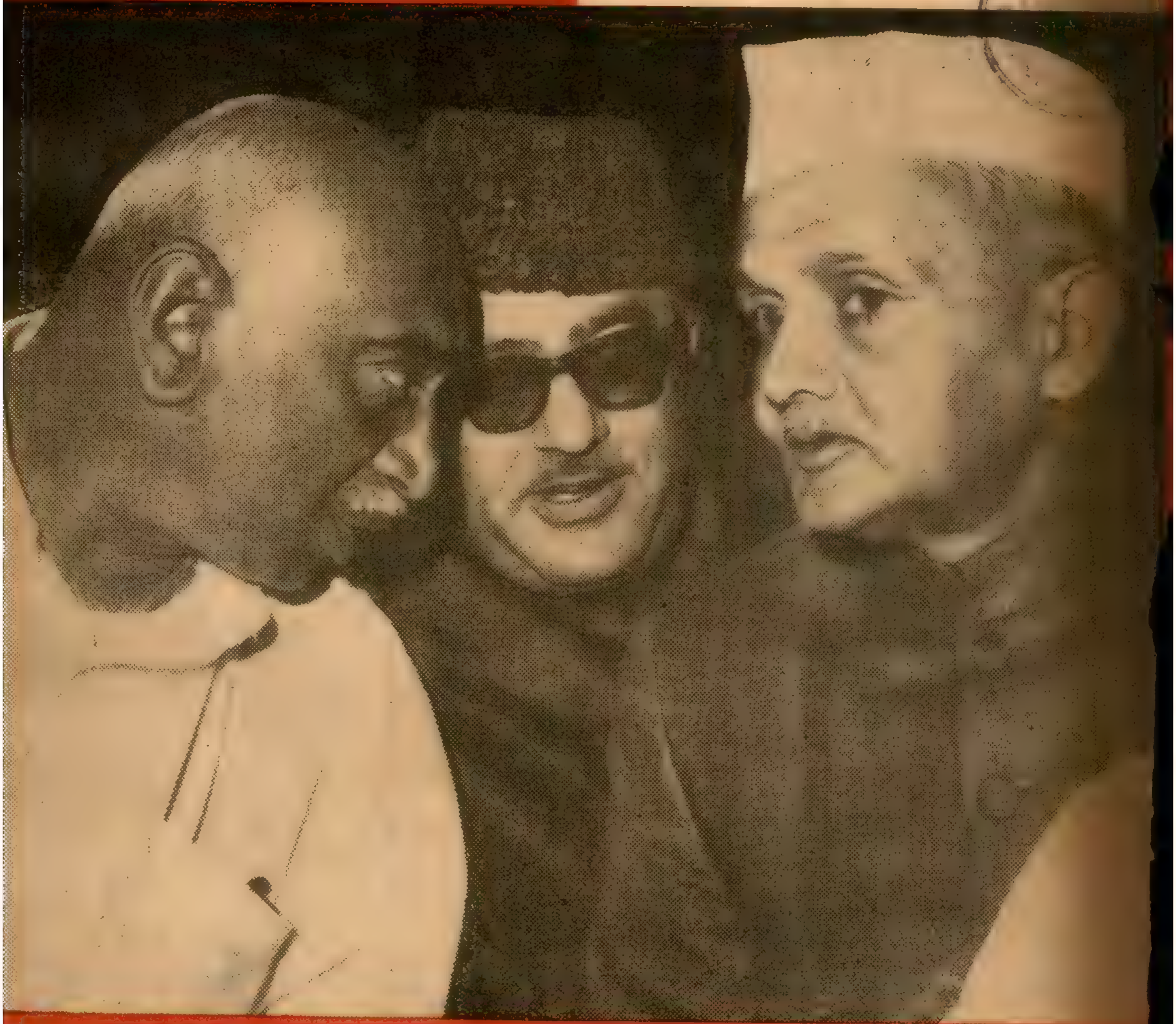

র্ষ, ৩৩শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৩০শে পৌষ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ • 14th January, 1965 • Vol. 69, No.

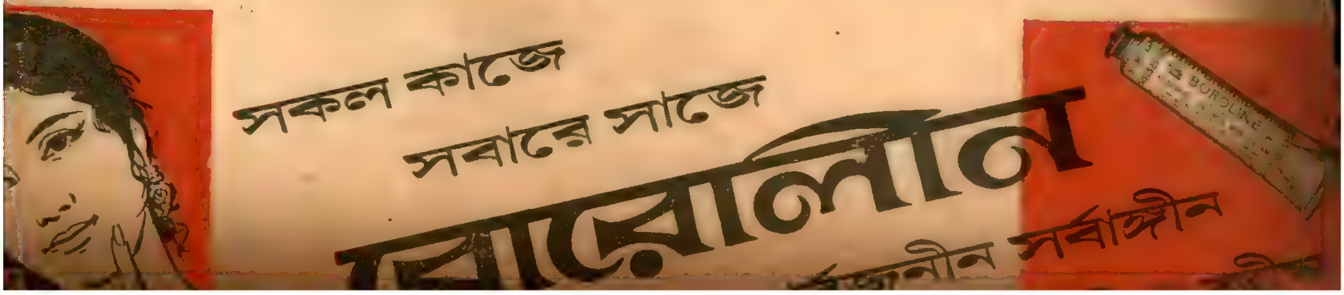

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	২০৫১
আজকের মানুষ	...	২০৫২
সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর	হরপ্রসাদ মিত্র	২০৫৩
জানলা বেয়ে সকাল (কবিতা)	দুর্গাদাস সরকার	২০৫৬
টি, এস, এলিঅট প্রসঙ্গে	..	২০৫৭
ক্রন্দসী কুমারী (কবিতা)	অক্ষয়কুমার চন্দ্র	২০৫৭
ভারতদর্শন	...	২০৫৮
আন্তর্জাতিক	...	২০৬১
অদ্বিতীয়া (ধারাবাহিক উপন্যাস)	সুশীল রায়	২০৬৬
ছায়াবৃতা (কবিতা)	অনিলেন্দু ভট্টাচার্য	২০৬৯
কোন প্রাচীনের খেদ (কবিতা)	কমলেশ চক্রবর্তী	২০৬৯

W. H. Harton & Co. Ltd.

Rope Manufacturers

Since 1780

Head Office **: 8, Dalhousie Sq. East, CALCUTTA.**

Telegrams : "HARTONCO." CALCUTTA. Telephone : Office : 22-2878 ; Works : 66-2011

We specialize in 'Ropes' and 'lines' of all descriptions, viz :—

- **Manila Ropes**
- **Sisal Ropes**
- **Hemp Ropes**
- **Coir Ropes**
- **Jute Ropes**
- **Cotton Ropes**
- **Loglines**
- **Pilot Lead Lines**
- **Marlines**
- **Seizing Lines**
- **Spun Yarns**
- **Oakums**
- **Heald Cords**
- **Whip Cords**
- **Temperband Cords**
- **Dobby Twines**
- **Coir Fenders**
- **Bore Springs**

Cordage Hawsers of any size up to 48" circumference.

Registered contractors and regular suppliers to Governmemt, Port Trusts, Railways, Mills, Mercantile Firms, Shipping and Engineering Workshops, Harbour and Dock Yards, etc.

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বঙ্গদর্শন	...	২০৭০
শিলালেখ (গল্প)	কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়	২০৭৫
আঁধারমাণিক (ধারাবাহিক উপন্যাস)	মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	২০৮১
ডিটেকটিভ সবাই হতে পারে (গোয়েন্দা-গল্প)	পরিমল গোস্বামী	২০৮৫
শহর কলকাতা	শ্রীপদাতিক	২০৮৯
হত্যা ঘৃণা ভয় (কবিতা)	বীরেন্দ্রনাথ সরকার	২০৯২
হে প্রহরী (কবিতা)	মৃত্যুঞ্জয় সেন	২০৯২
আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব		২০৯৩
চলচ্চিত্র সেন্সর	পি ভি রাজমান্নার	২০৯৬
সোনার ময়ূর	সরোজ সেনগুপ্ত	২০৯৯
দশকের দৃষ্টি	কল্পতরু সেনগুপ্ত	২১০২
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	শিলাদি	২১০৫
খেলাধূলা	শ্রীঅমিতাভ	২১১০

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠ্যপুস্তক)

মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার চণ্ডীর কাহিনী বাঙালার বিশিষ্ট জাতীয় জীবনের কাহিনী। তাঁহার কাব্যে পাই মধ্যযুগের বাঙালার নিখুঁত সমাজের সুস্পষ্ট আলেখ্য। শাসক সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্য্যাতিত বাস্তুচ্যুত মুকুন্দরাম দুঃখ ও বেদনাক্লিষ্ট বাঙালার প্রতিনিধি কবি—ব্যক্তির দুঃখ কি করিয়া সর্বজনের দুঃখ হইতে পারে বাঙালা সাহিত্যে তাহা মুকুন্দরামই সর্ব্বপ্রথম দেখাইয়াছেন। এই হিসাবে তিনি আধুনিক বাঙালার রোমান্টিক সাহিত্যসাধনার অগ্রদূত।

—বর্ত্তমান গ্রন্থে আছে—

১। মূল কাব্য, ২। সুবিস্তৃত ভূমিকা, ৩। কবির জীবনী, ৪। কাব্য-পরিচিতি, ৫। কবিকঙ্কণ যুগের বঙ্গভাষা (ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত), ৬। বিস্তৃত কাব্য সমালোচনা এবং ৭। অপ্রচলিত শব্দের অর্থ।

মূল্য সাড়ে চার টাকা

নীহাররঞ্জন গুপ্তের গ্রন্থাবলী

মূল্য সাড়ে তিন টাকা

কালো ভ্রমরের চমকপ্রদ বিস্ময়কর কাহিনীর মধ্য দিয়ে বিদেশী গোয়েন্দা-সাহিত্যের শার্লক হোমসের মত বুদ্ধিদীপ্ত কিরীটি রায়ের আবির্ভাব।

বাংলার মিস্ট্রী সাহিত্যে

ডাঃ নীহাররঞ্জনের দান অপূর্ব্ব

—তেরখানি নির্বাচিত রচনা—

কালো ভ্রমর, করেছে যা মরেছে, রক্তহীরা রক্তমুখী নীলা, পদ্মদহের পিশাচ, পঞ্চমুখী হীরা, রক্তগেরুয়া, ঘুম, কালচক্র, কবর, পাথরের চোখ, সর্প, অঙ্গুরীয়, প্রণাম জানাই

প্রতিষ্ঠাবান নাট্যকার ও প্রবীণ সাহিত্যিক

স্ব. মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মণিলাল গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—৬খানি রচনা ৩৩০ পৃঃ—৩

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা -১২

৩১ বর্ষ, ৩৩শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ প: | 25 Paise
বৃহস্পতিবার, ৩০শে পৌষ ১৩৭১ | Thursday, 14th January 1965

তৃতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

ভারতে অনুষ্ঠিত তৃতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। এর আগে দু'বার যে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার উদ্দেশ্য ছিল সৌভ্রাত্রমূলক। স্বভাবতই ঐ দুটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চলচ্চিত্রের ভাল-মন্দের বিচার প্রাধান্য লাভ করে নি। কিন্তু তৃতীয়বারের উৎসবটি প্রতিযোগিতামূলক হওয়ায় একদিকে যেমন ভারতের সঙ্গে উৎসবে যোগদানকারী অন্যান্য দেশের সংস্কৃতির আদান-প্রদান ঘনিষ্ঠতর হবে, তেমনি শিল্পী ও কলাকুশলীরা একত্র মিলিত হয়ে নিজেদের ভাব বিনিময় করতে পারবেন। কোনো দেশের আচার-ব্যবহার, জীবনপ্রণালী জানার পক্ষে সৎ চলচ্চিত্রের অবদান বর্তমান যুগে প্রধানভাবে স্বীকার্য। ঐ জানার দ্বারা যে নিজেদেরও তুলনা-মূলকভাবে পারস্পরিক চলচ্চিত্রের সাহায্যে জানা যায়, তা বলাই বাহুল্য। তা ছাড়া সার্থক পরিচালকের হাতে চলচ্চিত্রেও একটা বিশ্বজনীন রূপ ফুটে ওঠে। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে যে অনুষ্ঠান সুরু হয়েছে তদ্দ্বারা ঐ আদর্শ ত' ফুটে উঠবেই, অপরপক্ষে চিত্র-স্রষ্টাগণ পরস্পর সান্নিধ্য অনুভব করবেন এবং সচেতন হবেন।

এদেশে চলচ্চিত্রের উন্নতির জন্য সরকার রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত যেভাবে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে, তদ্দ্বারা সন্তুষ্ট হওয়া সম্ভব হয় নি। কারণ, সরকার সব সময় উদ্দেশ্য প্রণোদিত ছবির প্রতি উদার ব্যবহার করেছেন বললে অন্যায় কথা বলা হয় না। সরকার স্বয়ং অস্বীকার করতে পারবেন না যে, 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত'-এর মতো চিত্র প্রথমে তাঁদের রসদৃষ্টি আহরণ করতে পারে নি। অথচ যেসব ছবি আর্টের বিচারে অনেক নিচুমানের, সেইসব ছবি সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে ধন্য হয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক উৎসবের ক্ষেত্রে ভারতে নির্মিত চলচ্চিত্রের মান সম্বন্ধে সরকার সজাগ হবার সুযোগ পাবেন বলে আমরা মনে করি।

অবশ্য আমাদের সরকার স্বয়ং সোৎসাহে এই উৎসবের আয়োজন করেছেন, সুতরাং গতানুগতিক তার পথ ছেড়ে চলচ্চিত্রশিল্পের উন্নয়নে সরকার ইচ্ছুক, আমরা একথা নিঃসংশয়ে মেনে নিতে পারি।

তাই এই উৎসব উপলক্ষে আমরা আশা করবো—সরকার এমন ব্যবস্থা করুন, যাতে আমন্ত্রিত বিদেশী অতিথিবৃন্দ ছবি দেখার পর এদেশের 'স্টুডিও'র পরিবেশ সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন। এক্ষেত্রেও তাঁদের সংগঠনমূলক সমালোচনা আমাদের হিতসাধনই করবে। তা ছাড়া প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে আগত সমস্ত ছবি পরিচালক, কলাকুশলী ও শিল্পীদের দেখাবার ব্যবস্থা থাকা উচিত। দুঃখের ব্যাপার এই যে, এদেশের অধিকাংশ ছবির মান অত্যন্ত নিচু। সেই কারণে এইসব ছবি দেখার পর তাঁরা সিনেমা-শিল্পের কঠিন সাধনায় নিজেদের প্রয়োগ করতে পারবেন বলে আমরা আশা করি এবং এ ব্যাপারে সম্ভব হলেই ভারতের এই উৎসব অধিকতর সার্থক হয়ে উঠবে।

সম্পাদকীয়

আজকের —— মানুষ

সেদিন সম্ভবত দেশ-জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রায় প্রতিটি গণতন্ত্র-প্রেমী মানুষই উৎকণ্ঠে প্রহর গুণছিল। সাগ্রহপ্রতীক্ষা ছিল এক যুগান্তকারী নাটক দেখবার। কিন্তু অদৃষ্টে জুটল প্রহসন। সবাই দেখেছে : চণ্ডনিপীড়ন প্রতিহত করতে গিয়ে কেমন করে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল একটা ইস্পাত-কঠিন তলোয়ার। ছিঁড়ে গেল গণতন্ত্রের স্বপ্নগ্রন্থনা। পরিশেষে উৎসব হ'ল আগুন জ্বালিয়ে, নির্লজ্জ বুলেটের শব্দে, অনেক নিরীহ প্রাণের মূল্যে। ইতিহাসের পৃষ্ঠা যেন ইতিমধ্যেই পিছনের দিকে উল্টে গেল কয়েক শতাব্দী। কালের লিপিকার বিস্মৃতির ধুলো ঝেড়ে চেঙ্গিস, তৈমুরের পাশে আরও একটি নাম লিখলেন। ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খানের নাম। পাকিস্তানের নবনির্বাচিত (?) রাষ্ট্রপতি।

ইস্কান্দার মির্জাকে অপসৃত করে আয়ুব প্রথম যখন পাকিস্তানের শাসন-দায়িত্ব নিয়েছিলেন—সে ছিল তাঁর অভ্যুত্থান। আজ তিনি প্রতিষ্ঠিত। সেদিন শিশু-পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও বিক্ষুব্ধতার দিনে তাঁর আসন ছিল আশার, শুভেচ্ছার। আজ সেই আসনই যখন সাংবিধানিক (?) কার্যক্রমে আরও দৃঢ় হল,—সম্ভবত ধিক্কার আর অভিশাপ ছাড়া আর কিছুই রইল না।

রাজ্যের অরাজকতার বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছিল। সমরনায়ক আয়ুব ছিলেন তার পরিচালক। পাকিস্তানের সাংগঠনিক কাঠামো বদলে গেছে রাতারাতি। আয়ুব প্রবর্তন করলেন মার্শাল ল, ও ই, বি, ডি, ও (E, B, D, O)। একটা গোটা দেশের ভবিষ্যৎ, কোটি কোটি নাগরিকের আশা-আকাঙ্ক্ষা মুখ চেয়ে রইল একটি মানুষের। আয়ুবের ইচ্ছা-অনিচ্ছার বিরুদ্ধাচরণের নাম হ'ল দেশদ্রোহিতা। একনায়কতন্ত্রের পরাকাষ্ঠা দেখাতে কসুর করলেন না আয়ুব খান। তবু পাকিস্তানের সেদিনকার অনিশ্চিত জীবনযাত্রায় আস্থাহীন, অতিষ্ঠ পাকিস্তানবাসী তাঁর কথাই মেনেছিল। এমন কি অনেক আশাও ছিল তাঁকে ঘিরে। সাময়িকভাবে সে আশার অনেকটাই সেদিন পূর্ণ করেছিলেন আয়ুব। পাকিস্তানের অস্থির-শৈশবে তাঁর অনড় শাসনদণ্ড অনেক অবাঞ্ছিত প্রতিকূলতাকে সংহার করে অভিনন্দিত হ'য়েছিল। পাকিস্তানের প্রসাশনিক রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে তার আন্তর্জাতিক গুরুত্ব বৃদ্ধিতেও আয়ুবের অবদান ছিল সুস্পষ্ট।

কিন্তু ঠিক এর পরেই তিনি সংযম হারালেন। তাঁর আত্মলিপ্স জঙ্গীবাদী মন ক্রমশ হিংস্র হ'য়ে উঠে আত্মপ্রকাশ করল নগ্নভাবে। তাঁর শাসনের নামে স্বৈরতন্ত্রের তাণ্ডবে চমকে উঠল সারা দুনিয়া। আয়ুবের হঠকারিতায় পাকিস্তান হারালো পাশ্চাত্যের সহানুভূতি (আংশিকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া)। সোভিয়েট রাশিয়াকে করল বিমুখ। এমন কি ভারতের মত দরদী প্রতিবেশী বন্ধুরাষ্ট্রের মর্যাদা হানি করতেও কুণ্ঠিত হ'ল না। শেষ পর্যন্ত (আত্মহত্যার সামিল) হাত মেলাল চীনের সঙ্গে যারা, কনফুসিয়াস, বুদ্ধের আদর্শচ্যুত হ'য়ে আজ একদা বিশ্বত্রাস চেঙ্গিস খানের উপাসক।

মৌলিক গণতন্ত্রের নামে এক হাস্যকর পরিস্থিতিতে আয়ুব পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান মিলিয়ে মাত্র আশি হাজার ভোটদাতার মধ্যে সর্বোচ্চ প্রায় ছেচল্লিশ হাজার ভোট পেয়ে সাংবিধানিক (?) ভাবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়ক নির্বাচিত হ'য়েছেন। কায়েদ-ই-আজম জিন্নার বড় সাধের পাকিস্তান হ'য়ে উঠেছে স্বেচ্ছাচারী আয়ুবের খুশির পুতুল। গণতন্ত্র বিপুল উৎসর্গীকৃত প্রাণ জিন্না ভগ্নী মাদার-ই-মিল্লাত ফতিমা তাঁর মহৎ সংগ্রামে হেরে গেলেন। আপাতবিচারে এ পরিস্থিতি নৈরাশ্যজনক হলেও, ইতিহাস উত্তরকালের সাফল্য নির্দেশ করছে ফতিমা জিন্নার অনুকূলেই। সেদিন তিনি হয়ত নাও থাকতে পারেন। কিন্তু তাঁর প্রজ্জ্বলিত সংকল্পের শিখা থাকবে অনির্বাণ। কিন্তু মার্শাল আ ব যে নিজের গোরস্থান নিজেরই অজ্ঞাতে

আয়ুব খান

খনন করতে সুরু করেছেন এ দৃশ্য অন্তত তিনি দেখে যাবে। আয়ুবের এ পরিণতি ঐতিহাসিক বিধান। কেন না Pow corupts Partial power corupts partiall absolute power corupts absolutely,—এ ক সর্বকালীন, প্রমাণ নিরপেক্ষ সত্য। বস্তুত ক্ষমতা অর্জ শেষ সুযোগটুকুও আয়ুব নিয়েছেন এবং তার যথে অপব্যবহারও করেছেন অকুণ্ঠচিত্তে। তাই অবশ্যম্ভা পরিণতির কথা সুস্থভাবে চিন্তা করে আয়ুব খানের এ আত্মসম্বরণ ও চরিত্রসংশোধনের দিন।—(যদিও সে চে সময়ও বয়ে গিয়েছে অনেকটাই)—তাঁকে আজ স্বেচ্ছা যাত্মক যাত্রার লাগাম টেনে ধরতেই হ'বে।

সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর

—হরপ্রসাদ মিত্র—

কাফুর এই গল্পে শিল্পীর আকর্ষণের যে বেদনা বেজেছে, জীবনের আসল রসই তাই। মহাভারতে বিদুরের ঐ কথাগুলিতেযেন সেই কথাই অন্যভাবে উচ্চারিত। ওসব চিরকালের আদিকথা। ওই সে সুর বারবার আমাদের কানে আসে।

ন্যাচারালিজম্, ইম্প্রেশনিজম্, এক্স্প্রেশনিজম্ ইত্যাদি শিল্পভঙ্গির ঢেউ ভাঙতে-ভাঙতে মানুষের অনুভূতির ধারা বয়ে চলেছে। সেই নদীর এ-ঘাটে হয়তো আমরা আছি, ও-ঘাটে হয়তো অন্যেরা। এইরকম কত্তোবারই হয়েছে, চিরকালই ঘটছে।

দক্ষিণেশ্বরে মায়ের মন্দিরের ঘাটে বসেছিলুম একদিন। বিকেলের আলো পড়েছিল মন্দিরের চূড়ায়। নিচে সমস্ত পৃথিবীর ওপর অন্ধকার নেমে আসছে তখন। নদীতে খেয়া-পারাপার চলছেই। ফুল মিষ্টি পুজোর উপচারের দোকানে কেনা-বেচা বন্ধ ছিল না। কতো লোক আসছে, যাচ্ছে। তারই মধ্যে ক'টি ছেলেমেয়ে এলো। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে তারা এক মাঝির সঙ্গে নৌকো ভাড়া নেবার জন্যে দরদস্তুর আরম্ভ করলো। বোঝা গেল যে, বেড়াতে বেরিয়েছে। বেড়িয়ে বাড়ি ফিরবে।

তাদের পাশ দিয়ে জরাজীর্ণ একটি বুড়িকে উঠে যেতে দেখলুম।

তাকে ওরা দেখতেই পেল না।

আমি শুনলুম, বৃদ্ধা 'মা' 'মা' বলছে। তার গলার স্বর ক্ষীণ। শুনলুম সে কাঁদতে কাঁদতে জগত্তারিণী মাকে ডাকছে।

এদিকে, সোনা-রূপোর গয়না-গাটির বাক্সকে বিজ্ঞাপন ঝুলছিল ঘাটের দেয়ালে।

সিঁড়িতে জলের শব্দ।

পৃথিবীতে একই দেশে একই কালে বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। সেই নদীর ঘাটে সেই ছেলেমেয়েদের কথা শুনতে-শুনতে,—সেই বৃদ্ধার কথা ভাবতে-ভাবতে,—সেই সোনা-রূপোর বিজ্ঞাপন দেখতে-দেখতে যেন পাশাপাশি দুটি ঢেউয়ের মতন দুজন সাহিত্যিকের দুটি উক্তির নির্যাস একবার আমার মন ছুঁয়ে গেল। তার মধ্যে প্রথমটি আমার তৎক্ষণেই কিঞ্চিৎ অবান্তর বলে মনে হয়েছিল। সে-কথা সেদিন কেন যে সেই দৃশ্যের মধ্যে মনে জেগেছিল, জানি না। মন এইভাবেই কখনো-কখনো ভারি অবান্তর, অসম্পৃক্ত সব ঘটনার স্মৃতি জাগিয়ে তোলে। পাঠকরা আমাকে মার্জনা করবেন,—আগে সেই ছবিটিই স্মরণ করি।

ভার্জিনিয়া উল্ফের একটি প্রবন্ধে পড়েছিলুম—জীবনে এবং সাহিত্যে স্ত্রী-পুরুষের সহ-অবস্থানের আদর্শের দিকটি ভাবতে-ভাবতে তিনি কোলরিজের নাম করে বলেছিলেন যে, সত্যিকার বড়ো মনের একটি লক্ষণ এই যে, তা একাধারে স্ত্রীও বটে, পুরুষও বটে—'a great mind is androgynous'। বলেছিলেন—একজন লেখিকা যখন লেখেন, তখন তিনি তাঁর মায়ের মন দিয়ে ভাবেন। বলেছিলেন—মন এক-এক ক্ষণে এক-এক বিষয়ে নিরত। কেবলই মনের অবস্থান বদলে যায়, তার লক্ষ্যবিন্দুর পরিবর্তন হয়।

এইরকম ভাবনার স্রোতে নেমে গিয়েই ভার্জিনিয়া উল্ফ্ তাঁর সেই প্রবন্ধে লিখেছিলেন—স্ত্রী-পুরুষ এক যুগলকে সেদিন ট্যাক্সিতে উঠতে দেখে মনে হোলো—যেন আগে তারা বিচ্ছিন্ন হয়েছিল, এখন আবার দুটি সত্তা পরস্পরের সংলগ্ন হোলো। সেই দৃশ্য দেখে আমার মন জুড়োলো।

সেই ব্যক্তিগত তৃপ্তির কথা জানিয়েও তিনি লেখেন যে, মানুষের এই এক গভীর সংস্কার যে, মানুষ ভাবে—স্ত্রী-পুরুষের এই মিলনই ওদের চূড়ান্ত সুখের শর্ত। বলেছেন—এই অনুভূতি সত্ত্বেও আমি নিজেকে জিগেস করলুম যে, দেহে যেমন, মনেও কি তেমনি স্ত্রীলোক আর পুরুষের মধ্যে ভেদ আছে। পূর্ণ সুখের জন্যে তাদের মধ্যে মিলন ঘটা কি নিতান্তই দরকার?

এ-সবই খেয়ালের খেলা। ভার্জিনিয়া উল্ফ্ তাঁর সেই প্রবন্ধে এই খেয়ালের স্রোতের মধ্যেই নিজের প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেছেন। লিখেছেন—কোলরিজের নাম করে বলতে চাই—বড়ো মনের লক্ষণ এই যে, তা একাধারে স্ত্রীও বটে, পুরুষও বটে। অর্থাৎ? অর্থাৎ—সে মন 'resonant' এবং 'porous'। তাতে স্পন্দনেরও সুযোগ আছে, কল্পনারও অবকাশ আছে।

সেদিন দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে বসে সেই বিকেলের আলোয় আমি কোনো স্ত্রী-পুরুষের ট্যাক্সিতে ওঠবার দৃশ্য ভাবি নি, তবু ভার্জিনিয়া উল্ফের এই আলোচনার স্মৃতি আমার মনে দেখা দেয়। এটি সেই প্রথম ঢেউ, যেটিকে একটু আগেই আমি কিঞ্চিৎ অবান্তর, বলতে বাধ্য হয়েছি।

দ্বিতীয় ঢেউটি আসে এই প্রথম ঢেউয়ের গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে। সেটি কবি রিল্কের সঙ্গে জড়িত। 'ইম্যাজিনেশন' বা কবি-কল্পনার প্রকৃতি সম্বন্ধে রিল্কে বিশ্বাস করতেন যে, সে হোলো আমাদের-

বিস্মৃত অতীতের স্মৃতি,—আমাদের গভীর সেই ধারণাশক্তি যাতে সমর ঐতিহ্যের স্ফুলিকণা বিধৃত আছে।

প্রথম দৃষ্টিতে, সেদিনকার এ-চিন্তা কেমন যেন আকস্মিক মনে হয়েছিল বটে, কিন্তু একটু পরেই আমি অনুভব করেছিলুম যে, সেদিন সেই দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে বসে দেখা—মানুষের নানামুখী মনোগতির একটা ব্যাখ্যা যোগাতে গিয়েই আমার মন পাশাপাশি এই দুটি প্রসঙ্গের স্মৃতিনির্যাস আমাকে উপহার দিয়েছিল।

আমি নিজেই সেই অনুচ্চারিত ব্যাখ্যা বুঝতে পেরেছিলুম। লিখতে গেলে সেটা এইরকম দাঁড়াবে যে, জগতে কিছুই সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে দেখবার নয়। স্ত্রীলোক হোক, পুরুষ হোক,—কাঁদতে-কাঁদতে মন্দিরের দিকে যাওয়াই হোক্, আর হাসতে-হাসতে মন্দিরের বাইরে আসাই হোক,—বিষয়বুদ্ধির ঝক্‌মকে বিজ্ঞাপন হোক, অথবা সংসারের দিনান্তসমাগমের অন্ধকার হোক্,—সবই সহাবস্থানের রূপ। এ জীবন অদ্ভুত ভ্রমণ।

রিল্‌কের ইম্যাজিনেশন—ধারণার সঙ্গে ম্যাথু আর্নল্ডের পার্থক্য কোথায়, সে-বিষয়ে সমালোচকদের চুল-চেরা আলোচনার পাহাড় মনে জেগেছিল। সেই বিচার-বিতর্কের সব কথা মনে ছিল না,—হয়তো ঠিক বুঝি নি সে-সব তুলনা। ১৯২৯এ আই এ রিচার্ডস্‌ বলেছিলেন যে, আধুনিক কাব্য বিশ্বাস থেকে বিমুক্ত; আর রিল্‌কে বলেছিলেন যে, আধুনিক কবিতার কোনো 'ডগ্‌মার' দায় নেই। মনে পড়েছিল যে, এই দুটি ক্ষেত্রের মধ্যে সমালোচক কোনো সংযোগের ভূমি খোঁজেন নি,—বলেছেন এ দুটি পৃথক ভূমি। য়েট্‌স্‌ আর লরেন্স অসম্ভব ব্যাপারে বিশ্বাস করতেন বলেই রিচার্ডস্‌ তাঁদের কটাক্ষ করে গেছেন। আর, প্রাক্তন বিশ্বাসের বাইরে দাঁড়িয়ে টি এস এলিয়ট তাঁর 'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' লিখেছিলেন বলে রিচার্ডস্‌ তাঁকে অভিনন্দিত করে গেছেন। রিচার্ডস্‌ যেমন বলেছেন, এলিয়টও তেমনি লরেন্সের সঙ্গে মেলেন নি। তবু, গভীরে মিল ছিল এঁদের প্রত্যেকের মধ্যে। সেই মিলের তত্ত্ব সোজাসুজি সূত্র বেঁধে ব্যাখ্যা করা শক্ত কাজ। সেটা অনুভূতির গোচর। সেদিন দক্ষিণেশ্বরে হঠাৎ ঘাটের ঘণ্টা বেজে উঠতেই সেদিক থেকে আমার মন সরে গিয়েছিল। সূত্র বাঁধবার চেষ্টা করি নি। কিন্তু উঠেও পড়ি নি। মনকে দায়হীন ভ্রমণের সুযোগ দিয়েছিলুম।

কখনো-কখনো আচম্বিতে মন এক ভূমি থেকে অন্য ভূমিতে যেতে চায়। কিন্তু পুরোপুরি ভূমি ত্যাগ করতে পারে কই? পূর্বাপর সংগতি বজায় থাকে ঠিকই। মাঝে মাঝে উল্লম্ফন ঘটে বটে। সেই উল্লম্ফনে তাকে বাধা দেবো না,—এই সংকল্প মেনেই সাহিত্যের এই দেশ-দেশান্তর ভ্রমণে বেরিয়েছি। তাই, অতঃপর যা মনে এসেছিল, আজ তাই লিখছি।

১৯২৯ থেকে বারো বছর পেছিয়ে দাঁড়ালো মন। ১৯১৭। সে বছর টি ই হিউম মারা যান, আর এলিয়টের বিখ্যাত প্রুফ্রক বই হয়ে বেরোয়। তার পরের বছর,—১৯১৮তে প্রবীণ হপ্‌কিন্সের 'পোয়েম্‌স্‌' বেরিয়েছে। সে-দেশে তখনকার নবীন কবিরা তা থেকে গভীর উদ্দীপনা পেয়েছেন। সেই আঠারো সালেই উইলফ্রেড ওয়েন যুদ্ধে নিহত হন। প্রবীণ হার্ডির কিছু কিছু কবিতাও তখনকার লেখক, পাঠক উভয় পক্ষেরই তারিফ পেয়েছে। ডি এচ্‌ লরেন্সের বয়স তখন তিরিশের কোঠায়। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণবুদ্ধির পথে তাঁর অভিরুচি নেই,—জান্তব-প্রাণশক্তিতে আর নর-নারীর জৈব আকর্ষণে আগ্রহ তাঁর। তিনি যে মন্ত্রে বিশ্বাসী, তাকে বলা যায় জৈব মন্ত্র,—ইংরেজিতে কেউ কেউ লিখেছেন 'Vitalist Gospel'।

সেকালের সেই প্রাণতরঙ্গিণীর সেইসব ঢেউ কোথায় গেল? হয়তো, কিছুই হারায় না। কিন্তু কিছু তো যায়ই। মনে পড়লো ১৯২২-এর দুটি ঘটনা। সে-বছর 'ইউলিসিস' বেরিয়েছে। 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' বেরিয়েছে। ঐ সময়েই সার হার্বার্ট গ্রিয়ার্সন সপ্তদশ শতকের মেটাফিজিকাল কবিদের বিষয়ে লেখেন। ১৯২১এ তাঁর বই বেরোয়। পৃথিবীর কাব্যানুরাগীর দল কবি ডান সম্বন্ধে সচেতন হবার সুযোগ পান সেই গ্রিয়ার্সন সাহেবের প্রসাদে। ১৯২০তে বেরিয়েছে এলিয়টের প্রবন্ধমালা—'দি সেক্রেড্‌ উড'। ১৯২২ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত তাঁর সম্পাদনায় বেরিয়েছে সাহিত্যপত্র 'দি ক্রাইটিরিয়ন'। আরো পরে, ডক্টর এফ আর লিভিসের সম্পাদনায় দেখা দিয়েছে 'স্ক্রুটিনি'। সেসব সমালোচনার রীতি ছিল বিশ্লেষণ-সতর্ক,—রোমাণ্টিক-বিরোধী।

সেই কুড়ির দশকে ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌ যখন একটি বক্তৃতার জন্যে মহিলা-কথাসাহিত্যিকের নানা সমস্যার কথা ভাবছিলেন, তখন তাঁর মনে হয়েছিল যে, সে-বিষয়ে তাঁর নিজের বিশেষভাবে একটি গৌণ কথাই বলবার ছিল,—সেটি এই যে, গল্প-উপন্যাস লিখবেন যেসব মহিলা, তাঁদের এই একটি দাবি অনিবার্য যে, লেখিকার নিজের একটি ঘর থাকা চাই—এবং কিছু টাকা। 'All I could do was to offer you an opinion upon one minor point—a woman must have money and a room of her own if she is to write fiction.'

এই অতিশয়-সংগত, স্বাভাবিক সাহিত্যিক দাবির সমকালেই প্রবীণ য়েট্‌স্‌ ছিলেন প্রির্যাফেলাইট গোষ্ঠীর ভাবশিষ্য—এক অদ্ভুত মানুষ তিনি। আয়ার্লাণ্ডের রূপকথা আর লোক-সাহিত্যের নানা চরিত্র তাঁর মাথায়

● টি এস এলিয়ট

তা। সেইসব ভাবুকুহেলিকার মধ্য
ই তিনি নাকি তখনকার
নিকতায় পেঁ ৗচেছিলেন। ১৯২৮এ
'দি টাওয়ার' বেরোয়,---
১৩এ 'দি ওয়াইণ্ডিং স্টেয়ার'।
া যায়, ডারুইন আর টিণ্ডালের
ানে তাঁর ধর্মবিশ্বাস নাকি বড়োই
পায়।

ইংরেজি সাহিত্যধারার সেই একই
এজ্‌রা পাউণ্ডও ছিলেন। এলিয়ট
-নীভিস,---এবং আরো কেউ কেউ

যদি সেকালের রোমাণ্টিক-বিরোধীদের মধ্যে গণ্য হন, তাহলে পাউণ্ডের পরিচয় ---'romantic anti-romantic'! ভাবের দিক থেকে অংশত কবি রবার্ট ব্রাউনিঙের উত্তরাধিকারী বলা হয় তাঁকে। চীনা, ইটালীয়, প্রভেন্স-অঞ্চলের---নানা সংস্কৃতির স্মারক তিনি। ১৯২৫-এর আগেকার পাউণ্ড ছিলেন এই নানা রঙের রামধনু,—১৯২৫-এর কাছাকাছি সময় থেকে হয়তো এলিয়টের সঙ্গে তাঁর সান্নিধ্যই বেশি চোখে পড়ে,---কিন্তু, সমালোচক বলেছেন,---সম্ভবত পাউণ্ডই এলিয়টকে প্রভাবিত করেন।

এলিয়ট, পাউণ্ড, এমি লোয়েল—তিনজনেই আমেরিকার ; লুই ম্যাক্‌নিস, অডেন, স্পেণ্ডার,—তাঁদের চেয়ে বয়সে ছোটো ডাইলান টমাস এবং সে-পর্বের ইংরেজি সাহিত্যের আরো সব কবি যাঁরা বৃটিশ,—যাঁরা একই আবহাওয়ায় বাস করেছেন, একই কালের ভাবে ভাবনায় দৃশ্যে ঘ্রাণে মুগ্ধ ছিলেন,—তাঁদের সকলের সেই মিশ্র কণ্ঠস্বর কোন্ সমভূমিতে গিয়ে মিলছে? সেদিন মনে এই প্রশ্ন এলো।

মিলছে কি? মেলে কি? সকলের কথা সকলের শ্রুতিগোচর হওয়া প্রত্যাশিত কি?

ইতিমধ্যে এলিয়টের মৃত্যুসংবাদ এলো। লণ্ডন, ৫ই জানুয়ারী, ১৯৬৪ —রয়টার খবর দিচ্ছেন---ছিয়াত্তর বছর বয়সে আমেরিকার জাতক, বৃটেনের শীর্ষতম কবি---সমালোচক---নাট্যকারদের অন্যতম টি এস এলিয়ট গত রাত্রে তাঁর লণ্ডনের বাসভবনে লোকান্তরিত হয়েছেন। বিশ শতকের ইংরেজি কাব্যরীতির স্রষ্টা তিনি। ইউরোপীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যে তিনি ছিলেন গভীরভাবে নিবিষ্ট। ইংরেজি কবিতার সঞ্জীবনীর কাজ করেছে তাঁর সেই বিশিষ্ট মনন। টমাস স্টার্নস এলিয়টের সর্বাধিক পরিচিত রচনা-বলীর মধ্যে তাঁর 'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড', 'ফোর কোয়ার্টেটস', 'দি ককটেল পার্টি' এবং 'মার্ডার ইন ক্যাথেড্রাল' স্মরণীয়।

বাংলা দেশের কাগজে কাগজে তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা বেরুলো। শোক-প্রশস্তি পড়লুম। বিষ্ণু দে মশায়ের ভাষণ শুনলুম আকাশবাণীতে। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মুখ মনে পড়লো। মনে পড়লো—সমুদ্রপারে আমাদের কবি অমিয় চক্রবর্তী আছেন, বুদ্ধদেব বসু আছেন।

১৮৮৮তে আমেরিকায় সেণ্টলুই-এ এলিয়ট জন্মগ্রহণ করেন। হারভার্ড,

স্নাবোন, অক্সফোর্ডে লেখাপড়া করেছেন তিনি। ১৯১৫তে ইংলণ্ডে এসে স্থায়িভাবে বসবাস স্থুরু করেন তারপর। ১৯১৭তে বেরোয় 'দি লভ্ সঙ্ অফ জে অ্যালফ্রেড প্রুফ্রক'। ক্রী-ভর্সের সঙ্গে মাঝে মাঝে মিল ব্যবহারের রীতি ছিল তাঁর প্রথম দিকের কবিতায়। দান্তের ইনফার্নো যেমন,—এলিয়টের চিত্তগহনের ভেতর থেকে তেমনি প্রুফ্রকের অহংসত্তাটি নিজের ভাবভাবনা উচ্চারণ করেছে। প্রুফ্রক নামে উত্তীর্ণযৌবন ব্যর্থ ভদ্রলোকটির ক্লান্তি মনে এলো। বিষ্ণু দে'র ক্লান্তি মনে পড়লো,—সুধীন্দ্রনাথের লাইন মনে পড়লো—

অনের জগতে
নিজস্ব নরক মোর বাঁধ ভেঙে
ছড়ায়েছে আজ;
মানুষের মর্মে করিছে বিরাজ
সংক্রমিত নড়কের কীট;
শুকায়েছে কালস্রোত, কর্দমে মিলে
না পাদপীঠ।

দান্তে এবং এলিয়ট এবং সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেশ-দেশান্তরের, বিভিন্ন কালের একই নরক-যন্ত্রণার স্বাদ পেলো মন। মনে পড়লো সুধীন্দ্রনাথের 'নরক',—মনে পড়লো 'উটপাখি'!

লণ্ডনের কৃত্রিম জনসমাজে ক্ষুব্ধ বোধ করেছিলেন প্রুফ্রক। সেখানে তাঁর জীবনের দিনগুলি কেমন যেন বোঝা হয়ে উঠেছিল। সেখান থেকে পালাতে চেয়েছিলেন তিনি—

সেথা নয়, সেথা নয়,—
অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে।

মনে পড়লো আমাদের বাংলা কবিতায় তিরিশের দশকের শেষ আর চল্লিশের সূচনার কয়েক দিনের কথা। তখন সমর সেনের 'নাগরিক' পড়েছি বোধ হয়—

মহানগরীতে এলো বিবর্ণ দিন,
তারপর আলকাতরার মতো রাত্রি
আর দিন
সমস্তদিন ভয়ে শুনি বোলারের শব্দ,
দূরে, বহুদূরে কৃষ্ণচূড়ার লাল,
চকিত ঝলক
হাওয়ায় ভেসে আসে গলানো
পিচের গন্ধ;
মনে পড়লো তাঁর 'মহুয়ার দেশ',—
মনে পড়লো 'রোমন্থন'—
পুত্রকন্যা এখনো আঙুলে
গোণা যায়,
বয়স মাত্র পঁয়ত্রিশ,
তবু নিজেকে কতোদিনের জীর্ণ বৃদ্ধ
লাগে,---

না, না, প্রুফ্রক ঠিক এরকম জীর্ণ ছিলেন না। তিনি লণ্ডনের অধিবাসী। তাঁরও জীর্ণতা ছিল বটে। ঠিক আমাদের মতন নয়। আমাদের কবিরা আমাদের ভাষায় বলেছিলেন। কিন্তু বোধ হয়, তাঁরই নেতৃত্বে। এলিয়টের নেতৃত্ব ছড়িয়েছিল দেশে দেশে। আমরাও হঠাৎ লক্ষ্য করেছিলুম যে আমাদের অবস্থান তখন—বড়োবাজারের উপল উপকূলে—বিষ্ণুবাবুর 'টপ্পা-ঠুংরিতে'—যেখানে,—

জনগণের প্রবল স্রোত
উগারিছে ফেনা
আর বিড়ির আর সিগারেটের
আর উনুনের আর মিলের ধোঁয়া
আর পানের পিক্
আর দীর্ঘশ্বাস,
বড়োবাবুর গঞ্জনায়---

আমরা,—তাঁরা,—এরা, ওরা, সকলেই দেশে-দেশান্তরে মানুষ, অগণ্য-অসংখ্য মানুষ তখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এলিয়টের প্রুফ্রক ও ভারি ক্লান্ত মানুষ। কিন্তু জীর্ণ ছিলেন না ঠিক। তিনি একটু চায়ের পার্টির ফুর্তি খুঁজছিলেন,—'ফাঁকা লিবিডোকে এখন চালাবো কোন্ খেয়ালের বাঁকা খালে?' আমরাও প্রশ্ন শুধিয়েছিলুম নিজেদের। আমাদের বিষ্ণুবাবু লিখেছিলেন এ-কথা।

এলিয়টের মৃত্যুসংবাদ যেন সমুদ্রে গিরিপাতের নিনাদ। লেনিনের মৃত্যুসংবাদ শুনে ট্রট্স্কি ঐ উপমা ব্যবহার করেছিলেন। আজ কথাটা হঠাৎ মনে এলো। (ক্রমশঃ)

জানলা বেয়ে সকাল

দুর্গাদাস সরকার

ওরা রান্নাঘরের নিচে প্রাতঃরাশের প্লেটগুলি ঝন্ঝন্ শব্দে
সাজাচ্ছে,
আর এবড়ো-খেবড়ো রাস্তার ধার থেকে
আমি ফটকের সীমানায় হতাশায় হঠাৎ আবির্ভূত
ঝিদের মনমরা আত্মাগুলির কথা জানি।

কুয়াশার বাদামী ঢেউগুলি এক ঝাঁকুনিতে আমার কাছে
রাস্তার ওপারের শীতজর্জর মুখগুলিকে নিক্ষেপ করে দেয়,
আর কাদামাখা স্কার্টপরা এক মেয়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনে
একটি উদ্দেশ্যহীন হাসি—যা শূন্যে ভাসতে থাকে
এবং ছাদ বরাবর উঠে হারিয়ে যায়।

(T. S. Eliot-এর 'Morning at the Window' কবিতার অনুবাদ)

টি.এস. এলিঅট প্রসঙ্গে

টমাস্‌-স্টার্নস্‌ এলিঅট্‌ (১৮৮৮-১৯৬৫)—জন্ম, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সেণ্ট লুই-এ। মিসৌরী স্টেটে—শিক্ষা, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্টন কলেজে, অক্সফোর্ডে ও সোরবোয়ে। ১৯১৫ সালে ইংল্যাণ্ডে বসবাস করেন এবং ১৯২৭ সালে বৃটিশ নাগরিকত্ব লাভ করেন। হাইগেট-এ শিক্ষকতার পর লণ্ডনে লয়েডস্‌ ব্যাঙ্কের বৈদেশিক বিভাগে নিযুক্ত হন। ১৯২২ সালে তিনি তৎকালের সেরা সাহিত্য সমালোচনা পত্রিকা 'ক্রাইটেরিয়ন্‌' প্রতিষ্ঠা করেন। এবং অনতিবিলম্বে ফেবার এণ্ড ফেবার নামক প্রকাশক প্রতিষ্ঠানের অন্যতম পরিচালক নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি প্রায় আমরণ অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৯৪৮ সালে তিনি 'অর্ডার অব্‌ মেরিট' সম্মান লাভ করেন এবং ঐ সালে সমকালীন সাহিত্যে তাঁহার বিপুল প্রভাবের স্বীকৃতি হিসাবে, তাঁহাকে সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সাহিত্যিক সম্মানও তাঁর অসংখ্য। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য উপাধিতে তিনি ভূষিত হন। তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মড্‌লীন কলেজেরও ছিলেন অবৈতনিক সদস্য। ১৯২৬ সালে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লার্ক লেক্‌চারার এবং ১৯৩২-৩৩ সালে হার্ভার্ডের পরিদর্শক-অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

এলিঅটের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রুফ্রক্‌' ১৯১৭ সালে প্রকাশিত হয় এবং 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' ১৯২২ সালে। এই কাব্য দীর্ঘকাল রক্ষণশীল পাঠক ও সমালোচকগণের তীব্র আক্রমণের বিষয়বস্তু ছিল। 'সংগৃহীত কবিতাবলী (১৯০৯-৩৫)তে প্রথম দুইখানি কাব্য, 'অ্যাশ ওয়েন্সডে' ও ১৯৩৫ সালের আগে লেখা ছোট কবিতাগুলি বিবৃত হয়েছে। 'ফোর কোয়ার্টেটস্‌'—প্রথমাংশ, 'বার্ণ্ট নর্টন' সংগৃহীত কবিতাবলীতে বের হয়, অন্যান্য অংশ স্বতন্ত্র আকারে ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত হয়। পাঁচখানি নাট্যকাব্য—'মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রাল' (১৯৩৫), 'ফ্যামিলি রিয়ুনিয়ন্‌' (১৯৩৯), 'ককটেল পার্টি' (১৯৫০), 'কন্‌ফিডেন্সাল ক্লার্ক' ও 'এণ্ডার স্টেটসম্যান'—এবং একখানি শিশু-কাব্যগ্রন্থ 'ওল্ড পোস্‌সাম্‌স্‌ বুক অব প্র্যাকটিক্যাল ক্যাটস্‌', তাঁর অপর কাব্য গ্রন্থাবলী।

তাঁর একটি কবিতার অনুবাদ এখানে প্রকাশ করা হল—

ক্রন্দসী কুমারী

অক্ষয়কুমার চন্দ্র

'O quam te memorem virgo---O dea certe!'

আহা, কতো না তোমাকে স্মরণ করি, কুমারী, হে দেবী, নিশ্চিত!
দাঁড়াও সর্বোচ্চ চত্বরে সোপানের—
উদ্যানের পুষ্পপাত্রে দাঁড়াও বঙ্কিমভঙ্গিতে—
চলো বয়ন করে সূর্যের কিরণমালা তোমার কেশে—
সবলে চেপে ধর পুষ্পগুলি ব্যথিত বিস্ময়ে—
ফেলে দাও ভূমিতলে আর ফেরো
পলাতক বিরাগ-ভরা তোমার ও দু'নয়ন মেলে :
কিন্তু চলো বয়ন করে সূর্যের কিরণমালা তোমার কেশে।

এভাবেই চেয়েছিলাম সে ছেড়ে যাবে,
এভাবেই সে র'বে দাঁড়িয়ে শোকে বিহ্বলা,
এভাবেই সে ছেড়ে যেত
যেভাবে আত্মা ছাড়ে জীর্ণ দীর্ণ দেহ
যেভাবেতে মন ছাড়ে ব্যবহৃত দেহ।
আমি খুঁজি
পথ কোনো তুলনাবিহীন লঘু আর সুনিপুণ,
পথ কোনো আমরা দু'জনে বুঝবো যাহা,
সরল ও অবিশ্বাস্য হাস্য ও হস্তের কম্পনের মতো।

সে হোল বিমুখ, কিন্তু হেমন্ত সংকেতে
আমার কল্পনাকে বেঁধে বহুদিন ধরে,
বহুদিন এবং বহু ঘণ্টা :
কেশ তার বাহুর ওপরে আর বাহু দুটি ফুলে ভরা।
এবং আমি অবাক কেমন দু'জনে মিলিত তারা।
আমি হারাতাম একটি ভঙ্গি আর একটি ভাব।
আজও কখনো এই আলোড়ন বিস্ময়ে অবাক করে
ব্যাহত নিশীথে আর মধ্যাহ্ন বিরামে।

(T. S. Eliot-এর 'La Figlia Che Piange' কবিতার অনুবাদ)

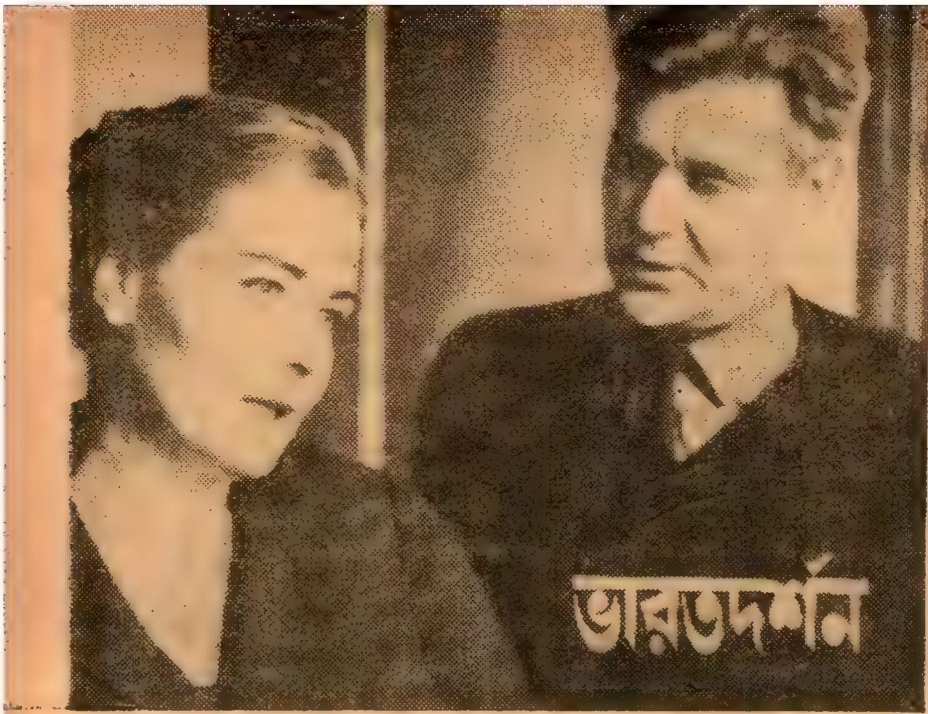

● রাজধানীতে 'স্টোরী অব ডন'-এর পরিচালক ভ্লাডিমির ফেতিন ও অভিনেত্রী লুডমিলা চুরসিনা।

রাজধানী ঃ

বিশ্বের বিবদমান রাষ্ট্রের নায়কদের মুখে আবার যখন শোনা যাচ্ছে রণহুঙ্কার, । চীন কলম্বো প্রস্তাবকে তাচ্ছিল্যভরে অকেজো কাগজের ঝুড়িতে ছুড়ে ফেলে দিয়ে হুমকী দিচ্ছে ভারত আক্রমণের। ছলে-বলে-কৌশলে আয়ুব খাঁ আবার গদী পেয়েই শাসাচ্ছে ভারতবর্ষকে। ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্রসংঘ বর্জন করে খোয়াব দেখছে পাল্টা একটি আন্তর্জাতিক-সংস্থা গড়ে তোলার। আয়ুবের জয়ে মাও-সে-তুং পর্যন্ত আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছেন। ঠিক সেই সময়টিতে দুর্গাপুরে সম্পন্ন হল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন। বিশ্বের রাজনীতিকরা আকুল আগ্রহে তাকিয়ে ছিলেন এ-অধিবেশনের দিকেই। ভারত তাঁর ঐতিহ্য রক্ষা করে আশার বাণী, শান্তির বাণীই বিশ্ববাসীকে শুনিয়েছে। ভারত বিশ্বাস করে---রাশিয়া ও আমেরিকা যত কাছে এগিয়ে আসবে, পারমাণবিক মারণাস্ত্রের বিভীষিকা তত হ্রাস পাবে।

নয়াদিল্লীও এ সময়টাতে একেবারে নীরব ছিল না। সেখানে তখন চলছিল দেশ-বিদেশের চলচ্চিত্রের মেলা। সে মেলার আবেদনও বিশ্বব্যাপী। শিল্পের আবেদন মানে নি কোন দিন সীমারেখা---তার আবেদন সীমাহীন, আহ্বান তার সর্বজনীন। বিশেষ করে

ডঃ রাধাকৃষ্ণণ

চলচ্চিত্র-শিল্পের গুরুত্ব বর্তমান বিশ্বে সমধিক। অজানা বিশ্বের ব্যাপকতা, তার দূরত্ব সে হ্রাস করে দিয়েছে। সারা বিশ্বকে আমাদের আঙ্গিনায় এনে পৌঁছে দিয়েছে। যাদের ভাষা জানি নে, যাদের সামাজিক জীবনের কোন সন্ধানই রাখি না, পর্দায় তাদের সঙ্গে দেখা হতেই খুলে যায় মনের দুয়ার, মনে হয় তারা আমাদেরই আপনজন, অতি পরিচিত বন্ধু।

বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ বিজ্ঞান ভবনে ভারতে তৃতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন করে সেই কথাই আবার সারা পৃথিবীর চলচ্চিত্র-শিল্পীদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। চলচ্চিত্র-শিল্পীরা নতুন বিপ্লবের পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন---চলচ্চিত্রের সাহায্যে বিশ্বে নৈতিক ও আত্মিক বিপ্লব সাধন সম্ভব হতে পারে। চলচ্চিত্র হতে পারে আমাদের বোঝাপড়ার মাধ্যম।

নামে তৃতীয় হলেও ভারতে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-শিল্পে প্রতিযোগিতামূলক উৎসব এই প্রথম। তিরিশটি দেশের প্রতিনিধিরা এ উৎসবে যোগ দিচ্ছেন। একুশে জানুয়ারী পর্যন্ত রাজধানীর প্রেক্ষাগৃহগুলোতে উৎসবে নির্বাচিত ছবিগুলো দেখানো হবে।

যেসব বিদেশী প্রতিনিধি এসেছেন, তাঁদের মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়নের তরুণী অভিনেত্রী লুডমিলা চুরসিনা এসেই দিল্লীবাসীর অন্তর জয় করেছেন তাঁর মিষ্টি হাসি আর সরল কথাবার্তায়। আরো একটি কথা পি, আই, বি অফিস থেকে ছড়িয়ে পড়েছে লোকের কানে কানে---লুডমিলা 'স্টোরী অব ডন' ছবির নায়িকা। এই ছবিতে তাঁর দ্বিতীয় অভিনয়। অভিনয়ের সঙ্গে ছবির পরিচালক ভ্লাডিমির ফেতিনকে তিনি ভালবেসে ফেলেছেন। এই ভালবাসা পরিণয়ে রূপ পাবার কথা ছিল ৮ই জানুয়ারী। কিন্তু ভারতের ডাকে তাঁরা বিয়ে স্থগিত রেখে চলে এসেছেন দিল্লীতে

ফিরে এসেও বিয়ে করা যাবে, কিন্তু দিল্লীর উৎসব তো বসে থাকবে না। তাই ফেতিন আর লুডমিলা দুজনেই একসঙ্গে চলে এসেছেন।

প্রাণচঞ্চল এই তরুণীর চোখে বর্ণরঙীন ভারত দেখে বিস্ময়ের সীমা নেই। ওঁরা দুজনে মুহূর্তে যেন ভারতকে জেনে নিতে চান। তাই ছুটেছে নার্গিস, রাজকাপুর, দিলীপকুমারের সঙ্গে দেখা করতে। রিপোর্টাররাও ছুটছে তাদের পিছু পিছু। প্রশ্নের ওপর প্রশ্ন চলেছে লাফিয়ে লাফিয়ে টেনিস বলের মত। ওঁদেরও জিজ্ঞাসার শেষ নেই—যেন বহু আকাঙ্ক্ষিত নিকট আত্মীয়ের বাড়ি এসেছেন। লুডমিলা এই চলচ্চিত্র উৎসবের মক্ষীরাণী।

• • •

দুর্গাপুরের সংবাদ রাজধানীর মানুষের মনে কোন আশারই উদ্রেক করতে পারে নি। প্রধানমন্ত্রী শ্রীলাল-বাহাদুর শাস্ত্রীর কাছ থেকে আরও পনের বছর ত্যাগ স্বীকারের আহ্বান কেউ আশাই করতে পারেন নি।

● চলচ্চিত্র উৎসবে ইতালীয় প্রতিযোগী চিত্র 'ইয়ং নান'-এর একটি দৃশ্য।

কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদার স্বল্পভাষী। কথার চাইতে তিনি কাজের মানুষ বলেই তাঁকে রাজধানীর মানুষ জানতো। তাঁর ভাষণে দেশের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য একটা উদ্বেগ ছাড়া আর কিছুই মানুষ খুঁজে পায় নি। ভুবনেশ্বরের প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তি করে তিনি বিবর্তনের পথে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প আবার দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। সে দৃপ্ত ঘোষণার মধ্যে ভবিষ্যৎ সমাজতন্ত্রের রূপরেখা পরিস্ফুট হয় নি। সামাজিক অনগ্রসরতা, অর্থ-নৈতিক বৈষম্য, নিরক্ষরতা, প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা কি করে দূর হবে, চোরাকারবারীদের—কালো-টাকার মালিকদের করালগ্রাস থেকে মানুষ কিভাবে মুক্তি পাবে, তার কোন ইঙ্গিত তিনি দেন নি। তিনি দুর্গাপুরে বসে কার্যত দেশবাসীর ভাগ্যটা দুর্গতিনাশিনী মা-দুর্গার হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। কংগ্রেসের রথের চাকার ধীর-মন্থর আবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে কতদিনে দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে, আর সাধারণ মানুষ সতের বছর কংগ্রেসের গতিবিধি দেখার পর তা আর ঠাহর করে উঠতে পারছে না। কংগ্রেসের নেতাদের সামনেও বোধ হয় সে ছবি পরিষ্কার পরিস্ফুট নয়।

দুর্গাপুরে একজন কংগ্রেস নেতা নাকি বলেছেন, ভুবনেশ্বরের পর তাঁরা পিছু হটেন নি এবং এগিয়ে যেতে পারেন নি ;—আকাশে উঠেছেন। খুব খাঁটি কথা বলেছেন তিনি। সব কথার কারসাজি আর প্রস্তাবের মার-প্যাঁচে বাষ্পীভূত হয়ে ঊর্ধ্বগামী হয়ে সৃষ্টি করেছে বিরাট ধূম্রজাল।

• • •

ধনুষ্কোটি ও রামেশ্বরমে একটি 'রাডার ইউনিট' প্রতিষ্ঠা করা হবে। ঘূর্ণিবাত্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলের সমীক্ষার পরই সরকার প্রাকৃতিক গোলযোগের সম্ভাবনার কথা জানিয়ে সতর্ক হওয়ার সুবিধার জন্য এই ব্যবস্থা করছেন। ধনুষ্কোটিতে ইতিমধ্যেই রেডিও-ওয়ারলেশ কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

• • •

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারী-লাল নন্দ দুর্গাপুরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যদের বামপন্থী কমিউনিস্ট গ্রেপ্তারের কারণ জানিয়েছেন। সরকারের ব্যবস্থা তাঁরা সাধারণভাবে অনুমোদনও করেছেন।

স্বরাষ্ট্রদপ্তর নাকি এর মধ্যেই কিছু সংখ্যক কমিউনিস্টকে মুক্তি দেওয়ার কথাও ভাবছেন। যাঁরা নাশ-কতামূলক কাজে সরাসরি লিপ্ত এবং এ কাজের উস্কানিদাতা তাঁদের আটক রেখে সাধারণ কর্মীদের ছেড়ে দেওয়া হতে পারে।

কেরল ঃ

মি: ...নের কাছাকাছি কমিউনিস্ট পার্টির জোট ভাঙ্গের নেতাদের গ্রেপ্তার সাধারণ মানুষ খুশি মনে গ্রহণ করতে পারে নি। সরকারের এ কাজে অনেকেই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছেন। চতুর রাজনীতিকরা পর্যন্ত এ সময়ে বামপন্থী কমিউনিস্টদের গ্রেপ্তারকে ভাল চোখে দেখছেন না। তাঁদের মতে গ্রেপ্তার কমিউনিস্টদের পক্ষে শাপে বর হয়ে উঠেছে। বামপন্থী কমিউনিস্টরা আগম নির্বাচনে এ সুযোগ ভালভাবেই কাজে লাগাবে। যে উদ্দেশ্যে এ গ্রেপ্তার, কেরলের ক্ষেত্রে তা ব্যর্থই হবে। শ্রী ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ সাধারণ মানুষের মনের সঙ্গে তাল রেখে গ্রেপ্তারের ঘটনাকে নির্বাচনের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়ে প্রচারকার্য চালাচ্ছেন।

বামপন্থী কমিউনিস্টদের সম্পর্কে কেরলের মানুষের মোহ একেবারে কেটে গিয়েছিল। এ দলের নেতারা অনেক চেষ্টা করেও সম্মানে আসনলাভ করতে পারে নি। এদের চীনের দালাল ছাড়া আর কিছুই কেউ মনে করতো না। কমিউনিস্টদের আকস্মিক গ্রেপ্তারে কিছু উল্টো হাওয়াই বইতে সুরু করেছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যারা একঘরে হয়ে পড়েছিল তারা আজ গলাবাজী সুরু করেছে। নিপীড়িত দল বলে সহানুভূতি সঞ্চারের চেষ্টা চলেছে। অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে।

এদিকে প্রদেশ কংগ্রেস পড়েছে বিপদে। বলিষ্ঠ যুক্তি দিয়ে, চীনের অনুচরদের কার্যকলাপ ফাঁস করে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের সমর্থন পেয়েছে কংগ্রেস নেতাদের কাছ থেকে। কংগ্রেসের একটি কাগজে কেন্দ্রীয় সরকারের কথারই পুনরাবৃত্তি এবং শ্রীশানানপল্লী গোবিন্দ মেননের একটি বিবৃতি ছাড়া কমিউনিস্টদের স্বরূপ উদ্ঘাটনের তেমন কোন চেষ্টাই প্রদেশ কংগ্রেস করে নি। শ্রী এম পদ্মনাভনের মত শক্তিশালী পুরুষ পর্যন্ত এ ব্যাপারে নীরব।

যে সকল রাজনৈতিক দলের সর্বভারতীয় নেতারা কমিউনিস্টদের গ্রেপ্তারে উল্লসিত হয়েছিলেন, তাঁদের কেরল শাখার কর্তারা কিন্তু কমিউনিস্ট ও বামপন্থী অপর দলের সঙ্গে সুর মিলিয়ে গ্রেপ্তারের তীব্র নিন্দা করছেন। সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দলের কেরল শাখার চেয়ারম্যান শ্রী কে চন্দ্রশেখর এ গ্রেপ্তারকে নির্বাচন বানচালের কৌশল বলে বর্ণনা করেছেন। আগম নির্বাচনে কমিউনিস্টদের কোণঠাসা করাই যাঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল,

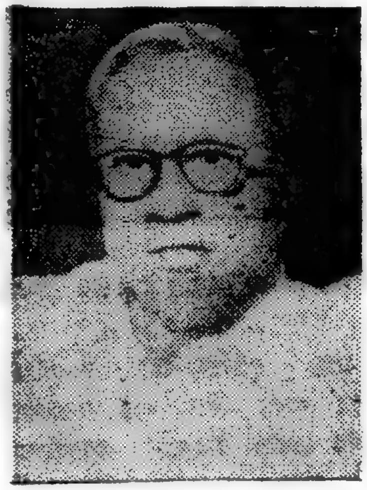

● শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ

তাঁরাও আজ কমিউনিস্টদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নির্বাচনে নামবার কথা চিন্তা করছেন। আজ বামপন্থী কমিউনিস্টদের সমর্থনে সভা-সমিতি হচ্ছে। ত্রিবান্দ্রমে বাভাটি দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট, আর এস পি এবং সংযুক্ত সমাজতন্ত্রীদের মিলিত প্রচেষ্টাতেই হয়েছিল। সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের সমালোচনা হয়েছে কঠোর ভাষায়। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনই গ্রেপ্তারের কারণ বলে তাঁরা একবাক্যে ঘোষণা করেছেন।

৪ঠা মার্চ নির্বাচনের দিন ধার্য হওয়ার পর থেকেই রাজনৈতিক দলগুলো আসরে নেমে পড়েছেন। প্রচারকার্য জোর চললেও কোন দলই প্রার্থী মনোনয়নের পালা শেষ করে নি।

শঙ্কর মন্ত্রিসভার পতনের পর থেকেই প্রদেশ কংগ্রেসে নির্বাচনের তোড়জোড় চলছে। কংগ্রেস অপর কোন দলের নির্বাচনী মিতালীও করে নি। এর্নাকুলমে আটাশে ডিসেম্বর কংগ্রেস নির্বাচন কমিটির সভাও হয়ে গেছে। কমিটি উনিশটি লোকসভার কেন্দ্রে পাঠাচ্ছেন উনিশ জন প্রতিনিধিকে। এঁরা বিধানসভার প্রত্যেকটির কেন্দ্র ঘুরে দেখে নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

বামপন্থী কমিউনিস্টদের গ্রেপ্তারের আগে পর্যন্ত বিরোধী দলগুলো অনেক চেষ্টা করেও নির্বাচনী জোট গড়ে তুলতে পারে নি। কমিউনিস্ট পার্টির দু তরফ আর এস পি ও প্রগতিপন্থী নির্দলীয় নেতারা চার মাস অক্লান্ত চেষ্টা করেও সকলকে দলে টানতে পারে নি। সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দলের সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা এখনও চলছে। সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দলের নেতারা এর মধ্যে মুসলীম লীগের সঙ্গে একটা মীমাংসা করে ফেলেছেন। বিদ্রোহী কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে সমঝোতার আলাপ-আলোচনা এখন চলছে।

মুসলীম লীগের ঘাঁটি মালাবার এলাকা। মালাবারের বাইরে যেসব ছোট ছোট অঞ্চলে তাদের প্রভাব বেশি, সেখানে অন্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে মিলিতভাবে নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণই তাঁদের উদ্দেশ্য। পঁয়তিরিশটি আসনে লীগ প্রার্থী মনোনয়নের আশা রাখে। তা ছাড়া বিদ্রোহী কংগ্রেসের পঁয়তিরিশজন প্রার্থী ও নির্দলীয় তিরিশজনকে লীগ সমর্থন করবে।

কেরলের নির্বাচনে বিদ্রোহী কংগ্রেস নেতাদের একেবারে উপেক্ষা করা সম্ভবও নয়। কেরলের মুসলমান-সমাজ ছাড়াও নায়ারদের এবং ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের কিছু ভোটদাতা তাঁদের পেছনে রয়েছে।

আন্তর্জাতিক

ইন্দোনেশিয়া ঃ

ইন্দোনেশিয়া যাতে রাষ্ট্রসংঘ ত্যাগ া করে, তার জন্য রাষ্ট্রপতি সায়েকার্নোর কাছে বিশ্বের বিশিষ্ট রাষ্ট্র-নেতারা আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু কল আবেদন অগ্রাহ্য করে সোয়েকার্নো দন্তে ঘোষণা করেছেন, ইন্দোনেশিয়া আর রাষ্ট্রসংঘে নেই। গত ৮ই জানুয়ারী াকার্তায় এক বিরাট জনসমাবেশে ভাষণ দেবার সময় সোয়েকার্নো বলেন, কবল রাষ্ট্রসংঘই নয়, রাষ্ট্রসংঘের ঙ্গে যুক্ত সকল প্রতিষ্ঠান, যেমন ইউনেস্কো', 'ইউনিসেফ' প্রভৃতির ঙ্গেও ইন্দোনেশিয়া সম্পর্ক ত্যাগ রেছে। এই প্রসঙ্গে তিনি রাষ্ট্রসংঘ সংশ্লিষ্ট – প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে বদ্রূপাত্মক মন্তব্য করতেও ছাড়েন নি।

এখনও সরকারিভাবে রাষ্ট্রসংঘ প্তরে ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রসংঘ ত্যাগের ংবাদ জানানো না হলেও সোয়েকার্নোর াকার্তা বক্তৃতার পর সব জল্পনা-ল্পনার অবসান হয়েছে। ইন্দোনেশিয়া ড়ান্তভাবেই রাষ্ট্রসংঘ ত্যাগ করেছে।

রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদের ভাপতি অ্যালেক্স কোয়াইসনস্যাকে আফ্রো-এশীয় সংহতির নামে, শান্তির র্থে ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সের সুরু করার কথা স্মরণ করিয়ে ায়েকার্নোকে এই অবাঞ্ছিত সিদ্ধান্ত রিবর্তনের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। ষ্ট্রসংঘের সাধারণ সম্পাদক ইউ ন্টও অনেক চেষ্টা করেছিলেন। ন্তু কোন কিছুতেই কাজ হয় নি। ন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রসংঘ ত্যাগে চীন ই খুশি হয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন এতে মর্মাহত। সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সোয়েকার্নো তাঁর সহকর্মীদের বিশেষভাবে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছিল, এই র্বের ফলে বিশ্বশান্তি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রচেষ্টা ব্যাহত হবে। সোয়েকার্নো কিন্তু কারও কথাই শোনেন । তিনি নিজের গোঁ-ই বজায় রেখেছেন।

এখন প্রশ্ন হল: ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রসংঘ ত্যাগের ফল কি হবে? সোয়েকার্নো তাঁর বড় সাধের 'মালয়েশিয়া ধ্বংসের' চেষ্টা অবশ্যই চালাবেন। কিন্তু কেবলমাত্র মালয়েশিয়া ধ্বংসের কর্মসূচী নিয়েই কি তিনি খুশি থাকবেন? অবস্থা দেখে তো তা মনে হয় না। ইন্দোনেশিয়া নিশ্চয়ই একার বুদ্ধিতে রাষ্ট্রসংঘ ত্যাগ করে নি। এ ব্যাপারে চীনের নেতৃবৃন্দ ও চীনাপন্থী ইন্দোনেশিয়া কমিউনিস্ট পার্টির উস্কানি ও পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বত্র আক্রমণাত্মক অভিযান চালানো চীনের উদ্দেশ্য। আর এই কাজে এবার চীনের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অগ্রসর হবে ইন্দোনেশিয়া। আরও বিপদের কথা, পাকিস্তানও এদের সঙ্গে গিয়ে জুটতে পারে। কায়রোতে বিগত জোট-নিরপেক্ষ সম্মেলনের সময়েই এই তিন রাষ্ট্রের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল এখন যদি চীন, ইন্দোনেশিয়া ও পাকিস্তান একত্রে এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল জুড়ে দৌরাত্ম্য শুরু করে, তবে আশ্চর্যের কিছু নেই।

• বৃটিশ রাজকীয় বিমানবাহিনীর অনুগামী ছত্রী-সৈন্যের একটি দলকে অসামরিক পোষাকে সিঙ্গাপুরে একটি বিমান ঘাঁটিতে অবতরণ করিতে দেখা যাচ্ছে।

• কোয়াইসন স্যাকে

মালয়েশিয়া ঃ

ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রসংঘ ত্যাগের সংবাদে সবচেয়ে বেশি বিচলিত মালয়েশিয়া। মালয়েশিয়াকে ধ্বংস করার জন্য ইন্দোনেশিয়া অনেক দিন ধরেই চেষ্টা করছে। নিরাপত্তা পরিষদে মালয়েশিয়ার সদস্য পদপ্রাপ্তিও ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রসংঘ ত্যাগের আপাত

অজুহাত। সুতরাং রাষ্ট্রসংঘ ত্যাগের পরে সোয়েকার্নো তাঁর সর্বশক্তি নিয়ে মালয়েশিয়াকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য চেষ্টা করবেন, এমন আশঙ্কা নিশ্চয়ই হবে।

বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদেও দেখা যাচ্ছে, ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া সীমান্ত বরাবর সৈন্য সমাবেশ করেছে। উত্তর বোর্নিও ও সারওয়াকের কাছে প্রচুর ইন্দোনেশীয় সৈন্য এসে উপস্থিত হয়েছে। যে কোন মুহূর্তে মালয়েশিয়ার ওপর বড় রকমের আক্রমণ হতে পারে।

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী টুঙ্কু আবদুল রহমান সম্ভাব্য ইন্দোনেশীয় আক্রমণের হাত থেকে মালয়েশিয়াকে রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্রসংঘ এবং কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির কাছে আবেদন জানিয়েছেন। সমগ্র মালয়েশিয়া জুড়ে ইতিমধ্যেই জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে।

মালয়েশিয়াকে রক্ষা করার জন্য বৃটেন সর্বতোভাবে সাহায্য করবে বলে ঘোষণা করেছে। আগের থেকেই মালয়েশিয়ায় প্রচুর বৃটিশ সৈন্য রয়েছে। এবার নতুন করে সংকট সুরু হবার পর আরও দুটি সামরিক ব্যাটেলিয়ান ও একটি বিমানবাহিনী মালয়েশিয়ায় প্রেরণ করা হয়েছে। লণ্ডনে নৌবাহিনীর একজন মুখপাত্র বলেছেন, আরও বেশি পরিমাণে নৌ-সৈন্য প্রেরণের জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বৃটিশ মন্ত্রিসভার এক জরুরী বৈঠকে স্থির করা হয়েছে, ইন্দোনেশিয়া যদি মালয়েশিয়া আক্রমণ করে, তবে বৃটিশ বিমান থেকে সুমাত্রার ওপর বোমাবর্ষণ করা হবে। এ ছাড়া ভি বোমারু বিমান দূর-প্রাচ্যে প্রেরণের জন্য সর্বদা প্রস্তুত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ইন্দোনেশিয়ার মোকাবিলা করার জন্য বৃটেন সর্বপ্রকারে প্রস্তুত। বলা-বাহুল্য, এ ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পুরোপুরিভাবে বৃটেনকে সাহায্য করবে। রাষ্ট্রসংঘের সদস্যদের পক্ষেও মালয়েশিয়াকে সাহায্য না করে উপায় থাকবে না। রাষ্ট্রসংঘের একজন সদস্যের ওপর যদি সদস্য নয় এমন কোন রাষ্ট্র আক্রমণ চালায়, তখন আক্রান্ত রাষ্ট্রকে সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য দেওয়া রাষ্ট্রসংঘ-সদস্যদের কর্তব্য। চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের সময় একই রূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল।

• টুঙ্কু আবদুল রহমান

কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়ন কি ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে মালয়েশিয়াকে সাহায্য করবে? মালয়েশিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক, ইন্দোনেশিয়ার এই অভিমত সোভিয়েট ইউনিয়নও সমর্থন করে। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্রসংঘ ত্যাগের পর যদি আবার নতুন করে মালয়েশিয়া আক্রমণ করে তখনও কি সোভিয়েট ইউনিয়ন চুপ করে থাকবে?

ভারতের ওপর চীনা আক্রমণের সময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রথম যে দেশ ভারতের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়, সে হ'ল মালয়েশিয়া। আজ মালয়েশিয়ার বিপদের দিনে ভারত সর্বতোভাবে মালয়েশিয়ার পাশে এসে দাঁড়াবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

• সোয়েকার্নোর রাষ্ট্রসংঘ ত্যাগের হুমকী

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঃ

গত ৪ঠা জানুয়ারী রাষ্ট্রপতি লিণ্ডন বি জনসন জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত বাণী (State of the Union Message) পারস্পরিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধির জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। জনসন এই আশা প্রকাশ করেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন, উভয়ে মিলিতভাবে শান্তিপূর্ণ বোঝাপড়ার নীতি অনুসরণ করলে স্বাধীনতার বিপদ হ্রাস পাবে এবং বিশ্বশান্তির পথ সুগম হবে।

জনসন সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। উভয় দেশের নেতাদের টেলিভিশনে অবতীর্ণ হবার জন্য তিনি অনুরোধ করেছেন। এই সফর ও টেলিভিশনের সাহায্যে পরস্পরের মধ্যে চেনা-পরিচয় বাড়বে।

জনসন অবশ্য তাঁর বাণীতে এশিয়ায় কমিউনিজম দমনে মার্কিন সরকারের দৃঢ়তার কথাও জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেন। মার্কিন সামরিক-শক্তির শ্রেষ্ঠত্বের উল্লেখ করে তিনি বলেন, যে-কোন শত্রুনাশের ক্ষমতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আছে।

• লিণ্ডন জনসন

• ব্রেজনেভ

• কোসিগিন

স্নায়ুযুদ্ধের যুগে পারস্পরিক বোঝাপড়া প্রসারের ক্ষেত্রে জনসনের বর্তমান বাণীকে ঐতিহাসিক বলে বিভিন্ন মহলে উল্লেখ করা হয়েছে। সোভিয়েট নেতাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের আমন্ত্রণ জানানোর মধ্যে উত্তেজনা প্রশমনের ঐকান্তিক চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, শান্তি ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার হৃদ্যতাপূর্ণ প্রয়াসের পাশাপাশি যদি কঙ্গো, ভিয়েৎনাম, কঙ্গোর মার্কিন নীতিও একই সঙ্গে চলতে থাকে, তবে এই প্রয়াস কি সফল হবে?

সোভিয়েট ইউনিয়নের সরকারী মুখপত্র 'ইজভেস্তিয়ায়' জনসনের ভাষণকে 'পরস্পরবিরোধী' বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। শান্তি ও পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য জনসনের সদিচ্ছার প্রশংসা করেও 'ইজভেস্তিয়া' তাঁর বক্তৃতাকে 'কমিউনিজম বিরোধী' বলে নিন্দা করেছে। জনসন আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কথা বললেও এর জন্য কোন বাস্তব কার্যক্রম উপস্থিত করতে পারেন নি।

জনসনের বক্তব্যের মধ্যে পরস্পর-বিরোধিতা থাকতে পারে, মার্কিন রাজনীতিতে তাই স্বাভাবিক,—কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিপুল জনসমর্থনধন্য নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি লিণ্ডন বি জনসন যে আন্তর্জাতিক শান্তি ও মৈত্রীর পথ অনুসরণ করবেন এবং এর জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রীসম্পর্ক দৃঢ় করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করবেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

জনসনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে লিওনিদ ব্রেজনেভ ও আলেক্সি কোসিগিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে গেলে এবং পাল্টা সফরে জনসন সোভিয়েট ইউনিয়নে এলে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নিঃসন্দেহে নতুন দিগন্তের সূচনা হবে।

নাইজেরিয়া ঃ

শেষ পর্যন্ত নাইজেরিয়ার সঙ্কট সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া গেছে?

প্রধানমন্ত্রী স্যার আবু বকর তফাওয়া ব্যালেয়া সকল পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য একটি জাতীয় সরকার গঠন করতে সম্মত হয়েছেন।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনকে উপলক্ষ করে নাইজেরিয়ায় এমন এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়, যাতে অনেকেরই সন্দেহ হয়েছিল, দেশবিভাগ ছাড়া আর কোন পথ নেই।

প্রায় ২৫০টি উপজাতি-অধ্যুষিত এই দেশের সাড়ে পাঁচ কোটি অধিবাসীর মধ্যে নানা ভাষা ও নানা ধর্মের লোক আছে। দেশের প্রধান চারটি অঞ্চল, হাউসা ও ফুলানী-অধ্যুষিত উত্তর, ইয়োরুবা-অধ্যুষিত পশ্চিম, শিল্পসমৃদ্ধ মধ্য-পশ্চিম ও ইবাদের বাসভূমি পূর্ব অঞ্চল। এর মধ্যে এক উত্তরের অধিবাসীই হল তিন কোটি।

এতদিন এই চারটি অঞ্চলের নেতাদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার জন্য মিলিতভাবে সরকার গঠন করে কাজ চালানো হচ্ছিল। রাষ্ট্রপতি নামডি অজিকিউই পূর্ব অঞ্চলের লোক এবং প্রধানমন্ত্রী আবুবকর তফাওয়া ব্যালেয়া উত্তরের অধিবাসী। কিন্তু এবার উত্তরের অধিবাসীদের দল ন্যাশনাল নাইজেরিয়ান এ্যালায়েন্স পার্লামেণ্টে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের জন্য চেষ্টা করে

• আবুবকর তফাওয়া ব্যালেয়া

এবং উত্তরের প্রধানমন্ত্রী সোকোটোর সারদুয়ানা বিরোধীদের বিরুদ্ধে চরম দমননীতির আশ্রয় গ্রহণ করায়, বিরোধী দলগুলি নির্বাচন বর্জন করে।

নির্বাচনের দিন রাজধানী লাগোসে ব্যাপক ধর্মঘট পালিত হয় এবং পশ্চিম, মধ্য-পশ্চিম ও পূর্ব অঞ্চলে অধিকাংশ ভোটদাতারা নির্বাচন বর্জন করে।

এই অবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা আবু বকর তফাওয়া ব্যালেয়া মন্ত্রিসভা গঠনের চেষ্টা করায় রাষ্ট্রপতি নামডি আজিকিউই পদত্যাগের হুমকী দেন এবং দেশবিভাগের দাবি জানান। ফুলানী মুসলমানদের আধিপত্যের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ইবা ও ইয়োরুবা উপজাতি ও খৃস্টধর্মাবলম্বীরা আজিকিউই ও প্রোগ্রেসিভ গ্র্যাণ্ড এ্যালায়েন্স পার্টির নেতৃত্বে দেশবিভাগের দাবি দৃঢ়তার সঙ্গে তুলে ধরে।

যাই হোক, আপাতত আবু বকর তফাওয়া ব্যালেয়ার চেষ্টায় সঙ্কটের মীমাংসা হলেও, এর পরস্পরবিরোধী এইসব উপজাতি ও ধর্মাবলম্বীরা কতদিন একসঙ্গে থাকতে পারেন, বলা শক্ত।

দক্ষিণ ভিয়েৎনাম:

পক্ষকাল পূর্বে সায়গনে সামরিক অফিসাররা জাতীয় পরিষদ ভেঙে দিয়ে পরিষদের বিভিন্ন সদস্যকে গ্রেপ্তার করেন এবং প্রধানমন্ত্রী ত্রান ভান হুয়াং-এর হাতে অধিকতর ক্ষমতা অর্পণ করেন। এই ঘটনার পিছনে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল নেগুইন খানের স্পষ্ট হাত ছিল। বৌদ্ধধর্মনেতাদের হাত থেকে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সরকারকে মুক্ত করার জন্যও সামরিক অফিসাররা চেষ্টা করছেন।

কিন্তু মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেনারেল ম্যাক্সওয়েল টেলর এই ঘটনায় ভয়ঙ্কর ক্ষিপ্ত হয়ে গেছেন। যে মার্কিন

• ম্যাক্সওয়েল টেলর

যুক্তরাষ্ট্র অর্থ, অস্ত্র, ও সৈন্য দিয়ে দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে বাঁচিয়ে রেখেছে, তার অনুমতি না নিয়ে শাসনক্ষমতার কোনরূপ পরিবর্তন টেলর কিংবা তাঁর প্রভুরা বরদাস্ত করতে রাজী নন। তাছাড়া এবারের ক্ষমতা পরিবর্তনের প্রকৃত নায়ক নেগুইন খান ম্যাক্সওয়েল টেলরের ঘোর বিরোধী। সুতরাং টেলর দাবি করলেন, সেনাবাহিনীর প্রধানদের প্রভাবমুক্ত সম্পূর্ণ বে-সামরিক একটি সরকার চাই। সামরিক নেতারা তাঁর এই দাবি মেনে না নিলে মার্কিন সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হবে এমন হুমকীও তিনি দিয়েছেন।

দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সরকার ও সৈন্যবাহিনীর ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চরমতম কূটনৈতিক চাপ দিয়েছে। ম্যাক্সওয়েল টেলর নিজে প্রধানমন্ত্রী ত্রান ভান হুয়াং-এর সঙ্গে আলোচনা করেছেন। সহকারী রাষ্ট্রদূত অ্যালেক্সিস জনসন সহকারী প্রধানমন্ত্রী নেগুইন জুয়ান ওয়ান এবং মার্কিন সৈন্যবাহিনীর সহকারী অধিনায়ক লেঃ জেঃ জন এল থ্রুকমর্টন দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সামরিক অফিসারদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়েছেন।

সপ্তাহব্যাপী আলোচনার পর দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সামরিক অফিসাররা নতি স্বীকার করেছেন। প্রধানমন্ত্রী ত্রান ভান হুয়াং-ও তাঁদের কাছে বে-সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার দাবি

• দঃ ভিয়েৎনামে সরকারী ফৌজের বিনগিয়া পুনর্দখল

মেনে নেবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। স্থির হয়েছে, ধৃত নেতাদের ছেড়ে দেয়া হবে এবং তাঁদের শাসনক্ষমতায় ফিরিয়ে আনা হবে।

এই সিদ্ধান্তের ফলে টেলর খুশি হয়েছেন ঠিকই। কিন্তু জেনারেল নেগুইন খান এই ব্যাপারটিকে মোটেই ভাল মনে গ্রহণ করেন নি। সাধারণ ভিয়েৎনামীরাও মার্কিন হস্তক্ষেপের বিরোধী। সুতরাং আবার যদি ক্ষমতা পরিবর্তনের চেষ্টা হয়, তবে বিস্মিত হবার কিছু থাকবে না।

পাকিস্তান ঃ

রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচনে সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রার্থী মিস ফতেমা জিন্না পরাজিত হয়েছেন। কিন্তু মিস জিন্না বা তাঁর সমর্থকেরা কেউই এই পরাজয়কে পরাজয় বলে স্বীকার করেন নি। তাঁরা সবাই একরূপ জানতেন, নির্বাচনের ফলাফল তাঁদের বিরুদ্ধে যাবে। যে অগণতান্ত্রিক নির্বাচন ব্যবস্থায় নির্বাচন হয়েছে, তাতে জনমতের প্রতিফলন সম্ভব নয়। নির্বাচনের ফলকে তাই কোন মতেই আয়ুব খাঁর প্রতি জনসমর্থনের অভিব্যক্তি বলে বর্ণনা করা যায় না। মিস জিন্না অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই বলেছেন, 'আয়ুব খাঁর এই জয়ই তাঁর সবচেয়ে বড় পরাজয়।'

৭১ বৎসর বয়স্কা মিস জিন্না অদম্য উৎসাহে ঘোষণা করেছেন, পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সংগ্রাম করে যাবেন।

নির্বাচনের পরাজয় বিরোধীদের উৎসাহিত করেছে নতুন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে। বিরোধী নেতৃবৃন্দ বুঝেছেন, আয়ুবী শাসনে তাঁর তৈরী আইন-কানুনে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন, কিংবা ন্যায় বিচার পাবার কোন আশা নেই। সুতরাং যদি কিছু পেতে হয়, তবে আয়ুবের ডিক্টেটরী শাসনের উচ্ছেদ করতে হবে। এই পথে বিরোধী দলের সবাই অগ্রসর হবেন কি না তাই এবার স্থির করতে হবে।

নেতারা যাই ভাবুন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বত্র সাধারণ মানুষ যে ইতিমধ্যেই চঞ্চল হয়ে উঠেছে, তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। বিচলিত আয়ুব সরকার ব্যাপকভাবে বিরোধী নেতাদের গ্রেপ্তার করা সুরু করেছেন। করাচীতে ছাত্র-সংগ্রাম কমিটী আবার অনির্দিষ্টকালের জন্য ছাত্র-ধর্মঘট আহ্বান করেছে। আপাতত স্কুল-কলেজ বন্ধ করে ছাত্র-আন্দোলনের গতি প্রতিরোধ করা না-হয় সম্ভব হল, কিন্তু বিক্ষুব্ধ ছাত্রসমাজ কি শান্ত হবে?

কায়দা-কানুন করে নির্বাচনে জয়লাভ করলেও সংঘবদ্ধ গণ-আন্দোলনের মোকাবিলা আয়ুব খাঁ করতে পারবেন কি না, ভবিষ্যৎই তার সাক্ষ্য দেবে।

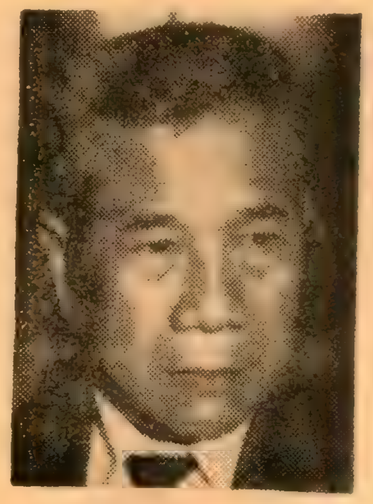

• ত্রান ভান হুয়াং

ধারাবাহিক উপন্যাস

অদ্বিতীয়া

সুশীল রায়

আশিস

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ তিন ॥

মোমিনপুরের বাড়িতে মহা সমারোহে চলেছে মহড়া। কিন্তু নায়িকা সাজছেন যিনি তাঁর আজও দেখা নেই। এঁতে নাটকটা জমতে জমতেও ঠিক যেন জমাট হয়ে উঠছে না কিছুতে। প্রথম দু'টি অঙ্ক নায়িকা-বিবর্জিত, দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ দিকে অবশ্য তাঁর সামান্য-একটু আবির্ভাব আছে, কিন্তু সেটা ধর্তব্যের মধ্যেই না; আসলে তাঁর পূর্ণাঙ্গ আবির্ভাব তৃতীয় অঙ্কে। সুতরাং তিনি বায়না ধরেছেন যে, এঁরা সকলে প্রথম অঙ্ক দু'টি পাকাপোক্তরূপে তৈরি করে নিক, তারপর তিনি আসছেন। কিন্তু এঁদের এত উদ্যোগ সত্ত্বেও সব কেমন যেন বিস্বাদ ঠেকছে, আলুনি বলে মনে হচ্ছে সমস্ত ব্যাপারটাই। ব্যঞ্জনে নুন না হলে কি স্বাদ হয়?

হরেশ যেহেতু শিল্পের কর্মী, সুতরাং সবসময়ই সে একটু বুন দিয়ে সবকিছু বুঝে নেবার চেষ্টা করে। নায়িকার অভাবে সকলের মনেই একটা বিষাদ আছে, কিন্তু কেউই তা স্পষ্ট করে প্রকাশ ক'রে ধরা দিতে চাচ্ছে না। সকলেই তাদের বুকের বেদনাটা চাপা দিয়ে বসে আছে। কিন্তু রেবতীর বা মনোজের বা বিকাশের কথা আলাদা, তাদের কাছে নায়িকাটি অপরিচিতা নয়, সুতরাং কৌতূহল বা রোমাঞ্চ তাদের তেমন তীব্র না হতে পারে। কিন্তু অন্যান্যরা? হরেশ, দীপক, নীহার, বীরেন? এবং তার চেয়েও বেশি যিনি, যিনি নাট্যকার—সেই সুহাংশু বিশ্বাস?

সুতরাং হরেশ একটু বুন দিল, একটা হাই তুলল, বলল, 'ভাল লাগে না এই প্রতীক্ষা। প্রতীক্ষারও একটা শেষ থাকবে, এইটেই ভেবেছিলাম। কিন্তু দেখছি এর শেষ বুঝি নেই।'

সকলেই বুঝি একটু চমকাল, অমিয় আড়চোখে হরেশের দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল, বলল, 'হচ্ছে কি, হরেশ?'

আক্ষেপের সুরে হরেশ বলল, 'কি আর হবে? কিছুই হচ্ছে না—সেই কথাই তো বলছি। এতদিন কেটে গেল, কিছুই এগলো না।'

রেবতী একটু শক্ত হয়ে বসে কড়া দৃষ্টিতে সকলের দিকে চেয়ে বলল, 'আমাদের একটু সাবধান হওয়া দরকার। আমাদের এখানে আমরা মেয়ে-অভিনেত্রী আনছি এই প্রথম, সে মেয়ের ইজ্জৎ রেখে যেন চলতে পারি আমরা, সে বিষয়ে আমাদের সকলেরই বেশ হুঁশিয়ার থাকতে হবে।'

হরেশ তর্ক করতে চায় না; তবু তাকে কথা বলতে হল, সে বলল, 'হুঁশিয়ার তো আছিই ভাই। কিন্তু সবসময় হুঁশ রাখা যায় না। কিছু এগলো না বলাতেই সব ইজ্জৎ চলে গেল? কিসের এগনোর কথা বলেছি বলো তো? আমি বলছি নাটকের কথা, তুমি বুঝলে নায়িকার কথা। তার মানেই হচ্ছে—নায়িকার জন্যে ছটফটানি কারও মধ্যেই কম নয়। বলো, বলো তোমরা সকলে—'

সকলে বলে উঠল, 'ইয়েস।'

বলে সকলেই হেসে উঠল।

অধ্যাপক-সুলভ গাম্ভীর্য বজায় রাখার চেষ্টা করে বীরেন বলল, 'আমরা সবাই কষ্ট পাচ্ছি। কেউ

পেতে হলে কষ্ট পেতে হয় জানি, কিন্তু রাধা পেতে হলেও যে এত বাধা, কে জানত বলো।'

'নিশ্চয়।' নীহার তার কথার মধ্যে একটু ফায়ার দিয়ে বলল, 'অত ডাঁট কিসের? নাচতে নেমে ঘোমটা টেনে লাভ কি? এসে যাও আমাদের সকলের মধ্যে, মিশে যাও আমাদের মধ্যে এক হয়ে। অনেক জ্বালা আছে আমাদের জীবনে, নতুন জ্বালায় আর জ্বালিয়ো না, প্রিয়সখি!'

অভিনয় করার ঢঙে বেশ দরদ দিয়ে কথাগুলো বলল নীহার। কেউ আর তাকে ঘাঁটাতে চাইল না, প্রত্যেকেই বুঝি ভয় পেল—আরও কত কি কথা বলে বসতে পারে নীহার।

'কিন্তু ওসব থাক্।' অমিয় বলে উঠল, 'বিনা নায়িকায় অভিনয় করার অভ্যাস আমাদের আছে, সুতরাং উঠে দাঁড়াও কৃষ্ণপ্রসাদ, আনন্দে রিহার্সেল সুরু হোক।'

রিহার্সেল সুরু হয়ে গেল। হরেশকে এই ভূমিকাটা দেওয়া হয়েছে, সে সাজবে কৃষ্ণপ্রসাদ—অচিনপুরীর আদিপুরুষ সে, সুতরাং একজন ঐতিহাসিক পুরুষ। এখন না হয় ধুতি-পাঞ্জাবি প'রে সে দাঁড়াল, কিন্তু স্টেজে যখন সে দাঁড়াবে তখন তার সাজ হবে আলাদা রকমের। একজন খানু নাবিকের বেশে দেখা দেবে সে। কিন্তু তার আক্ষেপ এই যে, যে পারস্য-ললনাকে সে সাদি করে নিয়ে এসেছিল ব'লে নাট্যকার বলেছেন, তাকে একবারও নাটকের মধ্যে আনা হয় নি। আনা হলে একটু মজা করে অভিনয় করা যেত, এমন কি অভিনয় নিয়ে একটু মজে যাওয়াও যেত। যাই হোক, তা নিয়ে হা-হুতাশ করে আর লাভ নেই। কৃষ্ণপ্রসাদের ভূমিকাটি সে প্রাণময় করে তোলার জন্যে বেশ চেষ্টাই করতে লাগল। অভিনয়ে তারা খাটো, এ অপবাদ তাদের আছে। এবার যদি সে পারে তবে দূর করে দেবে সেই অপবাদ।

কেবল প্রথম অঙ্ক দুটিই নয়, অন্যান্য তিনটি অঙ্কের যে কয়টি দৃশ্যে নায়িকা নেই, সেই দৃশ্যগুলিও তারা এগিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। অনেক রাত্রি পর্যন্ত চলেছে তাদের মহড়া। বেশ সমারোহের সঙ্গেই চলেছে কাজ।

হরেশদের উৎসাহ এখন একটু বেশি দেখা যাচ্ছে। যদিও তারা কেউই নায়ক নয়, কিন্তু পাঁচ অঙ্কের এই নাটকে তারা যা পার্ট পেয়েছে, তা বেশ লম্বা। অনেকক্ষণ স্টেজে থাকার সুযোগ তাদের আছে। হয়তো কেবল এইজন্যেই তাদের উৎসাহের মাত্রাও একটু বেশি দেখা যাচ্ছে ইদানীং।

তার ওপর, নাটকের কাহিনীও তাদের বেশ মনের মত হয়েছে। তারা তাই মনে মনে তারিফ করছে স্নেহাংশুকে। লোকটা অমন চুপচাপ-গোছের, কিন্তু গল্পটা ফাঁদতে পেরেছে বেশ ভালো এবং প্রাণে যে রস আছে তার প্রমাণও দিয়েছে বেশ। এর আগে ওর মুখে কাহিনীর কাঠামোটা শুনে তেমন বুঝতে পারে নি তারা; এবার নাটকটার ভিতরে ঢুকে তারা দেখছে স্নেহাংশুটা সত্যিই একটা জিনিয়স, সত্যিই একজন নাট্যকার।

সেদিন ওরা আগে থেকেই এসে বসে আছে মোমিনপুরের রিহার্সেল-বাড়িতে। নাট্যকার আসে নি, অমিয় আসে নি, বিকাশ-মনোজ-রেবতীও আসে নি। হরেশ দীপক নীহার আর বীরেন বসে-বসে আলোচনা করছে, আর মনে-মনে উচ্চারণ করে যাচাই করে দেখছে তাদের পার্ট ঠিক-মত মুখস্থ হয়েছে কি না।

ক্রমে-ক্রমে ঘনিয়ে এল সন্ধ্যা। মোমিনপুরের এই বাড়িটার কার্নিশে বসে কয়েকটা কাক কোয়া-কোয়া শব্দ করে যেন জানিয়ে দিতে চাইল যে, বেলা আর নেই। ঘরের ঘুলঘুলি থেকে মুখ বার করে কিচমিচ করে উঠল কয়েকটা চড়ুই।

বারান্দায় বসে বিড়ি বাঁধছিল যারা, তারা এখনকার-মত কাজ সাঙ্গ করে উঠি-উঠি করছে। আকাশে ফুটি-ফুটি করে উঠছে কয়েকটা তারা।

ওদের সকলের আসার সময় হয়ে এল বুঝি। ওরা এলেই লেগে যাওয়া যায় রিহার্সেল নিয়ে। হরেশ উঠে গিয়ে একটা আলোর সুইচ টিপে দিল, ঘরের মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল আলো। ফিরে এসে সে জোড়াসন হয়ে ঝুঁকে বসল তার ভূমিকার পাণ্ডুলিপির ওপর। বেশ মনোযোগ দিয়ে ওরা চারজন ঝুঁকে বসেছে। ওরা বুঝি মশগুল হয়ে গিয়েছে নাটকের মধ্যে।

এমন সময় হঠাৎ কার গলা শুনল তারা? বেশ মিহি গলা, বেশ মোলায়েম গলা, বেশ নতুন গলা?

চমকেই উঠল ওরা চারজন। সোজা হয়ে বসল ওরা চারজন। দরজার দিকে তাকাল ওরা চারজন।

—'রেবতীবাবু আছেন?

'নেই।'

'মনোজবাবু বা বিকাশবাবু?'

উঠে দাঁড়িয়ে কোঁচার প্রান্তটি পায়ের ওপর ছেড়ে দিয়ে দরজার কাছে এগিয়ে এল হরেশ, বলল, 'ওঁরা তো এখনও আসেন নি। এখনই অবশ্য এসে পড়বেন। আপনি—'

'আমি দিবা। আমার নাম দিবা বন্দ্যোপাধ্যায়।'

বাকি তিনজন উঠে দাঁড়িয়েছে ঘরের মধ্যে। তাদের শরীর কণ্টকিত হয়ে উঠেছে নিশ্চয়।

হরেশ বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'আসুন। ভিতরে আসুন। বসুন আপনি। ওরা এসে পড়ল ব'লে।'

নায়িকা সম্বন্ধে যা ভেবে রেখেছিল তারা, তার সঙ্গে কিন্তু মিল নেই একেবারেই। একেবারে নায়িকার মতই নয়। বড়ই সাধারণ আর বড়ই সাদাসিধে দেখতে।

ঘরটা বড়। একটা আলো জ্বেলে নিয়েছিল আগে, এবার আরও

পাশের ’টা আলো জেলে দিল। ...নো ...লের ধুলোপড়া ঝাড়-...লে সেই আলো পড়ে কেমন ...ময় হয়ে উঠল যেন আবহাওয়াটা। ...এই নিরিবিলি নিঃশব্দ পুরাতন ...অট্টালিকার মাঝখানে নায়িকাটির ...হঠাৎ আবির্ভাবে রহস্য বুঝি ...ও ঘনীভূত হয়ে উঠেছে।

হরেশ এতক্ষণ কথা খুঁজছিল। ...কথা দিয়ে কথা আরম্ভ করা ...তাই ভাবছিল সে। আর কোনো ...না পেয়ে সে বলল, ‘কোনো ...সুবিধে হয় নি?’

‘কিসের অসুবিধে?’ জিজ্ঞাসা ...ল দিবা।

‘এখানে আসতে। এই জায়গাটা ...জে নিতে?’

‘ওঃ এই কথা?’ দিবা বলল, ...তুন জায়গায় আসতে ওটুকু ...সুবিধে হয়েই থাকে। দোকানদারদের ...জ্ঞাসা করে নিলাম, তারা দেখিয়ে ...ল। তার ওপর মনোজবাবুরাও ভালো করেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, কোথায় নেমে কিভাবে আসতে হবে। অসুবিধে তেমন কিছু হয় নি।’

বীরেন বলে উঠল হঠাৎ, ‘আপনার কিন্তু ভীষণ সাহস। বড় রাস্তা থেকে আপনি ঢুকে পড়লেন অন্ধকার গলির মধ্যে ওই দোকানদারদের কথায়?’

হাসল দিবা বন্দ্যোপাধ্যায়, বলল, ‘ওটা সাহস নয়, ওটা অভ্যাস। এই-ই তো আমাদের কাজ। কত অচেনা জায়গায় অনবরতই যেতে হচ্ছে।’

‘ও ইয়েস!’ হরেশ বলল, ‘আপনার সঙ্গে পরিচয় করেই দেওয়া হয় নি। ইনি হচ্ছেন বীরেন পালিত অধ্যাপক; উনি দীপক মিত্র—পোর্টট্রাস্টের কর্মী, সব ব্যাপারেই ওঁকে ট্রাস্ট করা যায়।’ বলেই হেসে উঠল হরেশ, ওরাও সে হাসিতে যোগ দিল। তারপর হরেশ বলল, ‘আর উনি নীহার বসু—ফায়ার ব্রিগেডের কর্মী, আমরা ওর ডাকনাম দিয়েছি ফায়ার।’

সকলে নমস্কার ও প্রতি-নমস্কার করল। এবং সেই সুযোগে ওরা দিবা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে তাকে ভালো করে দেখে নেবার চেষ্টা করল।

তিনটি আলো জ্বলছে ঘরে, ঐ আলো তিনটির জন্যেই ঘরটি এমন আলোকিত হয়ে উঠেছে, কিংবা অন্য কোনো কারণে? এবার ঐ আলোতে নায়িকাটিকে যেন বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে, প্রথম-দর্শনে এমন মনোরম তো লাগে নি। বেশ স্ত্রী, বেশ স্মার্ট, বেশ নীট, বেশ ক্লীন, বেশ ছিমছাম, বেশ সুশ্রী, বেশ সাদাসিধে।

হরেশ বলল, ‘ওদের পরিচয় তো জানলেন। এবার আমার সঙ্গে পরিচয় করে দিই, আমার নাম—’

বারান্দায় অনেকগুলো পায়ের শব্দ একসঙ্গে বেজে উঠল। এসে গেছে ওরা।

খুব আনন্দের দিন আজ, খুবই তৃপ্তির দিন। এবং অন্তত স্নেহাংশুর কাছে খুবই উৎসাহের দিন। তার রচিত নাটকে অভিনয় করার জন্যে অবশেষে এসে গিয়েছে সেই বহু-প্রতীক্ষিতা নায়িকা। স্নেহাংশু নায়িকার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল। সে তার স্বপ্ন দিয়ে গড়ে তুলেছে নাটক, তার ইচ্ছা দিয়ে নির্মাণ করেছে নায়িকা। তা সেই স্বপ্নের এবং সেই ইচ্ছার সঙ্গে এই মেয়েটির মিল সে হয়তো খুঁজতে লাগল। মিল খুঁজে পেল কি না, সে কথা সে প্রকাশ করল না, কিন্তু তার মন বেশ প্রফুল্ল হয়ে উঠল। নাট্যকারের পক্ষে যতটা স্থির ও গম্ভীর হয়ে থাকার কথা, তার চেষ্টার ফলে তার মাত্রা বুঝি একটু বেশিই হয়ে গেল। স্নেহাংশুকে বড় কঠোর-কঠিন ও অস্বাভাবিক বলে মনে হতে লাগল।

মনোজ বিকাশ আর রেবতীর কাছে এ মেয়ে নতুন না। এদের

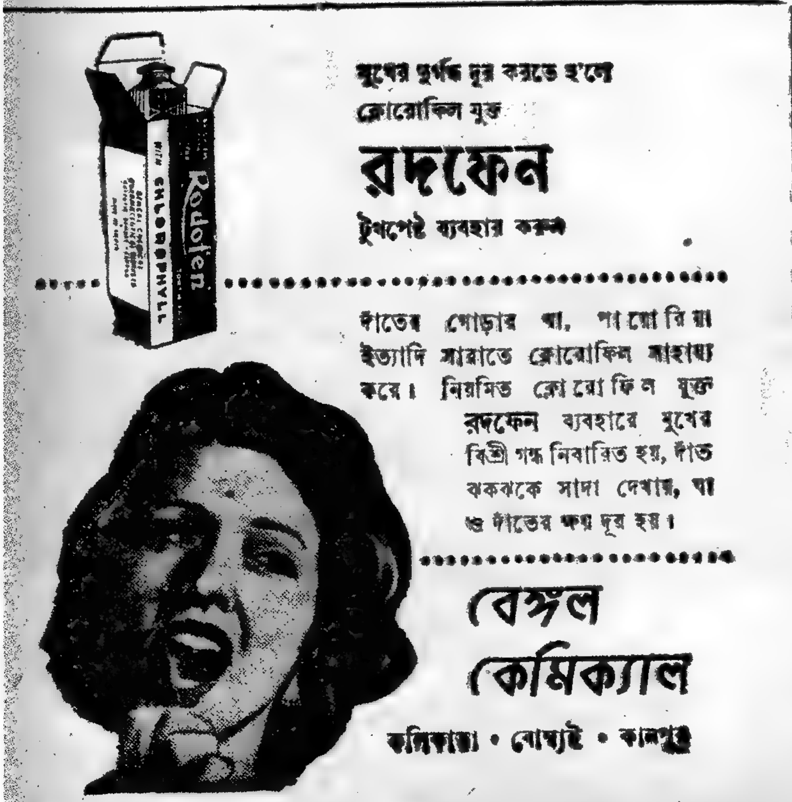

সঙ্গে পরিচয় করে দেবার তাই কোনো প্রশ্ন ওঠে না।

মনোজেরা সকলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসল। বসেই মনোজ বলল, 'এরা কিন্তু সকলে অধীর হয়ে উঠেছিল। আর সহ্য করতে পারছিল না এরা।'

দিবা দেবী এ কথার মানেটা বুঝবার বা এ কথার উত্তর দেবার আগেই হরেশ বলে উঠল, 'অসহ্য। অসহ্য এই হাংলামো। ওসব কোনো কাজের কথা নয় দিবা দেবী, আমরা কেউই অধীর হই নি, বরঞ্চ মনোজই অস্থির হয়ে উঠেছিল, মনোজ হচ্ছে নায়ক আর আপনি নায়িকা, সুতরাং আমাদের কারো অধীর হবার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু ওসব কথা থাক। এখন কাজের কথায় আসুন। ওঁরা দুজন কবে আসবেন?'

'কারা? কাদের কথা বলছেন?' দিবা জিজ্ঞাসা করল।

'ললনা আর মাধুরী?'

দিবা বুঝতে পারল না কিছু, সকলের দিকেই একবার তাকাবার চেষ্টা করে অবশেষে হরেশের দিকে তাকাল।

হরেশ বলল, 'তাও তো বটে। আপনার জানবার কথা নয়। আপনি জানবেন কি করে। নাটকটা তো আপনি সব পড়েন নি। ওদের নাম না জানবারই কথা। বলছিলাম, আরও দুটি মেয়ে আপনি নাকি আনবেন শুনেছি?'

দিবার উত্তর দেওয়ার দরকার হল না। উত্তর দিল রেবতী, সে বলল, 'তাদের আনলেই হবে পরে। ওসব এখন থাক। এবার রিহার্সেল আরম্ভ হোক।'

সকলে একমত হল এ বিষয়ে।

মনোজ উঠে এসে দিবার পাশে বসল। তারপর পরিচয় করে দিল সুহাংশুর সঙ্গে ও অমিয়র সঙ্গে। বলল, ইনি নাট্যকার, আর উনি কর্ণধার। এঁর লেখা নাটক না হলে আমাদের চলে না, আর ওঁর তদারক-তত্ত্বাবধান ছাড়া আমরা অচল। আর ওঁরা হচ্ছেন—'

মাঝখান থেকে হরেশ বলল, 'বাদ গেল মাত্র একটি বেচারী। আর সবার সঙ্গে পরিচয় উনি সেরে নিয়েছেন।'

'কে বাদ গেল?' জিজ্ঞাসা করল মনোজ।

উত্তর দিল দিবা, বলল, 'বাদ গেছেন উনি। নিজের পরিচয় নিজেই দিচ্ছিলেন, এমন সময় আপনারা এসে পড়ায় বাধা পড়ে গেছে।'

হরেশ হেসে বলল, 'আমি কেহ নহি, আমি শুধু দীনকর্মী—কাজ করি টাঁকশালে। অজস্র অর্থের মধ্যে আমার কর্মজীবন কাটে।'

(ক্রমশঃ)

ছায়াবৃতা

শ্রীঅনিলেন্দু ভট্টাচার্য

পৃথিবী এখানে আজ উদাসীন।
আলোকহীন পৌষের পিঠে পিঠ দিয়ে
মনে হয়, আমি আজ হেঁটে যেতে পারি
নীলকান্ত এ আকাশ যেখানে মিশেছে ওই
ধনুবাঁকা, ধানকাটা মাঠের ওপাশে।

মনের মাঠের থেকে ভালোবাসা খুঁজে নিতে পারি
যদি বলো তুমি। তোমার কুন্তল জুড়ে
কয়েকটি কাশফুল এখন না হয় আমি দিলাম যতনে;
তারপরে অন্ধকার এসে, পশ্চিমের অস্তে রাঙা
কিছুটা আবীর—তোমার কোমল মুখে ছড়িয়ে দিয়ে
ফাগুনের দিনকে যদি করি বা স্মরণ, ক্ষতি হবে?

কি জানি এ কেন হোল:
মনের প্রান্তে আজ একটি মানুষ আমি দেখি
আত্মমগ্ন আনন্দের দু'বাহু তুলে
তোমার মুখের ছবি এঁকেছিলো ভুলে—!

কোন প্রাচীনের খেদ

কমলেশ চক্রবর্তী

কী করে ভুলকে তুমি আরেক বৈশাখে
চাঁপার কলির মতো রক্তিম অঙ্গুলি
দীপ্তিমান আরণ্যক তর্জনীরে তুলি
হেলায় করেছ দান সে-প্রেমহীনকে।

বেদনার প্রসন্নতা। আজ দায়ভাগ
সমস্ত পৃথিবী জুড়ে পর্বত হলো সে,
কদম্বের ফুলবনে বর্ষরের রোষে
ওষ্ঠে কর্ণে চুম্বনের লিপ্সা রেখে যাক।

আত্তিমর হে পূর্ণতা বৈশাখ সম্মুখে,
অন্তত তৃষ্ণায় জল, কাতর বিলাপে
রোদনের উত্তোরল মর্মর উত্তাপে
প্রথম প্লাবন দাও শোকাচ্ছন্ন বুকে।

প্রার্থনা বিলাস হও অথবা পঙ্কজ
নিমেষ নিষ্ঠুর আর অবর সহজ।।

বঙ্গ দর্শনে

● কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন মঞ্চে দণ্ডায়মান শ্রীকামরাজ নাদার, শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ও শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী।

রাজধানী :

প্রায় দশ বছর পর শহর কলকাতা ও আশেপাশের শিল্পাঞ্চলে পূর্ণ রেশন প্রথা চালু হয়েছে। উদ্বোধন করেছেন কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মণিয়ম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর তিনি রেশনের খাদ্য বিক্রি করেছেন রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের কাছে। অনুষ্ঠানে শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেদিন একটি খাঁটি কথা বলেছেন—রেশন ব্যবস্থা একটা বড়রকমের পরীক্ষা। এই বিরাট কর্মকাণ্ডটি সফল করার জন্য জনসাধারণের সহযোগিতাও তিনি চেয়েছেন।

জনসাধারণ তো হাত বাড়িয়েই আছেন। তাঁদের সহযোগিতা সরকার গ্রহণ করলেই তাঁরা কৃতার্থ হবেন। চরম সহনশীলতার পরিচয়ও দিয়েছেন তাঁরা।

এই কর্মকাণ্ডের সাফল্যের ওপরই নির্ভর করবে এ রাজ্যের খাদ্যনীতির সার্থকতা। এ ব্যবস্থা বানচাল হলে ভেঙ্গে পড়বে সারা বাংলার অর্থনীতি। এ-কাজে ব্যর্থ হলে চোরাকারবারীদের খপ্পরে পড়তে হবে নতুন করে। তারা ধরবে তখন চারদিক থেকে টুঁটি চেপে। এই কথাটা সরকার তাঁদের আমলাদের বুঝিয়ে দায়িত্ব যথোপযুক্ত-রূপে পালনে বাধ্য করতে পারলেই সাফল্যের পথ সুগম হবে অনেকটা।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মণিয়ম তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেছেন, রেশনের খাদ্য নিম্নমানের হলে, যারা তার জন্য দায়ী, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য বর্ণনাকালে বলেছেন, দুর্ভিক্ষ, ক্ষুধা ও দারিদ্র্য নিয়ন্ত্রণ এবং চাষীকে ন্যায্যমূল্য দানই হল রেশন ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্য। ঠিক এই কথাগুলোই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সেদিন পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রীও উচ্চারণ করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর মত আমরা সপ্তাহের বরাদ্দ রেশন কিনেছি। তাঁর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীকে দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে, নিম্নমানের চাল দোকান থেকে সরবরাহ করা হচ্ছে। সে চালের ভাত খাওয়া কঠিন। নতুন ও পুরোনো চাল মিশিয়ে দেওয়ায় অর্ধেক তার সিদ্ধ হচ্ছে না—বাকি যাচ্ছে একেবারে গলে। চিনির সঙ্গে অনেক অখাদ্যই মিশে আছে। মুখ্যমন্ত্রী এ-বিষয়ে অনুসন্ধান করে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করলে, আর কিছু না হলেও, জনসাধারণের মুখে তিনি দেখতে পাবেন পরিতৃপ্তির হাসি। জনসাধারণকে পরিতৃপ্ত করতে পারলে সহযোগিতার অভাব কোনদিনই হবে না।

খাদ্যদপ্তরের কর্মচারীদের অকর্মণ্যতায় হাজার হাজার পরিবার পায় নি এখনও তাদের রেশন কার্ড। শহর কলকাতায় রেশন চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শহরতলীর রেশনবহির্ভূত এলাকার ঘরে ঘরে হাহাকার উঠেছে। চাল-গম-চিনি লোপাট হয়ে গেছে বাজার থেকে। ন্যায্যমূল্যের দোকানেও আংশিক রেশন মিলছে না। দোকানগুলো সরবরাহ পেতো দমদম, ব্যারাকপুর, পাণিহাটি, খিদিরপুর প্রভৃতি অঞ্চলের গুদাম থেকে। এসব এলাকাই এখন নিয়ন্ত্রণের বেড়াজালে আটকা। এ সঙ্কট সরকারী কর্মচারীদেরই সৃষ্টি। খোদ মুখ্যমন্ত্রীরও অজানা থাকার কথা নয়। গোড়াতেই যাঁদের এত বড় ভুল হয়, তাঁদের কর্তৃত্বাধীনে এই বিরাট কর্মকাণ্ড কতটা সফল হবে, এ মুহূর্তে বলা শক্ত। এঁদের ভুলের মাশুল দিতে হচ্ছে বরাবর সাধারণ মানুষকেই। কাজেই জনসাধারণকে তাদের দায়িত্বের কথাটা বার বার স্মরণ করিয়ে দেবার আগে যাঁদের ত্রুটিতে জনসাধারণের প্রাণ বাঁচানো দায় হয়ে ওঠে, তাঁদের সতর্ক করে দেওয়া ভাল।

• • •

কারো সর্বনাশ, কারো পৌষ মাসের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা কে, কবে, কি অভিজ্ঞতার থেকে বলেছিলেন, তার ঐতিহাসিক তথ্য এখনও উদ্‌ঘাটিত হয় নি। পৌষের সর্বনাশের পালাটা এ বছর পুরাদমে চলেছে পশ্চিম বাংলার দিকে দিকে। চাল, ডাল, তেল, মশলাপাতি প্রায় হাতছাড়া হয়েছে। মানুষের দুর্ভোগের অন্ত নেই। তবে, পৌষের জমকালো মেলা বসে নি এমনও নয়। সেখানে চাঁদের হাট ভেঙে পড়েছে। দেশের নেতৃবৃন্দ, ভি-আই-পি, ডেলিগেট, দেশ-বিদেশের সাংবাদিকরা সমবেত হয়েছেন সেখানে। হাঁকডাক, সমারোহ ও জাঁকজমকে দুর্গাপুর পরিণত হয়েছে ইন্দ্রপুরীতে। পশ্চিমবঙ্গের

● শ্রীসুব্রহ্মণিয়ম মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের নিকট সপ্তাহের রেশনের বরাদ্দ চাল, গম, চিনি বিক্রয় করছেন।

সাধারণ মানুষের বুকে যখন পৌষের আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে, তখন তাদের কাছ থেকেই সংগৃহীত টাকায় সেখানে হচ্ছে রাজসূয় যজ্ঞ। লক্ষপতিরা কি পরিমাণ টাকা দিয়েছেন এ রাজসিক কাজে জানি নে। পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের আসল অধিনায়ক শ্রীঅতুল্য ঘোষের ঘোষণা অনুযায়ী সাধারণ মানুষের কাছ থেকেই টাকাটা এসেছে।

কংগ্রেসের এ অধিবেশনে তিনিই 'ডাইনামিক ফিগার'। তারপরই নাকি শ্রীসুব্রহ্মণিয়মের স্থান। মোরারজীভাই প্রভাব বিস্তারের জন্যও আকুলি-বিকুলি কম করেন নি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যর্থতার সমালোচনায় তাই তিনি একেবারে বেসামাল হয়ে শ্রীমিশ্রের ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের এ উদ্যম অবশ্যম্ভাবী। তিনি এখন নাকি মন্ত্রিসভায় ফিরে আসার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন।

দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে ব্যর্থতার জন্য ওয়ার্কিং কমিটীকে বোধ হয় এর আগে কোনদিন এত তিক্ত সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয় নি। সবচেয়ে কঠোর সমালোচনা করেছেন মন্ত্রী রামসুভগ সিং। সমালোচনার প্রধান কথাই ছিল অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগুলোর বাস্তব রূপায়ণ। সমালোচকদের মতে কংগ্রেস শুধু প্রস্তাব পাশ করেই খালাস হয়—কাজের কাজ কিছুই হয় না। এ প্রসঙ্গ প্রথম তুলেছিলেন শ্রীজগজীবন রাম। কোন কোন সদস্য বলেছেন, দরিদ্র দিন দিন দরিদ্র হচ্ছে এবং টাকার মূল্য ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে।

আলোচনার সুরুতেই চারদিক থেকে উথালি-পাথালি তরঙ্গের গর্জন দেখে প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী দু-একবার এগিয়ে এসে হাল ধরতে চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু ফল অত্যন্ত খারাপ দেখে নাকি হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন।

আবাদী কংগ্রেসের অধিবেশন থেকে দেশের মানুষ আশায় বুক বেঁধে বসে আছে। দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে—শোষণের অবসান ঘটবে। প্রস্তাবের সমালোচকগণও দেশের মানুষের মনের কথাটাই তুলে ধরেছিলেন। তাঁদের কথা, ভুবনেশ্বরে ভুবনবিদারী ঢাকের বাদ্যি তুলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প ঘোষণা করা হয়েছিল, তার প্রতিফলন কোথাও মানুষ আজ খুঁজে পাচ্ছে না। চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়াতে পর্যন্ত সে ধরণের অর্থনীতির কোন আঁচ পাওয়া যাচ্ছে না। বড় বড় কথা, বাছা বাছা বুলি মানুষ অনেক শুনেছে। কথামৃত পান করে ধান-দূর্বা হাতে করে বসে থাকতে থাকতে সকলেই ধৈর্যের প্রায় শেষ সীমায় এসে পৌঁচেছে। এখন তারা হাতে কিছু পেতে চায়।

প্রস্তাবটি সাব-কমিটীর হাতে সামান্য পরিবর্তনের পর গৃহীত হয়েছে। এটাই রীতি। তবু, শুভ লক্ষণ দেখা দিয়েছে বলতেই হবে। কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাই বচনামৃত বিতরণের অসারতাটা উপলব্ধি করেছেন। প্রস্তাবে খাদ্যশস্য উৎপাদনের ওপর গুরুত্বের কথা রয়েছে এবং অতীতের অক্ষমতার কথাও ব্যক্ত হয়েছে। এ সবই পুরোনো উক্তি। অক্ষমতা ও ব্যর্থতার স্বীকারোক্তি আগেও আমরা শুনেছি। শুনি নি প্রতিকারের বাস্তব-পন্থার কথাটাই তারপরই দেখা গেছে, সমানে গোঁজামিলের বাহার। সমাজতন্ত্রের আসল ত্রুটি কেউ কোনদিন সামনে তুলে ধরতে পারেন নি।

দুর্গাপুরের অধিবেশনে ভুবনেশ্বরের সে উদ্যম, উৎসাহ ও উজ্জ্বলতা ছিল না। ভুবনেশ্বরের উল্লেখ বার বার নানা আলোচনায় এবং প্রস্তাবে করা হয়েছে মাত্র। সমাজতন্ত্রের যে পরিকল্পনা সেদিন করা হয়েছিল, তাকে রূপ দেবার মত উৎসাহ যেন আর কারো নেই। সমাজতন্ত্রবাদী কংগ্রেসসেবীরা এখানে ঠাঁই পান নি বললে অন্যায় হবে না। শ্রীঅতুল্য ঘোষের অনুকম্পার অভাবেই নাকি এবার কংগ্রেস-সোস্যালিস্ট ফোরামের অধিবেশন পর্যন্ত দুর্গাপুরে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে হতে পারে নি। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজের অনুগ্রহ তাঁরা লাভ করেছিলেন। ছয় ও সাত তারিখে বিধান নগরে সোস্যালিস্ট ফোরামের অধিবেশনের কথাও হয়েছিল। পরে অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে তাঁদের জানানো হয়েছে, স্থানাভাবে কিছুই করা সম্ভব নয়—

ঠাঁই নেই ছোট যে তরী
অতুল্যবাবুর সোনার ধানে
গিয়েছে সে ভরি।

এ অবস্থায় সমাজতন্ত্রের পথের পথিকদের পথিপার্শ্বে দাঁড়িয়ে আর্তনাদ ভিন্ন আর কিছু করবারও ছিল না।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মুখ থেকেই প্রথম সে আপশোষের কথাটা শোনা গেছে। ভুবনেশ্বরের পর ঠায় একই জায়গায় দাঁড়িয়ে কিভাবে ঘুরপাক খাচ্ছি, অন্ধকারের মধ্যে কেন হতাশ হয়ে বসে আছি তার কারণ জানতে চাইলে সাংবাদিকদের তিনি বলেছেন, সংখ্যায় কম হলেও ক্ষমতাবান মুষ্টিমেয় নেতার জন্যই সমাজতন্ত্রের বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব হচ্ছে না।

শ্রীমতী গান্ধীর এ-উক্তি নিয়ে বিধান নগরে আলোড়নের সৃষ্টিও হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে ক্ষমতাবান নেতাদের কথা কাটা-কাটিও হয়েছে। শ্রীমতী গান্ধী নাকি তাঁদের বলেছেন, তিনি অন্যায় কিছুই বলেন নি। ঠিকই, তিনি অন্যায় কিছু বলেন নি। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর তিরোধানের পর আমরা পেয়েছি যৌথ নেতৃত্ব। বিরাট পুরুষের অভাবের পর সেটাই স্বাভাবিক। এই যৌথ নেতৃত্বের অন্তরালে গড়ে উঠতে সুরু করেছে শক্তিশালী একটি গোষ্ঠী। যৌথ নেতৃত্ব তাঁদের চাপে অনেকক্ষেত্রেই মৌলিক সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে। এ বিষয়ের আলোচনা বারান্তরে করা যাবে। দুর্গাপুরের চোখ ধাঁধানো রোশনাই সমাজজীবনে কতটা বিস্তার লাভ করছে সেই কথাতেই ফিরে আসি।

পারমাণবিক বোমা নিয়ে চীনের সঙ্গে মোকাবিলার প্রসঙ্গ নিয়েও দুর্গা-পুরে উত্তেজনা কম সঞ্চারিত হয় নি। প্রায় চার ঘণ্টা ধরে উত্তপ্ত আলোচনা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী 'লাঠির বদলে লাঠি চালনার' নীতির অসারতা এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে কতটা সমীচীন, তা' সবিশেষ বিশ্লেষণের পর প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করা হয়—ভারতবর্ষ এখন বোমা তৈরি করবে না।

বিষয় নির্বাচনী কমিটীতে কংগ্রেসের কর্তব্য নিয়ে দীর্ঘ আলোচনাকালে শ্রীঅতুল্য ঘোষ নাকি একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছিলেন। তিনি সকল স্তরের কংগ্রেসকর্মীদের

● কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে সমাগত সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ

জনগণের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ স্থাপনের আহ্বান জানিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গঠনমূলক কাজে জনশক্তি সুসংহত করার দায়িত্বের কথাটা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন কংগ্রেসকর্মীদের। তাঁর এই সদুপদেশমূলক প্রস্তাবটির জয়ধ্বনি না করে সংশোধনপ্রস্তাব তোলা হয়েছিল সতেরটি। পনের জন বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেছেন।

শ্রীঘোষ পশ্চিম বাংলার অবিসম্বাদী নেতা। সারা ভারতেও সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। পশ্চিম বাংলার মাটিতে ভক্তদলপরিবেষ্টিত অবস্থায় তাঁর এমন দুর্দশা—তাঁর প্রস্তাবের বিরোধিতা কল্পনারও অতীত। একজন সংবাদদাতা বলেছেন,—

'At one stage Mr. Ghosh speaking in English appeared to lose his temper as he flayed critics of Congress.'

আগেই বলেছি অতুল্যবাবুর পরেই দুর্গাপুরে শ্রীসুব্রহ্মণিয়ম স্থান পেয়েছেন। অতুল্যবাবুর প্রস্তাবের সমাপ্তি প্রস্তাব এনে শেষ পর্যন্ত তিনিই নাকি মান রক্ষা করেছেন।

প্রস্তাবের সমালোচনাকালে অনেকেই নাম-ধাম না উল্লেখ করে দলের ও সরকারের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন। প্রস্তাবে তার কোন পরিষ্কার উল্লেখ না থাকাতে তাঁরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তাঁর বার্ষিক খতিয়ানে জানিয়েছেন, কংগ্রেসের শক্তি ও প্রতিপত্তি দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। প্রমাণস্বরূপ তিনি উপনির্বাচনের ফলাফল এবং সে ক্ষেত্রে কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের উল্লেখ করেছেন। কংগ্রেসী শাসনে মানুষ যখন নিষ্পেষিত, কংগ্রেসের ঘরোয়া কোন্দল যে সময় বাইরে সব চাইতে বেশি ছড়িয়ে পড়েছে, তখন কেন এমন ফল উপনির্বাচনে হ'ল, তার কোন কারণ তিনি দেখান নি। তা' ছাড়া, নির্বাচনের ফলাফল দিয়ে বিচার গণতান্ত্রিক নিয়ম হলেও, সে বিচার অভ্রান্ত নয়। পাকিস্তানের নির্বাচনের ফলাফলই তার জলন্ত প্রমাণ।

কংগ্রেসের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা সত্যিই এখনও আছে। এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। সে আস্থা বৃদ্ধি হয়ে থাকলে তার জন্য কংগ্রেসের গর্বের কিছু আছে কি? বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতের কোন মিল নেই। স্বাভাবিক গতিতে যাদের শক্তিশালী বিরোধী দল গঠনের কথা ছিল, তারা আজ তেভাগা হয়ে পড়েছে। তাদের বেপরোয়া কার্যকলাপ, বিদেশীর সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার গোপন কথা ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর মানুষের চিত্ত থেকে তারা ছিটকে অনেক দূরে সরে গেছে। এ অবস্থায় পরগাছা ত্যাগ করে যে সংস্থার শিকড় মাটিতে ছড়িয়ে পড়েছে তার দিকে মানুষ ঝুঁকে পড়তে বাধ্য। কংগ্রেসের নেতারা যেন তা' না ভুলে যান।

দুর্গাপুরে আয়োজনের কোন ত্রুটিই রাখা হয় নি। এত সমারোহের পরও স্পেশাল ট্রেনে দুর্গাপুরের যাত্রীর বড় অভাব। বাসের মালিকরা নাকি লোকসান দিচ্ছেন। জনতা ক্যান্টিনেরও সেই দুরবস্থা। শেষের দুদিন লোক সমাগমও আশানুরূপ হয় নি। দশ লক্ষ লোকের ব্যবস্থা করেছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান। সংবাদপত্রে প্রায় প্রতিদিনই দুর্গাপুরের আকর্ষণের বিজ্ঞপ্তি স্থান পেয়েছে। তবু এ অবস্থা কেন?

নেতারা একটু ধীরচিত্তে বিষয়টির পর্যালোচনা করলে দেখতে পাবেন, মুখে যত কথাই বলুন, তাঁরাও আজ সাধারণ মানুষের কাছাকাছি নেই। বিধান নগরে সকলের প্রবেশাধিকার ছিল কি? সারা ভারতের বাছাই করা সাদা পোষাকধারী পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি, তাদের সন্দিগ্ধ চাহনীর সামনে সাধারণ মানুষ আর এগোতে পারে নি। সাধারণ মানুষের জন্য দুর্গাপুরে স্থান সত্যি ছিল না। সেখানে বসেছিল পৌষের আনন্দের মেলা। সে আনন্দের অংশীদার যাঁরা নন, তাঁরা এ দুর্দিনের বাজারে গাঁটের পয়সা খরচ করে তামাসা দেখতে যেতে পারেন কি। গাঁটের পয়সা খরচ করে যাঁরা তামাসা দেখতে পারেন, তাঁদের কথা ঋষিপ্রতিম বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের বলে গেছেন, কাজেই আমি আর উল্লেখ করলাম না।

পকেট যাদের ভারী তাদের পেছনে দুর্গাপুরে চোর, জুয়াচোর ও পকেটমারের সমাবেশও হয়েছিল প্রচুর। এসব পকেটমারও মানদার আদমী। ভেতো বাঙালী কেউ নয়। রীতিমত ধোপ-দুরস্ত ভদ্রবেশী পকেটমার। যেখানে লাখ লাখ টাকার কারবার সেখানে ছিঁচকে পকেটমারের স্থান থাকতে পারে না। স্থান ও কালের মর্যাদা রক্ষা করেছে তারা। তাদের বুক পকেটে কংগ্রেসের পবিত্র ব্যাজও নাকি পাওয়া গেছে।

দুর্গাপুরের খুবধারের মধ্যে পকেটমাররাও বুকে ব্যাজ এঁটে প্রবেশের অধিকার পেয়েছে—পায় নি কংগ্রেসের প্রতি আস্থাবান সরল গ্রামের মানুষ। তাদের অভ্যর্থনার কোন ব্যবস্থাই কংগ্রেসের অধিবেশনে ছিল না। দেশের স্বাধীনতা লাভের পর রাতারাতি যাঁরা কংগ্রেস ভক্ত হয়েছেন, ব্যক্তিগত স্বার্থের চরিতার্থের আশায় কংগ্রেসের সাদা টুপি মাথায় রেখে যাঁরা দিনের পর দিন মানুষকে ঠকিয়ে প্রচুর অর্থ আহরণ করছেন, তাঁদের সমাগম দুর্গাপুরে কম হয় নি। দুর্গাপুরের আসর নাকি তাঁরা অধিকার করে বসে ছিলেন।

শালীনতা, শোভনতা রক্ষার খাতিরে দুর্গাপুরে পরস্পরের প্রতি তেমন কর্দম নিক্ষেপ না হলেও এ অধিবেশনে কংগ্রেসের রূপটা ধরা পড়েছে অনেকখানি। কংগ্রেসের 'ডিসিডেণ্ট গ্রুপ' অর্থাৎ বিবাদী

কংগ্রেসের স্বরূপটা খুলে পড়েছে। যাঁরা কংগ্রেসের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিবাদীদের সুরটাই বেজে উঠেছিল বেশি করে। কিন্তু কোন বিবাদেরই ফয়সালা দুর্গাপুরে হয় নি। এমন কি, জাতীয় অর্থনীতির কোন মৌলিক কথাও পরিস্ফুট হয় নি। দুর্গাপুর থেকে কোন আশার বাণী, সঙ্কট থেকে উদ্ধারের পথনির্দেশ মানুষ পায় নি।

নদীয়া:

সপ্তাহ কয়েক আগেও হাঁসখালি সরগরম ছিল। ছোট-বড় অনেক নেতা, মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর সমাবেশ হয়েছিল উপনির্বাচন উপলক্ষে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায়ও এসেছিলেন। তিনি দেশের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির দায়িত্বটা বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর চাপিয়ে দিয়ে গেছেন। তাঁদের প্রচারকার্য সফল হয়েছে। কংগ্রেসপ্রার্থী জয়লাভ করেছেন। এ কেন্দ্রে বিধানসভার প্রতিনিধি আগেও কংগ্রেস সদস্যই ছিলেন।

হাঁসখালি এলাকার কয়েকটি গ্রামে কলেরার প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। প্রতিদিনই রোগের সংক্রমণ বৃদ্ধির সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। পারবাচিকানারীতে এ রোগে দুজনের মৃত্যুও হয়েছে। কলেরার আক্রমণের খবরটা সংশ্লিষ্ট কর্তাদের গোচরেও আনা হয়েছে। কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা হয় নি। গ্রামবাসীরা নিশ্চয়ই স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করতে পারে, কলেরার প্রতিষেধক টীকা যথাসময়ে কেন দেওয়া হল না? এ প্রশ্ন অত্যন্ত সঙ্গত। কারণ এ কাজে বিরোধীদলের কেউ বাধা দিতে আসে নি। স্বায়ত্তশাসনদপ্তরের মন্ত্রী, নবদ্বীপের তথাকথিত জাঁদরেল কর্মী শ্রীফজলুর রহমানকে জানিয়ে রাখছি, গ্রামাঞ্চলের নলকূপ অকেজো হয়ে পড়ে আছে। মানুষ বাধ্য হয়ে চূর্ণী নদীর জলই ব্যবহার করছে। নির্বাচনী প্রচারের সময় তাঁর কণ্ঠটাই শেষ মাথে উঠেছিল।

জজের চাইতে দারোগার মর্যাদা ছিল গাঁয়ের মানুষের কাছে বেশি। দারোগাদের দাপটে গ্রামে তখনকার দিনে থরহরি কম্প উঠতো। পশ্চিম বাংলার সীমান্ত এলাকার পুলিশের অত্যাচার দেখছি সেটা বজায় রেখেছে। ছোট ছোট ব্যবসায়ী, রিক্সাওয়ালা, ও চাষীরা তাদের প্রসন্ন করতে না পারলে, পরিতৃপ্তির হাসি মুখে ফোটাতে না পারলেই বিপদে পড়ছে। অথচ এই পুলিশ বাহিনীর প্রচ্ছন্ন সহায়তালাভ করছে চোরাকারবারীরা। সান্ধ্য আইনের পুরোপুরি সুযোগ নিয়ে রাত্রির অন্ধকারে নির্বিবাদে মাল পাচার করছে পূর্ব-পাকিস্তানে। নদীয়ার মানুষ চিনি

শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায়

পাচ্ছে না অনেকদিন। নবদ্বীপের চায়ের দোকানে গুড় চলছে। ডালও বাজারে নেই। আমাদের কর্তারা একটু সজাগ হলেই দেখতে পাবেন জেলার বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ মাল—কলাই নিয়ে কি ধরণের চোরাকারবার চলছে। সীমান্ত এলাকার পথ ছাড়াও লালগোলার ট্রেনে মুর্শিদাবাদ হয়ে প্রতিদিন কলাই চলে যাচ্ছে পাকিস্তানে।

বর্ধমান:

দুর্গাপুর নাকি বর্ধমানের তহবিল ধরে টান দিয়েছে। কেউ কেউ বলছেন, দুর্গাপুরের বিরাট খরচের পর জেলার জনহিতকর কাজে অর্থাভাব হওয়া স্বাভাবিক। জেলার কৃষিবিভাগ, উন্নয়ন-বিভাগ, জনস্বাস্থ্য-বিভাগ এবং প্যাকেজ প্রোগ্রামের কর্মচারীরা পর্যন্ত সরকারী জীপে অবিরাম ছুটোছুটি করছেন দুর্গাপুরে। কেউ কেউ নাকি সেখানেই পড়ে আছেন। বিভিন্ন রুটের প্রায় শ'খানেক বাস রিজার্ভ করা হয়েছে দুর্গাপুরের জন্য।

দুর্গাপুরে যখন রাজসূয়যজ্ঞের আয়োজন চলছিল, তখন বর্ধমানে চাষীরা মিলিত হয়েছিল ধানের ন্যায্যমূল্যের দাবি নিয়ে। সরকার অনেক ভেবেচিন্তে ধানের দাম ঠিক করে দিয়েছেন। এরপর চাষীর কোন আপত্তি না থাকাই উচিত। তাদের আপত্তিগুলো প্রকাশ্য সভাতেই শুনবো ভেবেছিলাম। কিন্তু সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্যই শেষ পর্যন্ত সৃষ্টি হয় হট্টগোলের।

হট্টমেলাই আমাদের সর্বত্র। তা না হলে, ধানের দাম যাঁরা বেঁধেছেন, তাঁরা একবার ভেবে দেখতেন তেলের দাম, চালের দাম, তরিতরকারীর দাম, হালের খরচ, বলদের আহার, বিচালীর মূল্য এবং খইল ও অন্যান্য সারের মূল্য দেবার পর ধানের দামটা কত হওয়া উচিত। স্থানাভাবের জন্য হিসেবটা এবারে আর দিতে পারছি নে। আমাদের কৃষিদপ্তরের বড়বাবুদের ওপরই সে ভারটা দিচ্ছি। তবে, এইটুকু মাত্র জানিয়ে রাখি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পর সরকারী নির্ধারিত সোয়া পনের টাকা দরে ধান বেচে আসলে একজন চাষী সোয়া ন' টাকার বেশি পাবে না। কৃষিদপ্তরের সেক্রেটারী ও ডিরেক্টার বাহাদুর ভিন্ন তথ্য দিলে আমরা খুশিই হবো।

স্থানাভাবের দরুণ এ সপ্তাহে 'বাণিজ্যে সেকাল ও একাল', 'গ্রন্থমেলা' ও 'পাঠকমন' প্রকাশ করা সম্ভব হলো না।

—সম্পাদিকা

প্রথম বার ঘোষিত হল।

দুর্যোগপূর্ণ রাত্রি। বর্ষণ আর বাতাসের হা-হা রব কানে বাজছে। বিনিদ্র রয়েছেন জাহানারা। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে তাল রেখে তাঁর মনের প্রবল ঝঞ্ঝা চলেছে। নিজের মহলের দীর্ঘ অলিন্দে চাবতাই কুমারী অস্থিরভাবে পদচারণা করছেন। থেকে থেকে তাঁর চোখের ওপর ভেসে উঠছে বৃষস্কন্ধ, মহাবাহু যৌবনদৃপ্ত সেই পুরুষের ছবি

যৌবনভারপীড়িতা জাহানারা জাফরি-কাটা মর্মর প্রাচীরের আড়াল থেকে দিওয়ানি-আমে আগত অনেক পুরুষকে দেখেছেন। হৃদয় স্পর্শ করেছে অনেকেই কিন্তু এভাবে দাগ কেটে যায় নি কেউ। দ্বিপ্রহরে শাহনশাহ কথায় কথায় জানিয়েছিলেন, সন্ধ্যায় দরবারে বুন্দেলারাজ আসবেন।

মেহদী-চর্চিত আঙুল দিয়ে নিজের চূর্ণকুন্তল যথাস্থানে রেখে জাহানারা বললেন, তিনি তো খুব বীর শুনেছি বা-জান?

—এত অল্পবয়সে এরকম সাহসী যোদ্ধা দেখা যায় না। চৌহান-রাজপুত-বংশের উজ্জ্বল রত্ন বুন্দেলারাজ।

শাহজাহান যাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ, সেই বীরকে দেখবার জন্যে অধীর হলেন শাহজাদী। সম্রাট দরবারে গিয়ে বসার পরই স্ফটিক-জালির সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। বিস্ফারিত মুগ্ধ নয়নে দেখলেন, বহু যুদ্ধে জয়ী বুন্দেলারাজ রাও ছত্রশালকে। বিবশা জাহানারা হৃদয় হারালেন সেই মুহূর্তে। দ্রুত কম্পিত পায়ে নিজের মহলে ফিরে এলেন। কি দেখলেন—কি দেখলেন তিনি। সাক্ষাৎ দেবদূত দিওয়ানি-আম আলো করে রয়েছেন যেন।

মোগল-কুমারী কি রাজপুতরাজকে জীবনসঙ্গী করতে পারেন না? রাজপুত-বালারা রাজনৈতিক কারণে মোগল শাহাজাদাদের তো মালা দিয়েছে! কিন্তু—গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করেন গীর্বাণ গণিক জাহানারা রাজপুত-রাজবালা আর মোগল শাহাজাদীদের একত্র সারিতে ফেলা যাবে না। অনেক পার্থক্য। অনেক—। প্রাতঃস্মরণীয় আকবর আদেশ দিয়ে গেছেন, তাঁর বংশের কোন কন্যার বিবাহ হবে না। সেই আদেশ কঠোরভাবে পালিত হয়ে আসছে।

এক এক সময় জাহানারার মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এ কি অবিচার।

গোলাপের পাপড়ির মত দুচোখের পাতা ভিজে ওঠে, কখন-কখন। কেন তিনি এত গরিমা নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেন? কেন তাঁর জন্ম হল না কোন দীন-দরিদ্র ভিস্তিওয়ালার ঘরে? এই রূপ, এই যৌবন হেলায় নিঃশেষ হয়ে যাবে?

শাহজাহান সময় সময় নিমরাজী হন। কন্যাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন,

শিলালেখ

সন্ধ্যার একাকীত্ব তাঁর হৃদয়ে বাজে। আদরিণী জেহানের শাদির কথা চিন্তা করেন। আবার এক ফুৎকারে সে ইচ্ছে নিভে যায়। বংশের ঐতিহ্যকে কঠোরভাবে পালন করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

সেদিনের কথা পরিষ্কার মনে পড়ে জাহানারার। তাঁরই জন্য একটি সুন্দর জীবন নষ্ট হয়ে গেল। নওরোজ উৎসবের পরই, শায়েস্তা খাঁ এলেন ভাগিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। কুশল প্রশ্ন বিনিময়ের পর বললেন, তোমার শাদির কথা আমরা চিন্তা করছি।

শাদি! আড়ষ্ট হয়ে গেলেন জাহানারা। মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

—শাহনশাহের কাছে কথাটা তোলবার আগে তোমাকে জানান প্রয়োজন মনে করলাম। ছেলেটি ভাল। শিক্ষিত, সুপুরুষ—পারস্যের এক অভিজাত পরিবারের রক্ত তার শরীরে বইছে। আজ তোমার মা আর্জমান্দ বানু বেঁচে নেই, তোমার ভাল-মন্দের কিছুটা আমার দরকার বৈকি। মত আছে তো?

জাহানারার বুকের মধ্যেটা তোলপাড় করছে। দুর্বার ইচ্ছে জাগছে, প্রশ্ন করেন, বাদশাহজাদীর শাদি! তা কিভাবে সম্ভব। মাতুল বৃদ্ধ ব্যক্তি। কোন প্রশ্ন তিনি তুললেন না। একইভাবে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইলেন। শায়েস্তা খাঁ মৌন সম্মতির লক্ষণ বিবেচনা করে স্থান ত্যাগ করলেন।

জাহানারার শাদির ব্যাপারে শায়েস্তা খাঁর উৎসাহ প্রকাশের বলিষ্ঠ কারণ ছিল। তিনি দরবারে নিজের প্রতিষ্ঠা আরো সুদৃঢ় করতে চান। সম্রাটের নয়নের মণি শাহজাদীর শাদি যদি নিজের এক আত্মীয়ের সঙ্গে দিয়ে ফেলতে পারেন, তাহলে চিন্তার আর কোন কারণ থাকে না। যথাসময়ে কথাটা শাহজাহানের কানে উঠল। অবিলম্বে তিনি শ্যালককে আহ্বান করে বিস্তারিতভাবে সমস্ত কিছু জানতে চাইলেন। শায়েস্তা খাঁ এই আহ্বানের অপেক্ষায় ছিলেন। যতদূর সম্ভব হৃদয়গ্রাহীভাবে পারসিক নাজর খাঁর পরিচয় দিলেন। সসংকোচে পুরনো অবাস্তব ঐতিহ্যকে আঁকড়ে থাকার অসারতা সম্পর্কে মন্তব্য করলেন।

শাহজাহান নরম হয়েছেন বলে মনে হল। প্রশ্ন করলেন, জেহানের মত নেওয়া হয়েছে?

—সে রাজী আছে জাঁহাপনা।

একটু চিন্তা করে শাহনশাহ বললেন, নাজর খাঁকে কাল দরবারে নিয়ে এস। কথা বলে দেখব। কথাটা চাপা রইল না। পল্লবিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারিধারে। বাদশাহ বেগমের শাদি। পরের দিন দিওয়ানি-আমে তিলধারণের স্থান রইল না। উজির, নাজীর, সিপাহসালার, আমীর-ওমরাহ, মনসবদার, রৌজিনদার, তোজীনবীশ প্রভৃতি সকলে যে যার আসন গ্রহণ করলেন। ভুবন-বিখ্যাত তখ্‌ত-ই-তাউসে এসে উপবেশন করলেন শাহনশাহ। নাজর খাঁ কুর্নিশ করে এসে দাঁড়াল। সম্রাট তাকে নিজের কাছে বসালেন। খুশি মনে অনেক কথা আলোচনা করলেন। আমীর-ওমরাহরা উৎফুল্ল হলেন। শাহজাদীর শাদি সম্পর্কে সকলের মনে নিশ্চিন্ততা এল।

নাজর খাঁর সঙ্গে কথা শেষ করে অন্যান্য কাজে মন দিলেন শাহনশাহ। দরবার শেষ হবার পূর্বে আবার আহ্বান করলেন নাজর খাঁকে। মণিমুক্তা খচিত পানদান থেকে সোনালী তবকে মোড়া একটা পান তুলে নিয়ে ভাবী জামাতাকে খেতে দিলেন। সৌভাগ্যের প্রতীক সাগ্রহে গ্রহণ করে মুখে দিল নাজর খাঁ। তারপর—আকাশকুসুম চিন্তা করতে করতে গৃহে ফেরার পথে বিষক্রিয়ার ফলে তাঞ্জামের মধ্যেই তার মৃত্যু হল। কথাটা যথাসময়ে শুনলেন জাহানারা। হতভাগ্য নাজর খাঁর জন্যে বুকের মধ্যেটা টনটন করে উঠল। ধিক্কার এল মনে। পরোক্ষভাবে তিনি কি দায়ী নন ওই যুবার মৃত্যুর জন্য? অন্তরাল থেকে কে যেন চীৎকার করে বলছে, দায়ী—নিশ্চয় দায়ী—

মনের অবস্থা যখন এইরকম ঠিক সেই সময় তাঁর কক্ষে প্রবেশ করলেন দারা—মোগল সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী শাহি বুলান্দ ইকবাল দারা শিকো। তাঁরও মুখ ম্রিয়মাণ। জ্যেষ্ঠা ভগিনীর দিকে করুণ নয়নে তাকালেন। এখন বেশ কিছুক্ষণ একা থেকে মন বিশ্লেষণ করবার ইচ্ছে ছিল জাহানারার। বিরক্তির সুরে প্রশ্ন করলেন, কিছু বলবে?

—একটা আর্জি নিয়ে এসেছি পাদশাহ বেগম।

—আমার কাছে কেন? শাহনশাহের কাছে যাও।

দারার কণ্ঠে অনুনয়ের সুর, তিনি আমার আর্জিকে অগ্রাহ্য করেছেন। আপনি যদি—

সবিস্ময়ে জাহানারা বললেন, বা-জান অগ্রাহ্য করেছেন। এরপর আমি কি করতে পারি।

—আপনি কোন একটা ব্যবস্থা না করলে আমি বাঁচবো না।

—দারা—

—পাদশাহ বেগম—

জাহানারা ঘটনাটা শোনবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন এবার। দারা যা বললেন তার সারমর্ম হল, কয়েকদিন পূর্বে উপাসনা সেরে অশ্বারোহণে তিনি প্রাসাদে ফিরছিলেন। অকস্মাৎ দুটি কালো চোখ তাঁর মনে ঝড় তুলল। চোখ দুটি রাণাদিলের। দিল্লীর পথে পথে নেচে বেড়ায় নর্তকী রাণাদিল। দারা তাকে অন্তরের দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলেন। সম্রাটের কাছে রাণাদিলকে শাদি করবার অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। শাহজাহান আপাদমস্তক একবার শাহিজাদাকে দেখে নিয়ে গম্ভীরকণ্ঠে

জানিয়ে ছিলেন, হিন্দুস্থানের ভাবী শাহনশাহ কোন নর্তকীকে শাদি করার অভিপ্রায় প্রকাশ করা অশোভন নয়, লজ্জাজনকও। তখন থেকে দারার মনে সুখ নেই। কেমন অস্বস্থতা বোধ করছেন। রাণাদিলকে না পেলে তাঁর জীবনে কিছুই পাওয়া হল না।

জাহানারা অবাক হয়ে যান। দুটি পত্নী বর্তমান, অসংখ্য-রক্ষিতা রাতের পর রাত মনোরঞ্জন করে চলেছে, তবু একটি নর্তকীকে নিজের করে না পেলে কিছুই পাওয়া হল না। কামনার যূপকাষ্ঠে আর কতভাবে নিজেকে বলি এরা দেবে? অথচ তিনি একটি পুরুষের বলিষ্ঠ বাহুর জন্য কত লালায়িত। একই রক্ত বইছে তাঁর ও দারার শিরায় শিরায়। পার্থক্য শুধু তিনি নারী ও সে পুরুষ। মোগল শাহি কুলে নারী হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন বলেই কামনার আগুন কে স্নিগ্ধ করার কোন পথ খোলা নেই।

তিনি গাঢ়কণ্ঠে বললেন, তোমার দুটি পত্নী বর্তমান। তাদের কি অপরাধ দারা?

—তাদের কোন অপরাধ নেই।

—রাণাদিল নাদিরার চেয়ে দেখতে সুন্দর?

—না।

—তোমার উদিপুরীর চেয়ে দেখতে সুন্দর?

—না।

—তবু তুমি তাকে শাদি করতে চাও। নাম গোত্রহীন নর্তকী—

দারা কাতরকণ্ঠে বললেন, পঞ্চাশ হাজার অশ্বারোহী বাহিনীর অধিনায়ক আমি। অজস্র দায়িত্ব শাহনশাহ আমাকে দিয়েছেন। রাণাদিল আমাকে সমস্ত ভুলিয়ে দিচ্ছে। দায়িত্ব, কর্তব্যভার আমি কিছুই বইতে পাচ্ছি না। উৎসাহের উৎসকে আপনি আমার হাতে তুলে দিতে পারেন পাদশাহ বেগম। শাহনশাহ আপনার অনুরোধকে কখনই উপেক্ষা করবেন না।

—কিন্তু—

—আর আপত্তি আপনি করবেন না।

জাহানারা কনিষ্ঠদের স্নেহ করেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজী হলেন। শাহনশাহর কাছে দরবার করতে চললেন শাহজাদী। শাহজাহান স্বর্ণখচিত ফর্সিতে তাম্রকূট সেবন করছিলেন। কন্যার আবেদন শুনলেন সাগ্রহে। পীতাভ সুগন্ধময় ধূম উদ্‌গিরণ করতে করতে বললেন, দারা আমার কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে তোমার কাছে গিয়েছে।

—শাহীবুলান্দের অনুরোধকে উপেক্ষা করবেন না বা-জান।

—কিন্তু জেহান, একটা নাচওয়ালী হারেমে আসবে—?

—অনেক নাচওয়ালীকে চাখতাই পুরুষরা অনুগ্রহ করেছেন বা-জান। শাহীবুলান্দ একটি নাচওয়ালীকে শাদি করে শুধু মর্যাদা দিতে চাইছেন।

শাহজাহানের বসরাই গোলাপের আরকসিক্ত প্রশস্ত ললাটে কুঞ্চনের রেখা পড়ল, তিনি একটু চিন্তা করে বললেন, বেশ। তোমার অনুরোধে তার কথাটা আমি রাখছি যাও, শাদির আয়োজন কর। শাহীবুলান্দের শাদিতে জাঁকজমক যেন কম না হয়।

জাহানারা স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি আলামপনা মত দেবেন। একবার না বলে দিলে সে কথাকে হ্যাঁ বলান যে কত শক্ত, তা কে না জানে। তাঁর শাদির ব্যাপারে কতবার আগ্রহী হয়েছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তো হ্যাঁ বলেন নি। অভিমানে আর দুঃখে চোখ ফেটে জল আসতে চায়। কিন্তু---

দ্বিতীয় যাম ঘোষিত হল।

সহচরী মরিয়াম বিনতকণ্ঠে বলল, রাত অনেক হল। এবার বিশ্রাম করুন।

জাহানারা এতক্ষণে মনস্থির করে ফেলেছেন। মরিয়ামের কথা গ্রাহ্য না করে তিনি পত্র লিখতে বসলেন। বিদুষী শাহজাদী অতি দ্রুত পত্র লেখা শেষ করে বললেন, মরিয়াম খোজা ফতে খাঁকে আহ্বান কর?

—এত রাত্রে—

—আমার আদেশ পালন কর।

মরিয়াম দ্রুত কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হল। ফতে খাঁ জেনানা-মহলের প্রবীণ খোজা। জাহানারার অত্যন্ত বিশ্বস্ত। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফতে খাঁ এল।

—তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।

—আদেশ করুন।

—এই পত্র বুন্দেলারাজকে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। তিনি কোথায় অবস্থান করছেন, সে সন্ধান পেতে তোমার অসুবিধা হবে না। কাজ সমাধা হবে গোপনে।

বিস্মিত হলেও ফতে খাঁ নির্বেট মুখের ওপর বিস্ময়ের ভাব পরিলক্ষিত হল না। পত্র নিয়ে কুর্নিশ করে সে বিদায় নিল। হতভম্ব মরিয়ামের মুখের দিকে তাকিয়ে জাহানারা মৃদু হাসলেন।

নির্দিষ্ট সময়ে সাক্ষাৎ হল দু-জনার। আঙ্গুরীবাগের উদ্যানে দুরু দুরু বক্ষে জাহানারা গিয়ে উপস্থিত হলেন। অপূর্ব সাজে আজ তিনি সেজেছেন। মসলিনের নাকাবে অর্দ্ধেক মুখ আবৃত। কালো চোখ দুটিতে কিসের উন্মাদনা। স্ফটিক-জালির অপরপ্রান্তে উন্নত দেহ ছত্রশাল দণ্ডায়মান রয়েছেন। জাহানারা প্রাণভরে দেখছেন মনের মানুষকে। কি অপরূপ রক্ত-মাংসে গড়া দেহে এর চেয়ে বেশি রূপের ঢল বুঝি বা হয় না।

মৃদু অথচ দৃঢ়কণ্ঠে ছত্রশাল

বললেন, আমাকে আহ্বান করেছেন পাদশাহ বেগম ?

সরমজড়িতকণ্ঠে মোগল-কুমারী বললেন, শৌর্যের প্রতীক বুন্দেলা-রাজকে একান্তে দেখবার বাসনা হয়েছিল।

—আমি অনুগৃহীত।

—আল্লাহ আপনার দীর্ঘ জীবন দান করুন।

—আমিও প্রার্থনা করি আপনার জীবন দীর্ঘতর হোক।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জাহানারা বললেন, বাঁচার সাধ আমার আর নেই। বেঁচে থেকে কিই বা পেলাম ?

ছত্রশাল বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, জীবনের প্রতি পাদশাহ বেগমের এত বিতৃষ্ণা আমার জানা ছিল না।

—জানা থাকলে কি করতেন ?

বুন্দেলারাজ নীরব রইলেন।

—আপনাকে বোধ হয় বিব্রত করে তুলছি মহারাজ ?

—নারীকে সম্মান করতে রাজপুত জাতি জানে। আমি আপনার দাস। আপনার যে-কোন কথাকে মান্য করা আমার কর্তব্য।

—যুদ্ধ আর কর্তব্য পালন ছাড়া আপনার জীবনে আর কি কিছু আছে মহারাজ ?

—আমি সৈনিক পাদশাহ বেগম।

নকিবের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। শাহনশাহ উদ্যান-ভ্রমণে আসছেন। আর কথা হল না। দুজনে সরে গেলেন স্ফটিক-জালির দুপাশ থেকে। মনের মধ্যে অনেক পাওয়া আর অনেক হারিয়ে যাওয়ার কথা চিন্তা করতে করতে জাহানারা মহলে ফিরলেন। রাও ছত্রশাল কি তাঁর মনের ভাব বুঝতে পেরেছেন ? বুভুক্ষু নারীর হৃদয়কন্দরের পূর্ণ চিত্র কি তিনি মানসচক্ষে দেখতে পেয়েছেন ?

হয়তো পেয়েছেন। অনেক রাজ্যকে হেলায় জয় করেছেন বুন্দেলারাজ। আর একটি পরাজিত নারীর যৌবনকে সমস্ত নাগপাশ ছিন্ন করে নিয়ে যেতে পারেন না ? স্পর্ধিত যৌবন ছত্রশালের বিশাল হৃদয়ের কোন প্রান্তের কি এতটুকু চিড় খাওয়াতে পারেন নি। আর চিন্তা করতে পারেন না। জাহানারা।

সাক্ষাৎকারের পর একটি সপ্তাহ কেটে গেছে। নিটোল সাতটি দিন। শেষ পর্যন্ত বহু চেষ্টা করেও জাহানারা হৃদয়াবেগকে চেপে রাখতে পারেন নি। নিজের মনের সমস্ত কথা উজাড় করে বুন্দেলারাজকে পত্র দিয়েছেন। প্রথম প্রেম-পত্র লিখতে হাত কেঁপেছে শাহ-জাদীর। ভাষা কোথাও কোথাও স্খলিত হয়ে গেছে।

লেখা শেষ হবার পর মনমাতানো আতর দিয়ে পত্রটিকে সিক্ত করা হয়েছে। তারপর সকলের অগোচরে ফতে খাঁ পৌঁছে দিয়ে এসেছে যথা-স্থানে। আরক্তমুখে ভেঙে-পড়া মন নিয়ে জাহানারা উত্তরের অপেক্ষা করেছেন। উত্তর কি আসবে ? প্রিয়তম তাঁকে তরলমতি ভাববেন নাতো ?

উত্তর এল। তাঁর প্রেমপত্রের দীর্ঘ উত্তর দিয়েছেন রাও ছত্রশাল। পত্রের প্রতি ছত্র যেন আন্তরিক প্রেমের প্রতিচ্ছবি। যোদ্ধার হৃদয়ে এত কাব্য সঞ্চিত আছে। তার সন্ধান কে রেখেছিল। আনন্দে জাহানারা দিশেহারা হয়ে পড়লেন। বহুমূল্য রত্নবলয় উপহার দিলেন মরিয়মকে।

কালবিলম্ব না করে তিনি পত্রের উত্তর লিখতে বসলেন। অনেক অভিমান, অনেক সোহাগের কথা লিখলেন। যথাসময়ে উত্তর এল। ছত্রশাল আবেগ-মথিত ভাষাতেই উত্তর দিয়েছেন। এর পর নিয়মিত পত্রবিনিময় চলতে লাগল।

কয়েক মাস কেটে গেল এই ভাবে। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে অনেক ঘটনার সূত্রপাত হল।

অবশ্য এই সমস্ত ঘটনার সঙ্গে প্রেমিক-যুগলের সম্পর্ক না থাকলেও, অনিবার্য কারণে জড়িয়ে পড়তে হল তাঁদের।

শাহনশাহ জীবিত থাকা সত্ত্বেও তখত্ নিয়ে ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়েছে। দারা বিধর্মী। ইসলামের অনেক অনুশাসন মানেন না। অহঙ্কারী, অপদার্থ—তবু পিতা তাঁকে অন্ধের মত ভালবাসেন। অন্যান্য পুত্রদের এই হল অভিযোগ। এই অভি-যোগ এখন বিরাট আকার নিয়ে রণক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

বাংলার সুবেদার শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুজা আর বিলম্ব করা সমীচীন মনে করলেন না। সসৈন্যে অগ্রসর হলেন দারার বিরুদ্ধে। মুরাদ বিলাসের স্রোতে ভেসে বেড়ানো পছন্দ করলেও যোদ্ধা হিসেবে তিনি কারুর অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। তাঁর আশা গগনচুম্বী। তিনি স্থির করে ফেললেন, তখত-ইয়া-তাবুত। সিংহাসন অথবা সমাধি। কোন মধ্য-পন্থা তিনি অবলম্বন করবেন না। চার ভাই-এর মধ্যে তখতে বসবার যোগ্যতা যে একমাত্র তাঁর আছে, এ সম্পর্কে তাঁর মনে কোন সন্দেহ নেই।

মুরাদ কিঞ্চিৎ ধৈর্য অবলম্বন করেছেন। দারাও সুজার কার্য-কলাপ লক্ষ্য করছেন। এদিকে দাক্ষিণাত্যের সুবেদার সম্রাটের তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ঘটনার গতি পর্যবেক্ষণ করছেন। অতি বিচক্ষণ ও অতি ক্রূর আওরঙ্গজেব জানেন, শেষ পর্যন্ত মোগল মসনদের অধিকারী হবেন তিনি। মূর্খের দল নিজেদের মধ্যে প্রাথমিক হানাহানিতে শক্তিক্ষয় করে ফেলুক, তারপর—

মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে এ এক নতন অধ্যায়। ইতিপূর্বে

পুত্র পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু পিতা বর্তমান থাকতে তাঁকে গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে পুত্রেরা তখতের জন্য রক্তের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে—এ দৃষ্টান্ত অভূতপূর্ব। শাহজাহান দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। পুত্রদের নিরস্ত করার সাধ্য তাঁর নেই। তারা তাঁর কোন আদেশকে মান্য করা প্রয়োজন মনে করছে না।

আমীর-ওমরাহবর্গের সঙ্গে সম্রাট পরামর্শ করলেন। মনের মধ্যে তাঁদের যাই থাক, মুখে তাঁরা একবাক্যে দারার পক্ষ সমর্থন করলেন। প্রীত হলেন সম্রাট। প্রিয়পুত্র দারাকে তখতে বসিয়েই হিম-শীতল কবর-গহ্বরে তাঁর প্রবেশ করার আকাঙ্ক্ষা। তিনি শাহীবুলান্দকে নিজের সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করলেন।

ঘটনার গতির ওপর লক্ষ্য রেখেই—উপযুক্ত সময়ে আসরে অবতীর্ণ হলেন আওরঙ্গজেব।

মুরাদকে দীর্ঘ পত্র লিখলেন। কনিষ্ঠের শৌর্য-বীর্যের অপর্যাপ্ত প্রশংসা করবার পর তিনি লিখলেন, রাজ্যলিপ্সা, সুখ ভোগে তাঁর স্পৃহা নেই। আল্লাহ চিন্তায় দিন গুজরাণ করে চলেছেন আর তাকিয়ে আছেন মক্কার দিকে। মক্কায় গিয়ে বাকি জীবন অতিবাহিত করবেন তা স্থির হয়ে রয়েছে। যেতে পারছেন না, বিধর্মী দারার কার্যকলাপের দরুণ। মুরাদ বীর এবং উদার হৃদয়, তখতের যোগ্য অধিকারী। বিধর্মীকে সরিয়ে মুরাদকে তখতে বসিয়ে তিনি মক্কায় যেতে চান। নইলে সেখানে গিয়েও শান্তি পাবেন না। তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে সাহায্য করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন। বিশ্বস্ততার প্রমাণস্বরূপ একলক্ষ মুদ্রা উপঢৌকন পাঠালেন।

আওরঙ্গজেবের পত্র পেয়ে মুরাদের বুকের ওপর থেকে পাষাণ-ভার নেমে গেল। এঁর সম্পর্কেই একটু ভয় ছিল তাঁর। ভালই হল ধর্ম নিয়ে থাকুন আওরঙ্গজেব। মুরাদ ভাইকে আমন্ত্রণ জানালেন। আওরঙ্গজেব তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। সসৈন্যে।

কোন কথাই শাহজাহানের অবিদিত রইল না। মধ্যপ্রদেশের মধ্যে দিয়ে মুরাদ ও আওরঙ্গজেবের মিলিত বাহিনী অগ্রসর হচ্ছে। অবিলম্বে ওই বাহিনীকে প্রতিরোধ করবার জন্যে দারাকে নির্দেশ দিলেন বাদশাহ। দরবার স্থানান্তরিত হল দিল্লী থেকে আগ্রায়। প্রজাপুঞ্জ জানুক শাহজাহান এখনও জরাগ্রস্ত হন নি, পুত্রদের হাতে বন্দী হন নি—তিনি এখনও হিন্দুস্থানের একচ্ছত্র সম্রাট।

দারাকে বিদ্রোহ দমন করতে পাঠিয়ে সম্রাট শান্তি পাচ্ছিলেন না। আগ্রা পৌঁছেই শাহীবুলান্দের সাহায্যার্থে রাও ছত্রশালকে রওয়ানা হবার নির্দেশ দিলেন। এত বড় সুযোগের অপব্যবহার করতে চাইলেন না জাহানারা। বুন্দেলারাজকে সংবাদ পাঠিয়ে ফতেপুরসিক্রী রওয়ানা হলেন। সুরেলা ভাষায় প্রিয়তমকে তিনি লিখলেন, আকবরের স্বপ্ন ফতেপুর-সিক্রীর প্রাসাদে তিনি অপেক্ষা করবেন; মহারাজকে ওই পথ দিয়েই যেতে হবে, সুতরাং দিদারের এই অবকাশ তিনি যেন উপেক্ষা না করেন।

স্বল্প অবকাশ-বিনোদনের অনুমতি নিয়ে জাহানারা ফতেপুরসিক্রীতে এলেন। সঙ্গে এল মরিয়াম। রক্ষক হিসেবে কিছু হাবসি খোজা। ছত্রশাল এই সুযোগকে হেলায় হারালেন না। নিজের বাহিনীকে বিশ্রাম দিলেন ফতেপুরের প্রান্তে। দুজন পার্শ্বচরকে সঙ্গে নিয়ে অশ্বারোহণে প্রাসাদে এলেন।

ধূপের সৌরভে আমোদিত; সুসজ্জিত কক্ষে অস্থিরভাবে অপেক্ষা করছেন প্রিয়তমের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করবার জন্য শাহজাদী। মরিয়াম বুন্দেলারাজকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। তাঁর এগিয়ে আসা দৃঢ় পদশব্দ কক্ষের নিকটবর্তী হল। মুক্তার ঝালর দেওয়া কিংখাবের পর্দা সরিয়ে ছত্রশাল কক্ষে প্রবেশ করলেন। দুচোখভরে ক্ষণেকের জন্য প্রিয়তমকে দেখলেন তারপর লজ্জার

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বিজয়ওয়াড়া - শ্রীনগর - গৌহাটী

বাঁধকে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে জাহানারা তাঁর বুকের ওপর ভেঙে পড়লেন। অসীম পুলকে অজস্র জল দুচোখ বেয়ে গণ্ডপ্লাবিত করে তুলল।

রাও ছত্রশাল শাহজাহানের আদরিণী কন্যাকে আদরে আদরে ভরিয়ে তুললেন। দুটি বুভুক্ষু হৃদয় সরস হয়ে উঠল। কতক্ষণ কেটে গেল এইভাবে। আত্মবিস্মৃতি নর-নারীর সেদিকে কোন দৃষ্টি নেই।

তারপর—কত কথা, কত পরিকল্পনা, ভবিষ্যতের কত চিন্তা—এইভাবে দিন কেটে গিয়ে রাত এল। রাত ভোর হয়ে এল ক্রমে। ছত্রশাল এবার বিদায় নেবেন। যাবেন যুদ্ধক্ষেত্রে। জাহানারার দুচোখে মুক্তার মত জল টলটল করে উঠল।

ছত্রশাল তাঁকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, আমাদের স্বপ্ন নিশ্চয় সফল হবে।

—কিভাবে?

—বিদ্রোহ দমন করতে পারলে সম্রাট আমার কোন ইচ্ছা অপূর্ণ রাখবেন না জানিয়েছেন। বিদ্রোহীদের দমন আমরা করবই। তখন আমি তোমাকে চেয়ে নেব তাঁর কাছ থেকে।

—তিনি যদি আপত্তি করেন?

—আমি জানি, ইচ্ছে না থাকলেও তিনি আপত্তি করবেন না। রাজপুতের-রক্ত সবসময় মোগলের সম্মান রেখেছে। আমার শক্তির মূল্য তিনি বোঝেন।

যতক্ষণ দেখা গেল জাহানারা অলিন্দে দাঁড়িয়ে রাজপুত সৈনিককে দেখলেন। বুন্দেলারাজ দৃষ্টির আড়ালে চলে যাবার পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সরে এলেন। মরিয়মকে আদেশ দিলেন—আগ্রা প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করতে।

পক্ষকাল অতিক্রান্ত হয়েছে।

সংবাদ পাওয়া গেছে চম্বলের তটস্থিত এক বিস্তীর্ণ প্রান্তে মুরাদ ও আওরঙ্গজেব সসৈন্যে অপেক্ষা করছেন শাহী-বাহিনীর। আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নি। যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে এতদিনে নিশ্চিত। যুদ্ধের সংবাদের জন্যে শাহজাহান অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

সন্ধ্যা সমাগত।

সম্রাট আগ্রা দুর্গের প্রিয়-অলিন্দে বসে গভীর চিন্তায় মগ্ন রয়েছেন। এই অলিন্দ থেকেই তাজমহল পরিষ্কার দেখা যায়। কত জ্যোৎস্নাস্নাত রাতে এখানে দাঁড়িয়ে প্রিয়তমা পত্নীর স্মৃতি-সৌধের দিকে তাকিয়ে অতীতের প্রণয়মুখর দিনগুলির কথা রোমন্থন করেছেন।

সম্রাটকে নীরব দেখে জাহানারা বললেন, আপনি মিথ্যে অধীর হচ্ছেন বা-জান। বিপদের মেঘ দ্রুত কেটে যাবে।

—কাটবে না। আমি জানি জেহান কাটবে না।

—জোর দিয়ে একথা কেন বলছেন বা-জান?

গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে শাহজাহান বললেন, অনেক দিন আগেকার কথা। এক সন্ন্যাসী এসেছিলেন আমাদের কাছে। তোমার আম্মাজানের হাতে দুটি আপেল দিয়ে বলেছিলেন, যতদিন তোমার স্বামীর করতাল থেকে আপেলের গন্ধ নির্গত হবে ততদিন সব শুভ। গন্ধ উবে গেলেই ঘোর অশুভদিন আগত বুঝতে হবে। এতদিন আমি করতালে গন্ধ পেয়েছি। এখন আর গন্ধ নেই।

তিনি নিজের দুই হাত প্রসারিত করলেন। জাহানারা তাঁর করতলের ঘ্রাণ নিয়ে বললেন, গন্ধ তো রয়েছে বা-জান।

—গন্ধ নেই। আমি জানি গন্ধ নেই জেহান। তুমি আমাকে মিথ্যে স্তোক দিও না। যুদ্ধের অবস্থা এখন কি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। এতদিনে দু-একজন সংবাদ-বাহকের অবশ্যই এসে পড়ার কথা।

সম্রাটের দেহরক্ষী-বাহিনীর প্রধান খোজা আজম খাঁ কুর্নিশ করে এসে দাঁড়িয়ে সসম্ভ্রমে জানাল রাজা জয়সিংহ বিশেষ প্রয়োজনে সাক্ষাৎপ্রার্থী। সম্রাট ইঙ্গিতে রাজাকে এখানে পাঠিয়ে দেবার আদেশ দিলেন।

বহু যুদ্ধে জয়ী সেনাপতি অম্বরাধিপতি রাজা জয়সিংহ এলেন। কুর্নিশ করে বললেন, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সংবাদ এসেছে আলামপনা।

শাহজাহান সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন, আপনি অবশ্যই কোন সুসংবাদ বহন করে এনেছেন?

—আমাদের দুর্ভাগ্য---

—দুর্ভাগ্য।

রাজপুত কুলের মধ্যমণি মাথা নত করে বললেন, বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্রে দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা পরাজিত হয়েছি আলামপনা।

—আমাদের পরাজয় ঘটেছে! দারা—নিজের সমস্ত বিপদ শাহীবুলন্দ এড়িয়ে যেতে পেরেছেন বোধ হয়?

—তিনি অক্ষত শরীরে রণক্ষেত্র ত্যাগ করেছেন শুধু—

সম্রাট স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, শুধু কি মহারাজ?

—রাও ছত্রশালকে আমরা হারিয়েছি আলামপনা। প্রভূত বীরত্ব প্রদর্শন করে তিনি রণশয্যা গ্রহণ করেছেন।

ছত্রশাল নেই!!!

পরিবেশকে বিস্মৃত হয়ে তীক্ষ্ণ চীৎকার করে একটি স্ফটিকস্তম্ভ বেষ্টন করলেন শাহাজাদী। এই অচিন্তনীয় ঘটনার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর প্রিয়তম নেই—সেই বৃষস্কন্ধ মহাবাহু, তেজোদীপ্ত ছত্রশালকে আর দেখতে পাবেন না। তীব্র কান্নার বেগ হৃদয়কন্দরকে মথিত করে দিল। স্ফটিকস্তম্ভের অবলম্বনকে ছেড়ে মর্মরচত্বরের ওপর বসে পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন রূপবতী, যৌবনলাঞ্ছিতা গীর্বাণ গণিক জাহানারা।

বিস্মিত শাহনশাহ কন্যার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। অম্বরপতি জয়সিংহের দুচোখেও পরিপূর্ণ বিস্ময়। পূবের আকাশে তখন চন্দ্রোদয় হয়েছে। আলো ঝলমল তাজমহলে যেন করুণ হাসির আস্তরণ।

আঁধার মানিক

ধারাবাহিক উপন্যাস

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ ছাব্বিশ ॥

কাটোয়াতে পৌঁছে সুরকণ্ঠ গঙ্গাস্নানে গেলেন। কাটোয়া বড় পবিত্র স্থান, এখানে গঙ্গার তীরে এলেই তাঁর মন প্রফুল্ল হয়। কাটোয়া নিত্যপুণ্যধাম, কেন না এখানে একদিন দেড়শত বছর আগে মাঘ মাসের প্রত্যূষে শঙ্করাচার্য-পন্থী যতিশ্রেষ্ঠ শ্রীমৎ স্বামী কেশবভারতীর আশ্রমের সামনে স্নানার্থী নরনারী সকলে হাত জোড় করে দাঁড়িয়েছিলেন। বৃদ্ধা ও প্রবীণাদের চোখে জল, যুবতীরা ঘোমটা ফাঁক করে বিস্ফারিত চোখে দেখেন, শিশু ও বালক-বালিকার অবধি মুখে কথা নেই। কাটোয়ার সম্মানিত নাগরিকরা অবধি উপস্থিত। এমন জনসমাগমে চাইলেই কড়ি পাবে ভেবে যে-সব ভিখিরী-বাউলরা 'হরিনাম যাবে জেন সঙ্গে' গানের প্রথমকলি মুখ তুলে, কণ্ঠাস্থি কাঁপিয়ে, মোটা গলায় গেয়েছিল ও একহাত তুলে গুপীযন্ত্র বাজিয়েছিল তারা অবধি এখন নির্বাক।

কারো মুখে কথা নেই। ঐ অদূরে মধু নাপিত মাথা নিচু ক'রে করজোড়ে কাঁদে, কেশবভারতীর আশ্রমে দীক্ষা-কাঙাল নবীন সন্ন্যাসীর মাথা আর সে মুড়োবে না। এদিকে নবদ্বীপের সম্মানিত মানুষরা এসেছেন, সঙ্গে প্রভু নিত্যানন্দ। গঙ্গার এপারে ওপারে কতজনের মনে ব্যথা দিয়ে তবে নিমাই সন্ন্যাস নেন। মেয়েরা নিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, 'এমন পাষাণ মা-বউ দেখি নি গো, সন্ন্যাস নিতে অনুমতি দিলে। বুড়ো সন্ন্যাসী পাষাণ হয়েছে, সে মা কাঁদিয়ে ছেলে কেড়ে নেয়, আহা দোলে-সংক্রান্তিতে নৌকো ভাড়া করে কর্তারা নবদ্বীপে তার গান শুনতে যেতেন গো।'

সেই থেকে কাটোয়া বড় পুণ্য স্থান। বৎসরান্তে সুরকণ্ঠ কেন্দুলি যান, বৃদ্ধ বাউল বলেছিল, 'এবার যেতে পারব না আমি, কাটোয়ার ধুলো আমার জন্যে আনবেন নেকড়া বেঁধে, ও ধুলো মাথায় ঠেকালে পাপী স্বগ পায়।'

সুরকণ্ঠ তাই কাটোয়ার গঙ্গায় স্নান করে বড় আনন্দ পান। যখনি আসেন, তখনি স্নান করেন। শিবভক্ত মানুষ তিনি, সাধারণত নদীতে ডুব দেবার সময়ে 'হর হর' বলে থাকেন, কিন্তু কাটোয়া, নবদ্বীপ, পবিত্র স্থানে এলে তাঁর মুখে আপনা থেকেই 'হরি হরি' ধ্বনি বেরোয়।

'হরি হরি' বলে গঙ্গায় স্নান করে পাড়ে উঠে সুরকণ্ঠ ভেজা কাপড় বাতাসে শুকোতে থাকেন। গঙ্গার জলে শ্রান্ত, তাপিত, তৃষিতের জন্যে কি সুধা সঞ্চিত থাকে যে সব ক্লান্তি নিমেষে দূরে যায়। বৈশাখ প্রভাতে মৃদুমন্দ বাতাস। সজনা-

গাছের ডালে ভেজা কাপড়ের একটি খুঁট বেঁধে আর এক টি খুঁট বাতাসে নেড়ে নেড়ে সুরকণ্ঠ শুকোন। রেশমের পাটকাপড় নিমেষে শুকোয়, তিনি চেয়ে দেখেন।

আজ গঙ্গাতীর নির্জন, জনশূন্য। স্নানার্থীর ভিড় নেই, সঙ্কোচে যুবতী ভেজাগামছায় অঙ্গ ঢেকে ছেলের হাত ধরে ত্রস্তে উঠে যান না, প্রৌঢ়া 'কে গায়ে জল দিলি লো?' বলে উচ্চকণ্ঠে কলহ করেন না। এমন বৈশাখী প্রভাতে কাটোয়ার গঙ্গাতীরে বৃদ্ধা বসে দুধের বালিকাদের শিব গড়ে পুজো করে বিসর্জন দিতে শেখান। কুমড়ো, ডাঁটা ও শাক বোঝাই ঝুড়ি নিয়ে বাগদী মেয়েরা নৌকো চড়ে এপারে আসে ও স্নানার্থী বৃদ্ধরা গঙ্গায় বুক অবধি ডুবিয়ে 'ও মেয়ে, গণ্ডা কত? ও মেয়ে, আঁটি কত?' বলে চেঁচিয়ে দরাদরি করেন। এ সময়ে আনাজপাতি বড় দুর্লভ, অথচ কাটোয়ার ভদ্রপল্লীতে বৈশাখ মাসে কত ব্রত উদ্‌যাপন, দশজনের পাতে অন্ন দিতে হলে শাকসব্জী ছাড়া গৃহস্থ আর কি আয়োজন করতে পারে।

এমন সকালে সুরকণ্ঠ আগে আগে যখনই স্নান করে দণ্ডী হাতে গঙ্গাপাড় ধরে উঠে আসেন, তখনি তাঁর গম্ভীর হেমকান্তি চেহারা দেখে বৃদ্ধ স্নানার্থীরা বলেন, 'নমো নারায়ণায়।'

একসময়ে বৃদ্ধের সে সম্বোধন শুনে পাগল অবাক হয়েছিল কত। 'তোমায় নারায়ণ বললে কেন?' সে মাঝে মাঝে অবুঝ আব্দার করে, সব কথা জানতে চায়।

বৃদ্ধটি তাকে বুঝিয়ে বলেছিলেন, 'বাবা, ওঁর হাতে দণ্ড, পরনে গেরুয়া, তাই 'নারায়ণ' বলে দণ্ডবৎ হলাম।'

'ইনির হাতে দণ্ড, পরনে গেরুয়া তা বলে 'নারায়ণ' বললে?'

'তা তো বলতেই হবে বাবা,' বৃদ্ধটি সস্নেহ গলায় বলেছিলেন, 'তুমি এর সঙ্গ কর, অথচ এ-কথা জান না যে 'দণ্ডমাত্রধারণেন নরো-নারায়ণো ভবেৎ?' হাতে দণ্ড নিলে অর্থাৎ সন্ন্যাসী হলেই মানুষ নারায়ণের অংশ হন?'

বৃদ্ধের সে সভক্তি কথা শুনে সুরকণ্ঠ কতই লজ্জা পেয়েছিলেন। সবিনয়ে বলেছিলেন, 'আমি দীক্ষিত সন্ন্যাসী নই। পথে পথে তীর্থস্থানে ঘুরি, গেরুয়া ধারণে ময়লা হয় না কাপড়, এই যা সুবিধা। আমি আপনাকে প্রতিনমস্কার করি, আপনি নিজের কাজে যান।'

বৃদ্ধ অবাক হয়ে বলেছিলেন, 'তোমার মুখে চোখে যে অন্য কথা লেখা আছে বাবা। দেখো, কাটোয়ার গঙ্গাতীরে দাঁড়িয়ে মিথ্যাকথা বল না, এ নিত্যব্রজধাম।'

'আমি মিথ্যা বলি নি।'

বৃদ্ধ অসন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন, 'তবে যাও বাবু, নিজের কাজে যাও। আমার সকালটা দেখছি তোমার সঙ্গে বকে বকে নষ্ট হল।' সঙ্গে যে বালকটি ছিল তাকে ডেকে বলেছিলেন, 'চল, চল, দেখ দেখি সন্নেসী কোথা? সকালে তিনটি সন্নেসীকে পেন্নাম করব, ফল দেব এটি আমার মানসিক। বড় জাগ্রত থানে মানত করেছি বাবু, কথা না রাখতে পারলে সাক্ষাৎ বাবা এসে গলায় পা দেবেন রাতেভিতে, হ্যাঁ।'

বালক তাঁর ভেজাকাপড়-গামছা হাতে সন্নেসীর খোঁজে গিয়েছিল। বৃদ্ধের কাণ্ড দেখে সুরকণ্ঠ কৌতুকে কতই হেসেছিলেন। পাগল অসন্তুষ্ট হয়ে বলেছিল, 'এই শুনি তুমি সন্নেসী, আবার গঙ্গাতীরে দাঁড়িয়ে না-র সামনে বললে তুমি সন্নেসী নও। নও যদি তবে গেরুয়া পর কেন বাবু? এ সব আমার পছন্দ নয়।'

'কেন, সন্নেসী ছাড়া কেউ গেরুয়া পরে না?'

'কে পরে?'

'বিষ্টু পরে না?'

'এই দেখ, বিষ্টু হল রঙ্গারজী। কাপড় রাঙানো ওর কাজ। সাদা পরে থাকলে ওর চলবে কেন?'

'আমারও গেরুয়া পরা কাজ, বাঃ।' বলে সুরকণ্ঠ তাকে থামিয়ে দেন।

কাটোয়ার গঙ্গাতীরের সঙ্গে তাঁর কতই স্মৃতি আছে, সুরকণ্ঠ দেখলেন বৈশাখী বাতাসে, উজ্জ্বল রোদে তাঁর রক্তাভ পট্টবস্ত্র নিশানের মত উড়ছে। কুঁচিয়ে নিয়ে থলিতে রাখলেন। একসময়ে এই গঙ্গাতীরেই ছুটে এসেছিলেন তিনি, উৎসুক চোখ মেলে দেখেছিলেন গঙ্গার বুকে এক নৌকোয় ঢোলডগর বাজে, এক নৌকো লাল শালুতে মোড়া, এক নৌকোয় সওগাত ভারে ভারে, নৌকোর জানালার দিকে তিনি কতই আগ্রহে চেয়েছিলেন।

যেদিন ফুলেশ্বরী স্বামীর ঘর করতে আসছিলেন খাগড়া থেকে।

আজ সবই জনশূন্য, নির্জন। একটি ভিক্ষুক, একটি সন্ন্যাসী অবধি গঙ্গাতীরে নেই। চিড়েমুড়কি কদমা-বাতাসার দোকান গঙ্গাতীরের কাছেই থাকে। সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেন সুরকণ্ঠ। দোকান ঝাঁপবন্ধ, মানুষের চিহ্ন নেই কোথাও। অন্যসময়ে এখান থেকে স্নান সেরে চিড়েমুড়কি কিনে জলপান খেয়ে কত বাইরের মানুষ কাজে যায়।

ঐ দূরে, উপকণ্ঠে আর এক কোলাহল। নবাবের ফৌজ, হাতী, ঘোড়া, মিশ্রকণ্ঠে চীৎকার, এমন চীৎকার কেন? তবে কি বর্গীরা এখানেও এল? সুরকণ্ঠ ত্রস্তপদে চললেন। শহরের পথে পথে মানুষ নেই। দোরের আড়ালে ভীত শিশুকণ্ঠে কান্না শোনা যায়। মেয়েরা বলে, 'ঐ বর্গী, চুপ কর বাবা!' বোঝা যায় মানুষ শহরে আছে। যারা আছে তারাও প্রাণভয়ে অস্থির।

সুরকণ্ঠ আপনমনে পথ চলেন, এমন সময়ে সামনের কুটিরের দরজা হড়াম ক'রে খুলে গেল, 'বাবা!

সন্ন্যেসী বাবা !' আর্তচীৎকারে একটি মেয়ে এসে তাঁর পা জড়িয়ে ধরল।

সুরকণ্ঠ বিব্রত, 'পা ছাড় মা, আমি সন্নেসী নই।'

আমি কোনকথা শুনব না,' মেয়েটি কান্নায় ভেঙে পড়ে, 'দেশে বর্গীর হাঙ্গামা, সবাই বর্গী নামে ডরায়, পুরুষরা কেউ ঘরে নেই, আমরা বেনের মেয়ে বাবা গো, জন্মেও ঘর ছেড়ে বেরুইনে, এখন ছেলেমেয়ে, শ্বশুর-শাশুড়ী নিয়ে কোথা যাব ?'

'ঘরে যাও মা।' সুরকণ্ঠ একটু শক্ত হয়ে বলেন।

'আপনাকে গঙ্গাস্নানে যাবার কালে দেখেছি, এখনো দেখলাম, আমার ছেলে মরে যাবে, তুমি একটু দেখে দিয়ে যাও।'

সুরকণ্ঠের নিজের পোষাকের 'পরে ঘেন্না হয়। তিনি সঙ্কোচে বলেন, আমি সন্নেসী নই মা, আমার ঝোলাতে শেকড়বাকড় নেই। আমাকে নিয়ে যেতে চাচ্ছ, আমার সঙ্গে অনেক লোক আছে, তারা হয়তো খোঁজ করে এসে পড়বে এখানে।'

'বাবা গো দয়া কর।' মেয়েটির চোখ দিয়ে দরদরধারে জল পড়ে, এখন সুরকণ্ঠ দেখেন তার গায়ে কতই গহনা, সোনার বাউটি, চুড়ি, বাঁধানো শাঁখা, নোয়া, কানে মাকড়ি গলায় মালা, কোমরে গোট। দেখে তাঁর ভয় হয়।— এর চেয়ে কত সামান্য জিনিসের লোভে বর্গীরা মানুষের প্রাণ নিচ্ছে। পথে পড়ে এ মেয়েটি প্রাণ হারাবে।

'এত গহনা—গায়ে পথে কেন মা, চল চল তোমার ঘরে চল, শিব শিব।'

দেবতার নাম মনে করে সাহসে বুক বেঁধে সুরকণ্ঠ ভেতরে গেলেন। মনে মনে বললেন, 'ঠাকুর, তোমার নাম করে যাচ্ছি, মেয়েটির উপকার যেন করতে পারি। নইলে তোমার নামের মান থাকবে না।'

মেয়েটির সঙ্গে ঘরে ঢুকলেন। বেনে কুলে গন্ধ বেনে, তার ঘরে মশলার গন্ধ। সামনে যে ঘরটি দিয়ে ঢুকলেন, সেটি নেহাৎই কুটির। ভেতরের ঘরের মেঝে পাকা, দেয়াল পাকা; চালে খড়। ঘরের পর ঘর, মৌচাকের জাল বোনা যেন। সুরকণ্ঠের মনে হল পথ না জানলে হয়ত বর্গীরা ভেতরে ঢুকতে পারবে না। কিন্তু বিপদ হলে এরাই বা চট করে বেরুবে কি করে।

ভেতরের ঘর অন্ধকার। চোখে আঁধার সরে এলে সুরকণ্ঠ দেখেন ঘরের এক কোণে জড়াজড়ি করে ছাগল-ভেড়ার মত বসে আছে বুড়ো-বুড়ি, ছেলেপুলে, মেয়ে, বালক-বালিকা একপাল। একপাশে মেঝেতে পাতা বিছানায় শুয়ে ওঃ ওঃ করে একটি বালক এপাশ-ওপাশ করে।

'মা, জল দে মা।' বালক কাঁদে।

'এই যে বাবা, সন্নেসীবাবা এনেছি বাবা, তোমায় এখনি আরাম করবেন,' মেয়েটি মাথায় কাপড় টানে, ছেলের শিয়রে করজোড়ে দাঁড়ায়।

সুরকণ্ঠ, ছেলেটির মাথায় হাত রাখেন। কপাল পুড়ে যায়। নাড়ী দেখেন। নাড়ীর গতি দ্রুত, কিন্তু বেশ সবল, সতেজ।

'আর কি যন্ত্রণা ?'—তিনি বালককে জিজ্ঞেস করেন।

'পেটে ব্যথা।'

এখন সুরকণ্ঠ দেখেন পেটের ওপর লাল, স্ফীত ফোঁড়া। বলেন, 'ফোঁড়ার তাড়সে জ্বর তা বোঝ না ?'

'আমরা কি জানি বাবা। ছেলের রোগ হলে বৈদ্যঘরে বিধান নিতে যাই, আমরা মূর্খ মানুষ।'

সুরকণ্ঠ বলেন, 'দেখ, আমি বৈদ্য নই। তবে যা মনে পড়ে বলে যাই, করে দেখতে পার।'

'হ্যাঁ বাবা! যা বলবে তাই করব। কাল বর্গী কোথায় ছিল, কোন দেশ থেকে এল গো। ভয়ে পথে বেরুতে পারে না কেউ, যাকে ধরে তাকেই না কি কাটে।'

'তাদের দয়ামায়া নেই।' বলতে বলতে সুরকণ্ঠের চোখের তারা স্থির হয়, ক্রোধে নাকের পাটা ফুলে ওঠে। বলেন, 'তোমাদের সাবধানে থাকতে হবে, তারা এসে পড়লে আর প্রাণে রাখবে না কারুকে।'

'কোথা যাব বাবা ? তবে না কি মুর্শিদাবাদে বর্গী নেই।'

'বর্গী এখন সর্বত্র যাচ্ছে। তবে এখন কাটোয়াতে স্বয়ং নবাব আসছেন, এখানে আবার কি যুদ্ধ হয় কে জানে।'

'যুদ্ধ।'

'হ্যাঁ যুদ্ধ হল বই কি।' এখন সুরকণ্ঠ দেখতে পান কুলঙ্গীতে গণেশ মূর্তি, দেওয়ালে গেরিমাটিতে আলপনা আঁকা, ঘরের কোণে সারি সারি জালা, চুবড়ি, মুখঢাকা বেতের ঝাঁপি। ঘরের আড়ায় কাঁথা ঝোলে,

চৌকির নিচে পাঁজা করা কাঁসার বাসন দেখা যায়।

দেখে তাঁর কতই দুঃখ হয়। এসব কিছুই থাকবে না। আজই দেখেছেন গঙ্গাতীর নির্জন, রাজপথ জনশূন্য। আরো কত দেখেছেন চারদিকে ধ্বংস, উৎখাত, ভিটের ওপর শ্মশান। তিনি নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, 'শোন, আমার যা মনে হয় বলে যাই। ছেলের মাথা ধুইয়ে দাও। কচুপাতা এনে থাক চেপে জল দিও। গঙ্গামাটি এনে তাই নেকড়া কানিতে ছেঁকে ছেলের পেটের আশেপাশে ফোঁড়া বাঁচিয়ে প্রলেপ দাও। তোমরা গন্ধ-বণিক ঘরে তোকমা থাকা সম্ভব, থাকলে পরে পেটে নেকড়া করে পটি দাও। আর কিছু না পাও চন্দন বেটে ঘি-এর সঙ্গে প্রলেপ দাও। ফোঁড়া ফাটলে ছেলে আরাম পেতে পারে।'

বালক এতক্ষণে বললে, 'জল খাব।'

সুরকণ্ঠ উঠে পড়লেন। বললেন, 'দাও ওকে জল দাও। মৌরী মিশ্রী ভিজিয়ে রাখ, ঘনঘন জল দাও। ভেতর থেকে তাপ নেমে যাক।'

এখন সবাই তাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। 'বাবা যাচ্ছেন গো, তোমরা দণ্ডবৎ দাও,' বৃদ্ধা কম্পিত গলায় বলে। মেয়েটি গললগ্নে বাইরে আসে। বলে, 'এ সর্বনাশ কবে দূর হবে বাবা? ব্যবসা-বেসাত যে জলের নিচে গেল।'

সুরকণ্ঠ হাতের তালু চিৎ করলেন। গম্ভীর গলায় বললেন, 'এখানো অনেক দিন বাকি।'

মেয়েটি সভয়ে চুপ করে রইল। তিনি আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলেন। অন্ধকার ঠাণ্ডা ঘর থেকে বেরিয়ে হঠাৎ বৈশাখের রোদ যেন বড়ই প্রখর মনে হল। কি ঠাণ্ডা ঘর কি মশলা বয়ে ভুরভুরে বাতাস। এখন মনে হল দিদীমা বলতেন, 'বেনেদের ঘরে রূপা গড়াগড়ি যায়। ওদের মেয়েদের দাঁতের গুমোর, চুলের গুমোর জোরদা হয়। ওরা দুধে-আলতায় কোলের ছেলেকে চুবিয়ে রাখে তাতেই অমন রঙ হয়।'

সুরকণ্ঠ যখন এলেন, তখন নবাব-ছাউনিতে আনন্দের কোলাহল। বক্সীদেওয়ান তাঁকে সাদরে নিয়ে আসেন, প্রণাম করেন।

সুরকণ্ঠ দেখেন বক্সীদেওয়ানের ব্রাহ্মণ-পাচক, জলবাহক সবাই পাকের আয়োজনে ব্যস্ত।

'কি হল?' তিনি স্মিতহাস্যে জিগ্যেস করেন।

'মুর্শিদাবাদ হতে রসদ এসেছে। রসদ, টাকা, সৈন্য।'

'এবার যুদ্ধের গতি পাল্টে গেল।'

'পাল্টে গেল তাহলে?'

'বিশ্বাস করছেন না? দেখতে পাবেন।'

বিকেলবেলায় সুরকণ্ঠ বললেন, 'এবার আমায় বিদায় দিন।'

'না না, সে কথা কি বলছেন।' বক্সীদেওয়ান তাঁকে সানুনয়ে বলেন, 'এখন কোথায় বা যাবেন, পথেঘাটে বর্গী। দেখছেন না, আমরা বর্ধমান থেকে কাটোয়া এলাম, বেটারা নিমেষের জন্যে পিছু ছাড়ে নি। দূর দিয়ে বেড় ঘেরে যুদ্ধ করে, লুঠতরাজ আর চাষীর গোলা লুঠ করা, এর নাম কি যুদ্ধ?'

'কে জানে কার নাম যুদ্ধ।' সুরকণ্ঠ অলস ঔদাসীন্যে বললেন, 'ধর্মের জন্যে, ন্যায়ের জন্যে, যুদ্ধ আর হবে না জানবেন। সেদিন চলে গেছে। আর বলতে কি, ধর্মের জন্যে যুদ্ধ যখন হত, তখন কি স্বার্থ নিয়ে মানুষ ক্ষেপত না?'

'আপনি আমাদের শাস্ত্র-পুরাণকে মিছে বলছেন।'

বক্সীদেওয়ান বড়ই ক্ষুব্ধ হন। শাস্ত্র-পুরাণকে কি অবিশ্বাস করতে পারেন তিনি? এখন তাঁর বাড়বাড়ন্তের সময়। যুদ্ধ হোক, দেশের সর্বনাশ হোক, তাঁর অবস্থা উঠতির দিকে। এমন সময়ে লোকে দেবদ্বিজে ভক্তি করে, নিত্য পুরাণ-পুঁথি শোনে। সুরকণ্ঠ যতবড় জ্যোতির্বিদই হোন না কেন, পুরাণ-শাস্ত্র মিছে, একথা তাঁর মুখ থেকেও শুনতে পারবেন না তিনি।

সুরকণ্ঠ ধীরে বলেন, 'না, তা বলি নি। কিন্তু এই যে যুদ্ধ হচ্ছে, এর নাম কি যুদ্ধ! যে যার স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত-------'

'যা বলেছেন, আমি ঐ কথাটিই বলতে চাইছিলাম।' এখন বক্সীদেওয়ান উৎফুল্ল হন, ও সুরকণ্ঠের জানু চেপে ধরে বলেন, 'আপনি যদি আমাকে ভবিষ্যৎটা বেশ বলে দেন, তবে একটু গুছিয়ে নিতে পারি, জানলেন? যুদ্ধ কতদিন চলবে, কি হবে, একটু-আধটু জানা দরকার।'

সুরকণ্ঠ নিশ্বাস ফেললেন। বললেন, 'আমি আপনাকে কথা দিয়েছিলাম। আমি কথা রাখব। আমার সময় লাগবে অনেক। আপনি যদি রাজী থাকেন তবে আমরা আজ রাতে বসতে পারি। নতুবা ছুটি দিন আমাকে। আমি আপনার সঙ্গে পরে দেখা করব।'

'আজ রাতেই বসব তাহলে।' বক্সীদেওয়ান এগিয়ে এলেন। নিচু গলায় বললেন, 'এ কথা আর কারুকে বলবেন না যেন। নির্জন জায়গা চাই, গোপন রাখতে হবে সব। দেখি নৌকো পাই কি না।'

'নৌকো?'

'হ্যাঁ। গঙ্গার বুকে, মাঝরাতে, নৌকোয়, এরচেয়ে গোপন আর কি হবে বলুন? সুগুপ্তমন্ত্রণা নদীর বুকে হওয়াই ভাল।'

'তা যা বলেছেন।' সুরকণ্ঠ ঈষৎ হাসলেন, 'মা পতিতপাবনী, ভার বইতে তাঁর জুড়ি আর কে।'

সেই কথাই রইল। বক্সীদেওয়ান গোপনে নৌকোর খোঁজে লোক পাঠালেন।

অথচ সে রাতেই রাজধানী থেকে এল দুঃসংবাদ। (ক্রমশঃ)

[সাত]

অষ্টম অধ্যায়

ডিটেকটিভকে বোকা বানিয়ে গেল

আমার কাহিনীগুলি যাঁরা পড়ছেন তাঁরা যেন এমন কথা না ভাবেন যে খুব সতর্ক থাকলেই অভিজ্ঞ ডিটেকটিভ কখনও ভুল করবে না, অথবা পাকা প্রতারক তাঁকে বোকা বানাবে না। অন্য বৃত্তির লোকদের মতো তাঁরাও প্রতারিত হন, এবং অনেক সময়ে খুব সহজেই হন।

১৮৭৯ সালের ১০ই অগস্টের ঘটনা। নীলমাধব রুদ্র নামক এক স্বর্ণকার—এর সঙ্গে আমারও কারবার ছিল—তাঁর চাকরকে আমার কাছে এক সম্ভ্রান্ত চেহারার মুসলমানকে সঙ্গে দিয়ে পাঠালেন। তিনি জানতে চান, ঐ ভদ্রলোক একটি সোনার ঘড়ি বিক্রি করবেন, এবং ঐ ঘড়িটি তিনি নির্ভাবনায় কিনতে পারেন কি না। আমার অফিসে রক্ষিত চোরাই মালের তালিকাটা ভাল করে দেখলাম, কিন্তু ঐ বিবরণের কোনো সোনার ঘড়ির উল্লেখ খুঁজে পেলাম না, তাই আমিই ঘড়িটা কিনতে চাইলাম। তিনি যা চাইলেন, সেই দামই দিলাম। তিনি বললেন, তিনি বাজারে দেখিয়েছেন, ঐ দামের বেশি কেউ দিতে চায় নি। কাজেই আমি যে দাম দিলাম তাতে তিনি ঠকলেন না। ঘড়িটি নীলমাধব রুদ্র কিনতে চেয়েছিলেন, অথচ কিনলাম আমি। ভেবে দেখলাম, তাঁর সঙ্গে আমার যখন কারবার আছে, তখন তিনি অবশ্যই এতে কিছু মনে করবেন না।

বিক্রেতা গার্ডেন রীচে থাকেন বললেন। তিনি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাই তার সঙ্গে একজন দেশী দারোগাকে পাঠালাম গার্ডেন রীচে। উদ্দেশ্য, দারোগা সেখানে গিয়ে এই ব্যক্তির পরিচয় জেনে আসবেন। অর্থাৎ তিনি কে, এবং কি করেন। ভদ্রলোক আমার অফিস থেকে বিদায় নেবার আগে জানালেন যে, তিনি বৈবাহিকসূত্রে প্রিন্স ফারুক শার আত্মীয়। চেহারা দেখে এ পরিচয় মিথ্যা মনে হল না। বেশ সম্ভ্রম জাগানোর মতো চেহারা। তিনি দারোগার সঙ্গে যেতে কিছুমাত্র আপত্তি করলেন না। বললেন সে তো ভালই, এতে তাঁর পরিচয় যাচাই করার সুবিধা হবে। চেহারাতেও কোনো রকম অপরাধের ভাব ফুটে উঠতে দেখা গেল না। আমি তাঁর সততায় এতই নিঃসন্দেহ হয়ে ছিলাম যে, দেশী দারোগাটি যখন

কয়েক ঘণ্টা পরে ফিরে এসে আমাকে জানালেন যে তিনি সত্যিই প্রিন্স ফারুক শার শ্যালক, তখন আমি সে কথা মোটেই বিস্মিত হই নি।

কিন্তু এর পর দিন স্থানীয় থানায় ফারুক শা অভিযোগ উপস্থিত করলেন যে, তাঁর একটি সোনার ঘড়ি চুরি গেছে। এবং আমি যে ঘড়িটি কিনেছি, সে ঘড়িটার বিবরণও, হুবহু এক। তিনি ঐ থানা থেকে জানতে পারলেন যে আমি একজন দেশী অফিসার পাঠিয়ে ঐ ঘড়ি সম্পর্কেই খবর জানতে চেয়েছিলাম। কারণ ঐ ঘড়ি, বাজারে বিক্রির জন্য চেষ্টা করা হচ্ছিল। প্রিন্স এ খবর শুনে তখুনি তাঁর জুড়ি হাঁকিয়ে চলে এলেন আমার কাছে। দেখলেন, এটি তাঁরই ঘড়ি। তিনি সবটা কাহিনী শুনলেন। আমিও শুনে বিস্মিত হলাম যে তাঁর শ্যালক তাঁর চুঁচুড়ার বাড়িতে এসে ওঠার পর ঘড়িটি পাওয়া যাচ্ছিল না। সুতরাং তাঁকেই সন্দেহ করা হচ্ছিল।

এখানে তর্ক উঠতে পারে যে, ফিজিওগণমির বিদ্যা—অর্থাৎ মুখের ভাবে চরিত্র চেনার বিদ্যা এই বিশেষ প্রয়োগের ক্ষেত্রে অচল হয়েছে। এমন কি অভিজ্ঞ ডিটেক-টিভের বেলাতেও একথা সত্য হল। এর উত্তরে আমি বলতে চাই, এই বিশেষ ক্ষেত্রে অপরাধ চেতনার কোনো ভাব মুখে প্রকাশিত হয় নি এই জন্য যে, অপরাধীর মনে নীতিগত অপ-রাধের কোনো বোধ ছিল না। আত্মীয়ের জিনিস চুরি, আর সে আত্মীয় যদি ভগ্নিপতি হয়, তা হলে সাধারণ চুরির ক্ষেত্রে যেমন অপরাধ বোধ হয়, এ ক্ষেত্রে ঠিক তেমন হবে না এটাই স্বাভাবিক। এই কারণেই এই লোকটির মুখে অপরাধের চিহ্ন প্রকাশ পায় নি।

নবম অধ্যায়

হস্তলিপি

হস্তলিপি একটি শিল্প। যাঁরা ডিটেকটিভ হতে চান তাঁদের এই শিল্পের সঙ্গে ভাল পরিচয় থাকা দরকার, নইলে গোয়েন্দাগিরির বিদ্যা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। হস্তলিপির ব্যাখ্যা শিখতে হয়, কারণ হাতের লেখায় মনের ভাব ধরা পড়ে। সরল মনে লিখলে তার চেহারা এক রকম হয়, অপরাধের চেতনা নিয়ে লিখলে আর এক রকম হয়। মুখের ভাবে যেমন এ দুইয়েরই প্রকাশ হয়, হাতের লেখার ভিতর দিয়েও ঠিক তাই হয়। অপরাধ চেতনা শুধু মুখের পেশীর উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে না, হাতের পেশীতেও করে। কাজেই হাতের লেখাতে তা ধরা পড়ে। তবে কাজটি কঠিন। (বিলেতেও হস্তাক্ষর ব্যাখ্যার বিশেষজ্ঞ খুব বেশি নেই, আর তা ভাল করেই বোঝা গিয়েছিল ক্রফোর্ড-ডিল্‌ক্ কেসে)। মিস্টার স্টুয়ার্ট কামবারল্যাণ্ড এবং আরও দু'চারজন পেশীর ভাব দেখে 'থট-রীডিং'-এর ক্ষমতা লাভ করেছেন। অতএব এ বিদ্যা আজকের নয়।

হাতের লেখার সময় আঙুল বেশি ব্যবহৃত হয়, না হাত বেশি ব্যবহৃত হয়, তা নিয়ে মতভেদ আছে। আমি মনে করি, এর কোনো একটা আর একটাকে একেবারে বাদ দিতে পারে না। আমার মতে অক্ষরের ঊর্ধ্বমুখী আর নিম্নমুখী টানগুলি দিতে আঙুল ব্যবহৃত হয়, আর লেখাগুলি বাঁ ধার থেকে ডান ধারে চালাতে হাত ব্যবহৃত হয়। কাজেই স্বাভাবিক লেখাতে দুইয়েরই ব্যবহার হয়ে থাকে। স্বাভাবিক লেখার সঙ্গে নকল লেখার তুলনা করলেই কথাটা পরিষ্কার হবে। স্বাভাবিক লেখায় হাত সহজভাবে চলে, সমানভাবে চলে, কোথাও হঠাৎ বেশি চাপ পড়ে না। নকল লেখায় হাতের ঝাঁকুনি লাগে, দেখলেই বোঝা যায় অক্ষরগুলো লেখকের নিয়ন্ত্রণের অধীন ছিল না। লেখার সময় নিব যখন উপরের দিকে চলে তখন নিব কাগজে বিঁধে যায়।

নকল লেখায় অক্ষরের উল্টো দিকে চাপ পড়ে বেশি, আর ও এতেও অনেক সময় নকল ধরা যায়। বেনামা চিঠিতেই এ রকম থাকে বেশি।

স্বাক্ষর বা হস্তাক্ষর যখন প্রতারণার জন্য নকল করা হয় তখন হাতের পেশীর কাজই হয় বেশি। তখন আঙুল স্বাধীন ইচ্ছার সহজ নির্ভর লিখতে পারে না, মনোযোগটা নকল করার দিকে বেশি চলে যায়।

যাই হোক, নকল ধরার বিদ্যা, প্রয়োগক্ষেত্রে কতখানি সাফল্য লাভ করেছিল সে বিষয়ে একটি ঘটনার কথা বলি।

১৮৭২ সালের ১৮ই ডিসেম্বর বেঙ্গল ব্যাঙ্কের সেক্রেটারি পুলিস কমিশনারের কাছে অভিযোগ করেন যে ব্যাঙ্ককে প্রতারণা করে ১২০০০ টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। ব্যাঙ্কে একখানি জালকরা দলিল উপস্থাপিত করা হয়েছিল। এখানা প্রকাশ্যত মীরাট ট্রেজারির দেওয়া ব্যাঙ্ক অভ বেঙ্গলের উপর একখানা ট্র্যান্সফার রসিদ। নির্দেশপত্রে উল্লেখ ছিল মীরাটের তিননম্বরের দেশী ইনফ্যান্ট্রির অফিসার-কম্যাণ্ডিং-এর কাছ থেকে ঐ রেমিট্যান্স ট্র্যান্সফার রসিদখানা এসেছে। টাকাটা ক্যাপটেন জন্‌ মিল অথবা তাঁর অর্ডারি লোককে দিতে হবে। এই নির্দেশপত্র যে খামে এসেছে তার উপরের ডাকঘরের ছাপে মীরাটের নাম আছে, সেটাও জাল। ট্র্যান্সফার রসিদ ওয়াটারলু স্ট্রীটের বিখ্যাত হোটেলের মালিক করবিটের নামে এনডোর্স করা আছে অর্থাৎ ক্যাপটেন জন মিল হোটেল-মালিককে ঐ রসিদ ভাঙিয়ে টাকা তোলার অধিকার দিয়েছেন। চতুর জালিয়াত, করবিটকে তাঁর অজ্ঞাতসারে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছে। জাল ধরা পড়বার পরে স্বভাবতই করবিটকে পুলিস কমিশনার ডেকে পাঠালেন।

করবিট বললেন—'১৮৭২ সালের ২রা নভেম্বর তারিখে দীর্ঘদেহ সামরিক

চেহারার এক ভদ্রলোক আমার হোটেলে এসে ওঠেন, তাঁর চোখ দুটি নীল চশমায় ঢাকা ছিল। স্টাফ কোরের ক্যাপটেন জন মিল, এই নামে তিনি তাঁর পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে একটি চামড়ার ছোট পোর্টম্যাণ্টো ছিল, তার চামড়ার বন্ধনীর সঙ্গে ইস্পাতের খাপে একখানা তরোয়াল বাঁধা ছিল। একটা বাণ্ডিল ছিল, তার মধ্যে একটি অফিসারের ব্যবহারোপযোগী টুপি ছিল, তার উপরের মাস্তুলের মতন কাঁটাটা বাণ্ডিলের বাইরে দেখা যাচ্ছিল। আর ছিল একজোড়া কাঁটা লাগানো বুট। তিনি নিজের কামরায় বসে খেয়েছেন, এবং ৩রা তারিখে সকালে, প্রাতরাশ খাবার ঠিক পরেই, তিনি আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বলেন, তাঁকে আজকেই বম্বে মেলে কলকাতা ছাড়তে হবে, অতএব তিনি আমার উপরে একখানা চেক ভাঙানোর ভার দিচ্ছেন। সেখানা ব্যাঙ্ক অভ বেঙ্গল থেকে ভাঙাতে হবে। তাঁর যাবার প্রস্তুতিপর্বের জন্য এত কাজ করতে হবে যে তিনি নিজে ব্যাঙ্কে যেতে পারবেন না। তাঁকে এখন কোর্টউইলিয়ামে গিয়ে ব্রিগেড-মেজরের সঙ্গে দেখা হতে হবে, এবং সেখান থেকে ফিরতে ফিরতে ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে যাবে। আমি চেক ভাঙিয়ে দিতে রাজি হয়ে তাঁকে ওখানা আমার নামে এনডর্স করে দিতে বললাম, তিনি এনডর্স করে দিলেন। ব্যাঙ্ক থেকে আমি ৫০০ টাকা করে ২০ খানা নোট ও ২০০০ টাকা খুচরো পেয়েছিলাম। ঐ টাকা আমি যথাসময়ে, অর্থাৎ তিনি ফোর্ট উইলিয়াম থেকে ফিরে এসে তাঁকে দিয়ে দিই। টাকা পেয়ে তিনি হোটেলের বিল পরিশোধ করে দিলেন। এবং অবিলম্বে হাওড়া স্টেশনে রওনা হয়ে গেলেন। তাঁকে এর আগে বা পরে আর কখনও দেখি নি। হোটেলে থাকার সময় তিনি সবসময়ই চশমা পরে থাকতেন, চশমা-ছাড়া অবস্থায় তাঁকে কখনও দেখি নি।'

করবিট এর চেয়ে বেশি আর কোনো খবর আমাকে জানাতে পারলেন না। ফোর্ট উইলিয়ামের ব্রিগেড-মেজরকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, কিন্তু স্টাফ কোরের ক্যাপটেন মিল নামক কাউকে চেনেন না, এবং এমন কোনো লোক ৩রা নবেম্বর তাঁর সঙ্গে দেখাও করেন নি। তাহলে কে এই ক্যাপটেন মিল, এবং কোথায় গেলেন তিনি। আমি এই কেসের তদন্তের ভার পাই। কেসটি বড়ই জটিল। তাছাড়া ছ সপ্তাহ পার হয়ে গেছে। যেদিন ব্যাঙ্কে ঐ চেকটি যে জাল আবিষ্কার হল, আমি তার পরদিনই মেল ট্রেনে মীরাট রওনা হয়ে গেলাম। আমার উপর নির্দেশ ছিল জীবিত হোক, মৃত হোক, ক্যাপটেন মিলকে খুঁজে পেতে ধরে আনতে হবে, খরচের জন্য কোনো ভাবনা নেই, যত লাগে দেওয়া হবে।

মীরাটে নেমে সোজা ট্রেজারিতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। আমার সঙ্গে জালকরা দলিলগুলি ছিল। রেভনিউ বিভাগের অফিস ঐ একই বাড়িতে অবস্থিত। ট্রেজারির অফিসার আমাকে সেখানে নিয়ে গেলেন। সেখানে প্রায় চল্লিশ জন কেরানি কাজ করছিল। সবটা ঘুরে দেখে অফিসারকে বললাম, কেরানিদের মধ্যে কাউকে জালিয়াত মনে হল না। জিজ্ঞাসা করলাম ইতিমধ্যে কারো এখান থেকে বদলি করা হয়েছে কি না। অফিসার কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, ৩১শে অক্টোবরের পরে আর কাউকে বদলি করা হয় নি। বাট্‌রেস নামের একজন ঐ তারিখে এক মাসের নোটিস দিয়ে অফিস ছেড়ে গেছে। আমি তার হাতের লেখার নমুনা চেয়ে পাঠালাম। আমাকে রেভিনিউ বিভাগের অনেকগুলো খাতা এনে দেখানো হল, এই খাতাগুলো সে রাখত। তার স্বাভাবিক হাতের লেখার সঙ্গে জাল লেখা মেলাবার সুবিধা হল এতে। আমি বুঝতে পারলাম যে ওদুটি একই লোকের হাতের লেখা, তখন আমি ট্রেজারি অফিসারের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই লোকটিকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে?'

তিনি বললেন, 'সে বম্বেতে একটি চাকরি পেয়ে ১লা নবেম্বর এখান থেকে চলে গেছে। সেখানে সে যে চাকরিটি পেয়েছে, তার বেতন বেশি। সে কাজে ইস্তফা দেবার আগের দিন আমাকে একথা প্রকাশ করেছে।' 'ও! সে বলেছে বুঝি, সে বম্বে যাচ্ছে?—তা হলে সে আর যেখানেই যাক না কেন, ঐ বম্বেতেই সে যায় নি।'—আমি বললাম।

ট্রেজারি অফিসার বললেন, 'একটা কথা মনে পড়ল, মিলিটারী ক্যান্টনমেণ্টে ঐ লোকটির স্ত্রী এবং মা থাকে; সম্ভবত তাদের কাছ থেকে আপনি কিছু খবর পেতে পারেন।'

আমি তখনই ক্যান্টনমেণ্টে গিয়ে সন্ধান নিতে লাগলাম। তবে যাবার আগে ঐ লোকটির চেহারা কেমন দৈর্ঘ্য কতটা, এই জাতীয় সব বিবরণ জেনে নিয়েছিলাম। অন্যান্য বিবরণের মধ্যে একটি জানলাম এই যে লোকটি ট্যারা। তখন মনে মনে ভাবলাম, 'ও! এইজন্য সবসময় কলকাতা থাকতে সে নীল চশমায় চোখ ঢেকে রাখত।'

বাটরেসের স্ত্রী ও মা যেখানে আছে শুনলাম সেইখানে গেলাম, এবং গিয়ে শুনলাম কয়েক দিন আগে তারাও ক্যান্টনমেণ্ট ছেড়ে চলে গেছে। রেল স্টেশনে গিয়ে শুনলাম তারা লখনৌ-এর টিকিট কিনেছে।

আমিও লখনৌ যাত্রা করলাম। সন্দেহ হল, বাট্‌রেসের কোনো বন্ধু মীরাট থেকে তাকে তার করে জানিয়ে দিতে পারে যে তার পিছনে পুলিস লেগেছে। তাই আমি একখানা স্পেশাল এঞ্জিনের সঙ্গে একখানা গাড়ির ব্যবস্থা করে রওনা হয়ে গেলাম, এবং কলকাতা ছাড়ার তিন দিনেরও কম সময়ের মধ্যে আমি আমার পাখীকে খাঁচায় পুরলাম।

তারপর তাকে কলকাতা আনা হল। হাইকোর্টের বিচারে তার দশ বছরের সশ্রম কারাবাসের ব্যবস্থা হয়েছিল।

হস্তলিপি বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা না থাকলে বাট্রেসকে ধরা দুঃসাধ্য ছিল, হয় তো কোনো দিনই ধরা পড়ত না, এবং তার নিজের বিদ্যা নিরাপদে অন্যের উপর খাটাতে থাকত।

এই কেস্‌টি তখন খুব উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল; কারণ এমন সফল জালিয়াতির কেস্ বেশি দেখা যায় না। কলকাতার একটি প্রধান সংবাদপত্রে এই কেসের বিবরণে লেখা হয়—'অপরাধীকে খুঁজে বার করা এবং কেস্‌টি পরিচালনা করায় যে কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে, তা পৃথিবীর যে-কোনো পুলিসের পক্ষে উচ্চ প্রশংসা পাবার উপযুক্ত।'

কিন্তু এ জাতীয় প্রশংসা এবং কেসের গুরুত্ব সত্ত্বেও ক্যালকাটা পুলিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে (১৮৭২) অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত একটি বিবরণ মাত্র প্রকাশিত হয়েছিল। সেটি হল এই—

'(১৮৭২) জালিয়াতি।—ব্যাঙ্ক অভ বেঙ্গল বনাম জন বাট্রেস ওরফে ক্যাপটেন জন মিল দশ বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত।

'ডিটেকটিভ বিভাগের মিস্টার রীড অপরাধীর অনুসন্ধানে মীরাট প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট নৈপুণ্য দেখিয়েছেন।'

(বিশেষ দ্রষ্টব্য—ব্যাঙ্ক অভ বেঙ্গলের ডাইরেকটরগণ বাট্রেসকে ধরার জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ করতে রাজি ছিলেন। কিন্তু আমি তাঁদের প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ব্যাঙ্কের ইউরোপীয়ান কর্মী যাঁদের হাতে চেক পাস হয়, তাঁদের প্রত্যেকের জন্য দুইশত টাকা পেলে আমি তাঁদের হস্তাক্ষর পরীক্ষায় ওস্তাদ করে দেব, সে প্রস্তাব তাঁরা নেন নি।)

তৃতীয় খণ্ড—প্রথম অধ্যায়

বড় বড় অপরাধ তদন্ত করার কৌশল

ভূমিকা

একথা এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন, এবং ভারতের প্রত্যেক পুলিস অফিসারই তো অভিজ্ঞতা থেকে জানেন যে, যখন অপরাধ ও অপরাধী ধরা পড়ে তখন ডিটেকটিভের কাজ অর্ধ-সমাপ্ত হয় মাত্র। সবচেয়ে কঠিন কাজ তার পরের ধাপ। অর্থাৎ অপরাধ প্রতিষ্ঠার জন্য সাক্ষী জোগাড় করা এবং যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করা। এবং এইসব প্রমাণ জজ্ ও জুরীর কাছে সন্তোষজনক হওয়া চাই। যেসব অপরাধ হঠাৎ বা ঝোঁকের মাথায় অনুষ্ঠিত হয় না, পূর্ব পরিকল্পনায় আটঘাট বেঁধে অনুষ্ঠিত হয়, সেই সব অপরাধের পক্ষে প্রমাণ সংগ্রহই সবচেয়ে কঠিন। কারণ এমন অপরাধের প্রত্যক্ষ সাক্ষী খুঁজে পাওয়া যায় না, অতএব এমন সাক্ষী পাওয়ার আশা করাই অন্যায়। পূর্ব পরিকল্পিত অপরাধ এমনভাবে অনুষ্ঠিত হয় তাতে বাইরের কেউ না জানতে না পারে। অপরাধীরা এই জিনিসটাই এড়িয়ে চলার প্রাণপণ চেষ্টা করে। তাদের সকল বুদ্ধি এবং শক্তি নিয়োগ করে। কাজেই জুরী যদি অপ্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করে অপরাধীকে দণ্ড না দেবার পক্ষে মত প্রকাশ করেন, তা হলে তাঁরা সবচেয়ে মারাত্মক অপরাধীদেরই মুক্তি দেন। এবং যেসব ছোটখাটো অপরাধ হঠাৎ কোনো উত্তেজনার মুহূর্তে অনুষ্ঠিত হয়, এবং যার প্রত্যক্ষ সাক্ষী পাওয়া যায়, এমন ছোট অপরাধের অনুষ্ঠাতারা শাস্তি পায়। তারা হয় তো জাত অপরাধী নয়। অপরাধ অনুষ্ঠানের মুহূর্তে এমন লোকের কাণ্ডজ্ঞান লোপ পায়। এবং কেউ তা দেখছে কি না তা তাদের খেয়াল থাকে না বলেই তাদের শাস্তি দেওয়া সহজ হয়।

অবশ্য দেশী সাধারণ লোকদের সাক্ষ্য একটু সতর্কতার সঙ্গে গ্রহণ করা দরকার, কারণ তাদের সময় বিষয়ে জ্ঞান খুব ভাসাভাসা, তারা অশিক্ষিত এবং যা দেখেছে তা বর্ণনা করতেও সব এলোমেলো করে ফেলে। বাজারের গুজবের উপর তাদের অনেকে বেশি আস্থা স্থাপন করে, এবং কাল্পনিক সত্যের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে বসে। যা বলে তারও একটার সঙ্গে আর একটা মিল থাকে না, সামঞ্জস্য হারিয়ে যায়। এ অভিজ্ঞতা আমাদের কতবার হয়েছে যে, সাক্ষী করোনারের কাছে এক কথা বলেছে, এবং কয়েক দিন পরে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আর এক কথা বলেছে। আর এ জন্য তারা শাস্তিও পেয়েছে। এমন সাক্ষীকে যদি তার এই কথার অসামঞ্জস্য দেখিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে, 'আগে যা বলেছি তা সত্য নয়, পরে যা বলেছি সেটাই সত্য।'

'তা হলে আগে মিথ্যা বলেছিলে কেন?'

'আমি তো মিথ্যা বলি নি।'

তাকে তখন তার আগের কথাগুলি পড়ে শুনিয়ে দেওয়া হল। তখন সে বলল, 'আমি এ কথা বলি নি।'

'কিন্তু সবই তো লেখা আছে।'

'তা হলে এটা হাকিমের ভুল, আমার নয়।'

তখন বিরক্ত হয়ে তাকে কাঠগড়া থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া ভিন্ন আর কি করা যায়? এ রকম ঘটলে সাক্ষীকে ঘটনাস্থলে নিয়ে, তাকে সমস্ত জিনিসটা সে কি ভাবে ঘটতে দেখেছে, বর্ণনা করতে বললে অনেক সময় তার সাক্ষ্য সত্য কি মিথ্যা ধরা যেতে পারে।

তদন্তকারী অফিসারকে আমার উপদেশ এই যে, অপরাধের স্বীকারোক্তিও খুব সতর্কতার সঙ্গে নিতে হবে। বিশেষ করে সে যদি দীর্ঘকাল কোনো নিম্নপদস্থ পুলিসের লোকের অধীন থেকে থাকে তা হলে অবশ্যই সতর্ক হতে হবে। কোনো ভয় থেকে বা কোনো লোভ থেকে সে হয় তো নিজেকে অপরাধী স্বীকার করছে। কিন্তু তা যে কি, তা পুলিস সুপারিনটেণ্ডেণ্ট বা ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে জানা কঠিন। আসামী গুরু অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত। সে হয় তো এই বিশ্বাসে সব স্বীকার করে যে তা হলে তার দণ্ড লঘু হবে। দেশী পুলিস অফিসার অনেক সময় তার মনে এ রকম ধারণা জন্মিয়ে দেয়। কিংবা তার উপর এমন নির্যাতন চালানো হয়েছে যাতে সে অভিযোগ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।

এইবার আমি একটি বড় অপরাধের কাহিনী বলব। (ক্রমশঃ)

ব্যাখ্যা ॥

শহর কলকাতা

● ফুলবাগান অঞ্চলের একাংশের বর্তমান পরিবেশ

রাজাবাজারের বাজার ছাড়িয়ে পোল, পোল ছাড়িয়ে পরিবেশের বিচিত্র অনিয়ন্ত্রণ নারকেলডাঙায়। তারপরেই ফুলবাগান। এখানে ফুল নেই, বাগানও নেই। তবু ফুলবাগান তার নাম। নামটা একালের নয়, গতকালের। অবশ্য একালের পরিবেশ তার নিষ্ফুল বা নিরুদ্যান হলেও, সমীপবর্তী নারকেলডাঙার মতো দুস্থের দ্বারে নৈবেদ্য নয়। এখন পূর্ব থেকে পশ্চিমে তার বিস্তার বিঘ্নিত হলেও, উত্তরে-দক্ষিণে তার নবীন মুক্তির প্রসার ঘটেছে অনেকদূর। আজ তার শ্রেণীবদ্ধ সুচারু পথ, পথের প্রতিবাহুতেই উন্নত গৃহ-বিন্যাস শুরু হয়েছে সম্ভ্রান্তজনের। আর দ্বিপথের মধ্যবর্তী দীঘল জমিতেও মাথা তুলছে এক-একটি বৃক্ষশিশু। পরিবেশকে স্নিগ্ধ-মধুর এবং সংলগ্ন সরণী ছায়াঘন করার জন্যেই সপল্লবে আকাশপথে আত্মবিকাশের প্রয়াস তাদের। সুতরাং অঞ্চলগত দিক থেকে আকর্ষণের এই প্রারম্ভিক বিকাশ যেদিন সম্পূর্ণ হবে---সেদিন ফুলবাগান যে রম্য নগরীর এক নবীন সংযোজনরূপে প্রতিষ্ঠা পাবে সগর্বে, সে-বিষয়ে সন্দেহের কোনো কারণ নেই।

ফুলবাগানের পূর্বদিকেই বিচ্ছিন্ন বসতি বেলেঘাটার। কবে, কোন্‌কালে তার শ্রী বা সমৃদ্ধি ছিল---আজ তা গবেষণা-সাপেক্ষ। তবে বর্তমানে তার অবস্থানগত দুষ্কান্তিই পরিদৃশ্যমান। সীমিত হলেও, দুর্বিনীত বিত্তের প্রভাব আছে এখানেও, হয়তো বিলাসেরও অভাব নেই পরিবার বিশেষে, কিন্তু বিশুদ্ধ পরিবেশের মনুস্তর নির্বাধ বলেই সুরুচির বৈরিতাও এখানে নির্মম। হালে অবশ্য উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট। সম্ভবত সেই সূত্রেই এক নবীন সরোবরের উৎপত্তি ঘটেছে এতদঞ্চলের পতিত মৃত্তিকায়। কিন্তু সাবিক সংস্কারের কোনো সংকেত বা পরিলক্ষণ আজও নিরুক্ত। জানি না, সি-আই-টি-র এই দীর্ঘসূত্র-পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণ প্রতীক্ষমাণ কতদূরে। তবে যত শিথিলচালেই হোক, যেদিন সার্থকতার পথে তার জয়যাত্রা সুরু হবে নিশ্চিত—সেদিন বেলেঘাটার এই বিক্ষিপ্ত অংশ ফুলবাগানের সঙ্গেই হয়তো স্থাপন করবে সহাবস্থানের সমৃদ্ধ মিতালি।

ফুলবাগানের অরণ্য বা প্রাক-অরণ্যকালের ইতিহাস আজ আর

শ্রীপদাতিক

আবিষ্কার করা সহজ নয়। তবে তার পরবর্তীকালের, অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগের যে-মানচিত্র প্রণয়ন-স্বপক্ষে আজও আয়াস-সাধ্য---তাতেই বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় : তখন ফুলবাগানের কোনো স্বাতন্ত্র্য ছিল না অবস্থানগত দিক থেকে। তখন নারকেলডাঙার সঙ্গে বেলেঘাটা ছিল বিভেদহীন এবং ফুলবাগান ছিল তারই মধ্যে অন্তর্লীন অনেককাল। তবে আজ যে-সীমিত অঞ্চল ফুলবাগান নামের অন্তর্বর্তী---অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাক্-মধ্যাহ্নে সেখানেই প্রথম বর্ধিষ্ণু রূপ ধারণ করে লোক-বসতি। এই বসতির যারা অধিবাসী---তারা অধিকাংশই পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয়। অবশ্য কিছু নমঃশূদ্র এবং কিছু মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত পরিবারেরও বসবাস ছিল পাশাপাশি। কিন্তু পৌণ্ড্র-প্রধান লোকালয়ে তাদের কোনো স্বতন্ত্র সত্তা তখন ছিল না বললেই চলে।

পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয়দের নিজেদের মধ্যে কোনো অনৈক্য ছিল না কোনো-দিন। পরস্পর পরমাত্মীয়জ্ঞানেই তারা বসবাস করতো পাশাপাশি। আজ তাদের স্তিমিত উত্তরপুরুষদের মধ্যেও সে-ঐক্যবোধ বিদ্যমান। তবে ধর্মবোধ ছিল আদি-পুরুষদের মধ্যেই অধিকতর গভীর। তখন ঘরে ঘরেই ছিল দেবার্চনার রীতি। সারা পল্লীর উদ্বৃত্ত প্রণামীর বিনিময়েই নিযুক্ত হতেন ব্রাহ্মণ পুরোহিত। পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয়রা নিজেরাও পূজারী হতেন কেউ কেউ। তবে পূজো তাদের গৃহ-দেবতার উদ্দেশেই কেবল নির্দিষ্ট। মন্দিরের এবং লগ্নকালের দেবার্চনার অধিকার একমাত্র ব্রাহ্মণদেরই। সুতরাং পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয়দের বংশপরম্পরায় আধ্যাত্মিক গুরু নির্বাচিত হতেন ব্রাহ্মণরাই।

সেকালে এতদঞ্চলের এই পৌণ্ড্র-সমাজেরই এক ব্রাহ্মণ পুরোহিতের নাম ছিল পরমানন্দ। যৌবনের উদ্দাম অঙ্কেও তিনি ছিলেন অকৃতদার। কিন্তু মধ্যবয়সে তিনি একদিন হঠাৎ প্রেমের প্রভাবেই সম্ভবত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন এক শূদ্রাণীর সঙ্গে। হয়তো সে-কারণেই ব্রাহ্মণকুল তাঁকে সমাজচ্যুত করেন একযোগে। কিন্তু পৌণ্ড্র-সমাজের গুরুর পদে তিনি বহাল থাকেন যথারীতি। এ-ব্যাপারে কোনো

অভিযোগ নেই পৌণ্ড্রদের। সহধর্মিণী তাঁর শূদ্রাণী বলেই যদি কলঙ্কিত হয়ে থাকে তাঁর ব্রাহ্মণত্ব, তাহলে, দেবতার কোপেই তাঁর শাস্তিবিধান ঘটতো এতদিনে। কিন্তু তা যখন হয় নি, তখন ভক্তরূপে তিনি দেবতার কাছে পরিত্যাজ্য হতে পারেন না। এই যুক্তিতেই পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয়দের কোনো অশ্রদ্ধার ভাব সেদিন প্রকাশ পায় নি পরমানন্দের প্রতি। বরং আচারে তিনি সংস্কারমুক্ত বলেই প্রতিজনের আরও প্রিয়জন হয়ে ওঠেন দিনে দিনে।

পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয়দের পল্লীতেই বসতি স্থাপন করেন পরমানন্দ। শূদ্রাণীর সঙ্গে সংসার পাতেন তিনি সেখানেই। তিনি মধ্যবয়সী। শূদ্রাণীর সঙ্গে তাঁর বয়সের তফাৎ যথেষ্ট হলেও, আত্মিক তফাৎ কিছু ছিল না। সম্ভবত সে-জন্যেই মনোগত দিক থেকে কেউ কারো পক্ষে অকিঞ্চিৎকর হন নি তাঁরা। ভালোবাসা তাঁদের গভীর, সংসার তাঁদের বাহুল্যবর্জিত। সহায় তাঁদের দেবতা, আর তাঁদের পৌণ্ড্রদের প্রণামী। মন তাঁদের উদার, আসন তাঁদের প্রতি ঘরের দাওয়ায়। অতএব তাঁরা সুখী। সুখেই তাঁদের সংসারের তরণী ভাসে সময়ের নিরুদ্বিগ্ন স্রোতে।

দিনের পর দিন স'রে যায় নিঃশব্দে। ক্রমেই মধ্যবয়সের সোপানশ্রেণী ডিঙিয়ে প্রৌঢ়ত্বের দ্বারদেশে উপনীত হন পরমানন্দ। তারপর প্রৌঢ়ত্বের সীমান্তরেখাও পেছনে ফেলে পদার্পণ ঘটে তাঁর বার্ধক্যের প্রথম তোরণে। অবশ্য তখনও তিনি বলিষ্ঠ, কর্মঠ এবং অন্তর তাঁর তারুণ্যের প্রতিভাসে উদ্দাম—যেখানে অচল বলেই সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ বার্ধক্যের অচলায়তন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও একদিন থামতে হলো। যে-জীবনে প্রৌঢ়ত্ব ছিল বিফল, বার্ধক্য ছিল পরাভূত এবং ক্রমাগত কর্মের ক্লান্তি ছিল ভারহীন, একদিন সে-জীবনেই হঠাৎ যবনিকার পর্দা নামালো কোনো এক কালব্যাধির কালো হাত। চিরনিদ্রার আগে, শূদ্রাণীর মুখের দিকে একবার নিষ্প্রভ চোখ তুলে পরমানন্দ শুধু বললেন: এতদিন তোমার সান্নিধ্যই ছিল আমার স্বর্গ। এবার স্বর্গ ছেড়ে কোথায় চলেছি জানি না। তবে সেখানেই যাই, কোথাও তৃপ্তি পাবে না আমার আত্মা। কারণ স্বর্গ আমার প'ড়ে রইলো তোমার কাছেই।

● ফুলবাগানের নবীন বসতির দৃশ্য।

চোখ বুজলেন পরমানন্দ। তাঁর নিথর মুখে গভীর দৃষ্টির ছায়া পড়ে শূদ্রাণীর। সে-ও নির্বাক। চোখে তার জল নেই; হঠাৎ শোকে বুকে তার কোনো তরঙ্গমালা নেই অস্থিরতার। তার স্থির দৃষ্টির সরণী বেয়েই স'রে যায় মুহূর্তের পর মুহূর্ত।

একে একে প্রতিবেশীদের সমাগম ঘটে উঠোনে। শবদেহের সৎকার-কল্পে তারা যখন তৎপর হয়ে ওঠে প্রত্যেকে, তখনই কেবল মৃত স্বামীর সান্নিধ্য ছেড়ে বাইরে আসে শূদ্রাণী। তারপর সকলের সামনে সে ঘোষণা করে: স্বামীর সঙ্গে চিতায় উঠবে সে-ও।

শূদ্রাণীর এই স্বেচ্ছাপ্রসূত ঘোষণায় ধন্য ধন্য রব ওঠে প্রতিবেশীদের মধ্যে। সমগ্র পৌণ্ড্র-পল্লীর কণ্ঠে কণ্ঠে হঠাৎ ধ্বনিত হয়: সে-নারী জন্ম-জন্মান্তরের সতী। তাই শূদ্রাণী হয়েও সহধর্মিণী হতে পেরেছে ব্রাহ্মণের। এবার সেই ব্রাহ্মণ-পতির সঙ্গেই সে সহমরণ লাভ ক'রে আবার নতুন জন্ম নিতে চলেছে পরপারের ইন্দ্রপুরীতে।

তখন ইংরেজদের যুগ। শূদ্রাণীর সহমরণের সংকল্পের কথা শুনেই তদানীন্তন চৌরঙ্গী অঞ্চল থেকে পৌণ্ড্র-পল্লীতে ছুটে আসেন দু'জন সাহেব। তাঁরা এসেই দেখেন: শূদ্রাণী হলুদ মেখে রাঙাপাড় শাড়ি পরেছে এবং তাকে মৃত পরমানন্দের সঙ্গে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ করছে প্রতিবেশীরা। সুতরাং ত্বরিতপদেই শূদ্রাণীর সামনে আসেন সাহেব দু'জন। তারপর

বলেন : শূদ্রাণীর পক্ষে এভাবে আত্মঘাতিনী হওয়া উচিত নয়। সে যদি এই সহমরণের সংকল্প ত্যাগ করে—তাহলে তার আত্মীয়-স্বজনের বিদ্রূপ বা গঞ্জনার সীমানা ছাড়িয়ে তাঁরা তাকে পাল্কিতে ক'রে নিয়ে যাবেন দূরে এবং সেখানেই তার স্বচ্ছন্দ জীবন নির্বাহের ব্যবস্থা ক'রে দেবেন তাঁরা।

কিন্তু শূদ্রাণী অটল। সে বলে : সাতজন্মে সে সাতবার সহমরণ লাভ করেছে স্বামীর সঙ্গে। সুতরাং এ-জন্মেও তার সেই একই পথ। তার মতে এ-মরণ আত্ম-হনন নয়, পরম মুক্তি।

সাহেব দু'জন আরও বিবিধ উপায়ে বোঝাবার চেষ্টা করেন শূদ্রাণীকে। কিন্তু বারে বারে শূদ্রাণীর সেই একই কথা। তবু হাল ছাড়লেন না তাঁরা। যদি চিতার আগুনে খানিকটা দগ্ধ হওয়ার পর বাঁচার ইচ্ছা প্রকাশ পায় শূদ্রাণীর মনে, তাহলে তখনও তাঁরা তাকে উদ্ধার করতে পারবেন—এই ভরসায় শূদ্রাণী এবং শববাহীদের সঙ্গে শ্মশান পর্যন্ত এলেন সাহেব দু'জন।

নদীতীরে যথাসময়েই সাজানো হলো চিতা। চিতার কাষ্ঠ-শয্যায় শায়িত শবের বামপার্শ্বে আসন গ্রহণ করে শূদ্রাণী এবং সস্নেহে অঙ্কে ধারণ করে মৃত স্বামীর দেহভার। আগুন জ্ব'লে ওঠে চিতার চতুর্দিকে। ক্রমেই সে-আগুন যখন আকাশপথে বিস্তার করে তার লোলজিহ্বা—তখন সাহেব দু'জন আবার একবার শূদ্রাণীর উদ্দেশে কাতরস্বরে বলেন : এখনো সুযোগ আছে বাঁচার। তুমি নেমে এসো চিতা থেকে। তোমাকে আমরা আজীবন স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকার জন্যে অর্থ দেবো এবং এখান থেকে দূরস্থানে যাওয়ার প্রয়োজনে পাল্কিও দেবো একখানা।

জ্বলন্ত চিতা থেকেই প্রতিউত্তর ভেসে আসে শূদ্রাণীর : ওগো, এইতো পাল্কিতে উঠেছি আমি। এমন পাল্কি কি তোমাদের আছে? দেখো, কী উজ্জ্বল—কতো জৌলুষ আমাদের পাল্কির। এ-পাল্কিতেই দুলতে-দুলতে

নারকেলডাঙা এবং ফুলবাগানের সংগমস্থলের নির্মীয়মান বসতির দৃশ্য

আমরা ফিরে যাচ্ছি আমাদের বাসরঘরে। তোমরা আর পিছু ডেকো না।

আর কোনো সাড়া নেই, শব্দ নেই। কেবল উর্ধ্বশ্বাস চিতার প্রচণ্ড বিধূনন আরও প্রচণ্ড হয়ে ওঠে আকাশে। এভাবেই কেটে গেল প্রহরের পর প্রহর। একসময় সেই শূন্যচারী আগুন আবার ঝাঁপ দিয়ে পড়ে চিতায়। তারপর নিভে যায়। সব শেষ। কেবল ছাই আর ছাই। কাঠের ছাই, শবের ছাই, শূদ্রাণীর ছাই। পরে সব ছাইকেই ভাসিয়ে নিয়ে যায় নদী। নদীর কোনো বিকার নেই।

এ-কাহিনী অষ্টাদশ শতকের। কিংবদন্তী নয়, ঘটনা। এ-ঘটনার বিক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে এবং তার প্রতি একাধিক পুরাতত্ত্ববিদের সমর্থন ও প্রকাশ পেয়েছে নানাবিধ সূত্রে। হয়তো কালে কালে কিছু অতিরঞ্জনের প্রলেপ ধারণ ক'রে আজ কাহিনীর রূপ পরিগ্রহ করেছে ইতিহাস। কিন্তু কাঠামো অলীক নয় বলেই অতিরঞ্জন এখানে দুঃসহ বলা চলে না। বরং আবেগগ্রাহ্য বলেই আজ তা পরিবেশনযোগ্যও বলা চলে। তা ছাড়া এ-কাহিনীর সাবিক রূপকেই কেউ যদি ইতিহাস ব'লে গণ্য করেন—তাহলেও তাঁকে দোষ দেওয়া যাবে না হয়তো। কারণ অতিরঞ্জন সম্পর্কে আমরা নিঃসন্দেহ নই।

যাই হোক, সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেই পৌণ্ড্র-পল্লীতে আসে এক অভাবনীয় বিবর্তন। অর্থাৎ পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয়রা বিক্ষিপ্তভাবে স'রে যায় পল্লী ছেড়ে। মুষ্টিমেয় নমঃশূদ্র এবং মুসলিমসমাজও পিছিয়ে যায় দূরবর্তী অঞ্চলে। তার প্রধান কারণ মহামারী। মহামারীকে অপদেবতার প্রাদুর্ভাব বলেই গণ্য করতো সেকালের সাধারণ সমাজ। সুতরাং যে-অঞ্চলে হঠাৎ মহামারীর প্রকোপে অকালমৃত্যুর বান ডাকে, সে-অঞ্চল অধিবাসীদের পক্ষে পরিত্যাগ করাই তখন বিধেয় ছিল প্রধানত। ঠিক সে-কারণেই হঠাৎ স্বল্পকালের মধ্যে জনশূন্যতায় নিরঞ্জন ঘটে পৌণ্ড্র-পল্লীর। তার পতিত জমিতে আগাছার অবাধ বিস্তার ঘটে দিনে দিনে। তারপর অগাছাকীর্ণ পথে পা ফেলেই অতিক্রান্তি লাভ করে আরও কয়েকটি বছর।

সম্ভবত উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অথবা তার কিছু আগে, সেই আগাছাকীর্ণ জমি আবার নজর-বন্ধনে ধরা দেয় কোনো এক ভূ-স্বামীর। তিনিই এসে সেখানে আগাছা নিড়িয়ে উদ্ধার করেন পতিত জমি। তারপর প্রতিষ্ঠা করেন এক সুদৃশ্য বাগানবাড়ি।

এই বাগানবাড়িতে ভূ-স্বামীর সপরিবার অবস্থান ঘটে মাঝে-মধ্যে। অধিকাংশ সময় সেখানে বসবাস করে কেবল মালীর দল। তাদের যত্নেই সারা বাগানে ফুল ফোটে বিচিত্র বর্ণের। এখানে দেশী-বিদেশী ফুলের নিদর্শনতুল্য বাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ইংরেজ নর-নারীদেরও। তাই দূরবর্তী চৌরঙ্গী অঞ্চল থেকে প্রতি বিকেলের ভ্রমণোদ্দেশে বাগানবাড়িতে আসে তারাও। বখ্‌শিসের লোভে মালীর দল ফুলের তোড়া উপহার দেয় তাদের। তারা ফিরে গিয়েই সে-ফুলে সুশোভন করে তাদের ড্রয়িংরুম, ডাইনিংরুম, নাচঘর ইত্যাদি। এই ফুল আর ফুলের নানা রঙের দিনগুলি এভাবেই একটি নবীন অধ্যায়ের পত্তন ঘটায় এতদঞ্চলে।

পরে এই বাগান এবং ফুলের ধারাবাহিক সূত্রেই সমগ্র অঞ্চল নাম-ধারণ করে ফুলবাগান। তবে বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগেই ফুলবাগানের সেই ফুল বা বাগানবাড়িরও বিলয়-প্রাপ্তি ঘটে কোনো অজ্ঞাত কারণে। বিনিময়ে সেখানে বসতিস্থাপন সুরু হয় শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের। দিনে দিনে তাদেরই বস্তিবাড়ির সঘন বিস্তার ঘটে সমগ্র অঞ্চলে। কোনো শ্রী নেই, শৃঙ্খলা নেই, কেবল বাড়ি আর বাড়ি—যে-বাড়ির উঠোনেও আলো-বাতাসের নির্মম বৈরাগ্য অবিচল। চলাচল-যোগ্য রাস্তাও নেই। কেবল গলি আর উপগলি—তারও সংস্কার নেই। সারা অঞ্চল জুড়েই স্বাস্থ্য-পরাঙ্মুখ পরিবেশ। এই পরিবেশেরই অক্ষয় কীট-স্বরূপ প্রায় বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত একইভাবে বসবাস করে চলে শ্রমজীবী সম্প্রদায়।

তারপর বৃহত্তর কলকাতার পরি-কল্পনাসূত্রেই ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের অধিকারে আসে ফুলবাগান। ফলে একযোগেই উচ্ছেদ ঘটে শ্রমিক শ্রেণীর, ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় অজস্র খোলার বাড়ি। এভাবেই কিছুদিন কাটে। তারপর সত্যই একদিন সেই ধ্বংসস্তূপের গর্ভেই জন্মলাভ করে নতুন পরিবেশ, এদিকে-ওদিকে আত্মবিকাশ ঘটে সুদৃশ্য পথের এবং পথের উভয় পাশ্বতেই সুরু হয় সম্ভ্রান্তজনের বিজ্ঞান-সম্মত গৃহ-বিন্যাস।

আজ যদিও কোনো বাগান নেই এবং ফুল ফোটাবার সেই ফাল্গুনও বেশ দূরেই কাল গুণছে, তবু ফুলবাগানের সাবিক বিকাশে আজ যে-লাবণ্যের উল্লাস পরিদৃশ্যমান—তা উপেক্ষার নয় কোনোমতেই। দিনে দিনে আরও সম্পূর্ণ হয়ে যেদিন তা মানচিত্র প্রশস্ত করবে রম্য নগরীর—আশা করি, সেদিন তার দিকে তাকিয়েই বেশ বদলাবে পশ্চিমের নারকেলডাঙা এবং পূর্বদিকে বেলেঘাটার সেই বিক্ষিপ্ত অংশ-বিশেষেরও নবীন পদক্ষেপ সুরু হবে অনন্য উত্থানের পথে।

হত্যা ঘৃণা ভয়

বীরেন্দ্রনাথ সরকার

বাড়ন্ত ভাতের থালায়
ঘুমন্ত শিশুর ছায়া পড়ে
দু'চোখের গভীর ক্ষত
ক্ষয়ে ক্ষয়ে অন্ধকার।

এ-দিক ও-দিক পাহারাদার
বাঁকের বুকে ঘৃণা
গলির মোড়ে ভয়
ফুল ফুটলেই হত্যা
দু'চোখের গভীর ক্ষত
ক্ষয়ে ক্ষয়ে অন্ধকার।

পদ্মাপাড়ে উঠোন আমার
গঙ্গায় ভাসে ঘর।।

হে প্রহরী

মৃত্যুঞ্জয় সেন

বিশ্বাস করো, বিশ্বাস করো হে প্রহরী
আমি অন্তহীন দুঃখেই একে রেখে গেছি

আমি তারপর কত আগুন নেভাতে চেষ্টা করেছি
আমি কত যাত্রা করেছি, দীর্ঘপথ,
বিশ্বাস করো, হে প্রহরী। একটু শান্তির জন্যে

পৃথিবীতে সর্বত্রই গলন্ত ধাতু, অস্থির পোড়াগন্ধ
আমার আগুনই নেভে নি, পোড়াগন্ধে আমি অস্থির
বিশ্বাস করো হে প্রহরী, আমি তাই আবার ফিরলাম
তুমি ঐ মৃত্যুদেহটি আমাকে দাও, প্রথম যন্ত্রণার সঙ্গী ও।

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

● লুদমিলা চুরসিনা—সোভিয়েট অভিনেত্রী

ভারতের তৃতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতার বিচারকমণ্ডলী

পূর্ণাঙ্গ চিত্র

সভাপতি---শ্রী সত্যজিৎ রায়, সদস্য---শ্রী কে এ আব্বাস (ভারত), মিসেস মাগদা (মিশর), মিঃ এস কে কালাতোঝোভ, (সোভিয়েট ইউনিয়ন), মিঃ আঁদ্রে ওয়াইডনা (পোল্যাণ্ড), প্রফেসর এ এম ব্রাউসিল (চেকো-শ্লোভাকিয়া), মিঃ লিণ্ডসে এণ্ডারসন (গ্রেট বৃটেন), মিঃ জর্জ সাদৌল (ফ্রান্স), মিসেস কাওয়াকিতা (জাপান), ডাঃ ওক্টাভিয়া পাজ (মেক্সিকো), মিঃ আলবার্টো লাত্তুদা (ইটালী)।

স্বল্পদৈর্ঘ্য চিত্র

সভাপতি---শ্রী জে এল ভবনাগেরী, সদস্য---মিঃ বলেসুাব মিকালেচ্ (পোল্যাণ্ড), মিঃ গুয়োগলভার (কানাডা), মিঃ এফ ড্রিনিলেক (চেকোশ্লোভাকিয়া), মিঃ জেরার্ড এলকন (আমেরিকা)।

উৎসবের কর্মসূচী

গত ৮ই জানুয়ারী থেকে নয়াদিল্লীতে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব সুরু

● জে এল ভবনাগেরী—স্বল্পদৈর্ঘ্য চিত্রের বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি।

● সত্যজিৎ রায়—বিচারক মণ্ডলীর সভাপতি।

● কে এ আব্বাস—বিচারক-মণ্ডলীর সদস্য।

● 'আমেরিকা আমেরিকা' চিত্রের একটি দৃশ্য

হয়েছে। উদ্বোধন করেছেন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণাণ।

এই আন্তর্জাতিক উৎসব ভারত সরকার এবং ফিল্ম ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ার যুক্ত উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ইতিপূর্বে দুবারের উৎসব ছিল প্রতিযোগিতাহীন। এবার প্রতিযোগিতা হচ্ছে এবং প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ছবি ও পরিচালককে সোনার ময়ূর পুরস্কার দেওয়া হবে। ৮ই থেকে ২১শে জানুয়ারী একপক্ষকাল দিল্লীতে উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। ২১শে রাষ্ট্রপতি শ্রেষ্ঠ ছবি ও পরিচালক, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পুরস্কার দেবেন।

২২শে থেকে ২৮শে কলকাতায় ও মাদ্রাজে এবং ২৯শে থেকে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বোম্বাইতে চলচ্চিত্র সপ্তাহ আরম্ভ হবে।

কলকাতার কর্মসূচী

২২শে জানুয়ারী বিকাল ৫টায় রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু লাইট হাউস সিনেমায় চলচ্চিত্র সপ্তাহ উদ্বোধন করবেন। বিদেশাগত অতিথিবৃন্দ এখানে উপস্থিত থাকবেন। কলকাতার প্রায় ছয়টি সিনেমায় একসঙ্গে প্রতিযোগী ও অ-প্রতিযোগী ছবিগুলি প্রদর্শিত হবে। বিদেশাগত পরিচালক, শিল্পী, বিচারকমণ্ডলীর সদস্য ইত্যাদি প্রায় ৪০ জন অতিথি ২২শে জানুয়ারী সকালে দমদম পৌঁছোবেন।

এই অতিথিবৃন্দ ছবি দেখা ছাড়াও নগর দর্শন এবং বিভিন্ন সম্বর্ধনা-সভায় উপস্থিত থাকবেন। বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তির পক্ষ হতে সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়েছে।

নিম্নলিখিত অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ উপস্থিত থাকবেন :

২৩শে জানুয়ারী—সিনে টেকনিশিয়ান এসোসিয়েশন ও সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটায় অনুষ্ঠান।

২৪শে জানুয়ারী—পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

২৫শে জানুয়ারী—আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোক সেন এবং ফিল্ম সোসাইটি আয়োজিত অনুষ্ঠান।

২৬শে জানুয়ারী—রাজ্যপাল কর্তৃক রাজভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠান।

২৭শে—চলচ্চিত্রের মহিলা শিল্পীদের আয়োজিত অনুষ্ঠান।

২৮শে—বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের অনুষ্ঠান।

ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া মোশন পিক্চার্স এসোসিয়েশন (২৩শে), আর ডি বনশাল (২৪শে) এবং হেমেন গাঙ্গুলী (২৭শে) সান্ধ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন।

এছাড়া আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থাও হয়েছে। ২৫শে জানুয়ারী সিনে এমপ্লয়েজ ফেডারেশনের পক্ষ থেকে এবং ২৬শে সিনে টেকনিশিয়ান এণ্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এবং মোশন পিকচার্স এমপ্লয়েজ ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আলোচনার ব্যবস্থা হয়েছে। প্রতিনিধিবৃন্দ ২৩শে জানুয়ারী মিনার্ভা থিয়েটারে 'তিতাস একটি নদীর নাম' নাটক দেখবেন।

● আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিতব্য জাপানী ছবি 'মাদার'-এর একটি দৃশ্য

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রতিযোগী চিত্র ও পরিচালকের নাম

দেশ	ছবির পরিচয়	ছবির নাম	পরিচালকের নাম
১। বৃটেন	পূর্ণাঙ্গ চিত্র	গানস এট বেটাসী	জন গিলারমিন
	স্বল্পদৈর্ঘ	কাস্ট ইন এ নিউ মৌল্ড	মাইকেল হ্যাকফোর্ড
২। বেলজিয়াম	স্বল্পদৈর্ঘ ছবি	হিয়েরোনিমাস বস	ফ্রাককোর্টওয়েরগানা
৩। বুলগারিয়া	পূর্ণাঙ্গচিত্র	সেপার্ড কিস	নিকেলেভালচেভ
	স্বল্পদৈর্ঘ	কেবল	রাদকা বুচভারোভা
৪। কানাডা	স্বল্পদৈর্ঘ	কানন	নরম্যান ম্যাকলরেন
		কেনোযুরাক	জন ফিনে
৫। সিংহল	পূর্ণাঙ্গ চিত্র	গাবপারালিয়া	লেস্টার জমসপেরী
	স্বল্পদৈর্ঘ	ফরওয়ার্ড ইনটু দি ফিউচার	
৬। কিউবা	স্বল্পদৈর্ঘ	রোমিও এণ্ড জুলিয়েট	রেমন স্বরারেজ
		সাইক্লোন	সানটিয়াগো অলভারেজ
৭। চেকোশ্লোভাকিয়া	পূর্ণাঙ্গ চিত্র	জানোসিক(১ম ও ২য়)	পলো বেইলিক
	স্বল্পদৈর্ঘ	দি বটন এণ্ড দি ওয়ার্ল্ড	যেনেকস্মেটানা
৮। ফিনল্যাণ্ড	স্বল্পদৈর্ঘ	দি কার্টস অব মে ইন হেলসেঙ্কি	আইতোমাকিনন
৯। ফ্রান্স	পূর্ণাঙ্গ চিত্র	কাণ্টেমাস	পাঁত্রে হনেবেলে
	স্বল্পদৈর্ঘ	এ্যানিমালস	ফ্রেডেরিক রোসিফ
১০। পশ্চিম জার্মানী	স্বল্পদৈর্ঘ	ডিপিং অব দি ডিগ্নিটি অব ম্যান	ডাঃ হেসফেল্ড
	স্বল্পদৈর্ঘ	দি ফিল্ম হউ3 নোবডি সীগ	হান্স সান্ধ
১১। পূর্ব জার্মানী	পূর্ণাঙ্গ চিত্র	বিলাভড হোয়াইট মাউস	ডাঃ গটফিল্ড কলডিৎস
	স্বল্পদৈর্ঘ	সিটি নাইফ বিল্ডিং মেথড	গেরহার্ড জেনস্চ
১২। হংকং	পূর্ণাঙ্গ চিত্র	লাভার্স রক (সিনেমাস্কোপ)	পেন লেই
১৩। হাঙ্গেরী	পূর্ণাঙ্গ চিত্র	মিসিটারিব্যাণ্ড	এণ্ডে মার্টন
	স্বল্পদৈর্ঘ	ওয়ান-টু-থ্রি	
১৪। ভারত	পূর্ণাঙ্গ চিত্র	নির্জন সৈকতে	তপনসিংহ
	স্বল্পদৈর্ঘ	লাভল এণ্ড শিটি	এন, এস, থাপা
১৫। ইতালী	পূর্ণাঙ্গ চিত্র	ইরং মান	
	স্বল্পদৈর্ঘ	ফেকেডস অবরোন	
১৬। জাপান	পূর্ণাঙ্গ চিত্র	স্টোরি অব এ নিউ ফটোগ্রাফার	তাকেশী তুবোসিন
	স্বল্পদৈর্ঘ	এগ্রিকালচার ইন জাপান	তেরু আতসুসি
১৭। মালয়েশিয়া	স্বল্পদৈর্ঘ	[illegible]	[illegible] বি, [illegible]
১৮। নেদারল্যাণ্ড	স্বল্পদৈর্ঘ চিত্র	হল্যাণ্ড অফ গার্ড	গেরার্ড রাউক্যাম্প
	স্বল্পদৈর্ঘ চিত্র	এভরিথিং অব সামথিং	এড জ্যাচথিং
১৯। মরক্কো	স্বল্পদৈর্ঘ চিত্র	ন্যুটস এণ্ডালাউসেস	লাবি বেনানী
২০। নাইজেরিয়া	স্বল্পদৈর্ঘ চিত্র	ব্রিটেন ওয়ার্ল্ড	আণ্ডারউড
২১। পোল্যাণ্ড	পূর্ণাঙ্গ চিত্র	ফাকে ক্রম দি পাস্ট	জান রাইকোবস্কি
	স্বল্পদৈর্ঘ	রেসার্স	কোসিনস্কি
২২। রুমানিয়া	পূর্ণাঙ্গ চিত্র	দি হকমা	মিচি দ্রাগেব
	স্বল্পদৈর্ঘ	দ্যাট ইজ দি ওয়ে টু গো ইনফাগারাস	পল এমব
২৩। সিরিয়া	স্বল্পদৈর্ঘ চিত্র	এপ্লাইড আর্টস ইন সিরিয়া	পল এমল
২৪। সুইডেন	পূর্ণাঙ্গ চিত্র	ওয়েডিং সুইডিশ স্টাইল	জেলচক
২৫। তুরস্ক	পূর্ণাঙ্গ চিত্র	কনকোয়েরার অব দি গোল্ডেন সিটি	আতেফ রেফিগ
২৬। সংযুক্ত আরব রাষ্ট্র	পূর্ণাঙ্গ চিত্র	বাইড হ্যাজ এ মাদার	আতেফ সালেম
	স্বল্পদৈর্ঘ	সেভেন হাণ্ড্রেড ক্যাথিড্রাল	
২৭। আমেরিকা	পূর্ণাঙ্গ চিত্র	আইল্যাণ্ড অব দি ব্লু ডলফিন্স	জেমস বি ক্লার্ক
	স্বল্পদৈর্ঘ	কুইবেক স্পোর্ট পেগাণ্ট	জ্যাক কুনে
২৮। সোভিয়েট ইউঃ	পূর্ণাঙ্গ চিত্র	দি ডনস্টোরী	কেজিন
	স্বল্পদৈর্ঘ	দিস ইজ মাই ল্যাণ্ড	
২৯। যুগোশ্লাভিয়া	পূর্ণাঙ্গ চিত্র	ডু নট ক্রাই পিটার	
	স্বল্পদৈর্ঘ	কাউ এট দি বর্ডার	

হিন্দী পূর্ণাঙ্গ চিত্র 'হকিকৎ' (চেতন আনন্দ) বিশেষ আমন্ত্রণে প্রতিযোগিতায় প্রদর্শিত হবে।

প্রতিযোগিতার বাইরে কিছু সংখ্যক বিদেশী ও দেশী ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থাও হয়েছে। নিম্নোক্ত পূর্ণাঙ্গ ছবিগুলি প্রদর্শিত হবে :

বিদেশী : স্যাটারডে নাইট সানডে মর্নিং (বৃটেন), দি ক্যাট, দি হপ পিকার্স, দি ডেথ কল্ড এংগেচান (চেকোশ্লোভাকিয়া), দি আমব্রেলাস অব চেরবার্গ ; দি ম্যান ফ্রম রিও (ফ্রান্স), নেকেড এমং উলভস্ (পূর্ব জার্মানী), দি ভিজিট (পশ্চিম জার্মানী), হ্যাংস ওভার দি সিটি (ইতালী), হি এণ্ড সী, সেভেন সামুরাই (জাপান), নাইফ ইন দি ওয়াটার (পোল্যাণ্ড), উইন্টার লাইট (বার্গম্যান), আমেরিকা, আমেরিকা (এলিজাকাজান)।

দেশী : নজ্জিল উর আলয়াম (তামিল), রাঙ্কারূপানা (তেলেগু), নর্তনশালা (তেলেগু), মুঙ্গ মানসুলু (তেলেগু), দোস্তি (হিন্দী), আরতি (হিন্দী), গেহ্‌রা দাগ (হিন্দী), জী (হিন্দী), গঙ্গাযমুনা (হিন্দী), দো বিঘা জমিন (হিন্দী), কোর্ট ডান্সার এণ্ড এভালেন্স (ইংরেজী), প্রপঞ্চ (মারাঠি), [illegible]

চিত্রসেন্সর

পি. ভি. রাজমান্নার

প্রাচীন রোমের একজন বিচারপতিকে বলা হোত, 'সেন্সর'। তাঁর অন্যান্য কাজের মধ্যে ছিল, জনগণের নৈতিক চরিত্রের দিকে লক্ষ্য রাখা। এখনও সেন্সর করা মানে বলতে আমরা এই নীতির কথাই বুঝি। কোনও কিছু ছাপান, প্রচার বা প্রদর্শনের ওপর যখনই কর্তৃপক্ষ বিধিনিষেধ আরোপ করেন, তখনই তাকে 'সেন্সর' করা বলা হয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে নৈতিক মান উঁচু রাখা এবং রাষ্ট্রের কল্যাণ।

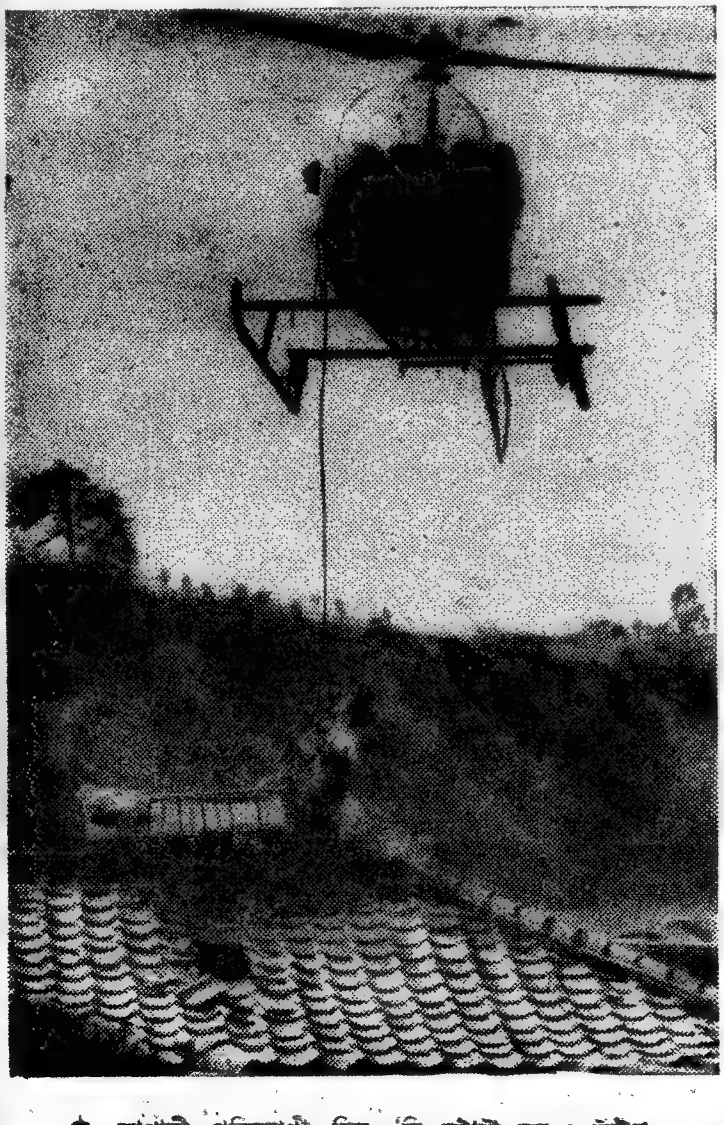

জাপানী প্রতিযোগী চিত্র 'দি স্টোরী অব এ নিউজ ফটোগ্রাফার'-এর একটি দৃশ্য।

সেন্সর করার মানেই সমালোচনা এবং দোষ ধরা। কাজেই কথাটা এবং কাজটা খুব জনপ্রিয় নয়। কারণ প্রচারের এবং প্রকাশের স্বাধীনতার সঙ্গে এটা খাপ খায় না। ভারতের সংবিধানের ১৯নং ধারায় প্রত্যেক নাগরিককে কথা বলবার এবং মত প্রকাশ করবার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই অধিকার একেবারে অখণ্ড অধিকার বা বল্গাহীন অধিকার নয়। সংবিধানের ১৯ (২) ধারায় এই সব বিধি-নিষেধের কথা আছে। তাতে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, অন্য দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব-সম্পর্ক, শৃঙ্খলা, সৌন্দর্যবোধ এবং নীতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্র আইন করে এই অধিকার কিছু পরিমাণ খর্ব করতে পারেন।

চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে

চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয় জনসাধারণের কাছে---প্রধানত এগুলি প্রমোদমূলক। অবশ্য কিছু কিছু চলচ্চিত্র তৈরি হয় কেবলমাত্র শিক্ষাদানের জন্য। চলচ্চিত্র নির্মাণ শিল্পীর কাজ। অবশ্য আরেক দিক দিয়ে এটি হল শ্রমশিল্প বিশেষ। চলচ্চিত্রের সবচেয়ে সুবিধা হল, এটি সকলের কাছেই পৌঁছোয়—সমাজের প্রত্যেক স্তরে এর গতি। কাজেই ছবির দর্শকদের মধ্যে থাকেন বুদ্ধিজীবীরা আবার তেমনি নিরক্ষররা। দর্শকদের মধ্যে থাকেন সংস্কৃতিবান ব্যক্তিরা, আবার থাকেন অ- বুদ্ধিরা। বই অথবা নাটকের চেয়ে চলচ্চিত্রের প্রভাব অনেক বেশি।

কাজেই এর ভাষা, ভাব এবং চিত্রায়ণের ওপর কিছু নিয়ন্ত্রণ রাখা প্রয়োজন। স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু ১৯৫৫ সালে এক চলচ্চিত্র আলোচনা-চক্রে বলেছিলেন: 'সিনেমার প্রভাব, বই, খবরের কাগজ, সাময়িক পত্রিকা ইত্যাদির চাইতে অনেক বেশি। কাজেই এর গুরুত্বও বেশি। কাজেই সরকারকে এ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে হয়। কিভাবে, সেটা অন্যকথা। এইসব শিল্পকলার ব্যাপারে সরকার খুব হস্তক্ষেপ করুক, এটা আমি চাই না। তবে যে জিনিসের প্রভাব ও প্রচার বেশি তার সম্পর্কে সরকার উদাসীন থাকতে পারেন না।'

● তুরস্কের হালিত রেফিগ পরিচালিত 'গুরবেত কোসলারি' ছবির এক নাটকীয় মুহূর্ত।

চলচ্চিত্র-নিয়ন্ত্রণ আইন

ভারতবর্ষে চলচ্চিত্র আইন বলতে প্রথম আইন পাশ হয় ১৯১৮ সালে। প্রত্যেক প্রাদেশিক সরকারকে ক্ষমতা দেওয়া হয় কমিটী গঠন করে চলচ্চিত্রগুলি যে সাধারণের কাছে প্রদর্শনযোগ্য তার সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য। ১৯৪১ সালে এই আইনের সংশোধন করে কেন্দ্রীয় সরকার নিজের হাতে ক্ষমতা নিয়ে নেন। ১৯৫২ সালে নতুন এক সিনেমা আইন পাশ হয়। এই আইন অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার একটি চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড গঠন করেন। বোর্ডে একজন সভাপতি এবং অনধিক ৯ জন সদস্য থাকেন। চলচ্চিত্র তৈরি হলে, এই বোর্ডের কাছে আবেদন করতে হয়। বোর্ড ছবিটি দেখে হয় প্রদর্শনের অনুমতি দেন—না হয় বলে দেন যে, এই ছবি কেবল প্রাপ্তবয়স্কের জন্য, আর না হলে কিছু কাটছাঁট করতে বলেন অথবা বলে দেন যে, ছবিটি একেবারেই প্রদর্শন করা চলবে না। অবশ্য আবেদনকারীকে তাঁর বক্তব্য বলার সুযোগ দেওয়া হয়। কাজের সুবিধার জন্য বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং কলকাতায় চলচ্চিত্র উপদেষ্টা বোর্ড গঠন করা হয়েছে।

● বৃটেনের কারেল রেইজ পরিচালিত 'স্যাটারডে নাইট এণ্ড সানডে মর্নিং-এর একটি দৃশ্য।

চলচ্চিত্রটি যদি সকলের প্রদর্শনযোগ্য হয়, তা হলে সেন্সর বোর্ড এটিকে 'ইউ' সার্টিফিকেট দেবেন। যদি কেবল প্রাপ্তবয়স্কদের উপযোগী হয়, তবে 'এ' সার্টিফিকেট দেবেন। আইনের ধারায় সংবিধানে উল্লিখিত বিষয় নিয়ে স্পষ্ট বলা হয়েছে, কোন কোন ক্ষেত্রে সেন্সর বোর্ড কি কি কারণে কাটছাঁট করতে পারেন।

সেন্সর বোর্ডের কাজ সম্পর্কে কয়েকটি নীতি নির্ধারিত করা আছে। যেমন, আত্মহত্যা, অস্ত্রোপচারের সময় খুঁটিনাটি দৃশ্য, যৌনব্যাধি, মহিলাদের অন্তর্বাস, কুরুচিপূর্ণ নাচ, কুরুচিপূর্ণ গান, জাতীয় প্রতিষ্ঠানের অবমাননাকর দৃশ্য, শিশুদের প্রতি নিষ্ঠুরতা, জঘন্য হত্যা, অথবা মাতলামির দৃশ্য, শ্রেণীবিদ্বেষ প্রচার,

অনৈতিকভাবে অর্থ আদায়ের দৃশ্য এবং জীবিত ব্যক্তির মানহানি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলচ্চিত্রশিল্প সবচেয়ে বেশি উন্নত। সেখানেও কিছু নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সকলে একমত। মার্কিন চলচ্চিত্র সমিতির সভাপতি মিঃ এরিক জনস্টন বলেছেন, আইনের মধ্যে যে স্বাধীনতা, সেটাই আসল স্বাধীনতা। নৈতিক দিক বাদ দিয়ে কোনও স্বাধীনতাই চলতে পারে না। আইনের নিষেধের বাইরে অবাধ স্বাধীনতার অর্থই হল উচ্ছৃঙখলতা।

হয় সেন্সর প্রথা চালু রাখতে হয়, না হলে চলচ্চিত্রশিল্প যাতে নিজে থেকেই কিছু কিছু বাধা-নিষেধ রেখে কাজ চালান, তার ব্যবস্থা দেখতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অধিকাংশই এইসব নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী। অর্থাৎ সেন্সর ব্যবস্থা সরকারের হাতে না দিয়ে চলচ্চিত্রশিল্প নিজেরাই একটি বিধি অনুযায়ী চলচ্চিত্র নির্মাণের পক্ষপাতী। দেখা যায় যে, ভারত সরকার যে নীতি অনুসারে সেন্সর করে থাকেন, মার্কিন দেশের চলচ্চিত্র শিল্পের নির্মাণ ও বিজ্ঞাপন বিধির ধাঁচও সেই রকমের। এই নীতিগুলির মোটামুটি ভিত্তি হল—

দর্শকদের নৈতিক দিক নিম্নমুখী করবেন না, তাঁরা পাপ এবং কুকর্মের প্রতি আকৃষ্ট অথবা সহানুভূতিশীল হবেন না, আইনকে ব্যঙ্গ করে আইন-ভঙ্গকে প্রশ্রয় দেবেন না ইত্যাদি। যেসব ব্যাপারে এবং যেসব বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে, সেগুলি হল—অপরাধ, পাপ অথবা নীতিবিগর্হিত কাজ, নরনারীর যৌন সম্পর্ক, প্রতিরক্ষা বাহিনী ও সরকারী চাকুরীর প্রতি অসম্মান, আইন-শৃঙখলার বিরোধিতা, বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারত সরকারের সম্পর্কহানি, সামাজিক অশান্তি ও হিংসা ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, অপরাধ যারা করে তাদের মহান করে দেখানো উচিত নয়, অথবা এমন ভাব দেখানো উচিত নয় যে, অপরাধ করলে সুফল পাওয়া যায়। নরনারীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিবাহের পবিত্রতাকে ক্ষুণ্ণ করে কোনও দৃশ্য যেমন দেখানো উচিত নয়, তেমনি বলাৎকার, গণিকা-বৃত্তি ইত্যাদিও দেখানো উচিত নয়।

তা ছাড়া কামোন্মত্ততা, নগ্নতা ইত্যাদি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ চালু আছে।

বৃটেনে সরকারী কোনও সেন্সর প্রতিষ্ঠান নেই। তবে বৃটিশ বোর্ড অফ ফিল্মস সেন্সর বলে একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান আছে: এই বোর্ড সার্টিফিকেট না দিলে কোনও ছবি প্রদর্শিত হতে পারে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যেমন চলচ্চিত্রবিধি আছে, বৃটেনে সেরকম কিছু নেই। বৃটেনে তিনরকম সেন্সর সার্টিফিকেট আছে, সাধারণভাবে সকলের কাছে প্রদর্শনযোগ্য, প্রাপ্তবয়স্কদের কাছে প্রদর্শন করলে ভাল হয়, কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য।

এরকম স্বাধীন সেন্সর যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য সদস্যদের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। সরকারের তত্ত্বাবধানে সেন্সর ব্যবস্থা খারাপ নয় যদি সদস্য মনোনয়নের সময় সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে এবং চলচ্চিত্রশিল্পের ঠিকমত প্রতিনিধি গ্রহণ করা হয়। সেন্সর প্রথা থাকলে তার বিরুদ্ধে সমালোচনা হতে বাধ্য। অনেকে সমালোচনা করেন যে, বিদেশী ছবি একভাবে সেন্সর করা হয়, দেশী-ছবি অন্যভাবে। এ ধরণের অভিযোগ খণ্ডন করা যায় না। তবে খোলা মন নিয়ে সরকার যদি এসব অভিযোগ সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করেন, তাহলে অভিযোগের তীব্রতা কমে যাবে।

● উৎসবে বিশেষ প্রদর্শন ডেন- ডেনমার্কের ছবি 'ড্রিম ট্রিপ টু ডেনমার্ক'-এর একটি দৃশ্য।

সরোজ সেনগুপ্ত

ময়ূর আমাদের জাতীয় পক্ষী, আমাদের ঐতিহ্যের প্রতীক। ভারতে অনুষ্ঠিত প্রথম প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার তাই সোনার ময়ূর। তবে পেখমধরা ময়ূর কিনা তা এখনও জানা যায় নি, যেমন এই প্রবন্ধ লেখবার সময় জানা যায় নি চূড়ান্তভাবে—কোন কোন দেশের ছবি প্রতিযোগিতায় যোগদান করবার জন্যে নির্বাচিত হয়েছে এবং নিমন্ত্রিত হিসেবে কোন কোন দেশের প্রতিনিধিরা ভারতবর্ষে আসছেন। কারা আসছেন না তা অবশ্য জানা গেছে। চ্যাপলিন-দম্পতি আসছেন না, এবং সোফিয়া লোরেন আসছেন না। চ্যাপলিন-দম্পতি কেন আসছেন না তা জানা যায় নি, কারণ মানবতাবোধের মূর্তপ্রতীক চ্যাপলিন আমাদের শ্রীমতী গান্ধীর দ্বিতীয় চিঠির জবাব-ই দেন নি।

শ্রীমতী গান্ধী অবশ্য নিমন্ত্রণ করবার সময় তাঁর পরলোকগত পিতার সঙ্গে চ্যাপলিনের সৌহার্দ্যপূর্ণ সাক্ষাৎকারের কথা উল্লেখ করতে ভোলেন নি। কিন্তু মনে হচ্ছে, আমাদের পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর কথা চ্যাপলিন একেবারে ভুলে গেছেন। নইলে ভদ্রতার খাতিরেও একটা জবাব দিতেন। সোফিয়া লরেনকে নিমন্ত্রণ করবার সময় সংশ্লিষ্ট দপ্তর একটা ভুল করেছেন। 'পুনশ্চ'-এর মধ্যে তাঁদের লিখে দেওয়া উচিত ছিল—'আপনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করিলে লোলোব্রিগিডাকে আমন্ত্রণ জানান হইবে। ভারতবর্ষে লোলোর গুণগ্রাহীর সংখ্যা তাহাতে বৃদ্ধি পাইবে।' আমি যতটুকু জানি, লরেন তা হলে এক সপ্তাহ আগেই এসে বসে থাকতেন।

শোনা গেল, সিডনী পইটিয়ার আসছেন। কৃষ্ণাঙ্গ এই অভিনেতাটি ইতিমধ্যে এমন কতগুলি কাজ করেছেন, যা অনেক শ্বেতাঙ্গও করতে পারেন নি। যথা, ১৯৬৩ সালে 'লিলিজ অব দি ফিল্ড'-এ অপূর্ব অভিনয়ের জন্যে বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন, ঐ একই কারণে আমেরিকান অস্কার পেয়েছেন এবং ১৯৬৪ সালে বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে আমেরিকান ডেলিগেশনের দলপতি হয়ে এসেছিলেন। ইতিপূর্বে কোন কৃষ্ণাঙ্গ এত সম্মানের অধিকারী হন নি।

পইটিয়ারের সঙ্গে আমার দেখা এবং ঘনিষ্ঠতা হয় বার্লিনে, চতুর্দশ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে। সাংবাদিক সম্মেলনে বিবিধ প্রশ্নের জবাবে তাঁর উত্তর শুধু আমাকে নয়, উপস্থিত সবাইকে বিস্মিত করে। লোকটি শুধু কৃষ্ণকায়-ই নন, শিক্ষিতও বটে। কৃষ্ণকায়দের নিয়ে আজকের আমেরিকার সমস্যা, কী করে আমেরিকা সেইসব সমস্যার সমাধান করবার চেষ্টা করছেন, তার নিখুঁত বিবরণ দেন পইটিয়ার স্ট্যাটিসস্টিক সহ। এ-ও বলেন, যে দক্ষিণ আমেরিকাকে জন কেনেডি সহ একাধিক মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে হত্যার জন্য দায়ী করা হয়, সেই দক্ষিণ আমেরিকা থেকেই তিনি সবচাইতে বেশি অভিনন্দন পেয়ে ছিলেন অস্কার লাভের পর। Ladies and gentlemen,

Kenne'y did not die for nothi g!

অনিল-এর সঙ্গে পইটিয়ারের বন্ধুত্ব খুতি সহজেই গড়ে ওঠে। 'আ রে, তুমি তো দেখছি বেশ ফর্সা! তা, এসো না, তোমাতে আর আমাতে আর একটা ডিফায়েন্স ওয়ান্স' তৈরি করি।' ককটেল পার্টির কোলাহলকে ছাপিয়ে উঠেছিল আমাদের উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দ।

'তুমি তো সাংবাদিক। ফিল্ম ফেয়ার নামক ভারতীয় মুভী ম্যাগাজিনে কলকাতা থেকে যিনি লেখেন তাঁকে চেন?'

'হ্যাঁ চিনি। কিন্তু কেন বল তো?'

'তাঁর লেখা 'লিলিজ অব দি ফিল্ড'-এর সমালোচনা আমি পড়েছি ওই মুভী ম্যাগাজিনের হলিউড সংবাদদাতা সিলভিয়া নরীসের সৌজন্যে। গালাগালটা উনি ঠিকই দিয়েছেন। 'ইস্ট বার্লিন সম্বন্ধে ওই প্রোপাগাণ্ডাটা না থাকলে ছবিটি আরও ভাল হত। দেখা হোলে তাঁকে বলো এই কথা।'

অনিল হাটে হাঁড়ি ভাঙল। তৎপরতার সঙ্গে বললো—'তার প্রয়োজন হবে না, কারণ সমালোচক খোদই শুনছে তোমার প্রশংসা।'

'তুমি!'

'হ্যাঁ, আমি।'

'আড়িপেতে নিজের প্রশংসা শুনছিলে?'

'এটা উচিত নয় ঠিকই, কিন্তু লোভও সামলাতে পারলাম না। তোমার কাছ থেকে প্রশংসা শোনাটা কম কথা নয়।'

'ফ্ল্যাটারার।' বলে পইটিয়ার আমার হাতটা ধরে সজোরে নাড়া দিল। কবজীর জোর দেখে বুঝলাম কেন ভারতের ক্রিকেট ক্যাপ্টেন নরী কণ্ট্রাক্টরের মাথা ফেটে ছিল।

আরো শুনলাম, পোলিশ চিত্রকার আঁদ্রেই ওয়াইদা আসছেন। আনন্দিত হবার মতো খবর। কারণ বিশ্ব-চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে ওয়াইদার স্থান অতি উচ্চে। ১৯৫৭ সালে কাঁ চলচ্চিত্র উৎসবে 'ক্যানাল' প্রদর্শিত হবার পর চলচ্চিত্র-দুনিয়ার একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত রটে গেল এই বার্তা যে, আর একজন দুর্ধর্ষ চিত্রকারের আবির্ভাব হয়েছে এবং পোলাণ্ড থেকে।

এরপর পৃথিবী দেখল 'ক্যানাল'-এর পূর্ববর্তী 'এ জেনারেশন' এবং পরবর্তী 'অ্যাশেস অ্যাণ্ড ডায়মণ্ড'। এবং বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দেখল কী করে একটা জাতির আত্মপ্রকাশের তাগিদ—দীর্ঘকাল ধরে যে তাগিদের তাড়নায় পোলিশ-শিল্পচিত্ত আত্মপীড়ায় বিক্ষুব্ধ ছিল—এই ছবিগুলির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। ওয়াইদার ছবি পোলিশ

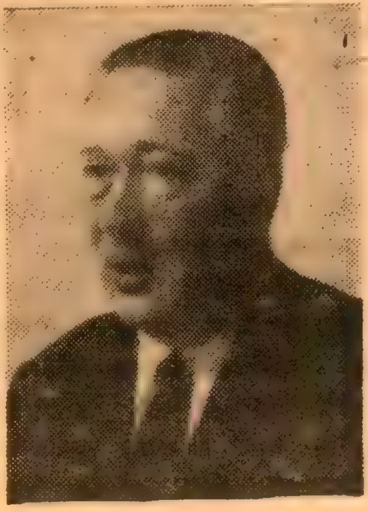

● সুইডেনের পরিচালক তোরে সোবাগ

ঐতিহ্যের ইতিহাস। উনবিংশ শতাব্দীতে নেপোলিয়ান এবং রাশিয়ান সম্রাট আলেকজান্দারের বিশ্বাসঘাতকতায় পোলাণ্ড বিক্ষুব্ধ হল, অনস্তিত্বের দাহ অন্তরে বহন করতে হল ১৯১৮ সাল পর্যন্ত। প্রথম মহাযুদ্ধের পর পোলাণ্ডের স্বাধীনসত্তা আবার বিপন্ন হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে। পোলাণ্ড এখন স্বাধীন রাষ্ট্র বটে, কিন্তু ইতিমধ্যেই অনেক জীবন নষ্ট হয়েছে, অনেক প্রতিভার অপমৃত্যু হয়েছে, অনেক যৌবন বিফলে গেছে। এই সর্বগ্রাসী মৃত্যুর কথা পোলাণ্ড ভুলতে পারে নি। ওয়াইদার ছবিতে সেই অবদমিত যন্ত্রণারই প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ আত্মপ্রকাশ।

ওয়াইদাকে আমি দেখি নি, কারণ বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে সোস্যালিস্ট দেশের ছবির প্রবেশ নিষেধ এবং আমাদের সরকার আমাকে কোন সোস্যালিস্ট দেশে যাবার অনুমতি দেন নি এতাবৎকাল। ভবিষ্যতে দেবেন কি না কে জানে।

শুনেছি উৎসবের বাইরে ইংমার বের্গম্যানের সর্বশেষ চিত্রসৃষ্টি 'দি সাইলেন্স' দেখান হবে এবং (un-censored) তা যদি হয় তবে স্বীকার করতেই হবে, শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে চলচ্চিত্রশিল্প নীতিবাদের পাশমুক্ত হয়ে এগিয়ে যাবার সুযোগ পাবে। কারণ আমাদের সমাজের 'নির্ধারিত নীতিবোধ' (comitted morals)-এর ওপর তীব্র কশাঘাত 'দি সাইলেন্স'। জিনিসটা আসলে অশ্লীল অথবা রুচি-বিরুদ্ধ নয়। অপরের অশ্লীল অথবা রুচি-বিরুদ্ধ একটা মনোভাব জিনিসটার ওপর আরোপিত হয় মাত্র। বিবাহ একটা মর্যাল কমিটমেণ্ট, কিন্তু ব্যভিচার কী নেই? বারবনিতার অস্তিত্ব কী নিঃসন্দেহে এই প্রমাণ করে না যে, 'চুক্তি' অনায়াসেই এবং সকলের জানিত মতেই লঙ্ঘিত হচ্ছে? অতএব নির্ধারিত নীতিবোধের কোন মূল্য নেই। এই দিক থেকে ছবিটিকে বিচার করলে দেখা যাবে, 'দি সাইলেন্স' একটি বিপ্লবী চিত্রসৃষ্টি।

মিসেস মাগদা নাম্নী জনৈকা জুরীমণ্ডলীর সভ্যা আসছেন কায়রো থেকে। ইনি 'দি টিন এজারস' ছবির নায়িকা মাগদা কিনা জানি না। শুনেছি তিনি এখন বিবাহিতা। তাই যদি হয়, তবে ১৯৬১ সালে বার্লিনে মিসেস মাগদার সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্ব হয়েছিল। অসাধারণ সুন্দরী এবং বুদ্ধিমতী মেয়ে মাগদা এবং

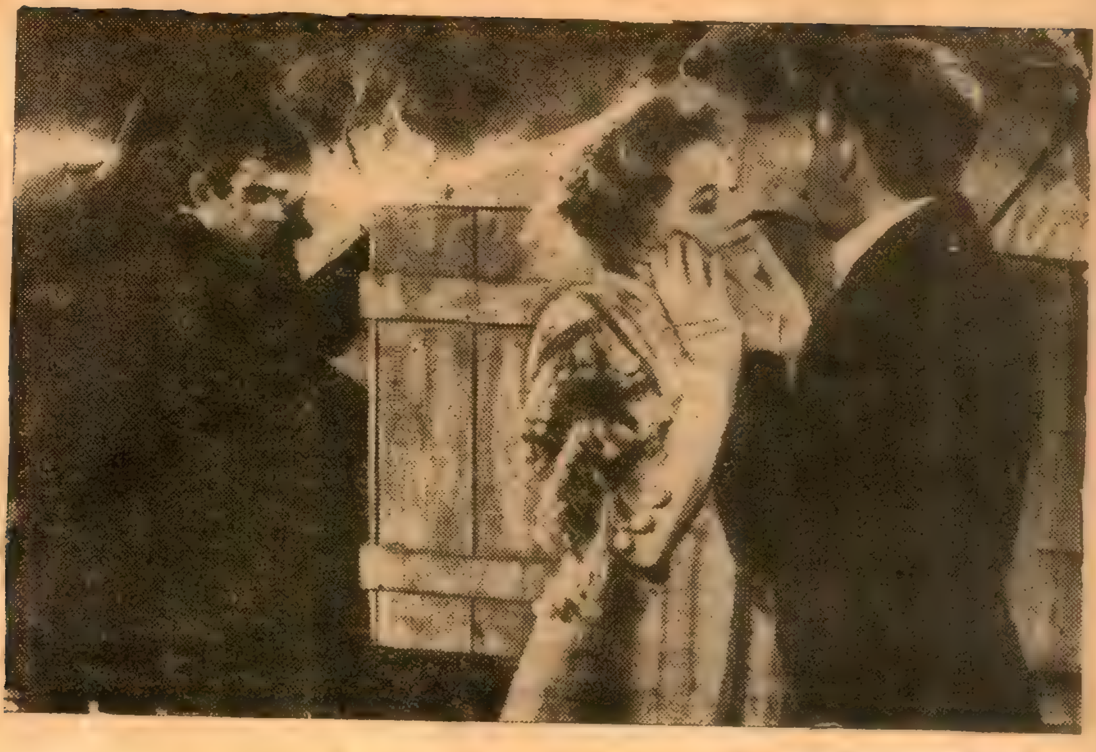

● উৎসবের বিশেষ প্রদর্শন 'আমেরিকা আমেরিকা' ছবির একটি দৃশ্য

প্রতিভাময়ী শিল্পী। সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রের চলচ্চিত্রশিল্প সম্বন্ধে আমার ধারণা উচ্চ নয়—একথা শুনেও তিনি অসন্তুষ্ট হন নি। বরং হাসতে হাসতে বলেছিলেন—'আমাদের মধ্যেও সত্যজিৎ রায় হবেন শীগ্‌গিরই।' রায় ১৯৬১ সালে বার্লিনে জুরীমণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন।

যেসব ছবি উৎসবে আসবে বলে শোনা যাচ্ছে, তার মধ্যে কারেল রেইস কৃত বৃটিশ ছবি 'স্যাটারডে নাইট সানডে মর্নিং', জ্যাকো ডেমি কৃত ফরাসী ছবি 'দি আম্‌বেলাজ্‌ অব সেরবু'', মাইকেল ককায়িস কৃত গ্রীক ছবি 'ইলেকট্রা', বার্নার্ড ভিকি কৃত পশ্চিম জার্মানীর 'দি ভিজিট', মাইকেল অ্যাঞ্জেলো আন্তোনীয়নী কৃত ইতালীয় ছবি 'লা নত্তে' (১৯৬১ বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে golden Bear প্রাপ্ত), জাপানী ছবি 'হি অ্যাণ্ড সি', 'দি ইনসেক্ট ওয়োম্যান' য়ুরোসোয়ার 'দি সেভেন সামুরাই', রোমান রোমানস্কি কৃত পোলিশ ছবি 'নাইফ ইন দি ওয়াটার' আন্দ্রেই ওয়াইদা কৃত পোলিশ ছবি ''দি ইনোসেণ্ট সোর সারার্স' লুই বুনুয়েল কৃত স্প্যানিশ ছবি 'ভিরিডিয়ানা' ইংমার বেয়ারম্যান কৃত সুইডিশ ছবি 'দি সাইলেন্স'—ছবিগুলি আমি দেখেছি এবং এদের নিয়ে অল্পবিস্তর আলোচনাও করেছি। কিন্তু এদের মধ্যে কোন প্রতিযোগিতায় শেষ পর্যন্ত যোগ দেবে তা যখন জানি না, তখন কে সোনার ময়ূর পাবে জানি না। এমন কথাও শুনি নি যে, কেউ এই বলে বায়না ধরেছেন—'তোরা যে যাই বলিস ভাই, আমার সোনার ময়ূর চাই।'

তবে প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ভারতে এই প্রথম। প্রথমবারের ভুল-ত্রুটি থাকবেই, বিশেষ করে যখন এমন এমন ব্যক্তি এর একাধিক কমিটীগুলির মধ্যে আছেন, যাঁদের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব সম্পর্কে সম্যক ধারণা নেই, অথবা চলচ্চিত্র কাকে বলে, তাই জানেন না। তবুও প্রথমবারের ভুল-ত্রুটির সমালোচনা না করাই ভাল। তবে, প্রশংসা করে একথা বলতেই হবে যে, জুরীমণ্ডলীর সভ্য-সভ্যা সবাই উপযুক্ত। এর চাইতে শক্তিশালী এবং representative জুরীমণ্ডলী প্রথম বারেই আশা করা যায় না। লিওসে অ্যাণ্ডারসন, আর্থার নাইট, জর্জ সাদুল, আলবার্তো লাতুয়াদা, রোজার ম্যানভিল প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত সমালোচক এবং ঐতিহাসিকরা আসছেন। এটা অতীব গৌরবের কথা। বাঙালী হিসেবে কংগ্রেস গভর্নমেণ্টের প্রশংসা করবার কোন সুযোগ আজ পর্যন্ত পাই নি; স্বনামে-বেনামে গালাগালিই দিয়ে এসেছি। কিন্তু প্রথম প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের যে আয়োজন ভারত গভর্নমেণ্ট করেছেন তার প্রশংসা করতেই হয়।

দর্শকের দৃষ্টি

কল্পতরু সেনগুপ্ত

ছবি ভাল লাগা নিয়ে সাধারণ দর্শক আর যাঁরা নিজেদের সমঝদার মনে করেন, তাঁদের মধ্যে তফাৎ ক্রমে ক্রমে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যে ছবিকে তথাকথিত সমঝদাররা সার্টি-ফিকেট দেন, সাধারণ দর্শকরা সে ছবি অনেক সময় পছন্দ করেন না।

কিন্তু কয়েকবছর আগে এই তফাৎ এত স্পষ্ট ছিল না। অবশ্য ভাল সাহিত্য হৃদয়ঙ্গম করার যেমন শক্তি থাকা দরকার, তেমনি ভাল ছবিও বুদ্ধি দিয়ে বুঝবার দরকার হয়। কিন্তু সাধারণ দর্শকদের এত বোকা মনে করা ঠিক নয় যে, তাঁরা ভাল-খারাপ বুঝতে পারেন না। এমন কোন দর্শক আছেন কি, তিনি সুশিক্ষিতই হন, আর অশিক্ষিতই হন, যাঁর চার্লি চ্যাপলিনের ছবি ভাল লাগ না?

একথা অবশ্যি সত্যি—চার্লি চ্যাপলিনের 'গোল্ড রাশ' বা 'মডার্ন টাইমস'-এর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তাৎপর্য শিক্ষিত দর্শকের মনে যতটা রেখাপাত করবে, অশিক্ষিত দর্শকের মনে ততটা করবে না। কিন্তু অশিক্ষিত দর্শকের মনেও সেই ছোট খাটো লোকটির জন্য সহানুভূতি জাগবে, লোকটির দুঃখ-সুখের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়বে; ছবিটি দেখে দর্শক গভীর আনন্দ উপভোগ করে মানবতার বাণীতে অনুপ্রাণিত হয়ে ফিরে আসে।

গ্রিফিথের 'ইনটলারেন্স' ছবির কথাই মনে করা যাক। সে ছবিতে এক ধনী নিজের ব্যবসাকে সঙ্কট থেকে বাঁচাবার জন্য নিজেকে দাতা হিসাবে জাহির করতে শ্রমিকদের বেতন কেটে অনাথ-আশ্রম খুলেছিল। প্রতিবাদ করায় শ্রমিকরা গুলী খেয়ে মরেছিল; তবে তাদের সন্তানরা অনাথ-আশ্রমে জায়গা পেয়েছিল।

এই ছবি হৃদয়ঙ্গম করার ব্যাপারে কোথাও দর্শকদের মধ্যে মতের পার্থক্য দেখা গেছে বলে তো শুনি নি। তবে রাগ করেছিল এক শ্রেণীর মানুষ, যাদের স্বরূপ এতে প্রকাশ হয়েছিল। তাই গ্রিফিথের ছবি আমাদের দেশের দর্শকরা দেখার সুযোগ পান নি। চার্লি চ্যাপলিনের

● উৎসবে বিশেষ প্রদর্শন চেকোশ্লোভাক ছবি 'দি ডেথ কল্ড এংলেচন'-এর একটি উদ্বেগপূর্ণ মুহূর্ত।

সর্বশেষ ছবি তো এতদিনেও এদেশে প্রদর্শিত হয় নি। সের্গেই আইজেনস্টাইনের 'ব্যাটলসিপ পটেম-কিন' সম্পর্কে কি এমন কথা শোনা গেছে যে, কোথাও অশিক্ষিত দর্শকরা এই ছবি পছন্দ করে নি? বরঞ্চ দেখেছি,—শ্রমিকদের ও সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ছবি দেখার জন্য অসীম আগ্রহ। বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ রাজনৈতিক বলা চলে। একদল জাহাজী বিদ্রোহ করেছিল। তাদের আত্মীয়-স্বজন তাদের জন্য অধীর হয়ে উঠেছিল। জনসাধারণ বিদ্রোহী জাহাজীদের সমর্থন করেছিল, জারের বাহিনী নির্মমভাবে জনসাধারণের উপর অত্যাচার করেছিল।

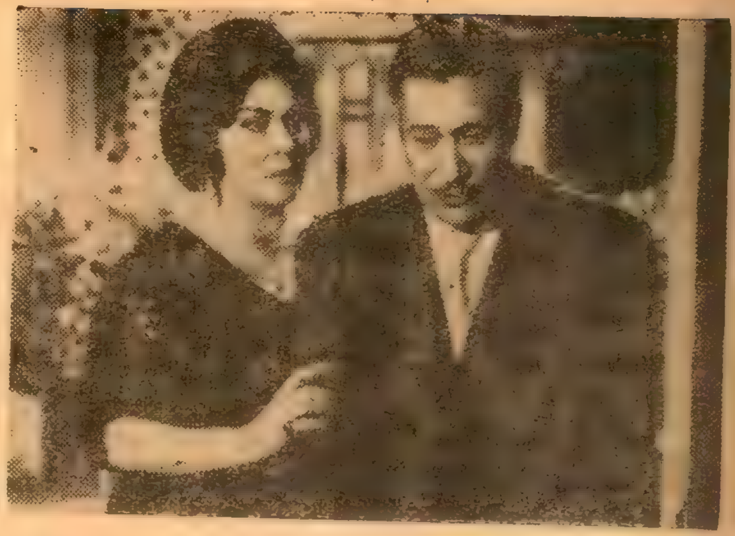

● সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রের 'ব্রাইড হ্যাজ এ মাদার' ছবির একটি দৃশ্য।

ছোট কয়েক রীলের নির্বাক ছবি, আজকালকার কথায় এতে কোন সাফল্যের চাবিকাঠি ও 'যৌন আবেদন' নেই। কিন্তু এই 'ঘাটতি' সত্ত্বেও কি ছবিটির জনপ্রিয়তায় কোন বাধা হয়েছে? আসল কথা যে ছবি সত্যিই ভাল, যে ছবিতে সার্বজনীন আবেদন আছে এবং পরিচালক সার্থকভাবে মানবিক দিকগুলি প্রকাশ করতে পেরেছেন, সে ছবি দর্শকরা গ্রহণ করেন।

যৌনতার প্রাধান্য, নগ্নতা প্রদর্শন কখনো দর্শকদের চাহিদায় ছবিতে আসে নি। পরিচালকদের সৃষ্টি-ক্ষমতা যখনই দেউলিয়া হয়ে গেছে, সেই শূন্যতাকে তাঁরা ঢাকতে চেয়েছেন যৌনতা দিয়ে। দর্শকদের মোহগ্রস্ত করে নীচের দিকে টেনে নামাবার জন্য পরিচালকরাই দায়ী। আজ তাঁরা নিজেদের অপরাধের জালে নিজেরা জড়িয়ে পড়েছেন। অথচ অনর্থক দোষ চাপাচ্ছেন দর্শকদের ওপর।

● হাঙ্গেরীর প্রতিযোগী চিত্র 'দি মিলিটারী ব্যাণ্ড'-এর একটি দৃশ্য।

প্রগতিশীল দর্শকরা বরাবর চ্যাপলিন, গ্রিফিথ, আইজেনস্টাইন, ডভঝেঙ্কো, ক্লুহাটি প্রমুখের বলিষ্ঠ সমর্থক। যাঁরা নিজেদের প্রগতিশীল বলতেন, তাঁরাই উক্ত স্রষ্টাদের সমর্থনে আলোচনা করতেন। কিন্তু হালফিল প্রগতির সংজ্ঞা পাল্টে গেছে। একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রগতিশীল পরিচালক তো বলে বসেছেন, চ্যাপলিন নাকি শেষের দিকে বড় বেশি রাজনীতি ঘেঁষা হওয়ার দরুণ তাঁর ছবি শিল্প-মূল্যের দিক থেকে আগের তুলনায় দুর্বল হয়ে গেছে ইত্যাদি।

একথা ঠিক, চ্যাপলিন কোন-এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেন নি, স্থবিরত্বের দোষ তাঁর শত্রুও তাঁকে দিতে পারবে না। এককালে 'মডার্ন টাইমস'-এ ধনতন্ত্রের স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে, পরবর্তীকালের ধনতন্ত্রের শেষস্তর ফ্যাসিজমের মুখোস উদঘাটিত হয়েছে তাঁর 'গ্রেট ডিক্টেটর'-এ। কালের গতির সঙ্গে তিনি এগিয়ে গেছেন। বিশ্বের গতিপথের নিয়ন্ত্রণশক্তি, রাজনৈতিক আবর্তন ও সামাজিক-অর্থনৈতিক ঘটনাবলী থেকে একজন চিন্তাশীল মানুষ দূরে থাকতে পারেন কি করে?

প্রগতিশীলদের একাংশ আজকাল

নিউ ওয়েভ চলচ্চিত্র রীতির সমর্থক। নিউ ওয়েভের অন্যতম নায়ক ট্রাফো একজন কৃতিসৃষ্টা এবং তাঁর ছবি সার্বজনীন আবেদনে বলিষ্ঠ। পোল্যাণ্ডের 'নাইফ ইন দি ওয়াটার'কে নিয়ে প্রগতিশীলদের খুব মাতামাতি। এই ছবিতে সর্বক্ষণ প্রায় নগ্নদেহ বিকিনি-পরা একটা মেয়েকে দেখান হয়েছে, সেই মেয়েটি পথে-জোটা এক তরুণকে দেহ দিয়ে স্বামীর আভ্যন্তরিতার ক্ষতিপূরণ করলো।

স্বামীর প্রভু-মনোভাবের বিরুদ্ধে অঙ্গুলি নির্দেশ করার জন্য ছবিটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমস্যায় সীমাবদ্ধ। সোভিয়েত রাশিয়ার পরিচালক চুখরাইর 'ফরটিফার্স্ট' ছবির কথা মনে করা যাক। বিপ্লবের পরে গৃহযুদ্ধের কালে বিপ্লবী বাহিনীর হাতে এক হোয়াইট রাশিয়ান অফিসার বন্দী হয়। বন্দীকে নিয়ে সমুদ্র পার হবার সময় ঝড়ে নৌকা-ডুবিতে সকলে নিখোঁজ হয়, কেবলমাত্র এক তরুণী-বিপ্লবী ও বন্দী অফিসার এক নির্জন দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করে। অনন্যোপায় হয়ে তরুণী বন্দীর সামনে নগ্ন হয়ে আগুনে গা গরম করে। ক্রমে বন্দীকে ভালবাসে। তখন বন্দীও প্রহরী নয়, প্রেমিক-প্রেমিকা। শ্বেত রাশিয়ানের পক্ষের লোকজন আসতে বুঝা গেল ওর প্রতিক্রিয়াশীল মত পাল্টায় নি। তাই তরুণীর গুলীতে সে প্রাণ দিল।

প্রশ্ন জাগে, বিপ্লবী-তরুণী শ্বেত রাশিয়ানকে কেন ভালবেসেছিল? তবে কি শুধু দেহের ক্ষুধা? তথাকথিত প্রগতিশীলরা বড় বেশি মাতামাতি করছেন 'হিরোসিমা মন আমোর' ফরাসী ছবিটিকে নিয়ে। যে এই ছবি পছন্দ করে না, তাকে এই ভদ্রলোকেরা প্রগতিশীল বলতে কুণ্ঠিত।

এই ছবির পরিচালক আলাঁ রেসনে অত্যন্ত শক্তিশালী পরিচালক; পূর্ববর্তী ছবিগুলিতে তাঁর প্রতিভার পরিচয় দেখা গেছে। 'হিরোসিমা মন আমোর'-এর বক্তব্য যুদ্ধ-বিরোধী। কিন্তু যুদ্ধ বিরোধিতা এখানে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যক্ত। এই বক্তব্য রাখবার জন্য তিনি ছবি সুরু করেছেন মৈথুনের দৃশ্যে। একবার নয়, দু-বার তাঁকে একজোড়া নগ্নদেহ নরনারীকে আলিঙ্গন ও মর্দনরত অবস্থায় দেখিয়ে তাদের আলাপের মাধ্যমে ছবির বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে।

রেসনের নায়িকার পরিচয় কি? সে নাৎসী অবরুদ্ধ ফ্রান্সে এক নাৎসী সৈন্যকে ভালবেসেছিল (যখন সকলে ওদের ঘৃণা করছে)। সেই সৈন্যটি মুক্তিযোদ্ধাদের গুলীতে নিহত হয়; নায়িকা নিন্দিতা ও লাঞ্ছিতা হয়ে প্যারিসে আসে। সেখানে নতুন করে জীবন গড়ে তুলে, বিয়ে করে, সন্তানের জননী হয়। জাপানে এসেছে হিরোসিমার বিষয়ে অর্থাৎ বিশ্ব-শান্তির জন্য একটা ছবিতে অভিনয় করতে। জাপান থেকে বিদায়ের দু-দিন আগে এক জাপানী ডাক্তারের সঙ্গে পরিচয় (দু-জনেই বিবাহিত সত্ত্বেও) তারই সঙ্গে সহবাস করে। শৃঙ্গারের সময় তার মনে পড়ে সেই প্রথম প্রেমের কথা। নাৎসীর সঙ্গে তার বিধ্বস্ত প্রেমকে সে হিরোসিমার সাথে মিলিয়ে দেখে।

অতীতের ভয়ঙ্কর স্মৃতিকে মুছে ফেলে বর্তমানকে সুন্দর করে গড়ে তোলার মহৎ বাণী শৃঙ্গারের ইঙ্গিতে না দেখিয়ে বলার আর কোন সুন্দর মাধ্যম কি ছিল না? এমন চরিত্রের নায়িকা উপস্থিত করা হয়েছে; যার জীবনে নৈতিকতার মূল্যবোধ নেই। তাই শতাধিক ফরাসী মহিলা এই ছবির বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে চিঠিতে লিখেছেন—

'আমাদের স্বামী-পুত্র-ভাইরা নাৎসীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এত যে বুকের রক্ত ঢেলেছেন, তাকি এর মত গণিকার পায়ে ঢালবার জন্য?'

আসলে রেসনে এবং চুখরাই নগ্নতার বিদ্যুৎ শক্তিতে একটা কথা বলতে চান। কথাটি হলো সাম্রাজ্যবাদী-যুদ্ধ আর দেশের মুক্তিযুদ্ধকে একাকার করে ফেলা। এরা আর কোন যুদ্ধ চান না। এমন কি পরাধীনতার বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধেও এঁদের আপত্তি; স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবে এঁরা শুধু রক্তপাত দেখেন। তাই রেসনের যেমন নাৎসীর সাথে প্রেম করতে আপত্তি নেই, চুখরাইও প্রেমের জন্য আদর্শগত বৈষম্যের কথা চাপা দেন।

এঁদের প্রত্যেকের ছবি টেকনিক্যাল দিক থেকে অসাধারণ উন্নত, কিন্তু সার্বজনীন বক্তব্যের দিক থেকে ও আবেদনে দুর্বল, বড় বেশি ব্যক্তিকেন্দ্রিক। এই ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার দরুণ যৌনতার ব্যাপারে এঁরা দর্শকদের মনে শক দেন। তার চমকে দর্শক আকৃষ্ট হয়। সে চমককে প্রগতিশীল বলে অভিনন্দন জানাবার কোন যুক্তি নেই। আসলে তা হচ্ছে ছবিকে বাজারে চালু করার জন্য প্রগতিশীল বক্তব্যের সুগন্ধ দিয়ে যৌনতার দুর্গন্ধকে চাপা দেওয়া।

এরূপ ছবি সাধারণ দর্শকদের ভাল না লাগে, যদি ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও নগ্নতার পঙ্ক থেকে আসল বক্তব্যের উদ্ধার করতে না পারেন, তার জন্য কি দর্শকদের দোষ দেওয়া যায়? দর্শক তাকেই গ্রহণ করে, যাতে ওদের জীবনের সত্যরূপ, সংগ্রাম ও জয়-পরাজয় প্রতিফলিত হয়, যা থেকে প্রেরণা লাভ করা যায়।

শিল্পের দিক থেকে তাকেই বলবো প্রগতিশীল, যা মানুষকে বিভ্রান্ত করে না, আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর করে তোলে না। সেই ছবিকেই সমর্থন করতে হবে, যে ছবি সত্যের আলোয় এগিয়ে চলার পথ দেখায়।

মহাকবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বৃত্র-সংহার কাব্য

দাম—দুই টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

আজকের পৃথিবীর সেরা বারজন চিত্রপরিচালক

রঙ্গমঞ্চের শিরোনামায় ছায়াচিত্রের পরিচালকদের টেনে আনাটা কি অপ্রাসঙ্গিক হবে? আমি তা মনে করি না---থিয়েটার থেকেই তো সিনেমা, রেডিও-প্লে এবং টেলিভিসন্-প্লে'র জন্ম। সিবিল থর্নডাইকও বলেছেন---Cinema is a growth from the theatre. সুতরাং উপরোক্ত শিরোনামা বজায় রেখেও মাঝে মাঝে ছায়াচিত্রের প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা চলতে পারে। সেরা বারজন পরিচালকের তালিকা নিয়ে তর্ক উঠতে পারে---ইউরোপ, আমেরিকায় শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে কার নাম আসবে এবং কাকে বাদ দেওয়া হবে, তা ঠিক করা সময়ে সময়ে বেশ কষ্টসাধ্য। ভারতবর্ষের এই একটা দিকে বড় সুবিধা---বাছতে অসুবিধা হয় না। প্রতিভাবান চিত্রপরিচালক আমাদের দেশে একজনই মাত্র হয়েছেন---কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সারা পৃথিবী বারবার স্বীকার করে নিয়েছে। যে-কোন ধরণের বিচারে দুনিয়ার সেরা বারজনের ভেতর তাঁর নাম থাকবেই। সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সৃজনশীল শিল্পী-পরিচালক হিসাবে যাঁদের অবদান এখনও পর্যন্ত

থেমে যায় নি, তাঁদের নাম হচ্ছে—

মাইকেল এঞ্জেলো এ্যান্টনিওনি, ইঙ্গমার বার্গম্যান, লুই বুনুয়েল, ফেডারিকো ফেলিনি, এ্যালফ্রেড্ হিচ্‌কক, জন হাস্টন, সত্যজিৎ রায়, জঁ্যা রেনোয়া, এ্যালেন রেজনায়স, ফ্রাঁসোয়া ট্রুফো, লুচিনো ভাইসকণ্টি ও বিলি ওয়াইণ্ডার। কেউ কেউ হয়তো আপত্তি তুলবেন কুব্রিক, ব্রেসন, ওয়েল্‌স, টোরে নিলসন কি বিরাট স্বজনশীল প্রতিভার পরিচয় দিচ্ছেন না নতুন নতুন ছবিতে? দিচ্ছেন বৈকি। তবে দুনিয়ার সেরা বারজনের মধ্যে এঁদের নাম দিতে আমার আপত্তি আছে। চ্যাপলিন, ক্লেয়ার, দা সিকার নাম বাদ পড়ল কেন এ প্রশ্ন উঠতে পারে। আমার উত্তর হল :

Such giants are omitted because they seem unlikely to regain the form of their greatest films.

অল্প কথায় সেরা বারজনের কিছুটা পরিচয় দেওয়া যাক—

মাইকেল এঞ্জেলো এ্যান্টনিওনি (ইতালী)
(MICHEL ANGELO ANTONIONI)

মনস্তাত্ত্বিক-সমস্যার কাব্যিক ধারায় বিশ্লেষণ এবং সমীকরণের বিরাট কৃতিত্ব দেখা যায় এ্যান্টনিওনির ছবির কাজে। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ এবং কিভাবে সে সম্বন্ধের ভেতর ভাঙন ধরে, এরই ওপর ভিত্তি করে তাঁর ছবির প্লট গড়ে ওঠে। ধনী এবং যাঁরা অবসর সুখ ভোগ করে সময় কাটান, এই জাতীয় লোকেদের নিয়েই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে ভালবাসেন ছবির বিষয়বস্তু হিসাবে। এঁর ছবির চরিত্রেরা সবসময়ই স্পষ্ট এবং আত্মসচেতন। তাদের জীবনের একঘেয়েমি, উদ্দেশ্যহীনতা, পরস্পরের সম্বন্ধে বিশ্বাসের অভাব, এসব দিক খুবই সূক্ষ্মভাবে ভেতর থেকে দেখতে চেষ্টা করেন এ্যান্টনিওনি। লোকেশন সুটিংই বেশি পছন্দ করেন **and can control his images with such virtuosity that they both communicate a sharp sense of time and place and reflect and comment on the states of mind of his characters.**

সাতচল্লিশ বছর বয়সে 'L' Avventura' ছবিটি তুলে ১৯৬০ সালে জগদ্বিখ্যাত হয়ে পড়েন। পরে আরও দুটি সেরা ছবি তুলেছেন—'La Notte' ও 'L' Eclipse.'

ইঙ্গমার বার্গম্যান (সুইডেন)
(INGMAR BERGMAN)

যুদ্ধোত্তর কালের ছবির জগতে একজন শ্রেষ্ঠ স্বজনশীল প্রতিভা। Visconti-র মত চলচ্চিত্র এবং রঙ্গমঞ্চ এই উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর বিরাট অবদান। গ্রীষ্মকালে যখন সূর্যের আলো থাকে প্রখর, তখন ছবি তুলতে ব্যস্ত থাকেন, আর শীতকালে, যখন আলোর অভাব, তখন থিয়েটারে নাট্য-পরিচালনায় মনঃসংযোগ করেন। স্ক্রিপ্ট বেশির ভাগ নিজেই লেখেন। বিভিন্ন বিষয়বস্তু এবং বিভিন্ন ধারায় কাজ করতে ভালবাসেন নিজের ইউনিট নিয়ে যেমন—স্টাইলাইজড্ হিস্টরিক্যাল লেজেণ্ড ('The Seventh seal', 'Virgin Spring'), ম্যাকাবার ফার্স ('The Face'), সিম্বলিক এলিগরি ('Wild Strawberries') আয়রনিক, বিটারসুইট কমেডী ('Smiles of a Summer Night').

রিলিজিয়াস এক্সপিরিয়ান্স ('Through a Glass Darkly')—যদিও কিছু কিছু ছবিতে এ সবেরই মিশ্রণ দেখা গেছে। ছোট আকারের চলচ্চিত্রশিল্পে কাজ করার দরুণ বার্গম্যান নিজের ব্যক্তিত্ব, কাব্যময়তা এবং জটিল প্রতিভাকে ফুটিয়ে তোলবার সুযোগ-সুবিধা পেয়েছেন বেশি—হলিউডের পরিবেশে কাজ করতে হলে ভেঙে পড়তেন এবং তাঁর প্রতিভাকে দম বন্ধ হয়ে মারা যেতে হত—একথা নিঃসঙ্কোচে বলা চলে।

লুই বুনুয়েল (স্পানিশ)
(LUIS BUNUEL)

ছায়াচিত্র-জগতের গয়া (Goya)! কল্পনাপ্রবণ, নিষ্ঠুর ও আপোষে কিছু মেনে-নেওয়ার বিরোধী। প্রথম নাম করেন 'L' Age d'or,' ছবি তুলে। ছবিটিকে বলা হয়—অধিবাস্তববাদী কামানের গোলা—প্যারিসে ১৯৩০ সালে প্রথম প্রদর্শনীর সময় দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি হয় এবং পুলিশ ডাকতে হয় গোলমাল থামানোর জন্য। **The picture is still not allowed public screening.**

এর কুড়ি বছর বাদে (১৯৫০) যখন 'Los Olvidados' প্রদর্শিত হল, তখনও দেখা গেল মনুষ্যজাতি সম্বন্ধে বুনুয়েলের ভীতি এবং ঘৃণা একটুও কমে নি। প্রচলিত সামাজিক ন্যায়নীতিবোধকে তিনি আগের মতই ভীষণভাবে আঘাত করেছেন এই ছবিতে। Panelope Honston তাঁর 'The Contemporary Cinema' বইতে বুনুয়েল সম্বন্ধে এইভাবে মন্তব্য করেছেন :

'A Bunuel film is like raw spirit poured straight on to an open wound, a stinging, canterizing therapy of shock.

'I am against conventional morals, traditional phantasms, sentimentalism, and all that moral uncleanliness that sentimentalism introduces into society. Bonogeois morality is for me immoral, and to be fought....' [Bunuel]

He has been fighting it, weapons, strategy, and tacties almost unchanged over the years, ever since L' Age d'or, that surrealist testament, was first shown in Paris thirty-three years ago and the police had to be called

to clear the Cinema. When Bunuel made Viridiana, in 1961, the censors were once more put on their mettle.

A recognition of how far Viridiana reaches beyond blasphemy also gave evidence of how fast and thoroughly ideas of what is or is not fit for public performance have been changing.'

বুনুয়েল যখন যেখানে সুবিধা পান, সেখানেই ছবি তোলেন—মেক্সিকোতে কয়েকটি ছবি তুলেছেন, যেমন—'Los Olvidados', 'Nazarin', ও 'The Exterminating Angel' (a harsh, brilliantly composed comedie noire) ।

শেষোক্ত ছবিটি ১৯৬২ সালের লণ্ডন ফিল্ম ফেস্টিভেল-এ দর্শক ও সমালোচকদের কাছে উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছিল ।

'Perhaps, like Lawrence, Bunuel is only an inverted idealist. Perhaps it is his great tenderness, the great purity and poetry of his vision, which forces him to reveal the abominable, the malicious, the ugly and the hypocritical falsities of man..... Either you are crazy, like the rest of civilized humanity, or you are sane and healthy like Bunuel. And if you are sane and healthy you are an anarchist and throw Bombs.'

ফেডারিকো ফেলিনি (ইতালী)
(FEDERICO FELLINI)

অনেক কারণেই, যেমন বিরাট উদ্ভাবনীশক্তি, বর্তমান সমাজের সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলিকে খুঁজে বের করা, হাস্যরসের উত্তেজনার অবতারণা করা, টেকনিকের সব রকমের উচ্চস্তরের পারফেকসন—এই সবে মিলে ফেলিনির ছবিগুলিকে করে তোলে সর্বজনপ্রিয়—কেউ কেউ অবশ্য বলেন, ফেলিনির ছবি ভাল সাংবাদিকতার সীমারেখাকে ছাপিয়ে উঠতে পারে না কখনই। ফেলিনি নিজেই তাঁর বিখ্যাত 'La Dolce Vita' ছবির সংগা দিয়েছেন—'a filmed newspaper' বলে। এই ছবিটিতে এবং ১৯৬২-তে তোলা '8½'-এ কোন সত্যিকার প্লট নেই—প্রধান নায়ককে ঘিরে আলগাভাবে জুড়ে দেওয়া হয়েছে কতগুলি ঘটনাবলী (arguably representing Fellini himself, as reporter or as a film director in search of a subject.) ।

'La Dolce Vita'র আগে যেসব বিখ্যাত ছবি তুলেছেন—যথা, 'I Vitelloni', 'La Strada' ও 'Cabiria'—তার মধ্যে শেষ ছবি দুটিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ বিখ্যাত অভিনেত্রী Giulietta Massina. ফেলিনি সম্বন্ধে Penelope Honston লিখেছেন :

'La Dolce Vita, that elaborate fresco of modern Rome, with its brilliance and its vulgarity, its assured sense of how to move people about on the screen and its facile symbolism (a helicopter-borne statue of Christ to begin with ; a dead fish on a dawn beach to end), set its own fashions, as it added a new phrase to the international gossip columnists' vocabulary.'

বর্তমান বাস্তববাদী সভ্যতার অন্তঃসার শূন্যতার এবং ব্যর্থতার সুন্দর আলেখ্য পাওয়া যায় এই ছবিটিতে। ফেলিনি নিজেই বলেছেন :

'—I wanted to put the thermometer to a sick world.'

কান্স চলচ্চিত্র উৎসবে সমস্ত বিচারক একমত হয়ে এই ছবিটিকে প্রথম পুরস্কার দেন। ইউরোপ এবং আমেরিকার সমালোচকেরা বলেন যে, ছায়াচিত্র হিসাবে এটি একটি মাস্টারপিস্ ।

অ্যালফ্রেড হিচকক্ (হলিউড)
(ALFRED HITCHCOCK)

ছায়াচিত্র-জগতের একজন সেরা পেশাদারী এণ্টারটেনার । সিনেমাকে হিচকক্, 'জীবনযাত্রার কয়েক পাতা' হিসাবে মনে করেন না—ছায়াছবি জিনিসটা তাঁর কাছে একটুকরো মিষ্টি কেকের মতই প্রিয়। হিচককের ছবিতে একদিকে যেমন দর্শকদের খুশি করবার প্রচুর মাল-মশলা থাকে, তেমনি অন্যদিকে দেখা যায়, শিল্প-কৌশলের পরম পরিস্ফুটন । 'শক্-ইফেক্ট' সৃষ্টি করার ব্যাপারে তিনি একমেবা-দ্বিতীয়ম—রেবেকাতে ক্রিমের-জার-এ সিগারেটের শেষাংশ চেপে রেখে দেবার ব্যাপারটা একবার স্মরণ করুন। বেখাপ্পা এবং অদ্ভুত সেটিং সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁর জুড়ি খুঁজে পাওয়া যাবে না (নর্থ বাই নর্থ ওয়েস্ট ছবি দ্রষ্টব্য) ইউনাইটেড নেশনস বিল্ডিং-এ হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারটা মনে করে দেখুন —ফরিন করেসপণ্ডেণ্ট ছবির ওয়েস্ট মিনিস্টার ক্যাথিড্র্যালের সেটিংও মনে রাখবার মত ব্যাপার। দর্শক রহস্য রোমাঞ্চ ভালবাসে এবং সেই অনুসারে হিচকক্ ভীতিপ্রদ ও রহস্যঘন পরিবেশের সৃষ্টি করেন ছায়াছবিতে। থার্টিসে ইংলণ্ডে থাকাকালীন হিচকক কয়েকটি সেরা জাতের কমেডি থ্রিলার তোলেন, দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য—(যেমন ধরুন The Lady Vanishes ছবিটি) ইংরাজ-সন্তান হিসাবেই তাঁর জন্ম—ক্যাথলিক ধর্মের আওতায় মানুষ হন।

ইংলণ্ড থেকে তিনি আমেরিকায় চলে যান এবং সেখানে ছবি তুলে আন্তর্জাতিক খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি অর্জন করেন। কাস্টিং এবং অভিনেতাদের ডিরেকসনের ব্যাপারে তিনি এ-পর্যন্ত যে ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, তার তুলনা হয় না।

Penelope Honston বলেন—'Hitchcock has always been a part-master of the planned incongruity.

He gloats over his own effects, draws them out like a man pulling at a piece of elastic, then snaps it abruptly shut in the audience's face.'

সম্প্রতি কলকাতায় হিচককের তোলা দুটি ছবি যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল—একটি সাইকো, অন্যটি বার্ডস। এখানকার সিনেমা-অনুরাগীদের কাছে এসব ছবির পরিচয় দেবার চেষ্টা করা বাহুল্য-মাত্র।

জন হাস্টন (হলিউড)
(JOHN HUSTON)

সম্প্রতি কয়েকটি দুর্বল ছায়াচিত্র তুলে কিছুটা সুনাম নষ্ট করেছেন—তা সত্ত্বেও হাস্টনকে হলিউডের চিরকালের সেরা পরিচালকদের নামের তালিকায় স্থান দেওয়া হয়। অত্যন্ত সুসংবদ্ধভাবে ছবি তোলার জন্য তিনি বিখ্যাত। তাঁর ছবির গতি বর্ণনাত্মক স্বতঃস্ফূর্ত—দৃঢ় এবং শক্তিশালী চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে তিনি একেবারে সিদ্ধহস্ত। বিবিধ বিষয়ে ছবি তুলতে ভালবাসেন। হাস্টন সম্বন্ধে বিখ্যাত বৃটিশ চিত্রসমালোচক James Breen বলেছেন—

'The Maltese Falcon 'remains one of the best thrillers ever made and both in this piece and 'The Asphalt jungle' he showed an extraordinary flair for getting across the greed, the double-crossing and the violent action of the tough male world.'

এ ছাড়াও তাঁর ছবিতে একটা নির্দিষ্ট প্রাণবন্ততার দিক আছে। তাঁর সৃষ্টিশীল শিল্পের জীবনধর্মী দিকের পরিচয় পাওয়া যায় The Red Badge of Courage ও The African Queen ছবিতে। আগেরটি যুদ্ধসংক্রান্ত—মনকে মাতিয়ে তোলে এবং কল্পনার লোকমার্গে দর্শককে বিমুগ্ধ করে দেয়। পরেরটি প্রেমের কাহিনী হলেও স্বকীয় বিশেষত্বে উজ্জ্বল। The African Queen ও The Misfits ছবিতে হাস্টনের কবিপ্রকৃতির সুন্দর পরিস্ফুটন লক্ষ্য করা যায়। ম্যারিলিন মনরোকে দিয়ে উজ্জ্বল আনন্দরসের সৃষ্টি করিয়েছেন হাস্টন মিস্‌ফিটে।

In these pictures Huston persuades us that men and women are really capable of nobility and aspiration and true love.

হাস্টনের অন্যান্য বিখ্যাত ছবির ভেতর The Roots of Heaven ও The Secret Passion-এর নাম করা যেতে পারে। সিক্রেট প্যাশন ফ্রয়েডের মনঃস্তত্ত্ববিষয়ক কাজকর্মের পরিচারিকা। ছবির সুরুতে দেখি, মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত কয়েকটি রুগীর চিকিৎসায় নিরত ফ্রয়েডকে—But as the picture progresses it acquires tension; the dark quest into the human psyche becomes a gripping work of detection.

ফাদার-ফিক্সেসনগ্রস্ত মহিলার চরিত্রটিকে অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এ ছবিতে।

শ্রীসত্যজিৎ রায় (বাংলা—ভারতবর্ষ)

গ্রীস যখন সভ্যতার চরমশিখরে উঠেছিল, তখন তার মধ্যমণি ছিল এ্যাথেন্স। আধুনিক ভারতে এ্যাথেন্সেরই মত গৌরবময় স্থান অধিকার করে বসে রয়েছে বাংলা দেশ। এই বাংলা দেশ আবার তার কৃষ্টি, সভ্যতা, সাহিত্য প্রভৃতির স্ফুরণ ব্যাপ্তি এবং সম্প্রসারণের জন্য বিশেষ-ভাবে ঋণী দুটি পরিবারের কাছে, প্রথমত এবং প্রধানত ঠাকুরপরিবারের কাছে এবং তার পরেই এই রায়পরিবারের কাছে।

আজকের দিনের শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কি না জানি না, যিনি ছেলেবয়সে উপেন্দ্র-কিশোরের টুনটুনির বই, ছেলেদের রামায়ণ, মহাভারত, কুলদারঞ্জনের রবিন হুড, ইলিয়াড, অডিসি, সুকুমার রায়ের আবোলতাবল, হ-য-ব-র-ল, অবাপালা ইত্যাদি বই না পড়েছেন। রায়পরিবার থেকে প্রকাশিত শিশুদের পত্রিকা সন্দেশের মত মাসিক শুধু বাংলায় কেন, সারা ভারতের অন্য কোথাও প্রকাশিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। প্রিন্টিং-এর ক্ষেত্রে স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোরের অবদান সারা বিশ্বে স্বীকৃত। সারা জগতের শিশু-সাহিত্যে ৺সুকুমার রায়ের আবোল-তাবোল বা হ-য-ব-র-ল'র মত বইয়ের সন্ধান পাওয়া যাবে কি না এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এই দুটি বইয়ের ঠিকমত অনুবাদ হলে শিশু-সাহিত্যিক হিসাবে সুকুমার রায় যে অদ্বিতীয় এবং অতুলনীয় হিসাবে গণ্য হতেন, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে।

বাংলার তথা ভারতের শ্রেষ্ঠ চিত্রপরিচালক এবং পৃথিবীর অন্যতম সেরা ফিল্ম ডিরেক্টর আজকের দিনের প্রথম বারজনের এক জন—শ্রীযুক্ত সত্যজিৎ রায় এই সুকুমারবাবুরই সন্তান।

চিত্রসমালোচক James Breen সত্যজিৎবাবুর পরিচয় দিতে গিয়ে দি অবজার্ভার উইকএণ্ড রিভিউতে (১৩ই অক্টোবর ১৯৬৩) লিখেছিলেন:

'Roy put the Indian cinema firmly on the European map in 1956 with the showing, at Cannes, of 'Pather Panchali'—which had taken him nearly three years to make because of lack of money and adequate equipment. This film was the first part of a poetic and profoundly humanist trilogy which he has since completed with 'Aparajito' and 'The World of Apu.' Comes from a cultivated background; admires Renoir; much more concerned with content than with technical display. Very much aware of the tension between the old superstitious and the new science in contemporary India—and seemingly

able to sympathise with the conservative as well as the socially progressive elements. Often uses non-professional actors and is good at encouraging them to act simply and naturally. Thinks of filming Forster's 'A Passage to India.' His latest film, 'Mahanagar', is in this year's London Festival.'

বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' ও ও 'অপরাজিত' গদ্যে লেখা উপন্যাস হলেও, সব ছাপিয়ে উঠেছে একটা কাব্যিক-অনুরণন এবং ব্যঞ্জনা। এই কাব্যিক ব্যঞ্জনাকে অপূর্ব ছন্দে ফুটিয়ে তুলেছেন সত্যজিৎবাবু তাঁর 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত' ও 'অপুর সংসারে।' এত সহজভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে, বিদেশী-সমালোচকেরও তা বুঝতে কষ্ট হয় নি। যে সহজ, স্বাভাবিক পদ্ধতিতে শ্রীযুক্ত রায় তাঁর ছবিতে অভিনয় করান, পেশাদার নটনটীর দ্বারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা সম্ভব নয় —সে জন্যই বোধ হয় তিনি অপেশাদার অভিনেতা-অভিনেত্রীর সাহায্যে বেশির ভাগ ছবি তোলেন। শর্মিলা ঠাকুর, অপর্ণা দাশগুপ্ত, সৌমিত্র চ্যাটার্জী প্রভৃতি যখন সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে অভিনয় সুরু করেন, তখন এঁদের কেউই নামী অভিনেতা বা অভিনেত্রী ছিলেন না। মহানগরে এককালের নামকরা গাইয়ে শ্রীহরেন চ্যাটার্জীকে দিয়ে যে অদ্ভুত অভিনয় করিয়েছেন—তা অন্য কোন পরিচালকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আবার ছবিও তুলেছেন কত বিভিন্ন ধরণের—একদিকে 'পথের পাঁচালী' ইত্যাদি, আবার সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের সব ছবি—দেবী, পরশ পাথর, কাঞ্চনজঙ্ঘা, মহানগর, তিনকন্যা বা চারুলতা।

Old Vic ১৯৫৬-৫৭ সিজনে বহু নাটকে ক্লেয়ার বুমের অভিনয় আমি দেখেছি—অভিনয় ভাল সন্দেহ নেই—কিন্তু একেবারে আহা মরি করবার মত কিছু নয়। পরে চ্যাপলিনের লাইমলাইটে ক্লেয়ার বুমের অভিনয়-প্রতিভার চরম বিকাশ দেখতে পাই—অথচ এ ছবিটি ১৯৫৬ সালের অনেক আগে তোলা। এ সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে এই কথাই আমার বারবার মনে হয়েছে যে, সত্যিকার প্রতিভাবান পরিচালকের হাতে পড়লেই শিল্পী তাঁর প্রতিভার চরম স্ফুরণ দেখাতে পারেন। মাধবী মুখার্জী তো কত রজনী মহেন্দ্র গুপ্তের পরিচালনাধীনে মঞ্চাভিনয় করেছেন। কিন্তু সত্যজিৎবাবুর ডিরেকশনে অভিনয় করবার আগে কেউ কি কল্পনা করতে পেরেছিল যে, তিনি এত বড় শিল্পী।

প্রতীক নির্বাচন এবং ব্যবহারের কৌশলে সত্যজিৎবাবু সারা পৃথিবীতে অদ্বিতীয়। পথের পাঁচালী গ্রুপের ছবিগুলি বা জলসাঘর বা যে কোন তাঁর তোলা ছবি মনোযোগ দিয়ে দেখলেই যে-কেউই এ কথার সত্যতা স্বীকার করবেন।

এবার বিখ্যাত বৃটিশ মহিলা-সমালোচক Penelope Honston তাঁর The Contemporary Cinema বইতে সত্যজিৎবাবু সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তা থেকে কিছুটা তুলে দিচ্ছি :

Roy was a young commercial artist from Calcutta, a member of a family which occupies among the intellectual aristocracy of Bengal rather the position of say, the Huxleys in Britain. In 1950, when Jean Renoir was in Calcutta to make The River, Roy had watched him at work, been told by him that 'You would be making great films here if you could only shake Hollywood out of your system', and had written of Renoir (for Sequence) :

There is nothing more important in a film than the emotional integgrity of the relationships it depicts. Technique is useful and necessary in so far as it contributes towards that integrity. Beyond that it is generally intrusive and exhibitionist.

Like Renoir, Roy looks, and looks, and looks again ; builds his films through painstaking observation ; assists his players (some professional, many not) to act with that suggestion of unaffected naturalism which looks spontaneous and means hours of the most concentrated patience.

● জন হাস্টনের পরিচালনায় মিস্ কি' নাটকে ক্লা গ্যাবল ও মেরলিন মনরো

● মোহনবাগান ও ফরাসীদলের প্রদর্শনী হকি খেলার একটি উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্ত।

শ্রীঅমিতাভ

এশিয়ান লন টেনিস

উডবার্ন পার্কে সাউথ ক্লাবের টেনিস লনে ১৯৬৪-৬৫ সালের এশিয়ান টেনিস প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। একদিকে রামনাথন কৃষ্ণাণ অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ার বব হিউইট। মাত্র ৫৩ মিনিটে পর পর তিনটি সেট জিতে কৃষ্ণাণ হিউইটকে পরাজিত করলেন। কৃষ্ণাণ সেমিফাইন্যালে মার্টিন মুলিগ্যানকে পরাজিত করে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কৃষ্ণাণ দুজন উদীয়মান অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়কে পরাজিত করে প্রমাণ করলেন—এখনও তাঁর টেনিস-প্রতিভা ম্লান হয় নি। এখনও তিনি চেষ্টা করলে অপেশাদার টেনিসে ভারতের মর্যাদা উজ্জ্বলতর করতে পারেন।

দুঃখের বিষয়, ডাবলস ফাইন্যালে ভারতের কৃষ্ণাণ ও নরেশকুমার জিততেও জিততে পারলেন না। অনেকটা তীরে এসে তরী ডুবে গেল। ঘটনাটি অপ্রত্যাশিত। নরেশকুমারের বুড়ো আঙুলের ব্যথার জন্যে তাঁর পক্ষে র‍্যাকেট ধরা আর সম্ভব হচ্ছিল না। তাই শেষ সেটটি বলতে অস্ট্রেলিয়ান জুটি মুলিগ্যান ও হিউইটের হাতে তুলে দেওয়া হল।

বর্তমানে আন্তর্জাতিক টেনিসে মুলিগ্যান ও হিউইট জুটিই অপরাজেয় বললেই চলে। কিন্তু কৃষ্ণাণ ও কুমার প্রথম দুটি সেট এঁদের কাছ থেকে অতি সহজেই ছিনিয়ে নিলেন। সকলেই আশা করেছিল, ভারতের কাছে অস্ট্রেলিয়ার পরাজয় অনিবার্য। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ান জুটি নিরাশ না হয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে খেলার মোড় ঘোরালেন। পর পর দুটি গেম হারানোর পর নিখুঁতভাবে খেলে তাঁরা পর পর দুটি গেম আয়ত্ত করলেন এবং শেষ গেমটি আগেই বলেছি, কৃষ্ণাণ জুটি তাঁদের হাতে তুলে দিলেন।

বহু খ্যাতনামা খেলোয়াড়ের আগমনে এবার এশিয়ান টেনিস প্রতিযোগিতাটি দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছে। কিন্তু ভারতের ভবিষ্যতের আশা প্রেমজিৎ ও জয়দীপ বিশেষ সুবিধে করতে পারেন নি। তবে অনুশীলন ও অভিজ্ঞতার আলোকে এঁদের উন্নতির পথ সুগম হোক, এই আমাদের কাম্য।

নাটকীয় ক্রিকেট

আমেদাবাদের তৃতীয় এবং শেষ টেস্ট খেলায় সিংহল নাটকীয়ভাবে ভারতকে পরাজিত করেছে। সিংহলের ক্রিকেট-ইতিহাসে এই দিনটি স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। কারণ, এই তাঁদের প্রথম বিজয়। ৪৫ রান পেছনে পড়ে থেকেও দলপতি টিসেরা ৩টি উইকেট হাতে থাকতেও প্রথম ইনিংসের

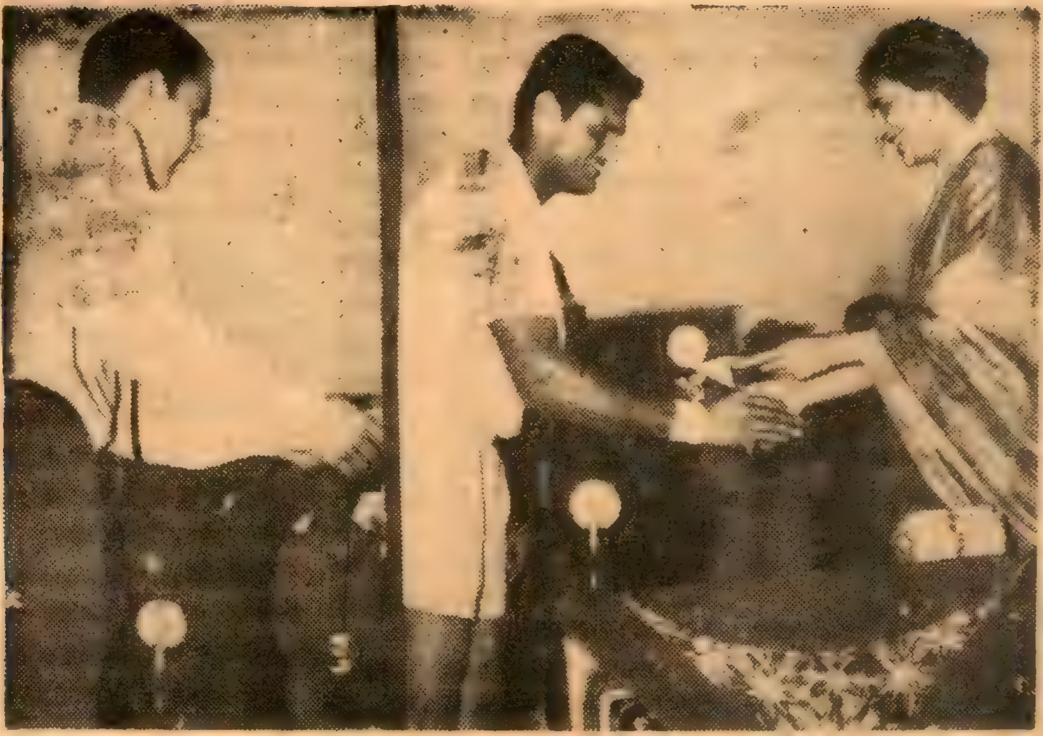

● শ্রীরমানাথন কৃষ্ণাণ ও বব হিউইট শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন

পরিসমাপ্তি ঘোষণা করে ভারতকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে পাঠালেন। তাঁর এই কূটনৈতিক চাল আশাতীত সাফল্যলাভ করল। ভিজে মাঠে ভারতীয় ব্যাটস-ম্যানদের শোভাযাত্রা সুরু হল। বেগ, সরদেশাই, হনুমন্ত সিং কেউই দলের পতন রোধ করতে পারলেন না। আশা ছিল, দলপতি পতৌদি শেষরক্ষা করতে পারবেন, কিন্তু সে আশাও ব্যর্থ হল। দর্শকরা হতাশ হয়ে পড়লেন মাত্র ৬৬ রানে ইনিংস শেষ। বাংলার তরুণ খেলোয়াড় সিংহল দলের আক্রমণধারাকে প্রতিহত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। অম্বরের প্রশংসনীয় এবং সময়োপযোগী দৃঢ়তায় তাঁর ব্যক্তিগত রান সংখ্যা হল ১৬, দলের মধ্যে সর্বোচ্চ রান।

২১০ মিনিটে ১১২ রান করার দায়িত্ব নিয়ে সিংহল ব্যাট করতে নামল। ভারতীয় ন্যাটা বোলার গোয়েল সিংহলের ৪টি উইকেট দখল করে খেলাটিকে প্রতিযোগিতামূলক করে তুলেছিলেন। কিন্তু দলপতি টিসেরা ধীরস্থিরভাবে সিংহলকে জয়ের পথে নিয়ে গেলেন।

ভারতের এই পরাজয় প্রসঙ্গে এই কথা বলতে হয় যে, মাঠের অবস্থা খারাপ থাকায় স্বাভাবিক ক্রীড়ামান বজায় রাখা সম্ভব হয় নি। তা ছাড়া পতৌদি অসুস্থ থাকায় দলপতি হিসাবে তাঁর দায়িত্ব সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে পারেন নি। জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন বাদ দিয়ে এই কথা বলতে হয় যে, বে-সরকারী টেস্ট খেলার মাধ্যমে ভারত আর সিংহল উভয় দলই তাঁদের দোষ ত্রুটিগুলি সম্বন্ধে সজাগ হবার সুযোগ পেলেন। এই ধরণের শিক্ষায় উভয় দেশই লাভবান হবে।

রাজ্য স্পোর্টস

এবারের রাজ্য-এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় দুটি এ্যাথলেটের অপূর্ব ক্রীড়ানৈপুণ্য সকলের কৃতিত্বকেই ম্লান করে দিয়েছে। একজন হলেন—স্বল্প পাল্লার তরুণ দৌড়বীর ব্যারী ফোর্ড, অন্যজন হলেন—নবাগতা মহিলা এ্যাথলেট—সোফিয়া খাতুন। মাত্র আঠারো বৎসর বয়স্ক ব্যারী ২০০ মিটার দৌড়ে পুরাতন রেকর্ড চূর্ণ করে যে নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা স্পর্শ করা অন্যান্য এ্যাথলেটদের পক্ষে হয়ত বহুদিন সম্ভব হবে না। পুরাতন রেকর্ড ছিল ২২'৪ সেকেণ্ড কিন্তু ব্যারী মাত্র ২২ সেকেণ্ডে দূরত্ব অতিক্রম করেছেন। ব্যারীর এই কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করছে যে, বর্তমানে বাংলা দেশে স্বল্পপাল্লার দৌড়ে তিনি শ্রেষ্ঠ। তরুণ ব্যারী যে অদূর-ভবিষ্যতে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও প্রথম সারিতে স্থান পাবেন, একথা প্রায়-সুনিশ্চিত।

এবার কয়েকজন মহিলা এ্যাথলেট যে চরম অখেলোয়াড়ী মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন, তার নজীর বোধ হয় মেলে না। প্রতিযোগিতার প্রথমদিন সোফিয়া খাতুন ২০০ মিটার দৌড়ে মৌরিন হোল্ডারকে পরাজিত করেন।

কিন্তু কয়েকজন মহিলা প্রতিযোগী সোফিয়া দৌড়াইবার সময় লাইন বদল করেছেন বলে প্রতিবাদ জানান। এঁদের প্রতিবাদ গ্রাহ্য হয় এবং সোফিয়া পরদিন অনুষ্ঠিত দৌড়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

প্রতিযোগিতার শেষ দিন দুটি বিষয়ে রেকর্ড সমান হয়। ১১০ মিটার হার্ডল-এ শেঠি এবং মহিলাদের ১০০ মিটার-এ মৌরিন হোল্ডার পুরাতন রেকর্ড স্পর্শ করেন। আন্তঃ রাজ্য এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় যোগদানের যোগ্যতার মান অতিক্রম করার কৃতিত্ব অর্জন করেছে মাত্র কয়েকজন এ্যাথলেট।

প্রদর্শনী হকি

ক্রিকেট, ফুটবলের পর এবার মোহনবাগানের প্লাটিনাম জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে দুটি প্রদর্শনী হকি খেলা অনুষ্ঠিত হল। একটিতে অংশগ্রহণ করেন, অতীতের খ্যাতনামা হকি খেলোয়াড়েরা। দ্বিতীয় খেলাটি মোহনবাগান দল এবং ফরাসী হকি দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। প্রবীণদের খেলাটিতে অংশগ্রহণ করেন জয়লাল সিং, জেণ্টল, পিণ্টো, কুডিয়াস, পেকমল, নন্দী সিং, পুলিশ কমিশনার পি কে সেন এবং মোহনবাগানের অতীতের কয়েকজন খেলোয়াড়।

মোহনবাগান এবং ফরাসী হকি দলের খেলাটি খুবই চিত্তাকর্ষক এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয়। অবশ্য শেষ পর্যন্ত ৩-২ গোলের ব্যবধানে সফরকারী ফরাসী দল পরাজিত হয়। মোহনবাগান দলে ইনামুর, আলিমুর এবং বালু অংশগ্রহণ করতে না পারায়, দলের শক্তি কতকাংশে হ্রাস পায়। ফরাসী দলের খেলার মধ্যে সূক্ষ্ম কৌশলের বদলে কিছুটা দৈহিক শক্তির ব্যবহারের ভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে ফরাসী দলের খেলা দেখে মনে হয়, আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই যথেষ্ট উন্নতি করতে সক্ষম হবে।

তরুণ প্রতিভা সন্ধানে

দার্জিলিংয়ের স্কুলটি লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের সমানভাবে উৎসাহ দেয় খেলাধূলার চর্চা করার জন্য। হোস্টেল-জীবন, পরিবেশ এবং সুযোগ-সুবিধাগুলি দার্জিলিং সেণ্ট জোসেফ কলেজের ছোট-বড় সকল ছাত্রকে খেলাধূলার দিকে আকৃষ্ট করেছে। এ্যাথলেটিক্স, হকি এবং ক্রিকেটে বহু খ্যাতনামা খেলোয়াড়ের হাতেখড়ি হয়েছে এই সেণ্ট জোসেফ কলেজে।

বাংলার তরুণ ক্রিকেট খেলোয়াড় দেব মুখার্জীকে বর্তমানে বাংলার ক্রীড়ামোদীরা প্রত্যেকেই চেনেন। স্কুল-জীবনেই দেব মুখার্জীর খ্যাতি বাংলার সীমা অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়েছিল সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে।

দেবের জন্ম ১৯৪৫ সালে কুচবিহারে। শৈশব-জীবন কেটেছে কলকাতায়। শৈলাবাস দার্জিলিংয়ের খ্যাতনামা সেণ্ট জোসেফ কলেজের স্কুল বিভাগে তিনি তাঁর স্কুল-জীবন অতিবাহিত করেছেন। নিচু ক্লাশ থেকেই দেব স্কুল দলের নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান হিসাবে স্বীকৃতি পান। মাত্র ১৩ বছর বয়েসে দেবের কলকাতার প্রথম ডিভিসনে দক্ষিণ কলিকাতা ক্লাবের পক্ষে খেলার সুযোগ ঘটে। পরের বছর থেকে দেব দক্ষিণ কলিকাতা দলে নিয়মিত স্থান পান।

১৯৬০-৬১ সালে দেব মুখার্জী প্রথম বাংলা স্কুল দলের পক্ষে মনোনীত হন। ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত তিনবার তিনি বাংলা স্কুল দলের পক্ষে খেলেন। ১৯৬১-৬২ এবং ১৯৬২-৬৩ দেবের খেলোয়াড়ী-জীবনের স্মরণীয় সময়। ১৯৬১-৬২ সালে তিনি ইস্ট জোন স্কুলের পক্ষে হায়দ্রাবাদের ফাইন্যাল খেলায় অংশ নেন। ইস্ট জোন স্কুল সেবার সর্বভারতীয় স্কুল ক্রিকেট বিজয়ী হয় এবং দেব সেবার শ্রেষ্ঠ ফিল্ডার নির্বাচিত হন। পরের বছর আবার ইস্ট জোনকে সর্বভারতীয় ক্রিকেটের কুচবিহার ট্রফি বিজয়ে সাহায্য করেন। আমেদাবাদে নিজে অর্জন করেন শ্রেষ্ঠ স্কুল-ক্রিকেটারের দুর্লভ সম্মান। স্কুল-জীবনে ১৯৬২-৬৩ সালে তিনি রঞ্জী ট্রফিতে বাংলা দলের পক্ষে দ্বাদশ খেলোয়াড় হিসাবে মনোনীত হন।

স্কুল-জীবন শেষ করে এসে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হলেন কলা-বিভাগে। সেই বছরই মোহনবাগান ক্লাবের আহ্বানে দক্ষিণ কলিকাতা ক্লাব ত্যাগ করে গেলেন মোহনবাগানে। সেই বছরই বাংলা দেশের পক্ষে কলকাতা রঞ্জী ট্রফিতে অংশগ্রহণ করলেন বিহার এবং উড়িষ্যার বিপক্ষে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে বেনারসে এবং দিল্লীতে অনুষ্ঠিত খেলায় প্রতিনিধিত্ব করলেন। দলীপ ট্রফিতে ইস্ট জোনের পক্ষে একবার দ্বাদশব্যক্তি মনোনীত হবার সুযোগও তাঁর হয়েছে। চলতি মরশুমে তিনি বিহারের বিপক্ষে খেলেছেন রঞ্জী ট্রফিতে।

এবার সফরকারী সিলোন দলের বিপক্ষে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দলের পক্ষে দেব মুখার্জী মাদ্রাজে অপূর্ব ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। কথাপ্রসঙ্গে বললেন যে, খেলোয়াড়ী-জীবনে অনুপ্রেরণা এবং উৎসাহ পেয়েছেন পিতা-মাতা এবং শ্রীভজহরি গাঙ্গুলীর কাছ থেকে। আর প্রচুর সাহায্য পেয়েছেন অনুজ রাজুর কাছ থেকে। দেবের সাফল্যের মূল কারণ হল, পড়াশুনাতেও যেমন তাঁর মনোযোগ, খেলাধূলাতেও তাঁর তেমনি সমান মনোযোগ। অধ্যবসায় এবং কঠিন অনুশীলনের দ্বারা দেব আজ অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছেন। আরও বিরাট সম্মান এবং বিস্তৃত ক্ষেত্র পড়ে আছে দেবের ভবিষ্যতে খেলোয়াড়ী-জীবনের সম্মুখে।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট্‌ কলিকাতা-১২।
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাপ্তাহিক
বসুমতী

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এই ঐতিহা
কলকাতা অধিবেশনে (মে, ১৯৩৯) দেশগৌ
সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতির পদ
পরিত্যাগ করেন।

৬৯ বর্ষ, ৩৪শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৭ই মাঘ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ • 21st January, 1965 • Vol. 69, No. 34

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	২১১৫
আজকের মানুষ	...	২১১৬
সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর	ভবপ্রসাদ মিত্র	২১১৭
বিপ্লব কি?	সুভাষচন্দ্র বসু	২১১৯
টাইগার্টেনের সেই দিনগুলি	সুভাষ সমাজদার	২১২৩
অশান্ত ভারত ঃ সুভাষচন্দ্র	বীরেন্দ্র মিত্র	২১২৮
নেতাজী ও বর্তমান যুগসংকট	নির্মল বসু	২১৩২
আন্তর্জাতিক	...	২১৩৫
আজাদহিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক নেতাজী	সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	২১৩৮
অদ্বিতীয়া (ধারাবাহিক উপন্যাস)	সুশীল রায়	২১৪১
উৎসব আজও হলো না (কবিতা)	আবুলকাশেম রহিমউদ্দীন	২১৪৪

ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বেকার, চাকুরীপ্রার্থী ও শিক্ষানুরাগীদের—
ভাষা শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য্য একমাত্র গ্রন্থ
॥ বিদেশী ভাষায় দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সহায়ক ॥
০০০ স্বল্পশ্রমে পর্য্যাপ্ত ফল অবশ্যম্ভাবী ০০০
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

রা জ ভা ষা

(ইংরাজী ভাষা সহজে শিক্ষার অদ্বিতীয় সাহায্যগ্রন্থ)
এক আধারে : ভাষা - ব্যাকরণ - শব্দার্থ
ইংরাজী হইতে বাঙলা—৩.৫০ ॥ ইংরাজী হইতে উর্দু—১.০০

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের

ম হা ভা র ত

[প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড]
(প্রতি খণ্ড মূল্য আট টাকা)
সদ্য-প্রকাশিত চতুর্থ খণ্ড ঃ মূল্য—ছয় টাকা
(ডাকমাশুল স্বতন্ত্র)

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

মাইকেল গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগে :—মেঘনাদবধ কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, পদ্মাবতী-নাটক, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা?
মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় ভাগে :—কৃষ্ণকুমারী নাটক, শর্মিষ্ঠা নাটক, তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী, বিবিধ কাব্য, মায়া কানন, হেক্টর বধ।
মূল্য—দুই টাকা

—ঔপন্যাসিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান—
দামোদর মুখোপাধ্যায়ের

দামোদর-গ্রন্থাবলী

১ম খণ্ড ১.৫০ ২য় খণ্ড ২.৫০
৩য় খণ্ড ১.০০ ৪র্থ খণ্ড ২.৫০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
রবীন্দ্রর তুমি বরণীয় (কবিতা)	বৈশম্পায়ন	২১৪৪
ডিটেকটিভ সবাই হতে পারে (গোয়েন্দা-গল্প)	পরিমল গোস্বামী	২১৪৫
বাণিজ্যে সেকাল ও একাল	ধনপতি সওদাগর	২১৫২
আঁধারমাণিক (ধারাবাহিক উপন্যাস)	মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	২১৫৫
দলাদলির শোক অবসান	সুভাষচন্দ্র বসু	২১৫৯
বঙ্গদর্শন	...	২১৬১
রঙ্গজগৎ	...	২১৬৫
গ্রন্থমেলা	জয়ন্তী সেন	২১৭০
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	শিলালি	২১৭১
খেলাধুলা	শ্রীঅমিতাভ	২১৭৪

প্রচ্ছদ পরিচয় :

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির স্মরণীয় কলকাতা অধিবেশন (মে, ১৯৩৯)। ছবিতে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে পণ্ডিত নেহরু, সীমান্ত গান্ধী প্রভৃতি নেতৃবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে। (নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর সৌজন্যে প্রাপ্ত)

রক্তযুগের বিপ্লবী গুরু

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

নির্বাসিতের আত্মকথা, উনপঞ্চাশী, সিনফিন, অনন্তানন্দের পত্র, বর্তমান সমস্যা, জাতের বিড়ম্বনা, পথের সন্ধান, স্বাধীন মানুষ, ধর্ম ও কর্ম।

মূল্য—আড়াই টাকা

বরিষ্ঠ কথাশিল্পী

জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী

৭ খানি বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ উপন্যাস এবং ৩ খানি বড় লেখা—সুবৃহৎ গ্রন্থাবলী।

মূল্য তিন টাকা

আধুনিক কথা-সাহিত্যিক

বিভূতিভূষণ ভট্টের গ্রন্থাবলী

স্বেচ্ছাচারী, আশা, সহজিয়া, সপ্তপদী।

মূল্য—৩৲ টাকা

রসরাজ

অমৃতলাল বসুর গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—হরিশ্চন্দ্র, আদর্শ বন্ধু, যাদুকরী প্রভৃতি ১১ খানি নাটক।

২য় ভাগে—খাসদখল, চোরের উপর বাটপাড়ি, অবতার প্রভৃতি ১১ খানি নাটক।

৩য় ভাগে—বিবাহ বিভ্রাট, তরুবালা, ব্রজলীলা প্রভৃতি ১১ খানি নাটক

প্রতি ভাগ আড়াই টাকা

কাব্য-সাহিত্যিক

বিহারীলাল চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী

জীবনী ও কাব্য সমালোচনা, বিহারীলালের সারদা, বিহারীলাল ও তাঁহার কাব্য, সারদামঙ্গল, বন্ধুবিয়োগ, প্রেম-প্রবাহিনী, স্বপ্ন-দর্শন, সঙ্গীতশতক, বঙ্গসুন্দরী, নিসর্গ-সন্দর্শন, মায়াদেবী, ধূমকেতু, শরৎকাল, দেবরাণী, বাউল বিংশতি, সাধের আসন, কবিতা ও সঙ্গীত। মূল্য ৩৲ টাকা

নয়জন কবির মূল্যবান সংস্কৃত ও বাংলা রচনার সমাবেশ। বঙ্গসাহিত্যে অভিনব আয়োজন।

বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী

মূল্য—পাঁচ টাকা

প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা

যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর গ্রন্থাবলী

২য় ভাগে—সীতা, বিষ্ণুপ্রিয়া, মহামায়ার চর ও পূর্ণিমামিলন

মূল্য দুই টাকা

উপন্যাস সাহিত্যের প্রদীপ্ত ভাস্কর

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

তৃতীয় ভাগ—বেলমতিয়া, বঙ্গসংসার, সনাতন গোস্বামী, পূজার মালা ও রাণী ব্রজসুন্দরী। মূল্য—এক টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

৬১ বর্ষ, ৩৪শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পঃ
25 Paise
বৃহস্পতিবার, ৭ই মাঘ ১৩৭১
Thursday, 21st January 1965

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

২৩শে জানুয়ারী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন। আমাদের কাছে এই দিন তাঁর জন্মদিনের পবিত্রতায় যেমন চিরস্মরণীয় তেমনি এ দিনেই যেন স্বার্থ-ত্যাগের আত্মশুদ্ধির মন্ত্র আমরা গ্রহণ করতে পারি। একথা ঠিক পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে আমরা মুক্ত হয়েছি কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর দেশ সংগঠনে যে বিপ্লব দরকার তা সম্পূর্ণ সাধিত হয় নি। তাই আজো দেশের মধ্যে ভেদবুদ্ধি হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে সারা ভারতের সংহতি ব্যাহত হয়। সেই ভেদবুদ্ধিকে পরাজিত করবার জন্যে দেশের মধ্যে সংহতির পূর্ণ রূপায়ণ দেখবার জন্যে তেইশে জানুয়ারীর পবিত্রতাকে যেন উপলব্ধি করতে পারি। মনে করতে হবে, এই দিনটিতে আমাদের নেতাজীর মধ্য দিয়েই ভারত-রূপ প্রকাশিত হয়েছিল।

স্বাধীন ভারতের জনসাধারণ নেতাজীর কথা আজ অধিকতরভাবে স্মরণ করবেই। কেন না ভারত স্বাধীন হলে তার পরবর্তী রূপ কি হবে—সে কথাও তিনি শুনিয়েছেন। সুতরাং সেই রূপকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যে বর্তমানে গৃহীত কর্ম-পদ্ধতির দ্রুততায় আমাদের আত্মোৎ-সর্গের প্রয়োজন আছে। দেশের মধ্যে এখন প্রচেষ্টার অভাব নেই—একথা স্বীকার্য; তবুও জনসাধারণের পুরাতন অবস্থার বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটে নি। জনসাধারণের সার্বিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নেতাজীর মতো ব্যক্তিত্বের তাই আজ চারিদিকে আকুল আহ্বান। তিনি মুনাফালোভী ব্যবসায়ীদের হাত থেকে স্বাধীনভারতে সাধারণ মানুষের মুক্তির কথা উচ্চারণ করেছেন। ভাষা বিরোধ এদেশে যে অনিষ্টের কারণ হবে তাও তিনি বলে গেছেন। তবু আমরা সচেতন হই নি। এই না হওয়ার মূলে আমাদের নিজেদেরও অপরাধ কম নয়। তেইশে জানুয়ারী তাই বাহ্যিক আড়ম্বরে নেতাজীর জন্মদিবস পালনের দিন নয়, এই দিনটি হচ্ছে স্বদেশ সংহতির আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ-ত্যাগের একটি কঠোর দিন। দেশের তথা জনসাধারণের জীবন-মান সমৃদ্ধির মূলে আমাদেরও আত্মত্যাগ দরকার। সেই আত্মত্যাগের মন্ত্র নেতাজীর যাবতীয় রচনায় বাণীতে ও কর্মের মধ্যে রয়েছে। সেই সম্পদগুলি নেতাজীর অনুপস্থিতিতে যদি গ্রহণ করি তাহলে বর্তমান সময়ে আমরা আমাদের কল্যাণময় পথ প্রত্যক্ষ করতে পারবো। আমাদের সেই পথেই রয়েছে আমাদের অভীষ্ট বস্তু। সেখানেই দর্শন লাভ করবো আমাদের নেতাজীকে।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

সামগ্রিক শক্তি বা সহযোগিতা প্রায়শঃ সৃষ্টি করেছে নানান বিস্ময়। রাজনীতির ইতিহাস এমন নজীর অনেক রেখেছে। এ ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যক্তিত্বের নেতৃত্ব অবশ্যই আছে কিন্তু সেই সঙ্গে আছে সম্মিলিত প্রয়াসের ফলশ্রুতি। অন্যথায় স্বীয় সংহতি ছাড়াও পারিপার্শ্বিক প্ররোচনাতে কখনও কখনও অভিনব আত্মপ্রকাশের সূচনা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে জাতির কাণ্ডারী নিয়েছেন অদ্বিতীয় ভূমিকা। দেশের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার প্রশ্নকে সামনে রেখে আত্মবিশ্বাস, ও পরিণাম-দর্শিতাকে মূলধন ক'রে পথ চলার দায়িত্ব নিতে হয় তাঁকে। সে দায়িত্বই আজ প্রেসিডেণ্ট সোয়েকার্নোর। ইন্দোনেশিয়ার আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রতিটি পদক্ষেপ আছে তাঁরই নির্দেশের অপেক্ষায়। সোয়েকার্নো ইন্দোনেশিয়ার আজীবন রাষ্ট্রনায়ক। চীনের মারাত্মক বন্ধুত্বে আশ্বাসে আচ্ছন্ন হ'য়ে আজ সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অধিনায়কত্ব লাভের স্বপ্ন তার চোখে। তাই পাশ্চাত্যের বিপক্ষে তাঁর সংকল্প। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আনুগত্যকে তিনি করেছেন অস্বীকার।

আজ থেকে প্রায় ৬৪ বছর আগে সুরাবায়ায় জন্মেছিলেন সোয়েকার্নো, বাবা ছিলেন জাভার লোক। মা, বলিদ্বীপবাসিনী। সোয়েকার্নো ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুল অফ বান্দুং ইউনির্ভাসিটির প্রথম ইন্দোনেশীয় স্নাতক। ছাত্রাবস্থা থেকেই রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ। সে সময়ে ছদ্মনামে অনেক জ্বালাময়ী প্রবন্ধ লিখেছেন বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী 'Ustusan Hindia' কাগজে পরবর্তীকালে তিনি বান্দুং পাঠচক্র গঠন করেন। বছর খানেক পরে তারই রূপান্তর ঘটেছে ইন্দোনেশীয় জাতীয়তাবাদী দলে। সে সময়ে বয়স তাঁর প্রায় ছাব্বিশ। ডাচ ঔপনিবেশিকতা-বাদীরা এই তরুণ নেতাকে চোখে চোখে রাখলেন। শেষ পর্যন্ত সোয়েকার্নোর হ'ল চার বছরের কারাদণ্ড। '৩০ সালে মুক্তি লাভের পর আবার আত্মনিয়োগ করলেন সংকল্প সাধনে। আবার কারাবাস। এমনি ভাবে মধ্যে মাত্র বছর দুয়েক ছাড়া একটানা '৪২ সালে ইন্দোনেশিয়ায় জাপানী অনুপ্রবেশকাল পর্যন্ত কাটালেন কারাগৃহে। ডাচরা জাপানীদের আক্রমণে দেশ ছেড়ে পালালো এরপর। সোয়েকার্নো আবার এসে হাল ধরলেন; ইন্দোনেশিয়ার মুক্তি-অভিযানের বিক্রমশালী বিদেশী শত্রুর গ্রাস থেকে—ইন্দোনেশিয়ার শান্তি ও স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে আনবার জন্য রুখে দাঁড়ালেন, অবশেষে স্বাধীনতা এলো '৪৫এ অগাষ্টের সতেরই। সোয়েকার্নো হলেন ইন্দোনেশিয়ার এই নতুন প্রজাতন্ত্রের অধিকর্তা। '৫০ সালে তিনি পেলেন রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক মর্যাদা। বাস্তবিকভাবেও তিনি রইলেন সর্বশক্তিমান। দেশের আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন দলীয় স্বার্থ ও সংঘর্ষের পরিণতি কখনও তাঁর সম্মানকে স্পর্শ করে নি। তাঁর সর্বময় নেতৃত্ব সন্দেহাতীত। দেশের দুর্যোগকালে ৫৭ সালে সোয়েকার্নো তাই গণতন্ত্রের নতুন অভিজ্ঞান রচনা করলেন। পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের ব্যাপকতর ধ্যান-ধারণা থেকে যার অনেক তফাৎ। বললেন: ইন্দোনেশিয়ায় গণতন্ত্রের চেহারা হবে স্বতন্ত্র। তিনি এই বিশিষ্ট গণতন্ত্রের নাম দিলেন, 'guided democracy' সোয়েকার্নোর পরিচালনায় এই (সীমায়িত) গণতন্ত্রের নতুন পরীক্ষা সুরু হ'ল ইন্দোনেশিয়ার মাটিতে। তাঁর 'guided democracy' সর্বাংশে সমর্থনযোগ্য না হলেও সেই সূত্রে দেশের আত্মপ্রস্তুতির পক্ষে তাঁর যুক্তি অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। সোয়েকার্নোর অনুপ্রেরণায় তাই ইন্দোনেশিয়ার মানুষ দুর্দ্ধর্ষ জীবনপথ বেছে নিতে পারে। জাগতিক আশা-আকাঙক্ষাকে বিসর্জন দিতে পারে জাতীয় সম্মানের বিনিময়ে।

প্রেসিডেন্ট সোয়েকার্নো

পশ্চিম ইরিয়ান সমস্যার সমাধান সোয়েকার্নোর উদ্দেশ্যকে অংশত সফল করেছে। সন্দেহ নেই। বাকিটুকু সার্থক করতে সোয়েকার্নো তাই দৃপ্ত ভঙ্গীতে বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে আপোষ-হীন প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন। তিনি চান সারা মালয় অঞ্চলকে এক পতাকাতলে সঙ্ঘবদ্ধ করতে। আর সেই সঙ্গে বোধ হয় তাঁর একচ্ছত্র প্রতিষ্ঠা। অথচ ওদিকে জন্ম হয়েছে মালয়েশিয়ার—ইন্দোনেশিয়ার আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতায় অন্তরঙ্গ প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে। ইন্দোনেশিয়ার অভ্যুত্থানকে দাবিয়ে রাখতে পাশ্চাত্য দেশগুলো তাই মালয়েশিয়াকে জানিয়েছে সমর্থন। ঠিক এই সময়েই সোয়েকার্নো সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ থেকে বেরিয়ে আসছেন। পাশ্চাত্য প্রভাবের বিরুদ্ধে তাঁর এই প্রতিবাদের ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া উপনীত হয়েছে এক সন্ধিক্ষণে। হয়ত বা নতুন আরেক অধ্যায় আসন্ন। তাই বিক্ষুব্ধ-ব্যক্তিত্ব প্রেসিডেণ্ট সোয়েকার্নো সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছুবার দিন সম্ভবত এখনও আসে নি।

সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর

হরপ্রসাদ মিত্র

মনে পড়লো স্বর্গত অতুলচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের আলোচনা। সেই সুদূর তিরিশের দশকে অতুলচন্দ্র জিগেস করেছিলেন সুধীন্দ্রনাথকে---এলিয়টের কবিতা সব বোঝা যায় কি?

সুধীন্দ্রনাথ বলেছিলেন---না, সব বুঝি নি। কিন্তু সব না বুঝলেও ক্ষতি নেই। এলিয়টের আবেদন গভীর।

দু'জনেই কৃতবিদ্য, রসিক, সজ্জন দুজনেই যথাকথা বলেছিলেন।

এলিয়টের কবিতা পুরোপুরি প্রত্যেকটি শব্দ ধরে পড়ে যাওয়া এবং বুঝতে পারা সামান্য বিদ্যার কাজ নয়। তাতে অনেক ভাবানুষঙ্গের খেলা,—বিভিন্ন উল্লেখের বৈচিত্র্য। তা ছাড়া শুধু ইংরেজিই তো নয়,—য়ুরোপের একাধিক ভাষা ছড়িয়ে আছে তাঁর লেখার মধ্যে। এলিয়ট পুরোনো বস্তাপচা বিশ্বাস থেকে মুক্ত—তাঁর সম্বন্ধে সেকালের এই হঠাৎ-পাওয়া তাজা হাওয়ার ভাবটা মনে এলো।

ফাঁপা মানুষের আড়ম্বর দেখেছেন তিনি; ঠাসা মানুষের অসার সমারোহ চোখে পড়েছিল তাঁর। কবিতায় সেই শ্রান্তি, অবসাদ, নৈরাশ্যের অবস্থাটা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল। সেই তীক্ষ্ণ সাবলীলতার নাম এলিয়ট।

আমাদের বাংলা কবিতায় নজরুল তখন পুরোনো হয়ে গেছেন। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মরুভূমি অনুষঙ্গের পুনরাবৃত্তি এবং কথায়-কথায় স্বপ্ন-সুষমা-সৌন্দর্যের প্রতি কটাক্ষও তখন চেনা-জানা ব্যাপার। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রথমা' আর রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া' তখন প্রায় বছর দশেকের প্রিয় পরিচিত কাব্যগ্রন্থ। অমিয় চক্রবর্তীর 'খসড়া' বেরিয়েছে। বুদ্ধদেব বসু উৎসাহের সঙ্গে 'কবিতা' পত্রিকা চালিয়ে যাচ্ছেন সে-আমলে। জীবনানন্দ দেখা দিয়েছেন অনুরাগী পাঠকের চোখে। সেই সময়ে বিষ্ণু দে এবং সুধীন্দ্রনাথের আগ্রহে এলিয়টের দিকে

● সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

কাব্যানুরাগী বাঙালী বিদগ্ধজনের নজর পড়ে।

তাঁরা দুজনেই রবীন্দ্রনাথকে এলিয়ট সম্বন্ধে উৎসাহিত করেন।

সেদিন এলিয়টের শোক-সভা হোলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে। বিষ্ণুবাবু এসেছিলেন। ছাত্রদের মধ্যে বেশ কয়েকজন এলিয়টের কবিতা পড়লেন। বিষ্ণুবাবু তাঁর নিজের অনুবাদ পড়ে শোনালেন। তারপর ছেলেদের অনুরোধে এলিয়ট সম্বন্ধে তাঁদের সেই সেকালের অনুরাগের কথাও বললেন।

বললেন—গদ্য-কবিতার রীতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর নিজের আলোচনার প্রসঙ্গ। তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে 'দি জার্নি অব দি ম্যাজাই'-এর অনুবাদ লিখে পাঠিয়ে দেন---এলিয়টের নাম গোপন রেখে। রবীন্দ্রনাথ বলেন---ওতে গদ্যের মধ্যে কবিতার আবেগ দেখা দিয়েছে,—দোলা লেগেছে।

তারপর সুধীন্দ্রনাথ আসল কথা বলে দেন---বিষ্ণু আপনাকে ঠকিয়েছে। ওটা এলিয়টের লেখা।

'পুনশ্চ' বইয়ে এই কবিতার রবীন্দ্রনাথের নিজের অনুবাদ 'তীর্থযাত্রী' আছে। সেই অনুবাদ ১৩৩৯এর। তা থেকে এলিয়টকে চেনা যায় বটে, কিন্তু সে আর কতোটুকু? সে-অনুবাদের মধ্যেও বিষাদের সুর ধরা পড়েছিল বটে,—আত্মচিন্তার কথাও ছিল,—জীবন-মৃত্যুর তীব্র, তীক্ষ্ণ যন্ত্রণার কথাও ছিল,—কিন্তু এলিয়ট যে কেবল মাত্র ঐ কবিতাতেই সর্বস্ব দেন নি,—তিনি যে ঐ ক'লাইনেই নিঃশেষিত নন, এই কথাই সেকালে খানিকটা ঝাপসা ভাবে বুঝেছিলুম। রবীন্দ্রনাথের ঐ ক'লাইন অনুবাদের মধ্য দিয়ে কিছু কিছু ছবির ছাপ পড়েছিল মনে। আজও মাঝে মাঝে সেই সব ছবির ছায়া দেখি—'জলযন্ত্রের চাকা আঁধারকে মারছে চাপড়',—'দিগন্তের গায়ে তিনটে গাছ দাঁড়িয়ে, বুড়ো সাদা ঘোড়াটা মাঠ বেয়ে দৌড় দিয়েছে', —'দুজন মানুষ খোলা দরোজার কাছে পাশা খেলছে টাকার লোভে, পা দিয়ে ঠেলছে শূন্য মদের কুপো'।

কতোদিন মনে মনে আবৃত্তি করেছি—তাঁর 'দি ওয়েস্টল্যান্ডস্' লাইন---I had not thought death had undone so many!

পথে চলতে চলতে মনে পড়েছে—
ওহে স্টেটসন, শোনো, শোনো—

'That corpse you planted last
year in your garden
Has it begun to sprout ?
Will it bloom this year ?
Or has the sudden frost
disturbed its bed ?
Oh keep the Dog far hence,
that's friend to men,
Or with his nails he'll
dig it up again !

যেমন রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে—'তীর্থযাত্রী'র সেই দিগন্তের গায়ে তিনটে গাছ-এর ছবি দেখেছিলুম, তেমনি অন্যত্র আর-এক অদ্ভুত দৃশ্য। 'অ্যাশ ওয়েড্‌নেস্‌ডে'র স্মৃতি সেটি—তিনটে নেকড়ে বসে আছে গাছের ঠাণ্ডা ছায়ায়,—আমার পা, আমার হৃদ্‌যন্ত্র আর যকৃৎটি খেয়ে সাফ করেছে তারা,—আমার মাথার খুলির ভেতর যে মগজ ছিল, সেটাও শেষ করেছে। আর ঈশ্বর বললেন—এই হাড়গুলো কি বাঁচবে? বাঁচবে কি? হাড়গুলো শুকিয়ে খনখনে। খন্ খন্ করে বললে—যেহেতু এই মহিলাটি বড়োই কল্যাণী, আর যেহেতু জননী মেরীর ধ্যানে ভোর হয়ে থাকেন তিনি,—তাঁর সেই সৌন্দর্যের গুণেই আমরা ঝকঝকে উজ্জ্বল হয়ে আছি।

মনে হয়, সুধীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছিলেন। এলিয়টের প্রত্যেকটি শব্দ না বুঝলেও অসুবিধা হবার কথা নয়। অদ্ভুত দৃশ্য, প্রচণ্ড কটাক্ষ, গভীর সংশয়, দুস্তর অবসাদ—ইত্যাদি ব্যাপার ছড়িয়ে আছে তাঁর রচনায় রচনায়। জুনিপার-গাছের নিচে সেই ঝকঝকে হাড়েদের গান যে কিসের ইশারা, সেটা যাঁর মন আছে, তিনিই বুঝবেন। সেই ছায়াচ্ছন্ন বালি আর হিমহিম-ভাবের-দেশে পেঁছে দিয়েছিলেন তিনি। আমাদের পরিণাম সম্বন্ধে কী যে ইঙ্গিত ছিল তাতে।

এলিয়টও মরুভূমির কথা বলেছিলেন। সমস্ত বিভেদ-বৈষম্য ভুলে হাড়গুলো বালিতে গিয়ে মিশেছে।

This is the land which ye
Shall divide by lot.
And neither division nor unity
Matters. This is the land.
We have our inheritance,

মাইকেল রবার্টস সম্পাদিত আধুনিক কাব্য-সঙ্কলনের ভূমিকায় বিশেষ ভাবে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, এলিয়ট তখনকার 'আধুনিক' পর্বের এমন একজন কবি—যাঁকে 'ইংলিশ' না বলে 'ইউরোপীয়ন' বলা উচিত। বোদ্‌লেয়র, র‍্যাবোঁ, লাফোর্গের দিকে সজাগ তাঁরা,—এবং দান্তের দিকেও—কিংবা ফরাসী-সাহিত্যের অন্যান্য প্রতীকী কবিদের পরীক্ষা সম্বন্ধেও। তিনি বলেছিলেন—এই 'ইউরোপীয়ন' কবি বলছি যাঁদের, তাঁরা নিজেরা যে-সমাজের অধিবাসী, সেই সামাজিক জগৎটাকে চেনেন, তার সমালোচনাও করেন,—তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন না, বরং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেন। সেই সমাজের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেবার জন্যে তাঁদের প্রয়াসের অন্ত নেই। বহুকালের পুঞ্জিত সে-জগতের সংগীত-চিত্র-ভাস্কর্যের খবর রাখেন তাঁরা,—টুকিটাকি আরো যাবতীয় ব্যাপারের। কতকটা বাবুয়ানির ভাব আছে তাঁদের মধ্যে, কতকটা শৌখীনতার; কিন্তু এই সব পরিদৃশ্যমান ব্যাপারের নশ্বরতা সম্বন্ধে সজাগ তাঁরা। রাজনীতির চর্বিত-চর্বণ, গণশিক্ষার সমারোহ কিংবা বড়ো-কাজের দায়িত্বহীন আস্ফালন—সবই তাঁরা দেখেন, শোনেন, জানেন, বোঝেন। ভারি আত্মসচেতন তাঁরা। চমৎকার বাক্‌পটুতা তাঁদের। 'ইউরোপীয়ন' কবি বিশ্বাস করেন যে,—অতীতে এমন অনেক কিছু হয়েছে বা ঘটেছে যা সত্যিই মূল্যবান। সেই মূল্যের বোধ আছে তাঁর। তাই সে-সব রক্ষা করতে চান। কিন্তু জোর করে কিছুই রক্ষা করা যায় না। সবই আচরণে রক্ষণীয়। 'ইউরোপীয়ন' কবি জানেন যে, যা থাকবার, সেটা কোনো জিনিস মাত্র নয়,—বস্তুমাত্র নয়; সে-সব কিছু কিছু মনোভঙ্গি, কিছু কিছু আচরণ। ইংলণ্ডে, আমেরিকায় সেই বিশেষ দৃষ্টির সংবাদ উচ্চারিত হয়েছিল কবিতায়। পাউণ্ড ছিলেন, এলিয়ট ছিলেন, য়েট্‌স্‌ও ছিলেন।

আরো তরুণ যাঁরা, তাঁদের কারও কারও লেখায় তখন যেন আরো চড়া সুরে রাজনীতির উত্তাপ এবং উদ্যম বেজে ওঠে। কিন্তু এলিয়টের মন পরিশীলিত। তাঁর মেজাজ সৌম্য। তিনি হাঁক-ডাক ভালোবাসতেন না। তাঁর মধু সুষমা তাঁর প্রতিটি বচনে। তাঁর কটাক্ষে রুক্ষতা ছিল না, কিন্তু তাঁর স্মিতহাস্যের উৎস ছিল বিষাদে। সে বিষাদ গতানুগতিক নয়। তারই নাম সার্থক আধুনিকতা।

কবে সাগরকন্যারা গান গেয়েছিল আর প্রুফ্রক শুনে ফেলেছিলেন সেই গান। কিন্তু প্রুফ্রক বুঝেছিলেন যে সে-আমন্ত্রণে সাড়া দেওয়া তাঁর সাধ্যের অতীত। রক্ত-মাংসের এই শরীরের ক্ষুধাতৃষ্ণা মিথ্যে নয়। আমাদের মন মাঝে মাঝে সমুদ্রকন্যার গানে বিভোর হয়। কিন্তু ফিরতে হয়—আবার ফিরতে হয়। প্রুফ্রক এই দ্বন্দ্বচেতনার প্রতিমূর্তি। 'পোর্ট্রেট অফ এ লেডি'তেও এই রকম আধুনিক মজির স্বরূপ-সন্ধান দেখা গেছে। 'সুইনি অ্যামিঙ' দি নাইটিঙ্গেল্‌স্‌'ও একই অনুষণের উদাহরণ।

প্রকৃতির দৃশ্য, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ দূরে রেখে, শরীরের নগদ দাবি মেটাচ্ছে কতকগুলো লোক। তারা আকাশের নক্ষত্র দেখতে চায় না, ধর্মমন্দিরের কোনো ছোঁয়া লাগে না তাদের চেতনায়। এদিকে, কতো বড়ো জগৎ মানুষের চারদিকে প্রসারিত। সুইনি কি সে-খবর জানে?

সুইনি-কবিতার মধ্য দিয়ে এলিয়ট সুনিশ্চিত কোন্ তত্ত্ব বোঝাতে চেয়েছিলেন, জানি না, কিন্তু বোধ হয়, তাঁর লক্ষ্য ছিল এ-যুগের স্থূল বস্তু-সর্বস্বতার দিকে।

এসব 'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ডের' আগেকার রচনা। ইতিমধ্যে গভীর বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে অবসাদবোধের যন্ত্রণা মিশেছে,—ঐতিহ্যের ধারণা খুঁজেছে মন, —ধর্মজিজ্ঞাসার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি চিদাকাশে—নানা ভাবনার তরঙ্গপথ তাঁর পদতলে। এলিয়টের সে-পথের সবটা হয়তো সব পাঠকের পক্ষে সমান উদ্দীপনার বিষয় নয়। কিন্তু তাঁর সঙ্গে ভ্রমণের সুখ একালের অনুরাগী পাঠকমাত্রেই কিছু-না-কিছু অবশ্যই পেতে পারেন। তাঁর সমালোচনার ভঙ্গি ভাবা হবে অনেকদিন,—তাঁর কাব্যনাট্যগুলি নতুন কালের নতুন কবিতার সম্ভাবনাভূমি হতে পারবে হয়তো। (ক্রমশঃ)

বিপ্লব কি?

সুভাষ চন্দ্র বসু

তোমরা তরুণ শিক্ষার্থীরা, যারা এই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করছো তাদের বিপ্লব সম্বন্ধে ভালরকম জ্ঞান থাকা উচিৎ। কি ভাবে অন্যান্য দেশে বিপ্লব সফল হয়েছিল তা তোমাদের জানা উচিৎ। যাতে করে তোমরা বিচার করতে পার আমরা আমাদের বিপ্লবের পথে কতদূর এগিয়েছি এবং আরও কতটা পথ আজও আমাদের সম্মুখে পড়ে আছে।

কি ভাবে বিপ্লব জয়যুক্ত হয় একথা বুঝতে শিখলে পথের বাধা দেখে কোনদিন হতাশ হয়ে পড়বে না। মানুষ তখনই হতাশ হয়ে পড়ে যখন সে এমন কিছুর সম্মুখীন হয় যা তার কাছে অপ্রত্যাশিত। যদি বিপ্লব এবং তার সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সম্পর্কে তোমাদের মনে একটা সুস্পষ্ট ছবি আঁকা থাকে তবে বিপ্লবের পথে চলতে গিয়ে কোনদিনই হতোদ্যম হয়ে পড়বে না।

প্রাকৃতিক জগতে যেমন সব কিছুরই নিয়ম আছে তেমনি বিপ্লবও কতকগুলি নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হয়। ম্যালেরিয়ার কথাই ধরা যাক। যখন মশা কামড়ায় ম্যালেরিয়ার বীজাণু তোমার রক্তে প্রবেশ করে এবং তোমার ম্যালেরিয়া জ্বর হয়। যদি এই সমস্ত বীজাণু থেকে তুমি দূরে থাক তোমার কোনদিনই ম্যালেরিয়া হবে না। যখন একজন ম্যালেরিয়া রোগীকে রোগমুক্ত করতে হয় তখন এই বীজাণুগুলিকে ধ্বংস করে ফেলতে হয়। তুমি খুব সবলদেহ লোক হতে পার কিন্তু ম্যালেরিয়া বীজে আক্রান্ত হলে তোমাকে অসুস্থ হয়ে পড়তেই হবে, কারণ তুমি প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করতে পার না।

ধর, বাগানে একটা গাছ জন্মাচ্ছে। যদি তুমি গাছটিকে বড় করতে চাও তবে জল দিতে হবে এবং যে সমস্ত কীট গাছটিকে নষ্ট করতে পারে সেগুলোকে ধ্বংস করে ফেলতে হবে।

ঋতুপর্যায়ের কথাই ধরা যাক না কেন। যখন গ্রীষ্মকাল চলেছে তখন যদি তুমি মনে কর যে এই গরমটাই চিরকাল ধরে চলবে তবে তুমি ভুল করছ।

গরমের পরে যথাকালে দেখা দেবে শীত। এটা আর একটা অলঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক নিয়ম। ঠিক এইরকম বিপ্লবেরও ঋতু-পরিবর্তন আছে। বিপ্লবের পথ একেবারে ঋজু পথ নয়। এপথে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সাফল্য আসে না। এ পথ বহু বিঘ্নসঙ্কুল, সুদীর্ঘ এবং সর্পিল। যদি তোমরা একথা বুঝতে পার, তবে তোমরা কখনও নিরুৎসাহ হবে না; ধরে নেবে বাধাবিঘ্ন কথাটাই স্বাভাবিক এবং হতাশ না হয়ে সেগুলি পার হতে চেষ্টা করবে।

প্রথমত তোমরা যদি বুঝতে পার যে প্রত্যেক প্রাকৃতিক ঘটনার মত বিপ্লবও কতকগুলি নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তবে প্রশ্ন উঠবে বিপ্লবের এই সমস্ত নিয়ম কি ভাবে জানা যাবে। কিরূপে বীজ বুনতে হয় এবং কি ভাবে তাতে জল সেচন করতে হয়, কৃষিকার্যের এই সমস্ত নিয়ম একজন কৃষক কি উপায়ে জানতে পারে তা একবার চিন্তা করে দেখ। কৃষিজীবী বহু শতাব্দীর পর্যবেক্ষণের ফলে এই সমস্ত জ্ঞানলাভ করেছে। ম্যালেরিয়া চিকিৎসার জ্ঞানই বা চিকিৎসকরা কি উপায়ে লাভ করেছেন ভেবে দেখ। হাজার হাজার ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগী দেখেই না তাঁদের মনে এই জ্ঞান জন্মেছে? ঠিক সেইরকম জগতের ইতিহাসে যে সমস্ত বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে সেইগুলি দেখেই বিপ্লব-বিশারদরা বিপ্লবের নিয়মগুলি আবিষ্কার করেছেন। অন্যান্য দেশের চিন্তানায়করা এ বিষয়ে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, প্রত্যেক বিপ্লবই তার পূর্ববর্তী বিপ্লবের চেয়ে বেশিদূরে এগিয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষে এই বিষয়টির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয় নি, কিন্তু অন্যান্য দেশে এটা ধীরে ধীরে বিজ্ঞানের ভিত্তিতেই দাঁড়িয়েছে এবং এর নিজস্ব পরিভাষাও আছে। ভারতবাসীদের এ বিষয়ে আলোচনা করবার সময় আজ এসেছে এবং এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট আলোচনার জন্য আমাদের হয়ত নতুন নতুন শব্দও সৃষ্টি করতে হবে।

এখন, বিপ্লব কি? ইংরাজী ভাষায় revolution মানে পরিবর্তন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, যে কোন পরিবর্তনকেই কি বিপ্লব বলা চলে? প্রাকৃতিক জগতে বহুরকম পরিবর্তন আছে। কতকগুলি স্বাভাবিক পরিবর্তনও আছে, এগুলোকে বিপ্লব বলা চলে না। কতকগুলি অস্বাভাবিক পরিবর্তনও আছে, যেমন মাঝে মাঝে অস্বাভাবিক বন্যা ঘটে যাতে আপাতদৃষ্টিতে প্রচুর ক্ষতির কারণ হয় কিন্তু পরিণামে প্রভূত কল্যাণ সাধন করে। মিশরবাসিগণ এই রকম বন্যার জন্য প্রার্থনা করে, কারণ যদিও এই রকম বন্যা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর তবুও এতে ভূমির উর্বরতা বাড়ে। ভূমিকম্প প্রাকৃতিক জগতের অস্বাভাবিক পরিবর্তনের আর একটা দৃষ্টান্ত। এই যে গাছপালা বড় হচ্ছে বা বৃষ্টি পড়ছে এ ধরনের স্বাভাবিক পরিবর্তনকে বিবর্তন বলা চলে, বিপ্লব বলা চলে না। বিবর্তনের অর্থ ধীরগতিতে পরিবর্তন এবং ক্রমবিকাশ। যখন একটা বিপুল এবং মূলগত পরিবর্তন ঘটে তখনই তাকে আমরা বিপ্লব বলে থাকি।

এখন তোমরা বুঝলে বিপ্লব কাকে বলে। এটি একটি সুবিপুল ও মূলগত পরিবর্তন, এই পরিবর্তন ঘটে অতি দ্রুতগতিতে। ক্রমবিবর্তনের পথে যা ঘটতে এক শতাব্দী লাগে তা বিপ্লবের মধ্য দিয়ে দশ বা পাঁচ বৎসর কালের মধ্যেই সংঘটিত হয়। যখন অত্যল্প কালের মধ্যেই কোন পরিবর্তন সংঘটিত করতে হয়, তখন সকল উপায় অবলম্বন এবং সকল অস্ত্র প্রয়োগ করতে হয়। বিবর্তনের পথে স্বাভাবিক নিয়মে মত পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করতে হয় কিন্তু বিপ্লবের পথে অস্ত্র ধারণ করে সমস্ত বাধা ধ্বংস করতে হয়, এবং সেই জন্যই রক্তপাতও বিপ্লবের একটি অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়।

যেহেতু বিপ্লবের সময় আমরা ন্যূনতম সময়ে প্রকৃষ্টতম ফললাভ করতে চাই সেইজন্য—কেন পূর্ববর্তী বিপ্লবগুলিতে বিলম্ব বা অসাফল্য ঘটেছিল তা জানা আমাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়।

আরও বেশিদূর অগ্রসর হবার আগে আমি একথাও স্পষ্ট করে বলতে চাই যে বিপ্লবের ফলে যে পরিবর্তন আসে তা মূলগত। সামান্য দু'চারটি নগণ্য পরিবর্তনকে বিপ্লব বলা চলে না। একটি গভর্নমেন্টের পরিবর্তন বা মন্ত্রিদলের পরিবর্তন বিপ্লব নয় কারণ এতে জাতীয় জীবনধারায় পরিবর্তন ঘটে না। এই পার্থক্যটা বোঝবার জন্য ফরাসীরা একটা শব্দ তৈরি করেছে 'coup d'etat' এবং জার্মানগণ তৈরি করেছে 'putsch' এই শব্দটি। যখন একটি মন্ত্রিদলের পরিবর্তন ঘটে বা কোন রাজাকে সিংহাসন থেকে অপসারিত করা হয় তখন আমরা বলি 'coup d'etat'। ইউরোপ ভ্রমণকালে আমি বুলগেরিয়ায় এইরূপ একটি ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছিলাম। ভোর ৪টার মধ্যেই সৈন্যদল এইরূপ একটি coup d'etat করেছিল। তারা মন্ত্রীদের বাড়ি ঘিরে ফেলে, তাদের বন্দী করে এবং রাজার কাছে উপস্থিত হয়ে মন্ত্রিদলের পরিবর্তন দাবি করে। রাজা নতুন গভর্নমেন্ট তৈরি করতে বাধ্য হন। কোন রক্তপাত হলো না, দেশের কোন আমূল পরিবর্তন হলো না। গভর্নমেন্ট গঠনকারী সভ্যদের মাত্র অদলবদল হলো। এটা বিপ্লব নয় এটা একটি coup d'etat অথবা putsch.

বহুদিনের পরাধীনতার ফলে ভারতবাসীরা দুর্বল হয়ে পড়েছে। তারা এখন ত্যাগ করতে বা প্রাণবলি দিতে ভয় পায়। এমনকি বিপ্লবের চিন্তাও তারা পছন্দ করে না, তারা ক্রমবিকাশের পথেই চলতে চায়। সব বিষয়েই তারা ধীরে ধীরে পরিবর্তন চায়। কিন্তু প্রাকৃতিক জগতের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে সময়ে সময়ে বৈপ্লবিক পদ্ধতি একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এরকম সময় আসে যখন ওষুধ প্রয়োগে ধীরে ধীরে চিকিৎসার ব্যবস্থা নিষ্ফল হয়ে পড়ে এবং অস্ত্রচিকিৎসার সাহায্য নিতে হয়। সময় সময় এমন অবস্থা কি আসে না যখন পা কেটে ফেলে অবশিষ্ট দেহকে বাঁচাতে হয়? একটু চিন্তা করলেই তোমরা বুঝতে পারবে যে সময়ে সময়ে রক্তপাত—অস্ত্রচিকিৎসার নির্মম পদ্ধতিই—জীবনরক্ষায় একমাত্র উপায় হয়ে দাঁড়ায়। ব্যক্তিগত জীবনে যে নিয়ম জাতিগত জীবনেও সে নিয়ম খাটে। কোন জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে সময়ে সময়ে বৈপ্লবিক পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারেই অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

বিপ্লব দুই প্রকারের। এক হচ্ছে বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লব। দ্বিতীয়ত দেশের আভ্যন্তরীণ সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিপ্লব। বৈদেশিক শাসনাধীন দেশগুলিতে বিপ্লবের প্রাথমিক উদ্দেশ্য বৈদেশিক শাসনের উচ্ছেদ এবং দ্বিতীয়ত নতুন সমাজ-ব্যবস্থা সৃষ্টি। ফরাসী বিপ্লবের সময়ে বৈদেশিক শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয় নি কারণ ফরাসীদেশীয় রাজারাই তখন সে দেশে রাজত্ব করতেন। ফরাসী বিপ্লবের উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন সাধন এবং একটি নতুন সমাজ-ব্যবস্থার সৃষ্টি। রাশিয়ার বিপ্লবেরও উদ্দেশ্য ছিল নতুন সমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্তন। দেশবাসী উপলব্ধি করেছিল যে তাদের নিজেদের রাজাই দেশের অগ্রগতির পথে বাধাস্বরূপ। নতুন সমাজ সৃষ্টির জন্য তাদের রাজাকে সিংহাসন থেকে অপসারিত করতে হয়েছিল। ১৯২৬ সালের আয়ারল্যাণ্ডের বিপ্লব ছিল বৈদেশিক শাসক শক্তির বিরুদ্ধে, সুতরাং আমাদের বিপ্লবকে আয়ারল্যাণ্ডের বিপ্লবের সঙ্গে তুলনা করা চলে। দেশীয় শাসকবর্গের বিরুদ্ধে বিপ্লব সৃষ্টি করে নতুন সমাজ-ব্যবস্থার জন্য চেষ্টা করা অপেক্ষাকৃত সহজ কাজ। কিন্তু প্রথমে বিদেশী শক্তিকে অপসারিত করা এবং তারপরে নতুনতর সামাজিক ব্যবস্থার সৃষ্টি সত্যই আরো কঠিন কাজ।

বিপ্লব সফল করে তুলতে হলে তিনটি জিনিসের প্রয়োজন। প্রথমত উদ্দেশ্য এবং আদর্শ সুস্পষ্ট হওয়া দরকার। দ্বিতীয়ত যে উপায় ও পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। এবং তৃতীয়ত বিপ্লবের পিছনে জনগণের সমর্থন থাকা আবশ্যক। বিপ্লব সফলরূপে আরম্ভ করতে হলে অন্তত নেতৃবৃন্দের মনে তাঁদের আদর্শ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। আর বিপ্লবের সফল পরিণতির জন্য নেতাদের মনে বিপ্লবের পদ্ধতি সম্পর্কেও একটা সুনির্দিষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন এবং জনগণের সমর্থন তাদের পাওয়া চাই-ই। যদি আদর্শ স্পষ্ট থাকে কিন্তু অবলম্বিত পদ্ধতি ভুল হয়, অথবা যদি পদ্ধতি ঠিক হয় কিন্তু আদর্শ অস্পষ্ট থাকে অথবা সুস্পষ্ট আদর্শ এবং উপযুক্ত পদ্ধতি থাকা সত্ত্বেও বিপ্লব যদি জনগণের সমর্থন লাভে সমর্থ না হয়, তবে এই তিন ক্ষেত্রেই বিপ্লবের ব্যর্থতা অনিবার্য। সাফল্যের জন্য এই তিনটি জিনিসই অপরিহার্য।

বিপ্লবের ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যাবে যে এমন অনেক বিপ্লব ঘটেছে যেগুলির সাফল্য সোজা পথেই এসেছে আবার এমনও অনেক বিপ্লব ঘটেছে যেগুলিতে তা হয় নি। ফরাসী বিপ্লবে আদর্শ স্পষ্ট ছিল। সেই বিপ্লবের নেতৃবৃন্দ 'সাম্য মৈত্রী এবং স্বাধীনতা' তাঁদের আদর্শ বলে ঘোষণা করেছিলেন। তাঁরা ফরাসীদের মধ্যে একটা নতুন জাতি সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন এবং ফরাসী জনগণও তাঁদের নেতৃত্বে রক্তপাতের পথে এগিয়ে যেতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু নেতারা তাঁদের পদ্ধতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করতে পারেন নি,—যার ফলে তাঁরা বহুদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। পর পর বিভিন্ন দলের হাতে ক্ষমতা আসে। ফলে সমস্ত জাতির পক্ষে বিপদ দেখা দেয়। ফরাসী জাতির এরূপ আত্মকলহের সুযোগ নিয়ে যখন অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলি ফরাসী-দেশকে ধ্বংস করবার জন্য একতাবদ্ধ হতে আরম্ভ করল, তখন নেপোলিয়ান এসে দেশকে রক্ষা করলেন। অপর পক্ষে গত মহাযুদ্ধের পর তুরস্কের বিপ্লব সোজা পথেই জয়যুক্ত হল।

মুস্তাফা কামাল একটা দল তৈরি করে বিপ্লব সুরু করে দিলেন; তিনি তুরস্কদেশকে বৈদেশিক শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করে দেশে এক নববিধানের প্রবর্তন করলেন। এই বিপ্লবের নেতৃবৃন্দের সম্মুখে আদর্শ ছিল স্পষ্ট, তাঁদের পদ্ধতি ছিল সময়োপযোগী এবং সমগ্র জাতি তাঁদের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিল। তুরস্কদেশে সমস্ত নেতা বিপ্লবের উদ্যোগ করেছিলেন, আজকে পুনর্গঠনের সময়েও তাঁরাই সে দেশের নেতা। তুরস্কের বিপ্লব-ইতিহাসে কোন মতভেদ আমরা দেখিতে পাই না যেমনটি আমরা দেখেছিলাম ফরাসী দেশের বেলায়।

আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, যে-নেতারা বিপ্লব সুরু করেছিলেন তাঁরা পরে অপরের হাতে কর্মভার অর্পণ করে সরে গেছেন। এই রকম ক্ষেত্রে যখন নেতৃবৃন্দ বহু প্রয়াস এবং রক্তপাতের পর তাঁদের কর্ম অসমাপ্ত রেখে চলে গেছেন তখন প্রায়ই বিপ্লবের ব্যর্থতা দেখা দিয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখা যাবে যে ১৯১১ সালে ডাঃ সান ইয়াৎ সেন চীন দেশের মাঞ্চু-সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিপ্লব সুরু করেন। নব্য তুরস্কের স্রষ্টা যেমন কামাল মুস্তাফা, নব্য চীনের স্রষ্টাও সেইরূপ সান ইয়াৎ সেন। কিন্তু মাঞ্চু-সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করবার পর এবং নতুন গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পর তিনি ইউয়ান সি কাই-র হাতে দেশের নেতৃত্বের ভার দিয়ে কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ইউয়ান সি কাই ছিল একজন প্রতিক্রিয়াপন্থী লোক, কাজেই এতে করে ঘড়ির কাঁটাকে পিছিয়েই দেওয়া হলো। ইউয়ান সি কাই-র অধীনে যে প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা গড়ে উঠলো সেটাকে ধ্বংস করবার জন্য আবার ১৯২৬-২৭ সালে আর একটি বিপ্লবের প্রয়োজন হয়েছিল।

তোমাদের বুঝতে হবে যে আমাদের উদ্দেশ্য দুইটি। প্রথম উদ্দেশ্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা, এইটাই হচ্ছে জাতীয় বিপ্লব। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ন্যায়ের ভিত্তিতে একটি সামাজিক ব্যবস্থার পত্তন—এটা হচ্ছে সামাজিক বিপ্লব। আমাদেরকে প্রথমত বৈদেশিক শাসন পাশ হতে মুক্ত হতে হবে, দ্বিতীয়ত আমাদের আদর্শ অনুযায়ী দেশকে পুনর্গঠিত করতে হবে।

প্রত্যেক ভারতবাসীই আজ উপলব্ধি করে যে ভারতবর্ষ থেকে বৈদেশিক শাসন দূর করতে হবে কেন না আমাদের উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায় এই বৈদেশিক শাসন। কিন্তু যদি ভারতবর্ষ থেকে বৃটিশ শাসন দূর হবার পর দেশের ক্ষমতা ভারতীয়দের হাতে আসে এবং তা-সত্ত্বেও এদেশে দারিদ্র্য এবং বেকার সমস্যা, মহামারী এবং মৃত্যুহার পূর্বের মতই থাকে, নিরন্নের অন্ন এবং জনগণের শিক্ষার কোন সুব্যবস্থা করা না হয় তবে আমাদের কর্ম অসমাপ্তই রয়ে গেল। আমরা জানি যে যতদিন এদেশে বৃটিশ শাসন থাকবে ততদিন দেশে এই সমস্ত সমস্যাও থাকবে। যাতে আমরা সমস্ত ব্যবস্থার ভার নিজেদের হাতে নিয়ে এমন একটি নতুন সমাজ গড়তে পারি যেখানে প্রত্যেক ভারতবাসীরই উপযুক্ত পরিমাণে অন্নবস্ত্রের সংস্থান হয় ও শিক্ষার ব্যবস্থা হয়, সেই উদ্দেশ্যেই আমরা বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদ চাই। আমরা যারা ভারতে বিপ্লব সুরু করতে চাই তারা যদি বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদের কথাই ভাবি এবং তারপর কি হবে সে কথা চিন্তা না করি তবে আমাদের কর্তব্য অসমাপ্ত থেকে যাবে। আমাদের বিপ্লব কেবলমাত্র সেইদিনই শেষ হবে যেদিন আমরা সত্য এবং ন্যায়ের ভিত্তিতে নতুন সমাজ গড়ে তুলতে পারব, যে সমাজে প্রত্যেক ভারতবাসীই তার জন্মগত অধিকার লাভ করবে। আমার মনে পড়ে যে যখন আমি ছোট ছিলাম তখন বৃটিশ শাসকদেরকে তাড়িয়ে

দেওয়াই আমাদের একমাত্র কর্তব্য মনে করতাম। কিন্তু পরে গভীর ভাবে চিন্তা করে আমি দেখেছি যে যদি ইংরাজকে তাড়িয়েই আমাদের বিপ্লব শেষ হয়ে যায় তবে ভারতবর্ষে নতুন সমাজব্যবস্থা সৃষ্টির জন্য আর একটি বিপ্লবের প্রয়োজন হবে। এটা খুবই সম্ভব যে যে-সমস্ত ভারতবাসী স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কোন ত্যাগই করে নি তারাই দেশে ক্ষমতা লাভ করবে এবং নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সেই ক্ষমতা ব্যবহার করবে। তোমরা জান যে ভারতবর্ষে এরকম লোক অনেক আছে যারা দেশের লোকদেরই শোষণ করে থাকে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গেই তোমরা কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করতে পার না কারণ বিদেশী শত্রুর সঙ্গে সংগ্রামের পর তোমাদের ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল জাতিগুলির হাত থেকে জাতিকে রক্ষা করতে হবে।

এখন আমাদের বিপ্লবের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি আমি আলোচনা করছি। আমি আগেই বলেছি যে বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা। আমাদের উদ্দেশ্য স্বাধীন ভারতবর্ষে ভাষা-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রত্যেক ভারতবাসীরই সমান অধিকার থাকবে। ভারতবর্ষে বাস করে এবং নিজেকে ভারতবাসী বলে পরিচয় দেয় এরকম প্রত্যেক মানুষই অন্নবস্ত্র ও শিক্ষালাভের সমান অধিকার পাবে। আমরা ভারতে এরকম শাসন ব্যবস্থারই প্রবর্তন করতে চাই যার ফলে প্রত্যেক মানুষকে উপরোক্ত অধিকার দেওয়া সম্ভব হয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের পথে যতগুলি অন্তরায় আছে সবই আমাদের দূর করতে হবে। এটা অতি স্বাভাবিক যে যদি আমরা প্রত্যেককেই তার ন্যায্য পাওনা দিতে চাই তবে কতকগুলি বড়লোককে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভোগের সুবিধা আমরা দিতে পারি না।

আমরা যে পদ্ধতিতে বিপ্লব করতে চাই তা হচ্ছে সম্মিলিত নেতৃত্বের পদ্ধতি। ফরাসী বিপ্লবে অতি সহজেই রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করা হয়েছিল কিন্তু যারা রাজাকে অপসারিত করতে হাত মিলিয়েছিল তাদের মধ্যে ঐক্য ছিল না। সেখানে দুটি দল দেখা দেয় এবং এদের মধ্যে একদল ছিল নরমপন্থী এবং আর একদল ছিল চরমপন্থী। এরা পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লেগে গেল, ফলে কোন ঐক্য সৃষ্টি সম্ভব হলো না। রাশিয়ার বিপ্লবে ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সকলেই একত্রিত হয়ে রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করেছিল, কিন্তু পরে তাদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হয় এবং বলশেভিক দল নামক অন্য একদল অক্টোবর মাসে আর একটা বিপ্লব করতে বাধ্য হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে বিপ্লবের নেতাদের মধ্যে ঐক্য একান্ত প্রয়োজন। তুরস্কের বিপ্লবে আমরা দেখি যে-নেতৃদল যুদ্ধ করে তুরস্কের স্বাধীনতা এনেছিল তারাই আজও সেখানকার শাসনকার্য চালাচ্ছে। তুরস্কের বিপ্লব মিলিত নেতৃত্বের একটা উদাহরণ পক্ষান্তরে ফরাসী বিপ্লব বহু দলীয় নেতৃত্বের উদাহরণ। এখন তোমরাই বিচার করতে পার কোন্ পন্থা আমাদের পক্ষে উপযোগী হবে।

সাফল্যের জন্য তৃতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস হচ্ছে জনগণের সমর্থন লাভ। যেখানেই আমি গেছি আমি লক্ষ্য করেছি যে, দরিদ্র জনসাধারণ সকলেই স্বতঃই আমাদের বিপ্লবকে সমর্থন করতে এগিয়ে আসে। যদি কেউ পিছিয়ে থাকে তবে সে হচ্ছে বড়লোক শ্রেণী। দরিদ্রেরা এগিয়ে আসে কারণ তারা বিশ্বাস করে আমাদের বিপ্লবের মধ্য দিয়ে তাদের মঙ্গল আসবে। তারা অশিক্ষিত বলে হয়ত স্পষ্টভাবে চিন্তা করতে পারে না কিন্তু তারা হৃদয় দিয়ে অনুভব করে যে বিপ্লব তাদের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে। যারা বড়লোক তারা পিছিয়ে থাকে এবং অগ্রগতির পথে হয়ত বাধা সৃষ্টি করে কারণ নতুন সমাজব্যবস্থায় তাদের সম্পত্তির কি অবস্থা হবে এই ভেবে তারা শঙ্কিত হয়ে ওঠে। বৈদেশিক শাসনের উদ্দেশ্য হচ্ছে উচ্চশ্রেণীর তোষণ এবং জনগণের শোষণ, তাই বৈদেশিক শাসনে উচ্চশ্রেণীর জীবনে দুঃখবেদনা আসে নি। তারা বিপ্লবকে ভয় করে। তারা জানে যে বিপ্লব সংঘটিত হলে তারা তাদের ধন এবং সম্মান দুইটি হারাবে। কাজেই দরিদ্র অশিক্ষিত জনসাধারণ যে বিপ্লবের সমর্থক হবে এটা খুবই স্বাভাবিক। জনসাধারণ নিরক্ষর হতে পারে কিন্তু তারা নির্বোধ নয়। তারা স্পষ্টই উপলব্ধি করে যে বিপ্লবই তাদের মুক্তির পথ।

প্রত্যেক জাতিকেই দুই ভাগে ভাগ করা চলে, ধনীর দল ও নির্ধনের দল। নির্ধনের দল স্বতঃই বিপ্লবে সহযোগিতা করবে এবং আমাদের দেশে তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। অবশ্য এই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মধ্যে হয়ত অত্যল্প সংখ্যক এমন লোক থাকতে পারে যারা এরূপ হীনাবস্থায় উপনীত হয়েছে যে তাদের মধ্যে আর কোন প্রাণের বা উৎসাহের স্পন্দন নাই। আবার সংখ্যালঘিষ্ঠ ধনীদের দলের মধ্যেও এমন কিছু লোক থাকতে পারেন যাঁরা নিঃস্বার্থ তাঁরা হয়ত বিপ্লবে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন। সুতরাং অনকয়েক স্বার্থপর ধনী এবং হতোদ্যম নির্ধন ছাড়া আমরা সমস্ত জাতিকেই বিপ্লবের পথে সহায়করূপে পেতে পারি।

আমাদের উদ্দেশ্য পূর্ণরূপে স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক। পূর্ববর্তী বিপ্লবগুলির ইতিহাস পাঠ করে আমাদের প্রকৃষ্টতম পন্থা ও পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। এবং সমস্ত জনগণের সমর্থন আমাদের লাভ করতে হবে। যতদিন পর্যন্ত আমাদের জাতীয় জীবনে স্বাধীনতার আদর্শ এবং সমাজ-জীবনে ন্যায়ের আদর্শ সফল না হয় ততদিন পর্যন্ত আমরা আমাদের বিপ্লব চালিয়ে যাব।

ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

(কাবে স্বরাজ যুব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত অলিখিত বক্তৃতার এই সারাংশ শ্রীঅমর নন্দীর সৌজন্যে প্রাপ্ত)।

টাইগার্টেনের সেই দিনগুলি

সুভাষ সমাজদার

সন ১৯৩৯।

সময়টা পৃথিবীব্যাপী একটা দুর্যোগের সময়। চারিদিকে সাজো সাজো রব। যুদ্ধের চক্রান্তে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানী তিলে তিলে শক্তি সঞ্চয় করে পোল্যাণ্ড আক্রমণ করবো করবো করছে। সমস্ত পৃথিবী ভয়ে ভয়ে জার্মানীর দিকে তাকাচ্ছে। হঠাৎ ইটালী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল। চিন্তিত হলো জার্মানী। ইটালীকে সাহায্য করার জন্য তার যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত সেনানীকে উত্তর আফ্রিকা কি বলকানে পাঠাবে কি না। ঠিক এমনি সময়—

এমনি সময় বার্লিনের ফরেন অফিসে এক বিদেশী ভদ্রলোক এসে হাজির হলেন।

—কি নাম আপনার?

—মিঃ অরল্যাণ্ডো ম্যাজোটা—

—পাসপোর্ট আছে?

—আছে।

—দেখি—

ভদ্রলোক খুব ধীরে ধীরে পোর্ট-ফলিও ব্যাগ খুললেন। বের করলেন পাসপোর্ট। ইটালীয়ান পাসপোর্ট। তাতে কাবুলের ইটালীয়ান এমব্যাসীর শিলমোহর। কাবুল থেকেই ভদ্রলোক পাসপোর্ট সংগ্রহ করে রাশিয়া হয়ে জার্মানীতে এসেছেন।

বেশ চিন্তায় পড়লেন পাসপোর্ট অফিসার। এই সঙ্কটের সময় কাকে—কাকে দেশে ঢুকতে দিচ্ছি। অতএব ফোন করো। চিঠি দাও। চিঠি দাও কাবুলে। ট্রাঙ্ককল করো কলকাতায়। প্রি-ওয়ার কাউন্সেল জেনারেলকে। কে এই ভদ্রলোক। কেন-ই বা চারবছর আগে জার্মানীতে এসেছিলেন। আবার কি দরকার পড়ল এই দেশে—এই পরিস্থিতিতে।

খবর এসে গেল।

আর চমকে উঠল জার্মানীর সেই ফরেন অফিসের কর্মচারীরা। ইতিহাসকার লিখেছেন—

All the information about his great past and knew from their reports that, as an active fighter against British imperialism....

কিন্তু—

আরও—আরও বেশি চিন্তিত হয়ে উঠলেন ফরেন অফিসের সেক্রেটারী। এইরকম একটি মানুষ। ফুয়েরারকে অর্থাৎ সেই একক—অদ্বিতীয় নেতা হিটলারকে না জানিয়ে তো কিছুই করা যেতে পারে না। তাঁকে বলা হলো, আপনাকে কিছুদিন পরে জানানো হবে—আপনি এদেশে নাগরিক অধিকার পেতে পারেন কি না।

আগন্তুক কিছুদিন নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে রইলেন। এদিকে হিটলার চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে হিটলারের ধারণা খুব ভাল ছিল না। যে দেশকে শত শতাব্দীব্যাপী বৃটিশরা পরাধীন করে রেখেছে, সেই দেশের মানুষের মানসিক গঠন সম্বন্ধেও তাঁর মনে যথেষ্ট দৈন্য ছিল। আবার এই মানুষটিকে সাহায্য করার অর্থ যেমন বৃটিশের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে বিরোধিতা করা, তেমনি ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ স্বাধীনতাকামী মানুষের সহানুভূতি আর সৌহার্দ্য পাওয়া। কিন্তু বহু দূরদেশ থেকে অনেক পাহাড়, অনেক সমুদ্র ডিঙিয়ে যে এসেছেন সে জার্মান সরকারের নিপুণ আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়ে আরামে এদেশে বসবাস করার জন্য আসে নি।

রাত্রির অন্ধকারের আড়ালে, তুষারঝরা সেই ব্রাহ্মমুহূর্তে একটা ধূর্ত অভিসন্ধির মূর্তির মত জার্মানীর পথে-প্রান্তরে সে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। কোথায়—কোথায় আছে তার দেশের লোক। হিমালয় আর গঙ্গা-কৃষ্ণা-কাবেরীর হাওয়ায় যারা পুষ্ট হয়েছে তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে তার ব্যথা। পরাধীন ভারতের অত্যাচারিত আর বিক্ষুব্ধ একটি বিদেহী আত্মা। ঝড়ের হাওয়ার মত ঘুরছে, আর ভারতের মানুষের কানে কানে বলছে—শোন, ঘুমিয়ে থেকো না। এই সুযোগ, বৃটিশ সিংহ কাবু হয়ে পড়েছে। জার্মানীর সাহায্য পাবো—জাপান তথা মধ্যপ্রাচ্য আর দূরপ্রাচ্যের সহানুভূতি আগেই পেয়ে গেছি---

কিন্তু শুধু রেস্তোরাঁয়, রাস্তার মোড়ে মোড়ে ঘুরলেই হয় না। পরিকল্পনাকে কাজে লাগাতে হবে। প্রতিষ্ঠা করলেন ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টার। এই ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টারের কাজ হলো প্রধানত দুইটি। রেডিও প্রপাগাণ্ডা এবং ভারতীয় স্বেচ্ছা-সেবকবাহিনী গঠন করা।

একথা বলা বাহুল্য, শত শত,

মাইল দূরে গিয়ে সেই বিদেশে বসে ভারতের জন্য এমন আকুলতা আর কার হবে? ইনিই নেতাজী। আসমুদ্র হিমাচলে যিনি এখনও পর্যন্ত সম্রাটের মহিমায় বিরাজ করছেন। জার্মানীতে, জাপানে, সুদূর প্রাচ্যে মধ্যপ্রাচ্যে তিনি দশের জন্য যে কি করেছেন, তা ভাবলে একটা মুগ্ধ তন্ময়তায় মনটা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। যাক—

রেডিও প্রপাগাণ্ডা করা খুব কঠিন নয়। জার্মান সরকার খুব সহজে সায় দিল। ঠিক হলো স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন করার বিষয়েও জার্মান সরকার তাকে সর্ববিধভাবে সাহায্য করবে। যে সমস্ত জার্মান সিভিলিয়ান তার রেডিও ব্রডকাস্টিং-এর সাহায্য করছেন, তাঁদের মাইনে দেবেন জার্মান সরকার। আর 'লেজিয়ন' অর্থাৎ বিদেশে ভারতীয় তরুণ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে আধুনিক যুদ্ধ বিদ্যায় শিক্ষিত করার জন্য সুশিক্ষিত জার্মান ক্যাপ্টেনদের এবং লেফট্যানেণ্টদের নিযুক্ত করা হলো। এই ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টার এবং লেজিয়নের যাবতীয় খরচ হলো 'ন্যাশনাল লোন টু বোস'—কথা ছিল, এই ঋণ তিনি শোধ করবেন তখন, যখন তাঁর স্বপ্ন সার্থক হবে।

সুভাষ বোস তাঁর মাসিক ভাতা পেতেন ৮০০ পাউণ্ড মাসে। আর ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টারকে জার্মান সরকার গ্র্যাণ্ট দিতেন নিয়মিত। ১৯৪১ সালে দিয়েছিলেন ১২০০ পাউণ্ড। ১৯৪৪ সালে সেই বারোশো বত্রিশ পাউণ্ডে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঐতিহাসিক লিখেছেন,

'It was a gentleman's agreement made in good faith. It was a personal debt of honour to Bose and the Indian Nation was not made responsible for its re-imbursement.

ঠিক এই সময় সুভাষ বোস চেয়েছিলেন চক্রশক্তি যদি খোলাখুলি ভাবে ঘোষণা করে যে ভারতের স্বাধীনতায় তাদের সমর্থন আছে এবং পরাধীন ভারতবর্ষকে তারা সাহায্য করবে তাহলে ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টারের প্রেরণা আরও বাড়বে।

প্রস্তাব শুনে রিবেনট্রপ চিন্তিত হলেন। সমস্যায় পড়লেন হিটলার। তাঁরা হাঁ না কিছুই বললেন না। কিন্তু তাঁদের অকৃপণ সাহায্যের প্রসারিত হস্ত আরও বেশি বদান্য হয়ে উঠল।

শেষ পর্যন্ত রিবেনট্রপ বললেন, ঠিক আছে বোস—তুমি ফুয়েরারের সঙ্গে দেখা করো—

রিবেনট্রপ ব্যবস্থা করলেন। ২৯শে মে, জার্মান মিলিটারী হেড কোয়ার্টারে দেখা হলো দুজনের। দু'টি সাধারণ—খুব সাধারণ হয়েও অসাধারণ—অতি অসাধারণ মানুষ। দু'জনের মনের গঠন সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। কিন্তু কতগুলো আশ্চর্য মিল ছিল তাঁদের। দু'জনের চোখেই স্বপ্ন ছিল অগাধ। কর্তব্যের প্রতি তীব্র নিষ্ঠা, ইস্পাতের মত কঠিন। অনমনীয় মন—নিজের সাধনার জন্য মৃত্যুপণ—এসব কথা যেন হিটলার আর সুভাষ বোসের কথা ভেবেই রচিত হয়েছে। আর—

আরও আছে। আজ পর্যন্ত মৃত্যু নেই হিটলারের। মৃত্যু নেই নেতাজীর। সে যা হোক—

ফুয়েরার বললেন, এখনও সময় হয় নি এই রকম একটা ঘোষণা করার। আমার মতে এই ঘোষণাটি করা সমীচীন তখন, যখন এ্যাক্সিস পাওয়ার একেবারে ভারতবর্ষের দুয়ারে গিয়ে হানা দেবে।

ঘোষণাটি করলেন না বটে। এই ডিক্ল্যারেশন করলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস একেবারে পাল্টে যেত কি না সেকথা আজ ইতিহাস গবেষকদের গবেষণার বিষয়। কিন্তু ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ, তিনি দীর্ঘদিন ধরে তিলে তিলে নিজের দেশকে তৈরি করেছেন, যিনি বহুদর্শী শুধু নন—দূরদর্শীও বৃটেন, সেই হিটলার বলেছে বলেই তাই চুপ করে থাকলেন নেতাজী।

—তথাস্তু বললেন।

বার্লিনে রাজকীয় সমারোহে আর কূটনৈতিক মিশনের মর্যাদায় কাজ করতে লাগল ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টার। নেতাজীর দলের সৈন্য মাথা পিছু, একজন সাধারণ জার্মান নাগরিকের তুলনায় চারগুণ বেশি রেশন পেত। আরও এমন অনেক জিনিসের বরাদ্দ ছিল যা কখনো সাধারণ লোক কল্পনাও করতে পারতো না। এক বছরের জন্য যে টাকাটা মঞ্জুর করা হতো—সেই টাকাটা সম্পূর্ণ বোসের হাতে দিয়ে দেওয়া হতো। আর কখনো ফিন্যান্স ডিপার্টমেণ্টের দরজায় হাঁটাহাঁটি করতে না হয় সেই ব্যবস্থা করেছিলেন ফুয়েরার। সব—সব কিছুর ব্যবস্থা হয়েছিল ঘড়ির কাঁটার মত নির্ভুল নিয়মে।

সুভাষ বোস জার্মানীর বিভিন্ন পল্লীতে জনপদে ইণ্ডিয়া কলোনীর খোঁজে ঘুরতে লাগলেন। যেখানে কোন ভারতীয়ের ভেতরে প্রাণের সম্ভাবনা দেখেছেন——তাকেই তিনি ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টারে নিয়ে এসেছেন। ১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসের শেষে অফিসে, এবং রেডিওতে সর্বসাকুল্যে ত্রিশজন কাজ করতেন। এঁদের ভেতরে লেডি টাইপিস্ট ছিলেন আর অন্যান্য অনেক লোক ছিলেন।

টাইগার্টেন। বর্লিনের অভিজাত অঞ্চল। সেদিন এখানে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রদূতদের ভবন সারি সারি দাঁড়িয়ে ছিল। এইখানেই ছিল পরাধীন ভারতের মুক্তিকামী আন্দোলনের পীঠস্থান—ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টার। এই সময় নেতাজীর সঙ্গে ছিলেন তাঁর দীর্ঘদিনের সহচর ফ্রলিন চেঙ্কাল। ১৯৩৪ সালে সুভাষ বোস ভিয়েনায় ছিলেন। এই সময় 'ইণ্ডিয়ান

১৯৪২ সালের ১৪ই জুন, বার্লিনে নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে ইণ্টারন্যাশনাল প্রেস ক্লাবে সম্বর্ধনা জানানো হয়। নেতাজীকে সম্বর্ধনার উত্তরে ভাষণ দিতে দেখা যাচ্ছে।

স্ট্রাগল' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে ক্রলিন খুবই সাহায্য করেছিলেন।

একজন বিদেশী—সেই একনায়কত্বের জার্মানীতে গিয়ে ভারতের সম্বন্ধে উদাসীন দেশের মানুষদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সেখানে স্বাধীনতা আন্দোলনের যে এই অভূতপূর্ব কাজ করেছিলেন—সেকথা কল্পনাই করা যায় না।

১৯৪১ সালের ২রা নভেম্বর ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টারের সাধারণ সভা হলো। এই সভায় সভ্যরা নেতাজীকে তাঁদের আনুগত্য, গোপনতা, নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে কাজের অঙ্গীকার করলেন। আর চারটি যুগান্তকারী প্রস্তাব করেছিলেন নেতাজী। খব সংক্ষেপে ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টারের উদ্দেশ্য যে পরাধীন ভারতের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি—সেকথা বুঝিয়ে দিলেন। আর বললেন চারটি প্রস্তাব। চারটি কথা—

(ক) জয়হিন্দ।

(খ) নেতাজী—জাতীয় নেতার নামকরণ।

(গ) জনগণমন—জাতীয় সঙ্গীত।

(ঘ) হিন্দুস্থানী—জাতীয় ভাষা।

'জয়হিন্দ' শব্দটি বার্লিনের মাটিতেই প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল। মানে কি—ভারত জয়যুক্ত হোক। ভারতের মুক্তি আন্দোলনের সৈনিকদের মনে এই কথাটাই আগুনের মত জ্বালিয়ে রাখার জন্যই নেতাজী রচনা করেছিলেন—জয়হিন্দ! পরস্পরের প্রতি শুভেচ্ছার বাণী হিসেবে এই জয়হিন্দ ব্যবহার হতো। আজও হয়।

বহু বিচিত্র জাতি। বহু বিচিত্র তার সংস্কার। অনেক রকম ধর্ম, অনেক রকম ধ্যান-ধারণা। এখানে কেউ বলে নমস্কার। কেউ বলে সালাম—কেউ বলে নমস্তে—কেউ বলে জয়গোপাল, আবার কেউ বলে রাম—রাম!

নেতাজী ভেবেছিলেন, বহুর ভেতরে ঐক্য আনতে পারবে, জয়হিন্দ। জয়হিন্দই হবে ভারতের জাতীয় শুভেচ্ছার বাণী। তাঁর কল্পনার সার্থকতা আজও আসমুদ্র-হিমাচলের মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হচ্ছে।

জয়হিন্দের আরও সার্থকতার কথা বলেছিলেন তিনি। জাতি হিসেবে একমাত্র ভারত ছাড়া পৃথিবীর আর সব জাতির এক প্রাণ, এক ভাষা, এক বেশবাস। আর এখানে বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। বহুরকম বেশবাস, বিচিত্ররকম ধ্যান-ধারণা। বাজারে-পথে-ঘাটে হয়েতো কেউ বলছে—সালাম আলেকুম—তার পাশেই আবার কেউ বলছে—নমস্তে। একথা কানে শুনলেই স্বভাবত মনে হয়, আমরা বুঝি পরস্পর বিচ্ছিন্ন দুটো ভিন্ন-ভিন্ন দেশের অধিবাসী। আমাদের চিন্তাধারা—আমাদের জীবনযাত্রা বুঝি সম্পূর্ণ আলাদা। এই বেদনাদায়ক পার্থক্য সেই বিদেশের

ঘাটিতে শুধু অপরাধ নয়—এতবড় একটা মহৎ কারণে যারা ভারতের পতাকার নীচে এসে দাঁড়িয়েছে—তাদের মনোবল ভেঙে দেওয়ার পক্ষেও যথেষ্ট। তাই 'জয়ের' সঙ্গে 'হিন্দ্' কথাটা বলতে আদেশ দিয়েছিলেন। অন্তত—তারা যে একই দেশের মানুষ—তারা যে ভারতীয়—এই কথাটাই তাদের মনে সর্বদা সোনার লেখার মত জলজল করত। আর—

নেতাজী। কেমন করে সৃষ্টি হয়েছিল এই প্রিয় নাম। আমাদের দেশে গুণীকে সম্মান করার জন্য বহু রকমের পদবী আছে যেমন, 'মহাত্মা', 'সর্দার', 'পীর', গুরুজী। কিন্তু বার্লিনের পরিবেশে, ভারত থেকে শত শত মাইল দূরে সুভাষ বোসের মত একজন প্রখর ব্যক্তিত্বশালী, জাতীয় নেতাকে 'মহাত্মা' বললে কেমন যেন মানায় না। পীর—সুভাষচন্দ্রও হতে পারেন না। এক বিশেষ সম্প্রদায়ের গুণী-ধার্মিক মানুষের উপাধি হয় পীর। আর 'সর্দার' কথাটার ভেতরে কেমন যেন 'লাঠি লাঠি' একটা গন্ধ আছে। একটু শ্রুতিকটু—একটু কর্কশ শোনায়। 'গুরুজী' তো হতেই পারে না। সুভাষ বোসের মত একজন সংস্কারমুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীর মানুষ কখনো গুরুবাদকে সমর্থন করতে পারেন না। তাই—

শুধু নেতা। লীডার। 'নেতাজী'। এই নাম সাব্যস্ত হলো। সুভাষ বোস আর আপত্তি করলেন না। জাতীয় সঙ্গীত নিয়েও যথেষ্ট ভেবে 'জনগণমন'কে ঠিক করেছিলেন। এই গানের ভেতরে ভারতের প্রতিটি প্রদেশের নাম আছে। এর ভেতরে আছে ভাতবর্ষের অপরূপ এক ছবি।

১৯৪২ সালে হামবুর্গে ইন্দো-জার্মান কালচারাল সোসাইটির সভায়, পরিপূর্ণ ঐকতানসহ 'জনগণমন' সঙ্গীত হয়েছিল। এই যুগান্তকারী ইতিহাস-বিখ্যাত সভার সেই জাতীয় সঙ্গীতের গ্রামোফোন রেকর্ড আজও বাজারে পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়। এই সভাতেই জার্মানীর মুক্ত বাতাসে পৃথিবীর অন্যান্য স্বাধীন জাতির পতাকার সঙ্গে ভারতের আত্মার মূর্ত প্রতীক তার ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকাও বাতাসে পত্ পত্ করে উড়ছিল।

এই সভায় হামবুর্গের মেয়র স্বীকার করেছিলেন, ভারতের মুক্তি আন্দোলনের জন্য সর্ববিধ সাহায্য করবেন। এই শপথ—এই অঙ্গীকার করেছিলেন ১৯৪২ সালের ২৯শে মে। এই সভায় মেয়র বলেছিলেন, অদূর ভবিষ্যতে আমরা ভারতকে স্বাধীন দেশ হিসেবে দেখতে পাবো। হলোও তাই—

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হলো বৃটিশ। জার্মানীতে, জাপানে, ফরমোসায় ভারতের জাতীয় আন্দোলনের যে আগুন ছড়িয়ে দিয়েছিলেন—তাতেই বৃটিশ বুঝতে পেরেছিল—আর বেশিদিন থাকা চলবে না।

এই সূত্রে মহাত্মা গান্ধীর একটি ঐতিহাসিক বক্তৃতাও স্মরণীয়। তিনি বলেছিলেন, সুভাষচন্দ্রের এই আই-এন-এ মুভমেণ্ট ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন একশো বছর এগিয়ে দিয়েছে। আমাদের স্বাধীন দেশের মুক্তির আন্দোলনকে জলন্ত প্রেরণা দিয়েছিল----

এখানে আরও একটা প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য। জার্মানীতে অধ্যয়নরত একজন পারসী ছাত্র। তিনি পড়তেন ইঞ্জিনীয়ারিং। এ্যাকাউণ্টেন্সী কি বুক কিপিং-এর কিছুই তিনি জানতেন না। শুধু মনের জোরে এবং চারিত্রিক নিষ্ঠায় তিনি ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টারের যাবতীয় হিসাব কিতাব ঠিক করে রাখতেন। ১৯৪১ সালের সুরু থেকে ১৯৪৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত অদ্ভুত নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি এই কাজ করতেন।

নেতাজী জার্মান সরকারের সাহায্যের অর্থের একটিও যেন অপচয় না হয়, তার দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখতেন। আর এই পাবলিক ফাণ্ড নিয়ে বহু বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয় বলেই এই তরুণ পারসীর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মর্তব্য। আজ পর্যন্ত কোথাও কেউ বলতে পারবে না, ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টার কি আজাদ হিন্দ রেডিওর একটি পয়সা অযথা অপব্যয় হয়েছে।

আজাদ হিন্দ রেডিও। এই রেডিও ব্রডকাস্টিং ছিল নেতাজীর প্রধান কাজ। এই কাজে তাঁকে সাহায্য করতেন জার্মান মহিলা স্টেনো-টাইপিস্ট। তাঁরা ইংরাজী জানতেন। জানতেন জার্মানী আর কণ্টিনেণ্টাল অন্যান্য ভাষা। ক্ষিপ্রহস্তে অদ্ভুত নিপুণতার সঙ্গে রেডিও প্রোগ্রাম টাইপ করতেন তাঁরা।

এই রেডিওর সাহায্য পেয়ে নেতাজীর খুব সুবিধা হয়েছিল। সেই সুদূর বিদেশ থেকে তাঁর দেশবাসীকে নিজের মনের কথা, নিজের কার্যক্রমের কথা কিছুই জানানোর সুযোগ ছিল না।

তিনি উঁচুদরের লেখক। ভাষা ছিল আবেগপ্রধান। কাব্যময়। উদ্দীপক। তিনি সুদক্ষ বক্তা। তাঁর মত বাগ্মিতাশক্তি যে কোন দেশে আজও বিরল। রেডিও পেয়ে আশার আলো দেখতে পেলেন।

প্রত্যেকদিন নির্দিষ্ট সময়ে মাইক্রোফোনের সামনে এসে দাঁড়াতেন নেতাজী। প্রশস্ত ললাটে তারুণ্যের অগ্নিলেখা জল-জল করতো। দু চোখের দৃষ্টি হয়ে উঠতো সুদূরপ্রসারী। তিনি যেন অন্তরের ভেতরে অনুভব করতেন, বহু—বহুদূরের নিজের মাতৃভূমিতে তাঁরই বক্তৃতার জন্য প্রতীক্ষারত লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃদু গুঞ্জন। তিনি অন্তর মেলে ধরে জ্বালাময়ী ভাষায় বলে যেতেন—ভারতের সেই আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দিনের কথা।

অনেক—অনেক দূরদেশ থেকে বাতাসে ইথারের ভেতর দিয়ে তাঁর যে বাণী এদেশে এসে পৌঁছোতো—তা যেন আগুনের ফুলকির মত ছড়িয়ে পড়তো চারিদিকে। সেসব নিশীথকালীন রোমাঞ্চকর দিনের গোপন-বাণীর কথা পাঠকরা জানেন।

জার্মান সরকারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে ইণ্ডিয়ান রেডিও প্রোগ্রাম 'আজাদ হিন্দ রেডিও' নামে একটি বিশেষ ও স্বতন্ত্র 'ওয়েভ' লেংথে বাতাসে তরঙ্গায়িত করা হতো। নেতাজীর বিশেষ লক্ষ্য ছিল, কিছুতেই যেন তাঁর প্রোগ্রাম জার্মান ব্রডকাস্টিং প্রোগ্রামের সঙ্গে মিশে না যায়।

এই আজাদ হিন্দ্ রেডিওতে শুধু উচ্চশিক্ষিত ভারতীয় যুবকরা নেতাজীকে সহায়তা করতেন। তাঁরা পৃথিবীর অন্যান্য রেডিও স্টেশন থেকে ভারতের স্বার্থে জড়িত সংবাদগুলো আহরণ করে দ্রুতহাতে অনুবাদ করতেন। এই সংবাদের ওপর ভিত্তি করে তাঁদের ও নেতাজীর রেডিও বক্তৃতার খসড়া প্রস্তুত করতেন। শুধু যে অনুবাদ, তা নয়। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় ভাষান্তরিতও করতে হতো। রেডিওতে নেতাজীর বক্তৃতার পর, সুদূরপ্রাচ্যের বিভিন্ন রেডিও স্টেশনে সেই বক্তৃতাকে ব্রডকাস্ট করতেন তাঁরা। একটা অদ্ভুত ছবি ভেসে ওঠে চোখের সামনে: জার্মানীর কোন জনবিরল, নির্জন অঞ্চলে কয়েকটি ভারতীয় নাগরিক কানে হেডফোন হাতে পেন্সিল নিয়ে অহরহ সংবাদ শুনছেন। আর ভাষান্তরিত করছেন। আমাদের দেশের মুক্তির জন্য, স্বাধীনতা আন্দোলনকে সার্থক করার জন্য সেই দূরদেশে তাঁরা করছেন রাত্রির তপস্যা। সময় নেই। আরাম-বিরাম নেই। সবসময় তাঁরা ব্যস্ত। সবসময় সূর্যমুখী ফুলের মত—ভারতের স্বাধীনতা এই স্থির লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে তাঁদের জীবনচক্র আবর্তিত হচ্ছে।

জার্মানীর ফরেন অফিসে শুধু আজাদ হিন্দ্ রেডিওর প্রতিদিনের প্রোগ্রামটা দাখিল করতে হতো। সেই ঘনঘোর দুর্যোগের দিনে যখন জার্মানীতে হিটলারকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র বাতাসে সাপের ফোঁস-ফোঁসানির মত শোনা যাচ্ছিল, সেই সঙ্কটের দিনেও জার্মান সরকার কখনো আজাদ হিন্দ্ রেডিওর কোন প্রোগ্রামের ওপরে সেন্সারের কাঁচি চালায় নি।

● আজাদ হিন্দ ফৌজের মুখপত্রের প্রচ্ছদপট

বিদেশের মাটিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য এতবড় ত্যাগ স্বীকার আর কোন দেশ করেছে কি না জানা নেই। জানা যায় নি, নেতাজীর মত আর কোন নেতা এতদূরে বিদেশে গিয়ে স্বদেশের মুক্তির জন্য এইরকম অভূতপূর্ব আন্দোলন করেছিলেন কি না।

'আজাদ হিন্দ ফৌজ স্ট্যাণ্ডার্ডের' (কাগজ) ওপরে একটি ছবি ছাপা হয়েছিল। ছবি নয়, প্রচ্ছদপট। একটি বাঘ শিকারীর ওপরে হিংস্র থাবা মেলে লাফিয়ে পড়ছে। নিচে ক্যাপশান আছে—স্প্রিংগিং টাইগার। নেতাজীকে যদি এই শিকারী বাঘের বিশেষণ দেওয়া যায়—তাও মনে হয় অপ্রতুল। যদি বলা যায় 'পথের দাবী'র সব্যসাচী। তাও মনে হয়—হলো না।

তাই হয়। মহতের, বিরাটের কোন বিশেষণ নেই। ভাষা—বাংলা ভাষার অপর্যাপ্ত ভাণ্ডারকে মনে হয় দীন। বার্লিনে নেতাজীর অভূতপূর্ব কর্মসংস্থা আর কার্যক্রম যে-কোন পরাধীন দেশের মুক্তি আন্দোলনের নেতাকে চিরকাল ধ্রুবতারার মত পথ-নির্দেশ দেবে—দেবে প্রেরণা।

অশান্ত ভারত ঃ সুভাষচন্দ্র

বীরেন্দ্র মিত্র

আরও একটি বৎসর অতিক্রান্ত গেল। আরও একটি সুভাষ-বৎসর।

বৃটিশ শার্দুল-শাসিত ভারতবর্ষের প্রথম অশান্ত যুবকটি আজ আমাদের মধ্যে সশরীরে উপস্থিত নেই। কিন্তু তাঁর আজীবনের স্বপ্ন সফল হয়েছে। সাগরপারের শ্বেত বণিকরা আজ আর শাসক নন, নির্দয় শোষক নন; আজ স্বাধীন ভারতের সঙ্গে তাঁদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক, সৌহার্দ্য বন্ধুত্বের সম্পর্ক। মানুষের সঙ্গে মানুষের এই গরিমাময় বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপনার জন্য আজীবন বিনিদ্র বিদ্রোহী ছিলেন সুভাষচন্দ্র। এই অনিবার্য সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য একটি মুহূর্তের শৈথিল্যও সহ্য করতে পারেন নি তিনি। মানুষে মানুষে বিদ্বেষ বিভেদের অসমতাকে তাঁর শুভ-ইচ্ছায় প্রচণ্ড তরঙ্গভঙ্গে সমতল করার জন্য মহাসমুদ্রের উদ্বেলতা নিয়ে সুভাষচন্দ্র ভারতের অসম তটভূমিতে আছড়ে পড়তে চেয়েছেন বার বার। এবং সুভাষচন্দ্রের সুবিশাল তরঙ্গায়িত রূপে চকিত উচ্চকিত হয়েছে চতুর্দেশ; তাঁর সুললিত কল্লোল-ধ্বনিতে প্রকম্পিত হয়েছে বৃটিশ তখৎ-ই-তাউস।

সুভাষচন্দ্রের ওপর, সুতরাং শ্বেত-শত্রুতা যত প্রচণ্ড ছিল ভারতের আর কোনোও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির প্রতি তেমনটি ছিল না। কেন না অন্যত্র প্রতাপ ছিল, সুভাষচন্দ্রের প্রচণ্ডতা ছিল না। অন্যত্র পদক্ষেপ ছিল শান্ত, ধীরগামী; সুভাষচন্দ্রের অভিযান বিদ্যুদগর্ভ। অর্থাৎ সুভাষচন্দ্র ছিলেন বৃটিশ সাম্রাজ্যের বুকে ভয়াবহ অপ্রতিরোধ্য অশনি-সংকেত।

২৩শে জানুয়ারী ভারতের সেই চির অশান্ত যুবক চিরকাল আপোষ মীমাংসা-বিরোধী ভারত-গর্ব নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পুণ্য আবির্ভাব দিবস; যে দিনটিতে ফিরে ফিরে অশান্তি-বিক্ষুব্ধ অতীত ভারতকে মনে পড়ে; মনে পড়ে নির্ভীক স্বার্থলেশ চিন্তাশূন্য, কেবল মাত্র দেশপ্রেমে জীবনোৎসর্গীকৃত ভারত-সন্তানদের যথার্থ নেতাজীর ভারত-সঙ্কটমুক্তির জন্য উদাত্ত আহ্বানসমূহের কথা; এবং তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার সঙ্গে পা মেলাতে অক্ষম আর একদল দেশ-কর্মীর সুভাষবাদের প্রতি বিরোধিতার প্রসঙ্গ।

নেতাজীর মত ও পথ অভ্রান্ত কি না এ প্রশ্ন তর্কসাপেক্ষ; কিন্তু আসন্ন মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে সুভাষ-চন্দ্রের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার সত্যতা অনস্বীকার্য। ভারতবর্ষ যখন আসন্ন মহাযুদ্ধের সুযোগ গ্রহণে প্রস্তুত নয়; সুভাষচন্দ্র তখন যুদ্ধের পটভূমিকায় ভারতের নিশ্চিত মুক্তিকে মানসচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তার জন্য সমস্ত রকম ঐতিহাসিক প্রস্তুতিও চালিয়ে যাচ্ছেন।

আজ ভাবলে অবাক লাগে, ৩০শের দশকে যখন মহাত্মাজীর মহান নেতৃত্বে ভারতের বরেণ্য নেতৃবর্গ ভারত-মুক্তির পথে ধৈর্যশীল পদক্ষেপ করছেন, সুভাষচন্দ্র সেদিন অসীম সাহসী রাজনৈতিক প্রত্যয়ে সেই মহান নেতৃত্বের উল্টো পথে সম্পূর্ণ একক নেতৃত্বে ভারত-মুক্তির সন্ধানে অগ্নি-সাধনা করেছেন। সেদিন জাতীয় কংগ্রেস দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিল। সুভাষ-

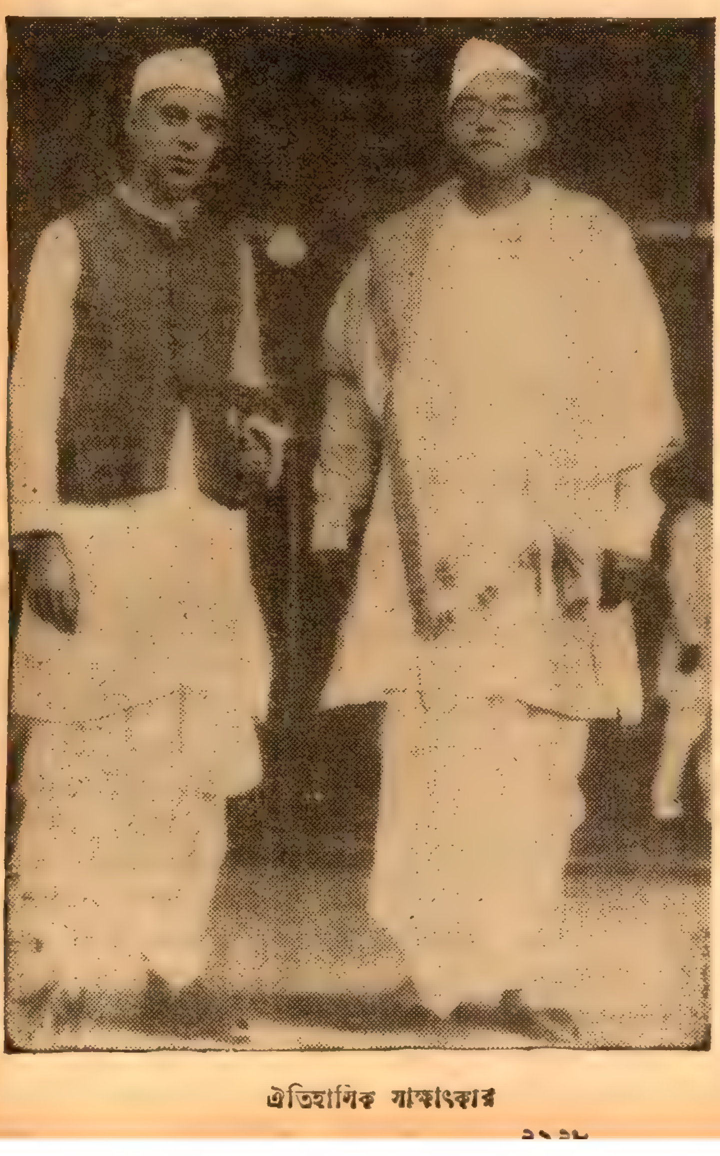

ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার

চন্দ্রের নেতৃত্বে বাম ও গান্ধীজীর নেতৃত্বে আপোষবাদী দক্ষিণী চিন্তার বিরোধ রাষ্ট্রপতি (জাতীয় কংগ্রেস সভাপতি) নির্বাচনের ক্ষেত্রে পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। নির্ভীক সুভাষচন্দ্র তাঁর বিশ্বাসে তিলমাত্র দ্বিধান্বিত হন নি। জীবনে দ্বিধার অস্তিত্বকে সুভাষচন্দ্র এবং নেতাজী সুভাষ কখনো স্বীকার করেন নি।

১৯৩১—এই সেই প্রচণ্ড স্থির-প্রত্যয় প্রতিবাদ ভারতের দিগদিগন্তে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট অনুসারে সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হওয়ায় সুভাষচন্দ্র তীব্র প্রতিবাদ করলেন। করাচীতে সভা-পতিত্ব করলেন নিখিল ভারত নও-জোয়ান সভার মঞ্চে। অচিরেই ইংরেজ সরকার আবার জেলে পুরলেন অশান্ত ভারতকে। জেলেই সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে এবং তিনি য়ুরোপে স্বাস্থ্যোদ্ধারে যাওয়ার অনুমতি পান। সুভাষচন্দ্রের জীবনে নতুন রাজনৈতিক সুযোগ এনে দিল এই য়ুরোপ-প্রবাস। য়ুরোপে য়ুরো-ভারত সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য দূরদর্শী রাজনীতিক প্রচেষ্টা সুরু করলেন তিনি, যার ভবিষ্যৎ মূল্য সম্পর্কে ভারতবাসী তখনও কোনো গুরুত্ব আরোপ করে নি। ১৯৩৬-এ দুর্দমনীয় সুভাষচন্দ্র ভারতে প্রত্যাবর্তন করার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সরকার পুনরায় গ্রেপ্তার করলেন তাঁকে। সরকারী আচরণে ভারতব্যাপী প্রতি-বাদের উত্তরে সরকারী মুখপাত্র সেদিন একটি চরম সত্য কথা বলেছিলেন,—'a man with Subhas Bose's intellect and powers of organitayion would be a danger to any stape,' আমরা জানি এবং আমাদের গর্বে বুক ভরে ওঠে একথা ভাবলে যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র একদিন অক্ষরে অক্ষরে ইংরেজের এই আশঙ্কার বাস্তবরূপ হয়ে উঠেছিলেন। নেতাজী পরিচালিত ভারতীয় জাতীয়বাহিনী বা ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি সায়ুধ যুদ্ধে ইংরেজকে ভারতের মাটি থেকে কিছুদূর হটিয়ে দিয়েছিল এবং নেতাজীর ভরসা বাণীর প্রভাবে সারা ভারতে বিপ্লবের দাবানল প্রজ্বলিত হয়েছিল।

কিন্তু ভারতবর্ষ সুভাষচন্দ্রের প্রচণ্ড উত্তাপকে সহ্য করতে পারে নি। ১৯৩৮ সালে সর্বসম্মতিক্রমে অতি অল্প বয়সে তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁর অনুগামীর সংখ্যা তখন কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের উগ্র পন্থা অহিংস গান্ধীজী ও গান্ধীবাদীরা মেনে নিতে পারেন নি। বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল কংগ্রেসের মধ্যেই। আজীবন বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র ইংরেজের সঙ্গে যে কোন রকম আপোষরফায় তীব্র বিরোধিতা করেছেন চিরদিন। কংগ্রেস সভাপতি হিসেবেও তিনি চরমপন্থা পরিহার করতে রাজী হলেন না। জনসাধারণকে তিনি জাতীয় সংগ্রামে প্রস্তুত হওয়ার জন্য আহ্বান জানালেন। নেতৃবর্গকে বোঝাতে চাইলেন পশ্চিম দিগন্তে মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি চলেছে, যে করেই হোক ভারতকে এ সুযোগ গ্রহণ করতেই হবে। বিদেশী শোষককে ঘায়েল করার স্বর্ণমুহূর্ত উপস্থিত। কিন্তু কেউ তাঁর কথায় কর্ণপাত করলেন না। করলে মন্ত্রিত্ব এবং আইনসভার কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হত; অহিংসার রাজপথ থেকে সংগ্রামের কাণাগলিতে প্রবেশ করতে হত শান্তিপ্রিয় ভারতবাসীকে। তবুও অশান্তিকে এড়ান যায় নি, বিপ্লবকে রোখা যায় নি, সুভাষচন্দ্রকে আটক করে রাখা যায় নি, অনিশ্চিত অপেক্ষার রাত্রি গণনার জন্য। ভারতে '৪২-এর বিপ্লবে ইংরেজের সাঁজোয়া গাড়ি পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়েছে; ভারতীয় সেনাদলে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। ভারতবাসীর শতাব্দীব্যাপী ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছে এবং ভারতের বাইরে নেতাজী স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার গঠন করেছেন।

গান্ধীপন্থীদের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯৩৯-এ সুভাষচন্দ্র যখন দ্বিতীয়বারের জন্য কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে জয়যুক্ত হলেন সুভাষ-অনুগামীয় শক্তি তখনই প্রমাণিত হয়েছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন একক নেতা। চরমপন্থায় সেজন্য পুরোপুরি ঝাঁপিয়ে পড়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। তিনি সভাপতির পদে ইস্তফা দিয়ে বেরিয়ে এসেছেন, নিজের মনোমত দল গঠন করেছেন—ফরওয়ার্ড ব্লক।

ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন, যে স্বাধীনতার সিংহদ্বার উন্মোচনে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অবদান ইতিহাসে অম্লান চির-উজ্জ্বল থাকবে; সেই স্বাধীন ভারতের অন্যতম কর্ণধার হিসেবে আমরা নেতাজীকে আমাদের মধ্যে পেলাম না, এই বেদনা এই দুঃখের কোন প্রকাশ কোন ভাষা ব্যক্ত করার ক্ষমতা রাখে না। আমরা শুধু জানি নেতাজী ভারতবর্ষকে যেভাবে রূপ দিতে চেয়েছিলেন আমরা তার অতি সামান্যই গ্রহণ করতে পেরেছি।

নেতাজীই সম্ভবত সর্বপ্রথম কংগ্রেস সভাপতি, যিনি দেশে শিল্প-পরিকল্পনার প্রস্তাব তুলেছিলেন। আজ জাতির জীবনে শিল্পোন্নয়ন অনিবার্য বলে মনে করা হচ্ছে। ৩০শের দশকে কিন্তু চিন্তাধারা ভিন্ন রূপ ছিল। এবং সেজন্যই তাঁকে বলতে হয়েছিল, 'to solve the economic problem, agricultural improvement will not be enough. A comprehensive scheme of industrial development under state-ownership and state's control will be indispensible. However much we may dislike industriali-

sation and condemn the evils which follow in it's train, we cannot go back to the pre-industrial era even if we desire to do so.---অর্থাৎ জাতির আর্থিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র কৃষির উন্নতিই যথেষ্ট নয়। চাই শিল্পোন্নয়ন। রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত শিল্পোন্নয়নের সেই চিন্তা আজ আমরা রূপায়িত করতে চলেছি। বিজ্ঞানের সহায়তায় ভারতব্যাপী কৃষি ও শিল্পোন্নয়নের অভিযান আমরা সার্থকভাবে শুরু করে দিয়েছি, যার আহ্বান আমরা সুভাষচন্দ্রের কাছেই প্রথম পেয়েছিলাম। কিন্তু সুভাষচন্দ্র যখন ১৯৩৮ সালে শিল্পপ্রসার ও জাতীয় উন্নয়নের নিমিত্ত একটি সর্বাত্মক পরিকল্পনা রচনার জন্য জাতীয় পরিকল্পনা কমিটীর প্রতিষ্ঠা করেন তখন সমুচিত সাড়া পান নি। এজন্য 'মুক্তি সংগ্রাম' গ্রন্থে সুভাষচন্দ্র অন্তরের দুঃখ প্রকাশ করেছেন। শুধু শিল্পোন্নয়নই নয়, সমাজবাদী সমাজ গঠনের কথাও তিনি তখনই উল্লেখ করেন। বলেন,—'if after the capture of political power, national reconstruction takes place on socialistic lines—as I have no doubt it will, it is the 'have-nots' will benefit at the expense of the 'haves'----'

জাতীয় ভাষার ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন হিন্দী ও উর্দুর সংমিশ্রণে রোমান হরফে লিখিত একটি ভাষাকে। তাঁর মতে হিন্দী ও উর্দুর মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য যৎসামান্য এবং ভারতের অধিকাংশ লোকই যেখানে নিরক্ষর সেখানে হরফ হিসেবে রোমান হরফ গ্রহণ করার নতুন কোনো অসুবিধার প্রশ্ন ওঠে না। অথচ ঐ হরফে আন্তর্জাতিক ভাব বিনিময়ের পথে আমরা অধিকতর সুবিধাভোগী হতে পারি। বলা বাহুল্য, ইদানীং ভাষা-তর্কের ক্ষেত্রে রোমান হরফের যৌক্তিকতা অনেক পণ্ডিতব্যক্তিই স্বীকার করেছেন। ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি উদারপন্থী ছিলেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ ও ঔদার্য সুবিদিত। কিন্তু তাঁর অখণ্ড ভারত এবং সর্বধর্ম-সম্প্রদায়ের ঐক্যের স্বপ্ন আমরা সফল করে তুলতে পারি নি। ভারতবর্ষের অঙ্গচ্ছেদ হয়েছে। ভারত পাকিস্তানের বৈরিভাব আজও কোনো মীমাংসায় স্থির হল না। অথচ নেতাজীর আজাদ-হিন্দ ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকাতলে ধর্ম-সম্প্রদায়ের বিভেদ ভুলে একত্র সমবেত হয়ে এক অভিন্ন দেশমাতৃকার জন্য বুকের রক্ত উৎসর্গ করেছিল। সত্যই, এমন একজন মহান সংগঠককে যে কোনো রাষ্ট্রই ভীতির চক্ষে দেখতে বাধ্য, যদি সে রাষ্ট্র ভারতের সঙ্গে শত্রু-ভাবাপন্ন হয়। ইংরেজ সেই ভয়ই পেয়েছিল। ইংরেজ জানত সেই অশান্ত দুর্দমনীয় ভারত-সন্তানটির মধ্যে একই সঙ্গে একটি স্থিরপ্রজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞ অটল অবিচলিতভাবে বসবাস করেন।

এই অশান্ত ছেলেটিকে কোনোভাবেই রোখা যায় নি। দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাই তাঁকে শান্ত করতে পারেন নি, বিদেশী ইংরেজ কেমন করে তা পারবেন। অহিংসার চিলেঢালাভাবে তিনি অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। মহাযুদ্ধের ঝড় উঠছে, সুভাষচন্দ্র এ সময়ে কেমন করে স্থির হয়ে ঘরে বসে থাকেন। ডাক আসছে জয়যাত্রার। সুভাষচন্দ্র ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের সমস্ত বিধিনিষেধ, পাহারা, বন্দোবস্ত অস্বীকার করে একরাত্রে নেতাজী ভবন থেকে সোজা মোটরযোগে বর্ধমান এবং সেখান থেকে পাঞ্জাব মেলে একেবারে পাঞ্জাবে এক রোমাঞ্চকর পাড়ি জমালেন। উদ্দেশ্য বিদেশে গিয়ে সৈন্য বাইরে থেকে ভারতে প্রবেশ করবেন।

সে দিন (১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৪০?) ভারতের মাটিতে স্বাধীন মুক্ত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবেন এই সঙ্কল্প নিয়ে ভারতের দামাল ছেলে, পৃথিবীর বিস্ময় সুভাষচন্দ্র ভারতমাতার কাছে বিদায় নিয়েছিলেন। সারা দুনিয়া যখন যুদ্ধে প্রস্তুত, তখন বৃটিশ ভারত থেকে বৃটিশ-শত্রু জার্মানী ও সেখান থেকে সাবমেরিন যোগে টোকিওয় উপস্থিত হওয়া এক অপ্রত্যাশিত সাফল্য। কিন্তু নেতাজী সুভাষ সেই ঐশ্বরিক শক্তির অংশ ছিলেন, যা ছিল তাঁর ধর্ম। অকুতোভয় নেতাজী সুভাষ যখন পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয়দের একত্র করে বিদেশী বর্বরতার মোকাবিলা করবার জন্য প্রস্তুত তখনও আমরা তাঁর সম্পর্কে নানা বিভ্রান্তি-মূলক প্রচার শুনেছিলাম। রাজনৈতিক কূটনীতির দ্বারা স্বার্থান্বেষীরা ভেবে-ছিলেন নেতাজীর প্রতি ভারতবাসীকে অবিশ্বাসী করে তুলবেন। আমরা কিন্তু সে ধাপ্পাবাজীতে ভুলি নি। ইংরেজের গোয়েন্দাকে ফাঁকি দিয়ে উৎকর্ণ ভারত সেদিন বেতার মারফৎ বহুদূর থেকে ভেসে আসা ভারতের বীর সন্তান অস্থায়ী স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রনেতার বাণী শুনেছে।

২৬শে জানুয়ারী, ১৯৪১ সালের সেই ঐতিহাসিক দিবসে নেতাজী সারা দুনিয়াকে তথা ভারতকে সশস্ত্র জাতীয় বাহিনীর পুণ্য জন্মক্ষণের সংবাদ জানিয়ে ছিলেন। ভারতবর্ষ তখন উদ্বেলিত চিত্তে স্মরণ করেছিল মান্দালয় জেল থেকে লেখা তাঁর একটি লিপির বক্তব্য,—'যেদিন প্রস্তুত হব, সেদিন এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে কেহ আটকে রাখতে পারবে না।'

পারে নি। ভারতের প্রথম বৃটিশ শৃঙ্খলমুক্ত স্বাধীন সৈন্যাধ্যক্ষকে বাঁধবার মতো শিকল সারা দুনিয়ায় প্রস্তুত ছিল না। বরং নেতাজী-প্রতিষ্ঠিত

অস্থায়ী সরকারকে অভিনন্দিত করে তৎকালীন ইংরেজ বিরোধী রাষ্ট্র-নেতারা নেতাজীর কাছে বাণী পাঠিয়েছেন। ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধে সহযোগিতা করতে এগিয়ে এসেছেন জার্মান, ইতালী, জাপান, স্পেন, শ্যাম, আয়র্লণ্ড।

পরাস্ত ইংরেজ সেদিন নেতাজীকে জাপানের এজেণ্ট, ফ্যাসিস্ট একনায়ক-রূপে চিত্রিত করেছিলেন, যে সংবাদ ভারত-সিংহ নেতাজী বিদেশে বসেই পেয়েছেন। তাই তাঁর প্রথম বক্তৃতায় নেতাজী টোকিও থেকে জানালেন,— 'পাখীদের মধ্যে কাক সবচেয়ে ধূর্ত ও নিষ্ঠুর, পশুদের মধ্যে শৃগাল এবং মানুষের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ জাত। এই বৃটিশ যদি আমাকে প্রলোভিত করতে না পেরে থাকে, তাহলে জগতে আর কোন শক্তি নেই যে তা পারে।' প্রকৃতপক্ষে কেউ তা পারেন নি। জাপানের কাছে তিনি স্বাধীন রাষ্ট্র-নায়কের পূর্ণ মর্যাদা আদায় করে নিয়েছিলেন। শুধু তাই নয় প্রবাসী ভারতীয়দের জন্যও স্বাধীন নাগরিকের ইজ্জৎ প্রতিষ্ঠিত করিয়ে নেন। অতবড় একটা যুদ্ধ পরিচালনার জন্য অর্থ ও রসদ তিনি দেশপ্রেমিক ভারতীয়দের কাছেই সংগ্রহ করেন। তাঁর মর্মস্পর্শী বক্তৃতার পর এক একদিনে লক্ষ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়েছে। রাষ্ট্রনায়ক নেতাজীর সেই অভূতপূর্ব জয় বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত করেছিল।

জয়তু নেতাজী! তোমার বিজয় অভিযান ভারতের বড় গর্ব, সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের বস্তু। তোমার বলিষ্ঠ তেজোদীপ্ত জ্যোতি থেকে আমরা যুগে যুগে দীপ জ্বালিয়ে নেব। তুমি যত দূরেই থাক, তোমার তেজ-বীর্যের উত্তাপে আমরা তোমার স্বপ্ন তোমার আজন্ম সাধনা ভারতের স্বাধীনতাকে চির অক্ষয় করে রাখব, গঠন করব বৈভব-শালিনী ভারতবর্ষকে। তোমার বীরত্ব আমাদের যে কোনো শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে সর্বদা প্রস্তুত রাখবে, তোমার অভয়বাণী তোমার আশীর্বাদ আমাদের সমস্ত সঙ্কটমুহূর্তে অতিক্রমে নেতৃত্ব দেবে। আমরা জানি তুমি আমাদের মধ্যেই আছ। ভারতের প্রতিটি যুবক জানুক নিপ্পনের মাটি ত্যাগ করার আগে তুমি আজাদ-হিন্দ ফৌজের টোকিও ক্যাডেটের কাছে যে পত্র লেখো, সে-পত্র ভারতের প্রতিটি যুবকের কাছেই তোমার স্নেহসিক্ত বাণী। হে অশান্ত যুবক! আজ তোমার সেই বাণী স্মরণ করে তোমার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই—

তুমি লিখেছিলে,

আমার প্রিয় পুত্রগণ,

নিপ্পনের মাটি ত্যাগ করার আগে আমি তোমাদের ভালোবাসা ও তোমাদের কার্যে সফলতার জন্যে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।—

যাবার আগে তোমাদের সঙ্গে দেখা না করতে পারায় আমি দুঃখিত। কিন্তু তোমরা জেনো, আত্মার মধ্য দিয়ে সর্বদাই আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। ভগবান তোমাদের আশীর্বাদ করুন। জয় হিন্দ।

জয়তু নেতাজী। তুমিও আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর, অন্তরের ভালোবাসা নাও।

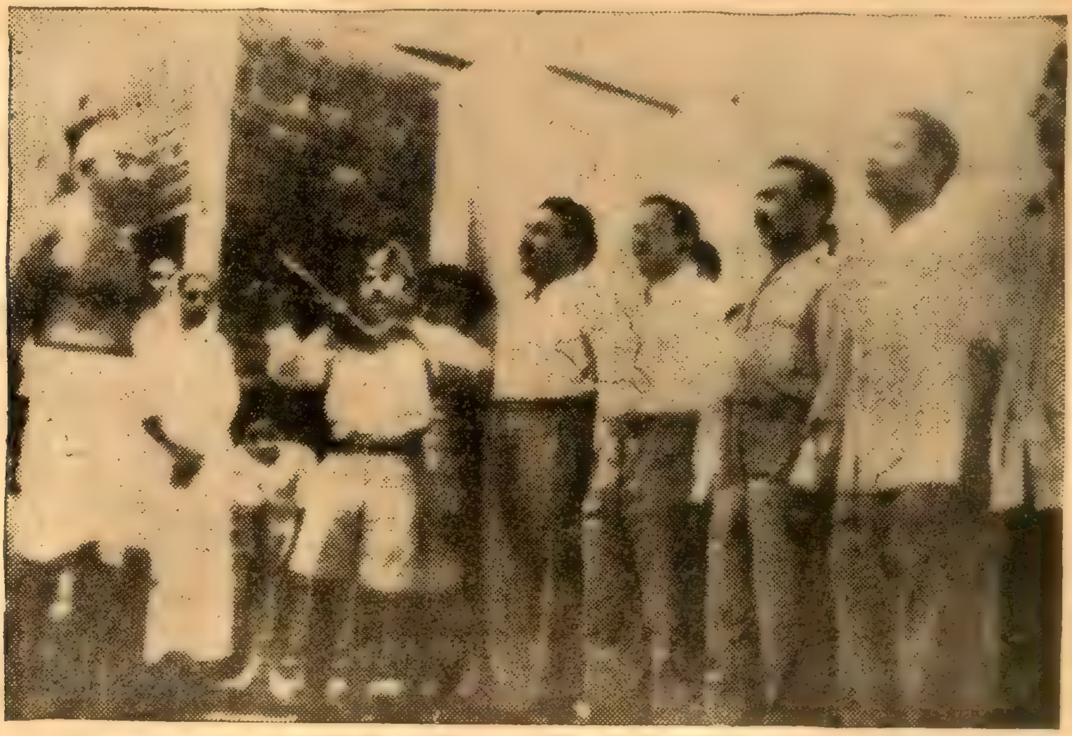

● আজাদ হিন্দ সেনানীদের সঙ্গে গান্ধীজী

নেতাজী ও বর্তমান যুগসংকট

নির্মল বসু

ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর অবদান বিরাট। মুক্তি-সংগ্রামের অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন তিনি। স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রধান সংস্থা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি, বিদ্রোহী সংগঠন ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি, নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি, নওজোয়ান ভারত সভার সভাপতি প্রভৃতি পদাধিকারী সুভাষচন্দ্র ভারতের গণ-আন্দোলন পরিচালনা করেছেন এবং তার সার্থক নেতৃত্ব দিয়েছেন। বামপন্থী আন্দোলনের নেতা-রূপে তিনি আপোষহীন সংগ্রাম গড়ে তুলেছেন। আজাদ হিন্দ ফৌজ ও সরকারের সর্বাধিনায়করূপে নেতাজী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন এবং ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তিকে সম্ভব করেছেন। সুতরাং ভারত থেকে বিদেশী শাসন উচ্ছেদের ক্ষেত্রে নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, এ সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

স্বাধীনতার পর নবভারত গঠনেও নেতাজীর প্রভাব লক্ষ্যণীয়। নেতাজী বারে বারে বলেছেন, স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে দেশকে গড়ে তুলতে হবে। ভারতের জনসাধারণ আজ স্পষ্টতই সমাজতন্ত্রাভিমুখী। সরকারকেও জনমতের চাপে সমাজতন্ত্রের নীতি কিছু কিছু গ্রহণ করতে হচ্ছে। লেনিনের নেতৃত্বে সোভিয়েট ইউনিয়নে যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সুরু হয়েছিল, সুভাষচন্দ্র তার দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতেও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রবর্তন চেয়েছিলেন। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটী গঠন করে তিনিই ভারতে পরিকল্পনার গোড়া পত্তন করেন। আজ ভারতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়ণের চেষ্টা চলছে।

স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রধান সেনাপতি

ও নবভারতের পথিকৃৎরূপে নেতাজী ইতিহাসে চিরপূজ্য হবেন। কিন্তু নেতাজীর সবচেয়ে বড় অবদান খুঁজতে হবে অন্যত্র।

সুভাষচন্দ্র এক অতি সংকটময় সময়ে ভারতের রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন। ইতিহাসে সব দেশেই ধারে ধারে যুগসন্ধি আসে। বিরাট সংকটের আবর্তে পড়ে দেশবাসী পথ হারিয়ে ফেলে। তখন এমন একজন বিরাট পুরুষের আবির্ভাব ঘটে, যিনি দেশবাসীকে মুক্তির পথ দেখাতে পারেন।

সুভাষচন্দ্র যখন ভারতের রাজনীতিতে এসেছেন, তখন স্বাধীনতার দাবি যথেষ্ট জোরদার হয়েছে। নানান বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের ফলে দেশবাসীর মনে দোলা লেগেছে। বিভিন্ন গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা-আন্দোলনে ব্যাপ্তিও এসেছে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে স্বরাজসাধনা আপামর জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু স্বাধীনতার যৌক্তিকতা স্বীকৃত হলেও, কিংবা ব্যাপক গণ-সংযোগ স্থাপিত হলেও, আন্দোলনের কোন ধার ছিল না। তীক্ষ্ণ তরবারির যে ধার, সেই ধারের অভাবে স্বাধীনতা-আন্দোলন নিজের পথ করে স্বচ্ছন্দ গতিতে এগোতে পারছিল না।

ক্ষুদিরাম-কানাইলালদের বিপ্লব-প্রচেষ্টার তীব্রতা ও সর্বস্বপণের উন্মাদনা, মুষ্টিমেয়ের মধ্যে আবদ্ধ ছিল —লক্ষ-কোটি জনতার মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ে নি। সুভাষচন্দ্র এই কাজটি করলেন। তিনি দেখেছেন, সাধারণ মানুষ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় এগিয়ে এসেছে। কিন্তু তারা দুর্বার সংগ্রামের সংকল্প নিয়ে, সর্বস্বপণ করে শত্রুর সঙ্গে সম্মুখসমরে এগিয়ে আসছে না। তাদের গতি স্তিমিত। এই সাধারণ মানুষের মধ্যে উন্মাদনাসৃষ্টির কাজে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিনি নিজে সর্বপ্রকার বিপদে এগিয়ে এলেন, দেশবাসীর সম্মুখে সংগ্রামী কর্মপন্থা তুলে ধরলেন এবং এই কাজের জন্য তিনি বিশেষভাবে নির্ভর করলেন ছাত্র ও যুবসমাজের ওপর। আসমুদ্রহিমাচল পরিভ্রমণ করে তিনি তরুণসমাজকে আহ্বান জানালেন। আন্দোলনের গণ-বুনিয়াদ পাকা করার জন্য তিনি শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনের ওপরও জোর দিলেন। এই ভাবে তরুণ নেতৃত্বে জঙ্গী কর্মপন্থার ভিত্তিতে সারা দেশে এক নতুন শক্তির আবির্ভাব হল—এই শক্তিই হল আপোষহীন, বামপন্থী, সমাজতন্ত্রী শক্তি। সুভাষচন্দ্র নিজে তো বটেই, জওহরলাল নেহরু, এমন কি ভারতের সমাজতন্ত্রী, সাম্যবাদী, শ্রমিক আন্দোলন—সবই এই ধারায় পুষ্ট।

কোনরূপ দ্বিধা বা জড়তা নয়, অবিচলিত নিষ্ঠার সঙ্গে সংগ্রামের পথে অগ্রসর হতে হবে। শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম হবে কঠোর ও কঠিন। যে কোন মূল্যে স্বাধীনতা চাই। দেশ ও দশের জন্য এই সংগ্রামে সর্বস্বপণ করে নামতে হবে। লক্ষ লক্ষ তরুণের মনে সুভাষচন্দ্র এই ভাব সৃষ্টি করেছেন, এবং তাঁরা দৃঢ়পদক্ষেপে স্বাধীনতা-সংগ্রামে অগ্রসর হয়েছেন। যাঁরা সুভাষচন্দ্রের মত মানেন নি, তাঁদের পথকেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে সুভাষচন্দ্রের এই আপোষহীন সংগ্রামের কর্মধারা।

একই সঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। মাঝে মাঝে পুরোনো নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার প্রয়োজন হয়। মহৎ নেতৃত্বও অনেক সময় স্থবির হয়ে পড়ে এবং নতুন পথে অগ্রসর হতে পারে না। তখন পুরোনো পথ পরিহার করে, প্রয়োজন হলে তার বিরোধিতা করেও নতুন পথে এগোতে হয়। কিন্তু ব্যক্তিত্বের দ্বারা আচ্ছন্ন ও নানা গতানুগতিকতার দ্বারা আবদ্ধ ব্যক্তিদের পক্ষে এই নেতৃত্ব দান প্রায়শই অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু যখন এরূপ নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটে, তখনই হয় যুগান্তর। সুভাষচন্দ্র এই যুগান্তর এনেছেন।

গান্ধী-নেতৃত্বের বিরাট ও মহান অবদান সত্ত্বেও যখন নতুন পথনির্দেশে তা ব্যর্থ হচ্ছিল, তখন সুভাষচন্দ্র সাহসের সঙ্গে, দৃঢ় পদক্ষেপে পুরোনো দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নতুন নেতৃত্বের সূচনা করলেন। ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসে এই বিদ্রোহের মহা-অভ্যুত্থান। গান্ধীজী যখন ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস ও নরম আন্দোলনের পথ নিয়ে থেমে থাকতে চাইলেন, তখন সুভাষচন্দ্র পূর্ণ স্বরাজ ও জঙ্গী গণ-আন্দোলনের পথে অগ্রসর হবার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান জানালেন। পরবর্তী তেরো বৎসর গান্ধী-সুভাষ বিরোধ প্রাচীন নেতৃত্ব ও গতানুগতিক পথের সঙ্গে নতুন নেতৃত্ব ও নতুন পথের সংঘর্ষ।

পুরোনো নেতৃত্বের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেও কিভাবে তার বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে বিদ্রোহ করা যায়, সুভাষচন্দ্র তা প্রমাণ করে গেছেন। মহাত্মা গান্ধীর রাজনীতির তিনি তীব্র বিরোধিতা করেছেন, এবং এই বিরোধিতার ফলে ভারতের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু জাতির জনকের প্রতি মুহূর্তের জন্যও তিনি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন নি।

॥ দুই ॥

ভারতের বর্তমান অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর দেশগঠনের কাজ বিরাটভাবে সুরু হয়েছে। কল-কারখানা, রাস্তা-ঘাট, ঘর-বাড়ি প্রচুর হচ্ছে। কিন্তু সব কিছুই যেন কৃত্রিম, প্রাণের স্পর্শ নেই কোথাও। স্বাধীনতা-আন্দোলনের দিনে কর্মীদের মধ্যে যে কর্মোন্মাদনা, নিষ্ঠা ও সততা দেখা গিয়েছিল, নবভারত গঠনের ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত। এর ফলে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ প্রভৃতি নানা অনাচারে দেশ ছেয়ে গেছে। সর্বত্র এমন একটা আদর্শহীনতা ও কর্মবিমুখতার ভাব যে, ভাল কাজ করার চেষ্টাও যেমন নেই, অন্যায় অত্যাচারের

বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার উৎসাহও তেমনি নেই। উন্নয়নের নানা ক্ষেত্রে যে সব কাজ হচ্ছে, সবই হয় বেতন গ্রহণ বা প্রমোশনের জন্য, অথবা বাহবা পাবার জন্য—বৃত পালনের নিষ্ঠা তার মধ্যে নেই।

অসৎ ব্যক্তিদের কারসাজিতে মূল্য-বৃদ্ধিজনিত সংকট আজ চরম আকার ধারণ করেছে। অন্যবিধ সমস্যাও আছে। মানুষের নাভিশ্বাস ওঠার মত অবস্থা হয়েছে। এই অন্যায়ের প্রতিবাদের জন্য যে বিপুল কর্মপ্রচেষ্টা প্রয়োজন, বিরোধী রাজনৈতিক কর্মী বা সাধারণ মানুষের মধ্যে আজ তা ভয়ঙ্করভাবে অনুপস্থিত। স্বাধীনতা-আন্দোলনের দিনের কিছু পুরোনো রাজনৈতিক কর্মী এখনও নিষ্ঠার সঙ্গে অন্যায়ের প্রতিবাদে অবিচলিতভাবে অগ্রসর হবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে সাধারণ মানুষ অগ্রসর হয় না—তাই তাঁদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

রাজনীতিক্ষেত্রে কোনরূপ আদর্শ আজ নেই। স্বাধীনতা পূর্বকালে বিদেশী-শাসন উচ্ছেদের আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা দেশবাসীর মনে যে আদর্শবাদ সৃষ্টি করেছিল, স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীনতার পর তা অন্তর্হিত হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে দেশগঠন বৃত, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, কিংবা বিপ্লবসাধন, এমন কোন আদর্শের আগুন আমরা বহুসংখ্যক কর্মী বা জনসাধারণের মধ্যে জ্বালাতে পারি নি। আর এই শূন্যতা থেকেই এসেছে সর্ববিধ সংকট।

একদিন এরূপ আর এক আদর্শ-হীনতার হাত থেকে সুভাষচন্দ্র দেশকে রক্ষা করেছিলেন। ১৯২৯ সালে সুভাষচন্দ্র পাবনা যুব সম্মিলনীর সভাপতির ভাষণে যা বলেছিলেন, এই প্রসঙ্গে তা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলছেন:

'আজ ভারতের এই হীন অবস্থা কেন? আছে তো সবই—প্রকৃতি, সৌন্দর্য, শারীরিক বল, শিক্ষা, দীক্ষা, শৌর্য, বীর্য, বিদ্যা, বুদ্ধি, এর কোনটির তো অভাব নাই; এ সব উপাদান লইয়া আমরা এক নিখুঁত মূর্তি রচনা করিতে পারি। কিন্তু প্রাণ প্রতিষ্ঠার আয়োজন কোথায়? প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইবে সেই দিন—যেদিন সমগ্র জাতির মধ্যে মুক্তিলাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইবে। কোথায় সে পুরোহিত, যে মৃতসঞ্জীবনী সুধা আহরণ করিয়া মুমূর্ষু জাতির দেহ-পিঞ্জরের মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে? যে ব্যক্তি মুক্তির আস্বাদ পাইয়াছে, মুক্ত হইবার জন্য এবং জাতিকে মুক্ত করিবার জন্য যে ব্যক্তি পাগল হইয়াছে, সে ব্যক্তি অপরকে পাগল করিতে পারে এবং সেই ব্যক্তি জাতীয় যজ্ঞের পুরোহিত হইবার যোগ্য। আমাদের এই যুব-আন্দোলন এইরূপ শত-সহস্র পুরোহিত সৃষ্টি করুক

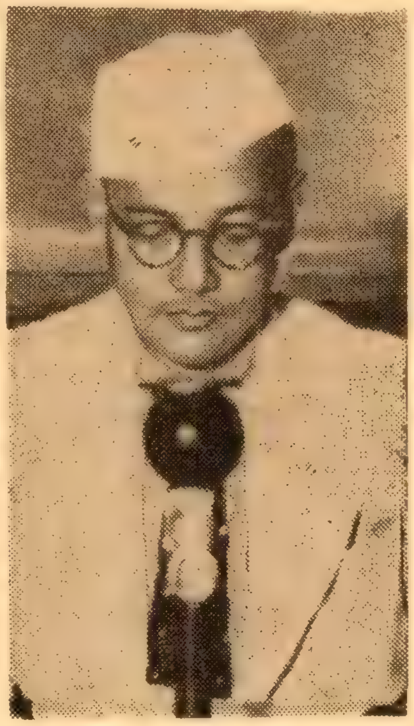

আমাদের আছে সবই, নাই শুধু এক বস্তু—নিঃশেষে আত্মবলিদান—সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, যাবতীয় বিপদ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া একটা আদর্শের পশ্চাতে সারাটি জীবন অনুধাবনের ক্ষমতা। এই ক্ষমতা, এই tenacity of purpose আমাদের নাই, ইংরাজের আছে—তাই ইংরাজ এত বড়, আর আমরা এত হীন। আমরা অন্তরের সঙ্গে দেশকে ভালবাসি না, স্বজাতিকে ভালবাসি না, তাই আমরা করি—গৃহবিবাদ, তাই আমাদের মধ্যে জন্মায় মিরজাফর উমিচাঁদ। মিরজাফর ও উমিচাঁদ আজও মরে নাই—এখনও তাহাদের বংশবৃদ্ধি হইতেছে। আমরা যদি দেশকে ভালবাসিতে শিখি তাহা হইলে আত্মবলিদানের ক্ষমতা লাভ করিব, আমাদের চরিত্রে অবিরাম ও অশ্রান্ত পরিশ্রমের ক্ষমতা tenacity of purpose ফিরিয়া আসিবে। এই দুইটি বল tenacity of purpose বা moral stamena কোথায় পাইব? বনে জঙ্গলে যুগ যুগান্তর তপস্যা করিলেও পাইব না। পাইব নিষ্কাম কর্মের মধ্যে জীবন ঢালিয়া দিলে—অবিরাম সংগ্রামে লিপ্ত হইলে।'

সুভাষচন্দ্রের আহ্বানে সেদিন দেশের তরুণসমাজ সাড়া দিয়েছিল—'স্বাধীনতার মদ্যপানে' তারা নেশায় পাগল হয়ে কর্মযজ্ঞে ঝাঁপ দিয়েছিল। তাই ভারত স্বাধীন হয়েছে। আজ সুভাষচন্দ্র আমাদের সম্মুখে উপস্থিত নেই, কিন্তু তরুণসমাজ আছে, তাদের মধ্যে যদি 'নিষ্কাম কর্মের, অবিরাম সংগ্রামের' আদর্শ স্থান পায়, তাদের মধ্য থেকে যদি কর্মযজ্ঞের 'শত-সহস্র পুরোহিত সৃষ্টি হয়, তবেই আজকের এই রাজনৈতিক বন্ধ্যাত্বের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

দেশের বর্তমান পরিবর্তিত অবস্থায় পুরোনো নেতৃত্ব ও পুরোনো কর্মসূচী আর চলছে না। কর্মীরাও উৎসাহ পাচ্ছে না, সাধারণ মানুষের কোন আস্থা নেই এর ওপর। পুরোনো নেতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মধারায় সম্পূর্ণ নতুন আর এক নেতৃত্বের জন্য দেশ সাগ্রহে অপেক্ষা করে আছে।

বাংলা তথা ভারতের ছাত্র ও যুব সম্প্রদায় আজ সমাজের অন্যান্য অংশের মতই বিভ্রান্ত, দিশেহারা ও আদর্শহীন। তবু ভরসা তারাই। তাদের মধ্য থেকেই আদর্শবাদ ও নতুন নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটতে পারে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবন আজও যুব-সমাজকে আকর্ষণ করে, তাঁর বীরত্ব, কর্মোন্মাদনা ও জ্বলন্ত আদর্শবাদ তাদের অনুপ্রাণিত করে। নেতাজীর জীবন ও কর্মসাধনার অনুশীলনের ফলে যুবসমাজের মনে আদর্শবাদের দীপশিখা প্রজ্বলিত হোক, নেতাজী জন্মদিবসের এই কামনা।

মালয়েশিয়া ঃ

ইন্দোনেশিয়ার সম্ভাব্য আক্রমণের হাত থেকে মালয়েশিয়াকে রক্ষা করার জন্য বৃটেন সর্বপ্রকারে চেষ্টা করছে। লণ্ডনে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন ঘোষণা করেছেন, মালয়েশিয়ায় বৃটেন ৫০ হাজার সৈন্য সমাবেশ করেছে। হংকং থেকে গুর্খা সৈন্যরাও সিঙ্গাপুরে এসে উপস্থিত হয়েছে।

বৃটিশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী ফ্রেড মূলে এক সপ্তাহ ধরে মালয়েশিয়া সফর করেছেন। সফর শেষে সীমান্ত শহর কুচুং থেকে এক বেতার-ভাষণে মূলে বলেছেন, মালয়েশিয়াকে রক্ষা করার জন্য বৃটেন কোন চেষ্টার ত্রুটি করবে না।

অপর দিকে ইন্দোনেশিয়াও মালয়েশিয়া সীমান্তে তার সৈন্য-সংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে। ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ সুবান্দ্রিও ঘোষণা করেছেন, ইন্দোনেশিয়ার সৈন্য অবতরণ বন্ধ করা হবে না, কারণ উত্তর কালিমান্তানের (উত্তর বোর্নিও) অধিবাসীরা ইন্দোনেশিয়ার এই সাহায্য চায়।

ইন্দোনেশিয়া কি সত্যি সত্যি মালয়েশিয়াকে আক্রমণ করবে? জাকার্তায় রাষ্ট্রপতি সোয়েকার্নোকে এই প্রশ্ন করা হলে তিনি সরাসরি জবাব দেন—'না'। সোয়েকার্নো বলেছেন, কোনরূপ যুদ্ধ করা তাঁর ইচ্ছা নয়। তবে কেউ ইন্দোনেশিয়াকে আক্রমণ করলে তাঁরা চুপ করে থাকবেন না। কিন্তু মুশকিল হল, কে কাকে কখন প্রথম আক্রমণ করেছে, সে প্রশ্নের মীমাংসা করবে কে?

তবে সোয়েকার্নোর সুর অনেকটা নরম হয়েছে। তিনি বলেছেন, মালয়েশিয়ার ব্যাপারে তিনি শান্তিপূর্ণ মীমাংসা চান। সাবা ও সারাওয়াক সম্পর্কে আফ্রো-এশীয় গোষ্ঠীর সালিশী এমন কি রাষ্ট্রসঙ্ঘের সালিশীও তিনি মেনে নিতে প্রস্তুত আছেন। অনেকেই আশ্চর্য হয়ে ভাবছেন, এত হাঁকডাক

• দক্ষিণ ভিয়েৎনামের রাজনৈতিক সঙ্কটের সমাধান—সশস্ত্র বাহিনী অসামরিক সরকারের হাতে শাসন কর্তৃত্ব ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত করার পর জেনারেল নেগুয়েন খান (দক্ষিণে) ত্রান ভান হুয়াংয়ের সঙ্গে দলিল বিনিময় করছেন।

করে যে সোয়েকার্নো রাষ্ট্রসঙ্ঘ ত্যাগ করলেন, তিনি এখন আবার রাষ্ট্রসঙ্ঘ সালিশের কথা বলছেন কেন? মনে হয়, ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রসঙ্ঘ ত্যাগ চীন ও তার ২।৩টি তাঁবেদার রাষ্ট্র ছাড়া আর কেউ সমর্থন না করায় সোয়েকার্নো একটু মুষড়ে পড়েছেন। আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্রগুলির প্রায় কেউই তাঁর এই বাহাদুরীতে চমৎকৃত হয়ে বাহবা দেয় নি। তাই সোয়েকার্নো আফ্রিকায় তাঁর বক্তব্য বোঝাবার জন্য ইন্দোনেশিয়ার সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে পাঠাচ্ছেন। আর, রাষ্ট্রসঙ্ঘ সম্পর্কে নরম সুরে কথা বলে

• ডাঃ সুবান্দ্রিও

প্রস্তাব করেছেন, রাষ্ট্রসঙ্ঘের মধ্যস্থতা মানতে তিনি প্রস্তুত আছেন।

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী টুঙ্কু আবদুল রহমান অবশ্য স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, সোয়েকার্নোর সঙ্গে কোন রকম আলোচনা করতে তিনি প্রস্তুত নন। পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বুঝেছেন, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার লোক সোয়েকার্নো নন। ইন্দোনেশিয়া যখন রাষ্ট্রসঙ্ঘে ছিল, তখনই কোন কথা শোনে নি, আর এখন তো রাষ্ট্র-সঙ্ঘের বাইরে—এখন তাকে কে নিয়ন্ত্রণ করবে?

রাষ্ট্রসঙ্ঘ বা আফ্রো-এশীয় গোষ্ঠীর চেষ্টায় মালয়েশিয়ার প্রশ্নে কোন আপোষ-মীমাংসার চেষ্টা না হলে এই অঞ্চলে যুদ্ধের উত্তেজনা বেড়েই চলবে। বৃটেন তার প্রতিশ্রুতি মত সৈন্য-সংখ্যা বাড়িয়েই চলেছে, যুদ্ধ-জাহাজ ও বিমান আসছে ক্রমাগত। অপরদিকে ইন্দোনেশিয়ার সৈন্য-সমাবেশও বাড়ছে। এর পরিণতি কি?

সোভিয়েট ইউনিয়ন ঃ

শাসন ক্ষমতা থেকে অপসারিত হবার পর নিকিতা ক্রুশ্চেভ কি করছেন, কি ভাবে আছেন, এই নিয়ে সর্বত্রই

বিশেষ ঔৎসুক্য ছিল। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নের ভেতর থেকে খবর বের করা তো সহজ নয়। শেষ পর্যন্ত ইউনাইটেড প্রেস ইণ্টারন্যাশনালের হেনরী স্যাপিরো ক্রুশ্চেভ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য সংবাদ পরিবেশন করতে সক্ষম হয়েছেন। স্যাপিরো গত ৩১ বৎসর ধরে সাফল্যের সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের খবর সংগ্রহ করে আসছেন, সুতরাং তাঁর খবর বিশ্বাস করা যায়।

প্রধানমন্ত্রিত্ব ও দলের নেতৃত্বপদ গেলেও ক্রুশ্চেভ বেশ বহাল তবিয়তেই আছেন। সোভিয়েট ইউনিয়নের বর্তমান রাষ্ট্রনেতারাও তাঁর প্রতি কোন অসৌজন্য প্রকাশ করেন নি। শেষ বয়সে অবসর জীবন যাতে তিনি ভালভাবে কাটাতে পারেন, তার জন্য সরকারী ব্যবস্থার কোন ত্রুটি নেই।

মস্কো শহর থেকে ২৫ মাইল দূরে মস্কো নদীর তীরে পাইন বনের মধ্যে এক সুদৃশ্য সরকারী বাড়ি (ডাচা) 'উসোভো'তে বর্তমানে ক্রুশ্চেভ সস্ত্রীক বাস করছেন। সরকার থেকে ক্রুশ্চেভকে মাসিক ৩৩৩ ডলার পেনসন দেয়া হচ্ছে—সোভিয়েট ইউনিয়নে বিশিষ্ট নাগরিকদের জন্য বরাদ্দ পেনসনের সর্বাধিক পরিমাণ হল এই। ক্রুশ্চেভের স্ত্রীর জন্যও মাসিক পেনসন দেয়া হচ্ছে ১৩৩ ডলার (সাধারণ নাগরিকের জন্য সর্বাধিক পেনসন); বিনা ভাড়ায় সরকারী ভবন 'উসোভো' ব্যবহার ভিন্ন, সরকারী অর্থে ক্রুশ্চেভের জন্য ৫ জন ভৃত্য এবং একজন চালকসহ একটি সুদৃশ্য চাইকা লাইমোসিন গাড়িও দেয়া হয়েছে। তা ছাড়া মস্কো শহরে লেনিন হিলসে ক্রুশ্চেভের জন্য একটি বাড়ি বরাদ্দ করা হয়েছে।

মস্কো শহরের বাড়িটি এখনও ব্যবহার না করলেও ক্রুশ্চেভ উসোভোতে যথারীতি বাস করছেন। শিকার ও কৃষিকাজে তিনি এখন সময় কাটাচ্ছেন। ক্রুশ্চেভ নিজের পছন্দমত যে কোন ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে পারেন। এ সম্পর্কে কোন কড়াকড়ি নেই।

ক্রুশ্চেভের পরিজনবর্গের প্রতিও সোভিয়েট নেতারা কিছুটা সদয় ব্যবহার করেছেন দেখা যাচ্ছে। ক্রুশ্চেভের জামাই আলেক্সি আজুবেইকে 'ইজভেস্তিয়া' সম্পাদক পদ থেকে অপসারিত করা হলেও, আর একটি সচিত্র মাসিক পত্রিকার সহকারী-সম্পাদক পদে তাঁকে নিয়োগ করা হয়েছে। ক্রুশ্চেভের নাতনী উলিয়াকেও একটি সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানে চাকরী দেয়া হয়েছে। (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য,

• ক্রুশ্চেভ

লিওনিদ ব্রেজনেভের মেয়ে নিলাও সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের কর্মী)।

সকল ক্ষমতা থেকে চ্যুত হলেও ক্রুশ্চেভ যাতে শান্তিতে জীবন কাটাতে পারেন, সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতারা সেই চেষ্টা করেছেন, এই সব ব্যবস্থা থেকে তাই প্রমাণ হয়। অবশ্য যিনি ক্ষমতা হারিয়েছেন, এতে তাঁর কোন সান্ত্বনা নেই। কিন্তু স্ট্যালিন আমলের থেকে যে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। স্ট্যালিনের আমল হলে, ক্রুশ্চেভের গলা কাটা যেত, অথবা দূর সাইবেরিয়ায় বন্দী-জীবন কাটাতে হত।

তবে ক্রুশ্চেভ ব্রেজনেভ কোসিগিনদের ওপর নাকি খুবই চটে আছেন। তাঁর সহকর্মীরা তাঁকে অকৃতজ্ঞের মত ক্ষমতা থেকে অপসারণ করবে, এ নাকি তিনি ভাবতেই পারেন নি। রাগের চোটে তিনি এখন কারও সঙ্গে দেখাই করছেন না—নিজের ঘনিষ্ঠ ক'জন বন্ধু ও আত্মীয় ছাড়া। বিদেশী কমিউনিস্ট প্রতিনিধিদের সঙ্গেও তিনি দেখা করতে অস্বীকার করেছেন।

দক্ষিণ ভিয়েৎনাম :

প্রধানমন্ত্রী ত্রান ভান হুয়াং ও সামরিক অফিসারদের সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেনারেল ম্যাক্সওয়েল টেলর একটা মীমাংসায় উপনীত হলেও, দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বিদ্রোহী ছাত্রসমাজ ও বৌদ্ধ ধর্মনেতারা এতে খুশি হন নি। বর্তমান সরকারের অপসারণই তাঁদের লক্ষ্য।

মধ্য ভিয়েৎনামের বিভিন্ন অঞ্চলে ছাত্ররা ব্যাপক বিদ্রোহ করেছে। ঘটনার বিবরণে দেখা যায়, দক্ষিণ ভিয়েৎনামের পুরোনো রাজধানী হিউ শহর সম্পূর্ণভাবে বিদ্রোহীদের দখলে চলে যায়। পুলিশ, সৈন্য সব কিছু ছাত্রদের কর্তৃত্বাধীন হয়ে পড়ে। সায়গনের সঙ্গে সাময়িক ভাবে হিউ-এর সকল সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

ছাত্ররা অবশ্যই কেবল নিজেদের জোরে এভাবে বিদ্রোহ করতে পারে নি—তাদের পেছনে বৌদ্ধ ধর্মসঙ্ঘের প্রবল সমর্থন ছিল। এই হিউ শহর থেকেই একদিন নগো দিন দিয়েমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সুরু হয়।

হিউ-এর বিদ্রোহ থেমে গেলেও অন্যান্য শহরে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। মার্কিন যুদ্ধঘাঁটি দানাই-এ হাজার হাজার ছাত্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে।

এবার অবশ্য ছাত্র ও বৌদ্ধ-বিক্ষোভের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ত্রান ভান হুয়াংয়ের সরকারকে সমর্থন করেছে।

ত্রান ভান হুয়াং বুঝেছেন, সাধারণ মানুষের সমর্থন ভিন্ন তাঁর পক্ষে শাসন চালানো, অথবা ভিয়েৎ কং-এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করা সম্ভব হবে না। ক্ষমতালোভী বৌদ্ধ ধর্ম-নেতাদের বাদ দিয়ে কিভাবে তিনি জনসমর্থন লাভ করবেন, তাই আজ প্রধান প্রশ্ন।

ম্যাক্সওয়েল টেলারের সঙ্গে ত্রান ভান হুয়াং ও সামরিক নেতাদের আপোষ প্রস্তাব অনুযায়ী 'উচ্চ জাতীয় পরিষদ' পুনঃ প্রতিষ্ঠার কথা আছে। ত্রান ভান হুয়াং কিন্তু পুরোনো জাতীয় পরিষদের পরিবর্তে সরাসরি নির্বাচনের দ্বারা নতুন একটি আইনসভা গঠনের পক্ষপাতী। দেশের বর্তমান বিপজ্জনক অবস্থায় নির্বাচন অনুষ্ঠান করা মুশকিল কিন্তু কোন রকমে নির্বাচন করতে পারলে তবেই একটি শক্তিশালী ও জন সমর্থনপুষ্ট সরকার গঠন সম্ভব— এই হল ত্রান ভান হুয়াংয়ের অভিমত।

ফ্রান্স ঃ

গত মাসে প্যারিসে যখন ন্যাটোর মন্ত্রী বৈঠক হয়, তখন মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিব ডিন রাস্ক ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি চার্লস দ্য গলের সঙ্গে কয়েকবার সাক্ষাৎ করেছিলেন। দ্য গল-রাস্ক সাক্ষাৎকারের ফলে অনেকের ধারণা হয়েছিল, এবার হয়তো ফ্রান্সের মার্কিন বিরোধিতা কমবে। এ রকমও মনে হয়েছিল, ফ্রান্সের বন্ধুত্ব লাভের জন্য সম্ভবত লিনডন বি জনসনও সাময়িকভাবে তাঁর বহুজাতিক পরমাণু বাহিনীর (M L F) প্রস্তাব মুলতুবী রাখবেন।

কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হয়েছে। দ্য গল তাঁর মার্কিন বিরোধিতা দৃঢ়তার সঙ্গে চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। নববর্ষ উপলক্ষে দ্য গল যে বক্তৃতা করেছেন, তাতে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাতব্বরির বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করেছেন।

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মার্কিন কর্তৃত্ব প্রসারের বিরুদ্ধে সবাইকে তিনি সতর্ক করে এরূপ আশংকা প্রকাশ করেন। মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্র ইউরোপকে তার সাম্রাজ্য রূপে গণ্য করতে চায়।

এতদিন দ্য গল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন, উভয়ের কর্তৃত্ব প্রসারের বিরুদ্ধেই বলতেন। কিন্তু এবার তিনি তাঁর বক্তৃতায় সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেন নি। পুরো ঝালটা ঝেড়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর। অপর দিকে চীন ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির সঙ্গে ফ্রান্সের ক্রমবর্ধমান সম্পর্কের কথাও দ্য গল তাঁর বক্তৃতায় উল্লেখ করেছেন।

'ন্যাটো'র প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, এই অভিমত প্রকাশ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে এক নতুন ধরণের আতলান্তিক মৈত্রীর প্রস্তাব করেছেন দ্য গল।

ইউরোপের রাজনীতিতে ফ্রান্সের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য দ্য গল এক দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব হ্রাস এবং অপর দিকে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও অন্যান্য কমিউনিস্ট দেশগুলির সঙ্গে বেশি করে মৈত্রী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবেন।

সুদান ঃ

সামরিক কর্তৃত্বের অবসানের পর থেকেই নতুন মন্ত্রিসভা দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা বলে আসছেন। এখন ঠিক হয়েছে, আগামী মার্চ মাসে এই নির্বাচন হবে। নির্বাচনকে উপলক্ষ করে দেশের প্রধান পাঁচটি রাজনৈতিক দলই তাদের কাজকর্ম সুরু করে দিয়েছে।

তরুণ নেতা ৩৩ বৎসর বয়স্ক সৈয়দ সাদিক আল মেহাদীর নেতৃত্বে প্রভাবশালী উম্মা পার্টি প্রগতিশীল কর্মপন্থা নিয়ে দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত হবার চেষ্টা করছে। দলের পুরোনো নেতা আবদুল্লা খলিলের পাশ্চাত্য ঘেঁষা নীতি সাধারণ কর্মীরা আর সমর্থন করছে না। মেহাদীর নেতৃত্বে উম্মা পার্টি দেশের অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের প্রসার এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে জোট-নিরপেক্ষতা ও আরব লীগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার নীতি নিয়ে অগ্রসর হতে চায়। সাম্যবাদ ও ধনতন্ত্র, উভয় পথ পরিহার করে মেহাদী সুদানকে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে চান।

উম্মা দলের প্রধান বিরোধী হল ইসমাইল আল আজহারির ন্যাশন্যাল ইউনিয়নিস্ট পার্টি। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আজহারি নির্বাচনে জয়ের জন্য বদ্ধপরিকর। 'উম্মা'র চেয়েও প্রগতিশীল ও বিপ্লবাত্মক কর্মসূচী তিনি গ্রহণ করেছেন। তা ছাড়া সুদানের প্রভাবশালী কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে একটা নির্বাচনী আঁতাত করার জন্য তিনি চেষ্টা করছেন।

সুদানের কমিউনিস্ট পার্টি আফ্রিকা ও আরব জগতের বৃহত্তম সাম্যবাদী দল। শ্রমিক সমাজ ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এই দলের বিশেষ প্রাধান্য আছে। বর্তমান যুক্ত মন্ত্রিসভায় পাঁচ জন মন্ত্রী কমিউনিস্ট দলের সমর্থক। আবদুল খালেক মাহজুবের নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ইসমাইল আল আজহারির ন্যাশনাল ইউনিয়নিস্ট পার্টির একটি বোঝাপড়া হলে, এরাই নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করবে বলে অনেকের ধারণা।

হাসান আল তুরাবি পরিচালিত চরম দক্ষিণপন্থী দল 'মুসলিম ব্রাদারহুড' সর্বপ্রকার প্রগতিশীল কর্মসূচীর বিরোধী। বর্তমান মন্ত্রিসভায় এই দলেরও একজন প্রতিনিধি আছেন। 'মুসলিম ব্রাদারহুড' সুদানকে একটি ঐস্লামিক রাষ্ট্ররূপে ঘোষণার পক্ষপাতী।

সৈয়দ আলি আল মিরগানির নেতৃত্বে পরিচালিত পিপলস ডেমোক্রাটিক পার্টির প্রভাব প্রধানত খাতমিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ।

আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক নেতাজী

সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

রেঙ্গুন শহর থেকে কিছু দূরে, জঙ্গল বনের একধারে অনেকগুলো সমতল জায়গা জুড়ে আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর ছাউনি পড়েছে। ঠিক মধ্যখানে একটি ক্যাম্প নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্য নির্দিষ্ট, কিন্তু তখন সেখানে তিনি নেই। ক্যাম্পের দরজায় দুজন শাস্ত্রী পাহারা দিচ্ছে। ক্যাম্পের ঠিক পেছনে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের গোয়েন্দাবিভাগের তাঁবুগুলো এমনভাবে সন্নিবিষ্ট যে, হঠাৎ বুঝবার উপায় নেই সেখানে কোনো অফিস আছে, বা লোকজন খাতাপত্র ফাইল নিয়ে মনোযোগ দিয়ে সংগোপনে কাজকর্ম করছে। সেই বিরাট ছাউনির মধ্যে সেদিন যেন লোকজনের তৎপরতা কিছুটা বেশি মনে হতে লাগল।

তখন সন্ধ্যা হয় হয়—এখনি ফৌজের ডাইনিং-হলে খাবারের ঘণ্টা পড়বে। এমন সময় ছাউনির মাঝখানে যে পাকা রাস্তা ছাউনি ছেড়ে দূরে—বহু দূরে এঁকে-বেঁকে চলে গেছে, সেই রাস্তা দিয়ে একটা weapon Career বা অস্ত্রশস্ত্রবাহী ট্রাক আসছে মনে হল। তার সামনে দুটি সাদা নিশান উড়ছে। দেখলে মনে হয় নিশানগুলো প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনেকটা বড়।

ভারী গলায় (কমাণ্ড) আদেশ শোনা গেল—'সাবধান'—ফৌজের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল; যে যেখানে আছে Position নিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে গেল—সকলেই প্রস্তুত। মনের মধ্যে সকলেরই কৌতূহল জেগে উঠল; কিন্তু আজাদ হিন্দ্ ফৌজের একমাত্র লক্ষ্য ভারতবর্ষের মুক্তি—সেখানে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার কড়া শাসনে আকস্মিক ঘটনাও প্রত্যেকের ধাতস্থ হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে ট্রাকটি একেবারে ছাউনির মাঝখানে এসে দাঁড়াল। সেনাদলের মধ্যে কয়েকজন বড় বড় 'অফিসার' অভিবাদন করে হাত তুলে দাঁড়াল। দেখা গেল তারা নিরস্ত্র।

ততক্ষণে নেতাজী হাসপাতালের সুব্যবস্থা চোখের সামনে পাকাপাকি দেখে নিজের ক্যাম্পে ফিরে এসেছেন।

বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর অফিসার দুটির সঙ্গে আজাদ হিন্দের অফিসারদের কথা হবার পর—নেতাজীর সেক্রেটারীর কাছে টেলিফোন করা হল। তিনি অফিসার দুজনকে নেতাজীর ক্যাম্পে আসবার নির্দেশ দিলেন।

'জয় হিন্দ' বলে নেতাজীর সামনে অফিসার দুজন অভিবাদন করে দাঁড়াল—। নেতাজী প্রত্যভিবাদন করলেন।—ক্যাপ্টেন বলল—'আমরা অনুতপ্ত, বৃটিশ সেনাবাহিনীর আমি একজন ক্যাপ্টেন—ইনিও ক্যাপ্টেন কিন্তু সামরিক হাসপাতালের ডাক্তার। আমরা ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে নিজেদেরকে উৎসর্গ করতে চাই। আপনি আমাদের পূর্ব অপরাধের জন্য ক্ষমা করে যদি আশ্রয় দেন—আমরা কৃতার্থ হই।'

আবার তারা অভিবাদন করে attention হয়ে দাঁড়াল। নেতাজী সুভাষচন্দ্র একবার তাদের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি হেনে মৃদু হেসে বললেন—

'Are you serious?—really repentant of what you have so far done? This is't a child's play here, you won't get what you used to get in the British Army. Hunger, Privation, trials and tribulation are what I can offer you. Are you prepared to accept them? You won't mind them, I belive if you mean what you say.'

অর্থাৎ—একথা কি সত্যি? সত্যিই কি তোমরা যা করেছ তার জন্য অনুতপ্ত? এটা ছেলেখেলা নয়—আগে বৃটিশ বাহিনীতে যেরূপ সুখ-সুবিধা পেয়ে এসেছ—এখানে তা পাবে না। ক্ষুধা, সর্বরকমের ত্যাগ স্বীকার, নানারকম পরীক্ষা, দুঃখ-কষ্ট ছাড়া এখানে অন্য কিছু নেই। প্রস্তুত আছ? যা বলছ তা যদি সত্যি সত্যি হয়—তাহলে আমার বিশ্বাস, এসকলে তোমাদের কিছু এসে যাবে না।

'yes sir'—হাঁ মহাশয়। দুজনেই একসঙ্গে এই কথা বলে সামরিক কায়দায় দাঁড়িয়ে থাকল।

নেতাজী বললেন—'তথাস্তু।'

বৃটিশ সেনাবাহিনীতে তাদের যে পদবী ছিল—তারা তার নিদর্শন দেখাল। 'আমি বলেছিনে' বৃটিশ সৈন্যাধ্যক্ষের স্বাক্ষরিত ঘোষণায় প্রকাশ পেল যে, উক্ত দুজন অফিসার (deserter) দলত্যাগী বিশ্বাসঘাতক (Traitor); তাদের ধরে দিতে পারলে একটা মোটা রকমের পুরস্কারের প্রলোভন দেখান হয়েছে এবং সে কাগজ যে-কোনও ভাবেই হোক আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর দপ্তরে নথিভুক্ত হয়ে গেল।

অফিসার দুজন বৃটিশ সেনাবাহিনী হতে বহু কষ্টে অর্জিত পদবী থেকে বঞ্চিত হল না। সামরিক কাজ-কর্মের যে ভার তাদের ওপর দেওয়া হল তাও দায়িত্বপূর্ণ।

আজাদ হিন্দ সরকারের সর্বাধিনায়ক নেতাজী (ডিসেম্বর ১৯৪৩) আন্দামানে অবতরণ করছেন

কিন্তু গোয়েন্দা বিভাগের কড়া নজর রইল এই দুজন অফিসারের ওপর। নেতাজী নিজে তাদের গতিবিধি সন্দেহের চোখে দেখতেন কি না তা কেউ জানল না—তবে প্রচলিত নিয়ম-কানুন অনুসারে তাদের ওপর কড়া নজর রাখল আজাদ হিন্দ ফৌজের গুপ্ত-পুলিশবিভাগ। এইভাবে পক্ষকাল চলল।

আগে হতে সাক্ষাৎকারের কথা না জানালে এবং অনুমতি না পেলে সর্বাধিনায়কের সঙ্গে দেখা করার রীতি নেই। এ নিয়ম সাধারণ সৈনিক হতে আরম্ভ করে উচ্চপদস্থ সেনানায়কের কারও কাছে অজ্ঞাত নেই। কিন্তু সেদিন তার ব্যতিক্রম ঘটতে দেখা গেল—সেদিন অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় হতে আকাশে অল্প অল্প মেঘ দেখা দিয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যে একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেল।

আজাদ হিন্দ বাহিনীর ছাউনি তখন রেঙ্গুন শহরের উপকণ্ঠে কিছু দিনের মত কায়েমী হয়ে বসেছে।

একটা দোতলা বাড়ির একতলায় সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্রের কেন্দ্রীয় সামরিক দপ্তর—ওপরের তলায় তিনি নিজে থাকেন। একটি সুবৃহৎ হলঘরের দেওয়ালে অসংখ্য মানচিত্র টাঙান,—বিশ-পঁচিশটি কাঠের আলমারী সামরিক বিজ্ঞানের পুস্তকে ভরা। শয়নকক্ষে একটা খাটিয়া, অতি সামান্য বিছানাপত্র; একখানি পোষাক পরবার ঘর। ড্রয়িংরুম বা সাক্ষাৎকারের জন্য নির্দিষ্ট ঘর নিচের তলায়।

নেতাজী তখন চা-পানের পর অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে একটা বই পড়ছিলেন আর মাঝে মাঝে দেওয়ালে টাঙান একটা মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করছিলেন। অতি ভয়ে ভয়ে তাঁর সেক্রেটারী ঘরে প্রবেশ করে দাঁড়ালেন, অন্যমনস্কভাবে একটা সিগারেট ধরিয়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁর দিকে মুখ তুলে চাইলেন।

সেক্রেটারী বললেন—'বৃটিশ সেনাবাহিনী হতে আগত সেই ক্যাপ্টেন দুজন আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান—'

অবিচলিতভাবে নেতাজী উত্তর দিলেন—'এটা ত আমার সাক্ষাৎকারের সময় নয়।'

সেক্রেটারী—'তারা নাছোড়বন্দা—নেতাজীর সঙ্গে তারা দেখা না করে নড়বে না।'

নেতাজী—'তারা কি নিয়ম-কানুন জানে না।'

সেক্রেটারী মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

নেতাজী—'আচ্ছা আমি দেখা করব। তাদের মতলব আমি বুঝেছি। কিন্তু অবিলম্বে এর যবনিকাপাত হওয়া দরকার।'

সেক্রেটারী—'সশস্ত্র শান্ত্রী গুপ্তভাবে অন্তরালে অবস্থান করছে—বসবার ঘরের প্রত্যেক জানালা-দরজার আড়ালে।'

নেতাজী সে কথার কোনও জবাব দিলেন না। ঘরের মধ্যে পায়চারী করে পোষাকের ঘরে গিয়ে আপাদমস্তক সামরিক পোষাকে সজ্জিত হলেন। দুই পকেটে দুটি গুলীভরা রিভলবার নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন।

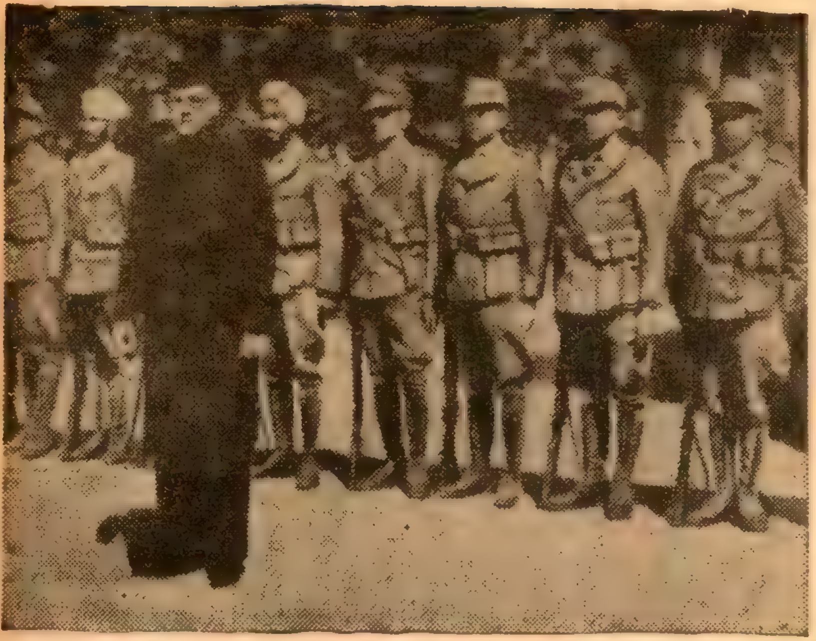

● জার্মানীতে আজাদ হিন্দ সেনা বাহিনীর সঙ্গে নেতাজী

বৃটিশ গভর্নমেণ্টের কদয়ে পুষ্ট অফিসার দুটি যেন সারা ভারতবর্ষের লজ্জা ও কলঙ্কের বোঝা মাথায় করে দাঁড়িয়ে আছে। দূরে দাঁড়িয়ে সেক্রেটারী, একজন গুপ্ত-পুলিশ-অফিসারকে তিনি বলছেন যে, এতদিন তিনি নেতাজীর কাছে কাছে আছেন কিন্তু এমন রুদ্র-মূর্তি কোনদিন তাঁর চোখে পড়ে নি এবং মুহূর্তের মধ্যে তাঁর চেহারার এমন ভয়াবহ পরিবর্তনও কোনদিন তিনি লক্ষ্য করেন নি।

নেতাজী ঘরে প্রবেশ করতে করতে বললেন---Sit down. 'বস'---

তারা অভিবাদন করল---কিন্তু বসল না। নেতাজী একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাদের দিকে চাইতেই তারা চোখ নামিয়ে নিল।

গম্ভীর স্বরে নেতাজী বললেন---'কি বলতে চাও বল?'

---ক্যাপ্টেন বলল---'আপনার সেনাবাহিনীতে যে-ভাবে কাজ-কর্ম চলছে, তাতে মনে হয় আপনারা জাপানের সঙ্গে সহযোগিতা করে তাঁদের কাছে আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে বিলিয়ে দিতে চান।'

সব জেনেশুনেও নেতাজী যেন একথা শুনবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর সারা মুখটিতে কে যেন খানিকটা তাজা রক্ত ছিটিয়ে দিল---মনে হল তার দুটো চোখ হতে রক্তবিন্দু ঝরে পড়ছে। তিনি দৃপ্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন---'তারপর?'

ক্যাপ্টেন বলল---'যে আশা নিয়ে আমরা এখানে এসেছিলাম সে আশা আমাদের ব্যর্থ হয়েছে, তা ছাড়া আপনার গুপ্তচর বিভাগ আমাদের উপর কড়া নজর রেখেছে---লজ্জার কথা!

নেতাজী গম্ভীরভাবে উত্তর করলেন---'তা আমি জানি। কিন্তু তুমি বার-বার তোমার ডানদিকের পকেটে হাত দিচ্ছ কেন? তুমি কি জান না যে সর্বাধিনায়কের সঙ্গে দেখা করার সময় নিরস্ত্র হয়ে আসতে হয়? আগে তোমার পকেটের রিভলবার আমার টেবিলের উপর রাখ---তারপর অন্য কথা।'

ক্যাপ্টেন থতমত খেয়ে গেল।

দুই পকেটের দুটি রিভলবার বের করে সে নেতাজীর সামনে রেখে দিল। তারপর আবার বলল---'কিন্তু আপনার কার্যকলাপ ভারতবর্ষের কল্যাণের পরিপন্থী।'

নেতাজীর কণ্ঠস্বর অতি ধীরে ধীরে গম্ভীর হয়ে এলো, তিনি বললেন---'ওঃ! সেই জন্য কি তোমরা আমায় হত্যা করতে এসেছ? আচ্ছা বেশ, এই নাও আমার নিজের রিভলবার, আমাকে গুলী কর। তোমাদের অভি-সন্ধি আমি সন্দেহ করেছিলাম, কিন্তু যদি শুধরে যাও এই আশায় তোমাদের স্থান দিয়েছিলাম---তার প্রতিশোধ নাও।'

নেতাজীর কণ্ঠে এবার বজ্রগর্জন শোনা গেল---'কাপুরুষ! বিশ্বাস-ঘাতক (Coward, traitor)।

বীরপুঙ্গব দুটি তখন ভয়ে কাঁপছে---হাত জোড় করে বলল, 'নেতাজী আমাদের ক্ষমা করুন। আমরা অপরাধ স্বীকার করছি।'

নেতাজী তৎক্ষণাৎ 'সুইসাইড স্কোয়াড' বা আত্মঘাতী বাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ অফিসারকে ডেকে অতি সাধারণ পোষাক পরিয়ে তাদের অবিলম্বে---বর্মা সীমান্ত ছাড়িয়ে দেবার আদেশ দিলেন। তারা নতজানু হয়ে আবার ক্ষমা ভিক্ষা করল। নেতাজী ক্ষমা করলেন।

ডাক্তার ভদ্রলোক হাসপাতালে দুঃস্থের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। কিছুদিন পরেই বৃটিশ সরকারের আক্রোশে শ্লিট ট্রেঞ্চের কাছে মৃত্যু-বরণ করে তিনি বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত করলেন কিন্তু আর একজন, যে বীর পুঙ্গবটি নেতাজীকে হত্যা করতে গিয়েছিল--তার বিশ্বাসঘাতকতা ইম্ফলের কর্দমাক্ত পথে জাতির দুরপনেয় কলঙ্ক হয়ে রয়ে গেল।

ধারাবাহিক উপন্যাস

অদ্বিতীয়া

সুশীল রায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

মনোজ বলল, 'এটা তোমার গর্ব হওয়াই উচিত। তবু তুমি টাকার মুখ দেখতে পাও, টাকার ঝুন শুনতে পাও। আর, আমরা ? আমরা আমাদের দীনকর্মী বলে ঘোষণা করিতে ভরসা পাই নে, তবেই বুঝছ আমরা সত্যিই কত দীন।'

'থাক। হয়েছে।' বাধা দিল অমিয়, বলল, 'ঠিক আছে। নিজেদের দৈন্য নিয়ে বড়াই করার দরকার আর নেই। দৈন্যটা অত অহংকারের জিনিস নয়।'

দিবা এদের সকলের দিকে তাকাচ্ছে, বোধ হয় ভাবছে এ কিসের মধ্যে এসে পড়ল সে। একপাল পুরুষের মধ্যে একা নারী সে। তার কোনো দৈন্য আছে কি না সে কথা এখন ওঠে না। কিন্তু এ কথা ঠিক, দৈন্য নিয়ে দাপট করার কোনো অর্থই হয় না। সে শুনেছে, যে নাটকে অভিনয় করতে সে এসেছে, সে নাটকের নায়িকা ও দীনহীন এবং সেই দীনতা ও হীনতা দূর করার জন্যে সেই নায়িকাটি নাকি অজস্র বিলাসের বন্যা বইয়ে দিয়েছে তার সেই ভগ্ন প্রাসাদের নেপথ্যে। এখানে দিবা এসে উপস্থিত হয়েছে যে প্রাসাদে—তাও তো নেহাতই ভগ্ন, এখানেও কোনো বিলাসের কোনো প্রস্তাব এদের মনে-মনে আছে নাকি?

কিন্তু এভাবে সময় নষ্ট করার কোনো অর্থ হয় না। দিবা তার হাত-ঘড়ির দিকে একটু চুরি করেই বুঝি তাকাল।

'অল রাইট, অল রাইট, অল রাইট।' উঠে দাঁড়াল মনোজ, বলল, 'কে প্রম্ট্ করবে? সুহাংশু, তুমিই করো। তোমার নাটক, তুমিই পারবে মেজাজ দিয়ে প্রম্ট্ করতে। উঠে আসুন, দিবা দেবী।'

কিন্তু সুহাংশু রাজী না। তার বানানো কথাগুলো তার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হলে তেমন-যেন মানান-সই হবে না, সুতরাং নরেশের দিকে এগিয়ে দিল সে পাণ্ডুলিপি।

নরেশের কোনো আপত্তি তো নেই-ই, বরঞ্চ এতেই যেন তার উৎসাহ। সাগ্রহে সে পাণ্ডুলিপিটি মেলে ধরে বলতে লাগল—'বলো মনোজ, বলো মধুসূদন—'

মধুসূদন।। তোমার জীবনে হঠাৎ আমার পদার্পণে এই প্রাসাদের প্রাচীরে-প্রাচীরে কেমন শিহরণ জেগে উঠেছে, চেয়ে দেখ ফুল্লরা। তুমি যে এত ফুল্ল, এত প্রফুল্ল, এত উৎফুল্ল—এ কথা আমাকে আগে কেন বলো নি তুমি। আমি ত্রিভুবন দেখি নি, কিন্তু এটা জানি নে, ত্রিভুবনে তোমার মত সুন্দরী নেই।

ফুল্লরা।। একটু ভেবে কথা বোলো। উচ্ছ্বাস দিয়ে কথা বললে মনের সব ভাষা চাপা পড়ে যায়।

মধুসূদন।। (স্বগত) চাপা পড়ে যায়? কি বলে এই কুমারীকন্যাটি? নিজেকে নিশ্চয় ও দেখে নি। জলের প্রতিবিম্বেও দেখি নি বুঝি নিজেকে? তা যদি দেখতো। (একটু থেমে, প্রকাশ্যে) তুমি বিশ্বাস করো আমার কথা ফুল্লরা। আমি দেখেছি অনেক চোখ, কিন্তু তোমার চোখের মত চোখ দুটি দেখি নি। এই দেখ, কি বলতে কি বলে বসেছি। তোমার চোখের মত চোখ দুটি দেখব না কেন? দুটি দেখেছি,

আর দেখিছি কেবল দুটিই, তার বেশি নয়। তুমি কি আমার কথা বিশ্বাস করো?

ফুল্লরা ॥ বিশ্বাস না করার কী আছে? বিশ্বাস করে প্রবঞ্চিত হওয়া ভালো, কিন্তু বিশ্বাস না করে নিজেকে বঞ্চনা করা ঠিক না।

মধুসূদন ॥ সুন্দর সুন্দর সুন্দর। এত সুন্দর কথা তোমাকে কে শেখালে ফুল্লরা। তোমার কথা যেন তোমার চেয়েও সুন্দর। তোমার কথা যেন তোমার ওই দুইটি চোখের চেয়েও মনোরম।

ফুল্লরা ॥ (দীর্ঘনিশ্বাস) শিখতে হয়। না শিখে উপায় কি।

মধুসূদন ॥ উপায় নেই বুঝি? শিখতে বুঝি হবেই? কেন, কেন শিখতে হবে অত অজস্র কথা? আকাশের তারা তো কথা বলে না, গাছের ফুলেরা তো কথা বলে না। তাদের যদি চলে কথা না বলে তবে তোমার চলবে না কেন? তুমি তারার চেয়েও উজ্জ্বল, তুমি ফুলের চেয়েও ফুল্ল। তুমি ফুল্লরা—এই তোমার একমাত্র পরিচয়।

ফুল্লরা ॥ শুনে আনন্দ পেলাম। বুঝলাম, পুরুষরা অতি বিষম বস্তু। পুরুষের কাছে নারী মাত্রই পরম-লোভনীয়।

মধুসূদন ॥ কঠিন আঘাত করেছ তুমি আমাকে। কিন্তু যে পুরুষেরা বিষম বস্তু, আমি সে পুরুষ নই। যে পুরুষের কাছে নারী মাত্রই পরম-লোভনীয় সে পুরুষও নই আমি ফুল্লরা। আমি তোমার হৃদয় হরণ করতে আসি নি, আমি এসেছি আমার হৃদয়টি তোমাকে উপঢৌকন হিসাবে উপহার দিতে। আমার এই দীন উপহারটি তুমি গ্রহণ করো, এই আমার নিবেদন।

ফুল্লরা ॥ এই জীর্ণ অট্টালিকার আমি একমাত্র অধিবাসিনী। আমার আপনার বলতে কেউ নেই। জানি, আমি এক উচ্চবংশের কন্যা, জানি অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি ছিল আমার পূর্বপুরুষেরা। কিন্তু তাতে আমার লাভ? আমার কে আছে? আমি একা, আমি অসহায়, আমি নিরুপায়, তাই এই নিভৃত নির্জনে তোমাদের মত পুরুষেরা নিত্য আমাকে প্রলোভন দেখাও।

মধুসূদন ॥ প্রলোভন? (অট্টহাস্য)। প্রলোভন দেখাব কেন? যা সত্য বলে মানি অকপটে তাই স্বীকার করে চলি। আর কোন্ কোন্ পুরুষ তোমাকে কি বলেছে জানি নে। হয়তো তাদের বিদায় দিতে পেরেছ তুমি। কিন্তু আমি সে পুরুষ নই, আমি বিদায় নিতে আসি নি, আমি এসেছি তোমাকে গ্রহণ করতে। এসো। (হস্তধারণ)।

ফুল্লরা ॥ (মৃদুহাস্য)

(পট পরিবর্তন)

হরেশ পড়ে গেল একটানা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনোজ মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল তার ডায়লগ। দিবা দেবী বসে-বসে শুনতে লাগল তার সংলাপ। মনোজ ইশারা করে দিবাকে উঠে আসতে বলল। দিবা কেন-যেন একটু দ্বিধা করছিল।

হরেশ আবার তাকে বলল, 'এবার আরম্ভ করা যাক।'

স্নেহাংশু বসে আছে অভিভূত হয়ে। অন্যের মুখে নিজের লেখা ভাষা শুনে সে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে মনে হল। কি রকম নাটকীয় করে তুলতে পেরেছে পরিবেশটা তা ভেবেই সে মোহিত হয়ে যাচ্ছে।

দিবা উঠি-উঠি করতে-করতে বলল, 'নায়িকার চরিত্রটা কিন্তু একটু কেমন হয়ে গিয়েছে। নায়িকার উপর যেন একটু অবিচার করেছেন নাট্যকার।'

'কি রকম?' স্নেহাংশুর মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে উঠল হরেশ। বলেই সে বলল, 'তা হবে। কাব্যেরও তো উপেক্ষিতা থাকে, স্বয়ং বাল্মীকিই নাকি উপেক্ষা করেছেন উর্মিলাকে—পড় নি রবীন্দ্রনাথ? আমাদের কবি স্নেহাংশু বিশ্বাসও না হয় একটু অবিচার করেছেন তাঁর নায়িকা ফুল্লরাকে। ওতে কিছু হয় না। এটা গৌরবেরই কথা।'

অগত্যা উঠে দাঁড়াল দিবা। হরেশ প্রম্পট করে চলল, মধুসূদন ও ফুল্লরা বলে যেতে লাগল তাদের ডায়ালগ।

রিহার্সেল চলতে লাগল। এদিকে দীপক নীহার আর বীরেন আলোচনা করতে লাগল তাদের নায়িকাটিকে নিয়ে। মেয়েটার ঔদ্ধত্যে তারা একটু যেন অসন্তুষ্ট হয়েছে। নাট্যকারের সামনে তার সৃষ্ট চরিত্র নিয়ে এমন সমালোচনার মানে হয় না। দুনিয়ার নারী মাত্রেই যেন সতী। দুনিয়ার কোনো নারী ব্যাভিচার যেন করে না। একটা বিরাট প্রাসাদের মধ্যে একা-একা থাকতে পারে যে মেয়ে, সে মেয়ের জীবনে কি কি ঘটতে পারে তা আন্দাজ করা

রোমাঞ্চ উপন্যাসের যাদুকর

৺দীনেন্দ্রকুমার রায়ের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—৪খানি সুবৃহৎ ডিটেকটিভ উপন্যাস। মূল্য ৩৷৷০ টাকা

২য় ভাগে—৪খানি রহস্য উপন্যাস মূল্য ৩৷৷০

জাতীয়-কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

রঙ্গলাল-গ্রন্থাবলী

পদ্মিনী, সুরসুন্দরী, কর্মদেবী, কুমারসম্ভব, নীতিকুসুমাঞ্জলি, কাঞ্চী-কাবেরী, কবির জীবনী। ৭খানি একত্রে ২·০০।

শ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন সম্পাদিত

নাড়ীজ্ঞান-প্রদীপিকা

(নাড়ী স্পর্শ দ্বারা রোগ নির্ণয় ও পরমায়ু নিরূপণ)

মূল্য এক টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

যায়। কিন্তু একটা নাটকের মধ্যে সব ব্যাপার তো খোলাখুলি বলা চলে না। স্নেহাংশু যা বলেছে তা খুব রেখে-ঢেকেই বলেছে। খুব সংযমই দেখিয়েছে স্নেহাংশু। স্নেহাংশু না হয়ে ওরা কেউ হলে আরও কয়েকটা দৃশ্য জুড়ে দিয়ে একেবারে বেআব্রু করে দিত নায়িকাটিকে।

খুবই বুঝি বিরক্ত হয়েছে ওরা। যে মেয়ে একা-একা হাজার জায়গায় গিয়ে হাজার-হাজার পুরুষের হাত ধরে মঞ্চে দাঁড়িয়ে অভিনয় করছে, সে আবার বলে অবিচার। ওটা ন্যাকামো ছাড়া কিছু না। ওটা নিজের দর বাড়ানো ছাড়া কিচ্ছু না। স্নেহাংশুটা নিরীহ মানুষ, তাই কিছু বলল না সে। পড়ত যদি ওদের পাল্লায় তবে ওরা দেখিয়ে দিত। অভিনয় করবি, পয়সা নিবি। সাফ কথা। এর মধ্যে অত মন্তব্যের কি দরকার?

হঠাৎ যেন চমকে গেল ওরা। ওই দিকে ওরা তাকাল। বা, বেশ সুন্দরভাবে তো কথা বলছে। হরেশের প্রম্‌টিং ধরে ধরে তো দিব্যি বলে চলেছে ডায়লগ—

আমি চাই নে সমাজ, চাই নে সংসার। চাই নে মান, চাই নে সম্ভ্রম। আমি চাই বাঁচতে। এই নিঃসঙ্গ প্রাসাদপুরীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে চাই আমি। আমার সহায় হও তুমি, সঙ্গী হও তুমি, মধুসূদন।

ওদের মন হঠাৎ ভিজে গেল। ওরা আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইল দিবার মুখের দিকে। যে মেয়ে এতক্ষণ মঞ্চে ছিল এমন নির্বাক হয়ে, এমন ক্লান্ত হয়ে, এমন বিষণ্ণই হয়ে, সেই মেয়ে তার সমস্ত রূপের বদল করে দিয়ে হঠাৎ নতুন মূর্তি নিয়ে দেখা দিল।

না, জানে মেয়েটা অভিনয় করতে। মনোজদের পছন্দ আছে। ভুল করে নি মনোজরা। আসি আসি করে এতদিন না এসে মেয়েটা যে তাদের এমন উৎকণ্ঠায় রেখেছিল, সার্থক সেই উৎকণ্ঠা, সার্থক তাদের অপেক্ষা করে থাকা।

চকিতের মধ্যে দিবা বন্দ্যোপাধ্যায় সকলের কাছে যেন বন্দনীয়া হয়ে উঠল। যারা এতক্ষণ তার সমালোচনা করছিল এখন তারাই তার সম্বর্ধনার জন্যে যেন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

ঐ বেজে উঠেছে আবার দিবার গলার স্বর। মনোজের অনর্গল কথার উত্তরে দিবা বলল—

শান্ত হও। জীবনটা জুয়াখেলারই তুল্য, তা জানি। জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলি তাই আমরা। পাপ আর পুণ্য? ওসব কোনো কাজের কথা নয়। কে পাপী নয়, কে নয় পুণ্যবান? আমার বাঁচবার অধিকার আছে। আমি বাঁচতে চাই। আমি বাঁচব, আমি বাঁচব, আমি বাঁচব। তুমি যদি আমাকে বাঁচতে সাহায্য না করো, তাহলে যে আমাকে বাঁচতে দেবে আমি দ্বারস্থ হব তার। এতে পাপ কোথায়? কোনো পাপ নেই এতে। আমাকে পাপিষ্ঠা বোলো না তুমি। আমি যদি পাপিষ্ঠা, তবে তুমি কোন্ পুণ্যবান; কেন তবে তুমি এই পাপিনীর জন্যে এত লালায়িত? যাও, তুমি যাও। আমার হৃদয়ের সমস্ত অর্গল আজ উন্মুক্ত, এ হৃদয়ে আজ সবার প্রবেশ-অধিকার আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, পার ওকথা বলতে, নিশ্চয় বলতে পার—আমি স্বৈরিণী আমি স্বেচ্ছাচারিণী আমি ব্যাভিচারিণী। ওতে বিন্দু-বিসর্গ ক্ষোভ নেই আমার। তা যদি বলো, তবে বুঝব যে, তুমি আমাকে চিনেছ, তুমি আমাকে জেনেছ। দীনদরিদ্রের বেশে দীনহীন হয়ে আমি থাকব কেন, আমার সর্বাঙ্গে ঐশ্বর্য নাকি অফুরন্ত—তোমরাই বলো সে কথা, তাহলে সেই ঐশ্বর্যের বিনিময়ে আমি নতুন ঐশ্বর্য আহরণ করে হয়ে উঠতে চাই এই জীর্ণ প্রাসাদের সম্রাজ্ঞী।

বা, বা, বা। অপূর্ব অদ্ভুত। চরিত্রটাকে একেবারে ফুটিয়ে তুলেছে দিবা। ফুলরা আর তো পাণ্ডুলিপির পাতার মধ্যে অক্ষরে-অক্ষরে জড়িয়ে নির্বাক হয়ে পড়ে নেই। ফুলরা জেগে উঠেছে, ফুলরা জাগিয়ে দিয়েছে সকলকে।

অনেকগুলি দৃশ্য পর-পর মহড়া দিয়ে চলল দিবা। এতদিন সে যে আসে নি তাতে ক্ষতি হয় নি কিছু। একদিনেই অনেকটা এগিয়ে দিল সে। নিজের ওপর এ বিশ্বাস তার আছে বলেই সে এদের এগিয়ে যেতে বলেছিল। পাকা অভিনেত্রী বললে ভুল করা হবে, দিবা একজন জন্ম-অভিনেত্রী। এটা কেবল চর্চা করেই অর্জন করা যায় না, এটা অর্জন করতে হয় প্রতিভা দিয়ে।

(ক্রমশঃ)

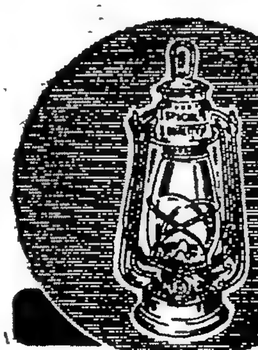

কিষাণ
লন্ঠন
সর্বোৎকৃষ্ট
গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
ফোন-২২-৬৫৮০ ২৬৬,ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১

কবিতা

উৎসব আজও হলো না

আবুলকাশেম রহিমউদ্দীন

সে-এক বিশাল অনুভূতি দিগন্তের ফসল
তোমার প্রশস্ত ললাটে ছায়া ফেলে
আপন সৃষ্টি-রহস্যের অনুধ্যানে বৃত,
এখন তুমি আদিগন্তের প্রদীপ্ত কৃষাণ।

ঝড় তখন বন্য-বরাহ,
দাপট তার ভীষণ।
তাই আসি-আসি করেও পিছিয়ে যায় অঘ্রাণ।
তবু আসন্ন সোনায় স্বপ্নের উচ্চারণ ছিল।
আর দেরি নেই,
ঝড় থামলেই ঘরের উঠোনে সমস্ত ফসল
মুক্তির উৎসবে হরিলুট দেবে অনেক কালের প্রতীক্ষা।

কিন্তু ঝড়ের সেই দাঁতাল প্রবৃত্তি
ঘর বাঁধার জরীপ করা জমিতেই উলঙ্গ আদিম।
তাই তোমার বশিষ্ঠ-প্রবীণ তর্জনী
তাকে শোনাতে চাইলো মানুষ হওয়ার মন্ত্র।

কিন্তু সফল হতে পারলো না।
কারণ সে-সম্ভাবনার প্রসবিনী তখন
গ্রহণ করেছে সেই পাশবিক বৃত্তেই পুরনারীর ভূমিকা।

হয়তো সে-জন্যেই
সেদিন অঙ্গীকার নেচে উঠলো রক্তে।
লাঙল নয়, এবার অস্ত্রই তোমার একমাত্র অনিষ্ট।
অতএব অন্ধকারকে থামতে ব'লে
সময়ের কাঁধে হাত রেখেই বেরিয়ে গেলে কোথায়।

তোমার এই গতিবিধির পদশব্দেই
হঠাৎ চমকে উঠলো মাঠজোড়া সেই জন্তু।
আর সেই সুযোগে
এবার অগ্নিশিখার মতো নেচে উঠলো সমস্ত ফসল,
অঘ্রাণ পা বাড়ালো প্রচণ্ড যোদ্ধার মতো।

শূন্য হাঁড়ির মতো মুখে আতঙ্ক বাজে দাঁতালের।
রাশি রাশি ফসলের দীপান্বিতায়
আরও উজ্জ্বল হলো তার পালাবার পথ।

তারপর?
ঘর উঠলো জমিনজুড়ে।
মধ্যে পড়লো দেয়াল।
দু'দিকের দুই উঠোনে জমলো ফসল;
কিন্তু উৎসব আজও হলো না—;
দেয়াল ভাঙার উৎসব।

কৃষাণ তুমি ফিরবে কবে?

রবীন্দ্রের তুমি বরণীয়

বৈশম্পায়ন

আমার প্রণাম লহ। রবীন্দ্রের তুমি বরণীয়।
শরৎচন্দ্রের তুমি বাস্তবকঠোর সব্যসাচী।
তুমি বীর সন্ন্যাসী যে, দুর্ধর্ষ দুর্বার, তবু প্রিয়।
'তুমি আছো' এই সত্য জেনে যাবো যতদিন বাঁচি।

আমরা তোমার কাছে করেছি যে মহা অঙ্গীকার।
এখনো কপালে জ্বলে নিজেদেরই রক্তের তিলক।
আশ্চর্য, নিশ্চুপ থেকে দেখি তবু মানুষ শিকার
এখানে, মুনাফা লোটে ক'জন কুচক্রী আহম্মক।

কা'রা যেন বলে, নেই, তুমি নেই। হে শাশ্বতপ্রাণ,
তাই তারা এ-ভারতে প্রকাশ্যেই এমন নির্ভয়।
তুমি চির বেগবান, তেজদৃপ্ত, মহাবলবান,
আমাদের ভালবাসা একমাত্র তোমার সঞ্চয়।

প্রাণের মহিমা জেনে এই ভারতের প্রতিষ্ঠায়
দিতে চাই আমা-দর-প্রাণ, বলো দেব তা কিভাবে?
স্বদেশকে ভালবেসে দিন কাটে আশায় আশায়;
আমরা অ-স্বাভাবিক হতে চাই তোমার স্বভাবে।

[আট]

দ্বিতীয় অধ্যায়

ক্যাথীড্রালের হত্যা

১৮৬৪ সালের ৭ই সেপটেম্বর, ঘোর সন্ধ্যা, এমন সময় যমুনা দাসী নামক এক স্ত্রীলোক এলো বামুন বস্তী থানায়। আমি তখন এই থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার। যমুনা দাসী জানাল—

'কলভিনের বস্তীতে আমার একখানা বাড়ি আছে। তাতে দুজন ভাড়াটে থাকে, তাদের দুজন বেটাছেলে, একজন মেয়েছেলে। গত চার দিন ধরে তাদের দরজা বন্ধ অবস্থায় রয়েছে। আজ একটুক্ষণ আগে আমি একটা কাজে ঐ পথ দিয়ে চলছিলাম, হঠাৎ দেখি বাইরের দরজার নিচে দিয়ে রক্তের মতন কি গড়িয়ে পড়ছে। একে সেখানে কেউ নেই, তার উপব এই কাণ্ড। আমার মনে বড়ই সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে, তাই এ বিষয়ে কি করা উচিত আপনার কাছে জানতে এসেছি।'

এইখানে আমি প্রসঙ্গত বলে রাখি, এমন ধরনের কেস্-এর সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে পুলিসকে সঙ্গে সঙ্গে যে সব উপায় অবলম্বন করতে হবে তার উপর। চালে একটুখানি ভুল হলেই সব পণ্ড হয়ে যেতে পারে। সে জন্য পুলিস অফিসারের উপস্থিত বুদ্ধি, বিচারশক্তি, ভবিষ্যৎ দৃষ্টি এবং স্থিরমস্তিষ্কতা একটু ভাল রকম থাকা দরকার।

এখন যে ঘটনাটি বিবৃত করতে যাচ্ছি তাতে এইসব গুণ থাকা যে কত দরকার তা বোঝা যাবে। আরও দেখা যাবে, এইরকম ঘটনাতেই এসবের দরকার সব চেয়ে বেশি।

কেস্‌টি অদ্ভুত ধরণের। কারণ এই হত্যার পিছনে কোনো উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তিন জাতীয় কারণে হত্যাকাণ্ড ঘটতে দেখা যায়। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে লোকে নরহত্যা করে। কোনো সময় লুটের উদ্দেশ্যে করে। অধিকাংশ সময়েই করে ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে। প্রথম জাতীয় হত্যাকারীকে হাতেনাতে ধরে ফেলতে না পারলে পরে হয় তো অনুতপ্ত হয়ে নিজে এসে ধরা দেয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর মনে কোনো অনুশোচনাই জাগে না, এবং এর ক্ষেত্রে লুটের মাল কিছু ধরা পড়লে তদন্তের সূত্র পাওয়া যায়। তৃতীয় ক্ষেত্রে বিশেষ

করে হত্যা যদি পূর্বকল্পিত হয় এবং গোপনে অনুষ্ঠিত হয় তা হলে হত্যাকারীকে ধরা বড়ই কঠিন হয়ে পড়ে।

এই বিশেষ হত্যাকাণ্ডটি পূর্বকল্পিত এবং গোপনে অনুষ্ঠিত। নিহত মেয়েটি যুবতী, তাকে নবীন ও কৈলাস নামক দুইজন দেশী খ্রীস্টান তার ঘর থেকে ফুসলিয়ে এনে তাকে ঐ ঘরে রেখেছিল এবং দুজনের সঙ্গেই তাকে থাকতে বাধ্য করেছিল। প্রায় চার মাস হল ওরা কলভিন বস্তীর ঐ বাড়িতে বসবাস করছে। এমন সময় একটি মেয়ে—কৈলাসের বোন—কৈলাসকে কলকাতায় দেখতে আসে তার দেশ থেকে। নবীন তাকে দেখে মুগ্ধ হয়, তাকে বিয়ে করতে চায়। মেয়েটিও তাতে রাজি হয়। মেয়ের বাবাও এসেছিল মেয়ের সঙ্গে, সেও এ বিয়েতে সম্মতি দান করে। জটিলতা আরম্ভ হল এর পর থেকে। কৈলাস এখন নবীনের শালা হতে চলেছে, এমন অবস্থায় ঐ রক্ষিতা মেয়েটিকে বিদায় করা দরকার। কিন্তু কি উপায়ে তা করা যাবে? ঠিক হল নবীন তাকে কিছু টাকা দেবে এবং অন্যত্র পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু নবীনকে ছেড়ে যেতে সে ভীষণ আপত্তি জানাল। কারণ সে তাকে ভালবেসে ফেলেছে। সে তাকে বলল, 'তুমি আমার আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে ভুলিয়ে এনেছ, আমার জাত মেরেছ, আর এখন কিনা তুমি আমাকে বিদায় করতে চাও? কিন্তু জেনো, আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না। তোমার টাকায় আমার দরকার নেই। আমি তোমাকে ভালবাসি, আমি তোমার সঙ্গেই থাকব। মরণ ভিন্ন আর কিছুতে আমাদের দুজনকে আলাদা করতে পারবে না। তুমি যদি আমাকে জোর করে তাড়াতে চাও তা হলে আমি ক্যাথীড্রালের পাদ্রীর কাছে গিয়ে সব বলে দেব। তুমি আমাকে কিভাবে ভুলিয়ে এনেছ, আর কিভাবে আমার সঙ্গে বাস করছ সব বলে দেব। আমাকে এখন তাড়াতে চাও, তাও বলব।'

এই শেষের কথাগুলিতে নবীন ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। সে বুঝতে পারল এ কথা সেখানে প্রকাশ হলে তার চাকরিটি যাবে, এবং তখন বিয়ে করাও আর চলবে না। এইখানে ঐ রক্ষিতাকে হত্যা করার একটা মোটিভ পাওয়া গেল। (আসামী পক্ষের উকিল কিন্তু প্রাণপণে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে হত্যার প্রেরণা দেবার পক্ষে এই মোটিভ যথেষ্ট নয়।)

এই সব তথ্য পাঠককে শোনাবার পর আমি এবারে ঘটনায় ফিরে আসি। আমি বাড়িউলি যমুনা দাসীর মুখে সংবাদ শুনে তখুনি তার সঙ্গে ঘটনাস্থলে গিয়ে হাজির হলাম। দেখলাম দরজার উপর এবং নিচে দুদিকেই শিকল আঁটা এবং তালাবদ্ধ। দরজার নিচের দিকটা চৌকাঠের সঙ্গে সম্পূর্ণ আঁটে না, কিছু ফাঁক থাকে। এই ফাঁক দিয়েই ঘরের ভিতর থেকে কিছু রক্ত বেরিয়ে এসেছে, দেখে তাই মনে হল। প্রতিবেশীর এক বাড়ি থেকে একখানা কুড়ুল চেয়ে এনে দরজা ভাঙা হল। রাত তখন ৮টা। আমার সহকারীর কাছ থেকে লণ্ঠন চেয়ে নিয়ে আমি একা ঘরে প্রবেশ করলাম, কিন্তু তার আগে বাইরে কৌতূহলী লোকের ভিড়কে সরিয়ে দিতে আদেশ দিলাম। বড় বিরক্ত করছিল তারা।

ভিতরে দরজার কাছেই দেখলাম একটি বাক্স, চেপে বন্ধ করা, কিন্তু ঢাকনাটা কিছু উঁচু হয়ে আছে, এবং একটা অংশ কব্জা থেকে খুলে এসেছে। এই বাক্স থেকেই রক্ত বেরিয়ে আসছে দেখা গেল। আমি অন্যান্য শিকলটা খুলে ডালাটি তুলতে গিয়ে দেখি ভিতর থেকেই এমন ঠেলা অবস্থায় ছিল, আপনা থেকেই সেটি খুলে গেল, কব্জা থেকেও খুলে পড়ল। ভিতরে যুবতীর মৃতদেহ। চাপ সরিয়ে নেওয়াতে যেন তা আরও ফুলে উঠতে লাগল। এই দৃশ্য দেখে আমার মনে একটা বিভীষিকা দেখার প্রতিক্রিয়া হল বললে কমই বলা হবে। তা বর্ণনা করবার ভাষা আমার নেই। যাই হোক, উপস্থিত বুদ্ধিটি তখনও আমার অক্ষত ছিল, আমি নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে খুব সাবধানে দরজা বন্ধ করলাম, এবং সঙ্গে সঙ্গে আবার ভিড় জমে গেল, তাদের প্রশ্ন 'ব্যাপার কি সাহেব?' আমি একটু হেসে বললাম, 'বিশেষ কিছুই না'—এবং খুব নিরাসক্ত ভাবে বললাম, যাতে ওদের অহেতুক কৌতূহল আর না বাড়তে পারে। তাই বললাম, 'বিশেষ কিছুই না, এ ঘরের লোকেরা কারো পাঁঠা চুরি করে এনে গোপনে কেটেছে এই ঘরে। তারপর বাক্সবন্দী করে রেখেছে। পাড়ার কারো পাঁঠা চুরি গেছে কি না তোমরা জান?'

এ কথা শোনার পর ভিড় ধীরে ধীরে কমতে লাগল। মনে হল তারা যেন ভীষণ হতাশ হয়ে পড়ল। তারা আশা করেছিল মজাদার কিছু দেখতে পাবে।

ভিড় বিদায় হলে, প্রতিবেশীর কাছ থেকে চেয়ে আনা একখানা বেঞ্চিতে বসলাম, এবং নোটবুক বার করে যমুনাকে প্রশ্ন করতে লাগলাম। আমাদের মধ্যে এইভাবে কথা চলল—

'তোমার ভাড়াটেদের পরিচয় কি?'

'তারা দুজন দেশী খ্রীস্টান, নাম কৈলাস আর নবীন। ওরা ক্যাথীড্রালে চাকরি করে। আর একজন স্ত্রীলোক ওদের সঙ্গে থাকে।'

'তার সঙ্গে ওদের সম্পর্ক কি?'

'সে নবীনের স্ত্রী বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু তারা দুজনেই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে বাস করে।'

'তোমার ঘর ওরা কতদিন ভাড়া নিয়েছে?'

'প্রায় চার মাস।'

'ঘর ভাড়া কে নিয়েছে?'

'দুজনে। তারপর সন্ধ্যায় স্ত্রীলোকটিকে নিয়ে আসে।'

'স্ত্রীলোকটির সঙ্গে ওদের সব সময়েই কি সদ্ভাব ছিল?'

'তা ছিল। কিন্তু মেয়েটি নবীনকে বেশি পেয়ার করত।'

'কখনও কি ওদের ঝগড়া হতে দেখ নি?'

'না। কিন্তু সপ্তাহখানেক আগে মনুমোহিনী কাঁদছিল জানি। আর বলছিল নবীন তাকে তাড়িয়ে দিতে চায়। সে কথা সে আমাকে বলেছিল।'

মেয়েটির নাম মনোমোহিনী।

'তোমার কাছে কি সে ঐ এক-বারই মাত্র অভিযোগ জানিয়েছিল?'

'হাঁ, ঐ একবারই।'

'মনুমোহিনীকে শেষ কবে দেখেছ?'

'চার দিন আগে সন্ধ্যায় তাকে শেষ দেখেছি। সে তখন দরজার কাছে বসে ভাত খাচ্ছিল।'

'নবীন অথবা কৈলাস কি তখন উপস্থিত ছিল?'

'হাঁ। তারা দুজনেই ঘরের মধ্যে ছিল।'

'নবীন আর কৈলাসকে পরে কবে দেখেছ?'

'পরদিন সকালে দেখেছি।'

'কি অবস্থায় দেখেছ? মানে, ওরা তখন কি করছিল?'

'তারা তখন কাজে বেরুচ্ছিল।'

'তুমি তখন কোথায় ছিলে?'

'আমি দরজা খুলছিলাম।'

'তাদের কাজে বেরুবার সময় তোমার দরজার সামনে দিয়েই যেতে হয়?'

'হাঁ।'

'যাবার সময় তাদের সঙ্গে তুমি কোনো কথা বলেছিলে?'

'না। তারাই বলেছিল।'

'তাদের মধ্যে কে বলেছিল?'

'নবীন।'

'কি বলেছিল?'

'বলেছিল, সালাম বাড়িউলি। আমি আমার দরজা তালাবন্ধ করে যাচ্ছি, কয়েক দিন থাকব না, আপনি একটু দেখবেন।'

'তুমি কি বলেছিলে?'

'আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মনুমোহিনী কোথায়?'

'নবীন কি বলল?'

'মনুমোহিনী ভবানীপুরে তার মাসির বাড়ি গেছে, কিছুদিন সেখানেই থাকবে।'

'নবীনের সঙ্গে যখন তোমার এই সব কথা চলছিল, তখন কৈলাস কোথায় ছিল? সেও কি সেখানে উপস্থিত ছিল?'

'সে তখন ফুটপাথে দাঁড়িয়ে নবীনের জন্য অপেক্ষা করছিল।'

'এই ঘটনার পর ওদের কেউ সেখানে এসেছিল?'

'না। আমি দেখি নি।'

'মনুমোহিনীও আসে নি?'

'না।'

'নবীন ও কৈলাসের তখন কি রকম জামাকাপড় পরা ছিল?'

'শাদা চাপকান।'

'আগের দিন যখন সন্ধ্যায় তারা ওখানে আসে তখন তাদের কি রকম কাপড় পরা ছিল?'

'নবীনের গায়ে ছিল ম্যাজেণ্টা-রঙের ফ্ল্যানেলের কোট, আর কৈলাসের গায়ে ছিল নীল রঙের। দুজনেই তা শাদা চাপকানের উপর পরেছিল, কারণ সে সময় গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টি পড়ছিল।'

'তাদের পায়ে জুতো ছিল?'

'জুতো তারা হাতে ঝুলিয়ে রেখেছিল, কারণ বস্তীর জমিতে জল জমেছিল, বিশেষ করে তাদের ঘরের দরজার সামনে একটু বেশি জল ছিল।'

'পরদিন সকালে যখন তারা বেরিয়ে যায় তখন তাদের পায়ে জুতো ছিল?'

'না। কারণ জল পার হয়ে তাদের ফুটপাথে উঠতে হয়েছিল।'

'তাদের হাতে কিছু ছিল?'

'না।' (যে ফ্ল্যানেল কোটের কথা বলা হয়েছে, তা ঐ ঘরেই মৃতদেহের কাছে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। ম্যাজেণ্টা রঙের জামাটায় রক্তের দাগ ছিল। দুজনেই, ও জামা তাদের, এ কথা অস্বীকার করেছিল, কিন্তু প্রমাণিত হয়েছিল তাদের কথা মিথ্যা।)

প্রতিবেশীদের কয়েকজনকে ডাকিয়েও ঐ একই ধরণের প্রশ্ন করা হল, এবং তাদের সাক্ষ্যও সব লেখা করে নিলাম। এ দেশের অপরাধীদের কাছ থেকে যে সব অদ্ভুত উপায়ে সাক্ষ্য আদায় করা হয়, তা জানতে হলে ঐ সব লোকের সামাজিক রীতিনীতির সঙ্গে পরিচিত থাকা দরকার। কোনো ইংরেজের এ সব জানা না থাকলে তার পক্ষে ঐ সব অদ্ভুত উপায়গুলির কথা বিশ্বাস করাই শক্ত হবে। অবশ্য কঠিন কঠিন অপরাধের ক্ষেত্রেই এ রকম দরকার হয়।

এই ঘটনার এক জন সাক্ষীর কাছ থেকে যেটুকু খবর পাওয়া গেল, আমার সন্দেহ হল, সে তার চেয়ে অনেক বেশি জানে, কিন্তু অনেক কথা গোপন করে যাচ্ছে। তখন আমি আরও কথা আদায়ের জন্য এই উপায় অবলম্বন করলাম—

'শোন হরি সিং, মনুমোহিনীর সঙ্গে একই বাড়িতে তুমি থাকতে। তোমার ঘর আর তার ঘরের মাঝখানে মাত্র একটি পাতলা মাটির দেয়ালের ব্যবধান। নবীন আর কৈলাসের সঙ্গে তুমি শেষ যেদিন ঐ বাড়িতে কাটিয়েছ, সেদিন রাত্রে নিশ্চয় তুমি পাঁঠা কাটার সময় তার ডাকের মতন কোনো আওয়াজ শুনেছ। ব্যাপারটা জরুরি কিছু নয়, কিন্তু তুমি জান আমি এ সব জিনিস তন্ন তন্ন করে জানতে চাই। এইবার বল তো হরি, তুমি কি রকম শব্দ হয়েছিল?'

হরি সিং একটুখানি ভেবে বলল, 'রাত্রে আমি বড়ই ক্লান্ত ছিলাম, তাই ঘুমে অচেতন হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু আমার বউ শব্দ শুনেছিল।'

'কি রকম শব্দ শুনেছিল, বল।'

'সার, আপনি যেমন বলছেন, তেমন শব্দ নয়। পাঁঠার ডাকের

শব্দ নয় সে। মানুষের গলা টিপে ধরলে যেমন শব্দ হয়, চেঁচাতে যাচ্ছে অথচ পারছে না, তেমনি শব্দ। তারপরে দরজা ধাক্কার শব্দ, এবং কয়েকজন মানুষের কথার আওয়াজ, কিন্তু খুব অস্পষ্ট।'

'ঠিক আছে। এবারে তোমার বউএর কাছ থেকে আরও ভাল করে শুনি?'

'কিন্তু সার, সে যে পর্দানশীন, আপনার সামনে বেরোবে না।'

'আমি তাকে দেখতে চাই না, পর্দার আড়াল থেকেই শুনব।'

হরি সিং রাজি হল। তার স্ত্রী যা বলল তা নোট করে নেবার পর সাক্ষীদের কাছে এবং প্রতিবেশীদের কাছে কি ঘটেছে সব খুলে বললাম। সাক্ষীদের বিশেষভাবে বললাম তারা যা বলেছে, তা সরল ভাবেই বলেছে, এবং তা লিখে নেওয়া হয়েছে, এবং আশা করছি পরে আরও নতুন কিছু আবিষ্কার হলেও তারা যা একবার বলেছে তা যেন ভুলে না যায়। তারা সবাই আমাকে প্রতিশ্রুতি দিল, ভুলবে না। তখন তাদের ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলাম মৃতদেহ সনাক্ত করাতে। কিন্তু সেই বিকৃত দেহ দেখে তারা এমন বিমূঢ় হয়ে পড়ল যে, এ যে কার মৃতদেহ তা তারা আর বলতে পারল না। কেউ কেঁদে উঠল, এবং চোখ ঢাকল। অন্যদের কোনো রকমে হাত ধরে বাইরে আনা হল। সেই বিভীষিকাপূর্ণ দৃশ্য তারা সহ্য করতে পারল না।

এই সব সরল গরিব বেচারাদের সাক্ষ্য আমি যে আগেই পকেটস্থ করেছি এজন্য আমার যে তুষ্টি হয়েছিল তা প্রকাশ করার ভাষা আমার নেই। কারণ বুদ্ধি করে এটা আগেই না করলে পরে ঐ মৃতদেহ দেখে আর তারা মাথা ঠিক রেখে কিছু বলতে পারত না। অবশ্য কেউ কিছু সেজন্য জানতেও পারত না, এবং এজরা স্ট্রীটের এবং আমহার্স্ট স্ট্রীটের হত্যাকাণ্ডের মতনই এটাও পুলিস-ব্যর্থতার একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকত।

এতখানি শোনবার পর পাঠকদের মনে হতে পারে হত্যাকারীকে ধরায় এতে এমন আর কি বাহাদুরি প্রকাশ পেয়েছে। মানলাম সে কথা। কিন্তু উপরের যে দুটি হত্যার কথা বললাম, তাদের বেলাতেও তা ঐ একই কথা খাটে? অপরাধী কারা সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না, কিন্তু কেস্ টেঁকে নি। সর্বস্তই যেখানে গৌণ প্রমাণ বা circumstantial evidence-এর উপর নির্ভর করে, সেখানে ব্যর্থ হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নয় কিছুই। অভিজ্ঞ বিচারপ্রসূত সাক্ষ্য এই সব বস্তীর লোকদের মুখ থেকে আদায় করা কখনই সম্ভব নয়। এরা জোরের সঙ্গে কোনো কথাই বলতে পারে না, তারা কোনো খুনের কেসের মধ্যে নিজেদের জড়াতে ভীষণ ভয় পায়, এবং অনেকে যারা কাজের মতন সাক্ষ্য দিতে পারত তারা সামনে আসেই না। এবং পাছে তাদের ডাক পড়ে সেজন্য অনেক সময় পলাতক হয়। বিলেতে ঠিক এর বিপরীতটাই কিন্তু ঘটে।

তদন্তের প্রথম দিকে আমি বুদ্ধি করে আমার এক নিম্নপদস্থ অফিসারকে সাদা পোষাকে ক্যাথীড্রালে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম নবীন ও কৈলাসকে গ্রেফতার করতে, অথবা না ডাকা পর্যন্ত সেইখানে আটকে রাখতে। এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল কেন, তা সহজেই অনুমেয়। হত্যার স্থানের কাছাকাছি স্থান থেকে যতটা তথ্য সংগ্রহ করা যায় তা করা হয়ে গেলে, একজন লোককে পাঠানো হল ক্যাথীড্রালে। সেখানে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়ে থাকলে ঘটনাস্থলে তাদের নিয়ে আসতে হবে, এই ছিল নির্দেশ। লোক কিছুক্ষণ পরে ফিরে এলো শুধু নবীনকে নিয়ে। কৈলাসকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। তাকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার পর তাকে মনমোহিনীকে ইচ্ছাকৃত হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত করা হল, এবং বলা হল তার যদি কিছু বলবার থাকে, তবে বলতে পারে। আমি আরও বললাম, 'কিন্তু মনে রেখো, তুমি এখন আমাকে যা বলবে, তা তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে ব্যবহার করা হবে।'

নবীন এর উত্তরে বলল, 'মনমোহিনী আমার ছিল না, সে কৈলাসের রক্ষিতা ছিল, হত্যা সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।'

নবীনকে তখন ঘরের ভিতরে নিয়ে লাশ দেখানো হল, এবং জিজ্ঞাসা করা হল, এ কার দেহ? সে বাক্সটির দিকে না তাকিয়ে আমার দিকে চেয়ে বলল, 'হাঁ, এটি মনমোহিনীরই মৃতদেহ।'—এর বেশি আর সে বলতে পারল না, সে হাওয়ায়-কাঁপা পাতার মতন কাঁপতে লাগল। তার মুখ ঘামে ভিজে উঠল, ঘাম গড়িয়ে পড়তে লাগল গলা বেয়ে।

গ্রেফতারের পর নবীনের দেহ পরীক্ষা করে দেখা গেল তার বাঁ কানটার কিছু প্রদাহ হয়েছে, একটা মোটা আঁচড়ের দাগও দেখা গেল সেখানে। কানের পাশের একটা জায়গা থেকে একগোছা চুল সমূলে উৎপাটিত হয়েছে। এর কারণস্বরূপ সে বলল, ক্যাথীড্রালের কম্পাউণ্ডে সে তার দেশের একটি লোকের সঙ্গে কুস্তি লড়েছিল, সেই সময় এই সব ঘটেছে। প্রতিদ্বন্দ্বী তার চুল মুঠো করে ধরেছিল তাকে কাবু করার জন্য, আর সে সুরকির উপর পড়ে গিয়েছিল। এসব তারই চিহ্ন।

আমি এ বিবৃতিতে খুশি হতে পারলাম না। তার কথা সত্য মনে হল না। একটুখানি ভাবতেই মনে পড়ল নিহত স্ত্রীলোক নিশ্চয় মৃত্যুর সঙ্গে লড়াইয়ের সময় হাতে যা

পেয়েছে মুঠো করে ধরেছে। নবীনের মাথা থেকে এক গোছা চুল অদৃশ্য হওয়ার সম্ভাব্য কারণ এটাই। আমার এই অনুমান যদি সত্য হয়, তাহলে মৃতার হাতের মুঠোয় তার প্রমাণ মিলতে পারে। কাউকে কোনো কথা না বলে আমি সোজা ঘরের মধ্যে গিয়ে লাশ পরীক্ষা করলাম। দেখলাম ঠিক তার ডান হাতের মুঠোর তখনও এক গোছা চুল ধরা রয়েছে। এবং এ চুল আকারে, এবং বর্ণে নবীনের চুলের সঙ্গে মেলে। এতে কি প্রমাণ হয়? আমি মনে মনে বিচার করতে লাগলাম, নবীন মেয়েটিকে শুধু যে হত্যা করেছে তাই নয়, মেয়েটি নিহত হওয়ার সময় চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল, আর নবীন তার উপর ঝুঁকে পড়ে তার দম বন্ধ করে মারছিল। আর ঠিক এই কারণেই মেয়েটি তার ডান হাতে নবীনের বাঁ দিকের চুলের গোছা ধরতে পেরেছিল। মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য হত্যাকারীর সঙ্গে শেষ বারের মতন এই জাতীয় লড়াই স্বাভাবিক। আর নবীনের বাঁ কানে যে খোঁচা আঁচড়ের দাগ পড়েছে, সেও ঐ একই কারণে।

পুলিস সার্জন মৃতদেহ পরীক্ষা করলেন। আমি তখন তার হাতের শক্ত মুঠো থেকে খুব সাবধানে চুলের গোছাটি খুলে নিয়ে, ভাল করে ধুয়ে কাগজে সযত্নে জড়িয়ে রাখলাম, ভবিষ্যতে কাজে লাগবে বলে। নবীনের কাছে একটি চাবি পাওয়া গেল, এবং সে চাবি মৃতার ঘরের একটি তালায় লাগে। আমাকে তালায় চাবি লাগিয়ে পরীক্ষা করতে দেখে নবীন বলল, 'ওটা ক্যাথীড্রালের এক দরজার তালার চাবি।' পরে পরীক্ষা করে দেখা গেল এ কথাটা সত্য। কিন্তু ক্যাথীড্রালে যেখানে সে থাকত, তার গুদামে আসল চাবিটি পাওয়া গেল। ওখানে এ চাবি এলো কি করে, তার উত্তরে নবীন বলল, 'ঐ ঘরে আমার সঙ্গে কৈলাস বাস করত, সেই হয় তো চাবি ওখানে ফেলে গেছে। আমি এ বিষয়ে কিছুই জানি না। মনমোহিনীর কাছে কৈলাসই শেষ বার গিয়েছে।'

ক্যাথীড্রালের রক্ষকের কাছ থেকে আরও কিছু মূল্যবান তথ্য পাওয়া গেল। সে বলল, যে দিন হত্যা-কাণ্ডটি ঘটেছে বলে অনুমান করা হচ্ছে, সেই রাত্রে ওরা দুজনেই ক্যাথীড্রালে অনুপস্থিত ছিল। আগের দিন সন্ধ্যায় তারা তার কাছ থেকে ছুটি চেয়ে নিয়েছিল। সাধারণ ভাবে দুজনকে একসঙ্গে সমস্ত রাত্রির জন্য বাইরে থাকতে পারে না। তা হলে ধরা পড়ে যাবে। কারণ তাদের একটি কাজ হচ্ছে পালা করে রাত্রে গীর্জা পাহারা দেওয়া, আর রক্ষকের কাজ হচ্ছে মাঝে মাঝে দেখা যে তারা ঠিকমতন কর্তব্য করছে কি না। রাত্রে এ রকম দু একবার তাকে পর্যবেক্ষণ করতে হয়। কাজেই কেউ না থাকলে ধরা পড়ে যাবেই।

এবারে নবীনের কথা রেখে কৈলাস কি কি করেছে তা দেখা যাক। সে রাত্রের জন্য ছুটি নেওয়ার পর নবীনের সঙ্গে বেরিয়ে যায়, তারপর আর তাকে সেদিন দেখা যায় না। হত্যাকাণ্ড আবিষ্কারের পূর্বদিনের আগে পর্যন্ত তার দেখা মেলে না।

সেদিন রবিবার ছিল, তাই সে এসে গীর্জার প্রার্থনা -সভার ঘণ্টা বাজানোয় নবীনকে সাহায্য করে-ছিল। দুই দিন অনুপস্থিত থাকার কৈফিয়ৎ স্বরূপ সে বলল ক্যাথীড্রালের গেট বন্ধ করতে হাতে তার আঘাত লাগে, তাই সে দুদিন কাজ করতে পারে নি। এ কৈফিয়ৎ ক্যাথীড্রালের রক্ষকের বিশ্বাস হল, তাই এ বিষয়ে আর কোনো কথা উঠল না। কৈলাস কিন্তু সেই রাত্রেই আবার নিরুদ্দেশ হল। পুলিস অনুমান করল লবণ হ্রদের কাছাকাছি তার এক কাকা বাস করে, সে তার নিজেদের বাড়িতে না গিয়ে ঠিক সেইখানে গিয়ে উঠেছে। অতএব মধ্যরাত্রে কয়েকজন পুলিসের লোককে ছদ্মবেশে পাঠিয়ে দেওয়া হল। তারা সেই বাড়িটিকে বেষ্টন করে রইল এবং কয়েকজন ভিতরে গিয়ে কৈলাসকে গ্রেফতার করল। তাকে থানায় এনে যখন তাকে বলা হল, তার বিরুদ্ধে মনমোহিনী হত্যায় নবীনের সাকরেদরূপে কাজ করার অভিযোগ আনা হচ্ছে, তখন সে সেকথা ঝেড়ে অস্বীকার করে বসল। সে বলল, 'আমি এর কিছুই জানি না, সবাই জানে মেয়েটি নবীনের রক্ষিতা ছিল, আমি কদাচিৎ সেখানে গিয়েছি, গত একমাসের মধ্যে একবারও যাই নি। ক্যাথীড্রালে অনুপস্থিত থাকা বিষয়ে নবীন রক্ষকের কাছে যে কৈফিয়ৎ দিয়েছিল, এও সেই কৈফিয়ৎই দিল।

কৈলাসের ডান হাতের তিনটি আঙুলে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ছিল। আমি ব্যাণ্ডেজ খুলতে বললাম। দেখলাম তিনটি আঙুলেরই পিছন দিকে আগাগোড়া ছাল উঠে গেছে। জিজ্ঞাসা করলাম, কি করে হল? সে গীর্জার রক্ষকের কাছে যা বল-ছিল, আমাকেও তাই বলল। আমি তখন তাকে ক্যাথীড্রালে নিয়ে গিয়ে বললাম, আমাকে দেখাও ঠিক কিভাবে ঐ আঘাত লেগেছে। গেটের কাছে দাঁড় করিয়ে দিলাম। বললাম গেট বন্ধ করতে কিভাবে আঘাত লাগে তা আমি দেখতে চাই। কৈলাস খুব চাতুর্যের সঙ্গে এটি দেখাতে চেষ্টা করল। কিন্তু সে যেভাবে ব্যাখ্যা করল তা আমাকে খুব সন্তুষ্ট করতে পারল না। যেভাবে দেখাল, তাতে হাতের আঙুলে আঘাত লাগে ঠিকই, কিন্তু তাতে ওভাবে চামড়া উঠে যেতে পারে না, চাপ পড়ে শুধু কালসিটে পড়ে যেতে পারে।

এবারে আমি ওর হাতের আঘাতের কারণ অনুসন্ধানে নিযুক্ত হলাম। কারণ আমি মনে মনে বুঝতে পারছিলাম ঐ আঘাত হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত। আমি চলে গেলাম ঘটনাস্থলে। বাক্স থেকে মৃতদেহ সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু বাক্সটি ঐখানেই পড়ে ছিল। দেখলাম ডালাটা যে লোহার পাত দিয়ে চারদিকে মোড়া ছিল তা ডালা বন্ধ করলে বাক্সের গায়ে এক ইঞ্চি পরিমাণ নেমে যায়। আমার এখন মনে পড়ল যখন আমি এর ডালা তুলি, তখন মেয়েটির হাতের কনুই এবং কাঁধ চাপ থেকে মুক্তি পেয়ে অনেকখানি উঁচু হয়ে উঠেছিল। আরও একটু চিন্তা করতেই মনে হল কৈলাস বাক্সের ডালাটি যাতে সহজে বন্ধ করা যায় সেজন্য নিশ্চয় মৃতদেহটিকে খুব জোরের সঙ্গে ভিতরে চেপে রেখেছিল। তারপর ডালাটা বন্ধ করার জন্য যখন আরও চাপ দিচ্ছিল, সেই সময় ঐ লৌহ বেষ্টনীতে তার আঙুলের চামড়া এইভাবে উঠে গেছে। সেখানে চামড়া লেগে ছিল। তিনখণ্ড চামড়া তা থেকে তুলে ভিজিয়ে কাগজের উপর মেলে দিলাম। তারপর চামড়ার ঐ অংশগুলি নিয়ে কৈলাসের আঙুলের তিনটি ক্ষতস্থানে রেখে দেখলাম সম্পূর্ণ মিলে যাচ্ছে।

ক্যাথীড্রাল থেকে কৈলাস নিরুদ্দেশ হয়েছিল, নবীন হয় নি, এটি অনেকের কাছে বিস্ময়কর বোধ হতে পারে। কারণ সমস্ত ঘটনা এবং সাক্ষ্য ইত্যাদি থেকে নবীনকেই হত্যাকারী মনে হবে। অথচ সে পালায় নি কেন? এর কারণ সম্ভবত এই যে নবীনের কিছু সম্পত্তি ছিল, তাতে সে নিরুদ্দেশ হলে তার ক্ষতি হত। কৈলাস ছিল নিঃস্ব, তার হারাবার কিছু ছিল না। হত্যার দায় নিজের ঘাড়ে নিয়ে কৈলাস লুকিয়ে থেকে বিচার এড়াতে পারবে ভেবেছিল। এতে নবীনকে আর কেউ সন্দেহ করত না। আর এজন্য নবীনের কাছ থেকে সে অনেক টাকা খেয়েছিল। এই হচ্ছে আমার অনুমান। পাঠক অন্য অনুমান করতে পারেন। এই কেসটার আর একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে। হত্যাটি পূর্ব-পরিকল্পিত, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এর পরের প্রশ্ন হচ্ছে: মৃতদেহটি বাক্সের মধ্যে রাখা হল কেন? কারণ এভাবে ফেলে রাখলে তো ধরা পড়তেই হবে? আমার যা মনে হয় তা এই—

ওরা ভেবেছিল হত্যার রাত্রিতেই ওখান থেকে সব সরিয়ে ফেলবে এবং পুকুরে বা নদীতে নিয়ে সবশুদ্ধ ডুবিয়ে দেবে। কিন্তু যখন দেহটি বাক্স থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল, এবং ডালার কব্জা খুলে এলো, তখন এ পরিকল্পনা তাদের ছাড়তে হল। এদিকে সকাল হয়ে আসছিল, তাই তারা 'যা হয় হোক' মনে করে অগত্যা ওখান থেকে সরে এলো।

তদন্ত শেষ করে কেসটি যথাযথ ভাবে দক্ষিণবিভাগের ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাশে দেওয়া হল। নবীন ও কৈলাস ইচ্ছাকৃত নরহত্যার দায়ে অভিযুক্ত হল। তারপর পরবর্তী হাইকোর্টের অধিবেশনে এদের বিচার আরম্ভ হল। এদের পক্ষের উকিল খুব কৃতিত্বের সঙ্গে এদের সমর্থন করেছিলেন, এবং অসামীরা যে নির্দোষ, শেষ পর্যন্ত সেটাই ঠিক ছিল। কিন্তু স্পেশাল জুরী খুব জোরালো গৌণ প্রমাণের উপর নির্ভর করে দুজনকে হত্যা অপরাধে অপরাধী স্থির করলেন, এবং তার ফলে দুজনেরই চরম দণ্ড হল।

১৮৬৮ সালের ১১ই ডিসেম্বর সকালে বড় জেলের সম্মুখে এদের ফাঁসি হয়।

পুলিস সার্জনের রিপোর্ট

হরি সিং সাক্ষ্য দেবার সময় বলেছিল, গলা চেপে ধরলে যেমন আওয়াজ হয় তেমনি আওয়াজ তার স্ত্রী শুনতে পেয়েছিল। শ্বাসরোধ করেই মেয়েটিকে মারা হয়েছিল তা পোস্ট-মর্টেম বা মরণোত্তর পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে। স্পেশাল জুরীর কাছে পুলিস সার্জন যে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তা এইরূপ—

পুলিস সার্জন ডাক্তার উডরব শপথ গ্রহণান্তে বললেন—'আমি পুলিস সার্জন। ৮ই তারিখে আমি মনমোহিনী নামক এক দেশী স্ত্রীলোকের মৃতদেহ দেখি। সে সময়ে এটি একটি ছোট বাক্সে (বাক্সটি দেখানো হল) চেপে ঢোকানো ছিল। প্রথম আমি এটিকে কলভিনের বস্তীর একটি কাঁচা ঘরের মধ্যে দেখি। এই বস্তী সার্কুলার রোডে অবস্থিত। দরজার চৌকাঠ ও বাক্সের মধ্যবর্তী স্থানে মেঝের উপর আমি রক্তাক্ত ফেনা দেখতে পাই। আমার মতে এই ফেনা ঐ মৃত স্ত্রীলোকের নাক মুখ এবং কান থেকে বেরিয়েছে এবং বাক্স থেকে গলে বাইরে এসেছে। বাক্সটি বাইরে এনে অনেক কষ্টে দেহটিকে তা থেকে বার করা হয়। পরে আমি মেডিক্যাল কলেজ হস্পিটালের মড়া-ঘরে ঐ একই শবদেহ দেখেছি। এবং আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মরণোত্তর পরীক্ষা শেষ করেছি। আমার মতে দেহের মৃত্যু ঘটেছে দুই থেকে চার দিনের মধ্যে (এর চেয়ে সঠিকভাবে সময় বলা কঠিন)। আমি যখন মৃতদেহটি দেখেছি এ সময়টা তারই পূর্বেকার। মৃতদেহ তিন দিন পরে যেমন চার দিন পরেও প্রায় সেই রকমই দেখায়। এবং শবদেহ কি অবস্থায় রাখা হয়েছে, কি রকম তাপে রাখা হয়েছে তার উপর তার পরিবর্তন নির্ভর করে। অর্থাৎ এই সব

অবস্থার বদলে মৃতদেহের অনেকখানি বদল ঘটে। আমি দেহটিকে গলিত অবস্থায় দেখতে পাই। অনেকখানি পচনক্রিয়া তাতে আরম্ভ হয়ে গেছে। চোখ বেরিয়ে এসেছে, দাঁত থেকে জিভ প্রায় এক ইঞ্চি, বাইরে বেরিয়ে এসেছে। জিভ দাঁতে চাপা ছিল। গলার শ্বাস-নলী থেকে বাঁয়ের দিকে চার ইঞ্চি পরিমাণ, দীর্ঘ একটি অনুভূমিক ব হোরিজণ্টাল রেখা চিহ্ন লক্ষ করেছি। পচন শুরু হওয়াতে মগজ নরম হয়ে পড়েছে। দুটি ফুসফুস, যকৃৎ এবং বৃক্কতে অতিরিক্ত রক্ত জমেছে দেখতে পাই। হৃৎপিণ্ডের ডান দিকে রক্ত দেখতে পাই, বাঁ দিকে কোনো রক্তই দেখতে পাই না। পাকস্থলীতে যে ভাত দেখতে পাই তা মৃত্যুর তিন চার ঘণ্টা আগে খাওয়া হয়েছে, তার বেশি নয়। দেহটি যুবতীর, মৃত্যুর সময় তার স্বাস্থ্য অটুট ছিল। আমার মতে সে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা পড়েছে। মৃত্যু ঘটাতে পারে এমন কোনো দেহাভ্যন্তরস্থ অসুখের সন্ধান আমি পাই নি। শ্বাসরোধের চিহ্ন হচ্ছে—গলার চিহ্ন, চোখ গর্ত থেকে বেরিয়ে আসা, জিভ ঝুলে পড়া, দাঁতের চাপে যেমন ছিল, এবং ফুস-ফুসদ্বয় রক্তে ভরে থাকা। শ্বাসরোধেই যে মৃত্যু আমার সে অনুমানের এই-গুলিই হচ্ছে কারণ। আমি এই মৃত্যুর অন্য কোনো কারণ অনুমান করতে অক্ষম। যেসব শ্বাসরোধজনিত মৃত্যু নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে, সেসব দেহে আমি এর চেয়েও বলপ্রয়োগের চিহ্ন কম দেখেছি।

মিস্টার মিয়রফিল্ডকে :—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, মৃত্যু শ্বাসরোধের পরে ঘটেছে এবং দেহটিকেও মৃত্যুর পরে বাক্সবন্দী করা হয়েছে। এতটা ছোট একটা বাক্সে দেহটি ঢোকাতে বেশ শক্তির দরকার হয়েছে। গলায় যে চিহ্ন দেখা গেছে তা দড়িতে ঘটেছে, আঙুলের চাপে নয়। এই দড়ি (দড়ি ঐ বাড়িতে পাওয়া, পুলিস-কর্তৃক সামনে উপস্থাপিত করা হল)—এই দড়ি যদি গলায় বেষ্টন করা যায় এবং টেনে ধরা যায়, তা হলে শ্বাসরোধ হবে, এবং আমি যেমন দেখেছি তেমনি চিহ্ন পড়বে। মৃতদেহের ডান হাতে মুঠোয় এক গোছা কালো চুল ধরা ছিল।

বিচারকের প্রতি :—চিহ্ন রেখার আকারের, উপরের দিকে উঠে যায় নি যেমন ফাঁসিতে ঝুললে দেখা যেত।

(আসামীরা ডাক্তারকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে নি।)

(ক্রমশঃ)

চুল পাকছে?
চুল পড়ছে??
চুল রুক্ষ হচ্ছে???

বেঙ্গল কেমিক্যালের
ক্যান্থারাইডিন
হেয়ার অয়েল
মেখেই দেখুন না ...

বয়স আপনার যাই হোক না কেন, এর ব্যবহারে মাথা ঠাণ্ডা রাখে—চুল হয়ে উঠে পরিপুষ্ট—চিক্কণতা ও কমনীয়তা বাড়ে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর • দিল্লী

শ্রীপতি সওদাগর

বানিজ্যে সেকাল ও একাল

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ সপ্তবিংশতি প্রবাহ ॥

হ্যামিল্টন।
টাভার্নিয়াব।
ভ্যালেণ্টাইন।

আরো বহু পরিব্রাজক-ঐতিহাসিকদের ভ্রমণবৃত্তান্ত বাংলার সপ্তদশ শতাব্দীর ইতিহাসের অন্ধকারে দপ করে আলো জ্বালিয়ে দেয়। তাঁদেব ডায়েরীর মত করে লেখা বিবরণের ভেতরে দেশেব সমাজজীবনেব নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায়। একালেব ভ্রমণকারীদের মত তাঁদের ভ্রমণের ভেতরে কোন স্বার্থ ছিল না। দু'চোখ ভরে যা দেখেছিলেন, তারই বাস্তবনিষ্ঠ বর্ণনা দিয়েছিলেন। তাই—

তাই আমরা আকুল আগ্রহে খুঁজে দেখি এই বিশ্ববিখ্যাত পরিব্রাজকদের লেখার ভেতরে কোথায় আছে তথ্য, কোথায় আছে মোগল যুগের ব্যবসাব ও বাণিজ্যের ইতিবৃত্ত।

টাভার্নিয়ারের এবং ভ্যালেণ্টাইনের মতই আরও একজন—গ্যামেলী কারিয়াব। সন ১৬৯৫। এসেছিলেন কাবিযার। তাঁর লেখাব ভেতরে বাংলার পটভূমি থেকে পর্তুগীজদের বিদায়-যাত্রাব পদধ্বনি শোনা যায়।

Portugeese further subdued. আর কি লিখেছেন। লিখেছেন তাম্রলিপ্তের অতীত গৌরবের কথা, লিখেছেন সুদূরকালেব বাংলার বাণিজ্যিক ইতিবৃত্তের কথা। তিনি স্পষ্টই লিখেছেন, Tambulin is the trade center of Bengal. আরও বিচিত্র কথা বলেছেন, বলেছেন, 'Tamluk also appears to have been a slave market.'

তাম্রলিপ্ত থেকে বাঙলার পণ্য নিয়ে দূর সমুদ্র পাড়ি দিত বড় বড় জাহাজ। কিন্তু শুধু কি পণ্য নিত? সাহাবুদ্দিন তালিবের লেখায় সেই কালের তাম্রলিপ্তের এক অদ্ভুত চিত্র পাওয়া যায়। তালিবের লেখা পারসী ভাষায় লেখা। কিন্তু ভাষার ব্যবধানকে এড়িয়ে, দূরকালের বিস্মৃতির কুয়াশার ভেতর থেকে এক বেদনামেদুর ছবি ফুটে ওঠে।

সে ছবি অস্পষ্ট।
বেদনায় ম্লান।
কান্নার আবেশে ভার ভার।

শত শত শতাব্দী পূর্বে তাম্রলিপ্তের বন্দরে কুয়াশায় মুখ ঢেকে শীতার্ত রাত্রি নেমেছিল। যতদূরে তাকানো যায় আদি-অন্তহীন দুর্ভেদ্য কুয়াশা। মনে হয়, প্রাগৈতিহাসিককালের বিশাল কোন জন্তু পৃথিবীজুড়ে গুড়ি মেরে শুয়ে আছে।

তাম্রলিপ্তের ঘাটে জাহাজে জাহাজে আলো জ্বলছিল। কুয়াশায় মুখ ঢাকা

আলোগুলোকে মড়ার চোখের মত নিষ্পলক আর কেমন পাণ্ডুর মনে হচ্ছিল।

সেই শীতজর্জর মধ্যরাত্রে সুষুপ্ত বন্দরের ঘাটে কয়েকটি ছায়াদেহের আভাস ফুটে উঠল। কারা যেন সেই নিশিরাতে অভিশপ্ত প্রেতমূর্তির মত ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের তীক্ষ্ণ আকুল দৃষ্টি রাত্রির সমুদ্রের দিকে স্থিরনিবদ্ধ। না—না—কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না। শুধু—

মত্ত হাওয়ার গর্জন।

সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ।

সারি সারি জাহাজ কাঁপছে।

বালুচর কাঁপছে। কাঁপছে দূর দিগন্ত। —আর নিঃসীম ঘন অন্ধকার। নিশাচর ছায়ামূর্তিরা যারাই হোক—তারা হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছিল। হঠাৎ একজন ঘুরে দাঁড়ালো।

—ওই তো—আ রে ওই তো দেখা যাচ্ছে—

—কি?

—আলো—

—জাহাজের আলো?

—মনে হচ্ছে।

উল্লাসে তাদের চোখমুখ চকচক করে উঠল। তারা বন্দরের সদরঘাট থেকে একটু দূরে নিরিবিলি দেখে বসল। আর, কুয়াশার ঘন আস্তরণের ভেতর থেকে একটু একটু করে একটা আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল।

আলো।

বিচিত্র পণ্যে বোঝাই রাত্রিচর সেই জাহাজের আলো।

নিঃশব্দে নোঙর করল।

আবার চারিদিক প্রেতায়িত স্তব্ধতায় থমথম করতে লাগল। হঠাৎ সেই ঘন নিস্তব্ধতার ভেতর থেকে কার যেন চাপা কান্নার স্বর শোনা গেল।

কে কাঁদছে।

কারা কাঁদছে।

কান্নার শব্দের ভেতরে যেন অনেক দিনের আর অনেক কালের ব্যথা পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। এই শব্দ শুনে কিন্তু পাড়ের লোকগুলো খুব খুশি হয়। কিন্তু বেশিক্ষণ দেরি করার সময় নেই। জাহাজের ওপর থেকে পাটাতন ফেলে দেওয়া হলো জেটির ওপরে।

নেমে এল একজন।

নেমে এল তরতর করে জাহাজ থেকে।

পাড়ের সেই লোকগুলো তাকে ঘিরে ধরে দাঁড়ালো। দশ-বারোটা মাথা ঝুঁকে এল। বাতাসে ষড়যন্ত্রের চাপা ফিসফিসানি ফুটে উঠল।

—মাল কেমন আছে?

—খুব ভাল। একেবারে সরেস। টাকা ফেল। এনে দিচ্ছি।

গুণে গুণে তার হাতে টাকা দেয়। পাশে দাঁড়ায়। অপেক্ষা করে। কখন এখানকার সকলের সঙ্গে কথা শেষ করে জাহাজের লোকটা জাহাজে ফিরে যাবে। আর সে তার মনের মত জিনিস পাবে। বাড়িতে কাজের লোক নেই। দূরদেশের এই মানুষগুলো বেশ শক্ত-সমর্থ হবে। কিছু টাকা দিয়ে একবার কিনে নিতে পারলে নিশ্চিন্ত বহুদিনের মত।

—আপনার কি চাই—

—ছেলে। অল্পবয়সী ছেলে।

—আচ্ছা। দামও কম লাগবে।

বুড়ো খরিদ্দার টাকা গুণে দিতে দিতে খুশি হয়। আর বলে, কেউ নেই বাবা। সব মরে-হেজে গেছে। বুড়োর তাও একটা অবলম্বন হলো—

—আপনার?

কথা বলে না লোকটা। মুখে সঙ্কোচের ছায়া পড়ে। বুড়োআঙুল দিয়ে মাটি খোঁটে।

—বুঝতে পেরেছি—

দ্রুতপায়ে জাহাজে ফিরে যায় দাসব্যবসায়ীদের সেই প্রতিনিধি। ফিরে আসে আবার। কিন্তু একা নয়। সঙ্গে এক অবগুণ্ঠনবতী। থর থর করে কাঁপছে পা দুটো।

ঘোমটা খুলল। আর ক্রেতার চোখে স্তব্ধ বিস্ময় নেমে এল। আর বেশি দেরি করল না। চটপট তাকে নিয়ে পাল্কীতে তুলল। দেখতে দেখতে ক্রেতারা যে-যার পছন্দমত দাসদাসী কিনে নিয়ে চলে গেল।

আকাশে ভোরের রেখা জাগল। বন্দরে জীবনের আভাস একটু একটু করে ফুটে উঠল। পরদিন সেই জাহাজ

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ
প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর
বেজওয়াড়া - শ্রীনগর - গৌহাটী

থেকে নামছে সুগন্ধী মশলা। নামছে রঙীন সুতো। তারা কিনছে ধান, চাল, চিনি।

রাত্রির দুঃস্বপ্নের মত তারা মুছে ফেলেছে সব গ্লানি—দাসব্যবসার যত কিছু ক্লেদ। তারা যেন ভদ্র, অতি-সজ্জন বণিক। ধান, চাল, মশলা কেনা-বেচা করছে। কিছুই জানে না।

শুধু গ্যাব্রেলী কারিয়ারের ডায়েরীতে নয়, শাহাবুদ্দিন তালিবের পারসীতে লেখা ইতিহাসে নয়, এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নাল অফ বেঙ্গলেও বলে—

"Selling of slaves was done through this intermediary man."

কয়েকদিন পর।

তাম্রলিপ্ত বন্দর ছেড়ে চলে যেত সেই বিচিত্র পণ্যবাহী জাহাজ। আবার কালিকট কি গোয়া আরও—আরও কোন দূর দেশের বন্দরে চলে যেত। আবার রাত্রির অন্ধকারের আড়ালে চলতো সেই ভয়ঙ্কর, সেই সর্বনাশা পণ্যের বেসাতি। এমনি করে—

এমনি করে তারা বণিকের ছদ্মবেশে এই হীন, এই জঘন্য দুষ্কার্য করে যেত। আর সমুদ্র উপকূলের কত নিভৃত শান্তরসাস্পদ জনপদ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসতো মনোরম পুষ্প-লতিকার মত সুঠামতনু কত নারী, শালপাংশু কত বলিষ্ঠ যুবক। যেন মাটির বুক থেকে দৈত্যের মত উপড়ে উপড়ে নিয়ে আসতো নরম-স্নিগ্ধ-শ্যাম-দুর্বাদল—আর কোন দেশের মানুষের লালসার আগুনের ভেতরে ঘৃতাহুতি দিত।

আজকের বঙ্গোপসাগরের হু-হু বাতাসে আর অশ্রান্ত গর্জনে যদি কান পাতা যায়, তাহলে হয়তো শোনা যাবে—

শোনা যাবে অনেক নারী-পুরুষের উতরোল আর্তনাদ। বহু—বহু যুগের ওপার থেকে ভেসে আসছে সেই কান্না। আর চোখের সামনে ভেসে উঠবে একটি দৃশ্য।

বিচিত্র অদ্ভুত সেই দৃশ্য।

সমুদ্রের ঢেউ কেটে কেটে সওদাগর-দের জাহাজ চলছে। কোন নিকটবর্তী বন্দরের দিকে যাচ্ছে। দ্রুত তার গতি। বাইরে আছে কোন পণ্যের বস্তা। বেশ সুন্দর করে সাজানো আছে। কিন্তু যে বন্দরে পৌঁছোবে সেখানকার কোন জনপ্রাণী জানতে পারবে না, চিনি কি ধানের পণ্য নয়। অনেক—অনেক কান্না, অনেক দীর্ঘশ্বাস, অনেক আর্তনাদকে রহন করে নিয়ে এসেছে দূরদেশের বিদেশী জাহাজ। আজ—

আজ সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলার বাণিজ্যের ইতিবৃত্ত বলতে বসে মনে হচ্ছে—মনে হচ্ছে, এই এদেশের মাটিতে কত যুগ—কত কাল থেকে কত মানুষ এসেছে, কত জাতি এসেছে। কত রক্তের সংমিশ্রণ হয়েছে বাংলা দেশের যুগ-যুগান্তরের নরবংশের স্রোতের সঙ্গে। তাই—

তাই বুঝি বাঙালীর আকৃতি, বাঙালীর চিন্তা, বাঙালীর মানসিকতা, বাঙালীর রুচি, বাঙালীর ধ্যান-ধারণার ভেতরে যত বৈচিত্র্য, যত বৈশিষ্ট্য এত পৃথিবীর আর কোন দেশের কোন জাতির নেই। একথা বিখ্যাত নৃ-তত্ত্ববিদরা বলেন, বলেন চিন্তাশীল মনীষীরা। কিন্তু—

কিন্তু রক্তের মিশ্রণ হয়েছিল কেন, তার কারণ খুঁজতে হলে যেতে হবে সভ্যতার আদিমতম যুগে। মানুষ এক দেশ থেকে আর এক দেশে এসেছে লোভের আকর্ষণে। অর্থের লোভ, সম্পদের লোভ, ঐশ্বর্যের লোভ। অর্থাৎ—

বাণিজ্য।

সভ্যতার প্রথম পদক্ষেপ।

(ক্রমশঃ)

"আমার জনসেবার জীবন-অধ্যায়ে বরাবরই আমি বিশেষভাবে অনুভব করে এসেছি যে যদিও ভারতমাতা পূর্ণ স্বরাজ অর্জন করবার শক্তিতে সর্বতোভাবে যোগ্যা হয়ে উঠেছেন, তথাপি তাঁর একটা বিশেষ অভাব ছিল—তা হচ্ছে ভারতীয় মুক্তিবাহিনী আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের নায়ক জর্জ ওয়াশিংটন বিজয় পতাকা উড্ডীন করতে সমর্থ হয়েছিলেন, কারণ তাঁর পশ্চাতে ছিল এক প্রবল সামরিক বাহিনী। গ্যারিবল্ডীও ইটালীয় গগনে স্বাধীনতাসূর্যের উত্থান ঘটিয়েছিলেন তাঁর সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর মাধ্যমেই।

আজ তোমাদেরও পরম সৌভাগ্য ও গৌরবের কথা যে তোমরাই এগিয়ে এসে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর প্রথম সংস্থা গঠন করে তুললে। যে সকল সৈনিকগণ তাদের জাতির প্রতি চিরকাল বিশ্বস্ত হয়ে থাকবে, সকল অবস্থাতেই কর্তব্য যথারীতি পালন করে চলবে ও সর্বদাই আত্মবিসর্জনের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকতে পারবে, তারা অপরাজেয় বাহিনীর গৌরব লাভের অধিকারী হবেই। তাই তোমাদের অন্তরের গভীরতম প্রদেশে এ তিনটি আদর্শই ক্ষোদিত করে রাখবে।

তোমাদের নৈশান্ধকারজনক পরিস্থিতি ও উজ্জ্বল দিবালোকিত পরিবেশে, তোমাদের সুখ-দুঃখে, তোমাদের নির্যাতন নিপীড়নে, তোমাদের বিপর্যয় ও জয়ের সন্ধিক্ষণে আমি তোমাদের পার্শ্বেই সর্বদা থাকব—এ প্রতিশ্রুতির কথা আজ তোমাদের কাছে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করছি। তোমাদের এ ত্যাগ-স্বীকারের বিনিময়ে বর্তমানে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দুঃখ, সামরিক অভিযানের প্রেরণা ও মৃত্যু—এ কয়টি উপহার ছাড়া আমার আর কিছু দেবার মত নেই। ভারত-ভূমিকে স্বাধীন অবস্থায় দেখবার জন্যে আমাদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত কে বেঁচে থাকবে-না-থাকবে—এ নিয়ে মাথা ঘামাবার আজ দরকার নেই। আমাদের পক্ষে আজ এ চিন্তাই যথেষ্ট—, ভারতমাতা স্বাধীন হবেন এবং তাঁর শৃঙ্খল মোচন করতে আমরা সব কিছুই উৎসর্গ করব।"

—নেতাজী

আঁধার মানিক

ধারাবাহিক উপন্যাস

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ সাতাশ ॥

বড় দু:সংবাদ আনল হরকরা। কাটোয়া নগরীর দু:সংবাদের সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয় নয়। তার আগে বর্গীর দল হানা দিয়ে গিয়েছে নগরে। স্বরকণ্ঠ অন্য পথে স্নানে গিয়েছিলেন, শহরের দু:খদুর্দশার ছবি তাঁর চোখে পড়ে নি।

পরে শুনলেন উপকণ্ঠ দিয়ে বর্গী চলে গেছে। ক্ষেত-খামার, শস্যের গোলা সব পুড়িয়ে দিয়ে গেছে। মুখোমুখি যুদ্ধ নয়, উত্যক্ত করে মারাই বর্গীদের উদ্দেশ্য।

যা হোক, নবাব এখন মুর্শিদাবাদের দিকে যান, বর্গীরা আপাতত উধাও। এখন আবার কি দু:সংবাদ এল ভেবে পেলেন না স্বরকণ্ঠ। তবে যে-রকম তড়িদগতিতে ডেরাডাণ্ডা তুলে আবার যাত্রার আয়োজন স্থরু হল, তা দেখে আশ্চর্য হলেন। তিনি বক্সীদেওয়ানকে বললেন 'আপনার যদি সময় না হয়, তবে এখন ছুটি দিন আমায়।'

বক্সীদেওয়ান যেন চমকে উঠলেন। তাঁর মুখ প্রায়সময়ে ভাবলেশহীন থাকে, নবাবের কানাত থেকে ঘুরে আসবার পর একেবারেই পাথরের মত, গম্ভীর। তিনি বললেন 'এখন ছুটি দিতে পারি না আপনাকে।'

'কেন?'

বক্সীদেওয়ান আস্তে আস্তে যেন আপন-মনে বলতে লাগলেন, 'যে প্রভু মানমর্যাদা বোঝেন, তাঁর জন্যে প্রাণ দিতে ইচ্ছে করে। এখন, এ বিপদে আমি সরে যেতে পারব না।'

'আপনি যান, আপনার প্রভুর জন্যে প্রাণ দিন গিয়ে। আমাকে মিছে আটকে রাখেন কেন?'

'কোথায় যাবেন আপনি?'

'যেখানে হয়। আমার কাছে সব অবস্থাই সমান এখন, পথই আমার ঘর।' এ-কথা বলতে বলতে স্বরকণ্ঠের মনে পড়ল আঁধারমাণিক ছেড়ে আসার সময়ে তাঁর মনে মনে প্রতিজ্ঞা ছিল যেমন করে হোক বিষয়-বৈভব করবেন, নইলে লোকের কাছে মান্য নেই। সন্ন্যাসীকে ভক্তি করে মানুষ, সে পোষাকী ভক্তিটুকু দেয়। সব সময়ের ভক্তিটুকু, মান্যটুকু দেয় বিষয়ীকে, সংসারীকে।

এখন সে-কথা মনে পড়তে হাসি পেল। হাসলেন স্বরকণ্ঠ। বক্সীদেওয়ান তাঁর হাসি দেখে দু:খিত হয়ে বললেন, 'এখন বড় সঙ্কটের সময়। আপনি কি আমার কথা শুনে হাসলেন? আমি কি মূর্খের মত কথাটা বলেছি?'

'না। আমি হেসেছি নিজের কথা মনে করে।' স্বরকণ্ঠ দেখলেন বক্সী দেওয়ান বড় বিষণ্ণ, বড়ই চিন্তাকুল, তাই নিজের মূর্খতাব কথা শুনিয়ে সান্ত্বনা দিলেন। বললেন, 'জানেন, আমি ভেবেছিলাম, বিষয়-বৈভব থাকলে আমি মানুষের কাছে আরো মান পাব।'

এ-কথা শুনে বক্সীদেওয়ান প্রথমটা বড়ই চিন্তিত হলেন। তিনি হচ্ছেন সেই জাতের লোক, যাঁদের ঐশ্বর্য, প্রতিপত্তি, বিষয়-সম্পত্তি, এ সবের আকাঙ্ক্ষা মিটতে চায় না। কিন্তু সাধুসন্নেসী, ফকির দরবেশকে নিদারুণ শীতে গায়ে সামান্য ভোটকম্বল দিতে দেখলেও তাঁরা বলেন, 'দেখেছ, লোকটা গেরুয়া পরার যোগ্য নয়, এমন বিলাসী।' বক্সীদেওয়ানের ধারণা গেরুয়াধারী সাধুসন্ন্যাসীর জীবনধারণের একমাত্র উদ্দেশ্য হল তাঁর মত বিষয়ী পুরুষকে সাহায্য করা। সুরকণ্ঠকে নির্লোভ জেনেই তাঁর ভক্তি আরো দ্বিগুণ হয়েছে।

'ঠাট্টা করেন কেন? আপনি একবার চাইলে কত ঐশ্বর্য আপনার পায়ের নিচে গড়াগড়ি যায়।'

সুরকণ্ঠ নিশ্বাস ফেললেন। বললেন, 'আমি কি করব ও-দিয়ে? তবে দেখলাম টাকা থাকলে অনেককে সাহায্য করা যায়, মানুষকে সেবা করা যায়।' কেন যেন হঠাৎ মনে পড়ল সুরপতি আচার্যের কথা। ওর বোনটি যখন আত্মহত্যা করে সমাজের লাঞ্ছনায়, তখন তাঁর মনে হয়েছিল অনেক টাকা থাকলে হয়ত এমন কাণ্ড ঘটত না। ওদের ভাই-বোনকে পাঠিয়ে দিতে পারতেন বিদেশে।

বক্সীদেওয়ান এখন আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন। 'আপনাকে ছেড়ে দিতে পারব না। এখন যদি ছেড়ে দিই ঠাকুর, তাহলে আপনি হয় বর্গীর হাতে নয় আমাদের সৈন্যের হাতে মারা পড়বেন।'

একথার উত্তরে সুরকণ্ঠ তাচ্ছিল্য-সূচক শব্দ করলেন। বললেন, 'এই জন্যে টাকাঅলা লোককে দূরে রেখে হাঁটি আমি।'

'আমার কি অপরাধ হল?'

'আমার আয়ু যখন ফুরোবে তখন মারা পড়ব আমি, সময় থাকতে বর্গীর সাধ্য কি আমায় মারে?'

'এত এত লোক মরল তাদের কি সময় হয়েছিল?'

'কে বললে হয় নি?' সুরকণ্ঠের কণ্ঠ গম্ভীর, চোখের দিকে চাওয়া যায় না।

'তুমি কি জান, আমি কি জানি? যিনি এত এত জীব গড়েছেন, তিনি নিতে না চাইলে বর্গীর সাধ্য কি এ দেশে আসে? তাঁর ইচ্ছা বিনা জেন, কিছুই হয় না এ সংসারে, গাছের পাতাটি অবধি নড়ে না।'

তাঁর সতেজ ভর্ৎসনা শুনে বক্সীদেওয়ান কাতর হন, সুরকণ্ঠের হাঁটুতে হাত রাখেন। বলেন, 'তাই না হয় হল। কিন্তু এখন কেমন করে তোমার ছেড়ে দিই ঠাকুর? তুমি এলে, আমার কত বড় সৌভাগ্য। একদিন যত্ন করতে অবধি পারলাম না। তোমার বয়স অল্প হলে কি হয়, মুর্শিদাবাদে যেদিন থেকে তোমায় জেনেছি, সেদিন থেকে ভক্তি করি। এ বাপের বয়সী ভক্তের কথাটা রাখ, আমার সঙ্গে চল। রাজধানী থেকে তোমায় সম্মান দিয়ে পাঠিয়ে দেব দেশে, যেখানে যেতে চাও সেখানে, এমন করে মিনতি করতাম না তোমায়, কিন্তু বিশ্বাস কর, এখন বড় দুঃসময়।'

ভগবানের লীলা বড়ই বিচিত্র। নবাবের বক্সীদেওয়ান, যিনি খেতাবে রাজা, ক্ষমতায় ছোটখাট আর এক নবাব, স্বভাবে ঘোর বিষয়ী, এখন কাটোয়ার শিবিরে বসে, আর এক-বার যুদ্ধযাত্রার সূচনায় হঠাৎ তাঁর মনে স্নেহ, উৎকণ্ঠা, মমতা জাগে। মনে হয় সুরকণ্ঠ যত জ্ঞানী, যত গুণীই হোন না কেন, বয়সে তাঁর চেয়ে ছোট, সংসারের একদিককার অভিজ্ঞতা তাঁর নেই।

'তুমি যেতে চাইলেই যেতে দিতে পারি না আমি।' ব'লে আস্তে আস্তে বক্সীদেওয়ান তাঁকে বলতে লাগলেন ইতোমধ্যে কি ঘটে গেছে।

বললেন, 'একথা এখানে বসে বলবার নয়। চলুন, আড়ালে যাই।'

কিন্তু আড়ালে যাবার সময় আর হল না। তার আগেই ভেরী বাজল, বাজনার শব্দ জানিয়ে দিলে কাটোয়ার ক্ষণিক বিশ্রামের পর্ব শেষ। হাতী, ঘোড়া, তাঁবু, কানাত, সার সার রসদবাহী গরুর গাড়ি, উটের গাড়িতে গোলাবারুদ, আবার সুরু হল ব্যস্ততা, সামনে যেতে হবে।

এখন কাটোয়ার সম্মানী গৃহস্থ, দীনদরিদ্র, ব্যবসায়ী, দোকানী, সবাই এসে কতই মিনতি জানাতে লাগল বক্সীদেওয়ানের কাছে। 'আরে আরে, সর সর' ব'লে সৈন্যরা বাধা দিলে কি হয়, তারা সৈন্যদের মধ্য দিয়ে ছুটে এল। পলিতকেশ বৃদ্ধ, নামাবলী গায়ে ব্রাহ্মণ, একবস্ত্র সম্বল সাধারণ নাগরিক, তাদের এ অবস্থায় দেখে সুরকণ্ঠের মনে বড়ই কষ্ট হল। তিনি স্বগত বললেন, 'কাল যুদ্ধ। গৃহস্থে-ভিখিরীতে, বামুনে-বাগদীতে তফাৎ রাখলে না কোন।' লোকগুলির মুখে-চোখে হতাশা, ভয়, প্রাণের আশঙ্কা লেখা ছিল, তা দেখে এখন সুরকণ্ঠের বুকের নিচে কে যেন তপ্ত লোহার শলা দেগে দেয়।

তারা এসে কাতরে মিনতি করে। বলে, 'বর্গীরা এসে একবার বাইরে থেকে হানা দিয়ে গেছে। গোলা ভেঙে যা পেরেছে নিয়ে গেছে, যা নিতে পারে নি আগুন দিয়ে গেছে। আমরা তোমাদের প্রজা। তোমরা এলে ব'লে নিশ্চিন্ত ছিলাম, এখন আমাদের রেখে কোথা যাও?'

'এদের রক্ষার্থে সৈন্য রেখে যাওয়া যায় না?' সুরকণ্ঠ প্রশ্ন করেন।

'না। এখন বর্গীর হাঙ্গামা সর্বত্র। কত জায়গায় সৈন্য মোতা-য়েন রাখা যাবে? আর রেখে এলেই যে এরা যুদ্ধ করবে তা মনে করবার কারণ কি? বর্দ্ধমানে সৈন্যরা ভয়

পেরে চলে এসেই গোলমালটা বাধায়।'

বক্সীদেওয়ান মাথা নাড়েন। বলেন, 'যার যার সৈন্য, তার তার অনুগত। এখানে পাহারা দেয়, এত সৈন্য এখন কারো হাতে নেই। থাকবার কথা নয়। উড়িষ্যা থেকে ফিরবার সময়েই আগে আগে পাঠিয়ে দেওয়া হয় সৈন্য, সেপাই, হাতী, সব। কে জানত এদিকে এই বিপদ অপেক্ষা করে আছে।' তাঁদের কথা বলতে দেখে লোকগুলির বড়ই ভয় হয়। তারা কাতরে বলে, 'দয়া হবে না দয়াময়? তাহ'লে আমরা কোথায় যাব?'

এখন বক্সীদেওয়ান তাদের বুঝিয়ে বলেন, 'বাপুসকল, তোমরা এখন যে যার মত সাবধানে থাক গে। বর্গীরা এখন সত্বর এদিকে আসবে না। তারা মুর্শিদাবাদে গেছে। সেখানে নবাব তাদের শায়েস্তা করবেন, তোমারা চিন্তা কর কেন?'

একটু ভেবে নিয়ে বলেন, 'তোমরা দু'চারদিনের পথ সরে গিয়ে থাক না কেন? কথায় বলে বিপদকালে আগু থাকতে ব্যবস্থা করতে হয়।'

একথা শুনে ছেঁড়া নামাবলী সম্বল এক দরিদ্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বড়ই উত্তেজিত হন। তিনি বলেন, 'হিন্দু হয়ে আপনি বলছেন বাস্ত ছেড়ে যাব? আমার বাস কাটোয়াতে আজ বহুদিন। পূর্বপুরুষ এসেছিলেন অযোধ্যা হতে, আর আমরা এদেশ ছেড়ে যাই নি।

'দেশ ছেড়ে যাবেন কেন----'

কিন্তু আর কিছু শোনেন না ব্রাহ্মণ। সজল, স্ফীত চোখে চেয়ে বলেন, জানেন, 'আমাদের গঙ্গাতীরের মন্দিরে স্বয়ং মহাপ্রভু এসে দাঁড়িয়েছিলেন। শ্যামরায়ের বিগ্রহ সেখানে নিত্য পূজা পান, তুমি কি বল, বিগ্রহ তুলে নিয়ে যাব?'

কথায় বক্সীদেওয়ানের সামান্যই ভাবান্তর হয়। তাঁর আশপাশের লোকেরা এদের আস্পর্ধা দেখে চটে ওঠে। কিন্তু তিনি বলেন, 'এদের যেতে দাও। এদের ওপর রাগ কর কেন? এরা ত' ভয়েই আছে, তাই খাঁড়ার ঘা-কে ডরায়।'

'হল না, দয়া হল না, এখন আমরা কোথায় যাব?' কলরব করতে করতে লোকগুলি চলে যায়। কিন্তু সুরকণ্ঠের মনে গভীর দুঃখ রেখে যায়। তিনি যেন মনশ্চক্ষে দেখতে পান গৃহস্থের উঠোন যেমন ভেঙে রাজপথ হয়েছে, গৃহস্থের দেবতাবিগ্রহও এখন তেমনই গড়াগড়ি যাবে। সাতপুরুষের বাস তুলে দিয়ে দেশান্তরী হওয়া যে বাংলার গৃহস্থের পক্ষে কতবড় অভিশাপ, তা এইসব রাজপুরুষদের কে বোঝাবে? যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে এঁরা নিজেদের অবস্থা ফেরান, এক রাজা যায়, আর এক রাজা আসে, সে পরিবর্তনের মধ্যেও এঁরা ভাগ্য অন্বেষণ করেন। যাঁদের সামনে বৃহৎ আশা, বড় স্বপ্ন, তাঁরা কেমন করে বুঝবেন ধানের গোলায় শেয়াল চরলে, গৃহদেবতার বিগ্রহ চাদরে বেঁধে দেশান্তরী হতে হলে গৃহস্থের বুকে কি শেল হানে।

চিরদিন সুরকণ্ঠ গ্রামবাসী, গ্রামের মানুষ দেখেছেন। মানুষ তার পিতৃপুরুষের ভিটেয় বাস করবে এর মধ্যে নতুন কিছু তিনি দেখেন না। কিন্তু এখন, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কাতর চেহারাটি চোখের সামনে ভাসতে লাগল। মনে হল, এক জায়গায় সাতপুরুষ বাসকরা যে কত বড় সৌভাগ্য তা আগে ভেবে দেখেন নি। এখন বাংলার গ্রামে গৃহস্থের বাস্ত বিপন্ন, তাই যেন বুঝতে পারছেন সব। ঐ ব্রাহ্মণ কত গর্ব করে বললেন স্বয়ং মহাপ্রভু তাঁর অঙ্গনকে পবিত্র করেছেন। এরকম গৃহস্থবাড়ি কত দেখেছেন সুরকণ্ঠ। যাত্রাপথে সন্ধ্যাকালে কত গৃহস্থের মাটিলেপা উঠোনে দাঁড়িয়েছেন অতিথি হয়ে, এই গঙ্গাতীরে, শান্তিপুরে, কত গৃহস্থ সগৌরবে দেখিয়েছেন তাঁকে 'ওঁ হরি' গেরিমাটি চন্দনে লেখা দরজা, আলাদা করে তুলে রাখা জলচৌকি, আসন। বলেছেন নদীয়ার ছেলে নিমাই একসময়ে শান্তিপুরের কত গৃহস্থবাড়িতে ঘরের ছেলে ছিলেন। পরে তাঁর স্মৃতিধন্য সামান্য জিনিসগুলি গৃহস্থরা যত্নে রাখেন। এইসব সামান্যকে ভক্তিভরে লালন করা, তুচ্ছ ঘটনাকে শ্রদ্ধার আসনে রেখে পুজো করা, এই ত হল রাঢ়বঙ্গের বৈশিষ্ট্য। কত ঘৃণা হল সুরকণ্ঠের, যাঁর সঙ্গে যাচ্ছেন তিনি এর কিছুই বোঝেন না বলে।

'আপনি এখনো ভাবছেন?'

সুরকণ্ঠ চমকিত হন। শুকনো

সালফার
গায়েমাখা সাবান

সকল চর্মরোগে বিশেষ উপকারী। সেজন্য এই সাবান নিত্য ব্যবহারে, বিশেষতঃ গরমের দিনে, খোস, কোড়া, চুলকানি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্মরোগ নিবারণ করে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

গলায় বলেন, 'ওরা যে আমার আপন-জন। ঐ রকম ঘর থেকেই আমিও এসেছি। চোখের সামনে ওদের লাঞ্ছনা দেখে একটু ভাবব না।'

'কি করা যায় বলুন?'

'দেখতে পাচ্ছি আপনারাও অক্ষম। কিন্তু মশায়, আপনাদের রাজায় রাজায় যুদ্ধ। কি তার কার্য, কি তার কারণ, কিছুই জানি না। মরতে মরে ওরা। ওদের বাস্তু যায়, গোলা যায়, পথের ভিখারী হয়, চিরকাল এমনি হচ্ছে।'

বক্সীদেওয়ান বিশেষ বিচলিত হন না। গৃহস্থের বাস্তু গেলে, কৃষকের জমি গেলে, সেটা যে কতবড় ক্ষতি, আশঙ্কার কারণ, তা তিনি বোঝেন না। বলেন, 'হ্যাঁ, রাজস্ব পেতে বেগ পেতে হবে বোধ হয়। কিন্তু এখন আর কেউই করতে পারবে না কিছু।'

গলা নিচু করে আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন, 'নবাব বড়ই বিপন্ন। হরকরা কি খবর এনেছে তা জানেন না?'

'না।'

'বর্গীদের প্রধান এখন ফিরে যেতে চেয়েছিল স্বদেশে। কিন্তু মীর হবিব তাঁকে নিয়ে অরক্ষিতে মুর্শিদাবাদ লুঠ করতে যায়। বলে লুঠ করতে হলে আসল জায়গায় হানা দাও। আসলে সে নিজের কাজটাও হাসিল করে নিতে চায়। এই সুযোগে বউ, ছেলে, ভাই, সবাইকে নিয়ে যেতে চায়। চলুন, পথে আপনাকে সব বলব।'

কাটোয়া থেকে ধুলোর মেঘ উড়ল। নবাব এখন রাজধানীর দিকে যান। শহর থেকে নবাবের সৈন্য সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঘরে আর্ত-ক্রন্দন উঠল, এবার হয়ত বর্গী সত্যি আবার আসবে। তারা কাছে কাছেই অপেক্ষা করছিল, এসে পড়তে দেরি হল না।

কাটোয়ার উপকণ্ঠে একটি বাড়িতে বক্সীদেওয়ানের নিজের হরকরা বিশ্রাম করছিল। সে এসে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিল, ও নিচুগলায় খবর বলতে লাগল। সুরকণ্ঠ রাজনীতির কিছুই বোঝেন না, তিনি বললেন, 'কেন, এর কথা সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য একথা বলছেন কেন।'

'এ আমার নিজের লোক। এখানে যে যার নিজের লোক রাখে, নইলে কার কথা বিশ্বাস করবেন?' তা ছাড়া, এ আমার সঙ্গে সম্পর্কিত-ও বটে।'

লোকটি সুরকণ্ঠকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানালে। তার বয়স খুব বেশি নয়। অতি সাধারণ চেহারা, গলার আওয়াজ একটু সরু। বললে, 'অধীনের নাম যুগলপ্রসাদ।' সে আস্তে আস্তে বলতে লাগল, 'আপনারা জানেন কি না জানি না, ফিরিঙ্গীরা অবধি দেশ ছেড়ে দেশান্তরী হয়েছে। কাশিমবাজারের কুঠিতে না আছে ইংরেজ, না আছে ফরাসী, না আছে ওলন্দাজরা। ওরা সহজে ডরায় না, তাহলে বুঝে দেখুন রাজধানীর অবস্থা ক'দিন কিরকম গেল।'

বক্সীদেওয়ান বিব্রত হলেন। বললেন, 'ফ্যাক্টর সায়েবরা আমাদের ভাল খাজনা দেন, কেন, তাঁদের কুঠি কি লুঠপাট হয়েছে?'

'এ যাত্রা নয়। তবে ভবিষ্যতে কি হবে তার স্থিরতা কি? স্বয়ং জগৎশেঠের গদী লুঠ হল।'

সে আড়ে আড়ে তাকায়। বক্সী-দেওয়ানের মুখে ভাবান্তর দেখে না। বোঝে এ খবর এখানে আগেই পৌঁছিয়েছে। একটু চিন্তিত হয়। খবর যত নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ হবে, দূতের কদরও ততই বাড়বে।

সে বলতে লাগল, 'চব্বিশে বৈশাখ হবিব সায়েব পৌঁছালেন দাহাপাড়া। গিয়েই বাজার গঞ্জে আগুন দিলে।'

'রাজধানীতে কে ছিল?'

'হাজি মহম্মদ খাঁ, হোসেন কুলী, এখন তাঁদের এখানে থাকবার কথা ছিল না মনে হয়। ইসলামাবাদ হতে কি জানি কি কাজে এসেছিলেন, কিন্তু যাকে বলে, বিপৎকালে বুদ্ধি গুলায়, তাঁরা কিন্তু বর্গীদের মুর্শিদাবাদ ঢুকতে দেবেন না বলে বড়ই চেষ্টা করেন।'

'চেষ্টামাত্র সার হল এই ত? ওঁরা কেউই যুদ্ধ বোঝেন না।'

'আপনি জ্ঞানীপুরুষ, সবই বোঝেন। ওদিকে মীর হবিব, যাকে বলে যুদ্ধের আদ্যোপান্ত নখদর্পণে রাখেন, তিনি হাজিগঞ্জের ঘাট পেরিয়ে মুর্শিদাবাদে ঢুকলেন, পরের দিন, বুঝলেন কি না, ঘাট পেশকার এসে খেয়া-পাটনীদের ওপর কি হম্বিতম্বি। বলে ওদের পার করলি কেন? আমি বললাম বাপু হে, তোমাদের তাবড় তাবড় সিপাইরা বর্গী দেখে কোথায় সেঁধুলে, ফতেচাঁদের গদী লুঠ হয়ে গেল। এরা সামান্য মাঝি মাত্র, পার না করে কি কাঁচা প্রাণটা দেবে?'

'যাকগে, তার পরের কথা বল।'

'কি আর বলব বলুন। ওদিকে হবিব সায়েব তাঁর ভাই মীর জারিফকে নিয়ে গেছেন।'

'তা নিয়ে যাকগে, ক্ষতির পরিমাণ বল।'

'কেউ বলছে ফতেচাঁদের গদী থেকে তিন লাখ টাকা নিয়েছে, কেউ বলছে এক কোটি, তবে মনে হয়, সাড়ে তিন লাখের বেশি নেয় নি। যা নিয়েছে ভারী টাকা, আর্কটের টাঁকশালে চালাই। তা ছাড়া-----।'

'তা ছাড়া আর কি?'

'এবার লাখ টাকার মাশুল হারালেন আপনারা, বর্গীরা তুঁতের চাষ খাইয়ে দিলে মশায়, এমন জানোয়ার, যে পলুর চাষ খাওয়ালে রেশম কোথা থেকে আসবে তা বুঝলে না, দেখবেন যেয়ে, কুঠিয়ালরা হায় হায় করছে, বসাকরা মাথায় হাত দিয়েছে মশায়, পলুর চাষ ও অঞ্চলে আর নেই।'

(ক্রমশঃ)

দলাদলির ঊর্ধ্বে আহ্বান

সুভাষচন্দ্র বসু

আমাদের মধ্যে একদল লোক আছেন, যাঁহারা স্বভাবত নৈরাশ্যপূর্ণ ও নৈরাশ্যবাদী। ইঁহারা সদাসর্বদা এই কথা প্রতিপন্ন করিতে ব্যস্ত যে, বাঙালী জাতি নিজের শক্তি সামর্থ্য হারাইয়াছে এবং দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর না হইয়া ক্রমশ পিছাইয়া পড়িতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সে সব ভ্রান্ত ধারণা যাঁহারা পোষণ করেন তাঁহারা স্বভাবত আত্মবিশ্বাসহীন বলিয়া মনে করিয়া থাকেন যে, সমগ্র জাতি তাঁহাদের প্রতিচ্ছায়া-স্বরূপ---তাঁহারা যেরূপ উন্নতিশীলতা ও অগ্রগামিত্ব হারাইয়াছেন সমস্ত জাতি বুঝি সেইরূপ এইসব বৃত্তি হারাইয়াছে।

আমি স্বভাবত আশাবাদী, তাই সর্বদা অন্যের হৃদয়ে আশা ও আত্মবিশ্বাস জাগাইবার চেষ্টা করিয়া থাকি। আমি মনে করি না যে, জাতি হিসাবে আমরা মূলত অন্য কোন জাতি অপেক্ষা হীন। নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া এবং নানা দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়া আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে। তবে বাস্তবতার দিক দিয়া আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, বর্তমান সময়ে আমাদের চরিত্রে এবং আমাদের সমাজে অনেকগুলি আবর্জনার সমাবেশ হইয়াছে। এই জন্যই আজ ভারত পরাধীন---এ জন্যই আমাদের মধ্যে এখনও পরপদলেহনকারী, বিশ্বাসঘাতক, কুকুর জাতীয় মানব পাওয়া যায়।

আমি একথা বলিতে পারি যে, নেতৃত্বের দিক দিয়া শত অসুবিধা ভোগ করিলেও বাঙালী জাতি ১৯২৫ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে যেরূপ ত্যাগ, জনসেবা, সাহস ও বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছে তাহা অন্য কোনও প্রদেশের অপেক্ষা কম নয়, বরং অনেক বিষয়ে অন্য প্রদেশের অপেক্ষা অধিক প্রশংসার্হ।

বাঙালীর তথা ভারতবাসীর ত্রুটি এখনও পর্যন্ত অনেক আছে। তন্মধ্যে বিশেষ করিয়া একটি ত্রুটির কথা আজকার বক্তব্যের মধ্যে উল্লেখ করিতে চাই।

ইউরোপের স্বাধীন জাতির সহিত তুলনা করিলে এই কথা সর্বপ্রথমে আমাদের চোখে ঠেকে যে, আমাদের (অর্থাৎ ভারতের, শুধু বাংলার নয়) প্রধান অভাব উপযুক্ত নেতার। আমরা এখনও পর্যন্ত তেমন নেতা পাই নাই, যিনি দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া এবং ঠিক পথে পরিচালিত করিয়া স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারেন। প্রকৃত স্বাধীনতা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা কয়জন ভারতীয় নেতা ধারণা করিতে পারেন? অধিকাংশ নেতা (এবং তার মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর নামও করতে পারি) যখন স্বাধীনতা বা পূর্ণ স্বরাজের কথা বলেন তখন প্রকৃতপক্ষে Dominion Status-এর (অর্থাৎ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত স্বায়ত্তশাসনের) পরিকল্পনা করিয়া থাকেন। যেখানে কল্পনা এত খাটো এবং আদর্শ এত ছোট সেখানে সাধনা যে পঙ্গু হইবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কোন হেতু নাই। যাহা হউক, অতীতের জন্য অনুশোচনা করিয়া লাভ নাই। ভবিষ্যতের জন্য আমাদিগকে এইরূপ

যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে যাহাতে অতীতের অক্ষমতার ও অসাফল্যের হাত হইতে আমরা চিরকালের জন্য মুক্ত হইতে পারি।

আমাদের প্রথম অভাব স্বাধীনতার সম্পূর্ণ পরিকল্পনার।

আমাদের দ্বিতীয় অভাব উপযুক্ত মনোবৃত্তির। যেখানে স্বাধীনতাকামী ব্যক্তিদের হৃদয়ে এত বেশি সংকীর্ণতা ও বিদ্বেষ এখনও বর্তমান সেখানে যে আমাদের স্বাধীনতা প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হইতে পারে না, একথা বলাই বাহুল্য। এইস্থানে বাঙলার দলাদলির কথা বিশেষ করিয়া আমার মনে আসিতেছে। এই দলাদলির জন্য আমি ব্যক্তি বিশেষকে বা দল-বিশেষকে দায়ী করিতে চাই না। দায়ী সমস্ত দলকেই আমি করি কারণ এক হাতে তালি বাজে না। এতদ্ব্যতীত আমরা সকলে প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে এই দলাদলির জন্য দায়ী, কারণ এই দলাদলিকে নির্মূল করিবার জন্য আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করি নাই। আমার অনেক সময় মনে হয় যে, এই দলাদলির মূল আছে আমাদের হীন ও সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তির মধ্যে। 'দেশ উদ্ধার যদি হয় ত আমার দ্বারাই হউক, নতুবা হইয়া কাজ নাই'---এইরূপ মনোভাব বাঙলার অনেক কংগ্রেস-কর্মীর আছে বলিয়া আমার আশঙ্কা হয়। এইরূপ হীন মনোবৃত্তির পরিবর্তে এক নূতন মনোবৃত্তির সৃষ্টি করিতে হইবে যাহার ফলে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ আমাদের ব্যক্তিত্ব দেশের ও দশের কল্যাণের মধ্যে সানন্দে ডুবাইয়া দিতে পারিব।

আমাদের হীন মনোবৃত্তির কথা বলিবার সময়ে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া পারি না। আজকাল জনসাধারণের মধ্যে এবং বিশেষ করিয়া তরুণ সমাজের মধ্যে একপ্রকার লঘুতা ও বিলাসপ্রিয়তা যেন প্রবেশ করিয়াছে---অথচ আজকাল দেশের আর্থিক অবস্থা পূর্বাপেক্ষা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ইহা কি সত্য? যদি তাহা হয়, তবে ইহার কারণ কি? আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন ছাত্রমহলে 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ' সাহিত্যের খুব প্রচার ছিল। আজকাল নাকি তরুণ সমাজের মধ্যে ঐ সাহিত্যের তেমন প্রচার নাই। তার পরিবর্তে নাকি লঘুত্বপূর্ণ এবং সময় সময় অশ্লীলতাপূর্ণ সাহিত্যের খুব প্রচার হইয়াছে। একথা কি সত্য?

যদি সত্য হয় তাহা হইলে ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, কারণ মনুষ্য সমাজ যেরূপ সাহিত্যের দ্বারা পরিপুষ্ট হয় তার মনোবৃত্তিও তদ্রূপ গড়িয়া উঠে। চরিত্র গঠনের জন্য 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ' সাহিত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাহিত্য আমি কল্পনা করিতে পারি না।

আমাদের তৃতীয় অভাব---উপযুক্ত সঙ্ঘের। জাতীয় মহাসভা (কংগ্রেস) অবশ্য সমগ্র দেশকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়াছেন এবং দেশবাসীকে নিয়মানুবর্তী হইতে শিখাইয়াছেন। তথাপি আমি বলিতে বাধ্য যে, আরও উৎকৃষ্ট ও সুসম্বদ্ধ সঙ্ঘ আমাদিগকে সৃষ্টি করিতে হইবে। সঙ্ঘের মধ্যে সামরিক কঠোরতা আনিতে হইবে। কঠিন নিয়মানুবর্তিতার উপর যদি গড়িয়া উঠে তাহা হইলে ঐ সঙ্ঘ অটল হইয়া সকল প্রকারের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিতে পারিবে। এবিষয়ে কংগ্রেস নেতৃবর্গের নীতি উপলব্ধি করা কঠিন। যেখানে কঠোরতা ও নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখা একান্ত দরকার সেখানে তাঁহারা দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন না। অথচ অন্য ক্ষেত্রে তাঁহারা অসহিষ্ণু এবং গত পাঁচ-ছ' বৎসর যাবৎ তাঁহারা কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি হইতে ভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তিকে একেবারে বাদ দিয়া আসিতেছেন---যার ফলে আজকার কার্যকরী সমিতি একটি পোঁ-ধরা কমিটীতে পর্যবসিত হইতেছে। ভবিষ্যতে আমাদিগকে এমন এক আদর্শ সঙ্ঘ গঠন করিতে হইবে যে, একদিকে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা বজায় থাকিবে এবং অপর দিকে সঙ্ঘের ভিতর সকল প্রকার মত ব্যক্ত করিবার সুযোগ ও অধিকার সকলের থাকিবে। একদিকে Democracy এবং অপর দিকে Military Discipline এই উভয়ের সমন্বয়ে আদর্শ সঙ্ঘ গঠিত হইয়া থাকে।

আমি গোড়ায় বলিয়াছি যে, আজ আমাদের প্রধান অভাব উপযুক্ত নেতার। শেষে আবার আমি ঐ কথা বলি---আজ আমাদের প্রধান অভাব---উপযুক্ত নেতার। নেতা আকাশ হইতে আসে না---সংগ্রামের ভিতর দিয়া এবং কঠিন সাধনার সাহায্যে সর্ব যুগে ও সর্ব দেশে নেতা গড়িয়া উঠে। যাঁহারা অতীতে নেতৃত্বের ভার লইয়াছিলেন, তাঁহারা সাধ্যমত জনসেবা করিয়াছেন এবং দেশবাসীকে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের অসমাপ্ত কাজ আমাদিগকে সম্পূর্ণ করিতে হইবে। উপযুক্ত পরিকল্পনা ও মনোবৃত্তি লইয়া আমাদিগকে কর্মক্ষেত্রে আগুয়ান হইতে হইবে এবং দেশবাসীকে আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিতর দিয়া সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে। সর্বোপরি আমাদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে কি উপায়ে, কি কৌশলে বিভিন্ন পরাধীন জাতি স্বীয় শক্তি বুদ্ধির দ্বারা স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছেন এবং আমাদিগের ভুলিলে চলিবে না যে, বর্তমান যুগে অন্যান্য দেশের সহানুভূতি ব্যতীত কোনও এক পরাধীন জাতির পক্ষে পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করা একপ্রকার অসম্ভব। তাই ভারতবাসীকে ঘরে এবং বাইরে, এক-সঙ্গে, স্বাধীনতার আন্দোলন চালাইতে হইবে। যে উপায়ে সর্বযুগে পর-পদানত জাতি মুক্তিলাভ করিয়াছে, সে উপায়ে যদি আমরা স্বাধীনতার মূল্য দিতে প্রস্তুত হই, তাহা হইলে আমরাও যে অতি শীঘ্র স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিব, যে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই ---কোনও সন্দেহ নাই।

(বহু পূর্বে লিখিত নেতাজীর এই প্রবন্ধটি আজও ভারতের রাজনৈতিক অবস্থায় সমান প্রযোজ্য, সমান মূল্যবান।

---সম্পাদিকা)

অধিনায়ক নেতাজী

সন্ধ্যে হলেই দামাল ছেলে ঝোঁক ধরে, 'মা সেই গল্প শোনাও।' সমস্ত কাজ ফেলে রেখে মাকে গল্প শোনাতে আসতে হয়, নয়তো ছেলে বাগ মানবে না। কিন্তু কিসের গল্প শুনলে দামাল ছেলের ঘুম ধরে!

সেই এক গল্প, নেতাজীর গল্প, জাগরণে নেতাজী, ঘুমালেও স্বপ্ন দেখে সেই ছেলে নেতাজীর।

তবু ছেলের স্বাদ মেটে না। যে গল্পের শেষ নেই, সে গল্পের শেষটা শুনতে চায় অবোধ শিশু।

বাংলা তথা ভারতের যে মাটিতে একালের শিশুরা জন্ম নিয়েছে, সেই মাটিতেই বিচরণ করেছেন সুভাষচন্দ্র, বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দিয়েছেন আকাশে বাতাসে, মাটির অন্তরে। দেশকে স্বাধীন করার মন্ত্রে চলে গেছেন দেশান্তরে। তারপর স্বাধীনতার বীজ রোপণ করে

একদিন নিজেই কোথায় হারিয়ে গেছেন।

—কিন্তু সেই হারিয়ে যাওয়া যে কতো বেদনার, তার প্রকাশ মন থেকে বাইরে কতটুকুই বা প্রকাশ পায়? ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট দেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীন হওয়ার পর সৃষ্টি হয়েছে কতো সমস্যার। তাই নেতাজীকে মনে হয় আজ বড় প্রয়োজন। মায়ের কাছে শোনা গল্পে যে শিশু জিজ্ঞেস করে এ গল্পের শেষ কোথায়—দেশের অসংখ্য নরনারী ভাবে হয়তো এ গল্প আবার সুরু হবে যেখান থেকে হঠাৎ একদিন শেষ হয়ে গেছিল। তারা যাঁকে দীর্ঘদিন আকুল প্রত্যাশা নিয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে তিনি আবার ফিরে আসবেন।

কেউ বা স্বচক্ষে কেউ বা ছবিতে দেখেছেন যে বলদৃপ্ত মহানায়ককে সেই জন-গণ-মন অধিনায়ক কি আবার বাংলার মাটিতে পা দেবেন। ভারত ছিল তাঁর স্বপ্নের স্বাধীন তীর্থ, বাংলা তাঁর সাধনক্ষেত্র। সেই বাংলার মাটিতে যে মহানায়কের আবির্ভাবের জন্য শিশু থেকে যুবক

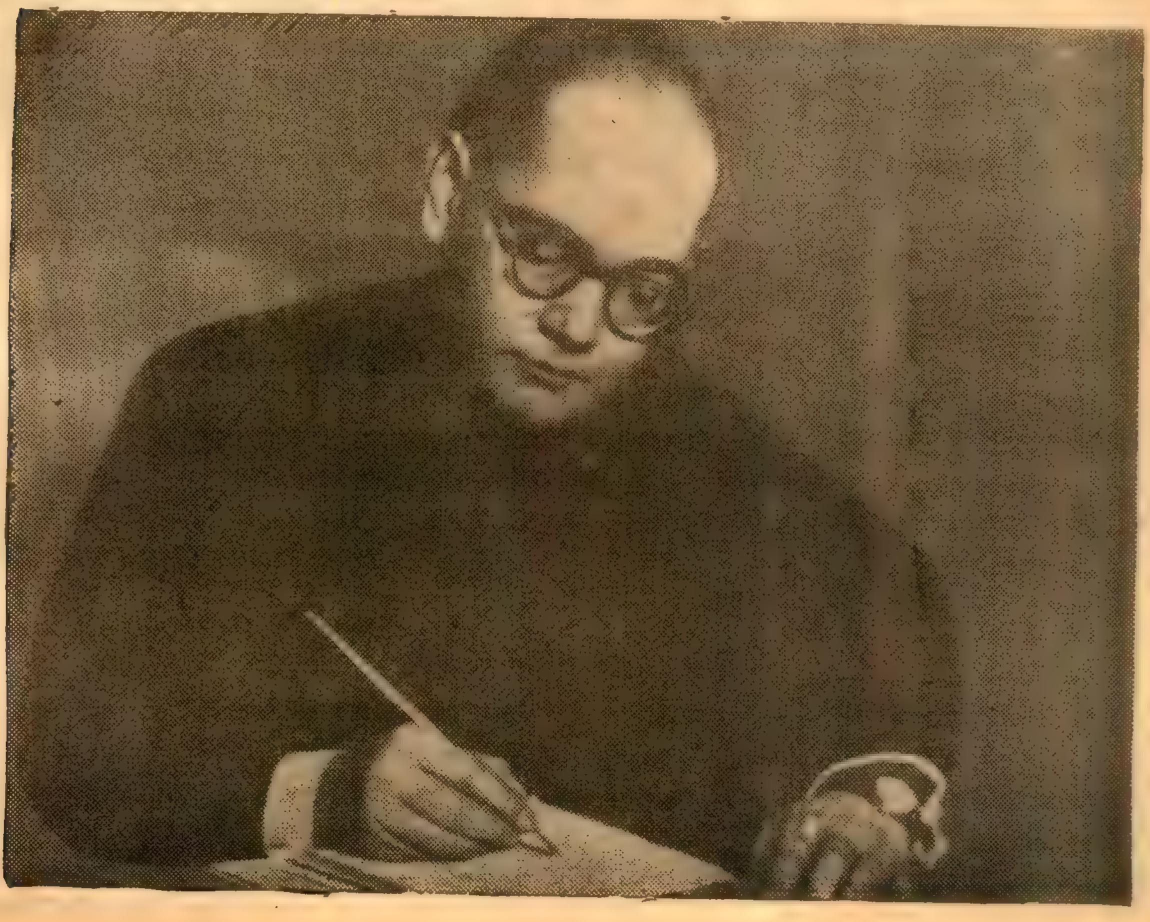

এবং অশীতিপর বৃদ্ধবৃদ্ধা পর্যন্ত অপেক্ষমাণ—সেখানে সত্যি সত্যি আজ যদি তাঁর আবির্ভাব সম্ভব হয়, তা হলে আমরা বলবো—

'তোমার আসন শূন্য আজি
হে বীর পূর্ণ করো।'

কিন্তু একথাও ত সত্য, যে বীরকে আমরা আসন দান করতে পারলে নিজেদের ধন্য মনে করতে পারবো—সেই বীর আমাদেরই মতো রক্ত-মাংসের মানুষ। ত্যাগে তিনি শ্রেষ্ঠ, আদর্শে তিনি বলীয়ান, দেশ হিতৈষণায় তিনি অদ্বিতীয়,—তবু আজ তাঁর আবির্ভাব ঘটলে নিশ্চয়ই সেদিনের সেই যুবককে আমরা প্রত্যক্ষ করবো না। অথচ তাঁর জন্মদিনে বাংলা দেশের বুকে, এমন কি বাংলার এই রাজধানীতে যখন আমরা বিরাট বিরাট মিছিল করি কিংবা অগণিত জনারণ্যে সভানুষ্ঠান করি তখন পতাকায়, ফেস্টুনে যে নেতাজীর মূর্তি আমরা তুলে ধরি তিনি চিরযৌবনের প্রতিভূ রূপে আমাদের সম্মুখে প্রতীয়মান হয়ে ওঠেন। আজ তাঁর আবির্ভাব হলে তাঁর মনের সমস্ত তেজ-সত্তা সত্ত্বেও সেই দৈহিক রূপে তাঁকে দেখতে পাবো কি না সে বিষয়ে সন্দেহ থাকা অসম্ভব নয়।

তবু তিনি আবির্ভূত হোন, এই আমাদের কামনা। কঠিন সমস্যার দিনগুলিতে তিনি আমাদের জড়ত্ব দূর করুন, অন্তর মধ্যে অবসাদ থেকে আমাদের মুক্ত করুন।

বর্তমান বাংলার ম্লান রূপকে তিনি একবার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুন, এই আমাদের কামনা। গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত বাংলার বুকে আজ এ কোন্ দুর্দশা। উদ্বাস্তুজীবন, অন্নসমস্যা, বেকারিত্ব—বাঙালীর গলায় ফাঁস পরিয়েছে। কার অসির ঝন্ঝনা শুনে দুর্বৃত্তের দল এই ফাঁস খুলে দেবে? হায়, বাঙালী জাতি কি সত্যিই মরে গেছে? বাঙালী যে মরে নি, বাঙালী যে মরতে পারে না তা নেতাজীই বলে গেছেন—

'হাজার হাজার বছরের বিপর্যয়, বিপত্তি ও প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হলেও বাঙলা সব সময়েই তার সুখে-দুঃখে, আনন্দ-বিষাদে, তার স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করে এসেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে যে নতুন চিন্তাধারা ও ভাবনার সংস্পর্শে সে এসেছে, তাকেও সে আপন করে নিয়েছে।' তবু 'বাঙালীর হৃদয় সব সময়েই বৈচিত্র্য, মিলন ও মৈত্রীর জন্য আকুল। সর্বদাই সে নবীনের পূজারী। বাঙলার যে অন্তর-প্রকৃতি সে প্রকৃতি গতিশক্তিসম্পন্ন, সে প্রকৃতি স্থিতিশীল নয়। তাকে 'বৈপ্লবিক'ও বলা চলতে পারে।'

বাংলার এই বৈপ্লবিক শক্তিকে জাগ্রত করার জন্যে নেতাজীর আবির্ভাব আমাদের হৃদয়-দুয়ারে যেন সব সময়ই দেখতে পাই—তা সে তাঁর জন্মদিনে হোক কিংবা সংগ্রামের প্রতিটি ক্ষণেই হোক।

হৃদয়ে যাঁর অধিষ্ঠান, বাইরে তাঁকে তবু আমরা অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছি। গত এক বছর নেতাজীর আবির্ভাব নিয়ে জল্পনা-কল্পনা কম হয় নি। এমন কি শৌলমারির সাধুর কথাও আমরা উত্থাপন করেছি। শৌলমারির সাধু স্বয়ং নেতাজী কি নেতাজী নন, সে প্রশ্ন হয়তো জনসাধারণের মনে উঠতে পারে। কিন্তু যিনি নিজেকে নেতাজী বলে অস্বীকার করেন, তাঁকে অযথা বিব্রত করা কতটা উচিত তা আমাদের ভেবে দেখা দরকার। সরকারী বিবৃতিতে আমরা হয়তো কর্ণপাত করি না, কিন্তু যে ব্যক্তি একটি সুচারু প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করে সেখানে যথার্থ মানুষ গড়ার জন্য আত্মনিয়োগ করেছেন, সেখানে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা অনুচিত। কেন না সেখানেও ত দেশের স্বার্থ জড়িত। তবু এককথায় কখনই যা খুশি হবেন, আমরা এখন ভবিষ্যতের কথা ভাবতে রাজী নই। আমাদের বর্তমান জীবন অতিষ্ঠ, তাই নেতাজীর মতো পুরুষের আবির্ভাবে আমাদের বর্তমান জীবনে সুখ ও শান্তির স্বপ্ন দেখতে পাই। কেন-না যে কংগ্রেস সরকারের কাছে আমরা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের স্বপ্ন দেখেছিলাম, সে স্বপ্ন ভেঙে গেছে। এর কারণ হয়তো কংগ্রেস সংগঠনের নিজের মধ্যেই বর্তমান। বহুপূর্বে নেতাজীর মুখেই আমরা শুনেছিলাম—

'জাতীয় মহাসভা (কংগ্রেস) অবশ্য সমগ্র দেশকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়াছেন এবং দেশবাসীকে নিয়মানুবর্তী হইতে শিখাইয়াছেন। তথাপি আমি বলিতে বাধ্য যে, আরও উৎকৃষ্ট ও সুসম্বদ্ধ সঙ্ঘ আমাদিগকে সৃষ্টি করিতে হইবে। সঙ্ঘের মধ্যে সামরিক কঠোরতা আনিতে হইবে। কঠিন নিয়মানুবর্তিতার উপর যদি গড়িয়া উঠে তাহা হইলে ঐ সঙ্ঘ অটল হইয়া সকল প্রকারের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিতে পারিবে। এ বিষয়ে কংগ্রেস নেতৃবর্গের নীতি উপলব্ধি করা কঠিন। যেখানে কঠোরতা ও নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখা একান্ত দরকার, সেখানে তাঁহারা দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন না। অথচ অন্য ক্ষেত্রে তাঁহারা অসহিষ্ণু---' ইত্যাদি।

অথচ এখন দেশ শাসনের ভার কংগ্রেস নেতৃবর্গের ওপর রয়েছে। কিন্তু জনসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তাঁরা যা করেছেন, তার জন্যে তারা সুখী নয় বলেই জনসাধারণ কামনা করে নেতাজীর মতো ব্যক্তিত্বের—যাঁর মধ্যে কোনোদিন প্রাদেশিকতা স্থান পায় নি যিনি সাম্প্রদায়িকতাকে কখনো প্রশ্রয় দান করেন নি, এবং সাধারণের সেবায় নিজেকে যিনি সম্পূর্ণভাবে অর্পণ করেন, যিনি ঘর ছেড়ে চিরপথিক,

● মহাজাতি সদনের ভিত্তিস্থাপন উৎসব

বর্তমানকালে একমাত্র তিনিই বলতে পারেন—

'হে ভবেশ, হে শংকর
সবারে দিয়েছ ঘর
আমারে দিয়েছ শুধু পথ।'

কোন্ অজানা পথে সেই বীর নায়ক আজ চলেছেন তা আমরা জানি না, আর সাত সাগরের তীরে যদিও বেজেছে শিঙা ফেরাবার ডাকে, তবু তিনি আমাদের ঘরে এখনো ফেরেন নি। হয়তো সেই উদ্ধত পুরুষ তাঁর ফেরারী ফৌজ নিয়ে একদিন জনসমক্ষে আবির্ভূত হবেন।

কিন্তু আবির্ভাব ত' সহজে হয় না। সেই স্বার্থত্যাগ, সেই দেশ-প্রেম আমরা কতটাই বা অনুভব করতে পেরেছি। একালের কাণ্ড-কারখানা চোখে দেখলে মনে হয়, যেন 'লুটে পুটে খাই' নীতিটাকেই গোগ্রাসে অধিকাংশ লোক গিলে খেতে চায়। এটাই প্রত্যক্ষ শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ বাঙালী তথা ভারত-বাসী বর্তমানের উদাহরণ গলাধঃকরণ করে ধীরে ধীরে চিরসুপ্তির কবর রচনা করবেন । নেতাজীর স্বপ্নের ভারতের রচিত হবে এক লজ্জাকর সমাধি। এই অশুভের হাত থেকে মুক্তির উপায় যে নেই, তা নয়। আর তা আছে আমাদেরই হাতে। কিন্তু হাতে থাকলে কি হয়, পরি-কল্পনা রচনার ভার ও তা রূপদানের কর্তৃত্ব যাঁদের হাতে, আজ তাঁরা শাসনযন্ত্রের লাগাম ধরে আত্মসুখ-পরায়ণ, লোভী ও স্বেচ্ছাচারী। তাই জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও আজো প্রকাশ্য স্থানে নেতাজীর পূর্ণাবয়ব মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে তারা বিলম্ব করে। সামরিক বেশ কিংবা ধুতি-পাঞ্জাবী পরিহিত নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সেই মূর্তি দেখলে, হঠাৎ হয়তো কোনো ব্যক্তির মনে সেই আদর্শ জাগরিত হয়ে উঠতে পারে—সেই আশঙ্কাও ত' কম নয়।

বর্তমানে জনগণের মধ্যে ত্যাগের ধারণা আছে, কিন্তু ত্যাগের প্রেরণা নেই। সেই প্রেরণার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন নেতাজীর আদর্শ। সেই আদর্শ কি আবার সঞ্চারিত হবে? না, জনগণ ভেড়ার শৃঙ্গের ভয়ে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে নিজেদের প্রাণের ভাষা বিসর্জন দিয়ে কালাতি-পাত করবে?

বিদ্যালয়ে শিক্ষার নামে আজকাল যা চলছে, তার নাম গোঁজামিল। অথচ নেতাজীর জীবনীকে যদি পাঠ্য-সূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহলে তথাকথিত শৃঙখলাহীন এবং প্রকৃত সমস্যাপীড়িত ছাত্রদের মনেও আদর্শ প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারে। নেতাজীকে কেবল রাজনৈতিক পুরুষ বলা ঠিক নয়, তিনিই দেশ, তিনিই দশ, দেশের তিনিই ভবিষ্যৎ। দেশের অগণিত তরুণের মধ্যে তিনি জাগ্রত হয়ে উঠুন। যে শিশু তার মায়ের কোলে নেতাজীর গল্পের শেষ পায় না খুঁজে—সে যেন নিজের মধ্যে সেই 'শেষের' পরিণত রূপ দর্শন করে। বর্তমান শাসনযন্ত্রের পরিবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতিতে তা কি সম্ভব হবে? নেতাজী কি পাঠ্যগ্রন্থে পঙক্তি লাভ করবেন? জানি না, বাংলা দেশেই বাঙালী সুভাষচন্দ্রকে সম্মান জানাতে পারবো কি না? নেতাজীর নির্বাচিত রচনাবলী ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'দেশনায়ক' প্রবন্ধটির কথা বাংলা দেশের ক'জনই বা উচ্চারণ করেন।

বাংলা দেশ নেতাজীর কথা বলে, কিন্তু নেতাজীর আদর্শকে আজ পর্যন্ত কতোটা আমরা তুলে ধরতে পেরেছি, তার দ্বারাই বিচার হবে সত্যিকারের আমরা নেতাজীকে ফিরে পেতে চাই কি না।

সারা ভারত তাঁকে চায়। বাংলা দেশে তাঁকে আজ আরো বেশি প্রয়োজন। বাংলা দেশের দিকে তাকালেই সারা ভারতের খবর রাখা যায়। বাংলার এ দুর্দিন যেন মুছে যায়। কবির স্বপ্নের ভূমি বাংলা যেন তোমার স্পর্শে সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা হয়ে ওঠে। আগামী দিনের কবিও যেন তাঁকে উদ্দেশ্য করে উচ্চারণ করতে পারেন 'বাঙালী কবি আমি, বাংলা দেশের হয়ে তোমাকে দেশনায়কের পদে বরণ করি।' আর সেইসঙ্গে নেতাজীর ভবিষ্যবাণী যেন বাংলা দেশের বুকে সত্যরূপে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে।

'বাঙালীর অনেক দোষ আছে, কিন্তু বাঙালীর একটা গুণ আছে যাতে তার অনেক দোষ ঢাকা পড়েছে এবং যার বলে সে আজ জগতের মধ্যে মানুষ বলে গণ্য। বাঙালীর আত্মবিশ্বাস আছে, বাঙালীর ভাব-প্রবণতা ও কল্পনাশক্তি আছে—তাই বাঙালী বর্তমান বাস্তব জীবনের সকল ত্রুটি, অক্ষমতা, অসাফল্যকে অগ্রাহ্য করে মহান আদর্শ কল্পনা করতে পারে—সেই আদর্শের ধ্যানে ডুবে যেতে পারে এবং আপাত-দৃষ্টিতে যাহা অসাধ্য, তাহা সাধন করবার চেষ্টা করতে পারে। এই কল্পনাশক্তি ও আত্মবিশ্বাস আছে বলেই বাঙলা দেশে একদা সাধক জন্মেছে এবং এখনও জন্মাবে। এই কারণেই দুঃখ-কষ্ট ও অত্যাচারের চাপে বাঙালীর মেরুদণ্ড কখনও ভাঙবে না। যে জাতির Idealism (আদর্শপ্রীতি) আছে সে জাতি তার আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য যন্ত্রণা ক্লেশ সানন্দে বরণ করে নিতে পারে।'

নেতাজীর এই বাণীর মধ্যে দিয়েই তাঁর আবির্ভাব সম্ভব হবে। তাঁকে বর[illegible] [illegible]র শক্তি আমরা যেন অর্জন করতে পারি।

রঙ্গজগৎ

● সোভিয়েট পরিচালক
ভি আই কেভিন।

চলচ্চিত্র নির্মাতাদের ভূমিকা

দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি তৃতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব উদ্বোধন করেছেন। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেছেন, চলচ্চিত্র আজকের দিনে অত্যন্ত শক্তিশালী শিল্পমাধ্যম, যার মধ্য দিয়ে ভাবের আদান-প্রদান ঘটে। লক্ষ লক্ষ মানুষ চলচ্চিত্রের দ্বারা সচেতন বা অচেতন ভাবে প্রভাবিত হয়। ছবির মধ্য দিয়ে আমরা জাতির ইতিহাস জানতে পারি ; একটা জাতি অন্য জাতির কাছে তার নিজের কথা প্রকাশ করে। মানবিক গুণসম্পন্ন ছবি সার্বজনীন আবেদনে সমৃদ্ধ। মূলত মানুষ এক। আফ্রিকা, এশিয়া, ইউরোপে বা যে কোন অঞ্চলের হোক, মানুষের ধ্যান-ধারণা এবং অভিজ্ঞতা একই রকম। আমরা আজ যেমন দেশ গঠনের জন্য সংগ্রাম করছি, আমাদের মত বহু দেশ এভাবে সংগ্রাম করছে, সমগ্র পৃথিবী আর একটা মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা রোধ করার জন্য সংগ্রাম করছে। অবশ্যম্ভাবী বলে মেনে নিয়ে ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করা মানুষের চরিত্র নয়।

মানুষ স্বাধীন জীব। তার নিজের বিবেক আছে, প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার শক্তি আছে, ইতিহাস গড়ে তোলার ক্ষমতা আছে। এই শক্তিতে আমরা সংগ্রাম করেছি, এভাবে আমরা ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবো। জীবনে সংকট আসে, সে সংকটকে পরাভূত করে মানুষ জয়ী হয়। তার কাছে বশ্যতা স্বীকার করে না।

শিল্পীর কর্তব্য মানুষের অপরাজেয় শক্তিকে জাগ্রত করা, তার বিবেক-বুদ্ধিকে জাগিয়ে তোলা, তার নৈতিক ও আত্মিক বিপ্লবকে জয়যুক্ত করা। সমগ্র মানবজাতিকে একই পরিবারভুক্ত রূপে এগিয়ে যাবার চেতনা সৃষ্টি করা। এভাবে আমরা জাতিবৈরিতা, উগ্র জাতীয়তা অথবা ধর্মীয় উন্মাদনা থেকে মানুষকে দূরে রাখতে পারি। পৃথিবীতে শয়তান কেউ নেই, কেউ কেউ হয়তো হতভাগ্য কিন্তু স্বভাবজাত শয়তান নয়। একটু ধৈর্য, একটু সহনশীলতা নিয়ে চিন্তা করলে—মানুষে-মানুষে জাতিতে-জাতিতে অনেক বিবাদ থেকেই পরিত্রাণ সম্ভব। এমন কি সামান্য একটু বিবেচনায় আন্তর্জাতিক বিবাদও বন্ধ হতে পারে। শিল্পীরা, বিশেষ করে সিনেমার মত শক্তিশালী শিল্পমাধ্যমের স্রষ্টা আমাদের এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারেন। তাঁরা তাঁদের শিল্পমাধ্যমে পৃথিবীকে আরো ঘনিষ্ঠতর করে তুলতে পারেন, মানবজাতিকে কল্যাণের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। আশা করি, শিল্পীরা তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকবেন।

● জার্মানীর প্রতিনিধি মিঃ মাবলার

● রুমানিয়ার প্রতিনিধি

রাষ্ট্রপতির এই বক্তৃতা আমাদের চলচ্চিত্র নির্মাতাদের দৃষ্টি খুলে দিক। সিনেমাকে নিছক শোবার ঘরের কাহিনীচিত্র থেকে উদ্ধার করে কল্যাণকর রূপদানে আমাদের সিনেমা নির্মাতারা যদি অগ্রসর হতে পারেন, তবে রাষ্ট্রপতির বক্তৃতা সার্থক হবে। আশা করি, তাঁর আবেদন ব্যর্থ হবে না।

—সুজন।

• দিল্লীতে আগত চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে সত্যজিৎ রায়, সামিয়া আহম্মদ, লুডমিলা চুরসিনা প্রমুখকে দেখা যাচ্ছে।

তৃষ্ণা

(গিল্ড ফিল্মস)

এমিলি ব্রুণ্টির উইদারিং হাইটস-এর বাংলা চিত্ররূপ 'তৃষ্ণা'। ইতিপূর্বে এই কাহিনী বিদেশে চিত্ররূপ লাভ করেছে। বাংলায় চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন বিজন ভট্টাচার্য। পরিচালনা করেছেন কৃতী পরিচালক অসিত সেন।

এক নাম-গোত্রহীন রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া বালক রাণীর খেলার সাথী হয়ে যৌবনে তার হৃদয়ে রাজার আসন লাভ করেছিল। রাণীর ডাকা রাজা নামটাই তার পরিচয় হয়ে উঠেছিল। রাণীকে নিয়ে সে রচনা করেছিল যৌবরাজ্য। এই যৌবরাজ্যের অধীশ্বর হয়ে থাকার জন্য রাণীর দাদার সব অত্যাচার সে মেনে নিয়েছিল। রাণীকে হারাবার আশঙ্কায় সে তাকে দৃষ্টির আড়াল করতে পারে নি। কিন্তু এত অত্যাচার রাজা সইলেও রাণী সইতে পারে নি। সে তাকে বলেছিল চলে যেতে; আর যেদিন তাদের সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াবার যোগ্যতা অর্জন করবে সেদিনই যেন ফিরে এসে তাকে গ্রহণ করে। কিন্তু রাজা সমাজের উপেক্ষা ও অমর্যাদা নিয়েও রাণীর কাছেই থাকতে চায়। হয়তো তাকে আঘাত দিয়ে সরিয়ে দেবার জন্যই রাণী অভিজাত ও বিত্তবান বিমলেন্দুর প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছিল। সেদিনই কেবল তার পৌরুষে আঘাত লেগেছিল। সে বুঝেছিল কেবল ভালবাসা নয়, রাণীর পাশে দাঁড়াতে হলে তাকে বিত্তের মানদণ্ডে সমাজের স্বীকৃতি আদায় করতে হবে। রাজা নিরুদ্দেশ হয়েছিল। তারপরে একদিন রাজা ফিরে এল মানমর্যাদা ও অভিজাতের স্বীকৃতি নিয়ে। ফিরে এসে দেখলো —রাণী অন্যের স্ত্রী। সেদিন যেমন রাজার মনে ঝড় উঠেছিল, তেমনি দ্বৈত প্রেমের দ্বন্দ্বে, অতৃপ্ত রাণীর মনও জ্বলে যাচ্ছিল। এই জ্বালায় সে মৃত্যুকে আশ্রয় করেছিল। আর জীবনতৃষ্ণা নিয়ে রাজা প্রতীক্ষায় ছিল রাণীর আহ্বানের, এ জন্মে যে তৃষ্ণা মেটে নি পরলোকে সে কামনা সার্থক করার।

ছবির প্রায় সর্বাংশ মনোরম পাহাড়ী পরিবেশে গৃহীত। এই পরিবেশে পরিচালক কাহিনীকে বিকশিত করেছেন এবং শেষের দিকে রহস্যময়তা সৃষ্টি করেছেন। চিত্রগ্রহণের নৈপুণ্যে প্রাকৃতিক দৃশ্য যথেষ্ট উপভোগ্য ও একটা মিষ্টি মেজাজ পাওয়া যায়। ছোটকালে রাণীর একটি স্বপ্ন-দৃশ্য রচনা এবং পাহাড়ের গুহার মধ্যে রাজা ও রাণীর কল্পনা-রাজ্য সৃষ্টিতে পরিচালক যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রকাশ করেছেন। কিন্তু রাণীর বিবাহ ও মনের দ্বন্দ্ব এবং রাজার রাতারাতি অভিজাত হয়ে ফিরে আসা যথেষ্ট বিশ্লেষিত হতে পারে নি। বিশেষ করে বিমলেন্দুর চরিত্র উপযুক্তভাবে প্রকাশ না হওয়ায় রাণীর অন্তর্দ্বন্দ্ব ফুটে ওঠে নি। শেষাংশের অলৌকিক রহস্যময় পরিণতি বাস্তববাদী

● আন্তর্জাতিক উৎসবে প্রতিযোগী চিত্র 'টেল অব দি ডন'-এর একটি দৃশ্য

মনে কিরূপ রেখাপাত করবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। যৌক্তিকতা ও বিশ্বাস্যতার উপর কাহিনী প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে নি। পরিচালক যেভাবে প্রতীক ব্যবহার করেছেন তাও বিশেষ কার্যকরী হয় নি।

জ্যোৎস্না বিশ্বাসকে রাণীর চরিত্রে ভাল লাগে। রুমা গুহঠাকুরতা শান্তি চরিত্রে সহানুভূতি লাভ করেন, অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিশ্বজিৎ, শেখর চট্টোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য, সুমিতা সান্যাল প্রমুখ। শ্যামল ঘোষাল চরিত্র সৃষ্টিতে সার্থকতা দাবি করতে পারেন না। নাচের দৃশ্য উপভোগ্য। বিশেষ করে মথাই ওঝার ঢোল এবং আসামের বিহু উৎসবের নাচ মনোরঞ্জনী দিকে সাহায্য করেছে।

রূপ-সনাতন
(শুভকল্প-চিত্রম)

বৈষ্ণব সাহিত্যে রূপ-সনাতনের কাহিনী বিশিষ্ট স্থান জুড়ে আছে। যে সময়ে বাংলা দেশে শ্রীচৈতন্যের প্রেমের ধর্মের জোয়ার এসেছে সে সময় গৌড়ের নবাব হুসেন শাহের দুই মন্ত্রী রূপ আর সনাতন কিভাবে সর্বত্যাগী হয়ে এই প্রেমধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন, তারই কাহিনী নিয়ে চিত্র-নাট্য রচনা করেছেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। এই প্রেমধর্মের সাধনার পথে তাদের যে প্রলোভন ও দুঃখকষ্ট জয় করতে হয়েছিল, আলোচ্য ছবিতে সে ঘটনাবলী দেখান হয়েছে। ভক্ত-হৃদয়ে এইরূপ ছবির আবেদন আছে। পরিচালক সুনীলবরণ ছবিটিকে ভক্ত-হৃদয়ের উপযোগী করে তোলার চেষ্টা করলেও, বাইজী নাচের প্রাধান্য এবং শিল্পী নির্বাচনে, বিশেষ করে সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা কাঞ্চনমালার ভূমিকায় শিল্পী নির্বাচনে সুবিবেচনা না করায় আশানুরূপ সার্থক হতে পারেন নি। তবে রথীন ঘোষের পরিচালনায় সঙ্গীত ছবিটিকে উপভোগ্য করেছে। কয়েকটি গানের সুরে কিছুটা নতুনত্ব এবং জনপ্রিয় শিল্পীদের কণ্ঠের গান তৃপ্তি দান করে।

অভিনয় এবং দৃশ্য-সৃষ্টিতে মঞ্চের প্রভাব দেখা যায়। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (সনাতন), রবীন মজুমদার (রূপ), নীতীশ মুখার্জী (হুসেন শাহ), জয়শ্রী সেন (কাঞ্চনমালা), সবিতা বসু (মীরা-বাঈ), শিপ্রা মিত্র (বেগম) এবং মলিনা দেবী প্রমুখ অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছেন।

ওয়ার এণ্ড পীস
টলস্টয়ের চিরায়ত সাহিত্যের চিত্ররূপ

বিশ্বসাহিত্য ভাণ্ডারে টলস্টয়ের 'ওয়ার এণ্ড পীস' এক অমূল্য সম্পদ। এই চিরায়ত সাহিত্যে যুদ্ধ বিকৃত জীবনের প্রতি ভালবাসা ও মানবতার জয়গান ঘোষিত। পরদেশ আক্রমণ-কারী ও মানুষের শান্তির বিঘ্ন সৃষ্টি-কারী শক্তির বিরুদ্ধে অসহযোগ ও প্রতিরোধের সংগ্রামের মহৎ প্রেরণায় এই সাহিত্য বিশ্বমানবের বিবেক-স্বরূপ। বর্তমানকালে যখন আরও এক মহাযুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা নিয়ে

অঁাদ্রে হেপবার্ন

মানবসভ্যতা মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে ; ঠিক সেই মুহূর্তে আর একটি মহাযুদ্ধের আশঙ্কার কথা মানুষ ভুলতে পারছে না। আজো ঔপনিবেশিকতা ও পররাজ্য আক্রমণে পৃথিবীর বুক থেকে রক্ত ঝরছে। এ সময় টলস্টয়ের 'ওয়ার এণ্ড পীস'-এর চিত্ররূপ দেখার সার্থকতা অনেক বেশি। শহরের চিত্ররসিক, বিশেষ করে ছাত্রসমাজ এই ছবি দেখে উপকৃত হবে। ছবিটি এলিট সিনেমায় মুক্তি লাভ করেছে।

এই বিরাট ছবিটি (বাইশ রীল) ভিস্টাভিশন পদ্ধতিতে গৃহীত এবং টেকনিকলার বর্ণরঞ্জিত। প্রায় ছয় বছরের পরিশ্রমে বিশ্বের নামকরা চিত্রতারকাদের সমবেত করে ছবিটি নির্মিত। যুদ্ধের দৃশ্যগুলিকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য প্রায় ১৮ হাজার ইতালীয় সৈন্যের ও অশ্বারোহী বাহিনীর সাহায্য নেওয়া হয়েছে। দিগন্তবিস্তৃত দৃশ্য, ভয়াবহ যুদ্ধ এবং ত্যাগ ও প্রেমের মর্মস্পর্শী ঘটনায় ছবিটি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে নেপোলিয়ান রাশিয়া আক্রমণ করেছিল। কিন্তু মস্কো পৌঁছে দেখেছিল জলশূন্য শহর এবং ভস্মীভূত গৃহ। রাশিয়ানদের অসহযোগিতার দরুণ নেপোলিয়নকে চরম বিপর্যয়ের মধ্যে ফিরে আসতে হয়েছিল। এই আক্রমণ ও প্রতিরোধের ঐতিহাসিক কাহিনীর মধ্যে দেখা যায় পিয়েরীর (হেনরী ফণ্ডা) মত মানবতাবাদী হৃদয়বান চরিত্র, প্রিন্স এণ্ড্রের (মেল ফেরার) মত বীর, অথচ যুদ্ধের পরিণতি সম্পর্কে সচেতন। নাটাশার (অঁাদ্রে হেপবার্ন) মত নিষ্পাপ তরুণী, জেনারেল কুটজভের (অস্কার হোমুলকা) মত বিচক্ষণ সেনাপতি। যুদ্ধের দিনগুলিতে এদের জীবনের অভিজ্ঞতা ভয়ঙ্কর। এণ্ড্রে ভালবেসেছিল নাটাশাকে। কিন্তু এণ্ড্রের অনুপস্থিতির সুযোগে কুরাগিন (ভিত্তোরিও গাসম্যান) এসেছিল নাটাশাকে কলুষিত করতে। যদি পিয়েরী এসে কুরাগিনকে বাধা না দিত, তবে নাটাশার জীবনে যুদ্ধের মত সর্বনাশ নেমে আসতো।

যুদ্ধের মধ্য দিয়ে মানুষের যেন অগ্নিপরীক্ষা হয়ে গেছে। পিয়েরী ও নাটাশা নিজ চোখে সব দেখেছে। জীবনের প্রতি ভালবাসা, মানুষের প্রতি বিশ্বাস তাদের বেড়েছে। তারা বুঝেছে সে যতই শক্তিশালী হোক না কেন মানুষের বিবেকের উপর কেউ আধিপত্য করতে পারে না। মানুষ অপরাজেয়।

গান্ধর্বী প্রযোজিত রবীন্দ্রনাথের 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্যের একটি দৃশ্য

পরিচালক কিং ভিডর 'ওয়ার এণ্ড পীস' রূপায়ণে গত ফ্যাসিস্ট বিরোধী মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েছেন। তাই নেপোলিয়নের মধ্যে হিটলারের প্রতিচ্ছায়া দেখা গেছে, অসহযোগী মস্কোতে পোড়ামাটি নীতির প্রয়োগ দেখা গেছে।

নাটাশার চরিত্রে অঁাড্রে হেপবার্নের অভিনয় অনবদ্য। হেনরী ফণ্ডার অভিনয়ে উদারনৈতিক যুবকের মানবতাবোধ ও দেশপ্রেম এবং অন্তঃসলিলা ভালবাসা চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে। কৃষকের চরিত্রে জন মিল এবং জেনারেল কুটজভের চরিত্রে অস্কার হোমুলকার অভিনয় চমৎকার। অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন এনিটা একবার্গ, বারিজোনস, মিলি ভিটালে, যেব্রিট প্রমুখ।

পরিচালক যথেষ্ট নৈপুণ্যের সাথে ছবিটিকে সার্থক করেছেন, তবে সাধারণ মানুষের মহত্ব আরো প্রতিফলিত হলে ভাল হতো। লিগোরকো পরিচালিত সঙ্গীত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

কলকাতায় ফিল্ম সপ্তাহ

তৃতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব উপলক্ষে কলকাতায় ২২শে জানুয়ারী হতে ফিল্ম সপ্তাহ সুরু হচ্ছে। এই সপ্তাহ উদ্‌যাপনের জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি কমিটী গঠিত হয়েছে। ২২শে জানুয়ারী লাইট হাউস সিনেমায় রাজ্যপাল ফিল্ম সপ্তাহ উদ্বোধন করবেন। এই উপলক্ষে বিদেশাগত প্রতিনিধি ও বিচারকমণ্ডলীর সদস্যদের অনেকে কলকাতা আসবেন এবং তাঁরা বিভিন্ন সম্বর্ধনা-অনুষ্ঠান ও আলাপ-আলোচনায় উপস্থিত থাকবেন।

২২শে থেকে ২৮শে জানুয়ারী ফিল্ম সপ্তাহে চলচ্চিত্র উৎসবে প্রতিযোগী ও অপ্রতিযোগী ছবিগুলির মধ্যে চল্লিশটি ছবি দেখান হবে। ছবি দেখান হবে (১) লাইট হাউস, (২) মেট্রো (৩) প্যারাডাইস (৪) প্রাচী, (৫) পূর্ণ, (৬) রাধা সিনেমায়।

● ইউনাইটেড রিক্রিয়েশন ক্লাব কর্তৃক অভিনীত 'ময়ূর মহল' নাটকের একটি দৃশ্য

এই কয়টি সিনেমায় প্রত্যহ তিনটি শো হবে। ২৩শে, ২৪শে এবং ২৬শে চারটি করে শো হবে। এ ছাড়া শিল্পী, টেকনিশিয়ান, পরিচালক এবং প্রযোজকদের জন্য কয়েকটি বিশেষ শো'র ব্যবস্থা করা হবে।

কলকাতায় যে ছবিগুলি দেখান হবে তার মধ্যে থাকছে: গানস এট বাটাসী, দি সার্ভেণ্ট, টম জোনস, স্যাটারডে নাইট এণ্ড সানডে মর্নিং (বৃটেন); দি হকস, টিউডর, (রুমানিয়া) দি স্টোরী অব ডন, আই বট এ ডাডি, হ্যামলেট (সোভিয়েট ইউনিয়ন); বিলাভেড হোয়াইট মাউস, নেকেড এমোং উলভস্ (পূর্ব জার্মানী), কাফে ফ্রম দি পাস্ট, নাইফ ইন দি ওয়াটার, ইনোসেন্ট সোরচেরার্স (পোল্যাণ্ড); ওকাসান, হারাকিরি, লাইফ অব ওহারু, লোয়ার ডেপথ, সী এণ্ড হি, থ্রোন অব ব্লাড, দি রিকশ ম্যান,, কুড আই বাট লিভ (জাপান); ব্রাইড হ্যাজ এ মাদার (মিশর), জানোসিক, হপ পিকার্স, দি ক্যাট, ডেথ কলড এঙ্গলেচেন (চেকোশ্লোভাকিয়া); দি ইয়ং নান (ইতালী); দি সেপার্ড কিং (বুলগেরিয়া); কনকোয়েরার অব দি গোল্ডেন সিটি (তুরস্ক) ; ভার্সপাটাণ্ড ইন মারিয়েনবোর্ন, দি ভিজিট (পশ্চিম জার্মানী), স্যাটারডে ইভেনিং, ডোণ্ট ক্রাই পিটার (যুগোশ্লাভিয়া), পারপেরালিয়া (সিংহল), উইনটার নাইট, ওয়েডিং ইন সুইডিস স্টাইল (সুইডেন) নোবোডি ওয়েবড গুডবাই (কানাডা), আমেরিকা আমেরিকা, দি স্যাণ্ড এণ্ড দি সান (ইউ, এস, এ) ; হকিকৎ (ভারত), এই সঙ্গে বিভিন্ন দেশের প্রামাণিক চিত্রগুলিও দেখান হবে।

নাটকের কথা

ময়ূর মহল

ইউনাইটেড রিক্রিয়েশন ক্লাবের দ্বিতীয় বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে গত ২৮শে ডিসেম্বর 'ময়ূর মহল' নাটকটি বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে ক্লাব-সভ্যদের দ্বারা অভিনীত হয়।

সত্যান্বেষী যুবক কল্যাণের ভূমিকায় শ্রীশঙ্কর মুস্তাফির সুন্দর অভিনয় দর্শকদের প্রশংসালাভ করে। রজতের ভূমিকায় শ্রীপ্রদীপ দাস, পান্নার ভূমিকায় শ্রীমতী দীপান্বিতা দাস এবং রাঘবের ভূমিকায় তপন ঘোষের অভিনয় যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। হীরাবাঈয়ের ভূমিকায় শ্রীমতী আশা বোস, বীরেনের ভূমিকায় সুনীল পাল, ডাঃ বসন্ত মল্লিকের ভূমিকায় শ্রীতারাচাঁদ দত্ত, ডাঃ অমিয় চৌধুরীর ভূমিকায় শ্রীসুখেন্দু সাহা, ত্রিদীপনারায়ণের ভূমিকায় শ্রীশচীন্দ্রনাথ দত্ত, জগৎনারায়ণের ভূমিকায় শ্রীহরিচরণ গাঙ্গুলী এবং উদয়নারায়ণের ভূমিকায় শ্রীকেশব চক্রবর্তী অভিনয় করেছেন। নাটকটি পরিচালনা করেন শ্রীবিজয়মোহন মুখার্জী।

গ্রন্থমেলা

কুমারী মাটির ঘুম ভাঙলো: (২য় খণ্ড)—মিখাইল শলোখভ। অনুবাদ: সত্য গুপ্ত। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ। ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম: আট টাকা।

'কুমারী মাটির ঘুম ভাঙলো'র ২য় খণ্ডটি যদিও স্বয়ংসম্পূর্ণ, তথাপি সোভিয়েত দেশ ও সেখানের বিপ্লবের বিরাট ইতিহাসের সম্পূর্ণ কাহিনী জানতে হলে পাঠকের কাছে ১ম খণ্ডটিও অপরিহার্য। ২য় খণ্ডে বিপ্লবী ও প্রতিবিপ্লবী দলের দ্বন্দ্বের পটভূমিকায় যে কাহিনীটি গড়ে উঠেছে তা ক্লাসিক-ধর্মী। কেন না, সেই কাহিনীর মধ্যে আদর্শ, ভালবাসা, হিংসা-প্রতিহিংসার মধ্যে প্রধান যে গুণ রয়েছে তা হচ্ছে—ঠিক জীবনাদর্শ ও মানবরসরসিকতা। সোভিয়েত দেশের মাটি থেকে মানুষের জন্য এমন একটা জিজ্ঞাসা উচ্চারিত হয়, যা সেখানের সাহিত্যের যে-কোন রচনাকে ক্লাসিক-ধর্মে উন্নীত করে। এই উন্নীত হবার মূলে তৃতীয় ... বর্তমান থাকে—তা হচ্ছে স্বয়ং লেখকের। তাঁর মনোধর্ম, বিশ্লেষণ-পদ্ধতি, ইতিহাস-চেতনা এবং জীবন ও জগৎ সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতা তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে। 'কুমারী মাটির ঘুম ভাঙলো' (২য় খণ্ড) উপন্যাসে লেখক শলোখভ বিপ্লবী ও প্রতিবিপ্লবীদের দ্বন্দ্বের মধ্যে বিরাট সমস্যা দেখেছেন এবং সেই সমস্যা থেকে উত্তীর্ণ হবার জন্যে নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে যথার্থ সংগ্রামকে লক্ষ্য করেছেন তাঁর নিজেরই সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে। দেশ ও মানুষের স্বার্থে তাই শেষ পর্যন্ত 'দক্ষিণ রুশিয়ার সোভিয়েত শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবের বিদ্রোহ সংগঠনে মরিয়া হয়ে ওঠা প্রচেষ্টার ঐতিহাসিক অকালমৃত্যু' ঘটেছে। এইরকম যে ঘটেছে তার কারণ, 'শত্রুকে পরাস্ত করতে হলে তার অস্ত্র সম্পর্কে জানা থাকা দরকার।' এই জানাটা শুধু চরিত্রগুলির নয়, আজ সব দেশের মানুষেরই তা জানা দরকার। তাই 'কুমারী মাটির ঘুম ভাঙলো' দেশে দেশে মানব-উদ্দীপনার এক শাশ্বত কাহিনী।

জয়ন্তী সেন

সত্য গুপ্তের সুন্দর অনুবাদে গ্রন্থটির বহমানতা সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হয়েছে। খালেদ চৌধুরী অঙ্কিত প্রচ্ছদ চমৎকার।

প্রহত প্রহর: সতীন্দ্র ভৌমিক। উত্তর প্রকাশন, ৯, কলেজ রো, কলিকাতা-৯। দাম: দুই টাকা।

সতীন্দ্র ভৌমিকের কবিতা হৃদয়ের জ্বালায় অভিসিক্ত। এই জ্বালা বাংলা-সাহিত্যের প্রাচীন যুগ থেকেই রয়েছে। তবে শ্রীভৌমিক আধুনিক যুগের যন্ত্রণা থেকে উত্তীর্ণ হবার অভিলাষী। সেই কারণে মাত্র দু-একটি ছাড়া কোনো কবিতার মাত্রা ব্যবহারে পরিমিতি রক্ষা করেন নি। হয় তো ছন্দপতনের ক্ষণে এটাই স্বাভাবিক। তথাপি কোন পথে জীবনছন্দ রয়েছে, তার ইংগিত তিনি, স্পষ্টভাবে না হলেও স্বাভাবিক বোধের অনুপ্রেরণায়, দেবার চেষ্টা করেছেন। কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিকে তিনি দুই ভাগে ভাগ করে উপস্থাপিত করেছেন। প্রথম ভাগের একটি কবিতা, যার নাম 'সিনিক' সেটি পঠনীয়। তিনি বলেছেন—

'পদাঘাতে পদাঘাতে সেইদিন
দেবে কি কবর?
হা ঈশ্বর, শোকরত হোক
যত শৃগালের সুর।'

দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে কবিচেতনার স্পষ্ট স্বাক্ষর বর্তমান। সেখানে তিনি উচ্চারণ করছেন—

'তুমি ঋত, । তুমি সবিতুর্বরেণ্যং।'

বর্তমান তরুণ কবিদের অনেকের মধ্যে একই শব্দ ও ক্রিয়াপদের ব্যবহার প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়: আশা করি, তা থেকে সতীন্দ্র ভৌমিক মুক্ত হবেন এবং পূর্ণ স্বকীয়তায় নতুন প্রহরের ঘোষণা করবেন।

কথন কুয়াশা: জগদীশচন্দ্র দাস। অ্যাল্‌ফা-বিটা পাবলিকেশনস্। পোস্ট বক্স: ২৫৩৯, কলকাতা-১। দাম: তিন টাকা।

মোট বত্রিশটি কবিতার সংকলন। প্রতিটি কবিতাই অপরিমিত মাত্রার গদ্য ছন্দে লেখা। কবি নিজে বলেছেন, 'আমি হৃদয়ের অনুভবের কবিতা লিখি।' অবশ্য কবিতায় বলেছেন, 'আমি আমার বিশ্বাসকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।' প্রতিটি কবিতার মধ্যে সেই অনুসন্ধিৎসা আমরা লক্ষ্য করেছি, হৃদয়ের আর্তিও অনুভব করেছি। সেই আর্তি রয়েছে 'রাঙা পা', 'এক ভাই' প্রভৃতি কবিতায়। কিন্তু দুটি কবিতার স্বাদ সম্পূর্ণ পৃথক। প্রথম কবিতায় রয়েছে কামনার উচ্ছ্বাসবাহুল্য, দ্বিতীয় কবিতায় পাই সমাজ-সচেতনার মুকুলিত সংশয়। কবির প্রতিটি কবিতায় হৃদয়ধর্মিতা পরিস্ফুট হয়েছে বলে হয়তো সকলেই স্বীকার করবেন না, যেমন 'বহু জগত' কবিতা মননপ্রধান। কিন্তু কবিতাটির বক্তব্য প্রখর। কবির অধিকাংশ কবিতা অন্তর্ধর্মী। তিনি যেখানে বহিরঙ্গে তুষ্ট, সেখানেই ব্যর্থ, কখনো বা পাঠকের কাছে তিক্ত। 'ইতিউতি' কবিতা সে কথার একমাত্র উদাহরণ, মনে হয়।

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

জঁ্যা রেনোয়া (ফরাসী)
(JEAN RENOIR)

অতীত ও বর্তমানে যত চিত্র-পরিচালক হয়েছেন বা আছেন, তাঁদের মধ্যে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন জঁ্যা রেনোয়া। ফরাসী চিত্রজগতে পরিচালকেরা তাঁকেই মনে করেন তাঁদের গোষ্ঠীপতি। তাঁদের মতে তিনিই চিত্রজগতের সবচেয়ে সম্মানীয় পরিচালক। ছবির কাজে সারা জীবন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কাটিয়েছেন রেনোয়া। জীবনরসে সবসময়েই ভরপুর—চিত্রনির্মাণের অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান তাঁর অতুলনীয়, এ বিষয়ে কৌতূহলের তাঁর শেষ নেই। ভারতবর্ষে এসে The River ছবি তোলেন এবং ইতালীতে The Golden Coach—দুটিই রঙীন ছবি।

'Both of these are erratic and sometimes careless in dialogue, performance, and construction; and both works which one could watch again and again for their sense of a setting and the effortless generosity of their response to a character.'—Penelope Houston.

রেনোয়া হচ্ছেন সেই ধরণের ডিরেক্টর, যাঁর স্টাইলের প্রভাব অন্য চিত্রপরিচালকদের পক্ষে এড়িয়ে ওঠা মুস্কিল। আর্টের দোহাই দিয়ে ছবিকে তিনি প্রাণহীন করে তোলেন নি কখনও।

থার্টিজ-এ তোলা তাঁর দুটি বিখ্যাত ছবি হচ্ছে—'La Grande Illusion' ও 'La Regle du Jen.' দুটি ছবিতেই বিষয়বস্তু অত্যন্ত জমাট, দুটিতেই হাসি এবং উপহাসের বস্তু রয়েছে। আর রয়েছে একটা গভীর নীতিবোধের অনুভূতি এবং সর্বাঙ্গীণ সহানুভূতির ভাব। বর্ণনাশক্তি, সময়-জ্ঞান, স্থান-কাল-পাত্রের ঠিকমত সংযোগ করবার ক্ষমতা, সব বিষয়েই তাঁর কোনো জুড়ি পাওয়া যায় না চিত্র-পরিচালনার ক্ষেত্রে। তাঁর ১৯৬২ সালে তোলা ছবি La Caporal Epingle প্রমাণ করে দিয়েছে এই বয়সেও তাঁর কর্মক্ষমতা এতটুকু কমে যায় নি—এখনও তিনি চিরনবীন, প্রাণবন্ত এবং অফুরন্ত কল্পনাশক্তির অধিকারী।

এ্যালেন রেজনায়স (ফরাসী)
(ALAIN RESNAIS)

রেজনায়সের মত সমালোচকদের কাছ থেকে এত তীব্র কশাঘাত এবং বিদ্রূপবাণ লাভ করা বোধ হয় আর কোনো পরিচালকের ভাগ্যে ঘটে নি। যে ছবি তুলছেন, তার কাহিনীর সাহিত্যিক মূল্য কতখানি—এ নিয়ে রেজ্‌নায়স যতোটা মাথা ঘামান, তাঁর সমকালীন অন্য কোন পরিচালক তা কখনও করেন না। ছোট ছোট ছবি তুলেই—যেমন Guernica—

ফেডোরিকো ফেলিনীর 'লা ডল্‌সা ভিটা' চিত্রের একটি দৃশ্য

● রবার্ট ব্রেঁসর 'ল্য জুর্নাল ডু্ন কিয়োর দ্য কাম্পেনে'র একটি দৃশ্য

কাজ আরম্ভ করেন, পরে অবশ্য ফিচার ও ডকুমেণ্টারী ছবিতেও মনোনিবেশ করেন। অতীত এবং বর্তমানের পারস্পরিক সম্বন্ধের ব্যাপারটাই তাঁর চরিত্রগুলির প্রধান সমস্যা। তাঁর হিরোসিমা ছবিতে নায়িকার বর্তমান জাপানী প্রেমিক এবং অতীতের নাৎসী সৈনিকের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারটা খুবই সহজভাবে বর্ণিত হয়েছে। বিরুদ্ধবাদী সমালোচকদের মতে এই ছবিটি অর্থাৎ Hiroshima mon Amour এবং L' Annee derniere a Marienbad মনের সমতা বজায় রেখে দেখা বা উপভোগ করা যায় না।

রেজনায়সের ছবি তোলার পদ্ধতিটাই যেন সবার থেকে কিরকম আলাদা ধরণের। এটা তাঁর একটা নিজস্ব স্টাইল—একে অনুকরণ করা যায় না।

The technique of his films, which owes more than that of most modern directors to editing, an extremely subtle timing and relationship of shots, does not particularly encourage imitation—Penelope Houston.

১৯৬৩ সালে তাঁর তোলা ছবি Muriel লণ্ডন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে দেখানো হয় এবং সমালোচকদের ভেতর যথেষ্ট বিস্ময় ও আন্দোলনের সৃষ্টি করে। এককথায় তাঁর ছবির পরিচয় দিতে গেলে James Breen-এর ভাষায় বলতে হয়—

'His films are cold, cerebral and deliberately literary.'

ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো (ফরাসী)
(FRANCOIS TRUFFANT)

নতুন শক্তিশালী পরিচালকদের ভেতর ত্রুফোই সবচেয়ে বেশি প্রতিভা-সম্পন্ন। প্রথমে তিনি ছিলেন নামকরা সিনেমা পত্রিকা Cahiers du Cinema-র চিত্রসমালোচক। তখন থেকেই জোর গলায় প্রচার করতেন—'ছবিতে বলবার বিষয়বস্তুর থেকে বলবার ধরণটাই হচ্ছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধটাই বড় জিনিস এবং তাকেই সহজভাবে ছবিতে ফুটিয়ে তুলতে হবে এবং কাহিনীর থেকে চরিত্রই আমার কাছে বেশি আকর্ষণীয়—এই হচ্ছে ত্রুফোর মতবাদ। মানুষকে সমষ্টিগতভাবে দেখতে আমি চাই না—চাই তার পরিচয় ব্যক্তিগতভাবে—বলে থাকেন এই নতুন দলের সব থেকে প্রতিভাধারী পরিচালকটি। ত্রুফোর কয়েকটি নামকরা ছবি হচ্ছে—Tirez sur le Pianiste, Les Quatre Cents Coups (এটি আত্মজীবনীমূলক। বিষয়বস্তু : একটি ছেলে বন্ধুবান্ধবহীন জগতে তার নিজের স্থান হাতড়ে বেড়াচ্ছে)। Jules et Jim প্রভৃতি।

তাঁর ছবি তোলবার ধরণটা হচ্ছে খানিকটা লিরিক্যাল, খানিকটা ডকুমেণ্টারী ও খানিকটা ক্লিনিক্যাল। রেনোয়ার দ্বারা তিনি যে যথেষ্ট প্রভাবিত একথা তাঁর দু-একটি ছবি দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যায়।

লুচিনো ভিস্কণ্টি (ইতালী)
(LUCHINO VISCONTI)

ভিস্কণ্টি যুদ্ধের আগে বিখ্যাত ফরাসী চিত্রপরিচালক রেনোয়ার সহকারী হিসাবে কাজ করতেন। ১৯৪২-৪৩ সালে সমালোচক উমবার্টো

● ফ্রাঁসোয়া ট্রুফোর 'জুলস এট জিমে'র একটি দৃশ্য

গার্বারো সে সময়ের তোলা ইতালীয়ান ছবিগুলির তীব্র সমালোচনা সুরু করেন—এইসব আলোচনায় নিওরিয়ালিজম শব্দটির ব্যবহার সুরু হয়। এই সময় ভিস্‌কণ্টি তাঁর Ossessione ফিচার-ফিল্ম ও এ্যাণ্টনিওনি তাঁর ডকুমেণ্টারী Il Gente del Po তোলেন—এই দুটি ছবিই হচ্ছে নিওরিয়ালিস্টিক ছবির আগমন বার্তাবাহী।

Ossessione তোলার পর ভিস্‌কণ্টি কয়েক বছরের জন্য থিয়েটারের কাজ নিয়ে মেতে ওঠেন। এরপর ১৯৪৮ সালে আবার তিনি ছবির কাজে ফিরে আসেন। সিসিলিতে দলবল নিয়ে গেলেন ছবি তুলতে। একটি ট্রিলজি তুলবেন এই ছিল উদ্দেশ্য—কিন্তু তার প্রথম পর্বই শুধু তোলা হোল—বাকিটা আর সম্পূর্ণ হয় নি। এই প্রথম পর্বের নাম দেওয়া হোল La Terra Trema। অর্থসমস্যায় জর্জরিত এক জেলে পরিবারকে নিয়েই ছবি—দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে আত্মসম্মান বজায় রেখে এদের আপ্রাণ সংগ্রাম, এই হচ্ছে কাহিনীর বিষয়বস্তু।

ভিস্‌কণ্টির জন্ম হচ্ছে সম্ভ্রান্ত পরিবারে, কিন্তু মতবাদের দিক দিয়ে তিনি মার্ক্সবাদী। তাঁর সম্বন্ধে James Breen বলেছেন:

Uses the screen almost like a painter—every image is composed with a wonderful eye for grouping and texture and (when he uses it) colour. Sometimes more concerned with manner than matter : but at his best capable of epic breadth and shattering emotional power.

তাঁর তোলা অন্যান্য বিখ্যাত ছবির নাম—Rocco and his Brothers, Bellissima, Senso, White Nights ইত্যাদি।

বিলি ওয়াইল্ডার (হলিউড)
(BILLY WILDER)

প্রথমে ছিলেন স্ক্রিপ্ট-লেখক—থার্টিস্‌-এর অনেক নাম করা কমিক-স্ক্রিপ্টই রচনা করেছেন বিলি ওয়াইল্ডার ও চার্লস ব্র্যাকেট যুগ্মভাবে (যেমন নিনচ্‌কা)। পরিচালক হিসাবে প্রথম ছবি তোলেন ১৯৪১ সালে—ছবিটির নাম, 'The Major and the Minor.' হিচককের মত তিনিও নিজের ব্যক্তিসত্তায় বিশ্বাসবাদী এবং অনেক সময় হলিউডের কর্তাব্যক্তিদের বাধা-নিষেধ সত্ত্বেও নিজের ইচ্ছামত এবং নিজের যা ভাল লাগে সেই ধরণের ছবি তুলেছেন। তাঁর স্টাইল বর্ণনাত্মক—মানুষের কুৎসিত নীচ প্রবৃত্তিগুলি এবং স্বার্থপরতা প্রভৃতিকে চোখের সামনে তুলে ধরতে তাঁর মত পটু পরিচালক দেখা যায় না।

গত দশ বছরে যেসব ছবি তুলেছেন, তার সব কটিতে নিজস্ব স্বদক্ষ রীতি সবসময়ে বজায় রাখতে পারেন নি বটে—কিন্তু কিছুদিন আগে তোলা দুটি ছবি—Some Like it Hot ও The Apartment—আবার চারদিক থেকে প্রচুর প্রশংসা পেয়েছে। তাঁর তোলা অন্যান্য বিখ্যাত ছবির নাম হচ্ছে—Double Indemnity (১৯৪৩), The Lost Weekend (১৯৪৫), Sunset Boulevard (১৯৫০) ইত্যাদি।

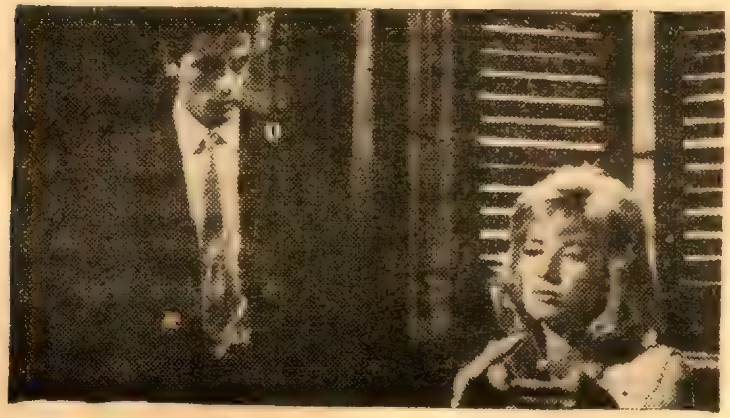

● এ্যাণ্টোনিওনির 'দি ইক্লিপস্' ছবির একটি দৃশ্য

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায়ণ

মূল্য দুই টাকা

"অমূল্য গ্রন্থ হয়েছে"—স্বামী অপূর্বানন্দ।
"বইখানি নতুন ধরণেরই হয়েছে।"
—স্বামী সদাত্মানন্দ।
"বইখানি দেখিতে সুন্দর, বিষয়বস্তু অমূল্য ও অতুলনীয়। একখানি গ্রন্থে এত মহামূল্য রত্নের সন্নিবেশ পূর্বে আর হয় নাই।" —স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজী।

নূতন উপন্যাস—নূতন সৃষ্টি
বর্তমান সময়ের সমস্যা ও
তাহার সমাধান

শ্যাম-সোহাগিনী

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত
মানুষ ভুল করে কিন্তু মানুষের মন যদি পবিত্র থাকে, তবে ভুল ভাঙিতে বিলম্ব হয় না। মূল্য ১৷৷০ টাকা

স্বনামধন্য কথাশিল্পী
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
গ্রন্থাবলী

স্বর্গাদপি গরীয়সী (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড), দৈনন্দিন ও বসন্তে। মূল্য—৩৫০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

● কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দল

শ্রীঅমিতাভ

ক্ষমতার দ্বন্দ্ব

বাংলা হকি সংস্থা এবং ভারতীয় হকি সংস্থার মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব বর্তমানে প্রায় চরম পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে। এই দুই সংস্থার মধ্যে গণ্ডগোলের মূল নায়ক বা কেন্দ্র হলেন খ্যাতনামা হকি খেলোয়াড় ইনামুর রহমান। গত মরশুমে কলকাতা ময়দানে হকি লীগে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের খেলায় চরম অখেলোয়াড়ী আচরণের জন্য দু-দলেরই কয়েকজন খ্যাতনামা খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন বাংলা হকি সংস্থা।

ভারতীয় হকি সংস্থা বাংলা হকি সংস্থাকে একেবারে আমলই দিচ্ছেন না। ভারতীয় সংস্থা বাংলা সংস্থার এই সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করেছেন। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে ইনামুর রহমান বর্তমানে কোন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের যোগ্যতা হারিয়েছেন; কিন্তু আশ্চর্যের কথা যে, ভারতীয় হকি সংস্থা ইনামুর রহমানকে বারবার খেলার সুযোগ দিচ্ছেন। এই বিষয়ে বাংলা হকি সংস্থা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন, কিন্তু ভারতীয় হকি সংস্থা বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করার প্রয়োজন বোধ করছেন না বলে মনে হচ্ছে।

দুই সংস্থার এই ক্ষমতার লড়াই সুরু হয়, গতবছর অলিম্পিক প্রত্যাগত জার্মানী হকি দল যখন ভারত সফরে আসেন। কলকাতায় ভারতীয় দল এবং জার্মানী দলের একটি টেস্ট ম্যাচ খেলার কথা ছিল। ভারতীয় দলে ইনামুর রহমানকে খেলাবার জন্য ভারতীয় সংস্থার কয়েকজন কর্মকর্তা খুব চাপ দিতে থাকেন, কিন্তু বাংলা হকি সংস্থা এই বিষয়ে কিছুটা তীব্র মনোভাব গ্রহণ করেন। অবস্থা চরমে ওঠে, ফলে ওই টেস্ট ম্যাচটি পরিত্যক্ত হয়।

এরপর দিল্লীতে ভারতীয় অলিম্পিক একাদশ এবং ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলায় ইনামুরকে বিশ্ববিদ্যালয় দলে স্থান দেওয়া হয়। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে, বর্তমানে ইনামুর আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈধ ছাত্র নন। ইনামুরকে এই খেলায় অংশগ্রহণ না করতে দেবার জন্য বাংলা হকি সংস্থা আপ্রাণ চেষ্টা করেন, কিন্তু তা বিফল হয়। শুধু তাই নয়, সফরকারী ফরাসী হকি দলের বিপক্ষে ভারতীয় দলের পক্ষে ইনামুরকে অংশগ্রহণ করতে দেখা গেল।

ভারতীয় হকি সংস্থা মান-সম্মানে এবং ক্ষমতায় অন্যান্য রাজ্য সংস্থাগুলির অনেক ওপরে; কিন্তু তাঁরা যদি ক্ষমতার অপব্যবহার করেন, তাহলে তাঁরাই লোকসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হবেন। একজন দোষী খেয়োয়াড়কে অবৈধ প্রশ্রয় দান করা যে কতবড় অন্যায় —তা বোধ হয় ভারতীয় সংস্থা উপলব্ধি করতে পারছেন না। তবে ভারতীয় সংস্থার এই ধরণের কার্যকলাপের বিষময় ফল দেখা যাবে অদূর ভবিষ্যতে।

তরুণ প্রতিভা সন্ধানে

যাঁদের পরিবারের সঙ্গে ক্রিকেটের এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, তাঁদের ক্রিকেটের দিকে আছে একটা সহজাত আকর্ষণ। এর ব্যতিক্রম হয় বটে, কিন্তু সংখ্যায় তা অত্যন্ত নগণ্য। বাংলা ক্রিকেটের জনক হিসাবে অধ্যক্ষ শ্রীসারদারঞ্জন রায়কেই অভিহিত করা হয়। তাঁরই পরিবারের শ্রীশৈলজারঞ্জন রায়, শ্রীক্ষীরাজ রায় পরবর্তীকালে বাংলা

ক্রিকেটে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে, বর্তমানে এঁদের সেই বংশের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখছেন তরুণ ক্রিকেট খেলোয়াড় শ্রীশিবাজী রায়।

শিবাজী রায়ের জন্ম ১৯৪৪ সালে এই কলকাতায়। পিতা শ্রীহৈমজা রায় এককালে ছিলেন ভাল ক্রিকেট খেলোয়াড়। সুতরাং শিবাজী ছোটবেলা থেকেই ক্রিকেটের দিকে যথেষ্ট সাহায্য এবং উৎসাহ পেয়েছেন পিতা-মাতা এবং পরিবারের অন্যান্যদের কাছ থেকে। শিবাজী রায় তাঁর স্কুল-জীবনে ১৯৫৬-৫৭ সালে প্রথম লা-মার্টিনার স্কুলের পক্ষে আত্মপ্রকাশ করেন। শিবাজীর মধ্যে সম্ভাবনার ইঙ্গিত লক্ষ্য করে লা-মার্টিনার স্কুলের ক্রীড়াশিক্ষক মিঃ ফিটজেরাল্ড তাঁর দিকে প্রথম দৃষ্টি দেন।

শিবাজী প্রথম ডিভিসনে আত্মপ্রকাশ করেন জনপ্রিয় স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাবের পক্ষে ১৯৫৯-৬০ সালে। স্পোর্টিং ইউনিয়নের কয়েকজন যশস্বী খেলোয়াড়ের সংস্পর্শে এসে শিবাজী অনেক মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ফাস্ট বোলার লেস্টার কিং এবং ভারতের প্রাক্তন টেস্ট খেলোয়াড় মন্মথনাথ কেনীর কাছে শিক্ষালাভের সুযোগ শিবাজী রায়ের ঘটেছে।

লা-মার্টিনার স্কুল থেকে সিনিয়ার কেম্ব্রিজ পাশ করে শিবাজী আসেন সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে। কলেজ দলের তিনি ছিলেন নিয়মিত খেলোয়াড় এবং তাঁর নেতৃত্বে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ উপর্যুপরি দুবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট বিজয়ী হিসেবে লাভ করেছে, তাঁরই পিতামহের নামে উৎসর্গীকৃত অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন ট্রফি। ১৯৬১-৬২ সালে শিবাজী প্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে খেলার সুযোগ পান। ১৯৬২-৬৩ সালে শিবাজী বিশ্ববিদ্যালয় দলের নেতৃত্বের গুরুদায়িত্ব পান। এ পর্যন্ত শিবাজী উপর্যুপরি চারবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে খেলেছেন। পূর্বে দুবার শিবাজীর বাংলা দলের পক্ষে খেলার সুযোগ এসেছিল, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার জন্য সে-সুযোগ তাঁর গ্রহণ করা তখন সম্ভব হয় নি। এবার রঞ্জী ট্রফিতে আসামের বিপক্ষে শিবাজীর খেলার সুযোগ হয়েছে। ১৯৬৩-৬৪ সালে শিবাজী প্রথম বিভাগ ক্রিকেটে এক অপূর্ব নজীর সৃষ্টি করেন, ৪টি সেঞ্চুরী সহ মোট ১৪২৮ রান সংগ্রহ করে। শিবাজী বলও করেন বটে কিন্তু ব্যাটসম্যান হিসাবে তাঁর সুখ্যাতি বেশি।

● শিবাজী রায়

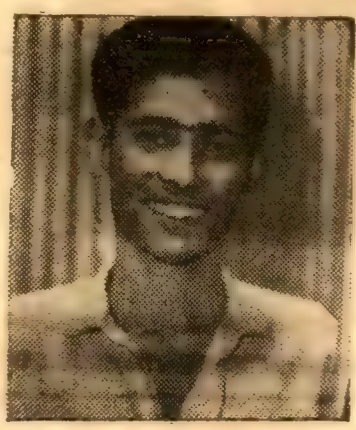

অম্বর রায়

পূর্বাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট

ইডেন উদ্যানে অনুষ্ঠিত পূর্বাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট ফাইন্যালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রথম ইনিংসের ফলাফলে পরাজিত করেছে। কলকাতা দলের এই জয়লাভ, পূর্বপরাজয়ের প্রতিশোধ; কারণ ১৯৬২-৬৩ সালে এই পূর্বাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট ফাইন্যালেই এই ইডেন উদ্যানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যাদবপুরের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল।

এবার অবশ্য কলকাতা দলে সর্বভারতীয় স্কুল ক্রিকেটের দুজন খ্যাতনামা খেলোয়াড় অম্বর রায় এবং রবীন মুখার্জীর আগমনে দলের শক্তি নিঃসন্দেহে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। এবার মূল প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইন্যালে কলকাতা দল বরোদার মাঠে উত্তরাঞ্চলের বিজয়ীর সম্মুখীন হবে।

কলকাতা দলের প্রথম ইনিংসের মোট রানসংখ্যা হয় ৩০৩ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ২৪৯ রান। প্রত্যুত্তরে যাদবপুর প্রথম ইনিংসে সংগ্রহ করে ১৮৩ রান এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৬ উইকেটে ১৭০ রান।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলায় প্রথম আবির্ভাবেই বাংলার তরুণ খেলোয়াড় অম্বর রায় ১২২ রান করে শতরান করার কৃতিত্ব অর্জন করেন। অম্বরের ব্যক্তিগত রানসংখ্যা কলকাতা দলকে বিরাট বিপদ থেকে রক্ষা করে, সঙ্গে রবীন মুখার্জীর ৩৪ রান এবং শঙ্কর বোসের ৩৩ রান উল্লেখযোগ্য।

যাদবপুরের এস দে এবং এ চ্যাটার্জী যথাক্রমে ৫৮ রান এবং ৪৪ রান সংগ্রহ করে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। কলকাতা দলের ন্যাটা স্পিন বোলার

● সোফিয়া খাতুন

ভাস্কর গুপ্ত ৩৫ রানের বিনিময়ে ৫ উইকেট এবং অম্বর রায় ১৬ রানে ২টি উইকেট দখল করেন।

দ্বিতীয় ইনিংসে কলকাতা দলের দেব মুখার্জী শতরান করার কৃতিত্ব অর্জন করেন, তাঁর ব্যক্তিগত রান-সংখ্যা হয় ১০৭। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে দেব মুখার্জীর এই প্রথম শতরান।

যাদবপুর দ্বিতীয় ইনিংসে ৬ উইকেটে ১৭০ রান সংগ্রহ করেন। খেলার নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হবার ফলে বিজয়ীর গৌরব অর্জন করে।

সমাচার দর্পণ

ইংলণ্ডে মানুষের রোগগ্রস্ত শিশুদের জন্য একটি সার্কাস-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এই সার্কাসে নানা ধরণের খেলার সঙ্গে একটি শিম্পাঞ্জীর ক্রিকেট বল করার খেলাটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইংলণ্ডের ফাস্ট বোলার ফ্রেডি ট্রুম্যান এই প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন।

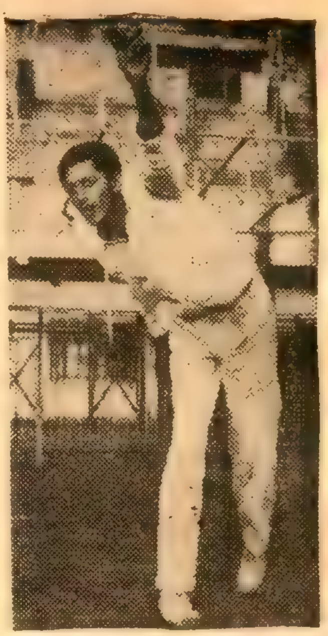

● ভাস্কর গুপ্ত

* * *

ববি সিম্পসন আগামী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরের জন্য অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন।

* * *

নিজ মাঠে মোহনবাগানের বার্ষিক স্পোর্টস অনুষ্ঠিত হল। এই স্পোর্টস-এ বেশ কয়েকটি নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। নবাগতা মহিলা এ্যাথলেট শ্রীমতী সোফিয়া খাতুন এখানেও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি ১০০ মিটারে প্রথম স্থান লাভ করেন; কিন্তু তাঁর বিজয়ে কয়েকজন বেশ অসন্তোষ প্রকাশ করেন। কারণ মৌরিন হোল্ডারকে নাকি অন্যায়ভাবে প্রথম স্থান অধিকারের গৌরব থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে বলে তাঁদের ধারণা।

* * *

নাগপুরের পঞ্চম হকি টেস্টে ভারতকে ফ্রান্স ১—০ গোলে পরাজিত করেছে।

● ইয়কশায়ার ও ইংলণ্ড দলের ফাস্ট বোলার ফ্রেড ট্রুম্যানকে বিলি স্মাটের সার্কাস দলের চৌকস শিম্পাঞ্জী খেলোয়াড় বল করার কৌশল দেখাচ্ছেন।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতা (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট্স কলকাতা-১২,
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

28th January, 1965 • Vol. 6
বর্ষ, ৩৫শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৪ই মাঘ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ
সকল কাজে
সবারে সাজে
বোরোলীন
সার্বজনীন সর্বাঙ্গীন

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	২১৭৯
আজকের মানুষ	...	২১৮০
সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর	হরপ্রসাদ মিত্র	২১৮১
ভারতদর্শন	...	২১৮৩
আন্তর্জাতিক	...	২১৮৮
অদ্বিতীয়া (ধারাবাহিক উপন্যাস)	সুশীল রায়	২১৯২
শহর কলকাতা	শ্রীপদাতিক	২১৯৫
বাণিজ্যে সেকাল ও একাল	ধনপতি সওদাগর	২১৯৯
রঙ্গজগৎ	...	২২০১
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	শিলাদিত্য	২২০৭

বৈষ্ণব-সাহিত্যের অমূল্য অবদান

ভক্তিজগতের কৌস্তুভরত্ন, ভগবদ্ভক্তগণের সাধনার ধন, ভক্তের তুলসী-মালা সদৃশ মহাপবিত্র ভক্তিশাস্ত্র সমন্বয়।

বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রলাপ ও শিক্ষাষ্টক

শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীকৃষ্ণলাভের জন্য যে উৎকণ্ঠা, এই 'প্রলাপে' তাহার অভিব্যক্ত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত 'শিক্ষাষ্টক শ্লোকই' তাঁহার একমাত্র রচনা। শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামীর সুললিত পদ্যানুবাদে এই অমিয় মাধুরী লীলায়িত।

নরোত্তম বিলাস

বৈষ্ণবগণের পরম উপভোগ্য উপজীব্য ভক্তিচরিতামৃত।

দুর্লভসার

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-রচয়িতা শ্রীল লোচনদাস বিরচিত, বৈষ্ণবগণের সংপূজিত।

আত্মতত্ত্ব

বৈষ্ণব দর্শনের সূক্ষ্মতম অনুসরণ।

মনঃশিক্ষা

শ্রীপ্রেমানন্দ দাস ঠাকুর বিরচিত। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত সাধন-ভজনের নিগূঢ় মর্ম্মসমাহিত।

শ্রীচমৎকার চন্দ্রিকা

পরম পণ্ডিত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য পরম বৈষ্ণব শ্রীল কৃষ্ণদাসের সুললিত পদ্যানুবাদ।

পাষণ্ড-দলন

মূর্ত্তিমান বৈরাগ্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বিরচিত প্রেমভক্তির লহর-লীলা।

ভক্তিতত্ত্বসার

হাটপত্তন, শ্রীশ্রীগুরু-বন্দনা, নামসংকীর্ত্তন চৌত্রিশ পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম, নরোত্তম দাসের প্রার্থনা, প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা। সুলভে নামমাত্র মূল্যে বিতরিত।

মূল্য : ৩৲ টাকা।

প্রখ্যাত কথাশিল্পী

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়ের

রামপদ গ্রন্থাবলী

৩৭২ পৃষ্ঠা—মূল্য ৩৲ টাকা

গিরীন্দ্রমোহিনী দেবীর গ্রন্থাবলী

মূল্য—বার আনা

বিগতকালের বরেণ্য সাহিত্যস্রষ্টা

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—

ফোকলা দিগম্বর, পাপের পরিণাম, ডমরুচরিত।

মূল্য এক টাকা

২য় ভাগে—

ভূত ও মানুষ, কঙ্কাবতী, মজার গল্প, মুক্তামালা।

মূল্য : দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অল্প পুঁজির ব্যবসা (গল্প)	দুলাল পাল	২২০৯
ডিটেকটিভ সবাই হতে পারে (গোয়েন্দা-গল্প)	পরিমল গোস্বামী	২২১৩
আরণ্যক (কবিতা)	বিশ্বেশ্বর সামন্ত	২২২০
বিপ্লব প্রচেষ্টার একটি বিস্মৃত অধ্যায় (প্রবন্ধ)	সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	২২২১
কালো চশমাটা (কবিতা)	আবদুল মজিদ	২২২৪
বুড়ো খোঁজে গ্রাম (কবিতা)	তারক সেন	২২২৪
আঁধারমাণিক (ধারাবাহিক উপন্যাস)	মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	২২২৫
রঙ্গদর্শন	...	২২৩১
গ্রন্থমেলা	জয়ন্তী সেন	২২৩৬
পাঠকমন	...	২২৩৭
খেলাধুলা	শ্রীঅমিতাভ	২২৩৮

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠ্যপুস্তক)

মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীই শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার চণ্ডীর কাহিনী বাঙ্গালার বিশিষ্ট জাতীয় জীবনের কাহিনী। তাঁহার কাব্যে পাই মধ্যযুগের বাঙ্গালার নিখুঁত সমাজের সুস্পষ্ট আলেখ্য। শাসক সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্য্যাতিত বাস্তুচ্যুত মুকুন্দরাম দুঃখ ও বেদনারই বাঙ্গালার প্রতিনিধি কবি—ব্যক্তির দুঃখ কি করিয়া সর্বজনের দুঃখ হইতে পারে বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা মুকুন্দরামই সর্বপ্রথম দেখাইয়াছেন। এই হিসাবে তিনি আধুনিক বাঙ্গালার বাস্তবিক সাহিত্যসাধনার অগ্রদূত।

—বর্তমান গ্রন্থে আছে—

১। মূল কাব্য, ২। বিস্তৃত ভূমিকা, ৩। কবির জীবনী, ৪। কাব্য-পরিচিতি, ৫। কবিকঙ্কণ যুগের বঙ্গভাষা ([illegible] লিখিত), ৬। বিস্তৃত কাব্য সমালোচনা এবং ৭। অপ্রচলিত শব্দের অর্থ।

মূল্য সাড়ে চার টাকা

নীহাররঞ্জন গুপ্তের গ্রন্থাবলী

মূল্য সাড়ে তিন টাকা

কালো ভ্রমরের চমকপ্রদ বিস্ময়কর কাহিনীর মধ্য দিয়ে বিদেশী গোয়েন্দা-সাহিত্যের শার্লক হোমসের মত বুদ্ধিদীপ্ত কিরীটি রায়ের আবির্ভাব।

বাংলার মিস্ট্রি সাহিত্যে

ডাঃ নীহাররঞ্জনের দান ৫ম পর্ব

—তেরখানি নির্বাচিত রচনা—

কালো ভ্রমর, [illegible], রক্তমুখী নীলা, পদ্মদহের পিশাচ, পঞ্চমুখী হীরা, [illegible], ঘুম, কালচক্র, কবর, পাথরের চোখ, বর্ণ, অঙ্গুরীয়, [illegible]

প্রতিভাবান নাট্যকার ও প্রবীণ সাহিত্যিক

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মণিলাল গ্রন্থাবলী

২য় ভাগে—৬খানি রচনা ৩৩০ পৃঃ—৩

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

৬১ বর্ষ, ৪৪শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পঃ
বৃহস্পতিবার, ১৪ই মাঘ ১৩৭১

25 Paise
Thursday, 28th January 1965

প্রজাতন্ত্র দিবসের সঙ্কল্প

ছাবিবশে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপিত হলো। আমরা এই দিবসে সম্মিলিতভাবে আমাদের রাষ্ট্রের চরমোৎকর্ষের কামনা করে সংকল্প গ্রহণ করলাম। জাতীয় সংহতি সাধনের জন্য আমরা পুনরায় প্রতিশ্রুতি দান করলাম। রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানগুলিতেও জাতীয় ঐতিহ্য ও রাষ্ট্রিক মর্যাদাসম্পন্ন কার্যাবলী জনচিত্তকে উদ্বুদ্ধ করেছে। এ নিঃসন্দেহ যে, বাহ্যিক আচরণে এমন কিছু প্রকাশ পায় নি—যদ্দ্বারা প্রমাণিত হতে পারে যে, প্রজাতন্ত্র দিবসের মহৎ মর্যাদা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তবু এ-প্রশ্ন আজ নিজেদেরই করতে হয়, রাষ্ট্রের চরমোৎকর্ষ যেখানে জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের মধ্যেই প্রধানভাবে নিহিত—তার সাফল্য কি পরিমাণে আজ পর্যন্ত সাধিত হয়েছে? শিল্প ও কৃষির উন্নতির জন্য চেষ্টা চলেছে—কিন্তু আজো আসমুদ্রহিমাচল কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয় নি। তা যদি না হয়, তাহলে বর্তমানে যে খাদ্য ও বেকার সমস্যার সম্মুখীন আমরা হয়েছি, তা থেকে কোনোদিনই উত্তীর্ণ হতে পারবো না। আমাদের রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হতে চায়। এই উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র শক্তিমান হয়ে উঠতে পারে, যদি ব্যক্তিগত বৃহৎ মুনাফার অবসান ঘটে অথবা ঐ মুনাফার পরিমাণ সরকার কর্তৃক সুনির্দিষ্ট হয়। এ সম্ভব হলে সমাজ থেকে শোষণ নিশ্চিহ্ন হবে। ধীরে ধীরে সমবণ্টন সম্ভব হয়ে উঠবে।

দুঃখের ব্যাপার, বিগত এক বছর ধরে সাধারণ মানুষের কাছে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কল্যাণময় দিকগুলি কুয়াশাচ্ছন্ন। সেই কুয়াশা অপসারণের যদি বা কিছুটা প্রচেষ্টা হয়েছে—জনসাধারণ কিন্তু দিনের পর দিন নির্লিপ্ততার প্রমাণ দিয়েছে। তাই মনে হয় প্রজাতন্ত্রের সংকল্পবাণী তারা বছরের পর বছর প্রথানুগতভাবে কিংবা হৃদয় থেকে উচ্চারণ করেছে তা তাদের নিজেদেরই জিজ্ঞাসা করা উচিত। নতুবা নিজেরাই নিজেদের প্রতারণা করবে। সে প্রতারণা ত আজ অনেক ক্ষেত্রেই চলেছে। বলপূর্বক হিন্দীভাষা প্রচলনের দ্বারা আজ জাতীয় সংহতি বিনষ্টির পথে, চাকরির ক্ষেত্রে প্রাদেশিক মনোভাব কি রকম প্রবল—সে সংবাদ দুদিন আগেই বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। আর কি না আমরা এইসব ঘটনার মধ্যে প্রতিশ্রুতি নিয়েছি জাতীয় সংহতির। এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণে বাহ্যিক আড়ম্বর যদি কোনোরকমে স্থান পায়—তা হলে তা হবে রাষ্ট্রের পক্ষে মারাত্মক। প্রজাতন্ত্র দিবসে তার মূলোচ্ছেদ সাধনেও কৃতসংকল্প হওয়া উচিত ছিল।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

জলাশয়ের ছোট্ট ঢেউই ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে। 'উপলক্ষ'কে আশ্রয় ক'রে এমনি করেই 'আসলে' গিয়েও আঘাত করে ঘটনার স্রোত।

ওয়াকার আবার হেরে গেছেন। আপাত বিচারে একজনের জয়-পরাজয়ের গুরুত্ব হয়ত সামান্য। কিন্তু গর্ডন ওয়াকারের পরাজয় আজ একটা দেশের শাসকগোষ্ঠীর স্থায়িত্বকেও নিয়ে গেছে কঠিন পরীক্ষার সামনে। ব্যাপারটা এমনিতে কিছুই না: প্যাট্রিক গর্ডন ওয়াকার উপনির্বাচনের সুযোগেও সাধারণ সভায় নির্বাচিত হ'তে পারলেন না। কিন্তু বস্তুত এ যেন উইলসন মন্ত্রিসভার প্রতিই সাক্ষাৎ চ্যালেঞ্জ। এবং সেই কারণেই বিষয়টা রীতিমত ভাববার। গর্ডন ওয়াকার পরাজিত বলেই আজ এত বহুবিশ্রুত। দেশে দেশে নানা লোকমুখে বারবার উচ্চারিত তাঁর নাম।

ঘটনার সুরু থেকে বলাই ভাল। কেন না উইলসন গত সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিক দলের অধিনায়ক হিসেবে ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থায় নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করবার সময় বলেছিলেন: গর্ডন ওয়াকার ছাড়া তাঁর মন্ত্রিসভা যেন অসম্পূর্ণ। অথচ গর্ডন সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হ'তে পারেন নি। তা সত্ত্বেও, স্মেথউইকে পরাজিত হ'বার পরও তিনি আমন্ত্রিত হ'লেন বৃটেনের নতুন রাষ্ট্রনায়ক প্রধানমন্ত্রী উইলসনের মন্ত্রি-পরিষদে। ওয়াকার হ'লেন বৃটেনের পররাষ্ট্র সচিব। কথা ছিল অচিরেই তিনি নিজেকে সাধারণ সভার সদস্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবেন। তাই এই লিটনের উপনির্বাচন। কিন্তু ভাগ্যের চাকার মুখ কিছুতেই ফেরাতে পারলেন না ওয়াকার। মন্ত্রিত্বের আসন শূন্য করে প্রশাসনিক সম্মানের ঝুলি ফেরত দিয়ে এবার তাঁকে মিশে যেতে হ'বে সাধারণ্যে।

গত সাধারণ নির্বাচনে মিঃ উইলসন অত্যন্ত অল্প ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়ে দেশের শাসনভার হাতে নিয়েছেন। তাঁর ও তাঁর মন্ত্রিসভার প্রতিষ্ঠা লাভের প্রয়াসকে অনেকটাই ব্যাহত করেছে গর্ডন ওয়াকারের পরাজয়।

শ্রমিক মন্ত্রিসভার কর্মসূচীর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই নানান প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে রাজ্যের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মহলে। লণ্ডন শেয়ার বাজারে দর বেড়ে গেছে। আগুনের মত দাম উঠেছে ইস্পাতের। শ্রমিক সরকার ইস্পাত-শিল্প রাষ্ট্রীয়করণের যে সংকল্প নিয়েছিলেন, গর্ডনের পরাজয় তাকেই যেন পরিহাস করছে।

প্যাট্রিক গর্ডন তাঁর পরাজয়ের একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন—(যদিও সে ব্যাখ্যা বোধ হয় বর্তমান রাজনৈতিক আবহাওয়ার দিকপরিবর্তনের পক্ষে যথেষ্ট নয়)। বলেছেন উদারনৈতিক দলের অনেক ভোটদাতা নাকি এই উপনির্বাচনে সমর্থন জানিয়েছেন রক্ষণশীলদের পক্ষে। এমন কি শ্রমিক দলের বহুসংখ্যক সমর্থকও তাঁদের ভোটদানে বিরত ছিলেন। তা সে কারণ যাই হোক না কেন—বৃটেনের বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর ওপর লিটনের এই ঘটনা যে মর্মান্তিক আঘাত হেনেছে, সে ব্যাপারে কোনও 'কিন্তু' নেই। মস্কো বেতার বলছে: এ ঘটনা শ্রমিক সরকারের প্রতি বৃটিশ শ্রমিকদের অসন্তোষের প্রমাণ। 'টাইমস'-এর রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক বলছেন—শ্রমিক সরকারের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত রায়ই দিয়েছে লিটন।—যাকে বলা চলে অন্তত উইলসন মন্ত্রিসভার আসন্ন পতনের পূর্বাভাস।

প্রধানমন্ত্রী উইলসন এখন আত্মসমীক্ষায় মগ্ন হবেন। নতুন ক'রে ভাববেন তাঁর মন্ত্রিসভার ভবিষ্যৎ পথের প্রতিটি পদক্ষেপে। নিতান্তপক্ষে উদারনৈতিক মতবাদের সমর্থকদের অনুকূলে আগামী কর্মসূচী নির্ধারণ না করলে বেশিদিন সংখ্যাগরিষ্ঠের মর্যাদা বাঁচিয়ে রাখা হয়ত সম্ভব হবে না। (বিশেষত পূর্বতন রক্ষণশীল প্রধানমন্ত্রী স্যার ডগলাস হিউম যখন যে কোনও মুহূর্তেই আবার ক্ষমতাসীন হবার আশায় উন্মুখ রয়েছেন!)

এ কথা হয়ত অতিরঞ্জিত নয় যে, ৫৭ বছরের প্রবীণ গর্ডন ওয়াকার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অন্যতম বিস্ময়কর রাজনৈতিক ঘটনার (উপলক্ষ) নায়ক হয়ে রইলেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, আমেরিকা, রাশিয়া, সর্বত্রই উঠেছে ওয়াকারের কথা। শ্রমিক মন্ত্রিসভার শত দিবসের রাজ্য প্রশাসনকালে অপসৃত হ'য়ে প্রধানমন্ত্রী উইলসনের ওপর প্যাট্রিক গর্ডন চাপিয়ে দিয়েছেন নতুন সমস্যার বোঝা। কালের যাত্রার ধ্বনির সম্যক অনুসরণে এবার উইলসন তাঁর লক্ষ্যের সীমার একান্তে পৌঁছুতে পারেন কি না—তাই আমাদের লক্ষ্য—বৃটেনের রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জীর উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ।

প্যাট্রিক গর্ডন ওয়াকার

সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর

হরপ্রসাদ মিত্র

এলিয়টের বিশেষত্বের লক্ষণ তাঁর আন্তরিকতাতেই আশ্রিত।

তিনি তাঁর নিজের কালের যে জীবনাভিজ্ঞতার কথা লিখে গেছেন, সে-বিষয়ে কোথাও কোনো ফাঁকি ছিল না। তাঁর কবিতা, নাট্যকাব্য, সমালোচনা প্রভৃতিই তার প্রমাণ।

কেউ কেউ তাঁর এই বিশেষ লক্ষণগুলি উল্লেখ করেছেন; অনেকে আলোচনাও করেছেন। একজন এইভাবে দেখিয়েছেন যে, প্রথমত এলিয়ট ছিলেন অতীত সম্বন্ধে খুবই আগ্রহী। সম্ভবত সাহিত্য আর ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে অতীতের ঐতিহ্য সম্বন্ধে তাঁর এই অনুরাগের ফলেই অপেক্ষাকৃত নতুন ভূখণ্ড অ্যামেরিকা ছেড়ে,—তিনি বৃটিশ-সমাজে বাস করতে আসেন। সেই কারণেই তাঁর রচনায় তিনি ছিলেন প্রাচীন ধর্মানুষ্ঠান, ব্রতকথা ইত্যাদির প্রতি মনোযোগী। সেই অতীত-প্রীতির ফলেই তাঁর লেখাতে দেখা দেয় অসংখ্য পুরানোল্লেখ। তাঁর কাছে অতীত তো শুধু পুঁথিশালার সামগ্রী ছিল না। অতীত কেবল বইয়ের মধ্যে বন্দী নয়।

আধুনিক কালের ওঠা-বসা-ঘোরাফেরার মধ্যেও অতীত ঘুরছে, ফিরছে।

ইয়ুং এবং ফ্রেজারের মনোবিজ্ঞানে তাঁর গভীর অনুরাগ। মানুষের সুদীর্ঘ অতীত জড়িয়ে আছে মানুষের অত্যাধুনিক বর্তমানেও। মনোবিজ্ঞানের এই দিকটা তাঁর খুবই ভালো লেগেছিল। এই ভালো-লাগার ফলেই দেখা দেয় তাঁর দ্বিতীয় বিশেষত্ব—যাকে বলা যায় সংকেত বা প্রতীকের দিকে ঝোঁক।

নৃতত্ত্ব সম্বন্ধেও তাঁর আগ্রহ ছিল। নৃতত্ত্ব আর মনোবিজ্ঞান থেকেই তিনি প্রতীক ব্যবহারের প্রেরণা পান।

তৃতীয়ত বুদ্ধিজীবীর দৃষ্টি দিয়েই তিনি বুঝেছিলেন যে, তথাকথিত নিরক্ষর জনগণের সঙ্গে গা ঘেঁষা-ঘেঁষি করে বেঁচে থাকা তাঁর মতন বিদগ্ধজনের আদর্শ হতে পারে না। এ রাজ্যে ঠিক অক্ষরে অক্ষরে গণসংযোগ মেনে চলা সম্ভব নয়। তাই, রাজনীতির দিক থেকে তাঁকে বলা যেতে পারে সংরক্ষণশীল লেখক। এই ব্যাপারটির সম্ভাবনা বিপজ্জনক। এ থেকে তাঁকে ভুল বোঝবার কারণ ঘটতে পারে। সেই সম্ভাবনা এই যে, কেউ কেউ ভাবতে পারেন, এলিয়ট বড়োলোকের কবি, গরিবের কেউ নন।

একথা আংশিক সত্য। গরিবের জন্যে দরদের অভাব ঘটলে নির্মমতা হয় বটে; কিন্তু, 'এলিয়ট একজন নির্মম কবি'—এ-কথা প্রলাপ মাত্র। তিনি নির্মম ছিলেন না। ১৯২৮ খৃীস্টাব্দে 'ফর ল্যান্‌সেলট অ্যান্‌ড্রুজ'-এর ভূমিকায় তিনি নিজের এই পরিচয় দেন যে, তিনি ধর্মবিশ্বাসে 'অ্যাংলো-ক্যাথলিক' সাহিত্যে 'ক্লাসি-সিস্ট' এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে 'রয়ালিস্ট'। আসল কথা, শিক্ষিত মন অশিক্ষিতের এলাকা থেকে আত্মরক্ষা করে। এলিয়ট সেই চেষ্টাই করে গেছেন।

চতুর্থত প্রুফ্রক যেমন নিজের কালের ব্যর্থতায় অক্ষমতায় জর্জর হয়ে বিদ্রোহ করেছিলেন বটে, কিন্তু পুরো-বিদ্রোহের জোর ছিল না তাঁর মধ্যে,—এলিয়টের মনোভাবটাও সেই রকম। আধুনিক মানুষের মনো-ভঙ্গি বা স্বভাবই এই,—তিনি এই রকমই বুঝেছিলেন, বোধ হয়। তাঁর কবিতার ধারায় এই প্রুফ্রক-স্বভাব একাধিকবার দেখা দিয়ে গেছে। সব জায়গায় বিশেষ ব্যক্তি-চরিত্র আসে নি বটে, কিন্তু এলিয়ট তাঁর নিজের যুগের এই আব-হাওয়াটাই ফুটিয়ে গেছেন।

তাঁর পঞ্চম বিশেষত্ব ক্রী-ভর্স-চর্চা, চিত্রকল্প-প্রয়োগ ইত্যাদি ব্যাপার। চিত্রকল্পের দিকে এই অনুরাগের জন্যে এজরা পাউণ্ডের কাছে ঋণ ছিল তাঁর। কিন্তু ১৯২৮এর সেই 'ফর ল্যানসেলট অ্যানড্রুজে'র ভূমিকায় তিনি যে আত্মপরিচিতি দেন, তখন থেকেই তাঁর রচনা ক্রমশ চিত্রকল্প-বাদী কবিদের আঙ্গিক-প্রকৃতি থেকে সরে যায়; ক্রমশ তাঁর দার্শনিকতা বেড়ে যায়। আর, রাজনীতি এবং ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাসের মূল কথা তিনি ১৯৪০এ প্রকাশিত 'দি আইডিয়া অফ এ ক্রিশ্চান সোসাইটি' নামে একটি লেখার মধ্যে বলে গেছেন।

শোনা যায়, 'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' পড়তে হলে শ্রীমতী ওয়েস্টনের 'ফ্রম রিচুয়াল টু রোমান্স' এবং স্যার জেমস ফ্রেজারের 'দি গোল্ডেন বাউ' বই-দুখানি আগে পড়ে নেওয়া দরকার। নৃতত্ত্ব এবং মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে শ্রীমতী ওয়েস্টন 'হোলি গ্রেল' কাহিনীর বিশ্লেষণ করেছেন। শ্রীযুক্ত ফ্রেজার লোকশ্রুত এবং দেশ-দেশান্তরে পরিচিত অন্য এক কাহিনী বিশ্লেষণ করেছেন। এক পবিত্র বনস্থলীতে প্রতি বছর নতুন এক আচার্য এসে পুরোনো আচার্যকে হত্যা করেন। এইভাবে আচার্যের পরে আচার্যের ধারা চলতে থাকে। এই সে-কাহিনী। দুটি গল্পই উর্বরতা-সৃষ্টির উপকথা। হোলি গ্রেলের গল্পেও রুক্ষ জমির কথা ছিল। অফলা জমি উর্বর করে তুলতে হবে। আজ যেখানে ফসল ফলে না, কাল সেখানে ফসল ফলাতে হবে। মানুষের এই শক্তির নাম প্রা ণ শ ক্তি। প্রা ণ লী লা ত্ম ক, ভাবাত্মক, সংকল্পময়। এলিয়ট তাঁর বন্ধ্যা ভূমির কাব্যে সেই প্রাণের গান গেয়ে গেছেন।

নরকের দৃশ্য আছে তাতে। ছিন্নমূল মানবসত্তার ইশারা আছে। কিছু ভবঘুরে, কিছু উদ্বাস্তু মানুষের ঘোরাফেরা সেখানে। কখনো এলিজাবেথের আমল, কখনো বা বিশ-শতকের প্রথম যুদ্ধোত্তর-কালের লণ্ডন-নগরী চোখে পড়ে। টেমসের জলস্রোতে রাজপরিবারের সমারোহের দৃশ্য কখনো,---কখনো বা অন্য দৃশ্য। সাধারণ নিম্নবিত্তের বস্তি কোথাও। টাইপিস্ট আসে, কেরানি আসে। সেকালের র‍্যাপজোর ছবি মনে আসে,—একালের বেসাতির দৃশ্যও। দান্তের নরক-বর্ণনার প্রতিধ্বনি কোথাও। একালের ভয়, শূন্যতা, বিনাশের রূপ দেখা যায়। শব্দগুলি রূপময় মনে হয়। অদ্ভুত তুলনার ছায়া দেখা দেয়। আবহাওয়া ভারি হয়ে ওঠে। তারই কোনো এক ছিদ্র দিয়ে শোনা যায় প্রাচীন কবি সাফোর সন্ধ্যাবন্দনা। সন্ধ্যা দিনের শেষ। তখন সবাই বাড়ি ফিরে আসে। টাইপিস্ট মেয়েটিকেও ঘরে ফিরিয়ে আনে। ফিরে এসে স্টোভ জ্বালতে হয় তাকে। টিনের খাবার গুছিয়ে রাখতে হয়। তার ঘরের জানলায় তখন সূর্যাস্তের আলো।

এই সব টুকরো-টুকরো টুকিটাকি নানাখানার রূপকার ছিলেন এলিয়ট। নানা বিদ্যার জলধারায় স্নান করে তাঁর মনের স্পর্শশক্তি ভারি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল। চড়া-আওয়াজের গরিব-দরদী কবিতা সত্যিই তিনি লেখেন নি। কিন্তু সেজন্যে তাঁকে 'নির্মম' বলা চলবে না। জ্ঞানী পাঠক-পাঠিকা আমাকে মার্জনা করবেন,---আমার মনে হয় ভারতচন্দ্র ঠিকই বলেছিলেন---'যে কহে বিস্তর, মিছা কহে সে বিস্তর।' খুব চড়া সুরে,---অতিশয় ঠাট্টাবিদ্রূপের ভঙ্গিতে কিংবা খুবই চলোচলো আবেগ দেখিয়ে যাঁরা নিপীড়িত জনগণের জন্যে একালেও কবিতায় হাহুতাশ করেন বা তাদের সমব্যথী বলে দাবি করেন, তাঁদের নৈপুণ্যের চেয়ে তাঁদের উদ্দেশ্যবোধই বড়ো। এলিয়টের কাব্যে 'নৈপুণ্য' আর 'উদ্দেশ্য' এরকম আলাদা হয়ে যায় নি। একালে,---এই ষাটের দশকেও আমাদের বাংলা কবিতায় তাঁর নিজস্ব কবিব্যক্তিত্বের কিছু কিছু ছায়া অনুভব করি। এলিয়টের ইংলণ্ডের প্রতিচ্ছায়া নয়,—আমাদেরই বাংলা দেশের—আবহাওয়া দেখা দিয়েছে সেসব কবিতায়। যেমন বিষ্ণু দে লিখেছেন তাঁর 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' বইখানির প্রথম কবিতায়—

> মাটির যেমন ক্লান্তি আসন্ন ফসলে
> সেই ক্লান্তি আমাদের আকাঙ্ক্ষিত
> মহাশয়।

লিখেছেন—'ভবঘুরে সমাজের বেকসুর গ্রামশহরের ক্লান্তি বড়ো ক্লান্তিকর।' আমাদের যুবক-যুবতীদের মন যন্ত্রণায় বিপন্ন। পুরোনো যুগের যে-সব অভ্যাস ছিল, আশ্রয় ছিল, বিশ্বাস ছিল,—সে-সব এখন প্রায় যায় যায়। রমণীর অন্তঃপুর নেই, পুরুষের অবকাশ নেই। এমতাবস্থায়—

> রাজার মেয়ে আজ আপিসে খাটে
> রাজার ছেলে খোঁজে কাজ
> ভালোই জানে তারা রাজ্যপাটে
> কিছুই নয় তারা আজ
>
> তবুও বয়সের উষার সঙ্কটে
> ছেলেটি ভাবে ধাপে বসে
> মেয়েটি সত্যিই রাজার মেয়ে বটে
> রাজার ছেলে নয় তো সে।

বলেছেন—

> আমরা নরকে আছি,
> অথচ সে জ্ঞান নেই মনে
> তাই বিবাহসভায় প্রচ্ছন্ন নরকে আজ
> বর নেই
> অথচ রাজার মেয়ে এবং রাজার ছেলে
> নরকের দেউড়িতে
> রাস্তায় প্রস্তুত আছে স্বাগতের প্রতীক্ষায়
> শুধু স্বভাবে প্রতিষ্ঠা চায় প্রতিবাদে
> প্রাণ মন চায় বরাভয়, তারাই যে বরকনে।

একালের চৈতন্যের মড়কের ছবি দেখিয়েছেন বিষ্ণুবাবু। এ মোটেই চড়া আওয়াজ নয়। এসব গভীর দুঃখের কথা,—এরই মধ্যে কবির গভীর স্বপ্নকামনা অনুরণিত। তাঁরও আশা ছিল—'আমিও তো আসন্ন আশ্বিনে আহা ধানের মঞ্জরী।' কিন্তু আমাদের এই আধুনিক পরিবেশ বড়োই প্রতিকূল।---'এখানে সভ্যতা নেই, হৃদয় শুকানো দীঘি'। এখানে—

> কেউ বা হিন্দির হনো, কেউ
> ইংরেজির হাঙর,
> নানা অবান্তর নানা শিকারীশিকার
> অথচ সবটা গৌণ অচেতন বা অর্ধচেতন
> নরকেরও ব্যঙ্গচিত্র, মৃত্যুরও বিকার।

এ সব কবির কথা। হিসেবী মানুষ যাঁরা তাঁরা কবিদের কথা ধরেন না। কবির কথা কতোটা ধরা দরকার, কতোটাই বা নয়---সে অন্য প্রসঙ্গ। এখানে এইটুকুই মনে দাগ রেখে যায় যে, আমাদের বাংলা দেশের কবি বিষ্ণু দে আজও এলিয়টের মতন নরকের দৃশ্য দেখছেন। অথচ সত্যিই নরক বা মড়ক বা যাবতীয় আধিব্যাধির পরিত্রাতা বলে নিজেকে জাহির করবার ঝোঁক নেই তাঁর। তিনিও প্রসন্নতা চান। এলিয়টের কথা ভাবতে ভাবতে মনে পড়লো বিষ্ণুবাবুর সেই গভীর আকাঙ্ক্ষার কয়েক ছত্র কবিতা—

> মনের আকাশে মুক্ত, বলয় যার নিরুদ্দেশ
> রুজির চিন্তায় নয়, মুনাফার দায়ে নয়
> থীসিসের চাহিদায়, খ্যাতির আস্থায় নয়
> নিছক মনের মাঠে, শরীরের প্রায় পাড়ে-- •

'শরীরের প্রায় পাড়ে' ইঙ্গিতটি ধরবার—কিংবা 'মনের মাঠে' বেড়াবার ক্ষমতা বা সুযোগ কি সকলের অধিগম্য? পৃথিবীর মানুষ হয় রুজির চিন্তায় না-হয় খ্যাতির আস্থায় ব্যতিব্যস্ত। এই প্রচণ্ড অমনোযোগিতার জগতে বাস করে মন বড়োই ক্লান্ত হয়। তখন বিষ্ণুবাবুর ঐ 'ঘুম নয়, ঘুমের কিনারে' কবিতার লাইনগুলিই মনে পড়া স্বাভাবিক—

> ঘোরা কিংবা ওড়া, যেন চিল, বাজ
> গগনভেড় বা যেন সোনালি ঈগল
> শিকারের খোঁজে নয়, স্বভাবে
> তৃপ্তিতে ভাসা
> দুই ডানা মেলে দেওয়া,
> যেন শুদ্ধ পিলু বা খাম্বাজ।

(ক্রমশঃ)

ভারত দর্শন

● 'যুগে যুগে ভারতীয় সেনা'-এন সি সি ক্যাডেটদের এই বর্ণাঢ্য প্রদর্শনী এবারকার রাজধানী দিল্লীর প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ।

রাজধানী ঃ

যথারীতি প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হ'ল রাজধানী তথা তামাম ভারতবর্ষে। কিন্তু এবারের উৎসবে কোথায় যেন একটা শূন্যতা, একটু বেদনার স্পর্শ রয়ে গেছে। আমরা সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম না, লক্ষ দর্শক সেই পরিচিত সন্নত চেহারার সাক্ষাৎ পেল না। এই প্রথম প্রজাতন্ত্র দিবসের উৎসবে নেহরুজী আমাদের মধ্যে নেই।

এতোদিন তাঁর ব্যক্তিত্বের ছায়ায় আমরা আয়াসে বিচরণ করেছি। কি উৎসব, কি সঙ্কট, তাঁর পল্লবাচ্ছাদনে ভারতবাসী অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিল,—উপযুক্ত গৃহস্বামীর অস্তিত্বে সমস্ত সংসারটি যেমন নাবালক এবং নির্ভয় থাকে। তখন যেন ভারত মহাসাগরের সমস্ত তরঙ্গভঙ্গ, সমস্ত ঝড়ঝঞ্ঝা সামলাবার দায়িত্ব ছিল ঐ একক ব্যক্তিত্বের ওপর। আজকের ভারত তেমনভাবে কারও একক ব্যক্তিত্বের অস্তিত্বকে প্রচণ্ডভাবে অনুভব করে নি। ভারতীয় গণমানসে বর্তমান নেতৃত্বের পক্ষে অনুরূপ আস্থা অর্জন করতে যে আরও কিছুকাল সময় লাগবে, এ সত্য কেউ অস্বীকার করেন না। স্বয়ং কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদার বিষয়টি যথার্থ অনুধাবন করেছেন। তিনি বলেছেন, নেহরুহীন ভারতে প্রশাসনিক ত্রুটি জনগণ কোনোক্রমেই বরদাস্ত করবেন না। অর্থাৎ প্রশাসনিক ত্রুটি-বিচ্যুতির ক্ষেত্রে জনগণের আস্থাভাজন নেতা নেহরুজী এতোদিন দেশব্যাপী সমস্ত বিরুদ্ধ আওয়াজের সঙ্গে যেভাবে মোকাবিলা করতে সক্ষম ছিলেন, দ্বিতীয় কোনো নেতা বর্তমানে সে ক্ষমতার অধিকারী নন। সুতরাং বর্তমান অবস্থায় দেশ ও জাতিকে পরিচালনার সুকঠিন দায়িত্ব যাঁদের ওপর ন্যস্ত হয়েছে, জনসাধারণের আস্থাভাজন হওয়ার জন্য তাঁদের অনেক বেশি সতর্ক, অনেক বেশি দায়িত্ব-বোধসম্পন্ন হ'তে হবে।

সুখের বিষয় আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীনন্দ জাতির নায়কত্বের পদে উপযুক্ত উত্তরাধিকার নিয়েই এসেছেন। নেহরুজীর জীবদ্দশায় শ্রীশাস্ত্রী অনেক কঠিন কঠিন রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে নিজের দূরদর্শিতার পরিচয় রেখেছিলেন। শ্রীনন্দ গত বছর জানুয়ারী মাসেই দেশ থেকে সমস্ত রকম দুরাচার দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করবেন ব'লে সঙ্কল্প ঘোষণা করেছিলেন।

কিন্তু অনন্ত সমস্যার মহাতট এই মহামানবের সাগরতীর ভারতবর্ষ। এখানে রাতারাতি অন্নবস্ত্র, চাকরি, শিক্ষা অথবা উদ্বাস্তু সমস্যার মতো কঠিন প্রশ্নগুলির সমাধান ক'রে ওঠা সম্ভব নয় এবং আমরাও তা স্বীকার করি। বিশেষত নেহরুজীর নেতৃত্বে আজ পনের বছর ধ'রে যেগুলির সমাধান সম্ভবপর হয় নি, বর্তমান নেতৃত্বের কাছে তার সমাধান রাতারাতি আমরা দাবিও করছি না। তথাপি আমরা যে ধীর মন্থর গতিতে এগোচ্ছি তার জন্য গভীরভাবে চিন্তা করার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয়েছে।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, অনেকদিন যাবৎ কংগ্রেস জনসংযোগ হারিয়েছে। একদিন কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ জনতার সঙ্গে একই সমতলভূমিতে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন। তখন জনতার সঙ্গে জননেতার সম্পর্ক ছিল হৃদয়ে প্রোথিত। আজ প্রশাসনিক হুকুমদারির প্রতি তাঁদের যত নজর, ক্ষমতার লড়াই-এর প্রতি নেতৃবর্গ যতটা সচেতন, জনমানসের গতি-প্রকৃতির সঙ্গে ততদূর ঘনিষ্ঠতা তাঁদের আর নেই। অথচ এ ব্যাপারে কংগ্রেস নিজেও অচেতন নন। সংগঠনকে ঢেলে সাজানোর প্রয়োজন; মন্ত্রিত্ব থেকে সাংগঠনিক কাজে অনেক নেতৃবর্গকে সরিয়ে আনার আবশ্যকতা সেজন্যই তাঁরা অনুভব করেছিলেন। কিন্তু সেই ব্যাপক আয়োজনের কোনো প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি আজও মেলে নি।

বরং ভারতবাসীর মনে হতাশা আজ ক্রমবর্ধমান। অন্ন বস্ত্র ও অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের অগ্নিমূল্য জনসাধারণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ও বিক্ষোভ সৃষ্টি করছে অথচ সে বিষয়ে সরকার আজও কোনো সুষ্ঠু সুরাহা ক'রে উঠতে পারলেন না। শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রেও সরকার আজও পর্যন্ত জনমনে নিরাপত্তার আশ্বাস সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেন

না। বহু সভা-সমাবেশ হল, দুর্গাপুর অধিবেশন হ'ল, কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক সঙ্কট একই তিমিরে তমসাচ্ছন্ন হ'য়ে রইল। প্রজাতন্ত্র দিবসে শুধু প্রতিশ্রুতি নয়, বক্তৃতা নয়; দেশের আপামর জনসাধারণ চেয়েছিল সত্যিকার কাজ, চেয়েছিল এমন কোনো ঘোষণা, যা তাদের মনে আস্থা, নিরাপত্তা ও নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করবে। বলা বাহুল্য সম্প্রতি দুর্গাপুর কংগ্রেসেও জননায়কেরা তেমন কোনো ঘোষণার দ্বারা প্রজাতন্ত্র দিবসের উৎসবকে বিশিষ্টতা দান করতে পারেন নি।

দুর্গাপুর কংগ্রেস অন্যপক্ষে বরং আরও বেশি হতাশ করেছে দেশবাসীকে, দুর্গাপুরে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দলাদলির চিত্রটিই প্রকট হ'য়ে উঠেছে অধিকতরভাবে।

আজ ভারতবর্ষে প্রতিমুহূর্তে আমরা বহিঃশত্রুর আক্রমণের আশঙ্কায় আছি। সীমান্তে চীনা তৎপরতা পুনরায় সুরু হয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে সীমান্ত-সঙ্ঘর্ষ তো প্রায় দৈনন্দিন সংবাদ। কিন্তু জাতির মনে কেবলমাত্র হতাশা স্তূপীকৃত হতে থাকলে বহিঃশত্রুর আক্রমণের সঙ্গে মোকাবিলা করব আমরা কোন শক্তিতে। বিশেষত ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দলের মধ্যেই যদি ক্ষমতার দ্বন্দ্ব প্রাধান্য পায়, যদি দুর্গাপুরের দলাদলির চিত্রটাই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আসল রূপ হয়, তাহলে ভারতের জনগণ কোন ভরসায় প্রজাতন্ত্র দিবসের সঙ্কল্পকে সুসাধিত করার জন্য এগিয়ে যাবেন।

শত্রু যদি শুধু সীমান্তের পরপারেই তার দুরভিসন্ধির জাল বিস্তার করত, তবে সঙ্কট এমন ঘনীভূত হত না। শত্রু ঘরেও তার গোপন নেপথ্যচারণা সুরু করেছে। জনজীবনকে অসুস্থ ও পঙ্গু ক'রে দেওয়ার জন্য একদল দেশদ্রোহী প্রতিমুহূর্তে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে। মুনাফাশিকারী, কালোবাজারীর ষড়যন্ত্রও সেই স্তরের জঘন্য অপকীর্তি। প্রজাতন্ত্র দিবসে আমাদের ক্ষীণ আশা, নন্দজীর আশ্বাসবাণী এখনও কার্যত প্রত্যাহৃত হয় নি।

ষড়যন্ত্রের আর এক পর্যায় বোধ হয় সুরু হবে ভাষা নিয়ে। হিন্দী ভাষাকে ২৬শে জানুয়ারী থেকে রাষ্ট্রভাষারূপে ব্যবহারের কেন্দ্রীয় কার্যক্রম অহিন্দীভাষীদের মধ্যে আর একজাতীয় আশঙ্কার সৃষ্টি করেছে। দক্ষিণ ভারত তো তীব্র বিরোধিতার জন্য তৈরি। দেশদ্রোহীরা এ সুযোগের অপব্যবহার

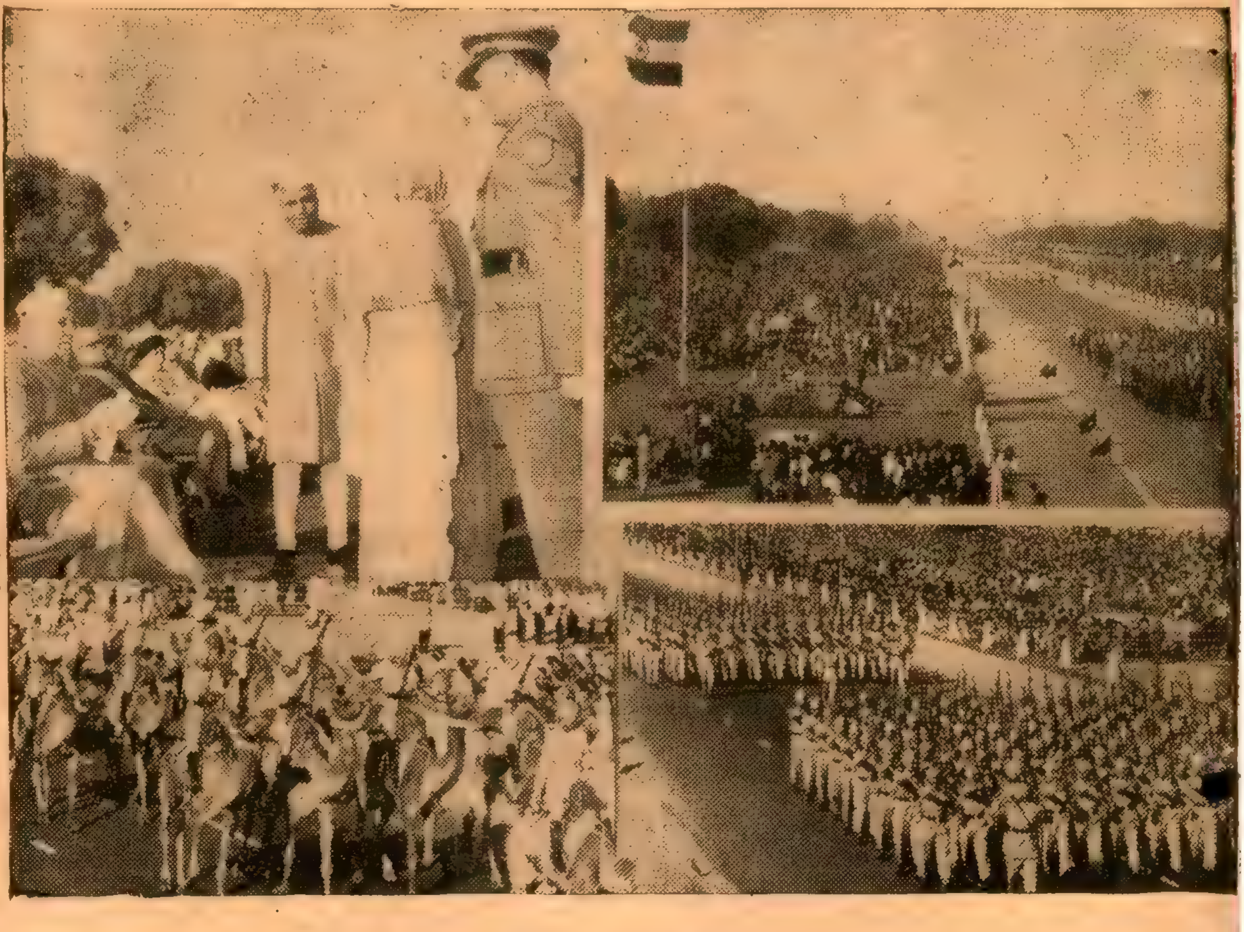

● নেহরুর উপস্থিতিতে দিল্লীতে প্রজাতন্ত্র দিবসে (১৯৬৪) প্রাণবন্ত অনুষ্ঠান

● রাজাগোপালাচারী

করবেন বলে আশা করা বিবেচকের কাজ নয়। জাতীয় ঐক্যের মধ্যে চূড়ান্ত বিভেদ সৃষ্টিতে ভাষার প্রশ্নকে হাতিয়ার ক'রে নেওয়ার চেষ্টায় তাঁরা গাফিলতি করবেন না। ডি-এম-কে নেতৃবৃন্দ সংবিধানের ভাষা সম্পর্কিত সপ্তদশ সংশোধন অংশটিতে আগুন দিয়েছিলেন, শ্রীরাজাগোপালাচারী ঐ অংশটিকে সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করতে চান। তিনি স্বীকার করেন যে, ভাষার প্রশ্নে তাঁর নিজের মনেই বিচ্ছেদের মনোভাব দানা বেঁধে উঠেছে। ভারতের অন্যান্য ১৩টি প্রধান ভাষাকে দাবিয়ে দিয়ে হিন্দীকে এইভাবে ভারতের অহিন্দী-ভাষী জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়ার সরকারী সিদ্ধান্ত ভারতের সংহতিতে কুঠারাঘাত করেছে নিঃসন্দেহে। ১৯৬৫ সালের ২৬শে জানুয়ারী অহিন্দীভাষীদের পক্ষে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদের দিনে পর্যবসিত হয়েছে একথাও অনস্বীকার্য, কিন্তু জাতীয় সংহতিতে ভাঙন ধরুক এমন কথা অন্তত বাংলা দেশ বলতে পারবে না। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলা দেশ সর্বত্যাগী তাপসের মতো আত্মোৎসর্গ করেছে। স্বীকার ক'রে নিয়েছে অনেক ক্ষয়ক্ষতি। স্বাধীনতার জন্য দেশের মধ্যে কঠিন প্রাচীর তুলে দুই ভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত হ'য়ে গেছে মুখ বুজে। ভারতের সংহতির জন্য প্রয়োজন হ'লে আজ তারা আরও অনেক অবিচারকেও হয়ত মেনে নেবে তেমনি ভাবেই। কিন্তু শুধু বাংলা বা সংহতি-প্রেমিক অন্যান্য পূর্ব ভারতীয় অহিন্দী অঞ্চলগুলি চুপ ক'রে থাকলেই কি বিচ্ছেদ এবং অনৈক্য রোধ করা যাবে? ১৯৬৫-র প্রজাতন্ত্র দিবস ভারতের বুকে আর একটি কঠিন সমস্যাকে হাত ধ'রে আমন্ত্রণ ক'রে আনল।

ভারতের অসংখ্য সমস্যার অদ্যাবধি কোনো সুষ্ঠু সুরাহা যেক্ষেত্রে আমরা ক'রে উঠতে সক্ষম হই নি, সেখানে ভাষা-সমস্যাকে এমন ব্যগ্রতার সঙ্গে এতো তাড়াতাড়ি আমন্ত্রণ না জানালেই কি আমরা কিছু পিছিয়ে থাকতাম?

পর পর কয়েকটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলে আমরা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে বেশ কিছু গঠনমূলক কাজ করেছি; আগামী কয়েক বছরে আরও করব, কিন্তু এ সমস্তই আকণ্ঠ তৃষিতের মুখে কয়েক বিন্দু বারিবর্ষণের সামিল। অবশ্য একথাও স্বীকার করতে হবে যে, একটি জাতির গঠনমূলক কাজে কেবল-মাত্র সরকারী উদ্যমের প্রতি তাকিয়ে থাকলেই চলে না, সমগ্র জাতিকে সমান আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে আসতে হয়, আমরা তা পারি নি। ভারতের সাধারণ মানুষ যদিও বা তাঁদের সাধ্যমত শ্রম ও শুভেচ্ছা নিয়োগ করেছেন, ভারতের বিরোধী দলগুলি এ বিষয়ে যথাকর্তব্য পালনে প্রকৃতপক্ষে বিরতই থেকেছেন। প্রজাতন্ত্র দিবসে প্রধান স্মরণীয় বস্তু এই হওয়া উচিত যে, শুধুমাত্র বিরুদ্ধাচরণের জন্যই প্রজাতন্ত্রে কোনো বিরোধী দলের অস্তিত্ব আকাঙ্খিত নয়। জাতি গঠনে তাঁদেরও বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। তাঁদের সেই মহান ভূমিকা হ'ল রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব নয়, জনগণ ও সরকারকে সঠিক পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করা।

প্রজাতন্ত্রের আর একটি নতুন বছরে পদার্পণের মুহূর্তে আমরা আশা করব ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দলগুলি একত্রে জাতিকে সেই মহান অগ্রগতির পথে পরিচালিত করবেন।

মধ্যপ্রদেশ ঃ

ডঃ কে এন কাটজুর একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র ক'রে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীডি পি মিশ্র বিরোধী মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেসের বিসম্বাদী দল বেশ উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছেন। একটি সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ডঃ কাটজু জানিয়েছেন যে, মধ্যপ্রদেশ আইনসভার কংগ্রেসী দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে বর্তমানে তাঁর কোনো আপত্তি নেই।

কিন্তু ডঃ কাটজু প্রসঙ্গত একথাও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি কংগ্রেসের মধ্যে কোনো দলাদলির সমর্থক নন।

দল-উপদল নির্বিশেষে মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেসের পুরোপুরি সমর্থন যদি পাওয়া যায়, একমাত্র তা হলেই তিনি নেতৃত্ব গ্রহণে সম্মত হবেন।

কংগ্রেসের মধ্যে আজ সর্বত্র দলাদলি দানা বেঁধে উঠেছে। ডঃ

● ডঃ কাটজু

কাটজুর ঘোষণা, সুতরাং নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ। কিন্তু তাঁর একক সঙ্কল্পে মধ্যপ্রদেশের উপদলগত প্রতিযোগিতা কতটা হ্রাস পাবে, তা নিশ্চয় করে বলা শক্ত। কেন না, ইতিমধ্যেই

● শ্রী মিশ্র

বিসম্বাদী দল নিজেদের কোলে ঝোল টানতে ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন। আত্মসন্তুষ্টি প্রকাশ ক'রে তাঁরা বলছেন, ডঃ কাটজুর উপরোক্ত ঘোষণা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ডি পি মিশ্রকে গদীচ্যুত করার প্রথম সোপানমাত্র। শ্রীমিশ্রের সমর্থকরা অবশ্য এ ব্যাপারে পুরোপুরি মুখ বন্ধ করে ব'সে আছেন। মধ্য-প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ কৈলাসনাথ কাটজুর উক্তিতে অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ই তাঁদের বাক্‌রুদ্ধ করেছে কি না বলা শক্ত।

উত্তর প্রদেশ ঃ

অর্থমন্ত্রীর দপ্তর নিয়ে উত্তরপ্রদেশে প্রশাসনিক গোলযোগের সূচনা দেখা দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনীর আচরণে সরাসরি শ্রীআলি জহিরের প্রতি অনাস্থার মনোভাব ব্যক্ত হ'য়ে পড়েছে, যে কারণে আইনমন্ত্রী শ্রীজহিরও অর্থ দপ্তরের দায়িত্ব গ্রহণে গভীর অনিচ্ছা প্রকাশ করেন।

বস্তুতপক্ষে শ্রীজহিরের এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ ছিল না। মুখ্যমন্ত্রী একান্ত কর্তৃত্বাধীনে অর্থমন্ত্রকের মতো মর্যাদাহীন একটি দপ্তরের কাজ চালিয়ে যাওয়ায় তাঁর সম্ভ্রমহানির সমূহ আশঙ্কা আছে।

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শ্রীমতী কৃপালনী অবশ্যই মন্ত্রিসভার যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিজে হস্তক্ষেপ করতে পারেন। কিন্তু শ্রীজহিরের ক্ষেত্রে তাঁর নির্দেশ নিতান্তই অবমাননাকর। আইন সভার অধিবেশনে শ্রীজহিরকে রাজ্যের বাজেট পেশের অধিকার দেওয়া হয়েছে এই সর্তে যে, তিনি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হলেও এবং আইন সভায় বাজেট পেশের অধিকার তাঁরই ওপর ন্যস্ত থাকলেও অর্থদপ্তরের সচিব জনস্বার্থের খাতিরে অর্থদপ্তরের যে কোনও বিষয়, যে কোনও সময় মুখ্যমন্ত্রীর এজলাসে পেশ করতে পারবেন। স্বভাবতই আত্মমর্যাদাবোধ-সম্পন্ন যে কোনও প্রথম শ্রেণীর মন্ত্রীই এহেন প্রস্তাবকে অবমাননাকর বলে মনে করতে পারেন এবং শ্রীজহিরও তাই মনে করেন। শ্রীজহির অর্থ দপ্তরের দায়িত্ব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন যথার্থ কারণেই।

সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের কথা এই যে, বাজেট পেশের জন্য যখন মাত্র একটি পুরো মাসেরও সময় নেই,

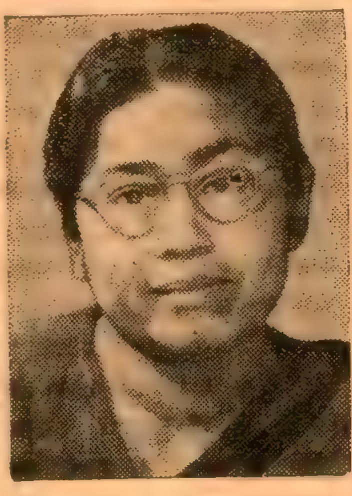

● শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী

মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের জন্য তখ বাজেট সম্পর্কে উত্তর প্রদেশ মন্ত্রিসভ পুরোপুরি অন্ধকারে আছেন বাজেট তৈরির ব্যাপারে কোন বিশি মন্ত্রী যে অংশ গ্রহণ করবেন মন্ত্রিসভা সদস্যরা সেটুকু তথ্যও অবগ নন। গণতান্ত্রিক মন্ত্রিসভায় এ-জাতী অসঙ্গতি সচরাচর চোখে পড়ে না

শ্রীমতী কৃপালনীকে এ কারণে যথেষ্ট বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হ'তে হয়েছে এবং হয়ত ভবিষ্যতে আরও কঠিনতর সমালোচনার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে তাঁকে।

কেরালা ঃ

নির্বাচনদ্বন্দ্বে রাম-রহিমই শুধু নয়, রাম-রাবণেও আঁতাত হয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল ক'রে তোলার জন্য রাজনৈতিক মতবাদে যথেচ্ছ পদদলন হয় নির্বাচনদ্বন্দ্বে জয়লাভের আশায়।

আসন্ন নির্বাচনের মুখে দেখা যা দুই বিপরীত চিন্তাধারা, দুই বিপরীত মতবাদে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দল বহুদিনের বন্ধুর মতো গলাগলি ক'রে জনসাধারণের ভোট কুড়োতে নেমেছেন ব্যাপারটা সাধারণ মানুষের কাছে যতবড় মিথ্যাচারই হোক, রাজ-নৈতিক দলগুলির কাছে তাই-ই রাজনীতি।

এই কূট রাজনীতির খেলা সুরু হ'য়ে গেছে কেরালায়। আসন্ন নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক কমিউনিজমে বিশ্বাসী উগ্রপন্থী ভারতী বাম কমিউনিস্টরা নির্বিচারে সঙ্কী সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে গঠি মুসলিম লীগের সঙ্গে নির্বাচনী আঁতাতে মিলিত হয়েছেন। লীগের সঙ্গে সম্পর্কের প্রশ্নেই নাকি গত তি মাস যাবৎ বাম ও দক্ষিণপন্থী কমিউ এবং আর-এস-পির মধ্যে একা সংহত যুক্ত ফ্রন্ট গঠিত হ'তে পারে নি এবং এ-বিষয়ে বামপন্থীদে

মুসলিম লীগের প্রতি নির্বাচনী আঁতাতের আগ্রহই বাদ সেধেছিল।

মুসলিম লীগ ব্যতীত বামপন্থী কমিউনিস্টরা এস-এস-পি'র সঙ্গেও আসন ভাগাভাগির চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন। বামপন্থীরা ৭৮টি, এস-এস-পি ৩৩টি, লীগ মনোনীত নির্দলীয় ৭টি এবং বাম কমিউনিস্ট মনোনীত ও এস-এস-পি—লীগ সমর্থিত প্রার্থী ১০টি আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ব'লে সংবাদে জানা গিয়েছে। এ ছাড়া এই দলত্রয় যুক্তভাবে সমর্থন জানাবেন কারশাকা থোঝিলালি দলের পাঁচজন প্রার্থীকে ।

কমিউনিস্ট দলে ভাঙন না ধরলে হয়তো তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ ক'রে প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন স্থায়ী কেরালা সরকার। এমন কি একটি বিশেষ কর্মসূচীর মাধ্যমে বাম ও দক্ষিণপন্থীরা একত্রিত হ'লেও জয়ের সমূহ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু বাম গোষ্ঠীর আচরণে সে সম্ভাবনা অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়েছে। অন্য পক্ষে প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক দল মুসলিম লীগ এই অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করছে। তাঁরা এমন অনেক জায়গায় প্রার্থী দাঁড় করাচ্ছেন, যে সব নির্বাচনী এলাকায় তাঁদের কিছুমাত্র প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল না। এক্ষেত্রে লীগের ভরসা বাম কমিউনিস্টদের পরোক্ষ সহযোগিতা । কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে বামপন্থীরা ভোট ভাঙিয়ে নিলে লীগের জয়ের সম্ভাবনা আছে, মূলত এই আশ্বাসেই লীগ সম্ভাবনাহীন নির্বাচনী এলাকায় অভিযান সুরু করেছেন। এ ছাড়া বিসম্বাদী কেরালা কংগ্রেসের পক্ষেও লীগ নির্বাচনী লড়াই-এ যোগ দেবেন বলে স্থির করেছেন।

কেরালা কংগ্রেস মোট ৮২টি প্রার্থী দাঁড় করাবেন; যদিও ব্যাপারটা কতদূর তাঁদের সাধ্যায়ত্ত হবে সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। কিন্তু এই সঙ্কল্প সাধনে যদি তাঁরা সক্ষম হন, তা হলে জাতীয় কংগ্রেসের বেশ কিছু ভোট হাতছাড়া হ'য়ে যেতে পারে। এবং তার ফলে নেপোয় দই মেরে নিয়ে যাবে, বিরোধী দলগুলি বিনা আয়াসে অপ্রত্যাশিত সুবিধা ভোগ করবেন।

বামপন্থী কমিউনিস্টরাও যে ৭৮টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন, এমন কথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। বরং শেষ পর্যন্ত হয়ত সেই দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গেই তাঁরাও একটা আপোষ রফায় উপনীত হবেন। কিন্তু অন্যত্র যেমনই আপোষ রফা হোক,

শ্রীকামরাজ নাদার

কয়েকটি এলাকায় বাম-দক্ষিণ স্বতন্ত্রভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হবেনই। ফলত সেই সব এলাকায় কংগ্রেসের কিছু আসন সংগ্রহের সুযোগ দেখা দেবে।

ওদিকে আবার আর-এস-পি সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলির সঙ্গে নির্বাচনী আঁতাতে রাজি আছেন দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টরা। আর-এস-পি ও দক্ষিণপন্থীরা প্রায় একশতটি প্রার্থীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামাচ্ছেন।

নির্বাচনী দ্বন্দ্বের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা এখন পর্যন্ত শুধু জাতীয় কংগ্রেসই তৈরি ক'রে উঠতে পারেন নি। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ যদিও কেরালায় নির্বাচনী ব্যাপারে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী, তথাপি পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সিদ্ধান্তের জন্য তিনি অপেক্ষায় আছেন। কেরালার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী আর শঙ্কর ও অন্যান্যদের সম্পর্কে সেজন্য তিনি কোনো স্থির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন নি। শ্রীশঙ্কর ও অন্যান্য দু-একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিই (দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের অভিযোগ থাকায়) এখন রাজ্য কংগ্রেসের সমস্যার বিষয়।

বিসম্বাদী কেরালা কংগ্রেস জানিয়ে দিয়েছেন যে, শ্রী আর শঙ্কর, শ্রী টি ও ভাবা এবং শ্রী এ এ রহিমকে যদিও জাতীয় কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন না দেন, তাহলে পনেরজন প্রাক্তন বিদ্রোহী এম-এল-এ সহ তাঁরা জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা ও নির্বাচনী মিতালি করতে এগিয়ে আসবেন।

যদিও বিসম্বাদী দলের অবস্থাই বর্তমানে অপেক্ষাকৃত ভালো, তবু তাঁদের আহ্বান প্রত্যাখ্যানে কংগ্রেস সভাপতি অনমনীয় মনোভাবের পরিচয় দিয়ে সাংগঠনিক দৃঢ়তার স্বাক্ষর রেখেছেন। পনেরজন বিদ্রোহী প্রাক্তন এম-এল-এ-কে তিনি কোনোক্রমেই কংগ্রেসে পুনঃপ্রবেশের অনুমতি দিতে রাজী নন। বিসম্বাদী গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যকে পুনর্গ্রহণে অবশ্য আপত্তি নেই তাঁর। শ্রীকামরাজ, শ্রীশঙ্কর ও অন্যান্য অভিযুক্ত (?) ব্যক্তিদের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাজী হন নি।

কেরালার রাজনৈতিক আকাশে সঙ্কটের পূর্বাভাস আগামী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কংগ্রেসকে যথার্থই বিচলিত করেছে। তত্রাচ শ্রীকামরাজের এই অনমনীয় দৃঢ়তা কংগ্রেস সংগঠনের নেতারূপে তাঁর উপযুক্ততাকে নির্ভুলভাবে প্রমাণিত করল।

• প্রেসিডেণ্ট জনসনের অভিষেক অনুষ্ঠান

বৃটেন ঃ

প্যাট্রিক গর্ডন ওয়াকারের অপ্রত্যাশিত পরাজয়ে শুধু তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অবসানই সূচিত হল না। গোটা শ্রমিক সরকারও গভীর সংকটের সম্মুখীন হল। মাত্র ১০০ দিন আগে হ্যারল্ড উইলসন সরকার গঠন করেছিলেন, কিন্তু এরই মধ্যে রক্ষণশীল দলের চ্যালেঞ্জের ফলে তাঁকে নতুন করে সাধারণ নির্বাচনের কথা চিন্তা করতে হচ্ছে। বৃটেনের কপালে কী আছে কে জানে?

প্রকৃতপক্ষে সাড়ে তিন মাসের মধ্যে গর্ডন ওয়াকারকে দ্বিতীয়বার পরাজয় বরণ করতে হল। সাধারণ নির্বাচনে তিনি বার্মিংহামের স্মেথউইক নির্বাচন কেন্দ্রে প্রথমবার হেরেছিলেন রক্ষণশীল প্রার্থীর কাছে। ওই কেন্দ্রে বর্ণবিদ্বেষ নীতি অনুসরণ করা হয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী উইলসন রক্ষণশীল দলকে আক্রমণ করেছিলেন। পার্লামেণ্টেও এ-প্রসঙ্গে তাঁর কঠোর মন্তব্য সারা দুনিয়ার আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নির্বাচনে হেরে গেলেও গর্ডন ওয়াকারের রাজনৈতিক জ্ঞান, দূরদর্শিতা এবং অভিজ্ঞতার জন্যে তাঁকে শ্রমিক মন্ত্রিসভায় নেওয়া হয় এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ দেওয়া হয়। উইলসন এ-বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন যে, উপ-নির্বাচনে ওয়াকারকে তিনি জিতিয়ে নিয়ে আসবেন, কাজেই তাঁকে মন্ত্রী করতে কোনো বাধা নেই। কিন্তু এবারেও যে তাঁর ভরাডুবি [illegible]ব তা কি প্রধানমন্ত্রী কল্পনা করতে পেরেছিলেন? সত্যি বটে রক্ষণশীল প্রার্থী রোনাল্ড বাক্সটন মাত্র ২০৫ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন। কিন্তু তাতে ঘটনাটার গুরুত্ব কমছে কৈ? অথচ যে নির্বাচন কেন্দ্রটি ওয়াকারের জন্যে বেছে নেওয়া হয়েছিল সেটা শ্রমিক দলের পক্ষে গত ৩০ বছর ধরে একটা নিরাপদ দুর্গ হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে। গত অক্টোবরের নির্বাচনেও শ্রমিক প্রার্থী লেটন নির্বাচন কেন্দ্রে প্রায় ৮ হাজার ভোটের ব্যবধানে রক্ষণশীল প্রার্থীকে হারিয়েছিলেন।

• মাইকেল স্টুয়ার্ট

ওদিকে মিডল্যাণ্ডস-এর ন্যুনএটন কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ফলাফলও শ্রমিক দলের পক্ষে আশাব্যঞ্জক নয়। কারণ যদিও তার প্রার্থী টেকনলজি বিষয়ক মন্ত্রী ফ্রাঙ্ক কাজিন্‌স এখানে জয়লাভ করেছেন, কিন্তু ভোটের ব্যবধান অনেক কমে গেছে। অক্টোবরে শ্রমিক প্রার্থী ১১,৭০২ ভোট বেশি পেলেও এবারে তিনি মাত্র ৫,২৪১টি বেশি ভোট পেয়েছেন রক্ষণশীল দলের প্রার্থীর চেয়ে।

• হ্যারল্ড উইলসন ও আলেক ডগলাস হিউমের সঙ্গে চার্চিল

এসব কারণেই প্রধানমন্ত্রী উইলসন ভাবিত হয়ে পড়েছেন। প্রথমত ওয়াকারের পরাজয়ে তিনি ক্যাবিনেটে একজন শক্ত ও অভিজ্ঞ সহযোগীকে হারালেন। দ্বিতীয়ত আগে যেখানে পার্লামেণ্টে শ্রমিক দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল ৪, এখন সেখানে হলো ৩ মাত্র। যে কোন মন্ত্রিসভার পক্ষেই এই সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে দীর্ঘকাল কাজ চালানো অত্যন্ত কষ্টকর। তাই বৃটেনে এখন নতুন করে আলোচনা সুরু হয়েছে সাধারণ নির্বাচন কবে—আগামী বসন্তে, না এই শরৎকালেই!

অন্তর্বর্তীকালে বৃটেনের পররাষ্ট্র-মন্ত্রীই বা কে হবেন? লর্ড সভার সদস্য করে গর্ডন ওয়াকারকে দিয়েই চালানো হবে, না শিক্ষা-মন্ত্রী মাইকেল স্টুয়ার্টকে রঙ্গমঞ্চে আনা হবে?

• • •

সারা বৃটেন এখন থমথম্ করছে—স্যার উইনস্টন চার্চিল গুরুতর অসুস্থ। চিকিৎসকেরা বলেছেন মস্তিষ্ক থেকে রক্ত ক্ষরণ হচ্ছে তাঁর, চিকিৎসা শাস্ত্রে যার নাম সেরিব্রাল থ্রম্বসিস। মাত্র মাস দেড়েক আগে স্যার উইনস্টন তাঁর ৯০তম জন্মবার্ষিকী পালন করে-ছিলেন, এরই মধ্যে যে তাঁর অন্তিম মুহূর্ত এসে দুয়ারে হানা দেবে তা কে জানতো?

কিন্তু ৯০ বছরের বৃদ্ধ চার্চিল, যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বৃটেনের দুর্ধর্ষ নায়ক হিসেবে দেশকে নাৎসীদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন, দেশকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, তিনি মৃত্যুর সঙ্গেও পাল্লা লড়ে চলেছেন। গত ২৫ বছর ধরে তাঁর পরিবারের চিকিৎসক ৮২ বছর বয়স্ক লর্ড মোরান ও ডাঃ ব্রেন অসুস্থ চার্চিলের শয্যাপাশে ২৪ ঘণ্টাই পাহারা দিচ্ছেন, আর বিস্মিত হচ্ছেন বৃদ্ধ বৃটনের অমিত শক্তি দেখে।

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ঃ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের অভিষেক অনুষ্ঠানটি সব চেয়ে জাঁক-জমকপূর্ণ ও দর্শনীয়। গত ২০শে জানুয়ারী দ্বিপ্রহরে লিণ্ডন বেনস জনসনের দক্ষিণহস্ত উত্তোলন করে শপথ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ওয়াশিংটনে এই অনুষ্ঠান সুরু হয়। বিভিন্ন প্রেসি-ডেণ্টের অভিরুচি অনুযায়ী এই অভিষেকপর্বের রূপ ও রীতি যুগে যুগে বদলিয়েছে।

তাহলেও জর্জ ওয়াশিংটন প্রথম প্রেসিডেণ্ট পদে অভিষিক্ত হওয়ার পর থেকে গত ১৭৬ বছরের মধ্যে এই অভিষেক অনুষ্ঠানের এক মহান ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে।

সেদিন যাঁরা অতীতে এই দেশকে গড়ে তুলেছেন, সেই দেশের কাণ্ডারীদের প্রতি সমগ্র জাতি শ্রদ্ধা জানায়, আগামীদিনের জন্য যে নতুন ইতিহাস তারা রচনা করতে যাচ্ছে তারই জন্য প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে।

ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে এই উৎসব আমেরিকার সর্বজনের। আর ঐ অভিষেক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রত্যেকটি প্রেসিডেণ্ট আপন আপন ব্যক্তিত্বেরও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়ে থাকেন।

১৯৬৫ সালের অভিষেক অনুষ্ঠানের বিশিষ্ট দিক হলো, গত ৩রা

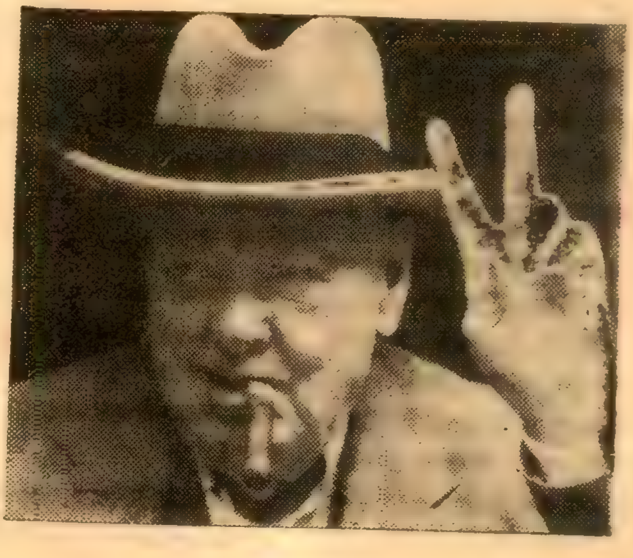

• ৯০তম জন্মদিনে

নভেম্বরের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনে লিণ্ডন বেনস জনসন যে বিপুল পরিমাণ ভোট পেয়েছেন, এঁত ভোট তাঁর আগে আর কোন প্রেসিডেণ্ট পান নি। ১৯৬৩ সালের ২২শে নভেম্বর ডালাসে প্রেসিডেণ্ট কেনেডি নিহত হওয়ার পর তিনি মাকিন রাষ্ট্রপ্রধানের কার্যভার গ্রহণ করেন। এই ঘটনার প্রায় এক বছর পরে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং জনসন বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেন।

অভিষেক অনুষ্ঠানের মুখ্য ব্যক্তি প্রেসিডেণ্ট জনসন—তাঁর স্থানই সর্বশীর্ষে তারপরে অন্যদের স্থান। সেদিন তিনি প্রধান বিচারপতি আর্ল ওয়ারেনের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণহস্ত উত্তোলন করে উচ্চারণ করেন:

'আমি ঈশ্বর সাক্ষী করে এই শপথ করছি যে, আমি বিশ্বস্ততার সঙ্গে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের কর্তব্য পালন করব এবং সাধ্যানুযায়ী মাকিন সংবিধানের নির্দেশাদি অব্যাহত রাখব এবং বাধাবিপত্তি থেকে সংবিধানকে সর্বতোভাবে রক্ষা করব।'

এই আনুষ্ঠানিক ঘোষণার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেণ্ট জর্জ ওয়াশিংটন আরও একটি কথা জুড়ে দিয়েছিলেন 'এ কাজে ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন।' এই কথাটিও এ সঙ্গে উচ্চারিত হয়ে থাকে। সেদিন মাকিন জাতির উদ্দেশে এবং তাদেরই মুখপাত্র হিসেবে বিশ্ববাসীর উদ্দেশে প্রেসিডেণ্ট জনসন একটি ভাষণ দেন।

অভিষেক সংক্রান্ত টুকিটাকি

অতীতে আমেরিকার প্রেসিডেণ্টদের অভিষেক ভাষণগুলির মধ্যে কোন কোনটি যেমন খুব দীর্ঘ হয়েছিল, কোন কোনটি আবার তেমনি অতি ক্ষুদ্র ছিল। প্রেসিডেণ্ট উইলিয়াম হ্যারিসন ১৮৪১ সালে ৮,৫০০ শব্দ সম্বলিত ভাষণ দিয়েছিলেন। ভাষণ দিতে তাঁর সময় লেগেছিল মোট সাড়ে ৩ ঘণ্টা। সবচেয়ে ছোট ভাষণটি দিয়েছিলেন প্রেসিডেণ্ট ওয়াশিংটন তাঁর দ্বিতীয়বার অভিষেককালে। এই বক্তৃতায় মাত্র ১৩৫টি শব্দ ছিল।

নবম প্রেসিডেণ্ট উইলিয়াম হেনরী হ্যারিসন ১৮৪১ সালের ৪ঠা মার্চ ঘোড়ার পিঠে চড়ে অভিষেক উৎসবে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। যথেষ্ট ঠাণ্ডা থাকা সত্ত্বেও তিনি ওভারকোট পরেন নি। এক মাস পরে নিউমোনিয়া রোগে তাঁর মৃত্যু হয়।

খারাপ আবহাওয়ার জন্য ১৯০৯ সালে উইলিয়াম হাওয়ার্ড টাফটের অভিষেক উৎসব ঘরের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল, বাইরে কোন অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয় নি।

১৮৭৩ সালে তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রীতে নেমে গিয়েছিল। ফলে জেনারেল গ্র্যাণ্টের অভিষেক উপলক্ষে আয়োজিত বলনাচের আসরের জন্য যে আইসক্রীম ও শ্যাম্পেনের ব্যবস্থা হয়েছিল তা জমাট বেঁধে গিয়েছিল।

১৯৬১ সালে প্রেসিডেণ্ট কেনেডির অভিষেক কুচকাওয়াজের দিন পেনসিলভেনিয়া অ্যাভেনিউয়ে এত তুষারপাত হয়েছিল যে, রাস্তায় জমে ওঠা স্তূপ পরিষ্কার করার জন্য সৈন্যবাহিনী তলব করতে হয়েছিল।

যাতায়াতের অসুবিধা থাকার জন্য জর্জ ওয়াশিংটনের প্রথম অভিষেক বিলম্বিত হয়েছিল। ১৭৮৯ সালের ৪ঠা মার্চের পরিবর্তে অভিষেক উৎসব হয়েছিল ৩০শে এপ্রিল। ফলে, ওয়াশিংটনের প্রথম দফার কার্যকাল প্রায় দুমাস কমে গিয়েছিল।

জর্জ ওয়াশিংটন চার ঘোড়ায় টানা রাষ্ট্রীয় শকটে চেপে শপথ গ্রহণ করতে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে গিয়েছিল ৫০০ লোকের এক সামরিক শোভাযাত্রা।

প্রেসিডেণ্ট ওয়াশিংটনের দ্বিতীয় অভিষেক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৭৯৩ সালে ফিলাডেলফিয়ায়। দ্বিতীয় প্রেসিডেণ্টরূপে জন অ্যাডামসের অভিষেকও অনুষ্ঠিত হয়েছিল ফিলাডেলফিয়ায় ১৭৯৭ সালে। ১৮০১ সালে তৃতীয় প্রেসিডেণ্ট টমাস জেফারসনের অভিষেককালে অভিষেকস্থল স্থায়িভাবে ওয়াশিংটনে স্থানান্তরিত হয়।

অভিষেক উৎসবে জাঁকজমকের প্রতিবাদে টমাস জেফারসন তাঁর বাসস্থান থেকে পায়ে হেঁটে একটি বুক দূরে অবস্থিত সেনেটে গিয়েছিলেন; আবার মধ্যাহ্নভোজের সময় পায়ে হেঁটে আবার খাবার টেবিলে ফিরে এসেছিলেন, সঙ্গে ছিলেন মাত্র ৩০ জন অতিথি।

কংগ্রেস ভবনের সোপানের ওপর নির্মিত কাঠের মঞ্চে অভিষেক অনুষ্ঠানের সূচনা করেছিলেন জেমস মনরো ১৮১৭ সালে।

অভিষেক উপলক্ষে বলনাচের অনুষ্ঠানের প্রথম সূচনা করেছিলেন প্রেসিডেণ্ট ম্যাডিসনের স্ত্রী ১৮০৯ সালে।

ওয়ারেন হার্ডিং প্রথম প্রেসিডেণ্ট যিনি মোটরযোগে অভিষেক উৎসবে গিয়েছিলেন। ১৯২১ সালে তাঁর অভিষেক উৎসবের বিবরণ সর্বপ্রথম বেতারযোগে প্রচারিত হয়েছিল।

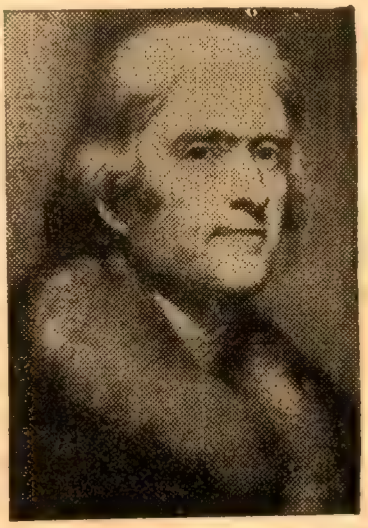

● টমাস জেফারসন

● ইউ থাণ্ট

রাষ্ট্রসংঘ : সোভিয়েট রাশিয়া রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী-জেনারেল ইউ থাণ্টকে একতরফা বিচারের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে। রাষ্ট্রসংঘের সোভিয়েট দূত নিকোলাই ফেডোরেঙ্কো তাঁর চিঠিতে লিখেছেন যে, সেক্রেটারী-জেনারেল রাষ্ট্রসংঘের আর্থিক সংকটের কথা বলতে গিয়ে সোভিয়েট রাশিয়াকে একতরফা ও অন্যায়ভাবে দায়ী করেছেন। এতে করে তিনি সোভিয়েট যুক্তিকে অগ্রাহ্য করেছেন বলেও ওই চিঠিতে বলা হয়েছে। ফেডোরেঙ্কো তাঁর চিঠিখানা যাতে রাষ্ট্রসংঘের সকল সদস্যের মধ্যে প্রচারিত হয় তার দাবিও জানিয়েছেন।

রাষ্ট্রসংঘের তহবিলে সোভিয়েট রাশিয়ার দেনা বকেয়া পড়ে রয়েছে বলে ইউ থাণ্ট অভিযোগ করেছিলেন। সে টাকার পরিমাণ হল প্রায় ৬ কোটি ডলার। এ টাকা বাকী ফেলার ফলে সোভিয়েট রাশিয়া কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে এ-আশংকাও সেক্রেটারী-জেনারেলের চিঠিতে রয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের আর্থিক সংকট নিয়ে গত কিছুকাল ধরেই তুমুল ঝড় উঠেছে। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ অধিবেশনেও এ-বিষয়ে বাক্-বিতণ্ডা হয়ে চলেছে। এমন কি রাষ্ট্রসংঘের ১৯ ধারা প্রয়োগ করে সোভিয়েট রাশিয়াকে ভোটদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার দাবিও আমেরিকা ইত্যাদি কয়েকটি রাষ্ট্র তুলেছিল।

কিন্তু এ-প্রসঙ্গে সোভিয়েটের বক্তব্য হল যে-কারণে রাষ্ট্রসংঘের এ-দৈন্যদশা উপস্থিত হয়েছে তার জন্য সে মোটেই দায়ী নয়। কঙ্গোতে রাষ্ট্রসংঘের সেনাবাহিনী প্রেরণ বা মধ্য প্রাচ্যের অপারেশনের ব্যাপারে সোভিয়েট রাশিয়া বরাবরই আপত্তি করে এসেছে এবং কথাও সে বহুবার বলেছে যে-ঝুঁকি রাষ্ট্রসংঘ নিচ্ছে তার জন্যে তাকে কোনোদিন দায়ী করা চলবে না। এখন রাষ্ট্রসংঘের সনদের একতরফা ব্যাখ্যার জন্যে সোভিয়েট ইউনিয়ন তাই ঘোরতর আপত্তি জানিয়েছে। সে একথাও বলেছে রাষ্ট্রসংঘ 'ন্যায্য পথে' খরচ করলে তার অংশ সে নিশ্চয়ই গ্রহণ করবে, কিন্তু কঙ্গো বা মধ্যপ্রাচ্য অপারেশনের নয়। এ-সমস্যার ফয়সালা কবে হবে বলা শক্ত, তবে একথা ঠিক যে সোভিয়েট রাশিয়াকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাষ্ট্রসংঘের মর্যাদা কিছুই বাড়ানো যাবে না।

ইরাণ :

রাজনৈতিক নেতাদের জীবনের নিরাপত্তা কি কোন দেশেই নেই? মাত্র সেদিন প্রেসিডেণ্ট কেনেডিকে জীবন দিতে হয়েছে আততায়ীর গুলীতে। এবারে ইরাণের প্রধানমন্ত্রীর জীবন আশংকিত হয়েছে। ৪১ বছর বয়স্ক প্রধানমন্ত্রী হাসান আলি-মনসুর যখন তাঁর গাড়ি থেকে নেমে পার্লামেণ্ট ভবনে ঢুকতে যাবেন তখন হঠাৎ দু-দুটো গুলী এসে তাঁকে বিদ্ধ করে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং অপারেশন সফল হবার ফলে মৃত্যুর আশংকা তাঁর কমে গেছে বলে চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন।

আততায়ীটি অবশ্যি হাতেনাতে ধরা পড়েছে। মহম্মদ বোখারাই নামে পরিচিত ২০ বছরের এই যুবকটি নাকি আগে তেহরান বাজারে একজন ব্যবসায়ীর কাছে কাজে নিযুক্ত ছিল। এই ব্যবসা কেন্দ্রটি নাকি সরকার-বিরোধী অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর ওপর এ-আক্রমণ হঠাৎ এল কেন তা সরকার এখনো অনুমান করতে পারেন নি। মিঃ আলি-মনসুর সেদিন সেই বিলটিই পেশ করতে চাচ্ছিলেন যেখানে সমুদ্রের গর্ভে তৈল নিষ্কাশন এবং পারস্য উপসাগরের উন্নয়নের জন্যে কয়েকটি কোম্পানীর সঙ্গে ইরাণের চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব ছিল। এ-চুক্তির ফলে সরকারী ন্যাশনাল ইরাণীয়ান অয়েল কোম্পানীর সঙ্গে পাঁচটি বিদেশী তৈল সংস্থার যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হচ্ছে সমুদ্রতীরে তৈল নিষ্কাশন বিষয়ে তাতে সরকার সাড়ে ১৮ কোটি ডলার নগদ বোনাস পাবে। এ-চুক্তির বিরোধী যে দেশে নেই তা নয়। দ্বিতীয়ত মিঃ আলি-মনসুর মাত্র গত মার্চে ক্ষমতায় এসেছেন, তাঁর বিপক্ষ দল এখানে রয়েছে। তা ছাড়া নিউ ইরাণ পার্টি গড়ে তিনি বিরোধীদের আরো বেকায়দায় ফেলতে চেষ্টা করেছেন। তৃতীয়ত 'সেণ্টো' এবং মধ্যপ্রাচ্য প্রতিরক্ষা সংস্থার সদস্য হিসেবে তিনি অনেক দেশের শত্রুও হয়েছেন। ওদিকে নাসের-বিরোধী হিসেবেও তিনি কম শত্রু সৃষ্টি করেন নি। আততায়ী বোখারাইর সঙ্গে এর কোনোটির কোনো সম্পর্ক আছে কি না এখুনি বলা যাচ্ছে না, তবে এর যে কোনো একটা প্রধানমন্ত্রীর প্রাণনাশের চেষ্টার সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে।

শেষ সংবাদ

চার্চিল আর নেই। দশ দিন ধরে মৃত্যুর সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ী সেনানায়ককে শেষ পর্যন্ত পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। রবিবার সকাল আটটায় তাঁর ব্যক্তিগত ডাক্তার ও ২৫ বছরের অন্তরঙ্গ বন্ধু লর্ড মোরান ঘোষণা করেছেন যে, স্যার চার্চিল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। চার্চিলের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বৃটেনের একটা যুগের অবসান হল—যে যুগে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ গৌরবের শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। স্বভাবতই এই বিরাট পুরুষের মৃত্যু সারা বিশ্বে শোকের ছায়া বিস্তার করেছে।

ধারাবাহিক উপন্যাস

অদ্বিতীয়

সুশীল রায়

অনেক রাত হয়ে গেল আজ। এগারোটা বেজে গিয়েছে।

এখানেই ক্ষান্ত দেওয়া হল বটে, কিন্তু বিশেষ করে সুহাংশুর ইচ্ছা হচ্ছিল—আরও হোক। সে যে এত চমৎকার করে লিখে ফেলেছে, এত সুন্দর লেখা লিখতে সে যে পারে—তার নিজেরই যেন সে কথা বিশ্বাস হচ্ছিল না।

কিন্তু আর না। ওরা সকলেই ক্লান্ত। দিবা তো ক্লান্ত নিশ্চয়ই। ভাব দিয়ে আবেগ দিয়ে অনেক ডায়লগ্ সে বলেছে, এটা যেমন-তেমন কথা না। এতে দম লাগে নেহাত কম না।

মনোজদের সঙ্গে দিবার পরিচয় আছে। তবুও মনোজের আজ কেমন যেন জড়তা ঠেকছে। ওরা দুজন এতক্ষণ এমন নিবিড়ভাবে প্রেমের কথা আর প্রণয়ের কথা বলেছে, এতেই মনোজের মনের মধ্যে এই জড়তা এসে থাকবে।

মোমিনপুরের কুঠি থেকে তারা বেরিয়ে এল। বারান্দায় জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে আছে অনেকগুলো বাণ্ডিল। ওসব কিছু না। ভিখারিরা রোজই এইভাবে এখানে আস্তানা নেয়। রাতের হিম সরাসরি এসে লাগে না তাদের গায়ে।

গলি-পথ পার হয়ে ওরা এসে পড়ল সদর সড়কে—ডায়মণ্ডহারবার রোডে। ওরা তো সবাই যাবে বেহালায়, একা দিবা যাবে অন্যদিকে—এসপ্লানেডের দিকে।

কিন্তু এই এত রাত্রে একজন মহিলাকে এভাবে রাস্তার মধ্যে ছেড়ে চলে যাওয়া সংগত কি না, এ কথা ওরা সকলেই ভাবছে কিন্তু কেউ কোনো কথা বলার ভরসা পাচ্ছে না। সকলের মনেই সংকোচ। যদি একে ওরা সকলেই অবজ্ঞার বা তাচ্ছিল্যের চোখে দেখতে পারত তাহলে এমন সংকোচের কোনো প্রশ্ন উঠত না। কিন্তু দিবা দেবী সকলের মনেই বেশ যেন একটু নাড়া দিয়ে দিয়েছে, সকলেরই মনে একটু বুঝি সাড়াই জেগেছে।

এমন কি অমিয় তরফদার, সেও যেন একটু কাবু হয়েছে। নাট্যকারের কথা তো আলাদা—তার কাবু হওয়াই স্বাভাবিক।

মাঝখান থেকে মনোজ বলল, 'চলুন, আপনাকে একটু এগিয়ে দিই। একা-একা এই রাত্রে যাওয়া ঠিক না।'

কিন্তু দিবা যেন তাতে গা করল না, বলল, 'দরকার হবে না কিন্তু। এ আর এমন কী রাত। এর চেয়ে বেশি রাত্রেও অনেক সময় ফিরতে হয় আমাদের। কখনো রাত একটা-দুটোর সময়ও তো অভিনয় ভাঙে।'

মনোজ মরিয়া সাহসে বলল, 'তবু, আমাদের দিক থেকে এটুকু ভদ্রতা করা তো উচিত।'

মরিয়া সাহস এইজন্যে যে, সে একবারও তার বন্ধুদের কথা ভাবল না, তার এতটা গরজ দেখে তারা তাকে কি বলবে, সে বিষয়ে সে ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত করতে পারল না।

'তবে আসুন কিছুটা।' দিবা সামান্য একটু হেসে বলল।

অনেকক্ষণ থেকে উসখুস করছিল হরেশ, এবার সে এগিয়ে এল, বলল, 'চলো ভাই মনোজ, আমিও সঙ্গ দিচ্ছি। তুমি আবার একা ফিরবে। ওঁকে এগিয়ে দিয়ে দু-জন গল্প করতে-করতে চলে আসতে পারব। কিন্তু ফেরার সময় বাস্ পাব তো?'

একটু বিরক্ত হয়ে থাকবে মনোজ,

বলল, 'কি জানি। বাস্ পাব কি না কে জানে। ট্রামও নিশ্চয় পাব না।'

দিবা হয়তো একটু হাসল, কোনো কথা বলল না। কিন্তু তার মনে-মনে ইচ্ছা যে, তার সঙ্গে কেউ না যাক।

এমন অদ্ভুত ইচ্ছাই বা তার কেন, সে প্রশ্ন আমরা তাকে করতে চাই নে, এ প্রশ্ন আমাদেরও যেন কেউ না করে। সকলের সব ইচ্ছে তোমার-আমার ইচ্ছের অনুরূপ হবে—এমন আকাঙ্ক্ষা থাকা ঠিক না। কিন্তু দিবার ইচ্ছেটা সাচ্চা—সে চায় না কেউ তার সঙ্গে যাক। তবু, অগত্যা তাকে রাজী হতে হয়েছে। দু-জন সঙ্গী নিয়ে ঐ চলেছে দিবা বন্দ্যোপাধ্যায় কুয়াসাচ্ছন্ন ঘোলাটে আলোর আবরণে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে। ঐ চলেছে তারা তিনটি নিঃসঙ্গ ছায়ার মত একবালপুরের দিকে ফুট-পাথের ওপর দিয়ে। ক্রমশ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে তারা; ঝাপসা হতে হতে একেবারে ফিকে হয়ে গেল, তারপর উহ্য।

যাক্। বেহালার পথে পা বাড়াল এবার ওরা দল বেঁধে।

ওদের কারও মুখেই কোনো কথা নেই। ওদের সব কথা হরণ করে নিয়ে বুঝি চলে গেছে ওই নায়িকা, ওই নায়ক, আর ওই প্রম্‌টার।

মাঝেরহাট ব্রিজ পর্যন্ত ওরা চলে এল কেউ কোনো কথা না বলে। ওরা সকলেই যেন বেশ চিন্তিত, সকলেই বেশ ভাবিত।

ব্রিজে ওঠামাত্র চারদিকের হিম হাওয়া দ্বিগুণ প্রতাপে এসে ওদের জাপটে ধরল।

এই হাওয়াকে অছিলা পেয়ে অমিয় বলল, 'কড়া শীত।'

'হুঁ'। শব্দ করল নীহার বসু, বলল, 'বেশ কড়া শীত। ওরাও বেশ কড়া পাল্লায় পড়ে গেল। রাত্রে ফিরতে পারলে হয়।'

বিকাশ আর রেবতী দু-জন দু-জনের মুখের দিকে তাকাল। তারা চেনে ওই মেয়েকে; চেনে বটে, কিন্তু অন্তরঙ্গভাবে অবশ্য চেনে না। কয়েকবার একসঙ্গে অভিনয় করেছে—এই মাত্র। মনোজের আজ হঠাৎ এতটা গরজ দেখে ওরাও আশ্চর্য হয়েছে, ও মেয়েকে মনোজ কি দেখে নি আগে? হঠাৎ আজ তার এতটা বিগলিত হয়ে পড়ার মানে কি, ভগবান জানেন।

'গড নোজ।'

বীরেন আপত্তি করল নীহারের ওই মন্তব্যে, বলল, 'না হে। গড বেচারাও জানে না, দেবা ন জানন্তি। আমরা তো সামান্য মনুষ্য। ডুবল, দু-জনে এক নৌকোয় পা দিয়ে দু-জনেই ডুবে মরল। নাটক তো গেলই, নায়কও গেল, প্রম্‌টারও গেল।'

স্নেহাংশুর দরদ আছে তার নাটকের ওপর, আজ সেই দরদ দ্বিগুণ করে দিয়েছে ওই অভিনেত্রীটি তার অভিনয়ের কৌশল দেখিয়ে। বীরেনের কথা মানতে সে রাজী না। না, না, যাবে না তার নাটক। তার নাটক প্রাণ পেয়ে গিয়েছে আজ। তার নাটকে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে আজ যে মেয়েটি, সে মেয়েকে ভুল ভাবতে পারছে না কিছুতে স্নেহাংশু বিশ্বাস।

স্নেহাংশু বলল, 'কিচ্ছু ভেবো না। সব ঠিক আছে।'

চালু পথে ব্রিজ থেকে নামতে-নামতে নীহার বলল, 'বেশ। ভাবতে যখন বারণ করছ তখন না হয় না ভাবলাম। কিন্তু মেয়েটা যে সামান্য না এটা স্বীকার করতেই হবে।'

'হ্যাঁ, তা স্বীকার অবশ্যই করব। ও হচ্ছে অসামান্য মেয়ে।'

আপনার
সান্নিধ্য মধুর করে তুলবে
মলয় চন্দন সাবান
(পূর্বে ইংরেজী বানান ছিল 'MALAYA')
মলয় চন্দন সাবান দিয়ে স্নান করুন। দেহমন তো স্নিগ্ধ হবেই, চন্দনের সুমধুর সৌরভ বহুক্ষণ আপনাকে ঘিরে থাকবে।
একটির বাক্স অথবা সুদৃশ্য উপহারোপযোগী তিনটির বাক্স পাওয়া যায়।
প্রস্তুতকারক: দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ, কলিকাতা ২৯

হয়েছে।' নীহার বলল, 'তুমিও ভিকটিম হয়েছ ওর।'

তর্‌তর্‌ করে কয়েক পা দ্রুত এগিয়ে স্নেহাংশুর গায়ের কাছে এসে সে বলল, 'ভাবতে চাই নে, তবু ভাবতে হচ্ছে—রাত বারোটায় একটা মেয়ে একা যেতে ভয় পায় না, আবার দু-জন সঙ্গী নিতেও ভয় পায় না। সে মেয়ে সম্বন্ধে আমার যা ভাববার আমি তা ভেবে ফেলেছি। ও একটা ইয়ে, থাক সে কথাটা ঘোষণা করে না-ই বললাম। কিন্তু জানো নাকি হে রেবতী, জানো নাকি বিকাশ—ও থাকে কোথায় ?'

প্রথমে ওরা উত্তর দিল না, কিন্তু নীহার বার-বার জিজ্ঞাসা করায় জানাল যে তারা জানে না। জানার ইচ্ছেও তাদের কোনোদিন হয় নি, জানার দরকারও হয় নি, জানার আগ্রহও হয় নি। কিন্তু আজ তাদেরও বুঝি মনে হচ্ছে—খবরটা জেনে রাখলেই হত।

রাস্তায় লোকজন নেই, রাস্তায় ট্রাম নেই, বাস্‌ নেই। শহরের এই অঞ্চলটা অন্ধকারের কম্বল মুড়ি দিয়ে একেবারে নিদ্রামগ্ন।

নিদ্রিত নগরীর রাস্তা দিয়ে জাগ্রত প্রহরীর মত হেঁটে চলেছে ওরা। হাঁটতে কোনো অসুবিধে তাদের হচ্ছে না। এ-পথটুকু দল বেঁধে তারা না হয় হেঁটেই পাড়ি দেবে, কিন্তু ওই দু বেচারা যদি ফিরতেও চায় তবে ফিরবে কেমন করে ? ট্যাক্‌সি ? হাসিই পায় ওদের। তেমন রেস্ত নিয়ে তারা সংসারেও যেমন নামে নি, অভিনয়েও না। তাদের সম্বল হচ্ছে তাদের উৎসাহ।

হরেশ আর মনোজের আশা ওরা জলাঞ্জলিই দিয়ে দিল, অন্তত আজ রাত্রিটুকুর জন্যে। করুণা হয়তো হল না তাদের জন্যে, কেন না তারা বুঝতে পারছে ইতিমধ্যে তাদের জীবনে আরম্ভ হয়ে গিয়েছে এক রোমাঞ্চকর নাটক।

রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ করে পিছন থেকে দ্রুতগামী একটা শব্দ আসছে। হয়তো কোনো ট্রাক আসছে। ওরা রাস্তার পাশে সরে গেল। শব্দটা তাদের কাছে আসতেই দুটো সম্মিলিত গলা ডেকে উঠল তাদের নাম ধরে।

থমকে দাঁড়াল ওরা। অন্ধকার একটা বাস্‌ দম কমিয়ে তাদের পাশে আসতেই বাস্‌-এর দরজা দিয়ে গলা বার করে দাঁড়াল হরেশ আর মনোজ। ওদের ডাকল চটপট উঠে আসার জন্যে। কিছু ভাববার আগেই ওরা দল বেঁধে উঠে পড়ল বাস্‌টায়।

ভগবান যদি জুটিয়ে দেন তবে এইভাবেই দেন।

হরেশ আর মনোজ হাঁটতে-হাঁটতে অনেকটা এগিয়ে দিয়ে এসেছে দিবাকে—খিদিরপুর ব্রিজ পর্যন্ত। আরও এগিয়ে দিতে রাজী ছিল তারা, অন্তত এসপ্লানেড পর্যন্ত। কিন্তু দিবা কিছুতেই তাদের সে প্রস্তাবে রাজী হল না। খিদিরপুর থেকে একটা ট্রাম যাচ্ছিল, সে উঠে পড়ল সেই ট্রামে। মনোজ আর হরেশ তৎক্ষণাৎ হঠাৎ একা হয়ে গেল এবং তখন তাদের ভাবনা হল তারা এখন ফিরবে কী করে। ভাবতে-ভাবতেই তারা দু-জন হাঁটা দিল বাড়ির পথে, তারপর হাওয়া-আপিসের কাছাকাছি তারা যখন এসেছে তখন দেখতে পেল এই বাস্‌টা—খালি বাস্‌, চলেছে গ্যারেজে। ড্রাইভারের করুণাই সম্ভবত উদ্রেক করে থাকবে তারা, দুটি অসহায় পথিককে এই শীতের মধ্যে ফাঁকা রাস্তায় দেখে ড্রাইভার তাদের তুলে নিল, বেহালাতেই যখন যাচ্ছে এই বাস্‌, বেহালার যাত্রীদের তখন তুলে নিতে ক্ষতি কি।

এইজন্যেই তাদের মনে হয়েছে যে, ভগবান যদি জুটিয়ে দেন তবে এইভাবেই দেন।

গভীর রাত্রে বন্ধুরা যে যার বাড়ি ফিরল সেদিন। সকলেই যেন ফিরল একটু আলাদা মানুষ হয়ে। সবার মনেই অল্পবিস্তর আলোড়ন জাগিয়ে দিয়ে গিয়েছে ওই মেয়েটি—ওই দিবা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কিন্তু দিবা কি মনে নতুন কোনো দাগ নিয়ে ফিরেছে ? সে কথা জানা বড় কষ্ট, কেন না দিবাকে স্পষ্ট করে জানতে পারা যায় না।

এরা তো গেল দল বেঁধে এবং এরা তো গেল যে যার বাড়িতে। এরা পুরুষ, এত রাত্রে এদের ঘরে ফেরার মধ্যে নতুনত্ব হয়তো একটু আছে, কিন্তু তার জন্যে বিস্মিত হবার কিছু নেই। এরা তো পুরুষ, এরা রাত করে ঘরে ফিরতে পারে ?

কিন্তু দিবা ? দিবা এত রাত্রে একা গেল কোথায় ? আস্তানা তার নিশ্চয়ই একটা আছে। কিন্তু সে কোথায় ?

সে কথা এখন থাক্‌।

(ক্রমশঃ)

রোমাঞ্চ উপন্যাসের যাদুকর
৺দীনেন্দ্রকুমার রায়ের
গ্রন্থাবলী
১ম ভাগে—৫খানি সুবৃহৎ ডিটেকটিভ উপন্যাস মূল্য ৩।।০ টাকা
২য় ভাগে—৫খানি রহস্য উপন্যাস মূল্য ৩।।০

জাতীয়-কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের
রঙ্গলাল-গ্রন্থাবলী
পদ্মিনী, শূরসুন্দরী, কর্মদেবী, কুমারসম্ভব, নীতিকুসুমাঞ্জলি, কাঞ্চী-কাবেরী, কবির জীবনী। ৭খানি একত্রে ২৲০০।

শ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন সম্পাদিত
নাড়ীজ্ঞান-প্রদীপিকা
(নাড়ী স্পর্শ দ্বারা রোগ নির্ণয় ও পথ্যাদি নিরূপণ)
মূল্য এক টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

শহর কলকাতা

শ্রীপদাতিক

॥ শ্যামবাজারের জন্ম পূর্বকাল থেকে একালের কথা ॥

বসতিপূর্বে অরণ্যের দাপট ছিল এখানেও। তদানীন্তন চিৎপুর-অরণ্যেরই তা বিক্ষিপ্ত বাহু। একালের উত্তরবর্তী টালা থেকে দক্ষিণের হাতীবাগান এবং পূর্ববর্তী ক্যানেল থেকে পশ্চিমের শ্যাম স্কোয়ার পর্যন্ত বিস্তার ছিল তার গভীর। তার ত্রি-উপান্তে বসতির আভাস ছিল না কোথাও। তবে জমি ছিল এলোপাতাড়ি—যার অংশ-বিশেষে ফসল ফলাতো দূর লোকালয়ের চাষী এবং অংশ-বিশেষ অনাস্থষ্টির পথ ধরেই পার হয়ে যেতো ক্লান্তিহীন সময়। আর অরণ্যের উত্তর-পূর্ব উপকণ্ঠে ভয়ঙ্কর এক শ্মশানেরও অবস্থিতি ছিল খালের ধারে। এখানে পোড়া কাঠ, রিক্ত চিতা, অসংখ্য করোটি এবং সময়-বিশেষে মুণ্ডহীন মানুষের একাধিক দেহে দিনের বেলাতেও প্রবল ছিল যামঘোষের দৌরাত্ম্য। দূর লোকালয়ের সংস্কারবাদী জনসমাজ এখানে মৃতের সৎকারে আসতো সদল-বলে এবং সভয়ে। যতক্ষণ চিতা জ্বলতো, ততক্ষণ তাদের উচ্চকণ্ঠ হরিধ্বনি জেগে থাকতো অবিরাম। হরিধ্বনির এই উচ্চরোলের ফলেই খানিকটা হালকা হতো তাদের অজানা আতঙ্ক। দিনান্তে এ-পথ কেউ মাড়াতো না। কারণ গোধূলি-লগ্ন থেকেই নাকি ভৌতিক-ঝড়ে নেচে উঠতো সমস্ত অরণ্য। গভীরে তার প্রেতের চোখ জ্বলতো হাজার হাজার—কুহকী আলো যার ঠিকরে আসতো বাইরেও। আর শোনা যেতো সহস্র অশ্বের খুরধ্বনি, বিচিত্র গোঙানি, উন্মত্ত উল্লাস এবং মাঝে মাঝে অসংখ্য ঢাকের একটানা দ্রিমি দ্রিমি। দূর-জনপদবাসীর ধারণায় তা জাগতিক নয়, সবই ভৌতিক। সুতরাং সেজন্যেই অরণ্যোপান্তে তাদের ছায়া পড়তো না দিনান্তে অথবা সন্ধ্যায়।

কিন্তু শোনা যায়: দূর-জনপদবাসী গোধূলি-লগ্ন থেকেই অরণ্যের ভয়াবহ এই পরিবর্তনকে ভৌতিক বা অলৌকিক ভাবলেও, প্রকৃতই তা তাদের ধারণাপ্রসূত ছিল না। আসলে অরণ্যের গভীর অন্তর্দেশে সুনিয়ন্ত্রিত এক আখড়া ছিল দুর্ধর্ষ দস্যুদলের। তাদের আরাধ্য এক কালীমূর্তিরও প্রতিষ্ঠা ছিল সেখানে। এই কালী-মূর্তির সামনেই যখন তারা মহাসমারোহে নরবলি দিতো, অরণ্যের আপ্রান্তিক নিস্তব্ধতা তখনই শিউরে উঠতো ঢাকের বোলে, চণ্ডনৃত্যের ছন্দে এবং উন্মত্ত

শ্রীপদাতিক

উল্লাসের ভয়ঙ্কর ধ্বনি-প্রবাহে। সন্ধ্যালগ্নে অসংখ্য মশাল জেলে, ললাটে বলির রক্তের তিলক পরে, এবং সারা অঙ্গে কালি মেখে সশস্ত্র তারা বাইরে আসতো কেউ অশ্বে, কেউ বা পায়ে হেঁটে। তারা ডাকাতির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতো তদানীন্তন খুলনা, যশোহর, নদীয়া, নবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলে। তারপর অন্ধকারেই আবার তারা জনশূন্য ময়দানের পথে এবং কখনো অরণ্য-পথে ফিরে আসতো আখড়ায়। এতদঞ্চলের বিক্ষিপ্ত বসতির জনসমাজ তাদের স্বচক্ষে দেখার সুযোগ পেতো না কখনো। তা ছাড়া অরণ্যো-পান্তের এই দীন লোকালয়ের প্রতি দস্যু-দলেরও দৃষ্টিপাত ছিল নির্মমভাবেই উদাসীন। তাই তাদের সামনে এ-অঞ্চলের সংস্কারবাদী জনসমাজকে কোনোদিন সংঘর্ষেও পতিত হতে হয় নি। তাই এই দস্যুদের অরণ্য-দেশের কার্যক্রম তখন ভৌতিক বা অলৌকিক বলেই প্রতীয়মান ছিল তাদের সংস্কারাচ্ছন্ন মনে।

শ্যামবাজারের তদানীন্তন অরণ্য-অধ্যায় এভাবেই অতিক্রম করে যুগের পর যুগ। তারপর সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগেই সুতানুটি অঞ্চলে যখন বিস্তার করে জব চার্নকের প্রাথমিক আমল, তখন বর্তমান শ্যামবাজারের সেই তদানীন্তন অরণ্যাঞ্চলেই একটি উপবন্দর প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অনুভব করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। জব চার্নক তখন কোম্পানীর এজেন্ট এবং সাব-এজেন্ট তাঁরই এক সুযোগ্য সহকর্মী চার্লস সাহেব। এই চার্লস সাহেবই উপবন্দর প্রতিষ্ঠার স্থানটি নির্বাচনের প্রয়োজনে এতদঞ্চলের অরণ্যদেশ পরিদর্শনে আসেন দলবলসহ। তিনি অরণ্যে প্রবেশ করেন চিৎপুরের পথে এবং কাঁটাকুঞ্জের জটিল পথেই এগিয়ে আসেন বর্তমান শ্যামবাজারের তদানীন্তন অরণ্য-কেন্দ্রে। তারপর আকস্মিকভাবেই তিনি মুখোমুখি হন দস্যুদলের। দস্যুদল তাঁকে আক্রমণ করে। তিনিও একা বা অস্ত্রহীন নন। সুতরাং সংঘবদ্ধ দস্যুদলের সঙ্গে তেমন এঁটে উঠতে না পারলেও, আত্মরক্ষা ক'রে সহজেই বেরিয়ে আসেন বাইরে।

চার্লস সাহেবের কাছে দস্যুদলের সংবাদ পেয়েই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে ইংরেজ-কুল। সুতরাং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দস্যুদের দমন করার উদ্দেশ্যে আর্জি পেশ করেন মুর্শিদাবাদের দরবারে। মুর্শিদাবাদের নবাব যথাযোগ্য তদন্তের শেষে আবার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকেই নির্দেশ দেন দস্যুদল দমন করার জন্য এবং সেইসঙ্গে সেখানে একটি উপবন্দর প্রতিষ্ঠারও অনুমতি দান করেন তিনি।

নবাবের নির্দেশ পেয়েই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৈন্যবাহিনী হানা দেয় অরণ্যে। দস্যুদলের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বাঁধে প্রচণ্ড। দস্যুদল সেদিন সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও, তাদের অস্ত্র কেবল সড়কি, টাঙ্গী, বল্লম প্রভৃতি। কিন্তু ইংরেজরা আগ্নেয়াস্ত্রের অধিকারী। এই আগ্নেয়াস্ত্রের বলেই তারা জয়লাভ করে অনায়াসে। দস্যুরা কেউ মরে, কেউ পালিয়ে যায়। আখড়ায় তাদের অগ্নি-সংযোগ করে ইংরেজরা। আখড়া জ্ব'লে যায় এবং সেইসঙ্গে জ্ব'লে যায় অরণ্যেরও অংশ-বিশেষ।

তারপর ভস্মীভূত অরণ্যের সেই অংশ-বিশেষেই অজস্র মজুরের সাহায্যে এক মার্জিত পরিবেশের পত্তন ঘটে দেখতে দেখতে। দস্যুদলের আখড়া জ্ব'লে যাওয়ার সঙ্গে তাদের আরাধ্যা কালীমূর্তির পর্ণকুটিরও ধ্বংস হয়। কিন্তু মূর্তিটি থাকে অক্ষুণ্ন। এ-মূর্তি সাধারণের আরাধ্যা দেবীপ্রতিমা বলেই সেখানে আরেকটি কুটির তুলে দেয় ইংরেজরা। তারপর সেই কুটির সংলগ্ন প্রশস্ত জমিতেই উপবন্দর প্রতিষ্ঠা করেন চার্লস সাহেব। পাশেই খাল গঙ্গার সঙ্গে সংযুক্ত। অতএব পণ্যবাহী নৌকোর যাতায়াত অনেক সুবিধাজনক বলেই দিনে দিনে বেশ সমৃদ্ধি আসে বন্দরের। এবং দেখতে দেখতে সেখানে প্রতিষ্ঠালাভ করে একটি বাজারও। প্রথম দিকে এই বাজারের কোনো নাম ছিল না। কিন্তু পরে বন্দরসহ সমগ্র বাজারটাই লোকের মুখে মুখে নামধারণ করে Charles Bazar।

তারপর সময় আরও এগিয়ে চলে। নিঃশব্দেই অতিক্রান্তি লাভ করে সপ্তদশ শতাব্দী। বাজারের পাশে এগিয়ে আসে বসতি। অনতিদূরে আত্মপ্রকাশ করে একটি সুদৃশ্য বাগান। একটি গীর্জাও মাথা তুলে দাঁড়ায় খালের ধারে। সম্ভবত গীর্জা সূত্রেই চার্লস বাজারে এসে সপরিবারে বসবাস সুরু করে দুজন পর্তুগীজ ধর্মযাজক। দিনে দিনে এভাবেই বিশেষ এক অভিরাম পরিবেশ ধারণ ক'রে অঞ্চলগত দিক থেকেও বেশ মর্যাদাসম্পন্ন হয়ে ওঠে চার্লস বাজার। সুতরাং তার প্রতি এবার আকৃষ্ট হয়ে ওঠে বাঙালী বণিক-সমাজও। তারাও চার্লস বাজারে এসে লেনদেন সুরু করে ইংরেজদের সঙ্গেই।

ঠিক এমনই দিনে, হঠাৎ এক অজ্ঞাত আততায়ী কর্তৃক নিহত হন চার্লস সাহেব। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আততায়ীর অনুসন্ধান করে বিস্তর। কিন্তু দীর্ঘদিন পরেও তার কোনো হদিস না পেয়ে এ-ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ। চার্লস সাহেবের এই অভাবনীয় মৃত্যু লক্ষ্য ক'রে সম্ভবত আতঙ্কেই সে-স্থান ত্যাগ করে পর্তুগীজ ধর্মযাজকদ্বয়। ফলে তাঁদের গীর্জাটি সম্পূর্ণ অনাদৃত হয়ে পড়ায় সেখানে এবার বসবাস সুরু করে বেওয়ারিশ কিছু পশু-পক্ষী।

চার্লস সাহেবের মৃত্যুর পর চার্লস বাজারের উপবন্দর পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন শ্যামচাঁদ নামে একজন বাঙালী সওদাগর। পূর্বে বাণিজ্যগত দিক থেকেও তিনি যুক্ত ছিলেন চার্লস সাহেবের সঙ্গেই। এবার চার্লস সাহেবের অনুপস্থিতিতে তারই একক প্রতিপত্তি বিস্তার লাভ করে সমগ্র অঞ্চলে। তাঁর প্রচেষ্টাতেই আরও পরিধি বাড়ে বাজারের এবং সংস্কার সাধিত হয়ে আরও প্রশস্ত আকার ধারণ করে গঙ্গার সঙ্গে সংযুক্ত খাল। তাছাড়া সেই ডাকাতে কালীমূর্তির পর্ণকুটিরের স্থলে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন একটি পাকাবাড়ি। সম্ভবত সে-কারণেই তিনি ব্রাহ্মণ না হলেও, তাঁকে শ্যামঠাকুর বা শ্যামচাঁদ ঠাকুর নামে অভিহিত করে তদানীন্তন জনসমাজ। তারপর শোনা যায়: এই শ্যামচাঁদ ঠাকুরকে স্মরণীয় করার জন্যেই শেষে চার্লস বাজারও তার নাম বদলায় অর্থাৎ বাজার বা বন্দরসহ সমগ্র অঞ্চল অচিরেই আবার নামধারণ করে শ্যামবাজার। অবশ্য অনেকের অভিমত শ্যামবাজার নামের উচ্চারণ নাকি চার্লস বাজার প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই ছিল। কিন্তু এ অভিমতের স্বপক্ষে যুক্তিজাল তাদের শতচ্ছিন্ন।

সম্ভবত তখন অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাক-মধ্যাহ্নকাল। ঠিক এই সময় থেকেই বাঙালী বিত্তশালী সমাজের আবির্ভাব সুরু হয় শ্যামবাজারে। তার দক্ষিণ উপকণ্ঠে সুরম্য বসতবাটী নির্মাণ করেন ক্লাইভের সুযোগ্য মুন্সী নবকৃষ্ণ দেব। ইংরেজ সমাজের অতিশয় প্রিয়-পাত্র তিনি। সুতরাং তাঁর বাড়িতে সম্মানীয় অতিথিরূপে প্রায় প্রত্যহই আবির্ভাব সুরু হয় ইংরেজ নরনারীদের। তাঁদের মনোরঞ্জনের জন্য নবকৃষ্ণ দেবেরও সাধনার অন্ত নেই। তিনি অতিথিবৃন্দের সামনে সময়-বিশেষে পরিবেশন করেন হিন্দুস্থানী খানার সঙ্গে রঙিন পানীয় এবং সময়-বিশেষে নৃত্যপটীয়সী বাইজীর সর্বজনীন যৌবন। দিনে দিনে এভাবেই তিনি তদানীন্তন ইংরেজ সমাজে এক অনন্য আসন দখল ক'রে, শেষে ইংরেজদের তদ্বিরেই দিল্লীর দরবার থেকে লাভ করেন রাজা উপাধি।

তারপর সারা বাংলায় দুর্যোগ ঘনিয়ে তোলে ১৭৫৭ সাল। স্বাধীন নবাব সিরাজের বিরুদ্ধে সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করে ক্লাইভ। যুদ্ধভূমি পলাশী প্রান্তর। এ-যুদ্ধে জয়ী হতো হয়তো সিরাজ-বাহিনীই। কিন্তু সিরাজের নির্ভরশীল সেনানায়কের আকস্মিক বিশ্বাসঘাতকতা শেষ পর্যন্ত জয়ের বরমাল্য দান করে কুখ্যাত ক্লাইভকেই। পলাশীর রক্ত-পঙ্কেই মুখ লুকায় বাংলার স্বাধীনতা-সূর্য। বিজয়ী ক্লাইভ ফিরে আসে কলকাতায়। তার জয়কে লক্ষ্য করেই উৎসবের বিচিত্র জোয়ারে দেহ ভাসায় কলকাতার ইংরেজ নরনারী। রাজা নবকৃষ্ণ দেবও প্রতীক উৎসবরূপে মহাসমারোহে দুর্গাপূজার আয়োজন করেন তাঁর নিজ গৃহে। এই পূজা-মণ্ডপে সেদিন উপস্থিত ঘটে তদানীন্তন শীর্ষস্থানীয় ইংরেজ সমাজের এবং স্বয়ং ক্লাইভের। নবকৃষ্ণ দেবীসমীপে

● টালা ব্রীজ

নিবেদিত পুষ্পের মালা গেঁথেই সেদিন ক্লাইভের কণ্ঠে দান করেন পরম ভক্তের মতো।

ভক্ত নবকৃষ্ণের প্রতি ক্লাইভও উদাসীন থাকে নি। সে তাঁকে উপ-ঢৌকন স্বরূপ প্রদান করে শহরতলীর প্রচুর ভূ-সম্পত্তি এবং সেইসঙ্গে তদানীন্তন নগরোপান্তের চার্লস বাজার বা শ্যামবাজার।

তারপর দিন কেটে যায় আরও। সারা শ্যামবাজারের একচ্ছত্র অধিকার বজায় থাকে শোভাবাজার রাজবংশেরই। সম্ভবত এই রাজবংশের দ্বিতীয় পুরুষের আমলেই শ্যামবাজারের সেই কালীমন্দিরে আবির্ভাব ঘটে একজন তান্ত্রিকের। নাম তাঁর চণ্ডীচরণ ব্রহ্মচারী। তিনি তান্ত্রিক হলেও, মাদক-দ্রব্যে তাঁর কোন আকর্ষণ নেই এবং দেবীসমীপে বলিদানের রীতিতেও তিনি বিশ্বাসী নন। দেবীর পূজা করেন তিনি ফুল দিয়েই। তাঁকে কেন্দ্র করেই মন্দির-প্রাঙ্গণে সমাগম ঘটে ধর্মভীরু জনসমাজের। সে দি ন অনেকেই গ্রহণ করে র শিষ্যত্ব। তারপর শিষ্যদের নিয়েই মন্দির-প্রাঙ্গণে একটি আখড়া গ'ড়ে তোলেন তিনি।

কিছুকাল পর মন্দিরের পার্শ্ববর্তী এক তরুতলে আবার আবির্ভাব ঘটে একজন পীরের। নাম তাঁর নূরুদ্দীন মোল্লা। তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয় মুসলিম সমাজ। দিনে দিনে সাগরেদের সংখ্যা বাড়ে তাঁরও। অতএব সাগরেদদের নিয়ে সেই তরুতলে একটি স্থায়ী মিল্লাত বা মজলিশ গ'ড়ে তোলেন তিনিও।

তান্ত্রিকের আখড়া এবং পীরের সেই মিল্লাত বা মজলিশ পাশাপাশি। উভয় দলের মধ্যে ধর্মগত কোনো মিল নেই, আচারেও কোনো সাদৃশ্যের বালাই নেই। পরস্পরের মধ্যে বৈপরীত্যই অত্যন্ত প্রকট। অথচ তা সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে কোনো বিরোধ লক্ষ্য করা যায় না। বরং সাধারণের চোখে মনোগত মিলটাই তাঁদের ধরা পড়ে দিনে দিনে। প্রায় রাতেই তান্ত্রিকের আখড়ার সঙ্গে পীরের মজলিশ এবং পীরের মজলিশের সঙ্গে তান্ত্রিকের আখড়া একাকার হয়ে মিশে যায়। তারপর কী যেন আলোচনা হয় সেখানে। তখন পীর এবং তান্ত্রিকের মধ্যে একেবারেই যে কোন ভেদ থাকে না—তার প্রমাণ পায় উদাসীন পথচারীও।

তখন কুঠিয়াল সাহেবদের দৌরাত্ম্যের দিন। তাদের বাধ্যতামূলক নীলচাষের ফলে প্রায় বন্ধ্যা হতে চলেছে গ্রাম-বাংলার উর্বর জমি। চাষীরা তাই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে দিকে দিকে। সাহেবদের বিরুদ্ধে তারা তখন প্রত্যক্ষ সংগ্রামী। উত্তরে-দক্ষিণে এবং পূর্বে-পশ্চিমে আগুন জ্ব'লে ওঠে কুঠিয়াল সাহেবদের কুঠিতে। ইংরেজ সরকার এই বিদ্রোহ দমন করার চেষ্টা করে নানাভাবে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। হুগলী-বর্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলের বিদ্রোহ খানিকটা দমিত হলেও, তা প্রচণ্ড আকার ধারণ করে সারা চব্বিশ পরগণায়। আবার চব্বিশ পরগণায় তা সাময়িকভাবে খানিকটা স্তিমিত হলেও, আঘাত এসে পড়ে খোদ কলকাতার শ্বেতাঙ্গ জীবন-যাত্রায়। ইংরেজ সরকার এবার তাই নিযুক্ত করে কিছু দেশীয় দালাল এবং তাদের সাহায্যেই আবিষ্কার করার চেষ্টা করে নীল-বিদ্রোহীদের প্রধান প্রধান ঘাঁটি। শোনা যায়: তদানীন্তন

সারমেয়-প্রতিম জন-কয়েক ভূস্বামী এ-সমস্ত দালাল নিযুক্ত করার পক্ষে ইংরেজ সরকারকে সাহায্য করে অক্লেশে।

যাই হোক, ছদ্মবেশে দালালশ্রেণী ছড়িয়ে পড়ে সারা বাংলায়। কৌশলে তারা নীল-বিদ্রোহীদের সঙ্গেই মিশে গিয়ে সাবধানে অনুধাবন করে তাদের গতিবিধি। এভাবেই প্রায় মাস-তিনেক পরিশ্রম করার পর সারা পশ্চিম বাংলা থেকে তারা সংগ্রহ করে যে-সমস্ত মূল্যবান সংবাদ—ইংরেজ সরকার তা থেকেই জানতে পারে : হাওড়া-হুগলী-বর্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলের বিদ্রোহ পরিচালিত হয় শ্রীরামপুর থেকে এবং সমস্ত চব্বিশ পরগণার সুপরিকল্পিত বিদ্রোহের উৎস খোদ কলকাতার অন্তর্গত শ্যামবাজারেই। অর্থাৎ তান্ত্রিক-রূপী চণ্ডীচরণ বৃহ্মচারী এবং পীররূপী নূরুদ্দীন মোল্লাই চব্বিশ পরগণার নীল-বিদ্রোহীদের নেতা। তাদের শ্যামবাজারের আখড়া এবং মজলিশ বা মিল্লাত থেকেই পরিচালনা করা হয় এতদঞ্চলের ইংরেজদের বিরুদ্ধে নীল-বিদ্রোহীদের অভিযান।

সুতরাং আর বিলম্ব না ক'রে ইংরেজ সরকারের সশস্ত্র পুলিশবাহিনী এসে ঘেরাও করে শ্যামবাজারের সেই আখড়া এবং মিল্লাত। অবশ্য তা সত্ত্বেও পালিয়ে যেতে সক্ষম হন চণ্ডীচরণ বৃহ্মচারী। কিন্তু নূরুদ্দীন মোল্লা পালাবার কোনো পথ না পেয়ে পুলিশবাহিনীর সঙ্গেই সদলবলে ধৃত হন প্রত্যক্ষ সংগ্রামে। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়, পরপর একাধিক গুলীর আঘাতে মুহূর্ত-কয়েকের মধ্যে তাঁর প্রাণহীণ দেহ লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। তারপর সব শেষ। আখড়া এবং মিল্লাত প্রায় জনশূন্য হওয়ার পর নূরুদ্দীনের শবদেহ খালের জলে নিক্ষেপ করে যথাস্থানে ফিরে যায় পুলিশবাহিনী।

পরদিন নূরুদ্দীনের বিকৃত শবদেহ খাল থেকে তুলে আনে তাঁর অনুরাগীবৃন্দ। তারপর তা সযত্নে সমাধিস্থ করে কালীমন্দিরের পার্শ্ববর্তী ভূমিখণ্ডেরই কোনো এক বিশেষ অংশে। পুরাতত্ত্বের প্রতি কৌতূহল যার অসীম—এমন কোনো ব্যক্তি এসে যদি বর্তমান কালীমন্দিরের আশে-পাশে নিক্ষেপ করেন তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টি, তা হলে হয়তো আজও তিনি আবিষ্কার করতে পারবেন সেই অনাদৃত কবর নূরুদ্দীন মোল্লার—যিনি ছিলেন বিদেশীরাজের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রথম যুগের শহীদ।

শ্যামচাঁদ ঠাকুরের আমল থেকেই 'শ্যামবাজার' নামটির প্রচলন ঘটলেও, তদানীন্তন দলিল-দস্তাবেজে 'চার্লস বাজার' নামটিই প্রাধান্য লাভ করে। সম্ভবত এ-নামের উচ্চারণ জেগে ছিল উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত। উনবিংশ শতাব্দীতেই শোভাবাজারের রাজবংশে কলহের সূত্রপাত ঘটে সম্পত্তি নিয়ে। স্বভাবতই এ-কলহ মকদ্দমার আকারে শরণাপন্ন হয় হাইকোর্টের। হাইকোর্ট তদানীন্তন আইনজীবী Eliot Mc-Naughten সাহেবকে রিসিভার নিযুক্ত ক'রে শোভাবাজার রাজবংশের আংশিক সম্পত্তি দখল করার যে-নির্দেশনামা জারী করেন—তাতেও চার্লস বাজার নামের উল্লেখ আছে। হাইকোর্টের সেই নির্দেশনামার অংশ-বিশেষ এই :

'It is hereby Ordered that Eliot Mc-Naughten Esq, the Official Receiver of this Court do take possession of the following immovable properties situate in Calcutta that is to say Charles Bazar, Hogol Cooudy etc.....'

উনবিংশ শতাব্দী থেকেই পরিবেশ-গত দিক থেকে বিবর্তন সুরু হয় শ্যামবাজারের। তখন থেকেই বাঙালী বিত্তশালীদের সুরম্য গৃহবিন্যাসের যে-জয়যাত্রা সুরু হয়, বিংশ শতাব্দীর প্রাক্-মধ্যাহ্নেই তা সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে বলা যায়। বিত্তশালীদের পাশাপাশি মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র শ্রমিক শ্রেণীরও বিস্তৃত বসতি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে শ্যামবাজারে। শ্যামবাজার তাই উত্তর-কলকাতার সর্বাপেক্ষা বসতিবহুল অঞ্চল। এ-অঞ্চলের আদি সরণী শ্যামবাজার স্ট্রীট, সার্কুলার রোড এবং পরবর্তীকালের রাজপথ বিধান সরণী, ভূপেন বসু এভিনিউ প্রভৃতি। প্রধান পথ বা রাজপথসমূহের বিভিন্ন অংশ থেকেই কয়েকশত অলি-গলির বিস্তার ঘটেছে সারা শ্যামবাজারে। কিন্তু কোথাও তেমন বিশৃঙখলার জটিল বন্ধন নেই। রাজপথসমূহের মতো শ্যামবাজারের অলি-গলিও বেশ সংস্কৃত এবং সুনিয়ন্ত্রিত। শ্যামবাজারের মতো অতিশয় বসতিবহুল অঞ্চলে রাস্তাঘাটের এমন সুনিয়ন্ত্রণ সত্যিই খুব আশ্চর্যের।

স্বাধীনতা পূর্বেই স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল শ্যামবাজার। আজও ঠিক সেভাবেই তার অধিষ্ঠান। তার পাঁচ মাথার মোড় থেকেই পরিদৃশ্যমান উত্তরে টালা ট্যাঙ্ক এবং টালা ব্রীজ ; দক্ষিণে বিধান সরণীর উভয় বাহুতে রমণীয় প্রেক্ষাগৃহের দৃশ্য ; পূর্বে আর জি কর হাসপাতালের পরেই বেলগাছিয়া ব্রীজ ব্রীজ এবং পশ্চিমে মণীন্দ্র নন্দী কলেজ ও শ্যাম স্কোয়ারের মার্জিত পরিবেশ। তা ছাড়া শ্যামবাজারের দক্ষিণ-পূর্বে দেশবন্ধুর মূর্তি শোভিত এবং তাঁরই নামাঙ্কিত ঐতিহাসিক পার্ক শ্যামবাজারকে মহিমান্বিত করেছে আরও। এ-পার্কে আজও যেমন পূজনীয় প্রাজ্ঞ-জনের পদশব্দ জাগে, তেমনই ষড়ঋতুর প্রতি বিকেলেই বসন্ত ফোটে ক্লান্তিহীন।

শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড় আজ নেতাজীর মূর্তি সংস্থাপনের উদ্দেশে নির্দিষ্ট। অচিরেই সে-মূর্তির সসম্মান অধিষ্ঠান এখানে ঘটুক—এমন ঐকান্তিক কামনা নিয়েই আজ দিন গুণছে শ্যামবাজারের সমস্ত অধিবাসী। তাদের এই আতুর প্রতীক্ষার সঙ্গে আজ সংযোজিত হয়েছে সারা কলকাতার গভীর আগ্রহ। অতএব আশা করা যায় : নাতিদূর ভবিষ্যতে একদিন অবশ্যই নেতাজীর মূর্তি প্রতিষ্ঠার এই পরিকল্পনা বাস্তব রূপায়ণে জয় করবে সার্থকতার বর।

বানিজ্যে সেকাল ও একাল

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ অষ্টবিংশতি প্রবাহ ॥

ট্যাভানিয়ার।

মোগলযুগের সংস্কৃতি আর ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিপুল ঐতিহ্যের নির্ভরযোগ্য সাক্ষী। কোন্ সুদূর অতীতে একক এই বিদেশী আমাদের দেশে এসেছিলেন। একেবারে একা। হাতে শুধু একটা লাঠি। মনের দুর্জয় সাহসকে সম্বল করে ভারতবর্ষের পথে-প্রান্তরে ভ্রমণ করেছেন। তাঁর বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করে গেছেন বলেই আজও শত শত শতাব্দী ব্যবধান এড়িয়েও তাঁর নাম মানুষের স্মৃতিতে সোনার লেখার মত জলজল করছে।

ট্যাভানিয়ার।

তিনি বলেছেন : 'In Mugal period, there was diamond mines of considerable importance and value in the region of Bengal. Although it is possible for many persons in India may be surprised.'

সেই দূর অতীতে ট্যাভানিয়ার আমাদের দেশের এক সুখী আর সম্পন্ন ছবি দেখতে পেয়েছিলেন। পালামৌ অঞ্চলের পার্বত্য পরিবেশে হীরার বিশাল এক খনি। সেখানে শত শত মজুর খনির অন্ধকার গর্ভে নামছে। উঠছে। আর ভূগর্ভের অন্ধকার শক্ত মাটির গায়ে কোদাল আর গাঁইতির ঘা দিয়ে দিয়ে এই মূল্যবান ধাতু আহরণ করছে। এই হীরার আদর ছিল সুদূর রোমে। রোমের বিলাসী সম্রাটের কণ্ঠে এই বাংলার হীরার মালা ঝকমক করতো। শুধু রোম নয়। আরও দূর দূর দেশে রপ্তানী হয়ে চলে যেত হীরা।

পৃথিবী বিখ্যাত ঐতিহাসিক টলেমিও (ptolomy) ট্যাভানিয়ারকে সমর্থন করে বলেছিলেন : 'Soumelpur (Sub-division of Palamu) produced the finest diamonds in the world.'

অনেকে সন্দেহ করে মহানদীর তীরবর্তী সম্বলপুরেও হীরার খনি ছিল। এই পালামৌয়ের সৌমেলপুর আর সম্বলপুর একই জায়গা। সে যাই হোক, এখানে একদিন শত শত বাঙালী কর্মী হীরার খনিতে চাকরি করে জীবিকা অর্জন করতো। বাঙালী ব্যবসায়ীরা একদিন এই হীরার ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিল।

শুধু পালামৌতে নয়। ছোট

নাগপুর অঞ্চলেও হীরার খনি ছিল। এইসব লুপ্ত আর মৃত মূল্যবান খনিকে কেন্দ্র করে অতীত ইতিহাস মুখর হয়ে ওঠে। ছোটনাগপুরের খনির কথা লেখা আছে ট্যাভার্নিয়ারের ভ্রমণবৃত্তান্তে, লেখা আছে জাহাঙ্গীরের আত্মচরিতে, তুজাকী জাহাঙ্গীরে। বুকব্যান অনুবাদ করেছিলেন এই TUZUK-I-JAHANGIR.

মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মচরিতে খনির এক চমকপ্রদ বিবরণ করেছেন। 'In A. D. 1616, it was reported to me (Jahangir), that Ibrahim Khan had overrun KOKRAH (diamond mines of Chotonagpur) and taken possession of its diamond washings.'

১৬১৬ খৃস্টাব্দে মোগল দরবারে এক দুঃসংবাদ এল। ইব্রাহিম খাঁ। দুর্ধর্ষ আর দুর্বিনীত এক দেশীয় রাজা সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়েছিল। একবার নয়। বারে বারে। শেষ পর্যন্ত একদিন রাত্রির অন্ধকারের আড়ালে শত শত সশস্ত্র সৈন্য নিয়ে এসেছিলেন হীরার খনি জোরদখল করতে। দিল্লী অনেক দূরে। কোথায় গভীর জঙ্গলাকীর্ণ পার্বত্য প্রদেশ ছোটনাগপুর। ইব্রাহিম খাঁর চোখে লোলুপ উল্লাস ঝকমক করছে। জলন্ত মশালের আলো সৈন্যদের চোখমুখে লোভের আভাকে আরও উজ্জ্বল আরও প্রখর করে তুলেছে। তাদের বুকের রক্তে রক্তে কলধ্বনি বাজছে। লুঠ করবো হীরা। যত পারি, দুহাত ভরে নেব।

ইব্রাহিম খাঁ হুকুম দিলেন। শিকারী বাঘের মত লাফিয়ে পড়ল সেই সুরক্ষিত হীরার খনির ওপরে। নিস্তব্ধ সেই নিশিরাত্রে সেই খনি অঞ্চলে যেন প্রলয়ের হাহাকার জেগে উঠল। চোখের পলকে ইব্রাহিম খাঁ দখল করে নিলেন সেই খনি। কিন্তু—

বিচক্ষণ সম্রাট অত সহজে হাল ছেড়ে দেন নি। তিনি বলেছেন: 'District, in which diamond was situated, was subject to me. Armed Soldiers were sent to arrest Ibrahim Khan.'

কোকরাহ নদীর ধারে সম্রাটের সৈন্যদের সংঘর্ষ হলো ইব্রাহিম খাঁয়ের। বলা বাহুল্য, যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ সেনানীর সঙ্গে ইব্রাহিমের অশিক্ষিত অপটু অনুচরেরা যুদ্ধে দাঁড়াতে পারল না। তারপর—

তারপর। সেকথাও লেখা আছে আত্মচরিতে। বহু যুগের ব্যবধানে এসেও তাঁর লেখার ভেতরে তাঁর গর্বের সুরটুকু যেন স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যাচ্ছে: 'All diamonds found in the possession of Ibrahim Khan are forwarded to the court.'

ইব্রাহিমের কাছে যত হীরা ছিল সব মোগল দরবারে নিয়ে আসা হয়েছিল। এইভাবেই সাড়ে তিনশো বছর আগে হীরার ব্যবসাকে ইব্রাহিমের ব্যক্তিগত মালিকানার হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীর। আবার—

আবার শত শত বাঙালী সওদাগরের পদশব্দে মুখরিত হয়ে উঠেছিল ছোটনাগপুরের হীরার খনি। আবার মুক্ত হয়েছিল দূর দূর দেশে রপ্তানী। এই প্রসঙ্গে একথাও উল্লেখযোগ্য, যে হীরাকে কেন্দ্র করে ভয়াবহ যুদ্ধ, রক্তপাত আর অগণিত লোকক্ষয় হয়েছিল সেই হীরার মূল্যও জাহাঙ্গীরের আত্মচরিতে জলজল করছে।

তিনি লিখেছেন:

'যে হীরা ইব্রাহিমের কবল থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল তার আনুমানিক মূল্য ছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা। তবে এর ভেতরে এমন হীরেও ছিল যে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। রঙীন হীরে।'

বলেছেন, স্যাফায়ার।

Sapphire—এই স্যাফায়ারের অভিধানগত অর্থ হলো, A transparent blue precious stone.

গভীর সমুদ্রের জলের রঙ। আকাশের রঙ। যার নীলাভ দীপ্তিতে চোখদুটো স্নিগ্ধ হয়ে আসে, একটু একটু করে মুগ্ধ একটা আবেশ আর অভিভূত আচ্ছন্নতায় চোখদুটো আমন্থর হয়ে ওঠে। মাত্র কয়েক রতি ছিল এই হীরের ওজন। এর এক খণ্ডের মূল্য ছিল তিন হাজার টাকা।

মূল্যবান সম্পদকে গচ্ছিত করে রাখা—ব্যক্তিগত মালিকানার এই বিষময় প্রভাব বুঝি স্মরণাতীত কাল থেকেই ছিল। শুধু জাহাঙ্গীরের আত্মচরিতে নয়। জেনারেল ডাল্টনের লেখার ভেতরেও আছে বাংলাদেশের এই অমূল্য সম্পদকে নিয়ে কাড়াকাড়ি আর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ইতিবৃত্ত। ডাল্টন বলছেন: 'That family of Raja of Chotonagpur possessed a diamond of these mines (Chotonagpur) valued at Rs, 40,000.'

ছোটনাগপুরের রাজপরিবারও যুগ যুগ ধরে এই হীরাকে তাঁদের রত্নভাণ্ডারের অন্ধকারে আবদ্ধ রাখতে পারেন নি। আবার বাঙালী ব্যবসায়ীরা এই হীরা নিয়ে দূর দূর দেশে রপ্তানী করেছিলেন। অনেক—

অনেকদিন পরে ১৬৬০ খৃস্টাব্দে দাউদ খাঁর লোভ মত্ত হাতীর মত আক্রোশ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পালামৌয়ের হীরার খনিতে। তিনি বহুদিন বাংলার হীরা নিয়ে ব্যবসা করেছিলেন। তাঁকে ইতিহাসকার আখ্যা দিয়েছিলেন Zamindari—Kani-Aimas, অর্থাৎ হীরার খনির মালিক। কিন্তু—

কিন্তু ইব্রাহিমের মত, ছোটনাগপুরের রাজপরিবারের মত খানসাহেবও দীর্ঘদিন হীরাকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি করে রাখতে পারেন নি। আবার বাঙালী ব্যবসায়ীদের জাহাজে জাহাজে হীরার পণ্য দূর দেশে চলে গিয়েছিল অগাধ সমুদ্রের জলরাশি পার হয়ে—চলে গিয়েছিল রোমে—প্যারিসে—

(ক্রমশঃ)

রঙ্গজগৎ

● শ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্রাপ্ত 'গামপেরালিয়া'র পরিচালক লেস্টার জেমস পেরীজ।

চলচ্চিত্র সপ্তাহের একটি দিক

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব উপলক্ষে জনসাধারণ বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেছেন। দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি উৎসবকে সফল করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। জনসাধারণের আগ্রহের প্রকাশ দেখা গেছে এই পত্রিকাগুলির চাহিদা এবং ছবি দেখার জন্য ধারণাতীত দীর্ঘ লাইন দেখে। এই উৎসব জাতীয় মর্যাদার ব্যাপার। কেবল সাংস্কৃতিক নয়, রাজনৈতিক এবং বিশ্বশান্তির প্রশ্নে এই উৎসবের গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক-সমাজতান্ত্রিক (!) ভারতে আজো আমলাদের দাপট। এই আমলাশাসিত ভারতে জনসাধারণের ইচ্ছা ও সম্মান প্রায়শই ধূলায় লুণ্ঠিত হয়। এই ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি।

উৎসবের সুরুতে ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস কাগজে পড়েছিলাম দিল্লীতে চিত্র-সমালোচকরা প্রথম দিন ছবি দেখতে পারেন নি। সাংবাদিকরা প্রবেশপত্র পান নি। কলকাতায়ও চিত্র-সমালোচকরা সকলে সমানভাবে প্রবেশপত্র পান নি। একটা প্রবেশপত্র সংগ্রহের জন্য তাঁদের অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। চিত্র-সমালোচকদের জন্য মাত্র সাতটি ছবি দেখাবার ব্যবস্থা হয়েছে। তাও পি-আই-বি'র কর্মকর্তা ঠিক করেছেন কোন ছবি দেখাবেন। প্রায় চল্লিশটি ছবির মধ্যে তাঁরা সাতটি ছবি দেখেই সন্তুষ্ট থাকবেন। তবে সাংবাদিকদের মধ্যে যাঁরা সৌভাগ্যবান তাঁরা নাকি আলাদাভাবে আরো তিনটি ছবি অতিরিক্ত দেখার সুযোগ পেয়েছেন।

কলকাতায় উৎসবের আয়োজন একটা বিশৃঙ্খল ব্যাপার। তাই বিদেশী প্রতিনিধিদের দমদম বিমানবন্দরে স্বাগত জানাবার জন্য মাত্র দুজন চিত্রতারকাকে দেখা গেছে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে লাইট হাউস সিনেমায় ৪।৫ জনের বেশি চলচ্চিত্র-শিল্পীকে দেখা যায় নি। বাংলা চলচ্চিত্র বলতে যাঁদের নাম সর্বাগ্রে মনে আসে সেরূপ তারকারা কেউ উপস্থিত ছিলেন না। এমন কি যে পাঁচজন অভিনেত্রী পুরস্কার পেয়েছেন, তাঁদেরও এই অনুষ্ঠানে দেখা যায় নি। সম্ভবত এঁরা কেউ আমন্ত্রণপত্র পান নি। স্বভাবতই প্রশ্ন আসে এই উৎসব কাদের জন্য?

যদিও ভারতে ইতিপূর্বে দুবার আন্তর্জাতিক উৎসব হয়েছে, এবং পরিচালনার অভিজ্ঞতা রয়েছে, কিন্তু এবারের কর্মকর্তারা সেই অভিজ্ঞতা গ্রহণ করেন নি। উৎসবের প্রধান কর্মকর্তা শ্রীভগৎ কলকাতায় সাংবাদিকদের সঙ্গে যে আলোচনা করেছিলেন, তার অধিকাংশ সময় কেটেছে—যে সব অভিনেত্রী বিদেশ থেকে আসছেন তাঁদের মধ্যে কে সুন্দরী আর কার কত বয়স এ-রকম রসাল আলোচনায়। সুতরাং উৎসব তাঁর কাছে যে একটা ফূর্তির ব্যাপার মাত্র, একথা সেদিনই বোঝা গিয়েছিল। তার সঙ্গে জুটেছে কয়েকজন ঠিকাদারী মনোবৃত্তির লোক—যারা সাংবাদিকদের প্রবেশপত্র থেকে আরো নানা বিষয়ে গায়ে পড়ে দায়িত্ব নিয়ে এ-সুযোগে নিজেদের জন্য গুছিয়ে নিয়েছে। এত নৈরাজ্যের মধ্যে যেটুকু সাফল্য হয়েছে তার জন্য পি-আই-বি অফিসের কয়েকজন নবীন কর্মীর পরিশ্রম অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। —সুমন।

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের পুরস্কার ঘোষণা

ভারতে তৃতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব নয়াদিল্লীতে সম্পন্ন হয়েছে। বিচারকমণ্ডলী পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। বিভিন্ন দেশের ন'জন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র-সমালোচক ও চলচ্চিত্রস্রষ্টাদের নিয়ে এক বিচারক-মণ্ডলী গঠিত হয়েছিল। বিচারক-মণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন শ্রীসত্যজিৎ রায়। স্বল্পদৈর্ঘ্য চিত্রের জন্য পাঁচ-জনের আলাদা বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন জে এস ভাটনাগেরী।

সিংহলের লেস্টার জেমস পেরীজ পরিচালিত 'গামপেরালিয়া' শ্রেষ্ঠ চিত্র বিবেচিত হয়ে গ্রাণ্ড প্রিক্স পুরস্কার স্বর্ণময়ূর লাভ করেছে। ১৮টি দেশের ১৯টি ছবি প্রতিযোগিতায় ছিল।

স্বল্পদৈর্ঘ্য চিত্রে কিউবার সাইক্লোন শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়ে স্বর্ণময়ূর লাভ করেছে। ২৩টি দেশের ২৮টি স্বল্পদৈর্ঘ ছবি প্রতিযোগিতায় ছিল।

বাংলা ছবি তপন সিংহের 'নির্জন সৈকতে'র অভিনেত্রীরা—শর্মিলা ঠাকুর, রুমা গুহঠাকুরতা, ছায়াদেবী, ভারতীদেবী এবং রেণুকা রায় শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সম্মান রৌপ্যময়ূর লাভ করেছেন।

● শর্মিলা ঠাকুর

● রুমা গুহঠাকুরতা

শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মান রৌপ্য-ময়ূর পেয়েছেন সোভিয়েট ইউনিয়নের ইয়েভগানি লিওনভ 'টেল অব দি ডন' ছবিতে অভিনয়ের জন্য।

বিশেষ জুরী পুরস্কার ব্রোঞ্জময়ূর পেয়েছে ইতালীয় ছবি 'ইয়ং নান'। এই ছবি পরিচালনা করেছেন ব্রুনো পাওলিনেলি। এই ছবির অভিনেত্রী লোরা ইফ্রিকিয়ান বিশেষ প্রশংসা লাভ করেছেন।

কৃতিত্বপূর্ণ রঙিন ফটোগ্রাফির জন্য চেকোশ্লোভাক ছবি 'জানোসিক' ব্রোঞ্জময়ূর লাভ করেছে। চিত্র গ্রহণ করেছেন ভ্লাডিমির জেসিনা।

জুরীরা জাপানী ছবি 'কুড আই বাট লিভ' ছবির বিশেষ প্রশংসা করেছেন।

ক্যালকাটা সিনে ক্লাবের বেঙ্গল টাইগার পুরস্কার পেয়েছেন এস স্থকদেও—তাঁর 'এণ্ড মাইলস টু গো' স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবির জন্য।

পোল্যাণ্ডের 'দি ম্যাচার' ছবিটি ব্রোঞ্জময়ূর পেয়েছে মানবিক মূল্য ও কলাকৌশলের জন্য।

কানাডার 'কেনন' ছবিটি নতুনত্ব ও চাতুর্যের জন্য ব্রোঞ্জময়ূর পেয়েছে।

শ্রেষ্ঠ ছবি গামপেরালিয়া

সিংহলের মার্টিন বিক্রমসিঙ্গীর জনপ্রিয় উপন্যাস অবলম্বনে চিত্র-নাট্য লিখেছেন রেগী সিরিবর্ধন। প্রযোজনা করেছেন এণ্টন বিক্রমসিঙ্গী। পরিচালনা—লেস্টার জে পেরীজ। চিত্র গ্রহণ—উইলি ব্ল্যাক। সম্পাদনা—সুমিত্রা গুণবর্ধন। সঙ্গীত—অমর দেব। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছেন—পুণ্যা হিন্দেনিয়া, হেনরী জয়সেনা, গামিনী ফনসেক, ত্রিলিসিয়া গুণ-বর্ধন, শান্তিলেখা, ডেভিড ধর্মকীর্তি।

'গামপেরালিয়া' পা রি বা রি ক ও ব্যক্তিগত সম্পর্ককে ভিত্তি করে কাহিনী গড়ে উঠেছে। সমাজব্যবস্থা কি ভাবে দেশের পরিবর্তনের মুখে ক্ষয় হচ্ছে, দক্ষিণ সিংহলের এক মধ্যবিত্ত পরিবারকে কেন্দ্র করে তারই প্রতিচ্ছবি দেখা গেছে এই ছবিতে। গ্রামের প্রধানের কন্যা নন্দা ভাল-বেসেছিল স্কুলের শিক্ষক পিয়ালকে। কিন্তু নন্দার মা-বাবা তাকে সামাজিক ভাবে সমমর্যাদার ঘরের ছেলে মনে করে না, তাই মেয়ের বিয়ে দিল সমান ঘরের জিনদাসের সঙ্গে। যদিও মা-বাবার ইচ্ছায় এই বিয়ে হয়েছিল, যেমন প্রাচ্যদেশের হয়ে থাকে, কিন্তু বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এক মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জিনদাসের বাস্তববুদ্ধির অভাবে এবং নন্দার বাবার আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ায় বিয়ে ভেঙে যায়। জিনদাস ভাগ্যান্বেষণে দেশ ত্যাগ করে এবং ব্যর্থ হয়ে আর ফিরে আসে না।

এদিকে পিয়াল নিজের ভাগ্য ফিরিয়েছে, ব্যবসায়ে সে কৃতকার্য হয়েছে। জিনদাসের মৃত্যুর একবছর পরে সে নন্দাকে বিয়ে করে। কিন্তু নন্দার পূর্বস্বামীর স্মৃতি তাদের দুজনারই মনের ওপর আধিপত্য করছিল।

প্রযোজক ও পরিচালক

১৯৬২ সালে 'গামপেরালিয়া' ছবিটির নির্মাণপর্ব সুরু হয়েছে।

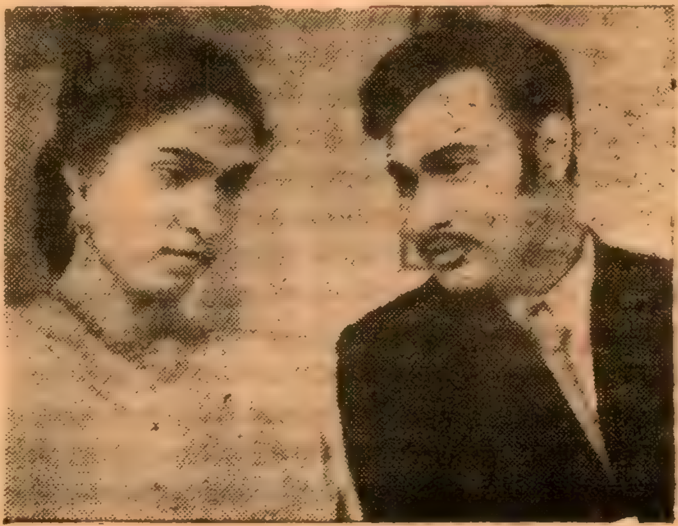

● সিংহলের 'গামপেরালিয়া' ছবির একটি দৃশ্য

এই ছবিটি মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছিল এবং বিচারক-মণ্ডলীর প্রশংসা লাভ করেছে। এই ছবিটি এযাবৎ ১২টি দেশের প্রশংসা লাভ করেছে। ছবির প্রযোজক এণ্টন বিক্রমসিঙ্গী একজন চা ব্যবসায়ী। কিন্তু ছোটকাল থেকে তিনি সঙ্গীতে উৎসাহী, শিল্পকলার একজন পৃষ্ঠপোষক। এখনও তিনি সিংহল ফিলারমোনিক অর্কেস্ট্রার সঙ্গে যুক্ত আছেন।

লেস্টার জেমস পেরীজ এবং আইভান পেরীজ দুই ভাই। দুই ভাই ইংল্যাণ্ড গিয়েছিল। আইভান চিত্রাঙ্কন বিদ্যাশিক্ষা করেছিল, লেস্টার প্রামাণ্য-চলচ্চিত্র নির্মাণে উৎসাহী হয়েছিল, কিছুদিন লেস্টার বৃটিশ ফিল্ম প্রোডাকসন্সে কাজ করে। দেশে ফিরে এসে 'রেকেওয়া' ছবিটি নির্মাণ করে; ঠিক সে সময়ে আমাদের দেশে সত্যজিৎ রায় 'পথের পাঁচালী'

● ইতালীর 'ইয়ং নান' ছবিতে লোরা ইফ্রিকিয়ান'

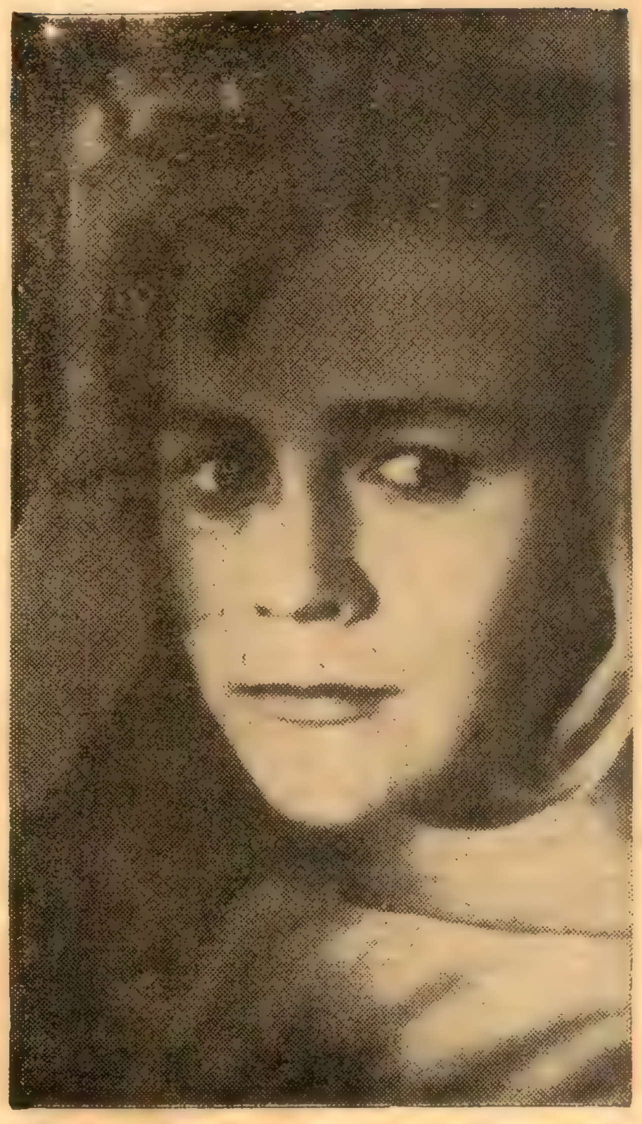

● 'ওয়েডিং সুইডিশ স্টাইল' ছবিতে ক্রিশ্চিনা শ্চোলিন

করেছেন। লেস্টার ছবিটিকে লণ্ডনে নিয়ে যায় এবং কনটেম্পোরারি ফিল্ম এই ছবিটি পরিবেশনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এরূপ ছবি আর্ট চিত্রের পর্যায়ভুক্ত, এতে প্রযোজকের ঘরে পয়সা আসে না। তা সত্ত্বেও এণ্টন বিক্রমসিঙ্গী উৎসাহী। তিনি বলেন, পয়সা না পেলেও এরূপ ছবিতে আমি সন্তোষ লাভ করি। অবশ্য 'গামপেরালিয়া' আর্থিক দিক থেকেও খুবই সাফল্য লাভ করেছে। তবে এণ্টন বিক্রমসিঙ্গীর মত প্রযোজক না পেলে লেস্টারের ভাগ্যে কি ছিল কে জানে।

'গামপেরালিয়া' নির্মাণের সঙ্গে একটা রোমাণ্টিক ঘটনা জড়িত রয়েছে। ছবিটি নির্মাণের সময় পরিচালক লেস্টার পেরীজের সঙ্গে সম্পাদক সুমিত্রা গুণবর্ধনের বন্ধুত্ব হয়। ছবি শেষ হবার পর তাঁদের বিয়ে হয়, এখন এণ্টনেরই একটা বাড়িতে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী সুখে বাস করছেন। গামপেরালিয়ার সম্পাদক সুমিত্রা যেমন নামে—তেমনি দেখতেও সুন্দরী।

সব দিক থেকে লেস্টার জেমস পেরীজের জীবনে 'গামপেরালিয়া' সৌভাগ্যের প্রতীক। ভারতে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে এই ছবির শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভে এন্টনের শিল্পকলার প্রতি প্রীতি সার্থক হলো; সিংহলের চলচ্চিত্র প্রেরণা লাভ করলো।

দি ইয়ং নান
(ইতালী)

জুরীদের বিশেষ পুরস্কার প্রাপ্ত ইতালীয় ছবি 'ইয়ং নান' পরিচালনা করেছেন ব্রুনো পাওলিনেলি। চিত্রধারক—এরিকো মেনজের। প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন—লোরা ইফ্রিকিয়ান এবং জোনাথন ইলিওট।

প্রায় চল্লিশ বছর বয়সের এন্টোনিওর জীবনে শান্তি ছিল না। তার জীবন ছিল বিশৃঙ্খল। ঘটনাক্রমে তার সাথে এক তরুণী যাজিকার দেখা হয়। এই সাক্ষাতে তার জীবনে পরিবর্তন সুরু হয়। যাজিকার শান্ত ব্যবহার, নম্র চাহনি, নীরব সঙ্গ থেকে তাদের মধ্যে এমন প্রেম সৃষ্টি হয়, যে পবিত্র প্রেমের কথা এন্টোনিও ভাবতেই পারে নি।

এই পবিত্র প্রেম এন্টোনিওর মত বিলাসী লোককে পরিবর্তিত করে দেয়, সে তার তথাকথিত সুখের জগৎ থেকে বিদায় গ্রহণ করে। তরুণী যাজিকা সেরেনার ভালবাসা তাকে প্রকৃত সুখের সন্ধান দেয়। এই প্রেমের গভীরতায় এন্টোনিও বুঝতে পারে তার পূর্বেকার সঙ্গ ও তাদের জগৎ থেকে তাকে সম্পূর্ণভাবে সরে আসতে হবে, নতুবা সেরেনার ভালবাসার প্রতি অমর্যাদা করা হবে।

কিন্তু পারিপার্শ্বিক জগৎ, তার আগেকার সঙ্গীরা সেরেনার পবিত্র ভালবাসা থেকে তাকে টেনে নামাতে চায়। বিশেষ করে আনা তাকে ভালবাসতো। সে তার দাবি নিয়ে উপস্থিত হয়। আনার জন্য এন্টোনিওর করুণা থেকে সৃষ্টি হয় এক অদ্ভুত নাটকীয় পরিবেশ। এন্টোনিও যদিও নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য চেষ্টা করে, কিন্তু তার মধ্যেকার ইতস্তত ভাবটা সেরেনার মনে আঘাত দেয়। সে দূরে চলে যায়। এন্টোনিও তাকে অনুসরণ করে, তার পবিত্র ভালবাসার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে।

লাইট হাউস সিনেমায় চলচ্চিত্র সপ্তাহ উদ্বোধন

গত ২২শে জানুয়ারী লাইট হাউস সিনেমায় চলচ্চিত্র সপ্তাহ উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী পি সি সেন। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, কয়েকবছর পূর্বে যা কেবল সখের ব্যাপার ছিল, আজ তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হয়ে উঠেছে। কলকাতার একদল তরুণ বাংলা চলচ্চিত্রকে সঞ্জীবিত করেছে। যার জন্য বাংলা ছবি আজ বিশ্বের দরবারে বিশেষ সম্মান লাভ করেছে। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু সভাপতিত্ব করেন। তিনি বিশ্বের শান্তি সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠায় চলচ্চিত্রের ভূমিকা উল্লেখ করে, চলচ্চিত্রের আরো বিকাশ কামনা করেন। ফিল্ম ফেডারেশনের সভাপতি শ্রীঅজিত বসু অভ্যাগতদের স্বাগত জানিয়ে ভাষণ দেন।

অনুষ্ঠানে বিদেশী অতিথিদের

দিল্লীতে ডিলাইট থিয়েটারে আমেরিকার চলচ্চিত্র প্রতিনিধিগণ

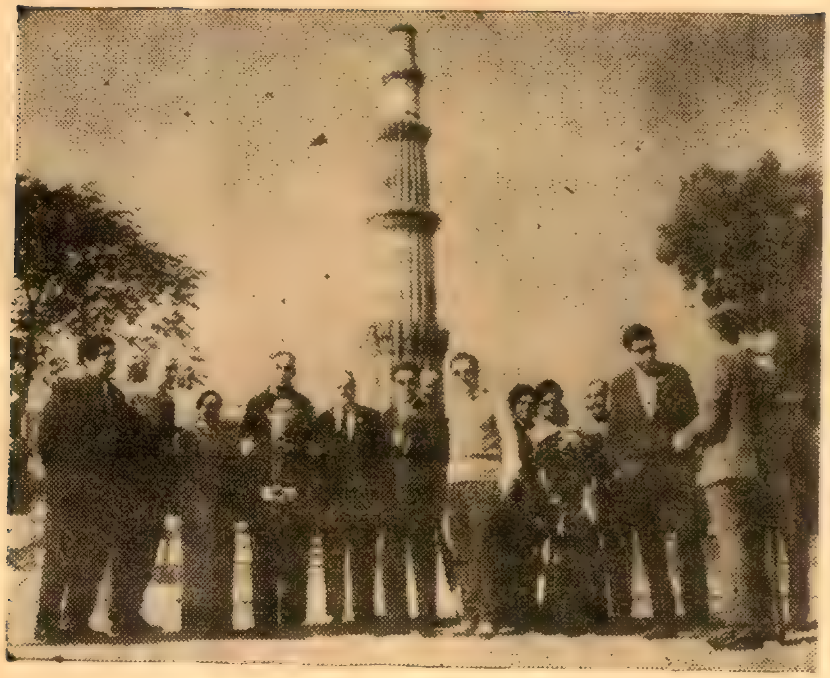

● দিল্লীতে কুতুবমিনারের সামনে চলচ্চিত্র প্রতিনিধিগণ

মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মিঃ ই কে ডিমিট্রভ (বুলগেরিয়া), মিঃ ডি ডি গৌরী (কানাডা), মিঃ জি ফনসেকা ও মিঃ মুরলীধরণ (সিংহল), মিঃ ডিট্রিক (চেকোশ্লোভাকিয়া), মিঃ এ বেনসিমন (ফ্রান্স), মিঃ ফ্রাঙ্ক বায়ার (পূর্ব জার্মানী), মিঃ মিসি ড্রাগেন (রুমানিয়া), মিঃ ইমাদ হামদি (সংযুক্ত আরব), মিস এডিথ লোরী (আমেরিকা), মিঃ এন মইরামভ, মিস এল এ চুরসিনা, মিঃ কেতিন (সোভিয়েট ইউনিয়ন), মিস মারিসিটন (বৃটেন), মিঃ তেরকোই (সিরিয়া), মিঃ ডি স্টাভিক (যুগোশ্লাভিয়া), মিঃ এস ওকুডাইরা (জাপান)। এই অতিথিদের পরিচয় দান করেন অভিনেতা শ্রীপাহাড়ী সান্যাল।

উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষে হংকং-এর ছবি 'লাভার্স রক' প্রদর্শিত হয়।

২২শে জানুয়ারী সকালে দমদম বিমানবন্দরে প্রতিনিধিগণ পৌছলে তাঁদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। কলকাতার চলচ্চিত্র-শিল্পীদের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন বসন্ত চৌধুরী, ললিতা চ্যাটার্জী ও অঞ্জনা ভৌমিক।

চিত্র আলোচনা

আলোর পিপাসা

(ডি আর প্রোডাকসনস : প্রযোজনা দেবেশ ঘোষ)

অন্ধকার জীবন থেকে আলোর পথে বেরিয়ে আসার আকুতি, সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার বাসনা এবং মাতৃত্বের কামনা নিয়ে রোশন বাই চেয়েছিল বাঁচতে। কিন্তু নিয়তি তাকে টেনে নিয়ে গেছে আবার সেই পঙ্কিল পরিবেশে। সেখানে তার কাজ কেবল বিলাসী পুরুষের বিলাস চরিতার্থ করা। পুরুষের লাম্পট্যের ইন্ধনরূপে সে দিনে দিনে ক্ষয় করেছে তার জীবনকে। এক সমাজ-উপেক্ষিতা নারীর ক্ষয়ে-যাওয়া দিনগুলিকে নিয়ে আলোর পিপাসার চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে। এই চিত্রনাট্যের অবলম্বন বনফুলের অগ্নীশ্বর উপন্যাস। ছবিটি পরিচালনা করেছেন তরুণ মজুমদার।

তরুণ মজুমদার চিত্র পরিচালক রূপে ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। বয়সে তরুণ হলেও—ছবির বক্তব্য মানবিক আবেদনের সাথে দর্শক মনোরঞ্জনের দৃষ্টিভঙ্গীতে তাঁর ছবি সাফল্য লাভ করে। এই ছবি এদিক থেকে আরো সাফল্য লাভ করেছে। রোশন বাঈ পেশায় বাঈজী। গঙ্গাস্নানে এক ব্রাহ্মণ যুবককে দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। নিজের জীবনযাপন-পদ্ধতির প্রতি বিতৃষ্ণা আর ছোট একটি সংসারের ঘরণী হবার বাসনায় সে নিজের

● সংযুক্ত আরবের 'ব্রাইড হ্যাজ এ মাদার' ছবির দৃশ্য

পরিচয় গোপন করে ব্রাহ্মণের কাছে এসে আশ্রয় লাভ করে। অতীত জীবনের অর্থসম্পদ ও গ্লানি ত্যাগ করে এই শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণের পতিব্রতা স্ত্রী সরমা রূপে সে নতুন করে জীবন গড়ে তোলে। তার যখন মাতৃত্বের সম্ভাবনা উপস্থিত, এমন সময় অতীত জীবনের প্রেতচ্ছায়া এসে তার সমস্ত ব্রত ভেঙে দেয়। সংস্কারবশে স্বামী তাকে ত্যাগ করে। সোহনলাল তাকে নামিয়ে আনে আবার সেই ক্লেদাক্ত জীবনে।

কিন্তু সে তখন মা হয়েছে। নিজের সন্তানকে এই ক্লেদাক্ত পরিবেশ থেকে বাঁচাতে, আর সে যে বাঈজীর সন্তান নয়, এক শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণের সন্তান সেকথা জানাতে চায়। এইখানেই কাহিনীর নাটকীয় মুহূর্ত ও সংঘাত। সন্তান বড় হবে, মানুষ হবে---কিন্তু জানবে না তার সত্যিকার মা কে। মা সন্তানের মানুষ হবার পথে সমস্ত বাধা দূর করে দেবে, অন্তরাল থেকে দেখবে তার বিকাশ, কিন্তু মায়ের দাবি নিয়ে তার কাছে যাবে না। প্রদীপের শিখার মত সে জলবে, আলো বিকিরণ করবে কিন্তু নিজে তিলে তিলে ক্ষয় হয়ে যাবে।

ছাত্রদের অপরিহার্য্য গ্রন্থ
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

পালামৌ

---ইহাতে আছে---

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রচিত সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী—সঞ্জীবনী-সুধা, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'পালামৌ সমালোচনা' এবং সমালোচক-শ্রেষ্ঠ চন্দ্রনাথ বসুর সঞ্জীব-সাহিত্য সমালোচনা। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ কর্ত্তৃক দ্রুতপঠন গ্রন্থরূপে নির্ব্বাচিত।

দাম এক টাকা।

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

● ভারতীয় প্রতিযোগী চিত্র 'হকিকৎ'-এর একটি দৃশ্য

বিলাসী পুরুষকে আনন্দ দান—তাদের মুখে হাসি ফোটানো তার পেশা। তাদের আনন্দের জন্য তারও মুখে হাসি। কিন্তু সে হাসির অন্তরালে গভীর কান্না। সেই প্রদীপের পেছনে জমা হয়ে আছে গভীর কান্না। বাইরে থেকে মানুষ এই হাসি ও আলোর রোশনাই দেখে, কিন্তু জমাট অন্ধকার ও চাপা কান্না শোনে না।

বাইজী রোশন বাইয়ের অন্তরে লুকোনো সরমার কথা আমরা শুনেছি এক বৃদ্ধ চিকিৎসকের মুখে। যাকে বিশ্বাস করে সে সমস্ত কথা বলেছিল, এবং মৃত্যুর পূর্বে সন্তানের জন্য নিজের অলঙ্কার গচ্ছিত রেখে গিয়েছিল। সন্তান মানুষ হয়েছিল রোশন বাইর ত্যাগে, কিন্তু মা চিরদিনের জন্য তার কাছে অন্ধকারে রয়ে গেল। এখানেই ট্র্যাজেডি।

এরূপ কাহিনীচিত্রণ নতুন নয়। ইতিপূর্বে সব দেশে, সব ভাষায় এরূপ মানবিক আবেদনসম্পন্ন চিত্র নির্মিত হয়েছে। এখানে পরিচালক এই কাহিনীকে নৃত্য, গীত এবং কালিদাসের শ্লোকে আরো রসাশ্রিত করেছেন। উর্দু গানগুলি সুরচিত ও সুগীত। তাতে সাধারণ দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয় হয়েছে।

তবে কাহিনীবিন্যাসে তেমন কোন নতুনত্ব ও বৈশিষ্ট্যের ছাপ রাখতে পারেন নি। উপরন্তু সংলাপের কিছু আধিক্য ঘটেছে। তবে চিত্রধারক সৌমেন্দু রায় পরিচালকের কল্পনাকে অত্যন্ত সুন্দর ও প্রশংসনীয়ভাবে স্থানে স্থানে প্রকাশ করেছেন। আলোকচিত্রের এই বাহাদুরী দর্শকরা উপলব্ধি করবেন। সম্পাদনায় দুলাল দত্ত কৃতিত্বের সাথে কাজ করেছেন। তবে চিত্রনাট্য যে স্থানে স্থানে বিশ্বাস্য পরিবেশ ও সীমা লঙ্ঘন করেছে সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

অভিনয়ে সন্ধ্যা রায় রোশন বাই ও সরমাকে যথার্থভাবে প্রকাশ করেছেন। সদাচারী ও সংস্কারগ্রস্ত ব্রাহ্মণরূপে বসন্ত চৌধুরী যোগ্যভাবে চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। সোহনলালের ভূমিকায় অনুপকুমার দর্শকদের বিরক্তি উৎপাদন করে শিল্পী হিসাবে নিজের অভিনয় ক্ষমতা প্রকাশ করেছেন। বৃদ্ধ ডাক্তারের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন পাহাড়ী সান্যাল। অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন—জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতবরণ, অনুভা গুপ্তা, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, আশা দেবী, শ্রীমান সুব্রত প্রমুখ।

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

ইংরাজী কবিতার আকৃতি, গঠন এবং প্রকৃতি বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে যে নতুন ধারায় বইছে তার জন্য প্রধানত দায়ী এজরা পাউণ্ড এবং টি এস এলিয়ট। রোমাণ্টিক পিরিয়ডে একসঙ্গে অনেক বড় কবির আবির্ভাব হয়েছিল ইংল্যাণ্ডে—তারপরে ঠিক প্রথম শ্রেণীর কবি বলতে মাত্র দুজনকে পাওয়া গিয়েছিল—টেনিসন এবং ব্রাউনিং। বিংশ শতাব্দীতে আবার একই সময়ে পাওয়া গেল অনেককে—পাউণ্ড, এলিয়ট, অডেন, ইশারউড, স্নাই, স্পেণ্ডার প্রমুখ।

গত এই জুন আধুনিক ইংরাজ কবিদের অন্যতম দিকপাল টি এস এলিয়ট ইহলোক ত্যাগ করে চলে গেলেন।

কবি হিসাবে পাউণ্ডকে খুব উচ্চস্থান দিয়ে গেছেন স্বয়ং এলিয়ট। পাউণ্ডের কবিতা সাধারণ পাঠকের পক্ষে সহজবোধ্য নয়। আধুনিক যুগের কবিদের ভেতর এলিয়টের কবিতাই অপেক্ষাকৃত সহজ এবং সাহিত্যানুরাগীদের কাছে সবচেয়ে প্রিয়। তাঁর নাটকের (কাব্যনাট্য) তো তুলনাই হয় না। ইংলণ্ডে কাব্যনাট্যের নবযুগের প্রবর্তক মার্টিন ব্রাউন বলেছেন যে, ইংলণ্ডে এলিজাবিথান যুগটাই ছিল কাব্যনাট্যের স্বর্ণযুগ—কিন্তু সেই যুগের ঠিক পরেই কাব্যনাট্যের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি একমাত্র আধুনিক যুগেই হয়েছে—আর এ যুগের শ্রেষ্ঠ কাব্যনাট্যকার হচ্ছেন টি এস এলিয়ট।

আধুনিক যুগের প্রবন্ধকারদের মধ্যেও এলিয়ট নিজের জন্য একটি বিশিষ্ট স্থান করে নিয়েছেন।

টি এস এলিয়টের জন্ম হয় আমেরিকাতে ১৮৮৮-তে। শিক্ষা—হারভার্ড, সরবোন ও অক্সফোর্ডের মার্টন কলেজে। ১৯২৭ সালে তিনি বৃটিশ সিটিজ্যানশিপ নেন এবং জীবনের বেশির ভাগ সময়টাই ইংলণ্ডে কাটান। ধর্ম, রাষ্ট্রনীতি ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি নিজেকে রক্ষণশীল এবং প্রাচীন সংস্কৃতির পুরুষানুক্রমিক ধারাবাহক হিসাবেই প্রচার করতেন।

তাঁর কাব্য-প্রতিভার স্ফুরণে ফরাসী সাঙ্কেতিক কবিদের, জয়েসের ইউলিসিসের এবং এজরা পাউণ্ডের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

সাহিত্যে তুলনামূলক অধ্যয়নে অনেক সময়েই অর্থবোধ ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে ওঠে। ১৯৪৮ সালে রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাটক নিয়ে আমি কিছু কাজ করছিলাম। এই বিষয়ে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন—ইয়েটসের Ideas of Good and Evil বইটি বারবার করে পড়তে বলতেন। নিজের লাইব্রেরী থেকে জার্মান নাট্যকার হাউপ্টম্যানের তিনটি সাঙ্কেতিক নাটক আমাকে পড়তে দেন—The Sunken Bell, Hannele ও Henry of Aue—হানেলের সঙ্গে ডাকঘরের কোথায় যেন একটা মিল আছে এ নিয়েও তাঁর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। তা ছাড়া শিশিরবাবু রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী প্রভৃতি নাটক আমাকে পড়ে শোনাতেন—এই রিডিং-এ বহু দুর্বোধ্য জায়গা স্পষ্ট এবং সহজ হয়ে যেত। একদিন শিশিরকুমার পড়ছিলেন—

নেপথ্যে

রাজা—বুঝাতে পারবে না। আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি—তোমার মতো একটি ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি—আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত। তৃষ্ণার দাহে এই মরুটা কত উর্বর ভূমিকে লেহন করে নিয়েছে, তাতে মরুর পরিসরই বাড়ছে, ওই একটুখানি দুর্বল ঘাসের মধ্যে যে প্রাণ আছে তাকে আপন করতে পারছে না।

শিশিরকুমারের রিডিং-এ এমন একটা শুষ্ক এবং রিক্তভাবের অনুরণন সৃষ্টি হচ্ছিল যে সঙ্গে সঙ্গে আমার কানে বেজে উঠল এলিয়টের The Waste Land-এর এই লাইনগুলি—

Here is no water but only rock
Rock and no water and the
sandy road
The road winding above
among mountains
Which are mountains of rock
without water.

শিশিরবাবুকে এ-ব্যাপারটা বলাতে অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে উত্তর দিলেন—এদিক দিয়ে খানিকটা রিসার্চ করে দেখতে পার—একটা নতুন দিক খুলে যাবে। সত্যিই দেখলাম এলিয়টের ওয়েস্ট ল্যাণ্ড ও রক্তকরবী পাশাপাশি রেখে পড়ে, যে উভয় ক্ষেত্রেই রচয়িতারা যেন বলতে একই সত্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। বলতে চেয়েছেন যে, একালের আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততায় পৃথিবী আজ সর্বনাশের পথে, ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে—মানুষ আজ আত্মবিস্মৃত, নির্জীব ও বিশেষত্ববর্জিত।

Eliot's death-haunted imagination saw human beings as bones, the contemporary scene as a waste land, a rocky barrenness and nothing but a miracle, a sudden shower from above could save humanity.

যক্ষপুরীতে নন্দিনীর আবির্ভাব এই miracle-এরই মত। ওখানকার মানুষদের পক্ষে—সেই তো এই 'a sudden shower from above'; তারই প্রাণশক্তির প্রভাব জীবন্মৃত যক্ষপুরবাসীদের জন্য বহন করে এনেছে মৃতসঞ্জীবনী সুধা।

● টি এস এলিয়ট

এলিয়টের নাটক পড়তে খুবই ভাল লাগত। যুদ্ধোত্তর যুগে 'মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্র্যালে'র মঞ্চসাফল্য কাব্য-নাট্যের ইতিহাসে একটা স্মরণীয় ঘটনা। এরই অনুপ্রেরণায় তখনকার যুবক কবির দল উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন কবিতায় নাটক লিখতে। আর তারই ফলে আজ বিংশ শতাব্দীর ইংরাজী কাব্যনাট্য একটা সত্যিকার সার্থক রূপ নিতে পেরেছে। মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্র্যাল নাটকটি প্রথমে ক্যাণ্টারব্যারীতে এবং পরে লণ্ডনের মার্কারী থিয়েটারে (এখানে ১৫০টি বসবার জায়গা ছিল) অদ্ভুত সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। এলিয়টের প্রায় বেশির ভাগ নাটকেরই প্রথম প্রযোজক মার্টিন ব্রাউন। অনেক সমালোচকের মতে এটিই এলিয়টের সবচেয়ে সেরা নাটক। আমি কিন্তু এর পরের নাটক দি ফ্যামিলি রি-ইউনিয়নকেই এলিয়টের সব থেকে ভাল নাটক বলে মনে করি। নায়কের কথাবার্তায় মাঝে মাঝে যেন হ্যামলেটের স্বগতোক্তির প্রতিধ্বনি পাই। যেমন হ্যারি যখন বলছেন:

It is not my conscience,
Not my mind, that is diseased, but,
the world I have to live in.

হ্যামলেটের মতই হ্যারির মনও যেন সব সময়েই বিষাদে ভরা।

এরপর এলিয়ট দি ককটেল পার্টি নাটকটি রচনা করেন। ভার্বেল ইমেজারী বাদ দিয়ে নাট্যকার পাত্র-পাত্রীকে স্বাভাবিক বাস্তবজীবনের অনুকরণে কথাবার্তা বলিয়েছেন—যার ফলে হঠাৎ মনে হয় নাটকটি গদ্যে লেখা বাস্তব-ঘেঁষা রচনা। অবশ্য ইঙ্গিতে মানুষের জীবনে দৈবের বিরাট প্রভাবের কথাও সূক্ষ্মভাবে বুঝিয়ে দেবার একটা প্রচেষ্টা নজরে পড়ে। সেদিক দিয়ে সোফোক্লিসের ইডিপাসের সঙ্গে একটা সাদৃশ্য আছে ককটেল পার্টির।

অবজার্ভার পত্রিকার বিখ্যাত সমালোচক কেনেথ টাইনান বলেন—অনেকের মতে ককটেল পার্টি দুর্বোধ্য ও অস্পষ্ট নাটক—আমার কিন্তু এ নাটকটিকে সহজ এবং জটিলতাবর্জিত বলেই মনে হয়। অথচ সারা ইংলণ্ডে এলিয়টের পরের নাটক দি কন্‌ফিডেন-সিয়াল ক্লার্ককে 'অতি সহজবোধ্য' বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রেও আমার ধারণা সম্পূর্ণ বিপরীত—আমার মনে হয় এলিয়টের সমস্ত রচনার মধ্যে এটিই সবচেয়ে জটিল।

এল্ডার স্টেটসম্যান নাটকটিও খুবই উপভোগ্য। তবে এ নাটকটি পড়বার সময় সঙ্গে সঙ্গে 'ইডিপাস এ্যাট্ কলোনাসও' পাশাপাশি রেখে পড়লে দুটি নাটকের অন্তর্নিহিত সাদৃশ্যের দিকটা চোখে পড়বে।

(ক্রমশঃ)

অল্প পুঁজির ব্যবসা

দুলাল পাল

সেদিন রাস্তায় ল্যাংচার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, মানে ল্যাংচা আমাকে দেখে ফেলল। আমি বরাবরই ওকে দূর থেকে দেখে সট করে সরে পাড়, কিন্তু এবার হাতে রেশনের চাল-গম ভরা থলি দুটো থাকায় গতি তীব্র করতে পারলাম না এবং তার ফলে ধরা পড়লাম।

ল্যাংচা সখেদে আরম্ভ করল, 'তোরা বেশ আছিস। অফিস করিস—ইচ্ছেমত সবকিছু করতে পারিস।'

'অফিস বলিস নে, বল চাকরগিরি।' ওকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলাম।

'থাক্, তোর আর কথার ফুলঝুরি পোড়াতে হবে না।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ল্যাংচা, 'আজ পাঁচবছর যাবৎ ওই চাকরগিরির জন্য হন্যে কুকুরের মত সারাদেশ চষে-বেড়াচ্ছি।'

বুঝলাম, ওর দুঃখের রেকর্ড বাজতে শুরু করেছে। নিরুপায় হয়ে থলি দুটো একটা বাড়ির রকে রেখে দিয়ে বসলাম।

ল্যাংচা উৎসাহিত হয়ে উঠল, 'হাজার হোক, তুই তো আমার ক্লাসমেট—একটা আলাদা সম্পর্ক। যাক সেকথা।' ল্যাংচা খুব সম্ভবত স্কুল-জীবনের কথা ভাবল কিন্তু সেটা অপ্রাসঙ্গিক হবে বলে বাতিল করে দিল।

'সে একদিন গেছে রে ল্যাংচা।' সহানুভূতি প্রকাশ করলাম।

'যা গেছে তা গেছে—শোন এখন আমার দুঃখের কথা।' ল্যাংচা বাস্তব পন্থা ধরল, 'মই' ছিল বলে চট্ করে তোর একটা হিল্লে হয়ে গেল, কিন্তু আমি এখন 'না ঘরকা না ঘাটকা।'

চাকরি না হলেও ল্যাংচার কমিক-ভাব এখনো আছে, (স্কুলের পুরস্কার-বিতরণী সভায় কি হাসানো না হাসাতো।) খুব সম্ভবত চাকরি হয় নি বলে, 'যখন চার আনা করে কাগজের দিস্তে ছিল (এখন আট আনা) তখন দশ দিস্তে কাগজ কিনে রেখেছিলাম। কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখে সেই কাগজে আবেদন করতে করতে সেই ভাণ্ডারে টান ধরেছে। প্রথম প্রথম টাইপ করিয়ে আবেদন করতাম। পরে মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল—টাইপ স্কুলে ভর্তি হলাম। ফলে, টাইপ শেখাও হতে লাগল, আবার আবেদনপত্র টাইপ করার খরচও বাঁচল। কিন্তু কলসীর জল কতদিন গড়িয়ে খাব। বেঁচে থাকলে দাড়িগোঁফ লম্বা হয়, জামা-কাপড় ছিঁড়ে যায়, ময়লা হয়, মাঝে মাঝে ট্রামে-বাসে চড়তে হয়, মনটা বেজায় বিগড়ে গেলে নিরিবিলিতে ধূমপান করতে হয়, এজন্য টাইপ স্কুলের মাইনে বাকি পড়ল প্রায় মাস ছয়েকের। আর সেখানে যাওয়া চলে না; বর্তমানে হাতে লিখে আবেদন করি। আবেদন করি আর অবাক হয়ে যাই। কোন আবেদনের জবাব পাই না। একদিন কাগজে পড়লাম—পিয়নরা কাজ সংক্ষিপ্ত করার অভিপ্রায়ে চিঠিপত্র মা-গঙ্গাকে উৎসর্গ করে, বুঝতে পারলাম, মা-গঙ্গা আবেদনপত্র পাওয়ায় চাকরি হচ্ছে না, স্বর্গে গিয়ে একসঙ্গে অনেকগুলো চাকরি পাব। আপাতত মর্ত্যের একটা চাকরির জন্য আর পোস্ট অফিসের ওপর ভরসা করলাম না; নিজে গিয়ে কাম্য অফিসের লেটার বক্সে আবেদনপত্র দিয়ে আসি। এত করেও কিন্তু কোন

অফিস আমার নাম স্মরণ করে না—আমার শ্রীবদনখানি দেখানোর জন্য আদেশ করা তো দূরের কথা। ফলে, আমার মনে কেমন একটা খটকা লাগল। একদিন এক অফিসে গেলাম একটা আবেদনপত্রের হদিশ নিতে। কেরানীবাবুরা তো কোন কথার উত্তর সোজাসুজি দেন না। বাংলা ভাষা জানি কিনা সন্দেহ হল। প্রথম বাবু কলমের ডগা দিয়ে দ্বিতীয় বাবুকে দেখালেন, দ্বিতীয় বাবু চোখ ইসারায় তৃতীয় বাবুকে; তৃতীয় বাবু মহাব্যস্ত, তিনি কোনরকমে চতুর্থ বাবুর কথা বললেন। এইভাবে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল পরিভ্রমণ (বাড়িটা তিনতলা ছিল) করে, আবার প্রথম বাবুর কাছে এসে যখন দাঁড়ালাম, তখন তিনি মুখে একগাল পান দিয়ে জাবর কাটছেন। ডান হাতের তর্জনীতে একটু চুন, বাঁ হাতে একটা দেশলাই। খানিকক্ষণ বাদে উনি আমার বুক-পকেট থেকে একটা টিনের কৌটো বের করলেন, তার ভেতর অনেকগুলো বিড়ি শোগান ছিল। তাদের একটাকে বের করে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের নখে দু'তিনবার টোকা মেরে ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরে সেটার একপ্রান্ত জ্বালিয়ে দিলেন। তারপর চোখ বুজে মৌজ করে নাক দিয়ে, মুখ দিয়ে ধোঁয়া বের করতে লাগলেন।

কেরানী-দেবতার লীলা দেখতে দেখতে স্থান-কাল-পাত্র-উদ্দেশ্য সব ভুলে গেলাম।

ঘ্যাচ্ করে একটা আচমকা আওয়াজ হল—আমার তন্ময়তা কেটে গেল। কেরানীবাবু ডান হাত দিয়ে টেবিলের একটা ড্রয়ার টেনে একটা পরিষ্কার ঝকঝকে কাগজ বের করলেন। সেটা টেবিলের ওপর বিছিয়ে দিলেন, ডান হাতটা মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে দু-একবার আওয়াজ করে একটা দ্রব্য বের করে কাগজটার ওপর রাখলেন।

আমার চোখ ট্যারা হয়ে গেল। সেটা যে আমার আবেদনপত্র।'

এই পর্যন্ত বলে ল্যাংচা বিরতি ঘটাল। আমি ওর চরম দুঃখের গল্পটা শুনে বললাম, 'দ্যাখ ল্যাংচা, একটা কথা বলি, রাগ করিস নে।'

শান্তস্বরে ল্যাংচা বলল, 'রাগ জিনিসটা আমার দেহ ত্যাগ করেছে—যা খুশি বলতে পারিস্।'

'সব কিছুতে গুরুর দরকার।' বিজ্ঞের মত সুরু করলাম, 'যেমন ধর শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু, কর্মগুরু ইত্যাদি আরো অনেক রকমের।'

'কিন্তু পাচ্ছি কোথায়?' ল্যাংচা হতাশা প্রকাশ করল।

'আছে। আছে। না হলে তোকে কি কথাটা মিছিমিছি বললাম। আজকাল বেঁচে থাকতে গেলে গুরুর শরণ নেওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই।'

'তোর কাছে কি সেরকম কোন গুরুর ঠিকানা আছে?' ল্যাংচা আগ্রহী হল।

বরাভয় মুদ্রা দেখিয়ে ল্যাংচাকে আশ্বস্ত করলাম, 'চল, তোকে ভজহরি ভটের কাছে নিয়ে যাই।' তাঁর উদ্দেশ্যে নমস্কার করলাম, 'বড় জাগ্রত গুরু, এ যুগের কল্পতরু—তোর যাহোক একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

ল্যাংচা কি রকম ভড়কে গেল। হয়ত এত সহজে ওর চিরজীবনের একটা ব্যবস্থা হবে ভেবে। বেকার হয়ে থাকতে থাকতে ভড়কে যাওয়া অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। আমি বিপন্ন বোধ করলাম; অথচ আমি ভজহরি ভটের পদাঙ্কানুগমনকারী একান্ত দৃঢ় বিশ্বাসী ভক্ত। ল্যাংচাকে বললাম, 'দ্যাখ, আজকাল ভগবানে অবিশ্বাস করলেও চলে।' একটু থামলাম, ভজহরিতে তোর ভক্তি না থাকে ক্ষতি নেই, কিন্তু অবিশ্বাস করিস নে—আখেরে তোর ক্ষতি হবে।'

ল্যাংচা স্বাভাবিকভাবেই আমার কথায় রাজী হল।

ভজহরি ভটের উদ্দেশ্যে একদিন ভোর পাঁচটায় আমরা দুজন শুভযাত্রা করলাম।

ভজহরি ভট একফালি ত্রিপলের ওপর শয্যাগত ছিলেন। আমরা যেতেই উঠে বসলেন। পরনে একটা কালো হাফ প্যাণ্ট, গায়ে খাঁকি রঙের একটা ফুল সার্ট দিতে দিতে শুধালেন, 'কি প্রয়োজন?' ভজহরি ভট অত্যন্ত বাস্তববাদী।

আমি ল্যাংচার বেদনাময় জীবন-কাহিনী তাঁকে নিবেদন করলাম। উনি ল্যাংচার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চাকরি! ও নাম করতে লজ্জা করে না? পরের দাসত্ব করবে, তা আবার লোকের কাছে গর্ব করে বলা—আমার চাকরি হচ্ছে না। তোর ঠাকুরদা একথা বলার আগে পাঁচবার গলায় দড়ি দিত। ছি! ছি! ছি!'

চাকরির কথা শুনে ভজহরি ভটের মেজাজের তাপমাত্রা শূন্য থেকে একশো ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে উঠে গেল। আমি এটা জানতাম এবং এ সম্পর্কে ল্যাংচাকে পূর্বাভাষ দিয়েছিলাম।

'ব্যবসা করতে পারিস নে, ব্যবসা?' ভজহরি ভট খেঁকিয়ে উঠলেন।

'কি ব্যবসা করব, গুরুদেব?' ল্যাংচা কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করল।

'আরে ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়।' ভজহরি ভট একটু মোলায়েম হলেন, 'তোর বাপ কি কোটি টাকা রেখে গেছে যে বড় ব্যবসা ফেঁদে বসবি? টাটা বিড়লার সঙ্গে কম্পিটিশন করবি?—ব্যবসা করবি অল্প পুঁজিব।'

'ঠিক বলেছেন গুরুদেব। আমাদের পাড়ার পটল পোড়েল তেঁতুল বিচি বিক্রি করে দোতলা বাড়ি হাঁকাচ্ছে।' ভজহরি ভটকে আরো নরম করবার চেষ্টা করলাম।

'তুই চুপ কর ত ফটকে। দরকারী কথার সময় দিক করিস নে। একটা ছেলের লাইফ-এ্যাণ্ড ডেথের ব্যাপারে নাক গলাবি নে—একথা আগেও হাজার বার বলেছি।' ভজহরি ভট গম্ভীর হলেন।

'কি ধরণের ব্যবসা করতে

গুরুদেব আজ্ঞা করেন? ল্যাংচা নির্দিষ্ট পথের নিশানা চাইল।

'চল।' ভজহরি ভট্ট বিছানা(।) ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, 'চল তোকে রামপুরীষ ফোকটওয়ালার কাছে নিয়ে যাই। ছ'মাস আগে শিষ্য হয়েছিল। একেবারে জলন্ত উদাহরণ—দেখলেই বুঝতে পারবি।'

ল্যাংচা এতক্ষণে দীপ্ত হল। ভজহরি ভট্ট আমাদের নিয়ে রাস্তায় বেরোলেন।

খানিকক্ষণ বড় রাস্তা দিয়ে যাওয়ার পর একটা বস্তির ভেতরে ঢুকলাম। মেজাজটা বিগড়ে গেল। ল্যাংচার মুখটা শুকিয়ে গেল। ভজহরি ভট্ট নিঃশব্দে নিরাসক্তভাবে হেঁটে চলেছেন। মিনিট দশেক চলবার পর আমরা বিরাট একটা 'খোলার ঘরের' সামনে এসে দাঁড়ালাম। সেখানে চার-পাঁচজন লোক একমনে পাথর গুঁড়ো করছে, দুজন যাঁতা ঘুরোচ্ছে আর দুজন সেগুলো নানাভাগে ভাগ করে, ওজন করে বস্তায় ভরছে।

'গুরুজী, রাম রাম!' ঘরটার এককোণ থেকে শব্দটা কানে এল। দেখি দড়ির খাটিয়ায় বিশাল ভুঁড়িওয়ালা একটা লোক দু'পায়ে দাঁড়াবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। দূর থেকে লোকটাকে ব্যারেলের মত দেখাচ্ছে। আমরা তিনজন লোকটার দিকে এগিয়ে গেলাম।

ভজহরি ভট্ট বললেন, 'থাক, থাক! আর উঠতে হবে না। বড্ড মুটিয়ে গেছিস তো, পুনপুন। সকালে উঠে একটু দৌড়ঝাঁপ করিস।' তারপর আমাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'এই হল গিয়ে রামপুরীষ ফোকটওয়ালা—আদর করে ডাকি পুনপুন।' ল্যাংচাকে দেখিয়ে রামপুরীষের উদ্দেশ্যে বললেন, 'এর নাম ল্যাংচাসুন্দর লাহিড়ী, আজ সকালে তোর গুরুভাই হল। তোর কাছে ব্যবসা শিখবে বলে এসেছে।'

ফোকটওয়ালা আপ্রাণ চেষ্টায় মাজাটা ভাঁজ করে মাথা নোয়াল, তারপর মুখ থেকে আওয়াজ বেরোল, 'জো হুকুম গুরুজী!'

রামপুরীষ ল্যাংচার উদ্দেশ্যে বলতে সুরু করল। 'এ ল্যাংচাবাবু, ইসব জোকুছ দেখছেন, সব হামারা ই গুরুজীর দোয়ায় হইয়েছে। উদিকে জোসব আদমীলোক দেখছেন, উসব হামার লোক আছে।'

'ওরা কি করছে?' প্রশ্ন করলাম।

'পথর ভাঙছে।' রামপুরীষ নির্বিকারভাবে জবাব দিল, 'ই তো হামার বেওসার মাল বানানো হচ্ছে।'

'আপনার কিসের ব্যবসা?' ল্যাংচা আগ্রহী হল।

'কানকরের।'

চমকে উঠলাম দুজনেই, 'কাঁকর কি করেন?'

'লুকে খাবে?' সহজ উত্তর দিল রামপুরীষ।

'সে কি!' সমস্বরে বলে উঠলাম দুজনে।

'আরে বাবুজী, লুকে খাবে নাতো কৌন খাবে? গরু খাবে? ভইষে খাবে?' রামপুরীষ আমাদের অবোধ বালক ঠাওরাল।

'কি রকম?' ল্যাংচা উৎসুক হল।

উত্তরে রামপুরীষ ফোকটওয়ালা কর্মরত লোকগুলোর কাছে নিয়ে গেল।

'ইসব হোল কানকর।' ফোকট-ওয়ালার গলা ভেসে এল, 'এ ভি নানা পরকার আছে—সাদা কানকর, কালা কানকর, বড়া কানকর, ছোটা কানকর। দাম ভি হরেক কিসিমের।'

'কেমন?' জিজ্ঞাসা করলাম।

'এ বহুত সস্তা—দশ টাকা মণ আছে।'

'পড়তায় পোষায়?' ল্যাংচা শুধাল।

'কেনো পুষাবে না?—ও পথল জোলোক ভাঙছে, ওলোক, পথল যুগাড় করবে; ভাঙবে; আউর পাঁচমণ ভাঙবে তো হামি ওদের একমণ চাউল দিব। হামার কোন খেতি হোবে না।'

'ওরা নিজেরা কেন এ কারবার করে না?' ল্যাংচা স্বাভাবিক প্রশ্নটা করল।

'কোরবে কি কোরে? উ উল্লুদের চিনে কৌন?'

'পাথর যোগাড় করে কোথা থেকে? কলকাতায় তো পাহাড় নেই।' আমি প্যাঁচ মারবার চেষ্টা করলাম।

'রেললাইন আছে, কোরপোরেশনকা সড়ক আছে; আউর সে-রকম দরকার হোবে তো অর্ডার দিব।' ফোকট-ওয়ালা খোসমেজাজে জবাব দিল।

ল্যাংচা রস পেয়েছে দেখলাম, 'শেঠজী, আর কোন ব্যবসা করেন না?'

'করি, করি, জরুর করি; সে তো হামার আসলি বেওসা আছে। আউর ই হামার সাইড বিজনেস।'

'সেটা যদি দেখান।' ল্যাংচা বিনয় প্রকাশ করে অনুরোধ করল।

'আপনাকে জরুর দেখলাব—আপনি হামার গুরুভাই আছেন।'

রামপুরীষ ফোকটওয়ালা আমাদের একটা বড় আস্তাবলের কাছে নিয়ে গেল। ভজহরি ভট্ট সেখানে দাঁড়িয়ে কি সব দেখছিলেন।

রামপুরীষ ফোকটওয়ালা ব্যাকুল হয়ে পড়ল, 'গুরুজী আপ হিয়া পর! আপকা কেত্ত তকলীব হচ্ছে?'

ভজহরি ভট্ট বললেন, 'সে পরে হবে। ল্যাংচার কত দূর।'

রামপুরীষ আবার ল্যাংচার উদ্দেশ্যে সুরু করল, 'এ ল্যাংচাবাবু। ই-সব জোকুছ দেখছেন, হামার এ গুরুজীর দোয়ায় হইয়েছে। উদিকে জো ঘুড়া দিখছেন, উ-সব ঘুড়া নেহি আছে—উ এক একটা কারখানা আছে।'

আস্তাবলে পনেরো-ষোলটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকটার শরীর বেশ নাদুশ-নুদুশ—তেল গড়িয়ে পড়ছে গা থেকে। ঘোড়াগুলো ভোজনে ব্যস্ত, গুড় আর ছোলা খাচ্ছে।

আস্তে আস্তে ন্যাংচাকে বললাম, 'ওকে সামনে দেখে শেঠ বোধহয় ঘাবড়ে গিয়ে যা-তা বকছে।'

ন্যাংচা বিরক্ত হয়ে বলল, 'যা।'

আমি সন্দেহ নিরসন করবার জন্য জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার কারখানা কি এখানেই শেঠজী?'

'ইখানে নেই আছে তো কুথা আছে?' ফোকটওয়ালা বিস্ময় প্রকাশ করল। 'তোবে হামি সব লিজ নিয়ে কারবার করি। এ যো আস্তাবল দেখছেন, ই হামার নেহি আছে; এ যো ঘুড়া দেখছেন—ই ভি হামার নেহি আছে।'

ন্যাংচা খেই ধরবার চেষ্টা করল, 'আপনার কি আছে? আপনি কি লিজ নিয়েছেন?'

ন্যাংচার বোকামিতে রামপুরীষ একগাল মিঠে হাসি হাসল, খয়েরে কালো দাঁতগুলো ঝিকমিক করে উঠল, 'ই তো ন্যাংচাভাই ঠিক কথা বোলেছেন—হামার কি আছে?' বলতে বলতে আমাদের একটা ড্রামের কাছে নিয়ে গেল—'হামার আছে ই-সব—হামি ইহারি লিজ লিয়েছি।' দুর্গন্ধের জন্য মুখে একগাদা থুথু এসে গিয়েছিল, রামপুরীষের কথায় বিষম খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম। সামলে নিয়ে অনুরোধ করলাম, 'বিশদ করুন শেঠজী।'

অবজ্ঞার হাসিতে ওর মুখ ঝলমল করে উঠল, 'ইটা বুঝলেন না। ইসব জো ঘুড়ার রাবিশ দেখছেন—ই হোল হামার কারখানাকা পরডাক্ট। আপলোগ ভাবছে—ইসব হামি সার বানানে কো সিন্ধি কারখানামে ভিজবো। কভি নেহি, কভি নেহি—ই-সব মসল্লা হইয়ে যাবে।'

ন্যাংচা ল্যাং খেয়ে পড়ে যাবার যোগাড়। রামপুরীষ সেদিকে খেয়াল করল না, বলে চলল, 'এ বেওসামে একদম রিস্ক নেহি আছে। আপনি যত পয়সা চালবেন, তত নাফা হবে।'

'আচ্ছা শেঠজী, তবে যত কম ব্যয় করব, তত তো বেশি লাভ হবে।' জিজ্ঞাসু হলাম।

'সি তো ঠিক কথা আছে।' ফোকটওয়ালা চিন্তিতভাবে ঘাড় নাড়ল।

'তবে ঘোড়াকে অত ভাল ছোলা খেতে দিচ্ছেন—ঘাস দিলেই পারেন।'

'পারে। পারে। লেকিন কোয়ালিটি কণ্ট্রোল কোরতে হোবে তো। ঘুড়া ছুলা খাবে তো এক পরকার মসল্লা হোবে, ঘাস খাবে তো আউর এক পরকার মসল্লা হোবে—হোবে কি না বোলুন?'

'ঠিক বলেছেন শেঠজী—কাঁচা মালের ওপর তো পাকামালের কোয়ালিটি নির্ভর করে।' ন্যাংচা এতক্ষণে ধাতস্থ হয়ে মন্তব্য করল।

রামপুরীষ এ মন্তব্যের খুব তারিফ করল, 'হামার ছুলার দাম আছে কোত? না বারো আনা কিলো। ও বারো আনা ঘুড়া খাচ্ছে লেকিন পাঁচ রূপেয়া হইয়ে বেরিয়ে আসছে। হামি ঘুড়াকে ছুলা খিলাব না কেনো ফুটকেবাবু? হামার ঘুড়া যত ভাল জিনিস খাবে, তত আচ্ছা চিজ তৈয়ার করবে।'

'আপনি ঘোড়ার তরল পদার্থ কি করেন?' ন্যাংচা অনুসন্ধিৎসু হল। ফোকটওয়ালা যুগপৎ চিন্তিত ও দুঃখিতভাবে বলল, 'উটা লিয়ে হামি মনে বড় আসোয়াস্তি রাখছে। ভাবছে ওটা কিসে দোব'। এ লিয়ে অবশ্য এক্সপেরিমেণ্ট হোচ্ছে।'

'কোথায়?' কৌতূহলী হলাম।

'কেরাসিনমে দিয়েছে—তিনজনাকা বস্তি ঘোরাতে পারে নি।' বলে ফোকট-ওয়ালা আমাদের দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর হঠাৎ হাসল, বলল, 'ইসব কি সহজ আছে বাবুজী'—মাথায় টোকা মেরে বলল, 'ইসব নাড়াচাড়া কোরতে হয়।'

ফোকটওয়ালার কাণ্ডকারখানা দেখে ন্যাংচা খুব খুশি। এ হেন মহান এবং সফল ব্যবসায়ীর সঙ্গগুণে ওর খিলুতে হাওয়া লেগেছে মনে হল, ও বলল, 'আপনার কাছে এসে আমার মাথাটা একেবারে ধাপার মাঠের মত সাফ হয়ে গেছে। একটা আইডিয়া মাথার ভেতর লাফালাফি করছে। আপনি সিনিয়র তাই আপনাকে বলি।'

'বোলুন। বোলুন। শরম পাবেন না—বেওসামে শরম করতে নেই।'

'গোবর।' ন্যাংচা ছোট্ট জবাব দিল।

'গোবর কি করবি?' আমি বুঝতে পারলাম না।

ফোকটওয়ালা কথাটা শুনে হাসি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে রইল।

'সমস্ত খাটালের সঙ্গে চুক্তি করব—যত গোবর হবে আমার। সেই গোবর থেকে পিল তৈরি করব। সঞ্জীবনী রস তৈরি করব। শিশিতে পিল আর সঞ্জীবনী রস ভরে লেবেল এঁটে দেব: গোময় বটিকা বা গোময় জারক। ইহা গ্রহণে মন পবিত্র করে, দুশ্চিন্তা নাশ করে, পাপ হইতে মুক্ত করে—সর্বোপরি স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত করে। ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ—খুব চলবে।'

ফোকটওয়ালা চেঁচিয়ে উঠল, 'আপনার 'পর গুরুজীর অসীম কৃপয়া আছে। আপনে দুদিনে লাখপতি হইয়ে যাবেন। হামাকে ওয়াকিং পার্টনার কোরে লিবেন ন্যাংচাবাবু?'

'নিশ্চয় নেব। তবে কাল থেকে আমি আর ফটকে দুটো বালতি নিয়ে বেরিয়ে পড়ব—পাড়ার খাটালগুলো হাত করতে হবে।' আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'রাজী আছিস তো?'

ন্যাংচার ভাগ্যোন্নতিতে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলাম। ন্যাংচার কথার জবাব দেব—তার আগেই ভজহরি ভট্ট বললেন, 'কি রে, কেমন বুঝলি ন্যাংচা?'

ন্যাংচা ভজহরি ভট্টের পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল, বলতে লাগল, 'গুরু গুরু! তুমিই আমাকে বাঁচালে। তুমি থাকতে কেন আমি দশ দিস্তে কাগজ অস্থানে-কুস্থানে ব্যয় করলাম।'

ভজহরি ভট্ট আশীর্বাদ করার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইলেন।

[নয়]

তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ের ভূমিকা

আমি পর পর দুটি ঘটনার বিবরণ দেব। একটি পোলক স্ট্রীট ট্র্যাজিডি, আর একটা আমহার্স্ট স্ট্রীট রহস্য। কিন্তু তার আগে এই ভূমিকা। এই দুটি কেস্-এর তদন্ত যে খুব সাফল্যের সঙ্গে করা হয়েছিল তা বলছি না। পুলিস বরং দুটি ঘটনার তদন্তেই অতি নিন্দনীয়ভাবে গোলমাল করে ফেলেছিল। এবং এ জন্যও ঘটনা দুটি উল্লেখযোগ্য নয়। আমি দেখাতে চাই বহু অকাট্য গৌণ প্রমাণ যেখানে উপস্থিত, সেখানেও সেগুলি পরস্পর সাজিয়ে একটি সম্পূর্ণ কেস্ খাড়া করতে কত কৌশলের দরকার হয়। এরই প্রমাণ মিলবে এ দুটি কেস্-এ।

অনভিজ্ঞের কাছে আমি গৌণ প্রমাণের প্রকৃতি ও ক্ষমতা বিষয়ে কিছু ব্যাখ্যা দেব। এক একটা কেস্-এ এমন সব প্রমাণ দেখা যায়, যার সবগুলিই পৃথকভাবে কোনো একটা বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেয়। প্রথমগুলির পরবর্তী প্রমাণগুলিকে সমর্থক প্রমাণ বা অতিরিক্ত প্রমাণ বলে।

এই সব সমর্থক-প্রমাণ যে কতখানি কার্যকারী তা পরীক্ষা করতে হলে প্রচুর সতর্কতা দরকার। যে সব প্রমাণ কেস্‌কে সমর্থন করছে শুধু সেইগুলিকেই নয়, যেগুলি কেস্-এর বিপক্ষে যাচ্ছে সেগুলিকেও বিবেচনা করে দেখতে হবে। তা ছাড়াও তৃতীয় কোনো অনুমান করা যায় কি না তাও ভেবে দেখা দরকার। তারপর যখন মনে হবে, আমরা সব রকম সম্ভাবনা পরীক্ষা করেছি, আর অবশিষ্ট কিছু নেই, সম্ভাবনা বা অনুমান কিছুই আর চলছে না, সমস্ত যুক্তি একই সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিচ্ছে, একমাত্র তখনই জোরের সঙ্গে বলা যাবে যে ঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি।

সম্ভাব্য যুক্তিগুলি একত্র করে পর পর বিচার করলেও একই সিদ্ধান্তে টেনে নিয়ে যাবে। এবং কোনোটা কোনোটাকে দুর্বল না করে পরস্পরকে জোরালো করবে। কারণ এর প্রত্যেকটা পৃথকভাবেও একই সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিয়েছে। কোনো একটি মাত্র যুক্তি যদি নিশ্চয়তাবোধক হয়, তা হলে সিদ্ধান্ত নির্ভুল হতে বাধ্য। এই রকম ক্ষেত্রে তাই প্রত্যেক পৃথক যুক্তির ভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা হিসাব করে দেখতে হবে। এইভাবে

সমস্ত যুক্তিগুলির গুণফল যা হয় তাতে তারা একত্র অনুমানকে সমর্থন করতে ব্যর্থ হবে। তখন ঐ নিশ্চয়তা-বোধক যুক্তিটি সমষ্টি থেকে বাদ দিলে তখন সেটি সমগ্রের চেয়ে বেশি সার্থক।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। এতে, এই জাতীয় বিচারের সঙ্গে যে অনিশ্চয়তা থাকে, তাও দেখা যাবে। মনে করা যাক কোনো একটি মানুষ একটি আঘাতের ফলে পথের উপর মরে পড়ে আছে। সেইদিনই সন্ধ্যায় একটি লোককে ঐ অঞ্চল থেকে ছুটে পালিয়ে যেতে দেখা গেল। এই লোকটির বাড়ি তল্লাস করে রক্তমাখা কাপড়, অথবা সম্প্রতি ধোয়া হয়েছে এমন ভিজে কাপড় পাওয়া গেল। মৃত ব্যক্তির কাছে গিয়েছে এবং এসেছে এমন মানুষের পায়ের ছাপের সঙ্গে এই লোকটির পায়ের ছাপ মিলে যায়। তারপর যে অস্ত্রে মৃত লোকটিকে আঘাত করা হয়েছে সেই রকম আঘাত হানার অস্ত্র এই লোকটির কাছে ছিল সবাই জানে, কিন্তু এখন পাওয়া যাচ্ছে না। অতএব এই ব্যক্তিই যে মৃত লোকটিকে হত্যা করেছে এমন সম্ভাবনা বেশি। প্রত্যেকটি ঘটনাই পৃথকভাবে ঐ লোকটির অপরাধের দিকে ইঙ্গিত করে, এবং সবগুলি ঘটনা একত্র বিচার করলেও, সেই যে অপরাধী, এ যুক্তি অনিবার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু মনে করা যাক এই লোকটিকে ধরার পরে সে নিম্নলিখিত বিবৃতিটি দিচ্ছে—সে ছোরা হাতে পথে চলছিল, এমন সময় একটি লোক তাকে এসে আক্রমণ করে; এর ফলে একটা লড়াই হয়, এবং তার আক্রমণকারীকে খুন করে। তারপর যখন বুঝতে পারল কাজটা ভয়ানক অন্যায় হয়ে গেছে তখন ভয়ে সে অস্ত্র ফেলে বাড়ি পালিয়ে যায়। কোনো ভীরু স্বল্পভাষী লোকের মুখ থেকে এমন কথা শুনলে তা বিশ্বাসযোগ্য হতেও পারে, কিন্তু এর বিপরীত সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করতে হলে লোকটির স্বভাবচরিত্রের পরিচয় নেওয়া এবং উদ্দেশ্যের কথা বিবেচনা করা দরকার, অবশ্য যদি কোনো উদ্দেশ্য থেকে থাকে। যদি মৃত ব্যক্তির টাকাপয়সা চুরি গিয়ে থাকে এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তির কাছে তা পাওয়া যায়, তা হলে সেই যে হত্যাকারী সে সন্দেহ আরও বাড়বে। কিন্তু যদি দেখা যায়, তার স্বভাবচরিত্র ভাল, এবং হত্যার কোনো উদ্দেশ্য তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া না যায়, তা হলে সে যে বিবৃতি দিয়েছে তা মিথ্যা মনে না হতে পারে।

অপ্রচুর প্রমাণ থেকে যথাসম্ভব নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছনো অপরাধ অনুসন্ধানের কাজে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য সমস্ত জানা প্রমাণের সঙ্গে মিলিয়ে একটা অনুমান খাড়া করলে, তবে তাকে ভিত্তি করে সন্ধানের ক্ষেত্র আরও বাড়ানো চলতে পারে। কিন্তু এই রীতিটি ডিটেকটিভ বিভাগের চেয়েও বিচার বিভাগের কাজে আসে বেশি। কারণ বিচার বিভাগের তাড়াতাড়ি বিচার শেষ করে ফেলার গরজ আবশ্যিক নয়। বরং বিচারকের রীতি হচ্ছে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়া, যাতে অস্পষ্ট আলো ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে, এবং শিথিল অনুমান দৃঢ় সিদ্ধান্তে রূপান্তরিত হতে পারে। ডিটেকটিভের কাজ তড়িদ্‌গতি। চিন্তার মতনই দ্রুত, কাজেই যে ডিটেকটিভের বিচার ক্ষমতা নিজের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, সে ডিটেকটিভই নয়। অপরাধ এবং অপরাধী সংক্রান্ত বিষয়ে সাফল্যলাভে দ্রুত বিচার ক্ষমতা এবং সুবিবেচনা-প্রসূত কর্মক্ষমতা বিশেষ দরকার।

পোলক স্ট্রীটের হত্যাকাণ্ড

১৮৬৮ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর ভোর চারটে—কলকাতার এক ধনী ইহুদী বণিকের স্ত্রী মিসেস লী জুডাকে তাঁর শোবার ঘরে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত দেহে পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গেল। অস্ত্রের আঘাত হাতে পায়ে মুখে সর্বত্র। তখনও তিনি মারা যান নি, তাঁর একজন ভৃত্য এই অবস্থায় তাঁকে পড়ে থাকতে দেখে সাহায্যের জন্য অন্য লোক ডাকবার আগেই তাঁর মৃত্যু ঘটল। পুলিসের তদন্তে জানা গেল—

মিসেস লী জুডা দুটি সন্তানসহ ৫নং পোলক স্ট্রীটে বাস করতেন। সন্তানদের মধ্যে একটি কোলের শিশু, অন্যটি চার বছরের মেয়ে। তাঁর স্বামী মিস্টার এন-ই জুডা, নাম করা ব্যবসায়ী। তিনি আফিঙের কারবারী, এবং এই হত্যার সময় তিনি চীন দেশে ছিলেন। এ সময়ে ঐ বাড়িতে দুজন ধাই, একজন পাচক, একজন কোচম্যান, একজন সহিস, একজন বেয়ারা ও একজন মালপত্র বহনকারী সাধারণ ভৃত্য বাস করত। মিসেস জুডার সঙ্গে যাঁরা দেখাসাক্ষাৎ করতেন, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন তাঁর আত্মীয়—নাম নাসীম শ্যালোমি গাবৃবয়। কলকাতা শহরে তাঁদের সম্প্রদায়ে তিনি একজন সম্মানিত ব্যক্তি। তিনি মিসেস জুডার কাছ থেকে বিদায় নেবার আধঘণ্টা অথবা কিছু বেশি সময় পরে তাঁর ভৃত্যেরা এই হত্যাকাণ্ড আবিষ্কার করে এবং সোর-গোল করতে থাকে। তাদের কাছ থেকে জানা গেল শিশুটি রাত আড়াইটের সময় কেঁদে ওঠে ও দুধের ধাই তাকে স্তন্য পান করায়। এই স্ত্রীলোকটির ঘুম সহজে ভাঙে না, এবং ভাঙলেও চোখ থেকে সহজে ঘুম ছাড়তে চায় না। শিশুকে স্তন্য পান করানোর সময় সে লক্ষ করল সে যখন ঘুমতে যায় তখন দুটো আলো জ্বলছিল, কিন্তু জাগবার পরে দেখে একটা জ্বলছে। একটা আলো নিবে গেছে বা কেউ নিবিয়ে দিয়েছে। তার কর্ত্রীর ঘর অন্ধকার। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে তাঁর গোঙানির শব্দ শুনতে পায় তিন চার বার। কর্ত্রী দুঃস্বপ্নের ঘোরে অমন চেঁচাচ্ছেন মনে করে সে তাঁকে উদ্দেশ করে বলল, 'মেমসাহেব, মেমসাহেব, জেগে উঠুন, নইলে ছোটরা ভয় পেয়ে

হবে।' কিন্তু কোনো সাড়া না পেয়ে সে তার ঘরের অন্য বিছানা থেকে দ্বিতীয় ধাইকে ডেকে বলল, 'দেখ তো, মিসেস কেমন যেন করছেন, এমন গোঙানি তো আগে শুনি নি কখনও।' কিন্তু সে কোনো উত্তর দিল না। হয়তো ঘুম ভাঙে নি, অথবা খুব ভয়ে কথা বলতে পারে নি। কিন্তু ইতিমধ্যে মিসেসের ঘরে ভারী কিছু পড়ে যাওয়ার মতন শব্দ শুনতে পেলাম। বাচ্চার দোলনাটা যেখানে ছিল শব্দটা সেইখানে হল। তারপর পুরুষের গলায় কে যেন বলে উঠল 'চুপ কর—' (যে কথাটা উচ্চারণ করল সেটি ইতর কথা) এতে আমি ভীষণভাবে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে চাকরদের ডেকে বললাম, ওগো তোমরা দেখ তো কি হল।' তার চিৎকারে চার বছরের মেয়েটা বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে তার কাছে ছুটে এলো। কিন্তু আসবার পথে তার পা তার মায়ের দেহে লাগাতে সে দেখল তার মায়ের পায়ে দড়ি বাঁধা। সে তখন কেঁদে উঠে ধাইকে বলল, মায়ের পায়ের দড়িটা খুলে দাও। সে তখন কর্ত্রীর ঘরের দরজায় গিয়ে তাঁর রক্তমাখা দেহটাকে মেঝেয় পড়ে থাকতে দেখতে পেল। মুখেও ভীষণ কাটা। সে তা দেখামাত্র বারান্দায় ছুটে গিয়ে চিৎকার করে বলে উঠল, 'বাড়িতে কি সর্বনাশ হল গো!' ভৃত্য ছুটে এলো উপর তলা এবং কর্ত্রীকে এই অবস্থায় দেখতে পেয়ে সে তো কপালে করাঘাত করে বলতে লাগল 'এমন শয়তানি কে করল?' ধাই তাকে বলল, এখুনি ছুটে যাও মিস্টার এজেকিয়েলের কাছে তাঁকে গিয়ে সব জানাও। —এজেকিয়েল নিহতা মহিলার শ্বশুর। তখন চারটে। তিনি খবর পেয়েই ছুটে এলেন ৫নং পোলক স্ট্রীটে, সেখানে মিস্টার এলাইয়াস গাব্বয়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। ইনি যে লোকটির ভাই, তাঁর ভূমিকা এ কাহিনীতে একটি প্রধান স্থান অধিকার করবে।

মিসেস জুডার দেহটি বিছানার সম্পর্কে সমকোণ অবস্থায় ছিল। পরিধানের বস্ত্রাদি রক্তে এমন ভিজে গিয়েছিল যে মনে হচ্ছিল যেন সেগুলো ঐ রঙেরই কাপড়। বিছানায় মশারি টাঙানো ছিল। বিছানা ও বালিশে ব্যাপকভাবে রক্তের চিহ্ন ছিল, আর দেয়াল মেঝে থেকে তিন ফুট পর্যন্ত উপরের দিকে রক্ত ছেটানো ছিল। শিশুদের ঘরের দিকের দরজার ডান দিকের পাল্লাটা বন্ধ ছিল, তার নিচের অংশে রক্তের চিহ্ন দেখা গেল। বিছানার চাদরে নোংরা পায়ের চিহ্ন; অথচ অবাক কাণ্ড, বিছানায় ধস্তাধস্তির কোনো চিহ্ন নেই, বালিস, চাদর, যেমন পাতা ছিল তেমনি আছে। মশারিটি অবশ্য ছেঁড়া দেখা গেল। পুরুষের পায়ের কালো চামড়ার একপাটি জুতো বিছানার উপর পাওয়া গেল। বিছানার নিচে পাওয়া গেল একজোড়া রবারের জুতো। এর এক পাটির উপরের দিকটায় রক্তের চিহ্ন আছে, কিন্তু ভিতরে নেই। এতে স্পষ্টই বোঝা গেল হত্যার সময়ে এ জুতো হত্যাকারীর পায়ে পরা ছিল, তা নইলে ভিতরেও রক্তের দাগ পাওয়া যেত। রক্তমাখা নোংরা ছেঁড়া একখণ্ড মলমল বিছানার উপরে বালিসের কাছে পাওয়া গেল।

দেহ পরীক্ষা করে দেখা গেল বুকের বাঁ পাশে দুটি জায়গায় অস্ত্র বেঁধানো হয়েছে, তার একটা নবম ও দশম বক্ষাস্থির মাঝখানে, এই আঘাতে প্লীহেটা কেটে দুভাগ হয়ে গেছে। অন্য আঘাতটা একাদশ ও দ্বাদশ বক্ষাস্থির মাঝখানে। এই আঘাতে অন্ত্রের ঝিল্লি আবরণ কেটে আলাদা হয়ে গেছে। ডান গাল কেটে হাড় পর্যন্ত বেরিয়ে পড়েছে। ডান হাতের পেশী তিন জায়গায় ভাগ হয়ে গেছে, কব্জির টেণ্ডন বা কণ্ডরা কেটে গেছে এবং ডান চোখটি সম্পূর্ণরূপে ভেদ হয়ে গেছে। এই সমস্ত হাঁ-করা কাটা ক্ষত থেকে প্রচুর রক্তপাত হয়েছে। মিসেস জুডার ঘর থেকে রক্তমাখা পায়ের চিহ্ন ঘোরানো সিঁড়ির উপর অবধি দেখে বোঝা যায় হত্যাকারী কোন্ পথে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

ভৃত্যকে জেরা করে জানা গেল: 'রাত তিনটের সময় আমার মনে হল কে আমার হাত ধরে ঝাঁকানি দিচ্ছে, জেগে উঠে দেখি নাসীম শ্যালোম গাব্বয় আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে। তিনি খুব ভীত এবং উত্তেজিতকণ্ঠে আমাকে বললেন, সদর দরজা খুলে দাও, তাড়াতাড়ি। আমি আদেশ পালন করতে ছুটে গেলাম। কোচম্যান আর সহিস জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার? আমি বললাম, 'নাসীম সাহেব।' তিনি গেট পার হয়ে তাঁর রাধাবাজারের বাড়ির দিকে চলে গেলেন। আমার চোখে তখনও ঘুম জড়িয়ে আছে, তাই আমি তাঁর হাতে কোনো বাণ্ডিল, অথবা পায়ে জুতো ছিল কিনা নজর করি নি।

৫নং পোলক স্ট্রীট থেকে নাসীমের বাড়ি যেতে জনৈক মিস্টার মাইকেলের বাড়ি পার হয়ে যেতে হয়। তিনি রাত তিনটের কিছু পরে তাঁর জানালায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি নাসীমকে তখন ঐ পথে খুব তাড়াতাড়ি চলে যেতে দেখেছেন। মনে হয়েছে তিনি বেশ উত্তেজিত অবস্থায় ছিলেন। গ্যাসের আলোটি মিস্টার মাইকেলের জানালার খুব কাছে অবস্থিত, সেই আলোতেই তিনি তাঁকে পরিষ্কার চিনতে পেরেছিলেন। নাসীম তাঁর বিশেষ পরিচিত বলেই তাঁর সব হাবভাবের সঙ্গে তিনি পরিচিত।

নাসীম ৫নং পোলক স্ট্রীট থেকে প্রায় ১৫০ গজ দূরে তাঁর রাধাবাজারের বাড়িতে বাস করতেন। বাড়িটি একটি ছোট দোতলা বাড়ি, এর মালিক তাঁর ভাই মিস্টার এলাইয়াস গাব্বয়। এটি তাঁর স্বদেশী গরিব আত্মীয়স্বজনের জন্য আলাদাভাবে রেখেছিলেন। নাসীমের সঙ্গে তখন এইরকম তিনজন আত্মীয় বাস করছিলেন। তাঁদের নাম যথাক্রমে মার্কাস স্টীন, মার্কোভিচ এবং নাথান লেভি। নাসীম যখন ঐ পথে যাচ্ছিলেন

জন মাইকেল ডিন আর সবাই ঘুমোচ্ছিলেন।

মার্কাস স্টীন বললেন: প্রায় সাড়ে তিনটের সময় আমি আমার বিছানায় ঘুমোচ্ছিলাম, এমন সময় মনে হল কে যেন আমাকে ধাক্কা মারছে। ঘর অন্ধকার ছিল, কে এমন করছিল দেখতে পাই নি। আমি জেগে উঠে দেখি নাসীম একপাত্র জল বয়ে নিয়ে চলেছে আমার ঘরের ভিতর দিয়ে তার ঘরের দিকে। সে সময়ে তার পরনে ছিল ঢিলে পাজামা, কিন্তু কোমর থেকে উপরের দিকে কোনো জামা ছিল না। কিছুক্ষণ পরে সে আরও একপাত্র জল নিয়ে তার ঘরে চলে গেল। আমি যেখানে শুয়ে ছিলাম, সেখান থেকে নাসীমের ঘরের ভিতরটা দেখা যায় না, কিন্তু শব্দ শুনে মনে হচ্ছে নাসীম কাপড় ধুচ্ছে। এমন সময় হঠাৎ পথে কে চিৎকার করে উঠল 'মানুষ খুন।' সে চিৎকার উষাকালের স্তব্ধতা ভঙ্গ করল। আর সঙ্গে সঙ্গে নাসীম আমার ঘরে ছুটে এসে আমার হাত ধরে খুব উত্তেজনার সঙ্গে বলল, 'তুমি সাক্ষী, আমি বাড়িতেই আছি।' পথের গোরগোল বেড়ে যেতে লাগল, তখন মার্কোভিচ ও নাথান লেভি ঘুম থেকে জেগে উঠল। আমি জানালা দিয়ে পোলক স্ট্রীটের দিকে চেয়ে দেখতে লাগলাম বহু লোক মিসেস জুডার বাড়ির দিকে ছুটে চলেছে। আমরা এই সব শব্দ শুনছিলাম আর লোকদের ছুটে চলার দৃশ্য দেখছিলাম, এমন সময় নাসীম হিব্রু ভাষায় বলল, 'কাকুম, কাকুম, (অর্থাৎ র‍্যাব্বি, র‍্যাব্বি,) তোমরা সাক্ষী, আমি সমস্ত রাত বাড়িতেই ছিলাম।' তারপর সে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

এর প্রায় কুড়ি মিনিট পরে নাসীম গ্রেফতার হলেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি এ বিষয়ে কিছুই জানি না। আমি সমস্ত রাত বাড়িতে ছিলাম, এবং আমার সাক্ষী আছে।'—নাসীমের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যমূলকভাবে মিসেস জুডাকে হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছিল। পুলিস প্রহরায় তাঁকে মৃতার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল, এবং সেখানে তাঁর দেহ তল্লাশ করা হল। তাঁর ডান হাতের তেলোয় এবং বুড়ো আঙুলে কয়েকটি বাঁকা আঁচড়ের দাগ দেখা গেল। দাগ স্পষ্ট, যদিও রক্তপাত হয় নি। বাঁ হাতের কব্জিতেও ঐ একই রকম আঁচড়ের দাগ আছে কিন্তু সেগুলি আরও বেশি স্পষ্ট, এবং তা থেকে রক্ত পড়েছে বোঝা গেল। ডান হাঁটুতেও আঁচড়ের দাগ, সেখানে চামড়া ছড়ে গেছে, বেশি নয়, সিকি পরিমাণ জায়গায়। তার উপরে একখণ্ড কাপড় বাঁধা রয়েছে। এ রকম ক্ষত হাঁটুর নিচে এবং হাঁটুর মাথার উপরে। এই শেষের দাগটি খুব লাল এবং সাম্প্রতিক, কিন্তু শুকনো। তিনি বললেন, বাথরুমে পড়ে গিয়ে এটা হয়েছে। হাতেও চক্রাকার অথবা ডিম্বাকার কালসিটে, কিন্তু কয়েক দিনের পুরনো। প্রথমে বললেন তাঁর এক বন্ধুর কাজ এটি, কিন্তু পরে স্বীকার করলেন কয়েকদিন আগে মিসেস জুডা ঠাট্টাচ্ছলে কামড়িয়ে দিয়েছিলেন। শার্টের ডান হাতায় রক্তের চিহ্ন ছিল; বললেন, মশার কামড়ের ফলে হয়েছে। মিসেস জুডার খাটের নিচে যে রবারের জুতো পাওয়া গিয়েছিল, তা ওঁর পায়ে সুন্দর ফিট করল। প্রথমে সে জুতো তাঁর, সে কথা অস্বীকার করেছিলেন, কিন্তু নিহতার বোন তাঁর সামনেই বলল, ও জুতো ওঁরই। এই সময়ে মেয়েটি উপস্থিত ছিল সেখানে।

আসামীকে এবারে পুনরায় তাঁর নিজের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল। এইখানে তাঁর ছাড়া জামা কাপড় সব যত্নের সঙ্গে পরীক্ষা করা হল। একটা সম্পূর্ণ ভিজে ফেজ টুপি পাওয়া গেল, বোঝা গেল কিছুক্ষণ আগে ওটা ধোয়া হয়েছে। একটা শার্ট পাওয়া গেল ভিজে-ভিজে, দুমড়ানো এবং তাতে সন্দেহজনক চিহ্ন। মনে হল এতে ভিজে হাত মোছা হয়েছে। আরও একটি শার্ট পাওয়া গেল, সেটি অল্পক্ষণ ধোয়া হয়েছে, কিন্তু তাতে বড় বড় রক্তচিহ্ন রয়েছে। কাপড়গুলি পরীক্ষা করলেন সরকারী রাসায়নিক পরীক্ষক ডাক্তার ম্যাকনামারা। তিনি তাঁর সাক্ষ্যতে বললেন আসামীর দেহে যে সব আঁচড়ের চিহ্ন আছে, আর কাপড়চোপড়ে যে সব রক্তচিহ্ন পাওয়া গেছে—এ দুইয়ের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই। যে অস্ত্রে হত্যা করা হয়েছে তার জন্য বাড়ি তল্লাশ করা হল, কিন্তু কোনো অস্ত্র পাওয়া গেল না। আসামীর একখানা ছোরা ছিল, কিন্তু তার পাত্তা মিলল না। সেখানা কোথায় গেল তা একটি রহস্য রয়ে গেল। একটা পাত্রে শুকনো চায়ের পাতা ছিল, তার মধ্যে একটা ছিপি আঁটা শিশি পাওয়া গেল, শিশিটি কাগজে জড়ানো ছিল, কাগজে ছাপা ছিল 'স্মিথ অ্যাণ্ড স্ট্যানিস্ট্রীট', কিন্তু শিশির মাথায় যে চামড়ার আবরণ থাকে, তা এতে ছিল না। শিশিতে যে লেবেল ছিল, তাতে লেখা 'ক্লোরোফর্ম'। কিন্তু মিসেস জুডার বিছানায় যে একখণ্ড ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো পাওয়া গিয়েছিল, তা যে-কাপড় থেকে ছেঁড়া, সে রকম কোনো কাপড় এখানে পাওয়া গেল না।

আবার, যে কালো চামড়ার জুতো জোড়ার একখানা বিছানায় আর একখানা মেঝেতে পাওয়া গিয়েছিল, তার মালিক যে কে তাও বোঝা গেল না। অতএব আরও একবার ৫নং পোলক স্ট্রীটে গিয়ে ঘরখানা তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করার দরকার হল।

যে দরজাটি দিয়ে হলের দিকে যাওয়া যায়, সেটি খোলা অবস্থায় ছিল। তাতে পরিষ্কার বোঝা যায় সেই দিক দিয়েই হত্যাকারী (অথবা হত্যাকারীরা) প্রবেশ করেছিল। রক্তের ছোপ এবং রক্তমাখা পায়ের দাগ এই দরজা থেকে হলঘরে কোণাকুণিভাবে দেখতে পাওয়া গেল। তারপর আর একটা দরজার ভিতর দিয়ে আরও একটা ছোট ঘর, এবং তারপর ঘোরা সিঁড়ির আরম্ভ। এর পর থেকে আর চিহ্ন নেই। সিঁড়ি

পরীক্ষা করা হল। এই সিঁড়ি থেকে নিচে নামলে বাড়ির উত্তর দিকের সরু পথ। উঠোন সাত-আট ফুট উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। ঐ গলির বিপরীত দিকে দেয়ালে ছোট একটি দরজা। ঐ সরু পথে পোলক স্ট্রীটে বেরোন যায়। এই ছোট দরজাটি দুদিক থেকেই তালাবন্ধ ছিল। দেয়ালে পায়ের চিহ্ন দেখা গেল ঐ দরজার কাছাকাছি জায়গায়। পথের দিকে দেয়ালের দু জায়গা পলেস্তারা খসে পড়েছে। ভিতরের দিকেও দুটি জায়গায় পলেস্তারা ভাঙা। বোঝা গেল, মই লাগানো হয়েছিল। বর্ষাকালে দেয়ালে যে সবুজ ছত্রাক জন্মে, তাও সম্প্রতি ঘষা লেগে কয়েক স্থানে উঠে গেছে দেখা গেল। সন্দেহ রইল না, দেয়ালের এইখানে সদ্য কোনো লোক উপর দিয়ে পারাপার করেছে। এই লোকটি নাসীম নন, কারণ নাসীম সদর দরজা দিয়ে আসা যাওয়া করেছেন। তা হলে কে এই লোক?

একজন দেশী কনস্টেবলের সে সময়ে টিরেটা বাজারের উত্তরের গলিতে বীট ছিল। সে ভোর ৩টে থেকে ৪টের মধ্যে বাঁশের মই ঘাড়ে নিয়ে একটি লোক তার দিকে আসছিল দেখেছে। তার হাতে একটি বাণ্ডিল ছিল। তার পোষাক কেমন ছিল তা সে লক্ষ করে নি। পায়ে জুতো ছিল কি না তাও তার নজরে আসে নি। শুধু দেখেছে তার মাথায় একটা ফেজ টুপি ছিল। আর একজন কনস্টেবলের ঐ সময়ে ডিউটি ছিল হরিণবাড়ি লেনে। সে ঐ লোকটিকে ছুটে যেতে দেখে তাকে থামতে বলে এবং কোথায় চলেছে জিজ্ঞাসা করে। সে বলে 'জাহাজে চলেছি মাল তুলতে।' তাকে অত্যন্ত বিচলিত বোধ হয়েছে। এবং সে মাতালের মতন টলছিল। সে তার হাতের বাণ্ডিলটা হাতে নিয়ে দেখেছে, তা ভিজে ছিল। যাই হোক, সে তাকে যেতে দেয়। লোকটি কে, এবং কোথায় সে গেল, তখন তা কেউ জানতে পারল না।

আরও সন্ধান নিয়ে দেখা গেল মিসেস লী মুডার হত্যার অল্প কিছু দিন আগে নাসীমকে এজকিয়েল সার্বানী নামক এক দুশ্চরিত্র ইহুদীর সঙ্গে প্রায়ই দেখা যেত। লোকটার জন্ম নীচ ঘরে এবং অবস্থাও খুব খারাপ। এমন একটা লোকের সঙ্গে নাসীমকে পথে ঘুরতে দেখে তাঁর নামেও খুব নিন্দে রটেছিল। এই ইতর লোকটির চরিত্র এতই খারাপ যে তার অসাধ্য কোনো কাজ ছিল না। নির্মম, জেদী চরিত্রের সার্বানী, অযোধ্যার রাজার অধীন সামরিক বিভাগে কাজ করত, অতএব কিছু অর্থলোভে তাকে দিয়ে নরহত্যা করানো এমন কঠিন কিছুই নয়। দুষ্কার্য করানোর পক্ষে এর তুল্য লোক আর নেই।

২৯শে সেপ্টেম্বর বুধবার, এবং ৩০শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার এরা দুজন একসঙ্গে সকালের খাওয়া খেয়েছে। এই শেষের দিন নাসীম তাঁর চাকর দাসরুকে ডেকে বলেন, 'এর সঙ্গে বাজারে যাও এবং এর যা দরকার সব কেন। তোমাকে বলছি, কারণ আজ ইহুদীদের একটি ধর্মীয় ভোজের দিন, আজ কোনো ইহুদীর পয়সা ছোঁয়া নিষেধ। কাজেই টাকা যা দেবার তুমি হাতে করে দেবে।'

তারপর একটা পাল্কী ডেকে তাতে চেপে সার্বানী সার্কুলার রোডের মৌলালীর দরগার দিকে চলল, চাকরটি তার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলল। এখানে পাঁচ আনা দিয়ে একটা বাঁশের মই কেনা হল। মইটির মাপ বারো ফুট দৈর্ঘ্যে এবং প্রায় এক ফুট প্রস্থে। এটাকে বয়ে নেওয়ার জন্য একজন মুটে ঠিক করা হল। মৌলালীর দরগা থেকে ওরা টিরেটা বাজারে এসে এক বাক্স লুসিফার দেশলাই কিনল, এবং এইখানে এসে চাকরটি মনিবের বাড়ির দিকে রওনা হল, সার্বানী মুটেকে নিয়ে নিজের বাড়ির দিকে চলল।

সেইদিনই সন্ধ্যা ছয়টার সময় এজকিয়েল আরও একবার নাসীমের বাড়ি এলো মই সঙ্গে নিয়ে। পথে দাসরুর সঙ্গে দেখা। এজকিয়েল তাকে বলল মইখানা এক জাহাজের ক্যাপটেনের জন্য দরকার। এ কথাটা তাকে জানাবার কোনো দরকার ছিল না যদিও। এজকিয়েল এবং নাসীম দুজনেই মই নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। এবং ফিরে এসে এজকিয়েল আবার চাকরটাকে বুঝিয়ে দিল

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেজওয়াডা - শ্রীনগর - গৌহাটী

যে মৈথুনা ক্যাপটেনকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরা আধ ঘণ্টার জন্য বাইরে ছিল। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে কোথায় গিয়েছিল, এবং কি করে এলো? তারা কি মৈটাকে সুবিধামতো কোনো স্থান রেখে এলো, যাতে পরে সেখান থেকে যথাসময়ে নিয়ে যাওয়া যাবে?

কিন্তু সে সব কথা এখনকার মতন থাক। ২৭শে সেপ্টেম্বর নাসীমকে আমরা দেখেছি এজকিয়েলের সঙ্গে, ডালহাউসি স্কয়ারে, ওষুধের দোকানে, ক্লোরোফর্ম কিনতে। এবং ২৮শে তারিখের রাত্রে দেখা যাচ্ছে, নাসীম তাঁর এক ভৃত্যের উপর ক্লোরোফর্মের ক্রিয়া পরীক্ষা করছেন। বলছেন, নাঃ। করছেন একটা। মার্কাস স্টীনকে বলা হল শুয়ে পড়। শোবার পর নাসীম রুমালে ক্লোরোফর্ম ঢেলে তার নাকে চেপে ধরলেন। মার্কাস অর্ধ অচেতন হল মাত্র, সম্পূর্ণ হল না। মেডিক্যাল বিভাগের লোকেরা বলেন, ক্লোরোফর্মে কেউ আংশিকভাবে, এমন কি প্রায় অচেতন হলেও, বাইরের কথা শুনতে পায়। এ ক্ষেত্রেও তাই হল। স্টীনের মাথা তোলার ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু তবু নাসীম ও নাথান লেভির ঠাট্টার হাসি বেশ শুনতে পেয়েছে। তাঁরা বলেছিলেন, ওকে মাতালের মতন দেখাচ্ছে, সে-কথাও সে স্পষ্ট শুনেছে। মার্কোভিচ অন্য ঘরে ছিল, সে বুঝতে পারছিল স্টীনকে নিয়ে ওরা ঠাট্টা করছে, কিন্তু সে বেরিয়ে আসে নি। স্টীন চেতনা ফিরে পেলে সে তার কাছে এসে পরে সব শুনেছে।

এই ক্লোরোফর্মে আশানুরূপ ফল না পেয়ে নাসীম পরদিন সার্বানীর সঙ্গে লালবাজারের একটি দোকানে গিয়ে বলেন, এমন ক্লোরোফর্ম কিনতে চাই যাতে দ্রুত এবং সম্পূর্ণ কাজ হয়। সার্বানী ঐ দোকানে নাসীমের পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল। নাসীম যখন ঔষধ বিক্রেতার কাছে বলছিলেন খুব কড়া ক্লোরোফর্ম চাই, যতদূর সম্ভব কড়া, তখন সে প্রাণ খুলে হেসেছিল। ভেবে দেখুন, যে লোকটা অন্যকে ক্লোরোফর্ম দিয়ে সম্পূর্ণ অসহায় করে ফেলার কল্পনায় এমন হাসতে পারে সে কি জাতীয় জীব। দোকানে তখন একজনমাত্র লোক ছিল, মালিকের অনুপস্থিতিতে এ রকম বিপজ্জনক জিনিস দুজন অপরিচিত লোকের কাছে কি করে বেচে, তাই সে তাদের অন্য সময়ে আসতে বলল। পরদিন যখন দোকানের মালিক উপস্থিত ছিলেন সেই সময় আবার ওঁরা এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু মালিক বললেন কড়া ক্লোরোফর্ম তিনি বেচবেন না। একথা শুনে তাঁরা ওখান থেকে চলে গেলেন। অতঃপর তাঁরা ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীটের কাছে অবস্থিত স্কট টমসনের দোকানে গেলেন, কিন্তু এখানেও তাঁরা কড়া ক্লোরোফর্ম কিনতে পারলেন না।

নাসীম এবং সার্বানী হত্যার আগে, সন্ধ্যায় একসঙ্গে আহার করেছেন। টেবিলে খাবার পরিবেশনের আগে দুজনে নাসীমের ঘরে দরজা বন্ধ করে প্রায় পনেরো মিনিট ধরে পরামর্শ করেছেন। খাওয়া শেষ হলে নাসীম একা বেরিয়ে যান। সার্বানী আধ ঘণ্টা সে-ঘরে বসে থাকে, এবং অন্যান্য ইহুদীদের সঙ্গে মদ্যপান করে। তারপর সেও চলে যায়। তখন রাত প্রায় নয়টা।

এতটা তথ্য সংগ্রহ করার পর পুলিস সার্বানীকে গ্রেফতার করে। সে একটা নোংরা বস্তীর ঘরে বাস করত। সে ঘর অনুসন্ধান করা হল। সেও তখন উপস্থিত ছিল সেখানে। কয়েকখানা জামা পাজামা পাওয়া গেল, প্রত্যেকটিতে ইংরেজী এন-এস-জি লেখা। অর্থাৎ নাসীম শ্যালোমি গাব্বয়। সেগুলোও পরীক্ষা করা হল। একটি শার্ট ও একটি ঢিলে পাজামায় সবুজ ছত্রাকের চিহ্ন পাওয়া গেল, ৫নং পোলক স্ট্রীটের বাড়ির ভিজে দেয়ালে যেমন ছিল। পুলিসে এই সবুজ চিহ্ন দেখেছে, এটি সার্বানী লক্ষ করা মাত্র সে পুলিসকে বোঝাতে চেষ্টা করল যে, সে সম্প্রতি এক ইহুদীর সমাধি অনুষ্ঠানে গিয়ে সেখানে একটি কবরের উপর বসাতে এই রকম দাগ লেগে গেছে। তৎক্ষণাৎ সন্ধান নিয়ে জানা গেল সম্প্রতি কোন ইহুদীকেই কবর দেওয়া হয় নি। পরীক্ষা চলাকালে একটা ময়লা কাপড়ের বাণ্ডিল থেকে একটা শার্ট টেনে বার করা হল, দেখা গেল তার বুকের কাছ থেকে একটা অংশ ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে। নিহতা মহিলার বিছানায় যে ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো পাওয়া গিয়েছিল, তা এর সঙ্গে লাগিয়ে দেখা গেল, সম্পূর্ণ মিলে যায়। রাত্রে প্রহরারত সেই দুই কনস্টেবল, হত্যার রাত্রে ভোরে এই লোকটাকেই বাঁশের মৈ নিয়ে যেতে দেখেছিল, সনাক্ত করল।

এবারে হত্যার উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করা যাক। এ হত্যায় একমাত্র সার্বানীরই যদি স্বার্থ থাকত, তা হলে তার উদ্দেশ্য বা মোটিভ হত লুণ্ঠন। কিন্তু ঘর থেকে কিছুই অপহৃত হয় নি। হত্যার সময় মিসেস জুডার হাতে ভারী ওজনের সোনার ব্রেসলেট ছিল, তা অপহৃত হয় নি। দামী হীরের আংটি ছিল, সেটাও আঙুলেই ছিল, সোনার বালা, সোনার ঘড়ি ও চেন বালিসের নিচে ছিল, তাতেও কেউ হাত দেয় নি। ঘরের অন্যান্য জিনিসও চুরি হয় নি। তা হলে হত্যায় একমাত্র নাসীমেরই স্বার্থসিদ্ধি হয়েছে, এবং সার্বানী কাজ করেছে তাঁর সাকরেদ হিসাবে। কিন্তু নাসীমের কি স্বার্থ আত্মীয় হত্যায়? কি তাঁর মোটিভ, কি তাঁর উদ্দেশ্য? এ কি ঈর্ষা?

এইবার তা হলে শুনুন। স্ত্রীর স্বামী মিস্টার জুডা চীনদেশের সঙ্গে আফিঙের ব্যবসাতে লিপ্ত। তাঁর বড় ব্যবসা। তিনি লেনদেনের ব্যাপারে কোন এজেন্টের উপর ভরসা না করে নিজেই হংকং-এ যেতেন। এর জন্য তাঁকে বিদেশে থাকতে হত বেশির ভাগ সময় আর সেহেতু স্ত্রীকে সাহচর্য দিতে পারতেন খুবই কম। এই কারণে স্ত্রী নিজের পরিচিতের সংখ্যা বাড়িয়ে নিয়েছিলেন

একক জীবনের অবসাদ দূর করার জন্য। নাসীম ৫নং পোলক স্ট্রীটের বাড়িতে প্রায়ই আসতেন। তিনি লীর আত্মীয়ও বটে। কাজেই তাঁর ঘন ঘন এ বাড়িতে আসা অপরের খুব দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি। ধীরে ধীরে ওঁদের দুজনের মধ্যে প্রণয় সঞ্চার হয়। লীর একক জীবনের শূন্যতা নাসীম প্রণয় দিয়ে পূরণ করতে লাগলেন, অথচ কলঙ্ক রটল না। নাসীমের যাতায়াত ক্রমেই বেড়ে গেল, এবং শেষে ভৃত্যদের কাছেও ব্যাপারটা অজানা রইল না। যখন ওঁদের এই অবৈধ প্রণয় শুরু হয়, তখন থেকে নাসীম সদর দরজার চাবি ভৃত্যের কাছ থেকে চেয়ে নিজের কাছে রেখেছিলেন। যখন ইচ্ছা গেট খুলে আসতেন এবং যখন ইচ্ছা বন্ধ করে চলে যেতেন। লীর অনুমতিক্রমেই এটা ঘটেছিল। নাসীম কখনো কখনো রাত দুটো পর্যন্ত লীর ঘরে থাকতেন, এবং অনেক সময় তিনটে চারটে পর্যন্ত। একটা খালি ঘরে তাঁর নিজের জিনিস-পত্রও কিছু রেখেছিলেন। এই জিনিস রাখা লীর স্বামীও জানতেন। তিনি এর মধ্যে যে খারাপ কিছু থাকতে পারে এমন মনে করতে পারেন নি।

মিসেস লী জুডার অন্যান্য আত্মীয়রা ওঁদের এ ব্যাপারটা জানতেন কিনা তা ঠিকভাবে জানা যায় না। কিন্তু দেখা যায়, তাঁর শ্বশুর গত ছমাস এ বাড়িতে পদার্পণ করেন নি। একবার মাত্র কিছু কফি ওজন করানোর জন্য তিনি এ বাড়িতে এলেও উপরে ওঠেন নি। লী অবশ্য নিহত হবার চার পাঁচ দিন আগে শ্বশুরের সঙ্গে দেখা করেছেন এবং সে সময় তাঁর শ্বশুর তাঁর সঙ্গে স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করেছেন।

মিসেস লী জুডা নিহত হবার আগে কতদিন ধরে ঠিক সেই ফরাসী প্রবাদ—'স্ত্রীলোক এক স্বামীতে খুশি থাকলেও এক প্রণয়ীতে খুশি থাকে না'—সার্থক করেছিলেন তা জানা গেল না। তবে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে নাসীম যখন নিজেকে লীর একক প্রণয়ী কল্পনা করে প্রেমে উন্মাদ হয়ে উঠেছিলেন, তখন তিনি এক সময় বুঝতে পারেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী জুটেছে। নিজের স্ত্রী হোক বা প্রণয়িনী হোক, প্রেমে প্রতিদ্বন্দ্বী জুটলে তাকে সহ্য করা কোনো হিব্রুর ধাতে নেই। এবং সে প্রতিদ্বন্দ্বীকে দূর করতে রক্তপাত করা তার স্বভাবসিদ্ধ। এমন অবস্থায় ঠাণ্ডা মাথা ইংরেজ বিবাহ বিচ্ছেদ আদালতে ধাওয়া করে, স্পর্শচেতন ফরাসী ব্যবহার করে তার সরু তরোয়াল—প্রতিদ্বন্দ্বীর দেহে বিঁধিয়ে দেয়। কিন্তু হিব্রু স্ত্রী বা প্রণয়িনীকে খুন না করা পর্যন্ত তৃপ্ত হয় না।

যাই হোক, এতক্ষণ আমরা সবতু তদন্তের ফলে যেটুকু জানতে পেরেছি তা বিবৃত করলাম। আসামীর বিরুদ্ধে যে সব প্রমাণ সংগ্রহ করা গেছে, তা সবই গৌণ প্রমাণ। এবারে, যে সব ঘটনা ও পরিস্থিতি এতক্ষণ বিবৃত করলাম, প্রমাণগুলি পরীক্ষার পর তা বিচার করব। আর এসব প্রমাণ প্রত্যেকটি প্রত্যেকটির সঙ্গে কিভাবে খাপ খায় তাও দেখব। আর সব শেষে দেখব তা থেকে কোন্ সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছনো যায়। আমি ধরে নিচ্ছি এই বিশ্লেষণ উচ্চপদস্থ পুলিস অফিসারগণ মনোযোগ দিয়ে পড়ছেন। কারণ তাঁদের সম্মুখে কোন জটিল কেস উপস্থাপিত হলে তাঁরা উল্টো দিক থেকে কিভাবে তার প্রমাণগুলি বিশ্লেষণ করতে হয় তা বোঝেন।

প্রথমে প্রশ্ন তোলা যাক—মিসেস লী জুডার হত্যাকারীরূপে আসামী নাসীম গাববয় যদি দোষী সাব্যস্ত হন, তাহলে এ কেস্ থেকে আমরা কি কি দেখতে পাব বলে আশা করতে পারি? তারপর দেখব প্রমাণগুলি তাঁকে অপরাধী প্রমাণ করার পক্ষে যথেষ্ট কি না। এ কেস্-এ দেখা যাচ্ছে যা আমরা দেখব আশা করছি, এবং যা দেখতে পাওয়া গেছে, এ দুয়ের মধ্যে একটা মিল আছে। আমরা আশা করব যে—

(১) যে-নাসীম একটি নারীকে একদা ভালবাসতেন তাকে তিনি একা খুন করবেন এটি প্রায় অসম্ভব। শেষ মুহূর্তে তাঁর মনে দুর্বলতা আসতে পারত, কাজেই এটা খুবই স্বাভাবিক যে, তিনি এ কাজে একজন সাকরেদ খুঁজেছেন।

অতএব আমরা নিহতা নারীর বিছানার পাশে দ্বিতীয় লোকের জুতো দেখতে পেয়েছি। আর পেয়েছি শার্ট থেকে ছেঁড়া একখণ্ড কাপড়—এবং এই শার্ট নাসীমের নয়।

দ্বিতীয় :—আমরা আশা করব তিনি এমন একটি লোককে তাঁর এই দুষ্কার্যের সহকারী বানাবেন, যে লোকটি তাঁর সমধর্মী, এবং চরম দরিদ্র, নাসীমের চেয়ে পদে খাটো, শক্তিশালী এবং রক্তপাতে অভ্যস্ত। এবং তার সঙ্গে তাঁর পূর্বে বোঝাপড়া হওয়া দরকার।

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি হত্যার আগে যে লোকটির সঙ্গে তিনি হত্যার ব্যবস্থা করেছিলেন তার স্বভাবচরিত্র এবং অন্যান্য বিষয়ে ঠিক আমরা যা প্রত্যাশা করি সেই মতো। এবং সেই লোকটির সঙ্গে আগে এক টেবিলে খেয়েছেন, একসঙ্গে বেরিয়ে গেছেন, একসঙ্গে ফিরে এসেছেন, প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনতে টাকা দিয়েছেন, এবং তাকে পোষাক দিয়েছেন। অথচ কেন, তার কোনো সদুদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

তৃতীয় :—যদি হত্যা হয়ে থাকে, তবে আমরা আশা করব, যে লোকটি ঐ বাড়িতে দিনে রাত্রে অবাধে যাতায়াত করতেন তিনি সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসবেন এবং যে লোকটি ও বাড়ির সবার অপরিচিত সে পিছনের দরজা দিয়ে যাতায়াত করবে।

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি, নাসীম সাধারণ সিঁড়ি এবং দরজা দিয়ে যাতায়াত করেছেন এবং তাঁর সাকরেদ গোপন পথে এসেছে এবং গিয়েছে, এবং এই কাজের চিহ্ন তার পোষাকে পাওয়া গেছে।

পিছনের দরজার পথে তার রক্তাক্ত পায়ের ছাপও দেখা গেছে। তারপর পাওয়া গেছে বাঁশের মৈ-এর দাগ।

চতুর্থ :—সাকরেদের উঠোনের দেওয়ালের উপর দিয়ে আসা যাওয়ার ব্যাপারে কিছু পূর্বপ্রস্তুতি দরকার, এবং আমরা তার প্রমাণ আশা করব।

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি, নাসীম তার চাকরকে সঙ্গে দিয়ে এজকিয়েলকে সে সার্কুলার রোডের মৌলালী-কা-দরগায় পাঠিয়েছে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে। হত্যার আগের দিন এটি ঘটেছে।

পঞ্চম :—আমরা আশা করব হত্যাকারী রাসায়নিকের সাহায্যে স্ত্রীকে হত্যার আগে অচেতন করার চেষ্টা করবেন, যাতে হতভাগীর কান্না বা আর্তনাদ কেউ না শুনতে পারে।

অতএব আমরা নাসীম ও এজকিয়েলকে কয়েকটি ওষুধের দোকানে একত্র যেতে দেখেছি, এবং আমরা সেই ক্লোরোফর্মের শিশিটি স্ত্রীর ঘরে পড়ে থাকতে দেখেছি।

ষষ্ঠ—নাসীম ক্লোরোফর্মের ক্রিয়া কিভাবে প্রকাশ পায় তা জানতেন না, কাজেই তিনি যে এই জিনিসটি আগে পরীক্ষা করে দেখবেন, এটা আশা করব।

অতএব দেখছি, সে ক্লোরোফর্ম তাঁরই বাড়ির একটি লোকের উপর পরীক্ষা করছেন, এবং বলেছেন এটি তিনি করছেন মজা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে।

সপ্তম :—আমরা আরও আশা করব —এই অপরাধী দুজন তাঁদের দুষ্কার্যের নানা চিহ্ন ফেলে যাবেন—যথা কাপড়-জাতীয় অথবা পরবার অন্য কিছু।

অতএব আমরা শার্ট ছেঁড়া একখণ্ড কাপড় এবং একজোড়া জুতো দেখতে পেলাম যে ঘরে হত্যাকাণ্ড ঘটেছে সেই ঘরেই। শার্ট-এর অংশটা এজকিয়েলের এবং জুতোজোড়া নাসীমের।

অষ্টম :—আমরা নিহত ব্যক্তির সঙ্গে লড়াই-এর চিহ্ন দেখতে আশা করব। এক্ষেত্রে যদিও লড়াই সমানে সমানে নয়, কারণ যাকে খুন করা হয়েছে সে স্ত্রীলোক, কিন্তু তবু লড়াই তো কিছু হবেই।

অতএব আমরা দেখছি, ওঁদের হাতে আঁচড়ের চিহ্ন আছে। হতভাগী মৃত্যুর আগে যে আত্মরক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন তারই চিহ্ন ওগুলি। তাঁর আঙুলের আংটি অথবা হাতের নখের। খাটের ধারে হাঁটুর ঘষা লাগলে যেমন ক্ষত হওয়া উচিত ঠিক তেমনি ক্ষতচিহ্ন দেখা গেল নাসীমের হাঁটুতে, আর এজকিয়েলের দেয়াল টপকানোর চিহ্ন দেখা গেল তার পায়ে।

নবম :—নাসীমের পোষাকে রক্ত-চিহ্ন আশা করব, এবং বাড়ি গিয়ে প্রথমেই তিনি সেই চিহ্ন ধোয়ার চেষ্টা করবেন, আশা করব।

অতএব দেখলাম নাসীম স্ত্রীকে হত্যা করে বাড়ি ফিরেই কাপড় ধুয়েছেন। ভিজে কাপড় তল্লাসীতে পাওয়া গেছে, রক্তচিহ্নও পাওয়া গেছে। ভিজে ফেজ টুপিও দেখা গেছে।

দশম :—নাসীম বা এজকিয়েলের কাছে আমরা হত্যায় ব্যবহৃত অস্ত্র পাবার আশা করব।

অতএব আমরা একখানা অস্ত্র (ছোরা) যা স্ত্রীর গায়ের ক্ষতের মতন ক্ষত করতে সমর্থ, স্ত্রীর ঘরে পেলাম এবং সে অস্ত্র নাসীমের, কিন্তু হত্যার দুতিন দিন পরে তা জানা গেল, অথচ তা তাঁর কাছে এখন নেই কেন তা বোঝা গেল না।

একাদশ :—নাসীম অপরাধ করে থাকলে মিথ্যা বলে অপরাধ ঢাকার চেষ্টা করবেন।

অতএব আমরা দেখলাম তিনি রাত ১০টা - ১০॥টার মধ্যে সবাইকে বেশ জানিয়ে শুনিয়ে বাড়িতে ঢুকেছেন, এবং পরে কাউকে না জানিয়ে গোপনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছেন। তারপর যখনই তাঁর উপর সন্দেহ পড়েছে, তখনই তিনি বাড়ির লোকদের ডেকে বলেছেন, তিনি সমস্ত রাত বাড়িতেই ছিলেন তারা সাক্ষী। তারা যেন পুলিসকে এ কথা বলে।

আমরা একটি বড় অপরাধের ইতিহাস রচনা করতে বসি নি। আমরা শুধু ডিটেকশন-কৌশলের একটি পাঠ চিত্রিত করলাম, অতএব যেখানে পুলিসের কর্তব্য শেষ হয়ে জজ এবং জুরির কর্তব্য আরম্ভ হল, সেইখানেই কাহিনী শেষ করলাম। (ক্রমশঃ)

আরণ্যক

বিশ্বেশ্বর সামন্ত

তালবীথি সারি সারি
দূরে কার পাড়া.
ঠিক যেন নিবিড় পাহারা।
ছায়া ফেলে শীতল-উত্তাপে,
ইথার-তরঙ্গগুলি কাঁপে।
একান্তে দাঁড়িয়ে তালবীথি ঘেরা বন,
খোলা মাঠে বায়ু খেলে উদ্ভ্রান্ত এখন।

তারের নতুন সংবাদে
আছে কি সন্ধান,
কথা বলা ইডেন উদ্যান?
এখনো আসে নি বুঝি ট্রেন,
ডাকবে গোপনে সাইরেন।
মেঠো পথ—হেঁটে গেছি বহুদূর,
একা পথে এসেছিল বাউলের সুর।

বিপ্লব প্রচেষ্টার একটি বিস্মৃত অধ্যায়

সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

'বিপদে মোরে রক্ষা করো,
এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখ তাপে ব্যথিত চিতে
নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।'

কবিগুরুর প্রার্থনার এই চরণগুলি রচিত হয়েছিল ২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৩১৪ সালে। অর্থাৎ এখন থেকে ৫৭ বছর আগে, ইং ১৯০৭-৮ সালের সময় বরাবর, যখন বাংলাদেশ সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনায় বোমা-পিস্তলের যোগাড়যন্ত্রে ব্যস্ত, আর তারই ফলস্বরূপ ঘাত-প্রতিঘাতের রেশ বাংলার চিত্তকে আলোড়িত করায় যুক্ত। এইরূপ আবহাওয়ার মধ্যেই বহুনিন্দিত ভেতো বাঙালীর ভিতর দিয়ে উনিশ শতকের শেষে ও বিংশ শতকের গোড়ায় যে সমস্ত বীরাঙ্গনার আবির্ভাব হয়েছিল, শ্রীমতী ননীবালা আর শ্রীমতী দুকড়িবালা তাঁদের মধ্যে অন্যতমা। ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিতে লিখেছেন —'১৯১৪-১৮ সালের বিপ্লব প্রচেষ্টা এনেছিল-----প্রথম নারী রাজবন্দী ননীবালা দেবী ও প্রথম নারী দণ্ডপ্রাপ্তা কয়েদী দুকড়িবালা দেবী।' (পৃঃ ৫৩)।

স্বাধীনতা যজ্ঞে উৎসর্গীকৃতা প্রাণ, বর্তমানে বিস্মৃতপ্রায় শ্রীমতী ননীবালা ও শ্রীমতী দুকড়িবালা দেবীর বিষয়ই এখানে এখন একটু আলোচনা করা হবে।

হাওড়া জেলার বালি অঞ্চলের অধিবাসী, পিতা সূর্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা গিরিবালা দেবীর স্নেহের দুলালী শ্রীমতী ননীবালার জন্ম হয়েছিল ২৪শে জ্যৈষ্ঠ

● প্রথম রাজবন্দী নারী শ্রীমতী ননীবালা দেবী।

১২৯০ সালে। তিনি ছিলেন উত্তরপাড়ার অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট আত্মীয়া, সম্পর্কে পিসিমা। সেই সূত্রে বিপ্লবী মহলেও তিনি পিসিমা বলেই পরিচিতা ছিলেন। পুলিশের গোয়েন্দারাও তাঁকে চিনেছিলেন পিসিমা বলেই। জীবনের সুরুতেই তিনি হয়েছিলেন বিপ্লবী দলের অন্তর্ভুক্তা অমরেন্দ্রনাথের দ্বারায়।

এইভাবে প্রথম দিকে তার কাজ ছিল বোম, রিভলবার, চিঠিপত্র ইত্যাদি বিপ্লবীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। ১৯১৬ সাল বরাবর বিপ্লবীরা যখন ক্রমানুয়ে চন্দননগরে আত্মগোপন করেছিলেন তখন তাঁকে যেতে হয়েছিল চন্দননগরে ঐ আত্মগোপনকারীদের আহার ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে। এই আভাস পাওয়া যায় পুলিশপুঙ্গব বসন্ত চ্যাটার্জীর হত্যাকারী দলের একজন, বিপ্লবী শ্রীপ্রবোধকুমার বিশ্বাসের কাছে কথা প্রসঙ্গে। যাই হোক, চন্দননগরে থাকার সময়ে গোয়েন্দারা ননীবালারও অনুসন্ধান আরম্ভ করে। তখনি তিনি কাশীতে গিয়ে আত্মগোপন করেন হরিদাস ভট্টাচার্যের বাড়িতে, কাশীর সোনারপুর নামক স্থানে, তারই কোন আত্মীয়ের কাছে।

অতঃপর গোয়েন্দা জীতেন ব্যানার্জী যখন কাশী পর্যন্ত তাঁকে ধাওয়া করেন, তখন ননীবালা আবার কলকাতায় ফিরে এসে হরীতকী বাগান লেনে ওঠেন তাঁর এক বান্ধবী শ্রীমতী সুবর্ণবালা ঘোষের বাড়িতে। এই বান্ধবীর স্বামী ছিলেন একজন পদস্থ সরকারী অফিসার। শ্রীমতী সুবর্ণবালার দুটি ভাইও (ডাকনাম ধনু আর মনু) সেই বাড়িতেই থাকতেন, আর কাজ করতেন কলকাতার জেনারাল পোস্ট অফিসে। এই ভাইয়েদের মধ্যে একজন, তথা ধনু

পরে পেশোয়ার জেনারাল পোস্ট অফিসে বদলি হন। তখন বান্ধবী সুবর্ণবালার ইচ্ছামত ননীবালাও সেই ভাইয়ের সঙ্গে পেশোয়ারে চলে যান দিদি হিসাবে। পথে তিনি একবার কাশীতে নেমেছিলেন পূর্বে পরিত্যক্ত কিছু গরম কাপড়-জামা নেওয়ার জন্য। এই সময় সেই বাড়ির অপর কোন ভাড়াটিয়া পুলিশে খবর জানিয়ে আসেন, ননীবালার বিষয়। শেষে উপরোক্ত গোয়েন্দা জীতেন ব্যানার্জী কাশী অধিবাসী সেই বাঙালীটির সহায়তায় পেশোয়ারে গিয়ে ননীবালাকে গ্রেপ্তার করেন। গ্রেপ্তারের দিন থেকে ননীবালা অনশন সুরু করেছিলেন, ব্রাহ্মণের হাতে ছাড়া খাবেন না, এই বলে। উক্ত অবস্থায় তিন দিন পেশোয়ার হাজতে, আর দু' দিন কাশীর হাজতে অবস্থানের পরে তাঁকে নিয়ে আসা হয় আলিপুরের জেল হাজতে। ননীবালার কাছে শোনা, গ্রেপ্তারের দিন থেকে তিনি অনাহারে ছিলেন দীর্ঘ ২২ দিন ধরে। এই সময় নিজের হাতে দু-তিন খাঁচলা জলপান ছাড়া আর কিছু তিনি খান নি। অতঃপর ৬ষ্ঠ দিনে পুলিশ তাঁকে নিয়ে হাজির করে স্পেশাল ডেপুটি সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিশ মিস্টার গোল্ডির সামনে। প্রশ্নবাদের সময়ে মিস্টার গোল্ডি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন—এখন কোথায় থাকবেন ?

উত্তরে ননীবালা বলেছিলেন—উদ্বোধনের মা-ঠাকরুণের কাছে আমি থাকতে চাই। কারণ ননীবালারই উক্তি—মা-ঠাকরুণের তথা শ্রীশ্রীমা সারদামণির কাছে তাঁর যাতায়াত ছিল শৈশব থেকেই।

অতঃপর মিস্টার গোল্ডিরই নির্দেশে এই কথা যখন তিনি তাঁকে লিখে দেন, মিস্টার গোল্ডি সেই লেখা কাগজটি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। এই ব্যাপারে ননীবালা তখন রাগে ও অপমানে এতই উত্তেজিতা হয়েছিলেন যে, তিনি তখন সজোরে মিস্টার গোল্ডির গালে এক চড় বসিয়ে দিয়ে বলে ওঠেন—তবে আমাকে লিখে দিতে বল্‌লি কেন ? পরক্ষণে গোল্ডির অপর গালে আর একটি চড় বসাবার জন্য যখন তিনি উদ্যত, গোল্ডি তখন অপমানে নিজ গালে হাত চাপা দিয়েছিলেন আর উপস্থিত অপর অফিসাররা তাঁকে 'পিসিমা চলে আসুন' বলে ঘরের বাইরে নিয়ে গিয়েছিলেন।

তারপরেই ননীবালা রাজবন্দী হয়ে কয়েক বছর আলিপুর ইত্যাদি জেলে আটক হন। পুলিশ তখন এই অনশনক্লিষ্টা রমণীকে খাওয়াবার জন্য ব্যস্ত। বিশেষভাবে প্রশ্নোত্তরে একাধিকবার ননীবালা বলেছেন—বন্দী অবস্থায় পুলিশ কখনই তাঁর উপর কোনরূপ শারীরিক নির্যাতন করে নি।

শ্রীগঙ্গানারায়ণ চন্দ্র লিখিত 'অবিস্মরণীয়' নামক পুস্তকে দেখা যায়—'কাশীর ডি এস পি জীতেন ব্যানার্জীর নির্দেশে তাঁকে বিবস্ত্র করে খানিকটা লঙ্কা বাটা শরীরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েও তাঁর কাছ থেকে কোন কথা বার করতে পারলে না পুলিশ। পুলিশের অত্যাচারের প্রতিবাদে তিনি রইলেন ২০ দিন অনশনে। (পৃ-৬৫, ৬৬)।' এই সম্পর্কে আমরা লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। যাই হোক পূর্বোক্ত অবস্থায় আলিপুর জেলে রাজবন্দিনীরূপে অবস্থানকালে শ্রীমতী ননীবালার দৃষ্টি প্রথমেই পড়ে সব আদর্শে উদ্বোধিত-প্রাণ শ্রীমতী দুকড়িবালার দিকে। দুকড়িবালা তখন একই কারাগৃহে নিচের তলায় সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করছিলেন। অপরদিকে পুলিশ কর্তৃপক্ষের ননীবালাকে আহার গ্রহণের জন্য বারবার অনুরোধের কথা আগেই বলা হয়েছে। এইবারে ননীবালা ব্রাহ্মণ রমণী দুকড়িবালাকে দেখিয়ে দেন পূর্বোক্ত রন্ধন কাজের জন্য। ফলে জেলের মধ্যে পুনর্মিলন হয়েছিল দুটি মহীয়সী বিপ্লবী নারীর কয়েক বছরের জন্য। ধন্য ননীবালা আর ধন্য দুকড়িবালার বিপ্লব মন্ত্র ! যেন দুটি সহোদরা, ছোট বোনটি তাঁর দিদির জন্য হয়েছিলেন রন্ধনে নিযুক্তা। এইবারে তাকানো যাক দুকড়িবালার দিকে।

১৯১৭ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবারের অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশ—

Trial under Defence of India Act.

'The Governor in Council directs that the following persons namely—(1) Nibaran Chandra Ghatak son of Indra Narayan Ghatak of Searsol, Ranigunj, Burdwan, (2) Dukuribala Debi, daughter of Nilmoni Chatterjee of Jhaopara, Nalhati, Birbhum, who are accused of offences punishable under Section 20 of the Act XI of 1878 shall be tried by Commissioners appointed under the said Act....of 1915"—বিচারের শুনানীর জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন—

(1) Mr. W N. Delevinge, I. C. S.. District and Sessions Judge, Midnapore—President : (2) Babu Syama Charan Chakraborty, Sub. Judge, Midnapore : (3) Babu Atul Behari Sinha, Pleader and Vice Chairman, Midnapore District Board—Members

তবে এই গ্রেপ্তারের সূত্র ছিল অনেক গভীরে। কোন গুপ্ত খবরের মাধ্যমে পুলিশ ১লা ডিসেম্বর, ১৯১৬ সালে চন্দননগরের গোন্দলপাড়া অঞ্চলে ক্ষেত্রমোহন ব্যানার্জীর বাড়িতে খানাতল্লাস করে রডা কোম্পানীর লুণ্ঠিত অস্ত্রের তিনটি পিস্তল পায় এবং একটি বত্রিশপাতা চিঠিও তাদের হস্তগত হয়। এই চিঠিতে তখনকার বিপ্লবীদের গুপ্ত কার্যধারার কথাও কিছু কিছু নাকি লেখা ছিল। এই চিঠি থেকেই পুলিশ জানতে পারে যে, বীরভূম জেলার অজয় নদীর ধারে বিপ্লবীদের গুপ্ত সমিতির কিছু কিছু লোকের অবস্থান আছে। *

পিতা নীলমণি চট্টোপাধ্যায় ও মাতা কমলকামিনীর একমাত্র জীবিতা সন্তান দুকড়িবালার জন্ম হয়েছিল ৬ই শ্রাবণ ১২৯৪ সালে। নীলমণি

* The Statesman Saturday 10.3.1917.

চট্টোপাধ্যায়রা ছিলেন তিন ভাই আর তাঁদেরই জ্যেষ্ঠ উপেন্দ্রনাথের কন্যা মৃগনয়নার জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন নিবারণচন্দ্র ঘটক। এই হিসাবেই দুকড়িবালা ছিলেন নিবারণচন্দ্রের মাসীমা। নিবারণচন্দ্রের সম্ভবত বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা হয়েছিল অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের দ্বারায় হুগলী কলেজে ছাত্রাবস্থায়। আবার দুকড়িবালার বিপ্লবী-জীবনের সঙ্গে পরিচিত লাভ নিবারণচন্দ্রের দ্বারায় এবং এই নিবারণচন্দ্রই ক্রমে দুকড়িবালার যোগাযোগ ঘটিয়েছিলেন বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী প্রমুখ বিপ্লবীদের সঙ্গে। আর নিবারণচন্দ্রের সম্পর্ক অনুসারেই বিপ্লবীরা সকলেই তাঁকে ডাকতেন মাসীমা বলে।

শৈশবে দুকড়িবালা ছিলেন একজন মেধাবিনী ছাত্রী এবং এগার বছর বয়সে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় তিনি ২৲ টাকা বৃত্তিলাভও করেছিলেন। অতঃপর তখনকার রীতি অনুসারে এগার বছর বয়সেই তাঁর বিবাহ হয়েছিল উক্ত ঝাউপাড়া গ্রামের প্রতিবেশী ও পনের বছরের বালক ফণিভূষণ চক্রবর্তীর সঙ্গে। আবার বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় স্বামী ফণিভূষণের চরণ স্পর্শ করে দুকড়িবালার স্বদেশী মন্ত্রে শপথ গ্রহণ হয়েছিল সব প্রথম। ১৩১২ সালের ১১ই চৈত্র, অর্থাৎ ১৮।১৯ বছর বয়সের সময় নিবারণচন্দ্র তাঁর মাসীর দেশাত্মবোধের আভাস পান এবং ১৩১৪ সালে দুকড়িবালা বৈপ্লবিক কাজে বিপ্লবীদের সহায়তা করার সঙ্কল্প নেন। এইভাবেই ইং ১৯১৫ সালের শীতকালে নিবারণচন্দ্র একটি ব্যাগে ভরা দুটি মশার পিস্তল ও কিছু বুলেট তাঁর মাসীর কাছে এসে প্রথম রেখে যান। আবার কয়েকদিন বাদে অস্ত্রভরা দুটি স্টিল ট্রাঙ্ক এনে তাঁর ঐ বিপ্লবী মাসীর হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন সযত্নে রক্ষা করার জন্য। তারপর বিপ্লবীদের অস্ত্রের আনা নেওয়া চলতে থাকে দুকড়িবালার সঙ্গে ক্রমানয়ে।

দুকড়িবালার নিজের উক্তি—'আমার কাছে ছিল ৭টি।—৪টি থাকত ট্রাঙ্কে, ২টি থাকত কাপড়ের বাক্সে, আর একটি থাকত বালিশের তলায়। আমি তখন সক্রিয় অংশ গ্রহণে বদ্ধপরিকর---

---প্রাথমিক অনুষ্ঠান হিসাবে গ্রামের উত্তরভাগে ত্রিপুতা নদীর পাড়ে লক্ষ্যভেদ অভ্যাস করি। —আমার সেই সঙ্কল্প ও সাধ পূর্ণ হয় নি।' প্রকাশ এইভাবে সঙ্কল্প ও সাধ মেটাবার জন্য একাধিক শিশুসন্তানের জননী ও বিংশশতকের প্রথম বাঙালী মহিলা টারগেটিং অভ্যাসে নিযুক্তা হয়েছিলেন ১৯১৬ সালের কোন সময়ে।

● প্রথম দণ্ডপ্রাপ্তা নারী কয়েদী শ্রীমতী দুকড়িবালা দেবী

'On January 8th the police simultaneously searched the house of the accused and found two steel trunks containing five revolvers and 1,132 cartridges and one revolver case....in the house of Surodhuni Molyani....Dukodi Devi and Surodhuni Molyani were arrested....' *

উক্ত সুরধুনী মলিয়ানী (তথা মওালিনী) ছিলেন দুকড়িবালার প্রতিবেশী সুহৃদ। ৮ই জানুয়ারী ১৯১৭ সালের ভোরে রাত ৪টায় আন্দাজ পুলিশ দুকড়িবালার গৃহে হানা দেয়। এই সময় ভিথি পুরুষদের ডাকার অজুহাতে বাড়ির নাহিন্দার পাঁচকড়ি বেটের সাহায্যে ঐ বন্দুক ও কার্তুজের ট্রাঙ্ক দুটি সুরধুনীর গৃহে স্থানান্তরিত করেন। অতঃপর খানাতল্লাসীর সময় পুলিশ দুকড়িবালার গৃহে কিছু না পেয়ে হতাশ হয়ে যখন প্রত্যাবর্তনে উদ্যত সেই সময় গ্রামের লোকেই পুলিশকে জানিয়ে যায় তাঁর সুহৃদ সুরধুনীর নাম। এইভাবেই দেখা যায় দেশের লোকের মধ্যেই নানারূপ দুর্বল কর্মতার আবির্ভাব সেদিন বিপ্লবের অন্তরায় হয়েছিল সর্বাধিক। অতঃপর পুলিশ সুরধুনীর গৃহে খানাতল্লাসী করে 'হিপ হিপ হুররে' দিয়ে বেরিয়ে আসে সেই ট্রাঙ্ক দুটি হস্তগত করে।

তারপর বিচারের তাণ্ডব। ৮।১।১৭ তারিখের সন্ধ্যায় দুকড়িবালাকে সশস্ত্র পুলিশ প্রহরায় নিয়ে যাওয়া হয় নলহাটি থানায়, সঙ্গে সুরধুনী মওালিনী, আর ৯।১।১৭ তারিখে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় রামপুরহাট এস-ডি-ওর কোর্টে। অতঃপর বন্দুক প্রহরায় তিনি স্থানান্তরিত হন সিউড়িতে, আর বিচার চলে স্পেশাল ট্রাইবুনালের সামনে ৯।৩।১৯১৭ তারিখ পর্যন্ত। সুরধুনী পরে মুক্তি পান আর দুকড়িবালা ও নিবারণচন্দ্রের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয় যথাক্রমে দু' বছর ও পাঁচ বছর। এইভাবেই দুকড়িবালা ১২।৩।১৯১৭ তারিখে আবার স্থানান্তরিত হয়েছিলেন প্রেসিডেন্সী জেলে। শেষে দীর্ঘ দু' বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগের পর আবির্ভাব হয়েছিল ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯১৮ সালের সুপ্রভাত, দুকড়িবালার মুক্তির দিন।

দুকড়িবালা গৃহে ফিরেছেন কিন্তু চতুর্দিকের আবহাওয়া তাঁর কাছে কেমন যেন থমথমে লেগেছিল।

---

* Amrita Bazar Patrika 10.3.1917.

দেখতে দেখতে শুরু হয়ে যায় পারিবারিক মতবিরোধ। দুকড়িবালার ভাষায়—'১৯২০ সালের আশ্বিনে আমার মত ও পথ নিয়ে মতদ্বৈধতার ফলে স্বামীর সাথে ছাড়াছাড়ি হল।'

বিংশ শতাব্দীর সীতার বনবাসই ঘটে। কিন্তু যেহেতু এটা বিংশশতকের ব্যাপার, কাজেই সতীসাধ্বী সীতা দুকড়িবালা তাঁর পুত্র কন্যা সহ নির্বাসিতা হয়েছিলেন পিতৃগৃহে। বাংলার প্রথম নারী দণ্ডপ্রাপ্তা কয়েদীর অন্তর্বেদনা—'সংসারের নানারূপ নির্মম ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে সরে এসেছি বিপ্লবের রাজ্য থেকে। দেশের কিছুই করতে পারি নি, তবে চেষ্টা করেছি, সে চেষ্টায় কোন খাদ ছিল না।' পুত্রশোক, মনস্তাপ, প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে সরকারের নজর ইত্যাদি বিবিধ কারণে জর্জরিতা এই বীরাঙ্গনা রমণী এখনও তাঁর পিতৃগৃহেই অবস্থান করেন: পূজা, ধ্যান, গীতা, চণ্ডী এই নিয়ে বিভোর।

আর বাংলার প্রথম নারী রাজবন্দী শ্রীমতী ননীবালা থাকেন কলকাতারই বুকের ওপর বোসপাড়ার একটি সরু গলির মধ্যে এক ভাড়াটে ঘরে। তিনি এখন সাধুমা নামে পরিচিতা। শ্রীমতী ননীবালার মুখের কথা—'আমি আজ গত চল্লিশ বছর যাবৎ বোসপাড়ার এই ভাড়াটে ঘরেই জীবন কাটাচ্ছি নিঃসঙ্গ অবস্থায়। সারদা মঠ, ত্রিগুণানন্দ মঠ ইত্যাদিতে ঘুরে বেড়াই, তবে বেলুড় মঠে এখন আর ওরা আমাদের পোঁছে না।' প্রসঙ্গত ননীবালা ৫ই ডিসেম্বর ১৯৬৪ তারিখে লেখককে জানিয়ে ছিলেন—'যে স্বাধীনতার জন্য আমরা জীবন উৎসর্গ করেছিলাম বর্তমানে দেশের সেই স্বাধীনতার রূপ দেখে মনে ধিক্কার জাগে।'

হায়! আত্মভোলা বাংলা দেশ, কে বা এঁদের খবর রাখে। একথা সত্য—কীর্তি তাঁরা চান নি, প্রতিপত্তি চান নি, চেয়েছিলেন কেবল দেশের মুক্তিকল্পে মানুষের শেষ সম্বল, জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে নিঃসঙ্কোচ আত্মবিলুপ্তি। পরাধীনতার সর্বব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে আবির্ভাব হয়েছিল এই সমস্ত নারীর, আর এই জাতীর কত কঠোর নিভৃত তপস্যার ভিতর দিয়ে "দেখা দিয়েছিল বর্তমান স্বাধীনতার ক্ষীণ আলোকরশ্মি, আজ তার হিসাব-নিকাশের সময় এসেছে। বিপ্লববাদের উজ্জ্বল অধ্যায়গুলির কিছু কিছু ইতিহাসের স্বাভাবিক ধারার ভিতর দিয়ে হয়ত আমাদের কানে এসেছে, কিন্তু তার পেছনে যে অন্ধ রাত্রির নিভৃত তপস্যা সেই প্রচেষ্টার আত্মপ্রকাশে সহায়তা করেছিল, উপরোক্ত দুটি চিত্র তারই সামান্য উদাহরণ। জানি না, বর্তমান দেশবাসীর তথা বর্তমান স্বাধীন রাষ্ট্রের কাছ থেকে আজ তাঁদের কি প্রাপ্য। আমরা এখন বিংশশতকের এই দুটি প্রথম বীরাঙ্গনার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার নিবেদন জানাই।

কালো চশমাটা

আবদুল মজিদ

সুলোচনা, খুলে ফেলো কালো চশমাটা
এখনো পৃথিবী দ্যাখো ভীষণ সবুজ।
অনন্ত সূর্যের স্রোতে পড়ে নি তো ভাঁটা,
সকল কাচের প্রেমে হ'য়ো না অবুঝ।

অতোই ঘোরাও তুমি কম্পাসের কাঁটা,
কেঁপে কেঁপে থেমে যাবে ঠিক সে উত্তরে।
নীরব মৃত্যুর নীল তীব্র বেদনাটা
কোনদিন আয়নায় দেখেছো নজরে?

সমুদ্রের নীল আর নীলিমার সোনা
দিগন্তে রঞ্জিত করো সপ্তবর্ণ রঙ;
কাচের দেয়াল তুলে হৃদয় ঢেকো না,
ডুবে যেয়ো আলোকের তরঙ্গে বরং।

খুলে দাও হৃদয়ের সবজান্তা-দ্বার,
কতো নাচে ঝঞ্ঝা-মত্ত সমুদ্র-জোয়ার।

বুড়ো খোঁজে গ্রাম

শ্রীতারক সেন

লাঠিতে লণ্ঠন বেঁধে দিনরাত ঘোরে এক বুড়ো।
দিনের স্ফটিকে দেখে তান্ত্রিকের দীক্ষিত আঁধার।
প্রলাপের ন্যায়সূত্রে করে দেশ-কালের বিচার।

'বাণিজ্যে বিপন্ন বুদ্ধি। নগরীর বৃন্ত নিরালোক।
ছেলেমেয়ের মত দিনে দিনে বাড়ে শুধু শোক।
উদ্বাস্তু শুভবুদ্ধি খোঁজে এক আত্মীয়ের গ্রাম
যেখানে হায়না হাটে মানুষের আত্মার নীলাম।'

বুড়ো খোঁজে স্বদেশের বৃত্তে সেই গ্রাম—
কি তার যে নাম?

আঁধার মানিক

ধারাবাহিক উপন্যাস

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ আটাশ ॥

'কাল পঞ্চাশ সনের কথা ভুলো না পেরাণ
(কাল বর্গী) জীয়ন্তে হরে নিল লক্ষ
চাষীর মান
পলুর ক্ষেতে বাঁধা ছিল মুর্শিদাবাদের মান'

এ-গান পরে শতাধিক বর্ষ ধরে মুর্শিদাবাদের পলু চাষী গেয়েছে। এ গানের উদ্ভব সেই এক সর্বনাশা দিনে, পঞ্চাশ সনের বৈশাখে, যেদিন মলহর রাও, শিসরাও ভাস্কর পণ্ডিতের দুই সর্দার হাজার হাজার ঘোড়সওয়ার এনে মুর্শিদাবাদের রেশম-কুঠির সংলগ্ন পলু ক্ষেতে ছেড়ে দেয়। ঐ পলু ক্ষেতে সেদিন বাংলার বস্ত্র-গৌরব অস্ত গেল।

বেঁচে রইল শুধু গান।

এ গান গায় হাটের বাউল, মাঠের মানুষ, নৌকোর মাঝি। সন্ধ্যেবেলা পিদীমের আলোয় বসে বুড়ি দিদিমা নাতি-নাতনীকে ভুলিয়ে রাখে গানে গানে। যারা শোনে তারা বলে 'তোদের গানে শুধু দুঃখ আর কান্না।'

যেমন বক্সী দেওয়ান একদিন স্বরকণ্ঠকে বলেছিলেন, 'খালি দুঃখ, কান্না আর চোখের জল। এ নিয়ে কেউ গান বাঁধে?' কথা হচ্ছিল কিরীটেশ্বরীর মন্দিরের চাতালে বসে। বক্সী দেওয়ানের ভাগ্য তখন আরো ফুলে ফেঁপে উঠেছে। দেবতাকে সন্তুষ্ট করবার এই ত সময়। তাই বৃদ্ধ বক্সী দেওয়ান মন্দিরে এসেছিলেন শ্যামাপূজার দিনে। সেদিন আবার মন্দিরে সন্ন্যেসী বাউলের ভিড়।

'এত ভিড় কেন?' বক্সী দেওয়ানের নকীব হেঁকেছিল।

'ভিড় ত আজকে হবেন গো।' আরো জোরে হেঁকে জবাব দিয়েছিল এক বৃদ্ধ বাউল।

'কেন, ভিড় হবে কেন? তো বেটারা মন্দিরে ভিড় করতে দিন পেলি না আর?'

'সে কথা যদি বলেন তবে আমরা বলব মায়ের কাছে ছেলে আসবে তার আবার দিন অদিন কি?'

আর একজন অতিবৃদ্ধ বাউল হেসে হেসে বলেছিল, 'ওদের চেটাং চেটাং কথা শুনবেন না মশায়, আমি সত্যি কথাটা বলি। আজ মুর্শিদাবাদের সিদ্ধপুরুষ সাধু আলানাথের তিরোভাব তিথি। তিনি আমাদের সবায়ের গুরুর গুরু। এইখানটিতে দেহ রেখেছিলেন তিনি। তাই আজ সবাই আমরা এখানে আসি। সাধু, সন্ন্যেসী, পীর-ফকির-বাউল-বৈরেগী সবাই ভিক্ষের অন্ন এক করে আলানাথের সন্তানদের ভোগ দিই। দেখুন না কেন, খেতে বসেছে সব?'

দেখে শিউরে উঠেছিলেন বক্সী দেওয়ান, তাঁর সঙ্গীসাথীরা সবাই। সারি সারি পাতা পেতে বসেছিল কুষ্ঠী, রোগী, অন্ধ আতুর।

অতিবৃদ্ধ বাউল হেসে বলেছিল 'দেখে ভয় পাবেন যিনি, তাঁরই মরণ।

হাসিমুখে করে দেখেন আপনারা। আলানাথের সন্তান এঁরা, মহাব্যাধি যাঁদের, তাঁদের কোল দিয়েছিলেন তিনি, তাঁদের সেবায় পুণ্যদেহ ক্ষয় করেন। মন্ত্র পড়া গাছ ছিল তাঁর, তাতে চেপে চলে যেতেন বাউলদের কেঁদুলী মেলায়, ফকিরদের নিত্যপুরের দরগায়, সন্ন্যেসীদের গাজনতলায়। সকলকে বাঁচাতেন আপদে-বিপদে, নিত্যপুরের দরগার থানটি প্রলয় ঝড়ে ত' তিনিই বাঁচালেন। বলে গেলেন—বাবা সকল, তোমরা সবাই সেই একজনের সন্তান। তাঁর হাতের পাঁচটি আঙুল। সেই কথাটি স্মরণে রেখে একটা দিন সবায়ের ভিক্ষের অন্ন এক করে আমার সন্তানদের ভোগ দিও। কেন, আপনাদের সঙ্গে আমার চেনা মানুষ আছেন যে, তিনি জানেন সব। এক সময়ে আমাদের ভোগ রেঁধেছেন, গান বলেছেন কত।'

সুরকণ্ঠ অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন 'তুমি সেই বাউল? আমার কাছে কাটোয়ার মাটি চেয়েছিলে না।

'হ্যাঁ ঠাকুর?' বৃদ্ধ হাসিতে লুটোপুটি খেয়েছিল। তারপর বলেছিল 'তখন তোমার বয়স কম, পাগল ছিলে। আমার কাছে কত কথাই না শুনেছিলে অজয়ের জলে পা ডুবিয়ে বসে।'

'হ্যাঁ। তুমি আমায় বলেছিলে মনের ভেতর মন থাকে, তাকে বলা হয় ভেতর মহলের পাহারাদার। হৃদকমলের ভোমরাটি। পদ্ম মুড়ে থাকে তাই টের পাও না। পাপ কাজ করতে গেলেই ব্যথায় ভোমরা গুনগুনিয়ে ওঠে, তখন সমঝে যাও।'

'সব মনে আছে ঠাকুরের।'

'সব।'

'তারপর থেকে ত' দেখছি তোমার বদল হয়েছে খুব। পরনে দিব্য কাপড়, রাজাগজার সঙ্গ কর, তা আলানাথের সন্তান সেবার কথা ত' অজানা নয় তোমার। মা গঙ্গা জানেন সব, এই একটি দিনে আমরা সবাই এক হয়ে ভিক্ষার অন্নে কাঙালীকে ভোগ দিই। এমন দিনে ওঁদের আনলে কেন? আর এনেছ যখন, ওঁদের বল মন তুষ্ট করে ভোগ পূজো দিয়ে চলে যাও।'

একজন আধা ক্ষ্যাপা ফকির গর্জে উঠেছিল, 'নয়তো নিজেরাই খেয়ে যাও গে যা এনেছ।'

তারপর সে গান গাইতে সুরু করে দিয়েছিল—

'কাল পঞ্চাশ সনের কথা ভুল না পেরাণ
পলুর ক্ষেতে বাঁধা ছিল মুর্শিদাবাদের মান।'

বড় অপ্রস্তুত হয়েছিলেন সুরকণ্ঠ। মনে হয়েছিল কেনে যেন সম্মানের উপঢৌকন বত। চীৎকার করে বলেন, 'হঠাৎ এসেছিলাম, তাই এঁদের সঙ্গে এসেছি। নইলে আমি থাকি দূরে, নির্জনে, নিজের সঙ্গে।'

কিছুই বলতে পারেন নি। গান শুনেছিলেন মন দিয়ে। বন্দীদেওয়ান বলেছিলেন, 'গান মানে শুধু চোখের জল, দুঃখ আর কান্না।' উসখুস করে উঠেছিলেন। বলেছিলেন, 'পূজো-পাট সার বাপু। ভাল লাগছে না আমার।'

সুরকণ্ঠ বলেছিলেন, 'যারা এ গান বাঁধে তাদের জীবনে শুধু দুঃখ আর চোখের জল ছাড়া কিছুই নেই যে।'

বৃদ্ধ বাউল বলেছিল, 'কংস রাজার দুঃখকষ্টের কারাগারে দেবতা জন্মান, আমরা সামান্য মানুষ, দুঃখকষ্টে আমাদের প্রাণে গানের জন্ম যেন তিনি, যিনি সকলের ওপরে।'

সুরকণ্ঠ অবাক হয়ে ভেবে দেখেছিলেন কথাটি বড় সত্যি। দুঃখকষ্ট, নিদারুণ যন্ত্রণার ঘটনাগুলোকে এরা গানে গানে জিইয়ে রাখে। বৃদ্ধের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।

এ গান জন্মায় কাল এগারো শ' পঞ্চাশ সনের বৈশাখে।

মুর্শিদাবাদে, সৈদাবাদে, খাগড়ায় সেদিন আতঙ্কের ঝড় বয়ে গেল।

বারাণসী বসাক, হীরালাল শেঠ, আজিম কাশ্মীরী, নগরের প্রধান বস্ত্রব্যবসায়ীরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন যেন।

নবীন সাধু শঙ্খবণিক সমাজের মাথা। তাঁর সম্প্রদায় সময়ে সাবধান হতে পেরেছিলেন। টাকা-পয়সা বিশেষ ক্ষতি হয় নি। তিনি বললেন, 'মশায়েরা বড় বেশি কাতর হচ্ছেন। জগৎ শেঠ আনন্দচাঁদ অবধি রেহাই পেলেন কি? সবাই বলছে তাঁর দু'কোটি টাকা লুঠ হয়ে গেছে। আপনাদের ক্ষতি সে তুলনায় আর এমন কি?'

এ-কথা শুনে বারাণসী বসাক বড়ই জ্বলে উঠলেন। তাঁর গলায় যে সোনা ও রুদ্রাক্ষের জপমালাটি থাকে সেটি ধরে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন যেন ঐ মালাটি ব্রাহ্মণের পইতে, ওটি ছুঁয়ে তিনি নবীন সাধুকে শাপ দিচ্ছেন। তাঁর শীর্ণ শরীরটি কাঁপতে থাকে, চোখ লালচে হয়, তিনি বলেন, 'বড় বেশি কাতর হচ্ছেন মানে? এ কথার অর্থ কি? আপনার কথা বড় চোটাং চোটাং, বুঝলেন মশায়।'

'কেন, আমি অন্যায়টা কি বলেছি?'

'আপনার কি! এখানে সুবিধে না হলে বড়গাও পেরিয়ে স্বদেশে যাবেন। তা ছাড়া এখনো হাসতে পারছেন, কেন না শাঁখারীপটির ওপর দিয়ে তেমন ঝড় যায় নি। কিন্তু আমি বলে রাখছি আবার আসবে ওরা। তখন দেখবেন এই রাধার ঘাটের তীরে গঙ্গার কাদায় গড়িয়ে গড়িয়ে মুর্শিদাবাদের শাঁখারী, বসাক, কাঁসারী আমাদের সকলকে কাঁদতে হবে।'

আজিম কাশ্মীরী অদূরে চিন্তামগ্ন মুখে বসেছিল। সে আস্তে আস্তে বললে, 'জগৎ শেঠ আনন্দচাঁদের সঙ্গে কার কথা? কুঠির সায়েবরা বলছে বর্গীরা না কি যে পরিমাণ টাকা নিয়ে গেছে, তা কোন না দু'তিন কোটি হবে। তা যদি বিলেতী, ফরাসী, আলিমান, ওলন্দাজ বা হার্মাদ কোন রাজার যেত, তবে লোকসান সামলাতে পারত না। একদিনে রাজ্য লাটে উঠত।

এঁদের কথা আলাদা, আজও হাজার লোক পাত পাতে সেখানে।'

'তাঁদের সঙ্গে আমাদের কথা?' বারাণসী বসাক আবার ক্ষেপে উঠলেন, 'এদিকে বর্গীরা পলুক্ষেত ঘোড়া দিয়ে খাওয়ালে, রেশম পোকার চাষ নষ্ট হল, চাষীরা ভয়ে কোথায় পালিয়ে প্রাণ বাঁচালে তার হিসেব নেই, এটা একটা সর্বনাশ নয়?'

এখন হীরালাল শেঠ হাত তুলে বারাণসী বসাককে থামালেন ও আস্তে আস্তে কথা বলেন। তাঁর কণ্ঠ ধীর স্থির, বিশেষ বিচলিত নন। এ ঘরের বিক্ষুব্ধ আবহাওয়াকে তিনি শান্ত করেন। বলেন, 'বারাণসী বসাক মহাশয় ঠিক কথাই বলেছেন। পলুর চাষ ক্ষতি হলে সমূহ ক্ষতি।'

'আমি কি সেটি অস্বীকার করেছি।'

'ভেবে দেখুন, পলুর চাষ মানে রেশমের কাপড়। আজো বাংলা-দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকার কাপড় বাইরে যায়। সূতীবস্ত্রে অত লাভ হয় না মশায়, রেশম কাপড়ে লাভ জেয়াদা। তসর, গরদ, কেঠে শুধু নয়, আসাম থেকে মুগা, এণ্ডির কারিগর অবধি আনিয়েছি আমরা এবং হাজার হাজার টাকার কাপড় বাইরে চালান দিই।

'দাদন দেওয়া থাকে তাঁতিদের কারিগরদের। পলুচাষীদের খানজমি দেওয়া আছে। আমাদের লোকজনরা সর্বত্র ব্যবসা করে, দিল্লী, আর্কট, উড়িষ্যা, গুজরাট, কাশ্মীর, দক্ষিণে দ্রাবিড়, কঞ্জীভরম, উত্তরে নেপাল, তিব্বত, ভোট দেশ, চীন, মঙ্গোল, আসাম, কামরূপ, দ্বারকাধাম, হরিদ্বার।

'সব দেশের মহাজন কারবারী টাকা লগ্নী করে রাখে ব্যবসায়ে, বর্গীরা পলুর চাষ খাওয়ালে তাতে মস্ত বড় ক্ষতি, দেশে দেশে বাংলার ঠাঁই নড়ে যাবে, রেশম না পেলে তারা অন্য দেশ হতে কিনবে।'

এ-কথা বলে হীরালাল শেঠ ক্ষণকাল চুপ করেন। তাঁর চোখে ভাসে বণিক বাংলার ছবি। বাংলা দেশ কোন বিচ্ছিন্ন ভূ-খণ্ড নয়, ভারতের অন্যান্য দেশের সঙ্গে একসূত্রে তাকে গেঁথে রাখে ব্যবসায়ীরা, কেন না তারা সর্বত্র যায়। শ্যামবর্ণ, তাম্বুলসেবী বাঙালী, কানে সোনার লবঙ্গ পরে কোমরে গেঁজে ভরা টাকা নিয়ে ভারতের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে ব্যবসা করে। ঘোড়ার পিঠে চেপে, গো-যানে, পদব্রজে, উটের গাড়িতে, নৌকো চড়ে তারা তিব্বত হতে কন্যাকুমারিকা, মঙ্গোল হতে দ্রাবিড়, দ্বারকাধাম হতে হরিদ্বার সর্বত্র যায়।

বর্ধমান হতে লক্ষ লক্ষ টাকার সীসে, তামা, টিন, মরিচ, তুঁতে কিনে নিয়ে যায় দিল্লী আগ্রার ব্যবসায়ী। তাদের দেহ উন্নত, বলিষ্ঠ, গৌরবর্ণ, তাদের এঁটোকাঁটার বিচার বাঙালী ব্যবসায়ী হতে ভিন্ন। উত্তর প্রদেশে দীর্ঘকাল মুসলিম শাসন থেকেছে বলে উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, গুর্জর এ-সব জায়গায় আচার নিয়ম যেন অনেকটা এক ছাঁচে ঢালা। এদের জন্যে বর্ধমানে, মুর্শিদাবাদে সারিসারি ঘর নেওয়া থাকে বাজারে, চৌকে। সেইসব ঘর ভাড়া দিয়েও কতজন ধনী হয়। কে বলে বাঙালী ব্যবসা বোঝে না। এ-সব ব্যবসায়ী কখনো টাকা দিয়ে, কখনো আপিম, সোরা, ঘোড়ার বিনিময়ে খরিদ করে নিয়ে যায় বর্ধমানের বাজার হতে মাল।

হীরালাল শেঠ আস্তে, স্বগত বলেন, 'আমরা, ব্যবসায়ীরা চিরদিন সর্বত্র বেসাত করেছি।'

এখন এ-কথাটি ভেবে তাঁর বড়ই গর্ব হয়। এমন সময় ছাড়া কখন আর হীরালাল শেঠ জাতবৃত্তির কথা ভাববেন? সবে রাজধানীতে হানা দিয়ে গেছে বর্গী, জগৎ শেঠের গদী লুণ্ঠিত, সর্বত্র হাহাকার, পলুচাষের চিরসবুজ ছায়াঘন ক্ষেতে ঘোড়া ঢুকিয়ে বর্গীরা ঘোড়ার খুরের নিচে বাংলার রেশম-শিল্পকে ছিন্নভিন্ন পদদলিত করে ছেড়েছে।

এই ত' গৌরবস্মৃতি মনে করবার সময়। হীরালাল শেঠের মনে কি ভাব এল তা অপরে বুঝলে না, তিনি বলতে লাগলেন, 'চাষীরা দেশ বলতে অন্য জিনিষ বোঝে, তাদের কাছে তাদের ধানক্ষেত আর কুঁড়েঘরটাই দেশ। রাজারা বোঝেন দেশ বলতে সেইসব জায়গা, যেখান হতে তাঁরা খাজনা পান। আমরা, ব্যবসায়ীরা দেশ বলতে বুঝি যেখানে ব্যবসা, সেখানে দেশ। চিরদিন, চিরকাল বাংলার মানুষ বাইরের সঙ্গে ব্যবসা করছে, কাশ্মীর হতে মানুষ আসে, কি রূপ তাদের, রঙীন জামা গায়ে, সুন্দরবনের মলঙ্গীদের লবণের দাদন দেয়। কাশ্মীরের মহাজনের টাকা নিয়ে বাংলার ব্যাপারী তিব্বতে চামড়া, আতর, নীল, মুক্তো, প্রবাল, মালদহের ডুরিসাটিং কাপড়, বালুচর বিষ্ণুপুরের রেশমসূতী নিয়ে যায়।'

এ-কথা শুনে এধরের ব্যবসায়ীরা বড়ই অবাক হন। এ-ওর মুখের দিকে তাকান। হীরালাল শেঠ এমনিতে বড় শক্ত লোক।

আজিম কাশ্মীরী ধীরে বলে, 'শেঠজী, সে ত' চিরকাল হয়ে আসছে। আরো হবে, এখন আপনি সে-কথা ভেবে কাতর হলেন কেন?'

'কাতর হব না?' মানুষ মরলে তখন কাঁদি, আহা সে কত ভাল ছিল, সে-কথা বলে কাঁদি। আজ ব্যবসার এমন দুর্দিনে বাণিজ্যের গৌরব স্মরণ করব না? আপনি বলেন কি?'

'এ অবস্থা দু'দিনের। আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'কোনদিন ঠিক হবে না। কাশ্মীরী সায়েব, বারাণসী বসাক, সাধুমশায়, আপনারা এ পাকামাথা বুড়োর কথা শুনুন। যে দিন যাচ্ছে তা ঠিক হবে না কোনদিন। আপনারা জানেন না, চেয়ে দেখেন না, আমি বলি। ভেতরের খবর জানেন কিছু?'

'কি খবর?'

'রোগের লক্ষণ, মৃত্যুর খবর।'

'কার রোগ? কার মৃত্যু?'

'আমার, আপনার, সকলের। এটি আমার ওপরমহল থেকে শোনা। আলোচনা হচ্ছিল, তাই শুনেছি।'

'কি শুনেছেন?'

'যতদিন দিল্লীর শাসন সবাই মানত, ততদিন দেশে দেশে বাণিজ্য করতে অসুবিধে ছিল না কিছু। ঘাট-মাশুল, চুঙ্গি, চৌকি, সবকিছু ছিল আঁটাআঁটির মধ্যে, নিশ্চিন্তে ব্যবসা করা চলত।'

'এখন মাশুল সর্বত্র বেশি লাগে।'

'এখন মাশুল বেশি লাগে, কেন না দিল্লীর শাসন ক্রমে মানে না কেও, যে যার রাজ্যে নিজেকে স্বাধীন মনে করে, ইচ্ছামত মাশুল বসায়। ব্যবসায়ীরা এদেশে, ভারতভূমিতে কবে বা অস্ত্র নিয়ে চলত। চিরদিন তারা নির্ভয়ে যেত, রাজার শাসনে পথঘাট কত নির্ভয়, সরাইখানা, চটি, ধর্মশালায় আশ্রয় মিলত, গুদামে মাল মজুত রাখা যেত। এখন ক্রমে সবই পাল্টে যাচ্ছে। চলাফেরা যদি নিরাপদে না হয়, রাজার খাঁই ক্রমে বাড়ে, মাশুল জেয়াদা দিতে হয়, তবে ক্রমে ব্যবসায়ী ডরাবে, কারবারে মন্দা পড়বে।'

'না, না, এ আপনি বড় আগিয়ে ভাবছেন।'

'দেখবেন, বুড়োর কথা সত্যি হয় কি না হয়।'

'তবে ব্যবসায়ী কি করবে?'

'যেখানে সুশাসন, সুবন্দোবস্ত পাবে সেখানে যাবে। এখন সবার চেয়ে মুর্শিদাবাদ ভাল। ভবিষ্যতে আর কোন জায়গা ভাল হতে পারে।'

'কি যে বলেন, মুর্শিদাবাদ হতে অপর বাণিজ্যস্থান আরো ভাল হবে?'

'কি হবে আর কি হবে না তা কে জোর গলায় বলতে পারে মশাই? দু'শো বছর আগে এ-স্থান ছিল গঙ্গাতীরে গ্রামমাত্র। কে ভেবেছিল রাজমহল, বড়গাঙ পারে ইসলামাবাদ, ওদিকে আজিমাবাদ সকলের গৌরব কানা করে এ-স্থান এমন হবে, যে ভারতের মানুষ ত' বটেই, সাগরপারের ফিরিঙ্গি এসে অবধি অবাক মানবে? আবার কে বলতে পারে একদিন এ-স্থান জঙ্গলে ঢেকে যাবে না? আমি মশায় সাতপুরুষ কেন, চোদ্দপুরুষে ব্যবসায়ী। আমাদের বংশপত্রিকায় লেখা আছে আমাদের পূর্বপুরুষ গৌড়ে ব্যবসা করতে এসেছিলেন। তাঁরা এসেছিলেন কোথায় অবন্তী দেশ, সেখান থেকে। সঙ্গে ছিল না কিছু, শুধু কোমরের কসিতে ছিল কিছু গোমেদ, পোখরাজ, আর ঐ যে জলরঙের পাথরটি, কি যেন বলি আমরা, যার নাম, ওপেল। তাঁরা লিখেছেন লোকের দোরে দাঁড়ালেই চাল, ডাল, ঘি, লবণ, মশলা, হাঁড়ি, উনোন পেয়েছিলাম, কষ্ট হয় নি কোন।

'তা এইভাবে গৌড়ে এসে তাঁরা দেখেছিলেন সে-নগরীতে লক্ষ লক্ষ দীপ জ্বলে, হাজার হাজার দোকানে পান বিক্রি হয়। ক্রমে তাঁরা লক্ষপতি হয়েছিলেন। এখন মশায়, সেবার গিয়েছিলাম বটে মালদহ, ডুরেসাটিং কাপড় দেখবার শখ ছিল। দেখে এলাম গৌড়। কোথায় কি, ঘোর জঙ্গল, গুটিকয় গণ্ডগ্রাম মাত্র।'

'মশায়, গৌড়ের পতন হতে পারে, কিন্তু মুর্শিদাবাদের গৌরব পড়বে না কখনো। নবাব দড় আছেন।'

'না পড়লেই ভাল।'

এ-হেন সংক্ষেপ উক্তি ক'রে হীরালাল শেঠ বললেন, 'শুনতে পাচ্ছি আলমচাঁদের গদী লুঠ হওনে ভয় পেয়ে অনেকে পালিয়েছেন মালদহ, ভগবানগোলা, এমন কি ফিরিঙ্গী-ফরাসী-ওলন্দাজ ফ্যাক্টর সায়েবগুলো অবধি পালিয়েছে কাশিমবাজারের কুঠি ছেড়ে, এ ভাল লক্ষণ নয়, এতে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।'

বারাণসী বসাক এতক্ষণ হীরালাল শেঠের সব কথা মন দিয়ে শুনছিলেন ও হাতের থলি থেকে আমলকীখণ্ড, মিশ্রীর টুকরো ও চিকে সুপুরি গালে ফেলছিলেন। এখন তিনি বললেন, 'তা প্রাণ বাঁচাতে হলে পালাবে না।'

আজিম কাশ্মীরী বললে, 'পালিয়ে প্রাণ বাঁচাবে কেমন করে? এটুকু ভেবে দেখলে না, যে বর্গী এতদূর আসতে পারে সে ভগবানগোলা, মালদহেও যেতে পারে?'

নবীন সাধু শুকনো মুখে বললেন, 'আমিও একবার মালদহ যাব মনে করছি। সেখানে ভগ্নীর কার্য করেছি, অনেকদিন থেকে আম খেতে নেমন্তন্ন করে রেখেছে, দেখি কবে যেতে পারি।'

হীরালাল শেঠ বিরক্ত হয়ে বললেন, 'যেতে চান যাবেন, তা আমের দোহাই কেন? মালদহের আম কি জৈষ্ঠ্যের আগে পাকে মশায়? এখন আর কোথায় বা আম পেকেছে, এক নবাবের কিছু কিছু খাসবাগান, আর পলাশীর লাখ-বাগের কিছু কিছু আমগাছ ছাড়া?'

'না না যেতে হবে আমাকে।

আমার মা বড় ভিতু মানুষ মশায়, সেই থেকে পত্র করেছেন, সামান্য বিপদ দেখলে যেন ঠাঁইনাড়া হই।'

'তা মানবেন, মায়ের কথা রাখবেন, এটি ভালকথা। আপনাদের পট্টির মনোহর সাধু এটি অন্যায় করেছে। মা-কে ভাত দেয় না, নাবালক ভাইবোনকে বঞ্চিত করলে, বউ-এর কথায় সকলকে ত্যাগ করলে এটি ভাল করে নি। আপনারা সমাজ ডাকলেন না কেন? এর প্রতিবিধান সমাজে হবে। ছেলে ভাত না দিলে কি মা দরবারে আর্জি করতে যাবে?'

'হবে, মনোহরের শাস্তি হবে। সমাজ ডাকি নি আমরা। কেন না আমদের সমাজপতি রতিকান্ত এখন খুড়ো মারা যেতে অশৌচ হয়েছেন। তিনি ভিন্ন এ-সব কাজ কে করবে!'

'বেশ সাধু মশায়, এ-কথাটিও ভাল। কিন্তু এখন বলি, যে-কথা দিয়ে আমরা আলোচনা সুরু করে-ছিলাম, সেই কথাটিতে ফিরে আসি। আপনি শুধু বসাকমশায় নন, বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের সকলের প্রতি রুক্ষ মন্তব্য করেছেন। না না, এ ভাল কথা নয়। আমাদের ব্যবসায়ীদের মধ্যে শাঁখারী, কাঁসারী, কাপুড়ে, তাঁতি, গন্ধবণিক, সোনার বেনে, হাতির দাঁতের সূরতী, সবাইয়ের মধ্যে একটা টান, ভালবাসা থাকা চাই। সেটি আছে বলেই এত সত্বর মুর্শিদাবাদ এমন বড় গঞ্জে পরিণত হয়েছে। সেটি নষ্ট করবেন না। বর্গী পনুচাষ ঘোড়া দিয়ে খাওয়ালে, এ-কথা শুনে হয়ত অন্যেরা, বাইরের লোকেরা বলবে বেশ হয়েছে, ও বেটাদের বড় বাড় হয়েছিল। তা বলে আপনিও বলবেন বেশ হয়েছে?'

'না শেঠমশায়, স্বীকার যাচ্ছি এ-কথাটি বলা আমার অন্যায় হয়েছে।'

'নবীন সাধু বিদায় নিলেন। তখন হীরালাল শেঠ বলেন, 'শাঁখারীপট্টিতে অন্য মানুষ আছে তাই রক্ষে। এমন মানুষ বেশি থাকলে সবাইয়ের ক্ষতি হয়। এমন স্বার্থ চেনা মানুষ।'

বারাণসী বসাক নিশ্বাস ফেলে বলেন, 'তা হবে না কেন? ওদের আর অসুবিধে কি বলুন? গেরস্তঘরের মেয়ে বউ চিরদিন শাঁখা পরবে, পুজো-পার্বণে শাঁখা লাগবে। ওরা পেটারী মাথায় গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াবে তাতেও লাভ আছে।'

হীরালাল শেঠ বললেন, 'মনটা বড় খারাপ হচ্ছে আমার। রাজধানীর এমন বাড়বাড়ন্ত, এমন শোভা!'

'এ বাড়বাড়ন্ত, রাজধানীর এ শোভা দেখে ভুল না বাবা, ভেতরে ভেতরে পাপের ভরা পূর্ণ হয়েছে।'

গঙ্গাতীরে, খাগড়ার, শ্মশানঘাটে বসে আছেন সুরকণ্ঠ। রাত একপ্রহর, আকাশ মেঘে ঢাকা, মেঘের কূলে কূলে বিদ্যুৎ ঝিকমিক করে, এবার বর্ষা আগে নামবে, ক্ষণিক বিদ্যুৎ ঝলকে ভাগীরথীর জল উদ্ভাসিত হয়, সুরকণ্ঠ আচারীবাবার কথা শোনেন।

রাজপুরুষের সঙ্গ ভাল লাগল না বাবা, তাই শ্মশানে পালিয়ে এসেছ?'

'শুনলাম আপনি এসে রয়েছেন এখানে, চরণ দেখতে এলাম।' এ কথাটি বলে সুরকণ্ঠ কত শান্তি পান মনে। এইখানে, গুরুর চরণতলে তাঁর আসন যেন পাতা থাকে, এসে বসলেই হল।

সঙ্গে সঙ্গে গুরু বলেন, 'ঠিক কথা বাবা, এখানে তোমার নিজের জায়গা, ভুলে ভুলে যত তুমি পালিয়ে থাক না কেন?'

আজ আচারীবাবার কণ্ঠে স্নেহবাৎসল্য গলে গলে পড়ে। নিমেষে এ স্নেহসুধা ক্রোধের আগুন হয়ে জ্বলে উঠতে পারে অথবা পাষাণের মত উদাসীন, সুরকণ্ঠ তা জানেন। তাঁর কাছে আচারীবাবা নরদেহে দেবতার মত, স্বয়ং শিব যেন, লোকালয়ে তাঁকে পাবেন এটি কত বড় সৌভাগ্য আজ।

'হ্যাঁ বাবা, আমি আজ এখানে এলাম।'

বিদ্যুৎ ঝলকার। সুরকণ্ঠ আগেই দেখেছেন পূজার উপচার, নানাভরা মিঠাই, কাপড়, ফুলের মালা, কিন্তু

পুজো কার, কখন হবে, কিছু জিজ্ঞাসা করেন না তিনি। ধীরে বলেন, 'এবার আমাকে নিয়ে যাবেন?'

'না বাপ, মনে তোমার এখনো সব বাঁধন কাটে নি।' আকাশের দিকে চেয়ে তিনি হঠাৎ শিশুর মত আব্দারের কন্ঠে বলেন, 'এই এলাম মা, এখন মা-কে পূজব বাপ, মা-কে পূজব, মা-কে পূজব,' ছোট শিশু হতেও শিশু যেন, বারবার বলেন, হাতে সরা নিয়ে নেমে যান। বৃষ্টি নামে, সুরকণ্ঠকে ডেকে বলেন, 'ঐ গঙ্গাপুত্রের খোড়ো চালায় দাঁড়াও বাপ।'

সুরকণ্ঠ অমনি পেছন ফেরেন, গঙ্গার কাদায় পা হড়কে যায়, খোড়ো চালায় যান।

এখন গঙ্গাজলে নেমেছেন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী। বিশাল দেহের কোমর অবধি জলে, আর দেখা যায় না। কণ্ঠ শোনা যায়, মনে হয় এ মানুষের গলার স্বর হতে পারে, অথবা নদীর জলে বৃষ্টিপাতের আওয়াজ, বাতাসের ঝাপটায় কখনো ক্ষীণ, কখনো স্পষ্ট।

'বড় দুঃখ মা তোর, কেউ তোকে দেখে না মা, এই নে, মালা পর, মালা পর, আমি উচ্ছিষ্ট করি নি, শুঁকে দেখি নি, এই যে ফুল নে, ভোগ নে, বস্ত্র নে, ও জানছে সব, তাতে লজ্জা কি তোর, আমি তোর সন্তান, ও আমায় গুরু বলেছে।'

তারপর খানিকক্ষণ আর শোনা যায় না কিছু। ধীরে, আবার, মেঘগর্জন ছাপিয়ে কানে আসে, 'পাপ তোকে দেয়, পুণ্য তোকে দেয়, তো'তে মলমূত্র ফেলে, নর্দমার জল, শ্মশানের ছাই, চিতার কয়লা, এখন পাপের ভরা পূর্ণ হবে, নইলে কাল অন্ত হবে কিসে? পাপের ভরা পূর্ণ হবে, নইলে শিব নাচবে কোথা বল?'

এখন বাতাসে নদীর জল আন্দোলিত, উত্তাল। সুরকণ্ঠের ভয় হয় বৃদ্ধ ভেসে না যান, বর্ষায় অজয়নদের বানে একবার ভেসে যাচ্ছিলেন, ভাবসমাধিতে যখন অজ্ঞান থাকেন, তখন ছুঁতে অবধি সঙ্কোচ হয়, কিন্তু না, ঐ যে তিনি উঠে আসছেন।

কোমরে কাপড় লেপটে আছে, হাতে দণ্ডী, কাদায় ঠুকে ঠুকে আসছেন, সুরকণ্ঠ ত্বরিতে পাশে গেলেন। দণ্ডধারী সন্ন্যাস এখন গঙ্গাতীর ধরে দক্ষিণে যাচ্ছেন।

'তুই আছিস এখনো? বেশ, চল, আমাকে এগিয়ে দে।'

সুরকণ্ঠ নীরবে যান। পায়ের নিচে চিতার কাঠের খণ্ড, নরকপাল মাড়িয়ে যান।

'তোরা অনেক পাপ ঢেলে দিয়েছিস, মা সামান্য নন, পলকে প্রলয় করতে পারেন, তুই দেখবি, আমার কথা মিথ্যা হবে না।'

'কি দেখব প্রভু?'

গঙ্গাতীরে দাঁড়িয়ে সন্ন্যাসী দণ্ড ঠোকেন। বলেন, 'এইখানে, এইখানে একদিন যুগ অন্ত হবে, প্রলয় ঘটবে, মা বড় বিরূপ হয়েছে, আমি জানতে পেরেছি সব। মা নিজে আনবে সর্বনাশ, পঞ্চাশ সনের সঙ্গে সর্বনাশের সুরু। নইলে মুখে শিবের নাম, 'হরহর' বলে কেউ সর্বনাশ করতে আসে? এ-দেশ শ্মশান হবে, সব দেখতে পাচ্ছি। সব যখন পুড়েঝুড়ে শ্মশান হবে, তখন সেখানে এসে বাবা নাচবে। চালাকি নাকি, মুখে বাবার নাম, 'হর হর' এদিকে নাঙ্গা তরোয়াল নিয়ে আমায় অবধি তাড়া করেছিল, জানলি?'

'কবে এ-দিন কাটবে?'

সুরকণ্ঠের এ বিনীত প্রশ্নে সন্ন্যাসী হঠাৎ রেগে যান। ঘুরে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়েন, অসংবদ্ধ জলসিক্ত চুল ঝাপটা দেন, বিদ্যুৎ আলোয় দেখা যায় তাঁর চোখ জলছে। ক্রুদ্ধ গর্জনে বলেন, 'আমার সঙ্গে বটকেরা? জানিস সব, নিজের মনে জানছিস, তবু শুধোন হচ্ছে? এখন বয়স আছে, রক্ত গরম, রাজা উজীর মারে বরছে তাই ধরাকে সরা দেখছিস? সব জানিস তুই, জানিস না?'

সুরকণ্ঠ পায়ে ধরতে যান। সন্ন্যাসী হাতের লাঠি ঘুরিয়ে তাঁর কপালে মারেন। বলেন, 'দূর হ বেটা, আদাড়ে পাদাড়ে ঘুরিস, গেরুয়াধারী দেখলে সঙ্গ করতে যাস, জ্যোতিষ বেচিস।'

'বেচিস' কথাটি আশ্চর্য ঘৃণায় সঙ্গে উচ্চারণ করেন। বলেন, 'খাক পড়ে কাদার মধ্যে, মায়ের তীরে তীরে দেশে দেশে যাস, একবার চেয়ে দেখিস না, গেছলি ত' পাপ পরামর্শ করতে, কাটোয়ার গঙ্গায় কালি ঢালতে, যাস নি?'

রেগে কাঁপতে কাঁপতে চলে যান তিনি। সুরকণ্ঠ কপালের ক্ষতস্থান হাতে চেপে ধরেন। ধীরে উঠে দাঁড়ান। কপাল রক্তে ভিজে উঠছে। সুরকণ্ঠ আস্তে অতি কষ্টে উঁচু পাড়ের দিকে আসেন এবং হেলান দিয়ে বসেন গাছের গায়ে। দূরে, ধীরে সন্ন্যাসীর মূর্তি বিলীন হয়ে আসে। সুরকণ্ঠের হৃদয় ভেঙে কান্না উঠে আসতে চায়, আবার কবে সাক্ষাৎ হবে? কবে সুরকণ্ঠের সময় হবে?

সময় কেটে যায়।

ক্রমে সুরকণ্ঠের আচ্ছন্ন চেতনা স্বচ্ছ হয়। প্রভাত এখনো দূরে। কিন্তু রজনী বুঝি বা মধ্যযামের শেষ প্রহরে। বৃষ্টি থেমেছে। খাগড়া, সৈদাবাদ, কুঞ্জঘাটা, গঙ্গাতীরে জনপদগুলির কুটির নিদ্রামগ্ন। শঙ্কিত নগরীতে গৃহস্থগৃহে দীপ নেই, মানুষ ঘরের দোরঝাঁপ টেনে রেখেছে, শ্মশানের শেয়াল অবধি পথে নেই।

এদিকে বৈশাখ শেষের নৈশ বর্ষণে কাতর, ক্লিষ্ট পৃথিবী যেন নীরবে স্নান করে উঠল। ঘাসের প্রতিটি শীষ জলে সজীব, গাছের পাতায় জল, সুরকণ্ঠ সামনের দিকে তাকান।

গঙ্গা নীরবে বয়ে যায়। নিরুত্তর, নিঃশব্দ নদী।

সুরকণ্ঠের গুরু আজই কান্না শুনেছেন, এইখানে, বাংলার গঙ্গাতীরে যুগ অন্ত হবে।

(ক্রমশঃ)

●পরিকল্পনার নামে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হলেও শিক্ষকদের বেলায় যত অভাব।
তাই সর্বস্তরের শিক্ষকদের এই মৌন মিছিল।

রাজধানী ঃ

আবার ছাব্বিশে জানুয়ারী এল।

এল আকাশে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা ওড়ানোর, আর দিকে দিকে স্বদেশী সঙ্গীতের গুঞ্জরনের দিন। কিন্তু বর্ষ-চক্রের আবর্তনে একটা দিন—তবু একটা দিন মাত্র। তা ছাড়া ছাব্বিশে জানুয়ারী সাধারণ ছাপোষা একটি মানুষের কাছে আর কি এমন নতুন বার্তা নিয়ে আসে—নিয়ে আসতে পারে।

—আরে ডাল নেই, চাল নেই, চিনি নেই। ডেলী নেসেসিটিজ সব বাজার থেকে উধাও। গণতন্ত্রের উৎসব করে কি হবে, আমাদের পাড়ার হরিশবাবু বলছিলেন।

হরিশবাবুর ছ'টি সন্তান। বুড়ো গরুর মত রোগা রোগা চেহারা। যেন মনে হয় অনেক কষ্টে বিশাল একটা সংসারের বোঝা নিয়ে কোন রকমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছেন।

কথাটা শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। পড়তে হলো। হরিশবাবুর করুণ মুখখানা দেখে মায়া হলো। মনের ভেতরে ভিড় করে এল পুরনো—অনেক-অনেক দিনের পুরনো স্মৃতি। রক্তক্ষরা জ্বালাময়ী স্মৃতি। লাহোর কংগ্রেস। সভাপতি তরুণ জহরলাল। এই কংগ্রেসেই স্বাধীনতা—পূর্ণ সার্বভৌম স্বাধীনতার সঙ্কল্প ঘোষণা করা হয়েছিল। বহু-বহু দূর থেকে স্মরণের বায়ুতরঙ্গকে আশ্রয় করে যেন কথাগুলো দূরাগত সঙ্গীতের মত ভেসে আসে সেই সুন্দর আর মহৎ বাণী—

'আমরা বিশ্বাস করি যে, অন্যান্য জাতির মত স্বাধীনতায় আমাদেরও জন্মগত অধিকার। সর্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধির পূর্ণ সুযোগ যাহাতে পাইতে পারে সেজন্য জীবনের যাবতীয় প্রয়োজনীয়তা এবং স্বপরিশ্রমের সুফল পাওয়ায় আমাদের অবিসম্বাদী অধিকার।'---

আরো ঢের কথা আছে। ওই যে 'সর্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধি' কথাটার আড়ালে হরিশ-বাবুর মত লক্ষ লক্ষ মানুষের অসহায় মুখচ্ছবি ভেসে ওঠে না কি? এই হরিশবাবুদের মত মানুষের জন্যই কত উজ্জ্বলন্ত প্রাণ ফাঁসীর দড়ি হাসতে হাসতে গলায় পরেছে। কত অমূল্য তরুণ প্রাণ কারাগারের অন্ধকারে তিলে তিলে স্তিমিত হয়ে এসেছে। অনেক শোক, অনেক দুঃখ, অনেক রক্তক্ষয়ের পর যে স্বাধীনতা এল—এই কি আমরা চেয়েছিলাম?

জানি। কংগ্রেস সরকারের সামনে অনেক সমস্যা ছিল। মনে পড়ে নেহরুজীর বক্তৃতা—'বিশ্বের অত্যন্ত সমস্যাপূর্ণ দিনগুলিতে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। এই স্বাধীনতাকে রক্ষা করা এবং তার ফল ভোগ করা অক্লেশ কর্ম নয়। আমাদের চারিপাশে গুরুতর সমস্যা---'

জানি। বাস্তুত্যাগীদের মত বিরাট সমস্যার সঙ্গে এই সরকারকেই পাঞ্জা কষতে হয়েছে। তবুও—

তবুও। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের পূর্ণ পনের বছরের দিনে হরিশবাবুর মত আমাদেরও ভাবতে ইচ্ছে করে, দুর্দিন আর দুঃখ-দুর্দশা কি আরও বেড়েই চলবে? এই অন্ধ তমিস্রার কি শেষ নেই? আর শুধু অন্ধকার নয়। কেমন ধাঁধার মত সব কথাবার্তা সরকারী মহলের। খুব জোর প্রচার করা হচ্ছে, এ বছরের মত আমন ধান না কি কোন বছর

লেগে হয় নি। কোথায় ধান
—কোথায়—কতদূরের মাঠে ?
লকাতার লোক যে তিমিরে
তিমিরেই। তাদের জন্য
খুব ভোরে—খুব ভোরে (পাড়ার
দোকানের লোমওঠা ঘিয়ে ভাজা
টা পর্যন্ত যখন আরামে ঘুমোচ্ছে)
দেওয়া। শুধু কি লাইন ? সেদিন
পাড়ার মাতব্বর ঋণ্টু ভোরের
পুলিশের খপ্পরে পড়েছিল। সে
কি—খুব শীত—খুব শীত তো,
দিন আগে প্রচণ্ড শীত পড়েছিল)
কম্বল মুড়ি দিয়ে চলেছে। ডান
তিন-চারটে ছেঁড়া ছেঁড়া ব্যাগ।
বাঁ হাতে ওটা কি ? কাপড়ের
ভেতরে খুব ভারী একটা কিছু
চলেছে।

—কৌন—হ্যায় রে—হল্ট—হেঁকে
পাহারাওয়ালা। খপ করে তার
ধরতেই পীচের রাস্তার ওপর
একখানা ইট।

—ইট নিয়ে কোথায় চলেছো ?

—ইট নিয়ে কণ্ট্রোলের লাইনে
গা রেখে এসে শোবো সেপাইজী,
ল। ঋণ্টু খিঁচিয়ে উঠল।

আবার একেকদিন বাতাসে খবর রটে
অমুক দোকানে তেল দিচ্ছে। সঙ্গে
শিশি, বোতল, হাঁড়ি, মগের দীর্ঘ
াযাত্রা সুরু হয়ে যায় দোকানের
নে। আর কলকাতার লোকের
কি আছে ?

আছে—আরও আছে। ডাল নেই।
ানদার আপনাকে হটিয়ে দিচ্ছে।
হঠাৎ লক্ষ্য করলেন—দোকানী
একজন বিশেষ খরিদ্দারকে বগতে
ছে। আর চোখে চোখে কি
টা নিঃশব্দ ইঙ্গিতও যেন হয়ে গেল।
চিনি নেই। খোলা বাজারে বিক্রি
অপরাধ। আপনার চিনি নেই।
শাঁসালো ব্যক্তির সবই আছে।
সময় নগজীর দুর্নীতির কড়া কড়া
তাগুলো মনে পড়ে। আর মনে হয়
বুঝি অন্য কোন দেশের, অন্য
ান মন্ত্রীর কথা।

খাদ্য সমস্যা তো তীব্র। তার দুঃখের কথা বলে শেষ করা যায় না। মনে হয়, মস্ত একটা দৈত্য বুঝি হাতে চাবুক নিয়ে অহরহ তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এই দৈত্য—খাদ্য সমস্যার দৈত্য। মনে হয়, পোড়া পেটের চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তা নেই আমাদের। কিন্তু—

সমস্যা কি একটাই। কথায় বলে না 'অয়ং বৃদ্ধ'। খাদ্য সমস্যার পায়ে পায়ে ভিড় করে আসে আরও বহুবিধ সমস্যা। এই সেদিন শিক্ষকদের বিশাল একটা শোভাযাত্রা রাজপথে দেখা গেল। জাতির শিক্ষাগুরু এঁরা। এঁরা মানুষ গড়ার কারিগর। বোধ হয় বার্টাণ্ড রাসেলের বক্তৃতায় পড়েছিলাম, শিক্ষকদের সবচেয়ে বেশি মাইনে দেওয়া উচিত। সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভূমিকা তাঁদের। তাঁদের গেজেটেড অফিসার করা উচিত - - -

এই সেদিন দুর্গাপুর কংগ্রেসে আলোর রোশনাই জালিয়ে আর মাইক বাজিয়ে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হলো। আর শিক্ষকদের মাগ্‌গী ভাতার দাবিতে দু' কোটি টাকা খরচ করা যায় না ?

দেশের শাসকবর্গের যে কোন বক্তৃতায় ভারতীয় সংবিধানের ভাষায় শোনা যায় সমানাধিকারের কথা। ইকোয়াল অপারচুনিটিজের কথা। কিন্তু সত্যিই কি সমানাধিকারের সুযোগ আমরা পাচ্ছি ? আমাদের ছেলেরা বি-এ ক্লাসে পড়তে পড়তে ভাবতে সুরু করে—পড়া শেষ হ'লে কি করবো ? জানাশোনা না থাকলে চাকরী হয় না। যাকে বলে 'ব্যাকিং'। ব্যাকিং চাই। যে কোন রাষ্ট্রে মাৎস্য-ন্যায়ের কালে এই হয়—এই হয়ে আসছে। আত্মীয় পোষণ, দুর্নীতি, অরাজকতা, দিকে দিকে দুঃখ-দুর্দিনের অন্ধকার। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা গেছে রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা যখন খুব দুর্বল হয়, পঙ্গু হয়—তখন তার রূপ আমাদের দেশের বর্তমান রূপ।

আর একটা সরকারী অফিসের লোয়ার গ্রেড কেরানী, যাঁদের মাইনে একশো থেকে দেড়শো টাকা তাঁদের কি করে চলে ? পৃথিবীর কোন শ্রেষ্ঠ পরিসংখ্যানবিদও তার রহস্য-ভেদ করতে পারবেন না। হরিশবাবু কোথায় কোন সরকারী অফিসের লোয়ার গ্রেড কেরানী। তাঁকে বলেছিলাম—কি করে চলে—মাসে কত লাগে আপনার ?

—কেন, অফিসের দু-একজন হিন্দুস্থানী বেয়ারা আছে। তারা সুদে টাকা ধার দেয়।

হরিশবাবুর মাসিক বাসা-খরচের হিসাবটা পাঠকের অবগতির জন্য নিচে তুলে দিলাম।

ঘরভাড়া—	২০'০০
দুধ—	১০'০০
রেশন—	৩২'০০
মুদীর দোকান	৩০'০০
ডাক্তার—	১০'০০
টিফিন ও গাড়িভাড়া—	৩০'০০
কাপড়-চোপড়—	১০'০০
বাজার—	৩০'০০
ছেলেদের স্কুলের মাইনে (ছোট তিনজন এখনও ভর্তি হয় নি)	১০'০০
মোট—	১৮২'০০

তারপরে আছে লৌকিকতা।
হঠাৎ আত্মীয় এসে পড়া ?

এসবই শুধু অসীম শূন্যতা। প্রত্যেক মাসেই বত্রিশ-তেত্রিশ টাকার জন্য অফিসের বেয়ারাদের কাছে হাত পাতা। হরিশবাবুর মাইনে মাত্র দেড়শো টাকা। কুড়ি টাকা ভাড়ায় একখানা ঘর। ঘরেরই একদিকে রান্না হয়। খেতেও হয়। বারো ঘর এক উঠোনের শরিকদের (ভাড়াটের) সঙ্গে জল পায়খানা ভাগ করে নিতে হয়। বাইরে কণ্ট্রোলে লাইন, বাড়িতে স্নানের জন্য লাইন—কাপড় খোয়ার জন্য লাইন।

বড় তিনটি ছেলে-মেয়ে স্কুলে

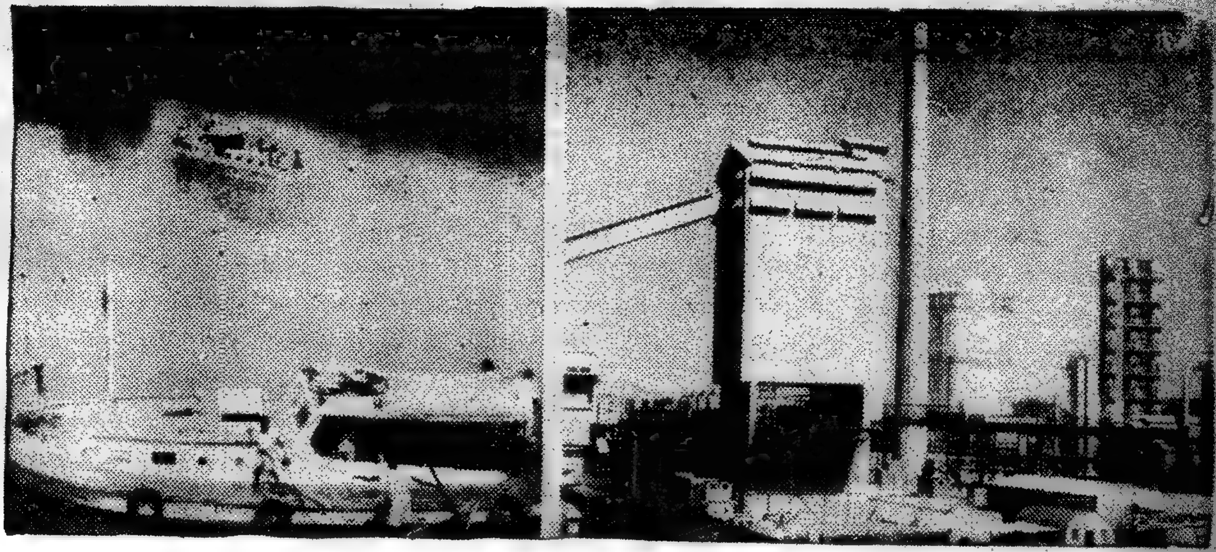

● শিল্পনগরী দুর্গাপুর

পড়ে। চতুর্থ ছেলেটিকে নিয়ে প্রত্যেক বছর জানুয়ারী মাসে একবার করে স্কুলের দুয়ারে দুয়ারে ঘোরেন। এ্যাডমিশান টেস্ট হয়। টেস্ট খারাপ হয় না। কিন্তু পরে কর্তৃপক্ষ বলেন—সিট নেই। এখানেও আত্মীয়-পোষণ নীতি। হরিশবাবুরই প্রতিবেশী মার্চেন্ট অফিসের মোটা মাইনের কেরানী মনতোষবাবুর জানাশোনা আছে স্কুলের গভর্নিং বডির মেম্বারদের সঙ্গে। তাঁর ছেলেকে ভর্তি করে নিলেন স্কুলের হেড মাস্টার। আর হরিশবাবু তাঁর ছেলেকে বাড়িতে নিয়ে এসে মুখ কালো করে বসে থাকলেন।

পনের বছরের ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের এই উৎসবমুখর পরিবেশে বসে এসব কথাই মনে হয়, কোন আশার আলো নেই, নেই কোন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবি? কেন—কেন এমন হলো?

ত্রুটি কি আমাদের নেই? আমরা কি খাঁটি প্রজা—অর্থাৎ স্বাধীন দেশের আদর্শ প্রজা হতে পেরেছি? দেশকে—মাতৃভূমিকে কি আমরা আমাদের নিজেদের দেশ বলে ভাবতে পারি—ভাবি? একজন চাইনীজ কি একজন রাশিয়ান এক কথায় দেশের জন্য প্রাণ দিতে পারে। আমরা পারি না। আমরা ভাবি—প্রাণ যদি দিতে হয়—তাহলে মন্ত্রীরা দেবে—আমরা কেন দেব?

আমরা যদি সুযোগ পাই, তাহলে এক প্যাকেট সিগারেট থেকে সুরু করে চার আনা পয়সা পর্যন্ত আমরা ঘুষ নিয়ে থাকি। ঘুষ, যে কোন রকম দুর্নীতি আমাদের রক্তে রক্তে মজ্জায় মজ্জায়। কেন—কেন এমন হলো? কারণ খুঁজতে হলে যেতে হবে—পায়ে পায়ে চলে যেতে হবে অনেক—অনেক দূর।

দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভেতরে, অগণিত লোকক্ষয়ের পর সেই বহু ঈপ্সিত স্বাধীনতা হস্তান্তর করা হয়েছিল। অর্জন করা হয় নি। একদিন নিশিরাত্রে ঘোষণা করা হলো, ভারতবর্ষ স্বাধীন। তাও চির-কালের সেই সুজলা সুফলা বঙ্গদেশ, সেই পদ্মা-মেঘনার দিগন্তপারে কাজল কালো এক একটি গ্রাম। সুখী আর সম্পন্ন মানুষের এক একটা উপনিবেশ। হাসিমাখা আর স্বপ্নে ভরা জীবন। কিসের অভিশাপে দেশের বিশাল একটা অংশ একেবারে বিদেশী রাষ্ট্র হয়ে গেল।

আমাদের নেতারা বহু বিতর্কের ধূম্রজালের পর খণ্ডিত দেশের প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন। স্বাধীনতার জন্ম হলো। জন্ম হলো ক্ষতবিক্ষত হয়ে। ফরসেপ ডেলিভারীতে যেমন কখনো কখনো শিশুর কোন অঙ্গে চোট লাগে। তেমনি আমাদের স্বাধীনতার শিশু ভূমিষ্ঠ হলো ক্ষত নিয়ে।

এই স্বাধীনতার জন্য আমরা প্রত্যেকে, প্রত্যেক পরিবার (অন্যান্য দেশের মত) ত্যাগ করি নি। যারা বিদেশী রাষ্ট্রের শাসকবর্গের ঘরের খাঁ ছিল তারাই কংগ্রেসের টুপি পরে দেশসেবক হয়ে বসল। রক্তের ভেতরে আছে দাসদের হীনমন্যতা, আছে হীন লোভ। কেমন করে দেশাত্মবোধ থাকবে?

পৃথিবীর যে কোন দেশের সংবিধান রচিত হয়, maximum good for the maximum people এই আদর্শকে ভিত্তি করে। কিন্তু সংবিধানকে রূপায়িত করবে কে—কে তাকে বাস্তবে রূপায়িত করবে? প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীজী, কি পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী।

না। লক্ষ লক্ষ সরকারী কর্মচারী যারা বিশাল দেশের দূরে দূরে সরকারী আইনকানুনের প্রতিভূ—তারা রূপ দেবে। দেবে লক্ষ লক্ষ মানুষ, তারা সহযোগিতা করবে। কিন্তু সবাই যদি অসৎ হয়,

...দি কারো ভেতরে মনুষ্যত্ববোধ না থাকে, দেশাত্মবোধ না থাকে, তাহলে সংবিধান কি একটা সুখপাঠ্য গ্রন্থে পর্যবসিত হবে না ?

আমাদের দেশে সরকারী কর্মচারী আর সাধারণ মানুষের ভেতরে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। ওরা (সরকার) যেন অন্য কোন দেশের লোক। আমরা সরকারী কোন কাজে সহযোগিতা করি না। শুধু সমালোচনা করি। সরকারও যা করছেন, সেটাকেই ধ্রুবসত্য বলে মনে করছেন। দেশবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে ছাব্বিশে জানুয়ারী থেকে রাষ্ট্রভাষার স্বরূপ 'হিন্দীভাষাকে' চাপিয়ে দিচ্ছেন। আবার—

আবার আমরা সব সময় বলছি কিচ্ছু হচ্ছে না—কিচ্ছু চ্ছে না—কিচ্ছু পাচ্ছি না। মন্ত্রীরা চুরি করছে। আমোদর ভ্যালীর ইঞ্জিনীয়াররা লুঠছে দুহাতে------

কিছু হচ্ছে না করে করেও কখনও তো হয় নি। কই আমরা তো কখনো ভাবি না, গ্রামে গ্রামে কম্যুনিটি হেলথ সেণ্টার বসেছে—হাসপাতাল, ডাক্তার, নার্স। দূর পল্লীতে যা ছিল অকল্পনীয়। কই কখনো তো ভাবি না—দুর্গাপুর, সিন্ধ্রি তো স্বাধীনতা-উত্তর যুগের এই কংগ্রেস সরকারেরই দান।

ভারতীয় প্রজাতন্ত্র দিবসে, আমাদের এই শপথ হোক—দেশকে সরকারকে আমরা নিজেদের বলে ভাববো। দেশের দিকে দিকে যে কর্মযজ্ঞ সুরু হয়েছে তার সঙ্গে সহযোগিতা করবো আমরা, সরকারী কোন প্রচেষ্টার সঙ্গেই আমাদের নৈতিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রাখলে হবে অপরাধ। আজ শুভদিনে এই হোক প্রার্থনা, সমস্ত দুঃখ-ক্লেশের ভেতর দিয়েও যেন দেশকে ভালবাসতে পারি।

২৪ পরগণা :

পশ্চিম বাংলার সীমান্ত এলাকা চোরাকারবারীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। রাত দশটার পর সুরু হয় এদের তৎপরতা। শেষ রাত পর্যন্ত চলে এদের কারবার অব্যাহত গতিতে। লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার চলছে প্রায় প্রতিদিন। যারা এ কারবারের আসল মালিক তারা সকলেই রাঘববোয়াল। পুলিশের সঙ্গে এদের নাকি মহরম মহরমও রয়েছে। সাধারণ মানুষকে এরা কোন আমলই দেয় না।

সীমান্ত এলাকার চোরাকারবারী-দের অপ্রতিহত ক্ষমতার কথা এবং এদের সঙ্গে পুলিশের গোপন সংযোগের অভিযোগের প্রতি আমরা আগেও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। এর পরিণাম কতটা সুদূরপ্রসারী হতে পারে, তার উল্লেখও আমরা করেছি। বিদেশের সঙ্গে গোপন ব্যবসা যারা করে, তারা যে-স্তরের মানুষই হোক না কেন, তারা কোনদিনই দেশপ্রেমিক হতে পারে না। বিশ্বাসঘাতকতার ও দেশদ্রোহিতায় এ-পর্যায়ের মানুষই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরকাল কলঙ্ক লেপন করেছে। চোরাকারবারীদের সহায়তায় দিনের পর দিন পাকিস্তানী নাগরিকরা পর্যন্ত অনুপ্রবেশ করছে পশ্চিম বাংলার বুকে।

অর্থের লোভে যে-সব পুলিশ অপরাধীদের আড়াল করে আরামে চাকুরী বহাল রাখছেন, তাদের অপরাধ আরও বেশি। সীমান্তের চোরাকার-বারীরা একশ্রেণীর পুলিশের সাহায্য পেয়ে অপর সকলকেই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাচ্ছে। এমন কি, সঙ্ঘবদ্ধভাবে পুলিশকে আক্রমণ করতেও তারা দ্বিধাবোধ করছে না।

জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে বনগাঁ সীমান্তে সাদিপুরে চোরাকার-বারীদের সঙ্গে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সংঘর্ষও হয়েছে। রক্ষীবাহিনীর সশস্ত্র চোরাকারবারীদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য দু'বার গুলী চালাতে সেদিন বাধ্য হয়েছিল। গুলীতে একজন আহত হয়ে ধরা পড়ে। পরে হাস-পাতালে তার মৃত্যু ঘটে। বাকি সকলেই চোরাই মাল তিন বস্তা কর্পূরের মায়া ত্যাগ করে পালিয়ে গেছে।

শুধু কর্পূর নয়, মশলাপাতি, বিদেশী মূল্যবান ঘড়ি, রেডিও সেট, সোনা এবং খাদ্যসামগ্রীর চোরা কারবার চলছে সীমান্ত এলাকায় অব্যাহত গতিতে। যে-সংবাদ সাধারণ মানুষ রাখে তা' পুলিশ ও শুল্কদপ্তরের কর্মীরা না রাখেন এমন হতে পারে না। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে, শুল্ক-কর্মীদের ফাঁকি দিয়ে এমন বেপরোয়া কারবার চলা সম্ভব নয়। সম্ভব হলে বলতেই হবে, পুলিশবাহিনী ও শুল্ক-কর্মীরা অপদার্থ অথবা দুর্নীতিপরায়ণ। কাজেই এ বিষয়ে অনুসন্ধান হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কোচবিহার :

চোরাকারবারের সঙ্গে সঙ্গে পাকি-স্তানীরা সীমান্তের পরিবারগুলোর ঘরের খবর পর্যন্ত সংগ্রহ করে। তারপর সুবিধামত চানায় এপারে এসে ডাকাতি ও রাহাজানি। এ অপরাধ যারা করে, তাদের অধিকাংশই হল পাকিস্তানী সৈন্যদলের লস্কর। চোরাকারবারীরা এদের অনুকম্পার পাত্র। প্রতিদানে নগদ কিছু প্রাপ্তির সঙ্গে ভারতীয় সীমান্তে রাহাজানি ও ডাকাতির উপযুক্ত তথ্যাদিও মিলে যায়। তারপর গভীর রাতে অতর্কিত আক্রমণ চালায় ভারতীয় নাগরিকদের গৃহে।

মেকলিগঞ্জ থানার ভোটবাড়িতে সম্প্রতি তলোয়ার ও মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এরা হানা দিয়েছিল। দু হাজার টাকার সম্পত্তি তারা লুণ্ঠন করেছে, জখম করে গেছে দুজনকে।

কলতাবাড়িতে তার আগের দিন পূর্ব-পাকিস্তান রাইফেল বাহিনীর লোকেরাই ঢুকে পড়ে একটি গৃহ আক্রমণ করেছিল। সংবাদ পেয়ে ভারতীয় রক্ষীদল এসে বাধা দেওয়ায় কোন ক্ষতি করতে পারে নি। পাল্টা আক্রমণে টিকতে না পেরে পালিয়ে গেছে।

জলপাইগুড়িঃ

মেটেলী থানার নেত্তরামাঝি-ফলী ও শালবাড়ি গ্রামের অধিবাসীরা দীর্ঘকাল ধরে একটি রেশনের দোকান খোলার দরবার করছে। গ্রাম দু'খানি আয়তনে ছোট। লোকসংখ্যাও হাজারের কম। কিন্তু গ্রাম দু'টির অবস্থানের কথা বিবেচনা করে তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা আগেই করা উচিত ছিল।

নদীপরিবেষ্টিত এই দুটি গ্রামের দুর্দশার শেষ নেই। কুরতিনেওরা ও মালের মত উদ্দাম পার্বত্য নদী পারাপারের কোন সেতু নেই। গ্রামে কোন রাস্তাও নেই। হাট, বাজার, দোকান, স্কুল ও হাসপাতাল গ্রামের বাইরে।

প্রবল বর্ষণ সুরু হলেই নদীগুলোতে চলে প্রলয় নাচন। বর্ষার দিনে সপ্তাহের পর সপ্তাহ গ্রামের মানুষ বাইরে যেতে পারে নি, এমন ঘটনাও বিরল নয়। অথচ এ গ্রামের অধিবাসীরাও কল্যাণ রাষ্ট্রেরই নাগরিক। সরকার এদের সম্পর্কে একেবারে উদাসীন। কল্যাণ রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে তারা অনেক কিছুই চাইতে পারে। এবারে তাদের আশু দাবি মাত্র একটি রেশনের দোকান।

দাবি তাদের অত্যন্ত ন্যায্য। সপ্তাহকাল যে-গ্রামের মানুষ বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তাদের পক্ষে রেশন আনতে পার্বত্য নদী অতিক্রম করা সহজ নয়। বিপদের ঝুঁকি নিয়ে তাদের নদী পাড়ি দিতে হয়। পেটের দায়ে রেশন আনতে নদী পার হতে গিয়ে স্রোতের টানে জীবন নিয়ে টানাটানি প্রায়ই হয়। গেল বর্ষাতেই এরূপ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। স্রোতে একজন ভেসে গেছে—আজও সে গ্রামে ফিরে নি—আর ফিরবেও না।

এ জেলার খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের কর্তাদের কাছে এ ঘটনা অজানা থাকার কথা নয়। * কিন্তু কিছুতেই তাদের টনক নড়ছে না। মেটেলীর বি-ডি-ও ও অঞ্চল-প্রধানের সুপারিশেও কোন কাজ হচ্ছে না। এই গ্রাম দুটির অসহায় মানুষের জীবনযাত্রার প্রতি আমরা পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আশা করি তিনি, মানবতার দিক বিবেচনা করে এদের খাদ্য সংগ্রহের জন্য নদী পারের দায় থেকে অব্যাহতি দিবেন।

• • •

গ্রামের মানুষকে বাদ দিয়ে তাদের জীবনকে বিপন্ন করে উন্নয়নমূলক কাজ হতে পারে না। এই কথাটাই একাধিকবার বলে এসেছি আমরা। দেশের বৃহত্তর স্বার্থ সকলেরই কাম্য। তার জন্য ত্যাগ স্বীকারেও মানুষ কুণ্ঠিত নয়। কিন্তু দিনের পর দিন অযথা লাঞ্ছনা ভোগ কেউ কোনদিন বরদাস্ত করতে পারে না।

নিউ আলিপুর স্টেশনের কাজ চলেছে পুরাদমে। তার জন্য জমি দখল করা হচ্ছে। নোটিশ পড়েছে ডাবগ্রাম, জামিরভিটা, কামরাঙ্গাগুড়ি, কইমারী প্রভৃতি গ্রামের চাষী ও সাধারণ মানুষের ওপর। এ-নোটিশ যাঁরা জারী করেছেন তাঁরা সামান্যতম বাস্তববুদ্ধির পরিচয় পর্যন্ত দেন নি। নোটিশ পাওয়ার তিন দিনের মধ্যে ভিটে ত্যাগ করে ফসল-ভরা জমি ফেলে কেউ যেতে পারে না। এই ধরণের নির্দেশ কোন কোন ক্ষেত্রে দেওয়া হয়েছে। নোটিশগুলো যাদের হাত দিয়ে বেরিয়েছে তাদের ওপর বদলীর নোটিশ যখন আসে তখন স্থান পরিবর্তনে ক'দিন লাগে, তা' কারো অজানা নেই।

গ্রামের মানুষ নোটিশ পেয়ে তিন দিনের মধ্যে কোথায় যাবে? নতুন ঘরবাড়ি বাঁধবার অর্থ কে দেবে? চাষের জমি কিনতে না পারলে, এরা খাবেই বা কি করে? উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাকে রূপ দিতে গিয়ে কাউকে নিরাশ্রয় ও পথের ভিখারী করা কোন সুসভ্য রাষ্ট্রের নীতি হতে পারে না। ভারত সরকারও সে-নীতি গ্রহণ করেন নি।

আজ যাদের অবিবেচনা ও অর্বাচীনতায় সাধারণ মানুষ বিপদে পড়েছে—চাষীকে তার সারা বছরের শ্রমের পাকা ধান কাটার সুযোগ না দিয়েই ঠিকাদার জমির মাটি কাটিয়ে তাদের শাস্তি কে দেবে? আমরা মনে করি যে, আইনের বলে জমি দখল করা হচ্ছে সেই আইনেই এদের গ্রেপ্তার করে শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত।

এ সব ঘটনা অত্যন্ত দুঃখের, অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আগেও রেলের কর্তাব্যক্তিরা জমি দখল করেছেন। জমির আইনসঙ্গত রেকর্ড, দলিল ও দাখিলা থাকা সত্ত্বেও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ ক্ষতিপূরণের কোন অর্থ পায় নি। এ বিষয়ে সন্তোষজনক কোন জবাব মানুষকে দেওয়া হচ্ছে না। দেশের সরকারী কর্মচারীরা আদপেই ভুল করছেন। ভুলে যাচ্ছেন, বিদেশী শাসকের অধীনস্থ কর্মচারী আর তাঁরা নেই—গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তাঁরাও সেবক। মেহনতী মানুষের কষ্ট লাঘবের জন্যই পরিকল্পনা। কাজেই পরিকল্পনা রচনা ও তা' রূপায়ণের আগেই মানুষের সুখ-সুবিধার কথাটাই আগে ভাবতে হবে। সেজন্য কর্তাভজা মনটাকে পাল্টানো দরকার। উপরতলার আমলাদের মনের সে পরিবর্তন না হলে কোন পরিকল্পনাই ত্রুটিহীন হবে না—মানুষের দুর্ভোগও কমবে না।

• • •

উত্তর বাংলার খরস্রোতা নদী তিস্তার ওপর সেতুসড়ক নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আগামী এপ্রিল মাসেই সড়ক ও রেলের সেতু দিয়ে যাতায়াত করবে অসংখ্য পথচারী ট্রেন, বাস ও অন্যান্য যান-বাহন। এ সেতু নির্মাণে ব্যয় হচ্ছে দেড় কোটি টাকা। তোরসার ওপরেও ছাপান্ন লক্ষ টাকা ব্যয় করে সম্প্রতি আরেকটি সড়ক নির্মিত হয়েছে। তিস্তার সেতুটি চালু হলে শুধু জলপাইগুড়ির মফস্বলের সঙ্গে শহরের দূরত্বই হ্রাস পাবে না, সারা উত্তরবঙ্গের যোগাযোগ-ব্যবস্থায় আনবে আমূল পরিবর্তন, সিকিম ভূটান ও আসামের সঙ্গে স্থাপিত হবে নিবিড় সংযোগ। ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন নতুন পথ খুলে যাবে।

গ্রন্থমেলা

The Gentle Colossus—A Study of Jawaharlal Nehru: Hiren Mukerjee. মনীষা গ্রন্থালয়, কলকাতা-১২; দাম: ১৫৲ টাকা। প্রচ্ছদ: খালেদ চৌধুরী।

ভূমিকায় উদ্ধৃত জহরলালের উক্তির উল্লেখ করে আমরাও প্রথমেই তার প্রতিধ্বনি তুলব—আজ পর্যন্ত ভারতে কি কেউ জীবনচরিত লিখেছেন? হীরেনবাবু অবশ্য তাঁর লেখাটির জন্য জীবনচরিতের দাবি ছেড়ে দিয়ে বলেছেন—হয়ত এটা ভাবী জীবনী, যা নিশ্চয় কোনদিন লেখা হবে, তারই অভিমুখী একটি প্রবন্ধ। আমাদের মনে হয় তাঁর এই ভাষ্যের চেয়ে লেখাটির নামের সঙ্গে তার প্রাথমিক পরিচয়—জহরলাল নেহরুর ওপর একটি আলোচনা—এটি বেশি উপযোগী।

তাঁর দেড় পৃষ্ঠার ভূমিকার মধ্যে তিনি ব'লে রেখেছেন—'যদি ভাল রকমের মার্ক্সপন্থী হতুম, আমি সশস্ত্র যা আমি নই,—তাহলে অন্যভাবে লিখতুম।' অধ্যাপক মহাশয়ের এই বিনীত স্বীকৃতি সত্ত্বেও—বিনয় বস্তুটা বৈদগ্ধ ও বিদগ্ধের যত বড় গুণই হোক না, মার্ক্সপন্থীর নিশ্চয় বড় পরিচয় নয়—আমরা কিন্তু তাঁর লেখাটিকে মার্ক্সদর্শনের বর্ণবিমুক্ত দেখতে পাই নি। তবু আমরা জোর গলায় বলব তাঁর সংসদীয় বিতর্কমুখর মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক—তিনি 'যথেষ্ট সৎ' মার্ক্সবাদী নয় বলে তাঁর যত আফশোষই থাক না, আমাদের তাতে একটুও দুঃখ নেই। কেন না জবরদস্ত মার্ক্সপন্থী হলে হয়ত তাঁর জোরদার কলমের খোঁচায় অজস্র আগুনের ফুলকি উঠত, যা দুরূহ মার্ক্সপন্থায় অনেক আলোকপাত করত। এমন কি সহপন্থী-মহলে তাঁর কলমবাজীর জন্য সাধু! সাধু!! রবও উঠত। কিন্তু তিনি 'অন্যভাবে' লিখলে, একটি বিদগ্ধ মনের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গিতে বর্তমান বিশ্বের এক বিশাল ব্যক্তিত্বের যে অনন্য ছবিখানি ফুটে উঠেছে, তা হয়ত আমরা পেতুম না।

বাস্তবিক ২৩২ পাতার ক্যানভাসে হীরেনবাবুর আঁকা 'আশ্রয় লালিত অস্বস্তি', 'গান্ধীর মন্ত্রমোহ', 'শিক্ষানবীশী—জেলের ভেতরে ও বাইরে', 'বাতাসে বজ্রের নির্ঘোষ', 'বিশ্বের আপন জন', 'মুক্তি যেদিন এল', 'ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের সন্ধানে', 'পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য', পর্যালোচক-সংশয়িত 'সমাজবাদের পথে', 'ভারতের মধ্যপথ'—এই দশখানি খণ্ডচিত্র ছাড়িয়ে যে অখণ্ড চিত্রখানি ফুটে উঠেছে তা হল—'এই ছিল একজন মানুষ,' 'শান্ত অতিকায়' ও 'আমাদের সকলের চেয়ে সংস্কৃতি সম্পন্ন'। নিঃসংশয়ে এই বিরাট ব্যক্তি-বিগ্রহ 'ভারতের অন্তরে' স্থান পেয়েছে।

এর পরেও কিন্তু আমরা বিদগ্ধ জীবনচরিত আলোচনাকারীর বিনয়ের আতিশয্যের ফলে আর একটি ত্রুটির কথা উল্লেখ না করে পারি না। তাঁর সঙ্গে জহরলালের ব্যক্তিগত স্নেহ-প্রীতির সম্পর্কটা প্রতি পদে সংকোচ ও কুণ্ঠার সঙ্গে এড়িয়ে চলেছেন। ফলে দুজনের মধ্যে যে আলাপ-আলোচনা—সাক্ষাতে ও পত্রযোগে, যে সংযোগ ও সংস্পর্শ, ব্যক্তি জহরলাল চরিত্রের ওপর আলোকপাত করে তাকে আরও উদ্ভাসিত করতে পারত, তা হতে পাঠক কিছুটা বঞ্চিত হয়েছে। জনগনের জীবনচরিত লিখতে হলে যে বসওয়েল হতেই হবে, এ যেমন বীরপুজারীদের জুলুম, নৈর্ব্যক্তিক চরিত্র আলোচনা করতে হলেই আলোচিত চরিত্রের সঙ্গে সর্বসংস্পর্শহীন হতে হবে, এও তেমনি ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষতার শুচিবায়ু। চরিতকারের আত্মসচেতনতা বা তাঁর অহমিকা যখন তাঁর চিত্রিত চরিত্রের ওপর ছায়াপাত করে, তখনই তা হয় মারাত্মক—সে তার শিল্পকর্মকে করে বিকৃত, আর নিরপেক্ষ দৃষ্টিকে শক্তিহীন; কিন্তু যে সূক্ষ্ম সংবেদনশীল মন রেলগাড়ির কামরা হতে সুপ্রীম কোর্টের ইমারতের ওপর দৃষ্টি পড়লে, চোখকে পীড়িত বোধ করেন আর হুমায়ুনের সমাধি দেখে তা দূর করেন, সেই মনের অধিকারী যদি চোখের চিকিৎসক বা আর কাকেও তা না বলে ভারত আবিষ্কারক বলেন, তিনি যে ব্যক্তি জহরলালের চরিত্র আলোচনায় তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক উল্লেখমাত্র আবেগ ও উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হতে পারেন, একথা কল্পনা করা কোন বিচক্ষণ পাঠকের পক্ষে কঠিন।

চাষী, মজুর, গ্রাম ও নগরের বাসিন্দা, তার শিশু, ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে যে বিশাল ভারতের আত্মা প্রসারিত, তার সুখ-দুঃখের বিচিত্র স্পন্দনে অনুকম্পিত শান্ত অতিকায়ের বিরাট হৃদয়যন্ত্রটি যেদিন মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবী স্পর্শে বন্ধ হয়, তার আগের রাত্রে তিনি আমেরিকার কবি রবার্ট ফ্রস্টের যে ক'টি লাইন—

শোভন বনানী গভীর অন্ধকার,
তবু আমার যে আছে রাখতে অঙ্গীকার,
আর নিদ্রার আগে যেতে হবে বহুদূর
আর নিদ্রার আগে যেতে হবে বহুদূর।

বিচিত্র খেয়ালে তাঁর ডেস্কের ওপর রাখা প্যাডে লিখে রেখেছিলেন, তার করুণ মধুর তাৎপর্য ব্যাখ্যা শক্তিমান হৃদয়ের দ্বারাই সম্ভব আর এই শক্তির স্বাক্ষর এই চরিত্র আলোচনার ছত্রে ছত্রে।

আমরা এই শক্তিমান হৃদয়বেত্তাকে ভারতীয় পার্লামেণ্টের বিতর্ক যুদ্ধক্ষেত্রে বিরোধী দলের নেতারূপে আক্রমণ পরিচালনা করতে দেখেছি। তাঁর শান্ত অতিকায় সেদিন লোকসভার নেতা। ক্ষুরধার বাগ্মিতার এই অসি চালনা সেদিন এই অতিকায়কেও স্তব্ধবিস্ময়ে অভিভূত করেছিল। সংহত, সুসংবদ্ধ চিন্তায় অনুভূতির গভীরতা যদি বাগ্মিতার এই বেগের আবেগ সঞ্চারিত করে, তাহলে যে স্টাইল সৃষ্টি হয়, হীরেনবাবুর এই লেখায় আমরা তার পরিচয় পাই। এই গতিবেগই পাঠককে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ ভারত-ইতিহাসের অর্ধ শতাব্দী উত্তীর্ণ করে স্বাধীনতা-উত্তর যুগে ও আরও পরে শান্ত অতিকায়ের মুখোমুখি হাজির করে। তাই গ্রন্থখানি সার্থক।

জয়ন্তী সেন

পাঠক মন

৩০শে পৌষ, ১৩৭১ তারিখের সাপ্তাহিক বসুমতীতে শিলালি লিখিত 'রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে' প্রবন্ধটিতে সাম্প্রতিক পৃথিবীর বারোজন শ্রেষ্ঠ চিত্রপরিচালকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তাঁদের ছবিসহ প্রকাশিত হয়েছে। ছবি সংযোজনায় রচনাটি অধিকতর উপভোগ্য হয়েছে সন্দেহ নেই। কারণ, আমাদের মত এমন কৌতূহলী পাঠকের অভাব নেই যাঁরা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ও কৃতী মনস্বীদিগের পরিচিতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের প্রতিকৃতি দর্শনেও যথেষ্ট আনন্দ লাভ করেন।

অতএব সুলেখক ও সহৃদয় 'শিলালি' যদি তাঁহার রঙ্গমঞ্চ ও নাট্য-বিষয়ক রচনায় মাঝে মাঝে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের (যেমন, ইব্‌সেন, বিয়র্নসন, স্ট্রিণ্ডবার্গ, গলস্‌ওয়াদি, চেখভ, ওয়াইল্ড ইত্যাদি) প্রতিকৃতি সংযোজন করেন তা হ'লে খুবই কৃতার্থ হই। একইভাবে, হরপ্রসাদ মিত্র মহাশয়ের 'সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর' প্রবন্ধেও উল্লিখিত কবি, সাহিত্যিক-দিগের প্রতিকৃতি মুদ্রিত হওয়া উচিত।

গিরিজামোহন চক্রবর্তী
লালপুর, পোঃ চাকদহ
নদীয়া

• • •

আপনার সম্পাদনায় পুস্তকাকারে সাপ্তাহিক বসুমতী আমার ভাল লাগছে। বিষয় নির্বাচনে—সন্নিবেশে—অভিনবত্ব—মৌলিকত্ব ও চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'শহর কলকাতা', 'বাণিজ্যে সেকাল ও একাল' মন অতীতে বহুদূরে টেনে নিয়ে যায়। সুজলা-সুফলা সোনার বাংলার বর্তমান হৃতসর্বস্ব ও 'চলমান শ্মশানের' রূপ দেখে মন ভারাক্রান্ত হয়। 'ভারতদর্শন,' 'বঙ্গদর্শন' 'আন্তর্জাতিক' সম্পাদকীয় প্রভৃতি অল্প কথায় প্রবহমান জগতের ঘটনা-বলীর ওপর অঙ্গুলি নির্দেশ ও আলোকপাত করে। আপনার সাপ্তাহিকটিতে সংবাদপত্র ও সাহিত্যের অপূর্ব সমাবেশ। আকার ও বস্তুর তুলনায় মূল্য সুলভ।

যদি সম্ভব হয় এবং অসুবিধা না হয় তবে রঙ্গজগৎ ও খেলাধূলার স্থান কিছু সঙ্কুচিত করে বসুমতীর ঐতিহ্য স্মরণ করে মহাপুরুষ ও তথাগতগণের যুগোপযোগী বাণী এবং লোকহিত-ব্রতী জীবনের জন্য স্বল্প স্থান রাখেন, তবে আমার মনে হয় আপনার সাপ্তাহিক অভিনবতম ও সর্বপরিপূরক হয়। আপনি আপনার কুশল-কৌশলী বলিষ্ঠ লেখনী দ্বারা বাংলার চলমান শ্মশানের বুকে ইষ্ট ও কৃষ্টির দীপ অনির্বাণ রাখুন। বাংলা যদি না বাঁচে তো কে বাঁচবে? আপনার সাপ্তাহিকের অভীঃ ধ্বনি সর্বত্র প্রতিধ্বনিত হোক। মৃত্যুর প্লাবন স্তব্ধ হোক।

আপনার বসুমতীর প্রচ্ছদপট চলতি জগতের বিশেষ বিশেষ ঘটনার নির্দেশক। এতৎ প্রসঙ্গে আমার মনে হয় বিশেষ বিশেষ দিনে যেমন গৌরাঙ্গ-দেব—ভগবান যিশুখৃস্ট, ভগবান রামকৃষ্ণ, স্বামীজী ইত্যাদি তথাগত ও দিব্য-পুরুষগণের শুভজন্মদিনে প্রচ্ছদপটে তাঁদের ভাবব্যঞ্জক ছবি ও বিশেষ বাণী দেওয়া যেতে পারে।

পত্রিকায় সুষ্ঠু ব্যঙ্গচিত্র, ভ্রমণ ও ঐতিহাসিক কাহিনীর অভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রথম শ্রেণীর ক্ষুদ্র গল্পের সমাবেশ হলে আপনার সাপ্তাহিকের মান আরো উন্নত হবে বলে মনে হয়।

সুধীরচন্দ্র বিশ্বাস
গ্রাম—হাটবেরিয়া পোঃ—রামনগর,
জেলা—সাহার সা (বিহার)

• • •

আমি দশম শ্রেণীর ছাত্র। সাপ্তাহিক বসুমতী আমার পড়তে খুবই ভাল লাগে। ভাল লাগে এই কারণে যে, পৃথিবীর সব রকম দেশের সব রকম খবর এর থেকে পাওয়া যায়। একটা বিষয়ে আপনাদের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি: বাপু নাদকার্নি, চন্দ্রশেখর এবং ইন্দ্রজিৎ এই তিনজন ক্রিকেট খেলোয়াড়ের ঠিকানা জানতে চাই। যদি সংগ্রহ করে দিতে পারেন তাহলে খুবই খুশি হব। এঁদের ঠিকানা সাপ্তাহিক বসুমতীতে ছেপে দিলেই হবে।

শ্রীমিহিরকুমার দাস;
অবধায়ক: শ্রীকৃষ্ণধন দাস
মধ্যমগ্রাম, ২৪-পরগণা

• • •

গ্রাহক, শুভাকাঙ্ক্ষী ও উন্নতিকামী পাঠক হিসাবে 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র 'পাঠকমন' বিভাগটিতে আমি আপনাদের দেওয়া কতকগুলি সুযোগের সদ্ব্যবহার করবো।

'আন্তর্জাতিক', 'ভারতদর্শন', 'বঙ্গদর্শন'—এ অধ্যায়গুলোর দু-একটা একঘেয়ে এবং অপ্রয়োজনীয় ছবি বাদ দিয়ে, ঐ ছবিই সময়োপযোগী ক'রে দিলে বা একটু নতুন ধরণের করলে—অধ্যায়গুলি অবশ্যই আরও আকর্ষণীয় হ'য়ে উঠবে।

মাঝে মাঝে খ্যাতনামা দু-একজন লেখকের ছোটগল্প প্রকাশ করলে ভাল হয়। তাতে নবীন লেখকগণ আরও একটু প্রভাবিত হ'তে পারেন।

প্রায় সংখ্যাতে উল্লিখিত 'সঙ্গীত-কথা' পাড়াগাঁয়ের প্রতিভাবান অথচ অখ্যাত শিল্পীদের মনে সাড়া জাগায়। তাঁদের প্রসুপ্ত হৃদয়ের বাসনাও অন্তত ক্ষণিকের জন্য মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সুতরাং এই ছোট্ট বিভাগটিও সুপ্রযোজ্য। এজন্য বুদ্ধদেব রায় ধন্যবাদার্হ।

এ ছাড়া অন্যান্য বিভাগগুলিও যে 'অভিনবত্বে'র মানদণ্ডে সমাসীন—একথা বলা বাহুল্য।

কালীশঙ্কর রায়
পোঃ -।- গ্রাম—আলিগ্রাম
জেলা—বীরভূম

খেলাধুলা

ক্যাসিয়াস ক্লেকে অটোগ্রাফ দিতে দেখা যাচ্ছে

ভাঙলো মিলন মেলা

অরুণদেব তখন আস্তে আস্তে গঙ্গার কোলে চলে পড়ার আয়োজন করছেন। ইডেন উদ্যানের প্রহরী বিশাল দেবদারুগুলি দীর্ঘ ছায়া মেলে বিশ্রাম করছে। হঠাৎ চারিদিকের ঝিমিয়ে পড়া ভাবকে সচকিত করে মাইকে উদাত্তকণ্ঠে ধ্বনিত হল সংস্কৃত স্তোত্র। স্তোত্রপাঠের মাঝে ধীর পদক্ষেপে চুনী গোস্বামী বেদীর ওপর দীপাধারে রক্ষিত অগ্নিশিখা নির্বাপিত করে এলেন। দীর্ঘ পঁচাত্তর দিন একটানা জলবার পর পূতাগ্নিশিখা নিভলো ১৮ই জানুয়ারী। মোহনবাগান ক্লাবের প্লাটিনাম জয়ন্তীর সমাপ্তি উৎসবের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আপনাদের সামনে উপস্থিত করছি। স্তোত্রপাঠের শেষ ধ্বনিটুকু মিলিয়ে যাবার সাথে সাথে বিউগল বেজে উঠল করুণ সুরে, ঘোষিত হল জয়ন্তী উৎসবের সমাপ্তি। বিউগলের সুরে বিষাদের ছোঁয়া উপস্থিত সকলকেই আনমনা করে দিয়েছিল। উদ্বোধনী সঙ্গীতের রেশ আবার সকলকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনল।

সভাপতির আসনে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এবং প্রধান অতিথির আসনে শ্রীঅতুল্য ঘোষকে বসিয়ে সুরু হল সমাপ্তি উৎসব সভা। ভাষণদান পর্ব সুরু করলেন মোহনবাগান ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শ্রী এস এম বসু। ১৯১১ সালের ঐতিহাসিক শীল্ড

শ্রীঅমিতাভ

বিজয়ী মোহনবাগান দলের সহ-অধিনায়ক এবং বর্তমানে সেই দলের একমাত্র জীবিত খেলোয়াড় রেভাঃ সুধীর চ্যাটার্জী তাঁর ভাষণে অতীত স্মৃতির উপভোগ্য কয়েকটি স্মরণীয় কাহিনী শোনালেন। তিনি দেশে এবং বিদেশে মোহনবাগানের সুনাম এবং যশের কথাও জানালেন।

এর পর একে একে ভাষণ দিলেন অতীতের কয়েকজন দিকপাল খেলোয়াড়। প্রথমে ভারতীয় অলিম্পিক হকি দলের অধিনায়ক এবং মোহনবাগান ক্লাবের প্রাক্তন খেলোয়াড় জয়পাল সিং, তারপর প্রথম ভারতীয় অলিম্পিক ফুটবল দলের অধিনায়ক এবং মোহনবাগানের প্রাক্তন অধিনায়ক টি আও এবং শেষে মোহনবাগান এবং অলিম্পিক ফুটবল অধিনায়ক শৈলেন মান্না সংক্ষিপ্ত ভাষণে মোহনবাগানের প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে আগামী দিনের খেলোয়াড়দের সেই পথ অনুসরণ করতে বললেন। সভার প্রধান অতিথি শ্রীঅতুল্য ঘোষ এবং সভাপতি শ্রীপ্রফুল্ল সেনও ভাষণ দেন। মোহনবাগান ক্লাবের পক্ষ থেকে নেহরু স্মৃতি ফাণ্ডের জন্য শ্রীপ্রফুল্ল সেনকে ৫০,০০০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। ক্লাবের তরফ থেকে ধন্যবাদ দানের পর সভা সমাপ্ত হয়।

কয়েক সহস্র লোকের সমাগমে মোহনবাগান মাঠ এই দিন এক নবরূপ লাভ করে। ফুটবলের আসরেও এই মাঠে অনেক অনেক বেশি লোকের সমাগম হয়। কিন্তু দুই রূপের আকাশ-পাতাল প্রভেদ। সন্ধ্যায় বাজী পোড়ানোর সময় মনে হচ্ছিল যেন এক আনন্দমেলার মাঝে উপস্থিত হয়েছি, চারিদিকে আলোকমালায় সজ্জিত তখন মোহনবাগান ক্লাব এবং মাঠ। রাত্রি নামল মোহনবাগান মাঠের বুকে, প্লাটিনাম জয়ন্তী উৎসবের পঁচাত্তর দিনের একটানা আনন্দ উৎসবের অবসান হল।

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় রোয়িং

প্রতি মরশুমেই ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, টেনিস, টেবল-টেনিস এ্যাথলেটিক্‌স্, ভলি, সাঁতার প্রভৃতি বিষয়ে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু খুবই আশ্চর্যের কথা যে, এ বছরই প্রথম সরকারীভাবে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় রোয়িং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল কলকাতার রবীন্দ্র সরোবরে। এই প্রথম সরকারী আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় রোয়িং প্রতিযোগিতায় কলকাতা, যাদবপুর, পুনা এবং লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় অংশ গ্রহণ করে। এবারের প্রতিযোগিতায় তিনটি

[বি]ষয় ছিল 'স্কাল', 'পেয়ার' এবং [ফ]োর'।

'স্কাল'-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় [প্র]থমেই সেমি ফাইন্যালে যাদবপুরের [ক]াছে পরাজয় স্বীকার করে। 'স্কাল-এ' [য]াদবপুর ফাইন্যালে অনায়াসে পুনাকে [প]রাজিত করে। আকর্ষণীয় পর্যায়ে [উ]ন্নীত হয়েছিল কলকাতা বনাম যাদব-[প]ুর 'ফোর' ফাইন্যাল। কলকাতা [ত]িন লেংথের ব্যবধানে যাদবপুরকে পরাজিত করে, 'পেয়ার'-এ যাদবপুরের [ক]াছে পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ [ক]রে। কারণ ঠিক এই বিষয়ের পূর্বে 'পেয়ার'-এ কলকাতা যাদবপুরের কাছে [দ]ুর্ভাগ্যবশত পরাজয় স্বীকার করতে [ব]াধ্য হয়। যাদবপুর দুটি বিষয়ে বিজয়ী হয়ে চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করে।

বিশ্ব রেকর্ড

তাসমানিয়ার হোবার্টে অনুষ্ঠিত একটি প্রতিযোগিতায় অস্ট্রেলিয়ার দূরপাল্লার দৌড়বীর রন ক্লার্ক ৫০০০ মিটারে নতুন বিশ্ব রেকর্ড স্থাপনের কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। ক্লার্ক ৫০০০ মিটার দূরত্ব ১৩ মিঃ ৩৪'৮ সেকেণ্ডে অতিক্রম করে নতুন রেকর্ডটি স্থাপন করেন। এই বিষয়ে পুরাতন রেকর্ডের অধিকারী ছিলেন রাশিয়ার বিশ্ববিখ্যাত দৌড়বীর ভ্লাদিমির কুটস। ভ্লাদিমির ১৯৫৭ সালে রোমে এই রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর সময় ছিল ১৩ মিঃ ৩৫ সেঃ। এখানে উল্লেখ-যোগ্য যে, রন ক্লার্ক এবারের টোকিও অলিম্পিকে দূরপাল্লার দৌড়ে যথেষ্ট নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন।

খেলার মাঠের জুয়াখেলা

প্রত্যেক দেশেই ফুটবল অসম্ভব রকমের জনপ্রিয়। ফুটবলের ফলাফল নিয়ে অবৈধ বাজি ধরার প্রচলনও আছে প্রায় সব দেশেই। এই খেলা নিয়ে জুয়াখেলার ফলে আমাদের দেশেও ফুটবলে মাঝে মাঝে অবিশ্বাস্য রকমের ফলাফল হতে দেখা যায়। আমাদের কলকাতায় মাঠেও খেলা নিয়ে মাঝে মাঝে জুয়াখেলা চলে; এমন বহু দৃষ্টান্তই পাওয়া যায়।

কিছুদিন পূর্বে ইংলণ্ডের পেশাদার ফুটবলার রোনাল্ড হাওয়েলস ষড়যন্ত্র করে আগে থেকে পেশাদার

● রন ক্লার্ক

● প্লাটিনাম জয়ন্তী সমাপ্তি উৎসবে চুনী গোস্বামী পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করছেন

● যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় রোয়িং দল

ফুটবলের ফলাফল নির্ধারণ করার জন্য দোষী গাব্যস্ত হয়েছেন আদালতের কাছে। ইংলণ্ড ফুটবলের মাঠে অখেলোয়াড়ী আচরণের জন্য দোষী খেলোয়াড় সর্বদাই শাস্তি পান। এমন কি নামী দলের দামী খেলোয়াড়েরাও অব্যাহতি পান না। খেলা নিয়ে জুয়াখেলার জন্য ইংলণ্ডে দোষীর আরও বেশি শাস্তি। কিন্তু আমাদের দেশে এখনও ফুটবল সংস্থা ততটা কঠোর মনোভাব গ্রহণ করতে না পারার ফলে আমাদের দেশে খেলার মাঠে শৃঙখলা প্রতিষ্ঠিত হবে না।

মহম্মদ আলি ক্লে?

বর্তমান বিশ্ব হেভী-ওয়েট মুষ্টিযুদ্ধ চ্যাম্পিয়ন মহম্মদ আলি ক্লেকে অতিক্রম করে আমেরিকার ওয়েল্টার-ওয়েট মুষ্টিযুদ্ধ চ্যাম্পিয়ন-এমিল গ্রীফিথ বৎসরের শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা বলে সম্মানিত হয়েছেন। আমেরিকার রিং ম্যাগাজিন কর্তৃক প্রকাশিত বাছাই তালিকায় গ্রীফিথের পর দ্বিতীয় স্থান পেয়েছেন ক্যাসিয়াস ক্লে।

গত বছর লিস্টনের সঙ্গে লড়াই স্থগিত হবার পর বাক্যবাগীশ মহম্মদ আলি ক্লে কিন্তু চুপ করেই আছেন। তিনি লড়াইয়ের ঠিক পূর্বেই হার্নিয়া অপারেশন করান। বর্তমানে তিনি অপেক্ষাকৃত সুস্থ আছেন, কিন্তু খুব শীঘ্র লিস্টনের সঙ্গে লড়াইয়ে মিলিত হতে পারবেন না।

ক্লে বর্তমানে আমেরিকার উগ্রপন্থী ব্ল্যাক মুসলিম সম্প্রদায়ের একজন সক্রিয় এবং গোঁড়া সদস্য। যে সমস্ত ব্ল্যাক মুসলিম তাঁদের কার্যকলাপের জন্য আদালতে বিচারের সম্মুখীন হয়েছেন, এমন এগারোজনের বিচারের সময় সাহায্যের জন্য বোস্টনের বিচারালয়ে মহম্মদ আলি ক্লে উপস্থিত হন।

সমাচার দর্পণ

মধ্যপ্রদেশের খাণ্ডাওয়াতে অনুষ্ঠিত শেষ হকি টেস্ট খেলায় ভারত ৩—০ গোলের ব্যবধানে ফরাসী দলকে পরাজিত করেছে।

• • •

মহিলাদের লন টেনিস প্রতিযোগিতা ফেডারেশন কাপের খেলায় অস্ট্রেলিয়া পুনর্বার বিজয়ী হয়ে তাদের একচ্ছত্র প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রেখেছে। অস্ট্রেলিয়া ২—১ খেলার ব্যবধানে আমেরিকাকে পরাজিত করে।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাপ্তাহিক বসুমতী

দিল্লীর রাজপথে প্রজাতন্ত্র দিবসের শোভাযাত্রায় নাগা গ্রামীণ জীবনের দৃশ্যসজ্জা।

৯ বর্ষ, ৩৬শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২১শে মাঘ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ • 4th February, 1965 • Vol. 69, No.

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	২২৪৩
আজকের মানুষ	...	২২৪৪
সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর	হরপ্রসাদ মিত্র	২২৪৫
আমি যুদ্ধে যাবো (কবিতা)	বিনোদ বেরা	২২৪৭
অক্সফোর্ড থেকে লিখছি	অশোক দেব চৌধুরী	২২৪৮
হাওয়া খান (রস-রচনা)	ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়	২২৫০
দিগন্তের আহ্বান (কবিতা)	অপরাজিতা গোপ্পী	২২৫২
ভারতদর্শন	...	২২৫৩
আন্তর্জাতিক	...	২২৫৭
গ্রন্থমেলা	জয়ন্তী সেন	২২৬৩
আঁধারমাণিক (ধারাবাহিক উপন্যাস)	মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	২২৬৪

বঙ্গযুগের বিপ্লবী গুরু

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

নির্বাসিতের আত্মকথা, উনপঞ্চাশী, সিনফিন, অনন্তানন্দের পত্র, বর্তমান সমস্যা, জাতের বিড়ম্বনা, পথের সন্ধান, স্বাধীন মানুষ, ধর্ম ও কর্ম।

মূল্য—আড়াই টাকা

বলিষ্ঠ কথাশিল্পী

জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী

৭ খানি বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ উপন্যাস এবং ৩ খানি বড় লেখা—সুবৃহৎ গ্রন্থাবলী।

মূল্য তিন টাকা

আধুনিক কথা-সাহিত্যিক

বিভূতিভূষণ ভট্টের গ্রন্থাবলী

স্বেচ্ছাচারী, আশা, সহজিয়া, সপ্তপদী।

মূল্য—৩৲ টাকা

রসরাজ

অমৃতলাল বসুর গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—হরিশ্চন্দ্র, আদর্শ বন্ধু, যাদুকরী প্রভৃতি ১১ খানি নাটক।

২য় ভাগে—খাসদখল, চোরের উপর বাটপাড়ি, অবতার প্রভৃতি ১১ খানি নাটক।

৩য় ভাগে—বিবাহ বিভ্রাট, তরুবালা, ব্রজলীলা প্রভৃতি ১১ খানি নাটক

প্রতি ভাগ আড়াই টাকা

কাব্য-সাহিত্যিক

বিহারীলাল চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী

জীবনী ও কাব্য সমালোচনা, বিহারীলালের সারদা, বিহারীলাল ও তাঁহার কাব্য, সারদামঙ্গল, বন্ধুবিয়োগ, প্রেম-প্রবাহিনী, স্বপ্ন-দর্শন, সঙ্গীতশতক, বঙ্গসুন্দরী, নিসর্গ-সন্দর্শন, মায়াদেবী, ধূমকেতু, শরৎকাল, দেবরাণী, বাউল বিংশতি, সাধের আসন, কবিতা ও সঙ্গীত। মূল্য ৩৲ টাকা

বরগুণ কবির মূল্যবান সংস্কৃত ও বাংলা রচনার সমাবেশ। বঙ্গসাহিত্যে অভিনব আয়োজন।

বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী

মূল্য—পাঁচ টাকা।

প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা

যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর গ্রন্থাবলী

২য় ভাগে—সীতা, বিষ্ণুপ্রিয়া, মহামায়ার চর ও পূর্ণিমামিলন।

মূল্য দুই টাকা

উপন্যাস সাহিত্যের প্রদীপ্ত ভাস্কর

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

তৃতীয় ভাগ—বেলমতিয়া, বঙ্গসংসার, সনাতন গোস্বামী, পূজার মালা ও রাণী ব্রজসুন্দরী। মূল্য—এক টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
শহর কলকাতা	শ্রীপদাতিক	২২৬৭
বাণিজ্যে সেকাল ও একাল	ধনপতি সওদাগর	২২৭০
ডিটেকটিভ সবাই হতে পারে (গোয়েন্দা-গল্প)	পরিমল গোস্বামী	২২৭৩
জীবন-তৃষ্ণা (গল্প)	বীথিকা ঘোষ	২২৭৮
লাজপৎ রায় (কবিতা)	বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়	২২৮১
অদ্বিতীয়া (ধারাবাহিক উপন্যাস)	সুশীল রায়	২২৮২
বঙ্গদর্শন	...	২২৮৪
চার্লি চ্যাপলিন	অশোক সেন	২২৮৯
রঙ্গজগৎ	...	২২৯৩
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	শিলালি	২৩০০
খেলাধূলা	শ্রীঅমিতাভ	২৩০২

ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বেকার, চাকুরীপ্রার্থী ও শিক্ষানুরাগীদের ভাষা শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য একমাত্র গ্রন্থ

॥ বিদেশী ভাষায় দক্ষতা অর্জ্জনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সহায়ক ॥

০০০ যত্নপ্রয়াসে পর্য্যাপ্ত ফল অবশ্যম্ভাবী ০০০

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

রা জ ভা ষা

(ইংরাজী ভাষা সহজে শিক্ষার অদ্বিতীয় সাহায্যগ্রন্থ)

এক আধারে : ভাষা - ব্যাকরণ - শব্দার্থ

ইংরাজী হইতে বাঙলা—৩·৫০ ॥ ইংরাজী হইতে উর্দ্দু—১·০০

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের

ম হা ভা র ত

[প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড]

(প্রতি খণ্ড মূল্য আট টাকা)

সদ্য-প্রকাশিত চতুর্থ খণ্ড : মূল্য—ছয় টাকা

(ডাকমাশুল স্বতন্ত্র)

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

মাইকেল গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগে :—মেঘনাদবধ কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, পদ্মাবতী-নাটক, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা ?

মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় ভাগে :—কৃষ্ণকুমারী নাটক, শর্ম্মিষ্ঠা নাটক, তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী, বিবিধ কাব্য, মায়া কানন, হেক্টর বধ ।

মূল্য—দুই টাকা

—ঔপন্যাসিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান—

দামোদর মুখোপাধ্যায়ের

দামোদর-গ্রন্থাবলী

১ম খণ্ড ১·৫০ ২য় খণ্ড ২·৫০

৩য় খণ্ড ১·০০ ৪র্থ খণ্ড ২·৫০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

৬১ বর্ষ, ৩৬শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পঃ 25 Paise
বৃহস্পতিবার, ২১শে মাঘ ১৩৭১ Thursday, 4th February 1965

হৃদয়বিদারক অগ্নুৎসব

প্রজাতন্ত্র দিবসে যে সংহতির আমরা কামনা করেছিলাম তা এবার এমন হৃদয়বিদারক 'অগ্নুৎসবে' পরিণতি লাভ করবে—তা আগে কল্পনাও করা যায় নি। প্রজাতন্ত্র দিবসের পবিত্রতাকে ক্ষুণ্ণ করে হিন্দী-যুগের সূচনা হয়েছে—সুতরাং বলপূর্বক হিন্দী প্রচলনের যাঁরা বিরোধী তাঁদের কাছ থেকে প্রতিবাদমূলক বিক্ষোভই আশা করেছিলাম। কিন্তু প্রাণের ভাষা রক্ষার জন্য অগ্নিতে প্রাণাহুতির মতো ঘটনা সাধারণ বিক্ষোভ মাত্র নয়, তা বলাই বাহুল্য। দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ, মাদুরা, অন্ধ্র প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে প্রজাতন্ত্র দিবস থেকে সুরু করে আজ পর্যন্ত 'অগ্নুৎসব'সহ যে সব ঘটনা ঘটে গেল তদ্দ্বারা আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার কোন্ নতুন শিক্ষা লাভ করলেন তা বুঝে ওঠা দুঃসাধ্য। তবে সরকারপক্ষ থেকে সংবিধানের দোহাই দিয়ে সারা ভারতের আষ্টেপৃষ্ঠে হিন্দীকে জুড়ে দেওয়াই যে উদ্দেশ্য—তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

আমাদের সরকার কথায় কথায় জনগণের কল্যাণের কথা বলেন। জনসাধারণের এই কল্যাণের দিক সম্পর্কে পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু সচেতন ছিলেন বলেই তিনি হিন্দী প্রচলনের ব্যাপারে কোনোদিন তাড়াহুড়ো করেন নি এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে মাতৃভাষার প্রতি যে আবেগ বর্তমান থাকে, তাকেও তিনি মর্যাদা দান করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। অথচ এই সময় যখন সেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা নেহরু আমাদের মধ্যে অনুপস্থিত, খাদ্যবস্ত্রের সমস্যায় সারা দেশ যখন জর্জরিত, দেশের মধ্যে সংহতি যখন প্রতিমুহূর্তে প্রয়োজন, তখনই হিন্দীকে ডেকে এনে সরকার যে অনাসৃষ্টির সৃষ্টি করলেন—তা এই কথা প্রমাণ করে যে, তাঁরা জনসাধারণের নাড়ীর খবর রাখেন না।

দেশের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে হিন্দী চাপিয়ে দেওয়ার আধিপত্য দেখে জনসাধারণও স্বভাবতই আজ মনে করতে বাধ্য হচ্ছে যে, হিন্দীর রোলার চাপিয়ে সরকার তাঁদের ভাষাগুলিকে দমন করতে চান। তাঁদের ভাষাও হিন্দীর চেয়ে কোনো অংশে নিকৃষ্ট নয়, বরং হিন্দীই তুলনামূলক ভাবে নিকৃষ্ট এবং তা সর্ববিষয়ে পরিবেশনের প্রতিবন্ধক। তা ছাড়া একথাও সরকারের ভাবা উচিত ছিল যে, রাতারাতি সাইনবোর্ড ও তকমা হিন্দী ভাষায় রূপান্তরিত করা হলেও অহিন্দী-ভাষীদের মনের মধ্যে তাকে স্থান দিতে বাধ্য করা যায় না। কিন্তু সরকার সেই অবৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন করেছেন বলেই ভারত-সংহতির জন্য আমরা আজ প্রশ্নাকুল। আর সংহতির বিনষ্টি যদি ঘটে তার জন্যে সরকারকেই দায়িত্ব বহন করতে হবে। তাই আমাদের সানুনয় অনুরোধ,—এখনও সময় আছে—ভাষার ব্যাপারে সরকার অন্যান্য ভাষাভাষীদের কথা বিবেচনা করুন। সংবিধানে যে কথাই লেখা থাকুক না কেন, মানুষের জন্যই সংবিধান এবং সে বিধান অলঙ্ঘনীয়, সরকার সেই সত্য উপলব্ধি করুন।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

খবর পেলাম দাক্ষিণাত্যের উত্তাল জনসমুদ্রে বিক্ষুব্ধ ঝড় উঠেছে হিন্দীভাষার জবরদস্তির বিরুদ্ধে। খবর পেলাম তিনটি তরুণ প্রাণ নিজ দেহে অগ্নিসংযোগ করে আত্মাহুতি দিয়ে জোরালো করতে চেয়েছে তাদের প্রতিবাদের ভাষাকে। চাঞ্চল্যকর খবর। এবং আশংকাজনকও বটে। কেন না, এ ধরণের প্রতিবাদে আত্মাহুতির প্রেরণা বা দৃষ্টান্ত কতটা সংগত জানি না, তবে হৃদয়বিদারক সন্দেহ নেই। কিন্তু উচ্চাভিলাষী (?) নেতা যেন এই মুহূর্তের সুযোগটুকুরই অপেক্ষায় থাকেন। কথায় বলে 'Strike the iron while it is hot.'। কিন্তু কিসের আগুনে লোহা উত্তপ্ত তার খোঁজ করার প্রয়োজন কি?

মোটকথা লোহাটা এখন গনগনে গরম। অতএব---। অতএব আন্নাদরাই-এর মত লোক আত্মপ্রতিষ্ঠার এই সুযোগ হারাতে রাজী নন কোনমতেই। আন্নাদরাই-এর কথা বলছি। ওই নাম ক'দিন ধরে কানে আসছে বারবার। অবশ্য, বস্তুত পক্ষে এই নামের সঙ্গে একেবারেই পরিচয় নেই তা নয়। প্রায় অষ্টাদশ শতকের মনোবৃত্তি নিয়ে রাজনীতিতে এসেছেন আন্নাদরাই। সামন্ততন্ত্রে তাঁর এখনও প্রগাঢ় আস্থা। জমিদারী প্রথা বিলোপের সময় জমিদার, রাজন্যবর্গের হ'য়ে তুমুল বাক্যবাণ নিক্ষেপ করেছেন। বিপুল সংখ্যক লোক তাঁর এ ভূমিকায় বিভ্রান্ত না হ'লেও তাঁর চেহারাটা মনে থেকে গেছে সকলের। ঘটনাচক্রে আজ হিন্দীভাষার জুলুমবাজীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিলে আন্নাদরাই-এর বিক্ষুব্ধ প্রেরণা সঞ্চার করেছে উদ্দীপনার। তাঁর পক্ষে সমর্থনও এসেছে প্রচুর। জুটেছে প্রায় নেতার মর্যাদাও। হিন্দীবিরোধী উত্তেজনার মধ্যে আজ তামিল অঞ্চলের অধিবাসীরা তার 'পলিসি অফ্ সেপারেটিজমকে'ও মেনে নিয়েছে। বিশেষত মধ্যবিত্ত স্বল্প শিক্ষিত দাক্ষিণাত্যবাসীদের ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের দুর্ভাবনার আংশিক আশ্রয় যেন তারা পেয়েছে আন্নাদরাই-এর বিপ্লবাত্মক চরিত্রে।

অত্যন্ত সাধারণ সম্ভাবনার ব্যক্তিত্ব নিয়েও সুযোগের সদ্ব্যবহারে আন্নাদরাই এক উল্লেখযোগ্য মানুষ। তামিল অঞ্চলের লোক তাঁকে চেনে শুধু 'আন্না' নামে। তাঁর রচনা, চিন্তাধারা, বক্তৃতা কোনটাতেই তেমন বৈশিষ্ট্য কিছু নেই। তবু আন্নাদরাই আজ জনতার সামনের সারিতে।

পাচায়াপ্পা কলেজের ছাত্রাবস্থা থেকেই রাজনীতিতে হাতেখড়ি। বৃটিশদের পৃষ্ঠপোষকতায় 'জাস্টিস পার্টির' প্রচারকার্য চালাতেন এক সময়। '৪৩ সালে 'সালেম' কনফারেন্সের 'দ্রাবিড় নাড়ু' প্রস্তাবের তিনিই উদ্যোক্তা। এই প্রস্তাবক্রমে তাঁর দল বিভক্ত হ'ল। রামস্বামী নায়কার গড়লেন 'দ্রাবিড় কাজহাগম' দল। আন্নাদরাই স্বতন্ত্রভাবে 'দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাজহাগম'---সংক্ষেপে ডি-এম-কে দল গঠন করলেন। দেশের জন্য বিনা স্বার্থত্যাগেই নেতৃত্বের আসন পেয়েছেন এমন মানুষ ভারতের রাজনীতির কালপঞ্জীতে আন্নাদরাই ছাড়া আর খুব কমই আছেন। সংগঠক হিসেবেও দক্ষ বলা চলে না। মুখে দ্রাবিড় সমাজতন্ত্রের বুলি আওড়ালেও তাঁর নিশ্চিত কোনও আদর্শ বা উদ্দেশ্য নেই। যে কোনও দলের সঙ্গেই তিনি সুবিধেমত সন্ধি স্থাপন করতে উদ্‌গ্রীব। আর এই স্বভাবের মূলধনেই দেশের বিভিন্ন রূপান্তরিত পরিস্থিতির অনুকূলে মানিয়ে নিতে পারেন নিজেকে। এমন কি সময় বিশেষে সেই জন্যেই তাঁর আহ্বান জনসাধারণের কাছে পৌঁছুতে অপেক্ষাকৃত কম

শ্রীআন্নাদরাই

সময় লাগে। আন্নাদরাই নিজেই সে ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন। এবং সেইটেই তাঁর সবচেয়ে বড় সুবিধে। তাই দক্ষিণাত্যের সাম্প্রতিক বিশৃঙ্খলার দিনে তিনি জনতার জোয়ারের তালে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করেন নি। আন্নাদরাই ঘটনার মোড় ফেরাতে কতদূর পারবেন তা নিয়ে জল্পনা আলোচনা উঠেছে বিস্তর। তবে এও ঠিক---যেখানে তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন জড়িত সেখানে কি আর ভাগ্যের মোড় ফেরাতে উঠে-পড়ে না লেগে পারেন।

সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর

হরপ্রসাদ মিত্র

কিন্তু গান না বেবাক বন্ধন? ঈগল না পোষা-টিয়া আমরা?

আমাদের ভবিতব্য কী?

রবীন্দ্রনাথের অজস্র কবিতায় এই রকম রাগ-রাগিণীর উল্লেখ দেখা গেছে। তাঁর সেই প্রসিদ্ধ কবিতা কার না মনে আছে—যেখানে প্রবীণ ওস্তাদ বরজলাল আর নবীন যুবা কাশীনাথ বসেছিলেন একই আসরে? 'লিপিকা'য় তিনি লিখেছিলেন—'এর পূরবী ওর বিভাসকে আশীর্বাদ করে চলে যাক'। মল্লার, দীপক, ইমন কল্যাণ, কোমল গান্ধার—গানের রাজ্য থেকে কতো সংকেতই তাঁর কবিতায় ব্যবহার করে গেছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের লাইন মনে রেখেই, বিষ্ণুবাবু তাঁর একখানি বইয়ের নাম রেখেছেন—'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার'। মনে পড়লো সে-কথা।

এ [illegible]ধ্বনি স্বাভাবিক। এমনি করেই [illegible] তৈরি হয়। এই ভাবেই আমাদে[illegible] মন সক্ষম হয়ে ওঠে।

আমাদের প্রত্যেকের মনে মনে একদিকে শৃঙখলার দাবি, অন্যদিকে শৃঙখল মোচনের। আমরা সংঘে গিয়ে নাম লেখাই, আবার নিজের নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার জন্যেও মন টন টন করে। বিষ্ণুবাবু চিল, বাজ, গগনভেড়, সোনালি ঈগল ইত্যাদি পাখির নভোবিহারে মুগ্ধ,—আবার মানুষের জটিল সভ্যতার আইন-কানুনও তাঁকে মানতে হয়। মনের এই দ্বিধা-গতিই মনোধর্ম। এই দ্বৈতভাব সম্বন্ধে সচেতনতাই স্বাস্থ্য।

ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌ লেখিকাদের সুযোগ-দুর্যোগের ভাবনা ভাবতে ভাবতে যেমন মেয়েদের কিছু টাকাকড়ি এবং অন্তত আলাদা এক-একখানি ঘরের অত্যাবশ্যক প্রয়োজনবোধের দিকটি দেখিয়ে গেছেন, তেমনি বলেছেন যে শেক্সপীয়রের কালে হঠাৎ একজন মহিলা-শেক্সপীয়রের অভ্যুদয় ঘটা আদৌ সম্ভব ছিল না। আজ সেই কথা মনে পড়লো।

বিষ্ণুবাবু ঐ যে গগনভেড়ের নভোবিহার দেখে পাখিদের সম্বন্ধে মনে মনে কিঞ্চিৎ ঈর্ষা বোধ করেছেন,—ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌ কতকটা সেই ভাবেই পুরুষ শেক্সপীয়র সম্বন্ধে ঈষৎ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। হয়তো তাঁর সে-কথার এ ব্যাখ্যা প্রত্যাশিত নয়। তবু মনে এলো। কথাটা খুলে বলা দরকার।

তিনি লিখে গেছেন—যারা খেটে খায়,—লেখাপড়াবর্জিত যারা,—দাসত্ব করাই যাদের বিধিলিপি—তাদের সমাজ থেকে প্রতিভার অভ্যুদয় ঘটা অসম্ভব। ইংলণ্ডের আদিম ইতিহাসই তার প্রমাণ। সেই প্রাচীন স্যাক্সন আর ব্রিটনদের সমাজ থেকে শেক্সপীয়রের আবির্ভাব ঘটে নি। শেক্সপীয়র যখন এসেছেন, তখন সে সমাজ পরিণত।

বলেছেন—শেক্সপীয়রের আমলে ইংলণ্ডে এমন কোনো মেয়ের কথা ভাবাও যেতো না যে নির্ভয়ে পায়ে হেঁটে মফস্বল থেকে লণ্ডনে গিয়ে পৌঁছোতে পারতো, আর কোনো নাট্যশালার দরজা খুলে সোজাসুজি মঞ্চাভিনয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে নিজের রাস্তা খুঁজে নিতে পারতো। কী উপদ্রবই ছিল সেকালের মেয়েদের জীবনে। কতো ভয় ছিল, কতো বাধা।

তবু বাধা চিরকালের নয়। ভয় দূর হয়, পথ প্রশস্ত হয়। মানুষ নরকে থাকতে চায় না। সে পালাতে চায়, হারাতে চায়,—বাঁচতে চায় তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে। কোনো পরিপাটি সোনার খাঁচাতেও বন্দী থাকতে চাই না আমরা। মন আমাদের আকাশের দোসর। স্ত্রী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন—শ্রেণীনির্বিশেষে আমরা সবাই স্বাধীনতা চাই। একালের জটিল বন্ধনদশার মধ্যে বাস করা আমাদের আধুনিক সভ্য মনের নিয়তি বটে,—তবু তারই মধ্যে চিল, বাজ, সোনালি ঈগলদের সঙ্গে গভীরে আমাদেরও যোগ আছে। বিষ্ণুবাবু ঠিকই বলেছেন—আমাদের মন চায়—'দুই ডানা মেলে দেওয়া, যেন শুদ্ধ পিলু বা খাম্বাজ'।

মেয়েদের তরফ থেকে ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌ও এই একই ইচ্ছের ইশারা দিয়েছিলেন। নিয়মানুবর্তী হতে আপত্তি নেই, কিন্তু নিয়মের জাঁতাকলে চাপা পড়তে সত্যিই নারাজ আমরা।

এই ইচ্ছের নাম 'প্রাণ'। প্রাণের বিপরীত যা, তাকেই বলি 'অপ্রাণ'। পৃথিবীতে এই যন্ত্র-যুগে, সেই অপ্রাণের মসৃণ এক ধরনের সফলতা আমরা সকলেই দেখছি। দেখতে দেখতে অনেক রকম ভাবনা মনে জাগে। কবি কিপ্‌লিঙের কথা মনে পড়ে। তিনি ডায়নামো, এঞ্জিন, স্টীমার ইত্যাদি যন্ত্রের অনেক প্রশংসা করে গেছেন।

আমি কিপ্‌লিঙকে দেখিনি। কিন্তু স্টিফেন স্পেণ্ডারকে দেখেছি। তাঁর নিজের কণ্ঠে আবৃত্তি শুনেছি—এক্সপ্রেস ট্রেন কবিতার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হলে সেই বিকেলে তিনি যখন তাঁর সুন্দর পাঠের মধ্য দিয়ে শ্রোতৃ দৃশ্যপটে, ইস্পাতের লাইন ধরে এগিয়ে যাওয়া

এক্সপ্রেস ট্রেনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী গতির বিস্ময় ফুটিয়ে তুলছিলেন, আমরা শ্রোতার দল তখন ভারি খুশি হয়ে তাঁর চমৎকার চেহারা দেখছিলুম।

সে বেশ ক'বছর আগেকার কথা। তখনো কিপ্‌লিঙের যন্ত্র-বন্দনা আমাদের মনে ছিল। শুনেছিলুম, তবু এইচ অডেন-ই কিপ্‌লিঙের পরবর্তী প্রথম উল্লেখযোগ্য কবি—যাঁকে বলা যায় যন্ত্র-রসিক কবি। সেসিল ডে-লুইসের প্রথম দিকের কবিতায় যন্ত্রানুরাগের চিহ্ন সম্বন্ধে মাঝে মাঝে আলোচনা কানে এসেছে। তারই মধ্যে আমরা বাংলায় রবীন্দ্রনাথের 'পথ', 'পাখি' ইত্যাদি প্রিয় রূপকের স্বাদে আকৃষ্ট থেকেছি। আমরা স্বভাব-রোমান্টিক। আমাদের হেমচন্দ্র রেলগাড়ির কবিতা লিখেছিলেন বটে,—রবীন্দ্রনাথ এরোপ্লেনের ওপরেও লিখে গেছেন,—কিন্তু সাধারণভাবে বোধ হয় এ-কথা বললে অন্যায় হয় না যে যন্ত্রে কখনোই খুব একটা মুগ্ধ হইনি আমরা।

কিপ্‌লিঙ ভগবানকে বলেছেন—মহামহিমান্বিত ওভারশিয়র। সমর, সাম্রাজ্য এবং—যন্ত্র-যুগের প্রথম মুগ্ধ ভাবটা তাঁর মধ্যে বেশ অনুভব করা যায়। যন্ত্র মিথ্যে কথা বলে না, যন্ত্র কোনো খুঁৎ সহ্য করতে নারাজ। এই ছিল কিপ্‌লিঙের বন্দনার কারণ। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, এ জগৎ সুশৃঙখল রহস্যময়তায় আচ্ছন্ন। শৃঙখলার ওপর তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল। হুকুম মেনে চলো—জগৎ-যন্ত্রের মসৃণ গতি অব্যাহত থাকবে। এই ছিল তাঁর মনের কথা। তাঁর আপন মেজাজ।

আজ এসব কথা মনে আসছে কেন? পৃথিবীর যন্ত্র-রসিক কবিদের তালিকা তৈরি করতে বসিনি আমি। বিষ্ণুবাবুর গগনভেড়ের ধ্যান একদিকে, আর কিপ্‌লিঙের বা অডেনের বা স্পেণ্ডারের যন্ত্রানুরাগের মর্জি অন্যদিকে—এই দুই ভিন্ন অভিমুখিতার লক্ষণই কথায় কথায় মনে এলো। অডেন, স্পেণ্ডার, বিষ্ণু দে—এঁরা একই কালের লেখক। সমকালীনরা সকলেই যে সমদর্শী বা সমপন্থী হবেন, তার কোনো বাধ্যতা নেই। কিপ্‌লিঙ আর কাফ্‌কার অথবা কিপ্‌লিঙের সঙ্গে স্ট্রিণ্ডবার্গের দূরত্বের দিক বিবেচ্য।

কিপ্‌লিঙ ইংরেজ লেখক। তাঁর জন্ম ১৮৬৫তে; তিনি মারা গেছেন ১৯৩৬এ। কাফ্‌কা ছিলেন জার্মান চেক,—আয়ুষ্কাল ১৮৮৩-১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ। স্ট্রিণ্ডবার্গ সুইডেনের লেখক, জন্ম ১৮৪৯, মৃত্যু ১৯১২তে। কিপ্‌লিঙ যখন ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের রূপে-গুণে-শক্তিতে মুগ্ধ ছিলেন, যন্ত্রের মসৃণ শৃঙখলায় বিভোর হয়ে তিনি যখন এঞ্জিনের গুণগান করেছেন, স্ট্রিণ্ডবার্গ তার কিছু আগে থেকেই উপন্যাসে আর নাটকে ন্যাচারালিজ্‌ম্‌ চর্চা করেছেন। আমাদের বিহারীলাল তখন সদ্য সারদামঙ্গল প্রকাশ করেছেন; রবীন্দ্রনাথ তখনো প্রতিষ্ঠিত নন।

সেই সুদূর ১৮৭৯তে স্কাণ্ডিনেভিয়ার সাহিত্যে প্রথম ন্যাচারালিজ্‌মের লক্ষণ দেখা দেয় স্ট্রিণ্ডবার্গের 'দি রেড রুম' উপন্যাসে। আশির দশকে পর পর তাঁর কখানি নাটক দেখা দেয়। আমাদের বাংলা নাটকের ধারায় তখন গিরিশচন্দ্রের আমল। ওদেশে স্ট্রিণ্ডবার্গ তখন নাটকে ন্যাচারালিজ্‌ম্‌ চর্চা করেছেন।

তাঁর ঐ প্রাকৃতবাদী নাটক 'দি ফাদার' (১৮৮৭), 'মিস জুলিয়া' (১৮৮৮) ইত্যাদির পরে আমাদের এই শতকের একেবারে গোড়ার দিকে তিনি 'দি ডান্স অফ ডেথ' এবং 'দি ড্রিম প্লে' নামে পর পর দু'খানি নাটক লেখেন,—প্রথমটি বেরোয় ১৯০১এ, দ্বিতীয়টি ১৯০২এ। এই দুটি নাটকের ঐতিহাসিক গুরুত্ব কম নয়। শোনা যায়, এক্সপ্রেশনিজ্‌মের সূচনা ঘটেছিল ঐ দুটি থেকেই। জার্মানির সাহিত্যে স্ট্রিণ্ডবার্গের প্রভাব ছড়িয়েছে। ফ্রাঙ্ক ওয়েডেকাইণ্ড (Frank Wedekind ১৮৬৪-১৯১৮), গের্জ কাইজার (Georg Kaiser ১৮৭৮-১৯৪৫) ইত্যাদি লেখক এক্সপ্রেশনিজ্‌মের দিকে মন দিয়েছেন। আমেরিকায় ইউজিন ওনিল Eugene O'Neill ১৮৮৮-১৯৫৩) দেখা দিয়েছেন সেই একই পথের পথিক হয়ে। কারেল কাপেক (Karel Copek ১৮৯০-১৯৩৮) ছিলেন চেক। উপন্যাসে আর নাটকে তাঁর সমান প্রতিপত্তির কথা শোনা যায়। তিনিও এক্সপ্রেশনিজ্‌ম্‌-পন্থী। তাঁর প্রসিদ্ধ একখানি নাটকের নাম—ইংরেজি অনুবাদে—'Rossum's Universal' Robots সংক্ষেপে R.U.R। সে বই বেরোয় ১৯২১এ। আমাদের বাংলা সাহিত্যে তখনো সে রকম কোনো ঢেউয়ের চিহ্ন ছিল না।

এই R.U.R থেকেই ইংরেজি ভাষায় 'রোবট' শব্দটি চালু হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, অলডাস হাক্সলির 'ব্রেভ নিউ ওয়ার্লড' (১৯৩২) জর্জ অরওয়েলের 'নাইন্টিন এইটি ফোর' ইত্যাদি আগামী কালের বিজ্ঞান-রাজনীতিসর্বস্ব ভবিষ্যৎ চিত্রণের প্রসিদ্ধ চেষ্টাগুলির সূচনা সেই কাপেকের R.U.R থেকেই। এইচ, জি, ওয়েলসের (১৮৬৬-১৯৪৬) 'দি টাইম মেশিন' 'দি ইনভিজিবল ম্যান'—দুইই গত শতকের শেষ দশকের বই।

অরওয়েল জন্মেছিলেন আমাদের এই বাংলা দেশে। তাঁর জন্ম ১৯০৩এ। যে বছর তাঁর ঐ '১৯৮৪' বই হয়ে বেরোয়, তার পরের বছর,—১৯৫০এ তাঁর মৃত্যু হয়। ভদ্রলোক ইটন ইস্কুলে লেখাপড়া করেন, বর্মা মুলুকে ব্রিটিশ নিরাপত্তা পুলিশের চাকরি করেন, কিন্তু কিপ্‌লিঙের মতন সাম্রাজ্য সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ছিল না তাঁর। চাকরি ছেড়ে দিয়ে প্যারিতে বসবাস শুরু করেন লেখক হিসেবে। ১৯৩৪এ বর্মার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তাঁর উপন্যাস বেরোয়—'দি বারমিজ ডেজ'।

তাছাড়া আরো বই ছিল তাঁর। কিন্তু '১৯৮৪'-ই বোধ হয় তাঁর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ বই।

ইউরেশিয়া, পূর্ব এশিয়া আর ওশিয়ানিয়া—১৯৮৪তে সারা দুনিয়া ভাগ হয়ে গেছে এই তিন বৃহৎ রাষ্ট্র বিভাগে। উপন্যাসের ঘটনাক্ষেত্র ওশিয়ানিয়া। সেই রাষ্ট্রের শাসন-প্রণালী চলে ইংরেজ সমাজতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে—যার নাম 'Ingsoc'। দক্ষিণ মেরু অঞ্চল, উত্তর ও দক্ষিণ অ্যামেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ এই ওশিয়ানিয়া মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত। সেখানে দেশ-প্রেমের আদর্শ—কোনো এক 'বড়-দাদার' প্রতি আনুগত্য। এই 'বড়দা'-কে কেউ দেখেনি। রাস্তায় রাস্তায় বিজ্ঞাপনে তাঁরই ঘোষণা—'মনে রেখো বড়দার নজর আছে তোমার ওপর'।

আমাদের রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' [illegible] পড়ে। যক্ষরাজ ভয়া-[illegible] বিদ্যমান, কিন্তু খোলাখুলি চোখে পড়েন না তিনি!

অরওয়েলের '১৯৮৪' এক ভয়াবহ ভবিষ্যতের ছবি। সেখানে ঘরে ঘরে গুপ্তচরের কাজ করে যন্ত্র। ঘরে ঘরে যন্ত্রের চোখ, যন্ত্রের মুখ। সে চোখ প্রত্যেকের প্রত্যেকটি ওঠা-বসা লক্ষ্য করে; সে মুখ রাজনীতির প্রচারযন্ত্র,—প্রচারে পঞ্চমুখ।

সেই প্রচার-বিভাগের নাম 'সত্য-মন্ত্রণা'—'Truth ministry'। উপন্যাসের নায়ক উইনস্টন স্মিথ সেই বিভাগে খবর-কাগজ আর পত্র-পত্রিকা পড়ে; প্রয়োজনমতন অতীতের চেহারা বদলে দেবার কাজে নিযুক্ত সে। রাজনীতির তাড়নায় মানুষের স্মৃতি সংকুচিত হয়ে গেছে সেখানে। ঐ 'ইংসক' প্রবর্তিত হবার আগে জগৎ কী রকম ছিল, সে-কথা কারও মনে নেই। 'সত্য'-কে দলের অভিপ্রায় করে তোলা হয়েছে। দলের মতলবের বাইরে কারও এক-পা হাঁটবার অধিকার নেই।

বিষ্ণুবাবুর ঐ কবিতার মতন, উইনস্টন স্মিথেরও একদিন অচলায়তন ভেদ করবার মতি এলো। জুলিয়া মেয়েটির সঙ্গে তখন তার গভীর প্রণয়। কিন্তু 'সত্য-মন্ত্রণা'র দাপট কম নয়। সেখানে প্রেম নিষিদ্ধ। ভালোবাসা বরবাদ।

তবু লুকিয়ে লুকিয়ে সত্য-মন্ত্রণার এই দুই কর্মচারীর মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ ঘটতে থাকে। তাদের প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। যদি তাদের মাতৃভাষা বাংলা হোতো, তাহলে ছেলেটি হয়তো বিষ্ণুবাবুর লাইন আবৃত্তি করতো মনে মনে—'মুক্তি-ইশারা নয়নে তোমার দূর বিহঙ্গ নভোবিহার'। হয়তো রবীন্দ্রনাথের লাইন উচ্চারিত হোতো তাদের মিলিত কণ্ঠে—'আমায় ছেড়ে দে রে, দে রে—যেমন ছাড়া বনের পাখি মনের আনন্দে রে!'

তারা বিদ্রোহের পথ খোঁজে। আর, ঠিক সেই সময়ে দলের অন্তরঙ্গ এক সদস্য—নাম তার ওব্রায়েন,—সেই ওব্রায়েনই চুপি চুপি ডাক দেয় তাদের,—গোপন বিদ্রোহী-দলের শক্তি বৃদ্ধি করবার আমন্ত্রণ জানায়।

কিন্তু উইনস্টন, জুলিয়া—কেউই অচলায়তনের ছলনা ধরতে পারে নি। ওব্রায়েন লোকটা ছিল 'বড় দাদার'ই গুপ্তচর। ফলে, শয়তানের চক্রান্তে দুটি পাখিই এক ঢিলে আহত হোলো। বন্দী হোলো দুজনেই।

উইনস্টনকে যন্ত্রণা দেওয়া হোলো গভীর কৌশলের সঙ্গে। এই ওষুধের ফল ফললো ঠিকই। বড়দাদার ইচ্ছেই জয়ী হোলো পরিণামে। অবশেষে দলের কথাতেই উইনস্টনের অগাধ বিশ্বাস ফিরে আসে। দলের তোতাপাখি হোলো সে,—দলের পোষা টিয়া।

অরওয়েল আমাদের ভবিষ্যতের এই ছবি এঁকে গেছেন। তখন এই শতকের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে। নাৎসী জার্মানি তখনো ভয়ঙ্কর ভাবে লোকদৃষ্টির সামনে আসেনি। রুশ বিপ্লব তার অল্প আগের ঘটনা। আমাদের দেশে সত্যাগ্রহ আর অসহযোগের আমল সেটা।

(ক্রমশঃ)

আমি যুদ্ধে যাবো

বিনোদ বেরা

খুব কম অন্ধকারে আলো ফুটবে, হন্নাবাজ হাওয়া
মেঘ ভেঙে গুঁড়ো করে, ঝুরো মিহি কচি সাদা রোদ
মাটি ও পাথর গাছ, পশু ও মানুষে স্পর্শমায়া
বুলায় নিবিড়, আহা আমি কি নির্বোধ।
আহা আমি কি নির্বোধ ভালো কর্ম করছি ঠায় বসে।
এই তো সময় এই রঙিন বিকচ ভোরবেলার আকাশ
ভালো নয় মনে রেখে চলে যাওয়া খাঁচার রক্তিম পরিতোষ
কেন যে অক্ষম ডানা, কেন যে পুকুরে খুশি হাঁস।
কেন যে অক্ষম ডানা গরুড়ের শক্তি পায় না, গুরুতর ঝড়
ওঠে না কেন যে বুকে, বরফের কুঁচি কেন নীলবর্ণ
স্ফুলিঙ্গ হয় না।

সেই সাদাসিদে দিন রাত্রি এক ধারণা অনড়—
তপ্ত মরু ঝঞ্ঝা কেন অনশ্বর সত্তায় বয় না।
এসো মরু ঝঞ্ঝা বেজে ওঠো একবার খুব কুট অন্ধকারে
অক্ষর ফড়িঙদের ছিঁড়ে জোর উন্মাদ কাঁপাও জলস্থল,
আমি যুদ্ধে যাবো, আমি চেতনার তীব্র তলোয়ারে
অধিকার করে নেবো বহুদেশ—বহু দেশ অদ্ভুত উজ্জ্বল।

অক্সফোর্ড থেকে লিখছি

অশোক দেব চৌধুরী

ইংলণ্ডে এসে একটা জিনিস আমার বিশেষ করে নজরে পড়েছিল : এদেশের অগণিত বৃদ্ধ-বৃদ্ধার অসহায় অবস্থা। ট্রেনে, টিউবে, বাসে, সিনেমায়, পার্কে সবত্র দেখবেন এই অসহায় মুখ। দুপুরবেলা পার্কে দেখবেন একটু রোদ এসে পড়েছে, খবরের কাগজের দিকে শূন্য দৃষ্টি মেলে কয়েকটি বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বসে রয়েছেন, কিন্তু কেউ কারোর সঙ্গেই কথা বলছেন না। বিকেলে দেখবেন একটি বৃদ্ধা তাঁর সাধের কুকুরটিকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন। বৃদ্ধা শূন্য দৃষ্টিতে পথে চলেছেন। যদি কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বলে কি সন্তুষ্ট যে বলবার নয়। আমাদের গরীব দেশে অর্থের অভাব সর্বত্রই চোখে পড়ে, কিন্তু এই ঐশ্বর্যশালী দেশে এই নিঃসঙ্গতা সাঙ্ঘাতিক। আমাদের ঠাকুমা-দিদিমাকে দেখেছি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের প্রতাপ এবং ক্ষমতা বাড়ছে। এখানে যে মুহূর্তে ছেলে বা মেয়ে বিয়ে করলে (ইংলণ্ডের ছেলেরা এখন সচরাচর ২২৷২৩ বছরে বিয়ে করছে। কয়েক বছর আগেও ২৬৷২৭ বছর ছিল বিয়ের বয়স) সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে তার নিজের আস্তানা গড়লে। বিয়ের পরও বাবা-মা'র সঙ্গে এক সাথে থাকবে —এটা তারা কল্পনা করতে পারে না। ভাববেন না যে, ইউরোপের সর্বত্র এই একই অবস্থা। ফ্রান্স, ইটালী বা বেলজিয়ামে বৃদ্ধ বাবা-মা'র অবস্থা ঠিক এই রকম অসহায় নয়। আমি এ বিষয়ে অনেকের সঙ্গে কথা বলেছি। অক্সফোর্ডের একজন Sociologist-এর সঙ্গে কথা হল। তিনি স্বীকার করলেন যে, ইংরেজ সমাজের এটা একটা ভয়ানক কলঙ্ক ...ি। অথচ কোন প্রতিকার ...াই। তিনি যুবসমাজকে এ জ... কোন দোষ দিলেন না। তিনি ...লেন, ধনবান সমাজে (afflue... society) এ অবশ্যম্ভাবী, অর্থ ... স্বাচ্ছন্দ্য যত বাড়ছে—মানুষের ব... স্বাতন্ত্র্য ঠিক সেইভাবেই বেড়ে চলে... আমি ফ্রান্স, ইটালী এবং স্পেনের ...উদাহরণ দিয়ে বললুম যে, এ সব ...শ বৃদ্ধ-বৃদ্ধার অবস্থা তো এতখানি অ...ায় নয়। তখন তিনি বললেন যে, ইংল... বিশিষ্ট সমাজ-ব্যবস্থা অবশ্যই এ জ... দায়ী।

আর একজন সাহি...র অধ্যাপকের সঙ্গে কথা হল। তি... পরিষ্কারভাবে আধুনিক ইংরাজ যুব...জের স্বাচ্ছন্দ্য-লোভী মনের দোষ ...লন। তিনি বললেন যে, এরা কেব...চায় নিজেদের সুখ-সুবিধে, নিজের ...্ল্যাট, গাড়ি এবং স্ত্রীর পোষাকে... কথাই চিন্তা করতে। অন্য কিছুতে... তারা বিশেষ নজর দেয় না। এক... ধর্মযাজকের সঙ্গে কথা হল। তি... যাজকোচিত প্রজ্ঞার সঙ্গে, 'Indee... তাই তো। বড়ই দুঃখের ব্যাপা... অহো।' ইত্যাদি আক্ষেপসূচক ব...াবলী বিতরণ করে বিষয়টা এড়ি... গেলেন। আমার প্রাক্তন Landl...y-র সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলার ইচ্ছে... ত্যাগ করলুম। কারণ তিনি যুবসমাজে... সম্বন্ধে কোন কথা বলতে গেলেই এত ...উত্তেজিত হয়ে পড়েন যে, সেটা তাঁর ...য়সের পক্ষে ভাল নয়। তবে তাঁ...মত আমার জানাই আছে। আমরা ...লেজ স্ট্রীটে কফি হাউসে বসে, huma... loneliness সম্বন্ধে কত কথা, কত ...র্ক করেছি। কিন্তু সেগুলো সবই ...বেশি কথার জাল, তর্কের ধোঁয়া। ...খানে এটা একটা সামাজিক সমস্যা, একটা বাস্তব ঘটনা—যে সম্বন্ধে এদের সমাজ-তাত্ত্বিকরা ভাবছেন, ধর্মযাজক চিন্তান্বিত, অধ্যাপক ক্ষুব্ধ। এ থেকে মনে হয় ইউরোপের যে existentialist চিন্তা সেটা শুধু মাথার ব্যাপার নয়, সেটা জীবনের সঙ্গে জড়িত একটা সামাজিক সত্য। আমাদের দেশে এসব সম্বন্ধে যা চিন্তা করা হয় তার কোন যে দাম নেই তা নিশ্চয় নয়, তবে সেটা বোধ হয় অনেকখানিই intellectual কসরতে গিয়ে দাঁড়ায়, জীবনের সঙ্গে যুক্ত হলে চিন্তায় যে বর্ণ এবং গন্ধ আসে তার অনেকখানি থেকেই আমরা বঞ্চিত হই।

এই বৃদ্ধ-বৃদ্ধার জগৎ থেকে যদি আমরা এদেশের এক শ্রেণীর তরুণদের দিকে তাকাই, তবে সেখানে দেখবো সম্পূর্ণ অন্য পৃথিবী। আমাদের দেশে এরা সাধারণত John Osborne কথিত a gry young men (and women) নামে পরিচিত। লণ্ডনে নেমেই এদের চেহারা এবং ধরণ-ধারণ দেখে আমি চমকে উঠেছিলুম। প্রথমত আধুনিক ইংরেজ তরুণ-তরুণীদের পিছন থেকে দেখলে বোঝাই যায় না এটি ছেলে না মেয়ে : পরনে টাইট রঙচটা জীন, একটি জ্যাকেট, চলার ধরণ পুরুষালি। তবে ছেলেদের চুল কাঁধ ছাড়িয়ে গেছে, এবং অনেক মেয়ের চুল প্রায় আমাদের দেশের ছেলেদের মত ছোট করে কাটা : তাতে বোঝবার আরো অসুবিধে হয়। এদের আদর্শ হচ্ছে Pop গাইয়েরা (Pop হচ্ছে Popular-এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ)। এদেশে না এলে আপনি কল্পনা করতে পারবেন না যে এই

Pop Musician-রা কি অস্বাভাবিক প্রতিপত্তিশালী ইংলণ্ডের তরুণমহলে। শুধু Beat কবি বা গাইয়েরা নয়—কয়েকটি বিখ্যাত গোষ্ঠীর নাম দিচ্ছি—Beatles (চারজন Beat গাইয়ের দল), Rolling Stones, Dare Devils, Animals, Pennies, Pretty Things ইত্যাদি ইত্যাদি। পোষাকের দোকান, Radio এবং Television, চুল কাটার দোকান মারফৎ সারা ইংলণ্ডের যুবসমাজ এদের অনুকরণে সপ্তাহে কয়েক লক্ষ পাউণ্ড খরচ করছে। এখানকার ১৭৷১৮ বছরের যে কোন ছেলেমেয়ের পক্ষেই সপ্তাহে ৭৷৮ পাউণ্ড রোজগার করা স্বাভাবিক—অনেক সময় বাড়িতে তারা বিশেষ কিছু দেয় না, রোজগারের একটা বড় অংশই যায় চুল, পোষাক, সিনেমা এবং Pub-এ।

এদের যারা আদর্শ সেই Pop গাইয়েরা কিভাবে জীবন কাটায় তার একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। এদের জীবনাদর্শ শুধু ইংলণ্ড নয়, কণ্টিনেণ্ট এবং খাস মার্কিন মুলুকেও যথেষ্ট বিস্তার লাভ করেছে। Television-এ দেখেছি Beatles-রা যখন তাদের মার্কিন বিজয় সমাপ্ত করে ইংলণ্ডের মাটি ছুঁলো, তখন বিমানবন্দরে Teen age-এর ছেলেমেয়েদের কি অস্বাভাবিক উত্তেজনা আর চীৎকার। স্বাভাবিকভাবে মেয়েরাই সব চেয়ে বেশি উৎসাহী এবং বিমানবন্দরে বা Music Hall-এ চীৎকার করতে করতে হিস্টিরিয়া রোগীর মত হাত-পা ছোড়ার পর অজ্ঞান হয়ে যাওয়া খুব স্বাভাবিক ব্যাপার এখানে। যারা প্রথম শ্রেণীর গাইয়ে (প্রধানত Beatles এবং Rolling Sto..es) তাদের মাসিক আয় কয়েক লক্ষ টাকা!

Pretty Things-এর পঞ্চ নায়ক লণ্ডনের Belgravia-তে একটি ফ্ল্যাট ভাড়া করে আছেন। তাঁদের গড়ে বয়েস হচ্ছে ২১ বছর। এবং তাঁদের গৃহকর্ত্রী Wendy Young থাকা-খাওয়া এবং সপ্তাহে ৭ পাউণ্ডের বিনিময়ে তাঁদের সর্ববিধ সুখ-সুবিধা দেখেন। ১৯ বছরের এই মহিলাটির নিজের ভাষায় শোনা যাক এঁদের সম্বন্ধে তাঁর কি ধারণা—'আমার এদের ভালই লাগে। আর তা ছাড়া বয়স্কা কোন মহিলা এদের বাড়িতে ১০ মিনিটও কাজ করবে না। এদের খাওয়ানো, পরানো, স্নান করানো বাদেও রোজ তাদের মায়েদের টেলিফোন করে জানাতে হবে আমি এদের সুখ-সুবিধার দিকে যথেষ্ট নজর রেখেছি। আর এদের যে এই চুল, এ এক সমস্যা বটে। এদের চুলে শ্যাম্পু করতে কোন আপত্তি নেই আমার—কিন্তু রোজ সকালে পাঁচটি মাথার লম্বা চুলে চিরুণী চালানো এ এক মারাত্মক ব্যাপার। আর এরা এত আলসে। সকালে কিছুতেই বিছানা ছেড়ে উঠবে না। আর জামা-কাপড়?

● লম্বাচুলো এক আধুনিক ইংরেজ তরুণ

নজর না রাখলে আমার ব্লাউজ, সোয়েটার সব কিছু এরা নিশ্চিন্ত মনে ব্যবহার করবে। আর আমার যে সুগন্ধি তেল সে তো এদের কল্যাণে চোখেই দেখতে পাই না।'

Wendy-কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'এদের কারোর সঙ্গে তোমার রোমান্সের কোন সম্ভাবনা আছে?' ম্লান হেসে উত্তর দিলে এই উনিশ বছরের মেয়েটি, 'রোমান্স? আমার পাশের দোকানের মুদি আমার ছোট চুল আর ট্রাউজার পরা মূর্তি দেখে ভেবেছিল এদেরই ছোট ভাই আমি। সেই থেকে এরা আমাকে Alf বলে ডাকে। কাজেই বুঝতেই পারছো!'

এইবার এই তরুণদের চুল সম্বন্ধে কিছু বলি—কেন না আলুলায়িত কুন্তল আজ আর বৃটিশ মেয়েদের পছন্দ নয়, কিন্তু তারা চায় তাদের ছেলে-বন্ধুদের চুল কাঁধ ছাড়িয়ে যাক। মেয়েদের চুল যত পুরুষালি হচ্ছে, ছেলেদের চুল সেই পরিমাণে মেয়েলি হচ্ছে। The Taker's বলে একটি গাইয়ে দলের ম্যানেজার Ralph Webster একটি ঘটনা বলেছেন এই লম্বা চুল রাখার সম্বন্ধে: কতদূর বিশ্বাসযোগ্য আপনারাই ভেবে দেখুন। 'চার বছর আগে Beatles এবং আর সকলে যখন জার্মানীর Hamburg-এ গাইতে গিয়েছিল তখন তাদের খাওয়ারই সময় ছিল না—তা আবার চুল কাটা। তা ছাড়া এরা জার্মান বলতে পারে না সেজন্য ঠিকমতন চুল কাটার অসুবিধেও ছিল। ফলে চুল ক্রমশই বাড়তে লাগলো আর পথঘাটে জার্মানরা আঙুল দেখিয়ে বলতো, এই যে ইংরেজ গাইয়েরা যাচ্ছে। তখন থেকেই লম্বা চুল রাখার রেওয়াজ হল।' এই লম্বা চুল রাখার বিপদও অনেক আছে। একজন লম্বাচুলোর জবানিতে শুনুন, 'বারো ইঞ্চি চুল নিয়ে যদি তুমি interview দাও, তাহলে যত কাজেরই তুমি হও না কেন, চাকরি তোমার বরাতে নেই।'

এই সেদিন Peterborough-তে একটি টেকনিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছেলেদের lavatory-তে একটি মেয়েকে আবিষ্কার করে ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে তাকে ধমকাতে গিয়ে পুনরাবিষ্কার করলেন মেয়েটি একটি ছেলেই বটে! এই চুলের দরুণ বৃটেনের ছেলেদের খরচ খুব কম না—হিসেব করে দেখা গেছে তারা বছরে কয়েক মিলিয়ন পাউণ্ড কেশ-পরিচর্যায় খরচ করছে। লণ্ডনের Curzon Street-এর Trumper's-এ ছেলেদের জন্য ৫০ রকমের hair lotion আছে—তাদের নামও বিচিত্র Adam থেকে Eve অবধি। আর প্রত্যেক বোতলে লেখা আছে, 'আমরা প্রিন্স ফিলিপের প্রসাধন সরবরাহ করে থাকি'। ট্রাফালগার স্কোয়ারে গেলেই আপনি রকমারি কেশভূষিত ছেলেদের দেখতে পাবেন। তবে তাদের দুঃখও অনেক। ট্রাফালগার স্কোয়ারের একটি দীর্ঘকুন্তল তরুণ বললেন, সকলেই National Gallery-তে গিয়ে লম্বাচুলো পুরুষের ছবি দেখে চমৎকৃত—আর আমরা যখন জ্যান্ত লোকেরা লম্বা চুল রাখি—।'

হাওয়া খান

— ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়

হাওয়া খেয়ে থাকুন।

ভেবে দেখবেন আমার কথাটা। ফুঁৎকে উড়িয়ে দেবার মত বাজে কথা নয়। কোনরকম ব্যঙ্গোক্তি বা বক্রোক্তির জন্যও এ প্রসঙ্গের অবতারণায় বসি নি। সহজ সরল ভাষায় বলতে চাই : চাল তেল মাছ চিনির সমস্যা যে রকম তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে এবং ইতিমধ্যেই মাসে দু-একদিন খাওয়া বন্ধ রাখার অনুরোধ এসেছে, তখন খাওয়ার ব্যাপারটা একেবারে উঠিয়ে দেওয়াই ভাল নয় কি? এর পর যখন মাসে দশ পনের কুড়ি, এমন কি গোটা মাসটাই না খেয়ে থাকার নির্দেশ আসবে তখন কি করবেন? তার চেয়ে আগে থেকেই যদি ভাত-রুটি ছেড়ে হাওয়া খেয়ে বেঁচে থাকতে অভ্যস্ত হন, তাহলে আপনাকে আর পায় কে?

তাই তো বলি হাওয়াকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হোন। হাসছেন নিশ্চয়ই, হাসির ব্যাপার মোটেই নয়। হাওয়া খেয়ে কেউ বাঁচে না বলছেন। নিশ্চয়ই বাঁচে। সাপ বাঁচে না? বাঁচে বলেই তো সে 'বায়ুভুক'। সাপের মত ক্রূর না হয়েও হাওয়া খেয়ে বাঁচার কৌশলটা শিখে নিতে পারেন সাপের মুখে দুধ-কলা একবাটি তুলে ধরে। লাইনে বেশিক্ষণ না দাঁড়িয়েও দুধ কলা জোগাড় করাটা সহজসাধ্য ব্যাপার। তবু বলবেন সাপ বায়ু খেয়ে থাকে বলে কি মানুষ পারে? তাও পারে। আপনাদের বাল্মীকি, বিশ্বামিত্র প্রমুখ মুনিবর হাজার হাজার বছর তপস্যা করেছেন কি খেয়ে? রত্নাকরের সারা দেহ যখন উইপোকার বাসা হয়েছিল তখন কে আর স্বাদু অন্নব্যঞ্জনের থালা পরিপাটি করে সাজিয়ে ধরেছিল তাঁর মুখের সামনে (ওর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা তো পাপের ভাগ নেবার ভয়ে ত্রিসীমানায় ছিল না)। তবু কি মুনি-ঋষিরা হাওয়া খেয়ে বেঁচেছিলেন হাজার হাজার বছর? আপনাদের হিমালয়ের কন্যা উমার কথাটা স্মরণ করুন তো : উমা গাছের পাতাটি পর্যন্ত না খেয়ে অনাহারের রেকর্ড করেছিল বলেই না সে অপর্ণা। অতএব বুঝতে পারছেন আপনার পূর্বপুরুষেরা যে হাওয়া খেয়ে বেঁচেছিলেন হাজার হাজার বছর, তার প্রমাণ ইতিহাস, বেদ-পুরাণের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে। সুতরাং মাভৈঃ।

তাই আমার সরাসরি প্রস্তাব হাওয়া খেয়ে থাকুন। ভয় নেই কোন কর লাগবে না। জন্মকর, মৃত্যুকর, আয়কর যত রকমেরই কর লাগুক, হাওয়া-কর দিতে হবে না আপনাকে। জলের অপর নাম জীবন, তাই জলেও কর লাগে কিন্তু হাওয়া সম্পূর্ণ নিষ্কর।

অবশ্য শহরবাসীদের কথা স্বতন্ত্র। দ্বিতল, ত্রিতল থেকে সুরু করে আকাশ-ছোঁয়া (sky-scraper) বহু-তল বিশিষ্ট উঁচুতলার বাসিন্দাদের কিছু কিছু কর (বেশি ভাড়া দিতে হয় আলো-বাতাসের জন্য)। কিন্তু হাওয়াকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করার জন্য কর দিতে হয় না বা হবে না। এমন কি একটি পয়সাও নয়।

তাহলেই ভেবে দেখুন চাল, তেল মাছের লাইনের মত ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে আপনার সময় ও উৎসাহের অপচয় করে ব্যর্থ হয়ে ফিরতে হবে না (সম্প্রতি একটি তেলকলের সুমুখে শুধু শিশি-বোতল ও কৌটার লাইন

দেখেছি, যার ব্যতিক্রম হচ্ছে মানুষ নেই)। আপনার আয়ের সিংহভাগ বেরিয়ে যাবে না শুধু খাদ্য কিনতে গিয়ে। বরং সেই পয়সার অর্ধেক দিয়ে ভাড়া নেবেন উঁচুতলার একটি ফ্ল্যাট। বাস দেখতে হবে না, ভাবতে হবে না, রাত্রিতে উঠে (এই শীতের রাত্রে) লাইন দেওয়ার দুর্ভোগ নেই।

এখন সমস্যা হচ্ছে ৬০।৭০ টাকা মাইনেওয়ালা গরীবদের নিয়ে। তারা তো আর উঁচুতলার বাসিন্দা নয়। বস্তির আলো-বাতাসহীন অস্বাস্থ্যকর নর্দমা-পায়খানা, গরু-মোষের খাটালের পাশে বাস করে, হাওয়া পাবে কোথায়? পাকাবাড়ির একতলা অন্ধকার, স্যাঁৎসেঁতে একটা কুঠুরি কিংবা এঁদো গলির ভিতর অন্ধকূপের মত কোন চারদেয়াল ঘেরা বন্দীশালা, অথবা বারো ঘর এক উঠানওয়ালা বাড়িতে বাস করে যারা মুক্ত আকাশের খবর রাখে না, যে বাড়ির মেয়েরা সূর্যের মুখ দেখে না বলেই অসূর্যম্পশ্যা হয়ে আছে? তাদের কথাও ভেবে রেখেছি। তারা সামান্য একটু-আধটু হাওয়া পাবে, যদিও উঁচুতলার মানুষের উচ্ছিষ্ট সে হাওয়া। তবু তো কিছু পাবে। তা ছাড়া তাদের অন্যদিকে সুবিধা বিস্তর। একতলায় হাওয়া নেই বলে থাকতে চাইবে না অনেকে। অতএব একতলার ঐরকম ঘর সর্বত্রই খালি, কেবল বাইরে লেখা 'নামমাত্র মূল্যে বাড়ি ভাড়া'।

আর ভাবনা নেই। দু-পাঁচ টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন ঘর ভাড়া। কিন্তু খাবার নয়। বেশ তো চলে যান না ছেলে-মেয়ে-বৌ নিয়ে দল বেঁধে গড়ের মাঠে, নয়ত চাঁদপাল ঘাটে কিংবা ইডেন উদ্যানে, আউটরাম ঘাটে। পেট পুরে সব হাওয়া খেয়ে আসুন আর বড় বড় বেলুনে পুরে নিয়ে আসুন অসময়ের জন্য। ছেলে-মেয়েরা যেই বারে বারে খাই খাই করবে অমনি একটা বেলুনের মুখ খুলে ধরুন, ৪।৫টি বাচ্ছার পেট ভরে যাবে একবেলুন হাওয়ায়।

এ ছাড়াও সুবিধে আছে অনেক। বাড়িঘরের আর প্রয়োজন হবে না গরীবদের। (প্রয়োজন থাকলেও এখনই সে দায় থেকে মুক্ত তারা)। আমাদের মাথায় অজস্র সমস্যার পাহাড়। গৃহসমস্যা তার মধ্যে হিমালয় না হলেও বিন্ধ্যপর্বত সন্দেহ নেই। অতএব মানুষ যখন হাওয়া খেয়ে বেঁচে থাকবে, হাওয়া যখন চাল-গমের স্থান নেবে, তখন কেউ চাইবে না ঘরের মধ্যে বন্দী থাকতে। সকলেই আশ্রয় নেবে ফাঁকা মাঠে, উন্মুক্ত নীল আকাশের নীচে। আশ্রয়হীন, গাছতলায় বসবাসকারী, মাঠে ঘাটে ফুটপাতে যাদের বাসা, তারাই হবে খাদ্যের দিক থেকে সবচেয়ে স্বাবলম্বী। অতঃপর খাদ্যসমস্যার সঙ্গে সঙ্গে গৃহসমস্যার সমাধানও হবে একই উপায়ে।

খাদ্য ও গৃহসমস্যার পর আসছে বেকার সমস্যা। সে সমাধানও হবে ঐ হাওয়া থেকেই। হাওয়া খাদ্য হিসাবে গৃহীত হলে নিশ্চয়ই তা গুরুত্ব পাবে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য হিসাবে এবং অবশ্যই তা সরকারী তত্ত্বাবধানে আসবে। এর ফলে খাদ্যদপ্তরের স্থান নেবে হাওয়াদপ্তর। সর্বত্র হবে এর অফিস। অজস্র বেকার চাকরি পাবে এই নতুন দপ্তরে। পুরাতন সেচব্যবস্থা, সার, ঋণ ইত্যাদির বাবদে ব্যয়িত অর্থ খরচ হবে অন্য উন্নয়নমূলক কাজে।

অবশ্য একথা ঠিকই যে, হাওয়া খাদ্যরূপে চালু হলেও খাদ্য দপ্তরগুলি একেবারেই বিলুপ্ত হবে না। কারণ কিছু কিছু গোড়া সংস্কারপন্থী লোক (conservative) চাইবে না হাওয়া খেয়ে বাঁচতে। অতএব তাদের জন্য ছোট সংস্করণের একটা খাদ্যদপ্তর রাখতেই হবে। বেশির ভাগ লোকই চাইবে হাওয়া খেতে। ধনীরা তো বটেই। হাওয়া মজুদ করার পরিকল্পনার জন্য শিক্ষিত ছেলেদের, বিশেষত বিজ্ঞানীদের লাগাবে গবেষণার জন্য। তার ফলে হাওয়ার ওপর চাপ পড়বে অত্যধিক। সেই ফাঁকে গরীবেরা বিনা লাইনে গম চাল তেল মাছ নামমাত্র মূল্যে পাবে (যেহেতু চাহিদা কমবে অথচ উৎপাদন হঠাৎ কমবে না)। এমন কি শায়েস্তা খাঁর আমলে টাকায় ৮ মণ চাল অথবা

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেজওয়াড়া - শ্রীনগর - গৌহাটী

২৫।৩০ বছর পূর্বে ৩।৪ টাকা মণ চাল, ।।০ আনা সের সন্দেশ (কল্পনা করুন সেই সব জিনিস খাচ্ছেন)। ছয় আনা সের তেল, গোটা একটা গঙ্গার টাটকা ইলিশ সিকি বা একটা আধুলিতে মিলবে।

আর কি হবে। এখন যে ছেলে-মেয়েরা বইতে পড়বে 'আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা গব্যঘৃত নামক এক প্রকার বলকারক অপূর্ব গন্ধে ভরা দ্রব্য গরম ভাতের সহিত, পোলাও রান্না করিয়া অথবা ময়দার দ্বারা লুচি ভাজিয়া খাইতেন। ঐ ঘৃত গরুর দুধ হইতে তৈরি হইত। তাহা অমৃতের মর্যাদা পাইত এবং ঋষিরা পর্যন্ত সেই ঘৃতের প্রশস্তিতে 'ঋণ কর আর ঘি খাও ভাই' বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া সরিষার তৈল নামক একপ্রকার তৈল সরিষা নামক তৈলবীজ পিষিয়া উৎপন্ন হইত যাহার দ্বারা ইলিশমাছভাজা, পাঁপর ভাজা, বেগুনি, চপ ইত্যাদি নানারকম মুখরোচক দ্রব্য সর্বসাধারণের অতীব প্রিয়বস্তু ছিল। কল্পনা করুন সেই তেল ঘি মাছ মাংসের দিন আবার ফিরে এসেছে। ঘরে ঘরে কি আনন্দ-উৎসব আর দুধ-ঘি খেয়ে জাতীয় স্বাস্থ্যের কি প্রকার উন্নতি কল্পনা করতে পারেন?

পারেন না। কারণ গ্রামগাঁথা এই সুজলা-সুফলা দেশ উপেক্ষিত, অবহেলিত। গ্রাম উজাড় করে তার সমস্ত সম্পদ পুঞ্জীভূত হচ্ছে শহরকে কেন্দ্র করে। সভ্যতা সংস্কৃতি আসলে শহরকেন্দ্রিক। অন্নদাত্রী গ্রামভারতের এই দুর্দশায় ব্যথিত হয়ে গান্ধীজী বলেছিলেন, গ্রামের দিকে মুখ ফেরাও। তাই শহরের মানুষকে মুখ ফেরাতে হবে গ্রামের দিকে।

কারণ হাওয়া খাদ্য হিসাবে ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শহর ভেঙে মানুষ ছুটবে গ্রামের দিকে। দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠের উদার উন্মুক্ত হাওয়ার লোভে গ্রামগুলি পরিণত হবে বড় বড় শহরে। শহরে বস্তি ভেঙে উঠবে গগনচুম্বী ইমারত। গ্রামের মাঠ, নদী, বন, শ্যামল শস্যক্ষেত্র সর্বত্রই হাওয়ার প্রাচুর্য। চাল, গম উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র হবে হাওয়া তৈরির প্রধান ক্ষেত্র। গ্রাম বলতে কিছু রইবে না। চারিদিকে শহর আর শহর। ব্যবসা-বাণিজ্যের পীঠস্থান গ্রাম আর ঘুমিয়ে থাকবে না নিরন্ধ্র অন্ধকারের আবর্তে। জেগে উঠবে জীয়নকাঠির স্পর্শে ঘুমন্ত রাজকন্যার মত। কালো রাত্রির চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমন্ত গ্রাম ঝলমল করে হেসে উঠবে প্রাচুর্যের বন্যায়। বিদ্যুতের পরশমণির ছোঁয়ায় মাটি হয়ে উঠবে সোনা। (দেখবেন হার্টের ওপর যেন বেশি চাপ না পড়ে, হার্ট ফেল করতে পারেন)।

অতএব মাভৈঃ মানুষ। আর মরতে হবে না তোমায় খাদ্যসঙ্কটে। দুঃখ তাদের জন্য, যারা অকালে মরেছে অখাদ্য খেয়ে রোগে, অনাহারে। মানুষ প্রায় অমরত্ব লাভ করবে। ভেজালের বিষে জর্জরিত হবে না সমাজদেহ।

দিগন্তের আহ্বান

অপরাজিতা গোস্বামী

দূর দূরান্ত হ'তে
পাহাড়-মাটির বুক ছুঁয়ে ছুঁয়ে,
প্রত্যহ যে বাতাস
নীল আকাশের বুকে যায় হারিয়ে,
তার নিভৃত হৃদয়তলে
ওপারের শব্দতরঙ্গ
দিয়ে যায় দোল
সবুজ বন্য প্রাণে।

এপারে সোনালি ধানের শীষে
আর সর্ষেফুলের
হলুদ ঢেউ তরঙ্গে
আহত পাখির মত
এ মন—কেবলি যায় হারিয়ে।

ওখানে ঝাউবন
আর দেবদারুর বুকে বুকে
মুক্ত বিহঙ্গের মত
বাতাস উঠেছে মাতাল হয়ে।

এখানে শিশির-ভেজা
সবুজ ঘাসের বুকে
পা ছুঁয়ে ছুঁয়ে তাই
বলাকার দল যায় হারিয়ে
নিরুদ্দেশ অলকার পথে।

সোনালি হলুদ ডানা দুটো মেলে
একঝাঁক ফড়িঙ,
শুধু গোলাপের বুক ছুঁয়ে
সূর্যমুখীর বুকে বুকে
গোপনে গানের সুরে
আবিরের রঙ ছড়ায়।

রঙ ছড়ায়—
ওপারে কঠিন শিলার হৃদয় ঘিরে
অস্তমিত সূর্যের শেষ চুম্বনে
অনুক্ত দ্বিধায়।

তবু আহত পাখির মত
এ মন কেবলি যায় হারিয়ে
সোনালি ধানের শীষে
আর ঝাউবনের
মর্মরিত গোপন হৃদয়তলে।

ভারত দর্শন

● নয়াদিল্লীতে বোকারো ইস্পাত কারখানা নির্মাণে রুশ-ভারত চুক্তি স্বাক্ষর

রাজধানী ঃ

বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে যখন রাজধানীতে প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান চলছে, প্রজাতন্ত্র দিবসের শুভক্ষণ থেকে হিন্দীভাষাকে রাষ্ট্র-ভাষা হিসেবে প্রবর্তনের প্রতিবাদে তখন মাদ্রাজে চলছিল প্রতিবাদ-বিক্ষোভ। ২২ বছরের তরুণ শ্রীশিব-লিঙ্গম এই দিন সকালে অগ্নিতে আত্মাহুতি দেয়। তার আগে ও পরে দুজন হিন্দীভাষা প্রবর্তনের প্রতিবাদে জীবনাহুতি দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে স্বাধীনতা দিবসকে মাঝে রেখে এই তিনজনের জীবনাহুতির বেদনাদায়ক সংবাদটি সমগ্র জাতির মনে দাগ রেখে গেছে। এ বছরের প্রজাতন্ত্র দিবস হয়েছে বিষাদে উদ্‌যাপিত হল।

অহিন্দীভাষীদের ক্ষেত্রে প্রজাতন্ত্র দিবস সংগ্রহ ক'রে এনেছে একদিকে আনন্দের অমৃতভাণ্ড, অপরদিকে আঘাতের মুদ্‌গর। হিন্দীভাষাকেই রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে ততখানি অসহিষ্ণু হয়ত কেউ ছিলেন না। কিন্তু অকস্মাৎ দ্রুততায় হিন্দীর আগ্রাসী রূপ দেখে অহিন্দীভাষী জনগণ আশঙ্কাতুর হ'য়ে উঠেছেন। অহিন্দীভাষীদের আশঙ্কা, তাঁদের মাতৃভাষার উপযুক্ত বিকাশেই যে শুধু হিন্দীর প্রাধান্য বাধা সৃষ্টি করবে তাই নয়, হিন্দী-ভাষার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় গড়ে ওঠে নি, তাঁরা এরপর সর্বরকম সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন। এ আশঙ্কা অমূলক নয়। আর নয় বলেই ১৯৬৫-র প্রজাতন্ত্র দিবস অহিন্দী-ভাষীদের ক্ষেত্রে অখণ্ড হর্ষের সংবাদ বহন ক'রে আনতে পারে নি। ভারতের ইতিহাস বর্তমান বৎসরে ২৬শে জানু-য়ারীতে ভারতের একাংশের মর্মবেদনার কথা লিপিবদ্ধ করবে। আর এ ব্যাপারে দিল্লীর দায়িত্ব একেবারে অস্বীকার করা যায় না। হিন্দী গ্রহণের জন্য দেশকে পুরোপুরি তৈরি না ক'রে কেবলমাত্র সংবিধানের দোহাই পেড়ে অপ্রস্তুত ভারতের ওপর হিন্দী চাপিয়ে দেওয়ায় যথার্থ সুবিচার করা হয় নি। বিশেষত এই বিশেষ দিনটিতে একটি অখণ্ড সংহত ভারতের রূপ দেখা গেল না, এটা সত্যই অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

৩০শে জানুয়ারী

সেই বেদনার্ত দিন। মানুষের চিরকালীন ভুলের ফলে যুগে যুগে আমরা মানবের প্রকৃত কল্যাণকারী মানবশ্রেষ্ঠকে হারিয়েছি। ৩০শে জানুয়ারী তেমনি একটি ভুলের ফলে আমাদের হারাতে হয়েছিল জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে। এই দিনটি ভারতের মাটিতে এক পবিত্র মানবাত্মার বেদনাখিন্ন বিদায়ের দিন। রাজধানী তথা সমগ্র ভারতে সেই পুণ্যাত্মা পবিত্র স্মৃতির স্মরণে এই দিনটিকে শহীদ দিবসরূপে পালন করা হয়। জাতি শ্রদ্ধাবিনম্র চিত্তে প্রণাম নিবেদন করেন জাতির জনকের সঙ্গে অপরাপর বীর শহীদদের প্রতি। রাজঘাটে এইদিন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ শান্ত-বিনম্র পরিবেশের মধ্যে মহাত্মাজী ও অন্যান্য শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। ঠিক বেলা এগারটার সময় সমগ্র ভারতবর্ষ তথা রাজধানী ২ মিনিটকাল স্তব্ধ নীরবতার মধ্য দিয়ে অন্তরের ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সেই ক্ষণজন্মা পুরুষদের প্রতি।

বোকারো ইস্পাত কারখানা

বিগত ২৫শে জানুয়ারী বহু আকাঙ্ক্ষিত বোকারো ইস্পাত কারখানা নির্মাণের উদ্দেশ্যে রুশ-ভারত চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হল নয়াদিল্লীতে। বছরখানেক আগেও বোকারো ইস্পাত কারখানার ভবিষ্যৎ ছিল অনির্দিষ্ট। সোভিয়েট সরকারের আনুকূল্যে ও অকৃত্রিম সাহায্যে

বোকারোতে এশিয়ার মধ্যে সর্ববৃহৎ ইস্পাত কারখানার স্থাপনা ভারতের অর্থনৈতিক প্রগতির ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সোভিয়েট সরকার ভারতের অগ্রগতির ক্ষেত্রে বহুতর-ভাবে সাহায্যের বাহু প্রসারিত ক'রে এগিয়ে এসেছেন। বোকারো ইস্পাত কারখানা নির্মাণে সোভিয়েট সাহায্য নীলনদের ওপর অসোয়ান বাঁধের নির্মাণেতিহাসকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। মিশরের ইতিহাসেও যেমন, ভারতের ইতিহাসেও তেমনি সোভিয়েট সাহায্য চিরকাল কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এই ঐতিহাসিক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন সোভিয়েট সরকারের পক্ষে বৈদেশিক অ নৈতিক সংযোগ দপ্তরের রাজ্য কমিটীর মন্ত্রিসংসদের ডেপুটি চেয়ারম্যান শ্রী ভি এ সায়গিভ এবং ভারত সরকারের পক্ষে স্বাক্ষর দেন ইস্পাত ও খনি মন্ত্রণালয়ের সচিব শ্রী টি এন ওয়াঞ্চু।

বোকারো শহরের কাছে মারো-ফারি গ্রামে ভারতের তথা এশিয়ার এই বৃহত্তম ইস্পাত কারখানাটির নির্মাণ-কার্য চূড়ান্তভাবে সমাপ্ত হলে ৪০ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদন সম্ভব হবে। বর্তমানে প্রথম পর্যায় হিসেবে ১৫ থেকে ২০ লক্ষ টন উৎপাদনের উপযোগী কারখানা নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। আশা করা যায়, প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজও সুরু হয়ে যাবে। প্রথম পর্যায়ের কাজ সম্পূর্ণ হবে ১৯৭০ সালে। কারখানার নক্সা তৈরি, যন্ত্রসজ্জা ও উৎপাদন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব নিয়েছেন সোভিয়েট সহযোগিবৃন্দ এবং ভারতীয় তত্ত্বাবধায়কদের ওপর ন্যস্ত হয়েছে কারখানা সংলগ্ন শহর নির্মাণ, জল ও মালমশলা প্রভৃতি সরবরাহের কাজগুলি। সুতরাং কার-খানা নির্মাণে ভারতীয়দের কোনো ভূমিকা না থাকায়, নির্মাণ সম্পর্কিত কোনো অভিজ্ঞতাই অর্জন করার সুযোগ পাবেন না ভারতীয় ইঞ্জি-নীয়রগণ। ভারত সরকার এই বিষয়টির পুনর্বিবেচনা করতে পারেন। কারখানা নির্মাণের ব্যাপারে যখন ভারতীয়দের অংশ গ্রহণে সোভিয়েট সরকারের কোনো আপত্তি নেই, তখন ভারতীয় বিশেষজ্ঞদের এ বিষয়ে অন্তত কিছু দায়িত্ব দিলে, তাঁদের পক্ষেও অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ মিলত।

● গান্ধীজীর মহাপ্রয়াণ দিবসে রাজঘাটে প্রার্থনা সভায় রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও উপ-রাষ্ট্রপতি প্রমুখকে দেখা

জম্মু-কাশ্মীর ঃ

একটি ঐতিহাসিক মিলন

কাশ্মীর জাতীয় সম্মেলনের কংগ্রেস-অন্তর্ভুক্তি জম্মু-কাশ্মীরের ইতিহাসে একটি নব অধ্যায় যোজনা করল ১৯৬৫-র প্রজাতন্ত্র দিবসে। জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে জাতীয় সম্মে-লনের এই সুচিন্তিত ও বহু আকাঙ্ক্ষিত অন্তর্ভুক্তিতে রাজ্যের সাধারণ মানুষ উৎফুল্ল ও আনন্দিত হয়েছেন। চতুর্দিক থেকে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জি এম সাদিকের নিকট অবিরত ধারায় আসছে সাধারণের হর্ষোৎফুল্ল অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। প্রধান প্রেরক হিসেবে মুসলিম অধ্যুষিত কাশ্মীর উপত্যকা উল্লেখযোগ্য। লাডাক সমেত অন্যান্য তহশীল এবং জেলা পরিষদগুলি এই রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক মিলনকে স্বাগত জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন।

এমন অবস্থায় ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রীসাদিকের আমন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রী

শ্রীশাস্ত্রীর কাশ্মীর যাত্রা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে প্রধানমন্ত্রী নবগঠিত জম্মু-কাশ্মীর কংগ্রেসে ভাষণ দেবেন ব'লে স্থির হয়ে আছে। শ্রীশাস্ত্রীর সফর রাজ্যের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনাবলীর পটভূমিকায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব'লে বিবেচিত হওয়ার অন্যতম কারণস্বরূপ শেখ আবদুল্লার বর্তমান ভূমিকারও উল্লেখ করা হয়েছে।

শেখ আবদুল্লার সমর্থকগণ কাশ্মীর কংগ্রেস ইউনিটের সদস্যবর্গের সঙ্গে সকল সম্পর্ক বর্জন করবেন ব'লে হুমকী দিয়েছেন। শ্রীশাস্ত্রীর কাশ্মীর সফর বর্তমান অবস্থায় উপযুক্ত প্রভাব বিস্তার করবে বলে আশা করা যায়। তা ছাড়া ইতিমধ্যেই জাতীয় সম্মেলনের কংগ্রেস-অন্তর্ভুক্তির সংবাদ রাজ্যে অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছে। সুতরাং এই মিলনের বিরুদ্ধবাদীরা জম্মু-কাশ্মীরে কোনোরকম সুবিধে ক'রে উঠতে পারবেন না ব'লেই বিশ্বাস। আরও জানা গেছে, কংগ্রেস সভাপতি জাতীয় সম্মেলনের দুই দলকেই কংগ্রেসে সমমর্যাদা দান করবেন বলে স্থির করেছেন। এই দুই দলের অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী সাদিক-সমর্থকগোষ্ঠী এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বক্সী গোলাম মহম্মদ সমর্থকবৃন্দের মধ্য থেকে এড-হক কমিটীর সদস্য গ্রহণ করা হবে। কিন্তু এই দুই বিবদমান দলের অস্তিত্বে এড হক কমিটীর কাজ কতদূর সুষ্ঠুভাবে অগ্রসর হবে তাতে স্বভাবতই সন্দেহ জাগতে পারে।

বক্সী গোলাম মহম্মদ

শ্রীগোলাম মহম্মদ সাদিক

শ্রীসাদিকের নেতৃত্বে ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে পাল্টা দুর্নীতির অভিযোগ এনে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীগোলাম মহম্মদ সমর্থক দলের পাঁচজন সদস্য সম্প্রতি দাবি করেছেন যে, শ্রীবক্সী গোলাম মহম্মদের বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত করবার জন্য যে কমিশন নিযুক্ত হয়েছে তাদের ওপর যেন ব্যাপক ক্ষমতা দান করা হয়, যাতে বর্তমান মন্ত্রিসভা, আইনসভার সদস্য ও অন্যান্য জননেতার বিরুদ্ধেও যে সব দুর্নীতির অভিযোগ আছে, কমিশন সেগুলিরও তদন্ত করতে পারে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বর্তমান সরকার বক্সী গোলাম মহম্মদের বিরুদ্ধে আনীত ৩৮ দফা অভিযোগের তদন্ত করার জন্য সুপ্রীম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীরাজাগোপাল আয়েঙ্গারকে নিয়ে একটি তদন্ত কমিশন নিয়োগ করেছেন। ইতিমধ্যে ১৭টি অভিযোগের তদন্ত শেষও হয়েছে। একটি অভিযোগে শ্রীবক্সী ও তাঁর আত্মীয়বর্গ মোট দেড় কোটি টাকার সম্পত্তি করায়ত্ত করেছেন বলে প্রকাশ পেয়েছে।

যাই হোক, এই তদন্তকে কেন্দ্র ক'রে দুই দলে যে বিসম্বাদ দানা বেঁধেছে তার পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে এখনই তা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না, তবে নবগঠিত এড হক কমিটীর কার্যে বিভিন্ন সময়ে যে সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হবে তা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সহজেই অনুমান করা যায়। এখন সাদিক-মন্ত্রিসভা যদি বক্সীবাদীদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ ক'রে বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের নির্দোষিতা প্রমাণ করতে পারেন, তাহলে রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় অনেক আস্থা ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে সাদিক-মন্ত্রিসভার পক্ষে কাজ করা সম্ভব হবে।

কেরালা ঃ

এস-এস-পি'র সংকট

বামপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি ও এস-এস-পি'র নির্বাচনী আঁতাতে এস-এস-পি'র কিছুসংখ্যক সভ্য ক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং প্রকাশ্যে নিজের পার্টির ক্ষমতাসীন নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছেন। এস-এস-পি রাজ্য কাউন্সিলের সদস্য শ্রীঅরবিন্দাক্ষণ নায়ার তাঁর অভিযোগে পার্টির ক্ষমতাসীন নেতৃবৃন্দকে স্বার্থপ্রণোদিত এবং ক্ষমতালোভী বলে উল্লেখ করেন। সাধারণ পার্টি সদস্যদের সম্মতিক্রমে এস-এস-পি নেতৃবৃন্দ আগামী নির্বাচনের (৪ঠা মার্চ অনুষ্ঠিতব্য) পরিপ্রেক্ষিতে বিরোধী দলগুলির সঙ্গে জোট সৃষ্টি করার অধিকার পেয়েছিলেন পার্টির ত্রিচুর সম্মেলনে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাঁরা সদস্যদের বিশ্বাসভঙ্গ করেছেন বামপন্থী কমিউনিস্টদের সঙ্গে নির্বাচনী আঁতাত ক'রে। সাধারণ পার্টি সদস্যরা বাম কমিউনিস্টদের দেশদ্রোহী ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারেন না। এ-হেন অবস্থায় এস-এস-পি'র সাধারণ কর্মীবৃন্দ হতাশ এবং ক্ষুব্ধ হয়েছেন। পার্টি চেয়ারম্যান শ্রী এস এম যোশীর কাছে ইতিমধ্যেই অনেকে প্রতিবাদলিপি ও টেলিগ্রাম প্রেরণ করেছেন ব'লে জানা গেছে। শ্রীনায়ার এক আবেদনে পার্টি নেতৃত্বকে সম্পূর্ণ ব্যাপারটি পুনর্বিবেচনা করতে অনুরোধ জানান।

পার্টি সভ্যদের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ক'রে নির্বাচনীদ্বন্দ্বে নেমে পড়াটা এস-এস-পি'র পক্ষে একটি হঠকারি পদক্ষেপ হবে এবং হয়ত শেষ পর্যন্ত তাঁরা বিক্ষুব্ধ সাধারণ সভ্যশ্রেণীর

● শ্রী এস এম যোশী

দাবি মেনে নিতেও পারেন। এবং তা হলে বামপন্থী কমিউনিস্টরা বেশ খানিকটা বেকায়দায় পড়বেন। নির্বাচনী-দ্বন্দ্বে তাঁদের দ্বিতীয় পথ হলেন সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক দল মুসলিম লীগ। সুতরাং কেবলমাত্র বামপন্থী কমিউ-নিস্টরাই নন, তেমন কিছু হলে মুসলিম লীগকেও সমপরিমাণ কিম্বা ততোধিক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে।

পাঞ্জাব ঃ

পাঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপৎ রায়ের পুণ্য জন্মস্থান পাঞ্জাবের অন্তর্গত ধুদেকে গ্রামে উপস্থিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীজী দেশব্যাপী লালাজী জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধন করেন।

পরাধীন ভারতের অপ্রস্তুত গণ-চেতনাকে সঙ্ঘবদ্ধ প্রস্তুতির পথে পরিচালিত ক'রে প্রতাপশালী ইংরেজ-শক্তির বিরুদ্ধে তিনজন ভারতীয় যে যুগে অকুতোভয় নেতৃত্বের দ্বারা ভারত-বাসীকে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন—বাংলার বিপিনচন্দ্র পাল, মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলক এবং পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায় সেই ত্রিশক্তি। ভারতের ইতিহাসে এ যুগ লাল-বাল-পালের বিজয়াভিযানের যুগ হিসেবে চিরোজ্জ্বল হয়ে আছে।

চণ্ডীগড়ের অনুষ্ঠানে লালাজীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন ক'রে প্রধানমন্ত্রী তাঁর সুমহান আদর্শের প্রতি দেশবাসীকে সশ্রদ্ধ ও সজীব থাকার জন্য আহ্বান জানিয়ে বলেন, দেশ আজও বহিঃশত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা-মুক্ত নয়। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান ও উত্তরের পীত কমিউনিস্ট চীনারা ভারতের সঙ্গে আপোষহীন শত্রুতা চালিয়ে যাচ্ছে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে দেশের জন্য কর্মের মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে এবং ভাষা ধর্ম প্রভৃতির ভিত্তিতে যাতে জাতীয় সংহতি ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

পাঞ্জাবে রাজনৈতিক বিবর্তন

শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটীর নির্বাচনী ফলাফল পাঞ্জাবের রাজ-নীতিতে একটি বিরাট পটপরিবর্তনের স্বাক্ষর রেখে গেল। শিখ সাম্প্র-দায়িকতার নিষ্ঠাবান হোতা মাস্টার তারা সিং-এর পরাজয় ও ১৪০টি আসনের মধ্যে ৯০টি আসনেই সন্ত ফতে সিং-এর নির্বাচনীসাফল্য শুধু সাম্প্রদায়িক চেতনারই অবসান ঘোষণা করে নি, যাঁরা মাস্টার তারা সিংকে এস জি পি সি'র নেতৃত্বে রেখে নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধির মতলবে ছিলেন, তাঁদেরও চূড়ান্তভাবে বিফলমনোরথ করেছে। ১৯৬২ সালে সন্ত ফতে সিং-এর হাতে একটি অনাস্থা প্রস্তাবের ভিত্তিতে মাস্টার তারা সিংকে পরাজয় বরণ করতে হয়। সেই সময় থেকেই মাস্টার এস জি পি সি'র নেতৃত্বে প্রত্যাবর্তনের জন্য চেষ্টিত ছিলেন এবং দেশের সাম্প্রদায়িক চেতনায় ইন্ধন জুগিয়ে তাঁর অভীপ্সা সফল ক'রে তুলতে সর্বতোভাবে চেষ্টাও করছিলেন। এস জি পি সি'র নেতৃত্বে প্রত্যাগমন করতে পারলে মাস্টার কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের মুখের মতো জবাব দিতেন।

পাঁচ বছর আগে 'পাঞ্জাবী সুবা' ধ্বনি দিয়ে মাস্টার তারা সিং নির্বাচনে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিলেন এবং রাজ্যব্যাপী সাম্প্রদায়িকতার জিগির সৃষ্টিতে লক্ষণীয় পদক্ষেপ রাখতে পেরেছিলেন। কিন্তু বর্তমান নির্বাচনে প্রমাণিত হল যে, পাঞ্জাব রাজ্যে সাম্প্র-দায়িকতার উস্কানী আর কাজে লাগবে না। রাজ্যের কৃষকসম্প্রদায়ের মধ্যেও পরিবর্তন দেখা দিয়েছে এবং সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতায় আবদ্ধ চেতনা উদার আদর্শগত রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক চেতনায় মুক্তি পেয়েছে। প্রাক্ ১৯৬২-র নির্বাচনী সময়ে মাস্টার তারা সিং ও জনসঙ্ঘ কৃষকসম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে যে সাফল্য অর্জন করেছিলেন, এবারে তা আর কোনো কাজেই এলো না। বর্তমান নির্বাচনে সন্ত ফতে সিং পাঞ্জাবীভাষী এলাকায় তারা সিং-এর তিনগুণ ভোট সংগ্রহ করতে পেরেছেন, কিন্তু হিন্দীভাষী এলাকায় সঙ্কীর্ণতাবাদের প্রবল জয় ঘোষিত হয়েছে। সেখানে মাস্টারের দখলে সাতটি এবং সন্তের হাতে মাত্র একটি আসন এসেছে। হিন্দীভাষী এলাকা এখন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে, মাস্টার জনসঙ্ঘ যুক্তফ্রন্টের পরিপোষক।

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে এই আশা নিশ্চিতরূপে লালন করা যায় যে, দূর ভবিষ্যতেও মাস্টার তাঁর সঙ্কীর্ণ মতবাদের ভিত্তিতে জনগণের সমর্থনলাভে সক্ষম হবেন না। অন্য পক্ষে সন্ত ফতে সিং-এর নেতৃত্বে পাঞ্জাবের রাজনৈতিক চিন্তাধারা অনেক পরিশীলিত এবং উদার রূপ পরিগ্রহ করতে অচিরেই সমর্থ হ'য়ে উঠবে।

রাজ্যের মন্ত্রিসভা সমর্থক দলও এস জি পি সি'র নির্বাচনসাফল্যকে নিজেদের পরোক্ষ জয় ব'লে মনে করছেন। অতঃপর তাঁরা রাজ্য সমস্যাং গুলিকে কিভাবে ঢেলে সাজাতে পারবেন, তার ওপর তাঁদের রাজ-নৈতিক ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করবে।

* 'ওয়ারস' গোষ্ঠীর রাষ্ট্রপ্রধানদের বৈঠকে যোগদানের জন্য আগত ব্রেজনেভ (বামে) ও কোসিগিনকে (মাঝখানে) পোল্যাণ্ডের গোমুলকার সঙ্গে দেখা যাচ্ছে।

পোল্যাণ্ড ঃ

গত সপ্তাহে ওয়ারস শহরে ওয়ারস গোষ্ঠীর রাষ্ট্রপ্রধানদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। পশ্চিমী শক্তি-গোষ্ঠীর সামরিক সংস্থা 'ন্যাটোর' পাল্টা সংস্থারূপে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলি এই সংগঠন গড়ে তোলে। এর সঙ্গে যুক্ত 'কমেকনের' মাধ্যমে এদের মধ্যে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার সম্পর্কও গড়ে উঠেছে।

এবারের ওয়ারস বৈঠক নানাদিক দিয়েই গুরুত্বপূর্ণ। গত অক্টোবর মাসে সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃত্ব থেকে নিকিতা ক্রুশ্চেভের অপসারণের পর এই প্রথম কমিউনিস্ট গোষ্ঠীর রাষ্ট্রনেতারা আনুষ্ঠানিকভাবে একটি বৈঠকে মিলিত হলেন। আরও উল্লেখযোগ্য, গত ১৯৬৩ সাল থেকে রুমানিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক ঘর্গে ঘর্গেউ-দেজ সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতাদের সঙ্গে একত্র কোন বৈঠকে মিলিত হতে রাজী হন নি। কিন্তু এবারের বৈঠকে তিনি এসেছিলেন। ক্রুশ্চেভের আমলে সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে রুমানিয়ার সম্পর্ক যেরূপ খারাপ হয়েছিল, সেদিক থেকে ওয়ারস বৈঠকে ব্রেজনেভ-কোসিগিনের পাশাপাশি ঘর্গেউ-দেজের বসা নিশ্চয় লক্ষ্য করার মত বিষয়।

সোভিয়েট ইউনিয়নের লিওনিদ ব্রেজনেভ ও আলেকসি কোসিগিন, বুলগেরিয়ার টোডোর ঝিকভ, চেকো-স্লোভাকিয়ার অ্যাণ্টোনিন নভোটনি, পূর্ব জার্মানীর ওয়ালটার উলব্রিখট, রুমানিয়ার ঘর্গে ঘর্গেউ-দেজ, হাঙ্গেরীর আনোস কাদার ও পোল্যাণ্ডের ব্লাদিস্লু গোমুলকা এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। আলবেনিয়া এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে ওয়ারস গোষ্ঠীর সদস্য হলেও কার্যত আলবেনিয়ার সঙ্গে এই সংস্থার আর কোন সম্পর্ক নেই। আলবেনিয়া থেকে কেউ এই বৈঠকে যোগ দেন নি।

আলোচনা শেষে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ একটি যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করেছেন। এই বিবৃতিতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে পশ্চিম জার্মানীকে পরমাণু অস্ত্র দেবার প্রচেষ্টার তীব্র বিরোধিতা করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাবিত 'বহুজাতিক পরমাণু বাহিনীর' MLF নাম উল্লেখ না করেও বলা হয়েছে, কোনভাবেই পশ্চিম জার্মানীর হাতে পরমাণু অস্ত্র দেয়া চলবে না।

এ কথা নিশ্চয়ই কেউ বিশ্বাস করবেন না, পশ্চিম জার্মানী তথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকে নতুন কোন বিপদের আশঙ্কায় কমিউনিস্ট নেতারা ওয়ারসতে মিলিত হয়েছিলেন, এবং এ বিষয়ে একটি যুক্ত ঘোষণা প্রচার করেই তাঁরা তাঁদের কাজ সম্পন্ন করেছেন। ওয়ারস বৈঠক আহ্বানের পশ্চাতে সোভিয়েট ইউনিয়নের আরও গভীর উদ্দেশ্য ছিল।

মার্চ মাসে মস্কোতে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির যে প্রস্তুতি সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছে, সে সম্পর্কে পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে কিছুটা প্রাথমিক আলোচনা করাই ব্রেজনেভ-কোসিগিনের উদ্দেশ্য ছিল। চীনের বিরুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়নের তাত্ত্বিক বক্তব্যের সমর্থনে সোভিয়েট নেতারা আরও বেশি সমর্থক সংগ্রহের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এদিক থেকে ওয়ারস বৈঠক সোভিয়েট নেতাদের হতাশ করেছে। চীনের বিরুদ্ধে একটি কথাও যুক্ত ঘোষণায় নেই। মনে হয়, অবস্থা বিবেচনা করে সোভিয়েট নেতারা এর জন্য কোন চাপ দেন নি। চীনের বিরুদ্ধে কোন কথা থাকলে ঘর্গেউ-দেজ তো যুক্ত ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করতেনই না, হয়তো আরও দু-একজন বেঁকে বসতেন। এমনিই তো শোনা যাচ্ছে, পূর্ব জার্মানীর উলব্রিখট ও বুলগেরিয়ার ঝিকভ ছাড়া আর কেউ মার্চের মস্কো বৈঠকের ব্যাপারে উৎসাহ দেখাচ্ছেন না। অনেকে এখনও আশঙ্কা করছেন, মস্কো বৈঠক শেষ পর্যন্ত আবার বন্ধ রাখতে হবে।

যাই হোক, আলবেনিয়া বাদে ইউরোপের সবকটি কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের

নেতারা একত্র মিলিত হয়ে সবাই মিলে সমবেতভাবে একটি ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করতে পেরেছেন, নতুন সোভিয়েট নেতাদের পক্ষে এ বড় কম কৃতিত্বের কথা নয়। ক্রুশ্চেভের পক্ষে শেষ দিকে এরকম যুক্ত ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি---অন্যান্য সবাইকে তিনি সম্মত করাতে পারেন নি।

পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলি সোভিয়েট ইউনিয়নের তাঁবেদার নয়, তারা সোভিয়েট ইউনিয়নের সমকক্ষ সহযোগী রাষ্ট্র, ওয়ারস গোষ্ঠীর নতুন চেহারা এই ইঙ্গিত বহন করছে।

ফ্রান্স ঃ

মাত্র ছ' মাস পূর্বে যে চার্লস দ্য গল লুডউইগ এরহার্ডকে অবিবেচক বলে সমালোচনা করেছিলেন, তিনিই এবার এরহার্ডকে দু' বাহু বাড়িয়ে আলিঙ্গন করতে এগিয়ে এসেছেন। গত সপ্তাহে পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলার লুডউইগ এরহার্ড প্যারিসের ৩০ মাইল দূরে রামবোলেঁ প্রাসাদে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি চার্লস দ্য গলের সঙ্গে দেখা করতে এলে দ্য গল নিজে এগিয়ে এসে এরহার্ডকে সাদরে বরণ করে নেন। গত ছ' মাসের মধ্যে কূটনৈতিক পরিস্থিতির যে পরিবর্তন হয়েছে, তার ফলেই এই ঘটনা সম্ভব হয়েছে।

এবারের বৈঠক এরহার্ডের আগ্রহেই হয়েছে। রামবোলেঁ বৈঠকের পূর্বে অবশ্য এরহার্ড ঘোষণা করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি তাঁর মনোভাবের কোন পরিবর্তন হয় নি। কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর তিনি ভরসা হারিয়ে ফেলেছেন, এবং এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিবর্তে তিনি ফ্রান্সের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির কথা ভাবছেন। 'বহুজাতিক পরমাণু বাহিনী' গঠনের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে খুব বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছে না বলেই পশ্চিম জার্মানী রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়েছে। পশ্চিম জার্মানী নিজের নিরাপত্তার জন্য এই প্রস্তাবিত সংস্থার ওপর খুব জোর দিয়েছিল। মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব ডিন রাস্কের সাম্প্রতিক একটি মন্তব্যও এরহার্ডকে ক্ষুব্ধ করেছে। ডিন রাস্ক বলেছেন, পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর একত্রীকরণের বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে আর কোন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করবে না। জার্মান ঐক্যের বিষয় জার্মান জনগণের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ যে, এই বিষয়ে কোনরূপ কার্যকরী কিছু না করতে পারলে এরহার্ডের পক্ষে অসুবিধা হবে। এই বৎসর পশ্চিম জার্মানীতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বিরোধী দল সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতা উইলি ব্র্যাণ্ড ঘোষণা করেছেন, তিনি জার্মান ঐক্যের বিষয়কে নির্বাচনের প্রধান প্রশ্নে পরিণত করতে চান। সুতরাং এ ব্যাপারে এরহার্ডের দিক থেকে কিছু না করলেই নয়। তা ছাড়া তাঁর নিজের দলের মধ্যেও ফ্রান্সের সঙ্গে পশ্চিম জার্মানীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য চাপ আছে। প্রাক্তন চ্যান্সেলার কনার্ড অ্যাদেনুর নিজে এই মনোভাবের প্রধান সমর্থক।

দ্য গলের সঙ্গে এরহার্ডের দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। আলোচনা শেষে ঘোষণা করা হয়েছে, ইউরোপের রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য উভয়ে চেষ্টা করবেন। পশ্চিম জার্মানী অনেকদিন ধরে এই দাবি করে আসছে। দ্য গল নাকি এরহার্ডকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, জার্মান ঐক্যের বিষয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের ওপর নতুন করে চাপ সৃষ্টির জন্য তিনি বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতাদের সঙ্গে কথা বলবেন।

এই আলোচনার পর এরহার্ড বেশ বিজয়ীর মত বনে ফিরে এসেছেন। এখন তিনি বেশ সাহসের সঙ্গে নির্বাচকমণ্ডলীর সম্মুখীন হতে পারবেন। কিন্তু সাধারণ জার্মান দ্য গলকে কতটা বিশ্বাস করে এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন পত্রিকা মন্তব্য করেছে, জার্মান ঐক্যের ব্যাপারে দ্য গল কিছু করবেন---এমন আশা করা দুরাশামাত্র।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রঃ

গত ২৭শে জানুয়ারী নিউ ইয়র্কে নেহরু স্মৃতি প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়েছে।

• শুভেচ্ছা বিনিময়রত দ্য গল ও এরহার্ড

নিউ ইয়র্কে নেহরু স্মৃতি প্রদর্শনীতে পরলোকগত মার্কিন প্রেসিডেন্টের পত্নী জ্যাকলিন কেনেডি ও যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত বি কে নেহরু ভাইস প্রেসিডেন্ট হামফ্রের বক্তৃতা শুনছেন।

এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপ-রাষ্ট্রপতি হুবার্ট হামফ্রে নেহরুর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। স্বাধীনতার পর নানা অসুবিধার মধ্যে যেভাবে নেহরু ভারতকে সংগঠিত করেছেন, তার উল্লেখ করে হামফ্রে নেহরুকে জর্জ ওয়াশিংটনের সঙ্গে তুলনা করেন। ভারত তথা এশিয়ায় গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা রক্ষায় নেহরুর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

হামফ্রে ভারতের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুত্বের উল্লেখ করে বলেন, দারিদ্র্য, ব্যাধি ও সামাজিক অসাম্য দূর করার জন্য ভারত যে প্রচেষ্টা সুরু করেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বতোভাবে তার সঙ্গে সহযোগিতা করবে। চীনা আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য মার্কিন নীতিও অব্যাহত থাকবে বলে হামফ্রে ঘোষণা করেন।

জনসন ও হামফ্রে যথাক্রমে রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি পদে শপথ গ্রহণের পর, এই প্রথম তাঁদের একজন দ্বিধাহীনভাবে ভারত সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি ঘোষণা করলেন।

নেহরু স্মৃতি প্রদর্শনীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন। আর যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতি আলেক্স কোয়াইসন স্যাকে, রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সম্পাদক ইউ থাণ্ট, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি আর্ল ওয়ারেন, শ্রীমতী জ্যাকলিন কেনেডি, সেনেট সদস্য ববি কেনেডি, নিউ ইয়র্কের গভর্নর নেলসন রকফেলার ও নিউ ইয়র্ক শহরের মেয়র রবার্ট ওয়াগনার।

রাষ্ট্রসংঘ শহর নিউ ইয়র্কে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৎসরে নেহরু-প্রদর্শনীর উদ্বোধনকে একটি স্মরণীয় ঘটনা বলে উল্লেখ করে হুবার্ট হামফ্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে নেহরুর উল্লেখযোগ্য অবদান ও জোটনিরপেক্ষতার কথা বলেন।

* * *

রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টোকে মুখের মত জবাব দিয়েছেন রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রী বি এন চক্রবর্তী।

সর্দার স্বরণ সিং যখন ভারতের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রসংঘে বক্তৃতা করেন, তখন তিনি ইচ্ছা করেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে

কিছু বলেন নি। তাঁর আশা ছিল, পাকিস্তানও এই মনোভাবের পরিচয় দেবে। গালাগালির পথ পরিহার করে সহযোগিতার পথে অগ্রসর হবার জন্য পাকিস্তান চেষ্টা করবে।

কিন্তু আমাদের কর্তারা এখনও পাকিস্তানকে চিনে উঠতে পারেন নি। ভালমানুষি পাকিস্তানের সরকারী নেতাদের কোষ্ঠীতে নেই। ভুট্টো তাঁর বক্তৃতায় অপ্রাসঙ্গিক ও অসংলগ্নভাবে ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছেন। ভারতকে তিনি সাম্রাজ্যবাদী বলে অভিহিত করেছেন এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির নিরাপত্তার পক্ষে ভারত এক মস্ত বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে, এমন মন্তব্য করেছেন। এছাড়া ভারতের কাশ্মীর গ্রাস ও ভারতে মুসলমান ধ্বংস এই দুটি অতি প্রিয় বক্তব্য তো আছেই।

শ্রী বি এন চক্রবর্তী ভুট্টোর বক্তৃতার জবাব দিতে গিয়ে, ভুট্টোর বিরুদ্ধে মিথ্যাভাষণ ও জালিয়াতির অভিযোগ করেছেন। চীন কর্তৃক আক্রান্ত ভারত আজ এশিয়ার বিপদ, না পাক-চীন আঁতাত এশিয়ার বিপদ, এই প্রশ্ন তিনি করেছেন। চীনের সঙ্গে চক্রান্ত করে পাকিস্তান ভারতের শত্রুতা করছে আর সেই পাকিস্তানই কিনা বলে, ভারত অপরের স্বাধীনতা বিপন্ন করতে চায়!

ভুট্টোর গালভরা আত্মনিয়ন্ত্রণের কথার জবাবে শ্রীচক্রবর্তী বলেছেন, কাশ্মীরের অধিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি জানাবার পূর্বে পাকিস্তান সরকারের উচিত পূর্ববঙ্গ, বেলুচিস্তান ও পাখতুনিস্তানের আত্মনিয়ন্ত্রণ মেনে নেওয়া।

কাশ্মীর প্রসঙ্গে প্রকৃত তথ্য বিশ্লেষণ করে শ্রীচক্রবর্তী বলেন, কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কাশ্মীর তথা ভারতের ৩২ হাজার বর্গ মাইল জমি পাকিস্তান জোর করে দখল করে রয়েছে। পাকিস্তান পররাজ্য আক্রমণকারী। পাকিস্তান রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হবার মাত্র ১০ দিনের মধ্যে সে অপর রাষ্ট্র আক্রমণ করেছে।

ভারত থেকে মুসলমানদের বিতাড়ন করা হচ্ছে এই অদ্ভুত কথার উল্লেখ করে শ্রীচক্রবর্তী বলেন, ভারতে পূর্বের তুলনায় মুসলমান জনসংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যদি মুসলমানদের তাড়ানো হয় বা তাদের মেরে ফেলা হয়, তবে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় কি করে?

পাকিস্তান প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব চায় না। বন্ধুত্ব স্থাপন ও বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য ভারত বারে বারে চেষ্টা করা সত্ত্বেও পাকিস্তান এ-ব্যাপারে মোটেই উৎসাহ দেখায় নি। পাকিস্তান কাশ্মীর সমস্যার সমাধান চায় না; সুযোগমত ঘরে-বাইরে এই উপলক্ষে উত্তেজনা সৃষ্টি করে কাজ হাসিল করাই পাকিস্তানের উদ্দেশ্য।

চীন ঃ

চীন আর ইন্দোনেশিয়া মিলে কি পাল্টা রাষ্ট্রসংঘ স্থাপন করবে? চৌ-এন-লাই-এর বক্তৃতা শুনে তো তাই মনে হয়।

ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্রসংঘ থেকে বেরিয়ে আসার পর, চীনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। রাষ্ট্রসংঘ ত্যাগের সিদ্ধান্তে সবচেয়ে বেশি খুশি চীন।

ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ সুবান্দ্রিও ছুটে গিয়েছেন পিকিং-এ

প্রদর্শনীতে ইন্দিরা গান্ধী নেহরুর একখানি তৈলচিত্র দেখছেন

চীনা নেতাদের সঙ্গে সলাপরামর্শ করার জন্য। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে চীন ও ইন্দোনেশিয়ার পক্ষ থেকে সম্মিলিত ব্যবস্থা গড়ে তোলাই এই আলোচনার উদ্দেশ্য।

পিকিং-এ প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী চেন-ঈ ডাঃ সুবান্দ্রিওর সঙ্গে সম্মিলিত সামরিক ব্যবস্থা ও পাল্টা রাষ্ট্রসংঘ গঠন এই দুই বিষয় নিয়েই আলোচনা করেছেন।

ডাঃ সুবান্দ্রিওর সম্মানে প্রদত্ত এক ভোজসভায় চৌ-এন-লাই অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, বর্তমান রাষ্ট্রসংঘ সাম্রাজ্যবাদীদের কুক্ষিগত—এখানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পছন্দমত কাজ হয়। কল্যাণকর কোন কাজ করা এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং পৃথকভাবে একটি বিপ্লবী রাষ্ট্রসংঘ স্থাপন করতে হবে।

চৌ-এন-লাই বলেন, চীন, কোরিয়া ভিয়েৎনাম প্রভৃতিতে বিশ্বের এক-চতুর্থাংশ অধিবাসী বাস করে, অথচ এরা কেউ রাষ্ট্রসংঘের সদস্য নয়। অর্থাৎ এইসব দেশের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়া যোগ দিয়ে যদি একটি নতুন বিশ্বসংস্থা গঠন করে এবং পরে আফ্রো-এশীয় গোষ্ঠীর আরও কয়েকটি দেশকে এর মধ্যে নিয়ে আসা যায় তবেই তো পুরোদস্তুর একটি রাষ্ট্রসংঘের প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে।

কিন্তু চীন-ইন্দোনেশিয়ার এই উদ্যোগ আফ্রো-এশীয় গোষ্ঠীর সদস্যরা মোটেই ভাল চোখে দেখছে না। রাষ্ট্রসংঘে এইসব দেশের যেসব কূটনীতিকরা আছেন, তাঁদের মধ্যে চৌ-এন-লাই-এর বক্তৃতার অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে এরূপ বিভ্রান্তিমূলক আচরণ কেউই পছন্দ করছেন না। রাষ্ট্রসংঘের ত্রুটি দূর করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু তাই বলে একে ভেঙে ফেলা, বর্জন করা কিংবা পাল্টা রাষ্ট্রসংঘ স্থাপনের মত বিভেদমূলক চেষ্টা কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নয়।

দক্ষিণ ভিয়েৎনামঃ

আবার পটপরিবর্তন। এই নিয়ে দু'বৎসরের মধ্যে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে ছ'বার শাসনব্যবস্থার উচ্ছেদ ও নতুন 'বিপ্লবী' সরকার গঠন হল। এবারের ঘটনায় দেখা যায়, ২৭শে জানুয়ারী সেনাবাহিনীর 'ইয়ং টার্ক' বা 'উগ্র তরুণ' সেনাপতিরা প্রধানমন্ত্রী ত্রান-ভান হুয়াং-এর প্রতি তাঁদের সমর্থন প্রত্যাহার করেন এবং তার ফলে এক রক্তপাতহীন বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন হয়। হুয়াং সরকারের পতন ঘটে এবং তার জায়গায় সেনাবাহিনীর প্রধানদের হাতে

বৃহস্পতিবার ৪ঠা ফেব্রুয়ারী শুভারম্ভ !

পাথরের বুকে লেখা দু'টি তরুণ হৃদয়ের জয়গান—

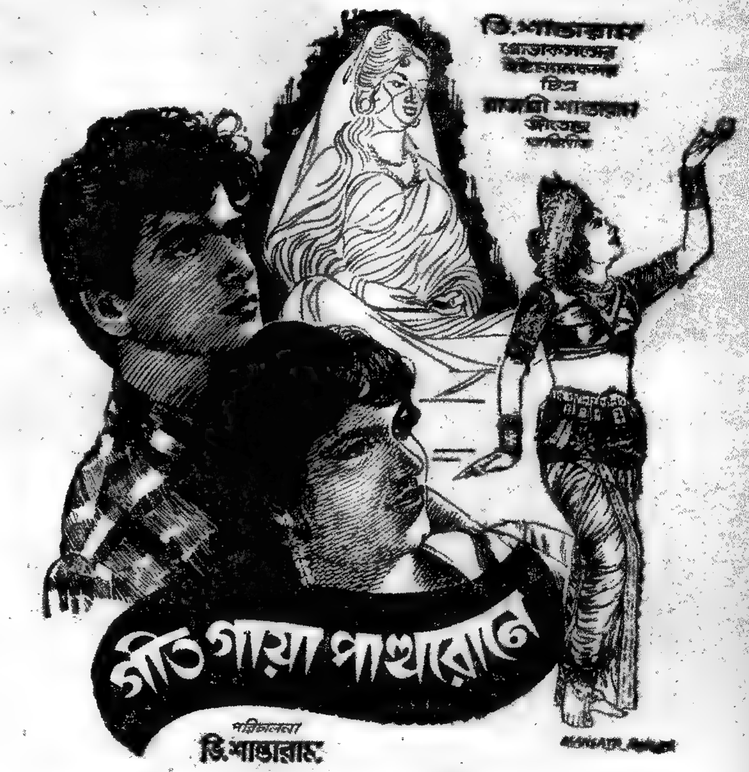

জ্যোতি – বসুশ্রী – বীণা – পূর্ণশ্রী – ইণ্টালী

দীপ্তি – চিত্রপুরী (খিদিরপুর) : পরী (মেটিয়াবুরুজ) : অশোকা (বেহালা) : বঙ্গবাসী (হাওড়া)

পিকাডিলি (সালকিয়া) : জয়ন্তী (রিষড়া) : লক্ষ্মী (টিটাগড়) : রজনী (জগদ্দল) : নৈহাটি সিনেমা (নৈহাটি) : দেশবন্ধু (ঝরিয়া)

৫ই ফেব্রুয়ারী হইতে

মৃণালিনী (দমদম)

॥ মানসাটা পরিবেশনা ॥

ক্ষমতা অর্পিত হয়। জেনারেল নেগুইন-খান আবার অস্থায়িভাবে প্রধানমন্ত্রী হন। পরে অবশ্য অর্থনীতিবিদ নেগুইন-জুয়ান-ওয়ানকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়েছে।

বিদ্রোহী সেনাপতিদের মুখপাত্র সায়গনের সামরিক গভর্নর জেনারেল ফাম-ভান-ডং বলেছেন, শীগ্‌গিরই ২০ জন ব্যক্তি নিয়ে সামরিক ও বে-সামরিক সদস্য বিশিষ্ট একটি শাসন-পরিষদ গঠন করা হবে। জাতীয় আইনসভাও স্থাপন করা হবে।

ত্রান-ভান-হুয়াং সরকারের পরিবর্তনের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বিদ্রোহীরা বলেছেন, দেশে বর্তমানে যে জরুরী অবস্থার উদ্ভব হয়েছে, তার সম্মুখীন হবার ক্ষমতা হুয়াং-এর সরকারের নেই, তাই সামরিকবাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন একটি শক্তিশালী সরকার প্রয়োজন।

গত ক'দিন ধরে সায়গন, হিউ, দানাং প্রভৃতি শহরে বৌদ্ধ ধর্ম-নেতাদের নেতৃত্বে ছাত্র ও সাধারণ মানুষ হুয়াং সরকারের পদত্যাগের দাবিতে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। এবারের আন্দোলন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও পরিচালিত হয়েছিল। ২২শে জানুয়ারী সায়গনে সাততলা বিশিষ্ট মার্কিন দূতাবাসে ছাত্ররা তীব্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং 'ইউ এস আই এস' লাইব্রেরি ভেঙে ফেলে।

বিক্ষুব্ধ বৌদ্ধদের সঙ্গে একটা মীমাংসায় উপনীত হবার জন্যই সেনাপতিরা শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন করেছেন। হুয়াং সরকারের উচ্ছেদের পূর্বে পাঁচজন নেতৃস্থানীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে বিদ্রোহী সেনাপতিরা কথা বলেছেন। ফাম-ভান-ডং-এর কথায় প্রকাশ পেয়েছে, বৌদ্ধরা আর রাজনীতিতে অংশ নেবে না এবং রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত তিনজন ভিক্ষু থিচ-তাম-চাউ, ত্রি-কুয়াং ও হো-গিয়াককে তাঁরা নির্বাসিত করবেন বলে বৌদ্ধ নেতারা কথা দিয়েছেন। বিপরীত দিকে বৌদ্ধদের দাবি মেনে নিয়ে সেনাপতিরা হুয়াং সরকারকে উচ্ছেদ করেছেন।

সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিক্ষোভ দূর করতে না পারলে কমিউনিস্ট ভিয়েৎ কং বাহিনীর বিরুদ্ধে ঠিকমত সংগ্রাম করা যাবে না, এই কারণেই গণবিক্ষোভ দমনের উদ্দেশ্যে সেনাপতিরা এবারের বিদ্রোহ পরিচালনা করেছেন।

কিন্তু প্রশ্ন হল, এতেও কি বিক্ষোভ থামবে? ইতিমধ্যেই রোমান

• জুয়ান ওয়ান

ক্যাথলিকরা নতুন সরকারের বিরুদ্ধে তাদের মত প্রকাশ করেছে। বৌদ্ধরা যে কি করবে বলা শক্ত। তারা বোধ হয় এখন অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছে। ছাত্ররা নতুন করে আন্দোলনের সঙ্কল্প ঘোষণা করেছে, এবার তাদের দাবি: মার্কিন রাষ্ট্রদূত ম্যাক্সওয়েল টেলরকে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ত্যাগ করতে হবে।

হুয়াং সরকারের উচ্ছেদ ও সেনাবাহিনী কর্তৃক ক্ষমতা দখলের ব্যাপারে মার্কিন দূতাবাস এখন পর্যন্ত কোন মতামত প্রকাশ করে নি। তারা এই ব্যাপারকে পছন্দ করবে কিনা বলা শক্ত।

বৃটেন ঃ

গত ৩০শে জানুয়ারী পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় স্যার উইনস্টন চার্চিলের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। রাণী এলিজাবেথের নির্দেশে পার্লামেণ্ট এই অন্ত্যেষ্টি সম্পর্কে বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যেরূপ বিরাটভাবে রাজকীয় সম্মানের সঙ্গে চার্চিলের শেষকৃত্য সমাপন করা হয়, তা এর পূর্বে মাত্র আর দুজনের ভাগ্যে জুটেছে। ১৮৫২ সালে ডিউক অব ওয়েলিংটন ও ১৮৯৮ সালে উইলিয়াম ইউয়ার্ট গ্ল্যাডস্টোন এরূপ সম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন।

ইংরেজরা আন্তরিকভাবে চার্চিলের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে। ইংরেজদের কাছে চার্চিল ছিলেন, এযুগের শ্রেষ্ঠ ইংরেজ। চরম বিপদের মুহূর্তে তিনি বৃটেনকে রক্ষা করেছেন এবং বর্তমান বৃটেনের অনেকখানিই চার্চিলের অবদান। যেসব দেশ বৃটেনের সঙ্গে একত্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে লড়াই করেছে, সেসব দেশেও চার্চিল বিশেষ শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। যাঁরা তাঁর সঙ্গে একমত নন, তাঁরাও তাঁর ব্যক্তিত্ব, দেশপ্রেম ও রাজনৈতিক দক্ষতাকে শ্রদ্ধা করেন।

সেণ্টপলস গির্জায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, রাণী এলিজাবেথ ও রাজপরিবারের অন্যান্য ব্যক্তি, চার্চিলের মহাযুদ্ধের সাথী প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি জেনারেল ডুইট আইসেনহাওয়ার, ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি চার্লস দ্য গল, লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ও অন্যান্য বিশিষ্ট রাষ্ট্রনেতাগণ। ১১৩টি রাষ্ট্র থেকে বিশিষ্ট নেতারা চার্চিলকে সম্মান জানাতে এসেছিলেন—এঁদের মধ্যে ছিলেন চার জন রাজা, দু'জন রাণী, কয়েকজন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী। ভারতের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার স্বরণ সিং।

গ্রন্থমেলা

আশ্চর্য! : সম্পাদক : আকাশ সেন। অ্যালফা বিটা পাবলিকেশনস, পোস্ট বক্স ২৫৩৯, কলকাতা-১। দাম। এক টাকা।

বাংলা দেশে পত্র-পত্রিকার অভাব নেই, কিন্তু 'আশ্চর্যে'র বৈশিষ্ট্য এই যে, এর রচনাসমূহ বিজ্ঞানধর্মী। ভারতের মানুষ মহাভারতের বৈজ্ঞানিক প্রাগ্রসর চিন্তা সম্বন্ধে গৌরব করতে পারে, কিন্তু বর্তমান কালের রচনায় সেই চেতনা মাত্র ক'জন লেখকের মধ্যে দেখা যায়—যাঁদের মধ্যে শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র অগ্রণী। যা হোক, 'আশ্চর্য' সেই ধরণের রচনা প্রকাশ করে বাংলা পত্রিকা-জগতে এক নবপথ রচনা করছেন বলা যায়। আলোচ্য সংখ্যায় যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে অদ্রীশ বর্ধন ছাড়া প্রায় সকলেই যে সায়েন্স ফিকশান নিয়মিত লেখেন—তা বলা যায় না, তবু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশু দাস, গৌরীশঙ্কর দে, অশেষ দাস, মনোরঞ্জন দে প্রমুখের লেখায় মুন্সিয়ানার পরিচয় পেয়েছি। 'সমুদ্রে কত সম্পদ' ছবিতে তথ্য। এই ধরণের আরো বেশি ছবি থাকলে তা আনন্দের কারণ হবে।

সচিত্র শ্রীমতী : সম্পাদিকা : শ্রীমতী বাণী ঘোষ। কার্যালয় : ২৯, ওয়াটারলু স্ট্রীট, কলকাতা-১। প্রতি সংখ্যা : এক টাকা।

'সচিত্র শ্রীমতী'র তৃতীয় বর্ষের সপ্তম সংখ্যাটি রচনায় ও অলঙ্করণে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। বড়দিন উপলক্ষে প্রকাশিত প্রবন্ধ ও কবিতাগুলি উল্লেখযোগ্য। 'শ্রীমতী' সম্পূর্ণ উপন্যাস দেবার যে পরিকল্পনা করেছে তার প্রাথমিক পরিচয় দেখে আমরা খুশি হয়েছি। তবে আমাদের বক্তব্য এই যে, অন্যান্য পত্রিকার মতো উপন্যাসের জন্যই উপন্যাস যেন এখানে না থাকে। রচনাগুণে লেখক যাতে স্বীকৃতি লাভ করে সেদিকে লক্ষ্য রেখে তাঁরা নতুনদের উপন্যাস প্রকাশ করবেন। পাঠকরা নিশ্চয়ই ভালো উপন্যাসের জন্য প্রথম দাবি জানায়—তা নামী বা স্বল্পনামী যে কোনো লেখকের লেখা হতে পারে। বর্তমান সংখ্যার 'বেহাগে বাহারে' সুখপাঠ্য বলে মনে হয়েছে। 'শ্রীমতী'তে যাঁরা কবিতা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরেন ঘোষ প্রমুখ আছেন। আশাপূর্ণা দেবীর ধারাবাহিক উপন্যাস, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক নাটক বিশেষ আকর্ষণীয়। এ সংখ্যায় রয়েছে দুজন তরুণ লেখকের দুটি গল্প। এ ছাড়া কয়েকজন তরুণ কবির কবিতাও প্রশংসনীয়। বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে

জয়ন্তী সেন

বিশ্ববার্তা, চিঠিপত্র, চলচ্চিত্র, লোক-পরিচয় এবং সর্বশেষে শিবরাম চক্রবর্তীর সমাপয়েৎ 'শ্রীমতী'র অন্যতম সম্পদ। পত্রিকাটির ফ্যাসন বিভাগের দায়িত্ব শ্রীমতী সোনা অধিকারীর। তিনি উক্ত দায়িত্ব পালন করেছেন।

অভিনব অগ্রণী : সম্পাদক : দিলীপ-কুমার বাগ। ৫৩, গোপাল ব্যানার্জী লেন, হাওড়া। দাম : ৫০ পয়সা।

ছোটদের এই মাসিক পত্রিকাটির আলোচ্য সংখ্যাটি ৺যামিনীকান্ত স্মরণে প্রকাশিত। এতে কবিতা লিখেছেন স্বপনবুড়ো, কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রমুখ কবি। যামিনীকান্ত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, গজেন্দ্র-কুমার মিত্র, রামপদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আকাশ : সম্পাদক : রথীন সরকার, ডি এন বোস লেন, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। প্রতি সংখ্যা : ১৫ পয়সা।

এটি মাসিক 'আকাশে'র প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা। এই পত্রিকায় কেবল গ্রাহক-গ্রাহিকাদের রচনাই প্রকাশিত হবে বলে উল্লিখিত আছে।

বিশেষ ঘোষণা

শারীরিক অসুস্থতার জন্য এতদিন শ্রীবিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য 'দিল্লী থেকে' রচনা পাঠাতে পারেন নি।

আশা করি আবার এই বিভাগটি এবার থেকে রীতিমত পাঠক-পাঠিকার সামনে পরিবেশন করা যাবে।

—সম্পাদিকা

তবুও কবি হেমচন্দ্র বাগচীর কবিতাও এ সংখ্যায় দেখা গেল। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সম্পর্কিত লেখাটি বড়ই সংক্ষিপ্ত। 'আকাশ' নিয়মিত প্রকাশিত হোক।

স্বরান্তর : সম্পাদক : রঞ্জিত রায়-চৌধুরী, অমল রায়চৌধুরী। ১১নং জাস্টিস মন্মথ মুখার্জী রোড, কলকাতা ৯। দাম : ৪০ পয়সা।

পাক্ষিক ছোটগল্পপত্র 'স্বরান্তরের' এটি তৃতীয় সংকলন। এই সংখ্যায় চারজন তরুণ লেখক গল্প লিখেছেন। গল্পগুলিতে নতুন বক্তব্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। গল্প ছাড়া গল্পের ওপর বিভিন্ন আলোচনা থাকাও প্রয়োজন মনে করি।

আঁধার মানিক

ধারাবাহিক উপন্যাস

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ উনত্রিশ ॥

মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, বিষণ্ণ প্রভাত, নিরানন্দ নগরী, গঙ্গাতীরে স্বরকণ্ঠের কাছে বক্সীদেওয়ানের পাল্কী এল।

'জানি না, আমি কিছুই জানি না। জানি, এই অহমিকা আমার অন্তরকে পূর্ণ করে রেখেছিল, এখন আমি শিশুর মত অসহায়।' স্বরকণ্ঠের মন যেন বারবার কথাটি আবৃত্তি করছিল। নিজেকে কতই অসহায় মনে হয়। যেন তাঁর অহমিকা একটি বহুমূল্য খেলনা, রাতের অন্ধকারে কে খেলনাটি কেড়ে নিয়ে গেছে। এখন স্বরকণ্ঠ বড় অসহায়। কৃষ্ণনগরে কৃষ্ণরায়ের মন্দির সামনে উৎকুণির মেলার জনকোলাহলে দেখেছিলেন একটি শিশুর চোখে এই রকম অসহায় দৃষ্টি। বড় দুঃখে করুণ চোখ মেলে সে তাকিয়েছিল সামনের দিকে। তার হাতের খেলনাটি সে হারিয়ে ফেলেছে। হাতে যতক্ষণ সেই রঙীন তালপাতার ভেঁপুটি ছিল, নিজেকে সে কতই ঐশ্বর্যবান ভেবেছিল। উৎসবমুখর জনস্রোত আপনার আনন্দে ভেসে চলে যায়, শিশুর চোখের বিষণ্ণ চাহনি কে চেয়ে দেখে।

'কি হয়েছে বাবা?'

তাঁর সাদর প্রশ্নে সে শিশু ডুকরে কেঁদে উঠেছিল 'মা'র কাছে যাব আমার খিদে লেগেছে গো।'

এমন সময়ে শিশু মা'র কাছে যায়। স্বরকণ্ঠ কার কাছে যাবেন। গুরুদেব বলে গেলেন মায়ের বড় দুঃখ। তিনি জাহ্নবীর জলে বস্ত্র, মিষ্টান্ন, মালা দিচ্ছিলেন। বলছিলেন 'নে মা, খা মা, তোর দুঃখ কেউ দেখে না।' তবে কি সামনের ঐ জলরাশিকে তিনিও মা বলবেন? কেমন করে বলবেন? ঐ জলরাশি আপনার মনে বয়ে যায়, কলকল ছলছল শব্দে গুরুদেব অশ্রুত কান্না শোনেন, স্বরকণ্ঠের সে সুকৃতি নেই।

অজয়তীরে বাউল বলেছিল মনের মধ্যে মন থাকে। এখন স্বরকণ্ঠ অন্তরের গভীর হতে শুনতে পান কে তাঁকে মৃদু তিরস্কার করে।

'না, গঙ্গা নিষ্প্রাণ জলরাশি নয়,' স্বরকণ্ঠ ধীরে বলেন। অমনি, কি আশ্চর্য, মেঘাবরণ সরিয়ে যেমন সূর্য নিমেষের তরে মুখ দেখান, তেমনি যেন সামনের নদী, অদূরে শ্মশান, ওপারের গ্রাম, বন, এপারের নদী-তীর, সিক্ত, নিরানন্দ জনবসতি, সব কিছুর ওপর থেকে নিমেষের জন্যে আবরণ ঘুচে যায়। কে স্বরকণ্ঠকে দেখিয়ে নেয় মুহূর্তের দিব্যছবি, এদিন যেমন দেখেছিলেন আঁধার-মাণিক গ্রামে, চৈত্রের দুপুরে, বিশু-কর্মার পটে জগৎসংসার, মানুষ, পশু, ক্ষেতখামার, ঘরবাড়ি সবাই যে যার কাজ করে চলেছে।

সে পটে দেখেছিলেন মানুষের সংসার।

এখন দেখেন বড় পবিত্র কারণে গঙ্গার উৎপত্তি, 'তিনি মৃতকে জীবন দিতে এসেছিলেন ভক্তের ডাকে।'

সুরকণ্ঠ অস্ফুটে বলেন, সেই সঙ্গে মনের গোপনে স্মৃতির পর্দা দুলে ওঠে যেন। শুনেছেন তিনি, শুনেছেন এ-সব কথা। শুনেছেন বক্রেশ্বরে শিবায়েৎ সাধু সম্মেলনে, গঙ্গাসাগরে স্নানযাত্রার মেলায়, গ্রাম্য, সরল, বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর মুখে। এখন সব কথা মনে পড়ে যায়। এরই নাম ভগবানের দেওয়া দিব্য অনুভূতি। যখন যেখানে যেটি শুনেছেন, তাঁর মন কুবের ভাণ্ডারীর মত সেটি সঞ্চয় করে রেখেছে। উপযুক্ত সময়ে মনে পড়ছে সব। এক মানুষের কাছে শোনা কথা, আর এক মানুষের মনে পড়ছে, এমনি করেই ভগবান তাঁর কাজ করিয়ে নেন।

'সব যেন শ্মশান হয়েছিল, জানলেন মহাশয়', সাধু বলেছিল, 'সব শ্মশান। শুধু ছাই, হাড়গোড়, গাছে পত্র নেই, ক্ষেতে শস্য নেই। তাই মা এলেন মরাকে জীয়ন্ত করতে। আজও করছেন, তিনি জল দিচ্ছেন তবে ক্ষেত আবাদ করছ, তাঁর দেওয়া অন্নে শরীর পালছ আবার ম'লে পরে তাঁর জলে দেহের ছাইটুকু সমর্পণ, তিনি জীয়ন্ত দেবতা। আর সকল দেবদেবী কলিতে অপ্রকাশ, শুধু ভক্তের কাছে প্রকাশ। শুধু মা ত্যাগ করেন না পাপীকে গো, নিরন্তর তোমার আমার সামনে আছেন মহাশয়।'

এখন সব মনে পড়ে যায়। ঐ গাছের পাতা বাতাসে চঞ্চল, যেন তাঁর আরতি হচ্ছে, ঐ জনপদে দিবারম্ভের কোলাহল, যেন তাঁর পূজাকল্পে শঙ্খঘণ্টা বাজছে, সুরকণ্ঠের হাত অমনি অঞ্জলি দানের মত ভঙ্গি পেল। কৃতাঞ্জলি হয়ে তিনি নেমে চললেন নদীর দিকে, 'গঙ্গা-জলে গঙ্গাপূজা সব বেটা কথার কথা বলে, আমি গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করি,' তিনি অস্ফুটে বলেন ও নদীর জল তুলে নদীতে দেন।

এখন তিনি আনন্দচিত্ত শিশু। কেন না এখন তাঁর মনে হচ্ছে মায়ের কোলে দাঁড়িয়ে আছেন। পরম আহ্লাদে তিনি বলেন 'জানি না, কিছু জানি না আমি, ভূত ভবিষ্যতের কথাটথা বলতে যাব না।'

কিন্তু অমনি, গঙ্গার জলশব্দে অশ্রুত কান্না ভাসে। বলতে হবে তাঁকে, দায়িত্ব পালন করতে হবে, গুরুদেব বলে গেছেন এখানে, এই খাগড়া-কুঞ্জঘাটা-সৈদাবাদ-বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ জনপদসমষ্টির মৃত্তিকা-বিধৌত ভাগীরথীতীরে যুগ পরিবর্তন হবে, এখন সুরকণ্ঠকে সব বলতে হবে বইকি। হয়ত এইটিই তাঁর কাজ, সেই জন্যেই ভগবান এমন যোগাযোগ ঘটিয়েছেন।

'কুসন্তান হব না মা', সুরকণ্ঠ বালকের মত সহজে বলেন। তখনি, 'হম্ ব্রো, হম্ ব্রো' শব্দে নদীতীর চমকিত করে বক্সীদেওয়ানের পাল্কী আসে।

'না মশায়, এই শ্রেষ্ঠ ঠাঁই', সুরকণ্ঠ স্বচ্ছন্দে ভেজাঘাসে বসেন, 'সামনে ভাগীরথী, উত্তরে শ্মশান, দক্ষিণে দেবালয়, বড় পবিত্র জায়গা।'

অগত্যা বক্সীদেওয়ান সেখানেই বসেন। তাঁর পাল্কী নিয়ে চাকর কাপড়, গামছা, খড়ম আনতে যায়, একেবারে গঙ্গা নেয়ে প্রভু ঘরে ফিরবেন। দূরে দাঁড়িয়ে পাইক-পেয়াদারা হাতের রূপোর বালা ঘোরায় ও মাটিতে বর্শা রেখে, তাতে ভর দিয়ে এদিকে-ওদিকে শরীর ঘোরায় ও চারদিকে দম্ভভরে তাকায়। তাদের দেখে স্নানার্থী মানুষ, সাধারণ পথিক সভয়ে দূরে যায়।

'মশায়, প্রথমে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি উদ্দেশ্যে আমার কাছে লোক পাঠিয়েছিলেন, কি কারণে নতুন বর্ষফল জানতে চাইলেন, এতকাল অবধি বাংলায় নবদ্বীপ মত নিয়ে কাজ চলেছে, এখন সে মত অবান্তর মনে করলেন কেন?'

'ঠাকুর, সে কথা পরে হবে, আমি সব কথার জবাব দেব। এখন তুমি আমায় বল---' বলতে বলতে বক্সীদেওয়ানের গলা নিচু হয়, কপালে উদ্বেগের রেখা ফোটে, বিষয়ীর বিষয় চিন্তায় এমন হয়।

'এক কথায় বলবার নয়। উপরন্তু আপনি কোষ্ঠিপত্র করতে দিয়েছিলেন একটি, তাতে জন্মতারিখ মাত্র লেখা ছিল।'

'কি দেখলেন?'

'কি আর বলব বলুন, জাতকের জীবন আর বড়জোর ষোল কি সতেরো বছর, তার জীবনের ইতিহাস আর বাংলার আগামী ক'বছরের ইতিহাস একই রকম।'

'একই রকম।'

'হ্যাঁ মশায়। এই বর্ষের বর্ষফল জানবার জন্যে ব্যস্ত আপনি, আগামী বহু বছর একভাবে যাবে।'

'একভাবে যাবে। কি বল তুমি ঠাকুর, যুদ্ধবিগ্রহ এমনি চলবে?'

'এমনি চলবে। এর চেয়ে বেশি হবে।'

'বর্গীরা আবার আসবে?'

'আবার আসবে, আবার আসবে, বারবার, আবার', সুরকণ্ঠের কণ্ঠ গমগম করে, 'দক্ষিণ থেকে তারা আসবে, রাজ্য ছারেখারে যাবে। চাষী, তাঁতি, কুমোর, কামার জাত-ব্যবসা ছাড়বে। শত শত মানুষ দেশান্তরী হবে। এখন যাদের হীনবল দেখছেন তারা ক্রমে প্রবল শক্তি ধারণ করবে।'

'আমাদের কি হবে ঠাকুর?'

'ধনী ক্রমে আরো ধনী হবে। দরিদ্র দরিদ্রতর হবে। এগারো শ' পঞ্চাশ থেকে এগারো শ' ছেষট্টি অবধি এ ষোল বৎসরে বাংলা দেশে কাল অন্ত, যুগ অন্ত হবে।'

বলতে বলতে তিনি সবিস্ময়ে সামনের দিকে চা'ন। বলেন 'আমার গুরুদেব বলে গেলেন ভাগীরথীর এই তীরে, এইখানে, এক যুগ অন্ত হবে আর যুগ আসবে। নিজের জন্যে ভাবনা কেন মশায়? দেশের এ সর্বনাশে আপনাদের কতজনের পৌষমাস হবে।'

'এই ভাগীরথীতীরে যুগ অন্ত কেমন ক'রে হবে ঠাকুর?'

'কেন, মা করাবে।'

স্বরকণ্ঠ অপ্রকৃতিস্থের মত হাসলেন। বললেন, 'যত পাপ, যত ময়লা মা-কে দিচ্ছ, এ কলিকালে মানুষের দেহে লোভ, পাপ, সর্বনাশের বাসা, সে দেহ পুড়িয়ে ছাইটুকু অবধি মা'র বুকে ঢেলে দাও। এবার মা প্রলয় আনবে।'

'তুমি এ কি বললে ঠাকুর!' এখন আমি গিয়ে কি বলব তাঁকে?'

'সত্যি কথা বলবে। কোষ্ঠীতে যা আছে তা কি পাল্টে যাবে? তোমার জাতক তোমার চেয়ে বুদ্ধি রাখে পাকা মাথায়, সে বুঝে নেবে ঠিক।'

'বড় দুঃখ পেলাম ঠাকুর, এতদিনে দেশে সুশাসন এল বোধ হয়েছিল, এ শাসক সকল প্রজার সমান দৃষ্টি রাখে।'

'সমান দৃষ্টি রাখবে, সুশাসনও করবে। কিন্তু ভাগ্যের লেখা এড়াবে কি করে?'

'বহু গুণে গুণী।'

'এক দোষে সর্বনাশ।'

'কি দোষ?'

'স্নেহান্ধতা।'

'স্নেহ একটি গুণ বটে ঠাকুর।'

'এ ক্ষেত্রে মহাদোষ, লোহার বাসরে কালনাগিনীর ছিদ্র, সকলের পালক হতে হলে সকল দুর্বলতার উপরে উঠতে পারা চাই।'

'তবু ঠাকুর---।'

'জ্যোতিষ জ্যোতিষ করছ কেন মশায়? সাদা চোখে সাদা কথাটা চেয়ে দেখ না। বর্গীরা এসে সহজে স্বচ্ছন্দে লুটপাট করে নিয়ে গেল, তারা আবার আসতে ছাড়বে কেন! এ দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের এখনো অপার সুবিধে, তা ছাড়া এ ঘোর কলিতেও নামমাত্র ব্যয়ে গ্রাসাচ্ছাদন সম্ভব হয়, এত সুবিধে আছে বলেই না সবাই এসে জেঁকে বসেছে। এতগুলো মানুষের স্বার্থ এক জায়গায় এসে মিশেছে, তা হানাহানি হবে না?'

'তুমি সব জান না ঠাকুর। ব্যবসা-বাণিজ্যের সত্যি সুবিধে ছিল যতদিন দিল্লীর বাদশার কোমরে জোর ছিল। পথঘাট ভাল ছিল, জেয়াদা মাশুল দিতে হত না পথে, ঘাটে, গুদামে। তখন সবাই অবাধে ব্যবসা করত। এখন সেদিন আর নেই। দিল্লীর বাদশা নখদন্তহীন বাঘ বললেই হয়। যে যে রাজ্যে যেমন খুশি মাশুল ধরে, ব্যবসায়ীর মরণ।'

'দিল্লীর বাদশার ক্ষমতা গেছে, আবার আরো কেউ আসবে যে সর্বত্র সুশাসন রাখবে। তখন না হয় ব্যবসায়ীর আরো বাড়বাড়ন্ত হবে। কিন্তু এখন কিছু কম নয়, আরো হবে, বৈশ্যযুগ, এ যুগে লক্ষ্মী বেনের ঘরে পুজো পাবেন।'

'তোমার কথা শুনে ঠাকুর মনটা আমার ভারী হল।'

'পাপ, পাপের ভরা পূর্ণ হলে এমন হয়। দেখ না মহাশয়, কোন দেশে ছিল বর্গী, এ দেশে এল, ফিরিঙ্গী বেটাদের দেশ কোথায়, এ দেশে ব্যবসা করতে এসেছে, লোভে লোভে মানুষ নিজের সর্বনাশ নিজে ডাকে।'

'জাতককে কি বলব ঠাকুর?'

'মুখে বলতে ভয় পান, কোষ্ঠী আপনাকে দিয়ে দেব, তিনি গণিয়ে নেবেন।'

'তোমার এ পাপটাপ, এ-সব কথা কি বুঝবে?'

'নিজে যা যা করেছে সেটিও লেখা আছে ওখানে। সেটি বুঝবে ত'? কিন্তু এখন বলুন ত' মশায়, এ বেটা গরীব বামুনের খোঁজ পড়েছিল কেন?'

বক্সীদেওয়ান সাগ্রহে বললেন, 'শুনবে ঠাকুর? আমরা ক'জনায় মিলে স্থির করি----'

'কি?'

'নবদ্বীপ মতই ত' সম্বল আমাদের। কিন্তু ইদানীং যাই বল, কয়েকটা ব্যাপারে দেখি, বেশ বড় বড় অমিল থেকে যাচ্ছে।'

'তা হতে পারে। রামরুদ্র, জ্যোতিষকুলে সত্যিই আচার্য ছিলেন। তাঁর বংশধররা হয়ত---'

'আমরা ক'জনা চেয়েছিলাম তোমাকে মাঝে রেখে আরো কিছু পণ্ডিত জ্যোতিষী আনাই। এই মুর্শিদাবাদ থেকে বর্ষফল গণনা, পঞ্জিকা গণনার বেশ একটা ব্যবস্থা করা যায়। ব্যয় নির্বাহ আমরাই করতাম---শুধু ধনে মান পাওয়া যায় না ঠাকুর, এতে সমাজে নাম হত আরো।'

'পয়সা দিলেই সব মেলে না মশায়। আপনি যা চাইছেন, আপনাদের তোষামোদ করে সদাই ভাল কথা কইবে, তেমন জ্যোতিষ এ শহরে অনেক আছে।'

'না ঠাকুর, আমি সে-কথা বলি নি।'

'কাগজপত্র আজই আপনাকে দিয়ে দেব সব।'

'তুমি কোথায় যাবে ঠাকুর?'

'স্ব-গ্রামে যাব।'

'বড় দুঃসময়, জানলে ঠাকুর?' বক্সীদেওয়ান আস্তে আস্তে বলেন, 'অনেকে ভগবানগোলা, মালদহ, দূরে দূরে পালিয়েছে। তুমি একা কোথায় যাবে, আমি বলি তুমি এখানেই থাক।'

'কেন, আপনি আমায় বিপদ থেকে বাঁচাবেন?'

'বাঁচাব বইকি।'

'স্বস্থানে এসে মশায়ের গলা খুলেছে দেখছি। বর্ধমান থেকে কাটোয়া আসতে একখণ্ড মিশ্রী অবধি জোটে নি জল খেতে। তখন গলার সুর অন্য রকম ছিল।'

বক্সীদেওয়ান হাসলেন। বললেন 'এবার আর ভুল হবে না সে রকম। নিজের বাড়িতে ঠাকুর, ঠাণ্ডাঘরে এলাহি বন্দোবস্ত রাখছি। বর্গীরা যদি ঘিরেও রাখে শহর, তবু অসুবিধে হবে না কিছু।'

তারপর হেসে বললেন, 'আগামী ষোল-সতেরো বছর দেশে অশান্তি থাকবে ওটা তুমি ঠাট্টা করেছ ঠাকুর। তা কখনো থাকতে পারে? আমাদের নবাব যুদ্ধে বড় দড়।'

স্বরকণ্ঠ হেসে বললেন, 'ভাল। কিন্তু ভাগ্যকে ত' চোখে দেখা যায় না মশায়, তার সঙ্গে কোন্ তরোয়াল দিয়ে লড়বেন?'

বক্সীদেওয়ান আবার হাসলেন। বললেন 'কাগজপত্র নিয়ে একবার অধীনের ঘরে এস ঠাকুর, তারপর যেখানে খুশি যেও।' (ক্রমশঃ)

● বাগবাজার স্ট্রীটের দৃশ্য

॥ বাগবাজারের নানা পরিচ্ছেদের বৃত্তান্ত ॥

অরণ্যযুগে একাঙ্গীভূত ছিল চিৎপুরের সঙ্গেই বাগবাজার। সুতরাং কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই তার তদানীন্তন ইতিবৃত্তেও। চিৎপুরের চিতে এবং তৎপ্রতিষ্ঠ চিত্তেশ্বরীর প্রচণ্ড প্রভাবের দিনে 'বাগবাজার' নামের কোনো উচ্চারণ ছিল—এমন প্রমাণ নেই কোনো গ্রন্থে। তদানীন্তন কাহিনী বা কিংবদন্তীর মধ্যেও প্রসঙ্গক্রমে কোনো উল্লেখ দেখা যায় না বাগবাজারের। অতএব বাগবাজার এবং চিৎপুর যে তখন অভিন্ন—এ-বিষয়ে আজ নিঃসন্দেহ হবার সুযোগ আছে যথেষ্ট।

সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর যবনিকা-প্রাপ্তির কাল যখন সমাগত প্রায়, তখনই বর্তমান বাগবাজারের সে-যুগের ভূমি-খণ্ড থেকে ধীরে ধীরে অপসারণ ঘটে অরণ্যের। বিনিময়ে সেখানে দেখা যায় বিক্ষিপ্ত বসতির উন্মেষ। হয়তো ভাগীরথী তখন পাশে বলেই জেলেদের তা স্বভাবজাত জীবিকার অনুকূল। তাই অরণ্যের হিংস্র স্বভাব অগ্রাহ্য ক'রে তারাই সে-স্থলে বসতির সূত্রপাত ঘটায় প্রথম। অবশ্য এই বসতি বিক্ষিপ্ত হলেও, অঞ্চলগত দিক থেকে কোনো স্বতন্ত্র নামের অধিকারী ছিল না। তা তখন সুতানুটীরই এক প্রান্তিক অঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে স্বাভাবিক-ভাবে।

তারপর সময়ের সেতুপথ থেকে অতীতের কালীদহে ঝাঁপ দেয় বছরের পর বছর। দেখতে দেখতে এক বিশেষ বৈচিত্র্যে আত্মপ্রকাশ করে অষ্টাদশ শতাব্দী। এই শতাব্দীতেই বিবর্তনের সাড়া পড়ে সমগ্র চিৎপুরে। পায়ে-পায়ে এগিয়ে আসে ভাগীরথী; অরণ্য নিজেকে গুটিয়ে নেয় সীমিত বৃত্তে; প্রাচীন বসতির পাশেই মুখর হয়ে ওঠে নবীন লোকালয় এবং অরণ্যের ঝরাপাতার পথ বেয়েই সশব্দে এগিয়ে আসে সভ্যতা।

আর পেরিন নামে একজন বিলাসী সাহেব—যিনি বাণিজ্যসূত্রে সপ্তদশ শতাব্দীর অন্তিমপর্ব থেকেই উপার্জন করতে সুরু করেন প্রভূত অর্থ, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনিও এক সুদৃশ্য উদ্যান প্রতিষ্ঠা করেন জেলে-বসতির পাশেই। সারা অঞ্চলকে প্রভাবান্বিত ক'রে, একটি রমণীয় বাংলো আত্মপ্রকাশ করে উদ্যানের অন্তর্সীমায়। সপরিবারে সেখানেই

শ্রীপদাতিক

বসবাস সুরু করেন পেরিন সাহেব। তিনি নিজেই তাঁর স্বরচিত উদ্যান-বাটীর নামকরণ করেন 'পেরিন্স গার্ডেন'। কিন্তু এ-দেশীয় জনসমাজের কাছে 'পেরিন্স গার্ডেনে'র পরিবর্তে প্রচলন ঘটে 'পেরিন-বাগ' নামের। এই পেরিন-বাগ বা পেরিন্স গার্ডেনের পাশে একটি বাজারেরও পত্তন ঘটে তখন এবং এখানেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অন্যতম লবণের গুদামটিও মাথা তুলে দাঁড়ায়। তখন স্বতন্ত্র কোনো নাম ছিল না বাজারের। যেহেতু পেরিন-বাগের পাশেই তার অবস্থান, সম্ভবত ঠিক সেহেতুই এ-দেশীয় জনসাধারণ তার নামকরণ করে 'বাগবাজার'। তারপর কালে কালে 'বাগবাজার' নামটিই প্রতিষ্ঠা লাভ করে স্থায়িভাবে এবং সে-নামেই শেষে এতদঞ্চলের বসতিও তার আপন পরিচিতির বিস্তার ঘটায় জনসমাজে।

অবশ্য নানাজনের ইদানীং অভিমত: 'বাগবাজার' নামের প্রচলন ছিল পেরিন্স গার্ডেন প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই। কিন্তু এই অভিমত সমর্থন করে না কোনো ইতিহাস। তা ছাড়া এই অভিমত যাঁরা কথায়-কথায় প্রকাশ ক'রে থাকেন, তাঁরা কেউ পুরাতাত্ত্বিক নন। এমন কি, পুরাতত্ত্বের প্রতি তাঁদের কোনো অনুরাগ আছে—এমন উদাহরণও দুর্লভ।

যাই হোক, গার্ডেন-প্রতিষ্ঠাতা সেই পেরিন সাহেবের চরিত্রে নাকি কোনো সংযম ছিল না। মদ-মাংসের সঙ্গে নিত্য-নতুন নারীযৌবনের প্রতি তাঁর লালসা ছিল অন্তহীন। ইংরেজ-রমণী তখন মুষ্টিমেয় বলেই সহজলভ্য নয়। সুতরাং তিনি জন-কয়েক দালালের মাধ্যমে প্রায় প্রত্যহই নাকি একটি ক'রে আমদানী করতেন এ-দেশীয় অবুঝ বালিকা। তিনি একজনকে একবারমাত্র ভোগ ক'রে ছেড়ে দিতেন। তারপর সে-মেয়ের যৌবন নিয়ে পারিষদের দল নাকি কাড়াকাড়ি করতো শকুনের মতো সারারাত। এভাবেই অত্যাচারের ফলে, রাতের পর রাত এক-একটি অসহায় বালিকার আর্তনাদ

জারি ক'রে তুলতো পেরিন্স গার্ডেনের অন্ধকার। সে-আর্তনাদে রাতের বাগানে ফুল ফোটার অলক্ষ্য লগ্নও নাকি পিছিয়ে যেতো অন্ধকারে মুখ লুকিয়েই।

শোনা যায়: একবার এমনই একটি বালিকা সাহেবের পারিষদবর্গের সারা-রাতের অত্যাচারে বরণ করে মৃত্যু। মৃত্যুর পর তার শবদেহকে নিক্ষেপ করা হয় জঙ্গলে। তারপর যেভাবেই হোক, খবর আসে মৃতার পিতার কাছে। পিতা তার মৃতা কন্যার শবদেহের সন্ধানে জঙ্গলে প্রবেশ করে পরদিন দিনের আলোয়। কিন্তু অনেক অনুসন্ধানের পর সে কেবল খুঁজে পায় কন্যার রক্তাক্ত কঙ্কাল। সম্ভবত জঙ্গলের কোনো মাংসাশী জানোয়ারই ভক্ষণ করেছে তার সমস্ত মাংস। সুতরাং শোকে এবং ক্রোধে অস্থির-চিত্ত পিতা কন্যার সেই কঙ্কালই কুড়িয়ে নিয়ে আসে গৃহে এবং পরদিন বস্তাবন্দী সেই কঙ্কাল নিয়েই রওয়ানা হয় মুর্শিদাবাদের উদ্দেশে।

মুর্শিদাবাদে পৌঁছেই সে নবাব আলিবর্দীর দরবারে অভিযোগ পেশ করে পেরিন সাহেবের বিরুদ্ধে এবং অভিযোগের অনন্ত সাক্ষ্যরূপে খুলে ধরে মৃতা কন্যার কঙ্কাল। আলিবর্দীর পাশে ছিলেন তখন দৌহিত্র সিরাজ। তিনি অভিযোগকারীর করুণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করার পর কঙ্কাল দর্শন করেই শিউরে ওঠেন এবং তৎক্ষণাৎ তার একটা প্রতিবিধান করার জন্য অত্যন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বার বার অনুরোধ করেন দাদুকে।

আলিবর্দী অভিযোগের স্বপক্ষে প্রথমত তদন্তের প্রয়োজনেই একজন অমাত্য প্রেরণ করেন কলকাতায়। কিন্তু সেই অমাত্য পেরিন সাহেবের কাছে গ্রহণ করেন উৎকোচ। তারপর মুর্শিদাবাদে ফিরে এসে আলিবর্দী সমীপে বর্ণনা করেন: অভিযোগকারীর কন্যার মৃত্যুর সঙ্গে পেরিন সাহেবের কোনো সম্পর্ক নেই। কন্যাকে তার নিধন করেছে বাঘে—যখন অপরাহ্নে সে কাঠ কুড়োতে গিয়েছিল জঙ্গলের ধারে।

সুতরাং আলিবর্দী আর অগ্রসর হতে চাইলেন না। তিনি তাঁর সেই উৎকোচগ্রহণকারী অমাত্যকেই বিশ্বাস করলেন সরলভাবে। কেবল বিশ্বাস করতে পারলেন না তরুণ সিরাজ। তাঁর দৃঢ় ধারণা: অভিযোগকারীর আনুপূর্বিক বৃত্তান্তে সত্যের অপলাপ নেই কোথাও। অতএব তিনি আর প্রকাশ্যে সেদিন কিছু না বললেও, মনে মনে সেই পেরিন সাহেব এবং সেই সঙ্গে কলকাতায় অধিবাসকারী তার প্রতিটি জাত-ভাইকেই সমুচিত শিক্ষাদানের নিমিত্ত প্রতীক্ষায় রইলেন সুযোগের।

সুযোগ অবশ্য অচিরেই জুটে গেল। অর্থাৎ কিছুদিনের মধ্যেই নবাবরূপে মসনদে আরোহণ করলেন তরুণ সিরাজ। তারপর কাশিমবাজার অধিকার করেই তিনি সসৈন্যে ছুটে এলেন কলকাতায়। চিৎপুরের পথে কলকাতায় প্রবেশ করতে গিয়ে প্রথমেই তিনি ধ্বংস করলেন পেরিন্স গার্ডেন। একটি মাত্র তোপের আঘাতেই শূন্যে মিলিয়ে গেল গার্ডেনের সুদৃশ্য বাংলো এবং সেই সঙ্গে সম্ভবত পেরিন সাহেব নিজেও।

তারপরের ইতিহাস সহজ। তরুণ নবাব কলকাতা অধিকার ক'রে বিজয়ীর বেশে মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তন করলেও পরের বছরেই তিনি শহীদ হন পলাশীতে। ফলে সারা কলকাতা আবার শাসনাধীনে আসে ইংরেজের। সুতরাং ইংরেজ এবার নিজ-স্বার্থেই উন্নয়ন সুরু করে কলকাতার। কোঠাবাড়ির বিপুল সমারোহে প্রচণ্ড বৈচিত্র্য ফোটে লালদীঘি অঞ্চলে এবং সঙ্গে সঙ্গে চিৎপুর থেকেও সমূলে অপসারণ সুরু হয় অরণ্যের। দেখতে দেখতে কুমারটুলি থেকে বাগবাজার পর্যন্ত বসতির রূপান্তর ঘটে এ-দেশীয় বিত্তশালী সমাজের সমাগম হেতু। এ-সমস্ত বিত্তশালীর মধ্যে এতদঞ্চলে মিত্রবংশেরই অধিষ্ঠান ঘটে প্রথম। তারপর তাঁদেরই আনুকূল্যে আবির্ভাব ঘটে অন্যান্যদের এবং এই নবাগতদের সুরুচির স্বপক্ষেই কুমারটুলি থেকে বাগবাজার পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ করে শহরের পরিবেশ।

একদিকে কুমারটুলি, আরেক দিকে বাগবাজার। মধ্যে মদনমোহনতলা। এখানেই দ্বিতল মন্দিরে সগৌরবে অধিষ্ঠিত মিত্রবংশের মদনমোহন বিগ্রহ। এ-সম্পর্কে কুমারটুলি সংক্রান্ত নিবন্ধে একবার আলোচনা হলেও, বাগবাজার সংক্রান্ত নিবন্ধেও তার

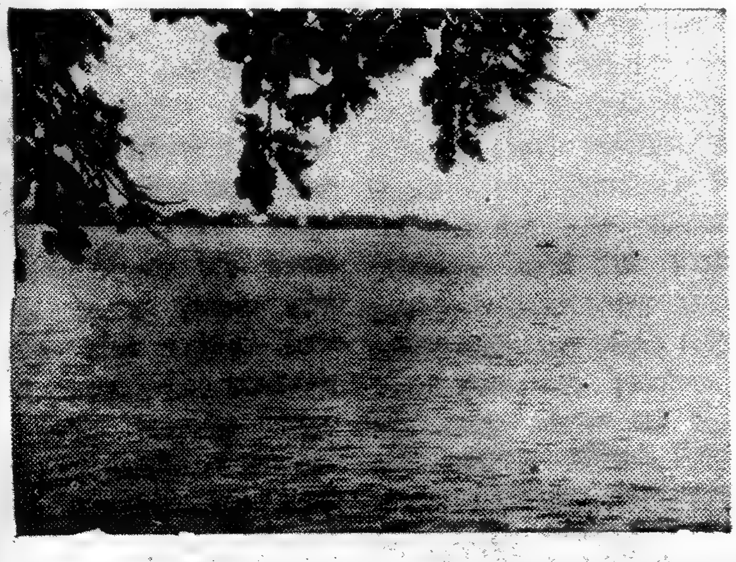

● বাগবাজার হ'তে গঙ্গার দৃশ্য

উল্লেখ এসে পড়ে স্বাভাবিকভাবে। কারণ মদনমোহনতলা এককালে ছিল কুমারটুলিরই অঙ্গ-বিশেষ, কিন্তু বর্তমানে পৌরসভার প্রচেষ্টাতেই তা অন্তর্গত হয়েছে বাগবাজারের। সম্ভবত সে-কারণেই আজ অঞ্চলগত দিক থেকে বাগবাজারের মর্যাদা বেড়েছে আগের তুলনায় অনেক বেশি। মদনমোহনতলার মদনমোহনই বাগবাজারের সমাজ-জীবনে রচনা করেছে আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল।

কুমারটুলি সংক্রান্ত নিবন্ধেই উল্লেখ করা হয়েছে: মদনমোহনের পূর্বাধিষ্ঠান ছিল বিষ্ণুপুরের রাজগৃহে। এ-সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদন্তী এই: বিষ্ণুপুররাজ গোপাল সিংহ একবার মিত্রবংশের গোকুল মিত্রের কাছ থেকে গ্রহণ করেন এক লক্ষ টাকা এবং বিনিময়ে তাঁর কাছে বন্ধক রাখেন মদনমোহনের সোনার বিগ্রহ। তারপর বেশ কিছুকাল পর এক লক্ষ টাকা আবার গোকুল মিত্রকে ফেরৎ দিয়ে গোপাল সিংহ যখন ফিরিয়ে চান তাঁর মদনমোহন, তখন গোকুল মিত্র নাকি বলেন: বিগ্রহ তিনি বন্ধক নেন নি, ক্রয় করেছেন এক লক্ষ টাকায়। সুতরাং তাঁর পক্ষে তা বিষ্ণুপুররাজকে আর প্রত্যর্পণ করা সম্ভব নয়।

সে-ই থেকে মিত্রবংশের আরাধ্য দেবতারূপে মিত্র-মন্দিরেই বিরাজ করছেন মদনমোহন। বিষ্ণুপুররাজ গোপাল সিংহ, গোকুল মিত্র এবং সর্বোপরি মদনমোহনকে কেন্দ্র ক'রে সেকালেই উৎপত্তি ঘটেছিল যে-সমস্ত ছড়া বা লোকগাথার—তা বিক্ষিপ্ত-ভাবে একালেও ছড়িয়ে আছে বাগবাজারে। তার কয়েক ছত্র এই:

'সুবুদ্ধি রাজার কুবুদ্ধি ঘটিল।
সোনার মদনমোহন বাঁধা দিয়ে গেল॥
বাগবাজারে এসে ঠাকুর রহিলেন ব'সে।
বিষ্ণুপুরের শ্রীমন্দিরের পাথর পড়ে খ'সে॥
রাজা কাঁদেন, রাণী কাঁদেন,
কাঁদে প্রজাগণ।
পূজারী ব্রাহ্মণ কাঁদেন হয়ে অচেতন॥
হাতিশালের হাতি কাঁদে ঘোড়ায় না
খায় পানি।
বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদেন গোপাল
সিংহের রাণী॥
রাজা ডাকে গোকুল মিত্র শুনহে বচন।
টাকা লয়ে দেও আমার মদনমোহন॥
মিত্র বলে মহারাজ কোয়ালা দেখ আছে।
বন্ধক নয়, মদনমোহন বিক্রি
হয়ে গেছে॥'

উনবিংশ শতাব্দীতে বাগবাজার তার গৌরবের বিকাশপ্রাপ্তি ঘটায় আরও। এই শতকেই এখানে এসে বসতি স্থাপন করেন সর্বযুগের স্মরণীয় নাট্যকার গিরিশ ঘোষ, যাঁর বৈঠকখানায় প্রায় প্রাত্যহিক মজলিশেই এসে মিলিত হতেন বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ মনীষিবৃন্দ। তারপর বাগবাজারে আরেকটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন মহাত্মা শিশির-কুমার এবং পশুপতি বোস। সংস্কৃতি, সংবাদ এবং সাহিত্য সেবায় আত্ম-নিবেদনের অক্লান্ত চরিত্ররূপে বলিষ্ঠ উদাহরণ শিশিরকুমার। আর সমাজ সেবাতে তদানীন্তন কালে বিদ্যাসাগরের সার্থক অনুসারী পশুপতি বোস। আজও বাগবাজারের শীর্ষদেশে মুখরিত যাবতীয় কীর্তি শিশিরকুমারের, এবং অন্য দিকে উনবিংশ শতাব্দীর মৌন সাক্ষীরূপেই দাঁড়িয়ে আছে পশুপতি বোসের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা।

নটগুরু গিরিশ ঘোষ যে-অংশে বসবাস করতেন, আজ সে-অংশেই গিরিশ ঘোষ এভিনিউ নামে উদ্ভব ঘটেছে একটি অনুপম সরণীর। তার উভয় বাহুতেই সমাহৃত আধুনিক বিত্তবানদের বসতবাটি। আর রাস্তার প্রায় মধ্যভাগেই অবস্থিত গিরিশ ঘোষ স্মৃতিমন্দির—আজ থেকে মাত্র বছর-কয়েক আগে যা প্রতিষ্ঠা করেছেন পৌরসভার সহযোগে ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট। যদিও আজ তা বিংশ শতাব্দীর কীর্তিরূপে খুব একটা অসাধারণ আকৃতি নয়, তবু ঐতিহ্যগত দিক থেকে মূল্য তার অপরিমেয় বললেও অতিশয়োক্তি হয় না। এই নাতিবৃহৎ ভবনটির ধূসর দেয়ালে দৃষ্টি-বিচ্ছুরণ ঘটলেই অনুভব করা যায় উনবিংশ শতাব্দীর সেই মহিমান্বিত মুখর অধ্যায়।

আজ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে বাগবাজারের চতুঃপ্রান্তিক রেখায় আরও অনেক বিবর্তনের সূত্রপাত ঘটেছে পরিবেশগত দিক থেকে। এ-বিবর্তন অংশ-বিশেষে মনোহর এবং অংশ-বিশেষে স্বাস্থ্য-পরাঙ্মুখ হলেও গতি তার বর্ধিষ্ণু। অতএব আশা করা যায়: রুচিবান এবং আদর্শবান পৌরজনের শুভ প্রচেষ্টাই চারদিকে আরও বাহু বিস্তার ঘটাবে বাগবাজারের। তখন নিছক ঐতিহ্যের ডাল ধ'রে কুৎসিত বাদুড়ের মতো আর দোল খাবে না পুরাতন; নতুনের পল্লবঘন শাখায় সানন্দেই সে অবস্থান করবে স্মৃতির হংসদূত হয়ে।

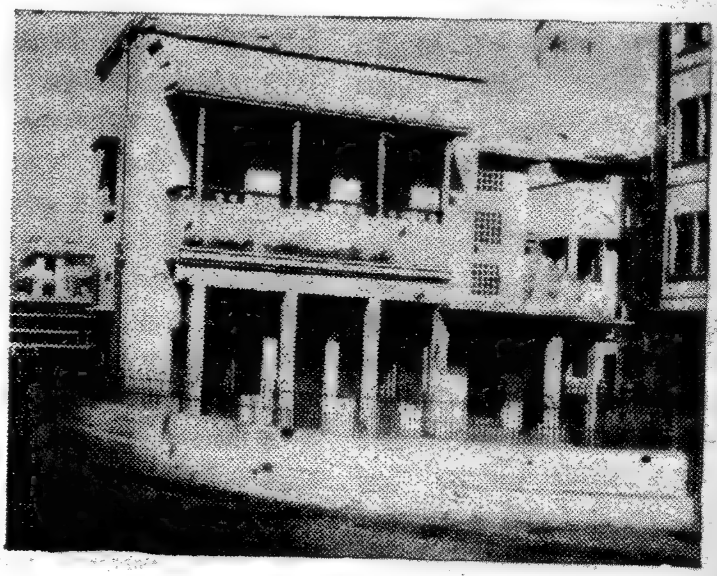

● গিরিশ ঘোষের বাড়ি

ধনপতি সওদাগর

বানিজ্য সেকাল ও একাল

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ উনত্রিংশ প্রবাহ ॥

সপ্তগ্রাম।

তাম্রলিপ্ত। আর —

হিজলীর মতই মোগল আমলের আর এক বিখ্যাত বন্দর খেজুরী। আজ কালের স্রোতে কোথায় অবলুপ্ত হয়ে গেছে এইসব ধনে-জনে সমৃদ্ধ ব্যবসাকেন্দ্র। কিন্তু শত শত শতাব্দী পূর্বে এই সব বন্দরে বাঙালীর পণ্যসম্ভার নিয়ে আসতো দূরদেশের সমুদ্রগামী জাহাজ। বাঙালী সওদাগররা একদিন এইখানে এসে তাদের পণ্য বিক্রয় করে কিছু অর্থ রোজগার করে খুশির পুলকে গৃহাভিমুখে চলে যেতেন। আজো খেজুরীর বাতাসে বাঙালী বণিকদের কত অস্ফুট কলোল্লাস আড়ষ্ট হয়ে রয়েছে।

ইতিহাসকার লিখেছেন: '১৬৭২ খৃস্টাব্দে সর্বপ্রথম হিজলী পর্যন্ত বড় জাহাজ আসিতে আরম্ভ করে। ইহার পূর্বে বালেশ্বর পর্যন্ত জাহাজ আসিতে পারিত। কারণ, তখন এদিকে জাহাজের গমনাগমনের পথ বা হাল চিহ্নিত হইয়া pilot's establishment অথবা চরবহুল নদীমুখে জাহাজ পরিচালনকারী নাবিক সঙ্ঘ গঠিত হয় নাই। ছোট ছোট 'স্লুপ' নামক জাহাজ বালেশ্বর হইতে কলিকাতাদি বন্দরে প্রেরিত হইত। এইরূপ জাহাজের গতায়াতের ও নানা দেশীয় বণিকগণের সমাবেশের জন্য খেজুরী একটি সমৃদ্ধিশালী বন্দরে পরিণত হয়।'

খেজুরী বন্দরের প্রধান পণ্য ছিল হৈমন্তিক ধান্য। সোনার ধানে সেদিন বাঙালীর ঐশ্বর্যলক্ষ্মীর প্রসন্ন আশীর্বাদ দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তো। দূর দূর পল্লী অঞ্চল থেকে গরুর গাড়িতে ধান বোঝাই করে এসে পৌঁছাতো খেজুরীর বন্দরে। দূর থেকে সেই গোযানের দীর্ঘ শোভাযাত্রার দিকে তাকিয়ে মনে হতো যেন বিশাল সোনার স্তূপ বহন করে নিয়ে চলেছে।

ধান এলেই সুরু হতো জাহাজ বোঝাইয়ের কাজ। শত শত বাঙালী কুলির কর্মব্যস্ততায় মুখর হয়ে উঠতো খেজুরী বন্দর। তারপরে একদিন এইসব দূরসমুদ্রগামী জাহাজ নোঙর তুলতো আর হুগলীনদীর জল কেটে কেটে যেত সমুদ্রের দিকে।

খেজুরী বন্দরই শুধু বিখ্যাত ছিল না। খ্যাতি ছিল এই খেজুরীর উর্বরা মাটিরও। খেজুরীর মাখনের মত নরম মাটিতে ফলতো অঢেল ফল—তরমুজ, ফুটি, কুমড়ো আর উচ্ছে। শুধু তরকারি বিক্রি করেই বাঙালী বণিকরা যথেষ্ট রোজগার করতেন। শুধু খেজুরী নয়—নিজকসবা, মেহদিনগর প্রভৃতি গ্রাম

ধনে-জনে-পণ্যে খুবই সমৃদ্ধ ছিল। এই মেহদিনগরের বাঁশের ও বেতের তৈরি জিনিস একদিন দূর বিদেশে রপ্তানী হয়ে যেত। আজ কোথায়—কতদূরে সেই খেজুরী আর মেহদিনগর—শুধু—

শুধু ইতিহাসের পাতায় খেজুরীর সমৃদ্ধির ইতিবৃত্ত আজও বেঁচে আছে। কিন্তু খেজুরী নেই, নেই মেহদিনগর। যেমন নেই মার্কো পোলো বর্ণিত সেই সোনার গাঁ। পৃথিবী বিখ্যাত ভ্রমণকারী লিখেছেন: 'সোনার গাঁও সূক্ষ্ম মসলিনের জন্য বিখ্যাত ছিল। এখানে সূক্ষ্মবস্ত্রের উপযোগী সূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুত হইত। তিতবাদী লক্ষীয়া নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে উত্তম কার্পাস উৎপন্ন হইত বলিয়া এই স্থানকে বলিত কাপাসিয়া।'

মার্কো পোলোর ভ্রমণকাহিনীর ভেতরে মোগলযুগের বাংলার এক সুখী ও সম্পন্ন ছবি ফুটে ওঠে। ব্রহ্মপুত্র আর মেঘনা বিশাল দুটো নদী। ঝুপঝুপ শব্দে পাড় ভাঙছে। তাদের ঢেউয়ে ঢেউয়ে দূর সমুদ্রের গর্জন শোনা যাচ্ছে। ঢেউয়ের মাথায় মাথায় সাদা মল্লিকা ফুলের মত ভাসছে সাদা সাদা ফেনা।

এই নদী ব্রহ্মপুত্র আর মেঘনা ছিল সেই অবিভক্ত বাংলার জীবনসরণি। এই নদীর বন্যা দুই পাড়ে উর্বর পলিমাটি রচনা করতো। সেই মাটিতে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠতো একেবারে সুদূর দিগন্ত পর্যন্ত সবুজ ফসলের আশীর্বাদ।

এই দুই নদীর এপার-ওপার দেখা যেত না। ওপারের সুদূর দিগন্ত-রেখাকে আবছায়া কুয়াশাময় অস্পষ্ট একটা ছবির মত মনে হতো। কিন্তু ওপারের কাজলকালো দিগন্তের ভেতরেই জবুথবু হয়ে থাকতো জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। মার্কো পোলের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের ভেতরে আছে: 'ব্রহ্মপুত্র আর মেঘনা ও তাহার শাখানদীগুলির ধারে ধারে যে তুলা উৎপন্ন হইত, সেইরূপ দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলা—সূক্ষ্ম আর কোমল তুলা জগতের কোথাও হইত না।'

শুধু তাই নয়। বিদেশী ভ্রমণ-কারীর বিবরণে আরও আছে: 'ইক্ষু, গম, তিল, চিনি, সর্ষপ ও নানা-জাতীয় কলাই, কদলী প্রভৃতি অপর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। নারিকেল ও তণ্ডুলজাত মদ্য, পাঁচ ছয় প্রকার মসলিন, রেশমী রুমাল

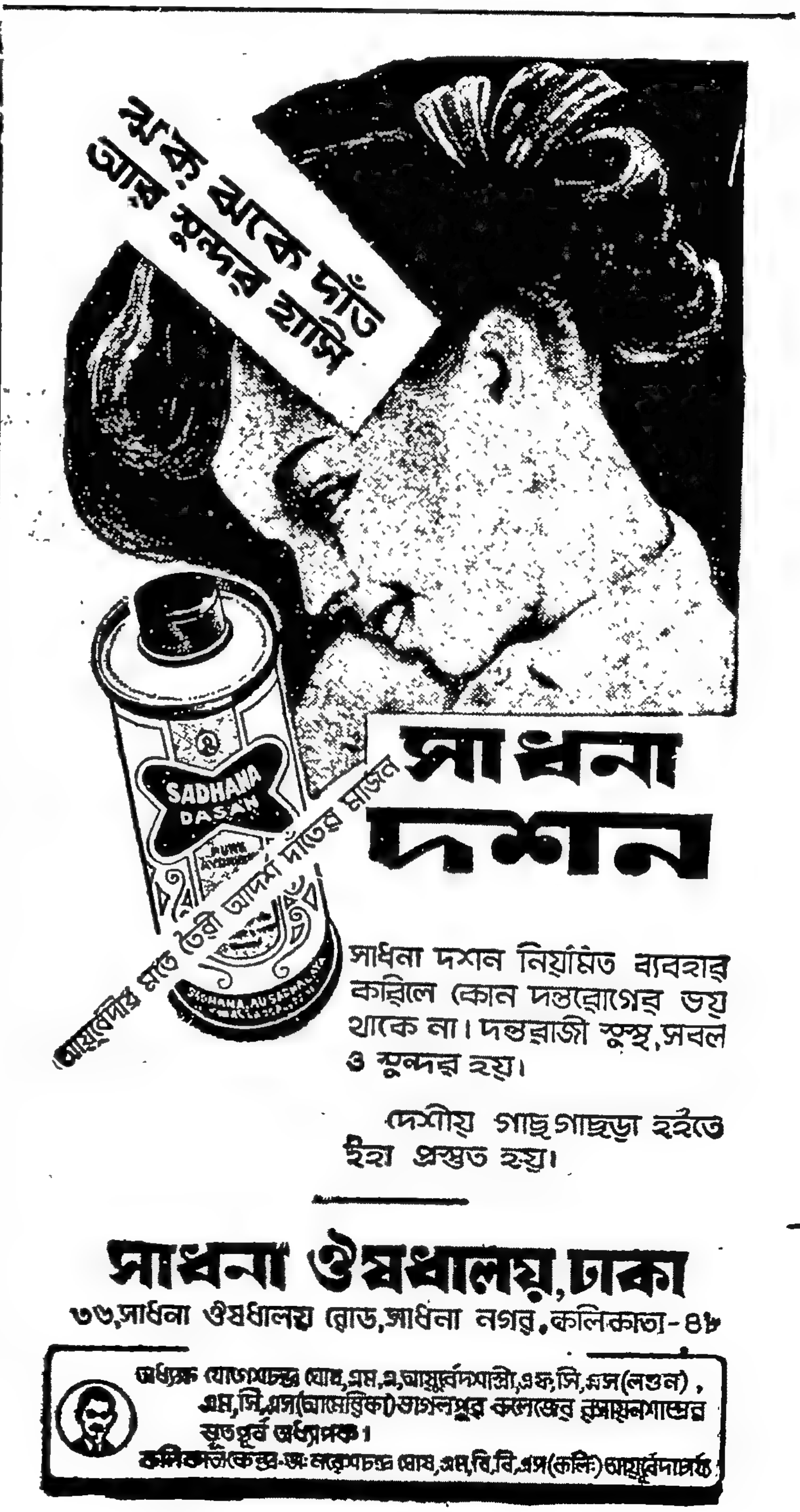

সোনালি কাজ করা টুপী, চিত্রিত মাটির বাসন, গামলা, পাত্র, দার লৌহ, বন্দুক, ছুরি, কাঁচি, বৃক্ষজাত ত্বক। মৃগচর্মের মত এক প্রকার কাগজ এদেশে বিস্তর পাওয়া যায়। বাংলার গাড়ির বলদ যেন এক একটা হাতী। এদেশে মৎস্য, মাংস, ঘৃত, চাউল, গম ও চিনি প্রচুর পাওয়া যায়।'

আর আছে বাঙালী মহিলাদের বস্ত্রবয়নে অসাধারণ দক্ষতার ইতিবৃত্ত। তারা ক্ষিপ্রবেগে চম্পক অঙ্গুলি বিন্যাসে সুতো প্রস্তুত করতেন। বিচিত্র একটা কাহিনী মনের ভেতরে গুঞ্জন করে ওঠে।

ঢাকা অঞ্চলের হিন্দু মহিলাদের এই বিচিত্র নিপুণতার কথা বিশ্বাস করতেন না তদানীন্তন কালের বাংলার সুবেদার। একদিন তিনি সাধারণ এক দরিদ্র গ্রামবাসীর ছদ্মবেশে এলেন লক্ষীয়া নদীর তীরবর্তী তিতবাদী গ্রামে। ঘরে ঘরে মেয়েরা সুতো কাটছে। বাইরে সোনার রোদ সিল্কের ওড়নার মত ছড়িয়ে পড়েছে মাঠে মাঠে। কিন্তু এ কী!

রোমাঞ্চ-রহস্য গ্রন্থ

রক্তনদীর ধারা

ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল

রক্তনদীর ধারা মাসিক বসুমতীর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। রোমান্স ও রোমাঞ্চের সত্য ঘটনায় বইটির আদ্যোপান্ত পরিপূর্ণ। রক্তনদীর ধারা জীবনের অভিজ্ঞতা নয়; জীবনপথের দিক-নির্দেশ। তাই প্রবঞ্চনা; ছলনা ও প্রেমের লীলার চাঞ্চল্যকর বইটি চাঞ্চল্য তুলেছে সকল সমাজেই। লোমহর্ষক সামাজিক কাহিনী।

দাম চার টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

তাকে থমকে দাঁড়াতে হলো। বিশাল মাঠে কাঠি পুঁতে পুঁতে তার মাথায় মাথায় সুতো বেঁধে দিয়ে রোদে শুকোতে দেওয়া হয়েছে। যতদূর দেখা যায়, মাঠের শেষপ্রান্তে বনদেহের সবুজের ভেতরে যেন উধাও হয়ে গেছে সেই কাঠির মাথায় বাঁধা সুতো। তাঁর মনে এল কৌতূহল। কতদূর—আর কতদূর চলে গেছে এক একটা সুতো।

এই সুতোকে অনুসরণ করে তিনি সমান্তরালে চলতে সুরু করলেন। আকাশের নাবালক সূর্য সাবালক হলো। মাঠে মাঠে তাপ ছড়িয়ে পড়ল। তার মাথার চাঁদি ফেটে যাচ্ছে। তিনি দ্রুত পায়ে হেঁটে চলেছেন। পথ আর ফুরোয় না। ফুরোয় না সুতো। মাঠের মত সুতোও কি অন্তহীন।

সুবেদার ভাবেন। আর অদ্ভুত একটা নেশায় পথ চলেছেন। মাঠ ছাড়িয়ে বড় সড়ক পাওয়া গেল। কাঁচা মাটির রাস্তা। বেশ উঁচু আর চওড়া। এই রাস্তার পাশে পাশে সেই সুতোও চলেছে। তিনিও হাঁটছেন। মনের ভেতরেও একটা জেদ আগুনের মত ধিকিধিকি জ্বলছে। দেখতে হবে—দেখতে হবে কতদূর দীর্ঘ এই সুক্ষ্ম সুতো? তাঁর কপাল বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। চোখে ক্লান্তির ছাপ পড়েছে। আর কতদূরে যাবেন?

এক গ্রামবৃদ্ধের চোখে হাসি ঝিকমিক করছে। আর লক্ষ্য করলে বুঝতে পারা যায়, একটা চাপা গর্বের দীপ্তিতে মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

—যা শুনেছি তাই সত্যি?

ছদ্মবেশী সুবেদারের গলার স্বর শোনা যায় না। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে। গ্রামবৃদ্ধের মনেও কেন যেন তার জন্য করুণা হয়। কথা বলে না। কিন্তু কোমল আর অদ্ভুত একটা স্নিগ্ধ দৃষ্টি মেলে ধরে তাকিয়ে থাকে সুবেদারের অবিশ্বাসী চোখের দিকে।

—অমন করে কি দেখছেন?

—কিছু না।

সুবেদার আবার চলতে সুরু করতেই বাধা।

গম্ভীর গলায় ডাকলেন—শুনুন—ঘুরে দাঁড়ালেন সুবেদার। গ্রামবৃদ্ধের মুখখানায় কেমন বিষাদের ছায়া পড়েছে। গাম্ভীর্যে থমথম করছে চোখ দুটো। একটু অবাক হলেন বাংলার দণ্ডমুণ্ডের মালিক। বুকের ভেতরে একটা অস্বস্তির কাঁটাও কি বিঁধছে? ও কি তাকে চিনতে পেরেছে?

কি বলছেন?

—আপনাকে চিনতে পেরেছি।

—কি বলছেন পাগলের প্রলাপের মত যা-তা—

অবিশ্বাসের হাসি হাসল গ্রামবৃদ্ধ। বলল, পোষাকটা পাল্টেছেন। কিন্তু হাতের হীরার আংটিটা খুলতে ভুলে গেছেন। আমরা যে জানি—ওই মূল্যবান হীরের আংটি একমাত্র আমাদের সুবেদারেরই আছে। আর—

হঠাৎ চুপ করে গেলেন বৃদ্ধ। সংকোচ আর ভয়ের ছাপ পড়ল তার চোখে। কাকে কি বলছি। যদি এই মুহূর্তে ফাঁসীর হুকুম জারী করে দেয়।

—থামলেন কেন—কি বলছিলেন?

তবুও কথা বলে না তিতবাদী গ্রামের প্রধান সেই বৃদ্ধ।

—বলুন না। কোন ভয় নেই—

এবার সাহস সঞ্চয় করে বলেই ফেলল। বলল—আমরা জানি, হিন্দু মেয়েদের সুতো তৈরির অদ্ভুত ক্ষমতার কথা বিশ্বাস করেন না। এই যে সুতো দেখছেন—এটা কতদূর চলে গেছে জানেন?

—কদ্দূর?

—একশো পঁচিশ ক্রোশ।

স্তব্ধ হয়ে গেলেন অবিশ্বাসী সুবেদার। তাঁর বিস্ময়কে আবার চমকে দিয়ে বললেন গ্রামবৃদ্ধ—মাত্র আধ সের তুলো থেকে তৈরি হয়েছে এই সুতো বুঝতে পেরেছেন?

(ক্রমশঃ)

চতুর্থ অধ্যায়

[দশ]

আমহার্স্ট স্ট্রীট রহস্য

১৮৬৮ সালের ১লা এপ্রিল, রাত দুটো। একটা দেশী কনস্টেবলের আমহার্স্ট স্ট্রীটে তখন পাহারা দেবার পালা। এই উপলক্ষে সে নানা গলি-ঘুঁজির মধ্যেও দেখে বেড়াচ্ছিল, কিন্তু কোথাও অস্বাভাবিক কোনো কিছুই তার নজরে আসে নি। সে তার শেষ সীমা অবধি ঘুরে ঘুরে যখন ফিরে আসছিল, তখন সে তার 'বুলস আই' লণ্ঠনের সাহায্যে দেখতে পেল বড় রাস্তার উপরে স্ত্রীলোকের কাপড়ের একটি বোঝা পড়ে আছে। এটি দেখল সে পথের পশ্চিম ধারে। কাছে এসে দেখল কাপড়ের বাণ্ডিলের মধ্যে একটি দেশী স্ত্রীলোকের মৃতদেহ। তার বাঁ হাতখানা বাঁ কোমরের নিচে চাপা, আর ডানহাতখানা মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় ডানধারের কানের কাছে উঠে আছে। তার গলায় গভীর কাটা চিহ্ন, তা থেকে প্রচুর রক্তপাত হয়েছে, আর সে রক্ত পথের উপরে যেখানে দেহটি পড়ে আছে সেইখানেই জমে আছে। কনস্টেবলের বীটের শেষ প্রান্ত থেকে ফিরতে মাত্র একঘণ্টা সময় লেগেছে, এরই মধ্যে এই কাণ্ড। স্ত্রীলোকটির পরনে একখানা শাড়ী, তারই একপ্রান্ত গায়ে জড়ানো, গায়ে একটি বডিস মাত্র। শাড়ী ঘাড়ের কাছে বেশি পাকিয়ে গেছে এবং তার একটা অংশ কাটা জায়গার ভিতরে ঢুকে গেছে। মাথার বাঁ পাশ থেকে একহাত দূরে একখানা ছুরি পড়ে আছে। এ ছুরি বিশেষ ভাবে নাবিকেরা ব্যবহার করে। এই ছুরির হাতলটা ছিল ঘাড়ের দিকে ফেরানো এবং তার ফলায় যে রক্ত ছিল তা শুকনো। দেহটি যেখানে পাওয়া গেল তার সামান্য দূরে পশ্চিমদিকে খানিকটা রক্ত দেখা গেল, রক্ত যেটুকু জায়গা জুড়ে ছিল সে জায়গার মাঝখানের রক্ত তখনও তরল ছিল, ধারগুলো শুকিয়ে গিয়েছিল। দেহের উত্তরদিকে ছ'সাত পা তফাতে নানা স্থানে রক্তচিহ্ন দেখা গেল, তাদের আকার একটাকা পরিমাণ থেকে এক সিকি পরিমাণ। কিন্তু এই রক্তচিহ্ন এবং ঐ দেহের মধ্যবর্তী স্থানে কোনো রক্ত দেখা গেল না। পায়ে কোনো জুতো ছিল না, অথচ মাটির দাগ বা ধুলোও ছিল না। তাতে বোঝা যায় মৃত্যুর আগে সে পথে হাঁটে নি। পায়ের নানা চিহ্ন দেখে মনে হল জুতো পরা অভ্যাস ছিল। অথচ দেহের কাছাকাছি কোথাও জুতো পড়ে থাকতে দেখা

গেল না। বডিস ছোট ছোট হুক দিয়ে বুকের কাছে আঁটা, এবং রক্তচিহ্ন বাদে বডিসটি পরিষ্কার, মনে হয় নতুন ধোয়া। বিপরীত দিকে পথের অপর পাশে গ্যাসের আলো জ্বলছিল। রাত দুটো এবং তিনটের মধ্যে কনস্টেবল সে পথে যাতায়াত করেছে, কিন্তু কোনো চিৎকার বা গাড়ি চলার শব্দ শুনতে পায় নি। সে অন্য একজন কনস্টেবলের জিম্মায় দেহটি রেখে বীটের কনস্টেবল থানায় গেল দারোগাকে জানাতে। তখন রাত সাড়ে তিনটে। আমহার্স্ট স্ট্রীটের ট্রিনিটি গীর্জার ঘড়িতে যখন চারটে বাজছে সেই সময় ইনস্পেক্টর সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। পরীক্ষা করতে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন মাটিতে যে রক্ত পড়েছিল তার উপর তিনটি আঙুলের চিহ্ন শুকিয়ে আছে, কিন্তু ধস্তাধস্তির কোনো চিহ্ন নেই। দেহের প্রায় পঁচিশ পা তফাতে একখানা রুমাল পাওয়া গেল। সেখানা ব্যবহৃত রুমাল, নতুন ধোয়া নয়। তার একটা কোণ পাকানো। মনে হয় তাতে চাবি বাঁধা আছে। সেটা খুলে চাবি পাওয়া গেল। হাত-পা ঠাণ্ডা হলেও নড়ানো যায়, শক্ত হয়ে যায় নি তখনও। কানে এক জোড়া সোনার ইয়ার-রিং, হাতে বিয়ের আংটি দেখা গেল। বোঝা যায় স্ত্রীলোকটি খ্রীস্টিয়ান, এবং বিবাহিত। আর দেখা গেল প্রবালের নেকলেস। এটি গলায় দুই পাকে জড়ানো ছিল, কিন্তু তার একটি পাক ছুরির আঘাতে ছিঁড়ে গেছে, এবং একটি অংশ গলার কাটা অংশে ঢুকে গেছে। সকাল ৭টার সময় দেহটিকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মড়া-ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে মোট চারদিন রাখা সত্ত্বেও কেউ তাকে সনাক্ত করতে পারল না। ইতিমধ্যে দেহে পচনক্রিয়া সুরু হয়ে গেছে। কাজেই দেহটিকে কবর দেওয়ার আদেশ দেওয়া হল। অবশ্য ২রা এপ্রিল তারিখে বোর্ন স্যাচে অ্যাণ্ড ওয়েস্টফিল্ড কর্তৃক দেহটির ফোটোগ্রাফ তুলিয়ে রাখা হয়েছিল, সেই ফোটোগ্রাফের কপি শহরে ও শহরতলীতে প্রচারের ব্যবস্থা করা হল।

পুলিস সার্জন মেডিক্যাল কলেজে মরণোত্তর পরীক্ষার এই বিষয়গুলি জানতে পারলেন।—ছুরির আঘাত বাঁদিকের চোয়ালের নিচে থেকে গলা কেটে ডানধার পর্যন্ত চলে গিয়েছে এবং সেদিকেও ঠিক চোয়ালের কোণের নিচে গিয়ে শেষ হয়েছে। কণ্ঠের উপরের কার্টিলেজ বা কোমলাস্থি কেটে গেছে এবং গলার দুপাশ বিভক্ত হয়ে পড়েছে। মাঝখানের আঘাত মেরুদণ্ডে গিয়ে পৌঁছেছে এবং সেখানে হাড়ে ছুরির দাগ লেগেছে। ছুরির আঘাত পাঁচ ইঞ্চি চওড়া এবং দুই ইঞ্চি গভীর। ছুরি এর বেশি আর যেতে পারে নি। ক্ষতচিহ্ন সরল, তাতে বোঝা যায় আঘাত একটিমাত্রই দেওয়া হয়েছে। আঘাত ডানদিকে এসে যেখানে শেষ হয়েছে, তা থেকে প্রায় এক ইঞ্চি দূরে খানিকটা জায়গা ছিঁড়ে গেছে। মনে হয় ছুরির ধারে কিছু জায়গা ভাঙা ছিল, অথবা হতভাগীর গলায় যে প্রবালের হার ছিল তার সঙ্গে ছুরি বেধে হয়েছে, অথবা হঠাৎ মাথা ঘুরিয়েছিল বলে হয়েছে। কিন্তু ছুরির ধার কোথাও ভাঙা ছিল না, মনে হয় আঘাতের সময় স্ত্রীলোকটির মাথা ঘোরানোতে এ রকম হয়েছে। ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণে মৃত্যু ঘটেছে। এবং গলা ঐ ভাবে কাটার কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই মৃত্যু ঘটেছে। সম্ভবত মেয়েটি পড়ে যাবার আগে এলোমেলোভাবে কয়েক পা ছুটে গিয়েছিল। কিন্তু পুলিস সার্জনের মতে এটা সম্ভব নয়, এবং পথে রক্তের চিহ্ন থেকেই সেটা বোঝা যায়। দেহের অবস্থা, বিশেষ করে বাঁ হাত ও বাঁ পাশের অবস্থা দেখে বোঝা যায়। আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই বাঁয়ের দিকে কাত হয়ে পড়ে গিয়েছিল।

এটা যে হত্যাকাণ্ড না হতে পারে, এ বিষয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উপস্থাপিত করা যায়: দেহে বলপ্রয়োগের কোনো চিহ্ন নেই। লড়াই-এর কোনো চিহ্ন নেই। যেখানে দেহটি পাওয়া গেছে সেখানে চারদিকে রক্ত ছিটিয়ে পড়েছে এমন চিহ্ন নেই। চুল বা পোষাক এলোমেলো হয় নি। গলায় আঘাতের আগে এক বা একাধিক লোক তাকে জাপটে ধরলে তার চিৎকারে পাড়ার লোক জেগে উঠত।

অপরপক্ষে এটা যে আত্মহত্যার ঘটনা নয়, তার প্রমাণ প্যাওয়া যায় কাটার স্থান দেখে। নিজহাতে গলা কাটলে এতটা নিচে আঘাত পড়ত না। তা ভিন্ন হাতে এত জোর হত না যার দরুন ছুরি কোমলাস্থি কেটে মেরুদণ্ডের হাড় পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। উপরন্তু তার কোনো হাতেই রক্তের চিহ্ন নেই।

দেহ সমাধিস্থ করার পরে অনুসন্ধান চলতে লাগল। নিহত স্ত্রীলোকটি সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহের জন্য শহর ও শহরতলীতে ঢেঁড়া পিটিয়ে ঘোষণা করা হল যে খবর দিতে পারবে তাকে একশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। অবশেষে ৮ই এপ্রিলের অপরাহ্ণে কিছু সংবাদ মিলল। ১০০ নং বৈঠকখানা লেনে মিস্টার হ্যারিস নামে একজন লোক থাকতেন, তিনি ঐ স্ত্রীলোকটির একখানা ফোটোগ্রাফ দেখে বললেন, 'এ যে আমাদের কম্পাউণ্ডে বাস করত সেই মেয়েটার মতন দেখতে। আমি জোর করে ঠিক বলতে পারছি না, তবে আমার স্ত্রী বলতে পারবেন।'

মিসেস হ্যারিসের সঙ্গে দেখা করা হল। তিনি ফোটোগ্রাফ দেখামাত্র মেয়েটিকে চিনতে পারলেন। যে গুদামঘরে সে বাস করত সেইখানে দেখা গেল দরজা বাইরে থেকে তালা বন্ধ। জানালাগুলিও বন্ধ। কিন্তু তালায় একটুখানি টান দিতেই তালাটা খুলে এলো, বোঝা গেল আদৌ তা চাবিবন্ধ ছিল না। ঘরে প্রবেশ করে দেখা গেল বিছানা পাতার পর সেখানে আর কেউ শোয় নি। মশারি খাটানো ছিল। তার তিন দিক বিছানার নিচে গুঁজে

দেওয়া আছে। একটা দিক গোঁজা হয় নি। তার ভিতর দিয়ে একজন লোক অনায়াসে ভিতরে ঢুকতে বা সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। ঘরে কিছু আসবাব ও কাপড় চোপড় দেখা গেল। একখানা ফোটোগ্রাফ পাওয়া গেল। ওখানা যার ছবি, পুলিসমহলে সে পরিচিত, তার নাম কিংসলি। পরিচয়ের প্রথম সূত্র পাওয়া গেল এইখানেই।

বীটের কনস্টেবল শুনতে পেল সব কথা। সে তৎক্ষণাৎ এসে বলল, 'হ্যাঁ, আমি তা হলে জানি ওর কথা। মাধবচন্দ্র দত্ত এ স্ত্রীলোকটিকে ঐখানে নিয়ে আসে। আমার বীট ছিল তখন, আমি দেখেছি। মাধব দত্তর বৌবাজার স্ট্রীটে একটা দোকান আছে। তাকে আমি ভাল রকম চিনি। কয়েক বছর হল তার সঙ্গে আমার পরিচয়।'

মাধব দত্তকে গ্রেফতার করা হল। তাকে সওয়াল করে জানা গেল, মিস্টার হ্যারিসের কম্পাউণ্ডে অবস্থিত গুদাম-ঘরে সে ঐ স্ত্রীলোকটির সঙ্গে গিয়েছিল, কিন্তু তার সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। এ রকম জবাব যে বিশ্বাসযোগ্য নয়, তা তাকে বুঝিয়ে বলা হল, কিন্তু তবু সে বলতে লাগল তাকে সে চেনে না। তারপর আরও চেপে ধরাতে সে স্বীকার করল জিগজ্যাগ লেন থেকে সে তাকে নিয়ে এসেছিল। ঐ লেনের বাড়িটি সে দেখিয়ে দিল। বাড়িটি মিস্টার রোজারিও নামক একটি লোকের। এইখান থেকে পুলিস স্ত্রীলোকটির নাম ও অন্যান্য কয়েকটি খবর জেনে নিল। স্ত্রীলোকটি রোজ ব্রাউন নামে পরিচিত ছি৽ মিস্টার রোজারিওর বাড়িতে সে প্রায় দুই মাস হল বাস করছিল। তারপর এইখান থেকে সে মিস্টার হ্যারিসের কম্পাউণ্ডে উঠে যায়। যখন রোজ ব্রাউন জিগজ্যাগ লেনে ঘর নেয়, তখন তার সঙ্গে একটা বাণ্ডিল মাত্র ছিল, কোনো আসবাবপত্র ছিল না। কয়েক দিন বাস করার পর সে একখানা খাট কিনে নেয়। তার যে অলঙ্কারপত্র ছিল তা সে মিসেস রোজারিওর কাছে গচ্ছিত রাখে। একজোড়া বালা দাম হবে ৪৫০ টাকা, সোনার খোদাই করা একটি লেডিস হান্টিং ওয়াচঘড়ি, তার সঙ্গে একটি চেন, দাম ১২০ টাকা। ১২ টাকা দামের একজোড়া সোনার ইয়ার-রিং। দেশী ডিজাইনের একটি সোনার নেকলেস দাম ৫০ টাকা। চারিটি হীরে বসানো সোনার আংটি, দাম ২০০ টাকা, আর একটি বিয়ের আংটি।—এই তার মোট অলঙ্কার। মোট দাম হবে ৬০০ থেকে ৭০০ টাকা। রোজারিওর বাড়িতে সে যতদিন ছিল, ততদিন মাধবচন্দ্র দত্ত তার কাছে প্রায়ই আসত। দুমাস শেষ হবার আগেই সে বাড়ি ছাড়ে। প্রথম মাসের ভাড়া দেয় মাধব দত্ত, দ্বিতীয় মাসের যে কদিন ছিল সে কদিনের ভাড়া রোজ ব্রাউন দেয়। ঐ বাড়ি ছাড়ার চারদিন আগে সে তার অলঙ্কারগুলি মিসেস রোজারিওর কাছ থেকে চেয়ে নেয়। নেবার সময় মাধব সেখানে উপস্থিত ছিল না, অতএব সে কিছু জানতে পারে নি। এ বাড়ি ছাড়ার কারণ, স্বরূপ মাধবের কাছ থেকে জানতে পেরেছিল যে কিংসলি তাকে খুঁজছে। কিংসলির সঙ্গে তার আগে ভাব ছিল। তা ছাড়া জিগজ্যাগ লেনের বাড়ি যথেষ্ট নিরাপদ কিংবা অন্তরালে নয়। অতএব কিংসলি তাকে খুঁজতে বার করবে সহজেই, তাকে পেলে সে তাকে চলন্ত রেলগাড়ি থেকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। কারণ রোজ ব্রাউন তার সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করে, তাকে ছেড়ে এসেছে। কিন্তু মাধব এসব কথা অস্বীকার করল, বলল, সে এমন কথা রোজ ব্রাউনকে কখনো বলে নি। অবশ্য একথা যে সে রোজ ব্রাউনকে বলেছে এমন সাক্ষী কেউ নেই। মিসেস রোজারিওর কাছে সে এইসব বলেছিল মাত্র। অতএব একথা সত্য হতেও পারে, নাও হতে পারে। তবে একথা ঠিক যে নিহত স্ত্রীলোকটি কিংসলিকে ভীষণ ভয় করত, কাজেই তার প্রতিহিংসা সম্পর্কে সে নানারকম বিভীষিকা দেখে থাকবে। রোজ ব্রাউনের মনে কি তার এই শোচনীয় পরিণাম সম্পর্কে কোনো পূর্বাভাষ জেগেছিল ?

রোজারিও পরিবারের কাছ থেকে রোজ ব্রাউন এবং মাধব দত্ত সম্পর্কে যতটা খবর জানবার তা জানা হয়ে গেলে মাধবকে মিস্টার হ্যারিসের কম্পাউণ্ডে নিয়ে যাওয়া হল। এখানে এসে দেখা গেল কিংসলিকে পুলিশে গ্রেফতার করেছে। রোজ ব্রাউনের কাপড় জামার মধ্যে কিংসলির ফোটো-গ্রাফ পাওয়ার ফলেই তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাকে হাওড়া থেকে ধরে আনা হয়েছে। এর পর পুলিশ মাধব দত্তের বাড়িতে খানাতল্লাশি চালান। সেখানে তার বাক্সে একটা চাবি পাওয়া গেল, এবং সে চাবি রোজ ব্রাউনের ঘরের তালায় ঠিক ফিট করে। যে বাক্সে ঐ চাবি পাওয়া গেল তার মধ্যে পাঁচ ছয় শত টাকার অলঙ্কার ছিল। তার দোকানে কিছু পুরনো নাবিকের পোষাক পাওয়া গেল, কিন্তু কোনো ছুরি পাওয়া গেল না। এ কথা বলা আবশ্যক যে মাধব নিলাম থেকে পুরনো ছুরি চামচে এবং অন্যান্য সামগ্রী নিয়মিত কিনত। এই জিনিসগুলি সবই মৃত নাবিকদের ব্যবহার্য জিনিস। তার দোকানে লেমনেড সিগার প্রভৃতির সঙ্গে এ সবও বিক্রয়ের জন্য খোলা অবস্থায় সবার সামনে ধরা থাকত। তার দোকান ছিল লালবাজারে।

মাধবচন্দ্র দত্তের বাড়ি তল্লাশির পর পুলিস হাওড়াতে কিংসলির বাড়ি খানাতল্লাশিতে গেল। কিংসলি তার পকেট থেকে চাবি বার করে গেট খুলে দিল। চটের একটা ব্যাগে ব্যবহার করা কাপড়জামা পাওয়া গেল। তার মধ্যে একটি শার্ট পাওয়া গেল, সেটি দুমড়ানো, এবং তার হাতা ভিজে। সম্প্রতি ধোয়া হয়েছে বোঝা গেল। কিংসলি বলল, সে গত গ্রীষ্মকালের পর থেকে আর এ জামা পরে নি। সে সাধারণত ফ্ল্যানেল শার্ট পরে। হাতা ভিজে লাগছে কেন, তা সে বলতে পারে না। কিন্তু পুলিস সার্জনের মতে রোজ ব্রাউনকে পিছন দিক থেকে অস্ত্রাঘাত করা হয়েছে. অতএব ভিজে

[illegible]তার ব্যাখ্যা প্রয়োজন ছিল। কিংসলির বাইরের অফিসঘর তল্লাশি করা হল, সেখানে স্ত্রীলোকের ব্যবহার্য কয়েকটি পোষাক পাওয়া গেল, তাতে রক্তের দাগ ছিল। এর কি ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করায় কিংসলি বলল, এগুলি রোজ ব্রাউনেরই বটে, কিন্তু এগুলি ব্যবহার করত মারিয়া স্মিথ, কারণ রোজ ব্রাউন তার আশ্রয় থেকে চলে গেছে। মারিয়া স্মিথ একদিন মাতাল হয়ে গুঁতো খেয়েছিল তার ফলে রক্ত বেরিয়ে পোষাকে লেগে গেছে। এই ঘরে দুটো চাবি পাওয়া গেল। একটা বারান্দায় হাত ধোয়ার স্ট্যাণ্ডের উপর। এই চাবিটি রোজ ব্রাউনের ঘরের তালায় লাগে। গেটের তালা ভিন্ন কিংসলির বাড়িতে আর একটি মাত্র তালা ছিল, আর তার চাবি ছিল কিংসলির পকেটে।

মারিয়া স্মিথ কিংসলির রক্ষিতা-রূপে তার সঙ্গে বাস করত, কিন্তু ঝগড়া বাধাতে সম্প্রতি সে তার আশ্রয় ছেড়ে গেছে। তাকে খুঁজে বার করা হল, তাকে জিজ্ঞাসা করা হল ২৫শে মার্চ থেকে ৫ই এপ্রিলের মধ্যে কোনো রাত্রে সে বাড়ির বাইরে ছিল কি না। মারিয়া স্মিথ কিছুক্ষণ ভেবে বলল, 'হঁ্যা, মাসের শেষ দিন সন্ধ্যায় সে বাড়ি ছেড়ে যায় এবং পরদিন ফেরে।' তাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হল, 'মার্চ মাস মোট কদিনে?' সে বলল, 'ত্রিশ দিনে।' তাকে বলা হল সে ভুল করছে, মার্চ মাস একত্রিশ দিনে, তখন সে বলল, 'হতে পারে, কিন্তু আমার মনে আছে, মাসের শেষ দিন সে সমস্ত রাত্রি বাইরে ছিল।' মারিয়া স্মিথ এরপর জিজ্ঞাসা করল, এ সব প্রশ্ন তাকে কেন জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে। এবং ঐ সঙ্গে বলল, কিংসলি তার উপর যেভাবে অত্যাচার করেছে, তাতে এ সব কথায় যদি তার ফাঁসি হয় তবে সে খুব আনন্দের সঙ্গে ফাঁসির দড়ি টানতে রাজি আছে। মারিয়াকে বলা হল, যে স্ত্রীলোকটি কিংসলির সঙ্গে আগে বাস করত, সে খুন হয়েছে। পরদিন কিন্তু মারিয়া স্মিথ আগের দিন যা বলেছিল তার সত্যতা অস্বীকার করল। সে বলল ঐ বিবৃতি দেওয়ার সময় তার মাথার মধ্যে সব গোলমাল হয়ে গিয়েছিল, কিংসলি কোনো দিনও বাড়ির বাইরে রাত কাটায় না, বাইরে গেলে রাত বারোটার আগেই সে ফিরে আসে। তার সঙ্গে সে যতদিন বাস করছে—এই তার অভিজ্ঞতা।

কিংসলির বাড়িতে খানাতল্লাশি চালিয়ে যখন সবাই ফিরে আসছিল তখন পথে আসামী মাধব দত্ত নিজে থেকেই একটি বিবৃতি দিল। কিন্তু সে কিছু বলবার আগে তাকে সতর্ক করে দেওয়া হল সে যা কিছু বলবে তা তার বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার করা হবে। সে বলল, 'জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে রোজ ব্রাউন আমার কাছে একদিন সকালে এসে বলল, সে কিংসলির কাছ থেকে পালিয়ে এসেছে, এবং জিগজ্যাগ লেনে মিসেস রোজারিও নামের এক স্ত্রীলোকের বাড়িতে বাস করছে। সে আমাকে বলল তাকে যেন আমি মাঝে মাঝে দেখে আসি। আমি তাই করতাম। একদিন তার খরচের জন্য আমি তাকে কিছু টাকা দিলাম। কয়েকদিন পরে সে আমার দোকানে এসে আমার সঙ্গে দেখা করল এবং জানতে চাইল আমার সঙ্গে ইতিমধ্যে কিংসলির দেখা হয়েছে কি না। সে শুনেছে কিংসলি জিগজ্যাগ লেনে তার বাসার কাছেই একটি মদের দোকানে নিয়মিত যায়। তাই তার ভয়, কোনো দিন হয়তো কিংসলি ধরে ফেলবে সে কোথায় থাকে। মিস্টার রোজারিও জানতে পেরেছেন যে সে তার স্বামীর কাছ থেকে পালিয়ে এখানে লুকিয়ে আছে, তাই তিনি তাকে অন্যত্র উঠে যেতে বলেছেন।

'এ কথা শোনার পর আমি তাকে মিস্টার হ্যারিসের কাছে নিয়ে যাই এবং তার জন্য একখানা ঘর ভাড়া করি। ৩১শে মার্চ তারিখে সে আমাকে বলল এ ঘরে এতদিন লুকিয়ে আছে, তাতে সে বড়ই পীড়া বোধ করছে। তাই সে আমাকে অনুরোধ জানায়, তাকে নিয়ে আমি যেন একটু বাইরের খোলা হাওয়ায় ঘুরিয়ে আনি। তখন আমি তাকে বললাম তোমার ঐ খ্রীস্টানী পোষাকে তোমার সঙ্গে বেরুলে যদি আমার কোনো হিন্দু আত্মীয় দেখে ফেলে তা হলে আমার জাত যাবে। সে তখন আমাকে একখানা শাড়ী আনতে বলল। আমি শাড়ী এনে দিলাম। বিকেল সাড়ে চারটের সময় শাড়ী নিয়ে তার ঘরে গেলাম, এবং তাকে শাড়ী দিয়ে আমি বাড়িতে খেতে চলে যাই। আমি পুনরায় তার কাছে ফিরে আসি রাত নটার সময়। এই সময় তাকে বাইরে বেড়াতে নিয়ে যাব এই আমার ইচ্ছা। তার দরজা বন্ধ ছিল, কিন্তু একটু কড়া নাড়তেই সে ভিতর থেকে বলল, সে এখন পোষাক বদলাচ্ছে, আমি যেন বাইরে একটুখানি অপেক্ষা করি। কিছু পরেই সে শাড়ী পরে বেরিয়ে এলো, তার হাতে একখানা রুমাল, তার এক কোণে সে তার তালা বন্ধের পর চাবিটি বেঁধে রাখল। তার কানে ছিল একজোড়া ইয়ার-রিং আর ছিল বিয়ের আংটি। প্রবালের নেকলেস গলায় ছিল কি না তা আমি লক্ষ করি নি। কিন্তু সে বলেছিল, গলায় নেকলেস আছে। তার পায়ে জুতো ছিল না। পৌনে দশটার সময় আমরা তার ঘর থেকে বেরুলাম। বেরিয়ে বৌবাজার স্ট্রীটে এসে পড়লাম, এবং সেখান থেকে ওয়েলিংটন স্ট্রীট কলেজ স্ট্রীট হয়ে কলুটোলা স্ট্রীটে এসে পড়লাম। এইখানে তাকে বললাম রাত বেড়ে যাচ্ছে, এবারে ঘরে ফেরো। কিন্তু বাইরে ঘুরতে তার যে আনন্দ হয়েছিল, খোলা হাওয়া নিশ্বাসে টানার সে যে স্ফূর্তি অনুভব করছিল, তা সে সহজে ছেড়ে ঘরে যেতে চাইল না। রাত বেশি হলেই বা কি, সঙ্গে তো পুরুষ আছে, অতএব সে নিরাপদ।

'আমি তার ইচ্ছায় কলুটোলা স্ট্রীট দিয়ে চিৎপুর রোডে গিয়ে পড়লাম। তারপর পূর্বদিকে বৌবাজার হয়ে পশ্চিমে চলতে থাকলাম। তারপর লালবাজার। যখন আমরা সেন্ট জেভিয়ার্স গীর্জায় পৌঁছেছি তখন রাত একটা। রোজ ব্রাউন তখন ক্লান্ত, আমি তার কয়েক পা আগে আগে চলেছি। হঠাৎ পিছন ফিরে তার দিকে চাইতে গিয়ে দেখি কিংসলি কোথা থেকে হঠাৎ এসে পিছন দিক থেকে তার ঘাড়ে হাত রেখেছে। রোজ ব্রাউন সভয়ে তার দিকে তাকিয়ে 'বাপ-রে-বাপ!'

বলে চেঁচিয়ে উঠল। (বাংলাদেশের লোকেরা ভয়ে, বিস্ময়ে বা বেদনায় এই কথা বলে চেঁচায়।) কিংসলির গায়ে ঘন ব্রাউন রঙের পোষাক। তার মাথায় ফেল্ট হ্যাট। হ্যাটের চারদিকে সিল্কের প্যাগড়ি জড়ানো। কাছেই জোরালো গ্যাসের আলো ছিল, সেই আলোয় তাকে চিনতে পারলাম। কিন্তু তার পা টলছিল কি না তা লক্ষ করি নি। আমি এই দৃশ্য দেখা মাত্র সেখান থেকে পালিয়ে গেলাম। কারণ আমার সঙ্গে তার রক্ষিতা ঘুরছে, এতে সে উত্তেজনাবশে আমাকে আর অক্ষত দেহে ফিরতে দিত না। আমি গিয়ে পৌঁছলাম এক সরু গলির মধ্যে। সেখান থেকে লুকিয়ে ওদের গতিবিধি লক্ষ করতে লাগলাম। ওরা আমহার্স্ট স্ট্রীটের দিকে চলল, একটু চাপা স্বরে কথা বলছিল। চলছিল ধীরে ধীরে। তারা আড়ালে যাবার পর আমি বাড়ি ফিরে গেলাম। পরদিন শুনলাম একটি স্ত্রীলোক খুন হয়েছে আমহার্স্ট স্ট্রীটে। তার গলা কাটা। কিন্তু আমি সন্দেহ করি নি যে সে স্ত্রীলোক রোজ ব্রাউন, তাই আমি এ বিষয়ে আমার কিছু করণীয় আছে বলে ভাবি নি। কিন্তু আমি যে স্ত্রীলোকটিকে মিস্টার হ্যারিসের কম্পাউণ্ডের ঘরে নিয়ে তুলেছিলাম, তার সম্পর্কে যখন পুলিস আমাকে জেরা করছিল, তখনও কেউ আমাকে বলে নি যে সে খুন হয়েছে।'

একটা জিনিস এখানে লক্ষ করতে হবে মাধব দত্ত এই যে বিবৃতি দিল, এটি সে আগে দেয় নি। সে এই বিবৃতিটি দিয়েছে কিংসলির হাওড়াস্থিত বাড়ি সার্চ হওয়ার সাত ঘণ্টা পরে। এবং হাওড়া যাবার আগে মিস্টার হ্যারিসের বাড়িতে কিংসলির সঙ্গে মাধবের দেখা হয়েছে। তখনও সে, ৩১শে মার্চ রাত্রে (অথবা আরও নির্ভুলভাবে বললে ১লা এপ্রিল সকালে) এই লোকটার সঙ্গে যে তার লালবাজারে দেখা হয়েছিল, সে-কথা বলে নি। হতে পারে কিংসলির সামনে কিছু বলতে তার মনে ভীরুতা জেগেছিল, কিন্তু সেখানে তো পুলিস ছিল, তাতে তার ভয় দূর হওয়া উচিত ছিল।

আমি কয়েকটি মাত্র মন্তব্য অতঃপর করব। তারপর মাধব এবং কিংসলি—এই দুজনের মধ্যে কে রোজ ব্রাউনকে হত্যা করেছে, এ রহস্যের মীমাংসা বুদ্ধিমান পুলিস অফিসারের উপর ছেড়ে দিচ্ছি।

আগের কেস্-এ লী জুডা হত্যার ব্যাপারে দুজন লোক একযোগে কাজ করেছে। বর্তমান কেস্-এ সে রকম নয়। এখানে রোজ ব্রাউন হত্যায় দুজন লোককে পৃথকভাবে সন্দেহ করা হচ্ছে, কারণ একযোগে মিলিতভাবে হত্যার প্রশ্ন এখানে নেই। মাধবের বিরুদ্ধে প্রবল প্রমাণ, সে বলেছিল, হত্যার রাত্রে রোজ ব্রাউন খালি পায়ে অতটা পথ হেঁটেছিল, অথচ খুন হওয়ার পর রোজ ব্রাউনের পায়ে খালি পায়ে হাঁটার চিহ্ন ছিল না। অর্থাৎ ধুলো বা কাদা কিছুই ছিল না। খালি পায়ে হাঁটলে কখনও তা হতে পারত না। অতএব রাত্রে খালি পায়ে পাঁচ ছ'-মাইল হাঁটার কথা যদি বানানো হয়, তা হলে কিংসলির সঙ্গে পথে দেখা হয়েছিল, এ কথাও বানানো। তা যদি হয়, তা হলে রোজ ব্রাউনের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ও হত্যার মধ্যে বেশি সময় অতিবাহিত হয় নি। সে যা বলেছে তার চেয়ে সে অনেক বেশি জানে, এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

মাধবের বিরুদ্ধে আরও একটা ঘটনা আছে। রোজ ব্রাউনের অলঙ্কার খুঁজে পাওয়া যায় নি, এবং তারও অর্থ পরিষ্কার নয়। মাধব জানে, তার ৬০০ কিংবা ৭০০ টাকার অলঙ্কার ছিল। রোজারিওর বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে উঠে যাওয়া এই মাধবের প্ররোচনাতেই হয়েছে। ঐখানে মাধব অনেকের পরিচিত ছিল, কিন্তু যেখানে রোজ ব্রাউনকে নিয়ে তুলল, সেখানে মাধবকে কেউ চিনত না। কিংসলি যে রোজ ব্রাউনকে খুঁজে বেড়াচ্ছে এবং পেলে তাকে যে খুন করবে, এটি মাধবই রোজ ব্রাউনকে বানিয়ে বলেছে।

কিন্তু মাধবই যদি রোজ ব্রাউনের হত্যাকারী হয়, তার একমাত্র উদ্দেশ্য বা মোটিভ হচ্ছে লুণ্ঠন। আবার কিংসলি যদি হত্যাকারী হয়, তবে তার মোটিভ হচ্ছে ঈর্ষা, অথবা প্রতিহিংসা, অথবা দুইই।

মনে রাখা দরকার যে, কিংসলি অত্যন্ত দুর্দান্ত প্রকৃতির লোক, চরিত্রহীন, এবং মাতাল অবস্থায় স্ত্রীলোকদের প্রতি অত্যন্ত পাশবিক হয়ে ওঠে। ইউরোপীয়ানদের মধ্যে সে একজন নিম্নস্তরের লোক, এরাই অপরাধীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে থাকে। রোজ ব্রাউনের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ, অতএব স্ত্রীলোকটি তাকে ছেড়ে যাওয়াতে সে যে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল, এমন কথা ভাবা অসঙ্গত নয়। রোজ ব্রাউন নিজে তার সঙ্গকে ভীষণ ভয় করত, এবং সে তাকে ছেড়ে আসার পরেও, তাকে ঐ লোকটা খুঁজে বার করতে পারে এই ভয় তার মনের আনন্দ নষ্ট করে দিয়েছিল। 'সে যদি আমাকে ধরতে পারে তা হলে সে আমাকে খুন করবে'—এ কথা সে অনেকবার বলেছে। এই লোকটাকে সে যমের মতন ভয় করত। এর ভয়েই সে ভাবতে পেরেছিল যে, সে যদি এই পশুটার কাছ থেকে অন্যত্র পালিয়ে যায় তা হলে পরে ধরতে পারলে তাকে মেরেই ফেলবে। এ রকম ভয়ও সে দেখিয়েছিল। এবং এ রকম করা যে তার পক্ষে সম্ভব এ বিষয়ে তার মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। রোজ ব্রাউনের পালিয়ে পালিয়ে বেড়ানোর আর কোনো অর্থ করা যায় না।

এ সবই বিবেচনা করে তবে প্রশ্ন উঠবে কে হত্যাকারী? মাধব, না কিংসলি?

পূর্বের কেস্-এ যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে সেটি এই কেস্-এও অনুসরণ করতে হবে। তাই আমি প্রস্তাব করছি, যে সব ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হল তা দুটি কলমে পাশাপাশি সাজাতে হবে। এবং দুদিক থেকেই যে সিদ্ধান্ত হয় তাও লিখতে হবে। তা হলে সাধারণ বুদ্ধিতেও বোঝা যাবে হত্যাকারী কে।"

বিশ্লেষণ:

প্রমাণ সমর্থিত ঘটনা ।। তা থেকে যে সিদ্ধান্ত হয় তা।

(ক্রমশঃ)

রান্নাঘরে শেষ পাট তোলার আওয়াজও আস্তে আস্তে কমে এলো। টুং টাং ঘড়াং—বাসনপত্র গোছাচ্ছে পদ্মর মা। তারপর একসময় টিক্ করে শব্দ হল একটা। নন্দার ঘরের একটা জানলা দিয়ে যে আলোর টুকরোটা এসে বসেছিল টেবিলের ওপর—সে লাফ দিয়ে নেমে যেন পালিয়ে গেল। এখন শুধু রাত আর নন্দা।

এতক্ষণ তবু বাড়িটার কোথাও না কোথাও, আশে-পাশেই আর একটা জেগে-থাকা দোসর ছিল—এখন নন্দা একা। পদ্মর মা সারাদিন কাজ করে, ক্লান্তও হয়েছে, ওর বিশ্রাম দরকার—এ-সব যুক্তি ছাপিয়ে তার অবুঝ মন এক্সটেনশনের দরবার করছিল—বাসন গোছানো আর রান্নাঘর ধোওয়া আরও কিছুক্ষণ চলুক। অথচ, এই একাকীত্ব তার নির্বাসন নয়, স্বেচ্ছা। এক ঘরে, এক বিছানায় কেউ সঙ্গে আছে, এ-কথা ভাবতে গেলেও গা শিরশির করে।

রাতগুলো সব জ্বালা। পোড়া চোখে ঘুম আসতে নেই কি? ঘুমের ওষুধের নাম শুনলে নিজেকে ন্যাকা বলে ঘৃণা করতে ইচ্ছে হয়—সুতরাং সে প্রশ্ন ওঠে না। কে জানে কেমন করে এই অভ্যাস কবে গড়ে উঠেছে, নন্দার ঠিক মনে পড়ে না—রাত বারোটা, একটা, দুটো—যেন অনন্তকাল এমনি অন্ধকারে চোখ মেলে আসছে সে, হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনে আর নিঃশ্বাস গুণে—তারপর কোন সময় ঘুম চুপিচুপি আসে, সে-ঘুমও খুব শান্ত নয়, পরের দিন বেলা দশটা পর্যন্ত গড়িয়ে তার খাজনা দিতে হয় নন্দাকে।

জাগতে কষ্ট নেই, ঘুমানোর জন্যে ব্যাকুল নয় নন্দা, কিন্তু, এত একা লাগে কেন? না, কারুর সঙ্গে গল্প করতে চায় না, মুখোমুখি সময় কাটাতে চায় না নন্দা—বেশিক্ষণ কারুর সঙ্গ ওর ভালোই লাগে না। কিন্তু কি-এক বেয়াড়া আব্দার মনে মনে পোষে ও—জেগে থাকুক, বাড়িতে কোথাও কোনখানে

কেউ জেগে থাকুক। লোকজন-চেঁচামেচি নন্দার অত্যন্ত অপছন্দ—কিন্তু পোড়ো-বাড়ির মত বীভৎস নিস্তব্ধ হয়ে ঘুমোয় কেন বাড়ি? একটুখানি আলো থাকুক, দুটি একটি কথা—কিছু পায়ের শব্দ। ব্যস্, নন্দা নিশ্চিন্ত হয়ে ডুবে থাকতে পারে নিজের ঘরে।

রাত ঝিমোচ্ছে। নন্দা ছটফট করে ওঠে বিছানা থেকে। ছোট্ট আলমারী একটা ঘরের কোণায়—সুদৃশ্য কাচ দেওয়া। একটা বাদামী মলাটের বই টেনে বার করে, ফের বিছানায় এসে ওঠে। ঘরটাকে কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে। ঘেরা-টোপের টেবিলল্যাম্পের আলো বৃত্তের গণ্ডিতে আটক—ঘরটার বাকি অন্ধকারটুকু অচঞ্চল। নন্দার অতি-প্রিয় বইগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম—রাজশেখরের রামায়ণ। একটা জায়গা খোলে নন্দা, পড়তে থাকে। মশারির জালি-কাটা ছায়া পড়ে বইয়ের পাতায় বেশ নক্‌শা হয়েছে—সকৌতুহলে খানিক পর্যবেক্ষণ করতে থাকে, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই দৃষ্টি ঘুলিয়ে যায়। অগত্যা পড়ায় মন দিতে চেষ্টা করে, পড়েও ফেলে পাতা দুয়েক। তারপর দুম্ করে বই বন্ধ ক'রে মন্তব্য করে—রামটা চোর।

বিছানা ছেড়ে নামে আবার—আলুতো পায়ে হেঁটে কোণে-রাখা মাটির কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে একটু খায়—আঃ। মেঝেতে পায়চারি করে এদিক-ওদিক। তারপর দরজা খুলে বাইরে আসে, বারান্দায়।

নিচে পাকা উঠোনে এক পাশে কিছু মাটি ফেলে বাগানের মিনিয়েচার করা আছে—একটা চাঁপা আর একটা কুলগাছ। পাশের বাড়ির লোহার ঘোরানো সিঁড়ির গোল-গোল নক্‌শার ফুটো দিয়ে চোলাই হয়ে আসছে গলির ল্যাম্পপোস্টের আলো—কুলগাছের পাতায় পাতায় পড়েছে—গাছটা যেন রূপকথার দেশের মোহরের গাছ হয়ে গেছে। চাঁপাগাছের মোটা মোটা লম্বা পাতা একটু-একটু হাওয়ায় গরুর কানের মত নড়ছে। সাদা ফুলগুলো অন্ধকারেও দৃশ্যমান।

নন্দা বেশ তদ্‌গত হয়ে দেখছিল। কোত্থেকে এক মেনি-বেড়াল লাফ দিয়ে নামল—পাঁচিল বেয়ে চলে গেল ল্যাজ তুলে। হঠাৎ নন্দার মনে হল—অমনি করে একটা চোর যদি ছুরি-হাতে নামে পাঁচিল টপকে? ভাবা-মাত্র চট্ করে ঘরে চলে আসে ও—খিল লাগায়। ভূতকে ভয় নেই, কিন্তু চোর যে মানুষ।

ফের বিছানা। চোখ বোঁজে নন্দা জোর ক'রে। এবার ঘুমিয়ে পড়ছি—আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস ফেলে ও, শরীরটাকে স্থির করে। এইতো বেশ ঘুমের মতন হয়ে এসেছে। কিন্তু ঘুম মানে তো অচেতন হয়ে যাওয়া—নন্দা তবে সব বুঝতে পারছে কেন? যাঃ, এমনি করে হবে না। ভেড়ার পাল গুণবে নাকি? কিংবা কল্পনা করা যেতে পারে, একজন প্রহরী, ঘুমে তার দু'চোখ ঢুলে এসেছে, কিন্তু সে প্রাণপণে তাকিয়ে থেকে পায়চারি করছে, একঘেয়ে, একটানা—হঠাৎ নন্দার খেয়াল হয়, কেমন শব্দ ক'রে নিঃশ্বাস পড়ছে তার, তালে তালে। রাত্তির ঘুমোচ্ছে, তারই নিঃশ্বাসের শব্দ নাকি? একটানা, একঘেয়ে—বুকের মধ্যে কি-রকম চাপ বেঁধে ওঠে সেই শব্দ শুনতে শুনতে—এ কি বিশ্রী পরিশ্রম হাপরের মত, দম ফেলবে কখন? সেই নিরুপায় শোনা ভোলার জন্যে বালিশে কান চাপে নন্দা। আশ্চর্য, বহু দূর থেকে একটা গুড় গুড় শব্দ ভেসে আসছে যেন—স্পষ্ট কানে আসে নন্দার। সেই ছোটবেলার পড়া 'আফ্রিকার জঙ্গল'—বুনোদের ডাক, ঢাকের আওয়াজ, মশালের আলোয় রং-আঁকা বীভৎস মুখ, আগুনের কুণ্ডের চারপাশে গোল হয়ে উদ্দাম নাচ,—নন্দা যেন সেখানে বন্দিনী, গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে তাকে। সেই দুমদুম শব্দ যেন দ্রুততর হয়ে ওঠে, দ্রুততম লয়ে—নন্দার হৃৎপিণ্ডটা যেন ফেটে যাবে।

নন্দা জোরে একটা শ্বাস ফেলে—নেশার জাল প্রাণপণ চেষ্টায় ছিঁড়ে চিৎ হয়ে শোয়। কড়িকাঠের দিকে নজর পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে সকালের ব্যাপারটা। আশ্চর্য, সারাদিনে আর মনে পড়ে নি তো ঘটনাটা।

নন্দা রান্নাঘরের আলসেতে দাঁড়িয়ে-ছিল। দেখতে পেল, হঠাৎ একটা গিরগিটি জাতীয় কি বস্তু, লম্বা তার ল্যাজ—লাফ দিয়ে টালির কার্নিশে উঠল। কোত্থেকে এসেছে ওটা, কে

জানে। নন্দা অবাক হ'য়ে দেখছিল—টিকটিকি-গিরগিটি নয়, এর ওপরের গাটা একেবারে ঝকঝকে, রূপোলি আর সোনালিতে বরফি-কাটা; পেটের তলাটা সাদা, তেলতেলে, ট্যান-করা চামড়া যেন। মাঝে মাঝে জিভ বার করছিল ওটা—টুকটুকে লাল মস্ত একটা সরু জিভ।

নন্দা চেঁচিয়েছিল—মা, ও মা, দেখে যাও, তক্ষক এসেছে।

তক্ষক নন্দা চেনে না—বর্ণনাও ভালো শোনে নি কখনও, তবু তার মনে ওই কথাটাই এলো সবচেয়ে আগে।

মা ঘরের সামনে বারান্দায় খাঁচার কাছে দাঁড়িয়ে ময়নাটাকে খাবার দিচ্ছিলেন, পড়াচ্ছিলেন—বল, রাধা-শ্যাম, বল---

মা ধীরপায়ে এলেন, সঙ্গে দৌড়ে এলো ছোট্টো বুবু—কই, কই ?

দেখে মা বললেন—তক্ষক কি বাড়িতে আসে ? ও তো পোড়োভিটেতে থাকে। কপালে তার সিঁদুরের ফোঁটা থাকে। এটা অন্য কিছু।

পুজোর ঘর থেকে ঠাকুমা বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। এসে চশমার কাচ থেকে ভালো করে দেখে বললেন—এ বোধহয় বহুরূপী, ওদের অনেক রং হয়—পাল্টাতে পারে গায়ের রং শুনেছি।

নন্দার কেমন জেদ হল। বলল—না, তক্ষক।

আশ্চর্য, ঠাকুমা বা মা কেউ প্রতিবাদ করলেন না। ঠাকুমা কেমন ঠাণ্ডা গলায় বললেন—হবেও বা। কিন্তু নন্দা বুঝছিল, তক্ষক যে নয়, সেটা যেমন নিজে ও জানছে, ও'রাও তেমনি বুঝছেন। কিন্তু ও'রা চলে গেলেন আর উৎসাহ না দেখিয়ে। খালি ছোট্টো বুবু চোখ গোল ক'রে বারবার বলতে লাগল—ওটা কী পিসি ? কোথায় থাকে ?

নন্দার কেমন নেশা লাগছিল জীবটাকে দেখতে। কি করে ওটা, দেখি। ওমা, আস্তে-আস্তে বুকে হেঁটে এগিয়ে চলেছে কাঠের কড়ি বেয়ে। হঠাৎ কিচিমিচি শব্দ, ডানা ঝটপট—কিছু খড়কুটো উড়ে নিচে পড়ল। ওঃ, কার্নিশের গায়ে ঘুলঘুলির মতন জায়গায় চড়াই বাসা ক'রে ডিম পেড়েছে। এই জীবটা সেই ডিমের খোঁজে এসেছে। কিন্তু লোভী হলে কি হয়, ভয়-ও আছে। চড়াই-এর কিচিরমিচির শুনেই একটু পেছিয়ে গেল। দুটো চড়াই বাসায় ছিল, বেরিয়ে এসেছে। একটা চড়াই গাঢ় খয়েরী—সাদা ছিট্ ডানায়—ওটা নিশ্চয়ই কর্তা-চড়ুই, নন্দা ঠিক করলে। অন্যটা হালকা বাদামী, বেশ নরম মোলায়েম ভাব—ওটা গিন্নী-চড়ুই। কে জানে বাসায় কি আছে—ডিম, না ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চা। চড়ুই বাবা-মা তাদের বাঁচানোর দায়ে সোরগোল তুলেছে।

সোনালি রূপোলি বরফি-কাটা জীবটা ভয়ানক শয়তান তো—গুঁড়ি মেরে-ফের এগিয়ে চলেছে—নন্দা অত্যন্ত উত্তেজিত বোধ করছিল, ঢিল মেরে তাড়াবে নাকি ? কিন্তু চড়াই দুটোর দিকে তাকিয়ে নিরস্ত হ'ল। আশ্চর্য, ওইটুকু পলকা পাখি দুটো রুখে দাঁড়িয়েছে—সাহায্যের দরকার নেই ওদের। আত্মরক্ষার লড়াই—জীব-জগতের চিরন্তন যুদ্ধ—জীবনযুদ্ধ—এ দেখার অভিজ্ঞতা নন্দার জীবনে এই প্রথম।

গিন্নী-চড়ুইটা বাসার মুখ আগলে প্রাণপণ চেঁচাচ্ছে। কর্তা-চড়ুই উড়ে উড়ে হ্যাংলা আক্রমণকারীর গায়ে ঠোঁটের খোঁচা দিচ্ছে। বিশ্রী জীবটা খুব ক্ষেপে গিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে লম্বা জিভ দিয়ে চড়ুই-এর নাগাল পেতে চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। শেষ পর্যন্ত রণে ভঙ্গ দিয়ে হঠাৎ ওটা পালিয়ে গেল—কড়িকাঠের কোন্ ফাঁক দিয়ে গ'লে কোথায় উধাও হয়ে গেল।

রণক্লান্ত চড়ুই দুটো ঠোঁট ফাঁক ক'রে কেমন হাঁপাচ্ছে—ওরা বিজয়ী। নন্দা আনন্দে হাততালি দিয়ে দিল—সাবাস।------

এখন এই রাত্তিরে নন্দা নিজেই চড়ুই পাখি হয়ে গেছে যেন। চিৎ হ'য়ে কড়িকাঠ দেখতে গিয়ে হঠাৎ গা শিরশির করতে লাগল তার—সেই বিচ্ছিরি দেখতে, সোনালি-রূপোলি বরফি-কাটা সেই জীবটা যদি ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে—মুখের ওপর লাল সরু জিভটা দিয়ে চেটে দেয়। গায়ে কাঁটা দিল নন্দার। মশারির বাইরে শুয়েছিল হাঁফ ধরবার ভয়ে, এখন মশারির মধ্যে ঢুকে পড়ল, ভালো ক'রে গুঁজে দিল চারপাশ, তারপর নিশ্চিন্ত হ'য়ে শুতে গিয়ে মনে হ'ল—আবার জলতেষ্টা পেয়েছে। না, অত আহ্লাদ নয়, এত কষ্ট ক'রে মশারি গোঁজা হয়েছে, আর বেরোনো যায় না।

নন্দা মনটাকে ধমক দিয়ে শুয়ে পড়ল। এবার ঘুমোতেই হবে।

চোখ বুজেছে—কালকের দিনটা ছবি হয়ে ফুটল,—গতকাল নয়, আগামীকাল। নন্দা জানে হুবহু—ঠিক কি কি ঘটবে। সকাল দশটা পর্যন্ত বিছানা—কলেজ, বিকেল—সাজগোজ,—অনিন্দ্য আসবে—সত্যিই সে রতু-ছেলে, সব নিন্দের বাইরে—গল্প হবে, ভালোবাসা, আদর—কি সুন্দর ছক-কাটা জীবন। ফুল-ছড়ানো রাস্তা, নরম, মসৃণ। কোথাও এতটুকু কাঁকর নেই পর্যন্ত। প্রেম—সেখানেও সকলের সাদর সম্মতি।

নন্দা ভাবল—এই আমি মশারির মধ্যে আছি—সেই তক্ষকটা লাফিয়ে পড়বে না আমার ওপর। আমি তো চড়ুই না।----চকিতে প্রশ্ন উঠল মনে—আমি তবে কি ? অনিবার্যভাবে মনে পড়ল খাঁচার পোষা ময়নাটার কথা· ময়নাটাকে সেই বিশ্রী জীবটা তাড়া করবে না—ওর নিরাপত্তা আছে। নিরাপত্তা আছে নন্দার। অর্থ, সুখ, প্রেম—মশারি।

তবু সুখের কথা ভাবতে গিয়ে নন্দার বুকের ভেতরটা এমন আটকে এলো কেন ? গলার কাছে কুণ্ডলী হয়ে জমছে কি-একটা যন্ত্রণার ডেলা।

আকাশ কাঁপিয়ে একটা জেট প্লেন উড়ে গেল। অন্ধকার চিরে কোন অজানার দিকে ছুটছে ও ?

নন্দা বালিশে মুখ গুঁজে কান্নাকে নির্বাধ হতে দিয়ে কোন অনামা দেবতার কাছে অর্থহীন আবেদন করতে থাকে অস্ফুট গলায়—আমি চড়ুই হতে চাই, আমি বাঁচতে চাই।

ফোঁটা ফোঁটা জলে বালিশ ভিজতে থাকে।

লাজপৎ রায়

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

জীবন স্বপন নহে, সৈনিকের দুর্ধর্ষ সংগ্রাম—
তোমার সাধনা হ'তে এই তত্ত্ব মোরা লভিলাম,
মৃত্যুর উৎসবে তাই সাজাইয়া শোক-অর্ঘ্যখানি,
অশ্রুজলে স্মরিলাম এই তব জীবনের বাণী।
তবে আর ভয় কিবা? মুছি এই তপ্ত আঁখিজলে,
তব ত্যক্ত তরবারি যৌবনের বজ্রমুঠি তলে—
ধরিব উৎসাহে মোরা, ছুটি যাব জীবন-সংগ্রামে।
দাসত্বপঙ্কিল এই মৃত্যুসম শান্তির বিশ্রামে—
চাহি না, চাহি না আর!---এই শান্তি কলঙ্কের গ্লানি
ঘুচাইয়া দিক তব যৌবনের সংগ্রামের বাণী।

তোমার গর্জন-ধ্বনি পাঞ্জাবের হে বীর কেশরী,
আসমুদ্র হিমাচল অকস্মাৎ প্রকম্পিত করি',
যেদিন ধ্বনিল মন্ত্র অগ্নিগর্ভ বিদ্রোহের স্বরে—
সুখসুপ্ত দাসত্বের ভয়াতুর শ্রবণ-বিবরে;—
সেদিন বুঝিয়াছিনু সাম্রাজ্যের ভিত্তির প্রস্তর
তোমার শক্তির কাছে একদিন কাঁপি থরথর,
জানাইবে দর্পভরে তরবারি ক্রুদ্ধ আস্ফালন,
তোমার ললাটে আছে রাজদণ্ড-দুঃখ-নির্বাসন।
তবু তব জয় হলো, সেদিনের লৌহ কারাগার
তোমারে দানিল, বীর, বৃহত্তর জীবন-বিস্তার।

হে সৈনিক, জন্ম তব পাঞ্জাবের পঞ্চনদী পারে,
ইতিহাস-খ্যাতভূমি বীরত্বের লীলার আগারে।
এই পঞ্চনদীতীরে হযে গেল কত অভিনয়,
কত সম্রাটের দম্ভ কলঙ্কিত কত পরাজয়,—
বিদেশী দস্যুর কত দিগ্বিজয় কীর্তির পিপাসা,
ধ্বংসের সমুদ্রতলে রহিয়াছে শতদ্রু, বিপাশা।
তুর্কি ও তাতারি রক্ত, শিখের সে আত্মবলিদান,
হিন্দুর বীরত্ব-কীর্তি, যাহা কিছু গৌরব মহান্;
সেই সব কীর্তিগাথা রক্তলিপ্ত দীপ্ত ইতিহাস,
তোমারে কি দিয়েছিল রণলুব্ধ মুক্তির প্রয়াস?

শুধু রক্তপাত নহে,---একদিন ওই সিন্ধুতীরে,
জাগ্রত সাবিত্রিমন্ত্রে সভ্যতার প্রভাতী মন্দিরে
উঠেছিল সামগীতি, পৃথিবীর প্রথম বন্দনা,
পূর্ণ মানবতা লাগি' আত্মার সে কল্যাণ মন্ত্রণা।
সেদিন কোথায় ছিল আজিকার দিগ্বিজয়ী দল।
পররাজ্য গ্রাসিবারে এই হিংস্র বর্বরের বল?
কেহ বা বল্কল পরি' পর্বতের পঙ্কিল গহ্বরে
ধন্য বরাহের মত অরণ্যের জঘন্য বিবরে---
হত্যার উৎসবে মগ্ন; দন্তে দন্ত ঘষি' দস্যুদল
ক্ষিপ্ত সারমেয় সম করেছিল মত্ত কোলাহল:

আজ তারা আসিয়াছে হাতে লয়ে রক্ত-তরবারি,
আর্য-পিতামহ-কর্ণে পশ্চিমের মহিমা ঝঙ্কারি'
শিখাইতে চায় তারা সভ্যতার মহৎ সাধনা।
হায় অভিশপ্ত দেশ! দুর্ভাগ্যের একি বিড়ম্বনা?
ক্রোধে, ক্ষোভে, দুঃখে তাই, একদিন করি' সিংহনাদ
বলেছিলে, 'ওরে ভণ্ড, এই দম্ভ উচ্ছিষ্ট প্রসাদ—
কে চাহে তোমার কাছে? মহত্তম মানবের বাণী,
সাধুতার তত্ত্বকথা, তোমা হতে মোরা ভাল জানি।
মগ্ন তরবারি লযে গাহ যবে দস্যুতার জয়,—
সেও ভালো, ভালো নহে ভণ্ডামীর এই অভিনয়।'

হে তপস্বী, জানি তব জীবনের দুঃসাধ্য সাধনা,
অর্ধ শতাব্দীর ব্রত, মহত্তর মুক্তির কামনা—
হয় নাই উদ্‌যাপিত, লভে নাই পূর্ণ পরিণাম,
এখনো হয় নি শেষ ভারতের মুক্তির সংগ্রাম।
তবু জানি, তব ব্রত, কারাগার-দুঃখ-নির্বাসন,
রাজরোষে সহিয়াছে লাঞ্ছনার যেই নির্যাতন;—
সেই তব ব্রত হতে, সেই তব দণ্ড হতে বীর,
অর্ধ শতাব্দীর অগ্নি, জানি জানি, পূর্ণ শতাব্দীর—
প্রজ্বলিত করি' গেল ভবিষ্যৎ বিপ্লব-অনল;
তব রক্তে জন্ম নিল ভারতের রক্ত শতদল।

শুনেছি স্পর্ধার উক্তি, ইংরাজের সাম্রাজ্য-সীমায়—
প্রভাতের-সূর্য নাকি অস্তলোকে কভু নাহি যায়।
তোমার ললাট তলে পাঞ্জাবের হে পুরুষবর,
আমি কিন্তু হেরিয়াছি সাম্রাজ্যের সায়াহ্ন-ভাস্কর
ডুবিতেছে অস্তলোকে; আজিকার গোধূলি আলোকে
মৃত্যুর সন্ধ্যায় যেন শ্যেনপক্ষ-রক্তিম-পালকে,
আসন্ন রাত্রির রূপ উদ্ভাসিয়া উঠে বারম্বার;
[illegible]র্ণ হবে এই গর্ব, সাম্রাজ্যের দম্ভ-অহঙ্কার।
তোমার মৃত্যুর দূত সিন্ধুতটে করিল ঘোষণা—
ভারত-জননী হবে বিপ্লবের নব শরাসনা।

[পাঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপৎ রায়ের বুকে পুলিশের লাঠির আঘাত পড়েছিল এবং এর কিছুকাল পরেই তিনি মারা যান। সেই উপলক্ষে এটি রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। পঁয়ত্রিশ বছর পূর্বে রচিত এই কবিতার আবেদন বর্তমান স্বাধীন ভারতেও অপরিমেয়। লালা লাজপৎ রায়ের জন্মশতবার্ষিকীতে এই কবিতাটি আমরা পুনর্মুদ্রণ করে লালা লাজপৎ রায়কে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাচ্ছি।

—সম্পাদিকা

ধারাবাহিক উপন্যাস

অদ্বিতীয়

সুশীল রায়

॥ চার ॥

আমরা আর-একটি বৃহৎ অট্টালিকার কাহিনীতে এসে উপস্থিত হলাম। এই অট্টালিকাটিও একটি সাধারণ অট্টালিকা নয়, এর আয়তন যেমন বৃহৎ, এর অবয়বও তেমনি বিরাট। কলকাতার মানিকতলা এলাকায়, মানিকতলার বাজারের কাছেই, এই বিরাট বাড়িটি আজও দাঁড়িয়ে আছে। যে পথটির ওপর এই বাড়িটি, তার নাম বাঙ্কিক লেন।

বাঙ্কিক লেনের এ একটা ব্যারাক-বাড়ি। এর খোপে-খোপে অনেক লোক আগে বাস করত, এখন বাড়িটা ফাঁকা। কেবল এর নিচতলায় রাস্তার ধারের কয়েকটা ঘরে দোকানপাট আছে, আর মোটর পার্টসের গুদাম আছে।

বাড়িটাকে জীর্ণ বলব না, বলব দগ্ধ। তিনমহলা এই বাড়িটা একটা মজবুত কঙ্কালের মত দাঁড়িয়ে আছে, দরজা-জানালার দগ্ধাবশেষ দেয়ালের সঙ্গে এক হয়ে লেগে কোনো দুর্ঘটনার সাক্ষ্য দিয়ে চলেছে। সে অনেক দিনের কথা। বাড়িটায় আগুন লেগেছিল। একটা বড়-রকমের অগ্নিকাণ্ডই সেটা। এখনও ঐ এলাকার অনেকে ঐ আগুন নিয়ে আলোচনা করে। অনেক পরিবারের অনেক ক্ষতি হয়েছে সে আগুনে, অনেক পরিবারের সর্বনাশও হয়েছে।

নিচতলার ঘরগুলির বেশির ভাগেই থাকত বিভিন্ন আপিসের পিয়ন-ধরণের মানুষ, কুলী আর ঠেলাওয়ালা ইত্যাদি, দোতলা-তিনতলার ঘরে থাকত নানারকম জীবিকার মানুষ নানারকমের সমস্যা নিয়ে। রাত্রিবেলা একতলার বিরাট বাঁধানো উঠোনে বসে ঢোলক বাজিয়ে গান গাইত ঠেলাওয়ালারা, দোতলা-তিনতলার ঘরে ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা সেই গানের হল্লার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চ্যাঁচামেচি করত। দিনের বেলায় বিভিন্ন ঘরের গিন্নিতে-গিন্নিতে কলের জলের বরাদ্দ নিয়ে তুমুল ঝগড়াঝাঁটি হত, ছেলেতে-ছেলেতে মারামারি হত, মেয়েতে-মেয়েতে রেষারেষি চলত। ভোর থেকে মাঝ রাত অবধি বাড়িটাকে যেন মাথায় করে রাখত সকলে। কলরব-কলহ আর কোলাহল—এই ছিল বাড়িটার একমাত্র জীবন।

কিন্তু আজ সে বাড়ি স্তব্ধ, আজ সে বাড়ি নির্জন আর নীরব। নিচের তলার দোকানে-দোকানে কেনা-বেচা চলে, মোটর পার্টসের দোকানে হয়তো একটু ঠুকঠাক শব্দ।

কি করে আগুন লেগেছিল বাড়িটায়, কে লাগিয়েছিল আগুন? -এসব নিয়ে অনেক রকমের কথা শোনা যায়। কিন্তু আসল কারণ ও আসল কালপ্রিট কে জানা যায় না।

সে কথা জেনেও বিশেষ লাভ নেই, সে কথা জেনেও বিশেষ উপকার নেই। ঘটনায় যা ঘটে গিয়েছে আলোচনার মধ্যে তাকে আবদ্ধ করে রাখার প্রয়োজনও অনেকের ফুরিয়েছে। কিন্তু এখনও অনেকের কানে বাজে সেই ঘণ্টার ধ্বনি, ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ির সেই পাগলা-ঘণ্টার শব্দ।

এখন ও-ঘটনা নিয়ে আলোচনা কেউ বড়-একটা করছে না; কিন্তু দুর্ঘটনাটি ঘটার পরে অনেকদিন ধরে এ-আলোচনা নিয়ে ব্যস্ত ছিল অনেকে। কেন না, এ-ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে অনেকের, সর্বস্বান্ত হয়েছে আরও অনেক বেশি মানুষ। যে ছিল বাড়িটার মালিক তারও বুঝি সর্বনাশই হয়েছে; কেন না সেই বাড়িটার গায়ে আজ অবধি

আর হাত পড়ল না কারও, কেউ এসে এর সংস্কার আর করল না। দশ বছর গত হয়ে গিয়েছে, কিন্তু আজও বারিক লেনের বিরাট এই ব্যারাকবাড়িটি সর্বাঙ্গে পোড়া দাগ নিয়ে কঠিন মূর্তি ধরে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ এসে তার দগ্ধ গায়ে পলেস্তারা মাখাল না, কেউ এসে বদল করে দিল না দরজা-জানালা।

সংকীর্ণ বারিক লেনের এক পাশে একটা দুঃস্বপ্নের মূর্তি ধরে দাঁড়িয়ে আছে প্রাক্তন এই ব্যারাকবাড়ি।

কম করে একশ'জন ভাড়াটে ছিল এই বাড়িতে। এই একটি বাড়িই ছিল এই অঞ্চলের একটা পল্লী। এই বাড়ির চাল-চলন আদব-কায়দা এই অঞ্চলের অন্যান্য বাড়ির থেকে ছিল আলাদা রকমের। এই বাড়িটাকে কেউ পছন্দ করত না, এ অঞ্চলে বাড়িটা ছিল যেন একেবারেই এক-ঘরে। বাড়িটা ছিল যেন ছোটলোকের ডেরা।

কিন্তু সকলেই ছোটলোক ছিল না, দারিদ্র্যই অনেককে ছোট করে রেখেছিল।

রেণুকার বাবা কাজ করতেন কলেজ স্ট্রীটের কাপড়ের দোকানে। যা রোজগার করতেন তা দিয়ে তিন মেয়ে আর তিন ছেলে নিয়ে সস্ত্রীক অন্য কোথাও বাস করা অসুবিধে; কিন্তু এখানে এক ফালি একটা ছোট ঘর নিয়ে বেশ ছোট হয়েই তিনি ছিলেন। আরামে হয়তো ছিলেন না, কিন্তু বেশ ছিলেন। কাপড়ের দোকানে কাজ করতেন, এতে মাঝে মাঝে উপরি-পাওনাও তাঁর ছিল। ছিট কাপড়ের ছাঁট মাঝেমাঝেই নিয়ে আসতেন। সেই সব টুকরো কাপড় জোড়া দিয়ে ছোট ভাইদের জন্যে জামা-পায়জামা তৈরি করে দিত রেণুকা। নিজের জন্যেও নিশ্চয় সেলাই করে নিত জামা; কিন্তু শাড়ি তৈরি করে নিতে পারত না। এরচেয়ে বড় ছাঁট কি জোগাড় করে আনতে পারে না তার বাবা?—ইচ্ছে হত, একথা জিজ্ঞাসা করে সে তার বাবাকে। কিন্তু বাবার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা সে করতে পারত না। বাবার মুখটাই ছিল কেমন-যেন, কেমন-যেন অপরাধীর মত।

রেণুকাকেই তাদের সংসারের প্রায় সব কাজ করতে হত। তার মায়ের চেহারাও বড় রুগ্ন, এবং সব সময় তাঁকে দেখায় খুবই ক্লান্ত। বসা-কাজগুলো তিনি করতেন বটে, কিন্তু ছুটোছুটির কাজগুলো করা তাঁর সাধ্য ছিল না।

একতলায় উঠোনের এক কোণে একটা বড় চৌবাচ্চা এবং একটি কল। এই বিরাট বাড়িটার যাবতীয় জলের চাহিদা মিটাতে হয় ঐ কল থেকে। চৌবাচ্চার কিনারে ভিড় জমে ওঠে সূর্য ওঠার আগে থেকেই। বাড়িটার যাবতীয় ভাড়াটে স্নান করে বাসন মাজে ওখানে; ঐ কল থেকে সংগ্রহ করে আনে খাবার জল। কলটার ওপর চাপ তাই খুব বেশি।

জল টানার কাজ রেণুকা একা করে না; এ কাজে তাকে সাহায্য করে তার ভাই-বোনেরাও, ছোট বালতিতে করে বারে-বারে জল বয়ে নিয়ে আসে তারা কিন্তু তাদেরই-বা বয়স কত, তারাও তো প্রায়-শিশুই। রেণুকা হচ্ছে সবচেয়ে বড়, তার বয়সই তখন বারো কি তেরো।

ঐ বাড়িতে অনেক মানুষের বাস। মানুষ যখন অনেক, তখন সেখানে বিস্তর মতের মানুষ থাকাই স্বাভাবিক। ওদের মধ্যে যাদের বিষয়বুদ্ধি আছে এবং যারা অপরের বিষয়ে মতামত দিতে ভালোবাসে তারা প্রায়ই ব্যস্ত করে তুলত রেণুকার বাবাকে। বলত, 'একটু বুঝে চলুন, হৃদয়বাবু। ছয়টি ছেলেমেয়ে আপনার, দায়িত্ব বড় কম না।'

হৃদয়বাবুর মুখ আরও অপরাধীর মত হয়ে উঠত। ম্লান হেসে বলতেন, 'অবুঝের মত তো চলছি না ভাই। কিন্তু কি ভাবে চললে যে ভালো হবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছি নে।'

'মেয়েটাও বড় হয়ে উঠছে। লেখাপড়াও শিখছে না—'

নিরীহ হৃদয়বাবুর মেজাজও বুঝি খারাপ হয়ে যেত ঐ কথা শুনে, একটু ভেবে বলতেন, 'তেমন ভালো ইস্কুলও তো দেখছিনে কাছে-ভিতে।'

কিন্তু ভালো ইস্কুলের অভাব যে নেই এই কলকাতা শহরে, এ খবর তাঁর অজানা নয়। যারা তাঁকে পরামর্শ দেয় তাদের থেকে বুঝি একটু বেশি খবরই রাখেন হৃদয়নাথ। সদর রাস্তার ওপরের একটা দোকানে কাজ করেন তিনি, সেখানে আসে নানা জাতের খরিদ্দার, সুতরাং বহু মানুষের সঙ্গে নিত্যই তাঁর দেখাসাক্ষাৎ হয়, বিস্তর খবরও আসে তাঁর কানে। কিন্তু সে সব কথা তো বলে লাভ নেই, তাই বোকা সেজে থাকাটাই তাঁর পক্ষে সুবিধেজনক।

(ক্রমশঃ)

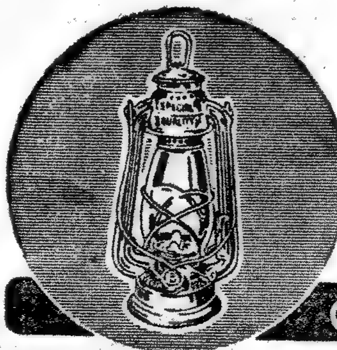
কিষাণ
লণ্ঠন
সর্বোৎকৃষ্ট
গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
ফোন-২২-৬৫৮০
২৩৩, ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১

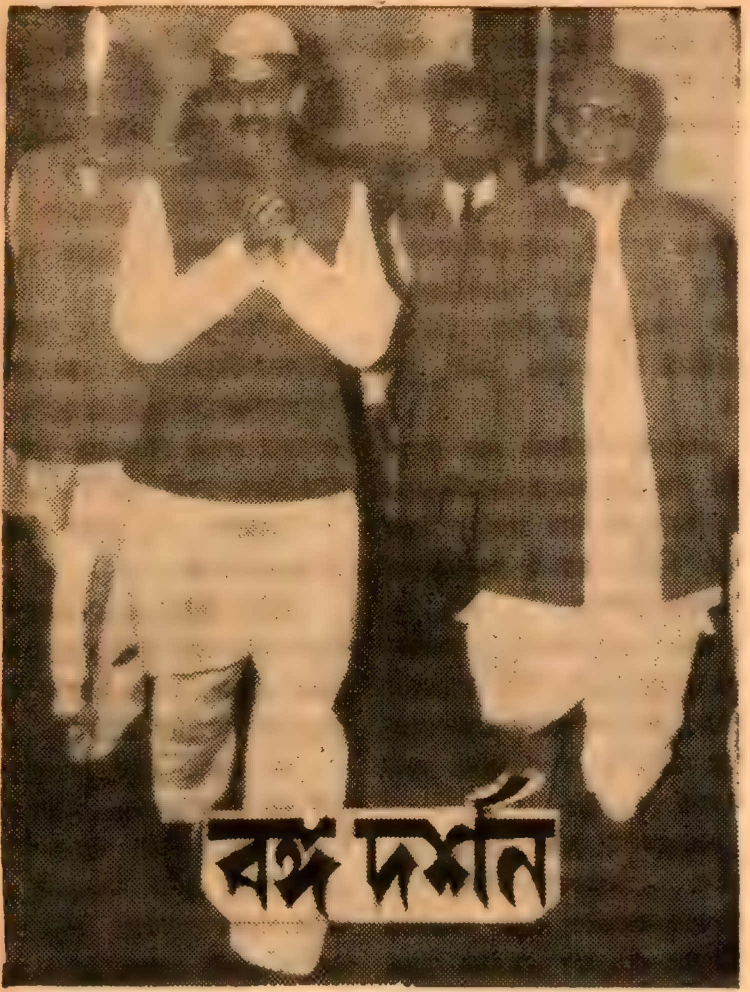

● পূর্বাঞ্চল পরিষদের বৈঠকে যোগ দেবার জন্য শ্রীগুলজারীলাল নন্দ ও শ্রীপ্রফুল্ল সেন অগ্রসর হচ্ছেন।

রাজধানী :
ভাষা নিয়ে তামাসা

মান নিয়ে এমন কি প্রাণ নিয়েও তামাসা চলে, কিন্তু ভাষার ক্ষেত্রে সে সুযোগ নেই। কত কত বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ভাষা একটি জাতির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারায় ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। জীবনে মরণে, ভাবে ভাবনায়, আশায় নৈরাশ্যে তখন সেই ভাষা জাতির জীবনে শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো, প্রাণবায়ুর মতো। তাই বলছিলাম, তামাসা করা যায় একটি মানুষের মর্যাদা নিয়ে, একাধিক মানুষের প্রাণ নিয়ে, কিন্তু যে ভাষা কোনো জাতির প্রাণের সঙ্গে, মনের সঙ্গে, ভাব ভাবনা ভালবাসার সঙ্গে মহাভাব সম্মিলনে স্থিত হ'য়ে আছে, সেই ভাষার ওপর অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ মারাত্মক পরিণামের কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়।

ভারত সরকার সংবিধানকে সামনে রেখে তেমনিই একটি মারাত্মক আত্মঘাতী ভুলের বীজ বপন করেছেন ২৬শে জানুয়ারীর পুণ্য প্রভাতে। হিন্দী-প্রেমীদের প্রচণ্ড উল্লাসের মধ্য দিয়ে শিশুসুলভ ব্যস্ততার সঙ্গে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না ক'রেই রাতারাতি ভারতের অন্য ১৩টি প্রধান ভাষার ওপর হিন্দীর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য ব্যগ্র হ'য়ে পড়েছেন কেন্দ্রীয় সরকার। এই দায়িত্বহীনতার মাশুল স্বরূপ সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড প্রত্যুত্তর এসেছে দক্ষিণ ভারত থেকে। অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়েছেন দুজন দক্ষিণী নাগরিক এবং বিষপানে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন একজন বিশ বছরের তরুণ—ভারতের ইতিহাসে যা একটি অনন্য ঘটনার সন্নিবেশ করেছে। অথচ বিক্ষোভের এই প্রচণ্ডতার কল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের তথা কংগ্রেসের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিতে ধরা পড়ে নি। ঘটনাস্রোতে এখন আমরা স্তম্ভিত হয়েছি। কিন্তু এ ঘটনা আকস্মিক নয়, আমাদের অবিবেচক সিদ্ধান্তই এই ঘটনার রচয়িতা। হিন্দী-প্রেমীদের আগ্রাসী মনোভাব এ ঘটনার জন্য মূলত দায়ী। পশ্চিমবঙ্গ তথা অহিন্দী-ভাষী অপরাপর রাজ্যেও চাপা বিক্ষোভ যে কোনো মুহূর্তে ফেটে পড়তে পারে এবং দক্ষিণের শিক্ষা আমাদের সেইভাবেই সাবধান করেছে।

এক রাত্রে রুট মার্চ ক'রে হিন্দী-ভাষাকে বাংলা ভাষার ওপর গর্বিত পদভার তুলে দিতে দেখে পশ্চিমবঙ্গ বিস্ময়ে বেদনায় মূক হ'য়ে গেছে। স্টেশনে, পোস্ট অফিসে, দমদম বিমান বন্দরে, বেলভেডিয়ার ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে হুকুমমাত্র বাংলা ভাষাকে মুছে দেওয়ার প্রভুসুলভ মনোভাব হিন্দী গ্রহণে বাঙালীর সদিচ্ছার ওপর অস্থির মমত্বহীন হস্তক্ষেপ করেছে। হিন্দী এবং ইংরেজির পাশে পশ্চিমবঙ্গেও বাংলার কোনো স্থান হয় নি। এ জাতীয় কাজের দ্বারা সর্বত্র বিভ্রান্তি সৃষ্টি হ'চ্ছে এবং হিন্দীর আগ্রাসী রূপটাই প্রকট হ'য়ে উঠছে। এবং এ জাতীয় ঘটনার প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর স্তোকবাক্য কারও কানের ভেতর দিয়ে মর্ম স্পর্শ করছে না। তাঁদের আশ্বাস-বাণীতে সত্য থাকলেও হঠকারী কার্যকারণ সে সত্যকে আবৃত করছে। ইংরেজও এমন ক'রে মায়ের মুখের ভাষা কেড়ে নিয়ে রাতারাতি বিজেতার ভাষাকে বিজিতের কণ্ঠে ঠেসে দিতে পারে নি। এ সমস্তই অহিন্দী সংহতিবাদী ভারতীয়দের শুভ ইচ্ছাকে নষ্ট করার নষ্ট চেষ্টা। এই অবিবেচক হঠকারিতার প্রতিকার এই মুহূর্তে প্রয়োজন এবং সেজন্য ভারত সরকারকেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বহু বৎসরের বিদেশী শাসন শৃঙ্খল মোচনের পর আজ আমরা স্বাধীন আবহাওয়ায় এক জাতীয় পতাকার তলে শ্বাস নিচ্ছি। আজ ঐক্য এবং সংহতি আমাদের একমাত্র কাম্য। কিন্তু উগ্র হিন্দীবাদ সে সংহতিতে যদি ফাটল ধরাতে চেষ্টা করে, তবে হিন্দী-অহিন্দী ভাষাভাষী ভারতীয় মাত্রেই জাতীয় কর্তব্যজ্ঞানে সেই সংহতি বিনষ্টকারী উগ্রতাকে খর্ব করতে এগিয়ে আসবেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

মায়ের মুখের ভাষা

যথার্থ সন্তানের মতো মাতৃজ্ঞানে মায়ের মুখের ভাষা, আমাদের এই বাংলা ভাষাকে রক্ষা করেছিল পূব বাংলার বীর ছেলেরা। পাকিস্তানী হুকুমনামা মানে নি, তোয়াক্কা করে নি সরকারী দমননীতি। বুকের রক্তে মাতৃভাষার আসন ধুয়ে সসম্মানে প্রতিষ্ঠা করেছিল বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের সরকারী ভাষা হিসেবে। আর এদিকে, দু' টুকরো মায়ের এদিকের ছেলেরা, আমরা, কিন্তু দিব্যি স্যুট-নেকটাই এঁটে ব'সে আছি। সরকারী বেসরকারী-কোনো ক্ষেত্রেই পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষাকে চালু করার চেষ্টা করি নি। লজ্জা এবং ঘৃণার কথা।

এবং সেজন্যই ২৬শে জানুয়ারী থেকে বাংলাকে পুরোদমে পশ্চিমবঙ্গের সরকারী ভাষা হিসেবে ব্যাপক ব্যবহারের কথা দ্বিতীয় দফা ঘোষণা করতে হয়েছে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে। ইতিপূর্বে আর একবার হুজুগ উঠেছিল, বাংলায় সরকারী কাজকর্ম সুরু করা হবে। হয় নি। ডিগ্রীধারী বঙ্গসন্তান লজ্জার মাথা খেয়ে (!) বাংলায় 'নোট ড্রাফট' রচনা করতে পারেন নি। বাংলা ভাষা নাকি তাঁদের কলমে সরে না (বলা বাহুল্য, যা সরে তা যথার্থ ইংরেজিও নয়। তবু এই মূর্খ উন্নাসিকতা)। এবারেও অবস্থা অনুরূপ। ছাব্বিশে জানুয়ারী মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বড় আশায় বুক বেঁধে আমার ইংরেজি-জানা বাঙালী ভাইবোনদের প্রশ্ন করেছি,—সরকার তো বাংলা ভাষা ব্যবহারের ঘোষণা করেছেন, তোমরা কি করছ? সঙ্গে সঙ্গে নাক সিটকানো উত্তর এসেছে,—'মাফ কোরো ভাই, বাংলা কলমে সরবে না।' উত্তরে অবাক হই নি। এই আমাদের শিক্ষিত বঙ্গ-ভাষীর চরিত্র, এই নিয়ে আমাদের বড়াই। আমরা না জানি যথার্থ বাংলা, না জানি অন্যতর কোনো ভাষা। কর্মক্ষেত্রে ইংরেজির কতকগুলি বাঁধা গত অভ্যাসে আয়ত্ত হয়েছে আর তাই নিয়ে দিব্যি নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকতে পারি। অথচ বাংলা ভাষা, সাহিত্য যে কালে বিশ্বের দরবারে অন্যতম উন্নত সাহিত্যের মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত, তখন বাঙালীর ছেলেমেয়ের বাংলায় সুষ্ঠু বাক্য রচনা করতে কলম ভেঙে যায়। সত্য বটে, কী বিচিত্র এই দেশ।

যে ভাষা, যে সাহিত্য অতি স্বল্প-কালের মধ্যে বিশ্বের দরবারে সম্মান লুঠ ক'রে এনেছে (১৮৪৭ খৃঃ-এ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বেতাল পঞ্চ-বিংশতি' প্রকাশের পর বাংলা গদ্যে পূর্ণভাষারীতির একটি নির্দিষ্ট ধারা তৈরি হয়।) সেই ভাষা নিয়ে আমরা গর্বিত কিন্তু তাকে সরকারী বেসরকারী খাতে রাজ্যের সরকারী ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্য আজ অবধি কিছুই ক'রে উঠতে পারি নি। এ কথা বাঙালীকে স্মরণ করিয়ে দিতে বাঙালী হিসেবে লজ্জা ও দুঃখ হয়, কিন্তু বেলা গেলে ঘুমন্ত মানুষের ঘুম না ভাঙিয়ে উপায় কি?

তবু সিদ্ধান্ত ঘোষণাই যে বাংলা ভাষার ব্যাপক ব্যবহারে একমাত্র করণীয় নয় এ কথাও অতঃপর সরকারকে উপলব্ধি করতে হবে। রেল স্টেশন বিমান ঘাঁটি, পোস্ট অফিস, যাদুঘর প্রভৃতি জনসংযোগ ক্ষেত্রে ইংরেজি হিন্দীর পাশাপাশি বাংলা ভাষাকেও সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা দরকার। সরকারী ও বে-সরকারী কার্যে বাংলা ভাষার ব্যবহার বাধ্যতা-মূলক না করলে আমাদের কণ্ঠবন্ধনী বা নেকটাই-প্রেমিক প্রশাসনিক কর্তা এবং হীনমন্যতার শিকার সাধারণ করণিককুলের ইংরেজি-প্রীতি (যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্ভুল নয়) বাংলার ব্যবহারকেও হয়ত আবারও ঠেকিয়ে রাখবে।

ধন্যবাদ কলকাতা পৌর প্রতি-ষ্ঠানকে। বাংলা ভাষা চালু করার জন্য তাঁরা সাধ্যমত চেষ্টা করছেন, যদিও ট্যাক্স বিল এখনো ইংরেজিতেই ছাপা হয়, নোটিশপত্রও ইংরেজি। তবে গাড়ি-টাড়িতে বাংলা হরফে চোখ জুড়োয়। পৌরসভা আরও একটু অগ্রসর হ'তে পারতেন। দোকান বাজারের নাম ঠিকানা অর্থাৎ সাইন-বোর্ডগুলিতে ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা রাখার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে পারতেন। রাস্তার নামগুলির ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে বাংলা হরফের ব্যবহার এতোদিনে শেষ ক'রে আনা যেত। বহুক্ষেত্রে তা তাঁরা করেওছেন। কিন্তু বাধ্যতামূলকভাবে সর্বত্র প্লেট বসানো হয় নি। ইদানীং প্রায় প্রতিমাসেই রাস্তার নাম পরিবর্তন করা হচ্ছে। অথচ নতুন নামের পাশাপাশি দোকান বাজারের সাইনবোর্ডে পুরোনো নাম বহাল থেকে যাচ্ছে। কেন, নাম পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বোর্ড পরিবর্তনের নির্দেশ দেওয়া যায় না কি? না গেলে, যাতে তেমন নির্দেশ জারি করা যায় এমন আইনগত ক্ষমতা গ্রহণ করা উচিত। আর আইন করা তো খুব একটা কঠিন কাজ ব'লে মনে হয় না, ভোটে ফেললেই আইন। ঐ আইনে বাংলার ব্যবহারটুকুও বাধ্যতামূলক ব'লে নির্দেশিত থাকলে বাংলা ভাষার ব্যাপক ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা খানিকটা এগিয়ে যেতে পারি।

বাংলা ভাষায় কাজ-কারবার পাকা-পাকিভাবে সুরু করার ক্ষেত্রে প্রধান

অন্তরায় নাকি উপযুক্ত টাইপ রাইটারের অভাব। বাস্তবিক এতোবড় একটা সমস্যা আমাদের মাতৃভাষাকে উপযুক্ত আসনে বসাবার উপযুক্ততম অন্তরায়ই ঘটে। এ্যাটম বোমা তৈরি করার জন্য আমরা হাতাহাতি মারামারি ধাক্কাধাক্কি করতে পারি, কিন্তু টাইপ রাইটারের সমস্যাটা বড়ই জটিল। ও'র গ্রন্থিমোচন একদিনের কাজ নয়। বাংলা শর্টহ্যাণ্ড বা সাংকেতিক লিপি ইতিমধ্যে অনেকে শিখে ফেলেছেন, আবার হতাশ হ'য়ে অনেকে মাঝপথে শিক্ষায় ছেদও টেনেছেন। লাভ নেই। কবে বাংলা পাকাপোক্তভাবে চালু হবে, কবে চাকরি জুটবে, জুটলেও ইংরেজি স্টেনোগ্রাফারের মতো সুযোগ-সুবিধা ও মাহিনা মিলবে কি না প্রভৃতি আশঙ্কায় অনেকে উৎসুক থাকলেও পিছিয়ে আসছেন। এঁদের এই বিভ্রান্তি দূর করার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন আছে।

দোকান বাজারের সাইনবোর্ডে ও রসিদ বই-এ, ছবিঘরের প্রবেশপত্রে, স্কুল-কলেজে, অফিস-আদালতের যাবতীয় কাজকর্মে আমরা এখনই উদ্যোগী হ'য়ে বাংলা চালু করতে পারি। সরকারী উদ্যোগে ইলেকট্রিক সাপ্লাই-এর বিলে, ট্রাম-বাসের টিকিটে, হরিণঘাটার কার্ডে বাংলার স্থান ক'রে দেওয়া যায়। কর্মের খাতিরে যা কিছু প্রতিদিন মানুষের হাতে হাতে ফেরে তাতেই আমরা বাংলা ভাষার অক্ষরকে দেখতে পেলে বাংলার ব্যাপক ব্যবহার আপনি চালু হ'য়ে যাবে।

আমরা সমবেত চেষ্টায় বাংলাকে চালু করতে পারলাম না, এ দুঃখের যেন পুনরাবৃত্তি না করতে হয় ভবিষ্যতে এই আশা রাখলাম।

পূর্বাঞ্চল পরিষদ

রাজধানীতে অনুষ্ঠিত স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রীর সভাপতিত্বে পূর্বাঞ্চল পরিষদের নবম অধিবেশন সমাপ্ত হ'ল। অধিবেশনে গৃহীত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব বাস্তবে ফলপ্রসূ হলে জন-সাধারণের অনেক অভাব-অভিযোগের সুরাহা হবে। দুর্নীতি দূরীকরণ, প্রশাসনিক ব্যবস্থায় লাল ফিতে ও মন্থরতা নিবারণ, সরকারী কাজে পদমর্যাদা নির্বিশেষে নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সাধারণের অভাব-অভিযোগ বিবেচনার জন্য বিশেষ সংস্থা গঠনের প্রস্তাব সাধারণ্যে অভিনন্দন লাভ করবে। প্রশাসনিক ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করার জন্য নতুন দপ্তর স্থাপনের সংবাদে খুশি হ'লেও আমাদের বাড়তি খরচের দিকটাও বিবেচনা করা উচিত। দপ্তরের সংখ্যাবৃদ্ধিতে যদি সত্যকার কাজ হয় তবেই নূতন দপ্তর চালু করার সার্থকতা। দুর্ভাগ্যবশত দেশে দপ্তরের পর দপ্তর বাড়ে, কাজের মধ্যে দীর্ঘসূত্রতা, গাফিলতি কিন্তু দূরীভূত হয় না। আশার কথা এই যে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতি দেশ ক্রমশ আস্থাশীল হ'য়ে উঠছে এবং তাঁর সতর্ক দৃষ্টির আওতায় থাকলে ভবিষ্যতে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় যে কার্যকরী রদবদল হবে এমন আশাও আমাদের মনে ভরসা সঞ্চয় করেছে।

চাকরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে কোনো কোনো রাজ্য সরকার যে ডোমিসাইল্ড নাগরিকদেরই এক-চেটিয়া সুযোগ দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, পরিষদের আলোচনায় সে সিদ্ধান্তকে অন্যায় ব'লে চিহ্নিত করা হয়েছে। পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য সরকার-সমূহের প্রতিনিধিরাও এ জাতীয় অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি হবে না ব'লে আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু প্রজাতন্ত্রী ভারতে এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে কেবল

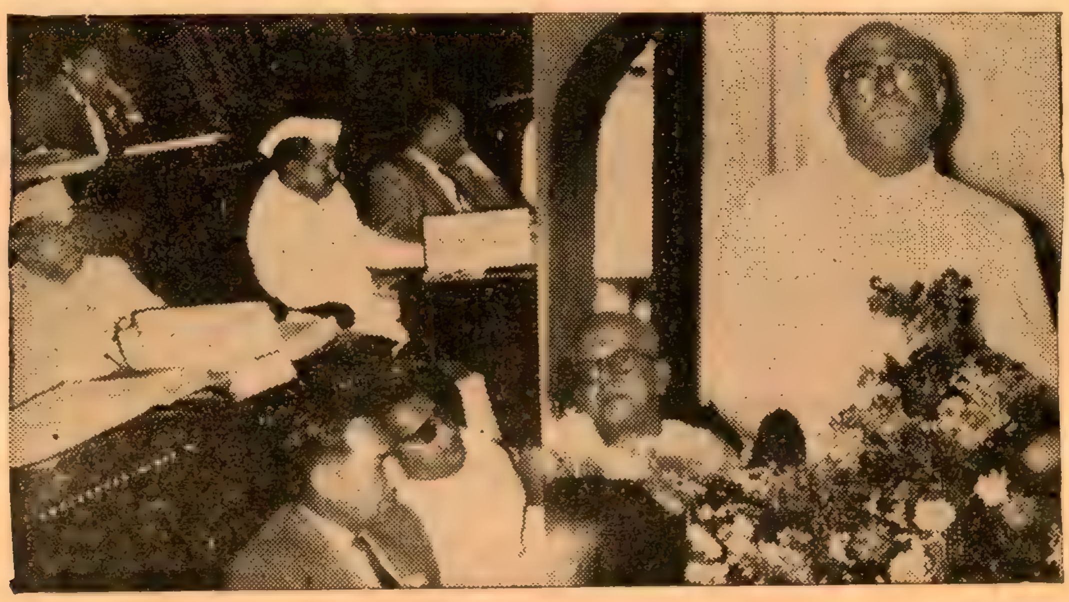

কলকাতায় সর্বভারতীয় মেয়র সম্মেলনের একটি দৃশ্য

মাত্র আশ্বাস গ্রহণ করতে হয় কেন? যে সংবিধানে ভারতের নাগরিকমাত্রেরই সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগের অধিকার স্বীকৃত, সেই সংবিধানের দ্বারা আবদ্ধ রাজ্য সরকারগুলি সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতার মনোভাবকে কেমন ক'রে প্রশ্রয় দেওয়ার সাহস পান। পরিষদে স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজ্যের প্রতিশ্রুতি না নিয়ে বরং ভারতের প্রত্যেক রাজ্য সরকারকে কড়া নির্দেশ দিতে পারতেন যে, যে সিদ্ধান্ত প্রাদেশিক মনোভাবপ্রসূত এবং যার দ্বারা বৃহত্তর ভারতের সংহতি বিনষ্ট হ'তে পারে, এমন কিছু গ্রহণ করার চেষ্টায় যেন রাজ্য সরকারগুলি ভবিষ্যতে বিরত থাকেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় শিল্প উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে শিল্পপতি শ্রী কে বিড়লা বিহার রাজ্যে কয়লাখনি মালিকদের প্রতি বিহার সরকারের নির্দেশনামাকে সঙ্কীর্ণ মনোভাবপ্রসূত ব'লে উল্লেখ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও বিষয়টি পূর্বাঞ্চলীয় পরিষদের নজরে আনেন। বস্তুতপক্ষে বিহার সরকার যেমন কেবলমাত্র বিহারীদের জন্যই চাকরি সংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে খনি-মালিকদের ওপর নির্দেশ জারী করেছেন, তেমনিভাবে প্রত্যেক রাজ্য যদি নির্দেশ দেন, তাহলে ভারতে ভারতীয় নাগরিকদের অবাধ বসবাসের সুযোগও (যা সংবিধান স্বীকৃত) প্রত্যাহার ক'রে নেওয়া হয়। শ্রীবিড়লা এ জন্য বিষয়টি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারকে অবহিত করতে চেয়েছেন। রাজ্যের প্রতিশ্রুতি নয়, এ-জাতীয় নির্দেশ দানের কোনো ক্ষমতাই যাতে রাজ্য সরকার প্রয়োগ না করত পারেন তার জন্য অবিলম্বে কেন্দ্রীয় নির্দেশ জারী হওয়া আবশ্যক।

মেয়র সম্মেলন

কলকাতা পৌর কেন্দ্র ভবনে অ ষ্ঠিত সর্বভারতীয় মেয়র সম্মেলনেও ভাষা নিয়ে একচোট হৈ-চৈ হ'য়ে গেল। হায়দ্রাবাদের মেয়র হিন্দীতে বক্তৃতা করতে উঠলে মাদ্রাজের মেয়র উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, ঐ ভাষা তিনি বুঝতে পারছেন না। তখন চেয়ারম্যান বক্তৃতা ইংরেজিতে অনুবাদ ক'রে দেওয়া হবে ব'লে আশ্বাস দেন। হিন্দীভাষীদের খুব সুবিধে হয়েছে, যত্রতত্র হিন্দী ব'লে গেলেই হ'ল, তা শ্রোতা বুঝুন বা না বুঝুন। এরপর তো তাঁদের আর কোনো ভাষা না শিখলেও চলবে, সারা ভারত দাপিয়ে যখন হিন্দী পদার্পণ করছে তখন আর বিলম্বে কাজ কি। যাই হোক নির্বাচনেও হিন্দীরই জয়জয়কার হয়েছে। যথাক্রমে দিল্লী ও আমেদাবাদের মেয়রদ্বয় চেয়ারম্যান ও ডেপুটী চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হয়েছেন।

অধিকারের প্রশ্নে মেয়রবৃন্দ একটি বিষয়ে সমস্বরে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। সরকারী অনুষ্ঠানে মেয়রদের যথোচিত মর্যাদা দেওয়া হয় না। প্রশ্নটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সাধারণের দ্বারা নির্বাচিত ও স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে তাঁর যথোচিত মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা অসঙ্গত। মেয়রের স্থান আই-জি'র মতো সরকারী চাকুরেরও পরে হলে সাধারণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। বিশেষত মেয়রের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ পদের মর্যাদা যথার্থভাবে রক্ষিত হয় না। বিষয়টি আলোচিত হওয়া উচিত এবং সমুচিত ব্যবস্থাও গৃহীত হওয়া আবশ্যক।

রাষ্ট্রীয় সম্মান

প্রজাতন্ত্র দিবসে বর্তমান বছরে বাংলা দেশের সর্বজনশ্রদ্ধেয় যে তিনজন ব্যক্তিকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে, সমগ্র ভারতবর্ষে তাঁরা তর্কাতীত শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত। দেশ এঁদের কাছে অনেক পেয়েছে তাই উপাধি বিতরণের দ্বারা দেশ এঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রকাশ করছে। উপাধি প্রাপককে বড় করে না, প্রাপক উপাধি গ্রহণ ক'রে উপাধিকে মর্যাদা দান করেন। বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্র প্রযোজক শ্রীসত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষকে বিশ্বের দরবারে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। চিকিৎসাজগতে গভীর গবেষণা ও উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য ডাঃ যোগেশচন্দ্র ব্যানার্জী সুপরিচিত। শিক্ষাবিদ ডঃ ত্রিগুণা সেন শিক্ষাজগতে গুণীশ্রেষ্ঠদের অন্যতম। তাঁর পরিকল্পনায় এবং কর্মদক্ষতায় আমরা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সুউন্নত বর্তমান রূপ দেখে বিস্মিত হই। কত স্বল্পদিনের প্রচেষ্টায় কি বিরাটকে গঠন করা যায় ডঃ সেন তার অলজ্যান্ত প্রমাণস্বরূপ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন।

আর পুরস্কার পেয়েছে হুগলী জেলার একটি অসমসাহসী বারো বছরের বালক শ্রীমান নির্মলকুমার মুখোপাধ্যায়। নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে সে নিমজ্জমান একটি নয় বছরের বালককে রক্ষা করল রাক্ষুসে হুগলী নদীর করাল গ্রাস থেকে। রাষ্ট্রপতি এই বীর বালককে জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত করেছেন। সাহসিকতার জন্য রাষ্ট্রপতির পুলিশ পদক লাভ করেছেন আর একজন অকুতোভয় বাঙালী সন্তান শ্রীদেবী রায়। ইনি ১৯৫২ সালে গ্যালাণ্ট্রি মেডেল ও ১৯৫৮ সালে পুলিশ পদক লাভ ক'রে কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যময় কর্মজীবনের পরিচয় দিয়েছিলেন।

মেদিনীপুর জেলার চিত্রকর পরিবারে জন্মগ্রহণ ক'রে পটুয়াশিল্পী শ্রীরজনীকান্ত চিত্রকর ৭২ বছর শিল্প সাধনায় নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন। তাঁর পটচিত্র, মূর্তি ও খেলনা তৈরির কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ রাষ্ট্রপতি রজনীকান্ত চিত্রকরকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কারুশিল্পী হিসেবে পুরস্কৃত করেছেন।

১৯৬৪ সালের আকাদেমি পুরস্কার

লাভ করেন 'যত দূরেই যাই' কাব্যগ্রন্থের কবি শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায়। ১৯৬১-৬৩ সালের মধ্যে প্রথম প্রকাশিত যাবতীয় বাংলা বই-এর মধ্যে কবি শ্রীমুখোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থই শ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকার লাভ করেছে। বাংলার কাব্যানুরাগী মাত্রেই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার সঙ্গে পরিচিত। মিষ্টভাষী পায়জামা পরিহিত তীক্ষ্ণ চেহারার এই তরুণ কবি জীবনাদর্শে মার্কসবাদী, কবিভাবনায় বিপ্লবী। মিছিলের পুরোভাগে তারুণ্য

● ডঃ ত্রিগুণা সেন

উজ্জ্বল সেই 'পদাতিক' কবির জয়যাত্রার পথের দিকে আরও প্রাপ্তির আশা নিয়ে আমরা সর্বদা প্রতীক্ষায় আছি।

চব্বিশ পরগণা:

কাঁচড়াপাড়া যক্ষ্মা হাসপাতালের চূড়ান্ত অব্যবস্থার এক করুণ কাহিনী জনৈকা রোগিণীর পত্রে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। রোগিণী তাঁর পিতাকে বাড়ি থেকে চাল, সরষের তেল এবং খাবার নিয়ে হাসপাতালে যাওয়ার জন্য করুণ আবেদন জানিয়েছিলেন। আশ্চর্য, যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসার জন্য যে হাসপাতাল সেখানে উপযুক্ত পথ্য দূরের কথা রোগীদের জন্য পর্যাপ্ত আহারেরও ব্যবস্থা নেই। অথচ এই রাজরোগে উপযুক্ত পথ্য একান্ত প্রয়োজন! কিন্তু কাঁচড়াপাড়া যক্ষ্মা হাসপাতাল রোগী-রোগিণী নিয়ে যে বিশেষ মাথা ঘামান না বর্তমান সংবাদই তার সাক্ষ্য নয়। গত বছর হাসপাতালের পরিচালন-ব্যবস্থায় গুরুতর ত্রুটির জন্য বিধানসভায় তর্কের তুফান উঠেছিল। কিন্তু যে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ চোখে ঠুলি পরে কানে তুলো গুঁজে বসে থাকেন, তাঁদের সচেতন করতে বুঝি আরও কঠোরতর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন। বিভিন্ন হাসপাতাল নিয়ে এ পর্যন্ত বহু রকমের অভিযোগ হয়েছে, কিন্তু দেশের বহু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষই তাতে কর্ণপাতের আদৌ কোনো কারণ খুঁজে পান না। রাজ্যের স্বাস্থ্যদপ্তরই বা প্রতিবিধানের কী উপায় করেন সাধারণে তা আর জানতে পারেন না।

বর্ধমান:

ভারতীয় শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি নতুন অধ্যায় যোজনা করল। এই প্রথম কেবলমাত্র ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারদের তত্ত্বাবধানে ভারতে একটি ইস্পাত কারখানা সম্পূর্ণভাবে নির্মিত হয়েছে। আর এই প্রথম ভারতবর্ষে এশিয়ার সব চেয়ে শিল্পোন্নত দেশ জাপানের সহযোগিতায় ভারতীয় ইস্পাত কারখানা গড়ে উঠল। ১৯৬৭ সালের আগে এই কারখানায় কোনো উৎপাদনের সম্ভাবনা নেই। অবশ্য ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারদের প্রচেষ্টায় কারখানায় উৎপাদনের কাজ আরও আগে সুরু হতে পারে। জাপান এই মিশ্র ইস্পাত কারখানার জন্য প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রার যোগান দিয়ে ভারতবাসীর অকুণ্ঠ ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন।

• • •

সংবাদে প্রকাশ, বর্ধমান জেলার জনৈক কংগ্রেস নেতা বক্তৃতা প্রসঙ্গে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের ওপর জেলা কংগ্রেসকে প্রভাব বিস্তার করার জন্য নাকি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের ওপর সমুচিত আস্থা রাখতেও আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু দীর্ঘকাল জেলা কংগ্রেসের নেতৃপদে থেকেও ইচ্ছাকৃত-ভাবেই এই নেতাই আবার বুদ্ধিজীবীদের সংস্রব সযত্নে পরিহার ক'রে গেছেন। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, বর্ধমানের মতো বর্ধিষ্ণু জেলায়, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, স্কুল-কলেজ সমেত শিক্ষাবিদরা স্থায়ী বসবাস সুরু করেছেন, বর্ধমান 'বারে' গুণী আইনজ্ঞের অসদ্ভাব নেই এবং সুশিক্ষিত চিকিৎসকবৃন্দের অপ্রতুলতা নেই, সেখানে এই কংগ্রেসী নেতা জেলা কংগ্রেসে উপযুক্ত সংখ্যক বুদ্ধিজীবীকে আকর্ষণ ক'রে আনেন নি কেন। বিপন্ন সংখ্যক কংগ্রেসকর্মী

● শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায়

তথা জেলাবাসিগণ মনে করেন জেলা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মানসিক দুর্বলতাই এর প্রধান কারণ। পাছে বুদ্ধিজীবীর সংখ্যাবৃদ্ধিতে বর্তমান নেতৃত্বের আসন টলমল করে এই আশঙ্কায় কৌশলে জেলা কংগ্রেস উপযুক্ত বুদ্ধিজীবী সদস্য গ্রহণে বিরত থেকেছেন। সংবাদের সত্য মিথ্যা অনুসন্ধান সাপেক্ষ, কিন্তু সংবাদের মূলে যদি কিছুমাত্র সত্য থেকে থাকে, তবে বলতে হয় বর্ধমান জেলা কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তিকে বর্তমান নেতৃবৃন্দ দুর্বল ক'রে তুলছেন, যার প্রতি কংগ্রেসের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া আশু প্রয়োজন আছে।

চার্লি চ্যাপলিন

অশোক সেন

এই নামটিতেই যেন যাদু মাখানো আছে। চার্লি বলার সঙ্গে সঙ্গেই চোখের ওপর ভেসে ওঠে সেই বিখ্যাত ভবঘুরের ছবি—ঢলঢলে ট্রাউজার্স, কিম্ভূতকিমাকার জুতো এবং অদ্ভুত ধরণের গোঁফ—পরে হিটলারেরও এই ধরণেরই গোঁফ ছিল বটে—কিন্তু অরিজিন্যালিটির কৃতিত্ব চ্যাপলিনেরই। ছেলে থেকে বুড়ো অবধি, এমন কোনো বয়সেরই লোক দেখা যায় না, যিনি চ্যাপলিনের অভিনয় দেখে মুগ্ধ না হয়েছেন।

কৃষ্টি, শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি আমোদ-প্রমোদ যে কোন দিক থেকেই বিচার করে যদি প্রশ্ন করা যায়, ছায়া-ছবির শ্রেষ্ঠ অবদান কি, তার একমাত্র উত্তর হবে 'চার্লি চ্যাপলিন'।

ফিল্ম-শিল্পের আদিযুগ থেকে এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত তিনি সমান নিষ্ঠা ও তৎপরতার সঙ্গে ছবির পর ছবি তুলে এসেছেন। শুনেছি তাঁর শেষ ছবি The King in New York নাকি flop করেছে। এর জন্য ছবির দোষ কতটা দায়ী কে জানে। রাজনৈতিক কারণেই নাকি ছবিটি আমেরিকানদের সমর্থন পায় নি।

কিছুদিন আগে চ্যাপলিনের আত্মজীবনী ধারাবাহিকভাবে কিছুটা ছাপা হয়েছিল লণ্ডনের Sunday Times-এ। সম্প্রতি পূর্ণাঙ্গ আত্মজীবনীটি বই হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে The Bodley Head (London) কোম্পানী থেকে।

বহু তথ্য এই বইটি থেকে পাওয়া যায়। যথা,—চ্যাপলিনের কাজের ধারা, তাঁর অভিনয়রীতি, তাঁর জীবনের প্রেম-বিরহের ইতিহাস, তাঁর বন্ধুবান্ধবদের কথা, আসামীরূপে তাঁর বিচারের কথা এবং সর্বোপরি চ্যাপলিনের জীবনদর্শন।

চ্যাপলিনের জীবনী সুরু, নাইনটিজের লণ্ডনে—যে লণ্ডনের সবকিছু বৈশিষ্ট্য আজ অতীতের ইতিহাস বলেই গণ্য এবং কেনিংটন রোডের অসংবদ্ধ বোহেমিয়ান পরিবেশে। এখানে ছেলেবেলা থেকেই কঠিন বাস্তব-জীবনের বহু ঘাত-প্রতিঘাত এবং ঝড়ঝাপটা চ্যাপলিনকে সহ্য করতে হয়েছিল বেশ কয়েক বছর। তবু ঐ বয়স থেকেই তিনি ছিলেন দুর্দান্ত এ্যাডভেঞ্চারার—মাঝে মাঝে নিদারুণ অসাফল্য এসে তাঁর মনকে গভীর হতাশায় ভরে দিয়েছে। পেশাদার শিল্পী হিসাবে তিনি প্রথম মঞ্চাবতরণ করেন আট বছর বয়সে।

এরপর ইংলণ্ড ছেড়ে কার্নোর দলের সঙ্গে গেলেন আমেরিকাতে। এখানে পরে চ্যাপলিন ম্যাক্-সেনেটের ফিল্ম কোম্পানীতে যোগ দেন এবং এইখানেই সৃষ্টি হয় চার্লির জগদ্বিখ্যাত ভবঘুরে চরিত্রটি।

১৮৮৯ সালের ১৬ই এপ্রিল, রাত্রি আটটায় ওয়ালওয়ার্থের ইস্ট লেনে চ্যাপলিনের জন্ম হয়। এরপর চ্যাপলিনরা উঠে যান ওয়েস্ট স্কোয়ারে, ল্যাম্বেথের সেণ্ট জর্জেস রোডে। প্রথম দিকটায় এঁদের অবস্থা মোটের ওপর ভালই ছিল। তিনটি আসবাবপত্র-ভরা ঘরে এঁরা থাকতেন।

চার্লির মা ভ্যারাইটি স্টেজে সুব্রেটের ভূমিকায় (ওপেরায় নায়িকার পরিচারিকা) অভিনয় করতেন—বয়স তাঁর তখন কুড়ির শেষ কোঠায়—চেহারার ভেতর সৌন্দর্যের থেকে মাধুর্য ছিল বেশি—এইজন্যই সবাই তাঁকে ভালবাসতেন। প্রত্যেক রবিবার সিডনে এবং চার্লিকে সুন্দর পোষাকে সাজিয়ে মা তাদের নিয়ে বেড়াতে বের হতেন কেনিংটন রোড দিয়ে—সিডনে পরতো ইটন-স্যুট ও লম্বা ট্রাউজার্স, আর চার্লি নীল ভেলভেটের পোষাক এবং তার সঙ্গে মিলিয়ে নীল দস্তানা।

তখনকার লণ্ডন ছিল শান্ত, ধীর, স্থির। সাধারণ জীবনধারাও ধীর গতিতেই বয়ে যেত। ঘোড়ায় টানা ট্রাম গাড়িগুলোও ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজ রোড দিয়ে শান্ত তালেই চলতো। এই সময়টা ছিল মায়ের স্বচ্ছলতার অবস্থা—চার্লিরা এবার ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজ রোডে একটি ফ্ল্যাটে উঠে এলেন। এখানকার পরিবেশটা ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ এবং আমোদে ভরা। দোকানপাট, রেস্তোরাঁ এবং মিউজিক হলগুলোর জাঁকজমক দেখে সবাই আকর্ষণ বোধ করতো।

মা মাঝে মাঝে চার্লিদের রয়েল একোয়ারিয়াম দেখতে নিয়ে যেতেন—তারপর ক্যাণ্টারবারী মিউজিক হলে।

এর কিছুকাল পরেই চ্যাপলিন—

যদিও তিনি তখন খুবই অল্পবয়স্ক---বেশ বুঝতে পারলেন, তাঁর মায়ের মনে আর আগেকার শান্তি নেই। একদিন চ্যাপলিন মেঝেতে বসে খেলা করছিলেন। মা সারা সকাল এক বান্ধবীর সঙ্গে বাইরে গিয়েছিলেন---ফিরে যখন এলেন, তখন তিনি খুবই উত্তেজিত। আবেগ ভরা গলায় এবং চোখ দিয়ে এসময় জল পড়ছিল, বান্ধবীকে বলছিলেন---আর্মস্ট্রং এই প্রশ্ন করলো---আর্মস্ট্রং ঐ প্রশ্ন করলো---আর্মস্ট্রং একটি জানোয়ার--- ইত্যাদি।

মায়ের এই ধরণের অস্বাভাবিক উত্তেজনা দেখে ভয়ে শিশু চার্লি কাঁদতে সুরু করলেন---মা এরপর তাঁকে কোলে তুলে নিয়ে শান্ত করলেন। কয়েক বছর পরে ---অর্থাৎ যখন একটু বয়স হয়েছে---চার্লি সেদিন তাঁর মায়ের সেই উত্তেজনার আসল কারণটা বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর মা সেদিন আদালত থেকে ফিরেছিলেন---স্বামীর বিরুদ্ধে তিনি আদালতে কেস করেছিলেন, তাঁর সন্তানদের ভরণ-পোষণের দাবি জানিয়ে। আর্মস্ট্রং ছিলেন চার্লির বাবার পক্ষের উকিল---কেসটা সেদিন মায়ের বিরুদ্ধেই যাচ্ছিল।

চার্লি স্বীকার করেছেন যে, এই বয়সটায় বাবার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি খুব একটা সচেতন ছিলেন না। চার্লির বাবাও ছিলেন ভডেভিলিয়ান (নৃত্য-গীতপ্রধান নাট্যের অভিনেতা)। তাঁর চেহারার সঙ্গে নাকি নেপোলিয়নের চেহারার সাদৃশ্য ছিল।

তাঁর ছিল হাল্কা ব্যারিটোন (উদাত্ত স্বরের) ভয়েস---বড় শিল্পী বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। তখনকার দিনেও তিনি সপ্তাহে চল্লিশ পাউণ্ড রোজগার করতেন---সেই সময়ের মান অনুসারে বিরাট মাইনে। আসলে তাঁকে নিয়ে মুস্কিল হত এই যে, তিনি বড্ড বেশি মদ খেতেন। আর এই কারণেই তাঁর মা'র সঙ্গে তাঁর বাবার বিচ্ছেদ ঘটে।

চার্লি কিন্তু পানাসক্ততার জন্য বাবাকে খুব দোষী করেন নি। বরং বলেছেন, সে সময় ভডেভিলিয়ানদের পক্ষে অতিরিক্ত পান না করাটা একটা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। প্রত্যেক থিয়েটারেই তখন এ্যালকহল বিক্রি করা হোত---তখনকার রীতি ছিল এই যে, অভিনয় শেষে নটেরা দর্শকদের সঙ্গে বারে বসে মদ খাবেন। অনেক থিয়েটারে টিকিট বিক্রি থেকে যা লাভ হোত, তার থেকে ঢের বেশি লাভ হোত বারের থেকে। স্টারদের বেশি মাইনে দেওয়া হোত---তাদের প্রতিভার মান

● সাড়ে সাত বছর বয়সে চ্যাপলিন

বিচার করে নয়, তাঁর থিয়েটারের বারে এসে প্রচুর টাকার মদ খাবেন বলে। অতিরিক্ত মদ্যপানে অনেক নটের জীবন সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যেত---চ্যাপলিনের বাবার ক্ষেত্রেও ঠিক তাই ঘটেছিল। অত বেশি মদ খাবার বিষময় ফল ফলতে বিশেষ দেরি হয় নি---মাত্র সাঁইত্রিশ বছর বয়সে তিনি মারা যান।

চার্লি চ্যাপলিনের মা'রা দুই বোন---তাঁর মা'ই বড়। দাদামশায় চার্লস হিল্, জাতিতে আইরিশ---পেশায় মুচি, আয়ার্ল্যাণ্ডের কর্ক কাউন্টি থেকে লণ্ডনে আসেন। এখানে এসে বুট মেরামতের ব্যবসা সুরু করেন। দিদিমার শরীরে জিপসি রক্ত ছিল কিছুটা পরিমাণ। চার্লির ছ' বছর বয়স হবার আগেই তিনি মারা যান। মা-মাসি দুজনেই অল্প বয়েসে ঘর ছেড়ে মঞ্চাভিনয়ে যোগ দেন। আণ্টুকেটও ছিলেন সুব্রেট---তাঁর সঙ্গে চার্লিদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল না। একটানা কখনও তাঁকে চার্লিরা নিজেদের মধ্য পান নি---হঠাৎ কখনও এসে হাজির হতেন, আবার হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে যেতেন। যেমন সুন্দরী, তেমনি মেজাজী---চার্লির মা'র সঙ্গে কোনদিনই তাঁর বনিবনা হোত না। আঠারো বছর বয়সের সময় এক মধ্য-বয়সী ভদ্রলোকের সঙ্গে চার্লির মা আফ্রিকাতে পালিয়ে যান। সেখানে খুব বিলাসের ভেতর তাঁদের দিন কাটতো---এখানে চাষ-আবাদের উপনিবেশের মালিক ছিলেন ভদ্রলোকটি ---বহু চাকর-বাকর এবং ঘোড়ার মালিক বলে তাঁর নামডাক ছিল। এইখানেই চার্লির দাদা সিডনের জন্ম হয়। চার্লি মা'র কাছে শুনেছেন যে, ভদ্রলোকটি নাকি একজন লর্ড ছিলেন এবং সিডনের একুশ বছর হবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরাধিকারসূত্রে দু' হাজার পাউণ্ড পাবে।

মা বেশিদিন আফ্রিকাতে থাকেন নি---ফিরে এসে পূর্ব-প্রেমিক চার্লির বাবাকে বিয়ে করেন। এই বিয়ের তিন বছর বাদে চার্লির জন্ম হয়। চার্লির জন্মের এক বছর বাদেই তাঁর বাবা-মা'র ভেতর সেপারেশন হয়ে যায়---অতিরিক্ত মদ্যপানই এর একমাত্র কারণ কিনা তা চার্লির জানা নেই। মা আগে বাবার থেকে খোরপোষ দাবি করেন নি। তিনি নিজেও ছিলেন স্টার---সপ্তাহে রোজগার করতেন পঁচিশ পাউণ্ড---সুতরাং স্বচ্ছন্দে নিজের এবং দুটি সন্তানের সমস্ত খরচ চলে যেত ঐ টাকায়। ভাগ্যের দুর্বিপাকে যখন রঙ্গমঞ্চের

চাকরি ছাড়তে বাধ্য হন, তখনই—আদালতের আশ্রয় নিতে হয় স্বামীর বিরুদ্ধে।

চার্লির মা'র কণ্ঠস্বর কোনদিনই খুব সবল ছিল না। অল্প ঠাণ্ডা লাগলেই ল্যারিনজাইটিস হোত। কিন্তু ছুটি নিয়ে গলাকে বিশ্রাম দেবার অবসর ছিল না। ক্রমশ গলার অবস্থা আরও খারাপের দিকে যেতে থাকল। অনেক সময় হোত কি মঞ্চে যখন গান গাইছেন, মাঝামাঝি সময়, হয় গলা ভেঙে গেল বা একেবারে বসে গেল। এর ফলে দর্শকরা হাসাহাসি সুরু করতো, বা অনেক সময় টিট্‌কারী দিতে থাকতো। গলার অবস্থা নিয়ে চিন্তা করতে করতে ক্রমশ শরীর ভেঙে যেতে লাগল—নার্ভের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়ল।

মায়ের গলার এই অবস্থার জন্যই পাঁচ বছর বয়সে চার্লিকে প্রথম মঞ্চাবতরণ করতে হয়। এই সময়টার বেশির ভাগ রাত্রেই মা চার্লিকে বাড়িতে একলা থাকতে না দিয়ে সঙ্গে করে থিয়েটারে নিয়ে আসতেন। তিনি তখন অল্ডারসটের একটি মঞ্চে অভিনয় করতেন। এখানকার দর্শকরা—সবই প্রায় সৈনিকের দল—হৈ চৈ এবং গণ্ডগোল করবার জন্য বিখ্যাত ছিল। অল্ডারসটে এক সপ্তাহ প্রদর্শনী করতে হবে শুনলে যে কোন দলই তখনকার দিনে ভয় পেত।

এক অভিনয়ের রাত্রিতে চার্লি উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। হঠাৎ স্টেজের ওপর গান করতে করতে তাঁর মা'র গলা ভেঙে গেল—ফলে গানের বদলে একটা ফিসফিসানির আওয়াজ আসতে লাগল। আর সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের ভেতর হাসি, হুল্লোড়, চিৎকার, বেড়ালের ডাক সুরু হয়ে গেল। ব্যাপারটা কি হচ্ছে চার্লির ঠিক স্পষ্টভাবে বোঝবার বয়স হয় নি তখনও। কিন্তু গোলমাল ক্রমশ বাড়তে লাগল এবং তাঁর মা বাধ্য হয়ে ভেতরের দিকে চলে এলেন। স্টেজের ম্যানেজার এর আগে চার্লিকে মায়ের

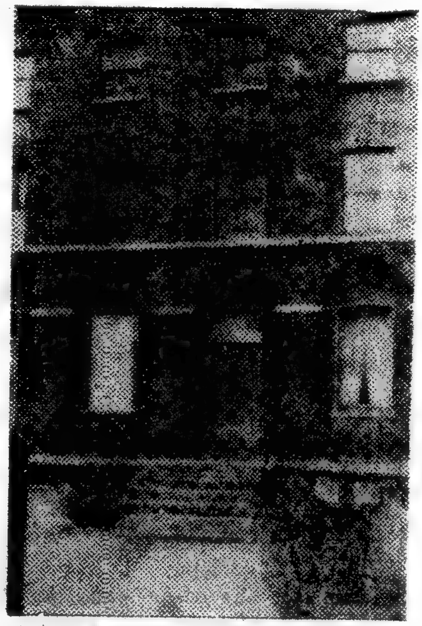

● কেনিংটনে

বন্ধু-বান্ধবীদের সামনে গান এবং অভিনয়ের অনুকরণ করতে দেখেছেন। তিনি করলেন কি, খালি স্টেজে চার্লির হাত ধরে নিয়ে এসে দর্শকদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন এবং নিজে স্টেজ থেকে সরে গেলেন। সামনে ফুট্‌ লাইটের চোখ-ঝল্‌সানো তীব্র আলো—মঞ্চের ওদিকের লোকেদের মুখগুলো যেন ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে মনে হচ্ছে—চার্লি গান ধরলেন, অর্কেস্ট্রা-বাদকেরা অল্প সময়ের ভেতরেই চার্লির গলার পর্দা ধরে নিয়ে বাজাতে সুরু করল। গানটি দর্শকদের খুবই পরিচিত—

Jack Jones well and known
to everybody...

গানের মাঝামাঝি সময়েই স্টেজের ওপর টাকার বৃষ্টি সুরু হোল—গান থামিয়ে চ্যাপলিন দর্শকদের বললেন আগে টাকাপয়সা কুড়িয়ে নিয়ে, ফের গান সুরু করবেন। ভারি মজা লাগল দর্শকদের—তাঁরা হো হো করে হেসে উঠল। স্টেজ ম্যানেজার একটি রুমাল হাতে করে এসে তাকে সাহায্য করতে লাগলেন টাকা কুড়োতে—চার্লির ভাব দেখে বোঝা গেল তাঁর ভয় হচ্ছে ম্যানেজার নিজেই না টাকাগুলো মেরে দেন। দর্শকরা একথা জানতে পেরে আরও উচ্চরবে হেসে উঠলেন—ভেতরে গিয়ে মায়ের হাতে সব টাকাটা তুলে দেবার পর তবে চার্লির শান্তি। ফের স্টেজে ফিরে এসে গান সুরু করলেন—এ ব্যাপারটা তাঁর কাছে অত্যন্ত সহজ মনে হচ্ছিল। দর্শকদের সঙ্গে বেশ সহজভাবে আলাপ করলেন, তাদের নাচ দেখালেন এবং শেষে করলেন নানা বিষয়ের অনুকরণ। এমন কি নিজের মায়ের গাওয়া আইরিশ মার্চ সংটিও ধরলেন—

Riley, Riley, that's the
boy to beguile ye, etc.

গানটি ফিরে গাইবার সময় মায়ের অনুকরণে ভাঙা গলা করে গাইতে আরম্ভ করে দিলেন। দর্শকের দল যেন উল্লাসে ফেটে পড়লেন—চারদিক থেকে সবাই চিয়ার্স দিতে লাগল, আর টাকার বৃষ্টি সুরু হোল স্টেজের ওপর। মা এবার তাঁকে ভেতরে নিয়ে যেতে এলেন। তিনি স্টেজের ওপর এসে দাঁড়াতেই দর্শকের দল বিরাট সম্বর্ধনা জানালো তাঁকে। সেই রাত্রেই চার্লির প্রথম মঞ্চাবতরণ—আর তাঁর মা'র পক্ষে সেটিই শেষরাত্রি। স্বাভাবিক গানের কণ্ঠস্বর আর তিনি জীবনে ফিরে পান নি।

শরতের পরিণতি যেমন শীতে, চ্যাপলিনদের অবস্থাও যেন তেমনি স্বাভাবিক গতিতে খারাপ থেকে আরও খারাপে যেতে লাগল। তাঁর মা এমনিতে সঞ্চয়শীলা ছিলেন—কিন্তু কাজ না থাকলে সামান্য জমানো টাকায় আর কতদিন চলতে পারে। ক্রমশ জুয়েলারী বিক্রি করতে হোল। অন্যান্য জিনিসও যা ছিল হয় বিক্রি, না হয় বাঁধা দিতে বাধ্য হলেন চার্লির মা। তাঁর একমাত্র আশা, আবার স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর ফিরে পাবেন।

অবস্থার বিপাকের সঙ্গে তিনঘরের ফ্ল্যাট ছেড়ে দু'ঘরে এবং তারপর একটি ঘর মাত্র সম্বল করে চার্লিরা দিন

কাটাচ্ছিলেন। তার মা'র মন এবার ধর্মের দিকে ভয়ানক ঝুঁকে পড়ল—ভেতরে ভেতরে বোধ হয় এই আশা ছিল ঈশ্বরভক্তিতে গলার অসুখ সেরে যাবে—আবার গান গাইতে পারবেন। তিনি নিয়মিতভাবে প্রত্যেক রবিবারে ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজ রোডের ক্রাইস্ট চার্চে উপাসনা শুনতে যেতেন। চার্চে যাতায়াত সুরু করার পর চার্লির মা তাঁর থিয়েটারের বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেন।

এই সময়টায় ভয়ানক দারিদ্র্যের ভেতর দিয়ে কাটে চ্যাপলিনদের। চার্লির মা সামান্য রোজগার করতেন সেলাইয়ের কাজে। পরের দয়ার ওপর নির্ভর করতে হোত সময় সময়—আবার কোনো সময় যদি শোনা গেল কোনো জায়গায় হয়তো সুপ বিতরণ করা হচ্ছে গরীবদের জন্য, অমনি সিডনে ছুটলেন সুপ আনতে। কিন্তু এত দুঃখের মধ্যেও মা ছেলেদের নানা নাটক থেকে অভিনয় করে শোনাতেন সময় পেলেই। সিডনে স্কুল-বিরতির সময়টায় কাগজ বিক্রি করতো।

এই সময় একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছিল। একদিন সিডনে অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে বাড়ি ফিরে কাগজের বাণ্ডিল বিছানার ওপর ফেলে দিয়ে বললেন—'আমি একটা পার্স পেয়েছি।' তারপর মা'র হাতে পার্সটা তুলে দিলেন।

বাসে উঠে কাগজ বিক্রি করতে গিয়ে সিডনের নজরে পড়ে একটি খালি সিটে পার্সটি পড়ে আছে। অন্যের অলক্ষ্যে একটি খবরের কাগজ তার ওপর ফেলে দেন সিডনে—পরে সুবিধা মত পার্সটি তুলে নেন। ওটি খুলে দেখেন রৌপ্যমুদ্রা এবং তাম্রমুদ্রার পার্সটি ভরা। চার্লির মা বিছানার ওপর মুদ্রাগুলো ঢেলে দেবার পরও মনে হোল মাঝের পকেটে আরও কিছু আছে, খুলে সাতটি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেল। পার্সটির ভেতর কোনো ঠিকানা মেলে নি।

এ কুড়িয়ে-পাওয়া টাকাতে চার্লিরা সবাই সাউথ-এণ্ড-অন সি'তে ছুটি কাটাতে গেলেন। প্রথম সমুদ্র দেখবার আনন্দে চার্লি প্রায় সম্মোহিতের মত হয়ে গিয়েছিলেন।

ল্যাম্বেথের ওয়ার্ক হাউস

কিন্তু এ টাকা তো আর চিরদিন থাকতে পারে না। ক্রমশ পুঁজি নিঃশেষ হয়ে এল—মা চাকরির খোঁজ করতে লাগলেন। চার্লির বাবা কোর্টের নির্দেশে সপ্তাহে দশ শিলিং করে এঁদের পাঠাতেন। তাও কিছুকাল ধরে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। নতুন সলিসিটরের মত নেওয়া হোল—তিনি দেখলেন এঁদের ঠিকমত ফিজ দেবার অবস্থা নেই। সুতরাং উপদেশ দিলেন ল্যাম্বেথ বরো কর্তৃপক্ষের কাছে সাহায্য চাইতে। এরা ব্যাপারটা নিয়ে নাড়াচাড়া করলেই চার্লির বাবাকে বাধ্য হয়ে এদের ভাতা বাড়িয়ে দিতে হবে।

দুটি শিশুসন্তান, নিজে ভগ্নস্বাস্থ্য—সুতরাং চার্লির মা'র পক্ষে সংসার ঠেলে নিয়ে যাওয়া দুঃসাধ্যের মধ্যেই এসে দাঁড়িয়েছিল। শেষকালে তিনি ঠিক করলেন, তিনজনেই গিয়ে ল্যাম্বেথের ওয়ার্ক হাউসে আশ্রয় নেবেন।

ওয়ার্ক হাউসে থাকার ব্যাপারটার ভেতর একটা হীনতা আছে একথা দুই ভাই-ই জানতেন—তবু একটা ঘরের ভেতর বাস্তবন্দীভাবে বাস করার পর, নতুন জায়গায় যেতে হচ্ছে, এই চিন্তাটাই যেন এ্যাড্‌ভেঞ্চারাস লাগছিল সিডনে ও চার্লির। প্রথম আঘাত লাগল যখন মা'কে ছেলেদের থেকে আলাদা করে দেওয়া হোল—তিনি গেলেন মহিলাদের ওয়ার্ডে এবং এদের পাঠানো হোল শিশুবিভাগে। আরও অনেক কিছু শক্ পেতে হয়েছে প্রথম প্রথম—ওয়ার্ক হাউসের বিশেষ পোষাক পরা, চুল ছোট করে কাটা প্রভৃতি ব্যাপারে। এর পরে আবার বয়সের মান অনুসারে সিডনে এবং চার্লিকেও আলাদা-আলাদা বিভাগে যেতে হয়। নানাধরণের কষ্টের ভেতর দিয়েই এঁদের কাটাতে হয়েছে ওয়ার্ক হাউসে।

(ক্রমশঃ)

রঙ্গজগৎ

চলচ্চিত্র-উৎসব নামে একটি নিষ্প্রভ অনুষ্ঠান শেষ

দিল্লীতে চলচ্চিত্র-উৎসবের পরে কলকাতায় এক সপ্তাহব্যাপী চলচ্চিত্র-সপ্তাহ শেষ হয়েছে। চলচ্চিত্র-সপ্তাহে বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে এলোপাতাড়িভাবে ছবি দেখাবার ব্যবস্থা হয়েছে। প্রতিযোগী চিত্র আর অ-প্রতিযোগী চিত্র ভাগ করে দেখালে সমালোচক এবং যাঁরা তুলনামূলক বিচার করে দেখতে চান তাঁদের পক্ষে ভাল হতো। বলা হয়েছিল উৎসবের আদর্শবাণী—বসুধৈব কুটুম্বকম; কিন্তু সরকারী কাগজে ছাড়া এই আদর্শবাণীকে অনুসরণ করে উৎসব পরিচালিত হয় নি। তাই উৎসবটা হয়েছে স্ফূর্তির ব্যাপার, অন্য কোন তাৎপর্য বোঝা যায় নি। এ দোষ কেবল কলকাতার নয়, দিল্লীর উৎসব কর্তৃপক্ষই এর জন্য দায়ী। এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, আমলারা যেমন উৎসবের ব্যর্থতার জন্য দায়ী, তেমন বে-সরকারী প্রতিনিধি ও সংস্থাগুলির দায়িত্ব তো কম ছিল না। আগত অতিথিদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে তার পরিচয় পাওয়া গেছে। প্রসঙ্গক্রমে ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া মোশান পিকচার্স এসোসিয়েশনের পার্টির কথা বলা যায়। বরাবরের মত এবারও সব সংবাদপত্রকে সমান মর্যাদা দেন নি।

উৎসবের ব্যর্থতা সম্পর্কে দিল্লী থেকে কলকাতায় সকলে একমত। ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি যেমন বিশৃংখলা ও বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছে; তেমনি উৎসবে নিম্নমানের প্রতিযোগী চিত্র আরো নৈরাশ্য সৃষ্টি করেছে। সবদিক থেকে এই উৎসব অত্যন্ত নিষ্প্রভ ব্যাপার। বিদেশী প্রতিনিধিরাও তাই তাঁদের মন্তব্যে যত বেশি আড়ম্বর ও আতিথেয়তার প্রশংসা করেছেন উৎসবের উল্লেখ তত করেন নি। এরূপ নিষ্প্রভ উৎসব আমাদের চলচ্চিত্রের খুব যে সহায়ক হয়েছে, সে কথা বলা চলে না। প্রথমত উৎসব কর্তৃপক্ষ ছবি বাছাইয়ের ব্যাপারে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। অবশ্য অ-প্রতিযোগী চিত্র হিসাবে কয়েকটি ভাল ছবি এসেছে। কিন্তু হট্টগোলের মধ্যে সেসব ভাল ছবি তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। ছবি দেখার আকর্ষণের পেছনে আনসেনসর্ড ছবি দেখার ঝোঁক ও বিকৃত মন যতটা কাজ করেছে ততটা বসুধৈব কুটুম্বকম আদর্শবাণী কাজ করে নি। এ কারণে আশঙ্কা হয় প্রথমবারের উৎসবের মত এই উৎসব ভারতীয় চলচ্চিত্রের পক্ষে শুভ-ফলদায়ক হবে না। হয়তো সাময়িকভাবে আমাদের চলচ্চিত্র-শিল্প লোকসানই হবে। এক সংবাদে প্রকাশ, বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি সত্যজিৎ রায় স্বীকার করেছেন এই উৎসব নিষ্প্রভ; এবং প্রশ্নোত্তরে তিনি বলেছেন এরূপ নীরস হলে আর উৎসবের দরকার নেই।

সকলের বিস্ময় সৃষ্টি করে 'স্বর্ণময়ূর' সিংহল পেয়েছে। উৎসবে যাঁরা বিচারক ছিলেন তাঁরা সকলেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র ইতিহাসবিদ্‌ ও সমালোচক হিসাবে খ্যাতিমান। এমন অভিজ্ঞ বিচারকমণ্ডলী গঠিত হতে পারায় ভারতের উৎসবের গুরুত্ব বেড়েছে। সুতরাং তাঁদের বিচার সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে না। এতে প্রমাণিত হয় প্রতিযোগিতায় যে ১৯টি ছবি এসেছে সেগুলি উচ্চমানের নয়। 'গামপেরালিয়া' সিংহলের মধ্যবিত্ত সমাজের জীবনের দিক থেকে প্রামাণিক মূল্য সম্পন্ন ছবি। নিঃসন্দেহে ভাল ছবি, কিন্তু রাজনৈতিক কারণ ব্যতীত 'স্বর্ণময়ূর' পাবার উপযুক্ত নয়।

উৎসব শেষে সর্বাপেক্ষা সু-সংবাদ সত্যজিৎ রায়ের পদ্মভূষণ সম্মান লাভ। আমরা শ্রীরায়কে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

—সুজন।

• পদ্মভূষণ—সত্যজিৎ রায়

চিত্র আলোচনা

চলচ্চিত্র উৎসবের কয়েকটি ছবি

প্রথমেই স্বীকার করছি চলচ্চিত্র উৎসবে যে ক'টা ছবি দেখা উচিত ছিল, সে রকম ছবি দেখা সম্ভব হয় নি। প্রতিযোগী ছবির মধ্যে মাত্র দুটো দেখেছি: একটি 'লাভার্স রক' অন্যটি 'গামপেরালিয়া'। এ ছাড়া আটটি ছবি দেখেছি প্রতিযোগিতা বহির্ভূত। এই আটটির মধ্যে রয়েছে 'ওহারু' ও 'হারাকিরি' (জাপান), 'দি ক্যাট' (চেকোশ্লোভাকিয়া), 'আম্বেলাস অব সেরবু' (ফ্রান্স), 'দি ভিজিট' (পশ্চিম জার্মানী), 'ইনোসেন্ট সোরসেরার্স' (পোল্যাণ্ড), 'আমেরিকা-আমেরিকা' (ইউ-এস-এ), 'স্যাটারডে ইভনিং এ্যাণ্ড সানডে মর্নিং' (বৃটেন)। চিত্র-সমালোচক হিসাবে আমাদের আরো কয়েকটি ছবি দেখা উচিত ছিল। কিন্তু একদিকে সরকারী অব্যবস্থা, অন্যদিকে দু-একটি বে-সরকারী সংস্থার মোড়লীর জন্য ছবি দেখবার সুব্যবস্থা হয় নি। উচিত ছিল, প্রতিযোগী ছবিগুলি তিনটি প্রেক্ষাগৃহে, অ-প্রতিযোগী ছবিগুলি স্বতন্ত্র প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা,

● সোভিয়েট ইউনিয়নের 'হ্যামলেট' ছবির একটি দৃশ্য

এবং আরো বেশিসংখ্যক প্রেক্ষাগৃহের সাথে চুক্তি করা। তাহলে চিত্র-সমালোচকরা প্রতিযোগী ছবিগুলি দেখতে পেতেন. তারপরে তাদের পছন্দ-মত অ-প্রতিযোগী ছবি দেখতেন। এরূপ ব্যবস্থায় বিশ্ব-চলচ্চিত্রের মোটামুটি একটা ধারণা করা যেতো, যা আমাদের দেশের চলচ্চিত্রের বিকাশে এবং দর্শকদের অভিজ্ঞতার দিক থেকে সহায়ক হতো। কিন্তু সরকারী কর্তাদের অপদার্থতায় চিত্র-সমালোচকদের জন্য ছবি দেখাবার ব্যবস্থা হয়েছিল পরিবেশক ও প্রযোজকদের জন্য নির্ধারিত শো-তে। ব্যবসায়িক দৃষ্টির সঙ্গে সমালোচকের দৃষ্টিকে একাকার করে ফেলা হয়েছে। এই অব্যবস্থার জন্য শ্রীমাথুর যেমন দায়ী, তেমনি ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া মোশান পিকচার্স এসোসিয়েশনের সেক্রেটারীর দায়িত্ব কম নয়। কারণ তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করেই ভিন্ন দৃষ্টি-ভঙ্গীর লোকের জন্য একই শো'র ব্যবস্থা হয়েছিল। সকল রকমের অরাজকতার জন্য সর্বাধিক বেশি দায়ী উৎসবের ডিরেক্টর দিল্লীর শ্রীভগতের। একটা অপদার্থ লোককে এতবড় কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। যিনি অভি-নেত্রীদের পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তোলা ছাড়া উৎসবের তাৎপর্য বুঝতে চেষ্টা করেন নি।

স্বর্ণময়ূর বিজয়ী

উৎসবে শ্রেষ্ঠ ছবি বিবেচিত হয়েছে সিংহলের 'গামপেরালিয়া'। এই ছবিটি

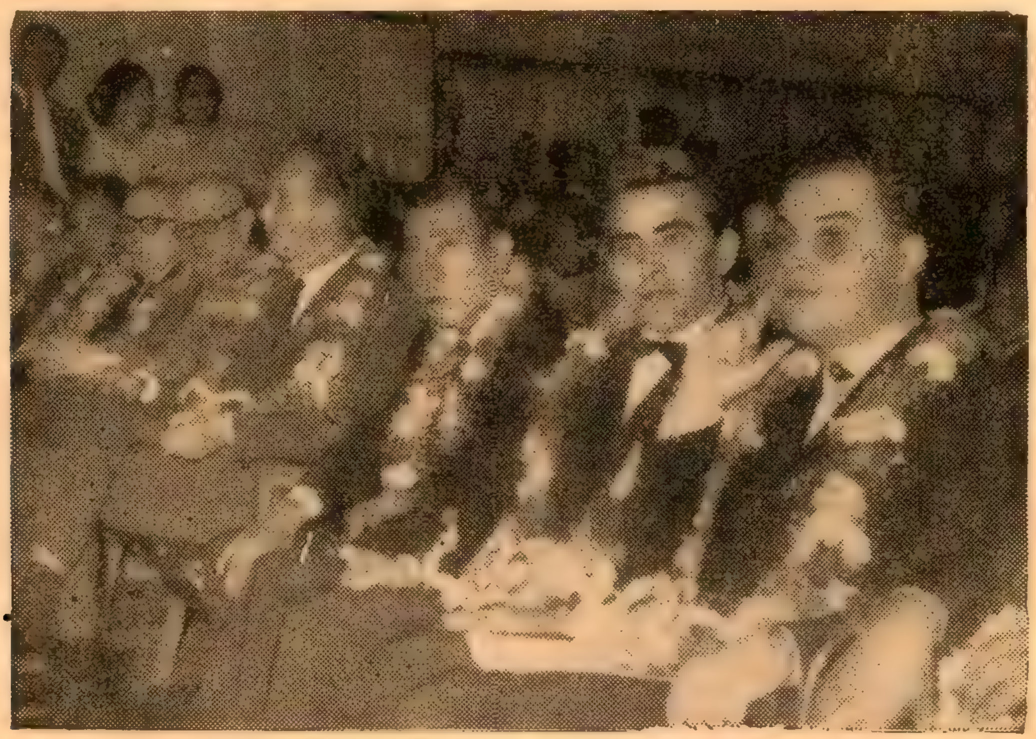

● কলকাতায় চলচ্চিত্র-সপ্তাহের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিদেশী প্রতিনিধিগণ

'স্বর্ণময়ূর' লাভ করেছে। এই ছবিতে সিংহলের মধ্যবিত্তসমাজের পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। নন্দাকে ভালবেসেছিল তার গৃহশিক্ষক পিয়ালী। নন্দারও মত ছিল। কিন্তু বিয়ে হতে পারে না। কারণ নন্দার বাবা অভিজাত ভূস্বামী, আর পিয়ালরা গরীব, সাধারণ মানুষ। নন্দার বিয়ে হলো সম-মর্যাদার জিনদাসের সঙ্গে। ক্রমে নন্দার বাবার অবস্থা যেমন খারাপ হচ্ছিল, জিনদাসের অবস্থা তেমনি খারাপের দিকে যেতে থাকে। জিনদাস ভাগ্যান্বেষণে গ্রাম ত্যাগ করে এবং কিছুদিন পরে খবর আসে সে মারা গেছে। পিয়ালের অবস্থা ফিরেছে, সে তখন বিত্তবান। এবার সে নন্দার সাথে বিয়ের প্রস্তাব করে এবং বিনা আপত্তিতে বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ের পরে হঠাৎ এক টেলিগ্রাম পেয়ে নন্দা হাসপাতালে গিয়ে দেখে জিনদাসের মৃতদেহ।

এই ছবিতে সিংহলের মধ্যবিত্ত সমাজের দুই জেনারেশনের দু-রকম চিন্তাধারা এবং সিংহলীদের সামাজিক রীতি-নীতি, সংস্কার ও সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয়েছে। এদিক থেকে সুস্থ সমাজবোধসম্পন্ন ছবিটির প্রামাণিক মূল্য রয়েছে। কিন্তু অসংগতি এবং অবাস্তবতাও কিছু কিছু চোখে পড়ে। পরিচালক লেস্টার জেমস পেরীজের ওপর সত্যজিৎ রায়ের প্রভাব অত্যন্ত বেশি। নিঃসন্দেহে এটি ভাল ছবি। তবে এই ছবির 'স্বর্ণময়ূর' প্রাপ্তিতে বোঝা যায় উৎসবে প্রতিযোগী চিত্রগুলি অত্যন্ত নিম্নমানের ছিল।

একটি কিংবদন্তী অবলম্বনে

হংকং-এর 'লাভার্স রক' একটি কিংবদন্তী অবলম্বনে তৈরি হয়েছে। মৎসজীবীদের গ্রাম, ছোট্ট একটা বন্দর, ঠাসাঠাসি করে ঘাটে বাঁধা রয়েছে মোটরবোট। এই বন্দরের পাশে অনেকগুলি শিলাখণ্ড—দেখতে মানুষের দেহের মত মনে হয়। লোকশ্রুতি—যেসব জেলে মাছ ধরতে গিয়ে ফিরে আসে না, তাদের জন্য প্রতীক্ষারত প্রিয়তমারা যুগ যুগ ধরে এভাবে প্রস্তরীভূত হয়ে আছে। ছবিতে এই শিলাখণ্ডের ব্যবহার বড় সুন্দর। একটি প্রেমকাহিনী হিসাবে গল্পটি উপভোগ্য। কিন্তু যেভাবে জেলে-জীবন প্রতিফলিত হওয়া উচিত ছিল, তা হতে পারে নি। পরিচালক পানলেই হলিউডের চিত্র-রীতি অনুসরণ করেছেন এবং দর্শক মনোরঞ্জনের দিকটা বেশি প্রাধান্য পেয়েছে।

দুটি জাপানী ছবি

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার তফাৎ জাপানী ছবিতে অত্যন্ত স্পষ্ট। জাপানী চিত্রস্রষ্টারা সমাজসচেতন। অন্তত 'ওহারু' ও 'হারিকিরি' দেখে আমার এই ধারণা হয়েছে। এই দুটি ছবির কাহিনীর পটভূমি তিনশত বছর পূর্বের জাপান। কিন্তু তিনশত

শুভমুক্তি ২৯শে জানুয়ারী
মনছোঁয়া একটি ঘরোয়া ছবি।

প্রীতি ফিল্মসের
মহালগ্ন

শ্রেঃ বিকাশ রায় · সন্ধ্যারাণী · অনুপ · পাহাড়ী · তরুণ · অনু
জহর রায় · মলিনা · রেণুকা · বাসবী · সুখেন · বীরেন · নৃপতি
দেবজিৎ · সুমিত্র সান্যাল · কল্যাণী ঘোষ · পূর্ণেন্দু

কাহিনী · পরিচালনা কনক মুখার্জী · সংগীত কালীপদ সেন

রাধা - পূর্ণ - অরুণা - আলোছায়া
পদ্মশ্রী - মৃণালিনী - পারিজাত - অলকা
শ্যামাশ্রী - শ্রীকৃষ্ণ - শ্রীরামপুর টকীজ
শ্রীমা - চিত্রালয় (দুর্গাপুর)

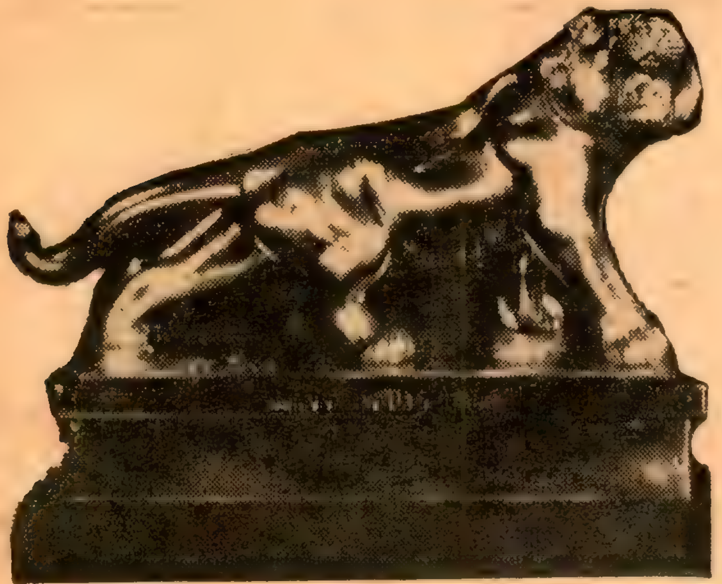

● ক্যালকাটা সিনেক্লাবের পুরস্কার—বেঙ্গল টাইগার

বছর পূর্বের পটভূমিকায় পরিচালকরা বর্তমানের কথাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। দুটি ছবিতেই মানবিকতার বাণী ও শাসকশ্রেণীর চরিত্র উদ্ঘাটনের চেষ্টা রয়েছে। 'হারিকিরি'তে সাধারণ মানুষ আর সামন্তযুগীয় শাসকদের মধ্যে তফাৎটাকে স্পষ্ট করে শাসক-শ্রেণীর অপেক্ষা সাধারণ মানুষ যে অনেক বেশি সৎ এবং বীর সে কথা বলা হয়েছে। জাপানী হারিকিরির কথা সারা বিশ্বে প্রচারিত; কিন্তু এই বর্বর প্রথা কিভাবে সামন্ত প্রভুরা চালু রেখেছে এবং মানুষের কত দারিদ্র্য, কত চোখের জল তার পেছনে রয়েছে, সে চিত্র অতি নির্মমভাবে পরিচালক উপস্থিত করেছেন। ছবিটি পরিচালনা করেছেন মাসাকি কোবায়াশী। 'ওহারু'র কাহিনী বিশ্বজনীন। ওহারু সুন্দরী তরুণী। তাকে যে প্রথম প্রেমনিবেদন করেছিল তলোয়ারের কোপে তার মাথা কাটা গিয়েছিল। অপরাধ নিচু ঘরের ছেলে হয়ে উঁচু ঘরের মেয়ের সাথে সহবাস করা। ওহারু ভালবেসে ঘর করতে চেয়েছিল, কিন্তু পিতার অবিমৃষ্যকারিতা ও সমাজের হৃদয়হীনতায় সে ঘরণী হতে পারে নি, হয়েছিল বারবনিতা। সন্তানের মা হয়েও মাতৃত্বের অধিকার পায় নি। পরিচালক কেনজি মিজোগুচি অত্যন্ত সচেতনভাবে সমাজের হৃদয়-হীনতা ও পিতা-মাতার দায়িত্বের কথা স্মরণ করে দিয়েছেন। মানবিক মূল্যবোধের দিক থেকে ছবিটি দর্শক-মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করে।

জাপানী ছবি দুটি যেমন সমাজ-চেতনার দিক থেকে তেমনি রূপায়ণ-রীতিতে বিশিষ্ট। সঙ্গীত ও

● সোভিয়েতের লুডমিলা চুরসিনা, মিঃ ফেতিন সহ অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিগণ

দৃশ্যসজ্জায় জাপানীরা যে জাতশিল্পী সে কথা অনুভব করা যায়। জাপানী জীবনের ছায়া ও মেজাজ ছবি দুটিতে স্বতন্ত্র স্বাদ সৃষ্টি করেছে।

একটি ফরাসী ছবি

নবতরঙ্গ চলচ্চিত্র-রীতির লীলাভূমি এবং উগ্র যৌনতাবোধের কাছে ছবির বক্তব্য যেখানে মাথা নত করে সেই ফরাসী দেশের জ্যাকুই ডেমি পরিচালিত 'আম্ব্রেলাস অব সেরবু' গীতধর্মী এক প্রণয়-কাহিনীচিত্র। গী ১৬ বছরের এক তরুণীকে ভালবেসেছিল ; অবিলম্বে বিয়ের পর্ব সমাধা করার জন্য গী'র চেয়ে তরুণীর আগ্রহ অনেক বেশি ছিল। গীকে যেতে হলো সৈন্যবাহিনীতে। তরুণী অন্তঃসত্ত্বা, তার গর্ভে গী'র সন্তান। কিন্তু কয়েক মাস পরে সে অনুভব করলো---গী'র স্মৃতি তার মন থেকে সরে যাচ্ছে। গর্ভবতী অবস্থায় সে বিয়ে করলো এক জহুরীকে। সেখানে আর্থিক নিশ্চয়তা বেশি। গী ফিরে এসে জীবনকে বিষাদময় মনে করলো। কিছুদিন পরে ম্যাডেলিন নামে আর এক তরুণীকে বিয়ে করে সুখী হলো।

হাল্কা পরিবেশে সরসভাবে পরিচালক এখানে ফ্রান্সের সমাজচিত্র উপস্থিত করেছেন এবং মেয়েদের, বিশেষ করে মেয়ের মায়েদের প্রতি কিছুটা শ্লেষ প্রকাশ করেছেন। প্রেমকে যতই স্বর্গীয় বিশেষণে বিভূষিত করা হোক, সঙ্গ এবং আর্থিক নিরাপত্তার ভূমিকা এখানে বাস্তববাদী দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। পরিচালক এখানে উগ্র যৌনদৃশ্য দেখাবার সুযোগ পেয়েও তা গ্রহণ করেন নি। সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। ছবিটি উপভোগ্য।

● রুমানিয়ার প্রতিনিধিকে অর্পণা দাশগুপ্তা পুষ্পমাল্যে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন।

● রেশমী এণ্টার প্রাইজের 'ও-কে' ছবির একটি দৃশ্যে কমল মিত্র ও লিলি চক্রবর্তী।

দুটি পশ্চিমী ছবি

বৃটেনের 'স্যাটারডে নাইট এ্যাণ্ড সানডে মর্নিং'-এর কথা আমরা অনেক শুনেছিলাম। এক প্রগতিশীল বাংলা মাসিক পত্রিকার পাশ্চাত্যের অধুনা চলচ্চিত্র ও মানুষের বিষয়ে আলোচনায় এই ছবির প্রশংসা কীর্তিত হয়েছিল। তাই আমাদের ধারণা হয়েছিল---বুঝি প্রগতিশীল চলচ্চিত্র। অবশ্য প্রগতির সম্পর্কে মতভেদ আছে। আজকাল একদল চিত্র-রসিকের চোখে উগ্র যৌনতা প্রগতির চিহ্ন। এ নাকি সত্যকে নির্ভীকভাবে প্রকাশের চেষ্টা। বৃটেনের এই ছবির নায়ক শ্রমিক। সে বিবাহিতা নারীদের সাথে অবৈধ যৌন সম্পর্ক রাখতে পছন্দ করে। খুব আমুদে প্রাণবন্ত যুবক। কিন্তু যৌনসুখ ছাড়া তা

জীবনে অন্য কোন চিন্তা নেই। শেষ পর্যন্ত তরুণী ডোরিন তার কুমারীত্ব দিয়ে যুবককে পথে আনে। এই যদি বৃটেনের শ্রমিকপল্লীর চিত্র হয়, তবে শ্রমিকদের মধ্যে যে লাম্পট্য কত বেশি এবং বে-জন্মার হার কত সেটা নিরুপণ করা যাবে না। এদিক থেকে ছবিটিকে শ্রমিকশ্রেণীর বিরোধী ছবি বলতে দোষ কি! ক্যামেরা যদিও শ্রমিক যুবক আর্থারের আনুকূল্যে রয়েছে, তবে তার সহবাসে বেণ্ডার গর্ভবতী হওয়াকে নারীদের পক্ষে সতর্কীকরণ হিসাবে এবং আর্থারের প্রচণ্ড মার খাওয়ার দৃশ্যকে পরিণতির জন্য হুমকি হিসাবে ধরে নেওয়া যায়। ছবিটির পরিচালক কারেল রেইজ।

এলিজা কাজানের 'আমেরিকা-আমেরিকা' এক অতি দীর্ঘ ছবি, যাকে প্রচারধর্মী বললে দোষের হবে না। উনবিংশ শতাব্দীর পটভূমিকায় গ্রীক এবং আর্মেনিয়ান সংখ্যালঘুদের ওপর তুর্কীদের অত্যাচারের পটভূমিকায় এক গ্রীক যুবকের আমেরিকা যাবার বাসনাকে নিয়ে ছবির চিত্রনাট্য। যুবক ডামাস্কাসে এসে সুন্দরী স্ত্রী ও বিত্তলাভের সুযোগ উপেক্ষা করে আমেরিকা চলে আসে। আমেরিকা এখানে মুক্তির দেশ। তাই আমেরিকা আসার জন্য পশ্চাদ্বর্তী দেশগুলির মানুষের তীব্র আকাঙ্ক্ষার চিত্র এখানে তুলে ধরা হয়েছে। পরিচালক মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও সমবেদনার দৃষ্টিতে সব দেশের এবং মেট্রোপলিটান নগরীতে লোকের যাবার জন্য আগ্রহ কেন—সেকথা বাস্তববাদী চিন্তায় প্রকাশ করতে পারেন নি, অথবা আমেরিকার প্রচারের উৎসাহে তিনি বাস্তববিমুখ হয়েছেন।

একটি ভালো ছবি

পশ্চিম জার্মানীর 'দি ভিজিট' একটি দর্শনযোগ্য ছবি। ছবিটি বক্তব্যের দিক থেকে এবং অভিনয়ে দর্শকদের মোহিত করে রাখে। পরিচালক

রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর পাশে আমেরিকান প্রতিনিধি মিস লোরি

বার্নহার্ড উইকি উদ্বেগপূর্ণ মুহূর্ত সৃষ্টি করেছেন। এখানে কোটিপতি মহিলা কার্লা গুলেন শহর পরিদর্শনে এসেছেন। গুলেনের নাগরিকরা খুব খুশি, দলে দলে তাঁকে সম্বর্ধনা জানাতে গেছে। কার্লা নাটকীয় চমক সৃষ্টি করে ট্রেন থেকে নামলো। পৌরসভার বিশিষ্ট নাগরিকরা সম্বর্ধনা জানালো, তাঁদের মধ্য থেকে মিলারকে সে ডেকে নিল। সবার সামনে বললো মিলার তার বাল্য-বন্ধু। মিলারকে নিয়ে তার দিন কাটলো,—দুজনে ঘুরে ঘুরে তাদের অতীত দিনের প্রিয় জায়গাগুলিতে বেড়ালো। কোটিপতি মহিলার এই সান্নিধ্য মিলারের কাছেও গৌরবের বোধ হচ্ছে। নাগরিকদের কাছে মিলারের কদর বেড়ে গেল।

সেদিন রাত্রে কার্লার সম্মানে ভোজসভায় সে সকলকে বিস্মিত করে ঘোষণা করলো, সে পৌরসভাকে এক মিলিয়ন ডলার এবং নাগরিকদের এক মিলিয়ন ডলার দেবে—যদি তাঁরা মিলারকে হত্যা করে। সবাই স্তম্ভিত! এত বন্ধুত্ব, এত খাতির, আর এই ঘোষণা! কারণ জানালো—কার্লার বয়স যখন ১৭ বছর তখন মিলারের দ্বারা সে গর্ভবতী হয়েছিল। নিজেকে দায়িত্ব থেকে বাঁচাবার জন্য দুজন মিথ্যা সাক্ষীকে দিয়ে মিলার

বলিয়েছিল যে, তাদের সঙ্গে কার্লা শুয়েছিল। চরিত্রহীনতার অপরাধে তাকে শহর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেদিন সে বিচার ভিক্ষা চেয়েছিল, কিন্তু কারো হৃদয় টলে নি। কার্লাকে বারবনিতার পথ গ্রহণ করতে হয়েছিল; সে পথে আজ কার্লা কোটিপতি। আজ সে সেদিনের অবিচারের বিচার চায়।

সেদিন শহরবাসীরা রাজী না হলেও টাকার প্রভাবে পৌরসভার মেয়র থেকে প্রত্যেক শহরবাসীর মনের পরিবর্তন হয়েছিল, এমন কি মিলারের স্ত্রী-পুত্রও তাকে সহ্য করতে পারছিল না। মিলারকে শাস্তি দেবার জন্য তারা দেশের আইন পর্যন্ত পরিবর্তন করে নিয়েছিল। প্রকাশ্য বিচারে মিলারের প্রাণদণ্ডের পক্ষে সকলে মত দিয়েছিল।

কার্লা সেদিন ঘৃণাভরে দুই মিলিয়ন ডলারের দুটি চেক দিয়ে গুলেনের নাগরিকদের প্রতি, সমস্ত পুরুষজাতির প্রতি তার ঘৃণা জানিয়ে ঘোষণা করেছিল 'ভিজিট' বা পরিদর্শন শেষ হলো।

ছবিটিতে বর্তমান সমাজব্যবস্থার প্রতি যেমন শ্লেষ আছে, তেমনি আছে মানুষের দুর্বলতার মুখোশ খুলে ধরার এবং মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা আর একটা বিদ্রোহের সুর। সমাজে টাকাই নিয়ন্ত্রণশক্তি, টাকার জোরে বিচার পায়, টাকা না থাকলে নিরপরাধ শাস্তিভোগ করে। টাকা কোন পথে এসেছে সেটা কেউ লক্ষ্য করে না।

এই কাহিনীর সমর্থনে আর একটি উপকাহিনীও এখানে রয়েছে। সেই উপকাহিনীর নারী চরিত্রটিকে একস্থানে সম্পূর্ণ নগ্ন দেখান হয়েছে। একমাত্র দর্শকদের আকর্ষণ বৃদ্ধি ছাড়া বক্তব্য প্রতিষ্ঠার জন্য সেই দৃশ্যের কোন প্রয়োজন ছিল না। ছবিটিতে এন্থনী কুইন, ইনগ্রিড বার্গম্যান, আইরিনা ডেমিক প্রমুখের অভিনয় বিস্ময়কর;

সংগীত কথা

লোক-শিল্পী ধীরেন্দ্রনাথ দাস

লোক-সংগীতের সুরের প্রচার ও প্রসারের জন্য শচীন দেববর্মন ও আব্বাস উদ্দীন আহমেদের মহৎ প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। এরপরে এ সব লোক-সঙ্গীতকে অবিকৃত অবস্থায় জনসাধারণের কাছে তুলে ধরেছেন খুব অল্পসংখ্যক শহরে শিল্পীই।

যে কয়েকজন সত্যিকারের দরদী শহুরে গায়ক কষ্ট করে পল্লীগ্রাম থেকে এসব গান সংগ্রহ করে গান গেয়ে শহরের শিক্ষিতদের কাছে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন, তাঁরাই আজ আর্থিক অনটনে দিন কাটাচ্ছেন। কারণ আধুনিক শিক্ষিত শহুরে-সমাজ খাঁটি অবিকৃত লোক-সঙ্গীত পছন্দ করেন না।

এই ধরণের সত্যিকারের দরদী গায়কদের মধ্যে পূর্ব বাংলার ময়মনসিংহ অঞ্চলের জালশুকা গ্রামের ধীরেন্দ্রনাথ দাস অন্যতম।

● লোক-শিল্পী ধীরেন্দ্রনাথ দাস

ধীরেনবাবু সত্যি একজন সুকণ্ঠ লোক-শিল্পী। সারা জীবন ধরে তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে বহু পরিশ্রম করে লোক-সঙ্গীত সংগ্রহ করে এসেছেন। বহু প্রাচীন লোক-গীতিসমূহ ধীরেনবাবু সংগ্রহ করেছেন। তাঁর সংগৃহীত প্রত্যেকটি গানই চমৎকার। ধীরেনবাবুর কণ্ঠে যে গানটি বেশি শোনা যায় তা হল:

'আগে যদি জানতাম রে
মামায় করবে বিয়া
আতুড় ঘরে মরতাম আমি
গলায় দড়ি দিয়া রে,
কি সর্বনাশ করল্যা কালা রে।---ইত্যাদি।

উপরোক্ত গানটি শ্রীরাধিকার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভালবাসার উজ্জ্বল নিদর্শন।

ধীরেনবাবুর আরো একটি গানে শ্রীরাধিকার শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের জ্বালার অভিব্যক্তি সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে, যেমন:

কাইল্যা ছেড়ার পাল্লায় পইরা,
সর্বনাশটা অইল রে,
পরাণ আমার যায় যায় রে॥
---ইত্যাদি।

বিরহের জ্বালা বিষম জ্বালা। তাই শ্রীরাধিকা আজ কৃষ্ণবিরহে পাগল হয়েছেন। সেই বিরহের কথা সুন্দররূপে প্রকাশ পেয়েছে ধীরেনবাবুর সংগৃহীত একটি গানে। যেমন:

সই গো—
মনের মানুষ বিনে প্রাণ বাঁচে না,
মনের মানুষ কই গেল গো,
একবার কইয়া গেল না॥

এই ধরণের অনেক গানই ধীরেনবাবু সংগ্রহ করে তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের মাধ্যমে গেয়ে থাকেন।

ধীরেনবাবুর মত দরদী শিল্পী পাওয়া খুবই দুষ্কর। কিন্তু যেহেতু তিনি এসব গানের মধ্যে দিয়ে হাল্কা চটকদারী রস পরিবেশন করতে পারেন না, তাই তাঁর আজকাল দুবেলা দু'মুঠো অন্নও জোটে না।

অধুনা তিনি গড়িয়ায় (২৪ পরগণা) থাকেন। পল্লীসঙ্গীত গেয়েই তিনি জীবিকা নির্বাহ করেন।

আধুনিক শিক্ষিতসমাজে ধীরেনবাবুর মত সত্যিকারের লোক-শিল্পীর মূল্য নেই—কেন না, তাঁরা তাঁদের গানে কমার্শিয়াল খোঁচ মারতে জানেন না। আমাদের শহরে আধুনিক সমাজের লোক সঙ্গীত-দরদীরা তাই বেশি পছন্দ করেন।

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

শিলাদিত্য

টি-এস্-এলিয়ট

অ্যান্ড্রু ওইলিয়ামসন্ তাঁর থিয়েটার অভ্ টু ডিকেড্স্ বইতে লিখেছেন ১৯২৮ সাল থেকে তিনি নিয়মিতভাবে থিয়েটার দেখা সুরু করেন। এর তিরিশ বছর আগে থেকেই রঙ্গমঞ্চ থেকে কাব্যনাট্য অন্তর্হিত হয়েছে। দুটি কারণে এই অবস্থা ঘটেছে—(১) রঙ্গমঞ্চে রিয়ালিজমের আবির্ভাব (২) প্রু অভ্ আইডিয়াজের জনপ্রিয়তা—রবার্টসন এবং ইবসেন দিয়ে যে আন্দোলনের সুরু এবং বার্নার্ড শয়ের লেখাতে যার পরম পরিণতি। রচনার সাহিত্যিক মূল্য যাতে ব্যাহত না হয়, সেদিকে বাস্তববাদী লেখকরা যথেষ্ট সজাগদৃষ্টি রেখে নাটক লিখেছেন—কিন্তু বক্তব্যকে কবিতায় না বলে গদ্য সংলাপের ভেতর দিয়ে প্রকাশ করেছেন।

ভিক্টোরিয়ান যুগের আদিপর্বে যেসব নিকৃষ্ট ধরণের মেলোড্রামা মঞ্চস্থ হয়ে থিয়েটারের পবিত্রতা নষ্ট করছিল, এই বাস্তববাদী নাট্যকারেরা রঙ্গমঞ্চকে সেই সব জঞ্জাল থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করেন। ইবসেন অবশ্য কাব্য-নাটক নিয়েই প্রথম থিয়েটারে এসেছিলেন। কিন্তু পরে তিনি দেখলেন, তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্য এবং তত্ত্বসমূহকে জনপ্রিয় করতে হলে গদ্যের মাধ্যমে বাস্তব পরিবেশের ভেতর দিয়ে তুলে ধরতে হবে দর্শকদের সামনে।

এলিজাবেথীয় এবং জ্যাকবীয়েন যুগের আগুনে ভরা আবেগময়তার পরও থিয়েটারে কাব্য-নাটকেরই প্রাধান্য ছিল সমধিক। কিন্তু এসব নাটক নামেই ছিল কাব্য-নাটক—কাব্যগুণের অভাবটাই বিশেষভাবে পীড়িত করত দর্শকদের এবং সমঝদার শ্রোতার দলকে। নাইন্‌টিন্‌থ সেঞ্চুরিতে কবিত্ব-শক্তির পরম পরাকাষ্ঠা দেখাতে চাইলেন নাটক রচনা করে বায়রন ও শেলী। মঞ্চের সঙ্গে কিছুমাত্র নাড়ীর যোগ না থাকাতে বায়রনের নাটকগুলো হল পড়ে উপভোগ করবার মত নাট্যকাব্য এবং মঞ্চস্থ করবার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী।

শেলীর চেন্‌চী নাটকটি কিন্তু ভিন্ন জাতের—মঞ্চসফলতা লাভ করবার অনেক গুণই এ-নাটকটিতে ছিল—যেমন প্রাণবন্ততা এবং কাব্যিক অলঙ্কার-বহুল সংলাপের বদলে সহজ স্বাভাবিক কথোপকথনের কাব্যিক-সংলাপ। এ বিষয়ে শেলী নিজেই লিখেছেন :

'In order to move men to true sympathy, we must use the familiar language of men'.

এক শতাব্দী বাদে T-S-Eliot ঠিক ঐ একই চিন্তাধারার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর 'The Cocktail Party' নাটকটি রচনা করেন।

আজকের দিনের মনস্তাত্ত্বিকদের বিচারের মাপকাঠিতে শেলীর কাউণ্ট চেনচী চরিত্রটি নিশ্চয়ই অতিরঞ্জিত এবং জ্যাকবীয়েন রচনারীতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। যেমন নিচের লাইন ক'টি—

> 'Thou pavement, which I tread
> Toward her chamber—let your echoes talk.
> Of my imperious steps scoring surprise..'

পড়লেই শেক্সপীয়ারের ম্যাকবেথের

> 'Thou sure and firm-set earth,
> Hear not my steps, which way they walk, for fear
> The very stones prate of my where about,
> And take the present horror from the time,
> Which now suits with it'.

এই লাইনগুলির কথা মনে এসে যায়।

কিন্তু একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, কাব্যনাট্য রচনায় শেলী সবেমাত্র এ্যাপ্রেণ্টেসী সুরু করেছিলেন—সেই হিসাবে দেখলে চেন্‌চী নাটকটিকে একটি সার্থক কাব্য-নাট্যের প্রয়াস বলে স্বীকার করতেই হবে। ইংলণ্ডের নাট্যসমালোচকেরা আজ সবাই স্বীকার করেন যে, ঠিকমত উৎসাহ পেলে শেলীই আবার বৃটিশ থিয়েটারে কাব্যনাট্যের নবযুগের সূচনা করতে পারতেন এবং তার ফলে এক বিরাট নাট্য-আন্দোলনের সৃষ্টি হতে পারতো—এলিয়ট ও ফ্রাই-এর জন্য (এলিজাবেথীয় যুগের পর কাব্যনাট্যের রিভাইভ্যাল এঁদের দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল) এত দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হোত না।

চেন্‌চীর বিষয়বস্তুই নাটকটিকে মঞ্চের পক্ষে অনুপযোগী করে তুলেছিল। তখনকার দিনে ইন্‌সেস্ট-বিষয়ক নাটক সেন্সরের দ্বারা অনুমোদিত হয়ে মঞ্চস্থ হবে একথা ভাবাও যেত না। আধুনিক কালেও নাটকটি অনেকদিন পর্যন্ত শুধু প্রাইভেট পারফরমেন্স-এর অনুমতি পেয়েছে। বি-বি-সি অবশ্য নাটকটির বেতার-অভিনয় করে প্রচুর দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। এ অভিনয়ে বিয়েট্রিসের ভূমিকায় রোজালি ক্রাচলে এবং তাঁর মা'র চরিত্রে সিবিল থর্নডাইক মনোমুগ্ধকর অভিনয়-শক্তির পরিচয় দেন।

পরে টেনিসনও কাব্যনাট্য লিখতে গিয়ে অকৃতকার্য হন। আসলে লর্ড বায়রনের মত তিনিও ছিলেন মঞ্চ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। স্টিফেন ফিলিপস্ কিন্তু অন্য কারণে অসফল হন—তাঁর কাব্যনাট্য অভিনেতারা পছন্দ করতো এবং কিছু দর্শকের ভাল লাগতো। কিন্তু এইসব রচনা failed to reveal the mind and vision of a major poet. সুতরাং রঙ্গভূমি ক্রমশ হয়ে দাঁড়িয়েছিল

ইবসেন, শ, পিনেরো এবং ম্যাঞ্চেস্টার স্কুলের বিচরণক্ষেত্র। আর্থুরিয়ান কোর্ট থেকে টেনে নিয়ে এসে নাটককে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হোল শ্রমিক-বস্তিতে, প্রি-র্যাফ্যালাইট পরিবেশ থেকে, স্ত্রী-জাতির সমানাধিকারের দাবি-দাওয়া, জনস্বাস্থ্য-সমস্যা, ডিভোর্সের কড়াকড়ির বিষময় ফল ইত্যাদি ব্যাপারে।

এর ফল অবশ্য খারাপ হয়েছে বলছি না—বরং রঙ্গমঞ্চকে উন্নতির পথেই চালিত করা হয়েছে এই ভাবে। কিন্তু মুস্কিল বাঁধল ঠিক তার পরেই—থিয়েটারের নাটক ক্রমশ স্টেজ-প্লে হিসাবেই রচিত হতে সুরু হল। যে সাহিত্যিকমূল্য থাকলে স্টেজ-প্লে'কে ড্রামার পর্যায়ে তোলা যায়, তার অভাব দেখা দিল বিশেষভাবে। কাওয়ার্ডের নাটক জনপ্রিয় হল বটে, কিন্তু মহৎ নাটক হোল না—here was the Congreve of the 'twenties, but without t..e Congrevian sense of language d literary style.

রসিক-দর্শকেরা এবার মনে-প্রাণে অনুভব করতে লাগলেন—

The need for a literary revival, a new richness and rhythm of language, was already felt in the 'thirties, and the success of T. S. Eliot's Murder in the Cathedral, as Cristopher Fry afterwards printed out, showed that the need for the poet was already stirring.

এলিয়ট বলেছেন নাটককে কাব্যের আকারে রচনা করলেই কাব্যনাট্য হয় না। কাব্যনাট্য এক বিশেষ ধরণের নাটক—এ নাটকে ন্যাচারেলিজমের থেকে রিয়ালিজমের প্রাধান্যই বেশি। (ন্যাচারেলিজম বলতে ফোটোগ্রাফিক ইমিটেশন অভ্ নেচারকেই বোঝায়—রিয়ালিজমের বেলায় এই ইমিটেশনটা হয় একটা পদ্ধতি অনুসারে—বাছাই, ছাঁটাই করে)—কবিতার পোষাকে সজ্জিত করলেই কাব্যনাট্য হয় না—বাইরের বাহুল্যকে বর্জন করে ভেতরকার আসল রূপটাকে তুলে ধরাই হোল কাব্যনাট্যের কাজ।

এলিয়টের মতে ব্রাউনিং-এর রচিত নাটকগুলো অত্যন্ত প্রাণহীন—কিন্তু ব্রাউনিং-এর সব থেকে বড় কাজ হোল ড্রামাটিক মনোলগের আবিষ্কারের ভেতর দিয়ে নাটকের চরিত্র-সৃষ্টির দিকটা। প্রথমটায় মনে হয়েছিল এলিয়ট বোধ হয় ব্রাউনিং-এরই প্রবর্তিত ধারা অনুসরণ করে চলবেন। কিন্তু কিছুদিন বাদেই (১৯২৬ সালের আগেই) দেখা গেল, তিনি কাব্য-নাট্যের নতুন ফর্ম আয়ত্তে আনবার চেষ্টা করছেন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে।

এলিয়ট তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেছেন : 'নাটকের মূল উপাদানগুলি সম্বন্ধে এ্যারিস্টটলই শেষ কথা বলে গিয়েছেন তাঁর পোয়েটিক্‌স্‌-এ। অর্থাৎ কাব্য, সঙ্গীত এবং নৃত্য এই তিনটিই প্রধান উপাদান। ছন্দের মাধ্যমে অনুকরণ-এর দ্বারাই কাব্যের সৃষ্টি। আধুনিক নাট্যে এই ছন্দময়তার অভাবই সবচেয়ে বেশি করে চোখে পড়ে। শেক্সপীয়ারের নাটকের প্রডাকসন করতে গিয়ে যেন নাট্য-পরিচালকেরা উঠেপড়ে লেগে যান কিভাবে এই ছন্দকে বর্জন করে তাঁর নাটক মঞ্চস্থ করবেন।'

গ্র্যানভিল বার্কার যেমন একদিকে মঞ্চকে বুঝতেন, তেমনি ছন্দ সম্বন্ধেও পুরোপুরি ওয়াকিবহাল ছিলেন। সেই কারণেই তাঁর পরিচালনায় মঞ্চস্থ শেক্সপীয়ারের নাটকগুলি একটা বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল বৃটিশ প্রডাকসনের ইতিহাসে।

(ক্রমশঃ)

● শেলী—বিখ্যাত কাব্যনাট্য চেনুচি রচনা

খেলাধুলা

● শ্রীশান্তি দত্ত (মিঃ হারকিউলিস)

ফুটবল-জগতের বিস্ময়

বিশ্ব-ফুটবলের সত্যিকারের এক পরম বিস্ময় হলেন ৪৯ বছর বয়স্ক স্টোক সিটি দলের ফরোয়ার্ড স্ট্যানলী ম্যাথুস। প্রথম বিভাগে ম্যাথুসের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে আজ থেকে প্রায় ৩৩ বছর আগে। বত্রিশ কি তেত্রিশ বছর বয়সে অনেক খেলোয়াড়ই খেলার মাঠ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু আশ্চর্য। ম্যাথুস ৪৯ বছর বয়সেও প্রথম ডিভিসনের স্টোক সিটি দলের একজন নিয়মিত এবং অন্যতম নির্ভর-যোগ্য খেলোয়াড়। মাত্র ১৭ বছর বয়সে স্টোক সিটির পক্ষে স্ট্যানলী ম্যাথুস প্রথম ডিভিসনে খেলা সুরু করেন।

ইংলণ্ডে একসময় ফুটবল মানেই বোঝাত স্ট্যানলী ম্যাথুস, আর ফুটবলের যাদুকর ম্যাথুস মানেই ছিল ফুটবল। অবিস্মরণীয় ফুটবল খেলোয়াড় পুসকাস,

শ্রীঅমিতাভ

পেলের মত স্ট্যানলী ম্যাথুসেরও এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে বিশ্ব-ফুটবলের সঙ্গে।

দীর্ঘ খেলোয়াড়ী-জীবনে ম্যাথুসের ভাগ্যে যেমন সম্মান জুটেছে তা বোধহয় সকল খেলোয়াড়েরই স্বপ্ন। তিনি ইংলণ্ডের জনপ্রিয় কয়েকটি দলের পক্ষে খেলার সুযোগ পেয়েছেন। একটানা বহুদিন আন্তর্জাতিক ফুটবলে ইংলণ্ডের পক্ষে স্ট্যানলী ম্যাথুস অংশ গ্রহণ করেছেন। ইংলণ্ডের ফুটবল-রসিকরা আজও পর্যন্ত ম্যাথুসের দারুণ ভক্ত। ওদেশের ফুটবল মাঠে স্ট্যানলী ম্যাথুসের মত জনপ্রিয়তা বোধহয় খুব অল্প খেলোয়াড়ই অর্জন করতে পেরেছেন। 'শ্রেষ্ঠ ফুটবলারের' সম্মান ম্যাথুসের ভাগ্যে জুটেছে। কিন্তু খেলোয়াড়ী-জীবনের শেষ অঙ্কে দুটি দুর্লভ সম্মান স্ট্যানলী ম্যাথুসের জন্য অপেক্ষা করছিল।

মাত্র দু' বছর আগে ম্যাথুস তাঁর পুরাতন দল স্টোক সিটিতে ফিরে এলেন। স্টোক সিটি দল তখন দ্বিতীয় বিভাগে কোনক্রমে অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্য যুদ্ধ করে চলেছে। এই সময়ে ম্যাথুসের আগমন যেন নবজীবনের সঞ্চার করল স্টোক সিটি দলে, নতুন আশার আলো দেখালো তাঁর এই পুরাতন দলকে। নব প্রেরণায় অনুপ্রাণিত স্টোক সিটি সেবার দ্বিতীয় ডিভিসনে বিজয়ী হয়ে প্রথম ডিভিসনে উন্নীত হল। সেবার স্টোক সিটির নাগরিকবৃন্দ ম্যাথুসকে 'ফ্রিডম অব দি সিটি'-র সম্মানে ভূষিত করলেন।

এখন ম্যাথুস আর শুধু স্ট্যানলী ম্যাথুস নন। এখন তিনি স্যার স্ট্যানলী ম্যাথুস। পেশাদার ফুটবল খেলোয়াড় হয়ে এই দুর্লভ নাইটহুড সম্মান লাভ সত্যিই এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। এবার নাইটহুড সম্মানে ভূষিত করে ইংলণ্ডের রাণী ম্যাথুসের ক্রীড়া-প্রতিভাকে যোগ্য স্বীকৃতি দিয়েছেন; স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান স্যার লেন হাটন, স্যার ফ্রাঙ্ক ওরেলের সঙ্গে একই সারিতে স্থান পেলেন স্যার স্ট্যানলী ম্যাথুস।

আন্তঃরাজ্য এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা

এ্যাথলেটিক্স-প্রিয় পাঞ্জাবের চণ্ডীগড়ে এবার তৃতীয় আন্তঃরাজ্য এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। ক্রীড়ামানের দিক থেকে এবারের প্রতিযোগিতা আশানুরূপ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। রেকর্ড ভাঙা-গড়ার দিক থেকেও এবারের চণ্ডীগড়ের প্রতিযোগিতাটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বাংলার কয়েকজন এ্যাথলেটের উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্য সত্যিই আশার সঞ্চার করেছে বাংলার ক্রীড়ামোদীদের মনে।

চারদিনের প্রতিযোগিতায় বহু নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভারতের স্বল্পপাল্লার দৌড়বীর পাওয়েল ১০০ এবং ২০০ মিটারে নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বাংলার তরুণ এ্যাথলেট ব্যারী ফোর্ড ১০০ এবং ২০০ মিটারে তৃতীয় স্থান লাভ করেছেন। দীর্ঘলম্ফনে বাংলার শিশুতোষ মুখার্জী দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছেন। বাংলার আর এক এ্যাথলেট বিবেকানন্দ সেন ২০ কিলো-মিটার ভ্রমণে তৃতীয় স্থান লাভ করেছেন। ছেলেদের পোল ভল্টে বাংলার স্বপন দাস দ্বিতীয় স্থান দখল করার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

বাংলার এ্যাথলেটিক্স মহলে নবাগতা মহিলা এ্যাথলেট সোফিয়া খাতুনকে নিয়ে যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল; সোফিয়ার সাফল্য নিয়ে বিভিন্ন মহলে যথেষ্ট অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু চণ্ডীগড়ের আসরে সোফিয়া তাঁর যোগ্যতা প্রমাণিত করেছেন। বালিকাদের ১০০ মিটার এবং ২০০ মিটার দৌড়ে সোফিয়া প্রথম স্থান অধিকার করে প্রমাণিত করেছেন যে, তাঁর মধ্যে সম্ভাবনার ইঙ্গিত আছে।

মহিলা এ্যাথলেটদের মধ্যে সন্দেশ লোধী যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছেন। ভারতীয় মহিলা এ্যাথলেটদের মধ্যে বর্তমানে সন্দেশ লোধী প্রথম সারিতে স্থান লাভ করেছেন।

এবার বাংলার এ্যাথলেটদের সাফল্য দেখে আশা করা যাচ্ছে যে, অদূর ভবিষ্যতে তারা এ্যাথলেটিক্সেও বাংলাকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন।

রোভার্স কাপ

বোম্বাইয়ের রোভার্স কাপের আসর এখন জমজমাট। কলকাতার এরিয়ান্স দল মফৎলালের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় ২-০ গোলের ব্যবধানে পরাজয় স্বীকার করে বিদায় নিয়েছে। এই মফৎলাল দল কোয়ার্টার ফাইন্যালে গতবারের বিজয়ী অন্ধ্রপুলিশ দলকে ১-০ গোলে পরাস্ত করে ক্রীড়ামোদী মহলে যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। মনে হয় সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত মফৎলাল আগামী খেলায় কলকাতার কোন দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

কলকাতার মহমেডান স্পোর্টিং প্রথম আবির্ভাবেই মহীশূর জেলা দলকে ৩-০ গোলে পরাজিত করে চতুর্থ রাউণ্ডে উন্নীত হয়েছে। দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলায় কেরালা দল ৭-২ গোলের বিরাট ব্যবধানে ফিনিক্স স্পোর্টসকে পরাজিত করে পরবর্তী রাউণ্ডে ওয়েস্টার্ন রেলের সম্মুখীন

● স্ট্যানলী ম্যাথুস

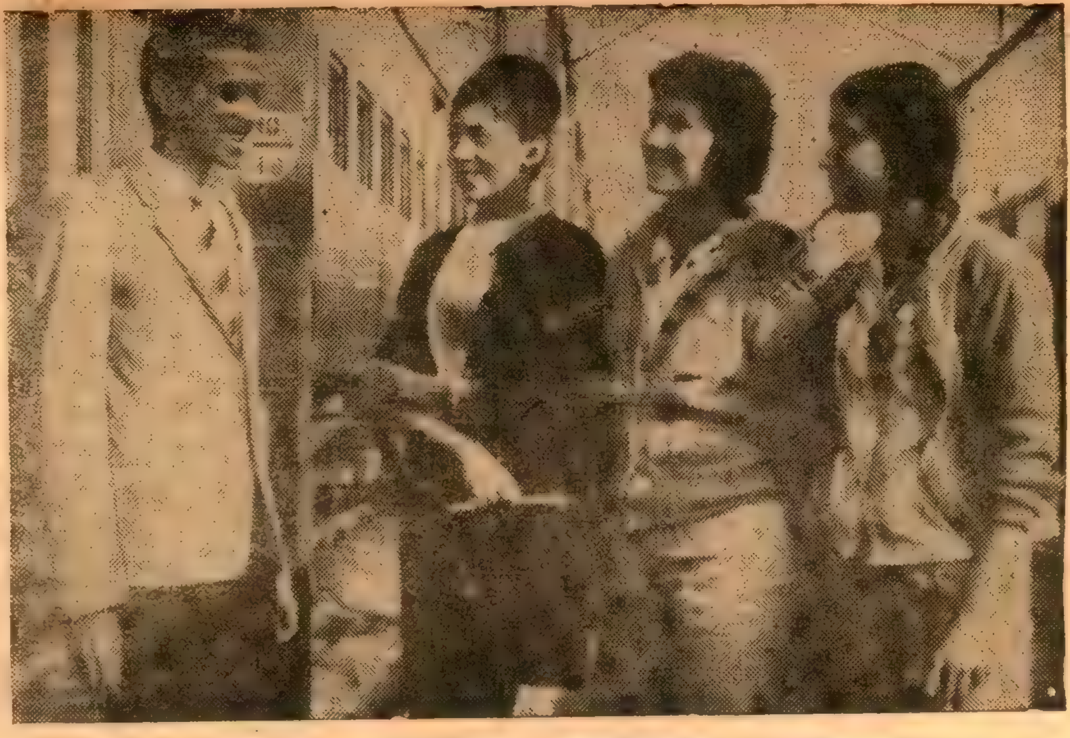

● চণ্ডীগড়ে আন্তঃ রাজ্য এ্যাথলেটিক্‌স প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী মহারাষ্ট্রের মাঝারী পাল্লার দৌড়ের প্রতিনিধি এ ডি সিকুইরা দলের মহিলা প্রতিনিধি ভায়োলেট পিটার্স (হার্ডলস), কৃশ্চিন ফৌর্জ (পেণ্টথালন) ও কে হারিকালের সঙ্গে আলোচনা করছেন।

হয়েছে। ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান রোভার্সের আসরে অবতীর্ণ হলে আসর জমে উঠবে। অন্ধ্র-পুলিশ পরাজিত হয়ে বিদায় নেবার ফলে কলকাতার দলগুলির এবার রোভার্স বিজয়ের সম্ভাবনা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। গতবারের রানার্সআপ ইস্টবেঙ্গল এবং এ বছরের ডুরাণ্ড বিজয়ী মোহনবাগান ক্লাবকে এবারের রোভার্সের সম্ভাব্য বিজয়ীর তালিকার উচ্চে বিনা দ্বিধায় স্থান দেওয়া যায়।

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দল আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেটের সেমি-ফাইন্যালে পাঞ্জাবকে পরাজিত করে, ফাইন্যালে বোম্বাইয়ের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছে। কলকাতা দলের শঙ্কর বোস প্রথম ইনিংসে ৫৫ রান করে দলকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। রবীন মুখার্জীর ৩৮ রান এবং দেব মুখার্জীর ৩৩ রান যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। প্রথম ইনিংসে পাঞ্জাবকে মাত্র ১১৫ রানে ইনিংস শেষ করতে বাধ্য করে কলকাতা দলের বোলারদের মারাত্মক বোলিং। ২৩ রানে ৬ উইকেট দখল করেন শঙ্কর বোস। শঙ্কর বোসের এই সাফল্য সত্যিই যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে।

যখন এই লেখা প্রস্তুত করছি তখন ফাইন্যাল খেলায় বোম্বাই দলের প্রথম ইনিংস মাত্র ২১৬ রানে শেষ হয়েছে। বোম্বাইয়ের শেষ জুটি দলের পতন রোধ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কারণ মাত্র ১৬৪ রানের মধ্যে বোম্বাইয়ের ৯টি উইকেটের পতন হয়। সঞ্জিৎ শীল এবং শঙ্কর বোসের মারাত্মক বোলিং বোম্বাই দলকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়। শীল ৮৫ রানে ৫ উইকেট এবং বসু ৪৬ রানে ৩টি উইকেট দখল করেন। কলকাতা দল ৫৯ রানে দুটি উইকেট হারিয়ে দিনের খেলা শেষ করেছে। তবে কোন দল যে এই খেলায় বিজয়ী হবে, বর্তমানে ভবিষ্যদ্বাণী করা খুবই শক্ত।

সমাচার দর্পণ

বৌবাজার ব্যায়াম সমিতিতে অনুষ্ঠিত শরীর প্রদর্শনী প্রতিযোগিতায় শ্রীশান্তি দত্ত 'মিঃ হারকিউলিস' উপাধি লাভ করেন।

• • •

এবার প্রজাতন্ত্র দিবসে প্রাক্তন ক্রিকেট খেলোয়াড় দেওধর এবং বিশ্ব বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়ান উইলসন জোন্স পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হয়েছেন।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতী

দিল্লীতে বার্মার রাষ্ট্রপ্রধান জেনারেল নে উইন

৯ বর্ষ, ৩৭শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৮শে মাঘ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ • 11th February, 1965 • Vol.

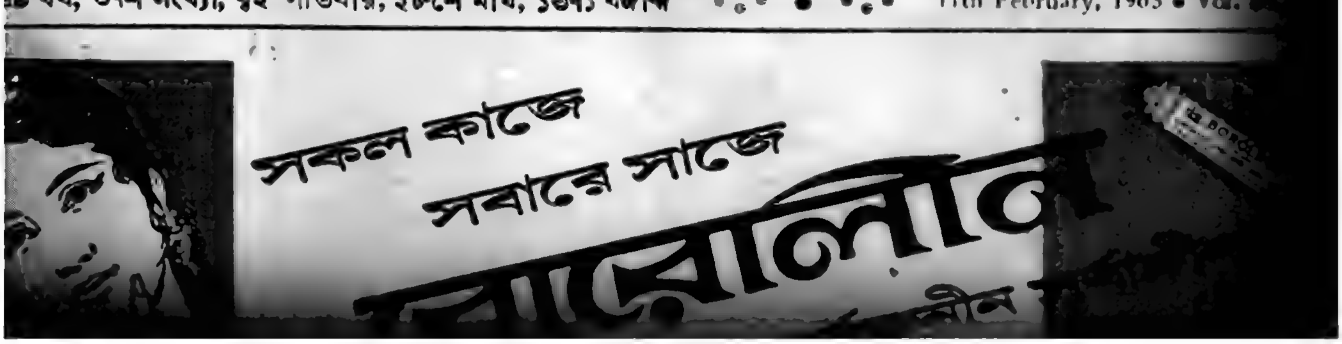

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	২৩০৭
আজকের মানুষ	...	২৩০৮
সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর	হরপ্রসাদ মিত্র	২৩০৯
তোমাকে (কবিতা)	সমীর ঘোষ	২৩১১
ভ্রান্তি. পথ. আহ্বান (কবিতা	সুধাংশু শাসমল	২৩১১
দিল্লী থেকে	বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য	২৩১২
রঁলার জীবনবেদ (প্রবন্ধ)	দিলীপ চৌধুরী	২৩১৫
স্বর্পণিকার প্রতি (কবিতা)	সুরজকান্তি দাস ভৌমিক	২৩১৮
এ মাসের বৃটেনে	জি এ জনসন	২৩১৯
ভারতদর্শন	...	২৩২১
আন্তর্জাতিক	...	২৩২৪
ডিটেকটিভ সবাই হতে পারে (গোয়েন্দা-গল্প)	পরিমল গোস্বামী	২৩২৯

W. H. Harton & Co. Ltd.

Rope Manufacturers

Since 1780

Head Office **: 8, Dalhousie Sq. East, CALCUTTA.**

Telegrams : "HARTONCO." CALCUTTA. Telephone : Office : 22-2878 ; Works : 66-2011

We specialize in 'Ropes' and 'lines' of all descriptions, viz :—

Manila Ropes	Loglines	Heald Cords
Sisal Ropes	Pilot Lead Lines	Whip Cords
Hemp Ropes	Marlines	Temperband Cords
Coir Ropes	Seizing Lines	Dobby Twines
Jute Ropes	Spun Yarns	Coir Fenders
Cotton Ropes	Oakums	Bore Springs

Cordage-Hawsers of any size up to 48" circumference.

Registered contractors and regular suppliers to Government, Port Trusts, Railways, Mills, Mercantile Firms, Shipping and Engineering Workshops, Harbour and Dock Yards, etc.

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অদ্বিতীয়া (ধারাবাহিক উপন্যাস)	সুশীল রায়	২৩৩৪
গ্রন্থমেলা	জয়ন্তী সেন	২৩৩৫
বাণিজ্যে সেকাল ও একাল	ধনপতি সওদাগর	২৩৩৬
আঁধারমাণিক (ধারাবাহিক উপন্যাস)	মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	২৩৩৯
নির্বিকল্প (কবিতা)	সন্দীপকুমার সেনগুপ্ত	২৩৪৪
সমুদ্রের নামে (কবিতা)	বরুণ মজুমদার	২৩৪৪
শিকার (গল্প)	দিলীপ মিত্র	২৩৪৫
বঙ্গদর্শন	..	২৩৪৯
চার্লি চ্যাপলিন	অশোক সেন	২৩৫৩
রঙ্গজগৎ	...	২৩৫৭
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	শিলালি	২৩৬৩
খেলাধুলা	শ্রীঅমিতাভ	২৩৬৬

শ্রী কৃষ্ণ

পরম ভাগবত দেবেন্দ্রনাথ বসু বিরচিত

ভক্তির মন্দাকিনী

প্রেমের অলকনন্দা

জ্ঞানের আকাশগঙ্গা

বঙ্গসাহিত্যে এরূপ মহাগ্রন্থ আর নাই

চিরনূতন—সুশোভন—সম্মোহন সংস্করণ

মূল্য পনর টাকা

যে জ্ঞান-সূর্যের সর্বতোমুখী প্রতিভার কিরণচ্ছটায় ভারত-মহিমা চিরভাস্বর—সেই সাহিত্যজগজ্জ্যোতি—প্রতিভা ও মনীষার অবতার—সাহিত্য-তপস্যানিষ্ঠ—

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর

হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী

কাঞ্চনমালা, বেণের মেয়ে, মেঘদূত, বাল্মীকির জয়, ভারত-মহিলা, বাঙ্গালা সাহিত্য সমালোচনা, ঐতিহাসিক নিবন্ধমালা, শিক্ষাসন্দর্ভ, সমাজসংস্কার নিবন্ধরাজি, মোহিনী।

এই জাতীয় সাহিত্য-জয়ন্তী মাত্র ১।।০

নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

শ্রীগৌরাঙ্গ ও প্রফুল্ল

শ্রীপ্রমথনাথ মজুমদার বি-এল প্রণীত

।। দ্বিতীয় সংস্করণ ।।

মূল্য দুই টাকা মাত্র

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

৬১ বর্ষ, ৩৭শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পঃ 25 Paise
বৃহস্পতিবার, ২৮শে মাঘ ১৩৭১ Thursday, 11th February 1965

মাধ্যমিক শিক্ষকদের ধর্মঘট

আগামী ষোলই ফেব্রুয়ারী থেকে মাধ্যমিক শিক্ষকদের অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতির প্রস্তাবে আমাদের সরকার উপেক্ষার ভাব প্রদর্শন করলেও, আমাদের কাছে তা উপেক্ষণীয় নয়। দিনের পর দিন শিক্ষকদের দাবিগুলিকে অস্বীকার করার মনোভাব নিয়ে সরকার যদি নির্বিকার থাকেন, তাহলে গণতন্ত্রসম্মত সংগ্রামের পথ গ্রহণ করা ছাড়া তাঁদের পক্ষে আর নতুন কোন্ পন্থা গ্রহণের উপায় থাকতে পারে? দেশের বিভিন্ন স্তরের কর্মে নিযুক্ত মানুষের মাহিনা বা মহার্ঘভাতা দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে আনুপাতিক হারে না হলেও—কিছুটা বেড়েছে। কিন্তু দেশের শিক্ষকগণকেও যে এই দুর্মূল্যের দিনে নগদ পয়সা ব্যয় করে প্রাণধারণ করতে হয়—সরকার এই সোজা কথাটা কেন স্বীকার করতে রাজি নন, তা আমরা ভেবে পাই না।

জাতীয় সরকার যদি এই মনোভাব নিয়ে থাকেন তাহলে দেশের শিক্ষারও যে সর্বনাশ হবে—তা আর চেঁচিয়ে বলার দরকার হয় না। কারণ অভুক্ত অবস্থায় শিক্ষক যদি না বাঁচে, তাহলে শিক্ষাকে বাঁচাবে কে? আমলাতান্ত্রিক ছাঁচে যে সরকার নির্মিত একমাত্র সেই সরকার শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার মৃত্যু কামনা করতে পারেন—কিন্তু কোনো কল্যাণকামী রাষ্ট্র সেকথা কখনো ভাবতেই পারেন না। তাই সরকারের নিকট আমাদের অনুরোধ, শিক্ষাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষার জন্য তাঁরা শিক্ষকদের কথা সর্বাগ্রে ভাবুন।

মাধ্যমিক শিক্ষকগণ নিরুপায় অবস্থায় যে ধর্মঘটের প্রস্তাব করেছেন তা থেকে বিরত করার জন্য তাঁদের দাবিগুলি সরকার স্বীকার করে নিন। মাধ্যমিক শিক্ষকগণ শুধু নিজেদের মাহিনা বৃদ্ধির জন্য ধর্মঘট আহ্বান করেন নি, তবে তাঁদের প্রাথমিক দাবি হচ্ছে অভুক্ত শিক্ষক দ্বারা শিক্ষা চলে না। এই দাবি একান্ত ন্যায্য। আমরা বলবো, সমাজে কিভাবে শিক্ষকদের সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যায় সেকথাও সরকারের ভাবা উচিত। আমরা শিক্ষকদের দারিদ্র্যের জন্য এমন ধারণায় পৌঁছেছি, সমাজের কেউ চাই না যে আমাদের সন্তান-সন্ততি শিক্ষাদানের পথ গ্রহণ করুক। অথচ বর্তমান যুগে অন্যান্য সভ্য দেশে এর বিপরীত ধারণাটাই সমাজচিত্রে দৃঢ়নিবদ্ধ থাকে। সেই কারণে বলতে ইচ্ছে হয়, হায় এদেশের মুমূর্ষু শিক্ষক-সমাজ, হায় এদেশের দুর্ভাগ্যপ্রপীড়িত শিক্ষা—যা বৃটিশ রাজত্বের আমল থেকে স্বাধীন ভারতেও একই আমলা-তন্ত্রের দ্বারা পরিচালিত।

যা হোক, শিক্ষকদের প্রস্তাবিত ধর্মঘটের দাবি শুধু মাহিনা বা মহার্ঘ-ভাতা বৃদ্ধিই নয়, তাঁরা চান শিক্ষার উন্নতি, সর্বস্তরে শিক্ষার সমন্বয়, পূর্ণ গ্রন্থাগার, ছাত্রদের টিফিনের প্রবর্তন, ক্লাসে ছাত্রদের বসবার উপযুক্ত স্থান, ভারী সিলেবাসের পরিবর্তন (যা হবে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ জীবনের গতি নির্ণয় করা সম্ভব হবে), সুযোগ্য শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতনের হার ও মর্যাদা (যার ফলে, তাঁরা বিদ্যায়তন ত্যাগ করে অন্য পথ গ্রহণে উন্মুখ হবেন না এবং ছাত্রদের পড়ার ক্ষতিও হবে না), এবং অভিভাবকদের ব্যয়বহন হ্রাস প্রভৃতি। বলা বাহুল্য, এই দাবিগুলিও অন্যায় নয় এবং ধর্মঘট থেকে নিবারিত করার ন্যায্য উপায় সরকারের হাতেই রয়েছে।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ। ভক্তিতেই প্রাপ্ত।

তাই রাজনীতি-জীবনের দীর্ঘ কণ্টকাকীর্ণ পথ তাঁকে অতিক্রম করতে হয় নি। বহুতর দুর্যোগের মুখোমুখি হতে হয় নি। অথচ একদিন পরিণত বয়সে প্রাপ্তির ঐশ্বর্যে তিনি স্বর্ণময় হলেন। চাকরির জীবন থেকে মঃ জর্জ পম্পিদু হলেন ফরাসী দেশের প্রধানমন্ত্রী। রাজনীতির সঙ্গে তাঁর কোনো প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না। কোনোদিন কোনো দলের নেতৃত্ব করেন নি। বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, অর্থনীতি-বিশেষজ্ঞ চাকরিজীবী মঃ পম্পিদু। দ্য গলের প্রতি তাঁর অপরিসীম ভক্তি আর অপরিমিত বিশ্বাস। রাজনীতি-সচেতন মানসিকতা নিয়ে প্রয়োজনবোধে তিনি দ্য গলকে সমর্থন করেছেন বরাবর। আর সেই জন্যই দ্য গল সম্ভবত, ফরাসী দেশের আর্থিক দুর্দিনে মঃ মিশেল দব্রের স্থানে মঃ পম্পিদুকে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেটা ১৯৬২ সালের এপ্রিল মাসের কথা।

দ্য গলের সঙ্গে পম্পিদুর ঘনিষ্ঠতা বাল্যকাল থেকেই। উভয়ের পিতা একই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। মঃ পম্পিদুরও প্রথম জীবন শুরু হয় শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে। তাঁর ছাত্রজীবন অসাধারণ কৃতিত্বে উজ্জ্বল। মঃ পম্পিদু ফরাসী সাহিত্য, ধনবিজ্ঞান ও রাজনীতিতে এম-এ। কিছুকাল শিক্ষকতার পর চাকরি নেন রথচাইল্ড ব্যাঙ্কে। ডিরেক্টার জেনারেলের কাজ। বিশ্ববিখ্যাত ধনী রথচাইল্ড-পরিবারের সঙ্গে তাঁর নিবিড় ঘনিষ্ঠতা ছিল। অনুমান করা হয়ে থাকে রথ্যাইল্ডের সপ্রীতি মনোভাব পরবর্তীকালে দ্য গলকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাহায্য করেছিল। ১৯৫৮ সালে দ্য গলের ক্ষমতা লাভের ব্যাপারে রথচাইল্ডের ভূমিকার পেছনে মঃ পম্পিদুর হাত ছিল অনেকখানি।

মঃ পম্পিদু হাতে-কলমে রাজনীতির জীবন শুরু করেন মাত্র তিন বছর আগে, কিন্তু রাজনীতির এলাকা থেকে যে খুব দূরে ছিলেন তা নয়। নানাভাবে নানা বিষয়ে তিনি দ্য গলকে পূর্ব থেকেই পরামর্শ দিয়ে এসেছেন। তাঁর চিন্তা-বুদ্ধির ওপর দ্য গলেরও আস্থা কম নয়। আলজেরিয়ার যুদ্ধের সময় মঃ পম্পিদুই দ্য গলের পক্ষে বিপ্লবী দলের সঙ্গে গোপন আলোচনা চালান। ১৯৬২ সালের গোড়ায় তাঁরই প্রচেষ্টায় এভিয়ার বৈঠক সার্থক হয়ে ওঠে। বেন বেল্লা দলের সঙ্গেও তিনিই বোঝাপড়া করেন এবং ফরাসী দেশের আর্থিক দুর্যোগের দিনে তাঁরই ডাক পড়েছিল প্রধানমন্ত্রিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করবার জন্য।

চুয়ান্ন বছর বয়স্ক ভারত-অতিথি মঃ পম্পিদুর আর একটি পরিচয়, তিনি কাব্যরসিক। ১৯৬১ সালে একালের ফরাসী কবিদের কবিতার সংকলন প্রকাশ করেছেন। নিজে কাব্য রচনা করেন না কিন্তু কবিতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাঁর সযত্ন প্রয়াস উল্লেখ করবার মত। তা ছাড়া মঃ পম্পিদু শিল্পরসিকও বটে। বিশেষত এ্যাবস্ট্র্যাক্ট আর্টের প্রতি তাঁর অনুরাগ মাত্রাতিরিক্ত।

এই প্রথম একজন ফরাসী প্রধানমন্ত্রীর ভারত পরিভ্রমণ। ভারতের সঙ্গে ফরাসী দেশের রাজনৈতিক সম্পর্ক দু'শো বছরেরও অধিককাল ধরে। তাই ফরাসী প্রধানমন্ত্রীর এই ভারত ভ্রমণ নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা এবং স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে কূটনৈতিক সম্পর্ক সৃষ্টির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আজকের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিচারে হয়ত ফরাসী দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক

মঁঃ জর্জ পম্পিদু

ষোলো আনা মধুর নয়, তথাপি একথা ঠিক, বিশ্ব-রাজনীতির ক্ষেত্রে ঐতিহ্যসম্পন্ন দু'দেশের মৈত্রী দীর্ঘস্থায়ী হবার পথে বাধা খুব অল্পই। মঃ পম্পিদুর ভারত ভ্রমণ তাই আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার ব্যাপারে অনেকখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে আশা করা যেতে পারে। বারুদ-ঠাসা বিশ্বকে সম্ভাবিত বিপদ থেকে রক্ষা করবার জন্য ফরাসী ও ভারতের দায়িত্বও কম নয়। আশা করা যায় উভয়ের মিলিত কর্মপ্রচেষ্টা সেই দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকবে। ভারত-ফরাসী মৈত্রী দীর্ঘজীবী হোক।

সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর

হরপ্রসাদ মিত্র

[পূর্বসংখ্যায় প্রকাশিত 'সাহিত্যের দেশ-দেশান্তরে'র শেষ অনুচ্ছেদের প্রথম বাক্যের পরে ভ্রমক্রমে একটি বাক্য বাদ পড়েছিল। প্রথম বাক্যটির পরে পড়তে হবে---বোধ হয়, এই ধরনের চিন্তার সূচনা সেই ১৯২১ এর কাছাকাছি সময়ে।]

সেই যন্ত্রণাকাতর ভবিষ্যৎ থেকে অতীতে ফিরলুম।

সময়ের বেড়ার মধ্যে মন ছটফট করে। যখন বর্তমান জ্বালা হয়ে ওঠে, তখন ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখি। যখন ভবিষ্যৎ দুঃস্বপ্ন হয়ে ওঠে, তখন অতীতে আশ্রয় চাই।

হয়তো, সেই কারণেই কাপেকের R. U. R.-এর সেই রোবট-ভাবনা স্থগিত রেখে, হঠাৎ রবীন্দ্র-নাথের গল্পগুচ্ছের দিকে মন ফিরলো।

১৯২১ থেকে আরো প্রায় বছর-তিরিশ আগেকার কথা। খ্রীস্টাব্দের হিসেবে নব্বুইয়ের দশক। 'মহামায়া' গল্পটি সেই আমলের রচনা। আজ কি সেদিনের ছবি আবার দেখা যায়? পৃথিবী কী রকম ছিল সেই আমাদের বাংলা ১২৯৯ সালে? সেই মহামায়ার কথা মনে এলো। সেকালের সেই প্রকৃতি কি এখনো আছে?

কাপেকের 'রোবট' নয়,---অর-ওয়েলের ভয়াবহ 'সত্য'-বৃত্তও নয়,---মনে পড়লো 'মহামায়া' গল্পের প্রথম লাইনটি---'মহামায়া এবং রাজীবলোচন উভয়ে নদীর ধারে একটা ভাঙা মন্দিরে সাক্ষাৎ করিল।'

ঐ লাইনটিতেই এক নাটকের বীজ ছিল। 'মহামায়া' গল্পে রবীন্দ্র-নাথ সেই পুরো নাটকটাই দেখিয়ে দিয়েছেন।

অরওয়েল আমাদের ভবিষ্যতের রোমাঞ্চকর নাটক দেখিয়ে গেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঐ গল্পে ভবিষ্যতের দিকে না এগিয়ে, অতীতে পিছিয়েছিলেন। অতীত বটে, কিন্তু সেও এক ভয়াবহ পরিস্থিতি।

সাহিত্যে এক্স্প্রেশনিজ্‌মের কথা ভাবতে ভাবতে আজ অকস্মাৎ সেই আমাদের বাংলা দেশের ভয়াবহ অতীতের ছবি মনে এলো।

মহামায়ার বাপ ছিলেন না, বড় ভাই ছিলেন ভবানীচরণ চট্টোপাধ্যায়; সে কুলীনের ঘরের কুমারী, বয়স চব্বিশ বছর,---বিয়ে হয় নি। যেমন স্বাস্থ্য, তেমনি ছিল সৌন্দর্য। আর, ভাই-বোন দুজনেরই মেজাজ এক রকম---মুখে কথা ছিল না, কিন্তু তাঁদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে তেজ ছিল। সেই তেজের পরিচয় দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লেখেন---'দিবা দ্বিপ্রহরের মতো নিঃশব্দে দহন করে।'---

ভাঙা মন্দিরে নদীর ধারে রাজীব মহামায়াকে দেখা করতে ডেকেছিল। সেটা সন্ধ্যা নয়, নিশীথ নয়, গোধূলিও নয়। দেখা হয়েছিল মধ্যাহ্নে।

মহামায়ার দৃষ্টি ছিল---'দিবালোকের ন্যায় উন্মুক্ত এবং নির্ভীক।' রাজীব সে-গ্রামে রেশমের কুঠির বড়ো-সাহেবের আশ্রিত। তার বাপ ছিলেন সেই বামনহাটির কুঠির কর্মচারী। পিতৃবিয়োগের পরে রাজীব তার এক পিসীর সঙ্গে সেখানে মহামায়াদের প্রতিবেশী হিসেবে বাস করতো। সেই সূত্রে পিসীর সঙ্গে মহামায়ার স্নেহসম্পর্ক দাঁড়িয়ে যায়।

রাজীবের বয়স তখন উনিশ বছর। তার পিসীও ইতিমধ্যে মারা গেছেন। মহামায়া রাজীবের বাল্যসঙ্গিনী ছিল বটে, কিন্তু উনিশ বছরের যুবক রাজীবকে সান্নিধ্যের উৎসাহ দেয় নি সে।

তবু দুজনের দেখা হয়েছিল। কারণ, রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন---'বৃদ্ধ প্রজাপতি যখন ঢুলিতেছিলেন, যুবক কন্দর্প তখন সম্পূর্ণ সজাগ অবস্থায় ছিলেন।'

কন্দর্প চিরকালের দেবতা। ১২৯৯ সালের বাঙালী লেখকের রচনাতেও তিনি বিদ্যমান, আবার ১৯৪৯এর বিদেশী লেখক অরওয়েলের '১৯৮৪'তেও তাঁর উপস্থিতি দেখা গেছে। তিনি আছেন বটে, কিন্তু অব্যাহত নন। মহামায়া-রাজীব কাহিনীতে তিনিই ছিলেন প্রচণ্ড ট্র্যাজেডির বিধাতা।

সে ট্র্যাজেডির সংঘাত-সংঘর্ষ যতোই প্রচণ্ড হোক, আজ আর তার আনার জোর নেই। মহামায়ার সঙ্গে রাজীবের সাক্ষাৎ ব্যাপারটি মহামায়ার অভিভাবক তেজস্বী ভবানী-চরণের চোখে পড়ে গিয়েছিল। তিনি মুমূর্ষু এক বৃদ্ধের সঙ্গে সেই রাত্রেই মহামায়ার বিবাহ ঘটিয়েছিলেন এবং পরদিনই মহামায়া বিধবা হয়েছিল। সহমরণের চিতাও জ্বলেছিল। কিন্তু মহামায়া রাজীবকে কথা দিয়েছিল যে সে রাজীবের ঘরে ফিরবে। তাই সে ফিরে এসেছিল।

চিতার আগুনে পুড়ে, সেই প্রলয়-ঝড়ের সন্ধ্যায়---'ঘরের মধ্যে আর্দ্র বস্ত্রে একটি স্ত্রীলোক প্রবেশ করিল, তাহার মাথায় সমস্ত মুখ ঢাকিয়া ঘোমটা।'

রাজীবকে সে বলেছিল---'কিন্তু রাজীব, আমি ঠিক সে আমি নাই, আমার সমস্ত পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে।

কেবল আমি মনে মনে সেই মহামায়া যাচ্ছি।'

বলেছিল---'যদি প্রতিজ্ঞা করো, কখনো আমার ঘোমটা খুলিবে না, আমার মুখ দেখিবে না---তবে আমি তোমার ঘরে থাকিতে পারি।'

রাজীব রাজি হয়েছিল। সেই রাত্রে, সেই ঝড়ের মধ্যেই তারা ছুটে বামনহাটি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তাদের সেই পলায়নের দৃশ্যটি এইভাবে দেখিয়ে গেছেন---'বায়ুর বেগ পশ্চাৎ হইতে আঘাত করিল। যেন ঝড়ে লোকালয় হইতে দুইটা মানুষকে ছিন্ন করিয়া প্রলয়ের দিকে উড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে।'

'মহামায়া' গল্পের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শেষ এইখানেই। গল্পটি এইখানেই শেষ হলে ক্ষতি ছিল না। অবশ্য সে-রকম ইচ্ছে করলে, রবীন্দ্রনাথ ঐ ঘোমটার প্রসঙ্গটুকু বলতেন না হয়তো, ---কিম্বা অন্যভাবে বলে অন্যভাবে শেষ করতেন হয়তো কিন্তু তা তিনি করেন নি। আরো একটি ছোটো পরিচ্ছেদ যোগ করেছেন এবং তাতেই ঘোমটা-ঘটিত ট্রাজেডিটুকু ঘটেছে। চিতার প্রচণ্ড জ্বালার পরে সে-জ্বালা আর ততোটা জ্বলে না। বোধ হয়, আমাদের বড়ো বড়ো আঘাতের পাশে আরো সূক্ষ্ম আঘাত্‌গুলো নির্দাহ না-হোক, নিস্তেজ হয়ে যায়। 'মহামায়া' গল্পের তৃতীয় পরিচ্ছেদটুকু তাই আমার ভারি ক্ষীণ মনে হয়।

কিন্তু সে-কথা যাক। তৃতীয় পরিচ্ছেদের শুরুতেই একটু কৈফিয়ৎ আছে। গল্পের ঘটনাকাল জানাতে গিয়ে সেই প্রথম অনুচ্ছেদেই লেখা হয়---'গল্পটা পাঠকেরা নিতান্ত অমূলক অথবা অলৌকিক মনে করিবেন না। যখন সহমরণপ্রথা প্রচলিত ছিল, তখন এমন ঘটনা কদাচিৎ মাঝে মাঝে ঘটিতে শুনা গিয়াছে।'

এই সুদূরকালের অতীতে পাঠককে পিছিয়ে নিয়ে গিয়ে তিনি বলেছেন যে রাজীবের জীবনে সুখ ছিল না। মহামায়ার সেই ঘোমটাই ছিল তার অসুখের কারণ। ---'সেই ঘোমটাটুকু মৃত্যুর ন্যায় চিরস্থায়ী, অথচ মৃত্যুর অপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক।'

রাজীব সেই ঘোমটা সরিয়ে মহামায়ার মুখ দেখতে চেয়েছিল। 'লিপিকা'র সেই রাজপুত্রের কথা মনে পড়ে যিনি পরী-কে বিবাহ করেছিলেন। পরী ছদ্মবেশে এসেছিলেন। তিনি চলে গিয়ে জানিয়ে দিয়ে যান যে তিনি এসেছিলেন।

মহামায়াও চলে গিয়েছিল। গল্পের শেষ লাইনে তার ক্ষমাহীন চিরবিদায়ের নীরব ক্রোধানল জ্বলেছে।

'লিপিকা'র 'পরী' কিন্তু সত্যিই ট্রাজিক। সেখানে ক্রোধানল ছিল না। সে বেদনা গভীর নৈরাশ্যের হাহাকার। তা ছাড়া সেখানে পুরো একটি রচনার অভিনিবেশ অনুভব করা যায় একই মর্মান্তিক বেদনার দিকে। সে-তুলনায় মহামায়ার ওপর ভাগ্যবিধাতার মারণাস্ত্রের প্রকোপ বড়োই বেশি। প্রথম আঘাত আসে অন্ধ ভবানীচরণের এবং নির্বোধ সমাজের বৈগুণ্যে, দ্বিতীয় আঘাত ঘটে খুবই স্বাভাবিক কারণে—সঙ্গতভাবে অসহিষ্ণু রাজীবেরই অবিবেচনায়।

তবে, রাজীবের বিরুদ্ধে আমার তো মনে হয়, পাঠকপক্ষে কোনো অনাস্থার কারণ নেই, কোনো সত্যিকার অভিযোগ নেই। তাই মহামায়ার শেষ-বিদায় ততো শোকাচ্ছন্ন মনে করতে পারি না, যতোটা আকস্মিক এবং অপ্রীতিকর বলে মনে হয়।

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ঐ প্রসিদ্ধ গল্পটির প্রথম দু'পরিচ্ছেদে গল্প-রসই ছিল মুখ্য আবেদন; তৃতীয় পরিচ্ছেদে গল্পের চেয়ে কবিতার মেজাজই বড়ো হয়ে উঠেছিল বোধ হয়।

লিখতে লিখতে এ-সব কথা এসে গেল। আজ আমার আসল অভিপ্রায় ছিল অরওয়েলের '১৯৮৪'-র ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে একটু অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া,---একটু বিশ্রাম দেওয়া মনকে। তাই 'মহামায়া' গল্পের বিশেষ দুটি আবহাওয়ার স্বাদ ফিরে পেতে চেয়েছিলুম। সে স্বাদ নৈসর্গিক। সেই আস্বাদনের কথা ভাবতে গেলেই মনে হয় প্রকৃতির সঙ্গে মন আমাদের কী যে গভীর গ্রন্থিতে বাঁধা। আমরা প্রকৃতির সান্নিধ্য চাই। আমাদের জীবনে প্রেম এবং প্রকৃতি দুইই দরকার। এ সত্য এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। যাঁরা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন, তাঁরা প্রকৃতির প্রতিশোধ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেন কি?

প্রথম আবহাওয়া দুপুরের। যে মধ্যাহ্নে রাজীবের সঙ্গে মহামায়া সেই বামনহাটির ভাঙা মন্দিরে দেখা করতে গিয়েছিল, সেই দুপুরের শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ আজও আমাদের মন উদাস করে। মনে মনে সেই মধ্যাহ্নের আবাহন করি। চিত্রপটে চিরকালের রাজীব-মহামায়ার স্থিরমূর্তি দেখতে পাই---

> 'বাতাসে মন্দিরের অর্ধ-সংলগ্ন ভাঙা কবাট এক-একবার অত্যন্ত মৃদুমন্দ আর্তস্বর-সহকারে ধীরে ধীরে খুলিতে এবং বন্ধ হইতে লাগিল; মন্দিরের গবাক্ষে বসিয়া পায়রা বকম্‌ বকম্‌ করিয়া ডাকে, বাহিরে শিমুলগাছের শাখায় বসিয়া কাঠঠোকরা একঘেয়ে ঠক্‌ ঠক্‌ শব্দ করে, শুষ্ক পত্র-রাশির মধ্য দিয়া গিরগিটি সর্‌ সর্‌ শব্দে ছুটিয়া যায়, হঠাৎ একটা উষ্ণ বাতাস মাঠের দিক হইতে আসিয়া সমস্ত গাছের পাতার মধ্যে ঝরঝর করিয়া উঠে এবং হঠাৎ নদীর জল জাগিয়া উঠিয়া ভাঙা ঘাটের সোপানের উপর ছলাৎ ছলাৎ করিয়া আঘাত করিতে থাকে। এই সমস্ত আকস্মিক অলস শব্দের মধ্যে বহুদূর তরুতল হইতে একটি রাখালের বাঁশিতে

মেঠো সুর বাজিতেছে। রাজীব মহামায়ার মুখের দিকে চাহিতে সাহসী না হইয়া মন্দিরের ভিত্তির উপর ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া এক প্রকার শ্রান্ত স্বপ্নাবিষ্টের মতো নদীর দিকে চাহিয়া আছে।'

দ্বিতীয় আবহাওয়া এক বর্ষাঋতুর কৃষ্ণদশমীর রাত্রির। সেই রাত্রেই রাজীব-মহামায়ার জীবনের দ্বিতীয় যোগটি ঘটে।—

'রাজীব দেখিতেছিল, অন্ধকার তরুশ্রেণীর প্রান্তে শান্ত সরোবর একখানি মার্জিত রূপার পাতের মতো ঝক্ ঝক্ করিতেছে। মানুষ এরকম সময় স্পষ্ট একটা কোনো কথা ভাবে কি না বলা শক্ত। কেবল তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ একটা কোনো দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে—বনের মতো একটা গন্ধোচ্ছ্বাস দেয়, রাত্রির মতো একটা ঝিল্লিধ্বনি করে। রাজীব কী ভাবিল জানি না, কিন্তু তাহার মনে হইল, আজ যেন সমস্ত পূর্বনিয়ম ভাঙিয়া গিয়াছে। আজ বর্ষারাত্রি তাহার মেঘাবরণ খুলিয়া ফেলিয়াছে এবং আজিকার এই নিশীথিনীকে সেকালের সেই মহামায়ার মতো নিস্তব্ধ সুন্দর এবং সুগম্ভীর দেখাইতেছে। তাহার সমস্ত অস্তিত্ব সেই মহামায়ার দিকে একযোগে ধাবিত হইল।'

আশ্চর্য আমাদের চৈতন্যের সম্ভাবনা! এইচ জি ওয়েল্স্ অলডাস্ হাক্সলি,—কাপেক—অরওয়েল ইত্যাদি পশ্চিমের রাজনীতি-বিজ্ঞানময় যন্ত্র-জগতের মনীষীরা আমাদের ভবিষ্যৎ অবস্থার ছবি এঁকেছেন। বিজ্ঞান এবং রাজনীতি আমাদের জীবনকে দিনে দিনে বাঁধছে আমরা সুখের উপকরণ খুঁজছি, পাচ্ছি,—কিংবা না-পেয়ে অসুখী হচ্ছি। সাহিত্যের নানা খবরের মধ্যে সে-খবরও জ্ঞাতব্য। সেই সঙ্গে এই অন্য খবরটাও ভোলবার নয় যে কোনো কোনো আশ্চর্য পরিস্থিতিতে মানুষের মন চায় অস্পষ্ট কোনো আদিম এবং চিরকালীন আকর্ষণের দিকে এক-যোগে ধাবিত হতে। বনের মতো গন্ধোচ্ছ্বাস, রাত্রির মতো ঝিল্লিধ্বনি হয়ে ওঠে মন। আমি তাকেই বলছিলুম—মনের মহামায়াবোধ।

সাহিত্যে এক্সপ্রেশনিজ্‌মের উৎস-মূলে ছিল এই মহামায়াবোধ সম্বন্ধে যন্ত্র-যুগের উদাসীনতা। আধুনিক সভ্যতার চাপে পড়ে মানুষ নিজের মনের মহামায়াকেই হারিয়ে ফেলেছে বলে কারও কারও মনে আশঙ্কা দেখা দেয়। সেই সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার এসে যোগ দেয়। স্ট্রিণ্ডবার্গ এ-আন্দোলনের আদি-নাম বটে, কিন্তু এ ধারা বেশ একটি ব্যাপক ধারা। মার্ক্সের গণ-আন্দোলন সম্পর্কিত আদর্শও এ-ধারায় ছায়া ফেলে গেছে। (ক্রমশঃ)

তোমাকে

সমীর ঘোষ

কোনো অবকাশ নেই।
দুরন্ত চড়াই ভেঙে ভেঙে
হাঁপ ধরে।
মনে হয় আকাশের রঙ বুঝি একান্ত সীমিত,
সমুদ্রের ঢেউ বুঝি হঠাৎ দাঁড়ালো ;
আলো আছে, তবু যেন অন্ধকার
অস্থির বধির—
বাতাসে প্রশ্বাস নেই
আছে শুধু ক্ষয়িষ্ণু নিশ্বাস।
তোমার চোখের রঙ কিন্তু যেন অসীম আনীল,
পাখা মেলে উড়ে গেছে পার হোয়ে
উত্তুঙ্গ কার্নিশ—
এ চড়াই ভেঙে ভেঙে নিশ্বাসের শেষাঙ্কের বিষ
হঠাৎই উড়িয়ে নেয় আশ্বাসের মত শঙখচিল।

এই পথে যেতে হবে। এই সেই মেরুবর্ষ পথ,
সুবর্ণের ঝলকানি, চমকিত স্বর্গীয় জীবন—
সীমিত আকাশ হোতে সংসারের অচ্ছেদ্য নিকটে
ক্ষয়িষ্ণু নিশ্বাস ফেলে এসো রাখি যাওয়ার শপথ।

ভ্রান্তি. পথ. আহ্বান

সুধাংশু শাসমল

গ্রামে ফিরে চল্ নাগরিক-চিল এখানে বড্ড ধোঁয়া ;
তুঙ্গ প্রাকারে ইঁদুরের খোঁজে চোখের মতন সারা
জীবনটা কেন ব্যয় ক'রে গেলি ; বাচ্চা হাতের মোয়া
জীবনটা নয় ; ভেবে দেখবার সময়ও নেই আজ
নাকে দড়ি দিয়ে কেবল ঘোরালো কে সেয়ান ধড়িবাজ।

কোন ভুল ক'রে উড়ে এলি এই লোভের অন্ধকারা
গোলোকধাঁধার মায়া কাটলো না ডানায় মৃত্যু নামে ;
ক্লেদ-নরকের আপাতরম্য ইঁদুরের লোভে সারা
সময়টা কেন ব্যয় ক'রে গেলি ; ভাবতে হবে না তোকে ?
নিন্দুক কেন ছড়ায় লজ্জা, দুর্নাম করে লোকে।

বিড়ম্বনার চিমনী আকাশে ঝলকে মৃত্যু ওঠে
টুপ্ ক'রে কবে খাবি খেতে খেতে পড়ে যাবি ফুটপাতে ;
এ লোভ আজকে শেষ হোক তোর গ্রামের আকাশে চল,—
সূর্যের রোদে ডানায় ডানায় সোনালি কুসুম ফোটে
তাল-দেওয়ার শাখায় তোমার চির আশ্রয়স্থল।

বর্ষায় ভ'রে গিয়েছে গ্রামের সমস্ত নদী বিল
(চুণোপুঁটি তোর চোখের বিষ)—গ্রামে ফিরবি না চিল ?

দিল্লী থেকে

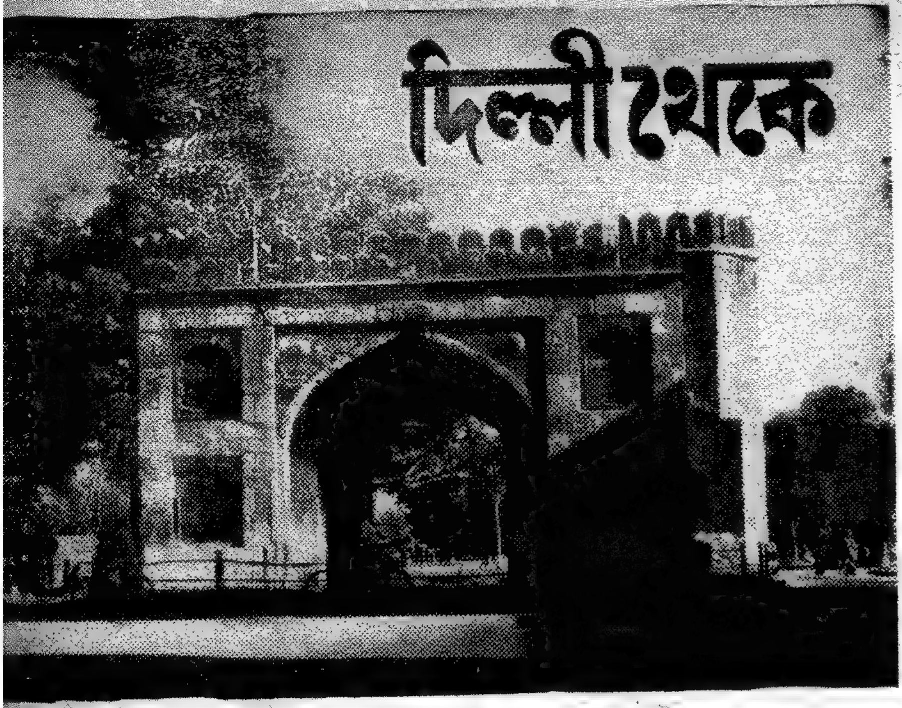

● দিল্লী গেট

দিল্লীর মহল দেখেছেন? বুলবুলি খাঁর মহল? আজ যেখানে দেখছেন তুর্কমান্ গেট্ আর দিল্লী গেট্ তার ঠিক মাঝখানে ছিল একটা বিরাট মহল। মোগলযুগেরও আগে দাসযুগে, পাঠানযুগে এই জায়গাটুকু ছিল দিল্লীর বালিগঞ্জ, মানে পশ্ এরিয়া। অমাত্য-বর্গদের বাসস্থান। কান পাতলে আজও নর্তকীর নূপুর-নিক্কণ শুনতে পাবেন। বাইজীরা আর নেই। মহাকালের গ্রাসে তাঁরা একে একে অতল গহ্বরে ডুবে গেছেন। রয়েছে দাঁড়িয়ে শুধু মহলের ভগ্নাবশেষ।

গত কয়েক দশকে অনেক নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। তার ভিতর একটা অভিজ্ঞতা বিশেষ করে হৃদয়কে নাড়া দিয়েছে। রাজপুত্রকে দেখেছি পথের ভিখিরি হতে। দেখেছি প্রতাপ-শালী জমিদারকে নিউ দিল্লী রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফরমে শায়িত অবস্থায়। তাঁদের এই দুরবস্থার সাথে কোথায় যেন এই মহলের একটা বিরাট সাদৃশ্য রয়েছে। একদিন রাজধানী মহানগরীর যে অংশটুকু ছিল অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রাণকেন্দ্র, এই কয়েক বছর আগে দিল্লী কর্পোরেশন থেকে সেই জায়গাটা বর্ণিত হয়েছে 'স্লাম্ এরিয়া' হিসাবে। তা হবে না কেন?

ভাবতে পারেন? কল্পনা করে দেখুন মহান্ প্রতাপান্বিত পূর্ব বাংলার দুর্ধর্ষ জমিদার—যার হুকুমে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়—শূন্য নারকেলের ভিক্ষাপাত্র হাতে আপনার সামনে এসে অশ্রুপূর্ণনয়নে বলছেন—দুটি পয়সা

শ্রী বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

পেতে পারি বাবা? এটা নিছক কল্পনা নয়। দেখেছি। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারি নি। চশমা খুলে, রুমাল দিয়ে চোখমুছে পরিষ্কার চোখে দেখেছি এ দৃশ্য। আজ এই দিল্লী মহানগরীর 'মহল' দেখেও ঠিক সেই দৃশ্যই চোখে ভেসে উঠছে কেন?

দরিদ্র, অর্ধনগ্ন, হাড় বেরকরা একদল হতভাগা বাস করছে এই 'মহলে'। জানে না তারা কোন্ প্রাসাদের অঙ্গে গেঁথে তুলেছে নিজেদের পর্ণকুটির। রয়েছে হিন্দু, রয়েছে মুসলিম। আজ একটি ধর্ম এসে তাদের এক করে দিয়েছে—সেটা হল দারিদ্র্য। যে সব গুণরাশিকে নাশ করে দেয়। সেই দারিদ্র্য এ হতভাগাগুলো নিজেদের দুরবস্থার কথা জানে না। এরই ভিতর আবার এদের বিয়ে-শাদী-নিকা ঘটছে। জন্মগ্রহণ করছে নব নব শিশু। মৃত্যুকে বরণ করে অমৃতের পথে চলছে বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, শিশু। মৃত্যুকে এরা ভয় পায় না। যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাসই পড়ে। খাবার ভাগ থেকে একটা মুখ কমলো।

মুসলিমদের জন্য অদূরে রয়েছে কবরখানা।

হিন্দুদের জন্য নিগমবোধ ঘাট।

এই 'মহল' দূরে থেকে বহুবার হাতছানি দিয়ে ডাকে কেন?

কলরব-মুখরিত জনপূর্ণ শহরে এই বস্তীপাড়ায় বারবার ঘুরে আসি কেন? কার দুর্নিবার টান আমাকে মোহান্ধ করে তোলে?

দাস, পাঠান, মোগলযুগে এটা ছিল অমাত্যদের বাগানবাড়ি। সুন্দরীর নৃত্যের তালে তালে সাম্রাজ্যের সেনাপতি, মন্ত্রী মদিরার পাত্র হাতে গ্রহণ করতেন এক-একটা ডিসিশন—যার ফল ছিল আহিমাচল—কুমারিকা-প্রসারী।

দাস রাজত্বের যুগে বাগানবাড়িটুকু প্রাসাদ থেকে বেশ দূরেই ছিল। পাঠান, লোদীদের যুগেও। মোগলযুগে এ মহল যেন রাজপ্রাসাদের অনেকটা কাছেই এসে গেল। এক কার্লভের ভিতরই লাল কিল্লা। শাহাজাদীদের বাউণ্ডারী লাইন ছিল এই মহলের গা ঘেঁষে।

এই বুলবুলি খাঁর মহলের পাশেই রয়েছেন সম্রাজ্ঞী সুলতানা রাজিয়া শায়িতা। চিরনিদ্রায় তিনি যে শয্যা বেছে নিয়েছিলেন তার স্থানও কি তিনি নিজেই করেছিলেন নির্ধারিত? ভারতের সিংহাসনে একমাত্র সম্রাজ্ঞী সুলতানা রাজিয়ার জীবন যেন একটা জীবন্ত নাটক। একাধিকবার সুলতানা প্রেমাভিনয়ে চোখের কটাক্ষঘাতে শত্রু-পক্ষকে ঘায়েল করেছিলেন। পরিণয়ের প্রতিশ্রুতিতে তিনি একই সাথে একাধিক শত্রুকে করতলগত রেখে অপূর্ব ডিপ্লোম্যাসির খেলা দেখিয়েছেন।

● বাজারের ভেতর দিক থেকে গৃহীত তুর্কমান গেটের একটি দৃশ্য

বিষয়ে তিনি বোধ হয় ইংল্যাণ্ডেশ্বরী থমা কুইন্ এলিজাবেথের ওপরও ক্কপ মেরে ইতিহাসে আপন নামটি ক্ষয় রেখে গেছেন। একাধিকবার তিনি শত্রুপক্ষকে কটাক্ষে ঘায়েল রেছিলেন। ইতিহাসে রয়েছে এর জীর।

অবিলম্বে সবাই জানতে পারলো ম্রাজ্ঞীর হৃদয় ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। নপ্রাণ তিনি সমর্পণ করে বসেছিলেন এক ক্রীতদাসের কাছে। ভাগ্যবান ক্রীতদাসটি ছিল এক আফ্রিকাবাসী। ভাগ্যচক্রে এসে পড়েছিল হিন্দুস্থানে। ছিল সে স্টেব্‌ল্‌-বয়। ঘোড়ার তদারক ছিল তার কাজ। তার ওপর একটা কাজ পড়লো সম্রাজ্ঞীকে ঘোড়ার পিঠে রোজ বসিয়ে দেওয়ার। আফ্রিকান স্টেবল-বয়ের স্পর্শে সম্রাজ্ঞীর শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতো। প্রতিদিন এই সময়টুকুর জন্য সুলতানা অধীর আগ্রহে প্রহর গুণতেন। ধীরে ধীরে আর তাঁর জানতে বাকী রইলো না তাঁর হৃদয়ডালি শূন্য হয়ে গেছে। সে অর্ঘ্য উজাড় করে হিন্দুস্থানের রাজরাজেশ্বরী সমর্পণ করে বসেছেন একটি ক্রীতদাসের পায়ে! ক্রীতদাসের কোন দোষ নেই। রোজ এসে বেচারা নিজের কাজ করে। সুলতানা ঘোড়ায় চাপেন। ক্রীতদাসের স্পর্শে সরমরক্তরাগে তাঁর হৃদয়ে কে যেন দোলা দিয়ে যায়?

সুলতানা নিজেকে সংবরণ করার চেষ্টা করেন। ভারতে দাসবংশের প্রতিষ্ঠাতা সসাগরা হিন্দুস্থানের সম্রাট আলতামাস যাঁর পিতা, যাঁর আদেশে সমগ্র ভারতবাসী উঠছে-বসছে, একটি অতি সাধারণ নগণ্য ক্রীতদাস তাঁর এতবড় হৃদয়খানা কি করে হরণ করে নিল? কিন্তু কি বিপদ! লক্ষ্মীছাড়া প্রেম যে নিয়মকানুন মানে না!

সম্রাজ্ঞীর কাজে মন নেই। কোন্ দূরের কোকিলের কুহুডাকে প্রাণ কেঁদে ওঠে। দিল্লীর বসন্ত যেন রোদনভরা। কিংশুক রক্তিমরাগে সরমবিড়ম্বিত সলজ্জ চুম্বনে একদিন সম্রাজ্ঞী ক্রীতদাসের জীবন ধন্য করে দিলেন।

এরই নাম প্রণয়। কোনো বিদেশী মনীষী বলেছেন: 'লভ্ ইজ এ নার্ভাস্ উইক্‌নেস্।' বেচারা প্রাণের দায়ে একথা বলেছিলেন কিনা জানি না, নিজে হতাশ প্রেমিক ছিলেন কিনা তাও জানা নেই। তবে সাইকলজির জগতে আজ এ তত্ত্বখানি নাকি সবাই বেদবাক্যের মতন মেনে নিয়েছেন।

সম্রাজ্ঞী সুলতানার প্রেম নিবেদনের তথ্যটুকু আর দিল্লী শহরে অজানা রইলো না। একেই অমাত্যবর্গ নারীর অধীনতা স্বীকারে নিমরাজী ছিল, এবার তাদের ঈর্ষার অনল সমগ্র দিল্লী গ্রাস করতে চলল। সুলতানার সবচেয়ে বড় স্ট্যাটিজি ছিল যে রাজ্যের অমাত্যবর্গের সবারই ধারণা সম্রাজ্ঞীর সে-ই আসল প্রণয়ী।

সে চলনা ভাঙ্‌লো।

● সুলতানা রাজিয়া

● বুলবুলি খাঁ'র মহল

পরিসমাপ্তি ঐ একই জায়গায়—শেষ-শয্যায় ধরণী যেখানে সবাইকে আপন কোলে তুলে নেন, সবাই সমান। নেই কোনো পার্থিব ভেদাভেদ।

শুধু কি সুলতানার জীবন?

এই মহলও কি আজ পর্যবসিত হয় নি একটা স্লাম্ এরিয়াতে? এইটেই মহাকালের মহান্ ইঙ্গিত। জীবন-যৌবন, ধনমান সব কালস্রোতেই ভেসে যায়। জেনেও জানি না। মরীচিকার পিছনে সবাই ছুটি। ভুল যখন ভাঙে তখন সময় থাকে না—পিছনে তাকাবার সময়টুকু তখন যেন আর হাতে থাকে না। সরমজড়িত দ্বিধায় যুগ-যুগের হৃদয় নিয়ে খেলার ক্রীড়ারঙ্গ বুলবুলি খাঁর মহল আজও যেন আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে—'শুনেছো, শুনেছো কি মহাকালের কালস্রোতে কালভৈরবের ডাক? কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও? তারই রথ নিত্য উধাও?'

দিল্লীর লাল কেল্লা, জামা মসজিদ, কুতুবমিনার তো সবাই দেখেছেন। দেখেছেন কেউ বুলবুলি খাঁর মহল?

অমাত্যবর্গ একে একে বশ্যতা শিথিল করে মাথা তুলে দাঁড়ালো। রাজদ্রোহীর দল একসাথে সামিল হলো।

সুলতানা হৃদয়ের খেলায় জয়ী হলেন বটে, যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁকে বরণ করতে হলো পরাজয়। শৃঙ্খলাবদ্ধা সম্রাজ্ঞী পরিণয়ের বিনিময়েও সেদিন পান নি মুক্তি। শত্রুর তরবারিতে ছিন্নমুণ্ড ধূলায় লুটিয়ে পড়লো। পুরুষবেশধারী সম্রাজ্ঞী পথের দরিদ্র ভিখিরির সাথে মিলে কবরে হলেন শায়িতা।

ঐ তো তুর্কমান গেটের অদূরে রয়েছে বেগম সুলতানা রাজিয়ার টুম্ব।

সেই কোমল শরীর এই বুলবুলি খাঁর মহলে লুকোনো দেউলতলে মাটির সাথে মিলে রয়েছে। 'পাথ্স্ অব্ গ্লোরি লিড্ বাট্ টু দি গ্রেভ্'—শুধু গ্লোরি নয়, জীবনের সব কিছু ধন,' সম্পত্তি, ঐশ্বর্য, বৈভব, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, মান, সম্ভ্রম, প্রেম, পরিণয়, সবার

● সুলতানা রাজিয়ার কবর

রঁলার জীবনবেদ

দিলীপ চৌধুরী

॥ ১ ॥

শান্তির সংজ্ঞা নিয়ে আজকের পৃথিবীতে যে দ্বন্দ্বের অবতারণা হয়েছে নিরপেক্ষতার অর্থ নিয়ে মতদ্বৈধতার যে আলোড়ন উঠেছে, রাজনৈতিক দলাদলির ঊর্ধ্বে থেকে বুদ্ধিজীবীমানসের অস্তিত্ব সুবিধাবাদের প্রচ্ছন্ন বিকাশ কি না তাই নিয়ে যখন বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে, তখন জাঁ ক্রিস্তফের স্রষ্টা রোমা রঁলার জীবন পর্যালোচনা থেকে বোধ হয় সুস্পষ্ট একটা সিদ্ধান্তে আসার সম্ভাবনা থাকে যে সৎ এবং মহৎ চিন্তানায়কের অভিব্যক্তি বিচারের মান কোন সগোত্র অনুসরণ করা উচিত।

রঁলা বিশেষ কোনো মতবাদে নিজের বিশ্বাসকে কোণঠাসা করেন নি, কিন্তু সমাজজীবনের বিপ্লবমুখর বিবর্তনকে তিনি অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। রঁলা ধর্মান্ধ ছিলেন না অথচ ধার্মিক আচার-অনুষ্ঠানের মানবিক দিকটাকে উপেক্ষা করেন নি। রঁলা রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ কোনো যোগাযোগ রাখেন নি, কিন্তু স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে একদিকে বিষোদ্গারে ইতস্তত যেমন করেন নি, অন্যদিকে রুশ বিপ্লবকে অভিনন্দন জানাতে এগিয়ে এসেছেন। তাই দেখি বারবুসের সঙ্গে প্রথম মহাসমরোত্তর দিনে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিরোধী সংগঠন গড়ে তুলতে তিনি এগিয়ে এসেছেন। গণনাট্যের মাধ্যমে জনমত গঠনের প্রয়োজন অনুভব করেছেন।

তাই বীটোফেন, মাইকেল এঞ্জেলো, এবং টলস্টয় তাঁকে মুগ্ধ করেছে, গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ তাঁর সমর্থন পেয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের মানবতাবাদী ধর্মমতে তিনি শান্তিময় জীবনের ইঙ্গিত দেখতে পেয়েছেন। ধর্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি—সব ক্ষেত্রে তিনি শান্তি এবং সুস্থ মানবপ্রীতির নিরপেক্ষ অথচ বলিষ্ঠ বিকাশ অনুসন্ধান করেছেন। কিন্তু নিরপেক্ষ থাকার এই প্রয়াস অনেক ক্ষেত্রে তাঁর মনের লাগামকে কৃত্রিমভাবে রুখতে চেষ্টা করেছে যার ফলে গণ-বিক্ষোভের স্বপক্ষে সমর্থন জানিয়েও তিনি এগিয়ে যেতে সঙ্কোচ করেছেন প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে, তাঁর প্রথম দিকের লেখায় ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব সুস্পষ্ট।

১৮৭০ সালে প্রুশীয় আক্রমণে বিপর্যস্ত ফ্রান্স এবং পরাস্ত কম্যুন তাঁর মনকে বিচলিত করেছে। এ স্বাক্ষর তাঁর Tragedies of Faith বহন করেছে। মানুষের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের বিরুদ্ধে, সংশয়, বৈরাগ্য এবং হতাশাবাদের বিরুদ্ধে রঁলার স্বতঃস্ফূর্ত লেখনী ভূমিকা নিয়েছে। স্বৈরতান্ত্রিক নির্বিচার অত্যাচারের সম্মুখীন সাধারণ মানুষের অসহায়তা তাঁকে বিচলিত করেছে।

Dryfus affair-এ দেখা যায় নাট্যাভিনয়ে তাঁর নিরপেক্ষতার প্রতি আকর্ষণ কার্যত ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়েছে। রাজশক্তি, সৈন্যবল আর প্রতিক্রিয়াবিরোধী সংগ্রামে তিনি যেন নিজের অগোচরে মিশে গেছেন জনতার স্বপক্ষে। অবিচার আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাদের উদ্বুদ্ধ করতে এগিয়ে গেছেন কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে মৃত্যুপণ সংগ্রামে প্রতিক্রিয়াশীল বিরোধীপক্ষের বিরুদ্ধে এগিয়ে দিতে তিনি ইতস্তত করেছেন।

Wolves নাটকাভিনয়ে তাঁর নিরপেক্ষতার সাগ্রয়ী হবার কৃত্রিম প্রয়াস তাই তার সার্থকতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়; একদিকে তিনি যুদ্ধ, বিবাদ, দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে নিজেকে পৃথক রাখতে চান, অন্যদিকে সংগ্রামী গণ-জীবনকে উদ্বুদ্ধ করতে তাঁর বুদ্ধিজীবী মন স্বপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে যেতে চায়—এ অন্তর্দ্বন্দ্ব তাঁর প্রয়াসকে তাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে Wolves নাটকে। রঁলার নিরপেক্ষতা বজায় রাখার প্রয়াস তাঁর Tragedies of Revolutions--the Fourteenth of july-তেও বিধৃত।

সেখানে লাফাতের কথাই তাঁর বক্তব্য অর্থাৎ যে কোনো জাতির স্বাধীনতাপ্রয়াসী দৃঢ়তা তার সংগ্রামে সাফল্য অর্জনের পক্ষে সহায়ক এবং যথেষ্ট। এখানে তিনি বলেছেন যে, জাতির অগাধ বিশ্বাসকে বিপ্লবের আধারে রেখে আমি সে বীরত্বকে চারদিকে ছড়িয়ে দেবো। তিনি দেখান ব্যাস্টিল অধিকারে সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার সার্থকতা কতোটা অবশ্যম্ভাবী। নায়ক এ নাটকে সামগ্রিক-ভাবে বিপ্লবী জনতা নিজেই এবং সঙ্ঘবদ্ধ একতার থেকে তার কোনো পৃথক অস্তিত্ব নেই। রঁলার মতে বলতে হয় 'যদি ঝড়ের একটা দৃশ্য ফুটিয়ে তুলতে হয় তবে সমুদ্রের এক একটা ঢেউকে আলাদা করে দেখানো নিষ্প্রয়োজন—প্রয়োজন তার সামগ্রিক উত্তেজনাকে ফুটিয়ে তোলার---ঠিক তেমনি জনসমুদ্রের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ উপেক্ষণীয়, কারণ সে জনতার স্রোতের সঙ্গে সম্পূর্ণ একাঙ্গিভত।'

ব্যাস্টিল দখল করতে অগ্রসর জনতার মধ্যে সেই চরিত্রগত দৃঢ়তা এবং আস্থাকে প্রধানত তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। দেখিয়েছেন—সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের কি দুর্দমনীয় এক আকর্ষণ আছে, নেশা আছে। এক একটি চরিত্র মিশে মিশে জনতা এমন এক সামগ্রিক রূপ নেয়, শক্তি এবং উদ্দীপনার এমন এক ঘনিষ্ঠ আকার নেয় যার কোনো টুকরো টুকরো আলাদা অস্তিত্ব আর থাকে না। সঙ্ঘবদ্ধতার আকর্ষণ কতটা তীব্র রঁলার একটি নাটকীয় কথোপকথন থেকে তা' সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

দুর্গ আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে জনৈক সহকর্মী অপরজনকে বলছে—'ওদিকে যেও না। ওরা এক্ষুণি মারা পড়বে—এ ধরণের মৃত্যুবরণের কোনো অর্থ হয় না।' জবাবে তার সহযাত্রী উত্তর দিয়েছে—'কিন্তু তুমি চলেছো কোথায়

● রোমাঁ রঁলা

বন্ধু?' খুব সহজভাবেই উত্তর এলো—'কেন, ওখানেই।' সংগ্রামের প্রতি আনুগত্য এবং আকর্ষণ অনেকটা সংক্রামক তাই একজন আরেকজনকে বৈপ্লবিক সক্রিয়তার দিকে এতো সহজভাবে বরণ করে নিতে পারে। সংশয়কে জয় করে নিজের অগোচরেই ব্যক্তিবিশেষ জনতারই ভগ্নাংশে পরিণত হয়।

রঁলার বুদ্ধিজীবী মন সংশয়ের অবকাশ থেকে ঠিক এভাবেই উত্তীর্ণ হয়ে ক্রমশ হাত বাড়িয়েছে সংশয়-মুক্তির দিকে। সংঘর্ষ এবং সংঘাতের প্রত্যক্ষ প্রভাব নিরপেক্ষতার প্রতি তার পক্ষপাতিত্বকে ক্রমশ নির্মূল করে তুলেছে।

জনতার স্বপক্ষে মূলত তাঁর মনের যোগ অবিচ্ছিন্ন থাকায় রঁলা গণ-নাট্যের মাধ্যমে সহজে নিজেকে বৃহত্তর গণমানসের ক্ষেত্রে উপনীত করতে পেরেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে একটি চিঠিতে তিনি তাঁর মত ব্যক্ত করে লিখেছিলেন—'An art for refined only appears to be a very seductive egoism. I hold that art, like nature, should satisfy the necessities and longings of all classes and all men' অর্থাৎ প্রকৃতির মতো শিল্পের জগতেও মানুষের অধিকার রয়েছে শ্রেণীনির্বিশেষে সমানভাবে। তাই সত্যিকার আর্টের বা সৃজনশীল শিল্পের মুখ্য উদ্দেশ্যই হওয়া উচিত মানুষকে সচেতন করা, মানুষকে শিক্ষিত করা।

যুগের বিবর্তনকে গ্রাহ্য করে শিল্পের রূপান্তর তাই প্রয়োজন, প্রয়োজন মানুষের বুদ্ধিজীবী মনকে উন্নত সমাজচিন্তায় পর্যবসিত করা। গণনাট্যের বিষয়ে তাঁর বইতে তাই লিখেছিলেন—'আজ গণ-নাট্যের একান্ত প্রয়োজন শিল্পের প্রবহমান ধারায় নতুন রক্তের সঞ্চার করবার জন্যে—জনতার শক্তি আর স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যে শিল্পের সঙ্কীর্ণ পরিধির বিরাট বিস্তার এনে দিতে। রঁলা নিরপেক্ষ থেকেও যে গণ-আন্দোলনের শরিক ছিলেন—তাঁর গণনাট্য সম্পর্কে লিখিত রচনা তার অনবদ্য প্রমাণ।

॥ ২ ॥

দল বা মতনিরপেক্ষ থাকার সতত প্রয়াস সক্রিয় রাজনীতি থেকে বরাবর তাঁকে দূরে রেখেছিল। এই সংস্কারবাদী তথা আদর্শবাদী বিশ্বাসের স্বার্থে তিনি অস্বীকার করতেন সমাজতন্ত্র বা মার্কসবাদে তাঁর আস্থা, পরিহার করে চলতেন রাজনৈতিক মতপোষণকে। অথচ গণ-আন্দোলনের প্রতি তাঁর মনের ছিল সূক্ষ্ম অথচ পরোক্ষ এক যোগাযোগ। যার ফলে তিনি স্বীকার করেছিলেন গণনাট্যের ভূমিকা, উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন ফরাসী বিপ্লবের তাৎপর্যে। কিন্তু এতে তাঁর নিরপেক্ষতার প্রতি আনুগত্য এক চূড়ান্ত সংশয়ের আবর্তে তাঁকে নিয়ে আসে এবং সম্ভবত সেই সংশয় থেকেই তিনি শেষ পর্যন্ত আশ্রয় নিয়েছিলেন আন্দোলনমুখর জন-জীবন থেকে দূরে শিল্পী-সাহিত্যিকদের জীবনচর্চায়। তিনি রচনা করতে সুরু করলেন বীটোফেন, মাইকেল এঞ্জেলো আর টলস্টয়ের জীবনী।

একদিকে সংগ্রামী জীবনের প্রভাব থেকে স্বাতন্ত্র্য, অন্যদিকে মানবতায় বিশ্বাসী সার্থক শিল্পস্রষ্টাদের জীবন-সংশ্লিষ্ট বিবরণীর প্রভাব—এ দুয়ের সংযোগক্ষেত্রেই সম্ভবত সূত্রপাত হয়েছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি জাঁ ক্রিস্তফের। জাঁ ক্রিস্তফ্ মূলত রঁলার আত্মবিশ্লেষণেরই নজীর। জাঁ ক্রিস্তফ আর তাঁর বন্ধু অলিভাকের চরিত্রচিত্রণের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছে রঁলার মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব। জাঁ ক্রিস্তফের দুই বন্ধুচরিত্র-দুজনেই সার্থক শিল্পী। দুজনেই মানুষের হিতকামী, শান্তির পূজারী। আত্মপ্রত্যয় তাঁদের যথেষ্ট—বাস্তবের

লন, স্বার্থপর," ব্যবসায়িক আগ্রহ আর পরস্পর বিদ্বেষের জটায় বিস্তীর্ণ সামাজিক বৈকল্যের মধ্যেও তাঁদের আদর্শের প্রতি আনুগত্য অসীম। দ্য ক্রিস্তফ্ প্রথম জীবনে রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা নিলেও উত্তরজীবনে নিজেকে সরিয়ে এনেছিলেন শিল্পের প্রশান্ত গভীরতায়। গণমানসের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং গণ-আন্দোলনের এককালীন শরিক হয়েও জাঁ ক্রিস্তফ মুক্তি খুঁজেছেন নিছক শিল্পের আবেষ্টনীতে। যদিও এই শিল্পানুগত্য তাঁর আশাবাদী মনকে আচ্ছন্ন করে নি অথবা চিরন্তন জীবনীশক্তির প্রতি আস্থা হারাতে দেয় নি।

এই জাঁ ক্রিস্তফ রচনার পেছনে রঁলা যে স্বস্তি খুঁজেছিলেন—তা' কিন্তু তিনি পান নি। আর পান নি বলেই 'শিল্পের জন্যেই শিল্প' সংস্কার অনুগামী হতে সচেতন-ভাবে পারেন নি। রঁলা শিল্পের পূজারী ছিলেন নিঃসন্দেহে, সৌন্দর্যের পূজারী ছিলেন নিঃসন্দেহে, কিন্তু জীবন-সংগ্রামের নিরপেক্ষ দর্শক হয়েও তাঁর গভীর অন্তরের নীরব সমর্থনকে তিনি সঙ্কুচিত করতে পারেন নি। ক্রিস্তফের সঙ্গে তাঁর নিজের পার্থক্য এখানেই। অন্যায়কে তিনি সহ্য করেন নি, প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর পূর্বপুরুষের ছিল ফ্রান্সের বিপ্লবী ঐতিহ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ। সেই প্রভাবকে তিনি অগ্রাহ্য করেন নি। তাই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তিনি উষ্মা প্রকাশ না করে পারেন নি। ১৯১৪-র রণদামামা শুনতে পেয়ে নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারেন নি। ইউরোপের সাংস্কৃতিক একতার আবেদন নিয়ে যুদ্ধবিরোধী মত-প্রচারে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন স্বপ্রণোদিত হয়ে। শান্তির স্বপক্ষে তাঁর আবেদন আইনস্টাইন, স্টিফেন জুইগ, বারবুস্, বার্ট্রাণ্ড রাসেল, নিকোলাই ও অন্যান্য মনীষীদের সমর্থন পায়। অন্যদিকে অঁাদ্রে জিঁদের প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকার সম্মুখীন হয়ে অভিহিত হন 'যুদ্ধ-দ্রোহী' এবং 'দেশদ্রোহী' বলে। প্রত্যেকটি যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের তিনি পুরোধা হন; কিন্তু এই শান্তির স্বপক্ষেও তিনি তাঁর চিন্তাগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল যে, যুদ্ধের সমর্থক তিনি ন'ন, শান্তি তিনি চান, কিন্তু যুদ্ধ-বিরোধিতার নেতৃত্ব নিলেও রণোন্মাদ অধিনায়কদের প্রতি কোনো বিদ্বেষ পোষণের পক্ষপাতী তিনি ন'ন। তিনি নিরপেক্ষ ন্যায় বিচারের সমর্থক। এই নিরপেক্ষ, আংশিকভাবে সহানুভূতি-শীল ভূমিকা নিয়ে শেষে হেনরী বারবুসের সঙ্গে তাঁর মতদ্বৈধতা হয়। আগেই বলেছি রঁলা নিজে অন্তর্দ্বন্দ্বের কোনো সমাধান পান নি। তাই তিনি গণমতের সমর্থনে অনেকদূর এগিয়ে এসে হঠাৎ থেমে প'ড়েছেন, এই দ্বন্দ্বের হাত থেকে রেহাই পেতে নিজেকে সরিয়ে এনেছেন সক্রিয় কোনো ভূমিকা থেকে।

গোর্কীর আবেদনে তিনি সাড়া দিয়েছিলেন। রঁলার আশা ছিল রুশ বিপ্লব ইউরোপে শান্তি ও স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু বিপ্লবের পরেই যখন গৃহযুদ্ধ জেগে উঠল তখন রঁলার প্রত্যয় আবার সেই স্ববিরোধী চিন্তায় পর্যবসিত হোলো। তিনি যদিও অনুভব করলেন যে, বিপ্লবের অনুসরণে গৃহযুদ্ধের সূত্রপাতের মধ্যে দোষ জন-সাধারণের নয়, তবু তাঁর মনে একটি অমীমাংসিত প্রশ্ন থেকে গেল যে, শান্তির পথ কি তা'হলে বিপ্লব নয়?

তিনি যুদ্ধ চাইতেন না, কারণ যুদ্ধোত্তর পৃথিবী বরাবর সাংস্কৃতিক অগ্রগতির সমাধিতে পর্যবসিত হয়েছে। আবার যুদ্ধবাদীদের তিনি সমর্থন না করলেও সহানুভূতির চোখে দেখতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন তাদের মধ্যেও সততা থাকা সম্ভব, মানবতার প্রতি সম্প্রীতি থাকা সম্ভব। যে কারণে কাইজারের 'ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র'র পরিকল্পনা তাঁর পরোক্ষ সমর্থন পেয়েছিল। বিপ্লবের প্রতি আস্থা সত্বেও, মানুষের প্রতি অকুণ্ঠ ভালোবাসা সত্বেও, শোষণের বিরুদ্ধে ঘৃণা সত্বেও রঁলা মানবতাবাদী আবেদন নিয়ে যুদ্ধবাদী অথবা সাম্রাজ্যবাদীদের জঘন্য চক্রান্তকে নস্যাৎ করে দিতে পারতেন না।

তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষ মূলত সৎ, কাজেই জঘন্য কাজ করেও

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশন

রবীন্দ্র-সুভাষিত—১২'০০

রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠকদের পক্ষে অপরিহার্য এই উল্লেখযোগ্য উদ্ধৃতি গ্রন্থটি রবীন্দ্ররচনা থেকে সঙ্কলন করেছেন—শ্রীবিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ

বাংলা দেশের নবজাগরণের পটভূমিকায় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর ইতিহাস

THE HOUSE OF THE TAGORES—১'৫০

লিখেছেন—শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্মচেতনার পরিচয় পেতে হলে পাঠ করুন—
৺হরিশ্চন্দ্র সান্যাল লিখিত

জ্ঞানদর্পণ—৩'০০ চৈতন্যোদয়—২'৫০

সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে—ডঃ প্রবাসজীবন চৌধুরী লিখিত

STUDIES IN AESTHETICS—১০'০০

প্রকাশক: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
৬/৪, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭

পরিবেশক: জিজ্ঞাসা
৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯ : ১৩৩, রাসবিহারী এ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯

তার পক্ষে সন্তুষ্ট হওয়া বা সৎপথে যাওয়া সম্ভব। তিনি নিজে বলতেন যে, আন্দোলন হচ্ছে মানুষের মুক্তির একমাত্র পথ, অথচ এ-ও সন্দেহ করতেন যে, বিপ্লবী শক্তি ক্ষমতায় আসীন হয়ে হয়তো ভবিষ্যতের শান্তিকে ব্যাহত করবে। তাই যুদ্ধ, সংগ্রাম, রক্তপাত তাঁর দরদী মনে বেদনা জাগাতো। বিপ্লবোত্তর সাফল্য আর দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্তর্কালের মধ্যে অপরিহার্য অরাজকতাকে তিনি সঠিক বুঝতে পারতেন না। রক্তপাত ছাড়া বিপ্লব সম্ভব নয়, আবার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শান্তিকে ব্যাহত করে তাই তিনি প্রত্যক্ষ সংগ্রামকে এড়িয়ে চলতেন। এ স্ববিরোধী চিন্তা তাঁর কোনো মতকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করার পথে বরাবর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঠিক এ কারণেই গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ তাঁর পূর্ণ সমর্থন লাভ করে।

তিনি এতদিন ঠিক এ-ধারার কোনো পথই যেন খুঁজছিলেন, যা'তে সংঘর্ষের চরিত্রে রক্তক্ষয়ী উন্মাদনা থাকবে না অথচ ন্যায়ের সমর্থনে আন্দোলনের জ্বালা থাকবে। আবার এ সংগ্রামে ব্যর্থতা যে অবশ্যম্ভাবী তাও তিনি স্বীকার করেছেন। তিনি দেখেছেন শান্তি আর সংগ্রাম এ দুটো একসঙ্গে চলে না। অথচ দুটোকে তিনি একসঙ্গেই খুঁজে ফিরেছেন। এগিয়েছেন আবার পেছিয়েছেন—মনের স্ববিরোধিতার সঙ্গে ক্রমাগত সংগ্রাম করেছেন।

॥ ৩ ॥

এ অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন তিনি শেষ বয়সে। ষাট বছরের প্রত্যন্তে পৌঁছে তিনি মুক্তকণ্ঠে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন রুশ বিপ্লবকে। লেনিনের মৃত্যুতে তিনি লিখলেন—'ইউরোপের কোন ধর্ম পারে নি এই গ্রানাইট পাথরের মতো অটল বিশ্বাস আনতে। এতো মহৎ, এতো বিরাট ব্যক্তিত্ব নেই আর মানুষের সংগ্রামী ইতিহাসে'। আরো লিখলেন—'রুশ বিপ্লবের সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও বর্তমান ইউরোপের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী জনহিতকারী পাদপীঠ এই রুশিয়া—আজ তার বিপদ তাই সমগ্র ইউরোপের বিপদ'। রুশ লেখক বুনিনেনকে পত্রান্তরে জানিয়েছিলেন—'রুশ বিপ্লবের সমস্ত রক্তাক্ত ভয়াবহতা সত্ত্বেও, তার ভুলত্রুটি অপরাধ সত্ত্বেও আমি অকুণ্ঠচিত্তে সেই শিশুর (বিপ্লবের) দিকে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি—এই নবজাতককে আমি তুলে নিচ্ছি: সে ভবিষ্যতের আশা, উন্মুখ ভরসা।'

এই বিশ্বাস, এই নির্ভরতা, এ বলিষ্ঠ কুণ্ঠাহীন সমর্থন তিনি যখন জানালেন তখন তিনি সত্তর বছরের বৃদ্ধ। আজীবন যে অন্তর্দ্বন্দ্বে তিনি শান্তি পান নি, তাঁর বুদ্ধিজীবী মন যে সংশয়ের আবর্তে মুক্তপক্ষ হয়ে নিজেকে বিস্তার করতে কুণ্ঠাবোধ করেছে, বিপ্লব আর রক্তপাতের অবিচ্ছিন্ন যে রূপকে তিনি বিশ্বাস সত্ত্বেও সমীহ করেছেন, নিরপেক্ষতার স্ববিরোধী যে চিন্তা তাঁকে স্বস্তি দেয় নি, সেই আত্মক্ষয়ী দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পেলেন জীবনের শেষ প্রান্তে এসে। মৃত্যুর অনতিপূর্বে যে সত্যের সাক্ষাতে তিনি হৃষ্ট হয়ে উঠলেন তা' হচ্ছে সাম্যবাদ, যা' খুঁজে পেলেন রুশ বিপ্লবের ঐতিহাসিক সফলতায়। সরল, সৎ, শান্তিপ্রিয়, মানবদরদী রঁলার সমকক্ষ জীবনদর্শীর দৃষ্টান্ত আজো সংস্কৃতির ইতিহাসে বিরল। জীবনান্বেষী তাঁর মতো প্রতিভা এবং নানা স্ববিরোধী দ্বন্দ্বমুখর চিন্তার জটিলতার মধ্য দিয়ে বুদ্ধিজীবী মনের স্ফুরণের দৃষ্টান্ত আজো দুর্লভ। *

---

* রোমাঁ রঁলার ৯৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই প্রবন্ধটি লিখিত হল।

সুপর্ণিকার প্রতি

শ্রীসুরজকান্তি দাস ভৌমিক

সুপর্ণিকা;
তোমার চোখে
সমুদ্র সমস্যার ঢেউ কাঁপছে।
তবুও মেঘগুলো পাইন ঝাউ শিরীষের বন ছাড়িয়ে
স্বপ্নের মন্থনে জন্ম দেয়
একটি রজনীগন্ধা।

তোমার স্পর্শে
মনে হয় পৃথিবীটা আকাশ হয়েছে!
তবু চুপ করে বসে থাকো।—
বুঝি অনেক সমস্যার পথ কেটে
আসতে হবে তোমাকে।

তোমার নিবিড় নীরবতার ঢেউ,
শিশিরভেজা ফুলের গন্ধ আনে।
তখন মনে হয়
পৃথিবীটা অরূপ সুন্দর
কুয়াশার পর্দা দিয়ে ঘেরা
লজ্জামেদুর অবগুণ্ঠিতা নারী

সুপর্ণিকা,
সমুদ্র-ঢেউ তোমার হৃদয়।
অনির্বাণ ঢেউ-এর মা
রাখলাম আমার প্রশ্ন।

এমাসের বৃটেনে

জি. এ. জনসন

জানি না, হঠাৎ কি করে ঠাণ্ডা লাগল! বড়দিনে যে বন্ধুটি নানা উপহার নিয়ে এসেছিলেন তিনিই কি সঙ্গে করে এটা এনেছিলেন, না জানুয়ারীর দোকানের ভিড় থেকে এই ছোঁয়াচে ঠাণ্ডা লাগল? শীতের ঠাণ্ডায় যে অসুস্থ হয়, সে নিজের কাছে তো বটেই, নিকট-আত্মীয়দের কাছেও দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। ডাক্তাররা বলছেন, অন্তত এক পক্ষকাল এই ঠাণ্ডা থাকবে। হায়, এক পক্ষ পার হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও কষ্ট কমে নি।

সাধারণভাবে জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে। এ যেন অনেকটা একটা কাপ-টাই ফাইনাল খেলার মত, যেখানে সকল দর্শকই খেলায় অংশ গ্রহণ করে। কেউ কেউ মনে করছে, তারা জিতেছে—আর কেউ কেউ ক্ষিপ্ত হয়ে প্রশ্ন করছে: আমরা কি নিচে পড়ে গিয়েছি? অবশ্যই তারা নিচে পড়ে নি, কিন্তু তারা খাদ্য দপ্তরের অত্যন্ত কাছাকাছি, যেখানে জিনিসপত্রের দাম কেবল বাড়ে, কখনও কমে না।

যাদের মনে হয়েছিল, শ্রমিক দল কমনওয়েলথ প্রশ্নটিকে নিছক নির্বাচনী প্রচার কৌশল হিসাবে ব্যবহার করছে, তাদের ভুল এবার ভাঙবে। কমন মার্কেটের ব্যাপারে রক্ষণশীল সরকার ব্যর্থ হয়েছে, তাই শ্রমিক দল কমনওয়েলথের ওপর জোর দিতে চায়, এ ধারণা ভুল। হ্যারল্ড উইলসন শীগ্‌গিরই কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রীদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য চেষ্টা করছেন। গত সম্মেলনে যে কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েট পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল, তা কার্যকরী করার জন্য বিশেষভাবে আলাপ-আলোচনা চলছে। দপ্তর বণ্টনের মধ্যেও দেখা গেছে, উইলসন কমনওয়েলথ সম্পর্ক দপ্তরকে পররাষ্ট্র দপ্তরের চেয়ে কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন না।

স্যার পল গোর-বুথের জায়গায় জন ফ্রিম্যান দিল্লীতে বৃটেনের হাই কমিশনার হয়ে যাচ্ছেন, এ সংবাদ সরকারী সূত্রে সমর্থিত হয়েছে। টেলিভিশন-সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়ে সকলে 'নিউ স্টেট্‌সম্যান' পত্রিকার বিদায়ী সম্পাদক ফ্রিম্যানের দক্ষতা ও উদারনৈতিক মনোভাবের পরিচয় পেয়েছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ফ্রিম্যানের টেলিভিশন-সাক্ষাৎকার যেরূপ বিতর্কের সৃষ্টি করত, এখন আর তা করে না। তাই বলে তাঁর আলোচনা

জন ফ্রিম্যান

কম চিত্তাকর্ষক নয়। তাঁর বয়স এখনও পঞ্চাশের নিচে, এবং অনেকেরই হয়তো মনে নেই বিশ বছর আগে ফ্রিম্যান একজন সহকারী মন্ত্রী ছিলেন এবং বার্মায় একটি প্রতিরক্ষা মিশনের নেতৃত্বও করেছিলেন। বিয়ের আগে ফ্রিম্যান-পত্নী টেলিভিশনের একজন নামকরা মহিলা ছিলেন।

জর্জ ব্রাউনের চেষ্টার ফলে, মালিক ও শ্রমিক উভয় পক্ষই সরকারের আয় নীতি সমর্থন করেছে। কিন্তু দেশের শ্রমিক বিক্ষোভ এখনও অব্যাহত রয়েছে। শিক্ষক ও ব্যালে নৃত্যশিল্পীরাও বিক্ষোভকারীদের দলে রয়েছেন। লণ্ডনে ডকের চাপ কমাবার সমস্যার সমাধানও কেউ খুঁজে পাচ্ছেন না। তবে শ্রমিক দল সরকার গঠনের পূর্বে যেভাবে জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাচ্ছিল, তা প্রতিরোধ করার জন্য ব্রাউন যে কর্মপন্থা গ্রহণ করেছেন, তার প্রতি বিভিন্ন অংশ দৃঢ় সমর্থন জানিয়েছে।

বৃটেনের আইন সংস্কারের কথা শোনা যাচ্ছে। 'কোডিফিকেশন', অর্থাৎ সূত্রাকারে সকল আইন বিধিবদ্ধ করা এবং আইনের আধুনিকীকরণ, দুই কাজই করা হবে। সাধারণ লোক বুঝতে পারে এমন সহজ ভাষায় আইন রচনা করার চেষ্টাও হচ্ছে।

মৃত্যুদণ্ড নিষিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে পার্লামেণ্টের বর্তমান অধিবেশনে যে বিলটি বিবেচনা করা হচ্ছে, কমন্স্ সভায় তার দ্বিতীয় পাঠ সমাপ্ত হয়েছে। দ্বিতীয় পাঠে বিলটি ৩৫৫-১৭০ ভোটে পাশ হয়েছে। বিরোধী পক্ষের কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য ভোট দেবার সময় অনুপস্থিত থাকলেও, রক্ষণশীল দলের প্রায় ৮০ জন সদস্য বিলটির সপক্ষে ভোট দেন। প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র-সচিব ব্রুক নিজে আবেগের সঙ্গে ফাঁসি সম্পর্কে তাঁর বিরূপ মনোভাবের কথা বলেন।

কিন্তু বিলের বিরোধীদের যুক্তিকে প্রমাণ করবার জন্যই যেন দেশজুড়ে হঠাৎ ব্যাপকভাবে গুলীচালনা ও হত্যাকাণ্ড সুরু হয়ে গেছে। এর মধ্যে কতকগুলির কোন উদ্দেশ্যই খুঁজে পাওয়া যায় না। আর এই গুলীচালন

সবচেয়ে বেশি হয়েছে লণ্ডন এলাকায়। জনসাধারণ ও সংবাদপত্র এই ব্যাপারে এতটা বিচলিত হয়ে পড়েছে যে, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড তাদের প্রচলিত রীতি ভেঙে সাংবাদিক সম্মেলন ডাকতে বাধ্য হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের একজন অ্যাসিস্টাণ্ট কমিশনার এই সব হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে জনসাধারণের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের জন্য আহ্বান জানান। 'যদি জনসাধারণ এগুলি হতে দিতে চায়, তবে এ সব হবেই- - -' এই বলে পুলিশের কর্তা জনসাধারণের নিষ্ক্রিয় মনোভাবের প্রতি কটাক্ষ করেন। কিন্তু ক'দিন আগে এই প্রতিরোধ করতে গিয়েই যে একজন তরুণ সাংবাদিক নিহত হয়েছেন, এ কথা পুলিশের কর্তারা ভুলে গেলেন কি করে?

যাই হোক, ক'দিন পরে অবশ্য কেনসিংটন এলাকায় একদল জ্যামেইকান ছাত্র সহ সাধারণ মানুষ পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করতে এগিয়ে এসেছিল। একজন দাগী আসামী দুজন পুলিশ ও পুলিশের একটি কুকুরকে গুলী করে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল, তখন সবাই মিলে তাড়া করে আসামীটিকে ধরে ফেলে। স্বরাষ্ট্র-সচিব সস্‌কিচ্‌ ও পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এই ঘটনায় জনসাধারণের ভূমিকার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন, এবং পুলিশের প্রতি সন্দিগ্ধ ও বীতশ্রদ্ধ জনসাধারণ যে বিলম্বে হলেও পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছে, তাতে তাঁরা সবাই খুশি। সকলেই একথা ভাবছেন, মৃত্যুদণ্ড বন্ধ করার আইন পাশ হোক আর নাই হোক, বে-আইনীভাবে অস্ত্র রাখার অপরাধে শাস্তির পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য অবশ্যই আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে। বন্দুকের ব্যবসায়ীদেরও তাদের হিসাব ঠিকমত রাখার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

অপরাধীদের মধ্যে অনেকেই বয়সে তরুণ। আর এর ফলে প্রবীণদের মধ্যে ক্রমে এই ধারণা বাড়ছে যে, তরুণেরা বর্তমানে বেশি উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ছে। এদের মধ্যে অনেকেই একেবারে বেপরোয়া, আবার কেউ কেউ ভয়ঙ্কর রকমের বিমর্ষ, এবং সামান্য উত্তেজনার জন্য এরা যে-কোন রকম কাজ করতে পারে। সম্ভবত এরূপ হবার অনেক কারণ আছে। তবে বেপরোয়া হবার অন্যদিকও আছে। সম্প্রতি ১৬ বছরের একটি বালক উত্তেজনা বোধের এমন একটি কারণ খুঁজে পেয়েছে, যা উল্লেখ-যোগ্য। পোর্টসমাউথ বন্দরে একটি ঐতিহাসিক বাড়ি স্থানীয় বরো কাউন্সিল ভেঙে ফেলছে, এই খবর জানতে পেরে ছেলেটি লণ্ডনে যায় এবং গৃহনির্মাণ ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রণালয়ে গিয়ে এই বাড়ি ভাঙার কাজ বন্ধ করার নির্দেশ আদায় করে ফিরে আসে।

শ্রমিকশ্রেণীর ছেলে-মেয়েদের মধ্যে শৃঙখলাহীনতার আর একটি কারণ, শিশুদের দিকে পিতা-মাতারা দৃষ্টি দেবার কোন সময় পায় না। শ্রমিকদের অবসর সময়ে শিশুর পিতা হয়তো শুঁড়িখানায় গিয়ে মদ খায় অথবা রেস খেলতে বসে যায়, আর মা হয়তো বিঙ্গো বাজায়। শিশুরা এই সময় রাস্তাঘাটে নিজেদের খেয়াল-খুশিমত নানা অপকর্মে লিপ্ত থাকে। কিন্তু যে-সব শিশু এভাবে ঘোরার সময় কম পায়, তারাও যে কম উচ্ছৃঙখল সে কথাও বলা শক্ত।

ভারতের ন্যায় বৃটেনেও বছরের শেষ সময় সম্মেলনের হিড়িক পড়ে যায়। আর শিক্ষা বিষয়েই সব চেয়ে বেশি সম্মেলন হয়। সংবাদপত্র খুললেই 'প্রাথমিক শিক্ষা ভেঙে পড়ছে', 'মাধ্যমিক শিক্ষার সংকট', কিংবা, 'অক্সফোর্ডে নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত', এই রকম বড় বড় শিরোনামা চোখে পড়বে। এ ছাড়া 'ব্রেন ড্রেন', অর্থাৎ বৃটেন থেকে ভাল ছাত্রদের বিদেশ গমন, উচ্চ শিক্ষায় অপূর্ণতা ও অপচয়ের সমস্যা, এবং শিক্ষায়তনে ছেলে-মেয়েদের বেশি করে মেলামেশার প্রশ্ন তো আছেই। কিন্তু 'কমপ্রিহেনসিভ্ স্কুল' বা 'ব্যাপক বিদ্যায়তনের' বিষয়টি সব কিছুকে ছাপিয়ে গেছে। বৃটিশ শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে যাদের ধারণা আছে, তারা সকলেই পরিচিত প্রতীক ও শব্দ, যেমন 'O', 'A', '১১', কিংবা 'লেভেল', 'স্ট্রীম' প্রভৃতি সবই সব বিদ্যায়তনে পাবেন, এবং এদিক থেকে কোন তফাৎ নেই। বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রদানের নানা মাধ্যম রয়েছে—যেমন, পাবলিক স্কুল আসলে যা প্রাইভেট, গ্রামার স্কুল, মাধ্যমিক আধুনিক স্কুল ও ব্যাপক বা কমপ্রিহেনসিভ স্কুল। কর্তৃপক্ষের সমর্থনের ফলে 'কমপ্রিহেনসিভ' স্কুলের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে—অবশ্য পাবলিক স্কুলগুলি এর জন্য মোটেই নিজেদের বিপন্ন বলে বোধ করছে না। সম্প্রতি একজন গানের শিক্ষক 'কমপ্রিহেনসিভ' বিদ্যালয়ের সমালোচনা করে বলেছেন, এই বিদ্যালয়গুলি আয়তনে অত্যন্ত বেশি বড় এবং অনুন্নত শ্রেণীর ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার মান উন্নয়নে এই বিদ্যালয়গুলি সাফল্য লাভ করে নি। এইরূপ ইঙ্গিত করা হয়েছে, অনুন্নত শ্রেণীর গৃহের পরিবেশ পরিবর্তন ভিন্ন তাদের শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব নয়।

এ কথা সত্যি, গ্রামার স্কুলগুলির, বিশেষ করে পুরোনো স্কুলগুলির অনেক দোষ-ত্রুটি আছে। তবে এ কথাও ঠিক, এদের বিরুদ্ধে যে-সব সমালোচনা করা হয় তার অনেকটাই উন্নাসিকতার ফল।

'ইকনমিস্ট' পত্রিকা সঙ্গতভাবেই বলেছে, 'কমপ্রিহেনসিভ' বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে এই সমালোচনার ফলে 'বৃটিশ সমাজের খুব বড় রকমের ক্ষতি সাধন করা হবে। কমপ্রিহেনসিভ বিদ্যালয়ে ক্লাশের মধ্যে সমাজের অবহেলিত অংশের সঙ্গে অন্যান্য অংশের একী-করণের যে প্রচেষ্টা সুরু করা হয়েছে, তা বাধাপ্রাপ্ত হলে খারাপ হবে। এই সব বিদ্যালয়ে আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। তবে টেলিভিশনের ন্যায় আধুনিক কয়েকটি মাধ্যম ছাড়া শিক্ষার নীতিগুলি বহু বছর পূর্বেই গৃহীত হয়েছিল। নতুন বিদ্যালয়গুলিতে এ সবের ব্যবহার বেশ সাফল্যের সঙ্গেই হচ্ছে।

বহুমূল্যে ক্রীত সেজানের (cezanne) চিত্র বর্তমানে ন্যাশনাল গ্যালারীতে দেখা যাচ্ছে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, যখন বিপুল অর্থব্যয়ে এই ছবি কেনার কাজ চলছিল, ঠিক তখনই ড্রেকের 'ড্রাম' বা বাদ্যভাণ্ডটি বৃটেনের হাতছাড়া হবার উপক্রম হয়েছিল। নিউবোণ্টের কবিতা পাঠ করে প্রথম আমি এই বাদ্যভাণ্ডটির বাস্তব অস্তিত্বের কথা জানতে পারি। কবিপুত্রের কথা থেকে জানা যায়, ১৯১৯ সালে জার্মান নৌবাহিনীর আত্মসমর্পণের সময় বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজের এক ক্যাপ্টেন দূর থেকে এক অজানা বাদ্যভাণ্ডের বাজনা শুনতে পান। তিনিই নিউবোণ্টকে লেখেন: এই কি ড্রেকের বাদ্যভাণ্ড?

ভারত দর্শন

● বুলেটের আঘাতে সর্দার প্রতাপ সিং কায়রোঁ মোটরের পেছনের সীটে লুটিয়ে পড়েছেন।

রাজধানী ঃ

হিন্দী প্রেমে ভাঁটা

হিন্দীভাষার রাষ্ট্রীয়করণের মহোৎসবটা সম্প্রতি যেন কিছু মিইয়ে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে। এর কারণ কি হিন্দী প্রেমে ভাঁটা, নাকি দেশ-ব্যাপী ধূমায়িত বহ্নির আলোকে ভয়-ভাবনার কাঁটা? সংখ্যাগরিষ্ঠ অহিন্দী-ভাষীদের জন্য এখন হিন্দীবাদের কণ্ঠে মিষ্টি স্তোকবাক্যের নির্ঝরিণী নিঃসৃত হচ্ছে চতুর্দিকে। এতোদিন ধারণা হয়েছিল হিন্দীর আব্দার বুঝি ছেলের হাতের মোয়ার মতো। এখন উল্টো ধারণার স্রোত এসেছে। দেখছি, অহিন্দীভাষীর হাতে সান্ত্বনার লাড্ডু তুলে দেওয়ার জন্য হিন্দী প্রভুত্বের মধ্যে প্রায় রেষারেষি সুরু হওয়ার উপক্রম হয়েছে। কিন্তু হিন্দীবাদ বুঝি একটু দেরিতে বোঝে। তাঁদের বোঝা উচিত ও লাড্ডু দিল্লীকা লাড্ডু ভেবে অহিন্দীভাষীরা সরাসরি প্রত্যাখ্যানই করবে। আশ্চর্য এই, হিন্দীর স্বপক্ষে যদি তর্কাতীত যুক্তিই থাকবে, তবে এই স্তোকবাক্যের প্রবাহ কেন? আসলে দুরন্ত বুদ্ধিমান শিশুকে চাঁদ• পেড়ে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে বড়ই বিপত্তির কারণ সৃষ্টি ক'রে ফেলা হয়েছে। তাই চতুর্দিকে 'সামাল' 'সামাল'।

ওদিকে স্তোকবাক্যের পরোয়া না ক'রে হিন্দীবিরোধী মনোভাব স্থান থেকে স্থানান্তরে দাবানলের আকারে ছড়িয়ে পড়ছে, যদিও বর্তমানে বহ্নির আকারে ধূমায়িত। মাদ্রাজ থেকে পণ্ডিচেরী, অন্ধ্র, বাংলা—স্ফুলিঙ্গ মন্দ বাতাসে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। এ আগুনে স্তোকবারির ছিটে বড় কাজে আসছে না। মূল উদ্দেশ্যেই যেখানে বিরোধ সেখানে গৌণ কারণ কতটুকু শক্তি ধারণের• ক্ষমতা রাখে?

হিন্দী হুকুম ছুঁড়ে ফেললেই যে হিন্দী হটবে, রাজ্যওয়ারী চাকরির ভাগ-বাঁটোয়ারা করলেই যে হিন্দীর আঁটো-সাঁটো গিঁট শিথিল হবে কিন্তু দিল্লীর

মনোলোভা আধুনিকার বেশে হাজির করানো হলেই যে লুব্ধ অহিন্দীভাষীরা হাবড়ে পড়বে, এমন সব ঠুনকো ধারণার জোরে কেমন ক'রে যে এতো-বড় একটা জাতীয় সমস্যার গুরুভার দায়িত্ব গ্রহণ করা যায়, অনেকের অ-ভি-আই-পি মস্তিষ্কে সে তত্ত্ব ঢোকে না। সমস্যাটার গভীরত্ব এতই অতল-স্পর্শী যে কেবলমাত্র তাত্ত্বিক রাজ-নীতির কায়দায় তাকে আয়ত্তে আনা অসম্ভব।

আমরা আগেও বলেছি, আবারও বলছি, ভাষার মতো একটি বস্তুকে জবরদস্তি বোঝার মতো পিঠে চাপিয়ে দেওয়া খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তার জন্য বহু মেহনৎ, বহু প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে। তার জন্য আবশ্যক হলে অধিকতর অপেক্ষায় কোনোরূপ পরাজয়ের গ্লানি নেই। জাতীয় সংহতির প্রয়োজনে অপেক্ষার যদি আবশ্যক হয়, একগুঁয়েমি শয়তানের হাত ছেড়ে তাহলে প্রতীক্ষার পথই হবে যথার্থ কল্যাণকর এবং রাজ-নৈতিক জয়। বিলম্বে লভ্য ফলও ফলই। বরং যা কিছু সুষ্ঠুভাবে লাভ করা যায়, তা বিলম্বিত হলেও সে লাভই যথার্থ। এক জাতীয় অবোধ পরীক্ষার্থীর মতো এক দফা অকৃত-কার্যতায় ধরাতল রসাতলে গেল মনে ক'রে আত্মহত্যা করাটা প্রাজ্ঞ রাজ-নীতি হ'তে পারে না। আর হিন্দীকে এখনই বাহুবলে প্রতিষ্ঠিত করার অর্থও জাতীয় সংহতির হনন। সুতরাং প্রয়োজন বোধে অপেক্ষাই শ্রেয়। সংবিধান যদি দুস্তর বাধা ব'লে প্রতীয়মান হয় তবে তার টিকা উত্তর প্রবীণ রাজনীতিবিদ সংসদ সদস্য শ্রী এন সি চ্যাটার্জি উপস্থাপিত করেছেন। শ্রীচ্যাটার্জি এক বিবৃতিতে বলেছেন, ১৫ বছরে ১৭ বার সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে এবং কখন কখন অতি সামান্য কারণেও সংশোধনে আটকায়নি। তিনি আরও বলেছেন, দেশ যখন বহিঃশত্রুর আক্র-মণের আজও পুরোপুরি মোকাবিলা ক'রে উঠতে পারে নি, তখন সংবিধানের কয়েকটি বিধির প্রয়োগ ক'রে জাতীয় ঐক্যের মূলে কুঠারাঘাত করা অসমীচীন।

তিনি বলেন, 'ভারতের নিরাপত্তা ভাষাগত গোঁড়ামির দ্বারা বিপন্ন হোক সংবিধান প্রণেতাদের কি এমন কোনো অভিপ্রায় ছিল?'

এ প্রশ্নের সাফ জবাব নিশ্চয় এই হবে,—'না, তা ছিল না।'

প্রতাপ সিং কায়রোঁ

প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ-কারের পর দিল্লী থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে বহু অভিনন্দিত, নিন্দিত ও বিতর্কিত পাঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্দার প্রতাপ সিং কায়রোঁ তিনজন সহযাত্রীসহ বর্বর আততায়ীর গুলীতে অতর্কিতে নিহত হ'ন ৬ই ফেব্রুয়ারীর প্রকাশ্য দিবালোকে। প্রকাশ্য দিবা-লোকে চলন্ত মোটর থামিয়ে কোন্ উদ্দেশ্যে কায়রোঁকে চারজন দুর্বৃত্ত হত্যা করেছে বর্তমান প্রবন্ধ প্রেসে যাওয়ার মুহূর্তে তার সঠিক বিবরণ জানা যায় নি। শুধু এই মর্মান্তিক সংবাদে স্তম্ভিত ভারতের অংশরূপে আমরাও স্তম্ভিতই হয়েছি।

সর্দার কায়রোঁ ও তাঁর পুত্রদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের যথারীতি তদন্তের পর দাশ কমিশনের দৃষ্টিতে সপুত্র সর্দার কায়রোঁ দোষী সাব্যস্ত হন এবং গোটা পাঞ্জাব জুড়ে তাঁকে নিয়ে গভীর চাঞ্চল্যের সূত্রপাত হয়। এ প্রসঙ্গে আদিল্লী তোলপাড় হয়েছিল এবং পাঞ্জাবের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বহু বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ-ভঙ্গ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সে সমস্ত আইনী বে-আইনী প্রশ্ন। যদি সেই প্রশ্নটা সর্দার কায়রোঁর এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের মূলে প্রভাব বিস্তার ক'রে থাকে, তবে ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে ভয়াবহ সন্ত্রাসবাদের সূত্রপাত হয়েছে বলে আশঙ্কা করতে হবে এবং এ বিষয়ে সতর্কতার আশু প্রয়োজন

● পি-এন-টি ৭৭৯০—এই মোটরের মধ্যে সর্দার কায়রোঁ আততায়ীর গুলীতে নিহত হন।

অবহেলা করা সমীচীন হবে না। কিন্তু সে প্রশ্ন এখনই উত্থাপন করার বিষয় নয়, যেহেতু সর্দার কায়রোঁর হত্যারহস্য এ পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত।

সংবাদে প্রকাশ, মাত্র কয়েক মাস আগে জনৈক জ্যোতিষী নাকি সর্দারজীকে সতর্ক ক'রে বলেন যে, ১৯৬৪ সালের শেষ দিকে সর্দার কায়রোঁকে গুলী ক'রে হত্যা করা হ'তে পারে। সংবাদটি তাৎপর্যপূর্ণ। জ্যোতিষের এমন বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যদ্বাণীতে কতজন বিশ্বাস করেন জানি না, তবে সেই জ্যোতিষীর সন্ধান ক'রে তাঁর গণনায় আততায়ীর কোনো সন্ধান মেলে কি না এ বিষয়ে চেষ্টা ক'রে দেখলে হ'ত। জ্যোতিষের আড়ালে আরও কিছু আবৃত থাকা এমন কিছু বিচিত্র ব্যাপার নাও হ'তে পারে।

সর্দার কায়রোঁ পাঞ্জাবে যে অসন্তোষের ঝড়ই প্রবাহিত ক'রে থাকুন না কেন, তার বিচার ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে এমন নির্মমভাবে যদি দ্বিতীয়বার সংঘটিত হ'য়ে থাকে, তবে দেশে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে বলতে হবে।

দাশ কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে এবং বহু অভিযোগের ফলে তাকে মুখ্যমন্ত্রিত্ব ত্যাগ করতে হলেও এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, পাঞ্জাবের এই প্রভাবশীল অধিনায়ক তাঁর জীবনে বহুমূল্য সাধনার ফলে পূর্ণ করেছেন তাঁর দেশকে, এগিয়ে নিয়ে গেছেন উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে। পাঞ্জাবের শান্তি, শৃঙ্খলা, সংহতি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সামাজিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য, আকালী দলের বিক্ষোভ প্রশমন ও পাঞ্জাবী সুবা আন্দোলন দমনে তাঁর কৃতিত্ব চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

শুভেচ্ছা সফরে নে উইন

বৃহ্ম বিপ্লবী পরিষদের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপ্রধান জেনারেল নে উইন ভারতবর্ষে সাত দিনের জন্য সরকারীভাবে শুভেচ্ছা সফরে এসেছেন। বৃহ্মদেশ ভারতের নিকট প্রতিবেশী। সাংস্কৃতিক বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ভারত-বৃহ্মের সংযোগ বহুকাল বিস্তৃত এবং উভয় দেশের জনসাধারণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব বিদ্যমান। সে সম্বন্ধ আজকের পরিবর্তিত পট-ভূমিতেও অব্যাহত আছে, এটা প্রকৃতই আনন্দের কথা।

জেনারেল নে উইনের ভারত সফর ভারত-বৃহ্মের সম্পর্ককে শুধু যে দৃঢ়তর করবে তাই নয়, তাঁর আগমনে ভারতের সীমান্ত সমস্যার অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ের আলোচনাও সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

আসাম ঃ

নাগাল্যাণ্ডে পার্লামেণ্টারী প্রতিনিধি দলের সফরের সাফল্য সম্পর্কে ইতিমধ্যে বিভিন্ন মহলে নানা প্রকার জল্পনা-কল্পনা সুরু হয়েছে।

রাজনৈতিক মহল এ সম্পর্কে খুব আশান্বিত না হলেও নাগাল্যাণ্ডের সাধারণ মানুষ কিন্তু খুব উৎসাহ প্রকাশ করছে। সরকারী মহলও আশা প্রকাশ করছেন নাগাল্যাণ্ডের প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করে একটি সুষ্ঠু সমাধান আবিষ্কারের পক্ষে এই সফর সহায়ক হতে পারে।

শান্তি মিশনের কতিপয় সদস্য, বিশেষ করে রেভাঃ মাইকেল স্কটের কয়েকটি প্রকাশ্য উক্তিকে কেন্দ্র করে নানাপ্রকার কথা উঠেছে। কিছু কিছু বিভ্রান্তিরও সৃষ্টি হয়েছে। তবে একথা ঠিক যে, শান্তি মিশনের বৈঠক সুরু হওয়ার পর থেকে নাগাল্যাণ্ডে হত্যাকাণ্ড আর ঘটে নি। এতে সাধারণ মানুষ খানিকটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছেন। একথা সত্য যে, বৈরী নাগা দলপতিরা জনসাধারণের মতামতের বড় একটা মূল্য দিতে চান না। তবু কিছুকাল ধরে বিভিন্ন নাগা উপজাতিরা জনসভা অনুষ্ঠিত করে শান্তির জন্য যে আগ্রহ প্রকাশ করছে তার প্রভাব নাগা নেতারা উপেক্ষা করতে পারবে না কোনমতে।

রাজনৈতিক মহলের ধারণা বৈরী নাগা নেতা এখনও সমস্ত শ্রেণীর নাগাদের আস্থা হারায় নি। ফলে শান্তি আলোচনা ব্যর্থ হলে আবার সেই লুণ্ঠন, নরহত্যা ও বর্বর অত্যাচারে বৈরী নাগারা আগের মতন মেতে উঠবে। তবে বেশ কিছু সংখ্যক নাগা দলপতিদের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছে। তারা একটা শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে।

বহু নাগা মনে করে পার্লামেণ্টারী প্রতিনিধিদলের প্রকৃত অবস্থার সাথে চাক্ষুষ পরিচয়ের ফলে একটা সমাধান সূত্র আবিষ্কার সহজতর হবে। সরকার সর্বশ্রেণীর নাগা নেতাদের সাথে প্রতিনিধিদলের মিলিত হবার ব্যাপক কার্যসূচী তৈরি করেছেন। সপ্তাহকাল সফরে তাঁরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে জনসাধারণের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করবেন। এ ছাড়া তিনটি দলে বিভক্ত করে এক একদলকে নাগাল্যাণ্ডের এক একটি বিশেষ অঞ্চল ঘুরিয়ে দেখানো হবে। জনসাধারণের পক্ষ থেকে তাঁদের সম্বর্ধনার আয়োজনও করা হয়েছে, এর ফলে জনমত যাচাই করার যথেষ্ট সুযোগ প্রতিনিধিরা পাবেন।

কতিপয় বৈরী নাগা নেতাদের সাথে প্রতিনিধিদলের আলোচনা বৈঠকের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। বৈঠকে নাগা নেতাদের কঠোর মনোভাবের পরিবর্তন ঘটিয়ে ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত রেখে একটি রাজনৈতিক আপোষ মীমাংসায় রাজী করানোর চেষ্টাও তাঁরা করতে পারবেন। প্রতিনিধিদল নতুন কোন সমাধান সূত্রও পেশ করতে পারেন এবং ভারত সরকারকেও তা মেনে নেবার জন্য বলতে পারেন বলে আশা করা যাচ্ছে। তা যদি না হয় তাহলে প্রতিনিধিরা তাদের যে যার দলীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী অবস্থার বিচার-বিবেচনা করে ফিরে এসে সরকারকে পৃথক পৃথক সমাধানের পথ নির্দেশ করতে পারেন। শেষ পর্যন্ত অবস্থা যাই দাঁড়াক না কেন, এই সফরে নাগাল্যাণ্ডের প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রতিনিধিরা ওয়াকিবহাল হতে পারবেন এবং শান্তি মিশনকে তথা সরকারকে নাগাভূমির অচল অবস্থার অবসান ঘটিয়ে শান্তি স্থাপনের কাজে অধিক সাহায্য করতে পারবেন, একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

● লাওসে ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানের প্রাক্কালে প্রিন্স সুভান্না ফুমার (ডান দিকে) সঙ্গে ফৌমি নোসাভানকে (বাঁ দিক থেকে দ্বিতীয়) দেখা যাচ্ছে।

লাওস ঃ

লাওস থেকে এক ক্ষণস্থায়ী বিদ্রোহের সংবাদ পাওয়া গেছে। নিরপেক্ষতাবাদী প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স সুভান্না ফুমার হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেবার জন্য দক্ষিণপন্থী সামরিক নেতারা চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছে। বিদ্রোহের নায়ক লাওসের সহকারী প্রধানমন্ত্রী জেনারেল ফৌমি নোসাভান অন্যান্য সহকর্মীসহ লাওস ত্যাগ করে থাইল্যাণ্ডে পালিয়ে গিয়েছেন।

৩১শে জানুয়ারী একদল সৈন্য ভিয়েনটিয়েনে বেতারকেন্দ্র, বিমান-বন্দর প্রভৃতি দখল করে ফেলে। ভিয়েনটিয়েনের সামরিক দপ্তরের অন্যতম স্টাফ অফিসার কর্নেল বৌনলাউত সাইকোসি'র নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনী ভিয়েনটিয়েনে বিদ্রোহীদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে, এবং প্রিন্স সুভান্না ফুমাকে একরূপ বন্দী করে ফেলে। বিকেলে সুভান্না ফুমার বাসভবনে বিদ্রোহীদের সঙ্গে সুভান্না ফুমার এক বৈঠক হয়। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বিদ্রোহীদের কয়েকটি দাবি মেনে নিতে রাজি হন, এবং বিদ্রোহীরাও তাদের সৈন্যদলকে ভিয়েনটিয়েন শহর থেকে ১৫ মাইল দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে সম্মত হয়। এর পর আনুষ্ঠানিকভাবে বিদ্রোহের অবসান ঘোষণা করা হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষের লোকেরা মীমাংসার সর্ত ভঙ্গ করেছে, এই কারণ দেখিয়ে বিদ্রোহীরা আবার অস্ত্রধারণ করে। ভিয়েন-টিয়েনের রাস্তায় রাস্তায় ক'দিন ধরে খণ্ডযুদ্ধ চলে। একদিকে জেনারেল কৌপ্রসিথ অভয়ের নেতৃত্বে সৈন্যদল সুভান্না ফুমার সমর্থনে এগিয়ে আসে, এবং অপরদিকে পাকসানে থেকে জেনারেল খামকাও খামকং-এর সৈন্যরা বিদ্রোহীদের শক্তিবৃদ্ধির জন্য ভিয়েনটিয়েন অভিমুখে যাত্রা সুরু করে। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী চূড়ান্তভাবে বিদ্রোহের অবসান ঘটেছে। প্রিন্স সুভান্না ফুমার সমর্থকরা জয়লাভ করেছে। নোসাভান, শিও, সাইকোসি প্রভৃতি বিদ্রোহের নেতারা লাওস ত্যাগ করে গিয়েছেন।

হঠাৎ এই সামরিক অভ্যুত্থানের কারণ কি? বিদ্রোহীরা বলেছে, সৈন্যবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধির জন্যই তারা এই পথ গ্রহণ করেছে। অপর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, প্রিন্স সুভান্না ফুমার নিরপেক্ষ নীতির পরিবর্তে পুরোপুরি দক্ষিণপন্থী নীতি অনুসরণের উদ্দেশ্যে ফৌমি নোসাভান শাসন ক্ষমতা দখলের জন্য এই বিদ্রোহের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন।

লক্ষ্য করার বিষয়, গতবারের দক্ষিণপন্থী অভ্যুত্থানের নেতা কৌপ্রসিথ অভয় এবার দক্ষিণপন্থীদের বিদ্রোহকে সমর্থন করেন নি। তিনি প্রিন্স সুভান্না ফুমাকে সমর্থন করেছেন। কৌপ্রসিথ অভয় বলেছেন, এই বিদ্রোহ নিছক পারিবারিক কলহের ফল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনও এই বিদ্রোহকে সমর্থন করে নি। ভিয়েন-টিয়েনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের দূতাবাসের সামরিক কর্মচারীরা ৩১শে জানুয়ারী বিদ্রোহীদের সঙ্গে প্রিন্স সুভান্না ফুমার মীমাংসার কাজে মধ্যস্থতা করেছিলেন।

এখন প্রশ্ন হল: লাওসের রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে নোসাভান কি স্থায়িভাবে বিদায় নিলেন, না, আবার তিনি ফিরে আসবেন? যদি তিনি ফিরে আসেন, তাঁকে কি পূর্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হবে? আর, তিনি না এলে লাওসের কোয়ালিশন-ব্যবস্থায় দক্ষিণপন্থীদের প্রতিনিধিরূপে কাকে গ্রহণ করা হবে? নোসাভান যদি না ফেরেন, তবে কমিউনিস্টপন্থী প্রিন্স সুফানো ভং-এর সঙ্গে প্রিন্স সুভান্না ফুমার কি একটা মিটমাট হবে?

মালয়েশিয়া ঃ

মালয়েশিয়া সীমান্তে ইন্দোনেশীয় গেরিলা দল নতুন করে কোন হামলা না করলেও, অদূর ভবিষ্যতে ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে বড় রকমের সংঘর্ষে লিপ্ত হবে, এমন

ওপরে : সুভান্না ফুমার বাসভবনে বিদ্রোহীদের সঙ্গে বৈঠকে কৌপ্রসিথ অভয় (বাঁ দিক থেকে প্রথম), বৌনলাউত সাইকোসি (বাঁ দিক থেকে তৃতীয়) প্রভৃতিকে দেখা যাচ্ছে।
নীচে : বিদ্রোহীদের সামরিক তৎপরতা।

আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সংবাদ পাওয়া গিয়েছে, সীমান্ত বরাবর বোর্নিও-তে ইন্দোনেশিয়া প্রায় বিশ হাজার সৈন্য সমাবেশ করেছে। হঠাৎ এত সৈন্য সমাবেশের কারণ কি? নিশ্চয়ই সীমান্ত রক্ষা, বা মালয়েশিয়ার নাশকতামূলক কার্য দমনের উদ্দেশ্যে নয়। বর্ষা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দোনেশিয়া কোন অজুহাত সৃষ্টি করে মালয়েশিয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, সামরিক পর্যবেক্ষকরা এরূপ আশঙ্কা করছেন।

রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কাছে মালয়েশিয়ার পক্ষ থেকে এই অস্বাভাবিক সৈন্য সমাবেশের সংবাদ জানানো হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘে মালয়েশিয়ার প্রধান প্রতিনিধি শ্রীরাধাকৃষ্ণ রামানি বলেছেন, এবারের ইন্দোনেশীয় প্রস্তুতির ধরণ একটু অন্য রকম। এতদিন মুষ্টিমেয় গেরিলা সৈন্য পাঠিয়ে সীমান্তে গোলমাল বাধাবার চেষ্টা করা হত। কিন্তু এই প্রথম এক বিরাট সৈন্যবাহিনী সীমান্তে জমায়েত হয়েছে। ক্ষুদ্র মালয়েশিয়ার পক্ষে এই সংবাদে বিচলিত বোধ করা স্বাভাবিক।

সীমান্তে ধীরে ধীরে সৈন্য সমাবেশের পর হঠাৎ কিভাবে আক্রমণ শুরু হতে পারে, তার নিদারুণ অভিজ্ঞতা ভারতের আছে। ভারত সীমান্তে তিব্বতের দিকে দীর্ঘদিন ধরে চীন সৈন্য সমাবেশ করছে, এই সংবাদ বহুবার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর হঠাৎ দেখা গেল, চীনা সৈন্য ভারত আক্রমণ করে বসেছে। তাই মালয়েশিয়ার বিচলিত হবার কারণ মোটেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

পিকিং-এ চৌ-এন-লাই ও ডঃ সুবান্দ্রিওর সাক্ষাৎকারের পরই মালয়েশিয়া সীমান্তে ইন্দোনেশিয়ার এই সৈন্য সমাবেশ অনেকের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে মনে হবে। ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্রসংঘ ত্যাগ করার পর পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ সুবান্দ্রিও পিকিং দৌড়েছেন চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই-এর সঙ্গে পরামর্শ করতে। পরামর্শ তাঁরা করেছেন। এই পরামর্শের ফলই কি এই নতুন যুদ্ধপ্রস্তুতি।

বর্ষা শেষ হবার পর সত্যই যদি ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়াকে আক্রমণ করে, এবং ইন্দোনেশিয়ার সমর্থনে চীন এগিয়ে আসে, তবে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে নতুন করে আগুন জ্বলে উঠবে।

ফ্রান্স:

ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি চার্লস দ্য গল তাঁর ষাণ্মাসিক সাংবাদিক সম্মেলনে রাষ্ট্রসংঘের সংস্কার সাধনের জন্য একটা নতুন প্রস্তাব করেছেন।

তাঁর বক্তব্য, রাষ্ট্রসংঘ বর্তমানে তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। এই ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার জন্য অবিলম্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ফ্রান্স, বৃটেন ও কমিউনিস্ট চীনের সম্মিলিতভাবে আলোচনা করা উচিত। এই আলোচনার পূর্বে চীনকে বাদ দিয়ে আর চারটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নিতে পারেন।

দ্য গল এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে, কমিউনিস্ট চীনের সঙ্গে আলোচনা করে রাষ্ট্রসংঘ বিষয়ে মনস্থির করতে হবে। রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠার সময়ই বিশ্ব-সংস্থার প্রধান দায়িত্ব পঞ্চশক্তির ওপর দেয়া হয়েছিল। কিন্তু চীনে রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে অবস্থা অন্যরকম হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘে আজও চীন বলতে ফরমোজা স্বীকৃত। মূল ভূখণ্ড চীন রাষ্ট্রসংঘে স্বীকৃত নয়। এর থেকেই যত সমস্যার উদ্ভব হয়েছে।

দ্য গলের প্রস্তাব যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করবে না, এতো জানা কথা। বহু রাষ্ট্রের দাবি সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কমিউনিস্ট চীনকে রাষ্ট্রসংঘে গ্রহণ করতে রাজি হয় নি। সুতরাং এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাষ্ট্রসংঘ সংস্কারের বিষয়ে আলোচনার জন্য সেই কমিউনিস্ট চীনের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হবে, একথা ভাবাই যায় না।

• দ্য গল

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি লিনডন বেনস জনসন দ্য গলের প্রস্তাব সম্পর্কে সরাসরি কোন মন্তব্য করতে সম্মত না হলেও, বর্তমান রাষ্ট্রসংঘের প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বলেছেন, বিশ্বশান্তি ও প্রগতির মূল আদর্শ এই রাষ্ট্রসংঘেই নিহিত আছে।

দ্য গলের ধারণামত পঞ্চশক্তি বৈঠকের পরিবর্তে কমনওয়েলথ, ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রো-এশীয় গোষ্ঠী, এরূপ পৃথক পৃথক বৈঠকের দ্বারা বিশ্ব সমস্যার মূল্যায়ন সহজ হবে বলেও জনসন মত প্রকাশ করেছেন।

চীন:

হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী অ্যালেক্সি কোসিগিন ৫ই ফেব্রুয়ারী একদিনের জন্য পিকিং ঘুরে গেলেন। উত্তর ভিয়েৎনামে রাষ্ট্রীয় সফরে যাবার পথে একদিনের জন্য কোসিগিন পিকিং-এ অবস্থান করেছেন। কিন্তু মস্কো থেকে হ্যানয় যাবার পথে তিনি পিকিং হয়ে যাবেন, এ খবর পূর্ব থেকে প্রচারিত হয় নি। পিকিং-এর কূটনৈতিক মহলও ঘটনাটি জেনেছে কোসিগিনের আগমনের সামান্য পূর্বে।

বিমানবন্দরে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ কোসিগিনকে সাদর সম্বর্ধনা জানান। আলিঙ্গনের উত্তাপ না থাকলেও, সৌজন্য পূর্ণমাত্রাতেই ছিল।

হঠাৎ কোসিগিন পিকিং এলেন কেন? ১লা মার্চ থেকে মস্কোতে বিশ্বের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির যে বৈঠক হচ্ছে, চীন তাতে যোগ দিতে সম্মত হয় নি। সম্ভবত কোসিগিন চৌ-এন-লাই ও অন্যান্য নেতাদের এই বৈঠকে যোগ দেবার জন্য আর একবার বোঝাতে এসেছিলেন।

• কোসিগিন

মাত্র একদিনের জন্য পিকিং-এ থাকলেও কোসিগিন চৌ-এন-লাই-এর সঙ্গে অনেকক্ষণ আলোচনা করেছেন। পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা, এই আলোচনার ফলে চীন-সোভিয়েট মতভেদের কোনরূপ মীমাংসা হয় নি। তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে চীন তার পুরোনো মতই আঁকড়ে আছে। আসন্ন মস্কো বৈঠকেও চীন যোগ দেবে না।

কোসিগিনের পিকিং সফর সম্পর্কে চীনের সংবাদপত্রে যে উপেক্ষার ভাব দেখানো হয়েছে, তার থেকেই প্রমাণ হয় বিরোধ মীমাংসার জন্য কোসিগিন যতই উৎসাহী হোন না কেন, চীনের নেতাদের এ-ব্যাপারে খুব একটা গরজ নেই।

পাকিস্তান ঃ

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়লাভের ফলে আয়ুব খাঁ নতুন উৎসাহ লাভ করেছেন। তবে তিনি বুঝেছেন, এই উৎসাহটা পাকিস্তানের বিরোধী দলগুলির বিরুদ্ধে প্রয়োগ না করে 'চিরকালের শত্রু' ভারতের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

আয়ুব খাঁ তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য সরকারী ভাষণেই ভারতের বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদ্‌গার করেছেন এবং যথারীতি ভারতের প্রতি হুমকিও প্রদর্শন করেছেন।

১লা ফেব্রুয়ারী জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত মাসিক বেতার ভাষণে আয়ুব খাঁ বলেছেন, কাশ্মীরের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য পাকিস্তান অনির্দিষ্ট-কালের জন্য অপেক্ষা করতে পারে না। তিনি ভারতকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যদি অবিলম্বে 'শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পথ না পাওয়া যায়', তবে 'ভারতের সমূহ ক্ষতি হবে'।

'শান্তিপূর্ণ' পথ বলতে অবশ্য আয়ুব খাঁ সমগ্র কাশ্মীরকেই ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার কথা ভেবে-

• আয়ুব খাঁ

ছেন। এছাড়া অন্য কোন 'শান্তিপূর্ণ' পথ কখনও কোন সময় তাঁর পছন্দ হয় নি। যদি ভারত অবিলম্বে কাশ্মীর ছেড়ে না দেয়, তবে 'ভারতের ক্ষতি হবে', অর্থাৎ, ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তান ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে—এই কথাই আয়ুব খাঁ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন।

আয়ুব খাঁ তাঁর বক্তৃতায় কাশ্মীরের পূর্ণ ভারতভুক্তির জন্য সম্প্রতি যেসব সাংবিধানিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছেন। এ সব কাজের পরিণতি ভারতের পক্ষে খারাপ হবে বলে তিনি ভারতের নেতাদের সতর্ক করে দিয়েছেন। আয়ুব খাঁ আরও বলেছেন, পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বারে বারে চেষ্টা করেছে, কিন্তু ভারত তাতে কোন সাড়া দেয় নি।

বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অবস্থাটা যে সম্পূর্ণ বিপরীত বিভিন্ন সময়ের ঘটনা সে কথাই অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে। ভারত বারে বারে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়েছে, কিন্তু পাকিস্তান পিছিয়ে গেছে। দেশবাসীর বিরাগভাজন হয়েও ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার পাকিস্তানের সঙ্গে কাশ্মীর প্রশ্নে আপোষ করতে উদ্যোগী হয়েছেন। কিন্তু পাকিস্তান কোন আপোষের প্রস্তাবে রাজি হয় নি। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদনের জন্য ভারতের প্রস্তাব পর্যন্ত পাকিস্তান গ্রহণ করে নি। আর পাকিস্তান বলে কি না, ভারত বন্ধুত্বের ডাকে সাড়া দেয় নি।

আয়ুবের হুমকিতে ভয় পাবার কিছু নেই। নিজ দেশের গণ-অসন্তোষকে অন্য পথে নিয়ে যাবার জন্য, এবং নতুন কর্তা চৌ-এন-লাই, মাও সে-তুং-দের খুশি করবার জন্য

• চৌ-এন-লাই

• ফতেমা জিন্না

ঝে মাঝেই তাঁকে ভারতের বিরুদ্ধে কি দিতে হবে। এ না করে বুবের উপায় নেই।

• • •

নির্বাচনে পরাজয়ের পর মিস তেমা জিন্না এখন পাকিস্তানের কল বিরোধী দলকে একটি মাত্র জনৈতিক দলের মধ্যে মিলিত রার জন্য চেষ্টা করছেন।

আয়ুব খাঁর বিরুদ্ধে ফতেমা ন্নার প্রার্থীপদের সমর্থনে পাকিস্তানের পাঁচটি দল ঐক্যবদ্ধভাবে জ করেছে, তাদের কাছে ফতেমা ন্না এই ঐক্যকে আরও দৃঢ় করার ন্য আহ্বান জানিয়েছেন। পাকিস্তানে ণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য এই বৃদ্ধ য়সেও ফতেমা জিন্না সংগ্রাম করতে স্তুত। তাঁর নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নসাধারণের মধ্যে তিনি যে ভূতপূর্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য রেছেন, তাতে তিনি উৎসাহিত বোধ করছেন।

সংবাদে জানা গেছে, নিজামে সলাম দল, জাতীয় আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী লীগের কর্মীদের এক বৃহৎ অংশ ফতেমা জিন্নার আবেদনে সাড়া দিয়েছেন, এবং সকল বিরোধ ভুলে একটি ঐক্যবদ্ধ দল গঠনের জন্য সকল দলের নেতাদের ওপর তাঁরা চাপ দিচ্ছেন।

কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে, দলের নাম নিয়ে। ফতেমা জিন্নার ইচ্ছা, নতুন ঐক্যবদ্ধ দলের নাম হোক মুসলিম লীগ। তাঁর ভাই কায়েদে আজম জিন্নার স্মৃতিবিজড়িত মুসলিম লীগের প্রতি তাঁর আবেগ-মিশ্রিত সমর্থন থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু যে সব দল পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে একজোট হয়ে একদিন মুসলিম লীগকে বিধ্বস্ত করেছিল, তাদের পক্ষে আবার এই দলের নাম গ্রহণ করা মুশকিল। তা ছাড়া, পাকিস্তানের জনসাধারণের মধ্যে যে নতুন গণতান্ত্রিক চেতনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তার সঙ্গে এই প্রাচীন, রক্ষণশীল ও সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের নামের সঙ্গতি রক্ষা করা শক্ত হবে।

যাই হোক, মিস ফতেমা জিন্নার নেতৃত্বে পাকিস্তানের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আরও বেশি ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী হতে পারলে, তার ফল নিশ্চয়ই শুভ হবে।

বুরুণ্ডি ঃ

আফ্রিকার অন্যতম নব স্বাধীন রাষ্ট্র বুরুণ্ডির সঙ্গে চীনের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে। বুরুণ্ডির অভিযোগ, চীনা দূতাবাস থেকে বুরুণ্ডিতে বিদ্রোহ সৃষ্টির চেষ্টা হচ্ছিল। কয়েক সপ্তাহ পূর্বে বুরুণ্ডির প্রধানমন্ত্রীর হত্যার সঙ্গেও চীনা দূতাবাসের কর্মীদের যোগসাজস ছিল, পুলিশের পক্ষ থেকে এমন কথা বলা হয়েছে।

চীনা দূতাবাসের সাহায্যে বুরুণ্ডির বিভিন্ন স্থানে সরকার বিরোধী লোককে অস্ত্র দেয়া হচ্ছে, এবং নানাভাবে বিদ্রোহে উস্কানি দেয়া হচ্ছে। সম্প্রতি বুজুমবুরায় সৈন্যবাহিনী কয়েকটি অঞ্চলে তল্লাসী করে প্রচুর চীনা অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করেছে।

চীন অবশ্য বুরুণ্ডির দূতাবাস বন্ধের সংবাদ ঘোষণার সময় এই সব অভিযোগ অস্বীকার করেছে। কিন্তু নানা সূত্রে চীনের নাশকতামূলক কাজের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। আফ্রিকার দেশগুলির ব্যাপারে চীন বর্তমানে বিশেষভাবে নজর দিয়েছে।

সম্প্রতি আইভরি কোস্টে নাইজারের রাষ্ট্রপতি হামানি ডিওরি ও উত্তর ভল্টার মরিস ইয়ামেওসোও মিলিত হয়ে পারস্পরিক স্বার্থের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁরা তাঁদের যুক্ত বিবৃতিতে বলেছেন, চীনের নাশকতামূলক কাজ আজ আফ্রিকার নিরাপত্তার পক্ষে এক প্রধান সমস্যা। তাঁরা অভিযোগ করেছেন, তাঁদের উভয়ের দেশেই চীন অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে বিদ্রোহীদের সাহায্য করছে।

সোভিয়েট ইউনিয়ন ঃ

প্রায় দেড় শতাব্দী ধরে চিকিৎসকরা কাঠের তৈরি স্টেথিস্কোপ ব্যবহার করে আসছেন। কখনও কখনও অবশ্য হাড় ও এবোনাইট দিয়ে তৈরি স্টেথিস্কোপও চিকিৎসকেরা ব্যবহার করেন। আগামী এপ্রিল মাসে কিন্তু বিশ্বের তিনজন সেরা চিকিৎসকের হাতে সোনার তৈরি স্টেথিস্কোপ দেয়া হবে।

হৃদরোগ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সমিতি 'ইণ্টার ন্যাশনাল সোসাইটি অব কার্ডিও-লজি' যে তিনজন বিশিষ্ট চিকিৎসককে স্বর্ণনির্মিত স্টেথিস্কোপ দিয়ে সম্মানিত করবেন বলে ঘোষণা করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন আলেকজাণ্ডার মায়াসনিকভ। সোভিয়েট ইউনিয়নের 'অ্যাকাডেমি অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস'-এর সদস্য মায়াসনিকভ ১২০টি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, ৮টি পুস্তিকা ও বহুসংখ্যক পাঠ্য-পুস্তকের রচয়িতা। তিনি যকৃতের রোগের চিকিৎসা সম্পর্কে এক নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন।

[এগারো]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যে অপরাধের কোনো কিনারা হয় না

এদেশে মানুষ খুন করা সবচেয়ে নিরাপদ। এ কথা যতই অবজ্ঞার কথা হোক, এতে আনন্দ পাওয়া যায় না। কারণ কথাটা সত্য। কোনো হিন্দু তরুণীবিধবা অবৈধ প্রেমে প্রলুব্ধ হল। তারপর কিছুকাল প্রেম গোপনে চলতে থাকল। শেষে কিন্তু এমন অবস্থা হল যাতে আর গোপন রাখা যায় না। তখন আত্মীয়স্বজনের সমাজের কাছে মাথা নিচু। তখন তারা আত্ম-সম্মান বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠল। কিন্তু কপালে করাঘাত করা ভিন্ন তাদের আর কি করণীয় আছে? (এ রকম হলে ইউরোপীয়ান অন্যের মাথায় আঘাত হানত, নিজের কপালে নয়।) আত্মীয়েরা গোপনে এইভাবে হায় হায় করতে থাকে এবং ব্রিটিশ সরকার সতীদাহ উঠিয়ে দিয়েছে বলে তাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করে। তবে কলঙ্ক যাতে বাইরে না রটে তার জন্য যত রকম সতর্কতা প্রয়োজন তা অবলম্বন করে। ভ্রান্ত বিধবাটিকে 'তীর্থযাত্রা'য় পাঠিয়ে দেয়, এবং সেখানে তার পাপমুক্তির জন্য যে সব ব্যবস্থা করা হয়, তার পরেও যদি মেয়েটি বেঁচে থাকে, তখন সে তার এই হীন প্রায়শ্চিত্তের পর ঘরে ফিরে আসে। কিন্তু এই পাপভার মুক্তির পরীক্ষায় কজন বাঁচতে পারে? দেশী দাই এ সব ব্যাপারের কতটুকু জানে? তাই তার ব্যবস্থায় অধিকাংশ হতভাগীরই প্রাণ যায়। আর যে হতভাগীর এই স্থূল ব্যবস্থাতেও ভারমুক্তি ঘটল না, তার অবস্থা যে আরও কত শোচনীয় তা ভাবতেও কষ্ট হয়। উচ্চশ্রেণীর হিন্দু রক্ষণশীল পরিবারে এমন ঘটনা ঘটলে তার পরিণাম আরও খারাপ। এ রকম ক্ষেত্রে সতীদাহের ব্যবস্থা করে। এ 'সতী' অনুষ্ঠানকে ঠাণ্ডা সতী বলা হয়। একটা আয়োজন করা হয়, হতভাগীকে নেশার দ্রব্য খাইয়ে অচেতন করে তাকে পরে বিষ খাওয়ানো হয়। তারপর তাড়াতাড়ি তাকে শ্মশানে নিয়ে পোড়ানো হয়। জীবন সম্পূর্ণ লুপ্ত হবার আগেই শ্মশানে নেওয়া হয়, কারণ বাড়িতে মারা গেলে সবার পাপ হয়। কোনো ধর্মপ্রাণ হিন্দু সেজন্য মুমূর্ষুকে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে যায়, সেখানে গিয়ে মারা গেলে আর কোনো পাপ হয় না।

এই জাতীয় 'ঠাণ্ডা সতী'তে ডবল হত্যার অপরাধ হয়। কিন্তু সবচেয়ে অস্বস্তিকর হয় যখন, যাকে মারতে নেওয়া হচ্ছে, সে সব ষড়যন্ত্রটা টের পেয়ে যায়। সে তখন বিষ খেতে অস্বীকার করে। সে তখন হয় তো তার মায়ের দিকে তাকিয়ে বিলাপ করে বলে, 'মা, আমাকে বাঁচাও, আমার প্রতি দয়া কর।' কিন্তু তার উত্তরে মা বলে, 'খেয়ে ফেল মা, খেয়ে ফেল, তোমার মায়ের ইজ্জত বাঁচাও, বাবার সম্মান রক্ষা কর।' ভ্রূণ হত্যার কাজ খুবই প্রচলিত রয়েছে এ সমাজে, এবং এ কাজ কেন করা হয়, তাও সবার জানা। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুবিধবা কোনো সন্তানের জন্ম দিলে নবজাতকের মুখে উনুনের ছাই ভরে দিয়ে তার শ্বাসরোধ করা হয়। এই ভাবে ধর্ম বাঁচিয়ে যে শিশুকে হত্যা করা হল তাকে ভাঙা ইটের টুকরো দিয়ে ঝুড়িতে পুরে শিশুর মাতামহী গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে আসে।

এখানকার সমাজে মেয়েদের স্বাধীনতা নেই। তারা সবাই অন্তঃপুরের আড়ালে বাস করে, তাই এমন কথা শুনলে ইংরেজরা বিশ্বাসই করতে চাইবে না যে এমন দেশে এটা সম্ভব। আর যারা অপরাধী তারা নিষ্কৃতি পায়, কারণ এ ধরনের শিশু বিনাশে ধর্ম রক্ষিত হয় এবং এটি এদেশের অনেকদিনের আচরিত প্রথা। পর্দার আড়ালে কত পাপানুষ্ঠান হচ্ছে তা তো আর গোপন থাকে না, কিন্তু কজন সামাজিক সংস্কারকের এ প্রথার বিরুদ্ধে লড়বার সাহস আছে? এমন কি জেলাশাসকও এ রকম কেস্ খোলা চোখে দেখতে চান না, কারণ এ ধরনের কেস্ হাতে নিলে নানা ঝঞ্ঝাট, এর ভিতরে যে গোপনীয়তা আছে তা টেনে বার করার চেয়ে এর থেকে চোখ ফিরিয়ে থাকাই তাঁর পক্ষে বেশি নিরাপদ মনে হয়।

আর গ্রাম্য পুলিসের লোকের কথা না বলাই ভাল। সাধারণত তারা অত্যন্ত নির্বোধ, অতএব তাদের দিয়ে কোনো কাজ হয় না। তা ছাড়া যেখানে নির্বুদ্ধিতা কম, সেখানে তার চতুর ব্যবহারে সমাজেরই ক্ষতি হয়। সে অপরাধীর কাছ থেকে ভয় দেখিয়ে টাকা খেতে থাকে, এবং অপরাধ যেমন চাপা ছিল তেমনি চাপাই থেকে যায়। সে পয়সার বশ, এবং ঘুস দিয়ে তাকে দিয়ে না করানো যায় এমন কাজ নেই। এবং যেখানে তার জাতের সঙ্গে কর্তব্যের বিরোধ ঘটে, সেখানে তাকে আদৌ বিশ্বাস করা চলে না। সে অসহায় এবং দুর্বলের উপর অত্যাচার চালাতে বড়ই পটু। ধনীর কাছে সে জোড়হাত। কিন্তু বুদ্ধিমান এবং কর্তব্যপরায়ণ হলেই বা তাকে দিয়ে কি লাভ হচ্ছে? বিধবার পদস্খলন আইনের চোখে অপরাধ নয়। কোনো বিধবার সন্তান সম্ভাবনা কি করে ঘটল তা তদন্ত করার ম্যাজিস্ট্রেটের কোনো অধিকার নেই। যখন পেটের সন্তান নষ্ট করার আশঙ্কা থাকে, তখনই কেবল সেদিকে লক্ষ রাখতে হয়। ম্যাজিস্ট্রেট জানবেন কি করে যে এমন আশঙ্কা দেখা দিয়েছে? জানবেন, কারণ বেনামা চিঠি আসে তাঁর নামে। যে সব চিঠির অভিযোগ সত্য বলে ধারণা হয়, সেই সব চিঠি পুলিস কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এবং এ ক্ষেত্রেও কেস্ জরুরি জ্ঞান করা হয় না, এবং সম্ভবত সেটা ঠিকই করা হয়। তদন্তে এত দেরি হয় যে ভ্রূণহত্যার একশ'টি ঘটনার মধ্যে পাঁচটির বেশি পুলিস প্রমাণ করতে পারে না। আমি এ বিষয়ের একটা অংশমাত্র প্রকাশ করলাম, বিস্তারিত বলতে গেলে পাঠকের হৃৎকম্প উপস্থিত হবে, রক্ত হিম হয়ে যাবে।

আমি এ কথা স্বীকার করছি, অন্য দেশের মতন এ দেশেও এমন সব সামাজিক দুর্নীতি আছে যা কোনো সরকারের সাধ্য নেই যে ঠিকভাবে দমন করতে পারে। কিন্তু হতভাগ্য বিধবাদের এ দেশে যে অমানুষিক অত্যাচার এবং অবিচার সহ্য করতে হয়, আমার বিবেচনায় তার কিছু প্রতিকার অন্তত করা উচিত, এবং করা অসাধ্য নয়। পুনর্বিবাহ আইনসঙ্গত করে, এবং যে লোকটি বিধবা বিবাহ করবে সেও যাতে জাতিচ্যুত না হয়-এমন আইন করা উচিত। সরকার নিরাপদে এ পর্যন্ত যেতে পারে, কিন্তু এর বেশি যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রগতিশীল সংখ্যালঘু হিন্দুরা যাই বলুন, কোনো দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শাসকই শিশুবিবাহ রোধ করে সমস্ত দুর্নীতির মূলোচ্ছেদে সোজা লেগে যেতে পারেন না। এই সংস্কার সমাজের ভিতর থেকেই আরম্ভ হওয়া উচিত। আমাকে হয় তো বলা হবে, সরকার তো বিধবাদের পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা আইনসিদ্ধ করেছেন। সে কথা সত্য, কিন্তু উচ্চ জাতি এর বিরোধী। একটি সাম্রাজ্যের গভর্নমেণ্টের কি অবস্থা ভেবে দেখুন।

ইংরেজ সরকারী লোকের পক্ষে বলা অবশ্যই সহজ যে বিবাহিত বিধবা এবং তার আত্মীয়েরা উচ্চ-জাতিকে অগ্রাহ্য করে চলুক। কিন্তু যারা এমন কথা বলে তারা জানে না 'মহাজন'-এর অভিশাপ কাকে বলে। সেই বিধবা এবং তার স্বামী এবং অধিকাংশ সময়ে এদের আত্মীয়-দের সবাই বিষের মতন পরিত্যাগ করবে। কাজেই দুজনের সৎসাহসের জন্য চল্লিশ-পঞ্চাশজন লোক দুঃখ ভোগ করবে। জীবনে শুধু নয় মরণেও তাদের দুঃখ ভোগের অন্ত থাকবে না। তাদের কোনো অনুষ্ঠানে উঁচু জাতের হিন্দুরা আসবে না, তারা তাদের কোনো অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হবে না। কর্ষণদাস মুলগি এক বিধবাকে বিয়ে করেছিল, কিন্তু তার দুর্ভোগের অন্ত ছিল না। তার বউ যখন তাকে জিজ্ঞাসা করত, ওগো, আমরা কবে

জাতে উঠব, তখন কর্মদাস শুধু অসহায়ভাবে কাঁদত, কোনো জবাব দিতে পারত না তার কথার। সামাজিক শাসন এমনই ছিল কঠোর। এই যে জাতিচ্যুত অবস্থায় সবার পরিত্যক্ত হয়ে থাকার ব্যাপারটা ইংরেজ স্ত্রী-পুরুষের কল্পনার বাইরে। মৃত্যু এর চেয়ে অনেক ভাল। বিধবা বিবাহ অস্তে স্বামী স্ত্রীর সুখে থাকার পালা প্রায় সব ক্ষেত্রেই জন্মের মতন ঘুচে যায়। তাদের নানাভাবে শাস্তি দেওয়া হয়। তাদের উপার্জনের পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়, এমন কি তাদের উত্তরাধিকার থেকেও বঞ্চিত করা হয়। এবং এই নতুন জীবনের শিক্ষা না থাকাতে স্বামী স্ত্রী সম্পূর্ণ হতাশভাবে ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথে এগোতে থাকে। পরস্পরের সুখের আশা মিলিয়ে গিয়ে এ ওর ঘাড়ে দোষ চাপাতে থাকে। তারপর এ ভাবে সমাজিক নির্যাতনের চরম লক্ষ্য করে অনেকে কুপথগামী হয়। জাতের কত বড় গৌরব! তবে এত বাধা ও অত্যাচার সত্ত্বেও এ দেশে বিধবা বিবাহ আন্দোলন এগিয়ে চলেছে, তাতে প্রমাণ হয় এটি সময়োচিত প্রয়োজনের দাবিতেই হচ্ছে, এবং এর শেষ সাফল্য সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নেই। গভর্মেণ্ট যদি এইটুকুমাত্র করে যে, বিধবা বিবাহ কেউ বাধা দিতে পারবে না, এবং যদি কোনো 'মহাজন' এই রকম বিয়ে যে করেছে তার জাতিচ্যুত করে তা হলে পাবলিক প্রোসিকিউটর তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবে, তা হলে সংস্কারের কাজ দ্রুত এগিয়ে যেতে পারে।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে মানুষের স্বাধীনতার উপর এই যে অত্যাচার এ কি কি কারণে সম্ভব হল? এর উত্তর হাতের কাছেই আছে। হিন্দু বিবাহ রীতি বহু শতাব্দীর শাস্ত্র-শাসিত রীতি। লক্ষ লক্ষ লোক ঐ রীতি এতকাল ধরে পালন করে আসছে। হিন্দুশাস্ত্রের নির্দেশ—প্রত্যেক হিন্দু মেয়েকে বিয়ে দিতেই হবে। বাড়িতে যদি কোনো পিতার অবিবাহিতা কন্যা থাকে তবে সে শুধু যে জাতিচ্যুত হবে তাই নয়, তার ধোপা-নাপিত বন্ধ হবে তাই নয়, তার অবস্থা এর চেয়েও খারাপ হবে। এই ঘটনা একটি ধর্মীয় পাপ বলে গণ্য হবে। শুধু ইহজগতের নয়, পরজগতের জন্যও তার কি শাস্তি হবে তা তাকে জানানো হবে। অর্থাৎ চিরনরক ভোগ। অতএব প্রত্যেক হিন্দু মেয়েকে বিয়ে দিতেই হবে, যেমন হয়েছিল লক্ষ্মীবাইয়ের বেলায়।

এ বিষয়ে আমি একটি ছোট্ট উদ্ধৃতি দিচ্ছি। ১৮৮২-৮৩ সালে কলকাতায় মিশনারিদের দশম বার্ষিক অধিবেশন হয়। সেই সময় মহীয়সী ইংরেজ মহিলা মিসেস ইথারিংটন তাঁর ভাষণে বলেছিলেন—

'গভর্মেণ্টের বিগত সেন্সাস রিপোর্টে এই ভয়ঙ্কর জিনিসটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ভারতে একুশ নিযুতের বেশি (২১ মিলিয়নের বেশি) বিধবা আছে। এর অর্থ কি তা কি আমরা গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি? ভারতের সমস্ত জনসংখ্যার সম্পর্কে প্রতি পাঁচজন পুরুষের মধ্যে একজন করে বিধবা আছে। এর মধ্যে ছোট পুরুষ শিশুকেও ধরা হয়েছে। আমি যদি এ বিশ্বাস করি তা হলে কি আমার খুব ভুল হবে যে, এই একুশ নিযুত বিধবার অর্ধেক সংখ্যাই যথার্থ অর্থে স্ত্রী হবার সৌভাগ্য লাভ করে নি? তারা নিশ্চয়ই বালিকা, তারা বালক স্বামীর নামমাত্র স্ত্রী হয়েছিল—এবং এই হাজার হাজার শিশুবিধবা স্বামীকে চেনে না, হয় তো একবারের বেশি দেখেও নি? আমাদের মধ্যে যারা তাদের বাড়িতে গিয়ে তাদের দেখার সুযোগ পেয়েছি (বিধবাদের আবার বাড়ি আছে নাকি?) সেই আমরা জানি, তাদের কি অবর্ণনীয় দুর্দশা। খুব কম করেও তাদের সম্পর্কে শুধু এইটুকু বলা যায় যে, যাতে জীবন সার্থক হয় তা থেকে তারা চিরবঞ্চিত। বলব না যে তারা খুব সুখ পায় নি, বলব যে জীবন যাতে নামমাত্র সহনীয় হয়, তাও তারা পায় নি কোনো দিন। একটি বিধবা আমাকে যে বলেছিল—যেমন আরও অনেক বিধবাই আমাকে বলেছে যে,

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেজওয়াডা - শ্রীনগর - গৌহাটী

আপনাদের সরকার আমাদের মৃত স্বামীর চিতায় মরবার স্বাধীনতাটুকু কেড়ে নিয়েছে, আর বদলে দিয়েছে শুধু দুঃখ যাতনা। আর কিছুই আমাদের জীবনে অবশিষ্ট নেই। সহমরণ এর চেয়ে অনেক বেশি কাম্য ছিল।'

'একজন প্রভাবশালী হিন্দু ভদ্রলোক একদা আমার স্বামীকে বলেছিলেন, শিশুবিধবাদের মধ্যে অন্ততপক্ষে দশজনের নয় জনই বিপথে যেতে বাধ্য হয়।' এবং আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি এর মধ্যে অতিশয়োক্তি নেই কিছুই। ভারতীয় স্ত্রীলোকদের মধ্যে কাজ করতে যে সব নানা বাধা উপস্থিত হয়, সে সব বাদ দিয়ে আমি শুধু এই একটি বিষয় নিয়ে এতক্ষণ বলেছি, তার কারণ এই সভা—এই প্রভাবশালী সভা—এই দুর্দশা দূর করার জন্য কিছু করবেন, এই আমার আশা। কি করলে বিধবাজীবনের এই অভিশাপ দূর হতে পারে তার উপায় নির্ধারণ করার ধৃষ্টতা আমার নেই, কিন্তু আমি এ কথা বলব যে, অবিলম্বে পুরুষেরা যদি একাজে ব্রতী না হন, তাহলে নারীরাই বাধ্য হয়ে এ কাজে নামবেন।'

কিন্তু সমাজ সংস্কারকের হাতেই আমি একাজের ভার দিতে আশা করি। এর পর আমি আর এক শ্রেণীর অপরাধের কথা বলি। এ অপরাধও ধরা পড়ে না, এবং অন্তরালে থেকে যায়। রেল লাইনের কাছাকাছি একটি লোককে খুন করা হল। তারপর রাত্রের অন্ধকারে তার দেহটিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হল রেল লাইনের উপরে এবং সেখানে শুইয়ে রাখা হল। যথাসময়ে রেলগাড়ি সেই দেহের উপর দিয়ে ছুটে চলে গেল। তখন সবাই জানল এটা রেলদুর্ঘটনার ব্যাপার। এই চাতুরিতে পুলিস অনেক সময়েই বিভ্রান্ত হয়। এবং এতে কষ্টসাপেক্ষ তদন্তও বেশ এড়িয়ে চলা যায়। পুলিস ঔদাসীন্যবশত জোর তদন্ত যদি না চালায় এবং কোনো পুলিস যদি তৎপরতার সাহায্যে কোনো এলাকার অপরাধপ্রবণতা দাবিয়ে রাখে, তা হলে সাধারণ লোক অবশ্যই শেষেরটি পছন্দ করবে।

তদন্তকারী অফিসার যদি খুব উৎসাহী হন এবং যথার্থভাবে কর্তব্য পালন করেন, তা হলে ঐ জাতীয় প্রতারণা ধরা তাঁর পক্ষে অবশ্যই সহজ হবে। রেল লাইনের উপর মৃতদেহ রাখা হয়েছে, না জীবন্ত লোক কাটা পড়েছে, এটা একটু তৎপর হলেই ধরা যায়। কিন্তু পুলিসদের মধ্যে আপন কর্তব্য বোঝে এবং তদনুসারে কাজ করে এমন ব্যক্তি খুবই বিরল। সেজন্য সাধারণের উপকার হবে আশায় আমি আত্মহত্যা ও দুর্ঘটনাজাত মৃত্যু ও হত্যার মধ্যে যে পার্থক্য আছে, এবং কি করে তা চেনা যায় সে সম্পর্কে একটি ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করছি। কোনো মৃত ব্যক্তির দেহ যদি ট্রেনে কাটা পড়ে তা হলে সেই কাটাছেঁড়া দেহ থেকে যে রক্তপাত হবে, তার পরিমাণ হবে খুবই অল্প। আর সে রক্তের চেহারা হবে পাতলা এবং জলো। এবং সে রক্ত জমাট বাঁধবে না। পক্ষান্তরে জীবন্ত মানুষ যদি কাটা পড়ে তা হলে সেই দেহ থেকে যে রক্তক্ষরণ হবে, তার পরিমাণ হবে বেশি, আর শুধু তাই নয়, সে রক্ত বাইরের হাওয়ায় জমাট বেঁধে যাবে। তার রং হবে ঘন লাল এবং উজ্জ্বল। মৃতদেহের উপর এঞ্জিন চলে গেলে সে রকম হবে না। এ দুইয়ের তফাৎ একটু মনোযোগ দিলে মোটেই বোঝা কঠিন হবে না।

রেলওয়ে সম্পর্কে যে সব গুরুতর অপরাধ সংঘটিত হয়, সে সম্পর্কে বলতে গেলে আরও অনেক রকম অপরাধের কথা মনে আসে। একটি অতি হীন চেষ্টা হয় যাত্রীবোঝাই গাড়ি লাইনচ্যুত করিয়ে গাড়িটাকে ধ্বংস করে দেওয়া। এটি প্রায়ই হতে দেখা যাচ্ছে। আর সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এই সব অপরাধ যারা করে তারা প্রায়ই ধরা পড়ে না, অতএব তারা নিরাপদে এই পাপ কার্যটি করতে পারে।

এঞ্জিন চালক লাইনে কোনো কিছু পড়ে আছে দেখতে পেলে কি করে বলছি। সে ব্রেক কষে গাড়িটাকে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি থামিয়ে ফেলার চেষ্টা করে। তখন গার্ড এবং ড্রাইভার দুজনেই নেমে দেখতে চেষ্টা করে লাইনের উপর কি রকম বস্তু পড়ে আছে, বা অন্য কি রকম বাধা উপস্থিত হয়েছে। তারপর পথ মুক্ত করা হয় এবং ট্রেনটিকে পরবর্তী স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেইখানে গিয়ে ঘটনা রিপোর্ট করা হয়। ইতিমধ্যে অপরাধীরা হয় তো নালা কিংবা একটু দূরের কোনো ঝোপের ভিতর থেকে সব দেখছিল, এবং যখন দেখল ট্রেন ধ্বংস হল না, তখন সেখান থেকে নিরাপদে পালিয়ে গেল। তারপর কয়েক ঘণ্টা বাদে পুলিস আসে, এবং না এলে যে ফল হত, আসাতেও তাই হয়, এবং বাইরে বাইরে তদন্ত করে চলে যায়। যদি লাইনের বাধা আবিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গার্ড যে কজন লোক পাওয়া সম্ভব তাদের সঙ্গে নিয়ে ট্রেন থামামাত্র, উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে, তাদের চতুর্দিকে অনুসন্ধানে পাঠায়, তা হলে সম্ভবত অপরাধীদের ধরতে পারে।

আমি নিজের একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি। এটা অবশ্য ডিটেকশনের এলাকায় পড়ে। যখন কে অ্যাণ্ড ডি রেলওয়ে প্রথম খোলা হল, তখন ট্রেন ধ্বংসের কয়েকটি চেষ্টা হয়েছিল। আমি নিজে এর তদন্তের ভার নিয়েছিলাম। কয়েকজন উৎসাহী ট্রলিচালককে সঙ্গে নিয়ে আমি রোজ প্যাসেঞ্জার ট্রেনে চলতে লাগলাম। লাইনের দুপাশ তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা ছিল না, তাই গাড়ির গতি ছিল মন্দ। এতে সুবিধা ছিল এই যে

কোনো বিপদ দেখা দিলে গাড়ি তাড়াতাড়ি থামিয়ে ফেলার সুবিধা ছিল। আমার পরিকল্পনা পরীক্ষা করতে খুব বেশি দিন অপেক্ষা করতে হল না। একদিন রাত্রে ড্রাইভার দেখতে পেল লাইনের উপর একটা গাছের গুঁড়ি পেতে রাখা হয়েছে। হঠাৎ গাড়িটা সে থামিয়ে ফেলল। আমি এক লাফে গাড়ি থেকে নেমে লোকজন সঙ্গে নিয়ে চারদিকে যেখানে যেখানে দুষ্ট লোকদের লুকিয়ে থাকবার সম্ভাবনা, সেই সব স্থানে ছুটে গেলাম। একটা বাঁশের ঝাড়ের দিকে এগিয়ে যেতেই তা থেকে দুটি লোক সেই ঝোপ থেকে বেরিয়ে গ্রামের দিকে চলছে, দেখতে পেলাম। আমি তাদের অনুসরণ করলাম, কিন্তু তাদের চেনবার বা ধরবার আগেই তারা বস্তীর মধ্যে ঢুকে পড়ল। গ্রামে গিয়ে প্রত্যেকটি বাড়ি সার্চ করলাম। কিন্তু দেখা গেল সবাই ঘুমুচ্ছে। আমি ঘরে ঢুকে প্রত্যেকটি ঘুমন্ত পুরুষের বুকে হাত রেখে পরীক্ষা করতে লাগলাম, দেখছিলাম কার বুকে নিশ্বাস ওঠাপড়া করছে বেশি। কার হৃৎপিণ্ড বেশি লাফাচ্ছে।

অবশ্য অভিযুক্ত করার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ নয়। কিন্তু এতে রেললাইনে বাধা সৃষ্টি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আর কখনো হয় নি এর পর।

গুরু অপরাধ করেও কি করে শাস্তি এড়ানো যায় তার আর একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। একটা পারিবারিক কলহে এক মুচি তার জামাইকে একেবারে মেরে ফেলে। তার বাড়ি থেকে কিছু দূরে এক বাঘ একটা গোরুকে আগের দিন মেরে ছিল, গোরুর কিছু অংশ খেয়ে বাঘ মড়াটাকে সেইখানে ফেলে রেখে গিয়েছিল, পরদিন এসে খাবে উদ্দেশ্যে। এই ঘটনার সুযোগ নিয়ে ঐ মুচি তার জামাইয়ের মৃতদেহ রাত্রের অন্ধকারে ঐখানে টেনে নিয়ে ফেলে এলো। সকালে উঠে হত্যাকারী সোজা থানায় গিয়ে জানাল যে তার জামাই মড়াটার কাছে চামড়া ছাড়িয়ে আনতে গিয়েছিল এমন সময় বাঘ তার 'পর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাঘটা কাছেই জঙ্গলে ছিল, সে তার জামাইকে ক্ষতবিক্ষত করে মেরে ফেলেছে। এই কাহিনী এমনই নির্ভরযোগ্য মনে হয়েছিল যে পুলিস এ বিষয়ে আর কোনো তদন্ত করার দরকারই মনে করে নি। নির্ভর-যোগ্য মনে হয়েছিল কারণ ওদের চামড়ার ব্যবসা, এবং বাঘে গোরু মেরেছিল সেটাও সত্য ঘটনা।

আরও একটা মারাত্মক অপরাধ কিভাবে গোপন করা হয়েছিল, বলি। এইটেই এবারের আমার শেষ কাহিনী। মফঃস্বলের কোনো এক স্থানে একটি সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড ঘটে। জায়গাটায় সহজে যাওয়া যায় না। এই হত্যাকাণ্ড প্রকাশ্যে অনেক লোকের সামনে ঘটেছিল। সেই মহকুমার শাসককে খবর পাঠানো হল যথাসময়ে, তাঁকে সমস্ত জানানো হল। তিনি এক-জন পুলিস ইন্‌সপেক্টরের উপর এর তদন্তের ভার দিলেন। কয়েকজন কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে তিনি তদন্তে এলেন। তিনি এসে যাদের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ করা হয়েছিল, তাদের গ্রেফতার করলেন। কিন্তু তারা সবাই হত্যা বিষয়ে একেবারে ঝাড়া অস্বীকার। তারা এ বিষয়ে কিছুই জানে না, এবং কেউ এ এলাকায় খুন হয় নি কবুল করল। তারা বলল, যে খুন হয়েছে বলে রিপোর্ট করা হয়েছে, সে দাঙ্গায় ধরা পড়ার ভয়ে কোথায় পালিয়ে গেছে। দাঙ্গা হয়েছিল একখণ্ড জমি নিয়ে। জলজ্যান্ত হত্যা বেমালুম অস্বীকার করে বসল, অথচ যাকে নিয়ে কথা, তার দেহ না পাওয়া পর্যন্ত কিছু প্রমাণ করাও শক্ত। প্রতিপক্ষের লোকেরা বলতে লাগল তারা স্বচক্ষে দেখেছে লোকটাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে একেবারে মেরে ফেলা হয়েছে, অথচ প্রমাণ করা যাচ্ছে না। একদিকের লোকেরা ঝাড়া অস্বীকার করছে, অন্যদিকের লোকেরা বলছে তারা খুন হতে দেখেছে, এবং দুদিকের সাক্ষীসাবুদ সমান জোরালো। এখন দেহ পাওয়া ভিন্ন খুনের প্রমাণ একেবারেই অসম্ভব হয়ে উঠল। পুলিস খুবই চেষ্টা করতে লাগলেন সত্য আবিষ্কারের জন্য, যদিও দুর্ভাগ্যের বিষয় তিনি বুদ্ধিটা আরও একটু বেশি চালনা করতে পারেন নি।

আশপাশের যাবতীয় পুকুরে খোঁজা হল, কয়েক মাইলের মধ্যে যত ঝোপঝাড় ছিল সেখানে খোঁজা হল, কিন্তু মৃতদেহের কোনো সন্ধান মিলল না। অবশেষে অভিযুক্তের বাড়ির পঞ্চাশ গজ দূরে একটা জায়গার মাটি দেখে মনে হল সম্প্রতি সেখানটা খোঁড়া হয়েছে। টিলে কিছু মাটি তুলে ফেলা হল, কিন্তু দেখা গেল সেখানে একটি মৃত ঘোড়া পুঁতে রাখা হয়েছে, সেটা মানুষের দেহ নয়। এইটে দেখেই তারা সন্ধানের কাজ থেকে বিরত হল। কিন্তু তারা আরও একটু যদি এগোত, তা হলে দেখতে পেত মৃতদেহটা সেখানেই ছিল। দেহটাকে ঘোড়ার পেটের ভিতর শেলাই করে রাখা হয়েছিল। ঘোড়ার পেটের নাড়ি সব বার করে সেইখানে দেহটাকে পুরে শেলাই করে দেওয়া হয়েছিল।

এই কেসে শেষ পর্যন্ত শেয়ালেরা ডিটেকটিভের ভূমিকা নিয়েছিল। তারা পুলিসের চেয়ে ভাল ডিটেকটিভ। তারাই এ-অপরাধের কিনারা করেছিল শেষ পর্যন্ত। অথচ পুলিস একেবারেই হাল ছেড়ে দিয়েছিল নির্বুদ্ধিতার জন্য। পাড়ার লোকেও পুলিসের ব্যর্থতায় অবাক হয়েছিল।

দেশী পুলিস অফিসার হয়ে এই চাতুরি ধরতে পারল না এটা বড়ই বিস্ময়কর। বিশ্বাসই করা যায় না। তার বোঝা উচিত ছিল ঘোড়া মারা গেলে এত কষ্ট করে তার কবর দেয় না কেউ। এই ঘটনাতেই পুলিসের মনে সন্দেহ জাগা উচিত ছিল।

(ক্রমশঃ)

ধারাবাহিক উপন্যাস

অদ্বিতীয়

সুশীল রায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

জীবনসংগ্রাম বলে একটা কথার চলন আছে। ঐ কথাটার সঙ্গেও যেমন পরিচয় আছে হৃদয়নাথের, ঐ জিনিসটার সঙ্গে পরিচয়ও আছে তাঁর তেমনি। কিন্তু তিনি যে সংগ্রাম করে চলেছেন, এমন বোধ যেন তাঁর নেই। তিনি নির্লিপ্ত, তিনি নির্বিকার। সারাদিন নম্বর গুণে-গুণে কাপড় বিক্রি করেন। নানা ধরণের মানুষের সঙ্গে কথা ব'লে-ব'লে এবং নানা মানুষের নানা রকমের উক্তি শুনে-শুনে হৃদয়নাথ মানুষটা যেন সহিষ্ণুতার একটা অবতার হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর প্রতিবেশীরা তাঁকে নিয়ে চিন্তিত, এ ব্যাপারটা তাঁর বড় বাড়াবাড়ি ঠেকে, এক-এক সময় বিরক্তবোধও তাঁর হয়, কিন্তু মুখে কোনো কথা তাঁর নেই।

চল্লিশ বছর বয়সও হয় নি হৃদয়নাথের, কিন্তু চেহারার ওপর বয়সের ছাপ পড়েছে খুবই! যত তাঁর বয়স তার চেয়েও অনেক বয়স্ক তাঁকে দেখায়। অত বেশি বয়স তাঁর দেখায় বলেই বুঝি তাঁকে উপদেশ দেয় সকলে। ছয়টি কচি-কচি ছেলেমেয়ে নিয়ে এই মানুষটা বিপন্ন অবশ্যই, কিন্তু অত উপদেশ দিয়ে ও উদ্বেগ দেখিয়ে তাঁকে আরও যে বিপন্ন করে তোলা হয় এটা বুঝি বোঝে না সকলে।

রেণুকার চেয়ে বেশি-বয়সী মেয়েও আছে এই ব্যারাকবাড়িতে। আছে মায়া, আছে মালতী, আছে ভবানী। তাদেরও লেখাপড়ার কোনো ব্যবস্থা করে নি তাদের বাপ-মা। অথচ, তাদের কথা তেমন উঠছে না, কথা উঠছে কেবল রেণুকাকে নিয়েই।

মালতীর মা ঠিকে-কাজ করে কয়েক বাড়িতে, মালতীর বাবা কাজ করে কাঠের কারখানায়। মায়ার বাবা ট্রামের কণ্ডাক্টার। ভবানীর বাবা রং-মিস্ত্রি। সুতরাং এরা তেমন ভদ্রলোক নয়; ভদ্রলোক হচ্ছেন একা ঐ হৃদয়নাথ, তিনি কাজ করেন দোকানে। তিনি যখন ভদ্রলোক, সুতরাং তাঁর জন্যেই সকলে চিন্তিত। তিনি যখন ভদ্রলোক, তখন ভদ্রভাবেই তাঁকে থাকতে হয়, হাজার রকমের বিরক্তি সত্ত্বেও মুখে তাই তাঁর কোনো কথা নেই।

বারিক লেনের ব্যারাকবাড়িটিতে এই মেয়েদের নিয়ে নানা কথা ওঠে। কিন্তু সেসব অন্য কথা। ছেলেছোকরাও আছে এ বাড়িতে অনেক। সকলে থাকেও বেশ কাছাকাছি ও ঘেঁষাঘেঁষি। আব্রু বা আবরণের কোনো বালাইও নেই এখানে, সুতরাং ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটু কথা যে উঠবেই, সেটা স্বাভাবিক।

সম্প্রতি এই ধরণের একটা ঘটনা নিয়ে গুঞ্জন যেমন চলেছে, তেমনি চলেছে, তেমনি চলেছে গুলতানি। ব্যাপারটা নাকি খুবই লজ্জার ও খুবই ঘেন্নার। মালতী মেয়েটাকে নিয়েই চলেছে কথা। মেয়েটা নাকি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। তার ওপর হালে যা কাণ্ড করেছে তা নাকি বলাই যায় না। সে কথা তবে আর বলে কাজ নেই। সহজেই আমরা সব ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারছি। যার মা ভোর না হতেই ঠিকে-কাজে বেরিয়ে যায়, যার বাবা সকালবেলাই চলে যায় তার কারখানায়, তারা যখন তাদের মেয়ের কথা ভাবে না, তখন মেয়ে নিজেই নিজেকে খুশিমত একটু চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। অনভ্যস্ত জীবনের এই চলার পা একটু হড়কে গেলেই পাঁচজন লোকে সেটা

গ্রন্থমেলা

একডোরে বাঁধা : ডাঃ বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচী। ভারতী বুক স্টল, ৬ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৯। দাম : এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

উপরোক্ত নাটিকাটি কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক ঘোষিত 'ঐক্যের সন্ধানে ভারত' নাট্য-প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত। নাটিকাটি কোনো অঙ্কে নয়, কেবল নয়টি দৃশ্যে বিভক্ত। নাটিকার মূল বক্তব্য হচ্ছে এই যে, 'ধর্মভেদে ও প্রদেশ ভেদে ভারতের একজাতিত্ব বিনষ্ট হতে পারে না—ভারতের সাংস্কৃতিক ভাবধারা একই।' হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি স্ত্রী-পুরুষ চরিত্রগুলি যথাযথভাবে ফুটে উঠেছে। গ্রন্থটি আদর্শমূলক, সেই কারণে স্বাভাবিক সাসপেন্স অপেক্ষা এতে ঘটনামূলক ঘাত-প্রতিঘাত চরিত্র-বিকাশে সহায়তা করেছে। আদর্শকে তুলে ধরার জন্য ডায়ালগ কোথাও কোথাও অতিরিক্ত মনে হলেও অভিনয় ক্ষেত্রে আবেগের মাধ্যমে দর্শক-শ্রোতাদের তা আনন্দ দিতে পারে।

তিন বেণী : কল্যাণী দত্ত। প্রকাশক : দুর্গা দত্ত। ৪১সি, এস পি মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬। দাম : দেড় টাকা।

কাব্যগ্রন্থটির কবিতাগুলি 'মিতাক্ষরা', 'লঘুত্রয়ী' ও 'সিংহাবলোকিতা'—এই

জয়ন্তী সেন

তিন পর্যায়ে বিভক্ত। 'মিতাক্ষরা'র কবিতাগুলিতে কবিজীবনের আত্মপ্রকাশের পরিবর্তে প্রাচীন সাহিত্য ও শিল্পের প্রতি কবির অনুভূতি প্রধানভাবে প্রকাশলাভ করেছে। পাণিনি, কৈলাস গুহা, অজন্তা, কালিদাস, মির্জা গালিব প্রভৃতি কবিতা 'মিতাক্ষরা'য় গ্রথিত। এইসব কবিতায় আধুনিক কাব্যরীতি প্রায় অনুপস্থিত হলেও বক্তব্য হৃদয়গ্রাহী। কৃষ্ণচূড়া কবিতায় কবির মুক্তি বেশ স্বতঃস্ফূর্ত। 'লঘুত্রয়ী' পর্যায় কিছুটা লঘুধর্মী হলেও তিনটি কবিতার মধ্যে তির্যক ব্যঙ্গ বিদ্যমান। তৃতীয় পর্যায়ে পঞ্চশিখের গানের বিষয়-বিভূতি ও স্বকীয়তা কিছুটা লক্ষ্য করা যায়।

নীলাভ শতাব্দী কাঁপে : সমীরণ মুখোপাধ্যায়। পরিবেশক : সিগনেট বুক শপ। ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম : এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

শ্রীসমীরণ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে কবিমন উপস্থিত। কাব্যের দ্বারা তা প্রমাণিত হয়, সুতরাং অপরের নিকট সার্টিফিকেট গ্রহণ তাঁর পক্ষে অনাবশ্যক। সমীরণবাবুর কবিতায় প্রধান যে চেতনা মুখ্যভাবে ফুটে উঠেছে, তা হচ্ছে জাগতিক জিজ্ঞাসা। দ্বিতীয় যুদ্ধ পরবর্তী জীবনে এমন জিজ্ঞাসা জাগাই স্বাভাবিক। তবু 'নীলাভ শতাব্দী কাঁপে' গ্রন্থটিতে কবির প্রেমাতি অনুল্লেখ্য নয়। তা ছাড়া তাঁর অধিকাংশ কবিতা ধীর লয়ে ছন্দায়িত হওয়ায়, সেগুলি বাহুল্যবর্জিত। তবুও বলা দরকার যে, উক্ত ধরণের কবিতা বিশ্বসাহিত্যে প্রচুর লিখিত হয়েছে—তাই সমীরণবাবুর কাছে অভিনবত্বও চাই—যা তাঁর 'বিরহ' কবিতায় দেখা যায়।

পদস্খলন বলে কোলাহল করে ওঠে বটে, কিন্তু মালতীদের মত মেয়েরা করে কি ? তাদের জন্মের প্রথম লগ্ন থেকে তারা তাদের জীবনের চারধার যেভাবে দেখে আসছে, আদবকায়দা দেখছে যেমনটি, তার বাইরের কোনো ধরণধারণ তারা পাবে কোথায় ? ঐ স্রোতেই পা ভাসিয়েছে তারা। সুতরাং ওদের কোনো ত্রুটিকে বড় করে দেখতে আমরা না-ই বা গেলাম।

আজ মালতী, কাল মায়া। আজ আন্নাকালী, কাল ভদ্রার মা। আজ লবঙ্গ, কাল লবঙ্গর মাসী—একটা-না-একটা ঝামেলা লেগেই আছে এই ব্যারাকবাড়িতে।

কখনো ওই ঝামেলা খুবই মুখরোচক হয়ে ওঠে, কখনো আবার সব কেমন তিক্ত হয়ে যায়। কিন্তু জীবন যথানিয়মে বয়ে চলেছে এই বৃহৎ অট্টালিকায়। এর ইটে-ইটে, অর্থাৎ এর পাঁজরে-পাঁজরে কখনো বেজে ওঠে হাহাকার, কখনো আর্তনাদ, কখনো হঠাৎ-বা একদিন উল্লাস।

এই বৃহৎ বাড়িটিকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখে না এই অঞ্চলের লোক। অথচ এই বাড়িটির ওপর নজর আছে সকলের সাড়ে ষোলো-আনা। নজর থাকার কারণও অবশ্যই আছে। —এখানে আছে মায়া মালতী লবঙ্গ; এখানে আছে আন্নাকালী ভদ্রা রেণুকা। এবং এ-ছাড়াও আছে আরও অনেক মেয়ে।

পাড়ার ছোকরারা দাওয়ায় বসে আড্ডা দেয়, নানা রকম আলোচনা চলে তাদের মধ্যে। সে-আলোচনার একটা অঙ্গই হচ্ছে এই বাড়িটা। ওরা বলে, 'ওটা ব্যারাকবাড়ি নয় রে, ওটা হচ্ছে জোয়ান মেয়েদের একটা ডিপো। চারধার ওর বন্ধ, ওর ভিতরে কত-কি যে ঘটছে তাই তা জানাই গেল না আজও।'

জানা গেল না ব'লে ওরা আক্ষেপ করে এবং জানার চেষ্টাও করে সেই সঙ্গেই। এবং দুঃখও হয়তো করে কেউ-কেউ। দুঃখ করে, কেন না অনেক মেয়েকে দেখে করুণাও হয় তাদের। তারা মনে করে যে, তেমন ঘরে জন্মালে এই মেয়েরাই অন্য রকম হয়ে যেত; ওদের চেহারার যে লাবণ্য এখন ছাই-চাপা হয়ে পড়ে আছে, তা ঝিলিক দিত রীতিমত।

তাদের এই দুঃখটা সত্যিকাবের দুঃখ, অথবা এটা দুঃখের মুখোশ-পরা এক-এক টুকরো লালসা—তা বলা বড় শক্ত। (ক্রমশঃ)

ধনপতি সওদাগর

বানিজ্যে সেকাল ও একাল

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ ত্রিংশ প্রবাহ ॥

ঢাকার মসলিন।

বাঙালীর বাণিজ্যের, বাঙালীর শিল্পের বিপুল ঐতিহ্য নিঃশব্দে আত্মগোপন করে আছে এই মসলিনের ভেতরে। লক্ষীয়া নদীর তীরবর্তী তিতবাদী গ্রামের সেই একশো পঁচিশ ক্রোশ দীর্ঘ সূক্ষ্ম সুতো দিয়েই অদ্ভুত ছন্দে ঘতিতে বাঙালী বস্ত্রশিল্পীরা তৈরি করতেন বিখ্যাত মসলিন।

প্রাচীন ইতিহাসকার লিখছেন : 'পূর্বে ঢাকা অঞ্চলে যে তুলো হইত তার আঁশ দীর্ঘ, সূক্ষ্ম ও কোমল হইত। উত্তম কার্পাস উৎপন্ন হইত বলিয়া ঢাকার সেই অঞ্চলের নাম ছিল কাপাসিয়া।'

এই কাপাসিয়ার তুলোর ইতিবৃত্ত শুধু যে বাংলার ইতিহাসে লেখা আছে তা নয়—গবেষকদের অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেছে, পালি ভাষায় লেখা এক পাণ্ডুলিপিতেও কোন সুপ্রাচীনকালের লেখক লিখেছেন ঢাকার বস্ত্রশিল্পের খ্যাতির ইতিহাস।

নিষিদ্ধ দেশ তিব্বতের এক অন্ধকার গুহার ভেতরে অনাদরে পড়েছিল এক পুথি। কষের কালিতে লেখা খুদি খুদি অক্ষর। পাঠোদ্ধার করে জানা গেল বইটির নাম 'দুবলা'। শুধু নাম নয়। আরও চমকপ্রদ ইতিহাস বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে মশালের মত জ্বলে উঠল। এই ঢাকা অঞ্চলের মসলিনের কদর ছিল সেই সুপ্রাচীনকাল থেকে। একবার কলিঙ্গরাজের কাছে দেখা করতে এলেন কোশলরাজ। রাজকীয় পরিদর্শন। রাজকীয় তার সমারোহ। অনেক লোকলস্কর, আলোর ঝলমলানি। কিন্তু সব কিছুকে বিস্ময়ে স্তব্ধ করে দিয়ে কলিঙ্গরাজ একটি বিচিত্র বস্ত্র উপঢৌকন দিলেন মাননীয় রাজ অতিথি কোশলরাজকে। একটি স্বর্ণখচিত সুদৃশ্য বাক্সের ভেতরে কি এমন বস্তু থাকতে পারে—এত হাল্কা—এত স্বচ্ছ।

—কি আছে এর ভেতরে ?

—খুলে দেখুন—

কলিঙ্গরাজের চোখে গর্বের দীপ্তি ঝিকমিক করে। কৌতূহলী কোশলরাজ খুললেন সেই সুদৃশ্য বাক্স। আর মুগ্ধ বিস্ময়ে চোখ দুটোর দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। প্রায় কাচের মত স্বচ্ছ আর আকাশের মত হাল্কা-নীল রঙের এক বস্ত্র।

—কি নাম এই কাপড়ের ?

—কোন্ শিল্পী তৈরি করেছেন ?

অনেক প্রশ্ন।

অনেক কৌতূহল।

বিপুল বিস্ময়।

কলিঙ্গরাজ একে একে সব বললেন।

বললেন সূক্ষ্ম মসলিনের ইতিবৃত্ত। কোশলরাজ শুনলেন। শুনলেন প্রত্যেকটি কথা। যেন ভাগবত পাঠ শুনছেন। আরও কত কাহিনী, কত উপাখ্যান—কত বিচিত্র কিংবদন্তী গভীর মমতার মত জড়ানো রয়েছে এই মসলিনের সঙ্গে। ঢাকার এই বিখ্যাত বস্ত্রের ইতিবৃত্তই একটি বিপুলাবয়ব গ্রন্থের উপকরণ হতে পারে।

মোগলযুগেই ঢাকার বস্ত্রশিল্পের বিপুল উন্নতি হয়েছিল। এই সময় মুগা ও রেশম মিশিয়ে প্রায় ত্রিশ প্রকার মিশ্রিত উপাদানের বস্ত্র তৈরি হতো। মুসলমানরা এদেশে এসেছিলেন। এসেছিলেন ইসলাম ধর্ম নিয়ে আর সঙ্গে ছিল যেমন লুণ্ঠনের লোলুপ উল্লাস তেমনি ছিল তাদের বিপুল ও বিস্ময়কর শিল্পপ্রতিভা।

PLATO
REGD.

ট্রেডমার্ক
সতর্কীকরণ নোটিশ

ফাউন্টেন পেন, নিব (ফাউন্টেন পেন), নিব (লিখবার), কালি, বল-পয়েন্ট পেন, রি-ফিল ও ঐ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরঞ্জাম সম্পর্কে প্লেটো আমার মক্কেল, মাত্রে পেন এণ্ড প্লাস্টিক ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড-এর (তুলসী পাইপ রোড, দাদর, বোম্বাই-২৮) রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক। রেজিষ্ট্রীকরণ ও দীর্ঘকাল যাবত ব্যাপক ও নিয়মিত ব্যবহারকরণের ফলে আমার মক্কেলগণ পূর্বোক্ত ট্রেডমার্ক সম্পর্কে একমাত্র স্বত্বাধিকার লাভ করিয়াছেন।

আমার মক্কেলগণ সন্ধান পাইয়াছেন যে তাহাদের সূত্রবহির্ভূত ও তাহাদের প্রস্তুত নহে এমন ফাউন্টেন পেন, নিব ও বল-পয়েন্ট পেন, এবং নিকৃষ্ট-ধরণের ঐ সকল দ্রব্য জাল প্লেটো ট্রেডমার্ক সহ অসাধু প্রস্তুতকারক, দোকানদার ও ফেরিওয়ালারা বিক্রয়ের জন্য বাজারে বাহির করিতেছে এবং নিরীহ খরিদ্দারগণ না জানিয়া ঐ সকল মালই আসল মনে করিয়া কিনিয়া লইতে প্ররোচিত হইতেছেন।

প্রস্তুতকারক, ব্যবসায়ী ও ফেরিওয়ালাদের এতদ্বারা সাবধান করা যাইতেছে যে যদি তাঁহারা জাল প্লেটো মার্ক সহ সকল মাল প্রস্তুত করেন, বিক্রয়ার্থ হাজির করেন, বিক্রয় করেন বা অন্য কোন প্রকারে ঐরূপ সকল মালের ব্যবসা চালান, তবে আমার মক্কেলগণ ঐ সকল অপরাধের জন্য তাহাদিগকে আইনতঃ অভিযুক্ত করিবেন এবং ঐ সম্পর্কে অন্যান্য উপযুক্ত আইনসঙ্গত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

সৎ ব্যবসায়ী ও খরিদ্দারগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে তাঁহারা যেন আমার মক্কেলগণকে ঐ সকল অসাধু প্রস্তুতকারক ও ব্যবসায়ীগণের নাম ও ঠিকানা জানাইয়া দিয়া এ বিষয়ে পরিপূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সারভ্যান্টস অফ ইণ্ডিয়া
সোসাইটি বিল্ডিং,
এস. ভি. পি. রোড, বোম্বাই-৪।

ডব্লিউ এস কানে, এডভোকেট,
মাত্রে পেন এণ্ড প্লাস্টিক ইণ্ডাস্ট্রিজ
প্রাইভেট লিমিটেড-এর তরফে।

তাঁরাই বঙ্গদেশে সূচীশিল্পের প্রভূত উন্নতি করেছিলেন।

গৌড়ে ছিল তাদের শাসনকেন্দ্র। এই গৌড় থেকেই বিচিত্র বয়নপ্রণালী ঢাকা এবং বাংলা দেশের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। মালদহের এলাচি কাপড়ের খ্যাতি ছিল দেশ-দেশান্তরে। কে না জানতো মশরুত কাপড়ের নাম। এলাচি কাপড় ছিল দুই পিঠ সমান। কোনদিক সোজা আর কোনদিক উল্টো, তা বুঝতে পারা যেত না। এই এলাচি আর মশরুত কাপড় সেদিন ছিল গৌড়বঙ্গের গৌরব।

এইখানেই পাঠকদের মনে একটা প্রশ্ন আসা খুব স্বাভাবিক। কবে—কখন সূচিশিল্পের উদ্ভব হয়েছিল আমাদের এই বঙ্গদেশে। এই সম্বন্ধে অনেক মতামত আছে। কেউ কেউ বলেন—সূক্ষ্ম সূচিশিল্পের প্রবর্তন হয় মিশরে। নবম শতাব্দীতে মিশর, আরব আর গ্রীসের সঙ্গে আমাদের এই বাংলা দেশের ব্যবসার সম্বন্ধ ছিল। সেই ব্যবসায়িক আদান-প্রদানের আড়ালে আড়ালে সামাজিক রীতিনীতি শিল্প-সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগও হয়েছিল। তার ফলেই বাংলা দেশে সূচিশিল্পের চলন হয়েছিল। কিন্তু—

কিন্তু এই সিদ্ধান্তকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় না। মুসলমান-যুগের বহু—বহু পূর্বে তন্তুবায়শ্রেণীর মানুষ ক্ষার জলে সুতো ধুয়ে নিয়ে রোদে শুকিয়ে নিত। তারপরে—তারপরে তাঁতে চড়িয়ে দিত সেই সুতো। আরও—আরও আছে। প্রাচীন শাস্ত্রে পুরানোকালের ইতিহাসে ছড়ানো রয়েছে বাংলা দেশের বয়নশিল্পের আদি ইতিহাস।

শুধু যে কলিঙ্গরাজ কোশলরাজকে দিয়েছিলেন এই বিখ্যাত আর সুদৃশ্য বস্ত্র তা নয়, প্রাচীন ইতিহাসের পাতায় আজও জ্বলজ্বল করছে আরও অনেক বিচিত্র কাহিনী।

বিখ্যাত ভ্রমণকারী ইবনবতুতাও প্রশংসা করেছিলেন এই সুদৃশ্য বস্ত্রের। বতুতা লিখেছেন: 'একটি দীনারে' অর্থাৎ এক টাকায় আটটি করিয়া হাঁস, মুরগী ও পনেরটি করিয়া পায়রা পাওয়া যায়। একটি স্থূলকায় ভেড়ার মূল্য দুই দীনার।'

আরও বলেছেন—সূক্ষ্ম কার্পাসে প্রস্তুত উত্তম বস্ত্রের ত্রিশ হাত, দুই দীনার মূল্যে বিক্রি হ'ত দেখেছি—। তারপর বাংলা দেশের বাণিজ্যের ইতিহাস বলতে গিয়ে স্পষ্ট উক্তি করেছেন—সাতগাঁও অতি প্রকাণ্ড নগর। এখানে গঙ্গার ওপর বাঙালীর বহু বাণিজ্যতরী জাতির সমৃদ্ধি ঘোষণা করতো।

ইবনবতুতা সেই প্রাচীনকালের বঙ্গদেশের (বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম) দিকে দিকে খুব ভাল করে ভ্রমণ করেছিলেন। ব্রহ্মপুত্রকে বলেছেন, জাতির জীবনসরণি। এই ব্রহ্মপুত্রের বিশাল জলরাশি পাড়ি দিয়ে বড় বড় বাণিজ্যতরী দেশ-দেশান্তরে চলে যেত। এই ব্রহ্মপুত্রকে ইবনবতুতা নীলনদের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

এই অস্বচ্ছ, সূক্ষ্ম মসলিনকে কেন্দ্র করে এক রোমাঞ্চকর কাহিনী মুখর হয়ে ওঠে—

এক দরিদ্র ভিক্ষুণী। পরনে সন্ন্যাসিনীর পোষাক। সারা মুখে তপশ্চর্যার জ্যোতি জ্বলজ্বল করছে। গঙ্গার ঘাট থেকে স্নান সমাপন করে ধীর পদক্ষেপে উঠে আসছিল রাজপথে।

রাজপথে পা দিতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ভিক্ষুণী। এক সুবর্ণ শ্রেষ্ঠীর নন্দিনী চারদিক আলো করে স্নানযাত্রাতে চলেছেন গঙ্গার দিকে। কিন্তু তার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল—নিতে হলো ভিক্ষুণীকে। ছিঃ ছিঃ এ কী বস্ত্র পরিধান করেছে অতবড় স্বনামধন্য শ্রেষ্ঠীর দুলালী। কাকচক্ষু জলের মত স্বচ্ছ সুদৃশ্য শাড়ির আড়ালে যৌবনভারে পুষ্ট বরতনুর ছায়াময় আভাস স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেন ছায়া ছায়া বড় জলের নিচে দেহলতা তরল অগ্নিধারার মত জ্বলছে। ওই আশ্চর্য রঙের শাড়ির জন্যই শ্রেষ্ঠীকন্যা বিচিত্র রূপে রূপবতী হয়ে উঠেছে।

ভিক্ষুণী সন্ন্যাসিনী। কিন্তু তার মনের অন্ধকারে একটা দৈত্য মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। লোভের দৈত্য। যৌবনের দৈত্য। সে-ও তো তরুণী। সন্ন্যাস নিলে কি হবে ? মনের কোণায় কোণায় বিষধর এক-একটা সাপের মত কত বাসনা আর কামনা যে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। এক এক সময় ওরা ফণা তুলে গর্জে ওঠে। বিষ উগ্রাড় করে ঢেলে দিয়ে কি এক মর্মান্তিক আক্রোশে ফোঁস ফোঁস করে। তখন যন্ত্রণায় মাথার ভেতরটা জ্বলে যায়। মরতে ইচ্ছে করে। কিন্তু—

মৃত্যু। মৃত্যু যে মনের কোথাও বাসা বাঁধে নি। জানে পাপ। তবুও সেই সুবর্ণ-শ্রেষ্ঠীর কাছে গিয়ে তরুণী ভিক্ষুণী প্রার্থনা করল মসলিনের শাড়ি। শ্রেষ্ঠীর বদান্যতার খ্যাতি ছিল। পুণ্যবতী ভিক্ষুণী এসেছেন। তাঁকে ফিরিয়ে দেবেন কি করে।

দান করলেন মসলিনের সুদৃশ্য সেই বস্ত্রসম্ভার।

তরুণী ভিক্ষুণীর চোখ দুটো লোভের আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বেশ পরিপাটি করে তার তন্বী দেহ পেঁচিয়ে পরল সেই শাড়ি। আয়নায় নিজের বিচিত্র রূপের দিকে তাকিয়ে নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেল। অদ্ভুত একটা নেশার মত আবেশে তার চেতনা কেমন আচ্ছন্ন হয়ে এল। কিন্তু—

মঠের প্রধান শ্রমণের চোখে পড়ল, ভিক্ষুণীর পরিধানে সেই লজ্জাজনক শাড়ি।

—থামো—কোথায় যাচ্ছো ?

—কেন মঠে ?

—না।

—কেন ?

—শীঘ্র পরিত্যাগ করো—পরিত্যাগ করো এই শাড়ি।

ভিক্ষুণীর মুখখানা করুণ হয়ে এল। চোখ দুটো ফেটে জল এসে পড়ল। আর তীক্ষ্ণ ও তীব্র যন্ত্রণায় এঁকে বেঁকে দুমড়ে গেল তার মুখখানা। নিঃশব্দে মঠের ভেতরে নিজের কক্ষে গিয়ে পরিধেয় পরিবর্তন করল, আর—

আর প্রধান শ্রমণ ঘোষণা করে দিলেন গ্রামে গ্রামান্তরে—কোন ভিক্ষুণীর পরিধানে যেন কখনো এই স্বচ্ছ সুদৃশ্য মসলিন বস্ত্র না দেখা যায়—

এই কঠোর ঘোষণার আড়ালে যেমন মসলিনের খ্যাতির সৌরভ আরও দিকদিগন্তে ছড়িয়ে পড়ল তেমনি ভিক্ষুণীর মত আরও কত যৌবনবতী ভিক্ষুণীর চোখের জলের গোপন ইতিহাস নিঃশব্দে জমাট হয়ে রইল সেই দূর অতীতকালের বিস্মৃতির অন্ধকারে। (ক্রমশঃ)

আঁধার মানিক

ধারাবাহিক উপন্যাস

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ ত্রিংশ ॥

আঁধারমাণিক গ্রামের আকাশে-বাতাসে কান্না ছড়িয়ে পড়ল।

বুকফাটা হাহাকারের কান্না নয়। চাপা গলার বোবা কান্না। রাতের আঁধারে সে কান্না বিল্বাসিনী মন্দির-তলায় শোনা গেল, গ্রামের লোক সভয়ে বললে, 'শ্মশানের কান্না, গ্রামে কি মড়ক লাগবে তবে?'

দুপুরে সে কান্না আচার্যদের নেড়া মাঠে, আচার্য পুকুরের পাড়ে, প্রান্তরে, অর্জুনগাছের ছায়ায়, মন্দিরে, দেবালয়ে ধ্বনিত হয়।

শেষ রাতে সে কান্না গৃহস্থের বাড়ির আনাচে-কানাচে শোনা যায়।

'কে কাঁদে, কে কাঁদে?'

সবাই প্রশ্ন করে। উত্তর কারো কাছে নেই। এ ওকে জিজ্ঞাসা করে, জবাব পায় না।

'তবে কি মড়ক হবে, না দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, না কি অতি বর্ষণে বন্যা', সবাই কাতর হয়।

'চল দেখে আসি মা কি মন্দিরে মুখ ফিরিয়েছেন?' প্রাজ্ঞজনরা এ-কথা বলেন। তাঁরা শুনেছেন দুর্দিনে, অশুভলগ্নে, প্রলয়ের প্রতিপদ তিথিতে এ-গ্রামের রক্ষয়িত্রী শ্মশানতলার দেবী বিল্বাসিনী মুখ ফিরিয়ে নেন।

আনন্দীরামের যে বৃদ্ধ পূর্বপুরুষের খড়ম, নামাবলী ও উপবীত মুখোটি-বাড়ির ঠাকুরঘরে শোভা পায় তিনি দেখেছিলেন। সুদূর অতীতে তিনি শ্মশানতলা দিয়ে কি কাজে যাচ্ছিলেন। এমনই বর্ষার প্রায়াহ্ন। আকাশ মেঘে মেঘে ভরা। তিনি ধীরে ধীরে যাচ্ছিলেন, 'কৃষ্ণ'নাম গাইছিলেন, হাতে লাঠি ছিল।

তখন তাঁর মন্দিরে যেতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু মন্দিরের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলেন কালো পাথরের মুখখানি পেছনে ঘোরানো। দেবী পাশ ফিরে বসেছেন, গাল বেয়ে জল পড়ছে। দেখে তিনি চেঁচিয়ে ওঠেন।

পুরোহিত এসে দেখেন না, প্রাতে যেমন তাই আছে, 'যান, আপনি ঘরে যান।' তিনি বৃদ্ধকে পাঠিয়ে দেন। তিনি সেখান থেকে আটচালায় আসেন। বলেন 'সাবধান।'

সেই শেষ। এখন বড় আচার্য বলেন, 'কে আর দেখবে বল। এ কলিকালে কার আর সে সুকৃতি আছে।'

'আমরা দেখব, আমরা যাব।' কাওরা, বাগদী, কেওট, অন্য জাতির কলরব ক'রে বললে। তারা সব কিছুই বিশ্বাস করে। সব তাতে উৎসাহ দেখায়। এখন, অশুভ কান্না শুনে সভয়ে তারা বললে, 'আমরা যাব। দেখব মায়ের মুখ কোন দিকে।'

'কেন, কি দেখতে যাবি? মায়ের মুখ ফেরানো থাকলেই বা।'

নরপতি মিশ্রের কথা শুনে সবাই চমকে উঠল। রামাই বাগদী বুড়ো আঙুলে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে বললে,

'কেবল বিশেষ বলে মস্ত হয়, অজন্মা, আমরা ভাবতে পারি এমন রাতেভিতে বীর দেব।'

'মানুষের কান্না কে বলেছে?'

'মানুষ কেন, মানুষ অমন কাঁদে না কি?'

নরপতি মিশ্র বাড়ির পেছনের লঙ্কাক্ষেতে কোদাল দিচ্ছিল। সে দীর্ঘ শরীরটি সোজা করে বলে, 'তো বেটারা আজগবী কথা গিলবি বলে হাঁ করে আছিস। বড় আচাৰি বলে দিলে অমনি দেখতে যাচ্ছিস দেবতার মুখ কোনদিকে। কেন যাচ্ছিস? না যখন দেবতার মুখ দেখবি পেছন পানে তখনি বুঝবি সামনে অমঙ্গল, তার আগে বুঝবি না।'

সে এগিয়ে এসে সামাই বাগদীর নাকের ওপর মাটিমাখা হাতখানা নাচিয়ে বললে, 'যদি দেখিস যেমন ঠাকুর তেমনি আছে, তবে?'

সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

'তবে কি, মশায়রা, ধরে নিতে হবে সবাই পরম সুখে আছে? বিপদ নেই কোথাও।'

'এরা আপনার কথা কিছুই বুঝছে না,' কাশীশুর ধীরকণ্ঠে বলে। সে পেছনে দাঁড়িয়ে কথা শুনছিল।

'তুমি বুঝেছ? বলি বাচস্পতির পো, তুমি বুঝেছ?'

'একটু একটু।'

'তবে যাও, বুঝিয়ে দাও যেয়ে তোমার বাপের ঠাকুরদের সর্বনাশের বাকি নেই কিছু। আশ্চর্য অজন্মবৃদ্ধি ঘটে না হোক, এদিকে বর্গী এসে গ্রাম ছারেখারে দিল, বাড়ে বন্ধে হাহাকার, নবাব করতে পারছে না কিছু।'

রাগে অধীর হয়ে নরপতি মাথার চুলে হাতের কাদা মোছে। চেঁচিয়ে বলে, 'তোদেরও বুঝতে বলি বেটারা, বর্গী এসে ধান গোলা লুঠলে, গাঁয়ে গাঁয়ে এক হাল, অজন্মা হবে, চুরি ডাকাতি করে মানুষ প্রাণ বাঁচাবে, অবাধ্য ছেলের মতন হবে, এর সবাই ত' হয়েছে। এবে দাঁড়িয়ে রূগে আছে কোথা? ঠাকুর মুখ ফেরাবে, তবে হবে। বেদ ঠাকুরের প্রাণ তো বেটাদের জন্যে কতই কাঁদছে।'

'কিন্তু কান্নাটার কি হবে ঠাকুর?'

নরপতি মিশ্র আরেকদফা গালা-গালি দেয় সবাইকে। এ গ্রামের মানুষরা অশস্য অন্ধ, সবাই বোকা, সবাই কানা। আরো অনেক বাছাই করা বিশেষণ ব্যবহার করে নরপতি। শেষে বলে, 'মতি কেওরাণীর খবর নিয়েছ কেউ? বাপ সকল?'

মতি কেওরাণী।

সবাই সবাইয়ের মুখের দিকে চায়। মতি কেওরাণী প্রৌঢ় বয়সে উন্মাদ। অসুখ বাড়িয়ে তাকে পাগল করে দিয়ে স্বামী তার ধানাবাটি কেড়ে নেয় ও আর একটি মেয়েকে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। মতি কেওরাণীকে সবাই মিলে গ্রামের উপান্তে ঘর তুলে দিয়েছে, তার ঘরে পালা করে একেকজন ভাত দিয়ে আসে। গ্রামসমাজে, আটচালার এই নিয়মটি সুকঠোর। বৃদ্ধ, রুগ্ন, উন্মাদ, অশক্ত, অক্ষমকে এক মুঠো অন্ন, একখানা বস্ত্র জোগাতেই হবে। মতি কেওরাণী ঐভাবে কাঁদে বটে।

'তা হলে মতিদিদি কাঁদে।'

'হ্যাঁ, ওনার কান্না ঐ রকম বটে, মুখে অন্য ভাষা নেই।'

নরপতি মিশ্র বলে, 'তাকে খেতে দিয়া নি কেউ আর কদিন যায়, তাই বেচারা পেটের জ্বালায় কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে। মানুষের সামনে আসতে ভয় পায়, জীবজন্তুর সামিল, ও কি আর মানুষ আছে?'

কেওরাদের দিকে চেয়ে বলে, 'তোরাও মানুষ নোস্। একদিন খোঁজ নিতে গেলি না তর।'

'পাপ হয়ে গেল,' একজন সরল অনুতাপে বলে।

'তা হল।'

'এখন কি করব।'

'তাকে নিয়ে আয় খুঁজে। খেতে-টেতে দিগে যা।'

সবাই চলে গেলেও কাশীশুর যায় না। সে অদূরে গাছের গায়ে হেলান দেয়, অলসদৃষ্টিতে নরপতির কুটির, সব্জীক্ষেত দেখে। নরপতির অস্বস্তি হয়। বিব্রত সঙ্কোচ ঢাকবার জন্যে সে জোরে জোরে মাটি কোপায়। তারপর মুখ তুলে বলে, 'কি ব্যাপার, আমার ঘরে তোমার পায়ের ধুলো কেন, অ্যাঁ? বামুনের পায়ের ধুলো? আমি এখন আর তোমাদের কেউ নই। ঐ ধর্মপুজোর বামুন, পঞ্চানন্দ পুজোর বামুন, যে পুজোয় বামুন লাগে না আমি সেই ঠাকুর পুজি, এ মজা মন্দ নয়, কি বল কাশী।'

নরপতি ভকলো এবং শূন্য হাসি হাসে।

কাশীশুর নিরুত্তর।

'ব্যাপারটা কি?'

নরপতি ধীরে বলে, কোদাল পাশে রাখে। এখন সে দুর্বল, বড় দুর্বল। যে মানুষ আনন্দীরামকে অপমান করে বিদায় দিয়েছিল, বড় আচার্যকে পাঁচ-জনের সামনে অপদস্থ করেছিল নরপতি সে মানুষ নয়। বড় দুর্বল সে, কাশীশুরকে তার ভয় করে।

'কথা বলতে হলে বল কাশী, আমার কাজ আছে।'

কাশীশুর নিরুত্তর।

'বলতে হলে বল, নয় যেথায় খুশি যাও, তুমি ভেবেছ কি। আমার বোন মরতে কেউ কাঁধ দেয় নি, কাঁধ দিয়েছিলে বলে কি তুমি আমার মাথা কিনে নিয়েছ?'

নরপতি আবোল-তাবোল বকে হাল্কা হতে চায়।

'মতি কেওরাণী পুরনারা গেলেও কান্না থামবে না নরপতিদাদা।' কাশীশুর সহসা বলে।

'তার মানে?'

'মানে তুমি জান। আনন্দীদাদার বাড়িতে কান্না, ছোট বউঠানের বাপের বাড়ির গ্রামে সবাই মরেছে। মরার ওপর হাত নেই কারো, ও কান্না একদিন আপনা হতে থামবে। কিন্তু, যত

আচার্যির মেয়ে নির্মলির কান্না থামবে না, আরো কতজন কাঁদবে এখন, বর্গীরা থাকতে এসেছে, যেতে আসে নি। এখন মেয়েছেলের চোখের জল শুকোবে না, আর নরপতিদাদা, যে ঘরে মেয়েছেলে মনের দুঃখে কাঁদে সে পরিবারের অমঙ্গল হয়। তবে গ্রামের কেন ভাল হবে বল, গ্রামের ভাল হবে না, দেশের ভাল হবে না, কারো ভাল হবে না।'

রেগে সোজা হয়ে দাঁড়ায় কাশীশুর। বলে, 'নিজের বোনকে কি ফিরে পেলে? পরের বিদুষী মেয়ের নামে কলঙ্ক দিলে যে?'

নরপতি যেন এই ভয়ই করছিল। সে জবাব দিতে পারে না কিছু। সে অবহেলিত, অত্যাচারিত, এ জন্যে কাশীশুরের বেশ খানিকটা সহানুভূতি তার ওপর ছিল। এখন সেটি নিমেষে খোয়া গেল। কাশীশুর বয়সে তরুণ। স্বভাবে নির্ভীক, দয়ালু, পরদুঃখকাতর। এ নিষ্পাপ বালক তার ওপর বিশ্বাস হারিয়েছে এ দুঃখ নরপতিকে কাতর করে।

এই কাতর, পরনিমেষে সে পাথর হয়।

'কাশীশুর, তুমি বালক, তাই চেয়ে দেখতে জান না, অন্যায় সকলে সকলের ওপর করে। নির্দোষী রেহাই পায় না কোথাও। অন্যায় দেখলে আমার মাথার ঠিক থাকে না তাই সইতে পারি না।'

'তাই নিজেও অন্যায় করে বসলে, কেমন?'

'ঐ অন্যায়টুকু না করলে বড়-আচার্যের দাপ কমত না; বুঝলে কাশী? মেয়েকে দিয়ে ওকে শাস্তি দিলাম, এর নাম বিষে বিষ ক্ষয়।' বলতে বলতে নরপতির গলা মিইয়ে যায়। সে বুঝতে পারে কথাটি ঠিক প্রয়োগ করা হয় নি, একে বিষে বিষক্ষয় বলে না।

'ভাল লাগে না আমার কিছু। এ-গ্রামে সবাই এক এক জাতের মানুষ। কেউ নেই তিনকুলে তাই মাটি কামড়ে পড়ে আছি। সমান, সবাই সমান।'

বলতে বলতে কাশী উঠে চলে যায়।

সুবকণ্ঠের গুরুদেব মুর্শিদাবাদে ভাগীরথীর জলে যে কান্না শুনেছিলেন তাই যেন ছড়িয়ে পড়ল ক্রমে, গ্রাম হতে গ্রামে, উত্তরে দক্ষিণে, পুবে পশ্চিমে।

আঁধারমাণিক গ্রামে মুখোটি-বাড়িতে ছোটবউ কুন্দ কাঁদলে বর্গীর হাতে সবাই মরেছে বলে। তাকে কোলে টানলেন বিশালাক্ষী।

'ছোট, পাগল হয়েছে শোকে, পার ত'শান্ত কর' বলে বউকে তাঁর হাতে সঁপে দিয়ে আনন্দীরাম ওপরে গেলেন।

সেখানে, বিশালাক্ষীর শোবার ঘরে খাটের বাজু ধরে ফুলেশ্বরী কতই কাঁদলেন। বললেন, 'তোমার জন্যে আমার এত দুঃখ সওয়া। কে না জানে সুরকণ্ঠ রায় পাগল বললেই হয়।'

'তবে তার ভরসায় এলে কেন ফুলি?' ফুলেশ্বরী প্রথমা, প্রথম ভালবাসা, আনন্দীরাম তাঁকে মাঝে মাঝে 'ফুলি' নামে ডাকতেন, এখন আবার সে ডাক মনে এল।

'তার ভরসায় আসি নি। আমি এসেছিলাম তোমার সঙ্গে দেখা করব বলে, এমন সর্বনাশ হবে তা জানি না, মা গো, বর্গীর বাস কোন দেশে, জীবনে নাম জানি না।' ফুলেশ্বরী কান্নায়জ্ঞানহীন আদুরে নাবালিকার মত গা দুলিয়ে বলেন।

'আমাকে জানালে আমি আপনা হতে কাশিমবাজারে যাই, তোমায় নিয়ে আসি।'

এ-কথা বলে আনন্দীরাম নিঃশ্বাস ফেলেন। সম্ভব হত না, সম্ভব হত না কিছুতে। ফুলেশ্বরী নিজেই আসতেন না হয়ত। কিন্তু, এই উদ্বেগ, এই ব্যাকুলতাও ত' সত্যি।

'বাবা আমাকে না দেখলে অস্থির হন, বিষ্ণু তাঁর চোখের মণি, আমি তাঁর এক সন্তান।' ফুলেশ্বরী এ-কথা বলে স্বামীর দিকে চা'ন।

'তাঁর দোহাই পাড়া কেন? তুমি যাবে বলে অস্থির হয়েছিলে তাই না চলে গেলে।'

'বাবা বলেন মেয়েকে কাছ ছাড়া করব না।'

'তবে তাঁর কাছেই থাকতে তুমি, এলে কেন?'

ফুলেশ্বরী নিরুত্তর।

'তুমি যা বলেছ হাবির কাছে, রাখির কাছে, শুনেছি আমি। অন্যায় আমা হতে হবে না বড়বউ।'

'বড়বউ' সম্বোধনে ফুলেশ্বরী কতই তটস্থ হ'ন। করুণস্বরে গুন্ গুন্ করে কাঁদেন। একদিন স্বামীর তাঁর ওপর কতই প্রীতি ছিল। এমন নির্মম ভাঙ্গা যে সব দিন নষ্ট ক'রে।

কিষান
লণ্ঠন
সর্বোৎকৃষ্ট
গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
ফোন-২২-৩৫৮০
২৩৩,ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১

'তুমি এখানে থাকতে চাও ত' বল, আমি নিজে গিয়ে বিষ্ণুকে নিয়ে আসব।'

ফুলেশ্বরী ঘাড় নাড়েন। আদরে আব্দারে তাঁর জীবন কেটেছে, জগৎপতি আচার্য বুঝতে দিয়েছেন এ পৃথিবী ফুলেশ্বরীর সুখভোগের জন্যেই তৈরি, সতীনের সঙ্গে থাকতে পারবেন না তিনি, সইতে পারবেন না অসচ্ছল সংসারের ক্লেশ। কাশিমবাজারে বাপের বাড়িতে তিনি বসে থাকেন, এক দাসী তাঁর চুল বাঁধে, একজন পায়ে আলতা পরায়। তাঁকে গল্পগাছা শোনাবে বলে বাবা দাম দিয়ে বাঁদী কিনে আনেন। তাঁর ঘরের মেঝেতে দশ-পঁচিশ, বাঘবন্দী খেলবার ছক আঁকা থাকে, ফুলেশ্বরীর যখন ইচ্ছে তখন খেলেন। ঝাঁপিতে, পেটারীতে থরে থরে থাকে ঢাকাই, মছলন্দ, উৎকৃষ্ট বালুচরী, দুধের ফেনার মত শুভ্র-সুকোমল শান্তিপুরী শাড়ি, তাঁর যখন যা মনে হয় তাই পরেন।

তা ছাড়া থরে থরে অলঙ্কার, চুল বাঁধবার বিচিত্র দড়ি, আরো কত শৌখিন অঙ্গসজ্জার উপকরণ। বাঁদীরা তাঁকে নানারকম উত্তেজক গল্পগাছা শোনায়, তারা শিখিয়ে দেয় কি ভাবে সুগন্ধি গরম জলে নাইতে হয়, কিসে রূপ উজ্জ্বল হয়।

'পারব না, আমি পারব না। তুমি আমার সঙ্গে চল। বাবা তোমায় রাজা করে রাখবেন। কাজ করতে চাও কাজ করবে, নইলে এমনিই থাকবে। যা আমার তাই তোমার, তুমি আমার সঙ্গে চল।'

যতক্ষণ ফুলেশ্বরী এ-সব কথা ভাবছিলেন ততক্ষণ তাঁর চোখে জল, পিঠে বেণী লুটোপুটি খায়, গলায় হাতে স্বর্ণাভরণ দোলে, সুঠাম সুন্দর গলা, কাঁধ, ঘামে চিকচিক করে, দেখতে ভাল লেগেছিল আনন্দীরামের।

এখন তিনি ঘৃণায় পাথর হন। নীরস, কঠোর কণ্ঠে বলেন, 'তবে যাও। এ বাড়ির দোর তোমার জন্যে খোলা থাকবে, বাবাকে কথা দিয়েছিলাম, যেদিন ভাল বুঝবে সেদিন আসবে। আমি তোমার সঙ্গে যাব না।'

'যাবে না?'

ফুলেশ্বরী বড়ই অবাক হন, 'আমি এলাম, তবু তুমি যাবে না? এত কলঙ্ক, এত অপমান সয়ে----'

'না, আমি যাব না।'

আনন্দীরাম বলেন, 'আমি তোমায় বিয়ে করেছি, তোমার সকল ভার আমার। তোমারও তেমনি কর্তব্য আছে। শুধু আমি নই, এ-সংসারের প্রতি তোমার কর্তব্য আছে। এদের প্রতি আমারও কর্তব্য আছে। কারুকে ছাড়তে পারব না আমি, ছোট, পিসীমা, মা, হাবি, রাবি, ছোটবউ, মুনিষ মাহিন্দার সকলের ভার আমার। তোমায় বড় উঁচুতে বসিয়েছিলাম বড়বউ, তুমি বিষ্ণুর মা, সবার ওপরে রেখেছিলাম তোমায়, কিন্তু আমি তোমার জন্যে সকলকে ছাড়তে পারব না বড়বউ, এতবড় কঠোর কথা বলতে আমার বুকে কি হচ্ছে তা ভগবান জানেন।'

বলতে বলতে আনন্দীরাম দেওয়ালের দিকে চান। আস্তর খসে এ দেওয়াল কতই জীর্ণ হয়েছে। তুলাদণ্ডে বেখে দেখছেন তিনি। একদিকে ফুলেশ্বরী, ভালবাসা, প্রেম, নিরুদ্বেগ জীবন। ফুলেশ্বরীর অবুঝ অভিমান ভুলিয়ে দিতে কি আনন্দ, বিষ্ণুর মুখের হাসি দেখে কত সুখ, জ্যোৎস্নারাতে তিনি ফুলেশ্বরীকে নিয়ে ছাতে গিয়ে লুকিয়ে গল্প করতেন, একবার ফুলেশ্বরীর অনুরোধে সুদূর বটপুকুরের পাড় থেকে চাঁপা ফুল এনে দিয়েছিলেন, প্রথম ভালবাসায় একটি বন্ধুত্বের ভাবও থাকে।

অন্যদিকে শুধু কর্তব্য, ঐ দেওয়ালের মত জীর্ণ, বিষণ্ণ, কাজে কোন আনন্দ নেই। কুন্দ বালিকা মাত্র, মা পিসীমা অবুঝ, মামা সহায় নন, বোঝা, জমিজমার আয় সামান্য, ছোট তাঁর মুখ চেয়ে বাঁচেন। কিন্তু পিতার মুখ মনে পড়ে। 'কর্তব্য ভুল না বাবা.' স্নেহময় কাতর কণ্ঠ। ছোটকে দেখতে বলে গেছেন তিনি, না না, কর্তব্য করতে সংসারে আসে মানুষ, তিনি সন্ন্যাসী নন, গৃহী। গৃহীকে কর্তব্য করতে হবে। তাঁর বংশে জন্মেছিলেন এক গৃহী সাধক। এখন কলিকাল, ধর্মের মাহাত্ম্য নেই। নাই বা থাকল, তা বলে কর্তব্যে বিমুখ হতে পারবেন না আনন্দীরাম।

'এই আমার শেষ কথা বড়বউ।'

আনন্দীরাম নিচে নেমে গেলেন। উদ্‌ভ্রান্তের মত বিষণ্ণচিত্তে চলে গেলেন বাইরে। বসে রইলেন কপালে হাত রেখে গাছতলার মাচায়।

সেখানেই এলেন মহীপতি আচার্য। তিনি এসেছেন, সঙ্গে থরে থরে খাদ্য-সম্ভার, পাইক পেয়াদা, এ-সংবাদ গ্রামে দাবানলের মত নিমেষে ছড়াল।

মহীপতি কি আশ্চর্য, বড় আচার্য এবং আর সকলের সনির্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করে উঠলেন স্বরকণ্ঠের ভাঙা বাড়িতে। নিজে এলেন মুখোটিবাড়ি। বললেন, 'তোমার ছোট মা-কে বল আনন্দীরাম, তিনি বেহান হন, এখানে দুটি প্রসাদ পাব, এখন নাতি হয়েছে আমাদের, বিপৎকালে মেয়ের ঘরে অন্ন খেলে দোষ নেই, কি বল।'

নিজের আনন্দে আরো কথা বললেন মহীপতি। তাঁকে বসবার আসন দেওয়া হয়, সবাই অভ্যর্থনা জানালে। অন্দরে গিয়ে বসে মহীপতি দরজার আড়ালে বিশালাক্ষীকে লক্ষ্য করে কত কথাই বলতে লাগলেন আনন্দে।

'স্বরকণ্ঠ আমায় যখন বললে বুনি এখানে, আপনার কাছে, তখন বড় আনন্দ হল আমার। নইলে কি এতকাল বাদে এ গ্রামে পা দিই। আপনার কাছে চলে এসেছে, ওর যে আপনা থেকে এ শুভবুদ্ধি হয়েছে তাতে আমি বড় খুশি হয়েছি। দাদা ভাবেন মেয়েকে সুখে রেখেছেন। ওর সুখ এ বাড়ির মাটিতে, তা দাদা বোঝেন কই।'

আরো অনেক কথা বললেন তিনি। এখন আর অপেক্ষা করবার সময় নেই। সত্বর ফিরে যেতে হবে, যাবার আগে অবশ্য আনন্দীরামের সঙ্গে পরামর্শ আছে। 'জামাতা পুত্র বটে, মা কি বলেন?'

মহীপতির কথা শুনে আনন্দীর মামা বললেন, 'তা বটে, তা বটে।'

বিশালাক্ষী ব্যস্ত হয়ে পড়লেন মেয়েদের নিয়ে, বউকে নিয়ে মহীপতির পরিচর্যার কাজে। আহার ও বিশ্রামের পর মহীপতি আনন্দীরামকে নিয়ে গেলেন নির্জনে, চৌবীঘরে।

'তুমি আমায় সাহায্য কর আনন্দীরাম,' এমন সহজ অধিকারবলে কথা বললেন, যেন আনন্দীরামের সঙ্গে আর কোন বিবাদ-বিরোধ নেই, ব্যবধান নেই কোন। আপনার জনকে গোপন কথা বলছেন, এমনি কথার সুর মহীপতির।

'চার হাজার টাকা এনেছিলাম আমি। টাকাটি তোমায় রাখতে হবে। এ টাকা সঙ্গে নিয়ে যেতে ভরসা পাই না আমি।'

আনন্দীরাম সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চান।

মহীপতি ধীরে ধীরে বলেন 'এ ছাড়াও টাকা আছে আমার সঙ্গে। সে নবাবকে দেয় টাকা, রাজধানীতে ফেরৎ নিয়ে যাব। বাপু হে, নবাব বিপন্ন জেনে আমাদের ব্যবসায়ীরা টাকাটা তুলে দিয়েছিল, তাদের কাছে নিয়ে যাব। কিন্তু এ চার হাজার আমার স্বোপার্জিত টাকা। এখন আমি সর্বসমেত চৌদ্দ হাজার টাকাই তোমার কাছে রাখি।'

'কোথায়?'

'লোহার পেটারী, তামার পাত মোড়া, তার মুখ ঝালাই করে বন্ধ করা। এ পেটারী মজা ইঁদারায় ফেল। তার মুখ ইট দিয়ে বন্ধ কর, কেউ জানবে না।'

'আমি ভরসা পাই না।'

'অতি সত্বর নিয়ে যাব আমি, তুমি ভাব কেন? এখন এ টাকা নিয়ে পথে বেরোন বড় বিপদের। খাদ্যসামগ্রী যা আছে, সব রাখ তুমি, ব্যবহার কর। রাহা খরচের সামান্য টাকা রাখব আমি, আর সব থাকবে এখানে। ঝাড়া হাত পা হ'লে চলে যেতে অসুবিধে হবে না আমার। অন্যথায় প্রাণ নিয়ে পৌঁছতে পারব কি না তাই জানি না।'

আবার তিনি বলতে সুরু করলেন কত আনন্দ হয়েছে তাঁর।

'দাদার আদরে মেয়ের সর্বনাশ হচ্ছিল, এ-কথা বলতে আমার আপত্তি নেই আনন্দীরাম। এখন তার সুবুদ্ধি হয়েছে এটি ভাল কথা। ভগবান করুন, তার এ সংসারে মতি থাকে।'

আরো কত কথা বলে যাচ্ছিলেন তিনি, আনন্দীরাম উত্তর দিলেন না কোন। সেই সন্ধ্যায়, গোপনে তাঁরা টাকার পেটি সাবধান করলেন, সকল কাজ সমাধা হল। সব কাজ শেষ হলে মহীপতি ভাইঝিকে ডাকালেন। বললেন 'বুনিকে ডাক আনন্দী, আশীর্বাদ ক'রে যাই।'

এখান আর ছলনা চলল না কোন। আনন্দীরাম নিরুত্তর, বিশালাক্ষী দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে রইলেন চুপ ক'রে। আনন্দীর পিসীমা ও মা একসঙ্গে কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে আনন্দীরাম বললেন, 'আপনাদের মেয়েকে, খুড়োমশায়, আপনি সঙ্গে নিয়ে যান।'

'সঙ্গে নিয়ে যাব।'

'হ্যাঁ, সে এখানে থাকবে না---'

দরজার আড়াল থেকে বিশালাক্ষী যেন সরে গেলেন, কাপড়ের খসখস শব্দ হল।

আনন্দীরাম মহীপতির দিকে চাইলেন। তাঁর চোখ বেদনায় বিমূঢ়, বিষণ্ণ। ধীরে বললেন, 'সে বলে এখানে সকলকে ত্যাগ করতে হবে, তার সঙ্গে যেতে হবে। নতুবা ছোটবউকে পাঠিয়ে দিতে হবে অন্যত্র। এর একটিও সম্ভব নয় আমার পক্ষে। তাই সে ফিরে যেতে চায়।'

'ফিরে যেতে চায়! তবে এল কেন?'

'খেয়াল হয়েছিল, এসেছিল। এসে বুঝল এ সংসারে মন বসবে না

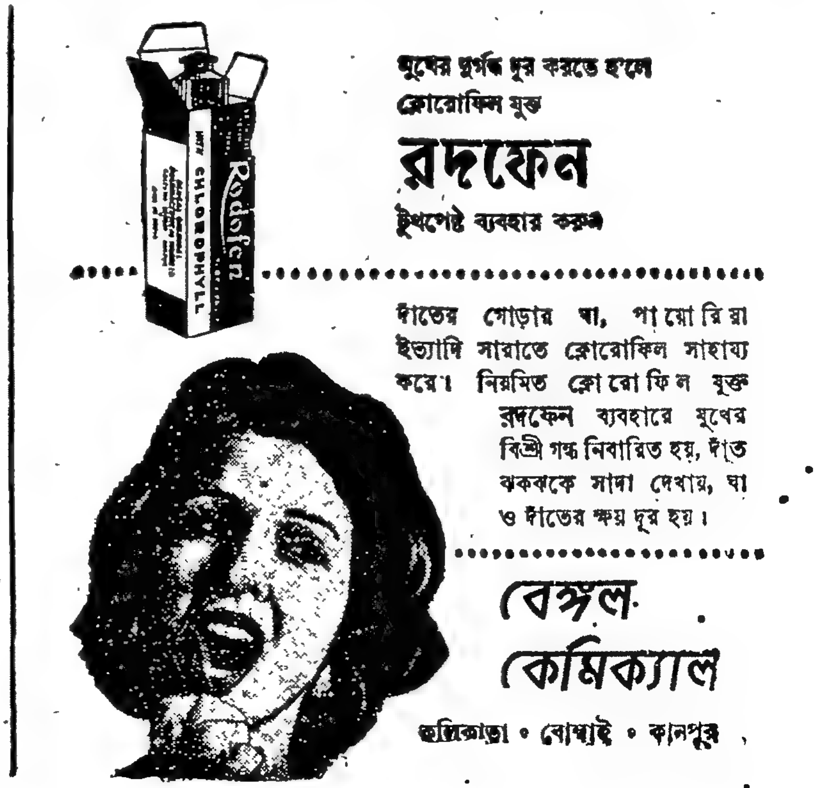

ভয়। এ দরিদ্র সংসার আপনাদের কাছে তুচ্ছ, আমার যা আছে এই সর্বস্ব,' বলতে বলতে আনন্দীরাম মুখ ফেরালেন। বললেন 'আপনি বড় দুঃখ পেলেন. আমায় ক্ষমা করবেন। আমি বড় নিরুপায়।'

মহীপতি কোন কথাই বলতে পারলেন না। তাঁদের চোখের অলক্ষ্যে কুলেশ্বরী ও আনন্দীরামের জীবন সুখের হচ্ছে, এতে তাঁর বড় আনন্দ হয়েছিল। মনে হয়েছিল হলে বা যুদ্ধবিগ্রহ, দেশজোড়া হাহাকার। তবু এইসব সুখ আনন্দ রচনা করে মানুষ যেন দেখিয়ে দেয় জীবন কত অপরাজেয়, এই সর্বনাশা প্রলয়ের শক্তি কত কম।

এখন সে আনন্দ নিমেষে নিরানন্দ হল। 'বেশ, আমি ওকে নিয়ে যাব দাদার কাছে,' বলতে বলতে মহীপতি বুঝলেন আসলে তাঁর ভেতরে প্রৌঢ়ত্ব এসে গেছে। তিনি ক্লান্ত।

আর কাঁদল আচার্যবাড়ির সকলে।

সমাজের বিধানে নিমলিকে গ্রাম ছেড়ে যেতে হবে। গ্রামে থাকতে হলে তপ্ত ঘৃত পান ক'রে পরীক্ষা দিতে হবে। 'ও পরীক্ষা দিলে এ যুগে স্বয়ং সীতাও বাঁচতেন না, তার চেয়ে নিমলি তুই প্রাণে বেঁচে থাক।' বড় আচার্যের স্ত্রী কেঁদে বললেন।

স্থির হল নিমলি নবদ্বীপ যাবে। সেখানে অনাথার ঠাঁই মেলে, তা ছাড়া সেখানে নিমলির মা-কে মানুষ করা এক বৃদ্ধা বৈষ্ণবী থাকেন। এখনকার মত, মনে হল সবায়ের, সেটিই নিরাপদ আশ্রয় নিমলির পক্ষে।

'কে তোকে নির্বাসনে দিতে যাবে মা গো?' বড় আচার্যের স্ত্রী কেঁদে বললেন। কে নিয়ে যাবে নির্মলাকে, এ বড় সমস্যা। অথচ সত্বর না পাঠালে নয়। তারপর এ বাড়িতে সকলকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, কেন না বাড়িতে আরো বিয়ের যোগ্য মেয়ে আছে, অন্নপ্রাশন, কর্ণবেধ, উপনয়ন, বিয়ে, শ্রাদ্ধ, সমাজের সব কাজই করতে হবে। তাই তাড়াতাড়ি বিদায় করে দিতে হবে নির্মলাকে। ভুলে যেতে হবে এ নামে এ বাড়িতে কোন মেয়ে ছিল, আর পাঁচটির মত সে-ও ব্রাহ্মণ সংসারে, গৃহস্থ বাড়িতে, সুখে আদরে, ব্রতপুজায়, নিরুদ্বেগ প্রসন্ন জীবন কাটিয়ে ছিল।

'কেমন করে ভুলব মা গো,' মেয়ের সৎ-মা কাঁদলেন কপালে হাত চাপড়ে। 'খিদে পেলে চেয়ে খেতে জানে না, এখন বাস হবে নবদ্বীপে, জীবিকা হবে ভিক্ষে, ভগবান, আমায় নাও না কেন, আমি কেমন করে সইব।'

মেয়ের বাবা শোকের অশ্রু মুছে স্ত্রীকে ধরে তুললেন। বললেন, 'তোমার মুখ চেয়ে আরো পাঁচজন আছে, তাদের কথা মনে কর।'

নির্মলা গোয়ালের পাশের চালায়, এ-ক'দিন বড় দুঃখে চোখের জল ফেলেছে। এখন সে-ই বললে, 'মা, আমায় আপনি পাঠিয়ে দিন। আমি আর থাকব না।'

'মা অমন করে বল না মা। তুমি বেড়াতে যাবে মা, নবদ্বীপে আমার মাসীর কাছে ঘুরে আসবে মা,' কিছুতে রূঢ় সত্য বলতে পারলেন না মা, চোখ মুছে ফিরে এলেন।

এমন সময়ে তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালে কাশীশ্বর। প্রণাম করে শুকনো গলায় বললে, 'আমি নিয়ে যাব নিমলিকে। এ-কথা বলতে ওই, আনন্দীদাদার মা এসেছেন।'

বিশালাক্ষী বললেন, 'নিমলি আমার দাদার কাছে যাবে। দাদা এখন নবদ্বীপে আছেন।'

(ক্রমশঃ)

নির্বিকল্প

সন্দীপকুমার সেনগুপ্ত

যে মনের সাথী বাতাসটা বিহ্বল,
কুষ্ঠীতে তার সখ্যতা লেখা নাই;
প্রচার চায় না, গড়িমসি করে, খল,
আছে এক রোগ, সৃজন যন্ত্রণাই।

সাথীরা যে নয় স্বজন সে-সব জানা।
অলিখিত মত : ভরসায় ভরপুর ;
আণবিক বোমা করে নি হরিণ-কানা,
লোভেতে এখনও লালা ঝরে চক্ষুর।

রাজার বাজারে রাণীরা কী আকছার
পারিপাটি হ'য়ে বেসাতি সাজায় হেসে।
খল তবে যাই নিরুদ্বেগের বেশে,
হিসেবী কাহন দিয়ে আসি গুণাগার।

ভাল নয় জানি ভাবনাকে ভালবাসা,
প্রাণটুকু ছাড়া ধড়টুকু যত খাসা।

সমুদ্রের নামে

বরুণ মজুমদার

রাতের প্রহর শেষে এই অবেলায়
কেন রে সমুদ্র তুই ডাকিস আমায়?
জেলের ডিঙিতে বসে শুধু সারাদিন
ওপারেতে দেখে যাবো স্তব্ধ তপোবন।

ঘাসের প্রান্তরে আমি সব দুঃখ ভুলে
একাকী থাকবো বসে বিকাল বেলায়।
পরিচিত শতাব্দীর জরাজীর্ণ দেহে
এঁকে দেবো নিরজনে স্নেহের প্রলেপ।

এখনো দ্যাখ রে চেয়ে সূর্য নিভে গেছে
বৃক্ষের কোটরে বসে ডাকে কালপেঁচা।
মানুষ তবুও দেবতাকে ভালবাসে,
মন্দিরেতে রাখে তার পুরাতন স্মৃতি।

ঘুম থেকে উঠে কিছু মুখে না দিয়েই বিজয় ঝিলের দিকে হাঁটতে শুরু করল। সকালের শীতের রোদে চারদিক ছেয়ে গেছে। কিছু লোকজন বসে বসে রোদ পোহাচ্ছে। দু'টো একটা নতুন বাড়ি উঠেছে এদিকটায়। সামনের বাড়িটার বাগানে নানারঙের গোলাপ সূর্যের দিকে চোখ মেলে হাসছে।

কিন্তু ফুলের দিকে তাকাবার সময় এখন নয়।

বিজয় ভাবল, একটু আগেই পৌছোনো দরকার। নইলে উৎপলার বুড়ো জেঠামশাই ওর পছন্দ করা জায়গায় গিয়ে ছিপ ফেলে বসে থাকবে। একবার বসলে কিছুতেই তাঁকে সরানো যাবে না।

ঝিলের ধারে এসে দেখল উৎপলার জেঠামশাই আগেই জায়গাটা দখল করে নিয়েছেন। একমনে তাকিয়ে আছেন জলের দিকে।

বিজয় টিফিনের বাক্সটা থেকে মশলা বের করল। পিঁপড়ের ডিম আর ভাত দিয়ে মাছের জন্য টোপ তৈরি করে সুতো জলের দিকে ছুঁড়ে দিল। প্রথমে কিছুটা মশলা জলে ফেলে দিয়ে চার তৈরি করে নিয়েছে।

সময় বহতা নদীর জলের মত চলে যাচ্ছে। সূর্য আরও একটু ওপরে উঠেছে। সামনের কাশের বনে কয়েকটা পাখি ডেকে ডেকে দূরে মিলিয়ে গেল।

তাড়াতাড়িতে কিছুই পেটে পড়ে নি। শ্রীঘৃতের কৌটায় রাখা পাঁউরুটির টুকরো মুখে দেবে মনে করে হাত দিয়ে সবে পাঁউরুটিটা ধরেছে, আর ঠিক তখনই জলের ওপর ফতনাটা নড়ে উঠেছে মনে হল।

রুটিটা মাটিতে গড়িয়ে পড়ল, জলের ওপর নজর রাখতে গিয়ে।

শিশুর মত দুষ্টুমি করে মাছ সরে পড়েছে। জলের ওপর সাদা ডেলার মত ভাসছে ফতনাটা।

বিজয় একবার রুটিটার দিকে তাকাল। কাদা লেগে গেছে, আর খাওয়া যাবে না। কষ্ট হল রুটিটার জন্য। তারপর একটা বিড়ি ধরিয়ে ভাবতে লাগল মাছের কথা।

দূরে একদল ছেলে-মেয়ে ফিস্ট করছে। রেকর্ডে গান হচ্ছিল, বিজয় ভাবছিল, আজ মাছ ধরা হয়েছে। শুধু অন্যমনস্ক করে দিচ্ছে। উৎপলার বুড়ো জেঠামশাই কিন্তু নির্বিকার। একদিন বিজয় বলেছিল, জেঠামশাই, সামনের রাস্তা দিয়ে শ্মশানের দিকে লোক নিয়ে যাচ্ছে। হরিবোল-হরিবোল করছে, আপনার অসুবিধে হয় না? একদৃষ্টিতে জলের দিকে চেয়ে থাকেন কি করে?

জেঠামশাই বলেছিলেন, আমরা সব বোল প্রুফ হয়ে গেছি। কানে ঢুকলেও মনে ঢোকে না। মনে শুধু এক চিন্তা কখন মাছ এসে টোপ গিলবে, বুঝলে বিজু। তারপর জলের দিকে চোখ রেখেই বলেছিলেন, তুমি হচ্ছ নতুন এ-পথে, একদিন আমাদের মতই সব বোল প্রুফ হয়ে যাবে। দৃষ্টি থাকবে শুধু জলের ওপর আর মনে ভাসবে একটি ছবি, মাছের পর মাছ এসে টোপ গিলছে।

রেকর্ডে কি একটা বিরহসঙ্গীত হচ্ছে। গানটা মনের মধ্যে কুরে কুরে খায়। বারবার উদাস করে তোলে। বিজয় মনে মনে বলল, এ ত' আচ্ছা জ্বালাতন দেখছি। জলের দিকে চোখ রাখব না মন দিয়ে গান শুনব?

হুইলের চাকা ঘোরানোর শব্দ হচ্ছিল। জেঠামশাইয়ের ছিপে কিছু বেঁধেছে মনে হচ্ছে।

মাছটা সুতো টানতে টানতে অনেক দূরে নিয়ে গেছে। জেঠামশাই সুতো ছাড়ছিলেন।

বিজয় বলল, বড় বলে মনে হচ্ছে।

—হুঁ। আর কোন শব্দ করলেন না জেঠামশাই।

মাছটা একবার এ-কোণে যাচ্ছে, আরেকবার ও-কোণে যাচ্ছে। একসময় ক্লান্ত হবে। তারপর বাধ্য হয়ে সুতোর সঙ্গে ভাসতে ভাসতে ডাঙার কাছে আসবে।

—বাছাধনকে একটু খেলাই। বেশ মজা লাগছে।

সংসারের পোড়খাওয়া জেঠামশাই নিচুস্বরে কথাটা বললেন, বিজয় শুনেছে, মাছ ধরার চেয়ে খেলানোতেই শিকারীর বেশি আনন্দ। একবার কাছে টেনে আনো, আবার দূরে সরিয়ে দাও। বেশ লাগে। মনে মনে শিকারী বলে, বাছাধন আর কতক্ষণ লড়বে এইভাবে? আরেকটু পরেই জালের মধ্যে পুরে ফেলব তোমাকে।

মাছটাকে শেষ পর্যন্ত জেঠামশাই ডাঙায় তুললেন। তবে খুব বড় নয়। দেড়, দুই কিলো হবে। জলের ধারে একটা বাঁশের খুঁটির সঙ্গে মাছ রেখে

দেওয়ার জালটা বাঁধা আছে। মাছটা জালের মধ্যে ছটফট করছিল। বিজয় বলল, খুব ছটফট করছে যে জেঠামশাই,

প্রথম প্রথম ওরকম একটু করবে। ভাবছে এইরকম ছটফট করলেই জাল ছিঁড়ে বাইরে বের হতে পারবে। জানে না, বড্ড শক্ত জাল। যখন বুঝবে আর যাবার উপায় নেই, তখন জালের মধ্যেই নিজেরে পড়ে থাকবে।

—আপনাদের কাছে দেশলাই আছে?

বিজয় তাকিয়ে দেখল, ফিস্ট করা ভদ্রলোকদের একজন, সঙ্গে একটি মেয়ে, বেশ সুন্দরী। জলের ওপর আবার মৃদু কম্পন, বিজয় ব্যস্ত হল। কোনরকমে পকেট থেকে দেশলাইটা বের করে দিল ভদ্রলোককে। আবার সব স্থির হয়ে গেছে। মাছটা সেই থেকে চালাকি করছে। একটু অন্যমনস্ক হল বিজয়। যদিও দৃষ্টি জলের ওপর। ভাবল, বেশ সুখে আছে। সুন্দরী মেয়ে নিয়ে ফিস্ট করছে। মেয়েটা কি ধারে-কাছেই কোথাও ঘুরছে? দূর ছাই, একটু ভাল করে দেখাও গেল না জলের ওপর নজর রাখতে গিয়ে।

সূর্য আরও কয়েক সিঁড়ি ওপরে উঠেছে। উৎপলার বুড়ো জেঠামশাই এখনও বসে রয়েছেন। মাছটার আর কোন সাড়াশব্দ নেই। জালের ওপর একটা প্রজাপতি সূর্যের আলো হলুদের মত গায়ে মেখে উড়ছিল। মাছটা একটা মুহূর্তের জন্য ছটফট করে আবার চুপ করে গেল। প্রজাপতিটা বাঁশের ওপর বসে বসে এখন একদৃষ্টিতে জালের দিকে তাকিয়ে আছে বোধ হয়।

জলের ওপর আবার মৃদু কম্পন। বিজয় চোখ রাখল, একটু পরে আগের মতই শান্ত হল। ময়ূরের পালক দিয়ে তৈরি ফাতনাটার ওপর প্রজাপতিটা উড়ে এসে বসল, মাছ চলে গেছে। কিছু মশলা ছুঁড়ে দিল জলের ওপর। প্রজাপতিটা উড়ে গেল রোদের অরণ্যে।

নতুন বছরের সুরুতে এ রকম অনেকেই এদিকে ফিস্ট করতে আসে। বিজয় ভাবছিল, একটা বছর চলে গেল দেখতে দেখতে। মনে মনে হিসেব করল, ওর বয়স ত্রিশ পার হয়ে গেছে। একটা অস্পষ্ট বেদনা মনের মধ্যে মেঘের মত কালো হয়ে জমছিল। ভাবল, ত্রিশ পার হয়ে গেলাম। বুড়ো হতে চললাম। নাঃ, এরপর আর বিয়ে-সাদি করার কোন মানে হয় না। জীবনটা এইভাবেই কাটাতে হবে।

উৎপলার বুড়ো জেঠামশাই উঠে পড়েছেন। উনি চলে গেলে বিজয় তাকিয়ে দেখল ঝিলের ধারে মাছ ধরার সঙ্গী আর কেউ নেই। সবাই চলে গেছে, বেলা তো কম হল না।

গ্রামোফোনে কোনও একটা করুণ সঙ্গীত বাজছিল। দূর থেকে অস্পষ্টভাবে ছেলে-মেয়েদের গলার স্বর শোনা যাচ্ছিল। বিজয়ের কষ্ট হচ্ছিল, ওর সঙ্গী-সাথীরা সবাই দুটো-একটা মাছ পেয়েছে। ঘন্টার পর ঘন্টা মিছেই সে বসে আছে। এক সময় সূর্যের দিকে তাকিয়ে ওর মনে হল, বেশ বেলা হয়েছে। জলের ওপর ভেসে-থাকা ফাতনাটির দিকে নজর রাখতে গিয়ে সময়ের খেয়াল ছিল না।

বিজয় ক্ষুধা অনুভব করছিল। বেলাও হয়ে গেছে। বাড়িতে এই নিয়ে কথা শুনতে হবে। মাছ-টাছ পেলে অন্য কথা। নইলে বিরক্তি আর রাগ। মাছ দেখলে বাড়ির লোকে বলবে, এইমাত্র খেয়ে উঠলাম তোমার জন্যে বসে থেকে থেকে। নাও, হাত-পা ধুয়ে খেতে বসো।

বৌদি বলবে, কুমকুম, তোর কাকাকে গামছাটা এনে দে তো। ওবেলার তরকারি থেকে একটু তুলে দে। বেচারী শুকনো শুকনো খেতে পারে না।

একভাবে বসে থাকার ফলে বিজয়ের পিঠ, শিরদাঁড়া ব্যথা করছিল। উঠে পড়ল। খিদেও পেয়েছে। ছিপ গুটিয়ে নিয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়াল। মনটা খারাপ লাগছিল। বাড়িতে সবাই যখন বলবে, পেলে না তো? মিছিমিছি সময় নষ্ট করলে। শরীর খারাপ করলে রোদে থেকে। অবশ্য মাছ পেলে কেউ সময় বা শরীরের কথা বলত না।

বানিয়ে বানিয়ে দু-তিনটে মিথ্যে কথা বলতে হবে। এসেছিল মাছটা, তুলতে পারলাম না। বিরাট মাছ। সুতো ছিঁড়ে পালিয়ে গেল। অন্তত পাঁচ-ছ' কিলো তো হবেই। এইভাবে মিথ্যে কথা বললে নিজের ভেতরে যে আরেকটা মানুষ আছে, সে শান্তি না পায়। মুস্কিল হচ্ছে সে কিছুতেই হার স্বীকার করতে চায় না।

বিজয় মাছের চিন্তা করতে করতে যাচ্ছিল। হঠাৎ পরিচিত ডাক শুনে ফিরে তাকাল। গ্রামের দুলাল মণ্ডল ডাকছিল, ও বিজুবাবু, আপনার কি একটা সোনার আংটি পড়ে গেছে?

বিজয় পিছন ফিরে তাকাল। দুলাল সোনার আংটিটা চোখের সামনে তুলে ধরেছে। সূর্যের আলো পড়ায় চকচক করছে আংটিটা। দুলাল কাছে এসে বলল, বোধ হয় অন্যমনস্ক ছিলেন। মাড়িয়ে চলে গেছেন নিজের আংটিকেই। আপনার চলার রাস্তাতেই পেয়েছি।

বিজয় আংটিটা হাতে নিয়ে দেখল। বেশ দামী আংটি। গরীব দুলালের সততায় মুগ্ধ হল, ভাবল, একবার বলে, হ্যাঁ পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু পারল না, বিবেকে আটকালো। বলল, না ভাই আমার না। বোধ হয় ফিস্ট করা বাবুদের কারো হবে।

ওর অনুমান মিথ্যে হল না। দেখল ফিস্টের দলের একটি মেয়ে কি যেন খুঁজতে খুঁজতে এগিয়ে আসছে। বিজয় গলা ছেড়ে ডাকল, এদিকে একটু আসুন তো।

ওর গলার স্বর শুনে মেয়েটি তাড়াতাড়ি কাছে এল। বিজয় বলল, কিছু হারিয়েছে বুঝি?

—হ্যাঁ, একটা সোনার আংটি।

—এটা? বিজয় হাতের মুঠি থেকে আংটিটা বের করল।

মেয়েটি বলল, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। খুব মিষ্টি করে হেসে মেয়েটি চলে গেল।

সুন্দরী মেয়ের আঙুলের স্পর্শে এখনও হাতে মিশে রয়েছে মনে হচ্ছে। দারুন সুন্দর তো মেয়েটি। নামটাও সুন্দর। আবীর, যার বউ হবে। সে খুব ভাগ্যবান। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল বিজয়ের।

কিন্তু পরেই মনে হল তাড়াতাড়ি ফিরে আবার ছিপ ফেলে বসতে হবে। সপ্তাহে একটা দিন ছুটি পাওয়া যায়। সারাদিন কনিষ্ঠ কেরানির স্মৃতি গলায় ফাঁসের মত জড়িয়ে থাকে। আজ পর্যন্ত পার্মানেণ্ট হওয়া গেল না। ফাইলের পর ফাইল। বড়বাবুর গালাগাল। সংসারে বৌদির সর্বক্ষণ নেই নেই চিৎকার। একদিন রেস্টুরেণ্টে পয়সা খরচ করে খেতে গেলে যাকে সাতবার ভাবতে হয়, সে আবার সুন্দরী দেখে গদগদ হয় কেন? মন বস্তুটা না থাকলেই ভাল হত। তাহলে এত জ্বালা থাকত না।

যেতে যেতে বিজয় ভাবছিল, মাছ ধরার চিন্তা করতে গিয়ে পায়ের কাছে পড়ে থাকা সোনার আংটিটাও দেখতে পায় নি সে।

বাড়িতে চোরের মত ঢুকল বিজয়। বৌদি বারান্দায় পা ছড়িয়ে 'স্বপ্নে দেখা রাজপুত্র' উপন্যাস পড়ছে। রোগা কংকালসার চেহারা হয়ে গেছে। বছর বছর আঁতুড়ঘরে ঢোকে আর দাদার চৌদ্দপুরুষকে নিয়ে গালাগাল দেয়। বলে, দাদা তাকে প্রেতিনী বানিয়ে ছেড়েছে। জীবন্ত মানুষের কোন সত্তা আর তার মধ্যে নেই।

—কি পেলে না তো কিছু? বৌদির গলার স্বরে জ্বালা।

—না, পেয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত তুলতে পারলাম না। বিরাট মাছ। কপালটাই খারাপ আমার। বিজয় এমনভাবে মুখটা কালো করে রইল, যাতে সত্যি সত্যি মনে হয় মাছ টোপ গিলেও সুতো ছিঁড়ে পালিয়েছে।

বৌদির কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না। শুধু বলল, সব বানানো কথা তোমার। রোজই তোমার কাছে মাছ আসে আর শেষ পর্যন্ত টেনে তুলতে পার না।

বিজয় নিচু গলায় বলল, মিথ্যে বলে আমার লাভ কি?

বৌদি বলল, রান্নাঘরে ভাত ঢাকা আছে। কে তোমার জন্য এতক্ষণ বসে থাকবে? যত সব বাজে নেশা। বাড়িটাকে তো হোটেল মনে কর। সংসারের দায়-দায়িত্ব সব কি একা তাঁরই। ছোট ছোট ভাইবোন তোমার না? ভাবো একবার বোনেদের বিয়ের কথা? মাছ ধরার নেশাতেই দিন কেটে যাবে?

বিজয়ের মনে হচ্ছিল, দুত্তোর ছাই, ছুঁড়ে ফেলে দিই ভাত। এত বেলায় খেতে এসেছি তবু কানের কাছে ভ্যানর ভ্যানর সুরু করেছে।

খেয়ে উঠে আয়নার সামনে একবার এল। সব চুল পড়ে গেছে। টাক পড়েছে মাথায়। পড়বে না? দিনরাত তো এক চিন্তা কি করে বোন দুটোকে পার করব। দেখতে দেখতে তালগাছের মত হয়ে উঠেছে।

ঘুমে দু'চোখ ভেঙে আসছিল বিজয়ের। দেখল, আয়নার পকুরে একটা মাছ ভেসে বেড়াচ্ছে। ঝুলিয়ে দেওয়া সুতোয় মাছটা দুলছে। পিছন ফিরে দেখল, কুমকুমের সাধের মাছটা। কৃষ্ণনগর থেকে এনে দিয়েছিল বিজয়। চোখটা ভেঙে গেছে। লেজের দিকটাও খানিকটা ভাঙা। রঙ বিবর্ণ হয়ে গেছে। মাছটা হাঁ করে আছে।

বিজয়ের মনে হচ্ছিল, এই মুহূর্তে মতনাটা নড়ে উঠবে!

মনে মনে একটু হাসল বিজয়, একবার ফ্রেশ কথাটার জায়গায় ফিস টাইপ করেছিল। বড়বাবু খুব বকেছিল। বলেছিল, মন থাকে কোথায়? ফাইলেও কি মাছ ধরার স্বপ্ন দেখছেন? বিয়ে না করলে এই অবস্থাই হয়।

শরীর খুব ক্লান্ত লাগছিল। ঘুমে দু'চোখ ভেঙে আসে, কিন্তু মনের মধ্যে মাছের চিন্তা, এ যেন একটা নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে। না গিয়ে পারা যায় না। বিজয়ের ওর দাদুর একটা পাখির কথা মনে পড়ল। পাখিটা বেশ কিছুদিন থাকার পর খাঁচা খোলা থাকায় উড়ে গিয়েছিল। নেই, নেই। একদিন দেখা গেল নিজেই এসে বন্ধ খাঁচাটা ঠোকরাচ্ছে ভেতরে ঢুকবে বলে।

রাস্তায় বেণুদার সঙ্গে দেখা। কোলের ওপর বরের টুপি। পাশে ওঁর স্ত্রী। মাথায় মুকুট। বেণুদা ওকে দেখতে পেয়ে বলল, বিজু আজ যাস বিকেলে, গানের আসর হবে। দশজন লোক আসবে। তুই বাঁশী বাজাবি।

বিজয় হেসে বলল, চেষ্টা করব। দেখছ না শিকারে বেরিয়েছি।

বিজয় যেতে যেতে ভাবছিল, বেণুটাও বিয়ে করল। ঝিলের কাছে এসে পড়েছে। দূর থেকে গান ভেসে আসছিল,

'যাবার আগে রাঙিয়ে দিয়ে যাও,
যাও গো আমায় রাঙিয়ে দিয়ে যাও।'

বিজয় খানিকটা উদাস হল গান শুনে। সূর্য ধীরে ধীরে নামছে। মনের মধ্যে কে যেন শুধু বলছে আর সময় নেই।

ঝিলের কাছে এসে দেখল সবাই যেন আনন্দ-যজ্ঞে মেতেছে। মেয়েরা পরিবেশন করছে। বিজয় ভাবল, একবার ওখানে গিয়ে একটু দাঁড়িয়ে থাকে। সবার আনন্দের বাতাস নিজেও কিছুটা বুক ভরে নেয়।

কিন্তু পারল না। হাতের ছিপ ওকে মনে করিয়ে দিল, তুমি শিকারে বেরিয়েছ।

এসে দেখল, অন্য একজন লোক ছিপ হাতে তাড়াতাড়ি ওর দিকে এগিয়ে আসছে। বিজয় মশলা ছুঁড়ে দিল জলের মধ্যে।

লোকটা বলল, বসে গেছেন আমার জায়গায়?

মেজাজ খারাপ ছিল। বিজয় রেগে বলল, জায়গাটা কি আপনার কেনা?

বেশ কিছুক্ষণ তর্ক করল দুজনেই।

অন্য একজন লোক এসে থামিয়ে দিল। বলল, কেন নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছেন? সামান্য বসার জায়গা নিয়ে ঝগড়া করা ঠিক না। একটু পরে যে যার পথে চলে যাবেন।

লোকটার কথায় কাজ হলো। বিজয় ভাবল, আফিসেও কলীগ গোবিন্দবাবুর সঙ্গে এইরকম ঝগড়া লাগে। উনি ভাবেন, আমিই ওর প্রমোশনের অন্তরায়।

একসময় বিরক্ত বোধ করল বিজয়। দুর, এ আর ভালো লাগে না। কিন্তু উপায় নেই। নেশায় পড়ে গেছে যে।

বিজয় কুমকুমের তৈরি আসনটার দিকে তাকাল। একটা হরিণ দূরের বনভূমির দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু এমনভাবে বিজয় বসেছে, মনে হচ্ছে হরিণের সরু গলা নিজের পায়ের চাপে চিপে গেছে, আর হরিণটা গলা বাড়িয়ে ছুটতে চেষ্টা করছে।

পাখিদের কলরব শোনা যাচ্ছিল। ট্রেন যাওয়ার ফলে মাটি কাঁপছিল। বিজয়ের মনে হচ্ছিল, সে সংসারের জালে বন্দী হয়ে গেছে। শৈশব থেকে যৌবন কাটল লেখাপড়া শিখে। আর যৌবন যাচ্ছে সংসারের দায়-দায়িত্ব মেটাতে গিয়ে। আর বার্ধক্য কাটবে অন্তরের হাহাকারে। কি করলাম, কি হলো সারা জীবনে—এই চিন্তায়।

রোদের কণা ডানায় মেখে আকাশের অনেক উঁচুতে একটা চিল উড়ছে। পাক খেতে খেতে নিচে নামছে খাবারের সন্ধানে। আশ্চর্য, রোদের কণার দিকে চিলের দৃষ্টি নেই।

অনেকদিন আগের কলেজ-জীবনে পড়া একটা কবিতার ছবি বিজয়ের মনে পড়ছিল।

জলের ওপর চোখ রাখল। অন্য-মনস্ক হয়ে গিয়েছিল বলে নিজের মনকে ধমকালো। তবু এই শূন্য আকাশ আর দূরের দিগন্তের দিকে চোখ রাখলে বুকটা হাহাকার করে ওঠে, কি যেন হল না।

একটা ভাল চাকরি না করলে আর চলছে না। চাকরিতেও সুখ নেই। এ ওর পিছনে লাগে। বাড়িতে বসেও চাকরির কথা ভাবতে হয়। সংসারের শান্তি কেড়ে নেয় চাকরির অশান্তি।

—কেঁও, কেঁও। বিজয় শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখে রেল লাইনের পাশে কয়েকটা কুকুর মারামারি করছে একটা কিসের মাথাকে নিয়ে। দূর থেকে করোটিটাকে দেখা যাচ্ছিল। একটু পরে কুকুরটা লড়াই করে যখন ঝিলের ধারে এল, তখন সমস্ত গা রক্তে ভেসে গেছে। চোখ দুটো করুণ। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছিল মাটিতে।

বিজয় সেদিকে তাকিয়ে শুধু বলল, ইস। জিভ দিয়ে একটা দরদের শব্দ করল। কুকুরটা ক্লান্ত হয়ে চোখ বুজে শুয়ে পড়েছে। বোধ হয় নিজের স্মৃতিচারণ করছে।

একবার ভাবল, উঠে গিয়ে কুকুরটাকে দেখে, কিন্তু পরেই নিজেকে বলল, আজ বড্ড অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছি। মাছ ধরতে এসে এটা উচিত না। মাছ ধরতে এসে দরদ দেখাতে গেলে নিজের মাছটাই ফসকে যাবে।

মন ফেরাল জলের দিকে। দূরে কাশফুল ফুটেছে। গ্রামোফোনের বাজনাটা এখনও বাজছে।

জলের ওপর ফতনাটা নড়ে উঠেছে। মাছটা টোপ গিলেছে। সুতো টেনে নিয়ে যাচ্ছে মাছটা। বিজয় হুইলের চাকা ঘুরিয়ে সুতো ছাড়ল। প্রাণপণ চেষ্টা করছিল মাছটাকে কাবু করতে। ওঃ, কতদিন পরে আজ বেধেছে। আজ বাড়িতে কত আদর দেখবো।

জলের ওপর সুন্দর শাপলা ফুলটা কাঁপছে। বোধ হয় মাছটা ওর ডাঁটার সঙ্গে সুতো জড়িয়ে ফেলেছে। মাছটা বোধ হয় সুতো নিয়ে ঘুরছে ডাঁটাটার চারপাশে। জড়িয়ে জড়িয়ে শেষ পর্যন্ত সুতো না ছিঁড়ে যায়।

একবার এ-কোণে যায়, আবার ও-কোণে যায়। পাড়ের ওপর কাচের টুকরোয় আঙুল কাটল। নিজের রক্ত দিয়ে দেখেও তাকাবার অবসর নেই। যেভাবেই হোক মাছটাকে তুলতে হবে।

এদিকে সূর্য ডুবুডুবু। মাছটা টোপ খেল শেষ সময়ে। মাছটাও যেন ওর সঙ্গে খেলা করছে। শাপলা ফুল তিরতির করে কাঁপছে। একসময় দেখা গেল, ফুলটা জলের ওপর কাৎ হয়ে পড়েছে। সুতো আল্গা হয়ে জলের ওপর ভাসছে।

বিজয় কোন কথা বলতে পারল না। শুধু বোকার মত জলের দিকে তাকিয়ে রইল। ডুবন্ত সূর্যের আলো জলে পড়ায় মনে হচ্ছে, কেউ যেন রক্তস্নান করেছে একটু আগেই। বিজয় অনুভব করছিল জমে থাকা অন্ধকার চারদিক থেকে ঘনিয়ে আসছে। সাদা ফতনাটা আর দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকারে ফুলের রঙ আর চোখের তারায় ধরা পড়ছে না।

বিজয় ছিপ গোটাতে সুরু করল। পরাজিত সৈনিকের মত সে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল, আনন্দ-যজ্ঞের মাঠটায় এখন গভীর শূন্যতা। ওরা চলে গেছে।

বিজয় অন্ধকার রাস্তায় দাঁড়িয়ে কিছুতেই সামনের সাদা কাশফুলের অস্তিত্বকে অনুভব করতে পারছিল না। ভাবল, মাছ ধরতে গিয়ে আজ সারা দিনমান নষ্ট হল। টেরই পায় নি সে, কখন সূর্য ডুবেছে। পাখিরা ঘরে ফিরেছে। আহা কতদিন সে সূর্য ডোবা বিকেলকে প্রাণভরে দেখতে পায় নি। বুক ভরে নিতে পারে নি উন্মুক্ত বাতাসকে।

মাঠটায় সেই রক্তাক্ত কুকুরটা অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। বিজয় তাড়িয়ে দিতে চাইল কিন্তু কুকুরটা গেল না।

বিজয় হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিল, বেণুর ওখানে আর এখন যাওয়ার সময় নেই। গান গাওয়াও হলো না। শোনাও হলো না।

জলের ধারের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময়ের একটা ছবি মনে পড়ল বিজয়ের। আর একটা শিকারী যেন ওরই সাথে সাথে হাঁটছে শিকারের খোঁজে।

বিজয় জলের দিকে চোখ রেখে দেখল, নিজের ছায়া হয়ে শিকারী ওর দিকে তাকিয়ে আছে!

তাড়াতাড়ি পা চালাল বিজয়।

● সরকারী ভাষা হিসেবে হিন্দীর প্রয়োগ প্রত্যাহারের দাবীতে রাজধানী কলকাতায় ছাত্র বিক্ষোভ।

রাজধানী ঃ

তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম

ঋষি কবি সেদিন যাই ব'লে থাকুন, ইদানীং বাগদেবীর আরাধনায় উৎফুল্ল নগরী কিন্তু সে কথা মনে রাখে না। আজ বাগদেবীকে নিয়ে আর বিদ্যার্থীর মৌরসীপাট্টা নেই, দেবী আজ সর্বসাধারণের আরাধ্যা। আপত্তি ছিল না, যদি ভক্তির প্রাবল্যে সরস্বতী পূজোর সংখ্যাবৃদ্ধি দেখতাম। কিন্তু পূজো আজকে গানের জলসার মতো হুজুগ। তারুণ্যের চপলতার মতো অগভীর। ক্লাব ও গোষ্ঠীর আত্মবিনোদনের মুখ্য উদ্দেশ্যে পূজো হয়েছে উপলক্ষ মাত্র। বিদ্যাদাত্রীর আরাধনা নয়, ধর্মের আবাহনও নয়, বারোয়ারী পয়সায় নিশ্চিন্ত আমোদ-প্রমোদ। বারোয়ারীতলার সংখ্যা বাড়ছে, সাধারণ মানুষের আতঙ্ক বাড়ছে এবং এক গলির মধ্যে একটি পাড়া বহুবিভক্ত হয়ে রেষারেষি দলাদলির সৃষ্টি করছে। মূল্যবৃদ্ধির চাপে নিষ্পেষিত মানুষের ওপর অসংখ্য পূজোর চাঁদার দাপট রাজধানীর বুকে আর এক বিপত্তির সৃষ্টি করেছে। 'না' বলার উপায় নেই, অক্ষমতা স্বীকার ক'রেও রেহাই নেই শহরে মানুষের। কষ্টার্জিত মাসিক আয়ের ওপর পূজোর প্রকাণ্ড দাবি তাঁদের মিটিয়ে দিতেই হবে। যিনি চোদ্দ বাড়ির সরু গলির বাসিন্দা, তাঁকে অন্তত সেই গলির চারটি পূজোর চাঁদা দিতে হবে, হবে স্কুল-কলেজে ছেলেমেয়ের চাঁদা গুণতে, নিজের ক্লাব ও আড্ডাখানা থাকলে সেখানে, কর্মব্যপদেশে আরও দু-এক জায়গায়। এবং টাকার মূল্য যখন আজকের দিনে সিকির নিচে নেমেছে, তখন প্রতি ক্ষেত্রে অন্তত একটি টাকার কমে ভদ্রতা, সম্ভ্রম (এবং ক্ষেত্র বিশেষে ভয়ে) রক্ষা হয় না। তাহলে হিসেবটা যে অঙ্কে স্থির হয়, তা অন্তত (সামান্য আয়ের ব্যক্তির ক্ষেত্রে) মাস মাহিনার শতকরা ন্যূনপক্ষে পাঁচ ভাগ। এ-হেন অবস্থায় পূজোর আগেই পকেট খালি ক'রে ভদ্রলোকেরা নিরুপায় হ'য়ে ঘরে বন্দী থাকবেন আর আশে-পাশে তাঁরই শূন্য পকেটের রসদ নিয়ে তহবিল পূর্ণ ক'রে একদল তরুণ উৎসব করবে, ঘটনাটির গুরুত্ব উপলব্ধি করলে পূজোর প্রচণ্ডতায় আতঙ্ক ছাড়া আর কিছুই লভ্য হয় না।

রাজধানীতে সেই সরস্বতী পূজো মহা ধূমধাম সহকারে অনুষ্ঠিত হ'ল। এবার নাকি পূজোর সংখ্যা গত বছরের থেকে অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। পূজোর ধাক্কা সামলাতে, সুতরাং, এখন সাধারণ চাকুরে মানুষের এ মাসের বাজেট কাটছাঁট করতে হবে।

অবশেষে কলকাতা

২৬শে জানুয়ারী থেকে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সমগ্র জাতির ওপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে এবং সংবিধান সংশোধন ক'রে সরকারী ভাষা হিসেবে হিন্দীর প্রয়োগ প্রত্যাহারের দাবিতে অবশেষে কলকাতা মহানগরীও সোচ্চার হ'য়ে উঠল। একটি বিক্ষুব্ধ ছাত্রমিছিল উপরোক্ত দাবি নিয়ে রাজভবন অভিযান সুরু করেছিল বিগত বুধবার অপরাহ্নে।

ইতিপূর্বে ভারতের যে কোনো আন্দোলনে কলকাতা মহানগরীই ছিল পুরোধা। নেহরুজী একদা কলকাতাকে 'দুঃস্বপ্ন নগরী' বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন। কিন্তু সে-কলকাতা ও এ-কলকাতায় অনেক ফারাক। আজ নেহরুজীর দুর্ভাবনার শহর বার্ধক্য-ক্লান্ত অবসরপ্রাপ্ত ন্যুব্জদেহী বিশ্রাম-বিলাসী। এ হেন শান্তিপ্রিয় মহানগরীও শেষ পর্যন্ত চুপ ক'রে থাকতে পারে নি, 'বিক্ষুব্ধ দক্ষিণে'র ঢেউ ভেঙেছে সমতটে। আওয়াজ তুলেছে,—'হিন্দী কথা বলব না', 'হিন্দী লেখা পড়ব না', 'হিন্দী ছবি দেখব না', 'হিন্দী গান শুনব না'। এ আওয়াজ অহিন্দীভাষী ভারতের সর্বত্রই উচ্চ বা নিম্নস্বরে গুঞ্জরিত হচ্ছে। অর্থাৎ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একথা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হচ্ছে যে, ভারতবর্ষ এখনও হিন্দীকে সরকারী ভাষারূপে নির্বিবাদে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত নয়। মাদ্রাজে নতুন সংগ্রাম পরিষদ গঠন ক'রে হিন্দীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে ছাত্ররা সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ সরকারী মহলের প্রদত্ত আশ্বাসে কেউ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছেন না। সর্ব-ভারতীয় চাকরির ক্ষেত্রে অহিন্দী-ভাষীদের জন্য আসন বরাদ্দের

প্রস্তাবকে যথার্থ যৌক্তিকতার সঙ্গেই সন্দেহের চোখে দেখা হচ্ছে। দেশে যখন পক্ষপাতিত্ব ও স্বজনপোষণের দুর্নীতি দূর হয় নি (হায় ভগবান, কোনো কালেও হবে কি?) তখন আসন বরাদ্দের প্রস্তাবে যুক্তিবাদী মানুষ মাত্রেই আপত্তি তুলবেন। বরাদ্দ ব্যবস্থায় নতুন করে নতুন উপায়ে অযোগ্য পোষণের হাওয়া বইতে সুরু হবে না, এমন কথা কেউ হলপ করে বলতে পারে না। সুতরাং নেতৃবর্গের এই আশ্বাসে কেউ খুশি হতে পারেন নি।

বস্তুতপক্ষে ভারতবর্ষের মতো বহুভাষী দেশে শুধুমাত্র আইন করে একটা ভাষার প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাবে গোড়াতেই গলদ রয়ে গেছে। ১৯৬১ সালের আদম সুমারির বিজ্ঞপ্তি অনুসারে যে দেশে শতকরা মাত্র পঁয়ত্রিশ জনের মাতৃভাষা হিন্দী (১৩ কোটি ৩০ লক্ষ লোকের), সেখানে হিন্দীভাষাকে সরকারী ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিতে হলে সর্বাগ্রে সবার কাছে হিন্দীকে আদরণীয়া করে তুলতে হবে। ভাষাকে যদি সাধারণের ভালবাসার আসনে প্রতিষ্ঠিত না করা যায়, তবে আইনের বলে সে ভাষা বড় জোর দলিল-দস্তাবেজের ভাষা হিসেবেই বহাল থেকে যাবে। অপর পক্ষে সমগ্র ভারতবাসীর শুভেচ্ছা ও ভালবাসা আদায় করে নিয়ে হিন্দী যদি সরকারী ভাষা তথা রাষ্ট্রভাষার পরিমালাভে সক্ষম হত, তাহলে দেশের পক্ষেই শুধু নয়, ভাষার পক্ষেও তা হত সত্যিকার মঙ্গল। ইংরেজি যদি শুধুমাত্র শাসকগোষ্ঠীর ভাষা হত, তাহলে ভারতবাসী তাকে এমন করে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে নিত না নিশ্চয়। ইংরেজি তার আপন মহিমায় আন্তর্জাতিক জগতেও নিজস্ব প্রভাব বিস্তার করেছে।

বাংলা ভাষা ভারতের সমৃদ্ধতম ভাষা (পাকিস্তানে যা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করেছে)। (৩ কোটি ৩০ লক্ষ ৪৮ হাজার মানুষের মাতৃভাষা—১৯৬১র রিপোর্ট অনুসারে, ভাষাভাষীর সংখ্যার ভিত্তিতে তৃতীয়; মাতৃভাষা হিসেবে অপেক্ষাকৃত সংখ্যাগুরু ভাষা তেলুগু, মোট ৩ কোটি ৭০ লক্ষ ৬৬ হাজার জন মানুষের মুখের ভাষা।) এই সমৃদ্ধতম বাংলা ভাষাই ইংরেজি ভাষার কাছে নানাভাবে ঋণী। ভারতবাসী ইংরেজিকে আদর করে গ্রহণ করেছিল আপন স্বার্থে এবং ইংরেজি ভাষার নিজস্ব গুণে মুগ্ধ হয়ে। ভাষাকে কামান দেগে চাপিয়ে দেওয়া হয়ত যায়, কিন্তু হুকুম করে একটি ভাষাকে অপর ভাষাভাষীর আদরণীয়া করা যায় না।

দেশের সংহতি বিনষ্ট না করে, দেশের মধ্যে বরং এমন অবস্থার সৃষ্টি করা হোক, যাতে অচিরেই হিন্দী ভারতবাসীর কাছে আদরণীয়া হয়ে উঠতে পারে। তাতে হয়ত সময় লাগবে, হয়ত বা উগ্র হিন্দীপ্রেমীরা যে সুযোগ-সুবিধা ও মালিকানার স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছেন তাঁদের পাকা ধানে মই পড়বে, কিন্তু জাতীয় সংহতির উদ্দেশ্যে সত্যিকার দেশপ্রেমী মাত্রেই বিলম্বে রাজী হবেন বলে আমাদের আশা।

শাকের আঁটি

আমাদের দেশের ব্যাপার-স্যাপার দেখে একটি প্রচলিত বাক্যে এখন রীতিমত সন্দেহ জাগে, মনে হয় সহনশীলতা অথবা বহনক্ষমতার ব্যাপারে 'বোঝার ওপর শাকের আঁটি' বলে কোনো শব্দের অস্তিত্ব বোধহয় এখানে নেই। এখানে বাহকের পিঠে বোঝার পর বোঝা চাপিয়ে গেলেই হল, আশ্চর্য—বাহক একবার হাঁটু মুড়ে পড়বে তারপর সেই বোঝাই এক অসম্ভব ক্ষমতায় ঠিক টেনে নিয়ে যাবে। স্টেট বাসে সাম্প্রতিক ভাড়া বৃদ্ধি সেই আশ্চর্য ক্ষমতার আর এক দফা প্রমাণ। এবার একরকম নির্বিবাদেই কর্তৃপক্ষ তাঁদের উদ্দেশ্য সফল করে নিয়েছেন। সাফল্যের কারণ যদিচ পুরানো। সেই divide and rule policy,—কতকগুলি রুটে সুবিধাদান করে অবশিষ্ট রুটগুলিতে এক লাফে দুই-তিন পয়সা ভাড়া বৃদ্ধি। একরকম ইচ্ছামত ভাড়া বৃদ্ধি; হিসাবের কোনো নীতি নেই। পথের দূরত্বের ভিত্তিতে রচিত ভাড়ার তালিকা নয়। এ যেন সর্বশক্তিমান বিধানদাতা বসে বিধান দিচ্ছেন।

সর্বগ্রাসী চাপে পর্যুদস্ত জনসাধারণ আজ মূক বধির অন্ধ দুর্বল। আর বিধানদাতারা সর্বক্ষেত্রে তারই সুযোগ নির্বিচারে গ্রহণ করে চলেছেন। গণতান্ত্রিক দেশে দুর্বল ঠুঁটো গণচেতনার ওপর এই উপর্যুপরি চাপ সৃষ্টি সর্বত্রই পরোক্ষ বিক্ষোভকে ক্রমশ ধুঁইয়ে তোলে, ক্ষমতাগর্বী একটি পর্যায়ে এসে সেকথা ভুলে যান। ভুলে যান, গণদেবতার বাহন ধীরগতি ইঁদুর হলেও গণদেবতার প্রতীকী মস্তকটি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও শক্তিশালী জীবের সশুণ্ড মস্তক ছাড়া অন্য কিছু নয়। ক্ষেপলে যে জীব মারাত্মক এবং উত্তম শিক্ষা পেলে যার দ্বারা অনেক গঠনমূলক কাজ সম্ভব, গণদেবতার মূর্তি কল্পনায় সেই শক্তিমত্তাকেই গ্রহণ করা হয়েছে। সুতরাং কল্যাণ রাষ্ট্রে এই জীবকে সুস্থ সবল করে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব গণ-নেতাদের। তাঁরা যদি এ কর্তব্য বিস্মৃত হন এবং গণশক্তির মুমূর্ষু অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাদের ওপর সর্বস্তরে এই নিয়মে বোঝা চাপিয়ে চলেন, তবে তার শোচনীয় ফল কল্যাণ রাষ্ট্রের কল্পনাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করবে। একথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার তো আবশ্যকতাই নেই যে, আজ পৃথিবীর উন্নতিশীল দেশগুলির প্রধান চিন্তা, কেমন করে সাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা যায়। এদেশে লোকের ক্রয়-ক্ষমতা হরণ করে সেই মানকে নিম্নাভিমুখী করা হচ্ছে। মনে রাখা উচিত, গণতন্ত্রে গণস্বাস্থ্য বজায় রাখাই প্রধান এবং প্রথম কর্তব্য।

মুমূর্ষ, মধ্যবিত্ত

কলকাতার বড়বাজার সমাজকর্মী সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় আইন ও সামাজিক নিরাপত্তামন্ত্রী শ্রীঅশোক সেন দুর্দশাগ্রস্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনকে সুন্দর, সুস্থ ও উন্নতিশীল ক'রে গড়ে তোলার জন্য সমাজ-কর্মীদের আহ্বান জানিয়ে বলেন, মূল্যসূচক শতকরা -শতাধিক বৃদ্ধি পেলেও মধ্যবিত্ত মানুষের আয় সমানুপাতিক হারে বাড়ে নি। মধ্যবিত্ত শ্রেণীই সমাজের মস্তিষ্কস্বরূপ এবং আন্তর্জাতিক জগতে তাঁদের অবদানই আন্তর্জাতিক অগ্রগতির মূলে সঞ্জীবনী সিঞ্চন করেছে। আইনমন্ত্রী সাধারণের বক্তব্যকেই নতুন মর্যাদায় উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ওপরই নিষ্পেষণ যন্ত্রের চাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। সংস্কৃতি-চেতনা-সম্পন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে চাকুরীজীবী শিক্ষিত মানুষ এবং শিক্ষক সম্প্রদায়ের যে বিরাট এবং প্রধান অংশ বহুতর অবিচার সহ্য ক'রে আজও টিকে আছেন, তার কারণ তাঁদের অটুট মনোবল। অর্থনৈতিক দুরবস্থার ধাক্কা সামলাতে এঁরা আজ ঘরে ঘরে ছোটখাট আকবর শা'র জন্ম দিচ্ছেন। উদয়াস্ত পরিশ্রম ও তিন ঘণ্টা ঘুম এঁদের দিনলিপি। এই আত্যন্তিক পরিশ্রমের পরও এঁরা সংস্কৃতি-চেতনাকে বিনষ্ট হ'তে দেন নি। সম্পদে ফকির, কর্মক্ষমতায় আকবর শা' এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় টিকে থাকবার জন্য দৈনন্দিন যে প্রাণান্ত জীবনযুদ্ধকে বরণ ক'রে নিয়েছেন, শক্তিক্ষয় হ'তে হ'তে সেইভাবে আর কতদিন তাঁরা টিকে থাকতে পারবেন তার নিশ্চয়তা নেই। এক স্থানের আয়ে এঁদের চলে না। অল্পাহার সম্বল ক'রে এ জন্য অধিক আয়ের জন্য এঁরা দু-তিন জায়গায় শ্রম বিক্রয় করেন।

আমাদের সরকার এই ভদ্র, শিক্ষিত ও পরিশ্রমী সম্প্রদায়ের প্রতি নিতান্ত উদাসীন। শিল্পের ক্ষেত্রে বহু স্থলে সরকার শ্রমিকদের জন্য বহুতর ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন, (উচ্চ-বিত্তের জন্য সরকারী বদান্যতার প্রশ্ন উল্লেখের প্রয়োজন করে না)। কিন্তু শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জীবন প্রতিদিন দুর্বিষহ হ'য়ে উঠলেও সরকার দৃকপাত করেন না কি এই জন্যই যে, শিক্ষিত

● শ্রীঅশোক সেন

মধ্যবিত্তের শ্রমিক শ্রেণীর মতো সংহত সংগঠন নেই? প্রসঙ্গত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সরকারী ও আধা-সরকারী কর্মচারীদের প্রশ্ন উল্লেখ্য। দেশে মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যথারীতি সর্বত্রই কিছু না কিছু মাহিনা ও মাগ্‌গী ভাতা বৃদ্ধি হয়, কিন্তু রাজ্য সরকারের কর্মচারীরা সেই মূল্যস্ফীতির চূড়ান্ত বোঝা ঘাড়ে ক'রে শূন্য হাতে ব'সে থাকেন। এই অসাম্য রাজ্যের এক শ্রেণীর মধ্যবিত্ত জীবনকে চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন করেছে। বোনাস ও আয়বৃদ্ধির দ্বারা একই রাজ্যে যখন অন্যান্য কর্মীরা প্রকৃত আয়বৃদ্ধির কিছুটা সুযোগ ভোগ করেন, তখন দুয়োরাণীর সন্তানের মতো রাজ্য সরকারের ও আধা-সরকারী কর্মীরা ভোগ করেন চরম অনটন।

আইনমন্ত্রীর বক্তৃতার আলোকে এই অবহেলিত শ্রেণীর দুর্দশার কথা স্বতঃই এসে পড়ে। প্রসঙ্গত এ বিষয়ে সহৃদয় বিবেচনার জন্য রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমরা।

জলপাইগুড়িঃ

মুনাফার মহোৎসব

জলপাইগুড়ির মাল অঞ্চলে একটি চালকলকে ঘিরে একটি ছোটখাট মুনাফাচক্র গড়ে ওঠায় স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। জনৈক ব্যবসায়ী কলের সম্পূর্ণ উৎপন্ন চালই কিনে নিচ্ছেন এবং পরে চড়া দামে কাঁকর মিশিয়ে সাধারণ্যে তাই সমুনাফায় বিক্রি করছেন। সরাসরি চাল বিক্রির স্বাধীনতা দিয়ে চালকলের মালিককে এই মুনাফা-শিকারীর সঙ্গে সহযোগিতা করার সুযোগ দেওয়া হ'ল কেন, স্বভাবতই সে প্রশ্ন স্থানীয় জনসাধারণ তুলতে পারেন। অবশ্য খবর পাওয়া গেছে, ভারপ্রাপ্ত বি-ডি-ও মহাশয় চালকলের ম্যানেজারকে কৃত অপরাধের জন্য যথোচিত তিরস্কারও করেছেন। আশা করা যায় বি-ডি-ওর সতর্কতায় এ জাতীয় মুনাফাশিকারী ষড়যন্ত্র অচিরেই বন্ধ হয়ে যাবে।

লাল ফিতের ফাঁস

মালভূমি সংস্কার বিভাগের সার্কেল ইন্সপেক্টর শ্রীঅজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের মীমাংসায় দীর্ঘসূত্রতার ফলে তাঁর পরিবারবর্গ আজ অনশনে অর্ধাশনে মুমূর্ষু। সংবাদে প্রকাশ, শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি কন্যার মৃত্যুর কারণ সাময়িকভাবে

কর্মচ্যুত শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের বিচারের ব্যাপারে আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতা। হতভাগ্য নিরপরাধিনী শিশুকন্যাটি অনাহারে মারা গিয়েছে বলে স্থানীয় জনসাধারণ অভিযোগ করছেন। সন্তানহারা শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় এখন অসহায়ভাবে অপর চারটি সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে আতঙ্কিত রাত্রি অতিবাহিত করছেন। অনেক আবেদন-নিবেদনেও কেন যে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের আশু বিচার হচ্ছে না তার কারণ আজও অজ্ঞাত। যদি আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতাই কারণ হয়, তবে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের বেদনাক্লিষ্ট অসহায় জীবনগুলির দিকে তাকিয়ে এখনই সরকারের পক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। যারা নিরপরাধ তারা যেন অযথা শাস্তি না পায়, সেদিকে আমলাবর্গের সচেতন হওয়া একটি অনিবার্য মানবিক কর্তব্য।

বীরভূম:

বিদ্যালয়ে অনাচার

সিউড়ী রিভার থমসন বালিকা বিদ্যালয়ে ছাত্রী ভর্তির অন্যতম সর্ত হিসেবে নাকি দশ টাকা সাহায্যাভিনয়ের জন্য চাঁদা অবশ্য দেয় ব'লে ধার্য করা হয়েছিল। 'বীরভূম বার্তা'য় প্রকাশিত এক সংবাদে আরও প্রকাশ, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই নির্দেশ নাকি সাধারণ বিজ্ঞপ্তি বোর্ডে টাঙিয়ে দেন। আর এই বে-আইনী নির্দেশের সংবাদ পাওয়া সত্ত্বেও জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ও বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটী সম্পূর্ণ নীরব আছেন।

ঘটনাটি সত্য হলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষে প্রচলিত আইন ভঙ্গের দুঃসাহসিকতাই প্রমাণ করে। অভিভাবকদের ওপর এমনভাবে চাপ সৃষ্টি করার দুঃসাহসিকতা আমাদের সামাজিক জীবনে চরম নৈরাশ্যের পরিচায়ক। মফস্বল বিদ্যালয়ে অনেক অনাচারের গোপন তালিকা ওয়াকিবহাল মহলে অজ্ঞাত নেই; কিন্তু চাঁদার মতো স্বেচ্ছাপ্রদত্ত বস্তুকে অবশ্য পালনীয় নির্দেশে পর্যবসিত করার এমন প্রকাশ্য স্বৈরাচারের নজির সহজে মেলে না।

এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের এখনই সমুচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

বর্ধমান:

উল্টোরথযাত্রা

ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের পশ্চিমবঙ্গ শাখার পঞ্চদশ বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হ'ল আসানসোলে। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন ও পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সভাপতি। তাঁদের উপস্থিতিতে অধিবেশনের সভাপতি বিশিষ্ট শ্রমিক-নেতা শ্রীকালী মুখার্জি তাঁর ভাষণে কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ উক্তির মাধ্যমে দুর্গাপুর কংগ্রেসের যে চিত্র উদ্‌ঘাটিত করেছেন, দেশের জনসাধারণের মনে তদ্দ্বারা যথেষ্ট বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। শ্রীমুখার্জি দুর্গাপুর কংগ্রেসে জাতীয় কংগ্রেসের প্রগতিবিরোধী ভূমিকার বিশ্লেষণ ক'রে বলেছেন, আবাদী কংগ্রেস থেকে ভুবনেশ্বর কংগ্রেসে জাতীয় কংগ্রেস যে প্রগতিবাদী কর্মধারা অনুসরণ ক'রে চলছিলেন, দুর্গাপুর কংগ্রেসে তার প্রত্যক্ষ পশ্চাদপসরণ লক্ষ্য করা গেছে।

জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শ্রীকালী মুখার্জির এই তীব্র এবং অসঙ্কোচ সমালোচনা জনসাধারণের মনে স্বভাবতই একটি প্রশ্ন উত্থাপিত করেছে, তবে কি নেহরুজীর বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেস তার ঘোষিত নীতি সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের রাষ্ট্র গঠনের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হ'তে চলেছে।

শ্রীমুখার্জি বিভিন্ন পরিসংখ্যানের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, ভারতের শ্রমজীবীদের প্রকৃত আয় তো বৃদ্ধি পায়ই নি, বরং পরিকল্পনার ফলশ্রুতি হিসেবে জাতীয় আয় কয়েকটি বিশেষ গোষ্ঠীর করায়ত্ত হয়েছে মাত্র।

বাস্তবিকপক্ষে অদ্যাবধি ভারতের বৃহত্তম সংখ্যক মানুষের দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য কোনো বিশেষ পরিকল্পনা কার্যকরী করা হয় নি। জাতীয় কংগ্রেসের সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ও নীতি গ্রহণের ফলে জনসাধারণ আশান্বিত ছিলেন কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য দুর্গাপুর অধিবেশন সে আশায় আঘাত হেনেছে। কংগ্রেসের প্রগতিবাদী দল দেশের অন্যান্য প্রগতিশীল ব্যক্তির ন্যায় তাই আশঙ্কাতুর। শ্রীমুখার্জির বক্তব্য সেই আশঙ্কায় নতুন যুক্তির অবতারণা ক'রে সাধারণ্যে চাঞ্চল্য ও উদ্বেগের সঞ্চার করল। দারিদ্র্যের চাপে নিষ্পিষ্ট মানুষের মনে আজ তাই একটি মাত্র প্রশ্ন, জাতীয় কংগ্রেস কি উল্টোরথের সারথ্য গ্রহণ করলেন? মানুষের মনের এই বিভ্রান্তি দূরীকরণের জন্য জাতীয় কংগ্রেসকে তথা কংগ্রেসের প্রগতিশীল অংশকে সুস্পষ্ট কর্মনীতির মাধ্যমে এগিয়ে আসতে হবে। কংগ্রেস ইতিমধ্যেই সাধারণ মানুষ থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন। কিন্তু জাতীয় স্বার্থে এবং সংগঠনের খাতিরেই কংগ্রেসকে এই ভ্রষ্ট পথ ত্যাগ ক'রে, ঘোষিত সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের রাষ্ট্র গঠনের জন্য জনসাধারণের সঙ্গে একত্রে পুরোমাত্রায় অভিযান সুরু করতে হবে।

বিভ্রান্ত জাতির সামনে আজ দ্বিতীয় কোনো যোগ্য কর্ণধার নেই। বিরোধী দলগুলি নীতিহীন দলাদলির চক্র। এমতাবস্থায় জাতীয় কংগ্রেসের মুখাপেক্ষী জনসাধারণ কংগ্রেসের মধ্যে আদর্শ ও নীতির সুষ্ঠু রূপায়ণের চিত্র দেখতে চায়। কংগ্রেসে আজ যাঁরা যথার্থ দেশপ্রেমী ও জাতির কল্যাণকামী শক্তি, এখন তাঁদের বলিষ্ঠতার সঙ্গে অগ্রসর হয়ে আসার একান্ত প্রয়োজন। জল অনেক ঘোলা হয়েছে, কুচক্রীর ঘৃণ্য স্বার্থের মুখোশ খুলে পড়েছে, প্রকৃত প্রগতিশীলদের আর দেরি করার সময় নেই।

চার্লি চ্যাপলিন

অশোক সেন

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

একদিন সিডনে মাঠে ফুটবল খেলছেন—তাঁকে ডাকিয়ে খবর দেওয়া হোল যে, তাঁদের মা পাগল হয়ে গেছেন এবং তাঁকে 'কেন্ হিল পাগলা গারদে' পাঠানো হয়েছে। বাইরে কোন রি-এ্যাক্শন্ না দেখিয়ে সিডনে মাঠে ফিরে গিয়ে খেলা শেষ করলেন—পরে যখন একলা হলেন, খুব খানিকক্ষণ কাঁদলেন। সিডনের কাছ থেকে দুঃসংবাদটা শুনে চার্লি প্রথমটায় বিশ্বাসই করতে চান না। চার্লি কাঁদেন নি বটে, তবে একটা নিদারুণ নৈরাশ্য এবং হতাশায় মুষড়ে পড়লেন। বারবার মনে হতে লাগল—মা এ কি করলেন! হাল্কা এবং আমুদে স্বভাবের তাঁদের মা কি করে পাগল হয়ে যেতে পারেন, একথা ভেবে ঠিক করতে পারলেন না দুই ভাই।

এর এক সপ্তাহ বাদে খবরটা অফিসিয়ালি এঁদের জানানো হোল—আরও শুনলেন আদালত থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, এখন থেকে দুই ভাইয়ের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে চার্লির বাবার ওপর। বাবার সঙ্গে থাকতে হবে—কথাটা ভাবতে গিয়ে বেশ উত্তেজিত বোধ করলেন চার্লি। এর আগে তাঁকে দু'বার মাত্র দেখেছেন—একবার স্টেজের ওপর। আর একবার কেনিংটন রোডের একটি বাড়ির কাছ দিয়ে যাবার সময় দেখেন বাড়ির সামনের বাগানের পথ দিয়ে একজন মহিলার সঙ্গে তিনি এগিয়ে আসছেন। চার্লিকে দেখে তিনি সামনে আসতে ইঙ্গিত করলেন এবং তার নাম কি জিজ্ঞাসা করলেন। চার্লি কিন্তু এই নাটকীয় মুহূর্তটি বেশ উপভোগ করছিলেন মনে মনে এবং কিছুই যেন বোঝেন নি, এইভাবে জানালেন তাঁর নাম 'চার্লি চ্যাপলিন।'

'আগেই বুঝেছিলাম'—এই ধরণের একটা মুখভাব করে তাঁর বাবা মহিলার দিকে তাকালেন এবং পকেট থেকে একটা হাফ্ ক্রাউন বের করে চার্লির হাতে দিলেন।

চার্লিও একদৌড়ে বাড়ি ফিরে মাকে বললেন যে, বাবার সঙ্গে তাঁর দেখা এবং কথাবার্তা হয়েছে। সেই কেনিংটনের বাড়িতে গিয়ে বাবার সঙ্গে থাকতে হবে। ভাবতেই সারা দেহে রোমাঞ্চ হচ্ছিল চার্লির।

এরপর চার্লিরা ২৮৭ কেনিংটন রোডে তাঁর বাবার ওখানে এসে উঠলেন। যে মহিলাটির সঙ্গে বাবাকে সেদিন আসতে দেখেছিলেন তার নাম লুইজি। লুইজির একটি চার বছরের সুন্দর ছেলে ছিল—অর্থাৎ চার্লির হাফ্-ব্রাদার। চার্লিরা বুঝতেন যে, লুইজি তাঁদের এখানে আসাটাকে খুব ভালভাবে নিতে পারেন নি—সিনিয়ার চ্যাপলিনের পরিত্যক্ত স্ত্রীর ছেলে তাঁরা—তাঁদের সঙ্গে লুইজির সম্পর্কটা তো খুব মধুর হতে পারে না।

বাবার সবকিছু দেখেই চার্লি মুগ্ধ হয়ে যেতেন— কিভাবে তিনি খাওয়ার টেবিলে বসেন, কিভাবে তিনি খান, কিভাবে ছুরি দিয়ে মাংস কাটেন—বহুদিন পর্যন্ত চার্লি বাবার সবকিছু ধরণ-ধারণ নকল করবার চেষ্টা করতেন। লুইজি এদের সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করতো—বিশেষত সিডনের সঙ্গে—একদিন চার্লি ছুরিগুলো মুছে পরিষ্কার করছেন—লুইজি তার এক বান্ধবীকে বলছিল—এ ছেলেটা তবু নিজের ছেলের (চার্লিকে দেখিয়ে), ওটাতো (অর্থাৎ সিডনে) তাও নয়। লুইজি মদও খেত খুব। চার্লির খুব ভয় হোত লুইজিকে—বিশেষত যখন সে মদ খেয়ে টং হয়ে থাকতো। যদিও কোনদিনও অবশ্য সে চার্লিদের গায়ে হাত দেয় নি। সিডনে কিন্তু তাকে কোন রকম আমলই দিত না।

চার্লিরা এই সময় কেনিংটন রোড স্কুলে পড়তে যেতেন—সেখানে অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে মিশে সময়টা বেশ ভাল কাটতো। শনিবার ছিল হাফ-হলিডে। চার্লির কিন্তু এই তাড়াতাড়ি স্কুল-বন্ধের ব্যাপারে মনে কোন উৎসাহ আসতো না—আগে বাড়িতে ফেরার মানেই তো সেই মেঝে পরিষ্কার করতে হবে, কাঁটা, চামচ, ছুরি মুছে ঝক্ঝকে করতে হবে—আর তার ওপর সব থেকে ভয়ের ব্যাপার—শনিবার হলেই লুইজি মদ-খাওয়া সুরু করবে।

এঁদের বাড়ির খুব কাছেই একটি পাব্ ছিল। শনিবারে রাত্রে মনটা যখন গভীর হতাশায় পূর্ণ থাকতো—পাব্ বন্ধ হচ্ছে—মত্ত কাস্টমাররা বাড়ি ফেরবার পথে গান ধরতেন—সে গানের কথাগুলো চার্লির মনের ওপর একটা গভীর দুঃখের প্রলেপ মাখিয়ে দিত—

For old times' sake don't
let our enmity live,
For old times' sake say
you'll forget and forgive.
Life's too short to quarrel,
Hearts are too precious
to break
Shake hands and let us
be friends
For old times' sake.

চার্লি অবশ্য এই ধরণের মনোভাবের সমর্থক নন্—কিন্তু সেইসময় নিজের মানসিক অবস্থার সঙ্গে কোথায় যেন গানটির ভাবধারার একটা মিল খুঁজে পেতেন—গান শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়তেন। সিনিয়ার মিস্টার চ্যাপলিন কচিৎ-কদাচিৎ রাত্রে বাড়িতে ফিরতেন। সিডনে ইচ্ছে করেই বেশি রাত্রিতে আসতেন—যাতে লুইজির সঙ্গে দেখা না হয়—কারণ লুইজি তখন বিছানায় শুয়ে পড়বেন।

এক শনিবার স্কুল থেকে ফিরে চার্লি দেখলেন কেউ বাড়িতে নেই—সিডনে তার নিত্য-নৈমিত্তিক নিয়মমাফিক ফুটবল খেলতে বেরিয়ে গেছেন, বেশি রাত্রের আগে ফিরবেন না। ল্যাণ্ডলেডির কাছে শুনলেন যে, লুইজিও সকাল বেলাতেই ছেলেকে নিয়ে বাইরে গেছে—একটা কথা এখানে বলা দরকার, লুইজি তার ছেলেকে চার্লিদের সঙ্গে মিশতে দিত না।

প্রথমটায় চার্লি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন—যাক্ মেঝে মুছতে হবে না, ছুরি-কাঁটা সাফ্ করতে হবে না। লাঞ্চ টাইমের পরেও অনেকক্ষণ অবধি চার্লি অপেক্ষা করলেন—তারপর চিন্তা হতে লাগল সবাই তাঁকে ফেলে পালিয়ে গেল কি না। খিদেও পেয়েছে খুব—ভাঁড়ার ঘর হাতড়ে দেখলেন কোন কিছু খাবার মেলে কি না—না, কিছুই পাওয়া গেল না। আর একা বাড়িতে বসে থাকতে অসহ্য লাগছে—বেরিয়ে পড়লেন রাস্তায়—বাজার, দোকানপাট দেখতে দেখতে অনেকটা সময় কাটল। রাত্রে বাড়ি ফিরলেন—দরজা ধাক্কালেন—না, কেউ ফেরে নি। ক্লান্তভাবে কেনিংটন ক্রশের পাথর-বাঁধানো কিনারায় গিয়ে বসলেন—বাড়ির কাছেই জায়গাটা—কেউ ফিরলে চোখে পড়বে।

অত্যন্ত ক্লান্ত এবং পরিত্যক্ত মনে হচ্ছিল নিজেকে। সিডনেই বা গেল কোথায়। সময়টা তখন প্রায় মাঝরাত—একে একে দোকানগুলোর সব আলো নিভে যাচ্ছে—একমাত্র কেমিস্টদের দোকান এবং পাবলিক-হাউসগুলো বাদে। নিজেকে ভয়ানক অসহায় মনে হচ্ছিল চ্যাপলিনের। হঠাৎ সঙ্গীত-ধ্বনিতে চারপাশের সব জায়গাটা যেন প্রাণ-বন্যার আবেগে ভরে উঠল। হোয়াইট-হার্ট-কর্নার-পাব-এর ভেস্টিবিউল থেকেই গানের কলি ভেসে আসছিল—টিউনটা ছিল দি হানিসাকল্ এণ্ড দি বি—সঙ্গে ছিল হারমোনিয়াম ও ক্লারিওনেট। চ্যাপলিন বলেছেন—I had never been conscious of melody 'fore, but this one was beautiful and lyrical, so blithe and gay, so worm and reassuring. হতাশা ভুলে যেখানে গান হচ্ছে সেদিকে এগিয়ে গেলেন চার্লি। দেখলেন হারমোনিয়াম বাদক অন্ধ—আর যে ক্লারিওনেট বাজাচ্ছে, তার মুখটা তিক্ততায় ভরা।

গান শেষ হয়ে গেল—রাত্রিটা যেন এবার আরও বেশি দুঃখে ভরা মনে হতে লাগল চার্লির। দেহ-মন পরিশ্রান্ত এবং দুর্বল। ধীরে ধীরে রাস্তা পার হয়ে বাড়ির দিকে এগোলেন চার্লি—কেউ ফিরে এসেছে কি না সে চিন্তাও মনে নেই। বিছানায় গিয়ে একবার শুয়ে পড়তে পারলেই হয়। হঠাৎ নজরে পড়ল বাগানের পথে কে যেন চলেছে—হ্যাঁ, লুইজি আর তার ছেলে। লুইজি যেন একটু খুঁড়িয়ে হাঁটছে এবং একপাশে অত্যন্ত বেশি হেলে

চার্লি চ্যাপলিন

রয়েছে। প্রথমটায় চার্লির মনে হোল হয়তো কোন accident-এর ফলে লুইজির পায়ে আঘাত লেগেছে। পরে বুঝলেন আঘাত নয়, লুইজি একেবারে ভীষণ রকম মাতাল হয়ে ফিরছে। এই অবস্থায় ওর সামনে না যাওয়াই ভাল—কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন চার্লি—লুইজি ভেতরে গেল। এর অল্প বাদে ল্যাণ্ডলেডিকে ঢুকতে দেখে তারই সঙ্গে ভেতরে গেলেন চার্লি। আস্তে আস্তে অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন—যাতে লুইজির নজরে না পড়েন।

টলতে টলতে সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়ালো লুইজি—চিৎকার করে বললে—'কোথায় যাবি ভাবছিস? এটা তোর বাড়ি নয়।'

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন চার্লি।

'আজ রাত্রে এখানে তোর ঘুমোনো চলবে না! তোদের নিয়ে বহু ভোগান্তি হয়েছে—এ-বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা—তুই আর তোর দাদা—তোদের বাপকে গিয়ে বল তোদের কোন ব্যবস্থা করতে।'

এতটুকু দ্বিধা না করে চার্লি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর জানা ছিল প্রিন্স রোডে কুইন্স হেড্ পাবে বাবাকে পাওয়া যেতে পারে। আধ মাইল দূরে জায়গাটা—সেদিকে রওনা হলেন চার্লি। কিন্তু কিছুদূর যেতেই দেখেন উল্টোদিক থেকে বাবা আসছেন।

'আমাকে বাড়িতে ঢুকতে দিচ্ছে না—মদে একেবারে চুর হয়ে আছে লুইজি'—বাবার কাছে নালিশ করলেন।

বাড়ির দিকে দুজনে আসছেন—বাবারও পা টলছে, বললেন,—'আমিও 'সোবার' নই।'

চার্লি বোঝাতে চাইলেন যে, বাবাকে মত্ত মনে হচ্ছে না।

'না, আমিও বেশ মাতাল হয়েছি,' অত্যন্ত অনুতপ্তভাবে জবাব দিলে সিনিয়ার চার্লি। বাড়িতে ফিরে স্বাগতভাবে তিনি লুইজিকে জিজ্ঞেস করলেন চার্লিকে ঢুকতে দেওয়া হয় নি কেন। কিছুক্ষণ হতভম্বের মত তাকিয়ে থেকে লুইজি বললে—'You too can go to hell—all of you!'

একটা জামা ঝাড়বার মোটা ব্রাশ ছুঁড়ে মারলেন লুইজির দিকে সিনিয়ার চার্লি। ব্রাশের উল্টো দিকটা ওর মুখের একপাশে গিয়ে আঘাত করল। আস্তে আস্তে চোখ বুজে এল লুইজির—তারপর ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেল অজ্ঞান হয়ে।

সকালেই নাকি দুজনে খুব ঝগড়া হয়েছিল। বাবা তাঁর ভাই স্পেনশার চ্যাপলিনের সঙ্গে সেদিনটা কাটাতে

● সিডনে

গিয়েছিলেন। ল্যাম্বেথের নানাদিকে স্পেনশারের অনেকগুলো পাবলিক-হাউস ছিল—সমাজে তার স্থান নেই—সুতরাং স্পেনশারদের বাড়িতে যেতে লুইজির আপত্তি—বাবাকে একলাই যেতে হোল। প্রতিশোধ দেবার জন্যই লুইজি অন্যত্র গিয়ে খুব মদ খেয়ে এসেছিল।

এমনিভাবেই দিন কাটছিল। সিনিয়ার চ্যাপলিন মত্ত অবস্থায় না থাকলে সবার সঙ্গেই চমৎকার ব্যবহার করতেন। ছেলের সঙ্গেও গল্প ও খেলা করে কাটাতেন।

এরপর একদিন Society for the prevention of cruelty to children থেকে কয়েকজন লুইজির সঙ্গে দেখা করে কি সব বলে গেল—এ নিয়ে লুইজি খুব বিরক্তি দেখাতে লাগল। এর কারণ পুলিশ রিপোর্ট করেছে যে, একদিন সকাল তিনটেয় সিডনে এবং চার্লিকে রাস্তায় চৌকিদারের চুল্লির পাশে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখেছিল। লুইজি সে রাত্রে দু'ভাইকে রাস্তায় বের করে দিয়ে বাড়ির দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। পুলিশ এসে জোর করে দরজা খুলিয়ে চার্লিদের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে যায় সেদিন।

এর কিছুদিন পরে—বাবা তখন অভিনয় সফরে প্রভিন্সেস টুর করে বেড়াচ্ছেন। লুইজি একটা চিঠি পেল যে, চার্লিদের মা সুস্থ হয়ে পাগলা-গারদ থেকে চলে এসেছেন। এর একদিন কি দু'দিন বাদে ল্যাণ্ডলেডি ওপরে এসে জানালো যে, বাইরে এক ভদ্রমহিলা অপেক্ষা করছেন সিডনে ও চার্লিকে নিয়ে যাবার জন্য।

তোমাদের মা—বললে লুইজি।

একলাফে নিচে নেমে গেল সিডনে—সঙ্গে সঙ্গে চার্লিও। সেই পুরানো মিষ্টি হাসি; হাসি মুখে মা দাঁড়িয়ে আছেন—দু'জনকেই কত আদর করলেন। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে দু'ভাই মায়ের সঙ্গে এ-বাড়ি থেকে বিদায় নিলেন।

যাবার সময় লুইজি কিন্তু চার্লিদের কারোর সঙ্গেই কোন খারাপ ব্যবহার করে নি—সিডনের সঙ্গেও না। বরং ভালভাবেই সবাইকে বিদায় দিল।

লিলি চ্যাপলিন (চার্লি ও সিডনের মা) কেনিংটন ক্রশের পেছনের রাস্তায় একটা ঘর নিলেন থাকবার জন্য। এ-জায়গাটা ছিল 'হে ওয়ার্ডস পিক্‌ল ফ্যাক্টরী'র কাছে—সুতরাং বিকেল থেকে সুরু হোত এসিডের বিশ্রী গন্ধ। কিন্তু প্রথমত ঘরটার ভাড়া ছিল কম—তারপর সবচেয়ে বড় কথা হোল, আবার

সবাই—মা এবং দুই ভাই—এক জায়গায় আসতে পেরেছেন। তাই কোন অসুবিধার কথাই কারও মনে আসতো না।

মায়ের স্বাস্থ্য তখন এত চমৎকার যে, দেখে কেউ মনে কোরতে পারতো না যে, কিছুদিন আগে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এ সময়টায় তাঁদের বিশেষ আর্থিক অসুবিধা হয় নি। বাবা ঠিকমতই সপ্তাহের দশ শিলিং পাঠাতেন—তা ছাড়া ব্লিকি সেলাই করে কিছু রোজগার করতেন। আবার নতুন করে চার্চের সঙ্গে তাঁর সংযোগ সুরু হল।

এই সময়ের একটি ঘটনাকে স্মরণীয় আখ্যা দেওয়া যেতে পারে—ভবিষ্যতে এর বিরাট প্রভাব লক্ষ্য করা যায় চার্লির জীবনে। চ্যাপলিনদের বাড়ির রাস্তার শেষ-মাথায় ছিল একটি কসাইখানা। ওঁদের বাড়ির সামনে দিয়ে ভেড়াগুলোকে নিয়ে যাওয়া হোত সেই কসাইখানায়। চ্যাপলিনের মনে আছে একদিন একটি ভেড়া দল থেকে পালিয়ে অন্য দিকে দৌড়তে থাকে—রাস্তার লোক দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল। কেউ কেউ ভেড়াটাকে ধরবার চেষ্টাও করছিল—ভেড়াটা মাঝে মাঝে ছোট ছোট লাফ দিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টায় ছিল। ভেড়াটার এই নাচের ভঙ্গিতে লাফ দেওয়া, দৌড়নো, চারপাশের লোক দেখে ভয় পাওয়া—সব মিলিয়ে এমন একটা মজার পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল যে, চ্যাপলিন খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন জন্তুটিকে ধরা হোল এবং টেনে কসাইখানার দিকে নিয়ে যাওয়া হোল, তখনই চার্লির এ ব্যাপারটার আসল নৃশংসতার দিকটা মনে পড়ল—দৌড়ে ভেতরে গেলেন, চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে মাকে বললেন—

'ওরা ভেড়াটাকে মেরে ফেলবে—ওরা ভেড়াটাকে মেরে ফেলবার জন্য জোর করে ধরে নিয়ে গেল।'

এই ঘটনা—ভেড়াটার প্রাণ নিয়ে পালানোরজন্য হাস্যকর চেষ্টা—তাকে ধরবার জন্য অদ্ভুত ধরণের এদিকে-ওদিকে ছোটাছুটি—এসব দৃশ্য অনেকদিন বারবার মনে পড়তো চার্লির। এরপর চার্লি মন্তব্য করেছেন—'and I wonder if that episode did not establish the premise of my future films—the combination of the tragic and the comic.'

স্কুলের সাধারণ পড়াশুনা বড় একঘেয়ে লাগতো।" মাকে আবার কাছে পাওয়াতে তিনি চার্লির থিয়েটারের প্রতি আগ্রহ এবং ভালবাসাকে আরও উৎসাহ দিতে লাগলেন নানাভাবে। চার্লির যে এদিকে প্রতিভা আছে, একথা মা'ই তাঁর মনে গেঁথে দেবার চেষ্টা করেছেন জন্ম থেকে। এর কিছুদিন বাদেই চার্লির স্কুল-জীবনে এক বিরাট গৌরবের দিন এল। প্রত্যেক ক্লাসে, ক্লাসে গিয়ে তাঁকে Miss Priscilla's cat কবিতাটি আবৃত্তি করবার জন্য বন্দোবস্ত করা হোল। এটি হা সি র কবিতা—মা চার্লিকে কবিতাটি আবৃত্তি করতে শিখিয়েছিলেন। একদিন স্কুলে বিরামের সময় চার্লি একজন সহপাঠীকে কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনাচ্ছিলেন—কিছুদূরে বসে স্কুলটিচার মিস্টার রিড কি কাজ করছিলেন। চার্লির আবৃত্তি শুনে তাঁর এত মজা লেগেছিল যে স্কুল বসবার, সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চার্লিকে নিয়ে ছাত্রদের কাছে কবিতাটি আবৃত্তি করালেন—ছাত্র-ছাত্রীরা কবিতা শুনে হাসিতে প্রায় ফেটে পড়ল। মুখে মুখে চার্লির আবৃত্তির প্রশংসা এত ছড়িয়ে পড়ল যে, ব্যবস্থা করা হোল পরদিন স্কুলের প্রত্যেকটি ক্লাসে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনাতে হবে চার্লিকে।

যদিও পাঁচ বছর বয়সের সময় তাঁকে প্রথম মঞ্চে নামতে হয়েছিল মায়ের 'বদলী' হয়ে দর্শকদের সামনে, কিন্তু তখনও অতশত বোঝবার বয়স হয় নি। চার্লি বলেছেন, বুঝেশুনে দর্শকদের খুশি করে আত্মপ্রসাদ উপলব্ধি করবার ঘটনা হিসাবে এইটিই তাঁর জীবনে প্রথম। স্কুলে যাওয়াটাও এখন থেকে বেশ উত্তেজনার বিষয় মনে হোত। অচেনা, অজ্ঞাত কোন একটি ছাত্র থেকে, সেদিনকার পর চার্লি হয়ে দাঁড়ালেন সমস্ত শিক্ষক এবং ছাত্রদের প্রধান আকর্ষণ। এর ফলে পড়াশোনার ব্যাপারেও মন বসল—কিন্তু শিক্ষার ব্যাপারে অন্যদিক থেকে বাধা পড়ল।

এইট্-ল্যাকাশিয়ার-ল্যাড্স নামে এক ক্লগ ড্যান্সারের (যে নাচে তালে তালে মেঝের উপরে পায়ের জুতা ঠোকা হয়) দলে যোগ দিয়ে তাঁকে চলে যেতে হোল স্কুল ছেড়ে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীইন্দ্রদয়াল মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায়ণ

মূল্য দুই টাকা

"অমূল্য গ্রন্থ হয়েছে"—স্বামী অপূর্বানন্দ।

"বইখানি নতুন ধরণেরই হয়েছে।" —স্বামী সদানন্দ।

"বইখানি দেখিতে সুন্দর, বিষয়বস্তু সরল ও সংক্ষিপ্ত। একখানি গ্রন্থে এত মহামূল্য রত্নের সন্নিবেশ পূর্বে আর হয় নাই।" —স্বামী জগদীশ্বরানন্দজী।

নূতন উপন্যাস—নূতন সৃষ্টি

বর্তমান সময়ের সমস্যা ও তাহার সমাধান

শ্যাম-সোহাগিনী

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত

মানুষ ভুল করে, কিন্তু মানুষের মন যদি পবিত্র থাকে, তবে ভুল ভাঙিতে বিলম্ব হয় না মূল্য ১৷৷০ টাকা

যশস্বী কথাশিল্পী

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

কাঞ্চনমূল্য (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড), বৈবাহিক ও বরযাত্রী। মূল্য—৩৫০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা—১২

রঙ্গজগৎ

সেন্সরবোর্ড চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন

চলচ্চিত্র উৎসবে নির্বাচিত কয়েকটি ছবি সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে। প্রত্যেক দেশের নিজস্ব নীতিবোধ ও নৈতিক মান আছে, চলচ্চিত্র উৎসবের নামে অবাধে যে কোন চিত্র পৃথিবীর কোন দেশই প্রদর্শনের অনুমতি দেয় না। এমন কি বিদেশের কোন উৎসবে গিয়েও নিজেদের নীতিবোধকে বিসর্জন দিতে পারে না---তার দৃষ্টান্ত এবার ভারতের উৎসবে দেখা গেছে। পশ্চিম জার্মানীর একটি ছবি উৎসবে প্রদর্শনের জন্য গৃহীত হয়েছিল, কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া আপত্তি করায় উৎসব কমিটী বাধ্য হয়েছিল পশ্চিম জার্মানীকে সেই ছবিটি প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ করতে। শেষ পর্যন্ত ছবিটি প্রত্যাহৃত হয়েছিল।

এই দৃষ্টান্তের পাশে স্বভাবতই প্রশ্ন আসে উৎসব কমিটী 'ওয়েডিং সুইডিস স্টাইল', 'কনকোয়েরার্স অব গোল্ডেন সিটি' এবং আরো কয়েকটি ছবি কি মানদণ্ডে গ্রহণ করেছিল। ইউরোপের বহু ছবিতে এবার যৌনতামূলক দৃশ্যের আধিক্য দেখা গেছে, কিন্তু উপরোক্ত ছবিগুলি বক্তব্য ছাড়িয়ে যৌনতাকে মুখ্য করে তুলেছে। উৎসবে এই ছবিগুলি দেখাতে দেওয়ায়, এবং হাজার হাজার মানুষ ছবিগুলি দেখার পর স্বভাবতই প্রশ্ন আসে 'টম জোনস' ছবিটিকে সেন্সরবোর্ড এতদিন মঞ্জুরী দেয় নি কেন? কেনই বা 'মাদার জোয়ান অব এঞ্জেল' মঞ্জুরী পাচ্ছে না। 'মাদার জোয়ান' কি 'ওয়েডিং সুইডিস স্টাইল' অপেক্ষা কুৎসিৎ ছবি? চলচ্চিত্র উৎসবের পরে ভারতীয় সেন্সরবোর্ড চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। চলচ্চিত্র উৎসব কমিটী এই চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে। প্রশ্ন উঠেছে সেন্সরবোর্ড রাখার কি প্রয়োজন আছে।

ছবি বাছাইয়ের ব্যাপারে প্রমাণিত হয়েছে, উৎসব কমিটী কোন আদর্শ অথবা নৈতিক মানদণ্ডের বিচার করেন নি। প্রকৃতপক্ষে 'আনসেন্সরড' ছবির রস তাঁদেরও পেয়ে বসেছিল। তাঁদের বিভ্রান্তি সমগ্র উৎসবকে তথা চলচ্চিত্র-শিল্পকে বিভ্রান্ত করার দিকে নিয়ে গেছে। প্রথমবার 'বাই সাইকেল থিফ', 'ফল অব বার্লিন' ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্পকে এবং দেশের যুবকদের মনে যে প্রেরণা ও শিল্প-বোধ জাগিয়ে তুলেছিল, এবারের উৎসব তা পারে নি। • ইউরোপে মানুষের মধ্যে শূন্যতাবোধ ও টেলিভিশনের সঙ্গে চলচ্চিত্রের প্রতিযোগিতার দরুণ চলচ্চিত্রকে যৌনদৃশ্যের চমকে বাঁচবার চেষ্টা করতে হচ্ছে। এখানে জীবন-সমস্যা ও দৃষ্টিভঙ্গী স্বতন্ত্র। একথা মনে রেখে উৎসব কমিটী কাজ করলে---নিম্নমানের ছবি সত্ত্বেও এই উৎসবের একটা দিকনির্দেশ পাওয়া যেতো, যা চলচ্চিত্র-শিল্পের পক্ষে এবং বলিষ্ঠ দর্শকমন তৈরির সহায়ক হতো।

---সুজন।

'THE CHALK GARDEN' (…)

● ডোরিন কার মেট্রোর 'চক গার্ডেন' ছবিতে।

চিত্র আলোচনা

মহালগ্ন

(দীপ্তি ফিল্মস : কনক মুখার্জী)

ছবিটি নিবেদন করা হয়েছে তাঁদের উদ্দেশ্যে---যাঁরা যুক্তিতর্ক বা বাস্তবতার প্রশ্ন না তুলে আনন্দ লাভ করতে চান। প্রারম্ভে একথা জানিয়ে দেওয়ার মধ্যে প্রযোজক

'THE CHALK GARDEN' (…)

● সিস হায়লে মিল 'চক গার্ডেন' ছবিতে।

পরিচালকের একটা স্বীকৃতি রয়েছে। এই স্বীকৃতি অনুসারে 'মহালগ্ন'র গঠন-রীতি, চলচ্চিত্র হিসাবে উৎকর্ষের অথবা বাস্তবতার প্রশ্ন ওঠে না, এখানে গল্পই প্রধান। একটি ভাবপ্রবণ গল্পের চিত্র। এই গল্প স্নেহ, প্রেম ও ধর্মবিশ্বাসের উপাদানে গ্রামজীবনের পটভূমিতে গড়া। কাহিনীকার ও চিত্রনির্মাতার উদ্দেশ্য পারিবারিক জীবনের মঙ্গলের দিকটাকে তুলে ধরা। আজকের দিনের ভাঙনের মধ্যে স্নেহ-প্রীতির এই কাহিনী দর্শকের মনে একটা মঙ্গলের বাণী পৌঁছে দেবে।

অপুত্রক আশু ডাক্তার ও তাঁর স্ত্রী আশা অনাথ আলোকে ভাগ্নে পরিচয় দিয়ে সন্তানের মত মানুষ করেছিল। আলোকে তাঁদের বাড়িতে আশ্রয় দেবার পর এক কন্যাসন্তানও তাঁরা লাভ করেছিলেন। গ্রামের মানুষের উপকার করে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করে হাসি-আনন্দে বন্ধনহীন আলোর দিন কাটে। একদা এক বৃদ্ধের তরুণী ভার্যা গ্রহণের বিরোধিতা করতে গিয়ে তার জের-স্বরূপ পাত্রীকে বিয়ে করতে হয় তার মামার আদেশে। এমনি হাসি-খেলায় একদিন বিষাদের ছায়া নেমে এলো মণিমাসীর আগমনে। আলো নিরুদ্দেশ হলো। হারানো আলোকে ফিরে পাবার জন্য আশু ডাক্তার ও আশা অস্থির হয়ে উঠলো। তারপরে কি করে আলোকে ফিরে পেয়েছিল সে ঘটনা ছবিতে দেখানো হয়েছে।

দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য কৌতুককর প্রেমের দৃশ্য, সঙ্গীত এবং বিবিধ রস প্রয়োগ করা হয়েছে। অভিনয়াংশে আছেন বিকাশ রায়, সন্ধ্যারাণী, অনুপকুমার, কল্যাণী ঘোষ, সুমিতা সান্যাল, পাহাড়ী সান্যাল, রেণুকা রায়, ভানু ব্যানার্জী, বাসবী নন্দী, সুখেন দাস, তরুণকুমার, দেবজিৎ প্রমুখ।

কনক মুখার্জি রচিত পরিচালিত দীপ্তি ফিল্মসের 'মহালগ্ন' ছবির অন্যতম নায়িকা কল্যাণী ঘোষ।

চলচ্চিত্র উৎসবে সমাজতান্ত্রিক দেশের দুটি ছবি

গত সপ্তাহে আটটি ছবি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই সপ্তাহে কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশের দুটি ছবি নিয়ে আলোচনা করছি। এই দুটি ছবি ওয়াজদার 'ইনোসেন্ট সোরসেরার্স' (পোল্যাণ্ড) এবং 'দ্যাট ক্যাট' (চেকোশ্লোভাকিয়া)।

ওয়াজদার পূর্ববর্তী ছবিগুলিতে একটা রাজনৈতিক পটভূমির পরিচয় পাওয়া যেতো। 'ইনোসেন্ট সোর-সেরার্স' সেদিক থেকে কোন পরিচয় প্রকাশ করে না। পশ্চিম ইউরোপের চলচ্চিত্রে নরনারীর সাক্ষাতের ঘটনা মাত্রই যেখানে বিবস্ত্র হয়ে শয্যা গ্রহণের দিকে চলেছে সেখানে ওয়াজদার ছবি ব্যতিক্রম। এখানে সংযম ও শালীনতায় তিনি এক নতুন যুব-সমাজের চিত্র উপস্থিত করেছেন। পশ্চিম আর পূর্বের চিন্তাধারার তফাৎ এখানে পরিস্ফুট। প্রাণবন্ত নায়ক খেলার দলের ডাক্তার, অবসর সময়ে সখের জাজ-বাদক। এই তরুণের হৃদয়ে সাড়া জাগাবার চেষ্টা মেয়েরা করে, কিন্তু সে তাদের এড়িয়ে চলে। একদিন সন্ধ্যায় এক তরুণীর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। তরুণী শেষ ট্রেন

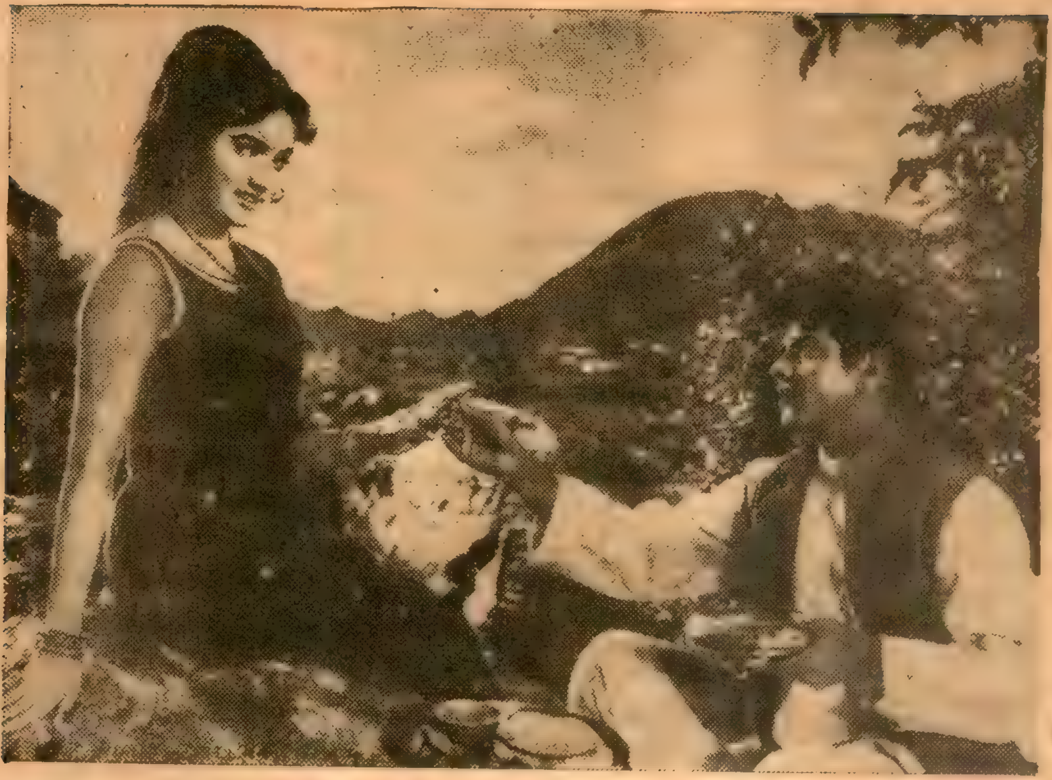

ভি, শান্তারাম প্রযোজিত 'গীত গায়া পাথরোনে' ছবিতে নবাগত জীতেন্দ্র ও শান্তারাম-জয়শ্রী কন্যা রাজশ্রী

ধরতে না পারায় বাধ্য হয়ে নায়কের ঘরে আশ্রয় নেয়। কথা হয়, হাল্কা-ভাবে কথাবার্তায়, খেলায় রাত কাটাবে।

শেষ রাতের দিকে তরুণী ঘুমিয়ে পড়ে। ডাক্তার বেরিয়ে যায় তার বন্ধুদের কাছে, যারা রাত্রে বাড়ি ফিরতে না পেরে হৈ-হুল্লোড় করে রাত কাটাচ্ছে। ফিরে এসে দেখে, তরুণী নেই। ছুটোছুটি করে পথে ও স্টেশনে অনেক খোঁজ করে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে দেখে তরুণী ঘরে আছে। বিদায়-মুহূর্তে যেমন ডাক্তার অনুভব করে তার হৃদয়ে প্রেমের অনুভূতি, তেমনি মেয়েটিও। কিন্তু কেউ কাউকে সেকথা জানায় না।

কাব্যধর্মী এই ছবিতে রাত কাটাবার জন্য দেশলাইয়ের বাক্স নিয়ে এক বাজীর খেলায় তরুণীর বস্ত্র খুলে ফেলার এবং স্কার্টের ওপরে টার্কিস টাওয়েল পরিয়ে সাসপেন্স সৃষ্টি করার কৌশল অপূর্ব। এখানে ঘটনা বিন্যাসে পরিচালক অদ্ভুত মাত্রাজ্ঞান ও সংযমের পরিচয় দিয়েছেন।

চেকোশ্লোভাকিয়ার ছবি 'দ্যাট ক্যাট' রূপক গল্পে বাস্তবকে দেখানো হয়েছে। পরিচালক ভি জাসনি ছেলেদের এক স্কুলকে কেন্দ্র করে কাহিনী গড়ে তুলেছেন। স্কুলমাস্টার রবার্ট ছাত্রদের বড় প্রিয়। একদিন তিনি বৃদ্ধ অলিভকে ডেকে আনলেন ছাত্রদের গল্প শোনাবার জন্য। অলিভ এখন ভ্রমণকারীদের গাইড। একদিন সে সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করেছিল। সে ছাত্রদের ডায়না এবং চশমায় চোখ ঢাকা তার যাদু বিড়ালের গল্প শোনালো।

একদিন শহরে এক যাদুকর এলো, তার সঙ্গে সুন্দরী ডায়না এবং যাদু বিড়াল। সন্ধ্যায় যাদুকর খেলা দেখিয়ে সবাইকে বিস্মিত করে স্কুলের হেডমাস্টার, রেস্টুরেণ্টের ম্যানেজার এবং রবার্টের বান্ধবীর আসল পরিচয় প্রকাশ করে দিল। এবার ডায়নার দড়ির খেলায় যেই সে বিড়ালের চোখ থেকে কালো চশমা খুলে নিল, সঙ্গে সঙ্গে প্রেমিকরা সব লাল হলো, মিথ্যাবাদী আর ভণ্ডরা পিঙ্গল, চোরেরা নীল। বিড়ালের দৃষ্টিপাতে সকলের পরিচয় প্রকাশ হয়ে গেল। এদের মধ্যে হেডমাস্টারকে দেখা গেল ভণ্ড, রেস্টুরেণ্ট ম্যানেজার অসাধু, এ রকম আরো অনেকে।

এই রূপক চিত্রে পরিচালক সমাজতান্ত্রিক দেশে সমাজের মধ্যে ভণ্ড, মিথ্যাবাদী ও চোরেরা যে লুকিয়ে আছে তাদের মুখোস খুলে দিয়ে সমাজকে সতর্ক করতে চেয়েছেন। ছবিটিতে রঙ ব্যবহারে যেমন বাহাদুরী আছে, তেমনি এর চিত্র-গঠনরীতি। তবে কিছুটা দীর্ঘ।

সমাজতান্ত্রিক দেশের আরো কয়েকটি ছবি দেখানো হয়েছে, কিন্তু কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থার দরুণ আমরা

সে সব ছবি দেখতে পারি নি। শোনা গেছে 'দি টেল অব ডন' (রাশিয়া), জানোসিক (চেকোশ্লোভাকিয়া), মিলিটারী ব্যাণ্ড (বুলগারিয়া) ইত্যাদি ভাল ছবি। সে ছবিগুলি দেখতে না পারলেও দুই দুনিয়ার ছবির মধ্যে তফাৎ আমরা লক্ষ্য করতে পেরেছি।' ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে একদিকে মানুষের মধ্যে নৈরাশ্যবোধ থেকে সিনিক চিন্তাধারা এবং অনাসক্তি কাটিয়ে দর্শক আকৃষ্ট করার জন্য যেমন বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যাবার প্রেরণা রয়েছে, অন্যদিকে টেলিভিশনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় উৎরোবার জন্য উগ্র জারক রস হিসাবে নগ্নতার অবতারণা। এই নগ্নতা দর্শকমনকে হীনতার দিকেই টানছে। আর সমাজতান্ত্রিক দেশের ছবিগুলি এদিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। সেখানে মানবিকতা ও সুস্থ প্রেমের বোধে ছবিগুলি উজ্জ্বল। ধনতান্ত্রিক দেশের হয়েও এদিক থেকে জাপানী ছবিগুলির মধ্যেও সমাজচেতনা দেখা যায়।

নাটকের কথা

নাট্যমঞ্চে নতুন নাটক

মিনার্ভা থিয়েটারে নতুন নাটকের মহড়া সুরু হয়েছে। বর্তমান নাটক 'ওথেলো'র পর লিটল থিয়েটারের নতুন নাটক 'কল্লোল' মঞ্চস্থ হবে। ভারতের নৌ-বিদ্রোহের ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করে নাটকটি লিখেছেন উৎপল দত্ত। এই নাটকে মঞ্চ কলা-কৌশলের দিক থেকে এবং আলোক-সম্পাতে এমন কিছু নতুনত্ব আশা করা যায়, যা ভারতের মঞ্চে ইতিপূর্বে দেখা যায় নি। বিভিন্ন ভূমিকায় লিটল থিয়েটারের শিল্পীদের সঙ্গে শেখর চট্টোপাধ্যায়কে একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় দেখা যাবে।

স্টারেও নতুন নাটকের মহড়া চলেছে। এখানে বিমল মিত্র রচিত 'একক দশক শতক' উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছেন দেবনারায়ণ গুপ্ত। পরিচালনার দায়িত্ব তিনিই গ্রহণ করেছেন। স্টার থিয়েটারের বর্তমান শিল্পীদের সঙ্গে নতুন যোগ দিয়েছেন নীলিমা দাস। মিনার্ভা ছেড়ে এখন থেকে তিনি স্টার থিয়েটারে অভিনয় করবেন।

সংবাদবন্যা

সংযুক্ত আরবায় চলচ্চিত্র উৎসব

মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে কলকাতায় সংযুক্ত আরবের এক চলচ্চিত্র উৎসব হবে। এই উৎসবে সংযুক্ত আরবের কয়েকটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র ও স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি দেখানো হবে।

রিচার্ড এ্যাটেনবরো

বৃটেনের রিচার্ড এ্যাটেনবরো বৃটিশ ফিল্ম ক্রিটিকস গিল্ড কর্তৃক ১৯৬৪ সালের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র অভিনেতা নির্বাচিত হয়েছেন। রিচার্ড এ্যাটেনবরো ভারতে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে উপস্থিত ছিলেন এবং

মঙ্গল চক্রবর্তী পরিচালিত 'দিনান্তের আলো' ছবিতে কালী ব্যানার্জি ও সাবিত্রী চ্যাটার্জি

● কিয়েভের সেবচেঙ্কো থিয়েটারে সোভিয়েট ব্যালে 'স্পার্টাকাস'-এর একটি দৃশ্য।

মহাত্মা গান্ধীর জীবনীচিত্র নির্মাণ উপলক্ষে তিনি বর্তমানে ভারতে আছেন।

'অস্কার' পুরস্কার কে পাবে

এবার 'অস্কার' পুরস্কারের ব্যাপারে হলিউডের প্রায় ছ'জন তারকার নাম নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। তাঁদের মধ্যে পেটার সেলার্স-এর নামটা বেশি শোনা যাচ্ছে। নিউ ইয়র্কের ফিল্ম ক্রিটিকরা 'মাই ফেয়ার লেডি' ছবিকে ১৯৬৪ সালের শ্রেষ্ঠ ছবি বিবেচনা করেছেন।

চলচ্চিত্রে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার

প্রকাশ, এবার থেকে ভারত সরকারের চলচ্চিত্র পুরস্কার অনুষ্ঠান দিল্লীর পরিবর্তে ফিল্ম কেন্দ্র সম্পন্ন শহরে হবে। তদনুসারে এবারের উৎসব মে মাসে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত হবে।

● পতি সংশোধনী ছবিতে ভানু ব্যানার্জী

ভারতে সোভিয়েট ব্যালে শিল্পিদল

সোভিয়েট ব্যালের একটি দল সম্প্রতি ভারত সফর করছেন। চলচ্চিত্র উৎসবের হৈ-চৈ'তে কলকাতায় তাঁদের কথা বেশি শোনা না গেলেও ইতিমধ্যে তাঁরা জয়পুর, মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ, বোম্বাই সফর শেষ করে, দিল্লী হয়ে লক্ষ্ণৌ ও পাটনায় ব্যালে নৃত্য প্রদর্শন করেছেন। এই দলে আছেন কিরভ অপেরার ও লেনিনগ্রাডের ব্যালে থিয়েটারের প্রাইমা ব্যালেরিনা নিনা প্রেট্রোভা, লেনিনগ্রাড ব্যালে স্কুলের সঙ্গীতশিল্পী এনাটোলি নিশেভচ্, উক্রানির প্রজাতন্ত্রের খ্যাত শিল্পী বারবারা পাট্রাপোভা, নেলি বাসিরোভা, আজাদ গারিবায়ান প্রমুখ ২৪ জন।

এই ব্যালে দল 'সোয়ানলেক' ও 'বুাইও গার্ল' ব্যালের অংশবিশেষ এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের লোক-নৃত্য প্রদর্শন করেছেন। এই সফরে তাঁরা ভারতীয় নৃত্য সম্পর্কেও জ্ঞান অর্জন করেছেন। তাঁরা ভারত নাট্যম্, কথাকলি, কথক, মণিপুরী এবং ভারতীয় লোকনৃত্য দেখেছেন। এই সাংস্কৃতিক দলের নেত্রী মিসেস জাজনৎসেবা।

বৈতানিকের রবীন্দ্র-নাট্যোৎসব

বৈতানিক গোষ্ঠী একাডেমি অফ ফাইন আর্টস হলে আগামী ১৪ই থেকে ১৭ই ফেব্রুয়ারী—কালমৃগয়া, ন্যাবরে-চৌরী, চিরকুমার সভা, তাসের দেশ ও বিনি পয়সার ভোজ—এই ক'টি নাটক পরিবেশন করছেন। চারদিনব্যাপী রবীন্দ্র-নাটক পরিবেশনের ব্যাপারে এটি তাঁদের দ্বিতীয় প্রয়াস। এই নাট্যোৎসবে নানা ভূমিকায় অংশগ্রহণ করছেন প্রায় শতাধিক শিল্পী।

সংগীত কথা

লোকশিল্পী অনন্ত দাস

অবহেলিত ও অনাদৃত প্রকৃত গ্রাম্য সঙ্গীতশিল্পীদের মধ্যে ঢাকা জেলার কালাবাহিল্যা গ্রামের অনন্ত দাস অন্যতম। অনন্ত দাসের মা হলেন সুপরিচিতা গ্রাম্য প্রবীণ গায়িকা মঞ্জুরী ক্ষেপী (বৈষ্ণবী)। বাল্যকাল থেকেই অনন্তের সঙ্গীত-প্রতিভার স্ফুরণ লক্ষণীয়। মাত্র ন' বছর বয়সের এই বালকের কণ্ঠস্বর একদিন গাঁয়ের সকলকে চমক লাগিয়ে দিয়েছিল। মায়ের কণ্ঠের প্রায় সব গানই অতি সহজে এই বালক অনুকরণ করে গাইতেন। ক্রমে বয়সের সাথে সাথে অনন্ত দাস দোতারা বাজিয়ে গাইতে সুরু করেন। অল্পদিনের মধ্যেই অনন্ত দোতারায় পারদর্শী হয়ে উঠলেন।

ঢাকা ও ফরিদপুর অঞ্চলের বহু প্রাচীন লোকগীতি সংগ্রহ করেছেন এবং কিছু কিছু গানও তিনি নিজে রচনা করেছেন। তবে যে পল্লীগীতি-গুলি অনন্ত দাস প্রায়ই গেয়ে থাকেন তা হ'ল তাঁর মা মঞ্জুরী ক্ষেপীর রচনা।

● অনন্ত দাস

অনন্ত দাসের অধিকাংশ গান-গুলিই হ'ল দেহতত্ত্বমূলক ও বাউল শ্রেণীর। তাঁর একটি গানে দীনবন্ধু অর্থাৎ ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণের চিত্রটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। যেমন:

দিন থাকিতে দীনবন্ধু রে,
দীনের কথা বলে রাখি,
আমার ফুরাবে যেদিন
আসবে সেদিন রে,
আমায় সেই দিনে দিও না ফাঁকি ॥

অনন্ত দাসের আর একটি গানেও গুরুবাদের সঙ্গে দেহতত্ত্বের কথা চমৎকারভাবে প্রকাশ পেয়েছে। যেমন:

আবাদ হল না দেহজমি,
রিপুর বশে সে যে সদাই
করছে আমি আমি!
ষড়রিপু লাঙল কর।
প্রেমিক গুরু চাষী ধর।
রাধা মন্ত্র বীজ ধরিয়া
বোন্ গা রে তুই ভূমি ॥

বাউল গানের এই গুরুবাদের কথা খুব স্পষ্ট ও সোজাসুজিভাবে ধরা পড়েছে অনন্ত দাসের সংগৃহীত আরো একটি গানে। যেমন:

অতলে তলিয়ে যেয়ে
গুরুকে ডাক,
গুরু প্রেম সিন্ধুনীরে
ডুবিয়ে থাক।
শীতল হবে দগ্ধ হিয়া
দেখবে রে মন ডুবটি দিয়া,
রতনমাণিক লও খুঁজিয়া,
সেই ভূষণে অঙ্গ ঢাক ॥

অনন্ত দাসের এই ধরণের সংগৃহীত ও রচিত কিছু কিছু গান আছে, যা এক-একটি বাংলা লোকসাহিত্যের রত্ন-বিশেষ। এতগুলি রত্নের অধিকারী যে লোকশিল্পী, তাঁরই মুখে দুমুঠো অন্ন জোটে না। অনন্ত দাসের মত আরও যেসব এই ধরণের লোক-শিল্পী আছেন, তাঁদেরকে আমাদেরই সমাজের প্রত্যেকের কাছে তুলে ধরতে হবে। যাতে তাঁরা একটু খেয়ে-পরে বাঁচতে পারেন।

—বুদ্ধদেব রায়

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

শিলাদিত্য

এলিয়ট বিশ্বাস করতেন যে, কাব্যের মাধ্যমেই নাটক স্বাভাবিকতা এবং সম্পূর্ণতা লাভ করে। থিয়েটার থেকে আমরা যা আশা করতে পারি, তার একাংশ মাত্র গদ্যনাট্য দিতে পারে—কাব্যনাট্য যে গভীরতা বা উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে, তা গদ্য-নাট্যে সম্ভব হয় না।

থিয়েটার ক্রমশ বাস্তবতার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে সুরু করেছিল—কারণ ছায়াছবির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে একথা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল 'that the stage should not compete with the film in illusion of scenery ... and event'—(Eliot). মঞ্চে জোর দেওয়া উচিত কণ্ঠস্বর, মুভমেণ্ট এবং অভিনেতার নিজস্ব করণীয় (যা ছবিতে সম্ভব নয়) সমস্ত কিছুর ওপর। এ বিষয়ে এলিয়ট বলেছেন :

'The Theatre should turn to the voice, to movement which is meant to be seen from several angles, and to things which can be done by the actor himself and which cannot be done by his pictures. And all th s points to the verse play.'

এলিয়টের বিশ্বাস ছিল যে, কবিতায় নাটক লেখার অর্থ হচ্ছে নাট্যের বিষয়বস্তুকে একটা মিউজিক্যাল প্যাটার্নের ভেতর দিয়ে দেখানো। কাব্যময়তার আধিক্যে নাটকের গতি ব্যাহত হলে, সেটা নাটকের পক্ষে দোষের কথা। নাট্যের গতিকে হতে হবে সহজ এবং অবাধ—কিন্তু এই গতির অন্তরালে এবং অন্তরে থাকা চাই একটা সঙ্গীতের লহরী—এর ফলে বহু গভীরতর অনুভূতি এবং ভাবব্যঞ্জনা (যা আপাতদৃষ্টিতে অস্ফুট) স্ফুরিত হয়ে উঠবে ঐ সুরলহরীর মাধ্যমে।

রচনার কারিগরী দিকটাতেও এলিয়ট যথেষ্ট নজর দিতেন। এ বিষয় সব সময়েই তাঁর লেখায় পরীক্ষা নিরীক্ষা করবার একটা প্রচেষ্টা থাকতো। কোন এক বিশেষ যুগের কাব্যের ফর্ম অন্য যুগের কাব্যের ফর্ম হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারবে না, এই ছিল এলিয়টের ধ্রুব বিশ্বাস।

সুতরাং আজকের দিনে অমিত্রাক্ষর ছন্দে নাটক লিখতে হলে নজর রাখতে হবে রচনায় সেক্সপীয়ারের প্রভাব যাতে না পড়ে।

ব্যাপারটা মুখে বলা যত সহজ, কাজে করা তত সহজ নয়। এ বিষয়ে এলিয়টের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই যে, যখনই তিনি কাব্যনাট্য লেখবার সময় মনের রাশে সামান্যমাত্র আলগা দিয়েছেন, অথবা মনটা ঝিমিয়ে পড়েছে বা ঠিকমত সজাগ থাকে নি---তারপরেই পূর্ণভাবে জেগে উঠে, কি লিখেছেন বিচার করে দেখতে গিয়ে আবিষ্কার করেছেন, এতক্ষণ ধরে খুব খারাপ সেক্সপীরিয়ন্ ব্ল্যাঙ্কভার্স রচনা করেছেন। ঐ ধরণের মানসিক অবস্থায় যা রচনা করেছেন তার সবটুকু বাতিল করে আবার সবটা সচেতনভাবে নতুন করে লিখতে হয়েছে।

মার্ডার ইন্ দি ক্যাথিড্রেল লেখবার আগে থেকেই কাব্যনাট্য রচনার স্পৃহা

বেকেটের ভূমিকায় রবার্ট ডোনাট

এলিয়টের মনে দেখা দিয়েছে—এর প্রমাণ পাওয়া যায় সুইনি এ্যাগোনিস্টিস্-এ ও দি রক্-এ।

১৯৩৫ সালের জুন মাসে ক্যাণ্টারবারী ফেস্টিভ্যালে অভিনীত হবার জন্য 'মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রেল' নাটকটি লেখা হয়। এটি একটি ঐতিহাসিক এবং ধর্মমূলক কাহিনীর ওপর নির্ভরশীল। নাটকটির রসগ্রহণ করতে গেলে টমাস বেকেট এবং তাঁর সময়ের ইংলণ্ডের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় থাকা দরকার। বেকেটের জীবনের ইতিহাস সম্বন্ধে স্যার উইন্স্টোন চার্চিল তাঁর A History of the English-Speaking Peoples (Vol. I) বইতে লিখেছেন : বেকেটের সঙ্গে দ্বিতীয় হেনরীর গণ্ডগোলের কাহিনীটি যেন একটি বিরাট এবং সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত জানলার মত—এই খোলা জানলা দিয়ে চাইলেই তখনকার রাজনৈতিক গগন আমাদের চোখের সামনে স্পষ্টভাবে ভেসে ওঠে, আর্চবিশপ অভ ক্যাণ্টারবারী টমাস বেকেট সেকিউলার লাইফে ছিলেন রাজা হেনরীর বিশেষভাবে অনুরক্ত প্রজা এবং অকৃত্রিম বন্ধু। স্পিরিচুয়াল লাইফে যাবার পর তাঁদের সুরু হল সঙ্ঘর্ষ—এই সঙ্ঘর্ষের কারণ অনুধাবন করতে হলে ব্যাপারটাকে ভালভাবে বুঝতে হবে। রাজা এবং তাঁর অনুগত ফিউড্যাল লর্ডসরা সেই সময়ে ধর্মের ব্যাপারে চার্চের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতেন। কিন্তু জাগতিক ব্যাপারে ধর্মযাজকদের হস্তক্ষেপের প্রচেষ্টাকে তাঁরা কিছুতেই মেনে নিতে চাইতেন না। অনেক ধনী ব্যারন মরবার ঠিক আগে পরলোক সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন হয়ে উঠতেন—ভাবতেন চার্চকে নিজের ধনসম্পত্তি দান করে পুণ্যের অঙ্কটা বাড়িয়ে নেবেন ওপারে যাবার আগে। এইভাবে ব্যারনদের ধনসম্পত্তি পেয়ে পেয়ে চার্চও ক্রমশ সমাজের সবচেয়ে বড় জমিদার ও ক্যাপিট্যালিস্ট হয়ে উঠেছিল। আর তা ছাড়া Rome used its ghostly arts upon the superstitions of almost all the actors in the drama.

এর ফলে প্রতিপদে রাষ্ট্রের ক্ষমতা বিঘ্নিত হচ্ছিল। দুটি পরস্পরবিরোধী প্রতিষ্ঠানের রেষারেষিতে রাজ্যশাসন ব্যবস্থাও যেন অচল হয়ে পড়ছিল। এ সঙ্ঘর্ষ শুধু ইংলণ্ডের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না—সারা ইউরোপেই তখন এই একই অবস্থা। উইলিয়াম দি কঙ্কারার তাঁর রাজত্বকালে কৌশল এবং আপোষ মীমাংসার দ্বারা এ বিরোধকে গজিয়ে উঠতে দেন নি। লাক্ষ্যাঙ্কের সময়ে চার্চ রাজার সঙ্গে সব কাজে সহযোগিতা করেছে। কিন্তু হেনরীর সময়ে যিনি এসে চার্চের মাথায় বসলেন—তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল বিরাট এবং অসাধারণ—এদিকে তিনি আবার ছিলেন রাজার বিশেষ বন্ধু। ধর্মযাজক হবার আগে বেকেট ছিলেন চান্সলার এবং রাজার অতিবিশ্বাসী ক্যাবিনেট মিনিস্টার। দেশী এবং বিদেশী রাজনীতির ব্যাপারে বেকেট অতীতে অত্যন্ত বিশ্বস্ত প্রজার মত রাজার স্বার্থের দিক দেখে সব কাজ করে এসেছেন। রাজা মনে মনে নিশ্চিন্ত ছিলেন যে চার্চে গিয়েও বেকেট তাঁরই নিজের লোক হিসাবে থাকবেন—সাধারণ অনুবর্তী হিসাবে নয়, অন্তরঙ্গ সঙ্গী এবং সহকর্মীরূপে। রাজার সাক্ষাৎ প্রভাব এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাতেই বেকেট আর্চবিশপের পদে মনোনীত হন।

কিন্তু মনোনয়নের সঙ্গে সঙ্গেই বেকেট তাঁর বুদ্ধি, প্রতিভা, ক্ষমতা সব কিছুকে নিয়োগ করলেন রাজার বিরুদ্ধাচরণে। ব্যক্তিগত জীবনে বেকেট চিরদিনই ছিলেন ধর্মভীরু এবং শুদ্ধাচারী। রাজকর্মচারী থাকাকালীন বেকেট জাঁকজমক এবং আড়ম্বরে সবাইকে ছাড়িয়ে যেতেন, তেমনি সন্ন্যাসজীবনে কৃচ্ছ্রসাধনের এমন একটা স্তরে নিজেকে উঠিয়ে নিয়েছিলেন, যার ফলে সাধক হিসাবে তাঁর যশ এবং খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল।

Becket pursued the same methods and ambitions in the ecclesiastical as previously he had done in the political sphere, and in both he excelled.

প্রতিপদে তিনি এখন চার্চের হয়ে রাজার বিপক্ষাচরণ করতে লাগলেন। বেকেট এরপর কিছুকাল কণ্টিন্যাণ্ট টুরে গেলেন এবং ফ্রান্স ও ইটালীতে ধর্মযাজকদের সঙ্গে নানা গোপন বৈঠকে মিলিত হয়ে নিজের কার্যপরিক্রমা ঠিক করলেন। ইংলণ্ডে ফিরে তিনি উঠে-পড়ে লাগলেন যাজকসম্প্রদায়কে রাজশক্তির ক্ষমতার এলাকার বাইরে এনে পোপের অধীনে স্বশক্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে। এর ফলেই গোলমালের সুরু—বেকেটের পূর্ববর্তী লাক্ষ্যাঙ্ক কিন্তু চিরকালই এই গোলমালকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করেছেন। উইলিয়াম দি কঙ্কারারের সময় থেকেই চার্চের ক্ষমতা খুব বেড়ে যাচ্ছিল। রাজা স্টিফেনের কাছ থেকে যাজকেরা নানাদিকে নানা সুবিধা পান এবং এ সময় চার্চের রাজনৈতিক ক্ষমতা চরমে ওঠে। হেনরী ১১৬৪ সালে কনস্টিটিউশন অভ ক্ল্যারেণ্ডন প্রকাশ করে চার্চের অনেক সুযোগ-সুবিধা কেড়ে নিলেন। এই নিয়ে বেকেটের সঙ্গে বাধল সঙ্ঘর্ষ। রাজা বেকেটকে আদেশ করলেন গ্রেট কাউন্সিলের সামনে এসে তাঁর আচরণের কৈফিয়ৎ দিতে। বেকেট জানালেন তিনি রাজাদেশ মানতে বাধ্য নন—কারণ যাজক হিসাবে তিনি হচ্ছেন পোপ এবং ঈশ্বরের আশ্রিত প্রজা এবং কৈফিয়ৎ দিতে হলে তাঁদের কাছেই দেবেন।

এরপর বেকেট ছ'বছরের জন্য ফ্রান্সে নির্বাসিতের জীবন যাপন করেন। ১১৭০ সালে টুরেনে ফ্রেটাভেলে রাজা ও বেকেটের সাক্ষাৎ ও ওপর ওপর মিটমাটের ব্যবস্থা হয়। বেকেট নিরাপদে ইংলণ্ডে ফিরে নিজের দায়িত্ব নিতে পারবেন এই

অতিপুরোহিত রাজার কাছ থেকে পান। হেনরীর সঙ্গে আর্চবিশপের শেষ দেখা হয় ১১৭০ সালের গ্রীষ্মকালে ফ্রেটভালে। স্যার উইনস্টোন লিখেছেন:

'My Lord,' said Thomas at the end, 'My heart tells me that I part from you as one whom you shall see no more in this life.' 'Do you hold me as a traitor ?' asked the king. 'That be far from thee, my Lord,' replied the Archbishop ; but he returned to Canterbury resolved to seek from the Pope unlimited powers of excommunication wherewith to discipline his ecclesiastical forces. 'The more potent and fierce the prince is,' he wrote, 'the stronger stick and harder chain is needed to bind him and keep him in order.' '[illegible] to England,' he said, 'whether to peace or to destruction I know not, but God has decreed what fait awaits me.'

বেকেট যখন ফ্রান্সে নির্বাসিত ছিলেন সেই অবসরে রাজা হেনরী তাঁর ছেলে হেনরীর সিংহাসনের উত্তরাধিকার ব্যাপারটা পাকাপোক্ত করে নেবার জন্য, তাঁর জীবিতকালেই ছেলের অভিষেক সমাধা করেন। এই উৎসবে পৌরোহিত্য করেন আর্চবিশপ অভ ইয়র্ক এবং তাঁকে সাহায্যের জন্য আরও দু'জন বিশপ উপস্থিত ছিলেন। এই ব্যাপারে বেকেট অত্যন্ত বিরক্ত হন—বেকেটের মতে এই অভিষেকের ক্ষমতা ছিল একমাত্র তাঁর নিজের এবং সেক্ষেত্রে আর্চবিশপ অভ ইয়র্ক ও তাঁর সহকারীরা নিজেদের ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করে এই কাজ করেছিলেন। হেনরী ভেবেছিলেন ফ্রেটভেলের চুক্তির পর উভয় পক্ষই আর অতীতের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। কিন্তু বেকেটের প্রকৃতি ছিল অন্য ধরণের।

বেকেট যখন নির্বাসনের পর দেশে ফিরলেন, তখন সর্বত্র তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হোল। ক্যান্টারবেরীর যাজকের দল এমনভাবে তাঁকে গ্রহণ করলেন, যেন তিনি সত্যি সত্যিই একজন দেবদূত।

বেকেট তাঁর ভাষণে বললেন, 'I am come to die among you.. In this church there are martyrs, and God will soon incre se their number.'

রাজকুমার হেনরীর অভিষেকে যে-সব যাজক অংশ গ্রহণ করেছিলেন, বেকেট প্রথমেই তাঁদের এক্সকমিউনিকেট অর্থাৎ ধর্মসম্প্রদায় থেকে বহিষ্কৃত করলেন। রাজা হেনরী এই সময়টায় ছিলেন নরম্যাণ্ডিতে। ঐসব যাজকেরা দলবল নিয়ে ছুটলেন রাজার সঙ্গে দেখা করতে। রাজার কাছে ব্যাপারটা অত্যন্ত অতিরঞ্জিতভাবে বলা হোল। চার্চিল লিখেছেন:

"They told a tale not only of an ecclesiastical challenge, but of actual revolt and a usurpation. They said that the Archbishop was ready 'to tear the crown from the young king's head."

রাজা হেনরীকে যখন এ সংবাদ শোনানো হোল, সে সময়টায় তিনি তাঁর নাইটস এবং রাজ্যের সব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের দ্বারা পরিবৃত অবস্থায় ছিলেন—হেনরী ছিলেন আবেগপ্রবণ লোক—একথা শোনামাত্র রাগে তাঁর গা জ্বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে উঠলেন—

—"What a pack of fools and cowards, I have nourished in my house, that not one of them will avenge me of this turbulent priest!' Another version says 'of this upstart clerk.'

তখনই এক সভা আহূত হোল—কিভাবে এই ব্যাপারে রাজার সর্বময় অধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যায় তারই উপায় নির্ধারণে নিযুক্ত হল এই সভা। তবে এ কথাও সবাই মনে মনে বুঝতে পারলেন যে, স্টেট ও চার্চের মধ্যে কোন ভয়াবহ সংঘর্ষের সৃষ্টি হওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না।

এদিকে ব্যাপার আরেক পথে গড়াল। চারজন নাইট হেনরীর আত্মবিস্মৃত অবস্থায় বেকেট সম্পর্কে যে উক্তি করেছিলেন—তার দ্বারা উত্তেজিত হয়ে চ্যানেল পার হয়ে সেখান থেকে ঘোড়ায় চড়ে সরাসরি ক্যান্টারবেরীতে গিয়ে হাজির। ক্যাথিড্রালে আর্চবিশপ বেকেটের সঙ্গে দেখা—তারিখটা ছিল ২৯শে ডিসেম্বর ১১৭০।

এইবার চার্চিলের ভাষায় বেকেটের মৃত্যুকাহিনীর বর্ণনা দিচ্ছি—

'The scene and the tragedy are famous. He confronted them with cross and mitre (বিশপের বা টুপি), fearless and resolute in warlike action, a master of the histrionic arts. After haggard parleys they fell upon him, cut him down, with their swords, and left him bleeding like Julius Caesar, with a score of wounds to cry for vengeance.

The tragedy was fatal to the King. The murder of one of the foremost of God's servants, like the breaking a feudal oath, struck at the heart of the age. All England was filled with terror. They acclaimed the dead Archbishop as a martyr, and immediately it appeared that his relics healed incurable diseases, and robes that he had worn by their mere touch relieved minor ailments. Here indeed was a crime, vast and inexpiable. When Henry heard the apalling news he was prostrated with grief and fear. All the elaborate process of law which he had sought to set foot on against this rival power was brushed aside by a brutal bloody act ; and though he had never dreamed that such a deed would be done there were his own hot words spoken before so many witnesses to fasten on him, for that age at least, the guilt of murder, and, still worse, sacrilege.

খেলা ধূলা

পূর্বাঞ্চল, পশ্চিমাঞ্চল দলের বিরুদ্ধে ফিল্ডিং করতে যাচ্ছেন

দুই হেলেনের যুদ্ধ

শ্রীঅমিতাভ

টেনিসের ইতিহাসে দুটি মেয়ের নাম অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। নামের দিক দিয়ে অদ্ভুত মিল; কিন্তু মনের দিক দিয়ে তাদের একটুও মিল ছিল না। মেয়ে দুটি একই স্কুলে পড়ত, একই ক্লাবে খেলত, একই জায়গায় তাদের বাড়ি, দুজনেই উইম্বলডেন এবং আমেরিকান চ্যাম্পিয়ান হবার সম্মান লাভ করেছিল কিন্তু এত মিল থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে প্রকৃত কোন বন্ধুত্ব ছিল না। দীর্ঘ দশ বছর আন্তর্জাতিক টেনিস-এ এরা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে—খেলার শেষে সৌজন্যমূলক হাতে হাত মিলিয়েছে কিন্তু ঈর্ষা এদের পরস্পরকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। হেলেন উইল্‌স এবং হেলেন জেকবস এই দুই আমেরিকান মহিলা টেনিস খেলোয়াড়কে কেন্দ্র করে বহু সমালোচনার তুফান উঠেছিল অতীতে।

মিস উইলস মিস জেকবের চেয়ে বয়সে দু'বছরের বড়। ১৭ বছর বয়সেই উইলস হলেন আমেরিকান চ্যাম্পিয়ান। জেকবের বয়স তখন পনের। তার খেলায় যথেষ্ট প্রতিভার ইঙ্গিত থাকায় স্থানীয় ক্লাব নতুন আমেরিকার চ্যাম্পিয়ান উইলসের সঙ্গে তার অনুশীলনী খেলার সুযোগ করে দিল। উইলস প্রথম থেকেই জেকবকে বিদ্বেষের চোখে দেখলেন। নির্মম ভাবে তিনি হারিয়ে দিলেন নতুন মেয়েটিকে। নতুন মেয়েটি মাথা নিচু করে বাড়ি ফিরে গেল; তবে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে গেল—এই অপমানের প্রতিশোধ সে নেবে।

ঠিক দশ বছর পরের ঘটনা, সালটা ১৯৩৩—ফরেস্ট হিল-এ আমেরিকান চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইন্যালে উঠেছেন ২৫ বছরের যুবতী মিস হেলেন জেকব বিপক্ষে তাঁর ২৭ বছরের মিসেস হেলেন মুডী, যিনি ছিলেন উইলস। সকলের ধারণা মিসেস মুডী অনায়াসে জয়ী হবেন। এই সময় জেকবের চোখের সামনে ভেসে উঠল স্কুল-জীবনের সেই অপমানকর খেলা। জেকব মাঠে নামলেন মুখে একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ, প্রতিশোধ নেবার একটা অদম্য সঙ্কল্প।

মিস জেকব প্রথম থেকেই আক্রমণাত্মক খেলার সূত্রপাত করলেন, আর ৩-১ গেমে প্রথম সেটে অগ্রগামী হলেন। তাঁর আক্রমণাত্মক খেলা বেশ ফলদায়ক হচ্ছিল। কিন্তু এই সময় অভিজ্ঞ এবং দক্ষ খেলোয়াড় মিসেস মুডী নিখুঁত ড্রাইভ মার মারতে লাগলেন, আর বলগুলিকে নেট ঘেঁষে কোর্টের দূরপ্রান্তে পাঠাতে লাগলেন। ফলে মিস জেকবের নেটের কাছে ঘুরিয়ে দিলেন। যাই হোক, প্রথম সেট দাঁড়িয়ে ভলির সাহায্যে পয়েন্ট সংগ্রহ করা সম্ভব হল না। দেখতে দেখতে মিসেস মুডী খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। যাই হোক প্রথম সেট জেকব জিতলেন ৮-৬ গেমে। এর পর মিসেস মুডী দুরন্ত গতিতে খেলা চালিয়ে ২য় সেটটি ৬-৩ গেমে দখল করলেন।

দর্শকরা ভাবল মিস জেকবের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী অলক্ষ্যে হেসেছিলেন। ৩য় সেটে মিস জেকবের খেলা খুলে গেল, তিনি পর পর তিনটি গেম জিতলেন। সাত বছরের অপরাজিত মহিলা খেলোয়াড় মিসেস মুডীর প্রথম পরাজয় আসন্ন। জেকবের মনে অদ্ভুত আনন্দ ও আত্মপ্রত্যয়। ৪র্থ গেমে তিনি পিছন ফিরে বল-বয়দের কাছে বল চাইলেন, কিন্তু তারা ভ্রূক্ষেপ করল না। তিনি অবাক হয়ে পিছনে ফিরে তাকালেন। দেখলেন মিসেস মুডী আম্পায়ারের কাছ থেকে সোয়েটার চেয়ে নিচ্ছেন। তিনি খেলা থেকে অবসর নিলেন। যদিও মিসেস জেকব বিজয়িনী হলেন, কিন্তু তাতে পরিপূর্ণ বিজয়ের গৌরব রইল না। সরাসরি পরাজয়ের হাত এড়ানোর জন্যে মিসেস মুডী অসুস্থতার অজুহাতে পশ্চাৎ অপসরণ করলেন।

হেলেন উইলস মুডী

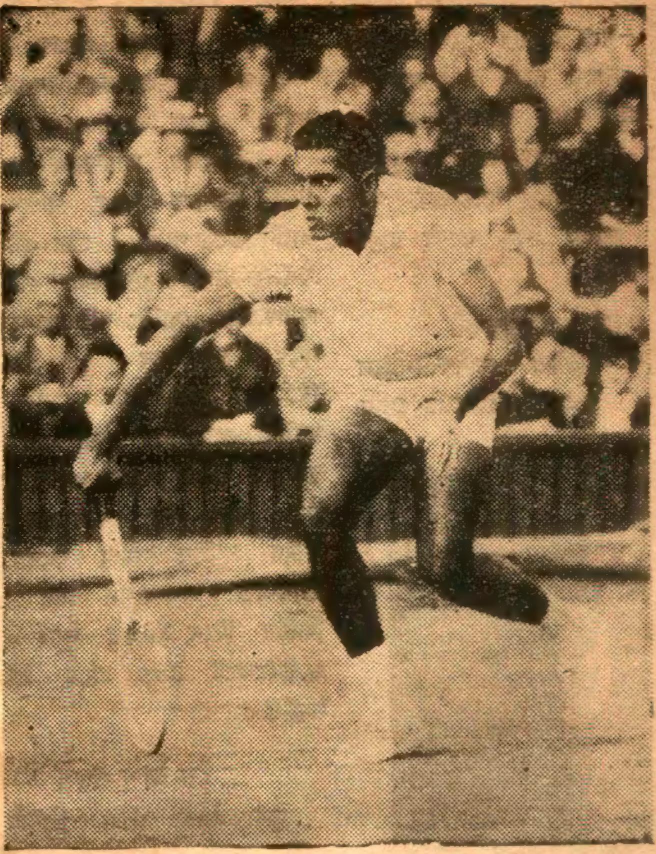

● জয়দীপ মুখার্জি

মিসেস মুডীর এই প্রথম পরাজয় মিস জেকবের হাতে।

এরপর উইম্বলডনের ক্রীড়াঙ্গনে চারবার এই দুই হেলেনের সংঘাত হয়েছে। আর চারবারই ফাইন্যালে মিসেস মুডী জয়ী হয়েছেন। মিসেস মুডী মোট আটবার উইম্বলডেন বিজয়ী হয়ে এক অপূর্ব নজীর সৃষ্টি করেছেন। একই শহরের, একই কলেজের, একই ক্লাবের খেলোয়াড় হয়েও তাঁরা কোনদিন বন্ধু হতে পারে নি। দুই হেলেনের নামে, আচারে-ব্যবহারে, শিক্ষায়-দীক্ষায়, খেলাধুলায় বহু মিল থাকা সত্ত্বেও তাঁদের গরমিল আর ঘুচল না।

বিশ্ব রেকর্ড

অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়ার দূর পাল্লার দৌড়বীর রন ক্লার্ক নিজের প্রতিষ্ঠিত ৫০০০ মিটারে বিশ্ব রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন। নিউজিল্যাণ্ডের অকল্যাণ্ডে ওয়েস্টার্ন স্প্রিং ট্র্যাকে ১৩ মিঃ ৩৩'৬ সেকেণ্ডে ৫০০০ মিটারের দূরত্ব অতিক্রম করে নতুন রেকর্ডটি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। গত ১৩ মাসের মধ্যে রন ক্লার্ক ৬ মাইল, ৩ মাইল এবং ১০০০০ মিটার দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ড ভঙ্গ করার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

নিউ ইয়র্কের ফোর্ড হ্যাম

● অজিত ওয়াদেকার

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ১৯ বছর বয়স্ক তরুণ সাম পেরী প্রায় অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। বর্তমান বিশ্বের দ্রুততম দৌড়বীর বব হেসের প্রতিষ্ঠিত ৬০ গজের বিশ্ব রেকর্ড সাম পেরী স্পর্শ করেছেন ৫'৯ সেকেণ্ডে দূরত্ব অতিক্রম করে। পেরী কয়েকদিন পূর্বে এ সময়ে সমান দূরত্ব অতিক্রম করেন ইওের কেল্ ট্র্যাকে। বব হেস এবার অলিম্পিকে ১০০ মিটারে স্বর্ণপদক লাভ করেছেন। পেরী মাংসপেশীর যন্ত্রণার জন্য অলিম্পিকের ট্রায়ালে অবতীর্ণ হতে পারে নি। বব হেস বর্তমানে পেশাদারত্ব গ্রহণ করেছেন, ফলে সাম পেরীর এখন প্রতিষ্ঠিত হবার সুবর্ণ সুযোগ।

•

ফুটবল জগতের কলঙ্ক

জেমস গাউল্ড বিশ্বাসঘাতকতা করেও নিষ্কৃতি পেলেন না। অন্যান্য দোষীদের সঙ্গে বিচারে তাঁরও হল চারবছর কারাবাস এবং পাঁচ হাজার পাউণ্ড দণ্ড। ইংলণ্ড পেশাদার ফুটবলে গড়াপেটা খেলার ষড়যন্ত্রের নায়ক হলেন এই জেমস গাউল্ড। গাউল্ডের জন্য একসময় এভার্টন চোদ্দ হাজার পাউণ্ড দল বদলের মূল্য দিয়েছিল। এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে প্রায় দশজনেরও বেশি খ্যাতনামা খেলোয়াড় লিপ্ত ছিলেন। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৩ সালের মধ্যে গাউল্ডের দল প্রায় চোদ্দটি খেলার ভাগ্য পূর্বেই নির্ধারিত করেছিল। ষড়যন্ত্রের নায়ক গাউল্ড স্বীকার করেছেন যে, তিনি অন্যান্য সকলকে টাকার ভাগ দেবার পর নিজে পেয়েছেন তিন হাজার দুশো পঁচাত্তর পাউণ্ড।

শেষে ষড়যন্ত্রের নায়ক গাউল্ড

স্বয়ং বিশ্বাসঘাতকতা করলেন অর্থের লোভে। সাত হাজার দুশো চল্লিশ পাউণ্ডের লোভে তিনি সমস্ত কাহিনী সংবাদপত্রের কাছে প্রকাশ করলেন। এরই ফলে সকলকে বিচারের সম্মুখীন হতে হল এবং সকলেরই হল শাস্তি। আরও ৩৯ জনের সম্বন্ধে অনুসন্ধান চলছে।

ইডেনের ক্রিকেট

দলীপ ট্রফির সেমিফাইন্যালে পশ্চিমাঞ্চল এবং পূর্বাঞ্চলের খেলা

● হাওড়া জুট মিলস স্পোর্টসে ভাষণরত অশোক সেন।

অনুষ্ঠিত হল ইডেন উদ্যানে। এই সংবাদ যখন প্রস্তুত করছি তখন মাত্র প্রথম দিনের খেলা শেষ হয়েছে। এবার পূর্বাঞ্চল দলে কয়েকজন তরুণ খেলোয়াড়কে সুযোগ দেওয়া হয়েছে দেখে ক্রীড়ামোদীরা সত্যই আনন্দিত। কারণ, এখন কয়েকজন প্রবীণ খেলোয়াড়ের অবসর গ্রহণ করে তরুণদের সুযোগ দেওয়া উচিত। পূর্বাঞ্চল দলে দু-একজন স্পিন বোলারকে দলভুক্ত করলে হয়ত ভাল হত।

পূর্বাঞ্চলের অধিনায়ক পঙ্কজ রায় টসে জয়লাভ করে পশ্চিমাঞ্চলকে ব্যাট করতে পাঠান। তাঁর এই সিদ্ধান্ত ফলপ্রসূ হয় না। প্রথম দিনে পশ্চিমাঞ্চল পূর্বাঞ্চলের বোলিং শক্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে অনায়াসে ৩ উইকেটের বিনিময়ে ৪১৬ রান সংগ্রহ করে। অজিত ওয়াদেকার সুন্দর এবং সাবলীল ভঙ্গীতে খেলে সংগ্রহ করেন ব্যক্তিগত ২২৮ রান এবং ভোঁসলেও শতরান করার কৃতিত্ব অর্জন করেন, তাঁর ব্যক্তিগত রান-সংখ্যা হয় ১১০। দ্বিতীয় দিনে লাঞ্চের পূর্বে বোরদে ৬ উইকেটে ৪৯৩ রানে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

রোভার্স কাপ

কলকাতার সেরা তিনটি দল মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং বি এন রেল রোভার্সের আসরে প্রথম বাধা অতিক্রম করেছে। মহামেডান স্পোর্টিং কোয়ার্টার ফাইন্যালে প্রথম দিনে খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করার পর ফিরতি খেলায় মাদ্রাজের ইণ্ট্রিগাল কোচ ফ্যাক্টরীর কাছে ২-১ গোলে পরাজয় স্বীকার করে।

এবারের ডুরাণ্ড বিজয়ী মোহন-বাগান প্রথম খেলায় সেকেন্দ্রাবাদের ই-এম-ই সেণ্টারকে ৩-০ গোলে পরাজিত করে পরবর্তী খেলায় মিলিত হবে ইণ্ট্রিগাল কোচ ফ্যাক্টরীর সঙ্গে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবও ওয়েস্টার্ন রেলকে ১-০ গোলে পরাজিত করে কোয়ার্টার ফাইন্যালে উন্নীত হয়েছে। অন্যদিকে বি এন রেল ১-০ গোলে মাদ্রাজ ইঞ্জিনীয়ারিং গ্রুপকে পরাজিত করে কোয়ার্টার ফাইন্যালে বোম্বাই লীগ বিজয়ী টাটা স্পোর্টসের জন্য অপেক্ষা করছে।

সমাচার দর্পণ

ভারতের তরুণ টেনিস খেলোয়াড় জয়দীপ মুখার্জী ইন্দোরে মধ্যপ্রদেশ টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের সিঙ্গলস এবং ডাবলসে বিজয়ী হয়ে দ্বিমুকুট লাভ করেছেন।

* * *

বালি জুট মিল মাঠে বিপুল উৎসাহ এবং উদ্দীপনার মধ্যে হাওড়া জুট মিলস

● দেব মুখার্জি

স্পোর্টস অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীঅশোক সেন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং অতিথিদের দৌড়ে যোগদান করেন।

* * *

বরোদায় অনুষ্ঠিত আন্তঃ বিশ্ব-বিদ্যালয় ক্রিকেট ফাইন্যালে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় ২৬১ রানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে পরাজিত করেছে।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীতুষারকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Thursday, 11th February, 1965 | SAPTAHIK BASUMATI | Regd. No. C 71
Price : 25 Paise | GRAM : "BASUMATI" | PHONE : 34-7771, 72, 73

চ্যবনপ্রাশ

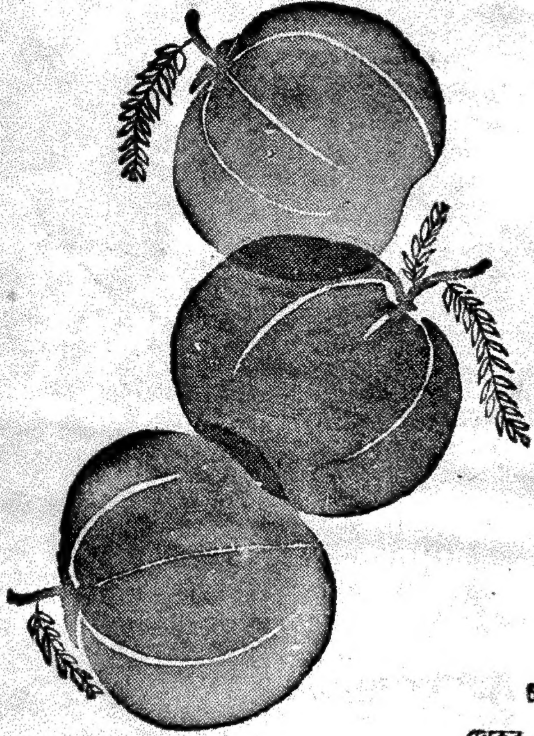

চ্যবনপ্রাশের মূল উপাদান আমলকী দেহের পুষ্টিসাধনে ও স্বাস্থ্যোদ্ধারে আমলকীর অত্যাশ্চর্য্য গুণাবলী সর্ব্বজন বিদিত। এতদ্ব্যতীত, বিশুদ্ধ গব্যঘৃত—কৃষ্ণতিল তৈল, মিছরী ও অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য ও বহু মূল্যবান ভেষজ সংমিশ্রণে ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা আয়ুর্ব্বেদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসায়ন।

সর্দ্দি, কাশি ও স্বরভঙ্গের মহৌষধ

অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ. আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী,
এফ. সি. এস. (লণ্ডন) এম্. সি. এস. (আমেরিকা)
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর কলিকাতা-৪৮

কলিকাতা কেন্দ্র—ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম্. বি. বি. এস. (কলিঃ) আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য।